মূর্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য
রচিত ছিল, আমরা এতদ্দ্বারা
তভাবে [illegible] কর্তব্য পালন
সমর্থ হইয়াছি, আমরা অবশ্য ইহা
করি না। তথাপি বাঙলার বিপ্লবীরা
কে কি দিয়াছে, মাষ্টারদা সূর্য সেন
য়ী সংকল্পশক্তি [illegible] ফাঁসীমঞ্চকে
কাইয়া জাতিকে ১৯ [illegible] আগে যে
য়া গিয়াছেন, সে চিন্তা আমাদের
যে রহিয়াছে, ইহাও সুখের বিষয়।
র এই বিপ্লবী বীর সূর্য সেন
কে কি দিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর
ৎ, প্রাণ দিয়াই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে
এই সত্য তিনি আমাদিগকে শিক্ষা
ছেন। ফলতঃ, হিংসা কিংবা অহিংসার
বিচারের প্রশ্ন এক্ষেত্রে উত্থাপন করা
য়। আদর্শের জন্য প্রাণপাত সাধনার
মূল্য সে বিচারে কিছু কমিবে না,
ইহাই বুঝি। আমাদের
মনে হয় পথের বিচার
য় বজায় রাখা যায় না এবং
খুঁটিনাটি পরিপাটি করিতে গেলে
র ব্যাপক প্রভাবটিই কার্যতঃ ক্ষুন্ন
বৃহৎ আদর্শের আলোক অন্তরকে
উদ্ভাসিত করে, ফলের দিকে লক্ষ্য
থাকে না। প্রত্যুত সাধনা এবং সিদ্ধি
এক হইয়া যায় — এ অবস্থায় জীবন
জীবনকে পাওয়া। আদর্শোজ্জ্বল
বীর জীবনের এমন আত্মদানের
ভয় প্রভাবেই সত্যের ভিত্তি
ভাবের শক্তিতে সমাজ-জীবনে
উঠে এবং মানুষ অন্ধকার
আলোকের রাজ্যে প্রবেশের
য়। এমনভাবে যাঁহারা বৃহদাদর্শের
নিজেদের জীবন বলি দিতে পারেন
র দ্বারাই মানব-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত
সে ধর্মের স্বল্পও মানুষকে মহাভয়
রক্ষা করে। সূর্য সেনকে
র মর্যাদা দিতে হইলে এই দিক
ই তাঁহার অবদানের মহিমাকে
ধ করিতে হইবে। বস্তুত আত্মোৎ-
উদ্দাম প্রতিবেশে তাঁহার জীবনে
র যে প্রাচুর্য উদ্বেলিত হইয়া
ছিল, তাহার শক্তি ঘটনার ক্ষণিকতার
নিবদ্ধ রহে নাই; পরন্তু সে শক্তি
জাতি ও বিশ্বমানবের মনোমূলে
ত্বর বীর্য সঞ্চারিত করিয়াছে এবং
করিতেছে। মৃত্যুকে বরণ করিয়া
সূর্য সেন অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছেন এবং অব্যয় প্রাণধর্মের সঞ্চার-
সামর্থ্য লইয়া আমাদের স্মৃতিতে তিনি
জীবন্ত রহিয়াছেন। আজ দেশ স্বাধীন
হইয়াছে; কিন্তু সেজন্য বাঙলার এইসব
আত্মদাতা বীর-সন্তানদের জীবনাদর্শের
শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, কিংবা
তাহা নিষ্প্রয়োজনও হইয়া পড়ে নাই।
পরন্তু ইঁহাদের ত্যাগপূত জীবনের
স্মৃতির সম্পুটেই স্বদেশের সেবা এবং
স্বাধীনতার জন্য জাতির মর্যাদাবোধকে
জাগ্রত করিবার উপযোগী শক্তি নিহিত
রহিয়াছে। দেশসেবার নামে ক্ষুদ্র স্বার্থের
মোহ আমাদের অন্তরকে আজ আচ্ছন্ন
করিতে উদ্যত হইয়াছে; আমাদের সমাজ-
জীবনে বৃহদাদর্শের সাধনায় প্রাণময়
উজ্জীবন আমরা অনুভব করিতেছি না;
এরূপ অবস্থায় ইঁহাদের জীবন-সাধনার
অন্তর্নিহিত বহ্নিবীজই মন্ত্রমহিমায় আমা-
দিগকে মনুষ্যত্বের পথে উদ্বুদ্ধ করিতে
পারে। সুতরাং ইঁহাদের পবিত্র জীবনের
স্মরণ, মনন এবং তৎপ্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের
সমধিক প্রয়োজন আজ জাতির পক্ষে দেখা
দিয়াছে। এই কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত
হইয়া আমরা বাঙলার এই বিপ্লবী গুরুর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য
নিবেদন করিতেছি।

খাদ্য-সমস্যার সমাধান

নয়াদিল্লীতে দুইদিনব্যাপী বিভিন্ন
প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত
হইয়াছে। সম্মেলনের আলোচনায় প্রকাশ
পাইয়াছে যে, গত বৎসরের চেয়ে বর্তমানে
খাদ্যশস্যের অবস্থা অনেক ভাল। ১৯৫৬
সালের মধ্যে ভারত চাউলের সম্পর্কে
স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইতে পারিলেও অন্যান্য
খাদ্যশস্যের অভাব শুনিতেছি থাকিবে না।
পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিবের মতে পশ্চিম-
বঙ্গের খাদ্যশস্যের অবস্থা এ বৎসর
আশাপ্রদ। চাউলের মূল্য কয়েকটি জেলায়
ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু সাধারণের
ক্রয়-সামর্থ্যের উপযোগীভাবে মূল্য এখনও
হ্রাস পায় নাই। একথা স্বীকার করিতেই
হইবে। ইহা ছাড়া এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন
জেলার মধ্যেই চাউলের মূল্যের কোন
একটা সমতা দেখা যায় না। কয়েকটি জেলায়
চাউল এখনও দস্তুরমত দুর্মূল্যই আছে।
লাভখোর মজুতদারদের কারসাজী এবং
সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাব দুই-ই
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সরকার ইহার
প্রতিকার করিতে পারেন নাই।
দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা
পূর্ণাঙ্গ হইলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের
অভাবই শুধু মিটিবে না, সমগ্র ভারতের
খাদ্যশস্যের ঘাটতিও পূর্ণ হইয়া যাইবে
কর্তৃপক্ষ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।
কিন্তু খাদ্যের অভাবই প্রকৃত সমস্যা নয়।
প্রত্যুত খাদ্যের অভাব না থাকা সত্ত্বেও
এদেশের লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়, এ
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমাদের নূতন নহে।
সুতরাং খাদ্যের অভাব মিটিবার সঙ্গে
সঙ্গে লোকের আয় যাহাতে বৃদ্ধি পায়,
সেজন্য চেষ্টা করাও প্রয়োজন হইয়া
পড়িয়াছে। এদেশের অধিকাংশ লোকই
কৃষিজীবী। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া
থাকিলে ইহাদের আয় বাড়িবে না এবং
খাদ্যে-স্বয়ংপূর্ণতা সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা
থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় অল্প জমিতে
যাহাতে অধিক শস্য উৎপাদন করা সম্ভব
হয়, পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে অবলম্বিত বৃহৎ
বৃহৎ পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ
না করিয়া সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া
দরকার। বলা বাহুল্য, অল্প জমিতে অধিক
শস্য উৎপাদন করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক
রীতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং
সেজন্য অর্থের প্রয়োজন। এদেশের দরিদ্র
কৃষকদের তেমন অর্থ-সামর্থ্যের একান্ত
অভাব রহিয়াছে। সুতরাং সরকারকেই এই
কাজে আগাইয়া আসিতে হইবে। কৃষকরা
যাহাতে সহজে এবং নামমাত্র সুদে ঋণ পায়
এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষকদের
অবস্থার যদি এইভাবে উন্নতি সাধন
সম্ভব হয়, তবে গ্রাম্য জীবন[illegible]রও
অনেকটা উন্নতি সাধ[illegible] হইতে
পারে। প্রত্যুত, উদরা[illegible] যাহারা
অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণ ক[illegible]ইতেছে,
এক খণ্ড বস্ত্র যাহাদে[illegible] তাহাদের
কাছে স্বাস্থ্যবিধির [illegible] বিশেষ
কোন কাজে আসিবে [illegible] বলাই
বাহুল্য। একথা বিস্মৃ[illegible] চলিবে না
যে, অনেক জাতিই য[illegible] নৈতিক
বিপর্যয় ইতোমধ্যেই [illegible] কাটাইয়া
উঠিয়াছে; কিন্তু আ[illegible] তাহা
সম্ভব হয় নাই। [illegible] মানুষ
আমরাও মানুষ। নেতৃ[illegible]মাদের
নাই, অন্ততপক্ষে আ[illegible]ভাবিতে
এবং আলোচনা-গবেষ[illegible] সে [illegible]
পাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে আ[illegible]
ঘটিতেছে সত্যকার বী[illegible]। [illegible]

গ্রামে নিজেদের সাধনার ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবাকে জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপে অবলম্বন করিবেন প্রয়োজন তাঁহাদের। যতদিন ত্যাগপরায়ণ তেমন কর্মীদলের এই অভাব না মিটিবে এবং উচ্চ রাজনীতির বিলাস দূর হইয়া সেবার প্রবৃত্তি আমাদের সমাজ-জীবনে না জাগিবে, ততদিন পর্যন্ত দেশের দুর্গতি দূর হইবার কোন সম্ভাবনা সত্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

পাকিস্থানে ছাত্র-আন্দোলন

কয়েকদিন উপর্যুপরি পাকিস্থানের রাজধানী করাচীতে সাঁঝবাতির রাজত্ব গিয়াছে। পুলিশ এবং সেনাদলের গুলী-বর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে। ছাত্রদের আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়াই এমন বিপর্যয়কর ব্যাপার। বেতন কমাইতে হইবে ইহাই নাকি ছিল ছাত্রদের দাবী। বেতন হ্রাসের দাবী হইতে সহস্র সহস্র ছাত্রের দলবদ্ধ হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ ব্যাপক উত্তেজনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। করাচীর ছাত্রদের এই আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য করিলে ঢাকার কথা আমাদের সহজেই মনে আসে। ঢাকার ছাত্রেরা বাঙলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে দাবী করে। পুলিশ তাহাদের উপর নির্মমভাবে গুলী চালায়। ফলে তরুণদের রক্তে রাজপথ সিক্ত হয়। করাচীতেও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছে। ঢাকার ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের সন্ধান পাইয়াছিলেন, করাচীর ছাত্রদের আন্দোলনকেও তাঁহারা সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এখানেও নাকি কম্যুনিস্টদের উস্কানি ছিল। বাস্তবিক-পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান বহুদূরে অবস্থিত হইলেও করাচী এবং ঢাকার ছাত্রদের এই আন্দোলনের মধ্যে একটা যোগসূত্র রহিয়াছে, অনেকেরই ইহা মনে হইবে। তরুণেরা স্বভাবতই আদর্শ-[illegible]দী এবং ভাবপ্রবণ। পাকিস্থানের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ বিপন্ন ইসলামের দোহাই দিয়া মধ্যযুগীয় সর্বময় কর্তৃত্বের [illegible] নীতি চালাইতে চাহিতেছেন, ছাত্রসমাজ সমস্তটা তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। মুসলমানপ্রধান বিভিন্ন [illegible] প্রগতিমূলক গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। মোল্লাই শাসন-নীতির বিরুদ্ধে তাহাদের চিত্তে বিক্ষোভের ভাব পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানের ছাত্র আন্দোলনের ভিতর দিয়া তথাকার তরুণদের এই মনোভাবেরই আমরা পরিচয় পাইতেছি। ছাত্র বিক্ষোভ ও তাহার দমনে প্রযুক্ত পুলিশের চণ্ডনীতির ফলে করাচীতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করে এবং দস্তুরমত অরাজক অবস্থার সৃষ্টি ঘটে। ইহার ফলে কর্তৃপক্ষ সেনাদলের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রাস্তায় লোক দেখিলেই গুলী করিবার আদেশ দেওয়া হয়। সব খবর অবশ্য পাওয়া যায় নাই, তবে যেটুকু সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কড়া পুলিশী ব্যবস্থায় কিংবা সেনাদলের গুলীর জোরে এই সমস্যার সম্যক্ সমাধান সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে যুগের দাবীকে পশুবলের সাহায্যে রোধ করা যায় না। পক্ষান্তরে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় জাগ্রত জনচেতনা পীড়নের ফলে প্রচণ্ডতরই হইয়া উঠে। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার নীতির মোহ হইতে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়কদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু মোল্লাই দলের যে কূট চক্রের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়াছেন তাহা কাটাইয়া গণতান্ত্রিক উদার আদর্শে রাষ্ট্রনীতিকে পরিচালিত করা তাঁহাদের পক্ষে কতটা সম্ভব হইবে, ইহাও সন্দেহের বিষয়। করাচীর আন্দোলনে যদি তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, তবে বুঝিব যে, তরুণদের আত্মদান বৃথা যায় নাই। তাহারা নিজেদের রক্ত দিয়া এই সত্যই প্রমাণিত করিয়াছে যে, ধর্মীয় আবরণে ফ্যাসিস্ত শাসন চালাইবার দিন শেষ হইয়াছে।

কথা ও কাজ

সম্প্রতি রেঙ্গুনে নিখিল এশিয়া সমাজ-তন্ত্রী সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রাক্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্স সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র হইতেও প্রতিনিধি দল এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সুতরাং আন্তর্জাতিক হিসাবে এই সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার এবং প্রভাব রুদ্ধ করা এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার দারিদ্র্যের প্রশ্নই এই প্রসঙ্গে প্রধানত আসিয়া পড়ে। এশিয়ার অনেক দেশ বর্তমানে [illegible] স্বাধীনতা লাভ [illegible] কতকগুলি স্থানে [illegible] রাজ্যবাদ সশস্ত্র বলবাহন [illegible] হইয়া [illegible] অধিকন্তু যে সব দেশ নীতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, [illegible] উগ্র [illegible] প্রভুত্ব বিস্তারের মোহ [illegible] এখনও ভাঙে নাই। প্রভুত্ত এই বিদ্যমান থাকিতে কম্যুনিজমের [illegible] করা সম্ভবপর নয়। মিঃ রেঙ্গুনের সম্মেলনে ইউরোপ এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দলকে সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আগ্রহ সত্ত্বে চেষ্টা সফল হয় নাই। এশিয়ার [illegible] সদস্য তেমন প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা তাহা ব্যর্থ হয়। ইহার কারণও [illegible] কারণ এশিয়ার নিপীড়িত সমূহের সমস্যাগুলি শ্বেতাঙ্গ [illegible] নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতেছে বস্তুত আদর্শের বড় বড় কথা তাহাদের মুখে শোনা যায়, ফাঁকা। মিঃ এটলী নিজেই কিছুদিন দিল্লীতে তাঁহার বক্তৃতায় কেনিয়া এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের অবলম্বিত সমর্থন করিয়াছেন। কেনিয়া এবং অধিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ; সুতরাং [illegible] স্বাধীনতার জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা [illegible] নীতিবিরোধী তাহারা দস্যু; তাহারা [illegible] বাদী। মালয়ের জঙ্গলে পশুর মত [illegible] খাইয়া মরা এবং কেনিয়ায় ভ্রাম্যমান মঞ্চে ঝুলিয়া পড়িয়া শ্বেতাঙ্গ [illegible] মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখাই এই সব দুষ্কৃত যোগ্য পুরস্কার। এশিয়ায় [illegible] প্রভুত্বের এমন মহিমা প্রচার করিবার সমাজতন্ত্রের আদর্শের যাহারা সামঞ্জস্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য [illegible] বেগ পাইতে হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির হাঁড়িকাঠে তাঁহারা এশিয়ার বাসীদিগকে বাঁধিয়া কম্যুনিজমের রোধ করিতে চাহেন। [illegible] সমবেত সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিবর্গ ফাঁদে পা না দিয়া ভাল করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র এশিয়া [illegible] সাম্রাজ্যবাদীদের মানবতা-বিরোধী বর্বর উচ্ছেদ করিবার জন্য জাগিয়া উঠিয়া সমাজতন্ত্রী দল যদি নিজদিগকে শক্তি এবং সংহত করিতে চাহেন, তবে বর্বরতার উচ্ছেদ সাধনে তাহাদের নীতি আদর্শকে [illegible]

একান্ত শান্তিবাদী তার
যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারি। এক, গত
র সময় আমি যুদ্ধপ্রচারে নিযুক্ত থেকে
অর্থের সদ্ব্যয়ে সহায়তা করেছি যা
। লোকহননে ব্যয়িত হোতো। দুই,
শান্তিবাদী সম্মে-
অধিবেশন হয়েছিল তখন আমি তার
সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেম. তৃতীয় এবং
প্রমাণঃ আমি স্টকহোম 'শান্তি'
নেও স্বাক্ষর করিনি এবং 'শান্তি'
করতে পিকিং বা ভিয়েনাও যাইনি।
, কোনো হাঁস বলতে পারবে না যে
তাকে 'বু' বলেছি। আমি নিজে একা
সবাইকে একা রাখি।

ন্তু তাই বলে শান্তির নামে অশান্তি
যেমন জাতির নামে বজ্জাতি হলে,
াকা দায়। আমি আশা করি যে রাশিয়া
আমেরিকা দুজনেই সমান আন্তরিক-
শান্তি কামনা করেন, কিন্তু চতুর্দিকের
ধ সাক্ষ্য এত প্রবল যে কথাটা পুরো-
বিশ্বাস করতে পারিনে। এঁরা
ই ঠিক করবেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
কিনা, এবং হলে তা হবে। আপাতত
নিয়েছি যে, দুজনের কেউই যুদ্ধ চান
দ্ধে যুদ্ধের পুরস্কার চান। আমরা
যেমন সারা মাস কাজ করতে চাইনে,
মাসের শেষে মাইনেটা চাই। আমরা
ক যেমন নিজ হাতে পাঁঠা বলি দিতে
া, কিন্তু খাবার টেবিলে মাংসটা পেলে
হই। জানি ওটা বিবেকবঞ্চনা, কিন্তু
আর যাই থাক নির্বোধ মোহ নেই.
ন্তি সৃষ্টির অপচেষ্টাও নেই। এটা
া নয়, কিন্তু মন্দের ভালো। অর্থাৎ
াপুরি মন্দের চেয়ে ভালো।

*

বিমিশ্র মন্দ হচ্ছে শান্তিকামনায় চিন্তা-
ান্তি ঘটতে দেয়া, শান্তিবচনে অপরের
চিন্তাবিভ্রান্তি ঘটানো। অধুনাতন
রণ উল্লেখ করব না। মেলা ঝামেলা
। পুরানো একটা দৃষ্টান্ত নেয়া
মঁসিয়ে লির্টভিনফের একটি অতি-
রত বাণী হচ্ছে এই যে, 'শান্তি
ভাজ্য।' অর্থাৎ বিশ্বের একটা
শান্তি বিরাজ করবে, আর অন্য
না অংশে যুদ্ধ, এ হতেই পারে না।
র কথা। মহতী প্রেরণা। উচ্চ আদর্শ।
আসলে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন

বিকল্প

রঞ্জন

এবং আসলে যা তাঁর বলা উচিত ছিল, তা হচ্ছে এই যে বিশ্ব-শান্তি অবিভাজ্য হলে ভালো হয়, যে বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করলে মানবজাতি যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। আমার টাকা থাকা উচিত, আর আমার টাকা আছে—এ দুটো যেমন এক কথা নয় তেমনি শান্তি অবিভাজ্য আর শান্তি অবিভাজ্য হওয়া উচিত এ দুটোও এক কথা নয়। একটা প্রশংসনীয় বাসনা, আরেকটা শোচনীয় ঘটনা। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর এক জায়গায় শান্তি ছিল, আরেক জায়গায় ছিল না। শান্তি অবিভাজ্য বিবেচনা করে স্টালিন তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তিনি জানতেন যে শান্তি বিভাজ্য। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ওয়েন্ডেল উইলকির বহুঘোষিত কথাঃ পৃথিবী এক। আদৌ নয়। আমি যখন শুধু চালের মধ্যে কাঁকর পাই, তখন উইলকির দেশের ডাস্টবিনে অভুক্ত সাদা রুটির স্তূপ। কে বলেছে পৃথিবী এক? লির্টভিনফ জানতেন, উইলকিও জানতেন, অন্তত দুজনেরই জানা উচিত ছিল যে ইচ্ছা এক কথা, সত্য আর। রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করলে কী হয় হিন্দু মায়াবাদী তা

লক্ষবার বুঝিয়ে বলেছেন। সর্পকে রজ্জু বলে ভ্রম করা আরো ভয়ানক খেলা।

*

সম্প্রতি দিল্লীতে বিশ্বশান্তি স্থাপনে গান্ধিবাদের প্রয়োগপদ্ধতি আলোচনা করতে নানা আন্তর্জাতিক দার্শনিক সমবেত হয়েছেন। ভবিষ্যতের আলোচনার জন্যে প্রথমে চাই অতীত ও বর্তমানের সঠিক বিশ্লেষণ। সমস্যাটাই যদি অসাধুতা বা মোহের বশে ভুলভাবে বিবৃত হয় তাহলে সঙ্গে সমাধান সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। ভুল সূত্র বা ভুল যুক্তির ফল ভুল সিদ্ধান্ত না হয়ে উপায় নেই। এই অমোঘ আইন শুভেচ্ছার আবরণে চাপা থাকতে পারে, আদর্শবাদের রঙীন কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে ফলটাও লোভনীয় মনে হতে পারে; কিন্তু আদর্শ তাতে এগিয়ে আসে না, আরো পিছিয়ে যায়। কণ্ঠে ধারণ করলেই সর্প যেন পুষ্পমাল্যে পরিণত হয় না।

আলোচনার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছোবার, আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার উপায় নির্ধারণে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে পণ্ডিতজী যা বলেছেন তার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সাধু কিন্তু ওই যে বলছিলেম, এখানেও বাসনা ঘটনার ছদ্ম-বেশে বিচরণ করছে, ইচ্ছা সত্যের মুখোশ পরেছে। পণ্ডিতজী আবার বলেছেন যে, যুদ্ধের দ্বারা কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। আমি বলি—হয়, পণ্ডিতজী Zানতি পারেননি। যদিও মানি যে, হওয়া উচিত নয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সমস্যা ছিল কাইজারের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি খর্ব করা। চার বছর ধরে তার পরে যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। কাইজার নির্বাসনে কাউকে শোকে না ভাসিয়ে পরলোকগমন করেছেন। জর্মনীর ক্ষমতা সীমিত হয়েছে। ফ্রান্স পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। য়ুরোপ দীর্ঘ পঁচিশ বছর শান্তিতে না হোক, যুদ্ধহীনভাবে কাটিয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরেজের সমস্যা ছিল হিটলারের ভয়াবহ প্রসরণ ব্যাহত করা। যুদ্ধে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

*

প্রতি যুদ্ধেরই উ[illegible] দ[illegible] বা দুটো সমস্যার সমাধান যু[illegible] করলে সে সমাধ[illegible]স। য [illegible] সর্বমানবের [illegible] নয়, তার কাছে তা আ[illegible] করাই ভুল। সব রোগ সারে লোক্যাল ট্রেনের ফিরিওয়ালা [illegible] ওষুধে। বাকি সব ওষুধের উদ্দেশ্য [illegible] বা দুটো ব্যাধির আরোগ্য। তা-ও [illegible] জীবনের জন্য নয়। তাই বলে কি [illegible] ওষুধে কখনো কোনো রোগ সারে না[illegible]

আবার বলছি, আমি যুদ্ধ ঘৃণা [illegible] কিন্তু প্রশ্নটা সত্যের, আর দৃষ্টিভঙ্[illegible] কোনো দেশনায়ক যদি মনে করেন যে, [illegible] দায় বিপুলা পৃথ্বী নিয়ে ও [illegible] নিরবধি কালের প্রতি—তাঁর স্বদে[illegible] স্বকালের প্রতি নয়—তাহলে তিনি [illegible] ভ্রষ্ট হয়েছেন এমন আশঙ্কা করা অ[illegible] নয়। কর্মীর কাজ ইহকাল ও ইহ[illegible] নিয়ে। চরাচর ও চিরন্তনী ভাব[illegible] ভাবনা। শরীর যে জীর্ণবাস মাত্র, এ[illegible] দার্শনিকের কাছে শুনব। কিন্তু আ[illegible] ডাক্তারের কাছে দাবী করব ব্যাধিম[illegible] বর্তমান যন্ত্রণার আশু আরোগ্য।

মাম্বালাম

নির্মলেন্দু মান্না

পাহাড় মাম্বালামের শীর্ষে ঈশ্বর বিষ্ণুকেশবের জীর্ণ মন্দির।

এ-মন্দিরে গ্র্যানাইটের গোপুরম্ নেই, পরিক্রমা পথ নেই, সপ্ত প্রস্তরের বেষ্টনী নেই। এর দুয়ারে পৌঁছতে হলে অঙ্গন ও নবরঙ্গ অতিক্রম করতে হয় না। এ-মন্দিরের মসৃণ গাত্রে অলঙ্কারভূষিতা কোন দেবীর মোহন মূর্তি নেই। এ-মন্দির সম্মুখে উহ্য রয়েছে সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজ-স্তম্ভ, শীর্ষ থেকে অদৃশ্য হয়েছে স্বর্ণকলস। কোন চোলরাজ রাজ-রাজেন্দ্রের কাঞ্চী বিজয়ের কাহিনী আবিষ্কৃত হয়নি এর শিলাগাত্রে। এ-মন্দিরের সম্মুখে কোন টেপাকুলাম নেই, অর্থাৎ কুণ্ড নেই, কুণ্ড মধ্যে বিহারক্ষেত্র নেই। দাক্ষিণাত্যের দেব-মন্দিরগুলির অতুলনীয় ঐশ্বর্য, অভিরাম আভিজাত্য এবং প্রার্থনা পূরণ-মাহাত্ম্য একে স্পর্শ করেনি। তাই এ-মন্দির দুয়ারে পৌঁছবার পায়ে-চলা পথের শীর্ণ রেখাটি দূরান্তের তীর্থযাত্রী, একান্তের ভক্তবৃন্দ এবং পূজক পুরোহিতের অভাবে ক্রমশ ঘাসে এবং ঘন বনে অবলুপ্ত হয়ে এলো।

পাহাড়তলিতে যখন অন্ধকার নামল, সমুদ্রগর্ভমগ্ন কোন শৈলগুহার মত অন্ধ-কঠিন নিঃশব্দতায়, যখন শুক্ল তৃতীয়ার বিশীর্ণ বঙ্কিম শশিকলায় সূর্যজ্যোতি প্রতিবিম্বের ক্ষীণ উদ্ভাসন জাগল নীলতনু পূর্ব দিকচক্রে, তখন সেই বিলুপ্তপ্রায় পথের ইঙ্গিত বেয়ে বেয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়ের ওপর উঠে এলো, কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হলো। বন্ধ মন্দির উন্মোচিত হলো তার দুর্বল করাঘাতে, অশক্ত অসমর্থপদে সে প্রবেশ করল অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভমন্দিরে, অশান্ত উদ্বিগ্ন আবেগে লুটিয়ে পড়ল প্রস্তর-বেদীর সম্মুখে, এ আমার অপরাধ—অপরাধ—আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর।

গর্ভগৃহের নিরবলম্ব শূন্যতার মধ্যে নিরাবয়ব তমিস্রার মধ্যে ওই দীর্ঘ উক্তি আক্ষেপ অদৃশ্য আবর্ত রচনা করল বারংবার, আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর—এ আমার অপরাধ—অপরাধ—

কয়েক মুহূর্ত অতিক্রমিত হলো, ধীরে ধীরে উঠে বসল সে, মুহ্যমান তার ভঙ্গী, মজ্জমান তার চাহনি, দেবতার নাতিউচ্চ বেদীকে সে আলিঙ্গন করল, বেদীপ্রান্তে মাথা রাখল, ব্যগ্র অঙ্গুলি রেখায় অন্বেষণ করল দেবতাকে, পাথরের বেদীর ওপর দেবতাকে পেল না কোথাও, শুধু করল বেদীপার্শ্বের মন্দির অলিন্দে এক সাধক মূর্তিকে। সে যেন করল, যদিও এ-মন্দিরে বিষ্ণুকেশ যদিও বিষ্ণুকেশব স্থানান্তরিত হ অন্যত্র, তবু এ-মন্দির শূন্য নয়, শূ তাঁর শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মশোভিত হ মূর্তির অনুপস্থিতিতে।

সে যেন অনুভব করল ভক্তের উপ তিনি এখনো প্রস্তরীভূত হয়ে কর উপবিষ্ট রয়েছেন দেবতার পার্শ্বে, তাঁর চোখে পলক পড়েনি, ভক্তিনম্র চ ভেতর থেকে বিনষ্ট হয়নি ঈশ্বর-বি দেবতার মূর্তিটি শুধু গিয়েছে চলে, রয়ে গেছেন সাধকের সাধনায়, দেবত গেছেন বেদীতে অলিন্দে, তাঁর নেমেছে মন্দিরের প্রতি পরমাণুতে।

ঈশ্বর বিষ্ণুকেশবের উদ্দেশে বার প্রণাম করল সে, এ-অপরাধের কি মা নেই ঠাকুর, এ-পাপের কি ক্ষমা নেই কি ক্ষালন হয় না শত প্রায়শ্চিত্তেও?

বেদী আঁকড়ে ভয়ার্ত নিরাপদ হয়ে বসে রইল।

সেই যে সকাল বেলায় বেরিয়েছিল কি জ্বালায়, ক্ষিধের জ্বালায় মাম্ব পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে আর বিনীতভাবে বলেছিল, একটা দিতে পারেন স্যার, সেই কথা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সাদার্ন রেলওয়ের মেন লাইনে পড়ছে, ছোট ছোট পাহাড় মেশি আক্রমণে সমভূমি হয়ে যাচ্ছে, মিটার গে দুপাশে জমছে তীক্ষ্ণকোণ কালো ব পাথরের স্তূপ। চাহিদার মুখে মাম্ব

...মানি একটি নিঃশব্দ বলি। সকলে ... হয়ে অপেক্ষা করছে, কবে ...ড় দুঃস্বপ্নের মত মুছে যাবে ...ী থেকে, উপনগর মাম্বালামের ...রণ ঘটবে, আরো নতুন বাড়ি, মাদ্রাজ ...লির আরো নতুন বাসিন্দে, স্থলচর ...র আরো একটু অন্ধকার বিস্মৃতি। ...ত মন্দিরের দিকে তাকায় আর হাসে, ...দরকে দেবতা পরিত্যাগ করেছেন, ...দরকে ইতিহাস এবং তীর্থযাত্রী ...গ করেছে, সে-মন্দির তাদের কাছে ...বৃহৎ উপহাস মাত্র।

...রের ভেতর শুধু ভক্ত বসে থাকেন, ...ত পাথরের সাধক, এ-উপহাস তাঁর ...পৌঁছয় না।

...াপদ তাঁর মসৃণ বাহু দুটি স্পর্শ ... বলল, আমার হয়ে তুমি প্রার্থনা ...ঠাকুরের কাছে, বোল, নিরাপদ সব ... পারে, শুধু ক্ষিধের জ্বালা সইতে ...না।

...লজ্জা—কী কুণ্ঠা, যখন ম্যানেজার ...স করল তার পরিচয়। কি কথা আজ ...সে! নিজের কোন পরিচয় উদ্ঘাটিত ... অপরের আনবৃত প্রশ্নের সম্মুখে। ...বলতে হল সব কথা। সে এক করুণ ...াস। সৈদাপেটের বাঙালী ব্রাহ্মণ ...রের কাহিনী। চাকরী জোটে না ...ও। অভাবী সংসারের চারদিকে ...কার পড়ে যায়। মান-মর্যাদা ধুলোয় ...ত হয়। অশিক্ষিত নিরাপদ পথে নামে। ...উ তাকে বাধা দেয় না। অক্ষম বৃদ্ধ ... নীরবে বসে থাকেন, বৃদ্ধা মা কী ... প্রার্থনা করেন অস্ফুট কাতর কণ্ঠে, ...ায়া স্ত্রী শুধু বলেন, এর চেয়ে পথের ... হওয়াও ভালো।

...রিয়ে আসবার আগে সে শুধু একবার ... পিতামহকে স্মরণ করে। কী অসীম ...য় তুমি বাঙলা ছেড়েছিলে, পঞ্চাশ ... আগে কি অসম্ভব সুলভ এবং সহজ ... চাকরী পাওয়া আর প্রবাসী হওয়া। ... একবার স্বর্গ থেকে তাকিয়ে দেখো, ...ার এক মূর্খ বংশধর আজ আবার— ...র তোমার মত ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়ে ...। তুমি বেরিয়েছিলে ভাগ্যকে পরীক্ষা ...ত আর নিরাপদ ঘর ছাড়ল সবায়ের ...—নিতান্তই দুমুঠো অন্নের সন্ধান ...ত।

...ন সে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে-

লাল, তিরিশোত্তর বলিষ্ঠ বলদৃপ্ত দেহ ঈষৎ নত হয়ে পড়েছিল সামনে, কপর্দকহীন সার্টের নীচে ক্ষুধার আক্রমণ মনে হচ্ছিল কঠিনতম কোন রোগ যন্ত্রণার মত, তখন সে ছুটে এসেছিল আর বলেছিল, আমি রাজী।

তার আগে কতবার তার সংশয়ভীরু পদচিহ্ন পিছু হটে এসেছে, সে কি পারবে, এ-কাজ সে কি পারবে, কতবার তার মন মথিত মর্মরিত হয়েছে যন্ত্রণায়, নির্বাপিত নিরুক্ত হয়েছে অনৌৎসুক্যে, কিন্তু তারপর যখন জন্তুর হিংস্র আক্রমণের মত মরণসন্ধানী ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছে, পরাহত, পরাভূত হয়েছে নিজের কাছে, উৎকণ্ঠিত হয়েছে আপন ভবিষ্যৎ এবং ফেলে-আসা প্রিয়জনের দুর্দশার কথা ভেবে, তখন সে মাম্বালাম পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে মন্থরগতিতে।

তারপর সে ডিনামাইটের পলতেয় আগুন দিল, নিজের চোখে দেখল তার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত রুদ্র বিস্ফোরণ, ম্যানেজারের কাছ থেকে জানল, এবার থেকে ওই হোল তার কাজ, তার করণীয়, আরো জানল, তারই আঘাতে এ-পাহাড় পাথর-কুচি হয়ে যাবে, মন্দির হয়ে যাবে ধূলিরেণু, আর বিনিময়ে সে পাবে বাঁচবার অধিকার, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাঁচবার দুরূহ অধিকার, ক্ষুধার লেলিহান আক্রমণ থেকে মুক্তির সনদ।

মাম্বালামের শান্ত উপত্যকার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে সে মধ্যাহ্ন ভোজন করল, সকলের প্রশংসা শুনল, এমন সুদক্ষ কর্মী নাকি তারা দেখেনি, সেই শুনে সে মনে করল প্রত্যেকবার পলতেয় অগ্নিসংযোগ করবার সময় নিজের মৃত্যু-আশঙ্কায় কি নিদারুণ দুর্বল হয়ে পড়ে সে, সেই মনে করে একটু হাসবার চেষ্টা করল, বাকী সর্বক্ষণ দূরে মন্দির চূড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর অন্ধকার নামল উপত্যকায়, সন্ধ্যায় আচ্ছন্ন হল মন্দির। শঙ্খের মত উচ্চগ্রামে সুর তুলে এলোকেশী রেল ছুটে গেল শহরছাড়া হয়ে, মাম্বালামকে ঘিরে কফিনের স্তব্ধতা এবং বিষণ্ণতা উঠল ঘনিয়ে। কাঁপতে কাঁপতে নিরাপদ পাহাড়ে উঠে গেল, কম্পিত করাঘাতে দুয়ার উন্মুক্ত করল, কোনক্রমে ভারী পাথরের মত টলতে টলতে বেদীর সামনে লুটিয়ে পড়ল।

তার সচকিত কাতর আক্ষেপ উক্তিতে গর্ভমন্দিরের নৈঃশব্দ বিদীর্ণ হয়েছে, ...

মত ম্লানায়মান অনুজ্জ্বল ক্রন্দনের রেশটুকু ঊর্ধ্বে সঞ্চারিত হচ্ছে, নিরাপদ সব সইতে পারে, শুধু ক্ষিধের জ্বালা তার সহ্য হয় না।

স্বর্ণাভ ধূসর সন্ধ্যা নিকষ কালো রাত্রিতে পরিবর্তিত হতে চলল, মন্দিরের ভেতর আলো হাতে উঠে দাঁড়াল নিরাপদ, ঘুরে ঘুরে সে দেয়াল দেখলো, অলিন্দ দেখলো, স্তম্ভের চারপাশে বাতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিল্পকর্ম দেখলো, দরজায়, প্যানেলে, সার্দালে আলো ফেলে ফেলে পাগলের মত বিস্ফারিত নয়নে অতি সূক্ষ্ম নক্সার কারুকাজ দেখলো। সবশেষে বসে পড়ে দুই হাতে চোখ ঢাকলো। আছে —আছে এ-মন্দিরের ঐশ্বর্য আছে, ইতিহাস আছে, আবার আবিষ্কৃত হবে শিলালিপি, আবার আগমন হবে তীর্থ-যাত্রীর, জীর্ণ মন্দিরের গায়ে গায়ে আবার লাগবে দেব মাহাত্ম্যের রঙ।

দেবপীঠের আসনের চতুর্দিকে যে 'প্রভাস' রয়েছে, তার ওপর অশ্রুঅন্ধ দৃষ্টি ফেলে ফেলে নিরাপদ অনুভব করল কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য লতাপাতা ও পুষ্প-সদৃশ কারুকার্যের মধ্যে উৎকীর্ণ রয়েছে। দেখলো আর দেবপীঠ স্পর্শ করে বললো, আমি তোমাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করব, ঈশ্বর বিষ্ণুকেশবের পাদস্পর্শ আবার নামবে তোমাদের শিরে।

এই কথা সে উচ্চারণ করল আর নত হয়ে দেবপীঠের এক কোণায় তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করলঃ

ক্রিস্তু পেরেন্দু ৯৮৫ ভারুডায়াল ভারাইল মানিদারগাল কুরায়াল সৈদা মূর্তি-গালাই ভালিপটু ওয়ান্দারগাল। পেরে গেল তাম্বিরাথিল সৈদ। মূর্তিগালাই ভাঞ্চপাড়া আরম্বিত্তারগল। আপ্পরিপাট্টা ইঙ্গিরিন্দা মূর্তিইয়ানা বিষ্ণুকেশব ক্রিস্তু পেরেন্দে ১৮৫০ ভারুডাম নভেম্বর মাসমু ইরেণ্ডান্তেদি কুরুক্কাল কানাভিল তোনড্রি তান্নাই পল্লাভারমথিল। উল্লা কেশব কৈলিল কণ্ডু ...তে আগে ভরি পাডুমুবডি সোন্নার।

অর্থাৎ, এখানে যিনি ছিলেন, তিনি অচল নন। ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজ-রাজ নামে চোল রাজার রাজত্বকাল হতে বিষ্ণুকেশব 'চলম্' অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। এক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রধান পুরোহিত ১৮৫০ সালের ২রা নভেম্বর বিষ্ণুকেশবের তাম্র মূর্তিকে পল্লভরমের কেশব মন্দিরে স্থানান্তরিত করেছেন।

এ-সংবাদ তৎকালীন প্রধান পুরোহিত কর্তৃক শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হল।

একথা মিথ্যা। এ-স্বপ্নাদেশ সত্য নয়। চতুষ্পার্শ্বের ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিরাপদ অনুভব করলো, কি অবিশ্বাস্য অর্থলালসার কাছে আত্মবিক্রয় করে মিথ্যা প্রচার করেছিলেন পুরোহিত। নিরাপদ মনে মনে বললো, এই অচল আসনে ঠাকুর আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন, আমিই—আমিই করব সেই কাজ।

শেষ প্রণামটি সেরে নিয়ে মন্দির ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। অক্টোবরের বর্ষা নেমেছে মাদ্রাজের আকাশে, মাম্বালামের শিরে জমছে উড়ে-আসা মেঘের টুকরো অংশ। পাহাড়ের গায়ে ট্রলি লাইনটা বিষদন্তী সরীসৃপের মত অকাতর শীত-নিদ্রায় নিথর হয়ে আছে, তার পাশে পাথর চূর্ণ করবার কাশার মেশিনগুলি পাহাড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে শিকার-সন্ধানী চিতার মত গুঁড়ি মেরে পড়ে আছে।

আরো নীচে, পাহাড়ের ঢালু সানুদেশে কুলি-কামিনের পাতা-ছাওয়া কুটীরের সারি। সেখান থেকে আর আলো, ধূম এবং গ্রাম্যসংগীত নির্গত হচ্ছে না। তারও পরে ম্যানেজারের সুদৃশ্য তাঁবু, যেন শ্বেত-কপোতী দুই ডানার কবোষ্ণ আশ্বাস মেলে ধরেছে।

সেখানে এখনো আলো জ্বলছে, আর আলো জ্বলছে রেল লাইনের ধারে মাদ্রাজ-গামী প্রসারিত পথের ধারে ধারে, পথের ওপাশে মাম্বালাম জনপদের ছোট ছোট ছবির মত সাজানো বাড়িগুলিতে।

অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে নিরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এক-পা এগোলেই মৃত্যু ছিল অবধারিত। সে দাঁড়িয়ে রইল, কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল, পলকহীন চোখে কতক্ষণ সে দেখল, এ-পাহাড়ের কতখানি সে ধ্বংস করেছে, আর ক'দিন পরে এ-পাহাড় নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যাবে তার হাতে, খাড়াই গ্র্যানাইটের একশ' ফুট উঁচু শীর্ষে দাঁড়িয়ে সে সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করল—নীচের কালো কালো পাথরগুলো শ্মশানের ভস্ম অবশেষ চিতাভূমির মত কি ভীষণ অবসন্ন মৃত্যু-শয্যা রচনা করেছে!

দুঠেনের আলোয় অন্য পথ ধরে ধরে মৃত্যুভীত নিরাপদ নীচে নামতে লাগল।

* * *

পরের দিন সকালে সে আবেদন-পত্র হাতে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াল, গেল তাল-পাতার কুটীরে কুটীরে, গেল ছবির মত সাজানো বাড়ির দোরে দোরে, সই নিল, মতামত নিল, সই যারা দিতে পারল না, তাদের আঙুলের ছাপ নিল, তাদের উৎসাহিত করল, বুঝিয়ে বলল, কেন তার এই আবেদন।

সকলে নির্বাক হয়ে শুনলে, অবাক হয়ে জানলে, ঐ মন্দির হাজার বছরের প্রাচীন, ওর অন্ধকার গর্ভগৃহে রয়েছে হাজার বছরের অনাবিষ্কৃত ইতিহাস, ওর অচল বেদীর ওপরে জমেছে শত বৎসরের সঞ্চিত প্রতারণা।

তাই সে আবেদন করছে সরকারের কাছে, তাই সে আবেদন করছে জনগণের নামে, যত শীঘ্র সম্ভব, সম্ভব হলে আজই কিংবা আগামী কালই এ-মন্দিরকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হোক, এ-মন্দিরের দেবতাকে পুরোহিতের লালসা থেকে মুক্ত করা হোক, উদ্ধার করা হোক এ-মন্দিরের অবলুপ্তপ্রায় ইতিহাসকে।

খামের ওপর বড় করে লেখা হল, টু দি হেড অব দি আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট অব মাদ্রাজ। দুপুরের ডাকে পাঠানো হল সেই আবেদন-পত্র। তারপর সে অনিচ্ছুক পা দুটোকে টেনে টেনে ম্যানেজারের তাঁবুতে প্রবেশ করল।

ম্যানেজার এস নাগোজী রক্তচক্ষু মেলে তাকালেন তার দিকে, ভেলিলে পডা, তিরুটু পাইয়ালে, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

আপ্পডিছোম্রাদিইরগল, সার, না-না, ও কথা বলবেন না স্যার, হাত জোড় করল নিরাপদ, না খেতে পেয়ে মরে যাব, আমার স্ত্রী-পুত্র কেউ বাঁচবে না।

কোন কথা নয়, লাফিয়ে উঠলেন নাগোজী, আমি সব খবর পেয়েছি, তুমি রেলওয়ের কাজে বাধা সৃষ্টি করবার মতলবে এসেছ।

মাথা নীচু করল নিরাপদ।

কাছে এগিয়ে এলেন নাগোজী, পারবে? আজ সন্ধ্যের ভেতরেই চাই পাথরগুলো গান পাউডার দিয়ে ফাটিয়ে তার ভেতর রাস্তা করে নিয়ে তোমার ওই একশো ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে ঠিক পঁচিশ ফুট নীচুতে দুটো গর্ত করে আসতে পারবে? কোম্পানীর যে কত তাড়া, তা যদি তুমি জানতে—

একসঙ্গে প্রচুর কথা বলে—না[...] হাঁফাতে লাগলেন।

অদ্ভুত ভীত দৃষ্টিতে মুখ তুলল [...] বলল, পারব।

নাগোজী হাসলেন, এনাক্কু তে[...] উন্নাল তান মুডি ইয়ুম ইয়েণ্ড্রু, জানতুম, এ-কাজ একমাত্র তুমিই পার[...]

থামলেন নাগোজী, [...] উঠলেন, খুব সাবধান, প্রায় পঁচাত্ত[...] উঁচুতে উঠছ, পাথরের ওপর পা [...] গেলে হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে, রিস্কের জন্যে তোমাকে অবশ্যই এক্সট্রা রেমুনারেশন দেওয়া হবে।

নিরাপদ শুধু বললে, পারব। পাউডার আর ড্রিলিং যন্ত্র হাতে [...] পাহাড়ের যে দিকটা পাথর কেটে [...] ফলে নগ্ন এবং প্রায় খাড়াই, সেই [...] এগিয়ে চলল সে।

তারপর যখন অন্ধকার নামল ম[...] শিরে, মাম্বালামের ছবির মত [...] জ্বলল আলো, দূর পাহাড় সান[...] স্যানাটোরিয়ামে প্রতীক্ষাম্লান জ[...] সঞ্চয় থেকে নিঃশেষিত হল আর [...] কড়ি, মৃত্যুপাণ্ডুর ওষ্ঠের মত [...] চতুর্থীর চাঁদ বঙ্কিম রেখায় অঙ্কি[...] পূর্ব দিগন্তে, তখন ডুবন্ত জ[...] বিপুল অসহায়তা নিয়ে নিরাপদ টলতে ওপরে উঠে এলো।

ঠাকুর—ঠাকুর, তুমি তো জান, [...] সব সইতে পারে, শুধু ক্ষিধের সইতে পারে না, দেবপীঠের সাম[...] বলিষ্ঠ দেহ আছড়ে পড়ল।

সমস্ত প্রার্থনা ছাড়িয়ে পাহাড়ে[...] অক্ষিকোটরের মত দুটি ছিদ্রের ক[...] মনে বিভীষিকার মত জেগে রইল। কেবলি মনে হতে লাগল, একটা ধ্বংসস্তূপের ওপর সে বসে আছে রাক্ষস করোটির মত এই পাহাড় অন্ধ অক্ষি-রন্ধ্রের বিস্ফারিত অগ্নি[...] একদিন আত্মঘাতী হবে, আর তা[...] হয়ে থাকবে সে নিজে।

ধীরে ধীরে এক ঝলক আর্দ্র[...] বাতাস মন্দিরের ভেতর প্রবেশ [...] মাম্বালামের আকাশে জমল অ[...] উদ্বিগ্ন মেঘ, দূর বিজনপদের [...] এগিয়ে এল কায়াহীন দানবের মত, চমকিত হল আকাশের গুরু[...] বিস্ফোরণে। অস্তিত্বের সীমায় দ্ব[...] এতদিন আবদ্ধ ছিল,

ন্ত্যুর। দ্বারা যা অনাদ্যন্ত লেছে সেই জীবন মৃত্যু সন্ধিস্থলের উচ্চ চূড়োর ওপর মন্দিরের তি কল্পনা করে নিরাপদ বার বার ত হল।

ম নিশ্চিত বিলুপ্তির মর্মভেদী া থেকে এ মন্দির উদ্ধারের আশা এ মন্দিরের গর্ভ গৃহে মৃত্যুর ত হয়েছে. একটি প্রবল আকর্ষণে এ ধীরে ধীরে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে । এর জন্যে সমাজ চিন্তিত নয়, দ্বিগ্ন নয়, পল্লভরমের পুরোহিত রের দেবতাকে দুই হাতে আগলে সেখান থেকে দেবতার উদ্ধার র অনিশ্চিত, অনির্ণেয়। মানুষের স্কতা এবং ঐতিহাসিকের নোর যোগে যে মন্দিরের ধ্বংস র্ণ হয়ে উঠল—কেন—কেন নিরাপদ তু হয়ে রইল. ইতিহাসের এ কোন কৌতুক, বিধাতার এ কোন জ্বালাময় স!

দাঁড়াল নিরাপদ, আলো ধরে ধরে সে মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত চিত্রের হিত অর্থ খ‍ুঁজে বেড়াল, আবার সে করল এ মন্দির মৃত্যুর আগে ক উদ্ঘাটিত করুক ইতিহাসের যদি সম্পদ লুকোনো থাকে তবে তা লের জন্যে বহন করে নিয়ে যাবে দ। আর—আর যদি কোন গুপ্তলিপি তে হয়, কোনো চাঞ্চল্যকর তথ্য, র অন্ধ দৃষ্টিকে মন্দিরতল অবধি ত করবার কোনো অব্যর্থ মুষ্টিযোগ নরাপদ তাও নিয়ে যাবে আজকের সন্ন বর্ষার রাত্রিতে।

য় চেয়ে যখন তার চোখের তারা দুটি হয়ে এল তখন ইতিহাসের বিস্মৃত লি একটি অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশের করল তার মনের মধ্যে...নবম শতাব্দীর ভাগে চোলদিগের সহিত সংঘর্ষের পল্লবগণের পতন...কল্যাণের পরাজিত ক্যর প্রতি রাজেন্দ্রচোলের পশ্চাদ্ধাবন দেশের গঙ্গাতীরে তাঁর অমিতবীর্য াহিনীর আগমন...রাজ রাজের পুত্র দ্র চোল কর্তৃক 'গঙ্গাইকোণ্ড'—বিজয়ী' উপাধি ধারণ. বাঙলাদেশের সুদূর দাক্ষিণাত্যের এক ঐতিহাসিক গ—না-না-না, এ পাথরের লয়-ক্ষয় ইতিহাসের হাতে এ মন্দিরের মোক্ষ-ঘটেছে। ঈশ্বর বিষ্ণুকেশব আবার স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হবেন। এক মহা-প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্পদে সমৃদ্ধ নিরাপদ নীচে নেমে এল।

ম্যানেজারের তাঁবুতে প্রবেশ করল সে।

এন্না সমাচারম্? নাগোজী এগিয়ে এলেন, কি খবর?

তামিল ভাষায় উত্তর দিলে নিরাপদ, নালাই ইয়া দিনম মাত্তিরম ভিড়ুমরাই ভেন্ডুম। কালকের মত ছুটি দিতে হবে।

কারণ?

নিরাপদ নিরুত্তর।

হিসেব করলেন নাগোজী, যা পাথর আছে তাই ভাঙতে সারাদিন লেগে যাবে। বেশ. তুমি বেতনহীন ছুটি পাবে কাল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল নিরাপদ, একবার তাকালো শুধু আলোজ্বালা পথের দিকে। ইতিহাস রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাজদূত কি আসবে না ওই পথ দিয়ে?

পরের দিন সকালে সে নিজের পুঁটলিটি নিয়ে পল্লভরমের দিকে যাত্রা করল।

শিয়রে সূর্য নিয়ে গ্রাম পল্লভরমের একাংশে অবস্থিত সেই অতি নিভৃত নির্জন মন্দির দুয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হল সে। কোনোদিকে চাইল না, একাগ্র অভিবিষ্ট প্রাণ তার 'সুখনাশী' অতিক্রম করে মন্দির দুয়ার পেরিয়ে আঁধার 'আদিতামে'র দিকে ছুটে গেল। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়ে সে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে উঠল, স্বামী নান্ তাঙ্গাড়াই থিরুইমববুম পাড়াইয়া ইডাতুক্কু এড়েত্তুচ্ছেল্লে ভিরুম্বুগিরেন।

করজোড়ে মুদিত নয়নে কতক্ষণ সে বসে রইল, মনে হল, তার এই নিঃশব্দ ভঙ্গকারী বাণী উচ্চারণে এখানের সমস্ত ভক্ত পুরোহিত সেবাইতের মধ্যে কোলাহল কলরোল পড়ে যাবে। তার কাছে সবাই ছুটে আসবে, জিজ্ঞেস করবে, কি, কি বললে?

সে তখন আর একবার বলবে, ঠাকুর, তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

কিন্তু কেউ এলো না। ক্লান্ত চোখ তুলে নিরাপদ তাকাল চতুর্দিকে, মন্দির সম্মুখের রৌদ্রতপ্ত অঙ্গন পেরিয়ে কাউকেই আসতে দেখল না সে।

তবে কি এ মন্দিরে পুজো হয় না? তবে কি বিষ্ণুকেশব আজও অন্নভোগ থেকে বঞ্চিত? সেই যে মাম্মালামের শীর্ষে কি এক অশুভ তারকার জন্মলগ্নে তাঁর দীপ নিভে গিয়েছিল, আরতি স্থগিত হয়েছিল, স্তবপাঠ স্তব্ধ হয়েছিল. সে আঁধার, সে অর্চনা, সে মন্ত্রগাথা আর কি অগ্নিসংযুক্ত, পুনরারম্ভ, পুনরুচ্চারিত হয়নি? তবে কি স্বপ্নাদিষ্ট পুরোহিতের বংশধর ব্যর্থ হয়েছে ভক্ত, তীর্থযাত্রী এবং সেবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে?

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে দেউড়ি থেকে নেমে এল নিরাপদ। সম্মুখের তপ্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তাকাল সম্মুখে। অনেক দূরে পুরোহিতের জীর্ণ কুটির স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে।

বিশ্রাম সে নিল না, বিশ্রাম নেবার কথা তার মনে এল না। শুধু আর একবার সিঁড়ি ভেঙে বন্ধ দুয়ারের কাছে উপস্থিত হল, দুয়ার স্পর্শ করে বলল, এ অপমান

থেকে তোমায় উদ্ধার করব। তারপর পুঁটলিটি ঘাড়ে করে পুরোহিতের জীর্ণ কুটিরের দিকে অগ্রসর হল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে ডাকল, অপেক্ষা করল, কড়া নাড়ল কিন্তু কোন উত্তর পেল না। তখন সে দুয়ার ঠেলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানেও সে কাউকে দেখতে পেল না। শুধু তার চোখে পড়ল বাড়ীটির অন্তিম অবস্থা। ইট খসেছে, বুনো গাছ গজিয়েছে ফোকরে ফোকরে. ভিত বসে গিয়েছে, মেঝে বরাবর ক্ষুধার্ত ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে হেথাহোথা।

সে তখনো জানত না গৃহস্বামীরও সেই অবস্থা। প্রায়ান্ধ স্থবির এক লোলচর্ম বৃদ্ধ এক প্রদীপ-জ্বলা কুঠরীতে পড়ে পড়ে অন্তিমের প্রহর গণনা করে চলেছে।

তিনি নিরাপদকে স্পর্শের দ্বারা দেখলেন, শ্রবণের দ্বারা অনুভব করলেন।

যখন সমস্ত কথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হোলো তখন আনন্দে আবেগে উত্তেজনায় চলচ্ছক্তি-হীন বৃদ্ধ বিছানা ধরে ধরে উঠে বসলেন, শূন্যে দুই বাহু বাড়িয়ে আকুল আগ্রহে ধরতে গেলেন নিরাপদকে, কুমারা, নিয়ামাগর কাড়ভুলাই এড়ড়ুক্কোড়ে পগপপুগিরাইয়া — বিষ্ণুকেশবের জয়, নিরাপদের কণ্ঠে শুধু একটি কথাই উচ্চারিত হল, জয়, বিষ্ণু-কেশবের জয়।

বৃদ্ধ বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন সেই পুরোনো কথা, নিয়ে যাবে বাবা? সত্যিই নিয়ে যাবে? দেবতার পূজায় ত্রুটি হচ্ছে, দেবতা ভোগ পাচ্ছেন না যথাসময়ে, তুমি নিয়ে যাও, ঠাকুর আবার তাঁর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হোন। কেন একথা বলছি জান বাবা?—

সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে বসে এক বিচিত্র ইতিহাস শুনলে নিরাপদ। এক ক্রমক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারের করুণ ইতিকথা।

বৃদ্ধ চুপি চুপি বললেন, আমার পূর্ব পুরুষ, যিনি এনেছিলেন দেবতাকে, আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল অন্য, তার মনে ছিল লালসা, স্বপ্ন তিনি দেখেন নি।

নিরাপদ মাথা নেড়ে বললে, আমি জানতুম, এ আমি জানতুম।

সেই থেকে বংশে অভিশাপ লেগেছে, বৃদ্ধ আবার মুখর হলেন, একজনের বেশী কেউ বাঁচে না। তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে আজ বংশের শেষ উত্তরাধিকারীকে বিষ্ণুকাঞ্চি পাঠালুম।

কেন? বিষ্ণুকাঞ্চি কেন? নিরাপদ চঞ্চল হয়ে উঠল।

আমি চলতে পারি না, মন্দিরে যেতে পারি না। কিন্তু বুঝতে পারি সব, মুমূর্ষু বৃদ্ধ অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন নিরাপদের দিকে, বিষ্ণুকেশবের পুজোয় ত্রুটি হচ্ছে, তাই নাতিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি বিষ্ণুকাঞ্চির বৈষ্ণবদের কাছে, তারা যেন আসেন আগামী—

এখনো তো পুজো হয়, এখনো তো দেবতা সম্মানিত হচ্ছেন নিত্য, বৃদ্ধের হাত-খানা জড়িয়ে ধরল নিরাপদ, এই তো আমি এসেছি, তারা আর কেন।

পাঞ্জাংগম্, বৃদ্ধ অঙ্গুলি ইঙ্গিত করলেন গ্রন্থস্তূপের দিকে।

পাঁজীটা নিয়ে এল নিরাপদ। মাঝখানে একটা কাটি দেয়া আছে। সেই পাতাটি খুলল।

পুণ্যাহ, গ্রহপুজা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠার সব-চেয়ে শুভদিন হল আগামী ছাব্বিশে অক্টোবর, বৃদ্ধ বললেন আমি লিখে দিয়েছি আগামী রবিবারে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে বিষ্ণু-যাত্রা শুরু হবে, তারা যেন অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে আসেন, গ্রামবাসীরা শোভাযাত্রা করে ঠাকুর দিয়ে আসবে।

আর এবারে? পুরোহিতের পা দুটি দুই হাতে স্পর্শ করল নিরাপদ, আমি শপথ করছি দেবতাকে সমস্ত অনাচার অপমান থেকে রক্ষা করব।

সে বড় শক্ত কাজ বাবা, বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, আমি কিছু কিছু শুনেছি, রেল কোম্পানীর কাছে পাথরের চাহিদা এত বেশী যে, পাথর কাটা মেশিন আর সামান্য গান পাউডারে যেখানে কাজ চলে সেখানে ডিনামাইট দিয়ে কাজ হচ্ছে। কেউ নাকি ডিনামাইট ফাটাতে সাহস করছে না, কে এক জোয়ান ছোকরা এসে—

না—না, আমি অপরাধী নই, আমি অপরাধী নই, দুই পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল নিরাপদ, আমি আবার শপথ করছি দেবতাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব, অপমান থেকে রক্ষা করব।

বিষ্ণুকেশবেক্ষু জয়, তবে তাই হোক বাবা, আমি তোমাকেই কথা দিলাম, বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে ক্রন্দনের করুণ আভাস ফুটে উঠল, গ্রামবাসীরা আমার নির্দেশে মাম্বালামের মন্দিরে ঠাকুর নিয়ে যাবে। বিষ্ণুকাঞ্চির বৈষ্ণবরাও ঐদিন ঠাকুরের সঙ্গে যাত্রা করবে।

আজ পঞ্চমী, আর দুটি দিন মাত্র নিরাপদ উঠে দাঁড়াল, আমাকে যেতে হবে।

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, যাও, তবে আগে প্রসাদ নিয়ে যেতে ভুলো না। তুমি বিষ্ণুকেশবের অন্নদাস হলে।

মস্তকে নিরাপদ বললে, হ্যাঁ, আমি ...নুদাস হয়ে রইলুম।

*   *   *   *

...কার স্তব্ধপ্রায় রাত্রিতে সে পাহড়ের ...য় বেয়ে উঠতে লাগল। এখন এ পথ ...্য, এ মন্দির আলোহীন। আর দেরী ...দবতা আসছেন, দেবতা আসবেন এই ...র ধরে, দেবতা আকর্ষণ করবেন অগণ্য ... এ পাহাড় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের হাত রক্ষা পাবে, এ মন্দিরে আলো জ্বলবে ...দর মুখরিত হয়ে উঠবে স্তবপাঠ এবং ...চর্চায়। পাহাড়ের পথ বেয়ে সে সমস্ত ক্লান্তির বোঝা সরিয়ে হৃদয়ের ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে সে উঠল, মর্মরিত ...র মন্দিরের দিকে সে ধাবিত হল।

...পর কখন সে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কাঁটা ...বেড়ায় ঘেরা বাধায় আঘাত পেয়ে ...বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে, চোখ ঝরেছে তার জল, প্রাণের মাঝখানে হয়েছে ক্ষত, সমস্ত আনন্দরেণু ...ার ঝটিকায় গিয়েছে ঝরে, বিসর্জনের ...া যেমন করে ভেসে যায় তেমনি সকল হয়েছে অদৃশ্য।

এমন করলে ঠাকুর—কার এমন কাজ, ...ড়ার চারদিকে নিস্ফল আকুলতায় ঘুরে বেড়াল নিরাপদ, কোথাও এতটুকু পথ পেলো না। শুধু এক জায়গায় ছোট্ট সাইন বোর্ড তার নজরে পড়ল। ...র স্তিমিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ...টি প্রাণহীন অক্ষর, ব্যঞ্জনাহীন বর্ণমালা দৃষ্টিকে অন্ধ করে ফেলল ঃ এতদ্দ্বারা ধারণকে জানানো যাইতেছে যে, প্রাচীন ...াসিক নিদর্শনরূপে রক্ষা করিবার এবং প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণা কার্যের ...ার জন্য এই মন্দিরে অনির্দিষ্টকালের সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল। ...রে প্রবেশ বা কোন প্রকার ক্ষতি সাধনের আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট।

...াঙ্গ কেঁপে উঠল, নিরাপদর। থেকে আলোটা পড়ে নিভে গেল। দূর বনান্তের পারে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ অস্ত গেল। অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের একটা গাঢ় ছায়া সমস্ত শূন্য আকাশ ব্যেপে ঘনীভূত হল, কি এক অজানা তমিশ্র বিষাদে হৃদয় অভিভূত হয়ে পড়ল।

সে অনুভব করল, এ মন্দিরের দেবতা পূজা পাবেন না, শ্রদ্ধা পাবেন না, এ মন্দির মানুষের মাঝে প্রাণরস সঞ্চার করতে পারবে না, ধর্ম এবং নৈতিকতার একটি সুদৃঢ় আদর্শ এ মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠবে না, এ মন্দির দুয়ারে অচরিতার্থ জীবনের কামনা বাসনার ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে পড়বে না......

সে আরো অনুভব করল, প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্য এখানে কবি, গায়ক ও নৃত্যশিল্পীর সমাগম হবে না, বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন হেতু কৃষক, বণিক ও ব্যবসায়ীর আগমন ঘটবে না, সমবেত শিষ্যদের মাঝে গুরু রত হবেন না শাস্ত্র চর্চায়, নগর পরিষদের অধিবেশন বসবে না, এ মন্দিরের নিঃশব্দ অনুশাসনে চালিত হবে না সমাজ-চিন্তা, এ মন্দিরের দেবতা চোল রাজত্বকালের ধাতুশিল্পের এক নগণ্য নিদর্শনরূপে কেবলমাত্র রক্ষিত হবেন, স্তবমন্ত্রের পরিবর্তে প্রত্নতত্ত্বের প্রাণহীন আলোচনায় মুখরিত হবে এ দেবস্থান......

দেবত্বের মৃত্যু ঘোষণা করে এ মন্দির দাঁড়িয়ে থাকবে......

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ম্যানেজারের তাঁবুতে প্রবেশ করল নিরাপদ। নাগোজী লাফিয়ে উঠলেন, আমার সমস্ত প্ল্যান নষ্ট করেছো, জানো, মন্দিরের ক্ষতি সাধন বে-আইনী হয়ে গেছে, এখান থেকে কাজ গুটোবার জন্যে কালই কোম্পানী থেকে অর্ডার আসবে, আঃ তুমি যদি জানতে, রেলওয়ে রিকন্সট্রাকশানের কত বড় কাজ হাতে নিয়েছি, এরই ওপর আমার সমস্ত সুনাম আর পদোন্নতি নির্ভর করছে। এই সময় কিনা কি এক হুজ্জুত বাধালে—

কোনো প্রতিবাদ করলে না নিরাপদ, শুধু বললে, ডিনামাইট বক্সের চাবীটা দিন স্যার।

আনন্দে উজ্জ্বল হলেন নাগোজী, কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি চুপি বললেন হ্যাঁ, তা যদি পার, এই রাত্রিতেই, এখনিই তাহলে গভর্নমেন্টের কিছু বলবার থাকবে না, অসাবধানতাবশত—না, না, কোনো অসৎ লোকের কিংবা কোনো ধর্মদ্বেষী রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টা হেতু—আঃ আধখান পাহাড় টলে উঠবে, গোটা মন্দিরটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে—কিন্তু—নাগোজী এগিয়ে এলেন, সাবধান, খুব সাবধান।

নিরাপদ নিঃশব্দে ডিনামাইট নিয়ে বেরিয়ে এল।

সেই মৃত রাক্ষসের অক্ষি কোটরের মত দুটো শূন্য গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়াল নিরাপদ।

আমি অপরাধী নই, না-না-না, আমি অপরাধী নই, পলতেয় অগ্নিসংযোগ করবার আগের মুহূর্তে স্বগতোক্তি করল সে, আমি শুধু শপথ পালন করলুম, ঠাকুর, আমি তোমায় অপমান থেকে রক্ষা করলুম।

জয়, বিষ্ণুকেশবের জয়!

পলতের আগুনের দিকে চেয়ে পিছু হটতে লাগল সে। তার যেন মনে হল ওই মৃত রাক্ষসের জ্বলন্ত অক্ষিকোটর তাকে সবেগে আকর্ষণ করছে আপনার দিকে। মৃত্যুভীত নিরাপদ পিছন ফিরে দ্রুত লাফ মেরে নীচে নামতে গেল, পাশে পালাতে গেল, পালিয়ে বাঁচতে চাইল, আর সেই অসতর্ক চঞ্চল মুহূর্তে মাসৃণ পাথরের ওপর পিছলে অতল অন্ধকারের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল।

গায়ের চামড়া কেটে রক্ত বেরুল, পায়ের হাড় ভাঙল, মাথা ফাটল, প্রবল আঘাতে সমস্ত জাগর চৈতন্য দুলে উঠল দুই চোখে সামনে—

তবে কি আমিই অপরাধী?

ঠাকুর!

ঠাকুর!

শিয়রে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটল।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমরা তাকে শুধু জন্ বোলেই জানতুম। নিশ্চয়ই তার একটা কোন পৈতৃক উপাধি ছিল। কিন্তু তা নিয়ে আমরা কেউ কোনদিন মাথা ঘামাই নি। আমাদের কাছে খালি জন্ই যথেষ্ট।

এক সময় জন্ লণ্ডন শহরে ক্যাব অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাতো। সে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে। তারপর এলো ট্যাক্সি-ক্যাবের যুগ। তাতে করে ফোরউইলার হ্যান্সম বুহ্যাম সবই একে-একে উঠে গেল। বেচারী জন্ তখন বুড়ো হয়ে গেছে। নতুন করে ট্যাক্সি চালানো শিখতে পারলো না।

তাছাড়া বোধ হয় শেখবার ইচ্ছেও তার বড় ছিল না। সেকালের সব লোকদের মতন জনেরও কলের গাড়ির উপর কেমন যেন একটু তাচ্ছিল্যের ভাব। বলতো—আমি চিরকাল ঘোড়া চালিয়েই এসেছি। স্টিয়ারিং-উইলে আমার হাত বসে না। তাতে কোন আরাম পাই নে। হ্যাঁ, ঘোড়া হাঁকানো—সে অন্য চিজ্।

জন্ আর এক ব্যবসা ধরলে। এখন সে একটা ক্যাবস্টলের মালিক। এই ক্যাবস্টলের একটু পরিচয় দেওয়ার দরকার। নইলে ব্যাপারটা সকলে ঠিক বুঝে উঠতে নাও পারেন। চার চাকার উপর বসানো একটা ছোট্ট কাঠের ঘরের মতন। তার ভিতর আছে টুকিটাকি রাঁধবার কিছু সরঞ্জাম। আর আছে কিছু পরিবেষণের পাত্র—পেয়ালা-পিরিচ, প্লেট-গেলাস, দস্তার কাঁটা চামচ।

রান্না সামান্যই। জন্-এর ক্যাবস্টলে পাওয়া যেত, ডিমসেদ্ধ, হ্যাম্ স্যাণ্ডউইচ, ফিশ অ্যান্ড চিপ আর রোস্ট-করা ডুমো-ডুমো ওয়ালনাট। ধোঁয়া-ওঠা গরম এক পেয়ালা কফির সঙ্গে তার যে কোন একটা খেতে বেশ উপাদেয়। স্টলটা রাস্তার উপরেই। স্টল-এর কাউণ্টারে ঠেসান দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া—বড় মজার ব্যাপার।

দিনমানে ক্যাবস্টলগুলো দেখতে পাওয়া যায় না। ভোর রাত্রে চাকাসুদ্ধু স্টল টেনে নিয়ে গিয়ে মালিকের বাড়ির কাছে রাখা হয়। সন্ধ্যের মুখে আবার যে-যার স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে। থিয়েটার-সিনেমা-ফেরতা, পার্টি নাচের মজলিশ ফেরৎ ফুলবাবু লোকরা ক্যাবস্টল থেকে একটু কিছু মুখে না দিয়ে ঘরে ফেরেন না।

জনের স্টলটা ছিল আমাদের পাড়ার মধ্যেই। আমাদের বাড়ির রাস্তা থেকে দুটো মোড় ফিরলেই জনকে দেখতে পাওয়া যেত। স্টলের ভেতর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে: একমাথা কোঁকড়া পাকা চুল। গালের দুধার বেয়ে দুটো মটনচপ দাড়ি। থুৎনির মাঝখানটা কামানো। গোঁফ চাঁচা। ভারি সৌম্য মূর্তি।

জনের পরনে সেই কবে উঠে-যাওয়া মর্চে-পড়া এক কালো ফ্রক কোট। হাঁটু পর্যন্ত নেমে গেছে। গলায় টাই কলার কিছু নেই। তার জায়গায় একটা প্রকাণ্ড সাদা সিল্কের রুমাল মাফলারের মতন করে জড়ানো। ছ-ফুট লম্বা জন্কে এই পোষাকেই মানাতো। হাল ফ্যাশানের কোর্তা-কুর্তিতে তার চেহারা মোটেই খোলতাই হোত না। জনের শান্তশুভ্র চেহারায় সেটা বড়ই বে-মানান হোত বোলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের পাড়াটা কোন থিয়েটার-বায়স্কোপের কাছে নয়। লোক চলাচলের পথেও পড়ে না। শান্ত শিষ্ট নেহাৎ নিরীহ ভদ্রলোকদের বাসস্থান। অতি নির্জন ঠাণ্ডা পাড়া। কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। তাই আমরা মাঝে মাঝে জনকে অনুযোগ করতুম—তুমি বাপু পিকাডিলি সার্কাস, কি লেস্টার-স্কয়্যার, কি নিতান্ত পক্ষে শাফট্সবরী অ্যাভিনিউ অঞ্চলে তোমার স্টল নিয়ে যাওনা কেন? বিক্রি-সিক্রি ভালোই হয়। জন্ একটু ফিকে হাসি হেসে বলতো—ওসব জায়গা আমার জন্যে নয়, ছেলে-ছোকরার তরে। আমার এই বেশ। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তো দেখতুম। বোধ হয়, পুরনো সেই সব দিনের কথা ভেবে।

কিন্তু এখানেও জনের বিক্রি মন্দ নয়। পাড়ার সবাই জন্কে ভালোবাসত। জনেরও ধর্মবুদ্ধি ছিল। খাবার দিত খুব ভালো, আর দাম নিত খুব কম। ছপেনীতে বেড়ে সাপার হোত। জনের রান্নার হাত ছিল পরিপাটি। তার তৈরি হ্যাম্ স্যাণ্ডউইচ, ফিশ অ্যান্ড চিপ্ অতি সুস্বাদু: কফি অত্যুৎকৃষ্ট। তাই ভদ্রলোকরা সবাই ফিরে-ফিরে জনের স্টল-এ বার বার আসতেন।

রোববার ছাড়া, আমি প্রত্যহ দুবা জনের স্টলে যেতুম। একবার সন্ধ্যের যখন জন্ সবে আড্ডা গেড়েছে। গল্প করবার জন্যে। আর একবা সাড়ে দশটা-এগারোটায়। তখন খাবার জন্যে। আমাদের জন্ খৃশ্চান। পারতপক্ষে রবিবারে দোকান খুলতো না। শুনেছিলুম, সকাল-সন্ধ্যে দুবেলাই সে গির্জে দুপুরে বাইবেল খুলে বসতো!

নিঃসঙ্গ বিদেশি ছাত্র দেখে আমা জনের কেমন একটু মায়া পড়ে গি সন্ধ্যে বেলায় স্টল সাজিয়ে সে কতো রকমের গল্প করে শোনাত। লণ্ডন শহরের কতো বিচিত্র কাহিনী! গলির কতো মজাদার রহস্য। আমা আগ্রহী শ্রোতা বোধ হয় জনের একটিও ছিল না।

বাস্তবিকই জনের মুখে গল্প আমার ভারি ভালো লাগতো। সে

...ঘরোয়ানা, ঘরের কথা, কতো এ্যাক্টর-...র কথা, কতো লেখক-আর্টিস্টের ... কতো রকমের ছিটগ্রস্ত ...গ্রস্ত লোক। কী তাদের ... খামখেয়ালি। এক ব্যক্তি তো ... মাথায় বাই চাপায় জন্‌কে জোর ... তার গাড়ির ভিতর বসিয়ে দিয়ে ... কোচবাক্সে চড়ে গাড়ি ... শুরু করে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস ... অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি, তাই রক্ষে।

...গাড়ি ব্যাপার নিয়ে জনের বড়ই গর্ব ...সে একবার তার গাড়িতে করে ...ডের রাজা, এডওয়ার্ড দি সেভেন্থকে ...বাড়ি পেঁছে দিয়েছিল। এডওয়ার্ড ... রাজা হননি, প্রিন্স অভ্ ওয়েলস ...। এডওয়ার্ডের মা, কুইন ভিক্টোরিয়া ...াশভারি জবরদস্ত প্রকৃতির মহিলা। ...্যোপায় পড়ে যুবরাজের খেল্ খেলতে ... এডওয়ার্ডের প্রাণ হাঁপাই-হাঁপাই ... তাই মাঝে মাঝে সামান্য লোকদের ...সাজসজ্জা করে তিনি অনুচরদের ... এড়িয়ে গোপনে বাইরে বেরিয়ে ...।

...দিন রাত্তির বারোটার সময় যুবরাজ ...শ পিকাডিলি সার্কাসের আশে-...রে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর বোধ হয় ...গেল, রাস্তার লোকে তাঁকে চিনে ...। অনেক বড়ঘরের ভদ্রলোকরা গভীর ... পিকাডিলি সার্কাসের এধার-ওধার ঘুরে বেড়ান। কি কারণে, সেটা আর খুলে বলে দিচ্ছি নে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রিন্স অভ্ ওয়েলসের চেনা লোক। তাঁরা যে ছদ্মবেশেও যুবরাজকে চিনে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

সৌভাগ্যক্রমে জন্ সেই সময় তার গাড়ি নিয়ে ধিকি-ধিকি চালে সেইখান দিয়ে চলেছে। যদি একটা শেষ সোয়ারী পাওয়া যায়। এমন সময় হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, যুবরাজ খপ করে গাড়ির পায়দানে চড়ে, দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে গাড়ির ভেতর টপ করে ঢুকে পড়লেন।

জন্ অমন কাণ্ড অনেক দেখেছে। অবাক হোল না। কেবল গাড়ির ছাদের ফাঁক দিয়ে একবার জিগোস করলে, কোথায় নিয়ে যেতে হবে। গন্তব্যস্থানের নাম শুনে জনের চক্ষু চড়কগাছ। এ যে যুবরাজের রাজবাড়ি! তাই তো বোলে, ছাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে জন্ দেখে, সত্যিই তো, যুবরাজই তো বটে। ঠিক সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পোষাক বদলালেও দাড়িটা তো আর বদলাতে পারেন নি।

যুবরাজ বাড়ি পেঁছে গাড়ি ভাড়াটার উপর জনকে একটা সভ্‌রিন বকশিশ করেছিলেন। সেই সভ্‌রিন এখনো জনের পেট-জোড়া ঘড়ির চেনের সঙ্গে লকেটের মতন করে ঝোলানো। স্ফূর্তির চোটে জন্ যখন-তখন সেই সভ্‌রিন নেড়ে-চেড়ে আমায় দেখায়। অতি সসম্ভ্রমে তার উপর হাত বোলাতে থাকে।

গল্প করতে করতে জন্ হঠাৎ দু-এক কলি গান ছেড়ে বসে। ভালো গলা। তবে আমাদের কাছে বিলিতী গলা যেন কিরকম কিরকম ঠেকে। গানটা পুরনো। ডেসী-ডেসী বলে তার আরম্ভ। গানের মাথা-মুণ্ডু কিছু নেই। এক ব্যক্তি ডেসী নাম্নী এক মহিলাকে প্রেমনিবেদন করে, বিবাহে তাঁর সম্মতি চাচ্ছেন! কিন্তু আগে ভাগেই সাবধান করে দিচ্ছেন, বিবাহে কোন স্টাইল করতে পারবেন না। কেননা, টঙ্কাদেবী তাঁর ট্যাঁক শূন্য করে পালিয়েছেন। তবে তিনি কোনক্রমে একটা দুজন বসবার বাইসিকল জোগাড় করে আনতে পারবেন। আর বলছেন, তাই চড়ে ডেসী শোভাযাত্রা করলে মানাবে ভালই ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯২০ সালের জুন মাস। তখন আমি এক হিড়িকে তিন-তিনটে প্রিলিমিনারী বার-একজামিন একসঙ্গে কোন রকমে থার্ড ক্লাশে পাশ করে বসে আছি। ফাইনাল একজামিন অনেক দূরে। যখন ইচ্ছে তৈরি হোয়ে দেওয়া যেতে পারবে। হাতে কাজ নেই। তাই খেয়াল হোল, উপনিষদের বাছাই-বাছাই শ্লোকগুলো ইংরিজিতে তর্জমা করি। বেশ! কিন্তু বেশ বললে কি হয়? উপনিষদের শ্লোকগুলোর মানে ওরি মধ্যে তবু একটু বোঝা যায়, কিন্তু তার শাঙ্করভাষ্য পড়তে গিয়ে মাথার ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে আসে। এক লাইনের বেশি এগুনো যায় না। পুঁথি বন্ধ করে জনের স্টলে আড্ডা দিতে ছুটতে হয়।

এমনি চলছে, এমন সময় উইলি পিয়ার্সন এসে খবর দিলেন, গুরুদেব লণ্ডনে আসছেন। শেষে একদিন গুরুদেব এসে গেলেন। এসে আমাদেরই বাড়ির কাছে কেন্‌সিংটন প্যালেস ম্যানসনে উঠলেন। কাছে বলে কাছে? আমার ওখান থেকে এক লাফে সেখানে পেঁছনো যায়। আমাদেরই ডিভিয়র গার্ডেন্সের রাস্তার ঠিক মোড়ের উপর।

রোটেনস্টাইন্ গুরুদেবের জন্যে ঐ জায়গাটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির থেকে কাছে হবে বলে। রোটেন-স্টাইন তখন কাছেই নটিং হিল গেটে, শেফিল্ড টেরাস বলে এক রাস্তায় বাস করেন। সেখান থেকে তিনি একদিন কেন-সিংটনে গুরুদেবের কাছে আসতেন; এক-দিন গুরুদেব নটিং হিল গেটে রোটেন-স্টাইনের ওখানে যেতেন।

একদিন কঠোপনিষদের বাকি অংশটার শাঙ্করভাষ্য শেষ করতেই হবে বলে পণ করে বসে পড়তে-পড়তে রাত্তির বারোটা বেজে গেল। আর না। বই রেখে উঠে পড়লুম। চললুম জন্-এর স্টলের দিকেই। আনমনা হয়ে ডিভিয়র গার্ডেন্স-এর মাঝ রাস্তা দিয়েই হাঁটছি। মোড় বরাবর পেঁছিয়েছি, এমন সময় একটা ট্যাক্সি কেন্‌সিংটন্ হাই স্ট্রীট থেকে বাঁক নিয়ে মোড় ফিরল। আমি তড়াক করে লাফিয়ে রাস্তা থেকে একবারে ফুটপাতে চড়ে পড়লুম।

আমার ঠিক বাঁ পাশেই কেন্‌সিংটন্ প্যালেস ম্যানসনের পাঁচতলা উঠে গেছে। ট্যাক্সিটা সেইখানেই থামল। দেখি, তার থেকে নামছেন স্বয়ং গুরুদেব। রাস্তায় নেমে গুরুদেব তাঁর ঝোল্লা জোব্বার একবার এ পকেট একবার ও পকেট হাতড়াতে লাগলেন। গুরুদেব আমাদের অত্যন্ত অন্য-

মনস্ক প্রকৃতির লোক। কোথাও যাওয়া-আসা করতে গেলে যে সঙ্গে কিছু রেস্ত নিয়ে বেরুন উচিত, সেটা গুরুদেব সদাসর্বদা ভুলে বসে থাকতেন। তাই নিয়ে অনেক অনর্থ বাধাতেন।

এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে—বেশ বুঝলুম। টাকা সঙ্গে নেন নি। এখন ট্যাক্সি ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারছেন না। আমি একটু এগিয়ে গেলুম। আমায় দেখে গুরুদেব বোল্লেন—এই তোর পকেটে কিছু আছে না কি? না, আমারি মতন একেবারে শূন্য? আমি বাক্যব্যয় না কোরে ট্যাক্সির মিটারের দিকে উঁকি মেরে দেখলুম, তাতে আড়াই শিলিং উঠেছে। তার সঙ্গে আর ছ-পেনী যোগ করে আমি ট্যাক্সি ভাড়াটা চুকিয়ে দিলুম। ক্যাবম্যান তার মাঝের আঙ্গুলটা তার টুপিতে ছুঁইয়ে বোল্লে—কু। কু-টা খারাপ কিছুই নয়, থ্যাঙ্ক ইউ-এর কক্‌নী অপভ্রংশ।

গুরুদেবের মুখ দেখে মনে হোল, তিনি খুবই নিশ্চিন্ত হোলেন। অত রাত্তিরে রথীবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ট্যাক্সি ভাড়াটা চাইতে গেলে, ব্যাপারটা কি রকম কি রকম হবে—গুরুদেব বোধ হয় তাই ভাবছিলেন। তার উপর প্রতিমা দেবী তখন অসুস্থ। রথীবাবুকে তাঁর বাবার জন্যে অনেক সইতে হয়, তাঁর অনেক কিছু ধকল সামলাতে হয়। কিন্তু এতটা ঠিক সইবে কি না, তাই ভেবে গুরুদেব একটু ইতস্তত করছিলেন বোলে মনে হোল।

আমি কাছে যেতে গুরুদেব বোল্লেন—রোটেনস্টাইন-এর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে ফিরছি। গল্পগুজবে অনেক রাত্তির হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু এত রাত্তিরে তুই কোথায় বেরিয়েছিস? পড়াশুনো কিছু করিস নে বুঝি?

আমি বোল্লুম—তা কেন? এই তো এতক্ষণ উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য পড়ছিলুম। পড়তে পড়তে মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

—তাই বুঝি মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছিস?—গুরুদেব প্রশ্ন করলেন। গুরুদেবের সব সময় রহস্য করা অভ্যেস। বিশেষত তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্রদের সঙ্গে।

আমি নিবেদন করলুম—কতকটা তাই বটে। জন্-এর স্টল-এ গিয়ে এক পেয়ালা গরম কফি খেয়ে ফেল্লে মাথা ধরাটা ছেড়ে যাবে।

জন্-এর কথা গুরুদেবকে সব খুলে বোল্লুম। বোলেই তাঁকে ধরে বসলুম, চলুন না একবার জন্-এর স্টল-এ। জন্ কতো খুশি হবে। আমার তখন অল্প বয়েস। তাই ধৃষ্টতার সীমাপরিসীমা ছিল না।

গুরুদেব আমার দিকে একবার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি চালালেন। একটু হাসলেন কি না, সেটা তাঁর গোঁফের আড়াল থেকে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর শুধু বোল্লেন—চল্।

আমি লাফিয়ে উঠে বোল্লুম—চলুন, এই কাছেই। আর একটা মোড় ফিরলেই জন্-এর স্টল।

নির্জন নিষুতি রাত। পথে বিলিতী ম্লান জ্যোৎস্নার আবছা আলো। গুরুদেব আর আমি পাশাপাশি চলেছি।

জন্-এর স্টল-এ পৌঁছবার আগেই গুরুদেবকে পিছনে রেখে আমি খানিকটা এগিয়ে গেলুম। জন্‌কে আগের থেকে সাবধান করে দিতে চাই—গুরুদেব আসছেন। সে যেন গুরুদেবকে সসম্মানে গ্রহণ করে।

স্টল্-এর কাছে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই দেখি এক অপরূপ দৃশ্য! অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। জন্-এর স্টল-এ একটিও লোক নেই। জন্ একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার চাউনি অনুসরণ করে দেখি দূরে গুরুদেবেরই উপর, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। গুরুদেব তখন মাথার মখমলের টুপিটা খুলে ফেলেছেন। সামনের বড় বড় বাড়ি-গুলোর মাথার উপর দিয়ে পান[illegible] একফালি চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। তা[illegible] এসে পড়েছে গুরুদেবের ঠিক মুখে[illegible]

দেখতে-দেখতে হাঁটুগেড়ে জন্ নিল্‌ডাউন হয়ে বসলো। তার হাত একসঙ্গে জোড়করা। পিছনু দেখি, গুরুদেব তাড়াতাড়ি সে জায়[illegible] চলে যাচ্ছেন। লন্ডনের রাস্তাঘাট গ[illegible] মোটেই সড়গড় নয়। কোথায় যেতে গিয়ে পড়বেন ভেবে, আমি প্রায় গিয়েই তাঁকে ধরলুম। সেইখানটায় ব্যাঁক। ঘুরতেই জনের স্টলটা আড়াল পড়ে গেল।

যেতে-যেতে একটি কথাও হো[illegible] নিঃশব্দে গুরুদেবকে কেন্‌সিংটন্ ম্যানসন্-এর নাইট্ পোর্টারের জিম্মা করে দিয়ে এলুম।

আবার জন্-এর স্টল্-এই ফিরে আমায় দেখে জন্ বোল্লে—চ্যাটার্জি, জীবন ধন্য। করুণাময় লর্ড যীজস্ দূর থেকে আমাকে আজ দর্শ[illegible] গেছেন। আমার জীবন সার্থক।

জন্-এর মুখে অপার শান্তি!

আমার মুখ দিয়ে আর একটি বেরুলো না। কিছু না খেয়েই সে[illegible] বাড়ি ফিরলুম।

•

তারপর ১৯২৬ সালে আবার বিলেত গিয়েছিলুম। আমি সেই বাড়িতেই উঠেছি। এবারও গুরুদেব [illegible] কিন্তু কেন্‌সিংটন্ প্যালেস ম্যান[illegible] নয়, রেজিনা হোটেলে। রথীবাবুও আছেন, প্রতিমা দেবীও আছেন। কে[illegible] আমার বন্ধু জন্। তার জায়গাও সেখানে আর কেউ স্টল্ খোলে নি।

তারপর কতো দিন চলে গেল! এখনো গুরুদেবের একটা ছবি হাতে সঙ্গে সঙ্গেই জন্-এর কথা ম[illegible] যায়।

রাজোয়ারা

শ্রীদেবেশ চন্দ্র দাশ

সুঠাম চরণ একখানি বিরাট
ডসন গাড়ির ভিতর থেকে
এল।

ৗীর ইণ্ডিয়া গেটের কাছে ময়দানে
অন্ধকারে শুয়েছিলাম। তৃণশয্যার
। আরামে। সেই তৃণের শয্যায়,
মরুসম শহরের বুকে গজাতে ও
যা খরচ, তা, তা আমার শয্যার
চেয়ে অনেক বেশি।

সন্ধ্যাতেই কাজের শেষে দিনের
এইখানে নিরিবিলি কোণে আমি
শুয়ে বসে থাকতে ভালবাসি।
সরকারী দপ্তরের (সেক্রেটারি-
হাত থেকে রেহাই নেই। স্বাধীনতা
পর পরিভাষায় পণ্ডিতরা আবার
ওই বিশাল পাষাণ দুর্গ দুখানার
য়েছেন মহাধিকরণ। তা দিন ক্ষতি
ন্তু দুঃখ এই যে এই সংস্কৃতিটুকুর
জের যে কোন সুরাহা হবে এমন
নেই। ওই পাষাণ দুর্গ দুখানা
তে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক নাম বতন
কের উপর সমানভাবেই জগদ্দল
য়ে চেপে বসে আছে।

র সময়ের কাজের চাপ আর তার
বছরটা নেতা ও রাজনীতিকদের
না আলাপ-আলোচনা সরকারী
ক দিশেহারা করে তুলেছিল। তার
ই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এল
উদ্বাস্তু সমস্যা। সব সরকারী
ই তা ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।
কাজের চাপ বাড়ল যে লোকে
ই করতে চায় না।

ন কাজের চাপ যে কেহ বসে কাজ
সময় পায় না। শুধু সময় পায় সে
ড়োর অবস্থা বাইরের লোককে
দেবার চেষ্টা করতে। একদিন পূর্ব
বাঙলার এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোককে একজন
সেটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন,—ভাগ্যিস
মশাই, পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়।
মাথায় দাঁড়ালে যে রকম মাথায় সব রক্ত
উঠে পায়ে দাঁড়ালে সে রকম হয় না।

কিন্তু নবাগত ভদ্রলোক নিজের দুর্ভাগ্যের
চিন্তায় ব্যাকুল। ফস করে উত্তর দিলেন—
ভয় নেই, ভয় নেই মশায়। আপনার পা
দুখানি ত আর শূন্যে নয়।

এই বলেই তার মাথার দিকে অর্থপূর্ণ
একটা চোরা চাহনী হানলেন।

কারো সঙ্গে অফিসে দেখা হলেই চোখে
ব্যস্ততা ও মুখে ত্রস্ততার ভাব ফুটিয়ে
বলে বসবেন,—দাঁড়ান মশাই, মরতে সময়
পাচ্ছি না।

উনি মৃত্যুশয্যায় শেষ শয়ন করতে সময়
পাচ্ছেন না বলে ইনি যে কেন দাঁড়িয়ে
থাকতে বাধ্য হবেন তার কোন সদুত্তর
নেই।

ইনি তখন সমান বা উনার চেয়ে বেশী
কাজের চাপের প্রমাণ দেবার জন্য গত মহা-
যুদ্ধের দান হাতাহীন বুশ শার্ট অর্থাৎ
কেপ কামিজ বা শার্ট ও কোটের কম্বিনেশন
আউটফিটখানার কলার দু আঙ্গুলে
দুমড়াতে দুমড়াতে বলে উঠবেন,—আর
বলবেন না মশাই। জন্ট (জয়েণ্ট) সেক্রে-
টারীর যা মেজাজ সকালে বিকালে দুবার
করে ফাঁসি এই দেয় কি এই দেয়।

সকালে ওই শেষ কৃত্যটি একবার সেরে
রাখলে বিকালে আবার কি করে তার
পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব তার হিসাব
চাওয়ার আর সময় হয় না।

তবু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে
ওরা এক আধটা রসিকতা করবার সময়
খুঁজে নেন। রসিকতা নয়, সঞ্জীবনী রস।

ভায়া, একটা বড় আবিষ্কার করেছি।

কি রকম? শীগ্‌গীর পেটেণ্ট নিয়ে
ফেলুন। এখনো বাজার গরম আছে। দু'
পয়সা মিলে যেতে পারে।

না সে রকম নয়। জানেন; আইবুড়ো
আর বিবাহিতের তফাৎটা?

কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ে উনি
বললেন,—কি রকম?

ইনি হাসলেন—আইবুড়োর কোটে
বোতাম থাকে না আর বিবাহিতের, ছাই,
কোটই থাকে না।

নিজের বাড়ীতে বালখিল্য রেজিমেণ্টটির
কথা স্মরণ করেই বোধ হয় উনি বললেন—
এবার বুঝেছি কেন আমার শার্টেরও শর্টেজ
হতে আরম্ভ হয়েছে। তা ভায়া, বেঁচে
থাকুক আমাদের বুশ-শার্ট।

ইনি সায় দিলেন,—সেটাই ত বলতে চাই।
শার্টও নয়, কোটও নয়, তবু কিছু একটা
গায়ে চাপিয়ে ফাইলের জঙ্গলে ঢুকতে হবে
তাই এটির নাম হয়েছে বুশ-শার্ট। মশাই,
যে এ জিনিসটা আবিষ্কার করেছে আর এই
নাম দিয়েছে সে মহাশয় ব্যক্তি। যেমন তার
দরদ, তেমনি রসবোধ।

এই ঘন ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সদ্য
স্বাধীন দেশের জন্য পাল্লা দিয়ে প্রাণ দিচ্ছে
অর্থাৎ দিতে প্রস্তুত অর্থাৎ দেবার যখন
সুযোগ নেই তখন বদলে পরিশ্রম দিচ্ছে
এমন একখানা ভাব সকলেরই। যত না কাজ
তার শত গুণ মহড়া, যত না সিদ্ধান্ত তার
সহস্র গুণ পাঁয়তারা প্রাণ সংশয় করে
তুলেছে। দেশের জন্য যদি প্রাণ দিতেই হয়
তাহলে নিষ্ক্রিয় নিরুল্লেখযোগ্য জীবনে এই
একটা নতুন পথ দেখা দিয়েছে। আমিও
সে হিসাবে নিত্য দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ
দিচ্ছি। রোজই। মায় ছুটির দিনগুলিতেও।
সেদিন সে, ছাই, আর পাঁচ জনও অফিসে
গিয়ে হাজির হয়।

কেন? আমাদের দিনের পর দিন সামান্য-
তার মধ্যে অসি ঘোরে না বলে কি আমরা
পেট্রিয়ট নই? জানেন মসী আমরা কত
চালাই রোজ?

অতএব কোমর বেঁধে দেশের জন্য কাজ
করে যাচ্ছে সবাই একেবারে কলম উঁচিয়ে।
দুঃখের বিষয় কেউ কেউ বিদেশী ট্রাউজার
ছেড়ে স্বদেশী চুড়িদার ধরাতে
কোমর বাঁধার অর্থাৎ কোমরে ট্রাউজারের
বেল্ট বাঁধার (ভেবে দেখুন টাইটেন ইয়োর
বেল্ট কথাটির মধ্যে কত গভীর তথ্য
লুকানো আছে) সুযোগ থেকে বঞ্চিত
হচ্ছেন।

অবশ্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁরা নয়া
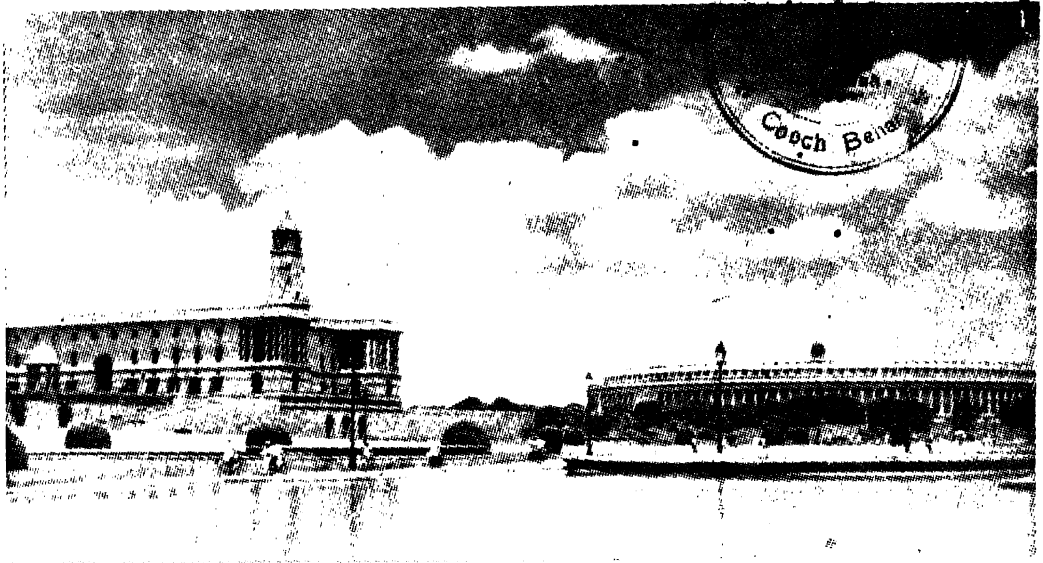
"ওই বিশাল পাষাণ দুর্গ দুখানার" একটি

হিন্দুস্থানের পোষাক আচকানে গলা বাঁধা দিয়েছেন।

অফিসে এইরকম কাজের তোড় আর অফিস থেকে বের হলেই পাঞ্জাব সিন্ধু থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর স্রোত। দিল্লীর পথে পা ফেলবার উপায় নেই। নয়াদিল্লীর সযত্নে ভীড় থেকে দূরে সাজিয়ে রাখা আভিজাত্য আর রইল না। কাজের শান্তি যদি বা স্তব্ধ সন্ধ্যায়, শহরে স্বস্তি বা শান্তি নেই সারাদিনে ও সারা রাত্রিতে।

কাজেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই নিভৃত তৃণশয্যায় এসে বসি একটু দম নেবার জন্য। গায়ের জামাটি খুলে পাশে রেখে দিয়ে মনে মনে প্রথম বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ব্যালপোলের মত বলি—এইখানে রইলেন সরকারী চাকুরে মহাশয়।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেক্রেটারিয়েটের বিরাট যন্ত্রটা এমনভাবে আমার মত সামান্য একটা পেরেক বা ইস্ক্রুপকে পর্যন্ত পাকড়িয়ে রেখেছে এই নিরিবিলি অন্ধকারে শুয়ে থাকলেও সাউথ ব্লক সেক্রেটারিয়েটের ছায়াটা চোখের সামনে থেকে সরে যায় না।

এ হেন প্রাণ দিতে প্রস্তুত পৈত্রিক দেহ-পিঞ্জরের একেবারে গা ঘেঁষে মাঠের উপর এসে থামল সুদীর্ঘ একখানা হাডসন মোটরকার। তার কোন বাতিই জ্বালান নেই। দূরে দুখানা আলোর বিন্দু হঠাৎ নিভে গিয়েছিল—অন্ধকার আকাশে দুখানা অজানা তারা হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়ার মত। তারপর কি হ'ল, তা কে লক্ষ্য করে?

ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে এই মোটরখানা নিঃশব্দে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। কোন-মতে চাপা পড়তে গিয়ে বেঁচে গেলাম। বেঁচে যখন গেলামই, তখন আর তা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ কি?

আর অপরপক্ষও ত পাল্লা দিয়ে তেড়ে আসতে পারে যে, যে নিভৃতে অন্ধকারে আত্মগোপন করে মাঠে শুয়ে থাকে হাডসনের তলাতেই, যদি তার গতি হয় তাতে দোষ যে চাপা দেয় তার না, যে চাপা পড়ে তার?

কিন্তু কোন কথাই ভাববার অবকাশ হল না। কারণ সুন্দর সুঠাম চরণ একখানি গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বাকী দেহবল্লরীও বাইরে আসার আশায় উৎসুক। কৌতূহলে আমিও উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দেখি, কি হয়।

নিঃশব্দে কোন অলক্ষিত দিক থেকে এগিয়ে এল সাইকেল হাতে এক মোটরের কাছে সাইকেল শুইয়ে রেখে বসল তৃণশয্যায়। মোটরে ঠেস দি

যে তৃণশয্যায় আমি শুয়ে আছি তৃণশয্যাতেই। এপারে আমি ওপারে ওরা। আর চারপাশে নি নির্জন সন্ধ্যা।

প্রথমেই ইচ্ছা হল উঠে পড়ি, স এই যুবক-যুবতীর নিভৃত ও নি আলাপনের ক্ষেত্র হতে। কিন্তু যবনিকা উত্তোলন হয়ে গেছে, নায়ক মঞ্চের মাঝখানে, অভিনয় আরম্ভ হ পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। আমি যদি যবনি করে উঠে পড়তে চাই এবং ওরা টে লজ্জা পেয়ে যায়, তাহলে ওদের এই সন্ধ্যাটির যা যতিভঙ্গ হবে, তা ফিরে কি না কে জানে। ক্রৌঞ্চমিথুনের বাধ বধ করেছিল বলে জীবনে তার হল না, কিন্তু ভাবের আবেগে দস্যু বাল্মিকী হয়ে গেল।

থাকুক না এই ক্রৌঞ্চমিথুন বিনা বিনা সন্দেহে তাদের নিভৃত স্বপ্ন লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনার পাপ কত পাপই করে মানুষ কত সময়। এদের সুবিধার জন্য আমার একটু

...। মহাভারত নিশ্চয়ই অশুদ্ধ

...ন মোটরকার ও সাইকেল।

...কারে নাম্বারপ্লেটের মধ্যবিত্ত মার্কার শোভা পাচ্ছে টকটকে লাল রঙের প্লেট। বোঝা শক্ত নয় যে, কোন রাজার নিজস্ব গাড়ি। অন্ধকারে ...ড়া গেল না, কিন্তু কৌতূহল ...য়ে রইল।

সাইকেল? বড় জোর দিল্লী ...প্যালিটির একটা গোল চাক্তি লাগান বাইকবিহারী যুবক সে খরচটাও ...চলবার চেষ্টায় হয়ত বা টিকিটই ...। কে তার খবর রাখে?

...নই যেন একটু নিস্তব্ধ।

...ও তাই নিস্পন্দ।

...ধীরে যুবকই নীরবতা ভাঙগল। ...র গহন অন্ধকারের পর যেন প্রথম ...কটুখানি আলো মহাসাগরের ঊর্মি-...উপর সামান্য চিকমিক করে উঠল। ...লে তুমি সত্যি সত্যিই দিল্লী ছেড়ে

...টুখানি চুপ করে থাকার উপর যুবতী ...দল—হ্যাঁ, তাই তোমায় আজ এখানে ...বলেছি।

...ধ রীতিমত নাটক দেখছি।

...একেবারে পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা

...লাম আমিও উঠে পড়ি। কি হবে ...অপরিচিত যুবক-যুবতীর নিভৃত ...ন গোপনে শুনে। 'বয় মিট্স ...-এত নিত্য-নৈমিত্তিক কাহিনী। ...বা আর কি হবে?

...তু বেচারীরা টের পেয়ে যাবে। ওদের ...র দিক থেকে সেটা আরো লজ্জার ...বরং রাত্রি আরো একটু ঘন অন্ধকার ...লে সন্তর্পণে সরে পড়বার চেষ্টা

...তু ব্যাপারটাও ততক্ষণে একটু ঘন ...র হয়ে এসেছে।

...। আমার সঙ্গে আর সংযোগ রাখবার ...করো না। জান ত সব অসুবিধা।

...? অন্তত চিঠিও লিখতে পারব না? ...ন্ত অবশ্য দরকার হয় নি, কিন্তু ...থেকে না লিখলে তোমার খবরও যে ...। 'ধর না, যদি একটা ছদ্মনামে ...রেস্টান্টে" করে চিঠি পাঠাই। ...রে এসে চিঠি জমা হয়ে থাকবে, আর আমি সেখান থেকে নিজে হাতে নিয়ে আসব।

না, সেটা ত দিল্লী শহর নয়। কে চিঠি আনতে পারবে ছদ্মনামে পরিচয় প্রকাশ না করে? আমরা কত পর্দানশীন তা জান না।

কিন্তু থাকব তাহলে কি নিয়ে?

এই রে। আবার সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে উঠলে। জান, আমার সেণ্টিমেণ্ট ভাল লাগে না।

জানি, কিন্তু মানি না। এটা শুধু তোমার একটা পোজ।

পোজ? ভুলে যাচ্ছ যে, আমাদের জীবনে পোজের অবকাশ নেই। চারদিকে সব মেয়েকেই দেখেছি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে পর্দার পিছনে চলে গেল। যেন পৃথিবী থেকে ধুয়ে-মুছে গেল। স্বামীর বিনা হুকুমে ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হবে না। না হল শিক্ষা, না মনুষ্যত্ব। যে জীব হয়ে জন্মেছিল, তার উপর উঠবার সুযোগ এ জীবনে হল না। মুখে হলিউডের হালফ্যাসানের 'প্যান-কেক' মেক-আপ যদি দেখতে পাও, জেনো যে সেটা হচ্ছে পতি-দেবতার আধুনিকতা ও বাহাদুরীরই জয়পতাকা। ঠিক গায়ে ভরা জরি-জহরতের মতই। ওটা শুধু মুখের মেক-আপ, মনের কোন ছাপ তাতে নেই। সফিস্টিকেসন হচ্ছে সভ্যতার ভেজাল। সেই মজাদার ভেজালের স্বাদ সে পায় না কখনো। এমন কি রাওয়ালার* চোখের জলেও ভেজাল নেই।

তোমার চোখে আমি জল ফোটাব অন্য-রকমভাবে—আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখিয়ে বললে যুবক।

তোমার এই দৃঢ়তা দেখে চমৎকৃত হলাম—যুবতীর কণ্ঠেও একটু দৃঢ় ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠল—আশা করি, এই দৃঢ়তা তোমায় শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগের হাত থেকে রক্ষা করবে।

তুমি, ওঃ তুমি কি নিষ্ঠুর হতে পার। দাও, তোমার হাতখানা আমার হাতে একটু-খানি রাখি। তাও ভাল লাগবে। পদ্মা, পদ্মা।

হাতখানা হাতে রাখল কি না অন্ধকারে টের পেলাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মিছে বলেন নি যে, আঙ্গুলে আঙ্গুলে কথা বিনিময় সবচেয়ে বড়, তা পুরোপুরিই টের পেলাম। শুনতে পেলাম মেয়েটি পরিহাসতরল সুরে বলছে—এখন কি তুমি কৃতজ্ঞ বোধ করছ?

একটু একটু আরম্ভ করেছি।

আরম্ভ করেছ? তোমার এই ঔদ্ধত্য—রহস্যতরল কণ্ঠরোষে গাঢ় হয়ে এল—তোমার এই ঔদ্ধত্য আমি পছন্দ করি।

জয়সূচক হাসি হেসে যুবক বলল—আমি জানি তা।

কিন্তু এ জয় নয়, পরাজয়। প্রমাণ এল হাতে হাতেই।

আচ্ছা, তাহলে তোমায় চিঠি লিখব, কিন্তু মনে রেখো, পদ্মা।

কোথায়? কোন্ ঠিকানায়? তুমি আমার কতটুকু জান? Love by the wayside, তাকে কতটা টেনে আনতে চাও?

শোন, দুটো আলাদা কথা হল। আমি তোমায় সবটুকুই জানি। অবশ্য তোমার ঠিকানা জানি না। তবে সেটা গৌণ। তোমায় জানাই আসল জানা।

হাউ ইম্পসিবলী রোম্যাণ্টিক। জয়, তোমাকে দিয়ে কোন আশা নেই।

ভরসাও নেই তোমার, পদ্মা। তোমায় আমি খুঁজে বের করবই। ছিঁড়ে ফেলব, টেনে ছিঁড়ে ফেলব This shroud of mistery (এই রহস্যের আবরণ)। দেখব তুমি রাজস্থান না সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, না কোথাকার কোন্ রাজার মেয়ে। ঠিক করে জানতে দাওনি কিছুই। শুধু রহস্যের পর রহস্য বাড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু এবার বের করে নিব। তোমার এই মোটরের নাম্বারপ্লেট থেকেই আমার প্রথম সন্ধান শুরু হবে।

থাক, থাক, জয়, আর বাহাদুরী করতে হবে না। আমায় জ্বালিয়ো না বলছি। কলেজে আমার নাম পদ্মা রাখা হয়েছিল সুবিধার জন্য। আমার আসল ঠিকানা ও নাম আমার পিতাজীই হোস্টেলে লেখান নি। কারণটা আন্দাজ করে নিয়ো। আর এ গাড়ি আমাদের স্টেটের নয়, তাও তোমায় জানিয়ে রাখলাম। আমার স্থানীয় অভিভাবকের কাছ থেকে এনেছি। যেমন মাঝে মাঝে নিয়ে আসি সন্ধ্যাবেলা একা ড্রাইভের জন্য। বলা বাহুল্য, তুমি তার কাছ থেকে আমার ঠিকানা পাবে না। সরি জয়, ভেরি সরি, কিন্তু আই কাণ্ট হেল্প।

একটু যেন নমনীয় হয়ে এল যুবতী। পদ্মার হৃদয়পদ্ম কি তাহলে বিকশিত হবে?

না, তা হবার নয়। পদ্মা ওকে পরিষ্কার

* রাওয়ালা=রাজ অন্তঃপুর।

...দেবার চেষ্টা করতে। ...

বুঝিয়ে দিল যে, ভালবাসা বড় সেকেলে কথা। ওর প্রপিতামহীর পিতামহীরা যখন আগুনে পুড়ে জহর-ব্রত করতে যেত, তখনো সে আগুনে ভালবাসার শিখা লক লক করে জ্বলে উঠত বলে ও মনে করে না। হয়ত কোনদিন ভুলে একটু ভালবাসা গজাত, এই দিল্লীর প্রান্তরে যেমনভাবে মনের ভুলে বর্ষার সময় ঘাস গজায়, কিন্তু আসল রূপ তার ওই বন্ধুর ধূসরতাতে। যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'ত, বরের বাড়ির দাসীর ইন্সপেক্‌সন আর সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে ও বংশ-কৌলীন্যের সঙ্গে রৌপ্য-কাঞ্চনের ওজন যাচাই করে, বাই জোভ, তার আবার ভালবাসাবাসি কি? রাজোয়ারার * রাওয়ালাতে (রাজস্থানের রাজ-অন্তঃপুরে) আছে শুধু স্বামীর বংশের জন্য সন্তান ধারণ, স্বামীর সম্মান বা স্বৈরাচারের জন্য আত্মত্যাগ—সে আত্মহত্যা করেই হোক বা আত্মসম্মান পকেটস্থ করেই হোক।

ছোঃ, এই দেশে আবার ভালবাসা! পর্দার আড়ালে পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে বাঁদী-বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ রোমন্থনময় জীবনে যেখানে একটু বাইরের মনমাতান বাতাস বা পরকীয় কটাক্ষ পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে না, সেখানে কোথায় ভালবাসা? সাধে কি এই দেশে মরুকণ্টক ছাড়া আর কিছু স্বভাবত গজায় না। রাজপুতানীর হৃদয়ে মরু-সাহারা ছাড়া আর কিছু নেই, থাকতে পারে না, থাকা উচিত হবে না।

অন্ধকার আকাশটা যেন একটু রুদ্ধ রক্তিমাভ হয়ে উঠল। আমিও শিগ্গির রাজস্থানে যাচ্ছি। জীবনে এই প্রথম দেখতে পাব সে দেশকে যে দেশে বইয়ের পাতার ভিতর দিয়ে তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়িয়েছি। এ ত বড় সুন্দর ভূমিকা হল তার। বহু অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট আবিষ্কারের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু, তুমি, তুমি ত আমায় ভালবাস। গদগদ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল জয় নামক এই অজ্ঞাত ও সাধারণ কোন ঘরের এই যুবক। জয়কুমার, কি জয়চাঁদ কি রামজয় এরকম কোন নাম বোধ হয় না ঠাকুমা দিয়েছিল ষষ্ঠীর রাত্রিতে রেড়ীর তেলের আধো অন্ধকারে চোখে কাজল পরাতে পরাতে। তারার আধো আলোর মায়ায় যে নাম হয়ে গিয়েছে শুধু জয়। যেন ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে রূপকথার এক রাঙা রাজকুমার। এনে দিয়েছে কাছে কোন সুগোপন অভিজাত রাজপুত বংশের 'ছদ্মনাম্নী পদ্মাকে। মুছে দিয়েছে দেশ বংশ সংসার ও অজ্ঞাততার ব্যবধানকে নিভৃত অভিসারের নীল নিচোলের নীচে।

শুধু জয় ও পদ্মা। মানবতার রঙ্গমঞ্চে এটুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু অবোধ জয়ের পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নয়। সে চায় পরিচয়, সে চায় প্রণয় এমন কি পরিণয়ও হয়ত ভবিষ্যতে।

আবার বিমুগ্ধ স্বরে সে বলল, কিন্তু তুমি ত আমায় সত্যিই ভালবাসতে। এখন দেশে চলে যাবে তাই পরিচয় না জানিয়ে চলে যেতে চাও। তাই বোধ হয় সে কথা অস্বীকার করছ।

It was a great fun, Jay, darling সে ভারী মজা ছিল, জয় ধন।

Don't try to kid me now. আহত স্বরে জয় তাকে নিয়ে এরকম ছেলেখেলা করতে বারণ করল। তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাসতে, এখনো বাস।

তুমি ভা-া-া-রী মিষ্টি, জয়। অনুমান করা শক্ত হল না যে, কৌতুকে এমন কি ব্যঙ্গে পদ্মার পদ্ম আঁখি প্রস্ফুরিত হয়ে উঠেছে।

বেচারা অবোধ জয়। সহজ সরল...
সে আবার বলে উঠল,—তুমি ...
বললে না এ কথাতে। তুমি কি ...
ভালবাসতে না?

একটুখানি মৌনতা। একটুখানি মনে মনে কথা কওয়া। একটুখানি ... দীর্ঘশ্বাস।

ভালবাসা? সেটা ত বড় বড় কব... গেল জয়। দেখ, তুমি মুখ নীচু করে... তার মাথার সব চুলগুলি ঝুলে পা... কবি প্রতিভার অগ্নিশিখা। দাউ ... করে জ্বলতে জ্বলতে নীচের দিকে আসছে। হাউ ফানি।

অগ্নিশিখাগুলি হয়ত মনের ... গরম হয়ে আবার মাথার উপরে স্ব... ফিরে এল। জয় কিন্তু গুম হয়ে ...

বুঝেছি। নিরাসক্ত কণ্ঠে ধীরে ... বলল পদ্মা। বুঝেছি এখন আমার ... গুণ করে রবিবাবুর ওই বাংলা ... শুনিয়ে দিতে হবে। কে না তোমার ... যে ওটি হিন্দীতে অনুবাদ করে... ধূর্জটিরাম ছিল তার নাম। তাকে ব... ও গানটা যেন তার নিজের ঘরানার ... তুলে রাখে। কোন একাকিনীকে শে... কোন ফল হবে না।

না ভুলাও রূপ সে
জীতু তুম্‌হে মৈ প্রেম...

গ্রাম্য রাজপুত বিয়ের নাচ

* রাজোয়ারা=রাজস্থান।

দ... প্লুট না হাথ সে
পর খোলুঁ সঙ্গীত সেঁ।
...পে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব;
...ত দিয়ে দ্বার খোলাব না
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।)

হাউ ইম্‌পসিবল্, জয়। এ গীত আবার কারো কানে গুণ গুণ করে শোনাতে হয়।

...করে রইল জয়। হয়ত আহত ...মান, হয়ত আড়ষ্ট অনুযোগ। কিন্তু ...প করেই রইল।

...রবতা ভেঙ্গে পদ্মাই আবার বলল,— আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না বলে ...র মনে কষ্ট হবে কিন্তু সে ত হাতের ...ঠা অঙ্গুলী থেকে একটা হীরার ...ট পড়ে যাওয়ার মত; অনামিকা তা ...ও পারবে না।

...কর পদ্মা, তুমি বড় ব্রুটাল। যে ...ব তোমার নিজের নেই তার প্রতি এত ...করা তোমার উচিত নয়। যা নেই ...নিন্দা করে উড়িয়ে দিতে পার না।

...ধ হয় পদ্মা বিদ্রূপে মুখ উদ্ভাসিত ...বসে রইল। কথাটা এত তুচ্ছ ওর ...যে উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না। ...ই আবার বলল— তবে শোন। এটাও ...র একটা পোজ। প্যালেসের বিলাস ...রাণ্ডা হোস্টেলের* পালিশ তোমার ...উপর প্রলেপ এনে দিয়েছে। তাই ...নিজের মনের ব্যথাকে ঢাকবার জন্য ...বলছ। তাই তোমার প্রেমস্বপ্নকে ...'ফান' বলে হেসে উড়িয়ে দিতে ...

...মার প্রেমও ছিল না, স্বপ্নও ছিল না ...দন। ভাল লাগত, মজা লাগত। ঠিক ...সরবৎ যেমন। একটু আরাম লাগে, ...লাগে। ব্যস, তার পর আর কিছু ...জিন মেশান গিমলেট খেয়ে ঘরে ...নেশায় মাথা ভার করে পড়ে থাকবার ...র আমি নই।

...কেন আমায় নিয়ে নাচালে? কেন ...এ নেশা ধরালে? জয়ের কণ্ঠে ...? ভৎর্সনার সুর।

...? আমার মজা লাগত বলে। ইচ্ছা ...খেলে বলে। আমার দেশের বংশের ...। রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ...হে বলে। আরো শুনতে চাও?

---

* দিল্লীর একটি বিখ্যাত মেয়েদের ... হোস্টেল।

জয় হয়ত কানে বা ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়েছিল। তার নীতিবাগীশ মন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে শুধু খুব নীচু স্বরে বলল—ভাল না বেসেই?

অসহিষ্ণু হয়ে পদ্মা বলে উঠল—আঃ, তুমি কেন খালি খালি ভালবাসা এর মধ্যে আমদানী করছ বুঝি না।

বোকা, আমি মহা আহাম্মক। এই বলে চুপ করে রইল যুবক।

চারদিক এত নীরব হয়ে এসেছে যে, মটরের ঘড়িটার টিক টিক শোনা যাচ্ছে; আমার নিজের নিশ্বাসস্পন্দন শোনা যাচ্ছে; আর যুবক যদি একটা নিরুদ্ধ ক্রন্দন উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে তাও এসে ওই যুবতীকে বোধ হয় স্পর্শ করে যাবে।

কি, এখনো প্রেম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? মৃদু সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করল পদ্মা।

একটু পরে যুবক বলল—না। আমি শুধু ভাবছি যে তুমি চলে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আর দেখা হওয়ারও পথ রাখলে না।

তার জন্য বরং দুঃখ করতে পার। কিন্তু আমি বলি যে, তাও করা ঠিক হবে না। এই যে, গত কয়েকমাসের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সম্পূর্ণ অচেনা মিস্টিরিয়াসভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এই কি যথেষ্ট নয়? তুমি রোম্যান্টিক টাইপের লোক। এটুকুর মধ্যেই যা রোম্যান্স তুমি পেয়েছ এর চেয়ে বেশী পরিচয় হলেও তার চেয়ে বেশী পেতে না।

বলতে বলতে পদ্মার কণ্ঠে আবার ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়ে উঠল—একটা সোনার স্বপন, কি বল? না হয়, ধর, সায়াহ্নের অস্তরাগ। বেশ কবিজনোচিত হল, নয়? কিন্তু দোহাই তোমার! ভয় হচ্ছে এখনি তুমি বলে বসবে যে আরাবলী শৈলমালার পিছনে তোমার জীবনের আলো অস্ত যাচ্ছে। হ্যাঁ—গুড্ বাই বলতে পার, কিন্তু সানসেট্ বলো না। ওসব সেণ্টিমেণ্টালিটির স্থান নেই পৃথিবীতে।

ও রিভোয়া (পুনর্দর্শনায় চ) পর্যন্ত নয়? ক্ষীণ প্রশ্ন করল জয়।

আবার জ্বালালে তুমি তোমার মিনমিনে প্রেম নিয়ে। পদ্মা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

আমি শুধু মানুষ। তোমাকেও শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তুমি নারী। শেষ প্রতিবাদের চেষ্টা করে বলে উঠল জয়।

এবার আবার রবিবাবুর তর্জমা আবৃত্তি কর। আছে ত তোমার কবিতার বইয়ের খাতা।

"মানুষে গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হতে।"

মনুষ্য নে তুম্‌হারে নির্মাণমে
আপনে অন্তস্তলকা সৌন্দর্য
সঞ্চারিত কর্ দিয়া হ্যায়

তা ভালই করেছে বাপু। আমার আপত্তি নেই। তবে একটু আধুনিক হবার চেষ্টা করো। বোকামীটাও আধুনিকভাবেই করা ভাল।

যথা?

যথা, এই ধর আমার রক্তিতিলক মাখা রাজোয়ারার মাটী সূর্য না হয় চন্দ্র না হয় হর বংশের প্রপিতামহীর বিয়ের সময় বর এল বীরবেশে, ঘোড়ায় চড়ে, তলোয়ার ঝুলিয়ে, সঙ্গে সৈন্যদল। পথের মধ্যে যৌতুকের মণিমুক্তা, সোনারুপোর গয়না এমন কি দেবধারীদেরও (কনের সখীদের) কোন হতাশ নাগর লুটে নিয়ে যেতে পারত। আমার মার বিয়েতে বাবা এলেন নির্ভয়ে ট্রেনে চড়ে, স্টেশনে তৈরী ছিল মটর যদিও সভায় অবতীর্ণ হলেন ঘোড়া থেকে। আর আমি যদি বিয়ে করি আদালতে থাকবে নোটীশ টাঙান। সেটাই হবে রাজপুত বিয়ের শ্রীফল (নারকেল) পাঠানর সামিল। এরোপ্লেনে করে উড়ে এসে নামব সেখানে। আর চাই কি তোমাকেই নিমন্ত্রণ করব আমাদের বেস্ট ম্যান হতে। পারবে ত?

লঘু পরিহাসের সুরে তার কণ্ঠে জলতরঙ্গের বাজনার মত বেজে উঠল। তারায় তারায় যেন হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। আকাশ হয়ে রয়েছে হতাশায় নীল। কিন্তু চাঁদের তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কোথায়?

না। এবার উঠে পড়তেই হবে। প্রথম নভেম্বরের দিল্লীর রাত্রি ঠান্ডা হয়ে আসছে ক্রমশ। আর দেরী করা চলে না। নয়া রাজস্থানের নবীনা আধুনিকা একজনের মন ভাল করেই জানা গেল একেবারে মর্মের ভিতর থেকে, অন্তরের অন্তর্লোক হতে। ক সপ্তাহ পর থেকেই ত তার যাচাই শুরু হবে।

খুব সন্তর্পণে উঠে আসবার সময় শুনতে পেলাম—তবে এও বলে রাখি যে, আমার ওই মনোপ্লেনে শুধু একজনের ঠাঁই কোনরকমে যদি বা হয়। তোমার ওই সেণ্টিমেণ্টের বোঁচকাবুঁচকি বা কটেজ পিয়ানোর তাতে স্থান হবে না। (ক্রমশ)

চাঁদে প্রথম মানুষ

অমরেন্দ্রকুমার সেন

গত অক্টোবর মাসে সংবাদপত্রে একটি ছোট খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, ডক্টর ওয়ের্নার ফন ব্রাউন নামে জনৈক মার্কিনবাসী বিজ্ঞানী কোন একটি মার্কিন সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে, আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে মানুষ চাঁদে পৌঁছতে পারবে। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছেন। বলতে গেলে তাঁর পরিকল্পনাটি ত্রুটিহীন এবং মনে হয় যে, পরিকল্পনাটি যদি ঠিকমত কাজ করে, তাহলে মানুষ চাঁদে পৌঁছতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, ডক্টর ব্রাউনের এই প্রবন্ধ সারা পৃথিবীতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, ডক্টর ব্রাউন মার্কিন সামরিক বিভাগে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মিলে এক আলোচনা বৈঠকে বসেছিলেন, যার ফলে উপরোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্গে ঐ সকল বিজ্ঞানীদের ছবি প্রকাশিত হলো। বর্তমান প্রবন্ধটি মূল প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে পারবে, এই ধারণা একদল বিজ্ঞানীর মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে। যে উপায়ে চাঁদে পৌঁছনো যাবে তার সবই এখন আমাদের আয়ত্তাধীন, প্রয়োজন খালি আসল পরিকল্পনার আর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা। অতএব আমাদের উচিত এখনই কাজে নেমে পড়া। এই কথা ঐ সকল বিজ্ঞানীরা বলছেন বেশ জোর গলায়।

বলতে গেলে প্রথম ধাপ আরম্ভ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এমন রকেট তৈরি করেছেন যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বায়ুহীন অসীম শূন্যে পৌঁছতে পেরেছে। এখন দরকার হলো আরও ভালো রকেটের, উন্নত মডেলের। কি করে তা তৈরি করতে হয় তা আমাদের জানা আছে।

পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে শূন্যে কোথাও না থেমে চাঁদে পৌঁছনো যাবে না, সেজন্য তৈরি করতে হবে বিরাট রকেট-জাহাজের এবং তার জন্য অর্থের প্রয়োজনও প্রচুর। প্রচুর অর্থব্যয় করেও তা সম্ভব কি না বলা শক্ত। আমরা চাঁদের পথে শূন্যে এক স্থানে থামব, সেখানে যে যানে করে পৃথিবী থেকে এতক্ষণ আসছিলুম তাকে ত্যাগ করে চাঁদে নামবার উপযুক্ত আর একটা যানে চড়ব। অর্থাৎ মাঝপথে থেকে যান পরিবর্তন করব। শিলিগুড়িতে বড় গাড়ি বদলে পাহাড়ে চড়ার উপযোগী গাড়িতে ওঠা আর কি!

আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে ১০৭৫ মাইল উঁচুতে পাকাপাকিভাবে একটা স্টেশন তৈরি করা সম্ভব হবে। এই স্টেশনটি নিজস্ব কক্ষ-পথে দু'ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসবে। তিন ভাগে ভাগ করা যাবে এমন একটি রকেটে করে মালপত্র ঐ দু'ঘণ্টার কক্ষপথে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মালপত্র দিয়ে ঐ স্টেশনটি ঐ দূরত্বে [illegible] করা হবে। আর রকেটটিতে যে তি[illegible] ভাগ থাকবে তার প্রত্যেক ভাগে আ[illegible] আলাদা মোটর ইঞ্জিন থাকবে, প্রয়ো[illegible] অনুযায়ী সেই ইঞ্জিনদের চালানো [illegible] এবং পরে তাদের ফেলে দেওয়া হবে।

এই সকল রকেট পৃথিবী [illegible] ১০৭৫ মাইল দূরে তাদের নিজেদের [illegible] পথে ঘণ্টায় ১৫৮৪০ মাইল বেগে ঘ[illegible] থাকবে, পৃথিবীর উপগ্রহের মতো। ত[illegible] এই যে ঘোরা, তার জন্য কোনো যা[illegible] শক্তির দরকার হবে না, তারা নিজে নি[illegible] ঘুরবে এবং যতদিন ইচ্ছে তাদের এই ঘোরানো যাবে। সেই রকেট থেকে [illegible] পত্রগুলি খালাস করে শূন্যে ছেড়ে [illegible] সেগুলিও রকেটের মতোই সমান [illegible] রকেটের সঙ্গে ঘুরতে থাকবে।

এই সকল মালপত্র থেকে ২৫০ [illegible] ব্যাস হবে এমন একটি চক্রাকৃতি স্টে[illegible] তৈরি হবে যাতে আশি জন লোকের থা[illegible] স্থান হবে, স্টেশনে তাদের জন্য বায়ু[illegible] নিয়ন্ত্রিত খুপরি খুপরি ঘর থাকবে। [illegible] এইজন্য ছোটখাটো একটি কারখ[illegible] স্থাপিত হবে দেখা যাচ্ছে এবং যে স্টে[illegible] স্থাপিত হবে তারও নানাদিক থেকে গ[illegible] থাকবে। এই স্টেশন থেকে পৃ[illegible] বিভিন্ন অংশ উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ [illegible] চলবে আবার যদি কারও কু-মতলব [illegible] তাহলে যুদ্ধের সময় সেখান থেকে [illegible] স্থলে বোমা ফেলাও যাবে। মার্কিন রাষ্ট্রের দেশরক্ষা দপ্তরের একদা ভার[illegible] সচিব জেমস ভি ফরেস্টল ১৯৪৮ [illegible]

আলোচনা বৈঠকে মিলিত বিজ্ঞানীগণ : বাম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ডক্টর ফ্রেড হুইপল এবং তৃতীয় ব্যক্তি ডক্টর ব্রাউন
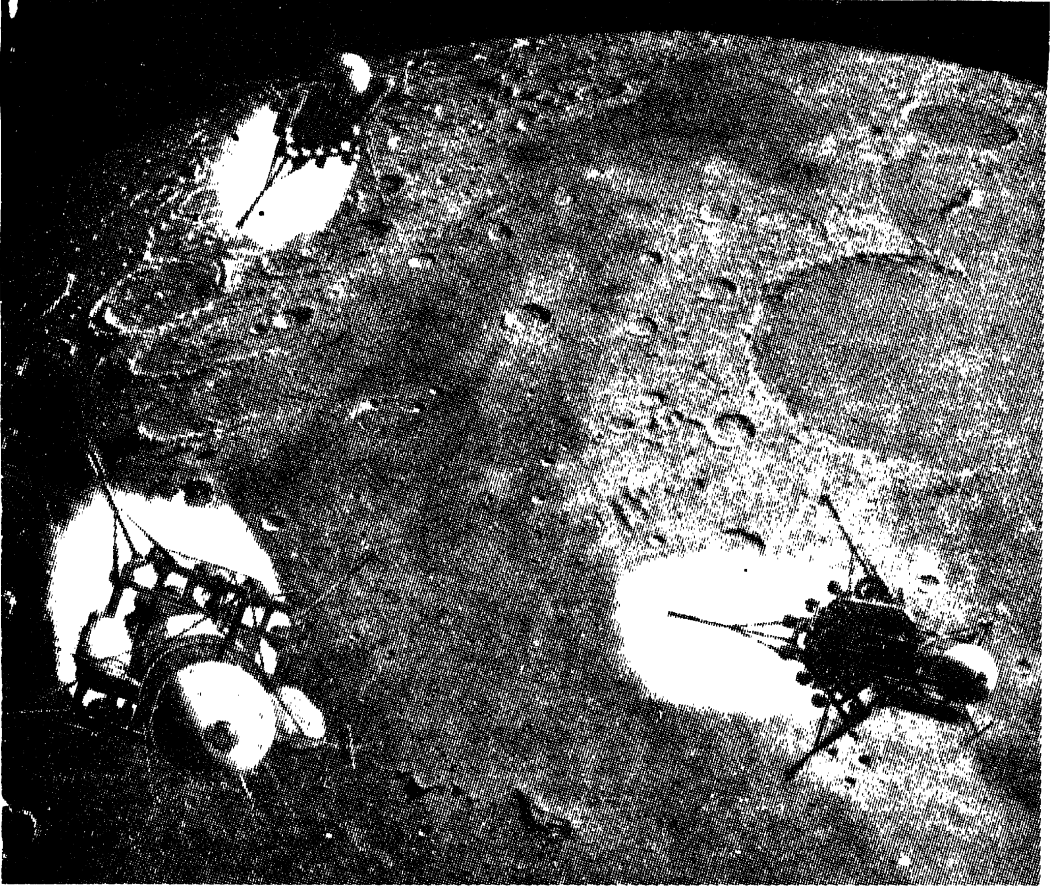
চাঁদে অবতরণ করবার ঠিক দশ মিনিট পূর্বে। চাঁদের এই স্থানটিকেই বলা হয় সাইনাস রোরিস।

...চ দিয়েছিলেন যে, এইরকম একটি ...স্থাপনের আয়োজন চলছে। একজন ...ন বিশেষজ্ঞের মতে এইরকম একটি ... স্থাপন করতে খরচ হবে ...০০০০০০০ ডলার। বলতে গেলে ...স্টেশনই হবে চন্দ্রাভিযানের আসল ...। আশা করা যাচ্ছে, ইংরেজি ১৯৬৭ ...নাগাদ এই স্টেশন স্থাপিত হবে এবং স্টেশন স্থাপিত হতে হতে এদিক-... অনেক কাজও এগিয়ে থাকবে। ...১ সালে একদল বিজ্ঞানী চাঁদে প্রথম ...ণ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করা ...

কিন্তু ঠিক কি করে চাঁদে পৌঁছনো যাবে? শূন্যের ঐ স্টেশনে তিনটি রকেট তৈরি করা হবে এবং এই রকেটে করে পঞ্চাশ জন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার চাঁদের প্রতি ধাবিত হবেন।

রকেটগুলি দেখতে মোটেই সুদৃশ্য হবে না এবং স্ট্রিমলাইনড্‌ও হবে না, কিন্তু তাদের কার্যকারিতা যে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হবে একথা বলাই বাহুল্য। শূন্যে যেখানে বাধা দেবার জন্য বায়ুর উপস্থিতি নেই সেখানে স্ট্রিমলাইনড্‌ না হলেও রকেট-গুলি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে। ...

দিনে ২৩,৯০০০ মাইল যেয়ে যাতে আবার ঐ দূরত্ব ঐ সময়ে ফিরে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা থাকবে আর তৃতীয় রকেটটিতে খালি যাবার ব্যবস্থাই করা থাকবে, কারণ সেটিকে ফিরিয়ে আনা হবে না। ফেরবার কোনো আয়োজন তাতে না থাকায় অতিরিক্ত যে জায়গা তাতে পাওয়া যাবে সে জায়গায় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের রসদ ইত্যাদি রাখা থাকবে, যাতে তাঁদের ছয় সপ্তাহ চলতে পারে।

স্টেশন ত্যাগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রকেটযানগুলি ঘণ্টায় সাড়ে উনিশ হাজার ...

তেত্রিশ মিনিট যাবার পরই তাদের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হবে। বাকি পথটা রকেটজাহাজগুলি চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চাঁদের ওপরে আপনা থেকেই পড়তে থাকবে। বলা বাহুল্য এই রকম একটি অভিযান সফল করতে কেবল অর্থ-বল ও লোকবল থাকলেই চলবে না, সেই সংগে থাকা চাই নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করে তাকে রূপ দেওয়ার দক্ষতা। তবে চাঁদে যাওয়ার যে সমস্ত সমস্যা ছিল সেগুলির সমাধান হয়েছে এখন দরকার হলো সব কিছু মিলিয়ে আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলা।

কিন্তু এ দিকের সব আয়োজন না হয় করা গেল, কিন্তু চাঁদে গিয়ে নামা যাবে কোথায়? শূন্যের সেই স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণকারী এক রকেট জাহাজে করে চাঁদের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে ভালো করে সব দিক এমন কি চাঁদের চিরঅন্ধকার-ময় দিকটাও দেখে আসা যাবে এবং কোথায় নামলে সুবিধা হবে তা স্থির করে ফেলা যাবে। তবে চাঁদের ইকোয়েটরে নামা যাবে না। সেখানকার উত্তাপ প্রচণ্ড, ২২০ ডিগ্রী, এর অনেক কম উত্তাপেই জল ফুটতে থাকে। আবার অন্য কোনো সমতল স্থানে নামারও মুশকিল আছে, সেখানে সেকেণ্ডে কয়েক মাইল বেগে ধাবিত মটরাকৃতি উল্কার সদাই আঘাত লাগবার সম্ভাবনা। অতএব এক বড় গর্তের মধ্যে নেমে ঘাটি স্থাপন করাই প্রশস্ত। সেই রকম সুবিধামতো একটা জায়গা আছে এবং যতক্ষণ না আরও ভালো জায়গার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্থানটিই অবতরণ করবার উপযুক্ত স্থান বলেই ধরা রইল। এই স্থানটির নাম হলো সাইনাস রোরিস অথবা ডিউই বে; ওসেনাস প্রোসেলেরাম অথবা স্টর্মি ওসেন নামে এক বিরাট সমতল ক্ষেত্রের উত্তর দিকের একাংশে এই স্থানটি অবস্থিত। কিন্তু এই সমতল ক্ষেত্রের নাম স্টর্মি ওসেন রাখার কারণ হলো যে, প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ মনে করতেন যে, চাঁদের সমতল ক্ষেত্রগুলি সমুদ্র। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ফ্রেড এল হুইপল্ বলেন যে, সাইনাস রোরিসই হলো চাঁদে নামবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। চাঁদের উত্তর মেরু থেকে সাইনাস রোরিস ৬৫০ মাইল দক্ষিণে, দিবাভাগে এখানকার উত্তাপ ৪০ ডিগ্রী। জায়গাটি মোটামুটি সমতল অথচ উড়ন্ত উল্কা থেকে লুকোবার আড়ালও আছে।
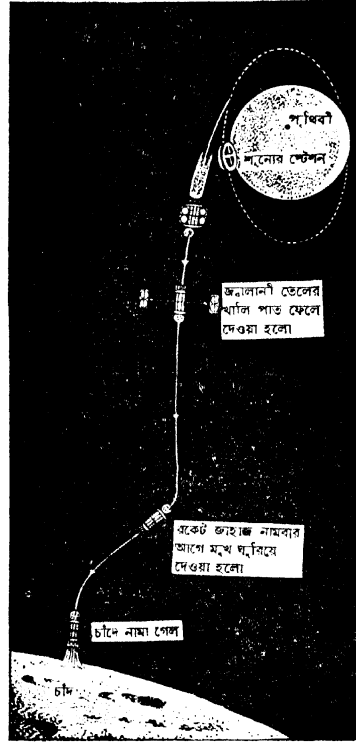
শূন্যের স্টেশন থেকে চন্দ্রাভিযান শুরু হলো

রকেটের জ্বালানি এবং সময় বাঁচাবার জন্য সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব পথেই যাওয়া ভালো। চাঁদ সাতাশ দিনের কিছু বেশি সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, আর আমাদের শূন্যের সেই স্টেশন দু ঘণ্টায় একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। দু' সপ্তাহ অন্তর একটা সময়ে এই স্টেশন আর চাঁদ এমন একটা রেখায় এসে পৌঁছয় যে তখন চাঁদে যাত্রা করলে পাঁচ দিনে পৌঁছনো যাবে, আবার দু' সপ্তাহ পরে ঐ যোগাযোগের সময় প্রত্যাবর্তন করা চলবে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য চাঁদে ছয় সপ্তাহ থাকবার চেষ্টা করবেন।

শূন্যের স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট দিনে যাত্রার ছয় মাস আগে থাকতে রকেটে করে শূন্যের স্টেশনে মালপত্র যন্ত্রপা...পাঠা... চাঁদে যাবার আসল রকেট তৈরি ... জন্য। শূন্যের স্টেশনে মালপত্র ... থেকে নামিয়ে সেইখানেই ছেড়ে ... হবে, সেগুলি কোথাও পড়ে যাবার সম... নেই, সেই স্থানটি মাধ্যাকর্ষণশক্তির ... কিন্তু সেখানে যা কিছু যাচ্ছে, সে... কিছু এমন কি লোকলস্কর সকলেই ... ১৫৮৪০ মাইল বেগে ঘুরতে থ... এইখানেই ধীরে ধীরে চাঁদে যাবার ... তৈরি করা হবে, ছত্রিশ টন ওজনের ... রকম মালপত্র থেকে, যেগুলি প্র... অ্যালুমিনিয়াম, প্ল্যাস্টিক আর ন... দ্বারা তৈরি। যাতে সহজেই সব ... সুষ্ঠুভাবে করা যায় সেজন্য আগে থা... উপযুক্ত ব্যবস্থা করা থাকবে।

প্রত্যেকটি রকেটজাহাজ লম্বায় ... ১৬০ ফুট আর চওড়ায় ১১০ ফুট ... প্রত্যেকটি জাহাজের নীচে তিরিশটি ... মোটর থাকবে, তাছাড়া সমস্ত র... জাহাজটি নানাপ্রকার জটিল যন্ত্রপা... পরিপূর্ণ থাকবে। চাঁদে বাস করবার ... এবং সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার ... সব রকম ব্যবস্থাই করা হবে। সব ... আয়োজন সম্পূর্ণ করে দিনক্ষণ ... যখন আমরা চাঁদে যাত্রা করব, ... মুহূর্তটির জন্য কোটি কোটি ... পৃথিবীর বুকে অধীর আগ্রহে অ... করবে। শূন্যের স্টেশন থেকে টেলি... সনের সাহায্যে এই যাত্রারম্ভ দে... ব্যবস্থা করা হবে। তখন পৃথিবীর ... অংশে রাত্রি, সেই অংশের লোকেরা ... তিনটি রকেটজাহাজের নব্বইটি ... মোটর থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রচণ্ড আ... রশ্মির একটা ক্ষীণধারা দেখলেও দে... পারেন; কিংবা কেউ কেউ হয়ত মনে ক... পারেন ঐ আলোকরশ্মি ছুটে য... সদ্যোজাত কোনো নক্ষত্রের।

আমাদের যাত্রা হলো শুরু। কিন্তু ... ধীর। সবুজ আলোকরশ্মির রেখা আঁ... আঁকতে রকেট তিনটি পর পর চলে... তেত্রিশ মিনিট চলবার পর আমরা ই... বন্ধ করে দিলুম, বাকি পথটা চাঁদ ... আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আমাদের ... নেবে। পৃথিবীকে আমরা দেখছি স... তুষার আর মেঘ-ঘেরা এক প্রায় সবুজসবু... মণ্ডিত গোল বলের মতো, চাঁদও আমা... সামনে। পৃথিবী ক্রমশ দূরে সরে ... আর চাঁদ আসবে কাছে এগিয়ে।

...ঝখানে সূর্যের আলোকে দীপ্যমান ...র ক্ষুদ্র শূন্যের স্টেশনটি দেখা যাবে ...ল করতে।

...ঘণ্টা চুয়ান্ন মিনিট পরে আমরা ...ী থেকে ১৭৭৫০ মাইল দূরে চলে ... তখন আমাদের গতি ঘণ্টায় ...০ মাইল। পাঁচ ঘণ্টা আট মিনিট ... আমরা ৩২৯৫০ মাইল পথ অতিক্রম ...ে, কিন্তু কমে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় আট ... মাইল। কুড়ি ঘণ্টা পরে যদিও ...দর গতি আরও কমে দাঁড়িয়েছে ...৪৩০০ মাইল, কিন্তু আমরা এক ... বত্রিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম ...ছ। প্রথম দিন নিষ্প্রয়োজনীয় ...নি তেলের একটি ট্যাঙ্ক ফেলে ...া হবে।

...ই যাত্রাপথে যে সকল নতুন অভিজ্ঞতা ...ত হবে তার মধ্যে একটি হলো যে, ... রাত্রির পার্থক্য সেখানে নেই, অতএব ...থ অথবা সময় ঠিক করবার জন্য একটা ...নগ্রাহ্য সময়াঙ্ক ঠিক করে নিতে ... আর সেই শূন্যে ওজন বলে কিছু ... সবই হয়ত নিজের পথে চলবার চেষ্টা ...। খাবার পাত্রগুলিকে চুম্বক অথবা ... উপায়ে আটকে রাখতে হবে। খাবার-...র হ্রস্ব ইলেকট্রনিক রশ্মি সাহায্যে ... করে নেওয়া হবে। জল অথবা অপর ...না পানীয় সরুমুখওয়ালা প্ল্যাস্টিকের ...লে ভরা থাকবে এবং বোতলের গা ... মুখের মধ্যে সেই পানীয় চালিয়ে ...ত হবে। অন্য আহার্য্যও খুব সাবধানে ... করতে হবে। যে আধারে খাবার ... থাকবে তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ...র বার করে মুখে পুরে দিতে হবে। ...তুর্থ দিনের আরম্ভে গতি আরও কমে ..., ঘণ্টায় মাত্র আটশ' মাইল। চাঁদ ...ন অনেক বড় দেখা যাচ্ছে, তার রুক্ষ ...রিভাগ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে আর ...াভ সবুজ পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে ...ছ, তার ব্যাস এক গজের বড় দেখাচ্ছে ... কিন্তু সময় যত সংক্ষেপ হয়ে আসছে ...মাদের উত্তেজনাও তত বেড়ে যাচ্ছে। ... থেকে যখন আমরা আর সাড়ে তেইশ ...জার মাইল দূরে তখন আমাদের গতি ...াৎ বেড়ে যাবে, ঘণ্টায় ছয় হাজার ...ইল। এবার সত্যি সত্যিই চাঁদের ওপর পড়তে আরম্ভ করেছি, বাধা দেবার জন্য বায়ুমণ্ডলও নেই। এই গতিতে পড়তে থাকলে ত' রকেটজাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা তার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রকেটজাহাজে হেলিকপ-টারের মতো ডানা লাগানো থাকবে এবং অবতরণ করবার আগে সেই ডানা ঘুরিয়ে রকেটজাহাজের গতি কমিয়ে দেওয়া হবে; আর রকেটের নীচের দিকটাই আগে নামবে সেইজন্য সেখানেও স্প্রিং লাগানো কয়েকটি পা থাকবে। সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাপূর্ণ সময় হবে শেষ দশ মিনিট। পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিকমতো চললে চাঁদে পৌঁছনো যাবে।

যত সহজে এগুলি লেখা হলো তত সহজে অবশ্য চাঁদে পৌঁছনো যাবে না। কত রকম বিপদ ঘটতে পারে। প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য হয়ত ইঞ্জিনের কোনো কোনো স্থানে খুব সরু ফাটল ধরতে পারে এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ইঞ্জিনকে বিকল করে দিতে পারে। কিংবা হয়ত দ্রুতগামী উড়ন্ত একটা বিরাট উল্কা রকেট-জাহাজকে আঘাত করতে পারে, ফলে কি হবে কে বলতে পারে?

১১

সেদিন 'মোহিনী-সিঁদুর' অফিস থেকে আসবার পথে সেই কথাই মনে পড়লো। ফতেপুরে থাকতে মানুষের দারিদ্র্য এমন করে কখনও তো চোখে পড়তো না। এখানে কলকাতা শহরের মধ্যে ক'মাস থাকতে থাকতেই যেন চোখ খুলে গেছে ভূতনাথের। চারদিকে বড় অভাব। বড় হাহাকার। রাস্তায় একটা ভিখিরী আধলা চাইতে চাইতে বড়বাজার থেকে একেবারে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত পেছনে পেছনে আসে।

বলে—একটা আধলা-পয়সা দাও বাবু—একটা আধলা-পয়সা দাও—

ভূতনাথ বলে—কোথায় বাড়ি তোমার—

বুড়ো মানুষ। গেরো দিয়ে দিয়ে কাপড়খানা কোনমতে কোমরে জড়িয়ে আছে।

বলে—বন্যে হয়ে আমাদের দেশ-গাঁ সব ডুবে গেছে গো, ভাসতে ভাসতে ডাঙায় এসে উঠেছি—দু'দিন কিছু খাইনি—একটা আধলা-পয়সা দাও বাবু—

সেদিন শিবু ঠাকুরের গলি দিয়ে আসতে আসতে আর একজন এক বাড়ির ভেতর থেকে ডেকেছিল।

—বাবা শুনছো—ও বাবা—

কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই বললেই চলে। স্ত্রীলোকের গলার শব্দ।

—এই যে বাবা, আমি এই দরজার ফাঁক দিয় কথা বলছি—

—দরজা খুলুন না, কী হয়েছে আপনার—

—কিছু মনে নিও না বাবা, তুমি আমার ছেলের মতন, একখান কাপড় নেই যে বেরোই সামনে, এই দু'টো পয়সা দেই, দু' পয়সার মুড়ি কিনে ওই জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দাও না বাবা—

কোথায় মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ, ফরিদপুরেব বন্যা—সবাই বুঝি জড় হয়েছে এখানে। অথচ বড় বাড়িতে অতগুলো লোক, অকারণে কত অপব্যয় হয়, কেউ দেখে না। বিলেত থেকে আসে কাঠের বাক্স ভর্তি নানান জিনিস। কাঠ-গ্লাসের ঝাড়-লণ্ঠন। একবার এল সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি উড়ন্ত পরী। গায়ে কাপড় নেই। হাতে একটা সাপ জড়ানো। মেজবাবুর নাচঘর সাজানো হলো। হাতী বাগানের বাজার থেকে নীলেমে অর্কিড গাছ কিনে নিয়ে এল ভৈরববাবু। চীনে অর্কিড। একটা বাচ্ছা গাছের দাম তিনশো টাকা। কলকাতা কেন সারা বাঙলা দেশে কারো বাড়িতে এ-গাছ পাবে না। এই এক চিলতে গাছের জন্যে খদ্দের হলো অনেক। সবাই এল কিনতে। খাস লাট সাহেবের বাড়ি থেকে বাগানের সাহেব মালী এলো, এলো ঠনঠনে, পাথুরেঘাটা, হাটখোলা, সব বাড়ির লোক। পাঁচ টাকা থেকে হু হু করে দর উঠতে লাগলো।

ভৈরববাবু যদি বলে—পঞ্চাশ—
ঠনঠনের দত্তবাবুরা বলে—বাহান্নো—
মল্লিকবাবুর লোক বলে—পঞ্চান্নো—

সেই গাছ কেনা হলো শেষ পর্যন্ত তিন শো টাকা দিয়ে। ভৈরববাবু সগর্বে বুক ফুলিয়ে সকলকে হারিয়ে দিয়ে গাছ নিয়ে এলেন বড় বাড়িতে। গাছ দেখতে জড় হলো বার-বাড়ির সবাই। অন্দর মহলেও পাঠানো হলো; মেজগিন্নী দেখতে চেয়েছেন। তিনশো টাকার গাছ। সোনা-দানা নয়, কুকুর-বেড়াল নয়, কিছু নয়—গাছ। মরে গেলেই গেল।

তা হোক. ভৈরববাবু গোঁফে তা দিতে দিতে বলতে লাগলো—বাবু তো বাবু মেজবাবু—ছেনি দত্ত বাবুয়ানি করতে এসেছে কা'র সঙ্গে জানে না—

সেই গাছ প্রতিষ্ঠা হলো। তার জ
তৈরী হলো। মেজবাবু নিজে এসে
করে গেলেন।

ওদিকে খবর পৌঁছুল লাট স
কাছে। চীনে-অর্কিড তিন শো
কিনে নিয়েছে বড় বাড়ির চৌধুরী ব
লাট সাহেব খবর পাঠালে—গাছ
আসবেন তিনি। সোজা কথা নয়।
সাজ রব পড়ে গেল। ভেলভেটের
পড়লো নাচঘরে। ঝাড় লণ্ঠন ঝাড়
হলো। চুনকাম হলো ভেতরে
রাজা-রানীর ছবি দু'খানা মুছে
হলো মস্ত আয়নাটার মাথায়। তার
লাল শালু দিয়ে লেখা হলো—God
the king. লাট সাহেব এসে তো
মুখে যেতে পারেন না। খানার ব
হলো। খাসগেলাসের ভেতর গ্যাসের
জ্বললো। বাড়ি সুদ্ধ লোকের
সাজ-পোষাকের ফরমাজ গেল ওস্ত
কাছে।

তিনশো টাকা গাছের পেছনে বি
হোক তিন হাজার টাকা বেবাক বেরিয়ে
নগদ।

সেকালের বনমালী সরকার
চৌহদ্দি গাড়িতে গাড়িতে ছেয়ে গে
তখন বড়কর্তা বেঁচে। লাট সা
গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন
লাট সাহেব আর লাট সাহেবের মেম
অনেক খানাপিনা হলো। খানার
পানীয়ই বেশি।

তা গাছ দেখে ভারি প্রশংসা
লাটসাহেব। ইন্ডিয়ান এত সব ধনী
রয়েছে। পরিচয় করে কৃতার্থ হলেন
খানা খেলেন। ঘুরে ঘুরে সমস্ত
দেখলেন। বাইজীর দল এসেছিল
থেকে। পাঁচশো টাকার মুজরো।
দেখলেন। বেনারসী পান খেলেন।
যাবার সময় বড়কর্তা সামনে
গিয়ে চীনে অর্কিড গাছটা নিয়ে
ধরলেন। হুজুর যদি গ্রহণ করে
চৌধুরী বংশ নিজেদের কৃতকৃতার্থ
করবেন—

লাট সাহেব, নিজে হাতে করে
নিলেন না। সঙ্গের লোক নিলে।
জন্যে এত কাণ্ড, সেই গাছই চলে গে
পর্যন্ত লাটসাহেবের বাগানে।

কিন্তু ফল ফললো কয়েক বছর
বড়বাবু বৈদ্যমণি চৌধুরী খেতাব পে

...ছেক হলেন রাজা বাহাদুর
...মণি চৌধুরী।

...ভাই বৈদূর্যমণি চৌধুরী, মেজভাই
...মণি চৌধুরী আর ছোট কৌস্তুভমণি
...রী। বৈদূর্যমণির ছিল পালোয়ানি
...। কুস্তির পালোয়ান বাড়িতে
...ছিলেন শরীরটা গড়ে তোলবার জন্যে।
...কাঠের মস্ত দু'টো মুগুর দু' হাতে
ভাঁজতেন দু'ঘণ্টা ধরে। সংসারের
ছিলেন তিনি। ওদিকে জমিদারী
বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের সুখ
...দ্যর দিকে নজর রাখা, তা ছাড়া তাঁর
...র কুস্তীর সখ। পৈত্রিক সম্পত্তির
রক্ষা নয় আয়তনেও বৃদ্ধি করে-
ন। তাঁর আমলে বড়-বাড়ির
...বস্থা ছিল না। তখন এই বড় বাড়ির
...করলে চিনতে পারতো সব লোক। আর
...—

...সব গল্প বদরিকাবাবুর কাছে শোনা।
...য় কোন পূর্ব পুরুষ মুর্শিদকুলী খাঁর
কানুনগোর কাজ করেছিল—
...বংশধর।

...রিকাবাবু বলেন—তাই তো বলি খেলতে
...ল কাণাকড়ি নিয়েও খেলা যায় হে—
...বড়বাবু যখন রাজাবাহাদুর হলো,
...কে কত ধুম-ধাম—সায়েব মেমের খানা-
হলো—আমি এই ঘরটিতে চুপ করে
...রইলাম। পিপে-পিপে মদ খেলে
...। আমি বললাম—তোমরা যাও, আমি
...মধ্যে নেই, রাজাবাহাদুর হয়নি তো
...বু, 'রাজসাপ' হয়েছে—যা বলেছিলুম
...ফলে গেছে—সেই বড়বাবু মরলো
...দন, মরবার সময় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত
...ন—

...তনাথ জিজ্ঞেস করে—কেন?

...দরিকাবাবু রেগে গেল। বললে—তুই
...র জিগ্যেস করছিস, কেন? সাতশো
... মোগল রাজত্বে ছ'কোটি লোক
...লমান হয়ে গেছে, আর একশ' বছর
...জ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ লোক খৃষ্টান
... গেল—সে কি ভাবছিস্ ওমনি-ওমনি?
...কহারামির গুণগার দিতে হবে না?
...বি সব যাবে—সব যাবে—কিছু থাকবে
...তাই দেখবো বলেই তো সারাদিন চিৎপাৎ
শুয়ে থাকি—আর ট্যাঁক-ঘড়িটার টিক-
শব্দ শুনি—

...মাজো ভুতনাথের মনে পড়ে বদরিকাবাবুর
...গুলো বর্ণে বর্ণে কেমন মিলে গেল
...ক একে।

অফিস থেকে ফেরবার পথে বাড়ির সামনে আসতেই সেদিনও ব্রিজ সিং ডাকলে—শালাবাবু—ছুটুকবাবু বোলায়া আপকো—

একা পেয়ে সেদিন বংশী এসে ধরলে। রবিবার। বললে—আজকে আপনাকে যেতেই হবে শালাবাবু, ছোটমা আমাকে রোজ বলেন—তোর শালাবাবুকে একবার ডেকে দিলিনে, আমি আপনাকে সুযোগ মত ধরতেই পারিনে, আপনি ছুটুকবাবুর আসরে গিয়ে বসেন, আর রাত হয়ে যায়—

ভূতনাথ বললে—কী দরকার কিছু শুনিসনি তুই?

—তা তো ছোটমা আমাকে বলেন নি আজ্ঞে।

—কিন্তু ব্রজরাখালকে জিগ্যেস না করে যাই কি করে—তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে অন্দর মহলে, আমি অচেনা পুরুষ মানুষ—যদি কেউ কিছু বলে—তখন?

—সে ছোটমা ভেবেছেন, আপনি কী করবেন? তা ছোটবাবু তো টের জানতে পারছেন না হুজুর—ছোটবাবু সন্ধের সময় বেরিয়ে গেছেন—আসবেন সেই আবার কাল ভোর বেলায়—

—কোথায় যান তোর ছোটবাবু?

—আজ্ঞে, সেই পিশাচ-নাগীর কাছে, জানবাজারে, ছোটমা বলেন—বামুনের শাপে নাকি অমন হয়েছে, আর জন্মে বামুনকে অপমান করেছিলেন—তাই এ জন্মে এই ভোগ—

—তুই তাকে দেখেছিস নাকি বংশী?

...দোখানি আবার, ছোটমা'র পায়ের যোগ্য নয় সে—তাতেই আবার কত ঠ্যাকার, নিজের হাতে এক ঘটি জল পর্যন্ত গড়িয়ে খান না—। বাবু যেদিন আসেন না, সেদিন ছোটমা পাঠায় কিনা আমাকে, মরতে মরতে যাই—এই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি তাকে, কী ছিল আর কী হয়েছে—ওই যে যদুর মা বাটনা বাটে, ওই কাজ আগে করতো ওর মা—আমরা ডাকতুম রূপো বলে—সেই রূপো দাসীর মেয়ে চুণী তখন ছিল আট বছর বয়েস—তারপর কেমন করে ছোটবাবুর নজরে পড়ে গেল, তখন ছোটবাবুর বিয়ে হয়নি, তারপর যখন ছোট-মা এ বাড়িতে এলেন, তখন রূপোর মেয়ের বয়েস তেরো—তখন থেকে আলাদা বাড়ি করে দিলেন ছোটবাবু, রূপো এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে উঠলো জান-বাজারের নতুন বাড়িতে—তা সমস্তই ছোট-মার কপালের লিখন শালাবাবু, রূপোরই বা কি দোষ, তার মেয়েরই বা কী দোষ—

বংশী বললে—তা' হলে ওই কথাই রইল, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন—আমি ঠিক সময়ে আসবো খন—

তারপর সন্ধ্যে হলো। গেটের পেটা ঘড়িতে ছটা বাজলো, সাতটা বাজলো, আটটাও বাজলো। তখনও ঘরের মধ্যে চুপ চাপ বসে ভূতনাথ। অনেকবার অনেক রকম করে ভাবতে লাগলো—ব্রজরাখালকে না বলে কি বাড়ির বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ভালো। তাও আবার ছোটবাবুর অসাক্ষাতে। যে-সে বাড়ি নয়, রাজা-রাজড়ার বাড়ি। এতদিন ধরে এ বাড়িতে আছে, কোনওদিন বউদের মুখ দেখা দূরে থাক, চেহারাও দেখেনি সে। পিছনের দরজা দিয়ে মেয়েদের যাওয়া-আসার রাস্তা। সে গেট চাবি বন্ধই থাকে। যখন গাড়ি ঢোকে, তখন চাবি খোলা হয়। বড় বউ যখন শুভ-তিথিতে গঙ্গায় স্নান করতে যান, তখন খোলা হয় মাঝে মাঝে। মেজবউ বাপের বাড়ি যান মাঝে মাঝে। তাঁর মা আসেন, রাঙামা আসেন। আর ছোট বউ?

বংশী বলে—ছোটমার তো মা নেই যে আসবে, গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের একটি মাত্তোর মেয়ে, ছোটমার রূপ দেখে বড়বাবু এ বাড়িতে বউ করে এনেছিলেন, তা বাপ এখন বুড়ো হয়ে গেছে, চলা-হাঁটা করতে পারেন না, ধম্ম কম্ম নিয়ে থাকেন, এক গুরু ছিল, গুরুর আশ্রমই এখন তাঁর ভরসা—

ছোট বউকে দেখেনি ভূতনাথ। কোনও বউকেই দেখেনি। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেককে সে চেনে। রাজা-বাহাদুর বৈদূর্যমণি চৌধুরী মারা গেলেন জমিদারীতে। একলাই যেতেন তিনি। নিজে গিয়ে দেখা শুনো করে আসতেন। নদীর ধারে চৌধুরীদের বিরাট কাছারি বাড়ি। মাসের মধ্যে একবার করে তাঁর যাওয়া চাই-ই। প্রজাদের নালিশ শোনা, তাদের খাজনা মকুব করা, এমন কত কাজ তাঁকে করতে হতো। গাঁয়ের পালোয়ানদের ডেকে তাদের কুস্তী দেখতেন। কুস্তীগীর হলে সাতখুন মাফ! সময় সময় লড়তেন তাদের সঙ্গে। তাঁর কুস্তীর আখড়ায় হনুমানজীর মস্ত একটা মূর্তি আজো আছে। তেল-সিঁদুর মাখানো মানুষ সমান মূর্তি। বদরিকাবাবু বলে—কিন্তু মরবার সময় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পেলে না—ও রাজা-বাহাদুর নয় রে, 'রাজসাপ'—

তা অত রাত্রে কে-ই বা জল দেয়। আর কে-ই বা খবর নেয়। আর কেউ জানতে পারলে তবে তো! সকালবেলা সবাই টের পেলে। অনাদি মৌলিক বুড়ো মানুষ। তিন পুরুষের গমস্তা। তিনি দেখলেন। দরোয়ান, সেপাই, বরকন্দাজ, সবাই।

অতখানি লম্বা চওড়া দশাসই শরীর বড়বাবুর। কুঁকড়ে নীল হয়ে পড়ে আছে উঠোনের মধ্যিখানে। আর পায়ের... আর একটা জিনিস পড়ে আছে। কম লম্বা চওড়া নয়। উল্টে পাল্টে ... পড়ে আছে সেটা। দুটোই প্রা... অনাদি মৌলিক অন্ধকারে দেখেই সা... পোঁছিয়ে এসেছিলেন। একে শনিবা... জাত কাল-কেউটে।

সে সব পুরোন ইতিহাস। ওই ... বাবু তখন ছোট। বড় বউ ছিলে... ধর্মশীলা। সাতদিন জলস্পর্শ করে... তারপর যখন উঠলেন ভূমিশয্যা ছেড়ে... আর সে মানুষ নন। এখন ভাত... পর চৌষট্টিবার সাবান দিয়ে হাত ন... শুদ্ধ হয় না শরীর। একটা স... কেটে চৌষট্টি টুকরো করতে হয়। ... সেই চৌষট্টি টুকরো সাবান আর ... ঘটি জল ঢেলে হাত ধুয়ে দেয় বড় ... ঠাকুর বাড়ির প্রসাদের সন্দেশ, তা-ও ... খেতে হবে। এমনি বিচার তাঁর।

বৈদূর্যমণি চৌধুরীর পর জ... ভার পড়লো হিরণ্যমণির ওপর। ... বড় মা'ঠাকরুণ ছাড়লেও, মেজবাব... ছাড়বেন কেন তাকে। বরং সুবিধেই ... দুজনের দুটো বাড়ি হলো। তার... হাসিনী। হাসিনীরও কাঁচা ... অনাদি মৌলিক টাকা পাঠান। সে...

ড়ে। ...ঠি যায় জোর তাগাদা দিয়ে। সরকার নিজে যায় তাগাদা করতে।

...বাবুর পানসী গঙ্গার বুকে পাল ...বরানগরের দিকে ভেসে চলে। আশে ... গ্রামের লোক শুনতে পায় গানের সুর ...রের শব্দ। নৌকোর ভেতর গ্যাসের ...জ্বলছে, গঙ্গার বুকের একটা অংশ ... আলো হয়ে গেছে।

...টবাবু কৌস্তুভমণি চৌধুরীর তখন ...য়েস। ওই ছুটুকবাবুর মত। সবে ...ড়া ছেড়েছেন। ল্যান্ডোতে উঠতে বিকেলবেলা। সিঁড়ি দিয়ে নাবছেন। ...বলা নেই কওয়া নেই মাথায় একটা ... লাগলো সজোরে।

...নাশ!

...টা বাতাবী নেবুর খোসার টুকরো লেগে পায়ের কাছে মাটিতে ছিটকে ...।

...মে রেগে গিয়েছিলেন ছোটবাবু। ...পর বললেন—কে রে ও?

...খাখানার সর্দার মধুসূদন যাচ্ছিল ... দিয়ে। বললে—আজ্ঞে ও রূপো মেয়ে চুনী—

...পো দাসী কে?

...াজ্ঞে বাটনা বাটে আর ডাল ঝাড়ে ...ণের ঘরে বসে—

...—বলে বেরিয়ে গেলেন যেমন ...ন। কিন্তু মধুসূদন ছাড়লে না। ...কা জরিমানা হয়ে গেল। মধুসূদনের ...না। এ ওর প্রাপ্য। ওর আর নড় ...ই। মাইনেই তো পায় রূপো এক ...সে আর মা-মেয়ের খাওয়া পরা। ...ছে তেরো বছরের চুনী টিপ্ টিপ্ ...কল খেলে গোটা কতক। চুলের মুঠি ...নে হিঁচড়ে নাকালের একশেষ করলে ... দাসী। শেষে কান্না—শতেক ...ীর জন্যে আমার কি মরেও শান্তি ...া, কবে মরবি তুই, যম ঠিক ভুলে গেছে ...পোড়া পেটের জন্যে ভূতের মতন ...তাতেও শান্তি নেই—

...সূদনের কাছে আর্জি গেল।

...সূদন বলে—ছোটবাবুর হুকুম, আমি ...রবো তার—

...তু রূপোর সাহস আছে বলতে হবে বৈকি। পাঁচটা টাকা তো কম কথা নয়। কেঁদে কেটে ছোটবাবুকেই ধরে পড়লো সে। চুনী ছিল সঙ্গে। বারো বছর বয়সের চুনীবালা। কাঁদা কাটার ফল ফললো দিন কতক পরেই। রঙিন সাড়ি উঠলো চুনীবালার গায়ে, কানে মাকড়ী। পায়ে আবার আলতা। মাইনে বেড়ে এক টাকা থেকে দু' টাকা হলো। রূপো দাসীর মুখে কথা ছিল না আগে। সেই মুখের ঝাল বাড়লো।

সৌদামিনী আনাজ কুটতে কুটতে সব দেখে। অত যে মুখ তার, তাও কিছু বলতে পারলে না। তবু স্বভাব যায় না মরলে। গজ গজ করে বলতে থাকে—চোক গেল তো তিভুবন গেল—ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবউ, চোক কান থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে নাও—কপাল না কপাল, ছি ছি, গলায় দড়ি জোটে না তোদের—

এ সব পুরোন দিনের কথা। ওই ওরা সব জানে। ওই মধুসূদন, লোচন বংশী, বেনী, শশী, সিন্ধু, গিরির দল।

রাত আটটা বাজলো অথচ বংশী তখনও এল না। কিন্তু এল অনেক পরে, যখন ছুটুকবাবুর আসরে ভূতনাথ তবলা বাজাচ্ছে—

গান তখন জমে উঠেছে। হঠাৎ বংশী পেছন থেকে আস্তে আস্তে ডাকলে—শালাবাবু—

ভূতনাথ পেছন ফিরে দেখে বললে—দাঁড়া—

কিন্তু ছুটুকবাবু দেখতে পেয়েছে। বললে—কী বলছিস্ রে বংশী—

—আজ্ঞে ছোট মা একবার শালাবাবুকে ডাকছেন—

—কেন?

বংশী বললে—তা' জানিনে—

ছোটবাবুর তখন খোশ মেজাজ। একটু আগেই নিধুবাবুর টপ্পা শুনেছে। নেশার ঘোর রয়েছে। বললে—যাও না ভাই, ছোটমা ডাকছে, যাও না দোষ কী—

কান্তিধরকে তবলা দিয়ে ভূতনাথ উঠলো। বললে—আমি আসছি এখনি—

অন্দর মহলের সিঁড়ির কাছে এসে ভূতনাথের যেন কেমন সঙ্কোচ হলো।

বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু, দাঁড়ালেন কেন—বলে একবার গলা খাঁকারি দিলে। তারপর সে-সিঁড়ির শেষে দোতলার সিঁড়ি পড়লো। সিঁড়ির মাথায় তেলের আলো জ্বলছে টিম টিম করে। লম্বা বারন্দায় একটা কাকাতুয়া চীৎকার করে ডেকে উঠলো। একটু ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। তারপর কোথা দিয়ে কোন বারান্দা পেরিয়ে কোন সিঁড়ি দিয়ে উঠে তেতলার মহলে গিয়ে পড়েছিল সেদিন চিনতে পারেনি।

তেতলার বউদের মহলে পড়তেই সিন্ধুর গলা—কে—?

—আমি বংশী,

—এখন একটু সবুর করতে হবে, বড়মা হাত ধুচ্ছে—

বংশী পেছন ফিরে বললে—একটু দাঁড়ান শালাবাবু—

একটু মানে যার নাম এক ঘণ্টা। ঠায় দুজনে দাঁড়িয়ে সেখানে। কী হলো!

বংশী বললে—বড়মা'র ছুঁচিবাই কিনা, হাত ধুতে একটু দেরি লাগবে—

সিন্ধুর গলা শোনা গেল—বড়মা আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, উঠুন, উঠুন—

বড়মার গলা শোনা গেল অনেক ডাকাডাকির পর। বললেন—ক'বার হলো?

—আর তিন বার—

কথাটি কানে যেতেই বংশী বললে—আর দেরি নেই, হয়ে এসেছে, একষট্টি বার হয়েছে—আর তিনবার হলেই শেষ—

তারপর অনুমতি পাওয়া গেল। সিন্ধু বড়মাকে তখন ঘরে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। বললে—এবার এসো গা—

ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো একেবারে শেষ ঘরখানার সামনে।

বংশী ডাকলে—চিন্তা, ও চিন্তা—

কালো কুচকুচে একখানা মুখ বাইরে এসেই হঠাৎ ভূতনাথকে দেখে ঘোমটায় ঢেকে গেল।

বংশী বললে—হ্যাঁরে ছোটমা কী করছেন?

মুখ নিচু করে চিন্তা কী বললে বোঝা গেল না। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দুজনকেই আসতে বলে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

(ক্রমশ)

ক্ষুদে কাশ্মীর

শ্রীকানাইলাল বসু

এ দেশের কাশ্মীরকে আমরা ভূস্বর্গ বলি। স্বর্গ কি? স্বর্গ কোথায়? আমরা ঠিক জানি না, তবে কল্পনা করি। সব কিছু সুন্দরের সমন্বয়ই বোধ হয় আমাদের মতে স্বর্গ। কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কাশ্মীরের আরামপ্রদ আবহাওয়া আমাদের মুগ্ধ করেছে—তাই আমরা তাকে স্বর্গ বলে আখ্যা দিয়েছি।

ভারতের মণিপুর রাজ্যের নাম শোনে নি এমন কোন লোক নেই বোধ হয় এদেশে। শিল্পকলার দিক থেকে বিশেষতঃ নাচের দিক থেকে মণিপুর তো বিখ্যাত। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সঙ্গে মণিপুরের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কাজেই মণিপুরকে আমরা যদি ক্ষুদে কাশ্মীর বলি তো সেটা খুব বেমানান হবে না। কাশ্মীরের মত মণিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতুলনীয়। নাচ ছাড়াও ভারতের পূর্ব সীমান্ত রাজ্য বলে মণিপুরের রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে। শিল্পকলা ছাড়া মণিপুরের বাস্তব বা বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—কারণ বৈষয়িক অবস্থার সঙ্গে শিল্পকলা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ভারতের "খ" শ্রেণীভুক্ত রাজ্য মণিপুরের আয়তন প্রায় আট হাজার ছয় শ' আটত্রিশ বর্গ-মাইল। মণিপুরের উত্তর সীমানায় আছে নাগা পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই আর বর্মা, পূর্বে বর্মা আর পশ্চিমে আসাম। মণিপুর রাজ্যের মধ্যউপত্যকাতেই খাস মণিপুরীদের বাস। এই অঞ্চলের আয়তন হবে প্রায় সাত শ' বর্গ-মাইল। অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে নাগা, কুকী আর অন্য সব পার্বত্য আদিবাসীদের বাস।

এই রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা হবে প্রায় ছ' লক্ষ, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ রাজ্যের মধ্যউপত্যকায় থাকে—বাকী বাস করে পার্বত্য অঞ্চলে। উপত্যকা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু হাজা ফুট উচু। রাজ্যের উত্তরে অব রাজধানী ইম্ফল। এখানে চীফ ক থাকেন। ইম্ফলের লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষ।

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা ম অতুলনীয় সে প্রাকৃতিক দৃশ্য। কো জায়গায় পাহাড়ের চূড়ো দশ হাজা উচু পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থিতি দেখ হয়, কোন একদিন হয়তো এ সমুদ্রের তলায় ছিল। এক অজানা দিনে ভূমি ফলে জায়গাটা জলের ওপর মধ্যউপত্যকার দক্ষিণে যেসব ও জলা জায়গা আছে, তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে। গরমের সম কোন জলা শুকিয়েও যায়। দক্ষিণ ম মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রাজ্যের প্রধান বরাক আসামের ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে অন্য নদী ইম্ফল গিয়ে মিশেছে চিন্দুইন নদীর সঙ্গে। যে সব হ্রদে জল থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় লো

ক্ষুদে কাশ্মীর মণিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
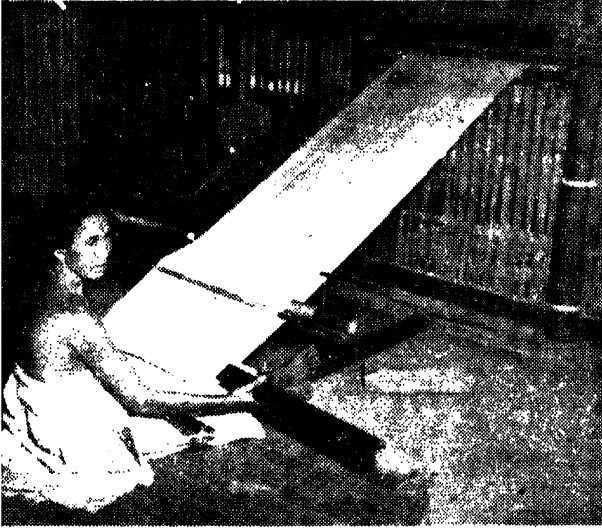
মণিপুরবাসিণী তাঁতে কাপড় বুনিতেছেন।

...ল যখন জল বাড়ে তখন হ্রদটি দাঁড়ায় প্রায় আট মাইল আর চওড়ায় ...ইল। দেখা যাচ্ছে, মণিপুরের প্রত্যেক ক্রমশঃ বুজে আসছে প্রতি বছর পলিমাটিতে। তবে মধ্যউপত্যকা মাটির জন্যে উর্বরা হচ্ছে।

...পুরের জমিকে মোটামুটি তিন ভাগে ...রা যেতে পারে। এঁটেল মাটি, ... মাটি আর এঁটেল মাটির সঙ্গে ... মাটি মিশানো—এই তিন রকম মণিপুরে আছে। জায়গায় জায়গায় সঙ্গে দো-আঁশ মাটির মিশোলও পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলে সব দো-আঁশ মাটিই পাওয়া যায়।

...পুর রাজ্যে ঠিক কি পরিমাণ জমিতে ... হয়, সেটা বলা শক্ত। কারণ সঠিক ...্যানের অভাব। পার্বত্য অধিবাসীরা ... স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে। ধান চাষ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা ...ম ফল ও অন্যান্য কৃষিজ ফসল তুলো আর লংকা চাষ তাদের আয় করবার প্রধান অবলম্বন। ... প্রয়োজন মিটিয়ে পার্বত্য অধি- বছরে প্রায় পাঁচ হাজার মণ তুলো ...্যকায় সরবরাহ করে। মণিপুরের ...ল্প তুলোর চাহিদা এই থেকেই বাড়তিটা রাজ্যের বাইরে রপ্তানি হয়। রাজ্যের বাইরে পার্বত্য অঞ্চলজাত লংকার রপ্তানির পরিমাণও নেহাৎ অল্প নয়।

রাজ্যের সমতল জায়গায় সাধারণতঃই চাষ হয়। এ ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে আরও এক-রকমভাবে চাষ হয়, তাকে বলে "জুম" চাষ। পাহাড়ের গায়ে খানিকটা অঞ্চলের বন-জঙ্গল কেটে প্রথমে পরিষ্কার করা হয়। তারপর কাটা গাছপালা জমির ওপর রেখেই তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ছাইটা জমির ওপর দু-চার দিন রেখে জমি কুপিয়ে মাটির সঙ্গে সেই ছাই মিশিয়ে দেওয়া হয়, পরে সেই জমিতে চাষ করা হয়। একেই বলে "জুম" চাষ। মণিপুরে যে তুলো হয়, সেটার আঁশ ছোট—চেষ্টা করলে মনে হয়, লম্বা আঁশের তুলোও হতে পারে। শুধু তাই নয়, যদি কোথায় কি হয় না হয়, সে সম্বন্ধে ঠিকমত খোঁজখবর নিয়ে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গবেষণা করে চেষ্টা করা হয় তো মণিপুরের কৃষি আর উদ্যানবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। সুযোগও আছে।

মধ্যউপত্যকায় যত চাষের জমি আছে তার শতকরা বিরানব্বই ভাগে ধানের চাষ হয়। প্রায় কুড়ি রকমের ধান হয়। পাকতে সময় কম লাগে এরকমও আছে, আর বেশি সময় লাগে সেরকমও আছে। কম সময় বলতে তিন মাস আর বেশি সময় বলতে ছ' মাস। তিন মাসের বেলায় ধান কাটবার সময় সেপ্টেম্বর মাস আর ছ' মাসের বেলায় নবেম্বর মাস। তবে ছ' মাসে পাকে এই রকম ধান চাষের পরিমাণই অপেক্ষাকৃত বেশি। মণিপুরে এক একরে (প্রায় তিন বিঘে) ধান হয় প্রায় কুড়ি থেকে চব্বিশ মণ। পুরোনো নথিপত্তর ঘাঁটলে দেখা যায়, ঊন-বিংশ শতকে এই রাজ্যে এক একরে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মণ ধান হতো। শুধু তাই নয়, বছরে প্রায় তিন লক্ষ মণ চাল আর দু লক্ষ মণ চিঁড়ে এই রাজ্য থেকে বাইরে চালান যেতো।

ধান ছাড়া আখ, অড়হর, মটর, খেঁসারি, ছোলা, সরিষা, তিসি প্রভৃতি মণিপুরের সাধারণ চাষের ফসল। এ ছাড়া আরও অনেক রকম দেশী ও বিদেশী তরিতরকারী মণিপুরে ভালোই হয়। আম, আনারস, কলা, পেয়ারা, কালোজাম প্রভৃতি ফল এখানে যথেষ্ট হয় বা পাওয়া যায়। মণিপুর-বাসীরা রেড়ীর চাষ করে ওষুধ তৈরি করবার জন্যে, আর তামাক চাষ করে ব্যবহারের জন্যে। সোয়াবিনের ফলনও হয় সন্তোষজনক। পাটের চাষ যে মণিপুরের লোকের কাছে একেবারে অজানা তা নয়, তবে গত বছরের আগে পর্যন্ত তেমন বিশেষ পাট চাষ হয় নি। মাত্র গত বছরেই প্রায় দশ মণ আন্দাজ বীজ আশি একর জমিতে ছড়িয়ে সবপ্রথম ঠিকভাবে পাট চাষের চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টায় একর প্রতি কুড়ি মণ করে পাট পাওয়া গেছে। মণিপুরের আবহাওয়ার তারতম্য থাকে পঞ্চাশ থেকে একানব্বুই ডিগ্রীর মধ্যে, আর বৃষ্টির পরিমাণ বছরে প্রায় ছেষট্টি ইঞ্চি, কাজেই পাট চাষের আবহাওয়ার দিক থেকে মণিপুর উপযোগী জায়গা।

মণিপুর রাজ্যে ঠিক কতটা পরিমাণ জমিতে কি কি চাষ হয়, তার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব আছে। তবে মোটা-মুটি যা জানা যায়, তাতে এই রাজ্যে আবাদী জমির পরিমাণ দুশ' তেইশ হাজার একর, গ্রাম্য গোচারণ উপযোগী জমি তেত্রিশ হাজার একর, ঘাস জমি ষোলো হাজার, বনভূমি ছেষট্টি হাজার, চাষযোগ্য পতিত জমি তেত্রিশ হাজার, লোকটাক হ্রদ প'য়তাল্লিশ হাজার, আর সরকারী ভেড়ী তেইশ হাজার একর। এই সংখ্যাগুলো থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মণিপুরে চেষ্টা করলে কৃষি সম্বন্ধে নানা বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে।

মণিপুরীরা অধিকাংশ কৃষিজীবী। তাহলেও এখানে নানা রকম কুটীরশিল্প বর্তমান—তার মধ্যে সুতী ও মুগা কাপড় তৈরি প্রধানও বটে, আর সবচেয়ে লাভজনকও বটে। সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয়, যে, এই দুটি কুটীরশিল্প বেশির ভাগ মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে মণিপুরী মেয়েরাও পেছপাও নয়। সংসারেও তারা সুগৃহিণী।

মণিপুরী কৃষ্টি, শিল্পকলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব বেশি। বৈষ্ণব ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা সৃষ্ট ও পুষ্ট।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মণিপুর অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মণিপুরের মাটি মণিপুরীদের প্রয়োজনীয় সবটুকু খাবার জোগায়। পরনের কাপড়ের জন্যে যা তুলোর দরকার, তাও মণিপুরের মাটিই মণিপুরীদের দেয়। মিহি কাপড়, কেরোসিন তেল, লোহার জিনিস-পত্তর রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। অন্যদিকে চাল আর তাঁতের কাপড়, লঙ্কা, আলু, ঘি, কমলা লেবু, সরষে—এই সব মণিপুর থেকে বাইরে চালান দেওয়া হয়। এই ছাড়া নানা রকম সৌখীন জিনিসও রাজ্যের বাইরে চালান দেওয়া হয়।

মণিপুরে বর্মার দিকের লাগোয়া অঞ্চলের জঙ্গলে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। আসামের দিককার অঞ্চলে বুনো চায়ের গাছ আছে। এক সময় এই অঞ্চল থেকে আসামের চায়ের বাগানগুলোতে বীজ নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু মণিপুরে চায়ের চাষ কেন যে ভালোভাবে হলো না বলা শক্ত। চেষ্টা করলে মণিপুরের বন-সম্পদের যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব।

ভারতের অনেক জায়গায় যেমন অভাবের সমস্যা, চড়া দামের সমস্যা আছে—মণিপুরে তা নেই। ভাত, কাপড়ের অভাব-অনটন প্রায় নেই-ই—যদিও বা থেকে থাকে তো তা অতি সামান্য। কাজেই মণিপুরবাসী তাদের কৃষি-উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেয় নি। প্রাচুর্যের মাঝখানে উন্নতি করার ইচ্ছে না থাকাই স্বাভাবিক।

মণিপুরের কুটিরশিল্পে বিভিন্ন সৌখীন দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইতেছে।

মণিপুরবাসীরা অধিকাংশ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। কাজেই এখানে হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পালনের বিশেষ চল নেই। এদিকে যা কিছু করে নাগা, কুকী ইত্যাদি পার্বত্য-বাসীরা আর করে মধ্যউপত্যকার সংখ্যায় অতি নগণ্য মুসলমানেরা। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও মণিপুরীরা মাছের ভক্ত—আর এই রাজ্যে মাছও পাওয়া যায় যথেষ্ট।

রাস্তা-ঘাটের অভাবের জন্যে এই রাজ্যের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জায়গার বিশেষ যোগাযোগ নেই। সম্ভবতঃ সেই । হয়তো সরল ও সাধারণ স্বয়ংস আর্থিক কাঠামোর দিকে মণিপ ঝুঁকেছে। আজকাল ইম্ফলের দু'একটি পাকা রাস্তা যোগাযোগ করছে। গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে এই ক পাকা রাস্তার যোগাযোগ আছে কাঁচা মারফৎ। আকাশপথে রাজধানীর বাইরের যোগাযোগ আছে। ভাল র ঘাটের অভাব মণিপুরের ব্যবসা-বাণি প্রসারের পক্ষে একটা মস্ত বড় বাধা।

আজকে অভাব-অনটনের দিনে কাশ্মীর মণিপুর তথা মণিপুরব অপেক্ষাকৃত সুখী। মণিপুরের সর্বা উন্নতি ভারতের উন্নতির পথে সং করবে।

চব্বিশ
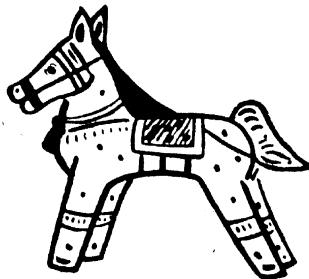
-ডি-ও এবং এস পি গৌরীকান্তের ঙ্গে শুধু দেখা করতেই আসেন নি। টা কাজ ছিল। তদন্তের কাজ। ধ্যে এখান থেকে টেলিগ্রাম গিয়েছে লোক মারফৎ দরখাস্তও গিয়েছে যে, রবাবু ও বিজয় দুজনে বাইরে বাইরে ল মেটাবার চেষ্টা করবার ভাণ করে াঁর ভিতরে দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টাই লা এবং গৌরীকান্ত অন্তরালে থেকে কৌশলে পরিচালনা করছে তাদের। শাহ-পুর অঞ্চলে যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, সে মা সুপরিকল্পিত ঘটনা। বর্তমানে ুলের জন্য সরকার যে-জমি দখল া আয়োজন করছেন, তাতে নিঃস্ব সম্প্রদায় প্রস্তাব করেছে যে, জমির র্তে তাদের সমান কদরের জমি দেওয়া া। এই জমি অনায়াসে জমিদারের সরী স্বত্বের অন্তর্ভুক্ত খাস জমি থেকে পার জমি আয়ত্ত করার বিশেষ আইন দে আয়ত্ত ক'রে দিতে পারেন। এমন কি ুর মধ্যস্বত্বাধিকারী বড় বড় জোতদার হ'শো বিঘার উপর জমির মালিক, যাঁরা ্যাতে বা স্বকীয় তত্ত্বাবধানেও জমি চাষ না, ভাগে, ঠিকায় জমি বিলি ক'রে ধ উপস্বত্বই ভোগ করেন, তাঁদের জমি ম জমি নিয়েও এই জমি সরকার আসে দিতে পারেন। এই প্রস্তাব কৃষক-আন্তরিক প্রস্তাব এবং এ তাদের মরণের প্রশ্নের মতই গুরুতর। কদের মধ্যে এই প্রস্তাব দ্রুত বেগে ্যপ্ত পড়েছে এবং প্রস্তাব এখন সংকল্পে লিপ্ত হয়েছে। এই কৃষকদের মধ্যে অধি-কই মুসলমান, মুসলমান কৃষকেরাই

তাদের নির্ভর। সুতরাং এই প্রস্তাব আন্দোলনের আকার নিয়ে জমাট বেঁধে ওঠায় একদিকে বিত্তবান হিন্দু জোতদার এবং জমিদারেরা শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। তাঁদেরই চক্রান্তে এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক কালি মাখিয়ে কলঙ্কিত করে দাঙ্গার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাসাচরের রামু গোপ কৃষক হলেও সম্পন্ন কৃষক। সে মহাজনীও ক'রে থাকে। এরফান শেখদের আমগাছ এবং অন্য সম্পত্তি কেনার দলিলই তার অকাট্য প্রমাণ। এরফান শেখ এই আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ নেতা। নবগ্রামের তথাকথিত কংগ্রেসী নেতা বিজয় রামু গোপের পুত্রদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই ডালকাটার অপবাদ দিয়ে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। এমনকি যারা শ্রাদ্ধের দিন ডাল কেটেছে, তারা মুসলমান হলেও তারা পেশাদার লাঠিয়াল এবং তারা বিজয়নারায়ণদেরই নিয়োজিত তারও প্রমাণ আছে। এই পরিকল্পনা গৌরীকান্তের এবং কিশোরবাবু সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছেন। দাঙ্গার প্রথম দিনেই বিজয়নারায়ণ ওই অঞ্চলে ধর্মডাঙ্গায় একটি বিরোধী মিটিং করেছিল এবং ধর্মডাঙ্গা থেকে ভাসাচর পর্যন্ত গিয়েছিল, তার প্রমাণও আছে।

অন্যদিকে প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে নবগ্রামের প্রবল প্রতাপ জমিদার এ অঞ্চলে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভস্বরূপ গোপীচন্দ্রের বংশধরদের সঙ্গে এক নিরীহ মুসলমান প্রজার বৈষয়িক বিরোধ উপলক্ষ্যে **ওই স্বৈরাচারী জমিদার বংশ ওই প্রজাটিকে তাঁদের কাছারীর থামে বেঁধে পাদুকা প্রহার করায় এক প্রজা অভ্যুত্থান হয়, সে তথ্য আজও থানা এবং জেলার সরকারী দপ্তরে**

জটিল পরিচালনায় এই জমিদার প্রজা বিরোধকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করেছিলেন, তারও তথ্যাদি সরকারী দপ্তরে মিলবে এবং স্থানীয় অনুসন্ধানেও প্রমাণিত হবে। সে দিনের এই প্রজা পীড়নকে এখানকার গণ্যমান্য ধর্মভীরু সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা কেউই সমর্থন করতে চাননি। তাঁদের যাঁরা আজও জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মহাদেব সরকার মহাশয় অন্যতম। কিন্তু গৌরীকান্তবাবুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কল্পনাকুশল ব্যক্তির সুনিপুণ রচনা মিথ্যা হলেও তাকে ব্যর্থ করে দেবার মত সামর্থ্য বা নৈপুণ্য তাঁদের ছিল না। প্রজা জমিদার বিরোধকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের রঙ মাখিয়ে সত্যকে বিকৃত করার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস গৌরীকান্তের আছে। সেদিন কিশোরবাবুও গৌরীকান্তের এই কাজ সমর্থন করেননি। কিশোরবাবু যদি যথার্থ সত্যবাদী হন, তবে তাঁকেও এ সত্য সমর্থন করতে হবে।

উল্লিখিত তথ্যগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তে সবই প্রমাণিত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। এবং সরকার সমীপে আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আন্তরিক ব্যাকুল প্রার্থনা এই যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতীয় ইউনিয়নে এই কূট চক্রান্তকারীদের অবিলম্বে যথাবিহিত আইনের বলে গ্রেপ্তার করে বা তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করুন। এই লোকগুলিকে আবদ্ধ করলেই মুহূর্তে সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। দেশে শান্তি স্থাপিত হবে।

দরখাস্তখানা বেনামী নয়।

দরখাস্ত করেছে মহম্মদ সুক্কুর। এই নবগ্রামের পাশের গ্রামের ম্যাট্রিক পাশ একটা ছেলে। ছেলেটি প্রথম কিছুদিন বিজয়ের চ্যালা ছিল। সাতচল্লিশ সালের মাস কয়েক এখানে মহা উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ করে প্রতাপশালী হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তার আগে ইস্কুলে পড়তে পড়তেই মুসলিম লীগের অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত সবুজ পতাকা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে নিজেদের পাড়ায় পাড়ায় কুচকাওয়াজ ক'রে বেড়াত। বর্তমানে মাস কয়েক হ'ল, বিজয়ের সঙ্গে বিরোধের ফলে স্বতন্ত্রভাবে

৩রা মাঘ, ১৩৫৯ সাল

গৌরীকান্ত দরখাস্তখানি এস-ডি-ওর হাতে ফিরে দিয়ে একটু হেসে বললে, সুকুর আমার সুনিপুণ রচনা শক্তির তারিফ করেছে। আমিও সুকুরের তারিফ করছি। দরখাস্তখানি লিখেছে চমৎকার। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের জয়জয়কার হোক।

এস পি বললেন, কিছু মনে করবেন না আপনি। আমরা এমনই নাগপাশে বাঁধা যে, এর একটা তদন্ত করতেই হয় আমাদের। এবং আপনাকেও দেখালাম যে, বুঝে দেখুন দেশ কোন মুখে ছুটেছে। আপনাদেরই দায়িত্ব, আপনারাই লেখার মধ্যে দিয়ে এর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

গৌরীকান্ত বললে, এত বড় একটা মন্থন হয়ে গেল জাতটার জীবন নিয়ে। সে মন্থনে অমৃতের মত উঠেছে স্বাধীনতা। মন্থনের শেষ পর্যায়ে এইবার বিষ উঠছে। সে তো উঠবেই। তাতে ভয় পেলে চলবে কেন?

—আমরা তাহ'লে উঠি। ভাসাচরে যাব। সেখানকার অবস্থা খুব ভাল নয়।

এস-ডি-ও একটু হেসে বললেন, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মহারণ্যের মত। ডাল পড়লে ঢেঁকি হচ্ছে, পাতা পড়লে কুলো হচ্ছে। এমন প্যানিক হয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। এই-মাত্র সেখান থেকে একজন কনেস্টবল এসেছে, মেসেজ নিয়ে। পড়ে যত হেসেছি, তত চিন্তিতও হয়েছি। কথাটা হয়তো একটু জটিল শোনালো, কিন্তু ঘটনাটি শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমার কথাটা কতখানি সত্য।

কনেস্টবল মেসেজ এনেছে।

আজ সকালে ভাসাচর গ্রামে রামু গোপের বাড়ীতে বসেছিল মজলিস। রামুর ছেলেরা এবং তারাচরণ ও তার সাকরেদবৃন্দ পরামর্শ করছিল এবং চা খাচ্ছিল। গত সন্ধ্যায় বিজয়বাবু এসে বলে গেছেন, যেন তারা নিজে থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামা না করে। তারা-চরণ নিজেও দাঙ্গাহাঙ্গামার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু তারাচরণের সাকরেদদের মত ঠিক তা নয়। দীর্ঘকাল ধরে তাদের সঙ্গে শাহ-পুরের একদল শেখের সঙ্গে বিরোধ চলেই আসছ। এবং লীগের রাজত্বে এইসব শেখেদের ঔদ্ধত্য এমনই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তার স্মৃতি তাদের কাছে মর্মান্তিক হয়ে রয়েছে। তাদের অন্তরের আঁউপ্রায় আজ যদি সুযোগ এসেই থাকে, তবে সে সুযোগ তারা ছাড়বে কেন?

ওদিকে শাহপুরেও মজলিস বসেছে, শাহপুরে সম্ভ্রান্ত মিয়া সাহেবেরা সকলকে ডেকে বলেছেন, কেউ যেন দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা না ভাবে; মনের কোণেও ঠাঁই না-দেয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেছেন। বড়-মিয়া বলেছেন—বিজয়বাবু বলে গেছেন—সকালেই পুলিশ ফৌজ পাঠাবেন। কিছু ডর ভয় করিও না। শুধু চুপ-চাপ থাক।

এরফান কোন কথা বলে নি কিন্তু এরফানের দলের একজন বলেছে—চুপচাপ থাকবারে বলছেন বড় মিয়া। কিন্তুক উয়ারা যদি এসে মারপিট দাঙ্গা ক'রে যায়, ঘরে আগুন ধরায়ে দেয়?

বড় মিয়া চটে উঠে বলেছেন—বান্দরটা কে রে? অ! এরফানের ফুফাত ভাইটা বুঝি! তা' না-হলে এমন বাত আর বলবে কে? আসে মারপিট করতে চায় তখন ঠেকাইবা। ঘরে আগুন দিতে আসে—লড়াই দিবা। আমি বলছি আগে ভাগে যাবা না।

ঠিক এই সময়েই দুই মজলিসেই খবর আসে—পূর্ব দিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠে প্রায় হাজার পাঁচেক কি দশেক লোক জমায়েত হয়েছে।

ভাসাচর ও শাহপুরের পূর্বদিকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় তিন চার মাইল বিস্তীর্ণ কৃষি-ক্ষেত্র ও ময়ূরাক্ষীর চরভূমি। ময়ূরাক্ষীর চরভূমির অংশে অগণিত কাশ ও শর গুল্ম। সেই অংশে সমবেত হয়েছে এবং এই গুল্ম-গুলিকে আড়াল দিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

ভাসাচর এবং শাহপুরের লোকেরা ছুটে গ্রামের বাইরে এসে, উঁচু একটা দীঘির বিপরীত দিকের দুই পাড়ের উপর উঠে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে। কথা মিথ্যা নয়। কাশ ও শর গুল্মের আড়াল থাকলেও অসংখ্য সাদা কালো সঞ্চরমান মানুষ চোখে পড়ল। ওঃ হাজারে—হাজারে মানুষ। কাতার দিয়ে চলে আসছে।

ময়ূরাক্ষীর ওপারে বাগদীপ্রধান অঞ্চল, সেখানে দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল বাগদীর বাস। তারা চিরকাল শাহপুরের মুসলমানদের বিরোধী।

এ দিকে এপারে ওই যে চার মাইল দূরে ধূলা-ধূসর গ্রাম বনশোভা—এই হ'ল মুরশিদাবাদের মুসলমান প্রধান অঞ্চল। ওখান থেকেই কাল এরফান সাত আঠজন লাঠিয়ালকে এনেছিল। তারা কাল মার খেয়ে ফিরে যাবার সময় হলফ নিয়ে গে[illegible] ফিরে আসবে এবং শোধ নিয়ে যাবে

দীঘির দুই বিপরীত পাড়ে দুই আশায় ও আশংকায় আন্দোলিত স্তব্ধ হয়ে দাঁতে দাঁত টিপে—দৃঢ় লাঠি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এ পক্ষই সংগোপনে আশপাশের গ্রা[illegible] পাঠিয়ে দিলে। ছুটে এস, মহাবিপ[illegible]

এর মধ্যে প্রায় বেলা ন'টা নাগাদ ন[illegible] দারোগা এবং বিজয়েরা গিয়ে উপস্থি[illegible] তারাও গিয়ে ব্যাপারটা দেখে কি[illegible] বিমূঢ় হয়ে পড়ে। পাঁচ সাত জন [illegible] —বন্দুক তিনটে—দারোগার রি[illegible] একটা, এ নিয়ে এই বিপুল উন্মত্ত [illegible] কি রোধ করা যায়। শক্তি উন্মত্ত হ[illegible] সর্বনাশিনী।

কিন্তু দারোগার উপায় ছিল ন[illegible] দুজন বন্দুকধারী সিপাহী নিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে বিজয়ও গিয়েছিল দূর এগিয়ে গিয়ে সন্দেহ হয়। কার এরা সঞ্চরমান বটে কিন্তু দলবদ্ধ হ[illegible] দিকে এগিয়ে তো চলছে না! তবে[illegible]

আরও কিছু দূর যেতেই জনতা[illegible] স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দলবদ্ধ জীব বটে কিন্তু মানুষ ন[illegible] এবং মহিষের পাল। প্রায় পাঁচ স[illegible] সঙ্গে কুড়ি পঁচিশ জন গোপালক এ অঞ্চলের মানুষ নয়, জেলার প্রান্তের পাহাড়িয়া অঞ্চলের বৈশাখের শেষে সেখানে প্রখর উত্তা[illegible] শুকিয়ে গিয়েছে, তারা গরু মহিষ নিয়ে ময়ূরাক্ষীর গর্ভে গর্ভে [illegible] গঙ্গার তটভূমির দিকে, হিজল অঞ্চলে এখন প্রচুর ঘাস এবং শুঁটিও প্রচুর। প্রতি বৎসরই এরা হাটে রাত্রি বেলা। তখন ময়ূরাক্ষী ঠাণ্ডা থাকে এবং ঝির ঝিরে বাতা[illegible] সকাল হলেই—তারা বালুময় নদী গ[illegible] চরভূমির উপর উঠে 'আঁট' দেয়। করে। এরা তারাই। কাল সকালে এ[illegible] থেকে ক্রোশ চারেক উত্তর-পশ্চি[illegible] জায়গায় ছিল। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু করে শেষ রাত্রে এখানে এসে ফেলেছে। এখানকার গণ্ডগোলের ক[illegible] বিন্দুবিসর্গও জানে না।

—হাসির কথা নয়? আপনি বল[illegible]

—অবশ্যই হাসির কথা। বিরা[illegible]

ন্ধ্যা উত্তরের নিজের গরুর পাল
সমুদ্র বলে ভয় লেগেছিল। তাতে
র হাসিই পায়। একটু করুণা-
কৌতুক অনুভবই করি।
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদটাও বুঝুন।
পালকে জনবাহিনী ভ্রম করা সেও
হজ উত্তেজিত অবস্থা নয়। যে কোন
র্ যা কিছু ঘটে যেতে পারে।

রীকান্ত হেসে বললে--হ্যাঁ এক পাল
দাঁড়িয়ে আছে—এখন যে কোন পক্ষে
বৃহন্নলার আবির্ভাব হলেই হয়।
করে হেসে উঠলেন এরা দুজন।

শোরবাবু সঙ্গে এসেছেন কিন্তু দীর্ঘ-
াথরের মূর্তির মত বসে আছেন।
ুপ করেই রইলেন।
ন থামিয়ে এস-ডি-ও বললেন--এই-
ামরা উঠব। এবং কিশোরবাবুর দিকে
রে বললেন-- কিশোরবাবু!
শোরবাবু এতক্ষণে বললেন—বলুন।
াপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।
ই' দরখাস্তের পরও আমাকে সঙ্গে
?
াপনি এই কথা বলছেন? আপনি
উপর অভিমান করবেন?
িন্তু—

ীকান্ত কিশোরবাবুর কিন্তুটুকুকে
র করে দিতেই বললে—কথাটা
় বলা উচিত ছিল। কিন্তু সময় পাই
ুক্কুরের দরখাস্তে কুড়ি বছর আগের
নাটির কথা উল্লেখ করে আমার উপর
াপ করেছে—সে ঘটনাটি কিন্তু সত্য।
ক উঠলেন এস-ডি-ও, এস-পি।--

াঁ সত্য। কিন্তু সুক্কুর হয় জানে না—
তখনও হয়তো তিন চার বছরের ছেলে,
নয় জেনেও গোপন করেছে খানিকটা অংশ।
ব্যাপারটার সূত্রপাত জমিদার প্রজার বিরোধ
নিয়ে এ কথা ঠিক। কিন্তু জলিল শেখ যে
অভিযোগ করেছিল তার বারো আনাই
মিথ্যে, তাকে থামের সঙ্গে বাঁধা হয় নি,
পাদুকা প্রহারও হয় নি। মাত্র ধরে এনে
বসিয়ে রেখেছিলেন কীর্তিচন্দ্রবাবু। ও-
দিকে জলিলের গ্রামের মুসলমানেরা দল-
বদ্ধ হয়ে এসে জলিলকে উঠিয়ে নিয়ে গেল
এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম পাঠালে কল-
কাতায় হক সাহেবের কাছে, কমিশনারের
কাছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওই সব
মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অত্যা-
চারী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগ
থাকে—সেটা আক্রোশেও পরিণত হয় এটা
সত্য। কিন্তু সেই ক্ষেত্রটিতে অত্যাচারী
জমিদার কীর্তিচন্দ্র হিন্দু বলে আক্রোশটা
অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল—এটা আমি
হলপ করেই বলতে পারি। এবং সে
বাড়ানোর মূলে ওদের জীবনে লীগ নীতির
উস্কানিও অনেকখানি দায়ী। নইলে ওই
প্রজা জলিল শেখের সহানুভূতিতে শুধু
মুসলমান প্রজাই যোগ দিলে আর হিন্দু
প্রজা চুপ করে রইল কেন? সেদিন যদি
কীর্তিবাবু জলিলের থাপ্পড় খেতেন—
তবে মহাদেব সরকার প্রমুখকে লাথি খেতে
হ'ত ওদের। এবং এই ছে চল্লিশ সাত চল্লিশ
সালে কলকাতার হাঙ্গামা নোয়াখালিতে,
নোয়াখালির শোধে বেহারে দাঙ্গা লাগার
সঙ্গে এখানেও দু চার টুকরো দাঙ্গা
লাগত। ব্যাপারটা এই হিসেবে সত্যি। আর
একটা কথাও আছে। সেটুকু না-বললে সব
সত্য প্রকাশ করা হবে না। খানিকটা চাপা
থেকে যাবে।

গৌরীকান্ত একটু হাসলে।

বললে—নিজেকে বাদ দিয়ে তো দুনিয়ার
ভাল মন্দে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে মিশিয়ে দেওয়া
যায় না। আমিও পারি নি। ঐ জলিলের
সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ছিল তিক্ত।
যে জমিদারীর অধিকারে কীর্তিচন্দ্র ওদের
জমিদার, সেই মহলের অংশীদার হিসেবে
আমিও জলিলের জমিদার ছিলাম। তখন
দু পুরুষ ধ'রে আমাদের সঙ্গে ওদের
বিরোধ চলে আসছে। আমাকেও সে দু চার
বার কড়া কথা বলে গেছে তখন। সে
ক্ষোভটাও সেদিন আমাকে ওই পথে ওই
ভাবনায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল--এতে কোন
সন্দেহই নেই। অন্যায় যদি থাকে আমার
ওই খানেই আছে। কারণ কীর্তিবাবুর ঘাড়টা
নুইয়ে দেবার সুযোগ যদি জলিলেরা পেত
তবে কীর্তিবাবুর পরেই আক্রমণ করত
আমাকে। আমার মাথাটা অনেক খাটো এবং
ঘাড়টা অনেক দুর্বল হলেও--কীর্তিবাবুর
পরেই ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল।

এস-ডি-ও এবং পুলিশ সাহেব দুজনেই
একটু হাসলেন। বললেন, টুপী খুলে
মাথা নুইয়ে যাচ্ছি। তা হ'লে আমরাই যাই।
আসব কিন্তু আবার।

ওরা চলে যেতেই কিশোরবাবু বললেন—
এ দরখাস্তের মূলে কে জান গৌরীকান্ত?
এর প্ররোচনা দিয়েছে রমা। মুসাবিদে
করেছে কপিলদেব। এবং সুক্কুরকে ওদের
দরখাস্তে সই করিয়েছে অক্ষয় ঘোষাল।

গৌরীকান্ত বললে--সুক্কুর জলিলের
চাচাতো ভাই। আর বামনীগাঁয়ের শেখেরা
এককালে ব্রাহ্মণ ছিল এবং নবগ্রামের
ব্রাহ্মণ বংশের জ্ঞাতি ছিল। ঠাকুর বংশের
সঙ্গে—

(ক্রমশ)

অরণ্য

অরুণ গুপ্ত

অরণ্যেরও শেষ আছে, সব অন্ধকার
ধুয়ে মুছে সেইখানে আলোর আভাস।
অরণ্যেরও শেষ আছে, প্রখর বিশ্বাস
হৃদয়ের, প্রাণ আছে, বসন্ত-বাহার—
ফুল আর হাসি আর সে ভালবাসার
সবটুকু ভুলে আছি, সেও ইতিহাস
যতটুকু মনে আছে, কুসুমের মাস
কবে ছিল একদিন, স্মৃতি আছে তার।

অন্ধকারে আপাতত কঠিন প্রহর,
পথ খুঁজি, স্থির জানি এরও আছে শেষ—
অরণ্যেই ঢেকে আছে নগর বন্দর
গ্রাম আর মাঠ ঘাট কত শত দেশ—
ফুলের সম্ভারে তবু বসন্ত অমর,
এ অরণ্য পার হয়ে আলোর উদ্দেশ।

হাওয়া

সুশীল রায়

দমকাই হোক আর ফুরফুরেই হোক, হাওয়া উঠলেই কেন যেন ইচ্ছে করে হাওয়া হয়ে যাই। শুধু ইচ্ছে করাই নয়, সত্যিসত্যিই আমি হাওয়া হয়ে যাই। বিশাল এই পৃথিবীটা আমার কাছে হয়ে যায় অবারিত।

যে-সমুদ্র চিনিনে, যে-নারিকেলকুঞ্জের কথা কেবল শোনা-কথা, আমি তা চাক্ষুষ দেখতে পাই। একত্র হয়ে, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে, পাতায় পাতায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নিরিবিলি দাঁড়িয়ে আছে অজস্র নারিকেল গাছ, হঠাৎ তাদের মাথায় ধাক্কা দিয়ে, পাতায় মর্মরধ্বনি তুলে, তাদের কাৎ করে হেলিয়ে দিয়ে তামাশা শুরু করে দিয়েছে যেন সমুদ্রের হাওয়া না, সে যেন স্বয়ং আমি। সেই অথৈ জলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিপের মত ছড়িয়ে আছে অগণিত দ্বীপ, আমি সেখানে গিয়ে খেলা আরম্ভ করি। দ্বীপে দ্বীপে লাফিয়ে বেড়াই, ঝাঁপিয়ে বেড়াই। এই ছুটোছুটি আর হুটোপুটি দেখে বালুরা সব ঢেউ হতে চায়; তারা মাটি ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে আসতে চায় শূন্যে। ভারি মজা লাগে তখন। বুঝতে পারি, আমার দেখাদেখি ওরাও আজ হাওয়া হয়ে যাবার জন্যে ছটফট করছে। কেবল হাওয়া হওয়া নয়, ওরা যেন একেবারে বদলে যাবার জন্যে ব্যস্ত। সমুদ্রের পাড় অগাধে নেমে গিয়ে আত্মহারা হতে চায়, বড় বড় ঢেউ তুলে সমুদ্র উঠে আসতে চায় পাড়ে।

কিন্তু বদল হওয়া হয় না ওদের। এদিকে বদলে যাই আমি। হঠাৎ বদলে যাই। সেই অচেনা সুদূর থেকে হঠাৎ ছিটকে এসে পড়ি আমার ঘরে। দেখতে পাই, জানলার পরদা ফুরফুর করে উড়ছে হাওয়ায়।

ওই হাওয়ার স্মৃতিটুকু যদি বন্দী করে রাখতে পারতাম এই ঘরে--তাহলে মন্দ হত না। এক ঝাঁক হাওয়া ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে যদি জানলা-দরজা আঁট করে বন্ধ করে দিই, তাহলে ওদের আটক করা যাবে কি না, তাই ভাবছিলাম। কিন্তু ওরা ফুর্তিবাজ যতটা, চালাক ঠিক ততটাই--এইটেই বড় মুশকিল। এক জানলা দিয়ে ঢুকে আর এক জানলা দিয়ে চড়ুই পাখির মত চট করে পালিয়ে যায়। দরজা-জানলা বন্ধ করার উপক্রম দেখলেই আবার গা-ঢাকাও দেয় চট করে।

বন্ধ ঘরের অন্ধকারে বাস করতে ওরা চায় না। খোলা প্রান্তর আর খোলা আকাশ না পেলে ওদের হাঁফ ধরে, দম বন্ধ হয়ে যায়। তাই যখনি ওরা দেখতে পায় যে, ওদের বাঁধবার জন্যে কেউ উদ্যোগ করছে, ওরা তখনি পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যায়। আমার মনে হয়, আকাশ-ভরা একটা হাসির সমুদ্রে সাঁতার কাটে ওরা—ওরা এক-একটা খুশির বুদ্বুদ, হাসির ফোয়ারা।

কাউকে ওরা ধরা দেয় না, কেবল ছোঁয়া দেয়। ওদের এই ছোঁয়াটা এমন ছোঁয়াচে যে, তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে করে ওঠে—ওদেরই মত অমনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলি পৃথিবীটা। কোন বাঁধে নিজেকে না বেঁধে, কোন আগল দিয়ে নিজেকে আগলে না রেখে, ওদেরই মত অদৃশ্য আনন্দ দিয়ে নিজের আপাদ মস্তক মুড়ে, হাল্কা হাল্কা পা ফেলে দমকা উল্লাসে লাফিয়ে বেড়াই চারদিকে।

ধন নয়, মান নয়, এর অতিরিক্ত আশাও কিছু নয়—আমার চাহিদা অতি সামান্য, আমি হতে চাই এক বিন্দু অনাবিল হাওয়া। এর চেয়ে লোভনীয় আনন্দ আর কিছুতে যে নেই, আজকের এই ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে কোলাকুলি করে হঠাৎ তা খোলসা-ভাবে জানা হয়ে গেছে। তাই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি, দেরি আর সহ্য হচ্ছে না কিছুতে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে, এক্ষুণি, ওদের মত অমনি হাওয়া হয়ে যাওয়া যায় কী করে। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য নয়—বরাবরের জন্য, চিরকালের জন্যে। খানিকক্ষণের জন্যে হাওয়া হওয়া—সে তো হামেশাই হয়ে থাকি। একটু আগেও তো তা হয়েছিলাম। কিন্তু ওই সাময়িক খুশিটায় মন ভরে না, মনকে ভরপুর করে খুশিটাকে চাই, যে-খুশি মনের কিনারা অবধি উঠে এসে সারাটা সময় টল-টল করবে, একটু নাড়া পেলে মাঝে মাঝে ছলকেও হয়তো পড়বে।

ওদের খুশি দেখেই আমি ওদের মত হবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি ওদের মনের উদারতাটাও। নিজেকে ঢেলে যদি সাজতে হয়, তাহলে হাওয়া হওয়া ছাড়া গতি নেই কিছুতেই। এক-একবার আশ্চর্যও লাগে। ভাবি, হাওয়া হওয়া ছাড়া আমার গতি নেই বটে, হতে পারে এটা আমার একটু অতিরিক্ত চাহিদা, কিন্তু হাওয়া হতে

না চাইলেও হাওয়া ছাড়া গতি আ
মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে পৃথিবী
হাওয়া যদি কেড়ে রাখা যায়, ত
পৃথিবীর সর্বনাশ করা যায় স
শুনেছি, আজকাল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞ
গবেষণাগারে পৃথিবী লোপাট করার
খুব তোড়জোড় চলেছে। কিন্তু
তেমন সুবিধে করে উঠতে পারছে
কেবল হুমকিই শোনা যাচ্ছে। ত
পৃথিবীকে উচ্ছন্নে পাঠাবার সাধ্য
কারো। যদি পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন ক
মতলব কারো থেকে থাকে, তাহলে
ঘরে বসে গবেষণা করার কোন দরকার
খোলা ময়দানে নেমে এসে হাওয়ার দ
হলেই চলে। হাওয়াকে হাত করতে প
পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাবার
আবিষ্কার করা যেতে পারে এবং এইভ
অক্ষয় কীর্তি লাভ করে অমর হতে
যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা
বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা জগৎকে
লাগিয়ে দিন না কেন, হাওয়াকে গ্রে
করার মত ফাঁদ তৈরি তাঁরা করতে প
নি; কোন রাজনীতিবিদ্‌ও এমন ক
ভাষা বের করতে পারেন নি, যা
হাওয়াকে নিজের দলে টেনে নিয়ে নি
কাজ হাসিল করবেন। সুতরাং, সু
আর কী! হাওয়া মনের আনন্দে সব
সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করে চলেছে
কারো একলার নয়—ও কারো দলেরও
—এই উদারতাটা ওর আছে বলে র
তা না হলে এতদিনে সাংঘাতিক ব

টে যেত, এ বিষয়ে আর বিন্দুবিসর্গ হ নেই।

ন ভয়ংকর ক্ষমতার যে ও অধিকারী, াও জানে না—এমন নয়। কিন্তু নিজের া সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার, একে-ই উদাসীন যেন। যার মন খুশি দিয়ে, তার মনে আর বাড়তি জায়গা ায়? —কোথায় সে রাখবে তার কা, কোথায় রাখবে তার আস্ফালন? সে জলাঞ্জলি দিয়েছে সেসব জঞ্জাল। ত্য কথা বলতে কি, এই সব কারণেই াকে আমার এত পছন্দ। হাওয়ার উপর র একটা আন্তরিক টান আছে বলেই কা মন হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু দম তেমন, তাই চট করে আবার ফিরে তার এই ছোট গণ্ডিতে, অপ্রশস্ত নিভৃত এই কোণটিতে।

নীগন্ধার বনে ঝড় তোলে যে হাওয়া, সৌখীন হাওয়ার আটপৌরে জীবনও দেখেছি। আমি একে দেখেছি নির্গন্ধ শের ডালে দোল দিতে, একেই আবার ছি যূথি-জাতি-মল্লিকাদের পাড়ায় ছুটি করে খেলা করতে। যখন এসব ছি, তখন ভেবেছি— জীবন উপভোগের অভিনব কায়দাই জানে এই হাওয়া। তখনি দেখেছি তার অন্য রূপ। পাতাদের সবুজ সমারোহ পার হয়ে চলে এসেছে অন্য পাড়ায়—শুকনো দের অঙ্গনে। ঠিক একই রকম খুশির দিয়ে শুকনো পাতা নিয়ে খেলা ভ করে দিয়েছে এ। এইটেকেই আমি আটপৌরে রূপ বলছিলাম; এবং হয়তো বলছিলাম। আটপৌরে হয়তো নয়, টই তার আসল রূপ। কাঁচা আর কাঁচ আমোদ করায় আর বাহাদুরি কী? ঝরে গেছে, মরে গেছে, পড়ে গেছে, ত্যক্ত হয়েছে—তাদের নিয়ে সমান াহে খেলা করে বেড়ানোতেই তো কৃতিত্ব। ক-এক সময় আমার সন্দেহ হয়, হাওয়া াই নিছক হাওয়া, না, এ একজন কবি। স জলেও এ ধাক্কা দিয়ে ঢেউ তুলতে র, আবার শুকনো বালুর বুকেও হাত য়ে এঁকে দেয় একই রকমের ঢেউ। কই এ স্পর্শ করেছে, তারই প্রাণে একটা দর দাগ টেনে দিচ্ছে অনায়াসে। কবি া এ-কাজ আর কে করতে পারে?

ত্যিই এ কবি, তাই এ এমন খেয়ালি, এমন উদার, এবং সেই জন্যেই এ এমন শর ভাণ্ডারী। ওর ভাণ্ডার থেকে কয়েক মুঠো খুশি লুঠ করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অতটুকু লাভে মন ভরে না। তাই হয়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর মতন একজন উদাসীন পর্যটক। যার দেশের কোন গণ্ডি টানা নেই; যখন যেখানে খুশি, তখন সেখানে অবাধে চলে যাওয়াটাই যার জীবনের একমাত্র কাজ।

আমরা আছি অতি ছোট একটা সীমার মধ্যে সন্তর্পণে বাঁধা। এক পা এগিয়ে যেতে হলে আমরা বিরত হয়ে পড়ি, বিচলিত বোধ করি। এই ছোট কুঠুরিটাকেই তাই আমার মনে হয়, আমার সাম্রাজ্য, সেখানে আমি সর্বময় কর্তা। নিজেকে ভালো করে চিনি নে, তাই ভাবি যে, আমার কবলে কত ক্ষমতাই না যেন স্তূপ করা আছে। কিন্তু এই ঘর থেকে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে যখন দাঁড়াই সামনের মাঠের ওই সামান্য জনতার মধ্যে, তখনি হারিয়ে ফেলি নিজেকে। সত্যিই নিজেকে খুঁজে পাইনে। তখনই বুঝি কত সামান্য এবং কত নগণ্য জীবনই একটা ফাঁকা দাপটের উপর বহন করে চলেছি।

আমরা যত ছোট, আমাদের সতর্কতাটা বড় সেই অনুপাতে। কারো গায়ের ছোঁয়াচ লেগে আরও ছোট হয়ে যাই, এই ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত। তাই এড়িয়ে এড়িয়ে আলগোছে নিজেদের তফাতে রাখাটাই আমরা করে তুলেছি আমাদের ফ্যাশান। মনে যে খুশি নেই, হাসতে গেলে যে কষ্ট বোধ করি, আনন্দে আত্মহারা হতে গেলে যে থতমত খেয়ে যাই—তার কারণ নিশ্চয় খোলা হাওয়ার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার অভাবটাই।

দরজা খুলে তাই দাঁড়িয়ে আছি, সারা গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাক এই প্রশান্ত হাওয়া। ও যদি আমার নিশ্বাসের বাতাস না জুগিয়ে আমার মন থেকে জঞ্জালগুলো টেনে-কেড়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

দরজার পরদা উড়ছে পতাকার মত পত্-পত্ করে। ওই পরদা ছিঁড়ে ফেলে ওই জায়গাটা জুড়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল—পরদার বদলে আমাকে ও যদি অমনি পতাকার মত একটু উড়িয়ে দেয় তাহলে। ওর কবি-মনের কাছ থেকে, আর কিছু না, চাই একটুখানি খুশি আর একটুখানি ছন্দ। ওর হাতছানি পেলেই হলপ করে বলতে পারি, আমি ওর সঙ্গেই ধাওয়া করব। আমি হয়ে যাব হাওয়া।

শীতের মরসুম

দীপঙ্কর

শহরে বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। কোথা থেকে শীতের কুয়াশার একটা গাঢ় আচ্ছাদনী চারদিক থেকে শহরকে ঘিরে ধরেছে। হাড়-ঠকঠক কাঁপুনি-ধরানো শীত হয়তো বাঙলা দেশে কোন কালেই পড়ে না, তবে হি-হি করা শীত যে নেমে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন আর 'এলো-যে শীতের বেলা বরষ-পরে' বলে শীতের আগমনী গাইবার অর্থ হয় না, এখন শীতের যথাযথ বর্ণনা দিতে হলে কবিগুরুরই আর-একটি গানের বাণীর আশ্রয় নিয়ে বলতে হয়, 'হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে।'

বাস্তবিক, শীতকে আঁকড়ে ধরে চার-দিকে যেন রিক্ততার হাহাকার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। উত্তুরে হাওয়ার এক-একটা প্রবল ঝাপটা গায়ে এসে লাগে আর মনে হয় কে যেন কানের পাশ দিয়ে আর্ত চীৎকার করে চলে গেল। বর্ষার পুবালি বায়ুর মধ্যে আছে স্নিগ্ধতার আমেজ, সজল স্নেহের মৃদু স্পর্শ; বসন্তের দক্ষিণ-সমীরণের মধ্যে আছে মন-আনচান-করা স্বপ্নসুখের লোভানি; গ্রীষ্মকালের সান্ধ্য বাতাস ঝিরিঝিরি বয় যেন আদর-সোহাগের ছলে মানুষের সঙ্গে খুনসুটি করে; কিন্তু শীতের হাওয়া, তার চেহারাই আলাদা। সে যেন গায়ে চাবুকের মতো এসে বেঁধে। উত্তর দিক থেকে অবিরাম স্রোতে ভেসে-আসা একটা যন্ত্রণাবিকৃত গোঙানি যেন কানের পাশে নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে। তুমি শুনতে চাও আর না-চাও, সে কান্না তোমার মর্মে প্রবেশ করবেই।

বাস্তবিক, ঋতুগুলি যে ভাবে বদলায় তার মধ্যে এই হাওয়া-বদলের রহস্যটাই সব চাইতে বিস্ময়কর। হাওয়ার দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যে সব ওলট-পালট হয়ে যায় তার হদিশ পাওয়া ভার। এই তো সেদিনও, শারদীয় ঋতুর অন্তিমে আর হেমন্তের শুরুতে, কেমন মৃদু-মৃদু হাওয়া দিচ্ছিল, মনে হয়েছিল এইরকম শীতের-আমেজ-জড়ানো স্নিগ্ধ বাতাসের সঞ্চয় বুঝি সহজে ফুরোবার নয়; কিন্তু যেই-না হেমন্তের আয়ু গড়িয়ে এল, বৈকালের পড়ন্ত আলো আকাশের গায়ে চিক্‌চিক্ করতে না করতেই রঙের ছোপ গোধূলির প্রায়ান্ধ-কারে মিলিয়ে যেতে লাগল, চোখের উপর চকিতে সব বদলে গেল। দিনগুলি যেন জাদুপ্রভাবে হঠাৎ চিমসে' অবিশ্বাস্যরকম ছোট হয়ে এল, সন্ধ্যার সূচনাতেই রাত্রির স্তব্ধতা ঘনীভূত হয়ে উঠল। গাছের পাতা খসে গেল, পুষ্পবৃক্ষের শোভা-সম্পদের ডালি বিশীর্ণ হয়ে উঠল, ফসল-তোলা মাঠের ধূধূ-করা রিক্ততা মনের ভিতর শূন্যতার হাহাকার ঘনিয়ে তুলল। শীত যেন কৃচ্ছ্রসাধনরতা এক তপস্বিনী ব্রত-চারিণী; তাঁর তপের তাপে সব-কিছু শুকিয়ে উঠল। রোদের তেজ কমল, বায়ু-মণ্ডলের শুষ্কতা বাড়ল। হাওয়ার দিক্ বদল হল, বেগ তীব্রতর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেল।

ঋতু পরিবর্তনের রহস্যের কথা যখন চিন্তা করি এইটে ভেবে অবাক লাগে, ঋতুর রঙ্গ আজও আমাদের চক্ষে পুরনো হল না। প্রতিবারেই তো ঋতুগুলি ঘুরে ঘুরে আসে, প্রত্যেকটি ঋতুর করণকারণের সঙ্গে আমরা পরিচিত, ইচ্ছা করলে আজন্মপরিচয়জনিত স্মৃতির প্রসাদে আমরা প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্যলক্ষণ হুবহু বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা এক বস্তু নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনুভূতি স্মৃতিধৃত বর্ণনার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলি এমন সাধ্য আমাদের নেই। শীত তো প্রতিবারেই আসে, তবু কেন মনে হয় এই প্রথম শীতের প্রকৃত চেহারা চাক্ষুষ করা গেল। যেন এর আগে শীতের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে কখনও পরিচয় হয়নি, যেন শীতঋতুর সঙ্গে জড়িত প্রতিটি অনুভূতির ফেরতার সঙ্গে এবারেই প্রথম ভালো করে জানাজানি হল। রিক্তপত্র বৃক্ষের ডালপালার ককানি, আকস্মিক হাওয়ার ঘূর্ণিবেগে উৎক্ষিপ্ত ঝরাপাতার উদাস মর্মর, বাতাসের শরশর এই মুহূর্তে আমার মনে যে অনুভূতি ঘনিয়ে তুলেছে তার সঙ্গে পূর্ব-পূর্ব বারের কোন অনুভূতিরই কোন তুলনা চলে না। আর যদি-বা চলে, তাদের সাদৃশ্য-লক্ষণের স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে।

এই কারণে বলব, ঋতুগুলি আমাদের পরিচিত হয়েও ঠিক পরিচিত নয়, এ আমরা প্রতি বৎসর নূতন করে আমাদের বয়স বাড়ে, শরীর পুরনো আমাদের অভিজ্ঞতা পুরনো হয় না। প্র পুরাতন অভিজ্ঞতার নবসঞ্জীবনের দিয়ে আমরা নতুন করে বেঁচে আস্বাদ লাভ করি। প্রতিবারেই আ জন্য অনাগত ঋতুর ঝোলায় কিছু-না-বিস্ময়ের চমক থাকেই। আজ, ঠিব ক্ষণে, শীতঋতুর অত্যন্ত নিকট-সা আমি রয়েছি, তাতে মনে হতে পারে বুঝি চিরকালের জন্য পাওয়া হয়ে কিন্তু আশা মরীচিকা। শীত ব অমন বিনিঃশেষে নিজেকে ধরা দেয় কোন ঋতুই দেয় না। তা হলে ঋতুর জারিজুরি সবই ফুরিয়ে অপ্রত্যাশিতের চমক সে কেমন করে ঋতুগুলির মনোভাব অনেকটা ছলা ময়ী প্রেমিকার মত। প্রেমিকা প্রেমিকের বাহুপাশে সম্পূর্ণ আত্মস করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে স করে, প্রেমিকের উদগ্র ব্যাকুলতাকে কেবলই খেলিয়ে বেড়ায়, তেমনি ঋতুগ মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় অ নিপুণ। ছলাকুশল শীত নিজেকে স জানান দিয়ে একদিনেই চিরচেনা যেতে রাজী নয়। কেন না চিরচেনা মানেই ফুরিয়ে যাওয়া। ধরাই যদি তবে আর আকর্ষণ কী রইল। স্ব স্পর্শে ধীরে ধীরে উন্মোচিত শত এক-একটি পাপড়ির ন্যায় প্রেমিকের কণ্ঠিত ব্যগ্রতার তাপে প্রেমিকার হৃদয় একটির পর একটি ক্রমশ উন্মোচিত থাকবে তবে তো প্রেমিকার মহিমা থাকবে। প্রেমিকের অসহিষ্ণুতার মহিমা বলি দিতে কে চায়?

শীত তপশ্চারিণী বটে, তবে জীবনের এই রহস্য সে অনবগত ব্রতক্লিষ্টা উমার মতো সে বিগত-এ হয়েও রহস্যমধুর আবরণে নিজেকে ব করে রেখেছে। আর তাই সে উমার ম অপ্রতিরোধ্যা, চিরনূতনা। শীতঋতুর গ্রন্থিবন্ধন যতই নিবিড় হোক, এ তুমি বলতে পারো না আগামী বৎসর কোন্ রূপে তোমার বিস্মিত দৃ সমক্ষে শীত নিজেকে মেলে ধরবে। ে হৃদয়কে বিদ্ধ করবার জন্যে ঠিক

অনুভূতির সায়ক সে তূণীরস্থ করে সে সম্বন্ধে। আগে-ভাগে স্থির-হওয়া কঠিন। কাজেই বলি, ঋতু-কে সম্পূর্ণ জানতে চেয়ো না, পেয়েছ তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে কর। যা পেয়েছ, যা জেনেছ তুলনা নাই—সুতরাং অধিকেন অলম্।

ত ধীরে ধীরে চেপে আসছে আর সঙ্গে সঙ্গে বাক্স-প্যাঁটরা থেকে গরম কাপড় একে-একে ঝাড়াইমোছাই হয়ে আসতে শুরু করেছে। সহজে যারা কাতর হয় না তেমন স্ফীতবপু সচেতন মানুষেরও এবার শীতার্ত পালা। শাল-দোশালা, আলোয়ান, বালাপোশ, পশমবস্ত্র, ফ্লানেল, ডর্ন, খদ্দর, সোয়েটার, পুল-ওভার, র, টুপি, মোজা, দস্তানা ইত্যাদি শীতনিবারক পোষাক ও উপকরণ র্তের গাত্র-শোভাবর্ধনে এ ওর সঙ্গে দিয়ে চলেছে। লেপ, কম্বল, 'রাগ', —যার যা সম্বল—সব এতকাল গর ভিতর কিম্বা তাকের উপর কিম্বা ঝুলানো আঙ্টায় অবজ্ঞাত বিশ্রাম-শয়ান ছিল, তাদের একে একে া হয়েছে। শীতের প্রকোপ যত তত শীতপ্রতিরোধক উপকরণ কৃত করে তোলা হচ্ছে। শীত কে কাবু করবার জন্যে যতই চেষ্টা মানুষের বুদ্ধি-সঙ্গতিও বড়ো কম শীতকে পাশ কাটাবার জন্যে তার জনের ঘটা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। নর প্রসাদে এই ক্ষেত্রে আরও কত কী ণের বাহুল্য ঘটবে কে জানে।

াতিবানের পক্ষে শীতঋতু এক ব আশীর্বাদ। কেননা স্বীয় ত্তের বিঘোষণের পক্ষে এমন উপযোগী আর নেই। শীতঋতু এলে বোঝা যায় তদূর ওজন—আর্থিক ওজন। বিত্ত-র মধ্যে যারা আত্মপ্রচারপ্রিয় তারা এই র অপেক্ষায় মুখিয়ে থাকে বললে , হয় না। এক-একটি দিন অপগত হয় ধনীর গাত্রসজ্জার উপকরণ পুঞ্জীভূত থাকে। প্রয়োজনের পোষাকের উপর জনের পোষাকও অনেক চড়ানো গাত্রোপরি শীতবস্ত্রের সে এক । আর কেনই-বা না হবে। শীতকে ার জন্যেই তো শুধু শীতবস্ত্রের র নয়, ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে সঙ্গে পরকে কাবু করাও তো চাই।

'আমার অনেক আছে, তোমার কিছু নাই' এটা যদি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখাতে পারলুম তবে আর সজ্জার ঘটাপটা কেন।

শীতের অনুভূতি বস্তুটি অত্যন্ত আপেক্ষিক। কার কী রকম শীতবস্ত্র আহরণের ক্ষমতা তদ্দ্বারা তার শীতের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিত্তবানের সম্বল প্রচুর, কাজেই তার শীতের অনুভূতি একটু বেশী। দরিদ্রের আয়োজন দীন, তদনুপাতে তার শীতবোধও অনেক কম। শীত ঠেকাবার জন্যে তার পক্ষে একটা ছেঁড়া কাঁথাই যথেষ্ট। নিদেনপক্ষে মলিন কাপড়ের খুঁট। এর বেশী তার প্রয়োজন হয় না, কেননা এইটেই প্রত্যাশিত, এইটেই বিধি। তবু যে দরিদ্রেরা শীতে কষ্ট পায় সে ব্যাটাদের স্বভাবের দোষে। কেবল খাই-খাই আর চাই-চাই। কিছুতেই সন্তুষ্টি নেই। এই হলে কি আর রাষ্ট্র গড়া চলে?

দেখেশুনে মনে হয়, শীতবোধ বস্তুটি অনেকটা আত্মসম্মানবোধের মতো। আমার আত্মসম্মানবোধ আছে বলে আমি মানী ব্যক্তি নই, আমি মানী ব্যক্তিরূপে সমাজে গণ্য বলেই আমার আত্মসম্মানবোধ এত টনটনে। মানের পান থেকে চুন খসলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি। আমার শীত-বস্ত্রক্রয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষমতা আছে তাই আমার শীতবোধ প্রবল; যার সে ক্ষমতা নেই তার শীতের বালাইও নেই। দরিদ্রের চিত্তে ভুলেও কোন সময় যদি উষ্ণতার আরামের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তাকে তক্ষুনি 'বালাই' 'ষাট্' বলে নিরস্ত করে দেওয়া উচিত।

ঠাট্টা নয়, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার গোটা ইমারতটাই যে বৈষম্যের নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে শীতঋতু তার মস্ত নির্দেশক। এই ঋতুর পাল্লার ভিতর এলে বোঝা যায় ধনীদরিদ্রের ব্যবধানের চেহারাটা কী সাংঘাতিক। কেউ শীতের দাপটে কুঁকড়ে দুমড়ে চুপসে এই এতটুকুন হয়ে গেছে, কেউ শীত কেন আরও জাঁকিয়ে পড়ে না সেজন্যে আপসোস করছে। আপ-সোসেরই কথা বই কি। শীতের প্রকোপ না বাড়লে তুমি যে শীতঋতুর দ্বারা বিশেষ-ভাবে কাতর সে কথা লোককে বোঝাবে কী দিয়ে, তোমার ক্ষুধাবৃদ্ধিই বা হবে কেমন করে? শীতকালে এত-যে বিবিধ আহার্যের ঘটাপটা সে তোমার উদরস্থ হবার জন্যই নয় কি?

আহার্যের কথায় শীতঋতুর অত্যন্ত স্থূল দিকটির কথা এসে পড়ল। কিন্তু কী করব, আসতে বাধা। শীতঋতু নিয়ে কেবল কাব্য করব এ হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের বুলি ছড়াবার জন্যেও শীত নয়, তার আরও উপযুক্ততর উপলক্ষ আছে। বস্তুত শীতঋতুর সঙ্গে ঔদরিক প্রসঙ্গের যোগ অতি নিবিড়। ঔদরিক আলোচনা বাদ দিলে শীতঋতুর অনেকখানি অকথিত থেকে যায়। শীতের আশীর্বাদগুলির মধ্যে এই একটা মস্ত আশীর্বাদ যে, এই সময়ে বাঙালী সংসারের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা স্বল্পমূল্যে বহুগুণ স্ফীতিলাভ করে। সম্বৎসর আধপেটা-খাওয়া ছা-পোষা গৃহস্থের পক্ষে সেটা কম কথা নয়। বাজারে যাও দেখবে শাকসব্জীর কত রকমের আয়োজন। দ্রব্যের পরিমাণ বহু সুতরাং মূল্য স্বল্পতর। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওল কপি, শালগম, মুলো, গাজর, পালং, রাই, সিম, কড়াইশুঁটি, নতুন আলু, লাউ, বেগুন, টম্যাটো,—কত নাম করব। ইচ্ছা করলে চার-ছ' আনা পয়সাতেই থলে ভরে নিয়ে আসা যায়। মৎস্যেরও কত রকমের বৈচিত্র্য। মৎস্যপ্রিয় বাঙালীর জিভে নোলা ঝরিয়ে দেবার মতো। গলদা চিংড়ি, ভেটকি, কালিবোস, পাবদা, কই—এইসব রসনাসেব্য মৎস্যের এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। কলকাতার বাজারে মাছের দাম অবশ্য সস্তা আশা করা অন্যায়—কলিকাতার মৎস্যমূল্য আকাশের ধ্রুবতারার মতো নিয়ত স্থির ও অচঞ্চল—তা হোক, দাম না হয় চড়াই থাকল, দামে কী এসে যায়, দাম দিয়েই কি সব সময় সব জিনিস পাওয়া যায়? রসনালোলুপতার পরিতৃপ্তির এমন ঢালাও সুযোগ সম্বৎসরে কটা মেলে? আর মাছ ভাগ্যে মাপা না থাকলে রকমারি শাক-সব্জী তো আছে। শাকান্ন থেকে বাঙালীকে বঞ্চিত করে কার সাধ্য!

শাকান্নের কথায় হেসে উঠবেন না। মহা-ভারতে বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, পৃথিবীতে সে-ই যথার্থ সুখী যে অঋণী, অপ্রবাসী, অনা-কাঙ্ক্ষ এবং স্বগৃহে শাকমাত্র আহার্যেই তৃপ্ত। বাস্তবিক, শাকপাতাই হোক আর যা-ই হোক, 'নিজের সুখের অন্ন খাই সুখী হয়ে' বলতে পারার মতো সুখ সংসারে আর দুটি নেই। সুখী ব্যক্তির শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার প্রয়োজন হয় না, শাক দিয়েই সে মাছের অভাব পূরণ করে। ■

আরও একটি কারণে শীতের এই সব্জিপ্রাচুর্য উল্লেখযোগ্য মনে করি। আমরা যাঁরা কলিকাতাবাসী, ইঁটকাঠের বন্ধ ঘিঞ্জির মধ্যে থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি, ত্রিসীমানার মধ্যেও যাঁদের সবুজের নাম-গন্ধ নেই, তাঁদের শুষ্ক-ঊষর প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার জন্যে প্রকৃতিসংযোগ একান্ত আবশ্যক। মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই বলেই আমরা মনেপ্রাণে এমন কাঠখোট্টা হয়ে উঠেছি। সকলেই আমরা বাস্তবাগীশ লোক, শহরের ইঁটকাঠ লোহা-পাথরের কারাগারের বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর দু'দণ্ড গিয়ে যে জিরোব তার যো নেই। আমাদের ন্যায় প্রকৃতি-সংসর্গের সুযোগবঞ্চিত, বিরলঅবসর, নগরবন্ধ জীবের জীবনে সব্জির প্রাচুর্য বহুবাঞ্ছিত সবুজের সমারোহ নিয়ে আসে। তাতে চোখ আর মন দুই-ই জিরোবার সুযোগ পায়। তাতে করে মাটির সঙ্গেও আমাদের পরোক্ষত যোগ ঘটে। ফুলকপি বা ওলকপির নিটোল সজীবতা কিংবা আলু, মূলো, গাজর, শাকালু প্রভৃতি মৃত্তিকাস্তীর্ণ মূলসমূহ যেন আচম্বিতে শহরবাসী আমাদেরকে প্রকৃতিজগতের কেন্দ্রমধ্যে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে। মৃত্তিকাউপবাসখিন্ন আমাদের জীবন এই উপায়েই যেন মাটির সংস্পর্শ সব চাইতে নিবিড়ভাবে লাভ করে। 'গ্রীন্ ভেজিটেবল্‌স্' শুধু যে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই উপাদেয় তা-ই নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও সমান উপকারী।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অভিমত বিচার্য। গান্ধীজী সব্জিচাষকে, ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে তো বিশেষ মূল্যবান মনে করতেনই, তাকে শিল্পসৌন্দর্যেরও আধার জ্ঞান করতেন। ফুলের শোভার তুলনায় ফলের শোভা মহাত্মাজীর চক্ষে কম সুদৃশ্য ছিল না। রকমারি সব্জি থেকে তিনি ফুলের মতোই সৌন্দর্য আহরণের ক্ষমতা রাখতেন। গান্ধীজীর শিল্প-দৃষ্টিতে সেই জিনিসই সেরা শিল্প-কৌলিন্যের অধিকারী যার ভিতর সৌন্দর্য (beauty) ও ব্যবহারিক উপযোগিতা (utility) একত্র বিধৃত। সৌন্দর্যের মূল্যায়নে তিনি প্রয়োজনকে অন্যায্য মনে করতেন না। বরং, বস্তুর প্রয়োজনমূল্যে বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এই ছিল তাঁর ধারণা।

গান্ধীজীর এই শিল্পমত বিশুদ্ধ শিল্প-রসিকদের গ্রহণীয় না হতে পারে,—প্রয়োজনকে তাঁরা শিল্পসৌন্দর্যের ক্ষেত্রে আমল দিতে আদৌ রাজী নন—, তা বলে তাঁর অভিমত এক কথায় উড়িয়েও দেওয়া যায় না। গান্ধীজীর প্রতিটি অভিমত সুগভীর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অসীম। অন্তত তাঁর বহুবিচিত্র কর্মজীবনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা-সমূহের মধ্যে অনায়াস-খণ্ডনীয় চটুল মতামতের স্থান ছিল না একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কাজেই গান্ধীজীর শিল্পদৃষ্টি আপাতবিচারে কিঞ্চিৎ অসাধারণ মনে হলেও তার তাৎপর্য ধীরভাবে চিন্তনীয়। মনে হয়, সারল্য ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্যের আদর্শ যদি আমরা জীবনে যথার্থতঃ গ্রহণ করতে পারি তবে গান্ধীজীর শিল্পদৃষ্টি অনুমোদন ও অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয়।

অন্ততপক্ষে এটা তো স্পষ্টই ব[illegible] যায়, সব্জি ও ফলমূলের সৌন্দর্য [illegible] গান্ধীজী যে কথা বলেছেন তার অনেকখানি সারসত্তা নিহিত আছে [illegible] সত্য উপলব্ধি করতে হলে তাকে নিবেশের সহিত অনুধাবন করা [illegible]

শীতের আলোচনা হচ্ছিল, [illegible] প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরে আসি। সঙ্গে উপসংহার-মন্তব্যের দায়টিও সমাধা [illegible] ইংরেজ কবি বলেছেন, If w[illegible] comes, can spring be far beh[illegible] কিনা, শীত এলে বসন্ত কি দূরে [illegible] পারে? এর অর্থ, শীতের জরাজী[illegible] মধ্যেই বসন্তের সম্ভাবনা লুক্কায়িত, বসন্তের অগ্রদূত। শীতের রিক্ততা কিছু নয়, বসন্তের পূর্ণতার প্রাক্-প্র[illegible] এই ভাবটি ইংরাজী কবিতার সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের কবিও তাকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। রবী[illegible] লিখেছেন, 'মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে ফুলের মার গো।' কিম্বা

"হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগলা ঝোরা পাবে ছু[illegible]
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘে[illegible]
আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি।
শুনছ না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজল ভেরী
দেখছ নাকি এই আলোকে
খেলছে হাসি রবির চে[illegible]
সাদা তোমার শ্যামল হবে,
ফিরব মোরা তাই-যে হে[illegible]

সাদা ও শ্যামলের তত্ত্ব যথাক্রমে শী[illegible] বসন্তের তত্ত্বের রূপক, বলাই বাহুল্য

সায়াহ্ন

বিকাশ দাশ

ঝরে পড়ে সায়াহ্নের একমুঠো সোনা,—
আকাশে-নদীতে হয় হাজার স্মৃতির জাল বোনা!
ঝুঁকে-পড়া শিরীষের কচি ডালে ডালে,
বিদায়ী রোদের চুমু অপরূপ লাগে এ' বিকালে!!

আরো অপরূপ লাগে ছাইরঙা গোধূলির ছায়ে,
তুমি যবে বসো খোলা জানালায় খোঁপাটি এলায়ে!
শিথিল গুন্ঠনখানি ঝির ঝির চটুল হাওয়ায়,—
কেঁপে ওঠে এলোমেলো আর মৃদু চোখে বাঁকা চায়!

হয়তো তোমার চোখে আলগোছে ছায়া ফেলে যায়,
একটি দূরের গ্রাম সাঁঝ-নামা অশত্থ-ছায়ায়!
কখনো বা ভেসে ওঠে উড়ে-যাওয়া ছবি বলাকার,
নেমে-আসা গুঁড়ো গুঁড়ো ধূম্রছায়া হয়তো সন্ধ্যার!

মনে পড়ে, টুপটাপ ঘন হয়ে মায়া-সন্ধ্যা ঝরে,
জাজিম বিছানো নীল মাঠে মাঠে ঘাসের ওপরে।
ওপারে নদীর চরে হিজলের বনখানি চুপ,
এখনো দু' চোখে ভাসে রঙ্‌ভরা বিকেলের রূপ!!

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

...শায়ী রোগীর কোনও কারণে জায়গা বদ্ধ দরকার হলে স্ট্রেচার ব্যবহার করা ... সাধারণভাবে হাসপাতালে বা অন্য ও জায়গায় এ ব্যবস্থায় কোনও ব'া হয় না। জলপথে রোগীকে না নড়ানোই মুশকিলের কথা। বিশেষত
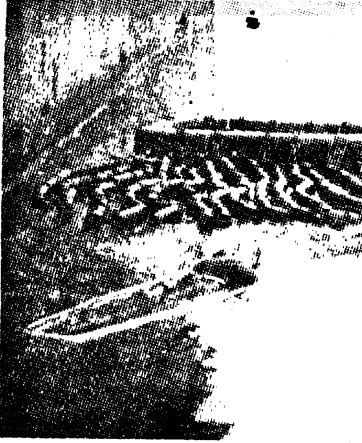
স্ট্রেচারটি রোগী নিয়ে জলে ভাসছে
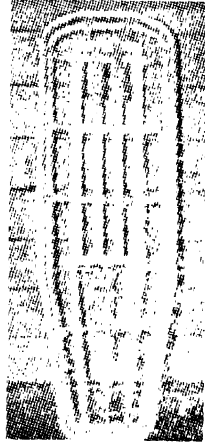
ভাসমান স্ট্রেচার

জাহাজে এক জাহাজ থেকে অন্য জ আহত সৈনিককে স্থানান্তরিত হলে খুবই ভয়ের কথা, কারণ র হাত ফস্কে স্ট্রেচারটি গেলে একেবারে জলে পড়তে হয়। ঐ ভাসমান স্ট্রেচারের ব্যবস্থা রাখতে া খুবই সুবিধা হয়। আজকাল এই ভাসমান স্ট্রেচারের প্রচলন হয়েছে। ন্ট্রচারের ফ্রেমটা দেড় ইঞ্চি প্রমাণ ফাঁপা ্যনিয়মের টিউব দিয়ে তৈরী হয়েছে। ্র এলুমিনিয়মের খুব পাতলা জাল া থাকে। রোগী যে দিকে মাথা রাখবে ্কে তলার দিকে দুটো মুখবন্ধ টীন থাকে। যদি কোনও কারণে স্ট্রেচারটি পড়ে যায়, তাহলে রোগী এই টীনের মাথা রাখলে জলের ঢেউ এসে কে বিপর্যস্ত করতে পারে না।

*

...সিল" কথাটা আমাদের খুবই জানা কিন্তু "জ্যান্তফসিল" কথাটা একটা ...কর। এ জগতে জ্যান্তফসিলের অনেক নিদর্শনই পাওয়া যায়। যে সব জীবের অস্তিত্ব ক্রমশঃ এ জগত থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই এরা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে, ঐ মুষ্টিমেয় সংখ্যক জীবগুলিকেই জ্যান্ত ফসিল বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার কোয়েলা এবং অস্ট্রিচ জাতীয় একরকম পাখী এই শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। অল্পদিন আগে ম্যাডাগাস্কার থেকে ২০০ মাইল দূরের একটি দ্বীপে সিলাকান্থ জাতীয় এক ধরণের মাছ পাওয়া গেছে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণের মতে এই জাতীয় মাছগুলির অস্তিত্ব প্রায় বত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে বর্তমান ছিল। লাংফিশ বা ডিপনোই জাতীয় মাছ প্রায় এদেরই সমগোত্রীয়। খুব সম্ভব সিলাকান্থ ও লাংফিশ উভয়ে—সমসাময়িক জীব। প্রায় ছয় কোটি বছর আগে জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করার জন্য সিলাকান্থ জাতীয় মাছগুলি স্বাদু জল থেকে লোনা জলে অর্থাৎ সমুদ্রে বসবাস করবার চেষ্টা করে। এরপর আর এদের কোনও খবরাখবর পাওয়া যায় না। কয়ে... বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রে তলদেশ থেকে ল্যাটিসেরিয়া নামে সিলাকান্থের ধরণে আর এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়। এই মাছটি পাওয়ার পর মানুষের ধারণা হয় যে, এই জাতীয় মাছ জগত থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি কিছু এখনও পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সিলাকান্থ মাছ পাওয়া যাওয়ায় লোকের ধারণা হয়েছে যে, এই জাতীয় মাছও বোধহয় সমুদ্রের তলদেশ থেকে পাওয়া যেতে পারে, এদের সংখ্যা খুব কম বলেই এতদিন মানুষের চোখে পড়েনি। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেন যে, পুরাকালের সিলাকান্থ আর বর্তমানের সিলাকান্থের মধ্যে আকৃতি ও অন্যান্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অনেক তফাৎ দেখতে পাওয়া যায়।

*

শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য আমাদের ভিটামিন প্রধান খাদ্য প্রচুর খেতে হয়। বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন বিভিন্ন রকমভাবে শরীরের পুষ্টিসাধন করে। শরীরে ভিটামিন "ডি" কম হলে সাধারণত রিকেট হয়ে থাকে। সেজন্য রিকেট হলে ভিটামিন "ডি" প্রধান খাদ্য খাওয়ানো এবং রোদের তাপ লাগান খুব দরকার হয়। দুজন ডাক্তার রিকেট রোগের চিকিৎসার্থে আরও এক ধরণের ভিটামিন বার করেছেন এটাকে সাময়িকভাবে "৬০৭" বলা হয়। পশুদের টিস্যুতে কোলেসটেরল নামে চর্বি জাতীয় যে পদার্থ থাকে তার থেকেই এই নতুন ভিটামিন তৈরী হয়।

*

আমরা যে সব গাছপালাকে আগাছা বলে তাচ্ছিল্য করি সেগুলোর মধ্যে সবগুলোই অকাজের নয়। তার মধ্যে অনেক গাছই বেশ কাজে লাগে। কেনা ওরিয়েন্টালিস্ নামে একধরণের আগাছা ধান জমি বা পাটক্ষেতে জন্মে জমিটাকে চাষের অনুপযুক্ত করে ফেলে। কলিকাতার কোনও একটি শিল্প গবেষণাগার পরীক্ষা করে দেখেছে যে এই আগাছাগুলো থেকে শ্বেতসার (Starch) ও আঁশ খুব ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়। এই আঁশগুলো পাটের আঁশের সঙ্গে মিশিয়ে একই কাজে লাগানো যায় তাছাড়া দরকার হলে কাগজের মণ্ড ও চটচটে আঠা জাতীয় জিনিস তৈরি করতেও কাজে লাগানো চলে।

চিঠিটা হাত থেকে খসে পড়লো পরিমলের, চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে উঠলো। তার দৃষ্টি চলে গেলো বাইরের দিকে, যেখানে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ-এর পর ঢেউ, আলো আঁধারির আপনিমগ্ন লগ্নে। মহানগরীর রাত্রিক যৌবন সাগ্নিক হয়ে সবে লাল নীল দীপশিখায় জ্বলছে নিভছে। পায়ের নীচে বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভে কলরব-ক্লান্ত দিনের অশ্রান্ত কূজন। তারই রেশ ছত্রলায় ঠিক না পৌঁছলেও ধূলিয়ে দিচ্ছিল বিশ্রান্তিকে।

চিঠিটা তুলে নিয়ে আর একবার পড়লো সে, লিখেছে সুপ্রীতি, সুনীতির বোন—

আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই, আলাপ জমাবার সুযোগও হয়নি কোনদিন তবু ছোড়দির মুখে তার এই দুর্বিনীতা বোনটির কথা হয়ত শুনেছেন, সে ত শুধু আমার সহোদরা ছিল না সচিব সখিমিথও বটে, পিঠোপিঠী আমাদের দুই বোনকে লোকে বলতো মাণিকজোড় এ পিঠ ও পিঠ! আর আপনার কথা যত না শুনেছি দিদির কাছে তত শুনেছি অন্যের কাছে, বুঝেছি আপনি শুধু অচল নন খাঁটি মেকিও বটে। ছোড়দি শুনলে আঁতকে উঠতো, কি শ্রদ্ধাটাই করতো আপনাকে, সব কিছু উজোড় করে দিতে পারতো আপনার একটি মুখের কথায় কিন্তু এমন কাপুরুষ আপনি, চাইবার সাহস হলো না, বলবার মুরোদ হলো না, ভোগের শক্তি নেই তাই ত্যাগের বুলি আওড়ে বড় বড় কথার মধ্যে ঢেকে রাখলেন নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতা।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে রয়েছে, কথায় কথায় অনেক দূরে এগিয়ে পড়েছি, যে কথাটা বলবো বলে কলম ধরেছি সে কথাটাই বলা হয়নি—কাল ছোড়দি আমাদের ছেড়ে চলে গেলো—মহাপ্রয়াণ বলবো না, কারণ বারে বারে সে যে আমার মনে ফিরে আসবে সে কথা আমার চেয়ে আর কে ভাল জানে। ভরা জ্যোৎস্নার তারাজ্বলা দোলালাগা রাত,
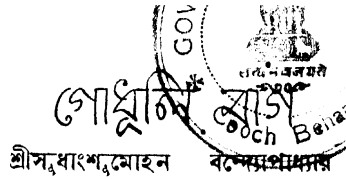
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত দিগন্তটা ধুয়ে গেছে সাদার প্লাবনে —এর ভিতর সে যেন মিলিয়ে গেল ঘুমন্ত পরিবেশে। তার সমস্ত শেষ কাজ সেরে যখন আমরা ফিরলাম তখন সবে ভোর হচ্ছে —সোনার দরজা খুলছে পূবের কোণে—মনে হলো চাকতে সেই উদয়ের পথেও মহা তপস্বিনীকে দেখেছি—চলেছে হাসি হাসি-মুখ। ভিতরে ভিতরে তার শরীরটায় যে এতো ঘুণ ধরেছে এই অল্প বয়সেই, এ কথাটা ঘুণাক্ষরেও সে আমাদের জানায়নি। আপনার সঙ্গে শেষ দেখা বোধহয় বছর চারেক আগে, তারই কিছুদিন পরে সে চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে চলে যায় দূর গাঁয়ে, সেখানকারই একটা ছোট্ট স্কুলে যোগ দিয়ে যেন তপস্যায় বসলো—এই ক'বছরের মধ্যে তার সঙ্গে মোটে একবারের বেশী দেখা হয়নি, চিঠিও খুব কম দিতো, যখন লিখতো, তার মধ্যে নিজের কথা ছাড়া আর সব কথাই থাকতো, কত কথাই তার বলবার ছিলো, কত পড়াই সে পড়েছিল, কোন চোখ দিয়ে সে দেখেছিল এই জগৎকে, কী অপূর্ব মন দিয়েই সে ভালোবেসেছিল সকলকে—কী আবেগ, কী উচ্ছ্বাস, কী শ্রদ্ধা তার প্রতি কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো, কে সেই মুখর মানুষটিকে চিরকালের মত মূক করে দিলে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। তিলে তিলে নিঃশব্দে সে নিজেকে ফোটাফুলের মত ঝরিয়ে দিয়ে গেছে নিঃশেষে—একে কী আত্মসমর্পণ বলবো না আত্মবিলোপ না নিছক মাথা খারাপের লক্ষণ। আমি অন্তত একে ভালবাসা বলবো না—আমার কাছে ও কথাটা আরো জীবন্ত আরো মোহময়, আরো ঘন, আরো বাস্তব—হার্ডফ্যাক্ট, নিছক স্বপ্ন নয়। ভাবালুতা একটা বিলাস, তারও সীমা আছে, প্রত্যেক বিলাসের মত তার অপব্যবহারও অপরাধ এবং যাঁরা সেটা প্রশ্রয় দেন জ্ঞাতসারেই হোক অজান্তেই হোক তাঁরাও সমান অপরাধী। মানুষের মনে যে মহাদেবতা বাস করেন তাঁরই দরবারে তাঁদের বিচার হওয়া উচিত, শাস্তি পাওয়া উচিত।

দিদির আর দোষ কি? গরীব বাঙালী ঘরের শ্যামলা কালো মেয়েদের কপালে বিধাতাপুরুষ বোধ হয় ভোঁতা লেখেন। রূপ ও রূপোর দুই-এরই যুগপৎ অভাব। নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রথমা দ্বিতীয়াদের হয়ত বা কিছু থাকে, তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমীদের লেখাপড়া শিখলে হতে হয় মাস্ট কেরানী, অল্প কিছু শিখলে নার্সগি টেলিফোনের সাকরেদী আর তারও ধাপের জন্য ভায়ের বাপের আশ্র সংসারে হেলায় অশ্রদ্ধায় জের টানা, বি বদলে পরের ছেলে মানুষ করা। ত নেমে আসুক সারাদেহমন জুড়ে এক অ ক্লান্তি হাড়পাঁজরা গুঁড়িয়ে দেওয়া শ্রা যেদিকেই তাকাও স্থান নাই স্থান নাই এ তরী।

ধার্মিক গুণী জ্ঞানী কবি মনীষ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—সন্ধ্যা মাল নিয়ে রজনীগন্ধাকে ঘিরে দাদার চৌ ছন্দে ছন্দে বেজে উঠলেই জীবনট সার্থক হলো? জগতের নাথ কি অন অনুভূতিকেই দারুভূত সনাতন ব নির্দেশ দিয়েছেন? সরকারী জমানব বাইরে মনের অলিগলির হিসাব নিকাশ কেউ করবে না? আপনাদের অজর আত্মার বাহন এই যে রক্তমাংসের সেটা কী কর্তার ভূতের মত ঘাড়ে চে থাকবে। এই অতি স্থূল জিনিস খাইয়ে পরিয়ে তার দাবী মেনে, ধূপছ চপল মায়ায় সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়ে রেখে কেউ বলে তাহলেই কি সে অনিত্যের হলো—এই দেবায়তন কি শুধু ভোগায়ত
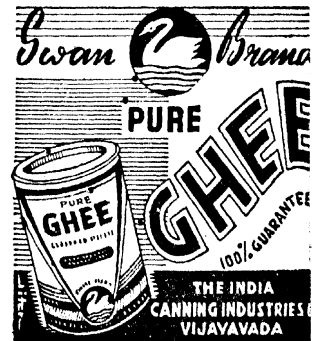
...ভ্রান্তি হয় কেন এই কথাই ভাবি। ... মানুষকে ছেড়ে নির্গুণ ভাবকে ...ন করে অনেকে হয়ত সিদ্ধ হয়েছেন ...র অশ্রদ্ধা করি না; কিন্তু মনে রাখবেন ...দের হাতে গান্ডীব নিজেদেরই ...াণ যোজনা করে। দায়িত্বজ্ঞানহীন ...নপর মনোবৃত্তি নিয়ে প্রকান্ড ধোঁয়ার ...য় নিরাপদ দুর্গ হয়ত গড়া যায়,, সে সাহিত্যই হোক্, ধর্মই হোক, বিজ্ঞানই বা সমাজ ব্যবস্থার নতুন সর্বরোগহর ...ই হোক কিন্তু ততঃ কিম্?

...ক্ গে যে কথা বলছিলাম, জরুরী ...গ্রাম পেয়ে আফিস থেকে ছুটি নিয়ে ...শ মাইল দূরের হাসপাতালে যখন ...ছলাম, তখন ছোড়দির প্রায় শেষ ...থা। নার্স সাবধান করে দিলে। ...ল হাত বুলুতে বুলুতে তার সংজ্ঞা ... এলো, বল্লুম—ছোড়দি, একী করেছিস ...ত, চল তোকে কলকাতায় নিয়ে যাই— ...ান ক্ষীণ হেসে সে বল্লে—বড্ড দেরী ...গেছে ভাই, যে ভুল করেছি সে ভুল যেন ...করিসনি, এই আশীর্বাদই রইলো—আর ... হ্যারে পরিমলকে কাছে ডেকে নিতে ...ব? ছিঃ কি বলছো,—

...রে, ওর উড়নচন্ডী মনকে হয়ত শান্ত ...ত পারবি তুই, আমি কোনদিন সে চেষ্টা ...ন, তাকে কাছে পেয়েও কিছু বলতে ...নি, শুধু যেদিন সে চলে যায়, সেদিন ...কে আর কিছুতেই সামলাতে পারিনি, ...া চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিলো, ...ধু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে- ...। আর একদিন অতি সন্তর্পণে তার ...র ধুলো নিতে গিয়াছিলাম থরথর করে ...প কুণ্ঠিত হয়ে বল্লে আমি ত প্রণামের ... নই, সেদিন সে যদি সরে না যেতো ... সেইখানেই আমি, যাক্ অনেকক্ষণ চুপ ...থেকে সে বল্লে—মনে মনে ভারী একা ও ... একটু দেখিস শুনে মনে হয়েছিল ...লে সব মেয়েই মা, আশ্রয় দিতে চায়, ... রাখতে চায়, বাঁচিয়ে রাখতে চায় ...বাসার ধনকে—দিদি, দিদি বলে আমি লুটিয়ে পড়েছিলাম বিছানার উপর, চোখের জলে ভিজে গিছলো শাড়ির আঁচলটা।

খানিক পরে আমার হাতদুটো ধরে সে বল্লে 'শেষ পারাণির কড়ি কণ্ঠে নিলাম গান' গা তো—

নিজে কি চমৎকার গাইতো, গান তার কত প্রিয় ছিল, কত সাধনার ধন আপনি ত জানেন, আমার যা কিছু শেখা তারই কাছে। সেতার এস্রাজ তানপুরোর ঝংকারে মনের মধুকোষে কত ভৈরবী পূরবী সাহানা-সোহিনী জমেছিল, তার ভাগ আমিও পেয়েছি।

শুনতে শুনতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে জানি না—সে ঘুম আর ভাঙলো না; ত্রিশ বছরেই ষাট বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে সে মিলিয়ে গেলো নিঃশব্দে, কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে; কিন্তু আমি দিদি নই, আমি নিঃসংকোচে এর বিচার চাই, কেন এই যৌবনের অপচয়, কেন? মনে পড়ছে বাবার কথা, বলতেন যৌবন মানেই আশা, বিশ্বাস, ভরসা, অনাগতের কল্পনা, অতীত যত বড়ই হোক তাকে লালন করা যৌবনের কাজ নয়, সে নিয়ে আসবে নূতনকে, সৃষ্টি করবে অনাগতকে, সরিয়ে দেবে বাধাকে, শুধু দেবে না, জোর করে নেবেও। যে সমাজ ব্যবস্থায় দেশের তরুণ ছেলে ও মেয়ে নিজেদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্বার্থপর ও পঙ্গু হয়ে ওঠে, ভয় পায়, তাকে অভিশাপ দেব না ত কি? কেন এই রিক্ততার গুরু-নিঃশ্বাস, বঞ্চনা বেদনার ইতিহাস ছড়িয়ে পড়বে ট্রামে বাসে ঘরে বাইরে রাস্তায় পার্কে, কেন তাদের যৌবন হবে না সফল, কেন তাদের মন হবে বিকল, সকল জাগ্রত মানুষের কাছে তাদের এই দাবী? আপনার কাছেও এই দাবী পেশ করলাম।

দিদির কাছে শুনেছি শ্রীপুরে নাকি আপনি একদিন বেড়াতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে। বাবুদের বাড়ীর গেটে ঝকঝকে চেনে বাঁধা এক বড়জাতের দামী মাদী কুকুর বসে ছিল—কি অঝোরে তার কান্না—কয়েক মাস পূর্বে তার ছানা মারা গেছে; কিন্তু ড্রেনের পাশে এক অনভিজাত কুকুরশিশুর কুঁ কুঁ শব্দ শুনে তার মাতৃহৃদয় হঠাৎ উথলে উতলা হয়ে উঠেছিল—সে আকুলি-বিকুলি করছিল চেন ছিঁড়ে চলে যাবার জন্য, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছিল, বদলে পাচ্ছিল মার, কেউ বোঝেনি তার ব্যথা। আপনি নাকি থাকতে পারেননি, অনধিকার চর্চা হলেও খুলে দিয়েছিলেন চেনটা, জুটেছিল দরোয়ানদের ধাক্কা আর হান্টারের খোঁচা—পরিচয় পেয়ে ব্যাপারটা বেশী দূরে গড়ায়নি, অপ্রীতিকর হয়ে উঠতেই মাঝপথে থেমে গিয়েছিল। দিদির মুখে শুনেছি সেদিনের সেই অজানা কুকুরের চোখের জল সে ভুলতে পারেনি আর পারেনি খানিকক্ষণ পরে সেই অভিজাতবংশীয়া কুকুরমাতা যখন পল্লী-গ্রামের বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো শাবকটিকে মুখে করে এনে তার গা চাটতে আরম্ভ করলে এবং তারি মাঝে ল্যাজ নেড়ে দুপা তুলে গায়ে পড়ে মনের আনন্দে আপনার পাটাও চেটে জানিয়ে দিলে তার পশুহৃদয়ের নীরব প্রীতি।

চিঠিটা নামিয়ে রেখে আবার বাইরের দিকে তাকালো পরিমল। পশ্চিম সাগর-তীরে সেই নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যা প্রশ্নটাকে নিয়ে ঘুরে ফিরে জবাব চাইছে। আলো না জেলেই সে বসে রইলো। কালই তার বিলাত যাবার দিন। নতুন করে রিসার্চ করবে। হঠাৎ বয়ের কথায় হুঁশ হয়—সার, ডিনার কখন দেবো? হ্যাঁ বলছি দাঁড়াও, তার আগে এই জরুরী তারটা নিয়ে যাও—

হুজুর—

লিখলে সে "আমি আসছি"

নিভন্ত দিনের সব শেষ ঐশ্বর্য ততক্ষণে আস্তে আস্তে তলিয়ে গেছে কালো জলের কোলে। তারই সুযোগ নিয়ে অনুরাগবতী সন্ধ্যা নেমেছে নীল আকাশের ছায়ায় ছায়ায় সদ্য অভিসারের আশায়। মত্তমাতাল সাগরের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিমজ্জিত করে দেবে সে নিজেকে নিশ্চিন্তু হয়ে—হয়ত একদিন তার সমস্ত সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে পরম ক্ষণের চরম অনুভূতিতে, যেখানে ক্ষণিক হবে নিত্য, প্রেম হবে প্রণাম।
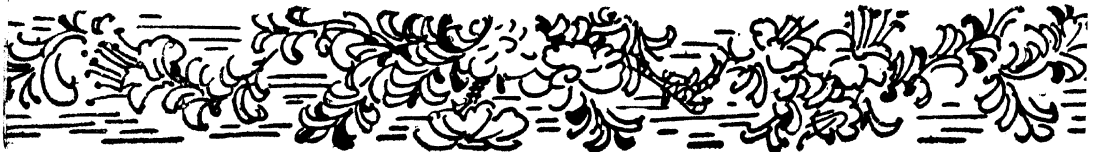
কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী

বাংলার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাহিত্য সংস্কৃতির মিলন-তীর্থ প্রবাসী (নিখিল ভারত) বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালী সন্তানদের মিলনের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার মহতী ইচ্ছা লইয়া ত্রিশ বৎসর পূর্বে কয়েকজন বাঙ্গালী মনীষী এই সম্মেলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি বৎসরের পর বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে।

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল উড়িষ্যার কটকে এবার সম্মেলনের অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। উড়িষ্যা প্রবাসী বাঙ্গালী এবং উড়িষ্যাবাসীদের সমবেত চেষ্টায়, যত্নে ও উৎসাহে সম্মেলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় উড়িষ্যার সহিত বাঙ্গলার যে নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে এবং বহুশতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির অটুট বন্ধনে এই দুইটি রাজ্য আবদ্ধ আছে, বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সুধীজনের কণ্ঠে বার বার তাহাই ধ্বনিত হয়। বস্তুত এই বৎসরের ন্যায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে নিবিড় বন্ধনের এইরূপ দৃশ্য সম্মেলনের বিগত কয়েক বৎসরের অধিবেশনে দেখা যায় নাই। উড়িয়া ভাষার সহিত বাঙ্গলা ভাষার সাদৃশ্য যে কত বেশী এবং দুইটি ভাষার মধ্যে যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই কতিপয় উড়িয়া সাহিত্যরথী তাঁহাদের বক্তৃতায় তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের প্রায় প্রত্যেকটি বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী মালতী চৌধুরী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীবিশ্বনাথ দাস, উড়িষ্যার শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ। ইহা ছাড়া, উড়িষ্যার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি-ক্ষেত্রের বহু বিশিষ্ট সারথি সম্মেলনে যোগদান এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় এবারের অধিবেশনটি

সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের প্রাক্কালে উড়িষ্যার রাজ্যপাল মিঃ এস ফজল আলী তাঁহার বাণীতে বলিয়াছিলেন, "এই সম্মেলন যে উড়িষ্যাবাসীর সর্ববিধ সমর্থন ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কারণ, পরস্পর-সংলগ্ন দুইটি রাজ্য—উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই যে শুধু সুনিবিড় ঐক্য ও সাদৃশ্য বিদ্যমান তাহা নহে, সম্মেলন উপলক্ষে বিপুল খ্যাতি-

সম্পন্ন সাহিত্যরথী ও ম[illegible] সমাগমও বড় একটা সাধারণ ঘ[illegible] তাহার বাণী সফল হইয়াছে। এ[illegible] উড়িষ্যার শিক্ষিত জনমণ্ডলীর [illegible] আগ্রহ ও উৎসাহের এতটুকু অভ[illegible] যায় নাই।

এবারের অধিবেশনের অন্যতম [illegible] ছিল সংস্কৃতি প্রদর্শনী। উ[illegible] বাঙ্গলার সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক[illegible] রূপ ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা হ[illegible] প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সম্মেলনের বি[illegible] বৎসরের ইতিহাসে স্থানীয় শিল্প[illegible] এবং বাঙ্গলার শিল্প-সংস্কৃতির [illegible] যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই প্রথ[illegible]

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মণ্ডপের প্রধান তোরণ। উড়িষ্[illegible]

কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শিল্পিগণ উদ্বোধন সঙ্গীত করিতেছেন

রুচিময় শিল্প এবং তথাকার
ীদের বিচিত্র জীবন ও সংস্কৃতির
পাওয়া যায় এই প্রদর্শনীতে।
ও উড়িষ্যার বিভিন্ন সাময়িক ও
ত্র ছাড়াও উড়িষ্যার বহু প্রাচীন
পুঁথি প্রদর্শনীতে রাখা হয়।
ও উড়িষ্যার চিত্রশিল্পীদের চিত্রাবলী
ীর সৌষ্ঠব বহুলাংশে বৃদ্ধি
ল। উড়িষ্যার পাহাড়ে, জঙ্গলে
ীদের জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন
নিদর্শন মডেল, নক্সা এবং অন্যান্য
ীর সাহায্যে দেখান হয়। আদিবাসী-
ন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য, তাহাদের বিভিন্ন
, কলিকাতার আশুতোষ মিউজিয়ম
উড়িষ্যা মিউজিয়মের সংগৃহীত
শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের
কিছু নিদর্শন প্রদর্শনীর অন্যতম
ছিল। তিনদিন শত শত নরনারী
টি দেখিয়া মুগ্ধ হন। এই
প্রদর্শনীর সাফল্যের মূলে ছিলেন
র বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষ—বিশেষ
তথাকার আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ—
দিবজ্জনমণ্ডলী।

ীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী ভি ভি গিরি
টির উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতীয়
র সুমহান্ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ

লনের এই কয়দিন প্রত্যেকটি অধি-
শুরু ও সমাপ্তিতে অপূর্ব
র পরিবেশন হয়। 'বন্দেমাতরম্-
করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মহম্মদ ইকবাল, সরলা দেবী চৌধুরাণী, অতুলপ্রসাদ সেন এবং কাজী নজরুলের সংগীতাবলী সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশনে প্রাণময় রূপ দান করে। সংগীত যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী শ্রীমালতী চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা উড়িষ্যার ডাক ও তার বিভাগের শ্রী কে পি সেন। তাঁহারা দুজনেই শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ইহা ছাড়া, শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রও সংগীতে অংশগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পরিচালনায় সংগীতাবলী অনুষ্ঠানক্ষেত্রে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সম্মেলন মণ্ডপের রূপসজ্জা এবং তোরণ ও মঞ্চসজ্জায় উড়িষ্যার সুকুমার শিল্প-সৌন্দর্য যেন বর্ণে-বর্ণে ফুটিয়া উঠে। মঞ্চের সম্মুখে একটি সুদৃশ্য আলপনা মণ্ডপের শোভাবর্ধন করে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীজগন্নাথ দাস মণ্ডপের সমুদয় রূপসজ্জার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিপুণ তুলিকা-স্পর্শে মণ্ডপের শ্রী ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে।

প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। মূল সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ এবার সকল দিক দিয়াই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার ভাষণ সমাগত প্রতিনিধি অধিবাসী বিশিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর মনে গভীর রেখাপাত করে। বাঙ্গলা দেশের কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ—"বাঙ্গলা দেশের কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি বাঙ্গলা ভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রকে জড়াইয়া লইয়া যদি সাহিত্যের মাধ্যমে নূতন ভাব-ধারা সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে কোন আঘাতই তাহাকে খর্ব করিতে পারিবে না। আপন প্রাণপ্রাচুর্যে, অন্তরের শক্তির বেগে সে ভাষা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বমহিমায় সুদৃঢ় গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।"

বাঙ্গলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার মহান্ প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সংগ্রামের উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন,

"বাঙলাদেশ আজ খণ্ডিত। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয় বাঙলার ভাষা আজও এক। একই ভাষায় হিন্দু-মুসলমান মনের ভাব প্রকাশ করে, চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আজ আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভাষার-ক্ষেত্রে আজও আমাদের মধ্যে অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। বাঙলা ভাষা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। বহু মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক বাঙলা ভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। রাজনৈতিক ভুল ভ্রান্তিতে পূর্ব বাঙলা পশ্চিম বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা তাহাদের প্রাণের ভাষা এই বাঙলা ভাষাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহার অমর্যাদা হইতে দিতে তাহারা নারাজ। ভাষা লইয়া আন্দোলন সেখানে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। তাহাদের মাতৃভাষা বাঙলা ভাষাকে ফেলিয়া উর্দু শিক্ষা করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত নয়। জোর করিয়া উর্দু ভাষাকে প্রচলিত করিবার অপচেষ্টা সেখানে আজ পদে পদে বাধা পাইতেছে। বাঙলার সহিত উর্দুশব্দ মিশাইয়া এক কৃত্রিম ভাষা-সৃষ্টির চেষ্টাও চলিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সকল চেষ্টা ব্যর্থই হইবে। কে জানে এই ভাষার বেদীমূলেই হয়ত কৃত্রিম ভেদ-রেখার অস্তিত্ব বিলোপ পাইবে, আবার নূতন করিয়া এক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সাহিত্যের উদার ছত্রতলে উভয় বঙ্গের মিলন সাধিত হইবে। শান্ত, সংযতচিত্তে আমাদের সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।"

সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়।

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে স্ব স্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায়

তন্মধ্যে অধ্যাপক আর্তবল্লভ মহান্তী, শ্রীচিন্তামনী আচার্য, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্যারিজা এবং শ্রীরাধানাথ রথের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত উড়িয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ত আছেই, পরন্তু উড়িয়া সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রচেষ্টায় কয়েকজন কৃতী বাঙ্গালীর দানও আছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা বাঙ্গালী বৈকুণ্ঠনাথ দে, গৌরীশঙ্কর রায়, সার যদুনাথ সরকার এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির নাম উল্লেখ করেন। যোগেশচন্দ্র বহুকাল কটক র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করেন।

এবারের সাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্কালে তিনি যে আশীর্বাণী দেন এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"এই বৎসর কটকে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইবে শুনিয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। কটকে আমার সারা যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়াছে। সহস্র স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। ভারতের নানা স্থান হইতে বহু সাহিত্যপ্রেমী সমাগত হইবেন, সকলে পরস্পর প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইবেন। আমি তাঁহাদের 'সহিত' হইতে পারিতেছি না, দুঃখ হইতেছে। মানুষ অন্ন-পানীয় দ্বারা জীবিত থাকে না, সাহিত্য দ্বারাই থাকে এবং তদ্দ্বারাই জাতিস্মর হয়। আমার উড়িয়া ভ্রাতৃগণ এই সম্মেলনে যুক্ত হইয়াছেন এবং ইহার সফলতার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিতেছেন শুনিয়া আমার আনন্দের অবধি থাকিতেছে না।

বঙ্গ ও উড়িষ্যার ভাষা এক মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বহুকাল হইতে বঙ্গ উড়িষ্যা নানাসূত্রে বদ্ধ হইয়া আছে। বহুকাল হইতে বহু বাঙালী উড়িষ্যায় বাস করিতেছেন। বাঁকুড়া-সিমলাপালের রাজা উৎকল ব্রাহ্মণ। আমি যখন এখানেও পাত্র, মহাপাত্র, ষড়ঙ্গী, ষনিগ্রহী, পণ্ডা, মহান্তী ইত্যাদি পদবী ও উপাধি শুনিতে পাই, তখন মনে হয় আমি কটকেই আছি। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে উড়িষ্যার সহানুভূতি বিস্ময়ের বিষয় নহে। জগদম্বার প্রসাদে সম্মেলন সার্থক হউক, সার্থক হউক। শুভমস্তু॥"

সাহিত্য শাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর সম্মেলন উপলক্ষে রচিত তাঁহার একটি কবিতা পাঠ করিতেছেন

সাহিত্য শাখার অধিবেশনে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যার উল্লেখ করেন এবং বলেন,

"আজ আমি নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছি যে আমাদের সাহিত্য ও জীবন এক প্রস্থ ফসল ফলাইয়া আবার নূতন ফসলের আশায় রিক্তশ্রী হইয়াছে। [illegible] আমাদের [illegible] একদিন [illegible] প্রাণরসে [illegible] দীনতা, তাহার এই ক্ষোভ, তাহ[illegible] উচ্ছৃঙ্খলতা আসন্ন বিপ্লবেরই প্রাথমিক [illegible] বাঙালী বারম্বার বিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আদর্শ-উদ্বুদ্ধ শিল্প-চেতনা তাহাকে [illegible] সঞ্জীবিতও করিয়াছে। অন্যায়কে [illegible] অসুন্দরকে আসনচ্যুত উৎখাত করিবার [illegible] বহুবার জীবনপাত করিয়াছে, আশা [illegible] আবার করিবে।"

দেশ ও জাতির এই যুগসন্ধি[illegible] প্রতিভাদীপ্ত এই সাহিত্যসারথির উদাত্ত বাণী হয়ত পতন-অভ্যুদয় পথের যাত্রীদের প্রেরণা দান করিবে।

অভিভাষণে তিনি সাহিত্য [illegible] বিশেষ আলোচনা করেন নাই। [illegible] এক শ্রেণীর প্রতিনিধির মনে [illegible] ক্ষোভের সঞ্চার হইলেও অ[illegible] [illegible] প্রাণের কথা, তাহাদের [illegible] বাক্ত করিয়াছেন [illegible] পাইয়াছেন। "জাতি [illegible]

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিদায়ী সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কর কটকে সম্মেলনের পরিসমাপ্তিসূচক বক্তৃতা করিতেছেন

কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শেষে 'জন-গণ-মন' সঙ্গীত গীত হইতেছে

আজ বিপন্ন, যে জীবন সাহিত্যের ামাদের সেই জীবনই আজ দুর্দশা- সেই জীবন সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নায় অধিবেশনটি মুখর হইয়া উঠে। ান শাখার সভাপতি অধ্যাপক বসু তাঁহার ভাষণে মাতৃভাষার বিজ্ঞান শিক্ষা দান এবং এতদ্দ্বারা কে সহজ ও জনপ্রিয় করার আহ্বান । এই প্রসঙ্গে তিনি বাংগলা ভাষার র উল্লেখ করেন। বাংগলা ভাষার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এই সীমা- রদে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শক- মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। বিজ্ঞান অধিবেশনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জন ভট্টাচার্যের "ভারতীয় ভাষায় র্তা প্রেরণ" প্রণালী প্রদর্শনী। মর্স যোগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভাষায় লিখিত একটি সংবাদ সম্পূর্ণ ভাবে প্রেরণ করিয়া তিনি ঐ প্রণালীর গিতা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত করেন। ক সত্যেন বসু আবিষ্কারককে দেন এবং এই আশা পোষণ করেন কদা হয়ত জনসাধারণের দাবীতেই এই পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য হইবেন। ীত শাখার অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব ডাঃ মিসেস বাণী দেবী। ইউরোপের ারী এই বিদুষী বাংগালী মহিলা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে ভারতীয় তের ধারা বর্ণনা করেন। ভাষণদান মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার মধুর কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করিয়া সকলকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া তোলেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর লক্ষ্ণৌ-এর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের সংগীত ও আলাপ এই অনুষ্ঠানটিকে আনন্দমুখর করিয়া তোলে। সান্ন্যাল মহাশয় শুধু সংগীতজ্ঞই নহেন, তিনি সুরসিক। তাঁহার সরস আলাপ ও কথাবার্তা প্রতিনিধিদের এক পরম লোভের বস্তু। তিনি যেমন হাসেন, তেমনি হাসাইতেও পারেন।

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি শ্রীদেবেশ-চন্দ্র দাশ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় বাংগালী কোথাও প্রবাসী নয়। যেখানে তার দিবার কিছু আছে, নিবার কিছু আছে, সেখানে সে নিজের নতুন শিকড় গেড়ে লতাপাতা মেলে সহজ নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সেটাই তার আপন স্থান। প্রাণরস যেখানে পাই সেই ভূমিই হচ্ছে মা; সেই গুণেই প্রতিবেশী হয় প্রিয়জন, প্রবাস হয় নিবাস। পরমধন যদি আমার থাকে আমি কাহারও পর নই।" বাংগালীর যুগসমস্যাকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন-ভাবে তিনি বর্তমানের পথনির্দেশ দেন।

মহিলা শাখার অধিবেশনটি মহিলা সমাগমে পূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার তাঁহার ভাষণে নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর ভারতের সংস্কৃতি সাধনায় নারীদের অতীত ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন এবং আধুনিক যুগের নারীদের মানুষের সর্বাংগীণ কল্যাণে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

এইকয়দিন বিভিন্ন অধিবেশনে কয়েকটি মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ হয়। তন্মধ্যে দর্শন শাখায় শ্রীঅবনীনাথ রায়ের (এলাহাবাদ) 'ভারতীয় তপস্যার বাণী' সাহিত্য শাখায় ও ভারতীয় সাহিত্য শাখায় পঠিত যথাক্রমে শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকালিকিংকর দত্তের প্রবন্ধ মনোজ্ঞ হয়। সম্মেলন উপলক্ষে প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায় একটি মূল্যবান প্রস্তাব প্রবন্ধাকারে প্রেরণ করেন। নিখিল ভারত বংগ সাহিত্য সম্মেলনের ধারক ও বাহকদের পক্ষে উহা এক অমূল্য সম্পদ।

তিনি বলেন, "সাহিত্য সম্মেলনের অতীত কর্মসূচী যাই থাক না কেন, এর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর মূলসূত্র হবে তিনটি। প্রথমত বাঙালী লেখকদের সংগে বাঙালী পাঠকদের যোগাযোগ। দ্বিতীয়ত বাঙালী লেখকদের সংগে অবাঙালী লেখকদের যোগাযোগ। তৃতীয়ত বাঙালী লেখকদের সংগে অবাঙালী পাঠকদের যোগাযোগ।

প্রথমটির সম্বন্ধে সকলে সচেতন। কিন্তু পদ্ধতি সম্বন্ধে গতানুগতিকের জের চলছে। সেই বক্তৃতা, সেই প্রবন্ধ পাঠ, সেই প্রস্তাব পাশ। ইংরেজীতে যাকে 'সোশ্যাল' বলা হয়, সে রকম কিছু থাকলে লেখকেরা ঘুরে ঘুরে পাঠকদের সংগে কথা বলার সুযোগ পেতেন, পাঠকরাও লেখকদের সংগে আলাপ করে প্রশ্নের উত্তর পেতেন, এর ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে কেউ কেউ ভেবেছেন। কিন্তু এখন থেকে যে প্রদেশে অধিবেশন হবে সে প্রদেশের অবাঙালী লেখকদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হবে ও বাঙালী লেখকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এ না হলে সম্মেলনের অংগহানি হবে।

তৃতীয়টি অভিনব। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের দায়িত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাঙলা সাহিত্য কেবল বাঙালীর সাহিত্য নয়, ভারতীয়দের সকলের সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যের আসরে অবাঙালীর যোগদান একান্ত স্বাভাবিক। বাঙালী লেখকদের বহু রচনা আজকাল হিন্দীতে গুজরাটীতে পাওয়া যায়, অন্যান্য ভাষাতেও। বাঙালী লেখকেরা যেহেতু ভারতীয় লেখক সেহেতু তাঁদের সংগে আলাপ করার অভিলাষ হিন্দীভাষী বা গুজরাটীভাষী বা ওড়িয়াভাষী পাঠকদের থাকতে পারে। দোভাষীর সাহায্যে আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ভাষণগুলো সংগে সংগে অপর ভাষায় অনুবাদ করে বা সংক্ষেপ করে শোনানো সম্ভব।

এখন থেকে এই রীতি চলিত হলে সম্মেলনের উপযোগিতা ওড়িয়া, বিহারী, মারাঠী, মাদ্রাজী প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করবেন। কটক বা হাজরীবাগ, নাগপুর বা তাঞ্জোর যেখানেই অধিবেশন হোক না কেন চারদিকে একটা সাড়া

পড়ে যাবে ও স্থানীয় অধিবাসীদের প্রীতি পাওয়া যাবে। একটা ছোট-খাট কংগ্রেস আর কি!"

প্রবাসী (নিখিল ভারত) বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরা পরিষদ কর্তৃক পল্লী বাঙলার সাংস্কৃতিক নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলার লোক-সংস্কৃতির নৃত্য ও গানের একটি ধারা-বিবরণী এই সঙ্গে প্রচারিত হয়। ময়ূর-ভঞ্জের 'ছউ' নৃত্য প্রতিনিধিমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া তোলে। এই নৃত্যটি উড়িষ্যার নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু আজ এই নৃত্যশিল্প ধ্বংসোন্মুখ। উড়িষ্যার সামন্ত নৃপতি-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিন এই নৃত্য-কলার সৌন্দর্য ভারতের সীমা ছাড়াইয়া সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঢেনকানল, ময়ূরভঞ্জ এবং সেরাইকেল্লার ছউ নৃত্য দেখিবার জন্য নৃত্যরসিকদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত। কিন্তু সামন্ত রাজ্যগুলির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যশিল্পও বুঝি আজ অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

'ছউ' নৃত্যের আসরে একটি ঘটনা উপস্থিত কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। নৃত্যের সময় কোনওক্রমে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব ভাঙিয়া যায়। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী সপরিবারে মঞ্চের সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দ্রুত ছুটিয়া আসেন এবং নিজ হাতে ভগ্ন কাঁচের টুকরাগুলি কুড়াইতে থাকেন। তাঁহার অনাড়ম্বর সাজপোষাক। প্রথমে অনেকেই মনে করিলেন উহা কোন স্বেচ্ছা-সেবকের কাজ হইবে। পরে তাহাদের ভ্রম ঘুচিয়া গেল। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্তব্য-নিষ্ঠায় কেহই মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই।

প্রবাসী (নিখিল ভারত) বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রবাসী বঙ্গ সন্তানদের মিলন-কেন্দ্র। সুদূর দেরাদুন, লক্ষ্মৌ, দিল্লী, শিলং, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে বঙ্গ সন্তানগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের সমস্যার কথা এবং প্রাণের কথা আলোচনার জন্য সম্মেলনে সমবেত হন। সম্বৎসরব্যাপী দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকেন এই কয়টি দিনের জন্য। এলাহাবাদের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ সম্মেলনের বিগত ৩০ বৎসরের ইতিহাসে কোন অধি-বেশনেই অনুপস্থিত হন নাই। সম্মেলনের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠার জন্য বিগত দিল্লী অধিবেশনে তাঁহাকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে বহু নবীন ও প্রবীণের সমাবেশ হয়। তাঁহাদের মিলন দৃশ্য অভিনব, অপূর্ব।

সকল দিক দিয়াই এবার সম্মেলনে প্রাণচাঞ্চল্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। প্রতিনিধি শিবিরে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের আনন্দ কোলাহল, রাভেনশ কলেজের বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তরে নির্মিত মণ্ডপে ও মণ্ডপের বাহিরে প্রায় সর্বক্ষণ কর্ম-চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া অধিবেশনের তিনটি দিবস সমাপ্ত হইল।

সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও বলিয়াছিলেন:—

"এও কি আশা করতে পারা যায় না যে, সুদূর ভবিষ্যতে হলেও, সর্বদেশের সাহিত্যের, বিশ্বসাহিত্যের এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যে সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত মানব-সমাজ একত্রিত হয়ে, পরস্পরের জ্ঞান ও অন্তরের অনুভূতিকে সাদরে গ্রহণ করবে, পরস্পরকে এক বিশ্ব-পরিবারের অন্তর্গত জেনে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবে, এবং [illegible] মিলনমন্দিরে সমবেত হবে যেখানে— পদ্মদলের উপরে নয়—মানুষের হৃদয়ে ভুবন-ঈশ্বরের আসন বিরাজিত।"

তাঁহার আশা পূর্ণ হউক।

পট পরিক্রমা

অজিতকুমার দত্ত

...ড়াতেই বোধ হয় বলে রাখা ভাল যে, এক্ষেত্রে পট বলতে, বাংলার ... লুপ্তপ্রায় শিল্প পট-চিত্রকেই ... হচ্ছে। আজকালকার রঙ্গপট, ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে এ আলোচনার ... যোগ নেই। সে-জাতীয় ভুল ...র নিরসনের জন্যেই এ-কথাটা বলা। ...র এই শেষ দশায় এখনও যে ...জন সুদূর পল্লীতে এ শিল্পকে ...ন করে বেঁচে আছেন এবং এখনও ... দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ পট, ইতস্তত ...দিক ছড়িয়ে আছে দেশের ...রে, তারই একটা আংশিক বিবরণ ... বলা যেতে পারে। হয়তো এক-...নের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা দুয়েকটি ...রী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ এ-জাতীয় ...গ্রহ-কাজের বিরাটত্বের তুলনায় ... নয়; তবুও মনে হয়, ছোট হ'লেও ...জ্ঞতাটুকু দশজনের গোচরে আনার ... বিশেষ প্রয়োজন আছে।

...চিত্র যে এক সময় সমাজের সর্বস্তরে ... অতি আদরের বস্তু ছিল তথা ... অশেষ মঙ্গল-সাধনও করে গেছে ...সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে সে-কথা ...মার ক'জনের মনে জাগে তা' বলা ...ক্ত। যাত্রা, পাঁচালী বা কথকতার ...এরও যে একটা নিজস্ব বিশেষ ... ছিল এবং সরল-প্রাণ গ্রামবাসীদের মধ্যে এর মারফতে ধর্ম, পুরাণ বা জনপ্রিয় কাহিনীর প্রচার যে লোক-শিক্ষার একটা অঙ্গ বলে পরিগণিত হত, তার প্রয়োজন কি আজ ফুরিয়েছে? সে কথাই আজ বিশেষভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই পটচিত্রের প্রচলন আছে, অবশ্য ছিল বলাই বোধ হয় বেশী যুক্তিযুক্ত। আজ তার স্থান সংকুচিত হতে হতে দেশের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলার বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে যেমন হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা বা রামলীলার পট বেশী দেখা যায়, তেমনি পূর্বাঞ্চলে গাজীর পট, মাণিক পীর বা সত্যপীরের পটের চলন বেশী। মোটামুটিভাবে ব্যবহার বা প্রসারের দিক থেকে পটচিত্রের প্রচলন পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ, একথা একরকম বলা চলে।

আকারের দিক থেকে "দীঘল পট" বা "জড়ানো পট"-টাই বেশী চালু হতে দেখা যায়। প্রায় এক হাত চওড়া আর প্রায় দশ বারো বা ততোধিক হাত লম্বা পটচিত্র, কোনও পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে তার কয়েকটি প্রধান দৃশ্যে বিভক্ত থাকে। কাঠিতে জড়ানো এই পটের দৃশ্যগুলি একটির পর একটি উদ্‌ঘাটিত করে পটুয়ারা নিজেদের রচিত ছড়া বা গান গেয়ে কাহিনীটি বিবৃত করে যায়। এই গান বা পটুয়া-সঙ্গীত পটচিত্রের একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গান পটুয়া-দের নিজেদের বাঁধা এবং বংশ-পরম্পরায় চলে থাকে।
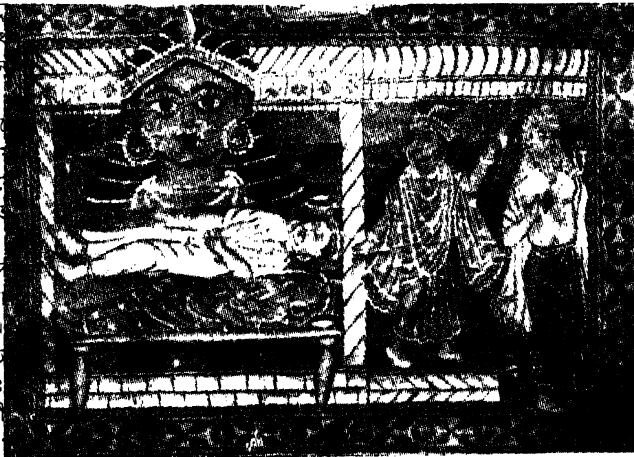
রাখাল চিত্রকর অংকিত একটি পাঁচমিশেলী পটের একাংশ (বীরভূম)

"চৌকো" বা একচিত্র-সমন্বিত পট বলতে স্বতই কালীঘাটের পটের কথা এসে যায়। কারণ বিশেষভাবে সেটা সেখানকার পটেরই বিশেষত্ব ছিল। আর আশ্চর্যজনক-ভাবে অদ্ভুত নৈপুণ্যময় বলিষ্ঠ প্রকাশ ছিল শিল্পচাতুর্যের—এই সব পটে। সাধারণ পটের পরিপ্রেক্ষণঘটিত, আলোছায়ার বা অস্থি-সংস্থানজনিত যাবতীয় ত্রুটি থেকেই

...লীলা পট (বর্ধমান) [আশুতোষ মিউজিয়াম]

এইসব পট মুক্ত ছিল পুরোপুরিভাবে। আর এর আরেকটা বিশেষত্ব ছিল, এর দেবদুর্লভ দূরত্বকে সযত্ন পরিহার-প্রচেষ্টা। দেবতাকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়েই পটুয়া ক্ষান্ত হননি, সমাজ-জীবনের নানা বিকৃতির দিকে ব্যঙ্গের চাবুক সদা-উদ্যত রেখে তার বাস্তব-বোধের চরম পরাকাষ্ঠা (যে-টা আমরা অতি-আধুনিক দিনের লক্ষণ বলে মনে করি) দেখিয়ে গেছেন।

মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে এই হ'ল পট-চিত্রের কথা। হয়তো কাঁচা, হয়তো ওস্তাদি মারপ্যাঁচে তত জটিল নয়, তবুও সরল প্রাণের এই স্বতস্ফূর্ত ভাবময় ব্যঞ্জনা নিঃসন্দেহে যে কোনও জাতির বা দেশের পক্ষে গৌরবের। এই পরিপ্রেক্ষিতে এর এবং এর সৃষ্টিকুশলীদের করুণ পরিণতির দিকে তাকালে এ অমূল্য রতন হারাবার বেদনা আরও বেশী করে বাজবে মনে।

* * * * *

হেমন্তের সকালের কাঁচা রোদে মাঠের আল্-পথে এগিয়ে চলেছি বীরভূমের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। দুধারে ছড়িয়ে রয়েছে

বাঁকু চিত্রকর অংকিত একটি দশাবতার পটের একাংশ (বীরভূম)

রাখাল চিত্রকরের পটের অন্য একটি অংশ

হলুদের ছোপ-লাগানো স্বর্ণশীষ ধানের মঞ্জরী। রাশি রাশি তারা ভারা ধান কাটা চলেছে মাঠে মাঠে। ফসল নাকি এবারে ফলেছে অদ্ভুতরকমের বেশী। রেল-লাইন পড়ে রয়েছে কয়েক মাইল পেছনে। শহরের কোলাহল বলে কিছু মনেই আসে না আর হট্টগোল মনে করিয়ে দেবার মতো একটি খবরের কাগজের টুকরোও নেই সঙ্গে। সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর এই সম্পদ-শ্রীতে মন স্বভাবতই রঙিন স্বপ্নে বিভোর হতে চায়। কিন্তু গ্রামের পথে পা দিতেই প্রান্তরের গান দিগন্তে মিলিয়ে যায়। ছন্নছাড়া চেহারা সবকিছুর—ঘর-বাড়ীর, চারি পাশের আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর। গ্রামবাসীর দৈন্যক্লিষ্ট জীবনকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল পদে পদে। মাঠে ধান হয়েছে ভাল, না-হয় বেশী-ই হয়েছে; কিন্তু সেটা উঠবে গিয়ে তার নির্দিষ্ট জায়গায়! সুদিন আসবে সবাই বাঁচবে নতুন জীবন পাবে

পটশিল্প আর পটুয়া-গোষ্ঠী—দু মনের এই স্বপ্নালু ভাব কাটতে সময় লাগলো না।

বনতা গ্রামে কয়েকঘর পটুয়া আছেন। প্রাপ্তবয়স্ক এর মধ্যে জনদশেক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আঁকতে জানেন না। পাশের গ্রামে করের আঁকা পট দেখিয়ে এখনও অনেকে অন্ন-সংস্থান করেন। বেশীর চাষ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আর অবসর পট নিয়ে গ্রামান্তরে ফেরেন। এদে শোনা গেল যে, স্বর্গত গুরুসদয় মহাশয়ই শেষ এসে এঁদের কাছে প ছড়ার খোঁজ নিয়ে যান। এর পরে বছর পনেরোর মধ্যে বাইরের আর কে এ সম্বন্ধে কোনও খবরাদি করে এঁদের এক সিঁড়ি আগেকার রসিক পর্যন্ত আঁকার রেওয়াজ ছিল এব আঁকা কিছু পট দেখা গেল ওখানে কেউ এঁদের মূর্তি-গড়ার এবং প্র সাজ-তৈরীর কাজ কিছু কিছু জা

থাকেন। এ'দের আন্তরিকতা, া সত্যি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। চা হাওয়ায় জীবন এ'দের এখনও াত হয়নি দেখে মনে বড় ভরসা া।
জ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পেলো যে, পট আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে এখনও প্রবল আর এর জন্যে প.সা বা ধান-লোকে এখনও হৃষ্ট চিত্তে দেয়। শত এ'রা বীরভূমের বাইরে পট ত যায় না। তবে ভাল পট হলে রেও অনেকে যায়। পট বিক্রীর জটা এ'দের মধ্যে কম। জানা গেল, ক বিশেষত শহর অঞ্চলে নাকি এখনও কনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
শেই শ্রদ্ধা গ্রাম। ছোট ছোট ইতস্তত স্ত জলাশয় আর তালীরাজি-বেষ্টিত। পাঁচটা এ অঞ্চলের গ্রামের মতোই মামুলী চেহারা। কিন্তু বাইরে যা-ই হোক অন্য গ্রামের সাথে এর প্রধান তফাৎ এই যে এখানকার কয়েক ঘর চিত্রকরের মধ্যে কয়েকজন এখনও 'আঁকার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন এবং চাহিদা অনুযায়ী পট এ'কে চলেছেন।

"গরীব মানুষ বাবু, পেট চলে না, তবুও কাজ করি আর ছেলেটাকেও শিখিয়ে যাচ্ছি এ-জাত-ব্যবসায়" অত্যন্ত দুঃখের 'সঙ্গে ব্যক্ত করলেন শ্রীবাঁকু চিত্রকর—এ অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবিত শিল্পী-কারিগর। এ'র শিক্ষাও বংশগতভাবে এ'র বাপ স্বর্গত রাখাল চিত্রকরের কাছে। কালো মতন, দোহারা গড়নের চেহারা। শরীরে জীবন-সংগ্রামের ছাপ সুপরিস্ফুট, যদিও বয়স আনুমানিক ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যেই।

চাষবাসের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইনি একেবারেই নন। চাহিদা না থাকলে পট আঁকেন না। অধিকাংশ সময়ই মূর্তিগড়া বা চালচিত্র-নির্মাণে কেটে যায়। ভাল পয়সা না দিলে ভাল পট আঁকা সম্ভব নয়। কিন্তু এমনই অবস্থা যে, গত বছর দুয়েকের মধ্যে মাত্র খানকয় মাঝারি ধরণের ছাড়া, পট তাঁর আঁকার সুযোগ ঘটেনি। পট নিয়ে ছড়া গাইতে বেরোনো তাঁর হয়ে ওঠে না আর সেটা আর্থিক দিক্ থেকে তাঁর পক্ষে কম লাভজনক। পট আঁকার মোটা-মুটি দেশী ধারাই তিনি অনুসরণ করে থাকেন। মোটা কাগজের ওপর শিশিরে ভিজিয়ে শাদা-কাগজ লাগানো আর গিরি-মাটি, লালমাটি ও দেশী কয়েকরকম রঙ ব্যবহার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নিজের পছন্দমাফিক ভাল পট যে উনি করতে পারছেন না, সেই ক্ষোভই শিল্পী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কয়েকবার প্রকাশ করলেন। চলে আসার সময় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন,

আবার ওদিকে গেলে যেন ও'র খোঁজ করি!

* * * * *

ম্লানায়মান গোধূলির আলোতে আর কুয়াশায় চারিদিক ঝাপ্সা হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দিয়ে ধূলি-ধূসরিত পথ ভেঙে ফিরে চলেছি। কেন জানি বার বার মনে পড়ছিলো বাংলা-সাহিত্যের একটা বিখ্যাত গল্পের কথা। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত এক গ্রামে নায়কের গমন ও প্রত্যাবর্তন। সে গ্রাম ঘিরে রয়েছে এক দুর্ভেদ্য রহস্যজাল। কোন অবচেতন স্তরে গিয়ে সে-গ্রাম নায়কের মনে বাসা বেঁধেছে আর কি করে সেটা উদ্ঘাটিত হ'ল তার সামনে এবং আবার মিলিয়ে গেল, সে-কাহিনী স্মরণ-পথে বার বার উঁকি দিচ্ছিল। আবার কি আসব? আবার কি বাঁকু চিত্রকরের খোঁজ নেওয়া হবে? না-কি জেনে শুনে তাকে মিথ্যা কতগুলো স্তোকবাক্য শুনিয়ে এলাম? কোনটা যে সত্যি ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।

সৃষ্টিধর এরা। নিজেদের বিশ্বকর্মার সন্তান বলে পরিচয় দেয়। তবুও সমাজ এদের স্বীকৃতি দেয়নি। অন্ত্যজ বলে হেয় জ্ঞান করেছে। অনেকেই এদের মধ্যে মুসলমান, হয়তো হিন্দুসমাজের অস্বীকৃতির প্রতিক্রিয়া। তা' সত্ত্বেও মনে-প্রাণে, আচারে-বিশ্বাসে, এমন কি নাম-পরিচয়ে এরা হিন্দুয়ানীর সব আঁকড়ে রয়েছে। এত সব বাধা-বিপত্তি মাথায় করেও এরা এতদিন টিকে ছিলো, কিন্তু আজ যে-সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে এদের ধ্বংস বা অবলুপ্তি একপ্রকার সুনিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু কেন এদের এই শোচনীয় পরিণতি? আমাদের সামাজিক অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ হয়তো কিছু বদ্লেছে এবং আরো বদ্লাবে, এ সবই সত্যি—কিন্তু এদের প্রয়োজন কি শেষ হয়ে গেছে? এদের এ পরিণতি নিশ্চয়ই "স্বাভাবিক" বা "ঐতিহাসিক" নয়। নয় এ কারণে যে, অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে এ-ধরণের বিয়োগান্ত পরিণতির নজীর বিশেষ দেখা যায় না। আমেরিকাতে আদিম রেড-ইণ্ডিয়ানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। দেশী গ্রাম্য শিল্পী-কারিগরের ভূমিকা অপ্রধান নয়। আর, এ-ধরণের শিল্পীর আদরের সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাবলো পিকাসোর দেশের অভ্যন্তরে কুম্ভকার-পল্লীতে বাসা বাঁধা। আজ এদেশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কাজ এবং দায়িত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও কি আগের মতোই নির্বাক, নিস্পৃহ দর্শক হয়ে দেশের একটি বলিষ্ঠ প্রাণধারার এই শোচনীয় পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে হবে? এই শতাব্দীর বিশ দশক পর্যন্ত সব অবহেলা-অনাদর সহ্য করেও এত শক্তি-শালী শিল্পধারার উত্তরসাধক কা[illegible] শেষ পটুয়া দু'জন কোনও [illegible] টিঁকেছিলেন বলে জানা যায়। [illegible] এভাবে চললে আজকের অব[illegible] ক্ষয়িষ্ণু পটশিল্পও জীবিত শিল্প[illegible] পরেই অনিবার্যভাবে শেষ হয়ে যাবে মস্লিনের মতো ইতিহাসের পাতা পটশিল্পেরও শেষ আশ্রয়?

[১নং ব্যতীত অন্য ফটোগুলি শ্রীম[illegible] কর্তৃক গৃহীত।]

...চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীভূরসিং শেখাওৎ

...ভূরসিং শেখাওৎ সুদূর রাজপুতানার ...নীর অধিবাসী। শিল্পে বাল্যকাল ...ই তাঁর অনুরাগ অপরিসীম—এই ...াগ আরও সাফল্য লাভ করে জে জে ...অব আর্টের শিল্পশিক্ষা সমাপনান্তে। ... সালে শিল্প বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ... গত কয়েক বৎসর নানান জায়গায় তাঁর ... প্রদর্শনী করেছেন। দিল্লী, মথুরা ও ...য় বিভিন্ন মন্দির গাত্রের নানান ভিত্তি- ...তার শিক্ষাজীবনের উল্লেখযোগ্য কাজ, ...ত আর্টিস্ট্রি হাউসে তেল রঙ জল ... পেন্সিল প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে ...ত তাঁর ছেষট্টিটি সুনির্বাচিত চিত্রের ... মনোজ্ঞ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে ... নানান দিক দিয়ে কলকাতার শিল্প- ...দের এই প্রদর্শনীটি আনন্দ দিতে ...। কিন্তু কলকাতায় চলতি প্রদর্শনী- ...র ভীড়ে এটি দেখবার সুযোগ ...ই পাননি। দুঃখের বিষয় উদ্যোক্তারাও ...কে কলকাতার রসিক সমাজে ...ত করিয়ে দেবার যথোচিত ব্যবস্থা ... নি।

...ল্পী ভূরসিং-এর প্রদর্শনী কলকাতায় ...থম। সুদূর রাজপুতানার শিল্পী বলে ... স্বভাবতই তাঁর রচনায় রাজপুতানার ঐতিহ্য এবং শিল্পধারার প্রত্যক্ষ ছাপ পাব এই আশাই করেছিলাম। আশা করেছিলাম তাঁর রচনায় রেখাময়তার সুনিপুণ প্রয়োগ। কিন্তু প্রদর্শনীটি দেখে সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তাঁর চিত্রে শুদ্ধ ভারতীয় আঙ্গিকের প্রয়োগ কোথাও নেই। বরং আছে পাশ্চাত্যের ধরণে আলো ছায়ায় বাস্তব জগতের অপূর্ব গভীরতার স্পর্শ। রঙ ব্যবহারেও শিল্পী অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। সজাগ ও সচেতন তাঁর দৃষ্টি কোথাও জোরালো রঙের ব্যবহারে দর্শককে চমকে দেবার প্রচেষ্টা তিনি করেননি। শিল্পীরা সাধারণতঃ যেসব রঙ খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন, সেইসব অপ্রচলিত রঙের ব্যবহার যেমন বেগুনি ও রোদ্দুরের হলুদ রঙের প্রয়োগ তাঁর একাধিক ছবিতে এক অপূর্ব সুষমা এনে দিয়েছে। শিল্পীর দৃষ্টিকোণ বাস্তবধর্মী হলেও একান্তভাবে প্রকৃতির নকল তিনি করেননি কোথাও। তাই কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণে তাঁর রচনাগুলি যে রূপলোকের সৃষ্টি করে, তা যেমন রোমাণ্টিক, তেমনই প্রাণস্পর্শী। অথচ বেশী জানাবার আগ্রহ তাঁর কাজে কোথাও পাইনে। রাজপুতানার বাস্ত সমস্ত হাট-বাজার, পল্লী জীবন, মন্দিরের পথে ধর্মপ্রাণ নরনারীর আনা-গোনা প্রভৃতি বিভিন্ন জীবনের বিচিত্র ছবি তিনি যে যত্ন ও নিষ্ঠা নিয়ে এঁকেছেন, ঠিক তেমনটি নেই তাঁর দৃশ্যচিত্রে প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যকে রূপ দেবার সময়। শিল্পী প্রতিকৃতি অঙ্কনেও যে সিদ্ধহস্ত, তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলোয়। স্টাডি (৪৯), যুবক সর্দার (৫১), আমার মেয়ে (৫৩), আমার বন্ধু (৫৫) প্রভৃতি প্রতিকৃতিগুলো রঙে ও আঙ্গিকের ব্যবহার তাঁর কুশলী হাতেরই পরিচয় দেয়।

শিল্পী ভূর সিং-এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই উপভোগ্য। এগুলোর মধ্যেও আবার টাচে আঁকা গোবিন্দ দেবের মন্দিরএ (৩) বেগুনি রঙের ব্যবহার এবং মন্দির গাত্রে রৌদ্রের খেলা নিখুঁত ও হৃদয়গ্রাহী। পিলানীর মন্দির (৫) এবং গরীবের বাড়ী (৩০) প্রভাত রৌদ্রের স্পর্শে জীবন্ত। গাছের নীচে বিশ্রাম (১০) ছবিটি রাজ-পুতানার প্রতিদিনকার অতি পরিচিত দৃশ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। রৌদ্রে (২২), নিরীহ ও শান্ত গো-বৎসের একটি রসোত্তীর্ণ রচনা। পাহাড়ী রাস্তা (৩৩), Supreme nature (৩৬), ক্যাস্পটি প্রপাত (৩৭), Splitary stream (৩৯), পাহাড়ের চূড়ায় (৪০) প্রভৃতি চিত্র রঙে ও আলো ছায়ার স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পর্বতমালা (৩৩) তাঁর আর একটি রসোত্তীর্ণ চিত্র। বেগুনী রঙের পর্বতমালা দূরে হাল্কা নীলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিরাট সীমাহীন প্রকৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয় এই চিত্রটি। গুহার ভিতর (৪৪) চিত্রটি একটি বিশেষ কোণ দিয়ে অঙ্কিত বলেই আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। সদ্যজাত (৪৮) চিত্রটিতে কুকুরছানাগুলোর অতি পরিচিত ভঙ্গী, পুরান দরজার ভেতর দিয়ে যাওয়া (৫০) ছবিটিও উল্লেখযোগ্য। তেল রঙের রচনাগুলোর মধ্যে প্রতিদিনকার কাজ (৬২) যোগী (৬৬) প্রভৃতি ছবি দর্শককে আনন্দ দেয় বেশী।

এই ধরণের সার্থক প্রদর্শনী ইদানীং কালের মধ্যে খুব বেশী নজরে আসেনি। উদ্যোক্তাদের অমনোযোগিতা এবং ত্রুটির জন্যেই এমন একটি প্রদর্শনী জনসাধারণের উচিত সমাদর না পেলে দুঃখ হয় বেশী।

প্রবন্ধ সাহিত্য

উত্তর তিরিশ ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃঃ নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য চার টাকা।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ দৃশ্যমান বস্তুর পরিচয় মস্তিষ্ককোষে পরিবহন করা, স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে। কিন্তু সেই দৃশ্যমান বস্তু উপযুক্ত মেধার সংস্পর্শে কি পরিচয় রেখে যেতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থটির রম্যরচনাগুলি তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শতকরা নিরানব্বই জন লোকের কাছে যে জিনিস বা যে ঘটনা অতি সামান্য, অনুল্লেখযোগ্য, সেগুলোই অনুশীলিত বুদ্ধির প্রভাবে কি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তা আলোচ্য গ্রন্থটি না পড়লে জানা সম্ভব নয়।

বুদ্ধদেববাবু চিন্তাশীল মনীষী। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখাপ্রশাখায় তিনি নিজের প্রতিভা সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হ'লেও, তাঁর বৈশিষ্ট্য কাব্যরচনায় এ কথা অনস্বীকার্য। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে এই কবি-মনটি প্রকট। ভাবাবেগোচ্ছল উচ্ছাসধর্মী কবিমনের অধিকারী তিনি নন তাঁর মনপরিস্থিতি-সচেতন, সজাগ, সক্রিয়। প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের ব্যাপ্তিতেই সীমিত হয় না, তাদের মূল্য নিরূপিত হয় গভীরত্বে। এই Third dimension বোধই বুদ্ধদেববাবুর দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব। যে তৃতীয় চক্ষুর প্রভাবে জীবের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব দেখা সম্ভব, খ্যাতিমান লেখক সেই তৃতীয় চক্ষুষ্মান। তাই 'দর্শন' শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে না, ব্যাপকতর অর্থে প্রযোজ্য হয়।

ত্রিশোত্তীর্ণ মানুষের চোখ দিয়ে আশেপাশের জিনিস দেখার প্রয়াস হ'লেও, আলোচ্য গ্রন্থের রচনাগুলোর আবেদন সর্বকালের। তীক্ষ্ণধী লেখকের রসসৃষ্টির শক্তিমত্তার পরিচয় গ্রন্থটির সর্বত্র। ডিকেন্সের ভাষায় 'Inegenuity in little things was transcendental.'

রম্য রচনার মূল প্রতিপাদ্য খুব সামান্য ঘটনা বা হাজারবার চোখে-পড়া কোন বস্তু, কিন্তু নিছক স্থূল বর্ণনায় লেখকের উদ্যম অবসিত হ'লে, এ জাতীয় রচনার অপমৃত্যুই সংঘটিত হতো। সরস বুদ্ধিদীপ্ত ভংগীমায়, ক্ষুরধার ভাষার মাধ্যমে সেই সামান্য জিনিষ অসামান্য দক্ষতায় চোখের সামনেই শুধু নয়, মনের সামনেও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। 'dull use of common things'কেও রচনানৈপুণ্যে অত্যাশ্চর্যের পর্যায়ে উন্নীত করে। খদ্যোতকে চন্দ্রালোকমণ্ডিত ক'রে তার দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য দেখানোর অপচেষ্টা নয়, লিখনভংগীতে খদ্যোতের নিজস্ব দীপ্তিকেই পাঠকের মনের পটে বর্ণাঢ্য ক'রে তোলা এ ধরণের রচনার বিশেষত্ব।

এ বিষয়ে বুদ্ধদেববাবু আরো অগ্রসর হ'য়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির রচনাগুলোর বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি এমন নির্বাচন করেছেন যেগুলোর সপক্ষে কিছু বলতে গেলে সুধীজন-সমাজে বিড়ম্বিত হবারই সমূহ সম্ভাবনা। 'স্পোর্টস-এর বিরুদ্ধে' অথবা 'মেক আপ এর বিপক্ষে' এ যুগে যে কিছু বলা সম্ভব সেটা রচনাগুলো পড়ার আগে আমাদের ধারণারই অতীত ছিল। অথচ লেখাগুলো শেষ করার সংগে সংগেই লেখকের সংগে একমত হ'তে তিলমাত্র দেরী হয়নি। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে ভেবেছি 'বড়ো রাস্তায় ছোট ফ্ল্যাটে' থাকার দুঃসহতম দুঃখ, দূরে দূরে বক্ষে অপেক্ষা করেছি মাসান্তে। সবচেয়ে দুঃখের দু ঘণ্টার' ভয়াবহ অভিজ্ঞতার জন্য।

তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস-প্লাবিত দেশে এ জাতীয় প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ সংগ্রহের একাধিক সংস্করণ হওয়া নিঃসন্দেহেই আশার কথা, কিন্তু তবু স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, পাঠকের গ্রহণশক্তি অপেক্ষা লেখকের অবদানদৈপুণ্য এখানে অনেক বেশী প্রকট। ৩৬১।৫২

ছোট গল্প

বিষকন্যা ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ঃ দুই টাকা আট আনা।

শরদিন্দুবাবু শুধু খ্যাতিমান গল্প-লেখকই নন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা পুষ্টিলাভ করেছে। নাটক, গোয়েন্দা কাহিনী, সরস রচনা সব কিছুতেই তাঁর প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট।

'বিষকন্যা' তাঁর প্রথম যুগের লেখা গল্পের সমষ্টি। ইদানীং যে প্রতিভার কিছু অংশ চলচ্চিত্রের কল্যাণে ব্যয়িত হ'য়েছে, 'বিষকন্যা'র গল্পগুলি রচনাকালে শরদিন্দুবাবুর সে প্রতিভার পূর্ণ অংশই নিয়োজিত হ'য়েছিলো সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে।

'বিষকন্যা'র গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি গল্পে শরদিন্দু প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি বর্তমান। ভাষায় গীতিকাব্যের মাধুর্য, বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব আর পরিমিত রসবোধ আলোচ্য গ্রন্থটির প্রতিটি গল্পকে শুধু শরদিন্দুবাবুরই নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ রচনায় পরিণত করেছে।

মধ্য এশিয়ার সীমাহীন মরুভূ থেকে করে কালিদাসের উজ্জয়িনী, প্রাগ্‌জ্যো যুগের প্রদ্যুম্ন আর মঘবার চরিত্রচি অপরিসীম কৌশলের পরিচায়ক তা বিস্মিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব কমানোই নয়, অ অচেনা দূরের মানুষের ব্যথা-বেদনা, কান্নার বোঝা একেবারে পাঠকের বুকের নামানো শরদিন্দুবাবুর ঐন্দ্রজালিকী শ কেবল সম্ভব। অনার্য-কন্যা এলার বেদনাই নয়, নিষ্কাম বৌদ্ধবিহারের মূর্তি লালসাপ্রতিম ইবার যৌবন ইতির কামনার রূপ, মদনোৎসবমত্তা বল্লার কামনার প্রতিলিপি অপূর্ব আঙ্গিকে সামনে মূর্ত হ'য়ে উঠে। দূরের জিনি পাঠকের কাছাকাছি আনা, এ অন্তরঙ্গতা সম্ভব পরিবেশ সৃষ্টির অনবদ্য কে উপযুক্ত শব্দচয়নে, দৃষ্টিভংগীর বিশে রচনার প্রসাদগুণে কি বৈদিক যুগের কা কি মধ্যযুগীয় উপকথা, কি হাফল্যাসান দেওয়া-নেওয়ার রোমাঞ্চ-ঘন বিবরণী, কিছুতেই লেখকের অসাধারণ দক্ষতা সমান পরিস্ফুট।

বিষকন্যায় সন্নিবিষ্ট গল্পগুলোই শরদি বাবুর রচনানৈপুণ্যের প্রকৃত ধারক, প্রোজ্জ্বল প্রতিভার বলিষ্ঠতম অবদান।

৩৭৩

মধুরেণ—(গল্প সংগ্রহ) লেখক দক্ষিণ বসু। প্রকাশক বেংগল পাবলিশার্স; বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দুই টাকা। পৃঃ ১০৮।

নবজন্ম, ঘূর্ণাবর্ত, সমাধান, চক্রবৎ, শেষ অলিখিত, মধুরেণ এই সাতটি ছোট গ সমন্বয়ে পরিবেশিত গ্রন্থখানি লে প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ত রচনার মধ্যে যে গুণটি সর্বাধিক প্রশং তাহা সমাজসচেতন শিল্পীদের পক্ষে অপরিহা তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় সাবলীল ভং আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সম

জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব করা, ...কে সমবেদনা এবং সহানুভূতির দিকে ...রিত করা যেমন শিল্পীর কাজ, তেমনি ...ধানের ইঙ্গিত দিয়া সামাজিক কর্তব্য ...ও আজিকার শিল্পীর দায়িত্বের আওতায় এদিক দিয়া বিচার করিলে লেখককে শিল্পী বলিতে হয়। তিনি পাঠকের শুধু রসোপভোগের মধ্যেই ছাড়িয়া দেন শুধু ব্যর্থতা আর বেদনার অন্তর্দ্বন্দ্বেই কারুকার্য পরিসমাপ্ত হয় নাই—তিনি ...কে আগামী দিনের বিধাতার আসনে ...ষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরিশেষে ...টের প্রশংসা করিতে হয়। বইখানির আয়তনের তুলনায় সস্তা হইয়াছে।

৪০০।৫২

...চীন সাহিত্য

...ওয়ান-ই-হাফিজ—শ্রীনরেন্দ্র দেব। প্রকাশক—...দাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, ...য়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য পাঁচ

...ন দিক হ'তে এই চমৎকার কাব্যগ্রন্থখানির ...চনা হ'তে পারে। প্রথম কবির রচিত ...টির কথা। কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি সুরচিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক ...জের জীবন চরিত, তাঁহার ধর্মমত, তাঁহার সাধারণ ভাবাদর্শ, তাঁহার গজল গানের ...ত্মিক ব্যঞ্জনা, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ...র সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সাধনা নিষ্ঠার কথা ...তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হাফেজের ...নের সঙ্গে যে সকল কাহিনী বিজড়িত ..., সেগুলি এই সঙ্গে বিবৃত করায় রচনাটি ... হয়েছে। লেখক কেন গজলের সুরে ছন্দে ...ঙ্গীতে গজলগুলির অনুবাদ করেননি ...ায় তার কৈফেয়ৎ দিয়েছেন। লেখকের ...য়ং অসঙ্গত নয়। কিন্তু ২।৪টি গজলের ...তঃ গজলী ঢঙে অনুবাদ করলে ভালো ...। তিনি ভূমিকায় সে ঢঙের একটি নিদর্শন ...ছেন। সে নিদর্শনটি বড়ই মধুর হয়েছে। ... সহীদুল্লাহ্ হাফেজের যতগুলি গজলের ...বাদ করেছেন, তাদের সবগুলি গজলী ঢঙেই ...ছেন। সেগুলির যথাযোগ্য সমাদর না হওয়ার ...—ছন্দোবন্ধনে পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার ...ব। যাক্, এটা অবান্তর কথা।

...দ্বিতীয় কথা মূল রচনাগুলির। মূল রচনা- ... হাফেজের গানের কাব্যরূপ। কবি শুধু ...জের রচনার বঙ্গভাষায় অনুবাদই করেন নি, রচনারীতিরও রূপান্তর সাধন করেছেন। ...জের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ...জির মারফতে। তা ছাড়া হাফেজের মূল ...লের টুকরা টাকরা আমাদের কানে এসেছে। ...মিলিয়ে হাফেজের ভাবরসের সম্বন্ধে একটা ...া আমাদের মনে আছে। হাফেজের মূল ...লের কতটা আনুগত্য এই কবিতাগুলিতে ...ত হয়েছে, সে আলোচনা হাফেজের রচনার ...বিশেষজ্ঞরাই করতে পারেন। নানাভাবে ...ফেজের রচনার সঙ্গে অল্প অল্প ক'রে ...চয় পেয়ে আমাদের মনে হাফেজের যে রস- ...পটি গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে কবিতাগুলির ...থ আনুগত্য লক্ষ্য ক'রে আমরা আনন্দ পেয়েছি। এগুলিকে হাফেজের ভাবে আবিষ্ট স্বতন্ত্র কতকগুলি গীতি-কবিতা ব'লেই উপভোগ করেছি। কবিতাগুলি পাকা হাতের লেখা। কাজেই সুরচিত। দু' একটি নিদর্শন এখানে তুলে দিই—

> "গতরাতে বুল্ বুল
> ছিল প্রিয়ে অনুকূল,
> গেয়েছিল মদির মধুর;
> সুরা আর গোলাপের
> সহবাস প্রলাপের
> তুলেছিল এল মেলো সুর!
> ওগো সাকি, সুরা দাও
> প্রাণহরা গান গাও
> মনোব্যথা করো মোর দূর;
> প্রমত্ত হোক্ প্রীত
> হোক্ পুন সঞ্জীবিত
> মৃত চিত জীবন-বধূর!"

অথবা—

> "চাঁদ তুমি ওই আকাশ চড়ে
> আমার হৃদয় রাজ্য জুড়ে
> রাখলে পেতে তোমার সিংহাসন;
> তোমার কালো কোঁকড়া চুলে
> মোর কামনা উঠছে দুলে
> অঙ্গ-সুবাস উতল করে মন।
> মুক্ত হ'য়ে এই কারাগার
> পালিয়ে যাবো যেদিন আবার
> সেই ত আমার প্রেমের পরমক্ষণ।"

কবি নরেন্দ্র দেব হাফেজের গজলগুলিকে সম্পূর্ণ রোমান্টিক রূপই দিয়েছেন—যতদূর সম্ভব মিস্টিক ব্যঞ্জনা পরিহার করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। কবিতাগুলিতে সুরে যখন মিস্টিক ভাব নেই—তখন ভাষায় তার ইঙ্গিত করাও ঠিক হ'তো না।

তৃতীয় কথা—পুস্তকের বহিরঙ্গের পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—সর্বোপরি চিত্রসজ্জা সুন্দর, সুশোভন ও সুরুচিসঙ্গত।

ধর্মপুস্তক

সাধনা—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমল-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য—তিন টাকা।

সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। নব নব সংস্করণ ইহার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছে। সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে, বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক মনোহর বাঙলা ও হিন্দী সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেক ভাবোদ্দীপক জাতীয় সঙ্গীত এবং আবৃত্তিযোগ্য রচনাও ইহাতে আছে। প্রাচীন এবং আধুনিক প্রসিদ্ধ সাধক এবং কবি—সকলের মর্মনিঃসৃত শ্রদ্ধাপূত অঞ্জলিতে সাধনা সমৃদ্ধ। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ভাবধারা সাধনার কুঞ্জে মনোহাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাধনা একখানি অমূল্য গ্রন্থ; এইরূপ শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দদায়ক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে নিতান্তই বিরল। বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেরই

ইহা নিত্যসঙ্গী হইবার যোগ্য। বিশেষ করিয়া, বর্তমান ভোগবাদের যুগে বিক্ষিপ্ত বহির্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করিতে বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগের নিত্যপাঠ্যরূপে 'সাধনা' নির্ধারিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে। হিন্দুর প্রতিগৃহে এই অমূল্য গ্রন্থখানি সমাদৃত হইলে তাহাতে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

সাধনার কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপটগুলিও ভাবপূর্ণ।

উপন্যাস

একতারা ঃ শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় ঃঃ চলতি নাটক নভেল এজেন্সি। ১৪৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২ টাকা।

কথা আছে 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরোধর্ম ভয়াবহ।' আলোচ্য গ্রন্থটির অবস্থা হইয়াছে তাই।

জলধরবাবু নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত। যতদূর মনে পড়ে, রঙ্গমঞ্চে তাঁর রচিত একাধিক নাটক দর্শকসমাজে যথেষ্ট আদৃত হ'য়েছে। কিন্তু 'একতারা' ঠিক কি জাতীয় পুস্তক বারবার পড়েও আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। রূপক, সাদামাঠা উপন্যাস অথবা কোন দার্শনিক তত্ত্ব উপন্যাসের মাধ্যমে বর্ণিত হ'য়েছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিক করা সম্ভব হয়নি। হয়তো এ আমাদের মেধার হীনতা, কিন্তু এমন একটা ব্যাপার হওয়া লেখকের পক্ষেও তো প্রশংসাজনক নয়। জীবনকবি আছেন তাঁর একতারা বুকে জড়িয়ে, পাশাপাশি রয়েছেন বিজ্ঞানী আর দার্শনিক মা-বসুন্ধরাকে বাঁচাবার মৃত্যু-শপথ নিয়ে, কিন্তু মা-বসুন্ধরাকে যেমন বাঁচাতে তাঁরা পারেন নি, তেমনি আলোচ্য গ্রন্থটিকেও তাঁরা পারেন নি অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে। স্থানে স্থানে সংলাপ শিশুসুলভ, চরিত্র চিত্রনের বালাই নেই, মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ও নিখোঁজ।

এমন একটা সময়ে যখন ভালো নাটকের দুর্ভিক্ষ অত্যন্ত প্রকট, নাট্যমঞ্চ চর্বিত-চর্বণ ক'রে দিন কাটাচ্ছে, জলধরবাবুর কাছে আমাদের একমাত্র অনুরোধ, অন্যদিকে সময় ও প্রতিভার অপচয় না ক'রে বলিষ্ঠ নাটক দিন আমাদের, জীবনের সমস্যা জড়িত প্রাণবন্ত কোন নাটক।

৩৬৩।৫২

বি টি রোডের ধারে ঃ সমরেশ বসু ঃঃ ইণ্টার-ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০। মূল্য দু টাকা আট আনা।

বেশ কিছুদিন আগে আমাদের দেশের উপন্যাসের উপজীব্য ছিলো অভিজাত জীবন। তাদের চলন-বলনের কৃত্রিমতা, দুঃখ-সুখ, ব্যথা-আনন্দের কাহিনী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবন নিপুণ শিল্পানুগ রেখায় রূপায়িত হ'লো। কথাশিল্পের প্রতিপাদ্য প্রথম মোড় নিলো কল্লোলযুগের শক্তিমান লেখনী-স্পর্শে। বস্তিবাসী থেকে কয়লা-কুঠির কুলীকামীনের জীবন ধরা দিলো অনবদ্য রচনা-মাধ্যমে। শুধু নতুন কিছু করার হুজুগেই পরিবর্তন সাধিত হ'লো না, এদেরও যে কিছু বলার আছে, অন্ধকারের জীবন থেকেও যে আহরিত করা যায় বিদ্যুৎকণা, কল্লোল যুগের শিল্পীরা সেটা প্রমাণ করলেন। কিন্তু কুলি-মজুর আর বস্তিবাসীর ভেঙে-পড়া জীবনের পাশাপাশি, তাদের নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত তাদের মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার প্রয়াস, পরিবেশের বিরুদ্ধে শুধু বিক্ষোভই নয়, আত্মরক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা প্রথম জ্বালাময়ী ভাষায় রূপ পেলো মাণিকবাবুর তীক্ষ্ণ লেখনীসম্পাতে।

তারপর ভাঙা-চোরা অস্থির সমাজ-জীবনের এই ছন্নছাড়া রূপ বহু আধুনিক লেখকের হাতে পুষ্টিলাভ করেছে, কোথাও অতিবাস্তব-বাদের ফেনিল ভঙ্গীমায় নব-সম্ভাবনার ভ্রূণকে হত্যাও করা হ'য়েছে, তবুও এই ক বছরে অবজ্ঞাত ও সমাজে অপাংক্তেয় মানুষের কাহিনী পাঠকসাধারণের অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে সক্ষম হ'য়েছে। শুধু দেহের নয় মনেরও।

এমনি অবহেলিত মানুষের কথাই আলোচ্য উপন্যাসটির উপজীব্য। শিল্পকেন্দ্র বি টি রোডের আশেপাশের চা-খানা, শুঁড়ির দোকান আর পানের গুমটিতে ভীড় ক'রে যে সব মানুষের দল তাদেরই হাসিকান্নার ব্যথা-বিক্ষোভে জড়ানো জীবনের কাহিনী সমরেশ-বাবু অনবদ্য ভঙ্গীতে আর রসসমৃদ্ধ ভাষায় রূপায়িত করেছেন।

মাত্র একসার খোলার ঘরের একমুঠো বাসিন্দাকে নিয়ে বৃহত্তর জীবনের যে ইঙ্গিত দিতে লেখক সক্ষম হয়েছেন তাতে বিস্মিতই হতে হয়। এ শিল্পনৈপুণ্য শুধু সম্ভব লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর দরদী মনের প্রভাবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি আঁচড়ও নয়, মাত্রাধিক্য কোথাও না, কিন্তু আশ্চর্য জীবন-চরিত্রের মিছিল। নায়ক ফোর টোয়েণ্টি গোবিন্দকে ঘিরে প্রেমপিয়াসিনী ফুলকী, স্ক্রিন গণেশ, রুক্ষতার স্তবকে মোড়া কোমল অন্তঃকরণের অধিকারী বাড়ীওয়ালা, মাদারী খেলোয়াড়, কালো নগেন, দুলারী, মেমের স্বপ্ন-দেখা পঙ্গু কিশোর এমন কি উঠানের ধারে নর্দমার পাশে পোড়া কুন্দগ... রঙে রেখায় সমুজ্জ্বল,

কিন্তু তবু বলবো শুধু এই ভেঙে... গানই কেন? সমস্ত শক্তি ক্ষয়িত হবে কি কালো মেঘের স্তবক রচনায়, ...ই পাড় ঘিরে বিদ্যুতের দীপ্ত-সম্ভাবনা দেবে না? বস্তিবাসীদের আস্তাকুঁড়ের ফেলে বার বার গোবিন্দরা নিজের রক্তের নিজেদের ক্ষয়ের ইতিহাসই শুধু লিখে আশেপাশের মানুষদের তুলে ধরবে না জীবন, বলিষ্ঠ জীবন, সার্থক ... পরিণতির দিকে।

প্রচ্ছদ-চিত্রণ অভিনব। ছাপা বাঁধাই ...

৩...

ভ্রমণ কাহিনী

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে— ... মিত্র প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ... ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকা... দাম ২৷৷০।

লেখিকার ইহা দ্বিতীয় ভ্রমণ-ক... এবারের ভ্রমণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ল...

সুইডেনকে লইয়া। মনোরম ...তোধিক মনোরম এদেশের নরনারী ও মানুষ এদেশে প্রকৃতির ক্রোড়ে বাস ...লিয়া সে দেশের পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ...শয়ের পরম সান্নিধ্যে তারা মানুষ, তাই দেহসৌষ্ঠব যেমন আকর্ষণীয় অন্তরের তেমনি আন্তরিক, পরদেশীকে সহজেই ...নিয়া লয়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার প্রাকৃতিক ...-রস লেখিকা দুই চোখ ভরিয়া পান ...ইন, সেদেশের নরনারীর হৃদয়ের স্পর্শও মুগ্ধ করিয়াছে। অন্তরের দরদ দিয়াই ...ই ভ্রমণলিপি রচনা করিয়াছেন, তাই ...র কাছে সে দেশের মানুষও নবপরিচয়ের বিস্ময়ে হৃদয়কে আপ্লুত করে। সুদৃশ্য কাগজে বইখানি মুদ্রিত, পাতায় পাতায় ...র্ণনার সহিত ছবির যোগাযোগে গ্রন্থের অধিকতর বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ...র নিকট আমরা এই ধরণের আরও ভ্রমণ-... পাইবার আশা পোষণ করি।

৩৪১।৫২

প্রাপ্তি-স্বীকার

...নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় ...চনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা ...রে নিকট প্রেরিত হইবে।

...ণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ...ধর পালিত কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, ...বাজার, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ...

১।৫৩

...ল—মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, ... চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

২।৫৩

...ম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাহিনী—টমগল্ট, এম ...রকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম ...জ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৷৹ আনা।

৩।৫৩

...া আমার শিশুর কাছে—ক্যারোলাইন প্র্যাট, ...স সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম ...জ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৵৹ আনা।

৪।৫৩

...স্তুরী মায়া ইত্যাদি গল্প—পরশুরাম, এম ...রকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ... কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৫।৫৩

...ীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য—শ্রীহরি গঙ্গো-...য়, এসিয়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেসন্স ...কেট, ১৯, নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা। ...—১৲। ৬।৫৩

...য়েড প্রসঙ্গে—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঈগল ...লিশিং হাউস, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, ...কাতা। মূল্য—২৷৹। ৭।৫৩

...ষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ—দেবীপ্রসাদ ...োধ্যায়, নিউ সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ৫৭।১, ...া স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷৹। ৮।৫৩

...হারাজ—শ্রীআশালতা সিংহ, ফাইন আর্ট ...লিশিং হাউস, ৬০, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। ...—৩৲। ৯।৫৩

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা—যতীন্দ্র রামানুজ দাস, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান কর্তৃক খড়দহ, ২৪-পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৹ ...১০।৫৩

সংগীত প্রবেশ ২য় ভাগ—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷৹। ১১।৫৩

নাম—চয়নিকা—মিহিরকুমার দাস, গ্রন্থ মন্দির, ১২১বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৸৹ আনা। ১২।৫৩

আর্ট ও আহিতাগ্নি—সম্পাদনা শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১২৲। ১৩।৫৩

... লক্ষ্য ক'রে আমরা আনন্দ ...

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, চাউলের মূল্য মণ প্রতি পাঁচ আনা নামিয়াছে। বিশুখুড়ো আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বক্তৃতার সুরে বলিলেন—"What a fall my country-men ?"

* * *

বৃটিশ ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী স্যার জর্জ সুস্টার নাকি বলিয়াছেন যে, ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনা বহির্জগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। "গেঁয়ো যোগীর কপালে ভিখ্ মিলবে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানা যায়নি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

বৃটিশের প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতকে স্বাধীন গণতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয়

মনে করেন। "সুতরাং সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

দিল্লীতে খাদ্যমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে কী স্থিরীকৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে জনৈক সহযাত্রীর এক প্রশ্নের উত্তরে অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"মোটে না রেঁধে তপ্ত দেওয়া চলে, না পান্তা দেওয়া চলে তাঁরা সে সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করেন।"

* * *

ডঃক্টর উইলিয়াম স্নো নামক জনৈক ধর্মযাজক নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এমন এক সময় আসিতে

পারে যখন সন্তানলাভের জন্য বিশ্ব মহা-সভার অনুমোদিত লাইসেন্স লইতে হইবে। শ্যামলাল বলিল—"সন্তান লাভের জন্যে পুত্রেষ্টি অবশ্য আমরা করেছি কিন্তু তার জন্যে 'কিউ' দিতে হলে যে"………শ্যামলাল সত্যি সত্যি লাল হইয়া উঠিল।

* * *

অন্ধ্ররাজ্য গঠন সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী মন্তব্য করিয়াছেন—বিবাহ স্থির হইয়াই আছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"হিন্দু কোডের পরের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে তা নিশ্চয়ই রাজাজী বলেন নি"।

* * *

একটি ট্রেনের টিকিট কালেক্টর নাকি টিকিট চেক্ করিতে করিতে হঠাৎ পাগল হইয়া যান।—"এটা মানুষের কুকুর কামড়ানোর মতোই সংবাদ। কেননা, পাগল হয়ে যাওয়ার কথা যাত্রীদের, টিকিট কালেক্টরের নয়"—বলে শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহেরুর দক্ষিণ ভারত পরি-ভ্রমণের সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি

সদলবলে মাচানে বসিয়া যখন বন্য জানোয়ারদের পরিদর্শন করেন সেই সময়টাই নেহেরুজীর কাছে কৌতু- হয়েছিল। জনৈক সহযাত্রী বলিলে "অথচ আমরা এতদিন মাচানের বদলে করে শুধুই গুচ্ছের টাকা খরচ করে

* * *

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান শুনিলাম ম স্ট্যালিনের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তনের জন্য আবেদন জানাইয়

খুড়ো গান করিলেন—"একে ঐ সুর্মা চাউনি বাঁকা, তায় ডাগর আঁখি, বাঁধে কেন হায় — — ট্রাম ডালহৌসির আসিয়া দাঁড়াইল।

* * *

আমেরিকার সংবাদে প্রকাশ, নাকি একটি নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক স রসরচনার ভাষার অনুকরণে মন্তব্য ক —"ভারতের আকাশে অগণ্য উ তারকায় যখন ঝলমল করতি থাকে আমরা বিস্মিত আতঙ্কে Caye থাকি"।

* * *

জেনারেল ... সবুজ ... পুরোপুরি দেশপ্রেমি প্রতি জেনারেলজী কথা। সাদা ইউনি পরা ব্যক্তিরা কি ত কাটেন"!

টবল

দেশিক দলের ভ্রমণ ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য
শিক খেলার সহিত দেশের খেলোয়াড়দের
চত করা ও দেশের খেলার মান নির্ণয়
ইহা ছাড়াও খেলার পদ্ধতি, রীতিনীতি
চ বহু বিষয়েও দেশের খেলোয়াড়দের
দেওয়া। কিন্তু আমাদের দেশের ক্রীড়া
লকগণ বিশেষ করিয়া ফুটবল পরি-
গণ এই বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া যে কোন
শিক ফুটবল দলের ভ্রমণ ব্যবস্থা
াছেন অথবা করিয়া থাকেন বলিয়া মনে
া। ১৯৩৬ সালেই সর্বপ্রথম বাঙলার
ল পরিচালকগণকে এই বিষয় উৎসাহী হইতে
যায়। এই সময় বার্লিন অলিম্পিক
ানে যোগদানকারী এক শক্তিশালী চৈনিক
ল দলকে ভারত ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আনা হয়।

লের মধ্যে লিডয়াই ট্যাং নামক একজন
য়াড় ছাড়া অপর কাহারও খেলা
গর বলিয়া মনে হয় না। তবে তখন এই
মনে মনে পোষণ করা হয় যে, ভবিষ্যতে
ধরণের কোন বৈদেশিক ফুটবল দলকে
আনাইয়া অযথা দেশের অত্যুগ্র ফুটবল
ীদের অর্থনাশ করা হইবে না। ঠিক
পরবর্তী বৎসরেই ইংলণ্ডের এক
াদার দলকে ভারতে আনা হয়। এই
পূর্বের চৈনিক দলের ন্যায় বিশেষ
গর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন
যুদ্ধের সময় এক সামরিক ফুটবল দল
গঠন করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে
ব্যবস্থা করা হয়। এই দলে ইংলণ্ডের
জন পেশাদার খেলোয়াড় ছিলেন তাঁহাদের
সত্যই প্রশংসনীয় ও অনেক কিছু শিক্ষা
র ছিল। তখন আমরাই বলিয়াছিলাম,
প ফুটবল দল ভারতে ভ্রমণ করিলে
য় ফুটবল খেলার মান যথেষ্ট বৃদ্ধি
।" কিন্তু আশ্চর্য এই বাঙলার তথা
র ফুটবল পরিচালকগণ কয়েকটি
িক ফুটবল দলের আগমনে প্রভূত অর্থ
মর পথ লক্ষ্য করিয়া সমানে একের পর
বদেশিক ফুটবল দল ভারতে আমদানী
ছেন যাহাদের আনিবার কোনই সার্থকতা
আমাদের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষ-
নহে ইহা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি
বলিবেন। ১৯৪৮ সালের চাইনিজ
পিক ফুটবল দল, ১৯৪৮ সালের বর্মা
দল, ১৯৪৯ সালের হেলসিংবর্গ ফুটবল
মন কি ১৯৫৩ সালের লিনজ এ্যাথলেটিক
ফুটবল দল ইহাদের একটিকেও বিশ্বখ্যাত
িক প্রথম শ্রেণীর ফুটবল দলের
ক্ত করা চলে না। অস্ট্রিয়ান লিনজ
পার্টস ক্লাব, অস্ট্রিয়ারই একটি
ইবারের ঐ দেশের ফুটবল
করিলে দেখা যাইবে যে,
ঠ স্থান। ইউরোপের
নর মধ্যেও ইহাদের
অবস্থায় এই দলকে
শক্তিহীন দল বলিয়া
নেই অন্যায় হইবে না।

খেলার মাঠে

এইরূপ একটি দলকে কলিকাতায় আনাইয়া অসময়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলাইয়া কয়েক সহস্র অর্থ নষ্ট করিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে আমরা বুঝিয়া পাই না। এইজন্য আমাদের ধারণা এইরূপ বৈদেশিক ফুটবল দলের ভ্রমণ ব্যবস্থার পূর্বে ভারত সরকারের উচিত সকল কিছু অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর অনুমতি প্রদান করা। শক্তিহীন দল আনাইয়া দেশের অযথা অর্থ নষ্ট করার নীতি নতুবা কিছুতেই বন্ধ হইবে না।

অস্ট্রিয়ান পেশাদার ফুটবল দল

অস্ট্রিয়ান লিনজ এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ক্লাবের ফুটবল দল এই পর্যন্ত কলিকাতায় দুইটি মাত্র খেলায় যোগদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি খেলা অমীমাংসিত ও একটি খেলায় দুই গোলে বিজয়ী হইয়াছেন। এই দুই খেলায় দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কেই খেলিতে দেখা গিয়াছে। খেলার পদ্ধতি সম্পর্কে ইহারা যে জ্ঞান রাখেন তাহা কোন সন্দেহ নাই তবে শেষ সময়ে গোল কিরূপভাবে করিতে হয় সেই জ্ঞান কম আছে। বৈদেশিক দল হিসাবে দৈহিক পটুতার অভাব নাই তবে দৈহিক শক্তি ইহাদের অধিকাংশেরই ভারতীয় খেলোয়াড়দের সমতুল্য। এইজন্যই প্রথম খেলায় অনভ্যস্ত মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া ইহাদের পরাজিত করিবার মত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মরসুমের মাসে এই দল কলিকাতায় খেলিতে আসিলে প্রত্যেক খেলায় পরাজয় বরণ করিতেন এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। এইজন্য আমাদের আন্তরিক অনুরোধ যেন ফুটবল পরিচালকগণ এইরূপ সকল ফুটবল দলকে দেশে আনাইয়া দেশের অর্থ নষ্ট না করেন। ইহা অপেক্ষা পেশাদার কৃতী ফুটবল খেলার শিক্ষককে অর্থ ব্যয় করিয়া দেশে আনাইয়া কিছুকাল তরুণ উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবে।

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল ত্রিনিদাদে প্রথম দুইদিনব্যাপী এক খেলায় যোগদান করিয়া অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছেন। এই খেলায় ভারতীয় দলের ব্যাটিং অথবা বোলিং নৈপুণ্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। খেলাটি স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীদের সহিত হয়। ম্যাটিং উইকেটের খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ বিশেষ অভ্যস্ত নহেন। তাহার ফলেই প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫৩ রানে শেষ হয়। একমাত্র এই খেলার অধিনায়ক ভিনু মানকড় ৭৩ রান ও সি গাদকারী ৩৪ রান করিতে সক্ষম হন। স্থানীয় ভারতীয় দলের আসঘর আলী ও জাকবীর উভয়েই ৪টি করিয়া উইকেট পতন সম্ভব করেন। পরে ভারতীয় দল খেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৬৬ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করেন। পি রায় ও এম এল আপ্তে দ্রুত রান সংগ্রহের কিছুটা পরিচয় দেন। পরে স্থানীয় ভারতীয় দল খেলিয়া ৩ উইকেটে ৮৫ রান করিলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই খেলায় এস গুপ্তের বোলিংই বিশেষ

উল্লেখযোগ্য হয়। তিনি দুইটি ইনিংসে ৮টি উইকেট মাত্র ৫৫ রানে দখল করেন। তবে এই খেলাকে ভারতীয় দলের শক্তি পরীক্ষার পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে। স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীদের উৎসাহিত করিবার জন্যই খেলায় যোগদান ও কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়াই খেলা পরিচালনা করা হয়। যাহার ফলে শেষ সময়ে এম এল আপ্তে, মঞ্জেরেকার, পি রায় প্রভৃতিকে বল করিতে দেখা গিয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভ্রমণে কিরূপ করিবেন তাহর কিছুটা আভাষ আগামী বিভিন্নদিনের খেলা হইতে পাওয়া যাইবে। খেলার ফলাফলঃ—

ভারত ১ম ইনিংসঃ—১৫৩ রান (সি গাদকারী ৩৪, বিনু মানকড় ৭৩, রামচাঁদ ১০; আসঘর আলী ১৭ রানে ৪টি, জ্যাকবীর ৪৯ রানে ৪টি, এস এম আলী ৩৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

ইস্ট ইণ্ডিয়ান একাদশ ১ম ইনিংসঃ—৬২ রান (জ্যাকবীর ১২, সুখরাম ২৩; এস গুপ্তে ২৯ রানে ৬টি, বিনু মানকড় ১৫ রানে ৪টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংসঃ—১ উইকেটে ৬৬ রান (পি রায় ৩১, এস আপ্তে নট আউট২৫; এম এস আলী ১৩ রানে ১টি উইকেট।)

ইস্ট ইণ্ডিয়ান একাদশ ২য় ইনিংসঃ—৩ উইকেটে ৮৫ রান (আসঘর আলী নট আউট ৩৭, নারায়ণ সিং ১৩, সম্পৎ ২৫; এস গুপ্তে ২৬ রানে ২টি ও মাঞ্জরেকার ৫ রানে ১টি উইকেট পান।)

বাঙলা ও বিহারের দলের খেলা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলায় বিহার দল যতবার বাঙলার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ততবারই পরাজিত হইয়াছে। এইবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে এইবারের খেলায় বাঙলা দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিহার দলকে পরাজিত করিয়াছে। এইরূপ ফলাফলের জন্য বাঙলা দলের অধিনায়ককেই দায়ী করা যায়। দল পরিচালনার নিবুদ্ধিতার জন্যই খেলা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। কোন সময় কোন বোলারকে বল করিতে দেওয়া উচিত সেই বিষয় যথেষ্ট জ্ঞানের যে অভাব তাঁহার মধ্যে আছে ইহা বিচক্ষণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পক্ষে বুঝিতে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। তাহা ছাড়াও শেষ দিনে জয়লাভের জন্য চেষ্টা না করিয়া অযথা অপর এক খেলোয়াড়কে শত রানের সুযোগদান করিয়া সময় নষ্ট করার কোনই হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বিহার দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় সুঁটে ব্যানার্জির শতাধিক রান সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি এই ধরণের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং বহুকাল করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। বাঙলা দলের পক্ষে পি বি দত্তের উভয় ইনিংসেই ব্যাটিং ভাল হয় ও রান যথেষ্ট করিয়াছেন। বোলার হিসাবে মণ্টু ব্যানার্জির নামই সর্বপ্রথম করিতে হয়। পি বি দত্ত ও বি দাশগুপ্তের শতাধিক রানও প্রশংসনীয়। বাঙলা দলকে ইহার পরবর্তী খেলায় উড়িষ্যার সহিত খেলিতে হইবে। **ঐ খেলায় বাঙলা দল যে সহজেই বিজয়ী হইবে এই বিষয়ে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নাই।** উড়িষ্যা সম্প্রতি ক্রিকেট খেলায় উৎসাহী হইয়াছে। নব গঠিত দল অভিজ্ঞ দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতাই যদি করে তাহাই প্রশংসার বিষয় হইবে। খেলার ফলাফলঃ—

বাঙলা ১ম ইনিংসঃ—৩২৩ রান (শিবাজী বসু ৩৫, পি বি দত্ত ৬২, বি দাশগুপ্ত ৫৭, জে টেলার ৪১, পি সেন ৪১, বি ফ্রাঙ্ক ১৯; সুঁটে ব্যানার্জি ১০৫ রানে ৩টি, ওমপ্রকাশ ৫১ রানে ২টি, বিমল বসু ৬৬ রানে ৩টি, এস প্যাটেল ২০ রানে ২টি উইকেট পান।)

বিহার ১ম ইনিংসঃ—২৩৫ রান (সুঁটে ব্যানার্জি ১৩৮, আর আর লুইস ২২, সলি প্যাটেল ২৩; এস ব্যানার্জি (মণ্টু) ৬৬ রানে ৭টি, এস গিরিধারী ৪২ রানে ১টি ও শিবাজী বসু ১০ রানে ১টি উইকেট পান।)

বাঙলা ২য় ইনিংসঃ—৫ উইকেটে ৩৫৪ রান বি দাশগুপ্ত ১০৪, পি বি দত্ত ১৪৩, জে টেলার ২১, এস গিরিধারী নট আউট ২৫; ওমপ্রকাশ ৯৭ রানে ২টি, বিমল বসু ৭২ রানে ১টি, সুঁটে ব্যানার্জি ৩৯ রানে ১টি উই পান।)

বিহার ২য় ইনিংসঃ—৭ উইকেটে ১৩০ (বি সান্যাল ২৩, পি ব্যানার্জি ২৪, সুধীর ২৪; এস দাশগুপ্ত ৪৫ রানে ২টি, শি বসু ১৯ রানে ২টি, এন চৌধুরী ১৬ ১টি উইকেট পান।)

উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বাঙলার দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বা ফাইন্যাল খেলায় উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বা পক্ষে খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয় মনোনীত হইয়াছেন:—

পি সেন (অধিনায়ক), শিবাজী বসু, দাশগুপ্ত, নির্মল চ্যাটার্জি, বি ফ্রাঙ্ক, চৌধুরী, এস. ব্যানার্জি (মণ্টু), এস পি বি দত্ত, জে টেলার ও এস কে গিরিধা

অতিরিক্তঃ—বি মৈত্র, এস দাশগুপ্ত এ মজুমদার।

...ী সংবাদ
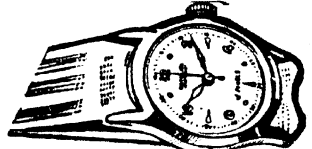
...ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য ...সভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনে জমিদারী ...বিলোপ বিল উত্থাপন করিয়া উহা সিলেক্ট ...িতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া ...গিয়াছে।

...টেনের শ্রমিক দলের পূর্বতন প্রধান মন্ত্রী ...র্তমান ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষের ... মিঃ সি আর এটলী অদ্য নয়াদিল্লীতে ... সাংবাদিক সম্মেলনে বলেনঃ "আমরা ...কে স্বাধীন গণতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয়রূপে ...না করি।" মিঃ এটলী রেঙ্গুনে সমাজ- ... সম্মেলনে যোগদানের পথে দিল্লীতে ...ণ করেন।

...ধ পরিহার করিয়া বিশ্বের সমস্যা ...নে গান্ধীবাদের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা ...গ নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ...গণের সমাবেশে আন্তর্জাতিক আলোচনা- ...পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে ... গান্ধীজীর আদর্শের বাণী ভাগবত ... মাত্র নহে, বাস্তব ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য।

...শ্চমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট রাজ্যের স্বল্পদণ্ডে ...ট কয়েদীদের জন্য আচরণ পরীক্ষণ ব্যবস্থা ...নের এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত ...ছেন।

...ই জানুয়ারী—মাদ্রাজ শহরের সাড়ে তিন ... পুলিশের মধ্যে যেসব পুলিশকে অস্ত্র ... অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, পুলিশ ...ক্ষ তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন।

...ান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য দিল্লীতে নিখিল ... ফসল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ...। ছয়জন কৃষককে নগদ ৫০০০ টাকা ... পুরস্কার এবং কৃষি কৃষি-পণ্ডিত উপাধি ...করা হয়।

... জানুয়ারী—নয়াদিল্লীর এক সংবাদে ... ভারত সরকার সিংহলের সর্বশেষ পরি-...তে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন ... জানা গিয়াছে। সিংহলে উপযুক্ত দলিল ...ত ভারতীয়দিগকে রেশন বই না দেওয়ার ...া হইয়াছে।

...রতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ...না সম্বন্ধে বিবেচ্য খসড়া পরিকল্পনা ...র্ক ডাঃ সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে ...কমণ্ডলী এক বৈঠকে মিলিত হন। ...কমণ্ডলী কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র ... ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একটি ...র ভার এক একটি সদস্যদলের উপর ন্যস্ত ...ছেন।

... জানুয়ারী—অদ্য সকালে মাদ্রাজ শহরে ...া কর্তৃক বেতন বর্জনের সপ্তম দিবসে

সাপ্তাহিক সংবাদ

সিটি কনস্টেবুলারি এসোসিয়েশনের ভবনে তল্লাসীর পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সামরিক প্রহরী-দল মোতায়েন করা হইয়াছে।

অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রিগণের দুই দিনব্যাপী সম্মেলনে চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে ন্যূনতম খাদ্যশস্য আমদানী করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে। জানুয়ারী হইতে গমের মূল্য মণ প্রতি ১ টাকা হ্রাসের সিদ্ধান্তও উক্ত অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য অপরাহ্ণে কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেজারী অফিসের ক্যাস কাউণ্টার হইতে নগদ ১৮ হাজার টাকার একটি থলি ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিলে কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী তাহাকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত ৩রা ডিসেম্বর কর্পোরেশনের ট্রেজারী অফিস হইতে নগদে ও চেকে ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার একটি থলি অপহৃত হয়।

৯ই জানুয়ারী—আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে সেই অধিবেশনে ট্রামে-বাসে ধূমপান নিবারণের উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট হইতে একটি বিল উত্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অদ্য অপরাহ্ণে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত রেলকর্মীদের এক সভায় সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের ফলে একমাত্র ইস্টার্ন রেলওয়েতে সরকারের প্রায় ২৫ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

১০ই জানুয়ারী—দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, কাশ্মীর সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত মধ্যস্থ ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে ভারত তাহার মূল অভিযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের উপর চাপ দিবে।

ব্যারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়েকে ইস্টার্ন রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রশ্নটি বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থানে ও বিদেশে যেরূপ সংবাদাদি প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় পাকিস্থান মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থায় যোগদান করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৫ই জানুয়ারী—বিখ্যাত রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্থান সেনাপতিমণ্ডলীর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল আকবর খাঁ ১২ বৎসরের কারদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

৭ই জানুয়ারী—করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, অদ্য সকালে ৫ হাজার ছাত্রের একটি দল শোভাযাত্রাসহকারে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বাসভবনে গমন করিলে পুলিশ তাহাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। নানাস্থানে ছাত্রগণের উপর লাঠিচালনা করা হয় এবং ৩৬ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৮ই জানুয়ারী—করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, অদ্য এখানে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ১০ জন নিহত ও অন্যূন ৬০ জন আহত হয়। স্কুলের বেতন হ্রাস ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবী করিয়া অদ্য 'দাবী দিবসে'র দ্বিতীয় দিনে ছাত্ররা যে শোভাযাত্রা বাহির করে তাহা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য লৌহশিরস্ত্রাণধারী পুলিশবাহিনী কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে।

৯ই জানুয়ারী—অদ্য করাচীর রাস্তায় রাস্তায় সারাদিনব্যাপী লড়াই চলে। লুণ্ঠিত মদ্যের প্রজ্বলিত বোতল এবং ধ্বংসস্তূপে রাজপথ গুলি ছাইয়া গিয়াছে। অদ্য বিক্ষোভের ৩য় দিবসে অস্ত্রশস্ত্রের দোকানসমূহ লুণ্ঠিত হয় এবং পুলিশ শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলী চালায়। ফলে ছয়জন নিহত ও বহু ব্যক্তি আহত হয়।

১০ই জানুয়ারী—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, আজ প্রাতে শহরে বিক্ষিপ্তভাবে চারিটি স্থানে লুঠতরাজ হয়।

মিশর সুয়েজ খাল এলাকার ঘাটিগুলি রক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবে ও তজ্জন্য সেনাবাহিনীর শিক্ষার নিমিত্ত পশ্চিমী শক্তিসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিবে ও মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে—এই সর্তে যুক্তরাজ্য সুয়েজ খাল এলাকা ত্যাগ করিতে সম্মত আছে।

১১ই জানুয়ারী—সিংহল ভারতীয় কংগ্রেস অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সিংহল সরকার চাউলের রেশন সম্পর্কে যে নূতন বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন উহার ফলে নারী ও শিশু-সহ প্রায় তিন লক্ষ ভারতীয় সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—I৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) I৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ · ১৩শ সংখ্যা

দেশ

শনিবার · ১০ই মাঘ, ১৩৫৯

DESH · Saturday, 24th January, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন · সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভাপতির অভিভাষণ

হায়দরাবাদে কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশন যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি-স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নূতন কথা কার্যত কিছুই বলেন নাই। তাঁহার অভিভাষণে তিনি কংগ্রেস-নীতির স্বরূপ, কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতা ও সাফল্য, ভারতের বৈদেশিক নীতি, পাকিস্থান-সমস্যা, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্বন্ধে যেসব বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলির সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত দেশবাসীর পূর্ব হইতেই জানা ছিল। বস্তুত ইতোপূর্বে বহু বক্তৃতায় এবং বিবৃতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে সব কথা বলিয়াছেন, কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপেও তাঁহার মুখে সেই সব কথার পুনরাবৃত্তিই আমরা শুনিতে পাইয়াছি। সুতরাং সে দিক হইতে কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণে দেশে নূতন কোনরূপে উৎসাহ এবং উদ্যমের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয় না। উৎসাহ ও উদ্দীপনা সভাপতির বক্তৃতায় নাই, আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না। তাঁহার বাক্‌-ভঙ্গীতে আলঙ্কারিক হিসাবে সে বস্তু স্বভাবতই থাকে। এ অভিভাষণেও যথেষ্টই আছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার বিচারে এবং কর্মনীতির প্রয়োগের করণে দেশবাসীর অন্তরে সাড়া জাগাইতে তাহা কতখানি সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কংগ্রেস-সভাপতি-স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; কিন্তু দেশের জনসাধারণের যেগুলি সমস্যা সেগুলির সমাধানে দেশব্যাপী আগ্রহ জাগাইবার মত বৈপ্লবিক প্রেরণা তাঁহার উক্তির মধ্যে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে কংগ্রেসের সভাপতি কার্যত ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বরূপেই এ ক্ষেত্রে দেশবাসীর নিকট বেশী প্রকাশ পাইয়াছেন এবং কংগ্রেস সরকারের অবলম্বিত নীতির সমর্থনের দিকেই তাঁহার সব বক্তব্যের জোর গিয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে জনগণের স্বার্থ-রক্ষায় সদা-জাগ্রত প্রচণ্ড প্রাণধর্মী তাঁহার যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভিতর দিয়া পূর্বে পাইতাম, তাহা অনেকটাই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর কংগ্রেসের সভাপতি বিশেষভাবেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু পরিকল্পনার যাহারা সমালোচক যুক্তির জোরে তাঁহাদের মুখবন্ধ হইলেই পরিকল্পনাটি সার্থকতা লাভ করিবে না। প্রকৃত জনসাধারণের সহযোগিতা এবং তাহাদের আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনার উপরই এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্থান কতটুকু আছে, এই প্রশ্নটি স্বভাবতই আসিয়া পড়ে এবং আদর্শের মূল্যে বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে ছোট হইয়া যায়। পাকিস্থান সম্পর্কে সভাপতির অভিভাষণে যে সমস্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। পাকিস্থানের কর্ণধারগণ মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সেখানে অমুসলমান যাহারা তাহারা মানুষের মত মর্যাদা লইয়া টিকিয়া থাকিবার অধিকার পাইবে না, কংগ্রেস সভাপতির এই উক্তি আমাদের অন্তর স্পর্শ করে; কিন্তু এই পর্যন্ত। ইহার পর যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ ব্যতীত ক সভাপতি তাঁহাদের অবস্থার প্রতীক কোন পন্থাই নির্দেশ করিতে পারেন এ সম্বন্ধে কোন ঝুঁকি লইতে গে ভয়ের কারণ আছে ইহাই এ সম তাঁহার উক্তির তাৎপর্য গিয়া কার্যত দাঁ ফলত কংগ্রেস-সভাপতির এতৎসম্প উক্তিতে তাঁহার অসহায়তাই প্রকট হই এবং আদর্শ ধোঁয়াটে হইয়া পড়িে বস্তুত এই সব দিক হইতে কংগে অধিবেশন এবার অনেকটা প্রাণহীন হই এবং গতানুগতিক ধারাই ইহাতে র হইয়াছে মাত্র।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন

হায়দরাবাদ কংগ্রেসে স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃত ইহা পূর্ব হইতেই বোঝা গিয়াছিল অবস্থার চাপে প্রস্তাবটি গ্রহণ অনি হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের নীতি অনির্দিষ্টকালের জন্য আর একদফা দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবে অবশ্য ভা ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের নীতি অগ্রাহ্য হয় নাই। এক্ষেত্রে যুক্তি পূর্ববৎ এই আপাতত এই নীতি অবলম্বন করা হইবে না। গৃহীত প্রস্তাবের ভাষা এই যে, অন্ধ্ররাজ্য সুগঠিত হইলে তখন অ বুঝিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নী প্রয়োগ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাই বাস্তবিকভাবে কংগ্রেস সভাপতির মতই সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পণ্ডি নেহরু একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বৎসর পূর্বে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠ নীতিকে কংগ্রেস সমর্থন করিয়াছে তিনি ইহার বিরোধী নহেন। প্র ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ আকারে কোন প্রদে তিনি পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু এসব স কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আগামী ৫ ব

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনে বিরুদ্ধতাই হইবে। ইহার কারণ কি? জীর অভিমত এই যে, নতা লাভ করিবার পর দেশের স্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বিং সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার সহিত হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত এ সম্বন্ধে স-সভাপতির আপত্তির কারণ বর্তমানে বিচার ছাড়িয়া নূতন একটি র পাকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, বলিয়াছেন, আমরা যদি এখন এই লইয়া মাতিয়া পড়ি, তবে পঞ্চবার্ষিকী কল্পনার কাজ কি করিয়া চলিবে? ণ সঙ্গে প্রাদেশিক পুনর্গঠনের নীতি পরিণত করিতে গিয়া যদি বিরোধ, ষ দেখা দেয়, তবে অবস্থা আরও তের হইয়া উঠিবে। বস্তুত ভাষার ত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি সম্প্রসারণের দ্ধে সভাপতি যে সব যুক্তি উপস্থিত াছেন, সেই সব যুক্তি সমভাবেই স্বপক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। রা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আমা- অভিমত এই যে, অন্ধ্ররাজ্য গঠনের ত্বের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সারণের প্রশ্নটি ভারতের রাষ্ট্রীয় র্থের দিক হইতে সমধিক গুরুত্বসম্পন্ন। ানা আজাদ বলিয়াছেন যে, এতদিন প্রদেশসমূহের ভাষার ভিত্তিতে গঠন সাধিত হয় নাই, তখন আরও ২৫ বৎসর এজন্য অপেক্ষা করিলে তের কোন ক্ষতি হইবে না। ফলত অন্ধ্র- গঠনের সম্বন্ধে এমন যুক্তি চলিত, তু পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের ন্ধে এ যুক্তি চলে না। দেশবিভাগের পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যে সমস্যার উদ্ভব াছে, তাহাতে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের আগেই চমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের নীতি ম্বন করা উচিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে চমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটির রাষ্ট্রনীতিক সমস্যাও বেশী কিছু । অধিকন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা র্য পরিণত করিবার পক্ষে এক্ষেত্রে রায় কিছু ঘটিত না; পরন্তু পশ্চিম- গর প্রশ্নটি বিশেষভাবেই বিবেচিত । এ কাজে প্রবৃত্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের মধ্যেও পঞ্চবার্ষিকী পরি- পনা কার্যে পরিণত করিবার সম্বন্ধে ধিক উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখা দিত। ানকার অধিবাসীরা একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিজেদের গঠনমূলক কর্মনীতি সম্প্র- সারণের সুযোগ পাইতেন। এ সম্বন্ধে ভারত সরকার এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দূরদর্শিতার অভাবেরই পরিচয় দিতেছে। এ বিষয়ে তাঁহাদের দ্বিধা এবং সঙ্কোচে জনগণের সহিত তাঁহাদের সংবেদনশীলতার অভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বৃহত্তর আদর্শের সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দৃষ্টির সমধিক উদারতা এবং নীতি- নিয়ন্ত্রণে বলিষ্ঠতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ সত্য আমরা একান্তভাবেই আজ উপলব্ধি করিতেছি।

মহামানবের জীবনাদর্শ

মহামানবের জীবন মর্মান্তিক কাব্যের মত বিশ্বে প্রাণরসের বিস্তার করিয়া থাকে। খান আব্দুল গফফুর খানের জীবন-কাব্য আত্মদানের এমনই মর্মান্তিক মহিমায় মানবের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিবে। পাকিস্থানের কারাগারে এদেশের স্বাধীনতা- সংগ্রামের এই ত্যাগপরায়ণ মানব-প্রেমিকের পবিত্র জীবন হয়ত পুষ্পের মতই ঝরিয়া পড়িয়া জগতের ইতিহাসে সৌরভ বিস্তার করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা এমন পবিত্র চরিত্র পুরুষকে নিজেদের প্রভুত্ব-স্পর্ধায় এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার পাশবিক প্রবৃত্তি বশে বিনা বিচারে দীর্ঘ দিন কারা- গারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারাই কলঙ্কিত হইবে এবং বিশ্ব মানব-সমাজে তাহারা ধিক্কৃত হইবে। প্রত্যুত গফফুর খানের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিবে এমন সাধ্য ইহাদের নাই। সীমান্ত-গান্ধী এযুগের অন্যতম মহাপুরুষ। আমরা ভারতবাসী, আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার অবদান অসামান্য। পাকিস্থান যে আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলেও এই অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ত্যাগব্রতী পুরুষের সাধনা রহিয়াছে; কিন্তু পাকিস্থানের মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধ শাসক দল নিজেদের স্বার্থের দায়ে সেই উদার সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহসী নহেন। তাঁহারা দুর্বল। অন্তরের দিক হইতে তাঁহাদের দৈন্য অপরিসীম, তাই গফফুর খানের মত মহৎ ব্যক্তিকে তাহাদের এত ভয়। হায়দরাবাদ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাবে এই বীরব্রতী সত্যসন্ধ সাধকের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি অবিচারের জন্য বিক্ষোভ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। শুধু ভারতেই নয়, কিছু দিন হইতে এই সাধুচরিত্র পুরুষের অসঙ্গত নির্যাতনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচীতে আরব দেশসমূহে পাকিস্থানের কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। তাঁহার বিষয়টি বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিচারার্থ উপস্থিত করি- বার জন্যও কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা আশাশীল নহি। কারণ বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘে বর্তমানে যেসব শক্তি- গোষ্ঠীর প্রাধান্য, তাঁহাদের মতিগতি আমরা জানি। পাকিস্থানের অসন্তোষজনক কোন কাজ বর্তমানে তাঁহারা করিবেন এমন বিশ্বাস আমাদের নাই, সে কাজ যতই ন্যায়সঙ্গত হোক্ না কেন। ফলত মধ্য- প্রাচীতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থাতে জোট বাঁধিতেই এই সব শক্তি বর্তমানে বেশী ব্যস্ত এবং এ কাজে, অন্য কোন মুসলমান রাষ্ট্রকে দলে ভিড়াইতে না পারিয়া এখন পাকিস্থানকেই তাঁহারা শেষে অস্ত্রস্বরূপে আঁকড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বিশ্বরাষ্ট্রের কাছে আবেদনের ফলে খান আব্দুল গফফুর খানের প্রতি অবিচারের কোন প্রতীকারের আশা নাই; পরন্তু পাকি- স্থানের ঘরোয়া ব্যাপার এই দোহাই দিয়া প্রস্তাবটি সেখানে অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে, ইহা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং সীমান্তের এই সাধুচেতা পুরুষকে সম্ভবত পাকি- স্থানের কারাগারেই তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে হইবে। ফলত "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই," বিশ্বকবির এই বাণীই এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

পাকিস্থানে গণতন্ত্র

পূর্ববঙ্গে পাকিস্থান গণতন্ত্রী দল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই নব- গঠিত দল সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য দাবী করিয়াছেন এবং বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্র- ভাষাস্বরূপে ধার্য করিবার আন্দোলনে ব্রতী হইবেন বলিয়া তাঁহাদের কার্যসূচীতে নির্দেশ করিয়াছেন। পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের বর্তমান ফ্যাসিস্ট নীতির প্রতিবাদেই যে দলটি গঠিত হইয়াছে, ইহা বোঝা যায়। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাও ইহার মূলে

অনেকখানি রহিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব এবং তজ্জনিত বৈষম্যের মনোভাব পাকিস্থান রাষ্ট্রের নীতির মূলে কাজ করিতেছে, সমাজ-চেতনাকে তাহার বিরুদ্ধে জাগ্রত না করিতে পারিলে, এই সব বিরোধী দল যে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বিশেষ কিছু সুযোগ লাভ করিবেন, ইহা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের কর্ণধারগণের হাতে এই ধরণের উদ্যম দমন করিবার পক্ষে বড় একটা অস্ত্র রহিয়াছে। তাহারা কম্যুনিজমের বিভীষিকা বিস্তার করিয়া কঠোরহস্তে এমন উদ্যম দমনে অগ্রসর হইবেন এবং সেই সঙ্গে বিপন্ন ইসলামের জিগীরও জোরে উঠিবে। ইহার প্রতিক্রিয়া কার্যত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই গিয়া চাপিবে এমন ভয়ের কারণও রহিয়াছে। বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্র মর্যাদা দানের জন্য পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণ সমাজের প্রচেষ্টার পরিণতি সেই অবস্থাতেই গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা অনেকে অদ্যাপি অকারণে সেজন্য কারারুদ্ধ রহিয়াছেন। ইহাদের মুক্তির জন্য পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষের কোন আন্দোলনই এ পর্যন্ত তেমন জোর বাঁধিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নয়; এবং শিক্ষিতের অভাব এক্ষেত্রে অনেকখানি রহিয়াছে। পাকিস্থানের শাসনাধিকারীরা এ সত্যটি ভাল রকমেই বুঝেন; এবং সেইজন্য পাকিস্থান শাসনতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণে ধর্মীয় সংস্কারের বজ্র আঁটুনী বাঁধিয়া দেওয়া তাঁহারা দরকার বোধ করিয়াছেন। তবে যুগের একটা দাবী আছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশের সঙ্গে সে দাবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যুগের সেই দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে গেলে সমাজ-জীবনে স্বভাবতই বিপর্যয় ঘটিবার কারণ সৃষ্টি হয় এবং জনমানসে সে অবস্থার প্রতীকারসাধনের জন্য ব্যাপকভাবে বলিষ্ঠ প্রেরণা জাগিয়া উঠে। পাকিস্থানের শাসকদের প্রগতি-বিরোধী নীতির তেমন প্রতিক্রিয়ার আঘাত তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে প্রভুত্বপ্রয়াসী শাসক সম্প্রদায়ের বঞ্চনাকে যেদিন একান্তভাবে উন্মুক্ত করিবে, শুধু তখনই সেখানকার অবস্থার মোড় ঘুরিতে পারে, এমন আশা করা যায়। বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্থান রাষ্ট্রের নীতির গোড়াতেই রহিয়াছে গলদ এবং গলদ কাটাইয়া উঠিতে ভাগ্যচক্রের বিড়ম্বনাও তাহাকে কিছুটা পোহাইতেই হইবে। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ মনোভাব লইয়া বর্তমান জগতে কোন রাষ্ট্রই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, পাকিস্থানের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর হইবে না। সে যে ভুল করিয়াছে, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তও তাহাকে করিতে হইবে। প্রকৃত স্বাধীনতা বাহুবলেই ক্রয় করিতে হয় এবং চালাকির পথে কোন মহৎ কার্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। পাকিস্থানের শাসকগণ এই শিক্ষা আজও লাভ করেন নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং যেভাবেই হোক, সে শিক্ষা তাহাদের একদিন পাইতেই হইবে। সে দিনের কত দেরী আমরা বলিতে পারি না।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে সমস্যা

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বড়দিনের বাজারে এদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে আমরা অনেক রকম তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের কাছে আসন্ন সমস্যা আরও গুরুতর। স্কুলে ছাত্র-ভর্তি এবং ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক যোগাইবার সংকট মধ্যবিত্ত-সমাজে একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্কুলের সংখ্যা কম এবং স্কুলে ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। ফলে বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ভর্তির ব্যাপারে নানারকমের বিধান প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। শিশু-শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করিবার ব্যাপারেও ভর্তি-পরীক্ষার এক অভিনব [illegible] অবলম্বিত হইতেছে। ছেলেমেয়েদের [illegible] করিতে গিয়া ভদ্রলোকদের [illegible] দোকানের মত লাইন দিয়া দাঁড়াইয়া [illegible] হইতেছে। এমন অবস্থায় নামকরা [illegible] ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা সাধারণ [illegible] পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপারে [illegible] হইতেছে। এই অবস্থায় অভিভাবক [illegible] বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন, তাহা [illegible] বোঝা যায়। ছেলেমেয়েদের পুস্তক [illegible] করাও দস্তুরমত দুরূহ ব্যাপার। স্কুলের পুস্তক রচনায় এক অরাজক[illegible] দিয়াছে। এক্ষেত্রে সকলেই [illegible] উমেদারীর জোর যাহার যেমন। বিদ[illegible] কর্তৃপক্ষও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে[illegible] বারে উন্মুক্ত এবং উদারচিত্ত। ফলত [illegible] বঙ্গের শিক্ষার ব্যাপারে ছেলেখেলা [illegible] হইয়াছে। এ অবস্থার প্রতীকার কি? বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি [illegible] সম্প্রতি ছাত্র-ভর্তি করার সংকটের একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিভা[illegible] সম্ভবপর ইহা বিবেচনার বিষয়। পুস্তকের নির্বাচনের সমস্যাকে সমধিক গুরুতর বলিয়া মনে করি [illegible] লোভের জন্যই অযোগ্য পুস্তকগুলি [illegible] হইতেছে, ইহা বুঝিতে অবশ্য বেগ [illegible] হয় না। কিন্তু এগুলি কিভাবে অন[illegible] হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সর্বত্রই [illegible] লুঠের বাজার আরম্ভ হইয়াছে। ম[illegible] পর্ষদ এবং শিক্ষাবিভাগের [illegible] কর্তৃপক্ষের এ উভয়েরই এ বিষয়ে [illegible] রহিয়াছে। সুতরাং এ সমস্যার [illegible] তাঁহাদের উভয়কেই উদ্যোগী হওয়া [illegible] বস্তুত শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি লাভখো[illegible] মুনাফা-শিকারীর দৌরাত্ম্য ও দুর্নী[illegible] ভাবে সম্প্রসারিত হইতে থাকে, [illegible] জাতির কোন ভবিষ্যৎ আমরা দেখি[illegible] না। দেশের সমাজ-জীবনে এই অধোগতি আমাদের মনকে নৈরাশ্যেই ভূত করিয়া ফেলে।
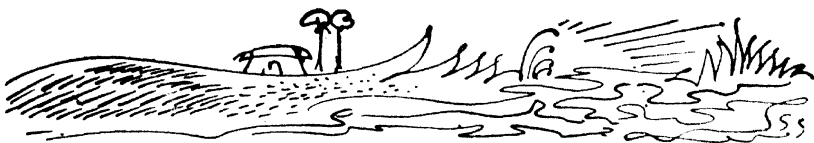
পাকিস্থান ও মধ্যপ্রাচ্য

...টা'র অর্থাৎ North Atlantic ... Organisation-এর অনুরূপ ... সাধনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যেও একটি ... গড়ে তোলার চেষ্টা অনেক দিন থেকে ... এটির নাম হবে Middle East ...ce Organisation, সংক্ষেপে মেডো ...O) বলা যেতে পারে। সুয়েজ ... বৃটিশ সৈন্য রাখা ও সুদানের ...—এই দুই বিষয়ে বৃটেনের সঙ্গে ... গোলমাল এখনো মিটছে না। ... ব্যাপার নিয়ে ইরানের সঙ্গেও ... মামলার নিষ্পত্তি এখনো বাকী। ...টো বড়ো গোলমাল কোনোরকমে ... পারলেই, মধ্যপ্রাচ্যে মেডো আত্ম... করতে পারে। তবে ভিতরে ভিতরে ...মর্শ অনেকদূর এগিয়েছে বলে মনে ...াকিস্থানকেও মেডোতে যোগ দেয়া...টা হচ্ছে,—সম্প্রতি এই ধরণের সংবাদ ... বিষয়টির প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি ...ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। এমনকি এই ... ভারতের প্রধানমন্ত্রী হায়দরাবাদে ... অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবে উদ্বেগ ... করেছেন। কেবলমাত্র উড়োখবরের ...নির্ভর করে পণ্ডিত নেহরু এরূপ ...গুরুতর আন্তর্জাতিক বিষয়ে মত... করবেন—এটা সম্ভব নয়। সুতরাং ...টেছে, সেটাকে ভিত্তিহীন বলে মনে ...চিত হবে না, যদিও লণ্ডন ও করাচী ...পর্যন্ত কিছু স্বীকার করতে চাচ্ছে ...

...তু ইংগমার্কিন ব্লক যদি পাকিস্থানকে ...ত যোগ দিতে আহ্বান করে থাকে ...াকিস্থান যদি সে আহ্বানে সাড়া ...থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ... ভারতবর্ষ যেদিন বিভক্ত হয়, সেদিনই ...ম্ভাবনার বীজবপন হয়। হয়ত ... আগে। কারণ পাকিস্থান সৃষ্টির ...বর বৃটিশ সমর্থকগণের মধ্যে ...রই উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্থানকে মধ্য... সামিল করে নেওয়া। তার কারণ ...—একটি রাজনৈতিক এবং অপরটি ...ক। রাজনৈতিক কারণটি হচ্ছে এই যে ...থান পেয়ে পাকিস্থানীরা বৃটিশের ... থাকতে এবং সবচেয়ে বেশি-

...সংখ্যক মুসলমানের বাসভূমি হিসাবে পাকিস্থানকে যদি মুসলিম জগতের নেতা বলে খাড়া করা যায়, তবে তার মারফৎ মধ্যপ্রাচ্যকে হাতে রাখা সহজ হবে। সামরিক কারণটিও দুর্বোধ্য নয়। গত দুই মহাযুদ্ধের সময়ে দেখা গেছে যে ইরান, ইরাকে যদি ভালোভাবে যুদ্ধ করতে হয়, তবে তার জন্যে পিছনে ভালো বড়ো ঘাটি রাখা দরকার। সে ঘাটি গত দুই মহাযুদ্ধের সময়ে ছিল ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে যদি ঘাটি না থাকত, তবে প্রথম মহাযুদ্ধে বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইরান, ইরাকে সফলতা লাভ করা সহজ হোত না। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্বন্ধেও একথা খাটবে। সুতরাং ইংগ-মার্কিন তরফ থেকে পাকিস্থানকে মেডোতে যোগ দিতে বলা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতে অথবা পাকিস্থানে যদি ঘাটি রাখার ব্যবস্থা না থাকে, তবে কার্যকালে মেডো'র খুবই অসুবিধা হবে। সেইজনাই পাকিস্থানকে মেডোতে যোগ দেয়াবার চেষ্টা হচ্ছে। এই চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে যদিও দূরদৃষ্টিতে পাকিস্থানের পক্ষে মেডোতে যোগ দেওয়া সব দিক থেকেই অহিতকর হবে।

মেডোতে যোগ দেবার মানে পুরোপুরিভাবে ইংগ-মার্কিন ব্লকের অংগীভূত হওয়া। যুদ্ধ লাগলে সংগে সংগে তাতে জড়িয়ে পড়তে হবে, নিরপেক্ষ থাকার প্রশ্নই থাকবে না। এই অশুভ সম্ভাবনা যে কত অশুভ, সে বিষয়ে বাক্যাবিস্তারের প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ের কথা ছাড়াও এর আর একটা অত্যন্ত খারাপ দিক আছে। মেডোতে যোগ দেওয়ার একটা ফল হবে এই যে, পাকিস্থান একটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ—এই ধারণাটি পাকিস্থানবাসীদের মনে দানা বাঁধতে শুরু করবে। তার নৈতিক ফল খুবই খারাপ হবে, কারণ এই ধারণার প্রভাবে পাকিস্থানের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলির মতন হবার দিকে একটা টান অনুভব করবে। আজ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেরই রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সর্বত্রে বিদেশী প্রভাবের সহিত সংঘর্ষ ও আপোষের গোঁজামিলের ফাঁকে ফাঁকে দুর্নীতির ক্লেদ বেরুচ্ছে। খুন-খারাবী লেগেই আছে, গণতান্ত্রিক শাসন কোথাও দৃঢ় হতে পারছে না, বরঞ্চ গতি উল্টা দিকে। একটির পর একটি দেশে স্বনামে অথবা বেনামীতে সামরিক ডিক্টেটরীর উদ্ভব হচ্ছে। এই রকম আবহাওয়ার সংগে সাযুজ্যে বোধ আনার ব্যবস্থা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলা অনাবশ্যক। কিন্তু হয়ত পাকিস্থানের অবস্থা ভিতরে ভিতরে এমন হয়ে এসেছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের উক্ত বর্ণিত আবহাওয়ার সংগে খাপ খায়। এই

যদি হয়ে থাকে, তবে পাকিস্থানের কল্যাণ হবে, যদি সে মধ্যপ্রাচ্যের আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। তা না করে সে এমন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করছে, যাতে অধোগতি আরো দ্রুত হবার সম্ভাবনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাকিস্থানের বর্তমান পরিস্থিতির ভিতর এমন কতকগুলি শক্তি কাজ করছে, যেগুলি পাকিস্থানকে মেড্যো'র দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্থানে একদল লোক আছে, যারা পাকিস্থানকে মুসলিম জগতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার জন্য গত পাঁচ বছর ধরে নানারকম চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। অন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পাকিস্থানের মাতব্বরী মেনে নিতে রাজী হয়নি। তাহলেও যারা পাকিস্থানকে মুসলিম জগতের নেতারূপে দেখতে চায়, তাদের স্বপ্ন এখনো ভাঙে নি। মেড্যো'র পরিকল্পনার দ্বারা এরা আকৃষ্ট হবে। মেড্যো'র ভিতর টার্কীকে বাদ দিলে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলির তুলনায় পাকিস্থানের মর্যাদা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ সামরিক শক্তি হিসাবে পাকিস্থানের গুরুত্ব বেশি হবে। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাকিস্থানের প্রাধান্য যারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তারা মেড্যো'র মারফৎ খানিকটা কাজ হাঁসিল করার আশা করবে। পাকিস্থানবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করার অবসর এদের নেই।

পাকিস্থানের মেড্যো'র দিকে ঝুঁকবার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা। গত দু বছরে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। মেড্যোতে যোগ দিলে ইংগ-মার্কিন তরফ থেকে নানাভাবে সাহায্য পাওয়া যাবে, এই আশা অনেককে প্রলুব্ধ করবে। পাকিস্থানের সরকারী নেতারা এখন হালে পানি পাচ্ছেন না, সুতরাং ইংগ-মার্কিনের সাহায্যের জন্য তাঁরা লালায়িত হবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদিও দূরদৃষ্টিতে এটাও ভুল, কারণ আখেরে দেখা যাবে যে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি একতালে চালান যায় না, বিদেশী সাহায্য পেলেও না। তবে মেড্যো'তে যোগ দিলে জনসাধারণের অবস্থার যাই হোক না কেন, পাকিস্থানের সামরিক শক্তি বাড়বে, এই আশায় অনেকে উৎফুল্ল হবে। মেড্যো'তে যোগ দিয়ে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি লাভের কথাটাই এরা ভাবছে, কিন্তু যদি দুই ব্লকের মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং মেড্যো'র ভিতরে... জন্য যদি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, ... দরুণ যে কল্পনাতীত ক্ষতি হওয়া স... সেটা এরা হিসাবের মধ্যে আনছে না কারণ, ভারতের প্রতি বিদ্বেষের দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এরা যে প্রকারেণ ভারতের তুলনায় পাকি... সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই মেড্যো'তে যোগ দিলে পাকিস্থানকে ... করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে ইংগ-... ব্লক অবশ্যই তৎপর হবে, তাতে পাকি... সামরিক শক্তি কিছুটা বাড়বে সন্দেহ ... পাকিস্থানের অনেক নেতা মনে করে... সেই শক্তি ভারতের উপর চাপ দেওয়ার ব্যবহার করা যাবে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অনেকে ভাবে যে, বৃটেনে...

(সি ২

অস্ত্রশস্ত্র পেলে সেগুলি সুযোগ মতো ...কে শায়েস্তা করার কাজে লাগানো ...কিন্তু মেডো'তে যোগ দিলে ভারতের ...পাকিস্থানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি আশা যারা করছে, তারাও বোধ হয়, ...রছে। কারণ পাকিস্থানে যদি অস্ত্র-...ধুম লেগে যায়, তবে ভারত গভর্ন-...নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন না। দুই রাষ্ট্রের ...পারস্পরিক মনোভাব ... যতদিন না ... ততদিন পর্যন্ত ভারত গভর্নমেণ্ট ...থানকে ভারতের তুলনায় অধিক ...লী হতে দেবেন না। পাকিস্থান যদি ...মরিক শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে, ...রত গভর্নমেণ্টও স্বীয় সামরিক শক্তি ...করার ব্যবস্থা করবেন। কিভাবে ...সে প্রশ্নের আলোচনা বারান্তরে করা ...তবে ভারত গভর্নমেণ্ট যে ভারতের ...তে পাকিস্থানের সামরিক শক্তিকে ...াড়তে দেবেন না, সে বিষয়ে সন্দেহ ...যদিও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার ...গিতার ফল কারো পক্ষেই পরিণামে ...বে না।

...স্থানী সরকারী নেতাদের বোধ হয় ...আশা হচ্ছে এই যে, মেডো'তে যোগ ...ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা যেমন করে হোক ...টা পাকিস্থানকে পাইয়ে দেবে। এ ...কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্থান ইঙ্গ-মার্কিন তরফের সহানুভূতি ...। গিলগিট প্রভৃতি অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিনের ঘাটি রাখার পরিকল্পনাও হয়ত সুস্থির হয়েছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন যতটা করেছে, তার চেয়ে আর বেশি কী করতে পারে? জোর করে কাশ্মীর দখল করে পাকিস্থানকে দিয়ে দেবে? সেটা সম্ভবপর নয়। একটু তলিয়ে দেখলে যে-যে আশায় পাকিস্থান মেডো'তে যোগ দিতে চাইছে, সবগুলিরই ভিত্তি অতি দুর্বল এবং এর পরিণাম ফল বিষময়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আপাত ঘটনা ও অতীতের কৃতকর্মের চাপে দূরদৃষ্টি দিয়ে অনেকেই দেখতে পারছে না।

ভারত গভর্নমেণ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। যদিও ভারত বিভাগে যাঁরা সম্মত হয়েছিলেন, বর্তমান পরিণতির জন্য ইতিহাসের নিকট তাঁদেরও দায়িত্বের অংশ স্বীকার করে নিতে হবে। যে পরিস্থিতির আজ উদ্ভব হয়েছে, এটা ভারত বিভাগেরই অন্যতম ফল। ভারত বিভাগের দ্বারা ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য ও ভারত ইতিহাসের ধারা উভয়কেই খণ্ডিত করা হয়েছে, যার ফলে সামরিক সুরক্ষার দিক থেকে আজ এই নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের এক অংশের মধ্যপ্রাচ্যের সামিল হয়ে যাবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার প্রতিরোধ করার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করা আবশ্যক। কেবল পাকিস্থানের অথবা কোন বর্তমান ভারতীয় রিপাবলিকের স্বার্থে প্রচেষ্টা নয়, আবশ্যক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ, যার মধ্যে বর্তমান ভারতীয় রিপাবলিক এবং পাকিস্থান উভয়ই রয়েছে, সেই ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের স্বার্থে এ চেষ্টা কর্তব্য। এ-কাজ যদি না করা হয়, ভারত বিভাগের এই বিষময় ফল খাওয়া থেকে যদি পাকিস্থানকে প্রতিনিবৃত্ত না করা যায়, তবে এই দেশকে আবার কয়েক শতাব্দীর জন্য বিশৃঙ্খলার সহবাস স্বীকার করে নিতে হবে। মেডো'র ভিতর টাকীকে বাদ দিলে উভয়ের জনসাধারণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। ইতিহাস অত্যন্ত নির্মম, তার হাত থেকে সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। ইতিহাস যাকে এক করেছে, তাকে দুভাগ করে স্বস্তিতে বাস করার কল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ভুলের মূল্য কিভাবে কতদিন দিতে হবে, কে জানে! তবে ভুল একদিন শোধরাতেই হবে।

২০।১।৫৩

তৃতীয় পৃথিবী

দিনেশ দাস

দু'ধারে আগুন জ্বলে—নীল আর গোলাপী আগুন,
শান্তির সোনালী নদী ভয়ে ভয়ে থেমে গেল—থামে গুনগুন ঃ
দুদিকে আগুন জ্বলে, বহ্নির বলয়
মাঝখানে স্থির হিমালয়।

ধোঁয়া ওড়ে—মৃতবাষ্প ঘোরে
ভোর আর হয় নাকো, আকাশ নেশার ঘোরে ঘুমোয় অঘোরে,
অশুভ অশুচি ছায়া পড়ে
গৃহস্থের ঘরে ঘরে, মাঠে, ক্ষেতে—অঙ্কুরিত বীজের উপরে।

শিবভূমি হিমালয়ে শান্তির তুষার
গঙ্গা-যমুনার গান নতুন ঊষার ঃ
ভারতের প্রাচীন মৌচাক হ'তে
অজস্র শান্তির মধু ঝরে দিনে, রাতের আলোতে।

তবুও এখানে যদি বিনামেঘে ঝড় তোলে কেউ
তখনি সুদূর কন্যা কুমারিকা হ'তে উত্তাল উন্মাদ ঢেউ
ছেয়ে যাবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের তীর,
স্থির
গৌরীশঙ্কর-শিখরে
চমকাবে বজ্রশিখা প্রহরে প্রহরে,
প্রশান্ত তুষার-দুধ
চোখের নিমেষে হবে রক্তের বুদ্‌বুদ।

দু'পারে আগুন জ্বলে ঃ
জ্বলন্ত তারার মত গন্‌গনে আঁচে
দুটি পথ পোড়ে যদি, জ্বলে যদি দুইটি শিবির ঃ
তবু জানি অন্যপথ, হয়তো তৃতীয় পথ আছে,
তৃতীয় পৃথিবী আছে—আশা, শান্তি, সবুজ শিশির!

ছাব্বিশে জানুয়ারী

শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা
। পঞ্চনদের পবিত্রভূমিতে সমবেত
ভারতের দেশপ্রেমিক সন্তানগণ
মির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্নি-
দীক্ষা গ্রহণ করেন। যে ভূমিতে
ন ঋষিকণ্ঠ হইতে পবিত্র বেদমন্ত্র
ত হইয়াছিল সেই স্থান হইতে
তর মুক্তিকামী সন্তানদের মুখে
নতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবাক্য
রত হয়। সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর
সে সাধনা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে।
স্বাধীনতা পাইয়াছে। মুক্তির
জাতির এই অগ্রগতির পথ কোনদিনই
ম আস্তৃত থাকে না। ভারতের পক্ষেও
ছিল না। শোণিতসিক্ত পথে দুর্গমের
অভিযানে জাতিকে অগ্রসর হইতে
ছে। আত্মদাতা সন্তানদের উত্তপ্ত রক্তে
-সাধনার বেদীমূলে সিক্ত হইয়াছে।
তর সে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস
বিচিত্র এবং জগতে মানব-মুক্তি
ায় সে সংগ্রাম অভিনব এক অধ্যায়
ক্ত করিয়াছে।

ামাদের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে,
ীনতা-সংগ্রামের নেতাহিসাবে আমরা
তর অন্যতম মহামানবকে লাভ করিয়া-
াম। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের
র দিয়া মানবের অন্তর মহিমাকে
ন নূতন আলোকে উদ্দীপ্ত করিয়া
লেন। গান্ধীজীর জীবন-সাধনায়
মানবের সংস্কৃতি উদার অভিব্যক্তির
ন পথের সন্ধান পায়। রাষ্ট্রনীতিক
ত্র অহিংস নীতির প্রয়োগ গান্ধীজীর
নার বৈশিষ্ট্য। এই নীতির প্রয়োগ-
ণ্যে মানবের অন্তর-মহিমার কাছে
বলের পরাজয় ভারতে স্বাধীনতা-
ামকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্য আমাদের এখনও সিদ্ধ হয়
। স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি
; স্বাধীনতা দিবস বর্তমানে প্রজাতন্ত্র
ষ্ঠা দিবসস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।
নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী দেশবাসীর দ্বারা
দেশের শাসন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।
কিন্তু যে আদর্শ লইয়া আমরা
স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে
লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এদেশের আত্মদাতা
সন্তানগণ হৃদয়ের তপ্ত রক্ত উৎসর্গ করিয়া-
ছিলেন, তাহা আজিও সম্যক্‌রূপে
পূর্ণ হয় নাই। ফলত ভারতের
স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃস্বরূপে গান্ধীজীর
সাধনা এখনও অপূর্ণই রহিয়া
গিয়াছে। এ সত্য আমাদের বিস্মৃত হইলে
চলিবে না। আমরা আমাদের লক্ষ্য-পথে
কতটা অগ্রসর হইয়াছি সে সম্বন্ধে আমাদের
আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ব্রত
যদি উদ্‌যাপিত না হয়, তবে আমাদের
শান্তি নাই, নিবৃত্তি নাই।

দীর্ঘদিনের বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে
মুক্তিলাভ করা খুবই একটা বড় কথা সন্দেহ
নাই; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে শুধু
সেই বস্তুই বুঝায় না। বস্তুতঃ জাতি যদি
তাহার অগ্রগতির পথে আত্মশক্তিকে ফিরিয়া
না পায়, তবে তাহার স্বাধীনতার কোন
মূল্যই থাকে না। স্বাধীনতা বীরভোগ্যা।
সে জিনিস দুর্বলের জন্য নয়। সুতরাং
রাষ্ট্রীয় যে স্বাধীনতা আমরা লাভ
করিয়াছি তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে
হইলে জাতির মনের মূলে যে
সব দুর্বলতা এবং দীর্ঘদিনের পরা-
ধীনতাজনিত গ্লানি জমিয়া রহিয়াছে,
সেগুলি উৎখাত করিতে হইবে।
প্রকৃত এজন্য আমাদের সমাজ-জীবনে
এবং রাষ্ট্র-সাধনার ক্ষেত্রে নৈতিক শক্তিকে
সুদৃঢ় করিয়া তোলা দরকার। দেশ ও
জাতির প্রতি কর্তব্য বোধে যদি আমরা
জাগ্রত না হইতে পারি, তবে বুঝিতে
হইবে, স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা আমরা
অর্জন করি নাই এবং পরাধীনতার
বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া আমাদিগকে পুনরায়
নিজেদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে
হইবে এবং সেক্ষেত্রে অতীতের কোন অধ্যাত্ম-
গরিমাই আমাদিগকে বর্তমান দুর্গতি
হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিবসের আজ এই
তৃতীয় বার্ষিক তিথিতে ভারতের ত্রিবর্ণ-
রঞ্জিত জাতীয় পতাকার তলে সমবেত
হইয়া জাতিকে আজ নূতন সংকল্প গ্রহণ
করিতে হইবে। ভারতের যিনি ভাগ্যবিধাতা
তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকল রকমের
দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া জাতির সেবায়
আত্মনিবেদনের ব্রত আমাদের নূতনরূপে
গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা-
সংগ্রামে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন,
তাঁহারা আমাদের কাজের দিকেই তাকাইয়া
আছেন। তাঁহাদের অনুদ্‌যাপিত ব্রত যাহাতে
উদ্‌যাপিত হয়, সেজন্য তাঁহাদের অমর
আত্মা আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।
আমরা যেন আজ একথা ভুলিয়া না যাই।
বাস্তবিতপক্ষে আমাদের শিরায় মানুষের
রক্ত বিন্দুমাত্র যদি থাকে, তবে এদেশের
স্বাধীনতা-সংগ্রামের আত্মদাতা সন্তানদের
কথা আমাদের পক্ষে বিস্মৃত
হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা
তাঁহাদের কথা ভুলিব না। তাঁহাদের
অনুদ্‌যাপিত ব্রত আমরা পূর্ণ করিব।
পরন্তু সেজন্য নিজেদের শেষ রক্ত-
বিন্দু পর্যন্ত যদি আমাদিগকে দিতে হয়,
তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমরাও
মানুষ; মনুষ্যত্বের মর্যাদা আমরা রাখিব।

ব্রত আমাদের পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জাতি
এখনও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত
রহিয়াছে, স্বার্থ এবং সংকীর্ণতার পাঁকে
এখনও অনৈক্য ও ভেদ-বিদ্বেষ পাপ জাতির
অন্তরকে অভিভূত করিতেছে, দুর্নীতির
বেড়াজাল দেশ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং
দরিদ্রের অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইয়া পিশাচ-
দলের এখনও চলিতেছে দেশের বুকে
তাণ্ডব নৃত্য। এই অবস্থার প্রতিকার
আমাদিগকে করিতে হইবে। 'জাগো বীর
ঘুচায়ে স্বপন'! দেবতার আহ্বান
আসিয়াছে। আজ সকলে ভারতের অন্তর-
দেবতার সেই অগ্নিময় আহ্বানে সাড়া
দিবার জন্য প্রস্তুত হও—'চূর্ণ হোক্,
স্বার্থ, সাধ, মান,' অখণ্ড ভারতভূমিতে
মহান্ প্রাণ জাগিয়া উঠুক।
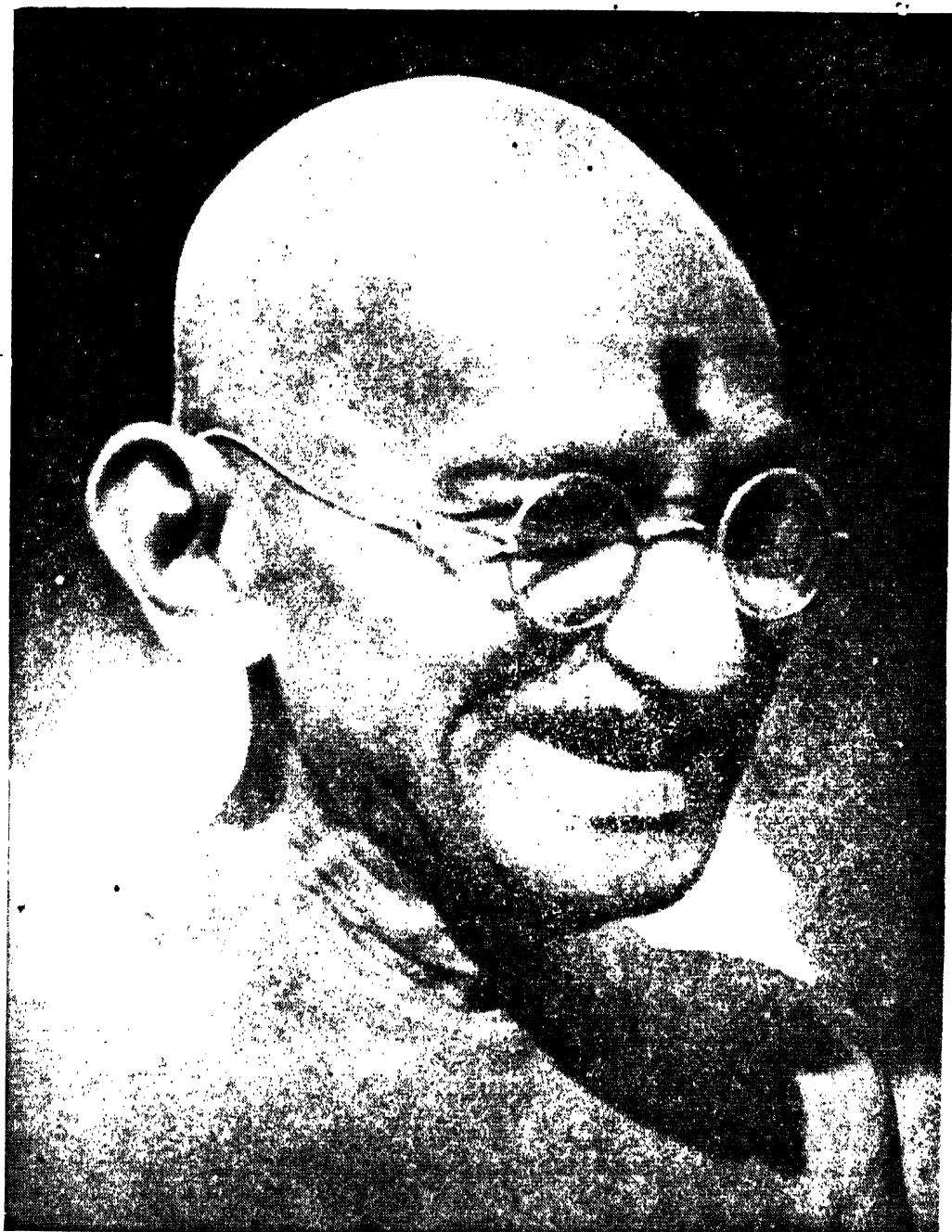
'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'

সুভাষচন্দ্র

শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি। এই হিসাবে ভারতের স/এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শুধু ভারতের কথাই বা বলি কেন, ন্দ্রের জন্মতিথি জগতের ইতিহাসেই যাগ্য হইয়া থাকিবে। বস্তুত দিনের পরাধীনতায় অভি- ভারতে সুভাষচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব ভূতপূর্ব ব্যাপার। এদেশে অবতার- হামানব অবতীর্ণ হইয়াছেন। মৈত্রী মানবতার বাণী তাঁহারা প্রচার ছেন। বিশ্বজনীন সত্যকে তাঁহারা র জীবন-সাধনায় দীপ্ত করিয়া ছেন। তাঁহাদের অবদানে ভারতের সমৃদ্ধ হইয়াছে, অজ্ঞানতার আঁধার ছে। মানুষ তাঁহাদের জীবনাদর্শে সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। একথা ত্য; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনে একটি বিশেষত্বের পরিচয় আমরা প্রকৃতপক্ষে, অবতারকল্প মহা- দের লোকোত্তর চরিত্র মহিমায় আমরা হই, তাঁহাদের প্রতি আমাদের দ্ধিত হয়; কিন্তু যে সত্যের প্রত্যক্ষ ধর উপর তাঁহাদের জীবনাদর্শ হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার মত আমাদের সকলের থাকে না এবং আমাদের বাস্তব জীবনে তাঁহাদের সর্বাঙ্গীনভাবে সার্থক করিয়া আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব ফলত সনাতন আদর্শ হিসাবেই সে তাঁহাদের অবদান অনেক- মুখ্যভাবে কাজ করে। আমরা কে যতটা বুঝি, শুধু তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পারি; সুতরাং লোকোত্তর চরিত্র গণ এবং আমাদের মধ্যে বাস্তব কর্মের ক্ষেত্রে একটা ব্যবধান যায়।

ষচন্দ্রের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এই ক বিলোপ করিয়া দিয়াছে। ভারতের সমাজ-জীবনে তাঁহার জীবনাদর্শ প্রাণশক্তির আবর্ত সৃষ্টি করে। বর্তের গতিতে এদেশের জন-জীবনে ন্য, সকল দুর্বলতা একেবারে বিচূর্ণ যায়। গোটা ভারতের চিত্ত র খেলায় মাতিয়া উঠে। বৃহত্তর অগ্নিময় প্রেরণা জাতির জীবনে তা লাভ করে। ভারতের সমাজ- ক দীর্ঘদিনের অবসাদ হইতে মুক্ত করিয়া বৃহদাদর্শ সাধনে জাতির আত্মমহিমা অমোঘ বীর্যে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া অঘটন ঘটানো সুভাষচন্দ্রের জীবন-সাধনার বিশেষত্ব। সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অধ্যাত্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত অমৃতের আহ্বান হয়ত সুভাষচন্দ্রের জীবন-সাধনায় জাতি পায় নাই; কিন্তু আমরা বলিব, তাহা অপেক্ষাও সুভাষচন্দ্রের সাধনায় জাতি বড় জিনিস পাইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে জাতি তাহার বাস্তব-জীবনে দুর্গতি হইতে মুক্ত হইবার মত প্রাণধর্মের সাড়া পাইয়াছে। সুভাষচন্দ্র দুর্বল জাতির অন্তরকে অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বীর ব্রতের উদ্বোধন করিয়াছেন এবং গূঢ় অধ্যাত্ম-তত্ত্বের গ্রন্থির পাকে জাতির মনো-বুদ্ধিকে তিনি সংশয়ের মধ্যে পড়িতে দেন নাই। ভারতের ইতিহাসে ইহা সত্যই অভূত-পূর্ব ব্যাপার এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুভাষচন্দ্রের এই বীর্যময় অবদান অভাবনীয়। এ জাতি বহুদিন এমন মানুষ পায় নাই। সুভাষচন্দ্রের জীবনে গীতার আদর্শই জীবন্ত হইয়া উঠে। বীরধর্মে নিষ্কাম কর্মের সাধনার সর্বাঙ্গীন রূপটি এখানে আমাদের চোখে পড়ে। পরাধীন ভারতের আকাশে ভারতের আত্মার মেঘ-বিনির্মুক্ত জ্যোতি দিগন্তে চমক জাগায়।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের অবদান শুধু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল, একথা বলিলে ভুল হইবে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বীর্যময় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি অন্যান্য দেশেও ঘটিয়াছে দেখিতে পাই; কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদাতা সেই বীরেন্দ্রবর্গের মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাঁহার জীবনাদর্শ বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিপীড়িত মানব-সমাজের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদনে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপনা সঞ্চার করে এবং সমগ্র এশিয়ার জন-জাগরণে দুর্নিবার সংকল্পশীলতা উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। অন্য দেশের মুক্তি-সাধকদের জীবন-সাধনায় এমন ব্যাপ্তি-চেতনার দীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুভাষচন্দ্র এই দিক হইতে সত্যই একক এবং অনন্যসাধারণ।

সুভাষচন্দ্রের সাধনা সার্থক হয় নাই, এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আমরা বলিব, তাঁহাদের বিচার নিতান্তই ভুল। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার হিসাব করিয়া শক্তির স্বরূপ এবং তাহার সম্ভাব্যতাকে নির্ণয় করা যায় না। বাস্তবিক সত্য এই যে, আমরা বর্তমানে যে স্বাধীনতা পাইয়াছি, তাহা সুভাষচন্দ্রের সাধনারই ফলে। ইংরেজ জাতিটা এতটা সহজ, সরল এবং উদার নয় যে, স্বেচ্ছায় তাহারা ভারত ছাড়িয়া গিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ দলের সামরিক শক্তিকে তাহারা সাম্রাজ্য-বাদী অপরাপর মিত্রবর্গের সাহায্যে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল, একথা সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা বিশেষভাবেই ইহা বুঝিয়া লয় যে, ভারতের যে সৈন্যশক্তি তাহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন, সেই ভারতীয় সেনাদলের উপর আর বিশ্বাস রাখা চলে না। সুতরাং সময় থাকিতে ভারত হইতে বিদায় লওয়াই তাহারা সুবুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া মনে করে। ফলত হিংসা-অহিংসার তাত্ত্বিক বিচার ইংরেজ বুঝে না। তাহারা শক্তেরই ভক্ত। সুভাষচন্দ্রের অবদানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের শক্তিরই পরিচয় পায় এবং তাহার ফলেই আমাদের স্বাধীনতা আসে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীনতার জন্য দুরন্ত জীবন-ব্রত বরণ করিয়া লইয়া-লইয়াছিলেন, সে স্বাধীনতা এখনও আসে নাই। ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত, শুধু তাহাই নয় জাতির জন-জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যে অভিভূত, অনৈক্য এবং ভেদ-বিদ্বেষ সমগ্র জাতিকে অনর্থের অভিমুখে লইয়া চলিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের আদর্শ স্বাধীন ভারতে এমন সব হীনতা, দীনতার স্থান নাই। জাতির যুগাগত কার্পণ্য এবং দুর্বলতা মুক্ত করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে আমরা তাঁহার জীবনাদর্শের অনুধ্যান করি। সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদেরই একান্ত আপনার জন; এজন্য আমরা গর্ববোধ করি। বাঙ্গলার আজ বড়ই সংকটের দিন। এ দুর্দিনে তাঁহার ন্যায় নেতার অভাব আমরা একান্তভাবেই অনুভব করি। তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত নাই; কিন্তু তাঁহার আদর্শ রহিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনায় জাতিকে জাগ্রত করুক, তাঁহার ৫৭তম জন্মতিথিতে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বার্লিনে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

কালীচরণ ঘোষ

ভক্ত ভারত আজও প্রায় ৩৬ কোটি লোকের বাসস্থান। চীন বাদ দিলে ীর মধ্যে জনসংখ্যায় ইহা এখনও য় স্থান অধিকার করিয়া আছে। া চল্লিশ কোটি লোক প্রায় দুইশত বিদেশী শাসকের অধীনে বাস ছে, সেখানে একপক্ষে বিদেশী র রীতি আর অপর পক্ষে ভারতীয় ণ লোক যাহারা—

ড়ায়ে নতশির
ব, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
ন মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
দিয়ে যায় সন্তানের বংশ বংশ ধরি,
সে অদৃষ্টেরে নাহি নিন্দে বিধাতারে স্মরি,
নাহি কভু দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টেক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

ইহাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাহাতে বিপুল ধনসম্পদের ভারতে মুষ্টি-মেয় লোকের মানুষের মত বাঁচিবার সুবিধা সুযোগ ঘটিয়াছিল। আর সব মানুষের অধিকারে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছে। দেশে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ধন উপার্জনের ক্ষেত্র সবই ক্রমে সংকুচিত হইয়াছে, অতুল প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ঘটিয়াছে, কৃষি, শিল্প, সেচ, পরিবহন, শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি যাহা মানুষের সুখেস্বচ্ছন্দে বাঁচিবার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা সম্যক প্রসারলাভ করে নাই। যাহা আজ দেখা যায় তাহা কয়েকটি পুরুষসিংহের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলন অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতির সমর্থনে ঘটিয়াছে। 'সভ্য' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, গবর্নমেণ্ট মাত্র সেই অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে এবং বিধিবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে রূপ-দান করা সম্ভব।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও ছিল এবং তাহার পরেও কেন্দ্রীয় ও প্রত্যেক রাজ্য সরকার জনকল্যাণকল্পে বিভিন্ন বিভাগে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছে। এখন প্রাক্তন শাসনযন্ত্র পালক-রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করায় কর্মপদ্ধতির পরি-বর্তন আবশ্যক হইয়াছে; আরও আবশ্যক হইয়াছে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাকে একত্রীভূত করিয়া সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া। সকল দিক বিবেচনা করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার চিত্র একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, সাধারণের জীবনের মান উন্নত করা, প্রতি নাগরিকের ধীশক্তির সহজ প্রকাশের পথের বাধা দূর করা, উপার্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া জীবনকে

হীরাকুণ্ডু বাঁধ পরিকল্পনা। বাঁধের দক্ষিণ পার্শ্বের অংশবিশেষের দৃশ্য
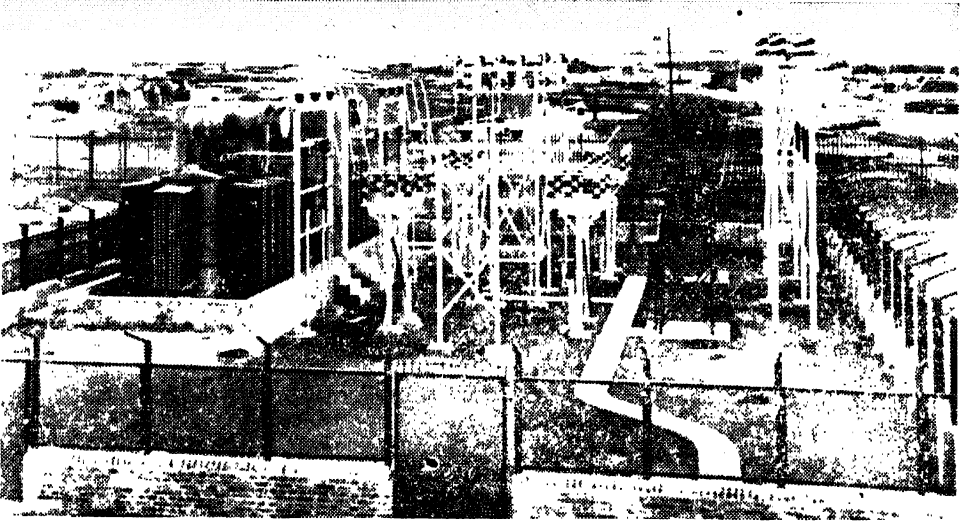
চিত্তরঞ্জনে হাইড্রো ইলেকট্রিক রিসিভিং স্টেশন

পূর্ণভাবে ভোগ করিবার উপায় করিয়া না দিলে আজ আর চলে না। ধনের বৈষম্য মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে; যাহার আছে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া যাহার নাই, তাহাকে দিলেই দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় না। যাহা অবান্তর, তাহা লইয়া দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করার যেমন রাষ্ট্রের অধিকার আছে, যাহার নাই বা সামান্য আছে, তাহার অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিবার দায়িত্বও আছে; ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকে নাগরিকে সকল বিভেদ উপেক্ষা করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সেই কাম্য অবস্থা যাহাতে বিনা উপদ্রবে সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহার কর্মপদ্ধতি এবং কার্যক্ষেত্রে তাহার সম্যক প্রয়োগ চেষ্টা আজ ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

মানুষের স্বাধিকারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে রাষ্ট্র যে স্থানই অধিকার করুক বা যত সাহায্যই করুক, প্রত্যেকের একটা নিম্নতম প্রয়োজনের তুলনায় অর্থসংগতি থাকা চাই। অতুল সম্পদের আকর হইলেও ভারত-বাসীর মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম; তাহার একদিকে আছে ধনকুবের; আর অপরদিকে বিত্তহীন উপার্জনহীন অজস্র নিঃস্ব। যাহাতে সকলেই কিছু উপার্জন করিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে, তাহার উপায় না থাকিলে কোনও রাষ্ট্রই শান্তিতে বাস করিতে পারে না। যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মানুষের একান্ত প্রয়োজন এবং তাহার পাইবার ইংগিত ও ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেইরূপ অর্থ উৎপাদন ও কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্র সৃজন অথবা প্রসারের পথ নির্দেশ করা একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অপরিহার্য অংগ এবং সেই কারণেই পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের পরিপূরক রূপে গঠন করা হইয়াছে।

ভারতের মত নানাবিধ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার নাগরিকের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে যে অসুবিধা আছে, তাহা উপেক্ষা করিলে চলে না। দরিদ্র, নিরক্ষর, স্বাস্থ্যহীন, সহায়সম্বল বাসহীন লোক মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অধিকার করিয়া আছে। মানুষের নিত্য ব্যবহারে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহার অভাব চতুর্দিকে বর্তমান। ইহার সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সর্বাধিক মংগল একমাত্র লক্ষ্য; তাহা না হইলে বিভিন্ন স্বার্থে বিভিন্ন চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত সকল লোকের সন্তুষ্টি বিধান কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। এ সকলের উপর ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থ[illegible] অবস্থাকে উপেক্ষা করিলে চলে না[illegible] কারণে 'পরিকল্পনা' বহুর মত সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গঠন [illegible] হইয়াছে। সাধারণতন্ত্রের নীতি ও পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা স্মরণ [illegible] হইয়াছে। এক বা দল নায়কত্বে সা[illegible] বাধ্য করিয়া যাহা করাইতে পারা যায় সাধারণতন্ত্রের বিধিবহির্ভূত। [illegible] সকলে উন্নতিমূলক বিধানের মর্ম [illegible] স্বেচ্ছায় তাহার অংশ গ্রহণ করে এব[illegible] কল্পনা সফল করিতে চেষ্টা করে, এক্ষেত্রে একমাত্র কাম্য। সুতরাং [illegible] কল্পনা'র একটা আভাষ রূপ পাইলে [illegible] অনুযায়ী স্থানীয় কর্মী মূলে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা পরিবর্তন করিতে ইচ্ছ[illegible] তাহাতে বাধা-নিষেধ নাই। সুতরা[illegible] নায়কত্বে 'পরিকল্পনা' যে পথে [illegible] ভারতবর্ষে তাহা বর্তমানে সম্ভ[illegible] এখানে বে-সরকারী কর্মী ও কেন্দ্র[illegible] না করিয়া মিশ্র অর্থনীতি মানিয়া [illegible] হইয়াছে এবং সেই সম্পর্কে কোন[illegible] যাহাতে না ঘটে, তাহা পদে পদে ব[illegible] চেষ্টা করা হইয়াছে। বিরাট দেশ, জনসংখ্যা এবং অপরাপর 'সভ্য' [illegible] তুলনায় তাহার প্রয়োজনও বিরাট। দেশে সে বিপুল অর্থ সংস্থান

াং যে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহার
কর্মপদ্ধতি এবং লক্ষ্য সীমাবদ্ধ
ত হইয়াছে। অর্থ সঙ্গতি থাকিলে
নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপের কল্পনা করা
, তাহা সম্ভব নয়। এই কারণেই কার্য
কায় অগ্রাধিকার বিবেচনা করিতে
ছে। অর্থ ব্যতীত উপযুক্ত বিচক্ষণ
র অভাব আছে। আরও এক বিষয়
ই স্মরণ রাখিতে হয়। পরিকল্পনার
মক খসড়া প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে
ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে
তাহা সম্পূর্ণ করাই এখন প্রথম কর্তব্য
পরিগণিত হইয়াছে। সকল বিষয়কে
দিতে যে অর্থব্যয় হইবে, তাহার একটা
মানিক হিসাব লইয়া অগ্রসর হওয়া
উপায় নাই। নূতন করিয়া কোথাও
বাধিলে অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তু আসিয়া
ল, ভোজ্য বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে
ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইলে
অপরাপর কোনও কারণে বর্তমানের
দর বৃদ্ধি পাইলে ভীষণ অসুবিধা
র সম্ভাবনা। অপরদিকে নানা কারণ
রার সংযোগে, সম্ভাবনা কম
লও পণ্য মূল্য হ্রাস পাইলে অর্থ
দূর হইবার কথা। সুতরাং বর্তমান
কে মান হিসাবে ধরিয়া পরিকল্পনা
যে কোনও ত্রুটি হইয়াছে, তাহা
রা যায় না।

সকল কথা স্মরণে রাখিয়া 'পরিকল্পনা'
করিলে একটা নিরপেক্ষ মতামত
যাইতে পারে। যে সকল বিষয়কে
কার দান করিয়া মোট 'পরিকল্পনা'
হইয়াছে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত
দেওয়া যাইতে পারে। আজও
র ভূমি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদ
করিয়া থাকে এবং তাহার পরই ক্ষুদ্র
শিল্প ভারতের অধিকাংশ লোকের
ার সংস্থান করিয়া দেয়। ভূমি ও
র প্রয়োজন ও প্রসারের প্রতি প্রধান
রাখিয়া কারখানা, পরিবহন, সেচ
, শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি কৃষিশিল্পের
ধনোৎপাদনের অপরাপর ক্ষেত্রের
অবশ্যম্ভাবী। ধনোৎপাদনের মূল
লি বর্তমানে যেমন দেশের সম্পদ
করিতে সমর্থ, তাহাই আবার কালে
মূলধন অর্থাৎ অর্থোৎপাদন ক্ষেত্রের
সম্পদ বা সুযোগ সৃষ্টি করিয়া
পরিকল্পনা কমিশন এদিকে যথা
ন মনোযোগ দিয়াছেন এবং আশা
করেন যে, আগামী কয়েক বৎসরে এই
শ্রেণীর কার্যে জাতীয় আয়ের এক পঞ্চমাংশ
অধিক সম্পদ উৎপাদনে নিয়োজিত হইবে
এবং জাতীয় আয় বাৎসরিক ১০,০০০ কোটি
টাকা হইবে। বর্তমান আয়ের ইহা মাত্র
শতকরা ১১ ভাগ বেশী। তবে আশা করা
যায়, আগামী সাতাশ বৎসরে জনপ্রতি আয়
দ্বিগুণ হইবে।

ভারতের শতকরা সত্তর জন কৃষকও
কৃষি নির্ভরশীল লোক। সুতরাং ভারতের
উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি যে সর্বপ্রধান স্থান
গ্রহণ করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা
যায়। কেবল যে অন্নের সংস্থান করে তাহা
নয়, ভারতে কৃষি পণ্যের দারুণ অভাব এবং
প্রতি বৎসরই লোক বৃদ্ধির সহিত ভোজ্য
ও ভোক্তার পরিমাণে ব্যবধান বিস্তৃতি লাভ
করিতেছে। ১৯৪৮ সাল হইতে এপর্যন্ত
৭৫০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী
করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতের প্রধান
কয়টি শিল্পের প্রধান উপাদান কৃষি সরবরাহ
করিয়া থাকে। পাট, কাপড়, চিনি, চা, কফি,
বনস্পতি, স্টার্চ বা শ্বেতসার, ফল সংরক্ষণ,
ধান ও গম কল, বিস্কুট, ঘানি প্রভৃতি শিল্প
কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আছে; ইহাদের
প্রসারও কৃষির উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে
যুক্ত। খাদ্য তণ্ডুল, তৈলবীজ, পাট, তুলা,
ইক্ষু প্রভৃতি সকলেরই উৎপাদনের পরিমাণ
নির্ধারিত হইয়াছে। কৃষিকে স্বতন্ত্রভাবে
গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, সেচ ব্যবস্থা,
জনসংঘ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির কার্যবিধি
প্রকারান্তরে কৃষির উন্নতিসাধন করিবে।
কৃষি উন্নয়নের জন্য যদিও ৩৬০ কোটি ৪৩
লক্ষ টাকা মোট ব্যয়ের শতকরা ১৭·৪
ভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন
দিক হইতে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিয়োজিত
থাকিয়া সেচ প্রভৃতি মিলিয়া কৃষির উপর
৯২২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় ও মোট টাকার
শতকরা অংশ চুম্বকে দিলে দেখা যায়ঃ

	কোটি টাকা	শতকরা অংশ
কৃষি ও জনকল্যাণ পরিকল্পনা	৩৬০·৪৩	১৭·৪
সেচ ও শক্তি উৎপাদন	৫৬১·৪১	২৭·২
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৭·১০	২৪·০
শিল্প	১৭৩·০৪	৮·৪
সমাজ কল্যাণ	৩৩৯·৮১	১৬·৪
পুনর্গঠন	৮৫·০০	৪·১
বিবিধ	৫১·৯৯	১·৯
	২,০৬৮·৭৮	১০০·০

সেচ বিভাগের প্রধান কাজ কৃষি পণ্য
উৎপাদনে সহায়তা করা। কার্য শেষে চার
কোটি হইতে ৪·৫ কোটি একর জমিতে
জল সেচ বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে
৭০ লক্ষ অতিরিক্ত কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি
উৎপাদিত হইবে। ইহার মোট খরচ
২,০০০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু কার্যা-
রম্ভে যাহা প্রয়োজন তাহার একটা আভাষ
না পাইলে অসুবিধা হইয়া থাকে। পরি-
কল্পনায় স্থির হইয়াছে যে ১৯৫১ সালে যে
সকল কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাই
প্রথমে সম্পূর্ণ করিয়া পরে নূতন কাজে
হাত দেওয়া হইবে। ইহাতে ৭৫৬ কোটি
টাকা ব্যয় হইবে তন্মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৩
কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

কৃষির উন্নতির সহিত ভূমি ব্যবস্থার
আলোচনা যুক্তিযুক্ত। প্রতি মালিকের
অধিকারে একটা উচ্চতম পরিমাণ নির্দেশের
কথা আছে, প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ করা
নাই। পরিকল্পনা যাহাই হউক, গভর্ণ-
মেণ্ট পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হওয়া
বা তাহার পূর্ব হইতেই পালক রাষ্ট্রের
অংশ গ্রহণ করিয়া নানা আইনের সাহায্যে
ভারতীয় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য পালন
করিতেছে। অনেক রাজ্য সরকার ভূমি
ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন
করিয়াছে। কৃষক বা কৃষিজীবী মাত্রকেই
ভরণ-পোষণের উপযোগী ভূমির মালিক
করিয়া দিবার একটা চেষ্টা আছে। প্রকৃত-
পক্ষে ভারতবর্ষে কর্ষণযোগ্য এত জমি নাই
যাহাতে এই নীতি পালিত হইতে পারে।
একক মালিকের উচ্চতম পরিমাণ 'পরি-
কল্পনায়' নির্দিষ্ট না করিয়া বহু জমির
কৃষক মালিককে চাষের বিবিধ সুযোগ
দানের বিষয় বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া
যাহাতে কোনও জমির উৎপাদন হ্রাস না
পায়, জমি পতিত পড়িয়া না থাকে অথচ
একটা প্রচলিত মান অনুযায়ী চাষ হয়,
তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে আইনের
আশ্রয় লইতে বলা আছে। কৃষির উন্নয়নের
জন্য সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত কৃষি পদ্ধতি
গ্রহণ করিলে সুফল হইবে। এই ব্যবস্থায়
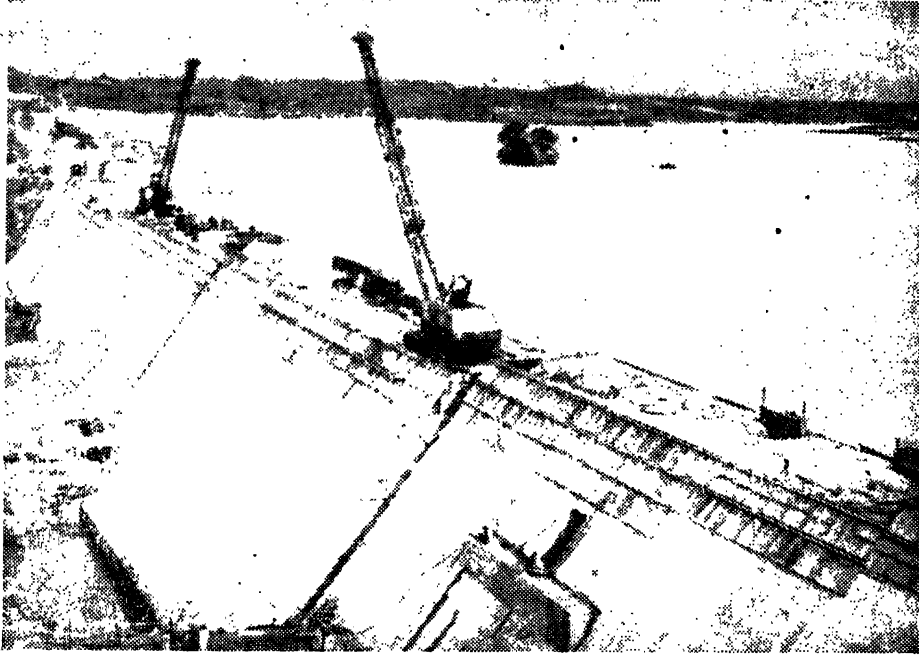
দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ১ম তিলাইয়া বাঁধের কাজ সম্পূর্ণপ্রায়। হ্রদটি ক্রমশ ভরাট হইয়া যাইতেছে

কেহ অতিরিক্ত জমি ভোগ করিতে গেলে তাহাতে যে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। জমির সহিত যখন সকলের স্বার্থ জড়িত তখন অধিকারের দাবী প্রমাণ করিলেই জমি ভোগ করা চলিবে না।

জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্তব্য কৃষির উন্নতি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কৃষি পণ্য ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় শিল্প প্রভৃতির উন্নতি ইহার অংশবিশেষ। পল্লী-শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত উপার্জনের পথ, গৃহ সমস্যা, নানাবিধ কারিগরী শিক্ষা এবং বৃহত্তর জনকল্যাণের ভার গ্রহণ করিয়া এই কেন্দ্রগুলি চলিতেছে। ইহাদের কার্যের দক্ষতা এবং কার্যকরী পরামর্শের সহায়তা দান করিবার জন্য জাতীয় (মঙ্গল) প্রসার প্রতিষ্ঠান (ন্যাশন্যাল এক্সটেনশন্ অরগ্যানিজেশন্) গঠনের নির্দেশ দেওয়া আছে। পরিকল্পনার প্রয়োগকাল শেষ হইবার সময় অন্তত ১,২০,০০০ গ্রাম এবং পল্লীবাসীর এক-চতুর্থাংশ উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিবহন ও যোগাযোগ জাতীয় জীবনে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। আধুনিক যুগে রেলই সর্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে। তাহা ছাড়া জাহাজের সংখ্যা ও তাহার ভারবহন শক্তি বৃদ্ধি, পোতাশ্রয়ের উন্নতি, ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন ও বিমানপোত প্রভৃতি সকল বিভাগের প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের মধ্যে রাস্তার নিতান্ত অভাব, 'পরিকল্পনায়' তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে যে সকল রাস্তা পুল প্রভৃতি নির্মাণের কার্য চলিতেছে, তাহা ছাড়া আরও কিছু নূতন কার্যে হস্ত-ক্ষেপ করা হইবে। তন্মধ্যে ৪৫০ মাইল নূতন রাজপথ এবং ছোট বড় অন্তত ৪৩টি সেতু নির্মিত হইবে। সুগম রাস্তার সহিত কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে সকল নূতন অঞ্চলে চাষ প্রবর্তিত হইবে তথায় মোটর [illegible] অন্ততঃপক্ষে যাহাতে গোযান প্র[illegible] স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে [illegible] ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

শিল্পের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি বর্ত[illegible] অবস্থার উপযোগী। গভর্নমেণ্টকে যে [illegible] কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহাতে উৎপাদনের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, কেন[illegible] প্রতিষ্ঠান গঠন একান্ত প্রয়োজন। ই[illegible] কোনও বে-সরকারী সংঘ অর্থনি[illegible] সম্মত হইবে না; অথচ গভর্নমেণ্টের [illegible] এত প্রচুর অর্থ থাকিবে না যাহাতে স[illegible] বৃহদাকার শিল্প গভর্নমেণ্ট গ্রহণ ক[illegible] পারে বা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার [illegible] করিতে পারে। বে-সরকারী শিল্প প্রতি[illegible] যাহা করিতেছে জন-স্বার্থে তাহার [illegible] সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এবং যথাবিহিত[illegible] সাহায্যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশের ম[illegible] নিয়োজিত করিলে ভারতের অর্থনৈ[illegible] সংস্থার হঠাৎ কোনও গুরু পরিব[illegible]

া হইবে না, অথচ শিল্প প্রসার প্রচেষ্টা
ইভাবে চলিতে থাকিবে। প্রয়োজনের
গভর্নমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতে
য় এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে
ব। বর্তমানে বে-সরকারী শিল্প
নে কয়েক হাজার কোটি টাকা মূল-
টিতেছে এবং যন্ত্রাদির পরিবর্তন বা
সংস্কার প্রভৃতি কার্যে অন্তত ৭০০
টাকা দরকার। এ অর্থ গভর্নমেণ্টের
নাই, উপরন্তু তাহা অন্য ক্ষেত্রে
করিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে।
শিল্পের উন্নয়ন ব্যতিরেকে
র অধিক মাত্রায় কর্মসংস্থান হওয়া
নয়। সুতরাং তাহার উপর যথেষ্ট
আরোপ করিয়া কিভাবে অগ্রসর
যায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ
হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পের
দূরে করিবার এবং বৃহৎ কারখানা
কিভাবে পল্লী শিল্পের মিত্রভাবে
পারে সে সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে
কার্যক্ষেত্রে সফল হইলে সারা
তে একটা পথ নির্দেশ করিয়া

ক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ কল্যাণ
লিকার অন্তর্ভুক্ত। যাহা প্রয়োজন
কোনও অংশকেই উপেক্ষা করা হয়
সকল ক্ষেত্রেই একটা সামঞ্জস্য রক্ষা
চেষ্টা হইয়াছে। পুনর্গঠন বিভাগের
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলে বহু
র পুনরাবৃত্তি এবং অর্থের অপব্যয়
হইবে। যাহা কোনও বিশেষ কারণে
ন হইয়া পড়িতে পারে, অথচ যাহার
অর্থ ব্যবস্থা নাই, তাহা 'বিবিধ'
ণের মধ্যে পড়িলে কোনও অসুবিধা
কথা নহে।

রকল্পনায় ত্রুটি নাই একথা কেহ বলে
কিন্তু ইহার পরিবর্তে হিসাবে কি পন্থা
করা যায়, তাহা কাহারও সম্মুখে
থিত নাই। যে অর্থ নিয়োজিত হইবে,
র পরিমাণ ২,০৬৯ কোটি টাকা। যে
তাহা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা
ছে তাহা লইয়া যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
ীয় ও রাজ্য সরকারের আয় ব্যয়ের
হইতে ৭৩৮ কোটি টাকা
রকারী সঞ্চয়, যাহা গভর্নমেণ্ট ঋণ-
গ্রহণ করিতে পারিবে, বা গভর্ন-
র নিকট সুদের আশায় লোকে জমা
ন,—৫২০ কোটি টাকা এবং বিদেশ
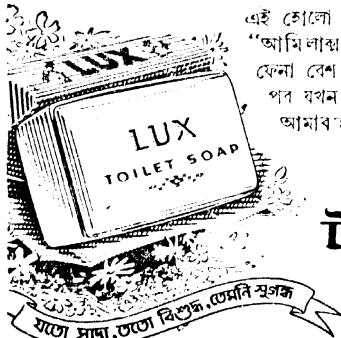
হইতে এ পর্যন্ত সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত ১৫৬ কোটি টাকা। বাকী ৬৫৫ কোটি টাকার জন্য বিদেশী অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য বা ঋণ এবং তন্মধ্যে ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা ২৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গভর্নমেন্টের উদ্বৃত্ত হিসাবে যে টাকা ধরা হইয়াছে বা বে-সরকারী লোক ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান হয়, সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম। বিদেশী অর্থ যথা-পরিমাণ পাওয়া যাইবে কি না এবং তাহা পাইলে আমাদের জাতীয় জীবনে বিদেশীর প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া একটা আশঙ্কা সহজেই মনের মধ্যে উঠিতে পারে। অর্থ-সংগ্রহে বাধা উপস্থিত হইলে কার্যতালিকায় অগ্রাধিকার প্রয়োগে ইহার অসুবিধা বহু পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইবে। এইখানে কর্মকর্তাদের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে; কারণ কার্যনির্বাচনে কোনও ভুল হইলে বিশেষ অপব্যয়ের সম্ভাবনা।

বিদেশী অর্থ আসিলেই তাহাদের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে বিপরীত স্বার্থে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবার এ পর্যন্ত কোনও লক্ষণ বা সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে সে প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। বিদেশী অর্থ যে পাওয়া যাইতে পারে তাহার প্রমাণ ভারতীয় লৌহ শিল্পের প্রসারের জন্য সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার ঋণ দান। যদি জনমত বিদেশী ঋণ বা সাহায্য গ্রহণে আপত্তি করে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কার্যতালিকার হ্রাস করা সমীচীন।

কার্যকাল শেষে পরিকল্পনা যে উৎপাদন লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছে, কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষত লোক সংখ্যার তুলনায় খাদ্য তণ্ডুল বিষয়ে অভাব দূর করিতে পারিবে না বলিয়া মত আছে। লক্ষ্যবস্তু অঙ্কে প্রকাশ করিলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না; উৎপাদন যতদূর সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহাই প্রকাশ করা এবং তাহা সফল করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। অন্ন-সমস্যা দূর না হইলে যে পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গহানি ঘটিবে তাহা সুনিশ্চিত। যদি বিদেশের উপর নির্ভরতা দূর করিতে হয়

তাহা হইলে কৃষি বিষয়ে কার্যক্ষেত্রে আরও অর্থ ব্যয় ও গুরু চেষ্টা করিয়া উৎপাদন লক্ষ্য অতিক্রম করা প্রয়োজন। বস্ত্র, চিনি, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্পে লক্ষ্য অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হইবে, মনে হয় কমিশন এ সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগ দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

অসুবিধা হইবে উপযুক্ত লোকের—সরকারী ও বে-সরকারী—অভাবে। কমিশন সাধারণের সহযোগিতা ও সমবায় প্রথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গত দুই বৎসর 'পরিকল্পনা' অনুযায়ী কয়েকটি বড় কাজ চলিতেছে। জনসাধারণের যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সাহায্য স্পৃহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল, তাহা পাওয়া যায় নাই। সমবায় প্রথা বাঙলা দেশে এ পর্যন্ত আশানুরূপ সফল হয় নাই। লেন-দেন সমবায় কয়েকটি সুচারুভাবে চলিতেছে মাত্র। সরকারী কর্মচারীর নিকট যে কর্তব্যানুরক্তি এবং অদম্য কর্মস্পৃহা পরি-কল্পনা সফল করিবার অন্যতম ভিত্তি, তাহার যথেষ্ট অভাব আছে। কমিশন ব্যাপক অসাধুতা ও কর্তব্য কর্মে অবহেলা উপেক্ষা করেন নাই। যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া ত্রুটি দূর করিবার নির্দেশ আছে। যদি তাহা কার্যে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলেই ইহাই পরিকল্পনা সফল হইবার প্রধান অন্তরায়স্বরূপ হইবে।

সাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্য বর্তমানে অর্থব্যয় ছাড়া উপায় নাই। সরকারী কর্মচারী যখন বেতন, ভাতা প্রভৃতি লইয়া কর্মস্থলে কর্তৃত্ব করিবেন, তখন সাধারণ দরিদ্র লোক স্বেচ্ছায় শ্রম দান করিবেন বলিয়া আশা করা ভুল। স্বাধীন ভারত পালক রাষ্ট্ররূপে রাজ্য পরিচালনার জন্য বহুতর নূতন কর স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে লোকে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া আছে, স্থানে স্থানে তাহা বিক্ষোভে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং পারিশ্রমিক সাহায্যে সহযোগিতা ক্রয় করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাইবে না একথা মনে করা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু পূর্বের সে যুগ নাই, কারণ তখন নেতৃবৃন্দ হইতে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ক্লেশ বরণ করিতে অধিকতর গৌরব বোধ করিতেন।

পরিকল্পনা আজ উপস্থাপিত হই[illegible] গভর্নমেণ্ট তাহা গ্রহণ করায় যথারী[illegible] হইবে; এ ব্যয়ের বোঝা প্রত্যেক [illegible] বাসীকেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বহন [illegible] হইবে। উদ্দেশ্য জনকল্যাণঃ সুফল [illegible] আপামর সাধারণ সকলেরই মঙ্গল [illegible] এ ক্ষেত্রে মনে হয়, প্রত্যেকেরই কর্ম[illegible] দায়িত্ব রহিয়াছে। অবশ্য এই দায়িত্বের যাহাতে সকলে গ্রহণ করিতে সক্ষম সেইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে [illegible] আজ কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা নব্বই [illegible] অর্থাৎ মোট ভারতবাসীর প্রায় প্রতি [illegible] জনে একজন। সুতরাং পরিকল্পনা [illegible] করিবার কার্যে প্রায় ১ কোটি কর্মী [illegible] যাইতেছে, অবশ্য যদি প্রত্যেক [illegible] কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া সভ্য [illegible] থাকেন। তাহা ছাড়া ভারত সেবক [illegible] এ কার্যের অংশ গ্রহণ করিবে এবং সকল রাজনৈতিক দলের কর্মী যে বি[illegible] করিবেন তাহাও নয়। ইহাদের ম[illegible] খাঁটি দেশপ্রেমিক আছেন, যাঁহাদের [illegible] ভার ন্যস্ত হইলে তাহা সুসম্পন্ন [illegible] আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। তাহা ছাড়[illegible] গ্রামে অকাতরে নীরবে সেবা দান [illegible] লোকের অন্ত নাই। যাঁহাদের উপর [illegible] সম্পাদনের ভার পড়িবে তাঁহারা যে [illegible] মাণ সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইবে[illegible] অনুপাতে পরিকল্পনার সফলতা [illegible] করিবে। অর্থের যদি অভাব ঘটে, ত[illegible] মধ্যে কোনও কোনও কাজ আরম্ভ [illegible] যাইবে না; তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক নহে। কিন্তু প্রকৃত কর্মীর [illegible] এবং অপব্যয়ে যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে [illegible] দুর্দিন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অর্থনাশ নয়, দেশ-বিদেশে অপদস্থ হইবে; তাহা অপেক্ষা গুরু বিপদ [illegible] বিরাট জনসাধারণ যে আর্থিক, সা[illegible] দুরবস্থায় আছে, সেখানেই থাকিয়া [illegible] এখন প্রতি কেন্দ্রেই কি উপায়ে [illegible] সাধারণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও [illegible] যোগিতা লাভ করা যায়, তাহার [illegible] নির্ধারণ করা প্রথম কর্তব্য। আর [illegible] ভারতবাসীর উপর পরিকল্পনা সফল[illegible] বার যে দায়িত্ব পড়িয়াছে তাহাও স্মরণ করা কর্তব্য।

হায়দ্রাবাদ কংগ্রেসের চিঠি

প্রত্যক্ষদর্শী

রতবর্ষ যে কতবড় তা কল্‌কাতা থেকে হায়দরাবাদ আস্‌তেই টের যায়। তবু তো দার্জিলিং থেকে ন পর্যন্ত যেতে হয়নি। এই তো না, শনিবার বেলা চারটেয়—ঠিক ঠিক গেলে চারটে চল্লিশে কল্‌কাতা াম, হায়দরাবাদের নামপল্লীতে ম সোমবার বেলা ১০টায়। এবার করুন। অত রাস্তা এসে অঙ্কে আর ঘামাতে চাইনে।

পল্লীতেই আমাদের নামার কথা ছিল। থেকে আমরা এলাম নানলনগর। গর আগে ছিল নিজামী সৈন্য- ীর ব্যারাক। রাজ্য কংগ্রেসের প্রথম ডন্ট নানলের নামে হয়েছে নানলনগর। একটা ব্যারাকের একটি ঘরে আমরা

দ মনে পড়ছে মাদ্রাজ মেল ৪-৪০-এ হাওড়া ছাড়ল। ট্রেন ছাড়তেই বাঙলার শেষ রোদ তির্যক্‌ গতিতে হঠাৎ ছাপিয়ে পড়্‌ল আমাদের কামরায়। তারপর তা ক্রমে এল নিস্তেজ হ'য়ে। কালো পাৎলা আস্তরণ ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগ্‌ল। গাড়ীর গতি তীব্র। আমরা বাঙলা ছেড়ে যাচ্ছি।

বাঙলার কয়েকটি ছেলে অবশ্যই এ কামরায় ছিল। নইলে নিঃসঙ্গ এই সফর কেমন লাগ্‌তো কে জানে? আমাদের প্রতিষ্ঠানের ফোটোগ্রাফার শ্রীবীরেন সিংহ একাই একশো। দুনিয়ার যত গান তাঁর জানা—কিন্তু সব তাঁর নিজস্ব সুর। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের রিপোর্টার শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অমৃতবাজারের শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, ইউনাইটেড প্রেসের শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জি, যুগান্তরের শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য আর অমৃতবাজারের ফোটোগ্রাফার শ্রীপান্না-লাল সেন বাকী কোলাহল পূরণ করেছিলেন।

গাড়ী থামেনি একবারও—অন্ধকারের আবরু ছিঁড়ে ফুঁড়ে ছুটে চলেছে ট্রেন—চলেছি আমরাও। পৌনে ছ'টা।

এই অন্ধকারেই কখন্‌ বাঙলার সীমা ছাড়িয়ে উড়িষ্যা এলাম। আটটা বেজে গেছে। বুঝেছি আমরা দক্ষিণগামী। জননী বঙ্গভাষা সীমাবদ্ধ হয়েছে এই কামরায়। বাইরে উৎকল।

সমুদ্রের ধারে ধারে উৎকল নিতান্ত সামান্য নয়। চলেছি তো চলেছি। কিন্তু যত বড়ই হোক্‌, অন্ধকার কাট্‌তে না কাট্‌তেই দাক্ষিণাত্যে ঢুকে গেছি। তেলেগু—তেলেগু—তেলেগু। সকালের রোদে দেখ্‌লাম তালের 'বনরাজি নীলা' কিন্তু কোথায় তমাল? হঠাৎ তবে কালিদাসের ছন্দপতন হ'ল নাকি? সমুদ্র অবশ্য দেখা যায় না। আমরা যাচ্ছি ট্রেনে—বিমানে নয়। সুতরাং কালিদাসের 'দূরাদয়শ্চক্র'—সবটা আওড়াবার দরকার হ'ল না। সমুদ্র হয়তো কাছে ধারেই, কিন্তু এখানে শুধু অপসয়মান পাহাড়, পাহাড় আর লাল মাটী।
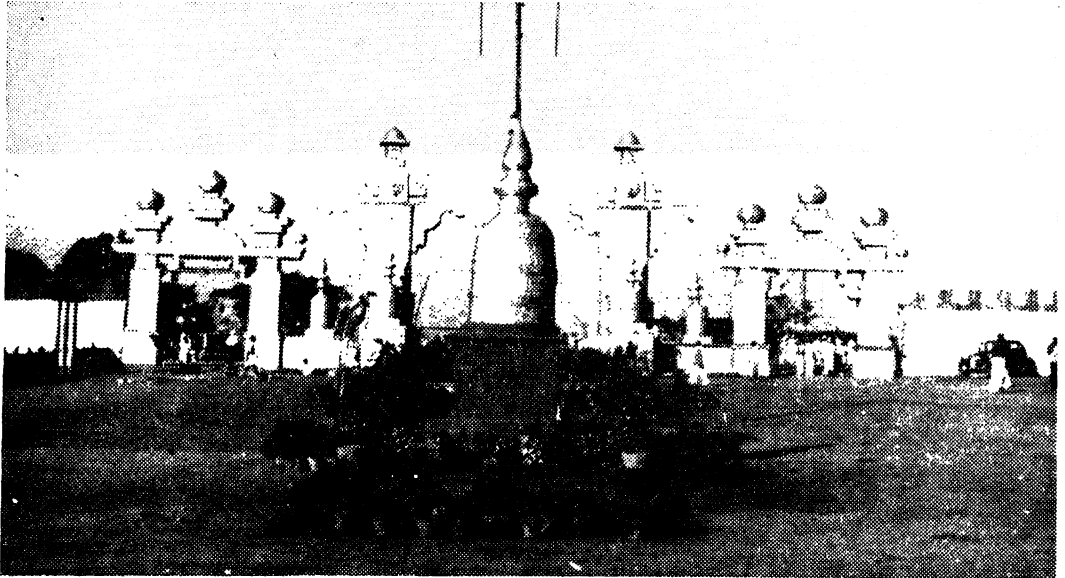
নানলনগরে সর্বোদয় প্রদর্শনীর প্রধান তোরণের দৃশ্য। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ভূদান যজ্ঞস্তম্ভ দেখা যাইতেছে
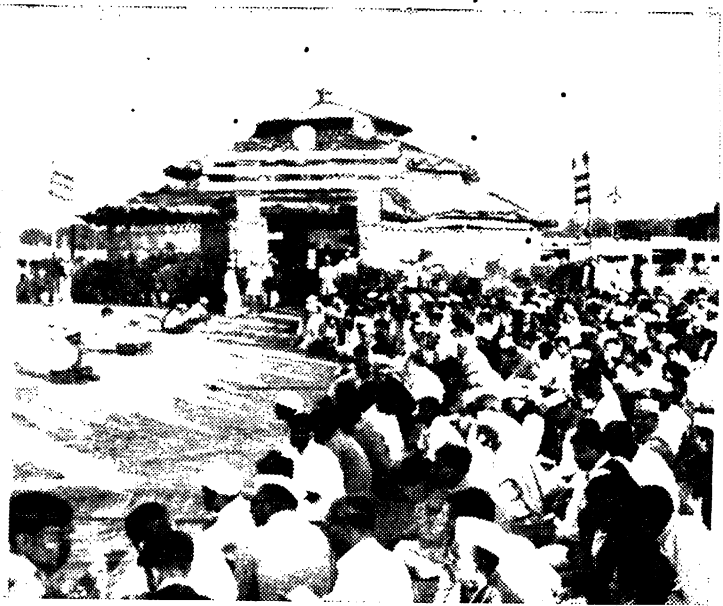
নানলনগরে সর্বোদয় প্রদর্শনীতে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে দেখা যাইতেছে

ভিজিয়ানাগ্রাম পার হয়ে এলাম ৯॥টায়। দেখতে এখানকার লোক কিন্তু অবাঙ্গালী নয়—পোষাক আর ভাষাই তাদের পার্থক্যের পরিচয়।

২৪ ঘণ্টা কেটে যাবার পর ট্রেনটা যেন হাঁপাতে লাগল। এতক্ষণ খুব ছুটে এসেছে, এখন ক্লান্ত, কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে থেমে থেমে চলছে। সময়ও রাখতে পারছে না। এর পরও একে মেল-ট্রেন বললে আর সব মেলট্রেনকে লজ্জা দেয়া হবে।

তারপর গোদাবরী। অস্তি গোদাবরী তীরে—গোদাবরীর দেখা পেলাম। বিশাল সেই শাল্মলীতরুর দেখা পেলাম না। আমাদের কামরাটিও আর একান্তভাবে 'বাঙ্গালী' নয়। অনেক অন্ধ্র-বান্ধবেরা উঠেছেন। তাঁদের চোখে অন্ধ্র প্রদেশের স্বপ্ন। একজন আমেরিকা-গামী বিদগ্ধ ব্যক্তি বললেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন চাই। একটি ফেরিওয়ালা বলল, নো হিন্দী। তবু নাকি মেয়েরা হিন্দী শিখছে? কেন? না, শিখতে সোজা। বাঙলা সোজা নয় কে বলল? হ'তে পারে, কিন্তু শেখাবে কে? হিন্দী প্রচারের আয়োজন আছে, বাঙলার নেই। সব কথাই ইংরাজীতে চলছে। সবাই ইংরাজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে রাজীও। তবু নাকি একটি 'দিশী ভাষা' চাই।

গোদাবরী পার হতে হতেই আবার রাত ঘনিয়ে এল। পৃথিবী ঘুরে গেছে ২৪ ঘণ্টা—আমরা যেদিকটায় আছি। আমরা ছুটে যেদিকে এসেছি তা উষ্ণমণ্ডল, কলকাতার ঠাণ্ডাও যেন এখানে নেই। একটু সন্ধ্যার ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা, একটু রাত্রির শীতলতা, একটু ট্রেন চলার ঠাণ্ডা হাওয়া।

আবার পৃথিবী ঘুরল—হায়দরাবাদের সীমান্তে বেজোয়াড়া এলাম, এর পরই তেলেঙ্গানা—ঐ দেখা যায়। কিন্তু রাত কাটল নিরাপদেই, তারপর সেকেন্দ্রাবাদ—তারপর—তারও পর নামপল্লী—যেখানে আমরা নামলাম।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেকের উর্দি—সাদা সার্ট, নীল প্যাণ্ট, কাঁধে পিতলের পাতে কোঁদা কংগ্রেস সেবাদল—হায়দরাবাদ হিন্দীতে। বঙ্গ, উৎকল, অন্ধ্র (নো হিন্দী), হিন্দী (যদিও হওয়া উচিত ছিল উর্দু! কিন্তু নিজামত নেই)।

নামপল্লী থেকেই কংগ্রেসের আয়োজনের আভাস পাওয়া অভ্যর্থনার জন্য বিরাট চন্দ্রাতপ—রাশের প্রচুর আয়োজন (অবশ্য খরচায়)। তারপর স্পেশ্যাল বাস—নগর (ভাড়া যার যার)। এ সবই বাস—কিন্তু স্পেশ্যাল। কণ্ডাক্টারের এক যন্ত্র—ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ঘুরোলেই বেরোয়।

সুন্দর পীচের চওড়া রাস্তা। মফ ঝাঁকুনি নেই। পাহাড় চেয়ে রয়েছে চার এখানকার অভিজাত মুসলিম সম্প্র মত নিরুপায় দৃষ্টি। নিজামী দৌলতে কাফের শাসনের স্বপ্ন বিলীন হ চোখে ঘনিয়েছে হতাশা?—প্রতিহিংস

নানলনগর সবে তৈরী হচ্ছে। এর দ্বারগুলো উঠছে দ্রুততালে। কাঞ্চ বদলে এঁরা ইক্ষুদণ্ড লাগিয়েছেন তৈরীর কাজে। কোথাও অবশ্য কাঁ বাঁশ। সর্বোদয় প্রদর্শনীর দ্বারদেশ চাচ আর হোগলার পাটিতে মুড়ে হয়েছে।

নানলনগরের রাস্তা পীচের নয়। ধুলো-কাঁকড়ের। গাঁওমে কংগ্রেস।
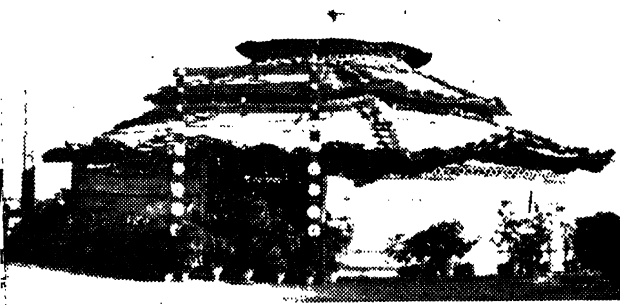
নানলনগরে বাপু মণ্ডপ। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও ফটোগ্রাফ এখানে প্রদর্শিত হয়

সর সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়েছে, নিবাস-
আছে। এইসব নিবাসে প্রতি-
দের আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।
এক প্রদেশের প্রতিনিধি এক এক
তি। অনেক বাড়ী আছে।
স্ত নগরটি ছড়ানো—অনুষ্ঠানস্থল-
দূরে দূরে—একটা থেকে আর
র ব্যবধান অনেকখানি। অসমতল
অঞ্চল—লাল কাঁকড়। ব্যস্ত-
দের সাধ্য নেই হেঁটে সব অনুষ্ঠান-
অথবা অনুষ্ঠান দেখে বেড়ায়। মোটর
মোটর না হলে অটো-রিক্সা চাই।
সাইকেল-রিক্সা, নিদেন সাইকেল।
সমে অসম্ভব।
লনগর নগরই বটে। একদিকে
তিনিধিগণ', মানে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফারদের পাড়া, কাছেই পশু-চিকিৎসালয়; সম্ভবত এঁদের যে অমানুষিক ছুটোছুটি করতে হবে তারই জন্য। নতুবা আজ এখানে নিজামের ঘোড়-সওয়ার নেই, ঘোড়াও নেই।

আর মানুষের হাসপাতালে স্থান দেয়া হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের, নানলনগরে নয়, নানলনগর থেকে চার মাইল দূরে—নীলোফোর হাসপাতাল। নীলোফোর ছিলেন নিজামের তুর্কীদেশীয় পুত্রবধূ! পুত্রকে সে তালাক দিয়ে গেছে। তার নামে হাসপাতাল। তবে এই সু-নাম থাকে কি না থাকে জানি না, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা এখানেই শয্যা নেবেন ঠিক হয়েছে। তাঁদেরও তো লাফঝাপ কম নয়।

নানলনগরের একটি পাড়া কংগ্রেস প্রতিনিধি পাড়া। মস্ত পাড়া। রাস্তা সোজা চলে গেছে পত্র-প্রতিনিধি গৃহের পাশ দিয়ে পশু চিকিৎসালয় পর্যন্ত আর ওদিকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভবনের দিকে—অথবা তারও পাশ দিয়ে বহুদূরে। কংগ্রেস প্রতিনিধি পাড়া পার হয়েই বিরাট ভোজনশালা। রাষ্ট্রীয় সমিতি ভবনের দিকে যেতে ডানদিকে 'প্রতিনিধি নিবাস নিবন্ধ'—গৃহ। এখানে যাঁরা আসেন বা আসবেন তাঁদের এখানে মাথাপিছু সাত টাকা ভাড়া জমা দিতে হবে। তবে বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। যাঁরা দর্শক তাঁদের দিতে হবে ১০, টাকা। তারপর ঘর বা গৃহভেদে ২৫,, ১০০,, ১২৫, টাকা।

এলাহি কারবার। একসঙ্গে ২০০০ লোক খেতে বসতে পারবে। নিরামিষাশী-দের খানাপিছু ১৷৹ আনা—মাছমাংসাশী-দের আলাদা খানাঘর (খরচ যার যার তার তার)। পেট খারাপ হলে, শরীর ম্যাজ্-ম্যাজ্ করলে যাতে ওষুধ পেতে পারেন সেজন্য ওষুধের দোকানও খোলা হয়েছে। চিঠি পাঠাতে চান ডাকঘর আছে। তার পাঠাতে চান তারঘর আছে। ট্রাঙ্ক করতে চান তার আয়োজন আছে। ইংরাজী সংবাদ পাঠাবার জন্য টেলিপ্রিন্টার আছে পাঁচ মিনিটে পৌঁছে যায়—যা নাকি মাদ্রাজ মেলের ২৷৷ দিনের পথ! বাঙলার উপায় নেই, যদি না তা রোম্যান অক্ষরের পোষাক পরে।

এলাহি কারবার। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভবনের সম্মুখে এখনই অসংখ্য মোটরের ভীড়। পাঁচশ সংবাদপত্র প্রতিনিধি আর ফোটোগ্রাফার আসবেন—তাঁরা অনুমতি-পত্র সংগ্রহে ছুটোছুটি করছেন আর নেতারা, নেতাদের অনুচরেরা, কংগ্রেসে নবাগতেরা, স্বেচ্ছাসেবকেরা উঁচু টিলার ওপর গড়া পাকা দালানের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন নামছেন। সেক্রেটারীয়েট!

তারপর ঐ অদূরে কংগ্রেস সেবাদলের শিবির। এখানকার সব সেবক-সেবিকাই হায়দরাবাদের। মোট ১৭৫০; তার মধ্যে সেবিকা আছে ২৫০। বাইরে থেকে কেবল দুজন এসছেন তালিম দিতে। তাঁর নাম শ্রীঅমৃতলাল তিলোয়াওয়ালা। অনেকটা জায়গা ঘিরে এই শিবির; শিবিরে অসামরিকের প্রবেশ নিষেধ; দুয়ারে প্রহরী। শিবিরান্তরে জাতীয় পতাকাদণ্ড।

এখান থেকে কিছু দূরে লক্ষ টন নূতন টিনে ঘেরাও করা প্রকাশ্য অধিবেশনের

গান্ধী মণ্ডপে সর্বোদয় প্রদর্শনীর একাংশ

নানলনগরে দেশসেবিকাগণ শ্রীনেহরুকে সামরিক অভিবাদন জানাইতেছেন। শ্রীনেহরুর বামে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ

জায়গা। সোয়ালক্ষ লোক শনুতে বা দেখতে পারে এমন জায়গা। মাঝে মাঝে চওড়া রাস্তা। দিকে দিকে আগমন নির্গমনের পথ। দর্শকের দর্শনী বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে ১০০৲, ৫০৲, ২৫৲ আর ১০৲ টাকা। প্রকাশ্য অধিবেশনে ১০০০৲, ৫০০৲, ২৫০৲, ১০০৲, ৫০৲, ২৫৲, ১০৲ আর ৫৲ টাকা। মেয়েদের আলাদা জায়গায় ২৫৲, ১০৲, ৫৲ টাকা।

পাঁচসালা পরিকল্পনা কি জিনিস? পাঁচসালা পরিকল্পনা হচ্ছে এইঃ একথা বোঝাবার জন্য নিয়োঁর সাদা আলোয় প্রকাশমান হবে এর ভবিষ্যৎ রূপ। চার্টে, ছবিতে, মডেলে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা চোখে আর হাতে ধরা দেবে। এজন্য কমিশন খরচ করছেন কত? অথবা এই নানলনগর সৃষ্টির অর্থোৎস কোথায় বা কি তাই বা কে জানে? কিন্তু কারবার এলাহি।

পাঁচসালা পরিকল্পনা কি জিনিস? পাঁচপূর্ণার ভাণ্ডার। মা জননীরা ঘরের সকল কাজ সেরে অথবা ছেড়ে এখানে অন্ন (অন্ন নয়, মিষ্টান্ন) বিতরণের আয়োজন করেছেন। তাও কয়েকটা বিয়ের মণ্ডপের সমান হবে। উদ্বোধন করেছেন সন্ন্যাসী স্বামী রামানন্দ তীর্থ।

বিষয় নির্বাচনী বসবে যেখানে তাও মস্ত ব্যাপার। তার পাশে আরও আরও বড় সর্বোদয় প্রদর্শনী। ভারতের গ্রামের রূপ বর্ণনায় স্থান পাওয়া গেছে অসীম। সারা ভারতে আজও যাঁরা গ্রাম আঁকড়ে আছেন, পুরোনো গ্রাম বা গ্রামীন্ শহর, নূতন হবে-কি-না-হবে উন্নয়ন পরিকল্পনার--গ্রামীন্ শহর নয়, তাঁরা এসেছেন এখানে তাঁদের তেল-গুড়-খাদি-বাঁশ-বেত নিয়ে।

যাই হোক্, সারা ভারত থেকে আস্ছে লোক পাহাড়ী নদীতে হঠাৎ বন্যার মতো। কি যে হবে কে জানে। এখানে সোয়া লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি বিপর্যস্ত না হ'লে বাঁচি। জল এখনও প্রচুর, অপচয়ও তত।

আরও ভয়ংকর কথা—যানবাহনের ভাড়া, খাদ্যদ্রব্যের দাম, পান-বিড়ি সিগারেটের দাম হু হু ক'রে উঠছে আকাশে—এক খিলি পান তিন পয়সা। 'হালি' দরে, মানে নিজামের মুদ্রায়, চার পয়সা! চিবোতে গেলে পয়সাগুলো গালে লাগে। তবু তো আজ মাত্র তেরোই; তাইতেই সেদ্ধ ডিমের দাম এক একটি চার আনা, এক কাপ দুধ আট আনা, এক এক টুক্রো পাউরুটী দু' আনা। তার ওপর বিক্রয় কর।

এবার কংগ্রেসের অধিবেশন খুব দ্রুত তালে সমাপ্তির দিকে ছুটে চলেছে। কেননা আরম্ভ হলে শেষ হতে বাকী কি? মানুষের বয়স বাড়ে তো মরবার জনাই। তাই এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এত বড় অধিবেশনের আয়োজন হয়েছে, তা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবসানের দিকে জোর কদম চালিয়েছে।

গত ১৩ই তারিখে বিরাট স[illegible] প্রদর্শনী আর পাঁচসালা পরিক[illegible] পরিচিতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ[illegible] পরদিন সকালে ১৪ই তারিখে [illegible] সভাপতি এসেছেন। ওয়ার্কিং ক[illegible] তিন দফা অধিবেশন হয়ে গেছে। সেব[illegible] সমাবেশ শেষ। ১৫ই তারিখে এ[illegible] বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন[illegible] গেছে। এত দ্রুত চালে চললে অ[illegible] বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত গোলকুণ্ডার [illegible] মতো নানলনগরের এই বর্তমান [illegible] নিভে যাবে, আশ্চর্য কি? বাস্তবিক [illegible] নগরই হয়েছে! আলোয় আলোয় [illegible] রাজ্য—ডানা-কাটা পরী এদেশে খুব [illegible] নেই, তবে পরীর স্বজাতেরা খুব ক[illegible] ভীড় যে খুব একটা বেশি তা নয়। [illegible] মস্ত ফাঁকা জায়গা, এজন্য অমন [illegible] ভীড় মনে হয়; কিন্তু এই ভীড়ে [illegible] আর মেয়ে ৫০|৫০ হতে পারে। গাবে[illegible] সংগীতের রাজ্য। জোরালো মাইকের স[illegible] বায়ুমণ্ডল সংগীতময়। ভাগ্যিস রেকর্ড[illegible] গান। নতুবা এখানে জাতীয় সংগীতে[illegible] সর্বনাশা সুর শুনেছি, মনে হয়েছে [illegible] তো গান গাই না, আমিই গিয়ে মাইক[illegible] জাতীয় সংগীতের প্রকৃত সুর (আর [illegible] শুনিয়ে দি। সেবাদলের সেবক-[illegible] দলে দলে চলতে ফিরতে কি একট[illegible] গায় তা নিয়ে আমার নালিশ নেই ওদের হিন্দী গান।

ন সর্বোদয়ে জনগণমন জাতীয় তর কি অপূর্ব কোরাস। এর মধ্যেও নিকে গড়ে করার প্রচেষ্টা আছে কিনা া, কিন্তু ওটি যে হাতে-তৈরি কাগজের খরখরে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ সর্বোদয় প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন শ দাশগুপ্ত। তাঁর কানে বেসুর কথা নয়। তিনি সাধন-মার্গে আরও ধাপ উঠে গেছেন। বয়স হয়েছে। ষষ্ঠি নিয়েছেন। খালি পা। গায়ে কোমরে ঝোলানো বটুয়া। আগেকার ক দাঁত বোধ হয় অনেক পড়ে গেছে। বয়স অবধি কামাতে কামাতে মুখ- ঐ কি রকম ভাঙাচোরা মসৃণতা হ। চোখে সাদা বড় রকমের চশমা। ছোট্ট এতটুকু একটি শিখা ছাড়া কশ নেই। হঠাৎ দেখলে দূর থেকে ীর কথা মনে হতে পারে।

র প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে গিয়ে ়, আমরা পুরোনো নিয়েই বসে খুব গবেষণা চলছে পুরোনোর দেখুন না, চরকার কত রকমফের

নীতে হিন্দীর ওপর খুব জোর হয়েছে। একটা জিনিসও অ-হিন্দী ইচ্ছে এঁদের ছিল না, একথা বোঝা প্রদর্শনীর গঠনে বৌদ্ধ শিল্পের প্রবেশদ্বারে তাই, মাঝখানে ভূদান স্তূপ আর গান্ধীমণ্ডপের প্যাগোডা- ও তাই। এই প্রদর্শনী দেখলে একটি হয়। সেটি এই যে, এখনও এই দেশে বহুকাল প্রচলিত আদিম প্রথায় ন প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা হচ্ছে। ছাঁটিতে যে ঢেঁকি লাগে, সে ঢেঁকির যান্ত্রিক নমুনা আছে। 'কাঠের ঘানি' ত এক জোড়া বলদ টানছে। তবে াদের গানটি ঠিক আছে। 'মা আমায় কত, 'চোখ-ঢাকা বলদের মতো।' গায়ে চাবুকও পড়ে।' কিন্তু গরুর যখন উঠল, তখন একথা স্বীকার হয় যে, প্রদর্শনীতে লাল খান্ডারি এমন ষাঁড় দেখেছি, যা সত্যিই র। শুনেছি বশিষ্ঠ মুনির বিরাট া ছিল। গোধন পরম ধন। হ্যাঁ হঁয় এই ষাঁড় রাখ।

সরকারী ব্যবস্থায় অধিক খাদ্য ফলাওর প্রদর্শনীও আছে। রান্নাঘরের কাছে সব্জী-বাগ—অবশ্য যার জমি আছে। তারপর চাষ করার নানা রকমের যন্ত্রপাতি—আধুনিক ঢংয়েরও, ঠিক সর্বোদয়ী নয়। তবে ট্রাক্টর নেই। তারপর ধরুন, মুরগী পালন, ভেড়া পালন, মৎস্য চাষ, চর্ম শিল্প আছে। গোবর থেকে গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। তবে যে ট্যাংক দেখানো হয়েছে, ঐ একটি ট্যাংক তৈরি করাতে কৃষকের জিন্দিগী কাবার। বেকারী আছে। ঐ বেকারীর রুটি বাজারে আনলে বেকার হতে দেরি সইবে না। তিল সাফ্ করার যন্ত্র আছে। মৌমাছি পালন আছে, সাবান তৈরি আছে, লণ্ঠন, এমনকি, অনেকগুলি ধাতু যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থাও আছে। কাঁচের চুড়ি আছে, হাতে-তৈরি কাগজ আছে, কুমোরের চাকায় তৈরি মৃৎপাত্র আছে, উনুন আছে, খেলনা আছে, মোজা আছে, রেশম আর খাদি আছে। আর একটি জিনিস আছেঃ জায়গা থাকলে কিভাবে ঘর বাঁধতে হয়। সব চাইতে বড় জিনিস স্বভাব-চিকিৎসা নয়। না, কেবল গাছ-গাছরা, ছাল-বাকল নয়—সেতো ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘ এনেছেনই, স্বভাব-চিকিৎসা হচ্ছে পেটে কাদার পুলটিশ লাগানো বা কোমরে, পায়ে জল-স্নান প্রভৃতি।

এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে যে 'পঞ্চবর্ষ যোজনার' প্রদর্শনী আছে, তা খোলা হল। খুললেন শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। চারদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে জলের ফোয়ারা—তারপর হায়দরাবাদের রিলিফ ম্যাপ, তারপর ঐ প্রদর্শনী কক্ষ। প্রদর্শনী গৃহের চূড়ায় রক্তগোলক, অশোক-স্তম্ভের ত্রিসিংহ মূর্তি। কিন্তু হিন্দী পঞ্চবর্ষ-যোজনা পর্যন্তই শেষ। ভিতরে ইংরেজি ভাষাই গুলজার, বাইরেই যাকিছু লাল, ভিতরে নিয়ন সাদা আলোর উজ্জ্বল আনন্দ। চার্ট, ম্যাপ, মডেল, ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি পরিকল্পনা মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি ইংরেজী আর শ্রী নন্দ হিন্দীতে বললেন। যারা শোনবার, তারা রেলিংয়ের বাইরে ছিল।

এর পরদিন সকাল বেলা বেগমপেট বিমানে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীজওহরলাল নেহরু এলেন। হ্যাঁ, এই বেগমপেট যেতে দেখা যায়, নিজামশাহী কেবল অর্থের অপচয়ই করেন নি, কিভাবে অর্থের সুনিয়োগ করতে হয়, তাও জানতেন এবং ভালভাবেই জানতেন। হায়দরাবাদ পাহাড় অঞ্চলের যদি কিছু সৌন্দর্য থাকে, তবে তা মানুষের শিল্পের স্পর্শে প্রতিভাত হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু নীচু জায়গায় গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে লুকানো কুঁড়ির মতো সাদা বাড়িগুলি প্রকৃতির সৌন্দর্য শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আর সে সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য নিজামশাহী যে বিস্তৃত দীর্ঘ মসৃণ পরিচ্ছন্ন পীচের পথ করে দিয়েছেন, তা যে কোন অভিমানী শাসক শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়। বেগমপেট কাছে-ধারে নয়। কিন্তু পথের মসৃণতায় সহজগতি আর স্থান নির্বাচন বেগমপেটের নানলনগর থেকে দশ মাইল দৈর্ঘ্য ভুলে যেতে হয়।

বিমানঘাটিতে অবশ্য তাঁরাই বেশি গিয়েছিলেন, যাঁদের মোটরযান আছে বা তা ব্যবহারের সুযোগ আছে। তাঁদের ভীড় বিমানঘাটিতে ছিল; তবে কিছু লোক পায়ে হেঁটেও এসেছিল। কিন্তু এসব ভীড়ের কলকাতার ভীড়ের সঙ্গে তুলনা চলে না। দীর্ঘ পথের সর্বত্রই লোক সারি দিয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু যে জায়গাটি লোকালয় অথবা বাণিজ্যকেন্দ্র সেখানে লোক শ্রীনেহরুকে দেখবার জন্য ছাপিয়ে পড়েছে, খুবই ভীড় হয়েছে সেখানে, আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে, শ্রীনেহরু মাল্যভূষিত হয়েছেন, শ্রীনেহরুও সেই মালাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন জনতার মধ্যে।

অনেক পথ, সুন্দর পথ, মোটরে দাঁড়িয়ে অতিক্রম করলেন শ্রীনেহরু হায়দরাবাদ সেকেন্দ্রবাদের পাহাড় পাথর অথবা অধিবাসীরা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখল তাকিয়ে শ্রীনেহরু কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট তো বটেই, ভারতের প্রধান মন্ত্রীও বটেন। ভীড়ে, স্বীকার করা উচিত, মুসলমান সমাজের প্রতিভূরা সংখ্যালঘু, অনেক জায়গায় একেবারে নেই। এদের সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ, বেদনা ও উল্লাস এদের সর্বাঙ্গে এক রকম। সারাদেহে এদের এক অনুভূতি। বিধ্বস্ত নিজামতী অহংকারের স্মৃতি বড় নির্মম।

(ক্রমশ)

প্রজাতন্ত্রী ভারতের

তৃতীয় বর্ষ

বিশ্ববন্ধু বসু

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণ স্বাধীনতার পঞ্চম বর্ষকে বা প্রজাতন্ত্রী ভারতের তৃতীয় বর্ষকে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের দুইটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের মিলন-ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করতে পারেন—একদিকে যেসব বাধা বিপদের সম্মুখীন হয়েও দেশ সে সব কাটিয়ে উঠেছে—সেই যুগের অবসান, অপরদিকে শান্তি ও সমৃদ্ধি, আশা ও আত্ম-বিশ্বাসের যুগারম্ভ। প্রকৃতির খেয়াল দেশের বিভিন্ন অংশকে দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপদের সম্মুখে টেনে নিয়ে গেলেও, বিশেষভাবে সংশিলষ্ট অঞ্চলের নরনারী এবং সাধারণভাবে সমগ্র জাতি যে পরিমাণ ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগী মনোবৃত্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তা পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতীয় চরিত্রের গৌরববর্ধক হত। সামগ্রিক-ভাবে দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে একথা বলা চলে যে স্বাধীনতার পর থেকে এদেশ যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তা আলোচ্য বৎসরে ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে। প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার সম্বন্ধে ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের মনে যে ভীতি ও সন্দেহ ছিল আলোচ্য বৎসরে তা শুধু দূরীভূতই হয়নি—ভারতের মাটিতে গণতন্ত্র যে সুন্দর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারে সে কথাও প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোপরি, এই বৎসর দেশের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ভারতবাসী-দের মনে অধিকতর বিশ্বাস জন্মেছে।

পররাষ্ট্র নীতি

শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেছেন ঃ "সত্যের ভিত্তিতে গঠিত ভারতের পররাষ্ট্র নীতিই তার প্রধান অস্ত্র।" সত্যের ভিত্তিতে গঠিত ভারতের পররাষ্ট্র নীতি বরাবর ঠিক পথে চলেছে—এবং পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের কাছ থেকে দেশের জন্য এনেছে ক্রমবর্ধমান সদিচ্ছা। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ভারত যে দৃঢ় কর্মনীতি অবলম্বন করেছে একমাত্র তারই ফলে আজ বিশ্ববাসিদের চোখে তার মর্যাদা গেছে বেড়ে এবং এপর্যন্ত সাহসের সঙ্গে ভারত যে কর্মনীতি অনুসরণ করে এসেছে এ হল তার স্বাভাবিক ফল। আলোচ্য বৎসরে বিশ্বের বড় জাতিগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ তার স্থান অক্ষুণ্ণ ত রেখেছেই—তার মর্যাদা বহুলাংশে বেড়েও গেছে। স্যান-ফ্রান্সিস্‌কোতে রচিত জাপানী শান্তি চুক্তি নামধেয় দলিলে অপরের অনুজ্ঞা মাফি[ক] করতে ভারতের অসম্মতি কোন কোন জা[তির] চোখে তার নিরপেক্ষতার ন[ীতি] পুনর্জ্ঞাপিত করেছে। যে সাধারণ নির্বা[চনের] ফলে ভারতীয় জনসমাজ নিজেদের গ[ভর্ন]মেণ্ট গঠনের সুযোগ পেয়েছিল তা [...] কয়েকটি জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছে[যে] ভারতবর্ষ একটি স্থায়ী এবং সবল [গণ]তান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই[...] এ বৎসর আন্তর্জা[তিক] ক্ষেত্রে ভারতের পদম[র্যাদা] আরও বেড়ে গেছে।

ভারত ও বিদেশী [...]

প্রতিবেশী রাজ্যগ[ুলির] সঙ্গে ভারতের মৈ[ত্রী] বন্ধন ছিল সু[দৃঢ়]। নেপালের প্রধান [...] এবং তাঁর অপর চা[...] সহকর্মী ১৯৫২ স[নের] জানুয়ারী মাসে [...] এসেছিলেন এবং [...] রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের [...] পারস্পরিক গুরুত্বস[ম্পন্ন] বিষয়ে আলোচনা [...] ছিল। ব্রহ্মের প্র[ধান] মন্ত্রী ১৯৫১-র অ[...] মাসে ভারত পরিদ[র্শন] করেছিলেন এবং ভার[তের] প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে [...] আলোচনা হয়েছিল [...] দেশের সাধারণ স্ব[ার্থ] সম্পর্কিত বিভিন্ন [...] নিয়ে। ১৯৫১ সা[লের] নবেম্বর মাসে থাই বি[মান] বাহিনীর প্রধান ডেপ[ুটি] কমিশনারের নেতৃত্বে থ[াই]ল্যান্ডের বিমান বাহি[নীর] একটি সদিচ্ছা মিশন [...] দেশ পরিভ্রমণ ক[রে]ছিলেন। ১৯৫১ সা[লের] শেষাংশে যে চৌ[...] সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি[...] দেড় মাসের জন্য এ দে[শে] এসেছিলেন তাঁরা ভার[তের] ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক [ও] সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি [...] পরিদর্শন করেছিলেন। ১৯৫১ সা[লের] জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্থা[নের] প্রধান মন্ত্রী একাধিকবার স্বল্পকা[ল]

দিল্লী পরিদর্শনে এসেছিলেন
তার ফলে ভারত ও আফগানি-
নর মধ্যবর্তী সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক
হয়েছে। ভারতবর্ষ ভৌগোলিক দিক
যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে তার
ত্ব কতখানি এবং তার উপর প্রতিবেশী
গুলির আস্থা কতটা—এইসব বৈদেশিক
নর যাতায়াত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া

ন্যান্য দেশের সঙ্গেও ভারতের সম্বন্ধ
তাপূর্ণ ছিল। এদেশে নূতন কূটনৈতিক
স্থাপন করেছে মেক্সিকো, হাঙ্গেরী,
পাইন রিপাবলিক ও জাপান; আর্থিক

সি রাজগোপালাচারী
(মাদ্রাজ)

সঙ্কোচের খাতিরে ভারতবর্ষ বিদেশে
পন করেছে একটিমাত্র মিশন। আলোচ্য
রে বৃটেন পাকিস্থানের প্রতি তার
টভঙ্গীর পরিবর্তন করেছে; জাপান
রাশিয়া অধিকতর পরিমাণে ভারতের
চ্ছা অর্জনের আগ্রহ দেখিয়েছে
ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সদিচ্ছা
ধর জন্য সুস্পষ্ট কর্মনীতি গ্রহণ
রছে। ১৯৫২ সালের ৫ই জানুয়ারী
রতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি
ন্ত্রক সহযোগিতার কার্যক্রম সম্পর্কিত
(Technical Co-operation Pro-
amme Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
ার্ড ফাউণ্ডেসন ও ভারতের মধ্যে অপর
টি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৫২-র
শে জানুয়ারী। এই দুটি চুক্তি ভারত-
র্ষর পল্লী উন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন পরি-
কল্পনা কার্যকরী করায় সাহায্য করবে এবং এইভাবে ভারতবর্ষ প্রাচুর্য ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। ১৯৫২ সালের শেষ-ভাগে দক্ষিণ আমেরিকার কিউবা ও ইউ-রোপের যুগোস্লাভিয়া থেকেও দুটি সদিচ্ছা মিশন ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

আলোচ্য বৎসরে ভারতে কয়েকটি আন্ত-র্জাতিক বৈঠক বসেছিল। ১৯৫১এর ডিসেম্বর মাস ও ১৯৫২এর জানুয়ারী মাসে নয়াদিল্লী ও কলিকাতায় আন্তর্জাতিক পরি সংখ্যান পরিষদের ২৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত গভর্নমেণ্ট আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে যান্ত্রিক সাহায্যের যে চুক্তি করেছেন তার প্রথম সূচনা হিসাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৯৫১র নবেম্বর মাসে নয়াদিল্লীতে শ্রম পরিসংখ্যান সম্বন্ধে একটি আলোচনা বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। ভারতসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের পরিসংখ্যানবিদ্ সরকারী কর্মচারিগণ এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন এবং আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫২ সালের শেষে নয়াদিল্লীতে গান্ধী দর্শন সম্বন্ধে একটি আলোচনা বৈঠক বসেছিল এবং এতে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন দার্শনিক ও রাজ-নৈতিক কর্মী যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের গোড়ায় বোম্বাইতে ঊনবিংশ বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টেবিল টেনিস খেলে এইরকম প্রায় সকল দেশের প্রতিযোগীই এতে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রথম প্রাচ্যের একটি দেশ, জাপান চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে-ছিল এই খেলায়। ১৯৫২ সালের শেষভাগে ভারতে অনুষ্ঠিত ভারত-পাকিস্থানের টেস্ট ক্রিকেট খেলাও এ বৎসরের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সরকারীভাবে পাকিস্থানের এই প্রথম আবির্ভাব। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে দুইটিতে বিজয়ী হয়েছে ভারত, একটিতে বিজয়ী হয়েছে পাকিস্থান এবং অপর দুইটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ফলে পাকি-স্থানকে পরাজিত করে ভারত এই সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেটে রাবার বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

ভারত-পাকিস্থান সম্বন্ধ

পৃথিবীতে যদি এমন কোন দেশ থাকে যার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ হৃদ্যতাপূর্ণ ও **বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না—সে হল পাকিস্থান।** অথচ পৃথিবীতে যদি এমন দুটি দেশ থাকে যাদের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য ও বন্ধুত্বের সম্ভাবনা খুব বেশী তবে সে দুটি দেশ দল ভারত ও পাকিস্থান। এই দুটি জাতি যেসব বন্ধনে আবদ্ধ সেগুলি এখনও দৃঢ়—যথা জাতীয়তার বন্ধন, ভাষা, ভূগোল, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি প্রভৃতির বন্ধন। তবু গত ৫ বৎসরের ইতিহাস থেকে এই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে মূলগত আদর্শবাদের বিরোধ আছে তার কাছে এগুলি শক্তিহীন। একটি বিরাট দেশ ভাগ করা হলে উভয় পক্ষ যদি সমস্যা সমাধানের
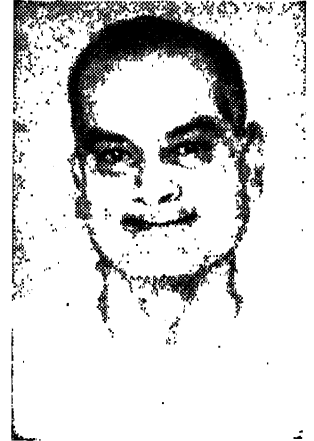
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়
(পশ্চিমবঙ্গ)

জন্য কিছু পরিমাণে আপোষ রফা করতেও সম্মত থাকে তা হলেও সব সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হয় না। আর এক পক্ষ যেখানে অসম্ভব অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াসী সেখানে ত উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করাই কঠিন।

কোন কোন প্রশ্নে আলোচ্য বৎসরে ভারত ও পাকিস্থান একমত হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির কোন সমাধান হয়নি। কাশ্মীরের প্রশ্ন আগে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। এই প্রশ্নটিতেই ভারত ও পাকিস্থানের আদর্শগত বিরোধ স্পষ্ট করে ধরা পড়ে। ভারত যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, পাকিস্থান সেখানে ধর্ম শাসিত রাষ্ট্র। কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্থান **ইচ্ছা করে দু' বৎসর ধরে খবরের কাগজ**

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী
(উড়িষ্যা)

বেতার, গান প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্থানীদের মনে জেহাদী প্রবৃত্তি জাগিয়ে রেখেছিল। কাশ্মীর প্রশ্নে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের আলোচনার ধারা অনুযায়ী এই জেহাদী প্রবৃত্তি বাড়ত এবং কমত। ভারতীয় এলাকার পুঞ্চ থেকে যে রাওয়াল কোটের দূরত্ব মাত্র ১৫ মাইল সেখানে পেশোয়ার থেকে ১৯৫১এর জুন-জুলাই মাসে সৈন্য সমাবেশ করে পাকিস্থান ভয় দেখাতে শুরু করেছিল। অতঃপর এই ধরণের আরও ভীতি প্রদর্শনকারী সৈন্য সমাবেশ করেছিল পাকিস্থান এবং ভারতের বিরুদ্ধে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিল 'বদ্ধমুষ্টি'। জুলাই মাসে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষও কিছু সৈন্য সমাবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং বারবার পাকিস্থানকে জানিয়ে দিয়েছিল যে কাশ্মীরের উপর কোনরূপ আক্রমণ ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের সামিল বলে ধরা হবে। নিষ্প্রদীপের মহড়া দিয়ে, নানারূপ জরুরী আইনকানুন জারী করে, জনগণকে শস্ত্রাদি দিয়ে সুসজ্জিত করে এবং রাজাকর, আনসার প্রভৃতি সৈন্যদল গঠন করে পাকিস্থান স্বরাজ্যে যুদ্ধের মনোভাব বাড়িয়ে তুলেছিল।

আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ পাকিস্থানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে উৎসুক ছিল এবং [illegible] 'যুদ্ধ বর্জনের ঘোষণা' করার প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করা হয়েছিল। পাকিস্থানের দিক থেকে এ প্রস্তাবে অনুকূল সাড়া না পাওয়া গেলেও ভারতের প্রধান মন্ত্রী একক দায়িত্বে ঘোষণা করেছিলেন, "পাকিস্থানের পক্ষ থেকে ভারতের বুকে যতক্ষণ কোন আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালিত না হয় ততক্ষণ আমাদের তরফ থেকে আক্রমণাত্মক ধরণের সামান্যতম কোন কার্যক্রমও অবলম্বিত হবে না।" প্রধান মন্ত্রী একথাও পরিষ্কার করে বলেছিলেন যে, "ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে কাশ্মীরও পড়ে।" এ বৎসর শুধু যে যুদ্ধের ভীতি অপসারিত হয়েছে তাই নয়, পাকিস্তানের নেতাদের মনে এই ক্রমবর্ধমান বোধেরও উদ্ভব হয়েছে যে, ভারতের সঙ্গে যে কোন শক্তিপরীক্ষায় তাঁদের সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হবে। অকল্যাণের মধ্য থেকে যেমন কল্যাণের উদ্ভব হয়, তেমনি এই উপলব্ধির ফলে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে শান্তি রক্ষিত হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি পাকিস্তানের শুভ বুদ্ধির উদয় কিন্তু আজও হয়নি। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে ভারতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও পাসপোর্ট ও ভিসার দ্বারা উভয় বঙ্গের লোক চলাচল নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করে পাকিস্তান প্রমাণ করেছেন যে, উভয় দেশের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক যোগাযোগ সংরক্ষণ তার কাম্য নয়।

কাশ্মীরে নববিবর্তন

এ বৎসর কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। ডাঃ ফ্রাঙ্ক পি গ্রাহাম

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা
(জম্মু ও কাশ্মীর)

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ
(উত্তরপ্রদেশ)

ধৈর্যের সঙ্গে সমাধান আবিষ্কারের প্রয়াস করেছেন তাতে সর্বপ্রযত্নে গভর্নমেণ্ট সহায়তা করেছেন। ভার[illegible] বরাবর বলে এসেছে যে, জম্মু ও কাশ[illegible] ভবিষ্যৎ নির্ণয় করতে তার জনসাধারণ আক্রমণকারীদের দয়ার উপর রাজ[illegible] ছেড়ে চলে আসা হবে না— একথাও [illegible] বর্ষ বলেছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতি[illegible] এক্ষেত্রে আপোষ মীমাংসার জন্য যে [illegible] করুন, এটা সত্যই বিস্ময়ের বিষয় এ[illegible] এই মহান প্রতিষ্ঠানটি আক্রমণকারী আক্রান্তকে একই পর্যায়ভুক্ত বলে বি[illegible] করে আসছেন। ১৯৫২ সালের শেষে [illegible] পরিষদ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে যে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ ক[illegible] পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলির তুলনায় তা [illegible] বেশি খারাপ। এই প্রস্তাবে জম[illegible] কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুনরায় আপোষ করতে বলা হয়েছে ডাঃ গ্রাহামকে। ভ[illegible] বর্ষ প্রথম থেকেই এ প্রস্তাব প্রত[illegible] করেছে এবং এ ব্যাপারে প্রথম থেকে নিজের অসহযোগিতার নীতি জ[illegible] দিয়েছে। নূতন প্রস্তাবটি পাকিস্থ[illegible] অনুকূল হওয়ায় সে তা গ্রহণ [illegible] নিঃসঙ্কোচে।

ইত্যবসরে জম্মু ও কাশ্মীর অভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক সংগঠনের এগিয়ে গেছে। রাজ্যসরকারের সি[illegible]

ষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর
। গণপরিষদের সম্মুখে দুটি প্রধান
ব্য ছিল দেশের ভবিষ্যৎ শাসনের জন্য
টি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা এবং রাজ-
র ভবিষ্যৎ পদমর্যাদা নির্ণয় করা। এই
কাজে সহায়তার জন্য গণপরিষদ অন্যান্য
য়র সঙ্গে একটি মূলনীতি কমিটিও
করেছিলেন। এই কমিটি রাজ্যের ভাবী
নতন্ত্রের মোটামুটি রূপ নির্ণয় করতে
জানতে চেয়েছিলেন যে, রাজ্য শাসন-
থা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক রীতিতে
চ হবে না বর্তমান নিয়মতান্ত্রিক রাজ-
ই চালু থাকবে। ফলে রাজ্যের রাজ-
র ভবিষ্যতের প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীরূপে
হয়ে দেখা দিয়েছিল।

মিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজ-
অতীতের সামন্ততন্ত্রের প্রতীক বিশেষ
ব্যক্তিবিশেষ ও তার সহায়তাকারী
বিদ্ধ শ্রেণীবিশেষের শ্রীবৃদ্ধির জন্য
র সম্পদ ও জনসাধারণের শোষণের উপর
ভিত্তি। সুতরাং রিপোর্টে আরও বলা
ছ যে কমিটির মতে রাজতন্ত্র জন-
আশা আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। কমিটি
মর্মে দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করেছিলেন
তিহাস ও সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে
হয়ে পৃথিবীর বহু অংশ থেকে যখন
ন্ত্র অবলুপ্ত হচ্ছে, তখন রাজতন্ত্রের
ক্ষণ ঐতিহাসিক দিক থেকেও ভুল হবে।
ই গণপরিষদের কাছে কমিটি সুপারিশ
যে, জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ
তন্ত্রের রূপ হবে পুরোপুরি গণ-
ক, বংশগত রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাতে
এবং রাজ্যপ্রধানের পদ হবে নির্বাচনের
ন। মূলনীতি কমিটির এই সব সুপারিশ
রিষদ কর্তৃক একবাক্যে গৃহীত
ছল। তদনুসারে ইতিমধ্যে কাশ্মীরের
নব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়েছে এবং
রাজ করণ সিং তিন বৎসরের জন্য
ীরের প্রথম নির্বাচিত রাজ্যপ্রধানের
পেয়েছেন।

উদ্বাস্তু সম্পত্তি

াশ্মীর প্রশ্নের পরেই ভারত ও পাকি-
নর মধ্যে আর যে সমস্যাটির সমাধান
হ বলে বিবেচিত হয়েছে সেটি হল
স্তু সম্পত্তির প্রশ্ন। এবিষয়ে একটি
সমাধান আছে। পাকিস্থান এই নীতি
র আঁকড়িয়ে আছে বলে এই প্রসঙ্গে
াপ-আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি
ছে। অভিজ্ঞতার ফলে ভারত ও

শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী
(আসাম)

পাকিস্থানে, ইউরোপ ও অন্যত্র দেখা গেছে যে, এ সমাধান অচল। এ সমাধানের মূল কথা হল এই যে, জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে আইনগত ও অন্যান্য প্রকারের বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের ছোট ছোট সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময় করবে। এই 'সমাধানে' নীচের প্রয়োজনীয় প্রশ্নের কোন জবাব মেলে নাঃ "ব্যক্তিগত বিক্রয় বা বিনিময়ের পথে বড় বড় সম্পত্তিগুলির বিলি-ব্যবস্থার পরও যে বহুসংখ্যক ছোট সম্পত্তির প্রশ্ন

শ্রীটিকারাম পালিওয়াল
(রাজস্থান)

অমীমাংসিত থেকে যাবে তার কি হবে?" পাকিস্থান কৃষিসম্পত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কোন কথাই বলে নি। এ ব্যাপারে ভারত-বর্ষের বক্তব্য এই যে, দুটি গভর্নমেণ্টেরই উচিত রাজ্যাভ্যন্তরীণ সম্পত্তিগুলি দখল করে নেয়া, সম্মিলিত ভারত-পাকিস্থান কোন এজেন্সী বা অন্য কোন নিরপেক্ষ সংস্থার মারফৎ সেই সব সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় করা এবং উভয় দেশের এই জাতীয় সম্পত্তির মূল্যের মধ্যে যে ব্যবধান থাকবে তা উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্মত পদ্ধতি অনুসারে অধমর্ণ দেশের উচিত উত্তমর্ণ দেশকে দিয়ে দেওয়া।

ভারতে বৈদেশিক অধিকার

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পাঁচ বৎসর পরে এবং স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে বিঘোষিত হবার আড়াই বৎসর পরেও ভারতে বৈদেশিক অধিকারভুক্ত কোন কোন স্থান আছে এটা কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তি-কর। যে-সব শক্তি এখনও এই সব পকেট দখল করে বসে আছে তাদের উচিত ছিল বুদ্ধিমানের মত সময়োপযোগী কাজ করা। এবং বৃটিশদের সঙ্গে দেশত্যাগ করে চলে যাওয়া। ভারতবর্ষ শান্তিপ্রিয় জাতি এইটাই বোধ হয় এই সহজ প্রশ্ন মীমাংসার পথে বাধা হয় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শান্তি-প্রিয় জাতিকে দুর্বল বলে মনে করা একটা বড় ধরণের রাজনৈতিক ভুল।

সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকা

আলোচ্য বৎসরে সিংহল ও বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার আলোকে বিচার করে বিদেশ প্রবাসী ভারতীয় ও ভারতীয়দের বংশধরদের জন্য ভারতের উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছিল। সিংহল তার অর্থবিনিময়ের নিয়মকানুন শিথিল করায় সিংহলস্থিত ভারতীয়ের পক্ষে ভারতে আত্মীয় স্বজনদের কাছে টাকা পাঠানো সহজ হয়ে উঠেছিল। আমরাও তখন আশা করেছিলাম যে, সিংহল তার অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতবাসীদেরও সমপর্যায়ভুক্ত করবে। কিন্তু তা হয় নি। ব্যবসায় ও চাকুরীতে সিংহলীকরণের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সিংহল ভারতবাসী-দের বিদেশী বলে গণ্য করেছে। সে একথা ভুলে গেছে যে, ভারতীয়দের সিংহলী নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করায় অহেতুক বিলম্ব এবং বরাবর সিংহল গভর্নমেণ্টের বাধা সৃষ্টিই ভারতীয়গণকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে থাকতে বাধ্য করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাও
(হায়দরাবাদ)

নাগরিকত্বের আবেদনপত্র গভর্নমেণ্ট যাতে দ্রুত বিবেচনা করে দেখেন তার দাবীতে সিংহল ভারতীয় কংগ্রেস সমগ্র সিংহল দ্বীপে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের পিছনে দ্বীপের জনশক্তির সকল অংশের সমর্থন ছিল।

সিংহল সম্প্রতি ধুয়া তুলেছিল যে, ভারতীয়রা বসবাসের উদ্দেশ্যে ঐ দ্বীপে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে। এ ধরণের অবৈধ প্রবেশের ব্যাপার দুই একটি থাকলেও থাকতে পারে—তবে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর কথায় বলতে হয় যে, এই ধুয়ার পিছনে সিংহলের পক্ষে প্রকৃত ভয়ের কিছু নেই। মনে হয় যে, সিংহলবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে সিংহল গভর্নমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করেছেন তারই সমর্থনে এ ধুয়া তোলা হয়েছে। বহুসংখ্যক ভারতীয়ের উপস্থিতি খাঁটি সিংহলীদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে—এইটাই হল এ ধুয়ার মূলে কারণ। সিংহলের এ ধরণের আশংকা থাকার কোন হেতু নেই—কেননা, ভারত নিজেই অদক্ষ ভারতীয় শ্রমিকদের বসবাসের জন্য সিংহল গমন নিষিদ্ধ করেছে এবং ভারতবাসীদের এই ধরণের বিদেশ গমন দমনে ভারতের আগ্রহ সিংহল অপেক্ষা কম নয়।

শ্রীভীমসেন সাচার
(পাঞ্জাব)
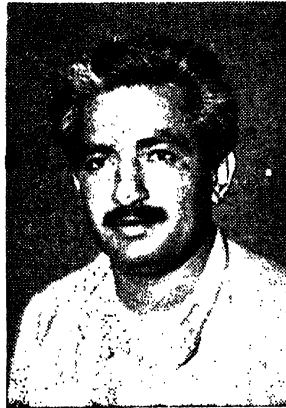
শ্রীব্রহ্মপ্রকাশ
(দিল্লী)

তবু সিংহলস্থিত ভারতবাসীদের বিতাড়নের জন্য সিংহল গভর্নমেণ্ট যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি সেখানকার ভারতবাসীদের তাঁরা হাতে না মেরে ভাতে মারার এক অভিনব ব্যবস্থা করেছেন। ভারতবাসীদের জন্য এমন রেশনবিধি করা হয়েছে যার ফলে অনেক ভারতীয় শ্রমিক রেশন থেকে চাল পাবে না এবং চোরাবাজারে চাল কিনে পেট চালাবার সামর্থ্য তাদের অনেকেরই নেই বলে তারা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হবে। এই নিয়ে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ধরণের ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক চিত্র আরও অসন্তোষজনক। ডাঃ মালান যে বর্বর কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেখানে শ্বেত ও অশ্বেতকায়দের ব্যবধানসূচক নিয়ম-কানুন ত ব এদের স্বতন্ত্রভাবে রাখার যে ব অবলম্বিত হয়েছে তার অদ্ভুত ফ গিয়েছিল সম্প্রতি জোহানেসবুর্গের হাসপাতালে; সেখানে ডাক্তাররা অশ্বেতকায় রক্তদাতার রক্ত একজন শে রোগিনীর দেহে না দিয়ে তাকে দিকে ঠেলে দিতেও প্রস্তুত মালান গভর্নমেণ্ট বিশ্বজনমতের বহু অন্যায় আইন পাশ করিয়েছেন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভার সহ অশ্বেতকায় জনগণ সারা
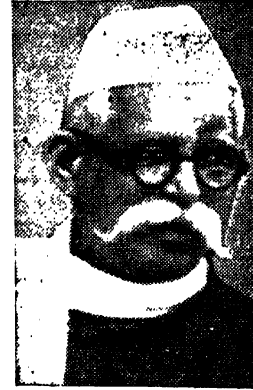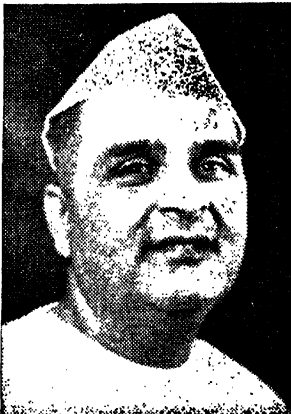
শ্রীরবিশংকর শুক্ল
(মধ্যপ্রদেশ)

শ্রীহনুমান থিয়া
(মহীশূর)

[illegible]ব্যাপী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দো-[illegible] সূত্রপাত করেন ১৯৫২ সালের [illegible]জুন। দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্ট [illegible]ন্দোলনকে লঘুচিত্তে গ্রহণের ভাব [illegible]ও পরে হাজার হাজার স্বেচ্ছা-[illegible]ক গ্রেপ্তার করে তাঁদের প্রকাশ্যে [illegible]া সহ নানাবিধ শাস্তি দিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্বেতাঙ্গদের জন্য [illegible]ত রেল-কামরায় ভ্রমণ করেছিলেন [illegible]াধারণ পার্কে 'নিষিদ্ধ' বেঞ্চিতে [illegible]লেন। ৩০শে জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকা [illegible]মণ্ট অশ্বেতকায় নেতৃবৃন্দের গৃহে [illegible]অফিসে হানা দেন এবং ভারতীয় ও [illegible]ান নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে অবরুদ্ধ

শ্রীমোরারজী দেশাই
(বোম্বাই)

[illegible]াখার জন্য কম্যুনিজম্ দমন আইনের [illegible]াও গ্রহণ করেন।

[illegible] এটা অবশ্য আশার কথা যে, দক্ষিণ [illegible]কার গোটা শ্বেতকায় সমাজ মালান [illegible]তাঁর নব-নাৎসীদের মত উন্মাদে [illegible] হয় নি। এটাও লক্ষ্য করবার [illegible] যে-দেশে ৪৫ বৎসর আগে ভারতের [illegible]ক গান্ধীজী অহিংসার শক্তি প্রদর্শন [illegible]লেন সেইখানে বর্তমানে সংখ্যালঘু [illegible]শক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু জনসমাজের [illegible]ার ও সুবিধা অর্জনের জন্য অহিংস [illegible]শৃঙ্খল সংগ্রাম চলেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ন্যায়ের দাবী পদদলিত হবে না এবং শেষ পর্যন্ত শ্বেত আধিপত্য এবং আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে জাতিগত সাম্য ও জাতীয় স্বাধীনতার শক্তি।

আভ্যন্তরীণ চিত্র

আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এ বৎসরটিকে কৃতিত্বপূর্ণ বলা চলে। যদিও খাদ্য এ বৎসরের বড় সমস্যা হয়েই ছিল তবু একথা স্বীকার করতে হয় যে, খাদ্যসমস্যার প্রতিকারে এ বৎসর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখানো হয়েছে। পশ্চিম ভারতে, রায়ল সীমায় এবং বিহারে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ আশংকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সাবধানী ও সুপরিকল্পিত খাদ্য আমদানীর নীতি, স্থানীয় শস্যসংগ্রহ এবং বণ্টনের ফলে পরিস্থিতি ভালভাবে আয়ত্তে আনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এত সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মাদ্রাজের নেতৃত্বে কয়েকটি রাজ্য আলোচ্য বৎসরে খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণের পরীক্ষা আরম্ভ করেছে। কিছুদিনের জন্য রেশনের দায়িত্ব পালনের মত মজুত খাদ্য হাতে থাকায় এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অনুকূল হওয়ায় কয়েকটি রাজ্য এই বৎসরে ক্রমিক খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেছে। এইসব ব্যবস্থা কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারক-দের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এবং আশা করা যায় যে, এইসব ব্যবস্থার ফলে জনগণের সকল অংশই উপকৃত হবে ও শীঘ্রই খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যমান একটা যুক্তিসম্মত স্থানে এসে স্থায়ী হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিসাব নিকাশের মধ্যে যে পরিচয় পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে ভারতের অবস্থা। অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে দুটি কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির বাজেটের তারতম্য ঘটেছে। তার একটি কারণ হল মূলধনের বাজারে অনিশ্চয়তা এবং যুদ্ধের পরে প্রথম ১৯৫২ সালের গোড়ায় দ্রব্যমূল্যের পতন। এই শেষোক্ত কারণটি সরকারী ব্যয়ের কোন পরিবর্তন না ঘটালেও সরকারী আয়ের উপর অনেকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তবু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গভর্ন-মেণ্টগুলির বাজেটের সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায় না, তার কারণ দেশের ব্যয়ের অধিকাংশ নিয়োজিত হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাজে এবং রাজ্য-সরকারগুলি যেসব ব্যয়বহুল বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন সেগুলির পিছনে। কংগ্রেস গভর্নমেণ্টগুলি দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার মূলে হাত দিয়েছেন এবং জমির সমস্যা ও শিল্পোন্নয়ন সমস্যার মত মূল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

ভূমি সংস্কার ও শিল্পোন্নয়ন

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজ্যেই বর্তমানে জমিদারী ও অন্যান্য প্রকারের মধ্যস্বত্ব ভোগ বিলুপ্ত হয়েছে। আলোচ্য বৎসরে জম্মু ও কাশ্মীর সিদ্ধান্ত করেছে যে, মালিকের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির দরুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। উত্তর প্রদেশে মোট ৪ কোটি ১৩ লক্ষ একর মধ্য-

শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
(বিহার)

স্বত্ব ভোগীর জমির মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমি গভর্নমেণ্ট অধিকার করেছেন ১৯৫২ সালের ১লা জুলাই। অন্যান্য যে-সব রাজ্য ধীরে ধীরে জমিদারী উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ করেছে এ বৎসর তাদেরও কাজ এগিয়েছে। আরব্ধ কার্যক্রম শেষ হলে এবং কৃষকদের মধ্যে জমি যথোপযুক্তভাবে বণ্টনের কাজ সমাপ্ত হলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কৃষি-পদ্ধতির পরীক্ষা চালানো যাবে। আচার্য বিনোবা ভাবে পদব্রজে ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামে পরিক্রমা করে যে ভূমিদান যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন তা জনমানসে গভীর ফল-প্রসূ হয়েছে এবং তার ফলে কৃষি-সংস্কারের

ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে শিল্পসংক্রান্ত (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন জারী করে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পের সুশৃঙ্খল উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নয়নের স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত হয়েছে তেমনই কোন কোন অবস্থায় জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ উৎপাদন ব্যবস্থা করার জন্য গভর্নমেণ্ট সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন।

এ বৎসর শিল্পপণ্যের উৎপাদন ভাল হয়েছিল। ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে সর্বপ্রকার শিল্পের উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ছিল ১২০·৪; এই সংখ্যা বেড়ে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩৩·৩। এই সময় একমাত্র সালফারিক্ এসিড্ ছাড়া প্রায় সব বড় শিল্প ও বুনিয়াদী শিল্পই বিস্তারলাভ করেছে।

রপ্তানি ও আমদানী

নানাদিকে উন্নতির ফলে এবং কোরিয়া যুদ্ধ, পুনরস্ত্রসজ্জা এবং বিভিন্ন দেশের শস্য মজুতে প্রয়াসের ফলস্বরূপ ভারতের প্রধান প্রধান পণ্যের চাহিদা গত দুই বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতের রপ্তানি-ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছে। এ বৎসর রপ্তানি ব্যবসায়ের পণ্যমূল্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে বলা চলে; আগের বৎসর যেখানে মোট বাণিজ্য, রপ্তানি ও আমদানীর মূল্যগত পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২১০·২২ কোটি টাকা, ৬০১·৩৮ কোটি টাকা এবং ৬০৮·৮৪ কোটি টাকা সেখানে ১৯৫১-৫২ সালে এই সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৬৯৭·৮৮ কোটি টাকা, ৭৩২·৬৩ কোটি টাকা এবং ৯৬৫·২৫ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধির অনেকটা নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক-কালের মূল্যবৃদ্ধি ও সমগ্র ব্যবসায়ের পরিমাণগত ক্রমিক বৃদ্ধির ফল। বাণিজ্য ক্ষেত্রে রপ্তানির চেয়ে আমদানী যে বেশী হয়েছে তার দরুণ লেনদেনের কোন অসুবিধা হয়নি তার কারণ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে সম্পাদিত গম-ঋণ চুক্তি অনুসারে মোটা পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে বস্ত্র ও পাটশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের স্টক ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল বলে কাঁচা পাট ও তুলাও অধিকতর পরিমাণে আমদানী করতে দেওয়া হয়েছিল।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

এ বৎসর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যারম্ভ হয়েছে। বুনিয়াদী শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য কলকারখানা সহ যে-সব বিভিন্ন নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও জলীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে সেগুলি সমাপ্ত হলে বৃহৎ শিল্প এবং কুটিরশিল্পের দ্রুত উন্নতি হবে। আশা করা যায় যে, এর ফলে এদেশের ভূমির উপর চাপ কমবে।

ভারত-মার্কিন যান্ত্রিক সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে ভারত গভর্নমেণ্ট এদেশে কতক-গুলি পল্লী ও শহর মিশ্রিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্ম দিবসে এ পরিকল্পনার কার্যারম্ভ হয়েছে। নির্বাচিত কতকগুলি অঞ্চলে স সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিধান এ পরিকল্পনার লক্ষ্য।

শাসনতন্ত্র ও আইন প্রণয়ন

শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও এ বৎসর (কয়েকটি বিবর্তন দেখা গেছে। : ৫১ সালে মহীশূর গভর্নমেণ্ট করেছিলেন যে, তাঁদের রাজ্যকে তন্ত্রের ৩৭১ ধারার বিধি বিধানে থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত ধারায় আছে যে, "খ শ্রেণীর রাজ্যের গভ সাধারণভাবে ভারত গভর্নমেণ্টের নি ধীনে থাকবেন এবং ভারত গভ মাঝে মাঝে যে সব নির্দেশ দেবেন (পালন করতে বাধ্য হবেন।" মহ সঙ্গে নব-সৃষ্ট 'খ' শ্রেণীর রাজ্য তফাৎ ছিল। প্রথমত 'মহীশূরের ভাবে নির্বাচিত আইনসভা ও তার দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিসভা চালু ছি দ্বিতীয়ত এটি ছিল দীর্ঘ সুশাসনের ঐতিহ্য সমন্বিত একক কাজেই অবশিষ্ট 'খ' শ্রেণীর রাজ্য মত এর কোন একীকরণের প্রশ্ন না। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি একটি ডিক্রি জারী মহীশূরকে শাসনতন্ত্রের ৩৭১ দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। আর বিবর্তন এই যে, একটি আইন পা হিমাচল প্রদেশ, বিন্ধ্য প্রদেশ, ভূপাল, কুর্গ ও আজমীঢ় প্রভৃ শ্রেণীর রাজ্যে জনপ্রিয় গভর্ন

ওয়াই এস পারমার
(হিমাচল প্রদেশ)

এ জে জন
(ত্রিবাঙ্কুর কোচিন)

ইউ এন ধেবর
(সৌরাষ্ট্র)
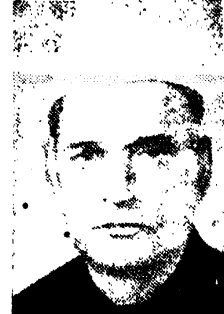
শ্রীশম্ভুনাথ শুক্ল
(বিন্ধ্যপ্রদেশ)

হরিভাউ উপাধ্যায়
(আজমীঢ়)

সি এম পুনাচা
(কুর্গ)

শংকরদয়াল শর্মা
(ভুপাল)

মিছরিলাল গাঙ্গোয়াল
(মধ্যভারত)

ভা সংগঠনের ব্যবস্থা করা
া।

ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র
ত আইন (PRESS ACT)
বারক অবরোধ আইন (PRE-
TIVE DETENTION ACT)
এ বৎসরের সর্বাপেক্ষা বেশী
াগ্য ঘটনা। কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট
নরূপে বা কোন আকারে হিংসা
বা হিংসাত্মক কার্যকলাপ
নের অনুমতি দিতে প্রস্তুত নন
মাণ পাওয়া যায় তীব্র সমালোচনার
এই সব আইন প্রণয়ন থেকে।
আইন প্রণয়নে সংবাদপত্র ও জন-
ের মধ্যে অস্বাভাবিক ভীতির ভাব
য়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে
াছে যে, জনসাধারণের অধিকার
করার উদ্দেশ্যে নয়—আইনমান্য-
াগরিকবৃন্দের রক্ষা করা ও এই শিশু
ক শক্তিশালী ও নিরাপদ করে
উদ্দেশ্যেই এই সব আইন প্রণয়ন
হয়েছে। কার্যত এই সব আইন
ারণের অধিকার হরণ করেনি বরং
া মূল অধিকার প্রতিষ্ঠা ও
ের কাজেই সহায়তা করছে।

সাধারণ নির্বাচন

বৎসরের শ্রেষ্ঠ ঘটনা কিন্তু সাধারণ
। সারা দেশে যেরূপ শান্তি-
ও সুশৃংখলভাবে নির্বাচন
হয়েছিল সেটাই ছিল এই
নের বড় বৈশিষ্ট্য। নির্বাচনের ফল
াড়িয়েছে যে, দেশবাসিগণ আগামী
বৎসরের জন্য স্থায়ী শাসনকার্য
পরিচালনা এবং মহান্ ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব প্রত্যাশা করতে পারেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ মাত্রায় আত্মনিয়োগ করে যাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছেন সেই কংগ্রেসসেবিগণ শিশুরাষ্ট্রকে নিরাপদ অবস্থায় উত্তীর্ণ করেই যে সন্তুষ্ট তা নন—সেই স্বাধীনতাকে তাঁরা যাতে আরও দৃঢ়সংবদ্ধ করতে পারেন সেজন্য দেশের জনসাধারণ বিপুল সংখ্যাধিক্যে তাঁদের পুনর্নির্বাচিত করে আবার পাঁচ বৎসরের জন্য দেশ শাসনের ভার তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে ভাল কাজ করেছেন। ভারতের শাসন ভার এখন যোগ্য হস্তে সমর্পিত এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে দেশ অনেকখানি এগিয়ে যাবে।

অন্যান্য কয়েকটি ঘটনা

এখানে অন্যান্য ২।১টি ঘটনার উল্লেখ করার প্রয়োজন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লীতে শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৫৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই কংগ্রেস অধিবেশনেই নির্বাচনী অভিযানের একটি কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয়েছিল। এবারের প্রজাতন্ত্রী দিবসের ঠিক মুখেই হায়দরাবাদে পুনরায় শ্রীজওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং সে অধিবেশনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। হেলসিঙ্কিতে কিছুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও ভারতের পক্ষে উল্লেখের দাবী রাখে। কেননা এই অলিম্পিকে হকিতে বিশ্ববিজয়ী হয়ে ভারত তার পঁচিশ বৎসরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পৃথিবীর আর কোন দেশ একই খেলায় একাদিক্রমে ২৫ বৎসরকাল বিশ্ববিজয়ী হতে পেরেছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

বিদেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর অন্যতম হল ১৯৫২ সালের শেষে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক দলের পরাজয় ও তার পরিবর্তে রিপাব্লিকান দলের জেনারেল আইসেনহাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এই পরিবর্তনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিতে কিছুটা রদবদল হওয়া বিস্ময়কর নয়।

দেশে বিদেশে আলোচ্য বৎসরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমাদের সগর্বে স্মরণ করা উচিত শ্রী বি এন রাও-এর কথা। বিদেশে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধিতে তাঁর যে দান তার তুলনা বড় একটা পাওয়া যায় না। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী বি এন রাও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক নিয়োজিত চীনের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক সাব-কমিটির সভাপতির কাজ করেছিলেন এবং ১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের অন্যতম বিচারক নির্বাচিত হয়েছেন।

[ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত Fifth year of Freedom নামক গ্রন্থের ভূমিকা অবলম্বনে]

কুতুবমিনার

এস পি চাবলানি

পৃথিবীর পরিসর ছোট্ট হয়ে গেছে। কোন জায়গা আর অজানা নেই, কোন জিনিস নেই যা অচেনা। রহস্যের আবরণ সব কিছু থেকে খসে পড়েছে। তবু অতি পরিচিত অনেক কিছুরও মর্ম-কথা, তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় আমরা কত কম জানি।

কুতুব মিনারে বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়ে থাকে। কিম্বদন্তী বলে যে, যমুনার ধারা দূরে সরে গেলে কোন ভারতীয় নৃপতি তাঁর রূপসী কন্যার যমুনা-দর্শনের জন্যে এই মিনার তৈরী করে-ছিলেন। কিন্তু এর চেয়ে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। কারণ কুতুব মিনার সাত শতাব্দীব্যাপী ক্রমে ক্রমে নির্মিত ও বারংবার সংস্কৃত হয়েছে। কুতুব মিনার আজ যে কলেবরে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে দাস বংশ, তোগলক বংশ, লোদী বংশ ও ব্রিটিশ — সকলেরই দান রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কালচক্রের আবর্তন কিভাবে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তার স্বাক্ষর এই মিনারটি মনোযোগের সাথে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে।

পৃথিবীর বিস্ময়

পর্যটক-প্রবর ও মধ্যযুগের ভাষ্যকার ইবন বাতুতা এই মিনার সম্বন্ধে বলেছেন, "এটি পৃথিবীর এক বিস্ময়......ইসলাম জগতে এর তুলনা নেই।" আজও এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, মাহাত্ম্যে সৌন্দর্যে, প্রসাধন-লালিত্যে এবং শিল্প-কৌশলে একখানি ছন্দোময় কবিতার মতো এই মিনারটি এজাতীয় স্থাপত্য-কীর্তির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কুতুব মিনার ২৩৮ ফুট উঁচু এবং পাঁচতলায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি তলার পার্শ্বদেশ অতি সুন্দর-ভাবে উৎকীর্ণ। মিনারের গাত্র ঝিঙ্গার খোলের মতো কতকগুলো থাম দ্বারা পরিবেষ্টিত। সর্বনিম্ন তলে একটি গোল থাম, তার পর একটি কোণা-তোলা থাম— এরকম চব্বিশটি থাম আছে; দ্বিতীয় তলের থামগুলো সবই গোল এবং তৃতীয় তলের সবগুলো থামই কোণা-তোলা। প্রত্যেকটি থাম এক তল থেকে আর এক তল পর্যন্ত লম্বমান। নিঃসন্দেহে এই থামগুলো মিনারের রূপ ও ব্যঞ্জনা অনেক-খানি বাড়িয়ে দিয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম তল লাল পাথরের মধ্যে বসানো মার্বেল দ্বারা চোঙ্গার মত করে তৈরী।

কোরাণের বাণী সম্বলিত কয়েকটি বন্ধনী মিনারকে বেষ্টন করে আছে। একটি বাণী হচ্ছে—"হে বিশ্বাসিগণ, যখন আল্লার নামে আজান দেওয়া হবে, তখন তোমরা সকলে কাজকর্ম পরিত্যাগ করবে, কারণ তিনিই সমস্ত ধন-দৌলত দিবার মালিক......"।

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, কুতুব মিনার হিন্দু কল্পনা ও উদ্যমের সৃষ্টি। কিন্তু এই মতবাদ এখন অগ্রাহ্য। হিন্দু স্থাপত্যে মিনার-গম্বুজের মতো নেই এবং কুতুব মিনারের সমগ্র অঙ্গ থাম, লতাপাতা পশুপাখী অঙ্কিত লঙ্কার, কার্নিস, সব কিছুরই ভ কল্পনা সারাসেন অর্থাৎ মধ্যযুগের দেশীয় মুসলমানদের স্থাপত্যরীতির রূপ। কাজেই হিন্দুরা কুতুব মি স্রষ্টা, এই মতবাদ বিচারসহ নহে।

কুতুব গজনীর মিনারগুলোর অন বিজয়-স্তম্ভরূপে নির্মিত হয়েছিল বিশ্বাস এবং কুতুবের ইতিহাস নিজ অঙ্গেই লিখিত। মিনারে নিম্ন তলের ভিত্তির উপর চিত্রের মধ্যে কুতুব-উদ্-দীন আই নাম লেখা রয়েছে, যিনি মুশ্লিম শক্তির যথার্থ প্রবর্তক। দুটি বন্ধনীর মধ্যে তাঁর প্রভু
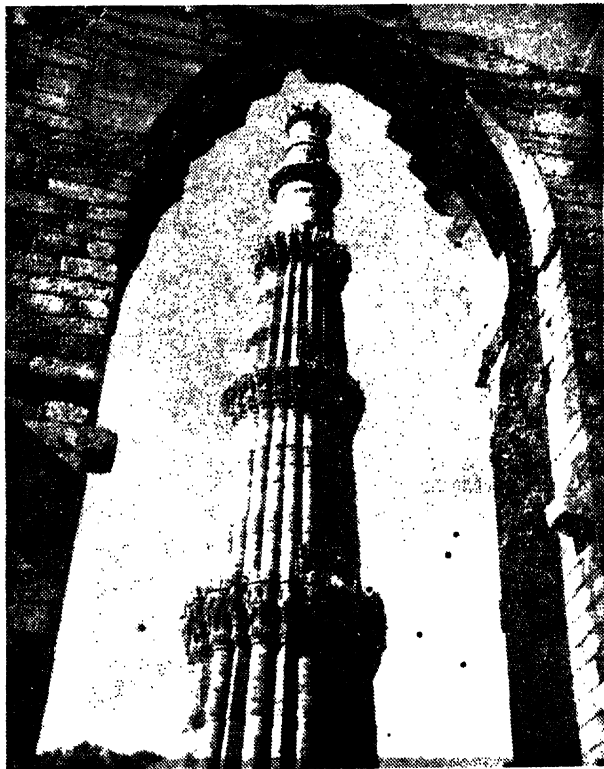
পৃথিবীর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি—কুতুবমিনার

বিন্-সামের নাম, এবং দ্বিতীয়, ও চতুর্থ তলের লিপিতে কুতুব-নের উত্তরাধিকারী ও দাস-বংশীয় ন আলতামাসের নাম রয়েছে। পঞ্চম এক লিপিতে বলা হয়েছে যে, ন্যাত ফিরোজশাহ্ তোগলক ১৩৬৮ দ মিনারের সংস্কার করেছিলেন এবং র প্রবেশপথ যা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ্ লোদী নতুন ক'রে নির্মিত হয়েছিল।

সোনার আপেল

এ নজীর থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কুতুব-উদ্-দীন আইবেকই কুতুব র স্রষ্টা। ভারতে মুশিলম রাজত্বের ঘোষণা করবার জন্যে ১১৯৯ দ তিনি এর নির্মাণকার্য আরম্ভ লেন বলে কথিত এবং সম্ভবত প্রথম টনি শেষ করতে পেরেছিলেন। তারপর শের সুলতানগণের মধ্যে সম্ভবত ক্ষা যোগ্য ও কৃতকর্মী, আলাতামাস, তিনটি তল সংযোজন করে মিনারকে তা দান করেন। তাঁর নির্মিত তল-সৌন্দর্যে প্রথমটির সমকক্ষ। তিনি টা উজ্জ্বল শ্বেত পাথরের একটি, ...এবং খাঁটি সোনার কতকগুলো ও তৈরী করিয়েছিলেন।

বজ্রাহত

ন বাতুতা (১৩৩৪-৪২ খৃষ্টাব্দ) টেকে এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও চার মধ্যে দেখেছিলেন; কিন্তু ৎ-ই-ফিরোজ ই-শাহী' গ্রন্থ পাঠে য় যে, তার কিছুকাল পরেই মিনারটি হয়েছিল। এই গ্রন্থে তোগলক লিখেছেন, "ঈশ্বর আমাকে যা কিছু করেছেন, তার মধ্যে একটি হল সর্ব-ণের জন্যে হর্ম্যাদি নির্মাণের বাসনা। ং আমি বহু মসজিদ, বিদ্যায়তন ও নাগার নির্মাণ করেছি। ...ভূতপূর্ব ই ও আমীরগণের নির্মিত যে সকল ও অন্যান্য নির্মিত বস্তু জীর্ণতা প্রাপ্ত ; আমি সেগুলোকে উদ্ধার ও নূতন নির্মাণ করেছি। ...মিনারের উপর ত হয়েছিল। আমি একে মেরামত ই এবং পূর্বের উচ্চতা থেকেও একে করেছি।"

রোজ শাহ চতুর্থ তল পুনর্নির্মাণ এবং তল নূতন সংযোজন করেন। তিনি একটি চন্দ্রাতপ দ্বারাও আচ্ছাদিত ছলেন। কালক্রমে চন্দ্রাতপ অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম তল এখনও বিদ্যমান। চতুর্থ ও পঞ্চম তল স্থাপত্য ও উপাদান, উভয় দিক থেকেই আইবেক ও আলতামাসের কাজ থেকে মূলত পৃথক। এগুলোতে ঝিঙ্গার খোলের মতো থাম নেই; এগুলোর স্তম্ভবপু চোঙ্গার আকারে উপরের দিকে উঠে গেছে এবং অধিকাংশ কাজ হয়েছে লাল পাথরের পরিবর্তে সাদা মার্বেল দিয়ে।

ভারতে মোগল শক্তি যখন অস্তাচলগামী, তখন আর একবার মিনার ভূমিকম্প দ্বারা প্রহৃত হয়। মিনারের চূড়া ভেঙে নীচে পড়ে যায় এবং এর ভিত্তিমূল পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের মেজর স্মিথ-এর উপর এর মেরামতের ভার দেওয়া হয়। অত্যুৎসাহী ইঞ্জিনীয়ার প্রভূত শ্রম ও নৈপুণ্যের সাথেই তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু তিনি যে সকল জিনিস নূতন প্রবর্তন করেন, যেমন 'খাঁটি গথিক রীতিতে নির্মিত পিলপেদার রেলিং' ও প্রবেশ ফটক, সেগুলো গুরুতর আপত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্মিথ নিজের কল্পনা থেকে একটি মণ্ডপও মিনারের সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর শিল্পগত অসামঞ্জস্য ভারতের গভর্নর জেনারেল স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জের (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) মার্জিত রুচিকে এত পীড়া দিতে থাকে যে, মণ্ডপটি তার উচ্চ স্থানভ্রষ্ট হয়ে এখন মিনারের বহিঃসীমানার প্রাঙ্গনে নির্বাসিত।

কুয়াত-উল-ইসলাম

মিনারের নীচে কুয়াত-উল-ইসলাম নামে পরিচিত একটি মসজিদ আছে। কুয়াত-উল-ইসলামের অর্থ মুশিলম গৌরব মসজিদ। এই মসজিদের বৈভব সম্বন্ধে ইব্‌ন বাতুতা লিখেছেনঃ "মসজিদটি অতি প্রকাণ্ড এবং সৌন্দর্যে ও বিশালত্বে এর তুলনা নেই...... এর তেরোটি গম্বুজ ও চারটি চত্বর আছে।"

সমসাময়িক নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে, একটি মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করে সেই জায়গায় কুতুব-উদ্-দীন-আইবেক (১১৯৩—৯৭ খৃষ্টাব্দ) কুয়াত-উল-ইসলাম তৈরি করেছিলেন। এরূপ বিশ্বাস যে, মসজিদ নির্মাণের অধিকাংশ উপাদান নানা হিন্দু দেবালয় ভেঙে সংগৃহীত হয়েছিল। মসজিদকে পরিবেষ্টন করে যে স্তম্ভশ্রেণী আছে, সেগুলোতে এখনও হিন্দু অলঙ্করণের চিহ্ন দেখা যায়, যেমন, অলঙ্কারযুক্ত দড়ির গুচ্ছ, ঘণ্টা, লতাতন্তু, পত্রপুষ্প, সবৎস গাভী প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে মনুষ্য মূর্তির চিহ্নও পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের নতুন ধ্বজাবাহীরা মূর্তি-বিদ্বেষের জ্বলন্ত উৎসাহে সেগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছে এবং যেগুলোকে যথেষ্ট বিকৃত করতে পারেনি, সেগুলোকে হয় প্ল্যাস্টার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, আর না-হয় দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে পিঠে পবিত্র কোরাণের বয়েত লিখে দিয়েছে।

পাঁচমিশালী সংগ্রহ

মসজিদ নির্মাণের মালমসলার বিরাট স্তূপ সবশুদ্ধ সাতাশটি হিন্দু মন্দির ভেঙে সংগৃহীত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন। স্থাপত্য-শৈলী-সম্মত না হলেও এই স্তূপাকার মালমসলা যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদে হিন্দু, জৈন এবং সম্ভবত বৌদ্ধ স্তম্ভও সারি সারি সাজান রয়েছে। এই স্তম্ভশ্রেণী মসজিদের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন স্থাপত্য থেকে সংগৃহীত এই পাঁচ-মিশালী উপকরণপুঞ্জের নূতন করে মূল্য নির্ধারণের জন্য গবেষণা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কাজটি শ্রমসাধ্য হলেও চিত্তাকর্ষক হবে সন্দেহ নেই।

মসজিদের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে, এর সম্মুখভাগের খিলানশ্রেণী, এগুলি মিশ্র ইন্দো-সারাসেনিক শিল্পের এক শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। এই খিলানগুলি আইবেকের তৈরি। আধুনিক বিশেষজ্ঞ পেজের কথায়, "সর্পিল লতাতন্তু ও আন্দোলিত পত্রদাম হিন্দু শিল্পকলা। অপর পক্ষে হর্ম্যমুখে এই প্রকার পত্রাকারে অলঙ্করণ সারাসেনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য।" এভাবে খিলানগুলিতে ভারতীয় ও ইসলামিক শিল্পরীতি ও পরিকল্পনার এক হৃদয়গ্রাহী সমন্বয় ঘটেছে।

আলতামাস খিলানশ্রেণীকে উভয় দিকেই প্রসারিত করেন। এগুলো অনেকখানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এখনও বিদ্যমান। আইবেক ও আলতামাসের খিলানের মধ্যে অলঙ্করণ-রীতির পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আলতামাসকৃত খিলানের খোদাই কাজে সারাসেনিক পদ্ধতি অতিমাত্রায় প্রকট; এগুলি ফুলপাতার পরিবর্তে বুহিতন আকারে জালের কাজে সমৃদ্ধ এবং আরবী ছাপও এগুলোতে অধিকতর পূর্ণতা লাভ করেছে।

আলতামাস মিনার প্রাঙ্গনে নিজের সমাধির জন্যে একটি কবরও নির্মাণ করে-

কোরানের বাণী সংবলিত মিনারের নিম্নাংশ
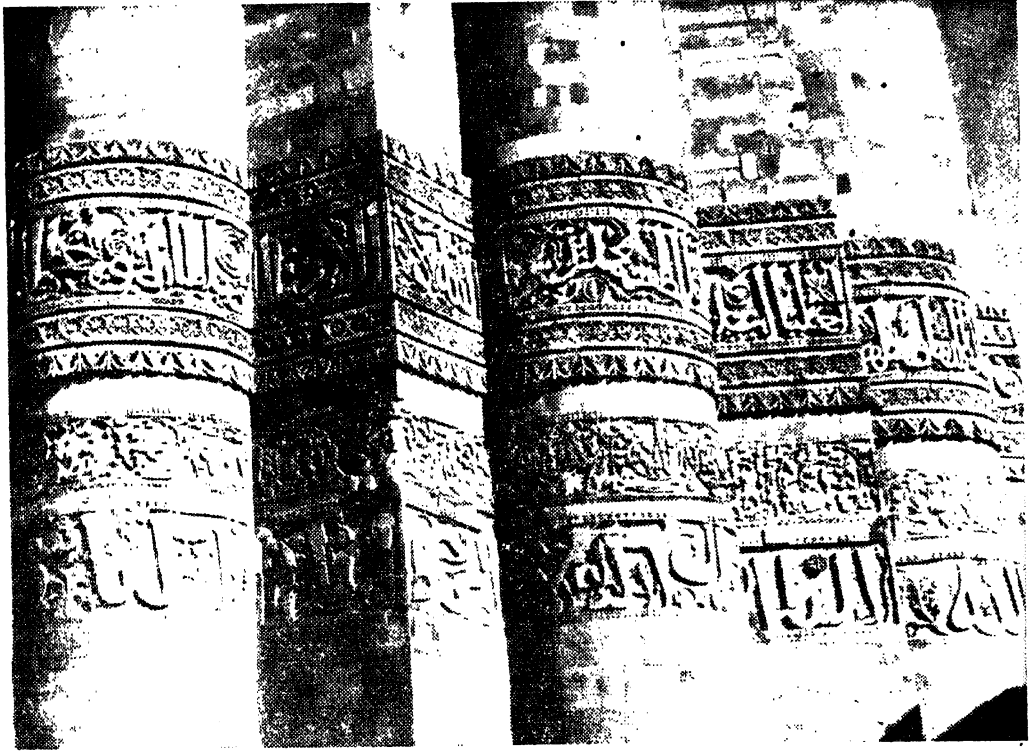
ছিলেন। এই অনাড়ম্বর সমচতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠটির অভ্যন্তর ভাগ বিশুদ্ধ সারাসেনিক পদ্ধতিতে অলংকৃত, অনেকটা তাঁর খিলানের অলংকরণের মতো। এই কবরটি সম্পূর্ণ যুক্তিসংগতভাবেই এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি সুন্দরতম নিদর্শনরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এর গম্বুজ আর নেই, কিন্তু আলোর প্রাচুর্য একে আরও সুন্দর ও মহিমান্বিত করেছে।

আলতামাস মসজিদের আয়তন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছিলেন এবং "নানা অসম্ভব পরিকল্পনা ও গগনস্পর্শী বাসনা"র নায়ক আলাউ-উদ্-দীন খিলজি (১২৯৬—১৩১৬ খৃষ্টাব্দ) তাঁর পূর্বগামীকেও ছাড়িয়ে যাবার সংকল্প করলেন। তিনি একটি পাঠগৃহ ও কবর যুক্ত করে এবং আরও খিলান, দরদালান ও ফোয়ারা তৈরি করে মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি করেন। তাঁর ফটক আলাই দরজার আদর্শে তৈরি বলে অনুমিত এবং আলাই দরজায় ইন্দো-সারাসেনিক অলংকরণ রীতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। তিনি কুতুবের মত আর একটি মিনারও তৈরি করার কল্পনা করেছিলেন, তৎকালীন কোন কবির কথায়—"যে রকম মিনার কখনই তৈরি হয়নি এবং কখনও তৈরি হবে না।" কিন্তু মৃত্যু এসে সাধে বাদ সাধল এবং তাঁর অসমাপ্ত প্রচেষ্টার সাক্ষী এখনও বিদ্যমান থেকে প্রতিশ্রুত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

লৌহস্তম্ভ

কুয়াত-উল-ইসলামের প্রাঙ্গনে বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। এর ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের যুগে এটি নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি, যার এখন পাঠোদ্ধার হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, স্তম্ভটি বিক্রমাদিত্যের কীর্তি—"যিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট......যাঁর যশ তরবারি দ্বারা ভুজযুগে লিখিত, আপন বিক্রম দ্বারা স্বর্গভূমি জয় ক ......চন্দ্র যাঁর নাম এবং পূর্ণশশীর সুন্দর যাঁর মুখশ্রী।"

স্থানীয় কিংবদন্তী হচ্ছে, তোমারা জনৈক রাজা স্তম্ভটিকে এর মূলে (মূলে জায়গা কোথায় ছিল, তা অ থেকে তুলে এনে বর্তমান জায়গায় করেছিলেন এবং স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত আছে যে, এ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় অন দিল্লী নগরীর নূতন করে প্রাণ করেছিলেন।

লৌহস্তম্ভ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিস্ময়কর পরিচয় এবং আমাদের সভ্যতা যে কতখানি উচ্চস্তরে উঠেছি স্তম্ভ তারই নিদর্শন। স্তম্ভটি ক্ষ লৌহ দ্বারা প্রস্তুত এবং কি প্রণা এর এত বিশুদ্ধি সম্পাদন করা হয়ে

·বিন
ও র্যন্ত কোন বুদ্ধি দিয়ে তার
নে হয়নি। এক অজ্ঞাত দস্যু এর
ন এক কামানের গোলা দেগেছিল,
এসামান্য টোল খাওয়া ছাড়া এর কোন
য়্যাম্নি। এ থেকেই বোঝা যায়, স্তম্ভের
দ কত। কালের বহু আক্রমণ তুচ্ছ
র লৌহস্তম্ভ আজ অবধি সগৌরবে
ন এবং জরা কিছুমাত্র একে স্পর্শ
না লৌহস্তম্ভ আজও চির নবীন,
ম্লান।

স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বহু গল্প
সবচেয়ে বেশি প্রচলিত গল্পটি হচ্ছে,
রাট সর্প স্তম্ভটিকে তার ফণার
রণ করে রেখেছিল। তোমারা বংশের
জা সাপকে বিতাড়িত করে দিয়ে-
তখন রাজার উপর এক
পাত বর্ষিত হয় এবং তাঁর রাজ্য
হয়ে যায়।

এ সকল ছাড়াও কুতুবের চতুঃসীমার ভিতরে একটি মোগল উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ, একটি পরিত্যক্ত সরাই, গাছপালার ভিতরে অর্ধ-লুক্কায়িত একটি ছোট মসজিদ এবং 'স্টাকো'র আস্তর দেওয়া ইমাম জামিনের একটি কবর আছে। কাজেই কুতুব ক্ষেত্রের ভিতরে এলে আমরা একাধারে দাস, খিলজি, তোগলক, লোদী ও মোগল বংশ এবং বৃটিশের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা পরিবেষ্টিত হই; যে সকল মূল উপাদান দিয়ে কুয়াত-উল-ইসলাম তৈরি, তাও যদি গণনা করা যায়, তবে একথা বলতে বাধা নেই যে, স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্তসার কুতুব ও এর সন্নিহিত শিল্পকীর্তিগুলোকে আশ্রয় করে আছে।

বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হয়েছে, কিন্তু বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের আঘাত সত্ত্বেও কুতুবের গরিমা অম্লান। এই বিজয়স্তম্ভ চতুর্দিকের সমস্ত হর্ম্যশীর্ষের ঊর্ধ্বে আকাশে মাথা তুলে বিশ্বজগতের দৃশ্য দে অবলোকন করছে। দূরে লাল কোট ও কেল্লা রায়পিথোরার ধ্বংসস্তূপ ও মেহরৌলি ভগ্নাবশেষ; মাঠের পরপারে দাঁড়িয়ে আছে বিজয় মণ্ডল, মৃত নগরী সিরিতে আলা উদ্-দীনের সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদপুরীর কঙ্কাল আর আবছায়ার মত দেখা যাচ্ছে হুমায়ুন ও সফদর জং-এর কবর, পুরান কেল্লার বহিঃপ্রাকার এবং জুম্মা মসজিদের চূড়া ও গম্বুজ।

কুতুব আরও দূরের দিকে তাকিয়ে দেখছে এককালের ঐশ্বর্যময় নগরী তোগলকাবাদকে; যার সেই আদিম গৌরব আর নেই এবং আজ যেখানে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

[মার্চ অব ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে]

(২)

শেষ রাত্রির তরল অন্ধকারে মাটীর মায়া ছড়ে উড়ে যাচ্ছি। ক্লান্ত নিদ্রালু নয়নে একে একে একুশজন যাত্রী ওভারকোট মুড়ি দয়ে বা হাতে 'রাগ' ঝুলিয়ে টাটা কাম্পানীর এরোপ্লেনে এসে ঢুকল। রজার সামনে নাম ডাকা হচ্ছে আর সে াকে সাড়া দিয়ে আত্মঘোষণা করে ঢুকতে চ্ছে। সবারই ঢুলু ঢুলু চোখ।

কিন্তু কান সজাগ রাখলাম।

হিজ হাইনেস দি মহারাজা অব—

রাওৎ সাহেব অব—

হার হাইনেস অব—

রাজা ওঙ্কারনাথজী—

প্রভৃতি। যাদের নাম খবরের কাগজে খেছি তাদের নাম আর নাই করলাম।

হঠাৎ তার মধ্যে নিজের সাধারণ অতি রিচিত মধ্যবিত্ত নামটা চিনে নিতে দ্বিধা ল।

আমিই না কি?

ওই সব হিজ হাইনেস ও হার হাইনেসদের ীরা মুক্তা চুনী পান্না খচিত উপস্থিতির ধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা?

আবছা অন্ধকারে ভাল করে তাকিয়ে খলাম চারদিকে। না, ওরা কেহ জড়ি হরতে মোড়া দরবারী পোশাকে আসেননি। ামারি মত সাধারণ পোশাকে লম্বশাট-টাবৃত। প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা শুদ্ধ রে নিয়ে নিজের মনে মনে বললাম—

লম্বস্যূটপটাবৃত।

হোক না কেন সে স্যুট লন্ডনের বন্ড ্রীটের বানান বা নয়াদিল্লীর ফেল্‌প্‌স্‌ াম্পানীর তৈরী।

ওই শ্লোকের বাকী চরণটুকুও মনে এসে পড়ল। যাক সুধী জনকে আর সে কথা মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

আরাবলী পর্বতশ্রেণীর একটি শেষ রেখা এলোমেলোভাবে দিল্লীর এরোড্রোমের কাছেই ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশের পার্বত্য বন্ধুরতার মধ্যে। জীবনে এই প্রথম এরোপ্লেনে চড়ছি। চঞ্চলভাবে নীচের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। মাটীর মায়া মনকে নীচে টানল।

কিন্তু কোথায় মাটী?

এ ত শুধু বন্ধুর পার্বত্য মাল যা আনন্দ দেয় কিন্তু আকর্ষণ করে রসসিক্ত নয়, রুক্ষ রিক্ত।

আর মাটীর মায়া রইলই বা কো স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে এই ক মধ্যে মানুষ দেশের নামে, ধর্মের অমানুষিক অত্যাচার করেছে। মাটীর ত্যাগ করে লোক দলে দলে, না হলে পালিয়ে ঘর ছেড়ে, প্রিয়জনকে ছেড়ে ভিটামাটি ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালি পালিয়েও অনেক সময় বাঁচতে পা দানবের হাতে মানবতা লোপ পেয়ে মৃত্যু এসেছে হত্যার রূপে নিয়ে। এঁকে দিয়েছে শুধু সংসারের চরম

দিল্লীর রেল স্টেশনে হাজারে হ স্ত্রী-পুরুষ-শিশু পাঞ্জাবে তাদের মাটী সংসার থেকে সমূলে উৎপাটিত আশ্রয় নিয়েছে। দিল্লী শহরের ঠিক প পাঞ্জাবের জেলা গুরগাঁও। সেখান থেকে আসার চওড়া পিচ ঢালা রাস্তায় এ বুক ফুলিয়ে মিলিটারী আমেরিকান দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াত। এখন সে দিয়ে ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার রাশির উদ্বাস্তুরা হাতে পিঠে যথা সম্বল ব
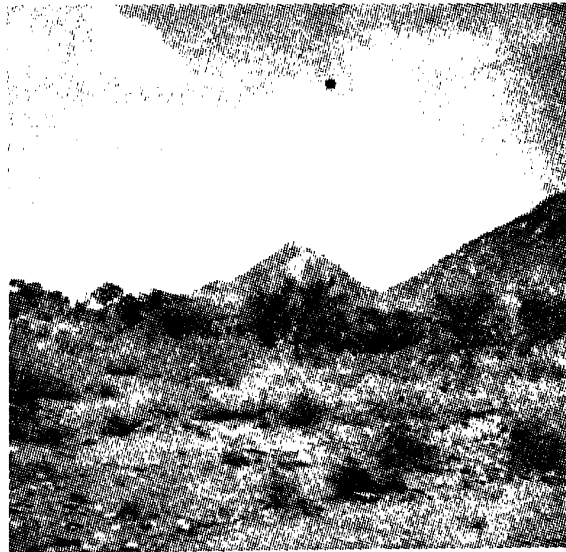
আরাবলীর গিরিপ্রান্তর (হলদীঘাটের অমর যুদ্ধক্ষেত্র)

ও কম্বল নিয়ে কোন মতে দেহের র বোঝা বয়ে পায়ে হেঁটে কোন- দিল্লীর দিকে আসছে। কাতারে আসছে ও পথের দু'ধারে ভিড় করে নীচে দিন কাটাচ্ছে।

পথ দিয়ে বহুবার পালম বিমান গেছি বন্ধুবান্ধবদের ইয়োরোপ কা যাত্রার সময় হাসিমুখে বিদায় ওরা যখন সুন্দর ছিমছাম প্লেনের ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে আমি রেশমী রুমাল উড়িয়ে বিদায় ন্দন জানিয়েছি। আজকাল সেই ঘাটিতে দেখছি যে প্লেন থেকে ত নামছে অগণিত নরনারী,—ছোট বিলেতী সার্ডিন মাছ যেমনভাবে াদি করে রাখা হয় সেরকম অবস্থায়। তাদের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি, শেষ সম্বল চাদর ও শাড়ীর বা য়ারের টুকরো। তার দুর্দশা আমার রেশমী রুমালের শৌখীন দোলার আজ ঢেকে দিয়েছে।

সোর বদলে হিংসার নিয়ম পৃথিবীর থেকে চলে আসছে। এখানেও তার ম হয়নি। তাই রাজস্থান থেকে র মধ্যে বহু জায়গায় মানুষে উৎখাত গেছে। এমনভাবে যে দিল্লীর দশ র মধ্যে, এমন কি দিল্লী শহরের খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে তে মুসলমান (মে ও), আর হিন্দু র মধ্যে যুদ্ধে শুধু বর্শা ও তরোয়াল ন্দুক রিভলবার স্টেনগান চলেছে বহু। র সে ধ্বংসকাণ্ডে যাতে ভারত সরকার বাধা না দিতে পারে সে জন্য লোহার রেল লাইনও উপড়িয়ে ছে। রাজপুতানা যাবার ট্রেন এখন চলে না।

জ তাই সদ্য খোলা বিমানপথে চলেছি থানে। বিপন্নদের উদ্ধার করে ার জন্য ভারত সরকার যতদূর সম্ভব র প্রায় সব ও বহু বিদেশী প্লেন করে পাকিস্থানে যাতায়াতের বন্দো- করেছেন। তাই রাজস্থানের রাজারা নিজেদের জন্য 'চার্টার' করে দেশে ত পারছেন না। টাটা কোম্পানীর খোলা প্লেন-পথে তারা চলেছেন রণ যাত্রীবাহী প্লেনে। আমিও চলেছি। দের সবারই প্রথম গন্তব্যস্থল হচ্ছে রে।

বহু নীচের রুক্ষ আরাবলী পাহাড়- গুলির চূড়া থেকে মন ও নয়ন সরিয়ে আনলাম এরোপ্লেনের মণিকোঠার মধ্যে। মণিকোঠা নয়ত কি? এতগুলি হিজ হাইনেস আর রাওরাজা রাওৎ প্রভৃতি, আর তার চেয়ে বড় কথা, একজন জীবন্ত হার হাইনেস যেখানে ঠিক আমারি মত সাধারণ ভাবে বসে আছে সেটা মণিকোঠা ছাড়া আর কি? এদের সামান্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেই অসামান্য ঝড় উঠে যায় এদের নিজেদের কোটে অর্থাৎ এলাকায়। এতই মূল্যবান্ এরা।

চার পাশে—না ঠিক চার পাশে নয়, কারণ আমি নিজেই জানলার পাশে বসে আছি— এতগুলি রাজন্যের উপস্থিতি। সবাই চলেছে রাজস্থানে। স্বভাবতই মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে রাজপুতানার বীরত্ব- কাহিনী—বীরের মত মরণকে বরণ করার কাহিনীর পর কাহিনী।

প্রাণ, শুধু প্রাণ নিয়ে পলায়মান মানবের যে জীবন্ত শবযাত্রা এতদিন দিল্লীর আশে পাশে দেখে এসেছি তার ছবি মন থেকে মুছে গেল।

আমার চার পাশে এমন রূপ নিয়ে দাঁড়াল অতীতের বীরদের শোভাযাত্রা— যাদের চির-উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য থেকে নেমে আসা বংশের শেষপ্রায় মোমবাতিগুলির কয়েকটি এখানে আমার সহযাত্রী হয়ে চলেছে। এই মোমবাতিগুলিও ফুৎকারে নিবিয়ে দেবার জন্য প্রবল দাবী জানাচ্ছে তাদেরই অগণিত প্রজার দল।

ত্রিশ বছর আগে মণ্টাগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে লেখা হয়েছিল যে, "আশা আর আকাঙ্ক্ষা রাস্তার ওপারের আগুনের ফিন্‌কির মত সীমান্ত পেরিয়ে আসতে পারে।" হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা ঘোষণা হবার পরের ঘটনাগুলি সে কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে। যে গণতন্ত্রের ঢেউ ও সারা হিন্দুস্থানের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছার ঢেউ দেশীয় রাজাদের সিংহাসনে এসে ধাক্কা দিচ্ছে সে ঢেউকে না মেনে নিলে সিংহাসনই ভেসে চলে যাবে।

১৯৪৭ সনের ২৫শে জুলাই অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের ঠিক কুড়ি দিন আগে শেষ বৃটিশ সম্রাট্ প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্ট- ব্যাটেন দিল্লীতে রাজন্যসভায় (চেম্বার অব প্রিন্সেসে) ঘোষণা করলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলির সঙ্গে বৃটিশ রাজছত্রের (মুকুটের) কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁরা আইনত স্বাধীন হয়ে

যাবেন। কিন্তু দেশরক্ষা, যাতায়াত আর বৈদেশিক সম্বন্ধ এ তিনটি ব্যাপারে সব সুবিবেচক রাজা যেন নিশ্চয়ই হিন্দুস্থান সরকারের কর্তৃত্ব মেনে নেন।

অনেকেরই একান্ত অনিচ্ছা ছিল। তবু প্রায় সবাই মিলে ঊনিশ দিনের দিন কেমন করে তাঁরা অন্তর্ভুক্তির (accession) দলিলে সই করলেন তা দিল্লীতে আমার খুপরীতে বসে দেখেছি। দেখেছি আর ভবিষ্যতের রূপ চিন্তা করেছি।

চিন্তা করবার কারণ যথেষ্ট ছিল।

লোকে লক্ষ্য করতে ভুল করেনি যে, অনেক রাজাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুইনিন মিকশ্চার খাবার মত মুখ করে ১৪ই আগস্ট ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার দলিলে সই করেছিলেন। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব তাঁরা সবাই হয়ত বুঝতে পারেন নি। এত তাড়াতাড়িতে সব হয়ে গেল যে, অনেকে হয়ত ভাববারও সময় করে উঠতে পারেন নি। অনেকে হয়ত মনে মনে দ্বিধা ও মানসিক রিজার্ভেশন পোষণ করেছিলেন।

একজন ছোট রাজা পুরো দরবারী ধরা-চূড়া পরে পাশে ঝোলান ঝকমকে তলোয়ারে ঝনঝন আওয়াজ তুলে সিঁড়ি দিয়ে দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের দোতলায় উঠে এলেন। খুব গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশের অধীনস্থ রাজা থাকা অবস্থায় তিনি স্বাধীন ভারতের দলিলে সই করতে চান না। সেটার মাহাত্ম্য তত বেশী হবে না। অতএব যখন বৃটিশ রাজছত্র অর্থাৎ রাজমুকুটের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্বাধীন হয়ে যাবেন তখন তিনি তাঁর স্বাধীন কলম দিয়ে সই করবেন। অতএব আজকের সই করবার কারবারটা মুলতুবী থাকুক।

চার পাশে লঘু পরিহাসের গুঞ্জনে তাঁর এই গুরু প্রস্তাবকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বলা হল, ইয়োর হাইনেস, আপনি 'হাই' থাকতে থাকতে এই সামান্য কাজটা সেরে নিন। আপনি কাল সকালে যখন স্বাধীন 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' হয়ে যাবেন তখন আর সদ্য প্রমোশন-পাওয়া আপনাকে এরকম অনুরোধ করার মত ধৃষ্টতা আমাদের থাকবে না।

অগত্যা হীরের আঙটিতে ভরা একটি হাত খাপে ঢাকা তলোয়ারের বাট থেকে সরে এসে সামান্য কলমে গিয়ে ঠেকল।

কিন্তু তাঁর হৃদয়ের ক্ষতস্থানে মলম পড়ল কি?

অথচ অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

জার্মানীর সব ছোট ছোট রাজ্য এক করে নিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিশ্বকর্মা বিসমার্কের কাহিনী রাজারা নিশ্চয়ই জানতেন। একবার ইংরেজ সৈন্য জার্মানী আক্রমণ করতে পারে এরকম একটি কথা শুনে তিনি বলেছিলেন,—কি? এত বড় স্পর্ধা? আমি পুলিশ পাঠিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে আনব।

রাজারা এটাও জানতেন যে, নবভারতের বিসমার্ক সর্দার প্যাটেলও মাত্র পুলিশ পাঠিয়েই তাঁদের রাজত্ব দখল করে নিতে পারবেন।

কি করে?

দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ভোলেনি যে, নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে ১৯৩৮এ হরিপুরার অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে, যে পূর্ণ স্বরাজ আমরা চাই তা সমস্ত ভারতের জন্য। দেশীয় রাজ্যগুলিও তার পূর্ণ ভাগীদার হবে। সেই স্বাধীনতা বৃটিশ ভারতে যখন এসেছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ার প্রজারা কি তা নিজেরাও না পেয়ে ছাড়বে? আর বৃটিশ ইণ্ডিয়াই কি তাদের না দিয়ে ছাড়বে?

তবু ১৫ই আগস্ট হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর আর জুনাগড় ভারতের সঙ্গে যোগ দিল না।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এখন এই রাজারা কি করবেন? তাঁরা কি এই মিলন ও আত্মবিলোপকে মেনে নিয়ে সত্যিই আমাদের সঙ্গে মিলে যাবেন?

রচিত হবে কি নবতর বৃহত্তর ভারত?

যে দেশে ছোট ছোট জমিদারীর মত জায়গাটুকুতে বসে একদিন সুলতানরা তাঁদের স্তাবক সভাকবিদের বা মোসাহেবদের মুখে রোজ শুনতেন যে তাঁরা হচ্ছেন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, পাতালে বাসুকী কাঁপে তাঁদের সেনাদলের পদভরে, আকাশে সূর্যগ্রহণ হয়ে যায় তাঁদের বাহুবলের ভয়ে,—সেই কূপমণ্ডুক ও স্বল্পে সন্তুষ্ট দেশে আজ বিরাটের মহত্তের স্বপ্ন দেখবে কি এক হয়ে অনন্যহৃদয় হয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পশ্চিম মরু প্রান্তর থেকে পূর্ব পার্বত্য প্রান্ত? দাঁড়াবে কি অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকাতলে পাশাপাশি কাশ্মীরী পণ্ডিত ও মালয়ালী মেনন, যোধপুরী রাঠোর ও নাগা মণিপুরী? দেবে কি ঢেলে দেহের রক্ত ও হৃদয়ের ভক্তি এক সঙ্গে এক মত এক প্রাণ হয়ে? গাইবে কি মিলিত কণ্ঠে 'জনগণ মন অধিন... ধ্বনিত করবে কি এক মন্ত্র বন্দে মাত...

সার্থক হবে কি আমার রাজস্থান যান? অতীতের রাজস্থানের ব... কাহিনী, গৌরবের গান শুনতে শুনে... লক্ষ্য করতে পারব ভবিষ্যতের ... ভারতের নবতর গৌরবের প্রথম অঙ্কুরা...

বীরত্বে যারা এত বৃহৎ ছিল আত্মো... কি তারা হতে পারবে মহৎ?

এতদিন ধরে শুনে এসেছি রাজন্য বৃটিশ ভারতের চেয়ে অনেক অন্যরকম রাজারা চান না ভারতের সঙ্গে মিলাতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের তাদের একটিমাত্র সম্বন্ধ ছিল—সেটা দমন। সেখানকার লোকও নাকি নি... আমাদের চেয়ে এত বেশী পৃথক্ মনে... যে, তারাও চাইবে না আমাদের সঙ্গে হয়ে যেতে, এত খাজনা দিতে, এত শাসনতন্ত্রে পিষে মরতে, ইনকাম ট... দোহন সহ্য করতে।

প্রায় কোন দেশীয় রাজ্যেই ই... ট্যাক্সের বালাই ছিল না।

মনে পড়ল, প্রায় বিশ বছর আমেরিকা থেকে এসে মিস মেয়ো ...

সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে এত নিন্দাজনক লেখেন যে, গান্ধীজী সে বইকে পরীক্ষকের রিপোর্ট বলে আখ্যা সেই বইয়ে মিস মেয়ো একটি জা সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, তিনি বলেছেন যে, বৃটিশ যদি ভারত ছেড়ে যায়, তাহলে এই বীরপুরুষের সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠবে যে, সুদূর বাঙলা একটি কুমারী বা একটি টাকাও বাকী না। কে মিথ্যা কথা বলেছিল বলে ধরা পড়বে? ওই বিদেশিনী লেখিকা ই স্বদেশীয় মহারাজা?

৯৪৭এর আগেকার বৃটিশ ইন্ডিয়া ও ান ইন্ডিয়ার জনগণ জেগে উঠে ভাবে এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা । তারা নিঃসন্দেহ যে, কোন রাজাই নবভারতের লোক হয়ে অমন কথা ত বা বলতে পারেন না।

ন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার অর্থাৎ রাজন্যদের ার ভারতীয়রা রাতারাতি নিজেদের ইন্ডিয়ার লোক বলে ভাবতে শুরু ছ। আজ যদি রাজাদের মধ্যে কেহ দের জনমত উপেক্ষা করে নিজেকে ীন বলে জাহির করতে চান বা বৃটিশ ত্রের ছায়ায় আশ্রয় পেতে চেষ্টা করেন ল তাঁর সুপ্রাচীন রাজবংশ যে বিনা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে সে শুধু আমাদের রাজ্য দপ্তরের মন্ত্রী প্যাটেল নন, যে কোন ভারতীয় তে পেরেছে।

করবে ওই রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ? জারা? না। তারা আজ সমগ্র ভারতের ীয়।

ন্যরা? না। তাদেরও মনে সে চিন্তার এসে লেগেছে। তাছাড়া তারা জানে ইংরেজের নিজের হাতে শিখিয়ে দেওয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দেওয়া তীয় সেনার কাছে দেশীয় রাজ্যের রা ঝড়ের মুখে পাতার মত উড়ে যাবে। জারা নিজেরা? না। তারাও না। কারণ ী তাদের বৃটিশ যুগেও একত্রিত হয়ে িলিত দাবী জানাবার পথ দেয়নি। আর ভারতীয় যুগেও দিতে প্রস্তুত নয়। ভৌম ক্ষমতা বৃটিশের হাত থেকে সরে ছে ভারতীয় হাতে। কাজেই কোন র্জাতিক আদালত বা ইউ এন ও দের দাবী শুনতে অধিকারী নয়।

রা জানেন যে, এঁদের প্রজারা আজ াইন রাইট অব দি কিং অর্থাৎ রাজাদের বিধিদত্ত অধিকারে বিশ্বাস করে না। তারা সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ বা হরবংশ কোথা থেকে জন্মেছেন সে নিয়েও মাথা ঘামায় না। কাজেই রাজাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু এঁরা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

আমার সহযাত্রীদের প্রত্যেকের মুখেই এক একটি প্রশ্ন চিহ্ন দেখতে লাগলাম। গ্রীক পুরাণে স্ফিংক্সের গল্প আছে। মুখ তার নারীর আর দেহ সিংহীর। তার মুখে মাখান চিরন্তন প্রশ্ন যার উত্তর কেহ দিতে পারে না। এই রাজাদের মুখেও আজ সেই উত্তরের সঙ্কেতহীন প্রশ্ন মাখান রয়েছে।

হিজ হাইনেস অব.........।

ভোর রাত্রির অন্ধকারের মায়া তার মুখের উপর পড়ে অতীত ও বর্তমানকে কিরকম যেন মিশিয়ে দিতে লাগল। তার মধ্য থেকে রূপ নিয়ে উঠে এল তার বংশের এক পূর্বপুরুষের ছবি। রাঠোর বংশের কোন একটা কনিষ্ঠ শাখার সন্তান ইনি। দেড় শ বছর আগে মালপুরার যুদ্ধে এই রাঠোররা ভয়ানক রোমাঞ্চকর বীরত্ব দেখিয়েছিল। সে যুদ্ধের গাথা রক্তাক্ত স্বর্ণাক্ষরে রাজস্থানের ইতিহাসে লেখা থাকবে। তাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন জেমস্ স্কিনার। তিনি বর্ণনা করেছেনঃ—

"দূর থেকে রাঠোরদের এগোতে দেখা গেল। তাদের বিরাট ও শ্রেণীবদ্ধ দেহগুলির পদক্ষেপ যুদ্ধের গর্জন ছাপিয়ে বজ্রনিনাদের মত ধ্বনিত হল। প্রথমে তারা মন্থর লম্ফ গতিতে এল, তারপর যত এগোতে লাগল ততই গতি-বেগ বৃদ্ধি পেল। আমাদের ব্রিগেডের সুসজ্জিত কামানগুলি তাদের ঘন-সন্নিবেশের উপর ছর্‌রা গুলি চালিয়ে প্রত্যেক ছর্‌রাতে শত শত জনকে মেরে ফেলতে লাগল। কিন্তু তাদের অগ্রগতি এতে একটুও ব্যাহত হল না। আমাদের ব্রিগেডের কামানে নিহত হতে হতে নিজেদের পনের শত মৃতদেহের উপর দিয়ে তারা ঝড়ের মত এগিয়ে এল। বন্দুকের মারাত্মক গুলিক্ষেপ বা শ্রেণী-বদ্ধ সঙ্গীনের খোঁচা কিছুতেই তাদের টলান বা বাধা দেওয়া গেল না। বন্যা-স্রোতের মত তারা ব্রিগেডের উপর বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ও মুড়িয়ে দিয়ে গেল। ব্রিগেডের চিহ্নমাত্র রইল না।"

সংগ্রামে আত্মোৎসর্গে এরা এত বৃহৎ ছিল। শান্তিতে আত্মত্যাগে কি মহৎ হতে পারবে?

না, আবার সংগ্রামের পথে শান্তির, সংহারের পথে সংহতির সন্ধান করতে হবে —এ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে যার অভিনয় দেখা গেছে?

কিন্তু আমরা যে নবভারতের নবতর ইতিহাস সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, ভারত ভাগ্যবিধাতার জয়গানের জন্য উৎসুক কর্ণ ও উন্মুখ কণ্ঠ নিয়ে।

তাই ভাল করে আবার সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

হিজ হাইনেস স্যর.........অব ।

ভাল করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলাম এই উচ্চবংশীয়কে। ইনি যে রাজ-পুত গোত্রের সেই গোত্রেরই একজন রাজার মজার মজার কাহিনী চল্লিশ বছর আগেকার এক প্রতাপশালী ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর স্ত্রী লেডি মিন্টো নিজের ডায়েরীতে লিখে গেছেন। সেই রাজাবাহাদুর সম্পূর্ণ নিজস্ব 'নিগ্রো' ইংরেজীতে মনের কথা কোনরকমে ফুটিয়ে তুলে ব্রিটিশ কর্তাদের চিত্তবিনোদন করতেন। ভোজের পরেই মজা। 'আফটার ডিনার টকে'র সময় অম্লমধুর টকে এসব কথা কত হাসির হুল্লোড়ই না বইয়ে দিয়েছে।

তিনি একবার বলেছিলেন—

"Viceroy he good pedigree; why for sending (to India as his successor) man no pedigree?....Why Government not taking me. Rajput long long pedigree; going with soldier, killing Bengali Babu; That very good."

(ডায়েরীর ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ

"ভাইসরয় তিনি ভাল বংশ; কেন পাঠান'র জন্য (ভারতে তার বদলে) মানুষ বংশমর্যাদাহীন?......কেন সরকার আমায় না নেয়। রাজপুত দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ-মর্যাদা, সৈন্য নিয়ে যেতে, বাঙ্গালী বাবু মারতে? সে বড় ভাল।"

বাঙ্গালী সবার আগে ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিখেছে। সেই গুরুমারা বিদ্যা দিয়ে সে ব্রিটিশের সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে দাঁড়িয়েছে। এদেশে রাজ্য চালানর

দরকার মত শিক্ষা দেওয়া যখন হয়ে গেল তারপর সে শিক্ষার বন্যাকে আর ঠেকান গেল না। তার ফলে এল স্বাধীনতার জন্য আকুলতা, দেশসেবার জন্য আহবান।

তারপরে আর বাঙালীর প্রতি কোন স্নেহ বা সহানুভূতি বৃটিশের থাকতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মে সে হয়ে গেল বৃটিশের চক্ষুশূল, হিংসা ও নিন্দার পাত্র। ভাল বাঙালী ছাত্রের নাম হল মুখস্থবাজ। ইংরেজের সঙ্গে বড় চাকরীর চেষ্টায় পাল্লা দিলে তার নাম হল শুধু পরীক্ষা পাশের ওস্তাদ বলে। ইংরেজের সদাগরী অফিসে ছোট চাকরী নিলে তাকে বলা হল বাবু। একটি ভদ্র কথা বিদ্রূপে পরিণত হল। একটা শিক্ষিত জাতি ইংরেজ ও তার "জী হুজুর" মহলে হাসি ঠাট্টার পাত্র হয়ে গেল।

কিন্তু এই বাঙালী বাবুই ভারতের জনজাগরণের মুখপাত্র। সবার আগে সে স্বাধীনতার পতাকার তলায় এসে দাঁড়িয়েছে; সবার আগে বুকের রক্ত ঢেলেছে। ঠিক যেমনভাবে ওই হাইনেসের পূর্বপুরুষেরা পাঠান মোগলের বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছেন। সেই রাজপুতদের সঙ্গে বাঙালীর আত্মার যোগ অনুভব করে এই অশিক্ষিত রাজপুত রাজার নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনা ভুলে যেতে কোন বাধা বোধ করলাম না।

রাওৎ সাহেব অব........আমার পাশের আসনটি দখল করে অস্বাচ্ছন্দ্যে এপাশ ওপাশ করছেন। যেন অশান্ত সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজ মোচার খোলার মত অসহায়ভাবে দোলা খাচ্ছে। কারণটা কি? মহিমান্বিত রাওৎ মহাশয়ের পকেটে এমনি একটি সুগন্ধময় হাভানা চুরুট বিরাজ করছে যার সুরভি তাকে চঞ্চল করে রেখেছে মৃগতৃষ্ণিকার মত কিন্তু যার স্বাদে তিনি বঞ্চিত থাকবেন যতক্ষণ না প্লেন থেকে তিনি বাইরে আসতে পারেন। কারণ এই প্লেনে ধূমপান বারণ। তাতে আগুন লাগার ভয় আছে।

যাক্, তবু ভাল। আমি ত ভাবছিলাম, এতগুলি হিজ হাইনেসের মধ্যে একমাত্র তিনিই অজ্ঞাত ও অনুচ্চ সান্নিধ পেয়েছেন বলে হয়ত অস্বস্তি অনুভব করছেন।

অথবা ঠিক সামনের সারির আসনে যে হার হাইনেস বসে আছেন তার সুবাসিত সঙ্গ—যথেষ্ট পরিমাণে নিকট অথচ সুদূর সঙ্গ—রাওৎ মহাশয়কে ট্যান্টাল্যাসের মত আকুলি ব্যাকুলি করে তুলেছে।

এরোপ্লেন কোম্পানী এ বিষয়ে বিমান-যাত্রীদের বড় রসালভাবে সদুপদেশ দিয়ে রেখেছে। সুদৃশ্যভাবে ছাপান ও কৌতুক-পূর্ণ ছবিতে রাঙান বিজ্ঞাপনটিতে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, রোম্যান্স তারা খুবই পছন্দ করে—এমন কি, চলাচলিতেও তাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু বিমান যখন উল্লাসে উতরোল হয়ে দে দোল দে দোল ছন্দে নাচবে তখন সবাই যেন কোমরবন্ধে চেয়ারের সঙ্গে নিজেকে এঁটে বসে থাকে এবং সে সময়টিকে যেন মধ্যযুগীয় নাইট-দের উপযোগী আচরণের জন্য বেছে না নেয়।

আচ্ছা, যদি নিত তাহলে এই মরু-প্রান্তরের আকাশে, পদ্মিনী, কর্মদেবীর বীরত্ব কাহিনীর দেশে যেখানে মেয়েরা নিজেরাই বিপদে পড়ে অসম নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নিতেন সে আধুনিকারা এরকম অবস্থায় কি তা জানতে আগ্রহ হল।

এ অবস্থায় বাঙালী একা কলকাতার ট্রামে বাসে যা করেন তার আধুনিকা রাজপুতানী যা করবে তুলনা করে দেখতে ইচ্ছা হল।

সে কথা আরো ভাববার আগেই সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ফি করলেন—সুপ্রভাত, ভোর হয়ে এল ন

সকৌতুকে বললাম,—কেন বলুন ভোরের কিছু বাকী আছে না কি?

একটা হাই তোলা হাতের চেটো ঢাকতে ঢাকতে তিনি বললেন,—তা ত

আজ রাতের ঘুমটা আমার আরম্ভই
য় নি।
তে পারলাম না।
নাম—কেন? যদিও শীতকাল এখন,
লেন খুব ভোরেই ছেড়েছে, রাতে
নিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল।
ন স্বীকার করলেন না। কই আর
সন্ধ্যা গভীর হতে না হতেই গেলেন
সময় হয়ে এল।
অবশ্য বটে। পরিশ্রমের দুঃখ যারা
বিশ্রামের সুখ থেকেও তারা বঞ্চিত।
তাদেরই হয় ঘাম যাদের ঝরাতে হয়।
পান্নায় সাজান, সুরা ও নারীতে
সন্ধ্যা যে এদের অনেকেরই জাগরী
িথনীকে নূপুর নাচনের ঝুন ঝুন
আঘাতে ঊষার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।
র ঊষা প্রভাতের বুকে ঘুম ভরা
মুখ লুকোতে লুকোতে কখন যে
হুর দিকে ঢলে পড়ে তা আমরা, যারা
কাজ করতে করতে হয়রান হয়ে ঘড়ির
তাকাতে থাকি, সেই অভাগা আমরা
রে জানব?

খলাম, ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভাল
। অনিদ্রার অতৃপ্তির পঙ্করেখা তার
ঠ মুখে অত্যাচারের বহু চিহ্ন রেখে
ছে। অভাবের ও ভাবনার উপরে
জীবন নদীর উপর পালতোলা
ার মত বয়ে যায় যাদের মুখে সে-সব
থাকার কথা নয়। কিন্তু শত মণি-
র চাকচিক্য রঙীন রেশমের পাগড়ীর
লে রঙ-এর মুখের বিকৃতির চিহ্নকে
তে পারবে না।
কটু অকারণ সহানুভূতি হল।
ললাম,—আশা করি, কাল রাতে অন্তত
ু ঘুমাতে পেরেছিলেন।
ভারের তরল অন্ধকারের উপর ঊষার
ুখানি আলোর ঝলকের মত হাসি সেই
রেখা কুঞ্চিত মুখে টেনে আনবার চেষ্টা
বন্ধুত্ব করতে উৎসুক ও রসালাপে
টু বলে রাজন্যসমাজে খ্যাত রাওৎ
হব উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ, ঘুমিয়েছিলাম।
তু স্বপ্ন দেখলাম যে ঘুমাইনি।
কিন্তু মহানিদ্রার কোলে ঢলে পড়তে
টুও দ্বিধা এদের পূর্বপুরুষরা করতেন
এই রাওৎ সাহেব যে রাজ্য থেকে
নছেন বলে মনে হ'ল সেখানকার রাজ-
শর এক পূর্বপুরুষের কাহিনী মনে
ল। সে প্রায় সাড়ে ছয় শত বছর

সুলতানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের দুর্গ রক্ষা করে এসেছিলেন। কিন্তু একদিন দেখা গেল যে, দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। সেই মহামরণের পূর্ব রাত্রিতে দুর্গে মহা উৎসব হল। পুরনারীরা ও রাজমহিষী সোহাগ সিন্দুর পরলেন সীমন্তে, বিদায় নিলেন তাঁদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে। সেই রাত্রিতে তরবারীর মুখে ও অগ্নি-গহ্বরে চব্বিশ হাজার নারী আত্মোৎসর্গ করলেন। সেই রাত্রি শেষে দুর্গে অবশিষ্ট চার হাজার যোদ্ধা জাফরানী রঙের কাপড় পরে, মাথায় মৌর পরে উন্মুক্ত তরবারী হাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।

রাজপুত ক্ষত্রিয়রা জীবনে দু'বার মাথায় মৌর পরতেন—বিবাহ বাসরে ও শেষ নিদ্রার সঙ্গে অভিসারে।

এবং এই দ্বিতীয় বারে তাঁরা পরতেন গৈরিক কাপড়। সংসার ছেড়ে সন্যাস নেওয়ার মত সংসার ছেড়ে মৃত্যুপণ নিতেন সে সময়। কোন বন্ধন বাকী থাকত না তাঁদের। উদ্দেশ্য থাকত একমাত্র শত্রুকে মেরে মরা। তাই 'জরদ কাপড়া ওয়ালা' রাজপুত সৈন্য ছিল শত্রুর কাছে বড় ভয়ের ব্যাপার।

হার হাইনেসের এলায়িত বাহু সুললিত ছন্দে নড়ে উঠল একটুখানি। ভোরের আবছায়া আলোতে শুধু তাঁর মুখের ডৌলটুকু পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। যেন মিশরের রাণী ক্লিওপ্যাট্রা মার্কিন ম্যাক্স ফ্যাক্টরের তৈরী একটা "কম্প্যাক্ট" থেকে একটু পাউডার নিয়ে প্রসাধন প্রলেপ করে নিলেন। তারপর একটি খুব ছোট্ট সুনীল শিশি থেকে পুষ্পসার (সেন্ট) নিয়ে কানের
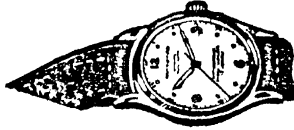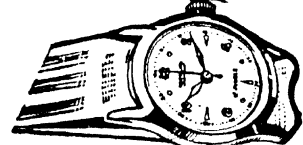
নীচে ও চিবুকে একটু হাল্কাভাবে লাগিয়ে দিলেন। সুরভি ছড়িয়ে পড়ল সমস্তটা কেবিনে। ঠিক যেমন করে খুশী ছড়িয়ে পড়ে সমস্তটা মনে। কোথায় তার উৎস আর কি-ই বা তার প্রেরণা তার সন্ধানের প্রয়োজন নেই।

ঠিকমত এবং সময়োপযোগী গন্ধসার নির্বাচন একটা সূক্ষ্ম সুকুমারশিল্প। পদ্মিনীর দেশে নিশ্চয়ই এই শিল্পকলার বিকাশে কোন ত্রুটী হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত সে দেশের চারনীদের সংগীতে সুরভি বিশেষ স্থান পায় নি। কিন্তু একাকিনী পদ্মিনীকে সে বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হয়েছে নিখুঁত আয়োজনে ও নিজেরই প্রয়োজনে। আজ যে তার নামের মরণের সংগে অভিসার বন্ধ হয়ে গেছে। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত ও বহু পূর্বপুরুষের পুরুষকারে অর্জিত প্রাণশক্তি বৃটিশ যুগের সুরক্ষিত, শান্তিময় ও দায়িত্বহীন অস্তিত্বের মধ্যে প্রকাশের পথ পায়নি। ফলে নাথ হয়ে উঠেছে বাধাহীন বল্গাহীন অশ্ব।

তাই তার অন্তঃপুরিকাকেও হতে হয়েছে নবযুগের মোহিনী। এই নিষ্ঠুর যুগ ত কাউকে ক্ষমা করে না। অন্তঃপুর বা কুল-ধর্ম বা বংশের প্রথা অর্থাৎ ট্রাডিশন কিছুই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি। কাজেই শাস্ত্রে যিনি সহধর্মিনী, তিনি বাইরের জগতে সহকর্মিনী বা অন্দরের মহলে সমসুখদুঃখ ভাগিনী না হলেও, তাকে বাইরের মোহিনীদের সংগে পাল্লা দিয়ে চলতে হবেই। অন্তঃপুরের নিভৃত কোণটিতে বসে থাকলেও। ঠোঁটের সিঁদুর, নখের আলতা, চোখের ছায়া (কাজল বা সুরমা বড় সেকেলে জিনিস) এ সবই হচ্ছে আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র। গন্ধসার অর্থাৎ সেন্টও তেমনি একটি অস্ত্র। মানসীকে হতে হবে দশপ্রহরণধারিণী।

এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের মন দেওয়া নেওয়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কি বলে তা রাওৎ সাহেব চুপি চুপি আমার কর্ণগোচর করলেন। প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তিনি বুঝে নিয়েছেন যে হার হাইনেস এই কুহকবিদ্যায় কুশলিনী। তিনি নিশ্চয়ই সকালে একটু হাল্কা চিত্তপ্রসাদকারী সুরভি ব্যবহার করেন আর বৃটিশ রেসিডেন্সীর টেনিস-কোর্টে এমন একটু স্নিগ্ধ তাজা গন্ধ যা ধরা যায় কি যায় না। সন্ধ্যায় এমন আর একটি সুরভি যা চটুল কপটতাময়, মোহাবিষ্ট অথচ বিজয়সংকেতে ভরপুর। আর ডিনারে ড্যান্সে এমন একটি বিশেষ বস্তু যাতে আছে মাদকতা ও রাত্রির রহস্যাতুরতা, যা রসিকজনকে নাকি আকর্ষণ করে কিন্তু সন্ধান দেয় না।

সাবাস!

স্মিতমুখে বললাম,—সাবাস, ইয়োর হাইনেস (যদিও রাওৎরা সাধারণত রাজা অর্থাৎ রুলিং প্রিন্স হয় না এবং ইনি শুধু একজন বড় জায়গীরদার না রাজা তা ঠিক জানি না আর ডেমোক্র্যাটিক ইয়োরোপীয় পোশাক থেকে তা ধরবার উপায়ও নেই—এটা অন্তত বুঝেছিলাম যে, এই মোক্ষম সময়ে একে অন্য কোন নামে অভিহিত করলে এই সুরভিত আলোচনায় ছন্দ পতন হবে) আপনি দেখছি বিশেষ গুণী সমজদার, বিশেষ মহাশয় ব্যক্তি। রিভিয়েরা আপনাকে নতুন আর কিছু শেখাতে পারবে না।

সকৌতুকে রাওৎ সাহেব বললেন,—রিভিয়েরা সুরভি সম্বন্ধে কি জানে তা জানেন? বড় দুঃখের কথা যে, ওরা এ বিদ্যা সম্বন্ধে কোনদিন যতটুকু জানতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশীই আমাদের গুণীরা এর মধ্যে ভুলে গেছে। সেই পুরানো আমলের গুণীদের কাছ থেকেই 'রেসিপি' (প্রস্তুত প্রণালী) সংগ্রহ করে আমরা ফ্রান্সে পাঠাই সম্পূর্ণ নিজস্ব ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত সুগন্ধ বানাবার জন্য। অন্য কারো জন্য বানাবার বা বাজারে তা বিক্রী করবার অধিকার তখন ওদের থাকে না।

বাঃ। এতে ত একটা জাতীয় শিল্প তৈরী হতে পারে আমাদের দেশে।

তবে শুনুন,—আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন তিনি। ওদের ভায়োলেট পুষ্পসারে ফুরিয়ে যাওয়া রোমান্সের স্মৃতি আনে আর আমাদের কস্তুরী স্মরণকেই হরণ করে নিয়ে যায়, মন মানিয়ে দেয়। মিস্টিরিয়াস ইস্ট সৃষ্টিই ত হয়েছে এ থেকে।

সুরভি শাস্ত্র আলোচনা শুনতে আমিই হার মেনে গেলাম। উনি নাকি একটা সেন্টের সন্ধান জানেন যার বিশ্বলুট মনোহরণ সম্ভব হয়। নাকি তার ছোঁয়া পেয়ে মূর্ছিত লুটোপুটি খায়।

আর?

কৌতূহলে প্রশ্ন করলাম—আর?

—আর সহেলীদের ত কথাই নেই

সহযাত্রীর অংগভংগি কৌতুকে কোণায় ভেংগে পড়ল যেন। যে য তুলে ধরল সে চাহনী তার পিছনে বহু অভিসারের ইশারা, অনেক দি আর নৈশ সংগীতের ইংগিত।

ইংলণ্ড ও কন্টিনেণ্টে এটিকে কালচার অধ্যয়ন হিজ হাইনেসের যায় নি। (

১২

জ এতদিন পরে ভাবতে অবাক লাগে, সেদিন সেই প্রথম দেখা ার চেহারাটা কেমন করে অমন সুন্দর ছিল। ভূতনাথ যেন অত রূপ মানুষের র আর কখনও দেখেনি। এক এক রূপ আছে, যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে প্রশান্তির প্রলেপ লাগায়, জ্বালা না—সে-ও বুঝি তেমনি। হঠাৎ সমস্ত শরীরে কে যেন চন্দনের প লাগিয়ে দিলে। চোখ নাক মুখের শ্রী বুঝি মানুষের মধ্যে দুর্লভ। তা' ছাড়াও সব মিলিয়ে যে-টা সব প্রথম নজরে পড়ে সে তো ছোটমার ার খুঁটিনাটি নয়। ভূতনাথের মনে ছল—সেই চারটে দেয়ালের মধ্যে ধ হয়ে আছে যেন কোটি কোটি ষের প্রাণের নিভৃততম কল্পনা। যুগ-ন্তের লাখ লাখ যুগের সমস্ত দর্যের তিল তিল আহরণ করে যেন মার অবয়বে তিলোত্তমা মূর্তি নিয়েছে। সে রূপ যেন শারীররূপ নয়, যেন ক স্পর্শ করা যায় না, ধরা ছোঁয়ার ক ঊর্ধ্বে সে, চাওয়া-পাওয়ার জগতের র এক অব্যক্ত বাণীময় রূপক কাব্য। যেন দেহ স্পর্শ করলে দেখা যাবে—দুধের ফেনার চেয়ে তা নরম, কাছে গেলে মনে হবে—আকাশের রামধনুর চেয়ে তা বর্ণাঢ্য। এতখানি প্রশান্তি বুঝি প্রশান্ত মহাসাগরেও নেই।

ভূতনাথের দিকে চোখ তুলে ছোটমা এক বার ছোট করে ঘোমটা তুলে দিলে মাথায়।

তারপর বংশীই যেন চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে—এই-ই শালাবাবু—

ছোটমা বললে—এসো-বোস এখানে—

মেঝেতে একখানা গালচে পাতা। ভূতনাথ বসলো।

ছোটমা বললে- বংশী তুই একটু বাইরে দাঁড়া গিয়ে, আমি ডেকে পাঠাবো—

চিন্তাকেও কী একটা কাজের হুকুম করে বাইরে পাঠিয়ে দিলে ছোটমা। কেমন যেন প্রচণ্ড এক অস্বস্তিতে ঘামতে লাগলো ভূতনাথ। ছোটমার চেহারার দিকে—বিশেষ করে মুখের দিকে—যেন হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখলেও তৃপ্তি হয় না। মাথা নিচু করে বসেছিল ভূতনাথ। কিন্তু কেবল মনে হচ্ছিল—আর একবার মুখ তুলে দেখা যায় না মুখখানার দিকে।

ছোটমার গলা শোনা গেল—ওরা তোমাকে শালাবাবু বলে ডাকে সবাই—আসল নামটা কেউ জানে না—বংশীকে বলেছিলুম, ও-ও বলতে পারলে না—

ভূতনাথ মাথা নিচু করেই বললে—আপনিও ওই নামেই ডাকবেন—

—তবু বাপ মায়ের দেওয়া একটা নাম তো আছে তোমার—

—বাপ মাকে চোখে দেখিনি, আমার নাম রেখেছিল পিসীমা—আমার নাম শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—নামটা সকলের পছন্দ হয় না—

—তুমি ব্রাহ্মণ—তা' হোক, তবু তোমাকে আমি ভূতনাথ বলে ডাকবো—কেমন, বয়েসে আমি তোমার ছোট হলেও সম্পর্কে তো বড়—আমাকে তুমি বৌঠান বলে ডেকো—

ভূতনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর চোখ তুলে বললে—আমাকে ডেকে-ছিলেন কী জন্যে, বংশী বলছিল—

—বলছি, কিন্তু তার আগে তুমি একটু জল খেয়ে নাও—আমার হাতে খেতে তোমার আপত্তি নেই তো?

বৌঠানের চাবির আর চুড়ির শব্দ কানে এল।

পায়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। চওড়া পাড় শান্তিপুরে শাড়ির নিচে যে-টুকু দেখা যায় তা হয়ত শরীরের এক সামান্যতম অংশ। ছোট ছোট আঙুল-গুলো আলতার বেষ্টনীতে অপরূপ অনবদ্য মনে হলো। ধবধবে দুধের মত সাদা নখ—আলতায় ঘেরা। টোপা কুলের মত যেন রসে ভরা।

চিন্তা শ্বেতপাথরের রেকাবীতে এনে রাখলে খাবার।

বৌঠান বললে—সব আমার যশোদা-দুলালের প্রসাদ—

তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—চিন্তা একটু জল দে ভূতনাথের হাতে—

বৌঠানের মুখে নিজের নামটা যেন আজ কেমন সুন্দর মনে হলো। ও নামটা আগে আর কারুর মুখে তো এত সুন্দর ঠেকেনি। মন্ত্রচালিতের মত এক-একটা করে মিষ্টি মুখে পুরতে লাগলো ভূতনাথ। তারপর আশে পাশে চেয়ে দেখলে। ঘরের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পালঙ্ক। ছাদের কড়িকাঠ থেকে একটা রঙিন মশারি ঝুলছে। চুড়ো করে বাঁধা। এতখানি পুরু গদির ওপর শাঁখের মত সাদা চাদর ঢাকা। দু'টো মাথার বালিশ, পাশ বালিশ। সবই প্রকাণ্ড। পঙ্খের কাজ করা দেয়ালের গায়ে অনেক ছবি। পটের ছবি, শ্রীকৃষ্ণের পায়স ভক্ষণ। গিরি-গোবর্ধনধারী যশোদা দুলাল। দময়ন্তীর সামনে হাঁসরূপী নলের আবির্ভাব। মদন ভস্ম—শিবের কপাল দিয়ে ঝাঁটার মতন আগুনের জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। আরো কত কি। একটা কাচের আলমারীতে কত পুতুল। বিলিতি মেম—ঘাগরা পরা। গোরা পল্টন—মাথায় টুপি। খোপা মাথায় কালীঘাটের বেনে বউ। আর মেঝের এক কোণে ছোট একটা জল-চৌকির ওপর ধূপ ধুনো জ্বলছে। ফুল আর বেলপাতার ভিড়ের মধ্যে রূপোর সিংহাসনের ওপর বসা শ্রীকৃষ্ণ। বৌঠানের যশোদাদুলাল। সোনার মূর্তি। বাঁশিটা পর্যন্ত সোনার তৈরী।

—পান খাও?

—না তো—

—খাও, একদিন খেলে দোষ হয় না, বৌঠান দিচ্ছে খেতে হয়—

পান চিবুতে চিবুতে ভূতনাথ ভাবছিল, হঠাৎ কীসের জন্যে এত আয়োজন আপ্যায়ন। এখন যদি হঠাৎ কোনও কারণে ছোটবাবু এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। বংশী

অবশ্য বলেছে—ছোটবাবু রাত্রে কোনওদিন বাড়ি থাকেন না। চুনীর কাছে থাকেন। রুপো দাসীর মেয়ে চুনীবালা। বাড়ি করে দিয়েছেন তাকে জানবাজারে।

ভূতনাথ বললে—এখন আসি তা হলে বৌঠান—

—সে কি, আসল কথাটাই যে বলা হলো না—বংশী বলছিল, তুমি নাকি 'মোহিনী সিঁদুর' আপিসে কাজ কর—

—সে এমন কিছু নয়, ব্রজরাখাল বলেছে, যদ্দিন ভালো চাকরি না পাই......তারপর ওদের অফিসে চাকরি খালি হলেই সায়েবকে বলে......

—আমি সে-কথা বলছি না—মোহিনী সিঁদুরে কিছু কাজ হয় বলতে পারো—

হঠাৎ এবার ভূতনাথ সোজাসুজি বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। পাতলা দু'টি ঠোঁট। লালচে আভা বেরোচ্ছে। কানের হীরে দু'টো টিক্ টিক্ করে দুলছে। আর কপালের ওপর দু' একটা অবাধ্য চুলের গুঁড়া। ঠিক তার নিচে দু'টো কালো চোখের সহজ অথচ সুগভীর চাউনি। কাজল মেখেছে নাকি বৌঠান!

বৌঠান বললে আবার—বংশী কিছু বলেনি তোমায়?

ভূতনাথ জবাব দিলে—বংশী শুধু বললে—আপনি আমায় ডেকেছেন—আমি আসবো-আসবো করে আসতে পারিনি—অফিস থেকে ফিরতেই দেরি হয়ে যায় রোজ—

—খুব বুঝি কাজ সেখানে?

—সহানুভূতি মেশানো বৌঠানের গলায়।

—একা তো সব আমাকেই করতে হয় কিনা—সুবিনয়বাবু শুধু টাকাকড়ির হিসেবটা রাখেন—

—সুবিনয়বাবু কে? তোমার মনিব বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রাহ্ম ও'রা, কিন্তু লোক খুব ভালো—আমার জন্যে ওদের ঠাকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন—

—কেন?

ভূতনাথ সবিস্তারে সব বললে। কত টাকা মাইনে, জবার ব্যবহার, জবার মা'র পাগল হওয়ার কথা—বাদ দিলে না কিছুই। যেন অনেক কথা বলতে আজ ভালো লাগলো ভূতনাথের। কোনও নারী আগে কোনওদিন ভূতনাথের কথা এমন করে মন দিয়ে শোনেনি, শুনতে চায়নি। এখানে এই বড়বাড়ির অন্দরমহলে এমন শ্রোতা পাওয়া যাবে কে জানতো। সহজ সাদাসিধে দুঃখের কাহিনী ভূতনাথের। ভালো করে গুছিয়ে বলবার ক্ষমতাও নেই তার। অথচ কে এমন করে ওকে আদর করে বসিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে তার মুখ থেকে গল্প শোনে। এখন বৌঠানের মুখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতেও যেন আর লজ্জা হলো না ভূতনাথের। বৌঠানের হাতে চাবির গোছাটা মাঝে মাঝে টুং-টাং করে বাজছে। সঙ্গে সঙ্গে চুড়িগুলোও। সিঁথির ওপর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে সিঁদুরের রক্তিমা। মনে হয়, বৌঠান যেন এখনই সিঁদুর পরে উঠলো টাট্‌কা। পতাকাটা চুলের ওপর এখনও জল চক্‌চক্ করেছে। অল্প অল্প হাসিহাসি মুখ। পাতলা ঠোঁট দু'টো গল্প শুনতে শুনতে একটু একটু দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে বৌঠান। ভূতনাথের এমন ভালো আর যেন আগে কখনও লাগেনি।

ভূতনাথ আবার বললে—এবার আসি বৌঠান, আপনার খুব দেরি করে দিলাম—

কিন্তু কথাটা বলে ভয়ও হলো। যদি সত্যি সত্যিই এখনি উঠে চলে যেতে হয়।

বৌঠান বললে—খুব তো বুদ্ধি তোমার—সাধে কি আর জবা তোমায় বোকা বলে—এতদিন এ-বাড়িতে আছো, এখনও টের পাওনি কিছু? এ বাড়িতে রাত বারোটায় সন্ধ্যে হয়, জানো না?

ভূতনাথ চুপ করে রইল এবার।

বৌঠান এবার বললে—তা' হলে কত দাম ওর—এই মোহিনী সিঁদুরের?

—দাম, দু' টাকা সওয়া পাঁচ আনা—কিন্তু এখন আমার টাকার দরকার নেই—

—কেন? চুরি করে আনবে বুঝি? তা' হচ্ছে না—

তারপরে বৌঠান 'চিন্তা' বলে ডাকতেই চিন্তা ঘরে ঢুকলো। বৌঠান বললে—ঐ চাবি নে চিন্তা, ভূতনাথকে পাঁচটা টাকা বের করে দে তো—

—পাঁচ টাকা আমি কী করবো? ভূতনাথ প্রতিবাদ করতে গেল।

—বাকিটা না হয় ফেরৎ দিও—বলে পাঁচটা চক্‌চকে রুপোর টাকা হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে বৌঠান। তারপর বললে—সিঁদুরের কথাটা কাউকে যেন বলো না আবার—

ভূতনাথের ততক্ষণে বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে গেছে। মনে হলো—বৌঠানের হাতের মধ্যে যেন যাদু আছে কোন! এত নরম। এত স্নিগ্ধ! বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। এখন যেন হঠ গম্ভীর দেখাচ্ছে বৌঠানের মুখটা।

বৌঠান বললে—সিঁদুরের বা কাউকে বলবে না—মনে থাকবে তো

—আপনি যখন বারণ করছেন, কাউকেই বলবো না—

—বারণ না করলে বুঝি বলে বে বৌঠান হেসে ফেললে। ভূতনাথ এ অর্থ ঠিক বুঝতে পারলে না। বে মুখের দিকে চেয়ে বোবার মত চুপ রইল।

বৌঠান বললে—হাঁ করে দেখছ জানো না, এ-সব কথা কাউকে বলতে

এবার আরো হেঁয়ালি ঠেকলে নাথের। সিঁদুর কিনতে দেওয়া এমন কী গোপনীয় থাকতে পারে লোকই তো সিঁদুর চেয়ে চিঠি দোকানে আসেও কত লোক। কিন্তু দুর্বোধ্য রহস্য আছে বৌঠানের এই চাওয়ার পেছনে?

ভূতনাথ বললে—আপনাকে কথা বৌঠান—আমি কাউকে বলবো না—

—এমন কি বংশীকেও নয়—

—বংশীকেও নয়—কথা দিচ্ছি—

—তোমার ভগ্নীপতিকেও নয়—

—কথা দিলাম—

—এমন কি জবাকেও নয়—সে-ও বুঝতে পারবে না, বিয়ে হলে বুঝ

নাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই, প্রশ্ন
-কেন?
ন তুমি বুঝবে না ভাই, বিয়ে হবার
সব মেয়েমানুষরাও বোঝে না—
াথ আবার প্রশ্ন করলো—আর রাধা?
বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, বেঁচে থাকলে
বুঝতে পারতো তো?
ানের চোখে মুখে কেমন ফিকে
ফুটে উঠলো।—
া কি বলা যায়, যা'র কপাল ভাঙে,
াঝে, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে
জা, এর চেয়ে বড় অপমান আর
া ভাই—
াথ বৌঠানের গলার আওয়াজে কেমন
ুকে উঠলো। ভালো করে মুখের দিকে
দেখলে। কাঁদছে নাকি বৌঠান! তবে
মুখে অত হাসির ছটা কেন! সেই
থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে
া ফুঁপিয়ে হেসে উঠলো বৌঠান।
াদা ঝিনুকের মত দাঁত চিক্ চিক্
ঠলো বৌঠানের। মুখে আঁচল চাপা
বার হরদম হাসতে লাগলো বৌঠান।
া—এ এক অবাক বাড়ি ভাই—
বাড়ি—আমার বাপের বাড়িও
—আমার মা-র কথাও একটু-আধটু
ড়ে—আমি গরীব লোকের মেয়ে
কন্তু এ এক অবাক বাড়ি—অবাক
টা—
র মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তেমনি
লাগলো বৌঠান। ভূতনাথ যেন কেমন
তর মত বসে রইল সেই দিকে
পাগল নাকি ছোট মা। এতক্ষণ কি
া সঙ্গে বসে সে গল্প করছে।
ফরসা হাত, মুখ, পা—সব থর্
র কাঁপছে বৌঠানের। টোপাকুলের
লতা মাখা পায়ের আঙুলগুলো এক
বোধহয় হাসির দমকে সঙ্কুচিত

ার মনে হলো হাত দিয়ে জোর করে
র আঁচলটা টেনে নিয়ে দেখে,
কাঁদছে না সত্যি সত্যি হাসছে।
় আঁচল যখন খুলল বৌঠান তখন
র স্বাভাবিক মানুষ।
দ—আমাদের বাড়ির পুরুষমানুষদের
তো ভাই, শুনেছও নিশ্চয় অনেক
এক এক সময় ভাবি, এ কী রকম
লা, এত বড় বাড়ি, এত নাম-ডাক,
সা এ'দের, কা'র পাপে এমন হলো
কন্তু তখনি মনে হয়, দোষ আর
কারো নয়, দোষ আমারই কপালের—আর জন্মে কত পাপ করেছিলাম—তাই সব পেলাম, মেয়েমানুষ যা চায় সব পেলাম, রূপ পেয়েছি জগদ্ধাত্রীর মত, অমন দেবতার মত বাপ, মায়ের অভাব বুঝতে দেননি, এত বড় বাড়ির বউ হলাম, টাকা-কড়ি, গাড়ি, বাড়ি, চাকর বাঁদি—যা কেউ পায় না—কিন্তু আসল জিনিষেই ফাঁকি—এর চেয়ে—

ভূতনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলো।

বৌঠান বললে—স্বামীজীকে তুমি চেন না, আমার বাপের বাড়ির কুলগুরু, তাঁকে বাবা জিগ্যেস করেছিলেন—পটুর কপাল এমন করে ভাঙলো কেন গুরুদেব?—(আমার ভাল নাম পটেশ্বরী কি না, বাবা আমাকে তাই পটু বলে ডাকতেন) তা গুরুদেব বললেন...যাক্‌গে সে-সব তোমার শুনে কাজ নেই ভাই—

ভূতনাথ কেমন যেন ছেলেমানুষের মত বলে উঠলো—না, বলুন বৌঠান—শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে কিন্তু—

বৌঠান বললে—স্বামীজিকে তুমি দেখনি ভাই, তাই হয়ত বিশ্বাসও হবে না তোমার—কিন্তু বাবা বলেন—উনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, ও'র কথা মিথ্যে হয় না, হিমালয়ে গিয়ে তিনি পঞ্চাশ বছর ধ্যানে কাটিয়েছেন, তারপর এখানে এসে এখন ধর্মপ্রচার করছেন—

—কী বললেন তিনি?

বৌঠান এবার মুখে আঁচল চাপা না দিয়েই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে—গুরুদেব বললেন, পটু আর জন্মে ছিল দেববালা, দেবসভায় ব্রাহ্মণের অপমান করেছিল—তারই শাপে এ-জন্মে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে—এ-জন্মটা ওর এমনি করেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বাবা জিগ্যেস করলেন—কীসে মুক্তি হবে ওর—? গুরুদেব বললেন—স্বামী সেবায়—

—স্বামী সেবায়?

—হ্যাঁ ভাই, স্বামী সেবায়, এ-বাড়ির ছোট কর্তাকে দেখেছ তো? এতদিন আছো দেখেছ নিশ্চয়ই, তোমার কী মনে হয় জানিনে ভাই, কিন্তু আমাদের ভাঁড়ারে যে রাঙা-ঠাক্‌মা আছে—সবাই তাকে রাঙা-ঠাক্‌মা বলে, এ বাড়ির সবচেয়ে পুরোন ঝি, আমার শাশুড়ির বিয়ের সময় এ-বাড়িতে আসে, তা তারই মুখে শুনেছি—ছোটবেলায় ছোটকর্তাকে নাকি দেখতে ছিল ঠিক দেবকুমারের মত—তেমনি সুন্দর শ্রী, তেমনি সুন্দর গড়ন, তা শুনে ভাবি আমিই যদি দেববালা হতে পারি তো ছোট কর্তা'রও দেবকুমার হতে দোষ কী! হয়ত শাপভ্রষ্ট দেবকুমারই হবেন, কী বলো ভাই, পৃথিবীতে এসেছেন প্রায়শ্চিত্ত-কাল পূর্ণ করতে। তা যেন হলো, কিন্তু একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয় ভাই—এক-একদিন যখন রাত্রে ঘুম আসে না, যশোদা-দুলালের পায়ের তলায় মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকি, তখন এক-একবার ভাবি আমার বিধাতা পুরুষের দেখা পেলে একটা কথা জিগ্যেস করতুম—

—কী কথা বৌঠান?

বৌঠান থামলো। বললে—না ভাই থাক, তুমি এক কাজ করো—সিঁদুরটা নিয়ে এসো—আর যদি পারো তো তোমার মনিবকে

জিগ্যেস করো, মানুষদের বেলায় তোমাদের 'মোহিনী-সিঁদুর' যদিই বা খেটে থাকে, দেবকুমারদের বেলায় এ-সিঁদুর খাটবে কি না—

ভূতনাথ হেসে উঠলো।

বৌঠান বললে—হাসি নয় ভাই, আমি সত্যিই বলছি, বাবা আর গুরুদেব তো বলেছেন, স্বামীসেবা করতে—কিন্তু স্বামীকে কাছে পেলে তবে তো সেবা করবো—! তাই সেদিন পাঁজি পড়তে পড়তে হঠাৎ ওই বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়লো—তারপর বংশীও বললে কথায় কথায়—তুমিও নাকি কাজ করো ওখানে—

অনেক দিনের আগেকার সব কথা। সাইকেল-এ যেতে যেতে ভূতনাথের আজো যেন সে-দৃশ্যটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মনে পড়ে। সেই বড়-বাড়ির তে-তলার শেষ ঘরখানার কথা। পটেশ্বরী বৌঠানের ঘর। উঁচু পালঙ্ক। বিলিতি পুতুলে ভর্তি আলমারী। আর সামনে বসে অপরূপ রূপসী বাড়ির ছোট বউ। যে-ঘরে ছোটকর্তার পদধূলি পড়ে না। যে-ঘরে বসন্ত-বাহার করুণ আর্তনাদ করে রাত্রের নির্জনে। যশোদা-দুলালের সেবায় স্বামী-সেবা যেখানে অভিনয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের হিন্দু-আভিজাত্য যেখানে মোগল-আমলের চৌকাঠ পেরিয়ে বিটিশ আমলের নাচ-দরবারে গিয়ে থেমেছে। অনেক কোতল-কচ্ছলের পর শাসন মানতে চায় না নবজাগ্রত মন। নিয়মানুবর্তিতাকে যখন শৃঙ্খল বলে মনে হয়। কিন্তু ওদিকে চোখ রাঙিয়ে ছুটে আসছে আর এক সভ্যতা। ঘড়ির কাঁটার মত সময়-নির্দেশ ক'রে ক'রে পদক্ষেপ করে চলে যন্ত্রযুগ। গম-ভাঙা কল থেকে শুরু করে রেল-চলা পর্যন্ত অনেক পথ অনেক প্রান্তর পার হয়ে আসছে ১৮৯৭ সন। ওরা চেয়ে দেখলে না কেউ। মুখ ফিরিয়ে রইল। ওই হিরণ্মণি আর কৌস্তুভমণিরা। বড়বাড়ির ইট চূণ সুরকীর মধ্যে গাছের শেকড় তখন হাত বাড়িয়েছে অনেকখানি। মিছি মিছি মাদুলি পরে ছোটবউ, যশোদা-দুলালকে মিছরি-ভোগ দেয়, সাড়ি গয়না আলতা পরে সারা রাত প্রতীক্ষায় বসে থাকে। আর পাঁজির পাতায় উদ্‌গ্রীব আগ্রহে মোহিনী-সিঁদুরের বিজ্ঞাপনটায় চোখ বুলোয়।

অত বড় বাড়ির বউ। ঠিক এমন করে আলাপ পরিচয় হবে ভাবা যায়নি। ভূতনাথ ভেবেছিল—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে আর পর্দার আড়াল থেকে কথা হবে ঝি-র মারফৎ। কিন্তু এ যেন কেমন হলো। এত ঘরোয়া। এত ঘনিষ্ঠতা প্রথম দিনের পরিচয়ে—বিশ্বাস না হবার মত। তফাৎ তো কিছু নেই—আর পাঁচজনের সঙ্গে। তবে হয়ত আড়ালে থাকে বলেই এত কৌতূহল, এত কল্পনা-বিলাস ওদের নিয়ে। কিম্বা হয়ত বৌঠান গরীব ঘরের মেয়ে বলেই এ-বাড়িতে এক ব্যতিক্রম।

যাবার আগে বৌঠান বললে—আমার যশোদা-দুলালকে প্রণাম করলে না ভূতনাথ—

ভূতনাথ সপ্রতিভ হয়ে এগিয়ে গেল বিগ্রহের দিকে। যশোদা-দুলাল একপদ হয়ে সোনার বাঁশি বাজাচ্ছেন। টানা টানা প্রকাণ্ড দু'টি চোখ। সামনে গিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করলো ভূতনাথ। কিন্তু মনে হলো তার সে-প্রণাম যেন ঠাকুরের পায়ে পৌঁছুল না। বাইরে বেরিয়ে এসেও তার যেন মনে হয়েছিল—প্রণাম সে কাকে করেছে? সত্যি সত্যিই কি বৌঠানের ঠাকুরকে? না আর কাউকে! অথচ বৌঠানকে প্রণাম করবার তো কোনও অর্থ হয় না। বৌঠানকে দেখে কি শুধু ভক্তিই হয়েছিল? আর কিছু নয়?

চলে আসবার আগে বৌঠান বলেছিল—সিঁদুরটা নিয়ে তুমি নিজেই চলে এসো, বংশীকে বললেই বংশী তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে—

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতনাথের মনে হলো—বৌঠান যেন তাকে আগে থেকেই চিনতো। কিন্তু কেমন করে চিনলে! তবে কি বংশীই তাকে সব বলেছে!

বার-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বংশী বললে—না বাবু, আমি কেন বলতে যাবো, আমি তো কিছু বলিনি—আমাকে জিগ্যেস করেছিল ছোটমা—শালাবাবু লোক কেমন। তা' আমি যা যা জানি সব বলেছি—মাইরি বলছি, আমি আপনার নিন্দে কী... আমি তেমন লোক নই শালাবাবু—

বংশী চলে গেল নিজের কাজে।

ছুটুকবাবুর গানের আসর ... চলছে। 'চমেলি ফুলি চম্পা'। হৈ হৈ ... সমে এসে গান থামলো। এখন আর ... যাওয়া যায় না।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে অ... ইব্রাহিমের ঘরের ওপর টিম্ টিম্ ... বাতিটা জ্বলছে। কলকাতা সহরও নি... বাইরের গেটে নাথু সিং পাহারা ... অবিশ্রান্ত। ঘরে গিয়ে দেখলে—ব্রজ... অনেকক্ষণ এসে গেছে। কী যেন ... পড়ছে। ব্রজরাখালকে অপ্রত্যাশি... দেখে ভূতনাথ যেন কেমন চমকে উ... একটু আগেই যেন কী একটা মহা ... করে এসেছে সে। মুখ দেখাতে যেন ... হলো।

ব্রজরাখাল সব শুনে বললে—তা ... কাউকে বলতে বারণ করে দিয়ে... বললে কেন আমাকে?

—তোমাকে সবই বলা যায় ব্রজর...

শেষে ব্রজরাখাল বললে—তা ... কিন্তু কাজটা ভালো করোনি বড়কুটু... হলো গিয়ে সাহেব বিবি আর আমর... গোলাম—ওদের সঙ্গে অত দহরম ... ভালো নয়—কাজটা ভালো ... বড়কুটুম—

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও সেই ... মনের মধ্যে তোলপাড় করতে ... কাজটা কি সত্যিই ভালো করে... বৌঠানের ডাকে না গেলেই কি ... করতো সে। কিন্তু খারাপটাই বা ... কোথায়। প্রণাম তবে করেছিল সে ... শুধু কি বৌঠানের যশোদা-দুলাল...

ভারতবর্ষের মৃৎশিল্প

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পথরের বুকে ভারতীয় ভাস্করের দল
যখন মূর্তি আর নক্সা খোদাই করে
ল, তখন তারই পাশে পাশে সাধারণ
–পাথর যাদের কাছে সুলভ নয়—
দয়ে রূপায়িত করছিল তাদের মনের
রণাকে। ভারতবর্ষের যে সমস্ত
ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে বের করা
, তার প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই এই
াটির কাজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া
হয় হাত দিয়ে টিপে টিপে গড়া,
চ গড়া এই সব মাটির মূর্তি
ব্যবহৃত হত নিত্যকর্ম পূজায়,
ী সাজানোর কাজে, ছেলেমেয়েদের
পুতুল হিসাবে, অথবা গরীবদের
জায়; পোড়ামাটির সীলমোহরও
গেছে প্রচুর; আর পাওয়া গেছে
পশুমূর্তি, যার পেছনে রয়েছে
মনের বিভিন্ন সংস্কারের স্বাক্ষর।
এই ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়াও এই
ড়ামাটির কাজ ভারতীয় সমাজ-
বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনার
ূল্যে সহায়। কারণ, কোনদিনই কোন
শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির বা কোন এক
প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে এদের
য়েনি; শিল্পী তার খেয়ালে গড়েছে
আর মালিকের খেয়াল-খুশীর ওপর
করেছে তার ব্যবহার। তাই যে
ছেলের হাতের খেলনা হয়েছে,
ত তাতেই দেবত্ব আরোপ করে তাকে
দেবতার মূর্তি করে নিয়েছে। আর
জন্যই, ভাস্কর্যের সমমর্যাদা পোড়া-
কাজ কোনদিন না পেলেও, ক্রম-
ধারা, অন্তর্নিহিত ভাব-কল্পনা
বভিন্ন জায়গায় তাদের অবস্থিতি
দিক থেকে ভারতীয় ভাস্কর্যের
দর সম্পর্কেও বিশদ আলোচনার
রয়েছে। এই নিবন্ধে খ্রীঃ পূঃ ৩য়
থেকে খ্রীস্টীয় ৩য় শতক পর্যন্ত
মৃৎশিল্পের আলোচনা করেছি।
ম অনুসারে ভারতীয় মৃৎশিল্পের
ার অসুবিধা রয়েছে অনেক।
ত মৃৎশিল্প বলে যাদের নাম দেওয়া
যুগ যুগ ধরে তাদের আকৃতির বা
তর বিশেষ কোন পরিবর্তনই
স্থানের দূরত্বও তাদের আকৃতিগত
ক বদলায়নি। এদের সঙ্গে সঙ্গে
খনন-ক্ষেত্র থেকে কালধর্মী মৃৎ-
র নিদর্শন মিলেছে, কিন্তু কালাতীত মৃৎশিল্পের সঙ্গে কি ভাবগত কি আকৃতিগত কোন মিলই তাদের নেই।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের তীরে তীরে যে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই সময় থেকে শুরু করে কালাতীত মৃৎশিল্পের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে—বিভিন্ন মাতৃমূর্তি, মানব-মূর্তি, খেলার পুতুল, অথবা ঘোড়া, হাতী, মেষ, ষাঁড়, বাঁদর, কুকুর, ব্যাং, মাছ, সরীসৃপ, পাখী প্রভৃতির মূর্তি (গাছপালা, লতাপাতা বা ফুলফলের কোন সন্ধানই প্রাচীন মৃৎশিল্পে মেলে না)—তারা সবই প্রায় হাতে গড়া। মানুষ অথবা পশুপাখী—যে কোন মূর্তিই হোক না কেন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবকিছু খুঁটিনাটির প্রতি নজর দেবার অবকাশ শিল্পীর নেই; শুধু মাত্র বিশেষ বিশেষ অংশের দিকেই তার ঝোঁক। স্ত্রী-মূর্তিগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে প্রশস্ত নিতম্ব, সরু কটি আর সময় সময় নাভি ও মেখলার দিকে; বলা বাহুল্য, এদের সব কয়টি লক্ষণই আসন্ন মাতৃত্বের ইঙ্গিতবহ। এদের মাথা হয় টিপে টিপে ওপরের দিকে সরু করে দেওয়া হয়েছে, নয়তো চেপে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে খোঁপা ছড়িয়ে পড়ার ভাবটা হয়ে উঠেছে সুস্পষ্ট। মাথা সরু করে দেবার পদ্ধতিটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ—পরবর্তী কালের উষ্ণীষ অথবা একশৃঙ্গ শিরোভূষণের এই হ'লো আদিম রূপায়ন। নিম্নাঙ্গ প্রায় কোন মূর্তিরই নেই, অথবা থাকলেও অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে গড়া। ডাঃ ক্রামরিশের মতে এ এক গভীর তাৎপর্যের দ্যোতক—

"The absence of limbs or the facts that they are made as short conical stumps, show these figurines in the process of acquiring distinct form; they are stages towards 'rupa-vheda,' differentiation of form....The material itself, earth, contributes its fictile nature to the total symbolism.

সিন্ধু নদের তীরভূমিকে বাদ দিলে, প্রাচীন শহরগুলির—যেখানে যেখানে খননকার্য চালানো হয়েছে—তার মধ্যে প্রধানত বক্সার, পাটলীপুত্র, তক্ষশীলা, কৌশম্বী এবং বসাড় থেকেই এই কালাতীত মৃৎশিল্পের নিদর্শন আমরা পেয়েছি।

কালধর্মী মৃৎশিল্পেরও কালানুক্রমিক আলোচনা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বসাড়, কুমরাহর এবং বুলান্দীবাগ থেকে এমন অনেক মৃৎ-মূর্তি পাওয়া গেছে আঙ্গিকের দিক থেকে যাদের ওপর কুষাণ শিল্পশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট; অথচ যে স্তরে তাদের হদিস মিলেছে তার অনেক ওপরকার স্তর থেকে পাওয়া গেছে সুঙ্গ যুগের মৃৎশিল্পের নিদর্শন। এর প্রধান কারণ বোধ

বানগড়ের নারীমূর্তি

হয়, হালে তৈরী হলেও যে সব ছাঁচে এরা গড়া তা' অনেক দিন আগেকার। বস্তুত পাটলীপুত্র, পাটনা, বক্সার এবং কৌশাম্বীর অল্প কয়েকটি মৃৎ-মূর্তিকে বাদ দিলে প্রাচীন শহরগুলি থেকে মৌর্যযুগের বিশেষ কোন মৃৎ-শিল্পের নিদর্শনই তো আমরা পাইনি।

হরাপ্পার কয়েকটি মূর্তি

এসব জায়গা থেকে যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের অল্প কয়েকটিরই নীচের দিকে বসাবার জন্য আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বাকীগুলো বোধ হয় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসানো হতো। অবশ্য সুঙ্গ যুগের কিছু মূর্তি রয়েছে যাদের পেছনে ছিদ্র রয়েছে, যার সাহায্যে খুব সম্ভবত এদের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। পোড়ানোর রীতি, উত্তাপের মাত্রা এবং মাটির রাসায়নিক উপাদান অনুযায়ী পোড়ানোর ফলে এই সব মূর্তির রং তামাটে, লাল, কালো অথবা ধূসর বর্ণ হ'ত। সময় সময় রং-এর ঔজ্জ্বল্য আনবার জন্য গাঢ় লাল অথবা কালো রং-এর প্রলেপও পোড়ামাটির ওপর লাগানো হ'তো। এদের অধিকাংশই ছাঁচে-গড়া, শিরোভূষণ শুধু হাতে বসানো। অনেক ক্ষেত্রে শরীর হাত দিয়ে গড়া হলেও মাথাটুকু সব ক্ষেত্রেই ছাঁচে গড়া এবং ঐ সব হাতে-গড়া শরীরের সাথে পরে জোড়া লাগানো। পরবর্তী কালে—অর্থাৎ গুপ্ত-যুগে অবশ্য আর হাতে গড়া মূর্তি চোখে পড়ে না, সেখানে ছাঁচের মূর্তিরই এক-চেটিয়া প্রাধান্য। সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পশৈলীর ছাপ যেমন এই সব মৃৎ-মূর্তির ওপর প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি সমকালীন ভারতীয় সমাজের রুচির ও বস্তু-ভিত্তির প্রতিফলনও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট। বুলান্দীবাগ, কুমরাহর, পাটনা, বক্সার, মথুরা, অহিছত্র, বসাড়, কৌশাম্বী, রাজঘাট, বানগড়, তক্ষশীলা, লৌরীয়া নন্দনগড়, সারী ঢেরী, মাস্কী, সাহেৎ মাহেৎ, গয়া প্রভৃতি প্রাচীন জায়গা থেকে যেসব মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, পোষাক, অলংকার, মুখাবয়ব এবং সময় সময় আকৃতি ও শিল্পরীতির ভিত্তিতে খুব সহজে না হলেও তাদের একটির সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য ধরা চলে।

সুঙ্গ কান্ব যুগে, অর্থাৎ খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে প্রায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত যেসব মৃৎশিল্প পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে স্ত্রী-মূর্তির প্রাধান্যই বেশী। এদের প্রায় প্রত্যেকটিই সুদৃশ্য পোষাক ও অলংকারে সুসজ্জিত। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে এদের সুঠাম দেহ তৈরী। এদের উন্নত বুক সুন্দর ওড়না দিয়ে ঢাকা। মাথা একটু বড় এবং হয় সুবিনাস্ত কেশ অথবা ভারী শিরোভূষণে ভারাক্রান্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের গঠন একটু ভারী মনে হ'লেও এরা যে যৌবন-সমাগতা নারীর প্রতিমূর্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমকালীন শহুরে অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই যে জন্ম, এদের অন্তর্নিহিত ইন্দ্রিয়জ আ[...] তার প্রধান সাক্ষ্য।

পাটনা যাদুঘরে সংরক্ষিত মৌর্যযুগের টেরাকোটা বালক-মূর্তি

বসাড়, বক্সার, পাটালীপুত্র ও [...] থেকে 'পাওয়া অপর কয়েকটি মূর্তি[...] যুগের বলেই মনে হয়, যাদের মুখ[...] গঠনরীতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পে[...] নিঃসন্দেহে হেলেনিস্টিক শিল্প [...] নেওয়া। এ যুগের শেষ দিকে বক্সার, [...] ও কৌশাম্বী থেকে পাওয়া কিছু নি[...] গঠনরীতির দিক থেকে আগেকার নিদ[...] গুলো অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট—অ[...] ও অপ্রচলিত আকৃতি ও শিল্পরীতির [...] এই সময় যে সংযোগ ভারতীয় শি[...] ঘটে ছিলো, তাই বোধ হয় এর কারণ।

পরবর্তী যুগ—অর্থাৎ শক-কুষাণ য[...] পোড়ামাটির মূর্তিগুলোর মুখাবয়ব[...] ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিভিন্ন জাতির নি[...] জাতীয় ছাপ বিদ্যমান। বিশেষ করে ম[...] থেকে পাওয়া এই সময়কার বিভিন্ন ম[...] মূর্তিগুলো তো নিঃসন্দেহে নবাগত জ[...] সমূহের নতুন ভাব-কল্পনা, ধ্যান-ধা[...] সাক্ষ্য বহন করছে। স্ত্রী-মূর্তিগু[...] মুখে হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। ভার[...] মৃৎশিল্পে এই সময়ই সর্ব প্রথম [...] করে এসেছে উন্নতনাসা বিভিন্ন বাদ্যব[...] দল তাদের নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র নি[...] ঘোড়সওয়াররাও এই প্রথম আত্মপ্র[...] করেছে—তবে তারা প্রায় সবাই ছাঁচে গ[...] সব মিলিয়ে, পাটালীপুত্র, অহিচ্ছত্র [...] মথুরা থেকে পাওয়া এই যুগের পে[...] মাটির কাজগুলি কি রূপভেদ ও ন[...] বিভিন্নতা থেকে, কি আকৃতির সুঠ[...] ও গঠন বৈচিত্র্যের দিক থেকে সমসাম[...] ভারতীয় শিল্পের পর্যালোচনায় এমন [...] অর্থবহ স্থান অধিকার করে রয়েছে, [...] সবটা সমকালীন ভাস্কর্যে মেলে না। [...] পূর্ব ৩য় শতক থেকে শুরু করে খৃ[...] তৃতীয়-চতুর্থ শতকে পর্যন্ত কিছু [...] ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির সংস্প[...] আসছিল, তাদের বয়ে আনা ভাবৈশ্বর্য [...] করে ভারতীয় সমাজমানসের ধ্যান-ধা[...] ভাব-কল্পনাকে রূপান্তরিত করছিল, [...] সাক্ষ্য ভাস্কর্যে যতটুকু পাই, তার অ[...] বেশী পাই সাধারণ মানুষের গড়া এই পোড়ামাটির কাজে।

পঁচিশ

মনীগ্রাম একদা যে ব্রাহ্মণের গ্রাম তার প্রমাণ ওই নামেই আছে।

লাকে বলে ব্রাহ্মণের গ্রাম ধ্বংস ক'রে প্রাচীন কালে তুর্কী বিজয়ের সময় মানেরা বসতি স্থাপন করেছিল। তা' নয়। বামনীগ্রামের ব্রাহ্মণেরা কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ; যজন যাজন র ছিল না, কিন্তু যজমান তাদের । কৃষিজীবী শূদ্রদের মধ্যে তাদের ন এবং তারা নিজেরা ছিল ঠাকুর-র শিষ্যসম্প্রদায়। নবগ্রামের অন্য ণ সমাজের সঙ্গে তাদের সম্প্রীতি না। সেইহেতু গুরুর সঙ্গে তারাও ন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ড়ি বাইশ বছর আগে জমিদার প্রজা ধের সূত্র ধরে যে দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক য় পরিণত হবার উপক্রম হয়েছিল, নায়ক রহম জলিল ওই বামনীগ্রামেরই এবং এবার যে সুক্কুর—শেখ মহম্মদ র দরখাস্ত করেছে সে ওই জলিল রই চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। জলিলের তো ভাই গ্রামান্তরে শ্বশুড়ের ভিটেতে করেছে।

কন্তু সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই র বংশের ছেলেরা কোন দিন কোন কালে ন বিবাদ ঘটতে দেন নি। আজ ঠাকুর-শের আর কেউ নেই। ঠাকুরবংশের টি শাখা আছে ওই শাহপুরে এবং নে আছে ঠাকুরবংশের এক দৌহিত্র। রবংশ যখন এখানে সমৃদ্ধশালী প্রতাপ-ীও ছিল, তখন তাদের আশ্চর্য মমতা হিন্দুদের উপর। শুধু মমতাই নয়, মও করতেন তাঁরা।

এক্ষেত্রে বরং আঘাত করেছে এখানকার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরাই বেশী।

জাতিচ্যুত হয়েও ঠাকুরবংশে যৌগিক সাধনা দীর্ঘকাল কয়েক পুরুষ ধরেই ছিল কুলগত সাধনা। তার উপর তাঁরা সেকালে রাজার জাতির ধর্ম গ্রহণ ক'রে বৈষয়িক প্রতাপেও প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলেন। যিনি যৌবনের তাজা রক্তের ক্ষোভে এবং অভিমানে জাতি-ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন, বার্ধক্যে তিনিই দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারেন নি; যিনি একদা বলেছিলেন, নবজন্ম লাভ হ'ল আমার; উদারতর মানবধর্মে মুক্তিলাভ হল সহজ; তিনিই বার্ধক্যে ছেলেদের বলে গেলেন, "কাউকে আঘাত কর না। বিশেষ ক'রে কারও ধর্মে দেবতায়। করলে, আমার অভিশম্পাত রইল তার উপর। সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

উত্তরকালে ঠাকুরবংশের কয়েকজনই অভিশাপ বলে গণ্য ব্যাধিতে ভুগে মারা গেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্বাস ওই বাক্যলঙ্ঘনই এই দুর্ভাগ্যের হেতু।

আরও একটি বিশেষত্ব ছিল ওই ঠাকুর-বংশের। তাঁরা উত্তরকালে কখনও জমিদার হবার চেষ্টা করেন নি, ওই সেকালের সেই সনদের নিষ্কর ভোগ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নবাব সরকারে কেউ চাকরীও করেন নি। এখানকার ব্রাহ্মণ বংশই নবাব সরকারে চাকরী গ্রহণ করে জমিদারী আয়ত্ত করেছে এবং সেই সময় থেকেই এখানকার প্রাধান্য তাদেরই করতলগত হয়েছে। এখানকার ঠাকুরবংশ তখন আত্মিক সাধনায় হীনবল। যৌগিক সাধনাও তখন তারা ভুলেছে, ঐশ্লামিক সাধনাতেও পাণ্ডিত্য বা পারঙ্গমতা লাভ করতে পারে নি। নিছক ঐসলামিক আচার পালন ক'রে, খোদাতয়লার প্রতি অগাধ ভক্তিতে নির্ভর ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন যাপন ক'রেছেন। কিন্তু অন্য সকলে তাঁদের এখনকার শিষ্যমণ্ডলী তা পারেনি। তাদের অন্তরে ক্ষোভ জেগেছিল। সেই ক্ষোভের ধারা কখনও চলেছে ফল্গুর মত লোকচক্ষুর অন্তরালে, কখনও আকস্মিক ঘটনাচক্রে ঘাতে প্রতিঘাতে ফাটলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে উৎসের মত। স্রোতের প্রবাহে বেয়ে চলেছে, খানিকটা আবার অন্তর্হিত হচ্ছে গভীর তলদেশে।

সন্তোষবাবু লিখেছেন, "মহাভারতে তো কুরুক্ষেত্রে হিংসার পথে জীবন পরীক্ষার অধ্যায় শেষ হইয়াছে। পরাশর তনয় ভগবান বেদব্যাস ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার ঋষিদৃষ্টি দিব্যমহিমাশক্তি। তিনি সেই দৃষ্টিতে, ধ্যানযোগে ভারতের আত্মার অন্তর লোকের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়াই এই ইঙ্গিত দিয়া দাপরের মহা-ভারতীয় নরলীলায় সমাপ্তির ছেদ টানিয়াছেন। ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নয়। কলিযুগের প্রথমপাদে নূতন অধ্যায়ে পুরুষোত্তম গৌতম বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া ভারত আত্মার সেই গূঢ় অভিপ্রায়কে বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।"

"মা হিংসী!"

"হিংসা পথ নহে। অহিংসার উত্তম পথে পরমগতিতে জ্যোতির্ময়তায় উপনীত হও। মানবাত্মার সেই সনাতন শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা—তমসো মা জ্যোতির্গময়। জ্যোতির্লোকে উপনীত হইবার ইহাই পথ।"

"ইহাই মানব জীবনের বিচিত্র লীলা। মানব জীবন কেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লীলারহস্য।

স্বভাবে ও বাসনায় সংঘর্ষ।

মহতমসা ও জ্যোতির্ময়তায় মহাদ্বন্দ্ব!

অনন্ত দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার ও চেতনা-হীন নিথরতা ও অবাঙময়তার মধ্য হইতে দ্যুতিময় বাঙ্ময় চৈতন্যের মহাসংগ্রাম চলিতেছে। মানব সমাজের মধ্যেও চলিতেছে।

ঠিক এই হেতুতেই রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্রের পরে প্রভাসে সমুদ্র উপকূলে সমগ্র যদুবংশ গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হইয়াছে—প্রাকৃতিক স্বভাবে ওই মহাতামসীর গ্রাসে, স্বয়ং পুরুষোত্তম,

জরা ব্যাধের শরাঘাতে স্বীয় রক্তধারায় তামসীর রক্ততৃষ্ণা নিবারণ করিয়া মহা-প্রয়াণ করিয়া যবনিকা টানিয়াছেন—মহা-ভারতের দ্বাপরলীলায় এবং পরবর্তী আবির্ভাবে গীতার 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'—এই উক্তির পরিবর্তে অহিংসার বাণী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাই মহাভারতে নূতন লীলায় নর-নারায়ণের নব-বাসনা। কিন্তু বাসনা হইলেই তাহা পূর্ণ হয় না। তাহার জন্য সাধনা প্রয়োজন হয়। স্বভাব ও বাসনায় দ্বন্দ্ব, স্বভাবকে পরাজিত করিয়া বাসনাকে ফলবতী করাই সিদ্ধি। এই কারণেই কুরুক্ষেত্রের পরেও রক্তপাতের শেষ হয় নাই। বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু বহু যুদ্ধের মধ্যেও বারবার এই 'মা হিংসী' বাসনাময় বাণী রক্তাক্ত কর্দমের মধ্যে সমাহিত হয় নাই; তামসী অট্টহাস্য ও দন্ত ঘর্ষণের উচ্চ ও অহরহ নিনাদিত হিংসাজর্জর হিংস্র নিনাদের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই। সেই মহাতপস্যা চলিয়াছে। আমি যেন দেখিতেছি, ভারত যোগাসনে উপবিষ্ট; তাহার সেই ধ্যান ভঙ্গ করিতে বারবার অভিযান আসিতেছে। আঘাত করিতেছে। যন্ত্রণায় ভারতের ধ্যান ভাঙিতেছে; লাঞ্ছিত হইতেছে; আবার সে লৌকিক পরাজয়ের মধ্যে দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও আত্মস্থ হইয়া সেই পরম বাসনায় সিদ্ধি লাভের সাধনায় নিমগ্ন হইতেছে।

ক্ষুদ্র নবগ্রামেও সেই লৌকিক ইতি-হাসের সংঘটন। কিন্তু সেই সাধনা? সেই সাধনা কই?"

* * * * *
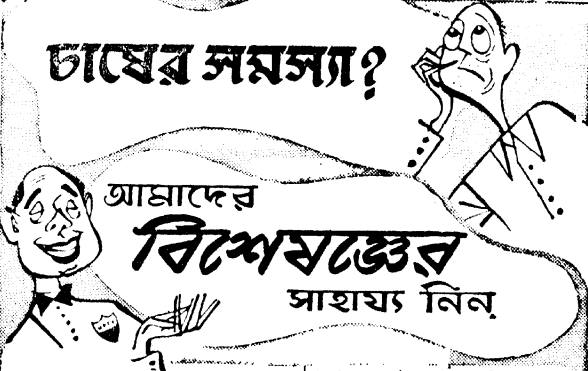
কিশোরবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই বললেন, যেদিন এই খাতা সন্তোষদা আমাকে দিয়েছিলেন গৌরী সেদিন আমি একটু হেসেছিলাম। ভেবেছিলাম প্রাচীন পন্থী, সেই পুরাণের যুগের সংস্কার এবং দৃষ্টি নিয়ে সন্তোষদা এ কালের সাধনা দেখেও দেখলেন না। সেদিন মনে মনে অহংকার করেই বলেছিলাম, আছে সন্তোষদা সাধনা আছে, শুরু হয়েছে আবার, আমি ভগবান রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ থেকে স্বামীজীর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সেই মন্ত্র বহন করে নিয়ে এসেছি নবগ্রামে। মনে মনে আরও বলেছিলাম—নবগ্রামই আমার ভারত, এই আমার বারানসী, ব্রাহ্মণ নবগ্রামবাসী, শূদ্র নবগ্রামবাসী, চণ্ডাল নবগ্রামবাসী আমার ভাই; নবগ্রামের কল্যাণ আমার কল্যাণ, নবগ্রামই আমার স্বর্গ। স্বামীজীর এই মন্ত্রের মধ্যে মুসলমান কথাটা নাই। কিন্তু ভগবান রামকৃষ্ণ তো ইসলামী পন্থায় সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করে তাকে স্বীকার ক'রে গেছেন। আমি তাদের সেবা করতে কোন দিন হাত গুটিয়ে থাকি নি! অনেক আশা করেছিলাম গৌরী। কিন্তু আজ ক'দিন থেকে মনে মনে আমি ভেঙে পড়েছি। মনে হচ্ছে সন্তোষদা'র কথাই সত্য। নবগ্রামে ভারতের ইতিহাসের সংঘটনের প্রতিফলন আছে, ঘাত-প্রতিঘাত আছে, সাধনা নাই। এটা একটা বালির চড়া। এখানে আছে মরা মাটি বালি আর কংকাল, ঝিনুকের খোলা, এখানে ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ে ফিরে যাচ্ছে। আর কিছু না। শুধু তামসীরই রাজ্য, নিরন্ধ্র নিস্পন্দ তমসা। জ্যোতির বিন্দুও নাই। কোথায় জ্যোতি?

—ওরে বাপরে! দোহাই কিশোরবাবু, দোহাই গৌরীদা, তোমাদের জ্যোতি তোমরা সম্বরণ কর বাপু। আমরা পাপ-পুণ্যে-গড়া মর্ত্যের জীব, স্বর্গের এতখানি অনাবৃত জ্যোতি সইতে পারছি না। দোহাই তোমাদের, এত বড় বড় তত্ত্ব ক্ষান্ত দাও।

কথাগুলি বললে গুণী, গুণেন্দ্র। সে যে কখন এসেছে সে কথা গ তন্ময়তার মধ্যে কিশোরবাবু বা গে কান্ত কেউই জানতে পারে নি। সে ব আড়ালেই দাঁড়িয়ে শুনছিল, এদের ব মধ্যে একটা ছেদ খুঁজছিল। সেই পেয়েই নাটকীয়ভাবে একখানি নাট কথাগুলি নিপুণভাবে অভিনেতার ' বাগিয়ে বলে ঢুকে পড়ল। নবগ্রামে দ কাল ধরে নাটকের খুব চর্চা ছিল, এ অল্প-স্বল্প আছে, এখানকার লোকে সাংস্কৃতিক পরিচয় ওই ধারাতেই উঠে থাকে। তার উপর গুণী বেশ শালী অভিনেতা। সিরিওকমিক তার ঝোঁকও বেশী, দক্ষতাও যথেষ্ট। এল রায়ের বঙ্গনারীর কেদারের ভূমি ওই কটি কথা ঝট ক'রে তার মনে গেল। ওই জ্যোতি শব্দটাই বোধ মনে পড়িয়ে দিলে এবং এমনভাবে ঢ যে, গুণী ঢুকল বলে মনেই হল মনে হল রঙ্গমঞ্চে যেন কেদারই ঢুকল

...সব দোষ-ত্রুটি ঢাকাও পড়ে গেল। ...রবাবু এবং গৌরীকান্ত দু'জনেই ...না হেসে পারলেন না। চিন্তার ...তায় দু'জনেই যেন ডুবে যাচ্ছিলেন। ...কাটিয়ে দিল গুণী তার ওই ...ীয় ভঙ্গিতে নাটকের উক্তির কৌতুকী ...র আঘাতে খানিকটা তরঙ্গ তুলে। ...ই যেন এরা দু'জনে মাথা তুলবার ...র পেলে।

...ণী বললে, ওসব কথা এখন কিছু-...র জন্য রাখুন। এখন এই অধমের ...দুটো শুনুন।

...ৗরীকান্ত বললে, বস। বল কি কথা ...র?

...ণী বললে, বসব না। তোমাদেরও ...চ দেব না। ওঠ। কিশোরবাবু ...নিও উঠুন। চলুন—শাহপুর ভাসা-...ব।

কিশোরবাবু বললেন, এইমাত্র এস ডি ও, এস পি এসেছিলেন; তাঁরাও অনুরোধ করেছিলেন গুণী। আমরা যাইনি।

—তাঁদের কথায় না-যেতে পারেন, আমার কথায় যাবেন চলুন। ও'রা তো রাজ-কর্মচারী, এটা ও'দের চাকরীর দায়িত্ব। বড় জোর কর্তব্য বলতে পারেন। আমাদের এটা প্রাণের দায়। কর্মভোগ-কৃতকর্মের ফলভোগ, প্রায়শ্চিত্তও বলতে পারেন। ও'রা ফায়ারব্রিগেডের লোক আর আমরা যে ঘরে আগুন লেগেছে সেই ঘরের লোক।

—এক্ষেত্রে ভাই ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের এগিয়ে দিয়ে ঘরের লোকদের পিছিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের হুকুম শোনাই বোধ করি বুদ্ধিমানের কাজ এবং যুক্তির দিক দিয়েও যুক্তিসংগত।

গুণী একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, অন্য সময় হ'লে মনে করতাম আমার ওপর অপ্রীতির জন্যে আমার সঙ্গে যেতে চাও না বলেই এ কথা বলছ। কিন্তু এস ডি ওদের ফিরিয়ে দিয়েছ, তার উপর সদর থেকে আসবার পথে সারাক্ষণটা সেই কুড়ি বছর আগে লীগের আমলে জলিল রহমদের নিয়ে যে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হয়েছিল সেই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। আপনা-আপনি মনে পড়ে গেল। সে দিনের কথা তো ভুলবার নয়। যতই মতবিরোধ থাক, যতই কলহ-বিবাদ করি, ঈর্ষা করি পরস্পরের দুঃখের মধ্যে, বিপদের মধ্যে আসল সত্যটা বেরিয়ে পড়ে। তাই মনে মনে ঠিক করেই এলাম যে, তোমাদের ধ'রে নিয়ে যাব সঙ্গে। পথে অকপটে হাত ধরে বলব ঝগড়া-ঝাঁটি, রাগ-রোষ সব বিসর্জন দিয়ে আমরা এক হয়ে যাই।

কিশোরবাবুর মুখখানি প্রদীপ্ত হয়ে

উঠল। বললেন, তা' যদি পার গুণী তাহলে নবগ্রাম সোনার নবগ্রাম হয়ে উঠবে। তোমার অক্ষয় পুণ্যলাভ হবে। তবে—

বলেই তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। যেন ভিতর থেকে কেউ তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের সেই দীপ্তিটুকুও নিভে গেল।

গৌরীকান্ত মুহূর্তে বলে উঠল—তুমি ভাই একলাই ঘুরে এস। আমরা তোমার অপেক্ষা করে থাকব। কিশোরবাবু দুঃখ পেয়েছেন, সুক্কুর একখানা—

—জানি গৌরীদা। সেই দরখাস্তটাই বেশী ক'রে মনে করিয়ে দিয়েছে সেই ঘটনার কথা। ওটা একটা উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি এক হতে পারি গৌরীদা তাহলে ওসব পতঙ্গের ফরফরানি আপনি চুপ হয়ে যাবে।

—আর আমি ভাই ওখানে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকার হারিয়েছি। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সাহিত্যসেবা করতে গিয়েছি ওদের সেবা ছেড়ে। ওদের কাছে তো আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছু নাই। কি বলে গিয়ে দাঁড়াব? তুমি যাও ফিরে এস।

—আসব। খাব তোমার এখানে রাত্রে।

—নিমন্ত্রণ রইল।

—যেচে নিলাম। একে নিমন্ত্রণ বলে না। বলে জবরদস্তি। ভাগ বসানো। শাক অন্ন বা এক তরকারী ভাতের বেশী কিছু হলে রাগ করব।

গুণী বেশ পুলকিতচিত্তেই চলে গেল। বাইরে জিপের ইঞ্জিন সশব্দে গর্জন করে উঠল।

কিশোরবাবু বললেন, তুমি আমাকে সত্য কথাই বলতে দিলে না গৌরীকান্ত।

—ভালই করেছি কিশোরবাবু। দুঃখ পেতো গুণী।

হয় তো দুঃখ পেতো খানিকটা। কিন্তু সাবধান হ'ত। সেবারের সেই মিলনীর পুনরাবৃত্তি হ'ত না। গৌরীকান্ত আমি তো ভুলতে পারিনে তুমি সেই নবগ্রাম ছেড়ে গেলে। যে নিষ্ঠুর অপবাদ তোমাকে ওরা দিয়েছিল!

সে কথা থাক কিশোরবাবু!

—ভোলা কি যায় গৌরীকান্ত? আবার যদি তাই হয়?

সেবারের কাণ্ডটা মনে পড়লে কিশোরবাবুর আপাদমস্তক রী-রী ক'রে ওঠে।

ওই জলিল রহমের সঙ্গে গুণীর জ্যাঠার জমিদার প্রজার ঝগড়ার পর। সেবার লীগের আমলে তিলকে বিচিত্রভাবে তাল ক'রে তুলে মুসলমানেরা জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে গুণীর জ্যাঠাকে জটিল জালে জড়িয়ে প্রায় বেঁধেই ফেলেছিল। গৌরীকান্তের কৌশলে এ পক্ষে সমস্ত হিন্দুরা এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই সে যাত্রা কিছু ঘটতে পায় নি। সদর থেকে সশস্ত্র পুলিশ এস ডি ও এসে পড়েছিল। এস ডি ও সেদিন সর্বসমক্ষে গৌরীকান্তকেই কটু কথা বলে শাসন করেছিলেন। সে কথাও জানিয়েছিল নবগ্রামের হিন্দুরা। ওই মহাদেব সরকার। কিন্তু গৌরীকান্ত সে লাঞ্ছনা হাসিমুখেই মাথা পেতে নিয়েছিল এবং সর্বদিক রক্ষা পেয়েছে দেখে নিজের কাজে পরের দিনই নবগ্রাম থেকে চলে গিয়েছিল। এর পর গ্রামে ঠিক এই ধরণের হিন্দু ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন হিন্দু-সমাজপতিরা। সেই প্রয়োজনে এক মিলনীর আয়োজন হয়েছিল ওই চণ্ডীতলায়।

গ্রামের হিন্দু যুবক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত একত্রিত হয়ে চণ্ডীমায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা কেটে প্রায় শপথ করেই পরস্পরের ভাই হয়েছিলেন এবং বড় মেজ সেজ ছোট ভাই থেকে শুরু করে খুড়ো ভাইপো, মামা-ভাগ্নে, পিতা-পুত্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র চণ্ডীতলার নাটমন্দির, ঘাট এবং আশপাশের জঙ্গলের মধ্যে থাম বা গাছের আড়াল দিয়ে বসে আকণ্ঠ মদ্য পান করে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে—ভাই! ভাই বলে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন এবং সকল বিবাদের অবসান হ'ল বলে শপথ করেছিলেন।

এ মিলনী যজ্ঞে কিশোরবাবু একবার গিয়েই আয়োজন দেখে ফিরে চলে এসেছিলেন।

গৌরীকান্ত নবগ্রামে ছিলই না এবং তার অভাবও সেদিন কেউ অনুভব করে নি। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার মাস কয়েক পরেই গৌরীকান্তকেই চরম অনিষ্ঠকারী ধার্য ক'রে দেশের লোকের কাছে অপরাধী হিসেবে দাঁড় করেছিলেন এ'রা।

গৌরীকান্ত দেশত্যাগ করেছিল।

ও'রাও দেশ ত্যাগ করেছিলেন। বলেছিলেন, নবগ্রামের লক্ষ্মীর আসন আমাদের ঘরের সিংহাসনে। ও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও ত্যাগ করলে গ্রামকে। নবগ্রাম লক্ষ্মীহীন হ'ল পর ধ্বংস হবে।

সে অনেক কথা। মনের ম অক্ষয়ই হয়ে আছে কিশোরবাবুর।

তিনি ভুলতে পারেন না গৌ দেশত্যাগ না করলে তার সাধনা এ ব্যর্থ হত না। গৌরীকান্ত ভুলতে পেরেছে, কারণ জীবে সার্থকতা লাভ করেছে।

কিশোরবাবু ঘাড় নাড়লেন। ভোলা যায় না গৌরীকান্ত।

—কিন্তু না ভুলতে পারলে সামনের পথে এগিয়ে যাওয়া কিশোরবাবু। ওই ভুলতে না-পা তো সেই তামসী শক্তির তাড়না।

—হয় তো—

কিন্তু কথা বলা হল না কিশো একখানা জিপ এসে দাঁড়াল। হয়ে কিশোরবাবুই মুখের কথাটি রেখে বলে উঠলেন, আবার জিপ এল? গুণী ফিরে এল?

ঠিক এই মুহূর্তেই আরও গাড়ি এসে থামল। পর পর গাড়ি। অনেকগুলি জুতোর শব্দ কিশোরবাবু গৌরীকান্ত চকিত দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

, সার্কেল অফিসার, এ এস পি, এ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর, তার একটি মেয়ে।

এ কি?

ীকান্তের আর বিস্ময়ের সীমা া। এ যে রমা! রমা কোথা থেকে দের সঙ্গে?

পিছনে ঢুকল গুণী।

বললে, ফিরে আসতে হ'ল া। রমাকে তো চিনতে পারছ। ামাকে সাক্ষী মেনেছে।

মেয়েটা আশ্চর্য। মাথার ঘোমটাটা একটু কমিয়ে দিয়ে হেসেই বললে দেখ, তোমাদের স্বাধীন রাজ্যে আমার লাঞ্ছনাটা দেখ। আমার অপরাধ কি জান গৌরীদা—

এ এস পি অল্পবয়সী ছেলে— সে বললে, আপনি চুপ করুন। যা জিজ্ঞেস করবার আমরাই করছি।

—তাই করুন। কিন্তু আমি এক গ্লাস জল চাইতে পাব তো? বড় তেষ্টা পেয়েছ গৌরীদা। জল খাব। আর একটু বসতে দাও।

সে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। বললে, এক গ্লাস জল দাও। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। সারাদিন খাওয়া জোটে নি ভাগ্যে। মুসলমানেরা ভয়েই মরে গেল। বলে, হিন্দুর মেয়ে বিধবা, আমরা জল দিতেও পারব না। শেষে এই নিয়ে হাঙ্গামা বাধবে। কিছু খাবার থাকে ত' খাবারও দিয়ো গৌরীদা। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান গৌরীদা, বিজয়দাই আমাকে বাঁধিয়ে দিয়েছে। আমি তোমাকে সাক্ষী মেনেছি। (ক্রমশ)
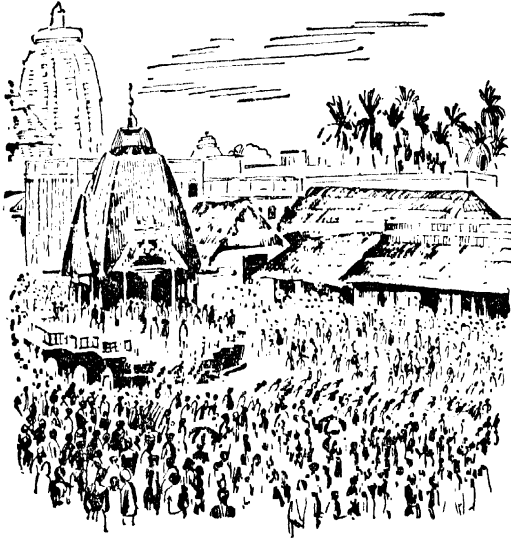
রঞ্জন
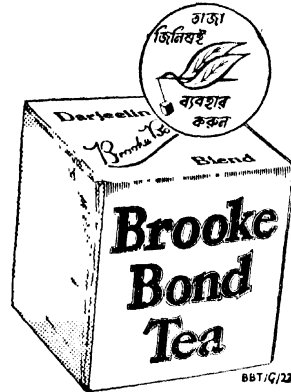
বা**ংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্তত** একটি শাখার দৈন্যের জন্যে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। সেটি নাট্য সমালোচনা। গ্রীনল্যাণ্ডের কবিরা সাপ নিয়ে কাব্য রচনা না করলে যদি দোষী সাব্যস্ত না হন, সাহারার গীতিকারেরা আমাদের মতো বর্ষা সংগীতে পারদর্শী না হলে যদি দণ্ডিত না হন, তা-হলে সেই একই কারণে নাট্য বিভাগে বাঙালী সমালোচকের নিষ্ক্রিয়তা নিশ্চয়ই ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু ইংরেজিতে শুধু প্রভূত ঐশ্বর্যশালী নাট্যসাহিত্যই নেই; তাকে ঘিরে বৃহৎ একটি নাট্যালোচনা-সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। এই আলোচনার অভ্যাস এত বিস্তৃত ও তার স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই এ নিয়েও আলোচনার অন্ত নেই। অভিনেতা অভিযোগ করেন, অভিনেত্রী অভিমান করেন, প্রযোজক শিরে কর হানেন—আলোচক নির্বিকার। তাঁর নির্দয় নিরপেক্ষ কর্তব্য তিনি সম্পাদন করে চলেন, কেউ দিনের পর দিন, কেউ সপ্তাহের পর সপ্তাহ। সব মিলিয়ে সাংস্কৃতিক মণ্ডলে মত্তোন্মাদনা সদা সজাগ।

থাক, কিন্তু তাই নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে বাগবিস্তার কেন? প্রশ্নটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমার অছিলা আছে। নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও যে ন'জন লেখক-সমালোচক আলোচ্য বইয়ের * আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তাঁরা প্রধানত নাটক ও নাট্যসমালোচনা সম্বন্ধে লিখলেও প্রসঙ্গত এমন অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যা ব্যাপকভাবে সমগ্র আলোচনা সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য। তাঁদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলিও কলাক্রিয়ার অন্যান্য শাখার সমালোচনার প্রতি বহুলাংশে প্রযোজ্য। তাঁদের মিল ও অমিলে মিলিয়ে আলোচকের ভূমিকার নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আভাস মেলে।

আলোচনার সূচনা করেছেন নাট্যকবি খৃস্টফার ফ্রাই। তিনি আলোচক নন, তিনি আলোচনার লক্ষ্য। কিন্তু আশ্রমমৃগ সেজে তিনি 'ন হন্তব্য, ন হন্তব্য' অনুরোধের অন্তরালে একবারও আশ্রয় ভিক্ষা করেননি। তিনি শুধু বলছেন, আলোচকরা যেমন ঐকামত নন, তেমনি অভ্রান্তমতও নন। তাঁদের কাছ থেকে নাট্যকারের প্রধান কাম্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা শুধু শেখাতে চাইবেন না, শিখতেও প্রস্তুত থাকবেন; যে তাঁরা তাঁদের বিচারপ্রবণতা প্রখর করবার জন্যে বিস্ময়বোধের পূর্ণ সংহার করবেন না; যে তাঁরা লেখকের বক্তব্য আপন বিশ্বাসের প্রভাবে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে এইটে বিচার করবেন যে, লেখক যা বলতে প্রয়াসী তা তিনি কিভাবে বলতে সমর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি আলোচকের সকাশে অনুরোধ যে তিনি সৃজনী সমালোচনা করবেন।

*

ধারাবাহিকভাবে এগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব। আমি বলব, আলোচক শিখতে প্রস্তুত, যে বিস্ময় ও বিচার কিয়দংশে পরস্পরবিরোধী এবং বাকিটুকুতে সমন্বয় আদৌ দুর্লভ নয়, যে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে বিচার না করে শুধু তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা মানে প্রতিমা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চালচিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, যে সৃজনী সমালোচনা দাবী করার অর্থ আলোচকের আলোচ্যাধীন সত্তার স্বাগত স্বীকৃতি। অর্থাৎ আলোচক স্বয়ং স্রষ্টা ও শিল্পী। অর্থাৎ তাজমহল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বেঁচে রইবে, তেমনি ওই কবিতাটি বিলুপ্ত হলেও তার সার্থক কোনো ভাষ্য আপন মহিমায় বিরাজ থাকতে পারবে। উপমা মল্লিনাথস্য।

কিন্ত এ উক্তি রঞ্জনস্য। যে আটজন নাট্য-সমালোচকের কাছে ফ্রাই তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছিলেন, তাঁদের অন্তত সাতজন প্রত্যাশিত প্রিয় ভাষণে কর্তব্য সমাধা করেছেন। 'অবজার্ভার' পত্রিকার আইভর ব্রাউন অননুবাদ্য পরিহাসে বলেছেন, "I am asked for my Approach to Dramatic Criticism. It is, I must confess, through the Stalls Entrance."

পরিহাসান্তে বলেছেন যে, নাট্যালোচকের নাট্যোৎসাহী হওয়া চাই এবং সমালোচনা সৌজন্যশূন্য হওয়া উচিত নয়। প্রবীণ ডার্লিংটন ('ডেলি টেলিগ্রাফ') বলছেন, সমালোচনা যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্ত নয়, সে শুধু ভালো-লাগা না-লাগার [illegible] প্রকাশ। 'ন্যুজ ক্রনিকল' পত্রিকার [illegible] ডেণ্ট ইংরেজি নাট্যালোচনার [illegible] আলোচনা করে বলেছেন (আমি [illegible] কর্নালির পরিভাষায় বলছি) ঃ লে হাণ্ট [illegible] জেমস্ এগেট পর্যন্ত যে 'ম্যা[illegible] আলোচনার প্রচলন ছিল, তার [illegible] হয়েছে এবং শুরু হয়েছে 'ভান[illegible] লেখা। এতে আক্ষেপের কিছু নেই [illegible] আলোচকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ ক[illegible] সারবান সুভাষী, নিঃসার সুভাষ[illegible] নিঃসার কুভাষী। হ্যারল্ড হবসন [illegible] টাইমস') সমালোচককে ঐতিহাসিক [illegible] বলেছেন, তাঁর কাজ ভবিষ্যতের [illegible] জন্যে বর্তমানের নাট্যাভিজ্ঞতার স্থায়[illegible] দান করা। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' [illegible] ফিলিপ হোপ-ওয়ালেস ফ্রাইর [illegible] উত্তরে সবিনয়ে বলেছেন, "We wil[illegible] Mr. Fry." ষষ্ঠ সমালোচক [illegible] কোয়ন ('পাঞ্চ') বলছেন সমালোচনা [illegible] নয়। ব্রাউনের সহকারী ট্রিউইনও [illegible] ইত্যাদি গুণের প্রয়োজনীয়তা [illegible] করেছেন।

খৃস্টফার ফ্রাইর উদ্ধৃত অনুনয়ের [illegible] প্রতিবাদ করেছেন 'নিউ স্টেটসম্যান [illegible] নেশন' কাগজের কাথবার্ট ওয়র্সলে। [illegible] যবনিকা তাঁর কাছে লৌহ য[illegible] সমালোচক আর শিল্পীর বা পরি[illegible] সম্বন্ধ তাঁর মতে বন্ধুত্বমুক্ত [illegible] বাঞ্ছনীয়' দুয়ে সহযোগিতা অনাব[illegible] অনভিপ্রেত। নাট্যকার বা অভিনেতা [illegible] বলবে, 'আমাকে ভালোবাসো, [illegible] বুঝতে চেষ্টা করো।' কর্তব্[illegible] নির্মমতার সঙ্গে আলোচককে বলতে [illegible] 'তোমার কাজ ভালোবাসানো, তোমা[illegible] নিজেকে বোঝানো। কান্না মিছে।' এ[illegible] সমালোচকের দায়িত্ব তার পাঠকের [illegible] অভিনেতকুল শিশুর মতো প্রশংসা [illegible] কিন্ত সমালোচকের কাজ প্রশ্রয় [illegible] অস্বীকার করা। বইটির পরিশিষ্টে [illegible] ওয়র্সলে ইস্কুল মাস্টার ছিলেন। [illegible] হইনি।

উপাদেয় ও পাণ্ডিত্যের আলোচনা [illegible] আছে রনাল্ড প্রায়ার্লের উপভোগ্য [illegible] সর্বশেষ পৃষ্ঠায় আলোচকের মস্তিষ্[illegible] কী গুণের উপস্থিতি প্রয়োজন, তার [illegible] নক্সা আছে। এ অঞ্চলের সমালোচকদে[illegible] না দেখাই ভালো। সবাই একসঙ্গে [illegible] করলে সম্পাদকরা কাগজ ভর্তি করবে [illegible] দিয়ে?

---

* *An Experience of Critics*, Edited by Kaye Webb (Perpetua Ltd., London, 7s. 6d.)

সহজে যে সমস্ত জিনিস বওয়া
থবা চট্ পট্ করে খ্লে ফেলা যায়
া যুদ্ধক্ষেত্রের পক্ষে বেশ কার্যকরী।
ন মত যেমন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে
ফলে একটা শহর গড়ে ফেলতে হয়
দরকারে সে-সব দু' এক ঘণ্টার মধ্যে

চক্রদত্ত

আহত সৈনিক নতুন ধরণের স্ট্রেচারে শ্রুয়ে আছে

নিয়ে রওনাও দিতে হয়। একটা
নর সঙ্গে সব কিছ্রর ব্যবস্থা, যেমন
াওয়া, গ্রলি-বার্দ, হাসপাতাল
রাখতে হয়। বিশেষ করে এই
ালের বন্দোবস্ত খ্রব ভাল হওয়া
এইজন্য সব সময় অভিজ্ঞ
। চেণ্টা করেন যে, কি করে উন্নত
যন্ত্রপাতি, ওষ্রধ ইত্যাদি আবিষ্কার
য়। কোরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের হাস-
র এক ডাক্তার আহত সৈন্যদের
জন্য এক নত্রন ধরণের স্ট্রেচার তৈরী
।। এই স্ট্রেচারটার এক সঙ্গে
্লো স্রবিধা পাওয়া যায়। প্রথমত,
ঙ্গ আহত সৈনিকের শরীরে রক্ত
যন্ত্রটি এমনভাবে লাগান হয়েছে যে,
ক প্রয়োজন মত শরীরের ভেতরে
করতে পারে। এ ছাড়া স্ট্রেচারের
এমনভাবে একটা পাতলা লোহার
াগান যায় যে, যদি এই ফ্রেমটির
কটা কম্বল ঢেকে দেওয়া যায় তাহলে
র আহত স্থানটির ওপর কোনরকম
থবা ভার পড়ে অস্রবিধার স্ৃষ্টি
না। অথচ কম্বলটি চাপা দেওয়ার
সৈনিক ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা
পাবে। সমস্ত স্ট্রেচার এবং তার সঙ্গের অংশগ্রলো খ্রব সহজেই ভাঁজ করে নিয়ে যাওয়া যায়।

*

মান্রষ একদিন চন্দ্রে বেড়াতে যেতে পারবে একথা বল্লে এখন আর মান্রষকে চন্দ্রগ্রস্ত (lunatic) মনে হয় না, কিন্তু শ্রুক্রগ্রহে বেড়িয়ে আসার কথাটা আজও আমাদের অবাক্ করে। জ্যোতির্বিদগণ ধারণা করছেন যে, স্র্যের কাছাকাছি এই শ্রুক্রগ্রহে খ্রব সম্ভব জীবের অস্তিত্ব আছে। এরা বোধহয় এ জগতের জীবের চেয়ে অনেক বেশী জংলীধরণের। শ্রুক্র-গ্রহটির চারিদিক একটি ঘন সাদা কুয়াসার মত আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। স্র্যের আলো এর ওপর প্রতিফলিত হওয়ার জন্য এটাকে সব সময় বেশ উজ্জ্বল সাদা আলোর মত দেখায়। স্পেক্টোস্কোপ নামে এক রকম যন্ত্র আছে সেটা দিয়ে আলো কিংবা প্রতি-ফলিত আলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় কী কী পদার্থে আচ্ছাদনটি তৈরী। এই আচ্ছাদনে কার্বনডাইঅক্সাড পাওয়া গেছে, কিন্তু অক্সিজেন অথবা জলীয় বাষ্পের কোনও অস্তিত্বই পাওয়া যাচ্ছে না। একথাও নিশ্চিত যে, অক্সিজেন অথবা জলীয় বাষ্প ব্যতিরেকে কোনও প্রাণীই ঐ স্থানে থাকতে পারে না। এই কারণেই ধারণা ছিল যে, এই গ্রহটি মর্রভূমির মতই জায়গা। জনৈক ব্রটিশ জ্যোতির্বিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প ঐ আচ্ছাদনটির ওপরের দিকে না থাকলেও নিম্নস্তরে থাকতে পারে। তিনি তাঁর যুক্তির প্রমাণস্বর্প বলেছেন যে, প্থিবীর জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেন মাত্র প্থিবীর সাত মাইল স্তরের ওপরেই আছে এবং এই কারণে অন্য কোনও গ্রহের লোকও যদি প্থিবীর ওপরের আবহাওয়া স্পেক্টোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে, তাহলে তাদের কাছেও প্থিবীটাকে শ্রুক্রের মতই একটি মর্রভূমি প্রায় মনে হবে।

*

যন্ত্রের সামনে বসে বোতাম টিপেই লম্বা লম্বা গ্রণ ভাগ করা আজকের দিনে নতুন কথা নয়, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে অন্রবাদকের কাজও যে হতে পারে এটাই আশ্চর্যের বিষয়। এও আজকাল সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক যে কোনও রকম লেখা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় পরি-বর্তিত করার জন্য যন্ত্রের মধ্যে ভরে দিলেই প্রয়োজন মত বোতাম টিপে দিলেই আর এক ভাষায় অন্রবাদিত হয়ে বার হয়ে আসে। যে তিনজন বৈজ্ঞানিক মিলে এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন তাঁদের মতে এটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রচলিত হলে খ্রব ব্যয়সাধ্য হবে না।

*

ম্যালেরিয়ার ওষ্রধ কুইনাইন একথা শিশ্রকেও বলে দিতে হয় না। আজকাল প্যাল্রড্রিন, মেপাক্রিন ইত্যাদি আরও অনেক ওষ্রধেরই প্রচলন হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের সময় 'প্রাইমাকুইন' নামে যে ওষ্রধটি বার হয়েছে সেটিই সব চেয়ে ভালো। কুইনাইন ইত্যাদি জাতীয় ওষ্রধে সাময়িকভাবে উপকার হলেও এগ্রলি ঠিক মত রোগ সারাতে পারে না। ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট যখন দেহের কোষের মধ্যে এবং রক্তের মধ্যে ল্রকিয়ে থাকে, তখন কোনও ওষ্রধই এদের অনিষ্ট করতে পারে না। নতুন ওষ্রধ প্রাইমাকুইন এই ল্রকানো অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়ার প্যারা-সাইটগ্রলি ধ্বংস করতে পারে ফলে লোকে আর বারে বারে ম্যালেরিয়ায় ভোগে না।

শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর জন্মস্থান

শ্রীআশুতোষ মিত্র

(নূতন পথে গমন)

ঠাকুরের স্ত্রীভক্ত যোগীন মা'র আত্মীয় শশীবাবুর সৌজন্যে লেখক প্রভৃতি শ্রীমাকে লইয়া বিষ্ণুপুর এবং কোতলপুর হইয়া গমন করে। এই শশীবাবু প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌সপেক্টর পূর্ণ লাহিড়ির অফিসার ছিলেন। বাগবাজারের নেবুবাগানের নিজবাটীর বৃক্ষতলে বসিয়া কার্য করিতেন। অপর ফুটপাথে একটি কনস্টেবল দাঁড়াইয়া থাকিত এবং তাঁহার ইশারা অনুযায়ী কাজ করিত। একদিন দ্বিপ্রহরে লেখক বৃন্দাবন পাল লেন দিয়া আসিতে আসিতে একজন অর্ধ-স্থূলকায়া নারীকে বিপরীত দিকে যাইতে দেখিতে পায়। তিনি যাইতে যাইতে ইশারায় তাঁর সহিত কথা কহিতে নিষেধ করেন। পিছনে সেই কনস্টেবলটিকে আসিতে দেখিয়া লেখক বুঝিয়া লয় উনিই শশীবাবু—পরনে একখানি দিশী কালাপেড়ে শাড়ী, পদদ্বয়ে মল, কোমরে গোট, হাতে বলয় ও তাগা, গলায় হার। ঠিক স্ত্রীলোকের মত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া চলিতেছেন। লেখকের ঐ কনস্টেবলকে চেনায় কোন বাধা হইল না। বিষ্ণুপুর ও কোতলপুরের থানার দারোগাদ্বয়কে শশীবাবু দুইখানি চিঠি দিয়াছিলেন। তাহা লইয়া সে রাত্রির গাড়ীতে হাওড়ায় আসিয়া বিষ্ণুপুর যাইয়া পেঁাছেন ভোরবেলা। মাতৃসন্তানদ্বয় কৃষ্ণলাল ও গণেন্দ্র তাঁহাকে সকালের গাড়ীতে লইয়া গিয়া দ্বিপ্রহরে বেলা আন্দাজ ১টায় বিষ্ণুপুরে পেঁাছেন। স্টেশনে দুইখানি গরুর-গাড়ী শ্রীমা'কে ও কন্যাসহ ছোট মামীকে গাড়ীতে তোলা হয়। গাড়ী দুইখানি অনতিদূরে একটি হোটেলের এক কক্ষের সামনে গিয়ে থামে। সেখানে বিষ্ণুপুর থানার ব্রাহ্মণ কনস্টেবল দ্বারা রাঁধা ভাত শুক্তা হইতে অম্বল পর্যন্ত প্রস্তুত দেখিয়া শ্রীমা লেখকের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হন এবং নিজ-ঠাকুরপূজা করিতে বসিয়া যান। পূজান্তে কৃষ্ণলাল ও গণেন্দ্রকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আগে খাওয়াইয়া দেন এবং পরে সকলে ভোজন করেন। উক্ত দুইখানি গরুর গাড়ী পরে কোতলপুর অভিমুখে রওনা হয়। পূর্বেই উটের গাড়ীতে একজন কনস্টেবলকে শশীবাবুর চিঠি সহ কোতলপুর পাঠান হয়। পরদিন সকালে কোতলপুরে পেঁাছিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ কনস্টেবল দ্বারা রন্ধন করাইয়া উক্ত গরুর গাড়ীতে দেশড়া অভিমুখে রওনা হওয়া যায়। দেশড়ায় গিয়া গরুরগাড়ী দুইখানি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দেশড়াতে আমোদর নামক একটি ক্ষুদ্র নদী মাতৃদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী এবং দেশড়ার মধ্যস্থলে। আমরা দেশড়া হইতে গরুরগাড়ী দিয়া, পদব্রজে চলিতে থাকি। ন[illegible] আসিয়া লেখক সিধা পার হইতে [illegible] আপত্তি করিয়া শ্রীমা ছোট [illegible] দেখাইয়া বলেন—ও সব জানে। ওর মত চলো—এ আঘাটা। ছোট মামী দূর গিয়া একস্থান দেখাইয়া দিলে [illegible] ছোটমামীর মেয়েকে তাঁহার কোলে [illegible] এক হাতে শ্রীমা'র ঠাকুরের বাক্স এব[illegible] হাতে তাঁহাকে ধরিয়া পার হইয়া [illegible] থাকেন। ইত্যবসরে একটি ক্ষীণ[illegible] দৃষ্টে মা 'কে যাচ্ছো গা' বলিয়া [illegible] সে একটি স্ত্রীলোক। সে শ্রীমা'র নাম[illegible]

তুমি। কোথায় আসিয়াছ এ যে শিওড় জয়রামবাটীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম। মা বলিলেন 'তুমি আমাদের পৌঁছে মা'। সে কহিল হ্যাঁ দিচ্ছি। শ্রীমা কে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—তুমি লে হয়ে মেয়ে মানুষের কথায় চললে তাইতেই ত ভুল হল। যাহা হউক দর্শিকার সাহায্যে সকলে নিশ্চিন্তে পৌঁছান গেল।
দেবী এতদূর ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন সিবামাত্র এক ঘটী জল খাইলেন এবং কে বকিয়াছিলেন বলিয়া চিবুক আদর করিলেন। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্রীমাতৃদেবীর জন্মভূমিতে

ার ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীর বিবাহে চরণ সামাধ্যায়ী এবং লেখক বিবাহ- সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে বরযাত্রীদের তর্ক করিবার জন্য শ্রীমাতৃদেবীর দ্বারা আদিষ্ট হয়। সেই রাত্রিতে তাঁহারা উভয়ে ঠাকুরের ভক্ত ভামী-পিসির নিকটস্থ গৃহে বিশ্রাম করে। যথাসময়ে ভামী-পিসি আসিয়া তাঁহাদের ডাকিয়া লয়। এই মোক্ষদা-চরণের বিষয়ে এখানে কিছু বলা উচিত। উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে কাশীতে সাম-বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি উদ্বোধনের এবং সর্বসমক্ষে সামাধ্যায়ী নামে আহূত হন। আসরে বরযাত্রীদিগকে তখনকার রীতি অনুসারে ইংরাজী ও সংস্কৃতে তর্ক করিতে বলিলে দেখা যায় কেহ ইংরাজী জানেন না এবং সংস্কৃতে কিছু বিবাহ বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে অনুনয় করেন। অতএব মোক্ষদা-চরণ বিবাহ সম্বন্ধে সংস্কৃতে কিছু বলেন ও তাহারা শ্রবণ করেন। বিবাহের দুই তিনদিন পরেই তাহারা বর্ধমান হইয়া ফিরিবার সময় শ্রীমা পথে তাহাদের ভক্ষণের জন্য মুড়ি দেন এবং গ্রামে কিয়দ্দূর পর্যন্ত তাহাদিগকে আগাইয়া দেন। প্রণামান্তে তাহারা তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া রওনা হয়। আমোদর এবং দারকেশ্বর নদী পার হইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওচালং নামক চটিতে একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সেই মুড়িগুলি ভক্ষণ করে। আর তিলেক বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত পথ হাঁটিতে থাকেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে দামোদর নদী পার হইয়া মোক্ষদাচরণের এক আত্মীয়ের গৃহে উপস্থিত হয়। তিনি রাজ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বাসায় উভয়ে আহারাদি করিয়া পুনরায় মঠাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময় রওনা হইয়া প্রভাতে মঠে ফিরিয়া আসেন। মঠবাসিগণ তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হন।

চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীনরেন মল্লিক

বলরাম ও কৃষ্ণ

সাধারণত একক প্রদর্শনী দেখে মোটামুটি ভাবে একজন শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় রঙের ব্যবহার, আঙ্গিকের প্রয়োগ, কম্পোজিশন, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি থেকে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়; কিন্তু শিল্পী নরেন মল্লিকের একক প্রদর্শনী (১নং চৌরঙ্গী টিরেস, ৮ই জানুয়ারী—১৫ই জানুয়ারী) দেখে শিল্পীর সর্বাঙ্গীণ পরিচয় যেন মেলে না। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছেচল্লিশটি রচনায় ক্রমশ কোথাও কোথাও বিষয়বস্তু মনোনয়নে সামান্য পার্থক্য এলেও আঙ্গিকের ব্যবহারে শিল্পী মুখ্যত সেই পুরাতন ধারার অনুসরণ করেই এসেছেন। কোন কোন ছবিতে যে পার্থক্যটুকু দেখা দিয়েছে তাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৩৭—১৯৩৮ সালের রচনাগুলোয় অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ প্রথার এবং তাঁর অংকন পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে এবং এই রচনাগুলোর যে দরদ, রঙে ও রেখায় যে মাধুর্য পাওয়া যায় ক্রমশ শিল্পীর অলক্ষ্যে সে সুর হারিয়ে গেছে। ক্বচিৎ সেই সুরের আমেজ ক্ষীণভাবে ধরা দিয়েছে অধুনা অঙ্কিত দু'একটি রচনায়। প্রসঙ্গত মাছধরা (২২), মধ্যস্থ (২০) প্রভৃতি চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা ছাড়া ড্রইং-এও ক্রমশ এসে গেছে দুর্বলতা এবং গতানুগতিকতা। তাই অতীতের পরিচ্ছন্ন রচনার পাশেই যখন একান্ত দুর্বল এবং নাটকীয় রচনার পরিচয় পাই তখন নিরাশ হতে হয়। একাধিক ছবিতে 'ফিনিশিং'-এর তারতম্যে মূল সুর কেটেছে বহু জায়গায় [নির্বাসিতা রাজকন্যা (২), চৈতন্যের জন্ম (৬), সাজাহান (১)]

ভারতীয় চিত্রকলা অবনীন্দ্রনাথের হাতে যখন নবজন্ম লাভ করল মুখ্যত সেই সময়ের ধারাকে অনুসরণ করে অঙ্কিত হলেও স্বপ্নপুরী (৩), হারেম (৪), বিশ্রামরতা (৫) প্রভৃতি চিত্র রঙে কম্পোজিশনে ও আলঙ্কারিক পরিবেশ সৃষ্টিতে মুগ্ধ করে। শিল্পী এক্ষেত্রে ক'এক জায়গায় যে স্বাধীনতা

স্বপনপুরী

হারেমে

গ্রহণ করেছেন তাতে ছবির মূল সু যায়নি। অথচ চিরাচরিত প্রথায় ও বলে মনে হবে। সুগা নৃত্য (১ একটি আকর্ষণীয় রচনা। পশ্চিমে (৯) ওয়াশ এবং ক্রেয়নে অঙ্কিত। ব্যবহারে খানিকটা পার্থক্য থাকার ভাল লাগে। পট অনুসরণে অঙ্কি রতা (১১), বাঁশী ও লাঙ্গল (দুটিও মন্দ নয়। আধুনিক (?) মত আঁকা Decadence (৪০), Rehal (৪২) Sunflower (৪৬), Bengal প্রভৃতি রচনাগুলো সেদিক দিয়ে নাটকীয় ও দুর্বল মনে হয়েছে। ছবিটির মধ্যে রূপকের সাহায্যে হয়তো একটা মতবাদ প্রচার করতে কিন্তু রূপক যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে চিত্র আবেদন গৌণ হতে সেই দোষই এই ছবিটির মধ্যে পরি এসে গেছে।

নিকট ভবিষ্যত শিল্পী মল্লিকের এইসব দোষ ত্রুটিমুক্ত হয়ে আমাদে আনন্দ দিতে পারবে এই আশাই ব

...নেক সহযোগী উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন—এবার কংগ্রেসের ...ন হইবে ইতিহাসখ্যাত অজন্তার ... আমাদের জনৈক সহযাত্রী ...ত হইয়া মন্তব্য করিলেন—"তুমি ...ল ছবি, শুধু পটে লিখা!"

*   *   *

... কেহ লালদীঘির লালমহল হইতে ...সম্প্রতি কী রকম একটা শব্দ নির্গত ...শুনিয়াছেন এবং ইহাকে তাঁহারা ... করিয়াছেন "কলগুঞ্জন" বলিয়া। ... বলিল—"তাঁরা ভুল করেছেন, ওটা ...য়, লালমহলের পৌষ-পার্বণে পিঠে- ...ছোঁক ছোঁক মাত্র। দিব্য কর্ণ ...পিঠে বণ্টনের পরের ম্যাও-ম্যাওটাও ...ন থেকেই শুনতে পাবেন!

*   *

...ন্ত্র নেহরু জনসাধারণকে জাতির ...হান ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ...হণের পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের ...যাত্রী ফোর্ডের উক্তি স্মরণ করাইয়া ...বলিলেন—"ইতিহাস তো একটা ...মাত্র!!"

*   *   *

...রিয়াতে রাশিয়ার সমস্ত বীমা ...বসা পরিচালনার ভার গ্রহণ ...ন চীন।—"অনেকে বলছেন, ...ট বোমার না হয়ে বীমার হলেই ...বেঁচে যাই"—বলে শ্যামলাল।

*   *   *

...প-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ মন্তব্য ...করিয়াছেন যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ ...ট যেমনই হউক না কেন, তার ...নীতি সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কিছু ...—"অর্থাৎ ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন ...ক না কেন, বাইরে কোঁচার পত্তন ... আমরা আসর জমিয়ে রাখতে ...মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

*   *   *

...ক সংবাদে প্রকাশ, নানলনগরে কংগ্রেস ...কর্মীদের একটি হাসপাতালে ... ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—"পর্যাপ্ত ...লনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, তা জানা গেলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারতাম"—বলে শ্যামলাল।

ট্রামে-বাসে

*   *   *

অন্য এক সংবাদে জানা গেল চীন নাকি রাশিয়াতে প্রচুর ডিম রপ্তানি করিতেছে।—"আমরাই শুধু রাশ্যা থেকে
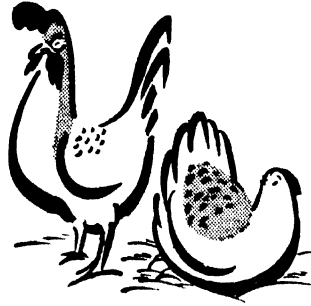
মনুমেণ্টপ্রমাণ অশ্ব-ডিম্ব আমদানী করছি"—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

*   *   *

জনৈক গণৎকার নাকি বলিয়াছেন যে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা চিত্র-তারকাদের প্রতি গত বৎসর হইতেই সুপ্রসন্ন।—"কিন্তু টলিউডের সংবাদে প্রকাশ যে, প্রযোজকের বর্তমান অবস্থান দশমে বলে অদূরভবিষ্যতে উল্কাপাতের সম্ভাবনাই বেশি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

*   *   *

জাপানের একটি রঙ্গালয়ে কমেডি দেখিতে গিয়া জনৈকা মহিলা নাকি হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন,—তবু ভালো; আমাদের হাসির ছবি দেখতে গেলেও মহিলাটিকে হয়ত মরতেই হতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি মরতেন কাঁদতে কাঁদতে"!!

*   *   *

পুলিসকে ছদ্মবেশ গ্রহণের কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য জনৈক চিত্র-পরিচালককে নিযুক্ত করা হইয়াছে—"কিন্তু

কাজটা ভাল হয় নি; অতঃপর লালবাজার ছেড়ে অনেকে যদি টলিউডে গিয়ে ভীড় করেন, তাহলে আমরা বিস্মিত হব না"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

রম্যরচনা

নিমন্ত্রণ—লেখক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। মূল্য ২৷০।

আধুনিককালে বাঙলা সাহিত্যের যে দু-একটা বিভাগে সত্যিকারের নতুন শক্তি সঞ্চয় হয়েছে, তার অধিকাংশই বোধ হয় রম্য-রচনাতে। প্রকৃত ক্ষমতাশালী কয়েকজন লেখকের আন্তরিক প্রয়াসে সাহিত্যের এই শাখাটিতে আজ এমন একটি মান প্রায় স্থিরীকৃত হয়ে আসছে, যার কাছাকাছি না এসে কোনো লেখক এক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তাঁকে কঠোর তুলনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু বিমলাপ্রসাদের ভীত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বস্তুতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের এই বিভাগটির তিনি একজন পথিকৃৎ!

বেশ কিছুকাল আগেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রথম সংগ্রহ 'ব্যক্তিগত' নিয়ে এক্ষেত্রে আসর জমিয়েছিলেন। 'নিমন্ত্রণ' তাঁর অর্জিত খ্যাতির প্রসরণ। 'আমার স্ত্রী', 'চলতি বাজার', 'অছিলা', 'খোসামোদ' ইত্যাদি প্রবন্ধের নামেই বোঝা যায় যে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে প্রথম পুস্তকের ধারা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। এর প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয় প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত জীবন থেকে নেয়া এবং তাদের উপর লিখিত মন্তব্যগুলিও আদৌ নৈর্ব্যক্তিক নয়। বিমলাপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ বইটির সর্বত্র ছড়ানো। তাঁর শিক্ষার, রুচির, স্টাইলের স্পষ্ট সাক্ষ্য আছে 'নিমন্ত্রণে'র প্রতিটি ছত্রে এবং তা আছে বলেই তাঁর সবকটি মতের সঙ্গে পাঠক সমাজের সবাই যদি সম্পূর্ণ একমত না হন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। আর কেউ যদি তাঁর রুচি বা স্টাইল নিয়ে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাও উপেক্ষা করবার মতো যথেষ্ট যুক্তি লেখকের পক্ষে থাকবে। পাঠকেরও।

সার্থক রম্য-রচনাকারদের একটু শিথিলভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ঃ যাঁরা খুব অল্প বাক্য ব্যয় করে অনেক কথা জানান। বিশদ বর্ণনা সযত্নে পরিহার করে যাঁরা বক্তব্য নিবেদন করেন স্বল্প আভাসে ও স্বল্পতর ইঙ্গিতে। তাঁদের অনুভূতি যেমন সূক্ষ্ম, প্রকাশ তেমনি সূক্ষ্ম। তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ, অনুরাগী স্বল্পসংখ্যক। অপর শ্রেণীর ব্যক্তিগত প্রবন্ধকার অনেক কথা বলেও বিরক্তিকর হন না। তাঁদের বক্তব্য উদার সাধারণের কাছে সহজেই আদরণীয়। দৈনন্দিন জীবনের স্থূল অনুভূতি-গুলিই তাঁদের লেখার উপজীব্য। বিমলাপ্রসাদ প্রথম দলে অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টাই করেননি; দ্বিতীয় শ্রেণীটিতে তাঁর আসন প্রথম সারিতে। 'শাড়ী', 'রোগ', 'দাঁত', ইত্যাদি দীর্ঘ প্রবন্ধ-গুলোর ভঙ্গী কথ্য এবং সরসতা সাবলীল। তাই এদের আকর্ষণও দুর্নিবার। বিমলাপ্রসাদ গম্ভীর বিষয় নিয়ে গম্ভীর গবেষণা করেননি। গম্ভীরকে লঘুও করেননি জল মিশিয়ে। লঘুই তাঁর লক্ষ্য। প্রতিদিনকার জীবনের যে সমস্ত আপাততুচ্ছ বিষয়ের উপর আমাদের শান্তি এবং স্বস্তি সত্যি সত্যি নির্ভর করে সেগুলিই তাঁর আলোচ্য। এ আলোচনা তিনি নীচেরতলা থেকে ঈর্ষাভরে করেননি। উপরতলা থেকে অবজ্ঞাভরে করেননি। তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ একটি উষ্ণ করমর্দন, পাঠকে-লেখকে সাক্ষাৎ দর্শন। বইটি শেষ করে বলতে হয়, আবার কবে দেখা হচ্ছে? ২৩০।৫২

কবিতা

ইন্দুমতী (রঘুবংশ)ঃ কবিশেখর কালিদাস রায়, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। তিন টাকা।

রঘুবংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম সর্গের অজ-ইন্দুমতীর উপাখ্যান নিয়ে রচিত কাব্যগ্রন্থ ইন্দুমতী। অজ-ইন্দুমতী উপা রঘুবংশের একটি অংশ হলেও একটি সম্পূর্ণ কাব্যোপাখ্যানের মর্যাদা পেয়েছে। ছ সহজ সাবলীলতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ গতিময় সুরের রেশ সৃষ্টি করেছে। অনু বাধানিষেধ কোথাও গতিভঙ্গ করতে পা মূলত অনুবাদ হলেও ইন্দুমতী কাব্যগ্রন্থ স সার্থকতাসমুজ্জ্বল। ৩৫৭।

গল্প

ভানুমতির খেল ঃ প্রদ্যোৎ গুহ ঃ চতুষ্কো ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট দুই টাকা।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সাম্প্রদায়িক বিষ বাঙলা। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত আর তারও নী

...র মানুষ সবাই এক ধ্বংসের মুখোমুখি। ... আশা, ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা। মানুষে বিশ্বাস ... জীবনে আশ্বাস নেই। তবু এই অন্ধকারেও ...মী মনের বিদ্যুৎস্ফুরণ। প্রায় সবকটি ...রই এই একটি সুর। স্বচ্ছন্দ ভাষায় ...রিক প্রকাশ। কিন্তু অধিকাংশ গল্পই যেন ...ধর্মী। খানিক ছবি, খানিক আভাস। ... কি তিনটি গল্প কেবল সুসম্পূর্ণ। কথাটা ...সোসের সঙ্গেই বলতে হলো।

৩৭৬।৫২

...গীত

...শী ও অশ্রু : সত্যানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ...ড়ি। আড়াই টাকা।

...ন্থখানি মূলত রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তি-রসের গীতিনৈবেদ্য। বাঙলা, **হিন্দী** এবং সংস্কৃতে রচিত সবকটি গানেরই মূল সুর এক তারে বাঁধা। ভক্তিরসও আবার নতি, আকাঙ্ক্ষা, যাত্রী, আভাস, মিলন ইত্যাদি স্তরে ভাগ করে গানগুলিকে সেই অনুযায়ী সাজান হয়েছে। বাঙলা অংশে অনেকগুলি গানের ভাব এবং ভাষা গীতাঞ্জলির কথা মনে করিয়ে দেয়। **ভক্তজন** বাঁশীও অশ্রুতে হয়তো সান্ত্বনা পাবেন।

৪০৫।৫২

আলোঝলমল : অনিল ভট্টাচার্য : প্রকাশক—শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য, ১৪-এ, মোহনলাল স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দুই টাকা।

অনিল ভট্টাচার্যের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রোত্তর **বাঙলা সঙ্গীতের ক্ষীণধারাকে নিঃসন্দেহে** ক্ষীণতর করেছে। **তাঁর লেখা অনেক** ভালো গান এর আগে সুর সংযোগে গীত হতে শুনেছি। এখন তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহ 'আলোঝলমল' পড়ে তাঁর অভাবের কথাটা গভীরভাবে নতুন করে অনুভূত হলো। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে কেবল সঙ্গীতের কাব্যাংশ সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কারণ সুরপ্রাণ সঙ্গীতের সুরটুকু এখানে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কিন্তু তবু রচনার মিল এবং ছন্দের মধ্যেই সুরের যে প্রচ্ছন্ন প্রবাহ আছে সেইটুকুই মনকে মুগ্ধ করে। ঝঙ্কার তোলে। কাব্যরসিক মাত্রেই গানগুলির কাব্যরসটুকু আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হবেন, কিন্তু যাঁরা সঙ্গীতের উপাসক তাঁরা তো পুরোপুরি খুশি হবেন না। তাঁরা সুরের একটি কাঠামো দেখতে চাইবেন, যাতে করে রচয়িতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও সুরলোকে বিহারের সুযোগ পান এবং তা করতে হলে স্বরলিপি প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য। সঙ্গীতের প্রচারের পক্ষে স্বরলিপি অপরিহার্য। ভবিষ্যতে প্রকাশক যদি এদিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গীতে যে সরল এবং আন্তরিক কাব্যমাধুর্য আছে, সমসাময়িক অনেক সঙ্গীত রচয়িতার মধ্যেই যার একান্ত অভাব, সুরের সিঁড়ি বেয়ে তা অতি সহজেই সাধারণের অন্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

ছাপা এবং প্রচ্ছদে যে সুশোভন রুচিমার্জনার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

৩৯৮।৫২

বাঁশরী—শ্রীশ্রীমৎ অসীমানন্দ সরস্বতী প্রণীত। সৎগ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১এম, হাজরা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১, টাকা।

সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সঙ্গীত। সাধক প্রধানত ষটচক্রভেদের যৌগিক প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভগবৎ প্রেমের উপলব্ধিকে সঙ্গীতের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতগুলি পাঠে আধ্যাত্মরসপিপাসু ব্যক্তিগণ আনন্দলাভ করিবেন।

৩৯৯।৫২

উপন্যাস

সংক্রান্তি : মিহির আচার্য। বুকমার্ক, ৩২এ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

কেমন ক'রে জানি না কতকগুলো আধুনিক লেখকের ধারণাই হ'য়ে গেছে যে বাস্তববাদ মানেই বস্তিবাদ। সেই কারণেই সময়ে অসময়ে নায়কনায়িকাদের শুধু তাঁরা টেনে বস্তিতেই নামান না, তাদের মুখ দিয়ে বস্তির ভাষাও বলাবার চেষ্টা করেন। হয়তো এর উদ্দেশ্য তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের অধঃপতনের প্রতি ইঙ্গিত করা, কিংবা হয়তো অবস্থার চাপে মানুষ নকল পারিপার্শ্বিকতা ভুলে, নির্মোক ঘুচিয়ে নগ্ন রূপটাই প্রকাশিত করে ফেলে, সেটার দিকেই কটাক্ষ করা।

আলোচ্য উপন্যাসটি এমনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নিচে নামার কাহিনী। বর্তমান **দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শশিনাথের পরিবারের তিলে তিলে আত্মক্ষয়ের ইতিকথা।**

ঘটনা প্রবাহ করুণা উদ্রেকের সম্পূর্ণ উপযোগী, কিন্তু দুঃখের বিষয় রচনাপদ্ধতি শিল্পানুগ নয়। অভাবের তাড়নায় দেহ-বিক্রয়, পুঁজিবাদী মালিকের মজুর-নিপীড়ন, উদ্বাস্তু সমস্যা সবই রয়েছে, কিন্তু সুতো ছেঁড়া হারের মতন শুধু ছড়িয়েই রয়েছে ইতস্ততঃ, নিপুণ হাতে কোথাও একত্র গ্রথিত হবার অবকাশ পায় নি।

লেখকের ভাষা স্থানে স্থানে ভালোই, কিন্তু বিষয়বস্তুকে সরিয়ে রেখে রাজনৈতিক বুকনী পাঠকদের রসাভাবই ঘটায়। ২৬৭।৫২

নাটক

অগ্নিশিখা — শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ। দুই টাকা।

নাটকের অফুরন্ত মালমশলা আছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাতায় পতায়। বিশেষত, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তীব্র গতিশীল অধ্যায়ে। অথচ দুঃখের কথা নাটকদুর্বল বাঙলা দেশেও নাট্যকাররা সেদিকে তেমন চোখ ফেরালেন না। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী তাঁর নাটক অগ্নিশিখায় সেই প্রচেষ্টা করেছেন। যে ঘটনা সাম্প্রতিককালে ঘটেছে, যার পাত্র-পাত্রী আমাদের অনেকেরই চেনা এবং যাঁদের অনেকে এখনও বেঁচে আছেন এবং সর্বোপরি যে আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের মন এখনও ভাবোদ্বেল তাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়া, বলাই বাহুল্য, অতি কঠিন কাজ। এবং যেহেতু এদের নিয়ে নাটক লেখা হচ্ছে নাটকের প্রয়োজনে তাই ঘটনার বিন্যাসেও স্বাধীনতা নিতে হবে। এইসব কারণে আলোচ্য নাটকখানিকে স্বার্থকতার নয়, প্রচেষ্টার মাপকাঠিতে বিচার করা বাঞ্ছনীয়। কার্যত নাট্যকার প্রচেষ্টার সিঁড়ি ভেঙে সার্থকতার চত্বরে পৌঁছতে পারেন নি। যে নাটকীয় ঘটনাবলীর পটভূমিকায় তিনি নাটক দাঁড় করিয়েছেন নির্বাচনের অনৈপুণ্যে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি। ফলে অনেকগুলো দৃশ্য কেবল যেন খাপছাড়া মনে হয়। এ ত্রুটির জন্য অবশ্য বেশী দায়ী দৃশ্যসংস্থাপন। সংলাপ মোটামুটি ভাল। দু-এক জায়গায় আর একটু যত্নবান হলে অধিকতর ফললাভ হতো। তাঁর প্রচেষ্টা এবং আংশিক সাফল্যের জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ। ৩৯২।৫২

জীবনী

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। শ্রীমুরলীধর পালিত, সম্পাদক। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র কর্তৃক ইমামবাজার, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২, টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব-প্রভাবে দক্ষিণেশ্বর পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বামী জগদীশ্বরানন্দ আলোচ্য গ্রন্থে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত এবং সেখানে ঠাকুরের সাধনা এবং সিদ্ধজীবনের দিব্যলীলার অপূর্ব আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন। ১।৫৩

ছবি

ছবি আঁকাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশুসাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ছোটদের ছবি আঁকতে শেখান কাজটি নিতান্তই কঠিন। ছোটদের অপরিণত কল্পনাশক্তির ওপর দৃশ্য জগতের প্রভাব এবং ছবির মাধ্যমে তার যথাযথ প্রতিফলন খুব সহজ সম্ভব নয়। প্রথমত রং ও রেখার যাদুলোকে সুকুমার মনকে আকৃষ্ট করা দ্বিতীয়ত সাবলীল রেখায় এবং রঙে সেই দৃশ্যানুভূতিকে প্রকাশ করা। এই দুটোর অন্তত দ্বিতীয়টি মোটেই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু ছবি-আঁকা বইটিতে এ সত্যটি অস্বীকৃত। সেই মামুলি কায়দায় আম-আনারস-আপেল-নাসপাতি আঁকতে শেখান। শিশুমনের কল্পনাকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করতে পারে এমন তুলির টান খুব কমই চোখে পড়ল। অনেকের ভীড়ে আরও এক। কী যে এর সার্থকতা শিল্পীই জানে। ৩৮৯।৫২

বিবিধ

গল্পে সৌরজগৎ—শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১, টাকা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দেওয়ার মত ভাল বইয়ের অভাব আজও আমাদের দেশে রয়েই গেছে। গল্পে সৌরজগৎ সেই অভাব খানিকটা পূরণ করেছে। বইখানি পড়ে ছোটরা শুধু আনন্দই পাবে না, জ্ঞান লাভের সুযোগও এতে আছে যথেষ্ট। সরস ভাষায় কাহিনীর মাধ্যমে অজানাকে জানবার এমন একটি আগ্রহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার ফলে শিশুমনের কৌতূহল আগাগোড়া সমানভাবেই বজায় রাখা হয়েছে। শিশুদের

...সত্যকারের দরদ না থাকলে এমন ...নি বই লেখা সম্ভব নয়। বইখানি যে ...ভেতর ছোটদের মনে সাড়া জাগাতে

পেরেছে—২য় সংস্করণই তার প্রমাণ। ছাপা বাঁধাই ভাল। ১৭।৫৩

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

আমাদের ছেলেমেয়ে—শ্রীকমলা গোস্বামী; নরনারী পাবলিশিং কনসার্ন, ২৬।১, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ টাকা। (১৪।৫৩)

লাফাইবার প্রকৃত পদ্ধতি—পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, সনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; মেসার্স পি গাঙ্গুলী এ্যান্ড সন্স, উত্তরপাড়া, হুগলী। মূল্য—১৷৵০ আনা। (১৫।৫৩)

রাগবিচিত্রা—অরুণকুমার দত্ত, নারায়ণচন্দ্র তালুকদার কর্তৃক ১১৬।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২, টাকা। (১৬।৫৩)

নরসুন্দর সমিতি—অমল দাশগুপ্ত; র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৷৵০ আনা। (১৮।৫৩)

ফুলকি ও ফুল—পার্থকুমার রায়; র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৷৵০ আনা। (১৯।৫৩)

সৃষ্টিতত্ত্ব—অনাদিনাথ সেন; আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৷০ আনা। (২০।৫৩)

জীবনসঙ্গিনী—মতিলাল রায়; প্রবর্তক পাব্লিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫, টাকা। (২১।৫৩)

ভারতমাতা—তারানাথ রায়; প্রবর্তক পাব্লিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১, টাকা। (২২।৫৩)

নূতন বৎসরের দেওয়ালপঞ্জী

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে ১৯৫৩ সনের দেওয়ালপঞ্জী পাইয়াছি,—

মেসার্স কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা), ৫৫, ক্যানিং স্ট্রীট—১ খানা দেওয়াল পঞ্জী ও ১ দোয়াত কালি; সলোমন এন্ড কোং, ২৯, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা—১; বেঙ্গল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, ২০।৩, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯; ধীরেন ধর, ৪২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২; আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮০।১৫, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬; নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা; কমলালয় স্টোরস লিঃ, ১৫৬এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩।

অরণ্য জীবনের গান

রমাপদ চৌধুরী

সিনেমার পর্দায় হঠাৎ হয়তো ডুমডুম ডুমডুম করে মাদল বেজে উঠলো, করুণকণ্ঠি বাঁশের বাঁশী হয়তো বাতাস কাঁপিয়ে সুরের ঝর্ণায় মন মুগ্ধ করে গেল দু'চার মুহূর্তের জন্যে, তারপরই নয়নারাম কয়েকটি স্বাস্থ্যবতী নৃত্যনটী সাঁওতালী বেশভূষার ব্যর্থ অনুকরণে প্রসাধিত হয়ে হয়তো বা পায়ের ছন্দ ও দেহের ভঙ্গিমা দেখানো অবাস্তব একটা আবেশ সৃষ্টি করে গেল, আর আমাদের শহরসভ্য চোখ এবং মন স্বীকার করে নিলো, সাঁওতালী গানের মত গান হয় না, নাচ তাদের অপূর্ব!

শুধু কি তাই? বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, এমন কি অনেক কাব্যগ্রন্থেও সাঁওতালী গীতিকা অনুসরণে লেখা বা ওঁরাও গানের অনুবাদ বা গোন্দ কবিতার ছায়া ইত্যাদি পড়ে অরণ্যজীবনের স্বাদ নিতে চাই আমরা। যাঁরা এই সব কবিতা অনুবাদ (?) করেন, তাঁদের সততায় সন্দেহ করার কোন কারণই খুঁজে পাই না আমরা, কারণ আদিবাসী জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত কম।

কথাশিল্পের ক্ষেত্রে শুধু একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে অন্যভাষী চরিত্রের মুখে বিকৃত বাংলা সংলাপ জুড়ে দেওয়ার সার্থকতা অবশ্যই আছে, যদিও তা উচিত কি না ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনুবাদ বা অনুসরণের নামে কেউ কেউ আদিবাসী গানকে শুধু বিকৃতই করেন নি, বহু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী কল্পনার আশ্রয় নিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন।

বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন অরণ্যবাসীদের কাছ থেকে অসংখ্য গান সংগ্রহ করার পর আমার সন্দেহ হয়েছে যে, বাংলাভাষায় প্রচলিত বা প্রকাশিত অনুবাদগুলির অধিকাংশই আদিবাসী গান নয়। আমার সংগ্রহ যে আরণ্যক সঙ্গীতের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ তা স্বীকার করি। কিন্তু সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা ভূমিপ হো বিড়হড় প্রভৃতি গোষ্ঠীর গানে যে বিশেষত্ব দেখতে পাই, অনুবাদগুলিতে তা পাই না কেন?

যখন আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, তখন আমার কাছে তাদের প্রতিটি গানই করুণ সুরের গান বলে মনে হ'ত। পরে দেখেছি, অনেক গানের অর্থেই বেশ একটা খুশির মেজাজ আছে। অর্থাৎ আমাদের সুরের সঙ্গে অর্থের যে যোগাযোগ আদিবাসী সঙ্গীত তা থেকে পৃথক নিশ্চয়ই। শান্ত নিস্তব্ধ রাত্রিতে হঠাৎ কোন পল্লীতে সারি-গান শুরু করলো হয়তো মেয়েরা, আর আমার মনে হয়েছে একদল মেয়ে করুণ কান্নার সুর টেনে চলেছে। অর্থ জানার পর দেখেছি বহু সারিগানে, যে গান সমবেত ভাবে বাপ মা ভাইবোনের সামনে গায় তারা, তার মধ্যে প্রেম অত্যন্ত স্পষ্ট; অথচ কোন কোন জুড়িগানে প্রেম একেবারেই নেপথ্যে। উপমা ব্যবহার বা তুলনামূলক পদ ব্যবহার আদিবাসীদের গানে সংখ্যায় খুবই কম, যদিও বর্তমান প্রবন্ধে আমি আদিবাসী গানের কল্পনাশক্তি ও উপমাজ্ঞানের পরিচয়ই দিতে চাই।

আদিবাসীদের বেশির ভাগ গানই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বার বার একই পদের পুনরাবৃত্তি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কাটিয়ে দেয় শীত-রাতের অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে, নাচের ছন্দে, তুমদা ঢোলকের উন্মাদনায়।

কয়েকটি গানের তর্জমা দেওয়ার আগে স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি কবি বা গীতিকার নই। তা ছাড়া খেরোয়াড়ী ভাষার যে কোন শাখাই বাংলার তুলনায় টেলিগ্রাফিক ভাষা, সুতরাং ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে।

একটি সাঁওতালী গান ঃ

দূর পাহাড়ের গুহার মুখে
সিংহ দাঁড়ালো,
সোনার কেশর সিংহ বুঝি
নিদ্রা হারালো।

তা নয় রে, সূর্য বোঙা
কিরণ কেশর জ্বালে,
ঘুম-ভাঙা চোখে কট্‌মটিয়ে
ক্রোধের আগুন ঢালে।

এ সূর্য কেন যে তুই
উঠলি এমন ভোরে,
আমার প্রিয়া ঘুমিয়ে আছে
আমার অন্তরে।

স্কেচ্ শ্রীনন্দলাল ব

ও যুবতী জঙ্ঘা তোমার
ধনুর মতই বাঁকা,
তুম্‌দা ঢোলক তোমার বুকে
চোখে আকাশ আঁকা।

রোদ-ঝল্‌মল্‌ সিংহ নামে
পাহাড় থেকে গ্রামে,
বুড়ামবুড়ির ঘুম ভাঙালো
সিমসাণ্ডির গানে।

ও যুবতী ঘুমোস কেন
এখনো এই ভোরে,
মন কেড়েছিস কোন লুবুড়ির
গোপন মন্তরে।

দূর পাহাড়ের গুহার মুখে
সিংহ দাঁড়ালো,
সোনার কেশর সিংহ বুঝি
নিদ্রা হারালো।

ভোরের সূর্য সহস্রকিরণে উজ্জ্বল
পাহাড়ের অন্তরাল থেকে আকাশে উ
না সোনার কেশর কোন সিংহ গুহার ব
মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছে? অগ্নি

ঝি বা ছিনিয়ে নিতে এসেছে দখিনের ঘুমিয়ে থাকা প্রিয়াকে। প্রিয়া? ধনুর টোল বক্রী জঙ্ঘা তার, চোখে আকাশ বুকের সৌন্দর্য শহুরে কবির তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু অরণ্য-প্রেমিক উপভোগ করতে চায় প্রিয়ার ণ্ডর মৃদুমন্থর ধ্বনি, তুমদা ঢোলকের বাঁধা মৃদু আওয়াজ। সূর্য উঠলো, হে নামলো পাহাড় থেকে গ্রামে? ন্ডি' অর্থাৎ মোরগের ডাক গান তে পারে, কিন্তু জয়াংদের বুড়াম-ঘুম ভাঙলো কেন সাঁওতালী য়? কোন ডাইনী লুবুড়ির কাছে গোপন মন্ত্রে প্রিয়ের মন কেড়ে নিয়ে আছে যুবতী প্রিয়া, ঘুম ভাঙছে ।

সার্থক কল্পনার পাশেই একটি না মুণ্ডা গান তুলে দিচ্ছি ঃ

যমুনা গাড়া জপা
বুরু গিতিল কদম সুবা
তিরিরিরি রুতু সারিতানা
মাদ সাকাম চোরোরোরো
সোবেন হাইকো নিরতানা
কারাকোম দো দুআর-রে
দুবকানা লান্দাতানা-এ।

বাঁশীর সুর তিরিরিরি
যমুনা নদীর তীরে
বাজে কদম তলায়
বালি-পাহাড়ের শিরে।

বাঁশপাতি আর চ্যাং মাগুর
আনন্দে করে ছুটোছুটি
দুয়ারে বসে দেখে তাদের
কাঁকড়া হেসে কুটিকুটি।

গানের বৈশিষ্ট্য শুধু সারল্যই নয়, গানের প্রভাবটুকুও লক্ষ্যণীয়।
টি ওঁরাও গান ঃ

তোমার বুকে সাহস দেখে
আমার মুখে রঙ্ সরে না আর।
তুমি যেওনা যেওনা যেওনা যেওনা
আমি ভয় পাবো একা থাকতে।

তোমার হাতের ধনুর বাঁক
আমার গলায় হাঁসুলিবাঁকা হার,
তুমি যেওনা যেওনা যেওনা যেওনা
আমি ভয় পাবো একা থাকতে।

এত সরল ভাষায় বাংলার গ্রাম্য-প্রিয়াও বোধ হয় বিদায়ক্ষণে নিষেধের আকুল অনুরোধ জানায় না।

একটি মুণ্ডা গান ঃ

পটি পার হয়ে মারাং গাড়ায় সে জল দেখবে। জলে উঁকি দিলে তার খোঁপায় গোঁজা সেংগেল বাহা (আগুন ফুল) লাল বাহার নিয়ে হাসবে। গিতি-ওরা (ঘুমঘর) থেকে লুকিয়ে এসে রাতের ছায়ায় তার চোখে জল ভাসবে। সে জলে উঁকি দিলে আমার চোখ দেখতে পাবো, যে চোখ তাকে ভালবাসবে।

একটি সাঁওতালী গান ঃ

গাড়া পার হয়ে মাঠ ধার হয়ে
যেতে যেতে দেখি কত লাল ফুল,
পাহাড় ডিঙিয়ে বনানী ছাড়িয়ে
দেখিনাকো আর কত কত লাল ফুল।

বন্ধু! চোখের আড়ালে হও যদি মন-কুল
তবু কালো চুলে জ্বলবে জ্বলবে একটি
আগুন ফুল।

একটি ওঁরাও গান ঃ

আমার পায়ে নাচ
তোমার মুখে গান
আমার বুক তোমার বুক
দুজনে এক প্রাণ।

কিন্তু হে বন্ধু, 'লজ্জাশরম' নামের মেয়েটা যে বড় শয়তানী করে, এসে বাধা দেয়, আমার চোখে এ'কে দেয় কপট অনিচ্ছার ভান।

কিন্তু এতগুলি গানের উল্লেখ করার পরও বলবো বিভিন্ন আদিবাসী গানের মধ্যে যতই উপমার বৈশিষ্ট্য, কল্পনার সামর্থ্য থাক না কেন, সাঁওতালী গানের মত এত সরল হয়েও এমন নিটোল রস পরিবেশন ওঁরাও বা মুণ্ডাদের গানে পাই নি।

এ গানে কোন বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু যে কোন বৈষ্ণব গানে প্রতীক্ষারতা রাধার মনে যে আশা-আশঙ্কার অনুভূতি প্রকাশ পায়, তার চেয়ে কম আবেগ নেই এই সাঁওতালী গানটিতে ঃ

মাটি গুমগুম্
পায়ের ধ্বনি আসছে,
তিরিরিরিরি
তিরগির সুর ভাসছে
ওলো সই বল্
এখনো কি সে আমাকেই ভালবাসছে!

এ প্রবন্ধে আদিবাসীদের কেবলমাত্র প্রেমের গানগুলিরই কিছু পরিচয় দিলাম। কিন্তু, তাদের গান বলতেই প্রেমের গান বোঝায় না। দেবদেবীর প্রতি প্রার্থনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের গানেও তাদের বিশেষত্ব ফুটে ওঠে। এই সূত্রে আদিবাসী অঞ্চলের পাঠকপাঠিকাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাঁদের প্রচেষ্টা যেন আদিবাসী সংস্কৃতির নির্ভুল ছবি ফুটিয়ে তুলে সাধারণ পাঠকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও তাঁদের সহায়তা পেলে উপকৃত হবেন।

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল ভ্রমণের সূচনায় পর পর দুইটা খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করায় অনেকেই দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ৪৬ বৎসরের অপরাজিত শক্তিশালী ত্রিনিদাদ দলের বিরুদ্ধে ভারত যেরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে তাহাতে উৎসাহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে এখনও উল্লসিত হইবার মত অবস্থা হয় নাই। সকলেই টেস্ট খেলার ফলাফলের জন্যই উদগ্রীব হইয়া আছে। ঐ খেলা কি হইবে কেহই বলিতে পারে না। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ ইংলণ্ড ভ্রমণের টেস্ট খেলার ন্যায় দৃঢ় মনোবৃত্তির অভাবের পরিচয় যদি না দেন তাহা হইলে নৈরাশ্যজনক ফলাফল আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ থাকিবে না। জয়ী না হইলেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবে না।

ভারতীয় প্রথম টেস্ট দল

ভারতীয় প্রথম টেস্ট দল যে সকল খেলোয়াড়কে লইয়া গঠন করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আর অধিক শক্তিশালী দল করা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। পি রায় দল হইতে বাদ পড়ায় অনেকেই আশ্চর্য হইবেন সত্য; কিন্তু তাঁহার দলে স্থান পাইবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরাই দেখি না। সারা ইংলণ্ড ভ্রমণ, এমন কি পাকিস্থানের বিরুদ্ধেও তিনি কোন খেলাতেই অভাবনীয় কিছু করিতে পারেন নাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের দুই খেলাতেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৫ রান করিয়া নট আউট ছিলেন বলিয়া যদি বলা হয় তাঁহার দল ভুক্তি উচিত ছিল তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। ঐ সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই জন ধুরন্ধর বোলার রামাধীন ও গোমেজ বোলিং করেন নাই। উঁহারা বল করিলে ফল কি হইত বলা খুবই কঠিন। সি গাদকারীকে দলে গ্রহণ করা হইয়াছে এই জন্যই যে তিনি একজন চৌকস খেলোয়াড়। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সকল বিষয়েই সমশক্তি সম্পন্ন। এমন কি ফিল্ডিংয়ে তাঁহার সমতুল্য ভারতীয় দলে এখনও কেহ নাই। এম এন আপ্তে ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলিতে পারিবেন তাহার যথেষ্ট যোগ্যতার প্রমাণ তিনি ত্রিনিদাদের খেলায় দিয়াছেন। ডি কে গাইকোয়াড়কে দলে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা কেবল ওপনিং ব্যাটসম্যানের অভাব পূরণের আশায়। যদি তিনি ভাল করেন। মাকা উইকেট রক্ষকতায় যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় পি জি যোশী দলের উইকেট রক্ষককে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। যেরূপভাবে দল গঠন করা হইয়াছে তাহাতে ফলাফল ভালই হইবে আশা করা চলে। তবে এই কথা সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে, "খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকে।" নিম্নে ভারতীয় প্রথম টেস্ট দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইলঃ

খেলার মাঠে

(১) বিজয় হাজারে (অধিনায়ক)
(২) বিনু মানকড় (সহঅধিনায়ক)
(৩) দাতু ফাদকার
(৪) পলি উমরিগার
(৫) জি এস রামচাঁদ
(৬) এম এন আপ্তে
(৭) এস পি গুপ্তে
(৮) পি জি যোশী
(৯) সি গাদকারী
(১০) দীপক সোধন
(১১) ডি কে গাইকোয়াড়
দ্বাদশ—পি রায়।

ভারত বনাম ত্রিনিদাদের খেলা

ভারত বনাম ত্রিনিদাদ দলের পাঁচ দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলার সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই প্রায় বারিপাতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পরিলক্ষিত হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট দলের অধিনায়ক বা ত্রিনিদাদ দলের অধিনায়ক স্টলমেয়ার টসে জয়ী হইয়াও ভারতীয় দলকে প্রথম ব্যাট করিতে দেন। তাঁহার ঐ সময় আশা ছিল সিক্ত মাঠে ভারতীয় দলকে অল্প রানে ইনিংস শেষ করিতে বাধ্য করিয়া পরে সহজেই বিজয়ীর সম্মানলাভ করিবেন। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে এই প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করেন। তিনি অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করিয়া শেষ পর্যন্ত ১৫৩ রানে নট আউট থাকেন। মন্থরগতিতে রান তোলার প্রথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দর্শকগণ বিরক্ত হইয়া বহু সময়েই বিদ্রূপ ধ্বনি করিয়াছেন। বিজয় হাজারে অচল অটল। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দলকে শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ইহার পর যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ত্রিনিদাদ দলের খেলার পালা আরম্ভ হইল তখন প্রাকৃতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। বিজয় হাজারে ইহার সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিলেন না। তবে ত্রিনিদাদ দলকে প্রথম ইনিংসে ভারতের সমতুল্য রান হইতে বঞ্চিত করিলেন। পঞ্চম দিনের চা-পানের সময় ত্রিনিদাদ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হইল। পরে ত্রিনিদাদ দলের অধিনায়কও খেলার গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় কৃতী বোলারদের বিশ্রামের সুযোগ দান করিয়া অপর সকলকে বল করিতে দিলেন। যাহার ফলেই ভারত শেষের ৯০ মিনিটে কোন উইকেট না হারাইয়া ৮১ রান করিলেন।

হাজারের খেলার প্রশংসা

বিজয় হাজারের অপূর্ব দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রত্যেক ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়াসমালোচক প্রশংসা করিয়াছেন। ফলেই ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট টিকিট সংগ্রহের ভীষণ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। পরিচালকগণ রেকর্ড অর্থলাভের আশা করিতেছেন। ইহাতে ভ দলেরও আর্থিক সুবিধা হইবে। একজন ও ক্ষতি হইবে বলিয়া দলের দায়িত্ব গ্রহণ তিনি মনে মনে দুঃখিত হইবেন এই যা

হাজারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস

এই দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্য ওয়েস্ট ই অনেকেই বিজয় হাজারেকে বিশ্বের খেলোয়াড়দ্বয় এম হ্যাসেট ও এল

দমদম বিমানঘাটিতে অস্ট্রিয়ান পেশাদার ফুটবল দল

বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এমনকি
রেই নাকি গত বৎসর যখন বিজয়
ক উহাদের সমতুল্য বলিয়া উল্লেখ করেন
অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। কিন্তু
। স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এস গুপ্তের প্রশংসনীয় বোলিং

গুপ্ত ভ্রমণের প্রথম খেলায় যেরূপ
াভ করিয়াছিলেন ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে
। না করিলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট
গণকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছেন।
স্ট খেলায় অনুরূপ বোলিং করিলে
ইণ্ডিজের অধিক রান করা অসম্ভব
লিয়াও কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ
ছন। এস গুপ্তে অধিক সাফল্য লাভ
নাই, তাহার জন্য উইকেট রক্ষককেই
দায়ী করিয়াছেন। টেস্ট খেলায় গুপ্তে
প বোলিংয়ের পুনরাবৃত্তি করুন ইহাই
র আন্তরিক কামনা।

ফলাফল ঃ

ত প্রথম ইনিংস ঃ—৩২২ রান (বিজয়
। নট আউট ১৫৩ রান, এম আপ্তে ৪৫,
ার ২৬, ডি কাদকার ১৮, মঙ্কড় ১৫, এস
১৬, ডেনিং ৮২ রানে ৩টি, রামাধীন
নে ২টি, গোমেজ ২১ রানে ২টি, কানাই
নে ২টি উইকেট পান)।

নিদাদ প্রথম ইনিংস ঃ—২৮০ রান (আসরফ
৪৭, স্টলমেয়ার ৬৪, লীগ্যাল ৪১,
ব ৫৮, কানাই নট আউট ২৩, এস গুপ্তে
নে ৪টি, জি রামচাঁদ ৪৬ রানে ৩টি
র ৫০ রানে ১টি ও গাদকারী ৩২ রানে
ইকেট পান)।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—কেহ আউট না হইয়া ৮১ রান (পি রায় নট আউট ৪৫, এম আপ্তে নট আউট ৩১ রান)।

গোলাম আমেদকে প্রেরণের প্রচেষ্টা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী দলের ম্যানেজার মিঃ রামস্বামী গোলাম আমেদকে প্রেরণ করিবার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নিকট তার করিয়াছেন। যদি গোলাম আমেদ না যাইতে পারেন তাহা হইলে যেন ঘোরপদেকে পাঠান হয় বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। আরও জানা গেল যে, ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারেও ভারত ত্যাগের সময় খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি মিঃ হোমি কনট্রাক্টারকে গোলাম আমেদকে প্রেরণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি অনুরোধ পত্রে লিখিয়াছেন, "যদি গোলাম আমেদকে প্রেরণ না করা হয় তাহা হইলে মানকড় বা গুপ্তেকে এই শ্রমসাধ্য ভ্রমণে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হইবে না—যাহার ফল ভাল হইবে না।" বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণও এইরূপভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া গোলাম আমেদকে পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। গোলাম আমেদের কথাবার্তা হইতে যেরূপ ধারণা হইতেছে তাহাতে মনে হয়, তিনি যাইবেন। যদি না যান ঘোরপদেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রেরণ করা হইবে। অতিরিক্ত খেলোয়াড় প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছিলেন তাহা সঠিক নহে ইহা হইতেই প্রমাণিত হইল।

হোলকার দলের অপূর্ব সাফল্য

হোলকার দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মধ্যাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় উত্তর প্রদেশ দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ৩২৮ রানে পরাজিত করিয়াছেন। সি টি সারভাতে এই খেলায় ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। হোলকার দলকে রণজি প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিজয়ী দলের সহিত খেলিতে হইবে। খেলার ফলাফল ঃ

উত্তর প্রদেশ ১ম ইনিংস ঃ—৮৩ রান (বালসুন্দর ২৯, আলভা ২৯, ধানওয়াড়ে ২০ রানে ৩টি, সারভাতে ১৫ রানে ৪টি ও এইচ গাইকোয়াড় ১৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

হোলকার ১ম ইনিংস ঃ—৪৬৪ রান (নিভসরকার ১০০, সারভাতে ১৪৯, মুস্তাক আলী ৭২, বি বি নিম্বলকার ৫৭, বলবীর খান্না ৯৮ রানে ৩টি, শিবশঙ্কর ৮০ রানে ২টি, পুরী ৭৭ রানে ২টি, শিমরণ সিং ৯৫ রাণে ২টি উইকেট পান)।

উত্তর প্রদেশ ২য় ইনিংস—৫৩ রান (সারভাতে

৮ রানে ৪টি, এইচ গাইকোয়াড় ২২ রানে ৪টি, অর্জুন নাইডু ২৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

ফুটবল

অস্ট্রিয়ান পেশাদার লিনজ্ এ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবল দল কলিকাতার মাঠে শেষ দিনে উন্নতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সম্মিলিত দলকে শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে পরাজিত করায় অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা করি নাই। যে দেশে ১৪০০ ফুটবল ক্লাব ও ১৩০০০০ রেজিস্ট্রীকৃত ফুটবল খেলোয়াড় আছে, সেই দেশের একটি পেশাদার ফুটবল দল ভারতীয় দল অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে না তো কে করিবে? তাহা ছাড়া এই দেশে ফুটবল খেলার "রেওয়াজ" বহুকাল হইতেই আছে। বিশ্বগ্রাসী সমরানলের পূর্বে এই দেশের ফুটবল খেলোয়াড়গণ, সিণ্ডেলার, সিউলড্, শাল প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই সময়ে অস্ট্রিয়ান ফুটবল দলকে ইউরোপের "বিস্ময়কারী" বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু সেইরূপ খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড এই দেশে আর নাই ১৯৪৯ সাল হইতে পূর্ব খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা চলিয়াছে। ঐ বৎসর সারা অস্ট্রিয়ার দল হইতে বাছাই করিয়া দল গঠন করা হয়। ঐ বাছাই দল ইটালীকে ৫—১ গোলে, যুগোশ্লাভিয়াকে ৭—২ ও ৫—২ গোলে পরাজিত করে। ১৯৫০ সালে গ্লাসগো খেলিয়া স্কটল্যাণ্ড দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। ১৯৫১ সালে স্কটিশ দল ভিয়েনাতে খেলিতে আসিয়া ৪—০ গোলে পরাজিত হয়। ঐ বৎসর ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত খেলিয়া ২—২ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। কিন্তু ১৯৫২ সালে ইংলণ্ড ৩—২ গোলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। ইহার পরেই অস্ট্রিয়া ৬—০ গোলে আয়ারল্যাণ্ড দলকে পরাজিত করে। ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যে অপেশাদার দল অস্ট্রিয়া প্রেরণ করে, শেষ ৮টি দলের মধ্যে স্থান পায়। কিন্ বলিয়া ভারত লিনজ্ এ্যাথলেটিক ক্লাবে দলের সমতুল্য দল বলিয়া অভিহিত অন্যায় হইবে। ঐই দলে বিশ্ব অলি একজন খেলোয়াড় মাত্র আছেন। এমন কি জাতীয় দলে নিয়মিত খেলিয়া থাকেন কোন খেলোয়াড় নাই। এই অবস্থায় ঐ একটি সাধারণ দল ছাড়া ইহাদের কিছু চলে না। তাহার উপর অনভ্যস্থ খেলো অসময়ে একত্র করিয়া হঠাৎ দল গঠন হইয়াছে। সেই দলকে নিয়মিত খেলোয়া গঠিত, ঐতিহ্যপূর্ণ দেশের একটি দল কারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? খেলার যদি বলা হয় ইতোপূর্বে গোটেবর্গ, হেন সার্ভিসেস ফুটবল দল প্রভৃতি সকলেই ক্রীড়া পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ভারতীয় দলকে শোচনীয়ভাবে করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এইর হঠাৎ অসময়ে কোন দল গঠন করা হয়

সংবাদ

জানুয়ারী—চট্টগ্রামে প্রবল ক্ষমতাশালী
র অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অধিনায়কত্ব করিয়া
রাধীন ভারতে অসীম সাহসের পরিচয়
বসাদগ্রস্ত জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে
করিয়াছিলেন, সেই বিপ্লবী বীর সূর্য
মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অদ্য
ায় কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার মর্মরমূর্তি
হয়।

দিল্লী ক্যান্টনমেন্টে এক বিরাট ও মনোজ্ঞ
কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভারতীয় সৈন্য-
পক্ষ হইতে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের প্রথম
নাপতি জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পাকে
ম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ত অবস্থানকারী পাকিস্থানী এবং
নে অবস্থানকারী ভারতীয় নাগরিকদের
র্ট ও ভিসা সংগ্রহের এবং স্থানীয়
নাম রেজিস্ট্রী করার তারিখ ১৪ই
ী হইতে আরও তিন মাস বাড়াইয়া
হইয়াছে।

জানুয়ারী—কংগ্রেসের জেনারেল
টারীদ্বয় অদ্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির
ক রিপোর্ট দাখিল করেন। গত সাধারণ
জনসাধারণ কংগ্রেসকে সমর্থন করায়
উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে,
জেনারেল সেক্রেটারীদ্বয় তাহার উপর
য়াছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশ
গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া
ক জনগণের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা
হইবে।

ীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অদ্য নানলনগরে
প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে জন-
ক সর্বোদয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত
বেদন জানান।

মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য বোম্বাই হইতে প্রায়
ল দূরে অম্বরনাথে ভারতের সর্বাধুনিক
সিনটুল প্রটোটাইপ কারখানার উদ্বোধন
এই কারখানাটি ভারতের নূতন নূতন
ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব-
শ গ্রহণ করিবে।

জেলার ফুলিয়া শহরের উন্নয়নের জন্য
সরকার কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি দপ্তর
,৭৫,০০০ টাকা পাইয়াছেন।

জানুয়ারী—দক্ষিণাঞ্চলের সেনাবাহিনীর
ঃ জেঃ মহারাজ রাজেন্দ্রসিংজী আগামী-
কে এম কারিয়াপ্পার স্থলে ভারতের
নাপতি এবং সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ
ষ্ঠিত হইবেন। তাঁহাকে 'জেনারেলের'
ীত করা হইয়াছে।

বাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের
অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি
লাল নেহরু আজ দিল্লী হইতে বিমান-
বেগমপেট বিমানঘাটিতে পৌঁছিলে
বে সম্বর্ধিত হন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

আজ নানলনগরে শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস কার্য পরিচালনা কমিটির ছয় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে পররাষ্ট্র নীতি, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৫ই জানুয়ারী—নানলনগরে কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে পাঁচটি খসড়া প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমটিতে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করিতে অনুরোধ করা হয়; দ্বিতীয় প্রস্তাবে আচার্য বিনোবাভাবের ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে সক্রিয়-ভাবে সাহায্য করিবার আবেদন জানান হয়; তৃতীয় প্রস্তাবে খাঁ আবদুল গফফর খাঁর সুদীর্ঘ কারাবাসে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়; চতুর্থ প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় মালান সরকারের বর্ণবৈষম্য-মূলক নীতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করা হয় এবং পঞ্চম প্রস্তাবে শ্রীপাণ্ড-শ্রীরামুলুসহ ২৯ জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অদ্য কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী সমিতিতে প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "মধ্যপ্রাচ্য প্রতি-রক্ষা চুক্তি ও পাকিস্থানের ব্যাপার আমাদের পক্ষে গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

১৬ই জানুয়ারী—নানলনগরে কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা-সূচক প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী—হায়দরাবাদে নানলনগরে ভরতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ভাষণ দেন। অতঃপর কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক নবভারত সংগঠনে বিশ্বাস ও শুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া আরও সচেতনভাবে এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হইবার জন্য ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশে আহ্বান জানান।

অদ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে পাকিস্থানের কারাগারে বন্দী খান আবদুল গফফর খানের অসুস্থতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আচার্য বিনোবাভাবের ভূদান যজ্ঞ সমর্থন করিয়া এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮ই জানুয়ারী—হায়দরাবাদে নানলনগরে কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনেহরু উপসংহার বক্তৃতায় প্রতিনিধিগণকে নিজ নিজ এলাকায় জন-সাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে আহ্বান জানান। অদ্যকার অধিবেশনে পাঁচসালা পরিকল্পনা সমর্থিত হইয়াছে, যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব অবলম্বন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত দাবীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের দুই দিনব্যাপী অধিবেশনে মোট ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই জানুয়ারী—রুশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'তাসের' এক খবরে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালে সোভিয়েট নেতা আন্দ্রেই এ জাদনভকে হত্যা এবং রুশিয়ার সামরিক কর্তাদিগকে "নিশ্চিহ্ন" করার চেষ্টার অভিযোগে রুশিয়ার নয় জন ডাক্তার অভিযুক্ত হইয়াছেন।

জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন যে, বিগত গ্রীষ্মকালের পর এ পর্যন্ত ২০।৩০ খানি রুশ বিমান জাপানের উত্তর এলাকার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর রুশ বিমান জাপ এলাকা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ গুলী করা হইবে।

১৪ই জানুয়ারী অদ্য দেড় শত মার্কিন জঙ্গী বোমারু বিমান সিনানজুর নিকটবর্তী এক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়। য়ালু নদীর দক্ষিণতটে এক আকাশযুদ্ধে মার্কিন জঙ্গী বিমানের আক্রমণে ৮টি কম্যুনিস্ট বিমান ভূপাতিত হয়।

১৫ই জানুয়ারী—পশ্চিম জার্মানীতে পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য নাৎসীদের এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই নাৎসী ষড়যন্ত্রের ছয়জন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর গোয়েবলসের দপ্তরের ভূতপূর্ব প্রচার সচিব ডক্টর ভার্নার নাউম্যান আছেন।

১৬ই জানুয়ারী—বার্লিন বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, গত রাত্রিতে বার্লিনে পূর্ব জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর দার্তিঞ্জারকে তাঁহার সরকার গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

১৭ই জানুয়ারী—কায়রোতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জেনারেল নাগিব প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে ও ২৫ জন মিশরীয় অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জেনারেল নাগিব তিন বৎসরের জন্য মিশরের সকল রাজনীতিক দলের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা ঃ প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা ঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিংশ বর্ষ

(১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত)

২০শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

শনিবার
১৭ই মাঘ, ১৩৫৯ সাল

DESH Saturday, 31st January, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

সর্বোদয় দিবস

৩০শে জানুয়ারী মহামানব গান্ধীজীর তিরোভাব তিথি। যাঁহারা মহামানব তাঁহাদের তিরোভাব বলিতে তাঁহাদের মৃত্যু বুঝায় না। মৃত্যুর তাঁহারা অতীত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আদর্শের ভিতরেই তাঁহারা নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রত্যুত মৃত্যুর পথে তাঁহাদের জীবন সমধিক পরিব্যাপ্ত এবং সত্য হইয়া উঠে। সুতরাং ৩০শে জানুয়ারী আমরা মহাত্মাজীকে হারাই নাই, বরং তাঁহার প্রকট জীবনের চেয়েও তাঁহাকে আমাদের সকলের নিকট করিয়া পাইয়াছি। জীবনাদর্শের ভিতর দিয়া এই দিনসে গান্ধীজীর সর্বতোভাবে উদয় ঘটিয়াছে। তাঁহার আদর্শ সর্বোদয়েরই আদর্শ অর্থাৎ আমাদের সকলের জীবনকে সত্য করিয়া তোলাই গান্ধীজীর তপস্যার মূলে ছিল। ফলত তাঁহার আদর্শ আর তিনি একই। গান্ধীজীর আদর্শকে আমাদের জীবন-সাধনায় যদি আমরা সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোদয় অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটিবে এবং সেই পথেই গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের স্মৃতির উদ্দেশে জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হইতে পারে।

সত্য ও অহিংসা গান্ধীজীর মূল ব্রত ছিল। তিনি সাধক ছিলেন; অন্তর্জ্যোতির আধ্যাত্মিক সত্তাই তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিন্তু মানব-সমাজের বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিবার জন্যই তাঁহার দিব্য-জীবনের তপঃ-প্রভা বিকীর্ণ হইয়াছে এবং সেই মহদুদ্দেশ্যেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে অন্তরের দিকে গান্ধীজীর দৃষ্টি ছিল বলিয়া বহির্বিষয়ক জ্ঞানকে উপেক্ষা করেন নাই। গান্ধীজী বলিয়াছেন মানুষের সেবার ভিতর দিয়াই তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাহেন এবং মানুষই তাঁহার কাছে ভগবান্। মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে বহির্বিষয়ক জ্ঞানও যে প্রয়োজন, জড়-বিজ্ঞান সার্থকতাও যে সেক্ষেত্রে আছে, এই নিতান্ত সাধারণ সত্যটুকু আধুনিক জগতের সর্বোত্তম মহামানবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু শুধু বহির্বিষয়ক জ্ঞান এবং সেই পথে মানুষের দুঃখের প্রতিকার করিতে গেলে যে মহানর্থের উদ্ভব হয় প্রজ্ঞাবলে তিনি সে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বহির্বিষয়ক জ্ঞানকে অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। ফলতঃ তিনি এই লক্ষ্যের নির্দেশই শুধু করেন নাই, ব্যক্তি-সাধনায় এবং সমাজ-চেতনার আদর্শকে সার্থক করিবার পন্থারও সূত্ররূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং গান্ধীজীর আদর্শের মূলনীতিগুলি শুধু দার্শনিকতত্ত্ব-স্বরূপে গণ্য করিলেই চলিবে না। বস্তুত সেগুলি শুধু ধ্যান-ধারণারই বিষয় নয়। প্রত্যুত ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে সেগুলির বাস্তবরূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও রহিয়াছে এবং এই সত্য বিস্মৃত হইয়া যদি গান্ধীজীর সাধনার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই আমরা আমাদের কর্তব্য নিবদ্ধ রাখি, তবে তাহা পাণ্ডিত্য এবং মনীষার পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু জাতির জনক গান্ধীজীর প্রতি আমাদের যথোচিত কর্তব্য তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে অপরের উপর অভিভাবকত্ব করিবার যুগ শেষ হইয়াছে। অন্ততপক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাহাই হওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমাদিগকে নাবালকের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছে এবং আমাদের সেই নাবালক অবস্থার সুযোগে তাহার অভিভাবকত্বের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদিগকে শাসন করিয়াছে ও দেশে শোষণ চালাইয়াছে। পরকীয় অভিভাবকত্বের এমন প্রতিবেশ মানুষের আত্মাকে পিষ্ট করে এবং তাহাদিগকে পশুর একান্ত অসহায় জীবনের দিকে লইয়া যায়। অতীতের সেই মোহ হইতে আজ আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। দীর্ঘদিনের এ সংস্কার; সুতরাং এই শৃঙ্খল সূক্ষ্ম আকারে আমাদের জাতীয় জীবনকে নানাভাবে জড়িত এবং অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

ইহাকে ছিন্ন করা খুবই কঠিন। পরন্তু সেজন্য আদর্শনিষ্ঠ সংকল্পশীলতা ত্যাগ এবং তপস্যা প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রত আমাদের পক্ষে কঠিন হইলেও আমাদিগকে মানবাত্মার পক্ষে একান্ত গ্লানিকর সেই অতীত সংস্কারের মূল ছিন্ন করিতেই হইবে। দুর্গত এই জাতির প্রত্যেক নরনারীর সেবার ব্রতে আমাদিগকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা পতিত, লাঞ্ছিত এবং উপেক্ষিত তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে হইবে। অপরের উপদেষ্টা হইব, এমন অভিমান

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যের উপর সর্দারী করিবার স্পর্ধা আমাদিগকে বলি দিতে হইবে এবং প্রেমের পথ ধরিতে হইবে। যাহারা শোষিত হইতেছে, তাহাদিগকে সেই শোষণ এবং পীড়নের চক্র হইতে মুক্ত করাই বর্তমানে আমাদের একমাত্র সাধনা হওয়া দরকার। জাতির সর্বোদয় অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন উন্নতি আমাদের এই সাধনার সার্থকতার উপরই নির্ভর করিতেছে। সর্বোদয় দিবসে এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজ যখন আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছে তখন আর আমাদের কিছুই করিবার নাই, পরন্তু আমাদের চতুর্বর্গ সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, এমন একটা মোহ জাতিকে ইতিমধ্যেই অনেকখানি পাইয়া বসিয়াছে। এ বস্তু বড়ই মারাত্মক। ইহার ফলে সেবার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় এবং সংকীর্ণ স্বার্থ তৃপ্তি করিবার ইতরাসক্তিই মনের কোণে পাকিয়া উঠিতে থাকে। ফলে অলস-জীবনে আরাম ভোগ করিবার লালসাই বড় হইয়া দাঁড়ায়। এই গ্লানি উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইয়া যদি আমাদের ব্যক্তি এবং জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে, তবে আমাদের গণতান্ত্রিকতার কোন মূল্যই থাকিবে না। প্রত্যুত দেশ, বর্তমানে পরহিতব্রতে সংকল্পনিষ্ঠ, উদারচেতা ত্যাগী এবং সাধকেরাই একান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। যাঁহাদের এমন সাধনার শক্তি আছে এবং আদর্শ-পরায়ণ, এমন যাঁহারা চরিত্রবান্ জাতির ভবিষ্যৎ তাঁহারাই গঠন করিবেন। তাঁহারাই, যিনি এ জাতির ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিবেন এবং গান্ধীজীর জীবনাদর্শকে সার্থক করিয়া তুলিবার অধিকার তাঁহাদেরই আছে। সর্বোদয় দিবসে মানব-সেবানিষ্ঠ এমন বলিষ্ঠ সাধকদের আবির্ভাবই আমারা একান্ত-ভাবে কামনা করিতেছি। তাঁহারা সর্বোদয় সমাজের আদর্শ—জাতির অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুন। আমাদের দুর্গতির অবসান ঘটুক।

পরলোকে নলিনীরঞ্জন সরকার

গত ২৫শে জানুয়ারী সায়াহ্ন ৬-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইতেই নলিনীরঞ্জন পীড়িত ছিলেন। প্রধানতঃ এ জন্যই তাঁহাকে রাজনীতিক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। তথাপি তাঁহার লোকান্তর গমন দেশ-বাসীকে আকস্মিকভাবেই আঘাত করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে তাঁহার একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এই সময় নলিনীরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই এত সত্বরই যে তিনি আমাদের সকলকে ছাড়িয়া যাইবেন এমন ধারণাও করিতে পারেন নাই।

নলিনীরঞ্জনের জীবনের সঙ্গে বাঙলার রাজনীতিক সাধনার অভি-ব্যক্তির গতি এবং ভাগ্যচক্র-বিবর্তনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহ-কুমার অন্তর্গত সাজিউড়া গ্রামে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নলিনীরঞ্জনের জন্ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন; কিন্তু অর্থের অভাবে কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শীঘ্রই কলেজ ত্যাগ করিয়া অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার মূলে নলিনীরঞ্জনের অসামান্য
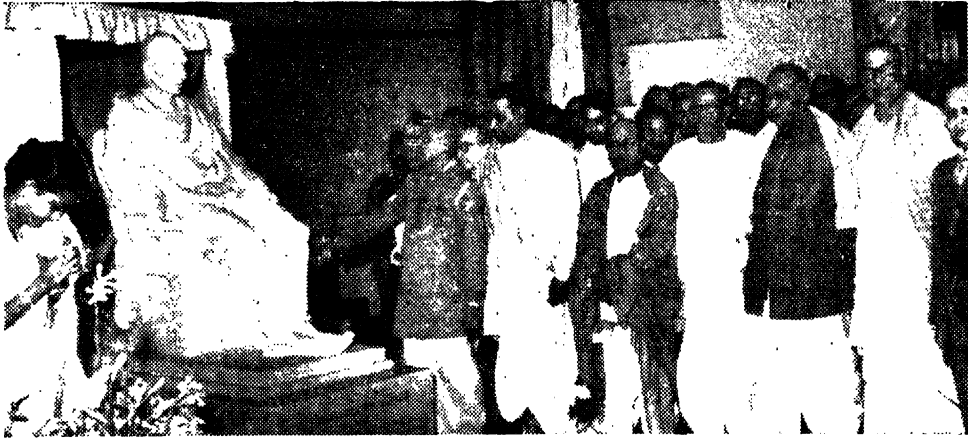
চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স ভবনে নলিনীরঞ্জন সরকারের মর্মরমূর্তি

প্রচেষ্টা এবং অক্লান্ত কর্ম-নৈপুণ্যই বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নলিনীরঞ্জনই পরবর্তী কালে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর প্রাণস্বরূপে পরিণত হইয়াছিলেন এবং এই কোম্পানীর উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নলিনীরঞ্জনের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিরও সূত্রপাত হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেরণা এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নলিনীরঞ্জন রাজনীতিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিক সাধনায় নলিনীরঞ্জন সব সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিচার এবং বিবেচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত ভুলও তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ ভুল রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা বিশিষ্ট নেতা, তাঁহাদের অনেকের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। মানুষ ভুল-ত্রুটির অতীত নয়। বাস্তবিক পক্ষে রাজনীতিতে অপরিবর্তনীয় সত্য বলিয়া কোন কিছু নাই; সুতরাং জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের উত্থান-পতন একরূপ অপরিহার্য ব্যাপার। কিন্তু এসব বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন, সে-পথ অবলম্বন করিতে গিয়া লোকপ্রিয়তাকেও তুচ্ছ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষ শক্তিশালী বিরোধী পক্ষেরও সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন। এ দেশে এইরূপ প্রবচন আছে। নলিনীরঞ্জন ছিলেন এই হিসাবে পুরুষ সিংহ। ফলতঃ নলিনীরঞ্জন ছিলেন কাজের লোক। সংকল্পশীল কর্মনিষ্ঠা এবং নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারাই তিনি বড় হইয়াছিলেন। কথার হেঁয়ালী রচনা করিয়া কাজ উদ্ধার করা কোনদিনই তিনি ভাল বলিয়া বুঝেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আগাগোড়া বস্তুতান্ত্রিক। এজন্য রাজনীতিক আদর্শের ভাবাবেগ এবং উদ্দীপনার চেয়ে অর্থনীতিজ্ঞস্বরূপে বিপুল যশ ঐশ্বর্য অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতের বাহিরেও তাঁহার যশ বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

সুদূর পূর্ববঙ্গের অজ্ঞাত এক পল্লীর দরিদ্র মধ্য পরিবারের একটি যুবক যেদিন নিজের ভাগ্য অন্বেষণ করিবার জন্য অসহায় অবস্থায় একদিন কলিকাতা শহরে আসিয়াছিল, পরবর্তী জীবনে সে যে প্রধানত ব্যক্তিগত কর্মসাধনার বলে ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি অর্জন করিবে কে, ইহা কল্পনা করিত? নলিনীরঞ্জন এমন অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন—এরূপ অধ্যবসায় এবং এই যে সাধনা, ইহা সামান্য নয়। বড় হইবার মত গুণ তাঁহার ছিল। আমরা আজ তাঁহার মহৎ গুণাবলীরই স্মরণ করিব। ফলতঃ অসাধারণ ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে বিনয়নম্র অমায়িকতা এবং নিরহংকারের ভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত। বিত্ত তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই।

নলিনীরঞ্জন বাঙালীকে স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়াছেন এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর অযোগ্যতার কলংক তিনি অপনোদন করিয়াছেন। কথা ছাড়িয়া কাজের ভিতর মন দিয়া জাতির দুর্গতি দূর করিতে হইবে, আমাদের রাজনীতিক জীবনে এই আদর্শকে তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। জাতির পক্ষে বর্তমানে এমন মানুষের একান্তই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। নলিনীরঞ্জনের মৃত্যুতে শুধু পশ্চিমবঙ্গই নহে, পরন্তু সমগ্র ভারত একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মীপুরুষ এবং স্বদেশপ্রেমিক হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এ অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গ এবং অনুরাগী সুহৃদবর্গের এই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

কবিতা

বিনুর স্বীকৃতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

আবার আমায় ফিরে যেতে হলো
প্রথম যৌবনে
পঁচিশ বছর পিছে ফেলে আসা
জীবনদর্শনে।
লীলাবাদী আমি তরুণ কুমার
চিরবসন্ত সম
জগতে আমার সব ঠাঁই ঘর
স্থিতি কোথাও না মম।
কেন তবে আমি দেশের সঙ্গে
নিজেরে জড়ায়ে বাঁধি
নিত্য বাঁধন কল্পনা করে
নিত্য অযথা কাঁদি!

২

উদাসীন নই দেশের প্রতি বা
যুগের প্রতি
সকলের সাথে আমারো গতি।
আর কারো নয় যে ভাবনা, কারো
নয় যে দায়
আমারি একার স্কন্ধে, হায়!
তাই নিয়ে আমি রইব আমার
বনভবনে
রইব আমার আপন মনে।
আর সকলের ভাগ্যে মিলুক
পুরস্কার
আমার ভাগ্যে তিরস্কার।
ব্রত যদি হয় সমাপন মহা
ভাগ্য মম
সুখী আর কেবা আমার সম!
দেশে দেশে আর যুগে যুগে হবে
তৃষ্ণা হরা
সৃষ্টি আমার অমিয় ঝরা।

৩

বিশ্বের যত কবিদের সাথে
তুলনায় বলো হবে কী
শতাব্দী পরে বিশ্ব থাকবে
কিছুই আমার রবে কী!
জানিনে, জানতে পারিনে
তবু একবার চেষ্টা না করে ছাড়িনে।
মোহ অঞ্জন মাখা দুই চোখে
দেখি লেখা মোর থাকবার
লিখি আর ভাবি থাকবেই, যদি
সংকেত জানি রাখবার।
জানিনে, জানতে পারিনে
সংকেত নেই, তবু আমি হাল ছাড়িনে।

বৈদেশিকী

কোন দিকে ?

২০এ জানুয়ারী জেনারেল আইজেন-হাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসি-ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ঐদিন তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে এমন কোনো কথা ছিল না যা থেকে মনে হতে পারে যে রিপাবলিকান শাসনাধীনে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির কোন মৌলিক পরি-বর্তন আসন্ন। তবে মার্কিন বৈদেশিক নীতির মূল ধারাগুলি অপরিবর্তিত থাকলেও হয়ত পূর্বের তুলনায় কোথাও একটু জোর বেশি, কোথাও বা একটু কম পড়বে যার ফলে একটা সুরের পার্থক্য নিশ্চয়ই অনুভূত হবে। পৃথিবীর অবস্থাও নিশ্চল হয়ে নেই, তার সঙ্গে আইজেনহাওয়ার স্পর্শের যোগাযোগে ধীরে ধীরে একটা নূতন পরিস্থিতি হয়ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। নির্বাচনে যদি ডেমোক্রাট পার্টির জয় হোত এবং তার ফলে আমেরিকায় ডেমোক্রাটিক পার্টির শাসন যদি অব্যাহত থাকত তাহলেও পৃথিবীর পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুসারে ডেমোক্রাটিক পার্টিকে চলতে হোত। ডেমোক্রাটিক পার্টির জায়গায় রিপাবলিকান পার্টির শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় হয়ত এখানে সেখানে দৃষ্টি-ভঙ্গীর একটু আধটু পরিবর্তন দেখা যাবে কিন্তু মোটের উপর পৃথিবী ডেমোক্রাট-শাসিত আমেরিকার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করতে পারত রিপাবলিকান-শাসিত আমেরিকার কাছ থেকেও তাই প্রত্যাশা করতে পারে।

নির্বাচন-অভিযানকালে জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই আশা দেন যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে কোরিয়া যুদ্ধের একটা গতি তিনি যা হোক করে করবেন। নির্বাচিত হবার পরে তিনি কোরিয়া ঘুরেও আসেন। তারপর অনেক সলা-পরামর্শ হয়েছে, এমন কি জেনারেল ম্যাকার্থারের মতামতও তিনি শুনেছেন। প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হবার পূর্বে অবশ্য নূতন কোনো নীতি কার্যকরী করার কথা ওঠেনি তবে কার্যভার হাতে নেবার পরে নূতন প্রেসিডেন্ট কোরিয়া সম্পর্কে বিশেষ তৎপর হবেন এটা সকলেই ভেবেছে। কোরিয়া সফরের পরে জেনারেল আইজেনহাওয়ার যে-দুচারটি কথা প্রকাশ্যে বলেন তাথেকে এটা বুঝা গিয়েছিল যে কোরিয়ার যুদ্ধ-ব্যবস্থায় যে-সব ত্রুটি তাঁর চোখে পড়েছে সেগুলো সংশোধন করে আরো ভালো করে যুদ্ধ করার ব্যবস্থাটা তিনি আগে করতে চান। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের শান্তি আনার পথ হচ্ছে বিপক্ষের উপরে এমন জোর চাপ দেওয়া যাতে সে শান্তি ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়।

সম্প্রতি কোরিয়া যুদ্ধের যে-সব খবর আসছে তাথেকে মনে হয় যে আমেরিকা কোরিয়ায় যুদ্ধের গতি বৃদ্ধি করছে। কোরিয়া পরিদর্শন করে এসে জেনারেল আইজেনহাওয়ার মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষকে তাঁর অভিমত জানানোর পর থেকেই সম্ভবত তাঁর উপদেশমত কোরিয়ায় মার্কিন রণ-যন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করা হয়। কোরিয়ায় যুদ্ধের বর্তমান গতিবৃদ্ধি বোধ হয় তারই ফল। তাই যদি হয় তবে কোরিয়ার যুদ্ধ এখন কিছুদিন বাড়তেই থাকবে। কিন্তু এর পরিণাম কী? আমেরিকা যাই করুক, গত আড়াই বছরের যুদ্ধের ইতিহাস থেকে এটা বুঝা গেছে যে, কোরিয়ার সীমার মধ্যে যুদ্ধ করে একটা হেস্তনেস্ত করা কোনো পক্ষেরই সুসাধ্য নয়। বিপুল লোকবলে বলীয়ান চীন অনির্দিষ্ট কালের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়। যুদ্ধের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির একটা বড়ো-রকম পরিবর্তন না হলে এর কোনো শেষ দেখা যায় না। ম্যাকার্থারের মত ছিল যে কোরিয়ার বাইরে চীনকে আঘাত না করতে পারলে চীন কাবু হবে না, সাক্ষাৎভাবে চীনের উপর কিছু হামলা করলেই কোরিয়ার যুদ্ধ ফতে হবে। কিন্তু কোরিয়ার বাইরে চীনকে আঘাত করলেই কার্যসিদ্ধি হবে, এরূপ আশা করা কি খুব যুক্তিসংগত? চীনের উপর বোমা-বর্ষণ করলে বা চীনের উপকূল অবরোধ করার চেষ্টা করলেও তো এই অচল অবস্থা বা ঢিমেতেতালা যুদ্ধ অনির্দিষ্ট-কাল ধরে চলতে পারে। তাতে যে লোক-ক্ষয় হবে সেটা চীনের সইতে পারে কিন্তু মার্কিন জনমত কি তা সইবে? বাকী থাকে এ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমার ব্যবহার। যদিও বর্তমানে কোরিয়ায় যে যুদ্ধ হচ্ছে তার অমানুষিক

নৃশংসতার কোনো সীমা নেই তাহলেও বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া কেবল কোনো এশিয় জাতির সঙ্গে লড়াইয়ে এ্যাটম বোমার ব্যবহার বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক কারণে আমেরিকা ও আমেরিকার সহযোগী শক্তিগণের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই অবস্থায় কোরিয়ার যুদ্ধকে বাড়িয়ে বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করার দিকে একটা অন্ধ আবেগের টান উপস্থিত হতে পারে। বিশেষত রাশিয়ার 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের গাত্রদাহ ক্রমশ বাড়ছে। অনেকের ধারণা যে ইউনো'তে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবিত বন্দি-মুক্তি সম্পর্কিত ফরমুলাটির ভিত্তিতে একটা আপোস হয়ে যেতে পারত যদি রাশিয়া বাগড়া না দিত। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য কি না বলা কঠিন। কোরিয়া যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের শক্তিক্ষয় হচ্ছে এবং পশ্চিম য়ুরোপের সামরিক সংঘটনও কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে—তাতে রাশিয়ার কিছুটা সুবিধা হচ্ছে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে এটা কি সম্ভব যে চীন যদি কোরিয়ায় যুদ্ধ চালানো নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করে তাহলে কেবল রাশিয়ার প্ররোচনাতেই সে আপোস করতে অস্বীকার করছে? ব্যাপারটা এতো সোজা কখনই নয়।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা এবং নৈকট্য সম্বন্ধেও নানা বিভ্রান্তিকর ধারণা ও সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে তার জন্য কোন্ পক্ষ বেশি দায়ী হবে সেটা বুঝা কঠিন। একটা কথা আজকাল চালু হয়েছে যে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নাকি অনেকটা কমেছে, তার কারণ নাকি এই যে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের 'আত্মরক্ষার' প্রস্তুতি যতটা এগিয়েছে তাতে রাশিয়া ভয় পেয়ে গেছে। বিপক্ষ অ-প্রস্তুত বা নিজের তুলনায় কম প্রস্তুত থাকলেই যদি তাকে আক্রমণ করা স্বাভাবিক হয় তবে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের তোড়জোড় আরো বাড়লে তাদেরই তো সোভিয়েট-ব্লককে আক্রমণ করার কথা। তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা কমল কিসে? তবে ইঙ্গ-মার্কিন তরফ থেকে বলা হবে যে তারাতো যুদ্ধ চায় না, কেবল সোভিয়েট পক্ষই সুবিধা পেলে যুদ্ধ বাধাবে।

ইঙ্গ-মার্কিন তরফের উপরোক্ত যুক্তি যেমন অবিশ্বাস্য, সোভিয়েট পক্ষের 'শান্তিপ্রিয়তা'ও তেমনি একটি 'আজব চিজ' বলে মনে হয়। এখুনি যুদ্ধে লিপ্ত হতে রাশিয়ার অনিচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু যাতে সত্যই যুদ্ধের মনোবৃত্তি কমবে সে কাজ রাশিয়া করছে কি? রাশিয়ার 'শান্তি অভিযানের' মুখ্য উদ্দেশ্য দেখা যায় আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচার—আমেরিকা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাচ্ছে, আমেরিকা যুদ্ধ লাগাবার জন্য তোড়জোড় করছে আর রাশিয়া শান্তিকামী ইত্যাদি। কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলির একসঙ্গে এক পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করার বুলিও কম্যুনিস্ট প্রচারকদের মুখে শোনা যাচ্ছে। আবার মিঃ স্ট্যালিনের নূতন 'থিসিসে' বলা হচ্ছে যে আগামী যুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের পরিণতি-রূপেই দেখা দেবে, সেই সঙ্গে কিন্তু এও শুনছি যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি লাগে তবে তাতে পুঁজিবাদী দেশগুলির চরম পরাজয় এবং পৃথিবীময় কম্যুনিজম্-এর রাজত্ব অবশ্যম্ভাবী। তাই যদি হয় তবে কম্যুনিস্টদের—যাদের কম্যুনিস্ট স্বার্থে যুদ্ধের প্রতি কোনো নৈতিক বিতৃষ্ণা নেই—তাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনিচ্ছা কেন হবে? কম্যুনিস্টদের 'শান্তি অভিযানে'র এই স্ববিরোধী ভাব বা উক্তি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের কাছেই অদ্ভুত লাগে। মোটকথা, মার্কিন পক্ষ ও সোভিয়েট পক্ষ কোনো পক্ষের প্রচার থেকেই পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থাটা কী তা বুঝবার উপায় নেই। কেবল এক বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উভয় পক্ষই—হয়ত ভয়েই—সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হচ্ছে। এর পরিণাম কী হবে সে বিষয়ে অতীতের ইতিহাসের সাক্ষ্য মোটেই আশাজনক নয়।

২৮।১।৫৩

মনের দরজা

আলোক সরকার

দরজা খুললেই ঠিক আলো এসে পড়ে
মনের দরজা—যতবার খুলি তার
সহজ কপাট দেখি শুভ্র পূর্ণিমার
অপার বিস্তৃতি। কাঁপে প্রশান্তির করে
দূর অসীমের বাণী। দরজা যেই খোলো
শুনবে শ্যামল কণ্ঠ স্নিগ্ধ সুধাময়।
(আকাশ বাতাস ভরে একি গো বিস্ময়!)
মধুর ললিত সুর যতো চোখ তোলো
ততই সম্মোহে ছায় সুদূর উদার
স্পর্শ তার জ্যোতির্ময় আনন্দ-প্রীতির
স্নেহের অমূর্ত ধ্বনি—অজানা গীতির
অনন্ত মাধুরী। অনির্বচনীয়তার
সৌরভ মায়ার মন্ত্রে অন্তর ভাসায়
ডাক দেয় অচিন্ত্যের অপূর্বের দেশে
অমৃত সভায়—সান্দ্র মরমী নির্দেশে
টেনে নেয়। দুঃখ-শোক হীন যন্ত্রণায়
ক্লান্ত যেই দরজা খোলো অমনি মর্মরে
দেখো, তার প্রাণময় আলো এসে পড়ে।

গান্ধী ও রাস্কিন

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ-জগতের ক্রমবর্ধমান বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানের ফসল আহরণ করবার ঝোঁক দিন দিন বেড়ে চলেছে। আজকাল সাধারণ পাঠকও নানা বিষয়ের বহু বই পড়ে বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে। এই জ্ঞানের ভাণ্ডার মজুতদারের গোলার ধানের মতো, যা কখনো দরিদ্রের ক্ষিদে দূর করতে সাহায্য করে না। এমনি পুঁথিগত জ্ঞানের সঞ্চয়কে গান্ধীজী বিশেষ মূল্য দেননি। তিনি আত্মচরিতে বলেছেন, ছাত্র-জীবনে পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে বই পড়বার উৎসাহ তাঁর ছিল না। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার

গান্ধীজী

পরও তিনি খুব কম বই পড়েছেন। এজন্য গান্ধীজীর কখনো অনুতাপ হয়নি। বরং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে, রাশি রাশি বই না পড়বার ফলটা ভালই হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে বই সম্বন্ধে গান্ধীজীর আগ্রহ খুব সীমাবদ্ধ ছিল একথা ভাবলে ভুল করা হবে। মহাদেব দেশাই যারবেদা জেল ডায়েরির ১২ই মার্চ (১৯৩২) তারিখে লিখছেন, "বাপু জানতে চাইলেন জেল লাইব্রেরীতে স্কট, মেকলে, জুলে ভার্ন, ভিক্টর হুগোর কোনো বই এবং কিঙ্সলির Westward Ho অথবা গেটের ফাউস্ট আছে কি না। তিনি আমাকে এডওয়ার্ড কার্পেণ্টারের Adam's Peak to Elephanta এবং নিবেদিতার Cradle Tales of Hinduism এনে দিতে আদেশ করে বললেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে বসে তিনি ডাক্তার জেকিল ও মিঃ হাইডের গল্পটা পড়েছেন। বাপু এখন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়ছেন আপ্‌টন সিনক্লেয়ারের "The Wet Parade". বাপু বললেন, সিনক্লেয়ারের লেখায় খুব উপকার হচ্ছে। তিনি একটার পর একটা সামাজিক পাপকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তাদের উপর চমৎকার আলোকপাত করেছেন।"

গান্ধীজীর অধ্যয়ন সম্বন্ধে এক দিনের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা থেকে কিন্তু তাঁর পুস্তক-বিমুখতা স্বীকৃতির সমর্থন পাওয়া যায় না। গান্ধীজীর জীবন ও কর্ম অনেক গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। ছেলেবেলায় ভাগবতের গল্প এবং তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। বিলেত গিয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন গান্ধীজী। সল্ট-এর Plea for Vegetarianism, এডুইন আর্নল্ডের The Light of Asia এবং The Song Celestial, মাদাম ব্লাভাৎস্কির Key to Theosophy প্রভৃতি পুস্তক গভীরভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও তিনি একে একে পড়তে লাগলেন সক্রেটিস, ম্যাক্সমুলর, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাবলী। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র স্তম্ভে গান্ধীজী বার বার স্বীকার করেছেন যে, তিনি অনেক কিছুর জন্য টলস্টয়ের নিকট ঋণী। তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজের' পাঠকদের তিনি টলস্টয়ের ছ'খানা বই গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। সক্রেটিসের নির্ভীক মৃত্যু তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। Trial and Death of Socrates গান্ধীজী গুজরাটিতে অনুবাদ করেন; কিন্তু ভারত সরকারের আদেশে ১৯১৯ সালে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

সবচেয়ে গভীরভাবে যে বই গান্ধীজীর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে তা হ'লো জন রাস্কিনের (১৮১৯-১৯০০) Unto this Last. "পুস্তকের যাদুমন্ত্র" নামক আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে গান্ধীজী এই গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের বিবরণ দিয়েছেন। "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের" কাজে গান্ধীজীকে নাটাল যেতে হবে। পোলক এসেছেন গাড়ীতে তুলে দিতে। পথে পড়বার জন্য পোলক তাঁর হাতে দিলেন রাস্কিনের "আনটু দিস্ লাস্ট"। পড়তে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকটি গান্ধীজীর মন প্রবলভাবে আকর্ষণ করে নিল; শেষ না করে তিনি থামতে পারলেন

রাস্কিন

না। সে রাত্রিতে তাঁর চোখের ঘুম গেল দূর হয়ে; সংকল্প করলেন রাস্কিন যে জীবনাদর্শ প্রচার করেছেন এই পুস্তকের মাধ্যমে তাকে তিনি বাস্তবে রূপ দেবেন। গান্ধীজীর বই পড়ার এই ছিল বৈশিষ্ট্য। গ্রহণযোগ্য কোন নূতন জ্ঞান বা আদর্শ পেলে বইয়ের সঙ্গে আলমারিতে আবদ্ধ করে রাখতেন না। জীবনে তাদের প্রয়োগ করে সত্যতা যাচাই করা ছিল তাঁর অভ্যাস। এই সত্যের পরীক্ষায় যে সব বই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে, "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর প্রভাব তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর।

গান্ধীজীর মতে "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর মূল কথা তিনটি: (১)

সমষ্টির মঙ্গলেই ব্যষ্টির কল্যাণ; (২) উকিল ও নাপিতের জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার; সুতরাং তাদের পারিশ্রমিকের হার একই নীতিতে নির্ধারিত হবে; (৩) কৃষক, মজুর প্রভৃতি যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের জীবনই আদর্শ জীবন। অবশ্য এই কথাগুলো গান্ধীজীর কাছে একেবারে নূতন ছিল না। অনুরূপ আদর্শের অনুভূতি তাঁর মনে নীহারিকার আকারে উপস্থিত ছিল। রাস্কিনের স্বচ্ছ চিন্তা ও রচনার গুণে নূতন আদর্শের অস্পষ্ট অনুভূতিগুলি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও সম্ভাবনাপুষ্ট হয়ে সাড়া জাগাল গান্ধীজীর মনে। তিনি তৎক্ষণাৎ "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর আদর্শ অনুযায়ী "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের" পরিচালন ব্যবস্থা নির্ধারিত হবে স্থির করলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' আপিস শহর থেকে সরিয়ে কোনো কৃষিক্ষেত্রে নিতে হবে। সব কর্মীদের প্রধান কাজ হবে কৃষি, অন্য সময় করবে "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের" কাজ। এ কাজে সম্পাদক থেকে কম্পোজিটার সবার মাইনে হবে এক। এই পরিকল্পনা সত্যি বাস্তবে পরিণত হয়েছিল এবং কিছুদিন গান্ধীজীর কাগজ এভাবেই চলেছিল।

পরে গান্ধীজী 'সর্বোদয়' নাম দিয়ে 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ক্রমে এই সংকীর্ণ অর্থ থেকে মুক্তি পেয়ে 'সর্বোদয়' নূতন মর্যাদা লাভ করেছে। গান্ধী-দর্শনের মূল কথাই হলো সর্বোদয়। গান্ধীজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা। স্বরাজ তার প্রথম ও আবশ্যিক ধাপ মাত্র। সর্বোদয়ের আদর্শ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে; এখানে তার ব্যাখার প্রয়োজন হবে না। যে গ্রন্থটি গান্ধীজীর মনে সর্বোদয় পরিকল্পনার প্রেরণা দিয়েছিল, তার মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

অর্থনীতির ভূমিকায় সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে রাস্কিনের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ হয়। রাস্কিন এতে না দমে তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্র গ্রথিত করে ১৮৬২ সালে Unto this Last বের করেন। সে যুগের পক্ষে রাস্কিনের মতবাদের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। এমন কি, আজকের দিনেও রাস্কিনের দৃষ্টিকে অত্যন্ত প্রগতিবাদী বলে মনে হবে। তাই সাধারণ পাঠকের সমাদর লাভ করা সম্ভব হয়নি "আনটু দিস্ লাস্টের" পক্ষে। এক হাজার কপির প্রথম সংস্করণ এগারো বছরেও নিঃশেষ হলো না। কিন্তু প্রভাতের সূর্যালোক যেমন সবার আগে পর্বতের চূড়াকে চুম্বন করে তেমনি সমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা রাস্কিনের নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। "আনটু দিস্ লাস্ট" টলস্টয়কে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করল; কার্লাইলের অকুণ্ঠ প্রশস্তিবাদ পেলেন রাস্কিন। য়ুরোপের অনেক মনীষী ইংরেজী শেখার উদ্যোগ করলেন শুধু 'আনটু দিস্ লাস্ট' পড়বার জন্য। ক্রমে নব আদর্শের আলো নেমে এলো সমতলে--ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল 'আনটু দিস্ লাস্ট।' যারা অত্যন্ত দরিদ্র, কিনে পড়বার সামর্থ্য নেই, তারা নকল করে রাখল সম্পূর্ণ বইখানি। তারা সকালে বিকেলে অবসর পেলেই পড়ত, আর আশা করত একদিন রাস্কিনের স্বপ্ন সফল হবে, শ্রমিক ও কৃষক যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯০৬ সালে পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সভ্যদের প্রশ্ন করা হলো কোন্ বই তাঁদের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। উত্তর থেকে দেখা যায় অধিকাংশ সদস্যই "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর নাম করেছেন।

রাস্কিন নিজেও মনে করতেন এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। শেষ বয়সে কথাপ্রসঙ্গে তিনি এক বন্ধুকে বলেছিলেন, এমন সর্ত যদি আরোপ করা হয় যে, একখানি বই ছাড়া তাঁর সমগ্র রচনাবলী পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং সে বইখানি নির্বাচনের ভার থাকবে রাস্কিনের উপর, তাহ'লে তিনি 'আনটু দিস লাস্ট'কেই রক্ষা করতেন।

রাস্কিন শিল্প ও সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর পক্ষে "আনটু দিস্ লাস্টে"র মতো বই লেখা একটু আকস্মিক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পুস্তক রচনার পটভূমিকার পরিচয় পেলে একে অস্বাভাবিক বলে ঠেকবে না। ১৮৬০ সালের কিছু আগে থেকেই ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ব্যবস্থায় শিল্প-বিপ্লবের কুফল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। ম্যাঞ্চেস্টার-গোষ্ঠীর অর্থনীতিবিদ্‌রা অর্থনীতি সম্বন্ধে যে নূতন মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন তাতে সংকট আরো বৃদ্ধি পেলো। এই ম্যাঞ্চেস্টার স্কুলের পুরোধা ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ ও জন স্টুয়ার্ট মিল। তাঁরা বললেন, উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে যদি প্রবল প্রতিযোগিতা থাকে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে গভর্নমেণ্ট যদি হস্তক্ষেপ না করে তা'হলে জাতীয় অর্থসম্পদ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে। এ'দের কাছে জাতীয় সম্পত্তির অর্থ হলো সমগ্র জাতির মোট সম্পদ। দেশের শতকরা নিরানব্বুই জন যদি অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র হয় তাতে ক্ষতি নেই; একজনের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিকেই জাতীয় ধন বৃদ্ধি বলে গণ্য করা হবে। আবার দেশের কৃষক-মজুর যদি দু'বেলা খেতে পায়, কিন্তু বিত্তশালী ধনীর সংখ্যা যদি কম থাকে, তবু দেশ দরিদ্র বলে পরিচিত হবার সম্ভাবনা। অর্থনীতির এই তত্ত্বগুলির কেন্দ্র হলো economic man বা 'আর্থিক মানুষ' বলে এক অদ্ভুত জীব। সে যুগের অর্থনীতিবিদরাই এর আবিষ্কর্তা। 'আর্থিক মানুষ' সকল মানবিকতাবোধ-শূন্য হৃদয়হীন জীব। তার সকল কর্ম-প্রচেষ্টার গোড়ার কথা হলো টাকা।

রাস্কিনের অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী মন এই বিকৃত ব্যাখ্যায় ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, মানুষ সামাজিক জীব; তার আনন্দ-বেদনার অনুভূতি থেকে অর্থ উপার্জনকে পৃথক করে দেখা একান্তই অসম্ভব। আমাদের হৃদয়বৃত্তি অন্য সকল কাজকে যেমন, অর্থ উপার্জনকেও ঠিক তেমনি, প্রভাবান্বিত করে। শুধু প্রতিবাদ করেই রাস্কিন ক্ষান্ত হননি। ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র শ্রেণীর শোচনীয় জীবন তাঁকে মর্মাহত করেছিল। অথচ সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে তখন মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের জীবনে এসেছিল স্বর্ণযুগ। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে সুস্থ সহজ জীবনযাপন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে রাস্কিন সামাজিক ভিত্তিতে এক আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করে দেশবাসীর হাতে দিলেন। "আনটু দিস্ লাস্ট"-এ তাঁর এই আদর্শটি রূপায়িত হয়েছে।

সে-কালের হৃদয়বৃত্তির সম্পর্কশূন্য অর্থনীতি বলত, ভৃত্যের কাছ থেকে কর্তা

যত বেশি কাজ আদায় করবে, সমাজের তত বেশি কল্যাণ হবে এবং সে মঙ্গল ভৃত্যকেও স্পর্শ করবে। কিন্তু সমস্যা হলো কাজ বেশি আদায় করা নিয়ে। কি করে তা সম্ভব? ভৃত্য তো আর যান্ত্রিক ইঞ্জিন নয় যে, যত চালাবে ততই কাজ পাওয়া যাবে। মানুষ কাজ করে তার হৃদয় ও আত্মার প্রেরণায়। কর্তা যদি ভৃত্যের হৃদয় স্পর্শ করবার ক্ষমতা রাখে তাহ'লে যে ফল আশা করা যায় অধিক বেতন, জবরদস্তি ইত্যাদি উপায়ে তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, অর্থনীতি যা-ই বলুক না কেন, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে যদি সহানুভূতিপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক থাকে তাহ'লে পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ। কেউ কেউ বলেন ভৃত্য প্রায়ই সদয় ব্যবহারের অমর্যাদা করে। হয়তো কখনো কখনো করে; কিন্তু ভালো ব্যবহার পেয়েও যে কৃতজ্ঞ থাকে না, খারাপ ব্যবহার তাকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলবে। উদারচেতা প্রভুর সঙ্গে যে ভৃত্য অসদাচরণ করে, সে ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে অন্যায়াচারী কর্তার পক্ষে। ভালো ব্যবহার যে ভৃত্যের অনিষ্টকারী মনোবৃত্তি কোমল করে আনে তাতে ভুল নেই। কর্তা যদি তাঁর দরদকে অধিক আয়ের জন্য বাহ্যিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার না করেন, তাঁর সহানুভূতি যদি আন্তরিক হয়, তাহ'লে ভৃত্য নিশ্চয়ই সকল হৃদয় দিয়ে কাজ করবে এবং তার পরিমাণ সহজভাবেই বৃদ্ধি পাবে। সকল শ্রেণীর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সম্বন্ধেই একথা সত্য।

কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে এবং প্রতিযোগিতার দ্বারা মজুরীর হার নির্ধারণ করবার নীতিটা মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ নীতি যে ঠিক নয় তা আমরাও জানি। কারণ যেখানে আমাদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেখানে আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করি; প্রতিযোগিতা, সরবরাহ ইত্যাদির প্রশ্ন মনে আসে না। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদটা আমরা কখনো নীলামে তুলি না; যোগ্যতম ব্যক্তিকে বেছে নিই। অসুখ করলে টাকা কে কম নেবে তা বিচার করতে বসি না; ভালো ডাক্তারকে ডাকি। এমনি সকল ক্ষেত্রে। তবে উকিল, ডাক্তার, মিস্ত্রী, মেথর প্রত্যেকের জন্য মজুরীর একটা নির্দিষ্ট হার থাকা উচিত। এক থেকে একশ' আটাশ টাকার মধ্যে ডাক্তারদের ফীস ওঠা-নামা করবে না। তার কারণ ডাক্তারদের সমাজের প্রতি একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। কর্তব্যটা যেমন নির্দিষ্ট, তার জন্য সমাজ যে মূল্য দেবে, তা-ও তেমনি নির্দিষ্ট থাকা সংগত। সুতরাং সব ডাক্তার এক ফীস পাবে, সেটা চার কিংবা আট টাকা যা-ই হোক্ না কেন। কথাটা শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন। ভালো-মন্দ সব ডাক্তার যদি একই পারিশ্রমিক পায় তাহ'লে ভালোর মূল্য কি? রাস্কিনের উত্তর হলো, আমরা যে ভালোকে বেছে নিই সেটাই তার মূল্য। যাদের দক্ষতা কম তারা অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতে কাজ করবার জন্য নিয়োগ-কর্তাকে প্রলুব্ধ করে এবং এই প্রলোভন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়ী হয়। এরই ফলে সমাজে দুঃখ ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। মজুরী নিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রকৃত দক্ষ কর্মী অনেক সময় কাজ পায় না; কিংবা পেলেও, উপযুক্ত মজুরী মিলে না। এতে কাজের মান নীচু হয়ে পড়ে এবং সকল শ্রেণীর কর্মীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। যারা কম পয়সায় কাজ করে তাদের জীবনও দুর্বহ হয়ে ওঠে; কারণ তাদের পারিশ্রমিক সব সময়ই প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে। অপরপক্ষে গুণ-বিচার যদি নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হতো তাহ'লে কাজ না পেয়ে অকুশলী কর্মীর মনে তাগিদ জাগত দক্ষতা অর্জন করবার।

সমাজ ও জাতির প্রতি আমাদের প্রত্যেকের একটা কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হয়। তার চেয়ে বেশি দাবী করা যেমন অন্যায়, কম নিয়ে কাজ করাটাও তেমনি অসংগত। আদর্শ সমাজে নাগরিকদের অন্তরে লাভ করবার মনোবৃত্তি থাকবে না। অথচ ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকদের এটাই হলো সবচেয়ে বড় প্রেরণা। জাতীয় জীবনে তাদের যতটুকু দান তার চেয়ে বহুগুণ বেশি তারা আদায় করে নিতে চায়। আশ্চর্য এই যে সমাজও তাদের মুনাফার দাবীটা মেনে নিয়েছে। তবে আমাদের অন্তর হয়তো এতে সায় দেয় না। কারণ শিক্ষক ও ডাক্তারকে যে মর্যাদা দিই ব্যবসায়ীরা তা পাবে না আমাদের কাছ থেকে।

প্রত্যেক সভ্য-সমাজে কর্তব্যের দিক থেকে বিচার করলে পাঁচটি প্রধান শ্রেণী আছে। সৈন্যের কাজ দেশ রক্ষা করা; গুরু শিক্ষা দেবে জাতিকে; ডাক্তারের হলো স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব; আইনজীবীর কর্তব্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং বণিক জাতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাবার ভার নেবে। সুতরাং অন্যান্য শ্রেণী যে হারে পারিশ্রমিক পাবে বণিক ও মিল-মালিকেরা তার বেশি চাইবে কেন এবং চাইলে সমাজ তা সমর্থন করবে কোন্ নীতিতে? সবচেয়ে শস্তায় জিনিস কিনে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রী করাকেই আমরা বলি ব্যবসা। আদর্শ সমাজে কিন্তু তার উল্টো। সবচেয়ে ভালো জিনিস যথাসম্ভব সস্তায় পাওয়া যাবে সেখানে। বিপদের সময় সৈন্যদের যেমন প্রাণ দিয়ে দেশ রক্ষা করতে হয়, মৃত্যুর ভয় না করে ডাক্তারদের যেমন মড়কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, ঠিক তেমনি দুর্ভিক্ষে ও দুর্দিনে ব্যবসায়ীরা জাতির চাহিদা মিটিয়ে যাবে নিজের ক্ষতি করেও। কর্তব্য করতে গিয়ে যদি সর্বস্বান্ত হতে হয় তাতেও দ্বিধা করলে চলবে না।

অর্থ উপার্জন করে ধনী হবার প্রকৃত মর্ম কি তা আমরা তলিয়ে দেখি না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হবার কৌশল যার আয়ত্ত, দেশের দশ জনকে দরিদ্র করে রাখবার বিদ্যাটা সে ভালোরূপেই জানে। আমার পকেটের টাকার মূল্য তখনই হতে পারে যখন চারপাশের লোকদের পকেট শূন্য থাকবে।

"The art of making yourself rich, in the ordinary mercantile economist's sense, is....equally and necessarily the art of keeping your neighbour poor."

তাই ধনিক সম্প্রদায়ের নিরন্তর চেষ্টা চলছে দেশের লোকদের গরীব করে রাখবার। কেবল স্তূপীকৃত টাকার দিকে চেয়ে চেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় না; স্বল্পবিত্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব করবার মধ্যেই রয়েছে আসল আনন্দ। ক্ষুধাক্লিষ্ট দরিদ্র না থাকলে প্রভুত্ব করবে কার উপর?

সুতরাং দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চক্রান্ত ধনসঞ্চয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা দেশ সম্বন্ধে যেমন এটা সত্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি। বিত্তশালী জাতিগুলি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জাতিগুলিকে আর্থিক ব্যাপারে পঙ্গু করে রাখবার জন্য সর্বদা ষড়যন্ত্র করছে। কে কত অর্থ নিজের ঘরে আনবে তার জন্য দেখা দিয়েছে মর্মান্তিক প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে বিশ্বযুদ্ধে নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। টাকার প্রতি এই বিধ্বংসী আসক্তি দূর হতে পারে যদি ব্যষ্টির জীবনে থাকে নীতিবোধ। প্রত্যক্ষরূপে সমাজকে যতটুকু সেবা করতে পারব প্রতিদানে তার বেশি কিছু চাইব না, যা প্রয়োজন নেই তার উপর লোভ করব না,—এই নীতিবোধ যদি আমাদের প্রত্যেকের মনে সজাগ থাকে তাহ'লে অর্থলোলুপ জাতিগুলি রক্ষা পেতে পারে।

অর্থনীতি বলতে রাস্কিন বুঝতেন "that which teaches nations to desire and labour for the things that lead to life: and which teaches them to scorn and destroy the things that lead to destruction."

নাগরিকদের কর্তব্যপরায়ণ, নীতিপরায়ণ জীবনগুলিই জাতির প্রকৃত সম্পদ। জীবনকে প্রস্ফুটিত করবার জনাই অর্থ, অর্থের জন্য জীবন নয়। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় অর্থ যে-কোনো উপায়ে আহরণ করলে চলবে না। মুদ্রায় শুধু রাষ্ট্রের ছাপ থাকলে কী হবে, চাই ধর্মের ছাপ। পথ যদি সৎ না হয়, তাহলে সে পথে যত অর্থই আসুক, তা কখনো প্রকৃত জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে না। টাকা-পয়সা যারা ব্যবহার করবে তারা যদি চরিত্রবান না হয় তাহ'লে অর্থ হবে অধোগতির পথ। রাস্কিন দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করতেন যে, সত্যিকার জাতীয় সম্পদ নির্ভর করে জাতীয় চরিত্রের উপর। তাঁর অর্থনীতি তাই ধর্মাচরণের সগোত্র।

নৈতিক জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে দুর্নীতি দেখা দেয়। তাছাড়া অসম প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যা-খুশী-হোক্ নীতি সমাজে দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করেছে। হৃদয়হীন প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে উপর তলার লোক তলিয়ে যায়, নীচু তলার লোক উপরে ওঠে। এর ফলে শুধু যোগ্য ব্যক্তি নয়, অনেক ঠক্, জোচ্চোর ও অপদার্থ বিত্তশালী হয়ে বসে। আবার কিছু অযোগ্য নির্বোধ লোকের সঙ্গে কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু লোক দারিদ্র্যের জ্বালায় পিষ্ট হয়। এই দুর্ভাগ্য প্রত্যহ চোখে পড়ে এবং আমরা ধিক্কার দিই ভগবানকে এবং ধর্মাচরণের উপদেশকে। রাস্কিন বলেন, প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারের সতর্ক হস্তক্ষেপ এর সমাধান করতে পারে।

'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর মূল কথা এই। জানি, রাস্কিনের অর্থনীতির অনেক তত্ত্ব আজকের বিশেষজ্ঞদের যুক্তির আঘাতে টলায়মান হতে পারে। কিন্তু এও জানি, যে নৈতিক ভিত্তির উপর তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত তাকে সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। গান্ধীজীর সঙ্গে রাস্কিনের আত্মার যোগাযোগ এই নীতিবোধকে কেন্দ্র করে। গান্ধীজী তাঁর সকল কাজের মধ্যে ন্যায় ও ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যষ্টির চরিত্র উন্নত না হলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয় একথা গান্ধীজী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানাভাবে প্রচার করে গেছেন। রাস্কিন ও গান্ধী দু'জনেই জোর দিয়েছেন নাগরিকদের নিজেদের কর্তব্যের উপর। কর্তব্য পালন করলেই তো অধিকার পাওয়া যাবে। আজকাল আমরা কিন্তু আগে অধিকার দাবী করি।

গান্ধীজী যা সত্য বলে জেনেছেন নিজে তাকে জীবনে গ্রহণও করেছেন। রাস্কিনের মধ্যেও এই দুর্লভ সততা ছিল। তিনি বলতেন, অপরের জন্য যে পরিমাণ কাজ করা হয়, ঠিক সে পরিমাণ ফিরে পাবারই আমরা অধিকারী। একশ' টাকা ধার দিলে ঐ একশ' টাকাই ফিরে পাওয়া উচিত; তার জন্য সুদ চাওয়া অন্যায়। কারণ সুদের টাকাটার জন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিদান দেওয়া হয় না। এই হিসেবে কোম্পানীর লভ্যাংশ কিংবা উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং রাস্কিন তার বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে শুধু নিজের লেখার আয়ের উপরে নির্ভর করলেন।

আমরা সত্যকে দৈনন্দিন জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে তাকে রেখেছি মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়। ঈশ্বরকে স্মরণ করি শুধু বিশেষ কয়েকটি দিনে। রাস্কিন সেই নির্বাসন থেকে এনে সত্যকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন আর্থিক ক্ষেত্রে। গান্ধীজী জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার সাধনা করেছেন। সত্য আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রাস্কিন ও গান্ধীজী যখন সত্যকে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রয়োগ করতে চাইলেন তখন আমরা চমকে উঠলাম। সত্যের প্রতি নির্ভেজাল নিষ্ঠার মধ্যেই রাস্কিন ও গান্ধীজীর আত্মীয়তার সূত্র উপলব্ধি করা যেতে পারে।

গান্ধীজী 'আনটু দিস্ লাস্ট'-এর গুজরাটি অনুবাদের নাম দিয়েছেন 'সর্বোদয়'। আচার্য ভিনোবা বলেছেন 'সর্বোদয়ের' পরিবর্তে 'অন্ত্যোদয়' নাম দিলে রাস্কিনের অর্থটা সুপরিস্ফুট হতো। কিন্তু পরিবর্তনটা যে গান্ধীজীর ইচ্ছাকৃত তাতে সন্দেহ নেই। সর্বোদয় কোনো সংস্থা নয়; এই একটি শব্দের মধ্যে বিবৃত হয়ে আছে সমাজ উন্নয়নের মহৎ আদর্শ। রাস্কিনের মতো এখানে দরিদ্র নাগরিকের আর্থিক উন্নতিটাকেই মুখ্য করে দেখা হয়নি। ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ প্রত্যেককে উন্নত করতে হবে, বিকশিত করে তুলতে হবে তাদের জীবনের পূর্ণ সম্ভাবনাকে। সেই উন্নতি শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উন্নতি হবে সর্ববিধ,—আর্থিক, নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক। যে যে-বিষয়ে পিছিয়ে আছে তাকে সেদিক থেকে টেনে তুলতে হবে, কারো প্রতি অবজ্ঞা নেই। এই সর্বাত্মক উন্নয়নের আদর্শ "আনটু দিস্ লাস্ট"-এর পরিপ্রেক্ষিতে থেকে মহত্তর ও বৃহত্তর পথের ইঙ্গিত দেয়।

তপোধন বিনোবা

(গান্ধী ও বিনোবার কয়েকখানি পত্র)

মহাদেব ভাই

['মহাদেব ভাইয়ের ডায়েরি' হইতে কয়েকখানি দুর্লভ ও হৃদয়স্পর্শী পত্র দেওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, প্রথম হইতেই বিনোবার জীবন কিরূপ সাধনাময় ছিল। অনুক্ষণ তিনি নিজ জীবন যাচাই করিয়া চলিয়াছেন। আজ তাঁহার বাণীতে যে ওর্জাস্বিতা ও শব্দে যে শক্তি স্ফূর্ত দেখা যায় তাহা নিঃসন্দেহ তাঁহার জীবনব্যাপী মহান্ সাধনার ফল।]

১০-২-১৮

আশ্রমের পূর্ব বিদ্যার্থী ভাই বিনায়ক নরহর ভাবের (বিনোবার) পত্রঃ

অসুস্থতা হেতু এক বছর আগে আশ্রম হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম। তখন স্থির ছিল দুই-এক মাস বাই-এ থাকার পর আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবুও আমার দেখা নাই। তাই আশ্রমে ফিরিব কিনা, বাঁচিয়া আছি কিনা, এরূপ শঙ্কা ওখানে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একথা আমায় স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই ব্যাপারে সবটা দোষই আমার। এমনি ত মামাকে (মামা ফড়কে) দুই-একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। 'সত্যাগ্রহ' শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় ত আমাকে অবশ্যই জানাইবেন। সব কিছু ফেলিয়া অবিলম্বে আমি চলিয়া আসিব, অন্যথায় যে লোভের হেতু আশ্রমের বাহিরে রহিয়াছি, তাহা শেষ হইলে পরে আশ্রমে ফিরিব, একথা সেই পত্রে ছিল। আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে একথা কেহ যদি মনে করেন ত সে দোষ আমারই। পত্র না লেখাই আমার অভ্যাস। কিন্তু একথা না বলিলে নয় যে, আশ্রম আমার মনে আসন পাতিয়াছে, তাহাই নহে, অপিচ আমার জন্মই আশ্রমের নিমিত্ত, এই বিশ্বাস আমার জন্মিয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে এক বছর আমি বাহিরে আছি কেন?

দশ বছর যখন আমার বয়স, তখনই আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতঃ দেশসেবা করিব। তারপরে আমি হাইস্কুলে ভর্তি হই। সে সময়ে গীতায় আমার ঝোঁক পড়ে। কিন্তু বাবা আদেশ করিলেন, দ্বিতীয় ভাষারূপে আমাকে ফ্রেঞ্চ পড়িতে হইবে। তাহা হইলেও গীতার প্রতি টান কমিল না। গৃহে আমি নিজে নিজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। বেদান্ত ও তত্ত্বজ্ঞান অধ্যয়ন করার সংকল্পও আমার ছিল। আপনার অনুমতি লইয়া আমি আশ্রমে যোগ দিই। কিন্তু তখন বেদান্ত অধ্যয়নের

বিনোবা ভাবে

উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়। বাই-এ নারায়ণশাস্ত্রী মরাঠে-নামক একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী পণ্ডিত ছাত্রদের বেদান্ত ও অপর শাস্ত্র পড়াইতেন। তাঁহার কাছে উপনিষদ পড়ার লোভ আমার হইল। এই লোভের কারণে বাই-এ আমি বেশী সময় থাকিয়াছি। ইতোমধ্যে আমি যাহা যাহা করিয়াছি জানাইতেছি।

যে লোভে এতদিন আমি আশ্রমের বাহিরে রহিয়াছি ও তদনুযায়ী যে কার্য করিয়াছি, তাহা এইঃ

(১) উপনিষদ, (২) গীতা, (৩) ব্রহ্মসূত্র ও শংকর ভাষ্য, (৪) মনুস্মৃতি (৫) পাতঞ্জল যোগ-দর্শন,-এ-সব গ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। তাহা ছাড়া, (১) ন্যায়সূত্র, (২) বৈশেষিক সূত্র, (৩) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থও অধ্যয়ন করা গিয়াছে। আর অধিক শিখার মোহ নাই। আর যাহা পড়িবার নিজে নিজেই পড়িয়া লইব। অপর কর্ম ছিল স্বাস্থ্যোন্নতি, যাহার জন্য আমার বাই-এ আগমন। সে সম্বন্ধেঃ

স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত প্রথমে আমি দশ বারো মাইল ভ্রমণ করিতে থাকি। পরে ছয় হইতে আট সের গম ভাঙিতাম। এখন তিনশত সূর্য নমস্কার ও ভ্রমণ, এই হইতেছে আমার ব্যায়াম। ইহার ফলে আমার স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গিয়াছে।

আহারের কথায়ঃ প্রথম ছয় মাস লবণ খাইয়াছি। পরে ছাড়িয়া দিয়াছি। মসলা ইত্যাদি আদৌ খাই নাই। মসলা ও লবণ জীবনে কখনও খাইব না ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। দুধ ধরিয়াছি। অনেক পরীক্ষার পরে দেখিতে পাইয়াছি যে, দুধ ব্যতীত বহু দিন চলে না। তাহা হইলেও, ছাড়া যায় ত ছাড়িবার বাসনা আছে। এক মাস কেবল কলা, দুধ ও কমলা লেবু খাইয়া থাকিয়াছি। ফলে দুর্বল হইয়াছি। এখনকার আহার এইরূপঃ

দুধ দেড় সের (৬০ তোলা), ভাখরী ২ খানা (২০ তোলা জোয়ারের), কলা ৪।৫টি ও লেবু ১টি (পাওয়া গেলে)। স্থির করিয়াছি আশ্রমে ফিরিয়া আপনার পরামর্শ অনুসারে খাদ্য ঠিক করিব। স্বাদের জন্য অন্য কোন জিনিষ খাওয়ার ইচ্ছা-ই হয় না। তাহা সত্ত্বেও উপরে খাদ্যের যে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা যে নেহাতই আমিরী, একথা অনুভব করি। দৈনিক খরচ মোটামুটি এইরূপঃ

কলা ও লেবু	/০
জোয়ার	৻১০
দুধ	/৫
একুনে	৵১৫

ইহাতে আর কি অদল-বদল করা দরকার, তাহা আপনার কাছ হইতে জানিতে বাসনা। পত্রে তাহা জানাইবেন।

কার্য

১। গীতার ক্লাশ করিয়াছি। বিনা পারিশ্রমিকে ছয়জন ছাত্রকে সমগ্র গীতা অর্থসমেত শিখাইয়াছি।

২। জ্ঞানেশ্বরী ছয় অধ্যায়। এই ক্লাশে চারিজন ছাত্র ছিল।

৩। উপনিষদ নয়। এই ক্লাশে দুই-জন ছাত্র ছিল।

৪। হিন্দী-প্রচার—নিজে আমি হিন্দী ভাল জানি না। তাঁহা হইলেও শিক্ষার্থী-দের হিন্দী সংবাদপত্র পড়িতে দিয়াছি, পড়াইয়াছি।

৫। ইংরাজি—দুইজনকে শিখাইয়াছি।

৬। ভ্রমণ করিয়াছি প্রায় ৪০০ মাইল—পায়ে হাঁটিয়া। রাজগড়, সিংহগড়, তোরণগড় আদি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ দেখিয়াছি।

৭। প্রবাস কালে গীতার উপর প্রবচন (ভাষ্য, ব্যাখ্যা) দেওয়ার কার্য বিনা ব্যতি-ক্রমে চলিয়াছে। আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটি প্রবচন দেওয়া হইয়াছে। এখন এখান হইতে হাঁটিয়া বোম্বাই যাইব আর তথা হইতে রেলে আশ্রমে পেীছিব। আমার সঙ্গে পঁচিশ বছরের একটি শিক্ষার্থী প্রবাস করিতেছে। আমার কাছে সে গীতা শিখিতে চাহে। খুব দেরি হয় ত চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে আশ্রমে পেীছিব।

৮। বাই-এ 'বিদ্যার্থী মন্ডল' নামে এক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। বিদ্যার্থী মণ্ডলে একটি গ্রন্থাগার খুলিয়াছি, আর উহার জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত জাঁতা চালান গিয়াছে। ঐ জাঁতার ক্লাসে আমি ও পনর জন ছাত্র গম ভাঙিয়া দিতাম। যাহারা কলে ভাঙায় তাহাদের গমই আমরা ভাঙিয়া দিতাম—পয়সায় দুই সের হিসাবে—। যে পয়সা আমদানি হইয়াছে গ্রন্থাগারে দিয়াছি। এই ক্লাশে ধনীর ছেলেও ছিল। একে ত বাই পুরাতনপন্থী স্থান, তাতে আমরা সকলেই স্কুল-পড়ুয়া ব্রাহ্মণতনয়। তাই সকলে আমাদের হন্দ মূর্খ ঠাওরাইয়াছে। তাহা হইলেও এই ক্লাশ দুই মাস চলিয়াছে এবং গ্রন্থাগারে চারিশত বহি সংগ্রহ হইয়াছে।

৯। সত্যাগ্রহ আশ্রমের তত্ত্ব লোকের কাছে প্রচার করার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি।

১০। বরোদায় ১০।১২জন বন্ধু আছে। লোক সেবার দিকে তাহাদের ঝোঁক রহিয়াছে। তাই মাতৃভাষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিন বছর আগে সেখানে এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলাম। এই সংস্থার বার্ষিক উৎসবে গিয়াছিলাম (উৎসব মানে সদস্যদের একত্র হইয়া, কি করা হইয়াছে আর ভবিষ্যতে কি করা হইবে এই আলোচনা)। তথায় হিন্দী প্রচারের কথা উত্থাপন করি। আমার বিশ্বাস এই সংস্থা এই কাজ শুরু করিবে। আপনি হিন্দী প্রচারের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে এই সংস্থা সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

পরিশেষে, সত্যাগ্রহ আশ্রমের নিবাসী রূপে আমার আচরণ কিরূপ ছিল, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

অস্বাদ ব্রত—আহারের বিষয়ে উপরে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

অপরিগ্রহ—কাঠের থালা, বাটি, আশ্রমের একটি ঘটি, ধুতি, কম্বল ও পুস্তক—পরিগ্রহের মধ্যে ইহাই আছে। ফতুয়া, কোট, টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করিব না সংকল্প করিয়াছি। তাই ধুতি দিয়া গা ঢাকিয়া লই। তাঁতে-বোনা কাপড় পরি।

স্বদেশী-বিদেশী প্রশ্ন আমার না-ই; (আপনি মাদ্রাজে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তদনুরূপ ব্যাপক অর্থ না করিলেও)।

সত্য-অহিংসা-ব্রহ্মচর্য — আমার বিশ্বাস এই সব ব্রত পালনে জ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি আমার হয় নাই।

অধিক কি লিখিব? স্বপ্নেও মনে একটা কথাই জাগে। ঈশ্বর আমা হইতে কোন সেবা লইবেন কি? আশ্রমের নিয়মানুসারে (একটি ছাড়া) আমার আচরণ আমি নিয়মিত করিয়াছি, অর্থাৎ আমি আশ্রমেরই একজন, একথা আমি নিরতিশয় দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। আশ্রমই আমার সাধ্য। যে ত্রুটির কথা উপরে বলিয়াছি তাহা হইতেছে নিজের খাদ্য (ভাখরী) নিজে তৈয়ার করিয়া লওয়ার কথা। এদিকেও চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু প্রবাসে তাহা সম্ভব হয় নাই।

সত্যাগ্রহের বা অপর কোন (রেল-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার কথাই অবশ্য বলিতেছি) প্রশ্নের বিষয় উপস্থিত হইলে অবিলম্বে আমি চলিয়া আসিব। নয় ত উপরে যে তারিখের কথা বলিয়াছি, সেদিন নিশ্চিত পেীছিব।

ইতিমধ্যে আশ্রমে কি কি পরিবর্তন হইয়াছে? ছাত্র কত জন? জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে কি? আর আমার খাদ্যে কি কি পরিবর্তন করা দরকার তাহা জানার আগ্রহ আমার প্রবল। আপনি নিজ হাতে পত্র লিখিবেন, ইহা বিনোবার—আপনাকে পিতার তুল্য মনে করে এবংবিধ আপনার পুত্রের নিবেদন। দুই-চার দিন মধ্যে এই গ্রাম হইতে আমি চলিয়া যাইব।

—প্রণতঃ বিনোবা

এই পত্র পড়িয়া "গোরখনে* মছন্দর কো হরায়া। ভীম হ্যায় ভীম। গোরখ মছন্দরকে হারাইয়াছে। ভীমই বটে, ভীম!" এই উক্তি বাপুর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। সকাল বেলা তিনি উত্তরে লিখিলেনঃ—

তোমার সম্বন্ধে কি বিশেষণ প্রয়োগ করিব, ঠাওরাহিতে পারিতেছি না। তোমার ভালবাসা ও তোমার চরিত্র আমায় অভিভূত করিয়া ফেলে। তোমাকে পরীক্ষা করিতে আমি অক্ষম। তুমি নিজে নিজের যে পরীক্ষা করিয়াছ, তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি এবং তোমার পিতার পদ গ্রহণ করিতেছি। আমার লোভ তুমি প্রায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছ। আমি বিশ্বাস করি যে, খাঁটি পিতা নিজের অপেক্ষা বিশেষ চরিত্রবান পুত্র উৎপন্ন করিয়া থাকে। পিতা যাহা করিয়াছে যে পুত্র তাহা আরও অধিক অগ্রসর করিয়া দেন সে-ই যথার্থ পুত্র। পিতা সত্যবাদী, দৃঢ়, দয়াময় হইলে পুত্রে এই সব গুণ বিশেষভাবে বর্তিয়া থাকে। তোমাতে তাহা দেখিতেছি। আমার প্রযত্নে তাহা তুমি পাইয়াছ, একথা আমি মনে করি না। অতএব তুমি যে আমাকে পিতৃপদ দিয়াছ, তাহা আমি তোমার ভাল-বাসার দান বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ঐ পদের যোগ্য হওয়ার প্রযত্ন করিব, আর যখন আমি হিরণ্যকশিপু বলিয়া প্রমাণিত

---

* গোরখনাথ ও মছন্দরনাথ নাথ যোগী-সম্প্রদায়ের গুরু। গোরখনাথের নাম হইতে গোরখপুরের নাম হইয়াছে। গোরখনাথ মছন্দরনাথের শিষ্য। মছন্দর নাথ একবার মায়ার ফাঁদে পড়েন। নিজ যোগবলে গোরখ-নাথ মছন্দর নাথকে উদ্ধার করেন। এই কাহিনী হইতে এই লোকোক্তির উদ্ভব। যে স্থলে শিষ্যের প্রতিভা গুরুর প্রতিভাকে ছাড়াইয়া যায় সে স্থলে এই লোকোক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হইব, তখন ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় আমার আদর-অনাদর করিও।

আশ্রমের বাহিরে থাকিয়া আশ্রমের নিয়ম তুমি যে ভালভাবে পালন করিয়াছ, তোমার একথা ঠিক। তোমার আশ্রমে আমার বিষয়ে আমার কোন সংশয় ছিল না। তোমার খবর মামা (ফড়কে) আমায় পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন আর তোমার হাতে ভারতের উন্নতি হউক, ইহা আমার কামনা।

তোমার আহারে কোনরূপ পরিবর্তন করার মত কিছু এখন আমি দেখিতে পাইতেছি না। দুধ এখনই যেন ছাড়িও না। উল্টা, আবশ্যকবোধে আরও অধিক পরিমাণে খাইবে।

রেল-সত্যাগ্রহের আবশ্যকতা এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উহার জন্য জ্ঞানী প্রচারকের দরকার আছে। খেড়াতে হয়ত সত্যাগ্রহ করার প্রয়োজন হইবে। এখন ত আমি কেবলই ঘুরিতেছি। দুই-একদিন মধ্যে দিল্লী যাইব।

সবিশেষ সাক্ষাৎ মত। তোমার জন্য সবে পথ চাহিয়া আছে।

—বাপুর আশীর্বাদ

পরে বাপু কহিলেন—"মস্ত বড় মানুষ। মহারাষ্ট্রীয় ও মাদ্রাজীদের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ একথা বরাবর আমার মনে হইয়াছে। মাদ্রাজী এখন নাই; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের কেহ আমাকে কখনও নিরাশ করে নাই। তাহাদের মধ্যে বিনোবা ত হদ্দ করিয়াছে!"

* * *

১৯-৯-৩২

বিনোবার পত্র এই সময়ে আসিল। উহাতে তাঁহার গ্রাম-প্রচারের বিবরণ ছিল। 'কলিঃ শয়ানো ভবতি', উক্তি করিয়া কৃত-যুগে (সত্যযুগে) ভ্রমণ ধর্ম আর আমাদের কৃতযুগী হইতে হইবে, এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাপু উত্তরে লিখিলেনঃ

কৃতযুগী বিনোবা,

তোমার কৃতযুগের ঈর্ষা করার কোনই হেতু আমাদের নাই; তার কারণ আমাদের এখানেও কৃতযুগী সরদার আছেন। অতএব (আমরা) তোমা অপেক্ষা অন্তত এক বিঘৎ আগে বাড়িয়া রহিয়াছি, নয় কি? তোমার জানা আছে যে সরদার অধিকাংশ সময়ই ভ্রমণ করেন। যদি সম্ভব হইত খাইতেনও তিনি চলিতে চলিতে, আর সুতাও কাটিতেন চলিতে চলিতে। বৃদ্ধ বয়সে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি গীতা আবৃত্তি করেন। উচ্চারণের নিমিত্ত তাঁহাকে তোমার কাছে পাঠাইতে হয়, আর তোমার হাতে দিতে হয় এক গাছি বেত। কিন্তু সে অবসর তোমার থাকিলো না!

দেখিতেছি, গরীবদের ফুসলাইতে তুমি ওস্তাদ! আমার মত গরীব যখন তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় থাকে, তখন ত তাহা তাহাকে লিখিতে নাই, আর যখন সে মৃত্যুশয্যায় শুইতে যাইবে, তখন তাহাকে লিখিবে, এবার আরম্ভ করিলাম, নিয়মিত লিখিব'। কিন্তু জানেন ভগবান, কৃতযুগী-দের কোন প্রতিজ্ঞা মিথ্যা যায় না। তাই পাছে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই জন্যই হয়ত বিছানা হইতে আমায় উঠিতে হইবে। যাক্, তোমার পত্র নিয়মিত পাইব এই আশায় থাকিলাম।

এমন পরিহাসচ্ছলে গুরুগম্ভীর পত্র লিখিতেছি। পরিহাস হইতে মন সরাইয়া লইলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনকে বলিলাম যে তোমার কাজের কোথাও কিছু সমালোচনা করার মত নাই। বলিতে যদি কিছু হয়-ই ত বলিব যে এই অগ্নি-পরীক্ষায় দেব ও জীব এই দুই পারের মিলন হইবে। আর কিছু লেখার থাকে ত লিখিব। পত্র এখানে শেষ করিতেছি।

* * *

১-১-৩৩

বিনোবার হৃদয়স্পর্শী পত্র আসিলঃ

পূজ্য বাপুজীর পবিত্র সমীপে,

নালবাড়ি ওয়ার্ধা হইতে দেড় মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অধিবাসী সবই হরিজন। ২৫শে হরি-ভরসা করিয়া ঐ গ্রামে যাইয়া বসিব। ওয়ার্ধা আশ্রমের (প্রতিষ্ঠার) বার বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে। এক সত্র (সত্র=বহুদিনব্যাপী যজ্ঞ) সমাপ্ত হইল। উত্তম অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। কর্তৃত্বের ভাব কাটিয়া গিয়াছে। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, এই বোধ জাগ্রত হইয়াছে। এত বৎসর ওয়ার্ধায় থাকিতাম না, আপনার আজ্ঞায় রহিয়াছি। আপনার আশীর্বাদ ছাড়া এ জগতে আর সব শূন্য। একথা বলিতে পারি যে এই বার বৎসর সকল ব্রত পালন করার সতত প্রযত্ন করিয়াছি। তাহা হইলেও নিজেতে বহু অপূর্ণতা রহিয়াছে। ঈশ্বরে আমার যতটা ভক্তি, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ঈশ্বরকৃপা আমি লাভ করিয়াছি।

আমি জানি, আপনার আশীর্বাদ আমাকে ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলেও, উহা যাচ্ঞা করার নিমিত্তই এই পত্র লিখিলাম। আপনার তুচ্ছ কর্মীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। আপনার মহাযজ্ঞে আহুতি হওয়ার যোগ্যতা উহাকে ঈশ্বরের কাছ হইতে লইয়া দিন। ভবিষ্যতের জন্য কোন নির্দেশ দেওয়ার থাকে ত তাহাও দিবেন।

বিনোবার দণ্ডবৎ প্রণাম দৃষ্টত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, বিনোবার কুসুম অপেক্ষা কোমল হৃদয় হইতে নির্গত সুমন হইতে মধুর আর কি হইতে পারে? 'ধর্মমণি-মীন' শীর্ষক ভজন গাইতে গাইতে অনেক সময় বাপুর ভক্তমালের মণি গণনা করার সাধ আমার হয় আর তাঁহাদের মধ্যে তপোধন বিনোবাকে শীর্ষ স্থান দিতে বিশেষ সংকোচ কখনও হয় নাই। এইরূপ মানুষ যতদিন থাকিবে ততদিন বাপুর পতাকা উড্ডীন থাকিবে, ইহাতে কি আর কোন সংশয় আছে? বেচারা হরিজনদের ক'জন আর বিনোবাকে চিনে? হরিজনেরা না জানিলে কি হয়, হরি ত জানেন। তবে আর ভাবনা কি?

এই পত্রের জবাবে বাপু-বাৎসল্যে অশ্রু-আর্দ্র পত্র লিখিলেনঃ

চিরঞ্জীব বিনোবা,

"তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধায় চক্ষু আনন্দাশ্রুতে আর্দ্র হয়। আমি ইহার যোগ্য হই বা না হই, কিন্তু তোমাতে ত তাহা ফলপ্রসূ হইবেই। তুমি মহৎ সেবার নিমিত্ত হইবে। নালবাড়ি গিয়াছ, ঠিকই হইয়াছে।

ভবিষ্যতের কথায় এখন ইহাই বলিবঃ দুধ ত্যাগের জিদ না করিয়া শরীর রক্ষা করিবে। অস্পৃশ্যতা-নিবারণাদি কর্ম আজিকার স্বধর্ম। আমি যাহা লিখি তাহা সময় করিয়া পড়িও। বেশী ত লিখি না। আমাকে পত্র দিতে ভুলিবে না। সপ্তাহে একখানাতেই তুষ্ট।"

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

রঞ্জন

গল্প লেখা যাঁদের কাছে নিঃশ্বাস নেয়ার মতো সহজ ও স্বাভাবিক সেই ভাগ্যবানদের কথা আলাদা। তাঁরা এ সম্বন্ধে সাধারণত সচেতনই নন। কাহিনী তাঁদের খুঁজে বেড়াতে হয় না, অন্ধকার ঘরে কালো বিড়াল খোঁজার মতো। সহস্র সাধারণ ঘটনা ও অবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে গল্প তাঁদের চোখে আপনি জ্বলে ওঠে, জোনাকির মতো। সেই গল্পের প্রকাশের জন্যেও তাঁদের শব্দ সন্ধান করে ফিরতে হয় না, মেয়ের বর খোঁজার মতো।

কিন্তু এমন দুর্ভাগাও আছে যারা প্রায় গল্প-কানা, যাদের সৃষ্টিশীল দৃষ্টি-শক্তি এত ক্ষীণ যে, তাদের গল্প-লেখা যেন দাবা খেলা, যাদের শব্দ-কান এত শুচিবাইগ্রস্ত যে, প্রতিটি বাক্যকে সাধ্য-মতো নিখুঁত না করে তাদের শান্তি নেই, যাদের আয়াসনির্ভর রচনাশক্তি এতই প্রেরণাপঙ্গু যে, প্রতিক্ষণ তাদের পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগুতে হয়। সাহিত্যরচনা তাদের কাছে স্বেচ্ছাবৃত সশ্রম কারাদণ্ড। যত্ন ও ক্লেশ আছে বলেই তারা লেখার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বকথিত ভাগ্যবানদের চাইতে সজ্ঞান ও সচেতন। দুটি ফরাসি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। জঁ কক্তো তাঁর একটা ছবি করবার সময় দিন-লিপি রেখেছিলেন, পরে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। আঁদ্রে জিদ তাঁর একটি উপন্যাসের দিনপঞ্জী রেখেছিলেন, তারও পাঠকসংখ্যা কম নয়।

পাঠক সাধারণত লেখককে দেখেন সেই বেশে যেমন অভিনেতা আসেন দর্শকের সামনে। রূপসজ্জাবিরহিত লেখকের সাক্ষাৎ মেলে তাঁর বইয়ের মঞ্চের পশ্চাতে, তাঁর সবুজ ঘরে। তাই যদি কোনো উদার শিল্পী বাইরের লোকদের তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার দেন, যেমন জিদ ও কক্তো দিয়েছেন, তাহলে তাঁর নিমন্ত্রণ সধন্যবাদে গ্রহণ না করবার কারণ দেখিনে।

*

জিদের অলজ্জ সততা আমার নেই, কক্তোর প্রদর্শনপ্রবণতাও নেই। কিন্তু— *trumpet and fanfare off stage*— আমি সম্প্রতি একটি উপন্যাসরচনা শেষ করেছি। এক মাস পরেও আঙুলে এখনও ব্যথা আছে, কপালে স্বেদবিন্দু। প্রথমটা টাইপরাইটার নেই বলে। কিন্তু দ্বিতীয়টা? সহস্র সমস্যা।

এক, গল্পের শেষ কোথায়? জেমস ব্রাইডিকে একবার নাকি এক সমালোচক বলেছিলেন, 'আপনার নাটকের আরম্ভটা সর্বদা চমৎকার, কিন্তু অন্তিম তৃতীয় অঙ্কটা কেমন যেন—'। ব্রাইডি বলে-ছিলেন, 'ঠিক তাই, কিন্তু বন্ধু, ঈশ্বর ছাড়া উত্তম অন্তিম অঙ্ক কেউ কি লিখতে পারে?' সমস্যা অসমাহিত।

সমাপ্তির সমস্যা ঈশ্বরের হাতে তুলে দিলেও আগেকার অনেক সমস্যা থেকে যায়। যথা লেখক নিজকে নিয়ে কী করবে? লেখকের তো শুধু এক জোড়া চোখ নেই; একটা মাথা আছে যা ভাবে, একটা মন আছে যা আনন্দ ও বেদনার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। উপ-ন্যাসের নানা চরিত্রের সুখদুঃখের নির্লিপ্ত দর্শক হতে যে অপরিসীম আত্মাবলোপন-প্রতিভার প্রয়োজন তার দৈন্য আমার মধ্যে পদে পদে লক্ষ্য করেছি। শুধু তাই নয়, উপন্যাসরচনায় ভূরি পরিমাণ হৃদয়-হীনতাও বোধহয় অপরিহার্য। পার্শ্ব-চরিত্রদের নিয়ে কী করব? কবির প্রবন্ধের পরে উর্মিলাকে কী করে অবহেলা করি? অনসূয়াকে উপেক্ষা? অথচ না করে উপায় নেই। নায়ক-নায়িকা নিয়েও সমস্যার অন্ত নেই। একান্ত বর্বরের ভাষার প্রয়োজন নেই; একান্ত সভ্য যে তার কাছে অনেকগুলি অনুভূতিকে ভাষা দেয়ার মানে বর্বরের স্তরে অবতরণ। সেগুলি বোঝাব কি করে? বর্ণনা দিয়ে? সে তো হবে কার্ডিয়াক স্পেশালিস্টের রিপোর্ট। হৃদয়ের পরিচয় কোথায়? যাহা মোর অনির্বচনীয়, উপন্যাসে তার স্থান কোথায়?

যা বলা হয় তাকে লিপিবদ্ধ করাও অবশ্য বাঙলা ঔপন্যাসিকের সমস্যা। কেরাণী শ্রেণী ও তদূর্ধ্ব সবাই আমরা প্রতিবাক্যে এত বেশি ইংরেজী শব্দ কারণে-অকারণে প্রত্যহ ব্যবহার করি যে, তা যথাযথ লিখিত হলে বাঙলা উপন্যাস কোনো কোনো কলেজের দোভাষী ম্যাগাজিনের চেয়েও হাস্যকর হবে। অথ যদি আমি আমার নায়িকাকে দিয়ে বাঙলা বলাই, 'ক্ষমা করবেন, আমি সত্যি আ আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব কেননা আমি আজ বেশ একটু অসুস্থ তাহলে সে কি অত্যন্ত কৃত্রিম শোনা না? এই 'কৃত্রিম' কথাটাও বোধহ 'আর্টিফিশ্যাল' লিখলে বেশি ন্যাচের শোনাতো! তবু বাঙলা উপন্যাসে সংলা বাঙলা করতে হবে; তাকে জীবন্ত, সত ও স্বাভাবিক শোনাতে হবে। বেশি ইংরেজি শব্দ থাকলে পাঠক (বেশি ক পাঠিকা) বলবেন, অত ইংরেজি ফলানে কেন? ওগুলির বাঙলা অনুবাদ করলে সমালোচক বলবেন, সবগুলি চরিত্র এমন অমিত রায়ের মতো বানানো কথা বলে কেন?

*

আরেকটা সমস্যা আছে যেটার বোধহয় কোনো সমাধানই নেই। সমস্যাটা ধারা-বাহিকতার। সাড়ে সাত শ পাতার বৃহৎ উপন্যাস কেন, দেড় শ পাতার বড়ো গল্পও (যা আমি লিখেছি) কারো পক্ষে একটানা এক সঙ্গে লিখে ফেলা সম্ভব নয়। দশ পাতার পরে খেতে হবে এবং তরকারীতে হয়তো দুটো লংকা বেশি পড়েছে। দুপুরে অফিসে যেতে হবে, এবং সেখানে হয়তো দুঃসংবাদ অপেক্ষা করে আছে। বিকালে দেখা হোলো এমন লোকের সঙ্গে যাকে দেখলে মানবজাতির প্রতি সামান্য-তম শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব, দেখা হোলো এমন মানবীর সঙ্গে যার অপরার্ধ হয়তো কল্পনা না হয়ে হোলো দুঃস্বপ্ন। এসবের পরে রাত্রে আবার লিখতে বসে নায়ককে কি অন্য আলোয় দেখতে হবে না? নায়িকাকে অন্য বেশে? অথচ প্রতি দশ পাতায় নায়ক-নায়িকার আমূল পরিবর্তন ঘটলে পূর্ণাঙ্গ একটি উপন্যাস রচিত হবে কী করে?

উপন্যাস শেষ করেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় নেই। শেষ কথাটি লেখা হলেই লেখকের নিজেকে অকস্মাৎ অবিশ্বাস্যরকম নিঃসঙ্গ মনে হবে। ছাপা-খানার তপ্ত সীসা শীতল হয়ে আমার গত কয়েক মাসের দিবারাত্রির সাথীদের আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে।

দুঃসহ নিঃসঙ্গতায় তাই আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

আমার রসের দীক্ষা হয়েছিলো ছেলেবেলায়, তখন আমার সাত আট বছর বয়স। সেকালে আমরা কলকাতাবাসী হলেও, অধিকাংশ সময়ে আমার মামার বাড়ি, রাজীবপুরে থাকতুম। রাজীবপুর গ্রামটি আজও আমার স্মৃতিতে সোনা হয়ে আছে। রাজীবপুরের সকল ভাবনা আমার সোনার ভাবনা।

আর, একটি নবীনা বৈষ্ণবী আমার সেই সোনার ভাবনার অঙ্গ। জানি না তার কি নাম ও কতো বয়স। কিন্তু সে আমার অন্তর্দৃষ্টিতে তার সেই নবীনতায় থেমে আছে। আজও তার মাধুর্য থেকে থেকে আমার চোখের সামনে টলটল করে ওঠে। বৈষ্ণবী নিত্য আমাদের বাড়িতে ভিক্ষা করতে আসতো, মন্দিরা বাজিয়ে কীর্তন গাইতো। তার স্বর ও সুর আমার অসহ্য ছিলো। যেখানেই থাকি না কেনো তার সাড়া পেলে ছুটে এসে শ্রবণময় হয়ে আমি তার গান শুনতুম। আমার গানের হাতে-খড়ি তার কাছেঃ

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।
সে সব দুখ কিছু না গণি
তোমার কুশলে কুশল মানি॥

বৈষ্ণবীর বাটালি-কাটা শ্যামল মুখ, উজ্জ্বল বড়ো বড়ো চোখ, পরিপূর্ণ দেহ, নাকে রসকলি। তাকে মনে পড়লে এখন তার লাবণ্য ও মাধুর্যের পরতটাই মনে পড়ে। মাধুর্য তার ছটা।

আমার চার দিদিমা। ছোট যিনি, তখন তাঁর বয়স অল্প। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন এবং আমার বৈষ্ণবীপ্রীতির কথাটা জানতেন। তিনিই কেবল বৈষ্ণবীকে কিছু বলতেন না। সে এলে তিনি খিড়কি দরজা থেকে আমাকে ডাক দিতেন, ওরে শিগ্‌গীর আয়, তোর বুন্টুমী এসেছে। পুকুরের মাঝখান অথবা পেয়ারা গাছের মগডাল থেকে আমি তখুনি ছুটে আসতুম। বৈষ্ণবী মিষ্টি হেসে নূতন করে গান ধরতোঃ

তুমি যারে হিয়ায় রেখে নয়নের প্রহরা দিতে।
বল বল বঁধু কোন পরাণে কেমন করে
পাসরিলে রাই-মুখ-ইন্দু।

মন্দিরার ঝঙ্কার তুলে সে আখর দিতো—

রাধানাথ আর বলব না কো
ও কুব্জার হরি।
ও লম্পট তুমি—

আমি প্রথমটার মতো এ গানটারও

সুর ও রস সবই গিলেছিলুম। আমার তন্ময়তা দেখে ছোট দিদিমণি বলতেন, ছেলেটা গেলো! বৈষ্ণবীকে বলতেন, তুই একে নিয়ে যা রে! না হলে ওর রসের বোঝা আমাকেই বয়ে মরতে হবে। পরে আমার নবযৌবন কালে এই ছোট দিদিমণিই ফুলশয্যা থেকে আরম্ভ করে তার জীবনের নানা প্রেমসন্ধিক্ষণের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে আমার পরকালটি ঝরঝরে করেছিলেন।

বৈষ্ণবী মৃদু হেসে বলতো, যাবে খোকা আমার সঙ্গে? এস।

অন্য দিদিমারা, বিশেষ করে বড় দিদিমণি কিন্তু বৈষ্ণবীকে দেখলেই গর্জন করে উঠতেন, তোকে না হাজার বার বলেছি, পোড়ারমুখি, যে আমাদের বাড়িতে আসবিনে! আমি এক পাল সোমত্ত ছেলে নিয়ে ঘর করি। দূর হ তুই এ বাড়ী থেকে।

বৈষ্ণবী মুখ টিপে হাসতো, কিছু বলতো না। তার আসাও কোনদিন বন্ধ হোত না। তর্জন করলেও, এই দিদিমারা তাকে সযত্নে সিধে সাজিয়ে দিতেন; পালপার্বণে শাড়ি টাকা দিতেন। আড়ালে তাঁদের বৈষ্ণবীর ওপর মায়াও দেখেছি। কিছুদিন সে না এলে তাঁরা উতলা হতেন। বোধ করি সব বাঙালী মেয়েদের এ রহস্যময়ীদের প্রতি একটু টান আছে। ভুল বল্লুম, তখন অন্তত ছিলো। এখন আছে কি না আমি জানি না।

কি করে যে বৈষ্ণবী আমার চন্দ্রপুলি ও নারকেল নাড়ুর প্রতি নিদারুণ লোভের কথাটা জেনেছিলো, তা আমার জানা নেই। আজও আমার সে আকর্ষণটা যায়নি এবং প্রত্যেকটি নাড়ু ও চন্দ্রপুলির সহিত আমার সে বৈষ্ণবী মাখানো থাকে। সে আমাকে প্রায়ই চুপি চুপি বলে যেতো, অ খোকা, আজ তোমার জন্যে চন্দ্রপুলি আর নাড়ু করেছি, আমাদের বাড়ি যেও।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে তাদের বসতি। তার সঙ্গে এবং একলাও আমি নিত্য তার বাড়ি যেতুম। সঙ্গে গেলে পাড়া পার হয়ে কোন বাগান বা মাঠের ধারে গেলেই আমি তার মন্দিরা নিয়ে বাজাতুম, বলতুম, তুমি গান গাও। বৈষ্ণবী জানতো কোন গানটা গাইতে হবে। মাঠ বেয়ে আমাদের মিলিত সুর ভেসে যেতো।

তুমি যারে হিয়ায় রেখে নয়নের প্রহরা দিতে—

তাদের আখড়ায় জন তিনেক পুরুষ এবং আরো একজন বৈষ্ণবী। গোটা তিনেক চালাঘর, তার একটাতে যুগলমূর্তি। আমি অনেক দেশ বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন মনোরম প্রশান্ত স্থান আমি আর দেখিনি। আমার কাছে সেইটুকুই বাঙলা দেশের প্রতীক। বাঙলা দেশের ভুবনমোহিনী রূপের সার।

বলতে ভুলেছি যে বৈষ্ণবী শুধু কীর্তন গাইতো না, দুর্গাপুজো এলে আগমনী ও বিদায়ের গানও গেয়ে বেড়াতো। তার একটা গান আমার আজও মনে আছে। প্রত্যেকটি পুজোর সময়ে সেই বৈষ্ণবী আমার মনের ভেতরে এসে গেয়ে যায়।

নবমী নিশি গো
তুমি আর যেন পোহাওনা।
তুমি গেলে আমার উমা যাবে
নয়ন জল আর ফুরাবে না।

এ গানটা মনে হলেই আমার বৈষ্ণবীর সেই ঘর, ঘরের পিছনে ভরা ধানের ক্ষেতে সোনালি আলোর বিশ্বসুন্দর-করা হিল্লোল মনে পড়ে যায়। অকারণে আমার শ্বাস ফুলে ওঠে, চোখে জল আসে, গলায় বেদনা হয়। আমি উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বসেও অনেক বৈঠকী আগমনী শুনেছি, কিন্তু বাঙলার সেই শরৎপ্রসন্ন আকাশ, শরতের সেই সোনালি মায়া-আলো, সেই আনন্দ-বিদায়ের প্রগাঢ় রসসিক্ত পল্লীসমীরণ হতে বিযুক্ত বলে ও গান এ দেশে প্রাণ পায় না।

আমি যতো নারকেল নাড়ু ও চন্দ্রপুলি খেয়েছি তার অধিকাংশটা বোধ করি বৈষ্ণবীর হাতের তৈরী। খাওয়ানো ছাড়া সে প্রায়ই আমার নাকে রসকলি এঁকে দিতো, আমি বৈষ্ণব হয়ে যেতুম। কিন্তু রসকলি নিয়ে আমার বাড়ি যাবার সাহস হোত না, জানতুম যে ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং রসকলি পরে যতক্ষণ পারি আমি আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াতুম। সেটা মুছে ফেলতে বাধ্য হলে আমার মনে বেদনা হোত। তবুও কোনদিন নাকে একটু চন্দনচিহ্ন থেকে গেলে, অথবা বৈষ্ণবীর বাড়ি গিয়েছি এ কথা প্রকাশ পেলে আমাকে বেশ শাস্তি ভোগ করতে হোত।

হয়তো আমি সোমত্ত হয়ে উঠছি ভেবে শাসিকারা আমাকে শাসন করতেন। ছোট দিদিমণি নিত্য আমাকে প্রহারের হাত থেকে উদ্ধার করতেন; শাসিকাদের বলতেন, আহা, গেলই বা একটু! সকাল সকাল রসের টিকেটা নিয়ে রাখা ভালো, সেজদি! গাঁয়ে এমন কোন পুরুষ আছে যার বষ্টুমীকে দেখলে একটু মন তাতেনা তা বলতে পারো?

সেজদি আমার নিজের দিদিমা। তিনি বলতেন, তুই আর জ্বালাসনে, ছোট বৌ! এবার সে ছুঁড়ি এলে আমি তাকে ঝাঁটাপেটা করবো।

ছোট দিদিমণি আমাকে বলতেন, তুই আমার সঙ্গে আয় ভাই। আমি তোর বষ্টুমী হবো। কিন্তু অমন গান তো গাইতে পারবো না! তবে চন্দ্রপুলি নিশ্চয়ই খাওয়াতে পারি তোকে।

বৈষ্ণবী প্রায়ই আমাকে বলতো, খোকা, কোন সন্ধ্যায় তুমি আরতি দেখতে এসো না! আসবে? মন ভরে গান শোনাবো।

ছোট দিদিমণিকে সে চুপি চুপি বলতো, আরতির সময়ে খোকাকে নিয়ে একদিন আসুন না মা!

তিনি মুখে কাপড় দিয়ে হাসতেন; বলতেন, তোদের আড্ডায় গিয়ে আমিও বষ্টুমী হয়ে মরি আর কি! বেরো তুই, গেরস্তর বৌকে লোভ দেখাসনি!

একদা আমরা এদেশে চলে এলুম এবং এ আদি পর্বটারও শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু বৈষ্ণবীর কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণে বন্দী হয়ে রইলো।

* * *

আদি পর্ব বল্লুম কারণ আমার জীবন আকস্মিকভাবে আর একটি বৈষ্ণবী পর্বে গিয়ে পড়েছিলো। সে প্রায় বছর পঁচিশ পরের কথা। একদিন আমি সংসারে একা হয়ে গেলুম। ভাবলুম, যখন আমাকে একাই হতে হোল তখন আর সংসার না পেতে তার আশেপাশে পথিক হয়ে থেকে সংসারলীলাটা দেখে বেড়ানো শ্রেষ্ঠতর কথা। পিতাঠাকুরের কৃপায় আমার যথেষ্ট পাথের সঞ্চিত ছিলো এবং ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়লে বিশ্রাম করবার জন্য একটা স্থায়ী আশ্রয়ও ছিলো।

সেবার কলকাতা থেকে ফিরছি। বাছাই করে অতিশয় মন্থরগতি রেল-

গাড়িতে ওঠা আমার রীতি। জীবনে আমার যখন কোন তাগিদই নেই, তখন শশব্যস্ত গৃহস্থের মতো তাড়াতাড়ি করার কি প্রয়োজন! একটা ছোট বাক্স ও ছোট একটা বিছানার বাণ্ডিল আমার পথের সাথী। রেলগাড়িতে বসে যে স্থানটা আমার ভালো লাগে, আমি সেইখানে নেমে পড়ি। কলকাতা থেকে পনর-ষোল ঘণ্টায় এলাহাবাদে আসা যায়। কিন্তু আমার আসতে দু' তিন মাসও লাগে।

কলকাতা ছাড়বার দিন কুড়ি-বাইশ পরে এক সকালে গাড়িটা এসে সাসা-রামে দাঁড়ালো। অদূরে একটা দীঘির তীরে শের শাহের মকবরা। অনেকবার সেটা গাড়ি থেকেই দেখেছি, তার কাছে যাওয়া হয়নি। গাড়িটা তখন ছাড়ছে। হঠাৎ আমার মনে হোল, সাসারামে নামা যাক, নামলুমও তখনি। শহরে গিয়ে ধর্মশালায় একটা ঘর ঠিক করে আমি পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লুম। ভোজন যে-কোন দোকানে হতে পারে, খাবার ভাবনাটা আমার ছিলো না। শের শাহের মকবরা দেখলুম। দীঘির ভাঙা ঘাটে বসে স্বতঃই সে বীরের কথা, তাঁর কালিন্ধরের যুদ্ধের কথা একটু কল্পনা করলুম। তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

একটা মাঝারি রাস্তার ধারে একান্তে একটা চুণকাম-করা ছোট দোতালা বাড়ি। দেখি তার দরজায় একটা কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে, ডাক্তার মদনমোহন ঘোষ, এম বি বি এস। নামটা দেখে আমি চমকে উঠলুম। বাঙালী নাম বলে নয়, চমকাবার কারণ, নামটা আমার প্রিয়তমজনের, আমার জীবনবন্ধুর। বছর কয়েক থেকে সে হারিয়ে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ কতো কি আমার মনে পড়ে গেলো।

ইস্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত মদন ও আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম। তারপর সে ডাক্তার হোল, আর, আমি হলুম লক্ষ্মী-ছাড়া ভবঘুরে। মদনের মদনমোহন রূপেই ছিলো, আর ছিলো গান গাইবার অপার্থিব ক্ষমতা। অমন মুগ্ধকরা গান বহু সৌভাগ্য না থাকলে শুনতে পাওয়া যায় না। বোধ করি দশ লাখ্ গাইয়ের মধ্যে একজন হয়তো অমন গান গাইতে পারে। আর বোধহয় মদনের মতো গায়ককেই লোকে পাপভ্রষ্ট কিন্নর বলে। কিন্তু ওই গানই মদনের কাল হোল। গানের জ্বালায় এলাহাবাদে তার এক-পয়সারও পশার হয়নি। হবে কোথা থেকে! সকাল বিকেল, রাত্রি, যখন-তখন লোকে তাকে গান গাইতে ধরে নিয়ে যেতো। তাছাড়া, কোথাও কেউ গালিব গাইছে, মদন সেখানে চোখ বুজিয়ে বসে আছে। জান্‌কী বাঈ কোনো আসরে ভৈরবী গাইবে, আমাদের মদনমোহন রাত বারোটা থেকে সে আসরে উপস্থিত। আর সে নিজে তো হোলি, পিলু, পরজ, সিন্ধু কাফির পরম আর্টিস্ট ছিলো। ওস্তাদেরা তার সে সব শুনলে মাথা নত করতো।

ইদানী মদন প্রায়ই আমাকে বলতো, দেখ্, গানের জ্বালায় আমি আজ পর্যন্ত একটা পয়সাও ঘরে নিয়ে যেতে পারিনি, কেবল দাদার অন্নধ্বংস করছি। দাদা বৌদিও এমন যে একদিনও সেজন্য মুখ বিরস করে না, উল্টে গান শুনলে মত্ত হয়ে যায়। এবার আমি পালাবো। এমন দেশে যাবো যেখানে গান নেই। সত্যই, কাউকে কিছু না বলে মদন একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো।

সে যা হোক। নামটার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আমি বাড়িটার রকে উঠলুম। ডাক্তারের বাড়ি, সামনের ঘরটায় রোগী যাওয়া আসা করছে। আমি চিক তুলে ভেতরে গিয়ে ডাক্তারকে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। মদনই তো! কিন্তু তাকে দেখে অবাক হইনি, হলুম তার বেশভূষা দেখে। সে বিলক্ষণ সৌখিন ও কাপুড়ে-বাবু ছিলো। তার পরনে ইংরিজি বেশ, কিন্তু নাকে তিলক, মাথার পিছনে গাঁঠ-বাঁধা শিখা, কানমোড়া শক্ত কলারের ভেতর থেকে তুলসীমালা উঁকি দিচ্ছে।

সে আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলে, বল্লে, এ বনবাসে তুই কোথা থেকে এলি? কিন্তু এতো করে দেখছিস্ কি?

আমি বল্লুম, দেখচি তোকে। তোকে পাবো তা আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু তোর সাজটা আশ্চর্য বৈকি!

আমাকে বসিয়ে সেও বসলো; বল্লে, ও-কথা এখন থাক। তোর জিনিসপত্র কই? উঠেছিস কোথায়?

আমি বল্লুম, ভবঘুরে যেখানে ওঠে, ধর্মশালায়।

চল্ তোর জিনিস আনিগে। রোগী-দের অপেক্ষা করতে বলে সে বাইসিক্ল বার করলে। আমরা দুজনে তাতে সওয়ার হয়ে ধর্মশালায় গেলুম। আমি ফিরলুম একটা এক্কায়।

বাড়ি ফিরে আমার হাত ধরে সে ভেতরে নিয়ে গেলো, বল্লে, আয়, যথা-স্থানে তোকে সঁপে দিয়ে যাই। বাইরের ঘরটা পার হয়েই ছোট উঠোন-ঘেরা দালান। সেখান থেকে সে ডাক দিলে, চন্দ্রা, দেখে যাও, কাকে ধরে এনেছি!

ভেতর থেকে সাড়া এলো, যাই গো!

সামনের একটা ঘর থেকে চন্দ্রা বেরিয়ে এলো। তারও নাকে রসকলি, রাধাচূড়া করে বাঁধা চুলের ওপর কাপড় টানা। তাকে দেখে চকিতে আমার চোখের সামনে রাজীবপুরের বৈষ্ণবীমিতা মূর্তিমতী হয়ে উঠলো।

মদন চন্দ্রাকে বল্লে, তুমি তো সব জানতে পারো! বলো তো এ কে?

সে মুখ নিচু করে মৃদুস্বরে বল্লে, শচীন ঠাকুরপো। তারপর দুটি হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে, এতোদিনে আপনার দেখা পেলুম।

তার কথায় অবাক্ হয়ে আমি প্রতি নমস্কার করতে ভুলে গেলুম। মদন বাইরে চলে গেলো। চন্দ্রার আহ্বানে আমি একটা ঘরে গিয়ে বসলুম এবং সঙ্কোচ কেটে গেলে তাকে প্রশ্ন করলুম, তুমি আমাকে চিনলে কি করে? তোমাকে 'আপনি' বলবো না তা বলে রাখছি।

আমিও আর বলবো না; বলা উচিতও নয়। চিনলুম? ও'র চোখে আনন্দ দেখে। তাছাড়া, তোমার কথা তো সবই শুনে রেখেছি। চেনা আর শক্ত কোনখানে!

চন্দ্রা এমন করে কথা কইতে লাগলো যেনো আমাদের আজন্ম পরিচয়। একটু পরে সে এক বাটি দুধ ও একটা রেকাবিতে দুটো মিষ্টি নিয়ে এলো, বল্লে, তোমাকে কিন্তু চা খাওয়াতে পারবো না। তোমার খাবার বেশ অসুবিধা হবে নিশ্চয়ই।

আমি বল্লুম, দেখো, ওই ভাবনাটাই আমার নেই। তোমরা যা খাও আমার তা দিয়ে বেশ চলবে।

কথার মাঝে মদন এলো, আমাকে বল্লে; ওরে, কাছেই একটা গাঁয়ে যাচ্ছি, ঘণ্টা দুয়েকে ফিরবো। তুই না হয় নেয়ে খেয়ে নিস।

তাকে শিখা ঢাকা দিয়ে এবং তিলকের ওপর মাথায় হ্যাট পরতে দেখে আমি হেসে ফেল্লুম, বল্লুম, এতোই যদি ছাড়লি, তা হলে ও বিড়ম্বনা আর কেনো!

মদন হাসলো, উত্তর দিলে, ভেখ না হলে ভিক্ষা মেলে না যে ভাই! তারপর চলে গেলো।

চন্দ্রা বল্লে, এসো ঠাকুরপো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দি। আমরা দ্বিতলে গেলুম। ছাতের একদিকে পাশাপাশি দুটো ঘর, একটা ওদের শয়নকক্ষ। অন্যদিকে একটা ছোট একানে ঘর, তাতে শিকল টানা। পাশের ঘরটা দেখিয়ে সে বল্লে, তুমি এটায় থাকবে।

আমি ওদের নিভৃত-বাসে ব্যাঘাত করতে রাজি হলুম না, বল্লুম, নিচের তলাতেই আমাকে থাকতে দিও, আমি ওপর-নিচে করতে পারবো না। তাছাড়া, কালই তো চলে যাবো।

চন্দ্রা এক মুখ হেসে বল্লে, আমার কাছ থেকে পালানো বড়ো শক্ত গো! কাল গেলেই হোল!

যথাকালে মদন বাড়ি ফিরে এলো, আমি ততক্ষণে স্নান করে নিয়েছিলুম। কাপড় বদলে এসে সে আমাকে আগেকার কালের মতো জড়িয়ে ধরে বল্লে, এখন বল্ তোর কথা।

বল্লুম, আমার কোন কথা জমেনি। সেহেতু আমিই গোঁসাইদের কাহিনীটা শুনবো। মদন হাসতে লাগলো।

একটু পরে ওদিক থেকে চন্দ্রার ডাক এলো, তোমরা এস গো!

সেটা ওদের খাবার ঘর। গিয়ে দেখলুম, হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। চন্দ্রা কাছে বসে পাখার বাতাস করতে লাগলো। কেউ কোন কথা কইলে না।

মনে অনেক প্রশ্ন উঠলেও মদনকে আমি কোন কথা জিজ্ঞেসা করলুম না। ওদের নিভৃত জীবন সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করার আমার কিসের অধিকার? তবে সে যদি নিজে থেকে কিছু বলে সে কথা আলাদা। সারা দিনটা প্রায় আমাদের গল্প করে কাটলো। চন্দ্রা মাঝে মাঝে এসে গল্পে যোগ দিলে। কেবল এক সময়ে আমি মদনকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁরে, তোর আগেকার সে গান-গুলো আর গাস্? শোনার ইচ্ছা আছে কিন্তু!

মদন বল্লে, সে সব অনভ্যাসে ভুলে গেছি। তবে অন্য গান শোনাবো এক সময়ে।

সন্ধ্যার সময়ে আমরা বেড়িয়ে ফিরলুম। মদন বল্লে, এইবার ভাই একটু ছুটি দিতে হবে।

নিচের ঘরটা বেশ। বাইরে বাধাহীন মাঠে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমি চন্দ্রার কথাই ভাবছিলুম। রাজীবপুরের বৈষ্ণবী আমার স্মরণে এলো, কিন্তু তার মুখ তেমন মনে পড়লো না, যেনো সেটা ছায়া হয়ে গেছে। আমি কেবল তার সুরে বাঁধা। তবুও যেনো তার ও চন্দ্রার কেমন একটা সাদৃশ্য আছে। খুঁজতে লাগলুম সে সাদৃশ্য কিসের। হঠাৎ আমার কানে কীর্তনের সুর এলো। আমি ভেতরের দালানে উঠে না গিয়ে থাকতে পারলুম না। ছাত থেকে গান ভেসে আসচে। মিলিত কণ্ঠস্বরের একটা মদনের, তা চিনে আমার হর্ষ হোল। অন্যটা নিশ্চয়ই চন্দ্রার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি চন্দ্রার সুরটাকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে কীর্তন থামলো। ওরা নিচে নেমে এলো। দুজনকেই দেখে আমি চমকে উঠলুম। মদনের এ রূপ আমি আগে কখনো দেখিনি। চন্দ্রাকে তো সবে দেখচি, তার সকল রূপ তখনো আমার দেখা হয়নি। ওদের দুজনেরই, বিশেষ করে চন্দ্রার চোখ দুটি যেনো আরতির যুগল প্রদীপ, কেমন যেনো একটা অবর্ণনীয় অপরূপ জ্যোতিতে উজ্জ্বল। চন্দ্রাকে ভালো করে দেখছিলুম, হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে তার ও আমার বৈষ্ণবীমিতার সাদৃশ্য কোথায়। তার মতো চন্দ্রারও দেহ ছাড়িয়ে লাবণ্য ও মাধুর্যের পরতটাই ঝলমল করছে। মনে হোল, সে বৈষ্ণবীর চেয়েও চন্দ্রার মাধুর্যের ছটাটা বেশি উজ্জ্বল। মনে হোল, সে বৈষ্ণবীর চোখেও চন্দ্রার মতো আরতি ছিলো। জানতে ইচ্ছা করছিলো, দিনের বেলার সাদামাটা চন্দ্রা রাত্রে অমন অপরূপা জ্যোতির্ময়ী হোল কি করে!

দুপুরের মতো মদন বা চন্দ্রা আর গল্প করলে না। যেনো ওরা অন্যমনস্ক, তখনো একটা অজ্ঞাত দেশে রয়েছে। যা-হোক, রাত্রের খাওয়া সেরে ওরা বিদায় নিলে। দুধ ফলমূল ওদের রাত্রের আহার।

ঘটনাচক্রে পরদিন মদনের নূতন একটা পরিচয় পেলুম। ডাক্তারের রোগী দেখাটা আমার বেশ লাগে। আমি মদনের কাছে বসেছিলুম। প্রত্যহ তার কাছে পঁচিশ-তিরিশ জন রোগী আসে। কিন্তু সে একটি করে টাকা নিয়ে পাঁচ টাকা হলে আর নেয় না। গাঁয়ে যেতে হলে কেবল এক্কা ভাড়াটা নেয়; শহরের ভেতর বাইসিক্ল তার বাহন। বাড়ির বাইরে তার ফী নেই। সেদিন তার বাইরে যাবার ছিলো না। রোগীরা চলে গেলে আমি এ কথাটা তুল্লুম।

মদন বল্লে, পাঁচ টাকা ও প্রেস্‌ক্রিপ্‌-শনের কমিশন আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি; তাই নিই না। কিন্তু রোগীরা সে সুবিধা পেয়ে ফাঁকি দেয় না। বরং সকাল সকাল এসে প্রথমে টাকা দেবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যায় না, এইখানে রোগী নিয়ে আসে।

সেদিনটা কাটলো। বিকেলে চন্দ্রাকে বল্লুম, কাল বেরিয়ে পড়ি। কি বলো চন্দ্রা?

চন্দ্রা শুধু নিষেধের মাথা নাড়লে। সে নিষেধ অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য।

বোধ করি চন্দ্রার সান্নিধ্যের কারণে বৈষ্ণবীমিতার কথা আমার মনে মুখর হয়ে উঠেছিলো। পরদিন আর আত্মসম্বরণ না করতে পেরে চন্দ্রাকে সে কাহিনীটা বল্লুম। চন্দ্রা বল্লে, ওমা, বলোনি তো ঠাকুরপো যে তুমি চন্দ্রপুলি আর নারকেল নাড়ু ভালোবাসো! আমি তোমাকে খাওয়াবো। তবে এখানকার ভেলি গুড়ে দেশের মতো নারকেল নাড়ু হবে না। কিন্তু আমি চন্দ্রাবলী, চন্দ্রপুলি বেশ গড়তে পারবো। সে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

রাজীবপুরে আমার আরতি দেখা হয়নি, তা আমি কথাপ্রসঙ্গে চন্দ্রাকে বলেছিলুম। সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে বল্লে, আরতি দেখবে, ঠাকুরপো? আমি দেখাবো। আর, আর যে গান তুমি ছেলে-বেলায় শুনেছিলে তাও শোনাবো।

আমি পুলকিত হলুম। আমার মনের কথা চন্দ্রাকে বলে ফেল্লুম,

সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।'

চন্দ্রা আমোদিত হয়ে হেসে উঠলো, বল্লে, হয়তো আর জন্মে আমিই সেই বষ্টুমী ছিলুম, কি বলো ঠাকুরপো?

এমন সময়ে মদন এসে পড়লো। চন্দ্রা তাকে বল্লে, ওগো, ঠাকুরপোর দীক্ষা হয়ে গেছে, তা জানো?

মদন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে কি রে? আমাকে আর কিছু বলতে হোল না। চন্দ্রাই আমার কথা মদনকে বলে গেলো। গান দুটোর কথা বলতেই মদন গুণগুণ করে গেয়ে উঠলো, "তুমি যারে হিয়ায় রেখে নয়নের প্রহরা দিতে—"

এ কি হোল? চন্দ্রাও তাতে যোগ দিলে। সে কি গান? তা শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আমি কোন বিশেষণ বা অলঙ্কার দিয়ে সে গানের বর্ণনা করবার চেষ্টা করবো না। সুরের, সুন্দরের, রসের বর্ণনা হয় না। হয়তো এই চন্দ্রাই সেই কৃষ্ণলীলার কালে চন্দ্রাবলী রূপে রাধার বিরহবেদনায় বিমথিত হয়ে কুব্জা-প্রীতির জন্য ওই গান গেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্কার দিয়েছিলো।

ওরা দুজনে বোধ করি এবার আমাকে মনে ঠাঁই দিলে। সন্ধ্যার পর চন্দ্রা আমাকে বল্লে, ঠাকুরপো, স্নান করে ওপরে এসো। আমি তাড়াতাড়ি ওপরে গেলুম। মদন ও চন্দ্রা সেই একানে ছোট ঘরটায় রয়েছে, সেটাই ওদের ঠাকুর ঘর। বেদীর ওপর রাধামদন বিগ্রহ। আমাকে দেখে চন্দ্রা মৃদুস্বরে বল্লে, ভেতরে এসো। আমি গিয়ে দেওয়ালের কাছে একটা আসনে বসলুম। সেখানে পূজার কোনই উপকরণ নেই। ওরা দুজনে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো। আমিও দাঁড়ালুম। মদনের হাতে মন্দিরা। ওদের দুজনেরই তখন বিগ্রহের পানে নিষ্পলক দৃষ্টি। ওদের দৃষ্টিতে আরতির প্রদীপ জ্বলছে। হিয়ার আরতি বোধ করি একেই বলে। চন্দ্রা একটু পরে গাইতে আরম্ভ করলেঃ

হৃদি-কুঞ্জ দুয়ারটি খুলে ঐ দেখ না সই
ও এল কে।
চির আঁধার কুঞ্জে গো মোর এমন প্রদীপ
জ্বাললে কে॥
এমন প্রদীপ জ্বাললে কে গো এমন আলো
করলে কে।
(আমি একে) কাঙালিনী তাই নয়নহীনা
আমারে তো কেউ চেনে না
আজ কার চরণের পরশ পেয়ে
আমার প্রাণটি নেচে উঠেছে॥
আমার ঘরটি ভরা আবর্জনা
তায় নাইক কোন সেজ বিছানা
কিবা দিবি সই বসতে আসন
আমার এই মরমখানা বিছিয়ে দে॥
কোথা পাব গো স্বর্ণ ঝারি
কোথা যাবি বা তুই আনতে বারি
আমার এই বিরামহীন নয়ন ধারায়
ও রাঙা চরণ দুটি ধুয়ে নে।
চরণ দুটি নিয়ে আমার রুক্ষ্ম কেশে
মুছিয়ে নে।

যার শুভ আগমনে
ফুটল ফুল এ শুকন বনে
আমি জেনেছি সই প্রাণে প্রাণে
আমার সেই শ্যাম নাগর এসেছে।

শুনেছি গান নাকি সাধনার অঙ্গ, গান দিয়ে অনেক ভক্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। কে জানে! চন্দ্রার এ গান বাচনিক হয়েও অনির্বচনীয়, সংসারকে অতিক্রম করে আর একটা দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সে নয়নজলে ঝাপসা দৃষ্টিতে কি রাধামদনকে দেখতে পাচ্ছিলো? অথবা, হয়তো সে নয়নজলে হৃদিবিধৌতির পরিশুদ্ধি দিয়ে বিগ্রহের ধাতুময় মূর্তি অতীত করে প্রাণময় মূর্তিই প্রত্যক্ষ করছিলো। একেই কি নিজের বুকে দেবতাকে জাগিয়ে দেবতাকে আরতি করা বলে? চন্দ্রার এ গান নয়, যেন বর্ণনার অসাধ্য আর কোন লোকে যাবার সোপান; যেন বাক্য মন অগোচরের অতীত সেই লোকেরই অনাহত ধ্বনি তার গান দিয়ে আমাদের এই মর্ত্যটাকে ছুঁয়ে যাচ্চে। আমার মনে হচ্ছিলো, আমিও যেন আমারই বুকের ভেতরে কোনো অজ্ঞাত আলোকময় স্থানে উন্নীত হয়েছি; আমি আর ধরার মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই।

ও গানটা শেষ হতে মদন ও চন্দ্রা এক সঙ্গে গাইলোঃ

হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্ত-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥

তারপর চন্দ্রা একা তন্ময় হয়ে বারবার গাইতে লাগলো, "কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া।" আমি চোখ বুজিয়ে ছিলুম। তীব্র রোমাঞ্চে আমি অনুভব করতে লাগলুম যেনো চন্দ্রা সত্যই তিল-তুলসী দিয়ে নিজেকে নৈবেদ্য দিচ্ছে, যে-নৈবেদ্য আর কখনো প্রত্যাহৃত হয় না, যে পরম-দানের পর তার সকল সত্তা বিলুপ্ত। সে নিজে নেই; তার স্বর্গ মর্ত্য, ইহকাল পরকাল, আনন্দ দুঃখ, জীবন-মৃত্যু কিছুই আর নেই, সবই সে চরম-অর্ঘ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

এবার মদন গাইলোঃ

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।

অবশেষে ওদের গানের পূজো শেষ হোল। ওপর থেকে নেমে এসেও আমার কানে বাজতে লাগলো, সে রাত্রে স্বপনেও শুনলুম, "তুয়া বিনু গতি নাহি আরা"। বুঝলুম মদন ও চন্দ্রা রাত্রে কেন তন্ময় হয়ে থাকে, কেন তাদের চোখের দৃষ্টি অমন। তারা যে প্রেমস্বর্গটা ছোঁয় সেখান থেকে বোধ করি সহজে প্রত্যাবর্তন করা যায় না।

পরদিন সকালে দেখি চন্দ্রা সেই সহজ মানুষ, পিঠে ভেজা চুল মেলিয়ে দিয়ে আমার জন্য চন্দ্রপুলি গড়ছে। আমায় দেখে সে বল্লে, ও ঘর থেকে একটা আসন এনে বস। তারপর তোমার বষ্টুমী-সংবাদ বলো। সে মুচকে হাসলে। অদ্ভুত তার চোখ দুটি; শুধু তার কেন, মদনের চোখও অদ্ভুত। ওরা দুজনেই আরতি-দৃষ্টি। চন্দ্রার মুখেও অনির্বচনীয় মাধুরী। বোধহয় ওরা পরস্পর ও রাধা-মদনকে সর্বক্ষণ আরতি করে করে সে দৃষ্টি ও মাধুর্য লাভ করেছে। চন্দ্রাকে তখন দেখে মনে হোল, এই মাটির মানুষটি বারবার কি উপায়ে দিব্যলোক প্রেমলোক দেখে আসে!

বল্লুম, কাল আমাকে ধন্য করেছো, চন্দ্রা। কি করে তুমি অমন হতে পারো? আমার মনের আকুল প্রশ্নটা আর আমি রোধ করতে পারলুম না, জিজ্ঞাসা করলুম, কি ভালোবাসলে, আর কতো ভালোবাসলে অমন হয়?

চন্দ্রা হাঁটুতে মুখ গুঁজে হেসে উঠলো। সেই অবস্থায় থেকেই উত্তর দিলে, তোমার বন্ধুকে তা জিজ্ঞাসা কোর, আমি মুখ্‌খু মানুষ, কি করে জবাব দেবো!

দুপুরে আমরা একত্র হলুম। স্থির করেছিলুম যে, মদনকে কোন প্রশ্ন করবো না, ওদের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হওয়া আমার উচিত নয়। চন্দ্রা কিন্তু বল্লে ওগো, ঠাকুরপোর জিজ্ঞাসার তুমি উত্তর দাও, আমার দেবার সাধ্য নেই।

উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, কি ভালোবাসলে আর কতো ভালোবাসলে অমন হয়?

বুঝলুম, আমি নূতন করে ওদের অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছি। মদন আমাকে এক দৃষ্টিতে একটু দেখে বল্লে, তাহলে একটু শুনতে হবে তোকে। চন্দ্রা কম নয়; ওর আদি নেই, অন্ত নেই, ও অফুরন্ত। না চন্দ্রা, তুমি পালিও না, বস। মদন তার পলায়নপর আঁচল চেপে ধরলে। আমি একা শুধু বলবো? তোমাকেও পাদপূরণ করতে হবে যে!

এলাহাবাদ ছেড়ে গানের হাত থেকে তো পালালুম, কিন্তু পালানো কি যায়! আমার বুকের ভেতর গানের নেশা রয়ে গেলো। সোজা গেলুম কলকাতায়। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে একদিন বটু ঠাকুরের কীর্তন শুনলুম। শুনে স্থির করে ফেল্লুম যে ডাক্তারি আপাতত তোলা থাক। নদীয়ায় বটু ঠাকুরের আস্তানায় ছুটলুম। ঠাকুর আমার গান শুনে বল্লেন, তোমার এ মুখের ব্যাকরণিক গান ভুলতে হবে, ওতে রস নেই। আমি বল্লুম, বেশ, ভুলিয়ে দিন আপনি। তিনি বল্লেন, দীক্ষা নাও, নাহলে হবে না। নয়ন মন শ্রবণ স্বর সব পাল্টাতে হবে। আমার দীক্ষা হোল।

একদিন এক মন্দিরে তিনি চন্দ্রার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন, এর কাছে শুনে আগে গানের প্রাণরসটিকে চিনে নাও। তোকে সংক্ষেপে বলি, কিছু-দিনে বুঝি আমি সে প্রাণরস চিনলুম। বুঝলুম যে গান দিয়ে স্বর্গ ছোঁওয়া যায়। কিন্তু সে ছোঁওয়ার রহস্যটা আজও আমি অধিকার করতে পারিনি। চন্দ্রা স্বর্গ ছোঁয়, আমাকেও মাঝে মাঝে ছুঁইয়ে আনে।

একদিন চন্দ্রা আমাকে বল্লে, আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে চলো।

আমি চন্দ্রার দিকে চাইলুম; সে মাথা নিচু করলে। মদন বল্লে, তুমি তার কারণ বলো, চন্দ্রা।

রাত্রের সে পূজারিণী তখন খেলায় নেমে এলো। চন্দ্রা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলে। তার চোখে কৌতুকময়ী নারী-দৃষ্টি ফুটে উঠলো। তারপর সে মুখ নিচু করে কৈফিয়ৎ দিলে।

সই পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শোনে ধরম কথা।
পিরীতি মিরিতি তুলে তৌলাইয়া
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যারে উপজয়
সে বুঝে না বুঝে আর।

মদন বল্লে, সত্যিই মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের ভার গুরু। আমি চন্দ্রার সঙ্গে থেকে বুঝেছিলুম যে, প্রেমসর্বস্ব-স্বভাবা কাকে বলে। ও বিশেষণটা দুর্গার, যাঁকে জানলে অখিলেশ্বরকে জানা যায়। চন্দ্রাও নিত্য-বৃন্দাবনের পথ। খুঁজে পেতে আমরা সাসারামে এলুম। এখানে এসে চন্দ্রা আমাকে ভালোবাসার মহাযানটি শেখালে —কাম থেকে ভালোবাসা, ভালোবাসা থেকে ভক্তি।

চন্দ্রা উঠে পালাতে গেলো, মদন তার ডান হাতটা ধরে তাকে বন্দী করলে।

মদন বলতে লাগলো, সার্কাসে টান-তারের ওপর বেড়াবার মতো চন্দ্রা অবলীলায় কাম থেকে ভক্তিতে বিচরণ করে বেড়াতে পারে। আমার মন বুঝে ও নারী হয়, আবার মূর্তিমতী ভক্তি হয়ে যায়। কিন্তু আমি আজও এগিয়ে যেতে পারলুম না, ভালোবাসার জালেই জড়িয়ে আছি। চন্দ্রাই আমাকে মহাসুখের মাঝে রাধা-মদনকে ডাকতে শিখিয়েছে। আমি জপ ছাড়া আর কিছু পারিনে, চন্দ্রা কিন্তু তখন রাধার অঙ্গ হয়ে যায়। চন্দ্রাবলী আমার সুখগুরু, রসগুরু, ধ্যানগুরু, ভক্তিগুরু। আমি বলিনে, "আদি অনাদিক নাথ কহায়সি, অব তারণ-ভার তোহারা"। বলি, চন্দ্রা, আমার তারণ-ভার তোমারি!

চন্দ্রা মুখ তুলে মদনের দিকে চেয়ে-ছিলো। সে কী মুখ! আমার মনে হোল, ও চন্দ্রা নয়, পৃথিবীর কেউ নয়, ও আর কেউ। চন্দ্রা প্রকৃতি হয়েও পরিত্রাতা।

মদনের কথা শুনে গভীরভাবে উপলব্ধি করলুম যে ওদের মাঝে আমার মতো বাইরের লোকের উপস্থিতি কতো বড়ো অত্যাচার। পরদিন ভোরবেলা আমার চারপাইটার ওপর এক ছত্র চিঠি লিখে রেখে আমি পালালুম।

কিন্তু মাস দুই পরে আর থাকতে না পেরে আমি আবার সাসারামে গেলুম। দেখি মদনের বাড়িতে তালা ঝুলছে। বাড়িওয়ালা বল্লে, ডাক্তার সাহেবেরা কাউকে কিছু না বলে একদিন কোথায় চলে গেছেন, কিছুই নিয়ে যাননি। তাঁরা আবার আসবেন এই আশায় আমি তাঁদের সব আগলে রেখেছি।

সে আমাকে বাড়িটার ভেতরে নিয়ে গেলো। মদনের সবই পড়ে আছে, কেবল ঠাকুরঘরে রাধামদন নেই।

আমিই তাদের এ নিরুদ্দেশের কারণ হলুম।

অসূর্যম্পশ্যা

অরবিন্দ গুহ

কতো দীর্ঘ, জনজীর্ণ, আঁকাবাঁকা পথ। লাল আলো,
স্রোত স্তব্ধ। নীল আলো দ্রুতগতি মত্ততা ছড়ালো
নগরের রক্তবাহী শিরায় শিরায়। পাতাঝরা
মেঘমুগ্ধ চৌরঙ্গীর যে নর্তকী হাওয়ার অধরা
হ'য়ে দীর্ঘশ্বাসে আদিগন্ত ভরে, তার ছলনাকে
বিচিত্র হৃদয়ে জ্বেলে একা একা খোঁজো তুমি কাকে!
কার নাম, কার গন্ধ? তাকে তুমি দ্যাখোনি, চেনো না;
সায়াহ্নের পৃথিবীতে এও এক স্বর্গের ছলনা।

ছলনা। তোমার ছায়া তারপর কালীঘাটে নেমে
ভীরু পায়ে হেঁটে পার হ'য়ে যায় অপার্থিব প্রেমে
যৌবনকুটিল গলি। পায়ে হেঁটে কিম্বা বলি ভেসে
যায় শ্বেতহংসী, অপরূপ কূলে কূলে অন্ধকারে
পৌষের কুয়াশা নদী হ'য়ে আছে পথের পাহাড়ে।
ঈশ্বরের দয়া, আমি দেখি। সূর্য এই মধুরিমা
দু'চোখে পেলো না, সূর্য কলকাতার আকাশের সীমা
পার হ'য়ে চ'লে গেছে সমুদ্রের ওপারে বিদেশে।

মধুসূদনের রাজসিকতা

শ্রীকালিদাস রায়

বাঙালী জাতি তাহার সাত্ত্বিকতা বহুদিনই হারাইয়াছিল। মধুসূদন যখন আবির্ভূত হন, তখন এ জাতি তামসিকতার মহাপংকে লুণ্ঠিত হইতেছিল। এ সময়ে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্য দিয়া ইউরোপ হইতে একটা রাজসিক ভাবতরংগ আসিয়া পড়ে। এই তরংগ এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনের তটে আঘাত করিয়া তাহার বহুকালের সরীসৃপ সুলভ নিদ্রা ভাংগিয়া দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাতির নবপ্রবুদ্ধ রাজসিকতার মূর্ত বিগ্রহ এই শ্রীমধুসূদন।

মধুসূদনের রাজসিকতা সাত্ত্বিকতার প্রতিবাদ নয়। 'সীতা-সরমার' কবির যে সাত্ত্বিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহাকে অস্বীকার করিবে? তাঁহার রাজসিকতা তামসিকতারই বলদৃপ্ত প্রচণ্ড প্রতিবাদ। সেজন্য তাঁহার সাহিত্য সাধনাতেও কোন কোন বিষয়ে যে বিদ্রোহাত্মক আতিশয্য দোষ ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বিদ্রোহ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ইত্যাদির পরিণাম ও প্রকৃতি প্রতীপাচারী বা বিরুদ্ধবাদীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে। সে যুগে মধুসূদনের বন্ধু ভূদেবও যে তামসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই, তাহা নয়। তবে তিনি ছিলেন শান্ত অনুদ্ধত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তিনি সাত্ত্বিকতাকেই জাতীয় জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এযুগে যেমন মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করিয়াছেন।

রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সে-যুগের মনীষিগণও তামসিকতার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রে মধুসূদনের মত প্রলয়ংকরী পৌরুষ শক্তি ছিল না—আত্মাভিব্যক্তির প্রচণ্ড প্রয়াস ও সৃজনী প্রতিভাও ছিল না। সেজন্য তাঁহাদের বিদ্রোহে আতিশয্য দেখা যায় নাই। মধুসূদনের চরিত্রের অদম্য পৌরুষ শক্তি ও অভ্রভেদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার রাজসিক জীবনকে মাত্রাতীত প্রচণ্ডতা দান করিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি নিজের জীবনে ও সারস্বত সাধনায় শৃংখল ও শৃংখলা দুই-ই নির্বিচারে ভাংগিয়াছিলেন।

কোন প্রতিভাই গতানুগতিকতা সহ্য করিতে পারে না। প্রতিভার লক্ষণই হইতেছে গড্ডলিকা প্রবাহের প্রতিরোধ করিয়া অভিনব ধারার প্রবর্তন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রতিভা বলে—I have come not to destroy but to fulfil. সাত্ত্বিক প্রতিভা যাহা বর্তমান আছে, তাহারই সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকেই নবকলেবর দান করিয়া তাহাতেই নবজীবনের সঞ্চার করে। আর রাজসিক প্রতিভা যাহা আছে, তাহাকে অর্থাৎ গতানুগতিককে একেবারে সবলে চূর্ণ করিয়া নূতন কিছু গড়ে। মাইকেলের রাজসিক প্রতিভা প্রচণ্ডবলে এক হাতে ধ্বংস করিয়াছে, অন্য হাতে গড়িয়াছে। গড়ার কাজ সম্পূর্ণ করার আগেই মধুসূদন মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন।

এই দুর্নিবার প্রচণ্ডতার জন্য একদিকে তিনি যেমন জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন বংগসাহিত্য ভাণ্ডারে, দেশের কাব্যধারার পথ হইতে বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া তাহাকে অবাধ অব্যাহত করিয়া গিয়াছেন —আর তামসিকতার পংক হইতে বংগবাণীকে উদ্ধার করিয়া রাজসিকতার পংকজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সাত্ত্বিকতা যে জাতীয় জীবনেই হউক আর ব্যক্তিগত জীবনেই হউক সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তামসিক জাতিকে ত একেবারে সাত্ত্বিকতার স্তরে উন্নীত করা যায় না, তাহাকে রাজসিকতার স্তরের মধ্যে দিয়া উঠিতে হয়। তাই অনেকে মনে করেন, মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জাতিকে সাত্ত্বিকতায় দীক্ষাদান ফলপ্রসূ হয় নাই।

মধুসূদন যে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই রাজসিকতার প্রচারক হইয়াছিলেন—ইহা হয়ত ঠিক নয়। দেশের নবজাগরিত জাতীয় জীবনই রাজসিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদনে পরিমূর্ত হইয়াছিল। মধুসূদন বংগসাহিত্যকে তামসিকতা হইতে উদ্ধার করিয়া রাজসিকতায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা আজ রবীন্দ্রনাথের সাধনায় সাত্ত্বিকতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

মধুসূদনের প্রচণ্ড রাজসিকতা তাঁহার জীবনে ভংগ করিয়াছে শৃংখলা, কিন্তু সাহিত্য সাধনায় ভংগ করিয়াছে শৃংখল। পয়ার ত্রিপদীর তটবন্ধনে অনুপ্রাস শ্লেষ-যমকের উপলখণ্ডগুলিতে গীতিঝংকার তুলিয়া বাঙলার কাব্যধারা গতানুগতিকভাবেই বহিয়া চলিতেছিল। রসকলহ, বারোমাসিয়ার মামুলি অনুকরণ, চৌতিশার কৃত্রিমতা, লৌকিক ধর্মপ্রচার, ইতর শ্রেণীর

রসিকতা, পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে লৌকিক গণ্ডীতে অবতারণ, নূতনত্বের প্রতি বিদ্বেষ, পুরাতনের চর্বিতচর্বণ বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ছিল প্রধান সম্বল। গতানুগতিকতাই তামসিকতা। এই তামসিকতার জীর্ণ কন্থা হইতে মধুসূদন বাঙালীর সাহিত্যরসবোধকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে রাজসিকতার পালঙ্কে স্থান দিয়াছেন।

মধুসূদনের চরিত্রগত রাজসিকতা তাঁহার রচনায় ছন্দের অভিনবতায়, ভাব-কল্পনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে, পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙ্গায়, মহাকাব্য রচনায় বীর ও রৌদ্ররসের সমাবেশে, অভিনব নৈতিক আদর্শে সুপরিস্ফুট। এমনকি, শব্দের চয়নে ও বয়নে ও তদ্দ্বারা উদ্দাম ছন্দঃ স্পন্দ সৃষ্টিতেও তাঁহার রাজসিকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমার এ নিবন্ধ যাঁহারা মধুসূদনের রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য, সেজন্য আমি কবির রচনা হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম না।

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি শুধু পাইয়াছিলেন—উপাদান ও উপজীব্য। সাত্ত্বিক কবি মিল্টন হইতে পাইয়াছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রেরণা, তিনি ভাব-কল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টির আদর্শ পাইয়াছিলেন রাজসিক গ্রীক ও রোমক গুরুদের গ্রন্থ হইতে। সেজন্য তাঁহার পরিকল্পিত পৌরাণিক চরিত্রগুলি অনেকটা অভারতীয় রূপ লাভ করিয়াছে। গতানুগতিক সামাজিক মন তাহাতে আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে কোন ক্ষতি হয় নাই—বরং বাঙলা সাহিত্য অভিনব স্বভাবানুগত মানবিক আদর্শ লাভ করিয়া লাভবান হইয়াছে। অভিনবত্বের বৈচিত্র্য সর্ববিধ আতিশয্য ও বিজাতীয়তাকে কবলিত করিয়াছে।

মধুসূদন দেখিলেন, তাঁহার স্বজাতি দরিদ্র, দুর্বল, পরাধীন, জাতীয়তা-বোধহীন, ভীরু, কর্মকুণ্ঠ ও অদৃষ্টের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই জাতির সম্মুখে, এমন চরিত্রাদর্শ স্থাপিত করিতে হইবে যে চরিত্র ী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই-কাণ্ড চরিত্রের সৃষ্টি। সৃষ্টি না বলিয়া সায়াস বলা যায়। কারণ বাল্মীকির রাবণের সঙ্গে মধুসূদনের রাবণের অনেক অংশে মিল আছে। বাল্মীকির রাবণ একজন বিরাট পুরুষ, পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ, নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। বাঙালী পাঠক কৃত্তিবাসের রাবণের সঙ্গে পরিচিত বলিয়া মধুসূদনের রাবণকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় চরিত্র মনে করিয়াছে। যাহাই হউক, গ্রীক সাহিত্যের আদর্শেই রাবণ রাজসিকতার সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত তামসিকতারও যেমন দ্বন্দ্ব—সাত্ত্বিকতারও তেমনি দ্বন্দ্ব। এইরূপ রাজসিক আদর্শই ছিল দীন দুর্বল ভীরু বাঙালী জাতির জন্য প্রয়োজন, তিনি এই কথা মনে করিয়াছিলেন।

দরিদ্র বাঙালীর চোখের সম্মুখে তিনি সোনার লঙ্কার অসীম ঐশ্বর্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। ভীরু বাঙালীর সম্মুখে তিনি বীরত্বের আদর্শ মেঘনাদকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অদৃষ্টের হাতের পুতুলদের তিনি দেখাইয়াছেন, পুরুষ-কারের মূর্ত বিগ্রহ রাবণকে। অবলা বাঙালী নারীর চোখের সম্মুখে ধরিয়া-ছেন—বীরাঙ্গনা প্রমীলা ও জনাকে। বাঙালীর দুর্নাম আছে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। সেজন্য তিনি বিভীষণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বাঙালীর জাতীয় চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য কেমন করিয়া নির্বিচারে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে হয়, তাহারই আদর্শ মেঘনাদ বধের প্রাণস্বরূপ।

মহৎ চরিত্র না হইলে মহাকাব্য হয় না, তাহা তিনি জানিতেন। মহাকাব্যে নায়ক-চরিত্র থাকে মহান্, প্রতিনায়ক চরিত্রও কম মহান্‌রূপে চিত্রিত হয় না। 'মহান্ মহত্ত্বে করোতি বিক্রমম্'। মহানের সঙ্গে মহানের সংঘর্ষই মহাকাব্যের প্রধান উপজীব্য। ভারতীয় মতে সাত্ত্বিকতায় মহানের সঙ্গে রাজসিকতায় মহানের সংঘর্ষই মহাকাব্যের মেরুদণ্ড। মধুসূদন নিজে ছিলেন রাজসিকতার মূর্ত বিগ্রহ, তাই তিনি রাজসিকতায় মহানকেই কাব্যের নায়ক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

মধুসূদন জীবনে স্বধর্মত্যাগী হইয়া-ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যে তিনি স্বধর্মচ্যুত হন নাই, অর্থাৎ তিনি রাজসিকতা ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকতাকে প্রাধান্য দেন নাই। বিচক্ষণ পাঠক বলিবেন—'না, জীবনেও তিনি স্বধর্মচ্যুত নহেন—তিনি পিতৃধর্ম-চ্যুত। রাজসিকতাই ছিল তাঁহার ধর্ম, সে ধর্ম তিনি আমরণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।' স্বধর্মের সহিত জীবনের, জীবনের সহিত সৃষ্টির সামঞ্জস্য যদি উচ্চ সাহিত্যের একটা লক্ষণ হয়, তাহা হইলে মধুসূদনের কাব্যে সে সামঞ্জস্য পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিতে হইবে।

মধুসূদনের রচনা যাঁহারা মন দিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, মেঘনাদবধের সীতা-সরমা সংবাদে, কতক-গুলি সনেটে বীরাঙ্গনার রুক্মিণী ও ভানুমতীর পত্রে এবং দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পুণ্যানুষ্ঠানের বার বার উল্লেখে কবি সাত্ত্বিকাতর মহিমাও স্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কপটতা নয়। বিদেশীয় চরম শিক্ষাও তাঁহার জাতীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে কবলিত করিতে পারে নাই। রাশি রাশি কুখাদ্য-অখাদ্য তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত পিতৃপুরুষের শোণিত ধারাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। বাঙালীর সরস কোমল মধুর হৃদয়টি তাঁহার কোট-প্যান্টের অন্তরালে স্পন্দিত হইত।

কবি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। যদি তিনি দীর্ঘায়ু হইতেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজসিকতার উপরের স্তরে তিনি আরোহণ করিতেন। ইহা 'নিশার স্বপন সম' হয়ত নয়।

সাত্ত্বিকতার আবেষ্টনীতে পুষ্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র একদিন অল্প-বয়সে মাইকেলের কাব্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। তারপর পরিণত বয়সে তিনি যে আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা আমার বক্তব্যের উপসংহার করি।

'অল্প বয়সে স্পর্ধার বেগে মেঘনাদ-বধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়া-ছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে, তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ম হইয়া উঠে। আমিও এই অমর-কাব্যের উপরে নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতে-ছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।'

(৩)

রাজস্থান বাঙ্গালী সাহিত্যিকের আবিষ্কার। সেই রাজপুতানা —"বসুধা বেষ্টিত যার কীর্তি মেখলায়"। ছেলেবেলায় প্রথম পরিচয় হল রাজস্থানের সঙ্গে রঙ্গলালের কবিতার মধ্য দিয়ে। মনের মধ্যে গেঁথে গেল কত অমর কাহিনী। তারপর সারা কৈশোর ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছি রাজপুতানার। সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। নিজের চোখে সেই স্বপ্নের ভূমি দেখে যাব। নিজের মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করে যাব। সমস্ত মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে আনন্দ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আনন্দ, প্রায় অসহ আবেগময় আনন্দ।

তার উপর জয়পুর শহর হচ্ছে বাঙ্গালী স্থপতি শিল্পীর সৃষ্টি। সে কথা মনে পড়াতে জয়পুরের সঙ্গে আরো একটি নিকট আত্মীয়তা অনুভব করলাম। পূর্বপুরুষের কীর্তি দেখে ছাতি ফুলে উঠবে না এমন নরাধম কে আছে?

রাজপুতানার প্রথম তোরণই যে বলতে গেলে জয়পুর সেজন্য আরো বেশী সুখী হলাম। একটি দেশ দেখতে চলেছি, এ যেন একটা আবিষ্কারের যাত্রা। আর সেই দেশে ঢুকতেই নিজেদের পূর্বপুরুষ কারো কীর্তি যেন দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করল—এস, এস, আমায় দেখবে এস। তোমার জন্যই যে আমি এতদিন অপেক্ষা করছি।

আমিও মনে মনে সাড়া দিলাম—এই যে এসেছি। অন্তরে ত তোমার কাছে সব সময়ই এসেছি এতদিন।

স্নেহভরা ভোরের নীলাভ দৃষ্টি দিয়ে আরাবলী পর্বতের চূড়াগুলি আমার দিকে তাকাল। আমায় কোলে তুলে নিল। এরোপ্লেন চারদিকে আরাবলীর শৃঙ্গে ঘেরা সমতল ছোট্ট এরোড্রোমটুকুর মাঝখানে এসে থামল। এক মুহূর্তে রাজপুতানার হয়ে গেলাম।

বাইরে সারি সারি সাজান আছে লম্বা চকচকে আমেরিকান মোটরকারগুলি। প্রত্যেকটার নেমপ্লেটের লাল বুকে শাদা অক্ষরে লেখা আছে তাদের রাজ্যের নাম। চট করে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিলাম কোন্ কোন্ রাজ্যের রাজা বা প্রতিনিধিরা এই প্লেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন। তাদের অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিতে এসেছে তাদের এ. ডি সি বা সর্দারের দল। জয়পুরের পক্ষ থেকেও এসেছে মহারাজার কয়েকজন এ ডি সি ও কয়েকখানা অটো।

অটো অর্থাৎ মোটরকার। হাল ফ্যাশনের বাজারে আমেরিকান বা কন্টিনেন্টাল নামগুলি ব্যবহার করলে আধুনিকতার একটা গন্ধ ছড়ান যায়। পেট্রল ত একেবারেই সেই মামুলী ইংরেজী ভাষার একটা কথা। তাকে বলুন গ্যাস; অমনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটু মৃদু গন্ধ পাবেন তাতে। বলুন তাকে জুস্; অমনি সমস্তটা রিভিয়েরা এসে
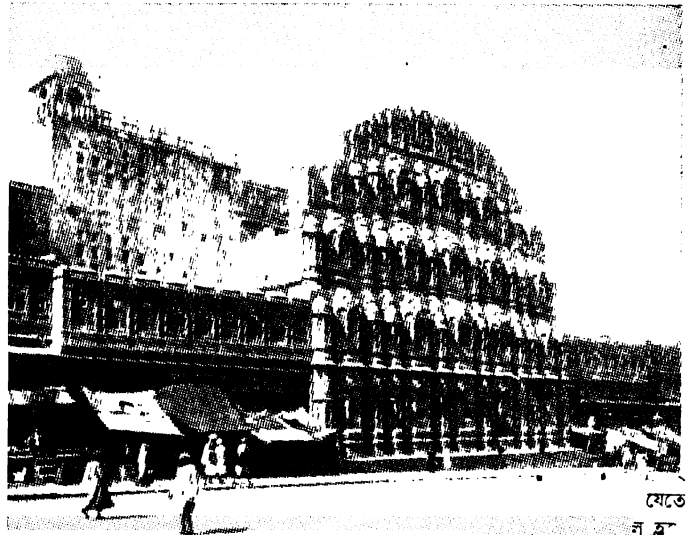
যেতে

বাঙালীর পূর্বপুরুষের কীর্তি

রাজপুত সর্দার

আপনার কাছে রূপ রসে ভরা কণ্টিনেণ্টের অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে হাজির হবে।

সেই রিভিয়েরা যার সোনালী বালু-বেলায় হলিউডের চিত্রতারকা আর হিন্দু-স্থানের মহারাজা সমানভাবে, সকলের নয়নমণি হয়ে বিরাজ করে। অবশ্য প্রথম পক্ষরা পুরুষের 'কাছে' আর দ্বিতীয় ...রা পুরুষোত্তমাদের কাছে।

...দু নয়নমণি নয়, পরশমণিও বটে। ...রা এত টাকা ছড়াতে পারেন ...দ বিলাস ও জাঁকজমকের ঘটা ...সায়াটে যে তাদের কাছাকাছি আসে ...ণ খুঁজে পায়। যা ছোঁও তাই সোনা হয়ে যাবে। হিন্দুস্থানের মহারাজারা তাই কণ্টিনেণ্টে ও আমেরিকায় লোকের কাছে একটা সোনালী স্বপ্ন হয়ে বিরাজ করেন।

রাওৎ সাহেবের সেই সেণ্ট রেসিপির কথা মনে পড়ল। যদি কোন ফরাসী গন্ধসার ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেয় যে, সে একজন ইণ্ডিয়ান মহারাজার গোপন প্রণালী নিয়ে একটা সেণ্ট বাজারে ছেড়েছে সে রাতারাতি কি বড়লোকই যে হয়ে যাবে তা ভাবতে গিয়েই নাকের সামনে মৃদু সুবাসের একটা আলোড়ন হয়ে গেল।

হার হাইনেস পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

বিচিত্র রাজপুত পোষাকে সজ্জিত রাজপুরুষরা বুকে হাত রেখে অর্ধ অঙ্গ সামনে ষাট ডিগ্রি কোণায় আনত করে তাদের প্রভু ও প্রভুর বন্ধুদের সম্মান দেখাতে লাগল। 'দরবার'রা অর্থাৎ হিজ হাইনেসের দল পরস্পরের কাছে সাময়িক বিদায় নিতে লাগলেন। শিষ্টাচারের ও মিষ্টালাপের বাহার একটা দেখবার ও শিখবার মত জিনিস। ইংরেজ রাজ ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছে। তার ছেড়ে যাওয়া জায়গা জুড়ে বসেছে কংগ্রেস রাজ। নিজেরা কতখানি জায়গা এরই মধ্যে দখল করতে পারবেন তা নিয়ে দিল্লীতে তুমুল আলোচনা করে এসেছেন রাজারা। কিন্তু এই মুহূর্তের আদব-কায়দাকে সে ঝড়ের ঝাপটা একটুও ক্ষুণ্ণ করল না।

ঠিক যেমনভাবে শত শত্রুর ভয় ও বিপদও এদের বীরধর্মের পথ থেকে বিচলিত করত না।

কিন্তু সে একটা অন্য ইতিহাস। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে টডের পাতায়, রঙ্গলালের কবিতায়, বঙ্কিম রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীতে।

আর এখানে এই হাইনেসদের মধ্যে দেখছি অন্য একটা রাজস্থানের ছবি। এদের প্রাণপাখী সযত্নে রক্ষিত ছিল সার্বভৌম বৃটিশের সোনার কৌটায়। যার ইচ্ছামত উড়ে বেড়ান বা পাখার ঝটাপটি নিয়ন্ত্রিত হত তারই অঙ্গুলী হেলনে, চোখের ইঙ্গিতে।

এদের পানপাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত শ্বেত অভ্যাগতদের আপ্যায়নে, শিকার, নাচ ও ভোজ পার্টির সমারোহে। এরা তৈরী করেছেন একটা নতুন রূপকথা, নতুন রাজস্থানের রূপকথা। সমাজতন্ত্রী বন্ধুরা বলেন—উপকথা। বিংশ শতাব্দীর শ্বেত অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিতা রাজপুতানার রূপকথা।

জয়পুর শহরে ঢুকবার অনেক আগে থেকেই নজরে পড়ে পাহাড়ের উপর চারিদিকে ঘেরা বিরাট দেওয়াল। যেন পাহাড়ের মাথায় পাথরের মালা চড়ান হয়েছে। ওই দেওয়াল ভেদ করে কি শত্রু কখনো জয়পুরে ঢুকতে পারত?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তিনজন অম্বরের মহারাজার কথা। আকবরের

সময় রাজা মানসিংহ মোগলের সেবা ও সহায়তা করে অম্বর ও মোগল সাম্রাজ্য পাকা করে যান। শাহজাহান ও ঔরংগ-জেবের সময় মীর্জা রাজা জয়সিংহ অম্বরের প্রতাপ আরো বাড়িয়ে যান। তার পর সোয়াই রাজা জয়সিংহ অতুলনীয় বুদ্ধি ও রাজনীতি দিয়ে অম্বরকে আরো প্রভাবশালী করে তোলেন।

এই জয়পুর মোগলের সংগে যুদ্ধে নষ্ট হয়নি, পারশীক আফগানের আক্রমণে লুণ্ঠিত হয়নি। এবং শান্তিতেই দিন কাটিয়েছে। তবুও গত দুশো বছর জয়পুর এত নিস্তেজ নিবীর্য হয়ে ছিল কেন সে প্রশ্ন প্রথমেই মনে এল।

ভবিষ্যতের রাজস্থান গড়তে গেলে অতীতের এই ত্রুটিগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হবে এখনই।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রাজপুত চরিত্র দেখে রাজপুতানাকে বিচার করলে সে ক্ষতি দেশেরই হবে। যে দৃষ্টিভংগী দিয়ে বাংগালী এ দেশকে দেখেছে সেটাই সত্য। সেটাই একমাত্র উপায় যার সাহায্যে আমরা ভাবী রাজস্থানকে গড়তে পারব। সে পথেই এদের কাছ থেকে আমরা সবচেয়ে ভাল যা এদের দেবার আছে তা আদায় করতে পারব।

আজ সারা ভারত চায় বেছে বেছে সব প্রদেশের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি খুঁজে নিতে। ছাই উড়িয়ে দিয়ে তার মধ্য থেকেও রত্ন খুঁজে নিতে উপদেশ দিয়েছেন সুধীরা। আর সেই বুদ্ধিমান গুণগ্রাহী মন নিয়েই মোগল সম্রাট্ জাহাংগীর তাজুক-ই-জাহাংগীরীতে খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন যে, তার অমর পিতৃপুরুষ ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর যা পারেন নি, হুমায়ুন যা করতে অক্ষম হয়েছিলেন, বিখ্যাত আকবর যা মাত্র আংশিকভাবে করতে পেরেছিলেন সে কীর্তি জাহাংগীর নিজে অর্জন করতে পেরেছেন।

অর্থাৎ পাঠান মোগলের চিরকালের শত্রু মেবারের (উদয়পুরের) শিশোদীয়া বংশের মহারাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ জাহাংগীরের সংগে সন্ধি ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

এই উল্লাসের পিছনে ছিল বীরপুজা। এবং বীরত্বে রাজপুতের তুলনা ছিল না।
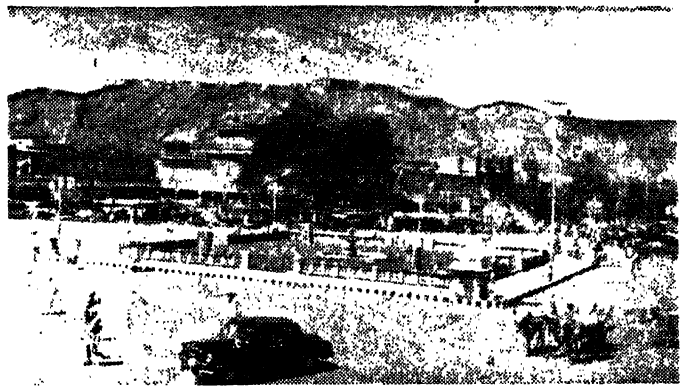
পাহাড়ের উপর চারিদিকে ঘেরা বিরাট্ দেওয়াল

এই বীরত্ব শুধু শত্রুনিধন ও আত্ম-বলিদানে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সংগে জড়িত ছিল স্বামীধর্ম অর্থাৎ প্রভুভক্তি ও ধর্মযুদ্ধের আকর্ষণ। একজন পারশীক ঐতিহাসিক দতিয়ার বর্তমান মহারাজার এক পূর্বপুরুষ, সুজন সিং বুন্দেলা সম্বন্ধে একটি গান লিখেছিলেন,

দো রোজ গুজের কর্দান অজ
মার্গ্ সাজা নিশ্ত্।
রোজকে কাজা বাশাদ,
রোজকে কাজা নিশ্ত্॥
রোজকে কাজা বাশা
কোশিশ্ না কুনাদ সুদ।
রোজকে কাজা নিশ্ত্, দারু-উ
মার্গ রাওয়া নিশ্ত্।

দুরকমের দিনে মরতে কোন দ্বিধা করো না—যে দিন তোমায় মরতে হবেই আর যেদিন তোমার মরা বিধির বিধানে নেই। কারণ যেদিন তোমার কপালে মৃত্যু অবধারিত সেদিন কোন চেষ্টাই তোমায় বাঁচাতে পারবে না। আর যেদিন কপালে মৃত্যু নেই সেদিন মৃত্যুর তোমার উপর কোন অধিকার নেই।

তবে আর ভয় কি? মরবার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রের চেয়ে ভাল বিছানা রাজপুতের আর ছিল না।

শেক্সপীয়র যে লিখে গিয়েছেন,

"Cowards die many times before
their deaths,
The valiant never taste of death
but once.
......Death, a necessary end,
will come when it will come."

সে কথা এদের জীবনে নিত্য প্রতিফলিত ছিল।

ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে তা এরা জানত। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের বাইরে এর তুলনা খুব বেশী পাওয়া যাবে না।

জয়পুররাজের অতিথিভবন মাশা কোঠির আড়ম্বরময় বৈঠকখানায় নিভৃত কোণে বসে ঠাকুর সাহেব সে কথাই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি বললেন, দেখুন, আমি জয়-পুরের কাহিনী বলব না, কারণ আমি নিজেই জয়পুরীয়া। মেওয়ারের কাহিনীও বলব না কারণ বাংগালীরা মেওয়ারকে চেনে বাংগলা দেশের চেয়েও ভাল করে। আমি একটা অন্য বংশের ইতিহাসই না হয় বলি। যে সময় আপনাদের বাংগলা দেশে ইংরেজ ক্লাইভ নবাবের সেনাপতি ও সভাসদদের ভাংগিয়ে নিয়ে পলাশীতে নেমকহারামী যুদ্ধ করবার বন্দোবস্ত করছিল সে সময়কারই একটা উদাহরণ দিই। ঠিক সে সময়ই দিল্লীর বাদশার সেনাপতি সালাবৎ জংগ রাঠোর রাজা রামসিংহের সংগে লড়াই করেছিল। মাড়োয়ারের মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে ঘণ্টা কয়েক যুদ্ধ করবার পরই মোগল সৈন্যরা তৃষ্ণায় পাগল হয়ে যেতে লাগল। সত্যি সত্যিই লোক পাগল [illegible] যাচ্ছিল। রাজপুতদের দখলি জ[illegible] ছিল কুয়া। কাজেই রাজপুত[illegible] কষ্ট ছিল না। মোগলরা কাঠফ[illegible]

প্রাণ নিয়ে রাজপুতদের কাছে গিয়ে জল চাইল। রাজপুতেরা কি করল জানেন?

সপ্রশংস সুরে বললাম,—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

পাগড়ীটা একবার খুলে নিয়ে মাথার খুলিকে এইবার হাওয়া খাইয়ে সেটা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুর সাহেব।

তারপর বললেন,—জানি, আপনি যখন ডি এল রায়, রমেশচন্দ্র দত্তের দেশের লোক আপনি তা বুঝতে পারবেন। তবু বলি, শুনুন। রাজপুতেরা তাদের জল দিল। যত জল চায় তত। তারপর বলল, যাও এবার ফিরে যাও; কারণ তোমাদের সংগে আজ আমাদের লড়াই আছে।

এ ভদ্রলোককে একটু অন্তরংগতার সূত্রে বেঁধে নিতে পারলে লাভের সম্ভাবনা আছে। অনেক কিছু যা বাইরের লোকের দেখা ও জানার বাইরে থেকে যায় তা দেখা ও জানা যাবে। অতএব ভদ্রলোকের সংগে একটু রসাল ভাব করবার চেষ্টা করলাম।

বললাম—হ্যাঁ, সে কাহিনী আমি শিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ বইতে মুসলমান লেখকের লেখাতেই পড়েছি। সত্যি, এমন জাত নেই। তবে শুনুন, আমি আপনাকে জয়পুরের নুরজাহানের গল্প শোনাব।

জয়পুরের নুরজাহান? সে ত, মশায়, দিল্লী আগ্রার নুরজাহান। জাহাংগীরের নুরজাহান।

হেসে বললাম—ওই খানেই ত মজা। জয়পুরের নুরজাহানের গল্প আমার কাছে শুনুন। জানেন নিশ্চয়ই, তবু শুনুন।

রসাল রহস্যের সন্ধান পেয়ে ঠাকুর সাহেব আরো একটু কাছে ঘেষে আরাম করে বসলেন।

দেড় শ বছর আগে আপনাদের জয়পুরের সবচেয়ে বড় দুর্দিন চলছিল। পনের বছর ধরে রাজা জগৎ সিংহ জয়পুরের সিংহাসন অন্ধকার করে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন। এত অসম্মান, এত কথার খেলাপ কখনো কোন রাজপুতের বোধহয় হয় নি। জয়পুরের নাম হয়ে গেল ঝুটা দরবার কারণ রাজা তাঁর কথা রাখতেন না; এমন কি, শরণাগতকে পর্যন্ত শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তবে সে কথাটা গৌণ কারণ পরে যা বলব সেটাই আসল কথা। কাজেই জগৎসিংহের কীর্তির কথা শুনে গল্প শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করবেন না।

মহারাজা ত জয়মন্দিরের কোষাগার

শূন্য করে দিলেন। জয়সিংহের সুন্দর শহরের পাঁচিলগুলি আমীর খাঁ পিন্ডারী ও মারাঠী লুঠেরার দল বার বার অপবিত্র করল। কখনো এক দর্জি, কখনো এক বেনে, এমন কি এক খোজা পর্যন্ত দরবারে আধিপত্য করতে লাগল। জগৎসিংহ নিজে তাঁর রাজালা অর্থাৎ অন্তঃপুরের অসম্মান করতে লাগলেন। রাসকাপুর (রসকর্পুরী) নামে এক যবনী বাইজীকে নিয়ে এত ঢলাঢলি করতে লাগলেন যে, নিজে তার সঙ্গে এক হাতীতে চড়ে বেড়াতেন। তাকে শেষ পর্যন্ত অর্ধ রাজত্বের অধীশ্বরী বলেও ঘোষণা করে দিলেন। এমন কি ওর আত্মীয়দের টাকার খাই মেটাবার জন্য জয়সিংহের অমূল্য পুঁথিশালার বইগুলিও বিলিয়ে দিলেন।

থাক্ থাক্ আর বলবেন না সে কথা। আমাদের মধ্যে এরকম বহু লজ্জার কাহিনী আছে। অন্তত বাঙ্গালীর মুখে সে কথা শুনতে চাই না—ক্ষুণ্ণ সুরে মাথা হেলিয়ে বললেন ঠাকুর সাহেব।

কিন্তু বাঙ্গালীর মুখেই আপনাদের খারাপ দিকটার কথাও জানতে হবে, কারণ আমরা নিরপেক্ষভাবে রাজস্থানকে যাচাই করতে চাই। যাক সে কথা। বাকীটা শুনুন। রাসকাপুর কিন্তু নুরজাহানের মত বহু বিদ্যা ও রাজনীতিতে ওস্তাদ ছিলেন বলে জানা যায় নি। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ওয়াকিয়ৎ-ই-জাহাঙ্গীরীতে লেখা আছে যে, জাহাঙ্গীর নিজে হাতে শিকার করবেন না বলে একটা প্রতিজ্ঞা নেওয়াতে নুরজাহান স্বামীর বন্দুকের এক গুলিতেই একটা বাঘ মেরে ফেলেছিলেন—যদিও একজন খুব বড় শিকারী সে বাঘ মারতে পারেনি। আর জয়পুরের নুরজাহান শুধু একটি বাঘ মেরেছিল—সে হচ্ছে মহারানা জগৎসিংহ।

রাসকাপুরের নামে জয়পুরের টাকা পর্যন্ত ছাপান হত। তবে এই ভালবাসা এতই ভঙ্গুর ছিল যে, যখন রাজা দেখলেন যে, নিজেকেই সিংহাসন হারাতে হতে পারে তখন শত্রুপক্ষের মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে পেয়ারের উপরাণীকে জেলে পাঠাতেও ছাড়েন নি। আরো সুবিধা মত তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফিরিয়েও নিয়েছিলেন।

তার পরে? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর সাহেব।

তবে শুনুন, বাকী কথাটা শুনুন ঠাকুর সাহেব। সেটাই আসল কথা। আপনাদের মধ্যে একজন ঠাকুরচাঁদ সিং ওইসব অসম্মানের দৃশ্য এড়াবার জন্য দরবারে হাজির হলেন না। তাঁর জরিমানা হল তিন লাখ টাকা। চার বছরের খাজনা। তবুও না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঠাকুর সাহেব,—আর তখনকার দিনের তিন লাখ টাকা। একটা জায়গীর কেনা যেত।

ঠাকুর সাহেব একজন বড় জায়গীরদার। তাই খাজনা ও জায়গীরের কথা তাঁর প্রাণে দাগা দিয়েছে। আমার মনে পড়ে গেল যে, প্রাণও দিয়েছিল কয়েকজন লোক এই উপলক্ষে। যেখানে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণ হয়ে রসকর্পুরীকে বিটিয়া বলে ডাকতেন ও রাজা নিজে তাকে রাজমহিষীদের সমান সম্মান দিয়ে বেড়াতেন সে অবস্থাতেও সাধারণ প্রজারা তার প্রতিবাদে প্রাণ দিতে দ্বিধা করে নি।

বললাম—শুধু জরিমানা ত সামান্য কথা। রাজা তার চেয়ে অনেক বেশীদূর এগিয়েছিলেন। সাধারণ রাজপুতের রীতি চরিত্র কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় ছিল। তারা যখন বাধা দেবার ক্ষমতা নেই দেখেছে তখন দূরে সরে থেকেছে। জয়মন্দিরের তোষাখানা রাজা বদ খেয়ালে এমনভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন যে চোখের সামনে তা দেখা যায় না। তোষাখানার যারা পুরুষানুক্রমে শিল্লেদার ছিল তারা, বেচারী সামান্য কোষাগাররক্ষীরা, কইতেও পারে না অথচ সইতেও পারে না এমন একটা অবস্থায় আত্মহত্যা করে আত্মসম্মান বজায় রাখল। রাজপুত স্বামীধর্ম বজায় রাখল।

উল্লাসে ঠাকুর সহেব বলে উঠলেন,—ঠিক জপানীদের মত।

উল্লাসের উপর একটু ঠাণ্ডা জল পড়ল যখন বললাম,—না। বলুন আসল রাজপুতদের মত। জাপানে যাবার দরকার কি? নিজেদের মধ্যেই খুঁজে দেখুন, এরকম অনেক গর্ব করবার ও লোককে শেখাবার জিনিস পাবেন। ভারতের জন্য রাজস্থানকে আবিষ্কার করুন।

জগৎসিংহের সময় সারা রাজোয়ারাতে মারাঠা বর্গীদের যে ভীষণ লুঠপাট ও অত্যাচার চলত তা মনে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে এখনো বাঙ্গলা দেশের মুখে মুখে প্রচলিত একটা কথা মনে পড়ল।

"জন্ম মৃত্যু বিয়ে
তিন বিধাতা নিয়ে"

এরকম একটা কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু রাজার ঘরে উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মান ত সোজা কথা নয়। সে বেচারার জন্মসঞ্চার থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যে তোলপাড় চলতে থাকে। যেখানে রাজারা এখনো মাথায় মুকুট পরে থাকতে পারেন সেখানে এ যুগেও উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মান একটি বিশেষ ব্যাপার।

এই জগৎসিংহের জয়পুরে এমনি একটা তোলপাড় ঘটনা হল। রাজার ষোল-জন বৈধ রাণী ছিল কিন্তু বৈধ কুমার ছিল না একটিও। কাজেই ইনি যখন মারা গেলেন আর প্রভুভক্ত রাজপুতেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সঙ্গে সঙ্গে আর একদিক দিয়ে অস্বস্তি আরম্ভ হল। রাজা মারা যায় কিন্তু রাজত্ব ত মারা যায় না।

জগৎসিংহ মারা যাওয়ার সময় রাজত্ব

চালাত তাঁর অন্তঃপুরের প্রধান খোজা মোহন নাজির। যেমন বুদ্ধিতে বিশারদ তেমনই জোচ্চোরি বাটপাড়িতে ওস্তাদ। রাজা যখন হঠাৎ মারা গেছেন এমন এক-জনকে গদিতে বসান দরকার যার লম্বা নাবালক অবস্থার মধ্যে নিজের প্রভুত্ব বজায় থাকে। এদিকে গদিতে বসবার মত দাবী করতে পারে এমন লোকের ত অভাব নেই।

মোহন নাজির রাজা মারা যাওয়ার পরদিন ভোরেই পকেট থেকে বের করল এক ন বছরের ছেলে মোহন সিংহ। নিজের নামের সঙ্গে মিল ছিল বলেই যে বেচারার এ সৌভাগ্য হল তা নয়। যদিও মাত্র এক শ বছর আগেকার জয়পুরে তাও অসম্ভব ছিল না। চলতি রীতি অনুসারে অম্বর রাজবংশের বারটা 'রাজাওৎ' শাখার মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিলেই চলত। কিন্তু তাতে অসুবিধা যে বড় বেশী। তাই ঠিক চৌদ্দ পুরুষ আগেকার সম্বন্ধের জের টেনে বের করা এই মোহন সিংহ শ্মশানে জগৎ-সিংহের মুখাগ্নি করতে শোভাযাত্রা করে যাবার জন্য সূর্যরথে চড়ে বসল।

নরের মধ্যে নাকি নাপিতই সবচেয়ে বেশী ধূর্ত। কিন্তু নাপিতরাও এই নাজিরের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারবে, মায় রাজনীতি পর্যন্ত। বারা কোটরির অম্বরকা অর্থাৎ অম্বরের বার সর্দারবংশের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বেশী ক্ষমতাশালী সর্দার ছিলেন তিনি জগৎ-সিংহের আমলে রাজার নিজের ভূসম্পত্তির অনেকখানি নিজের জমিদারীভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এখন নাজিরের দলে থাকলে কেহ সে সম্পত্তি আর ফিরিয়ে চাইবে না। অতএব তিনি ও নাজির চোরে চোরে মাসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করলেন।

শুধু তাই নয়। পুরোহিত, কুলগুরু, ধর্মভাই এসবের দলও নাজিরের হাতে হাত মিলিয়ে ফেলল। যদি রাজাওৎদের মধ্যে ভোটের কারবারের ফলে নতুন কোন রাজা নির্বাচিত হয় তাহলে কোথায় যাবে এসব অনুগৃহীতের দল? নতুন রাজার শুধু গবুচন্দ্র মন্ত্রীই যে আসবে তা নয়, আসবে নতুন গুরুপুরোহিত, ধাইমা, ধাই-ভাই, সভাপারিষদ। না, তার চেয়ে নাজিরের বাছাই করা নাবালক অনেক বেশী নিরাপদ।

যেসব সর্দারদের সহায়তায় আকবরের সময় থেকে ঔরঙ্গজেবের বংশধরদের সময় পর্যন্ত রাজা মানসিংহ, মীর্জা রাজা জয়সিংহ বা সোয়াই রাজা জয়সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের খুঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন সেই সর্দারবংশদের মধ্যে এক বাটপাড় সর্দার ছাড়া আর কারো পরামর্শ নেওয়া হল না। রাণীরাও কেহ কিছু জানলেন না। কিন্তু শ্মশানের শেষকৃত্য শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নাবালক দ্বিতীয় রাজা মানসিংহ নাম ধারণ করল আর নাজির জয়পুর দরবারে অন্যান্য রাজপুত রাজাদের প্রতিনিধি যারা ছিলেন তাঁদের কাছে এই রাজার স্বীকৃতি আদায় করে নেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। প্রায় আদায় করে এনেওছিল। কলকাতায় তখন বৃটিশ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। দিল্লীর বৃটিশ এজেণ্ট ও কলকাতা থেকে কোম্পানীরাজ নাবালককে রাজা বলে স্বীকার করলেন। রাজপুত রাজাদের স্থানীয় প্রতিনিধিরাও একরকম স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু স্বীকার করলেন না একজন রাজপুতানী। পদ্মিনী ও কর্মদেবীর দেশ রাজপুতানার এক রাণী। জগৎ-সিংহের রাণী ও যোধপুরের মহারাজার ভগ্নী। তিনি এই রাজা নির্বাচন উপেক্ষা করলেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সন্ধান পেয়ে প্রতিকূল বায়ুও বইতে লাগল। জয়-পুরের জনমত আত্মপ্রকাশ করল। সর্দাররাও নড়ে চড়ে উঠে বসলেন।

অস্ত্রের ঝনঝন আওয়াজের সম্ভাবনা দেখে নাজির খুব ভাল একটা কূটনীতির চাল চালল। মেবারের রাণাই ত রাজ-পুতদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সম্মানে ও প্রতাপে। তাঁর বার বছর আগে জয়পুরে মহারাজার বোনের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিল একবার। এখন যদি রাণাকে লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক আর বিরাট জাঁকজমকময় একটা বিয়ের লোভ দেখান যায় রাণা নিশ্চয়ই বিয়ে করতে জয়পুরে আসবেন আর জয়পুরের সব সর্দারই তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে আসবে। এক ঢিলে দু পাখী মারার চমৎকার বন্দোবস্ত।

সব কিন্তু ভেস্তে গেল জগৎসিংহের এক রাণী অন্তঃসত্ত্বা আছেন এই খবরে। কেহ কোন প্রশ্ন করল না যে, কি করে রাজা মারা যাবার পরেও তিন মাস পর্যন্ত এই সুখবরটি সযত্নে গোপন ছিল, বিশেষ করে যেখানে রাজা নিঃসন্তান মারা গেছেন বলে এত গোলমাল এবং যেখানে রাজবাড়ীর কেচ্ছাকাহিনী বাজারে সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। তার উপর আবার নাজির নিজেই রাওয়ালার (রাজ অন্তঃপুরের) প্রধান খোজা ও কণ্ট্রোলার অব হাউস হোল্ড!

ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা দরকার। ষোলজন বিধবা রাণী আর সব সর্দারের সর্দারণীরা এক সঙ্গে বসে রাণী সত্য সত্যই অন্তঃস্বত্বা হয়েছেন কিনা তা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন আর জেনানা দেউড়ীর বাইরে সর্দাররা সে পরীক্ষার ফলাফল প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। চার ঘণ্টা ধরে বিচার করার পর সবাই নিঃসন্দেহ হলেন যে, রাণীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে আর সবাই লিখে দিলেন যে, যদি কোন পুত্রসন্তান হয় সেই জয়-পুরের সিংহাসনে আরোহণ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বিধবা রাণীও নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু আর সেদিকে কেহ নজর দিল না। মিরাকল সংসারে শুধু একবারই হয়।

যথা সময়ে রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজোয়ারার সবচেয়ে ধনী রাজবংশের সম্মান রক্ষা করলেন। নাবালক মোহন সিংহ অলক্ষিতে কোথায় যে সরে পড়ল সিংহাসন ত্যাগ করে তার খবর কেউ রাখল না।

ইতি নীলবর্ণ-শৃগাল কথা।

(ক্রমশ)

লুপ্ত সঙ্গীত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

চৌরঙ্গীর রাস্তা ধরে চলতে চলতে কতদিন আনমনে তাকিয়েছি মিউজিয়মের দিকে। ঐ দৃঢ়কায় সৌধের ভিতরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও তেমনি মজবুত পাষাণকায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা দাঁড়িয়ে আছে কোন অতীতের সাক্ষ্য নিয়ে। বোবা, কথা কয় না। নিষ্প্রাণ পাষাণমূর্তিগুলির দিকে অবহেলাভরে একবার চেয়ে কি না চেয়ে লোকজন বারান্দা দিয়ে চলাফেরা করছে। আমিও তো কতবার গেছি ঐ যাদুঘরে; পুরোনো দ্রষ্টব্য জিনিস—একবার চোখ তুলে তাকিয়েছি মাত্র; খানিকটা এধার-ওধার ঘুরে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়েছি। রাস্তার ওপারে সবুজ ময়দানে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল হয়ে গেছি; যাদুঘরের কোন যাদুর পরশ লাগেনি সেদিন আমার চোখে কিম্বা মনে।

কিন্তু সেই দৃষ্টি, সেই মনের পরিবর্তন ঘটল। একদিন ঐ পাষাণ-মূর্তিগুলির কাছ থেকে নীরব নিমন্ত্রণ পেলুম। ইতিহাসের পাতায় প্রাচীন বাঙলার গৌরবের কথা পড়তে পড়তে একদিন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম। শিল্পী-মনের কত নিপুণ দৃষ্টান্ত রয়েছে, আর তার সঙ্গে মুদ্রিত রয়েছে পাষাণ-চিত্র, মৃন্ময়-চিত্র যা পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়ে। প্রাচীন বাঙলার সাঙ্গীতিক উৎকর্ষের পরিচয়ও অল্প নয়, কত বাজনা, কত ছন্দের নৃত্যভঙ্গী। ইতিহাসের পাতায় আর্টপেপারে ছাপা প্রাচীন চিত্রগুলি হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল। মন বল্লে, "অনুসন্ধান করো, তোমাদের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় আরও মিলবে, দেখতে শেখো, শুধু চোখ দিয়ে নয়, আমার ভিতর দিয়ে, অন্তর দিয়ে।" নতুন বার্তার সন্ধান নিতে আবার এলুম যাদুঘরে। কিন্তু এ কি? এ কোন্ স্বপনপুরীতে এলুম! ভুলে গেলুম বর্তমান, অতীত কথা কয়ে উঠলো—রূপায়িত হয়ে উঠলো। ঐ যে পাবনা থেকে খুঁড়ে বের করা পাথরের থামটা—ওর গায়ে খোদাই করা চিত্র,—একদল নর-নারী চলেছে কোন উৎসবে, বাজিয়ে চলেছে তারা মৃদঙ্গ, মুরজ, মর্দল, খঞ্জরী, করতাল, বীণা, বেণু, কাঁসর ঘণ্টা; সেই-সব ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট মূর্তিগুলি হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল, তনুতে ফুটে উঠলো অপরূপ লাবণ্য—কানে এলো তাদের মধুর ঐক্যতান। আজ থেকে হাজার বছর আগেকার সঙ্গীত রূপ ধরে আমার সামনে ফুটে উঠলো। তাদের মধ্যে একজন যেন আমার কানে কানে গানের সুরের মতোই মৃদু-কোমল কণ্ঠে বলতে লাগল ঃ—

"তোমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের দিকে তাকাও;—এই যে বীণা দেখছ, এই রকম একটা নয়, পঁচিশ রকমের বীণা বাজতো তোমাদের দেশে—নগরে, গ্রামে, প্রাসাদে, দেবভবনে। একটুখানি শোনাতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সেই প্রাচীন দিনের বৃত্তান্ত।

আজ তোমাদের দেশে পচা পানা-পুকুরের মেলা; হাজার বছর আগে তা ছিল না,—সেখানে ছিল প্রশস্ত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা। টলটলে তার জল, শ্বেত-মর্মরে বাঁধানো দুটো ঘাট, একটা ব্যবহার করত মেয়েরা অপরটা পুরুষেরা। মেয়েদের ঘাটের পাশে ছিল বটগাছ, তার তলায় বসে গান করত কত বিদেশী পথচারী ও পথচারিণী। তারা গাইত পাল-রাজাদের গান, তাঁদের মহৎ কীর্তিকথা। পুরুষেরা গাইত খঞ্জরী বাজিয়ে আর মেয়েরা বাজাত মন্দিরা। তাদের নিপুণ হাতে যখন এসব বাজনা বাজত, ভারী সুন্দর লাগত শুনতে। মেয়েদের হাতে মন্দিরা বাজত রিনি ঠিন্ রিনি ঠিন্ কিনি কিনি ঠিনি ঠিনি—কী মাধুর্য সেই কিঙ্কিনীতে, কী লীলায়িত ভঙ্গী তাদের হাতের। মেয়েরা স্নান করতে এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনত তাদের গান-বাজনা—বাড়ি ফিরে অবসর সময় চেষ্টা করত যদি তাদের হাতে মন্দিরার সেই বোল ফোটে।

নাগরিকগণ প্রদোষে স্নানের পর অঙ্গে চন্দনানুলেপন করতেন; তারপরে আসতেন গোষ্ঠী সমবায়ে। সেখানে কত রকমের গান, কত রকমের বাজনা হোতো। সে সব গানই বা কই, বাজনাই বা কোথায় গেল? আজ আর তোমাদের দেশে কেউ বীণা বাজায় না, বাঙলাদেশে বীণার ঝঙ্কার নেই, সে যন্ত্র চলে গেছে সুদূর দক্ষিণ দেশে; কিন্তু এইসব গোষ্ঠীতে কত কলানিপুণা গণিকা আসতেন বিচিত্র বীণা নিয়ে। না, না, নাসাকুঞ্চন কোরো না। গণিকা মানে আজকালকার রূপোপজীবিনী নয়। ইতর দেহ-ব্যবসায়িনী তাঁরা ছিলেন না, চৌষট্টি কলায় দক্ষতা অর্জন করে তবে তাঁরা গণিকা আখ্যালাভ করতেন। বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হোতো তাঁদের গৃহে—প্রচুর রাজসম্মানের অধিকারিণী ছিলেন তাঁরা।

গোষ্ঠীভবনের চতুর্দিকে মনোরম উদ্যান। ছায়াস্তীর্ণ বৃক্ষবাটিকায় পুষ্প-ভারাবনত একটি শাখায় প্রলম্বিত সুচারু প্রেঙ্খাদোলা। দোলপীঠিকায় বসে নগর-তরুণেরা যখন পরিহাসভরে ঈষৎ দোদুল্যমান হোতো তখন ঝরে পড়ত কত বিচিত্র রঙের পুষ্পপুঞ্জ। উদ্যান-লতিকার নবোদ্গত রক্তবর্ণ কুসুমকোরক পর্শ করত তাদের শরীর, জাগিয়ে দিত পুলকের শিহরণ। ভবনাভ্যন্তর থেকে ভেসে আসত মৃদু বীণাধ্বনি আর তার সঙ্গে অস্ফুট মুরজনির্ঘোষ, কখনো কখনো নূপুরশিঞ্জন। তরুণেরা আনমনা হয়ে পড়ত।

এই সব গোষ্ঠী থেকে বেরুতো ঘটা-নিবন্ধন উৎসবের যাত্রা, গণপতি-চতুর্থী, শ্রীপঞ্চমী আর শিবাষ্টমী উপলক্ষে। কী অপরূপ সেই যাত্রাবিলাস। এই যে প্রস্তরস্তম্ভ দেখছ, এতে উৎকীর্ণ আছে সেই যাত্রার চিত্র। বহুদিন থেকে এই সব

মন্দিরা

মুরজ

যাত্রার মহড়া চলত নগরগোষ্ঠীতে। কত দেশ থেকে আচার্যেরা আসতেন। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে আসতেন নৃত্যাচার্য। ভরত-পদ্ধতিতে নৃত্যশিক্ষা দিতেন তিনি। গৌড়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসতেন প্রসিদ্ধ ডমরু এবং মুরজশিক্ষকগণ। সুদূর মিথিলা থেকে আসতেন বীণা-বিশারদ। সুশিক্ষিত সেই সব যাত্রা যখন নগরগোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে রাজপথ অতিক্রম করত, তখন কত লোক পথের দুধারে দাঁড়িয়ে এবং মনোহর সজ্জিতা পুরাঙ্গণা-গণ ভবনশিখর থেকে সেই দৃশ্য উপভোগ করতেন। কত গন্ধবারী, কত পুষ্পস্তবক নিক্ষেপ করতেন তাঁরা যাত্রীদের উপর। সপ্তাহব্যাপী ছিল এই উৎসব।

গণপতি উৎসবে খঞ্জরী এবং মুরজ বাদ্যের প্রতিযোগিতা হোতো। তার ছবিও তো রয়েছে এখানে। তোমাদের এই প্রত্নশালাতেই সেই নৃত্যগণেশের মূর্তি রয়েছে। নৃত্যরত গণেশের পদতলে দেখতে পাবে সেই সব প্রসিদ্ধ শিল্পীদের চিত্র। মনোহর খঞ্জরী বাজাতে বাজাতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে 'বাদক, অপর এক পাটপটু' শিল্পী অবনদ্ধে নানারকম লহরা বাজিয়ে চলেছে। ওটাকে আজ তোমরা তবলা বল। তখনকার দিনে ওর কি নাম ছিল, আজ আর তা আমার মনে পড়ছে না। মুরজবাদ্যও কি একটা? বহুরকম নাম ছিল তার—অবচ্ছেদ, খণ্ডপাট, আস্থানগর্ত, বঙ্গ, সুন্দর, তলহস্ত, নাগবন্ধ, রূপক, উৎফুল্লক, মুষ্টিক,—আরও কত রকম। রামাবতী নগরের প্রসিদ্ধ মুরজাচার্যেরা মদন-চতুর্দশীর রাত্রে চর্চরী-প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। মহারাজ রামপাল পরিতুষ্ট হয়ে পারিতোষিক প্রদান করতেন তাঁদের। এইসব উৎসব উপলক্ষে বরেন্দ্রীর গ্রামাঞ্চল থেকে আসতেন দক্ষ ঘটবাদক। মৃন্ময় ঘটে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে নানা দুরূহ পাট প্রস্ফুটিত করতেন তাঁরা। ঘটবাদ্যের সেই প্রাচীন চিত্র এখনও দেখতে পাবে পাহাড়পুরের ভগ্নাবশেষে।

শ্রীপঞ্চমীতে সারস্বতভবনে হোতো বীণাবাদ্যের অনুষ্ঠান। দেবদাসীগণ নৃত্য করতেন,—নানারকম বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে ঝঙ্কৃত হোতো তাঁদের নূপুর-নিক্কন। কত বিচিত্র সেই সব বীণার নাম—বিপঞ্চী, বল্লকী, চিত্রা, ঘোষবতী, পরিবাদিনী, শততন্ত্রী, পিনাকধরণী, আলাপ, মহতী,—এইরকম আরও কত। একবার মগধ থেকে এলেন এক বীণকার, হাতে তাঁর আশ্চর্য বীণা। যবনদেশে ছিল সেই বীণার প্রচলন। এক বিদেশী বণিক মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তকে উপহার দিয়েছিলেন সেই বীণা। সম্রাট বক্লের সঙ্গে শিখেছিলেন সেই যন্ত্র-বাদন। বিষম-সমর-বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না—রসিক বাদকও ছিলেন। সেই যন্ত্র-বাদন-রত সম্রাটের চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা এখনও তোমাদের প্রত্নশালায় রক্ষিত আছে।

বীণার সঙ্গে বাজত মৃদঙ্গ। দেব-দাসীরা সঙ্গীতকলায় গণিকাদের চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শোন তা'হলে হাজার বছর আগের ঘটনা।

পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে অর্চনা সমাপ্ত হয়েছে। সন্ধ্যায় বিপুল সমারোহে আরম্ভ হয়েছে নৃত্যোৎসব। সহস্র প্রদীপালোকে দেবভবন উদ্ভাসিত। মহারাজ জয়ন্ত সুবর্ণসিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন; আসব পানান্তে উপভোগ করছেন সঙ্গীত। নৃত্য আরম্ভ করেছেন তখনকার শ্রেষ্ঠা নর্তকী দেবসেবিকা কমলা। ভরতোক্ত পদ্ধতিতে অপরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছিলেন তিনি। সহসা নৃত্যে বাধা পড়ল। তাঁর চোখ পড়ল এক অপূর্ব কান্তিমান যুবকের দিকে। এক হা[illegible] তাম্বূল গ্রহণ ক'রে অপর হাতে দক্ষত[illegible] সঙ্গে ছন্দের গতি নির্দেশ করছিলে[illegible] তিনি। মুগ্ধা নর্তকী সহসা নৃ[illegible] বিস্মৃত হলেন। কিন্তু সে ক্ষণকাল মা[illegible] পরমুহূর্তে সংযত হ'য়ে সমস্ত শিক্ষ[illegible] প্রয়োগ ক'রে কেবলমাত্র সেই যুবকে[illegible] মনোহরণের জন্যই নৃত্যানুষ্ঠান করলে[illegible] তিনি। নৃত্যশেষে বর্ষিত হোলো প্রভূ[illegible] রত্নালঙ্কার উপহার। কিন্তু সেদিকে[illegible] দৃক্পাত নেই তাঁর; সামান্য সেবিকা[illegible] মতো যুবককে তিনি সবিনয় আমন্ত্র[illegible] জানিয়ে নিয়ে এলেন নিজ গৃহে। কে এ[illegible] যুবক জানো? কাশ্মীরের ছদ্মবেশ[illegible] যুবরাজ জয়াপীড়—প্রবল পরাক্রান্ত[illegible] ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র। সুদূ[illegible] কাশ্মীরের রাজপুত্রকে দুর্দিনে সাহা[illegible] করেছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন বাঙলা[illegible] এক দেববারবণিতা। তাঁকে তৃপ্ত করে[illegible] ছিলেন কেবল রূপলাবণ্যে নয়, কলা[illegible] বৈদগ্ধ্যে।

ঠিক এমনভাবে আর একজন দেব[illegible] দাসী বাঙলাদেশকে গৌরবান্বিত কে[illegible] গেছেন, তাঁর নাম পদ্মাবতী। ইনি[illegible]

ডমরু

ছিলেন কোমলকান্ত-পদাবলীর স্রষ্টা কবি জয়দেবের পরিণীতা স্ত্রী। একদা পরম-বৈষ্ণব মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় এলেন এক দিগ্বিজয়ী গীতকোবিদ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তাঁর গুণবত্তার কাছে যখন সমগ্র রাজসভা পরাজয় স্বীকার করেছেন, তখন এলেন পদ্মাবতী। গান্ধার রাগের আলাপে তিনি শ্রেষ্ঠতর প্রতিভার পরিচয় দিলেন। কত গুণী ব্যক্তি আসতেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভায়, কিন্তু সবচেয়ে বড় গৌরব কি ছিল জানো? সে কবি জয়দেবের কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃত পদাবলী-গীত আর পদ্মাবতীর নৃত্য। কবি করতালি দিয়ে গাইতেন, "ললিত-লবঙ্গ-লতাপরিশীলন কোমল মলয়সমীরে" আর সেই ছন্দে মন্দিরা বাজিয়ে নৃত্য করতেন পদ্মাবতী। সমগ্র রাজসভা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করত সেই অপূর্ব সঙ্গীত। কতবার গানের শেষে মহারাজ স্বীয় কণ্ঠাভরণ উন্মোচন করে পদ্মাবতীর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন —ব্রাহ্মণী বিনীত প্রণাম জানিয়েছেন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় মহারাজাধিরাজের চরণে। অতীতের সেই সব ছবি একেবারে মুছে গেছে। আজ আর তাদের পরিচয় কেউ জানে না।

আমি এখনো দেখতে পাই প্রাচীন বাঙলার রাজপথ। নগর থেকে গ্রামে, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে চলেছে কত যাত্রী। পান্থশালায়, দেবালয়ে, বৌদ্ধবিহারে, এখানে ওখানে বসে তারা কতরকম গীত-বাদ্যে রজনী অতিক্রম করছে। মশালের আলোয় আলোকিত রাত্রে তারা অনুষ্ঠান করছে মঙ্গল প্রবন্ধ। মঙ্গলছন্দে সুললিত গীত গ্রামবাসী আনন্দের সঙ্গে শ্রবণ করছে। পরে তোমাদের দেশে কতরকমের মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে আজও তা তোমরা সংগ্রহ করে রেখেছ। কত সাধক এই পথ দিয়ে চলে যেতেন। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত সম্প্রদায় স্বীয় মতবাদ প্রচার ক'রে যেতেন নানারকম গীতে, গল্পে, অভিনয়ে। দেশের নানাস্থানে ছিল অসংখ্য বৌদ্ধ-বিহার। জগদ্দল, বিক্রমপুরী, ফুল্লহরি, পট্টিকের, দেবীকোট, ত্রৈকুটক, সন্নগর— এইসব বিহারে যাতায়াত করতেন কত যাত্রী, কত আচার্য, কত বিদেশী পর্যটক। এই পথেই কত সিদ্ধাচার্য চর্যাপ্রবন্ধ গেয়ে গেছেন। একসঙ্গে যখন তাঁরা ধ্রুবাগুলির আবৃত্তি করতেন, তখন কী সুন্দর লাগত শুনতে। এ'দের গানের সঙ্গেও বাজত মন্দিরা, মৃদঙ্গ, মুরজ, মর্দল। বুদ্ধ পূর্ণিমায় এইসব পথ অতিক্রম করত বুদ্ধ-নাটক সম্প্রদায়। এ'রা শুধু বাঙলায় নয় বহু দূর দেশ অতিক্রম করে নেপাল এবং তিব্বতের বহু দুর্গম স্থান পরিভ্রমণ করে আসতেন।

ইন্দ্রোত্থান পর্ব উপলক্ষ্যে নানা অভিনয়ের স্মৃতি এখনো স্পষ্ট রয়েছে আমার মনে। দূরদেশ থেকে আসতো গায়ক-বাদকের দল। একবার এলো মিথিলা থেকে তুম্বুরু-নাটকের সম্প্রদায়। পণ্ডিতপ্রবর আচার্য লোচন এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে। মহারাজ বল্লালসেন ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই নাটকের। সঙ্গীতাচার্য লোচন মিথিলায় উপহার নিয়ে গেলেন রাজকণ্ঠের মহামূল্য রত্নহার।

কোথায় গেল সেইসব নাটক, কোথায় গেল সেইসব যাত্রা, গান, নর্তন। সহসা একদিন অষ্টাদশ অশ্বারোহী বিপুল সৈন্যসম্ভার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনার বাঙলার বুকে। সমগ্র দেশটা যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কত জিনিস লুপ্ত হয়ে গেল, কত শিল্প বিনষ্ট হোলো। তবু বীণার ধ্বনির সঙ্গে বেজে উঠল রবাবের মূর্ছনা, বাঁশির সঙ্গে যোগ দিল সানাই, ভেরী, পটহের, সঙ্গে কাড়া, নাকাড়া। তাদের কাহিনী—সেও এক বিস্তারিত বিবরণ, আর একদিন বলব।"

মুখর পাষাণ সহসা স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

১৩

মোহিনী সিন্দুর অফিসে সেদিন সকাল থেকেই বড় কাজের তাড়া। একটা নিঃশ্বাস নেবার পর্যন্ত ফুরসুৎ পাওয়া যায় না। পাঠকজী তারই মধ্যে দুপুরবেলা ছাতু ভিজিয়ে খেয়ে নিলে। ভূতনাথেরও খুব ক্ষিধে পাচ্ছে। তবে কি আজকে কেউ ডাকতে আসবে না!

একটা মনি-অর্ডারের কাগজ নিয়ে সোজা ওপরে চলে গেল ভূতনাথ। সুবিনয়বাবু তেমনি ভাবে বসেছিলেন। পাশে জবা। আর একটা চেয়ারে জবার মা। বসে বসে বই পড়ছেন।

কাছে যেতেই ভূতনাথ লক্ষ্য করলে সুবিনয়বাবু মেয়ের সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছেন। ভূতনাথ কাছে যেতেই জবা উঠছিল।

সুবিনয়বাবু বললেন—না, উঠে যেও না মা, বোস—লজ্জা কি মা—

জবা বললে—ভূতনাথবাবুর খাওয়ার এখনও জোগাড় হয়নি বাবা—আমি যাই—

—কেন? সুবিনয়বাবু অবাক হয়ে গেলেন। ভূতনাথবাবুর খাবার দিতে এত দেরি করা বড় অন্যায় মা—

—কিন্তু উনি কি আমাদের হাতে খাবেন? —ও'কেই জিজ্ঞেসা করুন না বাবা—

—কেন, ওকথা কেন বলছ মা? বৃদ্ধ যেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

ভূতনাথ কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জবার মা আপন মনেই বই পড়ছেন। তাঁর যেন এ-সব কথা কানে যাচ্ছে না।

জবা পরিষ্কার করে বললে—আমরা তো ব্রাহ্মণ নই বাবা—

—ও, তাও সত্যি—তা' হলে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত কী হবে ভূতনাথবাবু? এ-কথাটা আগে ভাবিনি তো মা—একটা ঠাকুরের ব্যবস্থা করতে হয়। পাঠককে একবার খবর দিতে হবে—ওরে রতন—

—সে যখন হবে, তখন হবে, কিন্তু এখনি তো আর ঠাকুর আসছে না—আজকে কি উনি উপোস করবেন?

—সে কি একটা কথা হলো? বলে সুবিনয়বাবু হতবুদ্ধির মত ভূতনাথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভূতনাথেরও এই পরিস্থিতিতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল।

জবা এবার সোজাসুজি ভূতনাথকে প্রশ্ন করলে—আমি হাঁড়িটা চড়িয়ে দিলে, আপনি নামিয়ে নিতে পারবেন না—তাতেও আপনার কিছু আপত্তি আছে?

ভূতনাথ বললে—পারবো—

—এ তো বেশ কথা, খুব উত্তম কথা, যতদিন ঠাকুর না পাই, ততদিন এই রকম একটু কষ্ট করো ভূতনাথবাবু, জবা ঠিক বলেছে—তোর বুদ্ধি আছে মা—

—তা হলে আমি ব্যবস্থা করি গিয়ে—

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে, একটা কথা শুনে যাও মা, ভূতনাথবাবুকে আমি তা হলে রবিবার দিন আসতে বলি? কী বলো—

জবা মুখ নিচু করে বললে—সে তোমার অভিরুচি বাবা—

—না না, সে কি, তোমার বিয়ে, উৎসবটা তোমাকে কেন্দ্র করে, যাদের যাদের তুমি নিমন্ত্রণ করবে, তাদেরই আমি ডাকবো—আর ভূতনাথবাবু তো আমাদের ঘরের লোক—ব্রজরাখালবাবুর নিজের বিশেষ আত্মীয়—

—আমি ভূতনাথবাবুর রান্নার ব্যবস্থা করি গে বাবা—বলে দ্রুতপায়ে জবা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল এক নিমিষে।

ভূতনাথ এবার হাতের কাগজপত্র সুবিনয়বাবুর সামনে এগিয়ে ধরলে। যেখানে সই করবার, সেখানে সই করলেন তিনি। তারপর বললেন—বোস, কথা আছে তোমার সঙ্গে ভূতনাথবাবু—

ভূতনাথ বসলো।

সুবিনয়বাবু বললেন—জবার বিয়ের কথা বলছিলাম, তা আসচে রবিবার দিন একটা ছোটখাটো উৎসবের দিন স্থির করেছি—পরস্পর কথাবার্তা হবে—পাকাপাকি কথা সেই দিনই হয়ে যাবে—ভেবে দেখলাম আমার আর ক'দিন—আর উনিও—

পাশে বসা জবার মা'কে নির্দেশ করে বলতে লাগলেন—আর উনিও না-থাকার মত—ওদিকে জবারও বিবাহের উপযোগী বয়েস, ভালো পাত্রও পেয়েছি, ছেলেটি মেধাবী, বি এ পাশ করেছে—এবার আইন পড়ছে—বাপ বেঁচে নেই—তাহোক, এ সব সম্পত্তির ভার তো একদিন জবাকেই নিতে হবে—আমাদের পৈত্রিক কারবার—বাবা ছিলেন গোঁড়া কালীভক্ত হিন্দু—আমি ধর্ম বদলেছি বটে, কিন্তু বংশের ধারা কোথায় যাবে—নিজের ছেলে নেই, তা না থাক, জামাইকেই ছেলের মতন করে নিতে হবে—তারপর খাওয়াপরার জন্যে চিন্তা করতে হবে না—আমি যা রেখে গেলাম......কী বলো, অন্যায় কিছু বলেছি—

খানিকক্ষণ চুপ চাপ।

ভূতনাথ বললে—আমি আসি এবার—

—না বোস একটু—তোমাকে সেই গল্পটা বলা হয়নি—প্রথম যেদিন দীক্ষা নিলুম—সে কী কাণ্ড ভূতনাথবাবু—শুনুন তবে—

ভূতনাথ বললে—সে-গল্প আপনি আমাকে বলেছেন—

—বলেছি নাকি? তা' বলেছি বটে, কিন্তু কেবল মনে হয় বুঝি বলা হলো না কাউকে—কেউ কি মনে রাখবে সে-কথা ভূতনাথবাবু? আমার সময় তো ঘনিয়ে

এল—শ্রীমদ্‌ভাগবতে পড়েছি রন্তিদেবের গল্প, সমস্ত দিন ধরে সব দান করে যখন নিজের খাবার জলটুকুও এক ভিক্ষার্থী চণ্ডালকে দিয়ে দিলেন, তখন নিজের মনে যা বললেন—ভাগবতকার বলছেন তা অমৃত—ইদমাহামৃতং বচঃ—কী বললেন? বললেন—আমি ভগবানের কাছে পরমগতি চাই না, অষ্ট সিদ্ধিও চাই না—পুনর্জন্মও চাই না—আমি চাই আমি যেন সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের দুঃখকে পাই, যাতে তাদের দুঃখ না থাকে—আর একজায়গায় ভগবতকার বলেছেন—

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণি-
নামার্তিনাশনং"—

—আহা, বাবাকে দেখেছি বাড়ির বিগ্রহের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করছেন "ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'। বাবা ছিলেন আমার বড়ই গরীব—যজন-যাজন নিয়েই থাকতেন—। মনে আছে আমি ছোটবেলায় হুঁকো কলকে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতুম, দিনের মধ্যে অন্তত দশ-বারোটা কলকে ভাঙতুম। মনে আছে বাবা সেই উঠোনের ধারে বসে বসে...তোমার শুনতে ভালো লাগছে তো ভূতনাথবাবু? খারাপ লাগলে বলবে—

বহুবার শোনা গল্প। অনেকবার বলেছেন। তবু ভূতনাথ বললে—না খুব ভালো লাগছে, আপনি বলুন—

সুবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আবার আরম্ভ করলেন।

—তখন এক পয়সায় আটটা কলকে—সে-পয়সাও খরচ করবার মত সামর্থ্য ছিল না তাঁর—কোথায় গেল সে-সব লোক। সেই অবস্থার মধ্যেই একদিন ঈশ্বরের কৃপা পেলেন বাবা, ধ্যানে পেলেন মোহিনী-সিঁদুরের মন্ত্র—তাই থেকে চালা ভেঙে পাকা দালান উঠলো, দোতলা কোঠা হলো, মা'র গায়ে গয়না উঠলো। আর আমি এলাম কলকাতায় পড়তে, সেই পড়াই আমার কাল হলো ভূতনাথবাবু, আমি চিরদিনের মত বাবাকে হারালুম—

গল্প বলতে বলতে চোখ ছল ছল করে ওঠে সুবিনয়বাবুর।

—জানো ভূতনাথবাবু যেবার সেই ডায়মণ্ডহারবারে ঝড় হয়, সেই সময় আমার জন্ম, সে এক ভীষণ ঝড়, বোধহয় ১৮৩৩ সাল সেটা, কলকাতায় সেই প্রথম ওলাউঠো হলো, জন্মেছি ঝড়ের লগ্নে, সারাজীবনটা কেবল ঝড়ের মতনই বয়ে গেল, বাবাকে যা কষ্ট দিয়েছি, বাবা প্রতিজ্ঞা করলেন আমার মুখদর্শন করবেন না—সত্যিই আর করলেনও না—আমি একমাত্র সন্তান, আমার অসুখের সময় বাবা কবিরাজ ডেকে আনলেন, কিন্তু ঘরে ঢুকলেন না, পাছে আমার মুখদর্শন করতে হয়—সেই বাবা আমার প্রেতলোকে এক গণ্ডুষ জলও পেলেন না তাঁর একমাত্র বংশধরের হাতে—তাই সেই পাপে বোধহয় আমি আজ নির্বংশ—

বলে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভূতনাথের দিকে।

—কিন্তু কী করবো বলো ভূতনাথবাবু, মন বলে অন্য কথা। হৃদয়ের কথা মন শোনে না। বলে—ভুল, ভুল—সব তোমার ভুল ধারণা। তথাগত প্রচার করলেন—জন্মেই বন্ধন, জন্মরহিত হতে পারলেই মুক্তি। তাই তো ভাবি—দ্বৈতের জগতে স্বর্গরাজ্য আসতে পারে না, নিত্য বৃন্দাবনের পরমানন্দ, ব্রহ্মের রসোল্লাস—যেখানে একত্বের মধ্যে সকল বহুত্বের চিরঅবসান তা-ই কাম্য হওয়া উচিত—আমার জীবনের শেষ-দিনটা পর্যন্ত এর মীমাংসা বুঝি আর করতে পারবো না—মন বলে—ঠিক করেছো, হৃদয় বলে—না—। অথচ দেখ ভূতনাথবাবু, মোহিনী-সিঁদুরের ব্যবসাও ত্যাগ করতে পারলাম না—ও ভড়ংটাও রাখতে বাধ্য হয়েছি—

সে কি! ভূতনাথ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না। সব তবে ভড়ং। কিছু তবে সত্যি নেই এর পেছনে। খানিকটা দৈবশক্তি বা মন্ত্রশক্তি! ভূতনাথের মনে হলো কিছুটা দৈবশক্তি আছে জানতে পারলে যেন সে তৃপ্তি পায়। অন্তত একবারের জন্যেও সে বৌঠানের কাছে গিয়ে তা হলে এর গুণের কথা বলতে পারে।

সকাল থেকে যে-প্রশ্নটা বার বার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল, এই সুযোগে ভূতনাথ সেই প্রশ্নটাই করলে—

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা মোহিনী-সিঁদুরে কিছু কাজ হয়?

কিন্তু প্রশ্নটা করবার আগেই বাধা পড়লো।

হঠাৎ পাশ থেকে বই পড়তে পড়তে জবার মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সুবিনয়বাবু সচকিত হয়ে উঠেছেন।

—কী হলো রাণু—কী হলো রাণু—

সুবিনয়বাবু যেন ভুলে গেছেন ভূতনাথ এখানে বসে আছে। সুবিনয়বাবু হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্ত্রীর মাথাটা দুই হাতে ধরলেন। জবার মা'র হাত থেকে বইটা পড়ে গেল। আঁচলটা খসে গেল বুক থেকে। ছোট মেয়ের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

—কী হলো রাণু, কী হলো?

বৃদ্ধ অথর্ব শরীর নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। উঠে স্ত্রীর মাথাটি ধরে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

—কী হলো রাণু, বলো আমাকে? বলো—

কাঁদতে কাঁদতে জবার মা বললেন—আমার ক্ষিদে পেয়েছে—

—ক্ষিদে পেয়েছে, বেশ তো, কান্না কেন, খাও, খাবার আনছি আমি—

—কিন্তু এই মাত্র খেলাম যে—আরো প্রবল বেগে কাঁদতে লাগলেন জবার মা।

—তা'তে কী হয়েছে রাণু, আবার খাও—

ভূতনাথ এই পরিস্থিতিতে কেমন বিব্রত বোধ করতে লাগলো।

বললে—আমি এখন আসি তাহলে—

সুবিনয়বাবু মুখ ফেরালেন।

—তুমি যাবে?...তা হঠাৎ এই রকম হয় জবার মা'র, এই-ই অসুখ কি না, কিছুতেই সারলো না আর, আমার খোকার মৃত্যুর পর থেকেই এই রকম হচ্ছে—তোমারও খেতে দেরি হয়ে গেল ভূতনাথবাবু—তুমি যেন রাগ করো না জবার ওপর—

আর বাক্য ব্যয় না করে সোজা নিজের চেয়ারে এসে বসলো ভূতনাথ।

খানিক পরেই রতন খেতে ডাকতে এল।

খাবার সময় প্রথমে বিশেষ কথা হলো না। সারাক্ষণ জবা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

একবার জবা বললে—ভাত নষ্ট করবেন না—ওগুলো সব খেতে হবে কিন্তু আপনাকে—

ভূতনাথ মুখ তুলে চাইল। বললে—পাঁড়াগাঁয়ের ছেলেরা ভাত একটু বেশিই খায়—কিন্তু তা' বলে এত বেশি?—চাল একটু কম নিতে বললেই পারতে—

—শেষে পেট না ভরলে, তখন?

জবার মুখ যেন গম্ভীর-গম্ভীর। বেশি কথার আবহাওয়া নেই তার। আবার অনেকক্ষণ চুপ চাপ। এ যেন কেমন বিশ্রী ব্যাপার। এখানেই রোজ খেতে হবে—অথচ নিজের হাতে সব রান্নার ব্যবস্থা। যতদিন ঠাকুর না আসে, ততদিন এ-ছাড়া গতিও নেই।

খানিক পরে ভূতনাথ আবার কথা কইল। বললে—তোমার বাবা রবিবার দিন আমাকে আসতে বললেন, কিন্তু সন্ধ্যেয় না সকালে—কিছু বললেন না তো?

—সেটা বাবাকেই জিগ্যেস করবেন—

—কিন্তু তোমারই যখন বিয়ে, তখন তুমিও তো কিছু জানো,—আর হাতের কাছে তুমি থাকতে আবার......

—বিয়েটা আমার বলেই তো, আমার মুখে ও-কথা শোভা পায় না—

—বিয়ে জিনিসটা কি লজ্জার? সময় হলে একদিন সবারই বিয়ে হবে—

—হবে নাকি? আমার কিন্তু সন্দেহ আছে—

ভূতনাথ বললে—পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ভাত বেশি খাই বলে—কথাও বেশি বলতে পারবো এমন কথা নেই. কিন্তু এটা জানি যে সব মেয়েই আর তোমার মত নয়—

—ক'টা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার?

ভূতনাথের মনে হলো—সকলের নাম করে দেয় সে। হরিদাসী, রাধা, আন্না, তা'দের ব্যবহারও তো সে দেখেছে। আর কাল রাত্রের বৌঠান। বৌঠানের কথা মনে হতেই যেন সমস্ত মন প্রশান্ত হয়ে এল তার। এক মুহূর্তে যেন এই অফিস-বাড়ি ছেড়ে সে সোজা বড়-বাড়ি তেতলার শেষ ঘরখানায় গিয়ে পেঁাছেছে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ভূতনাথ এক নিমেষে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো—আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি তোমাকে, তোমাদের মোহিনী-সিঁদুরে কাজ হয়?

জবা যেন প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—এটাও কি বাবাকে জিগ্যেস করলে ভালো হয় না?

মানছি ভালো হয়, কিন্তু তোমাকেই না হয় জিগ্যেস করলাম, তুমি কিছু জানো?

—পাঁজির বিজ্ঞাপনে তো সব লেখা আছে—

—সে তো সবাই জানে, তুমিও জানো আমিও জানি—আরো হাজার-হাজার লোক জানে—

—আমিও তার বেশি কিছু জানি না, আমার নিজের কখনও ও সিঁদুরে ব্যবহার করবার দরকার হয়নি—

জবা হাসলো এবার।

তারপর হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করলো—আপনার বুঝি দরকার হয়েছে?

ভূতনাথ খাওয়া থামিয়ে বললে—হ্যাঁ—

জবা শাড়ির আঁচলটা নিজের শরীরে বিন্যস্ত করে বললে—প্রয়োগটা কি আমার ওপরে করবেন নাকি—তা' হলে কিন্তু ঠকবেন বলে রাখছি—

ভূতনাথ বললে—ঠাট্টা নয়, আমার বিশেষ দরকার, আজকেই জানা দরকার—তা' হলে আজই কিনে নিয়ে যাই এক কৌটো—আমায় পাঁচটা টাকা দিয়েছেন কিনতে—

—কে?

—সে আমার এক বৌঠান—

—কী হলো আবার তার?

—সে কি তুমি বুঝবে? বৌঠান বলে—বিয়ে হবার আগে ওসব মেয়েরা বুঝবে না, তা ছাড়া বলতেও বারণ আছে—। মেয়েমানুষের অতবড় লজ্জা, অতবড় অপমান নাকি আর নেই—

—বৌঠানটি আপনার কে শুনি?

—বলেছি তো বলতে বারণ আছে।

জবা বললে—ডাক্তারের কাছে লজ্জা করা বিপজ্জনক, রোগ সারাতে গেলে সমস্ত প্রকাশ করে বলতে হবে—

ভূতনাথ কী যেন একবার ভাবলে। তারপর বললে—কিন্তু বৌঠানকে যে আমি কথা দিয়েছি—কথা দিয়েছি, ব্রজ-রাখালকে বলবো না, বৌঠানের চাকর বংশীকেও বলবো না, কাউকেই না, এমন-কি, তোমাকেও না—

—আমাকে তিনি চেনেন নাকি?

—আমি বলেছি তোমার কথা—

জবা এবার হেসে বসে পড়লো সামনে। বললে—আমার সম্বন্ধে কী বলেছেন শুনি—খুব নিন্দে করেছেন নিশ্চয়—

—নিন্দে তোমার শত্রুতেও করবে না জবা—আর আমি তো তোমার শত্রুও নই—আর তাছাড়া তুমি আমার কে বলো না যে, খামোকা তোমার আমি নিন্দে করতে যাবো—

—আপনার সঙ্গে তো আমার মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক, কী বলেন—আর কিছু নয়—

—আমিও তাই-ই বলেছি—

কথাটা শুনে ভূতনাথ আবার নিচু মুখে খাওয়ায় মনোযোগ দিলে—জবাও খানিক চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনি দেখছি শুধু অকৃতজ্ঞই নন, আপনি মিথ্যেবাদী—

ভূতনাথ খেতে খেতেই জবাব দিলে—আমি তাও বলেছি—

—তার মানে?

ভূতনাথ কোনও জবাব দিলে না। যেমন খাচ্ছিল, তেমনি খেতে লাগলো।

—চুপ করে রইলেন যে,—জবাব দিন!

ভূতনাথ এবার মুখ তুললে। দেখলে জবার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বললে—আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, একটু বেশি ভাত খাই, গুছিয়ে বলতে পারিনে বটে—কিন্তু মান-অপমান জ্ঞান আমাদেরও আছে—

জবা বললে—শুধু আছে নয়—বেশি মাত্রাতেই আছে; নইলে মেয়েমানুষ বলে অপমান করতে সেদিন আপনার মুখে বাধতো—

ভূতনাথ এক মুহূর্তে বুঝে নিলে আবহাওয়াটা।

তারপর বললে—সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম স্বীকার করি—কিন্তু ক্ষমা চাইতে ফিরে আসবার পর তুমিই বা কোন্ আমার মর্যাদা রেখে কথা বলেছিলে?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—তোমাকেও তো দেখছি, আর বৌঠানকেও দেখলাম, অথচ—

—অথচ কী বলুন—

ভূতনাথ হাসলো।

—না থাক, তুমি রাগ করবে—

—রাগ যদি করিই তো ভাত আপনাকে কম খেতে দেব না তা বলে—

ভূতনাথ বললে—না, সে কথা হচ্ছে না, তোমাকে রাগালে আমার লোকসানই তো ষোল আনা, তোমার বাবা বলছিলেন, এ-সংসারের মালিক তো একদিন তুমিই হবে, তখন? তখন আমার সাত টাকার চাকরীতে টান পড়তে পারে কিম্বা সাত টাকা থেকে সতেরো টাকা হবার আশাতেও জলাঞ্জলি পড়বে হয়ত—

দেখছি নামে আর চেহারাতেই শুধু ভূতনাথ—কথাগুলোর বেলায় কলকাতার ছোঁয়া লেগেছে এরি মধ্যে—

খাওয়ার পর হাত ধুতে ধুতে ভূতনাথ হাসতে হাসতে বললে—তুমি নিজের মুখে আসতে না বললে—রোববার কিন্তু আমি আসবো না জবা—

জবাও হাসলো। বললে—আপনার আশা তো বড় কম নয় ভূতনাথবাবু—

ভূতনাথ জবার মুখের দিকে চেয়ে মনের কথাটা একবার ধরবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জবা ততক্ষণে নিজের কাজে স্থানত্যাগ করে চলে গেছে।

(ক্রমশ)

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

মীরা সান্যাল
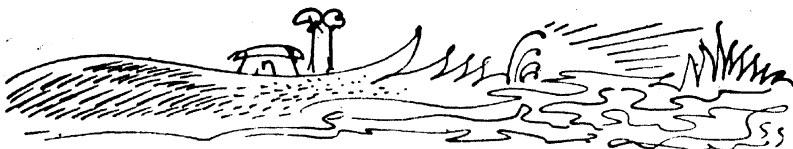
চারিদিকে সুন্দর শ্যামল তৃণের আস্তরণ বিছানো, মাঝে মাঝে বট-অশ্বত্থাদি বৃহৎ বৃক্ষরাজি স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছে—আর তাদেরই মাঝে নীড়াশ্রিত বিহঙ্গের কলরব নিস্তব্ধতার বুকে ঢেউ তুলছে। এরই মাঝে যে বিরাট প্রাসাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার অতীত কৌতূহলময় রহস্যে ভরা, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়।

বলছি বেলভেডিয়ারে অবস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা। ভারতবর্ষের বৃহত্তম গ্রন্থাগার হিসাবে জ্ঞানের আলো বিকীরণ করে জাতীয় জীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলার পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে এর।

যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের অনেক আশা, যার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন জড়ান, তার অতীত সম্বন্ধে কৌতূহল পোষণ করাটা খুব স্বাভাবিক। আর ন্যাশনাল লাইব্রেরির অতীতের মধ্যে এসে মিশেছে গত শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের একটা ধারা।

ইংরেজরা এদেশে আসার পর তাদেরই প্রয়োজনগত উৎসাহে আমাদের মনে যে আলোর কামনা জাগিয়ে তুলেছিল, তারই একটা অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত। এই নবজাগরণকে অন্য সকল ক্ষেত্রে যেমন সকল ভারতীয়ের মধ্যে বাঙালীই প্রথমে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিল, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যদিও আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরির অস্তিত্ব ছিল না সেদিন, তবু ন্যাশনাল লাইব্রেরির সঙ্গে সে ইতিহাসের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম ফলস্বরূপ আমরা পেলাম কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরি। আর তারই রক্তমাংসে গড়া এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

সুতরাং ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা বলতে গিয়ে কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরির কথা কিছু বলা অবান্তর হবে না। জনসাধারণের সঙ্গে শাসক-শক্তির প্রাণের ঐক্য ঘটে নি, ইংরেজ আমলে। তবে সরকারী দফতরখানায় ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছি একরকম, জনসাধারণের একজন হিসাবে পেয়েছি আর একরকম। শাসক হিসাবে ইংরেজরা পুরানো দলিল-পত্রের সংরক্ষণের প্রতি অবজ্ঞাভরে উদাসীন। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন নিজের হাতে ভারতবর্ষের শাসনভার তুলে নিলেন, তখন লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস থেকে তিন শ' টন অতি মূল্যবান পুঁথিপত্র বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিল এক কাগজের কারখানাকে, সেগুলির মণ্ড থেকে সস্তাদরের কাগজ প্রস্তুত করার জন্য।

কিন্তু তারই কিছুকাল আগে ১৮৩৫ সালে ইংরেজ ও বাঙালী জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরি। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ সালের ৩১শে আগস্ট টাউন হলে এক সভা হয়। তার সভাপতি ছিলেন বিচারপতি সার জন পিটার গ্রান্ট্ আর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ স্টাকায়েলার। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করার জন্য চব্বিশজন বিশিষ্ট নাগরিক নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হল। এই সভ্যদের মধ্যে দু'জন বাঙালী ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং হিন্দু কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত।

চব্বিশ পরগণার সিভিল সার্জন ডাঃ এফ পি স্ট্রং তাঁর ১৩নং এসপ্লানেড রো বাসভবনের একতলা বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন কলকাতার পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। জনসাধারণের নিকট আবেদন করা হল তিন শ' টাকা দিয়ে গ্রন্থাগারের অংশীদার হতে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম এই আবেদনে সাড়া দেন। আজও কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম স্বত্বাধিকারী হিসাবে তাঁর আবক্ষ মূর্তি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সযত্ন-রক্ষিত। মাস চারেকের মধ্যে জন-সাধারণের কাছ থেকে হাজার তিনেক টাকা সংগৃহীত হল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঁচ হাজার আর সাধারণের কাছ থেকে হাজার দেড়েক বই নিয়ে হল এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা।

ডাঃ স্ট্রংএর বাড়ীতে এই গ্রন্থাগার রইল অনেকদিন। এই সময়ে গ্রন্থাগারের উদ্যোক্তারা অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, কিন্তু জায়গার অভাবে সংরক্ষণের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি। ফলে অনেক ভালো ভালো বই নষ্ট হয়ে গেল। ভারতের সবচেয়ে পুরনো সংবাদপত্র Hickeys Bengal Gazette-এর যে কপি পাওয়া যায়, তা অযত্নে ক্ষতবিক্ষত। ফ্রান্সিস এবং হেস্টিংসের মধ্যে যে দ্বৈতযুদ্ধ হয়েছিল তার কৌতূ-হলোদ্দীপক বিবরণটুকুই কে কেটে নিয়ে গেছে। অথচ ব্রিটীশ মিউজিয়ামে এই পত্রিকাখানি অক্ষত অবস্থাতেই পাওয়া যাবে।

১৮৪১ সালে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি চলে এল ৮, লায়ন্স রেঞ্জে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করায় তদানীন্তন অস্থায়ী গবর্নর জেনারেল সার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি বৃহৎ ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। এই স্মৃতি-সৌধ নির্মাণের উদ্যোক্তারা এখানে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু একটি গ্রন্থাগার যখন সুপরিসর স্থানের অভাবে গড়ে উঠতে পাচ্ছে না, তখন অপর একটি স্থাপন করার কোন সার্থকতা নেই, একথা ভেবে সকলে ঠিক করলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরিকেই এই ভবনে স্থানা-ন্তরিত করা হবে। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির তরফ থেকে এই স্মৃতি-সৌধ নির্মাণের সাহায্যার্থে প্রায় ছ' হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল।

মেটকাফ হলে আসবার পর থেকে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা। কলকাতার বিদ্বজ্জনের মিলনতীর্থ হয়ে উঠল আর এই মিলন-সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৩৫ সালে গ্রন্থাগার স্থাপনার কয়েক মাস পরেই তিনি এখানে এসেছিলেন সহকারী গ্রন্থাগারিক হয়ে। ১৮৪৮ সালে বিদ্যোৎ-সাহী বেথুন সাহেব এই গ্রন্থাগারের কিউরেটর হয়ে যোগদান করলেন। তাঁর
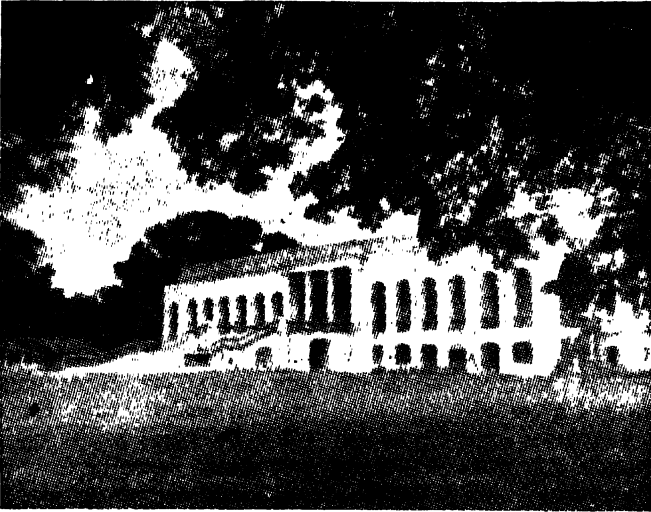
ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সম্মুখ ভাগ—বেলভেডিয়ার

সবচেয়ে বড় সংস্কার হল বই সাজাবার জন্য স্থিরবিন্যাস রীতির প্রবর্তন, যা আজও ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠাগার সংগ্রহে প্রচলিত।

বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরির পরিচালনব্যবস্থার কাঠামোতে পাবলিক লাইব্রেরির গঠনতন্ত্রের ছাপ আছে। পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল সাত জন কিউরেটরের উপর। ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাউন্সিল তারই একটি পরিবর্তিত রূপ মাত্র। তা ছাড়া পাবলিক লাইব্রেরি যদিও আজ থেকে একশ' সতের বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অন্তর্নিহিত আদর্শকেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি রূপায়িত করছে। সে আদর্শ ছিল শ্রেণী-ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য পূর্ণাঙ্গ এক গ্রন্থাগার স্থাপন।

একদিন পাবলিক লাইব্রেরির গৌরব অস্তমিত হয়ে এল। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে কৌতূহল নিয়ে প্রথম ইংরেজরা এদেশে এসেছিল, সেটা কালে স্তিমিত হয়ে এল—সর্বোপরি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনাই তার সকল রকম অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

তাই দেখি, ১৮৮৫ সাল থেকে পাবলিক লাইব্রেরির শোচনীয় আর্থিক অবস্থা। বাংলা সরকারের কাছে লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ হাত পাতলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুত সাহায্যেও বঞ্চিত হলেন। করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কিছু সাহায্য করলেন বটে, কিন্তু ১৮৯৯ সালে লাইব্রেরির কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য কয়েকজন পাঠক আসতেন সংবাদপত্র বা উপন্যাস পড়তে। ভারতের তৎকালীন রাজধানীতে একটি উৎকৃষ্ট ধরণের গ্রন্থাগার স্থাপনের মানসে লর্ড কার্জন এখানে পদার্পণ করে অবস্থা দেখে অত্যন্ত নিরাশ হলেন। আবার এখানে অযত্ন-রক্ষিত অথচ মূল্যবান বহু পুস্তকের সন্ধান পেয়ে কিঞ্চিৎ আনন্দিতও হলেন।

বঙ্গ-বিভাগের কুখ্যাতি জড়িত হয়ে আছে লর্ড কার্জনের নামের সঙ্গে—তবু তিনি পাবলিক লাইব্রেরিকে তদানীন্তন সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহার্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে দেশের যে উপকার করেছেন, তার গৌরবও কম নয়। ১৮৯১ সালে কতকগুলি ছোট ছোট সরকারী গ্রন্থাগারকে একীভূত করে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা। এই গ্রন্থাগার ব্যবহারে অধিকারী ছিলেন কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্মচারিবৃন্দ। ভারত সরকারের কোন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র ব্যতীত বেসরকারী পাঠক এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন না। লর্ড কার্জনই প্রথম জনসাধারণের নিকট এই গ্রন্থাগারকে উন্মুক্ত করার কথা কল্পনা করেন।

১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী লর্ড কার্জন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির দ্বারোদ্ঘাটন করেন জনসাধারণের জন্য।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করতে গিয়ে লর্ড কার্জন দেখলেন, সেখানে অত্যন্ত অপরিসর জায়গায় অত্যন্ত অযত্নলাঞ্ছিত অবস্থায় বহু বই। সরকারী কর্মচারীরা এই সব বই কখনও কখনও ব্যবহার করেন। জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য সেগুলি সার্থকভাবে ব্যবহার করার কথা কেউই চিন্তা করে না। অথচ পায়রা আর আগাছার মালিন্যে তখন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মেটকাফের স্মৃতি-সৌধ। মেটকাফ হলের অপর বাসিন্দা এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটী—এদের কর্ম-পরিষদের নিকট উপস্থিত হলেন লর্ড কার্জন, প্রস্তাব করলেন সম্পূর্ণ বাড়িটা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আর পাবলিক লাইব্রেরির প্রতি অংশীদারকে পাঁচ শ' টাকা দিয়ে গ্রন্থাগারের সর্ত কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই সময়ে সমগ্রভাবে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির সংখ্যা হল প্রায় এক লক্ষ। নবস্থাপিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হয়ে এলেন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারলেন। সেই জন্যই নবস্থাপিত গ্রন্থাগার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলল। এই গ্রন্থাগারের আদর্শ সম্বন্ধে লর্ড কার্জন যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ হচ্ছে, "বহুপ্রচলিত সমস্ত ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখা সমস্ত বই-ই এখানে রাখা হবে এবং নূতন নূতন রেফারেন্সের বই সকল সময়ই যোগাড় করে গ্রন্থাগারকে সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা দান করা হবে।" এই আদর্শ অবশ্য পূর্ণভাবে সফল করা সম্ভব হয় নি, কারণ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে ভারতীয় ভাষাসমূহ যথোচিত প্রাধান্য কোনদিনই পায় নি।

যাই হোক, গ্রন্থাগার মাত্রেরই দৈহিক-পরিধি যে নিয়মে ক্রমবর্ধনশীল সেই নিয়মেই বেড়ে চলল ইম্পিরিয়াল লাই-ব্রেরির আয়তন। বর্ষে বর্ষে নবপ্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় প্লাবিত হয়ে গেল এই গ্রন্থাগারের কক্ষতল। দেশের তদানীন্তন অবস্থায়, এমন কি আজও কতক পরিমাণে আমরা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উদাসীন; ফলে পুস্তকের বর্ধনশীল সংখ্যার অনুপাতে তার রক্ষণের ব্যবস্থা তাল রেখে চলে না। সুতরাং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির স্থাপনার বিশ বছরের মধ্যেই মেটকাফ হল একটা বই-এর গুদামে পরিণত হল। ১৯২৩ সালে অনন্যোপায় হয়ে এসপ্লানেডে স্থানান্তরিত করা হল।

তারপর থেকে মেটকাফ হল রুদ্ধদ্বার পড়ে রইল। ক্রমশ জনসাধারণ এর অস্তিত্ব একরকম ভুলেই গেল। কিন্তু মেটকাফ হলের সঙ্গে কলকাতার ইতিহাসের অনেক-খানি রইল জড়িয়ে। চল্লিশ বছর ধরে এই বাড়িতে বসে সরস্বতীর সেবা করে গেছেন 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র। এইখানেই বহু ভাষাবিদ হরিনাথ দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সর্ব-প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক হিসাবে ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

এসপ্লানেডে এই গ্রন্থাগার স্থানা-ন্তরিত হওয়ার পর অনেকদিন এখানেই কাটল। এই সময়ে গ্রন্থাগারের ইতিহাসে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, ১৯২৬ সালে রীচি কমিটির নিয়োগ তার অন্যতম। এই কমিটি গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করে যে রিপোর্ট দেন, তার মধ্যে প্রধান সুপারিশগুলি ছিল—(১) ইম্পি-রিয়াল লাইব্রেরিকে কপিরাইট লাইব্রেরিতে পরিণত করা, (২) এই গ্রন্থাগারকে কলকাতা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত না করা এবং (৩) পাঠাগারের ব্যয়ভারের কিয়দংশ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বহন করা। যদিও এই গ্রন্থাগারকে আজও 'কপিরাইট লাইব্রেরি'তে পরিণত করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু এই কমিটির সুপারিশে বাংলা সরকার ১৯২৯ সালে পাঠাগারে ব্যয় করার জন্য ২০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯৩৫ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ প্রথম গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করেন।

কিন্তু একদিন এসপ্লানেডের বাড়িতেও আর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান হল না। ইতিমধ্যে যুদ্ধের তাগিদে এসপ্লানেডের আবাস ছেড়ে দিয়ে গ্রন্থাগারকে চলে আসতে হল জবা-কুসুম হাউসে। এই বাড়ি অবশ্য গ্রন্থা-গারের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল, সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে আবার গ্রন্থাগারকে এসপ্লানেডে ফিরে আসতে হয়; তারপরেই তাকে তার বর্তমান আবাসে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৮ সালে জবা-কুসুম হাউস থেকে এসপ্লানেডে এবং এসপ্লানেড থেকে বেলভেডিয়ারে গ্রন্থাগার নিয়ে আসার কাজ শুরু হয়। এই সময়েই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পরিণত হয়।

বেলভেডিয়ারে এসে স্বাধীন ভারতের সর্বোত্তম গ্রন্থাগার হিসাবে বিকাশ লাভের সুযোগ পেয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ভাবলে মনে বিস্ময়-রোমাঞ্চ জাগে, যে ভবনে একদিন বিলাসের স্রোত বয়ে গেছে, যে ভবনের গর্বিত আভিজাত্যের সচেতন স্পর্ধার সামনে সামান্য পথচারী তার কৌতূহলবিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে শুধু পাশ দিয়ে চলে গেছে—সেখানেই মানুষের অনাড়ম্বর ধ্যানমগ্ন জ্ঞানের তপস্যা, সেখানেই প্রতিদিন ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলে একত্রিত হচ্ছে জ্ঞানসূর্যের আলোর তলায়।

বাস্তবিক, এই বিরাট প্রাসাদের বিশাল হলগুলিতে, কক্ষে কক্ষে এমন কী চারি-দিকের আবেষ্টনীতেও সঞ্চিত হয়ে আছে কৌতুক-রোমাঞ্চের খোরাক। কেউ জানে না এ সৌধ কবে কে গড়ে তুলেছিল। তবে একদা এটা ছিল নবাব মিরজাফরের সম্পত্তি। ওয়ারেন হেস্টিংস মিরজাফরকে নবাবের গদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মিরজাফর তাঁকে এই সম্পত্তি অর্পণ করেন। পুরানো দলিলপত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই ভবনের উপর হেস্টিংসের অধিকার মেনে নেওয়া চলে। স্ট্যাভোরিয়াস নামক একজন ইংরাজের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৭৭০ সালে ফোর্ট উইলিয়মের শাসনকর্তা কার্টিয়ার এখানে থাকতেন। সম্ভবত তিনি হেস্টিংসকে ভাড়া দিয়েই থাকতেন। দু' বছর পরে হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়মের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তিনি তখনও এখানে প্রায়ই আসতেন। ১৭৮০ সালে বেলভেডিয়ার হাউস মেজর টলিকে বিক্রয় করা হল। ১৭৮৪ সালে মেজর টলির মৃত্যুর পর সাড়ে তিন শ' পাউন্ড খাজনায় এই ভবন ইজারা দেওয়া হল মিস্টার ব্রুকস্ নামক ইংরেজ ভদ্রলোককে। ১৮২২ সাল থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত এখানে বসবাস করতেন সেনাপতি এডওয়ার্ড প্যাজেট। ১৮০৮ সালে এড-ভোকেট জেনারেল সার চার্লস প্রিন্সেপ এই ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৮০,০০০ টাকা দিয়ে বেলভেডিয়ার ক্রয় করেন। তারপর থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্নরের আবাস হিসাবেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে। দিল্লীতে ভারত-বর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে বেলভেডিয়ার বড়লাটের বাসভবনে পরিণত হল।

১৮৫৪ সালের পর থেকে বেল-ভেডিয়ার ভবনের অনেক সংস্কার সাধিত হয়। সার স্টুয়ার্ট বেলী এবং সার চার্লস এলিয়ট প্রাতরাশের কক্ষ এবং পশ্চিম-দিকের দ্বিতল অংশটি নির্মাণ করান। এণ্ড্রু ফ্রেজার বলরুম এবং নৈশ-ভোজনের ঘর প্রস্তুত করান। আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জীর আমলে বেলভেডিয়ারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়।

ব্রিটিশ আমলের অনেক অজ্ঞাত অথচ চমকপ্রদ ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বেলভেডিয়ার প্রাসাদ। মুর্শি-দাবাদের নবাব যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নীর অতিথি হিসাবে বেলভেডিয়ারে বাস করতেন, তখন কোম্পানীর তরফ থেকে তাঁকে এক হাজার টাকা দেওয়া হত প্রাত্যহিক ব্যয়ের জন্য। এই বেল-ভেডিয়ারের সামনে ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংসের দ্বৈতযুদ্ধ হয়েছিল; আহত অবস্থায় শুশ্রূষার জন্য ফ্রান্সিসকে বেল-ভেডিয়ারেই আনা হয়েছিল।

বেলভেডিয়ারের অনতিদূরে লাল রঙের বাগান-বাড়ি। সেখানে থাকতেন অপরূপ সুন্দরী মিসেস গ্র্যাণ্ড। ফ্রান্সিস এর রূপে মুগ্ধ হলেন। মহিলাটিও ফ্রান্সিসকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করলেন না। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে দু'-জনের নিভৃত-আলাপ পরিচারকবর্গের

দৃষ্টিগোচর হল। নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল রসনা। মধ্যযুগীয় 'নাইট'দের মত বীরোচিত ভঙ্গীতে মিঃ গ্র্যান্ড ফ্রান্সিসকে আহ্বান করলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। ফ্রান্সিস কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিলেন। অগত্যা মিঃ গ্র্যান্ড সুপ্রীম কোর্টে বিচার-প্রার্থী হলেন। বিচারে ফ্রান্সিসের প্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হল। এই মহিলাটির রূপের আগুন ফরাসী দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল একদিন, ঘটনাচক্রে ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার পররাষ্ট্র সচিব টালিরাঁকে ইনি বিবাহ করেছিলেন।

বেলভেডিয়ারের পূর্ব দিকে অবস্থিত ফ্রান্সিসের বাড়ির নাম 'লম'। এ বাড়ি পরে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৮১২ সালে এখানে এসেছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতা। বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত 'থ্যাকারে' এখানে কাটিয়েছেন। হয়তো চঞ্চল বালক থ্যাকারে বেলভেডিয়ারের বাগানে কতো ছুটোছুটি দাপাদাপি করে বেড়িয়েছেন।

বেলভেডিয়ারের সঙ্গে কিন্তু তখনকার ভারতীয় সমাজের কোন যোগাযোগ ছিল না। একটিমাত্র ব্যাপার ঘটেছিল যেটা বেলভেডিয়ারের সঙ্গে সাধারণের একটি ক্ষীণ যোগসূত্র হয়তো সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু সে ঘটনা ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। ১৮৯০ সালে সার স্টুয়ার্ট বেলীর নেতৃত্বে এক সঙ্ঘের উদ্বোধনী সভা হয় বেলভেডিয়ারে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল সুলভ মূল্যে সাধারণ ইংরেজী ও বাংলা সৎ সাহিত্যের প্রচার করা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সার রাসবিহারী ঘোষ, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরে বঙ্কিমচন্দ্রও এই সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন।

বিলাসের লীলাভূমি বেলভেডিয়ার তার এই সামান্য অতীত গৌরবটুকু বহন করে এনেছে আজকের নূতন যাত্রাপথে। এখানে আসার পর ন্যাশনাল লাইব্রেরির তথা বেলভেডিয়ারের জীবন-নাট্যে নব অধ্যায়ের সূচনা। এতোদিন দেখা গিয়েছিল, এই গ্রন্থাগারে দেশীয় ভাষার সঞ্চয়ের দিকটা কিছু দুর্বল। বাংলা দেশের প্রেস আইন অনুযায়ী বাংলা দেশে প্রকাশিত সকল বই-এর একখণ্ড এই গ্রন্থাগারের প্রাপ্য। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সব বই ঠিক সময়ে পাওয়া যায় না, অনেক বই মোটেই পাওয়া যায় না। ফলে বাংলা বই-এর সংখ্যা যতোগুলি হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক কম। ১৯৫২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত হিসাবে এখানকার বাংলা বই-এর সংখ্যা ২৩,৫৮৬।

তবু একথা সত্য যে, এখানে পুরানো এবং ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান বাংলা বই প্রায় সবই পাওয়া যাবে। বাংলা সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাস পাঠে উৎসুক ব্যক্তির কৌতূহল মিটবার উপযুক্ত মালমসলা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। পুরানো পত্র-পত্রিকার মধ্যে যা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে, তার কতকগুলির নামোল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পত্রিকার নাম এবং যে বছর থেকে শুরু করে যে বছর পর্যন্ত আছে নীচে দেওয়া হল।

সমাচার-দর্পণ — ১৮৩১—১৮৩৭।
সমাচার-চন্দ্রিকা -- ১৮৪৩—১৮৪৬।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা--১৮৪৯-১৯৩৩।
ভারতী (ভারতী ও
বালক) — ১৮৭৮—১৯২৪।
সাহিত্য -- ১৮৯০—১৯২৩।
তত্ত্ব-মঞ্জরী -- ১৮৯৭—১৯২০।
সবুজ-পত্র — ১৯১৪—১৯২০।
কল্লোল — ১৯২৩—১৯২৯।

এখনকার উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে আসে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক দেশ, শনিবারের চিঠি, মাসিক প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, পরিচয় এবং ত্রৈমাসিক বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা এবং চতুরঙ্গ। এ ছাড়া অনিয়মিতভাবে আরো অনেক বাংলা সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র আসে এবং সেগুলি রাখা হয়।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সমস্ত দৈনিক-পত্রিকা বাঁধিয়ে রাখা হয়। অন্য কোন গ্রন্থাগারে দৈনিক পত্রিকা জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেই। ধারাবাহিকভাবে রক্ষিত পুরানো পত্রিকা গবেষকদের বিশেষ উপকারে আসে।

সম্প্রতি বহরমপুরের রামদাস সেনের সযত্ন নির্বাচিত গ্রন্থসঞ্চয় এই গ্রন্থাগারকে অলংকৃত করেছে। এই সঞ্চয়ের মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য অথচ ঐতিহাসিক তথ্যবহুল পুস্তক পাওয়া গেছে।

সংস্কৃত প্রাকৃত পালি, আরবী, ফারসী তিব্বতীয় ও চীনা ভাষায় রচিত প্রাচীন পুঁথি আছে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ১৫৫০ খানি। এ ছাড়া ভারত সরকারের কেনা প্রাচীন চীনা ভাষায় রচিত এক গ্রন্থ-সঞ্চয়ের রক্ষণের ভার ন্যস্ত হয়েছে এই গ্রন্থাগারের ওপর।

ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগণ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট এবং অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা এখানে আসে এবং জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। বিদেশী সরকারের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রকাশিত পুস্তকাদি পাওয়া যায়। জাতি-সঙ্ঘের প্রকাশিত সমস্ত রকমের পুস্তক-পুস্তিকা নিয়মিতভাবে আসে।

স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তাই এখন প্রেস আইন অনুযায়ী প্রাপ্যের উপর বাংলা বই-এর সংখ্যা নির্ভর করবে না আর। বই কেনার টাকার একটা বিশেষ অংশ বরাদ্দ করে রাখা হচ্ছে বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বই কেনার জন্য।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির সামগ্রিক সংখ্যা সাত লক্ষ। এর মধ্যে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত পুস্তকের সংখ্যা ৭১১২, হিন্দী ৩১১৭ ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পুস্তকের সংখ্যা ২৩২০। এর সঙ্গে বাংলা বই-এর সংখ্যা যোগ দিলে দাঁড়ায় ৩৬,১৫৫। সমগ্র গ্রন্থাগারের তুলনায় এ সংখ্যা যে নিতান্ত সামান্য, একথা বলাই বাহুল্য। তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেকখানি নির্ভর করছে একে কপিরাইট লাইব্রেরিতে পরিণত করার উপর। যদি এই গ্রন্থাগার 'কপিরাইট' পায়, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে সমস্ত রকম ভাষায় প্রকাশিত সকল বই-এর এক বা একাধিক কপি পাবার অধিকার লাভ করবে। তাহলে ভারতে প্রকাশিত সমস্ত বই এখানে রক্ষিত হবে এবং এদেশের সমস্ত বই-এর ধারা-

বাহিক বিবরণী (ন্যাশনাল বিবলিয়োগ্রাফী) সংকলন করা সম্ভব হবে। এই বিষয়ে এই গ্রন্থাগারের তরফ থেকে কিছু কিছু চেষ্টা আগে চলেছে এবং এখনও চলছে। আশা করা যায়, সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।

গ্রন্থ সংগ্রহের এবং গ্রন্থ রক্ষণের দ্বারাই কোন গ্রন্থাগারের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। সদ্‌গ্রন্থের প্রচার এবং সেদিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্তব্য। পাঠকদের রুচির প্রকৃতি বুঝে চাহিদা মেটানোও গ্রন্থাগারের কাজ। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকদের রুচির নির্দেশ মেনে চলার সুবিধার জন্য সাজেসন্ রেজিষ্টার-এর ব্যবস্থা আছে। সাধারণ পাঠক যে বই লাইব্রেরিতে কেনাতে চান, সেই বই-এর নাম ও সে সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য এইখানে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে যান। কর্তৃপক্ষ যথাবিধি সে সমস্ত বই কেনার ব্যবস্থা করেন।

যাতে সকল বিষয়ের বই-এরই শ্রেষ্ঠ নির্বাচন সম্ভব হয়, সেজন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত এক পরামর্শ পরিষদ আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ শাখার পুস্তক-নির্বাচনে এঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

তথ্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রতীচ্যের গ্রন্থাগারসমূহে বিবিধ ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও সে সব ব্যবস্থা কিছু কিছু অনুসরণ করা হচ্ছে। অধিকাংশ পুস্তকের প্রচ্ছদপটে থাকে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার এবং লেখক-পরিচিতি। এই প্রচ্ছদপটগুলিকে মনোরমভাবে সাজিয়ে বই-এর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তা ছাড়া প্রতি মাসের উল্লেখযোগ্য নূতন বই-এর বিষয়ানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করে পাঠকদের সামনে রাখা হয়।

কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বিভক্ত বাঙলায় কলকাতার গুরুত্ব বেড়ে গেছে একমাত্র বড় শহর হিসাবে। এর চারিদিক ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বৃহত্তর কলকাতা। সেই পটভূমিকায় রেখে বিচার করলে ন্যাশনাল লাইব্রেরির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে এই বিরাট প্রাসাদ আর তৎসংলগ্ন বিশাল ভূমিখণ্ড (সব মিলিয়ে যার পরিমাণ ৭২ বিঘারও কিছু বেশী হবে) অধিকার করে এই গ্রন্থাগার প্রস্তুত হচ্ছে, ভবিষ্যতের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার পাঠকদের জায়গা দিতে।

চিত্র প্রদর্শনী

ঘোড়া (২১) প্রকাশ মিশ্র

কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা কোন ছবি অথবা শিল্প-প্রচেষ্টাকে নিতান্ত করুণা ও উপেক্ষার ভাব নিয়ে দেখা হত। শিশু মনস্তত্ত্ববিদদের কল্যাণে সেই মনোভাবের মধ্যে আজ অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে।

হিন্দী হাইস্কুল

শিশু শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আজকাল শিল্পকলাকে স্থান দেওয়া হচ্ছে।

বাইরের কোন প্রভাব ও শিক্ষায় বর্ধিত না হয়েও অনেক সময় শিশুদের মধ্যে রেখা ও রঙের সাহায্যে নিজের মনোভাব ও অনুভূতিকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা দেখা যায়। এই প্রকাশভঙ্গী অনেক সময়ে এমন মৌলিক এবং তার মধ্যে দিয়ে এই বস্তু ও রূপজগতের সম্বন্ধে শিশুমনের এমন বিচিত্র দৃষ্টিকোণ উদ্ঘাটিত হয়, যা
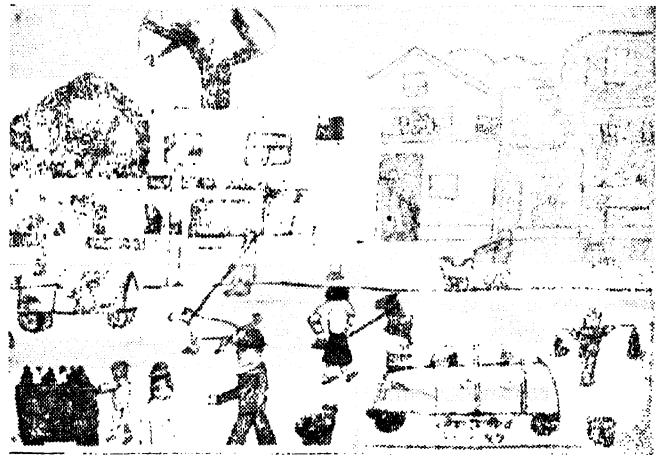
রাস্তার দৃশ্য (৩৯) রমেশ ডালমিয়া

ঘরমুখো (৫৯) এন কে মালিক

আমাদের পরিণত-মনে অদ্ভুত ও আশ্চর্য মনে হলেও এক অদেখা রূপজগতের সন্ধান দেয়।

এই ধরণের একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী সম্প্রতি আর্টিস্ট্রী হাউসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন হিন্দী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ। জলরঙ, পেন্সিল, ক্রাফ্‌ট প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকের একশো তেতাল্লিশটি রচনা দিয়ে প্রদর্শনীটি সাজানো হয়েছিল। জলরঙের ছবিগুলোর মধ্যে রমেশ ডালমিয়ার (তের বৎসর) কয়েকটি রচনা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বিশেষ করে তাঁর গোড়ার দিকের রচনাগুলোয় রঙ, কম্পোজিশন এবং দৃশ্যবস্তু সংস্থাপনে কল্পনাপ্রবণ কিশোর মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা মুগ্ধ করে—সে তুলনায় পরবর্তী সময়ের তাঁকা রচনাগুলো অতিরিক্ত পরিমার্জিত হওয়ায় কিশোর-মনের সে সুর হারিয়ে গেছে। এর আঁকা রাস্তার দৃশ্য (৩৯) উজ্জ্বল হলুদ, লাল, সবুজ প্রভৃতি রঙের ব্যবহার এবং ব্যস্ত-সমস্ত পথচারী, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতির সংস্থাপন অত্যন্ত সুন্দর। এর আঁকা বাজারের দৃশ্য (৭৮), দৃশ্যচিত্র (৭, ৩২), চৌরঙ্গী (৫০), Birds eye view (৩০), চড়ুইভাতি (৬১), দিল্লী স্টেশন (৮৫), রেস্তোরাঁ (৯৩) প্রভৃতি চিত্র-গুলিও নানান দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বহু জায়গায় নানান অপ্রচলিত রঙের ব্যবহারও ভাল। কমলকিশোরের (১২ বৎসর) ছাতার নীচে (৯) ছবিটিতে হাল্কা লাল, নীল, হলুদ রঙের প্রয়োগে আরও আকর্ষক হয়েছে। অনুরুদ্ধ শর্মার (১২ বৎসর) ছোট বাড়ি (৩৬), সজ্জন-কুমার টিকমানির (১২ বৎসর) চাঁদনী রাতে (৮), প্রকাশ পোদ্দারের (১৩ বৎসর) পাশা খেলায় (৭৩), ড্রাই ব্রাসের সুন্দর টেক্সচার, শ্রীপৎ সিংহানীয়ার (১২ বৎসর) পুতুল নাচ ও রাখাল বালক (৯০) প্রভৃতি রচনাগুলিও বিচিত্র কল্পনা এবং উজ্জ্বল বর্ণসুষমায় কিশোর মনের আকর্ষণীয় হয়েছে। মনোহর শেঠিয়ার (১০ বৎসর) ক্লাসরুম (৬২), পানীয় জল (৮০), নরেন্দ্রকুমার মল্লিকের (১৩ বৎসর) Charriot festival (৮৮) এবং ঘর-মুখো (৫৯), খুশিকুমারের (১১ বৎসর) দৃশ্যচিত্র (৬৫, ৬৭) এবং রাস্তার দৃশ্য (৭২), প্রকাশ মিশ্রর (১০ বৎসর) ঘোড়া, (২১), ভগবতী ভুয়ালকার (৯ বৎসর) হলুদ রঙের কাগজে জিরাফের ছবিটি (১৮), রমেশ কামানীর (৯ বৎসর) Before Starting (৮১), বালভদ্র শর্মার (৯ বৎসর) শীতের সকাল (১৪), বিজয় সিংহের (৮ বৎসর) Morning Song প্রভৃতি রচনাগুলিতে কল্পনাপ্রবণ মনের যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তা

মেছুনী (১২৮) জে এম অগ্রওয়াল
এন কে মালিক

মুগ্ধ করে। ক্র্যাফ্‌ট্‌ ও মূর্তির মধ্যে এন কে মালিকের রচনাগুলিই বেশি উপভোগ্য ও পরিমার্জিত মনে হয়েছে। তার শুয়োর (১৩৯), ফুচকাওয়ালা (১০), জিরাফ (১০৩), কুয়োর ধারে প্রভৃতি বিভিন্ন রচনায় আগামী দিনের এক কুশলী মূর্তিকারের ছাপ পাওয়া যায়। এই বিভাগে সি ডি দেশাইয়ের কয়েকটি রচনাও উল্লেখযোগ্য।

ক্লাসরুম (৬২) মনোহর সেঠিয়া

দুর্জ্ঞেয়
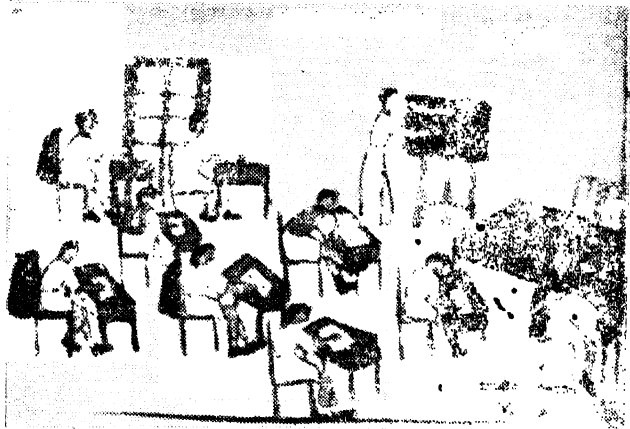
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পথের মোড় ঘুরতেই
রুপোর মিনে-করা লোহার হাতুড়ির মতো
বুকের উপরে নিক্ষিপ্ত হ'ল
সমুদ্র,
যতদূরে চোখ চলে ইস্পাত-ধূসর।
অসীম বিস্ময়
অনন্ত বেদনা!

মহৎ সৌন্দর্যে মহৎ আঘাত।
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উদ্বেল,
স্থলদুল্কার তিলক-পরা প্রকৃতি
তাই ভৈরবীর মতো মনোজ্ঞা,
দাবাগ্নির গোধূলির আকর্ষণ তাই
চক্রবাক্ মিথুনকে,
দুর্গম মেরুর সংকেতে অভিসারিকার মতো
চঞ্চল তাই
চুম্বকের শলাকা,
তাই সমুদ্র এঁকে দিল ভৃগুপদ-সংঘাত
আমার বক্ষে!

দিনের আলোয় দেখি
নীলের মধ্যে চমকিয়ে ওঠে
ফেনার বলাকা;
কাছে আসে আর জোট বাঁধে,
তীরের কাছে হাঁসের সুদীর্ঘ সারি
ফেনশুভ্র,
শুক্তিস্বচ্ছ,
অর্ধচন্দ্র;
একটার পরে একটা
আসছে ভাঙছে
আবার নূতন ক'রে গড়ছে,
আকাশে ছিটে ছিটে উঠ্ছে
জলের চামর
নিরন্তর
নিরবধি।

আর রাতের বেলায়
অনন্ত কালোর মধ্যে
এ যেন ফেনার বিদ্যুৎ!
মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছে শাখা-প্রশাখায়
কোন্ দিক্ থেকে কোন্ দিকে!
অসীম বিস্ময়
অনন্ত বেদনা!
অন্ধকার রাত্রে ঢেউয়ের ওঠা-পড়া
এ যেন এক শব্দের ঝড়।

দেহহীন বিক্ষোভ যেন
আশ্রয়ের সন্ধানে;
অন্ধ দৈত্য হাতড়িয়ে মরছে শিকার,
থেকে থেকে শব্দের অভ্রভেদী তোরণ
ধ্বসে' পড়ে জানিয়ে দেয়
তরঙ্গের তুঙ্গতা,
উন্মূলিত করবে যেন ধরিত্রীকে
এমনি আক্রোশ!

ওই অনন্ত কালোর গর্ভে
ছিন্ন-ভিন্ন সব
নিয়তির শৃঙ্খল;
চূর্ণ-বিচূর্ণ সমস্ত সংস্কার;
মথিত প্রমথিত উন্মথিত নিরন্তর
চৈতন্যলোকের রসাতল,
ছিন্নমস্তা জ্যোতিঃশিখা পান করছে
অন্ধকারের তরল রুধির;
অমাবস্যার তুফানে যেন
নিমজ্জিত
দিগবারণের বৃংহিত।

নিয়মের আল-বাঁধা
এই ডাঙাটুকুর উপরে ব'সে
যা ভাবছি
কোথায় তার সমর্থন
সৃষ্টির এই আদি উপকরণের ভাণ্ডারে?
ওখানে একই সঙ্গে
ভাঙনের হাতুড়ি আর গড়নের হাত সক্রিয়!
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া নীতি দুর্নীতি
সব ওখানে একীকৃত.
স্বয়ং বিধাতা ওখানে
বটপত্রমাত্র সহায়।
অসংখ্য 'কেন'র বুদ্বুদ ওখানে
অগম্য জিজ্ঞাসার দিগন্তরে ধাবিত।
অসীম বিস্ময়
অনন্ত বেদনা।

জীব-জগতে যখন ভাষা ছিল না,
উদ্ভিদ্-জগৎ যখন স্পন্দনহীন
তখন থেকে কি জিজ্ঞাসায়
আন্দোলিত ওই সমুদ্র?
আবার যখন অনন্ত 'না' এসে গ্রাস করবে
অনাদ্য হাঁ-কে
তখনো থামবে না ওর আর্তি।
ও যেন এক অনাদ্যন্ত আর্তনাদ
দিগন্তের ঘাটে ঘাটে মাথাকুটে মরছে।
মাটির খাঁচায় দুর্জয় গরুড়
'কেন'র টুঁটি ছিঁড়ে
আদায় করতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের শেষ রহস্য!
অসীম বিস্ময়, আর
অনন্ত বেদনা॥

চক্রদত্ত

গরুর দুধ বিশেষ পুষ্টিকর পানীয়, বিশেষত শিশু ও রোগীর পক্ষে দুধ অতি অবশ্যপেয়। বর্তমানে তিনজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন যে, ম্যালেরিয়া রোগীর পক্ষে গোদুগ্ধ অতি প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলেন, গরুর দুধকে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের প্রতিরোধক বলা যেতে পারে। তাজা গরুর দুধ ছাড়া শুকনো গুঁড়ো দুধ ও জমান দুধও ম্যালেরিয়া রোগের পক্ষে উপকারী। তাঁদের মতে এই কারণেই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ওপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম দেখা যায়। তাঁদের এই উক্তির সত্যাসত্য তাঁরা ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন। কতকগুলি ইঁদুরের মধ্যে সাংঘাতিকরকম ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ইনজেকশন করে তাদের শুধু দুধ খাইয়ে রাখা হয়; আরও কতকগুলি ইঁদুরের মধ্যে ঐ পরিমাণ প্যারাসাইট প্রবেশ করিয়ে ল্যাবরেটরীর সাধারণ খাদ্য খাওয়ান হতে থাকে এবং দেখা যায় যে, ঐ দুধ খাওয়া ইঁদুরগুলির শরীরে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট বৃদ্ধি পায়নি অথচ সাধারণ খাদ্যভোজী ইঁদুরগুলির শরীরে ঐ প্যারাসাইট খুবই বৃদ্ধি পায়—ঐগুলি ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

*

কথায় বলে, ব্রহ্মশাপ লাগলেই মাথায় বাজ পড়ে, ব্রহ্মশাপ এড়াতে পারলেই যে বাজের হাত এড়ান যায় এমন কথা অবশ্য শোনা যায় না। আবহাওয়াতত্ত্ববিদের মতে কতকগুলি সাধারণ ও সহজ উপায় মেনে চলতে পারলে বজ্রাঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বজ্রাঘাতের থেকে ঘর বাড়ী বাঁচানর জন্য বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ছাদের ওপর চুম্বক লাগান লোহা পোঁতা থাকে। এই চুম্বক লাগান বাড়ি ও না-লাগানো বাড়ির মধ্যে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে, দেখা যায় যে, চুম্বক দেওয়া বাড়িগুলির ১২ খানার মধ্যে হয়তো একখানাতে বজ্রপাত হতে পারে, অপরপক্ষে চুম্বক না-দেওয়া বাড়িগুলোর সবগুলিতেই বজ্রাঘাত হতে পারে। অতএব বাড়ির ছাদে এইরকম চুম্বকের ব্যবস্থা করা খুবই ভালো। এছাড়াও কতকগুলি ছোটখাট বিধিনিষেধ মানার দরকার। বজ্রপাতের সময় বাড়ির বাইরে না যাওয়া ভাল এবং সেই সময়ে বাইরে থাকলেও বাড়ি আসা উচিত। সেই সময়টা বেশ শুকনো জায়গায় থাকা আর আগুনের কাছ থেকে দূরে থাকা দরকার। বাইরে থাকাকালীন বজ্রপাত হলে একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া দরকার; এক্ষেত্রে খুব বড় আর লোহার ফ্রেমের তৈরী বাড়ি, চুম্বক লাগানো বাড়ি, কিংবা চুম্বকবিহীন খুব বড় বাড়িতে আশ্রয় নেওয়াই ভালো। খোলা দরজা জানলা থেকে দূরে থাকা দরকার। যদি কোনও জরুরী কারণে বাইরে থাকতেই হয় তাহলে অন্তত মাঠের মধ্যের ছোট্ট বাড়ি, খুব বড় গাছ যেটা এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তারের বেড়াঘেরা কোনও জায়গা, কোনও পাহাড়ের চূড়া ও খুব ফাঁকা জায়গায় থাকা উচিত না। কোনও খাদ মত জায়গায়, কোনও গুহার মধ্যে, কোনও গভীর উপত্যকার মধ্যে, কোনও পাহাড়ের পাদদেশে, কোনও ঘনজঙ্গলের ভেতর কিংবা গাছের ঝোপের মধ্যে থাকাই ভালো। বজ্রাঘাতে যত মৃত্যু ঘটে তার একটা তালিকা নিয়ে দেখা গেছে যে, ছেলেদের মৃত্যুসংখ্যা মেয়েদের মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ বেশী। এর কারণ অবশ্য খুবেই সাধারণ—ছেলেদের কাজে কর্মে ও খেলাধুলোয় মেয়েদের চেয়ে বেশীর ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয় সেজন্য বজ্রাঘাতে এদের মৃত্যু হয় বেশী।

*

ডাঃ ফিনব্লুম একরকম নতুন চশমার কাঁচ বার করেছেন। যে সব লোকের চোখ খুব বেশী খারাপ সাধারণ চশমার কাঁচ দিয়েও যারা খুব পরিষ্কার দেখতে পায় না এই কাঁচ তাদের দৃষ্টিকেও স্বচ্ছ করতে পারে। এই কাঁচটা বলতে গেলে তিনখানা লেন্স দিয়ে তৈরী এবং কাঁচগুলির একটি থেকে আর একটির দূরত্ব ½ ইঞ্চি। এই কাঁচের চশমা খুব জবড়জঙ্গ কিছু নয় সাধারণ চশমার মতই দেখতে। যে সব লোক সাধারণ চশমায় ভালো দেখতে পেতো না ডাঃ ফিনব্লুমের নতুন ধরণের চশমা তাদের নির্দোষ চক্ষুদান করেছে। তারা এই চশমা পরে বই-পত্তরও পড়তে পারে, আগে এই কাজগুলো অপরের সাহায্য ব্যতীত হতো না।

*

অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা আজকাল অনেক অসম্ভব ধরণের রোগ নিরাময় করা হয়। মাথার খুলি খুলে মস্তিষ্কের ওপর অস্ত্রোপচার করে মাথার রোগ সারান হয়। এর চেয়েও কঠিন ধরণের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও আছে। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করা খুবই কঠিন। একটি তের বছর বয়সের ছেলের হৃদযন্ত্রের ওপর অস্ত্রোপচার করে তাকে বাঁচান হয়েছে। জন্মাবধি ছেলেটির হৃদযন্ত্রে একটি টাকার মাপের মত গর্ত দেখা যায়। ক্রমশ এটা বড় হতে থাকে। দুটো অরিক্ল-এর মাঝখানে এই গর্তটি ছিল। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখে বুঝতে পারেন যে, ঐ গর্তটা থাকার দরুণ এবং ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার দরুণ ছেলের রক্ত চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয়। পেরিকার্ডিয়াম বলে যে পাতলা চামড়া হৃদযন্ত্রের চারিদিক ঘিরে রাখে ডাক্তাররা তার থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে গর্তটা বন্ধ করে দেন। ডাক্তারেরা বলেন যে, এই রকম কঠিন অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা দু'-তিনটার বেশী মানুষকে বাঁচান যায় না।

*

কোনও কিছুর আধিক্যই মানুষে সইতে পারে না। আলো ছাড়া অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু হঠাৎ খুব বেশী আলো চোখে এসে পড়লেও আবার কিছুই দেখা যায় না, এ অবস্থাকে আমরা ধাঁধালাগা বলি। অনেকক্ষেত্রে মানুষ খুব চট করে এ অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারে, আবার কখনও বা কাটিয়ে ওঠা শক্ত হয়। দেখা গেছে যে, অল্প বয়সে এই অবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ করতে পারে, আর বয়স বেশী হলে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটা কমে যায়। এই ক্ষমতা বিশ বছর থেকে ঊনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেশী থাকে, আর পঞ্চাশের পর খুব কমে যায়। এমন কি দশজনের মধ্যে মাত্র একজনের এ শক্তি বর্তমান থাকে।

--ছাব্বিশ--

শাহপুরের নিঃস্ব বনিয়াদী মিয়া বংশের প্রৌঢ় ফজলে আলী সাহেব রমাকে বিজয় এবং থানার দারোগার হাতে সমর্পণ করেছেন। ভোর বেলা মেয়েটি এসে শাহপুরে পৌঁচেছে। এবং এরফান প্রমুখ মুসলমানদের বাড়িতে উঠেছে। তার সঙ্গে এসেছে সুকুর। এরফানের বাড়িতে বেলা দশটা এগারটা নাগাদ মজলিস বসবার আয়োজনের কথা ফজলে আলি সাহেবের কানে আসে। তিনি চমকে উঠেছিলেন।

হিন্দুর মেয়ে এই বিরোধের মধ্যে মুসলমানের বাড়িতে? সে কেমন মেয়ে? মেয়ে যেমনই হোক সে বিচার তো লোকে করবে না; এই অজুহাতে যে সর্বনাশ বেধে যাবে!

ফজলে আলী সাহেব শাহপুর অঞ্চলে বনিয়াদী মিয়া বংশের সন্তান বলেই মাননীয় নন, তিনি নবগ্রামের ঠাকুর বংশের জ্ঞাতি এবং শাহপুর ও আরও কুড়ি পঁচিশখানি গ্রামের মুসলমানদের মাথার মণি, ধর্মগুরু। তিনি সচরাচর কারুর বাড়ি যান না। ক্রিয়াকর্মে সামাজিক অনুষ্ঠানে যান, তিনি গেলে সমবেত সকল জনেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করে। এখানকার ঈদ বকরীদ ইত্যাদি পর্বে মসজেদে, মসজেদের সামনে মাঠে যে নামাজ হয় সে সবগুলিতেই তিনিই প্রধান ব্যক্তি। সেই ফজলে আলী সাহেব এই সংবাদে বিচলিত হয়ে নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন এরফান সেখের বাড়ি।

মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একালের বাহিরের জগতের সঙ্গে ফজলে আলী সাহেবের পরিচয় নাই। তবে নিজের দলিজায় বসে এ অঞ্চলের হিন্দুদের মেয়েদের যেতে আসতে দেখেছেন। তাদের সাজ পোষাক প্রসাধন চলাফেরা কথাবার্তা সবই কিছুটা নতুন ঠেকে, কিন্তু এ মেয়ের সবই তাঁর কল্পনাতীত। মেয়েটির রূপের দীপ্তি কথার দীপ্তি, সপ্রতিভতার দীপ্তি নিয়ে মেয়েটি যেন একটি রঙ মশালের শিখা। এরফানের রাঙামাটিতে নিকনো উঠান রোয়াক সব যেন সাদা আলোর ছটায় ঝলমল করছে।

প্রথমে কথাটা শুনে তাঁর মনে একটা গোপন সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল সুকুরের উপর। মনে হয়েছিল এই বিবাদ কলহের সুযোগ পেয়ে সুকুর কাউকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। সহজ সময়ে এ অন্যায়কে কেউ সমর্থন করে না, কিন্তু বিবাদ বাধলে জেদের বশে আক্রোশের বশে অন্যায়কেও মানুষ সমর্থন করে। কিন্তু এরফানের বাড়িতে এসে দেখে শুনে সে সন্দেহ তাঁর রইল না, কিন্তু মেয়েটিকে দেখে বিস্ময়েরও অবধি রইল না।

এ মেয়ে কে? এ কি মেয়ে? এ বলে কি?

রমা হেসেই কথা বলে। আলোর সঙ্গে উত্তাপের মত ওর কথার সঙ্গে ওর হাসির সম্পর্ক। এমন কি সে যখন রাগ ক'রে কথা বলে এবং সে রাগ যদি ফেটে পড়ার মত রাগও হয় তবু সেই অবস্থাতেও ওর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে থাকে। সে হাসিতে যত ধার চেহারাতেও সে হাসি তত বাঁকা। দুঃখের মধ্যেও হাসে। ছেলেবেলা ওর সঙ্গিনীরা ওকে বলত—দেখন হাসি। ওর মা বলত হতভাগীর দাঁত তৈরী দুষমনের হাড়ে; সুখ দুঃখ মানে না।

রমার বুড়ো স্বামী ওই হাসি দেখেই আশ্বস্ত হয়ে ওকে বিয়ে করেছিলেন। যে মেয়ে দুঃখের মধ্যেও হাসতে পারে, সে মেয়ে অন্তত তাঁর মত বৃদ্ধের তরুণী-মনোরঞ্জনের চেষ্টায় অবশ্যই হাসবে। তিনি না হয় সেই চেষ্টাই অহরহ করবেন।

সে হাসির স্বভাব রমার যায়নি, লেখাপড়া শিখেও যায়নি, বরং মার্জনায় পালিশে ঝকমকে হয়ে উঠেছে।

এতগুলি পদস্থ কর্মচারী এখানকার প্রতাপশালী গুণী এবং কিশোরবাবুর মত এমন গম্ভীর সর্বজনমান্য ব্যক্তির সামনে এমন একটি জটপাকানো অবস্থার মধ্যে পড়েও রমা হেসেই কথা বলে গেল। গৌরীকান্তের কথা না হয় বাদই দেওয়া যায়, তাকে সে আপনারজনই মনে করে।

হেসে বললে—বৃদ্ধ মিয়া সাহেবকে আমি বললাম—আমি হিন্দুও না মুসলমানও না।

তা' মিয়া সাহেব খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু কৃশ্চান তো আমাদের এখানে নাই! আমি বললাম—আমি তাও নই। জাতের বালাই-ই আমার নাই। আমি মানুষ। জাত বলতে ওইটে আছে। তাতেও বৃদ্ধ বলেন, কিন্তু তুমি তো মেয়েছেলে মা। তা ছাড়া তুমি তো আমাদের জাত নও। এর কি জবাব দেব বলুন তো?

হাসতে লাগল রমা। স্বচ্ছন্দ পরিমার্জিত হাসি। মার্জনা করা কালো রঙের মুখে শুভ্র দাঁতগুলি ঝিকমিক করে উঠল। রমা পানও খায় না, ঠোঁটে রঙও মাখে না, তেল বা পাউডার তাও না। মাথায়ও তেল দেয় না।

গুণী ভ্রুকুটি রূঢ়স্বরে বললে—কিন্তু ও কথা তো জানতে আমরা চাই না।

আমরা জানতে চাই তুমি ওখানে কেন গিয়েছিলে?

রমা সহাস্য কৌতুকে ভুরু তুলে গুণীর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল; তারপরে বললে—যেতে কোন সরকারী নিষেধ তো আমার উপর জারী হয়নি। আমি এ এস পি সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করছি কথাটা।

এ এস পি বললেন,—কতকগুলো অলিখিত নিষেধ সব সময়েই সব দেশে সব গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে জারী করা থাকে।

—হ্যাঁ থাকে। তাও আমি লঙ্ঘন করেছি বলে আমি মনে করি না। কোন ক্ষতিকর কাজ আমি করতে যাইনি। আপনারাও বিবাদের মাঝখানে পড়ে বিবাদ মেটাতে গিয়েছিলেন আমিও তাই গিয়েছিলাম। আমি ঝগড়া করবার জন্য উস্কানি দিতে যাই নি।

—কিন্তু শুদ্ধ আপনি মুসলমানদের ওখানেই বা গেলেন কেন?

রমা হেসে বললে—এর উত্তরে বোধ হয় 'আমার ইচ্ছে' বললেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু তা' বলব না। আমি গোড়াতেই, মিয়া সাহেবকে যা' বলেছিলাম তা আপনাদের বলেছি। আমার কাছে ওরা মুসলমান নয় ওরা গরীব। আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান নেই আছে গরীব আর বড়লোক এই দুটো জাত। বড়লোকেরাই কৌশল ক'রে গরীবদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্ত থাকছে—মনে মনে হাসছে। আমি নিজে গরীব, আমার সাজ পোষাক ওদের থেকে কিছু ভিন্ন বটে, সেটা শিক্ষার গুণে রুচির ফলে হয়েছে। তাই আমি ওদের দলে। গরীবের দলে। গরীবের দলের মধ্যে যাদের আপনারা মুসলমান বলেন, তারাই বেশী বিপন্ন বেশী ভয় পেয়েছে, তাই আমি আগে তাদের ওখানেই গিয়েছিলাম। আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিধি-বহির্ভূত কিছু করেছি বলে তো মনে হয় না আমার। তবে বড়লোক গরীব লোকের কথা যা বললাম, তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো বলতে পারি নে। কারণ আপনাদের রাজত্ব তো বড়লোকের রাজত্ব।

এবার রমার মুখে বাঁকা হাসি খেলে গেল, বললে—তবে অবশ্য ভালি বড়লোকের রাজত্ব।

তারপরই গৌরীকান্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—গৌরীদা'র বইয়ে দুটো বিখ্যাত লাইন আছে। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করার প্রচলিত প্রবাদ সম্পর্কে ও'র নায়িকা বলেছে—ও কথাটাই ভুল। যে জলে কুমীর থাকে, সে জলে বাস করলেই কুমীরে খায়; সে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। এবার আর একটা লাইন ওতে জুড়ে দিয়ো গৌরীদা। জুড়ে দিয়ো—না তা খায় না। কুমীর যদি ভালো কুমীর হয় সৎ কুমীর হয় তো খায় না। এবং কুমীরকে সৎ করবার ভাল করবার মন্ত্রটাও জানিয়ে দিয়ো—রাম নাম। রঘুপতি রাঘব রাজারাম!

মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল। কিশোরবাবু প্রচণ্ড একটা ধমক মেরে চীৎকার করে উঠলেন, চুপ কর তুমি।

চমকে উঠল সকলে। গৌরীকান্ত পর্যন্ত।

এতক্ষণে রমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

কিশোর গাঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—গালাগালি করা আমার স্বভাব নয় ওকে আমি পাপ মনে করি; নইলে তুই বাঁকানো কথার আবরণ দিয়ে যেমন গালাগালি করলি, তেমনি গালাগালই দিতাম। ও সব অভ্যাস ভাল নয়। শুধু তোর পক্ষেই নয় গোটা পৃথিবীর পক্ষেই। ওতে অকল্যাণ হয় পৃথিবীর।

গুণী হেসে বলে উঠল—জলে যে সব কুমীর থাকে তারা সবাই বড়লোক কুমীর নয়, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতাপশালী কুমীরও থাকে; এবং তারাই বড় কুমীর। সেই কুমীরত্বের সাধনাতে সবাই নেংটী পরে জটা বানিয়ে চিমটে বাজিয়ে নাগা ফকীরের কুম্ভযোগে স্নানের প্রতিযোগিতার মত হুড়মুড় করে জলে ঝাঁপ দিয়ে জল তোলপাড় করে দিচ্ছে।

এতক্ষণ গৌরীকান্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। সে কথাগুলি ঠিক শুনছিল না। সে ভাবছিল।

ভাবছিল রমার কথা।

তার বুদ্ধি চাতুর্য ক্ষুরধার প্রগলভতার অন্তরালে তার জীবনের অকৃত্রিম ক্ষোভকে সে অনুভব করতে পারছিল—সে যেন স্পর্শ পাচ্ছে। আরও কিছু আছে। একটা বিশ্বাস। স্বপ্নময় একটা জগতের কল্পনায় বিভোর হয়ে সে সব ভুলেছে। তার জন্য সে তার প্রাণও দিতে পারে, যথা-সর্বস্ব দিতে পারে। এর জন্য তার কাছে পাপ নাই পুণ্য নাই ন্যায় নাই অন্যায় নাই নিজের সুখ দুঃখ নাই কিছু নাই। এই মোহান্ধতায় নিজের বিশ্বাস ছাড়া আর সকল বিশ্বাসকে উন্মত্তের মত আঘাত ক'রে তাকে ভেঙে চুরে চুরমার ক'রে দিতে চায়। বড় বড় মন্দির প্রাণময় বিগ্রহের দেব মহিমা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্বীকার না করতে পারে, কিন্তু শিল্প মহিমাকে স্বীকার করে শ্রদ্ধা ক'রে। রমা তাও করে না, সে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। রমার মতের অকল্যাণকরতা অশুভ ফলাফল সে জানে তবু তাকে স্নেহ না করে পারে না; তার এই সর্বনাশী সাধনায় উন্মত্ত ঐকান্তিকতার জন্যই স্নেহ না করে পারে না, বেদনা বোধ না করে পারে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। বললে—

—রমার কথার সত্যতার আমি সাক্ষী দিচ্ছি মিঃ সেন।

মিঃ সেন—,এ এস পি।

সেন একটু চমকেই উঠলেন—বললেন আপনি সাক্ষী দিচ্ছেন? মানে?

—মানে রমা যে বলেছে সে দাঙ্গা বাধাতে যায়নি, থামাতেই গিয়েছিল এবং তার কোন মুসলমানদের বাড়িতে গিয়ে ওঠার মধ্যে তার ধর্ম বা তার মর্যাদা হানির কথাই ওঠে না, উঠতে পারে না, এরই সাক্ষী আমি দিচ্ছি। এর মধ্যে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মত নিয়ে তার সঙ্গে আমার অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু আন্তরিকতা নিয়ে নেই। আমি সাক্ষী দিচ্ছি মিঃ সেন। এবং অনুরোধ করছি এ নিয়ে ওকে আর উত্যক্ত করবেন না।

* * *

সকলে চলে যেতে রমা যেন ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ল। সামনের টেবিলের উপর মাথা রেখে চুপ ক'রে মুখ লুকিয়ে বসে রইল। সব প্রথমে মাথাটি রাখবার আগে শুধু বললে—আমি জানতাম গৌরীদা। আমি জানতাম তুমি আমাকে বাঁচাবে।

গৌরীকান্ত মৃদুস্বরেই বললে—তোমাকে বাঁচাবার জন্যে নয় রমা। আমি যা বিশ্বাস করি তাই বলেছি। সত্য বলেছি।

অনেকক্ষণ পর গৌরীকান্ত বললে—রমা, ওঠ। বেলা বোধ করি দুটো। স্নান

কর যদি—স্নান কর; তারপর যা রান্না হয়েছে তাই খাই চল ভাগ করে।

—স্নান করব? খাব? তোমার এখানে?

—বেলা যে অনেক হয়েছে ভাই। পরক্ষণেই গৌরীকান্ত বলে উঠল—ওঃ হো! তুমি বুঝি আমিষের হেঁসেলে খাবে না? তাই বুঝি ও কথা বললে?

—নাঃ। হাসলে রমা। এত শিখলাম পড়লাম—এত বললাম—এরপরও তুমি আমাকে ঐ প্রশ্ন করলে গৌরীদা? আমিষ একাদশী—সাবিত্রী চতুর্দশীর এলাকা পার সত্য সত্যই হয়ে এসেছি আমি। ও সব মানিও না—বাছিও না। তবে।

একটু হেসে বললে—মাছটা খাইনে, সে ছেলেবেলা থেকেই খাইনে। আমার এতটুকু বয়সে বাবা মারা গিয়েছিলেন, মাকে আমি বরাবরই দেখছি বিধবা। বিজয়দা'দের বাড়িতে মা রান্না করতেন—খেতে বসতাম—বিজয়দার পিসী বলতেন—এই রমা ভাতগুলো মেলে দে তো। কেন—প্রথম প্রথম বুঝতাম না। পরে বুঝলাম—মা আমাকে ভাতের মধ্যে মাছের খানা লুকিয়ে খেতে দেয় কি না তাই দেখত বিজয়দা'র পিসী। ক'দিন পরেই মা জানতে পারলে। জেনে সেই দিন থেকে মা আমার মাছ খাওয়াই বন্ধ করে দিলে। বিয়ের পর আমার বুড়ো স্বামী প্রথম প্রথম ভাল মাছ কিনে আনত আমার জন্যে। আমি কিছুতেই রুচি করে খেতে পারিনি। শেষ আমার জন্যে তিনিও ধরলেন নিরিমিষ। জানেন তো কি মাছ ধরার সখটাই না ভদ্রলোকের ছিল! মাছ ধরতেও পারতেন। আনতেন ধরে, কিন্তু আমার জন্যে খেতেন না, বিলিয়ে দিতেন পাড়ায়। আমিষ হেঁসেল হোক—মাছ তুলে দিলেই হবে।

—যাও তা হ'লে স্নান করে নাও।

—নেব। কিন্তু এসে একটা তরকারী নিজে রান্না করে নেব। আমার জন্যে নয়। তোমাকে রান্না ক'রে খাওয়াব।

গৌরীকান্ত প্রসন্নকণ্ঠে বললে—তোমার গুণপনার যে পরিচয় তুমি দিয়েছ ভাই—তাতেই আমি মুগ্ধ। রান্নার গুণপনার পরিচয়টা কি তারও চেয়ে বিস্ময়কর হবে? তবে আমার এখানে যে রান্না, সে যদি তোমার মুখে ভাল না লাগে, তাহলে তুমি রান্না করতে পার।

রমাও হেসে উত্তর দিলে—না, সে ধরণের গুণপনার বড়াইও নেই, নিজেকে ভাল রাঁধুনি বলে গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষাও নেই; নিজের খাওয়া-দাওয়াতে বিলাসিনী নই আমি। এটা আমার সাধ।

—সাধ।

—হ্যাঁ সাধ গৌরীদা।

—তবে রান্না কর, বারণ করব না। কিন্তু তাহলে আর দেরি ক'র না। স্নানটা সেরে নাও আগে। ওই টিনের ছাউনি-করা—ওটাই স্নানের ঘর; ওখানেই সাবান পাবে, তেল বোধ হয় মাখো না। তাও আছে। আমি তোমাকে একখানা ধোয়া ধুতি আর তোয়ালে বের করে দিই।

গৌরীকান্ত ঘরের ভিতর থেকে কাপড়-তোয়ালে বের করতে গেল, রমা ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে বললে—তবে তোমাকে একটা মজার কথা বলি শোন গৌরীদা। ছেলেবেলা—মা যখন বিজয়দের বাড়ি রান্নার কাজ করত, তখন বিজয়ের বাবা আর পিসীমার ভয়ে অস্থির থাকতাম, তাতো জান। পালিয়ে এসে তোমার মায়ের কাছে বসে থাকতাম। তিনিই তো আমাকে প্রথমভাগ পড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয়ভাগও পড়েছি। বানান বলতে ভুল করতাম। কাশীর মাসীমা ধমক দিতেন—না পড়লে লেখাপড়া হয়? তুই মুখ্খু হবি। আমি বলতাম কি জান? আমি বলতাম—হই মুখ্খু, আমি মায়ের মত রান্না করব। বিজয়দের বাড়িতে নয় তা'বলে। গৌরীদার বউয়ের কাছে থাকব—রান্না করব। কাশীর মাসী আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন—ছিঃ! ও কথা বলতে নেই। ভাত রান্না করবে কেন তুমি? তোমার বিয়ে হবে, রাঙা টুকটুকে বর আসবে—কেমন ভাল ঘর, কত জমি, বাগান, পুকুর, লেখাপড়া জানা বর—বাড়িতে লোকজন—ঝি-চাকর রাঁধুনি: তুমি গৌরীর বউয়ের কাছে ভাত রান্না করবে কেন? একদিন আমি জেদ ধরেছিলাম—না—আমি ভাতই রান্না করব। সেদিন কাশীর মাসী আমার পিঠে এক কিল মেরেছিলেন। তারপর বড় হয়ে কথাটা বুঝে ওটা নিশ্চয় ভুলেছিলাম। আবার যেদিন তুমি মাকে বললে—বিজয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা, নিজে গিয়ে বিজয়ের মাকে বললে—সেদিন ভেবেছিলাম, গৌরীদা তো বিয়ে করলে না, বিজয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তো ভাসুর হবে আমার, তখন গৌরীদাকে আর ঠাকুর-চাকরের হাতে খেতে দেব না। আমাদের বাড়িতে খেতে বাধ্য করব। সেই সাধটা আজ মিটিয়ে নেব।

গৌরীকান্ত সুটকেস খুলে স্তব্ধ হয়ে বসে কথাই শুনছিল। স্নেহের স্পর্শ-পুলকে সে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল। রমার কথা শেষ হতে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাপড়-তোয়ালে এনে তার হাতে তুলে দিলে। রমা তার মুখের দিকে হেসে বললে—চোখে তোমার জল এসেছে গৌরীদা?

গৌরীকান্ত উত্তর দিলে না—হাসলে।

রমা কাপড়-তোয়ালে নিয়ে চলে গেল। পরমুহূর্তেই স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—ঘরে স্নান করা হল না গৌরীদা। জলও কম আছে, আর কেমন আড়ষ্ট লাগছে। আমি পুকুরে গিয়েই একটা ডুব দিয়ে আসি।

—সেকি? দাঁড়াও আমি জল দিতে বলছি।

আমরা কোথায়?

—না। বাড়িতে আমি স্নানের ঘরে স্নান করি নে গৌরীদা। পুকুরেই স্নান করি। সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ওদিকের দরজা দিয়ে। দরজার মুখেই প্রায় তাদের দুই বাড়ির, অর্থাৎ তার ও বিজয়দের ভাগের বেশ বড় পুকুর শ্রীপুকুর; জলও ভাল; এবং তাদের কয়েক বাড়ির মেয়েদের অনেক কালের স্নানের পুকুর এটি। মাঝখানে বাঁধানো ঘাটটির খানিকটা এমন-ভাবে উঁচু রাণা দিয়ে আড়াল করা যে, এক বিপরীত দিকের পাড়ে না দাঁড়ালে ওই ঘাটের কিছু দেখা যায় না। কিন্তু বিপরীত দিকের পাড়ের গোটাটাই বাগান, বাগানের চারিদিকই ঘন রাঙচিতে এবং ফণী মনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এ-পুকুরে রমা পনের-ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্নান করেছে। সাঁতার দিয়ে এপার-ওপার করেছে পুকুর। ওই রাণার উপর থেকে ঝাঁপ খেয়েছে।

গৌরীকান্ত চাকরটাকে ডেকে বললে —ওরে বাবা, তুই জায়গা করে ফেলতো— আমি স্টোভটা ধরিয়ে ফেলি।

স্টোভটা জ্বলে উঠেছে, এমন সময় দ্রুত পদধ্বনির শব্দ শুনে একটু চকিত হয়েই সে মুখ ফিরিয়ে দেখলে—রমা প্রায় ছুটে এসে বাড়ি ঢুকেছে। তার সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে। জলে ডুবেই উঠে পালিয়ে এসেছে—মাথা-গা মুছবারও সময় পায় নি। শুধু তাই নয়, মুখ পর্যন্ত তার ঘোমটা টানা।

—কি হ'ল রমা? এমন করে—

রমা স্নানের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—বিজয়ের মা, মাসীমা।

—তা কি?

—ঘরের ভিতর থেকে রমা জবাব দিলে—সবে ঘাটে নেমে গলা চুবিয়েছি, এমন সময় মাসীমার গলা পেলাম। বুঝলাম, ঘাটে আসছেন। আমি অমনি হুপ্ হুপ্ করে দু-তিনটে ডুব দিয়ে এক হাত ঘোমটা টেনে উঠে পালিয়ে এলাম। উনি ঘাটের মাথায়—আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

গৌরীকান্ত অবাক হয়ে গেল। কেন?

রমা শুকনো কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে বললে—ভারী লজ্জা লাগল গৌরীদা। কি বলব তোমাকে মাসীমা আসছেন— মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে ভাবতেই বুকটা যেন ধড়ফড় করে উঠল। হাসতে লাগল সে।

শান্তভাবেই গৌরীকান্ত প্রশ্ন করলে, কিন্তু কেন? খুড়ীমা তো কোন কালেই কাউকে কটু কথা বলেন না রমা।

—সেই তো গৌরীদা। লজ্জা তো সেইখানেই পায় মানুষ। সত্যিকারের সৎ মানুষ, তারা যে চিরকালের মানুষ। সে-কাল থেকে এ-কালের মানুষ হওয়ার যে অহঙ্কার, সেটা খাটে সে-কালের অহঙ্কারে অহঙ্কারী মানুষের কাছে। তাদের অহঙ্কারকে লজ্জা দিয়ে তাদের খাটো করে যে আনন্দ পাওয়া যায়—সে আনন্দটা দারুণ লজ্জায় চিরকালের এই মানুষগুলির কাছে মাথা হেঁট করে নিজেই খাটো হয়ে যায়। এই মাসীমা'র বাড়িতে রাঁধুনীর মেয়ে আমি চোদ্দ বছর কাটিয়েছি—অথচ একটা কটু কথা শুনি নি তাঁর কাছে। ওরে বাপরে!

গৌরীকান্ত বললে—যাও, ভেতরে দেখ আয়না-চিরুণী আছে। একটু তাড়াতাড়ি কর। বেলা দুটো বেজে গেছে কখন। চাকরটা ক্ষিধের চোটে ঢুলছে। এদিকে স্টোভটা ফোঁসাচ্ছে। পারমিটের কেরোসিন পুড়ছে।

—ওকে তাহলে অল্প ক'টি আলু কুচি করে রাখতে বল। আমি এলাম বলে। অল্পক্ষণেই চুলে বোধ হয় বার-কয়েক চিরুণী চালিয়েই বেরিয়ে এল রমা। স্টোভের উপর কড়াই চড়িয়ে দিয়ে বললে— একটা কথা শুনে কিন্তু আনন্দ হ'ল।

—কি বল তো?

—পারমিটের কেরোসিন পোড়ার জন্যে ভাবনার কথা শুনে আনন্দ হ'ল। তোমাকে কি সত্যিই ভাবতে হয়?

—হয় রমা। এখানে তো ট্যাক্স অনুসারে কেরোসিন। একা মানুষ বলেই চলে কোনরকমে। ঘরে নিশ্চয় টেবিলের উপর পোড়া বাতি দেখেছ। ঘরে তাই জ্বালাই।

—তুমি তো স্পেশ্যাল পারমিট চাইলেই পাও।

—পাই কি না জানি না, তবে চাই না।

—চোরাবাজারে কেনো না?

—না। তাও কিনি না।

—কিন্তু এত কষ্টই বা কর কেন?

—তোমরা সবাই কষ্ট করছ যখন— তখন করব না-ই বা কেন, বল? এবং ওটাই আমার নীতি।

—আমি অবিশ্যি ও কষ্ট সই না। আমি কিনি। যারা পারমিট পায়, অথচ কেরোসিন জ্বালে না, বড় জোর একটা ডিবে জ্বালে—তাদের কাছ থেকে কিনি। অন্ধকারে কিছুতেই থাকতে পারিনে। জান, ভারী ভূতের ভয় আমার। কেবলই মনে হয়, বাবা—যে ভালোটা বাসত আমার বৃদ্ধ স্বামী, সে যদি অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে থাকে! মা-গো!

কড়াইয়ে জল ঢেলে দিয়ে শব্দ তুলে আলুগুলিকে নেড়ে দিয়ে হঠাৎ রমা বললে, আমি বড় দুঃখী গৌরীদা। সবচেয়ে দুঃখ কি জান—আমার দুঃখটাকে কেউ দুঃখ বলে মনেই করে না।

(ক্রমশ)

তামিলনাদের কবি ভারতী

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি

সমগ্র তামিলনাদে একটা জাগরণের স্বপ্ন সম্ভাবনা ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের শৈল-সানু থেকে পূর্ব-ঘাটের সাগর সৈকত পর্যন্ত ভূমিখণ্ডই তামিলনাদের মাতৃভূমি তামিলনাদ। অরণ্য গিরি নদীর উপর প্রবাহিত মুক্ত বায়ু বলাকা শোভিত বর্ষার মেঘভারনম্র আকাশ, সবুজ বিতত শস্যক্ষেত্র সমগ্র দেশের উপর জাগরণী কাব্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে। তামিলের মানুষ তাই কবি কণ্ঠের কাব্য-ধ্বনিতে জাগরিত হয়। প্রকৃতির নিঃসীম বিস্তারে মানুষের মনে আসে মহত্তম ভাবের আবেগ।

এই স্বপ্নভূমি তামিলনাদে, তার প্রাচীন সংস্কৃতি সাধনা ও ঐতিহ্যের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে জাগরণী মন্ত্রের কবি ভারতীর আবির্ভাব হয়।

একদিন যে শিশু তামিলনাদের আকাশে বাতাসে মাটিতে তার মুগ্ধবোধ সমাপন করেছিলেন, তাঁকে ক্ষুদ্র তামিল ভূখণ্ড আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। আজ তাঁর তিরোধানের ত্রিশ বছর পরেও সর্বভারতে ধীরে ধীরে তাঁর আবির্ভাব ঘটছে। আজ তামিলনাদের কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে জানবার জন্য, তাঁর অমর ভাবচিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য দেশবাসীর কৌতূহলের অন্ত নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার আকাশ অযুত নক্ষত্রের আবির্ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। সেদিন বাঙলায় শুরু হয়েছিল নব নব ভাববিপ্লব। বাঙলার এই স্বর্ণযুগে প্রতিবেশী তামিলনাদের আকাশেও এক মহা জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়। সেদিনের যুগ প্রবর্তক বাঙালী মনীষা তামিলনাদের এই ভাব সাধকটির সম্যক পরিচয় পেলেও আজকার বাঙালী তথা ভারতবাসী এই দরিদ্র ভাব-যোগীর কথা প্রায় বিস্মৃতই হয়েছেন।

কবি ভারতীর বাল্যকাল কেটেছিল প্রকৃতির মহাসম্পদের মধ্যে; উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করে, নদীতীরে দাক্ষিণ ভারতের কাবেরী চিন্দুর সুরে মুক্ত কণ্ঠে গান গেয়ে। এইভাবে বাল্যকালেই স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয়েছিল তাঁর মনে।

এট্টায়াপুরমের জমিদার ভারতীর পিতা চিন্নস্বামী আয়ারকে একদিন বলেছিলেন, 'দেখ আয়ার, তোমার ছেলে সুব্বাইয়া একদিন মস্ত বড় একজন কবি হবে।'

এট্টায়াপুরমের জমিদার যে ভবিষ্যদ্-বাণী করেছিলেন কবি ভারতীর মধ্যে উত্তরকালে তা সত্যে পরিণত হয়েছিল। চিন্তায় সংস্কৃতিতে বর্তমান তামিলনাদের

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

জনক ভারতীর মধ্যে কর্ম ও কাব্যের এক অভাবনীয় সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর কাব্যে যা কিছু রূপ দিতেন, প্রবন্ধের মধ্যে যে মতবাদ প্রচার করতে চাইতেন তা তাঁর কর্মের মধ্যেও রূপান্তরিত হত। মহাকবি ভারতী তাই অন্যদিকে ছিলেন কর্মযোগী। ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল তাঁর ভাবকল্পনা। মহা মনীষী ভাব-সাধকদের ন্যায় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' —সর্বভূতে সেই প্রেমময়ের বিকাশ কবি ভারতীও গভীরভাবে অনুভব করে-ছিলেন। তিনি তাঁর অমর কাব্যকথার মধ্যে সেই বৈদান্তিক সুরধ্বনিই তুলেছেন। তাঁর 'বাজাও জয়ভেরী' কবিতার মধ্যে একস্থানে তিনি বলছেন,—

এই যে কাকেরা ঘোরে আর
উড়ে চড়ুইয়ের দল
এরা কেউ পর নয়,
আত্মার আত্মীয় হয় এরা,
ওই যে বিতত সিন্ধু,
তুঙ্গশীর্ষ ঐ হিমাচল
ওরই মাঝে লীন সত্তা হয়ে
আছে জেনো মানবেরা;
যেদিকে ফিরাই আঁখি
সর্বদিক তুমি আমি ময়
মহানন্দে কেঁপে ওঠে প্রাণ
হেরি একি অপূর্ব বিস্ময়।

কবি ভারতী ছিলেন মানব প্রেমিক। তিনি কল্পিত ঈশ্বর ও স্বর্গ অপেক্ষা নরনারায়ণ আর দৃশ্যমান প্রকৃতিকেই তাঁর সাধনার বস্তু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ জগতকে মায়াময় বলে অস্বীকার বা পরিহার করেননি। জগতকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তার মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাঁর একটি উক্তির মধ্যে আমরা তাঁর সরল সত্য চিন্তার পরিচয় পাই। তিনি বলেন,—আমাদের দেশে জগত যে অনিত্য এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমাদের দর্শন ও পুরাণশাস্ত্র এই কথাই বলে চলেছে। সাংসারিক পরিবারবদ্ধ জীব হয়ে আমাদের ঐ ধরণের চিন্তা অশুভ বলে মনে করি। আমি শুধু এই প্রশ্ন করতে চাই, যে সত্তা আমরা পিতৃপিতা-মহের কাছ থেকে পেয়েছি তা কি অসত্য? সংসার রমণী, যিনি সব কিছু সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন, যিনি সন্তানদের স্নেহ-বাৎসল্যে গড়ে তুলেছেন, তিনি কি অসত্য? আমি সন্তানের জনক জননীর কাছে এই প্রশ্ন করি যে তাঁদের সন্তানেরা কি অসত্য? ঘরের মঙ্গল দেবতা কি অনৃত?

ভাবম্বেগী ভারতী সমগ্র মানবের হয়ে এই সহজ প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।'

আমাদের ভাবসাধক মানব প্রেমিক বিবেকানন্দ বলেছেন,—

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।

তামিলনাদের কবিও এই ভাব-সাধনার সুরে তাঁর কাব্যবীণার তার বেঁধেছেন। তাঁর অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেছেনঃ

মূঢ় যারা বলে তারা মৃত্যুর পারেতে যাত্রা
বৈকুণ্ঠ কৈলাস
প্রেত বাক্য সম শাস্ত্র তাহাদের দেয় নিত্য
সে মিথ্যা আশ্বাস
হে আমার মহাশঙ্খ এই বাণী উচ্চে তুমি
কর উদ্বোধন।
মিথ্যার পশ্চাতে যেন মানবাত্মা নাহি আর
ধায় অনুক্ষণ—

কবি ভারতীর সাধনা ছিল মানব প্রেম সাধনা। সংসারের দলিত মথিত ব্যথিতের জন্য তাঁর মহৎ আত্মা সর্বক্ষণ অশান্ত হয়ে উঠত। এমনকি মহাশত্রুও তাঁর উদার হৃদয়ের কাছে এসে অপার ক্ষমার আস্বাদ পেয়েছে।

ইংরাজ রাজের কুনজরে পড়ে তাঁকে একবার পণ্ডিচেরী চলে যেতে হয়। কিন্তু ইংরাজ সরকারের কড়া দৃষ্টি তখন তাঁকে অনুসরণ করেছে। একজন ঝানু সি-আই-ডি নিযুক্ত হয়েছেন ছলে বলে তাঁকে ইংরাজ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য। সি-আই-ডি'টি প্রথমে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। পরে কিন্তু তাঁর সমস্ত ছলনাই ধরা পড়ে যায়। ঘরের মধ্যে বসে রয়েছেন কবি ভারতী, পাশে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী। সি-আই-ডি ভদ্রলোকটি ঘরে ঢোকামাত্র ভারতীর স্ত্রী কটু ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন। কিন্তু কবি ভারতীর মহাভাব উপস্থিত হল। তিনি সি-আই-ডি অফিসারকে দু' বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করে বলতে লাগলেন,—

ধূম্র জ্বালা তারও মাঝে
অগ্নিশিখা রয়
ঘৃণ্য যে জন তার মাঝেও
সেই সে প্রেমময়
শত্রুরে আজ কররে ক্ষমা মন
তিনি যেথায় আছেন সেথা
সবাই আপন জন।

মহান হৃদয়ের কাছে শত্রুমিত্র যে একাকার হয়ে যায় কবি ভারতী এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সত্য পরিচয় দিয়েছেন।—

মানব প্রেমিক ভারতী একদিকে যেমন শত্রুমিত্রের ভেদাভেদ বিস্মৃত হতেন, সর্বজীবের মধ্যে একই প্রেমময়ের আবির্ভাব দেখতেন, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদার মতাবলম্বী। সাধক রামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন আর বলতেন, সর্বধর্মই সাধনীয়। প্রত্যেক ধর্মপথেই সেই প্রেমময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া যায়।

তিনি হিন্দুর বৈদান্তিক সাধনার মধ্যে থেকেও যীশু আল্লা প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মের উপাস্যদের নিয়েও গভীর ভাবাত্মক কাব্য রচনা করেছেন। তিনি তাঁর আল্লা শীর্ষক কবিতায় বলছেন,—

যে জন মূঢ় মিথ্যাচারী দুষ্ট তামসিক
সজ্জনেরে এড়িয়ে চলে যে মহা দাম্ভিক
করাল কালের ভয়ে তারা ত্রস্ত ভীত হলে
তুমিও প্রভু রাখ তাদের
তোমার চরণ তলে।

'নন্দলালা' কবিতাটি কবি ভারতীর স্নিগ্ধ গভীর ভাবানুভূতির এক আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন। তিনি এই কবিতায় বৈষ্ণবীয় প্রেম সাধনার রাধা দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছেন। কাকের কালো ডানার মাঝে

হেরি তোমার কৃষ্ণবরণ
ওগো আমার নন্দলালা
গাছের শ্যামল পাতায় পাতায়
হেরি তোমার শ্যামলিমা
ওগো আমার নন্দলালা
সকল কোলাহলের মাঝে শুনি
কেবল তোমার (বংশী) ধ্বনি
ওগো আমার নন্দলালা
আগুনের ছোঁয়ায় লাগে তোমার
মধুর পরশ জ্বালা
ওগো আমার নন্দলালা।

কত গভীর ঈশ্বর চিন্তা ও ভাবানুভূতি থাকলে এ ধরণের কবিতা রচনা সম্ভব তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যে কোন উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব-পদাবলীর পদের সঙ্গে এটিকে সাজিয়ে রাখা চলে।

ভারতী ছিলেন যুগ প্রবর্তক কবি। তামিলনাদে তথা সর্বভারতে নবযুগের উদ্ঘোষণ বাণী তাঁর কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল। যুগ প্রবর্তকের সবগুলি গুণই আমরা ভারতীর মধ্যে দেখতে পাই।

ইংরাজ অধিকারে ভারতের আকাশ ধূলিধূমাচ্ছন্ন। আশাহত মানুষেরা দিনগত কর্মচিন্তায় ব্যস্ত। কিন্তু কবির চোখে ঘুম নেই। তিনি জাগরণের মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। তাঁর অগ্নিক্ষরা বাণীতে উজ্জীবিত করেছেন দেশবাসীকে। 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের' গ্লানিতে যে কবি দুঃসহ ব্যথাভার অনুভব করেছিলেন কবি ভারতী তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন,—

শুধু দুটি অন্নলাগি
স্বেদবিন্দু ফেলা অনুক্ষণ
অর্থহীন প্রলাপেতে নিত্য
শুধু করি আলাপন
লোকের মঙ্গল লাগি
প্রাণ কভু নাহি ধেয়ে যায়
পক্ক কেশ গুচ্ছ মাঝে
গাঢ় মৃত্যু তমিস্রা ঘনায়
চাহিনা চাহিনা আমি
ধূমাঙ্কিত এ আদর্শবাদ
মৃত্যুতেও চাহি নাথ
জীবনের অনন্ত আস্বাদ।

মহাজীবনে অভিলাষী কবি হৃদয় পরার্থকামনায় সতত নিরত থাকত। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় দেশের মূর্খ দরিদ্র নীচ চণ্ডাল ভারতবাসীর প্রতি তিনি অন্তরে অসীম অনুরাগ পোষণ করতেন। তাঁর স্বাধীনতা সংগীতে চণ্ডালদের মুখ দিয়ে তিনি যে কথা উচ্চারণ করেছেন তাতে তৎকালীন তথাকথিত উচ্চ অভিজাত শ্রেণী ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে তিনি নিজে একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

আয়রে সবাই মিলে নাচি আর গাই
এসেছে স্বাধীনতা এসেছে ভাই
বামুনের কাল গেল ভাইরে
ফিরিঙ্গির দাপট আর নাইরে
ভুঁড়িওয়ালাদের গোলা বোঝাই
করব না করব না আর মোরা ভাই
আয়রে সবাই মিলে শঙ্খ বাজাই
(মোরা) ভারত মায়ের ছেলে
বিভেদ ত নাই!

তিনি ছিলেন মানুষের কবি। একটি কবিতায় তিনি বলছেন,—

নীচতম জন বলি কেহ নাহি রবে
কেহ নাহি নির্বিচারে অত্যাচার সবে

জন্ম লভি এ ভারতে উন্নত সবাই
মহানন্দে এস বলি মোরা ভাই ভাই।

তিনি পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীর দশাত্মবোধক বহু উদ্দীপনাময়ী সংগীত তামিলনাদের পথে পথে গীত হয়েছে। মনে-প্রাণে তিনি যেমন আবাল্য মুক্তির আস্বাদ অনুভব করতেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা, নির্যাতিতের মুক্তির জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম আকুলতা। উদ্দীপনাময়ী স্বাধীনতা সংগীত রচনার জন্য তিনি ইংরেজদের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন।

মনে-প্রাণে ভারতী ছিলেন সাম্যবাদী। তিনি তাঁর রচনার একস্থানে বলেছেন,—'এখন থেকে আমরা একটিমাত্র নীতি সর্বদা পালন করব। সেই নীতিটি হল, যদি একটিমাত্র ব্যক্তিও অভুক্ত থাকে, তাহলে আমরা সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করব।'

সত্যসন্ধ কর্মযোগী ভারতীর মুখে একথা শোভা পায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তামিল-নাদের কবি ভারতীর মধ্যে বহু কলাগুণের সমন্বয় হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে ভারতীর অনুরাগ ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর রচনার বহু স্থানে নৃত্য সম্বন্ধে বহু রসগ্রাহী আলোচনা করে গেছেন। সংগীতে ভারতী তামিলনাদে এক নবধারা প্রবর্তন করেন। কঠিন রাগ-রাগিনীগুলিকে তিনি সাধারণের জন্য সহজ মধুর খাতে বইয়ে এনেছিলেন। তিনি বহু সংগীত রচনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সেগুলিতে স্বয়ং সুরযোজনা করেন। বিদেশাগত হারমোনিয়ম যন্ত্রটির ঘোরতর বিপক্ষে তিনি তাঁর মত দিয়েছিলেন। তামিলনাদের গীতকারদের তিনি তাম্বুরা ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন। দেবী সরস্বতী বীণাবাদিনী। তিনি তামিল গায়িকাদের বীণাসহযোগে কণ্ঠসাধন করতে বলতেন। তাঁর মতে বীণাধ্বনি কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে গভীর সমতা রক্ষা করে চলে।

এইভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কবি ভারতীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্য করলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়।

আমরা পাশের মানুষকে চিনি না, দূরের মানুষকে অন্বেষণ করে ফিরি। কিন্তু আমাদেরই প্রতিবেশী তামিলনাদে যে মহান চিন্তানায়ক লোকলোচনের অন্তরালে পড়ে আছেন, তাঁর প্রতি আমাদের বিদগ্ধ দেশবাসীর দৃষ্টি কবে পড়বে? তাঁর বিরাট সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে অভিভূত হতে হয়। এই অল্প পরিসর প্রবন্ধে তাঁর সোন্নত প্রতিভার স্বল্পতম পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বিদগ্ধ জনসমাজ যদি তামিলনাদের এই কবির প্রতি অকৃষ্ট হয়ে অগ্রসর হয়ে আসেন, তাহলে খনির অন্ধগহ্বর থেকে একটি মহামূল্য মণি আবিষ্কার করা যাবে সন্দেহ নেই।

বটানিক্‌স্

সমীর ঘোষ

পথ গেছে কিছুদূরে
ঘুরে।
শ্যামচ্ছায়া ফেলে দিয়ে অশোকের বন
ডেকে নিয়ে এসেছে শ্রাবণ।
তারপর সোঁদালের ফুল
দোলায়েছে হলুদের দুল
এই পথ দিয়ে যেতে তাই মনে পড়ে
স্মৃতির উত্তাল ঝড়ে
তুমি এসেছিলে—
শতঝুরি বটের ছায়ায়
তোমার যাত্রায়
ক্ষণতরে বিরতিও দিলে।
ক্ষণিকের সেই-থামা হয়েছিল হয়তো মধুর,
নেমেছিল মেঘচ্ছায়া একটি নিমেষে
এ বক্ষে মরুর।
অশোকের বন পার হয়ে
সোঁদালের লীলাভূমি ফেলে,
অজানা উদ্ভিদরাশি ঠেলে
অকস্মাৎ দাঁড়াই হেথায়—
অর্কিডের রাজ্য কিনারায়!
দুচোখের চিত্রযন্ত্রে শুধু ছবি তুলি
রঙের বিচিত্র স্রোতে সব যাই ভুলি—
তার পর মনে হয় তুমিও কি এসে
গেছো ভুলে এমনি নিঃশেষে!

তারপরে আমারি মতন
কিছু ঘুরে
কিছু পথ দূরে
চলে গেছো মন হতে সব কিছু মুছে—
অশোকের শ্যামচ্ছায়া, হলুদ সোঁদাল
সব গেছে ঘুচে।

পার হয়ে গেছো তুমি শতঝুরি বটের ছায়ায়
তখনো আচ্ছন্ন ছিলে অর্কিডের রঙীন মায়ায়!!

ট্রামে-বাসে

কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কোন ইংগিত নাই এবং কোন নূতন কথাই বলা হয় নাই, এই অভিযোগ অনেকেই করিতেছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ভদ্রলোকের এক কথা, একথা কে না জানেন; সুতরাং আর যা-হোক, অন্তত ভদ্রতা রক্ষা তাঁরা করেছেন।"

* * *

কংগ্রেস সভাপতি তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস অশ্রুজলে ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। —"সেই জন্যেই হয়ত কংগ্রেসের ইতিহাস এখনও অশ্রুরই ইতিহাস" মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নানল নগর কংগ্রেস অধিবেশনেও আবার পকেটমারেরা ভীড় করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। —"কংগ্রেস-সেবীদের পকেট এখন আর আগের মতো গড়ের মাঠ নয়, একথা তারা নিশ্চয়ই জানে" শ্যামলাল নিজের পকেটে হাত দিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইল।

* * *

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রশস্তি প্রসংগে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, অতঃপর আর কাহাকেও অনাহারে মরিতে দেওয়া হইবে না। —"খুবই ভালো কথা; তবে খেয়ে খেয়ে অজীর্ণ রোগে না মরলেই আমরা বাঁচি" —যিনি মন্তব্য করিলেন, তাঁর মুখ দেখা গেল না। কিন্তু সামনে বসিয়া যিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—হারাধনের আটটি ছেলে বসল খেতে ভাত, একটি মল পেট ফেটে, রইল বাকী সাত—তাকে আমরা দেখিলাম।

* * *

সংবাদে প্রকাশ, পরবর্তী অধিবেশনের জন্য পশ্চিমবংগ কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। —"লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদই যে আমাদের বাঞ্ছনীয়, সে কথা নিমন্ত্রিত-দের জানানো হয়েছে কি" জিজ্ঞাসা করেন বিশু খুড়ো।

* * *

পাকিস্থানের মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থানে যোগদান প্রসংগে পাকিস্থানের মুখপত্র 'ডন' নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এই উপমহাদেশের পূর্ব এবং পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার পাকি-স্থানের উপর আসিয়া ন্যস্ত হইয়াছে।" —"ডনের এই মন্তব্যে আমরা ডাইনীর হাতে পুত্র সমর্পণের কথা মনে না করে পারছিনে" বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, পাকি-স্থান উজীর সভার নাকি Re-shuffle হইবে। —"Shuffling ভালো জানা থাকলে টেক্কার ট্রায়ো নিজের হাতে রেখে পরমানন্দে blind খেলা যায়" বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

মেলবোর্নের এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে নাকি একটি 'স্বামী রক্ষা সমিতি' সংগঠন করা হইয়াছে। স্ত্রী, শাশুড়ি এবং স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানই এই সমিতির উদ্দেশ্য। — বিশু খুড়ো বলিলেন—"এর চেয়ে কল্যাণকর পরি-কল্পনা আর কিছু হতে পারে না। গো-রক্ষা সমিতির চেয়ে গোবেচারী রক্ষা সমিতির প্রয়োজন যে সবচেয়ে বেশি, এ-বোধ আমাদের কবে হবে"!!

* * *

আমরা শুনিলাম, ভারত সরকারের পূর্ত এবং সরবরাহ মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা ইডেন উদ্যানে 'ব্যবসায়িক যোগ্যতা প্রদর্শনী' নামক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। এই প্রদর্শনীতে অফিসে ব্যবহার্য নানা প্রকার সাজ-সরঞ্জাম, কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু সত্যিকারের ব্যবসায়িক যোগ্যতা এতে প্রদর্শিত হবে কি? সাড়ে পোনর ছটাক মাছ পাল্লায় চড়ে কী করে এক সের হয়, পাকা কড়াইতে কী করে রাতারাতি সবুজ রঙ ধরে, চর্বিতে সরবাটা ঘির গন্ধে উদাস করে—এসব সত্যিকারের যোগ্যতা Trade Secret হয়েই থাকবে"!!

* * *

প্রজাতন্ত্র দিবসের নৃত্য উৎসবে যোগদান করার জন্য প্রায় পাঁচশত পার্বত্য নরনারী দিল্লী আগমন করেন। শ্রীযুত নেহরু তাঁহাদের বলিয়াছেন যে, দিল্লী আজ আর রাজধানী নয়, এ-শহর তাঁদেরই, একথা তাঁরা যেন মনে করেন। —"অতঃপর তাঁদের দেওয়ানী খাসে বসিয়ে অভিষেক উৎসব কবে করা হবে, সেকথা অবশ্যি স্পষ্ট করে বলা হয়নি; অভিষেক না হলেও দিল্লীর লাড্ডুর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে"!!

* * *

পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা নির্মাণের ভার ইটালির ইঞ্জিনীয়ারদের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। —"নর্দমার আবর্জনা থেকে গ্যাস উৎপাদনের ভার আমরা দিয়েছি জার্মান পারদর্শীর হাতে; পররাষ্ট্র নীতিতে পাক্ বলে আমায় দেখ্, ভারতও বলে আমায় দেখ্—এপিঠ-ওপিঠ মাত্র!!"

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

প্রেমের সমাধি তীরে—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা। ...কুণ্ঠ বুক হাউস, ১৮৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। ...ল্য—১৷০ ।

মলাটের ছবিটি চাঁদের দিকে তাকিয়ে ...লুলায়িত কুন্তলা জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। ...টকের পঞ্চমাঙ্ক একেবারে। সারা বইতে এই ...াঁপাঝাঁপির,আক্ষরিকভাবে নয়, অন্ত নেই। ...মান্দা কথা সনাতন প্রেমের আদর্শ প্রচার ...রতে যত পন্থার আশ্রয় আজ পর্যন্ত ...লখকরা নিয়েছেন তার প্রায় সব ক'টিরই ...পূর্ব সমাবেশ করবার প্রচেষ্টায় লেখক গলদ-...র্ম। কিন্তু অক্ষমতার জন্য কেবল ঘর্মটুকুই ...র হয়েছে। সারবস্তুর কোন সন্ধানই তিনি ...তে পারেন নি। না গল্পে না রচনায়। ...টাই অক্ষম ছেলেমানুষি। (৩৮৩।৫২)

বাঁদী—গোলাম কুদ্দুস। সাধারণ পাবলি-...র্স, ৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা—১৭। ...ল্য—৩, ।

বাঙলা দেশের, অবিভক্ত বাঙলার কথাই ...লছি, জনসংখ্যার বেশীর ভাগ যে মুসলমান, ...াহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সেকথা ...তীয়মান হয় না। বাঙলার মুসলমান সমাজ ...য সাহিত্যে যথাযথ স্থান পায় নি তার কারণ ...বিধ। প্রথমত শক্তিমান অ-মুসলমান ...াহিত্যিকদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের ...রিচয়ের অগভীরতা, দ্বিতীয়ত সেই ...মাজে শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের অভাব। ...রণ যাই হোক তার ফলাফল এক। ...লা সাহিত্যে মুসলিম সমাজের পূর্ণাঙ্গ ...র পাবার মত বই খুব কমই প্রকাশিত ...য়েছে।

গোলাম কুদ্দুস-এর বাঁদী পড়ে এই সমাজের ...কদিকের অনেকখানিই পাঠক সাধারণের ...খে উদ্ভাসিত হবে। সাহিত্যের আসরে ...লাম কুদ্দুস-এর পরিচয় কবি হিসেবেই। ...ন্তু বাঁদী উপন্যাসে তাঁর আর একটি দিকও ...ঘাটিত হলো। সম্ভবত উজ্জ্বলতর দিক।

গরীব চাষীর ছেলে রফিক। পরীক্ষায় ...লো ফল করে কলকাতায় পড়তে এলো ...লোক মামার কাছে। এ এক নতুন জগৎ। ...শিক্ষিত ভদ্রসমাজের সঙ্গে তার এই প্রথম ...তরঙ্গ পরিচয়। এখানকার কায়দা-কানুন ...ব আলাদা। আভিজাত্যের কাছে মনুষ্যত্ব ...নিমূল্য। রফিকের কল্পনাপ্রবণ কিশোর ...ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ল। সংসারের ...রাজ্ঞী রফিকের মামী আর তাঁর জন্মবাঁদী ...সম্ভ্রমের মধ্যে ব্যবধান আকাশপাতাল। ...জনের কটাক্ষে সমস্ত সংসার তটস্থ অন্যের ...কুমতামিলে মুহূর্তবিলম্বের শাস্তি দৈহিক ...স্তি। কারণ বাঁদীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তৃত্ব প্রভুর ...তে। এহ বাহ্য। আসলে কিন্তু নারীর ...সম্ভ্রমের মাপকাঠিতে পুরুষের চোখে ...দের দুজনের কোন তফাত নেই। সেখানে ...রা দুজনই সম্ভ্রান্তহীনা বাঁদী। পুরুষের ইচ্ছাপূরণের সামগ্রী মাত্র। শিক্ষিতা তেজস্বিনী মেয়ে হেমিনাকেও ঘর করতে হয় এমন স্বামীর যার সঙ্গে তার রুচির গরমিল, যাকে সে ভালোবাসে না। অথচ যাকে সে ভালোবাসত, যার সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হতে পারত পারিবারিক সম্ভ্রম সেখানে বাধা হলো। কারণ ছেলেটি বাঁদীর গর্ভজাত।

বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নতুন অভিজ্ঞতার বিচিত্র আলোকে একটি কল্পনাপ্রবণ তরুণ মনের পাঁপড়ি খুলছে। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি, সামাজিক বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতা জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করছে। উপন্যাসের এই দিকটি নতুন ঔপন্যাসিকের পক্ষে কৃতিত্বের। কিন্তু যেখানে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে রচনা সেখানে দুর্বল। আবেগপ্রবণতার সঙ্গে তেমন যেন খাপ খায় নি। এমন কি স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত রাজনৈতিক মঞ্চবক্তৃতার মত মনে হয়। যেন স্রেফ অবতারণা করবার জন্যেই স্থানে অস্থানে কিছু কিছু রাজনৈতিক যুক্তিজাল ঢোকান হয়েছে। সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে নিঃসন্দেহে সার্থক হতো। হয়নি বলেই আফসোস। তবু সব ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করেও প্রথম উপন্যাস হিসেবে গোলাম কুদ্দুস-এর বাঁদী উল্লেখের দাবী রাখে। (৩৬৯।৫২)

ছোট গল্প

মানুষ হলেও দেবতা বলি—শ্রীঅতুলানন্দ রায়। প্রকাশক—শ্রীআশালতা রায়, মনোভিলা, দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা। মূল্য—১৷০ ।

মহাভারতের বিভিন্ন গল্প ছোটদের জন্য তাদের মত করেই বলা। বেছে বেছে মজার মজার গল্পগুলোকেই নেওয়া হয়েছে। বলার কায়দাটিও স্বচ্ছ। তবু মাঝে মাঝে ভাষা ছোটদের কাছে একটু দুরূহ লাগবে। ক্রিয়াপদের পরে কর্মের প্রয়োগে পরিমিতির অভাব শ্রুতিকটু। ছাপা এবং ছবিও আশানুরূপ নয়। (৩৯১।৫২)

ডিটেকটিভ গল্প—

মৃত্যু না হত্যা—শ্রীস্বপনকুমার। তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স, ৮১নং, আহিরীটোলা স্ট্রীট। মূল্য—।৵০ ।

রক্তাক্ত ধরিত্রী—শ্রীস্বপনকুমার। তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স, ৮১নং আহিরীটোলা স্ট্রীট। মূল্য—।৵০ ।

মৃত্যুচক্রে বাজপাখী—শ্রীস্বপনকুমার। জেনারেল লাইব্রেরী, ১১৮, আপার চিৎপুর রোড। মূল্য—৷৷০ ।

তিনটি গল্পই মূলত এক। সব ডিটেকটিভ গল্পের মত হত্যা দিয়ে শুরু। হত্যাকারী সমাজে প্রতিষ্ঠাবান বিশিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু বিপথচালিত। কিন্তু ডিটেকটিভের সঙ্গে পারবে কেন? হ্যাঁ, একজন সহকারীও আছে। তবে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই পুলিশ এসে উদ্ধারকারীর ভূমিকা নেয়। কাজেই ডিটেকটিভ অথবা তার সহকারীর পক্ষে...এমন কি শত্রুগৃহও রীতিমত নিরাপদ। ডিটেকটিভ গল্পের রহস্যের জটিল জাল অথবা ডিটেকশনের নিপুণ কৌশলের এমন সহজ ফরমুলা বের করলে লেখকের সব পরিশ্রমই বেঁচে যায়। তবে পাঠকদের হতাশার কথা ভেবে একটু দুঃখ হয় বইকি। (৩৯৩।৫২, ৩৯৪।৫২, ৩৯৫।৫২)

কণ্ট্রোলের অভিশাপ—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত। প্রতিভা প্রেস, ৩৮।২, ওয়েলিংটন স্ট্রীট। মূল্য—২, ।

লেখক বই-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে কণ্ট্রোলপ্রথার দোষত্রুটিগুলি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বক্তব্যে কিছু কিছু যুক্তি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে একদেশদর্শী। কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় কণ্ট্রোলপ্রথা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় নয় অপরিহার্যও বটে এবং সক্ষম সরকারের পরিচালনায় সার্থক কণ্ট্রোলপ্রথা চোরাকারবারীর মিত্র না হয়ে শত্রুও হতে পারে। অবশ্য এর সবটাই সরকারের কর্মতৎপরতা এবং জনসাধারণের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। সমস্যার এদিকটার প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। (৩৮১।৫২)

কবিতা

ফেরারী—আবদুল গণি খান। 'মতিমহল' পরিবাহরম্, বর্ধমান। মূল্য—১৷০ ।

বাঙালী মরিলে বাঁচিবে কে?—সমরেন্দ্র দত্ত রায়। আলোকতীর্থ প্রকাশনী, ৫, কলেজ

রোড, বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া। মূল্য—৷৷০।
ফেরারী গজল ঢঙে লেখা কবিতার সংকলন। সুরা এবং 'পিয়া'র আধিক্যে পুরোপুরি খৈয়ামি মেজাজ। প্রচ্ছদপটেও সেই পরিবেশই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ফল হয়েছে উল্টো। তবু লেখার মধ্যে নিজের কথা সহজ করে বলবার প্রচেষ্টা কবিতায় বিশেষ একটি রসের সৃষ্টি করেছে।
প্রচ্ছদপট এবং নামাকরণে রাজনৈতিক পুস্তিকা বলে ভ্রম হলেও 'বাঙালী মরিলে বাঁচিবে কে?' কাব্যগ্রন্থ। যদিও কবিতার বক্তব্য রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। বঙ্গবিভাগজনিত ক্লেশ এবং এর থেকে মুক্তির উপায় বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তু। মাঝে মাঝে দু'একটি কবিতা রাজনৈতিক ফতোয়া। দেশ বিভাগের গভীর অন্তর্বেদনা একাধিক কবিতায় মূর্ত। এই কারণেই নিছক পদ্য হয়েও একাধিক ক্ষেত্রে প্রায় কবিতার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ, যদিও তেমন নিপুণ নয়।
(৩৯৬।৫২, ৩১৬।৫২)

ধর্মপুস্তক

মহারাজা—আশালতা সিংহ প্রণীত। শ্রীরাধারমণ দাস কর্তৃক ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ৬০, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৲।
দেওঘরস্থ শ্রীশ্রীরামনিবাস বালানন্দ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনমূলে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকর্ত্রীর গুরুভক্তি আন্তরিক আবেগময় উচ্ছ্বাসে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে শ্রীভগবানের নাম-প্রেমে উন্মত্ত একটি সাধকের উজ্জ্বল জীবনের অবদান-মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। ৯।৫৩

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (দিগ্‌দর্শন সহ)—শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ দাস কর্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷০।
গীতার আলোচ্য সংস্করণে বিভিন্ন অধ্যায়ের এবং মূল শ্লোকগুলির বাঙলা শব্দ টীকার আকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্লোকগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপা এবং ছাপা ও কাগজ সুন্দর।
১০।৫৩

বিবিধ

সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীআদিনাথ সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৷০।
অণু-পরমাণু কিভাবে পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর দিয়া সৃষ্টিতে রূপায়িত হইতেছে পুস্তকখানিতে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের পরিভাষার অভাব বাঙলা ভাষাতে রহিয়াছে, সেই অভাব পূরণে পুস্তকখানি সাহায্য করিবে। ২০।৫৩

ভারতমাতা—তারানাথ রায় প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—ওরিয়েণ্টাল পাবলিশিং কোং, ১১ডি, আরপুলি লেন, কলিকাতা। মূল্য—১৲।
পুস্তকখানিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক এক্ষেত্রে ভারতের ঋষিদের নির্দেশ ও বিধির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমভাবেই দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচর্যের উপর জোর দিয়াছেন। লেখকের যুক্তি বিন্যাস-রীতি বড়ই সুন্দর। প্রতিপাদ্য বিষয়টি তিনি খুবই সহজ ও সরল এবং অল্প কথার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হইবেন। ২২।৫৩

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

এক রাত্রির ইতিহাস—ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, শিক্ষক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০। ২৩।৫৩

কিনু গোয়ালার গলি—সন্তোষকুমার ঘোষ, দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৷০। ২৪।৫৩

অবতামসী আবার রাত্রি—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য—২৲। ২৫।৫৩

রসময়ের রসিকতা—শিবরাম চক্রবর্তী, সাহিত্য-চয়ন, ২৩ডি, কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০। ২৬।৫৩

পুরানো কথা—উপসংহার—চারুচন্দ্র দত্ত, শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী কর্তৃক, ১৭, পন্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৲। ২৭।৫৩

নৈশ চক্রান্ত—স্বপনকুমার, রামনাথ দাস কর্তৃক ৮২, আহিরীটোলা লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৷৵০। ২৮।৫৩

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী অবিনাশানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲। ২৯।৫৩

বেদ পুরাণ কাব্যে (পৃথিবী ও) ভারতের ইতিহাস—শ্রীব্রহ্মপ্রসাদ মজুমদার, শ্রীরামমোহন মজুমদার কর্তৃক গুমাডাঙ্গী, পোঃ মুন্সিরহাট, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲। ৩০।৫৩

নিশিথ সূর্যের দেশ—অমল সান্যাল। গ্রন্থকার কর্তৃক ২২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৷৷০। ৩১।৫৩

রঙ্গজগৎ

প্রতিভার অবমাননা

প্রমথেশ বড়ুয়া 'মায়া কানন' নামক ইন্দ্রপুরি স্টুডিওর একখানি ছবি অসমাপ্ত রেখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি ছবিখানি তোলা আরম্ভ করেছিলেন; স্বাভাবিকভাবে তা শেষও হয়তো হতে পারতো, কিন্তু ব্যক্তিগত অসুখের জন্যেই হোক বা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে, ছবিখানি তোলা শেষ হয়নি বা হতে পারে নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হলো যে, প্রমথেশচন্দ্রের একজন শিষ্য, বিভূতি চক্রবর্তী, ছবিখানি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নানা ভাবের বিবরণ থেকে ধারণা হলো যে, ছবিখানি বড়ুয়া প্রায় শেষ করেই এনেছিলেন, সামান্য যা বাকী রেখে গিয়েছেন, সেই অংশই নতুন তুলে ছবিখানি সম্পূর্ণ করা হবে। আরও জানাজানি হলো যে, বড়ুয়া নিজে যে চরিত্রটিতে অভিনয় করছিলেন, সে অংশেরও চিত্রগ্রহণের কাজ বিশেষ বাকী ছিল না। তারপর মুক্তি আসন্ন হতেই পরিচালকের নামের জায়গায় প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার নাম থাকায় বুঝতে পারা গেল যে, ছবিখানি মোটামুটিভাবে বড়ুয়াই শেষই করে গিয়েছেন; খুচখাচ সামান্য কিছু অংশ এবং সম্পাদনা তত্ত্বাবধান করে ছবিখানি প্রস্তুত করার কাজটুকুই শুধু বাকী হলো এবং সে-কাজ তাঁর শিষ্য সম্পন্ন করেছেন।

*　　*　　*

'মায়াকানন' কিন্তু বড়ুয়ার ছবিই নয়। দেখা গেল, একখানা সম্পূর্ণ ছবির স্রস্টা হতে গেলে যতোটা কাজের সঙ্গে জড়িত থাকা দরকার, 'মায়াকাননে' বড়ুয়ার ততোটা যোগাযোগ ছিল না, তা-ই শুধু নয়, বড়ুয়া-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যেরও কোন ছাপই নেই ছবিখানিতে।

*　　*　　*

ছবির আরম্ভের গোড়াতেই বড়ুয়ার মূর্তির প্রতিমূর্তির গলায় মালা পরিয়ে স্বর্গত প্রতিভার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যেই তাঁর শিষ্যবৃন্দের চেষ্টায় ছবিখানি সম্পূর্ণ করা হয়েছে, বলা হয়। নজীর হিসেবে বলা হয়, কোন সাহিত্যিক মৃত্যুকালে কোন রচনা অসমাপ্ত রেখে গেলে যেমন তাঁর গুণমুগ্ধরা তা সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন, 'মায়াকানন'ও সেই ধারার অনুসরণেই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ এক উল্টা নজীর। উপন্যাস রচিত হয় একেবারে গোড়া থেকে এবং ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে থাকে এবং মূল লেখক যতোটা লিখে যান, যাঁরা গ্রন্থ সমাপ্ত করেন, তাঁরা তার পর থেকে লিখে যান। কাজেই মূল লেখকের অংশটুকুতে তার ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ থাকে, ঘটনাও থাকে তাঁরই কল্পনাপ্রসূত, চিন্তাও সে সবটুকু তাঁরই একার; পরবর্তী ভরাট অংশ যিনি বা যাঁরাই পূরণ করুন না কেন, মূল লেখকের গোড়ার অংশ যেমন তিনি লিখে গিয়েছেন, ঠিক তা-ই হুবহু থেকে যায়। কিন্তু ছবি

"ধ্রুব"—যুগ যুগ ধরে ভারতে ভক্তি ও একনিষ্ঠার সর্বজনপূজ্য আদর্শ চরিত্রের নামভূমিকায় শ্রীমান বিন্টু

তোলার রীতিই আলাদা। 'ছবি তোলা হয় কাহিনীর এখান-ওখান থেকে এক-একটা দৃশ্য বা কোন দৃশ্যাংশ ধরে, ঘটনাস্রোতের ধারাবাহিকতা অনুসারে নয়। 'মায়াকানন'ও বড়ুয়া তুলতে আরম্ভ করে-ছিলেন দৃশ্য পট মিলিয়ে মিলিয়ে এখান-ওখান থেকে দৃশ্য ধরে, কোন ধারাবাহিকতা ছিল না এবং তিনি মোট যতখানি তুলে গিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ছবিখানির পরিমাপে তা আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ ভাগ পূরণ করেছে, অর্থাৎ দশ আনারও বেশি ভাগ তোলা হয়েছে তাঁর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যের দ্বারা।

* * *

কোন ছবির কয়েকটি মাত্র স্থানে সন্নিবেশিত টুকরো টুকরো কয়েকটি মাত্র দৃশ্য দেখে কোন পরিচালকেরই প্রতিভার পরিচয় কিছুতেই পাওয়া যেতে পারে না। বিন্যাস চাতুর্যের কিছুই তো ফোটানো সম্ভব নয় ওর মধ্যে। আর পরিচালক কিভাবে কি দেখাতে চান, কেমনভাবে কাকে দিয়ে কি বলাতে বা করাতে চান, তারও কোন হদীশ থাকে না। খানিকটা তবু আঁচ পাওয়া যেতে পারে যদি সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত পুরো কাহিনীটিরই চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও ছিল বলে মনে হয় না—একেবারেই খাপছাড়া এলোমেলো সব ব্যাপার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে তাই মনে হয়, অনবরতই গল্পের সূত্র হারিয়ে যায়। কোত্থেকে যেন কিযে হয়ে যায়, বুঝে ওঠাই হয় মুশকিল। পর পর ঘটনার মাঝের সংলগ্ন দৃশ্য বাদ পড়ে গিয়েছে অনেকবারই—চিত্রনাট্য বড়ুয়ারই রচনা হলে আর যাই হোক, ঘটনার সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতা থাকত তো নিশ্চয়ই।

* * *

ছবিখানির মধ্যে বড়ুয়ার নিজের তোলা যেটুকু অংশ রয়েছে, তাতে মনে হয়, বড়ুয়া ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে একটু নতুন ধরণের একটা ক্রাইম-ড্রামা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে যে চরিত্রে অবতরণ করেছেন, সেটা একটা সিরিও-কমিক ভূমিকা—কৌতুক পরিহাসের মধ্যে দিয়ে এক দুর্বৃত্তের নৃশংস কান্ড-কারখানার রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। অনেক জায়গায় খেই হারিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত গল্পটা যা অনুমান করে নিতে হয়, তা হচ্ছে—'মায়াকানন' একটি নিরাময়াগারের নাম। এখানকার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নরেশ কৌশলে বড়োলোকেদের এখানে এনে আটকে রেখে নানারকম ইঞ্জেকশন প্রয়োগে তাদের আয়ত্তে নিয়ে এসে তাদের অর্থ আত্মসাৎ করে মেরে ফেলে দেয়। একদিন সন্ধ্যায় দুই যুবক, মোহন ও ভোলা, এই রহস্যময় বাড়িটির পরিচয় পায়। ডাঃ নরেশ সেদিন এদের বেশ আপ্যায়ন করেন। এরপর মোহনের বিবাহ-ঘোষণা ব্যাপারে রায়বাহাদুরের বাড়িতে আবার ডাঃ নরেশের দেখা পাওয়া যায়। ডাঃ নরেশ সব্বাইকে তাঁর আবাসে নিমন্ত্রণ করলে এক সন্ধ্যায়। রায়-বাহাদুরকে চায়ের সঙ্গে বিষ দিয়ে ডাঃ নরেশ তাঁকে এবং তাঁর কন্যা, মোহনের ভাবী পত্নী শান্তাকে কৌশলে আটকে ফেললে। ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে রায়-বাহাদুরের ওপর ডাঃ নরেশ পীড়ন

"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যের সাজপোষাকে শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দ—আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী এই দলটি শান্তিদেব ঘোষের তত্ত্বাবধানে "চিত্রাঙ্গদা" ও "তাসের দেশ" পরিবেশনের উদ্দেশ্যে বম্বে যাত্রা করবেন

আরম্ভ করলে টাকা আদায়ের জন্যে, আর অপর দিকে শান্তাকে তার পিতাকে হত্যা করার ভয় দেখিয়ে তাকে বিয়ে করাতে সম্মত করালে। এই অবস্থায় মোহন তার দলবল নিয়ে এক রাত্রে 'মায়াকানন' চড়াও করলে এবং প্রচুর গুলী-গোলা ছোঁড়া-ছুঁড়ির পর সবাইকে কাবু করে ফেললে। ডাঃ নরেশ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বোধ হয় আত্মহত্যা করলে। সবাই উদ্ধার পেলো, 'মায়াকাননে'র রহস্য ফাঁস হয়ে গেল।

*　*　*

ছবিখানি সম্পূর্ণ করার ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা অসুবিধের মধ্যেই পড়েছিলেন, কিন্তু সে অসুবিধেগুলো এমনই ছিল যে, সেসব দেখে-শুনে ছবিখানি শেষ না করতে যাওয়াই তাঁদের উচিত ছিল। ছবিখানির চিত্রগ্রহণ পুনরারম্ভ করতে গিয়ে দেখা গেল, তিনটি চরিত্রের অভিনয়-শিল্পী পরলোকে, তার মধ্যে রয়েছেন মুখ্য চরিত্র দুটির দুজন অভিনেতাই—মোহনের ভূমিকায় বড়ুয়া নিজে এবং অন্য প্রধান চরিত্র ডাঃ নরেশের ভূমিকায় প্রভাত সিংহ, আর অপর শিল্পিজন হচ্ছেন কুমার মিত্র। মোহন ও ডাঃ নরেশের ক্ষেত্রে দুজন বদলি শিল্পীকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রায় সর্বথাই তাঁদের পিছন ফিরিয়ে যথাসম্ভব মুখাবয়ব উল্টো দিকে রেখে কাজ করানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু যোগসূত্র মাঝে মাঝে কেটে গিয়েছে। এই দেখা যাচ্ছে কোন দৃশ্য যাতে আসল বড়ুয়া ও আসল প্রভাত সিংহ রয়েছেন, পরক্ষণেই দেখা গেল ওদের বদলি দুজনকে। আর বদলি দুজনের পিঠ দেখিয়েই ছবির দশ আনা ভাগ তোলা, তবুও ছবিখানিকে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার ছবি বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা প্রমথেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো নয়—এইভাবে তাঁর প্রতিভাকে অপদস্থই করা হয়েছে। সমস্ত দিক থেকেই ছবিখানি একেবারেই অচল নিকৃষ্ট পর্যায়ের আর তার দায়িত্বটা চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রমথেশচন্দ্রের নামে, সম্ভবত এই জেনে যে প্রমথেশচন্দ্র এর জন্যে প্রতিবাদ করতে আসবেন না।

একটি চিত্ররত্ন

গত বছর বাঙলার চিত্রশিল্প যে কয়েকখানি বিস্ময়কর ছবি পরিবেশন করে সারা ভারতকে চমকে দিতে সক্ষম হয়েছিল, তার মধ্যে দেবকীকুমার বসুর 'রত্নদীপ'-এর হিন্দী সংস্করটি পুরোভাগে পড়ে। ছবিখানি বাঙলার চিত্রশিল্পের ওপরে সমগ্র দেশের মনকে যেমন

টেকনিকলার প্রক্রিয়ায় চিত্রিত প্রথম ভারতীয় ছবি সোরাব মোদীর অনবদ্য সৃষ্টি "ঝাঁসী কী রাণী"র দৃশ্যে সোরাব মোদী ও মেহতাব

আগ্রহশীল করে তুলতে সমর্থ হয়, তেমনি দুনিয়ার কাছেও ভারতীয় চিত্রের নতুন করে মর্যাদা এনে দিয়েছে। বাঙলা চিত্র-শিল্প সম্পর্কে সব আশাই যখন লোপ পেতে বসেছিল, সেই দুর্দিনের মুখে প্রতিভার দীপালোকে উদ্ভাসিত দেবকী-কুমারের এই চিত্ররত্নটি ইতিমধ্যেই চলার পথকে আলোকিত করে দিয়েছে। বাঙলা দেশে তৈরি ছবি দেখবার জন্যে সম্প্রতি সারা ভারতের যে উদ্‌গ্রীবতা দেখা দিয়েছে, 'রত্নদীপ'-এর মতো ছবির সাফল্যই তার কারণ।

* * *

প্রথমে চিত্রিত বাঙলা সংস্করণের সঙ্গে আলোচ্য হিন্দী সংস্করণের মূল গল্পের কোন তফাৎ নেই। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিন্যাসের ক্ষেত্রে, কলাকৌশলের দিক থেকে এবং অভিনয়ের দিক থেকে দুটি সংস্করণের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো পার্থক্য আছে। হিন্দী সংস্করণখানি নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে অনেক উঁচু ধাপে গিয়ে পেণছেছে। বাঙলার রুচিকে ব্যাহত করার মতো হাল্কা রসের দৃশ্যের প্রাচুর্য অনেককে ক্ষুণ্ণ করেছে। এমনকি, বম্বেরও লোকে

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের সুপ্রযোজিত প্রথম ছবি "সাত নম্বর কয়েদী"র নায়িকা নবাগতা সুচিত্রা সেন

এ-ছবিতে বম্বেসুলভ কৌতুকাদির দৃশ্যের অবতারণার নিন্দা করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে দেবকীকুমারের পক্ষ নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে হলো।

* * *

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আবেগ-গম্ভীর ঘটনাস্রোতের মাঝে মাঝে হাল্কা রসের প্রয়োগ নাটকীয় প্রয়োজনেই দরকার বলেই দেবকীকুমার মাঝে মাঝে নায়িকা বহুরাণীর পরিচারিকা ও পার্শ্বচারিণী প্রভৃতিদের নিয়ে কৌতুককর দৃশ্যের অবতারণা করিয়েছেন। কুরুচিপূর্ণ কিছু নয়, তবুও হয়তো বাঙলা ছবির দর্শক-দের কাছে নিষ্প্রয়োজন বা অধিকন্তু ব্যাপার বলে মনে হবে। কিন্তু হিন্দী ছবির দর্শকেরা সবকিছুর মধ্যে কৌতুক-প্রদ কিছু না পেলে যে তৃপ্ত হয় না, তাতো সাফল্যমিণ্ডত প্রতি হিন্দী ছবির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। দেবকীকুমারও হিন্দী ছবির দর্শকদের কথা মনে রেখেই ছবিখানি তুলেছেন এবং তারা যাতে খুশি হয়, সেই জন্যেই তিনি কৌতুক দৃশ্যাবলী সন্নিবেশিত করেছেন। তাছাড়া হিন্দী ছবিতে যে ধরণের রঙ্গ-তামাসা থাকে, তার তুলনায় এ-ছবির কৌতুকাংশ তো অনেক অনেক বেশি মার্জিত এবং সুসংবদ্ধ চিন্তাপ্রসূত। তবে আমরা বলবো, দেবকীকুমারের মতো সৃজনী-প্রতিভার এ-দুর্বলতা শোভা পায় না—তিনিই তো জনসাধারণের রুচির ধারা গড়ে তুলবেন—জনসাধারণের রুচির তোয়াজ তিনি কেন করতে যাবেন? বম্বের দর্শক ও সমালোচকবৃন্দ যদি এই কারণে ঐসব কৌতুক দৃশ্যের জন্য আপত্তি তুলে থাকে, তাহলে অবশ্য আমরাও তাদের সঙ্গে একমত।

* * *

'রত্নদীপ'-এর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমাপের প্রতিটি ইঙ্গিতে প্রতিভার ঝলক ফুটে বেরিয়েছে। শিল্পশ্রী ও নাটকীয় রম্যতায় এমন সুপরিকল্পিত ছবি দেবকীকুমার আর দ্বিতীয় একখানি সৃষ্টি করেননি। প্রথম দৃশ্য থেকেই এমন একটা মোহ মনকে আবিষ্ট করে নেয় যে, এক অনুপলের জন্যেও ছবিখানির ওপর থেকে পলক ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। সর্বাঙ্গীণ কলাকৌশলের অসাধারণ উৎকর্ষ ছবিখানিকে শোভামণ্ডিত করে তুলতে সহায়তা করেছে, এমনকি, ছবিখানি দেখে আশ্বাস পাওয়াও গেল যে, বম্বের উন্নত কলাকৌশলের সঙ্গে দম্ভ দেখিয়ে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতারই পরিচয় এনে দিয়েছে; কিন্তু সব সত্ত্বেও এ 'রত্নদীপ' একা দেবকীকুমারের প্রতিভারই প্রোজ্জ্বলতম সৃষ্টি। সব জিনিসই কেমন বেশ স্বচ্ছন্দ ও পরিমাত্রিক—সেটা কেবল পরিচালকের পরম শক্তিশালী সৃজনীশক্তির প্রভাবেই সম্ভব।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট কিছুদিন হইতেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিতেছেন। হঠাৎ কেন যে তিনি এইরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করিলেন বলা কঠিন তবে তিনি এই পর্যন্ত বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে কয়েকটা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একেবারেই উপেক্ষা করা যায় না। ঐ সকল অভিমত নিছক বিদ্বেষপ্রসূত ও যুক্তিহীন বলিয়াও বলা চলে না। বিশেষ করিয়া সম্প্রতি বোম্বাই-র বি জে মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া অভিভাষণে তিনি বোর্ড বিষয়ে ও অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ক্রিকেট বিবরণী প্রচার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ ও সমর্থনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কোন নির্দিষ্ট নীতি ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করেন না। পদাধিকার বলে যেমন খুসী তেমনিভাবে কার্যপরিচালনা করেন। খেলিবার যোগ্যতা আছে কি না বিবেচনা না করিয়াই বৈদেশিক ভ্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে অধিনায়ক মনোনীত করেন।" তিনি ইহার সমর্থনে প্রথম কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে তাঁহাকে অধিনায়ক নির্বাচন ও সম্প্রতি ভ্রমণকারী পাকিস্থান দলের বিরুদ্ধে লালা অমরনাথকে অধিনায়ক মনোনীত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তিন বৎসর ক্রিকেট খেলা হইতে আমি দূরে ছিলাম কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাকে ভারত ভ্রমণকারী কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে অধিনায়ক মনোনীত করা হয়। অমরনাথের খেলিবার যোগ্যতা আছে কি না তাহা অনুসন্ধান না করিয়াই অধিনায়ক নির্বাচন করা হইয়াছে। অতীতের কৃতিত্ব ও ভবিষ্যতে পূর্ব ক্রীড়া কৌশলের অধিকারী হইবে এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল নির্বাচন।" বিজয় মার্চেণ্টের এই স্বীকারোক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই তবে নির্বাচনের পরেই যদি তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিতেন খুবই ভাল হইত। নির্বাচিত হইয়া খেলায় যোগদান করিয়া কয়েক বৎসর পরে নিজের অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করায় খুব বাহাদুরী থাকিলেও যে মনোভাবের পরিচয় তিনি বর্তমানে দেশবাসীর নিকট পেশ করিতে চাহিতেছেন তাহা অনেকখানি ম্লান হইয়া গেল ইহা না বলিয়া আমরা পারি না। তবে অমরনাথের পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্বাচন সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা একেবারেই ভ্রান্তিমূলক নহে। অমরনাথ সত্য সত্যই কয়েক বৎসর প্রতিনিধিমূলক খেলায় না যোগদান করায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে কোন খেলাতেই বোলিং অথবা ব্যাটিংয়ে অভাবনীয় সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অমরনাথ দলকে জয়যুক্ত করিয়াছেন ইহাও স্মরণ রাখা উচিত। অধিনায়ক হিসাবে দল পরিচালনায় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ও ভারতে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইলেও বলা চলে যে, অমরনাথকে পাকিস্থান ভ্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্বাচন যুক্তিসংগত হয় নাই।

তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ক্রিকেট সমালোচনা প্রচারকার্যের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "দেশের ও ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া উচিত। অল ইণ্ডিয়া রেডিও যে সকল সমালোচক নিযুক্ত করেন তাহাদের অনেকেরই যোগ্যতা নাই।" এই উক্তি সমর্থনযোগ্য। কতকগুলি সমালোচক ক্রিকেট খেলা বিষয় যে কিছুটা জানেন না ইহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কয়েকজন আছেন যাহারা খেলার মাঠের বিবরণ বিস্মৃত হইয়া নিজে কোথায় কি দেখিয়াছিলেন তাহা জোর গলায় প্রচার করিতে ব্যস্ত হন ইহা বহু ক্ষেত্রেই এই সকল সমালোচকদের ধারাবাহিক বিবরণীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শ্রোতারা অনেক সময়েই বিরক্ত হইয়াছেন ও অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষগণকে জানাইয়াছেন। মাঠের খেলা কি হইতেছে তাহাই লোকে শুনিতে ও জানিতে চাহে, সমালোচকের অভিজ্ঞতা শ্রবণ করিতে চাহে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষগণ সমালোচক নিযুক্ত করিলে শ্রোতারা সন্তুষ্ট হইবেন এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। তবে বিজয় মার্চেণ্ট তলায়ার খাঁকে একমাত্র সমালোচক বলিয়া যাহা দাবী করিয়াছেন তাহা সমর্থন করা যায় না। বাঙলার বিশিষ্ট ক্রিকেট সমালোচক বেরী সর্বাধিকারী তলেয়ার খাঁ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন।

তিনি পরিশেষে তাহার অভিমতের মধ্যে বলিয়াছেন, "এমন একটি অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে যখন ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি, এমন কি অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ক্রিকেট খেলা বিবরণী প্রচার-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।" এই বিষয় আমরা একমত। এই আলোড়নের কথা আমরা বহুবার বহু পূর্বে বলিয়াছি। অভাব অনুভূত হইতেছে আলোড়ন স্রষ্টার এই বিষয় বিজয় মার্চেণ্টই যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে বর্তমানে ক্রিকেট পরিচালকগণ যেরূপ যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতেছেন তাহার পথ রুদ্ধ হইয়া ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির পথ রচিত হইতে পারে। ইহা যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই মংগল।

বাঙলা দলের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে সাফল্য

বাঙলা দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় উড়িষ্যা দলকে ৭ উইকেটে পরাজিত করিয়াছেন। বাঙলা দলের এই সাফল্য আনন্দদায়ক ও প্রশংসার। তবে ইহার পরে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বাঙলা দল সাফল্য লাভ করিয়া শেষ নিষ্পত্তির খেলায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিবে বলিয়া যদি ধারণা করা হয় খুবই অন্যায় হইবে। বাঙলা দল যে শক্তিশালী নহে ইহার প্রমাণ বিহার ও উড়িষ্যা উভয় খেলাতেই পাওয়া গিয়াছে। প্রবীণ খেলোয়াড় এস্ ব্যানার্জি বিহার দলের পক্ষে শতাধিক রান করেন। উড়িষ্যা দলেরও তরুণ খেলোয়াড় এন পরিজাও শতাধিক রান ও বাঙলা দলের ৬টি উইকেট বোলিংয়ে পতন সম্ভব করিয়াছেন। বাঙলা দলের বোলিং ও ফিল্ডিং যে খুব উন্নত স্তরের নহে এই দুই খেলাতেই উক্ত দুইজন খেলোয়াড় দেখাইয়াছেন। সুতরাং রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের চরম সাফল্য সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ না করাই যুক্তিসংগত হইবে। বিহার ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যে সকল খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠিত হইয়াছিল পরবর্তী খেলায় তাহার কিছু পরিবর্তন হওয়া উচিত। অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠন না করিয়া ভবিষ্যৎ বাঙলার দলকে যাহারা সাহায্য করিতে পারেন এইরূপ তরুণ ও উৎসাহী খেলোয়াড়দের লইয়া পরবর্তী খেলার দল গঠন করা উচিত। জানি না বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ তাহা করিবেন কি না।

বাঙলা বনাম উড়িষ্যা

বাঙলা বনাম উড়িষ্যা দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের চারিদিন ব্যাপী খেলা তিন দিনেই শেষ হইয়াছে। বাঙলা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করিয়া ৩০১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। বি ফ্রাঙ্ক ও গিরিধারীর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং বাঙলা দলকে অধিক রাণ সংগ্রহে সাহায্য করে। উড়িষ্যা দলের বি পট্টনায়েক ৩৭ রানে ২টি ও এল পরিজা ৭০ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। পরে উড়িষ্যা দল খেলিয়া দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পরেই ১২৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ফলে উড়িষ্যা দলকে "ফলো অন" করিতে হয়। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৪৮ রান করে। বি পট্টনায়েক ৩২ রাণ ও এল পরিজা ৮৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে উড়িষ্যা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৮ রানে শেষ হয়। এল পরিজা ১৫২ রান করেন। বাঙলা দলকে পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় যোগদান করিয়া ৩ উইকেটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করিতে হয়।

খেলার ফলাফল—

বাঙলা ১ম ইনিংস—৩০১ রান (শিবাজী বসু ৪১, বি দাসগুপ্ত ৩৭, জে টেলার ৩৩, বি ফ্রাঙ্ক ৭২, গিরিধারী ৫২, এল পরিজা ৭০ রানে ৬টি, বি পট্টনায়েক ৩৭ রাণে ২টি ও টি শাস্ত্রী ১০৯ রানে ২টি উইকেট পান।)

উড়িষ্যা ১ম ইনিংস—১২৬ রান (এল পরিজা ৩৭, বি পট্টনায়েক ১২, এন চৌধুরী ৩৭ রানে, ৪টি, এস গিরিধারী ২৭ রানে ৪টি বি দাসগুপ্ত ৩ রানে ১টি, পি বি দত্ত ১১ রানে ১টি উইকেট পান।)

উড়িষ্যা ২য় ইনিংস—২৫৮ রান (এল পরিজা ১৫২, বি পট্টনায়েক ৩৮, এন বর্ধন ১৯, এস ব্যানার্জি ৬৫ রানে ৬টি, এস গিরিধারী ৭৫ রানে ২টি, এন চৌধুরী ৪২ রানে ১টি উইকেট পান।)

বাঙলা ২য় ইনিংস—৩ উইঃ ৮৫ রান (শিবাজী বসু ২৯, পি বি দত্ত ৩১, এন চক্রবর্তী ১২ রানে ২টি উইকেট পান।)

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল পুনরায় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় রোহিণ্টন বারিয়া কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। বোম্বাই দলের এই সাফল্যে কোনই নূতনত্ব নাই। প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে এই পর্যন্ত বোম্বাই দল ৯বার রোহিণ্টন বারিয়া কাপ বিজয়ী হইয়াছে। এইবার লইয়া ১০বার হইল। ইতঃপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষেই এত অধিক বার গৌরব লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ইহাদের পরেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দলের স্থান। তাহার পরেই মহীশূর। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্যন্ত উক্ত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দল ছাড়া আরও কাহারও ভাগ্যে রোহিণ্টন বারিয়া কাপ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় ক্রিকেট দল কোন দিনই ভাল করেন নাই সুতরাং এইবারেও করে নাই। ইহার জন্য যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ড দল কখনও করেন নাই—ভবিষ্যতে কোন দিন করিবেন ইহাও আশা করা চলে না। এই বোর্ডের পরিচালকদের জিজ্ঞাসা করিলে প্রতিবারই ঐ একই কথা শুনিতে হয় "অর্থ নাই"। সহস্র সহস্র ছাত্রছাত্রীর উপর কর্তৃত্বকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের অর্থাভাব সত্যই আশ্চর্যের ও পরিতাপের বিষয়।

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফাইন্যাল

আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ফাইন্যালে বোম্বাই দলকে দিল্লীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। দিল্লী দল তীব্র প্রতিযোগিতার পর পরাজয় বরণ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বোম্বাই দল দিল্লী দলকে ১৪৯ রানে পরাজিত করিয়াছেন। ফলাফল—

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়—১ম ইনিংস ২৮৭ রান। ২য় ইনিংস ২৮৮ রান।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—১ম ইনিংস ২১৫ রান। ২য় ইনিংস ২১১ রান।

পূর্ববর্তী বিজয়িগণ

১৯৩৫-৩৬ সাল পাঞ্জাব, ১৯৩৬-৩৭ সাল পাঞ্জাব, ১৯৩৭-৩৮ সাল পাঞ্জাব, ১৯৩৮-৩৯ সাল বোম্বাই, ১৯৩৯-৪০ সাল বোম্বাই, ১৯৪০-৪১ সাল বোম্বাই, ১৯৪১-৪২ সাল বোম্বাই, ১৯৪২-৪৩ সাল বোম্বাই, ১৯৪৩-৪৪ সাল পাঞ্জাব, ১৯৪৪-৪৫ সাল বোম্বাই, ১৯৪৫-৪৬ সাল বোম্বাই, ১৯৪৬-৪৭ সাল বোম্বাই মহীশূর, ১৯৫০-৫১ সাল মহীশূর।

ঘোড়পাড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রেরিত

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের ম্যানেজার গোলাম আমেদ অথবা ঘোড়পাড়েকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে প্রেরণ করিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করেন। গোলাম আমেদ পূর্বের ন্যায় পুনরায় সাংসারিক কারণে যাইতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। নব বিবাহিতের পক্ষে সংসার ত্যাগ করিয়া দূর দেশে যাওয়া খুব কমই সম্ভব হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে গোলাম আমেদের তাহাই হইল। বরোদায় ঘোড়পাড়েকে বিমানে ২৯শে জানুয়ারী প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অ্যাথলেটিকস—

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় অ্যাথলীট লেভী পিণ্টো ও সোহন সিং সর্বপ্রথম পূর্বের প্রতিনিধিদের অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় সারা ভারতের অ্যাথলীটদের মধ্যে অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। মনে আশা জাগে শীঘ্রই ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু অ্যাথলেটিকস মরসুম শেষ হইতে চলিল সেইরূপ কোন নিদর্শনই পাওয়া যাইতেছে না। বোম্বাই-র অ্যাথলীট লেভী পিণ্টো ও মিস্ ম্যারি ডিসুজা পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নতি করিয়াছেন। মাদ্রাজের আইভ্যান জেবকও উন্নতি করিয়াছেন। আগামী জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানসিপের জব্বলপুরের অনুষ্ঠানে অভাবনীয় কিছু হইবে না ইহা ধারণা করিলে কিছুই অন্যায় হইবে না। তবে এই দুই রাজ্যের অ্যাথলীটগণ নিয়মিত অনুশীলন ও উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার জন্য কিছুটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করা চলে না। এই বিষয় বাঙলার অ্যাথলীটগণ পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন তাহা অপেক্ষাও অবনতি হইয়াছে। বেঙ্গল এমেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে যে কিছুই হয় নাই তাহার যথেষ্ট নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। যদি একটি বিষয় বাঙলা পূর্বের খ্যাতিলাভ না করিতেই পারে তবে এত অধিক পরিমাণে স্পোর্টস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া লাভ কি?

আন্তঃ-রাজ্য স্কুল কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পোর্টস

উড়িষ্যার স্পোর্টস পরিচালকগণ আন্তঃ-রাজ্য স্কুল কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পোর্টস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এই চারিটি রাজ্যের হাই স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। নিখিল ভারত আন্তঃ-রাজ্য স্কুল স্পোর্টস অনুষ্ঠানের যে ইহা সূচনা হইল বলিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হইবে না। এই দিক দিয়া উড়িষ্যার স্পোর্টস পরিচালক শ্রীযুত এ সি দাসের অদম্য উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের ক্রীড়া পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াই আন্তঃ-রাজ্য পুলিশ স্পোর্টসের সূচনা করেন। ইহার পর আন্তঃ-রাজ্য স্কুল স্পোর্টস তাঁহারই দ্বিতীয় অবদান।

আন্তঃ-রাজ্য স্কুল কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পোর্টস অনুষ্ঠানে ছাত্র বিভাগে মধ্যপ্রদেশ ও ছাত্রী বিভাগে বাঙলা দল চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে।

বাঙলা বিভাগের ছাত্রী দলের এই সাফল্য কেবলমাত্র কুমারী নীলিমা ঘোষের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। তিনি একাই বাঙলা দলকে অধিকাংশ বিষয়ে সাফল্যলাভে সাহায্য করিয়াছেন। কুমারী নীলিমা ঘোষ দীর্ঘকাল স্পোর্টসের সহিত জড়িত, নিখিল ভারত এমন কি বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন সুতরাং এইরূপ একজন কৃতী মহিলা অ্যাথলীটের সাহায্য বাঙলার স্কুলের ছাত্রী দল দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করায় বিশেষ আশ্চর্যের কিছুই হয় নাই। তাহা ছাড়া তিনি প্রত্যেক বিষয়ে যেরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হইতেই অনুমান করা গিয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশ বা উড়িষ্যা বালিকা দলে এমন কোন ছাত্রী ছিল না যাহাকে প্রথম শ্রেণীর অ্যাথলীট বলা চলে। নিম্নে উভয় বিভাগের ফলাফল প্রদত্ত হইল—

ছাত্র বিভাগ

১ম মধ্যপ্রদেশ ৫৫ পয়েণ্ট, ২য় বাঙলা ৫১ পয়েণ্ট, ৩য় উড়িষ্যা ১৫ পয়েণ্ট, বিহার ১১ পয়েণ্ট।

ছাত্রী বিভাগ

১ম বাঙলা ৩৮ পয়েণ্ট, ২য় মধ্যপ্রদেশ ২৯ পয়েণ্ট, ৩য় উড়িষ্যা ২৩ পয়েণ্ট, বিহারের কোন প্রতিনিধি ছিল না।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে বাঙলার দল

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে জব্বলপুরে জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানসিপ অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পুরুষ ও মহিলা অ্যাথলীটদের এক বিরাট বাহিনী মনোনীত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় বিদায় গ্রহণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা কম সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেই ভাল হইত। নিম্নে প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

মহিলা প্রতিনিধিগণ

(১) কুমারী নীলিমা ঘোষ (সি টি এ সি), (২) কুমারী নমিতা ঘোষ (পাণিহাটী), (৩) কুমারী কমলা শ্রীমাণি (পাণিহাটী), (৪) মিস ওডিসেনা (ক্যালকাটা পুলিশ), (৫) মিস এস ডিসেনা (পাইওনিয়ার), (৬) মিস ও কাচটুর (পাইওনিয়ার)।

পুরুষ প্রতিনিধিগণ

১০০ মিটার দৌড়—কে পি কার্ভেলো, সি ক্যারিসন ও ভি জে বিটী।

২০০ মিটার দৌড়—ভি জে বিটী, সি স্নেল ও সি ক্যারিসন।

৪০০ মিটার দৌড়—ডি জে বিটী, এফ এণ্টনী।

১৫০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়—এফ এণ্টনী।

উচ্চ লম্ফন—কে চ্যাটার্জি ও এস মুখার্জি।

দৈর্ঘ্য লম্ফন—কে চ্যাটার্জি ও বি দাস।

হপ স্টেপ জাম্প—বি দাস ও ডি মিলডে।

পোলভোল্ট—এস চক্রবর্তী ও এস মুখার্জি।

লৌহ বল, হাতুড়ী ও ডিসকাস ছোড়া—কে ডবলিউ পেরেটে।

৫০০০ ও ১০০০০ মিটার দৌড়—সুন্দর সিং ও এস ধাড়া।

ম্যারাথন দৌড়—কে কে নন্দী।

পুরুষ বিভাগ—এস চক্রবর্তী (অধিনায়ক), মহিলা বিভাগ—মিস নীলিমা ঘোষ (অধিনায়িকা)। এস কে বসু দলের ম্যানেজার।

মজুমদার প্রমুখ বহু দেশনেতা এবং চিন্তানায়ক এই গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইম্পিরিয়াল স্বরূপে সরকারী সাহায্যে উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাহার গ্রন্থাগারিকরূপে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে আজও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সেদিনকার উৎসবের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের শিক্ষাসচিব ভারতের রাষ্ট্র-জীবনের অভিব্যক্তির কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সে ইতিহাস বিচিত্র। ব্রিটিশ আমলে যে বেলভেডিয়ার প্রাসাদ শাসন-কর্তাদের বিলাসভবন, তাহাদের শক্তি ও দম্ভের এবং স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি ছিল, সেই বেলভেডিয়ার প্রাসাদ আজ জ্ঞানপিপাসুগণের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মনোরম অট্টালিকার যে কক্ষে একদা বল নাচ হইত, সেই প্রশস্ত কক্ষটি এখন প্রধান অধ্যয়নের গৃহে রূপান্তরিত হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে যিনি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন সেই কার্জন সাহেবই আবার অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতি-স্তম্ভেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; অন্ধকূপ হত্যার সেই স্মৃতিস্তম্ভ কালধর্মের আবর্তনে বর্তমানে উৎখাত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী জাতীয় গ্রন্থাগার স্বরূপে লাভ করিয়াছে নবজন্ম। ভারতের শিক্ষাসচিবের উক্তি হইতে বস্তুতঃ এই সত্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দম্ভ, দর্প এবং প্রভুত্ব স্পর্ধা কোনদিনই ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করিতে পারে না; পরন্তু জ্ঞানের জ্যোতি কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এদেশের সংস্কৃতিতে এজন্য বিদ্যাস্থানকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হইলে জাতীয় মনীষার একাংশেরই পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা এবং উৎসবের আনন্দ তাই মানুষের পক্ষে যাহা চিরন্তন সত্য, সেই জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধেরই আনন্দ। জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশে শুভেচ্ছা নিবেদন করিয়া আমরা ইহাই কামনা করিতেছি যে, আমরা যেন এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিদ্যার দ্বারা অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হই।

সংগীত-নাটক একাডেমী

সম্প্রতি ভারত সরকার সংগীত-নাটক একাডেমী নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। সেদিন নয়াদিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান, শ্রীপৃথ্বিরাজ কাপুর, শ্রীকারাইকুদি সদাশিব আয়ার, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং শ্রীআর্যকুদি রামানুজ আয়েঙ্গার এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে সে কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ন্যায় বহু প্রদেশে বিভক্ত এবং বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রকে সংহত করিবার পক্ষে ইহাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। বিভেদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করাই ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মর্মকথা এবং সংস্কৃতির সেই শক্তিতেই বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারত অদ্যাপি জীবিত আছে। এইসব বিভেদ এবং বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি সংহতির সর্বজনীন সূত্র সম্প্রসারিত করিয়া অখণ্ড একটি চেতনাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। ইহার গতি বর্তমানে সুক্ষ্ম হইলেও ইহার শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতকে যদি অখণ্ড রাষ্ট্রহিসাবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হয় তবে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগত সেই একত্ববোধকেই উদ্দীপ্ত করা প্রথমে প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য, সংগীত প্রধানতঃ ভাষার সম্পদ বৃদ্ধির পথেই এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে; অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই রাষ্ট্রগত অখণ্ডবোধকে সুদৃঢ় করা আবশ্যক। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে সবই একই ছাঁচে ফেলিয়া গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলে মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু শিল্প-কলার সাধনার এদিকে জোর দিতে গেলে ফল বিপরীতই হইবে। কারণ, কোন ফরমাইসের তাগিদে প্রকৃত শিল্পকলার সৃষ্টি সম্ভব নয়। বস্তুতঃ অন্তরের শক্তি উজ্জীবনে এবং প্রাণরসের প্রাচুর্যেই শিল্পীর স্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে। আত্মানুভূতির সেই দীপ্তিতেই শিল্পকলার সমৃদ্ধি এবং ব্যাপ্তি ঘটে। নবপ্রতিষ্ঠিত একাডেমীকে পূর্ণভাবে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়া ভারত সরকার এক্ষেত্রে সঙ্গত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্মরণ রাখা দরকার যে, সত্য, শিব এবং সুন্দরের অনুভাবনাই সকল সার্থক সৃষ্টির মূল এবং সেই অনুভাবনা লাভ করিতে হইলে সংযমের প্রয়োজন। সেই সাধনায় নিজের ভিতর ডুবিয়া যাইতে হয়। প্রত্যুত সুন্দরের আদর্শে আপনাকে নিবেদন করিয়াই শিল্পী স্বধর্মে অবহিত হইয়া থাকেন। জাতির অখণ্ড আত্মায় সুন্দরের সেই সর্বতোভদ্র মনোময়ী মূর্তি পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়া এই নব প্রতিষ্ঠানটিকে সার্থক করিয়া তুলুক, আমরা ইহাই কামনা করি।

পাঁচশালা পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ

হায়দরাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে বহু প্রচারিত হয় এজন্য কংগ্রেস-সভাপতি জওহরলাল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিকে তাহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিগত কংগ্রেসের মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কৃষি ও পল্লীর উন্নতিকে এই পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মূল নীতির দিক হইতেও এ বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইলে ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কংগ্রেস জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কোন কোন প্রদেশে জমিদারীগুলি রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে আনাও আরম্ভ হইয়াছে। আগামী এপ্রিল মাস হইতে আসামেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। প্রত্যুত ভারতের মুখ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এখন পশ্চিমবঙ্গই

বিষয়ে এখন পিছনে পড়িয়া থাকিল। শ্চমবঙ্গ সরকার সত্বরই জমিদারী প্রথা লোপ সাধন করিবার জন্য একটি আইন প্রয়নে উদ্যত হইবেন, এইরূপ কথা মরা শুনিতেছি। কিন্তু এই উদ্যমের থে যে পাকচক্র চলিবে, তাহাতে পাঁচ-লা পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে এখানে মিদারী-প্রথা বিলুপ্ত হইবার কোন ম্ভাবনাই নাই। কংগ্রেসের পঞ্চবার্ষিকী রিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের ধ্যে যে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করিতে রে নাই, ইহা তাহার অন্যতম কারণ। হা ছাড়া, দামোদর, হীরাকুদ প্রভৃতি বড় ড় পরিকল্পনার পাকে পাকে জন-াধারণের অর্থের কিরূপ অপচয় টিতেছে, জনসাধারণ তাহা চোখের উপর েখিতেছে। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন রিকল্পনা হয়, তখনই এ দেশের আমলা-গোষ্ঠীর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা বার্থমূলক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঐসব াজে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাঁহাদের াত্মীয়-স্বজন এবং আশ্রিতবর্গ আসিয়া ুটিয়া যায়। সরকারী বিভাগের পাকা লাকেরাও এই দুর্নীতির গতি রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে, ঋণদানে কত কলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ পাইল; কিন্তু প্রতীকারের কোন ব্যবস্থাই হইল না। এখনও অবস্থার উন্নতি হয় নাই। টাকা লুটের অভিযোগ সমানভাবেই শোনা যাইতেছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বিধান-সভার উদ্বোধন-বক্তৃতাও এই সব কারণে দেশবাসীর মনে বিশেষ আশা-ভরসার উদ্রেক করিতে সমর্থ হইবে না। মোটা বেতনভোগী আমলাদের অকর্মণ্যতায় এবং অসাধুতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রিবাহী বাস-ব্যবসা লোকসান খাইয়া দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী সোনারপুর অঞ্চলের জলাজমির সংস্কার সাধনের জন্য একটি পরিকল্পনা লইয়া দুই বৎসর হইল কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে; কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই আগায় নাই। শুনিতেছি, দুই মাসের মধ্যে এই কাজে আরও দুইটি নূতন পাম্প বসানো হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কাজের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, সরকারী এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার এই ক্ষেত্রেও জন-সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, আর্থিক অপচয় এবং তাহা একই। বলা বাহুল্য, সরকারী পরিকল্পনাগুলি দুর্নীতির এই বেড়া-জাল হইতে যদি মুক্ত না হয় এবং ইংরেজ শাসনের আমলাতান্ত্রিক প্রতিবেশটিই এক্ষেত্রে বজায় রহে, তাহা হইলে জন-সাধারণের সন্দেহ ও উদ্বেগের কারণ থাকিয়াই যাইবে। নিজের কোলে ঝোল টানিবার লীলাখেলাই চলিবে। জনসাধারণকে সরকারী পরিকল্পনার কাজে সহযোগিতার নিমিত্ত উপদেশ বিতরণ করিবার সময় কংগ্রেস-নেতা এবং কর্মীরা যেন একথাটা বিস্মৃত না হন। প্রকৃতপক্ষে দেশের লোক একান্ত অজ্ঞ কিংবা মূর্খ নয়। নিজেদের মঙ্গল এবং অমঙ্গল বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহাদেরও আছে; কিন্তু প্রকৃত ত্যাগ এবং সেবার পথেই তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সম্ভব হইতে পারে। পরন্তু ফাঁকিবাজী এবং ধড়িবাজীর চক্র হইতে তাহারা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

বিধানসভার অধিবেশন

গত সোমবার হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ হইতে সদস্যদের বেতন এবং দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা জনসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ উদ্দীপ্ত করিবে। বিরোধী পক্ষ এই সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করেন, ইহাই দাঁড়াইবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায় মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরা যখন আপনাদের বেতনাদি বাড়াইয়া লইবার প্রস্তাব করেন, বিরোধী দল তখন তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবটি আগে না উঠাইয়া সদস্যদের আগে আনিলেই ঠিক হইত। এইবার সেই টোপ তিনি ফেলিয়াছেন। তাঁহার উপস্থাপিত প্রস্তাবে সদস্যেরা অতঃপর ঐ বর্ধিত হারে বেতন ও ভাতা প্রভৃতি পাইবেন, তাহাই নয়, সদস্যরূপে আসন গ্রহণের দিন হইতেই বর্ধিত হারে বেতনাদি তাঁহারা গণিয়া লইবেন। সুতরাং বস্তুটি স্বভাবতই লোভনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের মনের ভাব যেমনই থাকুক না কেন, দেশের বর্তমান আর্থিক দুর্দশার সময়ে তাঁহারা বর্ধিত হারে বেতন প্রভৃতি লইবার জন্য কোনক্রমেই হাত বাড়াইবেন না। অধিবেশন উদ্বোধনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পাল বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা না করাই তাঁহার জীবনাদর্শের দিক হইতে শোভন হইত বলিয়া আমরা মনে করি। কার্যপদ্ধতির মধ্যে গৃহীত না হইলেও বর্তমান অধিবেশনে আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হইবে বলিয়া মনে হয়। ফারাক্কা বাঁধ এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমা সম্প্রসারণের প্রশ্নটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই দুইটি বিষয়েই পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভায় ইতঃপূর্বে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী কার্যক্রমের মধ্যে গৃহীত হয় নাই। পরন্তু এ সম্বন্ধে সব অনুরোধ-উপরোধই দিল্লীর দরবারে উপেক্ষিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া বিধান-সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ভারত সরকারের কাছে তাহা পৌঁছে নাই, এমন কথাই তাঁহাদের মুখপাত্রগণের মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার পরও কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, প্রস্তাবটি দিল্লীর কর্তৃপক্ষের কাছে আজও পৌঁছিয়াছে কি না, তাহা জানা যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁহার অভি-ভাষণে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই। কিন্তু এই অধিবেশনে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থিত করিতে হইবে এবং সদস্য-দিগকেও এতৎসম্পর্কিত কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ফলত সরকার পক্ষের সমর্থকগণ যদি এ সম্পর্কে তাঁহাদের দায়িত্ব পাশ কাটিয়া এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তবে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ ঘটাইবে।

তারা

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ কোন মিছিলের
অবসন্ন পিছিয়েপড়া ভগ্নাংশের মতো
ক'লকাতার পূব আকাশে
এক গুচ্ছ তারা উঠ্‌লো
শীতকাতর।

একদা এই শহর ছিল না।
অঢেল নক্ষত্র ছিল,
পবিত্র শীত ছিল—
বরফদুরন্ত শীত—
মৃত্যুঠাণ্ডা চাঁদ,
নীল আকাশের নীচে
কুয়াশাচ্ছাদিত উপত্যকা
অসূর্যম্পশ্যা কুমারীর তনুর মতো নিষ্পাপ।

একদিন এই শহর থাকবে না।
একদিন এই মানুষ থাকবে না
অবসরপ্রাপ্ত নাবিকের মতো।
কিন্তু ওরা থাকবে
গুচ্ছ গুচ্ছ সমস্ত আকাশ ভরে
ভীরু চোখ চেয়ে।

নবঘোষিত মার্কিন নীতি

*গত সপ্তাহে আমেরিকার নূতন সেক্রেটারী অব স্টেট—বৈদেশিক মন্ত্রী—*মিঃ জন ফস্টার ডালেস একটি বেতার বক্তৃতায় নূতন মার্কিন গভর্নমেন্টের বৈদেশিক নীতির একটা আভাস দেন। তারপর তিনি বৈদেশিক সফরে বেরিয়েছেন, পশ্চিম য়ুরোপ সেরে এশিয়ারও কয়েকটি দেশের নাড়ী টিপে *দেখে তিনি স্বদেশে ফিরবেন। ইতি-মধ্যে গত সোমবার প্রেসিডেন্ট আইজেন-*হাওয়ারের প্রথম 'State of the Union Message'-এর বক্তব্য পৃথিবী শুনেছে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও মন্ত্রী ডালেস উভয়েরই কথার সুর কড়া—শত্রুমিত্র সকলকেই একটু সমঝিয়ে দেবার ভাব।

নববিঘোষিত মার্কিন নীতির মূল কথা হচ্ছে এই যে, শীঘ্রই কম্যুনিস্ট পক্ষের উপর এরূপ চাপ বৃদ্ধি করা হবে যে, তারা বেগতিক দেখে সন্ধির জন্য লালায়িত হবে। এটা যদি ফাঁকা ভয়-দেখানো মাত্র না হয়—সেরূপ মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই—তবে এর মানে হচ্ছে এই যে, কোরিয়ায় ও তার আশ-পাশের আবহাওয়াটা শীঘ্রই আরো একটু তেতে উঠবে। তার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়ে গেছে। ১৯৫০ সালে ফরমোজা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে আদেশ দেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সেটি পাল্টে দেন। ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন সপ্তম নৌ-বাহিনীকে ফরমোজাকে নজরবন্দী করে রাখার আদেশ দেন যাতে ফরমোজা থেকে চীনভূভাগে বা চীনভূভাগ থেকে ফরমোজায় কোনো উপদ্রব হতে না পারে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেছেন যে, উপরোক্ত আদেশের ফল হয়েছে এই যে, এতদিন মার্কিণ নৌ-বাহিনী কম্যুনিস্ট চীনের রক্ষীর কাজ করেছে; এ ব্যবস্থার কোনো যৌক্তিকতা এখন নেই কারণ চীনা কম্যুনিস্টরা কোরিয়ায় আমেরিকানদের সঙ্গে লড়ছে; ফরমোজার নিরপেক্ষীকরণের ফলে চিয়াং কাইশেকের দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় চীনা কম্যুনিস্টদের কোরিয়া যুদ্ধে বেশি সংখ্যায় যোগ দেওয়া সম্ভব *হচ্ছিল, ইত্যাদি।* প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ১৯৫০ *সালের আদেশদান কালে অবশ্য* পিকিং সরকার কোরিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না। ১৯৫০ সালের শেষাশেষি জেনারেল ম্যাকআর্থার যখন ইয়ালু নদী পর্যন্ত ধাওয়া করার চেষ্টা করেন তখনই চীনা 'ভলাণ্টিয়ার' বাহিনী কোরিয়া যুদ্ধে যোগদান করে। সে যাই হোক্ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ১৯৫০ সালে সপ্তম নৌ-বাহিনীর প্রতি প্রদত্ত আদেশের উদ্দেশ্য ও ফল সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যা বলেছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। চিয়াং কাইশেকের হাত থেকে চীনভূভাগকে রক্ষা করা উক্ত আদেশের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃত-পক্ষে সেই সময়ে ফরমোজা থেকে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদের দ্বারা চীনভূভাগ আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। বরঞ্চ তখন পিকিং সরকার কর্তৃক ফরমোজা দখলের চেষ্টা আসন্ন বলেই সকলে ভেবেছিল। *এই শেষোক্ত সম্ভাবনা* থেকে চিয়াং-কাইশেকের অবশিষ্ট বল রক্ষা করাই ছিল ১৯৫০ সালের আদেশানুসারে মার্কিন সপ্তম নৌ-বাহিনীর কাজ। মার্কিন নৌ-বাহিনী কর্তৃক রক্ষিত ফরমোজায় মার্কিন প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র সাজসজ্জায় এত-দিন ধরে চিয়াংকাইশেকের অনুবর্তী পাঁচ ছয় লক্ষ ন্যাশনালিস্ট চীনা সৈন্যকে তালিম দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালের আদেশের ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। যদি ফলাফল দেখে বিচার করতে হয় তবে বলতে হয় কম্যুনিস্ট চীনের রক্ষীর কাজ করার জন্য নয়, কম্যুনিস্ট চীনের মুষল তৈরী করার উদ্দেশ্যেই ৭ম নৌ-বাহিনীর প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আদেশ প্রদত্ত *হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সে আদেশ প্রত্যাহার 'করেছেন বটে* কিন্তু তার মানে হচ্ছে এই যে, ফরমোজায় ন্যাশনালিস্ট চীনা সৈন্যদের প্রস্তুতি এখন এরূপ অবস্থায় পৌঁছেছে যাতে তাদের এখন চীনভূভাগের উপর আক্রমণ বা উপ-দ্রব করার জন্য পাঠানো যেতে পারে। আইজেনহাওয়ার সাহেব তাঁর পূর্ববর্তী *প্রেসিডেন্টের নীতির উল্টো কিছু করলেন এটা মনে করা ভুল হবে। আসলে তিনি* প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আরব্ধ কাজ আর
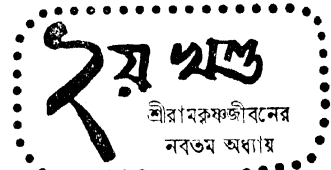
একটা ধাপ এগিয়ে দিলেন। এর দ্বারা মার্কিন নীতির ধারাবাহিকতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হোল না।

ফরমোজায় অধিষ্ঠিত ন্যাশনালিস্ট চীনা সৈন্যদের শবে কোথায় এবং কীভাবে কাজে লাগানো হবে সে বিষয়ে এখনি নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। তবে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ফাঁকা আওয়াজমাত্র করেছেন, এটা মনে করা ভুল হবে। কেবল ভয় দেখালেই কম্যুনিস্ট চীন বা তার মিত্র সোভিয়েট রাশিয়া ভয় পেয়ে মার্কিন সর্তে আপোষ করতে এগিয়ে আসবে, প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার নিশ্চয়ই এরূপ মনে করেন না। সুতরাং তিনি কাঠখড় পোড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমেরিকার সংগীরা, বিশেষ করে বৃটেন মোটেই স্বস্তি বোধ করছে না। চীনের সংগে লড়াই যদি ব্যাপক হয়ে ওঠে তবে হংকং বিপন্ন হবে, এটা বৃটেনের একটা বড়ো ভয়। অবশ্য হংকং রক্ষার বিষয়ে আমেরিকা বৃটেনকে কোনো বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিতেও পারে। তবে মুশকিল হচ্ছে কোরিয়ার ব্যাপারে বৃটিশ ও মার্কিন অনুভূতি একরকমের নয়। কোরিয়া যুদ্ধ বর্তমান না-আগু না-পিছু অবস্থায় থাকলে বৃটেনের খুব বেশি হয়ত আপত্তি নেই কিন্তু আমেরিকার বেলা তা নয়। এ পক্ষের যুদ্ধের ভার চৌদ্দ আনা আমেরিকাকে বইতে হচ্ছে, অন্য মিত্রসৈন্যের তুলনায় মার্কিন সৈন্যও মারা যাচ্ছে সেই অনুপাতে। এ অবস্থাটা আমেরিকার জনমতের আর সহ্য হচ্ছে না। আমেরিকা এর একটা হেস্তনেস্ত দেখতে চায়। নির্বাচনের সময়ে জেনারেল আইজেনহাওয়ার সে বিষয়ে বড়ো গলায় আশ্বাসও দিয়েছিলেন, সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি চট্‌পট্ কিছু করতে চাইবেন এটা স্বাভাবিক! ফরমোজা সম্পর্কে নববিঘোষিত মার্কিন নীতি বৃটিশ সরকারী মহলেও কিছুটা উদ্বেগ সঞ্চার করেছে। বৃটিশ মত হচ্ছে যে, এর দ্বারা যে সামরিক লাভ প্রত্যাশা করা যায় তার তুলনায় রাজনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। চিয়াংকাইশেকের ন্যাশনালিস্ট চীনা সৈন্যদের ক্ষমতা সম্বন্ধে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা মোটেই উচ্চ নয়। তাদের দিয়ে বেশি কিছু হবার আশা ইংরেজরা করে না। তাদের দিয়ে কিছু গোলমাল করাবার ভয় দেখালে পিকিং সরকারকে চীনের উপকূল রক্ষার জন্য আরো বেশি তৎপর হতে হবে বটে, কিন্তু তার ফলে কোরিয়া রণাংগনে চীনের চাপ হাল্কা হবে এটা নিশ্চিত নয়। বরঞ্চ বহিরাক্রমণের ভয় উপস্থিত হলে পিকিং সরকার স্বদেশরক্ষার ধ্বনি তুলে চীনাদের আরো বেশি সামরিক প্রস্তুতির পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারেন। চীনে পুনরায় ভ্রাতৃযুদ্ধের আগুন জ্বালাবার চেণ্টা দেখলে নিরপেক্ষ এশীয়দের মনেও মার্কিননীতির প্রতি বিতৃষ্ণার সঞ্চার হবে—আমেরিকার সংগে তর্কে ইংরেজরা এ যুক্তিটাও ব্যবহার করে থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিণ সরকার এসব ওজর আপত্তি শুনতে প্রস্তুত নন। সুতরাং একটু দূরে দূরে হলেও বৃটেন এবং অন্য মিত্রদের আমেরিকার পিছু পিছু আসতেই হবে।

মিত্রদেরও একটু সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। পশ্চিম য়ুরোপের ঐক্যসাধনের বিষয়ে আর গড়িমসি করলে চলবে না। মার্কিন সাহায্যদান সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার স্পষ্টই বলেছেন যে, "Common task" সম্পাদনে যে-দেশ যতটা চেণ্টা করবে মার্কিণ সাহায্যও সেই অনুপাতে পাবে। অতঃপর কোনো দেশের পক্ষেই নিরপেক্ষতার আস্ফালন এবং মার্কিন সাহায্য গ্রহণ এক সংগে চলবে বলে বোধহয় না। এর ফল ভালই হবে, যারা সত্যই নিরপেক্ষ থাকতে চায় তাদের পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের চেষ্টাতেই বেঁচে থাকতে হবে। বর্তমানে কোনো কোনো দেশে—এদের মধ্যে ভারতবর্ষকেও ধরা যায়—যে "ভাবের ঘরে চুরি" চলছে সেটা বন্ধ হবে, বন্ধ হওয়াই দরকার তা না হলে জাতির চরিত্র একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। নিজেদের শক্তিতে দাঁড়াবার চেণ্টা না করলে সংকটকালে দেখা যাবে যে, নিরপেক্ষতার বুলি ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন কিছু ছিল না।

৩-২-৫২
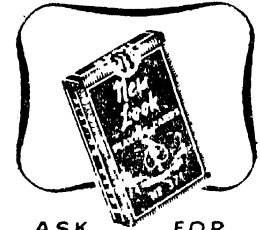
নোনাজলে
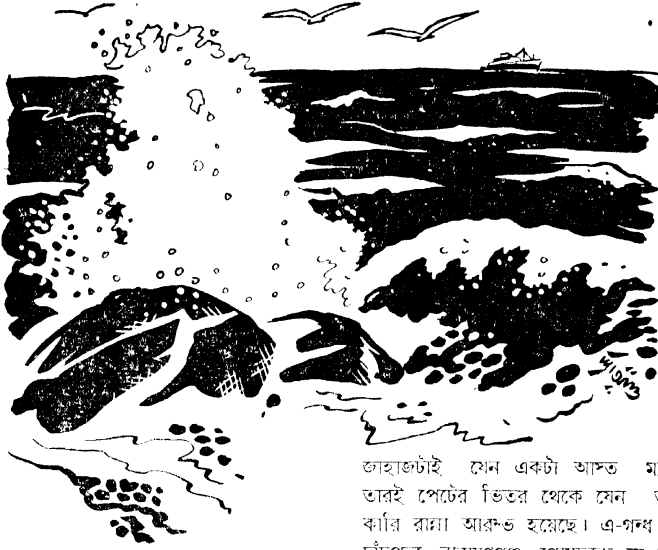
সৈয়দ মুজতবা আলী

সেই গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারবো, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরে-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসরের পরিচয়ের আমার আর সবাই বদলে গিয়েছে, বদলায়নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজে ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনো আছে, কিন্তু সব ক'টা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কিরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা—আর যে গন্ধটা আর সব কিছু ছাপিয়ে উঠে, সেটা মুর্গী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তারই পেটের ভিতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ যে কোন স্টেশনে পৌঁছন মাত্রই পাওয়া যায়।

পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেক চেয়ারে শুয়ে দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবিঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবলটা আনবো আনবো করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তাহলেও তাঁর 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না, নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে একটা নূতন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, না হলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কি করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা জোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এত সব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঃ, এ আবার একটা কথা হল! সিলেট-নোয়াখালির আনাড়িরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন।

জাহাজের মেঝো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি টুপী পরে ডেকের উপর টহল দিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়-নয়নে তাকাচ্ছে ও। ডিসপ্যাচের পুঁটি আর মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞেস করা যাক না 'রূপদর্শী' দর্শন করেছেন কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছেন কতখানি।

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে সেলাম করে বললো, আমাকে "আপনি" বলবেন না, সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশি দেখিনি, কিন্তু আপনার আব্বা-সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরীবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশি হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথায়? বসো না তার ফুরসৎ নেই?'

ধপ করে ডেকের উপরে বসে পড়লো।

আমি বললুম, 'সে কি? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজ-কাল—

কথাটা আমি শেষ করলুম না; সারেঙও টুল আনলো না।

তারপর আলাপ-পরিচয় হল—দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়লো না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শুনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যে রকম পুঁথি-পড়া শোনে, সে রকম আগাগোড়া শুনলো, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

আল্লাতালার উদ্দেশ্যে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়-ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, কিন্তু এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফী তো তারাই করে বেশি, যাদের খুদা ধন-দৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই বা কার জন্যে কি ইনসাফ রাখেন, তাই-বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়লো। চৌতলী পরগণার বাড়ি, না যেন ঐ দিকেই কোনখানে।

সারেঙ্গ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাই ছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছিল, ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলুম একই দিন একই সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'কি হ'ল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ্গ বললে, 'শুনুন।'

যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক্, কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান-মারা খাটনি, তার খবর কেউই কখনো দিতে পারবে না যে, সে জাহান্নমের ভিতর দিয়ে কখনো যায়নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কিরকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই, যার দুদিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের লেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে? এ তো বেহেশ্‌ৎ; আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নিচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনো হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। আর সেই দশ, বারো, চৌদ্দ হাজার টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে তার গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনো অনুমান করা যায়?

খাল-বিল-নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নমের মাঝখানে, কালো-কালো, বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখী।

পয়লা-পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নিচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলানো হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

কিম্বা দেখবেন, কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই বেলচা ফেলে দিয়ে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে 'এমখ'—

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরিজিতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে।'

সারেঙ্গ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ্গ বললে, 'আমাদের সক্কলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে জলে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখখনো একবারের তরেও কাতর হয়নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মনের কাছা-কাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারতো। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জন্মেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায়নি, 'এমখ' হয়নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই কামাবে, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্‌ৎ মানা।'

সারেঙ্গ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জান পানি হয়ে যে কুলুম্ব শহর পৌঁছিলুম—

আমি শুধালুম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাঙলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আর আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম্ব শহর। সেখানে ডাঙায় চরবার জন্যে আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নাবলোই না, বললে, নাবলেই তো বাজে খরচা। আর সে কথা ঠিক ও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে বন্দরে যা ওড়ায়। যে জীবনে কখনো পাঁচ টাকার নোট দেখেনি, আধুলির বেশি কামায় নি, তার হাতে পনরো টাকা! সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

আমরা পেট-ভরে যা খুশি তাই খেলুম। বিশেষ করে শাক-সব্জী। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও-জিনিস কম, নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

তারপর কুলুম্ব থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজি 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দুদিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল।'

বুঝলুম, ''সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।'

'তারপর পুর্সই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সব্জী খেতে নামলুম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ব-বিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খবরটি রাখে।

'পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মনির মুল্লুকে।'

ততক্ষণে সিলেটি উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কি ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজির বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বললো, 'হামবুর্গে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল লাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলুম নুউক বন্দরে—মিরাকিন মুল্লুকে।'

নয়া ঝুনা কোন খালাসীকেই নুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই না কেন? মার্কিন মুল্লুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষা-ভূষাও সেখানে মাসে পাঁচশ-সাতশ টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশ কালা আদমীও সেখানে তার চেয়ে বেশি কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সবকটা ভেগে গিয়ে তামাম মুল্লুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মার্কিন মজুরদের জবর লোকসান হয়; তাই আমরা হয়ে রইলুম জাহাজে বন্দী।

নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগের থেকে সমীরুদ্দী করলো শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভাণ করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতুম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলী করেনি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার জন্যে হুকুম দিলে।

নুউক পৌঁছনর দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কি কৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভালো করে বুঝিয়ে বললে।

বিশ্বাস করবেন না, সায়েব, কিরকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে-ভেবে তৈরি করেছিল। কলকাতার চোরাবাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাই, কলার, জুতো, মোজা। আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি জোগাড় করে দিতে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামলো জাহাজের উল্টো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতর তার সুট, জুতো-মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগ ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগ জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে শিষ দিতে দিতে চলে যাবে

শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটি ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহু দূরে, যেখানে সিলেটিরা কাঁচা পয়সা কামায়।

পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউক বাসিন্দা, সমুদ্র পারে এসেছিল হাওয়া খেতে।

পেলেনটা ঠিক উৎরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ-খোঁজ রব উঠলো পরের দিন দুপুর বেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয়, সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও, একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখীকে খুঁজলে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোঁসাই?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ্গ গেল জোহরের নমাজ পড়তে।

ফিরে এসে কোন ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ্গ বললে, 'তারপর হুজুর, আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুর্সৎ হয়ে ওঠেনি— আর কীই-বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচেছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতুম—বুড়া শেষের ক'বছর সুখেই কাটিয়েছে—খোদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্যে কাঁদতো। তা হুজুর, দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বাড়ির দু'ফোঁটা নোনা জল তার আর কি করতে পারে, বলুন।'

বললো বটে হক কথা, তবু সারেঙ্গের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ্গ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে, ওর মুখ থেকে খবর কিম্বা গুজোব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুৎ পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরাকিন মুল্লুকে দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করিনি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্যে কোন্ মুল্লুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস্ বাৎলাবে কে?

তারপর কলঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে ঢুকলুম ডিসপ্যাচের কামে।

এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে এক-দিন খুব ভোরবেলা, ফজরের নামাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললুম, 'ভাই সমীরুদ্দী।' এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপন ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।

কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশি তাজ্জব লাগলো আমার, সে আমার কোনো প্যারে সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে।

শুধালুম, 'তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাইনি। আবার এ-জাহাজে করে তুই চলেছিস কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিকলো না?'

কোন কথা কয় না। ফকীর-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায়নি।

বুঝলুম, কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে ঠেলে ঠুলে কোনগতিকে তাকে নিয়ে গেলুম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলুম, আণ্ডা ভাজা আর পরোটা দিয়ে সাজিয়ে—ঐ খেতে সে বড় ভালোবাসতো—কিচ্ছু মুখে দিতে চায় না, তবু জোর করে গেলালুম, বাচ্চাহারা মা'কে মানুষ যেরকম মুখে খাবার ঠেসে দেয় কিন্তু, হুজুর পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবাণী দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্যে খাবার গিলি কি করে?

সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলুম না। আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের যখন নামতে দেয়নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটলো।

হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করলো, কি ঘটেছে।'

সারেঙ্গ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না।

বললে, 'তার সে দুঃখের কাহিনী আমি ঠিকঠিক বলি কি করে সায়েব? এখনো মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি

অন্ধকারে সে আমাকে সব কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিন্ধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সবকিছু সেরে দিয়েছিল।

সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানিনে, একসঙ্গে কখনো চোখে দেখিনি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানিনে, আমিও দেখিনি—

বললে, 'তবেই বুঝুন হুজুর, সে টাকা কামাতে হলে ক'টা জান কুরবাণী দিতে হয়।'

প্রথম পাঁচশ পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে, তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্য, তারপর আরো অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরো বহুৎ টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুণকাম-করা, দেয়াল ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরো টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙী ঘরের উল্টো দিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুল্লুকে অসুরের মত খেটে, দু শিফট, আড়াই শিফটে গতর খাটিয়ে, জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরছার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরাকিন মুল্লুকের ভিখারীরও দিন গুজরাণ হয় না।

সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য—মিরকিন মুল্লুকে মানুষ যেরকম চাষার মত খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরি শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ি কালা আদমীও বিনা তকলিফে। তার উপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভালো শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে চলে গেল সোজা শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাই ছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাই ছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানক্ষেতের মাঝখানে।

মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নক্সাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনীয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুরে দেখেছেন আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমি জানি, সমীরুদ্দীও জানে।

মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙী ঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সে কি কথা?'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনেতেই পায়নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিছু না, কিছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরো পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে, ছটা ঠেকনা।

তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তাহলে তো নিশ্চয়ই সেকথা সে কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত।

এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিৎ মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সব্বাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মাধ্যখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে, গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া মেয়েমানুষ আরো কত কি।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বলো কি, সারেঙ। এরকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে! কিন্তু বলো, দিকিন গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠি তো সে কাউকে দিয়ে পড়ায়নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালা পাঠিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ী-ঘরদোর বাঁধতে জমি খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন; সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড়ভাই বিয়ে-শাদী করে

মিরাকিন মুল্লুকে গেরস্থালি পেতেছে, এদেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা, তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?'

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতরে ঢোকেনি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলেনি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন কিন্তু সে ফেরেনি। শুধু বলেছিল যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

কলকাতার গাড়ী সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বিরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে সেদিন গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু'পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে। আর পাঁচজনও বললেন, বাড়ী চল, ফের মিরাকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দু'দিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভায়ের কাছে এলো, সারেঙ?'

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন, সায়েব, সমীরুদ্দী কি করলে। ভাইকে লাথি মারলে না, কিচ্ছু না, শুধু বললে সে বাড়ী ফিরে যাবে না।

তারপর দিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা আপনাকে তো বলেছি, শান-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব-কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, 'ভিখিরি স্বপ্নে দেখে সে বড় লোক হয়ে গিয়েছে তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ী-ঘর-দোর বানিয়ে হয়েছিলুম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলুম কোথায়?'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হ'ত, স্বপ্ন হত তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চোদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

কিন্তু ঐ যে ইনসাফ বললেন না, হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে?

সমীরুদ্দী মিরাকিন মুল্লুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায়নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়ের কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়ালো।

ইনসাফ কোথায়?'

শ্যাওলা

সুশীল রায়

উঁকি দিয়ে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম — এমনি নিটোল নিশ্চল আর পরিচ্ছন্ন জল এই দিঘির। চারদিকে ঝাউগাছ, দু-একটা দেওদার। দিঘিটার চারটি ধারই ঘাসের গালিচা দিয়ে ছাওয়া—সমান ঢালু হয়ে নেমে এসে জলের কিনারে সে-গালিচা শেষ হয়ে গিয়েছে। যেন ঘাসের ফ্রেমে আঁটা একটা প্রকাণ্ড জলছবি। আকাশের ছায়া পড়েছে টলটলে দিঘিতে।

কাজহীন এমন দুপুর খুব বেশি পাওয়া যায় না। আজ এমনি দুর্লভ সম্পদ পেয়ে গিয়েছি যখন, তখন সে-দুপুরটা সার্থকভাবে খরচ হওয়া চাই। বাজে ব্যয় অনেক করেছি, কিন্তু এই দুপুরটাকে অপচয় করতে পারলাম না কিছুতে। তাই এসে বসেছি এখানে, ফ্রেমে-আঁটা এই জলছবিটার কিনারে।

আমার মনের খুশিটা আজ হাওয়া হয়ে গেছে—ছুটে গিয়ে ঝাউগাছের পাতায় উঠে খেলা শুরু করে দিয়েছে, দেওদারের কচিপাতায় দোল দিয়েছে। এমন খুশিটাকে নিজের মধ্যে আটক রেখে লাভ নেই। তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি, ছাড়া পেয়ে দিঘিটার চার ধারে সে খেলে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, এমন দুর্লভ দুপুর সে-ও হয়তো পায়নি জীবনে। আমাকে কে-যেন ছেড়ে দিয়েছে বন্ধনহীন এক খণ্ড খুশির মত। কিন্তু আমি ছুটে বেড়াচ্ছি নে, দিঘির নিটোল জলের মত নিশ্চল হয়ে ব'সে ছুটির স্বাদ উপভোগ করছি।

কিন্তু নিটোল জলেও ঢেউ ওঠে। ঝাউএর পাতা থেকে দু-এক টুকরো হাওয়া হয়তো লাফিয়ে পড়ছে জলে, তাতেই দিঘির বুকে বেজে উঠেছে শব্দহীন জল-তরঙ্গ। ঘাটের পাষাণে এসে ছলছল করে উঠছে জল। এটা ওর সজল আকুতি নয়, ভাষাহীন আনন্দ-সঙ্গীত।

একা বসে বসে এই গান শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমার সর্বাঙ্গ যেন ওই গানে বাঁধা পড়ে গেছে। এই দুপুরটা ফুরিয়ে যাবে বিকেলের দিকে, কিন্তু আমার মন থেকে এ-গান কখনো ফুরবে না। বাতাসে হোক জলে হোক ইথরে হোক, যে-কোনো আন্দোলনে যে-ঢেউ তোলা যাক-না কেন, সে ঢেউএর নাকি মৃত্যু নেই কখনো। বড় থেকে ক্রমে ছোট, তারপর ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হতে পারে সে তরঙ্গ, কিন্তু মিলিয়ে নাকি যায় না কখনো, তার রেশ নাকি থেকে যায়ই। বিজ্ঞান জানিনে, কিন্তু এ-কথাটা যে মিথ্যে হতে পারে না, এ জ্ঞান আমার আছে। তাই মন থেকে কোনোদিন আজকের এই সঙ্গীত-তরঙ্গ যে মিলিয়ে যাবার নয়—তা অস্বীকার করতে পারলাম না। বলা বাহুল্য, অস্বীকার করতে না পেরে কৃতার্থই হলাম। তাকে ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু মুছে ফেলতে পারিনে।

বাঁধাঘাটের একটি কোণে বসে আছি। আমি তো নগণ্য একটি জীব, সহজেই বাঁধা পড়তে পারি, বাঁধা পড়েও আছি। চেয়ে দেখি, ওই আকাশটাও আটক পড়ে গেছে এখানে। জলের উপর পড়ে ঘাসের ফ্রেমে এঁটে গেছে একেবারে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, এত নির্জন কেন এ-দুপুর, কেন এত নিঃশব্দ। এক কণা একটা খুশি কি একটু টুং করে বেজে উঠতে পারে না। কোনো দিকে কোনো শব্দ না দেখে নিজের হৃদ্-স্পন্দনের ধ্বনিটা শোনার জন্যেই কান পাতলাম। কান আর-একটু ভালো ক'রে পাততে পারলেই বুঝি শুনতে পেতাম ধ্বনিটা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। হাতছানিতে কে-যেন ডাকছে আমাকে। এগিয়ে গেলাম। ঘাটের সিঁড়ির আর একটা ধাপ নেমে বসে চোখ ইশারায় সাড়া দিলাম। এক টুকরো শ্যাওলা। জলের মৃদু মৃদু ধাক্কায় উঠছে নামছে। আমার সাড়া পেয়েও কোনো জবাব দিল না, একই ভাবে হাতছানি দিতে লাগল। তার জীবনে আর কোনো ভাষা আছে কি না জানি নে, কিন্তু তার এই ইঙ্গিতের ডাকটা আমাকে বেজায় কাবু করে ফেলল। মনে হতে লাগল, চারদিকের এই খুশির মধ্যে নিজেকে সে যেন পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তা না হলে এই জল-তরঙ্গের মতই সে দোল খেত, ওই ঝাউ-পাতার মতই সে ঝিরঝির করে উঠত, আর দেওদারের কচিপাতার সঙ্গে তাল রেখেই সে হ'ত আন্দোলিত। কিন্তু তার সঙ্গে মিল নেই কারো, সে কোনো সঙ্গীতের বা সঙ্গতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে কেবল বিকল আর ব্যাকুলভাবে যেন আমাকে হাতছানি দিচ্ছে।

পরিষ্কার আকাশ। ছেঁড়া-ছেঁড়া দু-চারটে লঘু মেঘ মাত্র এখানে-ওখানে ছড়ানো। বহুদূরে আকাশে দু-পাশে দু'টি পাখা ছেড়ে দিয়ে গা ভাসিয়ে চলেছে কয়েকটা চিল। এমন পরিচ্ছন্ন দিনের অনাবিল এই দুপুরটা হঠাৎ থমথমে হয়ে এল, মনে হল যেন আকাশ ভরে নেমে এসেছে অদৃশ্য মেঘের পুঞ্জ। চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, তবু মনে হল যেন দুপুরটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এক খণ্ড একটা শ্যাওলার সামান্য হাত-ছানিতে এমন কী ইন্দ্রজালের শক্তি লুকানো আছে—তাই ভাবতে লাগলাম। মনে হল, চারিদিকের এই আনন্দ আর খুশির বন্যার মধ্যে ও যেন আর কিছু না ও এক-টুকরো শ্যাওলাও না, ও হচ্ছে এক খণ্ড ট্র্যাজেডি।

কোথাও শিকড় নেই ওর, কোথাও স্থিতি নেই, কোনো অবলম্বন নেই ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ানোই ওর জীবনের কাজ। কোনো ঘাট কোনো দিন কোনো সহৃদয় আত্মীয়তার শিকল দিয়ে ওকে বাঁধে না। এক ঘাট থেকে ভাসতে ভাসতে ভিন্ন ঘাটে এসে সে কিছুক্ষণের জন্যে দম নিয়ে নেয় মাত্র, আবার ঘাটান্তরের দিকে ধাওয়া করে। তার নিজের জীবনের এই দীনতার জন্যে মাঝে-মাঝে তার মন হয়তো বিকল হয়ে যায়, অমনি সে কেঁপে ওঠে একটা ব্যাকুল হাতছানিতে।

জীবনে ট্র্যাজেডি চাই, তা না হলে জীবনের সব সুখ আলুনি হয়ে যায়। আজকের দুপুরের এই অকৃত্রিম খুশিটা ভালো লাগছিল বটে, কিন্তু তবু একটা অভাব যেন ছিলই, চারদিকের এই রমণীয় বাজনার মধ্যে একটা তন্ত্রীতে সুর যেন একটু বেসুরোই ছিল। তাই ঐকতানটার তাল কাটছিল মাঝে মাঝে। সেই সুর-হীন তারে সুর-যোজনা করে দিয়ে গেল এই ট্র্যাজেডিটা—এই শ্যাওলা। দ্বিপ্রহরের অর্কেস্ট্রা তাই জলতরঙ্গের ধ্বনিতে হঠাৎ যোগ করে দিল মহোল্লাস।

দুর্লভ দুপুরটা আজ দুর্লভ সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে

যেটুকু ফাঁক আর ফাঁকি ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে এখন, এখন তা সার্থক হয়ে উঠেছে।

ঘাসের ফ্রেমের দিকে তাকাতে আর ইচ্ছে করছে না, ইচ্ছে করছে না উড়ন্ত চিলের ছবি-আঁকা আকাশের দিকে, ভালো লাগছে না ঝাউ-এর ঝিরিঝিরি বা দেওদার-পাতার কম্পন; এখন আমার একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে এই দিকে, এই শ্যাওলার দিকেই। হতে পারে এ অখ্যাত একটা শ্যাওলা, হতে পারে এ মূলহীন আর মূল্যহীন, কিন্তু চতুর্দিকের এই ঐশ্বর্যকে সে যদি পেরেছে এমন মর্যাদা দান করতে, যদি সে পেরেছে এমন মহার্ঘ্য করে তুলতে, তাহলে তাকে অমূল্যই তো বলতে হয়। আমি তাই চেয়ে আছি ওই শ্যাওলার দিকে নিমেষ-হীন চোখে।

জল যেই দুলে উঠছে, ও-ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে, যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে ঘাটের পাষাণ। আজ সে এসে ঠেকেছে এখানে। এখনই এই জায়গাটা ছেড়ে যেতে মন বুঝি ওর চায় না।

ভাবলাম, আজ এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই, আগামীকাল এক ফাঁকে এসে আবার ওর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া যাবে। কিন্তু ভেবেই শিউরে উঠলাম। কাল এসে একে এখানে যে পাবই, তার নিশ্চয়তা কী! তার চেয়ে যতটুকু সময় ও এখানে দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততটুকু সময় অন্তত ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা যাক।

কিন্তু ঘনিষ্ঠতার ধার ও ধারে না। আন্তরিকতার সঙ্গে ওর অন্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। ও যদি ছোটখাট সুখের প্রত্যাশী হত, তাহলে হয়তো কারো কাছ থেকে একটা মূল ধার নিয়ে সে একখণ্ড মাটি আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে রস শোষণ করে বিরাট মহীরূহ হয়ে উঠতে পারত। সে সামান্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণ নয়। আর পাঁচজনের মত কেবল সুখের স্বাদ নিয়েই জীবনকে বিস্বাদ করে তুলতে চায় না। অত সুখে জীবন যে দীন হয়ে যায়, মন যে হীন হয়ে যায়—এ বোধ নিশ্চয় ওর আছে। নিশ্চয় ও জানে—সুখ হচ্ছে শুঁটকি-মাছ, জিভকে ছোটলোক করে নিতে না পারলে তার স্বাদ পাওয়া যায় না। সুখের লোভে দীনতাকে বরণ করা তার মর্জি নয়, তাই ট্র্যাজেডি হয়ে ভেসে বেড়ানোতেই ওর আনন্দ!

আমার গদ-গদ আন্তরিক হাবভাব দেখে বিরক্ত হয়ে থাকবে ও। দেখলাম, হাতছানিটা থেমে গেছে। আমার দিকে কঠোর চোখে যেন তাকিয়েছে ও। কী ও বলতে চায় জানিনে। কিন্তু মনে হল, আন্তরিকতার শিকল ও চায় না। কবিতায় যেমন ছন্দ, ব্যঞ্জনে যেমন লবণ, নাটকে যেমন যবনিকা পতন, আমাদের কাছে ও তেমনি পরম প্রয়োজন হতেই চায় কেবল—আত্মীয় হতে চায় না। বলেছি, ওর ভাষা জানিনে, তবু ওর দিকে চেয়ে মনে হল, ওর বক্তব্য হচ্ছে—

মূলহীন তরু আমি,
স্রোতে ভেসে এসেছি শৈবাল,
যে-ঘাটে ঠেকেছি আজ
জানি সেথা রহিব না কাল।

অতএব তার সঙ্গে যা-কিছু কথা যা-কিছু কাজকারবার, সব চুকিয়ে নিতে হবে আজই—এক্ষুনি।

এমন শ্যাওলা কি দেখি নি? অনেক দেখেছি। আগেও দেখেছি, পরেও আরো দেখব। কিন্তু সে সব দেখা হয়েছে গোলমাল হৈ-চৈ আর কলরবের মধ্যে। তাই ভাসমান সে-সব শৈবালের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাতে পারি নি, তাদের চোখ-মুখের বিষাদটা এত স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। আমাদের গায়ের কাছ দিয়ে পাশ কাটিয়ে রোজ কত শ্যাওলা আসছে-যাচ্ছে, কতজন হয়তো তীব্র বিষাদে বিব্রত হয়ে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডেকেওছে। কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় পাই নি আমরা। এক ঘাটে এসে ঠেকে সে সব শ্যাওলা এখন কোন্ ঘাটে গিয়ে দম নিচ্ছে, সে খোঁজও আমরা রাখিনে। এ সংসারটা নাকি বিরাট একটা সমুদ্র, তারা সব নোঙরহীন জাহাজের মত সেই সমুদ্রে কেবল ভেসে ভেসেই বেড়াচ্ছে; নিজেদের বাঁধবার জন্যে কোনো শিকল পাচ্ছে না, তাই তাদের জীবনেও নেই কোনো বন্দরের বদান্যতা। এর জন্যে বেদনাবোধ তারা করে, কিন্তু সে বেদনা থেকে ত্রাণ পেতে চায় না তারা। পরিত্রাণ যদি পেয়ে যায়, তাহলে তারা যে হয়ে যাবে অতি সামান্য এবং সেই সঙ্গে অতি সাধারণ। তাদের বেদনাটাই যে তাদের ঐশ্বর্য, বেদনা-বোধের সঙ্গে এ বোধটাও তাদের আছে। আছে বলে রক্ষে। তা না হলে আমাদের জীবন-নাট্যশালার নওবতখানায় বাঁশির পোঁ আর বাজত না; ঐকতান হয়ে যেত অর্থহীন।

প্রত্যহের কর্মব্যস্ত জীবনে এদের ভালো করে দেখার সুযোগ পাই নি, তাই আজ এই দিঘির পাড়ে এই একখণ্ড শ্যাওলাকে মন-প্রাণ দিয়ে দেখে সব না-দেখার খেসারত দিচ্ছি। এতটুকু বৈষয়িক বুদ্ধি যদি ওর থাকত, তাহলে এমনভাবে ভেসে বেড়াতে ওকে হত না। দিঘির জল ডিঙিয়ে পাড়ে উঠে হয় দেওদার, নয় ঝাউ, কিংবা হয়তো বা একটা বিরাট বটবৃক্ষই ও হতে পারত। আসলে ও যখন গাছই, তবে একটা শিকড় জোগাড় করে নিলেই হয়তো ওর ভালো হত, জীবনে সুরাহা হয়ে যেত একটা। সুরাহা হয়তো হত, কিন্তু সুরও থাকত না, আহাও থাকত না। ট্র্যাজেডি উধাও হত, সেই সঙ্গে সংগীত এবং জীবনের মানেও। সম্ভবত তাতে আমাদের কারো ভালো লাগত না।

চেয়ে দেখি, গা ছেড়ে দিয়েছে শ্যাওলা। পাষাণের মায়া ত্যাগ করে ভাসতে শুরু করেছে।

এদিকে দুপুরটা গড়িয়ে এসে পেঁৗছে গেল বিকেলে। সমস্ত রোদ হয়ে গেল স্তিমিত।
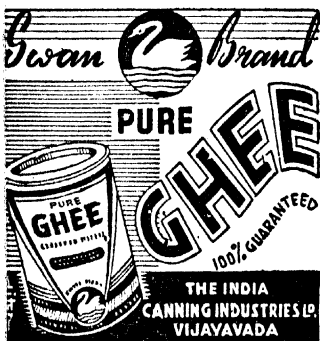
বাংলার পথঘাট

সত্যকাম

ঘুরে বেড়ানোটা আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়, ওটা আমার স্বভাব। কোন একটা জায়গার নাম শুনেই সে জায়গাটা আমার দেখতে ইচ্ছা করে। তারপরে সেখানে আমি যাবই, সেখানে দেখবার জিনিস কিছু থাক আর নাই থাক। এর থেকে একটা সুবিধা হয়েছে যে, বাঙলা দেশের অনেকগুলো জায়গা আমার দেখা হয়ে গেছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে যেতে হলে মেদিনীপুর দিয়ে যাওয়া সহজ না হুগলী দিয়ে সুবিধা, চাঁপাডাঙ্গার আলুর হাটে বাস চলাচলের রাস্তাটা কেমন, টাকী রোড দিয়ে হাসনাবাদ যেতে ক'টা পোল পেরোতে হবে, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে বর্ধমানের ভিতরের রাস্তাগুলোর তফাৎ কি, পুরসুড়াতে রাস্তা বলতে কি বোঝায়, গুপ্তিপাড়ায় আদৌ রাস্তা আছে কি না। এ সমস্তই আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি। এমনকি, সমুদ্দুরের হাওয়া খাওয়ার জন্যে কন্টাই রোড থেকে দীঘা পর্যন্ত যে রাস্তাটা সম্বন্ধে জানবার জন্য আপনারা এত ব্যস্ত হয়েছেন, সেখান দিয়েও আমি অনেকবার গিয়েছি।

গিয়েছি, তবে বড় কষ্ট হয়েছে। কবি গেয়েছেন বটে, "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ," কিন্তু আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন ত জানবেন বাঙলাদেশে পথ চলা ভয়ানক একটা কষ্টের ব্যাপার। শুনতে পাচ্ছি, এবার নাকি প্রায় তের চোদ্দ কোটি টাকা খরচ করে এখানকার রাস্তাঘাট সব ভাল করে তৈরী করা হবে। তাই যেন হয়। আমাকে এখনও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে, আর তার সবই বাঙলাদেশে। এখানকার রাস্তাগুলো একটু ভাল হোক, এছাড়া আমার আর কোনও কামনা নেই। তবে এবার আমায় গ্রামের ভিতরেই যেতে হবে বেশী করে, সেখানে যে একেবারেই রাস্তা নেই, তাই ভাবছি কি করব। সেখানকার অবস্থা ত দেখেছি। সেখানে এখনও ছোট ছোট ছেলেরা এক মাইল আল টপকে, তিন মাইল বাঁধ ভেঙ্গে, দেশের নিরক্ষরতা দূর করার পৈত্রিক দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্য দুবেলা হিমসিম খাচ্ছে।

বাঁধ মানে বুঝেছেন ত? নদী কিম্বা খালের ধার দিয়ে বর্ষা বা বন্যার জল থেকে আশপাশের জমিকে বাঁচাবার জন্য যে উঁচু করে পাড় দেওয়া হয়, তারই নাম বাঁধ। পাড়াগাঁয়ের লোকজনের চলাফেরার ঐটিই উৎকৃষ্ট পথ। তাই গাঁয়ের ভাষায় বাঁধ মানেই রাস্তা, রাস্তা মানেই বাঁধ। এমন কি, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, দিগন্তজোড়া ধানক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে পৈতের মত, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পি ডবলিউ ডি'র যে আঁকাবাঁকা রাস্তা হা য় লি, লি করতে করতে কি জানি, কোথায় চলে গেছে, গাঁয়ের লোক তাকেও বলে বাঁধ। এগুলি বেশীরভাগই কাঁচা অর্থাৎ মাটির; বর্ষাকালে অবিশ্যি এর কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটে, তখন মাটি আর মা—টি থাকেন না, তিনি হন কাদা।

কাদা দেখেছেন? দেখবেন না কেন? আপনারা লেকে যান, গড়ের মাঠে খেলা দেখেন, কাদা দেখেছেন অবিশ্যি। কিন্তু সে হল কলকাতার সভ্য-কাদা,—ফিচ্ করে ছিটকে একটু গায়ে লাগল, অথবা ফ্যাচ্ করে পা-টা একটু বসে গেল, ব্যস ঐ পর্যন্ত। তাইতেই আপনাদের কি ঘেন্না! পাড়াগাঁয়ের কাদা হচ্ছে কাদার বাবা, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনী ভাষায় যাকে বলে আদি এবং অকৃত্রিম। এর আবার দুটো জাত আছে; একরকম থকথকে আর একরকম হড়হড়ে।

থকথকের দেখা পাবেন সহজেই। শ্রাবণ মাস থেকে আশ্বিনের শেষ কি কার্তিকের গোড়া অবধি যে কোনও সময় একটানা দু-তিনদিন বৃষ্টি হয়ে যাক, ইতিমধ্যে বাঁধের উপর দিয়ে মানুষ চলুক, গরু চলুক, চলে ত গরুরগাড়িও চলুক, তারপরে আপনি চলুন। গোড়ালী ডুবেছে? মাত্তর? ও কিছু নয় চলুন। এ কি হাঁটু অবধি ঢুকে গেছে যে, টেনে তুলুন, টেনে তুলুন,—ঐখেনটায় কাল একটা গাড়ির চাকা বসে গিয়েছিল,—কাদার আর উপর থেকে বুঝবেন কেমন করে? এ কি, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে? সামনে হাত কুড়ি পথ ক্ষীর হয়ে আছে, হাঁটুতেও কুলোবে না; তাছাড়া পা ফেলবেনই বা কেমন করে, তুলবেনই বা কেমন করে! এই পথেই গাঁয়ের ছেলেদের ইস্কুল যেতে হয়, নয়ত মুখখু হয়ে থাকবে। এই পথেই গাঁয়ের চাষী মুলোটা, বেগুনটা বেচতে আসে হাটে; সেখানে তাদের কাছ থেকে ফড়েরা সেগুলো কিনে নিয়ে গিয়ে শহরে বিক্রী করে আরও দু'পয়সা লাভ করে। যেদিন খুব বৃষ্টি, মোট-মাথায় পথে চলা কি গাড়ি চালানো চাষীদের কাছেও অসম্ভব, সেদিন ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই পচে, এদিকে শহরে সেদিন তরকারীর বাজার আগুন, সেখানে মানুষের মুখে হায় বেগুন, হায় বেগুন।

পাকা, অর্থাৎ খোয়া-বিছানো রাস্তায় অবিশ্যি এসব অসুবিধা অনেকটা কম; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সব জায়গায় পাকা রাস্তা পাচ্ছেন কোথায়, সেইটাই ত দুঃখ্খু। আবার পাকা রাস্তা থাকলেও তার কিছুটা অংশ যদি কাঁচা থাকে, তাহলে ঐ একই অবস্থা। ইংরেজ বাহাদুরের একটা বাহাদুরীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোল বলে একটা জায়গা আছে, সেটা অনেকেই হয়ত জানেন না; কিন্তু নাড়াজোলের পরলোকগত জমিদার 'দেবেন্দ্রলাল খাঁ'র নাম না শোনাটা কোন বাঙালীর পক্ষেই গৌরবের কথা নয়, সেইজন্য ভরসা করে বলছি, নাড়াজোলের নাম আপনারা সকলে না হোক অনেকেই শুনেছেন। মেদিনীপুর শহর থেকে জায়গাটা বেশ কিছু দূর, কিন্তু মেদিনীপুর থেকে কেশপুর হয়ে সেখানে যাবার চমৎকার একটা রাস্তা আছে, এ রাস্তাটা আগাগোড়াই পাকা, কিন্তু যেহেতু 'দেবেন্দ্রলাল খাঁ কংগ্রেসের নেতা এবং কিছুতেই আর পাঁচটা জমিদারের সুপুত্তুরের মত ইংরেজ সরকারের তাঁবেদারী করতে রাজী ছিলেন না, সেইজন্য ইংরেজ সরকারের রাস্তা সরকার অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড নাড়াজোলের কাছ বরাবর মাইল তিনেক ঐ রাস্তাটা কাঁচা রেখে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, নাড়াজোলের রাজাকে জব্দ করা গেল না ত তাঁর প্রজারা জব্দ হোক, আর সেই সঙ্গে তামাম

মেদিনীপর শহরের লোকগুলো, যারা দেবেন্দ্রলাল খাঁ, দেবেন্দ্রলাল খাঁ করে চেঁচিয়ে মাথা খায়, তারাও জব্দ হোক। এর একটা কারণ ছিল। নাড়াজোলের পলীমাটিতে সোনা ফলে, মেদিনীপুরের আশে পাশে অমন তরিতরকারী, পটল, কুমড়ো জন্মাবার জায়গা আর নেই, রাঙগাদার ভাষায় বলতে গেলে নাড়াজোল মেদিনীপুরের ইউক্রেন। বর্ষাকালে ঐ মাইল তিনেক রাস্তা কাঁচা থাকার দরুণ নাড়াজোলের ফসল নাড়াজোলেই পচত, সেখানে পটলের দাম যখন পাঁচ পয়সায় দু'সের, মেদিনীপুরে তখন পাঁচ আনা সেরেও টাটকা পটল পাওয়া যেত না। এক ঢিলে নাড়াজোলের চাষীও চিৎ মেদিনীপুরের বাবুরাও পটাং। এটা অবিশ্যি ইংরেজ আমলের ঘটনা, এতদিনে আশা করি, সে রাস্তার সবটাই পাকা হয়ে গেছে; না হয়ে থাকলে এই বাজেটের প্রথম পাইটা ঐ রাস্তার পেছনেই খরচ করা উচিত, একথা আমি এক কলম লিখে দিতে পারি।

থকথকে কাদা যেমন বাঙলাদেশে প্রায় সব জায়গাতেই যখন তখন পাবেন, আসল বসুন্ধরা মার্কা হড়হড়ের দেখা পাওয়া কিন্তু এঁটেল মাটির জায়গা ছাড়া সম্ভব নয়। দেখা না হওয়াই মঙ্গল; নেহাৎ গেরোর ফেরে যদি কখনও এর সামনা-সামনি পড়ে যান ত জানবেন সেদিন আপনার পাঁজিতে বিষ্যুৎবার। কষ্টে-সৃষ্টে একটি পা বাড়িয়ে অনেক ব্যালান্স-হুজ্জুত করে আর একটি পা বাড়াব বাড়াব করছেন, হঠাৎ বুঝতে পারবেন আপনার দুটি পা-ই শূন্যে উঠে গেছে,— তারপরেই এক বিষম কেলেঙ্কারী। আনাড়ী লোক ঘোড়ায় চড়তে গেলে ঘোড়া যেমন প্রতিবারেই তাকে ঝাঁকানি দিয়ে পিঠ থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে বুঝিয়ে দেয় সে উজবুক, তেমনি শহুরে লোক হড়হড়ের গায় পা দিয়েছে, কি সঙ্গে সঙ্গে ছিট্‌কে পড়ে তার প্রত্যয় হবে, সে গাঁয়ের পথে চলার অনুপযুক্ত। জুতো? মাথায় রাখুন, মাথায় রাখুন; খালি পায়ে সজোরে আঙ্গুলগুলো মাটির সঙ্গে সাপ্‌টে গেঁথে যদি থম্‌কে থম্‌কে এগুতে পারেন ত ভাগ্যি জানবেন, আর সেই সঙ্গে জীবনে প্রথম উপলব্ধি করবেন ভগবান পায়ের আঙ্গুলগুলো খামখা ফালতু সৃষ্টি করেন নি। হাওড়া জেলার আমতায় নদীর ওপারে বাঁধের রাস্তায় আর কাঁথির ভগবানপুর থানায় কেলেঘাই নদীর পাড়ে অমরশির বাঁধে হড়হড়ের দুটো মস্ত আড্ডা। দুটো বাঁধই চওড়ায় বড়জোর হাত চারেক, কিন্তু উঁচু বারো তের ফুট। এই রাস্তায় বর্ষাকালে চলা মানে অলিম্পিকে জিমনাস্টিক করা— এদিকে হড়কেছেন ত, সড়াৎ, নদী, ওদিকে হড়কেছেন তো সুড়ুৎ—ধানক্ষেত;— কোনটাই সুবিধের জায়গা নয়।

এই পথেই কিন্তু ছেলেরা ইস্কুলে পড়তে আসে, নইলে আপনারা তাদের মুখ্যু বলবেন, গভর্নমেণ্ট চাকরি দেবে না। উপায় কি বলুন? ভগবানপুর থানায় ধরুন পঞ্চাশখানা গ্রামের মধ্যে একটিমাত্র হাইস্কুল। সেখানে মাসুড়িয়া কি টোটানালা গ্রাম থেকে যে ছেলেটি পড়তে আসবে, তাকে সোজা পথ ধরতে হলে পার হতে হবে খান দুই মাঠ, মানে পাঁচশ কি হাজার বিঘার ধানক্ষেত, তারপর এই বাঁধের হড়হড়ে কাদায় কিম্বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এগরা-বাজকুল রোডের থকথকে কাদায় আরও কমপক্ষে দু'মাইল পথ। আবার ফেরার পালা আছে। ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আসার পথ হচ্ছে ক্ষেতের আল, ফুটখানেক চওড়া একটা ঘেসো ফালি, তার কোথাও কাদা, কোথাও আল ছাপিয়ে জল উঠেছে, কোথাও দুটো ক্ষেতের মাঝখানে জল যাতায়াতের জন্য কেটে দেওয়া হয়েছে, সেখানটায় হাঁটুর কাপড় তুলে নামতে হ'ল—সুবিধের আর অন্ত নেই। তাছাড়া আলের দুপাশে ফোঁকরে কন্দরে গেঁড়িভাঙ্গা কেউটের আস্তানা, সত্যিকারের জ্যান্ত সাপ, একবার ছুঁলেই সোনা। উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ কোন্ এক বর্ষার রাত্তিরে চুরি করে মাছ ধরতে গিয়ে গোটা কয়েক আধমরা হেলে-কেউটেকে আমল দেয়নি, তাই পড়েই আপনারা এমন ইস্, ইস্, করতে আরম্ভ করেছিলেন যে তার ঠ্যালায় শরৎচন্দ্রকে শ্রীকান্ত গল্পটা ফেনিয়ে ফেনিয়ে চারটে পর্ব অবধি নিয়ে যেতে হয়েছিল। বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে অমন লাখো লাখো ইন্দ্রনাথ কেউটে গোখরোর পিঠ টপকে টপকে এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে দুবেলা হাট-বাজার করে—রাস্তা থাকলে ব্যাপারটা আপনারা স্বচোখে দেখে আসতে পারতেন। কামড়ায় না? তা মাঝে মাঝে কামড়ায় আর পাড়াগাঁয়ে থাকে বলেই সবাই কিছু কুন্তীর ছেলে ভীম নয়, তাই যাদের কামড়ায়, তারা মরেও। তবে তা নিয়ে হৈ-চৈ হয় না। বড় জোর বছরে একদিন কাগজের কোণায় ছোট্ট একটা খবর বার হয়,—এ বছর বাঙলাদেশে ৩১৫ জন লোক সাপের কামড়ে প্রাণ দিয়েছে,— এমনিধারা মোটমাট একটা পাইকারী হিসাব। এর জন্য আইনসভায় প্রশ্ন ওঠে না, গড়ের মাঠে মিটিং হয় না, গদী-আমলা ছোড় দো, ঘাড়-গর্দান তোড় দো, এসব কিচ্ছুই হয় না। কেননা, হয়েছেটা কি? লোক মরেছে? তা, না-খেয়ে ত মরেনি, গলায় দড়ি ত দেয় নি—সাপে কামড়েছে— ফুঃ, এ আবার একটা ব্যাপার নাকি?

আচ্ছা, সাপের কথা না হয় ছেড়ে দিন; কথায় বলে সাপের লেখা, ও নিয়ে লিখতে গেলে আর ফুরোবে না। ধরুন, রাত বিরেতে কারও অসুখ করল। খুব সাংঘাতিক কিছু, মনে করুন, এসিয়াটিক কলেরা কি টাইফয়েডের একুশ দিন, ও সে যাই হোক, তখন টাকাই ঢালুন, আর মাথাই খুঁড়ুন, ডাক্তার পাবেন না। সেই রাত-পোয়ালো ফর্সা হোল অবধি অপেক্ষা করতে হবে, ততক্ষণে রুগীও ফর্সা। ডাক্তারদের দোষ কি বলুন? একে ত পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার বাড়ন্ত, তার মধ্যে যে দু-একজন হাতুড়ে, মন্তুরে, কি দৈবি-সৈবি পাশ করা ডাক্তারই বা কাছেপিঠে থেকে থাকেন, ত ওই বন-বাদাড় টপকে, খানা-খন্দয় মুখ থুবড়ে পরের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণটা বেঘোরে খোয়াতে রাজী হবেন, এমন ধারা লুই পাস্তুর আর কজন জন্মায়?

একটা কথা মনে হতে পারে যে, রাস্তাগুলো সব গেল কোথায়? আর পাঁচটা জিনিসের মত ইংরেজ কি ওগুলোকেও জাহাজ বোঝাই করে ইংলণ্ডে পাচার করে দিয়েছে? নন্দ ঘোষের দোষ নেই মশাই, এ ব্যাপারে বেচারা নির্জলা নির্দোষী। সত্যি কথা বলতে গেলে, রাস্তা বলতে আমরা যা বুঝি, আমাদের দেশে তা কোনোকালেই ছিল না। বিশ্বাস করছেন না? আচ্ছা, রূপ-

কথার কাহিনীগুলো মনে করুন। সেই, রাজপুত্তুর দেশ ভ্রমণে বার হল, তারপর চলতে চলতে পথ হারিয়ে এক গভীর জঙ্গলে এসে পড়ল। ব্যাপারটা কি? রাজপুত্তুর ইনটেলিজেণ্ট ছেলে, সে পক্ষীরাজ হাঁকায়, রাক্ষস কাটে—সামান্য রাস্তা চিনে পথ চলতে পারল না? তারপর ইদানীংকালের সেই নাটকীয় গুরুগম্ভীর কথাটা ভাবুন—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? রাস্তাই যদি থাকবে ত লোকে অমন হুট হুট করে পথ হারায় কেন বলতে পারেন? রাস্তা সত্যিই ছিল না, আর তখন তার দরকারও ছিল না। আমাদের নদী-মাতৃক দেশ; এখানে পথ ছিল জল, সেইজন্য এখনও পথের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট কথাটা আমরা অকারণেই ব্যবহার করে থাকি। নদীর ধারে ধারেই ঘিরে থাকত গ্রাম, গড়ে উঠত বন্দর, নগর, রাজধানী।

তারপরে এল নবাবী আমল। তখনও বদল হল না বিশেষ কিছুর, একমাত্র শের শা দিল্লী থেকে বাংলা অবধি একটা রাস্তা বানালেন আর তাই জন্যেই তাঁর নামটা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রইল। এ ছাড়া মুসলমান আমলে আর রাস্তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি, অন্তত বাংলা দেশে মুসলমান আমলের কোনো ভাল রাস্তা আর চোখে পড়ে না। অহল্যাবাঈ রোড বলছেন? ওটাকে রাস্তা বললে কলকাতার মনুমেণ্টটাও একটা রাস্তা। ওটা বোধ হয় বরকন্দাজদের অবস্ট্যাকল রেস খেলবার জন্য তৈরি হয়েছিল, দু পা চলুন খাল, পাঁচ পা চলুন নদী, আর চলতে হবে না হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বেন। অহল্যার নামটাই কি এর অভিশপ্ত অবস্থার জন্য দায়ী? হয়ত তাই, নাহলে মুসলমান, খৃষ্টান কোনো রাজত্বেই কেউ এর দিকে নজর দিল না কেন? এখন শুনছি রামরাজত্ব চলছে, শাস্ত্রমতে এইবার অহল্যার উদ্ধারের কথা, যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন রামেরই বদনাম। যাকগে, মুসলমান আমলের রাস্তার নমুনা যদি দেখতে চান ত কাছে পিঠেই নবাবী রাজধানী মুর্শিদাবাদ দেখে আসুন। প্যালেস দেখবেন আজব, গম্বুজ দেখবেন তাজ্জব, সামান্য পিলখানাটা দেখলেই পিলে চমকে যাবে। কিন্তু রাস্তা? সে ঐ আপনার মধু হালদার বাই লেনের মত। এর কারণ, মুর্শিদাবাদের গা বেয়েই গঙ্গা, সুতরাং অন্য পথের আর কিবা প্রয়োজন। তখন ডাঙ্গার পথে চলতে হলে গরিব চলত হেঁটে, সেপাই চলত ঘোড়ায়, নবাব চলতেন হাতীতে, বৌ-ঝিরা চলতেন পাল্কীতে আর ডাকাত চলত রণ-পায়, বাঁশের লাঠির উপর। তারজন্য এমন বিশেষ আর চওড়া চৌকস রাস্তার কি দরকার?

অবশেষে এল ইংরেজ। চোখে তার আদেখলার নজর, পেটে তার দুর্ভিক্ষের আগুন। এদেশের সব তার চাই। সোনা-দানা মণি মুক্তো সব প্রথম চোটেই ত কেড়ে খামচে নিল। তারপর শুরু হল খাজনা দাও, ট্যাক্শো দাও, খোঁড় মাটি বার কর কয়লা, চা দাওরে, চট দাওরে, আর সব চটপট কর, ঝটপট সার। এত হুড়োহুড়ি নদীর ঝিরঝিরে স্রোতে, পালতোলা নৌকায়, চলবে কেন? কাজেই রাস্তা তৈরী করতে হল, আর সেই রাস্তায় ইংরেজ ঘোড়া ছুটিয়ে, ব্রুম্ হাঁকিয়ে, লুটের মাল তদ্বির-তদারক করে ফিরতে লাগল। যেখানেই ইংরেজ গেছে, সেখানেই মাকড়সার সুতোর মত একটি করে রাস্তা হয়েছে, যেখানে সে গেরস্থালী পেতেছে, সেখানে মাকড়সার ঠ্যাঙের মত চারদিক দিয়ে রাস্তা ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা হল রাজধানী বা ইংরাজধানী, তাই এখানে রাস্তাও বেরল ধাঁ ধাঁ করে। তারপর যেখানে রাজকর্মচারীদের রাখতে হ'ল, যেমন খাজনা আদায়ের কালেক্টর, মামলা বিচারের ম্যাজিস্ট্রেট, সব ভারী ভারী সায়েবসুবো ব্যাঙ্ক, সেখানেও জায়গার চেহারা বদলে গেল, গ্রাম হল টাউন, আর সেই সঙ্গে হল কয়েকটা রাস্তা। কিছু ইংরেজ নিজেরা জমিদারী ফেঁদে বসলেন, মেদিনীপুরে জমিদারী কোম্পানী নামে এদেশে এখনও ইংরেজের সে জমিদারীগিরির জের রয়ে গেছে। এই সব জমিদারীর এক একটি এলাকার ম্যানেজার ছিল এক একজন ইংরেজ, কাজেই সেখানে এক একটা রাস্তাও তৈরি হয়েছিল। মেদিনীপুরে, বাঁকুড়া প্রভৃতি যায়গার আশে পাশে যে ভাল ভাল রাস্তাগুলো দেখা যায়, তার প্রায় সবগুলিরই এই কারণে উৎপত্তি। আর এলেন ধর্মযাজকেরা, এদেশে রাজধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। যেখানে যেখানে এ'দের পীঠস্থান হল, সেখানে রাস্তাও হ'ল।

এই ক'টি গোণাগুণতি রাস্তার বুকে বুট বুলিয়েই ইংরেজের রাজত্ব চলছিল, এমন সময় বিজ্ঞান বানালো মোটর গাড়ী। অবাক কারখানা, ঘোড়া নেই, লাগাম নেই, গাড়ির পিঠে চেপে বসলেই ফুস মন্তরে হুস করে দিকবিদিকে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু এ গাড়ি চলতে হলে ভাল রাস্তার দরকার, কাদা হলে চলবে না, খানা-খন্দ চলবে না, দস্তুর মত পাকা রাস্তা চাই। তথাস্তু, তাই হোক, দেখতে দেখতে মোটর গাড়ীর দৌলতে সারা পৃথিবীতেই রাস্তা বানাবার একটা হুজুক উঠল আর বলতে গেলে রাতারাতি পৃথিবীর চেহারাটাই যেন পাল্টে গেল। খোয়া থেকে পীচ, পীচ থেকে কংক্রীট, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও বকের ঠ্যাঙের মত টি মডেল ফোর্ড থেকে নেউলের মত বুকে হাঁটা চেহারা ধরল।

এ যুগটা হল মোটর গাড়ির যুগ, তাই এ যুগের রাস্তা মানেও মোটর চলার উপযুক্ত রাস্তা। আমাদের দেশে বিশেষ করে পল্লীগ্রামে মোটর বলতে লোকে এখনও হরি মটরকেই বোঝে, সেখানে গাড়ির মটর আর কে চড়ে? কাজেই রাস্তা আর কে বানায়! দু দশটা রাস্তা যে তাও এদেশে হচ্ছে বা হব হব করছে, সে ঐ ইংরেজ আমলের শেখা রাজকর্মচারী আর রাজ-ধর্মচারিদের মুখ চেয়ে। সরকার থেকে কোথাও একটা গোশালা কি মুরগীশালা খোলা হল, সেখানে বসলেন কয়েকজন রাজকর্মচারী ত হল সেখানে রাস্তা। রাজধর্মচারী, মানে আজকাল রাজা ত নেই, আছেন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ইত্যাদিরা। এ'দের সমধর্মী, অর্থাৎ আত্মীয় পোষ্য কি পার্টির হোমরা চোমরারা যেখানে থাকেন সেখানেও রাস্তা হচ্ছে নতুন নতুন। এ ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, এমনি সব গৌরিসেনের খাজাঞ্জিদের দোড় গোড়ার রাস্তাও নেহাত নিন্দের নয়। ওদিকে চোখ দেবেন না। কেননা বারোয়ারিমে ঐসা হোতাই হায়। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকা-গুলোও যদি এ'দের পায়ের দিকে নজর রেখেই খরচ করা হয় তাহলেই ভাববার

কথা। আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ পরিকল্পনায় রাস্তা বাবদ খরচ হবে এইটাই শুধু বলা হয়েছে; কোথায় হবে, কি বৃত্তান্ত, তার জন্যে বাবুদের পেটে পেটে কি পরিকল্পনা আছে সেটা ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

তা ছাড়া টাকাই বা কটা। ও শুনতেই চোদ্দ কোটি, কিন্তু বাঙলা দেশে যত রাস্তার দরকার তার খরচের তুলনায় ও ত তিলোত্তমার তিল। তা ছাড়া মেরামতি খরচা নেই? আছে, বিলক্ষণ আছে; তার জন্যে একটা আলাদা ডিপার্টমেন্টই আছে! তার হাকিম হুকুম, এস ডি ও চাপরাশি, সব আছে, আর আছে কন্ট্রাকটার। এ বলতে গেলে একটা আলাদা রাজ্য। এর আইন কানুন আলাদা, হিসেব পত্তর আলাদা, মাপ-জোক আলাদা, বাইরে থেকে কিছুই হদিশ পাবেন না। শুধু দেখবেন এর কাজেরও শেষ নেই, রাস্তারও উন্নতি নেই। রাস্তার তলায় কতটা রাবিশ উপরে কতটা খোয়া, মাঝখানটা কইঞ্চি উঁচু পাশের দিকে কতটা ঢাল, তার তথ্য জানে শুধু কন্ট্রাক্টার আর ডিপার্টমেন্ট। আপনি দেখবেন এক যায়গায় মেরামত হচ্ছে ত বছর বছর সেইখেনটাতেই মেরামত হচ্ছে; এই খোয়া পড়ল তার দুদিন বাদেই আবার এখানে গর্ত, সেখানে গর্ত, যেন এক ভুতুরে ব্যাপার। ওঁদের বলুন, ওঁরা পাল্টা আপনার কাছেই নালিশ করবেন; দেখেছেন ত? দেখুন; খাটতে খাটতে আমাদের হাড়গুলো প্ল্যাস্টিক হয়ে গেল, কিন্তু রাস্তাগুলো আবার যে কে সেই তারপরে কারণটা খুলে বলবেন—গরু মশাই, আর গরুর গাড়ি; এ দুয়েব জ্বালায় রাস্তা ঠিক রাখার কি জো আছে? এই ছুতোয় শহর থেকে গরু, গাড়ি, গাড়োয়ান সব হটানো হল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে উপায়? সেখানে আশ পাশ দিয়ে রাস্তা থাকলে তার উপর দিয়ে গরু ত চলবেই, কারণ গরু হচ্ছে পাড়াগাঁয়ে মানুষের জুনিয়ার পার্টনার' কিংনা, ছোটাভাই—মানুষ ছাড়া বরঞ্চ গাঁ কল্পনা করা যায়, কিন্তু গরু ছাড়া গ্রাম কি করে হবে? একটা উপায় ঠিক হ'ল। কলকাতায় যেমন গাড়ি চলার রাস্তার পাশ দিয়ে মানুষ চলার ফুটপাথ আছে, শহরের বাইরেও তেমনি রাস্তার পাশ দিয়ে গরু চলার 'হুফ'পাথ থাকবে। তাই হোল, তবুও রাস্তা খারাপ হয়। রাস্তা ইনজিনিয়ার এবং কণ্ট্রক্টাররা বললেন হবেই ত, রাস্তার ধারে গাছ রয়েছে যে! ওর থেকে বৃষ্টির জল টুপটাপ পড়ে, আর রাস্তা একেবারে ছেতরে ছেরকুটে যায়। গাছ কাটার চেষ্টাটা আজও হয়নি, তাই রাস্তা মেরামতও বন্ধ হয় না। আশঙ্কা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকাগুলো মেরামতির কেরামতিতেই না উবে যায়, তাহলে নতুন রাস্তার জন্য আবার আর এক পঞ্চবার্ষিকীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, ততদিন বাঁচব ত?

কি করি, কি করি, ভেবে কথাটা একজন নামকরা নেতার কাছে প্রকাশ করেই ফেললাম। তিনি শুনে জিব কামড়ে বল্লেন, 'আরে আমরা কি বোকা? গ্রামে রাস্তা ত হবেই"। তারপর একটু উদাস হয়ে কবিতা কবিতা উচ্চারণে বল্লেন—রাস্তা হলে তবে ত ঐ পথে সভ্যতার আলোক ঢুকবে আমাদের তামসী পল্লীর অন্ধকারে আমরা যে তারই স্বপ্ন দেখছি"। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনের স্বপ্ন দেখায় বাগড়া দিতে আমার বাঙালী সুলভ ভদ্রতায় বাধল, তাই চুপ করেই রইলাম। কিন্তু ইচ্ছা হয়েছিল বলি যে তাহলে আর রাস্তা বানিয়ে কাজ নেই। কারণ যে যে পথ দিয়ে গ্রামে সভ্যতা ঢুকোতে চাইছেন সেই পথ দিয়েই গ্রামের অসভ্যতাও ত বেরিয়ে আসতে পারে। তখন দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাবেন কি করে আপনারা? কাজ নেই ওসব খোঁচাখুঁচিতে। কিন্তু যদি মনে করেন যে রাস্তা হলে সেই পথে শহরের বাড়তি পয়সাগুলো গ্রামে ঢুকবে আর গ্রামের টাটকা শাকটা সব্জিটা গাড়ী বোঝাই হয়ে বেরিয়ে আসবে, যদি মনে করেন গাঁয়ের ছেলেরা দলে দলে লেখাপড়া না শিখলে আপনাদের সেন্সাসে শিক্ষিতের সংখ্যা হাজার বাড়িয়ে দেবেও বিশেষ কিছুই দাঁড়াবে না, যদি চান গাঁয়ের লোকের অর্থনৈতিক মান বাড়ুক, তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ুক, চাষের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটা কাজের দিকে তারা মন দিক,—তাহলে তাদের নড়তে চড়তে দিন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকাগুলো সবটাই দীঘার জলে না ফেলে কিছুটা গ্রামের কাদায় ছড়ান।

(৪)

একটি রাজকন্যার কাহিনীর সঙ্গে আমার রাজস্থান দেখা এখানে জড়িয়ে গেল। হাতে তার বিষের পেয়ালা কিন্তু তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে বীরের দল সে বিষ অমৃতে পরিণত হবে এই আশায়। রাজকন্যা আত্মহত্যা না করলে তাদের আর নিষ্কৃতি নেই।

এই যদি মহাবীর রাজপুত রাজাদের দুরবস্থা ছিল, এদের ও অন্যান্য রাজাদের নতুন ভারতের মধ্যে এক করে নেওয়ার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা কেন? কেন সমস্ত ভারত আগ্রহ ভরে তাকিয়ে দেখছে যে রাজন্য-ভারত কোন্ পথ বেছে নেয়! আসমুদ্রহিমাচল এক দেশ হয়ে যাবার এক স্বপ্ন কেন সুদূর বাঙলা ও কন্যাকুমারী পর্যন্ত একসঙ্গে দেখতে আরম্ভ করেছি?

এটা কি শুধু ভুগোলের খাতিরে?

না, ইতিহাসের খেলা?

না, রাজনীতির নেশা?

তার উত্তর দিয়ে গেছেন লর্ড ওয়েলিংটন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে যাকে বলা হয় আয়রন ডিউক, সেই নেপোলিয়ন-বিজয়ী বীর। তখন অবশ্য তিনি অত বিখ্যাত ছিলেন না। কিন্তু সামরিক কৌশলের জন্য তিনি তখনি খুব নাম করেছেন। এ দেশে বহু দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর আধুনিক রণনীতির প্রমাণ হাতে হাতে হয়ে গিয়েছে।

তিনি তাঁর বড় ভাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিকে চিঠি লিখেছিলেন যে, রাজপুত শক্তির অস্তিত্ব এমন একটা জিনিস যা হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সবচেয়ে বেশী নিরাপত্তার কারণ হবে।

রাজপুতদের পৃথক পৃথকভাবে দেখলে এদের কারোই বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। এখনো নেই। কিন্তু এদের সবাইকে এক সঙ্গে করে নিতে পারলে যে রাজস্থান একটা মহাশক্তিতে পরিণত হতে পারে সে কথা শুধু বিচক্ষণ ইংরেজ নয়, আমাদের দেশের তখনকার নেতারাও বুঝতে পেরেছিলেন। মারাঠারা তখন হিন্দুস্থানে সবচেয়ে বড় দেশীয় শক্তি। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে অন্তত জয়পুর, উদয়পুর আর যোধপুরকে এক সঙ্গে মিলিয়ে নতুনওঠা বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দাড় করাবার। আর বৃটিশরাও বার বার ঠিক এই চেষ্টা করেছে। দু পক্ষই সমানভাবে রাজপুতদের চাপ দিয়েছে। দাবা বোড়ের চালের চাপে রাজপুতানার নাভিশ্বাস এসে গিয়েছিল।

শুধু রাজাদের নয়, প্রজাদেরও শান্তি ছিল না।

বাঙলাদেশে বর্গীর অত্যাচারের পুরানো কথার গান শুনিয়ে বাচ্চাদের এখনো ঘুম পাড়ান হয়। কিন্তু যে যুগে এই অত্যাচার হত সে যুগে ঘুম কারো চোখে ছিল না।

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেবো কিসে?

কিসে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য মারাঠ বর্গী ঘোড়সোয়ার অপেক্ষা করত না উত্তর জুগিয়ে দিত তার তরোয়ালের খোঁচা এবং সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যেত গ্রামকে গ্রাম ছারখার হবার পর আগুনের মধ্যে

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের কোন শিক্ষা হল না। তাদের রাষ্ট্রশক্তি ভেঙে গেল, কিন্তু লুঠপাটের প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। ক্ষমতা গেল, কিন্তু ক্ষতিকারকতা রয়ে গেল। রাজ্য গেল, কিন্তু উপরাজাদের অভাব হল না। উপদেবতার উপদ্রবে সমস্ত দেশ হাহাকারে ভরে গেল।

মানুষের এই জীবন্ত শ্রাদ্ধে পিণ্ড চড়াতে আসত পিণ্ডারীরা। এদের দেশ, জাতি, নীতি কোন কিছুরই বালাই ছিল না কিন্তু ধর্ম ছিল লুটপাট ও মোক্ষ ছিল অত্যাচার। মাইনে করা লুঠেরাদের ছিল সিপাহীর বৃত্তি ও ডাকাতের প্রবৃত্তি। যখন হাতে মাইনে দেওয়ার টাকা থাকত না সর্দারেরা নিশ্চিন্ত মনে মাইনের বদলে লুটপাটের যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়ে দিত। তাদের মাইনের পিপাসা মিটে গেলে আবার সর্দারদের লুট শুরু হত।

এদের চেয়ে তৈমুর বা নাদিরশার সৈন্যরাও ভাল ছিল কারণ তারা একবার মাত্র এসে লুঠপাট খুনখারাপি করে পিছনে মড়ক আর অগ্নিকাণ্ড রেখে নিজের দেশে ফিরে যেত। কিন্তু পিণ্ডারীরা যে দেশেরই লোক ছিল। কাজেই যাবে কোথায়? তারা শুধু ফিরে ফিরে আসত।

বিদেশী আক্রমণকারী অজানা দেশে এসে যুদ্ধ জয় করে ধনরত্ন লুট করে নারী ও শিল্পীদের দাসদাসী বানিয়ে বন্দী করে নিয়ে যেত। কিন্তু পিণ্ডারী ছিল নরখাদক বাঘ। যেখানে মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পেয়েছে সে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না। সে আবার ছিল সর্বভুক; বছরে বছরে চলত তার যাতায়াত নতুন নতুন দাবী ও অত্যাচারের কলা-কৌশল নিয়ে। রাজা ও প্রজা দুজনকেই সমানভাবে শোষণ করত।

প্রায় দেড়শ বছর আগে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী লোক ছিল

গ্রাম্য রাজপুত ঘোড়সোয়ার

পিণ্ডারী সর্দার পাঠান আমীর খাঁ। আমীর খাঁর লুটপাটের ইতিহাসই সে সময়কার রাজস্থানের ও মধ্য ভারতের ইতিহাস।

বলতে গেলে হোলকারের রাজ্য সেই শাসন করত। সিন্ধিয়ার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা তার ছিল। যোধপুরের মহারাজা আর ভূপালের নবাব তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল এবং জয়পুর ও উদয়পুরের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে আমীর খাঁ লক্ষ লক্ষ টাকা দাবী ও আদায় করত।

সবচেয়ে বড় কথা যে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানী বংশ, শ্রীরামচন্দ্রের সূর্যবংশের সন্তান মেবারের মহারাণার মেয়েকে কার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে তার বিধানও দিয়েছিল এই পিণ্ডারী আমীর খাঁ।

পাঠান হুকুম দিল যে, হয় কৃষ্ণ-কুমারীকে তার হাতের পুতুল যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে, না হয় তাকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হবে। সেই রূপসী শিশোদীয়া বংশের রাজ-কুমারীকে,—যার পূর্বপুরুষ মহারাণা প্রতাপ জয়পুরের রাজা মানসিংহ বোনের সঙ্গে মোগল সম্রাটের বিয়ে দিয়েছেন বলে তার সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে অস্বীকার করেছিলেন—যে বংশে বারের পর বার মেয়েরা জহর ব্রত করে শত্রুকে পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দেখিয়ে হাসিমুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে।

সেই মহাবংশের রাজকুমারীকে হাতে তুলে নিতে হল বিষ—যে বিষ সমস্ত রাজস্থানের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই বিষ। নিজেদের খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থার বিষ। দুর্বল অসহায়তার বিষ।

জয়পুরের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়।

সিন্ধিয়া আর হোলকার দুজনেই মারাঠা। দুজনকেই বৃটিশরা যুদ্ধে হারিয়ে তাদের রাজ্য দখল করে নিয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে কি তারা এক সঙ্গে মিলে দুজনেরই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আরো অন্যান্য দেশী রাজাদের সঙ্গে মিলিত হবেন?

না, ভারতের ইতিহাসে সে রকম ব্যাপার ঘটার কোন নজির নেই। শুধু আজই আমরা একমত এক প্রাণ হয়ে এক ভারতের সন্তান বলে নিজেদের মনে করতে শুরু করেছি।

অতএব সিন্ধিয়া ও হোলকার দুজনেই পালা করে জয়পুরকে শাসাতে ও লুট করতে কোন দ্বিধা বোধ করলেন না। বার বার লুটপাটে অস্থির ও ফতুর হয়ে জয়পুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা পাবার জন্য সন্ধি করল।

শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায় দেখে হোলকার শাসিয়ে দিলেন—রসো না, বৃটিশের সঙ্গে সন্ধির রস তোমায় ভাল করে খাইয়ে দিচ্ছি। এমনভাবে ছারখার করব জয়পুর রাজ্য যে বৃটিশও আর তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না।

ভয় পেয়ে জয়পুর বৃটিশ রেসিডেন্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু রেসিডেন্ট ত এই হোলকারের হুমকিতে বিশ্বাস করলেনই না, বরং পাল্টা নালিশ করলেন যে যোধপুর, জয়পুর ও উদয়পুর (মেবার) এক জোট হয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে দল বাঁধছে। এদিকে হোলকারের সৈন্যরা ততদিনে জোর করে জয়পুর রাজ্যের সীমায় ঢুকে নিজেদের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু জয়পুরের রাজার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের রাজ্য কি করে যে মারাঠার হাত থেকে রক্ষা পাবে তার ঠিক নেই, কিন্তু তার সৈন্যরা উদয়পুরে পাট্টা গেড়ে বসে আছে যাতে কৃষ্ণকুমারী তার হাত ছাড়া না হয়ে যায়। সৈন্যরা বিয়ের তত্ত্ব জোর করে মেবারের মহারাণার কাছে গছিয়ে দিল এবং তাঁকে তা নিতেও হল।

তাতে অবশ্য মহারাণার আর্থিক অবস্থার সুহারা হয় না। কারণ প্রায় এই সময়েই সিন্ধিয়া জোর করে মেবা র কাছ থেকে ষোল লক্ষ টাকা আদায় করে নেয়। অছিলার অভাব হয়নি—মহারাণা হোলকারের আশ্রয় পেয়েছেন বলে সিন্ধিয়ার দুঃখ হয়েছে, কাজেই সিন্ধিয়া তাকে নিজের আশ্রয় দেবার জন্য এগিয়ে আসছে এবং এই বদমায়েস জয়পুরীয়ার হাত থেকে কৃষ্ণকুমারীকে বাঁচাবার জন্য তার সদিচ্ছার অন্ত নেই! অতএব মহারাণাকে তার মূল্য দিতে হবে বৈ কি?

রাজকুমারীর অসম্মানের এখানেই শেষ হল না। সিন্ধিয়া প্রস্তাব করে বসল যে যোধপুর ও জয়পুর এই দুই পক্ষের গোলমালের মধ্যে উদয়পুরের যাবার কোনই দরকার নেই; সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য সিন্ধিয়া নিজেই রাজকুমারীকে বিয়ে করে ফেলতে চায়।

সূর্য বংশের কন্যা, মহারাণা প্রতাপসিংহের বংশের কন্যা কৃষ্ণকুমারী ও "চাষার বেটা" সিন্ধিয়া।

মহারাণার মহলে দরজা বন্ধ করে সবাই স্মরণ করতে লাগল যে মাত্র কয়েক পুরুষ আগে সিন্ধিয়ার পূর্বপুরুষের হাতে যা শোভা পেত তা রাজদণ্ড নয়, এমন কি সামান্য তলোয়ারও নয়, শুধু চাষের হাল আর মহিষের রাশ।

এদিকে কোম্পানী নালিশ করতে লাগল জয়পুরের কাছে যে সে সন্ধির সর্ত অনুসারে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সৈন্য দিয়ে সহায়তা করছে না।

অন্যদিকে জয়পুরীয়া সৈন্য উদয়পুরের বুকের উপর গেড়ে বসে থাকাতে লুটপাট চালাতে অসুবিধা বোধ করে সিন্ধিয়া কোম্পানীকে অনুরোধ করল যে, কোম্পানীর বন্ধু জয়পুর যেন শীঘ্রই সৈন্য সরিয়ে নেয়; তা না হলে মারাঠা প্রভুর রাগ উদয়পুরের বদলে জয়পুরের উপর গিয়ে পড়বে। জয়পুর তাহলে ছারখার হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত সিন্ধিয়া জয়পুরের সৈন্যদের যুদ্ধ করে উদয়পুর থেকে ভাগিয়ে দেয়। পাকা দেখা পাকা করা আর হল না। শঙ্খের বদলে কামানের আওয়াজ তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলল।

শুধু রাজনৈতিক অক্ষমতা নয়, নৈতিক নির্লজ্জতারও সীমা ছিল না সে যুগের রাজস্থানে।

যুদ্ধ করতে সাহস নেই বলে বিয়ে করতে উৎসাহ থাকবে না কেন? এ ব্যাপারের আরো একশ বছর পরে ঘরে ঘরে কি ছোকরারা বিয়ে করছে না বৌকে খাওয়াতে পারার সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও?

উদয়পুর থেকে সৈন্যরা পালিয়ে আসার পর জয়পুর বন্ধু কোম্পানীর কাছে নিবেদন করল যে এখন যেন জগৎ সিংহ ও কৃষ্ণকুমারীর বিয়েতে সম্মতি দেবার জন্য কোম্পানী সিন্ধিয়াকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে শুভকার্যে সাহায্য করে। শুভকার্যে বিলম্ব করতে নেই এই মহাবাক্য স্মরণ করে জয়পুর লিখে পাঠাল যে আগামী বসন্তকাল থেকে বর্ষার প্রথম ভাগের মধ্যেই যেন প্রজাপতির কৃপা হয়।

কোম্পানী রাজনীতিতে বড় হুশিয়ার। প্রজাপতিকে উড়তেও দিল না, পাখাও ছেটে দিল না। শুধু বুড়ো আঙুলে নাচাতে নাচাতে বলল যে, এ সব অপকার্যে শক্তি অপব্যয় করার সময় এখন নয়।

এদিকে যোধপুরের মহারাজা মানসিংহের অবস্থাও সমান শোচনীয় ছিল। সর্দারদের সঙ্গে যোগসাজসে সিংহাসন পেলেও তার পথ নিষ্কণ্টক ছিল না। আর একজন সিংহাসনের দাবীদার জয়পুরের মহারাজার দলেই ছিল এবং জয়পুরের মহারাজা উদয়পুরে অপমানিত হওয়ার পর অনেক সৈন্য নিয়ে ও এই দাবীদারকে সঙ্গে নিয়ে চললেন মাড়োয়ারের দিকে। এত সৈন্য নাকি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কোন রাজপুত রাজা জড়ো করেন নি ক নো। কিন্তু হায় উদ্দেশ্যটা কি ছোট, কি সামান্য তা ভাবতেও লজ্জা হয়।

ভীষণ যুদ্ধ হল। অনেকদিন ধরে চলল সে যুদ্ধ। যোধপুর দুর্গের ভিতরে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করলেন রাজা মান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা জগৎসিংহই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন

কোম্পানী বহুদিন থেকেই জয়পুরকে যোধপুরের সঙ্গে আপোস করতে, না হয় কোম্পানীকে সালিস মানতে অনুরোধ করছিল। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষীর বিভাগের ব্যাপার জটিল হয়ে উঠছে দেখে কোম্পানী ল্যাজ গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ল অর্থাৎ এই পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িত থাকতে চাই না বলে সন্ধি ভেঙে দিল।

মানসিংহ এবার এমন একটি অপকার্য করলেন যাতে তাকে আর কেহ, এমন কি তার পাত্রমিত্ররাও আর মানী লোক বলে মনে করতে পারে না। তিনি পাঠান সর্দার আমীর খাঁকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের সিংহাসনের দাবীদারকে সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করলেন। পিন্ডারী সর্দার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দরগায় গিয়ে পাগড়ী বদল করে প্রতিজ্ঞা করল যে যোধপুরের গদীতে তাকেই বসিয়ে দেবে। সেখানে সেই দরগারই সামনে এই শক্তি বৃদ্ধিতে আনন্দোৎসব করবার জন্য শুরু হল নাচ গান, চলল মদের পেয়ালা। এমন সময় তাঁবুর দড়ি কেটে দিল পিন্ডারীরা। ঘেরাটোপে জড়িয়ে পড়ল সব রাজপুত। ছররা গুলির বৃষ্টি ধারায় সব শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু রক্তের পিপাসা শেষ হল কি?

না। যে বিষের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছিল সমস্ত রাজস্থানে তার নিঃশ্বাস শুধু বাইরের জগতে, সৈন্য সামন্ত রাজাদের মাঝখানে ছড়িয়েই কেন শেষ হতে যাবে? মায়ের মন্দিরের ধূপ যে এখনো চারদিকে গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাকে ছাপাতে না পারলে বিষের সাফল্য পূর্ণ হবে না।

ইতিমধ্যে জয়পুর যোধপুরের সঙ্গে যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে হোলকারের শরণাপন্ন হ'ল।

কিন্তু রাম না হয় রাবণ একজন ত মারবেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ব্যাপারে রাম কেহ ছিল না। দু পক্ষেই রাবণ।

হোলকারের শরণ নেওয়াতে সিন্ধিয়া চটে জয়পুর আক্রমণ করে লুটপাট করে

একেবারে ছারখার করে দিল। সিন্ধিয়ার শিবিরে বসে একজন ইংরেজ রাজদূত লিখে গিয়েছিল যে—সব শস্য নষ্ট করা হয়েছে। ঘর বাড়ীর কড়ি বরগা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গিয়েছে। দরজা ও চৌকাট গুলি উপড়িয়ে নিয়েছে। গ্রামগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে শুধু ধোঁয়া উঠছে।

বিষের ধোঁয়া।

সময় বুঝে বাজ পাখীর মত ছোঁ মারতে নেমে এল পিন্ডারী সর্দার। পনের লক্ষ টাকা দিয়ে জয়পুর সিন্ধিয়াকে শান্ত করল। কিন্তু পিন্ডারীকে ঠান্ডা করে কি দিয়ে? কি আর বাকী আছে?

আমীর খাঁর নিজেরও কিছু ছিল না তখন। বেতনভোগী লুঠেরাদের মাইনে দিতে পারে নি বলে ওরা তাকে রোজ অনাহারে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত; জয়পুর শহরের পাঁচিলের বাইরে তাঁবুর বাইরে টেনে এনে পাইকারী দরে অপমান করত। জয়পুর পাঁচিলের ওপার থেকে সব দেখত।

তবুও এত অসহায় ছিল জয়পুর যে এই আমীর খাঁকেই তখন ষোল লক্ষ টাকা নজরানা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে উপায় ছিল না।

এর পর হিম্মত বেড়ে গেল পাঠানের। সে উদয়পুরে এসে কৃষ্ণকুমারীর ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধে মহারাণাকে হুকুম পাঠাল। হয় পাঠানের আশ্রিত রাজা মানকে বিয়ে করতে হবে না হয়—না হয় এই ষোড়শী রূপসী রাজকুমারীকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে।

আর তা না হলে?

তা না হলে একটি রাজকন্যার ইজ্জতের জায়গায় মেবার বংশের সব পুর-নারীরই ইজ্জত যাবে। অর্থাৎ লম্পট উচ্ছৃঙ্খল পাঠান পিন্ডারীরা রাজপ্রাসাদে ঢুকবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

রাজোয়ারার রাওয়ালা * হচ্ছে একটি আলাদা জগৎ। সেখানে অজানা গলি-পথে, অসংখ্য সুড়ঙ্গ দিয়ে ষড়যন্ত্র নিঃশব্দে আনাগোনা করে। তার মধ্যে এই কাহিনীর আসল ব্যাপারটা হারিয়ে গেছে। তবে এটুকু ঠিক যে একজনের পর একজন বীর পুরুষ নারী হত্যা করতে

* রাজস্থানের রাজ-অন্তঃপুর

অস্বীকার করে লজ্জা ঘৃণায় পিছিয়ে গেল, তবু 'বাপোতার' * সম্মান রক্ষা করবার জন্য নিজের মধ্যে ঝগড়া ভুলে এক হয়ে শত্রুকে তাড়াবার জন্য এগিয়ে এল না। শুধু মাথা নীচু করে সরে গেল।

মহারাণার খুড়তত ভাই যে জিভ এই শাস্তির আদেশ দিয়েছে সে জিভকে অভিশাপ দিতে দিতে সরে গেলেন। নিজের ভাই এই মৃত্যুদণ্ড পালন করবার জন্য রাজী হলেন শুধু এই ভেবে যে, রাজকন্যার হত্যা শুধু রাজ-হস্তেই হওয়া উচিত। এগিয়ে গেলেন তিনি তরোয়াল হাতে, কিন্তু স্বর্গের নিষ্পাপ একটি ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। হাত থেকে কৃষ্ণকুমারীর পায়ের কাছে পড়ে গেল তরোয়াল।

কিন্তু রাজকন্যার মুখে নেই বারণ, মনে নেই ভয়। প্রশান্তভাবে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনে পেশোলা হ্রদের বুকে জল ছল্-ছল্ করে উঠল।

মহারাণী মায়ের নিজের সন্তানকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই। তিনি শুধু কাঁদতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কোন বীরপুরুষ অস্ত্রাঘাতে রাজকুমারীকে হত্যা করতে রাজী হচ্ছেন না দেখে পুরনারীরা বিষ বানিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁকে বলা হল যে, এই পাত্র হচ্ছে তার পিতার কাছ থেকে দান।

রাজকুমারী মাথা নীচু করে পিতার দীর্ঘজীবন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে একটি শেষ প্রণাম জানিয়ে পেয়ালাভরা বিষ এক চুমুকে শেষ করে দিলেন।

চোখ দিয়ে এক বিন্দু জলও ঝরে পড়ল না। মাথার মধ্যে বিষের ক্রিয়া হতে আরম্ভ করেছে, তবু তিনি মাকে অনুরোধ করলেন কান্না থামাতে। বললেন,—"কেঁদো না মা। আমি কি মরতে ভয় পাই? আমি কি তোমার মেয়ে নই? আমি কেন ভয় পাব? জন্ম থেকেই তো আমাদের আত্ম-বিসর্জনের জন্য তৈরী করা হয়। শুধু বেরিয়ে যাবার জন্যই তো আমরা পৃথিবীতে আসি। আমি যে এতদিন বেঁচেছি, তার জন্য বাবাকে ধন্যবাদ দিই।"

তখনো তিনি মরছেন না দেখে আবার নতুন পেয়ালা ভরে বিষ এল। তবু ফল নেই। একটু পরে আবার আর এক পেয়ালা। তবু রাজকন্যার জীবনদীপ নেভে না।

দুর্যোধনের রাজসভায় দ্রৌপদীর শাড়ীর এমনভাবেই শেষ হচ্ছিল না। যত টানে দুঃশাসন ততই সে শাড়ী বেড়ে বেড়ে যায়। আজও শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন নাকি কৃষ্ণকুমারীর পাশে? সর্বলজ্জার সর্ব-দুঃখের শেষ শরণ সেই শ্রীহরি?

এদিকে রক্তপিপাসু পিণ্ডারী সর্দার আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। প্রাসাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে খোলা তরোয়াল আর ভরা বন্দুক হাতে পিণ্ডারীর দল। লালসা তাদের লুণ্ঠনের প্রবৃত্তিতে ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

আবার এল তাড়াতাড়ি আর এক পেয়ালা। স্নিগ্ধ কুসুম ফুল ও মূলের রস। স্নিগ্ধ শান্তিতে এবার হাসিমুখে ঢলে পড়লেন রাজকন্যা। বলে গেলেন—এবার এই ব্যাপার শেষ হোক। শেষ হোক।

রাজপুত চারণ ভাষার উচ্ছ্বাস ও বর্ণনার রঙ ফলান বন্ধ করে এখানে শুধু বলেছে—

"সে ঘুমাল।"

* * *

কৃষ্ণকুমারীর বিষপানে নীলকণ্ঠ যে রাজস্থান তার মিলনের অমৃতপান করবার সময় কি এল?

সেদিন রাজস্থান ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাই ছোট ছোট মারাঠা ও পিণ্ডারী সর্দারদের দস্যুতার বিরুদ্ধে পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে নি। এখন সমস্তটা দেশ তাকে দু হাত তুলে ডাকছে একসঙ্গে মিশে যেতে। প্রজারা সাড়া দিয়েছে। রাজারা দেবে কি?

চন্দ্রমহল রাজপ্রাসাদের দোতালায় জয়পুরের আগেকার দিনের মহারাজাদের অয়েল-পেণ্টিংগুলি জীবন্ত ভাব ধারণ করে তাকিয়ে আছে।

বাইরের পিচঢালা মসৃণ রাজপথে চলেছে প্রকাণ্ড এক প্রসেশন—রাজস্থানের জনসাধারণ। তেরঙা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে তারা দাবী জানাচ্ছে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এক হয়ে যাবার জন্য। দেশের ইতিহাস তৈরী করার মধ্যে এতদিন তাদের কোন হাত ছিল না। তারা ছিল শুধু পিণ্ডারী মারাঠার লুণ্ঠন সহ্য করতে, বৃটিশ রেসিডেন্সীর অনমনীয় প্রভাব অনুভব করতে আর বৃটিশরক্ষিত দরবারের বিলাসব্যসনের ব্যয়ভার যোগাতে। অন্য কিছুতে তাদের ছিল না কিছু হাত।

রাজপুতেরা যখন মরণপণ করে আশা-হীন যুদ্ধে নামত, তখন মাথায় পরত হলদে পাগড়ী—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের রঙের পাগড়ী। জরদাকাপড়াওয়ালা তাদের মূর্তি শত্রুকে বুঝিয়ে দিত যে, মরিয়া হয়ে তারা মারতে নেমেছে।

আজ সেই রাজপুতেরা শাদা গান্ধী টুপীতে মাথা ঢেকে নতুন যুদ্ধে নেমেছে।

এলো মহাজন্মের লগন।

(ক্রমশঃ)

* বাপের দেশের Fatherland

সাতাশ

রমা বললে—ঘর-সংসার স্বামী-পুত্র বিষয়-সম্পত্তি খাওয়া-পরা নিয়ে দুঃখ আমার নয়। সে ভুল তুমি বুঝবে না তা' আমি জানি। তবে কোন ব্যক্তিবিশেষের অভাবে যে আমার এগুলো তুচ্ছ মনে হয়—এও যেন তুমি মনে করো না। দোহাই তোমার। আমাকে তো দেখছ। দেখে বুঝতে পার যে, সংস্কারের বালাই আমার নাই। ওগুলো আমি ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি। এ দিক দিয়ে ওই কপিলদেবের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমার স্বামীকে তুমি দেখেছ—কিন্তু তাকে ঠিক জান না। সে ছিল যাকে বলে সত্যিকারের নাস্তিক। আর ছিল ইংরিজি পড়াশুনোর ওপর ঝোঁক। কিছুই মানত না। তার দোসর ছিল—প্রদ্যোত। প্রদ্যোত ঘোষ গো! উকীল! প্রদ্যোতও নাস্তিক। কিন্তু যেমন স্থূল—তেমনি—কি বলব? লোকটি একেবারে জন্তুস্বভাব সম্পন্ন। না—তাও নয়। জন্তুতেও কতকগুলো জৈববিধান মেনে চলে—ওটা তাও চলে না। ও লোকটা বোঝে শুধু গো-গ্রাসে খাওয়া—সে ক্ষিদে থাক বা না থাক। তার হাতেই পড়লাম স্বামীর মৃত্যুর পর। ভাবনা যে হয় নি তা নয়, কিন্তু সে কিছু নয় কারণ আমার মনটাও তখন ওইদিকে ঝুঁকেছে। এই সময়ে এই কপিলদেব না-এসে পড়লে ওর সঙ্গেই ভেসে যেতাম। কপিলদেব আমাকে নতুন পথ দেখালে। আমার প্রতি তার আকর্ষণ অবশ্য আছে, আমার মন সেও পেতে চায়। প্রদ্যোতের গ্রাস থেকে সে আমায় রক্ষা করেছে—আজও করছে। ইচ্ছে করলেই কপিল পিস্তল বের করতে পারে সে প্রদ্যোত জানে। আমার উপর জোর করে অনাচার চালালে, কি তার চেষ্টা করলেও সে তা চালাবে এটা ইঙ্গিতে কপিল তাকে জানিয়েও দিয়েছে। আমার এক পাশে বা পিছনে প্রদ্যোত লোলুপ জানোয়ারের মত ঘোরে আর পাশে পাশে চলে কপিলের মত মানুষ—আমার দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে চায়। দুদিকে যখন দুজন মনোরঞ্জনের জন্য ফেরে তখনকার মত উল্লাস বিহ্বলতার সময় মেয়েদের জীবনে হয় না। এ সময়ে কোন বিশেষ মানুষের কথা মনেও হয় না। তুমি বিজয়ের কথা বলেছিলে।

রমা হাসলে। বললে—ছি গৌরীদা! প্রদ্যোতটা লেখাপড়া জন্তু, বিজয় মূর্খ। কাচও রোদের ছটায় ঝকমক করে হীরেও করে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে অনেক দামের তফাৎ। মূর্খ ভাল লোক সংসারে কাচের সামিল। ওতে আমার একবিন্দুও আগ্রহ নাই।

গৌরী নীরবেই শুনে যাচ্ছিল, কোন কথা বলে নাই। এতক্ষণে বললে—তরকারীটা এইবার নামিয়ে ফেল রমা। সুপরিপক্ব ফলের মত গন্ধে ওটা জানিয়ে দিচ্ছে—আমি তৈরী আমাকে নামাও নইলে আমি এবার পুড়ব।

—উঁহু। আর একটু হবে।

ঘাড় বেঁকিয়ে গৌরীকান্তের দিকে চেয়ে বললে—ওটার অবস্থা এখন সদ্য পাশ করা তরুণের বাক্য ফরফরানির মত। এও এক ধরণের অকালপক্বতা। এখন আঁচটা কমিয়ে দিয়ে দু'তিন মিনিট ওকে মজতে দিতে হবে। আমার মত আর কি। তোমার সামনে বকেই যাচ্ছি—বকেই যাচ্ছি। লজ্জা পাচ্ছি না। বুঝেও বুঝছি না যে এ সব কথা তোমাকে ছুঁতেও পারছে না।

—অভিমানের কথা বললে ভাই! কিন্তু না, তুমি বিশ্বাস কর এতটুকু অবহেলা কি কৌতুক আমার মনে নাই। তবে বেলা হয়েছে—ক্ষিদে পেয়েছে এবং সেই ক্ষিদের মুখে তোমার রান্নার গন্ধটা আমাকে প্রলুব্ধ করেছে এটা ঠিক। নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় সদ্যপাশ করা তরুণের পাণ্ডিত্য বিস্তারের মুখর ভাষণও ভাল লাগে।

কড়াইখানা নামিয়ে ফেলে রমা বললে—তা হ'লে থাক একটু শক্ত। নামিয়েই ফেলি। তুমি বসে পড়, আমি তোমাকে পরিবেশন করি।

—একসঙ্গে বসে পড় ভাই। সঙ্কোচ করবে কেন? সে করার তো তোমার কথা নয়। এবং আমার মতেও ওটা ঠিকও নয়। একসঙ্গে খাওয়ার আনন্দ আছে। তা ছাড়া—তোমার কথাগুলিও বলা হবে।

খেতে রমা বসল কিন্তু কথা আর বললে না। নীরবেই খেয়ে চলল।

এক সময় গৌরীকান্তই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশ্ন করলে—রমা।

—বল।

—কই—তোমার কথা বললে না?

—আমার কথা? হাসলে রমা।

—হ্যাঁ। বলতে বলতে মাঝখানে থেমে গেছ। মনে হচ্ছে—ভূমিকাই করেছ শুধু। এবং সেই মুখে আমার কথা শুনে তোমার ধারণা হয়েছে—তোমার দুঃখের কথা শুনতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই।

—তোমার এই কথাতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হবার কথা গৌরীদা।

গৌরী মুখ তুলে বললে—ঈশ্বরের শপথ করে বলছি ভাই—

—ঈশ্বরের কথা ছেড়ে কথা বল গৌরীদা।

—তুমি বিশ্বাস কর না?

—বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছে আমাকে। সে শপথ করতে হয় আমাকে। এই তো আজই শাহপুরে বার কয়েকই করেছি। হাসলে রমা।

ঠিক এই মুহূর্তেই গৌরীকান্ত বলে ডেকে—বাড়ী ঢুকলেন কোন মহিলা।

গৌরীকান্ত বললে—খুড়ীমা!

অর্থাৎ বিজয়ের মা।

রমার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সে হাত গুটিয়ে বললে—মাসীমা।

—কই রে! কোথায়?

—খেতে বসেছি। যাচ্ছি।

—এত বেলায় খাচ্ছিস বাবা? হ্যাঁরে—কে এসেছে তোর বাড়ী? ঘাট থেকে একটি মেয়ে স্নান করে আমার পাশ দিয়ে উঠে চলে এল—তোর বাড়ী ঢুকল। মনে হ'ল—যেন বড্ড চিনি। কে-রে?

তিনি এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে রমার দিকে চেয়ে রইলেন। বিজয়ের মায়ের দৃষ্টি কমে এসেছে, চোখে ছানি পড়তে শুরু হয়েছে; তার উপর রমার এই নূতন চেহারা তিনি দেখেন নি বা তার কল্পনারও ঠিক মেলে না। তাই ঠিক চনে উঠতে পারলেন না। বললেন—ইনিই বুঝি। কে ইনি গৌরীকান্ত? মনে হচ্ছে বড্ড চিনি, কিন্তু মনে করতে পারছি নে।

রমার চোখে মুখে একটা ভাবান্তর ঘটে গেল। বিদ্রোহ ফুটে উঠল তার দৃষ্টিতে। কঠিন হয়ে উঠল মুখভঙ্গি। সে লক্ষ্য করেই গৌরীকান্ত বললে—হাঁ, উনি আজই এসেছেন। সদর থেকে এসেছেন এ-এস-পির সঙ্গে। কিন্তু আপনি একটু বাইরে বসুন খুড়ীমা। আমার এখানে তো রান্না খাওয়া এঁটো কাঁটার তেমন বাছ বিচার নেই।

—না। আমি তো ওঁকে চিনি।

—হ্যাঁ। চেনেন। আমি রমা।

—রমা?

—হ্যাঁ। আপনাদের বাড়ীতে ভাত-রান্না করতেন—আমার মা। আপনাদের সেই ভাতরাঁধুনীর মেয়ে—রমা—সেই আমি।

—রমা। তুমি—তুই রমা! হ্যাঁ তো। তাই তো বলি এত চেনা অথচ মনে করতে পারছিনে! কই রে, দেখি দেখি। আমার আবার কপাল মা—চোখের দৃষ্টি গেছে কমে—ঘরের বাইরে যদি বা দেখতে পাই, ভিতরে একটু অন্ধকার হলেই সব ঝাপসা। রমা—তুই সেই রমা!

বিজয়ের মা এগিয়ে গেলেন রমার দিকে।

রমা বললে—আমি খেতে বসেছি। একটু বসুন বাইরে, আমি খেয়ে উঠি।

খেতে বসেছিস?

—হ্যাঁ। সারাদিন খাই নি—গৌরী-দা'র এখানে এলাম; উনি খেতে বললেন। আমি তো আমিষ নিরামিষ বাছবিচার করি নে—খেতে বসে গেলাম। আমাকে এখন ছোঁবেন না।

—তা' খা। তার জন্যে কিছু বলছিনে। সে কালে নির্জলা একাদশী ছিল—একালে জল খাওয়া উঠেছে। আমিও এখন জল খাচ্ছি রে। আমাদের কালে ব্রাহ্মধর্ম উঠেছিল—সে ধর্মে কত বাছবিচার উঠিয়ে দিয়েছিল। ভালও করেছিল—মন্দও করেছিল। তুই আঁষ নিরামিষ মানিস নে—তার ভালমন্দ তোর। তার জন্যে তোর উপর আমি রাগ করছিনে। কিন্তু একজনের রান্না তোরা দুজনে খাচ্ছিস তোদের কম হ'ল না তো! ওরে আমার কাছে গেলিনে কেন? আমার হাঁড়িতে তো ভাত রাখতেই হয়। বিজয় যে কখন একজন দুজন বাড়তি লোক এনে হাজির হবে তার তো ঠিকানা নেই!

—না-না। কিচ্ছু কম হয় নি। আপনি একটুও ব্যস্ত হবেন না। রমাই বললে।

বিজয়ের মা এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে এসে রমার পাশে বসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে পরম স্নেহভরে বললেন—সেই রমা তুই রে। এ্যাঁ! এমন হয়েছিস!

—হ্যাঁ। ওই হ্যাঁ কথাটি ছাড়া আর কোন কথা রমা খুঁজে পেলে না।

—বড্ড ভাল লাগছে রে। বড্ড ভাল লাগছে। বড় ভাল মেয়ে ছিলিরে তুই! বড় ভাল ছিলি।

—এখন কিন্তু তেমনি দুষ্টু পাজী হয়েছি।

—না-না-না। ও কথা আমি বিশ্বাস করি নে।

—কেন? বিজয়দা আপনাকে বলে নি? নিশ্চয় বলেছে।

—যা আমি নিজে জানি—তার উল্টো বিজয় বললেই বা আমি বিশ্বাস করব কেন? কিন্তু—পাতের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে দেখে বললেন—কিন্তু এ যে তুই কিছুই খাস নি মা! কই ব্যান্নই বা কই রে? খাবি কি দিয়ে? তারপর গৌরীর বাড়ীর রান্না তো কাঁচা আর সেদ্ধ। তুই একটু বস। আমি আসছি। আমি নিজের হাতে শুক্তো রান্না করেছি। বিজয় ভাল-বাসে খেতে—রেখেছি তার জন্যে। আমি নিয়ে আসি। খবরদার উঠবি নে।

ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা যথাসাধ্য দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন। রমা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—কি বিপদে পড়লাম বলুন তো!

গৌরীকান্ত বললে—বিপদ আর কি? একটু বস। কতক্ষণ আর হবে?

—ক্ষণের জন্য নয় গৌরী দা; আমার বুকের ভিতরে যে কি হচ্ছে, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। এ যেন একটা মর্মান্তিক নির্যাতন ভোগ করছি আমি।

—নিজকে একটু সংযত কর। এত অধীর হবে কেন? অন্তত তোমার তা হওয়া উচিত নয়।

এ কথার কোন উত্তর দিলে না রমা। সে যেন অকস্মাৎ উদাস হয়ে উঠল। উদাস দৃষ্টিতে বাইরের পড়ন্ত বেলার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ বললে—অত্যন্ত চুপি চুপি। বললে—কপিলদেব

সেদিন দলের নতুন নির্দেশ নিয়ে ফিরে এসেছে। এখানে বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা হবে। তাতে যারা এখানে বাধা দেবে—তাদের—। তাদের তো অনেকেই জানা লোক। তার একটা তালিকা আগে থেকেই কপিলদেব করেছে।

চুপ করে গেল রমা। যেন বলতে বলতে শিউরে উঠে হঠাৎ থেমে গেল।

গৌরীকান্ত বললে—সে তালিকায় আমার নাম আছে বলছ!

—না। তোমাকে পেলে ওরা এখনও খুশী হয়। নইলে রাত্রে আমি যখন তোমার কাছে এসেছিলাম, তখন কপিলদেব আমার সংগে আসত না। লুকিয়ে ওর অমতে যা করি সে আলাদা কিন্তু ওর সামনে ওর অমতে কিছু করতে পারি নে আমি। সে শক্তি আমি হারিয়েছি। নবগ্রামের তালিকায় প্রথম নাম আছে কিশোরবাবুর।

—কিশোরবাবুর?

—হ্যাঁ। ওঁর ওই ধর্মনিষ্ঠা—সেই পুরানো কালের নীতিবাদ সব চেয়ে বড় বাধা।

স্তব্ধ হয়ে রইল গৌরীকান্ত। অবিশ্বাস করলে না সে। নূতন ধর্ম আনতে গেলে, পুরানো ধর্মকে আগে ধ্বংস করতেই হবে। মন্দির বিগ্রহ পরে ধ্বংস করলে চলে—সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হবে ওই ধর্মমন্দিরের তালার চাবী যার হাতে থাকে।

—তারপর দ্বিতীয় নাম—

—এই এসে পড়েছি আমি। একটু দেরী হয়ে গেল। গরম করে আনলাম।

এই মুহূর্তে এসে পড়লেন বিজয়ের মা। হাতে একখানা থালা, থালার উপর তিনটে বাটি। থালাখানা নামালেন সামনে। শুধু শুক্তো নয়। একটা বাটিতে শুক্তো, একটাতে ভাত, একটাতে দুধ: থালাতে দুটি মর্তমান কলা খানিকটা চিনি।

—নে, ও ঠাণ্ডা ভাত সরিয়ে রাখ। এ ভাত গরম আছে। দমে বসানো ছিল। গৌরী তুইও নে বাবা চারটিখানি। শুক্তো দিয়ে দুটি খানি খা। দুধ চিনি কলা মেখে দুটি খাবি। ছেলেবেলা রমা বড্ড ভালবাসত দুধ চিনি কলা মেখে ভাত।

—কিন্তু সে রুচি আর নেই মাসীমা। সে রমাই আমি আর নই। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন ওসব আমি খেতে পারব না। কিছুতেই পারব না। আমি হাত জোড় করছি আপনার কাছে।

—কেন বল তো?

—আমার ক্ষিদে নেই। রুচি হচ্ছে না।

বিজয়ের মা এবার তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি চোখ দুটি রমার মুখের উপর রেখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—হ্যাঁ রে, তোর ছেলে বেলায় তুই আমাদের বাড়ীতে বড় কষ্ট পেয়েছিস, না?

ঠাকুরঝি তোকে বড় কটু কথা বলতেন—না তিনি কটু কথা বলতেন না কিন্তু বড় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তুই তাঁকে ভয়ও করতিস। তোর সঙ্গে বিজয়ের কথায় তোর মাকে জবাব দিয়েছিলেন। সেই সব কথা তোর মনে আছে—না? হ্যাঁ—দুঃখ তোরা পেয়েছিস। কিন্তু এত মনে লেগেছিল রে যে—।

রমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না—মাসীমা না। আমি আর পারব না। খেতে আর পারব না।

সে দ্রুতপদেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাত মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। গৌরীকান্ত বললে—আমায় একটু শুক্তো দিয়ে ওগুলি তুমি নিয়ে যাও খুড়ীমা। বিজয় বোধ হয় শিগ্গির ফিরবে।

বিজয়ের মা গৌরীকান্তের পাতায় খানিকটা শুক্তো দিয়ে বললেন—কার মনে যে কোথায় কাঁটা বিঁধে থাকে বাবা! মেয়েটার মনে একটা শক্ত কাঁটা বিঁধে আছে বাবা।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—কিন্তু আশ্চর্যের কথা কি জানিস—মানুষের মনে শুধু আঘাত-গুলোই থাকে। স্নেহ-ভালবাসা এ সব থাকে না। ওটা যেন পৃথিবীতে পাওনাই।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। —আমি চলি বাবা। আমি থাকলে ও অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। আমারই বোঝা উচিত ছিল রে। গোড়াতেই হুঁশ করা উচিত ছিল। ভাবা উচিত ছিল—মেয়েটা অসময়ে যখন এল তখন আমার বাড়ী না-গিয়ে তোর এখানে উঠল কেন? যে তো দরকার আছে তোরই কাছে; কিন্তু তোর বাড়ীতে যখন মেয়েছেলে কেউ নেই তখন মেয়েছেলের একলা তোর বাড়ীতে আসা প্রথা নয়। আর আমার বাড়ীর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছেলেবেলার। আমার এখানে এসে উঠে ও বলত—মাসীমা গৌরীদা'র সঙ্গে একবার দেখা করব, দেখা করিয়ে দাও; এবেলা এখানে থাকব, খাব। তা যখন করে নি তখন আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

—দাঁড়ান মাসীমা, একটু দাঁড়ান।

মুখ হাত ধুয়ে রমা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

—প্রণাম করব আপনাকে।

—প্রণাম করবি তা কর, অনুমতি চাচ্ছিস কেন?

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বিজয়ের মা বললেন—তাই তো রে আমার যে আবার সকড়ি হাত! তা হোক নে—তুই তোর থুতনিটা একটু ধুয়ে নিবি।

বলে তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখ-খানা তুলে ধরে বললেন—কই একটু আলোর দিকে মুখখানা ফেরা তো রে, দেখি তোকে। গুজব শুনি রমার সেই কালো মেয়ের নাকি ঘর আলো করা রূপ হয়েছে। দেখি। তাই তো রে! এ যে তুই চমৎকার দেখতে হয়েছিস মা। চোখ দুটো তোর টানা বরাবর। কিন্তু মুখখানা যেন ভেঙে গড়েছে! বাঃ তা আশীর্বাদ করি সুখী হ' মা। মনে শান্তি পাস যেন।

একটু চুপ করে থেকে কিছু ভেবে নিয়ে আবার বললে—হ্যাঁরে, কিছু মনে করবিনে তো? একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

—বলুন। কিছু মনে করা স্বভাব আমার নয়।

—তুই বাছা আবার বিয়ে করিস নে কেন? তোর সে যে বিয়ে হয়েছিল—সে তো তোর ঠিক বিয়ে নয়। এই কাঁচ বয়েস, ছেলে পুলে নেই, এ যুগে চলনও হয়েছে; তই বাছা—বলতে গেলে কুমারীই আছিস। এত বড় জীবনটা তোর সামনে পড়ে। বিয়ে করলে তুই সুখী হবি। হ্যাঁ রে গৌরী—তুই বাবা একজন মস্তলোক—তুই মাথা হয়ে দাঁড়িয়ে রমা মায়ের একটা বিয়ে দিয়ে দে না। একটি ভাল পাত্র—তুই দাঁড়ালে এখুনি হয়।

রমা বললে—বিয়ে করলে আপনি আমার বিয়েতে যাবেন? খাবেন?

—যাব না? খাব না? নিশ্চয় যাব। নিশ্চয় খাব। গৌরী তুই ব্যবস্থা কর বাবা।

—সে ব্যবস্থা গৌরীদাকে করতে হবে না মাসীমা। করলে আমি নিজেই করব। গৌরীদার ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার মত মেয়েও আর নয় রমা। বিয়ে হলে আমি নিশ্চয় খবর দেব।

—তুই বিয়ে করিস রমা, তুই বিয়ে

করিস। ওরে আমি তোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি নি। নিজের পেটের মেয়ে ভেবেই বলছি।

বলেই চলে গেলেন বিজয়ের মা।

গৌরীকান্ত বললে—খুড়ীমার মত মানুষটি আর হবে না। এমন স্নেহ এমন মধুর কথা, এমন অন্তঃকরণ।—এ কি তুমি কাঁদছ রমা? কি হ'ল? না-না ভাই। উনি তো কাঁদবার মত কোন কথা তোমাকে বলেন নি! তুমি ভুল বুঝেছ।

বাইরে একটা বাইসেক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।

রমা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—গৌরীদা—এই এরা যারা আমাকে এত ভালবাসে—এ ভালবাসা তো মিথ্যে নয় ভান নয়—এদের আমার ভালবাসার উপায় নেই—এদের আমাকে শত্রু ভাবতে হচ্ছে। বিশ্বাস কর—ক্রমে ক্রমে তাই ভাবতে শিখছি। নবগ্রামের লিস্টে দ্বিতীয় নাম বিজয়ের। গৌরী দা—আজ ভোরে যে সুকুরের সঙ্গে শাহপুরে গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম জান? এই দাঙ্গার মধ্যে কোনক্রমে যদি বিজয়কে—।

শিউরে উঠল গৌরীকান্ত।—বল কি রমা!

—মিথ্যে বলি নি গৌরীদা। এবং কপিলদেব যখন বললে—তখন আমি খুব উৎসাহ করে ভার নিয়ে গিয়েছিলাম। এইটেই আমার বড় দুঃখ, এই দুঃখের কথাই আমি বলছিলাম। যাদের সত্যি করে ভালবেসে এসেছি—যারা ভালবাসে যারা এতদিনের আপনজন তাদের ভালবাসার আর পথ নাই, উপায় নাই—ওরা দিচ্ছে না—আর আমিও যেন ক্রমশ তাই হয়ে যাচ্ছি। তাদের ভালবাসতে পারছি না। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আছে গৌরীদা?

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সে ওঘরের দিকে চলে গেল।

বলে গেল—কাপড়টা শুকিয়েছে—আমি ছেড়ে ফেলি। কপিলদেবের বাইসিক্লের ঘণ্টা যেন শুনেছি। সে আসছে। তুমি হাত ধুয়ে ফেল গৌরীদা!

গৌরীকান্ত হাত ধুয়ে বারান্দায় বের হতেই দেখলে সত্যিই কপিলদেব এসেছে। ধূলিধূসর মূর্তি, বোধ হয় সারাটা দিন বাইসিক্ল চড়ে ঘুরছে।

—নমস্কার। এখানে রমা দেবী আছেন? শুনলাম—

হ্যাঁ আছেন, আসুন। তিনি আপনার বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দ পেয়েই কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হতে গেছেন।

—আপনাকে ধন্যবাদ। রমাকে আপনি বেশ খানিকটা স্বেচ্ছাচারী পুলিশ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচিয়েছেন। নইলে আমাকে এখুনি ছুটতে হত সদরে। এত বড় ফাঁকি—এত বড় স্বেচ্ছাচার—জনতা কিন্তু আর সইবে না গৌরীকান্তবাবু।

—আপনি বোধ হয় সমস্ত দিন অভুক্ত। কিছু খাবেন কপিলদেববাবু?

—ধন্যবাদ। না। রমা দেবী—রমা দেবী!

রমা বেরিয়ে এল। গৌরীকান্ত বিস্মিত হল, এ মেয়ে যেন সে মেয়েই নয়। আর এক মেয়ে। বললে—চলি গৌরীদা। চলুন কপিলদেববাবু।

(ক্রমশ)

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাস

প্রাথমিক শিক্ষা সকলেরই ভাববার কথা; আমার মনের কথা সরল-ভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন করবো।

প্রথমেই বলি শিক্ষকের কথা। আমাদের দেশে শিক্ষকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সম্প্রদায়। যাঁদের হাতে সমাজ তার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন শিশুদের ভার অর্পণ করেছে, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই স্বার্থে শিশুদের দেহ-মন উন্মেষণের কঠিন দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের প্রতি সমাজমনে যথোচিত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা নেই। দিনের পর দিন সমাজের একটা অতি প্রয়োজনীয় অংশ দীনবল ও ক্ষীণায়ু হয়ে পড়ছে, পরাজয় ও অবজ্ঞার ক্ষোভে এই একান্ত নিরীহ লোকেরাও মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলছেন, সেদিকে সমাজের দৃষ্টি নেই। অথচ এই ঔদাসীন্য সমাজেরই পক্ষে কত ক্ষতিকর। আজ শিক্ষার মান নিম্নগামী হয়ে পড়েছে বলে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু এই নিম্নমানের একটা প্রধান কারণ যে একটানা অভাবে নিষ্পেষিত শিক্ষককুলের নিদারুণ দুর্গতি, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? যে মাটির প্রাণ-রস আকর্ষণ করে শিক্ষার তরু পুষ্প-পল্লবের শোভা বিস্তার করে, সে রস শুকিয়ে গেলে, তার শোভা বিবর্ণ হবেই। তৃষিত মৃত্তিকায় জলসেচনের কথা ভুলে গিয়ে বৃক্ষের নিকট পুষ্পসম্ভার আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা।

শিক্ষকদের দুর্দশার কথা জানে সবাই, কিন্তু কারোই যেন এ সম্পর্কে করবার কিছুই নেই এমনি একটা মনোভাব সমাজের সর্বত্র। এই বাঙলা দেশের শহরে, মফঃস্বলে কত সময় কত উদ্দেশ্যে কত সাহায্য ভান্ডার, চ্যারিটির আয়োজন হয়, কিন্তু দুঃস্থ প্রাথমিক শিক্ষকদের সাহায্যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ধরণের আয়োজন করেছেন বলে শুনিনি। শিক্ষকদের বেতন কিছুটা বেড়েছে বটে কিন্তু তাও যে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়, কর্তৃপক্ষও বোধ করি তা অস্বীকার করবেন না। আসল কথা প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই—তাই শিক্ষকের কথা ভোলা সহজ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এদের জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই। অথচ আমাদের দেশেই এমন এক-দিন ছিল যখন লোকে এ শিক্ষার কদর বুঝত—গত শতাব্দীর তৃতীয় শতকে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বাঙলা বিহারে ছিল এক লক্ষ বিদ্যালয়। বলা বাহুল্য সর্বসাধারণের আগ্রহ ও আনুকূল্যেই সেদিন এদের বাঁচিয়ে রেখে-ছিল।

আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষার এতটুকু মূল্য নেই। তাঁরা ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। তাঁদের দৃষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। যে সকল নিম্নবিত্ত বা নিরক্ষর পিতামাতার সন্তানেরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের অর্ধেকেরও বেশী সেখানকার পাঠ সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিতনির্বিশেষে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, হাই স্কুলে প্রবেশ না করা পর্যন্ত শিক্ষার শুরুই হলো না। কাজেও দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ করে হাই স্কুলে যারা পাঠ গ্রহণ করে থাকে সত্যি সত্যি সাক্ষরতার দাবী করতে পারে তারাই। যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে চলে যায় তারা ত সাক্ষরতা লাভ করেই না যারা প্রাথমিক স্তরের অধিক অগ্রসর হলো না তাদেরও অনেকে অবশেষে নিরক্ষরে পরিণত হয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদের দেশে নিষ্ফলতার ইতিহাস। তার কারণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা প্রণিধান করিনি। প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা হবে শিশুর দেহ মনের সুপরিণতির ভিত্তি স্থাপন, বলতে গেলে মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন, মানুষের জগতে মানুষের মত দাঁড়াতে হলে এই শিক্ষা পর্যায় অতিক্রম করা চাই-ই। তারপর প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য গণ শিক্ষা। শিক্ষাহীনতার মতো দেশের অগ্রগতির পথে এত বড় বাধা আর কিছুই নয়। দেশময় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করে জনগণের দেহমনের বিপুল জড়তাকে জয় করলেই জাতীয় অভ্যুত্থান সম্ভব। আমাদের কালে তুরস্ক ও রাশিয়া একথা বুঝেছিল বলেই প্রথমেই তারা গণ-অজ্ঞানতার অভিশাপ দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। এই কার্যে তুরস্কের লেগেছিল ১৫ বৎসর রাশিয়ার ২০ বৎসর। আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষার সোপান মাত্র মনে করে এসেছি—এ এক প্রকান্ড ভুল।

প্রাথমিক শিক্ষাই জাতির জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষা। দেশের শতকরা আশী জনেরও বেশী লোকের এ শিক্ষাই হবে একমাত্র শিক্ষা, জীবন পথের সম্বল। শিক্ষার উপরই যদি সমাজের ও দেশের ভাগ্য নির্ভর করে, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, শতকরা আশী জন যে শিক্ষাকে আশ্রয় করে জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করবে সে শিক্ষা সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত হওয়া অত্যাবশ্যক। নচেৎ সুশিক্ষা বঞ্চিত শতকরা আশী জনের ব্যর্থতায় সমগ্র সমাজের ব্যর্থতা অনিবার্য। আমাদের শিক্ষিত জনমত ঐ দিক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিচার করেনি বলে

দেশব্যাপী অজ্ঞানতা আজও আমাদের লজ্জা ও অকৃতার্থতার কারণ হয়ে আছে।

আশার কথা আমাদের ভুল আমরা বুঝতে পারছি; আজ প্রাথমিক শিক্ষায় আমূল পরিবর্তনের কথা উঠেছে। যে শিক্ষা আমাদের দেশে এতদিন চলে এসেছে তার অসাফল্যের কারণ—এর লক্ষ্য ঠিক নেই। মানুষ তৈরী শিক্ষার উদ্দেশ্য আমরা সবাই জানি, কিন্তু কি আদর্শে কোথাকার জন্য মানুষ তৈরী হবে, শিক্ষার যেখানে শুরু অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরেই, তা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রধান দুর্ভাগ্য এই, জীবনের জন্য প্রস্তুতির আশায় শিক্ষালাভ করে জীবন-ক্ষেত্রে শিক্ষিতেরাই বোধ করি সর্বাপেক্ষা অপ্রস্তুত। এ শিক্ষার দোষ শিক্ষিতের দোষ নয়। এতদিন পরে আমরা বুঝতে আরম্ভ করেছি যে এ যাবৎ শিক্ষাকে দেশের সঙ্গে যুক্ত করে ভাবা হয়নি। যে দেশের জন্য মানুষ তৈরী শিক্ষার লক্ষ্য, সেই দেশকে সম্পূর্ণ পেছনে ঠেলে দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করাতেই আমাদের বিফলতার অন্ত নেই। দেশের জনজীবনপ্রবাহ এক-মুখী আর শিক্ষা চলেছে অন্য মুখে, তাই সে অদ্ভুত শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা দেশের জীবনের মধ্যে স্থান করে নিতে না পেরে সে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে বিক্ষুব্ধ ও ব্যর্থ হচ্ছে। শত সহস্র গ্রাম নিয়ে আমাদের এ দেশ, এই গ্রামই ভারতবর্ষ—আমাদের শিক্ষার মধ্যে এই সত্যের স্বীকৃতি নেই। আমরা বাইরে থেকে রকমারি শিক্ষা প্রণালী ব্যবস্থা আয়ত্ত করে প্রয়োগের চেষ্টা করতে পারি কিন্তু যদি বিস্তীর্ণ গ্রামীণ জীবনের মধ্যে শিক্ষাকে স্থাপন করতে অসমর্থ হই, একান্ত আন্তরিক হলেও আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। আমাদের দেশের যে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও আত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে, তাকে ভিত্তি করেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করতে হবে। এই পটভূমিকা আমাদের গায়ের রংএর ন্যায়, ইচ্ছা করলেই তা বদলানো যাবে না। শিক্ষার উচ্চ কল্পনা আমাদের মুগ্ধ করেছে কিন্তু দেশকে, আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই আজ ষোল আনা দেশের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনা করতে গিয়ে অগণিত গ্রামের এই ভারতবর্ষকে আমাদের চোখের সম্মুখে রাখতে হবে, তবেই আমাদের শিক্ষা সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারবো।

বহুদিন একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে আমাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কার কঠিন হয়ে আছে। পাঠশালার পর হাই স্কুল, হাই স্কুলের পর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—এই বাঁধা পথ,—যার মাঝে মাঝে এগজামিনের অগ্নিপরীক্ষা, যা উত্তীর্ণ হতেই হবে—তা আমরা চিনে রেখেছি। কিন্তু আজ এ মানসিক অভ্যাস পরিত্যাগ করে নূতন পথের সন্ধান করতে হবে। লক্ষ্যহীন পুরানো পথে চলা আর নয়। আলো হাওয়ার মত শিক্ষা সর্ব-জনের বস্তু হবে একথা যেমন সত্য তেমনি একথাও সত্য যে শিক্ষা সর্বস্তরেই দেশের প্রাণ-প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। একথা স্বীকার করেই অগ্রসর হতে হবে, শতকরা আশী জনের জীবন-ক্ষেত্র যে গ্রাম সে গ্রাম পরিবেশের মধ্যে সার্থক জীবনযাপনের যোগ্যতা দানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। নগর জীবনের মিথ্যা আলেয়ার পশ্চাৎধাবন করে আমরা নষ্ট হয়েছি। আমাদের দেশ যা নয়, তার অলীক স্বপ্নে মগ্ন না হয়ে আমাদের সত্যকার এই গ্রামময় দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষাকে আজ সর্বান্তঃকরণে আমরা আকাঙ্ক্ষা করবো।

মৃতপ্রায় গ্রামের পুনরুজ্জীবনই স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্মুখে সব চেয়ে বড়ো কর্তব্য। এই পুনরুজ্জীবন সাধনের মধ্যেই রয়েছে দেশের সর্বাঙ্গীন চরিতার্থতা এবং যথার্থ শিক্ষার দ্বারাই শুধু এই বৃহৎ কল্যাণ সাধিত হতে পারে। পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পল্লীজীবনের চিত্র আমরা বহুদিন মনে মনে অঙ্কিত করেছি কিন্তু তা বাস্তব রূপ লাভ করেনি। অর্থের বাধা, রাজশক্তির বাধা ত ছিলই আমাদের মনের বাধাও কম ছিল না। আমরা গ্রামানুগত, জনানুগত শিক্ষা লাভ করিনি; যে আধ্যাত্মিকতা ও জীবনাদর্শের গৌরব আমরা কীর্তন করে বেড়াই, তার ভিত্তিভূমি যে গ্রাম তা কোনদিন মনপ্রাণে উপলব্ধি করিনি, পল্লীর ধর্মনিষ্ঠ অনাড়ম্বর শ্রমসার্থক জীবনের মহিমা আমরা বুঝিনি। যে গভীর প্রত্যয় প্রত্যেক বৃহৎ উদ্যমের উৎস, আমাদের পল্লী-উন্নয়ন উদ্যোগের পশ্চাতে তার অভাব বরাবরই ছিল বলে তা বারং-বার অল্পকালেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আজ অর্থের বাধা হয়ত নেই কিন্তু মনের বাধা আছে—নূতন শিক্ষা প্রবর্তন দ্বারা সে বাধা লঙ্ঘন করতে হবে, দেশের মনে যথার্থ মূল্যবোধের, সত্যনিষ্ঠার সৃষ্টি করতে হবে।

দেশের উন্নতির কথা হলেই স্বভাবতই দেশের বাইরের আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলির নগর জীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ভারতবর্ষ আমেরিকা নয়। ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র অংশ, শতকরা কুড়ি জনেরও কম শহরবাসী—অথচ আমেরিকার শত-করা ছাপ্পান্ন ও ইংলণ্ডে শতকরা আশী-জন শহরের লোক, এদের প্রাণকেন্দ্র শহর আমাদের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম। আমাদের ইতিহাসের বিবর্তন গ্রামাশ্রয়ী। সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা এই আমার দেশের সত্য রূপ; দেশমাতার এই মহিমময়ী মূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের আজকের দিনে একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নূতন শিক্ষা ও নূতন শিক্ষালয়ের। এর মধ্য দিয়ে দেহ-মন ও আত্মার উৎকর্ষ লাভ করে আমাদের ছেলে-মেয়েরা মুমূর্ষু সমাজে নবজীবনের সঞ্চার করবে। আজ সর্বত্রই বিজ্ঞজনেরা বলছেন পুঁথি মুখস্থ করা শিক্ষা খাঁটি শিক্ষা নয়, এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সম্ভব নয়। পুঁথির পীড়নে শিশুর প্রাণপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়; সুতরাং এ উৎপীড়ন দ্বারা আর যাই হোক মানুষ তৈরী হয় না। শিশুর প্রাণধর্মকে অবহেলা করে তাকে তার স্বাভাবিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাকে এক অস্বাভাবিক পুঁথির রাজ্যের মধ্যে নির্বাসন দেই এবং ভাবি সন্তান শিক্ষার দায়িত্ব পালন করি। কিন্তু যে শিক্ষা শিশুর স্বভাবের পথ ধরে অগ্রসর হলো না, শিশুকে জগৎ ও জীবনের যোগ্য করে তুলতে তার ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর। বাইরের খেলাধুলার জগৎ ও বিদ্যালয়ের নির্জীব পুঁথি জগতের মধ্যে এতটাই ব্যবধান যে শিশু যখন সে বিদ্যাগৃহে প্রবেশ করে, আনন্দ থেকে নিরানন্দে, মুক্তি থেকে বন্ধনের মধ্যে উপস্থিত হয়ে মুষড়ে

পড়ে এবং একদিন যখন সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করে সে সংসারের মধ্যে এসে দাঁড়ায়, সে দেখতে পায়, সে কোন কাজেরই নয়—এ সংসারের কিছুই সে শেখেনি। সংসারের সবটাই কাজ—অথচ শিক্ষার নামে সে শুধু পুঁথির কথা মুখস্থ করেছে সেটা তার প্রাণ চায়নি। বাইরের বিচিত্র প্রাণ-চঞ্চল জগৎ তাকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে—তার মন পড়ে থাকে ইস্কুলের বেড়ার বাইরে। একদিন ঐ বেড়ার বাইরে গিয়ে তাকে জীবনযাপন করতে হবে এবং ঐ বেড়ার বাইরের বস্তুগুলিই পুঁথিতেও লেখা। যদি শিশুকে হাত ধরে ঐ বেড়ার বাইরে নিয়ে যাই, পুঁথিতে লেখা বস্তু-গুলি তাকে দেখতে দিই, নাড়তে চাড়তে দিই; ঐগুলি ছাড়া আরো যা কিছু তা নিশ্চয়ই তার ক্ষুধিত দেহমন স্পর্শ করতে চায় তাদের সান্নিধ্যে তাকে নিয়ে যাই, তবে পরম আনন্দের মধ্যে তার জগৎ পরিচয় হয়ে যায়, তার সমস্ত প্রকৃতি জাগ্রত হয়। তখন উপযুক্ত শিক্ষক তাকে অবলীলায় লেখাপড়ায় প্রণোদিত করতে পারবেন—শাসনের প্রয়োজন হবে না। তার চার পাশের সঙ্গে পুঁথির সঙ্গতি দেখতে পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সে পুঁথির কথা আয়ত্ত করে ফেলবে।

শিশু যে তার চার পাশটাকে আলোড়ন করতে চায় শুধু তাই নয়, বড়দের অনুকরণে সে কাজ করার জন্যও পাগল। বাজারে আলু পটলের দোকান দেখে সে মাটির ঢেলা দিয়ে দোকান সাজায়—ইঁটের উপর ইঁট চাপিয়ে তৈরী করে ঘর, বর্ষার জলে নৌকা ভাসায়—স্বেচ্ছায় ফুলের চারা লাগিয়ে ফুল ফুটিয়ে খুশী হয়, আরও কত কি করে। শিশুর এই কর্মপ্রবণতাই শিশুশিক্ষার স্বর্গদ্বার—এর সৎ ব্যবহার দ্বারাই শিশুর মধ্যে ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্বের ভিত্তি গড়ে তোলা যাবে। নূতন শিক্ষালয়ে থাকবে বিচিত্র কাজের আয়োজন। কাজ ক'রে ক'রে শিশুর চরিত্র শক্তি বিকশিত হ'তে থাকবে। কাজের মধ্যে শিশু আত্ম-প্রকাশের আনন্দ পাবে, শ্রমের মর্যাদা শিখবে, কর্মানুরাগী হবে, তার পর্যবেক্ষণ ও কার্য পরিচালনার ক্ষমতা জন্মাবে—কর্তব্যবুদ্ধি, সততা, সহযোগিতা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ জীবনের অতি আবশ্যক গুণ-গুলি দিনে দিনে অর্জিত হয়ে যাবে। এই কাজের মধ্য দিয়েই সে লেখাপড়াও শিখবে। সে লেখাপড়ার পরিধি বড়ো না হতে পারে কিন্তু কাজ কেন্দ্রিক লেখা-পড়া হবে শিশুর নিজস্ব বস্তু, তার জীবনের বাস্তবিক সহায়, আজকের লেখাপড়ায় যা হচ্ছে না।

কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। শিক্ষালাভ করে শিক্ষার্থীরা যে সমাজে জীবন যাপন করবে সে সমাজের উপযুক্ত কাজ অবলম্বন করেই শিক্ষা পরিচালিত হবে। ছোটরা যে কোন কাজ পেলেই খুশী, কিন্তু যে কাজ তাদের সমাজ-আবেষ্টনীতে অভিনব তা শিক্ষা করে তারা কিংবা তাদের সমাজ—কেউ উপকৃত হবে না। বিলিতী ইস্কুলে মেকানো সেট্ নিয়ে বাচ্চারা ইঞ্জিন, পুল প্রভৃতি তৈরী করে সেখানকার সমাজ আবেষ্টনে তা নিশ্চয়ই সংগত; কিন্তু আমাদের শিক্ষালয়ে সে শিক্ষা একান্তই সমাজ-সঙ্গতি-বিহীন! শিক্ষালয় সমাজের অঙ্গীভূত হবে, সমাজের হৃদ্স্পন্দন অনুভূত হবে তার সর্বত্র সর্ব কর্মে। সমাজের জীবনযাত্রা, কাজ-কর্ম, আমোদ-আনন্দ সব কিছুই হবে শিক্ষার অবলম্বন। এক কথায় বলতে গেলে, পুঁথির পরিবর্তে জীবনই হবে শিক্ষার মাধ্যম। এ নূতন শিক্ষাকে চট্ করে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তা জানি—পুঁথির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস একদিনে দূর হবে না। কিন্তু দেশের শিক্ষার দায়িত্ব যাঁদের তাঁদের আজ সাহস করে দু'শ বছরের অকেজো শিক্ষাকে মিটিয়ে দিয়ে নূতন কাজের শিক্ষাকে দেশময় প্রচলিত করতে হবে। তাছাড়া নূতন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার আর কোন পথ ভাবতে পারি নে।

আজ প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের নিকট আমার আবেদন তাঁরা যেন শিশুর প্রকৃতি ও পরিবেষ্টনকে অবলম্বন করে প্রাণবান শিক্ষার কৌশল আয়ত্ত করতে কুণ্ঠিত না হন। এই নূতন শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমাজের সঞ্জীবন মন্ত্র নিহিত আছে। এর প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষকগণ সত্যি সত্যিই শিক্ষালয়ের মধ্যে শান্তিময় নির্লোভ বৈষম্যহীন নূতন সমাজের সূত্রপাত করতে সক্ষম হবেন। প্রাথমিক শিক্ষকগণের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃত হবেই। নূতন সমাজের নির্মাতা ও নেতার গৌরব তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, এই আশা করতে তাঁদের সবিনয়ে অনুরোধ করি।

(১৪)

১৮৯৭ সাল। ব্রজরাখাল রাত্রে বাড়ি আসেনি। আগের দিন রাত্রে বলেছিল—খুব ভোরে উঠবে বড়কুটুম—নইলে হয়ত দেখতে পাবে না—ভীড়ও হবে খুব—এখন তো আর নরেন দত্ত নয়—এখন স্বামী বিবেকানন্দ—ট্রেনটা বোধ হয় সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই এসে পৌঁছোবে, তার আগেই গিয়ে হাজির হয়ো—আমি থাকবো—

স্বামী বিবেকানন্দ! কথা বলতে বলতে ব্রজরাখাল থর-থর্ করে কাঁপে।

বলে—যাবার আগে নরেন বলেছিল—

"I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child and Christianity but a distant echo."

হলোও তাই—

খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে ভূতনাথ। বড়বাড়িতে একটু দেরি করে সকাল হয়। তবু অন্ধকারে স্নান সেরে নিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে চাদর জড়িয়ে নিলে। কন্‌কনে শীত। তখনও বাড়ির আনাচ-কানাচের আলোগুলো নেভেনি। নাথু সিং পাহারা দিতে দিতে বুঝি একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। পায়ের আওয়াজ পেয়েই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত বাড়িটা নিদ্রাচ্ছন্ন। এখন বৌঠান কী করছে। এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। সারা রাত জাগে কী করে কে জানে! আশ্চর্য হয়ে যায় ভূতনাথ।

ব্রজরাখালের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল—বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে এসে বলেছেন—এস মানুষ হও, পেছনে চেও না, তোমার আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না—সামনে এগিয়ে যাও, ভারতমাতা অন্তত এমনি হাজার হাজার প্রাণ বলি চান, মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়—

ষাট টাকা মাইনের কেরাণীকে চায় না কেউ। পরান্নভোজী ভূতনাথ। এতদিন কলকাতায় এসে কী দেখেছে সে? মানুষ দেখেছে ক'টা! বড়বাড়ির মানুষগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ওদের গায়ে কোনও ছোঁয়াচ লাগে না। সমস্ত ঘরগুলোর ভেতরে ঢুকলে যেন অশান্তির আব-হাওয়ায় দম আটকে আসে। বৌঠান বলেছিল—অবাক বাড়ি এটা, বড় অবাক বাড়ি—।

অবাক বাড়িই এটা সত্যি।

সেদিন বদরিকাবাবুর কাছ থেকে এই কথাই শুনেছিল ভূতনাথ।

ডান পাশের ঘরটা খাজাঞ্চিখানা আর বাঁ দিকের বড় ঘরখানা খালি পড়েই থাকে।

দরজাটা বুঝি খোলা ছিল। চিত হয়ে তক্তপোশের ওপর কে যেন শুয়ে ছিল।

অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে শব্দ এল—কে যায়—

—আমি—

'আমি' বলে চলে আসছিল ভূতনাথ। কিন্তু আবার যেন ডাক এল—শুনে যাও—শুনে যাও হে—

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকেছিল ভূত-নাথ। ঘরে ঢুকে দেখলে—একটা তুলোর জামা গায়ে। মোটাসোটা বৃদ্ধ মানুষ। ভূতনাথকে দেখে উঠে বসলো। বংশীর কাছে শুনেছিল এর কথা। এরই নাম বদরিকাবাবু।

বংশী বলেছিল—ওদিকে যাবেন না বাবু, বদরিকাবাবু দেখলেই ডাকবে—ওই ভয়ে কেউ যায় না—

কিন্তু ভয়টা কিসের!

—বোস এখানে।

ভূতনাথ বসলো।

—নাম কী তোমার?

শুধু নাম নয়। বাবার নাম। জাতি। কর্ম। নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিলেন। সব শুনে বললেন—ভালো করোনি ছোকরা, গেঁজে যাবে—

ভূতনাথ কিছু বুঝতে পারলে না।

—হ্যাঁ গেঁজে যাবে। বদরিকাবাবু মিছে কথা বলে না হে। যদি ভালো চাও, পালাও এখনি, নইলে গেঁজে যাবে—। মুরশিদকুলী খাঁর আমল থেকে সব দেখে আসছি—লর্ড ক্লাইভকে দেখলুম, সিরাজ-উদ্দৌলাকে দেখলুম, এই কলকাতার পতন দেখলুম—হালসীবাগান দেখলুম—শেষ-টুকু দেখবার জন্যে এই ট্যাঁকঘড়ি নিয়ে বসে আছি সময় মিলিয়ে নেব বলে—

তারপর দেওয়ালের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন—ওই দেখ, তাকিয়ে দেখ—সব কুষ্ঠি-ঠিকুজি সাজানো রয়েছে, সব বিচার করে দেখেছি—মিলতে বাধ্য—

ভূতনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে—দেওয়ালের গায়ে আলমারিতে সাজানো সার সার বই সব। মোটা মোটা বই-এর মিছিল। সোনালী জলের লেখা নাম-ধাম।

—সব বিচার করে দেখেছি—মিলতে বাধ্য। যদি না মেলে তো আমার ট্যাঁক-ঘড়ি মিথ্যে—কেল্লার তোপের সঙ্গে রোজ মিলোই ভাই—একটি সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হবার জো নেই—

বলে ট্যাঁক থেকে বার করলেন ঘড়িটা। মস্ত গোলাকার ঘড়ি। চকচক করছে। ঘড়িটাকে নিয়ে কানে একবার লাগিয়ে আবার ট্যাঁকে রেখে দিলেন। বললেন—১৭৩৫ সালে তৈরি আর এটা হলো গিয়ে ১৮৯৯—এক শো চৌষট্টি বছর ধরে ওই একই কথা বলছে ঘড়িটা—

ভূতনাথ মুখ খুললে এবার। বললে—কী বলছে—?

—বলছে—সব লাল হয়ে যাবে!

—লাল?

—হ্যাঁ, নীল নয়, সব্‌জ নয়, হলদে নয়, শ্‌ধ্‌ লাল। দিল্লীর বাদশা ব্‌ঝেছিল, রণজিৎ সিং ব্‌ঝেছিল সিরাজউদ্দৌল্লা, আলীবর্দি খাঁ, জগৎ শেঠ, মীরজাফর, রামমোহন, বঙ্কিম চাট্‌জ্জে সবাই ব্‌ঝেছে শ্‌ধ্‌ 'বঙ্গবাসী' ব্‌ঝলে না—

—বঙ্গবাসী কী?

—খবরের কাগজ পড়ো না? নইলে ওই লোকটাকে, ওই বিবেকানন্দকে বলে গর্‌খোর, ম্‌র্গীখোর? নইলে সাতশো বছর মোছলমান রাজত্বে ছ'কোটি মোছলমান হয় আর একশো বছর ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ লোক খৃষ্টান হয়। ও কি ওমনি-ওমনি? নেমকহারামীর গ্‌ণগার দিতে হবে না? পালা এখান থেকে—ভালো চাস তো পালিয়ে যা, নইলে গোঁজে যাবি, আর যদি না-যাস তো মর্‌ এখেনে। যখন এই বড়বাড়ি ভেঙে গ্‌ঁড়িয়ে যাবে, শাবল গাঁইতি নিয়ে বাড়ি ভাঙবে কুলীমজ্‌রেরা, তখন কড়িকাঠ চাপা পড়বি, একশো চৌষট্টি বছরের ঘড়ি দিনরাত এই কথা বলছে, আমি শ্‌নি আর চিৎপাত হয়ে শ্‌য়ে থাকি—

এ এক অদ্ভুত লোক। ভূতনাথ সাইকেল চড়ে চলতে চলতে ভাবে সেই এক অদ্ভুত লোক দেখেছিল জীবনে। সারা জীবন শ্‌ধ্‌ স্থবিরের মত শ্‌য়ে শ্‌য়ে বিড় বিড় করে ভাবতো। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ কেমন করে সেই উন্মাদ লোকটার মস্তিষ্কে আবির্ভাব হয়েছিল কে জানে!

অনেকদিন ভূতনাথ ভেবেছে, বদরিকাবাব্‌র কোথায় যেন একটা ক্ষত আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

বংশী বলে—এই বাড়িতে যত ঘড়ি দেখছেন, সব ওই বদরিকাবাব্‌র জিম্মায়। দম দেন উনি, আর নটার সময় কেল্লার তোপের সঙ্গে ট্যাঁক ঘড়িটা মিলিয়ে নেন।

সে অনেক কালের কথা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

দিল্লীর বাদশার কাছে রাজস্ব পৌঁছে দিতে যাবে জবরদস্ত নবাব ম্‌র্শিদকুলী খাঁ। দর্পনারায়ণ তখন তার প্রধান কান্‌নগো। তাঁর সই চাই, নইলে বাদশার দরকারে রাজস্ব অগ্রাহ্য হবে। ম্‌র্শিদকুলী খাঁর জমিদারদের ঠকানো টাকায় তখন মাটিতে পা পড়ে না। একদিন খাজনা দিতে দেরি হলে জমিদারদের 'বৈকুণ্ঠ' লাভ। সে-বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর।

দর্পনারায়ণ বেঁকে বসলেন। বললেন, তিন লক্ষ টাকা চাই, তবে সই দেব—

ম্‌র্শিদকুলী খাঁ বললেন—এখন সই দাও, ফিরে এসে টাকা দেব—

দর্পনারায়ণও সোজা লোক নন। বললেন—তবে সইও পরে দেব—

শেষ পর্যন্ত ম্‌র্শিদকুলী খাঁ সই না নিয়েই চলে গেলেন দিল্লী। সেখানে গিয়ে ঘ্‌ষ দিয়ে কার্য সমাধা করলেন। কিন্তু অপমান ভুললেন না।

ফিরে এসে তহবিল তছর্‌পের দায়ে জেলে প্‌রলেন দর্পনারায়ণকে। সেই জেলের মধ্যেই না খেতে পেয়ে মারা গেলেন দর্পনারায়ণ। ইতিহাস ভুলে গেল তাঁকে।

সেই দর্পনারায়ণের শেষ বংশধর বদরিকাবাব্‌ আজ বড়বাড়ির ঘরে ঘরে ঘড়িতে দম দিয়ে বেড়ান। বোধ হয় ঘড়ির টিকটিক শব্দের সঙ্গে তাল রেখে কালের পদধ্বনি শোনেন।

তারপর কতকাল কত প্‌র্‌ষ পার হয়ে গেছে। কোথায় গেল নাজির আহম্মদ আর কোথায় গেল রেজা খাঁ। কোথায় গেল মধ্‌মতী তীরের সীতারাম, আর ফৌজদার আব্‌তোরাপ। নেই পীর খাঁ, নেই বক্স আলি। এক এক প্‌র্‌ষের পর আর এক প্‌র্‌ষ উঠেছে আর শেষ হয়েছে। কিন্তু দর্পনারায়ণের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি আজও। সে-বংশ এবার নির্বংশ হতে চললো। তব্‌ বড়বাড়ির বৈঠকখানা ঘরটার ভেতরে বসে দ্‌র্বল বদরিকাবাব্‌ ইতিহাস পড়েন, আর অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেন সমস্ত পৃথিবীকে। যে-পৃথিবী অত্যাচার করে, অন্যায় করে, মান্‌ষকে মান্‌ষের মর্যাদা দেয় না। যে-পৃথিবী শ্‌ধ্‌ টাকার গর্ব করে। বণিক সভ্যতার শিরে প্রতি ম্‌হূর্তে দ্‌র্বল আঘাত হেনে হেনে একটি দ্‌র্বলতর মান্‌ষ শ্‌ধ্‌ আরো দ্‌র্বল হয়ে যায়।

বলেন—ঘড়ি বলছে—সব লাল হয়ে যাবে—দেখছিস—

একশো চৌষট্টি বছর আগেকার সৃষ্টি যন্ত্রয্‌গের প্রথম দান ঘড়ি। ঘড়ির মধ্যেই যেন যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত বাণী সংকুচিত হয়ে আছে। ও বলছে—কিছ্‌ই থাকবে না। সব লাল হয়ে যাবে। অমৃতের প্‌ত্র মান্‌ষ, মান্‌ষের জয় হবেই।

বদরিকাবাব্‌ বলেন—একদিন দেখবি তুই, জয় হবেই আমাদের, আমি হয়ত সেদিন থাকবো না—এই বড়বাড়ি থাকবে না, এই মেজবাব্‌, ছোটবাব্‌ তুই আমি কেউ থাকবো না। এই ছোটলাট, বড়লাট, ইংরেজরাজ কেউ নয়—আমার কথা মিথ্যে হবে না, দেখে নিস—

শীতের মধ্যে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ভূতনাথ চলছিল।

রাস্তার দ্‌'পাশের দোকানপাট বন্ধ। অন্ধকার ভালো করে কাটেনি। চারদিকে শ্‌ধ্‌ ধ্‌লো আর ময়লার গন্ধ। অন্ধকারে চলতে চলতে ভূতনাথের কেবল মনে হয়েছিল, বদরিকাবাব্‌ পাগল হোক, কিন্তু তার ভবিষ্যৎবাণী যেন সত্য হয়।

শেয়ালদা স্টেশনের সামনে তখন বেশ ভিড় জমেছে। আবছা অন্ধকারে ভালো

দেখা যায় না মুখ। তবু ব্রজরাখালকে খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলো। এক-এক জায়গায় দল বেঁধে জটলা করছে লোক-জন। বেশির ভাগ যেন ছেলের দল। চারদিকে প্রতীক্ষমান মানুষ। এই দেশেরই এক ছেলে মহাবাণী বহন করে নিয়ে আসছে। যে বলেছে—'জগতের একটা লোকও যতদিন অভুক্ত থাকবে, ততদিন পৃথিবীর সমস্ত লোকই অপরাধী।' যে বলেছে—'আজ হতে সমস্ত পতাকায় লিখে নাও—যুদ্ধ নয়, সাহায্য,—ভেদ বিবাদ নয় সামঞ্জস্য আর শান্তি।' যে বলেছে—'তোমরা পাপী নও, অমৃতের সন্তান, পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই, যদি থাকে তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ। তুমি সর্বশক্তিমান আত্মা, শুদ্ধ, মুক্ত, মহান! ওঠো জাগো—স্ব স্বরূপ বিকাশ করতে চেষ্টা কর, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'।

ক্রমে ভোর হলো। আরো ভিড় জমলো। ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে সমস্ত শেয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে শুধু মানুষের মাথা। এরা কোথায় ছিল এতদিন! কারা এরা। এরাও কি বিবেকানন্দের ভক্ত ব্রজরাখালের মতন?

হঠাৎ জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেল—

চীৎকার উঠলো—জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়—জয় বিবেকানন্দ স্বামীজী কী জয়—

ভিড়ের স্রোতের সঙ্গে ভূতনাথও ঢুকলো স্টেশনে।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। বিপুল জনতা ঘন ঘন মহামানবের জয় ঘোষণা করছে। তারপর সেই অসংখ্য জন-সমুদ্রের কেন্দ্রে আর এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলো। মাথায় বিরাট গেরুয়া পাগড়ী—গেরুয়া-ভূষিত সর্বাঙ্গ। দুই চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। ভূতনাথের মনে হলো—মানবের সমাজে যেন এক মহামানব এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত ভারতবর্ষের আত্মা মথিত করে নবজন্ম গ্রহণ করলো যেন এক অনাদি পুরুষ। হিমালয়ের ভারতবর্ষ, উপনিষদের ভারতবর্ষ, বৈদিক ভারতবর্ষ, আজ যেন নরদেবতার রূপ নিয়েছে। মানুষ বুঝি আবার অমৃতের সন্তান হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করলে। ভূতনাথের আবার মনে হলো—যেন শেয়ালদা স্টেশনের স্বল্পপরিসর প্লাট-ফরম এটা নয়। অশ্রান্ত-কল্লোল বারিধির বুকে বুঝি প্রথম জেগেছে একখণ্ড ভূমি। হিমালয়ের শীর্ষ জেগে উঠেছে বুঝি মহা-সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে। এইবার জন্ম হবে মানুষের। নতুন মানুষের হৃদ্-স্পন্দনের মধ্যে ধ্বনিত হবে সেই আদি প্রশ্ন—কে আমি? কোথা থেকে আমি এলাম? তারপর গ্রহ নক্ষত্র সূর্য পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত স্তব্ধ করে এক মহাবাণী উচ্চারিত হবে আবার। আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে নতুন পৃথিবীর। নতুন মানুষ আর এক নতুন উত্তর পাবে মহামানবের মহাবাণীর মধ্যে! মানুষ অমৃত, মানুষ আর কেউ নয়। মানুষ অমৃতস্য পুত্রাঃ—মানুষ অমৃতের সন্তান।

জনস্রোত ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। ভূতনাথ মন্ত্রচালিতের মত জনতাকে অনুসরণ করে এল। বাইরেও এক বিপুল সমুদ্র, কিন্তু অপেক্ষায় অস্থির অশান্ত।

ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন মহামানব। চারঘোড়ার গাড়ি।

হঠাৎ ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঘোড়াগুলোকে খুলে দিলে তারা। তাদের উপাস্যকে তারা নিজেরা বহন করবে। স্বামীজীকে তারা মাথায় তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তাদের অন্তরের উৎস আজ অবারিত।

—জয়, স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়—

শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে সেই উল্লাসধ্বনিতে সমস্ত শহর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

ধীরে ধীরে গাড়ি গিয়ে হাজির হলো একটা গলির সামনে। রিপন কলেজের ভেতর স্বামীজীকে কিছু বলতে হবে। অন্তত একটু বিশ্রাম। অন্তত তারা সবাই দুচোখ ভরে দেখবে।

মনে হলো, হঠাৎ যেন ব্রজরাখালকে দেখা গেল এক মুহূর্তের জন্যে। তাড়াতাড়ি ভূতনাথ ভিড় সরিয়ে কাছে যাবার চেষ্টা করতেই আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ব্রজরাখাল। এদিক ও-দিক কোথাও দেখা পাওয়া গেল না তার।

কিন্তু হঠাৎ এক আশ্চর্য উপায়ে দেখা হয়ে গেল আর একজনের সঙ্গে। আবার এতদিন পরে এমন ভাবে দেখা হবে ভাবা যায়নি।

ননীলাল!

ননীলালও চিনে ফেলেছে। বললে—তুই? তুই এখেনে?

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হয় না। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। কী এক অদ্ভুত চেতনা। ননীলালের সে-চেহারা আর নেই। সেই কেষ্টগঞ্জের স্কুলের সহপাঠী, ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীলাল। একদিন এক মুহূর্তের দেখা পাওয়ার জন্যে কী কষ্ট একদিন স্বীকার করেছে ভূতনাথ।
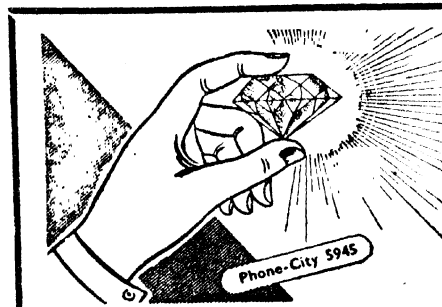
ননীলাল সিগারেট টানছে। ছোটবড় [illegible]। গোঁফ দাড়ি উঠেছে।

—তারপর?

—এখানে কী করতে? স্বামীজীকে [illegible]খতে?

—দূর, ও-সব দেখবার সময় নেই [illegible]মার।

বলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে লম্বা [illegible]রে।

—যত সব বুজরুক—

একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো ননী-[illegible]লের কথায়। কিন্তু কিছু বলতে [illegible]রলে না।

—কী করছিস এখন?

—বি-এ পাশ করেছি। এবার ল [illegible]ড়ছি—তুই?

—আমার পড়াশোনা হলো না, [illegible]সীমা মারা গেল। এখানে আমার [illegible]পতি থাকে। তার কাছে আছি, একটা [illegible]লো চাকরি পেলে করি, ঘোরাঘুরি [illegible]রছি—

—চল্, চা খাস?

—না, এখনও ধরিনি—

—এখনও পাড়াগেঁয়েই রয়ে গেলি—

বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো [illegible]নীলাল। ননীলালের গা থেকে এসেন্সের [illegible]ন্ধ এসে নাকে লাগছে। সুন্দর জামা-[illegible]পড় পরেছে। ননীলালের কাছে নিজেকে [illegible]ন বড় বেশি দরিদ্র মনে হলো আজ। [illegible]ন্তু কেন কে জানে, ভূতনাথের মনে [illegible]লো—ননীলাল যেন আর আগেকার মতন [illegible]ই। সেই আগেকার ননীলালই যেন [illegible]ল ভালো। এখন যেন চোখে কালি [illegible]ড়েছে। চোখের সে জ্যোতি কোথায় গেল [illegible]র। যেন অনেক বয়েস বেড়ে গেছে তার [illegible] ক'বছরের মধ্যেই।

—চা না খাস তো অন্য কিছু খা—

একটা দোকানের সামনে এসে ভূত-[illegible]থকে নিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

—ডিম খাস?

—হাঁসের ডিম তো।

—কলকাতা শহরে এসে এখনও তোর [illegible]মনাই গেল না—ইয়ং বেঙ্গল আমরা, এই [illegible]রে করে দেশটা গেল, গায়ে শক্তি হবে [illegible] করে? বিফ খায় বলেই তো সাহেবরা [illegible]ত দূর দেশ থেকে এদেশে রাজত্ব করতে [illegible]সেছে—আর তোরা পৈতে টিকি নিয়ে তাদের গোলামি করে মরছিস, ছাড় ও-সব, আমার সঙ্গে দুদিন থাক, মানুষ করে দেব তোকে—

তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালে ননীলাল।

—আছিস কোথায় বললি?

—বৌবাজারে, বড়বাড়িতে—

—চৌধুরীদের বাড়ি? তা ওদের ওখানে আছিস, ওরা তো আপ-টু-ডেট, শুনেছি ও-বাড়ির বৌগুলো খুব সুন্দরী, না?

—তুই জানলি কেমন করে?

কেমন একটা রহস্যময় হাসি হাসলো ননী। বললে—রূপ আর গুণ কখনও চাপা থাকেরে?

কী জানি কেন, ভূতনাথের মনে হলো সেই ননীলালের এমন পরিবর্তন হওয়া উচিত হয়নি যেন।

ননী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আরম্ভ করলে—চূড়ামণিকে চিনিস, যার ডাক নাম ছুটুক? ওই তো আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিলরে—দুবার ফেল করে এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে—তা' বাড়ির ঝি টি কাউকে আর বাদ দেয়নি। শেষে একদিন অসুখ হলো, কিন্তু মিথ্যে বলবো না ভাই বহু টাকা খরচ করেছে আমাদের জন্যে—এখন দেখা হয় না বটে, কিন্তু রোগ হবার পর থেকে ... রোগটা সেরেছে?

—রোগ? ভূতনাথ কিছু বুঝতে পারলে না।

—কী রোগ?

ননীলালের মুখে রোগের নামটা শুনে শিউরে উঠলো ভূতনাথ। ননীলাল কেমন বেপরোয়াভাবে রোগের নাম উচ্চারণ করে গেল, যেন ম্যালেরিয়া কিম্বা ইনফ্লুয়েঞ্জা। ও-রোগ ভদ্রলোকদের হয় ভূতনাথের জানা ছিল না।

ননীলাল ডিম কামড়াতে কামড়াতে বললে—হবে না রোগ? চেহারাটা দেখে-ছিস তো—আগে আরো লাল টুকটুকে ছিল, ক্লাশে বসে আমরা ওর গাল টিপে দিতুম, তা আজকাল কত রকম ওষুধ বেরুচ্ছে, ডাক্তার-ফাক্তার কাউকে দেখালে না, একদিন সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ বেরুলো—শেষে একদিন আর হাঁটতে পারে না— আর একটু মাংস নিবি?

—না—

—তা সেই অসুখের সময় গিয়েছিলুম ওদের বাড়িতে। অনেক চেষ্টা করেছিলুম ভাই দেখতে—কিন্তু এমন আঁটা বাড়ি, কিচ্ছু দেখা গেল না, যারা ঘন ঘন যেত, তারা বলতো—ওর কাকীদের নাকি পরীর মতন দেখতে—দেখেছিস তুই?

ভূতনাথ উত্তরটা এড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে বললে—দেখেছি, পরীদের মত নয়—

—পরীদের মত নয়, তবে কীসের মতন?

ভূতনাথ যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—জগদ্ধাত্রীর মতন—

ননীলাল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই আবার এত ভক্ত হয়ে উঠলি কবে?

ভূতনাথ বললে—পরীতো দেখিনি কখনও, জগদ্ধাত্রী দেখেছি যে—

—জগদ্ধাত্রী কোথায় দেখলি?

—কেন, ছবিতে।

—পরীর ছবি দেখিসনি?

পরীর ছবি কোথাও দেখেছে কিনা ভাবতে লাগলো ভূতনাথ।

ননীলাল বললে—পরী যদি দেখতে

চাস, তো দেখাবো তোকে—আমার বিন্দী যাকে বলে ডানা-কাটা পরী—

—বিন্দী কে?

—আজ বিন্দীর বাড়ি যাবি? চল্ তোকে পরী দেখিয়ে নিয়ে আসি—ছুটুক ওকে দেখে একরাতে দেড়শো টাকা খরচ করে ফেলেছিল—শেষে বিন্দী ওরই মুঠোর মধ্যে চলে যেত, কিন্তু আমার বাবাও তখন তিপান্ন হাজার টাকা রেখে মারা গেছে—আমাকে পায় কে?

—বাবা মারা গেছে তোর?

বাবার মৃত্যুর সংবাদ এমন করে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে কেউ পারে, এ-যেন ভূতনাথ বিশ্বাস করতে পারে না।

—বাবা মারা গেছে বলেই তো বেঁচে গেলুম ভাই, নইলে কি ছুটুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? ওরা কি কম বড়লোক। ওরা হলো সুখ-সাগরের জমিদার বংশ, প্রজা ঠেঙানো পয়সা, এখানে বসে কর্তারা শুধু মেয়ে-মানুষ নিয়ে ওড়ায়—ওদের সঙ্গে তুলনা? ছোট-বেলায় ওর কাকীমার পুতুলের বিয়েতে কত নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, তা এখন শুনতে পাই চূড়ামণি নাকি বাড়ীতেই আড্ডা বসিয়েছে, গান-বাজনা নিয়ে থাকে, আর একটু একটু মাল-টাল খায়, কিন্তু রক্তের দোষ ওদের যাবে কোথায়, তোকে বলে রাখছি ভুতো, তুই দেখে নিস, চূড়ামণির ও অভ্যেস-দোষ যাবে না, অমতে কখনও অরুচি হয় ভাই?

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো ননীলাল। ননীলাল তো আগে এমন কথা বলতো না। বিশেষ মুখচোরা লাজুক ছেলে ছিল। কেমন করে এমন হলো কে জানে!

ননীলাল আবার বলতে লাগলো—

—তা আমার এখন একটা আশা আছে ভাই, তোকে বলেই ফেলি, একটা বেশ বড়লোক গোছের লোকের মেয়েকে যদি বিয়ে করে ফেলতে পারি, তা আর কাউকে ভয় করি না আমি। বাবার টাকা-গুলো সব ফুরিয়ে এল কিনা—ও-পাড়ার দিকে আছে কোনও সন্ধান?

সেদিন যতক্ষণ ননীলালের সঙ্গে গল্প করেছিল ভূতনাথ, ততক্ষণই কেবল অবাক হয়ে ভেবেছিল। কই ব্রজরাখালও তো রয়েছে এখানে। বিবেকানন্দর চার ঘোড়ার গাড়ী যারা কাঁধে করে টেনে নিয়ে গেল, যারা গলা ফাটিয়ে 'বিবেকানন্দ স্বামীজী কী জয়' বলে চীৎকার করলো—যারা ভোরের শীত উপেক্ষা করে শেয়ালদা স্টেশনে মহাপুরুষকে দেখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, তারা তবে কারা? তারাও কি বাঙলা দেশের ছেলে? কলকাতার ছেলে? তারাও কি ননীলালের ক্লাশ ফ্রেণ্ড? তারাও কি ছুটুকবাবু কিম্বা ননীলালের মতন নয়? তাদের জাত কি আলাদা?

যাবার সময় ননীলাল বললে—সন্ধ্যে বেলা হেঁদোর ধারে দাঁড়িয়ে থাকবো, ঠিক আসিস—বিন্দীর বাড়ি যাবো বুঝলি? আর ছুটুককে যেন আমার কথা বলিসনি।

ভূতনাথ বললে—কেন?

—পরে বলবো তোকে—এখন আবার ক্লাশ আছে আমার—

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, যার হাতের ছোঁয়া লাগলে একদিন ভূতনাথের শরীরে রোমাঞ্চ হতো, যাকে দেখবার জন্যে ছুটির দিনেও কত ছুতো করে সাত মাইল হেঁটে গেছে ইস্কুল পর্যন্ত, সেই ননীলাল!

বাড়িতে গিয়ে ভূতনাথ নিজের বাক্সটা খুললে। অনেক পুরোন জিনিস জমে আছে ভেতরে। পিসিমার হরিণামের মালা একটা। পুরোন মনিঅর্ডারের রসিদ কয়েকটা। দেশের বাড়ির সদর দরজার চাবি, তারি মধ্যে থেকে একটা চিঠি বেরুল। বহুদিন আগের ননীলালের লেখা। সেখানা খুলে ভূতনাথ আবার পড়তে লাগলো।

"প্রিয় ভূতনাথ,

আমরা গত শনিবার দিন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা বেশ বড় দেশ, কী যে চমৎকার দেশ বলিতে পারিব না। এখানে আসিয়া অবধি বাবার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় রাস্তা। খুব আনন্দ করিতেছি। তোমাদের কথা মনে পড়ে। তুমি কেমন আছো জানাইও, উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—"

পড়তে পড়তে সেদিনকার ননীলালের সঙ্গে আজকের দেখা ননীলালের তুলনা করে দেখলে ভূতনাথ। কিন্তু কেন এমন হলো। একবার মনে হলো দরকার নেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু আবার বাক্সের ভেতরে রেখেই দিলে সে। থাক। সে-ননীলাল হয়ত সত্যিই মরে গিয়েছে। কিন্তু শৈশবের সে-ননীলালের স্মৃতি যেন অক্ষয় হয় থাকে সারাজীবন।

(ক্রমশঃ)

চক্রদত্ত

বিজ্ঞানের দ্বারা কত অদ্ভুত জিনিসই সম্ভব হচ্ছে! শব্দতরঙ্গের সাহায্যে ধ ও জল পরিশোধিত করা তে পারে। কোনও একটি জল-বরাহ কেন্দ্রের একজন কর্মী এই পারটি লক্ষ্য করেছেন। যে শব্দতরঙ্গ ক সেকেন্ডের মধ্যে এক লক্ষ বার রঙ্গায়িত হয় সেই রকম উচ্চগ্রামের ব্দতরঙ্গই জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। নও একটি কৃস্টালের ওপর বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার দ্বারা কম্পনের সৃষ্টি করে এই-কম শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। এই সঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করা কার। জনৈক ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছেন যে সব ধাতু থেকে আণবিক শক্তি গৃহীত হয় সেই ধাতুর বিচ্ছুরিত শক্তি দ সাধারণ জল এবং অপরিষ্কার নালার লের ওপরও ফেলা যায় তাহলে ঐ ল পরিস্রুত হয়।

*

ক্যান্সার রোগীর গলার খাদ্যনলীতে গ হলে ঐ নলী কেটে বাদ দিয়ে তার লে কৃত্রিম কোনও ব্যবস্থার বন্দোবস্ত নেকদিন থেকেই প্রচলিত আছে এবং সে বস্থা রোগীর পক্ষে খুব স্বস্তিকর না লেও কাজ চলে যায়। আজকাল াস্টিকের যুগে এই নলীর বদলে াস্টিকের নলী ব্যবহারের ব্যবস্থা চলছে। ই ব্যবস্থায় রোগী কোনওরকম অস্বস্তি ধ করে না। এই কৃত্রিম নলীটী ধারণত চার থেকে নয় ইঞ্চি পর্যন্ত ম্বা হতে পারে। যে ডাক্তার এই াস্টিকের নল ব্যবহারের প্রচলন করেছেন নি প্রায় ত্রিশজন রোগীর ওপর এই বস্থা চালিয়ে আটাশজনের কাছ থেকে ফল পেয়েছেন।

*

ব্লাড্‌প্রেসার রোগটা খুব সাধারণ লেও এ রোগের খুব ভালো ওষুধ আজ-র্যন্ত বার হয়নি। রকফেলো ইনস্টি-উটের দুজন ডাক্তার ব্লাডপ্রেসারের কটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। এই ষুধটি 'বড়ি' আকারের। এগুলো গবে-াগারের জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা করে খা হয়েছে যে, বেশ নিরাপদ ও কার্য-করী। এটি সেরাটোনিনের রাসায়নিক আকৃতির অদল বদল করেই এই ওষুধটি তৈরী হয়।

*

বিলের ধারে কিংবা জলার ধারে ধারে যারা পাখী শিকারে যায় তাদের অনেক সময় জলের মধ্যেও নেমে যেতে হয়। জল খুব অল্প হলে জলের মধ্যে নামা কিছুটা সম্ভব হতে পারে কিন্তু বেশী জলের মধ্যে শিকারের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র

শিকারী তাক্ করছে

নিয়ে নামা কোনও মতেই সম্ভব নয়। একজন অস্ট্রিয়ান শিকারী একরকম রবারের ফাঁপা জুতার মত পায়ে পরে জলের ওপর ভেসে ভেসে চলার জন্য জিনিস ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছেন। এই ধরণেব জুতা দুটো পরে জলের মধ্যে নিঃশব্দে চলা যায়। এ ছাড়া সঙ্গে জল কাটাবার জন্য একটা দাঁড় থাকে। পাখীটাকে মারার পর শিকারী ঐ দাঁড় বেয়ে জলের মধ্যে গিয়ে মরা পাখী তুলে আনতে পারে।

*

সাধারণত পুরান বইপত্তর সের দরে বিক্রী করা হয় অনেক সময় আবার এই পুরান বই মহামূল্যবান কিংবা অমূল্য হয়। ১৯৩৩ সালে বৃটিশ মিউজিয়ম ১০০০০০ পাউণ্ড দিয়ে একখানি নিউ-টেস্টামেন্টের সবচেয়ে পুরান অথবা আদি সংস্করণ কিনেছে। পৃথিবীর আর এক-খানি এই ধরণের অমূল্য গ্রন্থ, হাতে লেখা একখানি কোরান। আফগানিস্থানের আমীর পারস্যের সাহকে এই কোরানখানি উপহার দিয়েছিলেন। এখানি ১৬৭টি মুক্তা, ১৩২টি চুনী, ১০৯টি হীরা বসান সোনার পাতে বাঁধান। এর বাঁধাই খরচা ত্রিশ হাজার পাউন্ড। ম্যাজেরিয়ান বাইবেলও এইরকম একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। যে সব ছাপার হরফ সরান নড়ান যায় সেই হরফে ছাপা 'এই প্রথম গ্রন্থ—এর দাম ৬৫ হাজার পাউন্ড। ১৯৩০ সালে বার্লিন শহরে নিলামে এই বইখানি বিক্রী হয়।

*

বেগুন দেশী হোক্ অথবা বিলাতী হোক্ তার ভেতর হাজার হাজার বিচি থাকে। বিলাতী বেগুণ অর্থাৎ টোম্যাটোর বিচি সম্বন্ধে খুব বেশী আপত্তি না থাকলেও দেশী বেগুনের বিচি যত কম হয় ততই সুখাদ্য বলে মনে করি। টোম্যাটের মধ্যে একটিও বিচি না থাকলে কেমন হয় বলা যায় না। আমেরিকার এগ্রিকালচার বিভাগের রসায়নবিদ্‌গণ বিচিবিহীন টোম্যাটো উৎপন্ন করেছেন। ২, ৪—ডি নামক যে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে আগাছা ধ্বংস করা হয় সেই পদার্থের সাহায্যেই এই নতুন ধরণের টোম্যাটো উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে ২, ৪—ডি ব্যবহার করলে গাছের ক্ষতিই করে কিন্তু রসায়নবিদ্‌গণ এই ২, ৪—ডি সঙ্গে ৯—এ্যামাইনো এ্যাসিড্ নামক আর একটি পদার্থ মিশিয়ে একটি নতুন পদার্থের সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ নবজাত পদার্থের দ্বারাই বিচিশূন্য টোম্যাটো জন্মান সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আকারেও ঐ টোম্যাটোগুলি অনেক বড় হয়। অবশ্য এপর্যন্ত স্বল্প পরিসর জমির ওপরই এটি পরীক্ষা করা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত বড় জমির ওপর বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য এই পদ্ধতি কার্যকরী না হয় ততক্ষণ এসম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

প্রতিধ্বনি

রঞ্জন

গোড়াতেই দুটি একান্ত নেতিবাচক উক্তির উল্লেখ করতে হবে। বইটিতে *পল গোগাঁ বার বার বলেছেন, এটা বই নয়। "দিস্ ইজ নট এ বুক", এই পাঁচটি কথা যে কত পাতায় কতবার লেখা আছে তার শেষ নেই। একমত হতে বাধা নেই। এটা সত্যি বই নয়। অবনীন্দ্রনাথের ছবি-লেখা নয়, লেওনার্দো দা ভিঞ্চির জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নয়। এ হচ্ছে লেখকের রাজ্যে চিত্র-শিল্পীর পথ ভুলে প্রবেশ। তবু অনধিকারের প্রশ্ন অবান্তর, কেননা লিখতে অন্তত—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—লাইসেন্স, ডিপ্লোমা বা পারমিট দরকার হয় না। বরং কয়েকজন লেখক যেমন, যথা রবীন্দ্রনাথ, মাঝে মাঝে কলম সরিয়ে রেখে তুলি ধরে পরোক্ষ ইঙ্গিত করেন যে, এমন কয়েকটা কথা আছে যা কথায় বলবার নয়, তেমনি কোনো চিত্রকর যখন তুলি ছেড়ে কলম ধরেন, তখন আমি এই কথা ভেবে খুশি হই যে, তাহলে এমনও কিছু আছে যা তুলির বলা অসাধ্য।

দ্বিতীয় উক্তিটি পল গোগাঁর নয়, তাঁর ছেলের। তিনি বলছেন, "গোগাঁকে ঘিরে একটা অদ্ভুত রূপকথা গড়ে উঠেছে। যাঁরা আমার বাবার চিত্রপ্রতিভা সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ তাঁরাও তাঁর জীবন নিয়ে ওই রূপকথায় কৌতূহলী ও বিশ্বাসী। ...এক যে ছিল শেয়ার-দালাল। মধ্যবয়সী মধ্যবিত্ত, একান্ত সাধারণ। তাঁর স্ত্রী ছিল আর তিনটি সন্তান। তাঁর বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের কেউ কখনো সন্দেহও করেনি যে, তিনি সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু হতে অভিলাষী। তারপর একদিন হঠাৎ প্রায় স্বপ্নবৎ তিনি তাঁর সবকিছু বদলে ফেললেন। যে ঘুমিয়েছিল, সে সাধারণ ভদ্দরলোক—যে জেগে উঠল সে একটি দানব। দানব বলল, কা তব কান্তা—ইত্যাদি। ভদ্রতা চুলোয় গেল, সম্ভ্রান্ত হবার বাসনার হোলো বিসর্জন। ছবি আঁকা ছাড়া তাঁর আর কোনো কামনা রইল না জীবনে। ব্যস্, তিনি প্যারিসে পালিয়ে গেলেন, পরিবারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন, ছবি আঁকতে লাগলেন, পরে সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাহিতি গিয়ে বর্বরের জীবনযাত্রা বরণ করে নিয়ে সুখে দুঃখে আঁকলেন, বাঁচলেন ও মরলেন...চমৎকার গল্প। প্রতিবাদ করতে মায়া হয়। কিন্তু হায়, গল্পটা সত্য নয়।"

সমরসেট মমের বহুপঠিত ও অত্যন্ত উপাদেয় উপন্যাস 'দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের পক্ষে কাহিনীটা সনাক্ত করা শক্ত হবে না। ওখানে গোগাঁর নাম ছিল না, কিন্তু পরে 'দি রেজর'স এজ' বইতে মম স্পষ্টই বলেছেন যে, চার্লস স্ট্রিকল্যান্ড পল গোগাঁ ছাড়া আর কেউ নয়। দ্বিতীয় বইটিতে এই স্বীকৃতিও আছে যে, গোগাঁ সম্বন্ধে তিনি অল্পই জানতেন, যে তাঁর উপন্যাসের নানা উপকাহিনী একেবারেই উদ্ভাবিত। এক্ষেত্রে তাঁর পিতা সম্বন্ধে এমিল গোগাঁর সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তবু, মমের জীবনী-উপন্যাসের যতটাই কল্পিত হোক, গোগাঁর নিজের অন্তরঙ্গ দিনপঞ্জীতে যেন এমিলের জবানীর চেয়ে মমের গল্পেরই সমর্থন বেশি।

*

গোগাঁর নিজের কথা আরো বিশদভাবে জানতে পারলে ভালো হোতো। কিন্তু তাঁর ছবিতে যা ছড়ানো আছে, তা থেকে তাঁর জীবন সম্বন্ধে সুসম্বন্ধ একটা বর্ণনা উদ্ধার করা অসম্ভব। আর আলোচ্য বইতে (যা বই নয়) যা আছে, তা এত এলোমেলো, মাঝে মাঝে এত অসংলগ্ন, যে তা থেকেও শিল্পীর জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অসম্ভব। যখন যা মনে এসেছে লিখে গেছেন—অবাধে, নির্ভয়ে, অলজ্জ অনাবরণে। কখনো কোনো শিল্পী সম্বন্ধে, কখনো কোনো ঘটনা সম্বন্ধে। বইয়ের শেষে(!) ভূমিকায় গোগাঁ লিখেছেন, "এমন একটি বই লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না যা শিল্পসৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে (চেষ্টা করলেও পারতুম না)। ...কিন্তু আমি সভ্য ও বর্বর জগতের এত দেখেছি ও শুনেছি যে, সেকথা লেখার অধিকার আমার আছে। সমালোচকদের সাধ্য কী আমাকে নিরস্ত করে!"

বইতে যা আছে তা অনাদরণীয় নয়। আছে শিল্প, জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে একজন শিল্পীর মতামত। প্রকাশ নিখুঁত না হলেও অকপট। মতগুলি বিবেচনাপ্রসূত না হলেও প্রতিভাসঞ্জাত। কৌতূহলোদ্দীপক তো নিশ্চয়ই।

সবচেয়ে অবাক লাগে এই কথা ভেবে যে, হঠাৎ গোগাঁ কী করে নিজেকে তাঁর পরিচিত পরিবেশ থেকে এমন পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারলেন, কী করে পারলেন প্রচলিত সামাজিকতা থেকে এমন করে মুখ ফিরিয়ে নিতে। বোর্স থেকে বোহিমিয়ার দূরত্ব তিনি কেমন সহজে অতিক্রম করলেন!

একবার বেড়া পেরুলেই সব কিছু বদলে গেল। যা ছিল একঘেয়ে ধূসর, তা কত রকমারি রঙ ধরল। সে রঙে কত ছবি স্নান করল যা দেখে কত রসপিপাসুর তৃষ্ণা মিটল! কালো রঙের বাটিটা শুধু বাকি রইল পিছনে-ফেলে-আসা সভ্য সমাজের জন্যে। কালো কালিতে লেখা এই বইয়ের সেইটেই প্রধান ত্রুটি, তথা প্রধান আকর্ষণ। প্রতিবেশী বিশপকে চটাবার জন্যে গোগাঁ তাঁর বাড়ির নাম দিলেন 'দি হাউস অব কার্নাল প্লেজার'। পারিবারিক দায়িত্বের কথা কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে গোগাঁ বলতেন, অনভিনীত ঔদাসীন্যের সঙ্গে, 'পরিবার চুলোয় যাক'। ক্রিস্টিয়ানিটির নাম শুনলে রাগে জ্বলে উঠতেন। ক্যাথলিক পেগান হলে যা হয়। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও গোগাঁর তাঁর আর্টের প্রতি নিষ্ঠা কখনো শিথিল হয়নি। বার বার বলছেন, শিল্পসৃষ্টি আকস্মিক নয়। তার জন্যে সাধনা চাই, মুক্তি চাই।

মুক্তি মানে সমাজবন্ধন থেকে অব্যাহতি। সমাজ তা সহজে দেয় না, দিলে সমাজ থাকতই না। তবু যে সেই মুক্তি কেড়ে নেয় তাকে তার জন্যে মূল্য দিতে হয়। এজন্যে বিলাপ করাও মিছে। সমাজ থেকে মুক্ত না হলে গোগাঁ যেমন অন্য ব্যক্তি হতেন, তেমনি সমাজ তাঁকে সহজে মুক্তি দিলেও গোগাঁকে আমরা যেমন পেয়েছি, তেমন পেতুম না।

**The Intimate Journals of Paul Gavgin*, translated by Van Wyck Brooks, (Heinemann, London, 15s).

সাপ খেলান—বিজ্ঞান না ভেলকি?

নোরা সেকো ডি সুসা

প্রাচ্যের বহু রহস্য পাশ্চাত্যের নিকট অজ্ঞাত। প্রাচ্যের রহস্যময় বিদ্যাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সাপ-খেলান। ভারতবর্ষে এ বিদ্যা বহু শতাব্দীর প্রাচীন এবং ভারতের যে-কোন বড়ো শহরের রাস্তায় দেখা যাবে সাপুড়িয়ারা দর্শকদের খুশী করবার জন্যে মুখে বাঁশী লাগিয়ে তাদের ঝুড়ির সামনে বসে আছে। এ পেশা একান্ত দক্ষতাসাপেক্ষ এবং জনপ্রিয় হলেও এর বিপদ অনেক, কারণ সাপুড়িয়াদের যেসব সাপ নিয়ে কারবার করতে হয়, সেগুলোর সবই বিষাক্ত। এজন্যেই পেশাটি বংশ-পরম্পরাগত, বাপ ছেলেকে শিখিয়ে দিয়ে যায়। পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে শিক্ষা করলেই তবে এ বিষয়ে যথোচিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। ঝুড়ির গায়ে একটি টোকা মারতেই হীরকাকৃতি একটি বিশ্রি মাথা বেড়িয়ে আসে, চেরা-জিহ্বা বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং এক জোড়া কালো কুচকুচে সপ্রতিভ চোখ একদৃষ্টে বাঁশীর দিকে চেয়ে থাকে। সাপুড়িয়া বাঁশী হেলিয়ে-দুলিয়ে বিচিত্র সুরে যেমন বাজাতে থাকে, সাপও ক্রমশঃ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাঁশীর প্রত্যেকটি দোলার সঙ্গে দুলতে থাকে, চোখদুটি সর্বক্ষণ বাঁশীর দিকে স্থির রেখে। অবশেষে কুন্ডলী পাকিয়ে সে আবার নিতান্ত সুবোধ শিশুর মতো ঝুড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে।

সাপুড়িয়া শুধু খেলাই দেখায় না, সাপ ধরে পোষও মানায়। সাপ খেলান একান্ত বিপজ্জনক ও কঠিন কাজ। কাজেই সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগে সাপুড়িয়ার সাপকে পোষ মানাতেই হয়। সর্প ও সর্প-প্রকৃতি সম্বন্ধ সাপুড়িয়ার অগাধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তার ঠিক যে সাপটির সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই সাপটি জঙ্গলের কোথায় বাস করে, সে তা বলে দিতে পারে। সাধারণতঃ গোখুরা সাপই তার বেশি দরকার। কারণ সুবিস্তৃত ফণার দিক থেকে গোখুরা তার কাছে মূল্যবান, তাছাড়া এ সাপ তত মারাত্মক নয়। সর্প-শিকারের উপকরণ মহার্ঘ বা প্রচুর নয়—এক পাত্র দুধ, একটি বাঁশী ও ঢাকনা সমেত একটি মাটির হাঁড়ি মাত্র প্রয়োজন। গোখুরো সাপ দুধ ভালবাসে। এমনও শোনা যায়, গোখুরা

পোষা সাপের মালা গলায় ফাদার লে

সাপ গোয়াল-ঘরে ঢুকে গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খায়। সাপুড়িয়া একটি উপযুক্ত স্থান দেখে হাঁড়িটি রেখে দেয় এবং দুধের পাত্রও কাছাকাছি রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। শীঘ্র হউক বিলম্ব হউক, একটি অনুসন্ধিৎসু মস্তক তৃণগুল্মের ভিতর থেকে উঁকি মারবে, তারপর বুকে ভর দিয়ে মসৃণ গতিতে এসে দুধের পাত্রে মুখ দিবে।

সাপ যখন দুগ্ধ পান করতে থাকে, তখন বাঁশীও বাজতে থাকে। বংশীধ্বনি ও বাঁশীর দোলনে সম্মোহিত হয়ে সাপ দুগ্ধপানে বিরত হয় এবং সাপুড়িয়া খুব কাছে এসে পড়তেই ক্রমশঃ পেছন দিকে হঠতে থাকে। তারপর সাপুড়িয়া হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে মাথার পেছন থেকে সাপটিকে খপ করে ধরে হাঁড়ির ভিতরে পুরে ফেলে, সাপও সুড় সুড় করে ঢুকে পড়ে। চারদিন পর সাপকে হাঁড়ির ভিতর থেকে বের করে ওর বিষের থলে কেটে ফেলা হয়। অবশ্য এতেই বিপদের অবসান হল মনে করবার কারণ নেই, কারণ আবার ক্রমশঃ বিষ জমতে থাকে এবং প্রতি মাসে একবার বিষ অপসারণ করা দরকার। এই নিয়ম পালনে শৈথিল্যবশতঃ নিজের পোষা সাপের দংশনেই অনেক সাপুড়িয়ার অকালে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। সিংহ, বাঘ, কুকুর প্রভৃতি পশুকে পোষ মানিয়ে যেমন শিক্ষিত করে তোলা যায়, সাপকে তেমন পারা যায় না। সাপের মস্তিষ্ক এত কাঁচা যে, কিছুই সে শিখতে পারে না। প্রত্যেকবার তাকে নতুন করে পোষ মানিয়ে শেখাতে হয় এবং প্রত্যেকবারই তার অবাধ্য হয়ে দংশন করবার সম্ভাবনা থাকে।

সাপের কেন বিষ থাকে, প্রায়ই এই প্রশ্নটি করা হয়। বিষের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে শিকারকে কাবু করা; সাপের পক্ষে বিষের অন্যান্য উপকারিতা হচ্ছে, বিষ জারকরসরূপে কাজ করে এবং অন্যান্য বিষধর সরীসৃপের বিষ থেকে তাকে রক্ষা করে। বিষ নিঃস্রাবী-গ্রন্থি এবং বিষের থলে সাপের মাথার পেছনে ও পার্শ্বে থাকে। এজন্যেই বিষধর সাপের মাথা অদ্ভুত রকমে চওড়া আর এজন্যেই রাস্তায় অনেক সাপুড়িয়া খেলা দেখাবার সময় স্বেচ্ছায় মারাত্মক চন্দ্রবোড়া বা অনুরূপ বিপজ্জনক কোন সাপকে দিয়ে ছোবল মারিয়েও কখনই মারা যায় না। সর্পদংশনজনিত বিষ-ক্রিয়ার সমস্ত পরিচিত লক্ষণই তার দেহে প্রকাশ পায়। সে তখন মন্ত্র পড়তে পড়তে একটি পাথর, যাকে সে পরশ পাথর বলে, ক্ষত স্থানে ঘষে দেয়; পাথর 'বিষ শুষে নেয়' এবং পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

সাপুড়িয়ার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে এই।

সাপের মাথা যখন কোন বিশেষ এক ভঙ্গীতে থাকে, কেবলমাত্র তখনই সে তার ফাঁপা বিষ-দাঁতের ভেতর দিয়ে বিষ ঢালতে পারে। এজন্যে সাপুড়িয়া করে কি, মাথার যে অবস্থায় সাপ বিষ ঢালতে পারে না, সেই অবস্থায় মাথাটি ধরে সাবধানে সাপকে নিজের শরীরে কামড়াতে দেয়। সাপের দাঁত ফুটাবার জোড়াক্ষত সাপুড়িয়ার হাতে দেখা যায় এবং সামান্যতম পরিমাণে বিষও শরীরে প্রবেশ করে থাকতে পারে—সর্প দংশনের লক্ষণগুলো প্রকাশ পাবার পক্ষে যা যথেষ্ট। আমার আপনার হলে এই তিল পরিমাণ বিষেই জিন্দিগি কাবার হয়ে যেতে পারত, কিন্তু সাপুড়িয়া যে সম্প্রদায়ভুক্ত সুদীর্ঘ বংশপরম্পরায় সাপ ধরাই তাদের পেশা এবং সাপের বিষ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শৈশবেই তাদের প্রত্যেকের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ সাপের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

একবার এক সাপুড়িয়াকে একটি গোখুরা সাপ ধরতে দেখার এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। সাপটি এক ইঁদারার ফাটলের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, যে ইঁদারা থেকে লোকে খাবার জল তুলত। ইঁদারার মুখে দর্শকদের বেশ বড় এক ভীড় জমেছিল এবং আমিও তাতে ছিলুম। কোন অদৃশ্য সাপকে যে টেনে বের করা যেতে পারে, আমার কাছে তা অসম্ভব বোধ হচ্ছিল। সাপুড়িয়া হাতে একটি ফাঁস নিয়ে ইঁদারার ভেতরে নেমে অতি মোলায়েম ভাষায় সাপকে আহ্বান করতে লাগল। আমরা প্রথমে একটি মাথাকে উঁকি মারতে দেখলাম, তারপর ক্রমশঃ গোটা শরীরটি বেরিয়ে এসে ফাঁসের ভিতরে ঢুকতেই সাপুড়িয়া ফাঁস এঁটে দিল। সাপটিকে কাছাকাছি রেখে লোকটি যখন উপরে উঠে আসছিল, তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ ফাঁস ছিঁড়ে যায় এবং তারপরই আমাদের অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে আরম্ভ হল এক জীবন-মৃত্যু লড়াই। শেষ পর্যন্ত সাপুড়িয়ার বশীকরণ ক্ষমতাই ক্রোধোন্মত্ত ভুজঙ্গের উপর জয়ী হল। আবার সে তাকে বাগে এনে ইঁদারা থেকে তুলে বিস্ময়বিমূঢ় জনতার সামনে নিয়ে এল। সাপুড়িয়া পেছন দিক থেকে সাপের মাথাটি ধরে এক টুকরা কাপড়ের উপর ছোবল মারতে দিয়ে তার বিষ বের করে নিল। বিষের রঙ অতি ফ্যাকাসে হলদে রঙের—অনেকটা সালাড অয়েলের মতো। অসমসাহসিক কীর্তির জন্যে দশ টাকার একটি নোট বকশিস নিয়ে সাপুড়িয়া সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরে প্রস্থান করল।

সাপ খেলাবার মূল কথা হচ্ছে সম্মোহন। সাপের কান নেই, কিন্তু বুকের মাংসপেশী দিয়ে সে 'শোনে'। বুকের মাংসপেশী এত প্রখর অনুভূতিশীল যে, সাপ মৃদুতম শব্দতরঙ্গও ধরে ফেলতে পারে। বিশেষ করে গোখুরা সাপ অস্বাভাবিকরূপে শব্দসচেতন। সাপের

ভারতীয় গোখুরা

আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঘাড়ের বিস্তৃতি, যাকে ফণা বলা হয়। শুধু চামড়া ও মাংসপেশী নয়, অস্থি-পঞ্জরের গঠন প্রণালীও সাপকে ফণার বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সাপের ঘাড় ও পিঠের ঊর্ধাংশে কুড়ি জোড়া পাঁজর বক্র না হয়ে সমতল। এই পাঁজরগুলো মাথা থেকে একাদশ বা দ্বাদশ জোড়া পর্যন্ত ক্রমশঃ বিস্তৃত; তারপর ক্রমশঃ হ্রস্ব হয়ে দেহের সাধারণ বক্র পাঁজরগুলোর সাথে মিশে গিয়েছে। সাপ যখন উত্তেজিত হয়, তখন এই পাঁজরগুলো সামনের দিকে ঠেলে এসে চামড়াকে প্রসারিত করে ডিম্বাকৃতি বৃহৎ ফণার আকার দান করে। বৃহৎ ফণাযুক্ত গোখুরা বা কোবরা ডি ক্যাপোলোর ফণার পেছন দিক একটি কালো বক্র রেখার দ্বারা সংযুক্ত এক জোড়া চোখের মত দাগে চিত্রিত। সমগ্র দাগটিকে মনে হয় যেন একজোড়া চশমা। তবে গোখুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কুলীন, তাদের ফণা একটি মাত্র চশমার মত চক্র দ্বারা শোভিত। বেশি দিনের কথা নয়, বোম্বের বাঁদরাতে বেশ পরিপুষ্ট একজোড়া গোঁফ যুক্ত এক গোখুরা দেখা গিয়েছিল।

গোখুরা সাপের যদিও সমগ্র দেহের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে, তবু সে শুধু সামনাসামনিই দংশন করতে পারে। চতুর সাপুড়িয়া ও বেজী এর সুযোগ নিয়ে থাকে। সাপুড়িয়া আর যে একটি বিভ্রমের সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে বাঁশীর যে নিম্নাংশটিকে সে নাচায়, সে অংশ থেকে সে সুর বের করে আর এই সুরেই সাপ মন্ত্রমুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে বাঁশীর তালে তালে যেন দুলতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার উল্টো। সাপকে যখন আত্মরক্ষায় বাধ্য করা হয়, তখন সে না দুলে পারে না। সাপ স্বকীয় স্বাভাবিক ছন্দেই দুলতে থাকে। কাজেই সাপ বাঁশীর ছন্দে দোলে না, বাঁশীই সাপের দোলনের ছন্দে বাজে। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর সাপ নাচান আমি ভারতে নয়, বর্মায় দেখেছি। বর্মার গভীর অরণ্যাবৃত গ্রামাঞ্চলে এখনও মরণ-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

একটি পূর্ণবয়স্ক কিং কোবরা বা শংখচূড় সাপ ভর্তি একটি হাঁড়ি মাটিতে রাখা হয়, তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে একটি তন্বী কিশোরী আর চারদিকে বসে থাকে নিবিষ্টচিত্ত দর্শকদল। মৃদু বংশী-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুলতেই সর্প জিহ্বা বিচ্ছুরিত করতে করতে গোখুরা সাপের কদাকার শির হাঁড়ির প্রান্তে দেখা দেয়। তখন বালিকা বাঁশীর তালে তালে হাত ও দেহের ললিত ছন্দে নাচ আরম্ভ করে। সে যেন আবিষ্টের মতো নাচতে থাকে। নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধ সাপও বালিকার সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে, বালিকা ধীরে ধীরে যত অগ্রসর হয়, সাপেরও শির তত ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। বালিকা আরও কাছে চলে আসে, হৃদপিণ্ডে অনুরণন তুলে বংশীরব উচ্চ হতে উচ্চতর হতে থাকে, ফণিনীর মাথা থেকে বালিকার কোমল আননের ব্যবধান মাত্র কয়েক ইঞ্চি। তারপর সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সুবিস্তৃত ফণার নীচে সাপের

সাপের ব্যাঙ শিকার

গলদেশে আস্তে একটি চুম্বন করে। চুম্বন দিয়ে বালিকা আবার নাচতে নাচতে পিছু হঠে যেতে থাকে যতক্ষণ না সাপ আবার হাঁড়ির ভিতরে প্রবেশ করে এবং বংশীরব নিস্তব্ধ হয়। সামান্যতম ভুলে, দর্শকদের সামান্যতম নড়াচড়ায় বা বিচার-বিভ্রমে সাপের মোহাবেশ ভেঙে গিয়ে সে হয়তো ছোবল মেরে দিত। কিন্তু নর্তকী বয়সে নবীন হলেও সর্প সম্মোহন বিদ্যায় ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। সে নৃত্যে ও চুম্বনে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে জয় করেছে।

আমি মাদ্রাজের লয়োলা কলেজের রেভারেণ্ড ফাদার সি লে-কে জানি, যাঁর একাগ্র নেশা ছিল পাইথন বা অজগর সাপ পোষা ও তাদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ। সর্পজাতির বিরুদ্ধে মানুষ যত অন্যায় করে, সর্পজাতি মানুষের বিরুদ্ধে তত অন্যায় করে না, একথা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি যেরূপ পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, কোন সাপুড়িয়াই তা পারত না। রেভারেণ্ড ফাদার লে ইংল্যাণ্ডের ল্যাঙ্কাসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। সাপ সম্বন্ধে চিরকালই তিনি কৌতূহলী ছিলেন, কিন্তু এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ৩৫ বৎসর পূর্বে, তিনি যখন ত্রিচিনপল্লীতে সেণ্ট জোসেফ কলেজ মিউজিয়ামের কিউরেটার পদ লাভ করেন। তাঁর দুটি প্রিয় অজগর সাপ, জ্যাকব ও বেঞ্জামিন এখানেই অণ্ড থেকে জন্মলাভ করে। পরে ১৯৩৫ সালে তিনি মাদ্রাজের লয়োলা কলেজে বদলী হলে সাপদুটিকেও সেখানে নিয়ে যান। অজগর সাপমাত্রই ডিম থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দংশন করতে অভ্যস্ত। কেউ যদি অসতর্কভাবে চলাফেরা করে, তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে, তবে অজগর নির্ঘাৎ তাকে দংশন করবে। ফাদার লে বিপদ সম্ভাবনা মুক্ত থেকে অজগর সাপকে পোষ মানাতে ও তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারতেন। তাঁর এই দুর্লভ সাফল্য সম্বন্ধে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি সাপদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে থাকেন এবং এটিই হচ্ছে তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি।

বাইবেলোক্ত ধার্মিকশ্রেষ্ঠের নাম অনুযায়ী নামকরণ করলেও জ্যাকব ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত শ্রেণীর সাপ। কেউ তাকে উত্ত্যক্ত করে রাগান্বিত করলে সে তাকে যমালয়ের দক্ষিণদ্বার দেখিয়ে ছাড়ত; সে তার প্রভুকে একাধিকবার দংশন করেছে। ডিম থেকে বেরিয়ে ২২শে জুলাই, ১৯৩৩ সালে সে প্রথম সূর্যালোক দর্শন করে। তখন তার ওজন ছিল সাড়ে ৪ আউন্স ও দৈর্ঘ্য ছিল ২৪ ইঞ্চি। আট বৎসর পর তার ওজন দাঁড়ায় ৬৭ পাউণ্ড, দৈর্ঘ্য হয় ১১ ফুট ১৮ ইঞ্চি এবং বেড় হয় ১৮ ইঞ্চি। বেঞ্জামিন ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি এবং ঐ কারণেই তার নামও রাখা হয়েছিল বেঞ্জামিন। সে অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ছিল এবং ঐ বৎসরেরই ২৪শে জুলাই ভিন্ন মাতার গর্ভে তার জন্ম হয়। একই অবস্থায় লালিত হলেও বেঞ্জামিনের ওজন পুরা ৪.আউন্সও হয়নি এবং তার দৈর্ঘ্য ছিল ২৩ ইঞ্চি। এই সরীসৃপদের বাসস্থানের সমস্যারও সমাধান করা হয়। ফাদার লে তাদের ১০ ফুট লম্বা, ৮ ফুট উঁচু ও ৫ ফুট চওড়া একটি আরামপূর্ণ খাঁচার মধ্যে স্থান দেন। তারা যাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে পারে, সেজন্য খাঁচার ভিতরে মাঝামাঝি জায়গায় একটি তাক তৈরী করে দেওয়া হয়, মেঝের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় পরিষ্কার বালি এবং পানের জন্যে বা শুয়ে থাকার জন্যে দেওয়া হয় ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট গভীর ও ২ ফুট চওড়া একটি জলাধার।

যা হোক, এই সর্পকুল আহার্য সম্বন্ধে খুঁতখুঁতে ছিল না এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ সামান্যই হোত। মোরগ তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। মাদ্রাজে প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের মোরগ কলেরায় মারা যেত, তারা সে সব মোরগ জ্যাকব ও বেঞ্জামিনের ভোগের জন্য দান করত। জ্যাকবের ক্ষুধা ছিল কিছু বেশী। সে 'একাসনেই' তিন চারটি বড় মুরগী সাবাড় করে দিত এবং এই গুরুভোজনেও তার অস্বস্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ পেত না। সে একটি বড় কুকুর প্রায় এক ঘণ্টায় এবং একটি খরগোশ পনর মিনিটের মধ্যে খেতে পারত। তাদের সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য ছিল বাঁদর, ভোজ্য-সামগ্রীর মধ্যে বাঁদরকেই তারা অন্য সবকিছুর চাইতে বেশী পছন্দ করত। একটি বড়ো অজগর বলিষ্ঠতম মনুষ্যকেও অনায়াসে কাবু করে ফেলতে পারে, কিন্তু কোন ভারতীয় অজগর মানুষ গ্রাস করেছে বলে কোন প্রামাণ্য নজীর নেই। অজগর ১৫০ পাউণ্ড ওজনের একটি ভল্লুক বা হরিণকে গিলে খেতে পারে। এ থেকেই অজগরের মাথা ও চোয়ালের আকার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। সাধারণত যেরকম থাকে,

অজগরের চোয়াল সেভাবে পেছন দিকে কব্জার মতো আঁটা থাকে না বলে তাদের মাথা থেকে অনেকগুণ বড় বস্তুকেও তারা গিলবার জন্যে প্রকাণ্ড হাঁ করতে পারে।

আমাজন উপত্যকা অজগর সাপের এক সুবৃহৎ আড্ডা। ঐ অঞ্চলে যাঁরা তথ্যানুসন্ধানে গিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন যে, ওখানে পশুর শিং অথবা হরিণের শৃঙ্গ গিলতে অজগরদের অত্যন্ত বেগ পেতে হয়। কোন কোন অজগর হয়তো হরিণের শৃঙ্গ কষ্টেসৃষ্টে গিলে ফেলতে পারে, কিন্তু শৃঙ্গ পেটের ভিতরে চামড়া ভেদ করে সাপের মৃত্যু ঘটায়। অনুরূপ ঘটনা ভারতেও ঘটতে দেখা গিয়েছে। একটি মহিষের বাচ্চা গিলে ফেলে এক অজগরকে ছ সপ্তাহ অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়েছিল যতদিন না শিং-জোড়া পচে যায়। অজগর যদি সুস্থ অবস্থায় জীবন আরম্ভ করে, তবে মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসরও কোন কিছু না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সপ্তাহে একটি মূষিক খেয়েও অজগরের বেশ চলে যায়; একটি বড়ো কুকুর খেলে অন্তত দুই তিন মাস আর তার খাদ্যের প্রয়োজন থাকে না। তবে যত বেশী খাদ্য পাবে, তত বেশী সে হৃষ্টপুষ্ট হবে। একটি বন্দী সাপ দু বৎসর ন' মাস অনাহারে ছিল—এটিই সাপের দীর্ঘতম অনশনের নজীর। এই সাপটি ছিল একটি পার্বত্য বোড়া।

ফাদার লে তাঁর পোষা সরীসৃপ-গুলোকে যে খাদ্য দিতেন তার তালিকা দেখে বলা যেতে পারে যে, অজগর সর্ব-ভুক; লোমশ, পালক ও শল্কযুক্ত যা কিছু তারা অনায়াসে গিলতে পারে, তার সবই তারা খেয়ে থাকে। জীবন্ত শিকারই তারা বেশি পছন্দ করে, তবে সদ্য নিহত হলে মৃততেও আপত্তি নেই; কিন্তু 'বাসী' হলে স্পর্শও করবে না। বিড়াল, কুকুর, বাঁদর মৃত এনে ফেলা হোক; ইঁদুর, হাঁস, মুরগী ব্যারামে মরে থাকুক; ছোট বড় পেঁচা, সারস, বক, খরগোশ, গিনিপিগ, চিল, কাক সবই তারা খাদ্য-বস্তুরূপে গ্রহণ করে। ফাদার লে একাধিক-বার তাদের সঙ্গে চালাকি করেন। যখন অন্য কোন খাদ্য পাওয়া যেত না, তখন তিনি আধডজন খানেক কাক মেরে আনতেন এবং একটি কাক অজগরদের মুখের সামনে ঝুলিয়ে রাখতেন। তারা যখন সেটি খেতে আরম্ভ করত, তখন তিনি প্রথম কাকটির পায়ের সঙ্গে দ্বিতীয়টির মাথা বেঁধে দিতেন। এভাবে তিনি শেষ কাকটি পর্যন্ত একটির সঙ্গে আরেকটিকে বেঁধে দিতেন। অজগররা কোনপ্রকার সন্দেহ না করে, তা খেয়ে ফেলত। এভাবে মূষিকেরও মালা গেঁথে তিনি তাদের খেতে দিতেন এবং তারা আপত্তি করত না। কিন্তু গোমাংস সম্বন্ধে তাদের বাছবিচার ছিল অত্যন্ত তীব্র। এই অজগররা যেরূপ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ঘৃণার অভ্রান্ত চিহ্ন প্রদর্শন করে আপত্তিকর খাদ্য থেকে দৌড়ে পালাত, কোন উৎকট নিরামিষাশীও তা করতেন কিনা সন্দেহ। তারা উন্মত্তবৎ খাঁচাময় ঘুরে বেড়াত এবং আপত্তিকর খাদ্য সরালে তবে শান্ত হত।

বন্য অজগর শিকারের জন্যে মাটিতে ওৎ পেতে থাকে অথবা গাছের ডাল থেকে অংশত ঝুলতে থাকে এবং কোন জন্তু নীচে দিয়ে গিলেই তাকে আঘাত করে। দেখতে জড়ভরতের মতো হলেও প্রচণ্ড শক্তি ও ক্ষিপ্রতার সাথে তারা শিকারকে আক্রমণ করে থাকে। তারা মুখ হাঁ করে সামনের দিকে ছুটে এসে শিকারকে চোয়ালে কামড়ে ধরে এবং শিকার ছোট হলে তাকে জীবন্ত গিলে খায়। অজগরের বিষ-দাঁত নেই, পেঁচিয়ে প্রচণ্ড চাপ দেবার শক্তির উপরই সে নির্ভর করে। কিন্তু বিষ-দাঁত না থাকলেও, তার ভেতর দিকে বাঁকানো, সূচীতীক্ষ্ম দাঁত দিয়ে সে ভয়ংকর কামড় মারতে পারে। শিকার যদি অপেক্ষাকৃত বড়ো ও শক্তিশালী হয়, তবে বিরাট দেহভার দিয়ে পেঁচিয়ে সে তার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়—শ্বাস-রোধ হয়ে শিকার মারা যায়। অস্থি ভাঙবার বা চূর্ণ করবার প্রয়োজন নেই, কাজেই সে সে-চেষ্টাও করে না। অন্য সমস্ত সাপের মতো অজগরও খাদ্য চিবিয়ে বা টুকরো করে খায় না, শিকার আস্ত গিলে ফেলে এবং সাধারণত মাথাটি আগে গিলে। শিকার একবার গলাধঃকরণ হলে সাপের কণ্ঠনালী ভয়াবহরূপে বুজে যায় ও স্ফীত হয়ে উঠে, কিন্তু মুখের

চতর অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ম্বা শ্বাসনালীর সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস য়া স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে। য়োজন হলে সে এই শ্বাসনালীটিকে চের সম্প্রসারিত চোয়ালের মধ্য দিয়ে ড়িয়ে দিতে পারে। তারপর সর্পদেহের তিশীল পাঁজর ও মাংসপেশীর কাজ রু হয়। পাঁজরগুলো বুকের অস্থির ঙ্গ জোড়া লাগান নয় বলে এগুলো াধীনভাবে নড়তে চড়তে পারে ও নেকখানি বিস্তৃত হতে পারে। গতি-ীল পাঁজর ও নমনীয় মাংসপেশীগুলো দ্যকে চাপ দিয়ে ও নিংড়ে মণ্ডের াকারে পরিণত করে পাকস্থলীর দিকে লে দেয়।

অজগরের আত্মসম্প্রসারণের ক্ষমতা যে তো বিস্ময়কর, তা চোখে না দেখলে শ্বাস করা যাবে না। শিকারের আকার বং অজগরের মুখবিবর যার ভেতরে িকার প্রবেশ করে ও কণ্ঠনালী যার পর দিয়ে ভোজ্য গলিয়ে যায় াদের আকারের মধ্যে তুলনা করলে জগরের শিকার গেলা আপাতদৃষ্টিতে কটা অসম্ভব ব্যাপার এবং নিত্য-মিত্তিক ঘটনার চেয়ে যাদুকরের খেলা লেই বেশী মনে হবে। খাদ্য যখন খবিবরের ভেতর দিয়ে যেতে থাকে, তখন ুর লালা নিঃসৃত হয়ে তাকে সিক্ত ও পিচ্ছিল করে দেয়। অজগর তার দেহ এত সম্প্রসারিত করতে পারে যে, ভক্ষিত পশুর আকৃতি পর্যন্ত চামড়ার ভেতর দিয়ে দেখা যায়, এমন কি মৃত পশু যখন চোয়ালের মধ্য দিয়ে গলা বেয়ে নামতে থাকে, তখন তার দেহের লোম পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

অজগরের পরমায়ু কত তা কেউই এখন পর্যন্ত জানে না। তবে তিন বৎসর বয়সেই সে ডিম্ব প্রসব করে এবং বন্য-জীবনে ২০০ পাউণ্ড ওজন ও ২৫।৩০ ফুট দৈর্ঘ্য লাভ করতে তার অর্ধশতাব্দী সময় অতিবাহিত হতে পারে। ভারতের সর্পজাতির মধ্যে অজগরই বৃহত্তম এবং পৃথিবীর তিন শ্রেণীর বৃহত্তম সাপের অন্যতম। অপর বৃহত্তম সাপ দুটি হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার এ্যানাকোণ্ডা এবং বর্মা ও দূরপ্রাচ্যের পাইথন।

অজগরের চামড়া ভেড়া, ছাগল অথবা বাছুরের চামড়ার চাইতে বেশি টেঁকসই এবং এ চামড়া সংগ্রহের কষ্টসাধ্যতা বিবেচনা করলে এর দামও খুব বেশি নয়। লণ্ডনের কোন কোন সম্ভ্রান্ত বিপণি আগাগোড়া অজগরের চামড়ায় আবৃত করে সজ্জিত। কোন পর্যটক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সাপের চামড়া দেশে নিয়ে যেতে চাইলে ৩৫ ফুট পর্যন্ত যে কোন দৈর্ঘ্যের চামড়া তিনি কিনতে পারেন। ব্যবসায়ীরা সাপের চামড়া বিক্রি করলেও খুব কমই বিক্রি করেন। কোন ব্যবসায়ী একটি সাপ পেলে তার দৈর্ঘ্যকে চাহিদা মতো বাড়াতে পারেন! সিন্ধুঘোটকের তেল (ম্যানাটি) চামড়ায়, বিশেষত সাপের চামড়ায় প্রয়োগ করলে তা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক হয়ে উঠে। চামড়া একদিন সিন্ধুঘোটকের তেলে ডুবিয়ে রাখলে এর মূল দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ লম্বা করা যায়।

অজগর পোষার খেয়াল হল কেন, ফাদার লে-কে একথা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁর এই জবাব পেয়েছিলামঃ "বলা শক্ত, সম্ভবত অন্য লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য কোন কাজ করার বাসনাই এর মূলে ছিল। বিপজ্জনকতারও একটা আকর্ষণ ছিল। সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারব এবং আমার খুশী মতো তারা চলবে, এর মধ্যে একটা গৌরব বোধও ছিল। ঈশ্বরসৃষ্ট সুন্দর প্রাণীর প্রতি অনুরাগের প্রভাবও আছে। আমি মনে করেছিলাম, কোন যাদুকর যদি জীর্ণশীর্ণ একটি নির্জীব সাপকে পোষ মানাতে পারে, তবে আমার ডজনখানেক পরিপুষ্ট, বলবান ও স্বাস্থ্যবান সাপকে পোষ মানাতে পারা উচিত। এজন্যই আমি বিপজ্জনক অজগর সাপ বেছে নিয়েছি।"

[March of India হইতে]

সাগরিকা

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়

সতেজ আনত ঋজু একগুচ্ছ রজনীগন্ধার
শুভ্র বুকে নীল স্বপ্ন, আর কোনো ছুটন্ত ঝর্ণার
বর্ণালি, গতির ছন্দ ছিলোতো তোমার! মনে হয়—
দিগন্তের নক্ষত্রের আলোরেখা—অসীম বিস্ময়
নিয়ে শুধু একবার জেগেছিলে জীবনে আমার।

তারপর শূন্য সব। অন্ধরাতে ঘড়ির কাঁটার
কেবল স্পন্দন গোনা, দিনে স্বপ্ন হয় নয়-ছয়।

সন্ধ্যায় শঙ্খের ধ্বনি শুনে ভাবি, এমন তো হয়—
সমুদ্রের বালুকা বেলায়—আজো তুমি গাও গান
সাগরিকা! স্বপ্ন দেখো, ঢেউ গোনো। সমুদ্র-আহ্বান
আমারো শোণিতে বাজে। আঁকি ছবি শুধু কল্পনায়
সে ছবি তো মূর্ত নয়; মনে সব ঢেউ ভেঙে যায়।

ওপারের কোনো ভাষা—কোনো আলো, গান, ছন্দ, সুর
এপারে আসেনা ভেসে,—এ আকাশ বাতাস নিষ্ঠুর!

শ্রীশ্রীমাতৃদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

তখন শ্রীমা নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের বসুপাড়া লেনস্থ বাটীর গলির সম্মুখে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিতেন। স্বামীজী কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, ঠাকুরের সন্তানদের বেশির ভাগের সহিত মা প্রত্যক্ষে কথা কহিতেন না। উত্তরগুলি মাতৃ-সন্তান কাহারও না কাহারও মারফৎ দিতেন। যে ক'টি ঠাকুরের সন্তানের সহিত কথা কহিতে শ্রীমাকে আমরা দেখিয়াছি, সে ক'টির নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ। বাকীগুলি নিজেদের যাহা বলিবার, তাহা বলিতেন এবং শ্রীমার নিকট তাঁহার সন্তান কেহ থাকিলে তাঁহার দ্বারা বলাইতেন। এক্ষেত্রে স্বামীজী আসিয়া শ্রীমাকে বলিলেন—মা আপনার ঠাকুর কিছু নয়, আমি কাশ্মীর হইতে ফিরিবার সময় এক সাধুর চেলা আমার নিকট ক্রমাগত আসিত এবং আমাতে লিপ্ত হইয়াছিল। সাধু ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বলে যে, তুই কার নিকট যাইতেছিস? দেখিবি, তিন দিনের মধ্যে তাহাকে এই জায়গা ছেড়ে হাগতে হাগতে যেতে হবে। মনে করেছিস কি? মা তাই কিনা হলো। তিন দিনের মধ্যে আমাকে সে স্থান ছেড়ে আসতে হলো। বলুন, ঠাকুর কি কোন কাজের? তিনি বাঁচাতে পারলেন না।

শ্রীমা বললেন—ঠাকুর ত' আর ভাঙতে আসেন নি, গড়তেই এসেছেন।

স্বামীজী—ও যাই বলুন না কেন, তাঁর কোন শক্তি নাই।

শ্রীমা—নিজে বুঝতেই পারছ, এখনও পর্যন্ত তাতে অনুরক্ত আছ এবং থাকবেও। তুমি বলছো বটে, কিন্তু আসলে তাঁকেই দেখছো।

স্বামীজী কাঁদ কাঁদ হইয়া মাকে প্রণামকরতঃ উঠিলেন। তিনি কিছু প্রসাদ খাইতে দিলে স্বামীজী তাহা নিজ মস্তকে ঠেকাইয়া কাঁদ কাঁদভাবে উঠিলেন। শ্রীমা আশীর্বাদ করিলেন—তিনি যাহা করিতেছেন, তাই ভাল, মনে মনে তো বুঝচো?

স্বামীজী—ও যা বলুন না কেন, বুঝে নিয়েছি বামুনটা কেউ নয়।

শ্রীমা—তবুও তাঁকে ছাড়া আর কাউকে মানতে পার না। এমনি কঠোর বন্ধনে বেঁধেছেন।

স্বামীজী প্রসাদ মস্তকে ঠেকাইয়া হন হন করিয়া নিচে চলিয়া গেলেন। শ্রীমা হাসিতে লাগিলেন। আমাদের বলিলেন—ভেতরে কি টান? ও কি কম বিশ্বাস? নিচে নামিয়া স্বামীজী কাঁপিতে কাঁপিতে সেই প্রসাদ গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—বামুনটা যাদুকর। যাদু জানতো। স্বামী যোগানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিচের ঘরে বসাইলেন। এবং আমাদের খাবার জল দিতে বলিলেন। স্বামীজী জল হাতে করিয়া বার বার ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিতে থাকিলেন এবং মঠে যাইবার জন্য আমাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমার নিকট শুনেছি যাহা, তাহাই এখানে লিখিতেছি। তিনি গ্রামের কতকগুলি লোকের সহিত শ্রীঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে সঙ্গীগুলি আগাইয়া গিয়াছে, আর তিনি তেলো-ভেলোর মাঠে একাকী রহিয়া গিয়াছেন। তিনি রাস্তা জানা না থাকায় একাকী ঐ মাঠে রহিয়া গিয়াছেন। এমন সময় একজন পুরুষ বাগ্দীর মতন লাঠি হাতে তাঁহার নিকটে আসিয়া—কেরে? কোথায় যাস? বলিয়া আক্রমণ করিতে আসায় তিনি—বাবা আমি দক্ষিণেশ্বর যাইতেছি আমার স্বামীর নিকট, আমায় রক্ষা কর বলিলে একটি স্ত্রীলোক দেখা দেয়, আর তাহাকে শ্রীমা ঐরূপ কাকুতি-মিনতি করিলে সে পুরুষটিকে শ্রীমাকে আগাইয়া দিতে বলিয়া অন্তর্ধান হয়। লাঠিহাতে পুরুষটি আগাইয়া চলে এবং শ্রীমা তাহার পশ্চাতে চলিতে থাকেন। তেলোভেলোর মাঠ পার হইলে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া যান। অবশেষে সেই বাগ্দী দক্ষিণেশ্বরেও আসে এবং শ্রীঠাকুরের সহিত দেখাও হয়। ঐসব কথা শ্রীমা যখন গল্প করিতেছিলেন, তখন লেখক তাঁহাকে বলে—মা সেই বাগ্দিনীকে আপনি দেখিতে পান, না কি বাগ্দীকে বন্দিনীর বেশ ধারণ করে কথা কইতে দেখেন, কোন্‌টা ঠিক বলুন। উত্তরে শ্রীমা বলেন—তোমার খালি ঐসব কথা। আমি কেন দেখাতে যাব। লেখক বলে—সত্যই কি তাহা? শ্রীমা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি বাগ্দিনীকে দেখেছিলুম। লেখকের মুখ শুকাইয়া গেল, একথা বিশ্বাস করিল না। শ্রীমা বুঝিয়া বলিলেন—আমি যাইতেছিলাম ঠাকুরের কাছে, ইহাতে বাগ্দীকে ভয় দেখাইবার আমার কি দরকার? তোমার ত কেবল মা আর ছেলে। যাহা কিছু শুনবে, তাহাতেই ঐ ভাব।

শিশু রংমহলের শিশু মেলা

পংকজ দত্ত

তৃতীয় দিনের মেলায় অবনীন্দ্রনাথের "ক্ষীরের পুতুল" অভিনয়ের দৃশ্য

গত ২৩শে জানুয়ারী থেকে ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে কলকাতার যাদুঘর অঙ্গনটি অগণিত শিশু আর তাদের অভিভাবকে এবং সেই সঙ্গে শত শত শিক্ষাব্রতী ও সুধীজনের সমাগমে এক অভিনব চেহারায় রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। অভিনব একটি অনুষ্ঠান চলেছিলো এই ক'দিন ধরে। শিশু রংমহলের উদ্যোগে শিশুদের মেলা—দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত নানা জাতের শত শত শিশুর কতো বিচিত্র সাজপোষাকের ঝলমলানিতে আর আনন্দ কলরবে জীবনের যে সাড়া এনে দিয়েছিল, এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। শিশুদের এই উৎসব জমায়েতে কলকাতা প্রবাসী বিদেশী শিশুদেরও যোগদান অনুষ্ঠানটিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা যোগ করে দেয়।

বছরও পুরোপুরি হয়নি শিশু রংমহল কলকাতার ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটা অনুষ্ঠানে জমায়েৎ করে সাধারণ্যে হাজির করেন। ছোটরা ছড়া, গান, নাচ ও কৌতুকের মধ্যে দিয়ে অনাবিল আনন্দ বিতরণ করে। বার দুই শিশু রংমহল ঐ ধরণের অনুষ্ঠান পরিবেষণের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করে দিতে সক্ষম হয়। তারপরই এই পাঁচদিনব্যাপী শিশুমেলার আয়োজন অভিনব একটি অনুষ্ঠান মাত্রই নয়, আগামীকাল যাদের নিয়ে জাতি আজ থেকেই তাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত করে তুলতে; ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের পরস্পরের মধ্যে একাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে; দেশের শিল্প সাহিত্যের প্রতি তাদের অনুরাগ সৃষ্টি করে তুলতে—একটি প্রেরণাদায়ক পরিপুষ্ট আন্দোলনকেই মূর্ত করে তুলেছে। ছোটদের একটা মস্ত অভাব পূরণ করার চমৎকার পরিকল্পনা শিশু রংমহলের এই উদ্যোগ।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার দিন ছিলো ২২শে জানুয়ারী কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু সেদিনের অনুষ্ঠান স্থগিত হতে বাধ্য হয়। পরদিনও নেতাজীর জন্মদিনে দুর্যোগ অব্যাহত সত্ত্বেও অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। গোড়ার দিনটা শেষের দিকে যোগ করা হয় এবং মেলা সমাপ্ত হয় ২৬শে'র জায়গায় ২৭শে।

নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে প্রথমদিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

রাজস্থানের নাচ

সেদিনের সূচীতে ছিল "অভিমন্যু বধ", "ঝগরাটে পড়ুয়া" এবং "নয় বোকা জেলে"। সবশেষে হাসিখুশীর মেলার গান ও নাচের ছন্দ সকলকে মুগ্ধ করে। পরদিনের অনুষ্ঠান আরও জমে ওঠে এবং একটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালী, নেপালি, দক্ষিণ ভারতীয়, চীনা, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের সমাবেশে তাদের নিজেদের জাতীয় পোষাকে যেন ফুলের হাট বসে যায়। সেদিন চীনে ছেলেমেয়েদের সূর্যোদয় আর ধানকাটার নাচ এবং দক্ষিণী ছেলে-মেয়েদের নাচ প্রভৃত আনন্দ দান করে। ২৫শে জানুয়ারী ছিল অন্ধ ছেলেমেয়ে-দের "আনন্দ নাড়ু", "পুতুলের দোকান", অবনীন্দ্রনাথের "ক্ষীরের পুতুল", রামধনু নৃত্য এবং সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল" থেকে নির্বাচিত কবিতার আবৃত্তি। ২৬শে জানুয়ারী সকালে শিশু রংমহলের সভ্য, পরিষদ সভ্য, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং অভিভাবকদের একটি আলোচনা সভা হয়। বিকেলের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র-সংগীত, এবং "স্বপনবুড়ো" ও "চড়ুইভাতি" নাটিকাভিনয়। মঙ্গলবার ২৭শে জানুয়ারী পরিসমাপ্তি দিনের অনুষ্ঠানটিই হয় সর্বদিনের চেয়ে জমকালো। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা যার যার আঞ্চলিক পোষাকের একটি শোভাযাত্রা রচনা করে। আর, সেই সব ছেলেমেয়েরা তাদের আঞ্চলিক নৃত্য দেখিয়ে মনে একটা মাতন জাগিয়ে তোলে। মণিপুর, আসাম, দার্জিলিং, কুমায়ুন, মালাবার, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি নানা অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সমাবেশে উৎসব স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানটিকে উৎসাহিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দের আগমন হয়।

চীনে মেয়েদের নবান্ন উৎসব

"কুমড়ো ফটাশ"—শিশু মেলার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান

নেপালি ছেলেমেয়েদের ঝমপু নাচ

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রাবলী গ্রহণ করেছেন মনো মিত্র।

ম্যানহ্যাটান

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

উনিশ নম্বর ডি-ভিয়র্ গার্ডেন্স-এর যে ফ্ল্যাটে আমি থাকতুম, তার ত্রী ছিলেন মিসেস্ ফ্লেচর। ' ছোট্ট-খাট্ট করাত্ত বিধবা মানুষ। বেশ প্রাচীন য়েছেন, তবু তখনো সাজবার-গোজবার াল আনা ছেড়ে সতেরো আনা শখ। প্তার ছ-দিন তিনি নিজের বেড্রুমে ুয়ে-বসে দিন কাটান। রবিবার বিকেলে াজে-গুজে ফিট্ ফাট্ হয়ে নিজের ুহা ছেড়ে বেরোন। তখন আর তাঁকে নবার জো নেই। মাথায় অবরন্ ং-এর পরচুলো, গালে গোলাপী রুজের াভা। লিপ্স্টিক দিয়ে ঘন লাল রং-এ ুরু করে ঠোঁট রাঙানো তখনো ফ্যাশন্ য়নি। নখে রং পালিশ করাটাও সে সময় ানা ছিল না। তবে মিসেস্ ফ্লেচরের লায় আসল মুক্তোর মালা, আঙ্গুলে মী পাথরের আংটি। জবড়জঙ্গী সাজ ' হলেও, বেশ ছেলেমানুষী সাজ। ালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ুরোপীয়ন মেমেরা সহজ স্বাভাবিক-াবে বুড়ি হতে পারেন না। সেই কারণে ামাদের দেশের বৃদ্ধাদের মতন শান্ত ম্ভীর্য তাঁদের মধ্যে নেই। তাই দ্ধাস্পদ হওয়ার চেয়ে তাঁরা হাস্যাস্পদ ন ঢের বেশি। পদে-পদে।

ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে মিসেস্ ফ্লেচরের রবার বসত। আত্মীয় বন্ধু সকলেই নতেন, রবিবার সাড়ে চারটের থেকে াড়ে ছ'টা পর্যন্ত মিসেস্ ফ্লেচর অ্যাট মে। অর্থাৎ, ঐদিন ঐ সময়ের মধ্যে াগের থেকে খবর না দিয়ে যে কেউ এসে ্সেস্ ফ্লেচরের দর্শন পেতেন। আর ার সঙ্গে পেতেন, এক কি দু পেয়ালা , পাতলা কাগজের মতন কাটা দু' লাইস্ ফিনফিনে মাখন লাগানো ব্রাউন ্টি, আর কড়ে-আঙ্গুলপ্রমাণ ছোট্ট একটু ক্। মিসেস্ ফ্লেচরের এক সময়ে সাসাইটিতে আনাগোনা ছিল। সেই সূত্রে নেকেই রবিবারে আমাদের ফ্ল্যাটে দেখা তেন। এক প্রকান্ড গোল টেবিলের াঝখানে বসে মিসেস্ ফ্লেচর যখন তাঁর তিথিদের জন্য চা ঢালতেন, তখন তাঁর াধহয় মনে হোত তিনি মরেন নি; খনো জীবিত আছেন। সব দেখে শুনে ামার মনে হোত, মরা হাতিরও লাখ্ কা দাম।

রবিবারের দরবারে প্রত্যেক হপ্তায় দু'টি মেয়ে নিয়মিত আসত। বয়েসে উনিশ কুড়ি বছরের বেশী নয়। দুই বোন —অলিভ্ আর আইভী। মিসেস্ ফ্লেচরের কি রকম যেন আত্মীয়। তাঁরা পরস্পরকে কাসিন্ বলতেন। কিন্তু বিলিতী কাসিন্ শব্দটি ঠিক যে কোন্ সম্পর্ককে বোঝায়, তা আমি এখনো ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি। সামান্য একটু দূর সম্পর্কের খুড়ো মামাকেও কাসিন্ আখ্যা দিতে শুনেছি। সম্পর্কটা যাই হোক্, অলিভ্ ও আইভী মেয়ে দুটি বেশ সভ্যভব্য। লেখাপড়া জানা, কান্ডজ্ঞান-ওয়ালা, ধীরস্থির মেয়ে। ঠোঁটে মুখে রং মাখে না, বুঝে সমঝে একটু আধটু পাউডার লাগায়। কথায় কথায় সিগ্রেট ফোঁকে না। রাজার উপর পরম ভক্তি, খৃষ্টান ধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, পলিটিক্সে দারুণ কন্সারভেটিভ্। এদের চোখ বুঁজে বিশ্বাস করা যায়। আর বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় না। আত্মসম্মান জ্ঞান এদের এতই টন্টনে। অর্থাৎ বিলিতী আপার মিড্ল ক্লাশের মেয়েরা যেমনটা হয় এ দুটি ঠিক তাই। এসব মেয়েরা এখন যে কি রূপ ধারণ করেছে, তা অবশ্য আমার জানা নেই।

মেয়ে দুটোর মা অনেক আগেই মারা গেছেন। বাপও এই দু' বছর আগে প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রেই গোলা লেগে প্রাণত্যাগ করেছেন। অবস্থা তাই পড়তির দিকে। মেয়ে দুটো বিপদে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে না থেকে কিছু উপায় করে আয় বাড়াতে চায়। অলিভ্ আর আইভী আমাকে আংকল্ টোপো (আমার পিতৃদত্ত নামের বিলিতী অপভ্রংশ) বলে ডাকত। বয়েসে খুব প্রাচীন না হলেও, তখন থেকেই আমার চেহারাটা বেশ ভারিক্কে গোছের। বেশি কথা না কয়ে সভায় শোভাবর্ধন করতুম। ক্বচিৎ কদাচিৎ মুখ খুললে যে দু' চারটে বুক্নী ঝাড়তুম, তার থেকে সবাই ধরে নিয়েছিল, আমি নিশ্চয়ই ওয়াইস্ মেন্ অভ্ দি ঈষ্ট্-এরই একজন।

একদিন দুই বোন তাদের মনের কথাটা আমায় খুলে বললে। বাপ যা রেখে যেতে পেরেছিলেন, তার আয়ে আর ভদ্রভাবে চলে না। যুদ্ধের পর যা মাগ্গিগণ্ডার বাজার পড়েছে। শিগ্গিরই একটা কিছু বিহিত করা চাই। সব শুনে আমি একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বললুম, তোমরা কি জান আর না জান, তা তো আমার জানা নেই। তবে একটা জিনিস বলতে পারি। আমাদের পাড়ার কাছা-কাছি একটিও খাবার জায়গা নেই। রোজই দেখি, সামনের কেন্সিংটন গার্ডেন্সে বুড়ো-বুড়িরা রুটিন করে হাওয়া খেতে আসে। অনেক নিষ্কর্মা বড়লোকের ছেলে-মেয়েরাও ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ খুললে মন্দ চলবে না। ভাল লাঞ্চ চা পেলে এরা আসবে না কেন? লাঞ্চ যতটা না হোক, চা খেতে তো আসবেই। তোমাদের ইংরেজ-

দের, বিশেষত ইংরেজ মেয়েদের—লাঞ্চ না হোলে তবু দিন চলে যায়; কিন্তু ঠিক সময় এক পেয়ালা চা না পেলে, তাঁরা হন্যে কুকুর হয়ে ওঠেন।

কথাটা দুজনারই মনে লাগল। অলিভ্ বললে—আমি বেশ রাঁধতে জানি। ইস্কুলেও শখ করে রান্না শিখেছিলুম, পরে রান্নার ইস্কুলে ট্রেনিং নিয়ে হাত পাকিয়েছি। কিছুটা ড্রয়িং-পেণ্টিংও শিখেছিলুম; কিন্তু সেটা আর কোনো কাজে লাগল না। আইভী বল্লে—ইস্কুলে থাকতে আমি কিছুটা পিয়ানো, কিছুটা বেহালা বাজাতে শিখেছিলুম। পরে মিউজিক স্কুলে ভর্তি হয়ে তার চর্চাটাও রেখেছিলুম। কিন্তু এখন সে-সব কোনো কাজে লাগবে না। তবে মার্চেণ্ট হাউসে ঢুকবো বলে ভালো করে বুক্-কিপিংটা শিখ্‌ছি। ডিপ্লোমা পাবার সময় হয়েছে। আমি বল্লুম—তা হোলে লেগে যাও। ওই বিদ্যে নিয়েই তোমরা ইটিং-হাউস বেশ চালাতে পারবে। দুই বোনে খুশি হয়ে উঠে আমার দুহাত দুদিকে দুজনে ধরল। বলল—আংকল্ তুমি আশীর্বাদ করো, যেন আমাদের ব্যবসা ভাল চলে। আমি ইংরিজিতে কিছু বল্লুম না। দু' বোনের মাথার উপর দু-হাত রেখে বাংলাতেই বল্লুম—তথাস্তু।

পরদিনই ওদের সঙ্গে ঘর খুঁজতে বেরুলুম। ওদের আর তর সয় না। কেন্‌সিংটন্ পাড়ায় ঘরের দাম অসম্ভব। অলিভ্-আইভীর পুঁজি অল্প। তারা অত ভাড়ায় ঘর নিতে রাজি হোল না। আমি আশ্বাস দিলুম—ব্যস্ত হোয়ো না, আমি একটা কিছু শিগ্‌গিরই খুঁজে বের করছি। বেরও করলুম। কেন্‌সিংটন হাই-স্ট্রীটের উপরেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ির মাটির নীচে বেসমেণ্টে এক প্রকাণ্ড কোল্-সেলার। এককালে ওটা বাড়িওয়ালার সম্বচ্ছরের কয়লা মজুত রাখবার গুদাম ছিল। এখন বাড়ি-বাড়ি গ্যাস-ইলেক্‌ট্রিসিটি বসায় সেলারটি খালি পড়ে। যত রাজ্যের টুটো ফুটো তোরঙ্গ, বাক্স, আসবাবপত্তর, কাঠকাটরা পুরনো খবরের কাগজে ভর্তি। ইঁদুর আর আরশোলার রাজত্ব।

অলিভ্-আইভী দুজনে একসঙ্গেই চীৎকার করে উঠল—আংকল, এটা নিয়ে কি হবে? আমি বল্‌লুম রোসো, দেখাচ্ছি কি হবে। বলে, বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে অলিভদের নামে কোল্-সেলারটা বুক করে ফেললুম। ওটা তো এমনিই পড়ে ছিল। বেশি ভাড়া লাগল না। হপ্তা-হপ্তা আধ-গিনি দিতে হবে, স্থির হোল। পরদিনই বাড়িওয়ালা ভাঙ্গাচোরা লটবহর সরিয়ে ফেলে ঘরটাকে সাফ্-সুতরো করে দিল। ইলেক্‌ট্রিকের লাইন আগের থেকেই বসানো ছিল। গুটি কয়েক হাই পাওয়ারের বালব্ এনে লাগাতে অন্ধকার ঘরে দিনের আলো মালুম দিতে লাগল। আমি অলিভ্‌কে ডেকে বল্‌লুম, তুমি না বলেছিলে, আঁকাজোকার একটু হাত আছে তোমার? এইবার তাহোলে দেওয়ালের গায়ে হাত লাগাও। কি রং মানাবে না মানাবে সে তোমার ভার। ডিসাইন্ সাপ্লাই করব আমি।

এইখানে বলে রাখি, আমি বিদ্যে ফলাবার জন্যে মাঝে-মাঝে আর্টের বই দু' একখানা কিনে এনে পড়ি। যারা দু' লাইন এক সঙ্গে সোজা টান্ টান্‌তে পারে না, তারাই মনে করে, তারা বড়-গোছের আর্টক্রিটিক্। এটা আমার জানা ছিল। আমিও নামজাদা কখানা বইপত্তর ঘেঁটে কপ্‌চোবার মতন আর্টের অনেকগুলো বাঁধি গৎ রপ্ত করে ফেলেছিলুম। অনেক রাবিশ্ আর্ট বুকের মধ্যে একটা ভালো ইণ্ডিয়ান আর্টের বই আমার ছিল। সত্যি ভালো। কেননা, এতে ছবি বেশি, লেটার প্রেস কম। বইটার থেকে গোটা দু-তিন ডিসাইন্ বেছে নিয়ে অলিভের মুখের সামনে ধরতে সে তো লাফিয়ে নেচে উঠল। বলল—আংকল্, তোমার অনেক বিদ্যে আছে দেখ্‌ছি। আমি রহস্য করে বললুম, তা আছে বৈ কি? দেখ্‌বে এখন, এরপর আরো দেখ্‌বে। আমি মাসিকপত্রের নভেলের মতন ক্রমশ প্রকাশ্য।

যাই হোক, অলিভ্ বড় মিথ্যে বলে নি। এক সপ্তাহের মধ্যে তার হাতের গুণে বেস্‌মেণ্টের সেই কোল্-সেলার এক অপরূপ মূর্তি ধারণ করলে। চেনা দায়। তারপর ঘর সাজানো। পূর্বেই বলেছি, বাড়িওয়ালার অনেকদিন ধরে জমানো বেশ খানিক পুরনো কাঠ-কাটরা জড়ো হয়ে পড়ে ছিল। সেগুলো সস্তা দরে কিনে ফেলা গেল। তার থেকে কাঠ চিরে বের করে ওদেশের আর আমাদের দেশের দুরকম স্টাইল্ মিশিয়ে নীচু-নীচু কিন্তু বেশ আরামের কতকগুলো টেবিল চেয়ার তৈরি করানো গেল। ঘরের এক কোণ একবারে নতুন রকমে সাজানো হোল। সেখানে টেবিল চেয়ার কিছু নেই। একটা আধা-ডিভান্ আধা-তক্তাপোশ সেখানে পাতা হোল। তার উপর বিছবার জন্যে মিসেস্ ফ্লেচরের পুরনো অতি মনোহর নরম এক পার্‌সিয়ান কার্পেট জলের দরে পাওয়া গেল। মিসেস্ ফ্লেচর এমনিই দিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু অলিভ-আইভীর এমন শিক্ষা, তারা পারতপক্ষে কোনো জিনিস কারুর কাছ থেকে এমনি নেবে না। তক্তার উপর পড়ল আমাদের দিশি প্রথায় ছোট ছোট সিল্কের তাকিয়া।

পেয়ালা-পিরিচ, প্লেট, অ্যাশট্রে, ফুলদানি সবই অলিভ্ নিজে হাতে পেণ্ট করে ফেললে। সব ভাল করে দেখে শুনে নিয়ে আমি বল্‌লুম—এবার তোমাদের ড্রেস্। তোমাদের ঐ দারুণ আঁট-সাঁট বিলিতী ফ্রক্ এসব সাজসজ্জার সঙ্গে কিছুতেই মানাবে না। তোমরা ভিতরে যাই পর না কেন, তাতে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করব না। কিন্তু তোমাদের উপরকার ড্রেস্‌টা হবে সেকালের গ্রীক্ মেয়েদের আলখাল্লার মতন। পায়ে থাকবে মোজা-ছাড়া গ্রীক্ স্যাণ্ডেল। সত্যি বল্‌তে গেলে, আইডিয়াটা আমার নিজের নয়, একেবারে চুরিবিদ্যে। প্যারিসে ইসডোরা ডান্‌ক্যানের স্টুডিওতে নাচ শিক্ষার্থী মেয়েদের ঐ ড্রেস্ দেখেছিলুম। অলিভ্-আইভীর পরবার জন্যে ঘরের রং-এর সঙ্গে ম্যাচ করা আলখাল্লা এলো। তার সঙ্গে মানানসই কোমরবন্ধ। সেই

রং-এর মাথার রিবন। হিল্-ছুট্ স্যাণ্ডেল।

এইবার রেস্তোরাঁর একটা নাম দিতে হয়। আমি বল্লুম—ইংরিজি ভাষায় আমার এমন দখল নেই যে, তোমাদের ইংরেজদের কাছে কোন্ নামটা বেশ মন-টানা গোছের হবে—সেরকম একটা নাম খুঁজে বের করি। তোমরাই যা হোক একটা স্থির করে ফেল। অলিভ্-আইভী অনেক ভেবে চিন্তে একটা অ্যামেরিকান নাম পছন্দ করল। তারা দোকানের নাম দিল, ম্যান্হ্যাটান্। সব তো একরকম হোল। এদিকে উৎসাহের চোটে খরচ করতে করতে অলিভ্ বেচারীদের পুঁজিটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। এখন দোকান ভাল করে না চললে বিষম বিপদ। আমাকে মুষড়ে যেতে দেখে, দুই বোনে আদর করে বল্লে, আংকল্ ঘাবড়িও না। দেখবে শেষে সব ঠিক হয়ে যাবে, বিধাতার আশীর্বাদে আমরা নিশ্চয়ই সাক্সেস্ফুল হব। কি সাহস ঐ দুটো মেয়ের ছোট দুটো বুকের মধ্যে। আমি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করলুম মেয়ে দুটো যাতে জয়যুক্ত হয়।

ম্যান্হ্যাটান্ খোলবার দিন স্থির হয়ে গেল। ঠিক হোল, প্রথম দিনটায় আর লাঞ্চ খাওয়ানো হবে না। কেবল চা পরিবেষণ করা হবে। সার্ভ করবে অলিভ নিজে। দূরে এককোণে বসে আইভী মৃদু সুরে তার বেহালা বাজাতে থাকবে। তারপর চা পর্ব শেষ হয়ে আসতে দেখলে, সে বাজনা বন্ধ করে কাউণ্টারে এসে উঠবে। সেখানে বসে বিল্ লিখবে, আর টাকা জমা করবে। সব ঠিক ঠাক। বেস্মেণ্টে ঢোকবার মুখে সদর রাস্তার গায়েই অলিভের আঁকা একটা ছবি ঈস্লের উপর টাঙ্গানো হোল। সেইটেই ম্যান্হ্যাটানের সাইন-বোর্ড। সেটা পড়লেই লোকে জানবে, নীচে বেসমেণ্টে আছে খাবার ঘর।

আমি মনে মনে এক ফন্দি এঁটে রেখেছিলুম। সেটা অলিভ আইভীর কাছে আগে থেকে কিছু ভাঙ্গিনি। গুরুদেব তখন কেন্সিংটন্ প্যালেশ ম্যান্সনে বাস করছেন। সেটা ম্যান্হ্যাটান্ থেকে মাত্র দু-পাঁচ হাত দূরে। সেখানে গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে নিবেদন করলুম—আজ আপনার চায়ে নেমন্তন্ন। কাছেই একটা নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে সেইখানেই। গুরুদেবের যেমন, সব সময় রহস্য। আমার কথা শুনে বল্লেন,—তুই চা খাওয়াবি? এ তো ন ভূতং—ভবিষ্যতি কি হবে? না, কোথাও নিয়ে গিয়ে বল্বি, নিজের ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করে চা খান। গুরুদেবের শারদোৎসব নাটকে দু-চারবার লক্ষেশ্বরের পার্ট অভিনয় করে আমার যেমন নাম বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি আবার বদনামও হয়েছিল। লোকে কেমন ধরে নিয়েছিল, আমি বুঝি সত্যিই হাড়-কেপ্পন। যাই হোক্, পিয়ার্সন সাহেবকে যখন আসতে অনুরোধ জানালুম, তখন গুরুদেব কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। পিয়ার্সন সাহেব তখন গুরুদেবের সেক্রেটারী, তাঁর সঙ্গেই একত্র বাস করছেন। রথীবাবু, প্রতিমাদেবী লণ্ডনের বাইরে গেছেন। তাঁদের আর সেদিন পাওয়া গেল না।

বেলা চারটের সময় গুরুদেবকে ম্যান্হ্যাটানের দিকে নিয়ে চল্লুম। গুরুদেবের মতন চেহারা সহজে তো লোকের চোখে পড়ে না। রাস্তার লোকেরা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে বেস-মেণ্টে ম্যান্হ্যাটানে নামতে নামতে দেখি, আমাদের পিছনে একরাশ লোক—তারাও নামতে লেগেছে। তখন চা খাবার সময়। প্ল্যাকার্ড দেখে তারা ঠিক ধরেছে, এখানে পয়সা ফেল্লে চা পাওয়া যাবে। চায়ের নেশা বড় নেশা। ঠিক সময় এক পেয়ালা না পেলে পিত্তি পড়ে মাথা ধরে ওঠে। নাম্তে নাম্তে আইভীর বাজানো বেহালার সুরটা কানে ভেসে আসতে লাগল।

আমার বন্ধু হার্বার্ট পামারকেও আসতে বলেছিলুম। ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি আগেই এসে পড়েছেন। গুরুদেব ঘরের সাজসজ্জা আসবাবপত্তর দেখে তারিফ করলেন। বললেন, তুই তো খুঁজে খুঁজে বেড়ে চা খাবার জায়গা বের করেছিস। শুনে, আহ্লাদে আমি আটখানা না হোলেও চারখানা যে হয়েছিলুম, বলাই বাহুল্য। পামারকে টেনে এনে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। পামারও একজন কবি। কিন্তু কবি-কবি চেহারা তাঁর মোটেই নয়। চুল আমাদের চেয়েও ছোট করে ছাঁটা। গলায় বড় করে একটা বো পর্যন্ত বাঁধা নেই। নিতান্ত মামুলি, সেই একঘেয়ে একটা টাই। পরনের সুটেও কোনো রং-বেরং-এর বাহার নেই। সাদাসিদে একটা ব্রাউন্ সুট্ মাত্র। পামার লম্বায় প্রায় গুরুদেবেরই কাছাকাছি যান। কিন্তু চেহারায় কোনো ছিরি নেই। না খেতে পাওয়া রোগা হাড্ডিসার মূর্তি।

পামারের হাতে একটা আনকোরা নতুন চটি বই। সেটা আমার হাতে দিয়ে পামার বললেন, ওটা তোমার জন্যেই এনেছি। খুলে দেখি, পামারেরই লেখা গোটা তিরিশেক কবিতা-সংগ্রহ। হোগার্থ প্রেস ছাপিয়েছে। তখন ইংরিজি কাব্য-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, জন্ স্কুয়্যার। তখনো তিনি নাইট্ হননি। নবীন কবিদের কাব্যজগতে ঢুকতে হোলে জে সি স্কুয়্যারের পাসপোর্ট লাগত। পামারকে স্কুয়্যার ছাড়পত্র দেননি। তাই পামারের নাম ডাক তখনো হয়নি। তবে লেনার্ড উল্ফ্ সাচ্চা লোক, সমঝদার ব্যক্তি। তিনি পামারের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে, তাঁর হোগার্থ প্রেস থেকে পামারের কখানা কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছেন।

আমরা কোণের ডিভান্টা অধিকার করে বসলুম। সেইখান থেকে তাকিয়ে দেখলুম ঘর ভর্তি লোক! অলিভ্ সব অতিথিদের একে-একে চা খাবার সার্ভ করে যাচ্ছে। পুরনো গ্রীক্ ড্রেসে তাকে মানিয়েছে বেশ। অতিথিদের সবাইকার হাসিহাসি মুখ। গুরুদেবকেও খুশি দেখলুম। বরাবরই দেখে আসছি, পরি-পাটি সুন্দর পরিবেশে তাঁর মনটা আপনা হতেই বেশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আরামে চা খাওয়া চলছে। আমি মজা দেখবার জন্যে

আঙগুলের খোঁচা মেরে পামারকে ফিস্-ফিস্ করে বললুম—গুরুদেবকে তোমার দু-একখানা কবিতা শুনিয়ে দাও না। গুরুদেবের সঙ্গে কাব্য আলোচনা করে পামার তখন রসে ভরপুর। আমার খোঁচা খেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। তারপর সমানে একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি!

ঘরসুদ্দু লোক স্তব্ধ। অলিভের হাতের ট্রে হাতেই রয়ে গেল। আইভীর বাজনা বন্ধ হয়ে এল। লোকে চা খেতে ভুলে বসল। পামারের গলা খুবই ভাল। আর সচরাচর ইংরেজদের যেমন কবিতা পড়ে শোনাতে লজ্জা বোধ হয় হার্বার্ট পামারের সেসব বাজে লাজ ছিল না। উপরি-উপরি তিনটে কবিতা পড়ে যাবার পর পামার দম নেবার জন্যে একটু থামলেন। এতক্ষণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। কখনো তো এমনধারা শোনেনি? পামার থামতে তাদের যেন মোহভঙ্গ হয়ে গেল। তখন চারদিক থেকে জোর-জোর ক্ল্যাপ পড়তে লাগল। তাই শুনে, হাতের বইটা মুড়ে সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আর কথাটি না কয়ে পামার হন্-হনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

কিসের থেকে যে কি ঘটল, ঠিক ঠাওর করে উঠ্‌তে পারলুম না। কেবল গুরুদেবই ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—চল্, আর না। ইংরেজ জাতটা বড়ই বদরসিক। অগত্যা আমাকেও উঠতে হোল। পিয়ার্সন সাহেবও উঠলেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম, অতিথিদের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; তাঁরা আবার গরম চায়ের অর্ডার দিচ্ছেন। গুরুদেব তাঁদের টেবিলের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় তাঁরা সকলেই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাও করতে লাগলো। গুরুদেবও দিশি প্রথায় বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁদের প্রতিনমস্কার করে চলেছেন।

পরদিন অলিভ্-আইভীর মুখে শুনেলুম, ঐ একদিনে চা বিক্রি করে না কি তাদের ক্যাপিটালের সিকি উঠে এসেছে। পামারের মুখে শুনলুম, লোকদের হাততালিতে তাঁর মনের সুরের এমনি তাল কেটে গিয়েছিল যে, তিনি কিছুতেই আর সে সুর ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। মনের মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন। গুরুদেব তাহোলে তো ঠিকই অনুমান করেছিলেন।

অলিভ্-আইভীর ম্যানহ্যাটানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। পাঁচ বছর চালিয়ে তারা ওটা বিক্রি করে দিয়ে, দু-বোনেই বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। হার্বার্ট পামার সার্ জন্ স্কুয়্যারের পাস-পোর্ট না পেয়েও পরে কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

আমার কাছে পামারের একটা স্মৃতি-চিহ্ন রয়ে গেছে। বহুকাল পূর্বে, প্রায় ছেলে বয়সেই, শান্তিনিকেতনের মেঠো রাস্তা দিয়ে আসতে-আসতে এক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের মুখে আমি একটা গ্রাম্য গান শুনি। কিন্তু সেই থেকে সেই গানটি বারবার ঘুরে ফিরে মনে ভেসে বেড়াতো। একদিন পামারকে সেটা শুনিয়ে তার মর্মার্থ বলায় পামার্ তার একটা ইরিজি পোষাক তৈরি করে দিয়েছিলেন।

গানটা এইরকমঃ

> বন পোড়া যায় সবাই দেখে,
> আমার মন পোড়ে কেউ দেখে না—
> বন গেল, আগুন গেল—
> আমার মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ,
> তারে আর নিবান যে যায় না।

পামারের দেওয়া রূপঃ

> The forest-fire is seen of all;
> My love-fire there is none to see,
> The forest gone, the fire is out;
> My heart-fire ever rages in me.

সেদিন পুরনো কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই দু'ছত্র লেখা দেখতে পেলুম। তাইতে সব কথা মনে পড়ে গেল।

তবুও

ভবেন্দু ভট্টাচার্য

হয়তো বা চাঁদ আমার জন্যে নয়—
তবু রাত্রিতো আছে কোমল অন্ধকারে;
না হয় সে কোনো পূর্ণিমা রঙ
আঁকেনাকো আল্পনা, কৃষ্ণা তিথির
নিবিড়তা তবু
বাতায়নে এসে যায়নাতো ফাঁকি দিয়ে।

ঘাসের কুঁড়িতে ফুলের প্রসবঃ না হয়
নেইকো ফুল,
গ্রীষ্মের বিষে না হয় সবুজ
পুড়ে গেছে ছাই হয়ে; মাটির
নগ্ন দেহতো রয়েছে—
হোক না বন্ধ্যা,
থাকুক না হয় জ্বালা।

বাহুর প্রেরণা প্রেয়সী দিল না জানি—
প্রেম তো রয়েছে তন্দ্রাবিহীন
জাগ্রত সন্ন্যাসী; পৃথিবীর বুকে বৈশাখী রোদ
চৈতালী অবসানে, রয়েছে তবুতো
ঘুঘুডাকা বন—আমের
স্নিগ্ধ বীথি।

চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীবাসব ঠাকুরের ছাত্রবৃন্দ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারত-শিল্পকে নবরূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেন, উদ্ঘাটিত করেন নতুন রূপজগতের, আচার্য নন্দলালের হাতে সেই শিল্পধারা আরও পরিবর্তন ও পরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে এক পরিণতির দিকে। মুখ্যত এই দুই মহান্ শিল্পীর প্রচেষ্টাকেই উপলক্ষ্য করে আমাদের শিল্পধারা একটি শিল্প-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকের আধুনিক যুগে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই নানান পরীক্ষা করছেন এই শিল্পধারাকে নিয়ে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রভাবে ও অনুসরণে এসেছে নানান ধরণের আলোড়ন আর ঝোড়ো হাওয়া। সবক্ষেত্রেই যে তাতে নিরাশা এনে দিয়েছে তা বলিনে কিন্তু শিল্প আন্দোলন বলতে যা বোঝায় কারও প্রচেষ্টা সে রূপ আজও নেয়নি।

শ্রীবাসব ঠাকুরের যে বিশেষ একটি "শিল্প আন্দোলন" আছে এবং তাঁর "শিষ্যের দল" যে তাঁর প্রবর্তিত সেই শিল্পধারাকে ভগীরথপ্রবাহে বহন করে চলেছেন এসব তথ্য আমাদের মত অজ্ঞ জনের কাছে কিছুই জানা ছিল না। এদেশের চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে এমন একটা বিরাট ব্যাপার চলেছে, সে কথাটা প্রথম জানতে পারলাম, "বাসব ঠাকুরের শিল্প-শিক্ষার্থীর দল ও তাঁর প্রবর্তিত শিল্প-আন্দোলনের অনুগামীদের" কাছ থেকে একটি প্রদর্শনী দেখবার জন্যে আমন্ত্রণপত্র পেয়ে। স্বভাবতই গভীর আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলাম ওই চিত্রপ্রদর্শনীতে এবং গিয়ে এই পুরাতন সত্যটিই আরেকবার উপলব্ধি করলাম যে, অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও এমন একদল শিল্পরচনা-প্রয়াসী আছেন যাঁরা "খ্যাতি" অর্জনের সব চাইতে সহজ পথ হিসেবে যে কোন স্টাণ্ট-এর আশ্রয় নিতে লজ্জিত নন। আমন্ত্রণপত্রে ওই ধরণের দুর্বিনীত আত্মপ্রচার না থাকলে কেউ এ প্রদর্শনী দেখতে আসতেন কিনা সন্দেহ। আরও হতাশ হতে হয়েছে এই জন্যে যে, শ্রীঠাকুরের 'শিল্পান্দোলনের' সঙ্গে পরিচিত হতে পারা যায় এমন একটি চিত্রও প্রদর্শনীতে রাখা হয়নি, হয়তো ছাত্রদের রচনা-পরিচয়ের সঙ্গে সমপাংক্তেয় হওয়া উচিত নয় বলেই এখানে সেগুলিকে উপস্থিত করা হয়নি।

তাঁর ছাত্রদের রচনাগুলি দেখেও এই "শিল্প-আন্দোলনের" ব্যাপারটা মোটেই স্পষ্ট হল না। বরং সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বার বার এই কথাই মনে হয়েছে যে, এই প্রদর্শনী না করলেই কি চলত না? কি সার্থকতা এই ধরণের কাঁচা নকল-নবিশী ছবি সাধারণের সামনে তুলে ধরাতে? অধিকাংশ রচনাতেই বিভিন্ন শিল্পীর রচনাকে অনুকরণ করার প্রয়াসই পাওয়া যায়। কোন ছবিতে শিক্ষকের কাজের ছাপ এতটুকুও পাইনে যাতে অন্যদের সঙ্গে আলাদা করে সেই রচনাকে দেখা চলে। ড্রইং প্রভৃতির দুর্বলতাও পীড়াদায়ক।

সমগ্র প্রদর্শনীটি এতই দুর্বল এবং এত কাঁচা হাতের কাজে পরিপূর্ণ যে, দু' একটি রচনা যা সামান্য একটু ভাল লাগে তা হচ্ছে গৌরী দাশগুপ্তের রাধাকৃষ্ণ এবং স্নানঘাট, যদিও আঙ্গিকে বা প্রকাশে নতুন কোন শিল্পধারার পরিচয় পাওয়া যায় না। শোভা দে, আরতি মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কয়েকটি পুতুলও বেশ হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে। দেবব্রত দাশগুপ্তের at anchor মন্দ নয়। তাঁর বিশ্রামরতার মূর্তিটি সেদিক দিয়ে অনেক বেশী রসোত্তীর্ণ হয়েছে। অসীম ঘোষের ঘোড়া বেশ ভাল কিন্তু রঙটি সে তুলনায় সস্তা মনে হয়েছে। অত্যধিক দুর্বল রচনার মধ্যে যাদের নানান রচনা আংশিকভাবে সামান্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের মধ্যে প্রবীর দাশগুপ্তের আঁধারের কাছে ও বস্তী, অজয় চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষণিকের ব্যস্ততা ও গ্রাম্যসৌন্দর্য, নৃপেন মৈত্রের চাঁদ, বেণু লাহিড়ীর স্কেচ, অসীম ঘোষের কাঠখোদাই, হাসি চট্টোপাধ্যায়ের ভাঙ্গা কুঁড়েঘর প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ইউনুসের ছবি দুটোতে অনুকরণ-প্রিয়তার আধিক্য দৃষ্টিকটু—নিজস্বত্ব কিছু নেই ছবি দুটোর।

ইদানীং কলকাতায় এই ধরণের একান্ত দুর্বল একক বা কোন গোষ্ঠীর প্রদর্শনী প্রায়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণের সম্মুখে এই ধরণের প্রদর্শনী উপস্থাপিত করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। অপরিণত রচনা নিয়ে প্রদর্শনী করার দুঃসাহসকে তাই কোনোক্রমেই প্রশংসা করা চলে না। তাই শিল্পীরা তাদের শিল্প সম্বন্ধে সচেতন না হলে দর্শকের ওপর সেটা নেহাৎই অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়।

উপন্যাস

ঝড় ও শিশির—বিমল কর। টি কে ব্যানার্জি এণ্ড কোং; ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। সাড়ে তিন টাকা।

বাঙলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইদানীং একটি দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেটি হলো এই যে, গল্প লেখকদের হাতে উপন্যাস কিংবা ঔপন্যাসিকদের হাতে গল্প যেন আর আজকাল তেমন জমে উঠতে চায় না। ব্যাপারটা দুঃখ-দায়ক সন্দেহ কি? গল্প লেখকরা শুধু গল্পের আঁটোসাটো পরিধির মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকবেন, উপন্যাসের বিস্তৃতিকে তাঁরা আয়ত্ত করতে পারবেন না, কিংবা ঔপন্যাসিকদের হাতে ছোট গল্পের সূক্ষ্ম কারুকর্ম তেমন খুলবে না, এটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। স্বাভাবিক তো নয়ই। এই কারণে একে অস্বাভাবিক বলছি যে, আজকের দিনের তরুণতর কথাসাহিত্যিকেরা একদিন যে সমস্ত সাহিত্যরথীর কাছে তাঁদের প্রথম-পাঠ নিয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছোটো গল্প এবং উপন্যাস রচনায় সমপরিমাণে দক্ষ। সমালোচনার সূত্রপাতে যে আক্ষেপ জানিয়েছি তা এই কারণেই।

বিমল করের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস "ঝড় ও শিশির" আমাদের সেই আক্ষেপকে কিছু পরিমাণে হলেও, মেটাতে পেরেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে বিমলবাবু নবাগত নন। ইতি-পূর্বে তাঁর কয়েকটি ছোটো গল্প আমরা পড়েছি, পড়ে আমাদের ভালোও লেগেছে। 'ঝড় ও শিশির' গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া গেল, উপন্যাস রচনার দক্ষতাও তাঁর অনায়ত্ত নয়। বস্তুত একটি বড়ো পটভূমিকায় অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলিকে তাঁদের নিজ নিজ সম্ভাবনার মধ্যে একটি নিটোল সম্পূর্ণতা প্রদান করে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। ঘটনাবিন্যাসে অবশ্য অনুরূপ কৃতিত্ব তিনি দেখাতে পারেননি।

'ঝড় ও শিশির' সাধুভাষায় লেখা। সাধুভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা আজকাল আর বড় একটা কেউ করেন না। সেদিক থেকে উদ্যমটা প্রশংসনীয়। তবে সাধুভাষার নিজস্ব যে একটি ছন্দ বর্তমান, লেখক সেটিকে সর্বত্র ঠিক মতো আয়ত্তে রাখতে না পারায় মাঝে মাঝে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটেছে।

২৯৩।৫২

ছোট গল্প

রসময়ের রসিকতা—শিবরাম চক্রবর্তী। সাহিত্যায়ন ঃ পরিবেশক দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪-৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

মানুষকে কাঁদান সহজ, হাসান নয়। সমস্যাসংকুল জটিল জীবনের সঙ্কীর্ণ গলি-পথে হাল্কা হাসির ঝিলিক মারা রোদটুকু ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই পথ পায় না। তাকে পথ দেখিয়েছেন শিবরাম চক্রবর্তী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে, শিবরামের জুড়ি নেই। ব্যঙ্গের কষাঘাত নেই, বিদ্রূপের ঝাঁজ নেই—নিছক কৌতুক। অনুপ্রাসের আশ্চর্য অনুপানে ভাষার অপূর্ব হাস্যরসায়ন। গল্পের মার-প্যাঁচে হাসির সুড়সুড়ি। রামগড়ুরের ছানা-দেরও হাসতে হাসতে চোখ কানা হবে না। নানা করবার শক্তিটুকুও হাসির তোড়ে বানভাসি হবে। এই হলো শিবরাম চক্রবর্তী।

রসময়ের রসিকতার সবগুলো গল্পই শিবরামি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রসময়ের রসিকতার পাত্র যে আপনি নন তা ভেবে, গল্পটি পড়বার পরে, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। না খেয়ে নেমন্তন্নে গিয়ে যে দুর্গতি লেখকের কপালে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর সাবধান বাণী 'না খেয়ে নেমন্তন্নে যেয়ো না'। 'হাতীমার্কা বাতিক' যদি কারও থাকে তাহলে এখন থেকেই সাবধান। না হলে কর্ণহীন কাকার মত দুরবস্থা হবে। গোয়েন্দা বল্কেকাত্তিগর অপূর্ব সূত্রসন্ধান পড়তে পড়তে শরীর রোমাঞ্চিত হয় আর হতে হতে এক সময় হাসির তুবড়িতে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে। 'সাসপেন্স' সৃষ্টিতে 'দলের লোকদের বলো' অনবদ্য।

মোট কথা গল্পের বুননে ভাষার মার-প্যাঁচে রসময়ের রসিকতার প্রতিটি গল্পই এক একটি হাসির তুবড়ি। কখনও ভাদ্রের গুমোট দুপুরে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সুড়সুড়ি।

২৬।৫৩

ডিটেকটিভ গল্প

নিশাচর বাজ—দীনেন্দ্রকুমার রায়। গুরু-দাস চট্টোপাধ্যায় য়্যাণ্ড সন্স; ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। চার টাকা আট আনা।

'নিশাচর বাজ' একখানি গোয়েন্দা-কাহিনী। কাহিনীর নায়ক হিসাবে যে দস্যু-চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে সে এবং তাহার সঙ্গীদের প্রায় সকলেই ধনীপুত্র। দস্যুতা তাহাদের পেশা নহে, অসাধু বড়-লোকের টাকা লুটিয়া সে-টাকা তাহারা জন-হিতব্রতী প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া থাকে। তদুপরি দলপতি আবার সুদর্শন প্রেমিক যুবক। রহস্য, রোমাঞ্চ, প্রেম, লালসা, নৃশংসতা ইত্যাদি সবকিছুর একত্র-সংমিশ্রণ ঘটাইয়া একটি জমকালো কাহিনী ফাঁদা হইয়াছে। রহস্যোপন্যাসের পাঠকদের কাছে সে-কাহিনী যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানির ভাষা সুন্দর। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদও প্রশংসনীয়।

৪০২।৫২

জীবনী

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী—হেমন্ত চাকী। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স; ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট। তিন টাকা।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবী দল একটি গৌরবময় অধ্যায়ের রচয়িতা। সেই চূড়ান্ত স্বৈরাচারের দিনে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা যাঁরা বুকের রক্ত দিয়ে তুলে ধরেছিলেন শহীদ প্রফুল্ল চাকী তাঁদের অন্যতম। বিপ্লবী নেতারা যে বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করেছিলেন তার প্রমাণ আছে অজস্র কাব্য-গাথায়। কিন্তু আমাদের ভাব-প্রবণতা তাঁদের প্রামাণিক জীবনেতিহাসের দিকে তেমন আকৃষ্ট করেনি। সে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে অনেক পরে। শ্রীযুক্ত হেমন্ত চাকীর প্রচেষ্টা সেই নবচেতনারই প্রমাণ। অনেক পরিশ্রমে তিনি তৎকালীন বিপ্লবীদের সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করে শহীদ প্রফুল্ল চাকীর জীবনী লিখেছেন। তৎকালীন বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি অধ্যায়ের পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে লেখক সক্ষম হয়েছেন এবং সেই পটভূমিকায় প্রফুল্ল চাকীর জীবনালেখ্য। তবে পটভূমিকা অত বিস্তৃত না হলেও বইএর কোন অঙ্গহানি হতো বলে মনে হয় না, বরং সুষ্ঠুই হতো।

৩৮৫।৫২

জীবন-সঙ্গিনী—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীরাধারমণ চৌধুরী কর্তৃক প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রবর্তক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল

রায়ের সহধর্মিণী শ্রীরাধা দেবীর জীবনী। সঙ্ঘগুরু ইহার লেখক। বিপ্লবী স্বামীর বৈচিত্র্যময় জীবনের বিভিন্ন ছন্দে এই মহীয়সী নারীর শক্তি কেমন প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে এবং তাঁহার স্বামীর জীবন-সাধনাকে কিরূপে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে, গ্রন্থকারের সংবেদনময় অনুধ্যানে গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাধারাণী দেবীর এই জীবনালেখ্য বাংলার বৈপ্লবিক যুগের অনেক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উপর আলোক সম্পাত করিয়াছে। বৈপ্লবিক সেই আবর্ত সঙ্ঘগুরু মতিলালের প্রাণধারাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া উদ্বেলিত হইয়াছে, আর সেই প্রবল তরঙ্গভঙ্গী উচ্ছ্বাসের ঊর্ধ্বে অচঞ্চল থাকিয়া রাধা-রাণীর মাতৃ-মহিমা স্নেহ-মৃদুল আচরণের মৃণাল-দলকে আশ্রয় করিয়া আত্মনিবেদনের অমল উজ্জ্বল শতদলের মতই শোভা বিস্তার করিয়াছে। স্বামী ছিলেন সাধক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বাঙলার বিচিত্র মার্গের রস-সাধনার পথে তাঁহার জীবনের এষণার পরিচয় আমরা পাই। সাধনমার্গের অনেক নিগূঢ় রহস্যও তাহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম দার্শনিকতার ধারা ও সেই সব বিভিন্ন সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনকে ভাবময় ছন্দে সমাহিত করিয়া চলিয়াছে। সাধক হৃদয়ের আবর্ত এবং বিবর্ত এগুলির ভিতর দিয়া ধরা পড়ে। কিন্তু সহধর্মিণী রাধারাণী ছিলেন নিঃস্বরূপিণী। এই মহীয়সী নারীর জীবন সাধনার অনপেক্ষভাবেই সকল সত্যে সহজ এবং সরলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। মানবিক প্রবৃত্তির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ভিতর দিয়া রাধারাণী দেবীর দিব্য জীবনের দ্যুতি তাঁহার স্বামীর ভবিষ্যৎ যেন অনেকটা অলক্ষিত গতিতে অথচ অনন্ত শক্তির অলঙ্ঘ্য বীর্যে গড়িয়া তুলিয়াছে। রাধারাণীর জীবন উৎসর্গীকৃত জীবন, এজন্য তাহা পরিপূর্ণ। বস্তুত প্রাকৃত জীবনের আবিলতার ঊর্ধ্বে ছিল সতীর এই পবিত্র জীবন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সম্পূর্ণ জীবনীর দ্বিতীয় পর্ব। 'জীবন সঙ্গিনী'র তৃতীয় পর্ব প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে। আশা করি, তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইয়া রাধারাণী দেবীর অখণ্ড এবং অব্যয় মাতৃত্বের সুধারসে বাঙলার সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিবে। ২১।৫৩

শ্রীশ্রীমা, সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত। স্বামী অবিনাশানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বর্তমান বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের এই সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার অল্প কথার মধ্যে মায়ের মাধুর্য যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন সরস এবং মধুর করিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রচনা-শৈলী এবং প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে এ পুস্তকের প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ২১।৫৩

বিবিধ

মুক্তি-সংগ্রাম (১৯৩৫—৪২)—সুভাষ-চন্দ্র বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—আড়াই টাকা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পৃথিবীর কৃতিপুরুষদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যাঁর জন্ম-দিনের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হয়ে রইলাম। ঋষি মনীষীদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন দুই-ই জানতে পারি আমরা, কিন্তু সুভাষচন্দ্র যুগে যুগে ভারতের যৌবনশক্তিকে উজ্জীবিত করবার জন্যেই অমর হয়ে রইলেন। তাঁর বিগত জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'মুক্তি-সংগ্রাম' গ্রন্থটি নেতাজী সুভাষচন্দ্র গত যুদ্ধের সময় ভারত পরিত্যাগের পর লিখেছিলেন এবং এযাবৎ বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইটি অপ্রকাশিত ছিল, বর্তমানে এ বই সমস্যাকণ্টকিত দেশকে নতুন প্রেরণা দেবে।

যে দেশের এবং যে শক্তির সহায়তা নিয়ে সুভাষচন্দ্র তখন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, সেই শক্তিরই সমালোচনা অকপট ভাষায় প্রকাশ করতে সৎসাহসের অভাব হয়নি তাঁর। আবার ভারতের জাতীয় মুক্তি প্রচেষ্টার ভুলভ্রান্তিও তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের 'মুক্তি-সংগ্রাম' শুধুমাত্র ১৯৩৫—৪২ সনের দিনপঞ্জী নয়, শুধুমাত্র সুভাষ-জীবনের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়ই নয়, 'মুক্তি-সংগ্রাম' সদাজাগ্রত একটি মহা-জাতির সত্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী, পুনর্জাত একটি তৃতীয় পৃথিবীর ইতিহাস। এ গ্রন্থে তিনি যে-সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তার অসংখ্য প্রমাণ রয়ে গেছে সেদিনের জাতীয়তা-বাদী পত্রপত্রিকায়, সরকারী নথীপত্রে, এমন কি ভিন্ন দলীয় নেতাদের প্রামাণ্য উক্তিতেও।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্নকে স্মরণ করলে আজও আমাদের মনে পড়ে বাঙলার সন্ত্রাসবাদ, বন্দে মাতরমের গীতিবহ্নি এবং দুটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে গান্ধীজী পরিচালিত বিভিন্ন প্রস্তুতি ও আন্দোলন। তারপর যুদ্ধারম্ভের প্রায় ছ'মাস পূর্বে সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী ও

প্রস্তুতির ডাক, মহাত্মাজীর কারাবরণ ও 'ভারত ছাড়ো' মন্ত্র, বিয়াল্লিশের স্বতঃ-প্রণোদিত বিপ্লব, ভারতের পূর্বসীমান্তে নেতাজীর যুদ্ধ ঘোষণা। যুদ্ধোত্তর কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র এমনই এক জনপ্রিয়তার বেদীমূলে অধিষ্ঠিত হলেন যা পৃথিবীর কোন জাতি কোনদিন দেখেনি, জনজীবনের ওপর যার স্পন্দন দেখে যুদ্ধবিজয়ী অথচ ক্ষীণশক্তি নিঃস্ব ব্রিটেন প্রমাদ গণলো, ভীত হয়ে উঠলো বোম্বাই বন্দরে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভীর গোলা বর্ষণ দেখে। শুধু জনসাধারণই নয়, সেদিন ভারতের সমগ্র ফৌজী শক্তিও বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, ফাটল দেখা দিয়েছিল যুদ্ধক্লান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে। অভ্যন্তরের বিদ্বেষ আর আন্তর্জাতিক ইজ্জৎ দুয়ের চাপে পড়ে ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটেন।

'মুক্তি-সংগ্রাম' গ্রন্থ পাঠ করতে করতে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই পুরোনো দিনগুলিতে নতুন করে ফিরে যাওয়া যায়।

এ গ্রন্থটির কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিগুলিতেঃ

"ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্টপন্থী দেশ-গুলিতে ব্রিটিশ চররা আমাকে কমিউনিস্ট প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিল। ওদিকে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে তারা আবার আমাকে ফ্যাসিস্ট বলে চালাবার চেষ্টা করেছে।"

"১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে আমার সভা-পতিত্বে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমি প্রস্তাব করি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই মর্মে দাবী জানিয়ে একটি চরমপত্র প্রেরণ করা উচিত যে, ছ' মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে; একই সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের জন্যেও কংগ্রেসকে প্রস্তুত হতে হবে।"

"আগে যারা অবিশ্বাসী ছিল, ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধা-বার পর তারাই বলেছে যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারকে ছ'মাসের চরমপত্র দিতে হ'লে আমি রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলাম।"

"১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন গভীর রাত্রে আমি গৃহত্যাগ করলাম। গোয়েন্দা-পুলিশ দল সারাক্ষণ আমার উপরে সতর্ক নজর রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এক রোমাঞ্চ-কর পথ পর্যটনের মধ্য দিয়ে আমি ভারত-বর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হ'লাম।"

"১৯৪২ সনের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক হয়। পুনর্বার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহ-যোগিতার ইচ্ছা জানিয়ে সেখানে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'লো। এর ঠিক পরেই ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছাক্রমে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারত সফরে এলেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে রাজী করানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।"

"৯ই আগস্ট (১৯৪২) রবিবার ভোর রাত্রেই ভারত সরকার আঘাত হানলেন। বোম্বাইয়ের ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করতে এলে তিনি তাঁর প্রভাতকালীন প্রার্থনা-সমাপনের জন্য আধ ঘণ্টা সময় চাইলেন। গান্ধীজীর শেষ বাণীঃ হয় স্বাধীনতা লাভ, নয় মৃত্যু।"

এর পরের ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। জাতীয় চেতনা, বিয়াল্লিশ বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয়তা, বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদির সম্মিলিত ফলস্বরূপ ভারত-বর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলো। কিন্তু ঠিক যে ধরণের স্বাধীনতা সুভাষচন্দ্র কল্পনা করে-ছিলেন তা থেকে এ মুক্তির যেন অনেক পার্থক্য। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে বিভক্ত করে গেল ব্রিটিশ, নতুন নতুন সমস্যার বীজ রোপণ করে গেল।

এই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি লিখেছেনঃ

"প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-বলম্বনের পর ভারতবর্ষকে তার দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধানে ব্রতী হতে হবে।... স্বাধীন ভারতের তৃতীয় সমস্যা হলো তার শিক্ষা-সমস্যা।...শিক্ষা-সমস্যার সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও জড়িত হয়ে রয়েছে। সেটি হেলা হরফ সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে আমি ল্যাটিন হরফের সমর্থক।...ভারতবর্ষের জনমত খানিকটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তবে একটা কথা। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নিজ পন্থানুযায়ী আমরা কাজ করতে চাই।... ফলত ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উপযোগী ভারতীয় ব্যবস্থারই আমরা প্রবর্তন করবো।

ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশই দরিদ্র। এদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি না আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে অগ্রসর হই তা হ'লে চীনে আজ যে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষের সেই একই রকমের বিশৃঙ্খলা ও জটিলতার সৃষ্টি করা হবে। চীনে যে এ অবস্থার সৃষ্টি হলো কেন এবং কুয়োমিনটাং দল চীনা জনসাধারণের স্বার্থকেই তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকলে কমিউনিস্ট দলের মত বৈদেশিক প্রভাবাধীন আর একটি দল সৃষ্টির সেখানে প্রয়োজন হত কিনা, জানি না।"...

..."এবারে ন্যাশনাল সোস্যালিজম্ ও কমিউনিজমের কল্যাণকর বিষয়গুলির একটা তুলনা করে দেখা যাক্। দুটি ব্যবস্থাই গণ-তন্ত্রবিরোধী বা একনায়কত্ববাদী। দুটি ব্যবস্থাই পুঁজিবাদবিরোধী।......ন্যাশনাল সোস্যালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিধানে এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিবিধানে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ভিত্তির উপরে যে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, ন্যাশনাল সোস্যালিজম তার আমূল সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে কমিউ-নিজমের ভিত্তিতে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্। একটি বিরাট সাফল্যের সেখানে সন্ধান পাওয়া যাবে। তা হ'ল তাদের পরিকল্পিত অর্থনীতি। কমিউনিজমের ত্রুটি হল এই যে, জাতীয় মনোভাবের সে মূল্য বোঝে না। জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে-ব্যবস্থা জনসাধারণের সামাজিক প্রয়োজন মেটাতেও সমর্থ, ভারতবর্ষে এমনই একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই।"

"বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে সে-দেশ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে কবিরবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় চিন্তানায়কেরা সেখানকার কাজ দেখে অত্যন্তই প্রীত হন। অথচ কমিউনিজম সম্পর্কে এঁদের কোনও আকর্ষণ ছিল না।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রচনা কোন আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, তা ভারতীয় মহাজাতির ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের অতুলন ইংরাজী ভাষাকে সাবলীল অথচ যথাযথ অনুবাদে বাংলা-ভাষীর কাছে পৌঁছে দেয়ার কৃতিত্বের জন্য অনুবাদককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে হয়।

৩২।৫৩

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

পাখনাঃ—বটকৃষ্ণ দাস, ইউনাইটেড বুকস ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা। মূল্য—২। ৩৩।৫৩

ফলিত যোগঃ—শ্রীসুকুমার বসু, গ্রন্থকার কর্তৃক ৩৬।বি, বসুপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২। ৩৪।৫৩

রাত্রি

আশরাফ সিদ্দিকী

যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমের যাদুতে অচেতন
নদী মাঠ ফুল গিরি বন
ঘুমের তুহিন স্পর্শে নিঝুম নিসাড়
তখন রাত্রির রাজ্যে করেছ কি কোন অভিসার?
রাত্রির গোপন ভাষা শুনেছ কি তুমি?

নিরালায় অন্ধকারে কত রাতে পা' টিপে পা' টিপে
চুপিসাড়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি
নদী মাঠ ফুল গিরি বন জলাশয়
চুপি চুপি আকাশের সাথে কথা কয়!

আকাশ এসেছে নেমে মাটির উপর
তারারা এসেছে নেমে মাথার উপর

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত......
তারা নয়—তারা নয়—এ যে চেনামুখ!
অসহ্য কান্নার মেঘে ভিজে যায় বুক!!

ছাদের কার্নিশ ধরে' তখন নিজকে নিয়ে শুধু যুঝে মরা
তখন বলাকা মন উড়ে চলে যেতে চায় কোন সরোবর
মনে হয় এ পৃথিবী হাওয়ার নগর!

আরেক প্রজ্ঞার চক্ষু খুলেছে তখন।
খুলে গেছে তৃতীয় নয়ন।
আর দেখি খুলে গেছে আকাশের নীল বাতায়ন!

জোহরা সেতারা আর আদমছুরাত্
মেঘের বন্দর দিয়ে ঘোরে সারারাত
এক দুই তিন চার......হাজার হাজার
আকাশ কানন ঘিরে তাহাদের স্বপ্ন অভিসার
ঘুমায় আদম!

কোটি সূর্য আবর্তন, আহ্নিক বার্ষিক গতি সাথে
কোটি চন্দ্র জ্যোছনা প্রপাতে
পাখীর মতন কতো যুগ উড়ে গেল
তাইগ্রীস্ ইউফ্রেটিস্ আরব সমুদ্র তীর ঘেঁষে
মিশর ভারতবর্ষ ব্যাবিলন......কত কত দেশে
কত এল—কত তারা গেল!
ক'জনকে চেনা যায় আর!
কতই বা বয়স তোমার!!

গুরু গুরু গুরু গুরু টংকার ঝংকার ধ্বনি শুধু
আবর্তন বিবর্তন ভাঙা গড়া শুধু
কোন দিক হ'তে ছোঁড়ে সৌরভ আর
কোথা হ'তে ছুঁড়ে দেয় হাওয়া যে তাহার
কে জানে খবর!
কে নাবিক সেথা হ'তে ফিরেছে কখন—
কে পথিক কবে ছেড়ে আসে সে কানন!

এপারেতে মিছে গড়া প্রবালের ঘর—
যারে নিয়ে আছো ভুলে সে যে বালুচরঃ
—রাত্রির সমুদ্র তীরে শুধু মনে হয়!

তা'পর সকাল হ'লে বাঁকা রোদ এসে গেলে
যখন পৃথিবী জেগে উঠে
দীনতায় হীনতায় এ পৃথিবী পিষ্ট হ'তে থাকে
নিজেরি ছোবলে মোরা নিজেরাই মরি পাকে পাকে

তখন আকাশ তারা দূরে সরে যায়
রজনী সব কিছু স্বপ্নের মতন মনে হয়—
ভেঙে যায় আকাশের সাঁকো—

একটি তারাও আর দেখা যায় নাকো॥

ট্রামে-বাসে

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্থানের উজীর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব তাঁর এক ভাষণে বলিয়াছেন যে—দেশ বিভাগের সময় আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ছিল দুই ভাইয়ের মত।—"কিন্তু নিজের ভাই কী করে এখন বিবির ভাই হলেন সে খোঁজ খাজা সাহেব রাখেন কি?"—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশুখুড়োর।

* * *

খাজা সাহেব আরো বলিয়াছেন—আমরা স্বাধীনতার জন্য ভারতের সহিত এক সঙ্গে সংগ্রাম
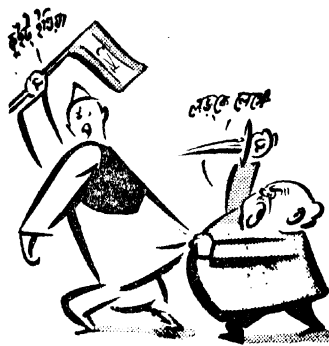
করিয়াছি। "খাজা সাহেব ভূগোল নিয়ে মেতে আছে বলে ইতিহাসটা তাঁর বড় একটা আসে না। ইতিহাসের পাতা খুললেই তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর উক্তিটায় একটুখানি ভুল আছে; কথাটা হবে—আমরা একই সময়ে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

হায়দ্রাবাদের কংগ্রেসে সমর্থিত প্রস্তাবগুলির প্রচারকার্যের জন্য শ্রীযুক্ত নেহরু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক প্রচারবিদ্ সহযাত্রী বলিলেন—"মনসার আর ধুনোর গন্ধের প্রয়োজন নেই, পাবলিসিটির কাজটি তাঁরা বেশ ভালোই সড়গড় করেছেন; শুনেছি ইতিমধ্যেই নাকি অজন্তা টেক্‌নিকের Layout পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেছে, Copy তো ফাইলে রয়েইছে, এখন শুধু কপি করে নেওয়া মাত্র"!!

* * *

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ মুখার্জি সম্প্রতি Art-in-Industry উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির প্রয়াসের প্রশংসা করিয়াছেন।—"আমরাও তাঁদের জন্যে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভের প্রার্থনা করছি। কিন্তু এই সঙ্গে মনে হচ্ছে বর্তমান Art in Politics-এর প্রয়োজন Industry-র চেয়ে বেশি"—বলেন খুড়ো।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম রেডিওতে সিনেমা সঙ্গীতের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা হইতেছে।—"প্রস্তাব উত্তম কিন্তু আয়গা-আয়গা যদি না থাকে তবে রেডিওর লাভ যে পিঁপড়েয় খায়গা-খায়গা"—এক সহযাত্রী বুঝি গান ধরিয়া বসিলেন।

* * *

প্রজাতন্ত্র দিবসে উড়িষ্যার আদিবাসী মন্ত্রী মহাশয় নাকি সস্ত্রীক আদিবাসী নাচ নাচিয়া দর্শকদের আনন্দ দান করিয়াছেন—"আগামী বৎসরে

পশ্চিমবঙ্গের তরফ হইতে কোন মন্ত্রী বাউল নাচ দেখালে আসর বেশ জমে উঠবে"—পরামর্শটা শ্যামলালই দেয়।

* * *

ডি এস্ ভুটো নামক জনৈক ধর্মপ্রচারক নাকি বিনা কপর্দকে তিন বৎসর ধরিয়া দশ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে, উক্ত ধর্মপ্রচারক নাকি বলিয়াছেন

—এই তিন বৎসর একটি অজ্ঞাত কণ্ঠ তাঁকে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধান দিয়াছে।—"তাঁর ভাগ্য ভালো বলতে হবে; মাইকের মারফতে আমরা কতই তো খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানই শুধু পেয়েছি কিন্তু পাবার বেলা লবডঙ্কা"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, পুনর্বাস খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব করিয়া দুই মাসের মধ্যে সাতাশ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন তাই নিয়া নাকি ম দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন।—"বড় জোর শ খানেক টাকা হলে আমরা না-হয় একটা এস্টিমেট করে দিয়ে সরকারের দুর্ভাবনা ঘোচাতে পারতাম; এ যে লাখ বেলাখে ব্যাপার, তাই তো মাথা গলাতে পারছি নে তবে যদ্দুর মনে হয়, একটা, দুটো দরকার হলে তার চেয়ে বেশি এক্সপার্ট কমিটি গঠনের একটা ব্যবস্থা তাঁরা করলেই টাকাটার একটা সদ্গতি কোনরকমে হয়ত হয়েও যেতে পারে"!!

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম শক্তি পরীক্ষার খেলা বা প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ সম্মানজনকভাবেই শেষ করিয়াছেন। ভৌতিক বোলার রামাধীন, বিধ্বংসকারী কিং কেহই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিব্রত করিতে পারেন নাই। দলের প্রথম হইতে শেষ খেলোয়াড়টি পর্যন্ত অপূর্ব দৃঢ়তা ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ব্যাট করিয়াছেন। এমনকি বিশ্বখ্যাত ব্যাটসম্যান যাহারা প্রত্যেকেই যে কোন সময় শতরাণ করিতে পারেন, তাঁহাদের অধিকাংশকেই নিখুঁত বোলিংয়ে বিব্রত করিয়া অধিক রান করিতে দেন নাই। ফিল্ডিং বিষয় ভারতের যে অখ্যাতি আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইবার মত—অপূর্ব ফিল্ডিংও করিয়াছেন। যাহার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিশিষ্ট ক্রিকেট সমালোচকগণ পর্যন্ত খেলার শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ভারতের ফিল্ডিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অপেক্ষা যথেষ্ট ভাল হইয়াছে। এই সকল সংবাদ সত্যই আনন্দদায়ক ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক। পরবর্তী টেস্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ অনুরূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করুন ইহাই সকলের কামনা।

তরুণ ব্যাটসম্যান আপ্তের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং

প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে বোম্বাইর তরুণ ব্যাটসম্যানকে গ্রহণ করিলে অনেকেই মনে মনে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ইহাকে ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে দলভুক্ত করিয়া যে কতখানি সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন, তাহা এই তরুণ খেলোয়াড়টি এই টেস্ট খেলার দুইটি ইনিংসেই প্রমাণিত করিয়াছেন। ইনি প্রথম ইনিংসে ৬৪ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫২ রান করিয়াছেন। পরবর্তী টেস্ট খেলায় যে ইনি ভারতীয় দলে স্থান পাইবার উপযুক্ত তাহার যথেষ্ট নিদর্শন দিয়াছেন। দীর্ঘকাল পরে ভারতের ওপনিং ব্যাটসম্যানের সমস্যা এম এল আপ্তে পূরণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি।

উমরিগরের শতাধিক রান

পলি উমরিগর এই টেস্ট খেলায় উভয় ইনিংসেই ভাল ব্যাট করিয়াছেন। প্রথম ইনিংসে তিনি শতাধিক রান করিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করেন। প্রথম ৫০ রান ২০০ মিনিটে করেন, কিন্তু পরের ৫০ রান ৭৫ মিনিটে সংগ্রহ করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ১৩০ রান করিয়া আউট হন। ইহার মধ্যে ১২টি বাউণ্ডারী, একটি ৫ রান ও দুইটি ওভার বাউণ্ডারী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৬৯ রান করেন। উমরিগরের ইহাই টেস্টের তৃতীয় শতাধিক রান। ইতিপূর্বে ইনি মাদ্রাজে তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ও তৃতীয় টেস্ট খেলায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে শতাধিক রান করেন।

ফাদকারেরও প্রশংসনীয় ব্যাটিং

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ফাদকারের ব্যাটিংও প্রশংসনীয়। ইনিও উভয় ইনিংসে অপূর্ব দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও দীপক সোধন ও ডি কে গাইকোয়াড়ের ব্যাটিং প্রশংসনীয়। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ভারতের ব্যাটসম্যানগণ সকলেই স্বাভাবিক ক্রীড়ার অবতারণা করিয়াছেন।

এস গুপ্তের অপূর্ব বোলিং

এস পি গুপ্তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভ্রমণের সূচনা হইতে যেরূপ কার্যকরী বোলিং করিতেছিলেন, এই টেস্ট খেলাতেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বিশ্বখ্যাত ব্যাটসম্যানগণ সকলেই ইহার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলিতে রীতিমত অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। প্রথম ইনিংসে ইনি একাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৭টি উইকেট দখল করিয়াছেন। ইহাকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানগণ সকলেই বিস্ময়কারী বোলার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার সহিত বিনু মানকড়ের বোলিং যদি কার্যকরী হইত, তাহা হইলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে অধিক রান করিয়া প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়া অসম্ভব হইত। পরবর্তী টেস্ট খেলায় গুপ্তে অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

উইকসের দ্বিশতাধিক রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাটসম্যান উইকস এই খেলাতে দ্বি শতাধিক রান করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম শতাধিক রানের গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি যদি ব্যাটিংয়ে সফলতা লাভ না করিতেন, তাহা হইলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত। ভবিষ্যতেও ইনি ভারতীয় বোলারদের বিব্রত করিবেন ইহারই নিদর্শন এই খেলায় পাওয়া গিয়াছে।
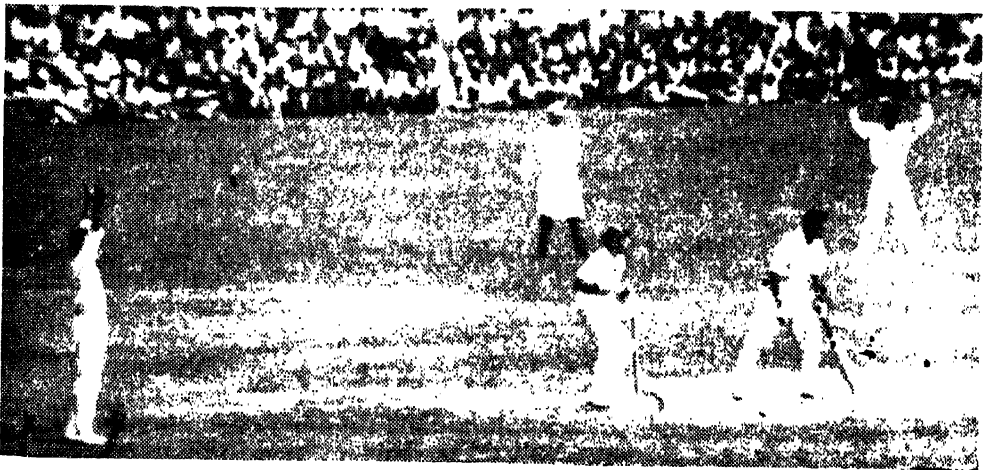
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলায় উমরিগরের আউট হইবার দৃশ্য

খেলার ফলাফল—

ভারত ১ম ইনিংস—৪১৭ রান (পি উমরিগর ১৩০, এম আপ্তে ৬৪, জি রামচাঁদ ৬১, বিজয় হাজারে ২৯, ডি ফাদকার ৩০, ডি কে গাইকোয়াড় ৪৩, ডি সোধন ৪৫, কিং ৭৫ রানে ২টি, গোমেদ ৮৪ রানে ৩টি, ভ্যালেন্টাইন ৯২ রানে ২টি, টলমেয়ার ৫৬ রানে ২টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস—৪৩৮ রান (স্টলমেয়ার ৩৩, ইভার্টন উইকস ২০৭, বি পেয়রাডো ১১৫, সি ওয়ালকট ৪৭, এস পি গুপ্তে ১৬২ রানে ৭টি, রামচাঁদ ৫৬ রানে ১টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংস—২৯৪ রান (এম আপ্তে ৫২, পি যোশী ৩২, পি উমরিগর ৬৯, ডি ফাদকার ৬৫, ডি গাইকোয়াড় ২৪, জি রামচাঁদ ১৭, রামাধীন ৫৮ রানে ৩টি, ওয়ালকট ১২ রানে ২টি, ওরেল ৩২ রানে ২টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস—কেহ আউট না হইয়া ১৪২ রান (এলাল রে ৬৩ রান ও স্টলমেয়ার ৭৬ রান নট আউট)।

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে। তৃতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা দল অবস্থার পরিবর্তন করে ও বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হয়। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা দল পূর্বের খেলার পুনরাবৃত্তি করিবে ইহাই ছিল সকলের ধারণা, কিন্তু তাহা হয় নাই। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের পর শক্তিহীন হইয়াও খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে। চারিটি খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ২টি জয়ী হওয়ায় টেস্ট পর্যায়ের খেলায় এখনও ২—১ খেলায় অগ্রগামী আছে। পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়ী না হইয়াও যদি অমীমাংসিতভাবে শেষ করে, তাহা হইলেই 'রবার লাভ' করিবে। নিম্নে চতুর্থ টেস্ট খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস—৫৩০ রান (সি ম্যাকডোনাল্ড ১৫৪, লিণ্ডসে হ্যাসেট ১৬৩, নীল হার্ভে ৮৪, জি হোল ৫৯, ডি রিং ২৮, টেফিল্ড ১৪২ রানে ৪টি, ম্যানসেল ১১৩ রানে ২টি, ফুলার ১১৯ রানে ২টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস—৩৮৭ রান (ডি ম্যাকগ্লু ২৬, ডবলিউ এনডীন ৫৬, জে ওয়েট ৪৪, কে ফানস্টন ৯২, জে ওয়াটকিন্স ৭৬, পি ম্যানসেল ৩৩, জনস্টন ১১০ রানে ৫টি, বিনড ১১৮ রানে ৪টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস—৩ উইঃ ২৩৩ রান (আর্থার মরিস ৭৭, নীল হার্ভে ১১৬, বিনড ১৮ নট আউট, ওয়াটকিন্স ৫৮ রানে ১টি, মেলে ৫০ রানে ১টি, ম্যানসেল ৪০ রানে ১টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় ইনিংস—৬ উইঃ ১৭৭ রান (ডি ম্যাকগ্লু ৫৪, জে ওয়েট ২০, জে ওয়াটকিন্স ২১, কে ঘানস্টন ১৭, ডবলিউ এনডীন ১৭, আর ম্যাকলীন ১৭, জনস্টন ৬৭ রানে ২টি, হোল ১৭ রানে ১টি, নীল হার্ভে ৯ রানে ১টি, আর্থার মরিস ১১ রানে ১টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট দল

অস্ট্রেলিয়া দলের দুইজন ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়াল ও কীথ মিলার আহত হওয়ায় পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে খেলিতে পারিবেন না। ইহাদের পরিবর্তে কুইন্সল্যাণ্ডের চৌখস খেলোয়াড় কেন আর্চার ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার জে নোবলেটকে পঞ্চম টেস্ট দলে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেন আর্চারের বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। ইনি ইতিপূর্বে কোন টেস্ট দলে খেলেন নাই। তবে নোবলেট ১৯৪৯-৫০ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচে খেলিয়াছেন। এই দলে ১৭ বৎসর বয়স্ক সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়কে পুনরায় গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য, তবে ইহাকে দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসাবেই রাখা হইবে সকলের ধারণা। নিম্নে অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—(১) এ এল হ্যাসেট (ভিক্টোরিয়া) অধিনায়ক, (২) নীল হার্ভে (ভিক্টোরিয়া), (৩) ডবলিউ জনস্টন (ভিক্টোরিয়া), (৪) সি ম্যাকডোনাল্ড (ভিক্টোরিয়া), (৫) ডি রিং (ভিক্টোরিয়া), (৬) এ আর মরিস (নিউ সাউথ ওয়েলস), (৭) আর বিনড (নিউ সাউথ ওয়েলস), (৮) আই ক্রেগ (নিউ সাউথ ওয়েলস), (৯) জি হোল (দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া), (১০) জি ল্যাংলে (দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া), (১১) জে নোবলেট (দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া), (১২) আর আর্চার (কুইন্সল্যাণ্ড)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট দল

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী বিশেষ চঞ্চল হইয়াছেন। তাঁহারা পরবর্তী বা দ্বিতীয় টেস্ট দল গঠনে বিশেষভাবেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে, প্রথম টেস্ট দলের এস রামাধীন, এলাল রে, বিনসকে বাদ দিবেন। তাঁহাদের পরিবর্তে রালফ লীগ্যাল, ক্রিস্টিয়ানী ও রয় মিনারকে দলভুক্ত করিবেন। লীগ্যাল উইকেট রক্ষক। রয় মিনার জামাইকার মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ও ক্রিস্টিয়ানী চৌখস ব্যাটসম্যান। প্রথম টেস্ট দল অপেক্ষা দ্বিতীয় টেস্ট দল আরও শক্তিশালী হইবে ইহাই তাহার নিদর্শন।

ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট দল শক্তিহীন

ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট দলে বিনু মানকড় ও জি এস রামচাঁদ উভয়েই খেলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পরিবর্তে কাহাকে গ্রহণ করা হইবে বলা কঠিন। তবে দল শক্তিহীন হইয়া পড়িল ইহাই দুর্ভাগ্যের বিষয়। খেলার ফলাফলও সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যেই রহিল।

ঘোড়পাড়ের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাত্রা

গোলাম আমেদ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে স্বীকৃত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বরোদার চৌখস খেলোয়াড় জয়সিং রাও এম ঘোড়পাড়েকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রেরণ করিয়াছেন। ঘোড়পাড়ে গুগলী বোলার, দ্রুত রান তুলিতে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডিংও ভাল করেন। এইরূপ একজন তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড়কে দলের শক্তির বৃদ্ধির জন্য প্রেরণ করা হইল, ফল ভালই হইবে আশা করা যায়। ইনি এস পি গুপ্তের পরিবর্তে দলকে বিভিন্ন খেলায় সাহায্য করিতে পারিবেন।

ব্যাডমিণ্টন

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভার পরিণতি দেখিয়া সত্যই দুঃখ হইল। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল যে, অন্তর্কলহ বলিতে ইহার মধ্যে কিছুই নাই। কিন্তু আইনঘটিত বাধা বিপত্তির সাহায্যে সাধারণ বার্ষিক সভা বেআইনী ঘোষিত হইবার পর আমাদের মত পরিবর্তন না করিয়া উপায় নাই। আমরা আশা করি, যাঁহারা এইরূপ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা বৃহত্তর স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া সকল বাদ-বিসংবাদ বিস্মৃত হইয়া একযোগে যাহাতে ভারতের ব্যাডমিণ্টনের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি দিবেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও যদি ইহা সম্ভব করিতে হয়, করা উচিত। একটি প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গা শক্ত নহে, গড়া ও তাহার ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা করা অনেক ত্যাগ ও ধৈর্যের প্রয়োজন। ইহা নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে কাহারও যে নাই, তাহা নহে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের সকল কিছু গোলযোগের অবসানের জন্য ঐ সকল ব্যক্তি যদি চেষ্টা করেন নিশ্চয় উহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

ভারতের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা লক্ষ্ণৌতে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার সকল গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন দিল্লী ও বোম্বাইর পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়গণ। তাঁহারাই বিভিন্ন বিভাগে শেষ নিষ্পত্তির খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। বাঙলার প্রতিনিধিদের শেষ পর্যায়ের খেলায় দেখা গেলেও ফাইন্যালে খেলিতে পারেন নাই। ইহার জন্য বাঙলা দলের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কৃতী খেলোয়াড় মনোজ

গৃহে হঠাৎ আহত হওয়ায় যেরূপভাবে প্রতি-যোগিতার খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পারিলে ফল কি হইত বলা কঠিন। বোম্বাইর উদীয়মানা মহিলা খেলোয়াড় সুশীলা রেগে তিনটি বিভাগে সাফল্যলাভ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পরেই বোম্বাইর অপর খেলোয়াড় হেনরী ফেরেবার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে দেবীন্দর মোহনের সহযোগিতায় ও মিক্সড ডাবলসে মিস সুশীলা রেগের সাহায্যে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছেন। উত্তর প্রদেশের ত্রিলোকনাথ শেঠ পুরুষদের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ইহার অপূর্ব দৃঢ়তাপূর্ণ খেলাই ইহাকে ফাইনালে ১৯৫১ সালের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান দিল্লীর খেলোয়াড় অমৃত দেওয়ানকে অতি সহজে পরাজিত করিয়াছে। তবে ইহা ঠিক ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলার মান যে পূর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হইয়াছে, ইহা যাঁহারা অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এক বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

খেলার ফলাফল—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল

ত্রিলোক শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫—১১, ১৫—৫ গেমে অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

দেবীন্দর মোহন ও হেনরী ফেরেরা (বোম্বাই) ১৫—৫, ১৫—৬ গেমে নন্দু নাটেকার ও ডি এস ধনগাড়েকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল

মিস সুশীলা রেগে (বোম্বাই) ১১—১, ১২—১১ গেমে মিস কৃষ্ণা নাণ্ডিগয়াকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

হেনরী ফেরেরা ও মিস সুশীলা রেগে (বোম্বাই) ১৫—৮, ১৮—১৫ গেমে নন্দু নাটেকার ও মিস শশী ভাটকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস সুশীলা রেগে ও মিস শশী ভাট (বোম্বাই) ১৫—১, ১৫—৭ গেমে মিস কৃষ্ণা নাণ্ডিগয়া (দিল্লী) ও মিস যশবীর কাউরকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন

গত তিনবারের উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ান বোম্বাই দল এইবারেও আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। দিল্লী দল তীব্র প্রতিযোগিতা চালাইয়াও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ৪—১ খেলায় বোম্বাইর নিকট পরাজয় বরণ করিয়াছেন। বোম্বাই দলের এই কৃতিত্ব সতাই প্রশংসনীয়। নিম্নে আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইন্যালের ফলাফল প্রদত্ত হইল—

সিংগলস

অমৃত দেওয়ান (দিল্লী) ১৫—১০, ১৫—১৫, ১৭—১৪ গেমে দেবীন্দর মোহনকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

হেনরী ফেরেরা (বোম্বাই) ১৮—১৭, ১২—১৫, ১৫—১২ গেমে পি এস চাউলাকে (দিল্লী পরাজিত করেন।

মিস সুশীলা রেগে (বোম্বাই) ১১—৩, ১১—৪ গেমে মিস কৃষ্ণা নাণ্ডিগয়াকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

ডাবলস

দেবীন্দর মোহন ও হেনরী ফেরেরা (বোম্বাই) ১৫—৯, ১১—১৫, ১৫—৭ গেমে অমৃত দেওয়ান ও পি এস চাউলাকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

হেনরী ফেরেরা ও মিস সুশীলা রেগে (বোম্বাই) ১৫—৮, ১৫—১১ গেমে অমৃত দেওয়ান ও মিস কৃষ্ণা নাণ্ডিগয়াকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

কুস্তি

হায়দরাবাদে জাতীয় কুস্তি প্রতি-যোগিতায় বাঙলার মল্লবীর দল পুনরায় দল-গত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। এইবার লইয়া বাঙলা মল্লবীর দল উপর্যুপরি চতুর্থবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হইলেন। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে এই সাফল্যে বাঙলা দলকে অধিকাংশ অবাঙালী মল্লবীরগণ সাহায্য করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিলে লজ্জায় মাথা নত হইয়া যায়। ইহার কারণ হিসাবে পূর্বেও যাহা উল্লেখ করা যাইত, তাহাই বর্তমান আছে। বাঙলাদেশে মল্লযুদ্ধ পরি-চালনার জন্য আরও একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা বহু কৃতী বাঙালী মল্লবীরদের নিখিল ভারতীয় ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান হইতে বিরত করিতেছেন। বাঙলার দুইটি মল্ল যুদ্ধ পরিচালকমণ্ডলী যদি একত্রে লইয়া কার্য না করেন, তাহা হইলে কোন দিনই বাঙলার সাফল্য অর্জনে অধিকাংশ বাঙালী মল্লবীর দেখা যাইবে না। স্বাধীন ভারতে এইরূপ দলাদলি বর্তমান থাকা কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা আশা করি, এই দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ একত্র হইয়া বাঙলা মল্লবীরদের বাঙলার গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবেন।

বাঙলা দল মোট ১৯ পয়েণ্ট পাইয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। পাঞ্জাব ১৩ পয়েণ্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও হায়দরাবাদ ১২ পয়েণ্ট পাইয়া তৃতীয় হইয়াছে। বোম্বাইর ওয়েল্টার ওয়েট মল্লবীর সূর্যবংশী ১৯৫৩ সালের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীরের স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। নিম্নে বিভিন্ন বিভাগে যাঁহারা ব্যক্তিগত সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল—

ফ্লাই ওয়েট

১ম এন জি কালে (বোম্বাই), ২য় ধরমবীর (দিল্লী), ৩য় এম জি বর্গে (কোলাপুর)।

ব্যাণ্টম ওয়েট

১ম রামস্বরূপ (দিল্লী), ২য় আনোয়ার (হায়দরাবাদ), ৩য় এম ভাকরকর (বোম্বাই)।

ফেদার ওয়েট

১ম হীরালাল সাহা (বাঙলা), ২য় শীতল সিং (হায়দরাবাদ), ৩য় ভালেরাম (দিল্লী)।

লাইট ওয়েট

১ম বৃন্দাবন ওঝা (বাঙলা), ২য় শিবাজী (হায়দরাবাদ), ৩য় সরভন প্রিয়াদ (মধ্য-প্রদেশ)।

ওয়েল্টার ওয়েট

১ম সূর্যবংশী (বোম্বাই), ২য় সুচা সিং (পাঞ্জাব), ৩য় লক্ষ্মণ (হায়দরাবাদ)।

সূর্যবংশী সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর হিসাবে স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন।

মিডিল ওয়েট

১ম মোহন সিং (পাঞ্জাব), ২য় জগল সিং (দিল্লী), ৩য় শ্যামসুন্দর (বাঙলা)।

লাইট হেভী ওয়েট

১ম কৈলাশনাথ শর্মা (পাঞ্জাব), ২য় কাশীনাথ সিং (বাঙলা), ৩য় রামভজন চোবে (মধ্যপ্রদেশ)।

হেভী ওয়েট

১ম আউদ বিহারী সিং (বাঙলা), ২য় রামানন্দ (মধ্য প্রদেশ), ৩য় লোকোরাম (হায়দরাবাদ)।

পিন ওয়েট

১ম গিয়ান প্রকাশ (দিল্লী), ২য় বিহারী-লাল (মধ্যপ্রদেশ)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ-

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য ভারতের সর্বত্র বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জনসভা, শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা, সামরিক কুচকাওয়াজ ঐ দিবসের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল।

কিষণগঞ্জের (পূর্ণিয়া) সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী শেষ রাত্রে একদল সশস্ত্র পাকিস্থানী হানাদার ভারত-পাকিস্থান সীমান্তবর্তী পানিরপার গ্রাম আক্রমণ করে। হানাদারদের গুলীতে দুইজন গ্রামবাসী নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরীয় মার্কিন নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক ভাইস-এডমিরাল রাইট অদ্য বিমানযোগে করাচীতে পৌঁছেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নেপালে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রী সি পি এন সিংকে শ্রী সি এম ত্রিবেদীর স্থলে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৭শে জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতায় জাতীয় সমর শিক্ষার্থী দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালে এই বাহিনী গঠনের পর এইরূপ অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

মার্কিন নৌ বাহিনীর ভাইস-এডমিরাল রাইট অদ্য করাচীতে বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পাকিস্থানের সুনিশ্চিত সামরিক গুরুত্ব আছে।

শ্রীমতী মণিবেন মুলজী নাম্নী রাজকোটের জনৈকা মহিলা বিক্রয় কর বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে অনশন আরম্ভ করেন। তিনি অদ্য সকালে মারা গিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী—নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথার কার্য পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পাসপোর্ট প্রথা সম্পর্কিত সমগ্র প্রশ্নটি বিস্তৃত আলোচনা করিয়া মূল সম্মেলনে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত অদ্যকার অধিবেশনে প্রত্যেক পক্ষের তিনজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

২৯শে জানুয়ারী—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন অদ্য এক সাংবাদিক-বৈঠকে বলেন যে, গত তিন দিনের মধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সহিত তাঁহার আরও পত্রালাপ হইয়াছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলিতে অস্বীকার করেন।

মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন সম্পর্কে পাকিস্থান এবং মিশর সম্পূর্ণ একমত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লীতে প্রস্তাবিত নেতাজী হল নির্মাণকল্পে ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য দিল্লী রাজ্য ফরোয়ার্ড ব্লক বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দকে লইয়া একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৩০শে জানুয়ারী—অদ্য ভারতের সর্বত্র প্রার্থনা, সূত্রযজ্ঞ এবং জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী জওহরলাল নেহরু পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কতিপয় পাকিস্থানী সংবাদপত্র কর্তৃক 'জঙ্গীবাদী প্রচারকার্য' চালনার প্রতিবাদ জানাইয়া গত ১৭ই নবেবর শ্রী নেহরু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, খাজা নাজিমুদ্দিনের এই পত্রটি তাহারই জবাব।

৩১শে জানুয়ারী—পাকিস্থানের কয়েকজন রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সম্মিলিতভাবে এক বিবৃতি দিয়া পাকিস্থান সরকারকে মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা অথবা অনুরূপ কোন পরিকল্পনায় যোগ না দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের এক প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য জম্মু হইতে ৩২ মাইল দূরবর্তী জরিয়ান নামক স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী এক মারমুখী জনতার উপর গুলী চালনার ফলে চারজন নিহত ও দুইজন আহত হয়। বর্তমানে জম্মু ও আখনুরের কোন কোন অঞ্চলে যে গুরুতর ধরণের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও অরাজকতা দেখা দিয়াছে উপরোক্ত ঘটনা তাহার চরম পরিণতি।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এস এন আগরওয়াল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কংগ্রেস কর্মিগণের উদ্দেশে অদ্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাইয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—নয়াদিল্লীতে পাসপোর্ট সংক্রান্ত ভারত-পাকিস্থান সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। এই সম্মেলনে উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ লোকের কষ্টের লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের শেষে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদলের নেতৃবৃন্দ যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা আগামী ১লা মার্চের মধ্যে কার্যকরী করা হইবে।

অদ্য জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আনুষ্ঠানিকভাবে কলিকাতায় বেলভেডিয়ার প্রাসাদে স্থাপিত জাতীয় গ্রন্থাগারের নবনির্মিত সুদৃশ্য ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জানুয়ারী—অদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধী দলের নেতা মিঃ জ্যাকব স্ট্রস ডাঃ মালানের সরকারকে দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত এবং অশ্বেতকায়দের আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দায়ী বলিয়া অভিযোগ করেন।

রেঙ্গুনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জাতীয়তাবাদী চীনা সেনাদল মংসুর (দেশীয় নৃপতি শাসিত অন্যতম শান রাজ্য) নৃপতিকে তাঁহার রাজধানী হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী—অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ত্রিশক্তি যে সংক্ষিপ্ত চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, উহা প্রত্যাহৃত না হইলে রাশিয়া অষ্ট্রিয়া সংক্রান্ত কোন আলোচনায় যোগ দিবে না বলিয়া পুনরায় ঘোষণা করিয়াছে।

২৯শে জানুয়ারী—ডেনমার্কের ভূমিতে শান্তির সময়ে অতলান্তিক বাহিনী মোতায়েন করার বিরুদ্ধে রাশিয়া ডেনমার্কের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং এই অভিযোগ করিয়াছে যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে ডেনমার্ক অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী—মার্কিন সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ফরমোজা রক্ষায় নিযুক্ত মার্কিন ৭ম রণতরী বহরকে প্রহরা-কার্য হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য আদেশ জারী সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বিচার-বিবেচনা করিতেছেন।

রেঙ্গুনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কারেন বিদ্রোহীরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে যে, ৪ সপ্তাহের মধ্যে সরকার তাহাদিগকে ২ লক্ষ টাকা প্রদান না করিলে তাহারা দক্ষিণ ব্রহ্মে ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু উড়াইয়া দিবে।

১লা ফেব্রুয়ারী—আজ ইউরোপের অধিকাংশ স্থলভাগ এবং উহার চতুর্দিকস্থ সমুদ্রের উপর প্রবল বাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে, হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং কয়েকখানি জাহাজ ডুবিয়াছে।

গতকল্য ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আইরিশ সাগরে 'প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া' নামক স্টীমার ডুবির ফলে মোট ১৩৩ জন প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক— ১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ৵০ আনা, বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

শনিবার
২রা ফাল্গুন, ১৩৫৯

DESH Saturday, 14th February, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

চারদিনব্যাপী বিতর্কের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি শেষ দিন অনেকটা উত্তেজনাময় পরিবেশের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। ৫৭ জন সদস্য এই বিতর্কে যোগদান করেন। বিরোধী দল রাজ্যপালের অভিভাষণের তীব্রভাবে সমালোচনা এবং কংগ্রেসী সদস্যগণ যথারীতি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। বিতর্কের মুখে মোটামুটি এই সত্যটি সাব্যস্ত যে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বহুবিধ সমস্যা আছে এবং সে সব সমস্যা অত্যন্তই জটিল। কিন্তু একথাটা তো কাহারো অজানা ছিল না। সমস্যার প্রতিকার কিসে হইতে পারে ইহাই জ্ঞাতব্য। বিতর্কের ফলে জনসাধারণের মনে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা-ভরসা জাগে নাই। বেকার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের এখন প্রধান প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এই সংকট হইতে মুক্ত করিবার জন্য খুবই আগ্রহশীল বলিয়া তাঁহার উক্তি এবং বিবৃতিতে পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত হইলে অনেকের কাজ জুটিবে, তিনি এই আশ্বাস আমাদিগকে দিয়াছেন। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সাফল্য লাভ করিতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে, ততদিন বেকার সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার যাহাতে বহু যুবকের কার্যের সংস্থান হইতে পারে। সরকারপক্ষ হইতে এই সম্পর্কে সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে সরকারপক্ষের কাজ সমর্থন করিতে গিয়া কোন কোন সদস্য তাঁহাদের বশংবদ মনোবৃত্তিতে বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। উদ্বাস্তুরা এই সমস্যার সমাধানে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, এমন অভিযোগও উত্থাপিত হইয়াছে। বস্তুত ভুক্তভোগী যাঁহারা, তাঁহারাই উদ্বাস্তুদের অবস্থা বুঝিতে পারেন, নতুবা মুখে মুখে বক্তৃতাবাজী খুবই চালানো যায়। বরং পুনর্বাসন মন্ত্রীর উক্তিতে এ সম্বন্ধে সর্বাধিক দায়িত্ব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি এই সম্পর্কে আত্মতুষ্টির মনোভাব অভিব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু যে সকল উদ্বাস্তু পুনর্বসতির স্থান হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব অতিরিক্ত মাত্রায় কঠোর বলিয়াই আমরা মনে করি। পুনর্বাসন সচিব এই সব দুর্গত উদ্বাস্তুদের উপর কার্যত চরমপত্র জারী করিয়াছেন। চরমপত্রের নির্দেশ এই যে, এই সব উদ্বাস্তুরা যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে যে সব কেন্দ্র হইতে তাহারা আসিয়াছে, তথায় প্রত্যাবর্তন না করে, তবে তাহারা সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। বস্তুত উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে তাহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করাই কর্তৃপক্ষের উচিত। এই বিপন্ন অসহায় বুভুক্ষু নরনারীর দল সাধ করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রেল স্টেশনে আসিয়া পড়িয়া আছে। সরকার কি ইহাই মনে করেন? তাঁহাদের এমন ধারণা, আমরা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করি। প্রকৃতপক্ষে যথাসম্ভব সতর্ক হইয়া এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। রাজনীতির দলাদলির যূপকাষ্ঠে ইহারা বলি পড়ে, ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। ফলত মনুষ্যত্ব এদেশে এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং বিপন্ন নরনারীর বেদনা জনসমাজের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবে, ইহাও বিচিত্র নহে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্ন

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় রাজ্যপালের অভিভাষণ সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন উত্তরই দিতে পারেন নাই। এ ব্যাপারে বিহার সরকারের উপর কোন রকম চাপ দেওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই। ডাঃ রায় শাসনতান্ত্রিক এই তত্ত্বটিরই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা-বিশেলষণ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। বিহার বিধানসভায় এই কথা প্রকাশ পায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের সীমানা-সম্প্রসারণের ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন চিঠি পান নাই। বলা বাহুল্য, পাইবার কোন কথাও নহে। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উক্তির যুক্তি সুস্পষ্ট। কারণ ভারত সরকারের পক্ষ হইতেই বিষয়টি বিহার সরকারের নিকট উপস্থিত করা উচিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় গৃহীত এতৎসম্পর্কিত প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া

লন নাই। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল পশ্চিমবঙ্গের দাবীর মূলে যুক্তি আছে, এমন কথা মাঝে মাঝে বলেন, কিন্তু সে যুক্তির কার্যকারিতা তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি একটি বিশেষ প্রশ্ন এবং ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন হইতে তাহা স্বতন্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ইহাই বুঝিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিতেছি। তাঁহাদের মতে এ কারণে হায়দরাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটির জন্য পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার পথে কোন রকম অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তাঁহারা যাহাই মনে করুন, দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তই কার্যত করিয়া বসিয়াছেন যে, হায়দরাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটি অন্তত পাঁচ বৎসরের জন্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। এ দিকে দেশ বিভক্ত হইবার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার ক্রমাগত চাপে পশ্চিমবঙ্গ পিষ্ট হইতে চলিয়াছে এবং এজন্য পশ্চিমবঙ্গ নিজে দায়ী নয়। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারেরই সেক্ষেত্রে দায়িত্ব রহিয়াছে এবং সেই দায়িত্ব প্রতিপালনে তাঁহাদের উদাসীনতার জন্য সমগ্র ভারতের পক্ষেই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের দাবীকে ক্রমাগত উপেক্ষা করিয়া ভারত সরকার চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন, এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের এই ত্রুটির জন্য পশ্চিমবঙ্গেরই শুধু যে দুর্গতি বাড়িবে, ইহা নয়, সমগ্রভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষেও বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইবে।

পাকিস্থানের রাজনীতিক পরিস্থিতি

পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ পূর্ববঙ্গে সম্প্রতি সফরে আসিয়া যে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে একই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি ঐক্য রক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। মিঃ গোলাম মহম্মদের পশ্চিম পাকিস্থানের বক্তৃতাতেও ঐ একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। পাকিস্থানের সমস্যা অনেক রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গবর্ণর জেনারেল সাহেব ঐক্য প্রচারে এইরূপ একান্তভাবে কেন ব্রতী হইয়াছেন, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। তবে কি পাকিস্থানের সত্যই একতার অভাব তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে? এই আশঙ্কা যে সত্য, বিভিন্ন তথ্য হইতে তাহা বেশই প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে আর্থিক সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। ছাড়পত্র প্রবর্তনে এই সঙ্কট গুরুতর হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বর্তমানে আর পূর্বের মত কাশ্মীর সমস্যার সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে সুযোগ পাইতেছে না। জেহাদী জিগীরও সেখানে জমিয়া উঠে, এমন দাহ্য উপকরণেরও সেখানে অভাব ঘটিয়াছে। দেশের লোকের এই দুর্দশার মূলে শাসকগোষ্ঠীর সর্বময় প্রভুত্বই অনেকখানি রহিয়াছে, সাধারণের তাহা বুঝিতে বাকী নাই। শাসনতন্ত্র নির্ধারণ কমিটির প্রগতিবিরোধী প্রস্তাবসমূহ অসন্তোষের কারণ তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। তরুণ দলে মোল্লাই-প্রভুত্ব এবং শাসকদের স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পূর্ববঙ্গের তরুণদের নেতা কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। ইঁহাদের মুক্তি মিলিতেছে না। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নায়ক-স্বরূপে মিঃ শহীদ সুরাবর্দী পাকিস্থানের বর্তমান কর্ণধারগণের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়িয়া ফিরিতেছেন। তিনি নাকি এবার সাক্ষাৎ-সংগ্রামে অবতীর্ণ না হইয়া ছাড়িবেন না। ইহার উপর নবগঠিত গণতান্ত্রিক দল তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, শ্রীহট্টের নানা স্থানে সরকারবিরোধী সভা হইতেছে। 'লীগ সরকার বরবাদ, মোল্লারাজ ব্যর্থ কর, বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হওয়া চাই' এইরূপ বচনসম্বলিত প্রাচীরপত্র স্থানে স্থানে টাঙ্গানো হইতেছে। সংবাদ সত্য হইলে ব্যাপার গুরুতর বলিতে হইবে। তবে উদার জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্থান গঠিত হয় নাই। সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বর্বরতার গোঁড়ামি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার মূলে অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে এবং এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন সে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হয় নাই। তথাকার বর্তমান শাসকদের ইহাই বড় ভরসা এবং গবর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদও এই মনোভাবের ভিত্তিতেই ঐক্যের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দীনও কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ববঙ্গে সফরে আসিতেছেন। বস্তুত 'বিপন্ন ইসলামের' মন্ত্রবীজই ইঁহাদের প্রচার ও প্রচেষ্টার মূলে কাজ করিতেছে। কিন্তু কালের গতিরোধ করা যায় না। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে গণতান্ত্রিকতার পথে যে বৈপ্লবিক জাগরণ ঘটিতেছে, পাকিস্থানে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, ইহা স্বাভাবিক। জনসাধারণকে কিছুদিন প্রবঞ্চিত করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল সে চাল চলে না। পাকিস্থানে এই সত্য ইতিহাসের নূতন অধ্যায় রচনা করিতে উন্মুখ হইয়াছে, তবে বর্তমানে ইহা অনেকটা নীহারিকা আকারেই রহিয়াছে; কিন্তু দানা বাঁধিয়া উঠা অস্বাভাবিক নয়।

টাকা লুঠের অভিনব কৌশল

শহরে রাহাজানি নূতন নয়। ব্যাঙ্কে বা বড় বড় কারবারীদের অফিসে অস্ত্র-শস্ত্রসহ হানা দিয়া টাকা লুঠের ঘটনাও বহু ঘটিয়াছে। গত রবিবার বিবেকানন্দ রোড এবং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে ভয়ানক ধরণের সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতঃপূর্বে কলিকাতা শহরে পর পর তিনটি ঘটনা এমনভাবে ঘটিয়াছে এবং লুণ্ঠনকারীরা এরূপ প্রয়োগ নৈপুণ্যের এমন পরিচয় দিয়াছে যে, তাহার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হইতে হয়। ফলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিপটু মার্কিন লুঠেরারাও ইহাদের কাছে মাথা নত করিবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কোষাগার হইতে টাকার থলিয়া উধাও, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকার থলিয়ার অন্তর্ধান, সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদর দপ্তর হইতে মোটা টাকা

উধাওয়ের ব্যাপার। দিনে দুপুরে যেখানে লোকজনের সমাগম রহিয়াছে, অবিরত কাজকর্ম চলিতেছে, তথা হইতে লোকচক্ষুর অলক্ষিতে টাকার থলিয়া এইভাবে অপসারণ কার্য ভানুমতীর খেলাকেও হার মানাইয়াছে। সরকারী ভবনের চারতলার উপর কোষাগার, তাহাতে গেটের উপরে গেট। সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গীন চড়াইয়া পাহারা দিতেছে। এই অবস্থায় সুযোগের ফাঁকে তাক রাখিয়া কোষাধ্যক্ষকে আক্রমণ, তাহাকে অজ্ঞান করা, তারপর সিন্দুক খুলিয়া টাকার থলি হাত করিয়া স্বচ্ছন্দে সরিয়া পড়া, এতগুলি কাজ যাহাদের কৃতিত্বে সাধিত হইয়াছে, তাহারা যোগসিদ্ধ পুরুষ বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। তবে এ যোগসিদ্ধির গুরু এদেশে মিলে নাই; পরন্তু পশ্চিম হইতেই এই বিদ্যা আসিয়াছে। বিদেশী সিনেমায় মধ্যে মধ্যে কৌশলপূর্ণ যে সব ডাকাতির ছবি দেখানো হইয়া থাকে তাহা হইতেই এদেশের জিজ্ঞাসুগণ এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। জনসাধারণ এখন পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে, সেদিন কলিকাতায় পুলিশ প্যারেডে রাজ্যপালের মুখে আমরা একথা শুনিয়াছি। অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রাচীন পন্থা বর্তমানে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সম্ভবত প্রাচীনপন্থীরা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রগতিপন্থী অপরাধীদের এই যেসব ধরণের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দমন করিবার উপায় কি? পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগে অপরাধী ধরিবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শিখানো হইতেছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। সেই বিদ্যা লুণ্ঠননীতির এই প্রগতিকে রুদ্ধ করিতে কতটা সমর্থ হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া সহজেই বোঝা যায় যে, যাহারা এই সব কাজ করিতেছে, তাহারা দলবদ্ধভাবেই এজন্য চক্রান্ত চালাইতেছে এবং তাহাদের কর্মনীতি বেশ সম্প্রসারিত এবং তাহা সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই সব গূঢ়চারীদের চক্রান্ত জাল ভেদ করিতে হইবে পুলিশকে তাহাদের দৃষ্টিকে সজাগ রাখিতে হইবে এবং বুদ্ধির কৌশলকেও সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

মহতের অবমাননা

পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলিম লীগের সদস্যগণ কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, রাজাকর দলের নেতা কাসিম রেজভী এবং খান বাহাদুর আব্দুল গফ্ফর খাঁ এই দুইজন বন্দীকে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিনিময় করিয়া ইঁহাদিগকে সেইভাবে মুক্তি দেওয়া চলে। হায়দরাবাদ কংগ্রেসে খান আব্দুল গফ্ফর খাঁর মুক্তি দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্ভবত মুসলিম লীগের সদস্যগণ সেই প্রস্তাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। খান আবদুল গফ্ফর খাঁ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা। তিনি একজন ত্যাগব্রতী সত্যসন্ধ পুরুষ। তাঁহার মুক্তির জন্য ভারতে উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে। ইহা স্বাভাবিক। সীমান্ত গান্ধীকে যদি আমরা পুনরায় নিজেদের মধ্যে পাই, তবে আমরা খুবই আনন্দিত হইব এ বিষয়ে কোন সন্দেহও থাকিতে পারে না। ফলত তাঁহার ন্যায় উদারচেতা পুরুষ ভারতে কেন, সব দেশ, সব জাতিতেই সমাদৃত হইবেন। কিন্তু তাঁহার মুক্তির সঙ্গে রাজাকর নেতা কাসিম রেজভীকে মুক্তিদানের প্রশ্ন জড়িত করার কোন অর্থই হয় না। রাজাকর নেতা রেজভী গুরুতর অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া কারারুদ্ধ আছেন। নরঘাতী হিংসায় তাঁহার হস্ত রুধিরাক্ত হইয়াছে। মধ্যযুগীয় বর্বর-প্রকৃতির তাড়নায় অন্ধ এমন লোকের মুক্তির বিনিময়ে গফ্ফর খাঁ কিছুতেই নিজের মুক্তি লাভ করিতে রাজী হইবেন না। তিনি কোন অপরাধ করেন নাই। তিনি পাকিস্থান ছাড়িতেও প্রস্তুত নহেন। পক্ষান্তরে পাকিস্থানে থাকিয়াই তিনি নিজের এবং নিজের রাষ্ট্রের সেবা করিতে চাহেন। মান, যশের ভিখারী তিনি নহেন, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করাও তাঁহার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য নহে। রাজাকর-নেতা মুক্তি পাইলে পাকিস্থানে গিয়া নিজের ব্যবসা পুনরায় জমাইয়া তুলিবেন ইহা আমরা জানি; কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রসিদ্ধ যোদ্ধা গফ্ফর খাঁ হীন সর্তে নিজের স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া মুক্তি চাহিবেন না, ইহা নিশ্চিত। বস্তুত দেখা যাইতেছে, কারা-প্রাচীরের অন্তরাল হইতেই সাধকের অন্তর-মহিমা বিশ্বমানবের সাংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে এবং খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ আত্মদাতা বীরগণের অন্যতম পুরুষস্বরূপে মানব-সমাজের পূজা পাইবেন।

পরলোকে শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার

ভারতের রক্ষা সচিব শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীগোপালস্বামী মনীষাসম্পন্ন রাজনীতিক পুরুষ ছিলেন। মাদ্রাজ সরকারের একজন সাধারণ কর্মচারীর পদ হইতে তিনি শাসন বিভাগের শীর্ষদেশে সমারোহণ করেন। স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিমণ্ডলে পণ্ডিত জওহরলালের সহকর্মিস্বরূপে তিনি রেল বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ এবং পরিশেষে ভারতের সমর-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কাশ্মীর সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃস্বরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও গত বৎসর জেনেভায় কাশ্মীর সম্বন্ধে ডক্টর গ্রাহামের সঙ্গে যে আলোচনা হয়, তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃস্বরূপে তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, কাশ্মীর সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইল না। এমন একজন তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক এবং দেশপ্রেমিক কর্মনিষ্ঠ পুরুষকে হারাইয়া ভারত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

ট্রামে-বাসে

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জনের মৃত্যুতে একটি শোকসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কম্যুনিস্ট সদস্যপ্রধান শ্রীযুত জ্যোতি বসু উহার বিরোধিতা করেন। মৃতের প্রতি এই সামান্য সৌজন্যের অভাব অনেককেই হতবাক করিয়াছে; শুধু পারে নাই খুড়োকে। তিনি বলিলেন—"অনেকেরই বোধ হয় মনে আছে যে, বিধান সভায় একদিন নলিনীবাবু বসু মহাশয়কে বলেছিলেন যে, কঞ্চিতে ছড়ি হয়, বাঁশী হয় না। জ্যোতিবাবু তাই হয়ত প্রমাণ করিলেন যে, বাঁশী না হলেও ঢাকের কাঠি হয়। এই বিরোধিতা ডুম-ডুমা-ডুম ছাড়া কিছু নয়।"

* * * *

নয়াদিল্লী সংসদ ভবনের পতাকা-দন্ডের নিম্নে একটি চক্র সন্নিবেশের ব্যবস্থা হইয়াছে। সংবাদে শুনিলাম, সংসদের অধিবেশনের সময় এই চক্রটি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকিবে। "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে হয়ত হবে না, তবে দশচক্রে ভগবানের ভূত হওয়া খুবই সম্ভব"—সংবাদটায় টীকা জুড়িয়া দেয় আমাদের শ্যামলাল।

* * * *

শ্রীযুত মুন্সী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতিই তাঁর আইন ব্যবসার

সাফল্যের মূল কারণ। —"শুধু তা-ই বা কেন, খাদ্যমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর রচিত উপন্যাস Hot Cake-এর মতো বিক্রী হয়েছে" বলেন বিশু খুড়ো।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত দেশমুখ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে বোম্বাই সরকার মদ্যপান বর্জন আইনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিতেও পারেন। —"কিন্তু

দেশমুখের এ ধারণা ভুল, কেননা ব্যাপারটা যাঁর হাতে ন্যস্ত, তিনি হলেন দেশ-I"!!

* * * *

মৎস্য মন্ত্রী শ্রীযুত নস্কর মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, গভীর জলে মাছ ধরার ব্যবস্থা সফল হয় নাই। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আরও মাছ জালে ধরা পড়িবে। —"নিশ্চয় সেগুলো ডাঙার মাছ, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কি সাফল্যের কোন আশা আছে, ডাঙার মাছেরা যে আরো সেয়ানা"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী দল নাকি প্রশ্ন করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের সীমা বৃদ্ধির জন্য কংগ্রেসীরা এই পর্যন্ত কী করিয়াছেন। —"কেন, তাঁরা গান গেয়েছেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে—সীমার মাঝে অসীম তুমি—আর আপনারা নেচেছেন ময়দানে—কাঠি নাচের খেলা কি বে কাঠি নাচের খেলা'!!

ব্যয়বহুলতার কারণে সরকারী কর্মচারীদের জন্য খাদি প্রশস্ত বিবেচিত হয় নাই—এই কথা নাকি বলিয়াছেন শ্রীযুত নেহরু। —"কিন্তু সেটাই বড় কারণ নয়, দেশের রাজনৈতিকগণ খাদির ট্রেড্ মার্ককে সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত করে রেখেছেন যে"!!

* * * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, পাকিস্তান নাকি কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে তুলা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। —"প্রস্তাবটা বিনিময়-কারীদের পক্ষে সত্যি যে লাভজনক, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তুলো ওজনের আগে পাকিস্তান পাষাণ দেখাতে রাজি হবেন কি?"

* * * *

ফতেগড়ের এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি নলসদৃশ একটি অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক দুই-দুইবার আকাশে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। —"পুকুর চুরি করে যাঁরা কেল্লা ফতে করছেন, তাঁদের জন্যে নলচালার প্রয়োজনেই কি নলসদৃশ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব?" —বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

আমরা কলিকাতায় সম্প্রতি একটি অদ্ভুতদর্শন শিশুর জন্মের কথা শুনিলাম, দুই দিন পরেই আবার "শ্যাম-

দেশীয় যমজের" জন্মের কথাও পাঠ করিলাম। আমাদের নানা পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কি রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি, বিকলাঙ্গের ছোঁয়াচ লাগা অসম্ভব নয়।

কী হবে

হামেশা মিঃ স্টালিনের নূতন নূতন বাণী বা বক্তৃতা কাগজে বেরোয় না। সেগুলো খুব ওজন করে ও দেরিতে দেরিতে ছাড়া হয়। ফলে মিঃ স্টালিনের যখনই যে-উক্তি প্রকাশ করা হয়, তাতেই দেশে-বিদেশে খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। চীনে মিঃ মাও-সে-তুংও এই রীতি অবলম্বন করেছেন। এই সপ্তাহের পূর্বে অনেকদিন তাঁর কোনো বক্তৃতা প্রচারিত হয়নি।

Chinese People's Political Consultative Conference-এর কমিটির বৈঠকে প্রদত্ত মিঃ মাও-সে-তুংয়ের যে বক্তৃতা চীনের সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য অপ্রত্যাশিত কথা কিছু নেই। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের 'State of the Union Message'এর উত্তরে চীনের পক্ষ থেকে অন্য কিছু আশা করাও ভুল হোত। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারও নিশ্চয়ই চেয়ারম্যান মাওয়ের কথায় আশ্চর্য হননি। মিঃ মাও বলেছেন যে, আমেরিকা যদি চায়, তবে চীন কোরিয়া যুদ্ধের চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়ে

যেতে প্রস্তুত আছে, তার জন্য যত বছরই লাগুক। 'কোরিয়াকে সাহায্য করতে হবে এবং আমেরিকাকে ঠেকাতে হবে'—এই ধ্বনি দিয়ে মিঃ মাও চীনকে আরো সচেষ্ট হবার জন্য বলেছেন।

চীনে একটা নূতন 'সাজো সাজো' রব পড়ে গেছে সন্দেহ নেই। তবে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের কথা থেকে যেমন তাঁর মনোগত অভিপ্রায় সবটা বোঝা যেতে পারে না তেমনি চেয়ারম্যান মাওএর কথা থেকেও চীনের মন সবটা বোঝা যায় না। গর্জনের উত্তরে গর্জন তো শোনা যাবেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে কতটা এগুতে প্রস্তুত হয়েছে, সেটা বোঝা সহজ নয়। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার কী কী করবেন, সেসব ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন, এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। ফরমোজা থেকে কুওমিণ্টাং সৈন্যদের দিয়ে চীন ভূখণ্ডে উপদ্রব করানোর মতলব থাকলেও সেটা কার্যকরী করার চেষ্টা কীভাবে হবে, সেটা এখনও পুরোপুরি স্থির হয়েছে বলে মনে হয় না। যদিও অনেক রকম গুজব রটতে শুরু করেছে। চীনের পক্ষে আতঙ্কজনক গুজব রটানো এবং আমেরিকার পরবর্তী কার্য সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনাকল্পনার প্রচারও হয়ত একটা উদ্দেশ্য নিয়েই করা হচ্ছে।

চীন উপকূলের নৌ-অবরোধের পরিকল্পনার কথা খুব শোনা যাচ্ছে। এরূপ অবরোধ ঘোষণা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল হবে। আমেরিকার মিত্রগণ, বিশেষ করে বৃটেন এ প্রস্তাবে সহজে রাজি হতে চাইবে না। বৃটেন বলছে, এতে চীনের যুদ্ধ করার ক্ষমতার তেমন কিছু ইতরবিশেষ হবে না, কারণ চীনের আমদানী বাণিজ্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ এখন সমুদ্রপথে চলছে। যুদ্ধের উপকরণ অস্ত্রশস্ত্র, সমস্তই আসে স্থল-পথে—সোভিয়েট রাজ্য থেকে অথবা সোভিয়েট রাজ্যের ভিতর দিয়ে। নৌ-অবরোধের দ্বারা চীনকে চট করে কাবু করার কোন সম্ভাবনা নেই, অপরপক্ষে যারা চীনের সঙ্গে ব্যবসা করে দু পয়সা কামাচ্ছে, যেমন বৃটিশ, তাদের লোকসান হবে। বিশেষ করে হংকংএর জন্য বৃটিশের দুশ্চিন্তা তো আছেই। সুতরাং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চীনের নৌ-অবরোধ করার পক্ষপাতী নন। নৌ-অবরোধ করা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার সামিল হবে এবং তার ফলাফল অতি ভীষণ হতে পারে—এই ধারণাটি বিশেষ করে বৃটিশ প্রচারকদের মুখেই

মুখোশ

ছিল, গতিশীলতা ছিল না; গতি ছিল রেখায় ও গড়নে; কিন্তু এক্ষেত্রে বর্ণ গতিমান, স্পন্দমান, গড়নের মধ্যে গতির ব্যঞ্জনা অপেক্ষাকৃত কম। সম্ভবত এই-রূপ বর্ণবিন্যাসের জন্যই এইসব ছবি সহজে চোখে পড়ে এবং মনে জোরালো ছাপ এঁকে দেয়। এরূপ বর্ণবিন্যাসের এই শ্রেণীর ছবিতে বাস্তব জগতের সাদৃশ্য আছে। এই সব ছবিতে গড়ন-গুলি সাদৃশ্যমুখী হলেও মূলত পূর্বাবিষ্কৃত অবাস্তব গড়নগুলির ভাব-ভঙ্গীকেই আশ্রয় করে আছে। এই সব ছবিতে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আবিষ্কার গড়ন বা গতি-ময়। প্রধান আবিষ্কৃতি হল বর্ণ; আরও ঠিক ঠিক বলতে হলে বলব, বর্ণের গতি, বর্ণের স্পন্দন, আলো-ছায়ার অনুরণন। এই স্পন্দমান গতি-মান বর্ণের বিন্যাসে বস্তুরূপের ভঙ্গী (gesture) ও ভাব (expression) ব্যঞ্জিত ও অনুকৃত হচ্ছে। বাস্তব-রূপের ভাবভঙ্গীর আকর্ষণে এই ছবি-গুলির প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে মানুষ। এই সব রচনায় মৌলিক গড়নের দিক দিয়ে নূতনত্ব না থাকলেও মুখভঙ্গীর ও অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো। মোটের উপর এই বর্ণের সজ্জায়, এই আলোছায়ার বিভ্রমে, এই ভাবভঙ্গীর আবির্ভাবে ছবিগুলি এক দিকে যেমন বাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছে বলা চলে অন্য দিকে তেমনি অপরূপ আশ্চর্য এক জগৎ সৃজন করেছে; তার চিরপ্রদোষ রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের পিছনে অপরিচিত, অর্ধপরিচিত, নট-নটী একপ্রকার মূক অভিনয় করে চলেছে। এই ছবিগুলিতে যুগপৎ দেখা যায় বাস্তবতা ও নাটকীয়তা; অর্থাৎ এ সৃষ্টি ভাবে-ভঙ্গীতে, আলোছায়ার মায়ার অনুকরণে, বাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছে, কিন্তু পূর্ব-কল্পিত গড়নের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেনি বলেই বাস্তবতার চরম পরিণামে উত্তীর্ণ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিল্পরচনার প্রধান অবলম্বন হল রেখার বুনুনি। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে আছেন লেখক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার সাবলীল সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব অতুলনীয় এ কথা কে না জানে? রেখার গতিকে অনুসরণ করেই তাঁর চিত্রকলা অঙ্কুরিত, বিকশিত ও রূপ-রঙে পরিণত ও পরিচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা শেষ পর্যায়ের বর্ণাঢ্য ছবিগুলিও দৈবাৎ রেখার বুনুনি থেকে মুক্ত। রঙিন ছবি থেকেও এই রেখার বুনুনি যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তার রূপের বাঁধন ও রঙের কারু আশ্রয়অভাবে কতটা অবশিষ্ট থাকবে বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ শেষ দিকে যখন বিশেষ করে বর্ণ-ব্যবহারের দিকেই ঝুঁকেছিলেন তখনও রেখা দিয়ে, কালী-কলমে, বহু দৃশ্যচিত্র (landscape) ও মানুষের ছবি এঁকেছেন —তাতে রেখাপাতের অসাধারণ বলিষ্ঠতা ও নিপুণতা লক্ষ্য করবার বিষয়।

অবশেষে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে পর্যন্ত খাতার পাতায় কাটা লেখাকে জোড়া দেবার গৌণ প্রয়োজনের মধ্যে বাঁধা ছিল, মেকানিকাল বাধার দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল, সে পর্যন্ত রেখা ছিল গতিশীল। এই শিল্পচেষ্টায় চরম পরিণতি অবচ্ছিন্ন রেখাছন্দের আবিষ্কারে। পরবর্তীকালে রেখার নৃত্য যখন গড়ন হয়ে উঠল সেই গড়নের মধ্যেও পাই পূর্বাবিষ্কৃত ছন্দ। রবীন্দ্র-নাথ যতই এই দৈবলব্ধ বা স্বতআবিষ্কৃত গড়নকে মার্জিত করেছেন ততই তা হয়ে উঠেছে স্থিতিশীল এবং আলোছায়ার কারুকৌশলে নির্ভরশীল। রবীন্দ্র-নাথের কালী-কলমে আঁকা শেষ দিকের ছবিতে দেখতে পাই আলোছায়ারই অবচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি। সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে এগুলি লাবণ্যযুক্ত হয়েছে; ইতিপূর্বে গড়নও লাবণ্য পেয়েছিল রূপসাদৃশ্যের আভাসে।

লেখন

শিল্পচর্চা

নন্দলাল বসু

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু তাঁর দীর্ঘ জীবনে যেমন ভাবের ও রসের নিরলস সাধনা করেছেন, তেমনি শিল্পের পুরাতন বা নূতন রীতি, অপরিচিত প্রকরণ, সে সম্বন্ধেও তাঁর কৌতূহল ও আগ্রহ সদাজাগ্রত। দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে যখনই যা শেখবার মতো পেয়েছেন তিনি যত্ন করে শিখেছেন এবং তা নিয়ে আপনার নিরন্তর সৃষ্টি-কার্যে নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন। শিষ্য-ভাব তাঁর চিরকালীন, আচার্যের আসনেও তাই তাঁর স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। শান্তি-নিকেতনস্থ কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের ভিতরেও সংক্রামিত হয়েছে আচার্যের এই জিজ্ঞাসাবৃত্তি, তথা কলাকারু সম্পর্কে নিত্যনূতন পরীক্ষার সাহস। কোনো একটি মায়াগণ্ডী রচনা করে তারই ভিতর চিরবন্দীদশা-যাপনের প্রবৃত্তি হয় নি। সিংহল চীন তিব্বত নেপাল আর স্বদেশেই জয়পুর পুরী মদুরা প্রভৃতি নানা স্থান থেকে শিল্পী কারুকর ও গুণীরা এসে শান্তিনিকেতনে বিশেষ সমাদর পেয়েছেন; পেয়েছেন শ্রদ্ধাশীল ও মেধাবী শিষ্যমণ্ডলী—সেই মণ্ডলীতে শ্রীনন্দলাল বসুর স্থান সর্বাগ্রে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, যদিও ঘটনাস্থল শান্তিনিকেতন নয়। মুঙ্গের অঞ্চলে আচার্য এক মাথা-পাগলা শিল্পীর কথা শুনেছিলেন—শিল্পী সম্প্রদায়ে মাথা-পাগলের অভাব তো হয় না, ট্রামে-বাসে হাওড়া-ব্রিজ পার হতে গিয়েও সেতুর পূর্বপশ্চিম সীমান্তপ্রাকারে অজ্ঞাতনামা বা -নাম্নী শিল্পীর দ্রুতপ্রসূত অজস্র চিত্রকৃতি কে না দেখেছেন আজ এই ১৩৫৯ সনে এই কোলকাতা শহরে, সন্ধান নিতে পারলে কী না জানি তথ্যের উদ্ধার হতে পারে—যা হোক, পূর্বোক্ত বাউল বা পাগল শিল্পী নিঃসম্বল হলেও ভিক্ষাজীবী ছিল না, ছিল শিল্পজীবী। ছবি এঁকে আনন্দদান ক'রে গ্রামবাসীর কাছে সে অন্নসংস্থান করত। আচার্য তাকে খুঁজে বার করলেন; রঙ তুলি কাগজ এগিয়ে দিলেন। প্রবল মাথা নেড়ে সে বললে, আমি আঁকি দেয়ালে। দেয়ালে যখন কাগজ এঁটে দেওয়া হল সে বললে, ও তুলিতে হবে না, ওসব রঙ বাতিল। সাধারণ ভুষো গুলে কালী তৈরি করে নিল। ন্যাকড়া ভাঁজ করে বানালো নতুন রকমের তুলি। ছবি এঁকে দিয়ে একটি পয়সা বা দু পয়সাই হয়তো হবে—বাঁধা দক্ষিণার কমে বা বেশিতে রাজী করা তাকে অসম্ভব ছিল—দক্ষিণা নিয়ে সে প্রস্থান করল। এই শিল্পী বাউলের ছবিখানি কলাভবনের চিত্রশালায় থাকাই সম্ভব। এই ন্যাকড়া-ভাঁজ-করা তুলির ব্যবহার করেছেন নন্দলাল চীনাভবনের দেয়ালে, বিখ্যাত তাঁর 'নটীর পূজা' চিত্রালিতে।

এইভাবে আচার্য নন্দলাল তাঁর নিরলস শিল্পীজীবনে বহুবিধ শিল্প-কৌশল, শিল্পের করণ ও উপকরণ, ব্যবহার করেছেন—সেগুলির অধিকাংশই আলোচিত হবে বর্তমান নিবন্ধমালায়। প্রায় প্রতি সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় এক-একটি করে মুদ্রিত হবে। এগুলি সবই তাঁর এবং তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর পরীক্ষিত

বস্তু, আচরিত পদ্ধতি। যেভাবে পরিষ্কার করে ও বিশদ করে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তা অন্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে, শিল্প-শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হবে আর এদেশের সমসাময়িক শিল্প-সংস্কৃতি লাভবান ও সমৃদ্ধ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাঁরা নিছক কারিগর অথবা যাঁরা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্ন-অধিকারী, এমন কি মধ্যবিত্ত, তাঁরা প্রায়শঃই দেখা যায় প্রাপ্ত বা অর্জিত শিল্পকৌশল গোপন করে রাখেন, শেখাতে চান না; বা শেখালেও তার পূর্বে বহু-ভাবে তাঁদের সাধ্যসাধনা করতে হয়। অপরপক্ষে অনেক শিল্পীগোষ্ঠী যুগ-পরিবর্তনে সমাদর হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন, কুলক্রমাগত বৃত্তি ত্যাগ করছেন, তাতেও বহু দুর্লভ বিদ্যা, অনেক আশ্চর্য শিল্পকৌশল লুপ্ত হয়েছে বা হতে চলেছে।

এ অবস্থায় শিল্পের পথিকৃৎ আর যুগ-যুগান্তরের পদাঙ্কচিহ্নিত পথের সমর্থ পথিক যিনি, তাঁর এই রচনাবলী শিল্পী ও শিল্পসন্ধানী সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং কাজে লাগবে, এ প্রত্যাশা অসঙ্গত হবে না।—সম্পাদক]

ছবি আঁকার নানারূপ কৌশল (technique) আর করণ (tool) ও উপকরণের (materialএর) বিষয়েও লেখা যাচ্ছে। যদিও আজকাল বাজার থেকে, পয়সা থাকলে, অধিকাংশ জিনিসই কিনতে পাওয়া যায়, তবু শিল্পী নিজের প্রয়োজনের জিনিস নিজে তৈরি ক'রে নিতে পারলে বড়ো আনন্দ পায়। আদিম যুগের শিল্পীদের ছবি আঁকবার উপায়-উপকরণ বাধ্য হয়েই নিজেদের উদ্ভাবন করতে ও তৈরি ক'রে নিতে হ'ত। ফলে তখনকার শিল্পীদের ছবি আঁকার উপায়-উপকরণে আর ছবি করার কৌশলে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য থাকত। শিল্পী যে দেশে বা যে অঞ্চলে বাস করে সেখান থেকেই শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করতে পারলে খুবই ভালো হয়। যে জিনিস পাওয়া যায় না, অথচ প্রয়োজনীয়, সেগুলি বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে বা ক্রয় করে ব্যবহার করায় দোষ নেই।

এইভাবে যতদূর সম্ভব ছবি করার আধার রঙ তুলি ইত্যাদি ব্যাপারে শিল্পী যদি স্বনির্ভর হতে পারে তা হলে ছবি স্বভাবতঃই সাদাসিধা, বাহুল্যবর্জিত, অথচ ভাবব্যঞ্জক হয়। অল্পেই অধিক ব্যঞ্জনা, ভালো ছবির এটিও একটি বিশেষ গুণ।

প্রতিভাবান্ শিল্পী আপনার চিন্তা-গুণে ছবি আঁকার বহু নূতন উপাদান ও কৌশল উদ্ভাবন করে থাকেন; অপরকে শিখিয়েও থাকেন। কিন্তু যে সব শিল্পীর মৌলিক সৃষ্টির শক্তি বা অধিকার নেই, রসের প্রেরণা নেই, প্রায় দেখা যায়, তারা গুরুর কাছে যা শিক্ষা করেছে, বা কদাচিৎ নিজে নিজে যা উদ্ভাবন করেছে, তা সহজে অন্য কোনো জনকে শেখাতে চায় না; কৃপণের মতো গোপন করতেই সচেষ্ট হয়। শিল্পসৃষ্টির যথার্থ অধিকার না হওয়াতেই, সৃষ্টিতেই স্রষ্টার যে আনন্দ তার স্বাদ না পাওয়াতে, এ জাতীয় অনুদারতা ঘটে থাকে। আর এই অনুদারতার ফলেই বহু বিস্ময়কর ও অমূল্য শিল্পকৌশল পৃথিবী থেকে কালে কালে লোপ পেয়ে গেছে; শিল্পীর জন্মভূমিকেও শ্রীসম্পদে দীন ও বঞ্চিত করেছে।

একটি কথা আছে, প্রতিভাবান গুণী নিজের বিদ্যা অন্যকে দিতে সদাই উৎসুক; তা ব'লে অনধিকারী হতে সাবধান না থাকলেও চলে না। অনধিকারী সেই, শিল্প-সৃষ্টির আনন্দই যার শিল্প-শিক্ষার লক্ষ্য নয়; অর্থের জন্যে বা নামের জন্যেই যার শিল্পকৌশল সংগ্রহ, ব্যাবসার পথ খোলাতেই আগ্রহ; যে শিক্ষার্থী স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনা এবং মেধাহীন।

ছবির করণ, উপকরণ, আশ্রয় বা আধার, ছবির ভাবের অনুযায়ী, ভাবের সঙ্গে সঙ্গত হওয়া চাই। ভোজন-ব্যাপারে নানারূপ আসন, বাসন ও তুলে খাওয়ার কাঁটা চামচ কাঠি ইত্যাদি যন্ত্র আছে। দেশ কাল আয়োজন ভেদে সেগুলির ব্যবহার। ছবির জন্যেও তেমনি নানারূপ আধার (কাগজ, কাপড়, কাঠের পাটা, ইঁটের বা পাথরের দেয়াল)—নানাবিধ জমি (বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত মাটি, চুণ-বালি, ডিম-মেশানো বা শিরীশ-মেশানো বা অন্য আঠা-মেশানো সাদা রঙের অস্তর বা আস্তরণ) এবং তার উপর ছবি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে পেন্সিল, কাঠ-কয়লা, রঙ, তুলি, এ-সবের প্রয়োজন হয়েছে। এক এক-রকম কাজে এক এক রকমের করণ, উপকরণ ও আশ্রয় উপযোগী। যে কাজের যা, না হলে ভালো ছবি ফুটিয়ে তোলা অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হয়; যদি বা ছবি হল তবু তার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। করণ, উপকরণ ও আশ্রয়ের পরস্পর সঙ্গতির ফলে শিল্পী নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনা পেয়ে, নূতন ধারায় নূতন-কিছু প্রবর্তনেও সমর্থ হন।

পরবর্তী নিবন্ধগুলিতে, আমরা শান্তি-নিকেতনের কলাভবনে যে যে করণ-কৌশলের পরীক্ষা ক'রে কৃতকার্য হ'য়েছি, যার শিক্ষা দিয়ে থাকি, পূর্ব শিল্পীদের কাছে যা পাওয়া গেছে, আর নূতনও যা উদ্ভাবিত হয়েছে—একে একে বিবৃত করা হয়েছে। যাতে শিল্প-শিক্ষার্থীদের ছবি করার সুবিধা হয়, যা জানা আছে তা নিয়েও হাৎড়াতে না হয়, এজন্যই এই উদ্যম। যে উপায়-উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা করা হয় নি তা লেখা হল না। কথাতেই আছে, জীবন স্বল্প, বিদ্যা বা শিল্প অনন্ত, অপার।

এ রচনা সাহিত্য নয়। আর একটা কথা বলে রাখি, বিশেষ ক'রে এ সব বিষয়ে, পড়া-শোনার চেয়ে দেখা ভালো, দেখার চেয়ে করা ভালো। লেখায় ত্রুটি থাকতে পারে; আর না থাকুক তবুও কোথাও কোথাও বোঝবার অসুবিধা হতে পারে—সে সব অভিজ্ঞ শিল্পীর কাজ করা দেখলে বা নিজে করলে নিরাকৃত হবে।

(ক্রমশ)

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে বেলভেডিয়ার ভবনে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার অন্যতম আকর্ষণ হলো রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটি ছবি। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে জনসাধারণের রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখবার আর একবার সুযোগ হলো।

প্রদর্শিত প্রায় ষাটটি ছবির মধ্যে অনেকগুলি ছবি এই প্রথম দেখবার সৌভাগ্য হলো। ইতিপূর্বে অন্য কোন প্রদর্শনী অথবা প্রতিলিপিতে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্প অনুরাগীদের কাছে এ-প্রদর্শনীটি একটি বিশেষ মূল্যে বহন করছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের মনে একদিকে যেমন অন্ধ ভাবালুতা রয়েছে, আর একদিকে আছে তেমনি একটা যুক্তিহীন অনমনীয় বিরূপতা। কোন একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে এখনো আমরা পৌঁছতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে স্বদেশ ও বিদেশের অনেক মনীষী এ পর্যন্ত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, আলোচনা ও বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই সুদূর হয়ে রয়েছে।

অবশ্য এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ আমাদের মন শিল্পকলার যে বাঁধা সড়কে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা তার থেকে এতো অভূতপূর্ব ও মৌলিক যে, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করা শুধু সাধারণ দর্শকের পক্ষে নয়, অভিজ্ঞ শিল্পরসিকের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য তাঁর অনেক রচনার মারফৎ তাঁর শিল্পসৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে নন্দনতত্ত্বের একটি নতুন অভ্যুদয় হিসেবে গ্রহণ করতে সে সব রচনা বিশেষ সাহায্য করেনি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার মূলে যে একটি সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশ আছে, তার পরিচয় অনেকের অজানিত নয়। কিন্তু যখন তা পরিপূর্ণ চিত্রকলা হয়ে অনাস্বাদিত রূপজগতের দরজা উন্মুক্ত করে দিল, তখন আমাদের অনভ্যস্ত মন

ল্যান্ডস্কেপ

বিচিত্র মিলন

তাতে বিরত বোধ করতে লাগলো। কবির বহুবিচিত্র শিল্পী-জীবনের লীলা-বিলাস বলে একদল আত্মসন্তুষ্টি লাভ করলেও আর একদলের বিরোধিতা বুদ্ধিগত প্রতারণার মধ্যে দিয়ে দেখা দিল। একাডেমিক বাঁধা বুলিতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ড্রইংয়ে ও রূপ-রচনার শিথিলতা, বর্ণ-ব্যবহারের চিরাচরিত ধারার বিচ্যুতি। যখন কোন নির্দিষ্ট ছবিতে ড্রইংয়ের, বর্ণ-ব্যবহারের ও রূপ-রচনার অসামান্য সৌকর্য তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়, তখনই তা আকস্মিক বলে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের চিত্র-রচনায় এই একাডেমিক পন্থা একান্ত বাহ্য। অন্ততঃ-পক্ষে এই দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলার বিচার করতে গেলে হতাশ হতে হবে। বিশ্বের শিল্পকলার এমন শিল্পীর রচনা তো দুর্লভ নয়, যাঁদের একাডেমিক শিক্ষা আশ্চর্য রকমে সুসম্পূর্ণ, কিন্তু শিল্পদৃষ্টির মৌলিকতায় তাঁদের রচনা সেই অনুপাতে বিবর্ণ ও বিস্বাদ। যে কোন মহৎ শিল্প-রচনায় শিল্পীর দৃষ্টি ও মনই সর্বপ্রথমে লক্ষণীয়। শিল্প-রচনার গুণগুলি তার অলংকার মাত্র।

তবুও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় ড্রইংয়ের অপূর্ব দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। তার পরিচয় এই প্রদর্শনী থেকেই পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে এমন কতগুলি মৌলিক গুণের সমাবেশ করলেন, যার জন্যে আমাদের মন ও দৃষ্টি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ করে আমাদের দেশে যখন নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলার উচ্ছল রোমাণ্টিসিজমের মধ্যে আমাদের মন আন্দোলিত, ছবির রূপারোপের চেয়ে ভাব ও ভাবনা যখন প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময়ে একান্ত আন-রোমাণ্টিক ছবির সূত্রপাত করে নিছক রূপ ও ফর্মের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। যে কবির রচনায় রোমাণ্টিসিজমের মহত্তম ও চূড়ান্ত পরিচয় লক্ষ্য করা গিয়েছে, ছবির মধ্যে এসে কোথা থেকে তিনি এ একান্ত বিপরীত দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিলেন? সুতরাং আমাদের দেশের সম-সাময়িক চিত্রকলায় তাঁর রচনা মূর্তিমান বিরোধিতা হয়েই দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে কোন নির্দিষ্ট কোন নাম ব্যবহার করতে চান নি। কারণ ছবিকে তিনি ছবি অথবা রূপ হিসেবেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন; ছবির বিষয়ের ভাবনা ছবির পরিচয় নয়।

মুখাবয়ব

কাঠিন্য শিল্পকে একটা অনুভবের অতীত করে তোলে, রবীন্দ্রনাথের শিল্প সেদিক থেকে অনেক স্পর্শগ্রাহ্য। অন্ততঃ-পক্ষে বাস্তব বোধের অনেকটা কাছাকাছি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র-শিল্পে আর একটি শিল্পগুণ এসেছে ছবির texture থেকে। আঙ্গিকের বিশেষত্বের দিক থেকে বলা যেতে পারে, তাঁর সব ছবিতেই texture এর বিশেষত্বই এক অপূর্ব সম্পদ এনে দিয়েছে। যেখানে রঙ ব্যবহার করেছেন, যেখানে শুধু মাত্র কলম দিয়ে চিত্র-রচনা করেছেন, সর্বত্রই একটা অত্যন্ত সহিষ্ণু, নিপুণ ও সযত্ন texture সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছবিতে অধিকাংশস্থলে কালো রঙের প্রয়োগই বেশি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে যখন ছবিতে বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ শুরু করলেন, তখনো এক আশ্চর্য স্বাধীন ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাতে তিনি দিলেন। কোথাও শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত শিল্পীর মতো তাঁর রঙ ব্যবহারের

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শিল্পমানসে রূপ ও ফর্মের যে নীহারিকা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, চিত্রশিল্পের মধ্যে তারই কিছুটা ছায়াভাস ব্যক্ত হয়েছে। কোথাও তা নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে সীমিত হতে চায়নি। তাই তা সর্বদাই একটা প্রাগ্-ঐতিহাসিক, আদিম ও প্রাথমিক রূপের আদলে রূপ-পরিগ্রহ করেছে। কিছুটা পরিচিত, কিন্তু অধিকাংশ অপরিচিত একটা রহস্যময় ফর্ম যেন শিল্পীর মনের সামগ্রিক ফর্ম-নীহারিকার খণ্ডাংশ মাত্র। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের যে কোন পশু, পক্ষী ও প্রাণীর শিল্পরূপ থেকে। আদিম প্রাণ-জগতের মধ্যে অপূর্ণ সৃষ্টির যে বিস্ময় ও রহস্য, শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই রহস্যকে ব্যক্ত করেছেন রেখা ও রঙের আধারে।

শিল্পের মধ্যে এই ফর্ম-চেতনাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই স্বভাবতই রঙ ও রেখার সাহায্য নিতে হয়েছে। যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য কোন দৃষ্টিসুখকর রূপ-পরিচয় দেওয়া নয়, তাই ফর্মের সমতালে রঙ ও রেখার একটা স্বাধীন প্রয়োগও তাঁকে করতে হয়েছে। সে রেখাও এত স্বতঃস্ফূর্ত ও বাহুল্যহীন যে, সময়ে সময়ে বস্তুর গঠন একটা রেখা-ছন্দের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। রেখা ও ফর্মের এই ঐক্যতানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পে একটা অমূর্ত (Abstract) গুণের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু অমূর্ত-শিল্পে যে একটা স্পর্শাতীত দুর্মর

হরিণ শিশু

মধ্যে কোন ভীরু সংস্কার নেই। বিভিন্ন রঙের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে তিনি ছবিতে রঙের বিশিষ্টতা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

ছবিতে এই রঙ কীভাবে দেখা দিয়েছে? রবীন্দ্রনাথের কাছে এই রঙ দেখা দিয়েছে আলোর বিভিন্ন স্তর ও ব্যাপ্তির প্রতীক হয়ে। তাঁর কাছে রঙ কোনক্রমেই বস্তুর বর্ণের পরিচয় নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে রঙ ব্যবহৃত হয়েছে প্রথমত আলোর প্রকাশক হয়ে, দ্বিতীয়ত, দর্শকের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করে ছবিতে চিত্রগুণ সঞ্চার করাতে। রঙের সাহায্যে আলোর বিস্তারের পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের বহু নিসর্গ চিত্রে। অন্ধকার সম্মুখ পটের অন্তরাল থেকে ক্ষীণ অথবা উচ্ছ্বসিত আলোকাভাস এক অতিমর্ত দ্যুতির সঞ্চার করেছে; চিত্রপট উদ্ভাসিত হয়েছে এক রহস্যময় আলোক-সম্পাতে। আলোর এই বিশিষ্ট প্রয়োগ এক রেমব্রাণ্ট ব্যতীত আর কারো হাতে লক্ষ্য করা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার যে দু-একটি বিশিষ্টতা উল্লেখ করলাম, তার পরিচয় এই প্রদর্শনী থেকেই পাওয়া যাবে। নিসর্গ চিত্রগুলির মধ্যে ৪নং, ৬নং ও ১০নং ছবিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিরূপগুলির মধ্যে ৪৩নং ছবিটি আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। কলম দিয়ে আঁকা ৩৪নং ছবিটি রবীন্দ্রনাথের ড্রইং-এর দক্ষতার একটি আশ্চর্য নিদর্শন। পাখীর ছবিগুলি শিল্পীর গঠনগত ছন্দ-সৃষ্টির অপূর্ব নমুনা হিসেবে সাক্ষ্য দেবে। রঙের ব্যবহারের আশ্চর্য পরিচয় আছে ৫৭, ২৭, ২৬নং ছবিগুলিতে।

বস্তুত প্রচলিত শিল্প কুসংস্কার থেকে নিঃশেষে মুক্ত করে নিয়ে না দেখলে রবীন্দ্রনাথের ছবির রসাস্বাদন করা সুকঠিন। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে অভিনব ও মৌলিক শিল্পসম্ভার আমাদের দান করে গিয়েছেন, তা এখনো চলতি ও পপুলার শিল্পকলার প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজকের বিমুখতাই চিরন্তন নয়, ভবিষ্যৎ মুক্ত-দৃষ্টি শিল্পরসিকের কাছে তার যথার্থ মূল্য একদিন অবশ্যই নির্ধারিত হবে।

৫

কাজেই গতজন্মের একটু খবর নিয়ে রাখা মন্দ নয়।

সে জন্মের রাজন্যসভাগুলির ভিতরের কাহিনী আমাদের জন্য সৃষ্টি হয় নি। ভারতের জনসাধারণ বা রাজ্যের প্রজাসাধারণের কোন অংশ তাতে ছিল না। এমন কি গড়ের মাঠের ফুটবল খেলায় গাছের ডালে চড়া দর্শকের অংশও নয়।

এ দৃশ্যের যবনিকা তোলা হত শুধু পাশ্চাত্য রাজপুরুষ বা রাজগোষ্ঠীর দর্শকের জন্য। দেশীয় যারা থাকত তারা শুধু স্বগোত্রীয় রাজামহারাজা বা সভাসদ্ বা বিশেষভাবে অনুগৃহীত জনকয়েক।

এই জনকয়েকের আবার চোখ থাকত অতিথিদেব উপর, হাত স্টেজের ড্রপসিন টানার দড়ির উপর ও কান হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের গ্রামোফোনের চোঙার উপর।

কানের উপর কর্ণধারের অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের অধিকার ছিল একেশ্বর এবং অনমনীয়। হাসিতে কাসিতে উঠিতে বসিতে শয়নে জাগরণে শুধু যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। হৃদিস্থিত 'দরবার' যিনি সেই মহারাজ ডেকে আনতে বললে যদি বেঁধে না আনে তাহলে পাল্লা দিয়ে যারা পারিষদি করে যাচ্ছে তারা আভাসে বুঝে নিবে ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিবে যে প্রভুভক্তির স্রোতে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। কাণাঘুষার সাগরবেলায় এ ভাটা কিন্তু একেবারে মারাত্মক। কোথায় যে আছে চোরাবালি, আর কোন্ দমকা স্রোতে যে অথই জলে টেনে নিয়ে যাবে তার কোন হদিশ নেই। অতএব অনুগৃহীতের তৎপরতায় না আছে বিশ্রাম না বিরতি।

কাজেই রাজঅতিথিদের সেবা ও মনোরঞ্জনে কোন ত্রুটি বা অবহেলা কখনো হত না। ইচ্ছা পালনে এত অনুরাগ ও তৎপরতা অন্য যে কোন মহত্তর কার্যের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু সর্বদেবময় হচ্ছেন অতিথি, বিশেষ করে তিনি যদি সাগরপারের হন।

হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার মত রাজন্যদেরও দেবতার সংখ্যার লেখাজোখা ছিল না। প্রতি শীতের মর্শুমে ইয়োরোপ ও আমেরিকার মন যখন ওভারকোটের ভার, কুয়াশার কালী ও তুষারের হিমধারা এড়িয়ে সাউথ সী আইল্যাণ্ডে দক্ষিণ সাগরের তালনারিকেল কুঞ্জে ছাওয়া প্রসন্ন সূর্যের দেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধাই পকেটবুক থেকে বের হয় বিভিন্ন সম্ভাবনার তালিকা। সে তালিকায় অবশ্য সর্বদাই প্রথম স্থানের গৌরব পেয়ে থাকে ইণ্ডিয়া কারণ এত হরেকরকমের চমৎকার দৃশ্য আর মজা অন্য কোথায় পাওয়া যাবে? সেখানে আছে সাপুড়ে ও সাধু, বাঘ ও বেনারেস, "হিমলায়া" ও তাজ, শিকার পার্টি ও তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছেন মহারাজা অব........। সেই যে সে বছর রিভিয়েরা তীরে বা লণ্ডন বা হলিউডের হোটেলে বা ইণ্ডিয়া ক্লাবের পার্টিতে হিজ হাইনেস, দি মহারাজা, বা যুবরাজ বা তাঁদের বৃটিশ কর্ণধার তাঁকে খোলা নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন,—যে বছর খুশী, যখন খুশী নিশ্চয়ই এসো। আমার রাজ্যের সবরকম আতিথ্য তোমার জন্য উন্মুক্ত ও নিযুক্ত। অন্যান্য রাজ্যেও তোমার রাজঅতিথি হবার বন্দোবস্ত ঠিক থাকবে।

অতএব প্রতি শীতকালে মানস-সরোবরের শুভ্র বলাকার চঞ্চল দলের মত চলে আসেন শ্বেতাঙ্গ বিদেশবিহারী নরনারীর দল। ডুয়িং ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষ করছি বা সারছি এ কথাটাই পাশ্চাত্য সমাজে একটা বুক ফুলিয়ে কইতে পারার মত কথা। তার উপর হিজ হাইনেস অব অমুকের অতিথি ছিলাম। সমাজের স্তরে আমার আসন কতখানি উঠে গেল, লোকে আমায় কত বেশী 'ইনটারেস্টিং' বলে মনে করতে লাগল এর পর—তার হিসাব, তোমরা, আমাদের রোমাঞ্চকর শিকার পার্টির মূক জঙ্গল পিটিয়ের দল, তোমরা কি করে বুঝবে?

এই প্রশ্ন করে ইণ্ডিয়ান স্টেটস্ পিপলস্ কংগ্রেসের একজন পাণ্ডা ব্যক্তি আমার দিকে কৌতুকে ও আঘাতে পূর্ণ একটা চাহনী হেনে চুপ করলেন। মির্জা ইসমাইল এভেনিউয়ের নূতন ঝকঝকে রাস্তায়—না, না, রাজপথে—ক্যামেরার দোকানে ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম কিনতে গিয়েছিলাম। আলাপী ব্যক্তি, চট করে আমার সংগে তিনি আলাপ জমিয়ে নিয়ে এই বিষয়ের কথা পেড়ে বসলেন।

বললেন,—মশাই, সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধুর দেশের লোক আপনি। রাজস্থান দেখতে এসেছেন; শুধু রাজাদের কীর্তি না দেখে প্রজাদের কথাটাও একটু শুনে যান।

খদ্দরের টুপিটা একটু মজাদার ভঙ্গিতে নাচিয়ে তিনি বললেন,—চিরঞ্জীব হোন মহারাজা শ্রেণী। তাদের মত উৎকৃষ্ট মহাশয় ব্যক্তি দুনিয়ায় দেখা যায় না। তাদের এই রাজ্যগুলি যে কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে জিইয়ে রাখা হয়েছিল এতেই বৃটিশ রাজের বুদ্ধিধর

সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যায়। সিপাহী যুদ্ধের পর বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখেছিলেন যে, এই এক ঢেউয়ের চোটেই ইংরেজ রাজত্ব সাবাড় হয়ে যেত যদি আমাদের মহারাজারা সমুদ্রের বাঁধের মত সে ঢেউ না সামলাত। বিশ্বাস না হয় এলফিনস্টোনের লেখা পড়ে দেখবেন। তিনি লিখেছেন যে, নিজাম, সিন্ধিয়া, শিখ এরা সব না থাকলে ১৮৫৭তে আমরা কোথায় থাকতাম?

একটু ইতস্তত করে বললাম—সে সব হচ্ছে বড় বড় পলিটিক্সের কথা। আমি দেশ বেড়াতে এসেছি। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমার দরকার কি?

গরম জবাব দিলেন তিনি। দরকার আলবৎ আছে। সাধারণ লোকের মনের ভাবটাও আমায় জানতে হবে। আদার ব্যাপারী যে আদার সঙ্গে কাসুন্দির খবরও নেয় কিছু কিছু। এই দেশীয় রাজ্যগুলির মত একটা চমৎকার প্রতিষ্ঠান না থাকলে পৃথিবী থেকে একটা রোম্যান্সই লোপ পেয়ে যেত।

রাজআতিথ্য অর্থাৎ 'স্টেট গেস্ট' হিসাবে বড় বড় অতিথিকে আপ্যায়ন করার মর্ম তিনি বোঝেন খুব ভাল করেই। এটা হচ্ছে নিতান্তই একটা প্রপাগান্ডা, নিছক একটা প্রচার, রাজাদের অস্তিত্ব রক্ষার সপক্ষে একটা নীরব ওকালতী, বৃটিশ কর্তাদের খোশমেজাজে রাখবার একটা কৌশল। অবশ্য কর্তারাও নিজেদের বিলেতী রাজ কায়েম রাখবার এত সুবিধাজনক যন্ত্রটি চালু রাখতে কসুর করেন নি। তাদের নিজেদেরই দরকার ছিল।

কিন্তু আমার চোখে রয়েছে রাজপুত আতিথেয়তার স্বপ্ন। ছেলেবেলা থেকে তার উদারতা ও মহিমার কথা শুনে এসেছি।

হাতের একটা দোলানীতে ভদ্রলোক এই মনোভাবকে বিদায় করে দিবার চেষ্টা করলেন। বললেন,—এই বিশাল হৃদয় ঐতিহাসিক আতিথেয়তার কোন ছাপ আমি এর মধ্যে খুঁজে পাই না। আর যদি বা তা থেকে থাকে এই জনজাগরণের যুগে সাধারণের সামান্যতাই আতিথ্যের আভিজাত্যের চেয়ে অনেক ভাল। এটা হচ্ছে ইনকালাবের যুগ।

এখানেই তিনি থামলেন না। বললেন—ওই যে সব ব্রিটিশ নাইট আর মার্কিন মিলিয়নেয়ারের দল যারা এসব রাজ্য ঘুরে আতিথ্য চেখে গিয়েছে তারা সবাই চেঁচাচ্ছে যে, ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় রাজাদের টেনে আনাটা একটা অন্যায় অত্যাচার। এই যে আজ রাতে ইংরেজ সেনাপতি অকিনলেককে বিদায়-ভোজ দেওয়া হচ্ছে উনি যদি সবাইকে বলে বেড়ান যে, মধ্যযুগের ওই রাজমহিমা গুলি অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত তাহলে কি আশ্চর্য হবেন কিছু? খবরের কাগজ দেখলেই জানতে পারবেন, এদের জন্য কত লর্ড আর লেডির দল এরই মধ্যে সাগরপারে অশ্রুপাত করতে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ এ কথাও বলছে যে, কংগ্রেস নিরীহ রাজাদের বাগে পেয়ে "য়্যাক্সেশন" (ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সর্ত) সই করিয়ে নিয়েছে। এর পরে আরো কত কি যে করবে ক্রমে ক্রমে তার ঠিক নেই।

একটু বাধা দিতে বাধ্য হলাম। ভদ্রলোককে মনে করিয়ে দিতে হল যে, অনেক রাজা নিজে থেকে ভারত সরকারে অন্তর্ভুক্তি করতে রাজী হয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের মনে দেশের জন্য টান প্রজাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। আর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও এই 'য়্যাকসেশন' পর্বে খুব সহায়তা করেছেন।

এর উত্তরে ইতিহাসের পাতা খুলে ধরলেন ভদ্রলোক। বললেন, দেশপ্রীতি না হয়ে যায় কোথায়? ইংরেজরা কি কম 'দাবাও' (প্রভাব) খাটিয়েছে ওদের উপর? ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক একটার পর একটা রাজ্য দখল করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া তৈরী করেছিল। যাদের নেহাৎই নাবালক বা নিরীহ বলে মনে হল শুধু তাদেরই নেটিভ স্টেট বানিয়ে রেখে দেওয়া হল। পাঞ্জাব আর সিন্ধুদেশ ওরা দখল করেছিল যুদ্ধ জয় করে বড় রাজা ছোট রাজত্ব দখল করে বসে এই নিয়ম অনুসারে। সাতারা, নাগপুর, ঝান্সি দখল করলে 'ডক্ট্রিন অব ল্যাপ্স' দিয়ে রাজার ছেলে নেই এই অজুহাতে। দক্ষিণে কুর্গ আর উত্তরে অযোধ্যা দখল করল খারাপভাবে শাসন চালান হচ্ছে এই অছিলায়, স্রেফ মোগলাই খুশীর বশে। বেচারা অযোধ্যার নবাবরা এত বেশী আকাট প্রভুভক্ত ছিল যে, ওদের ঠকাবার কোন অজুহাতই লর্ড ডালহৌসী পায় নি। শেষ পর্যন্ত এই লিখে সাফাই গেয়েছিল যে, লাখ লাখ লোকের দুর্দশার কারণ যে শাসনযন্ত্র তার সাক্ষী থাকলে ব্রিটিশ সরকার মানুষ আর ভগবানের চোখে নাকি দোষী হবে। হাঃ হাঃ। এর চেয়ে বাজে ভণ্ডামীর কথা আর শুনেছেন কোথাও?

সবিনয়ে একমত হলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার পাকড়িয়েছেন ভাল করে। ছাড়লেন না।

বলে চললেন,—ভেবে দেখুন, সেই ১৮৫৩ সালে লণ্ডনের টাইমস্ কাগজে এডিটোরিয়ালে লিখল যে, এই নির্বীর্য নিরর্থক রাজপাটগুলিকে ইংরেজরা ওরিয়েণ্টাল ডেসপটিজমের (প্রাচ্য স্বৈরাচারতন্ত্রের) যে নির্ঘাত ভাগ্য তা থেকে মুক্তি দিয়েছে। অর্থাৎ প্রজাবিদ্রোহে ওরা কোনদিন শেষ হয়ে যেত; কিন্তু বৃটিশরা ওদের রক্ষা করল। ওদের অক্ষমতা, দোষ, পাপ এসব সত্ত্বেও ওদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে, যদিও দায়িত্ব দেয় নি। ওদের এমনভাবে জিইয়ে রাখার ফলে রাজকোষের টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে, মশায়?

বলেই ভদ্রলোক এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমিই এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য দায়ী।

আবার আরম্ভ করলেন তিনি। যেন কাইজারের সৈন্যদলের 'বিগ বার্থা'-কামান চল্লিশ মাইল দূরে থেকে প্যারিসের উপর অনবরত গোলা দেগে যাচ্ছে।

বললেন,—টাইমস্, মশায়, ভদ্রলোকের কাগজ। হ্যাঁ, একটু ইম্পিরিয়ালিস্টিক বটে আর বুর্জোয়াও বটে। তবু ওরই মধ্যে সাধারণ লোকের কথাও কখনো কখনো ভাবে। টাইমসে ওরা লিখেছিল যে, জন বুল স্বীকারই করে নিয়েছে যে, গভর্নমেণ্ট প্রজাদের জন্য নয়, প্রজারাই রাজার জন্য আর ব্রিটিশ সরকার রাজাদের কাজকর্মহীন বেকার রাজাগিরি বজায় রাখলেই, এই দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের

প্রতি সম্রাটের কর্তব্য পালন করা হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের সুর একটু নরম করান দরকার হয়ে পড়েছে। না হলে লোকে কি ভাববে। বললাম,—এখন ত ভারত সরকার সেই সার্বভৌম ক্ষমতার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। সবই এবার ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আর এত ভাবছেন কেন?

সত্যই ত। ভদ্রলোকের হঠাৎ মনে পড়ল এতক্ষণে যে, তিনি আর ১৯৪৭ সনের আগের রাজস্থানে নেই। যে পালে হাওয়া লাগিয়ে তিনি সভা-সমিতি ও রাজনীতি করে এসেছেন এতদিন—সে পালও নেই, সে হাওয়াও নেই। দেশের বিরাট্ পরিবর্তনে তার পাল থেকে সব হাওয়া সরে পড়েছে, তার মেঘমালার ভিতর থেকে বজ্রের আওয়াজ চুরি হয়ে গেছে।

ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু অতি চমৎকার ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব মন থেকে যায় নি।

এদিকে যে রাজকীয় আতিথ্যের কথায় তাঁর এই একমাত্র শ্রোতার জন্য বক্তৃতা শুরু হয়েছিল তার খেই আবার তুলে নিলেন। গলায় একটু বিশ্বস্তভাবের সুর এনে বললেন,—আতিথ্য পর্বকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দেওয়া হত রাজ-কার্যের মধ্যে। প্রমাণ চান? খবর নিয়ে দেখবেন সব রাজ্যেই একজন মিনিস্টার অব এণ্টারটেনমেণ্টস (বিনোদন বিভাগের মন্ত্রী) আছেন এবং তিনিই সেখানকার সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান আর প্রভাবশালী মন্ত্রী। সম্ভবত সবচেয়ে সম্পত্তিশালীও।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত যেন ধারালো ছুরির মত চকচক করে উঠল।

কিন্তু অতিথিরা বলবেন যে রাজাদের উদার ও বন্ধুত্ব করতে উৎসুক মনের পরিচয় হচ্ছে এই আতিথ্য আর বিনোদনের মধ্যেই আতিথেয়তার সার্থকতা। না হলে শুধু যদি বাইরে বাইরে হোটেলে বিরাজ করে প্রাসাদের বাইরেটা ও মন্দিরের ছত্রীটা দেখে, বাজারের খেলনা ও ফুল-দানী, গুটিকয়েক পাথরের মূর্তি বা কার্পেট কিনে চলে যেতে হয় তাহলে যে ভ্রমণ হবে সেটা ত ঘরে বসে গাইড বুক বা ভ্রমণকাহিনী পড়েই শেষ করা যায়। তাকে ত "ডুইং ইণ্ডিয়া" বলা চলে না। তার জন্য চাই শিকার পার্টি, দরবারী নাচের আসর, হাতী আর উটের পিঠে চড়ে অভিসারের মতন মনমাতানো সফর, জরি জহরতে মোড়া মহারাজার সঙ্গে এক সঙ্গে ফটো তোলা, পথে যেতে যেতে কোন সাপুড়ে বা সাধু বা বরযাত্রীর দল দেখলে নেমে পড়ে তাদের সঙ্গে দুয়েকটা মিঠে ভদ্রতা। এবং তারপর আবার ফটো তোলা।

তা না করে কি সম্মানিত সাগর-পারের অতিথিরা শুধু হোটেলের বারান্দায় সারি দিয়ে বসে থাকা ব্যবসায়ী-দের বেসাতী দেখে দিন কাটাবেন? শুধু তাদের নমুনা হিসাবে কাণের কাছে আলগোছে লাগিয়ে দেওয়া 'সাজাহান চামেলী' আতরের গন্ধ শুঁকে "বোর্‌ড্" হয়ে পুরাণো তরোয়াল, টোল খাওয়া ঢাল আর ভাঙ্গা মূর্তির দর দাম করবেন? দেখুন না ভেবে কি রকম হৃদয়বিদারক ব্যাপার হবে সেটা। আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা একজন ফরাসী ভ্রমণকারী (বারণ করেছিলেন নাম প্রকাশ করতে) বহু শীতের মরশুমই এ দেশের আতিথেয়তা চেখে দেখে গিয়েছেন। তিনি প্রথম যখন দেখলেন যে, ঝুটা জহরৎ ও দ্যুতিহীন পাথরের রাশি লম্বা লম্বা টিনের তোরঙ্গের পাশে সাজিয়ে শাদা রাজপুত দাড়ি ছড়িয়ে বৃদ্ধ ব্যবসায়ীরা বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে তখন তাদের দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে, একদল শোকার্ত বাপ তাদের বিগতপ্রাণ বাচ্চাদের দেহ সাজিয়ে মুহ্যমান হয়ে আছে। না কয় তারা কথা, না চেষ্টা করে সেগুলি জোর করে গছাতে। সসম্মানে মৌন গাম্ভীর্যে তারা অপেক্ষা করছে কখন প্রভুরা তাদের বেসাতীর প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

ছিঃ, এই কি সময় কাটানর উপায় নাকি? তার চেয়ে 'বাথসল্টে' স্নিগ্ধ স্নানের পর মিড-নাইট ব্লু (মধ্যরাত্রির মত নীলবর্ণের) ডিনার জ্যাকেটের সুধা-ধবল শার্টের দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সন্ধ্যায় মহারাজার ক্লাবে সভাসদ ও মন্ত্রী পরিষদ সবার সঙ্গে দেখা হবে। আলাপ হবে ককটেল সেবনের ঘন অন্তরঙ্গতার মধ্যে। শুধু তাই নয়। আগামী দিনের শিকার পার্টির জন্য আমন্ত্রণ তার মধ্যেই উঁকি-ঝুঁকি মারছে। সেই ভাল। অমর সিংহ, চন্দ্র সিংহ, রঞ্জিত সিংহ আরো কত কি।

মন্দিরের ছত্রী

পাথরের মূর্তি (জগৎ শিরোমণি মন্দির—অম্বর)

সবাই নরসিংহ সেখানে। এবং সাগর-পারের অতিথি হচ্ছেন সিংহরাজ।

এই শিকার পার্টিগুলির প্রতি অবজ্ঞা দেখালে কিন্তু ভুল হবে। এগুলি শুধু রাজপুরুষদের অবসরবিনোদনের বা যুদ্ধের অভাবে অন্য পথে উদ্যম নিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখলে ঠিক হবে না। রাজস্থানের বালুরাশির মধ্যেও জঙ্গল ও মানুষের বা শস্যের শত্রু জন্তুর অভাব নেই। জঙ্গল প্রান্তে যারা থাকে তারা প্রতি বৎসর এই শিকারগুলির প্রত্যাশায় থাকে। তখনই তারা নূতন কোন বাঘ বা হায়েনা বা অন্য কোন পশুর অত্যাচার থেকে বিনা পরিশ্রমে মুক্তি পাবে। শিকারী বীররা সভ্যতা থেকে দূরে জঙ্গলের প্রান্তে এই লোকগুলির প্রতি দরদ দেখিয়ে সেখানে অনেক খরচ করে, তাদের মধ্যে কিছুদিনের জন্য একটি উল্লাস ও বৈচিত্র্য ছড়িয়ে দিয়ে যায়। তাদের আনন্দ উদ্দীপনাহীন জীবনের মধ্যে তার দাম শুধু টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে কষা যাবে না। যদিও জঙ্গল পিটিয়ের দল, এমনকি প্রান্তবাসী গ্রাম্য নারী ও বালিকারাও সকল শিকারের সময় বেশ ভালই বকশিশ পায়।

তার ফল দেখতে পাই আমরা খান্দেশের জেমস উটরামের স্মৃতিতে। একশ বছরের অনেক বেশী হয়ে গেছে; মাত্র দশ বছর তিনি সেখানে শাসন ভার পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তখনকার দিনের সাধারণ এক গাজিদাগা বন্দুকের সাহায্যেই দুশো ছটি বাঘ ও চিতা, পঁচিশটি ভালুক ও বারটি বন মহিষের হাত থেকে অসহায় আদিবাসীদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, বছর বছর তিনি শিকারে যেতেন, এই মহারাজাদের মতই পারিষদ ও অতিথি পরিবৃত হয়ে। কিন্তু আদিবাসীরা দেবতার মত তাকে আজো ভক্তি করে; তারই ফলে তারা সভ্য শাসন যন্ত্রের কাছে খুশী মনে মাথা নুইয়ে প্যাক্স ব্রিটানিকার পতাকা বয়ে এসেছিল।

মাড়োয়ারে আদিবাসী মের জাতিও এমনভাবেই পশুশত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। যখন সোয়াই মাধোপুর বা চিতোরের বনাঞ্চলে মহারাজার শিকারের তাঁবু পড়ে শুধু যে প্রান্তিক প্রজার সঙ্গে নূতন করে সংযোগ হয় তা নয়, রাজ্যের প্রধান কর্তব্য নিরাপত্তা সাধনটাও সম্পন্ন হয়। আজ ডেমোক্রাসীর যুগে মনার্কির ভাল দিকটা ভুলে গেলে ঠিক হবে না।

এই শিকারগুলির সার্থকতার একটা উদাহরণ দিই। এ কাহিনী লিখবার সময় অর্থাৎ রাজস্থানের ভারতীকরণের পরের একটা ঘটনা। একটা এলাকায় বাঘের অত্যাচার বড় ভীষণ হয়ে দেখা দিল। গরু মহিষ মানুষ কারো রক্ষা নেই। গ্রামের আশেপাশে যেসব শিকারী ছিল, তারাও হার মেনে গেল। এ যুগের প্রজাসাধারণের মুখপাত্র হচ্ছেন বিধানসভার সভ্যরা, রাজা নন। তাদের চেষ্টায় রাজস্থান সরকার এ সম্বন্ধে কিছু করতে রাজী হলেন। কিন্তু তাদের বকশিশের ঘোষণায় ও শিকারীদের কাছে আবেদনে বাঘ মহারাজ মরল না।

তখন রাজস্থান সরকার সেখানকার সামন্ত রাজাকে ওই বাঘটি মেরে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু এখন তার আর প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার বা সম্মান ও কাজ পাবার প্রত্যাশা নেই। রাজারা পাচ্ছেন শুধু বাঁধা মাসোহারা আর সব জায়গীরদার-দেরই অবস্থা খারাপ আর ভবিষ্যৎ টলমলে। কাজেই বাঘ বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সামন্ত রাজা তার বন্দুক রাইফেলগুলি বিক্রী করে দেবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। আর সরকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্দুকের বার্ষিক লাইসেন্সের টাকা সবটা আদায় করা হয়েছে কিনা, তা রেজিস্টারী দেখে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত রইলেন।

আগেকার দিনের সেক্রেটারী অব স্টেট মণ্টাগু যখন এদেশে নতুন শাসন সংস্কার দেবার জন্য ১৯১৭-১৮ সালে এসেছিলেন, তখন যে রোজনামচা লিখেছিলেন, তাতে দেখা যায়, বহু উইক-এণ্ড এ অর্থাৎ শনি রবিবারের ছুটিতে তিনি দিল্লী থেকে কোন রাজপুত রাজার এলাকায় বিশ্রামের জন্য চলে আসতেন। বিশ্রাম ছিল শিকারের জন্য পরিশ্রমে, কারণ বীর যোদ্ধার বিশ্রামের ব্যাপারই আলাদা। শাক চচ্চড়ি চটকানর পর এক ঘুমে দিয়ে উঠে ঢেকুর তুলতে তুলতে তাস পাশার মধ্যে যে বিশ্রাম, তা দিয়ে বীর-পুরুষ বা সাম্রাজ্য তৈরী করা যায় না।

মণ্টাগুকে মাথা আর কলম চালাতে হত উদয়াস্ত, ঠিক আরো অনেক সরকারী বড় কর্মচারীরই মত, এমনকি তাদের চেয়ে বেশীই। কিন্তু তার বিশ্রামের শখ ছিল এমন একটি ব্যাপারে, যাতে নিজের মন ও শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গরীব প্রজারও উপকার হয়। সুদূর মফঃস্বল গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ কর্মচারীদের নিজেদের জনপ্রিয়তা ও নিজের জাতের শাসন কায়েম রাখার পক্ষে এই দেশের আমোদ ও অবসর কাটানো যে খুব সুবিধাজনক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাদের চেয়ারে আজ যে দেশীয় কর্মচারীরা বসেছেন, তাদের অনেকেই এ বিষয়ে একেবারে বৈষ্ণব আর গোবেচারা।

আমাদের শাসন যন্ত্রটা ঠিক আগেকার দিনের যন্ত্রই বটে, কিন্তু যারা সে যন্ত্র চালাবে, তাদেরও বৃটিশ যন্ত্রীদের গুণ-গুলি নিতে হবে। তা না হলে যন্ত্র ও যন্ত্রী দুইই যদি খাঁটি থাকে, তবুও পাওয়া যাবে না লুব্রিকেটিং অয়েল। তেলের অভাবে কল ক্যাচকোচ করে গোঙাবে।

মণ্টাগুর এই শিকার পার্টিগুলিতে ইংরেজ শিকারীদের মধ্যে কে আগে বাঘ মারবে, কে আগে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে, সে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কারণ বাঘ যার হাতে মারা যাবে, তার সম্পত্তি হবে।

শিকারে চিরকালই এ নিয়ম। এজন্য পাল্লা দিয়ে বাহাদুরী দেখানর ঘটনা রাজপুত শিকারে বহুবার ঘটেছে। কিন্তু দেশের চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখার ফলে এই বাহাদুরী দেখানর চেষ্টা শুধু বীরত্ব নয়, বিরোধও এনে দিয়েছে। মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবর শুধু যে সব বড় বড় রাজপুত রাজাকে দাঁড় করিয়েছিলেন তা নয়, তার নিজের ভাই শক্ত সিংহকে যুদ্ধ করিয়েছিলেন। দুই মহাবীর ভাইয়ে এই মারাত্মক ঝগড়া শুরু হয় এই শিকারে। দুজনে এক সঙ্গে চলেছেন ঘোড়া ছুটিয়ে; শিকার করতে করতে ঝগড়া হয়ে গেল কে বড় ওস্তাদ সে নিয়ে।

কিন্তু ঝগড়া করে লাভ কি? ছাদের উপর ঘুড়ি উড়াতে উড়াতে বেপাড়ার ঘুড়িকে আমাদের দু ছাদের কোন ছোকরা গোত্তা টান মেরে সুরুৎ করে ভোঁ-কাটা কেটে দিয়েছিল, তা ঠিক করতে না পেরে হাণ্ডিসার টিঙটিঙে বাঙ্গালী ছোকরা আমরা তুমুল ঝগড়া করেছি বহুবার। সে ঝগড়া মোগল-রাজপুতে লড়াইয়ের মতই ক্ষমাহীন। শেষ পর্যন্ত পাড়ার মোড়ে হাতের গুলী ফুলিয়ে দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আমরা অন্য দলের ছোকরাদের শাসিয়ে শাসিয়ে হেঁকে ছিলাম, হাত থাকতে মুখ কেন? চলে আয় একবার অলপেয়ে।

অলপেয়ে অর্থাৎ অল্পায়ুর দল তখন শুধু দুয়েকটা গাট্টা ও ঘুষি চালিয়েছিল গালি ও তর্কাতর্কির বদলে। কিন্তু তার ফলে আখড়ায় গিয়ে ডন বৈঠক দেবার কথা আমাদের কারো মনে হয়নি। শুধু গুরুজনরা ভাল ছেলে হবার পথে এমন সব বাধা ও প্রলোভন এসে পড়ছে দেখে একটু চিন্তিত হয়েছিলেন মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

এই দুই রাজভ্রাতা ঠিক করলেন যে, কে যে বেশী বাহাদুর, সেটা প্রমাণ হয়ে যাক লড়াই করে। দৈবরথ যুদ্ধ অর্থাৎ ডুয়েল শুরু হল বর্শা দিয়ে।

মহা সর্বনাশের ব্যাপার। প্রতাপ ও শক্ত এই দুজনই তাদের বাপের চব্বিশ জন বেটার মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও যুদ্ধে ওস্তাদ। মেবারের পাহাড়গুলির ঠিক ওপারেই মোগল সৈন্য অপেক্ষা করছে দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। শিকারের বদলে এ যে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হল।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধের যেসব পাঁয়তাড়া কষার আর সহবৎ দেখানর নিয়ম আছে, সেগুলি শেষ হল। দুই ভাই পা মেপে মেপে যতখানি জায়গা দূর থেকে বর্শা হাতে তেড়ে আসতে হবে, তা ঠিক করে নিয়েছেন। সামন্ত রাজারা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দেখছেন কি হয় কি হয়। লড়াই থামাবার উপায় নেই। বীরধর্মে নাকি ক্ষমা নেই এ মুহূর্তে।

এমন সময় দু ভাইয়ের মধ্যে এসে পড়লেন রাজ পুরোহিত। ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করলেন তাদের থামতে। কিন্তু মাথায় তখন লড়াইয়ের নেশা চেপেছে; এক ভাইকে মরতে হবেই।

উপায় না দেখে পুরোহিত নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ব্রহ্ম হত্যাতে রাজরক্তের পিপাসা শান্ত হল।

কিন্তু শক্তকে মেবার ছেড়ে চলে যেতে হল এবং তিনি গেলেন কোথায়?

ভাই ও দেশের শত্রু আকবরের শিবিরে।

এই ইংরেজ শিকারীদের মধ্যে শিকারের সম্মান আর কার হাতে শিকার মরেছে, সে নিয়ে একটা ঝগড়ার সম্ভাবনা হল। বিচক্ষণ মণ্টাগু হেসে রায় দিলেন—'টস' করে নাও। টাকা বাজিয়ে যার জিত হবে, এই সম্মান তারই পাওনা হবে।

হাসি মুখে দুজনেই স্বীকার পেল। স্পোর্ট একেই বলে।

ব্যক্তিগত বীরত্বে আমরা কোনদিন কারো চেয়ে কম যেতাম না। কিন্তু আমরা ছোট ছোট টুকরো রাজত্বে দেশ ভরে রেখেছিলাম। বাইরের আক্রমণকারীরা একটাকে যখন আক্রমণ করে, তখন অন্য-গুলি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমায়। এমনভাবেই বিদেশীরা একে একে সহজে সেগুলি গ্রাস করেছিল। আর ইংরেজরা করল সসাগরা ধরণীতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সূর্য যার উপর অস্ত যেতে সময় পেত না।

ইতিহাসের সে শিক্ষা কি আমাদের হয়েছে?

(ক্রমশঃ)

'পঞ্চভূতে'র রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-এর ১২ই মে। বাঙলা হিসেবে সে হলো ১৩০৪-এর ঘটনা। তার অল্পকাল আগে 'সাধনা' পত্রিকার যুগ অতিবাহিত হয়েছে। ১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২-এর কার্তিক পর্যন্ত মোট চার বছর 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। ১৩০২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগে সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আড়াই মাস প্রবাস ভ্রমণ করে ১২৯৭-এর ১৯শে কার্তিক কলকাতায় পৌঁছে পৌষ-মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ রাজসাহী জেলার পতিসর অভিমুখে জমিদারী পরিদর্শনের কাজে যাত্রা করেন। উত্তরবঙ্গে বৈষয়িক কাজে আত্মনিয়োগ করে তিনি পদ্মা ভ্রমণের সুযোগ পেলেন। পতিসর, কালিগ্রাম, শিলাইদহ, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙলা দেশের অন্তরঙ্গ রূপমাধুরী পান করে ফাল্গুনে মাসে তিনি কলকাতায় ফিরলেন। সে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদনায় একদিকে 'সঞ্জীবনী' পত্রের প্রতাপ—অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী'র প্রভুত্ব—এই দুই সাপ্তাহিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বাস করে বাঙালী লেখক ও পাঠক সমাজ একখানি 'আদর্শ সাহিত্যিক সাপ্তাহিক পত্রের' প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। ১২৯৮-এর সূচনায় বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০—১৯৩২) সম্পাদনায় এই আদর্শ শিরোধার্য করে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' আত্মপ্রকাশ করলো। পদ্মা ভ্রমণের অবকাশে রবীন্দ্রনাথ যেসব গল্পের প্রেরণা পেয়েছিলেন, তার মধ্যে অনেকগুলি 'হিতবাদী'তে ছাপা হলো। ১২৯৮-এর আষাঢ় মাসে তিনি আবার উত্তরবঙ্গে জলপথে ভ্রমণ করে ভাদ্র মাস অবধি জমিদারী পরিদর্শন করে আশ্বিনে শিলাইদহে পৌঁছলেন। 'ছিন্নপত্রে' এই সব ভ্রমণের রেখাচিত্র ফুটেছে।

সুধীন্দ্রনাথ ১৮৯০-এ বি-এ পাশ করে ১৮৯২-এ (১২৯৮) 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করলেন। 'সাধনার' প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো। তাছাড়া 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি দিয়ে প্রথম সংখ্যা থেকেই 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের গল্পমালা শুরু হলো।

সে সময়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় নব্য হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা চন্দ্রনাথ বসু আহারতত্ত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১২৯৮-এর পৌষ সংখ্যার 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধের তীব্র এক প্রতিবাদ লিখলেন। পরবর্তী আর একটি প্রবন্ধে ('কর্মের উমেদার') এই চিন্তাধারারই অনুসৃতি দেখা যায়। একদিকে গল্পের ধারা, অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং এই সব চিন্তা-প্রভাবিত প্রবন্ধের ধারা তৃতীয়ত চিঠিপত্রের (ছিন্নপত্র) প্রবাহ—চতুর্থত কবিতার ধারা—যুগপৎ এই চার স্রোতের চতুরঙ্গ শোভাযাত্রায় 'সাধনার' যুগটি কবি-জীবনের বিশিষ্ট সৃজনী ঐশ্বর্যের স্মারক-রূপে বন্দনীয়। 'সাধনা' আবির্ভাবের প্রায় এক বছর আগে ১২৯৭-এর কার্তিকে তাঁর 'মানসী'র শেষ কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর ১২৯৮-এর ফাল্গুনে দেখা দিল 'সোনার তরী' কবিতাটি। অতঃপর গ্রন্থাকারে 'সোনার তরী' ছাপা হলো ১৩০০ সালে (২রা জানুয়ারী, ১৮৯৪)।

'পঞ্চভূতের' বিষয়ে আলোচনার ভূমিকায় 'সাধনা' যুগের, কবিমানসের বৈশিষ্ট্য যে অবশ্য স্মরণীয় উপাদানগুলির অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। এই পর্বে তাঁর কল্পনার সমৃদ্ধি, তাঁর আত্মপ্রকাশের সমস্ত অভ্যস্ত খাত যেন ছাপিয়ে দিয়ে গেছে। তাঁর গল্পের মধ্যে দেখা দিয়েছে অশরীরী ত্রাস-বিস্ময়-প্রেম-কারুণ্যের ছায়ামোহ। কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে প্রভৃতি গল্প এই সময়ের অন্যান্য বহু গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট। 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতি কবিতায় এই কল্পনা প্রাধান্যের লক্ষণ ফুটেছে। 'রবীন্দ্রজীবনী'র লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'ছিন্নপত্র' থেকে এই সময়কার দুটি প্রাসঙ্গিক উক্তি স্মরণ করেছেন। 'ছিন্নপত্রে' ১২৯৮-এর ২৬শে এবং ২৭শে চৈত্র (৭ই ও ৮ই এপ্রিল, ১৮৯২) পর পর দুই তারিখের দুখানি চিঠিতে যথাক্রমে কবি লিখেছেনঃ—

> 'জল এবং মেয়ে উভয়েই সহজে ছল ছল জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না।... মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন, Water unto wine—আমার... মনে হচ্ছে জল unto স্থল।
>
> [৭ই এপ্রিল, ১৮৯২]

> 'বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরল করে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।'
>
> [৮ই এপ্রিল, ১৮৯২]

এই দুই চিঠিই শিলাইদহ থেকে লেখা হয়। 'ছিন্নপত্রের' আর একখানি চিঠি লেখা হয় বোলপুর থেকে। সেই পত্রে (২রা মে, ১৮৯২) কবি লিখেছিলেনঃ—

> 'অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখী বসে থাকবার যোগ্য।'

প্রকৃতির প্রশান্ত বিস্তারের উপলব্ধি তাঁর এই সময়ের যাবতীয় রচনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর তৎকালীন অন্তরতম ব্যক্তিগত মনোভাব চিঠিপত্রের বাহনে যতোটা প্রকাশিত হয়েছে, অন্য কোনো বাহনে ততোটা নয়। এই সময়ের একাধিক চিঠিতে তিনি বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ স্বীকার করেছেন। বোলপুর থেকে লেখা এই সময়ের আর একখানি চিঠিতে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২) গদ্য-পদ্য নাটক—সাহিত্যের এই তিন বাহন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনাসূত্রে তিনি লিখেছিলেনঃ—

> 'রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তাহলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়—কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা ক'রে আসচি ও জিনিসটা এখনো

তেমন পোষ মানেনি—প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়!...এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা আপনি এসে পড়চে বলে আর নাটকে হাত দিতে পারচি নে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করচে।'

সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সময়ে লোকেন্দ্র পালিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে আলোচনা হয়, 'সাধনার' একাধিক সংখ্যায় সেগুলি ছাপা হয়েছিল। চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে হিন্দু ধর্মের আচার ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি বিতর্কমূলক আলোচনায় নেমেছিলেন। প্রভাতকুমার লিখেছেনঃ—

'এই সময়ের নব্য আন্দোলনের ভিতরে গুরুবাদ, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, বেদের অভ্রান্ত-বাদ প্রভৃতি এমন কতকগুলি মত প্রচারিত হইতেছিল, যেগুলি কোনো সুবুদ্ধিমান স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা কঠিন। চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখকগণ বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন, এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্র-ভাবেই বিঁধিতেছিল। দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষমাত্র।'

গল্প, কবিতা, চিঠি ছাড়া সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে তিনি যেমন নানান আলোচনায় নেমেছিলেন, তেমনি আবার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, এমনকি, শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কেও এই সময়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির প্রশ্নোত্তরসূত্রে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অনেক লেখা আত্মপ্রকাশ করে। ১২৯৯-এর পৌষ সংখ্যার 'সাধনায়', যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু তার প্রভূত প্রশংসা করেন। এসব ছাড়া এই পর্বের প্রশংসনীয় সৃষ্টির মধ্যে আরও মূল্যবান স্মরণীয় উপাদানের তালিকা নিতান্ত হ্রস্ব নয়। ১৮৯০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে প্রকাশিত নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধের ক'খানি বইয়ের নাম স্মরণ করা যেতে পারেঃ—'বিসর্জন' এবং 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১৮৯০-এ; ১৮৯২-এ ছাপা হয় 'চিত্রাঙ্গদা'; ১৮৯৪-এ 'সোনার তরী'; '৯৬-এ 'চিত্রা'; '৯৭-এ 'পঞ্চভূত'; ১৯০০-তে 'কল্পনা' এবং 'ক্ষণিকা'।

১৮৯৭-এ ছাপা হয় 'পঞ্চভূত'; তার পরের বছর ১৮৯৮-এর ২৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ—

'আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশ-হিতৈষতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।'

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' তাঁর এই দুই বিপরীত ভাবগ্রামের সন্ধিসমন্বয়ের স্বীকৃতিময় রচনা। ১৩৪২-এ এই বইয়ের যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল, তাতে সর্বসমেত ষোলটি প্রবন্ধ জায়গা পেয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম হলো—'পরিচয়'। লেখক এই প্রবন্ধে বলেছেনঃ—

রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

পাঁচ ভূতের সঙ্গে পাঁচটি মানুষের ঠিক ঠিক মিল খুঁজে পাওয়া যে অসম্ভব, একথা লেখক নিজেই স্বীকার করে নিয়ে বলেছেনঃ—

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম-শপথ আছে, যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।

মুখবন্ধে এই চিত্তাকর্ষক সত্য-ভাষণের ঘোষণা দিয়ে পঞ্চভূতের প্রকৃতি-পরিচিতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথমেই ক্ষিতির কথা। 'ক্ষিতি' হলেন পুরুষ—'আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন।' ব্যবহারিক জগতে উন্নতি লাভের উচ্চাশাই তাঁর মুখ্য আশা। 'উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশঃ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার'।

শ্রীমতী অপ্ (স্রোতস্বিনী) ক্ষিতির এই বিশেষ 'হিতবাদ' (Utilariansm) স্বীকার করেন না। তিনি জানেন, অনাবশ্যক আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, করুণা বা স্বার্থ বিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে। অতএব স্থূল প্রয়োজনের সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি না ঘটালেও তথাকথিত 'অনাবশ্যক'ও আবশ্যক।

শ্রীমতী তেজ (দীপ্তি) স্রোতস্বিনীর মতো 'মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গী' সমৃদ্ধ নন। তিনি একেবারে 'নিষ্কাশিত অসি-লতার মতো ঝিকমিক করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে ক্ষিতিকে বলেন'—

যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই দূর হইয়া যায়, তবে, একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে অনাথ শিশুসন্তানের এবং পুরুষের মতো এত বড়ো অসহায় এবং নির্বোধ জাতির কী দশাটা হয়!

'পঞ্চভূতের' চতুর্থ এবং পঞ্চম ভূত উভয়েই প্রথমোক্ত ক্ষিতির মতো পুরুষ-চরিত্র। শ্রীযুক্ত বায়ু (সমীর) ক্ষিতির শিষ্য নন—প্রতিপক্ষ! তিনি জানেন, 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ।' অতএব বস্তুসর্বস্বতা পরিহার্য।

শ্রীযুক্ত ব্যোম্ ধ্যানগম্ভীর অধ্যাত্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি বলেন, 'ঠিক মানুষের কথা যদি বলো, যাহা অনাবশ্যক, তাহাই তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক।'

ব্যোমের কথা ভালো বোঝা যায় না—শুধু এই কারণেই দীপ্তি তাঁর সম্পর্কে 'একটা আন্তরিক বিদ্বেষ' পোষণ করেন; স্রোতস্বিনী তাঁর কথা শোনবার ভাণ করেন, কিন্তু অন্তরে জানেন যে, ব্যোম 'বেচারা পাগল' মাত্র; পঞ্চভূতের ভূতনাথ রবীন্দ্রনাথ ব্যোমের কথা উপেক্ষা করেন না বটে, কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি স্থূল প্রয়োজন অস্বীকার করে নিজের জন্য মনুষ্যত্বের যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন—সর্ব-সাধারণের জন্য বিজ্ঞান সেই কর্তব্যই পালন করতে চায়। জড়ের অধীনতা কাটিয়ে ওঠার জন্যই আধ্যাত্মিক সভ্যতায় পৌঁছবার আগে 'একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনার' স্তর অতিক্রম করা দরকার।

ক্ষিতি আত্মবিশ্বাসের প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না; ব্যোম্ আত্মকথার খণ্ডনে কান দেন না। অতএব ভূতনাথের জড়স্তর, বিজ্ঞানস্তর, অধ্যাত্মস্তর সম্পর্কিত পর্যায় ঘোষণায় কোনও পক্ষেরই মত বদলায় না।

এই পাঞ্চভৌতিক ধ্যান-ধারণার বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূতের ডায়ারীর উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ডায়ারীর প্রস্তাব তুলেছিলেন দীপ্তি—ভূতনাথ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো। সমীর এ বিষয়ে আরও উৎসাহ দিলেন। স্রোতস্বিনী ডায়ারী লেখার দোষ-গুণ সম্পর্কে ভূতনাথের অভিমত জানতে চাইলেন। তখন ভূতনাথ বললেনঃ—

ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন।...একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র ভাগ আছে, সব-কটাকে সামলাইয়া সংসারে চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।

...আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহা ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

...জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনে করিতে চাহে।

স্রোতস্বিনী এই কথাগুলিই সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেনঃ—

'স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।

ভূতনাথ তাঁর পাঞ্চভৌতিক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য বললেন যে, সাহিত্য-ব্যবসায়ী সৃজনের আনন্দবশেই নিজের অন্তর্লোক থেকে নানা ভাব, নানা চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। সেজন্য তাঁর নিজের জীবনে ঐক্য থাকে না।

এই সব বাধাবিপত্তির আলোচনা করে অবশেষে স্থির হলো যে, ভূতনাথ ডায়ারী লিখবেন, এবং সে-ডায়ারীতে ব্যক্তি-বিশেষের কথা থাকবে না—'এমন কথা লিখিব, যাহা আমাদের সকলের।'

অতঃপর ডায়ারী শুরু হলো।

প্রকাশিত বইয়ের সূচীতে 'পঞ্চভূতের পরিচয়' সম্পর্কিত আলোচনাটির পরে যে পনেরোটি প্রবন্ধের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় লেখাটির নাম—'নরনারী'। 'পঞ্চভূতের' দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী হলেন নারী,—অবশিষ্ট তিনটি ভূত ক্ষিতি, সমীর এবং ব্যোম্ পুরুষ। পাঞ্চভৌতিক গোষ্ঠীর সদস্য-বৃন্দের মধ্যে নরনারীর অন্যান্য সমাবেশ যখন ঘটেছে, তখন এই রকম মানস-বৈষম্যের আলোচনা যে অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর নয়, সেকথা বিবেচকের পক্ষে স্বীকার্য। একদিকে দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী,—অন্যপক্ষে ক্ষিতি, সমীর, ব্যোম এবং স্বয়ং ভূতনাথ,—এই দুই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণের বিভেদ-বৈষম্য এবং মনোগঠনের বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা আছে 'নরনারী' প্রবন্ধে। ডেস্‌ডিমোনা, ক্লিয়োপাট্রা, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, বিদ্যা, মালিনী, দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা প্রভৃতি নারীবাহিনী দাঁড়িয়েছেন আসরের এক প্রান্তে,—আর, বিপরীত প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন ওথেলো, অ্যান্টনি, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল ইত্যাদি সাহিত্যের প্রখ্যাত কয়েকটি পুরুষ। আসরের মাঝখানে পঞ্চভূতের সভা বসেছে। সেই সভায় সমীর বলেছেন যে, ইংরাজি সাহিত্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে নায়িকারই প্রাধান্য। ক্ষিতি এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যান শুরু করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কতক রচনা 'মানসপ্রধান', কতক আবার 'কার্যপ্রধান'। ক্ষিতি বলেন,—

'মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।'

দীপ্তি এই মন্তব্যের প্রতিবাদসূত্রে 'দেবীচৌধুরাণী'র কর্তৃত্ব, 'আনন্দমঠের' শান্তির কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করলেন। সমীর বললেন—

'ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরল রেখার দ্বারা সমস্ত জিনিষকে পরিপাটিরূপে শ্রেণী বিভক্ত করা যায় না।...জীবন-শিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব।...ওথেলো তো মানসপ্রধান নাটক,

কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিংলিয়রের হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর!

নারী এবং পুরুষের প্রকৃতিগত, স্বভাবগত, আচরণগত পার্থক্যের মূল কারণ সম্পর্কে এই রচনাটির ছত্রে ছত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং গভীর রসবোধের উদ্দীপনা ফুটে উঠেছে। আমাদের দেশের নারী-প্রকৃতির স্তুতি এবং পুরুষ-স্বভাবের নিন্দাবর্ণনায় যখন স্বয়ং পঞ্চভূতের সভাপতি ভূতনাথও বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, তখন দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী বিশেষ সন্তোষ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু ক্ষিতি মনে মনে অস্বস্তিপীড়িত হয়েছেন। পাঞ্চভৌতিক সভার নারী-সদস্য দুটি এই স্তবে তুষ্টি লাভ করে সভা ত্যাগ করার পরে অন্যান্য বক্তাদের তিরস্কার করে ক্ষিতি বলেছেন ঃ

আদর্শ নারীর উপকরণ আয়োজন অনেকখানিই জোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তি ভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। এইজন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। কিন্তু যাহারা সার্থক হইতে পারে, তাহাদের তুলনা তোমার মেয়ে-মহলে মিলিবে কোথায়?

এই মন্তব্যের প্রতিবাদ উত্থাপনের অবকাশ না দিয়েই ক্ষিতি সভা ত্যাগ করে সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছেন।

নরনারীর স্বভাব-বৈষম্যের আলোচনা কোনও ধ্রুব, অকাট্য সিদ্ধান্তে ক্ষান্ত হতে পারে না। আলোচনার প্রথম দিকে সমীর যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ক্ষিতির একটি মন্তব্যের জবাবে সমীর বলেছিলেন ঃ

জীবন-শিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না।

সমীরের এই মন্তব্যটি পঞ্চভূতের সদস্যদের প্রকৃতি পর্যালোচনার পক্ষে বিশেষ আলোকপাত করে। জীবন-শিখা সামগ্রিকভাবে না হলেও অংশত এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। বুদ্ধি ও রসদক্ষতায় এঁরা সকলেই স্মরণীয়। সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে আগ্রহসম্পন্ন সজাগ কয়েকটি লোক এক জায়গায় মিলেছেন। এই সম্মেলনের ফলে ক্ষিতির জড়তা, ব্যোমের গাম্ভীর্য, সমীরের কল্পনাবিলাস, এমন কি স্বয়ং ভূতনাথের তথাকথিত পক্ষপাতমুক্ত স্বাতন্ত্র্যও যেন মাঝে মাঝে বিচলিত হয়েছে। সমীর বলেছেন ঃ

সতরঞ্চ ফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান চক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ তাহা নির্জীব কাষ্ঠমূর্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিষ নহে; তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট্‌-পালট্‌ হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন জীবন এবং অধ্যয়নের মিলিত উদ্ভাসনে মানবপ্রকৃতির মর্মস্থল যেমন দেখেছেন, তেমনি লিখেছেন। তা ছাড়া 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' রচনার অব্যবহিত প্রাক্‌-কারণ হিসেবে আরও একটি কথা স্মরণীয়। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর লেখায় সে কারণটির উল্লেখ করেছেন ঃ

'The 'Diary of the Five Elements' was inspired by the conversation of a few intellectuals who had gathered round Tagore to discuss life and letters. The Five Elements were the Five points of view of the philosophy of life. This little volume should be one of the world's classics. Even Tagore could not excel its brilliance.

অবশ্য, 'পঞ্চভূতের' সব রচনায় পাঞ্চভৌতিক সভার সার্বিক প্রভাব নেই। 'পল্লিগ্রামে' এবং 'মন'—এই দুটি রচনাই রবীন্দ্রনাথের অন্যনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত আত্মোদ্ঘাটনের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ যদিও পাঠকদের সতর্ক করবার জন্য লিখেছিলেন ঃ

পাঠকেরা যদি 'ডায়ারি' শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন।

—তবু, এই দুটি রচনা সম্পর্কে সে ঘোষণা গ্রাহ্য নয়। 'মন' প্রবন্ধে মনুষ্য-নিরপেক্ষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে মনের ঐকান্তিক পুষ্টি, পরিণতি, বিশ্রাম ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ভাবুকের মন প্রকৃতির সংস্পর্শসুখের মধ্যে চিন্তালেশহীন আদরপূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তি আস্বাদন করে। এই প্রাকৃতিকতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ক্ষেপা হৃদয়ের উদার উল্লাস'। অন্য পক্ষে, প্রীতিহীন যুক্তিসর্বস্বতাকে নিশ্চল পাষাণের সঙ্গে তুলনা করে মানুষের তর্কপ্রবণতাকে তিনি বলেছেন, 'কঠিন কীর্তি'। শুধু তাই নয়, অভিযোগ জানিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

'পল্লিগ্রামে' নামক অন্য রচনাটিতেও তিনি অনুরূপভাবে আত্মকথার উল্লেখ করেছেন। ভাদ্র মাসের জলমগ্ন পল্লী-অঞ্চলে গ্রামীণ বাঙালীর 'স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে' তিনি যখন সুখে দিন যাপন করছিলেন, তখন 'পঞ্চভূত-সভার কোনো একটি সভ্য' মারফৎ কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরা পেয়ে তিনি বৃহত্তর বিশ্বের মানুষের তুলনায় গ্রামের 'নির্বোধ, সরল মানুষগুলি'কে অধিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যোগ্য মনে করলেন।

দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য।
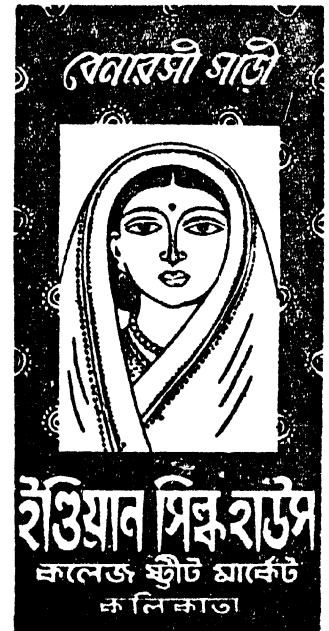
এমন কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন।... সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।

সরলতা কাকে বলে?

এ প্রশ্নের সরল জবাব লিখেছেন ভূতনাথ :

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

'নরনারী' প্রবন্ধে স্রোতস্বিনী বলেছিলেন :

পুরুষদেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়-শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন।

'পল্লিগ্রামে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'চাষাদের' মুখে 'রমণীর সৌন্দর্যের মতো' লাবণ্য লক্ষ্য করেছেন। পঞ্চভূতের সভায় নানা জ্ঞান, নানা বিশ্বাস, নানা মানুষের বিচিত্র কার্যকলাপের আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্র-মানসের অন্তর্নিহিত ঐক্যানুসন্ধিৎসাই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রধান আহরণীয় রত্নের দ্যুতি এবং লাবণ্য সঞ্চার করেছে। কেবল গ্রামীণ মনুষ্য-প্রকৃতির বন্দনা হিসেবেই যে 'পল্লিগ্রাম' প্রবন্ধটি উপাদেয় তা নয়, রবীন্দ্র-মানসের স্থায়ী ভাবটির অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবেই এই লেখাটি সমাদরণীয়। তাঁর এই রচনাভুক্ত একটি মন্তব্য দিয়েই 'পঞ্চভূতে'র প্রসাদ সম্পর্কে নিশ্চিততর সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। পল্লী-জীবনের সরলতার ব্যাখ্যানসূত্রে সে কথা বলা হয়েছিল :

যাহার প্রকৃতি কোনো একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আবার, বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধান-পরতার পটুত্বের জন্যই যে 'পঞ্চভূত' স্মরণীয়, তাও নয়:—বরং রবীন্দ্র-মানসের পরিপাক-সামর্থ্যের অপূর্বত্বই এই গ্রন্থের লাবণ্যকারী। 'গ্রীক' 'কোরাসে'র ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু পাত্র-পাত্রীর সংলাপের ব্যাখ্যা বা সমালোচনা মাত্র করেন নি—আত্মবিরোধের সমস্ত ধারা-উপধারা সামনে রেখে তিনি সর্বময় বিরোধাতিশায়ী, পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আনন্দ পেয়েছেন। অন্যত্র নিজের স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে সাধনা হচ্ছে, আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।

'চতুরঙ্গে'র শচীশ এই সাধনারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'পঞ্চভূতে' আত্ম-চিন্তাপর্যায়ের টুকরো টুকরো লেখার মধ্য দিয়ে এই মননই বাণীময় হয়েছে।

অতএব, গ্রীক কোরাস*—ল্যান্ডরের Imaginary conversations Oliver Wendell Holmes-এর The Autocrat of the Breakfast Table ইত্যাদি প্রসঙ্গের ভার বাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র রসগ্রহণের পথ বাধা-সঙ্কুল করে লাভ নেই। তবে, এই সব রচনার সঙ্গে পঞ্চভূতের আকৃতি-প্রকৃতি-গত অল্পবিস্তর সাদৃশ্য যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'পঞ্চভূতে'র অন্তর্নিহিত ঐক্যময়তার লক্ষণটি মনে রেখে Imaginary Conversations সম্পর্কে ইংরেজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকের অভিমতটি লক্ষ্য করা যাক :

Their strongest interest lies in the revelation and contrasting of souls; and these psycological dialogues are fundamentally inspired by the same spirit of moral curiosity, of philosophic emotion and of intelligent allowance for the diversity of things, which will produce the monologues of Browning.†

Landor-এর Imaginary Conversations প্রকাশিত হয় ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে। প্রায় একই সময়ে, —১৮৩১ সালের নবেম্বর মাসে Oliver Wendell Holmes তাঁর The Autocrat of the Breakfast Table লিখতে আরম্ভ করেন। দুটি প্রবন্ধ লিখে (দ্বিতীয়টির প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৮৩২) হোমস্ অনেকদিন তাঁর এই প্রয়াস স্থগিত রেখেছিলেন। পঁচিশ বছর পরে "The Atlantic Monthly" পত্রিকার তাগিদে এই পর্যায়ের আরও লেখা জমে ওঠে এবং ১৮৫৮ সালের নবেম্বর মাসে তাঁর এই বইখানি প্রকাশিত হয়। 'পঞ্চভূতে' রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেমন ভূতনাথ,—প্রাতরাশের টেবিলে স্বয়ং হোমস্ তেমনি হয়েছেন Autocrat, Poet এবং Professor। তিনি অভিনব আলাপচারী। ইংরেজি সাহিত্যে এই পর্যায়ের লেখায় চার্লস্ ল্যাম হলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য জুড়ি। বিচারক সাহিত্যরসিক লিখেছেন :

The chatter of "Elia" is the chatter of the artistic temperament; the chatter of our Breakfast Table philosopher that of the scientific temperament.

'পঞ্চভূতে'র ভূতনাথও আলাপচারী, কিন্তু তাঁর মুখ্য প্রবণতা মনস্তত্ত্ব-সন্ধানেও নিরত নয়, বৈজ্ঞানিকতার অভিমুখেও উদ্যত নয়। বিশ্লেষণের দিকে একটু বেশি ঝোঁক দেওয়া এই দুই প্রবন্ধকারেরই সাধারণ স্বভাব। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যই হলো সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধির দিকে। মন দিয়েই কি মনকে বোঝা যায়? 'ক্ষণিকা'র কবি লিখেছিলেন :

মন নিয়ে কেউ বাঁচেনাক,
মন বলে যা পায়রে
কোন জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিষ?
চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে।

'পঞ্চভূতে' সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই একই কথা অন্য পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে। ভালো সাহিত্যের আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্ব যাই হোক না কেন, ভালো সাহিত্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাবটি যে প্রাঞ্জল,—'প্রাঞ্জলতা' প্রবন্ধে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। মনের যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের মাপকাঠি দিয়ে বড়ো উপলব্ধির বিচার চলে না। মন দিয়ে

---

* 'The poet himself plays the part of a GK. chorus, a sort of ideal mediator between the elements.'—Lesny.

† Legouis and Cazamian.

িতি সর্বত্র সম্ভব নয়। ভূতনাথের কথা লো ঃ

> উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক য় এইজন্য কঠিন, যে, মন তাহাকে বুঝিয়া য় কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না। [প্রাঞ্জলতা]

সমীর বলেছেন ঃ

> মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে রে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই বস্থাটাকে বলি আনন্দ।...
>
> ...বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ ণনা করিয়া চলিতে হয়, আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মতো াসে, কাহারো আহ্বানও মানে না, নিষেধও গ্রাহ্য করে।... [অখণ্ডতা]

ক্ষিতি অন্য প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ রেছেন ঃ

> বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া য়ো মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে য ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই ঠারাঘাত করা হয়।...
>
> [সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ]

ব্যোম বৈজ্ঞানিক নিয়মতান্ত্রিকতার ংকীর্ণতা উপলব্ধি করে বলতে পেরেছেন ঃ

> আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গায় আমরা নিয়মের বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে—সে স্বাধীন; অন্ততঃ আমরা সেইরূপ অনুভব করি।... [বৈজ্ঞানিক কৌতূহল]

শুধু পাঞ্চভৌতিক সভার মহিলা সদস্যা দুটি মনের পরিসীমা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। তবে, তাঁরাও এ আলাপে যোগ দিয়েছেন। মনের জরীপে তাঁরা যে কেন হস্তক্ষেপ করেন নি, তার ইঙ্গিত আছে সমীরের উক্তিতে। সে উক্তিটি স্মরণীয় ঃ—

> রমণীও প্রকৃতির মতো। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মতো আগাগোড়া একখানি। এইজন্য তাহার গতিবিধি আচার-ব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এইজন্য দ্বিধা-দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী "মরণং ধ্রুবং"।
>
> প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি—তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার আলোচনা কেন-কী-বৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারি হস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়।... [অখণ্ডতা]

বলা বাহুল্য, এ অভিমত সর্বগ্রাহ্য নয়। বাদ-প্রতিবাদ শুরু করার পক্ষে নারীচিত্তের প্রকৃতি-নির্ধারণ সম্পর্কিত এই মন্তব্যটি বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু এ তত্ত্বকথার সমর্থনে-প্রতিবাদে কালক্ষেপ করে লাভ কি? রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের স্মরণীয়া নারীপ্রকৃতির রহস্য আলোকিত হয় এই উক্তির দ্যুতিতে। দামিনী-বিমলা-বিনোদিনীর মহামায়া মূর্তি চকিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাঠকের মানসপটে।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী অবশ্য সমীরের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদ বিচারতাড়িত, বুদ্ধিসমর্থিত, অহমিকালালিত এবং সজ্ঞানতাপ্রসূত। সভার এই প্রদেশের অন্তর্বর্তী আরও এক ভিন্ন প্রদেশ আছে। রবীন্দ্রনাথ নারীপ্রকৃতির সেই গূঢ় অন্তর্লোকের কথা বলেছেন।

১৮৯৭ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দূরত্ব যৎসামান্য। 'পঞ্চভূতে'র প্রকাশকাল থেকে 'ক্ষণিকা'র প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র এই তিন বছর। 'পঞ্চভূতে'র 'মন', 'অখণ্ডতা', 'নরনারী', 'মনুষ্য' প্রভৃতি রচনায় মানুষের মনের নিগূঢ়তা সম্পর্কে যে-সব ইঙ্গিত, আলোচনা, ব্যাখ্যান চোখে পড়ে, 'ক্ষণিকা'-র অনেক কবিতায় তারই অনুচিন্তা অথবা সম্প্রসারণ ঘটেছে লঘু-ক্ষিপ্র ছন্দোবন্ধে। 'ক্ষণিকা'র—'অনবসর,' 'অতিবাদ', 'বোঝাপড়া', 'অচেনা', 'উৎসৃষ্ট', 'অসাবধান' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রমানসের এই বিশেষ অভিমুখিতাই দর্শনীয়। সেই অভিমুখিতার উৎস সন্ধানে অগ্রসর হলে পিছিয়ে আসতে হয় 'ক্ষণিকা' থেকে 'পঞ্চভূতে'—১৯০০ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে,—তারও আগে ১৮৯২ সালের 'সাধনা'-পর্বের সূচনায়। পাঞ্চভৌতিক সভার অনুকূল বেষ্টনীর মধ্যেই মানস কক্ষপরিক্রমার প্রেরণা জেগেছিল। 'ক্ষণিকা'র 'সম্বরণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অশোক-টগর-চাঁপা-চামেলি - কৃষ্ণচূড়ার বাগানে প্রসন্ন হয়ে লিখেছিলেন ঃ—

> আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে,
> বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

আর 'পঞ্চভূতে' 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা'-প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ঃ—

> গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।
>
> সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পুরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি, সত্যক্ষেত্র গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘু পদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

ঐ একই রচনার অন্যত্র তিনি লিখে-ছিলেন ঃ—

> কথোপকথন সভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা।

'ক্ষণিকা'র 'বোঝাপড়া' কবিতায় 'মানসিক পায়চারি'র মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রেখেই সত্যস্বরূপের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে ঃ—

> মনেরে আজ কহ, যে
> ভাল মন্দ যাহাই আসুক
> সত্যেরে লও সহজে।

'পঞ্চভূতের' রবীন্দ্রনাথ সহজ সত্যের প্রসঙ্গ থেকে দুর্নিরীক্ষ্য সত্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। ভালোবাসা, সৌন্দর্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ববিদিত সহজ কথা থেকে জটিল কথার জালে পাঠকদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবু, সুকৌশলে আত্মকৃত দায়িত্বের পরিসীমা সম্পর্কে একটি কৈফিয়ৎ জুড়ে দিতেও ভোলেন নি। সিদ্ধান্তকাম পাঠক এ বই থেকে ভালোবাসা, সৌন্দর্য, কৌতুক, কাব্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের গূঢ় সিদ্ধান্ত উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু সত্যকাম পাঠকের মনে স্পন্দিত হবে 'পঞ্চভূতে'র ভূতনাথের বহুকথার একটি কথা,—কৌতুককথা নয়, সত্যকথা ঃ—

> এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতি-পদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই সকল অনিশ্চিত, সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভালো।

সত্য আর সিদ্ধান্ত অভিন্ন নয়। 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ—

> ওগো সত্য বেঁটেখাটো
> বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো—

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় "রাডার" নামে যে যন্ত্রটি নতুন আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি আজ আর কারো কাছে বিশেষ নতুন নয়। যুদ্ধের সময় এই "রাডার" ধ্বংসাত্মক কাজের সাহায্যের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল পরে অবশ্য এটি জনসাধারণের মঙ্গলার্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে প্রকৃতির একটা যোগাযোগ বোধ হয় থেকেই যায়। কে বলতে পারে পক্ষীকুলের অবাধ আকাশ বিহার দেখেই এয়ারোপ্লেনের আবিষ্কার-কর্তা এত বড় আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন কি না!

জিমনারকাস নিলোটিকাস (Gymnarchus Niloticus) নামে এক ধরণের মাছ আছে যাদের প্রকৃতির সঙ্গে 'রাডারের' প্রকৃতির বেশ একটা মিল আছে সেই কারণে অনুমান করা ভুল হবে না যে, এই মাছের গতিবিধি লক্ষ্য করেই রাডারের আবিষ্কারকর্তা এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। ডাঃ লিসম্যান লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, জিমনারকাস মাছগুলি তাদের শরীর থেকে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চারদিকের আবহাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং তার প্রতিধ্বনি শুনে তারা তাদের আশপাশের আবহাওয়া বুঝতে পারে এবং আরও বুঝতে পারে যে, কি রকম জায়গায় ও কি অবস্থায় তারা বাস করছে।

ডাঃ লিসম্যান লক্ষ্য করেন যে, এই মাছগুলো যেমন সাঁতরে সামনের দিকে এগিয়ে যায় সেই রকম পিছনের দিকেও হটে যেতে পারে। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই ডাঃ লিসম্যান ভাবতে থাকেন যে, মাছগুলো পিছনের কিছু না দেখে কেমন করে হটে যায় এর মধ্যে কি রহস্য আছে! তিনি পরীক্ষা করার জন্য এই ধরণের মাছ একটি আধারে রেখে তার মধ্যে অসিলোগ্রাফ যন্ত্র বসিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখেন যে, এই মাছগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছড়ায়। আরও পরীক্ষার জন্য ঐ আধারের মধ্যে তিনি এলোমেলোভাবে বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাতে লাগলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐ বৈদ্যুতিক প্রবাহসম্পন্ন মাছগুলিও বাইরের বিদ্যুৎপ্রবাহ দেখে শত্রু জ্ঞানে দূরে সরে যেতে লাগলো। ডাঃ লিসম্যান তখন মাছেদের নিজস্ব বৈদ্যুতিক প্রবাহ জলের মধ্যে চালনা করলেন ফলে মাছগুলো আবার ফিরে আসে। এইরকম নানারকম পরীক্ষার দ্বারা ডাঃ লিসম্যানের ধরাণা হয় যে, এই মাছগুলি রাডার প্রকৃতিবিশিষ্ট।

*

বাহু সঞ্চালনের ক্ষমতা যাদের নষ্ট হয়ে গেছে মনে হয় যেন তাদের কোনও কাজ করবারই ক্ষমতা নেই। অবশ্য বর্তমান যুগে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনার ফলে এ ধরণের অনেক অসুবিধার হাত থেকেই মানুষ রক্ষা পেয়েছেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ধরণের রোগীকে কিছুটা কার্যক্ষমতা দান করার জন্য কয়েকটি নতুন নতুন উপায় বার হয়েছে। এগুলির মধ্যে টাইপরাইটিং যন্ত্রে টাইপ করার পদ্ধতিটি খুবই সুবিধাজনক। রোগীর হাতের কব্জিতে দুটি লোহার বেল্ট লাগিয়ে হাত দুটি টাইপ-রাইটার যন্ত্রের উপর এমনভাবে রাখা হয় যাতে তিনি অনায়াসে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে লিখে যেতে পারেন। ছবিটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এইভাবে টাইপ করতে বাহু সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না।

শুধুমাত্র হাতের কব্জির সাহায্যে টাইপ করে চলেছেন।

*

প্রকৃত ফটোগ্রাফি বলতে যা বোঝায় তা শুধু ঐ ক্লিক ক্লিক করে ছবি তোলা নয়, তারপরও অনেকখানি কাজ বাকী থেকে যায়। ক্যামেরা থেকে ফিল্ম বা প্লেট বার করে সেটিকে ধুয়ে ছবিখানি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা ফটোগ্রাফির একটি বিশেষ অঙ্গ। এগুলি কোনও রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ধুতে হয় এবং তারপরে প্রচুর জল দিয়েও ধোয়া হয়। বর্তমানে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ধোয়া হয় যার ফলে পরে আর জল দিয়ে ধুতে হয় না। এই নতুন দ্রব্যটির নাম "এ্যামিডল ডেভালাপার।" যে সব জায়গায় জলের খুব অভাব, বিশেষত সামরিক ঘাঁটিগুলিতে এই "এ্যামিডল ডেভালাপার" খুব উপকারী। এই নতুন ডেভালাপারটির আর একটা সুবিধা এই যে, সাধারণভাবে ছবি ডেভালপ করতে যে সময় লাগতো তার ১/১০ ভাগ সময়ের মধ্যে কাজটি হয়ে যায়। ফিল্ম কিংবা ছবি ধোবার পর ওগুলোর ওপর সিলভার সল্ট বলে যে জিনিসটি থাকে "হাইপো" নামক রসায়ন দ্রব্য দিয়ে ধোয়ার দরুণ সেটি উঠে যায়। "এ্যামিডল" দিয়ে ধুলে পরে আর "হাইপো" দিয়ে ধুতে হয় না, কারণ "এ্যামিডলের" সঙ্গে থায়োরিয়া (Thiourea) নামে একটি পদার্থ বর্তমান থাকায় সিলভার সল্ট নামক জিনিসটি ছবির সঙ্গে বা ফিল্মের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

(১৫)

ভোর বেলাই বংশী এসেছে। বললে—শালাবাবু, আপনাকে কাল রাত্তিতে দু'বার খুঁজে গেছি, ছোটমা পাঠিয়েছিল দেখতে—

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি 'মোহিনী সিঁদুরের' কৌটোটা প্যাকেটে মুড়ে বংশীর হাতে দিয়ে বললে, এটা গিয়ে বৌঠানকে দে, আর—আর এই টাকা ক'টাও দিয়ে আয়—

বংশী বললে—ছোটমা বলেছে, আপনাকে নিজে যেতে। আজ ভোর বেলাই যে চিন্তাকে পাঠিয়েছিল আবার—

সকালবেলা। এখনি অফিসে যাবার তাড়া। অনেক কাজ বাকি। ব্রজরাখাল ক'দিন বাড়ি আসছে না। মেতে আছে গুরুভাইদের নিয়ে। রান্না-বান্নার দিকটা একটু দেখতে হবে। রাত্রে রান্না করা হয়েছিল। তার বাসনগুলো মাজতে হবে। রাত্রের খাওয়ার জন্যে বাজারেও একবার যাওয়ার দরকার।

ভূতনাথ বললে—তা হলে আজ রাত্রে তুই আসিস, আমি নিজে গিয়ে বৌঠানকে দিয়ে আসবোখন—

বংশী চলে গেল। কিন্তু অফিসে যাবার পথে মনে পড়লো—সন্ধ্যে বেলা তো ননীলালের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে তার। হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে সে।

একবার মনে হলো যাবে না সে। আর কিসের সম্পর্ক তার ননীলালের সঙ্গে। ননীলালের কাছ থেকে আর কিছু আশা রাখে না সে।

অফিসে গেলে পাঠকজী হাসতে হাসতে এল। সেলাম করলে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—অত হাসি-মুখ কেন পাঠকজী—

লম্বা পাঞ্জাবী পরা ফলাহারী পাঠক। এখনও বুঝি কুস্তি করে। ভারি জোয়ান চেহারা। পরিশ্রমে কাবু হয় না, হনুমানজীর ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছে জীবনের। গোঁফে তা দেয়।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—মাইনে বাড়লো নাকি পাঠকজী তোমার—

পাঠকজী বলেছে—যতদিন দিদিমণি থাকবে বাড়িতে, ততদিন তার মাইনে বাড়বার কোনও আশা নেই—

তারপর বলে—লেকিন হনুমানজী রাখে তো মারে কৌন কেরানীবাবু—

পাঠকজীর বয়েস বেশি নয়। কিন্তু প্রচুর স্বাস্থ্যের জন্যে একটু বয়স দেখায়। কারখানায় বসে প্যাকেট তৈরি করে আর ভজন গায় আপন মনে। বে-পরোয়া মানুষ। বলে—কত কেরানীবাবু এ বাড়িতে এল গেল, পাঠকজী কিন্তু হনুমানজীর কৃপায় এখনও টিঁকে আছে। কেন যে টিঁকে আছে কে জানে।

পাঠকজীকে জিজ্ঞাসা করলে বলে—সব হনুমানজীর কিরপা হুজুর—

লোকটা হনুমানজীর কথা বলে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুখেই ওর যত ভক্তি। ভূতনাথের কতদিন সন্দেহ হয়েছে, অফিস থেকে যেন চুরিটা চামারিটা করে। এখানে বউ নেই। বলে—বিয়ে করেনি। আসলে বিয়ে করেছিল, বউ মারা গেছে। খবর পেয়েছে ভূতনাথ। এই বাড়ির এক কোণে একটা ছোট ঘরে রান্না করে রাত্রে শুয়ে থাকে। এ-বাড়ির অনেক দিনের লোক।

—তা হাসি কেন অত পাঠকজী?

এবার হাসির কারণটা প্রকাশ করে বললে পাঠক। পাঠকও তা হলে খবর পেয়েছে? ফলাহারীর মনে হয়েছে—দিদিমণির বিয়ের পর শ্বশুর ঘরে তো চলে যাবে দিদিমণি, তখন বাবুকে বলে মাইনেটা বাড়িয়ে নেবে সে। বাবু তো লোক ভাল।

ভূতনাথও কিছু বললে না। দরকার নেই প্রকাশ করে দিয়ে। আশায় থাকা ভালো।

—আপনারও ভালো হবে কেরাণীবাবু, দেখবেন—

কে জানে—হয়ত সত্যি! পাঠকজী এতদিন ধরে দেখছে—ও হয়ত ঠিকই চিনেছে জবাকে! কিন্তু ভূতনাথের
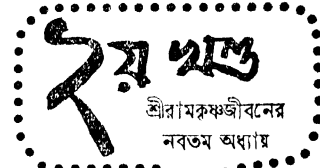
কিছুতেই মাথায় আসে না। রহস্যময়ী মনে হয় জবাকে। যেন পাঠকজীর কথাটাও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অমন যার বাবা, মাকেও যেন ভাল বলেই মনে হয়। অন্তত পাগল হবার আগে জবার মতন অমন অস্থির প্রকৃতির নিশ্চয়ই ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কেমন ধীর-স্থির। আবেগ আছে কিন্তু অবিবেচক নয় যেন। শুধু জবার বেলাতেই একটু অন্ধ। অথচ জবা যেন বাড়ির কাউকেই মানুষ বলে মনে করে না। যেন তারা সবাই জবারই কর্মচারী। ইচ্ছে করলে জবা তাদের বরখাস্ত করতে পারে। একটু যেন বেশি সংসারী। হিসেবী। কে-কোথায় ফাঁকি দিচ্ছে, সেদিকে যেন গোপনে দৃষ্টিও রাখে। কথার ঝাল মেশানো। ভূতনাথ ভেবে দেখলে—তার জানা-শোনা কোনও মেয়ের সঙ্গেই জবার যেন কোনও মিল নেই। রাধা ছিল সরল সাদাসিদে। ব্রজরাখালের স্ত্রী হয়েও সে যে ভূষণকাকার মেয়ে, তা সে ভোলেনি। আর আন্না—সে ছিল ছেলেমানুষ। গাছে ওঠাতেও যেমন, আবার সইএর বিয়ের বাসর জাগতেও তেমনি। আর হরিদাসী ছিল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী। বিয়ে হবার আগেই যেন সে স্ত্রী হয়ে গেছে। আর বৌঠান! পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে মাত্র একদিনের আলাপ। কিন্তু তার সম্বন্ধে এত কথা শুনেছে—যেন তার সব জানা হয়ে গিয়েছে। বৌঠান তো ভূতনাথের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, কিন্তু তবু যেন সামনে গেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ভাল লাগে। মনে হয় মাথাটা ঠেকিয়ে রাখে আলতাপরা পা-জোড়ার ওপর। বৌঠান যেন একাধারে সব। মা হয়নি বৌঠান, কিন্তু মা হলেই যেন মানাতো। স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি বৌঠান, কিন্তু ছোটবাবু চাইলেও যেন তাকে সহধর্মিণী করে নিতে পারবেন না—বৌঠান যেন ব্যক্তিত্বে ছোটবাবুর চেয়েও উঁচুতে। আর এ-বাড়ির জবা! জবা সত্যিই রহস্যময়ী! ধরা সে দেয় না, কিন্তু কেউ ধরে এটাই যেন সে চায়। কিন্তু নিজের আভিজাত্য যেন সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছে। স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্য প্রেম ভালবাসা সমস্ত তার কাছে তার পরে।

কাজ করতে করতে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা জরুরী কাগজ নিয়ে ওপরে যেতে হলো ভূতনাথকে। সুবিনয়বাবুর সই দরকার। সিঁড়িতে উঠে ডান দিকে হলের মধ্যে যাবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। ওপাশেই সুবিনয়বাবুর সঙ্গে জবার কথা হচ্ছে। খানিকটা কানে আসতেই ভূতনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সুবিনয়বাবু ব[illegible] পছন্দ করেছ—আমি এতে কী বলবো মা—

জবা বলছে—তবু আপনি একবার বলুন আপনি সুখী হবেন এ বিয়েতে—

—আমি তো কোনও দিন তোমার কোনও ইচ্ছেতে বাধা দিইনি মা, নিজে বরাবর বাবাকে দুঃখ দিয়েছি বলে—আমি চাইনে মা তোমার কোনও ইচ্ছেতে আমি বাধাস্বরূপ হই—আর তোমার মা যদি ভালো থাকতেন তো তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখতাম, কিন্তু তিনি তো এখন এ সংসারের বাইরে—

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে —কিন্তু আপনি তো দেখেছেন বাবা—আপনি চিনেছেন তাকে—

—শুধু একদিন নয়, ওরা আমাদের সমাজের পুরনো লোক—বিদ্বান বুদ্ধিমান আর খুব স্থিরবুদ্ধি বলে মনে হয়েছে আমার, ওর বাবাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি—তোমার জন্মদিনে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে তুমি ঠিক মানুষটিকেই বেছে নিয়েছ বলে মনে করি—আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হবে—

জবা বললে—কিন্তু কি জানি যেন কেমন ভয় করছে আমার—আমি আপনাকে ছেড়ে থাকবো কেমন করে?

—তুমি থাকবে মা আমার কাছে—তোমরা দুজনেই থাকবে—নইলে এসব কে দেখবে, আমার আর ক'দিনের? উনি তো না-থাকার মধ্যে—আর আমি? যতদিন বেঁচে থাকি আমাকেও তোমরাই দেখবে—দেখবে না মা?

জবা চুপ করে রইল।

সুবিনয়বাবু বললেন—আর এই

মোহিনী সিঁদুর ওটা যতদিন আছে থাক, বাবার কাছে কথা দিয়েছিলাম চালাবো, তাই চালালাম, তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, যদি ইচ্ছে হয় চালিও, আর যদি না চলে তবেও ক্ষতি নেই। তোমাদের জন্যে যথেষ্ট অর্থ রেখে যাবো মা—তোমাদের কোনও দিন উপার্জন করতে হবে না, তবে যদি পারো অন্য ব্যবসা করো—নতুন যুগ আসছে—। আমি আর কিছু চাইনে, পরম গতিও চাই না, অষ্টসিদ্ধিও চাই না—সেই গানটা একবার গাইবি মা, অনেক দিন শুনিনি—জয়জয়ন্তীর ধ্রুপদ—নাথ তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু—

জবা একটু পরেই গান আরম্ভ করলে—

নাথ তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু
তুমি ঈশ তুমি মহেশ
তুমি আদি তুমি অন্ত,
তুমি অনাদি তুমি অশেষ...

নিঃশব্দে ভূতনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তখনও জবার গান চলছে। কাল সকালে বেলা কাগজটা সই করালেই চলবে। টেবিল পরিষ্কার করে আরো খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে লাগলো ভূতনাথ। গানে সত্যিই যেন জবার তুলনা নেই। অন্তত একটা বিষয়ে সে যেন সকলের চেয়ে বড়।

রাস্তা দিয়ে সোজা আসতে আসতে একবার সময়টা আন্দাজ করলে। ননী হয়ত হেঁদোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ। বাঁ দিকের একটা গলি দিয়ে সোজা গেলেই হেঁদোর কোণটা পড়বে। ভূতনাথ হেঁদোর সামনে এসে দাঁড়াতেই চারপাশে নজর দিয়ে দেখলে। মনে হলো দক্ষিণ দিকের একটা আলোর নীচে যেন ননীলাল দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কাছে যেতেই ভুল ভাঙলো। ননীলাল নয়, অন্য লোক। অনেকটা যেন ভৈরববাবুর মতন দেখতে। আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ভূতনাথ। তবে হয়ত তার দেরি দেখে চলেই গেছে। ভালোই হয়েছে। ভূতনাথ রাস্তায় পা বাড়িয়েই ভাবলে ভালোই হয়েছে। দেখা হয়ে গেলে আর এক কাণ্ড হতো। হয়ত এড়াতে পারতো না।

আবার বড়বাড়ির দিকে ঘোরা পথ দিয়ে চলতে লাগলো ভূতনাথ। তাড়াতাড়ি পেঁছুতে হবে। বৌঠানকে সিঁদুরটা দিতে হবে আজ।

হঠাৎ পেছনে কে যেন ডাকলে—শালাবাবু—

অবাক হয়ে গেছে ভূতনাথ। এখানে এত রাত্রে কে তাকে ওই নামে ডাকবে!

ভালো করে দেখে ভূতনাথ বললে—শশী! তুই!

ছুটুকবাবুর চাকর—শশী! শশীর এ কী চেহারা হয়েছে। এত রাত্রে এখানে কেন? গানের আসর কি তবে বসছে না আজ?

শশী বললে—শালাবাবু কিছু পয়সা দিতে পারেন?

পয়সা! পয়সা তো সঙ্গে নিয়ে আসেনি ভূতনাথ।

বললে—পয়সা কি হবে? আর এত রাতে এখানে কেন তুই? ছুটুকবাবু কোথায়?

—আজ্ঞে ছুটুকবাবু তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়—

শশীর চুল উস্কো-খুস্কো। মনে হয় যেন অনেকদিন খায়নি। অথচ শশীর চুলের কি বাহার ছিল। ঢেউ-খেলানো চুলটার কী কসরৎ করতো। কাল-পরশুই যেন দেখেছে বড়বাড়িতে।

—কেন, তোকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে শশীও বলতে লাগলো। বললে—এতদিন ছুটুকবাবুর সেবা করলাম, আপনি তো দেখেছেন সব, গানের আসর আমি না হলে চলতো না, রাত একটা দুটো পর্যন্ত আমি নিজের হাতে সিদ্ধি বেটেছি। গেলাস সাজিয়েছি এখন আমার অসুখ হতেই তাড়িয়ে দিলে—

ভূতনাথ ভালো করে আপাদমস্তক দেখলে শশীর। রোগটা কী!

জিজ্ঞেস করলে—রোগটা কি তোর?

শশী শালাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে—এই বামুনের পা ছুঁয়ে বলছি, মাইরি শালাবাবু জগন্নাথের দিব্বি, আমার কোনও দোষ নেই, আমি বাড়ির বাইরে একটা রাতও কাটাই না; নেশা-ভাঙটা পর্যন্ত করি না, আমার নামে মিছিমিছি দোষ দিয়েছে গিরি—

—গিরি!
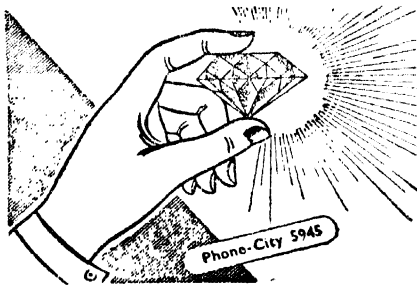
—হ্যাঁ, মেজমার ঝি গিরি।

—সে কেন লাগবে তোর পেছনে?

—আপনি সব জানেন না শালাবাবু, গানের আসর যখন শেষ হয়, তখন কতদিন ঘুম পায় আমার, কিন্তু তখন গিরি আসে ছুটুকবাবুর ঘরে—ছুটুকবাবু তখন নেশায় অজ্ঞান থাকে, আমি হেন চাকর বলেই সব কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করি—

ভূতনাথ যেন কিছু বুঝতে পারলে। গিরির চেহারাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করলে ভূতনাথ। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল

গিরির সেই লম্বা ঘোমটা টেনে দেওয়া। আর অসাক্ষাতে বাড়ির মধ্যে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করা। তারপর সেই প্রথম রাত্রে যেদিন ছুটুকবাবুর আসরে তবলা বাজাতে গিয়েছিল, সেদিন সেই মধ্যরাত্রে অন্ধকার ঝাপসা ছায়ামূর্তি।

শশী বললে—বংশীকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন শালাবাবু,—ছুটুকবাবুর যখন অসুখ হয়েছিল এই শশী সেদিন কি সেবা করেছিল, কোথায় ছুটুকবাবু ছটফট করেছে, নিজের ছুঁচিবেয়ে মা পর্যন্ত কাছে মাড়ায়নি, এই শশীই সেদিন পুঁজ-রক্ত পরিষ্কার করে দিয়েছে, কাপড় সাফ করে দিয়েছে—বাবুদের বেলায় কোনও দোষ নেই—চাকরদের বেলাতেই অশুদ্ধ—

বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল হাঁটিতে হাঁটতে।

শশী বললে—আর ওদিকে যাবো না হুজুর, মধুসূদন দেখতে পেলেই অনর্থ বাধবে—মধুসূদন কী করবে তোর!

—আজ্ঞে মধুসূদন কি কম লোক, বলে—চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব এ তল্লাটে এলে—অথচ বুড়ো সব জানে, কার দোষ, কার দোষ নয় সব জানে বুড়ো—একটা পয়সা নেই যে দেশে চলে যাই—

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই শশী চলে গেল।

ভূতনাথ বড়বাড়িতে ঢোকবার মুখে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি হলো।

ভদ্রলোক সামনা-সামনি এসে বললেন —ব্রজরাখালবাবু এ বাড়িতে থাকেন?

ভূতনাথ বললে—হ্যাঁ—

—একবার ডেকে দেবেন তাঁকে, বড় দরকার—

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে চারদিক দেখে নিলে। আশেপাশের দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করলে। তারপর এসে বললে—তিনি তো বাড়িতে নেই এখন—কিছু বলতে হবে?

ভদ্রলোক কেমন যেন অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন।

বললেন—আজ তিন-চার দিন দেখা নেই তাঁর—এখানে আছেন তো তিনি?

—আছেন এখানে, তবে সব দিন এখানে আসেন না রাত্রে—ভূতনাথ বললে।

—আজ যদি আসেন তো একটা খবর দেবেন তাঁকে, বলবেন মেছোবাজারের সেই ফুলবালা দাসী, আজ দুপুর থেকে আবার ভেদবমি শুরু হয়েছে তাঁর, একটা ওষুধ নিয়ে যেন যান আজ রাত্রেই,...... ব্রজরাখালবাবু আপনার কে হন?

—আমার ভগ্নিপতি তিনি—

ভদ্রলোক যেন খুব ব্যস্ত। বললেন—তা'হলে এখন চলি আমি, বলবেন তাঁকে, ভুলবেন না—

ভূতনাথ বললে—ফুলবালা দাসীর নাম করলেই চিনতে পারবেন তো তিনি?

ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—তা চিনবেন বৈকি! উনি নিজেই ফুলবালাকে পাদরীদের হাত থেকে বাঁচালেন, হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, সেই ফুলবালা আবার বিধবা হলো—একটা পয়সা নেই হাতে যে, নিজের পেটটা চালায়, ওই ব্রজরাখালবাবু না থাকলে ফুলবালাকে হয়ত দেখতেন কবে খৃস্টান হয়ে গিয়েছে—নিজে পকেট থেকে মাসোহারা দিয়ে এতদিন চালাচ্ছেন—আর নামটা ভুলে যাবেন? আর যদিই চিনতে না পারেন তো বলবেন কদম এসেছিল—

—কদম?

হ্যাঁ, আমার নাম। আমার ডাক-নাম। আর পুরো নামটা যদি মনে থাকে তো বলবেন যুবক সঙ্ঘের কদমকেশর বোস—

তারপর যাবার সময় বললে—উনিই তো যুবক সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট কি না—

হন হন করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। এতক্ষণে ভূতনাথ ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে—কামিজ গায়ে, অল্প-অল্প দাড়ি গোঁফ উঠেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না, তবু বেশি বয়স হয়নি যেন ভদ্রলোকের। লোকটি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার পর ভূতনাথ বাড়ির ভেতর আবার ঢুকলো।

(ক্রমশ)

অসমঞ্জ সন্তান

শ্রীবিজয়কেতু বসু

রা**মায়ণে** আছে সগরপুত্র অসমঞ্জ অতি দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে সরযূর জলে ফেলে দিত। সগর তাকে কোন-রকমে শুধরতে না পেরে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। অসমঞ্জর কাহিনী ভারতের অতি প্রাচীন ইতিহাসের কথা এবং রাজনীতিমূলক ইতিহাসের দিক থেকে এর বিশেষ গুরুত্ব না থাকলেও প্রাচীন ভারতের নিপুণ ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত সত্যানুরাগের পরিচয় স্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটি পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। অসমঞ্জের মত চরিত্র আমরা আজও দেখতে পাই, যেখানে বাপ মা অবাধ্য সন্তানকে কোন-রকমে সামলাতে না পেরে হাল ছেড়ে বসে থাকেন। অসমঞ্জর চরিত্রগত বৈলক্ষণ্য কত বয়সে শুরু হয় সে কথার উল্লেখ অবশ্য রামায়ণে নেই তবে আধুনিক 'অসমঞ্জ'দের সম্পর্কে বলতে পারি যে, চরিত্রের এই অস্বভাবিতা সাধারণত শৈশবেই শুরু হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক 'অসমঞ্জ'কে শুধরানো হয়তো অসম্ভব নয় কিন্তু খুবই শক্ত কাজ। পক্ষান্তরে শিশু 'অসমঞ্জ'দের মধ্যে অনেককেই উপযুক্ত চিকিৎসায় স্বাভাবিক করে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। এই বিষয়ে পথিপ্রদর্শক আউগুস্ট আইশহর্ন, অ্যানা ফ্রয়েড, মেলিটা স্পিডেবেয়র্গ প্রমুখ মনীষিগণ।

অসমঞ্জ শিশুর অর্থাৎ যার অসমঞ্জর মত শাসনে বা আদরে কিছুতেই সামাজিক কর্তব্যবোধ আসে না তার লালন পালনে অনেক রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। বোধহয় এইজন্যই ইংরাজীতে এরকম ছেলের নাম—প্রবলেম চাইল্ড। ইংল্যান্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ধনবান পাশ্চাত্ত্য দেশ-গুলিতে যে যে পদ্ধতিতে এই অসমঞ্জ শিশুর চিকিৎসা হয়, তার তুল্য ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত হবার শীঘ্র কোন রকম আশা নেই। এ অবস্থায় আমাদের এমনভাবে কাজ শুরু করা উচিত যাতে গোড়ায় কয়েকটি প্রাথমিক কেন্দ্র খোলা হবে এবং সেখানে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ দান ও ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-ব্যবস্থায় যে কুশলী কর্মিমণ্ডলী দরকার হবে, তাদের শিক্ষার আয়োজন—দুই-ই থাকবে। যেকোন চিকিৎসা-ব্যবস্থার সফলতা ডাক্তার, নার্স, ঔষধপত্র প্রভৃতি উপকরণ ছাড়াও রোগী ও রোগীর তরফের আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতার ওপরেও অনেকটা নির্ভর করে। অনেকের ধারণা আছে "ডাক্তারে যা বলছে, তাই করছি অতএব সহযোগিতাও পূর্ণমাত্রায় ঘটছে." একথাটা সবটা ঠিক নয়। মৌখিক সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাও অনেকটা দরকার হয়। রোগীর মধ্যে এই পূর্ণ সহযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলা প্রধানত চিকিৎসকেরই দায়িত্ব কিন্তু লোকশিক্ষামূলক প্রচারকার্য এবিষয়ে চিকিৎসককে অনেকটা সাহায্য করতে পারে। অসমঞ্জ শিশুর চিকিৎসায় এই লোকশিক্ষা বড়ই দরকারী। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে যে জটিলতা আছে এবং যতটা ধৈর্যের সঙ্গে চিকিৎসার ফলাফল অপেক্ষা করতে হয় লোকশিক্ষার মারফৎ বাপ-মা অথবা অন্য অভিভাবককে তার খানিকটা ধারণা দেওয়া থাকলে কাজের অনেক সুবিধা হয়।

অসমঞ্জ শিশু নানাশ্রেণীর হয়ে থাকে। এই শ্রেণী বিভাগ মূল কারণের বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই কটি শ্রেণী দেখা যায়—

১। যেখানে মূলকারণ শিশুর ঊনমানসতা অর্থাৎ জন্মাবধি যার মনের ভাল বাড় হয় না অথবা সাধারণ শিশুর তুলনায় খুব ধীরে ধীরে হয় এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বয়সেও অপরিণত থেকে যায়।

২। যেখানে মূল কারণ শিশুর মৃগীজাতীয় কোন ব্যাধি।

৩। যেখানে মূল কারণ শিশুর বাতুলতা জাতীয় কোন ব্যাধি।

৪। যেখানে মূল কারণ শিশুর শারীরিক কোন ব্যাধি।

৫। যেখানে মূল কারণ শিশুর মানসিক প্রতিবেশ।

এই কটি মূল শ্রেণীকে বিভিন্ন উপশ্রেণীতেও ভাগ করা চলে। এ ছাড়া লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য অনুসারেও কেউ কেউ শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। বাহুল্য বিবেচনায় সেগুলির উল্লেখ এখানে স্থগিত রাখলুম। এবার কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে অসমঞ্জ শিশুর চিকিৎসার এবং লালন পালনের জটিলতা সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতে চাই।

বার বছরের ছেলে, মেধাবী না হলেও স্কুলে পরিশ্রমী ছাত্র বলে শিক্ষক মহলে সুনাম আছে এবং নম্র স্বভাবের জন্য সকলের প্রিয়পাত্র। বয়সের অনুপাতে শরীর খর্ব ও কৃশ। পিতা সাধারণ গৃহস্থ। হঠাৎ ছেলেটির কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। ছেলেটির মাঝে মাঝে অশ্লীল গালাগালির ঝোঁক হতে লাগল এবং সে সময় কোন পাত্রাপাত্র বা স্থানকালের বিচার তার থাকত না। স্কুলে, বাড়িতে গুরুজনের সামনে রাস্তায়, নিমন্ত্রণ সভায় কোথাও ছেলেটিকে বুঝিয়ে এমন কি মারধর করেও সামলান গেল না। এত ভাল ছেলে যে কি করে এরকম খারাপ কথা উচ্চারণ করতে পারে তা ভেবে বাপ মা মাস্টারমশায়রা সকলেই আশ্চর্য হলেন, কিন্তু কোন উপায় করা গেল না। ছেলেটির ইস্কুল যাওয়া বন্ধ হল, বাপ-মা বিশেষ চিন্তিত হলেন। সামাজিক জীবনও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এল—মেলামেশা, বন্ধুবান্ধব সব একে একে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকেরই ধারণা হ'ল যে সে দুষ্টামি করে ঐ রকম ব্যবহার করছে এবং সেটা কুসংসর্গের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় ছেলেটিকে পরীক্ষা করে একদিন জানা গেল যে এই বিসদৃশ আচরণের জন্য তাকে মোটেই দোষী করা চলে না; মৃগী জাতীয় এক মানসিক ব্যাধিই এর কারণ। রোগ নির্ণয়ের পর উপযুক্ত ঔষধে সমস্ত লক্ষণেরই দ্রুত উপশম হ'ল। যথেষ্ট মাত্রায় বহুদিন ধরে ঔষধ খাওয়ানের পর ছেলেটি পুরোপুরি রোগের হাত থেকে রেহাই পেলে এবং তখন তার বাপ মাকে কেবল এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হল যে রোগের কোন লক্ষণ না থাকলেও যতদিন চিকিৎসক বলবেন ততদিন যেন ঔষধ কিছুতেই বন্ধ করা না হয়, নচেৎ তাড়া-

তাড়ি ঔষধ বন্ধ ক'রলে রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

এখানে যেমন সহজে সমস্ত জটিলতার একটা মীমাংসা হয়ে গেল অসমঞ্জ শিশুর সকল ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম নাটকীয় ফল ঘটতে দেখা যায় না। মৃগী জাতীয় ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুর লক্ষণও বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, সকলেই যে গালাগালি করে তা নয়। কেউ ঢিল ছোঁড়ে, কেউ মারপিট করে, কেউ বা জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করে। অন্য সময়ে শান্তশিষ্ট স্বাভাবিক সুবোধ ছেলে হয়ে থাকলেও যখন 'ভূত চাপে' তখন একেবারেই কথার অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং ঘটনার পর প্রায়ই কি হয়েছিল তা' মনে করতে পারে না।

এবার আর এক ধরণের অসমঞ্জ শিশুর কথা বলব। রোগী একটি সাত বছরের ছেলে—বাবা মা এই বলে দুঃখ করলেন যে, ছেলেটি তিন বছর বয়সে খুব বুদ্ধিমান্ ছিল—ভারি চটপটে ছিল, কিন্তু তারপর কি হল ক্রমশই যেন বোকা হয়ে যাচ্ছে—লেখাপড়ায় মন নেই, কিছুই মাথায় ঢোকে না অবাধ্যতা বেড়ে যাচ্ছে, বড়ই একগুঁয়ে, সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল শাসনে বা মিষ্টি কথায় কিছুতেই বোঝান যায় না—বেয়াড়াপনা কমবার নাম নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেল ছেলেটি ঊনমানস পর্যায়ের। বাপ-মা তিন বছর বয়সে যাকে বুদ্ধির পরিচয় বলে মনে করেছিলেন তা রোগের দরুণ অতিরিক্ত চঞ্চলতা মাত্র। ঊনমানস শিশুকে যদি তার মানসিক ক্ষমতার অতিরিক্ত পড়ার চাপ দেওয়া যায়, তাতে অনেক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক শিশুকে যে পদ্ধতিতে পড়ান হয় ঊনমানস শিশুকে সে পদ্ধতিতে পড়ান তার উপর একটা অত্যাচার করার সঙ্গে সমান। এই সমস্ত কথা বুঝিয়ে বাবা মাকে বলা হ'ল যে—তাঁদের ছেলের বুদ্ধি জন্মগতভাবেই সাধারণের তুলনায় অনেক কম এবং বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু বাড়লেও কোনদিনই সাধারণ প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের যতটা বুদ্ধি হয়, তার সমান হবে না, এমন কি নিজের ভাল মন্দ বিচার করে সংসারে চলবার মত বুদ্ধিও তার হবে না, চিরদিনই কোন না কোন অভিভাবকের দরকার হবে। সব শুনে তাঁরা খুবই দমে গেলেন। আরও নিরাশ হলেন, যখন শুনলেন এর কোনও ওষুধপত্র বা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি যাতে বুদ্ধি বাড়িয়ে তাকে স্বাভাবিক করে দেওয়া যায়। মানুষ কিন্তু অতটা চট করে হাল ছেড়ে দেয় না কাজেই এ অবস্থায় কি করা উচিত তার পরামর্শ যখন তাঁরা চাইলেন, তাঁদের বলা হল যে এ অবস্থায় আমাদের একমাত্র আশা ছেলেটির যেটুকু বুদ্ধি আছে তাকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগান। সাধারণ স্কুলে বা সাধারণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এ জাতীয় ছেলেদের বুদ্ধির বিকাশ করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সহানুভূতিশীল এবং কুশলী শিক্ষক না হলে কোন সুফল পাওয়া শক্ত। দক্ষ শিক্ষক অনেক সময়েই এ ধরণের ছাত্রের বিস্ময়কর উন্নতি করে দিতে পারেন, তবে সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে একটা বড় প্রভেদ এই যে উন্নতি বজায় রাখতে হলে ছাত্রকে বরাবরই নিয়মিত শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকতে হবে।

আর একটি দু বছরের ছেলের কথা বলি। বাপ-মা বললেন ছেলেটি বরাবরই নিরীহ, বুদ্ধিহীন, নির্জীব জড়ভরত গোছের—চটপটে ভাবটা নেই, কথাবার্তা কম, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এবং এর জন্য তাঁরা একটা মানান-সই নাম ঠিক করছেন ভোম্বল। উপস্থিত ছেলেটির যাতে একটু বুদ্ধি হয়, তার কোনরকম ওষুধ বা চিকিৎসা আছে কি না জানতে এসেছেন। জিজ্ঞাসার ফলে জানা গেল ছেলেটির এক ভাই জড়বুদ্ধি বা ঊনমানস এবং এক কাকাও সেই রকম। কাজেই ভোম্বলের বেলাতেও সেই সন্দেহ জাগল। আরও খবর নিতে কিন্তু জানা গেল ভোম্বল সাধারণ অন্যান্য ছেলের মতই সব বিষয়ে সময়মত বেড়ে উঠেছে যেমন হামা দিতে শেখা, দাঁড়াতে শেখা, হাঁটতে শেখা, প্রথম কথা বলা, দাস্ত প্রস্রাব সামলাতে শেখা ইত্যাদি। ঊনমানস শিশুর বুদ্ধির অভাব ছাড়াও সাধারণত কতকগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকে যথা তালুর খিলানটি সাধারণ শিশুর তুলনায় খুব উঁচু হয়। ভোম্বলের বেলায় সে সমস্তও কিছু নজরে পড়ল না। সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর নিতে জানা গেল—ভোম্বলের জ্বরজারি বিশেষ হয় না, তবে মধ্যে মধ্যে পেট খারাপ হয় এবং ক্রিমিও আছে, তা ক্রিমি ত ছোট ছেলেপিলের হয়েই থাকে, তাতে আর এমন কি আসে যায়? আরও জেরার পর টের পাওয়া গেল যে কেঁচোর মত একটা জিনিস দু মাস আগে একবার ভোম্বলের পেট থেকে বেরিয়েছিল। এসব জিনিস তাঁরা হামেশাই দেখেন বলে অতটা গুরুত্ব দেননি। ছেলেটি আপাতত ভালই আছে, তবে তাঁরা শুনলেন আজকাল নাকি বুদ্ধি বাড়িয়ে দেবার আর মাপবার কৌশল একটা আবিষ্কার হয়েছে তাই কতকটা কৌতূহলবশেই ছেলেটিকে দেখাতে এনেছেন। 'কেঁচো' অর্থাৎ round worm-এর খবর পাওয়ার পর চিকিৎসার একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল। সেই চিকিৎসার ফলে যখন ভোম্বলের পেট থেকে প্রায় আরও ডজন খানেক 'কেঁচো' বেরুল, তার চেহারা আর চাল-চলনের আশ্চর্য পরিবর্তন হল। ঊনমানসতার সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে ভোম্বল স্বাভাবিক শিশুর মত হাসিখুশি খেলায় মেতে উঠল এবং বয়সের যোগ্য বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগল।

এবার একটি সাত তের বছরের ছেলের কথা বলে প্রবন্ধটি শেষ করব। ছেলেটির বড় ভাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ছেলেটির গোলমাল সে ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে আর এমন গুছিয়ে কথা বানাতে পারে যে, কথাটাকে মিথ্যে বলে হঠাৎ কোন সন্দেহই হয় না। এই মিথ্যে কথার সাহায্যে ঠকিয়ে সে বহুলোকের কাছ থেকে পয়সা এমনি নিয়েছে বা ধার বলে নিয়েছে এবং সে পয়সায় তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বায়োস্কোপ দেখেছে, আর হোটেলে খেয়েছে। এই বদ অভ্যাস তাকে কেউই ছাড়াতে পারেনি। বহুবার ধরা পড়ে মার খেয়েছে, ঘরে শেকল দিয়ে আটক রাখা হয়েছে, খাওয়া বন্ধ করা হয়েছে, মিষ্টি কথা, আদর পুরস্কারের লোভ, পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করান কিছুই বাদ যায়নি, কিন্তু যে কে সেই—তার স্বভাবের কিছু মাত্র অদল বদল করা যায়নি। পরীক্ষায় দেখা গেল ছেলেটির বুদ্ধির কোন বিকার নেই, কথাবার্তা খুবই স্বাভাবিক, ব্যবহারে ভদ্রতা বা শিষ্টতার কোন অভাব নেই। নিজের

অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন, তার বিসদৃশ ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চাইতে সলজ্জ অনুতাপের ভঙ্গীতেই মাথা নীচু করে রইল। শারীরিক কোন ব্যাধিরও কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না। বংশ পরিচয়েও কোন গুরুতর মানসিক ব্যাধির ইতিহাস দেখা গেল না। যে সব ক্ষেত্রে সাধারণ উপায়ে রোগের কারণ নির্ণয় করা যায় না, সে সব জায়গায় একটু বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত এবং রোগীকে বেশী দিন ধরে নজরে রাখার দরকার হয়। এখানে একটা কথা বলা ভাল যে, যে কোন রোগের চিকিৎসার পদ্ধতিকে মোটামুটি দু'ভাবে ভাগ করা যায়—প্রথমত লক্ষণ বিচার ক'রে তার উপশম সাহায্যে অবস্থাটা সামলে যাওয়া যাতে স্বভাবের নিয়মে আপনিই রোগ সেরে যায় এবং দ্বিতীয়ত রোগের মূল কারণ নির্ণয় করে তাকে শান্ত করা। দ্বিতীয় পন্থাই উৎকৃষ্টতর, তবে প্রথমটিই সোজা রাস্তা। অনেক সময়েই দ্বিতীয় পথ বহু সময়সাপেক্ষ এবং বিঘ্নসংকুল হয়ে দাঁড়ায়। এই ছেলেটির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথম রাস্তাই বন্ধ কেন না চিরাচরিত কোন উপায়েই বাগ মানান যায়নি। বাতুলতা বা কোন রকম শারীরিক খুঁত না থাকায় ঔষধপত্রেও কোন উপকার হবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব ঐ বিঘ্ন-সংকুল দ্বিতীয় পথেই মূল কারণের সন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই তা বেশ বোঝা গেল। ছেলেটির আচার লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায় যে, অসামাজিক কাজে তার অস্বাভাবিক আশক্তি, লোভের চেয়ে জিদের বশেই বেশী পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে অসামাজিক কাজ করে কোন লাভ নেই অথচ লোকসান অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও সে অসামাজিক কাজ করছে। নেহাৎ যেখানে গায়ের জোরে তাকে আটকান হচ্ছে, সেখানেই কেবল শান্তশিষ্ট ভাল মানুষ সেজে চুপ করে থাকছে। পক্ষান্তরে এই জিদ থাকলেও তার বাস্তব-বুদ্ধির অভাব নেই, যেখানে অসামাজিক ক্রিয়াটি তার ক্ষমতার বাইরে সেখানে সে ভদ্র ও শান্তই থাকছে। পরিণামে তার ভাল হচ্ছে না, একথাও সে বোঝে, তবে 'কেয়ার' ক'রে না। কাজেই তার জিদকে একরকম বিদ্রোহ বলা যেতে পারে। এই বিদ্রোহের ভাবই তার রোগের মূল কারণ, এ সন্দেহ জাগবার পর প্রশ্ন উঠল, বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? কি জন্য? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার মধ্যেই চিকিৎসার যত জটিলতা ও কঠিনতা আরম্ভ। এ জাতীয় চিকিৎসা মনঃসমীক্ষণ সম্মত প্রণালীতেই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। প্রধানত দু' পদ্ধতিতে এই চেষ্টা চলতে পারে—

১ম। সপ্তাহে কয়েকদিন করে ছেলেটির সঙ্গে নিয়মিত আলাপ করা এবং কোন সমাজ সেবক অর্থাৎ 'সোশ্যাল ওআর্কার' মারফৎ ঘন ঘন তার বাড়ির খবর নেওয়া। তা ছাড়া বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলাপ। এর উদ্দেশ্য ছেলেটির মন এবং তার মানসিক প্রতিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলছে, সেগুলি লক্ষ্য করা।

২য়। ছেলেটিকে তার প্রতিবেশ থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা প্রতিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা, যেখানে সে তার অভ্যস্ত বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে সুবিধে ক'রতে পারবে না। এর জন্য সব চেয়ে ভাল উপায় মনঃসমীক্ষণসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত সংশোধনাগার। এখানে রেখে সংশোধনের চেষ্টা বাড়িতে রেখে করার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত নেই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার 'মানসিক প্রতিবেশ' শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের জীবন কতকগুলি স্থির বস্তুর সংগ্রহ মাত্র নয়, প্রবাহ বিশেষ বা ঘটনা-পরম্পরা। আমাদের প্রতিবেশও তেমনি প্রবাহ বিশেষ এবং বর্তমান প্রতিবেশের চেয়ে অতীত প্রতিবেশের প্রভাব আমাদের উপর কোন অংশে তুচ্ছ নয়, কেন না এই অতীত প্রতিবেশকে আমরা কখনই পুরো ছাড়তে পারি না—আমাদের সত্তার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। একে অবশ্য খানিকটা আলাদা করা যায় ও তার সংশোধনও করা যায়। যে ছেলেটির দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি, সে জাতীয় অসমঞ্জ চরিত্রের বিশ্লেষণে প্রায়ই প্রতিবেশের একটা গণ্ডগোল দেখা যায়, কিন্তু তার মূল সব সময়ে বর্তমানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, আর সাধারণত আমরা যাকে তুচ্ছ ঘটনা বলি, অনেক সময়ে তার ভিতরেও তাকে পাওয়া গিয়ে থাকে। এখানে স্থূলভাবে দেখলে মনে হতে পারে—যে প্রতিবেশে ছেলেটির আরও ভাইবোন মানুষ হয়েছে অথচ স্বাভাবিক রয়েছে, সেই প্রতিবেশের দোষে ছেলেটি কি করে খারাপ হল? প্রতিবেশের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভিন্ন এর উত্তর নাই।

পাঠকদের কৌতূহল থাকতে পারে ছেলেটির কি হল? তার প্রতিবেশে কি খুঁত পাওয়া গেল, কি করে সেগুলি তাড়ান হল ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপারে আমার অবস্থাও ঠিক পাঠকদের মত। ছেলেটি আর না আসায় অর্থাৎ তাকে আর না নিয়ে আসায় (কেন না এ সব ছেলে কখনই স্বেচ্ছায় সহজে আসে না), কোন প্রশ্নেরই মীমাংসার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

আশ্রয়

সুশীল জানা

—এক—

দলের রাতকানা লোকটা জিজ্ঞেস করলে, 'আরও কত্‌টা পথ হে?'

'রাত দু-পহর পর্যন্ত হাঁট শালা এখন—তারপর হাট-চালায় গিয়ে মাথা গুঁজবি।' পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি বললে, 'হাঁট এখন মুখ বুজে।'

কিন্তু মুখ বুজে থাকা তার পক্ষে কঠিন—হোঁচট খাচ্ছে সে পায় পায়, হাত ধরে চলেছে একজনের। বকে মরছে বিড় বিড় ক'রে। দলের আর সবাই চুপ। মাথায় কাঁধে মোট—পিঠে বোঁচকা, কোনো মেয়ের বোঁচকায় ঘুমন্ত শিশু। দলটিতে প্রায় মেয়ে মরদ ক'রে জনাদশেক হবে—চলেছে কোনো নতুন হাট-খোলার উদ্দেশে পুরানো কোন হাট-খোলা ছেড়ে। মাথায় পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছে ঘর-সংসার—হাঁড়িকুড়ি কাঁথা চ্যাটাই—মায় টঙ বাঁধার বাঁশ-বাখারিটি পর্যন্ত।

জাতে ওদের বলে 'কাক-মারা'—কোন্ বুনো পুজোর পদ্ধতিতে কাক ধরে বলি দেয়, কাকের মাংস খায় পরম উল্লাসে! ব্যাধের মতো পাখী শিকার করে—হয়তো বুনো পাখী সব সময় সহজলভ্য নয় বলে সুপ্রচুর কাককুল ওদের পরম ভোজ্য। বেদের মতো ঘুরে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাথা গোঁজে হাট-চালার আশেপাশে। গলায় লালনীল কাঁচের মালা—পুরুষেরা পাখী শিকার করে আর ভেল্কি ভোজবাজী দেখায়। আর তেড়ে নেশা করে গাঁজাগুলির। মেয়েরা ঝুড়িতে ক'রে বেচতে নিয়ে আসে সস্তা দামের সাবান তেল আয়না ইত্যাদি গ্রামের গেরস্থ মেয়ে ভোলানো শৌখীন টুকিটাকি জিনিস, আর নবীন যুবক চাষী ছোকরাদের টান মারে কখনো বা চোখ ঘুরিয়ে। জীবিকার পক্ষে উপযোগী হলে নিজেরা টঙ বাঁধে হাট-খোলার আশেপাশে যতো খানি আগ্রহে, ঠিক ততোখানি ঔদাসীন্যেই আবার হুট ক'রে চলে যায় কবে সব ভেঙে দিয়ে। মাতৃভাষা তেলেগু—কিন্তু দিব্যি কথা বলতে পারে স্থানীয় ভাষায়। কবে ওরা মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কে জানে—দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার সীমান্তের অঞ্চল থেকে অঞ্চলে।

দলের রাতকানা লোকটা পড়ে গেল দড়াম ক'রে একেবারে হুমড়ি খেয়ে।

পাশের জোয়ান মতো ছোকরাটি গাল দিয়ে বললে, 'শালা গোবনা সাঁঝ-পহর থেকে দড়াম দড়াম ক'রে পড়তে লেগেছে গো।'

শুধু পড়া নয়—এবার গোবনা আর উঠছেও না। যার হাত ধরে ধরে যাচ্ছিল সে বলে উঠলো, 'উঠছে না যে গো!'

'মরেছে!'

দল দাঁড়ালো থমকে।

শীতের রাত। চাঁদের আলো নেই। কুয়াশায় সবটা আচ্ছন্ন।

বাগাম্বর বুড়ো ঘোলাটে চোখ তুলে চারদিকে চেয়ে বললে, 'কত্‌ দূর এলম বলো দেখি?'

কে একজন বললে, 'নদীচরের জাল-পাই মহাল এখনও ছাড়াতে পারি নি।'

'তবে!'

রাতকানা গোবনা উঠেছে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে। বললে, 'পা দুটা মোর বশ থাকছে না কোনো রকমে।'—

পাশের জোয়ান ছোকরাটি খেঁকরে উঠে বললে, 'তবু বলবে না শালা-চোখে দেখতে পায় না।'

বাগাম্বর বললে, 'এক কাজ করা যাক এসো।'

দলের বুড়ো লোকটির কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সবাই।

বাগাম্বর বললে, 'মোদের এক বেটির ঘর এইখানে—আজ রাতটা থাকি চলো সেখেনে।'

'মোদের বেটি?'

'হাঁ গো—মোদের জাতের মেয়া। দল ছেড়ে চলে গেল একদিন সে একটা উদো চাষীর সঙ্গে। তার ঘর এই জালপাই মহালে।' বাগাম্বর বললে, 'জমিন গোরু ছাগল হাঁস মুরগী—ঘরদোর সব জমজমাট। মেয়াটা ভারী পয়মন্ত কি-না।'

'কে বলো দিকিন!'

'আন্দি। মোর এক স্যাঙাতের বেটি। চিনবেনি তোমরা।'

'কিন্তু তোমাকে সে চিনবে তো?'

'চিনবেনি! বল কি!' বাগাম্বর এক গাল হেসে বললে, 'মোরা যাই না বলে কত গোসা করে বেটি মোদের। গেলে

খাতির করবে কত! আর তার অভাবই বা কি বলো। গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ।'

ভূতের মতো লোকগুলোর জিভের তলায় জল এসে গেছে ততোক্ষণে, সমস্বরে প্রায় বলে উঠলো সবাই, 'চলো।'

দলটি মোড় ফিরলো উত্তর থেকে পুবে।

রাতকানা গোবনা ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে চলতে চলতে বললে, 'মোদের জন্যে তা হলে মাছটাছ ধরবে—কি বলো?'

বাগাম্বর বুড়ো বললে, 'অতো রাতে মাছ কি আর ধরবে! তবে হাঁস মুরগী একটা কিছু মারতে পারে।'

মাছ নয়—একেবারে মাংস! কাক খাওয়া তিতকুটে মুখগুলো এক লহমায় যেন সজল হয়ে উঠলো স্বাদে আর গন্ধে। দলের বুড়ো বাগাম্বরের পেছনে পেছনে চলেছে ওরা—হাঁটার গতি গেছে বেড়ে—মায় গোবনার পর্যন্ত।

দলের সামনের একজন বলে উঠলো, 'নতুন হাঁড়ি পড়েছে গো দাদা।'

বাগাম্বর শুধালো, 'শ্মশান?'

'তাই তো দেখি।'

বাগাম্বর বললে, 'শ্মশান পার হয়ে বাঁয়ে বেঁকবে।'

আগের লোকটার চোখ তখনো শ্মশানের মড়াফেলা হাঁড়ির দিকে। বললে, 'অনেক হাঁড়ি গো।'

গোবনা বললে, 'মোর ভাতের হাঁড়ি নাই—একটা বেছে তুলে দে না ভাই হাতে।'

বাগাম্বর বললে, 'সে সব সকালে হবে। এ মস্ত শ্মশান—অনেক হাঁড়ি পাবে, মনের সুখে তখন বাছবে। চলো এখন।'

দু-একজন তবু হাঁড়ির লোভ ছাড়তে পারে না—হাতে তুলে নেয় দু-একটা। ঠন্ ঠন্ ক'রে বাজিয়ে দেখে কাণের কাছে—ভালোই আছে। শ্মশানের মড়া ফেলা হাঁড়ি কলসীর জন্যে ওদের ঘৃণাও নেই—ভয় সংকোচও নেই। তাইতে গুষ্টিশুদ্ধ রাঁধে-বাড়ে খায় আর গাছ তলায় শোয়। মরে আর জন্মায় বংশপরম্পরায়। এই ওদের জীবন......।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম যেন আন্দি—উদো চাষী জগার বিধবা। তিনটে নাবালক ছেলে রেখে সাপকাটিতে জগা মরে গেছে। কিন্তু তার জমি-জিরেত ঘর-সংসার অটুট আছে আন্দির কাছে। বলদ হাঁকিয়ে নিজেই সে চাষ-আবাদ করে একটা জোয়ান মরদের মতো। তিন ছেলের মা কিন্তু এখনও সে ভরা যৌবনা, বেদের মেয়ের নির্ভীকতার সংগে মিশেছে কিষাণ বৌয়ের লক্ষ্মীশ্রী। ঘরদোর উঠোন দাওয়া ঝকঝক তক্তক করছে।

বাগাম্বরের বুনো 'কাক-মারার' দল উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

বাগাম্বর বললে, 'এই মোদের বেটি-জামায়ের ঘর।'

হঠাৎ অন্ধকারে অতোগুলো মানুষের কলকলানি শুনে আন্দি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথাকার লোক বটে গো?'

বাগাম্বর এগিয়ে গিয়ে এক গাল হেসে বললে, 'এলম গো মেয়া। কতোদিন ভেবেছি আসবো আসবো—তা আর হয় না। আজ ভাবলম—যাই একবার ঘুরে মোদের বেটি-জামায়ের ঘর। কতদিন যে দেখিনি বেটি তোকে।'

কিন্তু বেটির মুখের তখন দ্রুত ভাবান্তর শুরু হয়েছে। বাগাম্বরের মাথায় গোঁজা কাকের পালক আর গলায় লাল-নীল কাচের মালা দেখেই বুঝেছে আন্দি—উঠোনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কারা! সংগে সংগে খোঁজ পড়লো তার জঞ্জাল সাফ-করা ঝাড়ুর।

'যতো বেহায়া নাক-কাটা, ভাগাড়ের হারাম—ঝেঁটিয়ে সাফ করবো আজ। এত দূর দূর করি—তবু লাজসরম নাই!'—

এক লহমায় বুঝে নিল বাগাম্বর—আগেও তা হলে বহু দল তাড়া খেয়ে গেছে। তার নিজের ইজ্জৎ যায় যায় প্রায় তার দলের কাছে। বাগাম্বর হাসি মুখে তবু বললো, 'মোরা তো কখনো আসিনি বেটি।'

'ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে!' আন্দি এবার ঝাড়ু ছেড়ে বঁটির খোঁজ করলে।

অন্ধকার উঠোনে অপেক্ষমান দলটির মধ্যে এবার চাঞ্চল্য দেখা গেল।

বাগাম্বর মোলায়েম ক'রে বললে, 'মোরা শুধু রাতটা থাকবো একটু মাথা গুঁজে বেটি—কাছাকাছি কোনো হাট-খোলা নাই যে থাকি। আর এই জারের দিন!'—কাল সকালে উঠেই চলে যাবো মোরা।'

'যাবে—নড়বে তোমরা! আন্দি সমানে গাল পাড়তে লাগলো, 'যতো বেহায়া-ভাগাড়ের শকুন।'—

বাগাম্বর বললে, 'বেশ—সকালে উঠে না চলে গেলে তখন বলিস। একটা রাত-কানা আছে মোদের দলে—বেচারা পড়ে যাচ্ছে শুধু দড়াম দড়াম ক'রে। একটা রাত শুধু বেটি!'—

আন্দি বোধহয় একটু নরম হলো। তবু গর্‌গর্ করতে করতে বললে, 'অতো গুলান লোকের মুখে দেবো কি ছাই। কোথায় পাবো এত রাতে হাঁড়ি-কড়াই।'—

কথার ধারা বদলেছে দেখে দলের মধ্যে হঠাৎ একটা আশার সঞ্চার হলো যেন। গোবনা বলে উঠলো, 'হাঁড়ির অভাব কি গো। এই তো পাশের শ্মশানে কত বড় বড় হাঁড়ি সব গড়াগড়ি যাচ্ছে।'—

আর যাবে কোথায়। যুগপৎ ঝাড়ু বঁটি কাটারি ইত্যাদির ঘন ঘন উল্লেখ ও হুহুংকার একযোগে আন্দিকে উত্তাল ক'রে তুললে। তাকে আর নরম করতে পারে না কোনো রকমে বাগাম্বর। সত্যি সত্যি আন্দি হাতে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র মূর্তিতে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে সে—শ্মশানের হাঁড়ি-নাড়া এ ভূতের দলকে

আশ্রয় দিয়ে কেমন ক'রে সে অকল্যাণ ডেকে আনে!

চতুর বাগাম্বর আন্দির সুরে সুর মিলিয়ে গাল পাড়তে লাগলো গোবনাকে 'তাড়িয়ে দে শালা কাণাকে। বৌয়ের মান রাখতে জানে না শালা ছোটলোক।'

শেষ পর্যন্ত রফা হলো—আন্দির দাওয়ায় থাকবে ওরা একটা রাত। ভাত-টাত হবে না, মুড়ি পাবে সবাই চাট্টি চাট্টি। রাত থাকতে থাকতে পালাতে পাবে না কেউ—যাওয়ার সময় ঝোলাঝুলি সব খুলে দেখিয়ে যেতে হবে আন্দিকে। হাঁস মুরগীর একটা কোনো কিছুতে হাত দেবে তো ঝাঁটা খাবে সবাই।

মাথা দুলিয়ে তাতেই সায় দিলে বাগাম্বর। তারপর একগাল হেসে হাত বাড়ালো আন্দির বছর তিনেকের ছোট ছেলেটার দিকে, 'এসো দাদা।'

আন্দি খেঁকরে উঠলো। তারপর ছেলে তিনটেকে টেনে নিয়ে রাগে গর্ গর্ করতে করতে ঘরে ঢুকে গেল।

—দুই—

আন্দির মেজছেলেটার বয়স হবে বছর ছয়েক। সবটা বুঝুক না বুঝুক—কৌতূহল তার সব দিকে। মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে রাত্তিরে সে জিজ্ঞেস করলে, 'ওরা সব কারা এসেছে আম্মা?'

বড় ছেলে ভুটে একটু বেশী সেয়ানা বয়স তার বছর দশেক। সে বললে, 'ওরা সব মামা—সেই যে আগে এসেছিল আরো!'—

মেজাজ চড়ে আছে আন্দির নানান ঝঞ্ঝাটে। ভুটের ওপরে খেঁকরে উঠে বললে, 'ফের যদি মামা বলবি তো কেটে ফেলাব।'

আন্দি বলে কেউ ছিল কোনোদিন এই ভবঘুরে কাকমারার দলে—সে কথা ভুলতে চায় সে। চাষীর বৌ সে এখন—ঘরগেরস্থালী নিয়ে ছেলেপুলের মা। কিষাণ-জননী।

ভুটে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা আম্মা—মোদের বাড়িতে কোনো কুটুম তো আসে না!'

'নাই বা এলো—মোদের কি চলছে না!'

মায়ের মেজাজ দেখে ভুটে থামলো।

আন্দি বললে, 'আছে—তোর কাকারা আছে, জ্যাঠারা আছে, হোই উত্তর দেশে সে এক গাঁয়ে।' অর্থাৎ স্বামীর সম্পর্কিত চাষী গেরস্থরা সব। একটু থেমে আন্দি আবার বললে, 'কত জমি জায়গা, গোরু বাছুর তাদের সব—গোলায় ধান, পুকুরে মাছ।'

কাকমারা বেদিনীর মনে গজিয়েছে শেকড়—একদিকে আঁকড়ে ধরেছে পৃথিবীর মাটি আর একদিকে পল্লবিত হয়ে উঠেছে ঘরে গেরস্থালীতে।

ভুটে বললে, 'আমরা তবে যাই না কেন কাকাদের কাছে?'

'না—আমরাও যাই না, তারাও আসে না। সে যে চলে এলো একদিন সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে।'

'কে আম্মা?'

'কে আবার—তোদের বাপ। তোরা তখনো জম্মাসনি'।

তখন রঙ লেগেছে বাইশ বছরের জোয়ান চাষী জগার চোখে—ঘুর ঘুর করে সারা দিনরাত গাঁয়ের হাটচালার ধারে কাকমারার ঝুপড়ি টঙগুলোর আশপাশে। নবযৌবনের মোহ—আন্দিকে ঘিরে তখন তার অনাস্বাদিত আনন্দের স্বর্গ। তার জাতের শাসন আর গাঁয়ের বাঁধন—কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারলে না তাকে। কি ছিল শ্যামলা মেয়েটার চিকন মুখে চোখে—একদিন বাউরা হয়ে বেরিয়ে গেল সে ওই ভবঘুরের দলের সঙ্গে। ঘুরে বেড়ালো কতদিন গাছতলায় গাছতলায়—হাটচালায়-চালায়। দিনগুলো ভাসে আন্দি বেওয়ার চোখে। ভালোবাসার জাতবর্ণ নেই। এই বেদিনী মেয়েটার চোখ ছল ছল করে অন্ধকারে সেই একটা লোকের জন্যে —যে নোঙর ছেঁড়া জীবনে তাকে দিল স্বস্তির স্বাদ, শান্তির স্বাদ—রঙের মাতলামীই শুধু নয়।

চাষীর রক্তে আছে ঘরের টান—মাটির টান। একদিন তাই জগা বললে, 'আয় ঘর বাঁধি—চাষ-আবাদ করি।'

কিন্তু কাকমারার মেয়ে বিয়ে ক'রে কোন গাঁয়ে সে বাস করবে চাষীর মতো! তার সমাজ তাকে বেইজ্জৎ করবে পদে পদে। ঘুরে ঘুরে এসে পড়লো সে এই চরে। এ চর তখন সবে হাঁসিল হচ্ছে। সে হলো 'মুড়াকাটি' প্রজা—অর্থাৎ বনবাদা কেটে যারা আবাদ ক'রে প্রথমে এসে—ঘর বাঁধে।

বানভাসি বেদিনীর লাগলো নতুন নেশা—জমির নেশা, ঘরের নেশা। স্বামীর সঙ্গে মিলে যতোটা পারলে আবাদ করলে দু-হাতে। তারপর সে হলো জননী—জন্ম দিল এ চরের নতুন তিনটি প্রজার, বাদা হাঁসিল করা জমির উত্তরাধিকার। স্বামী তার বাঁধ বাঁধলো, ফসল ফলালো, ঘর গড়লো এ চরে।

ভুটে বললে, 'শুধু তুমি আর বাবা গোটা চর আবাদ করলে?'

'না—আরও লোক ছিল। কিন্তু তোর বাপের মতো চাষী ছিল কে! কে ছিল অমন জোয়ান মরদ—কাজের লোক!' বেদিনীর মুগ্ধ নারী সত্তা এই নগণ্য চাষীর কুঁড়ের অন্ধকারকে মুহূর্তে যেন মুখর ক'রে তোলে। এই অবোধ শিশুগুলো বাপের কথা শুধু শোনেই—বোঝে না মায়ের উত্তেজনা, তার সহসা চকিত ভাবান্তর।

ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়লো একে একে। বাইরে কাকমারার দলও নীরব নিঃসাড় হয়ে গেছে। আন্দি জেগে রইলো উৎকর্ণ হয়ে। একটি লোকের প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে। আর ছটফট করতে লাগলো মনে মনে।

মাগন মণ্ডল এলো অনেক রাত ক'রে। তার কাশির শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো আন্দি। দরোজা খুলে দিল।

মাগন বললে, 'হলো না কিছুই—শালা তশীলদার জরিপ-সাহেবকে একেবারে হাত করে ফেলেছে মায় আমিন পর্যন্ত।'

আন্দি প্রায় দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, 'জরিপ সাহেব কি বললে?'

'কি বলবে আর—যা করবার তাই করলে।' মাগন বললো, 'জগার সব জমি —মায় ভিটে পর্যন্ত খাস হয়ে গেল জমিদারের। জগার কোনো ওয়ারিশ নাই—এই কথা মেনে নিল জরিপ সাহেব।'

'আর এই তিন-তিনটা ব্যাটা, আমি' আন্দি দাঁতে দাঁত চেপে বললে।

'সব আমি বলেছি আন্দি।'

'বলেছ সব? বলেছ, কেমন ক'রে আবাদ করেছিলম এ চর, কেমন ক'রে গতর দিয়ে করেছিলম একে সোনার মাটি। বলেছ?—মোর মনে হয়, বুঝিয়ে বলতে পারোনি সব।'

'মোকে শুধু অবিশ্বাস করবি আন্দি চিরকাল?'

আন্দি বললে, 'আমি আর কারোকে বিশ্বাস করি না। এই তিন-তিনটা ব্যাটা, তার বাপের কেউ নয়—এই কথাটাই সত্যি বলে দাগা হয়ে যাবে সরকারী কাগজে?'

'এ শালা সেই গোবিন্দ তশীলদারের কারসাজি আর মালিকের ঘুষের জোর। আমি কি আর বলতে কিছু বাকি রেখেছি!'

'তবে?' আন্দি জ্বলে উঠে বললে, 'ভিটে ছাড়া করবে বলে হুমকি দেখায় মোকে,—কেড়ে নেবে মোর ব্যাটার হক পাওনার জমি!—বলেছ সব?'

'আহা—সে সব কি আর বলিনি!

'কে জানে—বলেছ কি-না। মোর ব্যাটাদের জমির ওপরে সব শালা ঢ্যামনার লোভ—মায় মালিক পর্যন্ত। বিশ্বাস করি কাকে!'

হঠাৎ এ কথায় মাগনের মুখটা শুকিয়ে আমশি হয়ে গেল একেবারে। অন্ধকারে দেখতে পেল না আন্দি—দেখতে পেলে হয়তো থমকে যেত। সে এক পুরানো কথা—হিয়ের কথা মাগনের। ঠিক ওই ভাষায় অমনি ক'রেই আন্দি জবাব দিয়েছিল একদিন—জগার মরার পর মাগন একদিন যখন একসঙ্গে ঘর বাঁধার প্রস্তাব করেছিল। একেবারে নিঃসঙ্গ টিংটিংয়ে এই লোকটার হিয়ের কথা যেন দাগই কাটেনি এই যুবতীর মনে। এক হাতের ঝাঁটা দেখিয়ে চরের চ্যাংড়া ইল্লুতে মরদ-গুলোকে যেমন দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তফাতে। তেমনি হাঁকড়ে দিয়েছিল মাগনকেও।

আজও সেই মহাস্ত্রটার উল্লেখ ক'রে ফের বললে আন্দি, 'ঝাঁটা মারি ওই ঢ্যামনা গোবিন্দর মুখে।'

মাগন বললে, 'তা মারিস তাকে একশোবার। কিন্তু আমি তোর কি করলম আন্দি! তোর ব্যাটার জমির জন্যে, ভিটের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাঠে-ঘাটে, আমিনের কাছে, জরিপ হাকিমের কাছে।'—

কথাটা মিথ্যে নয়। আন্দি চুপ ক'রে রইলো।

মাগন বললে—যেন কিছুটা অভিমানে, 'যা ভাবিস তোর ইচ্ছে। কাল হয়তো জরিপ হাকিম তোকে ডেকে শুনবে তোর কথা। আজ অনেক বলে কয়ে সেই বিচার চেয়ে এসেছি।'

মাগন চলে গেল। বাকী রাতটা কাটলো আন্দির ছটফটিয়ে—কাল কখন যাবে সে জরিপ-হাকিমের কাছে।

রাত থাকতে থাকতে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখলো—বাগাম্বরের দল তল্পিতল্পা বেঁধে বসেছে, এবার যাবে। ওদের দেখে খেঁকরে উঠে আন্দি বললে, 'ঝোলাঝুলি না দেখিয়ে যাচ্ছ যে বড় সব।'

হকচকিয়ে তাকালো সবাই। দেখতে দেখতে বিভ্রাট বেধে গেল একটা। এর ওর ঝোলাঝুলি থেকে কক্ কক্ ক'রে উড়ে বেরিয়ে এলো মুরগীর বাচ্চা, কার কাপড়ের তলা থেকে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে উঠলো ধাড়ি হাঁস। গোবনা বিপদ বুঝে ঝোলা চেপে বসে পড়লো মাটিতে—মড় মড় করে বেঙে গেল ডিমের কাঁড়ি, উঠোন ভেসে গেল ভাঙা ডিমের কুসুমে। কাঠ মেরে দাঁড়ালো বুড়ো বাগাম্বর। আন্দির হাতে ঝাঁটার আস্ফালন।

—তিন—

মুখ বুজে অনেক গালাগালি হজম ক'রে, নাকে খত দিয়ে বাগাম্বরের দল যখন ছাড়া পেল তখন সূর্য উঠেছে আকাশে।

বাগাম্বর বললে, 'কাজটা খুব খারাপ করেছ সবাই। বেটির কাছে মোদের ইজ্জৎ রইলো না।'

দল নীরব। তাদের বলার কিছু নেই। নীরবে চলেছে মাথা নীচু ক'রে।

বাগাম্বর বললে ফের, 'তোমরা হয়তো ভেবেছিলে—বেটি মোদের বোকা হাবা মেয়া কিন্তু দেখলে তো!'—

সে যে কি দেখা—সকলেরই মুখে চোখে তা একেবারে দাগা।

শ্মশান পেরিয়ে একটা বাঁক নিতেই দলটা এসে পড়লো একেবারে মালিকের কাছারি বাড়ির কাছে। ওদের দেখে গোবিন্দ তশীলদার দাঁড়ালো সামনে এসে। বললে সকৌতুকে, 'ইদিকে কোথায় গেছলে সব হে—কুটুম বাড়ি?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটির ঘর।'

'ভালো ভালো। তা এখেনে সব ডেরা বেঁধে থাকবে তো—নাকি?'

বাগাম্বর এক গাল হেসে মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'বেটি কুটুমের ঘরের কাছে থাকলে মোদের কি আর ইজ্জৎ থাকবে

হুজুর। বাগাম্বরের কাছে সেটি হবেনি কখনো। এই মোরা চলে যাচ্ছি।'

'বলো কি হে! আজই চলে যাবে বেটির গাঁ ছেড়ে?' গোবিন্দ বললে, 'থাক এসে মোদের কাছারির অতিথশালায়— ইজ্জৎ যাওয়ার কোনো ভয় নাই তোমার।' শেষে গোবিন্দ যেন হায় হায় ক'রে বললে, 'কই কেউ আস না তোমরা। তোমাদের পেয়েছি যখন—অন্তত একটা দিন থেকে যাও।'

লোকটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে না পেরে বাগাম্বর তাকিয়ে রইলো বোকার মতো।

গোবিন্দ গোরু খেদানোর মতো ক'রে নিয়ে চললো সবাইকে। আফসোস করতে লাগলো বার বার—এমন সুন্দর কাক-মারারা এ চরে এসে ডেরা বাঁধে না বলে।

কাল থেকে দল প্রায় অভুক্ত। যন্ত্র-চালিতের মতো চললো গোবিন্দর পেছনে পেছনে।

ভোজের হৈ চৈ পড়ে গেল কাছারি-বাড়িতে। তিন-তিনটে চাকর ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে গোবিন্দ চক্কোত্তির ফরমাসে। পুকুরে পড়লো জাল, গাঁজা এলো ভরি ভরি, নিজে তদারক করতে লাগলো গোবিন্দ। কাকমারার দল দিব্যি বসে বসে খেতে লাগলো একদিন নয়—পুরো দুটো দিন। চরের চাষাভুসোরা অবাক হলো প্রথমে—তারপর কাণাঘুষো করতে লাগলো এই বলে, 'ও আর কিছু লয়—দলে চেংড়ি যুবতী আছে কটা, তশীলদারের নজর পড়েছে সেই দিকে। শালা চরে এবার কাকমারা বসাবে।'

বাগাম্বর গাঁজায় দম দিয়ে দলের লোককে বললে, 'এত খাতির তাদের—শুধু বেটির জন্যে।'

দু-দিন তারিখ পেছিয়ে জরিপ-হাকিমের তাঁবুতে ডেপুটেশনের এজলাস বসলো তৃতীয় দিনে। এ দু-দিন কি ক'রে যে কেটেছে আন্দির—এ শুধু সে-ই জানে। ভিটে ছাড়ার হুমকী দিয়ে গেছে গোবিন্দ যাচ্ছেতাই ক'রে বলে গেছে তার পেয়াদারা। মুখ শুকনো ক'রে নিরুপায়ের মতো ঘুরে ঘুরে গেছে মাগন মণ্ডল। চরের পুরানো প্রজারা দেখিয়ে গেছে কপাল। পাথরের মতো মুখ ক'রে থেকেছে আন্দি। তিন দিনের দিন ছুটলো সে তাঁবুতে তিনটে ছেলেকে সঙ্গে ক'রে। তখন সন্ধ্যে।

অফিস-ফাইল, সাজগোজ করা পেয়াদা, চারদিক সুশৃঙ্খল। তার মাঝখানে হাকিমের মুখের দিকে চেয়ে সে ঘাবড়ে গেল। তাকালো ভয়ে ভয়ে।

মাগন বললে, 'এই হলো জগার বৌ হুজুর।'

গোবিন্দ খেঁকরে উঠলো, 'বৌ না আর কিছু! জগার রক্ষিতা হুজুর।'

হাকিম জিজ্ঞেস করলে, 'জগার সঙ্গে তোমার বিয়ে-সাদি হয়েছিল?'

গোবিন্দ মহা একটা রসিকতা শুনে যেন খ্যাক খ্যাক ক'রে হেসে উঠলো। বললে, 'কাকমারা মাগীর সঙ্গে সচ্চাষীর বিয়ে-সাদি হুজুর!'—

হাকিম শুধালো আন্দিকে, 'তোমার জাত কি?'

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে আন্দি —যেন এখনও কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না।

গোবিন্দ নিজের চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠালো বাগাম্বরকে। সব তৈরী ছিল গোবিন্দর। বাগাম্বর এসে দাঁড়ালো তার অদ্ভুত বেশবাস নিয়ে—মাথায় কাকের পালক গোঁজা লাল শালুর পাগড়ী, গলায় লালনীল কাঁচের মালা, হাতে লোহার বালা আর কানে কুণ্ডল।

গোবিন্দ বললে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন হুজুর। ও ওদেরি জাত।'

হাকিম আন্দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওকে তুমি চেন?'

বাগাম্বর আভূমি সেলাম ক'রে বললে, 'হাঁ হুজুর—মোদের বেটি, খুব পয়মন্ত বেটি।'—

বাকীটুকু বললে গোবিন্দ—কেমন ক'রে জগা ওই কাকমারার মেয়েকে নিয়ে চরে এসে ঘর করেছিল, সেই সব কথা। শেষে বললে, 'এরকম একচার হয় হুজুর। উদো চাষাভুসো যেমন ফাঁদে পড়ে তেমন ও মাগীরাও একটা থেকে আর একটার কাঁধে চাপে। সব বেশ্যার সামিল।'

আচ্ছন্ন মগজে এতক্ষণে যেন কথা-গুলো ছুরির মতো কেটে কেটে বসছে আন্দির। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠলো, 'কি বললি হারামের ব্যাটা—আমি বেশ্যা!'

'না তুই সতী লক্ষ্মী।' গোবিন্দ ডাকলে তার নিজের কাছারিবাড়ীর চাকর হারাধনকে। জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি কথা

বল ব্যাটা বামুনের সামনে—হুজুরও রয়েছেন, কতদিন থেকে যাওয়া-আসা করিস ওই মাগীটার কাছে?'

হারাধন মাথা নীচু ক'রে বললে, 'জগা মরার বছরখানেক পর থেকে হুজুর।'

গোবিন্দ বললে, 'এই সব ছোট-লোকের জাত হুজুর। নোংরা কথা শুনে হয়তো আপনার কষ্ট হচ্ছে।'

মুখ টিপে হাসলো হাকিম সাহেব। তাকালো আন্দির দিকে। দেখতে দেখতে ঘাবড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসেছে ওর যৌবনের বলিষ্ঠ উচ্ছ্বাস—ওর গভীর কালো চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে বেপরোয়া বেদিনী। কোলের ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে একটা বাঘিনীর মতো ছুটে গেল সে হারাধনের দিকে। এক লহমায় গিয়ে চেপে ধরলো তার গলাঃ

'হারামির বাচ্চা!'—

হৈ চৈ করে উঠলো গোবিন্দ। হারাধন চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে। ছুটে এলো পেয়াদারা। ধরাধরি করে ছাড়িয়ে দিল হারাধনকে। বোকার মতো খাপছাড়া-ভাবে হাকিমের দিকে চেয়ে আবার চিৎকার ক'রে উঠলো আন্দি নিজের তিনটে ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওরা মোর ব্যাটা—হোই দ্যাখ অবোধ বালকরা মোর। ওরা পাবে না তার বাপের হাঁসিল করা জমিন! বল—বল—আমি ওদের আম্মা! বল মোকে'—

গোবিন্দ ভেংচি কেটে বললে, 'রক্ষিতার বাচ্চা, সে আবার ওয়ারিশ! তোর জাতের দল বসে আছে হোই বাইরে—চলে যা সঙ্গে।'—

'তোকে মেরে ফেলাবো—ফেরে ফেলাবো হারামি'—গর্জে উঠে ছুটে গেল আন্দি গোবিন্দর দিকে।

গোবিন্দ টপ্ করে লাফ দিয়ে হুজুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখুন হুজুর—ছোট জাতের স্বভাব।'

'তোর ভদ্দরলোকের মুখে মারি লাথ!'—

এমন সময় বাইরে একটা কলরব পাকিয়ে ওঠে সহসা। বহুদূর থেকে চেঁচাচ্ছে যেন কেঃ

'আগুন......আগুন'......

কে বললে, তোর ঘরে আগুন আন্দি!'—

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো আন্দি। তার পর ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে ছুটলো সে তাঁবু ছেড়ে ঘরের দিকে। অন্য দুটো ছেলে কেঁদে উঠলো পেছনে ভয় পেয়ে। তারা ছুটলো মায়ের পেছনে পেছনে।

চাষীর কুঁড়ে। পুড়ে শেষ হতে আর কতোক্ষণই বা লাগে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে আগুন ধরে জ্বলে শেষ হয়ে গেল। কেরোসিন তেল চুম্বকের মতো টেনে নিল আগুনকে। দড়ি ছিঁড়ে গোরুগুলো পালালো কোথায় বনে বাদাড়ে, দম বন্ধ হয়ে মরে গেল কটা ছাগল, পুড়ে মরে গেল প্রায় সব হাঁস মুরগীগুলো। সেই ছাই-ভস্মের পাশে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো আন্দি।

ব্যাপারটার গভীরত্ব বুঝেই বোধ হয় বুড়ো বাগাম্বর গেল সান্ত্বনা দিতে, 'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুঃখ কি বেটি! মোরা কাকমারার জাত! ওরা যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে।'

......আবার সেই নোঙর ছেঁড়া জীবন!—

কিন্তু আন্দির চোখ-মুখের ভঙ্গী দেখে আর কথাটি মাত্র না বলে পালিয়েছে বুড়ো বাগাম্বর। আন্দি খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায়।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা ঢিল এসে টাঁই করে লাগলো মেজছেলেটার কপালে। দেখতে দেখতে কচি তাজা রক্তের ধারায় ভেসে গেল তার মুখ। 'আম্মা গো' বলে বসে পড়লো ছেলেটা। তার রক্ত ধারার দিকে চেয়ে চেয়ে ঝকোমক ক'রে উঠলো আন্দির পাথর-কালো চোখ দুটো।

মাগন ছুটে এসে তুলে ধরলো ছেলেটাকে। আন্দির দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, 'এখনও বলছি—পালা এখন এখান থেকে। মোর ঘরে চল। ভোর হোক।'—

'যাবো!' দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে আন্দি বললে, 'কোথায় যাবো মোর ব্যাটাদের ভিটে ছেড়ে। ওদের মতো জন্ম দিইনি মোরা এ চরের!'—

মাগন কাকুতি করে বললে, 'এখন শুধু সরে যা এখান থেকে—আবার কি অঘটন ঘটে যাবে একটা।'—

'এসে তাড়াক মোকে গিধ্‌ধোড়ের বাচ্চারা।' বিড় বিড় করে বললে আবার আন্দি, 'মোর স্বামীর ভিটে, মোর ব্যাটার ভিটে!'—

'হ্যাঁ হ্যাঁ—এ তোর ব্যাটারই ভিটে।' মাগন ওর একটা হাত চেপে ধরে বললে, 'এ চরের চাষীরা তা সবাই জানে। তারা বলেছে—তোর ব্যাটার জমিই তারা চষে আবাদ করবে। এই পোড়া ভিটেয় আবার ঘর তুলে দেবে। কেউ তাড়াতে পারবে না তোর ব্যাটাদের। ও হাজার লেখা হোক কাগজে কলমে। সবাই বসে আছে মোর দাওয়ায়—চল নিজে শুধোবি। এখন চল তুই এখেন থেকে—হাতে ধরে বলছি তোর—সরে চল।'—

কিন্তু তিনটে ছেলেকে ঘিরে তেমনি অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো আন্দি—নড়লো না এক পা। নিভন্ত আগুনের রক্তিমাভায় যেন এই বাঘিনী মেয়েটার সর্বাঙ্গে জ্বলছে—তার প্রেমে, তার মাতৃত্বে, তার অবিচল অধিকারে। তার সামনে আর সব তুচ্ছ ঝাপ্‌সা অন্ধকার হয়ে গেছে চার পাশে।

অন্ধকার থেকে আবার একটা ঢিল এসে পড়লো এবার আন্দির গায়ে। চিৎকার করে উঠলো এবার ঘুমন্ত কচি ছেলেটা।

বাঘিনী শুধু তাকালো অন্ধকারে—শিকারের সন্ধানে যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আটাশ

"তুমি একটু সাবধানে থেকো গৌরীদাদা। আমার মিনতি রইল। রমা। পুঃ—একে দু আনা পয়সা দিয়ো।" ছোট একটি টুকরো কাগজে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লেখা টেলিগ্রামের জরুরী খবরের মত খবরটুকুর দিকে চেয়ে গৌরীকান্ত বসেছিল। একটি রাখাল জাতীয় ছেলে তাকে চিঠিখানি দিয়ে গেছে। এই গ্রামেরই ছেলে।

গৌরীকান্ত চিঠিখানা থেকে চোখ তুলে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে—এ তোকে কে দিলে? কোথায় পেলি?

ছেলেটি বললে—মা দিলে। আপনাকে দিতে বললে।

—তোর মা?

—হ্যাঁ মশায়। ওই দাঁড়িয়ে রয়েছে মা। পুকুরের ঘাটে।

গৌরীকান্ত ঘাটের দরজার দিকে তাকালে। অবগুণ্ঠনবতী একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। গৌরীকান্ত তাকে ডাকবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এসে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললে—আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম মশায়। রমা ঠাকরুণের বাড়ি যে গেরামে, সেই গেরাম আমার বাপের বাড়ি। তা ঠাকরুণ আমাকে চিরকুটখানা দিলে—বললে, আপনাকে দিতে। বললে—বাউড়ি বউ, আমি ওই বাবুর কাছে দু আনা পয়সা পাব। তা সে আর কে আনতে যাবে! আর তার মত লোকেই বা দু আনা পয়সা খায় কেন? তুই পয়সাটা নিয়ে নিস্। জানব দুঃখী লোকে পেলে। তাতে আমার মনও খুশি, পুণ্যও হবে। আমি একটা চিরকুট দিচ্ছি। তুই দিস, দিলেই দেবে। কিন্তু খবরদার আর কাউকেও দেখাস নে। তাহলে আমার দুর্নামের বাকী থাকবে না। বলবে এমন লোক যে, দু আনা পয়সার জন্যে ঘুম হচ্ছিল না। তা কাউকে আমি দেখাই নি মশায়।

অর্থ এর যাই হোক, রমার চাতুর্য কিন্তু প্রশংসা পাবার মত। এই মেয়েটাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে নাই। এবং রচিত মিথ্যাটুকু অমন সহজ ও সুলভ অথচ এমনই নিরাপদ যে, তুলনা হয় না। সত্যিই তো দু আনা পয়সা চাইতে যাওয়াও পোষায় না; মজুরী দিয়ে লোক পাঠানো অসম্ভব, অন্তত ছ আনার কমে একটা লোক আসবে না; আর গৌরীকান্তের মত লোকের কাছে দু আনা পয়সা অনাদায়ই বা থাকবে কেন? তার চেয়ে বাউড়ি বউ নিলে রমার মনও খুশি হবে পুণ্যও হবে। তবে এটা বলিস নে বা চিরকুটটাও দেখাস্ নে, তাতে নজর ছোট দুর্নাম হবে।

গৌরীকান্ত পকেট থেকে একটি দুয়ানি বের করে দেখে দিলে। —নাও।

মেয়েটি চলে গেল। গৌরীকান্ত চিঠিখানা আবার পড়লে।

সাবধানে থাকতে বলেছে রমা। মিনতি করেছে। সেকালের রমা হলে দিব্যি জানাত। কারণটা বুঝতে দেরি হল না গৌরীকান্তের। কপিলদেবদের দল এইবার একটা যাহোক-তাহোক করে বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। একটা সংগ্রাম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, লড়াই করে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গত যুদ্ধের মধ্যে এদেশের মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করে—যুদ্ধোদ্যমে রাশিয়ার মিত্রপক্ষ হিসাবে ইংরাজ-আমেরিকানদের এদেশে যুদ্ধ প্রয়াসে সহযোগিতা করতে গিয়ে বড় বেশি দুর্নাম অর্জন করেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং বলেছে, বিভীষণ বলেছে। কোহিমার সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ প্রয়াসকে এরা বিশ্বাসঘাতকতা বলেছে, এদেশে সুভাষ-পন্থীদের কদর্য আখ্যায় অভিহিত করেছে। এই কারণেই এরা আজ সর্বজন-নিন্দিত। আজ সেই নিন্দা স্খালনের জন্যই এই প্রয়াস। একথা গৌরীকান্ত ভাল করে জানে। বিশৃঙ্খলা বাধে—বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে, ভাল—না হলে নির্যাতন ভোগ করেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দক্ষিণ ভারতে তেলেঙ্গনায় এ-যুদ্ধ আরম্ভ করেছে; এখানেও সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

বেদনা অনুভব করলে গৌরীকান্ত। এটা যদি সচেতন বুদ্ধির ইঙ্গিতে অন্যায় কৃতকর্মের দোষ স্খালনের একটি সুচতুর প্রচেষ্টা না হ'ত! আন্তরিকতাপূর্ণ অপরাধ বোধের প্রেরণায় প্রায়শ্চিত্ত করার সঙ্কল্পের পবিত্রতা এবং ঐকান্তিকতা থাকত।

মাস কয়েক পরের কথা।

দাঙ্গা থেমে গেছে অনেকদিন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই থেমেছে। সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেই ভালয় ভালয় মিটে গেছে। শুধু দাঙ্গাই মেটে নাই এই সঙ্গেই ক্যানেলের জন্য জমি নেওয়ার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনটা খাড়া করবার চেষ্টা করছিল কপিলদেব এ অঞ্চলে—সেটাও চাপা পড়ে গেছে। ক্ষোভের, ক্রোধের তার আর যেন শেষ নাই।

সে যেন অনুভব করছে, বিপ্লবের মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। কিন্তু কাকে নিয়ে বিপ্লব করবে? কে বিপ্লব করবে?

মানুষগুলি বিচিত্র অদ্ভুত। সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় যুগ যুগ ধরে বাস করে এদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত অপারিণত। নির্বোধ, স্থূল। যুক্তিকে গ্রহণের শক্তি পর্যন্ত নেই। সেই শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের সুরবালার মত। কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় পতিত ভীষ্মের তৃষ্ণা যখন পেল—তখন অর্জুনের বাণে বিদীর্ণ পৃথিবী থেকে ভোগবতীর জল না এল তো তৃষ্ণা মিটল কিসে? আর ভোগবতীর জল যখন এল, তখন অর্জুনের বাণে পৃথিবীই বা দীর্ণ না হল তো এল কি করে এবং ভীষ্মের তৃষ্ণা পায়নি এই বা কি করে হয়? ঠিক মনে পড়ছে না যুক্তিটা কপিলদেবের। তবে ঐরকম একটা কিছু। যার অর্থ নাই, আছে শুধু একটা অন্ধ বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। যাতে মানুষ নুড়িকে ভাবে ভগবান। শরৎচন্দ্র সে পড়েছে অনেকদিন আগে। সেই ইস্কুল জীবনে। তখন খুব ভালও লাগত। এখন আর পড়তে পারে না। বাঙলা কোন বই-ই সে বড় পড়ে না। পড়ে ইংরিজী বই। তাও অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানের বই, রাজনীতির বই। কিছুকাল আগে 'ফল অব প্যারিস', 'রেইন বো' উপন্যাস দুখানা পড়েছে।

এই মানুষগুলোকে কিছুতেই মানানো যায় না, বুঝানো যায় না। এমন প্রশ্ন করে বসে যে, হাসি পায়। এমন জবাব দেয়, যা শুনে কপিলদেব অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রথম কপিলদেব বলেছিল—লাঙ্গল যার জমি তার। সুতরাং এবার জমির ধান একমুঠোও কেউ জোতদারকে দেবে না।

প্রৌঢ় নবীন হালদার—জাতিতে কি যেন—তবে এখানকার চাষীদের মধ্যে বেশ মাতব্বর মানুষ—সে অবাক হয়ে গিয়েছিল—এবং মুর্খের মতই প্রশ্ন করেছিল দোব না? জোতদারকে ধান দোব না?

—না এক মুঠো না।

—সে কি গো! তারই যে জমি।

—না। জমি তোমার। তুমি কতদিন চাষ করছ এ জমি?

—তা অনেক দিন হবে। পাঁচ-সাত বছর বটে।

—তবে?

—কি তবে? ভাল করে তাই সমঝায়ে বলেন বাপু!

—জমি চাষ কর তুমি, সে করে না। তবে জমি তার কি করে হল? জমি তোমার।

—ওই। জমি যে তার গো। সে টাকা দিয়ে কিনেছে; জমিদারী সেরেস্তায় চেক হয় তার নামে।

—কি হয়েছে তাতে? একশো টাকা কি দুশো টাকায় জমি কিনে সে যতদিন ভোগ করেছে, তাতে তার টাকা কতদিন উঠে গিয়েছে।

—তা গিয়েছে।

—তবে? সে এখন কিসের মালিক।

—ওই সে কিনেছে যে।

—এককালে মানুষ বেচাকেনা হত। তা আর এখন হয় না। একালে তেমনি জমি কেনাবেচা উঠে যাবে। জমি যে চাষ করবে—তারই হবে সেই জমি। ধান দেবে না। জমির ধারে আসতে দেবে না। স্পষ্ট বলে দেবে।

—তা—হ্যাঁগো মশায়। ওই কথা স্পষ্ট বলা যায় নাকি? কোন্ মুখে বলব বলেন তো দেখি?

—এই মুখে—ঠিক আমার মত শক্ত করে বলবে।

—তা কি করে বলব? সে যে মিছে কথা বলা হবে। আর লাজের মাথা খেয়ে তা বলব কি করে?

—লজ্জা এতে কিছু নাই। আর মিথ্যে কথাও এটা নয়।

এর পর অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে নবীনকে বুঝাবার চেষ্টা সে করেছে। বুঝাবার চেষ্টা করেছে, এর সঙ্গে ধর্ম-অধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। যদি থাকে—নবীন যদি জোর করে তাই বলে তবে—এইটেই ধর্মের কথা। জমিতে যে চাষ করে, জমির যে সেবা করে, যত্ন করে জমি তার। যে টাকা দিয়ে কেনে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকে—আর ফসলের সময় এসে খামারে দাঁড়িয়ে ধানের ভাগ নিয়ে যায়—জমি তার হতে পারে না, সেই হওয়াটাই অধর্ম।

নবীন তবু বলেছে—তা না হয় তুমি বলছ বাবু। কিন্তু একথা যদি সে না বলে! না মানে?

—তাগিয়ে দেবে।

—সে যাবে কেন?

—না গেলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে।

—তারপর সে যখন ফৌজদারী করবে। লাঠি-সোটা লোকজন নিয়ে আসবে।

—তখন আমরা আছি—তোমাদের সঙ্গে থাকব, ভেবো না তোমরা।

—তোমরা থাকবে?

—হ্যাঁ আমরা থাকব।

—তা কেন থাকবে? আমি জমি পাব, সে আসবে—তার জমি যাবে, কিন্তু তুমি কি পাবে? তুমি কেন এর ভেতর আসবে?

এর উত্তরে কপিলদেব অনেক বক্তৃতা করেছে। নবীন সেসব কথার জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু আশ্চর্য, এর পরেও বলেছে—তাইতো মশায় বলছ বটে, কিন্তু।

—কিন্তু কি?

—বুঝছেন না কিন্তু কি? এমন কথা বলব কি করে গো? যখন ওনাদের সঙ্গে কথা বলে জমি নিয়েছিলাম, তখন তো এ কথা হয় নাই। সব বেঁচে খেতে আছে বাবু, ধর্ম বেঁচে তো খেতে নাই।

এই ধর্মের আফিং কোটি কোটি মানুষকে আজ পোষা জানোয়ারের অধম করে রেখেছে। অথচ এরাই আবার নিজেরা যখন মামলা-মোকদ্দমা করে, তখন আর মিথ্যাচারের বাকী রাখে না।

রাজনীতির অনুশাসন অনুযায়ী এদের জন্য মায়া-মমতার কথাটাই বড় করে বলতে হয়—বলেও কপিলদেব কিন্তু অন্তরে অন্তরে এদের উপর বিরক্তির তিক্ততার তার আর সীমা নাই।

ঠিক এই কারণেই জমির স্বত্বের কথা মুলতুবী রেখে—ভাগের কথাটাই বলতে হয়েছে। এতে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মুসলমান চাষীরা এতে সাড়া দিয়েছে। মুসলমানদের চেতনা, তাদের আত্মপ্রত্যয় হিন্দু চাষীদের থেকে অনেক বেশি। মুসলমান ধর্মের সামানীতি এদিক থেকে অনেক উপকার করেছে মানুষের। এই-জনাই কপিলদেব রমাকে সুক্কুরের সঙ্গে শাহপুরে পাঠিয়েছিল। একটা পরি-কল্পনাও ক'রে দিয়েছিল। মুসলমান চাষীদের মেয়েদের নিয়ে হিন্দু চাষীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলবে—এই দেখ—মুসলমান মেয়েরা তোমাদের বাড়িতে এসেছে। তোমরাই বল না—এদের সঙ্গে

তোমাদের কিসের ঝগড়া? তোমরা তোমাদের পুরুষদের বারণ কর, এরা এদের পুরুষদের বারণ করেছে। এ ঝগড়া বাধাচ্ছে ওই বড় মানুষেরা, ওই যারা জমিদার জোতদার তারাই। ক্যানেলের জমি নিয়ে যে কথা উঠেছে সেই কথা চাপা দেবার জন্যে, জমির স্বত্ব নিয়ে যে 'লাঙ্গল যার জমি তার' কথা উঠেছে সেই কথা চাপা দেবার জন্যে। ওরাই ভাড়া করে তারাচরণের মত লাঠিয়াল গুন্ডা এনে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখছে।

সুকৌশলে এক কথা পেড়ে তার মধ্যে আসল কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়ার ছুঁইয়ে দেওয়ার নীতিটা একটা চাতুর্যময় শিল্প। এদেশেও দু একটা এমন ভাল কথা আছে। এদেশের একটা কথা প্রথম প্রথম ভাল লাগত না কপিলদেবের। 'ভেকসে কভি কভি ভগবান মিল যায়'। বাঙলা হল ভেক নইলে ভিখ্ মেলে না। ভগবান এবং ভিখ্ অর্থাৎ ভিক্ষা দুটো বস্তুর উপর কপিলদেবের বিশ্বাস নাই; তাই আগে ভাল লাগত না। কিন্তু প্রদ্যোত ঘোষ বলেছিল ভগবান বা ভিক্ষে ও দুটোকে ডি লিট করে দিন না। তাহলেই দেখবেন ওর মধ্যে ঠাঁই রয়েছে আপনার সত্যকে বসাবার। ছেঁড়াচুলে আর বটের আটায় জটা বানিয়ে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে এসে রামনাম কি হরিনাম ক'রে বলে বসে আঃ, তোর তো বাচ্চা ললাটে দেখছি—যত সুখ তত দুঃখ। তার মানে দুঃখটা কাটিয়ে ফেলতে পারলেই আঙ্কিক নিয়মে সুখটাই শুধু থেকে গেল। আর তার দাওয়াই হিসেবে—ঠাকুরের পুষ্পই হোক আর মাদুলী কি সীসে বা লোহাই হোক সে আমার কাছে আছে। বাস ওতেই তো হয়ে গেল মশায়। আপনাদের প্রোপাগান্ডাও যা এও তাই।

কপিলদেবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠেছিল। সয়তান কোথাকার! তবুও আত্মসম্বরণ ক'রে সেদিন সে বলেছিল—প্রদ্যোতবাবু আপনাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি। ঐভাবে কথা আপনি বলবেন না। আপনি জানেন না—।

কূপমন্ডূক—কুয়োর ব্যাঙ এবং বিষাক্ত ব্যাঙ; বিরাট বিপুল আদর্শবাদের কি বুঝবে সে! লোকটা একেবারে পচে গেছে খসে গেছে। ব্যর্থতার ক্ষোভে নিজের দেহে নিজের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে নিজেরই বিষ। আজ নিতান্ত দুঃসময় বলেই এবং লোকটা দুঃসময়েও শত্রুতা করে না বলেই ওকে কিছু বলা চলে না।

উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সাল থেকেই বড় দুঃসময় চলছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দলকে দেশের লোকের কাছে অত্যন্ত হেয় অবজ্ঞেয় করে তুলেছে। সাধারণের মধ্যে যেন তাদের মুখ দেখাবার উপায় নেই এমন অবস্থা। কেউ রেয়াত করে নি। মহাত্মা গান্ধী থেকে এখানকার ওই কংগ্রেসী ক্ষুদে ফ্যাসিস্ত বিজয় পর্যন্ত। সবাই তাদের হেয় করবার চেষ্টা করেছে। বিজয় এখানে তার অবস্থা যে শোচনীয় করে তুলেছিল এই সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত তা মনে হলে তার আক্রোশের সীমা থাকে না। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে বিজয় তখন ফেরার; সেই সময় রমা একদিন খবর এনেছিল যে বিজয় দু একদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবে গভীর রাত্রে। রমা এসেছিল নবগ্রামে। অক্ষয় ঘোষালের বাড়ি থেকে খবরটা পেয়ে গিয়েছিল। তখন অবশ্য অক্ষয় ঘোষাল বিজয়ের বিরোধী ছিল না। অক্ষয় তখন বিজয়কে স্নেহই করত। খবরটা অক্ষয়ই এনেছিল। ট্রেনে কোথায় হঠাৎ ফেরার বিজয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বিজয় তাকেই বলে দিয়েছিল—বাড়িতে বলো দু তিন দিনের মধ্যেই একবার যাব। রাত্রি বারোটার পর।

রমার সেই সংবাদটা কপিলদেব বেনামী চিঠিতে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়েছিল জেলার আই বি আপিসে। তখন পর্যন্ত বিজয়ের সঙ্গে তার কোন ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না। বরং সদ্ভাবই ছিল এর আগে। এই মূর্খ আবেগসর্বস্ব দেশকর্মীটিকে শ্রদ্ধা করত না অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই নিদারুণ সন্ধিক্ষণে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিবেচনার তো অবকাশ ছিল না। ও দিকে তখন রাশিয়ার বুকের উপর রণদানব হিটলারের অনুচরবৃন্দের পৈশাচিক উন্মত্ত তান্ডব চলছে। সোভিয়েট তখন নিজের ফসলভরা ক্ষেত পুড়িয়ে বড় বড় শহরের সম্পদ নষ্ট ক'রে পিছু হটে চলেছে। এ দিকে বার্মায় রেঙ্গুন পড়েছে। দেশের মধ্যে চলেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে—স্যাবটেজিং; একদল গুপ্ত ষড়যন্ত্র করছে। এই সময় কি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিবেচনা করবার সময়! আজ দেশরক্ষা পেয়েছে তাই। ধূমকেতুর মত অশুভগ্রহ হিটলার তোজোর পতন হয়েছে তাই! যদি না-হ'ত তবে নূতন দাসত্বশৃঙ্খল পরতে হত দেশকে। ফ্যাসিস্ত শক্তির পদানত হ'তে হ'ত! তাই সে সংবাদ দিয়েছিল। এবং তার ফলেই বাড়ি আসবার পথেই বিজয় গ্রেপ্তার হয়েছিল। সাতচল্লিশ সালে আগস্টের পর এই সংবাদ বিজয় আই বি আপিস থেকে নিয়ে এসে তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছিল। কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল কপিলদেবকে।

রমার জীবনও দুর্বহ করেছিল বিজয়। নাম দিয়েছিল—রাধা।

তখন প্রদ্যোত তাদের উপকারে এসেছিল। তাদের সাহায্য করেছিল। রমার উপর আকর্ষণ এর একটা কারণ বটে, কিন্তু গোটা সমাজের উপর বিদ্বেষও একটা কারণ; কপিলদেবের আদর্শবাদের সঙ্গে সহানুভূতি তার এই কারণেই।

বন্যার জলে যখন মানুষ ভেসে যায় তখন একটা গলিতশব আশ্রয়েও যদি প্রাণ বাঁচে তবে তাই বাঁচানোই স্বাভাবিক। প্রদ্যোত গলিতশব সে জানে। তবু তাকে তার প্রয়োজন আছে। এখানে গলিতশব বলতে কি একা প্রদ্যোত? অসংখ্য গলিতশবে দেশ শবাকীর্ণ। মৃতের সমাজ। শব তো তবু ভাল। আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া যাবে। মাটির তলায় কবর দিয়ে ফলবান গাছ লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করা যাবে। কিন্তু প্রেত? শবাকীর্ণ সমাজে চলছে যে প্রেতের নৃত্য ওই যে মূর্খ বুদ্ধিহীনদের প্রভুত্ব, ওই বিজয়দের রাজত্ব—ওদের পিন্ড দান ক'রে না তাড়ালে প্রেতত্বের মৃত্যু না ঘটালে নূতন জীবন জাগবে কি ক'রে?

প্রদ্যোতকে গলিতশবকে আঁকড়ে ধ'রে সেই কারণেই সে বসে আছে।

কপিলদেব ঘরের ভিতরে বসে টুকরো টুকরো খবরের কাগজে প্রাচীরপত্র তৈরী করছিল। এ দিক দিয়ে সে প্রায় সব পারঙ্গম। সম্প্রতি একটি কবিতা পেয়েছে

সে—তাদের দলের কোন কবির লেখা। তার সঙ্গে নিজের দুটি লাইন জুড়ে একটি লাইন লিখে যাচ্ছিল। গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেবে; দেওয়ালে সেঁটে দেবে।

চাষী ভাই, আওয়াজ তোলো—
জোর সে বোলো—
দে ভাগা—দে ভাগা তে-ভাগা দে।

দেওয়াল ঘেঁষে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে প্রদ্যোত। এদিকে একটা জানালার ধারে বসে আছে সুক্কুর। সে বসে বসে বিড়ি টানছে। হঠাৎ সে বললে—কপিলবাবু, একটা কথা বলব?

—কি?

—লোকে দেখে হাসবে ও গুলো।

—হাসুক। হাসির মধ্যেই কাজ হবে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। কথাটা রপ্ত হলেই হ'ল। জানিস হিন্দুদের একটা গান আছে—"এবার কালী তোমায় খাব।" ডাকিনী যোগিনীগুলো অম্বলে সম্বরা দোব।" এটা শুনলে তোর হাসি পায় কি না জানি না—আমার হাসি পায়। কিন্তু দিনকতক যদি অহরহ শুনি আর আওড়াই তবে হয়তো চোখে জল আসবে ভক্তিভাবে। কিসে কি হয় সে আমি বেশী বুঝি। আমার কাজ আমি করি—তোর কাজ তুই কর। তুই সেঁটে দিয়ে আয়। সুক্কুর আবার একটা বিড়ি ধরালে।

সে বেশ একটু মনে মনে দমে গিয়েছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বুঝতে কপিলদেবের বাকী রইল না। কিন্তু তা নিয়ে সে চিন্তিত হ'ল না। সুক্কুর যায় যাবে। যতদিন আছে থাক, যেটুকু করে করুক। সেইটুকুই লাভ। সে যায় আবার লোক আসবে। আজ না আসে, কাল না আসে পরশু আসবে। পরশু না আসে তার পরের দিন আসবে, একজনের জায়গায় দশজন আসবে। এ বিশ্বাস তার আছে। আসতেই হবে। মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে যুগ যুগ ধরে ধর্মের ছাই চাপা দিয়েও যা নেভে নি—সে একদিন জ্বলবেই। তাতেই পুড়ে ছাই হবে এই শবদেহগুলো।

রমা দু কাপ চা হাতে ক'রে ঘরে ঢুকল। বললে—এই দুপুর বেলা চায়ের হুকুম পাঠালেন, চান করবেন খাবেন কখন?

—দেরী আছে। এগুলো লিখে শেষ না-করে নয়।

—কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করব।

—কি?

রমা সুক্কুরের দিকে চেয়ে বললে—সুক্কুর তুই একটু নিচে যা ভাই।

—কি দরকার? কি এমন গোপনীয় কথা যা ওর সামনে হতে পারে না?

—না পারে না।

—ঘোষের সঙ্গে কাল রাত্রি বেলা কি কথা হচ্ছিল আপনার?

কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কপিলদেব বললে—সে কথা আপনি শুনলেন কি করে? আড়ি পেতে ছিলেন? প্রত্যাশা করিনি। অন্যায় করেছেন শুনে।

—কানে এসেছে শুনেছি। এ কিন্তু ভাল হবে না।

—ভাল মন্দ আমি আপনার চেয়ে বেশী বুঝি।

—তা হ'লে কিন্তু আমি আর নেই। আমাকে পাবেন না।

আবার একবার স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে কপিলদেব বললে—যাবেন কোথায়? নবগ্রামে—গৌরীবাবুর বাড়ি?

রমা একটু হাসলে। বললে—আরও জায়গা আছে কপিলদেববাবু।

—বিজয়বাবুর বাড়ি? সমস্ত কথা বলে অনুতাপ প্রকাশ ক'রে গিয়ে দাঁড়াবেন? কিন্তু তা পাবেন না।

—তা পাব। আমাকে আটকাতেও আপনি পারবেন না। কিন্তু তা যাব না আমি। আমি যাব আপনাদের কর্তাদের কাছে। বলব—কপিলদেব—যে সব লোকদের নিয়ে দল বাঁধতে চাচ্ছেন—তারা ভাল লোক নয়—সমাজের লোকেরা তাদের দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ বলে। ঘৃণা করে।

হেসে কপিলদেব বললে—বিপ্লবের শুরুতে সব থেকে আগের কাজ কি জানেন? জেলখানা ভেঙে দিয়ে কয়েদীগুলোকে ছেড়ে দিতে হয়। যান নিচে যান, আমায় কাজ করতে দিন।

(ক্রমশ)

একটি নিশীথ রাত

মনোরঞ্জন রায়

গানের নরম কলি। আরামের ভিজে ভিজে সুর
কার কণ্ঠে বাজে বলো! কী নিঝুমে এ রাত দুপুর।
ক্লান্ত চোখ বুজে আসে। ছলো ছলো ক্ষণায়ু প্রদীপ
করুণ মিনতি নত,—'হে আলোক, ধীরে নিভে যাও,
নিভে যাও তুমি, আর তারপর আরামে ঘুমাও।'

আহা, তুমি বুকে চেপে এক বুক গাঢ় অন্ধকার
ঘুমোবে! ঘুমোও! তবু দীর্ঘশ্বাস ফেলো না। **এখন**
নির্বাক নিশুতি রাত! অভিশাপ হেনো না। কপোলে
চুমার মলিন দাগ! আলিঙ্গন দু বাহুলতার
শিথিল! অলকদামে অলস পুলক শিহরণ!

কুয়াশা কোমল মেঘে ঘন বৃষ্টি সুরভি সম্পাত
অবিশ্রান্ত রিমঝিম। কলকণ্ঠ জলকল্লোলের
সজল মূর্ছনা! আহা, মৃদু মৃদু ঢেউয়ের জলের
কেতকীবিলাসী মন ঘুমাও-এ মুগ্ধ মধু রাত!

রঞ্জন

ইংরেজি একটা সাপ্তাহিক কাগজে এ ই ডব্লিউ মেসন্ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রেহাম গ্রীন একান্ত প্রসঙ্গত একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উক্তি করেছেন। গ্রীন বলছেন, 'সাহিত্যে পিটার প্যানদের স্থান নেই।'

বাঙলা দেশের আইবুড়ো মেয়ের মতো পাঠকের বয়স দ্রুতবেগে বাড়ে, অথচ তার প্রিয় লেখক যদি পঁচিশে এসে পরিণতির প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে থাকেন, অর্থাৎ আর না বাড়েন, তাহলে পাঠকে আর লেখকে বৈসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। সেই অসামঞ্জস্যের অবশ্যম্ভাবী ফল নৈরাশ্য। বৈচিত্র্যহীন, মন-বামন লেখক তারপরেও নিয়মিত লিখে চলেন; কিন্তু পাঠকের অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

এ ব্যাধির বহিঃলক্ষণ বহুবিধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ রোগের বীজাণু থাকে প্রাথমিক সাফল্যে। সিনেমায় এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য। একবার যিনি রহস্যময়ী ছলনাময়ীর ভূমিকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন, বাকি যৌবন তাঁকে ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। হলিউডের প্রযোজকদের মতো লেখকদের মধ্যেও পূর্বতন সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাবার লোভ ব্যাপক ও গভীর। প্রায় একই বই তাই দুনামে, কখনো বা বিশ নামে, প্রকাশিত হয়। চরিত্রগুলির নামে একটু অদল-বদল থাকে, ঘটনা বা স্থানেও হয়তো একটু রকমফের, কিন্তু মূলত বই একই। পার্ল বাক, ফিকি বাউম,—এঁদের নতুন বই তাই আমি আর পড়িনে। বোধ হয় জানি যে, ওগুলিতে কী থাকবে। নাম করব না, কিন্তু অনেক বাঙালী লেখক সম্বন্ধেও আমার মত একেবারে অন্যরূপ নয়।

কিন্তু অভিসন্ধির প্রশ্ন স্থগিত থাক। সফল লেখক সজ্ঞানে যদি তাঁর প্রথম সাফল্যের প্রতিলিপি প্রকাশ করতে থাকেন, তবে তিনি অসাধু ব্যবসায়ী, অসৎ শিল্পী। ব্যবসার বিবেচনা বাদেও যে লেখক নতুন থালায় পুরানো খাবার পরিবেশন করেন তাঁর কথাটা আলাদাভাবে বিচার্য। তিনি কেন নতুন কিছু লিখলেন না? তিনি কেন তাঁর পুরানো সত্তার নকলনবিশী করতে গেলেন? না কি, না করে উপায় ছিল না?

বোধ হয় উপায় ছিল না। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি সংকীর্ণ, নতুন অভিযানের সাহস বা সম্বল পরিমিত। প্রথম বইতে তিনি তাঁর সবকিছু দিয়েছিলেন—যে গ্রামটি চিনেছিলেন বা যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলেন—তারপরে আর হাতে কিছু ছিল না। পরবর্তী দৈন্যটা মর্মান্তিক, কিন্তু এখানেই তাড়াতাড়ি এই কথাটা বলা প্রয়োজন যে, এমন শিল্পীকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কেননা, সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রথম সর্তই এই যে শিল্পী তাতে নিজকে দেবেন। অন্নদাশঙ্কর বোধ হয় আর্টের সংজ্ঞা করেছিলেন, নিজকে দেবার ছল। ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক আগে আরো স্পষ্ট, আরো ভালো করে বলেছিলেন, 'টু রাইট ইজ টু হ্যান্ড ওয়ানসেলফ ওভার।' লেখা মানে নিজকে সঁপে দেয়া। এই অকুণ্ঠ দান করতে অস্বীকার করলে সাহিত্যিক হওয়া যায়, লেখক নয়।

*

এই দেবার পরে লেখক যখন শূন্যহস্ত হলেন তখন তিনি হাতযশ বিকিয়ে আরো কিছুদিন লিখে যেতে পারেন, সে হাতসাফাইয়ের কথা একটু আগে বলেছি। লেখকের সামনে দ্বিতীয় পথ হাত গুটিয়ে বসে থাকা। ই এম ফর্স্টার যেমন ১৯২৪-এর পরে আর উপন্যাস লেখেননি।

তৃতীয় পথ, জীবনের পথ, হচ্ছে হাত বাড়িয়ে নিত্য নতুন রত্ন সংগ্রহ করা। 'রত্ন' কথাটাও থাক। কে জানে হাত বাড়ালে কী মিলবে? যা দরকার তা হচ্ছে অবিশ্রাম সন্ধান। প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে লেখক তার বুদ্ধি সজাগ রাখবে, বোধ নিবিড় করে রাখবে; সব কিছুর কাছে এসে হাত দিয়ে ছোঁবে, আবার পরম অনাসক্তির সঙ্গে দূরে চলে গিয়ে অন্য জগৎ আবিষ্কার করবে। লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিণতি অব্যাহত থাকবে, নিত্য নূতন জগতের সংস্পর্শে এসে নিজেকে সঞ্জীবিত করবে। কোনো ঘাটে বাঁধা পড়বে না দুদণ্ডের বেশি। অর্থাৎ লেখকের জীবনে কমা থাকবে, সেমিকোলন থাকবে, ড্যাশ থাকবে, হাইফেন থাকবে, এক্সক্লেমেশন থাকবে, সর্বোপরি ইন্টারোগেশন থাকবে। থাকবে না শুধু ফুল-স্টপ বা দাড়ি।

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী আগাগোড়া জীবনযাপন করা রক্তমাংসে-গড়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অসংখ্য স্খলন, অগণিত ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথও—যিনি বোধ হয় বিশ্বের সকল শিল্পীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসর্গীকৃত শিল্পীর মতো বেঁচেছেন—শেষ জীবনে বিলাপ করেছেন যে তিনি জীবনকে দেখেছিলেন সংকীর্ণ জানালার ভিতর দিয়ে। বিলাপটা পুরোপুরি মিথ্যা বিনয় ছিল না। অভিজ্ঞতার পর্যাপ্ততার দম্ভ একমাত্র সেই লেখকই করতে পারে যে অভিজ্ঞতার অসীমতা সম্বন্ধে অচেতন।

*

কিন্তু হাতের বাইরে যা তা পাব না বলে যা নাগালের মধ্যে তাকে কেন হাত বাড়িয়ে নেব না? অনবরত কেন জীবনের সীমানা বাড়িয়ে চলব না, তৈমুর বা হিটলার বা ইংরেজরা একদিন যেমন তাদের দেশের সীমানা বাড়িয়েছিল? কেন অভিজ্ঞতার প্রসারণ বন্ধ থাকবে যে পরিসরে জন্মগ্রহণ করেছি সেইটুকুর মধ্যে? কেন শুধু নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের হাসিকান্নার দুটো গল্প লিখে তৃপ্ত হবে বাঙালী লেখক? কেন বাইরের চাঁদে বান ডাকবে না বাঙালী লেখকের মনের নদীতে?

অথচ মর্মান্তিক সত্যটা হচ্ছে এই যে, বাঙালী লেখকের দৃষ্টির পরিধি কেবলই ছোট হয়ে আসছে। ভ্রমণের সামর্থ্য নেই, ব্যাপক শিক্ষাবিমুখতার জন্যে অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নেই, জীবিকার অতীত কোনো সমস্যার আলোচনা নেই। নতুন কিছু লিখতে হলে, বাঙলা সাহিত্যে আবার প্রাণসঞ্চার করতে হলে, বাঙালী লেখককে আবার হাত বাড়াতে হবে। জীবনের সঙ্গে পুনঃপরিচিত হতে হবে। সত্যি জীবনে অফিস ছাড়াও আরো যাবার জায়গা আছে, বাঙালী ছাড়া সংসারে আরো জীব আছে, র‍্যাশনের প্রশ্ন ছাড়া আরো সমস্যা আছে।

চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীগোপাল ঘোষ

নব্যভারতীয় শিল্পকলা যে সকল আধুনিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে শিল্পী গোপাল ঘোষ তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনা গত ক'এক বৎসর এমন এক বিশিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে যে আধুনিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর আসন অবিসংবাদিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

গোপাল ঘোষের চিত্র প্রদর্শনী কলকাতার রসিক সমাজের কাছে তাই নানান দিক দিয়ে নানান আকর্ষণ নিয়ে আসে। গত ক'এক বৎসর কলকাতায় তিনি নিয়মিত প্রদর্শনী করে আসছেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি আমাদের সম্মুখে এমন এক নূতন রূপালোক উদ্ঘাটিত করেছেন, যা দর্শককে পরিপূর্ণ আস্বাদনের সুযোগ দেয়।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী শিল্পী ঘোষের জলরঙ, টেম্পেরা, প্যাস্টেল ও স্কেচ প্রভৃতি

গোপালপুর (২৫)

সবুজ পরিবেশ (৬৪)

বিভিন্ন আঙ্গিকে অঙ্কিত সাম্প্রতিক দৃশ্যচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী একাডেমি সালোনে খোলা হয়েছিল। তিরাশীটি চিত্রে সজ্জিত এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ রচনা যদিও সাম্প্রতিককালের তবুও প্রথম যুগের ভারতীয় আঙ্গিকে অঙ্কিত ক'একটি সংবেদনশীল এবং নিখুঁত 'ফিনিশড' রচনাও পাশাপাশি রাখা হয়েছে। রাজকুমারী তুলসী (৫৯) এবং রাজকুমারী (৫৮)—দুটি রচনাই প্রথম যুগের। এগুলির সঙ্গে আজকের রচনায় আঙ্গিকগত এতটুকুও মিল নেই। অতীতের সেই অনুরাগ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর শ্রদ্ধাই বর্তমান কালের রচনায় এনে দিয়েছে অপূর্ব সাফল্য কোথাও অতীতের প্রভাব তাঁর নিজস্বতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বস্তুত মনের এই অস্থিরতা এবং পরিবর্তনশীলতা তাঁর রচনায় আনতে পেরেছে নূতনত্ব।

শিল্পী ঘোষের দৃশ্যচিত্রাবলী মুখ্যত রোমান্টিকধর্মী, বিশেষ করে তাঁর চিত্রের

ফলতাগ্রাম (৪৬)

বিচিত্র বর্ণসুষমা এই কথাই প্রমাণ করে। আধুনিক কালে আর কোন শিল্পীকে এমন নিপুণভাবে একাধিক দুঃসাহসিক রকমের মৌলিক রঙের প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি। প্রতিটি চিত্রে রঙের নিপুণ প্রয়োগ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। চিল্কার একাধিক ছবিতে তিনি রঙ নিয়ে কত বিচিত্রভাবের প্রকাশই না করেছেন অথচ একটির সঙ্গে আর একটির যেন মিল নেই। চিল্কার (৬) সেই হলুদ বালির বিস্তারের শেষ সীমায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। চিল্কায় আসন্ন অন্ধকার (৪৭) এ আঁধার আলোর খেলা। চিল্কা হ্রদে (৭৬) নীল ও হলুদ রঙের নিপুণ প্রয়োগ। রম্বা থেকে চিল্কার দৃশ্যের (৭৯) রঙে তৃতীয় মাত্রার আবেদন শুধু দর্শককে তৃপ্তিই দেয় না নিয়ে যায় রঙের স্বপ্নজগতে। গোপালাপুরের ক'একটি রচনা (২,২৫) ফলতাগ্রাম (৪৬) লামাদের বাসগৃহ (২৯), যাত্রী (৪১) অসীম (৪৪) প্রভৃতি রচনাও এই পর্যায়ে পড়ে। শিল্পী ঘোষ বাস্তবধর্মীও নন। প্রকৃতিকে তিনি নিজের অন্তর-দৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন, তাকে সাজিয়েছেন ইচ্ছেমত—তাঁর রঙীন কল্পনা আর দরদ দিয়ে হুবহু প্রকৃতিকে তুলে ধরেন নি কোথাও। মেঘের রাজ্যে (৪৮) দিগন্ত বিস্তারিত পর্বতমালার কোলে কোলে মেঘের খেলা, এখানে-ওখানে ঘন বৃক্ষ-রাজী. দার্জিলিং-এর পথে (৬৭) ছবিটির হাল্কা মোলায়েম রঙ্, বর্ণাঢ্য মাঠ-ঘাট (৬৯), নদী (৩) প্রভৃতি নানান রচনায় তাঁর সত্যিকারের কল্পনার রাজ্যকে যেন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি ছবিতে সৃষ্টির জন্য তাঁর মনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে দুর্বারভাবে। তাঁর এই অস্থির ও পরিবর্তনশীল মনের ছাপ এনে দিয়েছে নূতনত্বের আস্বাদ, আর এই অস্থিরতা এবং অতৃপ্তিই জীবন্ত শিল্পীর পরিচয় বহন করে।

এই প্রদর্শনীর আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ হচ্ছে মোটা টেম্পেরা রঙে অনেকটা তেল রঙের প্রথায় দ্রুত অঙ্কিত কতকগুলি দৃশ্যচিত্র। একাধিক জায়গায় তেল রঙের মত টিউব থেকে সোজাসুজি তিনি রঙ্ বসিয়েছেন এ রচনাগুলো দেখে মনে হয়েছে এই পরীক্ষা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিল্পী যেন শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর ইপ্সিতকে। এই ধরণের ছবিগুলোর মধ্যে ঘর-মুখো (৬১) সুবর্ণরেখা (৬৫) প্রভৃতি চিত্র আরও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ঘরমুখো রচনাটিতে নির্জন প্রকৃতির গ্রাম্যরাস্তার একটি মেয়ে এবং সুবর্ণরেখায় রঙের খেলা, মাছ-ধরা (৬২) ছবিটিতে ছেলেটির একাগ্রতা ও পেছনে ঝোপঝাড় প্রভৃতি আর একটি আবেদন নিয়ে দর্শককে আকৃষ্ট করে।

এ ছাড়া কতকগুলি স্কেচএ তাঁর রেখা ব্যবহারের দক্ষতা দেখে বিস্মিত হতে হয়েছে। রাজপুতানার মেয়ে (১৪) সে কি এল? (৩৫) স্কেচ দুটোয় ছন্দোময় ও অকম্পিত রেখার ব্যবহার মুগ্ধ করে। এই সঙ্গে কতকগুলো পাখীর স্কেচও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী ঘোষ একাধিকবার আমাদের সম্মুখে এক নূতন রূপলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু তার মনের অতৃপ্তি ও অস্থিরতা এখনও প্রতিটি চিত্র বহন করে। এই অতৃপ্তিই তাঁকে উত্তরোত্তর নতুন সৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে এই আশাই করি। নিকট ভবিষ্যতে তিনি আবার এক নূতন রূপলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন এই প্রত্যাশায় রইলাম।

পেশাদার লেখক
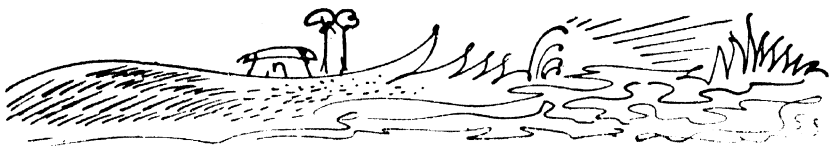
রূপদর্শী

এ যেন খড়ের ঘরে চড়ুই ধরা। দরজা জানালা বন্ধ করে হুস হাস তাড়া লাগাচ্ছি, হয়রাণ হয়ে টপাস করে নিচে একটা পড়েছে কি অমনি খপ, খাপ্ পেতে আছি। কিন্তু বৃথা। খড়ের চালে সহস্র ফুটো, ইচ্ছে করে ধরা না দিলে চড়ুই ধরা সাধ্যি কি?

লেখাটা আমার এই চড়ুই ধরার মতোই। ভাব ভাবনা সবাই চলে ওই চড়ুই পাখির চালে। ধরি ধরি করেও নাগালের বাইরে চলে যায়। ঝামেলা বিস্তর দেখে

রূপদর্শী

পালা প্রায় সাঙ্গ করে এনেছিলাম। 'বল হরি হরি' করলেই চুকে যেত। কিন্তু এসে গেল নতুন পালার বায়না, নগর সংকীর্তন। নতুন কথা বলবার আগে পুরানো পালা চুকিয়ে দিচ্ছি।

মগজে তা দিলে আমার ভাবনা কোন ফয়দা দেখায় না। লোকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার রঙ চোখে মাখি। এই লোকগুলো যেন সুরমা টানার কাঠি।

যে নক্শাগুলো এতাবৎ বুনেছি তার টানা আর পোড়েন সবই আমার আপনার ভাই বেরাদরদের জীবনকে নিয়ে। দিনের পর দিন ঘুরেছি এই জীবনের সঙ্গে 'জান-পহেচান' করতে। যেন নিত্যি নতুন অভিসারে যাওয়া। জীবন আওরাতের মতই খেলোয়াড়। পয়লা নজরে মুচকি হেসে মনটি দুলিয়ে দিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, তারপর আর নো পাত্তা। এখন এক বেভুলা দিওয়ানা তুমি প্রাণের দায়ে তাকে খুঁজে বেড়াও।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে লবেজান হয়ে 'দুত্তোর' বলে যদি হাল ছেড়ে দিলে তো ব্যস সব গেল। দুর্বলের সে কেউ না, কিন্তু তুমি যদি তার ঘুরোন চক্কর কাটিয়ে উঠে উল্টো পাকে তাকে ঘোরাতে পার, সে হিম্মত যদি তোমার থাকে তো সে তোমার কেনা বাঁদী।

জীবনকে ধরলেই শুধু হল না, ভাব করতে হবে তো। তুমি যে তার দিলের দোস্ত, তা যদি সে না বোঝে, তবে তো সে মুখে কুলুপ দিয়ে রাখবে। তাই তাড়াহুড়ো করো না, শনৈ পর্বতলঙ্ঘনম্, আগে পাশে বস, ফুলশয্যার রাতটুকু মনে আছে কি? মুখ গুঁজে থাকা সেই ঘোমটা-পরা মেয়েটির ছবি মনে পড়ে? প্রথমে ভয় ভয়, আড়ষ্ট আড়ষ্ট, তারপর সসংকোচে ছোঁয়াছুঁয়ি, মৃদু মৃদু হাসা, তারপর ধীরে ধীরে টুকটাক কথা। ঠিক এমনি ধারা কড়া কারবার জীবনের সঙ্গে।

জীবনের অজস্র রূপ ছড়িয়ে আছে চাদ্দিকে, কটার নক্শাই বা আঁকতে পেরেছি! কটা জাগরাতেই বা পৌঁছুতে পেরেছি! অনেক পাঠক ফরমাশ দিয়েছিলেন, অনেক গুরুস্থানীয় লোকেরাও আশা রেখেছিলেন, আরো নক্শা লিখি। সে সবগুলো আর এই কিস্তিতে হয়ে উঠল না। সে সব আবার নতুন পালায় গাইব না হয়।

আজকে বরং নিজের কথাই বলি। ছিলাম মিস্তিরি রাত পোহাতেই হয়ে পড়লাম লেখক। একেবারে 'গল্প হলেও সত্যি'।

বিত্তান্তটা বলি। হা চাকরী, জো চাকরী করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভোর না হতেই ফ্যাক্টরীর গেটে ধন্না দিচ্ছি। চাকরী যদি দুটো খালি লোক জমেছি দুশ। আর সব কাজ ছলে কলে ফ্যাক্টরীর কাজ গায়ের বলে। যাদের গায়ে তখনো জোর তারা কনুই-এর গুঁতোয় রাস্তা করে ভিতরে ঢুকে সালাম ঠুকছে। যারা একটু রোগা দুবলা, তাদের তরে কাম নেহি। এমনি করেই একদিন, দুদিন, পাঁচদিন। এক দরজা, দু দরজা, পাঁচ দরজা। তারপর একদিন দেহের বক্কী বলটুকু ছেঁড়া গেঞ্জীর মত এক ফ্যাক্টরীর গেটে ঝুলিয়ে রেখে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম। উপরে আশমান পেটে ক্ষিধে আর চক্ষে আন্ধার।

শহরের কলে বিনা পয়সায় পানি মেলে। পেট ভর্ত্তি জল নিয়ে মুখটা একটু

'স্ব-চিত্র অ'

তুলেছি কি একটা পেন্সিলে লেখা বিজ্ঞাপন, 'প্রুফ রিডার' চাই। অমুক রাস্তার অমুক নম্বরে অমুক কাগজের এডিটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। গেলাম। তখন আমি মরীয়া। এডিটার ছিলেন না, ম্যানেজার ছিলেন। দেখা করলাম। কি চাই? বললাম। এর আগে কখনো এ কাজ করেছো? মাথা দিয়ে টরেটক্কা করলাম, অ্যাও হয় ওও হয়। কতদিন করেছো?

এবার মুখ এগিয়ে এল। আমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ কিছু না করেই ঝড়াকসে জবাব দিলে, চারবছর। আরে আরে বলে কি? বেশ। তা সাইকেল চড়তে জানো? চমকে উঠলাম। সাইকেলে চড়ে প্রুফ দেখতে হবে না কি? কিন্তু সকালে উঠেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ কল্পতরু হব, যে যা শুধুবে, হ্যাঁ ছাড়া আর না বলব না। বললাম হ্যাঁ। কিন্তু স্যার, সাইকেল কি হবে? কেন, স্টলে স্টলে দিয়ে আসতে হবে না বিক্রীর জন্য? তা তো বটেই। আচ্ছা বিজ্ঞাপন আনতে পারবে?

আর আমাকে পায় কে? ততক্ষণে আমি আজ্ঞে হাঁ-এর সাইকিলে উঠে প্যাডেল করতে শুরু করেছি। গড় গড় করে চালাতে লাগলাম, হ্যাঁ। বেশ, তা ইয়ে লেখা-টেখা আসে? নিশ্চয়ই, মাইনের খাতায় আমি কখনোই অন্য লোকের মত টিপ ছাপ মারিনি। গোটা গোটা অক্ষরে নামসই করেছি। বললাম, আজ্ঞে হাঁ। মানে কবিতা-টবিতা? বললাম, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ক্রমশ প্রকাশিত উপন্যাস, তারকার সঙ্গে মোলাকাৎ, খেলার বিবরণ, স্মৃতিকথা, বিজ্ঞাপন—সব স্যার, সব।

কত্তা আমার দিকে এতক্ষণ চেয়ে-ছিলেন। চাওয়া নয়তো যেন আমার কথাগুলো চোখের কষ্টিতে ঘষে নিচ্ছিলেন। চাটনী খাওয়া ফিনিশ হলে টাক্‌রা যেমন টক করে এক আওয়াজ তোলে, তেমনি এক আওয়াজ করে কত্তা বললেন, কাল এসো। বললাম, কি দরকার স্যার, এক্ষুণি বসে যাই। আপনাকে আর খামাকা কষ্ট দিই কেন? বলেই প্রুফের গাদা টেনে নিলাম। বললেন, আহা-হা, এখনো যে মাইনে ঠিক হল না। বললাম, একটা কিছু করবেন, সে ভরসা আছে। কিন্তু এখেনে মাইনে বেশি দেওয়া হয় না। বললাম, ঠিক আছে দাদা। তাহলে পঞ্চাশ টাকা পাবে। যা ইচ্ছে। হ্যাঁ, মাসের দশ তারিখে আর্ধেক পাবে, আর বাকীটা মাসের শেষ নাগাত। তথাস্তু।

বহাল হলাম নতুন কাজে। হপ্তায় হপ্তায় কাগজ বের হয়। প্রুফ দেখি। প্রেসে গিয়ে কম্পোজিটারদের খবরদারী করি। কাগজ ছাপা হলে প্যাক করি, ঠিকানা লিখি, বিজ্ঞাপনের তাগাদা মারি, সাইকেলে করে (মধ্যে মধ্যে যখন বেয়ারাটা

চোখের কষ্টিতে ঘষে নিলেন

কামাই করে) বাগবাজার, বালীগঞ্জে পাড়ি মারি। একবার দিয়ে আসতে, আর একবার ফেরৎ আনতে। গর্বে কোলা ব্যাঙ। আমি কে? কোঽহং? না জর্নালিস্ট।

কম্পোজিটার তাগাদা মারে, স্যার, তিন ফর্মার দেড় পেজ খালি, ম্যাটার দিন। একটা গল্প দিন স্যার, কি সব এসে-টেসে পাঠাচ্ছেন, একটা রগরগে লভ্‌ ইস্টোরী ছাড়ুন দিকি। এই প্রেসটায় কাজ করে স্যার কিস্‌সু সুখ পাইনে। হাঁ, যখন শ' বাজারে কাজ করতুম, বাড়ুজ্যে প্রেসে, সে স্যার গিয়েছে একদিন, বুঝলেন, এক বইয়ের কাজ ধরা হল, 'নিচের তলার গল্প' না কি যেন, ওই গোছের নামটা, বলব কি স্যার, পড়তে পড়তে কি পুলকটাই না চাগান দিয়ে উঠত, মনে হত, মনের মধ্যে যেন ঘোড়ায় হামাগুঁড়ি দিচ্ছে। আরেকবার স্যার বিটি প্রেসে, 'দুরন্ত যৌবনজ্বালা' নিয়ে সেরেফ ফাটাফাটি হয়ে গেল দুজন কম্পোজিটারে। কি না লাস্ট চ্যাপ্টারটা কে কম্পোজ করবে। যাক সে কথা, এখন কিছু ম্যাটার

নিকালো

দিয়ে দিন তো, নইলে ওদিকে ফর্মা আটকে থাকবে, মেক-আপ হবে না।

গল্প চাই, আধ ঘণ্টা বাদে এসো। খেলার খবরটাই তিনের ফর্মায় তুলে দাও। লিখতে বসলাম গল্প। দেড় পেজি এক কড়া প্রেমের গল্প। স্যার এক পেজ কবিতা চাই। স্যার দেশ-বিদেশের টাট্‌কা খবর চাই দু পেজ। স্যার এবারের তারকার প্রথম প্রেম তো আজও এল না। ঠিক হ্যায়, সব হবে, এসো আধ ঘণ্টা পরে, তিন কোয়াটার পরে, দেড় ঘণ্টা পরে।

স্যার, বিশুবাবু যে কবিতা দিয়েছেন, পাঁচ লাইন কেটে দিন, বড় হয়ে গেছে। স্যার, এডিটোরিয়াল এক প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়ে দিন। স্যার, ছবিটার তলে ভাল চার লাইন পোয়েট্রি লিখে দিন। দিচ্ছি, দিচ্ছি, দশ মিনিট পরে এসো, বিশ মিনিট পরে, পঁচিশ মিনিট পরে।

এমনি করে এক বছর, লেখার কার-খানায় হাত পাকালাম, গুরু হল কম্পোজিটাররা। বল না এখন কি চাই? গল্প না উপন্যাস না বেলে লেটার না কবিতা।

লেখার নেশায় লিখে যাওয়া, সে ব্যাপারটা কেমনতরো টের পাইনি কখনো। লেখাই আমার পেশা। কলম পিষে রুজির জোগাড়, আমার ললাটে খোদা লিপি।

'অ' এর সঙ্গে আলাপ হল। আমরা লেখার ঘোড়ায় রেখার লাগাম চড়ালাম। এবার ওর কথাটাও বলি। যে সাপ্তাহিকে 'সবে ধন নীলমণি' ছিলাম। সেটি চোখ বুঁজলে। আবার বেরুলাম পথে। হঠাৎ দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। তার কাঁধে পা রেখে তার বন্ধুর বন্ধু হলাম। তার দৌলতে নগদা লাভ একটি প্রুফ রিডারীর চাকরী। জিগ্যেস করলেন, প্রুফ দেখতে জানেন? ঘাড় নামিয়ে জানালাম হ্যাঁ। সে ঘাড় আর তুললাম না। ক'টা প্রশ্ন হবে, ঠিক কি? কিন্তু আর প্রশ্ন হল না। সোজা বলে বসলেন, কাল অফিসে দেখা করবেন। অফিসে গেলাম। দেখা হল না। পরদিন, তাও না। রাম দুই সাড়ে তিন দিন পার হতে হঠাৎ একদিন চোখাচোখি। সামনের মাস থেকে প্রুফ দেখতে লেগে যান। যে আজ্ঞে।

প্রুফ দেখা জোর চলছে। মনিবের ঘর থেকে ডাক এল। ছোটদের সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে। বললাম, এককালে তো ছোট ছিলাম। ব্যস্ তো কাল থেকে শুরু করে দিন। 'অ'কে ডেকে বললেন, এ হল আর্টিস্ট, আপনাকে সাহায্য করবে। হপ্তায় চারদিন প্রুফ দেখি, দুদিন ছোটদের গার্জেয়ানি। ছড়া লিখি, গল্প লিখি, 'অ' আঁকে। মাস কতক পরে মনিবের ঘরে আবার তলব। সিনেমা দেখেছেন কখনো? আজ্ঞে হ্যাঁ। কেমন

মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ

লাগে? আজ্ঞে তা বেশ। বেশ কথা, কাল থেকে আপনি সিনেমা এডিটার। বহুতাচ্ছা। দ্বিপদী ছিলাম ত্রিপদী হলাম। হে ঈশ্বর, আরেকটা ধাপ উঠিয়ে দিলেই হাম্বা রবে বেরিয়ে পড়তে পারি। আর সেই চতুষ্পদেই বেরুলাম কিন্তু। 'অ'র আর আমার দুই দুগুণে চারটে' পা-ই হল।

'অ'তে আর আমাতে সেই যে গিঁট বাঁধলাম, অনেক নোনা জল গিলে আর ঝড়ো হাওয়া খেয়েও সে গিঁট ঠিক আছে।

'অ'কে বলেছি, চল হে খিদিরপুর যাই, চড়া রোদ্দুরে সেখানে গেছি। দুপুর রাতে কলকাতা দেখেছি। যে সময়ে নাবিক লিখি, দুজনে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ, কেউ আর পাত্তা দেয় না। কি যে ছিল আমাদের হাবে-ভাবে, তাতো আর জানিনে। সবাই কেমন সন্দ সন্দ করে। এড়িয়ে এড়িয়ে যেতো, শেষে অনেক কষ্টে একজনের সঙ্গে ভাব জমালাম। নিয়ে গেল ওদের হোটেলে। গল্প-সল্প বেশ চলছে, সঙ্গে সিগ্রেটটা-আসটা, গরজ আমার, সাপ্লাই আমিই করছি। লেখাটা ঠিক সময়ে জমা দিতে না পারলেই কম্ম গুবলেট হয়ে যাবে। দু-চারটে খবর জিগ্যেস করছি, টুকটাক নোট করছি, ওপাশে নাক লম্বা বুড়ো সেলর বসে বসে শুনছে, আর আড়চোখে 'অ'এর নুরে নিরীখ করছে। 'অ' আপনমনে আঁকিবুকি কাটছে। হঠাৎ একটা ছোকরা পাশ থেকে এক চীৎকার, চাচা, তোমারে বেবাক কাগজে তুলছে। যেই না বলা, বুড়ো একেবারে 'অ'এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, নিকালো, নিকালো, কি হল, কি হল, করতে না করতেই 'মার হালারে, মার হালারে' রব। কিসের থেকে কি হল, খতিয়ে দেখার সময় কই? অতি কষ্টে পৈতৃক প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আবার উল্টোটাও ঘটেছে। ছবি আঁকবে শুনেই এক খেলোয়াড় দিব্যি সোনা হেন মুখ করে, পোজ মেরে দাঁড়িয়ে বললে, সে চেয়ারা আর নেই দাদা। কি ছাতি, কি গুলো ছিল ওঃ। বাপের হোটেলে খেতুম আর শরীর বাগাতুম। এখন যা দেখছেন, এতো মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ।

দিন রাত্তির সতর্ক চোখে ঘুরেছি। যা দেখেছি, যেটা ভাল লেগেছে, তুলে ধরেছি। দুদিন, তিনদিন, চারদিন পর্যন্ত একই জায়গায় চক্কর দিয়েছি, সময় মাপা, সম্বল মাপা। হপ্তার পর হপ্তা লেখার জোগান দিয়েছি।

শুধু কি টাকার জন্যে? সেটাই প্রধান কারণ, তবুও মিথ্যে বলব না, জীবনের যে বিচিত্র রূপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে নিত্য অভিসারের নেশা, সেই নেশাটুকুই উন্মাদের মতো ঘুরিয়েছে। আর আত্মপ্রসাদ কি নেই? জীবনের এই যে বহুতর রঙের ছবি, পাঠকরা কাদের চোখ দিয়ে দেখেছেন? আমাদের চোখ দিয়েই না। তবে। সেটাই কি কম লাভ?

বিকল্প

মহাশয়,

শান্তির ব্যাপারে রঞ্জন যে বিকল্প বার করেছেন তা মেনে নেবার একটু অসুবিধে আছে। রঞ্জন Zনেন না যে, যুদ্ধের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান অন্তত আজকে আর সম্ভব নয়। তিনি লিখেছেন, "প্রতি যুদ্ধেরই উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ১টা বা দুটো সমস্যার সমাধান—যুদ্ধে জয়লাভ করলে সে সমাধান হাতে আসে।" তামাদী হয়ে গেছে বলে যুক্তিটা ঠিক হয়েও অচল। এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের একটা সুনির্দিষ্ট ফলাফল ঘটত। এক পক্ষ জিতে ঢাক-ঢোল বাজাত আর অপরপক্ষ হেরে গিয়ে মুখচুণ করে থাকত। তারপর বিজয়ী পক্ষ আগের শত্রুর ওপর চোখ রাঙিয়ে নিজের কাজটি দিব্যি গুছিয়ে নিত। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের দৌলতে সব উল্টে গেছে। বিজলী বাতির রোশ্‌নিতে দিনে রাতে আর তফাৎ নেই। তেমনি যুদ্ধের ব্যাপারেও আজ আর পাশ ফেল নেই। নিশ্চিত জয় বা সুস্পষ্ট পরাজয় আজ আর যুযুধানদের মধ্যে ঘটতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে দুপক্ষের হাতেই মানুষ মারবার এমন সরেস প্যাঁচ মওজুদ যে knock-out victory-র দিন গেছে। যখন শেষ ফলাফল এমন অস্পষ্ট তখন আর সমস্যা মিটবে কেমন করে কোন এক পক্ষের। একজন এ্যাটম বোমার ভয় দেখালে আর একজন H-বোমা বার করে। অবস্থাটা এহেন গোলমেলে বলেই ত' এখনও ক্রেমলিন হোয়াইট-হাউসের মসীযুদ্ধ অসি-যুদ্ধে পরিণত হয়নি। দুজনেরই ভাল করে জানা আছে লড়াই একবার বাধলেই সব খতম। যুদ্ধান্তের মহাশ্মশানে "একজন না রহিবে বংশে দিতে বাতি"!!

কাজেই দেখা যাচ্ছে কোনও জাতি রঞ্জন বর্ণিত ২।১টি সমাধানের আশাও করতে পারে না যুদ্ধের ভেতর দিয়ে—এমন কি সাময়িক সমাধানও কোন প্রশ্নের মেলা অসম্ভব। পণ্ডিত নেহরুর উক্তি "যুদ্ধের দ্বারা কখনো কোন সমস্যার সমাধান হয় না" খাঁটি কথা। তবু আগে হয়ত হতে পারত, কিন্তু বর্তমানে নৈব নৈব চ।

রঞ্জন দুঃখ করেছিলেন যে, যুদ্ধে সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত নয় তথাপি হয়। এখন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন সে বিষয়ে। আধুনিক মারণাস্ত্র, তার বহু বিভীষিকা সত্ত্বেও মানবজাতিকে এই অভয়টা দিয়েছে—হওয়া এবং হওয়া-উচিতের মিল ঘটিয়ে। ইতি—বশংবদ অমর চৌধুরী। করাচী।

অরণ্য জীবনের গান

১৩শ সংখ্যার 'দেশে' (১০ই মাঘ, ১৩৫৯) জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরীর লেখা আদিবাসী সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত

আলোচনা পড়ে খুবই ভাল লাগলো। আদিবাসী সঙ্গীত নিয়ে বাঙলা ভাষায় বিশেষ আলোচনা হয় নি। আদিবাসী সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক লেখকই যে আদিবাসী গানকে বিকৃত করেছেন এবং "স্বেচ্ছাচারী কল্পনার আশ্রয় নিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন" একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ রকম ক্ষেত্রে একটি বাস্তব এবং হৃদয়গ্রাহী আলোচনা স্বতই পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক প্রসঙ্গ-ক্রমে এক স্থানে মন্তব্য করেছেন, "উপমা ব্যবহার বা তুলনামূলক পদ ব্যবহার আদিবাসীদের গানে সংখ্যায় খুব কম।" সাঁওতালী লোকসঙ্গীত ব্যতীত আদিবাসী সঙ্গীতের অন্যান্য শাখাগুলির সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান নেই, তাই সেগুলি সম্বন্ধে লেখকের উপরোক্ত মন্তব্য কতদূর সার্থক, তা আমি জানি না। কিন্তু আমার নিজস্ব অভিমত এই যে, সাঁওতালী লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর উক্ত মন্তব্য মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুত, সাঁওতালী লোকসঙ্গীতে উপমা ব্যবহার এবং তুলনামূলক পদ ব্যবহারের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। লেখক প্রবন্ধটিতে কেবলমাত্র প্রেমের গান-গুলিরই পরিচয় দিয়েছেন, তাই আমিও আমার মতের স্বপক্ষে একটি প্রেমের গানেরই উদাহরণ দিচ্ছি। গানটি এইঃ

সোনেরো রূপ রূপেরো রূপ
সোনেরো রূপ লেকা গাতেঞ মেলায়
গাতেঞ দিসোয়রে সোনা মুন্দোম্‌
গাতঞ উইহয় জিবীদো লোকাতিঞ।

অর্থঃ—সোনা আর রূপার রূপের মধ্যে আমার প্রিয়তমের রূপ সোনার মতো। সোনার আংটি দেখে আমার প্রিয়তমের কথা মনে পড়ে যায়। সাঁওতাল পরগণা নিবাসী সাঁওতালেরা দরিদ্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের দারিদ্র্য তাদের জীবনকে দুঃখময় করে তুলতে পারে নি। জীবনের বিবিধ অনুভূতির প্রতি এদের একটি সহানুভূতিশীল মন সদাসর্বদা জাগ্রত থাকে। এই সহানুভূতিশীল মনই বিভিন্ন ছন্দের সংযোগে সহস্র সহস্র লোক-সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। সাঁওতালী লোক-সঙ্গীতে সর্বপ্রথমে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে তার সারল্য এবং বক্তব্য বিষয়ের সুস্পষ্টতা। কিন্তু এগুলিই সাঁওতালী লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। উদাহরণ স্বরূপ সাঁওতালদের মধ্যে একটি বহুপ্রচলিত সঙ্গীতের কথা মনে পড়ে।

ছোটো মোটো পুখুরী চরকুলিয়া পিন্ডরে
পোরোইনী ফুটে লালে লাল,
পাসেচ্‌ তেরী ফুল দেখি ফুলয় লোবেলবু
পাসেচ্‌ তেরী আধাদিন লাগিৎ।

—"চারিদিকে বাঁধানো ছোট একটি পুকুরে 'পুরেইন্‌' নামের লাল লাল ফুল ফুটেছে। সে ফুল দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছ। আমাকে দেখেও তুমি মোহিত হও। কিন্তু সে মোহ আধাদিনের জন্যে নয় তো?"

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখকের মতের সঙ্গে কারুরই দ্বিমত থাকা উচিত নয়। সত্যিই, "দেবদেবীর প্রতি প্রার্থনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের গানেও তাদের বিশেষত্ব ফুটে ওঠে।" বর্তমান ক্ষুদ্র লিপির সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাও সম্ভব নয়। পরিশেষে, লেখক পাঠক-পাঠিকার কাছে যে অনুরোধ জানিয়েছেন, সে অনুরোধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই। লেখক আদিবাসী অঞ্চলের পাঠকপাঠিকার সহায়তা পেলে উপকৃত হন জানিয়েছেন, তাই জানতে ইচ্ছে হয় যে, কিরূপ সহায়তা প্রার্থী তিনি।

নিবেদক—
শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, নয়া দুমকা।

স্মৃতির অতলে

মহাশয়।

কালচক্রের আবর্তনে বাঙলা তথা ভারতের কত নীরব সেবক, সাধক, গুণীর নাম অতল তলে ডুবে যাচ্ছে। আমরা তার কোন হদিশ পাই না। যদিও বহু কৃতিমানবের জীবনগাথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে, বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়িয়েছে, কিন্তু সেই সৌষ্ঠব দর্শনের সৌভাগ্য অনেকেরই নাই। এর প্রধান কারণ জীবনী সাহিত্য ক্রয়ের অর্থাভাব এবং সর্বত্র পাবলিক লাইব্রেরী না থাকা। তবে "দেশ" বা এরূপ ধরণের সাময়িক পত্রিকা পল্লী অঞ্চলেও পঠিত হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠায় যদি অনুসন্ধানী লেখকগণ অনুগ্রহ করে, কৃতি মানবগণের জীবন-আলেখ্য প্রকাশ করেন, তবে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সেবক, সাধক, গুণীদের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করার সুযোগ ও সাহিত্য রস পানে ধন্য হয়। আমার মনে হয় শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল মহাশয় দেশ পত্রিকায় "স্মৃতির অতলে কালে খাঁ" ইত্যাদি গুণীদের জীবনের সামান্যতম অংশটুকু লিখে শুধু আমার মত দরিদ্র নীরস পাঠকের সময় কর্তনের খোরাক যোগান নি, সাহিত্যিক পেয়েছেন সাহিত্য রস, সঙ্গীতজ্ঞ দেখেছেন সুরের মূর্ত মূর্তি। গুণগ্রহিতারা অন্তর ভরে গ্রহণ করেছেন গুণীদের গুণগরিমার কথা, আর দেশ জেনেছে তার কৃতি সন্তানের পরিচয়। অমিয়বাবুর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, আমরা তাঁর ও "দেশ" সম্পাদকের এই শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত কচ্ছি। বিনীত—শ্রীসুরেশকান্ত নাথ, ২৪ পরগণা।

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

ধনেপাতা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, মিত্রালয়ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, আড়াই টাকা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন কাহিনীকে একালের তৃষ্ণার সামগ্রী করে বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছিলেন। আবহ (Atmosphere) সৃষ্টির অভিনবত্বের প্রসঙ্গ তুললে আরও অনেকের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল এবং আরও কেউ কেউ এ-কাজে সিদ্ধি লাভ করেছেন। তারাশঙ্করের 'রায়বাড়ি', 'জলসাঘর' প্রভৃতি গল্পেও অবিস্মরণীয় আবহ ফুটেছিল, সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দাতার স্বর্গ', 'মেঘ-মল্লার', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'নব-বৃন্দাবন' প্রভৃতি গল্প একই সূত্রে স্মরণীয়। এবং আবহের প্রাধান্যের বদলে অন্যান্য বিশেষত্বের সঙ্গে আবহের দিকে অনিবার্য প্রবণতা যাঁদের বৈশিষ্ট্য, তেমন লেখকের সংখ্যাও আধুনিক বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল নয়। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল,—একালের এইসব খ্যাতনামাদের সঙ্গে অল্প-পূর্ববর্তী প্রমথ চৌধুরী এবং আরও পূর্বস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়া অসঙ্গত নয়।

প্রমথনাথ বিশী গল্প-কবিতায়-নাটকে-প্রবন্ধে—সর্বত্রচর আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। 'ধনেপাতা'য় তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা নির্বাচন করে প্রাচীন কালের আবহকে নবীন সরসতা দিয়েছেন। 'নিবেদনে' তিনি লিখেছেন—'এগুলি ইতিহাসের পাত্রে পরিবেশিত কল্পনার পানীয়। এগুলির ঐতিহাসিকতার দাবি সম্বন্ধে ইহার বেশি বলিবার কিছু নাই।'

'মহেন-জো-দড়োর পতন', 'মহালগ্ন', 'অসমাপ্ত কাব্য', 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন', 'ধনেপাতা' এবং 'গুরুমারা চেলা'—মোট এই ছ'টি গল্পের পাত্রে যথাক্রমে সিন্ধুর বন্যা ও আর্য জাতির আক্রমণে বিনষ্ট মহেন-জো-দড়োর পূর্ব মহিমা, মাসিডনপতি সেকেন্দর শার ভারত-আক্রমণ, উজ্জয়িনীর কবি কালিদাসের প্রণয়কাহিনী, কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের রচনাকাল-কল্পনা, দশম-একাদশ শতকের কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থিদের আচরণকথা—এবং সুলতান জালাল উদ্দিন খিলজীর সমকালীন গৌড়ের সারল্য ও নৈতিক ক্রমাবনতির হেতুসংকেত ধ্বনিত হয়েছে।

ইতিহাসে এবং প্রকল্পনায় (Fantasy) জড়িত এই ছ'টি কথার প্রত্যেকটিতেই প্রমথনাথের মনশীয়ানার ছাপ আছে। তাঁর প্রবন্ধের বই 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য' এবং 'বাঙালীর জবনসন্ধ্যা'য় বাংলা দেশের মানুষের জন্য তাঁর আন্তরিক যে মমতা এবং সমবেদনাময় উদ্বেগ দেখা গিয়েছিল, বর্তমান গল্প সংগ্রহের 'ধনেপাতা' এবং 'গুরুমারা চেলা', এই দুটি রচনায় তাঁর সেই মমতা দেখা দিয়েছে পরিহাস-কৌতুক-রঞ্জিত দূরবীক্ষণের নব-প্রচেষ্টায়। তবে, 'ধনেপাতা'-র মৃদু স্বাদু আকর্ষণের তুলনায় মহেন জো-দড়োর পতনের করুণ-গম্ভীর অধ্যায়টি ভারতবর্ষের ইতিহাসেও যেমন স্মরণীয়তর ঘটনা, প্রমথনাথের এই গল্পমালার মধ্যেও তেমনি উৎকৃষ্ট রচনা। অন্য লেখাগুলি ভালো, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে স্থায়ী।

৪০৪।৫২

আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প—মিত্র ও ঘোষ; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, পাঁচ টাকা।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যেমন মৈত্রেয়ীর মতো রমণী আছেন, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি আপন পরিবেশ-সংস্কার-আচার-অতিশায়ী মননের অধিকারিণী নারীও থাকতে পারেন। একালের বহু পরিচিত ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, এথেল ম্যানিন এবং আরও অনেক লেখিকার কথা এইসূত্রে সাহিত্য পাঠকের মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। বাংলায় অবিশ্যি এতোটা ঘটেনি। জ্যোতির্মালা দেবীর 'বিলেত দেশটা মাটির' বাঙালী পাঠকের মনে মেয়েলী-পুরুষালী মনন বৈষম্য সংক্রান্ত সংস্কার ভেদের মূলে হয়তো ঈষৎ আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতির্মালা কলম টেনে নিয়ে সহসা যেন কাজে ইস্তফা দিলেন। তাঁর লেখনী অদৃশ্য হলো। লীলা মজুমদারের কাছে সাহিত্য-পাঠকের কিছু দাবী ছিল, কিন্তু তাঁরও বোধ হয় অবকাশ নেই। অমলা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু—এঁরা স্বভাবত অন্তঃপুর-কথাময়ী। বাংলা দেশের মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের কাহিনী বুনতে বুনতে স্ত্রী-সংস্কারের রঞ্জন এঁরা সহজেই মগ্ন করেন।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পসংখ্যা বিশেষ কম নয়। সর্বসমেত একুশটি গল্প বেছে নিয়ে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলিত হয়েছে। তাঁর অভিনিবেশ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থালির সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার বৈচিত্র্যময় বৈচিত্র্য-হীনতার নানা পর্বে, নানা লগ্নে, নানা অনুরাগ-বিরাগ-প্রীতি-অপ্রীতির ক্ষণানু-সন্ধানব্রতী। বর্তমান সংকলনের প্রথম গল্পটির নাম 'ক্ষণ-গোধূলি'। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'সংস্কার', 'সর্পশিশু', 'আত্মহত্যা', 'একটি ভাঙাচোরা গল্প', 'পাকাঘর', 'অনুক্ত', 'কঙ্কণ', 'রাহু', 'ভয়', 'অঙ্গার', 'ঐশ্বর্য' প্রভৃতি বহু পরিচিত রচনা এ-বইয়ে

সংকলিত হয়েছে। এসব কথাও ক্ষণ-কথা। অর্থাৎ, ছোট গল্পের আখ্যান স্বভাবটি সর্বত্র বিদ্যমান আছে। অভ্রান্ত নিঃসংশয়তার বৈশিষ্ট্য আছে লেখিকার দৃষ্টিতে। ঈর্ষা, প্রণয়, কলহ, বঞ্চনা, লোভ, সহিষ্ণুতা, ভয়, লাঞ্ছনা,—বাঙালী জীবনের মানস প্রবাহের ক্ষীণ ঢেউগুলির সব কথাতেই তাঁর আগ্রহ আছে। প্রয়োজনমতো এক জায়গায় রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলে অবলীলাক্রমে যবনিকা তুলে ধরা-ই তাঁর স্বভাব। গল্পের মর্জিমতো পাঠক এগিয়ে যেতে বাধা পান না। তারপর কোনো এক অনিবার্য সন্ধির সংকেত! এমনি সন্ধিতে পেঁছে লেখিকা শুধু একটি মন্তব্য করতে পারেন,—'ইহার পর বলিবার মত কিছুই নাই।' আশাপূর্ণা তাই করেছেন। কিন্তু তারপর আবার যখন আখ্যানস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তখন তাঁর কৌশল দেখে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'গল্প-গুচ্ছে'র কথা মনে পড়ে,—কখনও বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নিশীথ-নগরী' প্রভৃতি চেনা কথার গল্পপ্রযুক্তির বিশেষত্ব মনে পড়তে পারে। আশাপূর্ণা সুপ্রিয়ার গল্পটি ('ক্ষণ-গোধূলি') এই কৌশলে গেঁথেছেন। একাধিক 'হয়তো'র সংকেতে সম্ভাবনার বৈচিত্র্য ধ্বনিত করে আখ্যান পরিসমাপ্ত হয়েছে 'নিভাঁজ সত্যে'র বস্তুকঠোর অকাট্যতায়। সেখানে অনিন্দ্য নেই, আশা নেই, স্বপ্ন নেই, মুক্তি নেই,—শুধু 'রাক্ষসের মত দুই-দুইটা চুলা খাঁ-খাঁ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে।

ছোট গল্পের ঠাট বাঁচিয়ে, দৃশ্য পরিবর্তনের নাটকীয় রীতি অনুসরণ করে কখনও কখনও তিনি দীর্ঘকালের বিস্তারে আখ্যানের পট স্থাপন করেছেন। অনুপমা-র অভিনয় ফুটিয়ে তোলার জন্য ('অভিনেত্রী') এমনি আয়োজনই দরকার। প্রথম দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্যের ব্যবধান এক-আধ বছরের নয়,—আশাপূর্ণা বলেছেন—'দু' যুগ পরের কথা...দু'যুগ কেন—বরং তার বেশীই।' এই পঁচিশ বছরের মধ্যে অনুপমা অবশ্যই কিছু বদলেছেন,—অনুপমার স্বামী তারানাথও বদলেছেন। কিন্তু অনুপমার অনুপম অভিনয় শেষ হয়নি। শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে, বাপ-মায়ের কাছে, স্বামীর কাছে—এমন কি নিজের ছেলে-মেয়ের কাছেও মমতাময়ী নারীকেও হতে হয়েছে অভিনেত্রী। কল্যাণী লালন করছেন 'চিরশিশু অবোধ পুরুষ জাতিকে।' একটি কুঠিন কঙ্কণের স্বর্ণ-সমাবেশের• স্তব্ধ বন্ধনীর মধ্যে স্পন্দিত হয়েছে মনীশের প্রেমের অনুবর্তন (কঙ্কণ'): —তুচ্ছ কেরাণীর বৌ অঞ্জলি দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে নিজের হাতের কাঁকন দেখে ভেবেছে —'হাঁ,—প্রেম নয়, করুণা নয়—স্নেহমাত্র'। কিন্তু পুরাপর্বের 'মেজদাদা' মণীশের উপহার হাতে নিয়ে উত্তর পর্বের বস্তু সত্যকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। অতএব, গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ পুকুরে বিসর্জন দিতে হয়েছে পঁচিশ মাইল দূরের গল্প। কঙ্কণের শেষ তিরোভাবটি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই অসামান্য! আশাপূর্ণা যেন গদ্য থেকে কবিতায় আশ্রয় খুঁজেছেন।

সংসারের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত অন্তরালই তাঁর অনুভূতিতে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর গল্পে ঝড়-তুফান-অগ্নিকাণ্ড-ভূমিকম্প-প্লাবন-ধাবনের দ্রুত তরঙ্গশোভা নেই, ত্বরা নেই, খরা নেই, নিনাদ নেই,—আছে বেদনা-মথিত করুণ মোহন সুসীম এক মনোভাব। সেই মনোভাবটির নাম দেওয়া যাক্—বঙ্গশ্রী।

অনুবাদ সাহিত্য

ফুলকি ও ফুল ঃ কৃষণ চন্দর। অনুবাদক ঃ পার্থকুমার রায়। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৸৹।

শোনা যায় বাঙলা ভাষায় ছোট গল্পের বই বিক্রী হয় না, অনুবাদ গল্প আরো কম। তা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অপরিণত হাতের কয়েকটি উর্দু গল্পের অনুবাদ ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থটিতে পরিবেশন করা হয়েছে। ভূমিকায় প্রকাশক জানিয়েছেন, 'বর্তমান ভারত ও পাকিস্থানের বিখ্যাত উর্দু কথাশিল্পীদের মধ্যে কৃষণ চন্দর অন্যতম'। আজকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতি সর্ব সময়ে রচনার বিচারে হয় না, সুতরাং কৃষণ চন্দর বিখ্যাত হয়েছেন এ কথা অস্বীকার করবো না। কিন্তু অন্যতম যে তিনি নন, তা শুধু তাঁর বাঙলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাব্য করা বই 'অন্নদাতা'ই নয়, বর্তমান গ্রন্থের গল্পগুলিও প্রমাণ করবে। ঐতিহ্যবাদী অথচ প্রগতি-সম্পন্ন বাঙলা ছোট গল্পের পাশে বাঙালী চরমপন্থীদের মতবাদ ভারাক্রান্ত গল্পগুলি অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়, তা সত্ত্বেও বলবো, কৃষণ চন্দরের তুলনায় তাঁরা অনেক বেশী রস পরিবেশন করতে সমর্থ। উর্দু সাহিত্যকে বাঙলার কাছে পরিচিত করতে হ'লে প্রাচীন ও বিগত যুগের উর্দু সাহিত্যের সম্পদকে উপস্থিত করাই উচিত এবং তার বিশেষ ঐতিহাসিক প্রয়োজনও আছে। অন্য ভাষার আধুনিক রচনা তখনই বাঙলায় অনূদিত হতে পারে যখন তা বাঙলার চেয়ে উন্নত না হোক, বাঙলার মনে নতুনত্ব দেবে, বা বাঙলার সমকক্ষ বলে স্বীকৃত হবে।

অনুবাদকের স্বচ্ছ ও সুখপাঠ্য ভাষা এবং পরিচ্ছন্ন ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। মাত্র একটি রঙের সাহায্যে এমন চমৎকার প্রচ্ছদপট আঁকার কৃতিত্ব যে শিল্পীর তাঁর নাম উল্লেখ নেই গ্রন্থটিতে। ১৯।৫৩

নরসুন্দর সমিতি ঃ মুল্‌ক্ রাজ আনন্দ। অনুবাদক ঃ অমল দাশগুপ্ত। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৸৹

আলোচ্য গ্রন্থখানি কয়েকটি অনুবাদ গল্পের ১০৩ পৃষ্ঠার ছোট্ট সংকলন। ইদানীং বাঙলা ভাষা অনুবাদ সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে এবং তার ফলে অনুবাদ গ্রন্থের পাঠকও বাড়ছে। বর্তমান অনুবাদক সাবলীল ভাষার অধিকারী এবং ভাষান্তরে তাঁর যে যথেষ্ট দক্ষতা আছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় বইটিতে। কিন্তু যে কোন গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করার পূর্বে অনুবাদককে কিছুটা সমালোচকের দৃষ্টিতে বই এবং লেখক নির্বাচন করতে হয়। দুঃখের বিষয়, ইংরেজী ভাষায়, বিশেষ করে বিদেশে, বই প্রকাশ করতে পারলেই যে কোন লেখক ভারতবর্ষে জাতে উঠতে পান অনায়াসেই। বাঙলা দেশ এতদিন তার নিজস্বতা বাঁচিয়ে রেখেছিল, তার প্রমাণ, বিদেশে যথেষ্ট সম্মান পেয়েও বহু লেখক এদেশে আদৃত হ'ননি। কারণ রসবিচারে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি তাঁরা। বাঙলা ছোট গল্পের ক্ষেত্র আজ এমন এক উন্নত মানে এসে পেঁছেছে যে মুলক্ রাজের গল্প পড়ে মনে হয় যেন পাক্ কল্লোল যুগের কোন মোটামুটি সক্ষম লেখকের গল্প পড়ছি। এ গ্রন্থের একটি গল্পও বর্তমান দিনে ভাষান্তরের যোগ্য বলে মনে হয় না। অনুবাদকের সামর্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করার কারণ পাইনি বলেই তাঁর কাছ থেকে সত্যিকারের মূল্যবান বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ চাইবো, আশা করবো তিনি শুধু অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যাই বাড়াবেন না, অনুবাদ 'সাহিত্য'কেও সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

মাত্র একটি বর্ণের ব্যবহারেই প্রচ্ছদপটকে সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। ১৮।৫৩

উপন্যাস

বকুল—মনোজ বসু; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—দুই টাকা।

বাঙলা কথাসাহিত্যের মনোযোগী পাঠক-মাত্রেই জানেন, সাম্প্রতিক গল্প- উপন্যাসের ধারা দুটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত। একটি আবেগের, অন্যটি মননের। সাহিত্যকর্মে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে কথাসাহিত্যিকদের একাংশ যেখানে আবেগের বা হৃদয়বৃত্তির পথটাকে বেছে নিয়েছেন, অপরাংশ সেখানে মননপন্থার পথিক। যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধির প্রতি অধিকতর আকর্ষণই যে দ্বিতীয়াংশকে মননধর্মের প্রতি সমধিক আগ্রহশীল করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। তাতে করে তাঁদের সাহিত্যকর্ম মেলোড্রামার স্থূল হস্তাবলেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে তা স্বতঃস্ফূর্ত রস-সঞ্চারেও খানিকটা ব্যর্থ হয়েছে কে তা অস্বীকার করবে। হৃদয়বৃত্তির নামে যদি উচ্ছ্বাসধর্মের উপাসনা চলে অবশ্যই তা কেউ বরদাস্ত করবেন না কিন্তু মননধর্মের নামে যদি বিশুষ্ক যুক্তিতর্কের মধ্যেই লেখকের

সর্বউৎসাহ অপব্যয়িত হয় তা-ই বা কী করে বরদাস্ত করা সম্ভব। আবেগসর্বস্বতার থেকে যেমন উচ্ছ্বাসের উদ্ভব হয়, মনন-সর্বস্বতার থেকেই তেমনি নীরসতার। এ-দুয়ের কোনোটিই আমাদের অভিপ্রেত নয়।

তাহলে উপায় কি? উপায় একটা আছে। এবং সে-উপায় অবলম্বন করলে কথা-সাহিত্যিকরা বোধ হয় সহজেই আপনাপন সাহিত্যকর্মকে সরস স্বতঃস্ফূর্তভার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন, ওদিকে উচ্ছ্বাস-প্রবণতার হাতেও তাঁদের ধরা দিতে হয় না। কী সেই উপায়? অন্য কিছুই নয়, আবেগ এবং মননের সমন্বয়সাধন। যুক্তিবুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ। একমাত্র এই পথেই বোধ হয় তাঁরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসকে প্রকৃত অর্থে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন। নান্যঃ পন্থা।

বাঙলা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অল্প যে-কজনের লেখায় সেই সমন্বয়সাধনের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, মনোজ বসু তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনা মূলত আবেগধর্মী। সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস 'বকুল' পড়েও বুঝলাম যে, হৃদয়-বৃত্তির প্রতিই তিনি অধিকতর আগ্রহশীল। হৃদয়াবৃত্তির প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠাকে চির-দিনই তিনি সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। এ-কারণে তাঁর সাহিত্যকর্মের সর্বত্রই একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তার মধ্যে একটি সংবেদন-শীল হৃদয়ের পরিচয়ও ছড়িয়ে পড়ে আছে। মানুষ এবং প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। ভালো আর মন্দের তিনি বিচার করতে যাননি, ভালোয়-মন্দে তাকে গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন থেকে যায়, আবেগধর্মের প্রতি এতখানি আকর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর রচনায় তাহলে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নেই কেন? তার সহজ উত্তর হলো এই যে, আবেগাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও মননপন্থার প্রতি তিনি উদাসীন নন। মূলত বোধের প্রতিই তিনি আস্থাবান, কিন্তু বুদ্ধির প্রতিও তাঁর অকারণ অবহেলা নেই। 'বকুল' পাঠের পর সে-কথাটা আরো-স্পষ্ট হলো। বোধ এবং বুদ্ধির—আবেগ এবং মননের—সার্থক সমন্বয়ে তাঁর এই উপন্যাসখানি একটি সুন্দর ভারসাম্য লাভ করেছে।

'বকুল'-এর মধ্যে লেখক বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি চরিত্রের যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা লক্ষণীয়। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো জয়ন্তী আর মনোরমা। চরিত্র দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। তবু পরস্পরবিরোধী নয়। বরং যেন একে-অন্যের পরিপূরক। জয়ন্তী খেয়ালী মেয়ে; কখনো ক্রোধী, কখনো শান্ত। অন্যদিকে মনোমার মধ্যে আশ্চর্য একটি সংযমশাসিত চরিত্র ফুটে উঠেছে। একে অন্যের বিপরীত সন্দেহ নেই, কিন্তু দুজনেই যাতে আপনাপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠকের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, তারই জন্যে বোধ হয় এই চারিত্রিক বৈপরীত্যের প্রয়োজন ছিল। আর-একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো বকুল, ছোট্ট একটি শিশু। জন্মাবধি মাতৃহীন পিতৃ-পরিত্যক্ত এই শিশুটির উপরে লেখক যেন তাঁর সমস্তটুকু মমতা উজাড় করে দিয়েছেন।

পরিবেশরচনায় মনোজবাবু দক্ষ শিল্পী। উপন্যাসখানির মধ্যে মাঝে মাঝে বাঙলার নিভৃত পল্লীজীবনের যে মাধুর্যময় বর্ণনা রয়েছে তাতে করে তাঁর রোম্যান্টিক মনের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে বর্ণনা বর্ণাঢ্য, কাব্যধর্মী। ২।৫৩

রক্তাক্ত সমাজ—শ্রীসত্যসাধন, প্রাপ্তিস্থানঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য সাতসিকা।

উপন্যাসটি অপরিণত বয়সের রচনা। সুখের বিষয় লেখক সে বিষয়ে সচেতন। কাহিনীটি উচ্ছ্বাসপ্রধান। ভাবাতিশয্যে কোথাও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। উপন্যাসটির নাম শুনে মনে হয় বুঝি সমস্যা-মূলক। কিন্তু পাঠান্তে সে ধারণা পরিবর্তিত হয়।

একটি মেয়ের বিড়ম্বনাময় বধূজীবনই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। পরিণতি বিয়োগান্তক—অত্যাচারিণী শ্বাশুড়ীর যন্ত্রণায় এবং স্বামীর নিষ্ঠুরতায় মেয়েটির অগ্নি-সংযোগে আত্মাহুতি।

কাহিনীবিন্যাস কাঁচা, ভাষাতেও লেখক সর্বত্র সংযম রক্ষা করতে পারেননি, তবুও গল্প বলার একটা সহজ ক্ষমতা লেখকের আছে সেটা স্বীকার্য। (৪০।৫৩)

নিশীথ সূর্যের দেশ ঃ অমল সান্যাল ঃ পুথিঘর ঃ আড়াই টাকা।

সভ্য সমাজের বাইরে ডুয়ার্সের চা-বাগান। একদিকে স্বার্থান্ধ মালিক অন্য-দিকে দরিদ্র কুলি-মজুর-কেরাণী। যারা মালিক শোষণে তাদের জন্মগত অধিকার ধারা কুলিকামিন তারা ভাগ্যের দাস। এ দুই-এর মাঝখানে আছে আর একদল। যাদের দিয়ে কাজ আদায় করা হয়। এদের যদি বিবেক না থাকে তো কোন অসুবিধে নেই, যদি থাকে তাহলেই বিপদ। এই রজোই চাকরি নিয়ে এলো তরুণ ডাক্তার। জীবনের এক নতুন রূপের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হলো। কুলিদের আর্থিক দৈন্য, বাবুদের নৈতিক

এই হলো উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শুধু এই নয়। ধনী ম্যানেজারের করুণ হৃদয় মেয়ে আছে (ডাক্তারকে সে ভালবাসে), বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়র শ্রমিক কর্মী ছেলে আছে, আছে কুচক্রী ম্যানেজিং ডিরেক্টর কলকাতা-ত্যাগী প্রৌঢ় অধ্যাপক, এককালে ক্যাম্বেলে ডাক্তারের সমপাঠিনী অধুনা শ্রমিকনেত্রী মেয়ে—আরও অনেক ছোট বড় চরিত্র। অনেক ঘটনা। লেখকের আকাঙ্খা হয়তো অনেক ছিল, কিন্তু সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সমর্থ হননি। ঘটনা অনেক আছে, কিন্তু তার কোন যুক্তি নেই। ইচ্ছেমত ঘটেছে। চরিত্র আছে অনেক, কিন্তু কোনটিরই ঘটনা নিরপেক্ষ কোন পরিণতি নেই। আর ঘটনাগুলোই যে কেন ঘটল তারও কোন বিশেষ কারণ নেই। এই জিনিষই আর একটু সিজিল মিছিল করে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিলে সার্থক উপন্যাস হতে পারত।

(৩১।৫৩)

মলী সেনের প্রেম—রমাপতি বসু। প্রকাশক অধিনায়ক, পি ২৮ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

সুদৃশ্য মলাটে মোড়া বই, কিন্তু ভিতরের কাহিনীটা কদর্য। মলী সেন নামে ইংরেজ মাতা ও বাঙালী পিতার একটি মেয়ের প্রেমকাহিনী লেখক বিবৃত করেছেন। এই মেয়েটির প্রতি কাহিনীর বক্তার আকর্ষণ হচ্ছে প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায়ে মেয়েটি বক্তার প্রতি প্রগাঢ়ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে, বলে, বক্তাটিকে না হলে তার চলবে না। তৃতীয় পর্যায়ে মলীর বিয়ে হল এক শিল্পীর সঙ্গে, যাঁর (মলীর ভাষায়) "স্বামী হবার কোনো যোগ্যতাই ছিল না—স্বামীর পৌরুষত্ব বলে কিছু ছিল না।" অর্থাৎ বইতে একটা মেয়ের জীবনের ট্র্যাজেডি দেখাবার চেষ্টা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, চেষ্টাটা নেহাতই হাস্যকর হয়েছে। এ ধরণের বই নিয়ে অলোচনা না হওয়াই সংগত; যদি বা হয়, তাহলে কঠোর সমালোচনা হওয়া উচিত।

(৩৫।৫৩)

গোয়েন্দা কাহিনী

নৈশ চক্রান্ত : শ্রীস্বপনকুমার **:** তারাচাঁদ দাস এন্ড সন্স **:** ৮২নং আহিরীটোলা স্ট্রীট **:** ছয় আনা।

গভীর রাত্রে বিপত্নীক লক্ষপতির মৃত্যু দিয়ে বইএর শুরু, শেষ হলো গোয়েন্দার তৎপরতায় ও পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় হত্যাকারীর গ্রেপ্তারে। আর একটি নতুন কথা আছে গোয়েন্দার সহকারীর পুলিশ বিভাগে উচ্চপদ লাভ। হত্যাকারী এক বিরাট দলের নায়ক নেহাত সাধারণ লোক নয়। রীতিমত বি এসসি পাশ করা বৈজ্ঞানিক। জীবনের প্রথম দিকে অবশ্য দারিদ্র্য আর হতাশার নিপীড়ন আছে। অল্পমূল্যে গোয়েন্দা কাহিনী বোধিকা।

(২৪।৫৩)

প্রবন্ধ—

আমাদের ছেলেমেয়ে : শ্রীমতী কমলা গোস্বামী **:** নরনারী পাবলিশিং কনসার্ন **:** ২৬-১ শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ **:** আড়াই টাকা।

মায়ের দায়িত্ব, ছেলেমেয়ে যখন ছোট থাকে সবচেয়ে বেশী। তাদের চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক ও সুস্থবিকাশে মায়ের সুস্পষ্ট সাহায্য অপরিহার্য। না হলে পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শিশু মনস্তত্বের কতকগুলি সাধারণ কথা প্রত্যেক মারই জানা প্রয়োজন, বিশেষ করে যাঁরা নতুন মা হয়েছেন। শ্রীমতী কমলা গোস্বামী তাঁর নিজের শিশুদের মানুষ করতে গিয়ে যে বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করেছেন সেই অভিজ্ঞতাটুকুই সুন্দর করে স্বচ্ছন্দ ভাষায় বলেছেন তাঁর বইতে। মনস্তত্বের দুর্বোধ্য তত্ত্বের অনর্থক অবতারণা নেই। বড় বড় গালভরা জ্ঞানগর্ভ কথা নেই। তাঁর বিশ্লেষণী চোখে নিজের এবং অন্যের শিশুদের ব্যবহারে যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, বিশেষ করে লক্ষ্য না করলে যা ধরা পড়ে না, সেই টুকুই অন্য মায়েদের চোখে তুলে ধরেছেন। অনেক অনভিজ্ঞা জননী এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

পরিচ্ছন্ন ছবিগুলি বইটির শোভা বর্ধন করেছে।

(১৪।৫৩)

জীবনী

জহান্-আরা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি একাধারে জীবনী ও ইতিহাস। ইতিপূর্বে মমতাজ-তনয়া শাহজাহান-দুহিতা জহান্-আরা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বাজার গুজবের উপর নির্ভর করিয়াই লেখা। সুতরাং তাহার মধ্যে অনেক বিকৃতি আসিয়া পড়িয়াছে। জহান্-আরার প্রকৃত জীবন তদ্দ্বারা জানা হয় নাই। স্যার যদুনাথ ভারত ইতিহাসের অনেক কলঙ্ক মোচন করিয়া প্রকৃত ভারত-ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। সেই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ জহান্-আরার জীবনী রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমরা সেই কারণে প্রকৃত জহান্-আরাকে দেখিতে পাইয়াছি।

রচনাগুণে সেই দেব-চরিত্রটি আমাদের নিকট স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেবল জহান্-আরা নহে, তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সহিতও পরিচয় লাভ করা যায়।

৩৬৫।৫২

বিবিধ

ফলিত যোগ—সুকুমার বসু। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীমতিলাল মণ্ডল, ৪।২, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য দুই টাকা।

যোগব্যায়ামের দ্বারা শরীর চর্চা করতে অনেকে ভয় পান, কারণ এই দুরূহ পদ্ধতিটি প্রয়োগে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি ঘটে এবং তার দরুণই সুফলের পরিবর্তে কুফল দেখা দিয়ে থাকে। আলোচ্য বইতে লেখক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে বিভিন্ন প্রকার আসনের বিষয় আলোচনা করেছেন। লেখক স্বয়ং ব্যায়ামবিদ, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই বিষয় আলোচনা করেছেন, এই কারণেই তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বিশেষ আশঙ্কার কারণ নেই বলেই মনে হয়।

(৩৪।৫৩)

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

Dilwara Temples— Published from The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Govt. of India, Old Secretariat Delhi. Price—Rs. 2|-.

৩৬।৫৩

পহলী পঞ্চবর্ষীয় যোজনা— Published from The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting Govt. of India, Old Secretariat Delhi, Price—Rs. -|6|-.

৩৭।৫৩

দুর্গরহস্য—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৸০।

৩৮।৫৩

কুঙ্কুম—মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।

৩৯।৫৩

রূপদর্শীর নকশা—রূপদর্শী, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩।

৪১।৫৩

চক্রান্ত ও সংঘর্ষ—স্বপনকুমার, শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০।

৪২।৫৩

বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—১২৸০।

৪৩।৫৩

সমাজের আরও একটি সমস্যা

দাগী আসামী কখনও স্বভাব পাল্টে ভালো ও সৎ লোকের জীবন যাপন করতে পারে কিনা এর সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্কবিতর্ক, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এর কোন মীমাংসা হয়ে ওঠেনি, কোন স্থির নিশ্চয়তায়ও পৌঁছনো যায়নি। কোন কোন মতে অপরাধ করাটা একটা বিশেষ ধরণের রোগ; তারা এ রোগকে চিকিৎসার সাহায্যে ভালো করে তোলার উপায় বের করার চেষ্টা করছেন। কেউ মনে করেন অপরাধ করার প্রবৃত্তিটা একপ্রকার দুষ্ট অভ্যাসের বশীভূত, সংগী ও পারিপার্শ্বিক যার জন্যে অনেকখানি দায়ী। তারা চেষ্টা করছেন সংগী ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে অভ্যাসটাকে নিবৃত্ত করে দিতে। কোন দিক থেকেই নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি এখনও। সমাজও এ বিষয়ে কোন কর্তব্য ঠিক করে উঠতে পারছে না। এখনও সমাজ ধরেই নিচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি একবার যদি কোন অপরাধ করে বসে তো তার সে দাগ মেটবার নয় কোনোকিছুতেই; সামাজিক জীবন থেকে বঞ্চিত থাকাই তার বরাদ্দ ব্যবস্থা।

দাগী অপরাধীদের উপায় তাহ'লে কি হবে? তারা যদি সততা ও মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তা সত্ত্বেও কি তাদের দাগী অপরাধী বলেই গণ্য করতে হবে? এটা একটা বড়ো লঘু সমস্যার কথা নয়! 'সাত নম্বর কয়েদী' ছবিখানি দেখে এই কথাই মনে জেগে ওঠে—একদা একজন দাগী অপরাধী ছিলো বলে সে তার অপরাধপ্রবণতাকে জয় করে দীর্ঘকাল মানুষের মতো মানুষ বলে গণ্য হয়ে থাকার পরেও কি তার পরিত্যক্ত জীবনের জের টেনে তাকে সমাজের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে; মানুষের মতো থাকবার তার কি কোন দাবীই থাকবে না? রত্নাকর যখন বাল্মীকি হলো তখন সুকীর্তির জন্যে তিনি ঋষি বলে স্বীকৃত ও সম্মানিত যদি হতে পারলেন, তার অতীত অসৎবৃত্তি যদি লোকে ভুলে যেতে পারলো, তাহলে আর কোন অপরাধী মহত্বের পরিচয় দিয়ে সৎভাবে কাটালেও তাকে সমাজ স্বীকার করে নিতে চায় না কেন?

* * *

সত্যকিংকর সতেরো বার জেল ফেরৎ

একটা দাগী চোর। থাকবার জায়গা তার দুটি—জেলখানা, আর নয় বস্তীতে বিনোদিনীর কুঁড়ে। কদর্য ব্যক্তিদেরই বস্তী; মেয়েরা যেখানকার নিত্যনূতন ভ্রমর অন্বেষিণী, আর যতো সব নেশাখোর গুণ্ডাবদমায়েসের আড্ডা। ওরই মধ্যে বিনোদিনীর মনটা কেমন যেন সত্যের ওপরে আটকে পড়েছিলো। ছবির গল্প আরম্ভ হয় জেলখানা থেকে এক নতুন কয়েদীর গারদে প্রবেশ নিয়ে। সত্যও তখন সেই গারদের অধিবাসী। নতুন কয়েদীর সঙ্গে সে আলাপ করলে; নাম জানলে অরুণ, ব্যাঙ্কে কাজ করতো। ব্যাঙ্কের টাকা উধাও হতে সন্দেহক্রমে ওকে ধরা হয় এবং দু বছরের জেল হয়। অরুণ জানায় সে নির্দোষ; সর্বস্ব বিক্রী করে সে মামলা লড়েছে, এখন তার অভাবে তার স্ত্রী ও কন্যার উপায়ের কথা ভেবে সে জেল থেকে পালাতে চায়। সত্যর কাছ থেকে সে সাহায্য চেয়েছিলো এ বিষয়ে, কিন্তু সত্য রাজী হয়নি। একরাত্রে অরুণ নিজেই পালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু প্রহরীর গুলীতে সে প্রাণ হারালে। মরবার আগে সে সত্যকে অনুরোধ জানিয়ে গেলো যেনো সে তার স্ত্রী ও কন্যার ভার নেয়, কিন্তু বাড়ির ঠিকানাটা আর বলে যেতে পারলে না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে ছাড়া পেলেও সত্য জেলের বাইরে যেতে নারাজ, কারণ বাইরে গেলেই তাকে মৃত অরুণের স্ত্রী কন্যার ভার বইতে হবে। বাইরে তাকে অবশ্য আসতেই হলো। রাস্তায় চলতে চলতে 'চোর চোর' বলে একটা কলরব শুনে সত্য দৌড়তে দৌড়তে একটা জীর্ণ ঘরে আত্মগোপন করলে। বাইরের গোলমাল থামতে তার চোখে পড়লো অন্ধকারে শায়িতা এক নারী মূর্তির হাতের বালাটি। এগিয়ে গেল সে বালাটি খুলে নিতে, কিন্তু দেহ স্পর্শ করে দেখলে ঠাণ্ডা, মৃতদেহ। একটু ইতস্তত করে বালাটি খুলে নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই একটা শিশুর কান্না শুনে ফিরে দাঁড়ালো। চোখে পড়লো খাটের নীচে শোয়া এক শিশু-কন্যা। একবার তুলে নিয়ে ওর কান্না থামিয়ে শুইয়ে দিয়ে সত্য আবার যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আবার কান্না তাকে থামিয়ে দিলে।

বিমল রায়ের "দো বিঘা জমীন" ছবিতে নিরূপা রায় ও বলরাজ। ছবিখানির কতকগুলি দৃশ্য সম্প্রতি কলকাতায় তোলা হয়েছে

কথা মনে করিয়ে দেয়। সেও তো তার চরিত্রকে শুধরে নিয়েছিলো! মাতৃ-হৃদয়ের অমন নিঃস্বার্থ মায়া-মমতার যে আদর্শ পরিচয় সে সামনে তুলে ধরছে, সমাজে কি তার কোন মূল্যই থাকবে না? শ্রীমন্তর মতো সেও অরুণাকে মানুষ করতে পেয়ে তার অতীত জীবনের সবকিছু ভুলে নতুন জীবন যাপন করতে চেয়েছিলো, কিন্তু শ্রীমন্তই তো, পাছে বিনুর কলুষ স্পর্শ অরুণার গায়ে আঁচ লাগায়, এই আশঙ্কায় তাকে দূরে হঠিয়ে রাখলে। শ্রীমন্তর এ আশঙ্কার হেতু কী এবং কাদের জন্য এই ভয়?

* * *

এমনিধারা তত্ত্বকথায় যখন মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে, তখন কাহিনীটির যে নাটকীয় জোর আছে, সেটা স্বতঃপ্রমাণিত। বস্তুত কাহিনীটির মধ্যে অভিনবত্ব যেমন আছে, তেমনি বিন্যাসগুণে বেশ রসপুষ্ট নাটকীয় অবদানও হয়ে উঠতে পেরেছে। হাল্কা ও ভারী রসের পরিমাণিক সমাবেশে কাহিনীটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মনের গভীরে আবেদনকে উচ্ছ্বসিত করে রেখে দেয়। একেবারে প্রথমে জেলখানার কয়েদ দৃশ্য থেকেই কাহিনীটির ওপরে মন নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর ধাপে ধাপে কখনও হাসি, কখনও আবেগের প্রস্রবনে দর্শক একটানা নাট্যরস উপভোগ করে যায়। হাসি ও কান্না—দুদিক থেকেই উজ্জ্বল দৃশ্য রয়েছে অনেকগুলিই। মৃতা নারীর হাত থেকে বালা নিয়ে পালাবার সময়ে শিশুর কান্নার পাল্লায় পড়ে সত্যর বিমূঢ়তার দৃশ্য প্রচণ্ড হাসির যেমন সৃষ্টি করে, তেমনি শিশুটির জন্য দর্শকের মনও মায়ায় ভরিয়ে তোলে। চুরি-করা মেয়ে বলে পুলিশের বিনোদিনীর বাড়ি চড়াও করা এবং বিনোদিনীই সত্যিকার মা প্রমাণিত হওয়ার দৃশ্যটিও কম নয়। তারপর বিনোদিনীর আশ্রয় থেকে সত্যর অরুণাকে নিয়ে চলে আসার সময়ে মায়ের মর্মান্তিক আকুলতার দৃশ্য; মেয়ের লজ্জা পাবার সময় সত্যর বেশ পাল্টে ভব্য হওয়া; ওর তেল ফিরী করা; লুকিয়ে লেখাপড়া শেখার চেষ্টা; বিনোদিনীর গোপনে গোপনে অরুণাকে দেখে যাওয়া; অরুণা ও রমেনের প্রণয়-অভিসারের ব্যাপারে মাস্টারের ইঙ্গিত; রমেনের খোঁজে টেলিফোনে অরুণার সঙ্গে রমেনের পিতার এবং পরে রমেনের সঙ্গে তার পিতার এবং অবশেষে জ্ঞানদার সঙ্গে টেলিফোনে হুল্লোড় ব্যাপার; বিনোদিনীর মৃত্যু; শেষে বিয়ের দৃশ্যে শ্রীমন্তর সব আশা ও স্বপ্নের শেষ—এমনিধারা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটার পর একটা দৃশ্য এসে দর্শক-মনকে অবিরাম রস-স্নাত করে রেখে দেয়। কয়েকটি জায়গায় একটু-আধটু খটকা লাগে। যেমন রমেনের অরুণার সঙ্গে আলাপ করাটা—কেমন একটু বেমক্কা, পরে অবশ্য সে-ভাবটা থাকে না। সত্যরও শ্রীমন্ত হয়ে ওঠা ব্যাপারটা মন্টাজের সাহায্যে বিবৃতি সংযোগে দেখানো হলেও সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর মনে হয়। সবায়েরই চেহারায় তৃতীয় অধ্যায়ে বয়োপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা গেলেও বাকী রেখে দেওয়া হয়েছে বিনোদিনীর প্রতিবেশিনী কালুর মাকে—তার চেহারা বরাবরই একই। বিনোদিনীর মৃত্যুর পর তার চিতার দৃশ্যটি অতিরিক্ত, লোকের কাছে পরিহাসই সৃষ্টি করে।

* * *

প্রত্যেকটি চরিত্রের সুঅভিনয় ছবি-খানির বিশেষ গুণ। সবচেয়ে তারিফের অভিনয় দেখিয়েছেন নামভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী এবং বিনোদিনীর ভূমিকায় মলিনা দেবী। এঁদের দুজনেরই সম্পর্কে বলা যায়, এই ছবিতে চরিত্রচিত্রণ তাঁদের শিল্প-দক্ষতার অতি স্মরণীয় সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হবে। এঁদের সঙ্গে ঠিকমতো তাল রেখে অভিনয়ের মানকে উঁচুতে রেখে দিয়ে গিয়েছেন, রমেন্দ্রের পিতার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, জ্ঞানদার ভূমিকায় প্রভা। মাস্টারের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো দেখা মাত্রই লোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে—একটু নতুন ধরণের ভূমিকায় ভানু কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। ছোট্ট হলেও দারোগার ভূমিকায় কমল মিত্র, পুরনো পোষাক ব্যবসায়ীর ভূমিকায় শ্যাম লাহা, দলের লোক অতীনলালের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালুর মার ভূমিকায় ছবি রায়, কয়েদী অরুণের ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতির সমাবেশেই চরিত্রগুলি দৃষ্টিতে পড়বার মতো জোর পেয়েছে। অরুণার ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অভিনয়ে এই প্রথম আবির্ভাব এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মতো কৃতিত্বটুকুই মাত্র তিনি দেখিয়েছেন। রমেনের ভূমিকায় সমর রায়কে বেশ চটপটে দেখা গেল; অভিনয়ও করেছেন ভালো।

* * *

দৃশ্যগুলির সংস্থাপনা ও রচনা ভালো এবং দৃশ্যপটের দিক থেকেও বেশ মনোজ্ঞ বাস্তব চেহারা একটা ফুটেছে, কাহিনীর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েও গিয়েছে, কিন্তু আলোকসম্পাতের সমতা আলোকচিত্রের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। শব্দগ্রহণ অনেক জায়গায় বিরক্তির সৃষ্টি করে দেয়। কোন কোন জায়গায় সংলাপ এত অস্পষ্ট, বিশেষ করে কলেজে অরুণা আর বিনোদিনীকে নিয়ে আবেগপূর্ণ একটি দৃশ্যে, যে লোকে প্রায় বিরক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। টাইটেল বাদে আবহ-সঙ্গীত নাটকীয় রেশ সৃষ্টিতে আগাগোড়া সহায়ক হয়েছে: গানেরও সুরগুলি ভালো, কিন্তু শব্দের ত্রুটিতে মিইয়ে গিয়েছে। সত্যরূপী জহর গাঙ্গুলীর তেল ফিরির গান ছবিখানির একটি বিশেষ উপভোগ্য অংশ।

সব মিলেয়েও ছবিখানিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি নগণ্য। কাহিনীর অভিনবত্বে, বিন্যাস চাতুর্যে এবং অভিনয়ে 'সাত নম্বর কয়েদী' নতুন বছরে বাঙলা চিত্রশিল্পের আশার দীপ জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছে। বরণীয় সৃষ্টি নতুন প্রযোজক-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের।

খেলার মাঠে

হকি

বাঙলার হকি মরশুমের খেলা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় কোন্ দল শক্তিশালী, কোন্ দল শক্তিহীন অথবা খেলার মান বা স্ট্যান্ডার্ড কোন্ স্তরের তাহা আলোচনার বিষয় হইতেই পারে না। সেইজন্য এই বিষয়টি লইয়া ক্রীড়া মহলে আলাপ-আলোচনা হইতেছে না দেখিয়া আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তবে কোন্ দলে বাহিরের কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন এই আলোচনা ও গবেষণা এইবারে যেরূপভাবে ক্রীড়া মহলকে

পারদুমার সিং (সটপুট) মাখন সিং (ডিসকাস)

চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইতিপূর্বে কখনও তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রতি বৎসরেই বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন দলে যোগদান করেন, এইবারেও করিতেছেন, তবে কেন এইবারে এত উত্তেজনা—এই প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে যে উদয় হয় নাই তাহা নহে। ইহার উত্তরে বলা চলে যে, এইবারে যতগুলি বিশিষ্ট বাহিরের হকি খেলোয়াড় কলিকাতার বিভিন্ন দলকে সাহায্য করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে হয় নাই। বিশেষ করিয়া বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান দলের অধিনায়ক উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড় কে ডি সিং বা "বাবুর" আগমন ও বিভিন্ন দলের হইয়া প্রদর্শনী খেলায় যোগদান হইতেই ইহার উৎপত্তি। ইনি প্রথম প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগানের পক্ষে যোগদান করেন। ইহাতে সকলেরই দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, 'বাবু' মোহনবাগান ক্লাবে খেলিবেন। কিন্তু দুইদিন পরেই দেখা গেল, বাবু ভবানীপুর ক্লাবের হইয়া প্রদর্শনী খেলায় খেলিতেছেন। ইহাতে পূর্বের ধারণা পরিবর্তিত হইল ও তিনি কোন্ দলে খেলিবেন ইহা লইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচনা আরম্ভ হইল। আলোচনার তীব্রতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্যন্ত বাবু নিজেই এক বিবৃতি প্রচার করিলেন ও স্পষ্টই বলিলেন, "আমাকে ভবানীপুর ক্লাবের তরফেই প্রথম অনুরোধ করা হয় ও আমি বলিয়াছি "হ্যাঁ"। কিন্তু ইহার পরেই দেখা গেল নিখিল ভারত হকি ফেডারেশন কোন বাহিরের খেলোয়াড়কেই কলিকাতার বিভিন্ন দলে খেলিতে দিতে স্বীকৃত নহেন। কেন নহেন, তাঁহারাই জানেন। তবে বিভিন্ন আলোচনা হইতে জানা যায় যে, কোন এক বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকই ইহার জন্য দায়ী। তিনিই ফেডারেশন যাহাতে বাঙলার বাহিরের কোন খেলোয়াড়কেই কলিকাতায় কোন দলকে খেলিতে অনুমতি না দেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন করিলেন ইহার উত্তর আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যতদূর আশংকা হয় জেদাজেদির জন্যই হইয়াছে। "আমার দলে খেলিলে না—আচ্ছা, দেখা যাক, অন্য দলে কিভাবে খেলো?" এই হইল প্রকৃত দ্বন্দ্বের রূপ। কলিকাতার এই পর্যন্ত বাঙলার বাহির হইতে ১৪জন খেলোয়াড় আসিয়াছেন। ইঁহারা কে কোন্ দলে খেলিবার জন্য ফেডারেশনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

(১) বাবু (উত্তর প্রদেশ), (২) কবির আমেদ (উত্তর প্রদেশ), (৩) ভগবান দাস (উত্তর প্রদেশ)—ইঁহারা ভবানীপুর ক্লাবে খেলিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। (৪) বালকিষেণ (পেপসু), (৫) বলবীর ছোট (পাঞ্জাব)—মোহনবাগানে খেলিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। (৬) সামাদ (ভূপাল), (৭) সরিফ (ভূপাল), (৮) লিয়াকত (ভূপাল), (৯) কুমার (ভূপাল)—মহমেডান স্পোর্টিং দলে খেলিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। (১০) গ্যাব্রিয়েল (মধ্যভারত), (১১) স্মিথ (মধ্যপ্রদেশ), (১২) ভাস্করণ (মহীশূর)—ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। (১৩) আমস্ট্রং (মহীশূর), (১৪) পিনাই (মধ্যভারত)—রাজস্থান ক্লাবে খেলিবার অনুমতি চাহিয়াছেন।

মগন সিং (১০০ মিটার) গামদুর সিং (১১০ মিটার হার্ডল)

ভারতীয় হকি ফেডারেশন অনুমতি না দিলে ইঁহারা কেহই কোন দলে খেলিতে পারিবেন না, কিন্তু আমাদের যতদূর ধারণা ইঁহারা সকলেই অনুমতি পাইবেন। কিভাবে তাহা সম্ভব হইবে প্রশ্ন হইলে নূতন কিছুই বলিবার আমাদের থাকিবে না। কেবল বলিতে হইবে যেভাবে বাঙলার বাহিরের ফুটবল খেলোয়াড়গণও ফুটবলের মরশুমের যে কোন সময় অনুমতি পাইয়া থাকেন ঠিক সেইভাবেই ব্যবস্থা হইবে।

এ্যাথলেটিকস্

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় কয়েকজন এ্যাথলীট কিছুটা কৃতিত্ব

সোহান সিং (৮০০ মিটার) ডালুরাম (৩০০০ মিটার)

প্রদর্শনে সক্ষম হইলে ভারতীয় এ্যাথলীট মহলে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফল যে ব্যর্থ হয় নাই ইহা খুবই আনন্দের ও সুখের বিষয়। ভারতীয় এ্যাথলীটগণ বিশ্ব স্ট্যান্ডার্ডে উপনীত হইবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রমাণ সম্প্রতি আন্তঃ সার্ভিসেস স্পোর্টস ও জাতীয় এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানসিপে পাওয়া গিয়াছে। আন্তঃ সার্ভিসেস স্পোর্টস অনুষ্ঠানে ৮টি ভারতীয় নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় এ্যাথলেটিকসেও ৭টি ভারতীয় নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এই সকল রেকর্ডের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সামরিক বিভাগের এ্যাথলীটগণ ও হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় এ্যাথলীট লেভী পিণ্টো (বোম্বাই), মিস ম্যারি ডিসুজা (বোম্বাই), আইভ্যান জেবক (মাদ্রাজ)। আমরা এই সকল এ্যাথলীটদের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

আন্তঃ সার্ভিসেস ও জাতীয় এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে যে সকল ভারতীয় নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) **৩০০০ মিটার স্টিপল চেজ**—এন কে ডালুরাম (সার্ভিসেস) ৯ মিঃ ২৬·৭ সেকেন্ড।

(৮) **৮০০ মিটার দৌড়ঃ**—সোহন সিং (সার্ভিসেস) ১ মিঃ ৫৪·৫ সেকেন্ড।

(৩) ১০০ **মিটার দৌড়ঃ**—মগন সিং (সার্ভিসেস) ১০·৬ সেকেন্ড।

(৪) **গোলা ছোড়াঃ**—পারদ্যুমার সিং (সার্ভিসেস) ৪৫ ফিট ১১ ইঞ্চি।

(৫) ১১০ **হার্ডলঃ**—গামদ্দুর সিং (সার্ভিসেস) ১৫ সেকেন্ড।

(৬) ১৫০০ **মিটার দৌড়ঃ**—গুলবন্ত সিং (সার্ভিসেস) ৪ মিঃ ৩·৯ সেকেন্ড।

(৭) **পোল ভল্টঃ**—এস জর্জ (সার্ভিসেস) উচ্চতা—১২ ফিট ৩ ইঞ্চি।

(৮) **ডিসকাস ছোড়াঃ**—মাখন সিং (সার্ভিসেস) দূরত্ব—১৪০ ফিট ৮½ ইঞ্চি।

৪০০ **মিটার দৌড়ঃ**—আইভ্যান জেকব (মাদ্রাজ) ৪৯·৬ সেকেন্ড।

(১০) ১০০ **মিটার দৌড়ঃ**—লেভী পিণ্টো (বোম্বাই)। ১০·৬ সেকেন্ড।

(১১) ২০০ **মিটার দৌড়ঃ**—লেভী পিণ্টো (বোম্বাই) ২১·৮ সেকেন্ড।

(১২) ৮০০ **মিটার দৌড়ঃ**—সোহন সিং (সার্ভিসেস) ১ মিঃ ৫৫·২ সেকেন্ড (পূর্বে আন্তঃ সার্ভিসেস অনুষ্ঠানে যে রেকর্ড করেন তাহা ভঙ্গ করেন।)

(১৩) ৮০ **মিটার হার্ডল (মহিলাদের)**—মিস ম্যারি ডিস্‌জা (বোম্বাই) ১২·৭ সেকেন্ড।

(১৪) **ম্যারাথন দৌড়ঃ**—ছোটা সিং (পেপসু), ২ ঘণ্টা ৩৩ মিঃ ২১·৪ সেকেন্ড।

(১৫) ৪×৪০০ **মিটার রিলেঃ**—সার্ভিসেস দল। ৩ মিঃ ২৩·৯ সেকেন্ড।

বিশ্ব রেকর্ডের সহিত এই সকলের তুলনা এখনও করা চলে না, তাহা হইলেও নিকটবর্তী হইতে চলিয়াছে বলা চলে।

জাতীয় এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানসিপ

জাতীয় এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানসিপের জব্বলপুরের অনুষ্ঠানে সার্ভিসেস দল পুনরায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। ইঁহারা মোট ১২১½ পয়েন্ট পাইয়াছেন। পেপসু ৩২ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও বোম্বাই ২৩ পয়েন্ট পাইয়া তৃতীয় হইয়াছে। মহিলা বিভাগে বোম্বাই দল পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। বোম্বাই দল ৫৭ পয়েন্ট পাইয়া প্রথম, মধ্যপ্রদেশ ১৫ পয়েন্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও বাঙলা ১৩ পয়েন্ট পাইয়া তৃতীয় হইয়াছে।

বাঙলার প্রতিনিধিদের ব্যর্থতা

বাঙলা হইতে বিরাট বাহিনী প্রেরণের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের উক্তি যে সত্য তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙলা কি পুরুষ কি মহিলা কোন বিভাগেই অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে বি দাস প্রথম হইয়াছেন। কে চ্যাটার্জি উচ্চ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে মিস ক্যাচটুর দুইটি বিভাগে দ্বিতীয় ও মিস নীলিমা ঘোষ ১টি বিষয় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। অপর
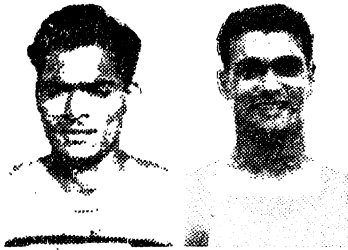
এস জর্জ (পোলভল্ট) এল পিণ্টো (১০০ মিটার দৌড়)

কোন এ্যাথলীটই কোন বিষয়ে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। সাধনা ও একনিষ্ঠতা ব্যতীরেকে সাফল্যলাভ অসম্ভব ইহা স্মরণ করিয়া বাঙলার এ্যাথলীটগণ যদি অনুশীলন না করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে ফলাফল আরও খারাপ হইবে ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে যেরূপ অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন পরবর্তী খেলায় শক্তিশালী বারবাডোস দলের বিরুদ্ধেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই খেলায় ভারতীয় দলে বিনু মানকড়, জি এস রামচাঁদ, এস পি গুপ্তে প্রভৃতি কৃতী বোলারগণ না থাকায় বারবাডোস দল প্রথম ইনিংসেই ছয় শতের অধিক রান করিয়াই ডিক্লেয়ার্ড করেন। তাঁহাদের আশা থাকে অবশিষ্ট তিন দিনেই ভারতীয় দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিবেন। ইহার সম্ভাবনা যে দেখা দেয় না তাহা নহে। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ২০৯ রানে শেষ হয়। ফলে ভারতীয় দলকে ৩৯৭ রান পশ্চাতে পড়িয়া ফলো অন করিতে হয়। তরুণ খেলোয়াড় মাঞ্জরেকার ও পি রায় একত্রে খেলিয়া ১৮১ রান সংগ্রহ করেন। মাঞ্জরেকার শতাধিক রান করিয়া

এম ডিস্‌জা

আউট হন। পুনরায় ভারতীয় দলের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়, এই সময় উমরিগার খেলিতে আসেন। ভারতের ৯ উইকেটে ৪৪৫ রান হয়। উমরিগার ৯৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। অকস্মাৎ বারিপাত আরম্ভ হওয়ায় শেষ সময় আর খেলা চালান সম্ভব হয় না। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সকল দর্শকই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিশেষ করিয়া মাঞ্জরেকার ও উমরিগারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

মাঠের পরিদর্শকগণই ভারতকে বাঁচাইয়াছেন

কোন এক খেলা সমালোচক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় দল পরাজিত হইত কেবল মাঠের পরিদর্শকগণের শিথিলতার জন্যই সম্ভব হয় নাই। মাঠের পরিদর্শকগণ নাকি বারিপাত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পিচ আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন নাই। ৮৫ মিনিট পূর্বে খেলা বন্ধ হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু এই সময় উমরিগার ৯৬ রান ও কানাইয়ারাম ১০ রান করিয়া যে নট আউট ছিলেন, তাঁহারাও যে আরও রান করিতে পারিতেন না তাহা কে বলিতে পারে। খেলা বন্ধ হইবার সময় ভারতীয় দল ৪৮ রানে অগ্রগামী ছিল। আরও কিছু রান হইলে ঐ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৫০ মিনিটের মধ্যে করিতে পারিতেন ইহা ধারণা করা খুবই অন্যায়। খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হইত, এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এই খেলায় মাঞ্জরেকারের সফলতা ভারতকে সাহায্য করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে উমরিগারের শেষ সময় ৯৬ রান সংগ্রহও খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে যে বেশ বেগ পাইতে হইবে ইহারই নিদর্শন এই খেলায় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল ঃ—

খেলার ফলাফল

বারবাডোস প্রথম ইনিংসঃ—৭ উইঃ ৬০৬ রান (উইকস্ ২৫৩, এ্যাটকিনসন্ ৮১, ডিপেজা ২৬, গডার্ড ৫০ নট আউট, ওয়ালকট, ৫১, উইলিয়ামস ৬০, হাণ্ট ২৯, মার্শাল ২৫, পি রায় ৫৮ রানে ২টি, ফাদকার ৯৮ রানে ১টি, কানাইয়ারাম ৬০ রানে ১টি উইকেট পান।

ভারত ১ম ইনিংসঃ—২০৯ রান (উমরিগড় ৬৩, ডি গাইকোয়াড় ২৭, সি গাদকারী ২৪, ভি মাঞ্জরেকার ৪৪, বার্কার ২২ রানে ৩টি, মার্শাল ৬২ রানে ৩টি, সোবার্স ৫০ রানে ৪টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংসঃ—৯ উইঃ ৪৪৫ রান (ভি মাঞ্জরেকার ১৫৪, পি রায় ৮৯, বিজয় হাজারে ৩৮, উমরিগড় নট আউট ৯৬, কানাইয়ারাম ১০ নট আউট; বার্কার ১১৩ রানে ৩টি, সোবার্স ৯২ রানে ৩টি, এ্যাটকিনসন ৬২ রানে ১টি উইকেট পান।)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ—

২রা ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। তিনি রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন খাদ্যনীতি, ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনা ও উহার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকারী নীতি বিশ্লেষণ করেন।

কলিকাতায় কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটস্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রাঙ্গণ হইতে অদ্য প্রায় ৬৫ হাজার টাকার একটি ব্যাগ রহস্যজনকভাবে উধাও হয়।

বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। আগামী ১৩ই হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হইবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী—গত রাত্রিতে করিমগঞ্জ বাজারে (আসাম) এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুই শতাধিক দোকান, গুদাম ও বাসগৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নয়াদিল্লীতে নবগঠিত নিঃ ভাঃ খাদি ও কুটীর শিল্প বোর্ডের প্রথম বৈঠকের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, কেবল বেকার সমস্যার সমাধান নয়, সমগ্রভাবে জাতির উন্নতির জন্য খাদি ও কুটীর শিল্পের উন্নয়ন আবশ্যক।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, একজন তুর্কী পণ্ডিত তুর্কী ভাষায় এই প্রথম ভগবদ্‌গীতার অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর চারি দিবসব্যাপী বিতর্ক শুরু হইলে বিভিন্ন বিরোধী দলের সদস্যগণ রাজ্যসরকারের নূতন খাদ্যনীতি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যর্থতা, বেকার সমস্যা ও শিল্প সংকটের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কলিকাতা সার্কুলার রেলওয়ে তদন্ত কমিটি মহানগরীর বেষ্টনী রেলওয়ে ব্যবস্থার সমগ্র পরিকল্পনাটি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য এক্ষণে কলিকাতায় মিলিত হইয়াছেন। এই পরিকল্পনাটিকে তিনটি পৃথক স্তরে ভাগ করিয়া সর্বশেষ স্তরে বালীগঞ্জ, মাঝেরহাট, ফেয়ারলী প্লেস, চিৎপুর ও কাঁকুড়গাছি দিয়া সমগ্র মহানগরীকে বেষ্টন করিয়া বৈদ্যুতিক সার্কুলার ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিতর্কের দ্বিতীয় দিবসে বিরোধী দলের সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গে ক্রম-বর্ধমান বেকার সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অবিলম্বে উহার প্রতিকারের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হইলে এই রাজ্য এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হইবে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—দিল্লীতে ও পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, কার্ণাল, গুরগাঁও, গুরুদাসপুর প্রভৃতি জেলায় ও কয়েকটি শহরে হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে নিবারক নিরোধ আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

অদ্য দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ারে সরকারী দপ্তর ভবনের কোষাগারে এক বিস্ময়কর ও মারাত্মক ঘটনা ঘটে—সরকারের ২১,৫৭০৷৴০ আনা খোয়া যায়। কোষাধ্যক্ষকে অচেতন অবস্থায় শৌচাগারে পাওয়া যায়। সেখানে ক্লোরোফর্মের একটি ক্ষুদ্র কাচ পাত্রও পাওয়া যায়।

৭ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন ট্রাইবুনাল রাজ্য বিধান সভার বড়তলা কেন্দ্রের নির্বাচনী মামলার রায়ে ঐ কেন্দ্রের নির্বাচন সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দেন এবং নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র দে'র নির্বাচন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন।

আজ নয়াদিল্লীতে কুড়িটি রাজ্যের শ্রম মন্ত্রীদের দুই দিবসব্যাপী সম্মেলন শেষ হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলনীতি সম্পর্কে সম্মেলনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীতে শ্রীনারায়ণ আচার্য নামক ৫৬ বৎসর বয়স্ক জনৈক যোগী ভূগর্ভে নয়দিন যাবৎ সমাধিস্থ থাকার পর অদ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ একটি অলঙ্কারের দোকানে এক দুঃসাহসিক ও চাঞ্চল্যকর সশস্ত্র ডাকাতিতে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার লুণ্ঠিত হয়। ষ্টেনগান ও রিভলবার সজ্জিত দস্যুদল ঘটনাস্থলে গুলী বর্ষণ করে এবং উহার ফলে চার ব্যক্তি আহত হয়।

বিদেশী সংবাদ—

২রা ফেব্রুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত তাঁহার প্রথম বাণীতে আজ নূতন পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে—ফরমোজা হইতে মার্কিন সপ্তম নৌবহর অপসারণ। এই নীতি দ্বারা জাতীয়তাবাদী চীনা বাহিনীকে চীনের মূল ভূখণ্ডের কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অদ্য উহার দ্বিতীয় 'আইন অমান্য প্রতিরোধ' বিল প্রকাশ করেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—হল্যাণ্ড ও বৃটেনে বন্যার ফলে বার শতের অধিক নরনারী নিহত হইয়াছে বলিয়া আশংকা করা যাইতেছে এবং অনুমান ৭৫,০০০ নরনারী গৃহহীন হইয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী ইডেন অদ্য কমন্স সভায় বলেন, ফরমোজার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করার সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নেই বৃটেনকে জ্ঞাপন করা হয় এবং বৃটেন তৎক্ষণাৎ এ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মিঃ ইডেন বলেন, বৃটিশ সরকার এইরূপ আশংকা প্রকাশ করেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ফলে অবাঞ্ছনীয় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেই অনুপাতে সামরিক সুবিধা হইবে না।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে যে সব বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত ইতোমধ্যেই মতৈক্য হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে কোরিয়ায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের জন্য কম্যুনিস্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই অদ্য এক প্রস্তাব করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—চীনা জাতীয়তাবাদীগণকে বর্ধিত হারে সামরিক সাহায্যদান সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আগত আমেরিকান সামরিক সাহায্যদান বিভাগের ডিরেক্টর মেজর জেনারেল জর্জ ওমস্টেড অদ্য ফরমোজায় জাতীয়তাবাদী চীনা বাহিনী পরিদর্শন করেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—কম্যুনিস্ট চীনের রাষ্ট্রনায়ক মাও সে তুং কোরিয়ায় শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

শনিবার
৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৯

DESH Saturday, 21st February, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের আয়-ব্যয়

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অর্থমন্ত্রি-স্বরূপে রাজ্য সরকারের নূতন বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠে আশাশীলতার যে সুর বাজাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, দুঃখের দিন আমাদের কাটিয়া গিয়াছে, এবং আর এক ধাপ পা বাড়াইলেই আমরা নন্দন-কাননের বিহারভূমিতে গিয়া পড়িব। তাঁহার মতে দেশের মূল্যমান হ্রাস পাইতেছে, উৎপাদন বাড়িতেছে; "আমরা এখন অধিক খাদ্য, অধিক বস্ত্র, অধিক চিনি, অধিক লোহা, অধিক কয়লা, অধিক সিমেণ্ট, অধিক দিয়াশলাই, অধিক খনিজ, অধিক কলের লাঙ্গল", মোটামুটি সবই অধিক পরিমাণে পাইতেছি। ইহার উপর অন্য সব দিক দিয়াও অবস্থা ভাল। আবহাওয়া ভাল, মনিব-মজুরদের মধ্যে সম্বন্ধ উত্তম, কাঁচা মাল মিলিতেছে এখন প্রচুর। প্রচুর খাদ্য, যথেষ্ট বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু সুলভ মূল্যে পাইয়া জনসাধারণ হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে ইত্যাদি। দেশের সাধারণ অর্থ-নৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও ডাঃ রায় যে মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা যদি সর্বাংশে সত্য হইত, তবে দেশবাসীরা নিশ্চই সুখী হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের লোকে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে অবস্থার এইরূপ উন্নতি উপলব্ধি করিতেছে না। বস্ত্রমূল্য হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মূল্যেও বস্ত্র ক্রয় করি-বার ক্ষমতা দেশের লোকের নাই। খাদ্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ক্রয়-সামর্থ্যের অভাবে লোকে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার জন্য কত লোক উপার্জনহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বেকার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উৎসন্ন হইতে চলিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ভাষার ভঙ্গী ফলাইয়া যেরূপ আশাশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন, দেশবাসীর অন্তরে তাহা সাড়া জাগাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ রায় রাজ্য সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির এবং বিভিন্ন জনহিতকর উন্নয়ন-মূলক কার্যাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলির জন্যও দেশের লোকে বিশেষ উল্লাস বোধ করিবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কতকগুলি পরিকল্পনা লইয়া কাজে নামিয়াছিলেন, সেগুলির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে লোকের তাহা জানিতে বাকী নাই। বস্তুত এই সব পরিকল্পনার সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। সরকারী মোটর বাসের ব্যবসা, সমুদ্রে মৎস্য শিকার পরিকল্পনা, গৃহ-নির্মাণ, চাউলের কারবার সবই লোকসানে দাঁড়াইয়াছে। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ইহা ফল। এতদ্দ্বারা জন-সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য অর্থব্যবস্থা পরিচালনায় দূরদৃষ্টির অভাব এবং দক্ষতার ত্রুটিই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বাজেটে গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্য সরকারের সমধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সত্য। শিক্ষার খাতে ব্যয়-বৃদ্ধির প্রস্তাব এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে যতটা অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল তাহা করা হয় নাই। অর্থের অভাবই ইহার কারণ; কিন্তু এই সম্বন্ধে একথা বলিতে হয় যে, এখানেও সরকারী দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ফলত বৃটিশ শাসনে পুলিশ এবং শাসন বিভাগের ব্যয় যেরূপ ছিল, দেশবাসীর হাতে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার আসার পরও সেই নবাবী ধারার উল্লেখ-যোগ্য তেমন পরিবর্তন ঘটে নাই। পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই বলিয়া তাঁহার বাজেট বক্তৃতার উপসংহার করিয়াছেন যে, 'আমরা আর্থিক হিসাবে পশ্চাৎপদ। আমরা গরীব; সুতরাং আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার হিসাব রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।' শাসনবিভাগের ব্যয়বাহুল্য এবং বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনায় দেশের জনসাধারণের শোণিত সম অর্থের যথেচ্ছ অপচয়ের বিরুদ্ধে তিনি যদি এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি অবলম্বন করিতেন, তবে দেশের লোক অধিক সুখী হইত।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে ক্ষুদ-কুঁড়া

কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট এবং রাজ্য-সমূহের মধ্যে আর্থিক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অর্থ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থের বাঁটোয়ারার ব্যাপারে

পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই অবিচার চলিয়া আসিতেছে এবং কমিশনের রিপোর্টে এই অবিচারের কতটা প্রতিকার হয়, তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুত চিন্তামণ দেশমুখ ভারতীয় সংসদে রিপোর্টটি দাখিল করিবার পর সে আগ্রহের নিরসন হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অদৃষ্টের বিশেষ কিছু পরিবর্তনও ঘটে নাই। তাহার ভাগ্যে ক্ষুদ-কুঁড়াই জুটিয়াছে। দেশ বিভাগের পূর্বে পাটের রপ্তানি শুল্কের শতকরা ৬২৷৷ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ পাইত; দেশ বিভাগের পর তাহা কমাইয়া শতকরা কুড়ি ভাগ করা হয়। এইভাবে ব্যবস্থার ফলে পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্র হইতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মাত্র পাইতে থাকে। অর্থ কমিশন এই বরাদ্দ বাড়াইয়া দেড় কোটি টাকা করিয়াছেন। অন্যদিকে আয়কর হইতে প্রাপ্য অংশ আরও হ্রাস করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা দরকার যে, পাট প্রধান আবাদভূমি পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও পশ্চিমবঙ্গের পাটের আবাদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দিক হইতে অর্থ-কমিশনের সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই, সহজেই বোঝা যাইবে। অবশ্য অর্থ-বণ্টনের এই ক্ষেত্রে কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রতিপত্তি যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, এই দৃষ্টি বিশেষভাবে রাখিতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সুপারিশ-সমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয় এবং সেই দুর্বলতাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন রাজ্যগুলি গড়িয়া উঠে, ইহা অবশ্যই কেহ কামনা করে না। কিন্তু এই বিষয়ে কমিশনের সতর্কতা কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। বস্তুত কেন্দ্রের আর্থিক প্রতিপত্তিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যগুলির অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আরও কিছু বেশি পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহারা ইহা না করাতে রাজ্যসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে শুভেচ্ছা মাত্রেই পর্যবসিত হইবে। ফলত কেন্দ্রের শক্তি দুর্বল না হয়, এদিকে যেমন দৃষ্টি রাখা দরকার, সেইরূপ কেন্দ্রীয় শক্তির পরিপোষক বিভিন্ন রাজ্যগুলির আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য করা আবশ্যক। কমিশনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের দিকেই বেশিটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং এতখানি একপেশে ঝোঁক বাঞ্ছনীয় ছিল না।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ

কেন্দ্রীয় লোকসভা এবং পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষায় ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতির গতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাই নিয়ম। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ক্রমবর্ধমানরূপে দেশের আর্থিক উন্নতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। আন্তর্জাতিক দিগ্‌চক্রবালে ঘনায়মান দুর্যোগের অন্ধকারের মধ্যে ভারতের অবস্থা সত্যই যদি সেরূপ আশাপ্রদ হইত, তবে দেশের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কিন্তু শাসনতন্ত্রের শীর্ষদেশে যাঁহারা সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদের দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ আশা-শীলতার কারণ সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত উভয়ের দৃষ্টিতে প্রচুর ব্যবধান রহিয়াছে। সরকারী পরিসংখ্যান সূত্রানুসারে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে আমরা ইহা দেখিতেছি। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিতে লোকের পক্ষে সান্ত্বনার কোন কারণ ঘটে নাই; কারণ লোকের ক্রয়-সামর্থ্যের বিচার করাও এক্ষেত্রে প্রয়োজন। ফলত দ্রব্যমূল্য এই হিসাবে সুলভ হয় নাই। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা সত্য, বস্ত্রের কথা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু লোকের ক্রয়-সামর্থ্যের উপযোগীভাবে দর না নামাতে কাপড় গুদামে জমা হইতেছে। সেগুলি বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, অথচ দেশের বস্ত্রাভাব দূর হইতেছে না। দেশের বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল আকার ধারণ করিতেছে এবং এই সমস্যার চাপে পড়িয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উৎসন্ন হইতে চলিয়াছে। প্রত্যুত সরকার এই সমস্যা সমাধানের কোন পথই নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। একমাত্র ভরসা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনার দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সেই অনুপাতে দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কতটা লাঘব হইয়াছে, ইহা বিচার্য বিষয়। বস্তুত এই পরিকল্পনা এ পর্যন্ত দেশের লোকের মনে বিশেষ কোন রকম আগ্রহ-উদ্দীপনা জাগাইতে পারে নাই। খাদ্য-সমস্যা আর চার বৎসরের মধ্যে মিটিয়া যাইবে এবং এদেশে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উছলিয়া পড়িবে, এইরূপ কথা আমরা শুনিতেছি কিন্তু কার্যত রেশনের দোকানের অখাদ্য চাউলই আমাদের অদৃষ্টে জুটিতেছে। দেশের রাজনীতিক অবস্থার বিচার করিলেও অবস্থা তেমন কিছুই আশাপ্রদ মনে হইবে না। পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে তো বিশেষভাবেই। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রপতি স্বীকার করিয়াছেন। ভাষার উপর জোর না দিয়া শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধার সম্বন্ধেও এই সম্পর্কে বিচার করা উচিত, তিনি এই কথা বলিয়াছেন। ফলত তাঁহার এই যুক্তি যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্প্রসারণের প্রশ্নটির সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়ে; কিন্তু ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের দাবীকে চাপা দিবার চেষ্টাতেই আছেন। ফলে দেশের লোকের মনে স্বভাবতই বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি নূতন আশার আভাস পাইয়াছেন। কিন্তু এই আশার আলোক পূর্ব কিম্বা পশ্চিম কোন দিক হইতে আসিতেছে, আমাদের ধারণায় কিছুই আসে না। পরন্তু পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মুখে বিপরীত কথাই কিন্তু আমরা শুনিতেছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা শুধু ইহাই লক্ষ্য করিতেছি যে, ভারত সরকার পাকিস্থান

সরকারের নীতির চক্রে নিজেদিগকে জড়াইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহাদের সুনির্দিষ্ট নিজস্ব কোন নীতি নাই।

সাহিত্য-সাধনা ও রাষ্ট্র

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের সমুন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া একটি বে-সরকারী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সেগুলির সমুন্নতি সাধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ভারত সরকারকে একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যিকদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সংস্থা গঠন করা দরকার। গ্রন্থকার-দিগকে সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দান এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহের স্ব-সম্পর্কিত বিবিধ ব্যবস্থায় তাঁহাদের স্বার্থ যাহাতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়, আইনের তদুপযোগী সংস্কার সাধনের কথাও প্রস্তাবে আছে। সংস্কৃতির দিক হইতে সমগ্র ভারতকে রাষ্ট্র-হিসাবে সংহত করিবার পক্ষে এইরূপ একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনে আছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সংস্কৃত ভাষাই অতীতযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতির মূলে মুখ্য শক্তি-স্বরূপে কাজ করিয়াছে এবং এখনও সমগ্র ভারতের সংহতির সূত্র সুদৃঢ় করিতে হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির জননী-স্বরূপিণী সংস্কৃত ভাষার প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার উপরই জোর দেওয়া দরকার। শুনিতেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অল্পদিনের মধ্যেই এখানে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ইহা এইদিক হইতে খুবই সুখের বিষয় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের এই শক্তিকে আঞ্চলিকভাবে সম্প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের অখণ্ডতার চেতনা জন-জীবনে জাগাইয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাসমূহকেও সমৃদ্ধ-তর করিয়া তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাষার দিক হইতে ব্যবধান-বোধ অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। এক প্রদেশের সাধারণ লোকে অন্য প্রদেশের সাহিত্যিক এবং তাঁহাদের অবদানের সম্পর্কে বিশেষ কোন খোঁজই রাখেন না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক সাধনাকে সংহত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন একান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক-দের সাধনা এবং তাঁহাদের অবদান প্রধানত ব্যক্তিগতভাবে চিন্তার স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই বিকশিত হইয়া উঠে। অপরের প্রভুত্বের আওতায় বাণীর সাধনা বিমলিন হইয়া পড়ে; সুতরাং সাহিত্যিক যাঁহারা, সরকারের ফরমাইস মত তাঁহারা চলিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। পরন্তু সাহিত্যিক সমাজে অন্যাপেক্ষা তেমন দৈন্য যদি দেখা দেয়, তবে সাহিত্যের অগ্রগতি স্বভাবতই রুদ্ধ হইবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ইংরেজী ভাষার আভিজাত্য

দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা জাতির নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং ইহার ফলে জাতির মনের মূলে এমন কতকগুলি সংস্কার গড়িয়া উঠে, যাহা সহজে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। মনকে সেই সব সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে গেলে যুক্তি আসিয়া শক্তির পথে অন্তরায় ঘটায়। এই সঙ্ঘাতে পড়িয়া মন শেষটা সংস্কার-দৃঢ় সহজ পথটিই সুবিধা-বাদের সূত্রে সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়া লয়। আমাদের অবস্থাও অনেকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে: কিন্তু ইংরেজ শাসনের সংস্কারটি আমরা মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না। আমরা সুবিধাবাদ ভাঙ্গাইয়া বুদ্ধি-মত্তার বড়াই করিতেছি। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল একটি বক্তৃতায় আমাদের এই দুর্বলতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, এদেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের মাতৃ-ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান সত্ত্বেও নিজেদের ভাষাগত পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য যেখানে সেখানে ইংরেজী আওড়াইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইংরেজী বিদেশী ভাষা এবং সে ভাষার মাহাত্ম্য যতই থাকুক না কেন, আমাদের দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের মাতৃভাষারই সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। পণ্ডিতজী স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার নিজেরও এই দুর্বলতা আছে, কাজেই অপরকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া সম্ভবত তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বিশেষভাবেই ইহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন যে, এইরূপভাবে ইংরেজী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করার মধ্যে গর্বের কিছু নাই; পক্ষান্তরে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশী ভাষাবিশেষকে এইরূপে মর্যাদা দেওয়াতে ভারতের সম্মানেরই হানি ঘটে। আজ পণ্ডিত নেহরুর মুখে যে কথা শুনিলাম, সে ধরণের কথা আমরা নূতন শুনিতেছি না এবং যুক্তিটি বুঝিতে বিশেষ কোনও বেগও পাইতে হয় না। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইহা মানিয়া চলিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বস্তুত দাস-মনোবৃত্তিই এমন অভ্যাসের মূলে রহিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় সমৃদ্ধি আছে, বিশ্ব-সংস্কৃতিতে তাহার মাহাত্ম্য-মহিমা প্রচুর, এসব কথাই স্বীকার্য এবং ইংরেজী কপচানোতে কাহারো কাহারো পাণ্ডিত্যাভিমানও পরিতৃপ্ত হইতে পারে ইহাও বুঝি; কিন্তু দেশ ও জাতির মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করিবার তেমন ঝোঁকের মূলে চিত্তের কতখানি দৈন্য রহিয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং এই প্রবৃত্তিকে সংযত করাই দরকার। প্রত্যুত কোন একটা বিদেশী ভাষা জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে পারে না। পরন্তু জাতীয় মর্যাদাবোধই জাতিকে বড় করিয়া তোলে

আচার্য বিনোবা

দিনেশ দাস

আর একটি করুণ ক্রুশ পৃথিবীর!
জনতার ভিড়
সোরগোল।
আহ্নিক গতির ঊর্ধ্বে নিটোল নির্গোল
একটি তারার আলো জ্বলে ঝিকিমিকি—
সে-আলো তুমি কি?

দিক্‌জোড়া মাঠে
কাঠ ফাটে :
পৈত্রিক লাঙল নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক চাষী
ভূমি-দেবতার জমি চষে, বীজ বোনে,
আর দিন গোণে।
হঠাৎ কখন তারা
দেখেছে তোমার আলো—একটি নতুন সন্ধ্যাতারা!

অনেক দুঃখের ঝড়ে নম্র তুমি
প্রথম শিশির-ভেজা সকালের শাখা,
ভোরের হাওয়ার মত রেখে যাও ঘাসে ঘাসে
কালের স্বাক্ষর আঁকাবাঁকা,
সমতার
মমতার।

এখানে সমস্ত দেশ টান্ হ'য়ে শুয়ে
শ্লেটের মতই কালো পাঁশুটে আকাশ :
তার নীচে, অবনত
তোমার পতাকা কাঁপে কবিতার মত :
আরো নীচে ঝড়ে
মাটির সোনালী গান ধান হ'য়ে ঝরে।

আমাদের হৃদয়ের চরে
তোমার স্ফটিক-ঢেউ লাগে অগোচরে,
ঘুমভাঙা নদীর মতন্
ভাঙেচোরে আমাদের কাঁচের জগৎ পুরাতন।

পৃথিবীর জাঁতা ঘোরে
প্রাচীন পাথরে :
হঠাৎ তোমার ডাক
প্রথম বৃষ্টির মত ঝ'রে পড়ে বিস্ময়ে অবাক্।
তোমার সোনার হার
পরেছে তেলেঙ্গানা, হাতে নেয় বাংলা বিহার।

সুদান-চুক্তি

সুদানের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গত সপ্তাহে কায়রোতে বৃটেন ও মিশরের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে মূলত মিশরের দাবীর চেয়ে বৃটেনের মতই বেশি জয়ী হয়েছে। তাতে দুঃখিত হবার কোনো কারণ থাকবে না, যদি এই চুক্তির ফলে কার্যত সুদান-বাসীরা স্বাধীন হতে পারে। যদিও এখনো কিছুকাল বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বেশ বেশিই থাকবে, তাহলেও অবিলম্বে সুদানীদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারাদি দিতে শুরু করা হবে। পার্লামেণ্ট নির্বাচন এবং মন্ত্রি-সভা নিয়োগও শীঘ্রই হবার কথা। পার্লা-মেণ্ট নির্বাচন হওয়ার পর থেকেই তিন বছরের 'transition period' আরম্ভ হবে। এই সময়ের মধ্যে বৃটিশ ও মিশরীয় কর্মচারীদের স্থানে ক্রমশ সুদানীদের বহাল করা হবে। চুক্তিতে তিনটি মিশ্র-কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। একটি কমিশন গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা-ব্যবহারের উপর দৃষ্টি রাখবে—এই কমিশনে একজন ইংরেজ, একজন মিশরীয়, একজন পাকিস্থানী ও দুজন সুদানী সদস্য থাকবেন। নির্বাচনী কমিশনের সদস্য-সংখ্যা হবে সাতজন—একজন ইংরেজ, একজন মিশরীয়, একজন আমেরিকান, একজন ভারতীয় ও তিনজন সুদানী। বৃটিশ ও মিশরীয় কর্মচারীদের জায়গায় সুদানী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থার তদারক করা যে কমিশনের কাজ হবে, তাতে একজন ইংরেজ, একজন মিশরীয় ও তিনজন সুদানী থাকবেন।

সুদানী পার্লামেণ্ট যখন এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করবে যে, "সুদান আত্ম-নিয়ন্ত্রণ চায়" তখনই "transition period"এর অবসান হবে। তারপর সুদানী পার্লামেণ্ট একটি কন্‌স্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লী নির্বাচনের জন্য আইন প্রণয়ন করবে এবং সেই অনুসারে সুদান নিজের ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে—অর্থাৎ সুদান স্থির করবে সে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা চায় অথবা সে মিশরের সঙ্গে কোনো ধরণের একটা গ্রন্থী রাখতে চায়। অনেকের ধারণা যে, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বেছে নিয়েও সুদান পরে বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত হবার ইচ্ছা জানাতে পারে এবং সে ইচ্ছা পূরণ করা বৃটিশের পক্ষে অবৈধ হবে না।

যাই হোক, নূতন চুক্তি অনুসারে সুষ্ঠুভাবে কাজ হতে হলে বৃটেন ও মিশরের মধ্যে অকপট সহযোগিতার ভাব থাকা আবশ্যক। সেটা সম্ভব হবে যদি

অনতিবিলম্বে সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য থাকা-না-থাকার প্রশ্নের একটা মীমাংসা হয়। এই প্রশ্নের যদি একটা নিষ্পত্তি না হয়, তবে সুদানে বৃটিশ ও মিশরীয়দের মধ্যে সুবাদ থাকবে না, আবার ঝগড়াঝাটি আরম্ভ হবে, সে অবস্থায় বর্তমান চুক্তি অনুসারে কাজ কতটা ঠিকমতো হবে সেটা সন্দেহের বিষয়। অবশ্য একবার এই চুক্তি হওয়ার পরে গোলমাল হলে তাতে বৃটেনের চেয়ে মিশরের পক্ষেই বেশি অসুবিধা হবে। সেই জন্যই মিশর পূর্বে সুদান এবং সুয়েজ খাল অঞ্চলের প্রশ্ন একসঙ্গে জুড়ে রেখেছিল। এই জোড় ভেঙ্গে দিয়ে প্রথমে সুদান সম্পর্কে একটা নিষ্পত্তি করে নিতে রাজী হওয়ায় জেনারেল নেগুইবের আপস করার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এতে বৃটেনের পক্ষে সুবিধা হয়েছে। তবে সুদান সম্পর্কে জেনারেল নেগুইব যতটা ছেড়ে নিষ্পত্তি করতে রাজী হতে পেরেছেন সুয়েজ খাল অঞ্চলের ব্যাপারে ততটা ছাড়া সহজ হবে না। কারণ এ বিষয়ে মিশরীয় জাতীয় মনোভাব অধিকতর প্রখর। সুদান মিশরের অধীন হোক বা না হোক, তার জন্য মিশরের জনসাধারণের খুব যে একটা মাথা-ব্যথা ছিল তা নয়, কিন্তু মিশরীয় ভূমিতে বিদেশী সৈন্য থাকবে, এটা মিশরীয় জনমতের নিকট অসহ্য। জেনারেল নেগুইব যে বৃটিশের পছন্দসই লোক, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। জেনারেল নেগুইবের ডিক্টেটরী থাকতে থাকতে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট মিশরের সঙ্গে একটা আপস-নিষ্পত্তি করে ফেলতে চান। আবার বৃটিশ গবর্নমেণ্টের এও দেখা দরকার যে, জেনারেল নেগুইবকে দিয়ে এমন কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া না হয়, যেটা মিশরীয় জনমতের অত্যন্ত বিরোধী হবে, কারণ তাহলে জেনারেল নেগুইবের নিজের কর্তৃত্বই বিপন্ন হবে এবং সেটা স্বর্ণ-অন্ড-প্রসবিনী হংসীর প্রাণবধের সামিল হবে। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এটা নিশ্চয়ই বুঝেন এবং সেজন্য সাবধানে অগ্রসর হচ্ছেন সন্দেহ নেই। তবে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট এ আশা অবশ্যই করছেন যে, আমেরিকার সহযোগিতায় জেনারেল নেগুইবের সঙ্গে সুয়েজ খাল অঞ্চল সম্পর্কে এমন একটা বন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে, যাতে "নিরাপত্তা"র দাবীও মিটবে অথচ মিশরবাসীদের নিকট জেনারেল নেগুইবের মুখরক্ষাও হবে। এটা মিশরকে প্রস্তাবিত মধ্যপ্রাচ্য সুরক্ষা সংস্থার শরিক করে নিয়ে সুয়েজ খাল অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষ একটা ব্যবস্থা করে অথবা অন্য কোনো উপায়ে হবে, সেটা এখনো বুঝা যাচ্ছে না। তবে এটা ঠিক যে, বৃটিশ ও মার্কিন গবর্নমেণ্ট যেমন জেনারেল নেগুইবের পক্ষপাতী এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য আগ্রহশীল হয়ে পড়েছেন, তেমনি জেনারেল নেগুইবও অনেক বিষয়ে বৃটিশ এবং মার্কিন সমর্থন ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন ও পড়ছেন।

ব্যাপারটা একটু কৌতুকাবহও বটে। আমেরিকা ও বৃটেন হলো গণতান্ত্রিক ব্লকের নেতা, কিন্তু তাঁরা মিশরে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক গবর্নমেণ্টের পরিবর্তে অন্তত আপাতত ডিক্টেটরী শাসনকেই স্বাগত করেছেন এবং ডিক্টেটর জেনারেল নেগুইবের কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব কামনা করছেন। এখন কিছুকাল জেনারেল নেগুইবের একাধিপত্য চলুক, ওয়াফদ্ দল অথবা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের পুনরভ্যুত্থান না হোক—এইটাই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বৃটিশ ও মার্কিন গবর্নমেণ্টের বর্তমান কাম্য। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সুদানে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির প্রবর্তনের দায়িত্বের অংশ যে মিশর গ্রহণ করেছে, তার নিজের ঘরে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আপাতত অবশ্য হয়েছে। সুদানে যতদিন "Transition period" চলবে, তার মধ্যে যে মিশরে ডিক্টেটরীর অবসান হয়ে পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণের সময় যখন আসবে, তখনও যদি মিশরে ডিক্টেটরী শাসন চলতে থাকে, তাহলে কি সুদানের কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লী মিশরের সঙ্গে সুদানের একটা গ্রন্থি রাখার পক্ষে মত দিবে? সেটা খুবই অস্বাভাবিক হবে নাকি? মিশরের যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সুদান স্বেচ্ছায় মিশরের সঙ্গে একটা গ্রন্থি রক্ষা করবে, তাহলে মিশরে ডিক্টেটরী শাসনের জায়গায় পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক শাসনের পুনর্বহাল যত শীঘ্র সম্ভব হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি হওয়া জেনারেল নেগুইব এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের কারোই মনঃপূত হবে না। মিশরে ডিক্টেটরী থাকাতে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের অবশ্য দুদিক দিয়েই সুবিধা। মিশরে ডিক্টেটরী থাকার জন্য যদি সুদান মিশরের সঙ্গে যুক্ত হতে না চায়, তবে সেটা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের অপছন্দ হবার কথা নয়, কারণ তাতে সুদানের স্বাধীন হয়ে কমনওয়েলথ-এ স্থানলাভ করার সম্ভাবনা বাড়বে।

১৮।২।৫৩

শিল্পচর্চা

নন্দলাল বসু

আগুনের পাত্র। পট তাতাবার জন্য

আগুনের পাত্র। জোসা করার জন্য

মাটির সরা
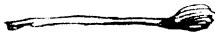
কেয়া ডাঁটির তুলি

শংখ বা কড়ি
পালিশের জন্য

বাক্ড়া পাথর
পালিশের জন্য

নারিকেল-মালা।

বালির পুঁটুলি

তুলির খুঙ্গি

জগন্নাথের পট

জগন্নাথের পটের অনুরূপ পট তৈরি করতে হলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি চাই—

একটি কাঠের পাটা, ছবি রেখে আঁকবার জন্যে।

সমান-সুতো, ঠাস-বুনানি, মোটা খদ্দর বা তাঁতের কোরা কাপড়।

পাথুরে খড়ি বা কাঠ-খড়ির সাদা রঙ।

একটি বাঁশের চোঙ বা খুঙ্গি, তুলি রাখার জন্যে।

গোটা আস্টেক নারিকেলের 'মালা'।

একটা তলা-চ্যাপ্টা, কানাওয়ালা মাটির গামলা বা ফুলের টব।

আরও একটি আগুনের পাত্র।

কিছু কাঠ-কয়লা।

ভালো, স্বচ্ছ গালা বা রজন।

কৎবেল (কপিত্থ), নিম বা বাবলা গাছের আঠা।

তেঁতুল-বীজ।

দুটি ছোটো ছোটো বালির পুঁটুলি।

একটি ছোটো মাটির সরা।

বাক্ড়া পাথর বা ঝামা ইঁট।

শংখ বা সমুদ্রের কড়ি।

কেয়া ডাঁটির তুলি।

অস্তর বা জমি তৈরি করার পদ্ধতি এইভাবের। টেবিল-চামচের তিন চামচ-পরিমিত সাদা রঙে (মাখমের মতো ভিজে) সমপরিমাণ তেঁতুল-বীজের আঠা[১], অথবা ঐ চামচের দু-চামচ গুঁড়ো সাদা রঙে তিন চামচ তেঁতুল-বীজের আঠা ভালোভাবে বাটিতে বা নারিকেলের মালায় আঙুল দিয়ে মেড়ে নিতে হবে। এক টুক্রো জালিকাপড়ের ভিতর দিয়ে রঙ ও আঠা একসঙ্গে ছেঁকে নিলেও দুটিতে ভালোরূপ মিশে যাবে।—ছ' কাপ (এক পোয়া চায়ের কাপ) আঠাতে দু' চিম্টা (দুই নুন-চামচ) পরিমাণে ফট্‌কিরি-গুঁড়ো বা চায়ের চামচের এক চামচ বোরিক পাউডার মিশিয়ে নিতে হবে। —এখন, মাড়া রঙে একটু জল মিশিয়ে চন্দুনি ক্ষীরের মতো পাৎলা করে নেওয়া প্রয়োজন। সেই রঙ একখণ্ড কাপড়ের (বিশদ উল্লেখ পূর্বের তালিকায় করা গেছে) দু'পিঠে একটি বাঁশ-ছেঁচা বা বেত-ছেঁচা তুলি দিয়ে (hoghair brush হলেও চলে) বেশ ঘষে ঘষে লাগাতে হবে; এ সময় কাপড়খানা একটি কাঠের পাটার উপরে রাখাই সুবিধাজনক। এক পিঠ শুকিয়ে গেলে অন্য পিঠে লাগাতে হবে। দু'পিঠ বেশ শুকিয়ে গেলে ঐ অস্তরে-লাগানো কাপড়ের টুক্রোটি কাঠের পাটার উপরেই রেখে, অল্প জল ছিটিয়ে, একটি কর্‌করে (বাক্ড়া) পাথরে বা ঝামার টুক্‌রোয় আস্তে আস্তে ঘষে সমান করে মিলিয়ে নিতে হবে। (যেভাবে ফ্রেস্কো কাজেও জমি সমান করা হয়। পরে আলোচিত হবে।) তারপর কাঠের পাটার উপর রেখে শাঁখ দিয়ে ঘষে অল্প পালিশ করে নেওয়া প্রয়োজন। এর উপর অল্প গেরি-মাটি ও গঁদ-মেশানো (পুরীর পটুয়ারা কৎবেল গাছের আঠাই ব্যবহার করে থাকে) শাঁখের সাদা রঙ নরম কেয়া ডাঁটির তুলি দিয়ে লাগাতে হবে। তা হলেই ছবি ছকবার মতো জমি তৈরি হয়ে গেল।

উল্লিখিত ঈষৎ গেরি রঙের জমির উপর শাঁখের পাৎলা সাদা রঙে (দুধের চেয়ে পাৎলা) আর নরম তুলিতে মূর্তি ও অন্যান্য বস্তুর মোটামুটি আকার বা ব্লক ও মোটা রেখাগুলি মোটের উপর ছকে নিতে হবে। পেনসিল বা কাঠ-কয়লা দিয়ে খসড়া করার প্রথা নেই। (এরূপ পটের খসড়া বিভিন্ন শিল্প-সংগ্রহে এবং 'কলাভবন'-চিত্রশালাতেও আছে)।

খসড়া হয়ে গেলে ছবির মধ্যে সব-চেয়ে ডেপ্‌থ্‌ বা গভীরতা যেখানে যেখানে বোঝাতে হবে, সেখানে (কালো ও হলুদে রঙ মিশিয়ে তৈরি) কাল্‌চিটে সবুজ

১ এই আঠা তৈরির পদ্ধতি পরবর্তী একটি প্রবন্ধের অঙ্গীভূত হবে।

রঙের ব্লক করে নিতে হবে। পোটোরা এরকম 'গভীরতা' ছবির নানা জায়গাতেই ব্যবহার করে। যাহোক, এইভাবে 'গভীরতা'র স্থলগুলি আগে থেকে স্থির থাকলে, ছবি শেষ করার কালে (finishingএ), পুরো পটে গভীরতার বাঁটোয়ারা কী ভাবের তার আন্দাজ ঠিক থাকবে ও কাজের সুবিধা হবে।

জগন্নাথের পটে গভীর কালচে সবুজের সংগে মানিয়ে উজ্জ্বল সাদা রঙের ব্যবহার হয়। ফলে, ছবি খুবই ঝলমলে (luminous) দেখায়। সাদা ব্লকগুলির ঘেরে হিংগুল, এলামাটি ও মাঝে মাঝে কাজল রঙের রেখা ব্যবহার করা হয়। সবুজের উপর এলা মাটি, সাদা ও অল্প কালো রেখা লাগে। নীলের উপর সাদা, লাল ও অল্প কালো রেখা লাগে। রঙের ব্লকগুলির সমধিক জলুস দেখাতে হলে নানা রঙের ছোটো বড়ো ফোঁটা লাগিয়ে তা সম্ভবপর হয়। এই ফোঁটা কাটা হয় মূর্তির পিছনে বা পটভূমিতে, মূর্তির পোষাকে ও গহনায়, আকাশে, দেয়ালে, ভূতলে—পটুয়ার যেমন খুশি, যাতে পট মানায়। সাদার উপর নীলের ফোঁটা, লালের ফোঁটা। নীলের উপর সাদা ফোঁটা। হলুদের উপর সাদা ও লাল ফোঁটা। তেমনি সবুজের উপর সাদা ও হলুদে রঙের ফোঁটা দেওয়া হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে জগন্নাথের পটের অনুরূপ পট আঁকতে হলে, ঈষৎ-গেরি রঙের জমিতে পাৎলা সাদা রঙের খসড়া আর উজ্জ্বল সাদা রঙের ও কালচে সবুজ রঙের ব্লক, অন্য নানা রঙের ব্লক—এ সব হয়ে গেলে লাল (গেরি বা হিংগুল) রঙ দিয়ে ছবির মধ্যে বস্তুর ঘেরগুলি (out line) বার করে নিতে হবে। তার পর সাদা ও অন্যান্য রঙের রেখা ও ফোঁটা-ফুঁটি লাগাতে হবে। সব শেষে কালো রঙের রেখা দিয়ে ছবিটি সমাধা করতে হবে। ওড়িয়া ভাষায় এই ক্রমটির নামকরণ হল এই রকম—(১) ছকা, (২) লাল কাঠি, (৩) টোপাটুপি (সাদা ও অন্যান্য রঙের ফোঁটা ও ফুল), (৪) কালো কাঠি।

ছবির চারধারে কালো বা ঘন লাল রঙের একটি পাড় (border) থাকে। সেই পাড়টিও ফোঁটা ফুল ও নানা রঙের রেখা দিয়ে সাজাতে বা মানাতে হয়। পটের পিছনে ঘন লাল (গেরি বা হিংগুল) রঙের লেপ লাগানো হয়।

ছবি আঁকা শেষ হলে, তার জোসা (glaze) করার কাজ। পূর্বোক্ত কানা-চওড়া মাটির পাত্রে কাঠ-কয়লার আগুন রেখে, পটটি পাত্রের কানায় ঠেকিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপিঠ ওপিঠ বেশ করে সেঁকে নিতে হয়। আগুন-পাত্রের কানা চওড়া থাকায় তার উপর রেখে তাতানোর সুবিধা হয়, আঙুলেও বেশি উত্তাপ লাগে না। সংগে সংগে আর একটি পাত্রের আগুনের উপর একটি সানকি (মাটির থালা) বা হাঁড়িভাঙা খাবরা রেখে তার উপর দুটি বালির পুঁটুলি (ঠাস কাপড়ের হওয়া চাই) উত্তপ্ত করতে হয়। এখন ঐ গরম পটটি খুব তপ্ত থাকতে থাকতে কাঠের পাটায় রেখে, তার উপর পাৎলা ভাবে মিহি রজনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে আর তপ্ত বালির পুঁটুলি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এক ধার থেকে টেনে টেনে মুছে নিতে হবে। এইভাবে ছবিটি বার বার তাতাবে আর উপরে রজনের গুঁড়ো বিছিয়ে তপ্ত বালুর পুঁটুলি দিয়ে বার বার জোসা বা পালিশ করে নেবে। দুটি পুঁটুলি থাকায় পালিশের কাজ প্রায় অবিচ্ছেদে ও দ্রুতভাবে চলবে। একেই জোসা করা বলে।

এই কাজে, রঙগুলি সব নারিকেলের মালায় কৎবেল গাছের আঠা অথবা নিমের বা বাবলার ভালো গঁদ মিশিয়ে আঙুলে মেড়ে মেড়ে তৈরি করতে হয়। পূর্বাবশিষ্ট শুকোনো রঙে নতুন করে অল্প জল মিশিয়ে, দরকার বুঝে অল্প আঠা মিশিয়ে বেশ করে মেড়ে নিয়ে প্রত্যহ কাজে বসতে হয়। নারিকেল মালা বসাবার জন্যে ছোটো ছোটো ন্যাকড়ার বিঁড়ে লাগে। যে বাঁশের চোঙের ভিতর তুলি রাখা হয় তার মুখ বন্ধ থাকে ন্যাকড়ার পুঁটুলি পাকিয়ে।

যে জায়গাটুকুতে ছবি আঁকা হয়, তার থেকে কাপড় বেশি রেখে ছবি সমাধা হয়ে গেলে উপরে নীচে পাট-করা ও সেলাই-করা ও সেলাই-করা পাড়ের ভিতর কাঠি গলিয়ে, এ জাতীয় পট দেয়ালে ঝোলানো যায়; আবার গুটিয়ে কাগজ বা কাপড় মুড়ে বাঁশের বা টিনের চোঙায় ভরে রাখাও চলে।

জগন্নাথের পটে এই ক'টি রঙের ব্যবহার—গেরি মাটি, এলা মাটি, হরিতাল, হিংগুল, শাঁখের সাদা, ভুষোর কালো, বিলিতি গুঁড়ো নীল। শেষোক্ত রঙের বদলে পূর্বে হয়তো পাথুরে নীল ও পাথুরে সবুজের ব্যবহার ছিল। ফ্রেস্কো বা প্রাচীর-চিত্রের কাজে কাপড়ে আর কাগজেও, তার ব্যবহার আজও আমরা করে থাকি—জয়পুরী পাথুরে সবুজ সহজেই সংগ্রহ করা যায়, পাথুরে নীল বা রাজাবর্ত (lapis lazuli) অপেক্ষাকৃত দুর্লভ ও দুর্মূল্য বটে।

রেখা টানা আর রঙ ভরাট করার কাজে যে সব তুলির ব্যবহার সেগুলি তৈরি করতে লাগে—কাঠবিড়ালির লেজের লোম, ছোটো ছাগলের ঘাড়ের লোম, বাছুর মোষের কাঁধের লোম অথবা মুখ-থেঁতো-করা সরু মোটা কেয়াঝুরির কাঠি। তুলি রচনার প্রসংগে এ গুলির আলোচনা করা যাবে। ঐগুলির অভাবে, বিলাতি তুলি (hog hair, camel hair বা sable hair দিয়ে তৈরি) ব্যবহার করলেও কাজ চলবে। (ক্রমশ)

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা

কানাই সামন্ত

লেখক যেকালে গণ্ডীবাঁধা লেখাপড়া শেষ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দুয়ার হতে অদূরে' এদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এক 'চীজ্'। আজও আছে কি? কতটা আছে তার খোঁজ রাখি নে। বই মুখস্থ করা (মায় অঙ্ক আর জ্যামিতি!), 'নোট' মুখস্থ করা, এসব অশিক্ষাজনক রীতির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। ইস্কুলের একটু উচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছুলেই অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, ইতিহাস, এমনকি দেবভাষা সংস্কৃত, ইংরেজির 'মাধ্যমে' শিখতে বা শেখবার ভাণ করতে হত যে তা বেশ মনে আছে। সংস্কৃত শিখতে ইংরেজি! এমন অদ্ভুত 'কর্মসু কৌশলম্' প্রাচীন বুটন বা ত্রিকালদর্শী প্রাচীনতর ঋষি কে বা ভাবতে পেরেছিলেন? কিন্তু fact is stranger than fiction, তার জানও খুবই কঠিন, টেকসই। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখতে হ'লে ইংরেজি ব্যাকরণের 'এপ্রন' ধ'রে থাকতে হত, নতুন নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন করে ধাই-মা'কে উপহার দিতে হত না তাও নয়; আর সাহিত্যগ্রন্থে বিষ্ণুশর্মা বা বাল্মীকি বা কালিদাস নামেই ছিলেন, তাঁদের রচনার ইংরেজি ভাষান্তর মুখস্থ করাই ছিল ছেলেদের প্রধান কর্তব্য। সে কী ইংরেজি! শুনলে শেলি কীটস্ মূর্ছা যেতেন, চিরদিনের জন্যে বোবা বনতেন শেক্স্পীয়র। ইংরেজ বা তার জ্ঞাতিগোত্র কোনো পুরুষে কোনোদিন সে ভাষা শোনে নি। ফল এই, ছাত্ররা সংস্কৃত শিখত না, ইংরেজি ভুল শিখত। এ অপরূপ পদ্ধতি কোন্ ব্যুরোক্রেশির উদ্ভাবন আর কোন্ মূঢ়ক্রেশির মেনে-নেওয়া বলতে পারব না। শুনতে পাই, অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে আজ। সংস্কৃত পাঠ্য বইয়ে ইংরেজি ধাই-মা'র চঞ্চল অঞ্চল এখানে ওখানে দেখা যায় না তা নয়, কেউ নাকি দৃষ্টি দেয় না। ভালোই। ইংরেজি দিয়ে সংস্কৃত শেখা, এর চেয়ে ভালো যে নাক দেখাবার জন্যে মাথার পিছনে পেঁচিয়ে হাতের দফা সারা, টালিগঞ্জে যাবার মৎলবে দৌড়ে ব্যারাক-পুরের বাসে চাপা, আর মামাদের কাহিনী মায়ের কাছে না শুনে রাস্তার পাহার-ওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা।

চিত্তের দৌর্বল্যে বা বুদ্ধির জড়তায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যও যখন অস্বীকৃত হয়, তাকে প্রমাণ করা এক ল্যাঠা। কোনো রকমে কেউ বুঝতে পারে না বললেই হয়। আজও কি হাওয়া ফিরবে না? স্কুলে হোক, কলেজে হোক, সর্বপ্রকার বিদ্যার আধার ও শিক্ষার বাহক হবে মাতৃভাষা, ইংরেজি ভাষাটা থাকবে ভাষা তথা সাহিত্য হিসাবেই শিক্ষণীয় হয়ে, শিক্ষার শক্তি বা সময় বা বিশেষ প্রয়োজন যার আছে তারই জন্যে। এই অতিরিক্ত ভাষা জুলুম ক'রে চালানো যাবে না। এইটে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত (পঞ্চবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা) যে, মাতৃভাষাতেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শেখা যাবে সকলপ্রকার বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ও সাহিত্য, শ্রুতি আর স্মৃতি অর্থাৎ আইন, সকল কলা ও কারুর তত্ত্ব। যে কোনো বিজ্ঞান আর ব্যবস্থা (আইন) সম্পর্কে সম্যক্ জানতে হলে যে মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরেজি বা অন্য কোনো অধীত ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে, এ আত্ম-অপমান তথা অনাবশ্যক আয়ুক্ষয় ও শক্তির অপব্যয় কেন? অর্থাৎ, এ অবস্থা যত শীঘ্র ঘুচে যায় ততই মঙ্গল। মাতৃ-ভাষায় আধুনিক যুগের সব জ্ঞান বিজ্ঞান

কর্ম থেকেই কর্মের উৎপত্তি। একটা লেখার দায়ে (দ্রষ্টব্য আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮।২।১৯৫৩ তারিখে : হিন্দি বনাম ইংরেজি) আর একটা লেখায় হাত দিতে বাধ্য হচ্ছি। ইংরেজি থাক্ ভারতের রাষ্ট্রভাষা, এ কথার অর্থ—মুখ্যতঃ বা অনন্যতঃ যা-কিছু আন্তঃ-প্রাদেশিক আর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্র, সেই সব স্থলেই ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা থাক্, পরাধীনতার গ্লানি নেই তাতে। নানা গুণে, এককালে সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলেই শুধু নয়, ইংরেজি অন্যতম বা বিশিষ্টতম বিশ্বভাষা, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভাষা। আগামী পঞ্চাশ বা একশো বৎসরে কী দাঁড়ায় বলা যায় না। ইতিমধ্যে মহা-ভারতখণ্ডে জীবনবেগ আর মননশক্তির প্রবৃদ্ধিতে বাংলা বা হিন্দি বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা আন্তঃপ্রাদেশিক এমনকি আন্তর্জাতিক, সমাদরের আসনে সহজেই স্থান পায় যদি, সে তো যারপর-নেই সুখের কথা। তখন ইংরেজির প্রয়োজন থাকবে না রাষ্ট্রভাষা হিসাবে। ইতিমধ্যে আইনের জোরে কোনো একটা ভারতীয় ভাষাকে সর্বভারতে চালাবার চেষ্টা বিশেষ কল্যাণকর মনে হয় না।

প্রদেশে প্রদেশে সর্ববিধ শিক্ষার বাহন কিন্তু মাতৃভাষা। 'মাধ্যম' কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছি। উত্তম-মধ্যম, দমাদম ইত্যাদি হাস্যকর বা ভীতিজনক শব্দ সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে। 'শিক্ষার বাহন' বলাই ভালো, বিশেষ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথেরই যখন বিন্যস্ত বচন। বচনের বিষয়ও তিনি দীর্ঘজীবনে বারংবার যা বলেছেন তাই। তাঁর কথায় কতটুকু বা কান দেওয়া হয়েছে? আমাদেরও 'কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে'—কলমে কালি সরে না। বিশেষ সংকোচের কারণ, গুরুর চেয়ে গুরুতর অবহেলা তথ্য-সরবরাহে বা সাংখ্যিক প্রমাণ-প্রয়োগে। তা হ'লেও সুধী ব্যক্তি অল্পেই আঁচ পাবেন আর পণ্ডিত ব্যক্তি, যেমন রায় পিথৌরা, তথ্য ও প্রমাণ জুগিয়ে যাচ্ছেন, আরও জোগাবেন, এই আশা আছে।

ধ'রে দেওয়া যায় না জড়বুদ্ধির একথা গ্রাহ্য নয়। ধাবমান যুগের সঙ্গে এক কদমে এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় জাপানও ইংরেজি শিখেছে, সার্থক হয়েছে সেই শিক্ষা। অর্থাৎ, ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে এ যুগের যা বিশেষ শিক্ষা—জানবার বোঝবার ভাববার জিনিস—তা দোহন ক'রে নিয়ে রেখেছে নিজেরই ভাষার আধারে। তবেই তো যুগোপযোগী শিক্ষা ও মনোভাব সহজে ব্যাপ্ত হতে পেরেছে সমাজের প্রায় সকল স্তরে; ভারতবর্ষের মতো হার্ড্ল্ পার হওয়ার ব্যর্থ কস্রতে ব্যর্থ বাহবা অর্জন করতে হয়নি। কাজেই ইংরেজি প'ড়ে ইংরেজিতে বই লিখেছে অল্প জাপানি। তা হ'লেও তারা রুশ-ভালুকের মুখ থেঁতো ক'রে দিয়েছে (য়ুরোপীয় জঙ্গী মনোভাবে চীনের উপরেও চড়াও হয়েছে), রিপাল্স্ ও প্রিন্স্ অব ওয়েল্স্ ডুবিয়েছে, বিজ্ঞানে বার বার নোবেল্ পুরস্কার অর্জন করেছে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে করিৎকর্মা আমেরিকা আর বৃটেনের প্রতিযোগী হয়েছে, আর আজ না হয় অবস্থাবিপাকে দুর্বল, হীনপদস্থ হয়েছে, তবু পুনরায় উঠবে যে সেও নিশ্চিত। (সব রকমে জাপান আমাদের অনুকরণীয় নয় নিশ্চয়ই। প্রাজ্ঞমানসহংস নীর আর ক্ষীর আলাদা ক'রে নিন্।)

আর এক তামাসা দেখুন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্জন পোষণ ও পরিবেশন বিষয়ে য়ুরোপীয় ভাষা না হলে চলবে না আমাদের একথা যখন বলি, ভেবে দেখিনে, এমনকি ভারততত্ত্ব যাকে বলা হয়, ভারতের ভাষা, শিল্প, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, তাও তো জর্মান পণ্ডিত জর্মান ভাষায় লিখে চলেছেন, ফরাসী পণ্ডিত ফ্রেঞ্চে আর ইংরেজ ইংরেজিতে। কৈ, বেদের বিষয় আলোচনা করছেন ব'লে সংস্কৃত, অন্তত হিন্দি ভাষায় লেখেন নি। শ্রীমদ্ ভাগবত আর উজ্জ্বলনীলমণি-ষট্সন্দর্ভের বিচারণাও ক'রে থাকতে পারেন, সেজন্যে তুলসীমালা আর তিলক ধারণ করতে হয়নি।

গুরু গুরু ব'লে 'প্রবন্ধ' শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, "এই যেসব বাঙালির ছেলে [আর মেয়ে। গুজ্রাটি বেহারি মরাঠি পঞ্জাবি ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটবে, ভাষার একটু অদল-বদল করে নিলে] স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলোটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত, কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা, মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি।......

"কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কৈ?...শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে। শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তাহার কেয়ারি করিবে, কিম্বা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।...

"সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র : আমরা চাই। এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারে শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন? কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূ[র্ণ] করিয়া তুলিবে?"

এইখানেই শেষ করা যেতে পা[রে।] সম্যক্ আলোচনের আকাঙ্ক্ষা নেই, শ[ক্তিও] নেই, যোগ্যজনদের আলোচনাকে সুযু[ক্তি] বা কুযুক্তি (?) দিয়ে হোক উস্কে দেও[য়াই] এই লেখকের উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাস[ন]কালে কামধেনু রাষ্ট্রভাষাটি মন্দ দুধ দে[য়] নি, কিন্তু চাট ছুঁড়েছে আর দেশশু[দ্ধ] লোককে গুঁতিয়ে সন্ত্রস্ত করে তুলে[ছে] তারও বেশি। কাছে ঘেঁষে নি বে[শি] কেউ। অথচ জাপানের গোয়ালে এ[ই] গাভীটিই—থাক্, সে আলোচনা কিঞ্চি[ৎ] হয়ে গেছে। মোট কথা, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষার সীমা-সরহদ্দ নতুন ক'রে নির্ণ[য়] করতে হবে; তার কল্যাণকর ব্যবহার থাকবে, অত্যাচার অনাচার থাকবে না। প্রদেশভাষা আর রাষ্ট্রভাষা কেউ কারও মর্যাদা লঙ্ঘন করবে না। প্রত্যেকটিরই কার্যকারিতা পৌঁছুবে প্রত্যেকটির অন্তিম সীমায়। স্বদেশের ও বিশ্বের যা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান ও রসবস্তু তার ধারণসামর্থ্য অর্জিত হবে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষায়—সরকারী আদেশে নয়, আনুকূল্যে, আর প্রদেশবাসীর জীবনের বেগে, কর্মের কুশলতায়, হৃদয়মনের মুক্তিতে।

দুষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ক'রে শিষ্ট নয় শুধু, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধক হয়ে উঠবে, সেও সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবিত হতে পারবে। সে হল ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

কুর্গের নারী

সীতা পুভাই

দেশের সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত-বিসারী পশ্চিমঘাট পর্বত-মালার অংকশায়িনী ক্ষুদ্র কুর্গ রাজ্য। মহীশূর, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়া এর প্রতিবেশী এবং খাস কুর্গের লোকসংখ্যা বড় জোর চল্লিশ হাজার।

স্কন্দ পুরাণে কুর্গ তিনটি বিভিন্ন নামে অভিহিত—ব্রহ্মক্ষেত্র, মৎস্যদেশ ও ক্রোড়দেশ। শেষোক্ত নামটিই অধিকতর উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়, কারণ এর বর্তমান নাম কড়াগু স্পষ্টতই 'ক্রোড়' শব্দের অপভ্রংশ। কুর্গ ইউ-রোপীয়দের দেয়া নাম।

পৌরাণিক কাহিনী এই যে, মৎস্য দেশের রাজা চন্দ্রবর্মণ অতীত কর্মফল-বশত তাঁর ক্ষত্রিয় পত্নীর দ্বারা পুত্রলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। অতঃপর চন্দ্রবর্মণ পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর উৎপত্তি স্থল, কুর্গের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি পর্বতে তপস্যায় নিমগ্ন হন। তপস্যায় তুষ্ট পার্বতী তাঁকে দর্শন দিয়ে বর দেন যে, কোন শূদ্র পত্নীর গর্ভে তাঁর পুত্রলাভ হবে। এই শূদ্রাণী হবেন উগ্র-বংশসম্ভূতা। পার্বতী আরও বর দেন যে, তাঁর পুত্রেরা ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হবে। দৈব বরে রাজা তাঁর শূদ্র মহিষীর দ্বারা এগারোটি পুত্র লাভ করেন। বিদর্ভের একশত রাজকুমারীর সাথে তাদের বিবাহ হয় এবং তাদের এরূপ বংশ বৃদ্ধি হল যে, তাঁরা নূতন দেশের সন্ধানে বহির্গত হলেন।

কুর্গ তাঁদের পছন্দ হল। দেশের আরণ্য-শোভাকে ছিন্নভিন্ন করে তাঁরা বহু সুরক্ষিত নগরী নির্মাণ করেন এবং নগরীগুলোর একটিকে আরেকটি থেকে গভীর গড়খাই দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এই গড়খাইগুলোর নাম 'কারাঙ্গা'। তাঁরা এই সুরক্ষিত দেশের নাম দিলেন 'ক্রোড়দেশ'—অর্থাৎ তেজস্বী মানুষ ও কাড়াঙ্গার দেশ। 'ক্রোড়দেশ'ই বিকৃত হয়ে কালক্রমে বর্তমান নাম 'কোড়াগু'তে পরিণত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গড়খাইগুলো এখনও দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সপ্তম শতাব্দীতেও এগুলো ছিল বলে জানা যায়।

উপকথা ছাড়া ইতিহাসের পাতায়ও কুর্গের অস্তিত্ব আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতিবেশী মহীশূর রাজ্যের জনৈক রাজা কুর্গ জয় করে আধিপত্য স্থাপন করেন। আশ্চর্যের বিষয়, তদবধি এই যোদ্ধৃজাতি মহীশূরের বিদেশী শাসকদের দ্বারাই শাসিত হয়ে আসছিল, যতদিন না

কুর্গ নারীর ওড়না ব্যবহারের রীতি

আবার ইংরেজ এসে তাদের বশ্যতা দাবী করে।

পৌরাণিক উৎপত্তির দিক থেকে কুর্গ-বাসী জাতিতে ক্ষত্রিয়। সে একাধারে সৈনিক ও কৃষক। তার রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান হিন্দুয়ানা ও আদিম পার্বত্য অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। সে মালাবার, কানাড়া ও তামিল সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। আবার কুর্গ অথবা উটির পার্বত্য অধিবাসীদের যে সব আচার-ব্যবহার সে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে বা আত্মস্থ করেছে, তাকে সে পূর্বোক্ত সংস্কৃতির সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। স্বাভাবিক গ্রহণ-ক্ষমতা বলে সে পরবর্তীকালে তার পাশ্চাত্য প্রভুদের আচার-ব্যবহারও যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির এই অদ্ভুত সমন্বয়ের দৌলতে এবং তার চেয়েও বেশী ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের অভাবে কুর্গের নারী-সমাজ যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ভারতের অন্যান্য স্থানের নারীদের ভাগ্যে তা ঘটেনি।

কুর্গে নারী নিজ পরিবারের কর্ত্রী এবং যে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার এক-কালে কুর্গের সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল, 'করুভা কর্তি' রূপে তিনিই তার কর্ণধার। সামাজিক হোক, ধর্মীয় হোক—গৃহিণীই সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বিবাহে, নামকরণ অনুষ্ঠানে তিনিই পুরোহিত এবং তিনিই সমস্ত উৎসবের প্রাণস্বরূপা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কুর্গে এমন একটি প্রথা আছে যা অন্যত্র হিন্দু সমাজে, এমন কি হিন্দু সমাজের বাইরেও সম্পূর্ণ অশ্রুত। প্রথাটি হচ্ছে, কুর্গের বিধবা তার মৃত স্বামীর চিতায় অগ্নিসংযোগ করে!

কুর্গের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বুঝতে হলে কুর্গের বিবাহ-পদ্ধতি জানা আবশ্যক। কুর্গে বিবাহ চিরজীবনের তরে দম্পতির গাঁটছড়া বাঁধার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে একটা সামাজিক চুক্তি রূপেই অধিকতর গণ্য। এখানে বৈদিক যুগের স্মারক যজ্ঞাগ্নি নেই—যাকে সাক্ষী করে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, মন্ত্র পড়াবার জন্যে পুরোহিতও নেই। ব্রাহ্মণ ছাড়া, অগ্নি ছাড়া, সপ্তপদী ছাড়া এ এক অদ্ভুত হিন্দু বিবাহ!

কুর্গের নারী-সমাজে বহুপতিত্ব একে-বারে অজ্ঞাত ছিল না। মালাবারের সান্নিধ্যের কথা বিবেচনা করলে পর্বতের ওপারে কুর্গ-নারীদের একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকারে বিশ্বাস আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয় না। কারণ মালা-

বিবাহসজ্জায় কুর্গ দম্পতি

বারে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-বিধি প্রচলিত এবং এর প্রভাব কুর্গের উপর পড়েছে। এরূপ কথিত যে, সাধারণত সহোদর ভাইরা তাদের স্ত্রীদের যৌথভাবে ব্যবহার করত, বিশেষত যখন কোন ভাইকে কর্তব্যের অনুরোধে দূর বিদেশে যেতে হত। এক সঙ্গে হাজার কুর্গকে রাজসেবায় নিযুক্ত থাকতে হত এবং তার চেয়েও অনেক বেশী লোককে রাজ্যের বাইরে যুদ্ধ করতে যেতে হত। তখন ভাইরাই যেমন রাজদরবারে তেমনি বাড়িতেও সাময়িকভাবে তাদের স্থান পূরণ করত। সম্ভবত এভাবে স্বামীর অনুপস্থিতির জন্যেই বহুপতিত্বের উদ্ভব হয়েছিল এবং সন্তান-সন্ততিরা সাধারণ সম্পত্তি বলে গণ্য ছিল। যা হোক, ১৮৭০ সালের পর এই প্রথার আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এক সময়ে নাকি কুর্গে গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। এ জাতীয় বিবাহের রোমান্স, উভয় পক্ষকে তাদের সম্পর্ক গোপন রাখতে হত এবং দু-তিনটি সন্তান জন্মাবার পরই শুধু পুরুষ তার সঙ্গিনীকে স্ত্রী বলে দাবী করতে পারত।

বিবাহের এবং পুনর্বিবাহের এবং স্ব সমাজে ও স্ব সমাজের বাইরেও বিবাহ করতে পারার অবাধ স্বাধীনতার ফলে কোনো মেয়ের অবিবাহিত থাকা দোষের নয় এবং গোঁড়া হিন্দু সমাজের মতো বয়স্কা কুমারী নিন্দাভাজন নয়। পিতৃগৃহে তার অধিকার থাকে এবং যতকাল তার ইচ্ছা ততকাল তাকে তথায় বাস করতে দেওয়া পিতা বা ভ্রাতাদের কর্তব্য। তবে যে অল্পসংখ্যক মেয়েই নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেয় তারা পারিবারিক গন্ডীর বাইরে স্বাধীন জীবিকার একটা উপায়ও করে নেয়।

সম্ভবত কুর্গে এমন একজনও মেয়ে নেই যে লেখাপড়া জানে না। কুর্গ ভাষার দৈন্য বশত কানাড়ি লেখ্য ভাষার স্থান নিয়েছে এবং ইংরেজী প্রায় দ্বিতীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ কুর্গ মেয়ে স্বচ্ছন্দে দেশের যে কোন স্থানে চলাফেরা করতে পারেন। যদিও মেয়েদের জন্য প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় ১৯১১ সালে স্থাপিত হয়েছে, তবুও শিক্ষার দিক দিয়ে আজ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের পরই কুর্গের স্থান এবং অক্ষরজ্ঞানের শতকরা হিসাবে সমগ্র দেশে কুর্গ তৃতীয় স্থানীয়।

সুতরাং কুর্গের শিক্ষিতা নারী শিক্ষা, চিকিৎসা, নার্সিং অথবা রাজনীতি —যে কোন ক্ষেত্রে গিয়েছেন, সেখানেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৈদেশিক চাকুরি থেকেও তাঁরা বাদ যাননি। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, শুধু বিদুষী হিসেবেই কুর্গের নারীর পরিচয়। কুর্গের নারী অন্য যে কোন স্থানের নারীর মতোই সাধ্বী স্ত্রী, স্নেহময়ী জননী, সুপাচিকা এবং শ্রমশীলা গৃহিণী। পুরুষদের সাথে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে কাজ করতে বা সুবৃহৎ জমিদারী পরিচালনা করতে তাঁরা দ্বিধা করেন না বা পশ্চাৎ-পদ নন। কোন মহিলা একাকী কোন দূর তালুকে আবদ্ধ হয়ে আছেন, নিকট-তম প্রতিবেশী মাইল পাঁচেক দূরে— এ রকম অবস্থা বিরল নয়। এ অবস্থায়

অবশ্য ডাক দিতে তিনি তাঁর মজুরদের পান, সঙ্গে একটি বা দুটি কুকুর থাকে, এবং হাতের কাছে একটি বন্দুক বা রিভলবারও মজুত রেখে দেন।

আরও একটি অদ্ভুত প্রথার কথা উল্লেখ না করলে কুর্গের নারীর বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকবে। এই প্রথাও দেশের অন্যান্য স্থানের প্রথার চাইতে পৃথক।

কুর্গে মেয়েরা অবশ্য সাড়িই পরেন, কিন্তু পরবার পদ্ধতি পৃথক। তাঁরা সাড়িকে পেছন দিকে ভাঁজ করে বাম কাঁধের নিচে দিয়ে ডান কাঁধের উপরে তুলে একটি সুবিধাজনক গেরো দিয়ে দেন। একটি আঁটসাঁট জামা কাঁচুলির স্থান নিয়েছে এবং মাথা আবৃত থাকে পৃথক একটি বস্ত্রখন্ড দিয়ে—যা সুন্দর মুখের পক্ষে চমৎকার একটি পটভূমি। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে সাড়ি পরার এই রীতির উৎপত্তি পার্বতীর উপর আরোপ করা হয়। কুর্গবাসী পার্বতীর প্রিয় সন্তান। কাবেরী নদীরূপে তিনি সত্যসত্যই কুর্গে নেমে এসেছেন কুর্গবাসীদের এবং আর যে সব দেশের উপর দিয়ে তিনি প্রবাহিতা সে সব দেশের পরিচর্যার জন্যে।

এই বিশিষ্ট পরিধান-রীতি পার্বতীর স্বর্গীয় অভিপ্রায়েরই নিদর্শন বলে বিশ্বাস ক'রে কুর্গবাসীরা গৌরব বোধ করে। পার্বতী চেয়েছিলেন কুর্গনারী হবে অনন্যসাধারণ। কিন্তু কিছু কিছু সাহসিকা কুর্গবাসিনী এই স্বর্গীয় বিধানের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করছেন না। তাঁরা স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে সর্বত্র প্রচলিত রীতি গ্রহণ করে অন্যান্য ভারতীয় ভগিনীর সাথে এক হওয়াই পছন্দ করেন।

কুর্গবাসীরা আরও বলে থাকেন যে, বেগবতী কাবেরী বস্ত্রকে সামনের দিক থেকে পেছন দিকে সরিয়ে নিয়েছে। এর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এভাবে সাড়ি পরলে মাঠে ও ঘরে কাজের সুবিধে হয়।

জাতীয় পোষাকে সজ্জিতা কুর্গের নারী

কুর্গ-নারীর পৌরাণিক ঐতিহ্যের কি কোন সার্থকতা নেই? তারা সত্যই কি শূদ্র মাহিষীর দুহিতা, যিনি 'তেজস্বী লোকের' এক বংশে—উগ্র বংশে জন্মেছিলেন? কুর্গ-মাতা ছাড়া আর কে ভারতকে তার প্রথম প্রধান সেনাপতি দিতে পেরেছে? কুর্গ রমণী ছাড়া আর কে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দেশের জন্য সংগ্রাম করতে অগণিত সৈনিক সরবরাহ করেছে?

[March of India হইতে]

রঞ্জন

মনে আছে, ছেলেবেলায় একটা হাসির ছড়া বা গানে শুনেছিলুম, 'আসে যদি রুশিয়া, তাড়াইব ঘুষিয়া' বা ওই রকমেরই কোনো কথা। পোর্ট আর্থারের পরেও ওটা হাসিরই কথা ছিল। আজকের দিনে সত্যি রাশিয়া যেদিকে আসবে ব'লে অন্তত সেদিককার লোকেরা মনে করছে, তাদের হাসির ছলেও অমন কথা বলার সাহস নেই। তারা জানে তাদের কামড়ে আর জোর নেই, গর্জন বৃথা। পশ্চিম য়ুরোপীয় সভ্যতার বড়ো শরিকের আজ দুর্দিন; ছোটো শরিক কী বলেন?

ছোটো শরিকের সমৃদ্ধি এখন শিখরে। তাই সে সানাইওয়ালাকে পয়সা দিয়ে দীপক রাগিনী বাজাবার আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত নয়, নিজের ঢাকটাও বড়ো বেশি বিরাম পায় না। সে বাজনায় রাশিয়া ভয় না পেলেও বড়ো শরিকের কানে তা বাজে। তার অভিমানে আঘাত লাগে। ছোটো শরিক জানতে চায়, কেন? আমেরিকার পক্ষে প্রশ্ন করেছেন ল্যুইস গালাঁতিয়ের, উত্তর দিয়েছেন (বা এড়িয়েছেন) নয়জন য়ুরোপীয়।*

লুইস গালাঁতিয়ের আমেরিকার সুর কোমলে বাঁধেন নি। তিনি সরাসরি বলছেন, "নীতির দিক থেকে আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকানদের) দাবী সবচেয়ে ন্যায়সংগত। অথচ আমরা যেন সর্বদা সসংকোচে আত্মসমর্পণে ব্যস্ত।......

......অথচ য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের আজো এই ধারণা দৃঢ়মূলে যে নির্যাতন ও শোষণ মার্কিনী বৈশিষ্ট্য, রাশিয়ায় ও বস্তু অজ্ঞাত!"

*

গালাঁতিয়েরের বিস্ময় বুঝি, তবু নয়জন নিমন্ত্রিত য়ুরোপীয়ের মধ্যে একজনও কেন তাঁর প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেননি তাও অনুমান করা শক্ত নয়। রেমঁদ আঁর সোজাসুজি প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়ে বলছেন, শুধু হাঁ কি না বলে এর উত্তর সম্ভব নয়। ছোটো শরিকের সাহায্য যদি শুধু আর্থিক আর সামরিক হোতো তাহলে তা গ্রহণ করতে দীর্ঘ দ্বিধার কারণ ছিল না, কিন্তু নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মার্কিন নেতৃত্ব নিঃসংকোচে মেনে নিতে য়ুরোপকে দুবার ভাবতেই হয়। এই য়ুরোপীয় অনীহার নানা কারণ আঁর উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু থলে থেকে বিড়াল বেরিয়ে যায় যখন আঁর বলেন, "মৌলিক কারণটা হচ্ছে সবলের প্রতি দুর্বলের স্বাভাবিক ঈর্ষা।...... আজ য়ুরোপকে তার পূর্বার্জিত আত্মসম্মান আঁকড়ে থাকতেই হয়।" "কিন্তু", একটু পরেই আঁর বলছেন, "একথাও গোপন করে লাভ নেই যে, সংস্কৃতিকে নির্যাস বা বড়ি করে পরিবেশন করবার যে প্রবৃত্তি আমেরিকানদের প্রায় মজ্জাগত তা য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের বিতৃষ্ণ শংকার মূল।" পুরানো য়ুরোপ আর নতুন আমেরিকার মধ্যে এই বৈষম্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

তবু আঁরর পথ পরিষ্কার। তিনি নিজে বিনা সর্তে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। কিন্তু সংগে সংগে যোগ করতে ভোলেন নি যে, এ বিষয়ে তিনি বর্তমান য়ুরোপের প্রতিনিধি নন। রুশ-মার্কিন দ্বন্দ্বে, আঁর বলেছেন, য়ুরোপ সক্রিয়ভাবে আমেরিকার পাশে দাঁড়াবে যদি (১) আমেরিকানরা মোড়লী ছেড়ে সত্যকার নেতৃত্বের পরিচয় দেন (২) তাঁরা এই দুরাশা পোষণ না করেন যে, আত্মরক্ষার্থে আমেরিকার অনুগামী হলে সর্বক্ষেত্রেই আমেরিকার অনুসারী হতে হবে এবং (৩) তাঁরা সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, রুশ-মার্কিন যুদ্ধ হলে সেই রাজায় রাজায় যুদ্ধে য়ুরোপের ভূমিকা হবে উলুখড়ের, একটু ভয় তাই স্বাভাবিক।

*

আর্থার কোসলার বলছেন, আদৌ তা নয়। "আজকের দিনে য়ুরোপে জীবন হয়েছে ঘুঘুচড়া মাঠে চড়ুইভাতি।... দুই বিরোধী বন্দুকের তলায় অসহায়ভাবে বাঁচার চিন্তা এতই ভয়াবহ যে চোখ বুজে না থেকে উপায় নেই।" য়ুরোপের তাই হয়েছে। উপসংহারে তিনি মার্কিনী নেতৃত্বের পক্ষপাতী, দ্বিতীয় পন্থা নেই বলে।

স্টিফেন স্পেন্ডার পুরো প্রশ্নটিই এড়িয়েছেন—আমেরিকার সম্বন্ধে এক বর্ণও বলেন নি এবং য়ুরোপের মানসের কথা না তুলে শুধু নিরবসর ইংরেজ লেখকদের নিরুপায় হয়ে সরকারী চাকরি নিতে বাধ্য হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন। অবান্তর। দ্য রুজমঁ বলছেন য়ুরোপের নৈতিক অবনতি ঘটেছে। নিকোলাস নাবোকফ্ যুদ্ধোত্তর সংগীত-প্রীতির বৃদ্ধিতে খুশি। সোবি পিকাসোর 'গোর্নিকা'র ছায়ায় য়ুরোপীয় আর্টের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সার্টন আমেরিকানদের য়ুরোপ ভ্রমণ করে য়ুরোপকে চেনবার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুলিখিত এবং কোনো কোনোটি সুচিন্তিত। কিন্তু রুশ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে য়ুরো-মার্কিন সম্পর্কের সাহসিক পর্যালোচনা করেছেন লেও লানিয়া ও মেলভিন লাস্কি।

*

লানিয়া বলছেন য়ুরোপ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন তাই শান্তিতে আসক্ত। রুশ বিভীষিকা সম্বন্ধে সে আমেরিকার আশানুরূপ আতংকিত নয় কেননা সে সিনিক, সে বিশ্বাস করে না যে তার সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। এই নিরাশাবাদীরা য়ুরোপে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ। লাস্কি নাম করতেও দ্বিধা করেন নি। বলছেন, য়ুরোপ আজ এমনই সংকীচত ও বিহ্বল যে ইংল্যান্ড 'নিউ স্টেটসম্যান অ্যান্ড নেশন'-এর প্রচারে বিভ্রান্ত, জঁ-পল সার্ত্র এখনো বিশ্বাস করেন যে স্টালিন প্রগতিপন্থী। এই বিপর্যস্ত অবস্থায় মালরো নিঃসংগ, কোসলার দেশত্যাগী, আর' হারা যুদ্ধের মত সৈনিক ও কেমু আত্মমুখ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংকল্প কোথাও নেই। নিরুৎসাহ, উদাসীন য়ুরোপের এই বাস্তব কিন্তু অপ্রীতিকর চিত্র আমেরিকাকে হৃদয়ংগম করতে হবে। আমেরিকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, কেন সে উন্মাদনা না হোক, উত্তেজনা না হোক, উদ্দীপনা পর্যন্ত জোগাতে পারে না অ-মার্কিন গণতন্ত্রবিশ্বাসীদের প্রাণে। এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে বিশ্বের প্রতি মার্কিন ব্যবহারের মূলেই কোথাও ভুল ছিল গো ভুল আছে।

---

* *America and the Mind of Europe*, edited by Lewis Galantiere (Hamish Hamilton, London. 6s.).

পশ্চিম বাংলার খনিজ সম্পদ

অনুসন্ধানী

দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিম বাঙলাকে অনেক কিছুই পূর্ব-বঙ্গের হাতে তুলে দিতে হয়েছে; শিল্প ও শস্য সম্পদ যা যা দিতে হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু খনিজ সম্পদ কতটুকু দিতে হয়েছে, তার বিবরণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

খনিজ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বেড়েই চলেছে; নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তাছাড়া আজ যে জিনিসের খনিজ মূল্য কিছুই নেই, কালকে কোন নতুন উদ্ভাবনের ফলে সে যে মহামূল্য হয়ে উঠবে না, তা জোর করে বলা যায় না। সেইজন্য খনিজ সম্পদের পরিমাণ কোন দেশে কোন সময়েই সুনির্দিষ্ট নয়। খনিজ সম্পদের এই যে সীমাহীন বিস্তার এছাড়াও এর আরেকটি দিক বিচার করবার আছে, সেটি হচ্ছে এর ক্ষয়িষ্ণুতা। আজকে খনি থেকে যে সম্পদ আহরণ করে নেওয়া হল, ভবিষ্যতে কোনও দিনই সে সম্পদকে নতুন করে পূরণ করা যাবে না। নতুন আবিষ্কার আমাদের যেমন নতুন সম্পদ দেবে, তেমনি পুরাতন সম্পদও ক্রমশ লয় পেতে থাকবে। এই দুই বিপরীতমুখী গতির মধ্যে সাম্য রক্ষা করা যায় কিনা, তা জানবার নির্দিষ্ট কোনও উপায় নেই।

আজকের দিনে তাই সবচেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে যে, খনিজ সম্পদের যে পরিমাণ আমাদের জানা আছে, তারই পরিমিত ও যুক্তিসংগত ব্যবহার; কোন কারণেই যেন এক ছটাক খনিজের অপ-ব্যবহার বা অব্যবহার না হয়। প্রসংগত পশ্চিম বাংগলার খনিজ সম্পদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানা হয়তো অবান্তর হবে না।

খনিজ সম্পদের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, সেইসব খনিজের কথা, যারা শিল্পের যন্ত্রদানবকে শক্তি জোগায়। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কয়লা আর খনিজ তেল (প্রেট্রলিয়াম); এরাই সব শিল্পের মূল। কারখানার যন্ত্র চালাবার জন্য চাই শক্তি, সে শক্তি আসে বিদ্যুৎ, বাষ্প কিম্বা খনিজ তেল থেকে। নদীর স্রোত কিম্বা বাষ্প শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, বাষ্পের জন্য চাই তাপ আর সে তাপ তৈরি হয় কয়লা পুড়িয়ে। সেইজন্য দেশের কয়লা-শিল্প একটি প্রধান শিল্প।

খনিজ তেলের বেলায় এতো ঝামেল নেই। ছোট একটি স্ফুলিংগ পেট্রলিয়ামে যে বিস্ফোরণ ঘটায়, সেই বিস্ফোরণের শক্তিকেই আমরা সরাসরি যন্ত্রদানবের কাজে লাগিয়ে থাকি।

খনিজ তেল থাকে মাটির নীচে, মানে অনেক নীচে, সেখান থেকে তাকে নল-কূপের সাহায্যে উপরে তোলবার ব্যবস্থা করতে হয়। মাটির নীচে কবে, কেমন করে তেল জমে, সে-কথা সঠিকভাবে বলা শক্ত, অল্প কথায় বলা আরও শক্ত। জিয়লজি-ক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার গত একশ' বছরের অভিজ্ঞতা আর বার্মা অয়েল কোম্পানীর অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, বার্মা, ভারত ও পাকিস্থানে এক বিশেষ ধরণের পাথরের সমাবেশ ও সেই পাথরের স্তরের কয়েকটি বিশেষ ধরণের আকৃতি থাকলে তবেই সেখানে তেল পাবার সম্ভাবনা থাকে। এই পাথরগুলি যে যুগে সৃষ্টি হয়েছিল, তার নাম 'অলিগো-মায়োসিন' যুগ। পৃথিবীর দুশো কোটি বছরের ইতিহাসে এই যুগ একেবারে আধুনিক না হলেও আধুনিক যুগের অল্প কিছুদিন পূর্বেই এর স্থান।

দার্জিলিং জেলার এক ধরণের পাথরকে এই যুগের বলে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু পেট্রলিয়ামের আভাস মাত্রও সেখানে পাওয়া যায়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে একজন বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ্ খনিজ তেল বহনের উপযোগী পাথরের স্তরবিন্যাসের সন্ধান পেয়েছিলেন। বর্তমানে সে জায়গা বোধ হয় বার্মা অয়েল কোম্পানীর ইজারাভুক্ত; কাজ সেখানে কতটুকু হয়েছে, তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া মেদিনীপুর জেলায় কিছু কিছু পাথরের স্তর আছে, যাদের উপরোক্ত যুগের বলে মনে করবার সংগত কারণ আছে।

পশ্চিম বাঙলার বেশ কিছুটা অঞ্চল পলিমাটির। পৃথিবীর ইতিহাসে এই পলিমাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে জমা হয়েছে। বাঙলার পলিমাটির নীচে কি আছে, তা সঠিক জানা নাই, যদিও কিছু কিছু গবেষণা এ নিয়ে হয়ে গিয়েছে (geology and underground water-Supply of Calcutta—A. L. Coulson. Mem. G. S. I. Vol. 76, 1940). পলাশীর কাছে নলকূপ খননের সময় নাকি পলিমাটির নীচে, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দুশো ফুট নীচে, শক্ত পাথর মিলেছিল। ঢাকুরিয়ার লেক খোঁড়বার সময় পাওয়া গিয়েছিল 'পীট' এর স্তর, যাকে ভূতত্ত্ববিদেরা জৈব পদার্থের কয়লায় রূপান্তরিত হবার প্রথম সোপান বলে মনে করেন।

তবুও বাঙলার পলিমাটির নীচে খনিজ তেল বহনের উপযুক্ত পাথর আছে কি নেই, তা বলা শক্ত। আজকাল তেলের খোঁজ করবার যেসব নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন হয়েছে, সেসব প্রয়োগ করলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু এ সব উপায়ের প্রয়োগ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সে ব্যয় বহন করবার শক্তি হয়তো দেশের এখন নেই। কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল যে, পশ্চিম বাঙলা ও বিহারের সামান্য কিছু অংশে খনিজ তেলের খোঁজ পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এখনও কিছু জানা যায়নি।

যাই হোক, বর্তমানে কিন্তু পশ্চিম বাঙলার কোথাও খনিজ তেল মিলে না, তাই শিল্পশক্তির উৎস হিসাবে পশ্চিম বাঙলাকে কয়লার উপরেই নির্ভর করতে হবে। কয়লা থেকে কৃত্রিম তেল তৈরি করা অবশ্য সম্ভব, কিন্তু তাতে বহু কোটি টাকার দরকার, লোকের দরকার, আর জানা দরকার যে পশ্চিম বাঙলার কয়লা অর্থকরী হিসাবে পেট্রলিয়াম তৈরির উপযোগী কি না।

১৭৭৪ সালে রাণীগঞ্জের কাছে কয়লা পাওয়া যায় বলে জানা ছিল, কিন্তু সত্যি-কারের কয়লা তোলা শুরু হয়েছিল

১৮১৪ সালে। তখনকার দিনে দামোদর নদী দিয়ে নৌকা করে কয়লা কলকাতায় নিয়ে আসা হত। তখন কয়লার চাহিদা ছিল কম, পরে ১৮৫৫ সালে রেল-লাইন তৈরী হবার পর থেকেই দেশে কয়লার চাহিদা বাড়তে শুরু করে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে আবার হয়তো জলপথে কলকাতায় কয়লা আমদানী করা সম্ভব হবে।

প্রসারের দিক থেকে রাণীগঞ্জ কয়লা-ক্ষেত্র ছোট নয়, পশ্চিম বাঙলার ৫০০ বর্গ মাইলেরও বেশী জায়গা জুড়ে এই কয়লা-ক্ষেত্র প্রসারিত। মোট ছয়টি যুগের পাথরের স্তর এখানে পাওয়া যায়, তার ভিতরে মাত্র দুটিতে কয়লার চাল (seam) আছে। এই দুই যুগের স্তরের নীচেরটি ২১০০ ফুট পুরু এবং উপরেরটি ৩৪০০ ফুট পুরু; নীচেরটিতে ছয়টি উল্লেখযোগ্য কয়লার চাল আছে, উপরেরটিতে আছে নয়টি। এ ছাড়াও এই সব প্রধান প্রধান কয়লার চালের ফাঁকে ফাঁকে ছোট-বড়ো অন্যান্য কয়লার চাল আছে। রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের যে অংশটুকু পশ্চিম বাঙলার সীমানা ছাড়িয়ে বিহারের মানভূম জেলায় ঢুকে পড়েছে সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে এখানকার কয়লার মোটামুটি পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

কয়লার শ্রেণী	পরিমাণ (ভূপৃষ্ঠ থেকে হাজার ফুটের ভিতরে)
উৎকৃষ্ট কোকিং কয়লা	৮ কোটি টন
ঐ ননকোকিং কয়লা	৯০ ,, ,,
নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা	৪০০ ,, ,,
	মোট—৪৯৮ কোটি টন

এইবার কয়লার শ্রেণী-বিভাগটা একটু বুঝবার চেষ্টা করা যাক। কয়লা সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গেলে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তার পরিমাণ সব কয়লায় সমান নয়। সম-পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কয়লা আলাদা করে পোড়ালে প্রথম কয়লার ছাই থাকে কম ও দ্বিতীয় কয়লাটিতে ছাই থাকে বেশী।

বায়ুশূন্য আধারে কয়লা কিছুটা পোড়ালে কোন কোনও কয়লা বেশ জমাট বাঁধে ও বেশ শক্ত ঢেলা হয়, তাকে বলা হয় কোকিং কয়লা। এই কয়লা ছাড়া লোহার

পাথর গলিয়ে লোহা বার করা সম্ভব হয় না। এই রকম জমাট বাঁধা আধপোড়া কয়লাকে বলে কোক, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই এর ব্যবহার বেশি। "পোড়া কয়লা" নামে যে জিনিস আমরা উনুনের জন্য কিনি সেও এক ধরণের কোকং কয়লা এবং এই 'পোড়া কয়লার' নাম হচ্ছে সফট্ কোক। যে সব কয়লা থেকে কোন রকম কোক হয় না, তাকে বলে নন-কোকিং কয়লা।

উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে উৎকৃষ্ট কোকিং কয়লা পশ্চিম বাঙলায় খুব বেশি নেই, মাত্র ৮ কোটি টন। এটা অবশ্য ভূপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট নীচে পর্যন্ত যে কয়লা আছে, তার হিসাব। রাণীগঞ্জ কয়লা-ক্ষেত্রে অনেক কলিয়ারীই এখন হাজার ফুটের বেশি নীচের কয়লা কাটছে, হয়তো অদূরে ভবিষ্যতে দুই হাজার ফুট মাটির নীচের কয়লা তোলাও সম্ভব হবে। তখন মজুত কয়লার পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়বে।

খনি থেকে কয়লা তুলবার পরে কয়লার মালিককে যে "রয়ালটি" দিতে হয়, সেইটাই ভূগর্ভস্থ কয়লার মূল্য বলা যেতে পারে। কয়লার শ্রেণী হিসাবে এই রয়ালটির মাত্রা কম-বেশি হয়ে থাকে। গড়-পড়তা হিসাব খুব কম করে যদি এই রয়ালটির পরিমাণ টন পিছু আট আনা ধরা হয়, তবে পশ্চিম বাঙলায় শুধু রাণী-গঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের কয়লার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ২৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

এই বিপুল সম্পদের মালিক কিন্তু সরকার নন। শোনা যায় যে, গোড়ার দিকে এর সবটাই নাকি বর্ধমানের মহারাজার ছিল। এখন এই অঞ্চলে ছোট বড়ো বহু জমিদার আছেন, তাঁরাই এর মালিক। তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেরই খনি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ছোট বড়ো নানা রকমের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে খনির দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী ইজারা দিয়েছেন। যেখানে ইজারা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বেশ বড়ো এবং কয়লার মালিকও বেশ প্রতিষ্ঠাবান সেখানে খনি-শিল্পের যে রকম সুবিধা ও উন্নতি হয়েছে, অন্যত্র সে রকম হয়নি।

নানা কারণে একেবারে ছোট ছোট খনিতে খনিজের অপচয় হয় বেশি, যদি ইজারার মেয়াদ কম হয়, তবে লোকসানের মাত্রা বেশি হবার সম্ভাবনা। এই লোকসান যদি কেবলমাত্র খনির অথবা খনিজের মালিকের লোকসান বলে মনে করা হয়, তবে ভুল হবে। খনিজ সম্পদ হচ্ছে প্রকৃতির দান, এটা একবার বরবাদ হয়ে গেলে মানুষ এটা আবার সৃষ্টি করে নিতে পারবে না। সেইজন্য খনিজ সম্পদের অপচয় হলে তার মালিকের আর্থিক ক্ষতি তো হয়ই, উপরন্তু সেই খনিজ থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য যে সাহায্যটুকু পেতে পারতো, সেটুকু থেকে বঞ্চিত হয়, সেইটাই হল দেশের ক্ষতি।

সব সভ্য দেশেই খনিজের অপচয় নিবারণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করা হয়। অবিরাম গবেষণার ফলে খনিবিদ্যার উন্নতি হচ্ছে, নিকৃষ্ট খনিজের উন্নতিসাধনের জন্য ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে, খনিজের নতুন ব্যবহার উদ্ভাবন হচ্ছে—এইখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, সম্প্রতি দামোদর ভ্যালি করপোরেশন বোকারোতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে তাপ জোগাবে ঐ অঞ্চলেরই নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা।

অবাঞ্ছিত লোকের খনিজ-শিল্পে আসা বন্ধ করবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে কতকগুলি নিয়ম চালু করেছেন। ঐ তারিখ থেকে প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদনপত্র (Certificate of Approval) ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কেউই খনিজ সম্পত্তির ইজারা নিতে পারবেন না। ভূতত্ত্ব বা খনিবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে অনুমোদনপত্র মিলবে না। অবশ্য বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা কিম্বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভূতত্ত্ববিদ বা খনিবিদ নিয়োগ করলেই অনুমোদনপত্র পাবার অধিকারী হবেন। নতুন অনুমোদনপত্রের জন্য সরকারকে দক্ষিণা দিতে হবে একশ' টাকা। অনুমোদনের মেয়াদ থাকে এক বছর, সেই-জন্য প্রত্যেক বছরেই একবার করে ওটা ঝালিয়ে (Renewal) নেবার দরকার হবে, সে সময় দক্ষিণা লাগবে পঞ্চাশ টাকা।

খনি ইজারার মেয়াদ করা হয়েছে ২০ বছর, অবশ্য ঐ সময়ের শেষে ওটা আরও কুড়ি বছর বাড়িয়ে নেওয়া চলবে এবং তারও পরে আরও কুড়ি বছর নেওয়া যাবে। এ ছাড়া আরও নানা রকম নিয়ম আছে, বর্তমানে মোট নিয়মের সংখ্যা হচ্ছে ৬৫টি। পশ্চিম বাঙলায়ও এর সব নিয়মই প্রযোজ্য।

খনিজ সম্পদ সম্পর্কে উপরোক্ত নিয়ম ছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অন্য-বিধ আইনকানুন আছে, কিন্তু সে সব এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় যে, পশ্চিম বাঙলা সরকারের এ বিষয়ে কোনও প্রাদেশিক আইন নেই। কথায় কথায় মূল বিষয় থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবারে আবার কয়লার কথায় ফেরা যাক।

দার্জিলিং জেলায় কয়লার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল ১৮৫৩ সালেরও আগে।

. হিমালয়ের কোল ঘেঁষে পশ্চিমে পাংকা-বাড়ী থেকে শুরু করে পূবে ডালিংকোট পর্যন্ত (প্রায় ২৮ মাইল) কয়লাবাহী গণ্ডোয়ানা যুগের পাথরের স্তর বিস্তৃত। লম্বা অতখানি হলেও চওড়া কিন্তু খুব বেশি নয়, গড়ে মাত্র সিকি মাইলটাক হবে অর্থাৎ মোট সাত বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে এর বিস্তার।

এই জায়গার নানা অংশে ছোট বড়ো অনেকগুলি কয়লার চাল আছে। এদের বেশিরভাগই যথেষ্ট পুরু নয়। এখানে বলা দরকার যে, কয়লার স্তর যদি পাঁচ ফুটেরও কম পুরু হয়, তবে সে স্তরের কয়লা উদ্ধার অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কয়লার স্তরে সুড়ঙ্গ করে কয়লা কাটতে হয়, সেই সুড়ঙ্গের ভিতর একজন লোক যদি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে, তবে তার পক্ষে কাজ করা মুশকিল। তিন-ধারিয়ার কাছে যে ১১ ফুট পুরু কয়লার চাল আছে, সেটি কোকিং কয়লার, কিন্তু বিশেষজ্ঞের মতে তার থেকে ভাল কোক হওয়া সম্ভব নয়।

দার্জিলিং জেলার কয়লার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, কয়লা বড়ো নরম; হাতের একটু চাপ লাগলেই গুঁড়িয়ে যায়। অবশ্য অন্য জিনিসের সঙ্গে এই গুঁড়ো কয়লা মিশিয়ে কাদার মতন করে তাকে ছাঁচে ফেলে ইটের মতন করে শুকিয়ে নিলে তা দিয়ে তাপ জোগাবার কাজ বেশ ভালভাবেই চলে, কিন্তু তাতে খরচ আছে। ১৮৭৪ সালে ম্যালেট সাহেব এই খরচের আন্দাজ করেছিলেন টন পিছু এক টাকা, কিন্তু আজকালকার দিনে——?

এ ছাড়াও আছে খনিবিদ্যা সংক্রান্ত অসুবিধা। রাণীগঞ্জের কয়লার চালের মতন দার্জিলিংএর কয়লার চালগুলি দিকরেখার সঙ্গে সমান্তরাল বা ঈষৎ ঢালু নয়, এরা হচ্ছে ঢেউ-টিনের মতন বঙ্কিম। তার মানে কয়লার স্তর ধরে চললে হয়তো কিছুদূর সেটিকে উপরের দিকে উঠতে দেখা যাবে তারপরেই হঠাৎ ঘুড়ির মতন গোত্তা খেয়ে নীচের দিকে নামবে। স্তর আবার সব জায়গায় সমান পুরু নয়, খুব অল্প দূরত্বের ভিতরেই মোটা স্তর পাতলা হয়ে যেয়ে একেবারে মিলিয়েও যেতে পারে।

বর্তমান খনিবিদ্যা এই ধরণের কয়লার চালকে কতটা কায়দায় আনতে পারবে তা বলা যায় না। এতো অসুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনধারিয়ার কাছে কয়লার খনি চালু ছিল এবং ঐ চার পাঁচ বছরের ভিতরে কয়লা উঠেছিল মোট ৭২৩১ টন।

দার্জিলিং জেলার মোট সাত বর্গ মাইলব্যাপী কয়লাবাহী পাথরের এলাকায় লিস্ ও রামতী নদীর মধ্যবর্তী প্রায় দেড় বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লার অনুসন্ধান করেছিলেন স্বনামধন্য ভূতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় প্রথমনাথ বোস। তিনি ঐ জায়গায় মজুত কয়লার যে আনুমানিক হিসাব দিয়েছেন, তা এখানে দেওয়া হল।

কয়লার শ্রেণী	পরিমাণ (ভূপৃষ্ঠ থেকে হাজার ফুটের ভিতর)
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোকিং কয়লা (ছাইর অংশ শতকরা ২২ ভাগের কম)	২ কোটি টন
নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা	১ „ „
	মোট—৩ কোটি টন

এই তিন কোটি টন কয়লার মূল্য পূর্বেবর্ণিত হিসাবানুযায়ী হয় দেড় কোটি টাকা। তার মানে দেড় কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিহিত আছে মাত্র দেড় বর্গ মাইল জায়গায়। কবে এর ব্যবহার হবে কে জানে!

কয়লা ছাড়াও পশ্চিম বাঙলায় আরও নানারকমের খনিজ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। দার্জিলিং জেলাতেই লোহা, তামা ও চুণের পাথর সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়; এক সময়ে রাণীহাট, কালিম্পং, মং পু, রং বং, বক্সা প্রভৃতি জায়গায় ছোট ছোট তামার খনি ছিল। ডলোমাইট পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে; বক্সা ডুয়ারের লাপ-চাকো থেকে শুরু করে প্রায় রাইডক পর্যন্ত ডলোমাইটের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ডলোমাইট থেকে চুণ তৈরী করবার কারখানাও আছে।

রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে কয়লা ছাড়াও পাওয়া যায় ফায়ার ক্লে ও নানারকম বালি। বাঁকুড়া জেলায় ছেদাপাথরের কাছে পাওয়া গিয়েছে উলফ্রাম। চিনামাটি, ফেলস্পার, প্রভৃতি ছোট-খাটো খনিজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। এদের সকলের বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ ও সুবিধা হলে এদের কথা পরে বলা যাবে।

অশোকের অন্তিমকাল

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দেহত্যাগের স্বল্পকাল পূর্বে সম্রাট অশোক একদিন শ্রমণ-সংঘকে প্রশ্ন করিলেন—"তথাগতের ধর্মসংঘে সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দান করিয়াছেন কে?"

ভিক্ষুগণ একবাক্যে উত্তর দিলেন—"গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ।"

সম্রাট পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তাঁহার দানের পরিমাণ কত?"

শ্রমণগণ বলিলেন—"একশত কোটি।"

ইহা শ্রবণ করিয়া অশোক চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য! গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ কি না শত কোটি দান করিলেন! আমি সম্রাট হইয়াও তাঁহার সমান দান করিতে পারিলাম না।"

তিনি শ্রমণসংঘকে সবিনয়ে বলিলেন—"আমিও ধর্মসংঘে শত কোটি দান করিব।"

তদবধি সম্রাট তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য অজস্র অর্থ দান করিতে লাগিলেন। জনকল্যাণে, বিদ্যালয়ে, মঠ প্রতিষ্ঠায়, চৈত্য নির্মাণে, তীর্থক্ষেত্রে উদার হস্তে দান করিতে করিতে তাঁহার ষণ্-নবতি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইল। তথাপি শতকোটি মুদ্রা দানের প্রতিজ্ঞা তাঁহার রক্ষা হইল না। তিনি রোগশয্যায় শায়িত হইলেন। 'প্রতিজ্ঞা পূরণের পূর্বেই আমার মৃত্যু হইবে' এই কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

সম্রাটের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন অমাত্য রাধগুপ্ত। তিনি সম্রাটকে এইরূপ বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশ্ন করিলেন—

"দুর্ধর্ষ অরাতি সনে হতো যবে রণ
দুর্নিরীক্ষ্য ছিল যার ভাস্বর আনন,
প্রচণ্ড কিরণবর্ষী দিবাকর সম;
শত রূপসীর মুখ শতদলোপম
চুম্বিল সতত যেবা। হে ধরণীনাথ,
সে আনন আজি কেন করে অশ্রুপাত?"

সম্রাট ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—"রাধগুপ্ত, অর্থনাশ, রাজ্যনাশ বা প্রাণনাশের আশঙ্কায় আকুল হইয়া যে আমি অশ্রুবর্ষণ করিতেছি, তাহা নহে। আমার দুঃখ এই যে, ভগবান তথাগতের সেবক এই শুদ্ধাত্মা শ্রমণগণের পরম কাম্য সঙ্গ হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইব।"

সেবিব না সম্মুখেতে শ্রমণ সজ্জনে
তুষিব না নিজহস্তে বরান্ন-ভোজনে

এই চিন্তা নিরন্তর জাগিছে অন্তরে
হৃদয় বিদারি তাই অশ্রুবারি ঝরে।

"তদ্ভিন্ন, হে রাধগুপ্ত, 'ধর্মসংঘে শতকোটি দান করিব'—আমার এ প্রতিজ্ঞাও মনে হয় পূর্ণ হইবে না।"

'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে'—অন্তরে এই ভীতি জাগ্রত হওয়ায় সম্রাট অশোক উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবশিষ্ট চারি কোটি মুদ্রা পূরণ করিবার জন্য স্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান দ্রব্য কুক্কুটারাম বিহারে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কুণালের পুত্র সম্পদী তখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিলেন—"সম্রাট অশোকের জীবনের আর অধিক দিন অবশিষ্ট নাই। এদিকে তিনি এইভাবে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই রাজ্য ধ্বংশ হইবে। কেননা, যে-কোষ রাজ্যের বলস্বরূপ, সেই কোষই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।"

অমাত্যবর্গের পরামর্শে যুবরাজ সম্পদী কোষাধ্যক্ষকে নিষেধ করিলেন। সম্রাট অশোকের দানে বাধা পড়িল। তখন তিনি তাঁহার স্বর্ণময় ভোজনপাত্রসমূহ কুক্কুটারামে প্রেরণ করিলেন। যুবরাজের আদেশে অতঃপর রৌপ্যপাত্রে সম্রাটের আহার্য আসিল। সম্রাট সেই রৌপ্যপাত্রও কুক্কুটারামে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর রৌপ্যপাত্রও নিষিদ্ধ হইল। কোনরূপ মূল্যবান পাত্রেই আর তাঁহার আহার্য আসে না। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর অশোকের জন্য মৃত্তিকা নির্মিত পাত্রে আহার্য আসিতে লাগিল।

নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু ছিল সমস্তই তিনি অকাতরে দান করিয়াছেন। কিছুই আর তাঁহার কাছে নাই। জীবনধারণের জন্য যাহা নিতান্তই অত্যাবশ্যক, তাহা ভিন্ন সমস্তই তাঁহার জন্য নিষিদ্ধ। তাঁহার বরাদ্দ সামান্য আহার্য তাঁহাকে আহার করিতে হয়। আহার না করিয়া দান করিতে দেওয়া হয় না।

এইরূপ নজরবন্দী অবস্থায় যখন তাঁহার দিন কাটিতেছে, তখন একদিন তিনি দেখিলেন তাঁহার নিকট একটি আমলকীর ভগ্নাংশ রহিয়া গিয়াছে। অতএব তাহাই তিনি কুক্কুটারামে পাঠাইতে মনস্থ করিয়া অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন।

অমাত্যগণ সম্রাট সকাশে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাঁহাদের প্রশ্ন করিলেন—"অধুনা এই ধরিত্রীর অধীশ্বর কে?"

অমাত্য রাধগুপ্ত কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর দিলেন—"মহারাজ স্বয়ং এই ধরিত্রীর অধীশ্বর।"

অশোক অশ্রু সংযত করিয়া বলিলেন—

"অনুকম্পাবশে কর কেন বন্ধু অমৃতভাষণ
কোথা সে প্রভুত্ব মোর?
ভ্রষ্টরাজ্য, ভ্রষ্ট সিংহাসন!
অনার্য্য ঐশ্বর্যে ধিক্‌——
ভরানদী খরস্রোত সম!
পৃথিবীর অধীশ্বর দারিদ্র্যের
ভীতি আজি মম!
নিঃস্ব আজি রিক্ত আমি!
হে অমাত্য বেশি কহিব কি
কাছে মোর আছে মাত্র নিজস্ব
এ অর্ধ আমলকী!

"হে অমাত্য, 'সম্পত্তি বিপত্তির মূল'—তথাগতের এই বাক্য আজ হৃদয়ঙ্গম হইল। ভগবদ্‌বাক্য মিথ্যা হয় না। মহাদ্রিশিলায় প্রতিহত মহানদীর স্রোতের ন্যায় সম্রাট অশোকের আজ্ঞাও আজ প্রতিহত হইতেছে।

"উচ্ছৃংখল জনতারে করি সুশাসিত
গর্বিত অরাতিবৃন্দে করিয়া দমন,
অনাথ আতুর জনে করি আশ্বাসিত,
একছত্রা ধরিত্রীর সম্রাট যে-জন
আছিল অনতিপূর্বে;—এবে অভাজন!
ভগ্নশাখা ছিন্নপত্র পাদপ অশোক
তেমনি অশোক আজি জাগায়িছে শোক।

অতঃপর সম্রাট সমীপবর্তী এক পুরুষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"ভদ্র, আজ আমি ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হইলেও পূর্ব উপকার স্মরণপূর্বক তুমি আমার একটি আদেশ পালন কর। এই আমলকী খণ্ড গ্রহণ কর। কুক্কুটারামে গিয়া সংঘস্থবিরকে ইহা দিয়া বলিও—"জম্বুদ্বীপের অধিপতি সম্রাট অশোকের ইহাই এখন একমাত্র বিভব। ইহাই তাঁহার শেষ

দান। এই দানে যাহাতে সমস্ত সঙ্ঘের সেবা হয় তাহাই করুন।

"এই মোর জীবনের সর্বশেষ দান
ঐশ্বর্য সম্পদ রাজ্য সকলই নশ্বর।
[illegible]
সংঘের শরণ নেয় ভারত ঈশ্বর।"

'যথাজ্ঞা' বলিয়া অশোকের আজ্ঞা পালন করিয়া সেই পুরুষ কুক্কুটারামে গমন করিল। সেখানে সঙ্ঘস্থবিরকে সেই আমলকী খণ্ড দান করিয়া বলিল—

"একছত্রা ধরিত্রীর অধীশ্বর যিনি
মধ্যদিনে প্রভাস্বর যেমতি ভাস্কর
তাঁপলা এ চরাচর, অরিকুল জিনি।
ভাগ্যদোষে হৃতরাজ্য আজি রাজ্যেশ্বর;
যেমতি নিষ্প্রভ রবি আসিলে যামিনী।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রণিপাত করিয়া তিনি এই চপলা কমলার চাপল্যচিহ্নিত আমলকীখণ্ড দান করিয়াছেন।"

অতঃপর সঙ্ঘস্থবির শ্রমণগণকে বলিলেন—"আজ আপনাদের বৈরাগ্য উৎপাদনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেননা ভগবান বলিয়াছেন—'পরের বিপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া উহা ভাবনা করিতে করিতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়।' আজিকার এই ঘটনায় কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির না বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিবে।

"সসাগরা ধরিত্রীর প্রিয় অধিপতি
বন্দী আজি ভৃত্যহস্তে—হৃত অধিকার!
নিঃসহায় রাজেশ্বর নিঃস্ব হায় অতি!
তুচ্ছ এক আমলক বিভব তাঁহার!
তাই তিনি শ্রদ্ধাভরে করিলেন দান
ধনগর্বে গর্বিতের চূর্ণ করি মান।"

অতঃপর সঙ্ঘস্থবির সেই আমলকী-খণ্ড চূর্ণ করিয়া যূষে মিশ্রিত করিলেন। সেই যূষ সমস্ত শ্রমণের মধ্যে বণ্টন করা হইল।

এই ঘটনার পর সম্রাট অশোক অমাত্য রাধগুপ্তকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"রাধগুপ্ত, বল দেখি কে এই ধরিত্রীর অধীশ্বর?"

রাধগুপ্ত কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর দিলেন—"দেব, আপনি স্বয়ং এই ধরিত্রীর অধীশ্বর।"

তখন সম্রাট শয্যা হইতে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ গাত্রোত্থানপূর্বক চতুর্দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন। অতঃপর সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—

"সসাগরা নীলাম্বরা রত্নবিভূষিতা
বিচিত্রা এ ধরা আমি করি সম্প্রদান।
লহ ইহা ধর্মসংঘ দীনের সেবক
রক্ষা পাক অনাথের আতুরের প্রাণ।
"পুণ্যলোভে আজি আমি করি না এ দান
চাহি না স্বরগে কিংবা ব্রহ্মলোকে গতি।
ধরণীর রাজৈশ্বর্য চাহি নাকো পুনঃ
বরষার নদীসম চপল সে অতি।

"এ দানের ফল হোক ভক্তিবিমণ্ডিত
এ দানের ফলে হোক চিত্ত-সুবিজিত
চিত্তের ঐশ্বর্য যাচি সর্বস্ব ছাড়িয়া
কেহ তাহা হরিবে না—লবে না কাড়িয়া।"

বন্ধু রাধগুপ্তের সহায়তায় দানপত্র সম্পাদন করিয়া সম্রাট তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা অঙ্কিত করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

অতঃপর অমাত্যগণ যখন কুমার সম্পদীকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিতে যাইতেছেন, তখন অমাত্য রাধগুপ্ত বলিলেন—"সম্রাট অশোক সমস্ত সাম্রাজ্য ধর্মসংঘে দান করিয়াছেন।" বিস্মিত অমাত্যগণ প্রশ্ন করিলেন—"কেন" রাধগুপ্ত বলিলেন—"সম্রাট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ধর্মসংঘে শতকোটি দান করিবেন। ষণ্-নবতি কোটি দানের পর কোষাগার বন্ধ করা হয়। অবশিষ্ট চার কোটির জন্য তিনি এই মহাপৃথিবী দান করিয়াছেন।"

তৎক্ষণাৎ চারি কোটি মুদ্রা দিয়া সাম্রাজ্য ক্রয় করা হইল, অশোকের পৌত্র যুবরাজ সম্পদী জম্বুদ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। *

* অশোকাবদাম হইতে অনূদিত।

রাজোয়ারা

শ্রীদেবেশ চন্দ্র দাশ

(৬)

সেই শিকার পার্টিটার কথা ভুলব না কখনো।

সে সময় রাজস্থানের যে অঞ্চলে ছিলাম, সেখানে ব্যাঘ্র মহারাজের দয়া হতে আরম্ভ করেছে। বাঙলা দেশের গ্রামে ওলাবিবির দয়ার মত। তার হাত থেকে কারো রক্ষার আশা নেই। মাত্র একটি বাঘ, কিন্তু চারশ'জন মানুষের যে কেহ যখন খুশি তার কবলে পড়ে শেষ হয়ে যেতে পারে। ত্রিশটি মহিষের কঙ্কাল ও বাঁকানো শিঙ্ জঙ্গলের আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ে থেকে তাদের সে কথা রোজ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আমরা চলেছি ছোট্ট একটি নড়বড়ে মোটরে। কোন পথ নেই সেখানে, শুধু আছে পায়ে-হাঁটা পথের একটা রেখা। কখনো মোটর আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়, কখনো বা আমরাই তাকে ঠেলে তুলি। এ পথে চাষা-ভূষোর মহিষের গাড়ী কখনো কখনো কষ্টেসৃষ্টে চলে থাকে, কিন্তু ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় যারা মোটর বানায় তারা এ পথে তাদের হাতের সৃষ্টি এভাবে ব্যবহার করা হবে জানলে বোধ হয় মোটর বানান ছেড়ে দিত।

অথবা আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠবে তাড়াতাড়ি মোটর বদলানর জন্য চাহিদা বেড়ে যাবে সেই আশায়? —আমায় উত্তর দিলেন আমার সুরসিক নিমন্ত্রণ-কর্তা।

জঙ্গল পিটিয়েদের দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে শিকার করার মধ্যে তেমন বাহাদুরী নেই —এই হচ্ছে তার মত। তার চেয়ে অনেক বেশি আমোদ ও বাহাদুরী আছে মাচান-সাধনায়। সুগোপনে গা-ঢাকা দিয়ে বাঘের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। খাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে দেবতার মত তাকে আবাহন করতে হবে। যদি তিনি সে দান গ্রহণ করতে হাজির হন, তবেই তার সঙ্গে মোলাকাৎ হবে।

আর পুজোর ঘট কোথায় বসাতে হবে? যেখানে তিনি আগে দয়া করে আবির্ভাব করেছিলেন তারই কাছাকাছি। সম্ভব হলে যাকে দয়া করেছিলেন তারই ছিটে-ফোটা যা অবশিষ্ট আছে, তাতেই ঘট বানাতে হবে।

গত তিন মাস ধরে শের-সিংহ (রাজপুতের দেশে বাঘকেও সিংহ বলে ডাকতে সাধ হয়) রোজ অথবা দুই-একদিন বাদে বাদে এক একটি করে মহিষ সৎকার করছেন আর গত দু'দিন, থুড়ি দু'রাত্রি ধরে আমরা তার সৎকারের আশায় বন-বাসী হয়ে আছি।

তরুতলে বাস নয়। তরুশিরে।

অপটু অনভ্যস্ত ও অসহিষ্ণুভাবে একটি গাছের আবডালে মাচান আঁকড়িয়ে আছি আমি ও বৃক্ষসঙ্গী রাও কিষণ-লালজী। আমার আবাল্য জ্যাঠামী ও গণ্ডামী থেকে সযত্নে বাঁচান হাঁচি টিক্-টিকি বাঁ চোখ নাচার লক্ষণের গণ্ডিরেখা ও বিধিনিষেধ ভাঙ্গতে সর্বদা উৎসুক অথচ প্রায়ই অক্ষম, তেলেজলে সযত্নে লালিত ডাল-ভাত চর্চ্চড়ির জীবনে এমন একটা য়্যাডভেঞ্চারের যে সুযোগ আসবে তা কে ভেবেছিল। একটা দু'নলা আধুনিক বন্দুক অবশ্য মাঝে মাঝে হাতে শোভা পায়, কিন্তু তার সার্থক ব্যবহার যে কোন দিন হবে, তা ধর্মতলা স্ট্রীটের সেই নিরীহ বন্দুক ব্যবসায়ী বা তার ক্রেতা কেহই বোধ হয় ভাবে নি। এমন কি বন্দুকটি যে বহু রাইফেলের সহযাত্রী হয়ে এই শিকারের অন্যান্য অভিযাত্রীদের মত পর পর তিন রাত্রি ব্যাঘ্র মহারাজের অন্বেষণে এসে ফিরে যাবার কৌতুক অনুভব করবে, তাই বা কে ভেবেছিল? আমাদের পার্টি এর মধ্যে তিন রাত্রি এসে ফিরে গেছে; কারণ মহারাজ দর্শন দেন নি। এবং আজই শেষ চেষ্টা হবে, কারণ আমার নিমন্ত্রণকারী তা না হলে ভীষণ একটা কিছু করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেটা যে কি, সে সম্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ হয়ে গেছে সহযাত্রীদের মধ্যে।

মনে পড়ে গেল ঃ—

জল স্পর্শ করব না আর
চিতোর রাণার পণ,
মাটির 'পরে বুঁদির কেল্লা
থাকবে যতক্ষণ।

কিন্তু মাটির 'পরে বাঘের বাচ্চা চরবে যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের আর মাটি স্পর্শ করা চলবে না। একেবারে ছেলেবেলাকার পাড়ার গলিতে গুলি খেলার নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু হয়ে গাছ আঁকড়িয়ে মাচানে লেপ্টে থাকতে হবে।

নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের কথা কাব্যে সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় পড়েছি। রাত্রির অন্ধকারে কিন্তু আমরা শুধু ওই রকম নয়, একেবারে সম্পূর্ণভাবে নিবানো প্রদীপের মত বসে আছি। গাছের সবচেয়ে উঁচু গোটা কয়েক ডালে লতাপাতা বাঁশের চাঁচি দিয়ে বানান কৌটর—তাকে ভেলা বললেও চলে—সেখানে বসে আছি নিঃশব্দে। নিঃশ্বাসও যেন না পড়ে এরকম ভাবে। বসে বসে সেই প্রতীক্ষা করার সঙ্গে অন্যান্য যে সব প্রতীক্ষার কথা বইয়ে পড়েছি, তাদের সঙ্গে তুলনা করতে লাগলাম।

সামনে বাঁধা রয়েছে বেচারী মহিষ। —বুঝতে কি পারছে না কেন তাকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে? জানে না কি সে কি হতে পারে তার অসহায় পরিণাম? কাদের খেলার জন্য বা কাদের বাঁচাবার জন্য তার এই অনিচ্ছুক আত্মবলিদান? তাদের কাছে সে কি নীরব মিনতিভরা চোখে ব্যাকুলভাবে প্রাণভিক্ষা করছিল আজ সন্ধ্যাবেলা যখন তার মাথার উপরে বসা কাকগুলি শেষবার বাঘের জন্য রাখা জলের গামলা থেকে জল পান করে কা কা করে আকাশকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল?

নাঃ। শবরীর প্রতীক্ষার মধ্যে এত অসহায়তা ছিল না, কারণ মনের মধ্যে তো বিরাজ করছিলেন একজন যিনি কবে বাইরের জগতে দর্শন দিবেন মাত্র সেটুকুই ছিল প্রতীক্ষার বিষয়। উমার তপস্যার মধ্যেও না। চোখের সামনেই শোভা পাচ্ছিলেন দেবাদিদেব। তিনি চোখ খুলুন আর না-ই খুলুন উমা তো নয়নভরে তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন আর আশা ছিল যে, কখনো না কখনো ধ্যানভঙ্গ হবেই।

আর এই বেচারী মহিষ। রাত্রির পর রাত্রি বাঁধা থাকছে মৃত্যুর দুয়ারে উৎসগীকৃত হয়ে। প্রতীক্ষা করছে যে পথে তার আগে আরো ত্রিশটি মহিষ গিয়েছে সে পথে পা বাড়াবার জন্য। আত্মরক্ষা বা পলায়নের চেষ্টা মাত্র করবার পথ নেই। তার নিজের ইচ্ছা কি তাও জিজ্ঞাসা করবে না কোন মানুষ, এমন কি মহিষ।

দূরের শেষ কাকটা কা কা স্বরে অন্ধকারের আগমনী ঘোষণা করে পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। মিশিয়ে রইল অন্ধকারে অন্ধকারবর্ণ ও ততোধিক অন্ধকার মন নিয়ে ওই বেচারী মহিষ। শুধু তার চোখের কোণার সাদা প্রান্তগুলি যেন সে অন্ধকার ভেদ করে ব্যাকুলভাবে মাচানগুলির দিকে চেয়ে নীরবে প্রাণভিক্ষা করছে।

নাঃ। আমার দ্বারা শিকার হবে না কখনো।

মাচানে প্রথম কয়েক ঘণ্টা মন্দ কাটে না। কি করে পতিত পত্রে বিচলিত পত্রে আওয়াজ না জাগিয়ে পা দু'খানা ছড়িয়ে বা গুটিয়ে নেওয়া যায়, কি করে নিঃশব্দে থার্মো ফ্লাস্ক খুলে চুক্ চুক্ শব্দ না করেই কফিতে গলা ভেজান ও মন চাঙ্গা যায়, সে সব কৌশল সহজেই আয়ত্ত করে নিলাম। শিয়ালের ঐক্যতান বাদনের প্রতি কানটা প্রাণপণে সজাগ রাখলে
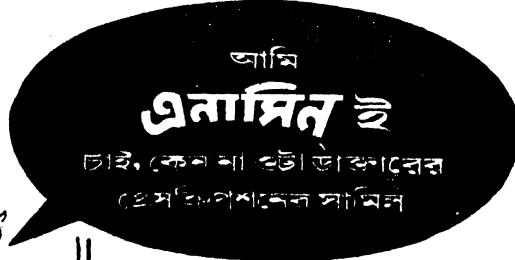
সুকুন্দনী পরিলেহন কথা আর মনেই এল না

যে কাসি আসার সম্ভাবনা কম হয়, সেটাও বুঝতে পারলাম। তারা গুণতে গুণতে কত রাত্রি পর্যন্ত কাটান যায়, কড়িকাঠ গোণা তার চেয়ে সহজ না শক্ত, সে সব সমস্যাতেও খানিকটা সময় কাটল। কিন্তু চোখ একেবারে জড়িয়ে আসছে ঘুমে, সেলাই করে দিচ্ছে যেন কে।

ছেলেবেলায় কলকাতার উপকণ্ঠে একবার এক সারারাত্রিব্যাপী যাত্রা দেখেছিলাম। কংসবধ কি কালীয়দমন ওই জাতীয় একটা কিছু। তখন কি কৌশলে ঘুমকে ফাঁকি দিয়েছিলাম, তা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেটা তো ছিল একটা শিয়াল-তাড়ানে যাত্রা। আর এটা হচ্ছে বাঘমারা যাত্রা—অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। তবুও পারছি না কেন?

মনে মনে সব বন্ধুকেই চিঠি লিখে ফেললাম—শুকন্তু বিশ্বে আমার সব মিত্রাঃ। চিঠির শিরোনামা ও সম্বোধন তো ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু লিখব কি? এমন একটা কিছু লিখতে হবে, যা শরৎবাবুর শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযানের মত হৃদয়গ্রাহী হয়।

এমন সময়—এমন সময়—কি যেন একটু নড়ছে না? হ্যাঁ. নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে সমাধি পেয়ে গেল।

হ্যাচ্চোঃ। হ্যাচ্চোঃ। রাও কিষণলালজী আত্মসংবরণ করতে পারলেন না এবং তার নাসিকা ও বদনবিবরের এই যুগপৎ ধ্বনিটি মাচান থেকে মাচানান্তরে বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা শিয়াল হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। মহিষ শুধু অবিচলিত।

পাশের গাছের উপর লতা-পাতা-শাখায় ঢাকা আর একটা মাচান থেকে খুব চাপা অথচ ক্ষীণ স্বরে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তা হাঁক দিলেন--উল্লুকো সামাল্ হো।

পলায়মান হরিণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় বাঘও এমন নির্মম হুঙ্কার দেয় না। মনে পড়ল আবার সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা

মাটির 'পরে বাঘের বাচ্চা
চরবে যতক্ষণ।

জানি না কাল ভোরে রাওজীর কপালে কি আছে।

এদিকে আমার রক্ত ভীষণ দ্রুততর চলাচল আরম্ভ করেছে; মনের মধ্যে একটা উল্লাসও বাঁধন ছিঁড়ে দাপাদাপি শুরু করেছে।

নীচের গামলাতে একটা জন্তু জল খাচ্ছে আর মহিষ বেচারী প্রাণভয়ে মাটিতে পা আঁচড়াচ্ছে আর সজোরে হাঁস-ফাঁস করছে। অতি নিঃশব্দে রাইফেলটি হাতে নিয়ে গাছের পাতার পর্দা একটুখানি সরিয়ে দিলাম।

মহিষ ততক্ষণ আর হাঁস-ফাঁস করছে না; দড়িতেও আর টানাটানি করছে না। ভয়ে বোধ হয় পাথর হয়ে গেছে। এদিকে সশব্দে জল খেয়ে উদ্দাম উল্লাসে ব্যাঘ্র মহারাজ নাকের ভিতর থেকে ঘরর্ ঘরর্ করে জল বের করতে লাগল। পরশুরামের গল্পের সেই বিশেষ প্রিয় কথাটা—সুকুন্দনী পরিলেহন, সে কথাটা উত্তেজনায় মনেই এল না।

হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে বিশাল শক্তিশালী টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ল বাঘের উপর। আমার বৃক্ষসঙ্গী বহু শিকারে অভ্যাস করা হাতে রাইফেল চালালেন। বিপুল গর্জনে মহারাজ চকিতে অন্তর্হিত হবার জন্য লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের গাছের মাচান থেকে আর একটি বিদ্যুৎরেখা বের হয়ে এল। বিপুলতর গর্জনের শুধু আরম্ভটুকু শোনা গেল। একটুখানি বুক ফেটে বেরোন ঘর্‌র ঘর্‌র শব্দ। তার পরই সব নিস্তব্ধ।

সেই শেষ রাত্রেই একটু গড়িয়ে নিবার চেষ্টা করলাম। পর্ণশয্যায় সে নিদ্রার মধ্যে দেবী অপর্ণা প্রসন্ন বরাভয় দেখিয়ে গেলেন। পাঁচশ বছরের যবনিকা উঠে সরে সরে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমি এখনো অদেখা আর একটি রাজপুত রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

তখন ফাল্গুন মাস। রাজপুতের বসন্ত উৎসব শুধু ফুলহার বা রঙ ঝারিতে সমাপ্ত হয় না। সেকথার উল্লেখ করে উদয়পুরের মহারাণা হেসে বললেন চল আজ তোমায় নতুন বসন্ত উৎসবে দীক্ষা দিব। দেশে গিয়ে তোমাদের কবি জয়দেবকে বলো শুধু "রণছোড়" (যুদ্ধবিমুখ) কানহাইয়ার গীত না লিখে এবার গীতগোরী লিখতে। তুমি না পরীক্ষার জন্য ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলে; ওঠ এই পাহাড়ীয়া ঘোড়ায়, আহেরীয় উৎসবে যাবে বলে।

সংকীর্ণ গিরিপথে (অমর হলদীঘাট)

পণ্ডিত দৈবজ্ঞ শুভক্ষণ গণনা করে দিয়েছিলেন। মহারাণা সব সামন্ত ও সঙ্গীদের সবুজ রংঙের পোষাক উপহার দিয়েছেন। সে পোষাক পরে কপালে হরিদ্রাবর্ণের চন্দনপঙ্কের মাঝখানে রক্তচন্দন তিলক নিয়ে বসন্ত পুষ্পাভরণা প্রকৃতির রাজ্যে আমরা সবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলেছি • মুহুরৎ কা শিকারে। গৌরী দেবীর পদতলে উৎসর্গ করা হবে বন্যশূকরকে। আজকের শিকারের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে সম্বৎসরের ভাগ্যের ইঙ্গিত। কোন রাজপুত যোদ্ধাই আজ তাই চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াবে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কারো বর্শা যদি হঠাৎ শূকরের বদলে শিকারীর গায়ে এসে বিঁধে, তার জন্য কেহ মহারাণার দরবারে এসে অভিযোগ করবে না। কেহ করবে না ভুল করেও কোন অনুতাপ। গুপ্তঘাতক যদি এ কাজ করে থাকে, তার হত্যার কথা গোপনই থেকে যাবে।

রাজপুত এক একটা বংশের সঙ্গে অন্য বংশের বংশানুক্রমিক শত্রুতা থাকে অনেক সময়। সে শত্রুতা চিরকাল শুধু নিজেদের নয়, রাজ্যকেও দুর্বল করে রেখেছে। কিন্তু আহেরিয়ার শিকারে যদি কোন শর ভুলে শত্রু বংশের কারো গায়ে এসে বিঁধে, তার মধ্যে প্রতিহিংসার গন্ধ কেহ খুঁজবে না।

আর অশ্ব যদি পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে না গিয়ে পর্বতের চূড়া দিয়ে ছুটতে গিয়ে কোন গহ্বরে শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে পড়ে, সে মৃত্যুর জন্য উপহাসও কেহ করবে না।

ওই ত ঘোড়া উড়িয়ে পার্বত্য নদী পার হয়ে সংকীর্ণ গিরিপথে ছুটে চলেছে সালুম্বরের চন্দাবৎ রাওৎ, বেদলার চৌহান রাও, বেদনোরের রাঠোর ঠাকুর, সদরির ঝালারাজ। ওরাই ত মেবারের মহারাণাদের সংগ্রামের সাথী, সন্ন্যাসের সঙ্গী। স্বাধীন জীবনের দীন, দুঃখ ও সুদীন সুখের ভাগী সামন্ত সর্দারদের অভিজাত দল। বীর্যে ঝলমল, উল্লাসে উতরোল। যাদের

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

আর তাদের সঙ্গে সমান বেগে সমান বেহিসাবী বেপরোয়া বীরত্ব দেখিয়ে আর কে চলেছে ঘোড়া ছুটিয়ে? আর কার অশ্বখুরের আঘাতে প্রস্তর বন্ধুর পথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জেগে উঠছে? আর কার কপালে শোভা পাচ্ছে যুদ্ধ করতে, মৃত্যু বরতে উৎসুক মানবতার জয়পতাকা হরিদ্রারক্ত চন্দন রেখা?

শত্রুর কাছে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করে সে কি ঘুমায় আরাবলীর গিরি-গুহায়? না, গঙ্গা-মেঘনার উদাস বালু-তীরে?

চোখে তার সোনার স্বপ্ন, মুখে প্রসন্ন প্রশান্তি।

পাশের পর্ণশয্যা থেকে সবেগে ধাক্কা দিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে ঘুম ভাঙ্গালেন রাও কিষণলালজী।

উঠুন, উঠুন। আর কতক্ষণ ঘুমাবেন? সবাই তাঁবুতে জমায়েৎ হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

রাও সাহেব কিন্তু ছাড়লেন না। বলুন ত খুলে, মুখে এত হাসির ফোয়ারা ছুটছিল কেন ঘুমের মধ্যে? বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন বুঝি স্বপ্নে?

বললাম তাকে স্বপ্নের কাহিনীটা। বাড়ি ফেরা নয়। ঘরছাড়া বিপদ্‌রাঙা পথে মৃত্যুর সঙ্গে হয় যে অভিসার

স্বদেশের জন্য, শত্রুজয়ের জন্য—যে অভিনয় আরাবলীর চূড়ায় চূড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রকাশিত হবার স্বপ্ন আমরা গঙ্গা-মেঘনার তীরে তীরে বসে দেখেছি এতদিন। যার দীপ্ত আহ্বানে বাঙালীর হাতের কলম কামানের মত অগ্নি-উদ্গীরণ করতে চায় তার দিব্যকথা।

আপনাদের বাঙালীদের তুলনা নেই তামাম ইন্ডিয়াতে—সশ্রদ্ধ হাসি মুখে ফুটিয়ে বললেন রাওসাহেব। তবে শুনুন আমার দুর্ভাগ্যের কথা। আপনি যখন আহেরিয়ায় অশ্বারোহণের মজা মারছিলেন, তখন আমার কি অবস্থা। মাচানের সেই হাঁচির কথা মনে আছে ত? ঠিক তেমনই একটা হাঁচি আমার এসেছিল ত্রিশ বছর আগে। তখন সবে এক দরবারের চাকরীতে ঢুকেছি। হিজ হাইনেসের যা প্রতাপ আর যা মেজাজ, তাতে রেসিডেন্ট বাদে আর সবারই মাথা হাতে কাটতে পারেন। প্রথম যেদিন তার সঙ্গে বাঘ শিকারে গেলাম, হঠাৎ মাচানের উপর থেকে বাঘ দেখে প্রকাণ্ড এক হ্যাচ্চো। প্রাণপণে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলাম পাগড়ির ঝুলটি।

কিন্তু পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল প্রাণটা। কারণ আওয়াজখানা কামানের আওয়াজের মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। হিজ হাইনেস তার চেয়েও বেশী হুঙ্কার দিয়ে দিলেন একটা কড়া হুকুম। ঠিক মৃত্যু পরোয়ানার মত।

ফেঁক দে উসকো পেড়সে।

সত্যিই কিন্তু তখন সবাই আমাকে গাছ থেকে নীচে ফেলে দিতে মনে মনে তৈরী ছিল। স্টেটের বাইরের লোক আমি। নতুন এসেছি সরকারে বড় চাকরী নিয়ে। আমাকে চেনেও না বিশেষ কেহ। যদি যাই বাঘের পেটে মুল্‌কী অর্থাৎ দেশের মধ্যেকার কোন লোক আমার চাকরীটা দখল করে মনে মনে বাঘকে আশীর্বাদ করবে।

আর মেজাজের মাথায় হিজ হাইনেস যা বলেছেন, তা সত্য বলে মেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তামিল করে ফেললে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

পরদিন তার মেজাজ ঠান্ডা হলে তিনি নিজেও কাউকে দোষ দিতে পারবেন না। মাচান থেকে পড়ে বাঘের পেটে গিয়েছি বলে বৌকে একটা মাসোহারা নিশ্চয়ই দিতেন। কিন্তু তাতে আমার কি?

শুনতে মজা লাগছিল খুব। কিন্তু দেখলাম যে, আতঙ্ক এখনো রাও সাহেবের মুখে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় ঠিক ওই ত্রিশ বছর আগেকার মতই। বুঝলাম যে. যদিও হয়নি কোন ক্ষতি, ক্ষত হয়েছে বড় গভীর।

এখন আপনার হাসি পেতে পারে. কিন্তু পরের দিন মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যাবার পর হিজ হাইনেস খবর নিয়েছিলেন যে, তার হুকুম সত্যি সত্যি তামিল করা হয়ে গিয়েছে কি না। কসম খেয়ে এই আমি বলছি যে. সেই হুকুমের স্বপ্ন এখনো আমি মাঝে মাঝে দেখি। আর তখন নির্ঘাত জীবন্তে মরে যাই। ইয়া গালপাট্টা দাড়ি-গোঁফের ভিতর থেকে আগুনভরা সেই হুকুম যমদূতের মত আমায় চারদিকে তেড়ে বেড়ায়।

ইতিমধ্যে সবাই আমার নিমন্ত্রণকর্তার গতরাত্রির সাফল্যকে অভিনন্দন করতে শুরু করেছে কাঁচের গ্লাসের মধ্যে বরফের ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ করে কপাল পর্যন্ত গ্লাস তুলে সম্মান দেখিয়ে।

সে গ্লাসকে এই মহামান্য পরিবেশে স্ফটিকাধার না বললে উপযুক্ত সম্মান করা হবে না। রাজপুতের কাছে সে পানপাত্র হচ্ছে মনোয়ার পিয়ালা অর্থাৎ আমন্ত্রণ-পাত্র।

তিনিও জলস্পর্শ করেছেন তাঁর শপথ রক্ষার উৎসবে।

সে জল হচ্ছে সাগরপারের সোনালী আমদানী। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

মানুষের চেহারা দেখে বয়স নির্ণয় করা খুবই শক্ত। অনেক সময় চল্লিশ বছরের কোনও ব্যক্তিকে ষাট বছর বয়স্ক বলে ভুল হয় আবার কোনও সময় ষাট বছরের লোককে চল্লিশ বছরের বলে মনে হয়। সাধারণত স্বাস্থ্য ও শক্তি দেখেই আমরা বয়স আন্দাজ করি আর সেইজন্যই ঠকতে হয়। বয়স নির্ণয় করার কোনও একটা পদ্ধতি কিছু নেই বল্লেই হয়। ডাঃ হার্ডিন জোনস বলেন যে, শরীরের পেশীসমূহের মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তার গতি লক্ষ্য করলেই বয়স ধরা পড়ে। দেহের রক্ত টিস্যুসমূহে প্রবাহিত হয়ে ঐগুলিকে পরিপুষ্ট করে সেই কারণে যে পরিমাণ রক্ত টিস্যুসমূহে পৌছায়, টিস্যুসমূহের সবলতা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। টিস্যুগুলির দুর্বলতা বয়স বৃদ্ধির লক্ষণ, সেই কারণে দেহের রক্ত প্রবাহের গতি লক্ষ্য করে বয়স আন্দাজ করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেশীসমূহে রক্ত চলাচল কম হতে থাকে। সাধারণত ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত যে অনুপাতে রক্ত চলাচল করে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে তার চেয়ে শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ কমে যায়। এইভাবে ক্রমশই কমতে থাকে। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে এক লিটার টিস্যুর মধ্যে প্রতি মিনিটে ২৫ কিউবিক সেণ্টিমিটার রক্ত প্রবাহিত হতে পারে। ২৫ বছর বয়সে এই মাপ ১৫ কিউবিক সেণ্টিমিটার ও ৩৫ বছর বয়সে ১০ কিউবিক সেণ্টিমিটার হয়। ডাঃ জোনস অবশ্য বলেন যে, ব্যক্তিবিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ডাঃ জোনস, আর্গন, ক্রিপটন ও নাইট্রোজেন ইত্যাদি তেজষ্ক্রিয় সম্পন্ন গ্যাসের সাহায্যে এই পরীক্ষা কার্য চালান। যে লোকের ওপর এটি পরীক্ষা করা হয়, তাকে ঐ গ্যাস নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে তার রক্ত চলাচলের পরিমাপ লক্ষ্য করার জন্য একটি যন্ত্র পেশীগুলির ওপর রাখা হয়।

*

মানুষের শ্রম লাঘব করার জন্য আজকাল কত অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রই যে বার হয়েছে ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ক্লিভ্লাণ্ডে একটি নতুন ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া ও নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ছবিতে যে খোপগুলি দেখা যাচ্ছে তার প্রত্যেকটিতে একটি করে টেলিফোন যন্ত্র থাকে। খদ্দের এসে শুধু-

এইখানে দাঁড়িয়েই লণ্ড্রি থেকে কাপড় দেওয়া-নেওয়া চলে

মাত্র ফোনটি তুলে লণ্ড্রির কেন্দ্রীয় অফিসের কর্তাকে তার বক্তব্য জানিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অফিসের কর্তাটি দূর থেকেই বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা ঐ খুপরীর দরজা খুলে দিতে পারেন, কিছুক্ষণ পরে ট্রাক এসে কাপড় নিয়ে যায় কিংবা দিয়ে যায়। ঐখানেই পয়সা দিতে হয়, খুচরা পয়সা ফেরৎ পাবার হলে যন্ত্রের সাহায্যেই ফিরে আসে এবং যদি ঠিকমত পয়সা না দেওয়া হয়, তাহলেও ফিরে আসে।

*

১৯৫২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে বিশেষত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যে ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেল তার সঠিক কোনও কারণ নির্ণয় করা যায়নি। অনেকে বলেন, কয়েক বছর ধরে এই অঞ্চলে কয়েকটি আণবিক বোমা ফাটানোর ফলে এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। আবহাওয়াতত্ত্ব অফিসের বড়কর্তা ডাঃ ওয়াক্সলারের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁর মতে এই ধরণের ঝড়ঝঞ্ঝা ঘটানো বা বন্ধ করা আণবিক বোমার বিস্ফোরণের জন্য হতেই পারে না। প্রমাণের জন্য তিনি বলেন যে, ১৯৩৪ সালে এই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই ১৯৫২ সালের চেয়ে অনেক বেশী ঝড়-তুফান হয়, কিন্তু তখন আণবিক বোমার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ডাঃ ওয়াক্সলার আরও বলেন, বনের মধ্যে দাবানল হলে অনেক সময় বৃষ্টি হতে দেখা যায়, কিন্তু আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সে ধরণের বৃষ্টি হয়-ই না ঝড়ঝাপ্টা তো দূরের কথা! এই রকম ঝড়ের সৃষ্টি করতে হলে স্থানীয় আবহাওয়ার আর্দ্রতা কয়েক ঘণ্টা ধরে বেশ কয়েক মাইল ব্যেপে আকাশের ঊর্ধ্বে পৌঁছান দরকার। দাবানলের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার বিপর্যয় ঘটাতে অনেকখানি শক্তি ব্যয়িত হয়, সে হিসাবে আণবিক বোমার অত শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাই নেই, এটি একটুখানি জায়গার মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

*

গত পনর বছর ধরে উড়োজাহাজের যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে সেগুলি লক্ষ্য করে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার থেকে এই ধারণা হয় যে, বয়স্ক চালকরা যুবক চালকদের চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য নয়। এই তথ্যের মধ্যে দেখা গেছে যে, যে সব দুর্ঘটনা ঘটেছে সেগুলি সাধারণত জাহাজ ছাড়ার তিন ঘণ্টার মধ্যেই ঘটেছে। সুতরাং এতে বোঝা যায় যে, চালকদের ক্লান্তি ঘটার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে না। বয়স্ক চালকরা বরং দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখলে স্থির মস্তিষ্কে ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক করতে পারে, কিন্তু যুবক চালকদের এভাবে ধীরেসুস্থে চিন্তা করার ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। বর্তমানে যতগুলি উড়োজাহাজ চালক আছে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ জনের বয়স ৪০ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

শচীন ভৌমিক

ট্রামটা নিশ্চিন্ত ছিল সিগন্যালের রক্তচক্ষু জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠার আগেই ক্রসিংটা পেরিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ সবুজ আলো লালে রুদ্ধশ্বাস। রক্তিম সংকেত। আর তক্ষুণি জোর ব্রেক কষতে হল ড্রাইভারকে। বিপত্তি ঘটল তাতেই। বনশ্রীর আর কি, ও তো সিটে বসতেই পেরেছে, ও শুধু ঝাকুনিটা সামলে নিল সামনের বেঞ্চিটা ধরে। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাশের দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি। ছেলেটিকে অবিশ্যি এতক্ষণ খেয়াল করেনি ও, অন্যমনস্ক চোখে নারীসুলভ নিস্পৃহতার নির্মোকে ও যথারীতি চোখ ডুবিয়ে রেখেছিল ট্রামের বাইরে, চৌরঙ্গীর ঘাসে। সম্মিলিত আহা, আর বালব ফাটার আওয়াজে এবার ওকে চোখ ফেরাতে হল। কয়েকটি ফ্লাশ বাল্‌ব ভেঙ্গে চূর্ণ, অন্য হাতের একটা ফাইল খুলে গিয়ে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রখান। এরপর আর চুপ করে থাকা চলে না। কাগজপত্রের টুকিটাকি কিছু কিছু পড়েছে ওর কোলে, শাড়ির ভাঁজে, পায়ের কাছে মেঝেতে, পাশের বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলাটির গায়ে। অগত্যা সহানুভূতির রোদ্দুরে মুখ ঢেকে কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে তুলতে থাকে বনশ্রী। নানারকম চিঠি, ছাপা ফর্ম, গুটিকয় ফটো, রং-বেরং-এর চালান, রসিদ, আরো কতো কি। হঠাৎ চমকে উঠল বনশ্রী। পায়ের কাছে পড়েছিল ওটা, একখানা ফটো। ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে বনশ্রীর, হাত নড়তে চায় না, একটা দুর্বোধ্য হিমানীস্রোত বয়ে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে। পুরোন দিনের ইতিহাস স্মৃতির জালে যেন কুমীরের মতো পিঠ ভাসালো আচমকা সেই ফটো! ছবিটা হাতে নিয়ে চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। পুরু লেন্সের ওপাশে এক জোড়া প্রশ্নিল চোখে বিদ্যুৎ। নিজেকে জোর করে সংযত করে রাখলো বনশ্রী। তবু কি হাত কাঁপেনি? তবু কি ঠোঁটের বিশুষ্কতায় শীত নামে নি? কাঁপা হাতেই ফটোটা এগিয়ে দিল বনশ্রী। আর মল্লার মুখার্জি হাত না বাড়িয়ে শুধু চাপা কণ্ঠে বলল,—'কে জাপানী না?'

ট্রামের কৌতুহলী চোখগুলোতে উৎসাহের অলো। যেন দর্শনীয় নাটকের সর্বশেষ অংক দেখছে তারা। ডাকনামটার অভিনবত্বে ওদের রোমাঞ্চিত করে।

মুহূর্তে বুঝতে পারে মল্লার। পরিবেশটা অপ্রীতিকর। তবু চোখ রাখে ও বনশ্রীর ঠোঁটে। যে ঠোঁটে এইমাত্র খানিকটা হাসির কংকাল আত্মপরিচয়ে স্বীকৃতি জানাল। শুধু নিভু নিভু কণ্ঠে বলল ও,—'চিনতে পেরেছো মল্লিদা।'

ছবিটা এবার হাতে তুলে নেয় মল্লার। তারপর কিছু বলবার আগেই উঠে দাঁড়ায় বনশ্রী। 'আমার স্টপেজ এসে গেছে, এসো না মল্লিদা, নামবে এসো।'

চলো,—একরাশ ঈর্ষাকাতর চোখের বল্লম পেরিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল ওরা। তন্বী, সহ্যাতিরিক্ত রূপসী বনশ্রীর পেছু পেছু হতদরিদ্র মলিনবেশ মল্লার। একজোড়া অসঙ্গতি যেন নেমে গেল ট্রাম থেকে। পাশাপাশি একজোড়া প্রলাপ।

*　　*　　*

মফঃস্বল শহর থেকে কোলকাতা কলেজে পড়বার জন্যে রওনা হবার সময় মা চিঠিটা লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিদিবচন্দ্র গংগোপাধ্যায়, প্লিডার, আঠারো'র এক মতিমহল রোড, কলিকাতা। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে যেদিন জবুথবু সতেরো বছরের লাজুক ছেলে মল্লার এসে ত্রিদিববাবুর হাতে মা'র চিঠি দিলে সেদিন, 'আরে আরে তুমি শশাংকর ছেলে, তাই বলো। উঃ, বুঝলে বাপু, আমি আর শশাংক শুধু সামান্য দুটি কাপড়-জামা ভরতি টিনের ভাঙ্গা সুটকেস নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম সেই বর্মা। অর্থ নেই, তদ্বিরের লোকলস্কর কিছু নেই, শুধু যা থাকে কপালে বলে মনের জোরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম বিভুঁইয়ে। তা দেখলে তো, ঠকতে হলো না আমাদের। আরে আসল জিনিস হচ্ছে উদ্যম, বুঝলে, উদ্যমের,—আঃ, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন, বসো না বাপু। তুমি শশাংকর ছেলে, তা তোমাকেও আবার ভদ্রতা করতে হবে নাকি। হ্যারে নেলো, যা যা তোর গিন্নিমাকে খবর দে, গিয়ে বল, প্রোমের শশাংক চাটুয্যের ছেলে এসেছে, আমাদের মল্লি। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আঃ বড় ভালো লোক ছিলেন তোমার বাবা। কিন্তু ভালো লোকদের ওপর ভগবানের যতো নেকনজর। অকালে মারা গেল শশাংক।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

পড়ে ত্রিদিপবাবুর। 'আর তোমার মার চিঠিতে জানলাম কাকা তোমাকে ভিন্ন করে দিয়ে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছে। এই হয়, বুঝলে, এই কাকাকেই টাকা পাঠাতে একদিনও দেরী করত না শশাংক, একবার তো, জানলে'—'কি একটানা বক-বক করে চলেছো। ছেলেটাকে একটু সুস্থির হয়ে বসতে দিলে না তুমি',— গাঙ্গুলী-গিন্নি ঘরে ঢুকলেন পর্দা ঠেলে। মার তালিম দেয়া ছিল, তাই দেরী করলে না মল্লার। উঠে টিপ করে একটা প্রণাম করলে ও।

—থাক বাবা, সুখে থাকো, বাপের নাম রাখো,—আশীর্বাদে গদগদ হয়ে ওঠেন তিনি।

—'কিন্তু',—ত্রিদিববাবু জানতে চান. —তা তোমার জিনিসপত্র সব কই, সঙ্গে আনোনি?'

'—জিনিসপত্র তুলেছি গ্রামের এক চেনা লোকের মেসে। শেয়ালদার কাছে।' জবাব দেয় মল্লার।

—'মেসে? হতভাগা ছেলে—সেগুলো সঙ্গে করে সরাসরি এখানে এলে হোত না, না?'

—'এখানে? এখানে কি হবে?'— গদগদ গিন্নি-কণ্ঠ এবারে সন্দেহসংকুল। —'কি আর হবে। থাকবে। শশাংকর ছেলে আমরা থাকতে থাকবে কি মেসে-বোর্ডিং-এ? বলি এখনো ত্রিদিব গাঙ্গুলী তো মরে যায়নি।

যাও ছেলে, এক্ষুণি সব নিয়ে চলে এসো। তুমি এখানে থেকেই কলেজ করবে। হ্যাঁ, গিন্নি, মান্তি পানুদের পড়ার ঘরটা খালি করে দাও গে এখুনি, ওঘরেই থাকবে মল্লি। আর মান্তি-পানু এখন পড়বে আমার এই বৈঠক-খানায় বসে। ও মল্লি, গেলে না এখনো, দ্যাখো, হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে তো দাঁড়িয়েই—'

এরপর আর দাঁড়ায় নি মল্লার। সেই ও বহাল হয়ে গেল সে বাড়িতে।

বনশ্রীকে ও দেখলো আরো অনেক পরে। সন্ধ্যারও পর। বিরসমুখ গিন্নির তদারকির পর তখন ও মোটামুটি নিজের ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছে। তারপর গামছা কাঁধে নিয়ে হাত মুখ ধুতে ও এসে দাঁড়ালো বাথরুমের দরজায়। দরজা বন্ধ। খুট করে দরজা খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছমেয়েলি কণ্ঠ বেজে উঠল,— 'জানো মা, আজ বাসন্তী বলছিল',— বলতে গিয়েই সামনে অপরিচিত মানুষ দেখে চমকে থেমে গেল বনশ্রী। সোপ-কেসশুদ্ধু হাতটা কেঁপে গেল, আর সাবানটা নড়ে উঠল কেসের ভেতর। চুড়ি বেজে উঠল ঠুনঠুন, আর সদ্যস্নাত ভেজা আঁখিপল্লব চড়ুই ছানার ডানা ঝাপটানোর মতো থরথরিয়ে উঠল কয়েকবার।

কয়েকটি নিশ্চল মুহূর্ত। তারপর দ্রুত চলে গেল ও। অনেক পরে সচেতন হয়ে উঠল মল্লার। চোখের সামনে দিয়ে যেন ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি বসে-থাকা একটা সূর্যমুখী হেঁটে চলে গেল। ফুল-ফুল সাড়িটা যতো সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর ঘাস রঙের টাইট-হাতা ব্লাউজটা, ব্লাউজটা যতো সুন্দর, তার চেয়েও আরো সুন্দর আলতা দুধ-রঙা কমনীয় মুখটা। আর মনে হল, মেয়েটি যত সুন্দর তার চেয়ে ঢের ঢের সুন্দর ওর হাওয়ায় ফেলে-যাওয়া রোমাঞ্চ-মদির গন্ধ। সুগন্ধি তেল, সুবাসিত সাবান, আর আনকোরা নতুন এক মেয়েলি বুঝতে-না-পারা ভালো লাগার সৌগন্ধে যেন নেশা লাগল মল্লারের। যখন খেয়াল হল তখন ও নিজের ঘরে আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারে বসে। কাঁধের শুকনো গামছাটা শুকনোই।

বনশ্রীকে সেই ওর প্রথম দেখা।

দেখা তো এরপর অনেক হল। কিন্তু......

ভাব হল না বনশ্রীর সঙ্গে। আলাপ হল, অন্তরঙ্গতা হল না। ভালো লাগল, কিন্তু সমান্তরাল স্বীকৃতি জুটল না বনশ্রীর তরফ থেকে।

—'আরে, ঐ মল্লি, তুই জাপানীকে দেখলে অমন কাঁচুমাচু হয়ে যাস কেন। আরে তুই তো ওর ছোটবেলার বন্ধু ছিলি। আর জাপানী, তুমি ওকে দাদা ডাকবে, বুঝলে। ও হয়েছিল পোষে, আর তুমি, বোশেখ না জষ্টি—যেন, বোশেখ, না না, হ্যাঁগা, আমাদের জাপানী কি মাসে হয়েছিল? বোশেখ না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। যাক তুই ওকে দাদা ডাকবি, তিন মাসের বড়ো কম নয় বাপু। মনে থাকে যেন। যাও মল্লি, তোমার ক্লাসের আবার দেরী হয়ে না যায়। হ্যাঁগা, আমার ইয়ে, কি বলে, চশমার খাপটা গেল কোথায়?'—

—'ঐ যে বাবা',—বনশ্রী এগিয়ে আসে,—'তোমার বা হাতেই তো ধরা রয়েছে খাপটা।' হেসে ফেলে ও: বাবার যা কাণ্ড!

—'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না, দ্যাখো কি ভুলো মন, নাঃ, বকে বকে স্মৃতি-শক্তিটা একেবারে গেছে। অথচ জানিস, একবার, তখন আমরা স্কটিশের ছাত্র, জাঁদরেল প্রিন্সিপাল ছিল রেভারেণ্ড
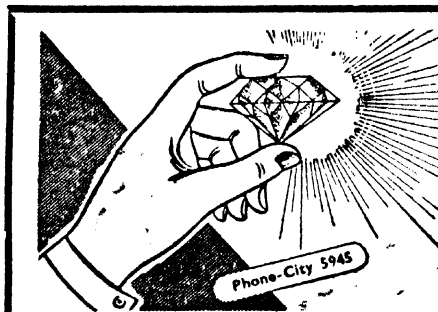
র্গুসন। উনি একদিন টপ করে মাকে প্রশ্ন করলেন'—

কি প্রশ্ন করলেন এবং আশ্চর্য স্মৃতি-ক্তিসম্পন্ন ত্রিদিববাবু তার কি জবাব য়েছিলেন শুনতে গেলে পার্সেণ্টেজ কে না, তাই আর দেরী করেনি মল্লার। রিয়ে পড়ল কলেজের পথে।

সেই সে দাদা ডাকার স্বত্ব পেলে। কন্তু এ যেন সরকারের 'স্যার' উপাধি দওয়া সত্ত্বেও কারুর 'স্যার' না ডাকা। র্থাৎ বনশ্রী তাকে কখনোই দাদা ডাকত া, দাদা কেন, আদপেই সে ডাকত না ল্লারকে।

কিন্তু চাঁদ না ভালোবাসুক, চাঁদকে ালবাসতে মানা নেই। বনশ্রীর আশ্চর্য পে যেন নেশা ধরে যায় মল্লারের। ওর পেক্ষা, ত্রিদিববাবুর স্তীর নিদারুণ বজ্ঞা কোন কিছুতেই মল্লারের বাঁধে না। ও যেন অভিমন্যু, সপ্তরথীর ভয়ে ীর ব্যূহ প্রবেশে এতটুকু ভয় নেই।

বনশ্রীর প্রতিটি গতি, প্রতিটি ভঙ্গী দেখে দেখে ওর মুখস্ত হয়ে গেছে। ও ঠিক বলে দিতে পারে বনশ্রী সোমবার কোন্ সাড়ি পরে কলেজে যাবে, কোন্ চটি পায়ে দেবে শনিবার। এমন কি, রোববার দিন ওর গালে কবার পাউডার পাফ বোলাবে তাও মল্লারের নখাগ্রে।

একবার কলেজ থেকে ফিরে এসে বনশ্রী সবে ঘরে ঢুকেছে, সেই সময় ডিকসিনারিটা চাইতেই আসছিল মল্লার। কিন্তু কে জানে কেন, হঠাৎ সে সময় ঘরে ঢুকতেই পারল না মল্লার, চলে যেতেও পারল না। লোভী চোখের বল্লম ছুড়ে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো। কিন্তু পায়ে কিসের সুড়সুড়ি লাগতেই চটিটা জোর ঘষে গেল মেঝেতে, আর 'কে?'—লে তক্ষুণি দরজায় এসে দাঁড়ালো বনশ্রী। ধনুকের মতো ভ্রূ দুটো ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল একবার, আর চাপা কণ্ঠে শুধু দুটো কথা উচ্চারণ করল ও, া তরল আগুনের মতো মল্লারের কানকে জ্বালিয়ে দিল।

—'আপনি? ছিঃ',—বলেই ঘরে ঢুকে মুখের ওপর দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল বনশ্রী। আর বন্ধ দরজার ওপাশে আঠারো বছরের একটা ব্যর্থ প্রেম অসহায় লজ্জায় স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চিরদিনের ভালো ছেলে মল্লার মুখার্জি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করলে সেকেণ্ড ডিভিসনে। তাতে আরো ক্ষেপে গেল সে। ভালো রেজাল্ট আর বনশ্রী একটা তার চাইই। যেদিন রেজাল্ট বেরুল সেদিন রাত্রেই সে ফুলস্কেপ কাগজের চার পাতা ভর্তি এক চিঠি লিখল বনশ্রীকে। যার আরম্ভঃ—"প্রিয় জাপানী, তোমাকে না পেলে আমি মরে যাব। তোমাকে আমার সমস্ত মন সঁপে দিয়েছি অনেক দিন। আমার দিন-রাতের একমাত্র চিন্তা তুমি। আমার হৃদয়ের একমাত্র অধিশ্বরী। লক্ষ্মী জাপানী, আমাকে তুমি দয়া করো, তুমি সাড়া দাও, তুমি আমাকে গ্রহণ করো।"...

সাড়া দিয়েছিল বনশ্রী। শুধু সাড়া? নাড়াই দিয়েছিল ও। দুচোখে তীব্র আগুন জ্বালিয়ে বলেছিল—'শুনুন, আপনি এত নীচ, এত ইতর জানতাম না। আপনি আজই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান নইলে আমি এই চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ে চাকর দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেবো আপনাকে।

বহুদিন পর প্রেম ভালোবাসা সব ছাড়িয়ে মা'র বিষন্ন মুখটা মনে পড়েছিল ওর। মা'র একমাত্র সন্তান, মা'র আশা, তার ভবিষ্যৎ!! না না অসম্ভব, এ মোহ থেকে তার অব্যাহতি চাই, তার ভবিষ্যৎ চাই, সম্ভাবনা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মুহূর্তে বনশ্রীর দুটি পা জড়িয়ে ধরেছিল মল্লার। —'মাপ চাইছি তোমার কাছে, আর করব না ওসব। কক্ষণো না। আমি মানুষ নই, আমি',—শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মল্লার। আঠারো বছরের জোয়ান ছেলের চোখে পরাজয়ের অশ্রু। —'ছিঃ ছিঃ কাঁদছ কেন, ওঠো মল্লিদা, ওঠো। আর এরকম ছেলেমানুষী করো না তুমি, কেমন? ভয় নেই এ চিঠি কাউকে দেখাবো না, নষ্ট করে ফেলব—'

বনশ্রী চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর খেয়াল হল মল্লারের, সন্ধ্যা আর নেই। রাতের অন্ধকার ওর নির্বাত কুঠুরীতে বনশ্রীর চুলের মতোই ঘন হয়ে নেমেছে। ক্লান্ত পায়ে উঠে সুইচ টিপে দিলে ও। আঃ, কি আশ্চর্য আলো, কি নরম আর কি নিষ্ঠুর!

হঠাৎ মনের ভেতর কেমন একটা আনন্দদায়ক বেদনা ভেসে উঠল। আজ এতদিন বাদে মল্লিদা বলে ডেকেছে ও, 'তুমি' বলে কথা বলেছে। আশ্চর্য!

তারপর ক্রমে ক্রমে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা ঘটে গেল বনশ্রীর সঙ্গে। আজ-কাল মল্লিদা ব'লে এটা সেটা দু'চার কথা বলে বনশ্রী, আর মল্লারও জাপানী তুমি-টুমি বলে সাত-সতেরো বলে। যে মল্লারকে দেখে ঘৃণা করতো বনশ্রী, সে মল্লার বুঝি এ নয়। যে কয়লা দেখে কালির ভয় করত ও, সে বুঝি তার তীব্র বিস্ফোরণে হীরে হয়ে গেছে আচমকা। এক ধমকেই বদলে গেছে মল্লার।

তবে কি ওর মনের ময়ূর পেখম গোটাল সেখানেই? বাঁক নিল ওর দুর্জয় কামনা? কই আর বাঁক নিল! কাণ্ডটা তো ঘটল এর পরেই। বিষম কাণ্ড।

বিয়ের প্রস্তাব চলছিল বনশ্রীর।

কথাটা হৈ-চৈ করে জানালো বাক্য-বাগীশ কৃতকর্মা ত্রিদিববাবু।

—'ও হে মল্লার, জানো তো পরশু জাপানীকে দেখতে আসছে? ছেলেটি চমৎকার কিন্তু। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসেই ঢুকেছে পুণার এক মিলে। সাড়ে সাতশো পায়। একবারে জুয়েল। পরশু ছেলের

মা আর ছেলের পিসিমা দেখতে আসবে। তা তুমি পরশু দিন সন্ধ্যার দিকে বাড়িতেই থেকো। ওরা আসবে এ সময়, ঘরোয়া ব্যাপার, থাকবে, দেখাশোনার একটু কাজটাজ করবে, বোনকে দেখতে আসবে তোমারও তো বেশ ইণ্টারেস্ট থাকা উচিত। আর জানো তো তোমার বাবার জন্যে তোমার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম আমি। ওঃ, সে এক ব্যাপার। স্টেশনে নেমে দেখি তোমার মামাবাড়ির কারুরই কোন পাত্তা নেই। এদিকে বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। আমি আর তোমার কাকা গৌরাঙ্গ তো ওয়েটিং রুমে বসে বসেই রাত কাবার করলাম। ভোর হতেই দেখি',—

'আমার ক্লাসের দেরী হয়ে যাবে মেসেমশাই, আমি চলি'—।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই, তা তো বটেই',—শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন ত্রিদিববাবু।

পথে নেমে হাঁফ ছাড়ে মল্লার। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেছে, যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা ফুটে গেছে মল্লারের বুকে। এই মুহূর্তে গেটের ওপর লতানো মালতী গাছে এতগুলো ফুল ফুটে থাকার কোন মানেই যেন নেই মল্লারের কাছে। অদূরে রেডিওর গিটারের আওয়াজে যেন শ্লেষের টংকার, বিদ্রূপের ঝংকার। দ্রুত পা চালায় মল্লার। কিন্তু মতিমহল রোডের আঠারো'র এফ নম্বরের বাড়ি ছেড়ে পালালেও মন থেকে বনশ্রীর মুখকে সরানো গেল না, ইকনমিক্সের খাতায় মুখ ঢেকেও ভোলা গেল না পরশু বনশ্রীকে দেখতে আসবে।

নির্ভুল অঙ্কের মতো সব গড়িয়ে গেল। তিন চার দফায় তিন চার দল দেখতে এলো বনশ্রীকে এবং মল্লারের সমস্ত প্রার্থনা ব্যর্থ করে সবারই খুব পছন্দ হয়ে গেল। ছেলে নাকি বেজায় মাতৃভক্ত। মা যে পাত্রীই ঠিক করুন, সে রাণী থেকে চাকরাণী যাই হোক, তাকেই সে বিয়ে করতে রাজী। তবু হেসে হেসেই ত্রিদিববাবু বললেন ছেলের মাকে, যে ছেলের ব্যক্তিগত পছন্দের জন্যে তিনি ছেলেকে মেয়ের ছবি পাঠাতে চান।

—'বেশ তো',—মিষ্টি হেসে বলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার-ফেরৎ ছেলের রত্নগর্ভা মা,—আপনারাই পাঠান খোকাকে। ঠিকানা দিচ্ছি আমরা। ছেলের চাকরী সম্পর্কেও আপনারা যাচাই করতে পারেন এক-আধটু। আর ছবি পাঠিয়ে ওর মত চাইবেন। জবাব পড়ে আপনার পক্ষে খোকনের চরিত্র বলটাও দেখতে পাবেন। কি বলব ত্রিদিববাবু, জানেন, ওর ক্ষিদে পেয়েছে কি না তাও আমাকেই বলে দিতে হয়। আমি যদি বলি এক মাস তুই উপোস দে খোকন, ব্যাস, প্রাণ বেরিয়ে যাক খোকন আমার আদেশের এতটুকু নড়চড় করবে না। একেবারে মা-অন্ত ছেলে।'

মাতৃভক্তির বহর শুনে বহুদিন বাদে বাক্যবীর ত্রিদিববাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল, একটা কথাও ফুটল না তাঁর মুখ দিয়ে। অনেকক্ষণ বাদে তিনি শুধু হেঁ হেঁ করে কৃতার্থ হাসি হাসলেন একগাল। পার্ক স্ট্রীটের কোন এক মস্ত সাহেব ফোটোগ্রাফারের দোকান থেকে একটা ছবি তোলা ছিল বনশ্রীর। চমৎকার ছবি, বনশ্রী যত সুন্দর তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর সে ছবি। একখানা প্রিণ্টই ছিল বাড়িতে সে ছবিখানাই গুণো পাঠানো ঠিক হল।

সে ছবি ও একখানা চিঠি লিখে ত্রিদিববাবু মল্লারের হাতে দিলেন।—

'বাবা মল্লি, আজই এ দুটো জিনিস এ ঠিকানায় রেজেস্ট্রী খামে ভরে পোস্ট করে দেবে। বিয়েটা আমার ইচ্ছে ফাল্গুনেই সেরে ফেলব।'

সেদিন কিছুই পোস্ট হল না। সে বিনিদ্র রাতে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে সারা রাত মল্লার কি লিখলে কে জানে। পরিদন ও দুটো খাম পোস্ট করলে দু ডাকঘর থেকে। একটা ছেলের মাকে আরেকটা পুণা, ছেলের কাছে।

সাত দিন পর একটি চিঠি এল ছেলের মা'র কাছে থেকে। বিয়ের সম্বন্ধ তিনি ভেঙ্গে দিলেন। এ বিয়ে হবে না। 'অধিক লেখা বাহুল্য।' ওদিকে পুণা থেকে কোন চিঠিই এল না।

চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ত্রিদিববাবু। স্তব্ধ হয়ে থাকলেন দু'দিন। তারপর ফেটে পড়লেন,—'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। বেটির রকম-সকম দেখেই আমার ভালো লাগেনি। ও বেটির অমন মা-ন্যাওটা ছেলের সংগে বিয়ে দেবো আমার মেয়ের? আরে, যে ছেলে এখনও অমন মা'র আঁচল ধরে থাকে সে কি পুরুষ, তুমিই বলো মল্লি, সে কি ছেলে? সে তো মেয়েছেলে! ম্যাঞ্চেস্টারের ইঞ্জিনীয়ারিং না কাঁচকলা, আসলে মিস্তিরী, স্রেফ মিস্ত্রী, বুঝলে মল্লি।'—

সুতরাং দক্ষিণ দিকের হাওয়া আবার সেই দক্ষিণ দিকেই বইতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন এ'ও মনে হল মল্লারের, গেটের ওপর মালতী ঝাড়টারও একটা মস্তো বড় মানে আছে। রেডিওর এই মুহূর্তের সেতার আলাপেও যেন একটা আশ্চর্য মাধুর্য!

বিপত্তি ঘটল কয়েক দিনের মধ্যেই। প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল তখন। কোন এক সাহেব কোম্পানীর এলুমেনিয়মের কারখানায় শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে কয়েক জন সাহেবকে জ্যান্তো ফার্নেসে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। তা নিয়ে সারা শহরময় উত্তেজনা ধরপাকড়। হঠাৎ একদিন মল্লারের সংগে দেখা করতে এল তার সেই গ্রাম সম্পর্কে শেয়ালদা মেস-বাসী বলাইদা। কলেজে। এক ধারে ডেকে নিয়ে বলল তার একটা উপকার করতে হবে। কি উপকার? না, সে ঐ কারখানার আন্দোলনে জড়িত, কতগুলো বে-আইনী কাগজপত্র রয়েছে তার কাছে সেগুলো সে গচ্ছিত রাখতে চায় মল্লারের হেফাজতে। নিরাপদ আশ্রয়ে। আর মল্লারের ভয় কি, ওকে আর সন্দেহ করবে কে?

'বেশ, রাখব', রাজি হল মল্লার। সে সন্ধ্যায়ই এক বোঝা কাগজপত্র নিয়ে সে লুকিয়ে রাখল তার স্যুটকেসের তলায়। সারা পথ সে খুব সতর্ক হয়েই এসেছে? তবু......

সে রাতেই আচমকা রাত একটায় পুলিশ হানা দিল আঠারোর এফ মতিমহলে। সার্চ ওয়ারেণ্ট নিয়ে। কি অদৃষ্ট, পুলিশের ঠক্‌ঠকে সদর খুলে দিয়েছিল মল্লারই। সেকেণ্ড শো ছবি দেখে সবে সে ফিরেছে তখন। দরজা খুলেই পুলিশ দেখে মুখ বরফের মতো সাদা হয়ে গেল ওর। পৌষালী শীত লাগল হাঁটুতে। সারা শরীরে কাঁপুনি।

কলরব করে জেগে উঠল সারা বাড়ি। ত্রিদিববাবুর বাড়িতে পুলিশ? সমস্ত বাড়ি আতঙ্কিত হয়ে জড়ো হল এসে মল্লারের ঘরে। আশ্চর্য, এ কালসাপ ছিল এ বাড়িতে!

—'দারোগবাবু আমি খুলে দিচ্ছি, আমি সব দেখাচ্ছি',—আর্তনাদ করে উঠল মাল্লার।

কিন্তু না, চাবিটা টেনে নিয়ে অভ্যস্ত গাম্ভীর্যের কঠিন হাসি হেসে স্যুটকেসটা খুলে ফেলল এস বি'র লোকটা। হাতের মুরগী তারা ধীরে-সুস্থে ভোঁতা ছুরিতে ঘষে ঘষে কাটতে চিরদিনেরই ওস্তাদ।

—'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মল্লারবাবু। আপনি স্থির হয়ে বসে থাকুন না।' বলল স্যুটকেস তল্লাসদার লোকটি। বিদ্রূপ!

বেরিয়ে পড়ল। শুধু বে-আইনী কাগজপত্র নয়, তার চেয়ে মারাত্মক বে-আইনী জিনিস। বনশ্রীর সেই ফোটো।

সমস্তগুলো চোখ কেন্দ্রীভূত হল সেই ফোটোর ওপর। মান্তি পানুকে নিয়ে পাঁচ জোড়া পলকহীন চোখ। তারপর আচমকা চীৎকারে ফেটে পড়লেন ত্রিদিববাবু—'এ ছবি, এ ছবি এখানে এলো কি করে, মল্লি? জানোয়ার, তবে তোমার এ 'কাজ',—বলে আর এক মুহূর্তও দেরী করেন নি ত্রিদিববাবু। এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক চড় কষালেন ওর গালে,—'কেন, কেন তুমি এ কাজ করেছিলে?' খপ করে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিলেন তিনি। ছিটকে দূরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মল্লার। আর পেছনের দিকে একবারও না তাকিয়ে ত্রিদিববাবু ভারি ভারি পা ফেলে চলে গেলেন সে ঘর ছেড়ে।

গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল মল্লারকে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে।

জেলে মাস দুই পরে চিঠি পেয়েছিল মল্লার। বনশ্রীর চিঠি। সঙ্গে সেই ফোটো।

—"আসছে বুধবার আমার বিয়ে, সেই ছেলের সঙ্গেই। তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ মল্লিদা, সে সব পুরোন স্মৃতি ভুলে যেও। আর আমার কোন অপরাধ নেই, তাই আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমার ছবি এবার আমি নিজেই

পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। কিছু আমি দিতে পারিনি তোমাকে, এ ফটোটা শুধু দিলাম। তোমাকে আমি কোনদিন ভালবাসতে পারি নি, এখনও বাসি না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার সমবেদনা আছে, সহানুভূতি আছে। জেনে রেখো, এ মনোভাব আমার থাকবে চিরদিন। ইতি—জাপানী।"

*　　*　　*

—"এই যে আমার বাসা মল্লিদা, এসো",—বনশ্রী কলিং-পুশে আঙুল ছোঁয়াল। দরজা খুলে গেল একটু বাদেই। ছোট্ট একটা বসবার ঘর। বাংলা ভাষায় বৈঠকখানা, আর ইংরেজী কিতায় ড্রইং রুম।

—'একটু বোস মল্লিদা, আমি এই একটু হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।'

হাত-মুখ ধোওয়া?......

আশ্চর্য, একদিন এই হাত-মুখ ধোয়ার পরই তো ও দেখেছিল বনশ্রীকে। নাঃ, সে সব পুরোন ইতিহাস, জীবন থেকে মতিমহল রোডরা বিদায় নিয়েছে অনেকদিন। গুড ওলড্ ডেজ! গুড? কে জানে!......

—'তারপর বলো এখন কি করছ, কোথায় আছো?'—

স্নাতশুভ্র বনশ্রী এসে ঘরে ঢুকল। মেরুন রঙের সাড়িতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বনশ্রীকে।

—'আমি? থাকি কসবার এক বস্তিতে, আর করি ফোটোগ্রাফী। ছোট্ট একটা দোকান দিয়েছি কিছুদিন হল, দিন দশেক, গড়িয়াহাটার বাজারের কাছে। এই কোনমতে চলছে। কিন্তু তোমার খবর বলো শুনি, পুণা থেকে কবে এলে, তারপর তোমার সব ছেলেপুলেরা গেল কই?'

—'হয়নি তো। ছেলেপুলে তো আমার নেই। পুণা থেকে এসেছি মাস চারেক হয়ে গেছে। চার মাস কেন পাঁচ মাসই হবে। থাকি এবাড়ির একতলায়, একা।'—হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল বনশ্রী, জ্বলন্ত একটা মোমবাতিকে কেউ যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। যন্ত্রণা-চাপা মুখ। শ্রাবণগম্ভীর চোখ।

এ আকস্মিক ভাবান্তরে বিস্মিত হয় মল্লার। একটু ঝুঁকে ও প্রশ্ন করে—'কি ব্যাপার জাপানী, হঠাৎ, হঠাৎ অমন—'

—'কই কিছু না তো'—মরা-মাছের মতো মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে খানিকটা হাসির বিদ্রূপ দুলল। তারপর মল্লারকে বিমূঢ় করে দিয়ে আচমকা দু'হাতে ওর একটা হাত মুঠোয় তুলে নিয়ে বনশ্রী অনুনয়ের কান্নায় ভেঙে পড়ল,—'মল্লিদা বড় ভুল করেছি আমি, বড় ভুল করেছি। আমি হেরে গেছি, আমি সুখী হতে পারি নি। তুমি জানো না আমার স্বামী, আমার স্বামী আসলে'—দাঁত দিয়ে একবার ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বনশ্রী,—পুরুষই নয়। ও মেয়ের মতোই, না, মেয়েরও অধম। অথচ আমার শাশুড়ী বলেন, ছেলেকে তাঁরা আবার বিয়ে দেবে। যেন, যেন আমিই দায়ী। উঃ অসহ্য, বিলেত-ফেরৎ মাতৃভক্ত স্বামী আমি আর সহ্য করতে পারছি না মল্লিদা, আর পারছি না। ওকে ছেড়েই আমি চলে এসেছি এখানে, একটা চাকরি নিয়েছি, তাই দিয়ে চালাই, একা থাকি। ওরা আর খোঁজ করে না একবারও। বাবা মা এখন তো গাঁয়ে রয়েছেন, আর কোলকাতা থাকলেও তাঁদের কাছে আমি যেতে পারতাম না। মল্লিদা',—হঠাৎ গলার স্বর ষড়যন্ত্র-চাপা ফিসফিসে নেমে এল বনশ্রীর —'তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো? পারো আমাকে আবার তোমার পাশে তুলে নিতে?'—সমস্ত চোখমুখে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধার মতো বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ওর, —'পারো না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি পারবে মল্লিদা, পারবে। আমি জানি তুমি আজো আমাকে ভালোবাসো, আজো তুমি ভুলতে পারোনি। বলো মল্লিদা, কথা বলো।' বনশ্রীর দু'হাতের আগ্রহ-নিষ্পেষণে মল্লারের হাতটা ঘেমে উঠল।

—'সে আর হয় না জাপানী। তুমি ওসব কথা আর আমাকে বলো না। তুমি সুখী হও নি দেখে আমি সত্যিই আজ তোমাকে শুধু সমবেদনা আর সহানুভূতি ছাড়া কিছু দিতে পারি না। আমার স্ত্রী আছেন, আমার ছেলেমেয়েও আছে জাপানী। তুমি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি',—।

—'কি?'—আহত নাগিনীর মতো ফুঁসে ওঠে বনশ্রী। নোংরা কোন স্পর্শ থেকে তড়িৎ ঘৃণায় নিজেকে সরিয়ে নিল যেন। মল্লারের হাতটা ছুড়ে দিয়ে সোফা থেকে বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়ালো ও। —'মিথ্য বলো না মল্লিদা, তুমি যদি আজো আমাকে ভালো না বাসতে, তবে এতদিন বাদে স্ত্রী ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার ছবি বুকে করে নিয়ে ঘুরতে না। স্ত্রী! হাসালে তুমি! তোমার স্ত্রী আছে, আমার স্বামী নেই? বিয়ে করলেই পুরোন ভালবাসা মরে যায় না, মল্লিদা। আর, আর পরস্ত্রীর ছবি যে এমনি বুকে করে বেড়াও, তা সাধ্বী স্ত্রী কিছু বলেন না? নিজেকে মিথ্যে ফাঁকি দিতে চেও না মল্লিদা।'

—'তুমি ভুল করছ জাপানী। তোমার ছবি আমি বুকে নিয়ে বেড়াই না। ওটা আমার সুটকেস ট্রাংকও থাকে না। এইমাত্র ওটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম একটা পার্টিকে আমার পোর্ট্রেট ছবির স্যাম্পল্ দেখাতে। অন্য সময় ওটা থাকে আমার স্টুডিও'র শো-কেসে। আর শো-কেসে যে-ক'টি মেয়ের ছবি রয়েছে, সব ক'টিই তাঁরা পরস্ত্রী। সুতরাং বুঝতে পারছো, আমার স্ত্রীর চট্‌বার কথাও নয়। অন্য দোকানের তোলা ছবি আমার শো-কেসে, ফাঁকি শুধু এইটুকুই। আর জানো তো, ব্যবসায় এক-আধটু ফাঁকি থাকেই।' —গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মল্লার। —'আচ্ছা জাপানী, এবার আমি চলি।'

এতটুকু আওয়াজ ফুটল না বনশ্রীর বেদনাদগ্ধ মুখে। ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো শুধু থর্‌থরিয়ে উঠল একবার। আর, তার পরমুহূর্তেই দু'হাতে মুখ ঢেকে অজস্র কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল ও। এ কান্না কি ফুরোবে?.........

(১৬)

সেদিন আবার।

রাত হয়েছে বেশ। সেদিনও রাত্রে যথারীতি অন্দর মহলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সোজা তেতলায়। আগে আগে বংশী। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে ভূতনাথ। সদুর ঘরে তখনও টিম টিম করে আলো জ্বলছে। তরকারী কোটা শেষ করে তখন জানালার ধারে বসে পান সাজছে সদু। যদুর মা অত রাতেও একমনে শিল-নোড়া নিয়ে বাটনা বেটে চলেছে। সদু পান সাজে আর বক্ বক্ করে বকে চলেছে—শীতের মরণ, শীতের ছিরি-ছাঁদ নেই, একটু তেল নেই যে পায়ে দিই মা, পা ফেটে একেবারে অক্ত বেরোচ্ছে গা, ভোলার বাপ থাকতে পায়ের কি এই দশা ছিল—মিনসে মোল আর কপাল পুড়লো আমার—মিনসে মরেছে তো হাড় জুড়িয়েছে, কিন্তু একটা মরা-হাজা ছেলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল গা—মিনসে বলতো—ফুলবউ—তিভুবনে কেউ কারো নয়—

দোতলার সিঁড় বেয়ে উপরে উঠতেই বাঁ দিকে কর্তাদের শোবার ঘর। এখন অন্ধকার। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে নিশা তখন একমনে মেজবাবুর কাপড় কোঁচাচ্ছে। তারপর দোতলা আর অন্দর-মহলের তেতলার মধ্যেকার পোলটা পেরিয়ে ওধারে যেতে হবে।

বংশী বললে—এখানে একটু দাঁড়ান শালাবাবু—দেখি বড়মা এখন রাস্তায় আছে কিনা—

ভাগ্য ভাল বলতে হবে। বড়বউ তখন নিজের ঘরে। বংশী ফিরে এসে বললে—আসুন—

একেবারে বরাবর ছোটমার ঘর। বংশী ভিতরে ঢুকে খবর দিলে। চিন্তা বেরিয়ে এল।

—যান, ভেতরে যান—

সেদিনও বৌঠানকে যেমন দেখেছিল ভূতনাথ, আজও তেমনি। তেমনিই অবিসম্বাদী রূপ। তবু অনেক না-পাওয়ার প্রাচুর্য যেন অনেক পাওয়াকে ম্লান করে দিয়েছে। হয়ত বৌঠানের ইতিহাস শোনা ছিল বলেই এ-কথা মনে হলো ভূতনাথের। কিন্তু হঠাৎ দেখলে বুঝি মনে হতো ওটা তার অহঙ্কারের আত্মপ্রকাশ। অহঙ্কারের সঙ্গে মিশে আছে প্রশান্ত মনের লালিত্য। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সুখী কি দুঃখী—সে প্রশ্ন আর মনে আসে না। দু'চোখের শান্ত-গাম্ভীর্য যেন দর্শকের সমস্ত বিচার-বুদ্ধিকে শিথিল করে দেয়।

অথচ সেই মানুষ যখন কথা বলে! যা'কে দেখলে শ্রদ্ধা হয়, শান্তি হয়, হয়ত খানিকটা ভয়ও হয়, তার কথা শুনলে যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

বৌঠান বসে ছিল সেদিনকার মত। একটু সরে বসে বললে—এসো ভাই—

ভূতনাথ বসে পকেট থেকে কৌটোটা বের করে দিয়ে বললে—এনেছি সেটা—কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে সব লেখা আছে এতে—

তারপর ঠিক সেদিনকার মতই চিন্তা আবার ঘরে ঢুকলো এক থালা খাবার নিয়ে।

ভূতনাথ বললে—আমি এত খেতে পারবো না বৌঠান—

ক্ষিধে যে পায়নি ভূতনথের তা নয়. কিন্তু বৌঠানের সামনে বসে খেতে কেমন লজ্জা করে। কিন্তু বৌঠানও ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে—না খেলে আমি কথাই বলবো না তোমার সঙ্গে—সব খেতে হবে—

সত্যিই খেতে হলো। খাওয়ার শেষে বৌঠান বললে—একটু বসো, আসছি—

বৌঠান উঠে পাশের একটা ঘরে চলে গেল। এতক্ষণে নজরে পড়লো ভূতনাথের পাশেই আর একটা ঘর। সেদিন নজরে পড়েনি। ঘরখানার চারদিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। আলমারি ভর্তি পুতুলগুলো স্থির হয়ে রয়েছে কাচের ভিতরে। তাদের মধ্যে একটা বড় কাচের পুতুল যেন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে ভূতনাথের দিকে। সোনালি রূপালি পাড় বসানো শাড়ি-পরা, গায়ে পুঁতির গয়না। হঠাৎ মনে হলো পুতুলটা যেন একবার নড়ে উঠলো। আশ্চর্য! যেন চোখের ইঙ্গিত করে তকে ডাকলে। ভূতনাথ আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। না, ওটা তো নিষ্প্রাণ পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

বৌঠান আবার ঘরে এল। ননীর মত নরম আলতা-পরা পা দুটো ঘুরিয়ে আবার বসলো সামনে। হাতে একটা পাঁজি। পাঁজি খুলে পাতা উল্টে দেখে দেখে বৌঠান বললে—কাল তো একাদশী দেখছি—দিনটাও ভাল—কালকেই এটা পরবো তা হ'লে—

তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললে—ছোটকর্তার কোনও খারাপ হবে না তো এতে, ভূতনাথ—শরীর তো ও'র ভালো নয়, জানো, মাঝে মাঝে ভোগেনও খুব, অত অত্যাচার—শরীর সইবে কেন—

ভূতনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। খানিক পরে বললে—একদিন পরেই দেখুন না—

—তাই ভালো—

তারপরে কী যেন ভাবতে লাগলো বৌঠান নিজের মনে। যেন চিন্তাগ্রস্ত।

খানিক পরে মুখ তুলে বৌঠান বললে—আজ পর্যন্ত সজ্ঞানে কখনও মিথ্যে কথা বলিনি ভূতনাথ, কিন্তু হয়ত তাই-ই আমায় বলতে হবে—। আমার যশোদা-দুলাল জানে, আমি কারোর ওপর কোনও অন্যায় করিনি, কাউকে 'জীবনে একটা কষ্ট দিইনি, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার কাছেও স্বীকার করছি—বাবার উপদেশ আমি বর্ণে বর্ণে মেনে এসেছি—কিন্তু স্বামী-সেবার জন্যে তা-ও করবো আমি—

বলে ডাকলে—চিন্তা—

চিন্তা আসতে বৌঠান বললে—

বংশীকে একবার ডেকে দে তো এখেনে—

বংশী আসতে বৌঠান বললে—ছোটবাবু আজ কখন বেরিয়েছে?—

—আজ্ঞে সন্ধ্যে সাতটার সময়—

—আচ্ছা, কালকে দুপুরবেলা একবার আমার ঘরে নিয়ে আসতে পারবি ছোট-বাবুকে? বলবি—আমার ভীষণ অসুখ, একবার যেন দেখতে আসেন—যে-কোন রকমে একবার তোকে এ-ঘরে আনতেই হবে ছোটবাবুকে আর চিন্তা, তুই রাঙাঠাকমাকেও বলে দিস আমার অসুখ—আমি কিছু খাবো না,—

বংশী বললে—ছোটবাবু যে দুপুরে ঘুমোবে—

—ঘুম থেকে ওঠার পর বলবি—

সেই ভাল।—

—আচ্ছা এবার যা—

ভূতনাথের বসে বসে কেমন অস্বস্তি লাগছিল। এই সুযোগে বললে—আমিও তা হলে এবার আসি বৌঠান—

—তুমি একটু বোস, এত তাড়া কিসের তোমার, কোনও কাজ আছে?

ভূতনাথ বললে—না, কাজ নেই—

—তবে, লজ্জা করছে বুঝি? সেদিন মেজ্‌দিও তো বলছিলেন—ছেলেটি লাজুক বড়—

—মেজদি কে?

—এ বাড়ির মেজ-গিন্নী, এই পাশের ঘরেই থাকেন। আমাকে প্রথম দিনেই জিগ্যেস করেছেন—কে তোর ঘরে এসে-ছিলরে ছোটবউ? আমি বললাম—আমার গুরুভাই—। এ বাড়ির ভেতরে এমন করে আগে আর কখনও বাইরের পুরুষ মানুষ আসেনি তো, তা' আজকাল এ বাড়ির নিয়ম-কানুন তো একটু একটু করে ভাঙছে, মেজদির বাবাও এখন এই অন্দর মহলে আসেন—তা' আমিই বা...

কথা অসমাপ্ত রেখে বৌঠান থামলো।

তারপর আবার বললে—আজই তোমার সঙ্গে হয়ত শেষ দেখা ভূতনাথ, এ বাড়িতে বউদের সঙ্গে সাধারণত কেউ কথা বলতে পায় না, আমারও আর দেখা পাবে না, কিন্তু দিদিকে মনে রেখো—আর তোমার যদি কোনও উপকার করতে পারি, দরকার হলে বংশীকে দিয়ে খবর পাঠিও—কেমন?

ভূতনাথ উঠলো। তারপর যোশোদা-

দুলালের সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম করলে একবার।

বংশী এসে আবার তেমনি করে নিচেয় নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

ভূতনাথের মনটা কেমন বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে রইল অনেকক্ষণ! আর দেখা হবে না! একটা সামান্যতম উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করে দু'দিনের সামান্য পরিচয়। কিন্তু তবু পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে যেন একটা পরম আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল দুদিনেই। এতখানি স্নেহ-করুণ আত্মীয়তা ভূতনাথ যেন জীবনে কখনও পায়নি আগে। সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে সেই কথাই ভাবছিল ভূতনাথ।

উঠোনের উপর এসে দাঁড়াতেই বংশী বললে—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে শালাবাবু—

—আমার সঙ্গে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে, আপনিই পাবেন—

—কী কাজটা, বল না—

—ছুটুকবাবুর আসরে তো আপনি তবলা বাজাতে যান, ওর একটা চাকরের দরকার, আমার ভাই-এর জন্যে যদি বলেন একটু—

—কেন, ছুটুকবাবুর চাকরের কী হলো?

—আপনি সে-কাণ্ড জানেন না?

—কিসের কী কাণ্ড?

—শশীকে ছুটুকবাবু যে তাড়িয়ে দিয়েছে—

শশীর কথাটা মনে পড়লো এতক্ষণে। আজই তো সন্ধ্যেবেলা দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।

—শশী যে আমার কাছে পয়সা চাইছিল, আজই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে রাস্তায়—

—তাই নাকি, ছোঁবেন না আজ্ঞে ওকে—

—কী হয়েছিল তার?

—পারা, পারা ঘা বেরিয়েছিল সারা গায়ে মুখে—একসঙ্গে শোয়াবসা করি, শেষকালে ছোঁয়াচ লেগে আমাদের হোক আর কি—মধুসূদন কাকাকে গিয়ে লোচন বলে দিলে। মধুসূদন কাকা বলে দিলে ছুটুকবাবুকে, সরকার মশাই খাজাঞ্চীখানার খাতা থেকে নাম কেটে দিলে ওর—

ভূতনাথ বললে—বেচারি বলছিল বড় কষ্টে পড়েছে, দেশে যাবার পয়সা নেই—

—তা' তখন মনে ছিল না। আমরা পই-পই করে মানা করেছি আজ্ঞে, ও-সব বাবুদের পোষায়, টাকা আছে, রোগ সারিয়ে ফেলে, ছুটুকবাবুর হয়েছিল—সেরে গেল—কিন্তু ভদ্দরলোকের বাড়িতে ও-রোগ হলে সে-চাকরকে রাখবে কেন—

বংশী একটু থেমে বললে—তা আজ্ঞে ওই জায়গায় আমার ভাইকে আপনি ঢুকিয়ে দিন না ছুটুকবাবুকে বলে—

—আচ্ছা বলবো—বলে ভূতনাথ নিজের ঘরে এল। ব্রজরাখালের ঘরের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। এখনও আসেনি। এখন ব্রজরাখাল ব্যস্ত বড়। সেই কদম-কেশর বোস! ভদ্রলোকের জরুরী কাজ ছিল ব্রজরাখালের সঙ্গে। ফুলদাসী মৃত্যু শয্যায়। কে জানে কত কাজ—কত প্রতিষ্ঠান ব্রজরাখালের। ঠাকুরের নাম প্রচার করতে হবে। বিবেকানন্দস্বামী এসেছেন। কাজ আরো বেড়ে গেছে। বেদান্ত আর অদ্বৈতবাদ প্রচার করতে হবে। মিস্টার আর মিসেস সেভিয়ারও সঙ্গে এসেছেন শিষ্য হয়ে। সাহেব মেম শিষ্য—এ-কেমন জিনিস। কিসের আকর্ষণে এসেছে ওরা।

অন্ধকার ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে রইল ভূতনাথ। হঠাৎ যেন সমস্ত বড় বাড়িখানা একটা গুঞ্জন শুরু করলো। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। ভূতনাথের মনে হলো—কবে ১৩৪৫ সালে কে ঘড়ি তৈরি করেছিল প্রথম, সেই ঘড়ির কল-কব্জা ধীরে ধীরে আজ বুঝি চলতে শুরু করেছে। আজ এতদিন পরে। বদরিকাবাবুর কথাই বুঝি সত্য হবে। সব লাল হয়ে যাবে। কিন্তু লাল কেন হবে? এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট কি টের পেয়েছে? কবে মোগল বাদশাদের আমলে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষ জমিদারীর সনদ পেয়েছিল। পেয়েছিল কোতল করবার অধিকার। কবে হাজার হাজার লাঠিয়ালের আঘাতে গ্রাম-জনপদ ভীত-বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে, কত নারীর সৌন্দর্য-সৌজন্য-শালীনতা আর সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষ—এই চৌধুরী পরিবারের অত্যাচারের তরঙ্গ কত সুদূর সীমান্তে গিয়ে গ্রামবাসীদের অভিশাপকে থামিয়ে দিয়েছে! বদরিকাবাবুর কাছে সব সেদিন শুনেছে ভূতনাথ। আর শুধু কি এরা! কলকাতার প্রাচীন সমস্ত বংশের ইতিহাসের পিছনে যে-মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতা আর জাতি-দ্রোহিতার কলঙ্ক লুকিয়ে আছে, আজ এই রাত্রে সব যেন একসঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠলো। ওই যে বদরিকাবাবু শুধু নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যায়, ওর ব্যথা কে বুঝবে। বৌঠান বুঝি কাঁদছে এখন তেতলার অন্দর মহলের একান্তে। কে ঘোচাবে তার দুঃখ? ননীলালের জন্যে কি কেউ দায়ী নয়? আর ওই সুবিনয়বাবু! তার স্ত্রী উন্মাদ-গ্রস্ত কা'র পাপে! শশী কেন হঠাৎ বেকার হয়ে যায়? একদিন জলাভূমির উপর যে শহরের পত্তন হয়েছিল জবচার্নকের আমলে, সেই শহর আজ দিনে দিনে সৌধমালায় সেজে উঠেছে কি অকারণে? ছুটুকবাবুর ঘর থেকে তখনও খেয়ালের আলাপ কানে আসছে—'চমেলি ফুলি চম্পা'। পাশের জানালা খোলা ছিল। ওধারে দক্ষিণের বাগানে বুঝি ছিরু জমাদারের ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। 'বিল্ব-মঙ্গলের' পাগলিনীর একটা গানের সুর—'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে।' ভূতনাথের মনে হলো—সমস্ত কলকাতা শহর যেন কাঁদছে। তার প্রথম জীবনে ভূতনাথ যে-বেজিটা পুষেছিল, সেই বেজিটা মরবার দিন ঠিক এমনি অদ্ভুত সুরেই কেঁদেছিল যেন।

কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগলো ভূতনাথের। কিছুতেই যেন ঘুম আসছে না। হয়ত পটেশ্বরী বৌঠানের দুঃখটাই আজ তাকে বড় অভিভূত করে দিয়েছে। মনে হলো—এখন এই সময়ে প্রাণ ভরে বাঁয়া-তবলা বাজাতে পারলে হতো। তবলায় চাঁটি দিয়ে মনের সমস্ত দুর্ভাবনাগুলোকে হয়ত এড়াতেও পারা যেত।

কিন্তু হঠাৎ একটা আচমকা শব্দে চমকে উঠেছে ভূতনাথ।

—কে?

—আমি, এখনও ঘুমোওনি বড়কুটুম?

—এত দেরি হলো? তোমাকে এক ভদ্রলোক খুঁজতে এসেছিলেন—

আলো জ্বালালে ব্রজরাখাল। তারপর গায়ের জামা খুলে ফেললে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ব্রজরাখালকে।

—আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি কিছু, কিছু খাবার আছে বড়কুটুম?

—মুড়ি আছে, খাবে? দিচ্ছি—আমি আজ রাঁধিনি, বাইরে খেয়েছি—

বলে ভূতনাথ টিনের কৌটো থেকে মুড়ি বার করে দিলে।

সারা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ভূতনাথ মুখ হাত পা ধুয়ে এল।

হাত-পা গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—সারাদিন খুব ঘোরাঘুরি গেল, শেয়ালদ' থেকে গেলাম রিপন কলেজে, সেখান থেকে বাগবাজারে রায় বাহাদুর পশুপতি বোসের বাড়ি, তারপর সেখান থেকে স্বামীজী আর সেভিয়ারদের নিয়ে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়িতে—ওঃ খুব সাজিয়েছে বাগান-বাড়িটা—

—দু'টি খেয়ে নিলে না কেন ওরই মধ্যে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—সময় পেলাম না—কাল আবার সক্কালবেলাই ছুটতে হবে কাশীপুরে, সন্ধ্যেবেলা আবার যেতে হবে আলম-বাজারের মঠে—

তেল-মাখা মুড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে ব্রজরাখাল বললে—কে খ'ুজতে এসেছিল বললে?

—কদমকেশর বোস নামে এক ভদ্র-লোক—

—কেন, কিছু বলেছে?

—তোমায় বলতে বলেছে যে, মেছো-বাজারের ফুলবালা দাসীর দুপুর থেকে ভেদবমি শুরু হয়েছে, একটু ওষুধ চাইছিল—

—ভেদবমি? তবে আর খাওয়া হলো না—বলে উঠলো ব্রজরাখাল। আবার জামা গায়ে দিয়ে পায়ে জুতো গলিয়ে নিলে।

ভূতনাথ বললে—আবার চললে নাকি?

—যেতেই হবে—

—কাল সকালে গেলে চলবে না?

—কাল সকালে, অনেক কাজ—বলে বাইরে বেরুল ব্রজরাখাল।

—মুড়ি ক'টা খেয়ে যাও—

কিন্তু কথাটা হয়ত শুনতে পেলে না ব্রজরাখাল। ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে সে। বাইরে শীতার্ত রাত। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের কোণের টিম্‌টিমে আলোয় অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা উঠোনের উপর একবার দেখা গেল শুধু। যেন হাঁটছে, নয়—দৌড়ুচ্ছে।
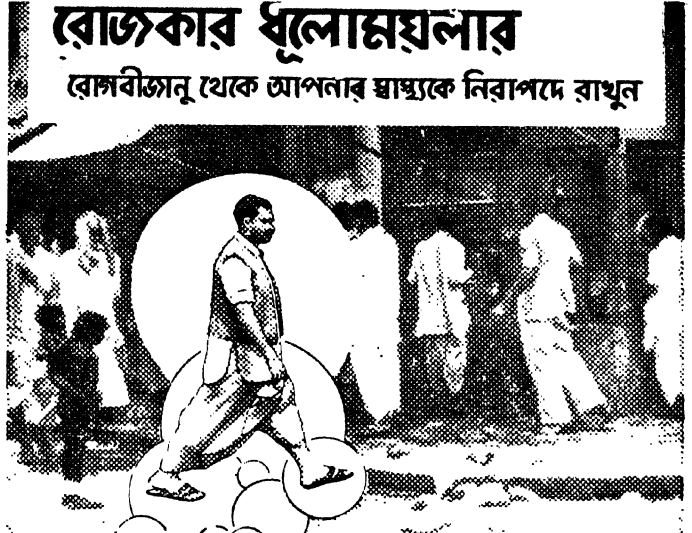
ভূতনাথ ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ছুটুকবাবুর ঘর থেকে তখনও খেয়াল গানের সুর ভেসে আসছে—চমেলি ফুলি চম্পা', বিশ্বম্ভরের গলা। কান্তিধরের তবলার চাঁটি। আর ওদিকে দক্ষিণের বাগানের কোণ থেকে ছিরু জমাদারের ছেলের বাঁশিতে বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর গান—'ওঠা নাম প্রেমের তুফানে—'
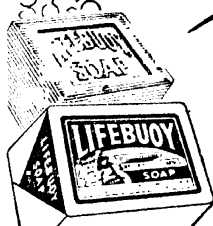
(ক্রমশ)

উনত্রিশ

যেখানে যত অসন্তোষ প্রচ্ছন্ন আছে তাকে ফু দিয়ে জ্বালিয়ে তোল, তাদের সুকৌশলে এক জায়গায় জমিয়ে দাও, বড় একটা আগুনের সৃষ্টি হবে। ওখানে পবিত্র অপবিত্র বাছলে চলবে না ওখানে বাছতে হবে কোন দাহ্য বস্তু কত সহজে জ্বলবে কত প্রচণ্ডবেগে জ্বলবে তাই। যদি অপবিত্র আবর্জনার মধ্যে সেই শক্তি থাকে তবে তাকেই গ্রহণ কর সর্বাগ্রে। শুচিবাই যদি তোমার থাকে তবে তুমি স'রে দাঁড়াও।

তুমি মূর্খ তুমি ভীরু তুমি অন্ধ। তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাক। ন্যায় শাস্ত্রের তালপাতার পুঁথি ওই আগুনে ফেলে জ্বালিয়ে দাও; না পার মাটির তলায় গর্ত খুঁড়ে তারই মধ্যে আশ্রয় নাও।

অপবিত্র! আবর্জনা! মূর্খ কোথাকার? ওরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ওরা কি থাকবে? অগ্নিদাহটা হয়ে যাক। তারপরও যদিই দু একটা আবর্জনা থাকে তখন তাকে নূতন আগুনে ছাই করে দেওয়া যাবে।

সরে দাঁড়াও। ভয় পেলে স'রে দাঁড়াও। লগ্ন ক্ষণ চলে যাবে। গেলে আর ফিরবে না। অঙ্ক ক'ষে উত্তর নির্ণয়ের মত তাকে স্থির করতে হবে। তাপমান যন্ত্র সামনে রেখে নির্ণয় করতে হবে কখন কোন মুহূর্তে তাপমাত্রা উঠবে সর্বোচ্চ সীমায় এবং নির্ণয় করতে হবে আগুন জ্বাললে স্বাভাবিক নিয়মে যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হবে ঋতু অনুযায়ী তার গতি হবে কোন দিকে, আরও নির্ণয় করো—বর্ষণ সম্ভাবনা আছে কিনা—থাকলে সে সম্ভাবনার সময় কখন; তারপর জ্বালো আগুন—ছারখার হয়ে যাক সব। সরে দাঁড়িয়ে দেখ। অগ্নিকাণ্ডের শেষে এসে কর্ষণ কর ওই দগ্ধ দেশ! ভরে উঠবে নূতন ফসলে।

তোমাকে উঠতে হবে ওই উঁচু ঠাঁইটিতে। সিঁড়ি নাই, মই নাই, কি করবে? মানুষ রয়েছে। মানুষ স্তূপীকৃত করে দাও। জীবন্ত মানুষ নড়ে চঞ্চল হয়, তাতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে সুতরাং মানুষকে শবে পরিণত কর। উঠে যাও উপরে।

দোহাই তোমার ন্যায়শাস্ত্রের বুলি আওড়ে আমার চিন্তায় ব্যাঘাত করো না। তোমার উপর আমার ধারণা আরও উঁচু ছিল রমা। কিন্তু তুমি নিতান্ত এদেশের নভেলগুলোর নায়িকাদের গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা আছ; বড় জোর একটু লাফাঝাঁপা বেশী কর। তার বেশী নয়।

একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেশ চলছে। চারিদিকে অভাব, বিশৃঙ্খলা। এরই মধ্যে আমাদের ধ্বংসের চেষ্টা চলছে। আমাদের জ্বলতে হবে। আগুন জ্বালাতে হবে।

কপিলদেবের চোখ জ্বলছিল—কণ্ঠস্বরে অগ্নির উত্তাপ ঝরে পড়ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে কথা বলছিল। মূর্তি তার ভীষণ হয়ে উঠেছে।

রমা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কপিলদেবের কথা শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ সে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যাও তুমি নিচে যাও। এমনি পলকহীন ফ্যালফেলে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকো না। যাও। কিন্তু তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, একটা খবর যদি নবগ্রামে গিয়ে পেঁাছোয় বিশেষ ক'রে গৌরীকান্ত বিজয় কি কিশোরের কাছে তা হলে জানব এ খবর তুমি দিয়েছ।

এবার রমা ফিক্ করে হেসে ফেললে—বললে—কি করবে তা' হলে?

তারপরই বললে—কিছু মনে করো না, তুমি আজ আমাকে তুমি বললে—তাই তোমাকেও আমি তুমি বললাম। আচ্ছা।

এখানকার অবস্থা বুঝে—নবীন হালদারের সঙ্গে এবং আরও দু একজন প্রবীণ ভাগজোতদারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কপিলদেব এইটুকু বুঝেছে যে, এরা ভাগ প্রথার পরিবর্তন চায় না এমন নয়, চায়, আন্তরিকভাবেই চায়, কিন্তু যেভাবে এবং যে পথে অর্থাৎ জোরের পথে—যে পথে চাইতে কপিলদেব বলছে—সে পথে সেভাবে চাইতে ওরা নারাজ। কারণ অন্যে যে যাই বলুক এমনকি ওরা নিজেরাই যা বলছে বলুক সেটা আসলে হল ভয়, দুর্বলতা। যুগ যুগ ধরে যে মানুষেরা জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে আছে—বুকের বেদনায় মুমূর্ষু-প্রায়, তাদের হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে বললে তারা পারবে না।

যারা বলে—এর পিছনে আছে ধর্মজ্ঞান নীতিজ্ঞান—ভারতবর্ষের ঐতিহ্য তাদের সে ব্যঙ্গ করে মূর্খ বলে। মানুষ আসলে হ'ল বৈজ্ঞানিক জৈব মানুষ। মানুষের সেই জৈব প্রবৃত্তিতে খোঁচা দিয়ে জাগাতে পারলেই হ'ল। পাহাড়ের গায়ে—ছোট কয়েক টুকরো পাথরের ঠেকায় একটা বড় চাঁই আটকে থাকে। সে একটা বিচিত্র অঙ্কের নিয়ম। কিন্তু পাথরের বড় চাঁইটাকে ক্রোনক্রমে নাড়িয়ে দিলেই ব্যস। সে তখন আপনার ভারে—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে—ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে নিচে নামতে থাকে।

সেই পাথর গড়িয়ে যাক—তারপর দেখা যাবে।

সেই পাথর গড়াবার জন্যে তারা স্থির করেছে এখানকার যে সব কৃষাণ—ভাগ-চাষীকে লোকে দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে তাদের নিয়েই দলটা গড়া হবে প্রথমে। এবং কয়েকজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোককেও নেওয়া হবে এর সমর্থক হিসেবে। তাদের কথা দেওয়া হয়েছে যে চাষীরা যদি বেশী ভাগ আদায় করতে পারে তবে তারা সাহায্য করেছে বলে একটা ভাগ তাদের দেওয়া হবে।

পরামর্শটা প্রদ্যোতের।

নাস্তিক্যবাদী প্রদ্যোত আসাধারণ কূটবুদ্ধি। সে কপিলদেবের মত পুঁথিগত বিদ্যার পন্থানুসারী নয় সে অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ। এখানকার মানুষকে সে জানে চেনে। তা ছাড়া সে এখানকার বিষয় ব্যাপারের ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত। আইনে বুদ্ধি ক্ষুরধার।

এখানে ক্রোশ খানেক দূরে রামঘাটি বলে একখানি গ্রাম আছে। রামঘাটিতে কয়েক ঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর হিন্দু পেশাদার লাঠিয়ালের বাস। তার বাল্যকালে সে রামঘাটির পোড়া সেখ এবং রাখা সেখের দারুণ প্রতাপ দেখেছে। ডাকাতিতে পোড়া এবং রাখার জেল হয়েছে। দাঙ্গাতে হয়েছে। জমিদার জমিদারে সীমানার দাঙ্গায় এরা টাকা চুক্তি করে সীমানা দখল দিয়ে দিত। নিজেদের কিছু কিছু জমিও ছিল। প্রদ্যোতের প্রথম কৈশোরে এমনি একটা বিচিত্র ঘটনায় এরা প্রায় পুরো কৃষিজীবি হয়ে যায়। দুই তৌজির সীমানায় খানিকটা পতিত জমি নিয়ে দুই জমিদারে বিরোধ বাধতে এক পক্ষ এদের ডেকে সেই জমি বিনা সেলামীতে এদের বন্দোবস্ত করে দেন এবং চার বৎসর কোন খাজনাই নেন নি, পরের চার বৎসর অর্ধেক খাজনা নিয়েছিলেন। তারা অবশ্য এতেও জমি রাখতে পারে নি। জমি হস্তান্তরিত হয়ে মহাজন জোতদারের হাতে গিয়েছে। তবু জমিটা চাষ ওরাই করে। এদের দেখিয়ে দিয়ে প্রদ্যোত বলেছে—কপিলদেববাবু ওই ওদের নিয়ে শুরু করুন।

পানের ছোপ ধরা বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বল্লেছে—আলেকজেণ্ডার আর সেই ডাকাতের গল্পের আপনারা আলেকজেণ্ডার ওরা ডাকাত। দিগ্বিজয় করতে হলে ওদের নিন। পাঞ্জাবের হিন্দু সাধু

I
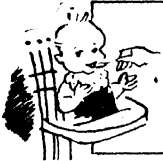
কালানসদের মত যারা বা তাদের শিষ্য সেবক যারা তাদের ভরসা ছেড়ে দেন। ওদের ডাক দিলে ওরা আসবে না। মাথা কেটে আনলেও ওরা বলবে আমার মাথাই গেল—আমি গেলাম কই?

রামঘাটির পোড়া সেখ এবং রাখা সেখ এখন নাই তারা অনেকদিন আগেই মারা গেছে। তাদের সাকরেদ আছে ছেলে ভাইপো নাতি আছে। তারা পোড়া সেখদের মত না-হলেও ঐ ধারা ধরণেরই লোক।

পোড়া সেখের নিজের মুখে শোনা গল্প প্রদ্যোত বলে—তার মুখেরও হাসি মিলিয়ে যায় বলতে বলতে। ডাকাতির গল্প, দাঙ্গার গল্প।

কপিলদেব মনে মনে প্রদ্যোতকে ঘৃণা করেও—তাকেই সঙ্গে করে রামঘাটি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছে।

এখানে এখন ওস্তাদ মামুদ সেখ। মামুদ নিরক্ষর নয়। নবগ্রামের ইস্কুলেই কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। কুস্তী করে লাঠি খেলে—চাষবাস করে। বছর চল্লিশেক বয়স, খুব যত্ন করে তেড়ী কাটে।

সে সমস্ত শুনে রাজী হয়েছে সানন্দে। শুধু প্রশ্ন করেছে—তাতো বুঝলাম গো উকীল ভাই কিন্ত একটা কথা শুধাই। কথাগুলো ভাল বটে। খুব ভাল বাত। জোর করে হাঁকডাক করে বেশী ভাগ টেনে না নিলে ভাগ জোতদার বেশী ভাগা দিবে না; নিতে হবে, জবরদস্তি ভাগ কায়েম করতে হবে। আর একজনা দুজনা করলে হবে না, জোট বাঁধতে হবে ইটাও ঠিক বাত। আজ দশজনা একবার জোট বাঁধলেই আবও বিশজনা পঞ্চাশজনা এসে জুটবে ইও ঠিক। কিন্ত ই বাবুটির তাতে লাভ কি? ই বাবুর তার জন্যে গিয়ে দরদ হল ক্যানে কও।

—উনি তোমাদের ভাল চান—মঙ্গল চান মামুদ।

—ওই তো ভাই ইথেই তো ডর লাগে উকীল ভাই।

—কেন ডর কিসের? তুই হাসালি মামুদ। তুইও ডর পাস তা হলে?

—পাই না? চোখ দুটো জ্বলে উঠল মামুদের।

—ডর পাই না? আমরা মানুষ নই উকীল ভাই? ছাওয়াল বয়সে দেখেছি—ইখানে হিঁদুতে মোছলমানে কত ভাব। ই উয়ার চাচা উ ইয়ার ভাতিজা। হিঁদুর ঘরে অন্দরে গেলছি—চাচি বলেছি ফুফু বলেছি—মিঠাই খেয়েছি। হিঁদু মোছলমানে পাল্লা চলেছে কুস্তীর আখড়ায়—গাঁয়ের ভিতর। গাঁয়ের বাহার হলেই আর হিঁদু মোছলমান নাই গাঁয়ে গাঁয়ে পাল্লায় গাঁয়ের ইজ্জত বড় হল। তা পরেতে হল লীগ। বলতো দেখি—কি হাল করে দিয়ে গেল? তুমি তো জান, তুমার কাছে তো ছাপি নাই—কলকাতায় দাঙ্গা লগল আমি গেছিলাম সেই দাঙ্গায়। কয় কি পাকিস্তানি কায়েম করার লাগি লড়াই। তা দু চারটা জান নিচি এই হাতে। ফিরে এলাম ভাবলাম পাকিস্তান হল কায়েম। বুঝলা খান চারেক লীগের ঝাণ্ডাও নিয়া আসছিলাম। তা পরেতে কি হল তা কও? পাকিস্তান হল—যারা পাকিস্তান পাকিস্তান করে নাচায়ে তুলেছিল তারা তো মজা করে রাজা উজীর সেজে গিয়া পাকিস্তানে গিয়া জেঁকে বসছে। আমরা হেথা পড়ে রইছি। হিঁদুদের সাথে পরাণ খুলে কথা কইতে গিয়া কেমন যেন অশ্বস্তি লাগে। তারাও বিশ্বাস করে না। এই গেল মাসে ভাসা-তোড়ে শাহপুরে হাঙ্গামা বাধাইল; তারাচরণ এসে নাকি খুব এক হাত খেলা দেখাইয়া গেছে। আমার হাতটা নিশপিস্ করছিল উকীল ভাই। কি তারার সঙ্গে এক হাত লড়াই দিয়া আসি। কিন্তু পারলাম না। কি জানি, কি হয়!

কপিলদেব মৃদু স্বরে বলেছিল—আপনি একটু ভুল করছেন। পাকিস্তানের ব্যাপার ধর্ম নিয়ে সেখানে হিন্দু মুসলমান আছে। আমাদের ব্যাপার ধর্ম নিয়ে নয়, এতে হিন্দু মুসলমান নেই। আছে শোষক এবং শোষিত, ধনী এবং সর্বহারা! এ পৃথিবীর সর্বত্র আছে—দুটি তিনটি দেশ বাদে। তাই আমাদের এতে পৃথিবী ভাগ হবে না—এক হবে।

হাঁ করে চেয়েছিল মামুদ কপিলদেবের মুখের দিকে। তার কথা শেষ হলে সে বলেছিল—কি কইলেন সব বুঝলাম না। তা' না বুঝি—আমি যা কইতে চাই—তাই শেষ করি আগে।

—বলুন।

—আপনারা কোন দলের লোক বলেন। কোন ঝাণ্ডা? লাল?

—হ্যাঁ। আপনি তো অনেক খবর রাখেন?

—তা রাখি। এই সে দিন ডাকাত আজাদ পড়তাম মশায়। জানি কিছু কিছু।

—আপনি অনেক জানেন।

—হাঁ। যুদ্ধের কালে নবগ্রামের বিজয়-বাবুরে তা হ'লে আপনি ধরায়ে দিছিলেন।

—না। ওটা ঠিক নয়। ধরিয়ে আমি দিই নি।

—তা না দেন। তার তরে আপনার সাথে ঝগড়া নাই আমার। বিজয়বাবুদের সাথে আমাদের বনাবন্তি নাই ঢের কাল। এখুন আপনারা এই কংগ্রেসীদের উৎখাত করবেন?

—দেশ চাইলে হবে। আমরা চাই দেশের ভাল। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই, চাষীর হাতে জমি দিতে চাই। কংগ্রেস ধনী জমিদারের সাথে মিতালী করছে—আমেরিকা ইংলণ্ডের তাবেদারী করছে—আমরা তা চাই না।

—তাই হ'ল গো। সি সব তো তোমরা গদীতে না-বসলে হবে না। সে বুঝলাম। কথাটা বুঝে নিতে হয় তাই বুঝে নিলাম! এখুন আমাদের কথা বলে নি।

—বলুন। হাসলে কপিলদেব। মামুদের কথায় সে খুশী হয়েছে। ধাতুটা

খাটী এবং শক্ত। পুড়িয়ে পিটিয়ে গড়ে নিতে পারলে মজবুদ হাতিয়ার হবে।

—শুনেন। ই কাজে লোক আপনি বেশী পাবেন না।

—কেন পাব না? এ দাবী তো অন্যায় নয়। ন্যায্য দাবী।

—হুঁ। দাবী ন্যায্য বটে কিন্তু পথটা জবরদস্তির।

—জবরদস্তি ঠিক নয়, কিন্তু জোর ছাড়া দাবী আদায় হয় কোন কালে? এই যে কংগ্রেস বলছে স্বাধীনতা এনেছে—যদিও কথাটা ঠিক নয়—তবু তর্কের খাতিরে তাই যদি মানি—তবে এ স্বাধীনতা আদায়ে কি কংগ্রেস জোর করে নি। আইন অমান্য করে নি?

—কথাটা ঠিক কইলেন না আপনি। আইন অমান্য কংগ্রেস করেছে কিন্তু জোর জবরদস্তি করে নি। ইংরেজের জবরদস্তি সহ্য করে তারে হার মানাইছে, সরম দিছে। নবগ্রামে আমি দেখেছি নিজের চোখে আর তারিফ করেছি। সাবাস দিছি। থাক তকরার ছাড়ান দেন। আমার কাছে যে কালে এসেছেন—সে কালে ওই বাতই উঠে না। আমার বাত হল—ইয়াতে মামলা আছে মোকদ্দমা আছে—সে সবের ভার নিবে কে?

প্রদ্যোত বললে—সে ঠিক আছে মামুদ। তার জন্যে ভাবিসনে।

—না, উকীল ভাই। আছে ভাবনার কথা। তোমার পসার থাকলে পর ভাবতাম না। পর মুহূর্তেই হেসে বললে—ঝুট বাত বললাম উকীল ভাই। তোমার পসার থাকলে পর ইখানে ই লড়াইটা তোমার সঙ্গেই আগে লাগত। তোমার যা বুদ্ধি তাতে তোমার টাকা থাকলে—ইখানকার বেবাক জমি তুমি বঁড়শী গাঁথা পুঁটি মাছের মত প্রতি টোপে তুলে খারুই ভর্তি করতে।

কপিলদেব বললে—এর তো কোন জামিন দেওয়া যায় না সেখজী। সেটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। আর এতে তো স্বার্থ লাভ আপনাদের; আমার নয়। ভেবে দেখুন আপনি।

সে দিন এই পর্যন্ত কথা বলেই তারা চলে এসেছিল। এর পর নিজেই এসেছিল মামুদ। আরও কথাবার্তা বলে গিয়েছে। বলেছে কপিলদেবের মত লেখাপড়া জানা মানুষ, আর একটা বড় দলের মানুষ যারা না কি একদিন কংগ্রেসের মত গদি দখল ক'রে বসতে পারে—তাদের কাছে জামীন আর চাইবে কি? আর জামীন যদি ঝুট হয় তবে তার দামই বা কি? কথায় বিশ্বাস করাই ভাল। ভেবে চিন্তে তাই বিশ্বাস সে করেছে। তারা নামতে রাজী আছে তবে ধান টানের কোন ভাগ খরচার জন্যে চাইলে তারা দেবে না। আর অন্য কোন জমির ধান যদি জোর ক'রে ভাগচাষীর ঘরে তুলতে সাহায্য তাদের করতে হয় তবে তার ভাগ তাদের পেতে হবে। কোন মসজিদের জমি হ'লে সেখানে ধান আটকাতে গেলে চলবে না। হিন্দুরা যদি বলে তবে হিন্দুর দেবতার ধানও ছেড়ে দিতে হবে। আর ক্যানেলের জমি নিয়ে হাঙ্গামায় তারা নেই। কারণ ক্যানেল হলে তারা বাঁচবে।

হেসে বলেছিল—তে-রঙ্গাই হোক আর লাল ঝাণ্ডাই হোক—গদী যার হাতে থাক—জমি তো আমাদের থাকবে। ধান তো আমরা পাব।

কপিলদেব তাতেই সম্মতি দিয়েছে।

এরপর একদিন কপিলদেবদের কর্মী সম্মেলনও হয়ে গিয়েছে। সেই সম্মেলনে এখানকার অঞ্চলে—আন্দোলনের পক্ষে যারা বাধা স্বরূপ তাদের নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পুরানো ফর্দ একটা ছিল—সেই ফর্দ সংশোধন করে নূতন ফর্দ তৈরী হয়েছে। পুরানো ফর্দে গৌরীকান্তের নাম ছিল না। কপিলদেবের ধারণা ছিল—হয় তো নিজের ভুল বুঝতে পারবে গৌরীকান্ত। বুঝতে পারবে কত বিরাট একটা সমর্থক দল সে হারাচ্ছে। অনুভব করবে কিভাবে তাকে তারা ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে। এবং নবগ্রাম অঞ্চলে সে স্থায়ীভাবে বাসও করতে আসে নি। কিছুদিন পরেই সে চলে যাবে এখান থেকে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যখন যাচ্ছে না তখন তার নাম এখানকার ফর্দেই অন্তর্ভুক্ত করেছে সে। গৌরীকান্তের প্রতি লেখক হিসাবে শ্রদ্ধা তার আছে। কিন্তু সে শ্রদ্ধাকে সে কোন মূল্য দিতে পারবে না। সে তার দলের শত্রু, সে দশের শত্রু, সে মানুষের শত্রু, সে পৃথিবীর প্রগতির পথের বাধা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি; তাকে ধ্বংস করতেই হবে!

এর মধ্যে একটা বড় মিটিং করবার চেষ্টাও হয়ে গিয়েছে। খুব সফল হয় নি সে চেষ্টা। কিন্তু কপিলদেব হতাশ হয় নি। হতাশ হওয়া তার ধর্ম নয়—তার ধাতু প্রকৃতিসম্মত নয়। সে পোস্টার লিখছে—সুকুর সাঁটিছে।

প্রদ্যোত পরামর্শ দিয়েছে—মিটিং এ ভাবে জমবে না। পথে ঘাটে কোন বিরোধী লোক পেলে তাকে ধ'রে আন। মজলিশ ডেকে তার অপমান কর। সেই অপমানের খেউড় দেখতে লোক জমবে।

প্রদ্যোত সাক্ষাৎ সয়তান। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা যায় না।

আজ রমা চলে যেতেই প্রদ্যোত মুড়ি দেওয়া কাপড়খানা খুলে উঠে বসল। বললে—বড় কড়া টান দিয়েছেন কপিলবাবু। ছিঁড়ে না যায়?

—ছিঁড়ে যাবে কোথায়?

—মরে যাবে। ও মেয়েকে আপনি জানেন না। তার চেয়ে—

—কি?

—আমার হাতে ওকে ছেড়ে দেন কপিলবাবু। আপনি পথটা ছাড়ুন। আর যদি চান তবে ওকে বিয়ে ক'রে বেঁধে ফেলুন। ভাল আপনি ওকে বাসেন। আমাকে বিয়ে করতে ও ঠিক চাইবে না। আপনাকে ঠেলবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

—না। এ দিক দিয়ে আপনার বুদ্ধি স্থূল প্রদ্যোতবাবু। ওকে ঘাঁটাবেন না ও চঞ্চল হয়েছে। ঠিক কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারছি না। (ক্রমশ

চিত্র প্রদর্শনী

চিত্রাংশু

স্কেচ—দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্রাংশু শিল্পগোষ্ঠীর ষষ্ঠ বার্ষিক প্রদর্শনী সম্প্রতি ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে খোলা হয়েছে (৫ই ফেব্রুয়ারী—২১শে ফেব্রুয়ারী), প্রদর্শনীটিতে শতাধিক জল-রঙ ও তেল-রঙের রচনা এবং স্কেচ স্থান পেয়েছে, এই নব্যপন্থী শিল্পিগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই কলকাতার রসিক সমাজের কাছে সুপরিচিত, কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের প্রদর্শনীটি যে উন্নত হয়েছে, তা বলা যায় না। শিল্প-রচনা সবক্ষেত্রে যখন স্বতঃস্ফূর্ত নয়,—যখন তা হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যমূলক, তখনই তাতে এসে যায় নানান দোষ-ত্রুটি, পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি তাতে সম্ভব হয় না। এই শিল্পিগোষ্ঠীর রচনায় এই দোষ-ত্রুটি এবারও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ'দের প্রায় প্রত্যেকেই উগ্র নব্যপন্থীদের অনুসরণ করতে ব্যস্ত, অথচ তা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ে তাঁদের মূল বক্তব্য বিষয়ই হারিয়ে যাচ্ছে। টেকনিকই যেন এ'দের রচনার মুখ্যবস্তু এবং এই টেকনিকটাকেই লক্ষ্য করে এ'কে যাওয়াতে মূল বক্তব্য বিষয় বহু জায়গায় হারিয়ে গেছে। যেখানে সেখানে যেমন-তেমন তুলির আঁচড়ে একটা কিছু আঁকবার দুর্বার আগ্রহে বহু ছবি একাকার ও ভারাক্রান্ত হয়েছে। দর্শককে ছবির বক্তব্য বিষয় বের করতে বিভ্রান্ত হতে হয়। নব্যদৃষ্টি ভঙ্গীর আমরা বিরোধী নই, কিন্তু সেই ধারায় কাজ করা যদি প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে আরও নিষ্ঠা, দরদ ও একাগ্রতা নিয়ে অনুধাবন করতে হবে মডার্ন রূপদক্ষদের রচনা। তা না হলে অদূরভবিষ্যতে এ'দের রচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ রচনা এবং স্কেচগুলো দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের। অন্যান্যদের তুলনায় তিনি অনেকাংশে আত্মস্থ, কিন্তু যেখানেই তিনি উগ্র নব্য-পন্থীদের অনুসরণ করবার প্রয়াস করেছেন টাচের কাজের মধ্যে দিয়ে—সেখানেই এসেছে ব্যর্থতা। এই ধরণের রচনাগুলো তার অন্যান্য রসোত্তীর্ণ রচনা-গুলোর সঙ্গে বিচার করলে হতাশ হতে হয়। অতিরিক্ত এবং যথেচ্ছভাবে তুলির আঁচড় অযথা নানান রঙের ব্যবহার এবং বক্তব্য বিষয়ে মনের কোণে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় ছবিগুলো ভারাক্রান্ত মনে হয়েছে। ড্রইংএর বিকৃতিও দৃষ্টিকটু। নব্যপন্থীদের অনুসরণে কাজ করাটাই কি বিকৃতিকে প্রাধান্য দেয়া? এ'র আঁকা সং অফ মাউণ্টেন (১) বর্ষার দিন (৬) ফ্লেম অফ দি ইউথ (৭) সেদিক দিয়ে অনেক বেশী রসোত্তীর্ণ হয়েছে, হাল্কা মোলায়েম রঙ ব্যবহারের গুণে তা আরও ভাল লাগে। কিন্তু সে তুলনায় ভিলেজ কর্ণার (২) প্রতীক্ষা (৮) সিটি সুবার্ব (১০) নৃত্য (১৫) মন্দির দ্বার (১৮) প্রভৃতি রচনা একান্ত দুর্বল। এ'র আঁকা কতকগুলো রঙীন স্কেচএর বর্ণবৈচিত্র্য ভাল লাগে।

অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওয়ে টু সুইট ফলসএ প্রদর্শনীর একটি উল্লেখ-যোগ্য রচনা। ছবিটির রঙ ভারী হৃদয়-গ্রাহী। এ'র আঁকা মনসুন (২৪) লাভিং লেন (২৬) আপার সিলং এবং ভারতীয়

প্রদীপ্ত যৌবন—দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

আঙ্গিকে অংকিত ম্যাসেঞ্জার অফ লাভ (২৮) প্রভৃতি রচনাগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্যামল দত্ত রায়ের থ্রু দি গেল (২৯) এবং সাঁকো (৩৫) তৈলচিত্র দুটিই ভাল হয়েছে। সুধীর বাগচির থ্রু দি ব্রিজ (৩৯) হ্যাপী ভ্যালী (৪০) সিটি কর্ণার (৪৪) প্রভৃতি রচনা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভাল লাগে। শুভচারী দাশগুপ্তর ক'একটি রচনাও মন্দ হয় নি।

নিখিল বিশ্বাস কিন্তু প্রতিবারকার মতই হতাশ করেছেন সব চাইতে বেশী। তিনি কি বলতে চান তা তাঁর নিজের কাছেই পরিষ্কার নয়। তা ছাড়া টাচের কাজে যে দক্ষতা দরকার, তা না থাকায় যথেচ্ছ এবং অতিরিক্ত রঙের প্রয়োগে ও তুলির আঁচড়ে তা দুর্বল হয়ে গেছে। দর্শককে বক্তব্য বিষয়ে খুঁজে বেড়াতে হয়। ওয়াটারিং (৫৩) ড্যান্সিং (৬০) আন-হ্যাপী কাপ্‌ল্ (৬৭) ছবিটির মেঘলা ও চিত্র এই পর্যায়ে পড়ে। সে তুলনায় তাঁর রেনি ডে (৬৩) ছবিটির মেঘলা ও আঁধারের এফেক্‌ট মোসন অফ জয় অনেকাংশে সার্থক হয়েছে।

জীবাণু যুদ্ধ

অমরেন্দ্রকুমার সেন

'মারি অরি পারে যে কৌশলে' বলে একটা কথা শোনা যায়। তাই মানুষকে মারবার জন্য মানুষ যত রকম পেরেছে, তত রকম অস্ত্র তৈরি করেছে। বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল, কামান, বোমা এতরকমের আছে যে, তাদের নাম আর পরিচয় দিতে গেলে পুরোপুরি বই লিখতে হয়। এইসব হাতিয়ার ও অস্ত্র ব্যতীত আরও কয়েকটি অস্ত্র আছে, যথা তেজস্ক্রিয় রশ্মি, গ্যাস এবং মারাত্মক রোগের জীবাণু। প্রথমোক্ত অস্ত্র সাহায্যে যুদ্ধ ঘোষণা না করেও শত্রুকে ঘায়েল করে দেওয়া যায়। শত্রু আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে শরীরে ও মনে, তার ক্ষেতের শস্য নষ্ট হয়ে যাবে, বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা লোপ পাবে এবং আরও কত কি হবে। কিন্তু কোথা থেকে ও কিভাবে এইসব ঘটছে, তা হয়ত তারা বুঝতেও পারবে না। তবে এই প্রকার ঘোষিত অথবা অঘোষিত যুদ্ধ এবং গ্যাস প্রয়োগ করে রীতিমতো যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি। কোরিয়ার রণক্ষেত্রে জীবাণু প্রয়োগে যুদ্ধ চলছে বলে শোনা যাচ্ছে।

আকাশ থেকে জীবাণু বৃষ্টি করলেই যে সেই দেশে ব্যাপকভাবে মহামারী দেখা দেবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এর মধ্যেও অনেক ব্যাপার থাকতে পারে। কিছুদিন আগে ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানিজেসনের প্রধান ব্যক্তি ডক্টর ব্রক চিজোম বলেছিলেন যে, এমন এক মারণাস্ত্রের সংবাদ মানুষ জানতে পেরেছে, যার কাছে অ্যাটম বোমা খেলনা বলে মনে হবে। সেই মারণাস্ত্রের মাত্র সাত আউন্স ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বটুলিনাস টক্সিন নামে একটি ভীষণ জীবাণুর তিনি উল্লেখ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সংবাদ শান্তিপ্রিয় মানুষকে শঙ্কিত করে তুলবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, ঠিক নিজের ইচ্ছানুযায়ী মারাত্মক রোগ জীবাণু প্রয়োগ করে একটা গোটা দেশের সমস্ত লোককে মেরে ফেলা যায় কিনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জার যে মহামারী হয়েছিল, তাতে যুদ্ধে নিহত মোট জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক মারা গিয়েছিল। সম্ভবত এই দেখেই কারও মাথায় উদয় হলো যে, বাঃ এইতো এক সহজ অস্ত্র পড়ে রয়েছে! অত কামান, ট্যাঙ্ক, বোমা, গোলাগুলীর দরকার কি? ল্যাবরেটরিতে বসে কিছু টাইফয়েড, কলেরা কি থাইসিসের জীবাণুর চাষ করো, তারপর সেইগুলি শত্রুরাজ্যের মধ্যে কোনোমতে ছেড়ে দাও! ব্যস্, কিছুদিন পরে সব ঠান্ডা। যুদ্ধ করবে, মড়া পোড়াবার কি গোর খোঁড়বার লোকই পাওয়া যাবে না ত যুদ্ধ করবে কে? অথচ তাদের তৈরি বা মজুত যা কিছু কারখানা কিংবা গমের বস্তা সর্বকিছু এমনই পাওয়া যাবে। বোমার ঘায়ে কিছুই নষ্ট হবে না। রাস্তাঘাট, বাড়িঘরদোরও সবই ঠিক থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা কি, ঐ সব বড় বড় অস্ত্র অপেক্ষা রোগের জীবাণু অনেক সস্তায় তৈরি করা যায়।

ইংরেজি ১৯২৫ সালে জেনিভাতে এক সম্মেলন হয়, তাতে জার্মানি সমেত বহু দেশ যোগদান করেছিল। ঐ সম্মিলনীতে ঠিক হয় যে, যুদ্ধের সময় কোনো দেশ জীবাণুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবে না। ইংরেজ গুপ্তচর বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মানিতে নাৎসী শাসনের সময়েও অস্ত্ররূপে ব্যবহারের জন্য জীবাণু নিয়ে কোনোরকম গবেষণা অথবা পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়নি। মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের সংবাদেও প্রকাশ যে, জাপানও কখনও অনুরূপ অস্ত্র ব্যবহার করেনি, কিন্তু সোভিয়েট সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ৫৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা এবং তাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করার জন্য ১২জন জাপানী অফিসার অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ বিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে, ১৯৩৬ সালে মাঞ্চুরিয়ার হার্বিনের কাছে এক বিরাট গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে মোট দু হাজার লোক কাজ করত। তার মধ্যে ১৫০জন ছিল জীবাণুবিদ্। এখানে প্লেগ, টাইফাস এবং অ্যানথ্র্যাক্সের জীবাণু এবং সেই জীবাণুদের বহন করে নিয়ে যাবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় মাছি উৎপন্ন করা হতো। এই গবেষণাগারের জীবাণুদের সাহায্যে ১৯৪২ সালে চীন দেশে প্লেগ মহামারী সৃষ্টি করা হয়েছিল এমন অভিযোগও করা হয়েছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিও যে জীবাণু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন, ১৯৪৬ সালে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত 'মার্ক রিপোর্ট' থেকে তা জানা যায়। তবে এই রিপোর্টের প্রচার প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ সরকারের অনুরোধে মার্কিন সরকার জীবাণু সম্পর্কিত গবেষণায় আরও জোর দেন এবং এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ইউ. এস. আর্মি কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার সার্ভিসের ওপর। মেরিল্যান্ড রাষ্ট্রের ক্যাম্প ডেট্রিক নামক স্থানে গবেষণাগারাদি স্থাপন করে কাজ শুরু করা হয়। সেটাতে মোট ৩৯০০ জন ব্যক্তি কাজ করত। কৃত্রিম পরীক্ষার জন্য ইউটা এবং মিসিসিপিতে দুটি পরীক্ষাগার বসানো হয়। ইন্ডিয়ানাতেও একটি পরীক্ষাগার বসানো হয়েছিল। মার্কিন নৌ-বিভাগ কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক পরীক্ষাগারের আয়োজন করেছিলেন। মার্কিন সরকার এই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবাণুযুদ্ধ সম্পর্কে যে গবেষণা চালানো হয়েছিল, তার পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ ছিল; যথা—(১) প্রচুর পরিমাণে রোগ জীবাণু উৎপন্ন করার উপায় ও সুযোগ নির্ধারণ করা, (২) এই সকল জীবাণুর বিষক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধি করা, (৩) কীটপতঙ্গ অথবা জীবজন্তু সাহায্যে রোগজীবাণু ছড়াবার জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা, (৪) মারাত্মক জীবাণু চেনবার কৌশল আয়ত্ত করা এবং (৫) জীবাণুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা, বিশেষ করে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য এবং জল সরবরাহ রক্ষা করা এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে প্রতিষেধক টিকে ও ইঞ্জেকসন দেওয়া।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও তীক্ষ্ণ জীবাণু-অস্ত্র, মার্কিন মুল্লুকে যা উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা হলো বটুলিনাস টক্সিন এবং ক্যাম্প ডেট্রিকে কিভাবে ও ক পরিমাণে এই মারাত্মক বস্তুটি উৎপন্ন করা হয়েছিল, তাও প্রকাশ করা হয়েছিল। অবশ্য বটুলিনাস জীবাণু খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং এর নিঃসৃত টক্সিনের খুব সামান্য পরিমাণ, বোধ হয় আলপিনের ডগায় যতটুকু উঠতে পারে, তার চেয়েও কম, একটা মানুষকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে। তাছাড়া আকাশ থেকে বিমান সাহায্যে ছড়িয়ে সবজি ও শস্যাদি ধ্বংস করবার জন্য একরকম 'হর্মোন' তৈরি করা হয়েছিল। আসলে এইরকম হর্মোন গাছ নিজের বৃদ্ধির জন্য উৎপন্ন করে, কিন্তু আধিক্য হলে গাছ মরে যায়। অতএব বিমান থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে এই হর্মোন ছড়িয়ে দিলে সবজি ও শস্য নষ্ট হতে বিলম্ব হবে না। দু-রকমের হর্মোন নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল, একরকম সবজি নষ্ট করতে পারে আর একরকম শস্যাদি। শোনা যায় যে, মার্কিন সরকার গত মহাযুদ্ধের সময় এই রকম এক জাহাজ হর্মোন প্রশান্ত মহাসাগরে পেরণ করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল জাপানের ধানের ক্ষেতের ধান গাছ ধ্বংস করা। যুদ্ধশেষেও জীবাণু সম্পর্কিত পরীক্ষা চালানো হচ্ছে, তবে পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের মতো অত দ্রুত গতিতে নয়।

যুদ্ধশেষে বৃটেনেও জীবাণুযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, যার নাম মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট। পোর্টন শহরে এই উদ্দেশ্যে খুব বড় একটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে অ্যাণ্টিবায়োটিক পর্যায়ের ওষুধও তৈরি করা হবে। কিন্তু এই গবেষণাগারে কাজ করার জন্য লোক সংগ্রহ করবার সময়েই হলো মুশকিল। ডাক্তার, জীবাণুবিদ্, পশু চিকিৎসক কাউকেই কাজ করাতে রাজি করানো যায় না। যে গবেষণাগারের উদ্দেশ্য হলো ধ্বংস, সেখানে কোনো মানুষকে কাজ করতে রাজি করানো সত্যই কঠিন, এমনকি উচ্চ বেতনেও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সব লোক সমান নয়, সেই কারণে কিছু লোক পাওয়া গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ তেজস্ক্রিয় সন্ধানী পদার্থের সাহায্যে সেই পরীক্ষা চালাচ্ছে, যার দ্বারা জানা যাবে আকাশ থেকে পতিত জীবাণুসমূহ মানুষের দেহের কোষগুচ্ছের মধ্যে কি করে প্রবেশ করে। তেজস্ক্রিয় ফসফরসের মধ্যে নিউমনিক প্লেগের জীবাণু উৎপন্ন করে সেই জীবাণু ইঁদুরের গায়ে খুব সূক্ষ্মভাবে কুয়াশার মতো করে ফেলা হলো। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঁদুরগুলিকে মেরে ফেলে তাদের শবব্যবচ্ছেদ করা হলো এবং তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ গাইগার কাউণ্টার নামক যন্ত্র যাতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ধরা পড়ে, তাই দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, শরীরের প্রায় সর্বত্রই জীবাণু প্রবেশ করেছে, তবে কোনো অংশে বেশী, কোনো অংশে কম, যেমন ফুসফুসে যে পরিমাণ প্রবেশ করেছে, তার প্রায় দ্বিগুণ প্রবেশ করেছে অন্ত্রে। এই পোর্টন গবেষণাগার থেকে ১৯৪৭ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, স্ট্রেপ্টোমাইসিন নিউমনিক প্লেগ আরোগ্য করতে পারে। উক্ত রিপোর্ট পাঠে আরও জানা যায় যে, পরীক্ষা কার্যের জন্য পোর্টনে একটি যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল, যার দ্বারা নিউমনিক প্লেগ জীবাণু কুয়াশার মতো ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তবে জীবাণুযুদ্ধ বিষয়ে যতদূর পরীক্ষা করা হয়েছে, তার দ্বারা জানা যায় যে, নিম্নলিখিত রোগ জীবাণুগুলি ছড়িয়ে হয়ত মহামারী সৃষ্টি করা যায়; যথা,—অ্যানথ্রাক্স, টুলারেমিয়া (র‍্যাবিট ফিভার), ব্রুসেলোসিস (আনডুলেণ্ট ফিভার, সাইটাকোসিস (প্যারট ফিভার) নিউমনিক প্লেগ, যার জীবাণু নিঃশ্বাসের সঙ্গেই মানুষের শরীরে প্রবেশ করে; হেমোলিটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই যা রক্ত বিষিয়ে দিতে পারে। মানুষের দুষ্ট বুদ্ধি এখানেই শেষ হয়নি। তারা নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ে জীবাণুগুলির শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারে। স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরেলিয়াস নামে জীবাণুকে পেনিসিলিন ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু এই জীবাণুর ওপর যদি আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ করা হয়,

তাহলে পেনিসিলিন তাদের কিছুই করতে পারে না। কতকগুলি রোগজীবাণু সোজা-সুজি মানুষকে আক্রমণ করতে পারে না, কোনো জন্তু অথবা কীটের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে, কিন্তু কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে সে বাধা দূর করা হয়েছে। এছাড়া মানুষ আরও একটি দুষ্ট বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে, তা হলো তীব্র জীবাণুর শক্তি হ্রাস করা, সৎ উদ্দেশ্যে নয়! এই কমজোরী জীবাণুগুলি মানুষকে মারতে পারে না, কিন্তু তাদের দুর্বল করে দেয়, ফলে আক্রমণকারী সৈন্যের পক্ষে এই কমজোরী রাষ্ট্রকে সহজেই পরাজিত করা সম্ভব হয়। দশ হাজার মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা দশ হাজার রোগগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তির ঝঞ্ঝাট পোয়ানো অনেক হাঙ্গামা। তার ওপর সেই সময় আবার শত্রুর আক্রমণ!

যুদ্ধের সময় জীবাণু ছড়িয়ে মহামারী সৃষ্টি করবার জন্য তিনভাবে জীবাণু ছড়াবার পদ্ধতি অবলম্বন করার সম্ভাবনা আছেঃ

১। বিমান থেকে অথবা পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে পানীয় জল জীবাণু-সিক্ত করে দেওয়া,

২। জীবাণুভর্তি বোমা নিক্ষেপ করা, বিমান অথবা রকেট থেকে অথবা

৩। মশা মারবার জন্য যেমন পিচকারি থেকে ডি-ডি-টি মেশানো তেল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, সেই রকমভাবে বড় পিচকারির মতো যন্ত্র সাহায্যে জীবাণু-মিশ্রিত গ্যাস ছেড়ে দেওয়া।

এই তিন প্রকার পদ্ধতি ব্যতীত রোগ-গ্রস্ত ইঁদুর, পোকা বা মাছি লক্ষ্যস্থলে ছেড়ে দেওয়া যায়।

তবে কথা আছে। প্রথম পদ্ধতি কার্যকরী না হতেও পারে। এইভাবে অনেক জল দূষিত না হতেও পারে। তাছাড়া যেখানে জল পরিশ্রুত করা হয়, সেখানে জীবাণুগুলি আটকে যেতে পারে। এই কলকাতা শহরেই টালা-কাশীপুর অঞ্চলে যেখানে সর্বদা পরিশ্রুত জল পাওয়া যায়, সেখানে কলেরা মহামারী দেখা দেয় না।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অবশ্য কার্যকরী হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টিনের তৈরি চার পাউন্ডের ওজনের বোমা তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে জীবাণু ভরা থাকে। এই বোমা বিমান থেকে নিক্ষেপ করলে, বোমা ফেটে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। বাতাসের বেগ ও গতির ওপর এর সাফল্য নির্ভর করে। শেষোক্ত পদ্ধতি কোনো কোনো স্থানে সফল হয়েছে বলে শোনা যায়।

তবে দ্বিতীয় বোমা ফেলতে হলে বহু বোমা ফেলতে হবে। চার টন বোমা এক বর্গ মাইল স্থানকে জীবাণুসিক্ত করতে পারে এবং সেই স্থানের অধিবাসী-দের যদি প্রতিষেধক না নেওয়া থাকে, তাহলে মাত্র অর্ধেক লোক রোগগ্রস্ত হতে পারে। তবে এই উপায়ে কারখানা অঞ্চলের শ্রমিকদের সহজেই দুর্বল করে দেওয়া যায়, যার ফলে উৎপাদন হ্রাস পাবে। বিপক্ষ দলের এও কম লাভ নয়।

তবে আর একটা পদ্ধতি কার্যকরী হয়েছে। তা হলো শস্যাদির শত্রু জীবাণু তাদের ওপর ছড়িয়ে দেখা গেছে যে, শস্য নষ্ট করা যায়। তবে অ্যাটম অথবা অন্য বোমা ফেলে ক্ষতির পরিমাণ একটা অনুমান করা যায় ,কিন্তু জীবাণুযুদ্ধের ব্যাপারে দূর থেকে কিছু অনুমান করা শক্ত। জীবাণু ক্ষেপন করে শত্রুর কতখানি ক্ষতি হলো, তা স্থির করা মুশকিল। এর কার্যকারিতা স্থানীয় বাতাসের বেগ, উত্তাপ এবং জনসাধারণের রোগপ্রবণতার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। জীবাণু ছড়িয়েই যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সকলেই রোগাক্রান্ত হয়েছে, তাহলে ভুল করা হবে। অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশ ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে তাই একবার তাদের মধ্যে জীবাণু প্রয়োগ করে মহামারী সৃষ্টি করবার চেষ্টা চললো, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই চেষ্টা বিফল হয়েছিল। অনেক সময়ে ল্যাবরেটরিতেও পরীক্ষা করবার জন্য রক্ষিত জীবজন্তুকে রোগগ্রস্ত করা যায় না। জীবাণুযুদ্ধের একটা বিপদও আছে; তা হয়ত আক্রমণকারীকে প্রতি-আক্রমণও করতে পারে।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি ভালো থাকে এবং নিয়মিত সেখানে যদি টিকে এবং প্রতিষেধক ইঞ্জেকসন দেবার ব্যবস্থাদি থাকে, তাহলে জীবাণুর আক্রমণ সহজে তাদের কাবু করতে পারে না। অপরিষ্কার স্থান ও অপরিষ্কার ব্যক্তিরাই রোগ-জীবাণুর প্রথম লক্ষ্যস্থল। যেখানে ময়লা সেখানেই রোগ। কাগজে কলমে অনেক কিছুই ভালো মনে হতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপরীত হতে পারে। অস্ত্র হিসেবে রোগজীবাণু অ্যাটম বোমাকেও ম্লান করে দিয়েছে, এ অতিশয়োক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জয়ন্তিয়া পাহাড়

সুশীলকুমার গুপ্ত

জীবনের কোন মানে, জিজ্ঞাসার নূতন উত্তর
পাওয়া যায় এলে এই জয়ন্তিয়া পাহাড়ের 'পর!
সুপ্রসন্ন জীবনের প্রশান্তির আশ্চর্য উৎসব
স্তব্ধতার রাজ্য জুড়ে। প্রস্ফুটিত প্রাণের সৌরভ
কস্তূরী মৃগের মত ছুটে ফেরে হ'য়ে আত্মহারা।
পাইন শাখার হাতে উদ্ভাসিত মনের ইশারা।
পাহাড়ের চূড়া থেকে দুগ্ধধারা মত ঝর্ণা নামে
মাটির শিশুর মুখে। ঊর্ধ্ববাহু প্রাণের প্রণামে
উন্নত গিরির সারি। আকাশের নিলীমার হাত
আশীর্বাদ ঢালে। নামে উচ্ছ্বসিত রৌদ্রের প্রপাত
অফুরন্ত কলহাস্যে জীবনের তোলে জয়ধ্বনি।
জ্যোৎস্নার ঐশ্বর্য নিয়ে আসে মুগ্ধ প্রেমের রজনী।

প্রাণের উজ্জ্বল অর্থ যারা ভোলে অশান্তি-অসুখে
এসো শুধু একবার জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বুকে!

নগর-সংকীর্তন

রূপদর্শী

কলৌ নামৈব কেবলম্‌। কলিতে শুধু নামই সার। নাম গানই হচ্ছে কীর্তন। ক-এ কৃষ্ণ নয়, কালী নয়, কলির শহর কলকেতা, আমার তাই কলকেতা কীর্তন। কোথা দিয়ে শুরু আর কোথা গিয়ে সারা তা ভেবেই দিশাহারা।

কলকেতার রূপের কি শুরু শেষ আছে? মহিমার কি আদি অন্ত আছে? কি করে ফোটাবো? গদ্যে বলবো না পদ্যে?

কোন শব্দ কোন ভাষা
পূরাবে যে অভিলাষা
তাহা কিছু না পাই উদ্দেশ।
জয় জয় কলিকাতা
মোহ নাশা মোক্ষ দাতা
তব ক্রোড়ে হই যেন শেষ॥

এই আমার অন্তিম প্রার্থনা। পালার শুরুতে একেবারে আর্থের চাওয়া চেয়ে নিয়ে গাওনা শুরু করলুম।

খোশ গল্পটা সবাই জানেন। একবার চারটে অন্ধকে হাতী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। হাত বুলিয়ে হাতী দেখে চারজনে চারটে রিপোর্ট দিলে। জবাব-গুলো একেবারে সরকার আর বিরোধী দলের সওয়াল জবাবের জ্ঞেয়াত-গোত্তর। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। যার হাত হাতীর পায়ে ঠেকল, সে বললে, হাতীর চোহারা থামের মতো, যার হাত কানে ঠেকল, সে বললে, হাতী কুলোর মত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তত্ত্বের গন্ধ পেলে যাদের নোলায় জল সক্‌ সক্‌ করে তাঁরা বলেন, মুরুখ্খু, গল্প পড়েই ক্ষান্ত দিও না, এগিয়ে গেলেই 'মরাল' পাবে। হাতীটা হল পৃথিবী, আর আমরা বেবাক ব্যক্তি ওই অন্ধ দর্শক। হাত বুলিয়েই ঠাহর করে যাচ্ছি। আমাদের জ্ঞানের দৌড় ওই অব্দিই।

বলতে পারতুম, আমার দেখাটাও এমনিতরো, কিন্তু তাতে সত্যকথন হত না। আমার কলকেতা দেখা চার অন্ধের হাতী দেখা নয়, এক অন্ধের হাতী দেখা। তাই কখনো থাম দেখব, কখনো কুলো দেখব, কখনো শুঁড়কে ভাববো বোম্বাই জোঁক।

অতএব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়তাড়া না কষে গুরু গোঁসাই স্মরণ করে যাত্রা সুরু করলুম। কলকেতা কলকেতা তো খুব করে যাচ্ছেন। পিওর কলকেতা কতটুকু? না যতটুকু কর্পোরেশনের চৌহদ্দি। অতএব সেই পথেই চলি। পথের কথাই আগে বলি।

উত্তর থেকে আসতে চান? কাশীপুর

রোড থেকে কাশীনাথ দত্ত রোড। সেখান থেকে 'নাক বরাবর ডান দিকে চোখ রেখে' চলুন কালীচরণ ঘোষ রোড, তারপর রামকৃষ্ণ ঘোষ লেন। এবার খানিক দক্ষিণে আসুন, ব্যস্ আগের কালের ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানীর শড়ক। 'রেল কম ঝমাঝম্'। যদি বরাতকে পাকিস্তানে চালান না করে থাকেন তো 'পা পিছলে আলুর দম' বনবার কোন চান্স নেই। রেল শড়কে পাশ কাটিয়ে ঝপ্ করে ঢুকে পড়ুন নয়া খালের পাশে। ধার ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই বেলেঘাটার খাল। বেলেঘাটা খালের দক্ষিণ পাড় দিয়ে পশ্চিম দিকে টাল খেলেই পাগলাডাঙ্গা রোড। চিংড়িঘাটা রোডের সঙ্গে গোত্তা খেয়ে

দক্ষিণমুখী খানিক ছুটুন। তারপর চিংড়ি শেষ হল তো মুখ বদলে নিন ট্যাংরা দিয়ে। ট্যাংরা রোড। সাউথ ধরে পূববুধারে এগুলেই পাবেন তপ্‌সে। খা-সা মশাই। এতো বাউণ্ডারী নয়, একেবারে মাছের বাজার। দরদামের সময় নেই, ধরো আর থালুয়ে ভরো। তপ্‌সে নর্থকে কায়দা করে ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন এণ্টালী-পার্ক সার্কাসের হে পারে, হিউজ রোডে। হিউজ রোডের পুবে ফুট ধরে ধরে গুটি গুটি এগুলেই 'আহা ভেতরে বাহিরে সে কী মেশামেশি।' একেবারে 'টাইনে'র বাহে আর গ্রামের 'বাহে'তে মোলাকাত। উত্তর বাঙলার গ্রামের লোকদের বাহে বলে। তাদের রীতি প্রকৃতি সরল বলে হুঁশিয়ার লোকেরা তাঁদের সঙ্গে মজা মেরে দুটো সুখ সুল্‌পো উশুল করে নেন। একবার এক বাহে দুধ বেচতে এসেছে। বাবু শুধুলেন, কি হে দুধ ভাল তো? হেঁ হেঁ করে বাহে বললে, কর্তা কি যে বলেন? একেবারে আসল গোরুর দুধ। দুধ যে নকল গোরুর নয় তা জানি, বলি খাঁটি তো? খাঁটি হবে না বলেন কি, দুধ তো নয় বটের আঠা। কিন্তু আমার যে জল মেশানো দুধ চাই হে, ডাক্তারের হুকুম। বাহে একগাল হেসে বললে, কিছু কি আর না মিশিয়েছি স্যর, আমরা টাইনের (টাউনের) বাহে, খাঁটি দুধ বেচিই না।

হিউজ রোডের পুবে মুড়োটা নাক ঠেকিয়েছে দুটি প্রমাণ সাইজের পয়নালির সঙ্গে। একটি বেশ চালাক চতুর দেখলেই মনে হয় টাইনের। আর অন্যটি আশপাশ মফস্বলের। তপ্‌সে রোড কয়েক চক্কর এধার ওধার মেরে আবার সরে পড়েছে। কলকেতার সীমানার গেটে পাহারা দেবার ডিউটি তারপর থেকে খানিকক্ষণ পড়েছে তিলজলা মসজিদবাড়ী লেনের উপর। এ তল্লাটে আমদানী শুধু চামড়ার আর ছুট লোহা আর ধোপা আর কাঠ মিস্ত্রীর। গন্ধে তিষ্টুনো দায়। একটু পা চালান মশাই। তারপর পুব দক্ষিণে পাড়ি মারলেই তিলজলা রোড। হরেক রকম চিজ বোঝাই তেত্রিশ বাসের একটুক্ষণের সঙ্গী। যেন হাটুরে পথের সাথী। মিঞা, যাবেন কদ্দুর? রাজা বাজার, আপনি? চাঁদনী চক। লেন তবে বিড়ি ধরান। আচ্ছা, আদাব আরজ আদাব আরজ। ভাবখানা এই বেশ যাচ্ছিল, তিলজলা মসজিদ-বাড়ী, দক্ষিণে মোড় নিয়েই ফ্যাসাদ বাধালে। হুস-হাস ট্রেন যাচ্ছে। খটাংখট মালগাড়ি। সেরেছে। বের হই কোথা দিয়ে। ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের হাত যদিও এড়ালুম, ফের পড়লুম গিয়ে বজবজ লাইনের কবলে। জট ছাড়িয়েই রসা রোড। এবার একটু জিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এক কাপ গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে চাঙ্গা শরীরকে আরো দক্ষিণে ঠেলে দিন। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। আরো দক্ষিণে যান তো পোর্ট কমিশনারের ডক বানাবার বিরাট পতিত জমি। ছড়িয়ে আছে ওদিকে সেই ডায়মণ্ডহারবার রোড ইস্তক। এই তামাম ভুঁই চক্কর খেয়ে আর ধারে পড়লেই সার্কুলার গার্ডেন রীচ খিচ খিচ করে উঠবে। গার্ডেন রীচের এই মাথা আর সেই মাথা দৌড় মেরে পুব দিকে এগুলেই প্রিন্স দিলওয়ারজার গলি। তারপর পোর্ট কমিশনারের জমি। আর তারপরই ভোঁপ ভোঁপ জাহাজ ইস্টিমারে শুয়োর-ঠাসা হুগলী নদী। পাড় ধরে পাড় ধরে এগিয়ে যাও সেই পশ্চিম দিকে। আরো আরো আরো। হ্যাঁ, এই হল পরামাণিক ঘাট রোড। তারপর কাশীপুর রোড। যেখান থেকে যাত্রা করা, সেই ঠেঁয়ে আবার এসে পড়া। সুকুমার রায়ের মতো 'আমড়াতলার মোড়' থেকে যাত্রা করে 'চলতে চলতে দেখবে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে।' তারপর

'দেখবে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে
পথ গিয়েছে কত,
তারি ভিতর ঘুরবে খানিক
গোলক ধাঁধার মতো।
তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে
মোচড় মেরে,
ফিরবে আবার বাঁয়ের দিকে তিনটে
গলি ছেড়ে।
তবেই আবার পড়বে এসে আমড়াতলার
মোড়ে।'

একটার পর একটা রাস্তা দিয়ে শিকল গড়ে প্রায় একত্রিশ বর্গমাইল

পরিমাণ যে জায়গাটুকু কর্পোরেশন বেঁধে রেখেছেন সেইটুকুই কলকেতা। বিঘের হিসেবে উনোষাট হাজার আর তারো উপর একানব্বই বিঘে জমির পরে শহর কলকেতা ঘর বাড়ী পার্ক পুকুর ইস্তক গড়ের ময়দানখানা ট্যাঁকে পুরে খাড়া।

শুনেছি কাশী নাকি বিশ্বেশ্বরের খাস তালুক। সেখানে হাজার পাপ করেও কেউ যদি মরে তো তার আখেরি মোকাম কৈলাসে। যমের বাপের সাধ্যি কি কাশীর সীমানায় ঢোকে। যমের দাপট কাশীতে গিয়েই তেজ পক্ষের স্বামীর মতো ঠাণ্ডা মেরে যায়। ঠিক তেমনি ব্যাপার কর্পোরেশনের। এই একত্রিশ বর্গমাইলের মধ্যে তার দাপট যমকেও বাপ ডাকিয়ে ছাড়ে। কিন্তু কেল্লা এলাকায় দাদার আমার সব পাওয়ার খোলা শিশির কর্পূর হয়ে যায়। কেল্লা ইজ কেল্লা। এখনো সে ফোর্ট উইলিয়ম। স্বাধীন বাঙলায় ক্লাইভ স্ট্রীট নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে গেল। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার হল আজাদ হিন্দ বাগ। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম, ফোর্ট উইলিয়মই থাকল। তার টিকিতে টান দেবে অমন লম্বা হাত কার। ফোর্ট উইলিয়ম কলকেতার কাশী। তার বিধি-বন্দোবস্ত আলাদা। কর্পোরেশন তার দেওয়ালে দাঁত ফোটাতে পারে না। আরো খানিকটে জায়গা—হেস্টিংসের কিছুটা, ক্লাইভ রো-এর উত্তর মাথা দক্ষিণ মাথা আর স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে হুগলী নদীর কিনারের জায়গাটুকু কর্পোরেশনের ট্যাক্সকে লবডঙ্কা দেখায়।

শহর কলকেতা শুধু বাঙলার নয়, বাঙালীরও শুধু নয়, তামাম দুনিয়ার। যার আর কোথাও ঠাঁই নেই তার কলকেতা আছে। বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজও শহর। কিন্তু কলকেতার পাশে কিছু না। এত লোক, এত বৈচিত্র্য তারা কোথায় পাবে? এক বর্গমাইলে ৭৭ হাজারের উপর লোক বাস করে এখানে। সন ১৬৯৮ সালে কোম্পানী মাত্তর ১৩০০ টাকায় তিনখানা গ্রাম ইজারা নিয়ে কলকেতার পত্তন করে। আঠারো বচ্ছর পরে লোক গুণে দেখা যায়, সব নিয়ে লোক হলেন একুনে বারো হাজার। আর স্বাধীনতা পাবার পর ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেল সাড়ে পঁচিশ লাখের কাছাকাছি। প্রতি ঘণ্টায় গড়ে সাতজন জন্মাচ্ছে, আর প্রতি দু ঘণ্টায় গড়ে নয়জন মরছে।

হাওড়া ইস্টিশান থেকে মোগলসরাই সিধে চারশ এগারো মাইল। মেল গাড়ী চেপে বারো ঘণ্টা দৌড় দিলেই মোগল-সরাই। কলকেতা শহরে যে রাস্তাগুলো তাদের মাদী মদ্দা আণ্ডা বাচ্চা ধরে ধরে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে তারাও হাত বাড়িয়ে মোগল সরাইকে ছুঁই-ছুঁই করে।

অলিতে গলিতে কলকেতা একেবারে গোলকধাঁধা। গইগেরামের লোকের মতো সদাসতর্কতার আঁচলে গিঁট দিয়ে না চললেই গুব্‌লেট। একবার, তখন আমি কাঠ বাঙ্গাল, কলকেতা দেখতে এসেছি এক মুরুব্বীর সঙ্গে। শেয়ালদায় নামা মাত্তর আমার আক্কেল সেই যে ল্যাজ তুলে দৌড়ুলো আর তার নাগাল পেলুম না। মুরুব্বীটি এর আগেও বার কতক এসেছেন। তাই তার ভরসায় না' ভাসিয়ে হালটি তাকে দিয়ে পালের দড়ি ধরে বসে রইলুম। মুরুব্বী বললেন, এই খুব কাছেই, বৌবাজার আর চিত্তরঞ্জন এভে-নিউয়ের মোড়টা। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট, বাসে চড়ে আর কি হবে, কি বলিস? সায় দিলুম। কলকেতায় যা দেখি তাই ভাল লাগে। মফঃস্বলের লোক। প্রত্যহ যা দেখি, প্রত্যহ যা শুনি, তার সঙ্গে কলকেতায়-পা-দেওয়া দিনের কোনো সম্পর্ক নেই। এ একেবারেই সৃষ্টিছাড়া। মফস্বল যদি গোরুর গাড়ী তো কলকেতা হাওয়া গাড়ী। কি গতি! কত প্রাণবন্ত! জড়তাহীন উদ্দামতা। চিরযৌবনা উন্মাদনা আর উত্তেজনা। বৌবাজারের ফুটপাতে পা দিতে না দিতেই একেবারে আলুর দম! মুরুব্বী বললেন, লাগল না কি হে ছোকরা। ক্যাবলার মতো জবাব দিলুম, আজ্ঞে না। কিন্তু মনে মনে জানলুম কলকেতা আমাকে কোল দিলে। কানে কানে বললে, এখানে গতি। খুট খুট পা ফেলো না। চুল উর্ধশ্বাসে। গুণে গুণে পা ফেললে আবার পপাত হতে দেরী হবে না।

ধুলো ঝেড়ে পায়ের অসাড়তা ভেঙে উঠে দাঁড়ালুম। বুঝলুম ঝিঁঝিধরা গেঁয়ো পায়ে এখানে চলা যাবে না। এর চলন স্বতন্ত্র। সেই থেকে কলকাত্তাই চলন রপ্ত করতে চেষ্টা করছি। পেরেছি তা বলব না। কলকাত্তাই চলন এ যুগের চলন। ভাল না খারাপ, এগুচ্ছি কি পিছুচ্ছি সে হিসেব আমার রাখবার নয়। এখানে চলাটাই নয়, ঠিক চালে চলাই আসল। ভুল ঠিকানায় পেঁছে গেলেও মজার কমতি নেই। অতএব চল চল কলকেতা, কলির কলকেতা। কলিতে সার শুধু কলিকাতা। আমার কেত্তন, এরই কেত্তন।

চলচ্চিত্রের নতুন পদ্ধতি—সিনেরামা

পংকজ দত্ত

চলচ্চিত্র জগতে একটা নতুন কথা যোগ হয়েছে—সিনেরামা (Cinerama)। এটা হলো চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রদর্শনের একটা নতুন পদ্ধতি, যা সারা বিশ্বেরই চলচ্চিত্র শিল্পে যুগান্তর আনার ইংগিত দিয়েছে, যেমন একটা যুগান্তর এসেছিলো পঁচিশ বছর আগে নির্বাক ছবি সবাক হবার সময়। গত অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে থিয়েটারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সিনেরামা প্রথম জনসমক্ষে উপহৃত হয়। এই প্রথম দেখা মাত্রই সিনেরামা পদ্ধতিতে তোলা এবং প্রদর্শিত ছবি দর্শকদের এতোই মোহিত করে দেয় যে, পদ্ধতিটির আবিষ্কার এবং প্রবর্তন উদ্যোক্তাবৃন্দ বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছেন সিনেরামাকে আরও প্রসারিত করতে। বহু কোটি টাকা মূলধন নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান হয়েছেন মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ারের প্রাক্তন কর্ণধার লুইস বি মেয়ার। সিনেরামাতে ছবি তোলা ব্যাপারটা যেমন ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি তোলা ছবি দেখাবার জন্য চিত্রগৃহকে উপযুক্ত করে নেওয়াও অত্যন্ত খরচের ব্যাপার। এখন আর্থিক অবস্থা যা তাতে প্রযোজক বা প্রদর্শক কারুর পক্ষেই বিরাট একটা খরচের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে। সেই কথা ভেবে মেয়ার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানান, সিনেরামার যা খরচ—ছবি তোলা এবং দেখানো উভয় দিকেই এত প্রভূত পরিবর্তন দরকার যা অচিরে সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সিনেরামার প্রবর্তকদের হয়তো নিজেদেরই স্টুডিও এবং চিত্রগৃহ তৈরি করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আগামী দশ বছরে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে তাঁরা শ'দুই উপযুক্ত চিত্রগৃহ গড়ে তুলতে পারবেন।

সিনেরামার কথা ঘোষিত হবার সংগে সংগেই আরও কয়েকটি পদ্ধতির কথা প্রচারিত হয়েছে, যেগুলির প্রত্যেকটিই সিনেরামার চেয়ে অনেক কম খরচ ও কম ঝক্কির বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, টুয়েণ্টেথ সেঞ্চুরী ফক্স এবং মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ার প্রতিষ্ঠান দুটি প্রচারিত সিনেমাস্কোপ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে কোন চলতি ক্যামেরাতে মাত্র একটি ব্যাপক-দৃষ্টি লেন্স লাগিয়ে নিলেই চলবে। কেবল ছবি দেখাবার সময় প্রক্ষেপণ যন্ত্রে আর একটি বিশেষ প্রকার লেন্স লাগিয়ে নিতে হবে। এই পদ্ধতির আর অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে ছবি দেখাবার পর্দাটা বড় করে নেওয়া। আর-কে-ও রেডিও আর একটি পদ্ধতির কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এ-পদ্ধতিগুলি ছবিতে ত্রি-স্তর বা Three Dimension মায়া সৃষ্টির জন্য উদ্ভাবিত। সিনেরামাকে কিন্তু তার উদ্ভাবক ত্রি-স্তর বা স্টিরিও ছবির পদ্ধতি বলে দাবী করছেন না।

সিনেরামা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি, তবে সম্প্রতি 'আমেরিকান সিনেম্যাটোগ্রাফার'য়ে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সিনেরামাকে বলা হয়েছে এমন একটা পদ্ধতি, যা বিশেষভাবে তৈরি বিরাট পর্দায় ছবি সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে বিশালতা ফুটিয়ে তোলে এবং মনে ক্ষেত্রের ব্যাপকত্ব-বোধ ধরিয়ে দেয়।

সিনেরামা উদ্ভাবনের পিছনে রয়েছে অবিশ্রান্ত অনুশীলন এবং কোটি কোটি ডলার খরচ। গোড়াতে কিন্তু চলচ্চিত্রের কাজে আনবার কথা মনে করে এ-পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়নি। এর উদ্ভাবক ফ্রেড ওয়ালার গত মহাযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীকে শত্রু-বিমানের ওপর গুলী করা শেখাবার একটা পদ্ধতি কার্যকরী করে তোলেন। এই পদ্ধতিতে ছিলো—একটা বড়ো ঘরে চারজন শিক্ষার্থীকে একটা অর্ধ-বৃত্তাকার পর্দার সামনে বসিয়ে দেওয়া হতো। পাঁচটি তাল মেলানো প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই পর্দার ওপরে এদিক-সেদিক থেকে শত্রু-বিমানের অতর্কিত আক্রমণের ছবি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিফলিত করে দেওয়া হতো। সেই ছবির হুমড়ি খেয়ে পড়া শত্রু বিমানগুলি লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা গুলী করা শিখতো। এই শিক্ষাপদ্ধতি যুদ্ধে অনুমান সাড়ে তিন লক্ষ হতাহত কমিয়ে দিতে পেরেছে। ওয়ালারের এই পদ্ধতি থেকেই সিনেরামার উদ্ভাবন।

ফ্রেড ওয়ালার আগে প্যারামাউণ্ট স্টুডিওতে কৌশল চিত্রগ্রহণ বিভাগের প্রধান থাকাকালে মডেলের সাহায্যে জাহাজডুবি থেকে সিণ্ডারেলার কুমড়োর গাড়িটি পর্যন্ত বহু অদ্ভুত সব দৃশ্য তৈরি করেছেন। ওয়ালার ভাবতেন, এমন ক্যামেরা ও প্রক্ষেপণ যন্ত্র যদি উদ্ভাবন করতে পারেন, যা মানুষের একজোড়া চোখের দৃষ্টিকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক-রূপে প্রতিভাত করিয়ে দেবে, তাহলে বাকী কাজ মস্তিষ্কের ওপরে ছেড়ে দিলেই চলবে। ওয়ালারের প্রথমে যন্ত্র ছিলো এগারো লেন্সযুক্ত এক বিকট ক্যামেরা আর তাতে তোলা ছবি দেখাবার জন্যে তাল মেলানো এগারটি প্রক্ষেপণ যন্ত্র। ওয়ালারের মতে "ওটা বড়ো বেচপ্তের ছিলো, তবে দর্শকদের একটা অভিজ্ঞতা অর্জন হতো, তাতেই বুঝেছিলাম, নিজের কল্পনাকে মূর্ত করতে পারবো।"

সিনেরামার সাহায্যে বাস্তবে যে মায়া সৃষ্টি করা হয়, তা অনেকটা চোখের মণি এবং কানের পর্দার কার্যক্রমের মতো। চিত্রপদ্ধতিটি বাস্তব জীবনকে ফুটিয়ে তোলে দর্শককে সম্পূর্ণরূপে গতি ও শব্দের আবেষ্টনীতে ঘিরে রেখে। সিনেরামা থেকে যে ছবি প্রক্ষিপ্ত হয়, তা প্রায় একটা সম্পূর্ণ অর্ধবৃত্ত, ১৪৬ ডিগ্রী চওড়ায় এবং খাড়াইয়ে ৫৫ ডিগ্রী। মানুষের দৃষ্টির প্রসার হচ্ছে চওড়ায় ১৮০ ডিগ্রী এবং খাড়াইয়ে ৫৫ ডিগ্রী—কোন লেন্সের পক্ষেই ছবি অবিকৃত রেখে অতখানি প্রসার অধিকার করা সম্ভব নয়। সিনেরামাতেই লাগানো হয়েছে ২৭ মিলিমিটারের তিনটি লেন্স—চোখের তারার চেয়ে বড়ো নয়—লেন্স তিনটি ৪৮ ডিগ্রী কোণাকুনিভাবে বসানো। প্রত্যেকটি লেন্সের দ্বারা পর্দায় যতোটা দেখা যায়, সেই প্রসারের এক-তৃতীয়াংশ
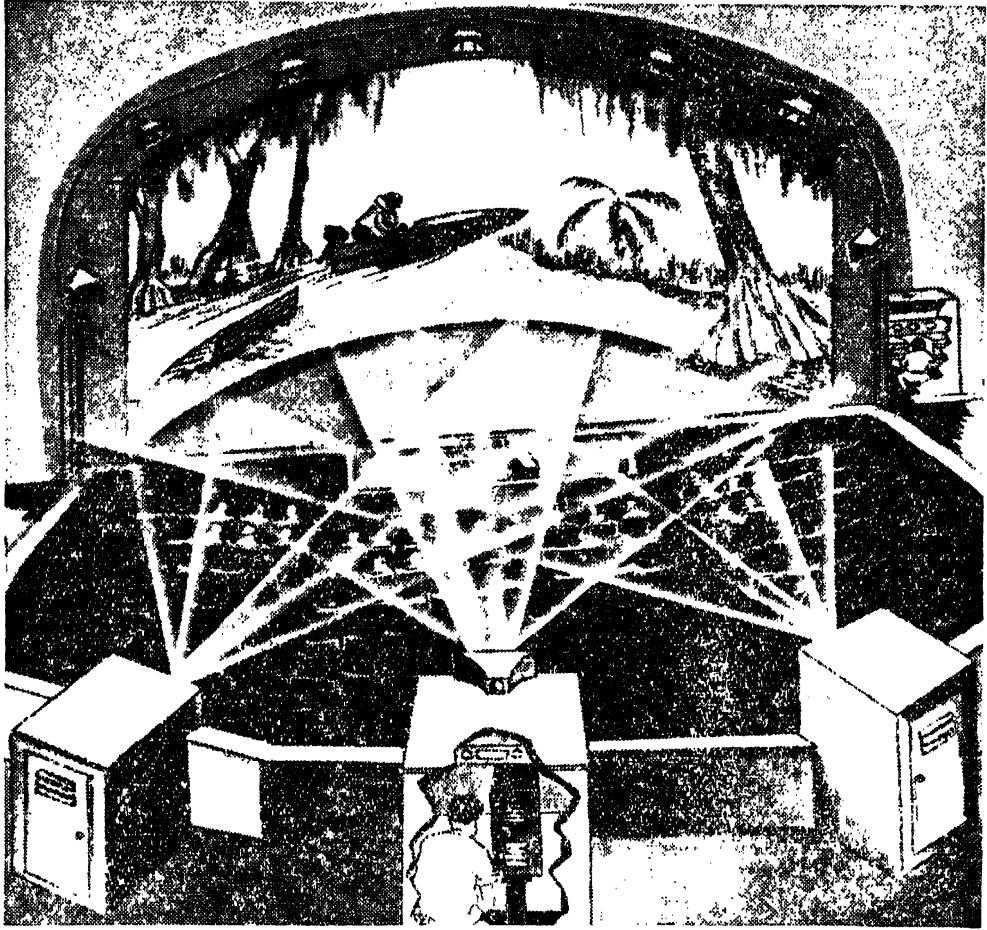
সিনেরামা পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ—অর্ধবৃত্তাকার ঢালু পর্দা; সাধারণ পর্দার দ্বিগুণ বড়ো। প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন স্থানে বসানো ৮টি স্পীকার। একযোগে তিনটি প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে ছবি প্রতিফলিত করা হয়। এসোসিয়েটেড প্রেসের শিল্পী জন কার্লটন এই ছবিটি পরিকল্পনা করেছেন।

অনুচিত্রিত হয়; প্রতি লেন্সের দরুণ স্বতন্ত্র ৩৫ মিলিমিটারের ফিল্ম থাকে। খুদে ত্রি-বিভক্ত ছবির ফ্রেমের মতো একটা বিশেষ মাউণ্টে লেন্সগুলি সাজানো থাকে। মাঝের লেন্সটার লক্ষ্য সোজা সামনের দিকে। দুপাশের লেন্স দুটির বাঁদিকেরটি দৃশ্যের ডানদিকের অংশ অনুচিত্রিত করে এবং ডানদিকের অংশ অনুচিত্রিত করে দৃশ্যের বাঁদিকের অংশ। লেন্স তিনটির পরস্পরের দৃষ্টি রেখাকে এক করে মিলিয়ে দেবার জন্যে একটি ঘূর্ণায়মান সাটার চালানো হয়।

সিনেরামার স্বতন্ত্র প্রত্যেকটি ফ্রেম স্ট্যাণ্ডার্ড ছবির ফ্রেমের দেড়গুণ উঁচু, অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড ফ্রেমের চারটি ঘাটের জায়গায় এতে থাকে দুটি ঘাট। প্রত্যেকটি লেন্সের দরুণ আলাদা এক-একটা ছবির রোল দরকার হয়, কাজেই ফিল্মও লাগে স্ট্যাণ্ডার্ড ছবির চেয়ে মোট সাড়ে চারগুণ বেশি। এর পর ৫১×২৫ ফিট মাপের পর্দাতে তিনটি ফিল্মকে এক করে ছবি প্রতিফলিত করতে তোলার প্রক্রিয়ার বিপরীত এক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। তিনটি ৩৫ মিলিমিটার প্রক্ষেপণ যন্ত্রের কক্ষ থেকে পর্দার ওপরে ছবি প্রক্ষিপ্ত হয়। ডানদিকের প্রক্ষেপণ যন্ত্র থেকে প্রক্ষিপ্ত

হয় পর্দার বাঁদিকের এক-তৃতীয়াংশ; বাঁদিকেরটি থেকে ডানদিকের তৃতীয়াংশ এবং মাঝেরটি থেকে মাঝের অংশ। পর্দা বৃত্তাকার বলে প্রতিফলিত ছবি বিকৃত হবে মনে হতে পারে, কিন্তু তা হয় না।

তিনটি পৃথক পৃথক ফিল্মের রোল থেকে ছবি প্রতিফলিত হওয়ায় মাঝের পৃথকীকরণ রেখার অপনোদন একটা সমস্যা দাঁড়ায়। কলাকুশলীরা এ সমস্যার সমাধান করেন 'গিগোলো'র সাহায্যে—একধারে দাঁতওয়ালা চিরুণীর মতো ফলক। এই ফলকগুলি ফিল্মের এক-এক অংশের সীমান্তে যুক্ত হয় এবং অতি দ্রুতবেগে ওঠানামা করার ফলে সীমান্ত রেখার দাগ মিলিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে, সিনেরামা প্রক্ষেপণ যন্ত্রের প্রত্যেকটিতে ফিল্মের যে রিল থাকে, তাতে ৭,৫০০ ফিট করে ধরে, অর্থাৎ প্রায় ৫০ মিনিট অবিরল চলার মতো ছবি।

সিনেরামার শব্দগ্রহণ ও প্রক্ষেপণের দিকটাও ছবি তোলা ও প্রক্ষেপণের মতোই অভিনব। সিনেরামাতে ছবি তোলার সময় দৃশ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ তুলে নেবার জন্য পাঁচটি মাইক্রোফোন খাটানো হয়। একটা থেকে আরও তিনটে মাইক্রোফোন অনেকখানি একধারে বা ক্যামেরার পিছনে বসানো হয় লোকের স্বর, ধাবমান ইঞ্জিনের আওয়াজ যা আসছে এবং সঙ্গের এমনি শব্দ প্রভৃতি ধরবার জন্যে। এই শব্দকে চিত্রগৃহে পর্দার পিছনে খাটানো পাঁচটি স্পীকারের সাহায্যে প্রতিধ্বনিত করা হয়—তোলার সময়কার এক-একটা মাইক্রোফোন পিছু এক-একটা স্পীকার। আরও কয়েকটি স্পীকার চিত্রগৃহের দুধারে এবং একটি পিছনের দেয়ালে খাটানো হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি স্পীকার ছবি তোলার সময় যে মাইকে যেমন শব্দ গ্রহণ করা হয়, চিত্রগৃহে তা-ই প্রতিধ্বনিত করে তোলে এবং এইভাবে শব্দের মধ্যে বাস্তবের স্পর্শ এনে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটা মোটরবোট ধরা যায়। বোটটি পর্দার এক ধার থেকে যেই দেখা দিতে আরম্ভ করে, তার আওয়াজটাও ঐ ধারেরই স্পীকার থেকে আসে এবং ক্রমশ বোটটি যেমন আর একধারে চলে যায়, তার আওয়াজও সঙ্গে সঙ্গে স্পীকার বদলে বদলে তার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত করে যায়।

সিনেরামা প্রথম জনসমক্ষে উপস্থিত হতেই নতুন উদ্ভাবনটির ওপরে লোকের প্রভূত উৎসাহ দেখা দিয়েছে। যাঁরা দেখেন নি, তাঁরা উৎসুক হয়েছেন জানবার জন্যে যে, এটা চলচ্চিত্র শিল্পকে কিভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করবে, সাধারণভাবে চলচ্চিত্রের আলোকচিত্রগ্রহণে কি পরিবর্তন আনবে এবং টেলিভিশনেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে কি না। টেলিভিশনের কথা উঠছে এই কারণে যে, আমেরিকা ও বৃটেন এবং অন্যান্য যেসব দেশে টেলিভিশনের প্রভূত চল, সেসব দেশে চলচ্চিত্রের এই মারাত্মক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই পাবার চিন্তাই বড়ো হয়ে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে, সিনেরামা টেলিভিশনে প্রযুক্ত হতে অনেক দেরি। তাছাড়া সাধারণ যেসব ছবি তোলা হয়, তারও কোন ক্ষতি হবে না এর জন্যে। সিনেরামার নিজেরই একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এ পদ্ধতি অত্যন্ত জমকালো ছবির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলবে। সিনেরামার উপযুক্ত হচ্ছে দৃশ্যসম্ভারে অতিসমৃদ্ধ বিষয়—'ক্যু ভ্যাডিস' বা 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'এর মতো ছবির সিনেরামার পদ্ধতিতে জমবার সম্ভাবনা বেশি।

সিনেরামা প্রবর্তন করতে প্রচুর অর্থের দরকার। ছবি তোলার জন্য তিনটি ক্যামেরা ও সেইমতো সংখ্যক কলাকুশলী দরকার। পরে ছবি দেখাবার জন্যেও দরকার ছটি প্রক্ষেপণ যন্ত্র, যে জায়গায় এখন রয়েছে মাত্র তিনটি। আর প্রথম প্রবর্তনের সময়কার প্রায় পৌনে চার লক্ষ টাকা খরচ প্রদর্শকদের বর্তমান সময়ে চিন্তিত করে তুলবেই। বহুল সংখ্যায় যন্ত্রপাতি তৈরি হতে থাকলে অতো খরচ অবশ্য থাকবে না। এমনও আশা করা যাচ্ছে যে, পরে হয়তো এমন প্রক্ষেপণ যন্ত্রের উদ্ভাবন হবে, যাতে তিনটি করে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের জায়গায় একটিতেই কাজ চলবে এবং তখন সাধারণ ছোটখাটো প্রদর্শকদের পক্ষেও সিনেরামা প্রবর্তন করা সম্ভবপর হতে পারবে।

টেলিভিশন চলচ্চিত্রের প্রতিযোগী হয়ে বাজারে এসে পড়ায় আমেরিকার সবায়ের চিন্তা ছিলো, চলচ্চিত্রে এমন একটা অভিনবত্ব যোগ করে দেওয়া, যা টেলিভিশনের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভবপর হবে না। সিনেরামা সেই অভিনবত্ব নিয়ে আসতে পেরেছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে। বিখ্যাত বৃটিশ প্রযোজক স্যার আলেক-জান্ডার কোর্ডা সিনেরামাকে চলচ্চিত্রের সমগ্র ইতিহাসে এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন বলে আখ্যাত করেছেন। সিনেরামার উদ্যোক্তাদের অন্যতম এবং আমেরিকার খ্যাতনামা প্রযোজক লাওয়েল টমাস এই পদ্ধতিটিকে বলেছেন, "এক নতুন মাধ্যম নিয়ে অভিযান, যা চলচ্চিত্রের কাহিনী রূপায়নের রীতিতে বিপ্লব নিয়ে আসবে। গোড়া থেকেই ছবি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমা-বদ্ধ থেকেছে। এক-একটা ফ্রেম পর পর সাজিয়ে যাওয়া। চলতি ধারার চলচ্চিত্র এক সংকীর্ণ পর্দায় সীমাবদ্ধ—এতে চোখের সোজা সামনের দৃশ্যই দেখা যায়, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে চোখের কোণ দিয়ে দেখারও সুযোগ রয়েছে। চলচ্চিত্রকে কেউ কেউ বলেছেন, একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে ছবি দেখা। সিনেরামা সাধারণ পর্দার পাশের দিককে অতিক্রম করে যায় এবং প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টি ও শ্রুতি নিয়োজিত করে নেয়।"

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

দুর্গরহস্য—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৷০ টাকা।

কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিকায় গল্প লিখে রোমাণ্টিক সাহিত্যে শরদিন্দুবাবু খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা দুই-ই অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান হ'ল রহস্য-সাহিত্যে। ডিটেকটিভধর্মী রচনার পক্ষে সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার পাওয়া দুরূপরাহত মনে হতে পারে; কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যেও এ ব্যতিক্রম ঘটেছে। কোনান ডয়েল থেকে আগাথা ক্রিস্টি অবধি কয়েকজন লেখকলেখিকাই গোয়েন্দাকাহিনীর মাধ্যমেও কিছুটা সাহিত্যরস পরিবেশন করেছেন। টাইপচরিত্র নয়, রীতিমত জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি ক'রে পাঠকদের মোহিত করেছেন। কিন্তু বাঙলাদেশে গোয়েন্দাকাহিনী যে অত্যন্ত নিম্নস্তরে পড়ে আছে তার কারণ সাহিত্যিক সামর্থ্য যাঁদের আছে, তাঁরা কেউই অবসর বিনোদনের জন্যেও গোয়েন্দাকাহিনী লেখেন না। এদিক থেকে শরদিন্দুবাবুই সম্ভবত প্রথমজন যিনি রহস্যকে রসে পরিণত করেছেন; ব্যোমকেশের মাধ্যমে বাঙলাদেশকে একজন দেশী শার্লক হোমস্ দান দিয়েছেন।

এ গ্রন্থের 'চিত্রচোর' ও 'দুর্গরহস্য' দুটি-ই তাঁর পূর্ব গৌরব অক্ষত রাখবে বলে আশা করা খুব অন্যায় হবে বলে মনে হয় না। যাঁরা এই ধরণের বই পড়তে চান, তাঁদের এ বই ভালই লাগবে।

প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই মোটেই ভাল নয়।

৩৮।৫৩

জীবনকথা

মোগল-পাঠান—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible]ন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস [illegible]ড, কলিকাতা ৩৭। মূল্য আড়াই টাকা।

[illegible]ভূমিকায় শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—[illegible]তিহাসের কোনো সত্যই না ক'রে আর [illegible]গড়া ঘটনা ও কথাবার্তার বুকনি না [illegible]য় কেমন করে ইতিহাস বিখ্যাত লোকদের [illegible]প মিষ্টি ক'রে লেখা যায়, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ এই গল্প সংগ্রহে দেখিয়েছেন।"

ভারত ইতিহাসের পাঠান মুঘল যুগের কাহিনী হইতে বাছাই করিয়া পনেরোটি কাহিনী ব্রজেন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সেইগুলি একত্রিত করা হইয়াছে। আমাদের দেশের ছেলেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবে এবং এই সব ঐতিহাসিক বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাহিনী পাঠ করিয়া ভারতের ইতিহাস পাঠে বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যিক তথ্য লইয়াই ঘাটাঘাটি করিয়াছেন বেশী, কিন্তু তাঁহার রচনার হাতও যে কেমন মিষ্ট ছিল—এই গল্পগুলি তাহার প্রমাণ।

৩৩৪।৫২

ছোট গল্প

কুঙ্কুম—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২ টাকা।

কুঙ্কুমের টিপের মত ছোট্ট নিটোল আর সুন্দর গল্পের সমষ্টি। দু' তিন পৃষ্ঠার এক একটি গল্পে রসের আভাস, চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সম্ভাবনা, আর গল্প জমে ওঠার মুহূর্তেই একটি অনাশঙ্কিত 'চমক' এসে গল্পের মোড় ফেরানোর আশা দিয়ে হঠাৎ নটেগাছ মুড়িয়ে দেয়। এ বই বাঙলা ভাষায় বৈচিত্র্য বাড়াবে। গল্পের অনেকগুলি বেশ সুখপাঠ্য, কয়েকটিতে ও হেনরী জাতীয় সুলভতা না থাকলেই ভালো হ'ত; সামান্য কয়েকটির সঙ্গে প্রচলিত বিদেশী রসটিপ্পনির খুব সুদূর সম্পর্ক নেই। তা হোক্, কুঙ্কুম এক নাগাড়ে পড়ে যাবার মত, পড়ে ভাল লাগবার মত বই।

প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই ভালো।

৩৯।৫৩

বিবিধ

শিক্ষা আমার শিশুর কাছে : ক্যারোলাইন প্র্যাট। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় আনা।

যাঁরা 'আমেরিকান' সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, বা 'আমেরিকান' গ্রন্থ পড়তে চান, বা যাঁরা একজন 'আমেরিকান' শিক্ষক 'আমেরিকান' শিশুদের কাছ থেকে কি জেনেছেন এবং জেনে কাজে লাগিয়েছেন তার বিবরণ পড়তে চান, তাঁদের এ বই অবশ্যই ভাল লাগবে। অনুবাদটির বৈশিষ্ট্য হ'ল, প্রতি লাইনেই বোঝা যায় যে, একটি 'আমেরিকান' বই পড়ছি। কিন্তু নাম-পত্রের মাঝে অকস্মাৎ একটি ইংরেজি হরফের টাইটেল পেজ রুচি বিরুদ্ধ ঠেকে যদিও এর পিছনে কোন আইনগত কারণ আছে সন্দেহে প্রকাশকের ওপর দোষারোপ থেকে বিরত থাকতে হয়। প্রচ্ছদপট পাঠ্য পুস্তক ধরণের।

৪।৫৩

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাহিনী : টম গল্ট। এম সি সরকার অ্যাণ্ড্ সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

ইহা একটি নিউইয়র্কে প্রকাশিত আমেরিকান পুস্তকের অনুবাদ। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকটিতে পরিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য এক আকর্ষণ হইল নরম্যান টেট নামক জনৈক মার্কিন শিল্পী অঙ্কিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র। আজ-কালকার

ট্রামে-বাসে

প্রদেশপালের ভাষণ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সম্প্রতি যে বিতর্ক হইয়া গেল, তাহাতে সাতান্ন জন বক্তা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। —"অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু বক্তা বাঙলার মাটিতে আপনিই ব্যাঙের ছাতার মতো গজায়। আমাদের বক্তিয়ারী ঐতিহ্যের দিক থেকে সাতান্ন সংখ্যাটা বরং কমই হলো। যাহোক, পরবর্তী অধিবেশনে আমরা তা পুষিয়ে নিতে পারব"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

সরকারবিরোধী দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত দাশরথি তা মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, রাধা কানু হেন গুণনিধিকে কাহার কাছে দিয়া যাইবেন ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। বৃটিশ ভারত ত্যাগের পূর্বে তাদের গুণনিধি 'কানুকে' কংগ্রেসের হাতে দিয়া গিয়াছেন। —"তা মশাই রসিকতা ভালোই করেছেন। তবে এতে আমাদের শঙ্কার কারণ নেই, কেননা, জটিলা-কুটিলা থাকতে কানুর জারিজুরী চলবে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিধান পরিষদের বক্তৃতায় বলিয়াছেন—মন্ত্রীদের কথায় সব সময় যেন জনসাধারণ অবিশ্বাস না করেন।—"রাজকুলকে বিশ্বাস না করার নীতি আমরা মানলেও মাঝে মাঝে একটু এদিক-সেদিক যে একেবারে না করি, তা নয়। এই যেমন ধরুন, মন্ত্রী যদি বলেন, অমুক তারিখ থেকে চালের বরাদ্দ কমবে, তাহলে সেটাকে আমরা ধ্রুব সত্য বলেই বিশ্বাস করে থাকি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।
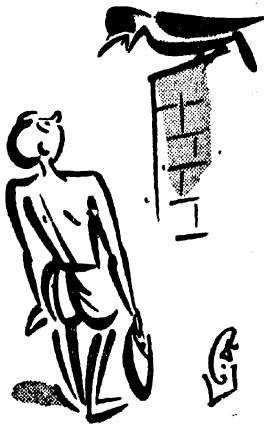
* * *

এডমিরাল রাইট সম্প্রতি খাইবার পাস পরিদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের জানাইয়াছেন,

তাঁর পরিদর্শনের পেছনে কোন ঘাটি খোঁজার মতলব ছিল না। —"না, হয়ত দুম্বার সন্ধানেই তিনি খাইবার পাসে এসেছিলেন" মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

করাচীর 'ডন' কাগজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাক্ মন্ত্রিসভায় ফাটল ধরিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ফাটল আগেই ছিল, তবে ভালো পুটিং ছিল বলে তা মালুম হয়নি"।

* * *

এক সংবাদে জানা গেল, চীনের এক শ্রেণীর পদ্ম নাকি রাশ্যার মাটিতে জন্মিয়াছে। আশ্চর্য কিছু নয়, পদ্মফুল কোন কোন সময় গোবরেও ফলে বলে আমরা শুনেছি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতায় চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে সংবাদ পাঠ করিয়া শেষ করিতে-না-করিতেই বিবেকানন্দ রোডের গহনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির কথা আমরা
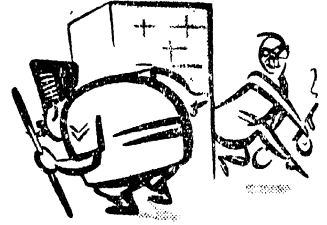
পাঠ করিলাম। জনৈক সহযাত্রী এই গুরুতর ব্যাপারটিকে লঘু পরিহাসের বস্তু করিয়া গাহিয়া উঠিলেন—"খুঁজে দেখা পাইনি তাহার, পরান তবু আছে বলে"!

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, এক-একটি গ্রামের জন্য নাকি এক-একটি ডাকঘরের ব্যবস্থা হইতেছে। —"সংবাদ সত্যি হলে সুখের কথা, কিন্তু ভাবছি, 'ডাকঘর' না হয়ে শেষ পর্যন্ত না 'তাসের দেশ' হয়"!!

* * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের শেষ খেলায় ভারত ১২৯ রান করিয়া আউট হইয়াছে। —"এই বিপর্যয়ের জন্য প্রধানত দায়ী বোলার রামাধীন। তিনি ভারতেরই বংশধর, সুতরাং — — —

* * *

আমরা শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গের কোথায় নাকি সম্প্রতি একটি বাঘ মোটর চাপা পড়িয়াছে।—"আশ্চর্য নয়, এই কোলকাতা শহরেই পরিবহন বিভাগের বাঘটি নাকি বাস্ চাপা পড়ে খোঁড়া হওয়ার অবস্থা হয়েছে, সরকারী চিকিৎসায় কিছু হচ্ছে না বলে তার নাকি হস্তান্তরের ব্যবস্থাও হচ্ছে"—খুড়োর মন্তব্যটা যেন ধাঁধাঁর মতই শুনাইল।

বম্বেতে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান

গত সপ্তাহে ছ' দিন ধরে বম্বের লোকে এক অনবদ্য রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ করেছিল। ঐ ছ' দিন ছিলো শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয়। খাঁটি শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখবার বম্বের লোকের আকাঙ্ক্ষা অনেক দিনের; কলকাতায় ওঁদের কেউ এলেই এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে গিয়েছেন বহুবার। এতদিনে তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা মিটলো এবং তার জন্যে ওখানকার লোকে বম্বে শাখা আশ্রমিক সংঘকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাবে। বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে 'ঠাকুর সপ্তাহ' পালন উপলক্ষ্যে আশ্রমিক সংঘ শান্তিনিকেতনের এই দলটিকে ওখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

* * *

ভাষা যে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে না, বম্বেতে 'তাসের দেশ' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র সাফল্য তার প্রমাণ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতনের ভক্ত ভারতের আর সব জায়গার চেয়ে বোধ হয় বম্বেতেই সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি। কিন্তু তাই বলে তাঁদের সবাই নিশ্চয়ই বাঙলাভাষী নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সব অ-বাঙালী দর্শকদের যে মন মেতে উঠেছিলো, সে খবর আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। আর মেতে যে উঠতোই, সে বিষয়ে সন্দেহেরও কোন কারণ ছিলো না। এখানে যাঁরা শান্তিনিকেতনের শিল্পবৃন্দের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখে আসছেন, তাঁরা জানেন যে, এই শিল্প-নিবেদন কেবল বম্বে কেন, বা ভারতেরই যে কোন অঞ্চল কেন, পৃথিবীরই যে কোন দেশের লোকের মনকে মাতিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। ভারতের সত্যিকারের নাট্যশিল্পকে যদি পৃথিবীর কোথাও পরিবেশন করার দরকার হয়, তাহলে কেবল রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের দ্বারাই মর্যাদা আনা সম্ভব।

* * *

বম্বের একসেলশিয়র থিয়েটারে ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'তাসের দেশ' অভিনয় হয়; তার পরের তিন দিন হয় 'চিত্রাঙ্গদা' এবং শেষ দিন হয় আবার 'তাসের দেশ'। বিশিষ্ট ধারার অভিনয়ে, সাজ-পোষাকের বৈচিত্র্যে, নৃত্য ও সঙ্গীত-মাধুর্যে দুখানি নৃত্যনাট্যই বম্বের সুধীজনের মনে পুলক দানে নতুন চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছে। 'তাসের দেশ'এ অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে সুখ্যাত হয়েছেন দলের অধিনায়ক শান্তিদেব ঘোষ। এই নৃত্যনাট্যে রাজপুত্রের ভূমিকায় বরাবরই শান্তিদেবই অভিনয় করে আসছেন এবং রাজপুত্রের এমন একটা রূপ তিনি গড়ে নিয়েছেন, যা এখানকার লোকের মনে তো গাঁথা হয়েই আছে। তাছাড়া বম্বেতে অভিনয়ে প্রশংসা অর্জন করেন হরতনির ভূমিকায় প্রণতি চট্টোপাধ্যায়; ছক্কা, পঞ্জা ও সম্পাদকের ভূমিকায় যথাক্রমে সাগরময় ঘোষ, শিশির ঘোষ ও অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি সম্পর্কেও আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, নাম-ভূমিকায় প্রথমাংশে সুজাতা মিত্র এবং দ্বিতীয়াংশে প্রণতি চট্টোপাধ্যায়

গত সপ্তাহে বম্বেতে শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" অভিনয়ের দৃশ্যে
ডানদিক থেকে সদাগরপুত্র, রাজপুত্র, ছক্কা, পাঞ্জা, তিরি, দুরি
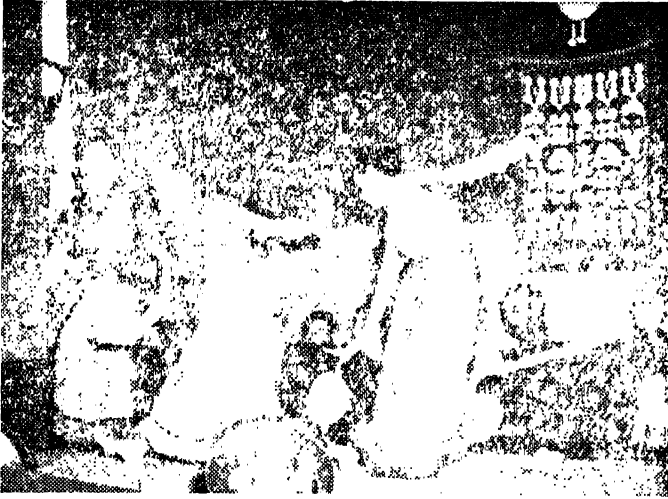
গীতাঞ্জলির "চণ্ডালিকা" অভিনয়ের একটি দৃশ্য। ছবির ডানদিকে রয়েছেন সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস প্রভৃতি

নৃত্যাভিনয়ে দর্শকদের পরম আনন্দ পরিবেশন করেছেন। আরও অভিনয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন অর্জুনের ভূমিকায় হরিদাস নায়ার, মদনের ভূমিকায় এড্না ইভান্স এবং সখীদের ভূমিকায় শিখা গুহ, মিত্রা দত্ত, শিবানী গুহ, সুমিতা গাঙ্গুলী; অর্জুনের সহচরদের ভূমিকায় সুশীল বর্ধন, গুণতিলক এবং ভালচাঁদ ভাটের। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা সেনের গানেও দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হন।

'গীতাঞ্জলি'র "চণ্ডালিকা"

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'গীতাঞ্জলি'র প্রযোজনায় বালীগঞ্জ সিংঘী পার্কে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা অভিনীত হয়। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, এই নৃত্যনাট্যাভিনয় দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি। এর হেতু হচ্ছে এই যে, এই অভিনয় নিছক অভিনয়রূপেই মঞ্চে এসে আবির্ভূত হয়নি; সংগীতে, সজ্জায় ও নৃত্যে এ যেন প্রকৃত-পক্ষে প্রাণ পেয়েছিল। এ কথা কেবল আমাদের কথাই নয়, যে তিন-চার হাজার দর্শক এই অভিনয় দেখেছেন সেদিন, এ-অভিমত তাঁদেরই বলা চলে। তাঁরা তাঁদের এই অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের আচরণের দ্বারা। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার নীচে দর্শক-দের বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল, ভিতরে জায়গার তুলনায় লোক হয়েছিল বেশি, অনেক অসুবিধে হয়েছিল দর্শকদের; কিন্তু অভিনয় আরম্ভ হবার পর কোনো কোণ থেকে একটা শব্দ পর্যন্ত হল না—সকলে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে গেলেন। তাঁদের এই নীরব মনোযোগিতাটাই এই নৃত্যনাট্যের একটা বড় সার্টিফিকেট।

নৃত্যের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে প্রকৃতির (সুনন্দা গুহ) নাচ। তাঁর নাচটি এত ভালো লাগার হেতু হচ্ছে, তিনি চরিত্রটিকে কেবল নৃত্যের দ্বারাই নয়, তাঁর মুখের ভাব দ্বারাও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মা-রূপী রেবা দত্তের নাচও উচ্চস্তরের হয়েছে, কিন্তু তাঁর মুখে কোনো ভাব-পরিবর্তন না থাকায় নাচটি অনেকখানি ঝুলে গিয়েছিল। কিন্তু চমকপ্রদ নাচ নেচেছেন চুড়িওয়ালি (বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়); একটা বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে তিনি যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন মঞ্চে, সমবেত নৃত্যের মধ্যেও তিনি যখন অন্যান্য নাচিয়ের অন্যতমা হয়ে এসেছিলেন,

"মালঞ্চ"-র একটি দৃশ্যে যমুনা ও প্রভাতকুমার—প্রফুল্ল রায় প্রযোজিত রবীন্দ্র কাহিনীর ছবিখানি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে

তখনও তাঁর বৈশিষ্ট্যটা স্পষ্টই ধরা পড়ছিল চোখে। আনন্দর (ইরা গুপ্ত) ভাবময় চলার মন্থরগতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতির গানগুলি গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র এবং আনন্দর গান গেয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস। এ'দের গান সুগীত হয়েছে। সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস যথাক্রমে মেয়ে ও পুরুষ গাইয়েদের মধ্যে বর্তমান কালে রবীন্দ্রসংগীতের সেরা গাইয়ে। এদিনের তাঁদের গান দিয়ে নতুন করে তাঁরা এর প্রমাণ দিয়েছেন। এ জন্যে তাঁদের সম্বন্ধে নূতন ক'রে প্রশস্তি করার দরকার বোধ করিনে। মা-র গান গেয়েছেন শুক্লা সেন, এ'র গলা ভালো, কিন্তু জবান ভালো নয়, অর্থাৎ কথা স্পষ্ট নয়—এই জন্যে অনেক জায়গায় ভাষা কিছুই বোঝা যায় নি।

নৃত্যনাট্যটি উৎরেছে নাচের ও গানের জন্যে বটেই, কিন্তু এর সাফল্যের আরও কারণ এর মঞ্চ ও সজ্জা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। বিশেষ কোনো আড়ম্বর না করে অতিসাধারণের মধ্যেও অসাধারণত্ব আরোপ করতে হলে যে শিল্পবোধের প্রয়োজন হয়, সুনীতি মিত্র মঞ্চটি সাজিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছেন। আর, রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন অমলা সরকার—ইনি পরিকল্পনা করেছিলেন, পাত্রপাত্রীদের সাজ-সজ্জার। আনন্দর চরিত্রানুযায়ী পূত পবিত্র ও গম্ভীর রূপে তাকে সাজানো হয়েছে, প্রকৃতির (চণ্ডালিকা) চরিত্রানুযায়ী তাকে সাজানো হয়েছে, চুড়িওয়ালিকে সাজানো হয়েছে অবিকল এক চটুলা করে; কিন্তু সবচেয়ে সজ্জার বাহাদুরি হচ্ছে প্রকৃতির মা-কে সাজানোয়। ঘরোয়া জামা-কাপড় পরিয়ে, রং-ঢঙে সাজে সাজিয়েও যে একটা গ্রাম্য রূপ দেওয়া যায়, অমলা সরকার তার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্য-পরিকল্পনা করেছেন রেবা দত্ত—তিনিও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোকসম্পাতের দ্বারা মঞ্চে যে পরিবেশ রচনা করা হয়েছিল, তা-ও বেশ মনোরম হয়েছিল।

প্রথমেই বলেছি, নৃত্যনাট্যটি আমাদের ভালো লেগেছে। ভবিষ্যতে 'গীতাঞ্জলি' সম্প্রদায় বর্তমানের ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধন করে নাটিকাটি পুনরভিনয় করবেন আশা করি।

বাঙলা ছবির আদর

এই সপ্তাহে প্যারাডাইস সিনেমায় বাঙলা ছবি "৭৪॥"-এর মুক্তিলাভ—শুনতে তেমন কিছু ব্যাপার মনে না হলেও সমগ্র বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পেরই একটা পরম কৃতিত্বই প্রকাশ পাচ্ছে এতে। কলকাতায় দিশী ছবির মুক্তিগৃহ হিসেবে প্যারাডাইসের চেয়ে আর কারুর মানও নেই, অতো জনপ্রিয়তাও নেই। সেই 'অচ্ছুৎকন্যা' মুক্তিলাভ করার পর থেকে আজ ষোল বছর ধরে একটার পর একটা যতো ছবি প্যারাডাইসে জনপ্রিয়তার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, তার তুলনা ভারতের আর কোন চিত্রগৃহের নেই। এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত ছবিই ছিলো হিন্দী ভাষাতে। বাঙলা ভাষাতে না হলেও কিন্তু

প্যারাডাইসে বাঙালী দর্শকের সমাগম আর যে কোন হিন্দী চিত্রগৃহের চেয়ে বেশি; আর বলতে গেলে বাঙালী দর্শকের কাছে হিন্দী ছবিকে প্রিয় করে তুলতে প্যারাডাইস সিনেমার চেয়ে কৃতিত্ব আর কারুর নেই। এই প্যারাডাইস সিনেমাতেই আজ প্রথম বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করছে—এই ঘটনা কেবলমাত্র কলকাতার অ-বাঙালী দর্শকদেরই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেরও অ-বাঙালী দর্শকদের কাছে বাঙলা ছবি পরিবেশন করার একটা ঝোঁক সৃষ্টি করার পথ করে দেবে বলে আশা করা যায়।

* * *

বাঙলা ছবির এ আদর হঠাৎ নয়। একথা সত্যি যে, হিন্দী ছবির এখন আর উৎকর্ষের মান উঁচু নয়, তদোপরি ছবির সংখ্যাও কমে গিয়েছে। তাই বলে বাঙলা ছবি দেখাতে প্রবৃত্ত হওয়া সেইটেই কারণ নয়। আসল কারণ হচ্ছে, বাঙলা ছবির মর্যাদা যেটা অর্জিত হয়েছে "মহাপ্রস্থানের পথে", "রত্নদীপ", "বাবলা", "বিন্দুর ছেলে", "শুভদা" প্রভৃতি কতকগুলি ছবির জোরে। যে ছবিগুলির সুখ্যাতি বাঙলার বাইরেও এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভিন্ন রাজ্যের অ-বাঙালীরাও এখানে এসে বাঙলা ছবি দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে গিয়েছে। বাঙলা ছবির মতোই ছবি আজ কাম্য বলে নির্দ্বিধায় এখন সারা ভারত স্বীকার করছে। প্যারাডাইসে '৭৪॥' মুক্তিলাভ সেই স্বীকারেরই প্রথম কার্যকরী অভিব্যক্তি। প্যারাডাইস হলো পথপ্রদর্শক—একে একে আরও হিন্দী চিত্রগৃহ এ-পথ অনুসরণ করবে, তাঁরা শুধু অপেক্ষা করছেন '৭৪॥'এর ব্যবসা সাফল্য দেখবার জন্যে।

* * *

এইতেই যেন বাঙলার চিত্রশিল্প নিশ্চিন্ত না হয়ে ওঠে যে, কেবল বাঙলা ছবি দিয়েই ভারতের বাজারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নেওয়া যাবে। সেটা সম্ভব হতে পারে না। এ-সুযোগটা এসেছে সাময়িকভাবে এবং হিন্দী ছবি উৎকর্ষে উন্নততর বা সংখ্যার দিক থেকে প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই সুযোগ থাকতে পারে। তার মধ্যেই যদি বাঙলার চিত্রশিল্প উন্নততর হিন্দী ছবি সংখ্যায় বেশি করে তুলে যেতে পারে, তবেই ভারতের বাজারে বাঙলা চিত্রশিল্পের আধিপত্য প্রবহমান থাকতে পারবে। বাঙলা চিত্রশিল্পের এ এক অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছে—ভেবেচিন্তে যদি চলতে পারা যায়, তাহলে অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রধান কেন্দ্র বম্বে থেকে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব হবে না।

রান
রান

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া ১৪২ রানে পরাজিত হইয়াছে। ভারতীয় দলের এই পরাজয় দুঃখের সন্দেহ নাই, তবে যেরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়া পরাজয় বরণ করিয়াছে, তাহাতে অগৌরবের কিছুই হয় নাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলও কোন ইনিংসে খুব বেশী রান করিতে পারে নাই। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস অল্প রানে শেষ হইয়াছে কেবল রামাধীনের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য। তাহা ছাড়াও ভারতীয় দলের একজন খেলোয়াড় ডি কে গাইকোয়াড় পূর্বের দিনের খেলায় ফিল্ডিংয়ের সময় আহত হইয়া শেষ দিনে খেলিতে পারেন নাই। বিনু মানকড় হাতের আঘাত সত্ত্বেও দলের খেলায় যোগদান করেন। রামচাঁদও সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়াই খেলায় খেলিয়াছেন। এইরূপ সকল বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতীয় দলকে খেলিতে হইয়াছে ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আশা করা যায়, ভারত তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করে। প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানে শেষ করে। একমাত্র ওয়ালকট ৯৮ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। মানকড় ও এস পি গুপ্তের বোলিং কার্যকরী হয়। ভারত পরে খেলিয়া ২৫৩ রানে ইনিংস শেষ করে। বিজয় হাজারে, এম আপ্তে, উমরিগার প্রভৃতি ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভ্যালেণ্টাইনের বোলিং বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ২২৮ রানে শেষ করেন। ফাদকারের মারাত্মক বোলিং ইহা সম্ভব করে। ভারত খেলায় জয়ী হইতে পারিবে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৯ রান করে ও খেলায় ১৪২ রানে পরাজিত হয়। ডি কে গাইকোয়াড় খেলায় যোগদান করিতে পারেন না। রামাধীন একাই ২৬ রানে ৫টি উইকেট দখল করেন।

খেলার ফলাফল ঃ—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসঃ—২৯৬ রান (পেয়ারাডো ৪৩, স্টলমেয়ার ৩২, ওরেল ২৪, উইকস্ ৪৭, ওয়ালকট ৯৮, লীগ্যাল ২৩, রামাধীন নট আউট ১৬, ফাদকার ২৪ রানে ২টি, এস গুপ্তে ৯৯ রানে ৩টি, মানকড় ১২৫ রানে ৩টি ও বিজয় হাজারে ১৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারত ১ম ইনিংসঃ—২৫৩ রান (এম আপ্তে ৬৪, ভি মঞ্জরেকার ২৫, বিজয় হাজারে ৬৩, পি উমরিগার ৫৬, জি রামচাঁদ ১৭, ফাদকার ১৭, কিং ৬৬ রানে ২টি, ভ্যালেণ্টাইন ৫৮ রানে ৪টি, রামাধীন ৫৯ রানে ২টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসঃ—২২৮ রান (স্টলমেয়ার ৫৪, উইকস ১৫, গোমেজ ৩৫, ওয়ালকট ৩৪, ক্রিশ্চিয়ানী ৩৩, সি কিং ১৯, ডি ফাদকার ৬৪ রানে ৫টি, এস গুপ্তে ৮২ রানে ২টি, মানকড় ৫৪ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারত ২য় ইনিংসঃ—১২৯ রান (পি রায় ২২, জি রামচাঁদ ৩৪, মঞ্জরেকার ৩২, রামাধীন ২৬ রানে ৫টি, ভ্যালেণ্টাইন ৫৩ রানে ২টি উইকেট পান)।

জে এম ঘোড়পাড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

ভারতীয় দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য দলের ম্যানেজার গোলাম আমেদ অথবা জে এম ঘোড়পাড়েকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। গোলাম আমেদ যাইতে অস্বীকার করিলে বরোদার লেগ স্পিন গুগলী বোলার

ঘোড়পাড়েকে প্রেরণ করা হয়। তিনি অনিবার্যকারণে লণ্ডনে আটদিন আটকাইয়া পড়েন, ফলে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে উপনীত হইতে পারেন নাই। যেদিন খেলা শেষ হয়, সেইদিন তিনি ব্রিজ টাউনে উপনীত হন। ইনি একজন চৌখস খেলোয়াড়। দেখা যাক, ইহার সাহায্য ভারতীয় দলকে কতখানি শক্তিশালী করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ত্রিনিদাদের পোর্ট অফ স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হইবে। ভারতের পক্ষে কাহারা খেলিবেন এখনও জানা যায় নাই। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মনোনীত করা হইয়াছেঃ—

(১) স্টলমেয়ার (অধিনায়ক), (২) ফ্রাঙ্ক ওরেল, (৩) ভের্টন উইকস, (৪) জো ওয়ালকট, (৫) এস রামাধীন, (৬) সি ভ্যালেণ্টাইন, (৭) গোমেজ, (৮) লীগ্যাল, (৯) সি কিং, (১০) পেয়ারাডো, (১১) এলান রে।

দ্বিতীয় টেস্ট দলের ক্রিশিচয়ানীকে ...নায় বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দল পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলায় ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকান দলের এই সাফল্যের ফলে টেস্ট পর্যায়ের খেলার জয়পরাজয় সমান সমান হইয়াছে ও কোন দলই "রবার লাভের" গৌরবে ভূষিত হইতে পারে নাই। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল উপর্যুপরি প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে জয়ী হয়। তৃতীয় টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকান দল জয়ী হয়। চতুর্থ টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। পঞ্চম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হইলে অস্ট্রেলিয়া দল টেস্ট পর্যায়ের খেলায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিত, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকান দল ইহাতে বাদ সাধিয়াছেন। ইহা খুবই প্রশংসার ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। এইবারের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দক্ষিণ আফ্রিকান দল এইরূপ খেলোয়াড়-দের লইয়া গঠিত, যাহাদের অনেকেই ইতঃপূর্বে টেস্ট ম্যাচে, বিশেষ করিয়া অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলিবার সৌভাগ্যলাভ করেন নাই। এই জন্যই এই দল অস্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করিয়া বিভিন্ন খেলায় পরাজয় বরণ করিলে অনেকেই ধারণা করেন, শেষ পর্যন্ত এই দলকে খেলায় পরাজিত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু ফলতঃ তাহা হইল না। অস্ট্রেলিয়ার সহিত টেস্ট খেলায় সমান গৌরবের অধিকারী হইয়াই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ইহাতে নব-প্রেরণা লাভ করিবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দল দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া প্রথম ও শেষ বা পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়ী হন। অবশিষ্ট তিনটি খেলাই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তবে সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে সাহায্য করিবার জন্য ভিলজোয়েন, ডাডলী নর্স, রোয়ান প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ছিলেন। সেই দলের একমাত্র চীথামই এইবারের ভ্রমণকারী দলের অধিনায়ক। স্বদেশের মাঠে যে অস্ট্রেলিয়া দলকে সেই সময় পরাজিত করা সম্ভব হয় নাই, তাহা অস্ট্রেলিয়ার মাঠে হইল ইহাতে চীথামের আনন্দের সীমা নাই। এই দলের সাফল্য সম্পর্কে এইটুকু বলা চলে যে দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই দলের ও দেশের ক্রিকেট খেলার গৌরব বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সেই জন্যই দুইটি টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষেও বলা চলে যে, তাঁহাদের দুইজন কৃতি ফাস্ট বোলারের কিথ মিলার ও লিণ্ডওয়ালের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে শেষ দুইটি টেস্ট খেলায় পরাজিত করিতে পারেন নাই। নিম্নে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের পঞ্চম টেস্ট খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

খেলার ফলাফলঃ—

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসঃ—৫২০ রান (নীল হার্ভে ২০৫, আর্থার মোরিস ৯৯, ক্রেগ ৫৩, ম্যাকডোনাল্ড ৪১, ফুলার ৭৪ রানে ৩টি, টেফিল্ড ১২৯ রানে ৩টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংসঃ—৪৩৫ রান (ওয়াটকিন্স ৯২, ওয়েট ৬৪, ম্যাকলীন ৮১, চীথাম ৬৬, ম্যানসেল ৫২, বিল জনস্টন ১৫২ রানে ৬টি, নোবলেট ৬৬ রানে ১টি উইকেট পান)।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২য় ইনিংস—২০৯ রান (আর্থার মোরিস ৪৪, হ্যাসেট ৩০, ক্রেগ ৪৭, বিনড ৩০, ল্যাংলে নট আউট ২৬; ফুলার ৬৬ রানে ৫টি, টেফিল্ড ৭৩ রানে ৩টি ও ম্যানসেল ২৯ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ২য় ইনিংস—(৪ উইকেট) ২৯৭ রান (এণ্ডীন ৭০, ওয়াট-কিন্স ৫০, ফানস্টন ৩৫, কীথ নট আউট ৪০, ম্যাকলীন নট আউট ৭৬ রান)

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল

এই বৎসরের গ্রীষ্মকালে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংলণ্ড ভ্রমণ করিবেন। এই ভ্রমণকারী দল ১৭ জন খেলোয়াড়কে লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই ১৭ জনের মধ্যে এল হ্যাসেট, নীল হার্ভে, ডবলিউ জনস্টন, ডি রিং, কিথ মিলার, আর্থার মোরিস, লিণ্ড-ওয়াল, ট্যালন প্রভৃতি আটজন ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়াছেন। নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়ই এইবারের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলিয়াছেন। একমাত্র উইকেটরক্ষক ট্যালন খেলেন নাই, তিনি অসুস্থ ছিলেন। এই জন্যই ইঁহার নির্বাচন সকলকেই আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। এই দলের সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ খেলোয়াড় হইতেছেন আইয়েন ক্রেগ ও সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইতেছেন দলের অধিনায়ক এল হ্যাসেট। ইঁহার বয়স ৩৯ বৎসর। নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইলঃ——

(১) এল হ্যাসেট (ভিক্টোরিয়া)—অধি-নায়ক, (২) এ আর মোরিস (নিউ সাউথ ওয়েলস্)—সহঃ অধিনায়ক, (৩) আর এন হার্ভে (ভিক্টোরিয়া), (৪) ডবলিউ জনস্টন (ভিক্টোরিয়া), (৫) ডি টি রিং (ভিক্টোরিয়া), (৬) সি সি ম্যাক্‌ডোনাল্ড (ভিক্টোরিয়া), (৭) জি হিল (ভিক্টোরিয়া), (৮) কে আর মিলার (নিউ সাউথ ওয়েলস্), (৯) আর আর লিণ্ডওয়াল (নিউ সাউথ ওয়েলস্), (১০) আইয়েন ক্রেগ (নিউ সাউথ ওয়েলস্), (১১) আর বিনড (নিউ সাউথ ওয়েলস্), (১২) জে ভিকার্স (নিউ সাউথ ওয়েলস), (১৩) এ ডেভিডসন (নিউ সাউথ ওয়েলস্), (১৪) জি ল্যাংলে (সাউথ অস্ট্রেলিয়া), (১৫) জি হোল (সাউথ অস্ট্রেলিয়া), (১৬) আর আর্চার (কুইন্সল্যাণ্ড), (১৭) ডি ট্যালন (কুইন্সল্যাণ্ড)

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণে অনিচ্ছা

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই বৎসরের শীতকালে ভারত ভ্রমণ উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডকে একটি দল প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যুক্তি হিসাবে কেবল বলিয়া-ছেন যে, উহা বর্তমানে সম্ভব নহে। এই পর্যন্ত যতবার ভারত হইতে অস্ট্রেলিয়া

বোর্ডের নিকট অনুরোধ গিয়াছে, ততবারই তাঁহারা ঐ একই যুক্তি দিয়া দল প্রেরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কোনই নূতনত্ব নাই। তবে এই সম্পর্কে মেলবোর্নের এক পত্রিকায় যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা খুবই যুক্তিপূর্ণ ও বিবেচনার যোগ্য। তাঁহারা লিখিয়াছেন, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট পরিচালকগণ দেশের খেলার স্টান্ডার্ডের অবনতিতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, এই অবস্থার জন্য দায়ী একটানা ছয় বৎসরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা। খেলোয়াড়গণ বিশ্রাম অভাবেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রীড়ামোদিগণের অবনতি হইয়াছে। তাহা ছাড়া জাতীয় প্রতিযোগিতা শেফিল্ড শীল্ডের খেলাও ইহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অথচ এই শেফিল্ড শীল্ডের খেলাই দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড় সৃষ্টি করে। এইজনাই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড ইংলণ্ড ভ্রমণের পরই দলকে ভারতে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ঠিক এইরূপে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে একটানা ভ্রমণ ব্যবস্থা বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। আমরা আশা করি, ভারতের ক্রিকেট পরিচালকগণ এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আরও একটি কমনওয়েলথ দলের ভ্রমণ ব্যবস্থা

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আরও একটি কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলকে শীতকালে ভারতে আনাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয় পূর্বেই দুইটি কমনওয়েলথ দলের উদ্যোক্তা ও ম্যানেজার জর্জ ডাকওয়ার্থকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তিনি নাকি এই বিষয় তোড়জোড় করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে বলিলে খুবই অন্যায় হইবে, তবে হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কেন নহে ইতোপূর্বে আমরা বহুবার বলিয়াছি।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভারতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেও ১৯৫৪-৫৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণ করিবার জন্য দল প্রেরণ করিবেন বলিয়া একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। জামাইকা গভর্নমেণ্ট অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ডকে দল প্রেরণে অনুরোধ করেন ও অস্ট্রেলিয়ান কন্ট্রোল বোর্ড তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ নাকি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গত ৩০০ বৎসর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারত বৃটিশের নাগপাশ হইতে মুক্ত—ইহা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মনঃপূত হয় নাই, ইহাই যদি বর্তমানে ধারণা করা হয় বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

বাঙলা দলের সাফল্য

বাঙলা ক্রিকেট দল রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালের খেলায় সার্ভিসেস দলকে ২৫৭ রানে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের এই অগ্রগতি প্রশংসনীয়। বাঙলা দলকে সেমি-ফাইন্যালে মহীশূরের সহিত খেলিতে হইবে। মহীশূর দল খুব শক্তিশালী নহে। সুতরাং বাঙলা দল ফাইন্যালে উন্নীত হইলে কিছুই আশ্চর্যের হইবে না। অপর দিক হইতে ফাইন্যালে কোন্ দল উঠিবে বলা কঠিন। হোলকার সেমি-ফাইন্যালে উঠিয়াছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই দুই দলের বিজয়ী সেমি-ফাইন্যালে হোলকারের সহিত খেলিবে।

বাঙলা বনাম সার্ভিসেস দলের খেলা

বাঙলা দল প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করে ও প্রথম দিনেই মাত্র ১৯১ রানে প্রথম ইনিংস্ শেষ করে। ইহাতে অনেকেই হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু সার্ভিসেস দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া বি দাশগুপ্ত, এন চৌধুরী, এস ব্যানার্জি প্রভৃতির কার্যকরী বোলিংয়ের জন্য ১০৭ রানে ইনিংস্ শেষ করে। বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হইয়া উৎসাহিত হয় ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫৬ রান করে। নির্মল চ্যাটার্জি ৯৫ রান ও বি ফ্রাঙ্ক ১১৮ রান করিয়া ব্যাটিংয়ের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পরে সার্ভিসেস দল আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৩ রানের অধিক করিতে পারে না। ফলে বাঙলা ২৫৭ রানে জয়ী হয়।

ঃঃ খেলার ফলাফল ঃঃ

বাঙলা ঃ ১ম ইনিংস—১৯১ রান (শিবাজী বসু ৩২, বি দাশগুপ্ত ৪৮, পি সেন ৩৬, বি ফ্রাঙ্ক ২২, এস সোম ১৪; স্বামী ৫০ রানে ৪টি, ইন্দ্রজিৎ ৪৪ রানে ৩টি, ইকবাল করণ ৫২ রানে ২টি উইকেট পান)

সার্ভিসেস ঃ ১ম ইনিংস্—১০৭ রান (মেজর কোহেন ৩০, অধিকারী ১৫; বি দাশগুপ্ত ২২ রানে ৪টি, এন চৌধুরী ৩৭ রানে ৩টি, এস ব্যানার্জি ৩১ রানে ২টি উইকেট পান)

বাঙলা ঃ ২য় ইনিংস্—৩৫৬ রান (বি দাশগুপ্ত ৩৫, নির্মল চ্যাটার্জি ৯৫, বি ফ্রাঙ্ক ১১৮, এস গিরিধারী ৪৫; স্বামী ৯৩ রানে ৩টি, ইন্দ্রজিৎ ১৩৯ রানে ৫টি উইকেট পান)

সার্ভিসেস ঃ ২য় ইনিংস—১৮৩ রান (সীতারাম ৪৯, অধিকারী ৩৬, এস গ্রিওয়াল ২৮ রান নট আউট, এ খান্না ২১; এস সোম ৪৪ রানে ৪টি, এস ব্যানার্জি ৭২ রানে ২টি, পি বি দত্ত ৭ রানে ১টি, বি দাশগুপ্ত ২৬ রানে ১টি উইকেট পান)

গুজরাট রনজি ক্রিকেটের সাফল্য

লালা অমরনাথের অধিনায়কত্বে গুজরাট দল এক ইনিংস্ ও ৮৯ রানে সৌরাষ্ট্র দলকে পরাজিত করিয়া রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালে মহারাষ্ট্র দলের সহিত খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

ঃঃ খেলার ফলাফল ঃঃ

সৌরাষ্ট্র ঃ ১ম ইনিংস—৯১ রান
গুজরাট ঃ ১ম ইনিংস্—২৭৩ রান
সৌরাষ্ট্র ঃ ২য় ইনিংস্—৯৩ রান

হোলকারের তিনজন খেলোয়াড়ের ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে যোগদান

ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দলে এতদিন ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট খেলোয়াড়দেরই যোগদান করিতে দেখা যাইত; কিন্তু এইবারে তাহার পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে হয়। হোলকারের তিনজন তরুণ খেলোয়াড় এইবারে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের তিনটি দলের হইয়া খেলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। একজনের নাম অর্জুন নাইডু। ইনি এক্রিংটন দলে পেশাদার হিসাবে খেলিবেন। অপর জনের নাম সৈয়দ রাও ধনোয়াড়ে। ইনি কেণ্ডাল ক্রিকেট ক্লাবে যোগদান করিবেন। তৃতীয় খেলোয়াড়ের নাম এন আর নীতসরকার। ইনি রিশ্টন ক্লাবে খেলিবেন। হোলকারের রাজার আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি ক্রিকেট দল তুলিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছেন। যাহার ফলেই এই দলের খেলোয়াড়দের অর্থের সন্ধানে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিতে হইতেছে।

দেশী সংবাদ—

৯ই ফেব্রুয়ারী অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় এক উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা সংশোধন বিলের আলোচনা আরম্ভ হয়। মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসু, কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী বিলের বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা করেন। এই বিলের প্রতিবাদ জানাইয়া পরিষদ ভবনের বাহিরে এইদিন অপরাহ্ণে এক বিরাট জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে।

উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীজগন্নাথ দাস এবং বিচারপতি শ্রী মহাপাত্র অদ্য কটকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস এন পট্টনায়ককে আদালত অবমাননার অপরাধে আদালতের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মাদ্রাজ শহর আপাতত পাঁচ বৎসর-কালের জন্য অন্ধ্র রাজ্যের অস্থায়ী রাজধানী হইবে বলিয়া নয়াদিল্লীতে খবর পাওয়া গিয়াছে। বিচারপতি বাঁচুর রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে ভারত সরকারের অন্ততপক্ষে এক পক্ষকাল সময়ের প্রয়োজন হইবে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার সোমবার রাত্রি অনুমান তিন ঘটিকার সময় মাদ্রাজে পরলোকগমন করিয়াছেন।

নব ব্যারাকপুর ক্যাম্পের তিনজন মহিলা-সহ যে চারজন উদ্বাস্তু গত পাঁচদিন যাবৎ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভবনের সম্মুখে অনশন ধর্মঘট করিতেছে, তাহাদের দাবীর সমর্থনে অদ্য অপরাহ্ণে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় উদ্বাস্তুদের অনশনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য সংসদের দুইটি সভার যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতার দ্বারা সংসদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়।

কলিকাতায় পরিমিত মূল্যের দোকান-সমূহে চাউলের বিক্রয়-মূল্য (মণ-করা ৩২৸০) হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং সপ্তাহকালের মধ্যে উহাকে কার্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মিঃ রফি অমেদ কিদোয়াই কলিকাতায় সাংবাদিকগণের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু নয়াদিল্লীতে নূতন কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। মোট ৭ জন নূতন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী

শ্রী সি রাজগোপালাচারী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আছেন।

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রী মতিরাম বোরা ঘোষণা করেন যে, আসাম সরকার আগামী ১৫ই এপ্রিল তারিখে আসামের জমিদারীগুলি দখল লইবেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় বিরোধী পক্ষের প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে নিরাপত্তা সংশোধন বিলটি ১১৫—৫৫ ভোটে গৃহীত হয়।

শ্রীহট্ট জেলার কুশিয়ারা নদীর উপর দিয়া যাইবার সময় একটি যাত্রিবাহী বাস নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে ৯ জন জলমগ্ন ও ১৩ জন আহত হইয়াছে এবং ১৭ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখ অদ্য সংসদের উভয় পরিষদে অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট কমিশনের সুপারিশসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাই ব্যতীত 'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত সমস্ত রাজ্যই কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশ ও বরাদ্দ অর্থ বর্ধিত হারে পাইবে। অর্থ কমিশন আয়-কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ হইতে রাজ্য-সমূহের জন্য বরাদ্দের মাত্রা শতকরা ৫০ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য লোকসভায় বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা স্থাপন সম্পর্কিত যে কোন খবরই ভারত সরকার উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শ্রী এ সি গুহের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থা সম্পর্কে ভারত সরকার সরকারীভাবে কোন খবর পান নাই বা উক্ত সংস্থায় যোগদানের জন্য অপর কোন সরকার ভারত সরকারকে আমন্ত্রণও করেন নাই।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—লোকসভায় রাষ্ট্র-পতির ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হইলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সদস্য শ্রী এ কে বসু আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত চা বাবদ আবগারী শুল্ক হিসাবে বৎসরে যে ৯ কোটি পৌনে ৩৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে, তাহা ক্ষতিগ্রস্ত চা-বাগানসমূহের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিবার প্রস্তাব করেন।

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রী কিদোয়াই বলেন যে, দেশের সামগ্রিক খাদ্যাবস্থা সাধারণভাবে সন্তোষজনক। গত ২৪শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির হেফাজতে সাড়ে ১৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল।

নেপালের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রী এম পি কৈরালা এবং তাঁহার সমর্থকগণ মূল নেপালী কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া নিজেরা একটি নূতন দল গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহর-লাল নেহরু অদ্য রাত্রে নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির অধিবেশনে বলেন যে, জম্মু অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অভিযোগের সঙ্গে প্রজা পরিষদ আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই, ভারত গবর্নমেণ্টকে বিব্রত করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

বিদেশী সংবাদ—

৯ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রে টোকিওতে ব্যাপকভাবে এই গুজব প্রচারিত হয় যে, জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্যদল দক্ষিণ চীনের আময়ে অবতরণ করিয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—পিকিং বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনের সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে ব্যাপী দুর্গশ্রেণীকে "ইস্পাতের ন্যায় সুদৃঢ়" করিয়া তোলা হইতেছে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের প্রবেশের সুযোগ-সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত গান্ধী-স্মাট চুক্তি অতঃপর বাতিল হইয়া যাইবে এবং তৎস্থলে দেশের স্বাভাবিক আইন-কানুন প্রযোজ্য হইবে—দক্ষিণ আফ্রিকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ ডাঙ্গস অদ্য পরিষদে ইহা ঘোষণা করেন।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' অদ্য ইসরাইল ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—জাতীয়তাবাদী চীনের গানবোটগুলি কম্যুনিস্ট অধিকৃত চীনের উপকূলবর্তী আময় বন্দর অবরোধ করিতেছে বলিয়া হংকংএ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

তেহরাণের সংবাদে প্রকাশ, মধ্য ইরাণের মরু অঞ্চলে অদ্য রাত্রিতে ভূমিকম্পে প্রায় ১৫ শত লোক মারা গিয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রীদের মধ্যে দুই দিনব্যাপী আলোচনান্তে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর স্বাধীন ও গণতন্ত্র-বাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রধান ভূমিকা সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য জেনেভার নির্ভর-যোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণ বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ

১৮শ সংখ্যা

দেশ

শনিবার

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯

DESH

Saturday, 28th February, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

দামোদরের দক্ষিণ মূর্তি

গত ৯ই ফাল্গুন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তিলাইয়া এবং বোকারোতে দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বাঁধের এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী এই উদ্যোগের মধ্যে তাঁহার ধ্যানের ভারতের আত্মপ্রকাশের সূচনা দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই বাঁধ ও এই বিদ্যুৎ-উৎপাদক কেন্দ্র ভারতবাসীর দারিদ্র্য-নিরোধ অভিযানের এক সাফল্যেরই নিদর্শন। ফলতঃ দুরন্ত দামোদর এই উপায়ে শান্ত হইলে ব্যাপক অঞ্চলের কৃষকদিগকে আর বন্যার পীড়নে উপদ্রুত হইতে হইবে না। একমাত্র বন্যা-নিরোধের ফলেই কয়েক কোটি টাকা মূল্যের কৃষিজাত শস্য প্রতি বৎসর রক্ষা পাইবে। প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনার প্রভাবে দামোদরের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইবে। জলযানের গতিবিধির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া দুরন্ত দামোদরই বিস্তৃত অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সাধন করিবে। ভারতের প্রতি গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য সঞ্চারিত হউক, ভারতের শ্রম-জীবনের উন্নয়ন সাধনের জন্য সতত চিন্তাশীল মহাত্মা গান্ধী ইহা কামনা করিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় জীবনে ইহা বিশেষ একটি শুভ ঘটনা যে, আজ দামোদর-পরিকল্পনা, জল-বিদ্যুৎ এবং তাপ-বিদ্যুৎ স্থানীয় জন-জীবনে সেই বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রসাদ বহন করিয়া আনিতেছে। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনা সমগ্র দেশবাসীর শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের এই পরিকল্পনা শ্রেণী বা গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থসাধনে প্রযুক্ত হইবে না। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নই ইহার মূল লক্ষ্য। কিন্তু আঞ্চলিক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শোষক শ্রেণীর প্রভুত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবার ভয় যে না আছে, এমন নয়। লাভখোর এবং মুনাফাশিকারীর দল চারিদিকে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। দেশের নৈতিক অধোগতি আমাদের জাতীয় জীবনে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া নিজেদের উদরপূর্তি করিবার জন্য এক্ষেত্রেও একশ্রেণী আগাইয়া আসিবে ইহা স্বাভাবিক। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থকে তাঁহারা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না। বস্তুত এই শ্রেণীর লোকেরা বড় আশা করিয়া এই পরিকল্পনার সাফল্যের দিকে তাকাইয়া আছে। উদ্বোধন-উৎসবে সমাগত কৃষক জনতার কণ্ঠ নিঃসৃত 'জয় হিন্দ' ধ্বনির মধ্যে আত্মনির্ভরকামী ভারতের নবজাগরণের চেতনাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিলাইয়া বাঁধের প্রথম জল এবং বোকারো শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রের প্রথম বিদ্যুৎবিকাশে নবভারতের গঠনমূলক সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠুক এবং দুঃখ-দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণ হইতে জাতির জনসাধারণ মুক্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

ভারত-পাকিস্থান আলোচনা

ভারতীয় লোকসভায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে এখনও পত্রের আদান প্রদান চলিতেছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নটিও নাকি এই প্রসঙ্গে ভারতের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছে। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলালের সাক্ষাৎকার এখন উভয় পক্ষেরই কাম্য, এ কথাও শোনা যাইতেছে। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হয় যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুই এজন্য উদ্যোক্তা; কারণ এ সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ এবং উৎসাহ অফুরন্ত। কিন্তু এই উৎসাহের কি কারণ দেখা দিয়াছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর অভিনব জেহাদী কর্মোদ্যমেরই আমরা পরিচয় পাইতেছি। খালের জল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়া ভারত কিভাবে পাকিস্থানকে শুকনা ডাঙ্গায় ফেলিয়া মারিবার চেষ্টায় আছে, এ সম্বন্ধে এক মিথ্যা বিবরণ দিয়া ফলাও করিয়া করাচী হইতে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে ভারতের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত এবং বিভ্রান্ত করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। খালের জল অর্থাৎ সিন্ধুর অববাহিকার ধারার প্রশ্ন লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মতভেদ আছে।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের মে মাসে এই সম্পর্কে যে চুক্তি হয়, তাহা পাকিস্থান না মানিলেও ভারত সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতেছে। ইতোমধ্যে সিন্ধুর অববাহিকার জল সরবরাহের উৎসে বিশ্বব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞগণের অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, এই অনুসন্ধান কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু হইয়াছে। বস্তুত শুধু বিশ্বব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞগণের উপরই নয়, কাশ্মীর প্রশ্নের উপরও ইহার প্রতিক্রিয়া ঘটাইবার দুরভিসন্ধি পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের মনে কাজ করিতেছে। এই অবস্থায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকারে আলোচনায় কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কার্যত ভারতকে পাকেচক্রে জড়াইয়া সে ক্ষেত্রে পাকিস্থান নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নূতন সুযোগ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে; আমাদের মনে এই ভয় হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এই সিদ্ধান্তই সহজে আসে। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক উৎসাহ দেখাইবার পূর্বে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

আন্দামান দ্বীপের নাম পরিবর্তন

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়ন সাধনের জন্য ভারত সরকার তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতবাসীর পক্ষে বিভীষিকাস্বরূপ ছিল। পুলিপোলাও বা কালাপানির নামে লোকের শরীর কাটা দিয়া উঠিত। যাহারা এখানে যাইত, তাহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইত। বন্দীনিবাস এই আন্দামান, ফরাসীদের ডেভিল দ্বীপের মতই কুখ্যাত। কিন্তু আন্দামান দ্বীপের এই ভয়াবহ স্মৃতির সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্নিময় দ্যুতি জাতির অন্তরে উদিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহের স্বদেশ স্বাধীনতাকামী বীরবর্গের অনেকের পঞ্জরাস্থি এই আন্দামানের বুকে নিহিত রহিয়াছে। আর বাঙলা? বাঙলা দেশ আন্দামানকে ভুলিতে পারে না। বাঙলা দেশের অগ্নিযুগের অনেক সাধক সন্তান এই আন্দামানের বুকে দেশজননীর চিন্ময়ী মূর্তি অনুধ্যানে সুদীর্ঘ বন্দী-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। অনেক সাধক সন্তানের অপরিম্লান জীবনপ্রসূন এই দ্বীপের বুকে ঝরিয়া পড়িয়াছে এবং সৌরভ তাহার সমুদ্রের শীকরসংপৃক্ত বায়ুতে আজও বিকীরিত হইতেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ দলের অধিনায়কস্বরূপে ব্রিটিশ প্রভাববিনির্মুক্ত আন্দামানে যেদিন পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদাতা বীরগণের প্রাণময় ছন্দ তাঁহার অন্তরে নিশ্চয়ই হিন্দোল খেলিয়াছিল। কিন্তু দেখিতেছি, আমাদের রাষ্ট্রচক্রের বর্তমান নিয়ামকগণ আন্দামানের এই ঐতিহ্য ইহার মধ্যেই বিস্মৃত হইয়াছেন। ভারতীয় লোকসভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত সরকার আন্দামান দ্বীপের নাম পরিবর্তন করিয়া সুভাষ দ্বীপ করিবার প্রস্তাব ইতিপূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন বোঝা যায় না, ইদানীং তাঁহাদের সে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব ডাঃ কাটজু আন্দামান এই নামের মহিমা বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্দামান এই নামের সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণের পরিচয় ঘটা দরকার। দ্বীপের উন্নয়নকার্য সাধিত হইলে কালাপানির বদলে দ্বীপের নাম গোরাপানি রাখা যাইতে পারে, তাঁহার ইহাই যুক্তি। কিন্তু সুভাষ দ্বীপ নয় কেন? সুভাষচন্দ্রের সাধনার সঙ্গে এই দ্বীপকে জড়িত করিলে ইহার সম্বন্ধে অতীতের বিভীষিকাময় স্মৃতি দেশের লোকের মন হইতে সহজে দূর হইত এবং এই দ্বীপটিকে উপনিবেশে পরিণত করিবার পক্ষে ভারতবাসী বিশেষভাবে বাঙালীদের মনে বিশেষ আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইত। সেক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বীপটিকে হৃদয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আপন করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত। বস্তুত দ্বীপটিকে সুভাষ দ্বীপে নামান্তরিত করিবার মধ্যে তেমন কিছু তাৎপর্য নাই, স্বরাষ্ট্র সচিবের এই যে যুক্তি দেশের লোকে ইহা সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিয়া লইবে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করিবে। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাবে তাহারা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

ভারতীয় লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিয়া রেল বিভাগের মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোক বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রেল বিভাগের আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই গরীব অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে আসে, সুতরাং টাকার ভাগ যাহারা বেশী দেয়, তাহারা তদনুযায়ী সুখ-সুবিধারও বেশী দাবী করিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কর্তারা রেলপথে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর ব্যবস্থা রহিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য যে টাকা বর্তমানে ব্যয় হইতেছে, তাহা যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপকারে আসিবে, তাহা নয়, পক্ষান্তরে প্রথম শ্রেণীর বদলে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণোপযোগী নূতন শ্রেণীর আরামপ্রদ গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। রেলওয়ের বাজেটের হিসাবে দেখা যাইতেছে, যাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং যাত্রীদের গতিবিধিও পূর্বের চেয়ে হ্রাস পাইয়াছে বলিতে হয়; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ক্লেশের কিছু লাঘব হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর গাড়ীগুলি অনেক সময় খালি যায়; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের গরু ভেড়ার মতই বাক্সবন্দী অবস্থায় প্রাণান্তকর ক্লেশ সহ্য করিয়া রেলযাত্রার দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যথেষ্টসংখ্যক গাড়ীর অভাবই ইহার কারণ; কিন্তু গাড়ী প্রস্তুতের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এই অবস্থার প্রতীকার সাধন করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পাখা এবং আলোর

সুব্যবস্থা হওয়া দরকার, বিশেষত গাড়ী-গুলি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের সর্বাধিক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। জলের অব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট প্রধান অভিযোগ, কিন্তু এ অসুবিধা এখনও দূর হয় নাই। নোংরা এবং কদর্য প্রতিবেশের মধ্যে থাকিয়া হতভাগ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না—কল ঘুরাইয়া জলের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মিলে। রেলমন্ত্রী কতকগুলি ক্ষেত্রে ভাড়ার সম্পর্কে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ইহাতে অনেকে আশ্বস্ত হইবে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই সুবিধার কথা উল্লেখযোগ্য; কিন্তু এই ব্যবস্থা সর্বাধিক ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। ইহা ছাড়া রিটার্ণ টিকেট এবং সপ্তাহান্তিক টিকিটের বিশেষ সুবিধা অন্ততপক্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে পুনঃ প্রবর্তিত হওয়া অবিলম্বে আবশ্যক। পূজার ছুটিতে বিশেষ সুবিধামূলক টিকিটের ব্যবস্থা পুন প্রবর্তিত হইলে শুধু জনসাধারণের প্রয়োজনই মিটিবে না, রেল বিভাগের আয়ও বাড়িবে। রেলবিভাগের সচিব এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার মধ্যেই রেলবিভাগের আয় বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া যাত্রীদের ভাড়া হ্রাস কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে টিকেটের মূল্য হ্রাসের সুবিধা না করিলে রেলপথের আয় স্থায়ীভাবে বাড়িবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সঙ্গে রেলবিভাগের নীতিনির্ধারণে কর্তাদের খেয়ালখুশির মনোভাবেরও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। বহুক্ষেত্রে যে বেহুদা ব্যয় চলিতেছে তাহা হ্রাস করিতে হইবে। রেল বিভাগের দুর্নীতির কথা রেলমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য তদন্ত কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুর্নীতির স্রোত বন্ধ করা বড়ই কঠিন। যতদিন পর্যন্ত রেলপথে লোকের ভিড় না কমিবে অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ যাত্রী এবং মালগাড়ীর ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করিয়া উঠিতে না পারিবেন, ততদিন রেলপথে দুর্নীতির গতি রুদ্ধ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বস্তুত গাড়ীতে স্থানাভাবে এবং মালগাড়ীর একান্ত অভাবের সেই অবস্থায় লোকে প্রাণের দায়ে এবং স্বার্থহানির সংকট এড়াইবার জন্য উৎকোচ প্রদানে প্ররোচিত হইবে এবং কর্মচারীদের পক্ষে দুর্নীতির আশ্রয়ে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র উন্মুক্তই থাকিবে।

শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতির গতি

রেল বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত লালবাহাদুর শাস্ত্রী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা দুর্নীতির গতি রুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতার এই পরিস্থিতিতে নৈতিক অধঃপতনের গতি আমাদিগকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে আমরা এ সম্বন্ধে যতই ভাবি, আমাদের মনপ্রাণ ততই নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়ে। শুধু রেল বিভাগ কেন, শাসন-বিভাগের অনেক ক্ষেত্রেই দেশের দুর্দশা লইয়া অর্থ লুণ্ঠন করিবার পাপ ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত সরকারের ছয়জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িকভাবে কার্যচ্যুত করা হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারো কাহারো নামে মামলাও দায়ের করা হইয়াছে। এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারসমূহের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত সকল বিভাগের মধ্যে দুর্নীতি এবং অসাধুতা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে এবং সরকারের যত রকমের সাধু সংকল্প সবই এই অসাধুতা ও দুর্নীতির পাকে ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতেছে। দেশের লোকের রক্ত চুষিয়া অসাধু কর্মচারীবর্গের রাক্ষসী পিপাসা পরিতৃপ্ত হইতেছে। অবস্থাটা নিশ্চয়ই জটিল এবং গভীর উদ্বেগজনক। এই পাপচক্রের আবহাওয়া বস্তুত সমধিক সুদূরপ্রসারী এবং ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে হয়ত অনেকটা গোড়ায় যাইতে হয়। বস্তুত দেশের রাজনীতির মূলে জাতির বৃহত্তর স্বার্থবোধের আদর্শ বর্তমানে আর তেমন বলিষ্ঠভাবে কাজ করিতেছে না। পরন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের দুর্বলতা রাজনীতির প্রাণ-শক্তিকে অনেকটা অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ফলে গতানুগতিক ব্যবস্থা চালাইয়া যাইবার একটা সুবিধাবাদ শাসনবিভাগের নীতির মূলে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অবস্থাটা গভীরভাবে তলাইয়া দেখা দরকার। কমিটি কমিশন নিয়োগ অথবা তদন্তের ফলে, ইহার বাহ্য উপসর্গটিকেই কিছুদিনের জন্য চাপা দেওয়া চলিতে পারে; কিন্তু ব্যাধি নূতন আকার ধারণ করিবে এবং তাহার গতি হয়ত সমধিক সূক্ষ্ম আকারে সম্প্রসারিত হইবে। কার্যত রোগের কারণ তদ্দ্বারা নিরাকৃত হইবে না। সাময়িক তুকতাকের চেষ্টা না করিয়া এই ব্যাধির মৌলিক প্রতিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রশক্তিকে জাগ্রত করাই বর্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং বড় বড় পরিকল্পনার বিলাসে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এইটিই প্রয়োজন।

রঞ্জন

সেই ম্যাক্স ম্যুলার আমাদের আর্য বলে অভিহিত করবার পরে (যখন আমরা সকল কার্য ছেড়েছিলুম) অনেক দিন আমাদের আত্মাভিমানের অনুকূল বিশেষ কিছু বাইরে থেকে আমরা শুনিনি। তার পরে যত অপবাদ ভারতের শিরে স্তূপীকৃত হয়েছে প্রায়শই তার পশ্চাতে রাজনীতিক দুরভিসন্ধি ছিল। আমরাও সেই অজুহাতে সেগুলি হেলাভরে উপেক্ষা করেছি, কখনো বা কাদার বদলে কাদা ছুঁড়েছি। ওটা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ। যুদ্ধে ও ঘৃণায় সাত খুন মাপ।

পরে ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি সব বদল হয়ে গেল। আমাদের নিন্দারটনায় যাঁদের রসনার একদিন বিরাম ছিল না অকস্মাৎ তাঁরা আমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। গতকালের 'উলঙ্গ ফকির' হঠাৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব বলে বর্ণিত হতে লাগলেন। গত সপ্তাহের জাপানী তাঁবেদার আজ কলকাতার ফিরিঙ্গি কাগজে 'নেতাজী'। পণ্ডিত নেহরুর মতো দূরদ্রষ্টা বিশ্বনায়ক তো নাকি সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে কভি নেহি হুয়া।

প্রশংসার মতো আফিম আর নেই। যাদের নিন্দা একদিন অভিসন্ধিপ্রসূত বলে অবজ্ঞা করতুম, আজ আমরা তাদের প্রশংসা বিনাপ্রশ্নে মাথায় তুলে নিই; একবারও সন্দেহ করি না যে এই প্রশংসাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে। একবারও মনে এমন সম্ভাবনার স্থান দিই না যে বর্তমানের স্তুতিবর্ষণের মূল লক্ষ্য এও হতে পারে যে, আমরা যেন ওদের অতীতের দুষ্কৃতি স্মরণে না রাখি, আমরা যেন আমাদের বর্তমান দৈন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে না উঠি। অর্থাৎ, এও হতে পারে যে আমাদের আবার আর্য বলে সম্ভাষণ করা হচ্ছে ঠিক এই কারণেই যে আবার যেন আমরা সকল কার্য ছাড়ি।

*

হল্যান্ডের বিশ্রুত য়ুট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আলফ্রেড শেংকমান যে সম্প্রতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুণকীর্তন করেছেন তা ঠিক উপরের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করে অবিচার করব না। কিন্তু প্রশংসা বলেই তা নির্বিচারে গলাধঃকরণ করতে আমার বাধে। প্রথমত মনে রাখতে হবে যে অতিথির পক্ষে অমায়িক হওয়াই স্বাভাবিক। বহিরাগত বান্ধবদের প্রশংসা-সেবনের বিধি তাই বেশ কয়েক চামচে নুন মিশিয়ে নেয়া। দ্বিতীয়ত, ভারতে আসবার কালে কেউ কেউ এত কম আশা নিয়ে আসেন যে তাঁরা অল্পেই খুশি হন। এতে আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগলেও এর সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তৃতীয়ত, যে যে ভারতীয় সংস্থার কার্যকলাপ আমরা সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করি তার কতটুকু ভ্রামণিকের চোখে পড়ে? তবু সেই বিদেশীরই রায় মেনে নিতে হবে? শেংকমান নিজেও ভারতীয়-দের মধ্যে এই দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা বিদেশীর মতামতের অত্যধিক মূল্য দিই। নিজেদের চোখের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে বাইরের লোকের নিন্দায় বিচলিত হই এবং প্রশংসায় প্রতারিত হই। এই মনোবৃত্তির মূলে আছে গভীর আত্ম-অনাস্থা। শেংকমান আমাদের এই অপ্রিয় সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বন্ধুর কাজ করেছেন।

*

কিন্তু একটু পরেই এই প্রিয় অসত্য-গুলি তিনি কী করে উচ্চারণ করলেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি য়ুরোপের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ-য়ুট্রেক্টের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়? যে উপ্সালার ছাত্রে আর উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রে কিছু-মাত্র গুণগত প্রভেদ নেই? যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি অন্যান্য দেশের তুলনায় আদৌ অবজ্ঞেয় নয়? কথাগুলি মানতে পারলে নিরতিশয় আনন্দের কারণ হোতো, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেবে।

শেংকমান নিজেও তাঁর ডান হাতে দেয়া সব প্রশংসা বাঁ হাতে ফিরিয়ে নেন যখন তিনি বলেন, ভারতীয় ছাত্রদের প্রধান উদ্দেশ্য যেন বিদ্যার্জন নয়, পরীক্ষাবৈতরণী পার হওয়াই তাদের প্রথম ও সর্বশেষ অভিলাষ।

এই ডিগ্রীলোলুপতার কারণ একটি নয়। সবগুলির জন্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও দায়ী নয়। সামাজিক বিপর্যয়ের প্রতিফলন শিক্ষায়তনেও ব্যাপ্ত হতে বাধ্য। কিন্তু এর সবকিছু মেনে নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় যত অভিযোগ জড়ো হয় তার পরিমাণ ভয়াবহ ও লজ্জাকর। সর্বকালে ও সর্ব-দেশেই শিক্ষার একটা ব্যবহারিক দিক থাকে, পরীক্ষার সিঁড়ি বেয়ে চাকরির দোতলায় আরোহণ। কিন্তু সার্থক শিক্ষক কখনো এই বিদ্যার বেচাকেনায় প্রশ্রয় দেন না, সে ব্যবসায় ব্যাপারী হওয়া তো দূরের কথা। আমাদের অধিকাংশ ছাত্রদের যে আজ বিদ্যার্জনে রুচি নেই তার প্রধান কারণ এই যে অধিকাংশ অধ্যাপকরা আজ অন্যমনা। তাঁদের দৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাগারে নিবদ্ধ নয়, তাঁদের লুব্ধ চোখ আজ আশুতোষ ভবনের নীচের তলার ওই দোকানগুলির উপর।

*

এই দোকানী মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ শুধু নোটবই-লেখায় আর টুইশানি-সন্ধানেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য লক্ষণ শিক্ষাসম্বন্ধবিরহিত অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-বিতরণ, মন্ত্রীপূজা, ইত্যাদি ঘৃণ্য প্রথা-গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এই মনোবৃত্তি প্রবেশাধিকার লাভ করাতে সমস্ত আবহাওয়াটাই দূষিত হয়েছে, এবং বিচিত্র নয় যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে সংক্রামিত হয়েছে। একান্ত সহজবোধ্য কারণেই, দায়িত্বটা শিক্ষকদেরই বেশি।

শিক্ষক যদি বিদ্বান বলে সম্মানিত হয়ে তুষ্ট না থেকে রাজসম্মান ভিক্ষা করেন, অর্থলোভে শিক্ষকতা পরিহার করে অন্য চাকরি গ্রহণ করতে সদাব্যগ্র থাকেন, ছাত্রদের সামনে প্রকাশ্যে বিদ্যা-হীনের পদলেহনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (প্রত্যেকটার জন্যে একাধিক নাম করতে পারি)—তাহলে ছাত্ররা নিজগুণে অন্যরূপ হবেন, এমন আশা করি কোন অধিকারে?

শেংকমানের রায় মেনে নিয়ে আমার মত বদলাবার আগে আমি তাই ব্রজেন্দ্র-লাল মিত্রের তদন্তের ফলাফল জানতে চাই।

/

শিশুসাহিত্য ও শিক্ষা

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে লোকশিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার কিন্তু শিশুসাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষা নিতান্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়, এক কথায় বলিতে গেলে, শিশুসাহিত্যের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি এই শিক্ষার ব্যপদেশেই।

শিশুমন সকল জিনিস গ্রহণ করিতে পারে না, আর নিছক শিক্ষার রূঢ়তাকে সহ্য করিবার মত শক্তিও তাহার থাকে না। কাজেই তাহাকে যাহা দান করিতে হইবে, তাহা পরিপূর্ণভাবে তাহার গ্রহণোপযোগী হওয়া চাই। নচেৎ সে দান ব্যর্থ। শিশুসাহিত্য শিক্ষার এই রূঢ়তাকে নানাপ্রকারের আবরণ দিয়া শিশুমনের উপযোগী করিয়া তোলে আর এই উপযোগিতাই শিশুসাহিত্যের কৃতিত্বের পরিমাপ।

লেখার ভিতর যদি শিক্ষাদানের একটা উৎকট আগ্রহ প্রকাশ পায়, তবে কিছুতেই তাহা মনোরঞ্জক হইতে পারে না; পরন্তু সর্বথা পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডে শিশুর ভয় অপরিসীম, অশ্রদ্ধাও যথেষ্ট। কাজেই পাঠশালার শিক্ষায় তাহার আগ্রহের অভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে। শিশুকে উপদেশ দিতে হইবে মন ভুলান ছন্দে। কথাটা দরদীর নিকট হইতে আসিতেছে এ ধারণা তাহার হওয়া চাই; নতুবা সে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। সোজা পথে পাঠশালায় না লইয়া গিয়া, ফুলবাগান, তালপুকুর ও খেলার মাঠের পথ ধরিয়া তাহাকে পাঠশালায় লইয়া যাইতে হইবে।

শিশুর মনস্তত্ত্ব না জানিলে সার্থক শিশুসাহিত্য রচনা অসম্ভব। শিশুদের জন্য লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিষয় নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি অক্ষর, পংক্তি সমস্তই ওজন করিয়া লিখিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে রচনার ব্যর্থতা অনিবার্য।

বিশেষজ্ঞদের মতে শিশুমনের পরিণতি দ্বিতীয় পর্যায় সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে। এই সময় শিশুর মেধা অত্যন্ত বাড়ে। তখন যাহা সে কণ্ঠস্থ করে প্রায়শ, পরবর্তী জীবনে তাহা সে ভুলিতে পারে না। একথার যথার্থতা আমরা নিজেদের জীবনেই দেখিতে পাই। সাধারণত ছেলেবেলায় আমরা যে সকল কবিতা ও ছড়া মুখস্থ করিয়াছি তাহা বয়স্ক হইয়াও নির্ভুল বলিয়া যাইতে পারি। কাজেই এই সময় শিশুকে যে সকল জিনিস পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা একদিকে যেমন চিত্তগ্রাহী অন্যদিকে তেমনি চিত্তবৃত্তির পরিবর্ধক হওয়া দরকার।

মনের শক্তি বিকাশের দুইটি দিক আছে। একটি মনের বিস্তৃতি অন্যটি উহার অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ। উদাহরণ দিয়া কথাটাকে একটু পরিষ্কার করা যাক। ফলটি প্রথমত আকারে ক্ষুদ্র থাকে পরে ক্রমশ বড় হয়—এটা তাহার বিস্তৃতি। আবার অন্যদিকে পাখীর ডিমটি ক্রমশ বড় হয় না; উহা হইতে একটি নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়—ইহা ক্রমবিকাশ।

প্রত্যেক মনেরই এই দুইটি দিক বর্তমান, বিশেষত শিশুমনের। শিশুমন পরিপূর্ণরূপে সকল জিনিস গ্রহণ করিতে চায় এবং ক্রমাগত মনের বিকাশের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠে। ক্ষণে ক্ষণে সে নূতন জিনিস আহরণ করিয়া তাহাকে ব্যবহারিক করিয়া তুলিতে চায়। এই নূতন মালমশলা

সংগ্রহে তাহার মনের প্রসার আর তাহার ব্যবহারে মনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। এই দুইটি ব্যাপারকে যাহা দ্বারা সাহায্য করা যায়, তাহাই শিশুমনের খোরাক।

শিশুমন সর্বদাই ক্ষুধার্ত। তাহার আহার্য সংগ্রহ হয় দুই প্রকারে। প্রথমত কোন কোন জিনিসের উপর তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে; এই স্বাভাবিক আকর্ষণের মধ্য দিয়া সে যাহা সংগ্রহ করে তাহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। আহার্য সংগ্রহের দ্বিতীয় পন্থা হইল শিক্ষালব্ধ আকর্ষণ। এ পন্থাটি সহজভাবে তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে না; পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের প্রভাবে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই পথে শিশুর মন ঠিকমত স্ফূর্তিলাভ করিতে পারিলে তাহার আকর্ষিত বিষয়ে বিশিষ্টতালাভ অবশ্যম্ভাবী। এ দিক দিয়া শিশু-সাহিত্যের দায়িত্ব সর্বাধিক।

আমরা প্রথমত স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা বলিব।

অতিশয় রঙীন চিত্র, অত্যন্ত অদ্ভুত স্বর প্রভৃতির প্রতি শিশুমনের স্বাভাবিক আকর্ষণ। জগতের সমস্ত জিনিসকেই সে এইরূপ এক একটি বিশিষ্টতার মধ্য দিয়া পাইতে ইচ্ছা করে; সাধারণ জিনিসের প্রতি তাহার খেয়াল থাকে না। শিশুমন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু এই কল্পনা মোটেই সুসংগত নহে। গরুর দেহের উপর হাতীর মাথা চাপাইয়া সে মজা দেখিতে চায়; কাজেই 'হাতীমি' বা 'হাঁসজারু' তাহাকে আনন্দ দেয়।

অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ বলিয়াই শিশু-মনের কাছে সাহিত্য ভাল লাগে। এই সাহিত্যের মধ্যে ছড়া, কবিতা, সাহসিকতার কাহিনী ও আজগুবী গল্পই তাহার প্রধানতম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ছড়া ও কবিতা আবৃত্তির পক্ষে সুবিধাজনক। সাধারণত শিশুদের মনে যে একটা স্বাভাবিক তালজ্ঞান বর্তমান, কবিতা আবৃত্তিতে তাহার প্রকাশ পায়। দোলনায় দোল খাওয়ার মত মনের এ ছন্দদোল অত্যন্ত রুচিকর। এমন কোন লোক আছেন কিনা সন্দেহ যিনি ছেলেবেলায় কবিতা পড়িতে ভালবাসিতেন না। বয়সের সংগে সংগে, জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে হয়ত তাহার মন আর সেরূপ কোমল নাই —হয়ত এই স্বাভাবিক ছন্দজ্ঞান তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে; কিন্তু কোনও শুভমুহূর্তে সেই সহজ ও সাবলীল তালের ও ছন্দ-জ্ঞানের কথা তাহার মনে পড়িবে সন্দেহ নাই।

শিশুদের জন্য কবিতা রচনা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শিশুসাহিত্যের কবিতায় 'কাব্য' অপেক্ষা কথা বেশি থাকা চাই; ভাষা সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য হওয়া দরকার। আর চাই ছন্দের দোল— অতি সুললিত।

তারপর বিষয়নির্বাচন। বিষয়টি যত মূর্ত ও ব্যক্তিগত হইবে, লেখা শিশুদের নিকট তত সরস হইবে সন্দেহ নাই। অমূর্ত জিনিসকে মনে মনে আকার দিয়া তাহা হইতে রস সংগ্রহের ক্ষমতা শিশু-মনের থাকে না; কাজেই বক্তব্য বিষয়টা তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে না।

শিশুর নিকট আজগুবী গল্প ভাল লাগে। এই ভাল লাগিবার কারণ, এগুলি তাহার কল্পনাপ্রবণ মনের খোরাক জোগাইয়া চলে। তাহার কল্পনায় সম্ভব অপেক্ষা অসম্ভবের দাবী বেশি; কাজেই গল্প যত অসম্ভব হয়, ততই তাহার আকর্ষণ বাড়ে। ক্রমশ নানা ব্যাপারের অসম্ভবত্ব তাহার নিকট সুপরিস্ফুট হইতে থাকে আর সেই সময় হইতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইতে শুরু হয়।

এই অসম্ভবত্বে বিশ্বাসপ্রবণতা আছে বলিয়াই বাস্তবের রূঢ়তাকে শিশুমন ক্রমশ সহ্য করিতে শিখে। বয়সের সংগে সংগে ইহার নিঃশেষ পরিসমাপ্তি ঘটিবার কথা, কিন্তু সর্বত্র তাহা ঘটে না। বয়স্ক লোকদের মধ্যেও ইহা সর্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

এখানে শিশুমনস্তত্ত্বের একটি অতি প্রধান কথার উল্লেখ করিতেছি। সেটি এই। শিশুরা সর্বজিনিসের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিতে চায় আর নিজেকেও এই দৈনন্দিন জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারে না। কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করা যাক। জড় জিনিসের মধ্যে যে চেতনা নাই, তাহারা যে আমাদের মত সুখ ও দুঃখ বোধ করিতে পারে না, একথা শিশুরা প্রথমত বোঝে না। পরে ক্রমশ ব্যবহারিক জগতের সম্পর্কে আসিয়া একথা বুঝিতে থাকে। তাই আছাড় খাইলে মা যদি মাটিকে শাসন করে, তবে সে সন্তুষ্ট হয়। তাহার জগতে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, শৃগাল কুকুর মনুষ্যের ভাষায় কথা বলে। তাহার চিন্তা-জগৎ পারিপার্শ্বিক জগতের বাহিরে যায় না কাজেই সজনে গাছের ফুল, কুলের আচার, খালের জল, খেলার মাঠ, দাদার বকুনি আর মায়ের আদর ইত্যাদিকে বাদ দিয়া কিছু রচনা করিলে সে রচনার কদর তাহার নিকট হইতে পারে না।

তারপর শিক্ষালব্ধ আকর্ষণের কথা। সে কথা আপাতত মুলতুবী রহিল।

ডাক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কে তোমরা আমাকে ডাকো। শীতহ্রস্ব অল্পায়ু শিথিল
দিনের অন্তিম আলো পৃথিবীর মন
যে-মুহূর্তে মেখে নেয়, সূর্যদেব হঠাৎ যখন
অপসৃত আকাশের রক্তরঙ রঙ্গমঞ্চ থেকে
নেপথ্যের অন্ধকারে, দৃষ্টির দুয়ারে দিয়ে খিল
যখন বিবর্ণ যুঁই-মল্লিকার ম্লান গন্ধ ভাসে
সন্ধ্যার হাওয়ায়, তার স্মৃতির জানলায় মুখ রেখে
কে তোমরা আমাকে ডাকো অন্ধকার রাত্রির আকাশে।

কে বলো তোমরা দু'হাতে ছড়াও
কুয়াশাকঠিন জ্বালা
এ-হৃদয়ে, এই নিদ্রানিবিড়
রাত্রির চোখে জ্বলে
যে-আশা তোমরা কে তাকে পরাও
স্মৃতির ছিন্ন মালা,
কে তোমরা জাগো শীতরজনীর
গোপন গুহার তলে।

কে তোমরা, কে তোমরা এই অবসন্ন চিন্তার শরীরে
যন্ত্রণা জ্বালাতে এলে, শীতবন্ধ্যা মাঠে
কে তোমরা দাঁড়িয়ে আছো জরাজীর্ণ স্মৃতির চৌকাঠে।
আমাকে ডেকোনা,—ওই ব্যগ্র ডাক শুনে
কে যাবে হারিয়ে বলো আকাশের নক্ষত্রের ভীড়ে,
কে-আর পোড়াবে পাখা বারবার স্বপ্নের আগুনে।

কাঠি-পরানো ছবির কাপড়

ফ্রেমে-আঁটা ছবির কাপড়

বড়ো তিব্বতী টংগায় এইভাবে কাজ করা হয়

শিল্পচর্চা

নন্দলাল বসু

তিব্বতী টংগা

এ রকম কাজকে ইংরেজিতে ব্যানার (banner) ও তিব্বতী ভাষায় টংগা বলা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, গুটিয়ে রাখা হয় আর ইচ্ছামতো দেয়ালে টাঙানো যায়, এজন্যে উড়িষ্যাতেও এ-জাতীয় চিত্রপটকে টংগাই বলে। তিব্বতী টংগার প্রতিচ্ছবি অনেক ছবির বইয়ে পাওয়া যাবে। অনেক মিউজিয়মে বা চিত্রশালাতেও আসল তিব্বতী টংগা সংগৃহীত আছে; এগুলি দেখলে বস্তুটির বিশেষ বিষয় আর বিশেষ রকম অঙ্কনরীতি বা বর্ণ-সমাবেশের রুচি ও প্রথা ঠিকমতো বোঝা যাবে। তিব্বতী টংগার অনুরূপে ছবি করতে হলে যে সব জিনিস দরকার আর যেভাবে কাজ করতে হয়, সংক্ষেপে তা লিপিবদ্ধ করা যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ জিনিসের মধ্যে—ছবির ফ্রেমের মতো চৌকা একটি ফ্রেম। দেশী, মোটা, কোরা কাপড় (কোরা কাপড় ফ্রেমে চড়াবার আগে কেবল কচ্‌লে ধুয়ে নিতে হবে) অথবা ফাঁক-বুনোন লিনেন (কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল মার্কেটে পাওয়া যায়)। কাপড়ের আয়তন ফ্রেমের তুলনায় চারদিকে কমপক্ষে দু' ইঞ্চি করে ছোট হবে; ছবির আয়তন বুঝে আরো ছোটো করলে ক্ষতি নেই। ফ্রেমের ভিতর-কার চার ধারের মাপের চেয়ে এক ইঞ্চি করে ছোটো চারটি কাঠির প্রয়োজন। কাঠিগুলি পেন্সিলের মতো মোটা ও গোল; বেত বা শর কেটে নিয়ে বা বাঁশের কঞ্চি চেঁচে ছুলে নিয়ে কাজ চলে যাবে। ঐ চারটি কাঠি যাতে গলিয়ে পরানো যায়, কাপড়ের চারধার এমনভাবে ভাঁজ করে মুড়ি-সেলাই করে নিতে হবে। এরপর কাপড়ের ঐরূপ চারটি পাড়ের ভিতর দিয়ে চারটি কাঠি পরিয়ে, টোয়াইনের মতো মোটা শক্ত সুতায় মোটা ছুঁচ দিয়ে পূর্বোক্ত ফ্রেমের উপর দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ঢোলক ছাওয়ার মতো ছাইতে হবে; ফলে কাঠি-পরানো কাপড়খানা চারধারে ফ্রেমের সংগে যুক্ত হয়ে যাবে; সুতা টেনে-টুনে ইচ্ছামতো কাপড়খানি টান করা বা ঢিলে করা সম্ভব হবে। বড়ো ফ্রেমে বড়ো মাপের কাপড় চড়িয়ে ছবি আঁকবার জমি তৈরি করে ইচ্ছানুযায়ী কয়েকটি ভাগ (division) করে নিয়ে একসংগে তিন-চারখানি ছবি করতে পারা যায়। তা হলে তিন-চারখানি ছবির জন্যে তিন-চারবার কাপড় ছাওয়ার হাংগামা থাকবে না। যখন যে অংশটিতে ছবি করা হবে, সেটি খুলে রেখে বাকি অংশটা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখলেই ছবি আঁকার অসুবিধা হবে না। আর, ইচ্ছা হলে অস্তর লাগিয়ে জমি তৈরি করে নেওয়ার পর ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কাপড় কেটে কেটে নিয়ে কোনো একটা কাঠের পাটার উপর আঠা-লাগানো কাগজের ফিতে বা পটি দিয়ে মাউণ্ট করে অর্থাৎ চারধার এঁটে নিয়ে সহজেই ছবি আঁকা যাবে। মাউণ্ট করবার জন্যে কাপড়ের টুক্‌রাটি একটি চ্যাপ্টা চওড়া তুলি বা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে খুব সামান্য ভিজিয়ে নিতে হবে, পরে আঠা-লাগানো কাপড়ের বা কাগজের পটি দিয়ে কাপড়ের চারধার কাঠের পাটার সংগে আঁটা হবে; কাপড় শুকিয়ে গেলেই বেশ টান হয়ে যাবে।

তিব্বতীরা ইজেল বা দাঁড়া তেকাঠি ব্যবহার করে না; বড়ো ছবি হলে কীভাবে আঁকে সেটা কৌতূহলের বিষয়। সেক্ষেত্রে আড়ায় বা সামনের কোনো একটা থামে (চিত্রকরের আসনের বাঁ দিকে) একটি দড়ি বেঁধে দড়ির অপর প্রান্তটি ছবির ফ্রেমের উপরের কোণায় (চিত্রকরের ডান দিকে) বাঁধে, যাতে ছবির ফ্রেমখানা তেরছাভাবে সামনের চৌকির উপর একটু লেগে থাকে এবং ইচ্ছামতো অল্প ঘোরানো-ফেরানো চলে।

এর পর জমি তৈরি করবার বা কাপড়ে অস্তর লাগাবার পদ্ধতি। এজন্য রঙ কিভাবে তৈরি করা চাই, সেটিই প্রথমে দেখা যাক্। খানিকটা ভালো পাথুরে খড়ির রঙ (পাথুরে খড়ি বেনের দোকানে পাওয়া যায়, প্রতিমা রঙাবার কাজে এই খড়ির ব্যবহার আছে) বা শাঁখের তৈরি সাদা
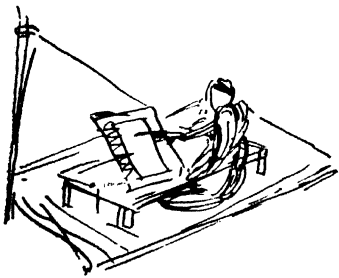
রঙ (পুরীর পটুয়াদের কাছে পাওয়া যায়) বা সফেদা (zinc white) প্রয়োজন। শুক্নো গুঁড়ো সাদা হলে ঔষধ-মাড়া খলে, পাথরের খলে, আর বেশি রঙ হলে মজবুত বড়ো কাঠের খলে মেড়ে মোলায়েম করে নিতে হবে। ঐ রঙ আলাদা পাত্রে থাকবে এবং প্রয়োজনমতো নিয়ে শিরিষ আঠা ও ডিম (মুরগি বা হাঁসের ডিমের পুরো কুসুম ও সাদা অংশ) মিশিয়ে খল-নুড়িতে আর একবার অনেকক্ষণ ধরে ভালোভাবে মেড়ে নিতে হবে। দরকার বুঝে অল্প অল্প জলও মেশানো চলবে। এখন ঐ ঘন মাখমের মতো রঙ কাপড়ে পোঁছ বা লেপ দেবার উপযুক্ত করবার জন্যে আরো জল মিশিয়ে চন্দনি ক্ষীরের মতো পাৎলা করে নিতে হবে। অতঃপর চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা রঙে নুন-চামচের এক চামচ বোরিক পাউডার মেশানো প্রয়োজন। তবে পূর্বোক্ত শিরিষ তৈরি করবার সময় অল্প রিঠার টুকরা দিয়ে সিদ্ধ করা হয়ে থাকলে বোরিক লাগবে না। (ফট্‌কিরির ব্যবহার হবে না) এক পেয়ালা রঙে দু-তিন ফোঁটা লবঙ্গ-তেল দেওয়া ভালো, তাতে ডিমের দুর্গন্ধও কতকটা যাবে। দিনান্তরে তৈরি রঙ ঘন হয়ে শুকিয়ে যেতে পারে, তখন ঈষদুষ্ণ (ঠাণ্ডা বা গরম নয়) জল ও আঠা শিরিষ ও ডিম মেশানো) মিশিয়ে পাৎলা করে নিলেই হবে; বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই, প্রথমবারে তৈরি রঙের চেয়ে এখন আঠা বেশি না হয়ে পড়ে। আঠা ঠিক হল কি না, তার পরীক্ষা—ধারের কাপড়ে অর্থাৎ ছবির জন্যে যতটা নির্দিষ্ট তার বাইরের জমিতে একটু রঙ লাগিয়ে শুকোবার পর আঙুল দিয়ে ঘষে দেখা। আঠা কম হয়ে থাকলে আঙুলে রঙ উঠে আসবে। আর বেশি আঠা হয়ে থাকলে রঙ-শুকোনো কাপড়টি মুড়লে রঙ ফেটে যাবে বা রঙের প্রলেপের মধ্যে ছোপ-ছোপ দাগ ফুটে উঠবে।

অস্তরের রঙ ঠিক-ঠিক তৈরি হলে সেই রঙ কাপড়ে লাগিয়ে জমি তৈরি করার কথা আসে। তৈরি রঙটি ফ্রেমে জড়ানো কাপড়ের দুপিঠে একটি শক্ত তুলি (বেত-ছেঁচা তুলি বা hog-hair brush) দিয়ে বেশ করে ঘষে ঘষে লাগাতে হবে, যাতে একদিকের রঙ আর এক দিকে অল্প অল্প বেরিয়ে আসে। দুপিঠেই রঙ লাগানো হলে ঐ তুলি দিয়ে দুপিঠের, রঙটিকে সমান করে নিতে হবে। আর, কাপড়ে লাগানো রঙ বেশ শুকিয়ে গেলে, অস্তরটির উপর ঘাসের কুঁচি দিয়ে বার বার জল ছিটোনোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভোঁতা ছুরি বা বাঁশের চেয়াড়ি (পাকা বাঁশের ছাল তুলে ছুরির মতো করে নেওয়া হয়) তা দিয়ে বার বার চেঁছে ফেলে দিতে হবে; অবশ্য ফেলে না দিয়ে উদ্বৃত্ত অস্তরের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতেও পারা যায়। কাপড়টি চাঁছা হয়ে যাওয়ার পর ভালো করে শুকিয়ে নেবে। সমান করে চাঁছা না হলে পূর্বোক্ত রীতিতে আবার ভিজিয়ে আবার চাঁছতে হবে অথবা অস্তরের রঙ আবার লাগিয়ে সমান করে নিতে হবে। চাঁছার পর শুকিয়ে গেলে কাপড়টি আলোয় ধরে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, আর অস্তর লাগানোর বা চাঁছার প্রয়োজন আছে কি না। অস্তরের রঙের ভিতর দিয়ে কাপড়ের বুনানি যখন সব জায়গায় সমানভাবে দেখতে পাওয়া যাবে, তখনই বুঝতে হবে জমি ঠিক তৈরি হয়েছে।

এই জমি শুকিয়ে গেলে ঘোঁটন-পাথর (agate বা শাঁখ) দিয়ে শক্ত পালিশ-করা কাঠের পাটার উপর রেখে পালিশ করতে হবে। জমি খুব সামান্য স্যাঁৎসেতে (damp) থাকা এবং জমির উপর একখানি পাৎলা তেলা কাগজ (tracing paper) রেখে পালিশ করা ভালো। কাঠের পাটার বদলে পুরু কাঁচ হলে তো ভালোই হবে। পালিশ করতে করতে কাপড় ঢিলে হয়ে পড়লে কাপড়ে আর ফ্রেমে জড়ানো সুতো টেনে-টুনে কাপড়টি আবার টান করে নিতে হবে।

ছবির রেখাচিত্র বা ড্রয়িং ঠিকঠাক আলাদা একখানি কাগজে করে তৈরি জমির উপর তুলে (trace করে) নিতে হবে। টেম্পারা ছবিতে যে রঙ লাগে, বিলাতি জল-রঙের কেক (Winsor & Newton-এর পাকা রঙ) এতে ব্যবহার করা যাবে। অথবা দেশী মাটি বা পাথরের রঙে হিসাবমতো ডিম (হলুদে কুসুম) অথবা শিরিষ অথবা গঁদ মিশিয়েও কাজ করা যাবে। সর্বদা ছবিতে লাগাবার আগে রঙ আঙুল দিয়ে উত্তমরূপে মেড়ে নেওয়া দরকার। রঙ লাগালেও সম্ভবমতো লক্ষ্য রাখা চাই, জমির বুনোন কিছু যেন দেখা যায়। এক রঙ বার বার লাগিয়ে পুরু করতে হবে, একেবারে ঘন রঙ ব্যবহার করা ভালো নয়। সমাপ্ত ছবিতে যে রঙের যে ঘনতা দরকার, রঙ তৈরি করতে গিয়ে প্রথমেই সেইমতো ঘন করলে চলবে না, সাদা মিশিয়ে অপেক্ষাকৃত হাল্কা করেই তৈরি করতে হবে, বার বার লাগাতে লাগাতে ক্রমশ রঙ আপনা থেকে ঘনতা পাবে—যে কোনোরকম টেম্পারা ছবি করা থাকলে একথা সহজেই বোধগম্য হবে। রঙ লাগানো সারা হলে পূর্বের মতো আর একবার পাৎলা কাগজ রেখে পালিশ-পাথর দিয়ে ছবি পালিশ করে নেবে। ট্রেসিং
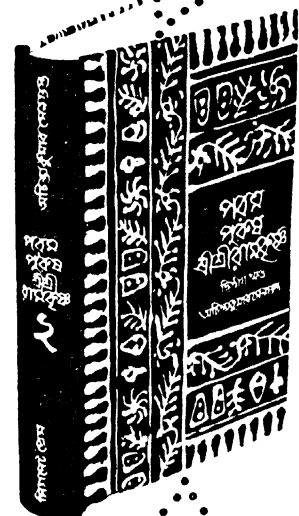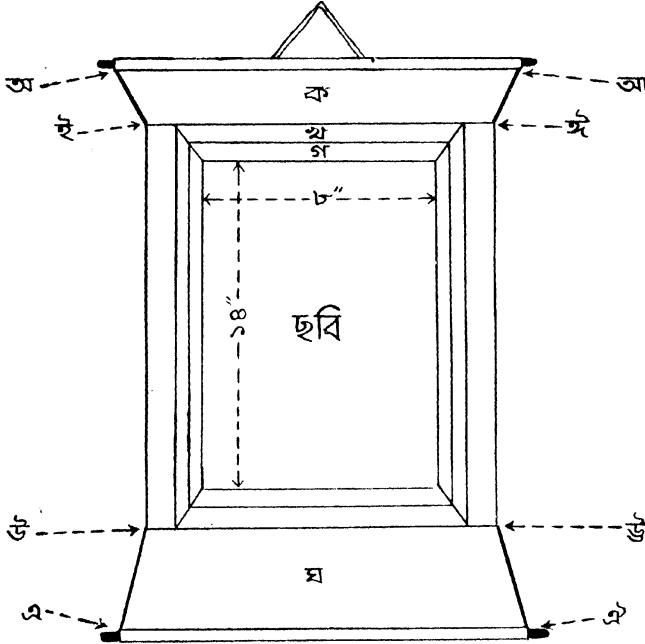
ছবিটির ক্ষেত্র ৮″×১৪″ ইঞ্চি। তার চারধারে প্রথম একটি সরু পাড় (গ ১২″ চওড়া), দ্বিতীয় পাড়টি আরো সরু (খ ১″ চওড়া)। ইঈউঊ সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র, চওড়ায় (ইঈ বা উঊ) ১৪″ ইঞ্চি। ক চওড়ায় ৩″ ইঞ্চি, ঘ ৭″ ইঞ্চি চওড়া। অআ অথবা এঐ মাপে ১৫″ ইঞ্চি। টঙ্গাটির উপরে ও নীচে মজবুত, মসৃণ ও গোল রোলার বা কাঠি পরানো আছে; প্রয়োজনমতো গুটিয়ে রাখা যায়, টাঙানো যায়।

কাগজ ব্যবহার করাই চাই, সরাসরি রঙের উপর ঘোঁটা না হয়। খুব সূক্ষ্ম কাজ বা গহনা ইত্যাদি নক্সার কাজ করবার থাকলে, তৎপূর্বে তিসি-থেঁতো করা জলের হাল্কা একটি লেপ (wash) বুলিয়ে, শুকিয়ে আবার একটু পালিশ করে কাজ আরম্ভ করবে।

[তিসির জল ॥ বড়ো চামচের এক চামচ (one table spoon) শিলে ছেঁচা তিসি ন্যাকড়ার পুঁটুলি বেঁধে আধ সের ফুটন্ত গরম জলে এক রাত্রি ভিজিয়ে রেখো। তারই সঙ্গে চায়ের চামচের এক চামচ ভালো মদ (বা absolute alcohol) মিশিয়ে খুব পাৎলা আঠা বা সলিউশন (solution) হবে; তারই দু-এক পোঁছ ছবিতে লাগালে ছবির রঙ মোলায়েম হবে, ধাতুর রঙ, যেমন সোনা রুপা, লাগিয়ে গহনা প্রভৃতি সূক্ষ্ম কারুকাজ করবার সুবিধা হবে। কেবল সোনা-রুপা লাগাবার জায়গাতেই এই সলিউশন ব্যবহৃত হবে।]

ছবিতে আলো ছায়া (সাদা বা ঘন রঙ) লাগাবার সময় তুলিতে রঙ নিয়ে মুখের লালা দিয়ে রঙটি পাৎলা করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে মিলিয়ে ব্যবহার করার রীতি আছে। লালাতেই আঠার কাজ করে। বেশি আলো-ছায়ার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। পাথুরে ও মেটে রঙ, উদ্ভিজ্জ রঙ, এ ছাড়া ধাতব বিষাক্ত রঙ এভাবে ব্যবহার করা ঠিক নয়, বিপদ হতে পারে। জল দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে এরূপ আলো-ছায়ার কাজ করা সম্ভব। রঙটি মেলাবার জন্যে বাঁ হাতের চেটো বা উল্টা পিঠ অথবা ছোটো তেল-রঙের প্যালেট (oil colour palette) ব্যবহার করা যেতে পারে।

সবশেষে ছবিতে ভার্নিশ লাগাবার বিধি। ভালো ছবিতে, বিশেষত দেব-দেবীর ছবিতে, ভার্নিশ লাগাবার রেওয়াজ নেই। এক বোতল ভালো তার্পিন তেলে (এক পাঁইট পরিমাণ) পরিষ্কার খাঁটি মোম (একটা টোপা কুলের পরিমাণ) দিয়ে সেই বোতলটাকে গরম জলের পাত্রে রাখো। মোম গলে গেলে বেশ করে ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে নাও। সেই মোম-মেশানো তার্পিন গরম-গরম একটা নরম চ্যাপ্টা তুলি দিয়ে অথবা স্প্রে (spray) করে একবার অথবা দু'বার লাগালেই চলবে। এতে ছবি চক্‌চকে হবে না, কিন্তু রঙগুলি বেশ মোলায়েম দেখাবে।

এখন ফ্রেম থেকে (পাটায় আঁকা হয়ে থাকলে পাটা থেকে) ছবির চারধার কেটে ছবি বার করে নিয়ে কি রকম কাপড়ে কয়টি পাড় বসিয়ে কিভাবে ছবি বাঁধাই করলে টাঙাবার উপযোগী হবে, সেটি কোনো একটি ভালো তিব্বতী টঙ্গা দেখে বুঝে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কোনো একটি তিব্বতী টঙ্গার মোটামুটি মাপ এখানে দেওয়া গেল। এতে মাপগুলির পারস্পরিক মান বা প্রমাণের কতকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

আঠা (medium)

ছবি আঁকবার জমি তৈরি করা হয় সাদা রঙের 'অস্তর' (আস্তরণ) বা প্রলেপ দিয়ে, জমি তৈরি হলে নানা রঙে ছবি আঁকা হয়। সব সময়েই অস্তরে বা ছবির রঙে আঠা মেশাতে হয়; না হলে অস্তর বা রঙ স্থায়ী হতে পারে না। আশ্রয় বা প্রয়োজন ভেদে নানারকম আঠা, তা তৈরি করবার পদ্ধতি উপস্থিত আলোচনা করা যাক্।

শিরিষ আঠা

বাজারে পরিষ্কার শুক্‌না শিরিষ আঠা পাওয়া যায়। শিরিষের সগোত্র আরো দুই প্রকার খুব ভালো আঠা পাওয়া যায়: তা হল—fish glue আর gelatin। সংস্কৃতে শিরিষকেই বলা হয়েছে বজ্রলেপ।

ক্রয় করা শিরিষ অল্প গুঁড়িয়ে অথবা কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে একটি কলাইয়ের বাটিতে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখো বেশ কিছুক্ষণ। অপেক্ষাকৃত বড়ো একটি পাত্রে জল গরম করো; তৎপূর্বে শিরিষ-ভেজানো বাটিটা বড়ো পাত্রে আধ-ডুবিয়ে রাখো কয়েকটা নুড়ির উপর। বড়ো পাত্রের জল যেমন ফুটতে থাকবে, তারই উত্তাপে ছোটো পাত্রের শিরিষ গলতে থাকবে, কেবল কাঠের একটি কাঠি দিয়ে মাঝে মাঝে নেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। শিরিষটা বেশ গলে গেলে কাপড়ে ভালো করে ছেঁকে নিয়ে একটি কোনো কাঁচের বা কলাইয়ের পাত্রে রেখে দেওয়া যাবে। একতার চিনির রসের মতো হবে শিরিষ। চা-পেয়ালার এক পেয়ালা শিরিষে নুন-চামচের এক চামচ ফট্‌কিরি-গুঁড়ো মেশাতে হবে; শিরিষটা বেশ ঠাণ্ডা হলে, তার পূর্বে নয়। ফট্‌কিরির বদলে প্রতি পেয়ালা শিরিষে চা-চামচের আধ চামচ বোরিক গুঁড়া মেশালেও চলে। ফট্‌কিরি বা বোরিক মেশালে তৈরি শিরিষ বেশি দিন রাখা যাবে, আর যে রঙে মেশানো হবে তাতে পোকা লাগবে না। তিব্বতীরা ফট্‌কিরি বা বোরিকের বদলে শিরিষ জ্বাল দেবার সময়েই অল্প রিঠার ছাল দেয়, কীটনিবারণ তাতেই হয়।

ভারী পাথুরে বা মেটে রঙের সঙ্গে মেশাতে হলে শিরিষ একটু ঘন হবে; মিহি রঙে পাৎলা। প্রয়োজনমতো ও পরীক্ষা করে করে শিরিষ পাৎলা বা ঘন করা যাবে। ঘন আঠা পাৎলা করতে হলে গরম জল মেশাবে।

রঙে আঠা মিশিয়ে ঠিক হল কি না, সর্বদা পরীক্ষা করে নিতে হবে—ছবির বাইরে কোনো জায়গায়। পরীক্ষার সহজ রীতি হল আঠা-মেশানো রঙ হাতের উপর-পিঠে লাগিয়ে শুকোনো; পরে আঙুল দিয়ে ঘষলে রঙ যদি ধুলোর মতো আঙুলে লেগে যায়, বুঝতে হবে আঠা কম হয়েছে, আর হাতের ঐখানটা কুঁচকে ধরলে যদি পাপড়ি হয়ে রঙ ফেটে যায় ও ঝরে যায়, বুঝতে হবে আঠা বেশি হয়েছে। রঙে আঠা বেশি হলে রঙের প্রলেপে ছোপ ছোপ দাগ ফুটে উঠবে। এমন কি জমির অন্তরেও যদি এরকম দাগ একবার ফোটে, ছবি শেষ হওয়া অবধি যত রঙের পোঁছই চাপানো যাক, সে আর কিছুতে ঘোচে না। আঠা-মেশানো রঙ কাগজে লাগিয়ে রোদে বা আগুনের তাপে শুকিয়ে পূর্ববৎ পরীক্ষা করা যেতে পারে। ঠিক-ঠিক আঠা হলে কাগজে বা হাতে পাৎলা একটি পর্দার মতো লেগে থাকবে, ঘষাঘষিতে উঠবে না।

মূলে শিরিষ বস্তুটি নিজেও তৈরি করা যায়। মোষের কাঁচা (untanned) শুক্‌নো চামড়া ছোটো ছোটো করে কেটে গরম জলে উত্তমরূপে ধুয়ে নাও। একটি পুরু মাটির পাত্রে জল চড়িয়ে ঐ ছালের টুক্‌রোগুলি ঢিমে আঁচে সিদ্ধ করতে থাকো; পাত্রের জলে ছালগুলি সব সময়ে যেন ডুবে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ সিদ্ধ করার পর আস্তে আস্তে জলটি উপর-উপর একটি কাঁচের পাত্রে ঢেলে রাখতে হবে, ঠাণ্ডা হলে জেলির মতো জমে যাবে। তখন ঐ জেলির মতো আঠা কলাপাতার উপর ঢেলে ইচ্ছামতো আকারে ভাগ ভাগ করে রাখলে শুকিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো শিরিষের আঠা হবে।

সাইজ (size) বা পার্চমেণ্টের আঠা

এই আঠা তৈরির বিধি লেডি হেরিং-হ্যাম, অজন্তা গুহা-চিত্রের নকল নিতে যিনি এসেছিলেন, তাঁরই কাছে পাওয়া। একটু হাঙ্গামা আছে। ইংলণ্ডে কারি-গরেরা সোনার তবক লাগাতে এই আঠার ব্যবহার করে। সেখানে তৈরি আঠাও বাজারে পাওয়া যায়। তবু কাজের সময় টাটকা আঠার প্রয়োজন হলে এটি নিজে তৈরি করে নিতে পারলে মন্দ কী। পার্চ-মেণ্টের অভাবে ভেড়া বা ছাগলের চামড়ার ছাঁট ব্যবহার করা যায়, যারা তবলা ছায়, তাদের কাছে পাওয়া যাবে। অবশ্য, পার্চ-মেণ্টের ছাঁট পাওয়া গেলেই ভালো; মূল্য-বান দলিলপত্র লিখতে পার্চমেণ্টের ব্যবহার আছে, ছাঁট আদালতের দপ্তরীদের কাছে পাওয়া যেতে পারে।

এখন উল্লিখিত চামড়ার বা পার্চ-মেণ্টের ছাঁটগুলি পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বেশ করে ধুয়ে নাও; তারপর একটি পাত্রে জল দিয়ে ফোটাও, জলে ছাঁটগুলি সর্বদা ডুবে থাকা চাই। ঢিমে আঁচে ঘণ্টা দুই সিদ্ধ করে জলীয় অংশটি উপর-উপর ঢেলে নিলে জেলির মতো জমে যাবে। একেই 'সাইজ' বলে। বেশিক্ষণ ফোটালে পাত্রের জল ঘোলাটে হয়ে যাবে, 'সাইজ' ভালো হবে না। যারা নিজের হাতে রান্না করেছে, কেমন উত্তাপে কতক্ষণ সিদ্ধ করা প্রয়োজন সহজেই বুঝে নেবে। চামড়া বা পার্চমেণ্ট ফোটানো জল ঠাণ্ডা হয়ে সহজেই জেলির মতো জ'মে যাবে শীতের দিনে, গরমের দিনে তেমন ঘন নাও হতে পারে। এই আঠা টেম্পারা কাজে (কাঠ, কাগজ, কাপড়, দেওয়াল যে আধারে বা আশ্রয়েই হোক) জমির অন্তরে ব্যবহার করা হয়। শিরিষের বদলে ডিমের আঠা অন্তরে মিশিয়ে দেখা গেছে অন্তর বেশি মজবুৎ অর্থাৎ বেশি স্থায়ী হয়; কিন্তু ডিমের আঠা সম্পূর্ণ শুকোতে পাঁচ-ছয় মাস লাগে—তারপর ডিম-মেশানো রঙে কাজ করা সম্ভব হয়। ডিমের আঠার বিষয় অতঃপর বলা যাচ্ছে।

ডিমের আঠা

তাজা মুরগির ডিমের আঠাই ভালো; কেবল হল্‌দে কুসুম-অংশ থেকে আঠা

হয়, সাদা অংশ ফেলে দেওয়া হয়। কেবল তিব্বতীরা তাদের টঙ্গায় ডিমের সাদা আর হলদে দুই ব্যবহার করে; কিন্তু তা রঙে মেশাবার আগে কাপড়ে ছেঁকে নেওয়াই প্রশস্ত।

ডিমের কুসুমটি পেতে হলে ডিমের এক ধারে দুটি ছিদ্র করে সাদা অংশটি আস্তে আস্তে ঢেলে ফেলো। সাদা অংশটি বেশ বেরিয়ে গেলে কুসুমটিতে সামান্য জল মিশিয়ে মিহি ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নাও। ফলে ডিমের সাদা বা সাদার ভিতর সাগুর মতো দানা কিছু যদি থেকে থাকে, তাও পরিত্যক্ত হবে। এখন কুসুম এক ভাগ, জল দু' ভাগ, মিলিয়ে চামচে দিয়ে ফেটিয়ে নাও। অল্প একটু বোরিকের গুঁড়ো (চায়ের পেয়ালার মাপে এক পেয়ালা তৈরি আঠাতে চায়ের চামচের আধ চামচ) মিলিয়ে নিতে হবে, আর দু-চার ফোঁটা লবঙ্গের তেল; তাহলে কীট নিবারণ করবে আর তেলের দরুণ বদ গন্ধ নাশ করবে। এই আঠায় ফট্‌কিরি মেশাবার রেওয়াজ নেই; আমরা মেশাই নে।

গুঁড়ো রঙ বা ভিজে রঙের সঙ্গে এই ডিমের আঠা আন্দাজ মতো মিশিয়ে ছবি আঁকতে হবে। (আঠা ঠিক হল কি না তার পরীক্ষা শিরিষের আঠার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, সেই রকমই।) কেউ কেউ এক পেয়ালা আঠায় ফোঁটা পাঁচ-ছয় ডুমুরের আঠা ও ফোঁটা পাঁচেক মধু মিশিয়ে নেয়। এতে রঙ নাকি বেশ পাকা হয় ও আঁকবার সুবিধা হয়। কিন্তু অন্য কিছু না মিশিয়ে শুধু ডিম আর জলেও বেশ কাজ হয়। ডিমের আঠা ব্যবহারের একটা সুফল এই যে, কাজ পুরাতন হয়ে গেলে জল দিয়ে মুছলেও রঙ সহজে উঠে যায় না। শিরিষ বা গঁদের আঠা মেশানো রঙে যে ছবি আঁকা যায়, পুরাতন হলেও জল লাগলে দাগ হয় বা জল দিয়ে মুছলে রঙ উঠে আসে। এরূপ বিচারে ডিমের আঠা ভালো। • তৈরির হাঙ্গামা আর ব্যবহারের একরূপ অসুবিধা বিবেচনা করেই ডিমের বদলে গঁদ বা শিরিষের আঠা সকলে ব্যবহার করে। রঙে ডিমের আঠা বেশি হলে রঙ লাগতে চায় না অথবা ছবি হওয়ার পর জোলো হাওয়ায় সহজেই তাতে ছাতা পড়ে। মোট কথা রঙে আঠার মাত্রা বেশ হিসাবমতো ও ঠিক-ঠিক হওয়া চাই; পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় কালে ঠিক হিসাব হবে। ডিম-মেশানো রঙ সম্পূর্ণ শুকোতে অন্তত পাঁচ-ছয় মাস লাগে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ভার্নিশ লাগানো চলে।

পাঁইট বোতলের এক বোতল পরিমাণ ভালো তার্পিন তেলে চারটা বড়ো সুপারির পরিমাণে পরিষ্কার খাঁটি মোম দিয়ে বোতলটি গরম জলে অনেকটা ডুবিয়ে রাখতে হবে। মোম গ'লে গেলে বোতল ঝাঁকিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মোম-মেশানো এই গরম তার্পিন নরম চ্যাপ্টা তুলি বা স্প্রে'র সাহায্যে ছবিতে একবার বা দু'বার লাগালেই হবে। এতে ছবি চক্‌চকে দেখাবে না, অথচ ছবির রঙ মোলায়েম দেখাবে ও অধিকতর স্থায়ী হবে। সাবধান, তার্পিন তেল সরাসরি আগুনের উপরে বা কাছে রাখবে না, আগুন ধরে যাবে।

ডিম-আঠা-মেশানো ছবিতে যদি ছাতা পড়ে এক পাঁইট পরিষ্কার জলে (পরিস্রুত জল বা বিধিমতো ধরা বৃষ্টির জল) দুই চামচ ভিনিগার মিশিয়ে একটি দ্রব পদার্থ বা সলিউশন তৈরি করবে। তাতেই ন্যাকড়া ভিজিয়ে নিয়ে ছবি মুছে নেবে। গরম কালে রোদের সময় (কাঠের পাটায় হলে তাতে অল্পকাল রোদ লাগিয়ে) ছাতাটি শুকিয়ে কাপড়ে বা পালকের ঝাড়নে (না মুছে) ঝাপ্‌টা দিয়ে যতটা হয় ঝেড়ে ফেলতে হবে। পরে ঐ ভিনিগারের জলে আস্তে আস্তে মুছে নিতে হবে।

অনেক সময় ছবি আঁকার পাঁচ-ছয় মাস পরে খুব গরমের সময় ছবিটি প্রথমে পূর্বোক্ত রীতিতে ঝেড়ে-ঝুড়ে এক টুকরা নরম রেশমী কাপড়ে আস্তে আস্তে ঘষতে থাকলেও বেশ পালিশ হবে, ভার্নিশ লাগাবার প্রয়োজন হবে না।

প্রসঙ্গান্তরে বলে থাকব, তিব্বতী টঙ্গায় ডিমের হলদে ও সাদা শিরিষের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়—মাপ-অনুযায়ী যতটা ডিম ততটাই শিরিষ। তিব্বতীরা প্রায় হাঁসের ডিমই ব্যবহার করে।

শ্বেতসারের আঠা

যে কোন রকম শ্বেতসার (starch) থেকে ছবির রঙে মেশাবার আঠা পাওয়া যেতে পারে; তবে বেশি আঁট না থাকায় তেমন স্থায়ী হয় না ও ভালো ছবিতে লাগে না। সবরকম শ্বেতসারের মধ্যে তেঁতুল বীজের আঠাই সব থেকে ভালো। এর চলন ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকে। ভাতের ফেন (মাড়) আঠা হিসাবে ব্যবহার করার রীতি আছে।

তেঁতুল-বীজের আঠা

তেঁতুল বীজ টাটকা জলে দু-রাত দু-দিন ডুবিয়ে রাখো। পরে চটকে বা চটের থলির উপর ঘ'ষে ঘ'ষে খোসা ছাড়িয়ে শিল নোড়ায় বেশ মিহি করে বেঁটে নাও। এর পর বেশি জল দিয়ে পাৎলা করে নিয়ে ঢিমে আঁচে কাঠি দিয়ে নেড়ে নেড়ে সিদ্ধ করো। ময়দার পাৎলা কাই বা লেইয়ের মতো হলে উনুন থেকে নামিয়ে ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিতে হবে। আধ পোয়া বীচিতে ছয় চায়ের পেয়ালার পরিমাণ ঘন বার্লির মতো আঠা হবে; এই আঠাতে নুন-চামচের দু চামচ ফটকিরি গুঁড়ো অথবা চা-চামচের এক চামচ বোরিক মিশিয়ে নিলেই হবে।

তেঁতুলবীজের খোসা ছাড়াবার আর এক উপায় বলা যাচ্ছে। বীচিগুলি গরম বালি-খোলায় অল্প নেড়ে নিয়ে হামান-দিস্তায় ঘা দিলে খোসা আলাদা হয়ে যাবে। সেই বীচিগুলি একদিন একরাত্রি জলে ডুবিয়ে রেখে পরে মিহি করে বেঁটে পূর্বোক্ত রীতিতে সিদ্ধ করে এবং ফটকিরি বা বোরিক মিশিয়ে আঠা তৈরি হবে। একটু কড়া ভাজা হলে খোসা-ছাড়ানো বীজ অল্প ঘুঁটের ছাই মিশিয়ে কাঁচের বোয়েমে বহুদিন রাখা চলে।

তেঁতুল বীজের আঠা দশ-বারো ঘণ্টার বেশি রাখলে টকে যায়; আঠা উদ্বৃত্ত থেকে গেলে সেটা পুনরায় জল দিয়ে ফুটিয়ে নিলে পুনর্বার কাজে লাগানো যাবে। এই আঠা মেশানো অস্তর কাপড়ে, কাঠে, আর (অজন্তা ভিত্তিচিত্রের কায়দায়) দেয়ালে কাজ করবার পক্ষে উত্তম। বিশেষ করে মাটির দেয়ালে শিরিষ বা অন্য আঠার চেয়ে এইটেই বিশেষ উপযোগী। জগন্নাথধামের পটে আর ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের পটুয়াদের কাজে এই আঠার ব্যবহার। বাঙলার কুমোরেরা

প্রতিমা রঙ করতে সর্বদা এই আঠাই ব্যবহার করে।

গঁদ

সাধারণভাবে গঁদের আঠাই শিল্পীরা ব্যবহার করেন। এর প্রচলনও বহুদিন থেকে। বাবলা, নিম, কৎবেল, খয়ের ইত্যাদি গাছের আঠা থেকে গঁদ তৈরি হয়। নিমের আঠা খুব ভালো, এই আঠার জন্যেই ছবিতে পোকা কম লাগে। গঁদের আঠা ব্যবহারের বিধি—রঙে মেশাবার সময় জলে গুলে রাখা গঁদ ব্যবহার করার চেয়ে পরিষ্কার শুকনো গঁদের টুকরা রঙের বাটিতে রঙের সঙ্গে ঘ'ষে ঘ'ষে মেশানোই ভালো। এতে রঙের উজ্জ্বলতা বাড়ে। আগে থেকে জলে গোলা গঁদ রঙকে একটু ময়লা করে।

'ছানা'র আঠা

কেসিন (casein) বা 'ছানা'র আঠা আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। য়ুরোপেও প্রচলিত হয়েছে। এখানে কেসিনের আঠার সিংহলী পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হল।

খানিকটা মাখম-তোলা দুধের দই কাপড়ে বেঁধে বেশ করে জল ঝরিয়ে নিয়ে আঁট হয়ে গেলে কাপড়বাঁধা অবস্থাতেই গরম জলে ফোটাতে হবে। ফোটাতে গিয়ে জলে মাখম যতক্ষণ পাওয়া যাবে, পুনঃ পুনঃ নতুন জলে সিদ্ধ করতে হবে। এই রকম বার তিন ফোটালেই সব মাখম নিষ্কাশিত হয়ে যাবে; তখন সিদ্ধকরা দইটা বা 'ছানা'টা ছুরি নিয়ে সরু সরু ফালি করে নিয়ে বা হাত দিয়ে ছোটো ছোটো কুলের মতো গুলী পাকিয়ে রোদে বেশ করে শুকিয়ে রাখতে হবে। এই হল শুকনো 'ছানা' বা কেসিন। কাজের সময় এই কেসিন ছুরি দিয়ে চেঁছে অল্প মাখমের মতো চুণের সঙ্গে (পানের চুণ, কাদা-কাদা) মাড়লেই ডিমের আঠার মতো নরম হয়ে যাবে। এই আঠা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারা যায়। অন্তরে বা ছবির রঙে যতরকম আঠা ব্যবহার করা হয়, সব থেকেই এটি মজবুৎ। এই আঠা দিয়ে কাঠ কাঁচ ও নানারূপ জিনিস জোড়া যায়।

কাগজের ওয়াস্‌লি করবার আঠা

চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা মতো জলে আধ পেয়ালার মতো ভালো গম ভিজিয়ে দাও। এভাবে একদিন একরাত্রি (২৪ ঘণ্টা) রাখতে হবে। যখন হাতে গমের দানা টিপে দেখলে বেশ গলে যাবে, তখন সব গমটা বেশ করে চটকে কাপড়ের ভিতর দিয়ে ছেঁকে শ্বেতসার বার করে নাও এবং পরিস্রুত জলে বা বৃষ্টির জলে সিদ্ধ করো (পরিষ্কার জলের গুণে তৈরি আঠা বেশি দিন থাকবে)— গভীর পাত্রে খুব নরম কাঠ কয়লার আঁচে সিদ্ধ করবার সময় একটি শক্ত কাঠি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে আঠাটা প্রথমে খুব শক্ত হয়ে যাবে, জ্বাল পেতে পেতে ক্রমশ আবার পাৎলা হয়ে আসবে। যখন আঠার মলিনতা (opaqueness) কেটে গিয়ে একটা স্বচ্ছভাব হবে, আঠাটা গাঢ়ও হবে, তখন বুঝতে হবে ঠিকটি তৈরি হয়েছে। এখন এই আঠা একটি পরিষ্কার চীনে মাটির বা কাঁচের পাত্রে খানিকটা পরিষ্কার পরিস্রুত, ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে, মুখে কাপড় বেঁধে রেখে দাও। জল মাঝে মাঝে বদলে দেওয়া দরকার, প্রত্যেক বারেই পরিষ্কার পরিস্রুত জল হওয়া চাই; তা হলেই অনেক দিন রাখা যাবে। কাজের সময় প্রয়োজনমতো আঠা তুলে নিয়ে মিহি কাপড়ে ছেঁকে নাও; সে সময় অল্প বোরিকের গুঁড়ো মেশানো ভালো।

এই আঠা খুব নরম। এ দিয়ে রাজপুত ও মোগল পদ্ধতির চিত্রকরের ওয়াস্‌লি তৈরি করতেন। ওয়াস্‌লি তৈরির পদ্ধতি পরে আলোচিত হবে।

অন্য একপ্রকার আঠা

টেবিল চামচের এক চামচ তিসির তেল (linseed oil), চা-চামচের এক চামচ ভিনিগার, দুটি মুরগির ডিম (কুসুম) এগুলি ভালো করে মিশিয়ে ফেটিয়ে নেবে; তারপর পাৎলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে একটি শিশিতে উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ করে রাখতে হবে। অনেকদিন অবিকৃত থাকবে। গঁদ যে আন্দাজে রঙের সঙ্গে মেশানো হয়, সেই পরিমাণেই এর ব্যবহার। যেসব টেম্পারা কাজে ডিমের আঠা মেশানো রীতি, তাতে এই আঠা মিশিয়েও কাজ হবে। এই আঠা মিশিয়ে রঙ একদিন পর্যন্ত রাখা যায়, পরে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে—নূতন করে তৈরি করতে হয়।

গঁদ বা যে কোনো আঠার বদলে ব্যবহার করা চলে; এই আঠার ব্যবহারে রঙ খুব পাকা হয়। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

১৯৫০ সালে মহীশূরে ভারত সরকার কর্তৃক 'সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউশন' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি অখাদ্য থেকে খাদ্য তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করেছে। কলাগাছের কান্ড, যাকে সোজা কথায় 'থোড়' বলি এবং খুব একটা সুখাদ্য হিসাবে বিবেচনা করি না, সেই পদার্থ দিয়ে এরা 'কাস্টার্ড পাউডার' ও শ্বেতসার জাতীয় জিনিস তৈরী করেছেন। কাজু বাদামের যে শাঁশালো অংশটির সঙ্গে বাদামটি লেগে থাকে সেটা আমরা সাধারণতঃ ফেলে দিয়ে থাকি। ঐ শাঁসালো অংশটি থেকে খুব সুগন্ধি ফল-নির্যাস, চাটনী, জ্যাম, মিছরী ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া এই অন্নাভাবের যুগে এই প্রতিষ্ঠানটি ভাতের বিনিময়ে ঐ জাতীয় খাদ্যেরও ব্যবস্থা করেছে। চীনা বাদাম ও একরকম গাছের মূল থেকে একটা পদার্থ তৈরী হয়েছে সেটা ভাতের মতই পুষ্টিকর। আসল ভাতের চেয়ে এর মূল্য শতকরা পঁচিশ ভাগ সস্তা। চীনা-বাদামের দুধ থেকে এখানে ক্রীম ও চীজ তৈরী হচ্ছে। ফলের রস শুকিয়ে এখানে গুড়ো অবস্থায় শিশিতে ভরে রাখা হয়। সুতরাং যে ক্ষেত্রে এই সব ফল দুচার দিনেই পচে যায়, কিংবা ফলের রসও বেশীদিন রাখা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে এই গুড়োগুলি মাসের পর মাস রাখা যায় এবং এর সুগন্ধ বা খাদ্যপ্রাণ সম্পূর্ণ বজায় থাকে। এই রকম আসল ফল থেকে ফলের গুড়ো তৈরি করা জগতে এই প্রথম সম্ভব হয়েছে; এর আগে কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের ফেলে দেওয়া গাছগাছড়া থেকে খাদ্য তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছেন। এরা নতুন নতুন খাবার তৈরী করেই নিবৃত্ত হচ্ছেন না, আমাদের সাধারণ খাদ্যগুলি কী করলে সহজভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তারই চেষ্টা করছেন। বিশেষত আমাদের দেশের যে সব ফল অতি অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলি টিনজাত করে অধিক দিন রাখার জন্য এখানে গবেষণা চলছে। রোগী অথবা শিশুরা সব খাবার হজম করতে পারে না সেজন্য এখানে ঐ সব খাবার কিছুটা জরিয়ে নিয়ে টিনে ভরে রাখা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপাতি এত কম যে, এদের এই ব্যবস্থামত প্রস্তুত খাদ্যবস্তু বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এই কারণে এই সব ব্যবস্থা ও নির্দেশ সাধারণ গৃহস্থের সংসারে প্রচলিত করার জন্য এখান থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা আছে—কৌতূহলী জনসাধারণের আগ্রহ থাকলে সংগ্রহ করে থাকেন।

*

রোগীকে সুস্থ রাখা মানেই রোগীর হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসদি ভালভাবে কার্যকরী রাখা। অস্ত্রোপচারের সময় ডাক্তার-

প্রফেসর যন্ত্রটির ব্যবহার দেখাচ্ছেন
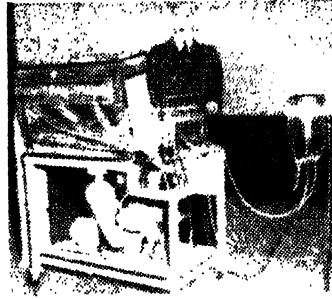
দের এই দুটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। খুব সূক্ষ্ম ধরণের ও সময়সাপেক্ষ অস্ত্রোপচারের সময় হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের কাজ ঠিকমত চালু রাখা খুবই শক্ত। হল্যান্ডের জনৈক প্রফেসর এই ধরণের অস্ত্রোপচারের সময়ে হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের বিনিময়ে ব্যবহার করার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রটি বেশ একটু জটিল ধরণের। প্যারিসের ডাক্তারদের কাছে তিনি তাঁর এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটির কার্যকারিতা দেখিয়েছেন।

বোম্বাই প্রদেশে একটি নতুন উপায়ে ধানের চাষ করা হচ্ছে। এই উপায়ে চাষ করে সাধারণ অবস্থার চেয়ে ৮০০ গুণ বেশি ধান পাওয়া গেছে। এই নতুন পদ্ধতিটি আর কিছুই নয়, জাপানী পদ্ধতিতে ধান রোওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতির জন্য খুব দামী দামী বিদেশী যন্ত্রপাতি দরকার হয়নি, সেজন্য যে কোনও চাষীই এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

*

দিল্লীর "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউশন" আমের আঁটির কষি থেকে খাদ্যবস্তু আবিষ্কার করেছেন। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে কার্বো-হাইড্রেট, ক্যালসিয়াম ও স্নেহ-পদার্থ থাকে। ধান, যব ও গমে যে ক্যালোরিক মূল্য আছে এতে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। গরু, ছাগল জাতীয় গৃহপালিত জন্তুদের খাদ্য হিসাবে এটা ব্যবহার করা যায় এবং যাদের চর্বি ও শ্বেতসারের কারখানা আছে, তারাও এটি কাজে লাগাতে পারেন।

*

বজ্রাঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক বাড়ির ছাদে চুম্বকের ব্যবস্থা রাখা থাকে। চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে নেমে আসে। মাটির মধ্যে ঐ বিদ্যুৎ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার অনিষ্ট করার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য মাটির তারতম্য অনুপাতেই এই ক্ষমতা হ্রাসের কমা-বাড়া নির্ভর করে। সুইডেনের এক ভদ্রলোক একটি রাসায়নিক বস্তু বার করেছেন যেটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ঐ মাটির বিদ্যুৎ নষ্ট করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। বেতার, টেলিভিসন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব জায়গায় থাকে ঐ জায়গার মাটির সঙ্গে ঐ নতুন রসায়ন দ্রব্যটি মিশিয়ে দিতে পারলে ঐ মাটির বিদ্যুৎকে নষ্ট করার ক্ষমতা খুব বেশী বেড়ে যায়। সাধারণত কাদা-কাদা এঁটেল মাটির বিদ্যুৎ দমনের ক্ষমতা স্বভাবতই থাকে আর বেলেমাটির এই ক্ষমতাটি মোটেই থাকে না সেই কারণে বেলেমাটির জায়গাতেই এই রাসায়নিক পদার্থটি মেশানর বেশী প্রয়োজন।

মাথা আছে যেখানেই — মাথা ব্যথা

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথাব্যথা অনেকেরই বিশেষত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে যেন ভূতের মত চেপে বসেছে। আর তার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে যেন অভিভাবকদেরও হয় হেড্-এক্।

মাথাব্যথায় কষ্ট পেলেই সাধারণত প্রথমেই চোখের ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। সকলে তখন মনে করেন হয়ত চোখের দোষেই এই মাথাব্যথা: কেননা চোখ বেচারাকেই বেশীর ভাগ সময় কাজ করতে হয়। অবশ্য সে ধারণা যে একেবারে ভুল তা নয়। কিন্তু চোখ ছাড়াও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের বিকল অবস্থাতেও মাথা-ধরা হতে পারে। হজমের দোষে, যকৃতের গোলমালে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণে, রক্তের চাপ বৃদ্ধি বা কম হেতু, মূত্রগ্রন্থির বিকৃতি অবস্থায়, কিশোরী-যুবতীর রজঃ-সংক্রান্ত গণ্ডগোলে, রক্তহীনতা, দুর্বলতা, এইরূপ নানাপ্রকার কারণে মাথাধরা হওয়া স্বাভাবিক। এইসব দৈহিক কারণের মূলে আছে মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ। উত্তেজনা বা অবসাদ মগজে রক্ত সঞ্চালনে সাময়িক বিশেষ ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করে। উত্তেজনার প্রভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় বেশী মাথার মধ্যে। তখনই কপালে ঘাড়ে, চোখে দবদবানি শুরু হয়ে যায়। আর অবসাদগ্রস্ত ভাবের জন্য হয় মস্তিষ্কে রক্তক্ষীণতা যার ফলে স্নায়ুপুঞ্জ যথোপযুক্ত পুষ্টি সংগ্রহে সমর্থ না হওয়ায় হয়ে পড়ে দুর্বল। এই দুর্বল স্নায়ুপুঞ্জ যখন বহিরাগত উত্তেজনার আঘাত সহ্য করতে না পারে তখনই হয় বেদনার সৃষ্টি। যার অভিব্যক্তি— মাথাধরা।

স্নায়বিক ব্যাধির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সেখানে মাথাধরাই সবচেয়ে বড় লক্ষণ। তাই মাথাধরা বল্‌লেই চোখ দুটোর ঘাড়ে সব দোষ আগে না চাপিয়ে দেহের অন্যান্য অসুস্থ অবস্থার বিষয় প্রথমে চিন্তা করা দরকার। সে সব দিক থেকে যদি মাথা-ধরার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়া যায়, তখনই চোখের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

মাথাধরার সঙ্গে দৃষ্টিক্ষীণতা যদি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তবে অনেক ক্ষেত্রেই চক্ষু চিকিৎসা বা উপযুক্ত চশমা ব্যবহারে মাথাধরা সেরে যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায় যে, চোখে দেখতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না; অথচ এক-দৃষ্টে কোন জিনিস দেখলে, বা খানিকক্ষণ বই পড়লে বা শেলাই করলে, সিনেমা দেখলে মাথাব্যথায় কষ্ট পেতে হয়। এসব ক্ষেত্রে মাথাব্যথার কারণ মানসিক সুস্থতার অভাব। প্রত্যেক মাথাধরার পেছনে আছে বিশিষ্ট কোন মানসিক উদ্বেগ; যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সকলেই সন্দিহান। যদি বলা যায় "আপনার এই মাথাধরা 'মেণ্টাল' তাহলে তার প্রতিক্রিয়া মনের উপর এমন এক বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে, যার অভিব্যক্তি তখনই প্রকাশ পায় প্রতিউত্তরে "আপনি কি বলতে চান্ আমি পাগল? নিশ্চয় আপনারই মাথা খারাপ হয়েছে"। সেই বিশিষ্ট মানসিক উদ্বেগের বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। সেই বিশিষ্ট উদ্বেগ নিভৃতে আমাদের জাগ্রত মনের অগোচরে বেশ তার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করছে। অথচ জাগ্রত মন তাকে কখনও স্বীকার করে না।

এখানে হতে হবে আমাদের ঐ বিশিষ্ট উদ্বেগের বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন। তখন মনকে প্রশ্ন করতে হবে 'সত্যই কি অবস্থাটা মেণ্টাল'? প্রথমে হয়ত মন স্বীকার করবে না। কিন্তু বারে বারে ঐ একই প্রশ্ন মনকে উদ্ব্যস্ত করলে তখন হয়ত সাড়া পাওয়া যাবে 'হ্যাঁ'। তখনই খুঁজতে আরম্ভ করতে হবে কারণ। এই রকমে আত্মবিশ্লেষণ করাতে সেই 'বিশিষ্ট কারণ' আপনিই ধরা দেবে বাস্তবতার রূপ নিয়ে।

এখন এই মাথাধরার প্রতিকার সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ঐ 'বিশিষ্ট কারণের' প্রতিকারে। এই মানসিক উদ্বেগ সম্পূর্ণ মনোরাজ্যের হতে পারে বা তার সঙ্গে দেহের অঙ্গবিশেষের বিশিষ্ট সম্বন্ধও থাকতে পারে। যদি দৈহিক অসুস্থতা মানসিক অসুস্থতারূপে প্রতিফলিত হয়, তবে তার ভার চিকিৎসকের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজের সহযোগিতাও থাকবে সম্পূর্ণ। 'বিশিষ্ট কারণ' যতই অবচেতন মন থেকে বাস্তব চিন্তার বিষয় হয়ে পড়বে—মনের সদা আড়ষ্ট ভাব ততই কমতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরার তীব্রতার অভাববোধও হতে আরম্ভ করবে।

'বিশিষ্ট কারণ' যখন কেবল মনো-রাজ্যেরই অধিবাসী হয়, তখনই তাকে বলা যায়, 'মানসিক অসুস্থতা'। স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত ও মানসিক বিকারগ্রস্ত— এ উভয়ের বাহ্য প্রকাশ প্রায় একই রকম। কিন্তু কারণ সম্পূর্ণ পৃথক। সত্য যখন মিথ্যার রূপ ধারণ করে মনকে প্রভাবান্বিত করে, তখন সেটা স্নায়বিক আখ্যা পায়। উঁচুতে উঠে নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরতে থাকে। এটা স্নায়বিক বিকার। যদি নীচে পড়ে যাই, এই ভয়ে মনে যে ভাবের উদ্ভব হয়, তার ফলে মগজে সাময়িক রক্তহীনতা অবস্থার সৃষ্টি করে মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপসর্গের কারণ হয়। এখানে যদিও জানছে, সুরক্ষিত অবস্থায় নীচে পড়বার

কোন সম্ভাবনা নেই—এই সত্য—এক মিথ্যা—অর্থাৎ পড়ে যাবো এই চিন্তায় মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তেমনি পরীক্ষা দিতে গেলে 'যদি ভাল করতে না পারি'—ট্রেন ধরতে গেলে 'যদি ট্রেন ফেল করি'—এই ভয়ে অনেকের স্নায়ু-দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়—যেমন বুক ঢিব ঢিব করা, ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া, গলা শুকিয়ে আসা, ইত্যাদি। অথচ ঠিকমত পড়া বা সময়মত গাড়ি ধরতে রওনা হবার কোন ত্রুটি নাই।

আবার অন্যদিকে 'মিথ্যা' যখন 'সত্যের' রূপে প্রতিভাত হয়, তখন সেই অবস্থা 'মানসিক' আখ্যা পায়। যেমন ভূত দেখা। সেখানে বাস্তবিক কোন মূর্তির অস্তিত্ব নাই, অথচ মন দেখছে, চোখ দেখছে, এক জীবন্ত মূর্তি। 'সর্পে রজ্জুভ্রম—হেন অন্ধ করেছে নয়ন'। এখানে অবাস্তবতা (মিথ্যা) বাস্তব (সত্য) মূর্তি ধরে মনকে প্রভাবান্বিত করায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এক ভীতির সঞ্চার করে। তেমনি স্ত্রী বা স্বামীর চরিত্রে মিথ্যা সন্দেহ প্রতি মুহূর্তে নানারূপে সত্যের আকার ধারণ করে কত-জনের যে মানসিক শান্তি নষ্ট করছে, তার ইয়ত্তা নাই।

এই উভয় ক্ষেত্রেই জাগ্রত মন যখনই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এখানে নিজেই নিজের চিকিৎসক। এইরূপে মনোরাজ্যে বিপ্লবের মাত্রা যতই বাড়তে থাকবে, মানসিক উৎকণ্ঠাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই যাবে। যার অভিব্যক্তি চোখে-মুখে প্রকট হয়ে ওঠে; চোখ দুটো নিষ্প্রভ, গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, সদা চঞ্চল চাহনি, কিসে যেন বাধা পাচ্ছে, চোখের কোলে কালিমা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে, মুখের কান্তি ক্লান্তি-চিহ্নরূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, খাদ্যে অনিচ্ছা, নির্জনপ্রিয়তা প্রভৃতি উপসর্গ সৃষ্টি করছে।

এ অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে হলে দরদী বন্ধুর কাছে মনের রুদ্ধ দ্বার খুলে দিতে হবে। অবদমিত মনের সকল ভাব অকপটে ব্যক্ত করে যেতে হবে তার কাছে। তখন দেখা যাবে, মন কত হাল্কা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে সত্য-রূপে আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে চিনতে চেষ্টা করতে হবে। মনের ইচ্ছাশক্তি বাড়াতে হবে। তবেই রক্ষা পাওয়া যাবে। নচেৎ 'পাগল' আখ্যা পাওয়া বিচিত্র নয়।

মনের ইচ্ছাশক্তি বাড়ানর দ্বারাই মাথাধরা, এমনকি, অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ঔষধের সাহায্য শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করতে পারে না, যদি না রোগ সারাবার ইচ্ছা প্রবল হয় নিজের মনে। অনেকে হয়ত মনে করেন, 'কেউ কি আর সাধ করে রোগ ভোগ করে' এটা ঠিক নয়। জ্ঞানত রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে—কিন্তু 'অবচেতন' মনে তার ক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপে। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই—চিকিৎসকের পরামর্শকে মনে-প্রাণে আমল না দেওয়া, এমনকি, পালন না করা; দুই-একদিন পর পরই চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর পরিবর্তন করা; বিশ্বাস ও নির্ভরতার অভাব; উপদেশ প্রভৃতি নিজের মনোমত গ্রহণ বা বর্জন করা; 'এতে কিছু হবে না', 'ও কত খেয়েছি' প্রভৃতি নিরাশব্যঞ্জক বাক্যের ব্যবহার দ্বারা বলে দিচ্ছে যে, মন চায় না রোগমুক্তি।

এই থেকেই আমরা দেখতে পাই, রোগ নিরাময় করতে ডাক্তার বা ঔষধের কার্য-কারিতা কত সামান্য! আর নিজের ইচ্ছাশক্তি কত প্রবল! ঔষধ ও ডাক্তার উপলক্ষ্য মাত্র। নিজের ইচ্ছাশক্তি একমাত্র

সহায়ক রোগ মুক্ত করতে। রোগের সৃষ্টি করতেও এই 'মন'; আবার রোগমুক্ত করতেও ঐ 'মন'। এই মনকে শক্ত করার শিক্ষার উপরেই নিজের কল্যাণ—জাতির কল্যাণ। আমরা মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারি না, সে সত্য কথা; কিন্তু মনকে শক্তিশালী করবার শিক্ষায় শিক্ষিত হবার চেষ্টা আমরা সকলেই করতে পারি। সংসারের নিত্য নানা সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে মন যাতে বিক্ষুব্ধ না হয়ে পড়ে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার বেশি। বাড়ির অশান্তি বাড়িতেই রেখে যেতে হবে। সেই অশান্তি কর্মস্থলে নিয়ে গেলে—এখানকার ও সেখানকার অশান্তি উভয়ে মিলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে, যার ফলে মনের সকল শান্তি ব্যাহত হবে। ফলে কাজে ভুল, খিটখিটে মেজাজ, অমনোযোগিতা, মাথাধরা, প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেওয়া নিশ্চয়ই কর্ম-জীবনে সুখকর নয়। তেমনি কর্মস্থলের অশান্তি সেইখানেই রেখে আসতে হবে। সেটা বাড়িতে আনলে গৃহের শান্তি সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যস্ত হবে। কর্মস্থলের দমিত বিরূপ মনোভাব গৃহে সামান্য কারণেই মুক্তি পেয়ে এক অনর্থের সৃষ্টি করে বসা বিচিত্র নয়। খেলতে গিয়ে চিত্ত-বিনোদনের পরিবর্তে চিত্তবিক্ষুব্ধ করার কারণও ঐ এক। অশান্তিকে যথাস্থানে 'ধামাচাপা' দিয়ে শান্তির অন্বেষণে অন্যত্র আনন্দের পরিবেশে ব্যাপৃত থাকার মধ্যে মনের আড়ষ্ট ভাব কাটাতে সাহায্য করে অনেক।

মন যখন শান্তি পাবার জন্য ব্যগ্র; আত্মবিশ্লেষণে 'বিশিষ্ট কারণ' যখন জাগ্রত মনে স্বরূপে উদ্ঘাটিত, তখনই মন প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হবে মানসিক অশান্তি, অর্থাৎ মাথাধরার হাত থেকে নিস্তার পেতে। মনকে সাময়িকভাবে চিন্তাশূন্য করে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কোন চিন্তা মনে না রেখে, এলোমেলোভাবে, শৃঙ্খলাবর্জিত 'যা-তা' কোন হাল্কা চিন্তা বায়স্কোপের ছবির মত তীব্রগতিতে মনের মধ্যে কিছুক্ষণ চালিয়ে নিলে মনের আড়ষ্ট বা অবসাদ ভাব কেটে যাবে অনেক। তখন এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত ও পুষ্ট করতে হবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও যতদূর সম্ভব ঢিলে অবস্থায় (Relaxed) রাখতে হবে।

আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে যে, মাথাধরা এক সময় না এক সময় আপনিই চলে যায় ঔষধ প্রভৃতির সাহায্য ছাড়াও। এই অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। মাথাব্যথার প্রকোপের মধ্যে শরীর ও মন সম্পূর্ণ ঢিলে অবস্থায় রেখে মনকে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'মাথাব্যথা দু-পাঁচ ঘণ্টা পরে ত আপনিই সেরে যাবে, তখন দুই-এক ঘণ্টা আগেই কেন সারবে না? —এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেন সারবে না? —দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই কেন সারবে না? দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কেন সারবে না? —এখনই এই মুহূর্তে তবে কেন সারবে না?' মন যখন এই Suggestion-এর চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে উঠবে, তখনই দেখা যাবে, মাথাধরার তীব্রতা কমতে কমতে একেবারে চলে যাবে। এখানে মাথাধরারূপ পরগাছা মনের আধারে উপযুক্ত জীবন-রসের অভাবে আপনিই শুকিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মাথাধরার চিন্তা মনের মধ্যে যতই প্রবল হবে, জীবন-রস ততই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে; ফলে মাথাধরা ডাল পালা বিস্তার করে দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন ঔষধ, চশমা বা এটা-ওটা নানা পরামর্শ দু-একটা ডাল পালা কেটে সাময়িক কিছুটা অন্ধকার পরিষ্কারের মত মাথা-ধরার প্রকোপের লাঘব করবে বটে; কিন্তু সে-ডাল আবার গজাবে—আবার অন্ধকার আচ্ছন্ন করবে—আবার মাথাধরা ফিরে আসবে, যদি না গাছের প্রাণ-উৎস নষ্ট করা যায়।

এটা হলো মাথাধরা প্রতিকারের একটা দিক। সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্যথা প্রবণতার কারণগুলিকেও সারাবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক মাথাধরার পিছনে আছে বিশিষ্ট কোন মানসিক অশান্তি। তেমনিই প্রত্যেক মাথাধরার পেছনে আছে বিশিষ্ট কোন মানসিক পরিবেশ; যার সত্তা আমাদের মনে মাথাধরার অমোঘ কার্যকারিতা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। শিশু বাড়িতে প্রায়ই দেখে আসছে, কেউ-না-কেউ মাথা ধরেছে বলে শুয়ে আছে। শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনে তখনই উদয় হয় এই মাথাধরার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য—কাজে ফাঁকি দেবার একটা অজুহাত। কেননা, আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরই আর মাথাধরার অস্তিত্ব থাকে না তাদের। তখনই শিশু শিখে নিল এই অমোঘ কৌশল—মাথাধরার অভিনয়। আবার কোথাও একটু অতিরিক্ত স্নেহ-ভালবাসা আদায় করবার জন্যও এই মাথাধরার অছিলার আবশ্যক হয়। এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে শিশুর মনোবৃত্তি গঠিত হয় বলেই পরে আপনার মনের অলক্ষ্যেই কার্যকালে ঐসব অস্ত্র আপনিই ব্যবহার করে থাকে। এই রকম থেকেই পরে হয়ত একদিন শুনতে পাওয়া যাবে, মা ডাক্তারকে বলছেন, 'মেয়ে মার মাথাধরার উত্তরাধিকারী হয়েছে ছেলে-বেলায় আমিও খুব মাথাধরায় ভুগেছি—এখনও মাঝে মাঝে ভুগি'। তিনি ভুলে যান যে, এ অবস্থার সৃষ্টি তিনি নিজেই শিখিয়েছেন মেয়েকে, অবশ্য নিজের অজ্ঞাতসারে।

শিশুর এই নূতন অভিজ্ঞতা পদে পদে কাজে লাগাবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়াও স্বাভাবিক। তখন কথায় কথায় মাথাধরার অভিনয় হতে থাকে পরীক্ষা-মূলকভাবে। কারণেরও অভাব নাই বাড়িতে। কোন আদিষ্ট কাজ করতে মন চাইছে না—অমনি মাথা ধরেছে। স্কুল বা

কলেজের পরীক্ষা দেবার আগেই মাথা-ধরার প্রকোপ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার অথবা আশানুরূপ ফল করতে না পারবার সম্ভাবনার হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার জন্য মাথা ধরার অভিনয়। কেননা, সব দোষই তখন মাথাধরার উপর চাপান যাবে। মাথা ধরার জন্যেই ত ভাল করে পড়া করতে পারে নাই, এ-খবর বাড়ির বা আশেপাশের সকলেই জানে। বাপ-মার কাছ থেকে আরও আদরযত্ন আদায় করবার অজুহাতও হলো এই মাথাধরার অভিনয়। বাড়ির ছোট ছোট ভাইবোনদের উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের সহায়ক হিসাবে মাথাধরাকে কার্যকরী করা হয় সময়ে সময়ে। অনেক মাথা খেলিয়ে তবে মাথা ব্যথার সৃষ্টি করতে হয় তাদের।

এইরূপে বহু প্রকারে প্রয়োজন হিসাবে মাথাধরার অভিনয়ের দরকার হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অভিনয়ের প্রকার-ভেদ এই মাত্র। কালের নিয়মে অভিনয়ে তারা এতই নিপুণ হয়ে পড়ে যে, প্রয়োজনের হেতুর পরিসমাপ্তি হলেও তাদের মাথাধরার পরিসমাপ্তি হয় না। ফলে নিজেরাই দুর্ভোগ ভোগ করে থাকে। এ যেন তাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যুর অবস্থার মত। ব্যূহ মধ্যে ঢোকবার কায়দা শিখেছে, কিন্তু বেরিয়ে আসবার শিক্ষা নাই। বাসনার জাল ছড়াতে শিখেছে, কিন্তু গোটাবার শিক্ষা নাই। তাই উদ্দাম মনকে সংযত করতে অপারগ হওয়ায় মাথাধরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

শিশুমন চায় নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা সম্বন্ধে যখনই শিশু সন্দিহান হয়, তখনই সে নিজেকে বড় অসহায় মনে করতে থাকে। তাই স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত, উপেক্ষিত শিশু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে শীঘ্রই অতি অল্প বয়স থেকেই নিজেদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মাথাধরার শরণাপন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ পরিস্থিতির সংঘাত এসে পড়ে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে যৌন-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তারা হয় খুব ভাবপ্রবণ; যার ফলে তাদের মানসিক উৎকণ্ঠার মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলে। এই বয়সে বালিকাদের মধ্যে মাথাধরার প্রাবল্য হয় বেশি। রজোধর্মের বিকাশ তাদের মনের উপর এমন এক আধিপত্য বিস্তার করে, যার ফলে ঐ কয়েকদিন তাদের মানসিক শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় প্রথম প্রথম। কেননা, ঐ অবস্থাতেই তাদের স্কুলে যাওয়া ও খেলাধুলা সবই করতে হয়। কিন্তু মন পড়ে থাকে কখন কোন্ অসাবধানতার অবকাশে বন্ধুসমাজে হাস্যাস্পদ হতে হবে। তাই মাথাধরার সাহায্যে ঐরূপ পরিস্থিতির হাত থেকে সাময়িক উদ্ধারের চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। যুবক-যুবতীদের সমস্যাও প্রবল। যৌন আকাঙ্ক্ষা, বিবাহ, মাতৃত্ব, সামাজিক বন্ধন, জীবন যাপন পদ্ধতি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার, কর্মে প্রতিষ্ঠা এইরূপ নানা সমস্যার সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় তাদের। এই সময়ে মানসিক বিপর্যয়ের আধিপত্য খুবই প্রবল হয় তাদের; তাই জ্ঞানত বা অজ্ঞানত তারা মাথাধরার আবর্তে পড়ে প্রায়ই হাবুডুবু খায়।

এখানে মাথা ধরার পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আমাদের, ছেলেমেয়েদের মাথাধরা সারাতে হলে। অভিনিবেশ সহকারে ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে কারণগুলি প্রায়ই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন একটু সতর্কতা ও নিপুণতার সহিত 'কারণগুলির' সম্মুখীন হলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাথাধরা প্রবণতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যায়।

ছেলেমেয়েদের অনুকরণস্পৃহা বড়ই প্রবল। অপরের কোন জিনিসের মোহ যখন তাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সেই জিনিসটা পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাই তারা বাড়িতে অথবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ফ্যাশান দুরস্ত চশমার ব্যবহার দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ায় চশমা পাবার জন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের মাথাধরার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা বিশিষ্ট কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। শিশুমনের এই বিশিষ্ট ভাবধারার অভিব্যক্তিস্বরূপ চশমার প্রাবল্য আজ প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। অনেকেই ছেলেমেয়েদের চোখে চশমা 'বংশানুগত' এই আখ্যা দিয়েই নিজেদের দুষ্কৃতি স্খালনে যত্নবান হন। তাঁরা নিজেরাই ফ্যাশানের দাস হয়ে নিত্য নূতন ধরণের চশমা পরিশোভিত নয়ন-যুগলকে শিশুমনের উন্মাদনার খোরাক যুগিয়ে তাদের চশমা পাবার আগ্রহকে সতত সজাগ রাখবার ফলস্বরূপ তাদের এই দৃষ্টিশক্তির অবনতি, মাথাধরার প্রাবল্য এবং চশমার বহুল ব্যবহার। এসব ক্ষেত্রে তাদের মনের কল্পনাপ্রসূত ভাব-ধারাকে বাস্তবতার সম্মুখীন করে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার মধ্যেই হবে তাঁদের কৃতিত্ব।

চোখ যখন ভাল দেখতে পারছে না, তখন চশমার সাহায্যে ভাল দেখতে পাওয়া নিশ্চয়ই বহু আকাঙ্ক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সময়েই যদি আমরা মনে রাখি, 'চশমা দেখবার জন্য—দেখাবার জন্য নয়', তাহলে আমাদের এই অক্ষমতার খোঁচা সতত মনকে সজাগ রাখবে চক্ষুর সম্বন্ধে নিজেকে সচেতন হতে—আর অন্যান্য সকলকেও সচেতন করতে। কিন্তু যখনই এই অক্ষমতাকে আভিজাত্য মণ্ডিত করে ফ্যাশানদুরস্ত 'দেখাবার' বস্তুতে পরিণত করা হবে, তখনই এই অক্ষমতা খোঁচা দেবার পরিবর্তে আনন্দই দেবে প্রচুর। আর সঙ্গে সঙ্গে যারা এই 'অক্ষমতা'মুক্ত, তাদের প্রাণে খোঁচা মারবে অহরহ। কেন তাদের চোখ খারাপ হয়নি?' তখনই মনের নিভৃত অন্তরালে কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে—ছলে বা কৌশলে—'মাথাধরার' সৃষ্টি ঐ আকাঙ্ক্ষিত ফ্যাশানদুরস্ত চশমা পাবার উপায়স্বরূপ। বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরী হয়ত এই পর্যায়ভুক্ত।

আমরা যখন নিজেরা 'সেই সেকেলে পণ্ডিতমশাই প্যাটার্ন' চশমা অপরিহার্য-রূপে ব্যবহারের সৎসাহস দেখাতে পারবো এবং চোখ খারাপের অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ ঐজাতীয় চশমা ছেলেমেয়েদের নাকে ওঠাতে পারবো, তখন অতি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চশমার প্রাবল্য ও মাথাধরার আধিক্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে চলে যাবে, সেটা সুনিশ্চিত।

(১৭)

আজো মনে আছে সেটা শুক্রবার। কী কটা উপলক্ষ্যে বুঝি ছুটি ছিল।

বংশী এল। বললে—এখন ছুটুকবাবু একলা আছেন, এখন আজ্ঞে দেখা হলে চাকরিটা হয়ে যায়। শশীর কাছে শুনলাম ছুটুকবাবু আপনাকে খুব পছন্দ করেন কিনা—

শেষ পর্যন্ত যেতে হলো।

ঠিক সন্ধ্যে হয়নি তখনও। গানের আসর বসতে তখনও দেরি আছে। একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে কী একটা বই পড়ছিল ছুটুকবাবু। কোঁচানো ধুতি। ঢেউ তোলা বাবড়ি ছাঁট চুল। পাশে পানের ডিবে। জরদার কৌটো। সিগারেট। আর মেঝের উপর গড়গড়া। বোধ হয় একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছেন।

ভূতনাথকে দেখতে পেয়ে বললেন—আসুন স্যার, কী খবর—অনেক দিন পদধূলি পড়েনি—

ভূতনাথ বসলো গদীর উপর।

ছুটুকবাবু বললেন—কালকে এলেন না, বেনারসের ওস্তাদ আনোয়ার আলী এসেছিল, আহা কী আলাপ আর কী খেয়াল গাইলে যে কী বলবো, যেমন তৈরী গলা তেমনি লয়-জ্ঞান, সঙ্গত করছিল বৈজু—যাই বলুন বৈজুর হাত বড় মিঠে স্যার, রাত তিনটের সময় দরবারী কানাড়ার খেয়াল ধরলে একখানা—আ হা হা কোথায় লাগে আপনাদের ইয়ে—

তারপর একটু থেমে বললেন—আমাদের বাড়িতেই ছোটবেলা গান শুনেছি কজ্জন বাঈএর—দোলের দিন। সে কী নাচ আর গান। আমার বাবা মশাই-এর বন্ধু ধর্মদাসবাবু ডুগি-তবলা বাজিয়েছিলেন। আমরা স্যার তখন ছোট, দপ্তরখানার ভেতর দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলুম—নাচতে নাচতে সোনার থালা থেকে ঠোঁঠ দিয়ে সবগুলো মোহর তুলে নিলে—তারপর আর একবার তাকে দেখেছিলাম অনেক দিন পরে, সে চেহারা আর নেই—মেজকাকীর কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেল। অনেক বলা কওয়াতে একটা গান গাইলে—'বাজ বন্ধ খুলু খুলু যায়—' ভৈরবীর রে-গা-ধা-নি-র মোচড়গুলোতে তখনও যেন জাদু মেশানো রয়েছে—সেই কজ্জন বাঈএর গান শুনেছিলুম আর কালকের আনোয়ারের দরবারী, আ-হা-হা—

গানের গল্প আর থামতে চায় না ছুটুকবাবুর।

একটু ফুরসুৎ পেতেই ভূতনাথ আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাধা পড়লো।

কে যেন ঘরে ঢুকছে। সামনে চোখ চেয়েই ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।

ননীলাল!

ননীলালও বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। বললে—আরে, ভূতনাথ যে—

তারপর ছুটুকবাবুর দিকে চেয়ে বললে—চূড়ামণি, একটা কাজে এলুম তোর কাছে—

ছুটুকবাবুও যেন খুশী বেশ। বললে—কাজ হবে খন—তোর খবর কী? বিন্দির খবর কী?

—বিন্দি ভালো আছে, তোর খবর জিগ্যেস করে। আমি বলি সে এখন সাধু হয়ে গিয়েছে, গান বাজনা নিয়ে আছে,—কিন্তু আজকে সময় নেই ভাই—এখনি যেতে হবে—

ছুটুকবাবু বললে—সে কী রে, একটু বোস্। সরবৎ খা—

—না ভাই ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা ছুটকবাবুর কাছে যেন বিশ্বাস না হবার মতো। বললে—সে কী?

—হ্যাঁ ভাই, বিন্দির কাছেও আর যাই না—

—কেন?

—বিয়ে করছি—

ভূতনাথও এবার অবাক হলো। বললে—বিয়ে?

ছুটুকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ননীলালকে আপনি চিনলেন কেমন করে ভূতনাথবাবু?

—ও যে আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়েছে, আমাদের গাঁয়ের স্কুলে—

কিন্তু ননীলালের তখন বাজে আলোচনা করবার সময় নেই। বললে—সেই জন্যেই তো এসেছি তোর কাছে, কিছু টাকা চাই আমার, বিয়ের পর সব শোধ করে দেব—বেশি না এক হাজার টাকা—

ছুটুকবাবু কিছু কথা বললেন না। একটা সিগারেট ননীলালকে দিয়ে নিজে আর একটা ধরালেন।

লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে ননীলাল বললে—সত্যি বলছি, টাকাটার বিশেষ দরকার, তারা তো জানে না, বাড়ি-টাড়ি সব বাঁধা পড়েছে—জানে বড়লোক, টাকার অভাব নেই। তা যা হোক, এবার আমিও ভাই তোর মতন বিয়ের পর সাধু হয়ে যাবো সত্যি বলছি,—

ছুটুকবাবু বললেন—সে সব কথা থাক—বিয়ে করছিস কোথায়, মেয়ে কেমন?

ননীলাল বললে—মেয়ে মানুষের নেশা আমার চলে গেছে ভাই, এখন শুধু টাকা চাই—টাকার বড় দরকার—ওদের অগাধ টাকা, ওখানে বিয়ে হলে সারাজীবনের মত টাকার ভাবনাটা ঘুচবে—কিন্তু তার আগে আমার নিজের খরচটার জন্যে হাতে কিছু টাকা চাই—

ছুটুকবাবু আবার বললে—কিন্তু বিয়ে করছিস কোথায়?

ননীলাল টপ করে কথাটার জবাব দিতে পারলে না। একবার ভূতনাথের দিকে চাইলে। যেন সংকোচ হচ্ছিল। ভূতনাথ উঠলো। হয়ত গোপনীয় কোনও কথা আছে। বললে—আমি এখন উঠি ছুটুকবাবু—পরে আসবো—

বংশীর ভাইটার চাকরির কথা বলতেই আসা। হলো না। তা পরে হবে একদিন।

বাইরে আসতেই বংশী ধরেছে। বললে—বলেছেন আজ্ঞে?

—না রে বলা হলো না, একজন বন্ধু এসে পড়লো—তা তোর ভাবনা নেই, বলবোখন একদিন—

আজ সে বংশীও নেই, তার ভাইএর চাকরিটাও হয়নি সেদিন। কিন্তু সেই চাকরির উপলক্ষ্যে ছুটুকবাবুর কাছে না গেলে তো ননীলালের সঙ্গে দেখাও হতো না ভূতনাথের। অথচ সমস্ত সর্বনাশের বীজ বুঝি সেইদিন প্রথম বোনা হয়ে গেল ভূতনাথের জীবনে। শুধু ভূতনাথের জীবনেই বা কেন? ওই জবা, ওই ছোট-বাবু, ওই পটেশ্বরী বৌঠান সকলের জীবনের ওপরই এক ধূমকেতুর মতন আবির্ভাব হলো ননীলালের। ননীলাল যেন ভূতনাথের জীবনের প্রারম্ভে এক অনন্ত সর্বনাশের সূচনা। ননীলাল যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বণিক সভ্যতার বিষ! বিষের অঙ্কুর। আজ ঘরে ঘরে সে অঙ্কুরের চারা গজিয়েছে যেন।

কিন্তু সেদিন সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনাটা না ঘটলে হয়ত সমস্ত রোধ করতে পারতো ভূতনাথ।

'মোহিনী-সিঁদুর' অফিস থেকে বেরিয়ে ভূতনাথ হাঁটা পথে আসছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাগবাজারের ভেতর দিয়ে গলি রাস্তা। চারিদিকে অন্ধকার। দু পাশের নর্দমার নোংরা এড়িয়ে রাস্তার মধ্যেখান দিয়ে আসতে হয়। ছাড়া ছাড়া খোলার বাড়িতে টিম টিমে বাতি। দু'টো রাস্তার মোড়ের কাছে সেই দিশী মদের দোকানটার কাছে আসতেই নাকে গেল চেনা গন্ধ। এড়িয়েই যেতে চেয়েছিল ভূতনাথ। রাস্তার ওপরেই বসে বসে কয়েকজন ভাঁড়ে করে মদ খাচ্ছে। সুর ভাঁজছে। হল্লা করছে। একজন গাইছে—

পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাইলো।
ওলো রাধে, রাজার মেয়ে,
ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে, ছি লো,
'খাসা দৈকে ফেলে দিয়ে কাপাস খেলি তুই লো
লাজে মরে যাইলো—

আর একজন পাশ থেকে সমের মাথায় চীৎকার করে উঠলো—হা হা হা হাঃ...

অন্ধকারে মূর্তিগুলোকে সব দেখা যায় না। হট্টগোলের মধ্যে কয়েকটা মাতালের নৈশ-উল্লাস। কিন্তু এমন সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো। হঠাৎ সামনে একটা মূর্তিকে দেখে যেন চিনতে পারলে ভূতনাথ। সেই জবাদের বাড়ির পুরোন ঠাকুরটা না?

কিন্তু সামলে নেবার আগেই একটা আস্ত থান ইঁট ভূতনাথের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। মাতাল ঠাকুরটার কথাগুলোর কিছু অংশ যেন কানেও গেল—শালার কেরানীবাবুকে দে শেষ করে—

তারপর আর কিছু মনে নেই ভূতনাথের।

তখন বিংশ শতাব্দীর শুরু। লর্ড কার্জনের রাজত্ব। আজও সাইকেল-এ যেতে যেতে স্পষ্ট মনে পড়ে সব। বয়েসটা কমিয়ে চাকরিতে ঢুকেছিল সেদিন, তাই এখনও চাকরিতে রয়েছে সে। স্বাস্থ্যটা ভালো ছিল তাই বেশি বুড়ো দেখায় না। তবু সেদিনকার আঘাতে সে যে মরেনি এই-ই তো আশ্চর্য!

গোলদীঘির ধারেই বুঝি কোন একটা বাড়িতে কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

প্রথম যখন চোখ মেলল, দেখলে—একটা পাকা ঘর। পুরোন ময়লা দেয়াল চারিদিকে লাল কালিতে লেখা—'বন্দে মাতরম্'। কয়েকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। জানালা খোলা ছিল। দেখা যায়—সামনে কুস্তির আখড়া। বাইরে বিকেল হয়ে এসেছে। সমস্ত শরীর ব্যথা!

একটু ওঠবার চেষ্টা করতেই কে একজন এসে ধরলে। কামিজপরা, অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ উঠছে। চেহারাটা যেন চেনা চেনা মনে হলো।

মাথাটা ধরে বললে—এখন উঠবার চেষ্টা কোর না ভাই—

তারপর কাকে যেন ডেকে বললে—শিবনাথ আর একটু দুধ আনো তো—

শিবনাথ দুধ এনে দিতে লোকটি বললেন—এটুকু খেয়ে নাও তো—

দুধ খেয়ে আবার যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল খানিকক্ষণ। আবার যখন তন্দ্রা ভাঙলো কানে এল কাদের কথাবার্তা। বেশ অন্ধকার হয়েছে চারিদিকে। একটা হারিকেন জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। ভূতনাথ মনে মনে ভাবছিল এ কোথায় এল সে। যারা একটু আগে এসে তাকে দুধ খাইয়ে গেছে, তারা বোধ হয় বাইরে রয়েছে।
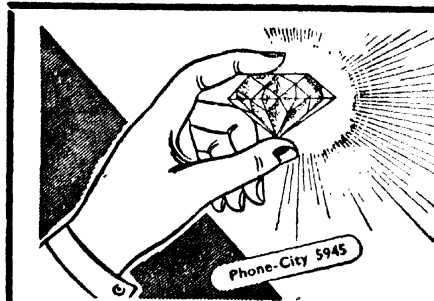
কে একজন বলছে—কদমদা, এবার ওদের একটা শিক্ষা দিতেই হবে—কালকে গড়ের মাঠেও একজন গোরা বুটের লাথি মেরে একজনকে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছে—

—গোরাতে একে মেরেছে জানলি কী করে?

—গোরাতে না মারলে কি ভূতে মারতে এল?

—গুন্ডাও তো হতে পারে? নিজের চোখে তো দেখিসনি তুই? কলকাতার রাস্তায় গুন্ডাও তো কম নেই আর, তা ছাড়া একটা গোরাকে মেরেও তো লাভ হবে না কিছু—কটা গোরাকে সামলাবি? শেষকালে কেল্লা থেকে যখন হাজার হাজার গোরা বেরিয়ে মারতে শুরু করবে তখন বাঙালীরা পালাবে কোথায়? সাহস তো খুব বোঝা গেছে। একটা কুস্তীর আখড়াতেই মেম্বর জোগাড় করা যায় না—

—কিন্তু কদমদা' ভারতবর্ষ জয় করতে ক'টা ইংরেজ এসেছিল?

খানিকক্ষণ কোনও কথা শোনা গেল না। তারপর কে যেন বলতে লাগলো—তোরা ভুল করছিস শিবনাথ, আমাদের 'যুবক সঙ্ঘের' উদ্দেশ্যই যে তা নয়—স্বামীজী বলেছেন—

"The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word tell like a thunder-bolt. Awake, awake great souls! The world is burning in misery, can you sleep?"

রাজনীতি দিয়েও দেশের উপকার হবে না, ধর্মের জয়ঢাক পিটিয়েও কিছু হবে না, অর্থনীতি দিয়েও অভাব মিটবে না আমাদের, আমরা যুবক সঙ্ঘের সভ্যারা একটা জিনিস চাই, সে এই যে দেশের ওপর মাতৃভূমির ওপর প্রেম,—জ্বলন্ত প্রেম,—। সে প্রেম তোর আত্মা, তোর বিত্ত তোর সন্তানের চেয়েও বড়। যে সেই জ্বলন্ত প্রেম নিয়ে গরীব বড়লোক, হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান সকলকে সমান চোখে দেখতে পারবে, সেই শুধু পারবে। তবেই সমস্ত ভারতবর্ষ এক হবে—তোরা ভুল বুঝিসনে আমাকে, সিস্টার নিবেদিতাও সেদিন সেই কথাই বললেন—বড়দারও সেই মত—

হঠাৎ অনেকগুলো গলার আওয়াজ এক সঙ্গে উঠলো—ওই যে বড়দা এসে গেছেন—

বড়দা এসেই জিজ্ঞেস করলে—কীসের কথা হচ্ছে?

শিবনাথ বললে—সেদিন আর একজনকে গোরাতে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে—

—কই? কোথায়?

—ওই যে ঘরের ভেতর রয়েছে—

ঘরে আসতেই চেহারা দেখে চমকে উঠলো ভূতনাথ।

ব্রজরাখালও কম বিস্মিত হয়নি। বললে—এ কী বড়কুটুম?

ভূতনাথের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। কিন্তু মুখে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই।

ব্রজরাখাল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কাঁদছ কেন বড়কুটুম, কোনও ভয় নেই তোমার, আমাদেরই 'যুবক সঙ্ঘ' রয়েছে৷ এখানে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার, কদম রয়েছে শিবনাথ রয়েছে বরং বড় বাড়িতে থাকলে দেখাশোনা করবে কে?

তারপর শিবনাথের দিকে চেয়ে বললে আরে এ যে আমার বড়কুটুম হয়—কোথায় পেলি একে!

যাবার সময় ব্রজরাখাল বলে গেল—আসবো আবার আমি, এখন কিছুদিন বড় ব্যস্ত আছি।

সে কতকাল আগের কথা! গোলদিঘীর ধারের সেই 'যুবক সঙ্ঘে'র ঘরটাতে ভূতনাথ তারপরেও কতদিন গিয়েছে। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে নিতান্ত অসহায়ের মতন যে কয়েকদিন সে শুয়ে পড়েছিল ওখানে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে তার স্মৃতি যেন জড়িয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই সব দেখতো সব শুনতো সে। ছেলেরা কুস্তি করতো, মুগুর ভাঁজতো, লাঠি খেলতো আর গান করতো। কয়েকটা গান এখনও মনে আছে—

"মা গো যায় যেন জীবন চলে
বন্দে মাতরম বলে—
বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মা'র সেই ছেলে!
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে—"

আর একটা গান—

"শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া চরণে নম্র শির।
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর—"

নিবারণের কথাও মনে পড়লো।

ছেলেটা মাথার কাছে বসে ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সামনের আখড়া ফাঁকা। কারো গলার শব্দ আসছে না। হঠাৎ মাথার কাছে একটা শব্দ হতেই ভূতনাথ চোখ তুলে দেখলে কে যেন বসে আছে তার দিকে চেয়ে।

নিবারণ বলেছিল নিচু হয়ে—কিছু কষ্ট হচ্ছে আপনার?

ভূতনাথ শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখেছিল নিবারণের মুখের দিকে। কিছু কথা বলেনি।

নিবারণ শেষে নিজেই বলেছিল—একটু জল খাবেন?

জল খেয়েও ভূতনাথ তেমনি তাকিয়ে আছে দেখে নিবারণ বলেছিল—কিছু বলবেন আমাকে?

ভূতনাথ বলেছিল—তুমি কে?

নিবারণ বলেছিল—আমি নিবারণ, আমায় চিনতে পারবেন না—আমি 'আত্মোন্নতি সমিতি' থেকে নতুন এসেছি—আপনার কাছে রাত্রে থাকবো—

ভূতনাথ বললে—'আত্মোন্নতি সমিতি' কোথায়?

—আগে খেলাত ইনস্টিটিউসনে বসতো—এখন যুবকসঙ্ঘের সঙ্গে মিশে গেছে, যেদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হয়, সেদিন থেকেই ঠিক হয়েছে দুটো সমিতি এক হয়ে যাবে—ফিরিঙ্গী-গুলো বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে কিনা, যাকে তাকে রাস্তায় মার-ধোর আরম্ভ করেছে। আমরাও ঠিক করেছি ফিরিঙ্গী ছোকরা দেখলেই মারবো, কিন্তু কদমদা বলে, ওতে কাজ হবে না, তাই নিয়েই তো আজকে মিটিং ছিল আমাদের—

—মিটিং-এ কী ঠিক হলো—

—ঠিক হলো না কিছুই, বড়দা হাজির ছিলেন না—

—বড়দা কে?

—ব্রজরাখালবাবু, উনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট কিনা—

ব্রজরাখাল! নামটা শুনেই ভূতনাথ যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। একথা তো ব্রজ-রাখাল কখনও বলেনি।

নিবারণ কিন্তু তখন নিজের মনেই বলে চলেছে, কিন্তু কদমদা যাই বলুন, আমরা ঠিক করেছি আমরাও আমাদের নিজেদের পথে চলবো। বৃটিশ রাজত্ব যত-দিন থাকবে, ততদিন মনুষ্যত্ব বজায় রেখে বেঁচে থাকা কঠিন—

আজো মনে পড়ে সেদিনকার নিবারণের সেই কথাগুলো। কী জ্বলন্ত আগুনের ফুলকির মত সব ছেলে। কথা-গুলো যেন আজো কানে বাজছে। সেই ২২শে জুন তারিখের ঘটনা যেন তার কণ্ঠস্থ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসবের পর পুণার গণেশখণ্ডের লাটসাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আস-ছিল প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড সাহেব। দুর্দান্ত বদমাইস সাহেব। সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুন করলে দুই ভাই দামোদর চাপেকার আর বালকৃষ্ণ চাপেকার। শিবাজী মহারাজার বংশধর। বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের সেই তো শুরু। আর সেই চাপেকার সঙ্ঘের সদস্যরাই তো ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরু। সে বুঝি ১৮৯৯ সাল। একদিন শেষ রাত্রে দুই ভাই-এর ফাঁসি হয়ে গেল নিঃশব্দে। কিন্তু যে-বিশ্বাসঘাতকরা চাপেকার ভাই-দের ধরিয়ে দিলে, তারাও তো প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো না শেষ পর্যন্ত।

নিবারণ হঠাৎ থেমে বললে, কিন্তু বাঙালীরাই বা পেছিয়ে থাকবে কেন। তাই চাপেকার সঙ্ঘ থেকে লোক কলকাতাতেও আসছে—আমি চিঠি দেখেছি। একটা র‍্যাণ্ডকে খুন করলে তো কিছু কাজ হবে না, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ র‍্যাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে যে ভারতবর্ষে. নীলকর সাহেবরা গেছে কিন্তু চা-বাগানের সাহেবরা?

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কারা আসছে কলকাতায় বললে?

—তিনজন বাঙালী, যতীন মুখুজ্জে, বারীন ঘোষ আর তার দাদা অরবিন্দ ঘোষ। আর এখানে আমাদের ব্যারিস্টার সাহেব পি মিত্তির রয়েছেন। একটা সমিতি করার কথা হয়েছে, নাম হবে 'অনুশীলন সমিতি'—মাণিকতলা স্ট্রীটের মাণিক দত্তের বাড়িতে ওদের আড্ডা বসছে—

(ক্রমশঃ)

এইবার ঘাবড়ালেন বিন্দুবাসিনী। না, আর বোধহয় থাকা গেলো না।

আবার ঢেউ উঠেছে ত্রাসের। শোনা গেছে পাসপোর্ট নামক কী একটা তৈরি হচ্ছে দেশে, আর কেউ পাকিস্তান ছেড়ে যেতে পারবে না হিন্দুস্থানে, একেবারে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো হিন্দুদের সব গুম্ খুন ক'রে ফেলবে ওরা।

'তাই নাকি?'
'তাই নাকি?'

ভয়ের শিরশিরানি উঠলো পাকিস্তানি সংখ্যালঘুদের মধ্যে। তারপর ঝোপঝাড়, বন বাদাড়, মাঠ ঘাট, ক্ষেত খামার, সব পেরিয়ে দৌড় দৌড় আর দৌড়। মোট ঘাট মাথায় নিয়ে কেউ, কেউ দুই ট্যাঁকে দুই বাচ্চা নিয়ে, কেউ বা একা একা, যে যেখান দিয়ে পারলো ছুটলো। কোনো রকমে সীমানাটুকু পার হ'তে পারলেই হয়। ক্ষ্যাপার মতো, উন্মাদের মতো, শ্বাস টানতে টানতে প্রাণের ভয়ে পালালো সব।

গালে হাত দিয়ে বিমর্ষমুখে বিন্দুবাসিনী ঘরে ব'সে ভাবতে লাগলেন এখন তিনি কী করবেন? এরপরেও কি থাকা উচিত? কিন্তু যাবেনই বা কোথায়? কে আছে তার? কী আছে? একলা একটা মানুষই তো নয়, তিনি নিজে, বিধবা পুত্রবধূ, আর এমন কপাল যে তার ঘরেও দু-দুটো মেয়ে। একটা জোয়ান ছেলে থাকলেও না হয় একটা ভরসা ছিলো। এখানে এই বসতবাটিতে বাস ক'রে কিছু কষ্টেতো নেই তারা। নেই নেই ক'রেও লোহার সিন্দুকে সোনা আছে চল্লিশ ভরি, বেনারসি আছে তিনখানা, রুপোর বাসন আছে দুই সেট, তামা কাঁসা পেতলও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়! চুনবালি খ'সে গেলেও কেমন রমরমে কোঠাবাড়ি, দালান। পাঁচখানা বড়ো-বড়ো হলের মতো ঘরে আটখানা পালঙ্ক আছে সিংহ মুখ পায়ার। বৈঠকখানায় দুটি সিংহাসন চেয়ার আছে, গালিচা আছে আনন্দে উৎসবে পাতবার জন্য। ঘর জোড়া সতরঞ্চি আছে তিনটি, ফরাসের চাদর আছে, ঝাড় লণ্ঠন আছে, গ্যাস-

লাইট আছে। কোনো একদিনের স্বাচ্ছন্দ্যের স্মৃতি হ'য়ে তোষাখানার অন্ধকারে শুয়ে আছে তারা। বহাল তবিয়তেই আছে। বিন্দুবাসিনী বছরে তিনবার বার করেন সেগুলো, রোদ্দুরে দেন, ঝাড়েন, পোঁছেন, আবার তুলে রাখেন। একমাত্র পুত্র, বংশের একমাত্র তিলক নীরদবরণের বিয়ের সময় সব ঝাড় জ্বালিয়েছিলেন দেড়শো মোম দিয়ে। সব প্রজাদের খাইয়েছিলেন পরিতুষ্ট ক'রে, গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুস্থানীয়দের জন্যে সিংহাসন চেয়ার দুটো পাতা হয়েছিলো কার্পেটের উপর। মেয়ের বাড়ির কুটুম্বরা ফরাসের সাদা চাদরে শুয়ে গড়িয়ে আলস্য যাপন ক'রে খুশী হ'য়েছিলো বড়ো ঘরে মেয়ে পড়েছে ব'লে।

তারপর অবিশ্যি সব আলো একদিন নিবে গেল এই বাড়ির। বাপ বেটা আড়া-আড়ি ক'রে মারা গেল এক বছরের মধ্যে। তারপর আরো কাণ্ড ঘটলো দেশ ভাগ হ'য়ে। কালের প্রভাবে তাঁর নিজের শোক যদিবা উপশমিত হলো, তবু বিন্দুবাসিনীর মনে হয় এই নতুন আতঙ্ক তার চাইতেও বেশি শোকাবহ। মারামারি কাটাকাটি, অকারণ ত্রাস কত কিছুই দেখলেন, গ্রাম শূন্য হ'য়ে গেল চোখের সামনে, ভয়ে ত্রাসে উৎকণ্ঠায় কতদিন কত রাত মুখে ভাত দিতে পারলেন না, রাত্রে ঘুমুতে পারলেন না। উতলা হ'য়ে তল্পি তল্পা গুছোলেন, তারপর মুসলমান প্রজাদের আশ্বাসেই আবার খুলে ফেললেন সব। ভয় যেমন এখানে আছে, তেমন তো যেখানে যাবেন সেখানেও ভয় লেগে থাকবে তাঁর পেছনে? ভয় ছাড়া কোথায় একটি নিরাপদ ঠাঁই অপেক্ষা ক'রে আছে তাদের চারটি অসহায় স্ত্রীলোকের জন্য? তবু এখানে নিজের বাড়িতে ঘরেতে, জমিতে জায়গাতে, ছোট্টো তালুকদারির আদায়ে ওয়াশিলে একমাত্র মুসলমানের ভয় ছাড়া আর তো কোনো ভয় নেই। আর মুসলমানের ভয় যে অন্তত তাঁর জীবনে কত অমূলক' তার প্রমাণ তো তিনি আজকে পর্যন্তও পাচ্ছেন?

ভেবেচিন্তে, হালচাল দেখে তাঁর প্রজাশ্রেষ্ঠ জামির মিঞাকেই তিনি ডেকে পাঠালেন।

'কী, মা?' জোয়ান শরীরে আভূমি আনত হ'লো জামির।

'জামির, আর তো ভরসা হয় না বাবা। সব তো চ'লে গেল। আমাকে কি করতে বলো তুমি?'

জামির মাথা নিচু ক'রে রইলো, জবাব দিলো না।

বুকটা কেঁপে উঠলো বিন্দুবাসিনীর। জামির চুপ কেন? জামিরের জোরেই তো ভয় ডর সামলে তিনি টিঁকে আছেন গ্রামে।

'মা', অনেক পরে মুখ তুললো জামির 'আপনি বরং সন্ধ্যাবেলা সবাইরে ডাকেন একবার। বছির, কালুশেখ, জালালুদ্দিন—'

'কেন, জামির?' বিন্দুবাসিনীর গলা কেঁপে উঠলো, 'তুমিই তো আমার একা একশো', তুমি ছাড়া আর আমার এখানে কী জোর আছে।'

জামিরের ছোটো ছোটো চোখ জলে ভরে উঠলো। এত বড়ো কাঁচা-পাকা বাবড়িতে, দাড়িতে একটা ঝাঁকানি দিল সে, 'সব আল্লার মরজি মা। সব আল্লার মরজি। কিন্তু খোদার কসম আমি কারো কথায় কান দেই নাই, আমার মন আজ পর্যন্ত

এতটুকু হেলে নাই, না পয়সার লোভে না তাগো গরম-গরম বক্তৃতা শুইনা।'

বিন্দুবাসিনী স্থির হ'য়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে।'

মেহেদি রাঙা দাড়িতে জামির হাত বুলালো। 'মাগো, বাইরে থেইকা যে বড়ো বড়ো মিঞারা সব আইছে দ্যাশে। তারা মারামারি করতে কয়, লুটপাট করতে কয়, কইতে সরম লাগে, কয় যে সব হিন্দু মাইয়ালোকগো ধইরা ধইরা নিকা কর, বুড়া গুঁড়া মানিস না।'

বিন্দুবাসিনীর দাঁতে দাঁত ঠেকলো। বললেন 'তোমরা কী বলো?'

'আমরা?' জামির হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো—'আমরা আর মাইনসের মধ্যে আছি নাকি? দ্যাশের ভালো ভালো মৌলবিরা পর্যন্ত সেই লগে মাথা লাড়ে। কমু কী। না, মা আপনে চইলাই যান। গ্রামের পনেরো আনি লোকই অরা হাত কইরা ফালাইছে টাকা দিয়া। পারলে আপনে আইজই চইলা যান। ষাইট। দিদিমনিরা সব সোমত্ত হইয়া উঠছে, বৌমারই বা বয়সটা কী? এই তো সেদিন গমটা দিয়া আইল এই বাড়িতে।' হাতের পিঠে চোখ মুছলো জামির।

এর পরে আর কার ভরসায় মনকে প্রবোধ দেবেন বিন্দুবাসিনী? সারাদিন সারারাত ধ'রে পুঁটুলি বাঁধলো শাশুড়ি বৌ। জামির বললো, 'লইয়া যাইতে দিব না কিছুই। গয়নাগাটি যা পারেন চাইর-জনেই পিন্দা লয়েন শরীরে। আলগা টাকা, জিনিস, সোনা যত কম পারেন সঙ্গে লয়েন। মনে কইরা লন ঐ সব ছাচ কত্তেই ফুরাইয়া যাইব।'

ইস্টিশনে কেমন ভিড়, ক'জন মরছে, ক'জন পড়ে থাকছে, ক'জন হেঁটে হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছে সীমানা, কার ট্রাঙ্ক-বাকস ছিনিয়ে রেখেছে বদমাস পুলিশের লোক সব কিছুরই একটি , ভয়াবহ মর্মান্তিক বিবরণ দিল সে। বললো, 'বুঝছেন মা, আইজকালকার বাজার খারাপ মাইনষেই ছাইয়া গেছে। কী আপনাগো হিন্দু আর কী আমাগো মোছলমান দুই-ই সমান। আমার পরানডাও দেইছেই করে এই সব দেইখা শুইনা।'

অতএব দুই নাতনি আর পুত্রবধূ নিয়ে রওনা হ'লেন বিন্দুবাসিনী। মস্ত মাঠের মধ্যে দুই দিকে দুই দড়ি দিয়ে লম্বা ক'রে যাবার রাস্তা তৈরি ক'রে দিয়েছেন সরকার। হাজার হাজার লোক ঢুকছে সেই দড়ির ফাঁকে। চেপ্টে যাচ্ছে শিশু, চাপা পড়ছে গর্ভবতী স্ত্রীলোক, কারো মাথার ট্রাঙ্কের গুঁতোয় ভেঙে যাচ্ছে আরেকজনের মাথা, ফাঁকে ফিকিরে কে কার বৌ ঝির শরীরে হাত দিচ্ছে, কোমরে গোঁজা সঙ্গে নেবার নির্দিষ্ট পাথেয়টুকু শুষে নিচ্ছে কেউ, এরই মধ্যে ছেঁচড়ে মেচড়ে দু'দিনের অস্বাভাবিক কষ্টে প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় পাকিস্তানের মাটি ছেড়ে হিন্দুস্থানের মাটিতে বিন্দু-বাসিনী পা রাখলেন। এক, দুই, তিন, চার। না। কেউ প'ড়ে থাকেনি বা ম'রে যায়নি। তারপরে গ্রামেরই আরো দশ বারোটি রিফিউজি পরিবারের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগলেন পাকা সড়ক ধ'রে। দলের সবাই মোটামুটি প্রায় চাষী শ্রেণীর। তার মধ্যেই যা ইতর বিশেষ। এরা প্রথমে বনগাঁ ইস্টিশনে এসে তল্পি তল্পা নামিয়ে একরাত বাস করলো, তারপরের দিন কতকগুলি ভুঁই ফোঁড়ের চোখ রাঙানিতে টিঁকতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবার হাঁটতে আরম্ভ করলো রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে মস্ত এক আমবাগানে এসে থামলো তারা। প্রকাণ্ড চাতাল বাঁধানো জায়গা। কে জানে, সৈন্যদের ছাউনি পড়েছিলো হয়তো যুদ্ধের সময়। সেই চাতালেই নামানো হ'লো ছেঁড়া কাঁথা, টিনের স্যুটকেস, লেপ তোষক, বালিশ মাদুর। যার যার সামান্যতম পুঁজি। বিন্দু-বাসিনীর ট্রাঙ্কটিও নামানো হ'লো সেখানে। নাতনি দু'টি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো, পুত্র বধূ বললো, 'মা, আর পারি না।'

বিন্দুবাসিনী বললেন, 'এইতো সবে শুরু।'

সঙ্গের প্রায় সব জিনিসই তিনি খুইয়ে এসেছেন। কোমরের লম্বাটে থলিতে তিনশো টাকা ছিলো তা গেছে, লজ্জার মাথা খেয়ে শাশুড়ি বৌ গলায় হার প'রে এসেছিল সতেরো ভরির তা গেছে, দুই নাতনীর হাতে ঢলঢলে ষোলো গাছা চুরি, মকর মুখ বালা কোমরে সোনার পটি, কানে ভারি পাশা মাকড়ি গলায় মবচেন প্রায় কিছু নিয়েই তিনি পৌঁছতে পারেননি হিন্দুস্থানে। অমন সোনার বাড়িঘর, জিনিসপত্র বাসনকোসন খাটপালঙ্ক সবই তো ফেলে এসেছেন কোন অনিশ্চয়তের অন্ধকারে। কেবল সোনাটুকু আনতে চেষ্টা করেছিলেন পথের সম্বল হিসেবে, তাও গেল। সঙ্গে পুরুষ নেই, যে যা বলেছে তাই সই। ভয়ে চকিত হ'য়ে সব খুলে দিয়েছেন বিন্দুবাসিনী। নিক, নিক। প্রাণে বাঁচি তো, মানে বাঁচি তো। কোনোরকমে একবার হিন্দুদের আশ্রয়ে পৌঁছলে আর কিসের ভয়? কত স্বেচ্ছাসেবক, কত দয়ালু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সেখানে ছড়ানো। পৌঁছনোমাত্র সব অন্ধকার স্বচ্ছ হ'য়ে যাবে। অতএব কেবল স্ত্রীলোকের বহন করবার যোগ্য ছোট্ট ট্রাঙ্কটিই প্রায় খালি হ'য়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে সীমানা পার হ'লো তাদের সঙ্গে। কী লাভ।

'আমার কাকা তো আছেন কলকাতা ঝাঁমাপুকুর লেনে, তাঁদের একটা খবর পাঠালে কি আমাদের নিয়ে যান না এসে?' উত্তরা চোখের কোণ আঁচল দিয়ে মুছলো। বিন্দুবাসিনী বললেন, 'চিঠিতো তিনখানা লিখেছিলে, জবাব দিল কই?'

তা তো সত্যিই। কতবার কত বিপদের কথাইতো জানিয়েছে উত্তরা, একবারও তো তাকে আহ্বান করেননি তিনি। রিফিউজিদের কে ঠাঁই দিতে চায়।

কান্না ভাসা মুখ আঁচলে ঢেকে বৌ চাতালের সিমেন্টেই গা ঢেলে দিলো। মিলু বুলুর মুখে কথা নেই। ভয়ে লজ্জায় অসম্ভ্রমে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে তারা। বিন্দুবাসিনী মন শক্ত ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন কী উপায় করা যায়। মাথাটা ঘুরে উঠলো, তিনিও চাতালে শুলেন।

সন্ধে হ'য়ে এলো। কার্তিকের হিম নামলো বাগানে। খোলা মাঠে শরীরে নামলো বরফের স্রোত।

বারোটি পরিবারের গড়পড়তা চার বারো আটচল্লিশটি বাচ্চা সেঁটে রইলো— মায়েদের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে। শিশুরা স্তন টেনে টেনে শুকনো চামড়া ছিঁড়ে দিল। স্ত্রী-পুরুষের শ্রান্ত ক্লান্ত সারাদিনের অনাহারক্লিষ্ট একেকটি দেহ

একেকটি কাটা গাছের মতো ধড়াস ধড়াস প'ড়ে গেল মাটিতে।

'এর চেয়ে বাড়িতে থেকে আমাদের মরাও ভালো ছিলো, মা' বৌ আবার ফুঁপিয়ে উঠলো নির্ঘুম চোখে। অনেক রাত্রিতে ছোট নাতনি দশ বছরের তাজা মেয়ে বুলু গুটি গুটি এগিয়ে এলো ঠাকুমার কাছে। দুই হাতে তাকে বুকের উত্তাপে টেনে নিতে গিয়ে চমকে উঠলেন তিনি—'একী! গা' যে পুড়ে যাচ্ছে। ঈশ! নিশ্বাস যে আগুন।' ভয়ে ত্রাসে বুলুর মা উঠে বসলো গায়ে আঁচল জড়িয়ে। ও পাশে মিলু ঘুমুতে ঘুমুতে এগিয়ে গেছে কার বিছানার কাছে, অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে তাকে টেনে আনতে গিয়ে অনুভব করলো এগিয়ে যায়নি; কে যেন আস্তে আস্তে ঘুমন্ত মেয়েকে টেনে নিচ্ছে কাছে। হাতের সঙ্গে হাত ঠেকে হঠাৎ একটি রূঢ় কড়া পুরুষে হাত আঁতকে স'রে মিশে গেল ঘন অন্ধকারে। কেঁপে উঠে উত্তরা মেয়েকে সাপটে কাছে টেনে নিয়ে এলো।

পরের দিন সকালে রিলিফের লোকেরা এলো। লিখে নিল নাম, ধাম, ঠিকানা। প্রত্যেক শিশুকে দুই ছটাক দুধ দিল, সাবালকদের দিল চিঁড়ে গুড়। আশ্বাস দিল কেউ, কেউ ধমকালো, কেউ কেমন কেমন চোখে তাকালো। বিন্দুবাসিনী আর তার বৌও দুই মেয়ে নিয়ে ভিক্ষুকের মতো পাত্র হাতে গ্রহণ করলো সেই আহার্য।

সারাদিন জ্বরে ধুঁকলো বুলু, সারাদিন কেঁদে কেঁদে নাকমুখ ফুলিয়ে ফেললো মিলু, অন্যান্য সহযাত্রীরা তারই মধ্যে যার যার জায়গায় খড়ি দিয়ে তার তার সীমানা এঁকে হাড়ি কড়া নিয়ে সংসার পাতলো। ছেলেপুলেরা সারা আমবাগান মুখরিত করলো খেলাধুলোর আনন্দে, মেয়েরা উকুন বাছতে লাগলো পরস্পরের, কেউ কেউ কাঠকুটো কুড়িয়ে খিচুড়ি বসালো। ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে তাদের বড়ো বড়ো ছেলেরা কিম্বা স্বামীরা খোঁজ-খাঁজ ক'রে চাল ডাল কিনে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। পুরুষেরা বেরুলো কাজকর্মের সন্ধানে। রিফিউজি সার্টিফিকেট নেয়া আছে, তারা যে ক্যামফো মেরে আসেনি সেই কথা প্রমাণ করা আছে, আছে ছাড়-পত্রের যোগাড়, চাষী ব'লে সরকারের কাছে চাষের জমির আবেদন, আরো কত কী! কেউবা এর মধ্যে ঘরামির কাজে গিয়ে বহাল হ'লো দ্বিগুণ রোজায়, কোনো জোয়ান মেয়ে হঠাৎ কোন বাড়ির ঠিকের কাজ পেয়ে গেল, ছোটো ছোটো ছেলে-গুলো পানের দোকানে বিড়ির দোকানে ঘুরতে লাগলো ফুটফরমায়েসের আশায়, ছেঁড়া ফ্রক উকুন মাথা ছোট মেয়েগুলো ভিক্ষে করতে বেরুলো পথে। কেবল বিন্দুবাসিনীই খুঁজে পেলেন না কোনো পন্থা।

আবার রাত হ'লো, আবার সকাল, আবার রিলিফের লোক, আবার সেই চিঁড়ে গুড় আর দুই ছটাক নীলচে দুধ সরকারের। তারই মধ্যে একটুখানি এই যা তফাৎ যে মোটাসোটা, সামনের দাঁত দুটি ঈষৎ উঁচু, পরনে খদ্দর, কাছাছাড়া-গেরুয়া চাদর গায়ে এক সন্ন্যাসী ভদ্র-লোকও এসেছেন সঙ্গে। প্রশান্ত চোখে তাকালেন সকলের দিকে, আস্তে আস্তে করুণ হ'য়ে এলো তাঁর চোখ। ঝুঁকে প'ড়ে মোহাচ্ছন্ন বুলুকে স্পর্শ করলেন, তারপর জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ ক'রে মাথা নাড়লেন। আর এইটুকু সহানুভূতিতেই বিন্দুবাসিনীর চোখ সজল হ'য়ে এলো। শোনা গেল রিফিউজিদের সুখ-সুবিধের জন্যেই ইনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেবা ধর্মই তাঁর ব্রত। একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছেন এজন্যে। বৌ বললো 'মা, ও'কে আমাদের কথা বললে হয় না?'

বিন্দুবাসিনীও সে বিষয়েই চিন্তা করছিলেন। নাতনীর জ্বরতপ্ত মাথাটি তার মার কোলের উপর রেখে আস্তে আস্তে তিনি উঠলেন।

একটু নিভৃতে গিয়েই বললেন সব কথা। চোখ বুজে ভদ্রলোক শুনলেন সব মনোযোগ দিয়ে। পরের দিনই বেলা দু'টোর সময় একখানা জিপ এসে দাঁড়ালো আমতলার কাঁচা রাস্তায়, এক ঝাঁক শিশু আর পুরুষ দৌড়ে গিয়ে ভিড় করলো সেখানে। কী জানি কী নতুন আলো, নতুন আশা বহন ক'রে এনেছে এই গাড়ি কে জানে। বুলু তখন হেঁচকি টানছে নিঃশ্বাসের কষ্টে, চোখ মুছে বিন্দু-বাসিনী আর উত্তরা দুই মেয়ে নিয়ে উঠে বসলো সেই গাড়িতে।

সূর্য পশ্চিমে হেললো, দুরন্ত জিপ বনগায়ের আম জাম জারুলে ঢাকা মসৃণ পিচের রাস্তা বেয়ে দু' পাশের নিচু জমিতে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ভুট্টার জঙ্গল পেছনে ফেলে ক'লকাতা পৌঁছুলো। আশ্রমটি একেবারে নিরালা নিভৃত একটি কোণে। স্থানটি কলকাতার কোন অংশ কে জানে, গঙ্গা একেবারে দেড় হাত দূরে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। মিষ্টি একটি হাওয়ার ঝাপটা লাগলো চোখে মুখে।

'এই আমার আশ্রম' সন্ন্যাসী ভদ্রলোক বিনয়ে অবনত হ'লেন, 'দেখুন ভালো লাগে কিনা। কয়েকদিন কাটান, তারপর সুযোগ-সুবিধে মতো—'

বিন্দুবাসিনী কৃতজ্ঞচোখে তাকালেন শুধু। কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না তাঁর। নাতনীকে নিয়ে তাড়া-তাড়ি ঘরে এসে বিছানা পেতে শুইয়ে দিলেন, কাতর হ'য়ে এক ফোঁটা অসুধ প্রার্থনা করলেন। 'নিশ্চয়ই' ভদ্রলোক তখুনি নিয়ে এলেন ডাক্তার, টিপে টুপে মাথা নেড়ে অসুধ দিলেন তিনি।

কত কষ্টের পর একটুখানি আরাম, আমতলার নিরাশ্রয় মাঠের বদলে এমন সুন্দর দালান কোঠা বাড়ি। ঐটুকু আয়াসেই হাজার দুর্ভাবনা সত্ত্বেও অধিক রাত্তিরে বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এলো একটু শাশুড়ি বৌয়ের চোখে। আর ঘুম ভাঙলো কাক ডাকলে। দু'জনেই উঠে বসলো ধড়মড়িয়ে, দু'জনেই একসঙ্গে হাত রাখলো বুলুর বুকে। নিঃস্পন্দ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে সে। না, আর কোনো কষ্ট নেই তার, কোনো উত্তাপ নেই, কোনো যন্ত্রণা নেই। মহানিদ্রা শান্তি দিয়েছে তাকে। উত্তরা আর্তনাদ করে উঠলো, চকিতে ঘুম ছুটে উঠে বসলো মিলু, বিন্দুবাসিনী জানালা দিয়ে ভোরের আকাশে তাকালেন।

•

দিন সাতেক পরে কেশবানন্দ বললেন—এখানে সেই সন্ন্যাসী ভদ্রলোককে সকলেই এই নামে ডাকে—'এই নিন আপনার ইয়ারিং বিক্রীর পঁচিশ টাকা। কিন্তু এই সামান্য টাকাতে আর ক'দিন চলবে। তারচেয়ে আপনার বৌমাকে কোনো একটা কাজে ভর্তি করে দিন।'

বুদ্ধি তো ভালোই কিন্তু ও কী কাজ করবে? ও কি লেখাপড়া জানে? একটু ইতস্তত ক'রে বিন্দুবাসিনী বললেন, 'ঘর সংসার করা ছাড়া ওতো আর কিছু—'

'তাইতো! সে সব কাজের কথাইতো আমি বলতে চাইছি। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর দু'টি মা-হারা মেয়ের জন্য কোনো একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা চাইছিলেন উনি—'

'ঝি! ঝিয়ের কাজ। ছি—'

'না, না, তা কেন? গবর্নেস্। ইংরিজিতে গবর্নেস্ বলে। অত্যন্ত শিক্ষিত মেয়েরাই কলকাতা শহরে এসব কাজ করেন। কেননা মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, ভদ্রতা-সভ্যতা, আদপ-কায়দা এসবই তো শেখাতে হয় তাঁদের?

তবু বিন্দুবাসিনীর দ্বিধা কাটলো না। উত্তরা লাফিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, মা, কিছু আপত্তি করবেন না আপনি। এ কাজ আমি নেবো।'

'শেষে কি তুমি—' বিন্দুবাসিনীর গলা ভেঙে এলো, উত্তরা বললো, 'আপনি মিছিমিছি মন খারাপ করছেন। কাজ ক'রে মাইনে নেবো তাতে কি সম্মান যায়? এখানে এভাবে, এমন নিঃসম্বল হয়ে আর ক'দিন থাকতে পারবো আমরা?' তাতো সত্যিই। এর উপরে আর বলবার কী থাকতে পারে?

দু'দিন পরে কেশবানন্দ সব ঠিকঠাক ক'রে উত্তরাকে নিয়ে গেলেন কাজে ভর্তি ক'রে দিতে। ফিরে এলেন একা একা।

'একা যে? বৌমা? বৌমা কই?' বিন্দুবাসিনী ছুটে এলেন।

'বৌমা রইলেন। আজ থেকেই লেগে গেলেন কাজে। খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর কাজ। মাইনে অতি চমৎকার! আপাতত পঁচাত্তর, একমাস পরে আরো দশ টাকা বাড়িয়ে দেবেন বললেন। আপনি কিছু ভাববেন না মা, একটুও মন খারাপ করবেন না—এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারতো?'

বিন্দুবাসিনী মুখ নিচু ক'রে রইলেন।

'এই যে, এই নিন' হঠাৎ মনে পড়লো। গেরুয়ার আঁচল থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু আগাম নিয়ে এলাম।'

'আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো'—বিমনা বিন্দুবাসিনী হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিতে নিতে বললেন। চোদ্দ বছরের ভরা যৌবন বাড়ন্ত মিলু কাছে এসে দাঁড়ালো—'মার ঠিকানা কী?'

ঈষৎ থমকালেন কেশবানন্দ তারপর সহাস্যে বললেন, 'বড্ড মন কেমন করছে না? আচ্ছা দাঁড়াও'—একটু চিন্তা ক'রে 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি পর্শু কি তর্শু নাগাদ হয় তোমার মাকে নিয়ে আসবো এখানে নয় তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো। গাড়িটি চ'ড়ে টুক্ ক'রে যাবে আর আসবে, তারপর ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে শুয়ে রাত্তিরে সব বলবে, আর ঠাকুমা তখন আমার আশ্রয় ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে, নিজের জন্য নতুন বাড়ির খোঁজে লেগে যাবেন।' নিজের রসিকতায় নিজেই উদার গলায় হেসে উঠ্লেন। বিন্দু-বাসিনীও হাসলেন একটু।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হ'লেন কেশবানন্দ, 'আমি বলবো কি মা, কর্তাটি চমৎকার। বৌমা সুখে থাকবেন। ও'র বাপের বয়সী ভদ্রলোক তো।'

তা বাপের বয়সী বৈ কি। রাজীব-লোচন সরকার তো আজকের লোক নন। এই কেশবানন্দই তো তার কাছে এ কাজ করছে আজ ষোলো বছর। ডান হাত বাঁ হাত। ঢুকেছিলো যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে চুল পাকালো। মাঝেমাঝে পেছন ফিরে তাকায় কেশব। মা নেই, বাপ নেই, জ্যাঠার অন্নে প্রতিপালিত সচ্চরিত্র অনাথ বালক। লেখাপড়ায় পরিষ্কার মাথা, বুদ্ধিতে তীক্ষ্ন। কিন্তু কী লাভ হ'তো সেই চরিত্র নিয়ে গ্রন্থকীট হ'য়ে বেঁচে থেকে? দু' মুঠো অন্নের জন্য তো দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হ'তো? বাজে!

রাজীবলোচন উদ্ধার করেছেন তাকে, সুখের রাস্তা বাৎলে দিয়েছেন। ঢুকেছিলো সামান্যতম কর্মচারী হ'য়ে চব্বিশ টাকা মাইনেতে। আর আজ? আজ কেশবানন্দ কোথায়? ব্যাঙ্কে যার লক্ষ টাকা জমা আছে, যার অবলাবান্ধব সমিতির আয়ই মাসে দু' হাজার টাকা, সরকারী সাহায্য যার হাতের মুঠোয়। চোরাকারবারের প্রসিদ্ধ ধনী রাজীবলোচনের যে প্রধানত —প্রধানতম কী?

এখানে এসে কুট্ ক'রে একা পিঁপড়ের কামড় লাগে বিবেকে। সহস কত ভয়, কত ত্রাস, কত চোখের জল ছ[illegible] হ'য়ে ভেসে ওঠে চোখে। আশ্চর্য! ওখানে গিয়েই যেন কী বুঝে ফেলে ওরা। তাকিয়[illegible] ঠেস দেয়া কর্তার অসম্বৃত সিলকের লুঙ্গি আর হাত কাটা গেঞ্জি দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে পর্দা ধ'রে, আর সেদিকে তাকিয়ে কর্তা, যাকে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই কেশবানন্দের নিত্যি নতুন শরীর যোগান দিতে হয়, তার চোখ আতুর হ'য়ে ওঠে লোভে।

রেফিউজিরা এসেই আরো সুবিধে হয়েছে। অভাব কী? বোকাগুলো! বাঙালগুলো! ওদের ভোলাতে যদি এক দাঁতের বুদ্ধিও খরচ করতে হয়! একটু মিষ্টি কথা বললেই কেমন নির্ভর ক'রে বিশ্বাস করে, উদাস উদ্‌ভ্রান্ত চোখে কেমন পায়ে পায়ে চলে আসে নতুন আশায় আলোকিত হ'য়ে। মূঢ়! নির্বোধ! এদের তো এই-ই হবে। এই-ই হওয়া উচিত।

এইতো উত্তরা। একত্রিশ বছরের আঁটোসাঁটো যোয়ান মেয়ে। কালো হ'লে কী হয়? কী সুন্দর, কী লাবণ্য, যেন ঊনিশ বছরের যুবতী। এলোতো? অচেনা ব'লে কতটুকু দ্বিধা করলো সে? বাঁ হাতে চোখের জল মুছে ডান হাতে বাবা ব'লে হাত ধরলো অনায়াসে। আর কেশবানন্দ? রেফিউজিদের যিনি ত্রাণ-কর্তা, আশ্রয়দাতা, কেমন অকাতরে আহুতি দিয়ে এলো তাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন সরকারের কামনার যজ্ঞে। বাঘের মুখে ভয়ার্ত হরিণের দৃষ্টি কে কবে দেখেছে? কিন্তু তা যে কেমন কেশবানন্দ তা জানে।

পরের দিন সকালে কেশবানন্দ আপি[illegible] ঘরে গিয়ে পারাবত ফিলিম কোম্পানীর বন্ধু শশিশেখরকে জরুরী ফোন করলো আর দুপুরেই সে টেরি বাগিয়ে পা[illegible] খেয়ে ভয়েলের পাঞ্জাবী গায়ে বি[illegible] ফুঁকতে ফুঁকতে ছুটে এলো অবলা বান্ধব সমিতিতে। পারাবত ফিলিমে মেয়ে যোগাড় করে। দরজা ভেজিয়ে মুখো মুখি চেয়ারে বসিয়ে কেশবানন্দ বললে

তোমাদের 'বাস্তুহারার বেদনা'র নায়িকা পেয়েছ?'

'আর শালা নায়িকা। কচি খুকি যোগাড় করতে দম বেরিয়ে গেল আমার। সবে যুবতী, গোলাপসুন্দরী এখন কোথায় পাই বলো দেখি?'

'আমি দিতে পারি।'

'মাইরি?'

'কিন্তু সর্ত আছে অনেক। শোনো—' খুব নিচু গলায় একটি একটি ক'রে সব সর্ত শোনালো সে। শশিশেখর বললো 'বহুৎ আচ্ছা, মেয়ে দেখাও।'

দেখা হ'লো মেয়ে, শশিশেখর লাফাতে লাফাতে চ'লে গেল।

তার পরের দিন মিলুর কাছে তার মাকে দেখাতে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন কেশবানন্দ। বিন্দুবাসিনী বললেন 'বৌমাকে একদিন নিয়ে আসবার কথা বলবেন দয়া করে।'

'নিশ্চয়ই। দেখুন না আজই নিয়ে আসি কিনা। একটুও অস্থির হবেন না আপনি। ভয় কী? ভাবনা কী? আমি তো আছি।'

জাম রংয়ের তাঁতের শাড়ি পরা, কালো চুলে ঘেরা ফর্সা ফুটফুটে মুখ নাতনীর দিকে তাকিয়ে জল ভরা চোখে বিন্দুবাসিনী অস্ফুটে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

হুস ক'রে খোলা জিপ গলি ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় এসে পড়লো। বেলা দশটার কলকাতা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মিছিল, লক্ষ লক্ষ যানবাহনের স্রোত, হাঁ হ'য়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো মিলু। কত বেঁকলো, কত ঘুরলো, কত অলিগলির প্যাঁচ খুলতে খুলতে এক সময় চমক ভাঙলো তার। গাড়ি থেমেছে, নামতে হবে। কিন্তু একি! এ কি অদ্ভুত ধরণের চোরাগলির অন্ধকার। জরাজীর্ণ বাড়িগুলো কঙ্কালের মতো হাঁ ক'রে আছে দু' পাশে। কাঁচা নর্দমার পচা গন্ধ উঠছে থেকে থেকে। এখানে, এই বীভৎস রাস্তায় থাকেন নাকি তার মা? বুকটা যেন কেঁপে উঠলো আতঙ্কে।

রাস্তা থেকে কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, চোরের মত পা টিপে টিপে সন্তর্পণে সেই সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে উপরে এলেন কেশবানন্দ। সরু, নোংরা, পানের পিক্ ফেলা চিক ঘেরা রেলিংওলা লম্বা বারান্দা, বারান্দা ঘিরে একটার পর একটা ঘর। একদম শেষের ঘরে এসে ঢুকলো তারা। হন্তদন্ত হ'য়ে বিছানা থেকে উঠে বসলো এলোমেলো শশিশেখর।

'আরে এসো, এসো, বোসো বোসো।' কোমরে কাপড় আঁটলো সে। মিলু শিহরিত হলো। 'মা। মা কই।' গলায় যেন কান্না ফুটে বেরুলো তার।

'তুমি বোসো, আমি এখুনি ডেকে আনছি মাকে' কেশবানন্দ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, ত্রস্তহাতে তৎক্ষণাৎ ঘরের খিল এঁটে দিল শশিশেখর। মিলু ভয়ে ছুটে এলো দরজার কাছে শশিশেখর সহাস্যে ডান হাতের মুঠোয় তার আর্তনাদ উদ্যত মুখটি চেপে ধ'রে বা' হাতের আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে এলো বুকের কাছে।

কাল থেকে মিলুকে রাখবার জন্যই এই পাড়ায় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সে। কিছুকাল তার ট্রেনিং পিরিয়ড চলবে তো। বিষ দাঁত না ভেঙে, কান্না না থামিয়ে এইসব বুনো জংলি দিয়ে তো কাজ হবে না? তিন দিনে এ পাড়ার স্ত্রীলোকেরা ঠিক করে দেবে ওকে। এমন কত কত সতী দেখেছে শশিশেখর, কয়েক দিনেই সব ঢিট্। সব শেয়ালের এক রা।

ততক্ষণে আশায় আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন বিন্দুবাসিনী। কে জানে মেয়ের সঙ্গে তার মা-ও হয়তো আসবে। একবার ঘরে গেলেন, একবার বাইরে এলেন ছাতে গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যতদূর দৃষ্টি চলে। নাতনী ফিরে না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই তাঁর। আর ওদিকে পুরো বেগে জিপ্ চালিয়ে ছুটে আসতে আসতে কেশবানন্দ ভাবলেন, সব ব্যবস্থাই খুব ভালো হ'লো, এখন বুড়িটাকে কোন মতে বিদায় করতে পারলেই হাতের ময়লা ঝাড়তে পারি। মা আর মেয়ের জন্যই ঐ বাহুল্যটাকে ন'দিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হ'লো।

আশ্রমে এসেই দরাজ গলায় ডাক ছাড়লেন, 'কই, মা কই? শীগ্গির চলুন।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন বিন্দুবাসিনী 'কোথায়?'

'আপনার বৌমার কাছে, আর কোথায়। মায়ায় পড়ে বুড়ো বয়সে আমারও কম শাস্তি হয়নি।' প্রশান্তমুখে হাসলেন তিনি।

'বৌমার কাছে?'

'মেয়েকে তো ছাড়লেনই না না খাইয়ে, মাকেও চাই। বুড়ো কর্তা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন নিয়ে আসুন মার যখন মর্জি। আমি ভেবেছিলুম নিজে গিয়ে নেমতন্ন ক'রে সসম্মানে একদিন নিয়ে আসবো, তা আজ না হয় অমনিই আসুন। ভালোই হলো। আপনিও বাড়ি-ঘর লোকজন সব দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হোন। তাছাড়া আর একটা সুবিধের প্রস্তাবও করেছেন সেই ভদ্রলোক। মস্ত বাড়ি তো, উনি বলেন তাঁর গাড়ি রাখার উপরের ঘরটা যদি পছন্দ করেন আপনি তা হলে সেটা উনি ছেড়ে দিতে পারেন বিনা ভাড়ায়।

বিন্দুবাসিনী আর দেরি করলেন না, তাড়াতাড়ি উঠে এলেন গাড়িতে। পেছনে বসতে যাচ্ছিলেন, কেশবানন্দ বললেন, 'সামনেই বসুন না, আবার এক্ষুণি তো নামতে হবে, এসব গাড়িতে নামাওঠায় যে কষ্ট।'

বেলা এগারটার ঝলমলে রোদ্দুরে আবার ছুটলো খাকি রঙের জিপ্। লম্বা

লম্বা রাস্তা পেছনে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললো। কী বিরাট শহর কলকাতা। কী অগণিত জনস্রোত। প্রথমটায় বিন্দুবাসিনী তাঁর নাতনীর মতই হাঁ ক'রে দেখতে লাগলেন, শেষে ক্লান্ত শরীরের পিঠে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রা এলো। আস্তে আস্তে গাড়ি শহরের রাস্তা ছাড়িয়ে লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে চ'লে এলো। আরো অনেক মাইল ডিঙিয়ে ঝোপঝাড় জঙ্গল কত কিছু পেরিয়ে কোনো এক নির্জন প্রান্তরে এসে তারপর মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠলো একটু। হঠাৎ বিন্দুবাসিনীর তন্দ্রাচ্ছন্ন আলগা শরীরে যেন ধাক্কা দিলে কে চলন্ত গাড়ি থেকে অত জোরে ছিটকে প'ড়ে যেতে যেতে বাঁচবার আশায় আকুল আগ্রহে হাত বাড়ালেন তিনি কেশবের দিকে, একটি অস্ফুট প্রার্থনাও ফুটলো হয়তো, কিন্তু বোঁ বোঁ শব্দে মোচড় ফিরে চরম শক্তিতে কোথায় কতদূরে ধুলো উড়িয়ে মিলিয়ে গেল গাড়ি। মস্ত একখণ্ড পাথরের উপর এসে আছড়ে পড়লো তাঁর কাঁচাপাকা চুলে ভরা সুডোল মাথাটি, ভারি শরীর মাটিতে লুটোলো। এক ঝলক কাঁচা রক্ত রঙিন ক'রে দিলে সেই বহুকালের ধূলিধূসরিত তামাটে পাথর। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই বিন্দুবাসিনী কাকে দেখলেন? স্বামীকে? ছেলেকে? সদ্যমৃত নাতনীকে? কাকে? কে? কে এসে দাঁড়ালো তাঁর মৃত্যুশিয়রে? তবে তারা কই? তাঁর বৌমা? উত্তরা? তাঁর বুকের মাণিক, চোখের আলো একমাত্র নাতনী মিলু, মৃণালিনী! কোথায়? কতদূরে! কতদূরে তাদের ফেলে যাচ্ছেন তিনি।

রোদ বাড়লো, তেজ বাড়লো, আকাশের মাঝখান থেকে রঞ্জনরশ্মি ফেললো জ্বলন্ত সূর্য। পাথরের বালিসে মাথা রেখে মাটির বিছানায় শুয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইলো বিন্দুবাসিনীর সুগঠিত সুঠাম দেহ। অনেক, অনেক বেলায়। কত দূরের কোন গ্রাম থেকে একটা নেড়ি কুকুর এসে শুঁকতে লাগলো তাঁকে। আর তারো অনেক পরে, যখন সূর্য পাটে নামলো তখন সারি সারি পিঁপড়েরা বেরিয়ে এলো রক্তের গন্ধ পেয়ে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। দেখতে দেখতে বিন্দুবাসিনীর নাকে মুখে চোখে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো তারা।

(৭)

প্রথম প্রেমের কথা হচ্ছিল। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন কাল রাত্রির সেই হিজ হাইনেস। শুনেই লোকে ভাববে যে, সন্ধ্যার পরে খুব আরামে রেশমী ট্যাপেস্ট্রীর নীল ও সোনালী লতাপাতা আঁকা কাপড়ে মোড়া বৈঠকখানার সোফায় গা এলিয়ে শেরীর গ্লাস হাতে তুলে নিসে আড্ডা হচ্ছিল। রাজা-রাজড়ারা এছাড়া আর কিভাবে প্রথম প্রেমের আলোচনা করতে পারে?

অতএব তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও ঠিক সেই রকম আবহাওয়াতেই এরকম একটা জমাট বিষয় নিয়ে আড্ডা দেবে।

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। শিকারের সাফল্যে আমাদের পার্টির সবারই মন খুব দিলদরিয়া হয়ে গিয়েছিল। নেশা, বিশেষ করে কোন প্রিয় নেশা পরিমাণ মাফিক হলে দিল দরিয়া হয়ে যায়; স্ফূর্তির সাগরে মন লাল ডিঙি চড়ে বেড়ায়, এরকম একটা কথা আছে। কিন্তু অত্যন্ত মামুলি বাঁধাধরা, সাদামাঠা জীবনে লোককে বলতে পারার যে, কোন নেশা থেকেই বঞ্চিত আমি। তাই হায় সেই দরিয়ার পারে দাঁড়িয়ে কত ডিঙি, কত পানসীকেই হেলে দুলে হেসে খেলে ভাসাতে দেখলাম। সমজদার বন্ধুদের দেখে কতবার মনে হয়েছে যে, রসের সায়রে সোনার তরী বেয়ে হেসে খেলে পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু মাঝিকে হেঁকে ডাক দিয়ে বলা হল কই—

সকলি মধুর হেরি থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে।

যাহোক, আমার একটুও আপসোস নেই সেজন্য। বরং একটা বড় সান্ত্বনা আছে। ব্রাউনিং কবির শিষ্য আমি। তিনি বলে গেছেন যে, যা মন থেকে করবে বা খুশি হয়ে নেবে, তাই সার্থক। তাই অনুশোচনা নেই কিছুতেই। কি পাইনি তার হিসাব করে কি হবে? যা পেয়েছি, তাতেই যে মন ভরে রেখেছি।

অন্য একটা দিক দিয়ে দরিয়ার মত দিলের কবি ওমর খৈয়ামও যা পেয়েছেন, তাতেই মন ভরে রেখেছিলেন। তার অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্ত ছিল স্ফূর্তির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এত আশ্বাস তিনি কোথায় পেলেন? তা খুঁজতে গেলে তার একেবারে প্রথম রুবাইটি মনে রাখতে হবে। সে রুবাইটি গোলাপ আর বুলবুল, সাকী আর পেয়ালায় ভরা রুবাইগুলির ভীড়ে আমাদের মন থেকে হারিয়ে গেছে। তিনি প্রথমেই বলেছেন—

যদি গাঁথি নাই মুক্তার হার
তোমার সেবাতে, প্রভু।
অন্তত মোর মুখ হতে
পাপ-ধূলি মুছি নাই কভু॥
সে কারণে আমি তব করুণায়
আশাহীন নই, নই।
কখনো বলিনি ঈশ্বর
দুই হতে পারে এক বই॥

সেই আশায় নিশ্চিন্তমনে ওমর খৈয়াম গেয়েছেন—

ওঠো, আমায় দাও মদিরা, কথার সময় নেই।
রাতের আশা মিটবে তোমার ছোট্ট বদনেই॥
দাও মদিরা গোলাপ গালের আভায় ভরানো।
সেইত প্রায়শ্চিত্ত কোকড়া কেশেই জড়ানো॥

এমনভাবে ইহকালের মধ্যেই সব আনন্দের সন্ধান যে পেয়েছে, পরকালের কথা ভেবে তার মন ভারী হয়ে উঠবে কি করে? তাই তিনি গাইলেনঃ—

বার চেরা-এ-গুল নাসিম-ই-নওরোজ
খুশ্ অস্ত্।
দার জের-এ-চমন রু-এ-দিল ফারোজ
খুশ্ অস্ত্॥
গোলাপের মুখে বসন্ত বায় মধুরে
বহিয়া আনে।
কুঞ্জ ছায়ায় কত মধু হায় প্রেয়সীর বয়ানে॥

আমরাও শিকার থেকে ফিরবার পথে মনে মনে অনুভব করলাম যে, মহুয়ার বনে বসন্ত বায় বইতে শুরু করেছে। ফাল্গুনের প্রথম পরশে মহুয়ার শাখায় শাখায় আগুন জ্বালা জেগে উঠেছে। লালে লাল হয়ে গেছে আকাশের একটু একটু টুকরো এক-এক জায়গায়।

মহুয়াকে রাজস্থানের এ অঞ্চলে কেশোলা বলে। কৈশোরে কলকাতার থিয়েটারে গান শুনেছিলাম, বুনো পাহাড়ী যুবক-যুবতীরা নেচে নেচে গাইছে—

কে দিলো খোঁপাতে মহুয়া ফুল লো।

কে পরালো ফুল, সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উঠেছিল মনে। সে কি সখীরা? না, সখারা? না, অশরীরী প্রকৃতি গাছের ডাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে মাথার খোঁপায় মহুয়ার ডালি উজাড় করে দিয়েছিল?

কৈশোর যায়-যায়, এমন সময় মনে আর প্রশ্ন রইল না কোন। কবির চোখ দিয়ে তার উত্তর দেখতে পেলাম—

প্রিয়ারে যেদিন পাব
ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

আর আজ চারদিকে মহুয়ার মাতাল-করা রঙঝারি যেখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে লাল রঙ সেখান দিয়ে কি শুধু চোখ চেয়ে চলে যাব? আর কিছুই নয়? মনকে এত নাড়া দিচ্ছে যা, তা সাড়া নিশ্চয়ই জাগাবে। অন্তত মনে মনে গুণ গুণ করে

একটা গানের প্রথম কলিও তৈরি করবার চেষ্টা করব। এই যেমন—

কেশোলা পরাব তব কেশে?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাই প্রথম কলিই হল শেষ কলি। পুরানো মোটরের আরো পুরানো টায়ার ফাটল। হিজ হাইনেসের মন এত খুশি ছিল যে, তিনি মোটেই বিরক্ত হলেন না। ড্রাইভার প্রভৃতি লোক যারা সাহায্য করতে পারত, তাদের সবাইকে আগে একটা স্টেশন-ওয়াগানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত করে আমরা পাঁচজন একটা ফুলন্ত কেশোলার তলায় বড় একটা পাথরের ছায়ায় এসে বসলাম।

প্রস্তাবটা এল আমার নিমন্ত্রণ-কর্তার কাছ থেকেই। তিনি বললেন যে, আমি যখন একমাত্র বাইরের লোক, পরদেশী, তখন আমাকেই ঠিক করতে দেওয়া হল যে, এই সময়টুকু কি করে ভালভাবে কাটান যায়।

মনে মনে প্রমাদ গণলাম।

কি বলা যায় এ অবস্থায়? মোল্লার দৌড় থাকে মসজিদ পর্যন্ত। আর বাঙালীর মাত্র আড্ডা পর্যন্ত। তা-ও পাড়াগাঁয়ের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ লোপাট হয়ে যাবার পর ওরকম বা ওর বদলী আর কোন 'ন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়ে ওঠেনি এখনো। পড়ার তাড়া আর মাস্টার মশায়ের শাসানি—তা-ও আজকাল তিনি শাসান না, আমরাই শাসাই—এই দুই দুষমনের হাত এড়িয়ে যে সময়টুকু হাতে থাকত, তা-ও কেটেছে পাশের বাড়ির বিনা ভাড়ার রোয়াকে, না-হয় গলির মোড়ে পাড়ার পাইকারি পার্কে। যে পার্ক একেবারে ন্যাড়া, ঘাসের টিকি-টুকু পর্যন্ত সেখানে গজাতে পারে না।

সেখানে রসাল কোন কিছু গজাবে কোথা থেকে?

আমাদেরই মধ্যে ,, যারা একটু বেশি ওস্তাদ ছিল, তারা খেলেছে তাস-পাশা, দেখেছে সিনেমা-থিয়েটার। অবশ্য বাপের পয়সায়। কিন্তু জমাট প্রাণভরা এমন কিছু তাদের জীবনে ঘটে নি, যা স্মরণ করে এই গাছতলার আড্ডায় নিবেদন করতে পারি। আজই প্রথম বেদনার সঙ্গে অনুভব করলাম যে, আমাদের অবসরের সময়টুকু শুধু হেলায় কাটিয়েছি, খেলায় ভরে তুলি নি, মেলামেশায় রাঙিয়ে তুলি নি।

আমাদের দুর্লভ ছুটিটুকুতে থেকে যায় বড় ফাঁক। ফাঁকি পড়েছি নিজেরাই তাতে।

এদিকে সবাই পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন যে, বাঙালী প্রথায় তারা এ সময়টুকু কাটাতে চান। নতুন একটা স্বাদের আশায় ব্যাঘ্র শিকারীরা উৎসুক হয়ে উঠলেন।

রাও কিষণলাল কানে কানে বললেন —শিগ্‌গীর শুরু করুন যাহোক কিছু। ফ্লাস্কের চা তা না হলে আপনার ভাগে আর কিছু বাকী থাকবে না।

সতৃষ্ণ নয়নে দেখলাম যে, সবাই ফ্লাস্কগুলি খালি করে এনেছে অপেক্ষা করতে করতে। চা যে কত মিষ্টি, তা এই ভর দুপুরে—যখন আমরা চা চাই না—এই প্রথম প্রাণভরে অনুভব করলাম।

চা মিষ্টি—চুমোর চেয়ে মিষ্টি—ঘোষণা করেছিল নিত্যানন্দ নীলকণ্ঠ কেবিনের বিষ গিলতে গিলতে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শেষ চুমুকে তলানিটুকু মেরে দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেটে শেষ ফোঁটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে সে আরো বলেছিল,—এমনকি, প্রথম প্রেমের চেয়েও।

ব্যস্। প্রেরণা পেয়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত এই আড্ডার স্মৃতিই আমার কাজে এল। আমি খুব ভণিতা করে ঘোষণা করলাম যে, প্রত্যেককে তার নিজের জীবনের আদি ও অকৃত্রিম প্রথম প্রেমের কাহিনী বলে যেতে হবে। অল রাইটস্ রিজার্ভড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অর্থাৎ বাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধুর গৃহিণীর কানে তুলে দিতে পারবে না কেহ। কি শুনেছি, তা ভুলে যাব এই মহুয়া তলাতেই।

রাজপুত গালপাট্টার ভিতর থেকে হাসি উপছিয়ে উঠল। হিজ হাইনেস পরম পুলকে বিগলিত হয়ে এই প্রস্তাবের নূতনত্বের তারিফ করলেন।

সবাই মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

কারণ বোধ হয়, সায় না দিলে উপায় ছিল না। কিন্তু আমি আদার ব্যাপারী। জাহাজের খবরে এখন আমার দরকার কি? সে যখন বন পেরিয়ে বন্দরে পেঁছবে, তখন দেখা যাবে। মোট কথা, সবাই খুশি হয়ে সায় দিল। বোধ হয়, রাজাবাহাদুরের সমর্থনের জোর পিছনে না থাকলেও সায় দিত।

এখন কে প্রথম তার মনের মণিকোঠা খুলে বাকী সবাইকে দেখাবে?

প্রেমে পড়ার চেয়ে সেটা স্বীকার করা অনেক বেশি শক্ত।

কিন্তু রাজপুতের পক্ষে নাকি প্রেমে পড়াই সবচেয়ে বেশি শক্ত। প্রেমে পড়েছি, একথা মনে হলেই নাকি রাজপুত সরমে শিহরিয়ে ওঠে। সেটা লজ্জার পুলকে না ঘরণীর ডরে, সেটা বুঝতে চেষ্টা পর্যন্ত করবার ইচ্ছা হয় না তার। সে শুধু ভাবে—ছিঃ, শেষ পর্যন্ত আমিও নাকি?

একথা বললেন ঠাকুর করণসিং। মাথার পাগড়ীটা খুলে মাথায় একটু হাওয়া বুলিয়ে তিনি আমাকেই প্রথম প্রেমের গল্পটা বলতে অনুরোধ করলেন।

বললেন, আমরা, রাজপুতেরা প্রেম করলাম কখন? ঘোড়া চড়তে বলুন, জান দিতে বলুন, গায়ের জোরে অন্য জায়গীরদারের খানিকটা জায়গীর দখল করতে বলুন, তাতে আমরা আছি। এমনকি, পাঁচটা নারীঘটিত বদমায়েসী বলুন, তাতেও আছি। কিন্তু তা বলে প্রেম?

সবাই যেন বেঁচে গেল একথাতে। সবাই হৈ-হৈ করে সায় দিল। ছিঃ, রাজপুতের পক্ষে প্রেম? তার চেয়ে প্রাণ দেওয়াও ভালো।

কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বললাম—উঁহু; তাতে হবে না। এহেন পুরুষ নেই যে, প্রেমে পড়েনি; অন্তত পড়েছে বলে মনে করে নি। আপনাদের পৌরুষে বাধছে না একথা বলতে?

পৌরুষের কথায় হিজ হাইনেস অত্যন্ত বিচলিত হলেন। যেন গোটা রাজস্থানের মান রক্ষার ভার তার ঘাড়ে এসে পড়ল। তিনি বললেন—প্রেম যদি করতে হয় ত—সেই সেবার বড়দিনের সময় ভাইসরয় সাহেবের ঘোড়দৌড়ের জন্য কলকাতায় গিয়ে বুঝেছি যে, বাঙলা মুলুকেই যাওয়া দরকার। যেখানে

মেয়েরা বেণী দুলিয়ে কলেজে যায়, ট্রামে-বাসে একা ঘোরাফেরা করে, এমনকি, সিনেমাতেও একা যেতে ভয় পায় না। রাজস্থানের কোন শহরে কি আপনি মেয়েদের বাইরে দেখেছেন বেড়াতে? এ-মরুভূমিতে ঘাসই গজায় না, তার প্রেম।

আমিও অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। বললাম যে, মেয়েরা রাস্তায় বের হয় না, কিন্তু জানলায় ত আসে বটে। খোলা মুখ দেখা যায় না বটে, কিন্তু ঘোমটার আড়ালে ত দেখা যায়। যাকে ভালো করে দেখিনি, সে-ই বেশি সুন্দর। যে দুধটা দূরে, সেটাই বেশি ঘন। প্রেমের প্রথম ভাগে এই লেখা আছে। একেবারে শাস্ত্রের বচন।

অতএব?

কপট কোপ দেখিয়ে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তা বললেন—অতএব আমরা প্রেম করে থাকি?

যদি না করে থাকেন, তবু বলব যে, করা উচিত ছিল। পর্দার মুলুকে প্রেম—ওঃ, ভাবতেই মনটা আনচান করে ওঠে। বোঝেন না—যত বাধা, ততই রাধা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন বাঁশরীয়ার জন্য।

কিন্তু তিনি সে পথ দিয়ে গেলেনই না। বললেন—ওসব হচ্ছে বাঙালী কবিদের কথা। আমাদের এদেশে মেয়েই দেখা যায় না, তার প্রেম। আমরা তাদের ইজ্জতের জন্য লড়ি বটে, কিন্তু প্রেমে পড়ব তা বলে? সেটা অশাস্ত্রীয়।

এবার হাতে হাতে মেয়ে কোথায় ও কি করে দেখা যায়, সে পথ দেখিয়ে দিলাম।

বললাম—আপনাদের দেশে প্রায় সব জায়গাতেই বড় চমৎকার বিয়ের প্রথা আছে। মনে করে দেখুন—উদয়পুরে বিয়ের যে তোরণ-তোর্‌ণারা প্রথা আছে, সেটার মধ্যে কত সুন্দর সম্ভাবনা আছে প্রেমে পড়বার। আর কি চাই এর পরে?

বিয়ের সময় কনের বাড়িতে তোরণ তৈরি করা হল। দুধারে কাঠের খুঁটি দাঁড় করিয়ে তার মাথায় তৃতীয় খুঁটি বেঁধে একটা ত্রিভুজ (ট্রায়াঙ্গাল) করা হল। না, না, আমি এর মধ্যে কোন 'এটার্নাল ট্রায়াঙ্গালের' সন্ধান এখনি শুরু করছি না। সেটাকে নানা রঙের কাগজ বা রেশমী কাপড় দিয়ে মুড়ে তার চূড়ায় একটি ময়ূরের মূর্তি বসান হল। তারপর তোরণটি এনে সাজান হল কনের বাড়ির ফটকের সামনে। ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করে বর্শা হাতে লড়াই করতে এল বর বীরবেশে। তোরণ ভেঙে তবে অন্তঃপুরে কনেকে লাভ করতে হবে। কিন্তু ওই যে ইংরেজিতে বলে—বীর ছাড়া কেহ সুন্দরীকে পায় না। এখানেও লড়াই করতে হবে বৈকি?

কনের পক্ষের মেয়েরা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে দলে দলে। তারা রক্ষা করবে তোরণ। তাই চরণে বাজছে রুণু ঝুণু নূপুর, রণে আগুয়ান হবার জন্য উৎসাহ দিয়ে। পরনে তাদের রঙের ফোয়ারা ছোটান লেহ্‌ঙ্গা (ঘাগরা), ওড়না, কুর্তি (কোমর পর্যন্ত লম্বা ব্লাউজ), আর চোলি (কাঁচুলি)। মনে মনে ওই ছবি এঁকে নিলেই বসন্তের কোকিল যেন চারদিকে গেয়ে ওঠে।

আর অস্ত্র? সে নানা রকমের অস্ত্র। একেবারে মারাত্মক, কারণ মরমে মেরে দেবার মত সাংঘাতিক। বিশেষ করে পলাশ ফুলের রেণু। মুঠো মুঠো রেণু ছড়িয়ে তারা বরের আগমনকে করে তোলে সুবাসিত, ভরে তোলে মধুরের স্বপ্নে। আর গান গায় কিশোরীরা রূপালি কণ্ঠে সোনালি সুরে।

তোরণ আয়া রহিবর।
থারা রারা কাঁপে রাজ॥
নেগাঁকা নেগ চুকাসা।
তব্ মায় আগ্ আসাঁ॥

তোরণে এসেছে বর, কিন্তু সে রাজাটি ভয়ে থর থর কাঁপছে। আমাদের যার যা পাওনা আছে, তা সব মিটিয়ে দিয়েছে। তবেই ত আমরা এগিয়ে এসেছি। অর্থাৎ, গানে গানে সখীরা বুঝিয়ে দিল যে, তাদেরই জয় হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত চারদিকে হৈ-হল্লা ও স্ফূর্তির ফোয়ারার মধ্যে তোরণ ভাঙা হয়ে গেলে মেয়েরা বরের পথ ছেড়ে দেয়।

এই বিয়ের প্রথা উল্লেখ করে বললাম—এবার বলুন ত, ইয়োর হাইনেস, এই রকম সুন্দর একটা প্রথার মধ্যে প্রেমে পড়বার কত সুযোগ রয়েছে। অবশ্য আজকাল এতটা হয় না। তবু যা হয়, তা-ই বা কম কি?

কম, বড়ই কম, মশায়। শুধু ওদের দেখেই প্রেমে পড়ে যাব, এত দুর্বল আমরা রাজপুতেরা নই। বিশেষ করে যখন তোরণ-তোর্‌ণার গানে অনেক সময় দুরকম মানে থাকে ভিতরে ভিতরে।

বিশ্বাস করতে পারলাম না। আপনাদের রাণী পদ্মিনীর সখীদের বর্ণনাতে কবি বলেছিলেন যে, ওদের

তারা রক্ষা করবে তোরণ

কারো বিলোল কটাক্ষের আঘাত পেলে লোকে ছুরিকাহত হয়।

জা সউ' বেই হেরহি' চখু নারী।
বাঁকা নয়ন জনু হর্নাহি' কটারী॥* ,

রাজোয়ারার যেটুকু আমি দেখেছি, তাতেই বুঝেছি যে, সে কথা মোটেই মিছে নয়।

হেসে বলে উঠলেন আমার নিমন্ত্রণ-কর্তা যে, আমি যখন এতই প্রেমে পড়ার পথের, এমনকি, অলি-গলিরও সন্ধান পেয়েছি, তখন আমিই ওদের এখন গল্প শুনিয়ে দিলে ঠিক হয়। তবে সেটা প্রথম প্রেমের গল্প হওয়া চাই এবং গল্প হলেও সত্যি হওয়া চাই।

বলে তিনি বিশেষ আত্মপ্রসাদ বোধ করে গোঁফে একটু ভাল করে চাড়া দিলেন। তাঁর অনুচররা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে দেরি করলেন না। সকলেই চেপে ধরলেন

---

* চারশ বছর আগেকার হিন্দী; পদ্মিনীর কাহিনী। মনে হয় যেন বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী পড়ছি—লেখক।

যে, আমাকেই একটি প্রথম প্রেমের গল্প বলতে হবে।

ভেবে দেখলাম যে, ওদের প্রস্তাবটা অসঙ্গত নয় মোটেই। আমি ওদের অতিথি, পুরোপুরিভাবে ওরা অতিথি-সৎকার করেছেন, মায় শিকার পার্টি পর্যন্ত। আমার ত তার বদলে অন্তত এটুকু করা উচিত।

বিশেষ করে যখন ওরা বাঙালীকে প্রেম সম্বন্ধে স্পেশ্যালিষ্ট বলে মনে করে।

তবে রফা হল যে অন্য কোন লোকের প্রথম প্রেম হলেও চলবে। শুধু জীবন্ত জ্বলন্ত প্রেম হওয়া চাই।

শুনুন তবে। একেবারে জলজ্যান্ত সত্য ঘটনা। এক যে ছিল রাজপুত্র।

আপনাদের 'লেগ পুল' করছি বা ঠাট্টা করছি মনে করতে পারেন কিন্তু আমি আপনাদের যার প্রথম প্রেমের গল্প বলব তার নামটা আপাতত গোপন রাখছি। এই রাজপুত্রটির পাঁচ বছর বয়সে বিয়ের 'এনগেজমেণ্ট' হয়। তিনি সে সময় তার খুড়ো অন্য এক রাজার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে দু-পক্ষেরই বাপ-মায়েরা বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে ফেললেন। সম্পর্কে খুড়ো; তার মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যে রাজা রাজরাদের মধ্যে অচল নয় সে ত আপনারা জানেন।

তার পর ভাবী বর আর ভাবী বধূতে দেখা সাক্ষাৎ নেই। হবার কথাও নয়। তার উপর রাজপুত্রের সিংহাসন আবার বড় টলমলে। বাপও এদিকে মারা গিয়েছে আর চারদিকে বড় গোলমাল, বড় অনিশ্চয়তা। পাঁচ বছর বয়সের বিয়ের কাছে এ অবস্থায় আর কি প্রেম আশা করা যায়?

রাজপুত্রের এদিকে বয়স হল সতের। রাজকন্যাও পঞ্চদশ বসন্তের এক গাছি মালা হয়ে ফুটে উঠেছে। কন্যাকেই যেচে আসতে হল বরের বাড়ী যদিও শাস্ত্রে বলে যে মেয়েরা জন্মেছে বিয়ের প্রস্তাবের বাণী শুনতে, শোনাতে নয়। কিন্তু কি করা যায়? দিনকাল খারাপ। অভিসারে যখন এল না তার বর, উপযাচিকা হয়েই এলেন বাগ্‌দত্তা প্রেমিকা তার কাছে।

বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটল না। অন্তত তার খুসবুই ছড়াল না বরের চারদিকে। বরের মনে হতে লাগল যে কনের উপর টান আছে কিন্তু তার প্রতি মন নেই। টান আছে কিন্তু মন নেই এ কেমন কথা? কিন্তু সত্যি তাই। ভালো লাগে কিন্তু ভালবাসা জাগে না।

এ কি লজ্জা না সাহসের অভাব তা রাজপুত্র নিজেই বুঝতে পারে না। প্রথম প্রথম দশ পনের বা কুড়ি দিন পরে পরে দুজনে দেখা হয়। পরে অদর্শনের ব্যবধান আরো বেড়ে গেল। (ইতিমধ্যে রাজপুত্র নিজেই রাজা হয়ে রাজ্যভার নিজের মাথায় নিয়েছে) রাজমাতা ত খেপে আগুন। ছেলের লজ্জা বেড়ে যাচ্ছে আর টান কমে যাচ্ছে দেখে ছেলেকে চৌদ্দ-পুরুষের মত ভূত ছাড়িয়ে জোর করে বৌএর কাছে পাঠাতে লাগলেন। তাও মাসে দেড় মাসে একবার। যেন চোর চলেছে জেলখানায়। বাসরে দোসর নয়।

এমন সময় তার জীবনে এল বাবুরী সাধারণ ঘরের সন্তান, সামান্য তার ব্যক্তিত্ব। লোকে তাকে পথের ধারে দেখে ঘেটু ফুলের মত উপেক্ষা করে চলে যাবে। কিন্তু রাজার জীবনে সে চম্পা চামেলীর রূপ রস সুবাস নিয়ে এসে দাঁড়াল।

আশ্চর্য ব্যাপার। প্রথম দর্শনের পরেই রাজা ফিরে এসে নিজের ডায়েরীতে কবিতায় লিখলেন।—আমি অদ্ভুত আসক্ত হয়েছি এর প্রতি। শুধু তাই নয়। সত্য কথা বলতে কি আমি এর জন্য পাগল দিশেহারা হয়ে গেছি।(গ)

এর আগে তিনি ঘরে পঞ্চদশী রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার জন্য 'প্যাসন' অনুভব করেন নি। এমন কি প্রেম বা কামনা প্রকাশ কেমন করে করতে হয় তা শোনেন নি বা দেখেন নি। সত্যি কথা বলতে কি তার নিজের জীবনে এত চাঞ্চল্য ও অশান্তি চলছিল যে এদিকে মনও ছিল না। কিন্তু এখন তিনি নিজেই কবিতায় হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করে ফেললেন। লিখলেনঃ—

পাগল হইনু প্রেমাবেশে,
মতি স্থির না রহিল হায়।
মধুর মুখানি ভালবেসে
কে জানে পড়িব এ দশায়॥(ঘ)

একদিন বাবুরী তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে যাকে এত ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন তার মুখের দিকে লজ্জায় সোজা তাকাতে পর্যন্ত পারছেন না। এ অবস্থায় কেমন করে আর তাকে খোস-গল্পে আলাপে খুসী করবেন বা নিজের মাতাল-করা প্রেমের কথা খুলে জানাবেন? মনের ভিতরটা এত এলোমেলো হয়ে গেল, আনন্দ এত মাতিয়ে দিল তাকে যে রাজা তাকে তার কাছে আসার জন্য ধন্যবাদ-টুকু পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

না পারলেন সে চলে যাবার সময় একটু অভিমান বা অনুযোগ করতে।

চলে যাবার পর তার মন হাহাকারে ভরে গেল যে তার রাঙা অতিথিকে এতটুকু ভদ্রতা দেখিয়ে, এতটুকু অভ্যর্থনা করে তার ঘরে চরণ দুখানি পাতবার জন্য আবাহন করতে পর্যন্ত পারেন নি। মন তার এতটুকু পর্যন্ত নিজের বশে ছিল না। রাঙা অতিথি চলে গেল তার মনকে রাঙিয়ে!

রাজা ঘরে ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন। এই ভাবনাই তার একটা কবিতায়—হ্যাঁ তিনি যখনি মনের আবেগ অসহ্য হয়ে উঠত তখনি দু চার লাইন কবিতা রচনা করে নিজের মনের ভার হাল্কা করে নিতেন—ফুটে উঠল—

ভালবেসে এত দুঃখী, এত আত্মহারা,
এত তুচ্ছ হয়নি ক' কেহ মোর পারা॥
কারো প্রিয়া যেন ওগো তোমার মতন।
উদাসীনা নাহি হয় অথবা নিঠুরা॥

একদিন তিনি কয়েকজন পারিষদের সঙ্গে একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাবুরী তার চোখের সামনে পড়ে গেল। এমনভাবে মুখোমুখী হয়ে রাজার মনের এমন অবস্থা হল যেন তিনি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। তার চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না। না পারলেন মুখের একটা সামান্য কথা প্রকাশ করতে। মাথার ভিতর কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল। সরমে জড়িত চরণে নিজে সরে গেলেন সেখান থেকে। ফারসী কবি মহম্মদ সালির কবিতা স্মরণ করলেন তিনিঃ—

প্রিয়ারে হেরিলে সরমে মরিয়া যাই।
বন্ধুরা সবে চাহে মোর পানে,
আন পানে আমি চাই॥(ঙ)

ভাবলেন যে তার নিজের অবস্থার সঙ্গে এই কবিতার বর্ণনা হুবহু খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

'প্যাসন' এই ইংরেজী কথাটাই ব্যবহার করছি কারণ আমাদের কোন দেশী ভাষায় এই কথাটার সমস্ত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় বলে জানি না। তার কারণ সম্ভবত এই যে আমরা প্রেম করি, কামোন্মাদনাও অনুভব করি, কিন্তু প্যাসনে যে রক্তাক্ত আধো আলো আধো আঁধারি পাগল করা ভালবাসার অনুভব আছে তা প্রকাশ করার কোন পথ নেই আমাদের ক্ষীণরক্ত (এ্যানিমিক) সভ্য ভব্য সামাজিক জীবনে। আর সংসারে যা প্রকাশ করা অশোভন সাহিত্যে তাকে বিকাশ করবার ভাষা কোথায়?

যাক্ সে কথা।

প্যাসনের উল্লাসে যৌবনের উচ্ছ্বাসে রাজপ্রাসাদ ও রাজপোষাক ছেড়ে রাজা পথে পথে, কুঞ্জবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বন্ধুবান্ধব ও রাজকার্যে রইল না মনোযোগ; না রইল নিজের প্রতি অন্যদের অবহেলার জন্য কোন অনুযোগ।

অথচ সে সব কথাই তিনি বুঝতেন। এমন নয় যে প্রেমে পাগল হয়ে তিনি পৃথিবী থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন। একদিন নিজের ডায়েরীতে তিনি একটি গজল লিখেছিলেন,—

গোলাপের কুঁড়ি মোর হিয়া,
দলগুলি মাথা রক্তধারে;
হাজার বসন্ত পরশিয়া
ফুটাইতে পারিবে কি তারে?(চ)

মাঝে মাঝে পাগলের মত একা পাহাড়ে চড়ে, মরুভূমিতে ঢুকে ঘুরে বেড়াতেন। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরে বেড়ানর নেশা তাকে পেয়ে বসল। অথচ বাবুরীর সন্ধানে নয়। এমনি। শুধু এমনি।

একদিন ডায়েরীতে তিনি লিখলেন—

যেতে নাহি পারি, অথবা রহিতে নারি;
এ কি দশা হায়
করেছ আমায়,
হে হৃদয়, আমারি।(ছ)

বিকেল গড়িয়ে এল। মহুয়ার মাতাল-করা রঙ যেন এই রাজারই প্রেমের নেশার প্রতিচ্ছবি হয়ে আকাশে ফুটে রইল। সে নেশার আমেজ, সে রঙের ছোঁয়া সবারই মনে।

হিজ হাইনেস মাথা থেকে পাগড়ীটা নামিয়ে রেখেছেন ততক্ষণে। আমি একটু চায়ের রসে মন দিলাম। চায়ের সোনালী রঙেও যেন একটু নেশার ছোপ পড়েছে।

সবাই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন—তারপর কি হল? তার-পর কি হল?

একজন শুধালেন—এতই যদি প্রেম, রাজা তাকে বিয়ে করলেন না কেন? না হয় ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করে মাথা ঠিক

করে তার সঙ্গে একটু ভাল করে, সাংসারিক হিসাবে প্রেম করলেও এরকম দেওয়ানা ভাবটা কেটে যেত।

রাও কিষণলালজী একটা মহুয়ার ফুলন্ত শাখার দিকে চোখ রেখে দার্শনিকের মত বলে উঠলেন—এহি হ্যায় দুনিয়া। আচ্ছা, মাশাহ্, তার পর কি হল বলুন এবার।

মাশাহ্ অর্থাৎ মহাশয়।

তার পর আর কি হবে? রাজার জীবন থেকে বাবুরী মুছে গেল। শুধু ডায়েরীতে অক্ষয় অক্ষরে এই সোনার কাহিনী—যতখানি আমি এখানে আপনাদের কাছে বললাম হুবহু ঠিক ততখানি—জ্বল জ্বলে ভাষায় তিনি লিখে রাখলেন। আর কিই বা করতে পারেন?

কেন? বেচারা বাবুরী রাজবংশের নয় বলে কি এতই তাকে তাচ্ছিল্য করতে হবে যে তাকে বিয়েও করা চলবে না? একেবারে ভুলে যেতে হবে?

বললাম যে ঠিক তা নয়। রাজা তাকে কখনো ভোলেন নি। এই প্রেম হঠাৎ ধূমকেতুর মত তার জীবনে উদয় হয়েছিল; উল্কার মত তার আকাশ থেকে সরে গেল অলক্ষিতে। কিন্তু পাঁচ বছর পরে রাজা একটু নতুন হাতের লেখার ষ্টাইল তৈরী করে তার নাম দিয়েছিলেন বাবুরী ছাঁদের লেখা।

কিন্তু তাকে বিয়ে করলেন না কেন? কেমন হিম্মৎ সে রাজার যে এত দেওয়ানা হয়ে যায় তবু বিয়ে করতে পারে না।

খুব গম্ভীরভাবে বললাম—সেটা সম্ভব ছিল না। বাবুরী ছিল পুরুষ।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সবাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। কেহ কিছু আর বলতে পারলেন না।

খানিক পরে আমার নিমন্ত্রণকর্তাই প্রশ্ন করলেন—বলুন ত কোন্ রাজা এরকম অদ্ভুত প্রেম করেছিলেন। তাকে নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারব। অবশ্য আপনার যদি মানা থাকে তাহলে বলবেন না। তবে পাহাড় মরুভূমি এসব জায়গার কথা যখন বলছেন আমাদের রাজস্থানেরই কেহ হবে বোধ হয়।

না। রাজস্থানের রাজা নয়। এ-কালের কোন রাজাও নয়। মধ্য এশিয়ায় তুর্কী-স্থানে ফরগণার চাখ্তাই তুর্কী রাজা বাবরের কাহিনী এটা। আজ থেকে সাড়ে চারশ বছর আগেকার ঘটনা। প্রাচীন তুর্কী রক্তের উন্মাদনা আধুনিকতম কাব্যের রোম্যান্সের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলে নিজের হাতে বাবর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন।

বাঃ। আপনি দেখছি রাজস্থানে এসে তার দুষমনেরই গল্প করে গেলেন—প্রতিবাদ করে বললেন তিনি।

স্বীকার করলাম সে কথা। এ-কথাও বললাম যে রাজস্থানে এসে তার দুশমনদের কথাই সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে। ভাবছি যে কেন রাজস্থান হিন্দু-স্থানের ইতিহাস পালটে দিতে পারল না। এই বাবরকে হারাতে পারলেই রাজপুতেরা অন্যরকমের ইতিহাস তৈরী করতে পারত। আমাদের নিজেকে যাচাই করা উচিত শত্রুর চোখ দিয়ে।

যে যুগে, যে দেশে, যে সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব নীচে ও ছোট, বিয়ে ছিল একটা সাংসারিক দরকার বা রাজনীতিক সুবিধা আর প্রেম ছিল শুধু একটা অপ্রয়োজনীয় বিলাস বা বড় জোর পৌরুষের পরিচয় মাত্র সে সময়কার পরিবেশে এই কাহিনীকে যাচাই করে দেখতে হবে। অস্বাভাবিক বলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে এর কাব্যসৌন্দর্যকে উপেক্ষা করা হবে।

এ যুগে অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা ডোরিয়ান গ্রের ছবি বইখানাতে পুরুষের প্রতি পুরুষের আকর্ষণের কাহিনী আছে। কিন্তু এ দুই কাহিনীর তুলনা করলে হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, অসি হাতে যার জীবন কেটেছে, তার মসীকে অতুলনীয় বলতে হবে।

অসি দিয়ে তিনি রচনা করলেন ইতিহাস, আর মসী দিয়ে কাব্য।*

(ক্রমশঃ

---

* ফারসী ও তুর্কী কবিতার ধ্বনি-লালিত্য যে কতখানি আর এই ভাষা দুটি না জানলেও পদগুলি যে কত মিষ্টি লাগে তা এই রুবাইগুলির মূল পদ থেকে বেশ বুঝা যায়—লেখক।

(ক)
গর্ গহরে তা তাৎ নফস্তাম হরগিজ্।
গরদ গুণাহ আজ চেহরে নেরফতম্ হরগিজ।
ব: ইন্ হামা নোমিদ্ নীম্ অস্ কর্মাৎ।
জান্ রুখে ইয়াকেরা দো নগুফতম্
হর্গিজ।

(খ)
বর্ ঘেজ বা বাদাহ্ চে জায় সকুনস্ত্।
কাম শব দহেন্ তনক তু রোজিয়ে মনস্ত্।
মারা চু রুখ খেশ ম্যয় গুল গুণ দহ্।
কীং তোবা-এ-মন্ চু জুল্ফে তু
পুরশ্কনস্ত্।

(গ)
মন বা ওয়া গরিব দৈল পয়দা করদম্।
বল্কে বাগ্যে খুদ্রা জার ও শেয়াদা
করদম্।

(ঘ)
আশিক-উল গচ্ বে খুদ ওয়ো দিওয়ানা
বেয়ল্দম্ বেল্গান্।
কীম পারি রুখসারা ইশাকিয়া বু
তাবর্মেশ্ খোয়াস।

(ঙ)
শোম্ শর্মিন্দা হর্ কেইয়ার্ খুদ্রা দর
নজর্ বিনম্।
রফিকান সুয়েমন্ বিনন্দ মন্ সুয়ে
দিগর্ বিনম্।

(চ)
মাপনীক কাউন কলোম কেহ্ গুল নেক
গুন্চে সিবেক্ খান্দন্।
অগর্ য়োজামিনিক বাহার ওপ্সা ওহিম্
নিয়াগি নে ইমকান্ দোস্।

(ছ)
নী বার দর্গাব কুয়াতাম বার্ নি তু
রা রাগে তাবেদ্।
বে জানিন্ বু হালত গেহ্ সিন কল্লাহ্
নবাক্ গ্রিফ্তারিয়ে কো মলুল্।
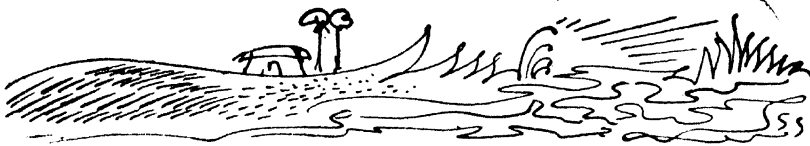
ত্রিশ

কিশোরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন অহিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে মিথ্যাকে আশ্রয় করে যারা একাজ করতে চায় তারা ভারতবর্ষের সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে; ভারতবর্ষ তার নির্দিষ্ট পথে চলেছে; ...ষ্ট গতির পথে নয়—তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ গতির পথে। পরমপুণ্যের পথে। সেই পথ থেকে তারা ভারতবর্ষকে ভ্রষ্ট করতে চায়। এই কারণেই এদের সঙ্গে আমার বিরোধ। আমি যাব এই জন্যেই যাব। তোমার 'না' কথাটা আমার কানে আজ নিষ্ক্রিয়তা বলেই মনে হচ্ছে। আমি যাব।

কথাটা বললেন গৌরীকান্তকে।

বিজয় একটি সভা আহ্বান করেছে। এখানকার জমির মালিক এবং ভাগজোতদার ও কৃষাণদের নিয়ে সভা। জমির ধানের ভাগ সম্পর্কে একটি নতুন বিধান তৈরী করার জন্য এ সভার আয়োজন। দেশের সকলেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। অনেক দিন থেকেই আসছে। আলোচনাও হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই নিয়ে কপিলদেবেরা মামুদের দলকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে প্রায় লাঠালাঠির পথে। দু তিন জায়গায় লাঠিবাজী হয়েও গিয়েছে। তারা একটা খোলা মাঠকে যৌথ-খামার ঘোষণা ক'রে সেইখানে ধান তুলবার ব্যবস্থা করেছে। এতদিন পর্যন্ত জমির মালিক যেখানে স্বগ্রামবাসী সেখানে ধান তোলার নিয়ম মালিকের খামারে। মালিক ভিন্ন গ্রামবাসী হলে ধান ভাগদারের খামারেই ওঠে, ধান মাড়াইয়ের সময় মালিক বা তার লোক এসে উপস্থিত থাকে, মাড়াই শেষ হ'লে নিয়ম মত ধান ভাগ ক'রে বাড়ি নিয়ে যায়। গোড়াতেই সেই প্রথা বাতিল ক'রে এই সাজার খামার প্রবর্তনের মূলে কপিলদেবদের উদ্দেশ্যটি গূঢ়। এখানকার চাষীরা নবীন হালদার এবং তার মত মণ্ডলের দল এই ধরণের জোরজবরদস্তির পথকে ন্যায়সংগত মনে করে না, পাপ হবে ব'লে মনে করে বলে—মামুদদের সাহায্যে তাদের ক্ষেতের ধান এই খামারে টেনে আনতে চায়। এই খামারে ধান আনতে পারলে তাদের আর এদের সংগে যোগ না দিয়ে উপায় থাকবে না।

বুদ্ধিটা প্রদ্যোতের। যৌথ-খামার কথাটা অবশ্য কপিলদেবের। মামুদ জন-দশেক অনুগত চাষীকে দলে এনেছে। তারা ওই দু সীমানার জমি চাষীর দল। অন্য চাষীদের তারাই বলেছে ধান এই সাজার খামারে তুলতে হবে। নিজের ঘরেই হোক আর মালিকের ঘরেই হোক ধান তোলা হবে না।

সাধারণ চাষীরা নিরীহ মানুষ—তারা অনিয়ম এবং তাদের নিজের বুদ্ধি ও বোধমত পাপকে যত ভয় করে তার থেকে এই মামুদের দলকে কম ভয় করে না। বেশী ভয়ই করে। পাপ করলে যম-দূত ভয়ংকর মূর্তিতে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য আসে মৃত্যুর পর এরা তার আগেই লাঠি নিয়ে তাদের থেকেও ভীষণতর মূর্তিতে এসে দাঁড়ায়। তারা দিনগত পাপক্ষয় পন্থায় উপস্থিত পাপ বিদায় করবার জন্যই বলেছিল—সবাইকে বল বাপু, সবাই যা করবে আমরাও তাই করব।

ধান কাটা পর্যন্ত এইভাবেই কেটেছে।

ধান তোলার সময় বিপদটা বেধেছে। মামুদেরা এসে ধান বোঝাই গাড়ির সামনে দাঁড়ায়। বলে—ঘোরাও গাড়ি। নিয়ে চল সাজার-খামারে।

তাদের রক্ত চক্ষু উগ্র মূর্তির সম্মুখে এরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মিনতি করে, হাতজোড় করে, কাঁদে। মামুদেরা হাসে। অভয়ও দেয়, বলে—তুর এত ডর কেনেরে বাপু?

ডর কেন এবং কতটা, সে এরা ঠিক বুঝতে পারে না।

তবু কিছু বুঝায়—বলে—এরপর আমাকে আর জমি দেবে না। জমি ছাড়িয়ে নেবে।

—কার সাধ্যি? এ জমি তোর। জমি তার কিসের? আমরা রইলাম। কে জমির মাথায় আসে দেখে নিব। লাঠির ঘায়ে খেদায়ে দিব।

তা মামুদেরা পারে। সে ওরা মিথ্যে জোর করেনি। চাষীরা সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু—। চাষীরা কাতর কণ্ঠে বলে—নালিশ করবে যে। তখন কি করব?

—দেশশুদ্ধ চাষী যদি এই করে, তবে নালিশ ক'রে করবে কি? ওরে হারামী—এ হ'ল নয়া জমানার ডিগ্রী! এ রদ করে কে? সরকার বরবাদ হবে। উল্টে যাবে। নতুন দুনিয়া।

এ পর্যন্ত মাত্র নয়া জমানা আর নূতন দুনিয়া এই একার্থবোধক কথা দুটোকে বাদ দিয়ে দুপক্ষের বোঝাপড়া স্পষ্ট। কিন্তু এর পরই চাষী তাকায় উপরের দিকে। সেটা মামদুরা বুঝতেও পারে না, উত্তর দিতেও পারে না। চাষীও বুঝতে পারে না—এ পদ্ধতিটা ধর্মসম্মত হয় কি ক'রে? সে অসহায়ভাবে উপরের দিকে তাকায়। আকাশের নীল এই অবোধদের কাছে শূন্য মণ্ডল নয়—ও নীলিমা তাদের কাছে একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ লোক। অন্ধবিশ্বাসে সে লোকের মধ্য থেকে একটা শাসনের ইংগিতও যেন তারা অনুভব করে। এবং

দুই লোকের দুই দণ্ডদাতার উদ্যত দণ্ডের নিচে দাঁড়িয়ে কাঁপে।

এরই মধ্যে ইহলোকের দণ্ডদাতাদের উদ্যত দণ্ডের তাড়নায় গরু দুটো মোড় ফিরে সাজার খামারের দিকে চলতে থাকে।

এমনিই চলেছিল দিন কয়েক। চার পাঁচ দিন। চার পাঁচ দিনে থান কুড়ি বাইশ গাড়ি বোঝাই ধান খামারে এসে উঠেছিল। কিন্তু তার পরই চাষীরা জোট পাকিয়ে দল বাঁধলে এ কি জবরদস্তি!

ধানের বেশী ভাগ তারা চায় না এমন কথা তারা বলছে না। তারা চায় নিশ্চয় চায়। কিন্তু এভাবে তারা চায় না। কখনও চায় না। কেন তোমরা এমন জবরদস্তি করবে? তারাও দল বেঁধে মামুদের দলের সামনে দাঁড়াল। কথা কাটাকাটি তকরারে মাঠ মুখরিত হয়ে উঠল। তারপর ঠেলা-ঠেলি। এরই মধ্যে মামুদের দলের লোকেরা গাড়ির উপরে উঠে ধান বাঁধা বাঁশের রশি কেটে বা খুলে ধান ফেলে দিয়ে লুঠ করে নিয়ে পালাল। তারপর রাত্রে ধান তুলে নিয়ে যাওয়া শুরু হল। নবীন হালদারের একখানা জমির ধান রাত্রে কেটে নিয়ে গেল।

ঠিক তার পরের দিন নবীনের সঙ্গে মামদুদের লাঠালাঠি হয়ে গেল। নবীনের মাথা ফেটে গেল। নবীনের সঙ্গে সেদিন তার ভাগের জমির মালিক রমণ মিত্র ও কয়েকজন লোক নিয়ে এসেছিল—রমণের কান মলে ঘাড়ে ধরে মাঠের উপর নাকে খত দেওয়ানোর জন্যই লাঠালাঠির সূত্রপাত হয়েছিল। নবীনকে নবগ্রামের হাস-পাতালে এনেছিল, সে তখন অজ্ঞান। প্রায় ছ' সাত ঘণ্টা পর জ্ঞান হ'ল। কিশোরবাবু তার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে দেখে নবীনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বললে—এর বিধান করুন দাদা-বাবু। নইলে পিথিমীতে ধর্ম থাকবে না।

কিশোরবাবুর সঙ্গে তার অনেক কালের পরিচয়। অনেক অন্তরঙ্গতা। দুর্ভিক্ষের মধ্যে কিশোর দাদাবাবু চালের বস্তা ঘাড়ে নিয়ে কাপড়ের বোঝা নিয়ে তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। মহামারীতে ডাক্তার সঙ্গে ক'রে ওষুদের বাক্স পথ্যের সামগ্রী নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। তেরশো আঠারো বাইশ আটাশ উনত্রিশ এমন কি এই উনপঞ্চাশের ঝড় এবং বন্যায় গ্রাম ভেসে গেলে কিশোর দাদাবাবু ভেলায় চড়ে এসে
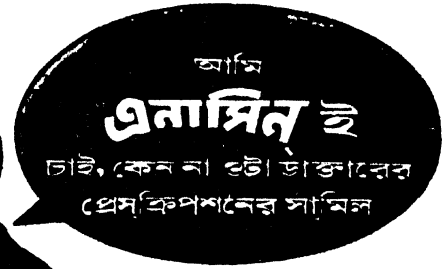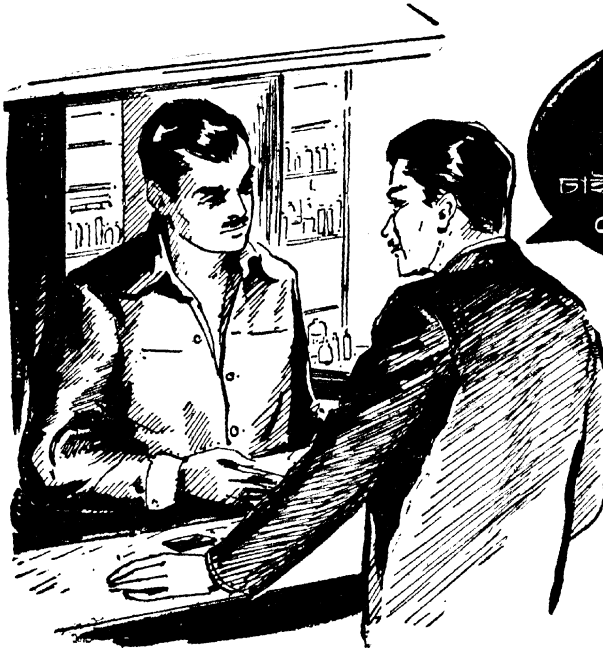
তাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। নবীনের জীবনে বার তিনেক ঘর পুড়েছে। তার মধ্যে দুবার কিশোর দাদাবাবু এসে হাজির হয়েছেন ছেলের দল নিয়ে বালতী হাতে। জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির দাবীর বিরুদ্ধে যে ধর্মঘট হয়েছিল—তার ঘট পেতেছিলেন ওই কিশোর দাদাবাবু। তাঁকে দেখে নবীন আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে পৃথিবীতে ধর্ম বিলুপ্তির আশঙ্কা জানিয়ে নিবেদন করলে তাকে তুমি রাখ।

কপিলদেব খবরটা শুনে ঘৃণার হাসি হাসলে।

ধর্মরক্ষার জন্য কিশোরবাবুর ব্যাকুল হয়ে ওঠার কথাই বটে। অথর্ব চলচ্ছক্তিহীনতার স্বভাব নিয়মই হ'ল—সেই পুরাতন ধর্মকে জীর্ণ নিয়মকে আঁকড়ে ধরে থাকা। ওটা গেলে নতুন ধর্ম এলে সে ধারণ দণ্ড অভাবে মাটিতে পড়বে লুটিয়ে। ধর্ম! কতকগুলো অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের নাম ধর্ম! দুর্বল ভীরু! কাপুরুষের দল! বৈশাখের অপরাহ্নে যে নিয়মে ঝড় আসে অনিয়ম নিয়ে—ভাঙার অভিযান নিয়ে সেই নিয়মে সে এসেছে অনিয়ম নিয়ে। আবার ভেঙে চুরে সেই দেবে বর্ষণ। নতুন সৃষ্টি হবে। সেই তো নতুন দুনিয়া নয়া জমানা! সত্য-অহিংসা! মূর্খের দল! অর্থহীন ভাববিলাসিতা! এতকাল যুগযুগান্তর ধরে জোঁকের মত এই সব মানুষের বুকে বসে রক্ত শোষণ করে তাদের রক্তহীন বিবর্ণ করে তুলেছে সেই জোঁকেদের বুকে পা দিয়ে সেই রক্ত নিঃশেষে বের ক'রে নেওয়ার মধ্যে হিংসার পাপ দেখছ? যে নেকড়ের দল যুগ যুগ ধরে এদের রক্ত মাংস ছিঁড়ে খেয়ে এদের পরিণত করেছে কঙ্কালের দলে—তাদের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার মধ্যে দেখছ হিংস্রতা! মূর্খ এরা মূর্খ!

বিপ্লব কেমন করে আসে তা জানে না। কোন আঙ্কিক নিয়মে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের পদ্ধতিতে ঘটনার পর ঘটনা বিন্যাসের সুকৌশলে কার্য করে কারণ সৃষ্টি করে ঘাতে প্রতিঘাতে তাকে কেমন করে ত্বরান্বিত করতে হয় সে তোমাদের বোধগম্য নয়। তোমরা মূর্খ! তোমরা মূর্খ!

ঘটনা বিন্যাসে ত্বরান্বিত হয়েছে ঘটনার গতি। তার অভিপ্রায়ের পথেই ছুটেছে সে! তার রুখু চুলগুলো শীতের অপরাহ্নের বাতাসে এলোমেলো হয়ে উড়ছিল।

কিন্তু প্রাণের উল্লাসে সে দিকে তার লক্ষ্য দেবার অবকাশ ছিল না। মনে মনে তার কবিতা গুঞ্জন করে উঠল। নূতন যুগের বিপ্লবী কবির বহ্নিজ্বালাময়ী কবিতা।

"বিপ্লবী উত্তাপ আজ ভারতের তৃষ্ণার্ত মাটিতে
প্রচণ্ড শব্দে সে আজ চাহিছে ফাটিতে।"

ফাটবে। কঠিন শপথে আজ মানুষ দৃঢ় মুষ্টি বেঁধে উঠে দাঁড়াবে। সেই মানুষরা ফাটবে; লড়বে।

"এই ভারতের ক্ষেতে ও খামারে
পথে ঘাটে কলে কারখানায়
মজুর কিষাণ ছেলে ও মেয়ের
গড়বো ফৌজ
লাল ফৌজ
ভরোশিলভের লাল ফৌজ
মাও সে তুংয়ের লাল ফৌজ
আসছে সনের নভেম্বরে
বাংলা বানাবো তেলেঙ্গানা
বাংলা বানাবো চীনেরও বাড়া
বাংলা বানাবো লেনিনগ্রাদ!"

সে এবার স্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! তার ধমনীতে উষ্ণরক্তস্রোত বইছে। দক্ষিণে উত্তরে পূর্বে পশ্চিমে ছোট ছোট মুক্ত অঞ্চলের সৃষ্টি হবে। সেখান থেকে চলবে জনগণের মুক্তিযুদ্ধ। তারাই লাল ফৌজ! গেরিলা বাহিনী!

প্রদ্যোত সচকিত হয়ে তার দিকে তাকালে। হেসেই প্রশ্ন করলে—কি হ'ল? হঠাৎ লড়াইয়ে ঘোড়ার মত চিঁহি চিঁহি রবে চীৎকার করে উঠলেন যে!

কপিলদেব খপ ক'রে তার কাঁধের উপর থাবা বসিয়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল—প্রদ্যোতবাবু। আপনাকে আমি ভেঙে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব।

ভয় পেলে প্রদ্যোত। সে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিলে—বললে—কাঁধটা ছাড়ুন। কপিলদেবের এমন মূর্তি সে দেখে নাই। চতুর কৌশলী মানুষকে সে ভয় পায় না। কিন্তু এমন ভাবোন্মত্ত রুদ্রমূর্তি সে সইতে পারে না। বুদ্ধিমান মানুষের কাছে নিজের প্রাণটাই সবচেয়ে বড়—সবার আগে। রুদ্রের কাছে নিজের প্রাণটা তুচ্ছ তাই পরের প্রাণ নিতে পারে সে এক মুহূর্তে।

কপিলদেব তার দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে—তারপর ডাকলে—মামুদ সাহেব!

মামুদ আজ একটু চিন্তিত। ব্যাপারটা সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে। নবীন বুড়া যদি মরে যায়, তবে কাণ্ডটা হবে অতি বিশ্রী কাণ্ড! খুনের মামলায় পড়তে হবে। এতেই দাঙ্গা আর লুঠের মামলা আসবে। তাতে পার আছে। খুনের মামলা সে বিশবাঁও জল; আশ্বিনের ঝড়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা' বলে—তাই। এক এক সময় ইচ্ছে হচ্ছে কপিলদেবের মাথায় বসায় আর এক লাঠি! কিন্তু কপিলদেবকে ছুঁতে তার ভয় লাগে। আদমীটার ভিতরে একটা তেজ আছে। আর আছে তার কোমরে একটা পিস্তল। সেটা কপিলদেব তাকে দেখিয়েছে। তাই ভরসা হয় না।

কপিলদেব আবার ডাকলে—শুনছেন মামুদ সাহেব!

—হাঁ। বলেন।

—ভয় পেয়েছেন না কি?

—তা খানিকটা পেলাম বই কি গো। মামলা হবে তো। নবীনটা মরে গেলে তো ঘোর ফ্যাসাদ।

—আর তো ভয় পেয়ে ফল নাই মামুদ সাহেব। তবে মামলা হলে—মামলা চালাবার জন্যে ভয় করবেন না। সে সব ঠিক চলবে। কিন্তু তার আগে যদি এখানকার লোকদের আমরা বাগে আনতে পারি, তবে মামলাতেও কিচ্ছু হবে না।

—সে কি করে আনব বলুন?

—হিম্মতে। জোরে। একা নবীনের মাথা ফেটেছে। এখন হয়তো দশজন বিশজন তড়পাচ্ছে। দুটো তিনটে পাঁচটার ফাটলে ভয়ে সব চুপ ক'রে যাবে। যাবে না?

—না।—

—তাই ঠিক। আজ রাত্রে তারই নোটিশ দিয়ে আসুন।
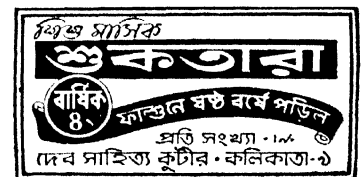
—নোটিশ? চমকে উঠল মামুদ।

—হ্যাঁ। নবীনের বাড়িতে খামারে আগুন দিয়ে দিন। দুপুর রাতে। অন্ধকারে রাত্রে আগুনে লেখা নোটিশ।

স্তম্ভিত হয়ে মামুদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ আদমীটা কি? সয়তান? না রুস্তম? ডর নাই?

কপিলদেব বললে—আর রমণ মিত্তিরের ঘরে।

প্রদ্যোতও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে-ও ভয় পেয়ে গিয়েছে। এ কি আগুন নিয়ে খেলা সে খেলেছে। নিরীহ নিস্তেজ মামের বাতির মত ভেবে যাকে নিয়ে সে খেলা করেছে—কখনও ফু দিয়ে নিভিয়েছে খন দেশলাই জেবলে আবার জেবলেছে ই নিরীহ বাতি যেন মশাল হয়ে জবলে ঠল! সে সভয়ে বললে—না-না-না পিলদেববাবু। কাজ নেই।

হেসে উঠল কপিলদেব নিষ্ঠুর হাসি।

মামুদ দৃঢ় স্বরে বললে—আপনি ংগে যাবা?

—হাঁ। নিশ্চয় যাব।

—বেশ। তা হলে কথা রইল—ঠিক দুপুরের শিয়াল ডাকার পর মাঠে আমি দাঁড়ায়ে থাকব। গাঁয়ের ধারে দাঁড়ায়ে থাকবেন। আমি ইশারা দিব।

রাত্রে আগুন লাগল।

নবীনের ঘরে নয়। নবীনের প্রতিবেশীর ঘরে। সে ঘরে লাগলে নবীনের ঘর বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। বাঁচলও না।

কপিলদেবের অনুমান মিথ্যা হল না। চকিত হয়ে উঠল অঞ্চলটা। শুধু তাই নয়—ওদিকে হাসপাতালে নবীন মারা গেল। পুলিশ এসে মামুদকে বা তার সংগীদের খুঁজে পেলে না।

প্রদ্যোতের ওখানে এল পুলিশ—কপিলদেববাবু কোথায়?

—তিনি তো এখানে থাকেন না।

—থাকেন না? এখানেই তো ছিলেন কাল পর্যন্ত।

—না। কাল সন্ধ্যেবেলা চলে গিয়েছেন। এখানে থাকেন না। মধ্যে মধ্যে আসেন আবার চলে যান।

—কোথায় গেছেন?

—তাঁর দেশে গেছেন বোধহয়। বাড়িতে মায়ের অসুখ। খবর পেয়ে চলে গেছেন। যাবার সময় আমি বাড়ি ছিলাম না। আমি গিয়েছিলাম হাসপাতাল নবীনকে দেখতে। এসে দেখলাম এই চিঠি। তিনি চলে গেছেন।

চিঠিখানা ফেলে দিলে প্রদ্যোত।

দারোগা চিঠিখানা পড়লে—"প্রিয় প্রদ্যোতবাবু, এই মাত্র ছোট ভাই এসেছিল। দেশে মায়ের খুব অসুখ। আমি রওনা হলাম। সেখানে সেবা করবার লোক নাই শুনে রমা দেবী ধরে বসলেন—আমার সংগে যাবেন। আমি ভেবে চিন্তে তাঁকে সংগে নিয়েই চললাম। মা বহুকাল আমাকে বিয়ে করতে বলে দুঃখ পেয়েছে তিনি যদি নাই বাঁচেন, তবে রমাকে দে যাবেন। ইতি কপিলদেব।"

—কোথায় তাঁর দেশ?

—ঠিক তো বলতে পারব না। পাকিস্থান, বোধহয় খুলনায়।

প্রদ্যোত হাসপাতালে গিয়েছিল আ দিন সন্ধ্যায় সে কথা পুলিশ জা দারোগার সংগে দেখা হয়েছিল তার।

দারোগা মামুদের দলের একজ পেয়েছিল। নবীনের সংগে লাইনে দিন সে কিন্তু তাদের সংগে ছিল না। প্রমাণ আছে। তবুও তাকেই গ্রেপ্তার ক নিয়ে গেল।

এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই বিজয় ডেকেছে। কিশোরবাবুকে ধরেছে আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

গৌরীকান্তকেও বলেছিল বিজ কিন্তু গৌরীকান্ত বলেছে—তুই না যদি গুণী সভা ডাকত বিজয় তা হ আমি যেতাম। কপিলদেবরা আমা ডাকতে এসেছিল—আমি যাইনি। ডাকলেও আমি যাব না। কিশোরবাবু টানিস নে।

কিশোরবাবু উত্তেজিতভাবে উঠলেন—না। আমি যাব। হিংসাকে দিয়ে মিথ্যাকে আশ্রয় করে যারা এ করছে তারা ভারতবর্ষের সাধনার বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। আমি যাব বাধা

(ক্র

সমাগম কবিতা

অনাদি চক্রবর্তী

মাঘের কুণ্ঠার শেষে শীতজীর্ণ নির্জন সন্ধ্যার
অবসাদ দীর্ণ করে, যেন কোনো অলকানন্দার
নৃত্যের অনিত্য তালে হাওয়া আসে। রজনীগন্ধার
সুরভি সঞ্চয় যায় টুটে। দূর করবীর বন
উতল অস্থির, তাই আকাশে আলোর উজ্জীবন।
বুকের গহন গৃহে মায়াক্ষুব্ধ নূতন যৌবন
কী আবেগে ওঠে মেতে! রবি শশী নক্ষত্রের দেশে
বাস্তুহারা প্রাণস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে মরে নিরুদ্দেশে,
কোথায় সে ইন্দ্রধনু মরীচিকা—নীলিমার শেষে?

সে বুঝি কোথাও নেই, তবু আমি আঁকি ছবি তার
তাহারি অশ্রুত ছন্দে সুর বাঁধি মোর কবিতার।
করুণ অরুণ বর্ণ ময়ূখমেখলা সবিতার
স্বপ্নের সকল মায়া-ঝিলমিল দুলালে সমীরে
তারোপর, চৈত্রশ্রান্ত দূর সরসীর তীরে
সে ছায়া পাবে না দেহ! —অন্ধকার জোনাকির ভীড়ে
এখন দাঁড়িয়ে আছে। সেই চাওয়া কবিতার সাথে
কখন যে মিশে গেছে!—অবাধ্য দুরাশা তাই মাতে

আর কিছু নয় সখি, হাতখানি তুমি রেখো হাতে॥

চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীশঙ্কর আয়োজিত শিশুচিত্র প্রদর্শনী

গাছ—গীটা ফার্থ (৮), বৃটেন

রঙ, কালি, পেন্সিল প্রভৃতি দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে খেলার ছলে যার জন্ম, তার মূলে উৎসই হচ্ছে কল্পনা-প্রবণ শিশুমনের খেয়াল খুশী থেকে, বড়রা তাকে সাধারণত অবহেলার চোখেই দেখতে অভ্যস্ত. ভবিষ্যতের শিল্পী, বিজ্ঞানী বা আরও অন্য কিছু স্রষ্টার পরিণত মন এই খেলার আঁচড়ের মধ্যে যে লুকিয়ে থাকতে পারে কিছুদিন আগে পর্যন্তও এ কেউ ভাবতে পারেনি। কিন্তু আজ শিশু মনস্তত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন যে, এই আঁচড় বা দাগকাটা শুধু খেলাই নয় ভবিষ্যত মানুষ তৈরিতে এর হাত অনেকখানি. তাই আজ দেশে বিদেশে সকলেরই দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। শিশু-শিল্প নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হচ্ছে। শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তাই শিল্পচর্চাকে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয়েছে। কোনরূপ শিল্পশিক্ষা গ্রহণ না করে তারা অনায়াসে মনের কথাকে ভাঙা চোরা ভাবে রঙ ও রেখায় রূপ দিতে পারে। শিশুরা কখনও খেলার ছলে অঙ্কিত এই চিত্রগুলিই এমন এক রূপ-জগতের সন্ধান দেয় যে আশ্চর্য হতে হয়।

এমনই পঁয়ত্রিশটি দেশবিদেশের এক আন্তর্জাতিক শিশুচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন গত কএক বৎসর শ্রীশঙ্কর করে আসছেন। বিরাট ও মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। শিশুচিত্র প্রদর্শনীর এমন এক বিরাট আয়োজন আর কোনও দেশে হয় বলে জানিনে। শ্রীশঙ্করের এই প্রচেষ্টা তাই সকলের কাছেই ধন্যবাদার্হ ও প্রণি-ধানযোগ্য। এই সঙ্গে প্রকাশিত শিশুচিত্র কবিতা ও লেখার একটি বিরাট ও মনোজ্ঞ চিত্রপঞ্জীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীটি দিল্লীতে হয়ে যাবার পর সম্প্রতি কলকাতায় যাদুঘরে খোলা হয়েছিল। স্বীকার করতেই হবে, দ্রষ্টব্যের

বেলুন বিক্রেতা—কবিতা চক্রবর্তী (৬), কলিকাতা

উল্লম্ফন—ডেনিস এক্‌শ (১০), বৃটেন

সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। যাদুঘরের বিরাট ও দীর্ঘ দ্বিতল বারান্দাটি প্রায় দেড় সহস্র রচনায় অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত মনে হয়েছে, যেন তিলার্ধ স্থানও নেই। চিত্রসংখ্যার বাহুল্যে দর্শককে একটু বিব্রতই বোধ করতে হয়। পাখীর চোখ নিয়ে খুঁজে বেড়ালেও বহু ভাল ছবির সন্ধান মেলাও

পার্কে—বীরা সেনগুপ্ত (৬), কলিকাতা

সহজ নয়। তাছাড়া সবদিক দিয়ে বিচার করলে একাধিক রচনা বয়সের অনুপাতে যেন আরও পাকা হাতের কাজ বলেই ধারণা হয়। শিশুমনের ছাপই যদি ছবিতে না থাকে তবে ভাল হলেও নির্বিচারে সেই চিত্র বাদ দেওয়াই উচিত। এইভাবে অপ্রয়োজনীয় ছবি বাদ দিয়ে প্রদর্শনীটিকে অনেক মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় করার সুযোগ ছিল। তাছাড়া প্রদর্শিত চিত্রাবলীর সংখ্যা অনুযায়ী ছবি এবং শিল্পীর নামের একটি তালিকা না থাকায় দর্শককে আরও বিব্রত হতে হয়েছে। স্বভাবতই দর্শক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চায় শিল্পী এবং তার রচনার নাম। কিন্তু সে রকম কোনও ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করেননি। ভবিষ্যতে এ তিনটি দিকে বিশেষ ভাবে উদ্যোক্তারা দৃষ্টি দেবেন এই আশাই করি।

প্রদর্শনীটি দেখতে দেখতে এমনই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় যে বহু ভাল ছবি দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এ কথার আগেই উল্লেখ করেছি. তবু দেখতে দেখতে আলোর ফুলকির মত একান্তভাবে যে ক'একটি রচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নিম্নে তার মাত্র ক'একটির উল্লেখ করা গেল। পুতুল (১০০৭—মালয়), পোলো খেলোয়াড় (১০৩৫—আর্জেন-টিনা), মা ও ছেলে (১০০৬—ভারতবর্ষ), পার্ক-এ (১১৯৭—ভারতবর্ষ), খরগোস (১১২৮—ইউনাইটেড স্টেটস্), বিড়াল (১০৮৫—বৃটেন), গাছ (১২৫১—বৃটেন), রাখাল বালক (১১১১—ফিনল্যাণ্ড), বাইরের সন্ধানে (১২৫৯—জাপান) একটি দৃশ্য (১২৯২—তুরস্ক), স্কুলের পথে (১৩৯০—চেকোশ্লোভাকিয়া) ঘোড় সোয়ারের দল (১৩৯১—হাঙ্গেরী), ঘোড়া (১৬২৬—বৃটেন) বলখেলা (১৬৩৮—ইউনাইটেড স্টেটস্), শুয়োর (২২৩৯—যুগোশ্লাভিয়া), মেলার নৃত্য (১৯১৫—হাঙ্গেরী), নৃত্যরতা মেয়েরা (২৪৩৬—হাঙ্গেরী), দৃশ্যচিত্র (২১৬১—চেকো-শ্লোভাকিয়া), পুতুল (১৮০৭—জাপান) ট্রাম-বাসের টিকিট কেটে একটি পাখির মনোজ্ঞ রচনা (১৮৭০—বৃটেন) মেলা (২১০৯—ভারতবর্ষ), কাপড় কে...

মা—নমিতা চক্রবর্তী (৪), কলিকাতা

সূর্যমুখী ফুলের অনবদ্য একটি রচনা (২৪৩১—জাপান)।

এ ছাড়াও একাধিক রচনা বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে শিশুমনের ছাপ খুব কম পেয়েছি না তা রীতিমত পরিণত হাতের কাজ বলেই মনে হয়েছে। তাই সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ছবি কেনা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

লরেন্স বিনিয়ন্-এর সঙ্গে কি সূত্রে যে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, তা এখন আর আমার মনে পড়ছে না। তবে তাঁর কাছে ঘন ঘন আসা-যাওয়ায় বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

বিনিয়ন্-এর বেশ প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ। ঠোঁট দুটোয় একটু মজা ছিল। তাতে সর্বদাই একটু মৃদু হাসি লেগে থাকতো। সে-হাসি যেন জানান্ দিতে চায়, মানুষের বেকুবির আর অন্ত নেই।

লরেন্স বিনিয়ন্-এর সরকারী কাজ একটা ছিল। বৃটিশ মিউসিয়ম্-এ প্রাচ্য-দেশের যে সব ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ আছে, স সবের হেফাজত করা। তিনি সেই ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কীপার্। তাঁর বেসরকারী কাজ, কবিতা লেখা আর আর্টের বই ছাপানো।

বিনিয়ন্ ছেলে বয়েস থেকেই কবিতা লিখ্ছেন। বলেছিলেন, সেকালে তাঁদের একটা ক্লাব ছিল। তার নাম রাইমারস্ ক্লাব। অর্থাৎ পদ্য লিখ্ড়েদের আড্ডা। লণ্ডনের ফ্লীট্ স্ট্রীটের চেশার চীজ্ বলে বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় সেই আড্ডা বসত। পূর্বকালে ডক্টর জনসন্ তাঁর শিষ্য-বর্গ নিয়ে এইখানেই আড্ডা জমাতেন।

ক্লাবের তেরো জন মেম্বর ছিলেন। কিন্তু সব ক'জনের নাম শুনিনি। শুনলেও ভুলে গেছি। এই দলে তখনকার দিনের অনেক কবি ছিলেন, যাঁদের নাম এখনকার দিনের খুব কম লোকেই জানে।

এই গ্রুপ্-এর লাইয়োনেল জন্সন্, স্টীফেন ফিলিপ্স্, আরনেস্ট ডাওসন্, আরনেস্ট রীস্, জন্ ডেভিড্সন্, আর্থার সিমনস্—এঁদের কাব্য কে আর পড়ে? দুচারটে টুকরো-টাকরা কোনো কাব্য-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায় মাত্র।

কিন্তু আমাদের কিছু পূর্ববর্তীদের মধ্যে তখন যাঁদেরই ইংরিজি কাব্যে একটা দখল ছিল, তাঁদের মুখে মুখে ফিরতো ডাওসন্-এর সায়নারা, ডেভিড্-সন্-এর হলিডে, স্টীফন্ ফিলিপ্স্-এর মারপেসা ইত্যাদি। শুনে শুনে আমাদেরও অন্তত কম দুচার লাইন করে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

এঁদের অনেকেই জীবনের উপর বিতৃষ্ণ হয়ে মদভাঙ্গ খেয়েই হোক্ আর আত্মহত্যা করেই হোক, অল্প বয়েসেই জীবন শেষ করেছিলেন। বেঁচে থাকলে তাঁদের হাত দিয়ে যে কবিতা বেরতো, তাতে ইংরিজি কাব্য অনেকটা পরিপুষ্ট হতে পারত, সেটা অনুমান করতে কোনোই কষ্ট হয় না।

যাঁরা এই ঘোর হতাশার হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে বেরোতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম্ বাট্লার্ ইয়েটস্-এর নাম সবাই জানেন। তাঁর লেখা ইনিসফ্রি কবিতাটি কে না একাধিকবার পড়েছেন? যতদিন ইংরিজি ভাষা জীবিত থাকবে, ততোদিন সুর আর কথার অপূর্ব সমাবেশে লেখা এই লিরিক ইংরিজি কাব্যরসিকদের মনে আনন্দ সঞ্চার করে যাবে।

আরনেস্ট রীস্ কবিতা লেখার চেয়ে কাব্য সমালোচনা আর কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনায় ঢের বেশি কেরামতি দেখিয়েছেন। আর্থার সিমন্স্-এরও কবিতার চেয়ে সাহিত্য সমালোচনা আরো অনেক উপাদেয়। লরেন্স বিনিয়ন্-এর কবিতা অনেকের ভালো লাগলেও আমার কাছে কি রকম যেন পান্সে পান্সে বলে ঠেকে। কাঠা-মোটা বেশ ছিমছাম পরিপাটি। টেক্নিকও উঁচু দরের, তবু কিন্তু তার মধ্যে যেন প্রাণের সাড়া নেই। আসল কথা, বিনিয়ন্ মন দিয়ে কবিতা লিখেছেন, প্রাণ দিয়ে নয়। তাঁর আর্টের উপর বইগুলো অনেক বেশি মনোজ্ঞ।

এই দলে এককালে এক বাঙালী কবিও ছিলেন। তিনি মনোমোহন ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দের বড় ভাই। লরেন্স বিনিয়ন্ বলতেন, মনোমোহন সত্যিকারের কবি। জীবিকা উপায়ের জন্যে তাঁকে চাকরি নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হ'ল—এইটেই তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী।

আরো বলতেন, দীর্ঘকাল এদেশে না থাকায়, তিনি ইংরিজি কবিতার ভাষা ভুলতে বসেছিলেন। আর ওদিকে বাংলা ভাষা না জানার দরুণ, তাঁর অত বড় কাব্যশক্তি মাতৃভাষাতেও প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলেন না। কথাটা অনেকটা সত্যি বলে মনে হয়। ইংল্যাণ্ড থেকে দূরে থেকে ইংরিজি গদ্য একরকম ভদ্রভাবে লেখা যেতে পারে, কিন্তু ইংরিজি পদ্য কিছুতেই আর জুতসই হয় না। কারণ ওদেশের কাব্যজগতে কথার মূল্য শেয়ার-মার্কেটের মত ক্রমাগতই উঠছে পড়ছে।

মনোমোহন ঘোষ আমাদের প্রেসি-ডেন্সী কলেজে শেলী, ব্রাউনিং আর সুইন্বার্নের কাব্যের পাঠ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মনে হ'ত বটে কবিতা পড়ছি। তাতে এগজামিন পাশের বড় সুবিধে হয় নি; কিন্তু যা রস পাওয়া গিয়েছিল তার আনন্দে এখনো মন ভরপুর।

মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ির খুব কাছেই এলিয়ট্ রোডে থাকতেন। মাঝে মাঝে এক এক সন্ধ্যায় হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়তেন। তারপর ঠিক মুডে থাকলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরিজি কাব্য আলোচনা করে চলতেন। খাওয়া-দাওয়ার হুঁশ থাকত না।

রাইমার্স ক্লাবের মুরুব্বি গোছের ছিলেন, অস্কার ওয়াইল্ড। ক্লাবের মেম্বরদের উপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব। অস্কার ওয়াইল্ড যে বড় দরের কবি, তা নয়। তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলো আরো উঁচু স্তরের। কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর এই সব অর্বাচীন ভক্ত শিষ্যদের একটা অ্যাটিচিয়ুড্ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সে ভঙ্গীটার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। মোদ্দা কথা এইটুকু বলা যেতে পারে যে, সে অ্যাটিচিয়ুড সকলের সহ্য হয়নি।

অস্কার ওয়াইল্ডের উপস্থিত বুদ্ধি আর চট্ করে পাল্টা জবাব শুনিয়ে দেবার ক্ষমতার সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প শুনলুম। লেডী স্ট্যান্লী সেকালের লণ্ডনের এক বিখ্যাত হোস্টেস্। সার্

হেন্‌রী স্ট্যান্‌লীর স্ত্রী। সেই হেন্‌রী স্ট্যান্‌লী, যিনি আ্যাফ্‌রিকার ঘোর অন্ধকার বনজঙ্গল থেকে লিভিংস্টোন্‌কে খুঁজে বের করেছিলেন।

লেডী স্ট্যান্‌লী নিজেও জ্ঞানী গুণী আর তাঁর বাড়িতে জ্ঞানীগুণীদের বিশেষ সমাদর। লণ্ডনের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের সদাসর্বদাই তাঁর বাড়িতে নেমতন্ন। এর উপর লেডী স্ট্যান্‌লী নিজে আর্টিস্টও ছিলেন। তাঁর আঁকা ফার্স্ট অফেন্‌ডার ছবিটা এখন বোধ হয় ন্যাশনাল গ্যালারীতে স্থান পেয়েছে।

অস্‌কার ওয়াইল্ড তখন ইংরিজি লেখকসমাজে একটা কেষ্ট-বিষ্টু। একটা দিক্‌পাল বল্‌লেই চলে। একদিন স্ট্যান্‌লীদের বাড়িতে তাঁর ডিনারে নেমতন্ন হয়েছে। সময় বয়ে যায়, কিন্তু অস্‌কার ওয়াইল্ডের আর দেখা নেই। আটটা গেল, সাড়ে আটটা গেল, ন'টা বাজে বাজে। খিদেয় সকলের পেট চুঁইচুঁই করছে। শেষে আর থাকতে না পেরে, সবাই ডিনার টেবিলে বসে পড়লেন।

খাওয়া চলেছে, এমন সময় হেল্‌তে দুল্‌তে পরম নির্বিকার চিত্তে অস্‌কার ওয়াইল্ড এসে ডাইনিং রুমে প্রবেশ করলেন। মেয়েদের যেমন কাণ্ড আর কি?

সোজাসুজি খেতে বসিয়ে না দিয়ে, লেডী স্ট্যান্‌লী দেরির জন্যে অস্‌কার ওয়াইল্ডকে তাঁইস করতে শুরু করে দিলেন।

অস্‌কার ওয়াইল্ড চারিদিক চেয়ে একটু হেসে জবাব দিলেন, লেডী স্ট্যান্‌লী ম্যাডাম, ঘড়ি দেখে কি কেউ সূর্যের গতি নির্ণয় করে? না, সূর্যের গতি দেখে ঘড়ি ঠিক করে? জবাব শুনে তো ঘরসুদ্দু লোক একেবারে থ! লেডী স্ট্যান্‌লীর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না।

একদিন বিনিয়ন্‌ আমাকে লাঞ্চে ডেকেছেন। বৃটিশ মিউসিয়ম্‌-এর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটা আলাদা ছোট দোতলা বাড়িতে তখন বিনিয়ন্‌-এর বাসস্থান। খানিকটা আগেই গিয়েছিলুম। বিনিয়ন্‌-এর মুখে কথাবার্তা শোনবার জন্যে। বিনিয়ন্‌ বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যেটুকু বলেন, তার সবটাই সারবস্তু।

একথা-সেকথার পর আলাপটা ইণ্ডিয়ান আর্টের উপর গিয়ে পড়ল। সম্প্রতি বিনিয়ন্‌ আমাদের মুকুল দে-র কপি-করা অজন্তা আর বাঘগুহার ক'খানা ছবি বৃটিশ মিউসিয়ম্‌-এর জন্যে কিনেছেন। মুকুলচন্দ্র সেই সবে লণ্ডন শহরে গিয়ে পৌঁছিয়েছেন।

বিনিয়ন্‌ বললেন—তোমাদের প্রাচীন আর্টিস্টদের কি চোখ! যা দেখতেন, তা আর কস্মিনকালে ভুলতেন না। তারপর তাই হুবহু দেওয়ালে এঁকে গেছেন। হাত কি! ওই অন্ধকার গুহার মধ্যে বসে মশাল জ্বালিয়ে দিনের পর দিন এঁকে গেছেন। কোথাও একটুকুও হাত কাঁপেনি। কোথাও একটুকুও লাইন বাঁকেনি, কোনো ভুল-চুক নেই। আর রং-এরই বা কি সূক্ষ্ম জ্ঞান। কটাই বা রং ব্যবহার করেছেন? কিন্তু কোথাও কোনোটা বেমানান হয়নি।

এই বলে বিনিয়ন্‌ থেমে গেলেন। আমি কিছুই বলছিনে, তিনি নিজেই কথা বলে যাচ্ছেন দেখে, তাঁর যেন একটু লজ্জিত ভাব। আমি তবুও মুখ খুললাম না। সে যে অতি গভীর জল। সেখানে কি ধরাছোঁয়া দিতে আছে? সেখানে মুখ খুললে যে নাকানি-চোবানি খেতে হবে। সংস্কৃত বচনটাও মনে ছিল—কারুর কারুর ততক্ষণই শোভাবর্ধন হয় যতক্ষণ না তিনি মুখ খোলেন। আমি বিজ্ঞের ভাণ করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে রইলুম। বিনিয়ন্‌-এর মুখে সেই মৃদু হাসি।

খানিক পরে বিনিয়ন্‌ নিজেই বলে গেলেন—রাজপুত ছবিতে, মোগল ছবিতে এমন কি তোমাদের ফোক্‌-আর্টেও বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোথাও ছাড়াছাড়ি নেই। প্রাচীনকালের মতন আকারে বড় না হলেও আর তার বৈচিত্র্য না থাকলেও, এগুলো লাইফ্‌ থেকেই নেওয়া। কিন্তু তোমাদের এখনকার আর্টিস্টদের দেখি, কেমন যেন লাইফ্‌ থেকে ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। লাইফ্‌ এর ত্রিসীমানায় তাঁরা ঘেঁসতে চান না।

আমি আর নিজেকে চাপতে পারলুম না। নিতান্ত বোকার মতন বলে উঠলুম—জীবনটাকে আপনারা ইয়োরোপীয়ান্‌রা এমন একান্তভাবে আঁকড়িয়ে আছেন যে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যেতে আমাদের কেমন লজ্জা বোধ হয়। তাই আমাদের এখনকার আর্টিস্টরা পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক সাব্‌জেক্ট নিয়ে সন্তুষ্ট আছেন। তাঁদের ভয়, আপনাদের আর্টিস্টদের মত লাইফ্‌ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলেই আপনারা বলে বসবেন ওটা চুরিবিদ্যে। দেখুন না কেন, গুরুদেব যখন ইংরিজিতে গীতাঞ্জলি প্রকাশ করলেন, তখন আপনাদেরই কোনো কোনো ক্রিটিকরা বলে উঠলেন, ওঁর ভাবটা বাইবেল থেকে নেওয়া, আর ভাবটা ক্রীশ্চান মিশনারীদের কাছ থেকে পাওয়া।

বিনিয়ন্‌-এর মুখে আবার সেই হাসি। ক্রিটিকদের কথা ভেবে? না আমারই বেকুবি দেখে?

আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় দরজায় টোকা মেরে এক দাসী এসে ঘরে ঢুকল। ভিতরে এসে জানাল, দুটি বিদেশি ভদ্রলোক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাঁরা মাস্টার-এর সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না। নাম একটা বলেছিলেন বটে কিন্তু সেটা ঠিকভাবে উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মাস্টার যেন তাকে সেইজন্য ক্ষমা করেন।

বিনিয়ন্-এর মুখে তখনো সেই হাসি। হুকুম দিলেন, ভদ্রলোকদের ভিতরে নিয়ে এস।

ঘরে প্রবেশ করল দুজন ভারতবর্ষীয় ছোকরা। বাঙালী নয়, হিন্দুস্থানী। একজনের বগলে একটা কাপড়ে বাঁধানো কার্ড-বোর্ডের পোর্টফোলিও। অন্যজন সেটাকে খপ করে ছিনিয়ে নিয়ে, সামনের একটা টেবিলের উপর রেখে বললে—আমরা শুনেছি, আপনি নাকি বৃটিশ মিউসিয়ম্-এর তরফ থেকে ভারতীয় ছবি কেনেন? আমরা ক'খানা ছবি আপনার কাছে বিক্রির জন্যে এনেছি।

পোর্টফোলিওটা যার বগলে ছিল, সে ছোকরা এবার বললে—ওগুলো আমাদের দেশ থেকে সোজা এদেশে আনা। মোটমাট ছ'খানা আছে। এক-একটার জন্যে দশ পাউণ্ড করে দাম চাই কিন্তু। খুব ভালো জিনিস সার্। ঠিক এরকমটা আর কোথাও পাবেন না সার্, বলে দিচ্ছি। এই বলে, ছবি ক'খানা পোর্ট-ফোলিও থেকে বের করে বিনিয়ন্-এর মুখের সামনে এনে ধরল।

বিনিয়ন্ ছবিগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। মুখে শুধু সেই হাসি।

রকম দেখে, ছোকরারা ভাবলে বুঝি বিনিয়ন্ দর কষাকষির তালে আছেন। যে জন গোড়ায় কথা শুরু করেছিল সে বললে—আচ্ছা, দশ পাউন্ড যদি নাও দেন, [illegible] পাউন্ড করে তো দেবেন? বিনিয়ন্ তখনো কথা বলেন না।

দ্বিতীয় ছোকরা বলে উঠল—আচ্ছা [illegible]ত পাউন্ড? না? পাঁচ পাউন্ড? [illegible]ও না? আচ্ছা, শেষ কথা; তিন পাউন্ড করেই দেবেন। আর কমাতে [illegible]রব না কিন্তু স্যর্। বিনিয়ন্ তবুও [illegible]প। কিছুই বললেন না। তাঁর চোখ [illegible]টো তখন প্রায় বুজে এসেছে। মুখের [illegible]সি আরো কিছুটা পরিস্ফুট।

ছবিগুলো পোর্টফোলিওতে আবার [illegible]তে ভরতে ছোকরাদের একজন কটু [illegible] বলে বসল—আপনাদের বৃটিশ [illegible]উসিয়ম্ ফ্রিটিশ মিউসিয়ম্ সবই [illegible]খছি ভুয়ো ব্যাপার। বিনিয়ন্ তাও [illegible]রব। কোনো প্রতিবাদ করলেন না। কেবল একটু এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টার বড়িতে একটা টিপ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই দাসী এসে হাজির। বিনিয়ন্ তাকে বললেন—ভদ্রলোকদের বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।

লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল। খাবার তৈরি। খাবার টেবিলে বসে বিনিয়ন্-এর মুখ খুলল। খেতে খেতে বললেন—আশ্চর্য ভালো কপি!

আমি বললুম—কপি?

বিনিয়ন্ বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি খুব ভালো কপি।

তারপর ধীরে ধীরে বিনিয়ন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন—হালের কাগজ, নতুন রং, তুলির অত্যন্ত সাবধানী টান। এগুলোর থেকে কি করে কপি বলে ধরা যায়, শেষে তার লক্ষণগুলোও একে একে বলে দিলেন। আমি হতভম্ব হয়ে শুনে গেলুম।

বিনিয়ন্ বললেন—কপি করা ছবিকে পুরোনো ছবি বলে চালানোর এক রীতিমত বড়ো ব্যবসা আছে। সে কি ইয়রোপে আর কি এশিয়ায়, সর্বত্র। যাঁরা চিনতে পারেন না, তাঁরা লোকসান দিয়ে শেষে হাত কামড়িয়ে মরেন।

তার পর দিন সকাল বেলা।

একটা কি রেফারেন্স খোঁজবার দরকার পড়ায়, বৃটিশ মিউসিয়ম্-এ যেতে হয়েছিল। ফেরবার পথেই পড়ে গ্রেট্ রাস্‌ল্ স্ট্রীট। সেখানে এক সেকেন্ড-হ্যান্ড বই-এর দোকান। দোকানের মালিক লেভি বলে এক জাত-জু। দোকানটা ছোট হলেও, লেভির ব্যবসাবুদ্ধি বেশ টনটনে। চারদিকে তার চার চোখ। তাই অনেক ভালো ভালো বই-পত্তর ছবি-ছাটা লেভি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে পারত। অন্যের সঙ্গে কি করত জানি নে; কিন্তু আমার উপর দিয়ে এক হাত বাণিজ্য করে নেবার ফন্দি লেভির কখনো ছিল না। ভালো কিছু দোকানে এলে আমাকে খবর দিত। কিনতে চাইলে, ন্যায্য মূল্যেই ছাড়ত।

আমাকে আসতে দেখেই লেভি বলল—গুড্ মর্নিং সার্! আজকে কতকগুলো ছবি আসবার কথা আছে। একটু দাঁড়িয়ে যান, দেখতে পাবেন।

আমি দোকানের ভেতর ঢুকে বই নিয়ে নাড়া-চাড়া করছি, এমন সময় বাইরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে উঁকি মেরে দেখি, কাল বিনিয়ন্-এর কাছে যে দুই ছোকরা গিয়েছিল, তারাই আজ লেভির দোকানের সামনে উপস্থিত। পাছে তারা আমায় দেখতে পেয়ে চিনে ফেলে, সেই মনে করে আমি বই-এর গাদার আড়ালে গা-ঢাকা দিলুম।

তাদের দেখে লেভি জিজ্ঞেস করল—কি হোল সার্?

ছোকরাদের একজন বলল—কিছুই হোল না। তাই তোমার কাছে আবার ফিরে এলুম।

তারপর দরদস্তুর চলতে লাগল। শুনলুম, এক ছোকরা বলছে—আচ্ছা, পাঁচ শিলিং করে দাও।

আড়চোখে নজর দিয়ে দেখলুম, লেভি দু হাত মাথার উপর উঠিয়ে, চোখ দুটো কপালে তুলে বল্‌লে—পাঁচ শিলিং! বলেন কি সার্? তার চেয়ে আমার গলায় ছুরি দিন। বলে হাতখানা নিয়ে গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গী করলে।

শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর দু শিলিং করে ছবিগুলোর দাম স্থির হোল। লেভি ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ময়লা দশ শিলিং-এর নোট আর দুটো রুপোর শিলিং বের করে ছোকরার হাতে দিল। তারপর পোর্টফোলিওটা খুলে দেখে নিলে ছ'খানা ছবি তাতে ঠিক আছে কিনা?

ছোকরারা চলে যেতে লেভি ছবিগুলো আমার সামনে ধরে বললে—দেখুন সার্, কেমন জিনিস।

আমি বললুম—ওগুলো আগেই দেখেছি।

লেভি তো আকাশ থেকে পড়ল। থতমত খেয়ে এক নিঃশ্বাসে শুধালো—কোথায়? কখন সার্?

আমি উত্তর দিলুম, কাল বিকেলে, লরেন্স বিনিয়ন্-এর বাড়িতে।

লেভি এক চোট খুব হেসে নিল। এক গাল হাসিমুখে বলল—তাই নাকি? আপনি সেখানে ছিলেন? আরে—আমিই তো ভদ্রলোক দুটিকে মিস্টার বিনিয়ন্-এর কাছে পাঠিয়েছিলুম।

এবার আমার অবাক হবার পালা। প্রশ্ন করলুম—তুমি? কেন বল তো?

তখন লেভি সব কথা খুলে বললে। ছোকরারা ছবিগুলো নিয়ে তারি কাছে প্রথম আসে। ছবি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হওয়ায়, সে-ই ও দু'জনকে লরেন্স বিনিয়ন্-এর কাছে পাঠায়। বলে দেয়, সবচেয়ে বেশি দাম ঐখানেই পাবে। আসল কথা লেভির মনে ছিল, বিনিয়ন্ যদি ছবিগুলো কেনেন তাহলে ঠিক বোঝা যাবে, ছবিগুলো আসল কিনা। আর তিনি যদি না নেন তো তখুনি ধরা পড়ে যাবে, ছবিগুলো নকল। আসল হ'লে বিনিয়ন্ সাহেব কখনই ছবিগুলো হাতছাড়া করবেন না, নেবেন-ই নেবেন—একথা লেভি জানে। কথা ছিল, বিনিয়ন্-এর কাছে বিক্রি করতে পারলে ছোকরারা লেভিকে দামের দশ পারসেন্ট কমিশন দেবে। বিক্রির পথ বাতলিয়ে দেবার জন্যে এই কমিশন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। আর একটু খোলসা করে নিতে গিয়ে আমি সসঙ্কোচেই জিজ্ঞেস করলুম—যদি ওরা ছবি বিক্রি করে কমিশনটা না দিয়েই পালাত?

লেভি বললে—ব্যবসা করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু বিশ্বাস করতেই হয়। তাতে একেবারে যে কখনো ঠকিনি, তা নয়। কিন্তু খুবই কম।

ছবিগুলো লেভির হাত থেকে নিয়ে বই-এর স্তূপের উপর বিছিয়ে আমি সেগুলোকে ভালো করে দেখতে লাগলুম। বিনিয়ন্ ঠিকই বলেছিলেন। ছবিগুলো আশ্চর্যরকমের ভালো কপি। লেভিকে জিজ্ঞেস করলুম—এগুলো কততে ছাড়বে? লেভি বল্লে—আপনি নেবেন সার্? সব জেনে শুনে? আমি হ্যাঁ বলায়, লেভি জানালে—আপনি তো দেখলেনই সার্, আমি ওগুলো কততে কিনলুম। তারপর খানিক মাথা চুলকে বললে—তা আপনি তিন শিলিং করে দেবেন সার্।

আর কথাটি না বলে আমি পকেট-বুক থেকে একটা করকরে পাউন্ড নোট বের করে দিলুম। লেভি বারকতক থ্যাঙ্ক ইউ সার্, থ্যাঙ্ক ইউ সার্ বলতে বলতে দু'শিলিং চেঞ্জ ফেরৎ দিল। তারপর পোর্টফোলিওটা ব্রাউন পেপারে মুড়ে একটা বাণ্ডিল করে ফেললে। আমি সেটাকে বগলদাবা করে লেভির দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

পরে ছবিগুলো বেশ দাঁও-এ ঝেড়ে দেবার সুযোগ ঘটেছিল। অনেকেই কপি বলে ধরতে পারেন নি। কিন্তু বেচবার মন সরলো না। ছবিগুলো এখনো আমার কাছে আছে। তবে বিনিয়ন্-এর সঙ্গে সেই সেবার কথা হবার পর আমার ছবি কেনার বাতিক অনেক কমে গেছে। এখন অনেক বুঝে-সুঝে ও-বাতিকের চর্চা করি।

তটস্থ

শ্রীজীবিতেশ চক্রবর্তী

ফেনিল মৃত্যুপান করে বসে আছি।
যৌবন—তট তরঙ্গ—যক্ষ্মায়
ক্ষয় হয়ে হয়ে ক্ষীণ হয়ে এলো ঐ!
দেখি আর ভাবি। অতীত স্মৃতির মালা
মনের অলিতে ঘুরে আসে বারে বার।
আকাশ এখন ধূসর, এখনো নামেনি অন্ধকার।

আর কতো কাল?—প্রশ্ন করেছি।
জবাব পাইনি তার।
হয়তো যুগের প্রবীণ সাক্ষী
বসিয়া থাকিতে হবে।
পথ চাওয়া আর দিন গোণা আর নির্জীব গৌরবে।
হয়ত অনেক বাকী রয়ে গেছে
অনেক ঋণের বোঝা!

ঊষার আলোক, সাঁঝের আকাশঃ
স্নেহ প্রীতি আর আশ্লেষ-পাশঃ
নয়নের কোণে সজল প্রাণের গোপন প্রণতিটুকুঃ
হয়তো হয়নি পরিশোধ করা
অনেক ঋণের বোঝা!

জীর্ণ জগতে মুমূর্ষু আমি
আশায় বাধিনি নীড়।
নীরব প্রাণের তন্ত্রীতে শুধু বাজাই একটি সুরঃ
"এ পারের ঋণ ওপারে শুধিব,—
ওপার নয়তো দূর।"

বন্ধুর পথে বন্ধু আমার
ঋণী কোরে আর বাড়ায়োনা ভার।
মুমূর্ষু আমি ফেনিল মৃত্যু পান ক'রে আছি বসে!
যৌবন-তট তরঙ্গে ক্ষয়,
আর দূরে নয়, আর দেরি নয়, ঐ বুঝি পড়ে ধ্বসে!

দামোদর উপত্যকায় ভারতের নবজন্ম

শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩। দামোদর উপত্যকায় সমৃদ্ধির স্বপ্ন নিয়ে নতুন ভারতের নবজন্ম, স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশের প্রথম স্বর্ণ উষা! এই দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতের দারিদ্র্য-জয়ী সাধনার দুই অর্ঘ্য -তিলাইয়া বাঁধ ও বোকারো বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন।

তিলাইয়া বাঁধ ও বোকারো বাষ্প-বিদ্যুৎ কেন্দ্র বহুউদ্দেশ্য সাধক দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অংশ। দুর্বার খেয়ালী দামোদরের সঙ্গে বহুমানুষের অনন্ত দুঃখের স্মৃতি জড়িত। বর্ষায় স্ফীতকায় দামোদর দুকূল প্লাবিত করে বিহার ও বাঙলার জনপদ ভাসিয়ে দিয়েছে, সহস্র সহস্র নর-নারীকে গৃহহীন করেছে, রেললাইন উপড়ে, সড়ক ভেঙ্গে মহা অনর্থের সৃষ্টি করেছে; আবার শরৎ ও গ্রীষ্মে ধারণ করেছে বালুকাময় জল-শূন্য শীর্ণ কলেবর। দিকে দিকে তৃষিত শস্যক্ষেত্র এক ফোঁটা জল পায়নি দামোদর গর্ভ থেকে। দামোদর ছিল এক দুঃস্বপ্নের অভিশাপ।

ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর স্বভাবতই দেশের অর্থনৈতিক শাপ-মোচনের প্রতি রাষ্ট্র-কর্ণধারগণের দৃষ্টি পড়ে। রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় দামোদর উপত্যকাকে তাঁরা বেছে নিলেন। দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে উপত্যকাকে শস্যশ্যামলা করে তোলাই তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য ছিল না। দামোদর উপত্যকা ও এর আশে-পাশে রয়েছে প্রচুর কয়লা, অভ্র, লৌহ, তাম্র, এ্যালুমিনিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু সম্ভার। এ সমস্ত খনিজ-সম্পদই বন্ধ্যা পড়ে আছে যুগযুগান্ত ধরে, পড়ে আছে পাষাণী অহল্যার মতো কোনো রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে জেগে ওঠার প্রতীক্ষায়! দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রামচন্দ্রের পাদস্পর্শের মতোই এসেছে উপত্যকার শিল্পসম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে, একে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি অথরিটির দৃষ্টান্তের পর নদী-নিয়ন্ত্রণ এখন আর সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে শুধু বন্যার আশঙ্কা দূর করা বা সেচকার্যের জন্যে খাল কাটা গৌণ হয়ে পড়েছে। এখন নদী-

শাসন বহুউদ্দেশ্য সাধক পরিকল্পনায় পরিণত হয়েছে—অর্থাৎ নদীর সম্পদ ও উপত্যকার সম্পদকে এক অখণ্ড পরিকল্পনার মধ্যে স্থান দিয়ে যতটুকু সম্ভব সুবিধা আদায় করে নেওয়া। এভাবে একত্র গ্রথিত ও সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা থেকে যে উপকার পাওয়া যেতে পারে তা হচ্ছে—বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নৌ-পথ, বিদ্যুৎ-শক্তি, জলসরবরাহ, মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ, বন-সংরক্ষণ, খনিজ-দ্রব্যের সদ্ব্যবহার।
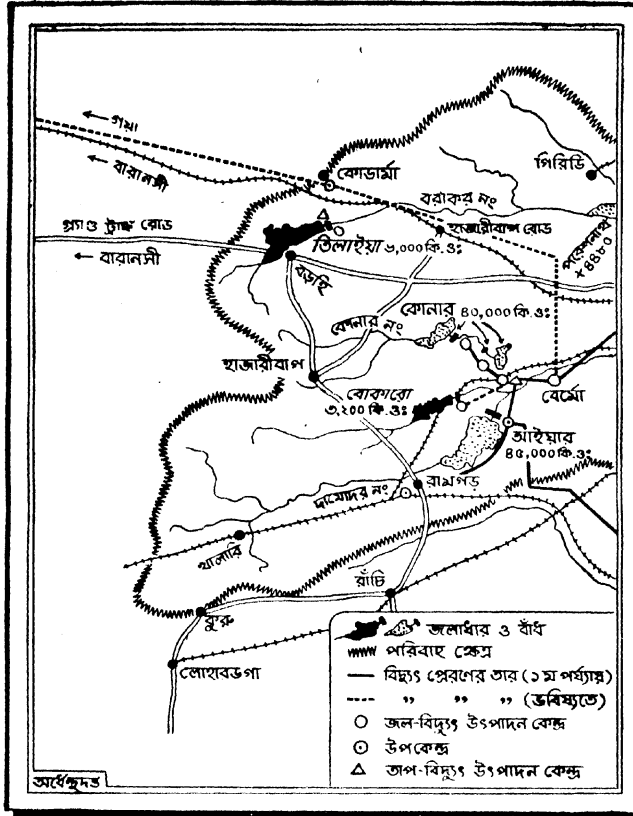
দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বহু-উদ্দেশ্য সাধনের এই আধুনিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে এবং ভারতে যত নদী-উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাই বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় দামোদর নদ ও এর শাখাগুলোর উপর সাতটি বাঁধ তৈরী হবে। প্রত্যেক বাঁধের সঙ্গে থাকবে একটি কৃত্রিম হ্রদ যাতে বর্ষাকালে জল ধরে রাখা হবে এবং এই জল বৎসরের অন্যান্য সময় ক্রমে ক্রমে ছাড়া হবে। এভাবে নিম্ন উপত্যকায় বন্যার আশংকা হ্রাস পাবে এবং সারা বৎসর সেচকার্যের জন্যে জল পাওয়া যাবে। প্রত্যেক বাঁধের সঙ্গে একটি করে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকবে। জলসেচের জন্যে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে একটি নালীবাঁধ (ব্যারাজ) তৈরী হচ্ছে। এই নালীবাঁধ থেকে ৯০ মাইল দীর্ঘ সেচ ও নৌ-চলাচল-উপযোগী একটি খাল কাঁচড়াপাড়ার বিপরীত দিকে হুগলী নদীতে গিয়ে পড়বে। দামোদরের দক্ষিণ দিকে আর একটি খাল কাটা হবে। প্রধান খাল, শাখা খাল এবং ছোট ছো[illegible] উপনদীগুলির দৈর্ঘ্য হবে ১৫৫০ মাই[illegible] এবং এগুলির সাহায্যে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার দশ লক্ষাধিক একর উর্বর পলিমাটিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে। নৌ-চলাচলের উপযোগী খালটি দুর্গাপুরের নিকট অণ্ডাল-রাণীগঞ্জ এলাকাকে কলকাতা বন্দরের সাথে যুক্ত করবে এবং অল্পখরচে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সারা বছর এই পথে নৌকা যাতায়াত করতে পারবে। এর ফলে সস্তা মাশুলের জন্যে পণ্যও সুলভ হবে এবং রেলের উপর চাপ কমবে।

সমগ্র পরিকল্পনার জন্যে ব্যয় হবে ৯০ কোটি টাকা এবং আট বৎসরে এই বিরাট গঠনকর্ম সমাপ্ত হবার কথা। হিসাব করে দেখা হয়েছে যে, পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপায়নের পর সুষ্ঠু জলসরবরাহে হলে বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ মণ ধান ও প্রচুর রবিশস্য দামোদর উপত্যকায় উৎপন্ন হবে, বর্তমান বাজারদরে যার দাম হবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। জল-বিদ্যুৎ ও বাষ্পবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন হবে বৎসরে প্রায় ১৩১৪০ লক্ষ কিলো-ওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তি। এই অপরিমিত বিদ্যুৎশক্তির সদ্ব্যবহার করে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হবে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম পর্বে স্থান পেয়েছে চারটি বাঁধ—তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেট পাহাড়; বোকারোর বাষ্প-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং দুর্গাপুরের ব্যারাজ ও এর আনুষঙ্গিক খাল। এই কর্মতালিকার মধ্যে তিলাইয়া বাঁধ এবং বোকারোর অতিকায় বাষ্প-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। কোনার বাঁধ সম্পূর্ণ ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি, মাইথন বাঁধ ১৯৫৪ সালে আর পাঞ্চেট পাহাড় বাঁধ ও দুর্গাপুরের নালীবাঁধ ১৯৫৫ সালে শেষ হবে। সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে ১৯৫৬ সালে।

শ্রী নেহরু সহস্র কণ্ঠের হর্ষধ্বনি এবং সারা ভারতের নিবিড় ঔৎসুক্যের মধ্যে তিলাইয়া বাঁধের উদ্বোধন করে বলেন—'সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে শিল্পপ্রসারের
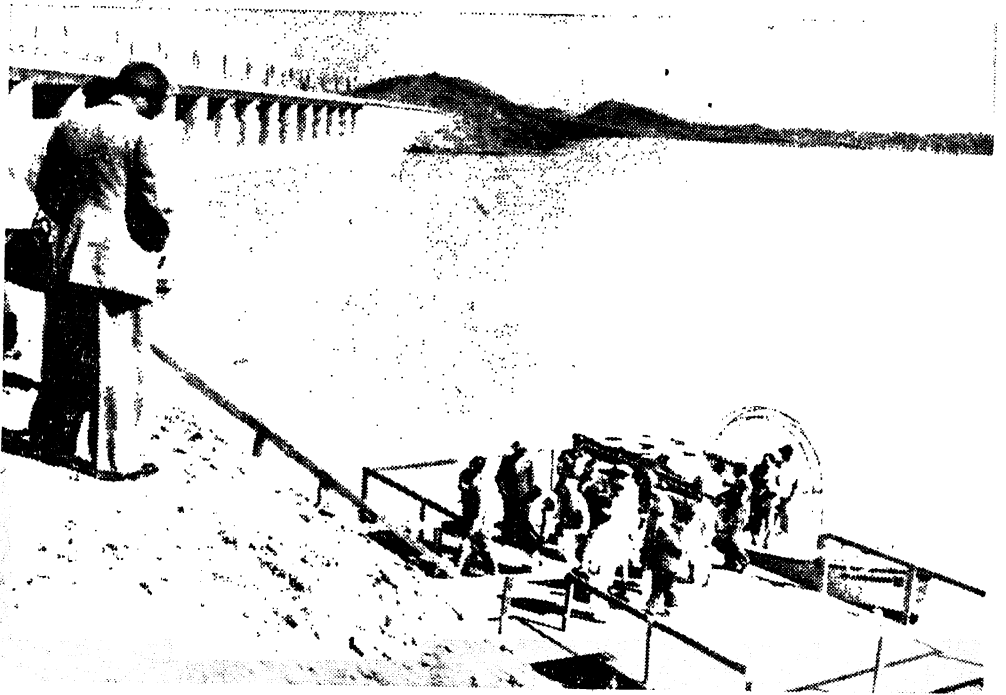
মোটরবোটে কৃত্রিম হ্রদ অতিক্রম করিবার পর তিলাইয়া বাঁধের পাদদেশের ঘাটে বিহারের রাজ্যপাল ও দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পণ্ডিত নেহরুর সম্বর্ধনা
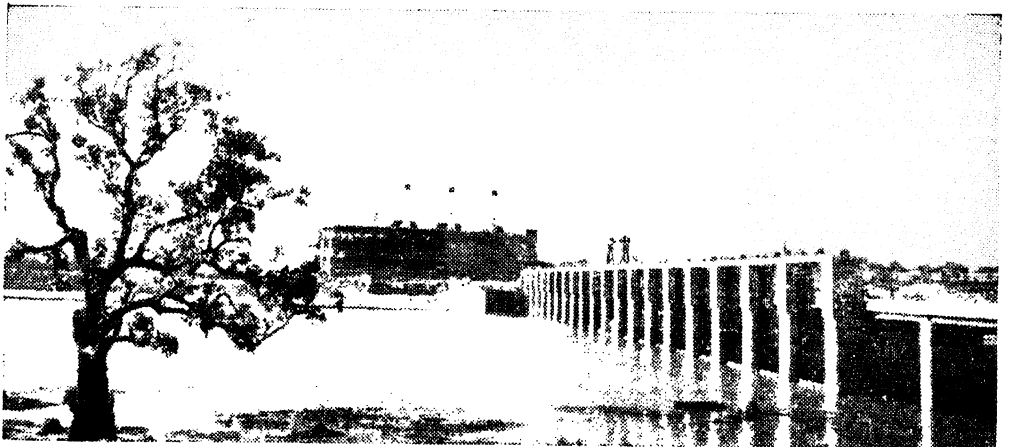
বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জল সরবরাহের জন্যে কংক্রিটের বাঁধ। পশ্চাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখা যাইতেছে
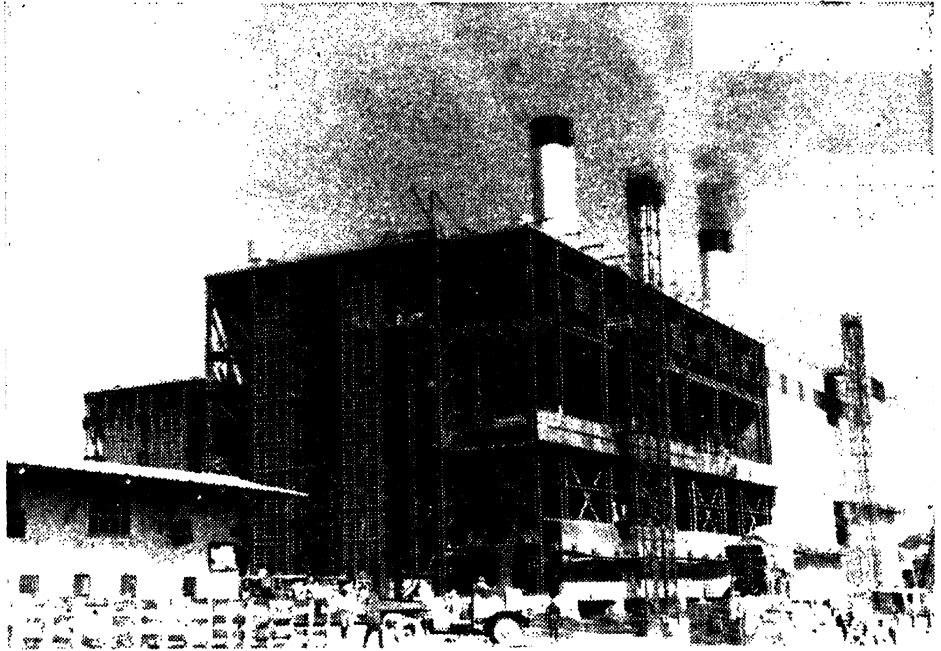
বোকারো তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

স্বার অবারিত হল। এই বাঁধ এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এটিই হল তাৎপর্য। বাঁধকে উপত্যকাবাসীদের এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রকে সারা ভারতের নামে উৎসর্গীকৃত করে শ্রী নেহর বলেন, "গ্রামবাসীদের আর বন্যা ও অনাবৃষ্টির ভয়ে ভীত থাকতে হবে না। সারা বছর তারা প্রচুর জলের যোগান পাবে। তারা সস্তা বিজলি দিয়ে শুধু নিজেদের ঘরই আলোকিত করবে না, বিজলির সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল শিল্পসম্ভারেও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। চারদিকে মিল ও কলকারখানা গড়ে উঠে দেশের বেকার-সমস্যা দূর করবে।"

শ্রী নেহরু মঞ্চের উপর রক্ষিত একটা সুইচ টিপে বাঁধের উদ্বোধন করেন এবং বাঁধ-সংলগ্ন জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি টার্বাইন ঘুরতে আরম্ভ করে। তিলাইয়ায় উদ্বোধন সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রী আশি মাইল দূরে বোকারো যান এবং স্বারপথে একটি ফিতা কেটে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই বিরাট গঠন-কর্মের কর্মিগণ, পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়, লেডি মাউণ্টব্যাটেন, বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আর আর দিবাকর ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বহু বিশিষ্ট অভ্যাগত এবং জনসাধারণ।

তিলাইয়া দামোদর ও বরাকরের সংগমস্থল থেকে ১৩০ মাইল দূরে। গ্র্যাণ্ডকর্ড রেলপথের কোডার্মা ষ্টেশনের কয়েক মাইল দূরে বরাকর নদী হাজারিবাগ জেলার ৪০ মাইল অতিক্রম করে তিলাইয়ায় দুটি অনুচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পথ কেটে গেছে। এখানেই কংক্রীট দিয়ে তিলাইয়া বাঁধ নির্মিত। বাঁধের দৈর্ঘ্য ৫১০ ফুট এবং প্রস্থ ৯৬ ফুট। জল ধরে রাখবার জন্যে বাঁধের সংগে যে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী হয়েছে তার আয়তন প্রায় ২৬ বর্গ মাইল। এই বাঁধের জল থেকে প্রতি বৎসর প্রায় ৯৯ হাজার একর জমিতে জলসেচ করা যাবে। এই বাঁধের জলের দাক্ষিণ্য ইতিমধ্যে প্রচুর শস্য-সম্পদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে এই বাঁধের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এই বাঁধের জলাধার তৈরী করবার জন্যে প্রায় ১৪৯৩টি পরিবার উৎখাত হয়। তাদের বসতি জলমগ্ন হয়ে গেছে। এই উৎখাত পরিবারবর্গের পুনর্বসতির জন্যে চারটি আদর্শ নতুন গ্রাম তৈরী করে দেওয়া হয়েছে এবং পাঁচ হাজার একর পতিত জমি উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে, যা বাঁধের জলের সঞ্জীবনী স্পর্শে উর্বর হয়ে উঠে ফসল দান করতে আরম্ভ করেছে। বাঁধের সংগে যে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, তা থেকে অভ্র ও অন্যান্য খনি অঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যাবে।

কোনার বাঁধের ১২ মাইল নীচে কোনার ও বোকারো নদীর সংগমস্থলে
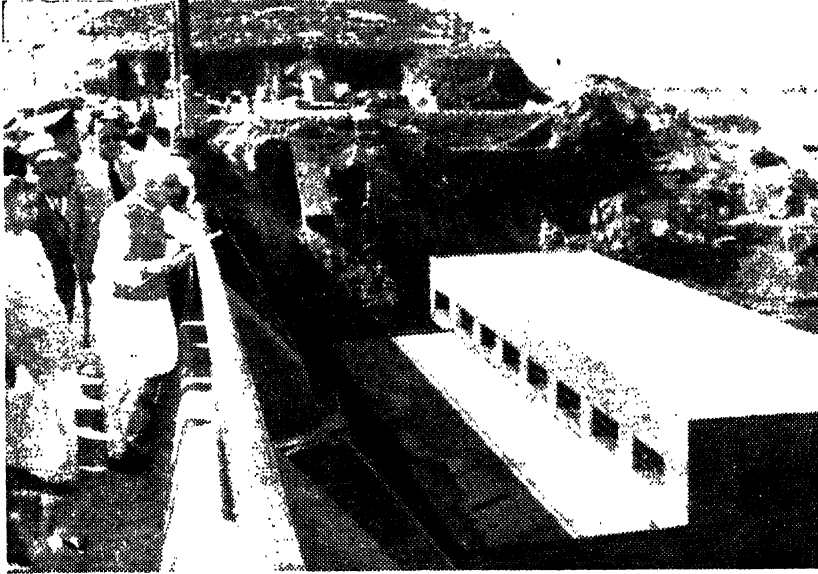
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু তিলাইয়া বাঁধ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাপন কেন্দ্র দর্শন করিতেছেন

বিহারের এক অনার্বর ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে অতিকায় বাষ্প বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এইটিই বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত সমস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রই হবে জল শক্তি দ্বারা চালিত, কিন্তু একমাত্র বোকারোর এই বিরাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইন্ধন কয়লা। এ অঞ্চলের নদীগুলো বর্ষার মাস তিনেক ছাড়া সারা বছরই প্রায় বিশুষ্ক থাকে; তাই সারা বছরে বিদ সরবরাহের পরিমাণ ঠিক রাখবার জ কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যব বোকারোতে করা হয়েছে। এখানে অ নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট কয়লা অন্যান্য শিল্পকার্যের জন সংরক্ষিত রাখা যাবে। বোকারোর পাওয়া হাউসে আপাততঃ তিনটি বিদ্যুৎ-উৎপাদ যন্ত্র বসানো হয়েছে। চতুর্থটি বসাবারও

বোকারো তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বক্তৃতা দিতেছেন। তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আর আর দিবাকর, বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীরামচরিত সিং, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
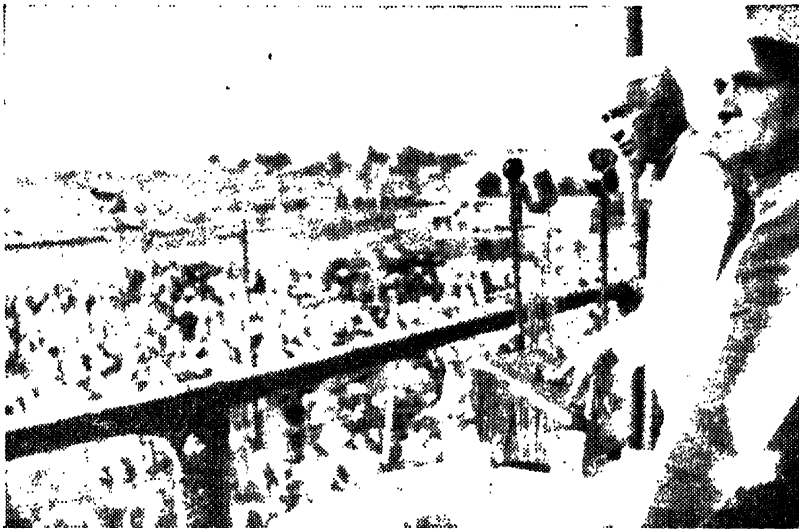
প্রধানমন্ত্রী বোতাম টিপিয়া তিলাইয়া বাঁধের উদ্বোধন করিতেছেন

আয়োজন করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি যন্ত্র ৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারবে এবং সমষ্টিগত-ভাবে এগুলি ১৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করবে। চতুর্থ যন্ত্রটির কাজও আরম্ভ হলে একা বোকারো স্টেশন ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির যোগান দিতে পারবে। জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্রগুলো যদি জলাভাবে অচল হয়ে পড়ে, তবু বোকারো এককভাবে সমস্ত ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। বোকারো থেকে সম্বৎসরে ৫২৬০০০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যাবে। এই অপরিমিত বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে আড়াই হাজার বর্গ মাইল জুড়ে নানা শিল্পকার্যের জন্যে ও উপত্যাকার নানা খনিতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎশক্তির যোগান দেওয়া যাবে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করে-ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী। এর নির্মাণ ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণ স্বরূপ দিয়েছেন প্রায় ৯ কোটি টাকা। ১৯৪৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এই অতিকায় বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়েছিল।

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে ঘিরে একটি সুন্দর উপনিবেশও গড়ে উঠেছে। এই কলোনীটি এখানকার প্রায় দেড় হাজার স্থায়ী কর্মচারীর বসবাসের উপযোগী।

মানব-দ্রোহী দামোদরকে বিজ্ঞানের শক্তিতে এবং স্বাধীন ভারতের কর্মসাধক-গণের অক্লান্ত শ্রমে বশীভূত করে তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসা হয়েছে। যে দামোদর একদা লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ করেছে, সেই দামোদর আজ লক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিয়ে নবরূপে রূপান্তরিত।

দামোদর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার মধ্যেই এর চরম সার্থকতা নয়। দামোদর যে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, এখন সে পথে লক্ষ্মীশ্রীকে আবাহন করে নিয়ে আসতে হবে। দিগন্ত-বিস্তৃত ধান্যভারনম্র শস্যক্ষেত্র এবং শিল্প-সমৃদ্ধির পরম ঐশ্বর্য এখন আর কল্পনার বস্তু নয়, বাস্তবিকপক্ষেই এখন তা করতলগত হবার যোগ্য।

পরিকল্পনার রচয়িতাগণও পরি-কল্পনার যা চরম লক্ষ্য—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সে দিকেও দৃষ্টি রেখেছেন। তাই উপত্যকায় কৃষি-গবেষণা ও পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কার্যত প্রয়োগ করা হচ্ছে; তিলাইয়া জলাধার থেকে জল নিয়ে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য ও পতিত জমি উদ্ধারের জন্যে যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। এসঙ্গে নিম্নউপত্যকায় জমি থেকে দুবার ধান ফলানো যায় কিনা তার গবেষণাও চলেছে। দামোদর উপত্যকা যখন তাড়িৎ-শক্তির এক বিরাট আধার হতে যাচ্ছে, তখন তাড়িৎ-রোধক দ্রব্য প্রস্তুতের একটা কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনাও অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং এরকম একটা কারখানাও গড়ে উঠবে।

দামোদর উপত্যকা এক বিরাট কর্ম-ক্ষেত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। পরাধীনতার ভারে ন্যুব্জদেহ হতমান হতদরিদ্র ভারত-বাসী তার প্রতিভা ও কর্মশক্তি বিকাশের এক নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পাবে এখানে।

এ**কটি** সংবাদে প্রকাশ এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পরীক্ষায় মেয়েরাই সব চেয়ে বেশি তত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থনীতিতে। শুখুড়ো বলিলেন—"এটা সত্যি

...ন্দের কথা। কিন্তু মজা হলো এই যে ...রে পর যে নীতি সম্বন্ধে মেয়েরা ...দে পদে অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন সেটা ...া অর্থনীতি। সুতরাং সেদিক থেকে ...য়েদের জ্ঞানের কোন পরিবর্তন না ...া পর্যন্ত তাঁদের পরীক্ষার কৃতিত্বে ...সিত হতে পারছিনে!!"

* * *

প**শ্চিমবঙ্গ** সরকার ইটের উপর ট্যাক্স ধার্যের ব্যবস্থা করিবেন ...িয়া নাকি মনস্থ করিয়াছেন।—"এই ...ে আশা করি তাঁরা পাটকেলের ...ও ভাববেন, দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে ...কি না"—মন্তব্য করে শ্যামলাল!

* * *

"খু**ড়ো নেহরু"** ইতিমধ্যে জাপান, টার্কী, জার্মানী ও আমে...দের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এক একটি হাতী উপহার দিয়াছেন। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ অনুরূপ একটি হস্তী উপহার নাকি চীনের ছেলে-মেয়েদের জন্যও পাঠানো হইয়াছে।—"রাশ্যাতে কয়েক ডজন ইয়োইয়ো পাঠালে বোধ হয় বেশ হয়"—পরামর্শটা জনৈক সহযাত্রীর।

* * *

দি**ল্লীর** "অন্নপূর্ণা" অন্নহীন দ্রব্যের রান্নার একটি প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।—"আমরা এ পর্যন্ত অনেক রকম রান্নার পরামর্শ শুনেছি এবং একথাও শুনেছি যে সব-কটিই ভাইটামিনে ভরপুর। এবারে কেউ যদি বহুদিন আগে আবিষ্কৃত ভেরেণ্ডা-ভাজাকে আবার চালু করতে পারেন তা হলে একটা কাজের মতো কাজ হয়"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

দু**ই** ফুট লম্বা জনৈক "সাধু" কলিকাতার রাস্তায় দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা পরিক্রমণ করেন। তাঁহাকে অনেকেই "কল্কি অবতার" বলিয়া মনে করেন এবং দৈনিক গড়পড়তা তাঁর আদায়ী প্রণামীর আয় নাকি পঞ্চাশ টাকা।—"কলিতে কল্কের প্রভাব যে কতখানি সে কথারই প্রমাণ পাওয়া গেল!"

* * *

পে**নসিলভানিয়ার** সুপ্রীম কোর্ট নাকি রায় দিয়াছেন যে কোরিয়ার যুদ্ধ, যুদ্ধ নয়।—"লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে যে মরিয়াছে তার কারণ নিশ্চয়ই অগ্নি-মান্দ্য"—রায় দিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

ল**ক্ষ্ণৌতে** সম্প্রতি ভারতীয় দন্ত-চিকিৎসকদের যে সম্মেলন হইয়া গেল তা উদ্বোধন করিয়াছেন উত্তর প্রদেশের প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত মুন্সী। জাতীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য দন্ত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রদেশ-পাল বক্তৃতা দেন এবং তিনি আশা করেন কেন্দ্রীয় এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। শ্যামলাল বলিল—"আমাদের দন্তস্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য মুন্সীজীও যে খানিকটা দায়ী তা কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের ফাইল খুঁজলেই জানা যাবে"—শ্যামলাল দেঁতো হাসি হাসিল!

* * *

প্র**ত্যেকটি** গরুর গাড়িকে বৎসরে ছয় টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে এই মর্মে সরকার প্রস্তাবিত একটি বিলের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন কংগ্রেসী সদস্য অনেকেই। গরু নেহাৎ অ-বলা জীব নইলে তারা হয়ত শ্রীকান্তর মত বলিতে পারিত—"হায় অকৃতজ্ঞ রাম, দড়ি ধরার কাজ কি তোমার ফুরাইয়া গিয়াছে!!"

* * *

শ্রী**যুক্ত** মুন্সী নাকি বলিয়াছেন যে তাঁর নিজের বয়স যে কত ত তিনি নিজেই জানেন না।—"বন মহোৎ-সবের অধিকর্তা হিসেবে গাছ পাথর নেই বলা চলে, ঠিকুজীর দিক থেকে বায়ে কি তেয়োও বলা যায়"—বলেন বৃদ্ধ বিশু খুড়ো।

নগর-সংকীর্তন

রূপদর্শী

কএ যদি কৃষ্ণ নয়, কালী নয়, কলকেতা; তো হ-এ ও হরি নয়, হর নয়, হাওড়া। ওপার হাওড়া এপার কলকেতা, মাঝখানে এক বিভেদ; হুগলী নদী, ওরফে ভাগিরথী, মুখের কথায় গঙ্গা।

ওপারে হাওড়া, হাওড়ার ইস্টিশান। পাটকিলে তার রঙ। মাথায় ঘড়ির তাজ। আর চার পাশে সব ইয়ার বক্সী—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্‌শা, এমন কি জলুষ-চটা ঘোড়ার গাড়ি। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যহই পুরো মাইফেল। জোড়া জোড়া সমান্তরাল ইস্পাতের লাইন পাঠিয়ে হাওড়ার ইস্টিশান তাবৎ দূরের টিকি বেঁধে রেখেছে। যখন যাকে দরকার কি কাছে পেতে ইচ্ছে, দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ কি আরো জানা অজানা, চেনা অচেনা অজস্র স্থানকে এই জোড়া লাইন ধরে টান মারে আর সুড় সুড় করে তারা এসে হাজির হয় গাড়ির রূপ ধরে ধরে। এটা কি? বোম্বে মেল। ওটা কি? দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস্‌। আর ওইটে? মাদ্রাজ মেল। নাগপুর প্যাসেঞ্জার, মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার, দানাপুর, কিউল, সাহেবগঞ্জ —অজস্র অজস্র।

মেল, এক্‌স্‌প্রেস্‌ প্যাসেঞ্জার,—এরা তো সব রেল বংশের কেষ্ট বিষ্টু। দূর পাল্লায় পাড়ি জমায়। এ ছাড়া লোক্যাল আছে। খুচরো খেপের কারবারী। কিন্তু এদের তুচ্ছ করেন আপনার সাধ্যি কি? রেল কোম্পানীর তোষাখানায় রেস্ত জোগানোর এক মোটা হিস্যা এদের। এ ছাড়া আছে পার্সেল আর গুডস্‌ মানে মালগাড়ি। পার্সেল আর গুডস্‌ কাজ করে বেশী তবে বোধ করি তেমন দর্শনধারী নয়, কলকেতার বড় চাকুরের বাড়িতে হাফ শিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে খুড়তুতো ভাই, এসেছ যখন থাক, দেহে শক্তি আছে, বাজারটা আসটা করো, কিন্তু বাপু খবরদার, ওই ভূতো চেহারা নিয়ে সদরে বেরিয়োনা, লোকজন হরদম আসছে, কে ফস্‌ করে পরিচয় জিগ্যেস করে বসবে আর মাথা কাটা যাবে। তাই মালগাড়ির স্থান হয়েছে হাওড়া ইস্টিশানের খিড়কীতে। ও তল্লাটের নামই গুডস্‌ সেড্‌। হালফ্যাশানের বাবু বিবির নজর ওদিকে পড়বার কথা নয়। পার্সেল ট্রেন বড় উপর-চালাক। ব্যাটা আসলে বয় মাল। কিন্তু কখনো সখনো প্যাসেঞ্জার নিয়ে জাতে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। দেহটাকেও ঘষে মেজে চেকনাই ছাড়বার বৃথা আয়াসে ব্যস্ত। যেন গ্রামের মেয়ে 'ডেরেস্‌' করে 'থ্যাটার' দেখতে 'ইস্টা এসেছে। ব্যক্তিটি খলিফা সন্দেহ নেই ঠেলে ঠুলে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেই আপ ঠাঁই বাগিয়ে নিয়েছে। হোকনা তা এবে বারে একটেরে, সেই বার নম্বরে।

আমরা যারা নিত্যি নিত্যি যাতা করি হাওড়া দিয়ে, আজকাল কেউ বা নম্বর প্ল্যাটফরমটায় ভুলে ভুলুক মে চাইনে। ও যেন বাবুর আগের আম কোট। টন্‌কো আছে, কিন্তু পুরো তাই এখন উঠেছে চাকরের গায়ে। এ আমাদের কারবার এক থেকে এগা নম্বরের সঙ্গে।

মেন বিল্ডিং ছেড়ে ডি এস অফি দিকে দুপা গিয়েই ডান দিকে মারুন। সার সার কতকগুলো আ হাওড়া কণ্ট্রোল। কানে হেডফোন চোখের সামনে নক্‌শা। সদা সতর্ক গুলোর মুখ থেকে অনবরত বে হ্যালো বর্ধমান, সাঁয়ত্রিশ আপ্‌? ছাড়লো। তো হুকের উপর পিন পো হ্যালো আসানসোল, টু ডাউন? নেই। তো ফোন চলল আরো হ্যালো কাটোয়া, হ্যালো ব্যান্ডেল, খানা, হ্যালো অণ্ডাল? থার্টিন ড

নবেন আপ্? অমুক গুডস্? তমুক র্সেল? লাইট ইঞ্জিন, সাটল্? কে থোয় কখন কোন লাইনে, আসছে কি চ্ছ, নাকি উল্টে পড়ে আছে সব খবর ণ্ট্রোলে। জিগ্যেস করতে না করতে াব! ফোর ডাউন? এখনো আসানসোল ড়েনি। এক ঘণ্টা সাঁয়ত্রিশ মিনিট লেট। ণ্ট্রোল অফিস ছাড়িয়ে একটু এগুলেই ৃসহীন এক প্ল্যাটফরম্। 'খাঁচা' ঘরের ামনে। খাঁচা ঘর কি? না স্ট্রং রুম্। ল কোম্পানীর বিরাট সিন্ধুক। পার্সেলে সব দামী দামী মাল আসে তা গাড়ি কে খালাস করে কোথায় রাখা হয়? এই চা' ঘরে। মোটা মোটা লোহার শিক য় ঘরটা সুরক্ষিত। তাই কুলীরা বলে চা। ও সব টং ফং আংগরেজী বোলি োতি আদমী আমরা, আমাদের মুখে বসে বাজে না। তার চেয়ে এই বেশ া সিধা সাধা খাঁচা ঘর। এই খাঁচা রে সামনেই প্ল্যাটফরম নম্বর বারো। না আর কেউ ফিরেও চায় না।

কিন্তু সে আরেকদিনের কথা। হাওড়া ষ্টিশানের এত বড় ইমারত তখন ঠেনি। এত জমজমাট, এত এরিয়া, এত স্ট্রাম ট্যাক্সি, রিকশার ভিড় কিছুই ল না। শুধু ছিল ঠিকে ঘোড়ার গাড়ি। দিন তাদেরও জলুস ছিল, কারণ তারাই একমাত্র যান। যাতে চেপে সাহেব-কলকেতা যেতেন। আর জলুস ছিল প্ল্যাটফরমটার। তখন এ বারো নয়, মেবাদ্বিতীয়ম্। একমাত্র প্ল্যাটফরম। আমলের তাবৎ প্যাসেঞ্জারের 'একমাত্র বিশ্বাস্য প্রতিষ্ঠান'। অরিজিন্যাল, ড়ার ইস্টিশান ছিল এই তল্লাটেই।

রেল কোম্পানীর সুয়োরাণী হয়েছে ও মহল—এগারোটা প্ল্যাটফরমের ফাট ফাট নতুন বিল্ডিং। প্রতিদিন খানা গাড়ি ছাড়ছে, সাতান্ন গাড়ি আসছে। প্রতিদিন কুড়ি র মাথা কোলাপসিবল্ গেটের ঠে পেরিয়ে ঢুকছে, আর বেরুচ্ছে ন দিয়ে, গড়ে যেখানে টিকিট বিক্রী ই দৈনিক এক লাখ টাকার, নিশ্চয়ই আদের বেশী হবে। কে মনে রাখে াতনে? তবুও কোনো কৌতূহলী যদি গালের স্রোত ঠেলে পুরানো মহলে ন পড়েন কখনো, খাঁচা ঘরের পাশ দিয়ে পার্সেল আফিসের দিকে এগুতে গেলেই তাঁর নজরে পড়বে, আপন অভিমান বুকে চেপে দাঁড়িয়ে থাকা এক অভিজাত পিত্তল ফলকের উপর। মাঝখানে এক তারা। উপরে আর নিচে ইংরেজী হরফে খোদাই করা কটি কথা অরিজিন্যাল জিরো মাইল, ই আই আর। এখান থেকেই ই আই রেলের শুরু। এই হল পুরোনো হাওড়ার প্রথম প্ল্যাটফরম। এক পার্সেল ছাড়া এখন আর কে পোঁছে তাকে।

এলাহী কথাটার যদি কোনো আকার থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে হাওড়া। ভারতের আর কোথাও দৈনিক এত গাড়ি যায় আসে না, আর কোথাও এত প্যাসেঞ্জার নামে ওঠে না, পৃথিবীর আর কোনো ইস্টিশানে এত বিচিত্র যানবাহন নেই, এত বেশী যানবাহন নেই।

মশাই, চাট্টিখানি কথা নয়, এই ইস্টিশানের স্টাফ কত জানেন? পুরো পাঁচটি হাজার। চোদ্দশ' আঠাশজন তো কুলিই আছে। তাতেও কি কুলোয়, হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছিনে! অজস্র ডিপার্টমেণ্ট অজস্র লোক, এদের সবার উপরে কর্তা হলেন স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। অফিসও হেথা, কোয়ার্টারও হেথা। উঁচু গাছে হাওয়া লাগে বেশী, বুঝলেন স্যার। আমরা শা—রা চুনোপুঁটি, কে চায় আমাদের দিকে। সিফ্ট্ ডিউটি করে যাচ্ছি, কখনো ভোরে, কাকপক্ষীর ঘুম না ভাঙতেই আফিসে এসে হাজরে দিচ্ছি, কখনো ইভনিং ডিউটি, কাজ যখন সেরে উঠলাম তখন জগৎ ঘুমে অচেতন। বড় বড় বাবুদের বড় বড় কথা বুঝলেন না, এই দেখুন না, ওদের দশটা পাঁচটা ডিউটি, তবুও ওদের এখানেই কোয়াটার। কেন? না বিগ্‌গান যে! আর আমরা স্যার সাতষট্টি মাইল পাড়ি মেরে সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে ডিউটি করতে আসছি। পোড়া পেটটি না থাকলে চাকরীর মুখে ঝাড়ু মেরে কবে চলে যেতাম। হ্যাঃ!

আর আর সব ডিপার্টমেণ্ট তো পাবলিকের চক্ষুর আড়ালে থাকেন। কিন্তু গেটের টি সি মানে টিকিট কালেক্টর আর বুকিং ক্লার্ক, এরা যাবেন কোথায়? তাই যত খেঁচাখেঁচি এদের সংগে। আর সব কাজ ঢিমে তালে কিন্তু ট্রেনের কম্ম টাইমে চলে। ঘড়ির কাঁটার তিলেক পরিমাণ কারচুপীতেই কোয়েশ্চেন অব্ লাইফ্ অ্যান্ড্ ডেথ্, স্যার। তাই কারো আর তর সয়না। একবার ভিড়ের সময় এসে দেখবেন না টিকেট কাউণ্টারে। চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।

তিনটে শিফট্ বুকিং কেরাণীদের, আট ঘণ্টা ডিউটি। ছ ঘণ্টা টিকিট বিক্রী, দু ঘণ্টা তার হিসেব। হেডে আর মাথা থাকে না স্যার। হাওড়ার কাউণ্টার। সাত আট হাজার টাকা করে দৈনিক এক এক কাউণ্টারে উশুল। থার্ড ক্লাশ কাউণ্টারের কথা বলছি। বুঝুন দেখি, টাকা বাজিয়েই বা নেব কখন, নোটটাই বা দেখি কখন, আবার হিসেব করে পয়সাই বা ঠিক ঠিক ফেরৎ দিই কি করে। একটু সময় নিলেই তো দুনিয়া অন্ধকার। খদ্দেরের গালের চোটে স্বর্গ থেকে ঠাকুর্দা নেমে আসেন। আর তাদেরই বা দোষ দিই কি করে? মনে সর্বদা ভাবনা, এই বুঝি তাকে রেখে ট্রেন ছেড়ে দিলে। মনের আতংকে কার মেজাজ ভাল থাকে? আমারই কি থাকত? তারপর দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাক। কর্তারা প্রতি বছর তো রেল বাজেটে বক্তৃতা ঝাড়ছেন পাবলিকের সুবিধে করে দিচ্ছেন। খালি বাত, খালি ব্যোম্ ঝাড়া। এই হাওড়া, এত ইনকাম, এখানে কত মান্থলি ইসু হয় জানেন? বিশ হাজার! বললাম না, ধারণা করতে পারবেন না, কিন্তু থার্ড ক্লাশ টিকিট কাউণ্টার মাত্তর তিরিশটি। তাও আঠারোটার বেশী এক-সংগে কাজ হয় না এতে কি হয় বলুন। 'রাশ্ আওয়ারে' বুকিং কেরাণীদের বুকের রক্ত জল হয়ে গংগায় গিয়ে জোয়ার তোলে। একটুও বাড়াচ্ছিনে স্যার। আমার এক বন্ধু, তার টি-বি হয়ে গেছে, কাজের চাপে, এখন কাঁচড়াপাড়ায় ভুগছে, হাওড়া বুকিংকে বলত কুকিং অফিস্। রেল কোম্পানী তার কেরাণীদের এখানে পাঠিয়ে

ভাজে, ভেজে তেল বের করে। সেই তেলে রেলের চাকা সড়গড় রাখে। কথাটা কি মিথ্যে স্যার?

বাইরে শুনুন, শুনবেন বুকিংএর চাকরী রাজার চাকরী। কেন? না টু-পাইস্ ইনকম্ খুব। স্যার রেলের চাকরী, কোথায় উপরির কারবার নেই, বলুন তো। 'অল্ বার্ড ফিস্ ইটার ওন্লি মাছরাঙ্গা ইজ্ থিব্' শুধু মাছরাঙ্গাটাই দোষী, বেড়ে জাস্টিস্ দাদা। উপরি না পেলে রেলচাকুরের ছেলে অব্দি ভূমিষ্ঠ হয় না, তা জানেন?

তবে বলি শুনুন। রেলের বেশ বড় গোছের অফিসার, কেষ্টবিষ্টু গোছ, তার ওয়াইফের সময় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ডেলিভারী হয় না। এগারো মাস পার হয়, তবু না। ডাক্তার বদ্যি হার মানল, শেষ কালে এলেন এক রিটায়ার্ড রেলের ডাক্তার। তাঁর তিনপুরুষে রেলে কাজ। তিনি দেখে শুনে বললেন, গোলমাল কিছু নেই, প্রসূতি সুস্থ, বাচ্চার অবস্থাও ভাল। তবে শুধু হাতে ওকে বের করা যাবে না, ঘুঁষ লাগবে। ঘুঁষ না পেলে বেরুবে না, ব্যাটাচ্ছেলে রামঘাঘু। ছেলের বাপ বললে, ঠিক হ্যায়, কি চাই? ডাক্তার চাইলেন এক আংটি। আংটিটি হাতে দিয়ে ডাক্তার কুটুস করে কাজটি হাঁসিল করে দিলেন। ছেলের হাতের বন্ধমুষ্টি খুলতেই টুক্ করে আংটিটি খসে পড়ল। এই তো মশাই এখানকার রেওয়াজ। ঘুঁষ নেওয়া রেল-চাকুরের বার্থ রাইট।

কিন্তু এর আরেকটা দিকও আছে। তাহলে সেটাও শুনুন। ওই খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকি, আর প্রাণটা চ্যাপ্টা করে বেরুই। সব ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আসেন তো। টিকিটগুলো খোপ থেকে নামাতে হবে, পরের টিকিটখানায় সিরিয়াল ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে, একখানা গড়বড় হলেই দাও গাঁট গর্চা। গর্চা তো হরবখৎ দিতে হচ্ছে। তারপর ঘটাং করে পাঞ্চ করো, তারপর তো খদ্দেরকে দেওয়া। কিন্তু সব প্রথমে পয়সা নাও গুণে। অধিকাংশ লোকই টিকিটের দাম জানে না। কোথাকার টিকিট? বোলপুর। দিন দু টাকা চোদ্দ আনা ন পাই। তো সে দিলে একখানা দশ টাকার নোট। তো হয়ে গেল মশাই। সে নোটটি ভাল করে দেখতেই দু মিনিট কাবার। ওদিকে কাউণ্টারের বাইরে চিল্লাচিল্লী লেগে গেছে। 'একখানা টিকিট দিতে ক ঘণ্টা লাগে, ও মশাই! বলি দাদার কি রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ও স্যার, টিকিট দিতে দিতে গাড়ী যে বর্ধমান পেঁাছে গেল। এখন বলুন, শত মুখের অগ্নি উদ্গীরণ আমি সামলাই কি করে? অন্যমনস্ক হয়ে নোটটি যদি নিয়ে ফেলি, আর সেটি যদি জাল নোট, কি বাতিল নোট হয়, তখন? হেড্ অফিস থেকে 'ডেবিট্' হয়ে আসবে। আর মাস মাইনে থেকে কচাং—তত টাকা কর্তন করে রাখবে। ভবিষ্যতের কথা নয়, নিয়ত হচ্ছে। কিন্তু পাবলিক তো সে খবর জানে না। একবার বলে দেখুন তো, মশাই নোটটা পাল্টে দিন। দেখবেন তখন। চোদ্দ হাজার জেরা। কেন, নোটটার কি পেট খারাপ হয়েছে? শুনুন কথা! সেই ভিড়ের মাথায় এই সব চুলকুনি শুনলে কার মেজাজ ভাল থাকে। তখন কাউণ্টারের সামনে ওই অজগর লাইন দেখেই তো প্রাণ হাফ হয়ে গিয়েছে। হয়ত একটা জবাব দিলাম। একটু কথান্তর হল, হয়ে গেল রিপোর্ট। অফিসার আছেন না পিছনে, কোথায় সাবর্ডিনেটদের একটু সাহায্য করবে তা না উল্টো। এসেই কাউণ্টার থেকে হয় সরিয়ে দিলে, নয় সস্পেণ্ড করলে। পাওয়ার দেখাবার যে কয় কায়দা আছে সব একে একে ঝেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেলেন। নয়ত এসে ধমক দিলেন, জলদি করুন। বুকিংএ অত শ্লো হলে চলবে না।

সে তো আমরাও বুঝি বাপু। সাধ করে কেউ কাজ আটকে রাখে না। আমি বলি, কাউণ্টারে নোট দেবার দরকার কি? পয়সা ভাঙিয়ে, টিকিটের দামটা গস্ত করে দিলেই তো আদ্ধেক সময় বেঁচে গেল। আরে দাদা, আগে এই হাওড়া ইস্টিশানেই টাকা ভাঙানোর দুটো কাউণ্টার ছিল। সেটি তুলে দিয়ে ফায়দাটা কি হল? জিগ্যেস করুন না রেল কোম্পানীকে।

এই যে দেহাতী প্যাসেঞ্জাররা কাউণ্টারে কাউণ্টারে ঘুরে ঘুরে অযথা হয়রাণ হচ্ছে, সময় নষ্ট করছে, গাড়ী ফেল করছে, আমাদের সময় নিচ্ছে, জোচ্চর দাগাবাজদের কবলে পড়ছে, রে[illegible] কোম্পানী দেখছে তা? কি হয় ব[illegible] শুনুন। গ্রামের লোক। সাদাসি[illegible] আদমী। ঘ্যান ঘ্যান করছে বাবু এখা[illegible] ঘালিয়ার টিকিট মিলবে? কেউ একজ[illegible] মাথা নেড়ে দিলে তো তার পিছনে[illegible] দাঁড়িয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পর কাউণ্টা[illegible] যখন এল, দেখা গেল সেটা কাটোয়[illegible] কাউণ্টার। যত বলি, বাপু তোম[illegible] টিকিট এখানে মিলবে না, তত কান্না[illegible] করে। দিয়ে দাও বাবু, অনেকক্ষ[illegible] দাঁড়িয়ে আছি। তখন ধমক লাগাই। স[illegible] যায়। আরেক কাউণ্টারে গিয়ে ঝা[illegible] ঘাধায়। এমন একজন কেউ কি নে[illegible] এদের একটু সাহায্য করতে পারে। [illegible] প্যাসেঞ্জার গাইড্? তারই তো [illegible] এইসব। প্যাসেঞ্জার গাইডের টিকি অ[illegible] পর্যন্ত কেউ দেখেছে মশাই? ওরা মা[illegible] না পায়জামা তাই তো কেউ আজ পর্য[illegible] জানল না। আর হেড্ অফিস[illegible] করেছে এমন একটেরে, এন্কোয়ারী[illegible] জিগ্যেস করলে হদিশ পাওয়া মুশকি[illegible] অবিশ্যি হেড্ অফিসে ওরা পারত[illegible] থাকেন না। প্যাসেঞ্জার গাই[illegible] খুঁজছেন? তবে এখানে কেন? [illegible] চায়ের স্টলে দেখুন। সেইটে [illegible] ব্রাঞ্চ অফিস। গেলুম। [illegible] ক্বাপস্। স্যুট বুট পরে অ্যাসা [illegible] বাগিয়েছেন, যে জন্‌রল্ মান্‌[illegible] মাজেস্টর, কে কহিবে? কাছে এগু[illegible] ঘুক ঢিপ ঢিপ, শুধুলো কোন প্র[illegible] আমারই যদি এই অবস্থা তো [illegible] আদমীদের অবস্থাটা কি হয় [illegible] দেখুন।

অথচ প্যাসেঞ্জার গাইড্রা এ[illegible] লাগালে আদ্দেক মামলা ডিসমি[illegible] দিতে পারেন। লাইনে গিয়ে কোথা কোথা যাবেন করলেই বেরিয়ে পড়[illegible] ঠিকানার প্যাসেঞ্জার। তাদের কাউণ্টার বাতলে দাও। ভাড়া [illegible] দাও। দ্যাখ ঠিকমতো পয়সা ফের[illegible] কিনা।

একদল জোচ্চর মশাই হাওড়া[illegible] বেড়ায়। লিলুয়া রামরাজাতলার গুচ্ছের কিনে রাখে। গ্রামের লো[illegible] ভিড়ের কাছেই ওদের ঘোরাঘুরি। পাল্লার টিকিট একজন কিনলে।

বললে, বাবু দেখিয়ে তো, ঠিক হ্যায় কি নেহি। এদের পাল্লায় পড়েছে কি তার ও-কম্ম হয়ে গেল। হাতসাফাইয়ের খেল দেখিয়ে আসল টিকিট গায়েব করে দিলে, তারপর লিলুয়ার টিকিট গছিয়ে, ঠিক তো হ্যায় বলে, কেটে পড়লে। কিম্বা পুরোনো টিকিটই একখানা গছালে। যদি হাওড়াতে ধরা পড়ল তো বুকিং ক্লার্ককে নিয়ে টানাটানি। তার কাউণ্টার তক্ষুণি বন্ধ করে সার্চ, পয়সা বেশী হয় কিনা? ওদিকে দোষী যারা তারা তো টিকিটটি 'রিফান্ড্' নিয়ে হাওয়া দিলে। কত কেস্ যে হাওড়ায় হয় দৈনিক, কে তার খোঁজ রাখে?

ভোর চারটে পনেরো, তখনো চতুর্দিকে ঘুম ছড়ানো থাকে। হাওড়া ইস্টিশান জেগে ওঠে। দিনের প্রথম ট্রেন আসবার সময় হল। চারটে পনেরোয় পুরী প্যাসেঞ্জার। টি সি গিয়ে গেটে দাঁড়াল, কুলীরা প্ল্যাটফর্মে। বুকিং ক্লার্কও এসে খাঁচায় ঢুকেছে। চারটে পঞ্চাশে ছাড়বে পয়লা ট্রেন, মেদিনীপুর লাইট ট্রেন। টিকিট বিক্রীর সময় হল। কিন্তু তারও ঢের আগে থাকতে বুকিং বাবুর কাজ। শুধু কি টিকিট বিক্রী। তার আগে টিকিটের ক্লোজিং নম্বর মিলিয়ে নিতে হবে না? পাঞ্চ মেসিনে তারিখ বদলাতে হবে না? চোখ থেকে ভাল করে ঘুম ছোটেনি, জোর পাওয়ারের আলো চোখে এসে ঘা দিচ্ছে। একাউণ্ট্স্ অফিসের বারান্দার কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে গায়ে ব্যাথা হয়েছে। ভোর চারটেয় ডিউটি, বাইরে থাকে, আসতে হয়েছে গত রাত সাড়ে নয়টায়। কোয়ার্টার কোয়ার্টার করে হন্দ হয়ে গেল। রেস্ট রুম বানাচ্ছে কোম্পানী আজ আট বছর ধরে। সাতটা টি বি কেস বেরিয়ে গেল, রেস্ট রুম বানানো হল না। চেয়ার-গুলোতে ছারপোকা ভর্তি। হাওড়া স্টেশন থেকে ডেলি কত আয় হয়? গড়ে দৈনিক লাখ টাকা। তাহলে বউনি সুরু হল। কাউণ্টারের বাইরে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লোক এসেছে। কিন্তু কাজ যে এখনো বাকী? খাতায় স্টেশনের নাম তুলতে হবে। গতকাল হিসেব মেলেনি। সাড়ে বারো টাকা সর্ট। হিসেবেই গোল হল, না টাকা বেশী দিয়ে দিল? চারটে টাকা চলবে বলে মনে হয় না? দশটাকার নোটটা কি 'ফোর্জ্‌ড', জাল? না 'কেমিকেলি ইরেজড্'? বার্মার নোট থেকে. বার্মা কথাটা কেমিকেল দিয়ে ঘষে তুলে দিয়েছে? টিকিটই বেচব না নোট এক্সপার্ট হব। একশ বাহান্নটা ইস্টি-শানের নাম টুকতে হবে খাতায়। পরশু ছিলাম ফরেনে, আড়াইশ'র উপর নাম লিখেছি। আজ সর্ট কিছু মেক্-আপ্ করতেই হবে। নইলে মাস গেলে আর মুখে অন্ন জুটবে না। প্রতি মাসে 'সর্ট' যায়। ছ' ঘণ্টা টিকিট বিক্রী, দু ঘণ্টা হিসেব। দু হাজার থেকে চার হাজার টাকা এক এক কাউণ্টারের আদায়। প্রতিদিন একজন লোক এত কাজ করতে পারে কখনো। লোক বাড়াও, কাউণ্টার বাড়াও, কাজ কমাও। সর্ট হবে না। কাজেই অসৎ কাজ কেউ করবে না। কাজ নাও, আরামও দাও।

কাজ কাজ কাজ। ঢেউ-এর পর কাজের ঢেউ আসে। আর অচল অটল হাওড়ার ইস্টিশান, মাথায় এক ঘড়ির তাজ পরে. বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, রিকশ্, ঘোড়ার গাড়ীর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল। অজস্র ভিড় বাড়ে, দূরের যাত্রী, লোকাল যাত্রী। মোট ঘাট। দর দস্তুর। চেঁচামেচি। বিকেল থেকে রাত্রি। দশটা তিরিশ। বর্ধমান লোকাল। শেষ ট্রেন এসে গেল। বুকিং-এ তখনো লোক। চুঁচুড়ো দিন একখানা। শ্রীরামপুর দুটো। ওতোরপাড়া আড়াইটে। দশটা পঞ্চাশ। ব্যাণ্ডেল লোকাল। দিনের শেষ ট্রেন ছেড়ে দিল। ঝিমুনি এসেছে হাওড়ার। বাস ট্রাম চলে গেছে অনেকক্ষণ। রিকশ, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী নেই। গেটে তালা পড়েছে। তখনো বুকিং ক্লার্ক তহবিল মেলাচ্ছে। দ্যাখ তো চায়ের দোকান খোলা আছে কি? খিদে পেয়েছে প্রচুর। সাড়ে এগারো, জিরো, একটা। বুকিং বাবু ক্লোজিং নম্বর লিখছেন। ঘুম আর নেই, শুধু ক্লান্তি। ঘাড় পিঠে টন্ টন্ ব্যথা। দেড়টা। হাওড়া বুকিং-এর আলো নিভলো! টাকা পয়সা জমা করে আবার সেই একাউণ্টস্ অফিসের বারান্দার টেবিল। ভাল বেঞ্চে আরেকজন এসে শুয়ে পড়েছে। তার মর্নিং ডিউটি।

রহস্য উপন্যাস

বার্মিজ মিস্ট্রি—কমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম এ। দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯।

অর্ধনগ্ন ফিরিঙ্গি মেয়ের ছবি, পিস্তল, দস্যুর ভাঁটার মত চোখ, মাথায় ফেট্টি বাঁধা—ডিটেকটিভ বই-এর যাবতীয় নোংরামি প্রচ্ছদ-পটেই পাওয়া যাবে। চমৎকার ভালো কাগজে ঝরঝরে ছাপা কাহিনীর পঞ্চম পৃষ্ঠায় পৌঁছে গ্রন্থ পাঠের বাসনা ছাড়া অন্য কোন আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে হয় না।

'যুবক যুবতীর সুখপাঠ্য ডিটেকটিভ উপন্যাস' বলে বিজ্ঞাপিত হ'লেও এটি আসলে 'অসুখপাঠ্য' বই, কারণ নিতান্ত রোগশয্যায় পড়ে না থাকলে এবং হাতের কাছে অন্য বই থাকলে কোন সুস্থমন এ বই পড়তে চাইবে না।

দেব সাহিত্য কুটীর খ্যাতনামা প্রকাশক, বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা ইচ্ছে করলে এখনো সুনাম অর্জন করতে পারেন ছোটদের জন্যে সত্যিকার সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশ করে। এক সময় করেছেনও। ৫২।৫৩

বিবিধ

আর্ট ও আহিতাগ্নি—যামিনীকান্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য বারো টাকা।

গ্রন্থকারের ভূমিকা হইতে অনুমিত হয় ১৩২৮ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "এই গ্রন্থখানিতে কাব্য ও চিত্রকলাদির ভাব ও আদর্শাত্মক আলোচনা"র অতিশয় দুরূহ, অপিচ এতদ্দেশে অতীব বিরল, উদাম দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে হইলেও পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছে যে, ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নয়। বর্তমানে সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় একটি সুলিখিত ভূমিকা যোগ করিয়া, এই গ্রন্থের মর্মে প্রবেশ করিবার পথ সাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়াছেন। এজন্য এবং শ্রমসাধ্য সম্পাদনকার্যের কারণেও বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থখানি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ হইলেও পড়িয়া দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে স্বর্গত গ্রন্থকারের বিদ্যাবত্তার ও চিন্তাশীলতার খ্যাতি ছিল। এ গ্রন্থ তাঁহার উপযুক্ত কীর্তি। বাংলা সাহিত্যে অন্য কোনো পণ্ডিত বা রসিক ব্যক্তি সাহস করিয়া, ধৈর্য ধরিয়া এরূপ অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া জানি না। এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে লেখকের ব্যাপক পাণ্ডিত্যের তথা চিন্তাশীলতার পরিচয় পরিস্ফুট। একান্ত দুরূহতার কারণ এই যে, কোনো একটি দেশের, একটি যুগের, একটি শিল্পের প্রসঙ্গে আলোচনা সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। লেখক শিল্পদর্শন আর শিল্পনিদর্শন (তাহার তো সংখ্যা নাই, প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্ত্যে, স্থাপত্যে, সংগীতে, কাব্যে, মূর্তিতে ও চিত্রে) উভয়ই একটি প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত করার ফলে রচনা যথেষ্ট সংহতি পায় নাই; দানা বাঁধে নাই; জানিবার ও বুঝিবার মুখ্য আর গৌণ বিষয়নির্বিশেষে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ায় সাধারণ পাঠক ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না; ইহার সারসংগ্রহ ঘটিয়া উঠিবে না—এই আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ। সমাজের সহিত শিল্পসৃষ্টির সম্পর্ক, বিভিন্ন শিল্পের পরস্পরনির্ভরতা, ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যের অপরিসীম মূল্য ও তাৎপর্য, শিল্পে আদর্শবাদ ও বস্তুনিষ্ঠা অর্থাৎ জীবননিষ্ঠা উভয়েরই অপরিহার্যতা গ্রন্থে আলোচিত প্রত্যেক বিষয়টি অত্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সংস্কৃতিমান্ সংস্কৃতিমুখী শিক্ষিত নরনারীর বি ধ্যান-ধারণার যোগ্য। গ্রন্থকারের স অভিমত সকলের গ্রাহ্য হইবে এমন ন কিন্তু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁ উস্কানিতে এ সকল বিষয় দেখি শুনিতে ও চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই দেশের অপরিসীম মঙ্গল হইবে।

পরিশেষে প্রকাশকের নিকট অনু না জানাইয়া পারিলাম না—গ্রন্থে মুদ্রণপ্র অত্যন্ত বেশি; মূর্তি ও চিত্রের সং কিরূপ বিচারে সম্ভবপর হইয়াছে জানা (স্থাপত্যের এবং ধাতুমূর্তির কোনো নিদ দেখা যায় না)—রচনার সহিত সেগু ভালোরূপ সম্পর্ক পাতাইয়া দিবার চে অনুপস্থিত, আর মুদ্রণ পারিপাট্যহীন অযোগ্য। সর্বোপরি হুতাশন হইতে মলাটের চেহারায়; কারণ, অর্থব্যয় হই মানি, তবু ছেলে-ভুলানো অথবা এ অল্পশিক্ষিত-নবদম্পতি-ভুলানো পুস্তকে চলে ইহাতে সে তো কিছুতেই শোভা না। যাহা হউক 'আর্ট ও আহি শিক্ষিত বাঙালীর মনোযোগ আকর্ষণ ক ইহাই প্রার্থনা করি। ১৫

পূজা-পার্বণ—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় নিধি প্রণীত। প্রকাশক—বিশ্ব ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি পৃষ্ঠা ১৭৮। মূল্য—৩৲।

ভারতবর্ষে অসংখ্য পূজা-পার্বণ আছে। স্থানভেদে ইহার ভেদ ইহা হিন্দু জাতিকে এক সূত্রে বদ্ধ ক আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে পূজা- বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সুপণ্ডিত এবং সুপরিচিত। তিনি উপনিষদ ও পুরাণাদি হইতে দে শারদোৎসব, রাসযাত্রা, শ্রীশ্রীসরস্বতী বারুণী, দশহরা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি পূজা ও পার্বণের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ক তাহাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি এবং ভা বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের কি প্রকার দেখা যায় ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পূজা-পা প্রচলনকাল অয়ন, বিষুব, তিথি হইতে গণিত জ্যোতিষের সাহায্যে হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে জ্যোতিষে ভাষার বাখ্যা ও উদাহরণ দেওয়া এই বিষয়ে বহু মতভেদ থাকায় সিদ্ধান্ত করা সম্ভব না হইলেও ইহাতে নানা তথ্য ও গবেষণার বিষয় এই গ্রন্থে দেবদেবী ও নক্ষত্রাদির চিত্র দেওয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য: শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় এম এ: এশিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ১৯, নূরমহম্মদ লেন, কলকাতা—৯: এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রসমালোচনার এই ছোট বইটি সুন্দর আর্ট পেপারে ছাপা। অনেকগুলি ছবিও মুদ্রিত হয়েছে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে এখনও তেমন আলোচনা হয়নি। বোধ হয় কোন চিত্রশিল্পীর ছবি নিয়েই হয়নি। তার কারণ হয়তো ছবিকে এখনও আমরা সাহিত্যের মত গ্রহণ করতে পারিনি। ছবি দেখার চোখ আমাদের তৈরী হয়নি এখনও। অধিকাংশের চোখেই ছবি এখনও গৃহশয্যার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিক থেকে শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। কিন্তু কেবল প্রচেষ্টাই। অসংখ্য উদ্ধৃতি সহযোগে কিছু অতি সাধারণ আলোচনা ছাড়া যৌক্তিক বিশ্লেষণসাপেক্ষ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিন্দুমাত্রও অনুপস্থিত। উক্তি কিছু আছে, কিন্তু তার সমর্থনে যুক্তির অভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ—'সারল্য রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির একটি বড় জিনিস।' তার বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত হতে পারবেন জানা নেই। ধরে নিলাম এটি রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পের বিস্তৃত আলোচনা নয়—ভূমিকা মাত্র। কিন্তু এতৎস্বত্ত্বেও আশ্বস্ত হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। ৬।৫৩

কার্ল মার্কস এন্ড বিবেকানন্দ—(ইংরাজী) শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থকার কর্তৃক ১৩৩, আপার সারকুলার রোড, ৩নং ব্লক; কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১॥০।

গ্রন্থের শিরোনামা দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম গ্রন্থকার বুঝিবা কার্ল মার্কসের সাম্যবাদ ও স্বামিজীর অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবতাবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদূর পড়িয়াই ভ্রম ভাঙ্গিল। মাঝে মাঝে নানা প্রকার উদ্ধৃতির সহিত অসংলগ্ন উচ্ছ্বাসে ভরা এই গ্রন্থের মধ্যে প্রতিপাদ্য কিছুই নাই। লেখকের কল্পনা স্বপ্নের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে কার্যকারণ সম্পর্কহীন হইয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিকগণ এই বইখানি কৌতুহলের সহিত পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট ইহা অসুস্থ ভাবাবেগের বিকৃত বিজৃম্ভন বলিয়াই মনে হইবে। ৪৪।৫৩

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

সংগীতায়ন — সুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্য, সংগীতায়ন প্রকাশনী, ১৯এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য—১৷৹। ৫০।৫৩

মানুষের মহিমা—নীলাপদ ভট্টাচার্য, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲। ৫১।৫৩

অ-নামা—অসীমানন্দ, সদ্ গ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১এম, হাজরা লেন, কলিকাতা। মূল্য—৷৷০। ৫৩।৫৩

স্মৃতিলেখা—সতোশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজসুন্দর ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৷০। ৫৪।৫৩

সেতু—আনন্দ বাগচী, সাহিত্য চক্র, ১০৫ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৷৷৵০। ৫৫।৫৩

সপ্তর্ষি—রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তিনকনিয়াপুকুর, বর্ধমান হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৵০। ৫৬।৫৩

একটি হাসির বোমা

আনন্দলাভের যতোগুলি রস আছে, তার মধ্যে লোকে সবচেয়ে মত্ত হয়ে পড়ে হাস্য রসে। তার সঙ্গে যদি থাকে ছেলে ছোকরাদের খানিকটা বেপরোয়া আদিখ্যেতা, প্রবীণ দম্পতির প্রেম ও কলহ, আর খানিকটা পরকীয়া প্রেমের ঝামেলা, তাহলে তো ছবির গল্পের চরিত্ররা যেমনি, তাদের দর্শকরাও তেমনি হুল্লোড়ে কাণ্ড বাঁধাবেই। কারণ হাসি মস্করা জমিয়ে তোলার এইগুলিই হচ্ছে সহজ এবং নির্ঘাত উপায়। এই জন্যেই এম পি প্রডাকসন্সের নতুন ছবি '৭৪৷৷' জমে উঠেছে বেশ; হাসতে হাসতে লোকের চোয়াল ধরে যাবার জোগাড়। ছবিখানি ছাড়পত্রে সর্বসাধারণের দর্শনযোগ্য বলেই অভিহিত হয়েছে, সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোটরাও যাচ্ছে দলে দলে, (অবশ্য ছাড়পত্রে 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বলে মার্কা থাকলেও অপ্রাপ্তবয়স্কারা যেতো দেখতে, কারণ মার্কা থাকলে কি হবে, তাদের প্রবেশ রোখে কে?) তারাও হাসিতে দু ঘণ্টা ধরে লুটোপুটি খেয়ে ফিরছে; কিন্তু তাই বলে ছবিখানি ঠিকভাবে বিচার করলে অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও দেখার উপযুক্ত বলতে একটু সংকোচ আসবেই।

* * *

কোন ছবি অনর্গল হাসিয়ে যেতে পারলেই সেছবি অতি নির্মল, অতি পরিচ্ছন্ন এবং তার মধ্যে যা কিছুই থাক, ছবিখানি সর্বাংশেই সর্বসাধারণের দেখবার উপযুক্ত বলে গণ্য করে নেওয়ার এক অদ্ভুত বিচারবুদ্ধির পরিচয় কলকাতার সেন্সর বোর্ড দিয়ে থাকেন। 'পাশের বাড়ী' হাসির ছবি কাজেই ওর মধ্যে কোথাও—কোন যুবককে দেখে নায়িকা যুবতীর বক্ষাবরণ স্খলিত করে দেওয়ার মতো শ্লীলতাবিরুদ্ধ দৃশ্য থাকলেও সেটা আপত্তিকর হতে পারে না। 'মাণিকজোড়'-এর ক্যাবলামীতে হাসির প্লাবন সৃষ্টি হয়, অতএব সদ্যস্নাতা তরুণীর নগ্নবক্ষ চেহারা দেখাবার দৃশ্যকে কুৎসিত বলে ধরা যায় না। তবে আপত্তিকর হতে পারে মা যদি তার শিশুপুত্রকে চুম্বন করেন আর সেই চুম্বনের আওয়াজটা হয় জোরে। যেমন হয়েছিলো 'বিন্দুর ছেলে'র বেলায়। বোধ হয় 'বিন্দুর ছেলে' হাসির ছবি না হয়ে কাঁদাবার ছবি ছিলো বলেই ওর ক্ষেত্রে ঐ রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। '৭৪৷৷' ছবিখানিও গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে অবিরাম হাসিয়ে লোককে একেবারে হাঁপিয়ে তোলে। বোধ হয় সেই কারণেই প্রাপ্তবয়স্ক আর অপ্রাপ্তবয়স্কদের কার পক্ষে কি উপযুক্ত হতে পারে না-পারে, তা নিয়ে বাচবিচারকে সেন্সর ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। গোড়াতেই সেন্সরের বিচারবৈচিত্র্যের কথা তোলা হলো বলে কেউ যেন না '৭৪৷৷'কে অনুপভোগ্য বা অতি কুৎসিৎ ছবি বলে ধারণা করে বসেন। পরন্তু ছবিখানি আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত থেকে সর্বশেষে পর্দায় মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অনর্গল প্রাণখোলা হেসে আনন্দ উপভোগ করার যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তার তুলনা

বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে মোটেই বেশী নেই। সেন্সর যে পুরোমাত্রায় খামখেয়ালীভাবে ছবির বিচার করে, তারা যে ছবির বিচারে কোন নির্ধারিত মানের ধারই ধারে না, নিজেদের ব্যক্তিগত ধারণার তুষ্টির ওপরেই নির্ভর করে তারই আরও একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেলো বলেই সেকথাটা গোড়াতেই উল্লেখ না করে পারা গেলো না। মার কেন যে '৭৪॥'কে এরই উদাহরণ রে নেওয়া হচ্ছে, এর গল্পটা থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

* * *

কলকাতার একটা বোর্ডিংয়ের বিশ-জন তরুণ থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত অবিবাহিত-দের মধ্যে এক তরুণীর আবির্ভাব নিয়ে ল্প। ছবির আরম্ভ একটি গ্রাম্য হিণীকে নিয়ে। ইনি হলেন ঐ বোর্ডিংয়ের মালিক রজনীবাবুর গৃহিণী অন্নপূর্ণা—তার নামেই বোর্ডিং। রজনী-বাবু সপ্তাহান্তে একবার করে বাড়ি যান, যতটুকু সময় থাকেন স্ত্রীর সান্নিধ্য পেতে চান একটু। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা রয়েছে চতুর্দিকে আর তার চার-দিকে ঘিরে 'এতো ছোঁকছোকানি, ঘুসুর ঘুসুর' করার জন্য রজনীবাবুর ওপর রমূর্তি হয়ে উঠেন অন্নপূর্ণা দেবী। রজনীবাবু স্ত্রীর কাছে শান্তি পেতে আসেন, বলেন, বৌ মানে গাছতলা। কিন্তু স্ত্রীর মুখঝাপটা খেয়ে কথা ঘুরিয়ে স্ত্রীকে আখ্যা দেন 'খেজুর গাছ' বলে। অন্নপূর্ণা দেবীও স্বামীকে আর কোন ছায়াওয়ালা গাছ' দেখে নেবার জন্য বলেন। রজনীবাবু রেগে কলকাতায় চলে আসেন ছায়াওয়ালা গাছের কাছে যাচ্ছেন বলে শাসিয়ে।

বোর্ডিংয়ের বিশজন বিশ রকমের। কেউ গাইয়ে, কেউ বাজিয়ে, কেউ হঠযোগী, কেউ তান্ত্রিক, কেউ ব্যায়ামবিদ, কেউ সুড়ে; প্রবীণ বয়স্কও আছেন দু একজন। এদের সবায়ের ফরমাইশ খাটবার জন্য রয়েছে মদন চাকর, আর সব যতো কথার শ্রোতা সৌদামিনী ঝি। এই হাটের হুল্লোড়ের মধ্যে এসে উঠলেন রজনী বাবুর বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বামী ও কন্যা রমলাকে নিয়ে। আগের বাড়ী-ওয়ালা তাদের উচ্ছেদ করে দেওয়ায় এই বোর্ডিংয়েই এসে উঠেছেন কাকা যদি একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন এই আশায়। প্রথমেই তো বোর্ডারদের মধ্যে হট্টগোল হলো ওদের থাকতে দেওয়া নিয়ে। গৌরিকেদার যাই হোক চেঁচামেচি করে ওদের থাকতে দেওয়ার প্রস্তাবটাই ভোটে জিতিয়ে নিলে। আবার ফ্যাসাদ বাঁধালে বড়লোকের আহ্লাদে ছেলে রাম-প্রীতি এসে। কেদারের কথায় রামপ্রীতির সঙ্গে আগেই রমলার 'টেলিফোনে কানেকশন' হয়েছিলো, অবশ্য কলহসূত্রে। রামপ্রীতি রমলাদের থাকতে দিতে রাজি নয়। আবার হৈহৈ ব্যাপার তাই নিয়ে। এবারও কেদারের দল জিতে গেলো। রমলা সটান মেয়ে। রামপ্রীতির সঙ্গে তার এখানেও কলহ হলো। রমলার মা মেয়ের হয়ে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে কেদারকে ডাকিয়ে আনালেন। কেদার তো ধন্য; রমলার মাকে সে সঙ্গে সঙ্গেই মাসীমা করে নিলে। রমলারা রয়ে গেলো। মদনের কথায় 'ভোর না হতেই রেলিং ভর্তি'—নানা ছুতোতে সবাই সার দিয়ে দাঁড়ায়, সবায়ের দৃষ্টি ওপরতলায় রমলা-দের বারান্দা পানে। রমলা পাশ দিয়ে নেমে গেলে এক একজনের এক এক ভঙ্গী, কতো ঠাট্টা টিটকারি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রামপ্রীতিকে অপমান করার জন্য রমলার মনে অনুশোচনা এলো; অবশেষে রামপ্রীতির সঙ্গে প্রথমে প্রীতি পরে প্রেম হয়ে গেলো। কেদার গিয়ে নালিশ করলে রজনীবাবুর কাছে একেবারে প্রমাণ হাতে নিয়ে—রামপ্রীতিকে লেখা রমলার প্রেমপত্র যা কেদাররা পত্রবাহক মদনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলো। দেশে যাবার তাড়ায় রজনীবাবু চিঠিখানি পকেটে নিয়েই বাড়ীতে হাজির হলেন। সে চিঠি পড়লো অন্নপূর্ণার হাতে। অন্নপূর্ণা বুঝতে পারলে রজনীবাবু যে ছায়াওয়ালা গাছের কথা বলে শাসিয়ে গিয়েছিলেন, এ তারই চিঠি। রজনীবাবু তো কলকাতায় পালিয়ে এসে বাঁচলেন। তারপর রামপ্রীতি আর রমলার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো। সেই সূত্রে রজনীবাবুর সপ্তাহ দুয়েক আর বাড়ী যাওয়া হলো না। অন্নপূর্ণার আর বুঝতে বাকী রইলো না। বোর্ডিংয়ে রজনীবাবু বিয়ের তোড়জোড় নিয়ে মেতে আছেন, আর ওদিকে অন্নপূর্ণা অন্যের পরামর্শে স্বামীকে বশ করার জন্য ওঝাকে দিয়ে বশীকরণ ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। এমন সময় গিয়ে হাজির হলো বোর্ডিংয়ে বিয়ের আয়োজনের কথা। অন্নপূর্ণা সব
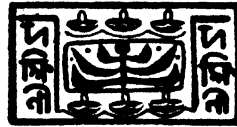
ফেলে ছুটে এলেন কলকাতায়। রজনীবাবু তখন গলায় মালা পরে বরকর্তা—ঝাঁপিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা এবং রজনীবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন বিয়ের আসর থেকে। দারুণ কেলেঙ্কারি, হট্টগোল। শেষে অবশ্য অন্নপূর্ণা আসল ব্যাপার জানতে পারলেন। তখন সব ঠাণ্ডা হলো।

* * * *

উঠোনে অন্নপূর্ণার গোবর জল ছিটানো নিয়ে ছবির আরম্ভ; তার পরের দৃশ্যে একখাট ছেলেমেয়ের মাঝে শুয়ে রজনীবাবু শিশুপুত্রটি বিছানা ভিজিয়ে কেঁদে উঠতেই রজনীবাবুর ঘুম ভেঙে তাকে 'জানোয়ারের বাচ্চা' বলে আখ্যাত করা থেকে সেই যে হাসির জোয়ার বইয়ে দেয়, মাঝে কেবল দুখানি একক গানের জায়গায় লোককে দম নেবার সামান্য একটু যা ফাঁক দেয়, নয়তো হাসির ঢেউয়ে আর কোথাও ভাঁটা পড়তে পায় না। অতিরঞ্জিত কল্পনার জোরে গুঁতিয়ে হাসানো নয়, বাঙালীর নানা ধরণের চরিত্রের কৌতুকপ্রদ স্বভাব ও চালচলনের দিককে সাজিয়ে গল্পটিকে তৈরি করা হয়েছে। এতে এমন কোন চরিত্র নেই, যাকে বাস্তবে খুঁজে পাওয়া যাবে না বা এমন কোন ঘটনাও নেই, যা বাস্তবে হয় না বা হতে পারে না বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। বিশ রকমের চরিত্র রয়েছে গল্পটিতে। কাউকে মনে হবে ন্যাকা, কাউকে ছ্যাবলা, কাউকে হয়তো ভণ্ড মনে হবে, কাউকে হয়তো ভাঁড়, কিন্তু এমন কেউ নেই বা তাদের কেউ এমন কোন কাজ করে না, যা বাস্তবের নিয়ম। বাস্তবের সঙ্গেই পূর্ণ যোগ রয়েছে বলেই হাসির প্রস্রবণটা হয়েছে বেশী সাবলীল, ছবিখানি হয়েছে উপভোগ্য।

* * * *

'৭৪॥' সাঙ্কেতিক সংখ্যাটির সঙ্গে এ ছবির বিষয়বস্তু ও ঘটনানুযায়ী নামের যোগাযোগ কিছু নেই বললেই চলে। তবে সেটা কারুরই ক্ষণেকের জন্যেও খেয়ালে আসবে না, আর এলেও কেউ গ্রাহ্যও করবে না, এমন হাসির তোড়ে সবাই শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের কতকগুলি স্বভাবকে নিয়ে ব্যঙ্গও করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রমলাদের বোর্ডিংয়ে থাকতে দেওয়া নিয়ে বোর্ডারদের প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার দৃশ্য, অনেকটা যেমন গলাবাজি তরুণদের দঙ্গলে সাধারণত হয়ে থাকে। এমনিধারা দৃশ্য আরও আছে, যাতে আমাদের স্বভাব ধরা পড়ে গেছে।

ছবিখানির একটা মস্ত গুণ হচ্ছে, সব ঘটনাই এসেছে বেশ সাবলীল ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে। কৃত্রিমতাও কোথাও দেখা যায় না। ছবিখানি উপভোগ করা আরও অনিবার্য করে তুলেছেন এর অভিনয় শিল্পীর দঙ্গল। তাদের অধিকাংশই হলেন জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা, যাদের কাউকে একা দেখলেই লোক উল্লসিত হয়ে ওঠে; এখানে আবার তারা রয়েছেন ডজন ভরে। আর ভাবগম্ভীর চরিত্র অভিনয় করেন তাদেরও এতে এমন চরিত্রে এমন বেশে এবং এমন ঘটনার মধ্যে হাজির করা হয়েছে যে তারাও কৌতুকাভিনেতার দলই পুষ্ট করেছেন। কেউ কেউ তাদের ছাপিয়েও গিয়েছেন, যেমন অন্নপূর্ণার ভূমিকায় মলিনা দেবী। বস্তুত এ ছবিখানির মধ্যে মলিনা দেবী তার বহুমুখী একটি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এক টাইপ চরিত্রকে এমন বাস্তব করে তুলেছেন যা মনে থাকবে বহুকাল। রাজনীবাবু রাগ করে চলে যেতে অন্নপূর্ণার সেই কাঁদ কাঁদ ভাব; রজনীবাবুকে তুষ্ট করার জন্য বুড়ো বয়সে সাজগোজ করে মন ভোলানো ঢঙ; রজনীবাবু বিয়ে করছে মনে করে বোর্ডিংয়ে এসে তার হৈ-হৈ কাণ্ড এখনও মনে করলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। অবশ্য তার জুড়ী রজনীবাবুর ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তীও বড়ো কম যাননি। ছবির গোড়াতেই ছেলের কান্নায় ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ব্যাজার হয়ে নিজের ছেলেকেই জানোয়ারের বাচ্চা বলে অভিহিত করে প্রথম হাসির বোমাটা তো তিনিই বিস্ফোরিত করে দেন। তারপর তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে আর কেই বা পাল্লা দিতে পারে, আর তাকে রোকেই বা কে!

* * * *

ছবিতে সবচেয়ে বিধ্বংসী বোমাটি কিন্তু ছাড়েন কেদারের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপ্রীতি টেলিফোনে মেয়েলী গলার সঙ্গে ঝগড়ার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতেই কেদার যেই বলে ওঠে "তুমি তো হালায় আগেই টেলিফোনে কানেকশন কইরা নিছ"—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সারা প্রেক্ষাগৃহে দাপাদাপি শুরু হয়। এর পর ভানুই হয়ে রইলেন দর্শকদের প্রধান লক্ষ্য। রমলার মায়ের আমন্ত্রণে তার কৃতার্থবোধ; রামপ্রীতির রমলার দিকে গতিবিধি লক্ষ্য করা দর্শকদের প্রায় আসনচ্যুত করে দেয়। অবশ্য দলের সর্দার হওয়ার সুযোগটাও ছিলো তার পক্ষে।

আর যাদের দেখলে বা কথাবার্তা শুনলে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে আসে তাদের দলে রয়েছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যাম লাহা, রঞ্জিৎ রায়, নবদ্বীপ ও হরিধন। এদের দলকে আরও পুষ্ট করেছেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, গুরুদাস, গোকুল মুখোপাধ্যায়, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এতে নায়ক রামপ্রীতি ও নায়িকা রমলার ভূমিকায় রয়েছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। উত্তমকুমার সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয়ে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন, আর সুচিত্রা সেনকেও সুস্বাগতম জানাবার প্রকৃত সুযোগ পাওয়া গেলো এ ছবি-খানিতে।

* * * *

গান আছে তিনখানি। প্রথমখানি তো কোরাসে মেসের ছেলেদের হুল্লোড়, কিন্তু উপভোগ্য বেশ এবং জমেও। আর দুখানি গানও ভালো এবং হাসির একটানা প্রবাহে দর্শকদের একটু হাঁফ ছাড়ার অবকাশ এনে দেয়। সঙ্গীত পরিচালনায় কালিপদ সেনের কাজ আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছে। কলাকৌশলের দিক সাধারণ। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন নির্মল দে। "বসু পরিবার"-এর পর তাঁর নাম আরও বাড়িয়ে দেবার মতো কৃতিত্ব ফুটেছে এতে। বাঙলা চিত্রশিল্পের একটি উপভোগ্য ও জনপ্রিয় অবদানের স্রষ্টা হিসেবে তিনি অভিনন্দন লাভ করবেন।

খেলার মাঠে

হকি

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত হকি লীগ প্রতিযোগিতার খেলা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় কোন দল কোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইবে অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা লইয়া গবেষণা বা আলোচনার কোনই যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এইবারে কলিকাতা মাঠে বিভিন্ন বিশিষ্ট হকি দলের খেলার ফলাফল লইয়া দর্শকগণের মধ্যে যেরূপ প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হইতেছে, ইতিপূর্বে কখনও তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহার পরিণাম হিসাবে খেলার মাঠে বিভিন্ন দিনে ফুটবল মরসুমের ন্যায় বহু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিতেছে। ইহাতে এইটুকু অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, হকি খেলা সম্পর্কে বাঙলার সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা খুবই সুখের বিষয়, তবে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা কোনরূপেই বরদাস্ত করা চলে না। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহার জন্য বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকদের তাহাদের সমর্থকদের সংযত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধের ফল কিছুটা হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্থার পরিবর্তন করে নাই বা করিতে পারে না। ইহার জন্য দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও প্রকৃত ক্রীড়াসুলভ মনোবৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষা কেবল খেলার মাঠে দিলে হইবে না। সংসারের আবেষ্টনীর মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠে সকল স্থানেই শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা যদি কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবেই দেখা যাইবে খেলার মাঠে, স্কুলে, কলেজে, সামাজিক অনুষ্ঠানে উচ্ছৃংখলতা বলিতে কিছুই নাই। জানি না ইহা কবে আমাদের দেশে বাস্তবরূপ ধারণ করিবে।

ইহার প্রধান কারণ কি?

প্রকৃত খেলার উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুতিই এই শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ। খেলা কি জন্য সৃষ্টি এবং কি ইহার প্রধান লক্ষ্য, তাহা আমাদের দেশের ক্রীড়া পরিচালকগণ এমন কি সাধারণ দর্শকগণের শতকরা ৯৯ জনই জানেন না বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। দল জয়ী হইবে ইহাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার জন্য পরিচালকগণও সমর্থকদের চাপে বহু কার্যে ব্রতী হন, যাহা হয়তো তাঁহার অন্তরআত্মা পর্যন্ত বিরোধিতা করে। এমন সকল কার্য ইহারা করিয়া থাকেন, যাহা সাধারণ সমাজ জীবনে করিলে আইন অনুসারে দন্ডনীয় হইতে পারিতেন। দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য দেশ বিদেশ হইতে খেলোয়াড় আমদানী করা, অপর দলের আমদানী খেলোয়াড়কে অর্থের লোভের দ্বারা বা নানা প্রকার প্রলোভনের বশবর্তী করিয়া রাতারাতি অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত করা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ রাখা প্রভৃতি বহু জঘন্য কার্য, যাহা এতদিন বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা বর্তমানে হকি পরিচালকদেরও সংক্রামিত করিয়াছে। বাসিন্দা প্রমাণিত করিবার জন্য তিন চারি মাসের পূর্বের রেশন কার্ড প্রবর্তনও এইবারে এই সকল লোক দ্বারা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াও জানা গিয়াছে। এই সকল সংবাদ শুনিলে সত্যই মনে হয়, খেলার মাঠের আর কোনই পবিত্রতা নাই। ইহা দুস্কৃতির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন খেলোয়াড়গণই বা কেন এই সকল কার্যে এই সকল পরিচালকদের সাহায্য করেন? উত্তরে বলা চলে—না করিয়া উপায় নাই। চিরকালের অবহেলিত আর্থিক দুরবস্থায় নিপীড়িত খেলোয়াড়গণকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ইহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইতে বাধ্য হইতে হয়। সমাজ বা রাষ্ট্র ইহাদের এই পর্যন্ত কোনরূপ সাহায্য করে নাই। ক্রীড়াকৌশলের সাফল্যেই কেবল 'বাহবা' দিয়াছে।

বাবুর স্পষ্ট উক্তি

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের অধিনায়ক কে ডি সিং বা বাবু এই সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে স্পষ্টই খেলোয়াড়দের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'এই দেশের খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। তাহাদের অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানের কোনই পথ নাই। দেশের খেলোয়াড়দের জীবনধারণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য আমি হকি খেলোয়াড়দের একটি সংঘ গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছি।' এই উক্তি তিনি নিজে অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বলিতে সাহসী হইতেছেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের খেলোয়াড়। সেই উত্তরপ্রদেশে এমন কোন ব্যবস্থা নাই, যাহাতে তিনিও তাঁহার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন। এই জন্য তিনি কলিকাতার মাঠে কোন এক বিশিষ্ট দলে খেলিয়া অর্থ সংস্থানের জন্যই আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কড়া অনুশাসনের জন্য তাঁহার খেলিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবার মত অবস্থা হইয়াছে। এমন কি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যে সকল খেলোয়াড় কলিকাতার মাঠে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই অবস্থা ঐ একইরূপ দাঁড়াইয়াছে। বিপর্যস্ত অসহায় অবস্থায় কাহারই ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না। বাবুরও তাহাই হইয়াছে। তিনি সেই জন্যই কলিকাতায় কেন আসিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই উক্তির মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাঙলার বাহিরের যতগুলি হকি খেলোয়াড় আসিয়াছেন, ইহারা সকলেই ঐ একই পথের পথিক। ইহা সকলেই জানে। ফুটবল খেলোয়াড়গণও যে বাঙলার বাহির হইতে এই জনাই আসেন, ইহাও কাহারও অজানিত নাই। তবে ইহা প্রকাশ্যে বলা হয় না কেবল আন্তর্জাতিক এমেচার আইনের কড়াকড়ির জন্য। বিশেষ করিয়া কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে পেশাদার খেলোয়াড় এ্যাথলীটের যোগদান একেবারেই নিষিদ্ধ এই জন্যই এত গোপনীয়তা। কিন্তু যাহা স[illegible] যাহা বাস্তব, তাহা অস্বীকার করিয়া [illegible] কি? এই সমস্যা কেবল বাঙলা তথা ভার[illegible] দেখা দিয়াছে, তাহা নহে সকল দেশেই দে[illegible] দিয়াছে। সেই জন্যই পেশাদার ও এমেচা[illegible] উভয় যাহাতে একই পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে তাহার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। একদিন হয়[illegible] আসিবে, যখন ইহা সকল দেশেই আত্মপ্রকাশে[illegible] সুযোগ পাইবে। সেদিনের জন্য খুব বেশ[illegible] দিন অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়া ম[illegible] হয় না।

ভারত হকি খেলায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী

ভারত ১৯২৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত হকি খেলায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হইয়া আছে। এই খ্যাতি ও সুনাম অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের অসন্তোষ দূরীকরণের ব্যবস্থা না হইলে ভবিষ্যৎ ফল কখনও [illegible] হইতে পারে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যাহা করণীয়, তাহা নির্দেশ দিবার মত শক্তি আমাদের নাই। দেশের রাষ্ট্রনায়কগণকেই চিন্তা করিতে বলি।

লীগ প্রতিযোগিতায় তীব্রতা

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের খেলায় এইবারে খুবই তীব্রতা অনুভূত হইবে। বিশেষ করিয়া প্রথম ডিভিসনের যোগদানকারী দলের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সকল দলকে চ্যাম্পিয়ান হইতে রীতিমত লড়িতে হইবে। এই বিষয় বর্তমানে ভবানীপুর ক্লাবই অগ্রণী সন্দেহ নাই তবে [illegible] রক্ষা করিতে পারিবে এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে করা যায় না। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব স্পোর্টস, রাজস্থান, কাষ্টমস প্রভৃতি দলের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। নিম্নে লীগ খেলার বর্তমান অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

লীগে কাহার কিরূপ স্থান

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	পক্ষেঃ	বিঃ	পঃ
ভবানীপুর	৭	৬	১	০	১৬	৩	১৩
পাঞ্জাব স্পোর্টস	৭	৪	১	২	১৪	৪	৯
রাজস্থান	৪	৩	১	০	১১	২	৭
ইষ্টবেঙ্গল	৪	৩	১	০	১০	৩	৭
রেঞ্জার্স	৬	৩	১	২	৮	৮	৭
মোহনবাগান	৪	৩	০	১	১২	৩	৬
কাষ্টমস	৪	২	২	০	৭	২	৬
এরিয়ান	৩	৩	০	০	৬	৩	৬
মহঃ স্পোর্টিং	৪	২	১	১	৮	১	৫
ডালহৌসী	৫	২	১	২	৪	৬	৫
গ্রীয়ার	৩	২	০	১	৭	৪	৪
মেসারার্স	৫	১	২	২	৯	১০	৪
আর্মেনিয়ান্স	৪	১	২	১	৩	৪	৪
আর্মি পুলিশ	৪	০	২	২	৫	৮	২
পুলিশ	৫	১	০	৪	৬	১১	২
ষ্টিঃ জিঃ প্রেস	৫	১	৩	১	১	১৩	২
পোর্ট কমিশনার্স	৫	১	০	৪	৩	১৭	২
কালীঘাট	৪	০	১	৩	২	১০	১
সেণ্ট জোসেফস	৭	০	০	৬	৩	১৬	০
জোপা	২	০	০	২	০	৮	০

ক্রিকেট

বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ম পরিষদের সভ্য শ্রী ডি পি থানাওয়ালা কিছু দিন হইতেই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিতেছেন। ইহার ঠিক কারণ কি তাহা তিনিই জানেন। তবে সম্প্রতি তিনি বোর্ডের সভায় কেন যোগদান করিবেন না, তাহার প্রসঙ্গে যে সকল অভিযোগ উল্লেখ করেন, তাহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল দিল্লী বোর্ডের সভায় শ্রীযুত থানাওয়ালার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইবে, কিন্তু তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া গেল না দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হইল। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন, 'বোর্ডের খুব কম কার্যকলাপই আইনসঙ্গতভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। অন্তর্ভুক্ত এসোসিয়েশনসমূহ পর্যন্ত সকল কিছু জানিতে পারে না। যেরূপ আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ হইয়া থাকে, তাহাই যদি চলিতে দেওয়াই হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে তাহার ভিতরে থাকিয়া ঐ সকলের সহিত জড়িত হওয়া অপেক্ষা বাহিরে থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যাল বাঙলা বনাম মহীশূর দলের খেলা কলিকাতায় ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ও ১লা মার্চ হইবে স্থির হইয়াছে। ইহা রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা উপসমিতির ন্যায্য অধিকারের চরম উপেক্ষার নিদর্শন। আইন অনুসারে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সেমিফাইন্যাল অথবা ফাইন্যালের খেলা স্থির করিবে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উপ-সমিতি। আমি ঐ উপ-সমিতির সভ্য। আমার সহিত ঐ বিষয় কোন আলোচনা করা হয় নাই। ২২শে ফেব্রুয়ারীর দিল্লীর বোর্ডের সভায় যে সকল বিষয় আলোচনা হইবে, সেই সম্পর্কে কোন কাগজ-পত্রই আমার হস্তগত হয় নাই। আমি ও আমার এসোসিয়েশন উহা লইয়া যে আলোচনা করিব, তাহার সুযোগই পাইলাম না এইরূপ অবস্থায় আমি সভায় না যোগদান করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছি।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ইহা যে কেবল তাহারই অভিমত তাহা নহে, অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ এসোসিয়েশনেরই মত।' এই সকল অভিযোগ-পূর্ণ উক্তির কোনরূপ আলোচনা না হওয়ায় সাধারণতঃ মনে হয় 'মৌনম সম্মতি লক্ষণম', অর্থাৎ অভিযোগ সত্য; কিছু বলিলে আরও অধিক প্রকাশ পাইবে। সুতরাং চুপচাপ থাকাই যুক্তিসঙ্গত। ইহা যদি সাধারণের ধারণা হয় অন্যায় হইবে না। শ্রী ডি পি থানা-ওয়ালাও ইহার পর যে চুপচাপ থাকিবেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, ইহার পর তিনি অন্যভাবে দ্বন্দ্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। ইহা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। তবে এটা ঠিক শ্রীযুত থানাওয়ালাকে পরবর্তী সাধারণ সভার পর আর বোর্ডের সভ্য দেখা যাইবে না। সমালোচকদের দূরী-করণ বিষয়ে কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ণধারগণ খুবই পটু।

বিজয়নগরের মহারাজকুমারের বেতার বিবরণী

বিজয়নগরের মহারাজকুমারের বেতার বিবরণী সম্পর্কে পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অধিনায়কদের সুখ্যাতিপূর্ণ পত্র বোর্ডের সভায় আলোচিত হইতে দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন, কিন্তু আমরা হই নাই। কারণ আমরা জানি ইতিপূর্বেই বিজয়নগরের মহারাজকুমারের বেতার বিবরণী সম্পর্কে বহু সমালোচনা হইয়াছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট পর্যন্ত পরোক্ষভাবে বেতার কেন্দ্র পরিচালকদের ঐ শ্রেণীর লোকদের খেলার বিবরণী প্রচার হইতে নিবৃত্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি এতদূরও বলিয়াছেন, যদি উহা বন্ধ না করা হয়, তাহা হইলে সারা ভারতে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করিবার জন্য তিনিই নিজে অবতীর্ণ হইবেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে কত যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ অবস্থায় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ণধারদের সর্বাপেক্ষা সমর্থক বিজয়নগরের মহারাজকুমারের সুখ্যাতি বোর্ড হইতে প্রচারিত না হইলে চলিবে কেন? বোর্ডের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের ইহাতে মত পরি-বর্তনের কোনই সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ড ভ্রমণের রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড ভ্রমণের রিপোর্ট ও আয়-ব্যয় অডিট হইবার পরও কেন যে বোর্ড সাধারণ সমক্ষে প্রকাশে বিলম্ব করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ উপ-সমিতির আলোচনার জন্য স্থগিত রাখিলেন, ইহা সাধারণের অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তবে দুর্মুখ লোকেরা বলিতেছেন, এখনও হিসাবে অনেক গলদ আছে। উহা সংশোধন হওয়া যে প্রয়োজন আছে। ইহা যদি সত্য হয়, খুবই পরিতাপের বিষয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে আর্থিক ঘাটতি

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ৪০ হাজা টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভ্রমণ কর্মসূচী এখনও শেষ হয় নাই, সুতরাং এই পরিমাপ এখনও অনুমান হিসাবেই গৃহীত হইবে।

পাঁচজন খেলোয়াড়ের পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড হোল-কারের তিনজন ও বাঙলার দুইজন খেলোয়াড়কে পেশাদার হিসাবে ল্যাংকাসায়ার লীগ ক্রিকেটের খেলায় যোগদানের অনুমতি দিয়াছেন। অনুমতিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের নাম যথাক্রমেঃ—(১) বি ডি ধানওয়াড়ে (হোল-কার), (২) অর্জুন নাইডু (হোলকার), (৩) নিভ সরকার (হোলকার), (৪) বি ফ্রাঙ্ক (বাঙলা), (৫) এস কে গিরিধারী (বাঙলা)।

ইতিপূর্বে ল্যাংকাসায়ার লীগ ক্রিকেটে পেশাদার হিসাবে 'অমর সিং, অমরনাথ, বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, সি এস নাইডু, পি উমরিগার, ডি ফাদকার, এস ব্যানার্জি (মণ্টু), গুল মহম্মদ, জি এস রামচাঁদ, বি বি নিম্বলকার প্রভৃতি বহু ভারতীয় খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কোনই নূতনত্ব নাই। তবে আশ্চর্য হইতে হইয়াছে, বিজয় হাজারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে পেশাদার হিসাবে গণ্য হইবার আবেদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করায়। ভ্রমণ উপ-সমিতি ইহার কি বিবেচনা করিবেন ধারণাতীত। যে অর্থ দিতে হইবে, তাহা বোর্ডকেই দিতে হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাহার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত হইত।

বোর্ডের ব্যাজ পরিধানের আইন

বিজয় মার্চেণ্ট সর্বপ্রথমে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের প্রতীক অপব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দেন যে, বোর্ডের সহকারী সম্পাদক যাঁহার ইংলণ্ড ভ্রমণকারী দলের সহিত কোনই সম্পর্ক ছিল না, তিনি কেন উহা ব্যবহার করেন ও খেলোয়াড়দের পূর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি-দের সহিত পরিচিত ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন। ইহার পর বোর্ড ব্যাজ পরিধান সম্পর্কে যে আইন করিয়াছেন, তাহা অপ-ব্যবহারের পথ রোধ করিবে বলিয়া মনে হয় না। বৈদেশিক ভ্রমণকারী দলের খেলোয়াড়গণ ও ভারতীয় টেস্ট দলের খেলোয়াড়গণ পূর্ণ প্রতীক ব্যবহার করিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ—

১৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাজ্যপরিষদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক সময়ে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, যাঁহারা যুদ্ধ সমর্থন করেন না, যাঁহারা শান্তি চান এবং কোন সামরিক শক্তিগোষ্ঠীতেই যোগ দিবার ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, এরূপ যত অধিক সংখ্যক সম্ভব দেশ লইয়া একটি 'তৃতীয়াঞ্চল গঠন' শান্তির পথে সহায়ক হইতে পারে। তিনি বলেন, এই তৃতীয়াঞ্চল কোন তৃতীয় রাষ্ট্র-গোষ্ঠী বা সামরিক শক্তিগোষ্ঠী হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য রাজ্য বিধান সভায় রাজ্য সরকারের আগামী বৎসরের (১৯৫৩-৫৪ সালের) বাজেট পেশ করেন। উহাতে রাজ্য সরকারের রাজস্ব খাতে আগামী বৎসর মোট ৫ কোটি ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ঘাটতি দেখা যায়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—জমিদারী উচ্ছেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল যে কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, সেই কমিটি জমিদারী উচ্ছেদের জন্য জমির মালিকগণকে জমির আয়ের সর্বাধিক ১৫ গুণ এবং সর্বনিম্ন ৪ গুণ ক্ষতি পূরণের সুপারিশ করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সরকারী বিলসমূহের আলোচাকালে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব (সংশোধন) বিল গৃহীত হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—চারদিন ব্যাপী বিতর্কের পর রাষ্ট্রপতির ভাষণে বর্ণিত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি অদ্য লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতার পর বিপুল ভোটাধিক্যে অনুমোদিত হয়।

ভারতের রেলওয়ে ও পরিবহন মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী অদ্য লোকসভায় ১৯৫৩-৫৪ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়া বলেন, গত মে মাসে অনুমান করা গিয়াছিল যে, ১৯৫২-৫৩ সালে ২৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু পরবর্তী কালে হিসাব করিয়া দেখা যায়, ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ পূর্বে অনুমান অপেক্ষা ১৪ কোটি টাকা কম উদ্বৃত্ত হইবে। রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, আলোচ্য বৎসরে ১২টি নূতন রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হইবে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার সংশোধন বিলটি গৃহীত হয়। এই বিলের দ্বারা প্রধানত বর্গাদার চাষীকে জমি হইতে উচ্ছেদ করার সর্ত কঠোরতর এবং অন্যায় ভাবে উচ্ছেদীকৃত বর্গাদারকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা বিধিভূত করা হইয়াছে।

গত দুই মাসে মাদ্রাজে সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কার্যে নিযুক্ত ৩,৮৫০ জন কর্মচারীকে ছাটাই করা হইয়াছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী— অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মোট চারিটি বিল গৃহীত হয়। অতঃপর গঙ্গাসাগর মেলা বিলটি (১৯৫৩) উত্থাপিত হইলে সরকার পক্ষকে বিরোধী-পক্ষের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। তীর্থযাত্রীদের উপর কর ধার্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তীর্থযাত্রীদের উপর প্রস্তাবিত ঐ করকে 'জিজিয়া করের' ন্যায় অন্যায় বলিয়া অভিহিত করেন।

অদ্য লোকসভায় ১৯৫২-৫৩ সালের জন্য মোট ৪৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার অধিক অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী গৃহীত হয়। রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময়ে লণ্ডনে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তর যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে যাহা ব্যয় হইবে, তাহার আংশিক ঐ বরাদ্দ হইতে নির্বাহ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় সভায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী—ভারত পাকিস্থানকে খালের জল সরবরাহ হইতে বঞ্চিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছে, এই অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্থানে যে নূতনভাবে ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেন। শ্রীনেহরু লোকসভায় বলেন যে, ভারত ইচ্ছাপূর্বক পাকিস্থানকে খালের জল সরবরাহ হইতে বঞ্চিত করে নাই কিম্বা ঐরূপ করিবার ইচ্ছাও তাহার নাই।

অদ্য অপরাহ্নে আলীপুর কালেক্টরেটের নাজিরের অফিস হইতে আলীপুর নেজারতের ৭,২৯৯, টাকা ভর্তি একটি বাক্স রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। এই দিন দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে এক দুর্বৃত্তদল হাওড়ায় এক সশস্ত্র ডাকাতি করিবার সময় জনসাধারণ ও পুলিশের চেষ্টায় তিনজন দুর্বৃত্ত হাতেনাতে ধরা পড়ে।

অদ্য লোকসভায় বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি পরিচালন (সংশোধন) বিলটি গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বাস্তুত্যাগেচ্ছুদের সম্পর্কে ব্যবস্থাসমূহ বাতিল করা হইয়াছে এবং বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়কের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ১,১৪৭ ফুট দীর্ঘ তিলাইয়া বাঁদ এবং তিলাইয়া হইতে ৮২ মাইল দূরবর্তী বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। শ্রী নেহরু এই নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নবীন ভারত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন।

পেপসুর মুখ্যমন্ত্রী সর্দার জ্ঞান সিং রারেওয়ালা এবং শ্রমমন্ত্রী সর্দার মিহান সিং গিলের নির্বাচন বাতিল বলিয়া আজ নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল ঘোষণা করিয়াছেন।

খুলনার (পূর্ববঙ্গ) সংবাদে প্রকাশ, বর্তমান সপ্তাহের প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম পাট কেন্দ্র দৌলতপুরের চারটি গুদামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু জামসেদপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিলাইয়া বাঁধ ও বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র উদ্বোধনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দামোদর উপত্যকায় ভারতের পুনর্জন্ম লাভ হইতেছে। এই পরিকল্পনা দ্বারা দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে।

কেন্দ্রীয় উৎপাদন মন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডী অদ্য যাদবপুরে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র নির্মাণ কারখানার (ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরীর) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বিদেশী সংবাদ—

১৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য উত্তর জাপ হক্কাইডোর আকাশে রুশ নির্মিত দুই জঙ্গী বিমান লক্ষ্য করিয়া দুইটি মা জেট চালিত জঙ্গী বিমান হইতে গুলী হয় বলিয়া মার্কিন বিমান বা জানাইয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনের ওয়াকিব মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি সামরিক সংযোগ সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ওয়াশি পঞ্চশক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—মস্কোতে নব ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী কে পি এস গতকল্য রাত্রিতে মার্শাল স্ট্যালিনের স সাক্ষাৎ করেন এবং ৩০ মিনিটকাল তা সহিত আলোচনা করেন। মার্শাল স্ট্যালি সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা তাহা প্রকাশ করিতে শ্রীমেনন অস্বী করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী—রেঙ্গুনের এক সং বলা হইয়াছে যে, চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত হই ৩২ মাইল দূরবর্তী যুনানের ওয়ান্টি শ অবস্থিত চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদলের স জাতীয়তাবাদী চীনা সেনাদলের সংঘর্ষ হ গিয়াছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—নয়া চীনের সং প্রতিষ্ঠান অদ্য এই বলিয়া অভিযোগ করিয় যে, ৩৮ হাজার উত্তর কোরিয়ান যুদ্ধ বন্দী দক্ষিণ কোরিয়ান বাহিনীতে নিযুক্ত থাকি যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদফটো: ফুলের স্বর্গ: শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

দোল সংখ্যা
কথাসাহিত্য
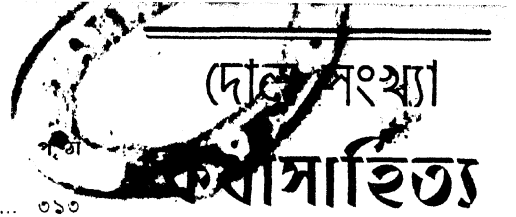
বিচিত্র রচনাসম্ভারে পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে—

—ঃ এ সংখ্যার লেখকগণ ঃ—

কুমুদরঞ্জন মল্লিক
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
কালিদাস রায়, কবিশেখর
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অপূর্ব্বমণি দত্ত
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বাণী রায়
গোপাল ভৌমিক
রণজিৎকুমার সেন
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
সুমথনাথ ঘোষ
প্রমথনাথ বিশী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সন্তোষ দে
গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
বিরিঞ্চি বাবা
অখিল নিয়োগী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

●

মূল্য কিন্তু বাড়ে নাই—ছ' আনা।
সডাক বার্ষিক মূল্য চার টাকা
— প্রতি সংখ্যা ছ' আনা —

●

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
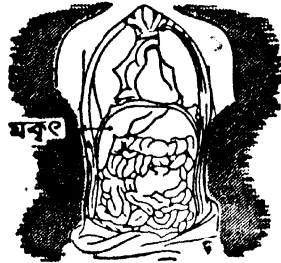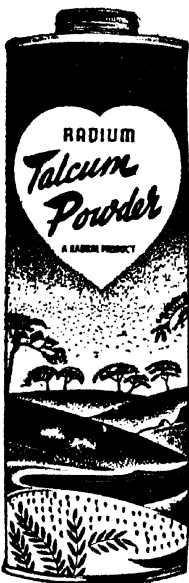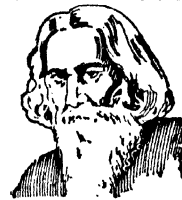
২০শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

দেশ

শনিবার
২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৯

DESH

Saturday, 7th March, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

রলোকে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

গত ১৭ই ফাল্গুন, রবিবার বলা এক ঘটিকার সময় কলিকাতার ময়র শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুত চন্দ্র বহুদিন হইতে হৃৎরোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, বুধবার হইতেই তাঁহার অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। বাঙলার বিগত ত্রিশ বৎসরের অধিক কালের রাজনীতিক সাধনার সঙ্গে শ্রীযুত চন্দ্রের স্মৃতি বহুভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। স্বরাজ্য দলের আমল হইতে রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে যে পঞ্চ কর্তৃত্বের প্রভুত্ব প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়, শ্রীযুত চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে শ্রীযুত চন্দ্রের রাজনীতিক জীবনের সূচনা ঘটে। তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করাতে তিনি তৎকালে বাঙলা দেশে সকলের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রীযুত চন্দ্র কিছু দিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯১৫ হইতে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার, ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রায় দশ বৎসরকাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ১০ই এপ্রিল শ্রীযুত চন্দ্র কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের অল্ডারম্যান এবং ১লা মে মেয়র নির্বাচিত হন। শ্রীযুত চন্দ্রের প্রতি তাঁহার দেশবাসীর ইহাই শেষ সম্মান। রাজনীতি

ছাড়া দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এবং জনসেবার দিকে শ্রীযুত চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি দীর্ঘদিন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন এবং চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল পরিচালন-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নিঃস্ব হিতৈষণী সভা এবং আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি পদে বৃত হন। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুত চন্দ্র অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। দর্শন, অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীত, কলা-বিদ্যা, সাহিত্য এসব ক্ষেত্রেই তিনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। গল্প ও আলোচনা জমাইয়া তুলিবার তাঁহার অনুপম বাক্‌পটুতা ছিল। প্রত্যুত আলাপে, ব্যবহারে, সৌজন্যে তিনি আদর্শ বাঙালী ছিলেন। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার এবং ক্ষমতা লোভের মালিন্য-মুক্ত হৃদয় লইয়া তিনি অকলঙ্ক, শুভ্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙালী একটি খাঁটি মানুষ হারাইল। তাঁহার মধুর চরিত্রের বিবিধ গুণরাজী স্মরণ করিয়া আমরা শোকার্তচিত্তে তাঁহার সহধর্মিণী, পুত্র-কন্যাগণ এবং অগণিত বন্ধুমণ্ডলীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারত সরকারের বাজেট

ভারত সরকারের বাজেটের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপরই সব রকমে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অর্থ-সচিব শ্রীযুত দেশমুখ পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ীই প্রধানত তাঁহার নিজের নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। এই ধারাটি নূতন। সাধারণত অর্থসচিবই রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে

এ-তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ অনেকটা অবান্তর। মোটামুটিভাবে এই কথা বলা চলে যে, ভারত সরকারের বর্তমান বৎসরের বাজেটে কতকগুলি নীতি জন-সাধারণের সমর্থন লাভ করিবে। এই সম্বন্ধে আয়কর সম্পর্কিত ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নূতন বৎসরের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়ের উপর ৪২ শত টাকা পর্যন্ত কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না, পূর্বে এই পরিমাণ ৩৬ শত পর্যন্ত ছিল। পূর্বে হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের বাৎসরিক ৭২ শত টাকার উপরে ট্যাক্স দিতে হইত, ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া ৮৪ শত টাকা করা হইয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আয়কর হইতে এইভাবে কিছু রেহাই পাইয়া নিশ্চয়ই আশ্বস্তি লাভ করিবেন। বর্তমান বাজেটে পাটের উপর হইতে রপ্তানি শুল্কের হার হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাহিরের বাজারে পাটের কাটতির পক্ষে সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। পার্শেল, রেজেস্ট্রী এবং ইন্সিওরেন্সের উপর ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি করা সমীচীন হয় নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ধনীদের সৌখীন বস্ত্র, প্রসাধন দ্রব্য, মোটরগাড়ি প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বাড়ানোতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু ডাক-মাশুলের হার এইভাবে বৃদ্ধি করাতে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের উপরই চাপটা বেশি গিয়া পড়িবে। ইহার ফলে আয়-কর হইতে রেহাই পাইবার ষোল আনা সুবিধা কার্যতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভোগে আসিবে না। পেনিসিলিন প্রভৃতি কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধের এবং শিশু ও রোগীর দুগ্ধজাত পথ্যের উপর হইতে শুল্ক হ্রাস করা খুবই সঙ্গত হইয়াছে। অর্থ-সচিবের একটি ঘোষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ট্যাক্স নির্ধারণের নীতি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইবে, ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারত সরকারের ট্যাক্স নির্ধারণ নীতিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর গুরুতর রকমের অবিচার করা হইতেছে, একদল ক্রমাগত এই অভিযোগ উত্থাপন করেন; পক্ষান্তরে অপর এক-দলের এই বিশ্বাস যে, সরকার ধনী ব্যবসায়ীদেরই দিকে টানিয়া নিজেদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে, কয়েকজন আদর্শনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী, এমনকি, আচার্য বিনোবা ভাবেজীর ন্যায় সাধু পুরুষও এই শেষোক্ত মত সমর্থনও করেন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সাহায্যে এই বিষয়ে বিচার করিবার জন্য এই তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হইতেছে। ডাঃ জন মাথাই এই কমিশনের সভাপতিত্ব করিবেন। বলা বাহুল্য, এই কমিটির তদন্ত কার্যের প্রতি জনসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ উদ্দীপ্ত থাকিবে এবং আশা করা যায়, লোকের মনের সন্দেহ-সংশয় নিরাকরণে কমিটির তদন্ত-ফল বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। এইরূপ একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল; অর্থসচিব এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শিক্ষকদের দাবী

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক এবং উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহের প্রায় দুই হাজার শিক্ষক গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সম্মুখে গিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে নিজেদের দুঃখের কথা নিবেদন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হন। তাঁহার এই কাজে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা স্বাভাবিক। এদেশের শিক্ষকেরা বস্তুত অফিসের দারোয়ান-বেয়ারাদের চেয়েও আর্থিক হিসাবে হীনদশাপন্ন। অধিকন্তু ইঁহাদের দাবীর মধ্যে অযৌক্তিকতাও কিছু ছিল না। মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে ইঁহাদের শুধু বক্তব্য ইহাই ছিল যে, মাধ্যমিক শিক্ষকেরা তাঁহাদের যে হারে বেতন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, সেই হারে অবিলম্বে তাঁহাদের বেতন দেওয়া হউক এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-গুলিতে প্রস্তাবিত হারে শিক্ষকেরা যাহাতে বেতন পান, সেজন্য বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হউক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যদি ইঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিতেন, তবে পশ্চিমবঙ্গে এমন কি যে বিপর্যয় ঘটিত, আমরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাভাবের যুক্তি এ পক্ষে আছে; কিন্তু শিক্ষকদের দাবীও এমন বেশি কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হইলে বিপন্ন শিক্ষক সমাজের দুর্গতির অন্তত আংশিক প্রতীকার যে না করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে আন্তরিকতারই অভাব। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্দশা দূর করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের বাজেট-ব্যবস্থায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যত কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের জন্য তোড়জোড় বাড়ানো হইয়াছে যথেষ্ট; কিন্তু সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদের জীবিকার সংস্থান মিলিবার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই। সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেহুদা ব্যয় অনেকভাবে হইতেছে এবং আরও হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। এরূপ অবস্থায় বিবেচনার সঙ্গে কিছুটা ব্যয়সঙ্কোচ করিলে দরিদ্র শিক্ষকদের উদরান্নের অভাব কিছুটা নিশ্চয়ই মিটানো যাইত, ইহাই আমরা মনে করি। শিক্ষার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকার পক্ষের কর্তাব্যক্তিদের মুখে আমরা বড় বড় কথা অনেকই শুনিতে পাই; কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে, যাঁহারা শিক্ষাব্রতী, দেশের ভবিষ্যতের আশা-ভরসাস্বরূপ, বালক-বালিকাদিগকে গড়িয়া তুলিবার ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহাদিগকে বুভুক্ষু রাখিয়াই আমাদের রাষ্ট্রচক্রের নিয়ন্তৃগণ নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বস্তুত শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের প্রতি তাঁহাদের সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা। পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের আচরণে শিক্ষকদের দাবী সম্বন্ধে কর্তাব্যক্তিদের মনের মূলগত লঘুতার এই সংস্কারই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সত্যই বেদনাদায়ক। শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে গুরুত্ববোধ এবং শিক্ষকদের প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধি যদি আমাদের সমাজ-জীবনে

আমাদের রাষ্ট্র-চেতনায় শিথিল হইয়া পড়ে, তবে কোনরূপ গঠনমূলক পরিকল্পনাই জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত।

পাকিস্থানের তরুণদের আন্দোলন

পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে বাঙলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আন্দোলনের মূলে যুগোচিত আদর্শের প্রেরণা কাজ করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা রাষ্ট্র-চেতনাকে উদার এবং সম্প্রসারিত করিবার জন্যই প্রণোদিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলা ভাষা-মূলক আন্দোলনের ফলে গত বৎসর পুলিশের গুলীতে যেসব তরুণ নিহত হয়, তাহাদের স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টা এই তরুণ জাগরণেরই সূচনা করিতেছে। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্থান ইতিহাস সম্মেলনের সভাপতি আল্লামা সুলেমান নাদভির মন্তব্যে তরুণদের আপত্তির মূলে মাতৃভাষার প্রতি তরুণদের এই মর্যাদাবুদ্ধিরই আমরা পরিচয় পাইয়াছি। বস্তুত সম্মেলনের সুপণ্ডিত সভাপতির অভিভাষণে বাঙলা ভাষার ক্রম-বিকাশ সম্পর্কিত মন্তব্যে গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনাব নাদভির মতে বাঙলা ভাষা পূর্বে লেখ্য ভাষা ছিল না। মুসলমানগণ আরবী বর্ণমালায় উহা লিখিতে আরম্ভ করেন। বৃটিশ রাজত্ব-কালে হিন্দুরা ইংরেজ শিক্ষায় মুসলমান-দিগকে ছাড়াইয়া যান এবং বাঙলা ভাষায় নূতন বাক্যভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। তাঁহারা হিন্দীর অনুকরণে বর্ণমালার সৃষ্টি করেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ ধার করিয়া লন এবং আরবী ও ফারসী শব্দ বর্জন করেন। এইভাবে একটি নূতন ভাষার উৎপত্তি হয়। ইহাই বর্তমান বাঙলা ভাষা। এই ভাষা সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ এবং হিন্দু পুরান ও দেবদেবীর আখ্যান হইতে এই ভাষা অনুপ্রেরণা লাভ করে। এই ভাষা চলিত হওয়ার ফলে বাঙালী মুসলমানদের সহিত ভারতের অবশিষ্ট অংশের মুসলমানদের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আল্লামা সাহেবের এই ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। কিন্তু দেখা যায়, বাঙলা ভাষার ক্রম-বিকাশের মূলে মুসলমান কবি ও সাধক-দের এবং পরবর্তীকালে মুসলমান চিন্তাশীল এবং মনীষীদের অবদানের ঐতিহ্য তিনি চাপিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদের কথাই বড় করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু শুধু এই যুক্তির জোরে বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতি হইতে মুসলমান সমাজকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃত শব্দ কি ফারসী শব্দের অনুপাত কষিয়া বাঙলা ভাষার বিচার করা চলে না। ভাষার প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জাতির বিশিষ্ট যে সংস্কৃতি এবং জাতীয় প্রকৃতি গড়িয়া উঠে, তাহা অন্য বস্তু। এই প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ববঙ্গের উপর উর্দু ভাষা চাপাইতে গেলে সেখানকার রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনের গোড়াতেই আঘাত পড়িবে। পূর্ববঙ্গের তরুণ দলের অন্তরে এই সত্যটিই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আন্দোলনের রীতি এবং সেই পরিচালনার নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিতে পারে; কিন্তু এই আন্দোলনের মূলে যে সমগ্রভাবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ-জীবনের কল্যাণ প্রেরণা রহিয়াছে, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তির কোন কারণ নাই এবং এই দিক হইতে পাকিস্থান রাষ্ট্রের যাঁহারা প্রকৃত উন্নতিকামী, এই আন্দোলন তাঁহাদের সকলের সমর্থন লাভের যোগ্য।

ভারতে তৈল শোধনাগার

ভারতে যত পরিস্রুত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, যথা, কেরোসিন, বিমান চালনার তেল, পেট্রোল, ডিজেল অয়েল, লুব্রিক্যাণ্ট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশই ইরান হইতে আমদানী। কিন্তু আবাদানে এ্যাংলো-ইরানীয়ান তৈল শোধনাগারের কাজ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অন্যান্য দেশের মত ভারতকেও প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভারতে দুটি তৈল কোম্পানী—বর্মা শেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম বোম্বাইয়ের নিকট দুইটি তৈল শোধনাগার নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের সাথে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম যে শোধনাগার তৈরি করিবে, তাহা সাড়ে বার লক্ষ টন তৈল ধারণ করিতে পারিবে ও ইহার নির্মাণ-ব্যয় হইবে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা। বর্মা শেলের শোধনাগারের প্রায় কুড়ি লক্ষ টন ধারণের ক্ষমতা থাকিবে এবং এটি নির্মাণ করিতে খরচ হইবে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা। ভারতে ইহাই হইবে বৃহত্তম তৈল শোধনাগার। আরও একটি শোধনাগার নির্মাণের কথা আছে, কিন্তু সেটির ধারণ ক্ষমতা ও নির্মাণ-ব্যয়ের পরিমাণ জানা যায় নাই। তিনটি শোধনাগারে যখন কাজ আরম্ভ হইবে, তখন ঐগুলি দৈনিক প্রায় ১১।১২ হাজার টন অপরিস্রুত তৈল পরিস্রুত করিতে পারিবে।

১৯৫৬ সালের মধ্যে দুটি শোধনাগারের কাজ যখন পুরোদমে আরম্ভ হইবে, তখন ভারতে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণও দৈনিক প্রায় ১৫ হাজার টনের কাছাকাছি দাঁড়াইবে। ঐ সময়ে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত অধিকাংশ কাজ শেষ হইয়া আসিবে বলিয়া পেট্রোয়িলামজাত দ্রব্যের চাহিদা স্বভাবতই অনেকখানি বৃদ্ধি পাইবে। তৈল শোধনাগার দুটির কাজ এমন সময় আরম্ভ হইবে, যখন ভারতে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পরিকল্পিত তৈল শোধনাগারগুলি ভারতের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে।

রঞ্জন

কলম যে তলোয়ারের চেয়ে শক্তিধর, এ কথাটা কলম দিয়েই লেখা। তাই, পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু কলম যে নানা মনে স্থায়ী আঁচড় কাটতে পারে সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যে কলম রাজনীতির প্রচারে নিয়োজিত হয়, তার প্রভাব আরও দ্রুত ও ব্যাপক, তাই রাজনীতির যুদ্ধে লেখনী অন্য যে কোনো অস্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। গত পঞ্চাশ বছরে যে ক'জন ব্যক্তি চিন্তাজগতে একটা নতুন আবহাওয়া আমদানী করেছেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মনোবিজ্ঞানে যেমন ফ্রয়েড, অর্থনীতিতে কেন্‌স্‌, কাব্যে টি এস এলিয়ট, তেমনি রাজনীতিতে হ্যারল্ড ল্যাস্কি অনেকগুলি মনের অনেকগুলি জানলা খুলে দিয়েছিলেন। সে হাওয়ায় যত সহস্র তরুণ মনে একদা ঝড় উঠেছিল তার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যাও অল্প ছিল না। একটি অধ্যাপকের জীবনে এইটেই কম পুরস্কার নয়।

*

তাঁর জীবনীকার কিংসলি মার্টিন* দেখিয়েছেন, ল্যাস্কি নিজে শুধু শিক্ষকের পুরস্কার নিয়ে তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর আদর্শবাদ এমন গভীর ছিল যে ছাত্রমনের নরম মাটিতে সাম্যবাদের বীজ বপন করেই তিনি কখনো ক্ষান্ত হতে পারেননি, দলীয় রাজনীতির পতিত জমি আবাদ করেও তিনি সোস্যালিজমের সোণা ফলাতে চেয়েছিলেন। প্রেরণা মহতী সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়াসের এই বিক্ষেপের জন্যে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। রাজনীতিবিদ্যায় তিনি তেমন কোনো মৌলিক অমর গ্রন্থ লিখে যাননি, যদিও অমন বই লেখবার মতো প্রতিভার তাঁর অভাব ছিল না। রাজনীতিকর্মে তিনি একাধিকবার অপ্রীতিকর বিসম্বাদের লক্ষ্য হয়ে দলীয় বন্ধুদেরও বিড়ম্বনার কারণ হয়েছেন। অধ্যাপকদের সভায় তিনি মাঝে মাঝে তাঁর যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হতেন, কেননা, তিনি গুরুগিরির নিয়ম মতো বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্য দিকে, পলিটিশানদের সভায় অনেকেই তাঁকে কিঞ্চিৎ সন্দেহের চোখে দেখতেনঃ ল্যাস্কি বড়ো বেশি বুদ্ধিমান! "হি থিংক্‌স্‌ টু মাচ্‌, অ্যান্ড সাচ্‌ মেন্‌ আর্‌ ডেঞ্জেরাস্‌।"

ল্যাস্কি একই সঙ্গে যে দুটো ক্ষেত্রে কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্যে সাফল্যের চেয়ে বেশি বিফলতা অর্জন করেছিলেন—এই অবস্থাটার মধ্যে আমাদের বর্তমান সমাজের বৃহৎ একটা সমস্যা নিহিত আছে। কর্মে আর চিন্তায়, থিয়োরি আর প্র্যাকটিসে, ক্রমশ যে বর্ধমান দূরত্ব রচিত হচ্ছে, ল্যাস্কি সেই ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছিলেন, দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আগেই বলেছি, সফল হননি। অথচ গণতন্ত্র যতদিন না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ততদিন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্লেটোর যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব হবে না। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিত্বের নীতি ক্ষুণ্ণ না করেও কী করে ভাবুকের সঙ্গে রাজনীতিক কর্মীর মিলন ঘটানো সম্ভব। শুভবুদ্ধিশূন্য রাজনীতিক কর্মের পরিণাম ইতিহাসে রক্ত দিয়ে লেখা আছে। কর্মপঙ্গু বন্ধ্যা চিন্তার করুণ কাহিনীও লেখা আছে চোখের জলে। গণতন্ত্র যদি এদুয়ের সমন্বয় সাধন করতে অসমর্থ হয়, তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

*

ল্যাস্কির নিজের জীবনের দ্বিমুখীনতার ব্যাখ্যা কিংসলি মার্টিন সন্ধান করেছেন ল্যাস্কির পরিবেশে। গৃহহীন ছিন্নমূল য়ীহুদী পরিবারে স্বাচ্ছল্য থাকতে পারে, কিন্তু জন্মগত যে চিত্তস্থিরতা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রক্তে বর্তমান য়ীহুদী তা থেকে বঞ্চিত। য়ীহুদীর একমাত্র ঠিকানা তাই য়ুটোপিয়ায়, কল্পলোকে। মর্ত্যের সঙ্গে স্বভাবতই তার সাদৃশ্য অল্প। মর্ত্যের হিটলারি জার্মানি থেকে সে বিতাড়িত এবং 'পোগ্রম' শব্দটা যে রুশ ভাষার ক্রেমলিন সেকথা সম্প্রতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার উপর অত্যধিক আদর্শবাদ থাকলে ইজ্‌রেলের সঙ্গেও য়ুটোপিয়ার মিল খুব বেশি নয়।

এমন অবস্থায় ল্যাস্কি নিরাশাবাদী হয়ে পড়লে বিস্ময়ের কারণ ছিল না। অন্যান্য অনেক য়ীহুদীর তাই হয়েছে। কিন্তু ল্যাস্কির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে তিনি কখনো আশা হারান নি। এই আশা তাঁকে মাঝে মাঝে পাতি-কম্যুনিস্ট থেকে অভিন্ন করেছে, আবার গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থাও অবিচল রেখেছে। ফলে তিনি দু'পক্ষেরই অভিশাপ কুড়িয়েছেন। চার্চিল-বীভারব্রুক তাঁকে নানা অপপ্রচার থেকে নিষ্কৃতি দেননি, আবার কম্যুনিস্টরাও তাঁকে বর্ণচোরা লিবারেল বলে উপহাস করেছেন।

আসলে কম্যুনিস্টদের রায়টা বোধহয় একেবারে অসঙ্গত নয়। নানা চরিত্রগত সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও—যেমন খ্যাতসান্নিধ্যে ছেলেমানুষী গর্ব বা অন্যের কথা একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলবার দুর্বলতা—মানুষ হিসাবে ল্যাস্কি যে অত্যন্ত দয়ালু ও সহৃদয় ছিলেন তা শুধু তাঁর জীবনীকারই বলেননি, তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী দেশে-বিদেশে সেই সাক্ষ্যই দেবে। অধ্যাপকের পক্ষে ছাত্রের প্রশংসাপত্রের চেয়ে আর কোন্‌ সুপারিশ বেশি মূল্যবান? সহস্র ইংরেজ মধ্যবিত্তের মনে সমাজচেতনা আর সহস্র ঔপনিবেশিক ছাত্রের মনে স্বাধীনতাপিপাসা জাগানো কি একটি জীবনের পক্ষে তুচ্ছ সাফল্য?

আর রাজনীতি? অ্যাট্‌লি ল্যাস্কিকে একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে অধ্যাপকের পরামর্শে তাঁর প্রয়োজন নেই তবু ল্যাস্কি লেবার গভর্নমেণ্টকে বারবার সাবধান করেছেন যখনি সে দল সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে শুধু অ্যাট্‌লি নয়, চার্চিল-বল্ডুইন, এমন কি রুজভেল্টকে পর্যন্ত তিনি নিয়মিত পত্র লিখে উপদেশ বিতরণ করতেন। সে উপদেশ সর্বদা গৃহীত হয়নি—কলম তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী নয়—কিন্তু ল্যাস্কির অজস্র রচনা ও বক্তৃতা যে অলক্ষ্যে লক্ষ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ সবটা প্রত্যক্ষ না হলেও পরিমাণে অল্প নয়। সেই ব্যাপক ও গভীর প্রভাবের একটি ত্রুটি বাস্তববিমুখতা, যার ফল কোন কোন সময় সফেন উচ্ছ্বাস। সেই প্রভাবের প্রধান গুণ আশাবাদী নিষ্ঠা, যা বাদ দিলে রাজনীতি কূটনীতির পর্যায়ে নেমে আসে।

***Harold Laski, A Biographical Memoir, by Kingsley Martin.** (Gollancz 21s.).

উভয় সংকট!

গত মাসের ৯ই তারিখে টেল আভিভ-এ সোভিয়েট দূতাবাস বোমায় জখম হয়। দূতাবাসের কিছু লোকও অল্পবিস্তর আহত হন, তাঁদের মধ্যে সোভিয়েট দূতের পত্নীও ছিলেন। এই দুর্ঘটনার জন্য ইজরেলী গভর্নমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করেন ও সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। কিন্তু সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এতে সন্তুষ্ট হন না। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বলেন যে, ইজরেলী গভর্নমেণ্ট ক্রমাগত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে আসছেন, বোমা-নিক্ষেপের সঙ্গে তার কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। বোমা দুর্ঘটনার জন্য ইজরেলী গভর্নমেণ্টের দুঃখ প্রকাশকে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট দায়িত্ব এড়াবার জন্য মিথ্যা ভাণ বলে অভিহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতকে দেশে চলে আসার হুকুম এবং ইজরেলের সঙ্গে সোভিয়েট কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধ সমালোচক মহলের ধারণা যে, সোভিয়েট দূতাবাসের উপর বোমা নিক্ষেপকারীদের কার্যের প্রতি ইজরেলী গভর্নমেণ্টের কোনো সহানুভূতি থাকতে পারে না, বরঞ্চ এতে ইজরেলী গভর্নমেণ্ট বিশেষ চিন্তান্বিত ও সন্ত্রস্ত হন, কারণ তাঁরা মনে করেন, এই ব্যাপারের ফলে সোভিয়েট ও সোভিয়েট-প্রভাবাধীন রাজ্যগুলিতে যে-সব ইহুদী আছে তারা আরো বিপন্ন হবে। এঁদের মতে, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন ইজরেল ও ইহুদীদের প্রতি সোভিয়েটের ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধতার একটা নিদর্শন মাত্র, বোমার ব্যাপারটা একটা অজুহাত হিসাবে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কাজে লেগেছে।

সোভিয়েট ও সোভিয়েট-প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলিতে ইহুদী-বিরোধী নীতি চলছে, এই অভিযোগ কিছুদিন থেকে খুব শোনা যাচ্ছে। এই অভিযোগ কতখানি সত্য বলা কঠিন, কারণ উভয় পক্ষেরই সত্যপ্রচারের চেয়ে প্রতিপক্ষকে দুর্বৃত্তরূপে চিত্রিত করার আগ্রহ ও চেষ্টাই বেশি। যদিও ইজরেল রাষ্ট্র ঘোষিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেমন

আমেরিকা তেমনি সোভিয়েট গভর্নমেণ্টও তাকে স্বীকার করেন, তাহলেও সোভিয়েট কর্তৃক "Zionism" এবং "Jewish bourgeois nationalism" এর সমালোচনা নূতন নয়। গোড়ায় যখন নবপ্রতিষ্ঠিত ইজরেলের প্রতি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বিরূপ ছিলেন, তখন রুশ গভর্নমেণ্ট ইজরেলের প্রতি বন্ধুভাব দেখাতে শুরু করেন—এটাকে কূটনৈতিক জগতের ধর্ম বলা যেতে পারে। তা'হলেও কিছুদিন পরেই সোভিয়েট রাজ্য ছেড়ে ইহুদিদের ইজরেলে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রাশিয়ায় অনেক ইহুদি থিয়েটার ও সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয় বলেও একটা খবর রটেছিল, কিন্তু তার মধ্যে কতখানি সত্য ছিল নিশ্চিত বলা যায় না। কয়েক মাস পূর্বে চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মামলায় দণ্ডিত আসামীদের অধিকাংশই ছিলেন ইহুদি। তারপর সোভিয়েট নেতাদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে যে "ডাক্তারী ষড়যন্ত্রের" অভিযোগ মস্কো থেকে প্রচারিত হয়েছে তার প্রধান আসামীও ইহুদি। এইসব ইহুদি ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে চরের কাজ করছিলেন এবং এই কাজের সঙ্গে কোনো কোনো আন্তর্জাতিক ইহুদি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ আছে, এটাও কম্যুনিস্ট পক্ষের অভিযোগ। এইসব থেকে অন্যপক্ষে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইহুদি জাতির প্রতি বিদ্বেষ-মূলক নীতি অনুসরণ করছেন। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট "Zionist" প্রতিষ্ঠানগুলিকে শত্রু বলে মনে করছেন সন্দেহ নেই এবং কোনো "Zionist" প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট-বিরোধী চরের কাজ করা হয়নি একথাও কেউ জোর করে বলতে পারে না।

বরঞ্চ এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় এরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণও কিছু আছে। তবে "Zionist" প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং নীতি হিসাবে ইহুদি নির্যাতনের নীতি অনুসরণ করা এক জিনিস নয়। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইহুদি জাতি নির্যাতনের নীতি অনুসরণ করছেন, এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে এখনো মনে করার সময় আসে নি। অভিযোগকারীরা এ বিষয়ে যে এতো নিশ্চয়ভাব দেখাচ্ছেন তার কারণ এই যে, ওরূপ নীতির দ্বারা সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিযোগকারীদের মুশকিল বাড়াতে পারেন। মজা হচ্ছে এই যে, এই অভিযোগ যদি সত্য নাও হয় তবুও এর আরোপিত উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হতে পারে, কারণ অভিযোগকারীরাই প্রচারের দ্বারা তার পথ সুগম করে দিচ্ছেন।

ইহুদি জাতির প্রতি সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বিরূপ হয়ে তাদের ওপর অত্যাচার করছেন, এই রটনায় আরব রাষ্ট্রগুলি খুশি হবে কারণ ইজ্‌রেলের সংগে তাদের ঝগড়া মেটে নি, ইজ্‌রেলের অস্তিত্ব তারা সহ্য করতে পারছে না। এর ফলে আরব রাষ্ট্রগুলির সংগে ইংগ-মার্কিন ব্লকের আপোষ-নিষ্পত্তি আর একটু কঠিন হবে অর্থাৎ আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দরাদরি করার একটু বেশি সুবিধা হবে। ইজ্‌রেলের প্রতি সোভিয়েট যখন বিরুদ্ধভাবাপন্ন তখন আর ইজ্‌রেলকে খাতির করার প্রয়োজন ইংগ-মার্কিন ব্লক বোধ করবে না এবং তাহলে ইজ্‌রেলের স্বার্থ নষ্ট করেও আরব রাষ্ট্রগুলির মন রাখতে চেষ্টা হবে, ইজ্‌রেলীদের এই ভয় হয়েছে।

আর একদিক থেকেও বিপদ দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইহুদিদের সুনজরে দেখছেন না, এ সংবাদে নাৎসী-ভাবাপন্ন জার্মানদের মন রাশিয়ার প্রতি অনুকূল হবার সম্ভাবনা। ইংগ-মার্কিন ব্লকের পক্ষে সেও তো কম বিপদের কথা নয়। তাছাড়া পূর্ব জার্মানী এবং মিশরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার জোর চেষ্টা চলছে। পূর্ব জার্মানী থেকে অর্থনৈতিক ও সামরিক উপদেষ্টার নেগুইব যেদিন চাইবেন সেইদিনই তাঁরা মিশরকে সাহায্য করার জন্য কাইরোতে উপস্থিত হবেন।

ইংগ-মার্কিন পক্ষের মুশকিল হচ্ছে এই যে, রাশিয়া ইহুদিজাতি নির্যাতনের নীতি গ্রহণ করেছে একথা প্রমাণ করতে পারলে রাশিয়ার বদনাম হয় বটে, কিন্তু রাশিয়ার স্বার্থ যদি আরব রাষ্ট্রগুলিকে ভাংচি দেয়া হয় তবে এই বদনাম যত রটবে ততই রাশিয়ার কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা বাড়বে। ইংগ-মার্কিন প্রচারকগণ যতো জোর দিয়ে বলবেন যে, রাশিয়া ইহুদিদের ওপর অত্যাচার করছে আরব রাষ্ট্রগুলির মন, অন্তত আপাতত ততই রাশিয়ার প্রতি অনুকূল হবে। এক শ্রেণীর জার্মানের মনের উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। একেই বলে বিড়ম্বনা। শত্রুর দোষ দেখানোও বিপদ! ১।৩।৫৩

বসন্ত উৎসবের করুণ আহ্বান

ক্ষিতিমোহন সেন

বসন্তকালে বৃক্ষলতায় ফুল ফোটে। প্রকৃতির তখন দীক্ষাকাল। মানব-সাধনাতেও বসন্তকাল প্রেমের দীক্ষাকাল। সংত বাউলদের ইতিহাসে এই কথাই দেখি। প্রায় তিনশ বছর পূর্বে এক বসন্ত দিনের কথা বলা যাক।

বলা অর্থাৎ বলরাম, কৈবর্তের ছেলে হলেও ধনী। বহু জেলে তাঁর অধীন। মাছের ইজারায় তাঁর ঐশ্বর্য, কাজেই জীবন ঐশ্বর্যে ভরতি। কিন্তু একটি শোকের আঘাত তাঁর অন্তরে রয়েছে।

বসন্তকালে সন্ধ্যার সময় একদিন মেঘনা নদী বেয়ে চলেছেন, হঠাৎ দেখলেন একটি কন্যা বিয়ের পরে বাপের বাড়ি হতে রওনা হচ্ছে। কিছুদূর যেতে না যেতেই শুনলেন মেয়েটির কান্না—

থামাইওরে ঢোল ঢুলী ভাই,
কাঁশীর ঝনঝনি।
ধীরে ধীরে বাইওরে মাঝি,
যেন মায়ের কান্দন শুনি॥

সে জানে মায়ের কাছে ফিরতে পারবে না, তবু মায়ের কান্নাটুকুও যে শোনা যাবে না এইটাই মেয়েটির অসহ্য। তাই সে চারিদিকের এই বাদ্য-ভাণ্ড থামিয়ে দিতে বলছে—এমনকি, নৌকা-চালনার শব্দ পর্যন্ত শান্ত করে আনবার অনুরোধ করল। চারদিকের যে নিষ্ঠুর সমারোহঃ তারা কি তার সে কাতর অনুরোধটুকু রাখলো?

কি জানি কেন বলা সেদিন হঠাৎ দেখতে পেলেন, আমরা সবাই আমাদের মায়ের কাছ থেকে ক্রমেই সরে চলেছি। দিনের পর দিন যে তাঁর থেকে দূরে ভেসে যাচ্ছি তাকি আমরা টের পাই? চারিদিকের সব ক্ষণগত টানে টানে যে আমরা সেই নিত্যস্থান থেকে দণ্ডে দণ্ডেই সেরে যাচ্ছি—মায়ের করুণ বেদনার কান্না চাপা পড়ে যাচ্ছে হাজার ক্ষণিক ব্যস্ততায় নানা প্রাত্যহিক কোলাহলে। আমাদের চিত্তের মধ্যে কি ঐ মা-হতে-দূরে-সরে-যাওয়া মেয়েটির মত একটি চাপা কান্না শোনা যায়?—

ধীরে ধীরে বাইওরে মাঝি,
যেন মায়ের কান্দন শুনি॥

বসন্ত-সন্ধ্যায় সে কান্না হঠাৎ সেদিন বলা শুনতে পেলেন। তাঁর সমস্ত বাহিরের ঐশ্বর্য তুচ্ছ করে বাহির হয়ে পড়লেন। অনেক দুঃখ অনেক ঘোরাঘুরির পর সাধক নিত্যনাথের কাছে তিনি সাধনার পথের সন্ধান পেলেন। কিন্তু আসলে তাঁর গুরু সেই মেয়েটি, যার কান্না তাঁর প্রাত্যহিকতায় অভ্যস্ত পরদা হঠাৎ একদিনেই দিয়েছিল সরিয়ে। পূর্ববঙ্গের বাউলদের অন্যতম আদিগুরু হলেন—বলা।

ঐ যে তাঁর জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার পরদা একদিনেই হঠাৎ সরে গেল, তিনি তাঁর পরম মায়ের কান্না শুনতে পেলেন, সেই তো তাঁর মহা-দীক্ষা। সেদিন থেকেই আরম্ভ হোলো তাঁর নূতন জীবন।

বীজের মহোৎসব হোলো সেদিন যেদিন আকাশ হতে নেমে এল প্রাণের ধারায় বর্ষণ, চারিদিকের প্রাণহীন ধূলো-মাটি হতে যেদিন সে জীবন্ত অঙ্কুরে একেবারে হয়ে গেল স্বতন্ত্র। সেইদিনই তো তার নবজীবনের আরম্ভ। কখনো কখনো বিধাতার কৃপায় নবজীবনের জন্য ক্ষণিক তুচ্ছতার পরদা সরে যায় মহোৎসবের দেখা তাই তো মেলে জীবনে।

বসন্তকালে এমন একটি মহাদীক্ষা এনেছিল মহাসাধক তুলসী সাহব হাথরসীর জীবনে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজকুমার। পরদিনই তিনি হবেন তাঁর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত এমন সময় হঠাৎ কেমন করে তিনিও শুনতে পেলেন—"মায়ের কান্দন"। অমনি তাঁর সংসারের ঐশ্বর্যের পরদা ক্ষণিক তুচ্ছতার কোলাহলের আবরণ গেল সরে।

তিনি তখনি মায়ের প্রেম রূপ দেখতে পেলেন, তাঁর ব্যথিত আহ্বান এসে মায়ের হৃদয়ে পৌঁছল, যা এতদিন নানা বাধায় ছিল চাপা অন্তর্হিত।

ক্ষণ অরু নিমেষকা পরদা হট গয়া,
হমেশকী নজর, খোল জারৈ
গগনকে গুমট পর, গৈবথলক চাংদনা,
পলক প্রদীপ বুঝে দৃষ্টি আবৈ॥

দৃষ্টি কো মুক্ত করি, পীব্‌কো পেখিয়া,
জক্ত অরু খলক প্রীত পূর্ণ মাগী।
খুর্দ রাজ অরু, প্রভু পণ ত্যাগিকে,
অধর অরু অপারকে সুর্ত লাগী॥

সেই নিত্যকালের পরমাত্মার পরশ যখন তিনি পেলেন তখন তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। তখন তিনি আর সংকীর্ণ জাতি পংক্তি বা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে কিছু দেখতে পেলেন না। তাঁর দৃষ্টি সর্ব দেশের সর্বকালের সকল সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক হয়ে গেল। বিশ্বের বিরাট সত্য যখন তিনি দেখতে পেলেন, তখন মানব কৃত সব ক্ষুদ্র ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গেল। বিশ্বের মন্দির তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল সেদিন ছিল বসন্তকাল।

নকলী মন্দির মসজিদোঁ মে
জায় সদ অফসোস হৈ
কুদরতী মেসজিদ কা সাকিন
দুখ মিটানে কে লিয়ে।
কুদরতী কাবে কী তু
মিহরাব্ মেং সুন গৌর সে।
আরহী ধ্বনি সে সদা
তেরে বুলানে কে লিয়ে॥

তখন দেখলেন সত্যকার বিশ্বমসজিদে মানুষ তাঁকে ডাকছে না, ডাকছেন পরম প্রেমময়। তাঁর বিশ্ববসুধাই মসজিদের মিহরাব। বিশ্বের অণুপরমাণুর মধ্য দিয়ে নিরন্তর সেই মায়ের কান্দন, মায়ের ডাক আসছে। সেই ডাক যেই তিনি শুনতে পেলেন, তখন কোথায় গেল তাঁর সিংহাসন, কোথায় গেল তাঁর রাজ ঐশ্বর্য! নিত্য উৎসবের অবারিত আনন্দের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে ধারণ করতে না পেরে তিনি সব বাঁধন ছাড়িয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন। বসন্তের পুষ্পরাজির মত।

তিনি শুধু ঘর বা রাজাই ছাড়লেন না, সম্প্রদায় ও ধর্মের সব সংকীর্ণতা তিনি একদম ছেড়ে দিলেন—ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও। এই বাঁধনই সব থেকে বড় বাঁধন। বিশেষতঃ তখন তাঁর বংশই মুসলমানদের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধে রত। কিন্তু তাঁর বাণী হিন্দু কি মুসলমান সাধকের এখন তা বোঝাই কঠিন। তাঁর বাণী—

গোশী বাতিন হোঁ কুশাদা
জো কুছদিন করে অমল।

লা ইলাহ ইল্লাহ হো
আকবর পৈজানে কে লিয়ে॥
রহ সদা তুলসী কী হৈ
আমিল অমল পর ধ্যান দে।
কুন কুরাঁ মেঁ হৈ লিখা
অল্লাহ আকবর কে লিয়ে॥

সম্প্রদায় সীমাবদ্ধ ব্রাহ্মণের বাণী এ নয়। এ বাণী সকল সম্প্রদায়ের অতীত সাধকের। জগন্মাতার ডাক শুনে যখন তিনি বের হলেন এই সমস্ত ভেদ বুদ্ধি তখনই হল অপসারিত। তিনি তখন ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছেন—

আরহী ধ্বসে সদা
তেরে বুলানে কে লিয়ে॥

হঠাৎ একদিনে প্রাত্যহিকতার পরদা সরে নিত্যকালের সত্য উদ্ভাসিত হওয়াকেই বলে উৎসব। সবদেশে এইজন্যই উৎসবের আয়োজন করা হয়। তখন প্রাণপণ চেষ্টা হয় যাতে সংসারের কোলাহল নানা বৈষয়িকতার দাবী অন্তত তখনকার মত দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। জীবনের বাদ্যভাণ্ডের কোলাহল তখন থামিয়ে দিতেই হয় এমন কি জীবন নৌকা চালনায় দাঁড় লগির শব্দ সব শান্ত করে স্তব্ধ হয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয় মায়ের কান্দন শোনা যায় কি না।

আজকের বসন্ত উৎসবও আমাদের তখনই হবে যথার্থ উৎসব, যখন আমরা সব কোলাহল শান্ত করে, মায়ের ব্যথিত আহ্বান আমাদের অন্তরের মধ্যে শুনতে পাব। আমরা যে দিন দিন তাঁর প্রেম হতে দূরে সরে চলেছি, মায়ের বুকভরা সে কান্না আমাদের অন্তরের মধ্যে এসে পৌঁছবে তো? সব কোলাহল না থামালে তা হবে কেমন করে?

এই বসন্ত উৎসবের এমন সুযোগেও আমাদের কঠিন চিত্ত না গললে বুঝতে হবে, সাংসারিক হিসাবে এই প্রাণ যতই জীবন্ত হোক না কেন আধ্যাত্মিক হিসাবে এ প্রাণ মৃত। বসন্তের প্রাণপবন পরশেও গাছে যদি ফুল না ফোটে তবে আর তার কিসের আশা?

অথচ আমাদের মত নিরুপায় সাধনা-হীনের একমাত্র ভরসার স্থল এমন যে মায়ের স্নেহ ডাকের উৎসব তাকেও আমরা নানা গোলমালে কোলাহলে আলোতে, প্রদীপে, মালায় সমারোহে দিয়েছি একেবারে চাপা দিয়ে বিক্ষুব্ধ করে। এর মধ্যে কি আজ 'মায়ের কান্দন' শোনা যাচ্ছে? যদি না শোনা যায় তবে আজ থামিয়ে দিতে হবে এই সব বৃথা মুখর উৎসব সমারোহ; স্তব্ধ হয়ে কান পেতে শুনতে হবে—অসীমের অন্তর হতে মায়ের কান্দন আমাদের অন্তরের মধ্যে শোনা যায় কিনা।

তাই তো ভক্ত নেতজী তাঁর অন্তরের গভীর ব্যথা ধ্বনিত করে বললেন—

শেষ চহুঁ ওর ঘোর,
ধুরে আঁধিয়ার হৈ,
পরসো সাঙ্গ তনু মেরী।
স্রবন বহির দোই
নৈন অন্ধ মেরো,
বৈন মৈন ব্যর্থ তেরী॥

এই কথা তুলসী সাহব হাথরসী বল্লেন,—

চেত মেঁ তো স্রবণ নহীঁ
আঁখ গয়ী সো ফুটী।
দিন দিন নাবু ঔঘট বহৈ,
হালত কৈ সে ছুটী॥

অন্তরের এই বেদনাই রজ্জবজী ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তাঁর বিখ্যাত গানে—

অয মিটৌ অয মোচন স্বামী।
অংতর ভেটৌ অংতর জামী॥
গত লোচন অংধ অচল অনাথা।
গতি দে স্বামী পকড়ো হাথা॥
শরণ তুম্হারা তুম্হে সির ভারা।
জন রজ্জব কী সুনহু পুকারা॥

পরমদেবতার কাছে আমাদের এ প্রার্থনা—আজকের বসন্ত উৎসবে পর যদি নাই সরলো তবে অন্তত তিনি ত পরশ দিয়ে গতিহীনকে দিন গতি প্রেমময় তিনি; দারুণ দুঃখের মধ্যে অন্ধের এই সৌভাগ্য যে পথ দেখাতে হ তাকে তাঁর পরশ করতে হবে। দূরে হ তাকে পথ দেখানো চলবে না, সে অন্ধ! দারুণ দুর্ভাগ্যের মধ্যে এইটু তার পরম সৌভাগ্য—অন্ধতার চ সার্থকতা।

তাই আজ পরিপূর্ণ বসন্তের ম চাই প্রেমময়ের কৃপা। তাঁর করুণা বাদ দি আপন সাধনা-বলে যে সিদ্ধি পাব শুধু মিথ্যা দম্ভ। তাই তাঁকে পাবার জ যে সব কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নি তাতেই তাঁকে আরও বেশী করে হারা

...সেছি। প্রদীপ দিয়ে খুঁজতে গিয়ে যদি তাঁর রূপখানি ফেলি হারিয়ে তবে নিবিয়ে ফেলতে হবে সেই প্রদীপ।

দিনের আলোটুকু মিলিয়ে গেলে রাত্রির অসীম আকাশ যেমন ভরে ওঠে অনন্ত গ্রহনক্ষত্র তারায় তেমনি ক্ষুদ্র সংসারের আলো নিবিয়ে দিলে যদি দীপমান হয়ে ওঠে তাঁর জ্যোতি তবে নিবে যাক এই ব্যর্থ প্রদীপ, আসুক চারিদিক ঘিরে দুঃখ দুর্দিনের সার্থক অন্ধকার। তখন হৃদয় বলে, "হে প্রেমময়, তোমার জন্যই তো দীপ. দীপের জন্য তো আর তুমি নও। চাইনে প্রভু প্রদীপ, অন্ধকারে যদি তোমাকে পাই তবে ধন্য পরিপূর্ণ আমার সেই অন্ধকার। দীপ দিয়ে আর আমার কি হবে? বিনা দীপেই না হয় চলুক আমাদের মিলন মহোৎসব। তাই তো ভক্ত হাথরসী তুলসী সাহব বলেন,

টার দে দীপ সব,
দেখ পীব্ চান্দনা,
(হোয়) প্রেম মগন সোই, মর্ম পাবৈ্।
অগম কী জোত মোঁ,
ভরিলে প্রাণ মন,
শুনো মন নাদ নো, থল্ক ছারৈ॥
পৈঠ মন পৈঠ রে,
রা. জক্ত অপূর্ব মেঁ,
তিমির টারি পৈঠে, ভৌন মাঁহী।
সকল গগন দেখ,
মগন সোই প্রেম মেঁ,
পীব্ ঔর প্রেম হৈ, ঔর কছু নাহী॥

যতদিন না পাই তার দেখা, না মেলে তাঁর পরশ, ততদিন বারবার ক্ষণিক কোলাহলের পরদা সরিয়ে সরিয়ে, শুনবো তাঁর ব্যথিত আহ্বানের ধ্বনি অন্তরের মধ্যে শোনা যায় কিনা, দেখবো, তাঁর মুখের জ্যোতি একটুও দেখা যায় কিনা, তাই হবে বসন্ত মহোৎসবের পরিপূর্ণতা।" পরদাটুকু একটু সরিয়ে যদি হৃদয় পেতে একটুখানি শুনতে একটুখানি দেখতেও না ব্যাকুল হই, তবে কোন্ লজ্জায় তাকে বলবো মহোৎসব।

নিত্য নিরন্তর প্রাণকে বলবো—"জেগে থাক দুঃখী প্রাণ আমার, জেগে থাক তাঁরি আশায় আশায় চারিদিকে যখন কোথাও কোনো আশার চিহ্নমাত্র নেই; যেমন করে গভীর নিশায় অসম্ভব অদম্য আশা নিয়ে কমল জেগে থাকে তার অন্ধকার দুঃসহ সলিল শয্যায়। থাক মাথা তুলে; জীবনে তাঁর প্রকাশের প্রথম অরুণ-জ্যোতি-লেখা যেন তোকে না দেখতে পায় নিদ্রিত। যেন সেই মহালগ্নটি তোর না হয় ভ্রষ্টলগ্ন।

তিমির জক্ত ভরি,
জ্যোতি নহিঁ কহীঁ,
কছু ভরোস জব্ নাহীঁ।
জাগি রহু দুখী
প্রাণ কমল মেরো
অটল আস লই চিত্ত মাহীঁ॥
সকল সংকট জিতি,
অন্তর বিশ্বাস লই,
নীর শয়নি বহু জাগি।
প্রথম প্রকাশকা
ক্ষণ না চুকৈ কহীঁ
লিলাড় তিলক সোই মাঁগি॥
(নেতজী)

তবু যদি জড়তায় চারিদিকে দিনে দিনে নিবিড় করে ঘিরে ফেলতে থাকে, প্রাণ যদি এমন অসাড় হয় যে এই অচেতনতার মৃত্যুকেও না চিনতে পারে বসন্তের দিনে তবে প্রেমময়ের কাছে এই একান্ত প্রার্থনা যে—

দুঃখ দিও, আঘাত দিও, কিন্তু নিদ্রায় অচেতন হয়ে যেতে দিও না। হে রুদ্র তোমার কঠোর কৃপা যেমন করেই হোক রাত্রি দিবা যেন আমাদের জাগ্রত রাখে, এই আজ আমাদের প্রার্থনা। এটকুই না হয় হবে আমাদের সাধনা।—

এই ভরসাটুকুও যদি মেলে তবেই বুঝবো, আজকের দিন শুধু লোকালয়ের আলো প্রদীপ-ফুল-মালা-বাদ্য এবং প্রকৃতি মন্দিরে পুষ্প-পল্লবের সমারোহ মাত্রেই মিলিয়ে যাবে না। অন্তরের মধ্যেও আজ শোনা যাবে মায়ের কাতর আহ্বান, মায়ের কান্দন। অন্তত বুঝতে পারবো কোন উজ্জ্বল নিষ্ফলতার দিকে ভেসে চলেছে আমাদের জীবন-তরণী। তখন যদি তরী মায়ের উল্টা দিকে চলে, তবে বুঝবো পালে আজ যতই হাওয়া লেগে থাকুক তাকে থামিয়ে মায়ের দিকে হাল ঘুরিয়ে ধরতে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা—

হে জননী, জীবন-তরণীর হাল আমাদের হাতে যদি না ঘুরতে চায়, তবে কৃপা করে তুমি দাও ঘুরিয়ে। তরী দিনে দিনে চলুক তোমার দিকে। দিনে দিনে আমাদের অন্তরের মধ্যে তোমার ব্যাকুল ডাক স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকুক বসন্তের মহাসমারোহের মধ্যে। তোমার ব্যাকুল ডাক যেন ব্যর্থ হয়ে চাপা পড়ে না যায়। তোমার ডাক কানে আসুক। জীবন-নৌকার গতি ফিরুক। বসন্ত-উৎসব সার্থক হোক।
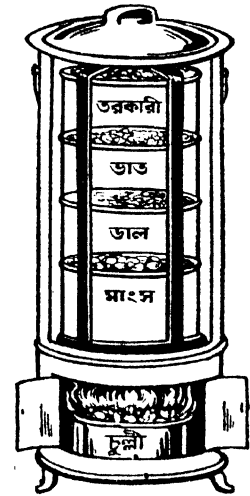
শিল্পচর্চা

নন্দলাল বসু

কাঠের পাটায় ছবি আঁকা

ছবি আঁকার পক্ষে সেই কাঠই ভালো যার আঁশ অত্যন্ত কড়া নয় আর সমান, যে কাঠে সহজে ঘুণ বা পোকা ধরে না। শোনা যায়, বহুদিন ধোঁওয়া লাগালে কাঠে পোকা ধরে না। পুরাতন সেগুন কাঠের পাটাই ভালো। জানলা দরজা আলমারির পুরাতন সেগুন তক্তা সবচেয়ে উপযোগী। সেগুন ছাড়া অন্য ভালো আঁশের কাঠ পুরোনো ও পাকা (seasoned) হলে ব্যবহার করা চলে। আনকোরা নূতন তক্তায় ছবি করলে পরে তাতে দাগ বেরিয়ে ছবি নষ্ট হতে পারে। আর যদি নূতন তক্তাই হয়, একটি বড়ো পাত্রের জলে ডুবিয়ে বেশ ক'রে সিদ্ধ ক'রে নিতে হবে। তা হলেই একরকম পাকা করা হল। **তৈলাক্ত বা গাঁঠ ও ছিদ্র যুক্ত কাঠ ভালো নয়।** সেও যদি ব্যবহার করতে হয়, তা হলে, তেল-লাগা কাঠ অল্প সোডা দিয়ে সিদ্ধ ক'রে নাও। গাঁঠ থাকলে তা কেটে বার ক'রে নিয়ে উপযুক্ত-ভাবে নতুন কাঠ জুড়ে মেরামত ক'রে নিতে হবে। ছিদ্র থাকলে কাঠের গুঁড়ো ও শিরীষ মিশিয়ে তা বন্ধ ক'রে শিরীষ-কাগজে ঘ'ষে পালিশ ক'রে নিতে হবে। এসব কাজের কৌশল যে কোনো ছুতোর মিস্ত্রির কাছে সহজেই দেখে শুনে বুঝে নেওয়া যাবে।

সেগুন কাঠের পাটায় ছবি আঁকার চলন বহুদিন থেকে। শোনা যায়, ইটালির শিল্পীরা ভারতবর্ষ থেকে সেগুন-তক্তা সংগ্রহ করতেন। দেড় ফুট দুই ফুট পরিসরের পাটা এক ইঞ্চি পুরু হলেই ভালো। তার চেয়ে বড়ো তক্তায় ছবি আঁকতে হলে দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু হলেই চলবে। সেগুনের তক্তা সচরাচর চওড়ায় আড়াই ফুট পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর চেয়ে চওড়া ছবি আঁকতে হলে একাধিক তক্তা ভালো ক'রে জুড়ে নিতে হবে। ভালো ক'রে জুড়লেও, জোড়ের মুখ পরে অল্প ফাঁক হয়ে পড়া সম্ভব। জোড়া তক্তায় অস্তরের রঙ ধরাবার পর (ছবি আঁকবার পূর্বে অস্তর তো লাগাতেই হবে) তক্তার পিছনের বিট খুলে ফেলে, জোড়ের মুখগুলি ভালো ছুতোর মিস্ত্রিকে দিয়ে শিরীষ কাগজ ঘষে মিলিয়ে নেবে; এর পর বিটগুলি আবার পিতলের স্ক্রু দিয়ে এঁটে নিলে ভবিষ্যতে জোড়ের মুখ বেশি ফাঁক হতে পারবে না। ছবির বিশেষ অংশ, বিশেষ ক'রে পাত্র-পাত্রীর মুখ জোড়ের জায়গায় ফেলবে না; হিসাব ক'রে ছবি ছঁকে নেবে।

অস্তর লাগাবার আগে তক্তাখানা র‍্যাঁদা দিয়ে ভালোরকম চেঁছে, মোটা
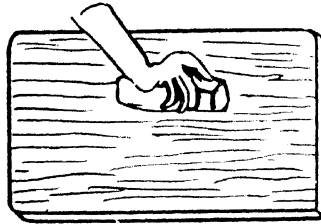
আঁশের গতি অনুসরণ করে ঘষতে হবে

শিরীষ কাগজ ঘষে সমান করে নিতে হবে। পরে কাঠের উপর প্রচুর জল-ছড়া দিয়ে বেলে আমা ইঁটের টুক্‌রো দিয়ে আঁশের গতি অনুসরণ ক'রে, বিশেষ চাপ না দিয়ে, ধীর হাতে ঘষতে হবে। হাতের ওজনের চাপই যথেষ্ট। আঁশের এড়ো (cross) দিকেও ঘষবে না। অন্যভাবে ঘষলে কাঠের পাটায় খোঁদল হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে ঘষতে হবে আর মাঝে মাঝে জলে ধুয়ে দেখতে হবে যে, কাঠের উপরিতলটি ভেলভেটের মতো রোঁয়া রোঁয়া (woolly) হল কিনা। যখন কাঠের পুরো পিঠটি ঐরূপ হবে তখন জল ঢেলে পরিষ্কার ক'রে, শুকিয়ে, প্রথমেই খুব পাৎলা শিরীষের আঠা (জলের মতো) দু-এক পোঁছ লাগাতে হবে। অথবা ডিমের হলদেতে বেশি জল মিশিয়ে খুব পাৎলা ক'রে লাগালেও চলবে। সাবধান, ডিমের বা শিরীষের আঠা কোনোটাই বেশি না হয়। এরপর কাঠখড়ির সাদা ও ঈষৎঘন শিরীষ-আঠা মিশিয়ে একটি শক্ত ও চওড়া তুলি দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে অস্তর লাগাতে হবে। শিরীষ-আঠা বেশি হলে, কড়া হলে, অস্তরে ছোপ ছোপ দাগ বেরোতে পারে, আর কম হলে ঘষলে আঙুলে রঙ উঠে আসবে। তাই, পূর্বে পূর্বে যেমন বলা গেছে, কাঠের পিছনে বা হাতে পরখ ক'রে নেবে আঠা ঠিক হল কিনা। কাঠের চার ধারে আর পিছন-পিঠেও অস্তর লাগিয়ে দেবে। এইভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে বার তিন লাগাবে। অতঃপর পাটার উপর-পিঠটি হাতীর দাঁতের মতো মসৃণ করতে হলে মিহি শিরীষ কাগজ অথবা পাকা ডুমুর পাতা বা শিউলি পাতা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে অস্তরটি সমান করে নিতে হবে। আর কাঠখড়ির সাদায় পূর্বের চেয়ে কম শিরীষ-আঠা মিশিয়ে আরো কয়েকবার পাৎলা ক'রে লাগাতে হবে। পরে আবার পাকা ডুমুর পাতায় আস্তে আস্তে ঘষতে হবে। এরূপ কয়েকবার করলেই ছবি আঁকবার জমি হাতীর দাঁতের মতো পালিশ করা হয়ে যাবে। অবশ্য, কেউ বা ছবি আঁকার পক্ষে মোটা জমিই পছন্দ করেন।

জমি পছন্দ মতো তৈরি হয়ে গেলে, টেম্পারা কাজের মতো, রঙে শিরীষ, ডিম, গঁদ, যে-কোনো আঠা মিশিয়েই কাজ করা যেতে পারে। রঙের উপর পালিশ পাথরে কখনো জোরে বা বেশি চাপ দিয়ে ঘোঁটা চলবে না (না ঘুঁটলেই ভালো)—রঙ পাপড়ি আকারে উঠে আসতে পারে। ছবি সারা হলে ভার্নিশ দেওয়া চলে, যেমন নেপালী টঙ্গায় বা ডিমের টেম্পারা কাজে দেওয়া হয়।

মেটে বা পাথুরে অর্থাৎ স্থায়ী রঙ ব্যবহার করাই ভালো। ছবিতে যে যে রঙ লাগানো হবে তা যখন প্রথম তৈরি

রে নেবে তখনই এমন পরিমাণে করবে ন শেষ পর্যন্তই কুলিয়ে যায়।

কাঠের উপর ছবি আঁকার প্রথা পুরাতন। কিন্তু কাপড় না চড়িয়ে সরাসরি কাঠেই অস্তর লাগানো ও ছবি আঁকা বিরল; আমরা তা বাইরে থেকে শিখি নি। আমাদের সবচেয়ে পুরানো কাজ বাগ-গুহার ছবির কিয়দংশের নকল (কয়েকটি মুখ)—কলাভবন-চিত্রশালায় আছে, তার বয়স হল প্রায় ৩০ বৎসর। খুব ভালো অবস্থায় আছে—পাটার মাপ ৪'×৩'×১॥'' পুরু। স্যাঁতা (damp) বা তাপ নিবারণ করবার জন্যে পাটার পিছনে বেলে মাটি আর গোবর মিলিয়ে প্রলেপ দেওয়া আছে।

পরে কলাভবনের ছাত্রেরা যা কাজ করেছেন তার বয়স ১১।১২ বৎসর; কোনোটাতে রঙের চটা উঠেছে, কোনোটায় চিড় খেয়েছে। খুব সম্ভব সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়নি বা তক্তা ভালোভাবে পাকা ক'রে নেওয়া ও ঘষা হয়নি, অথবা হয়তো প্রথম লেপে পাৎলা আঠা দিয়ে পরের লেপে কড়া ঘন আঠা মেশানো হয়ে থাকবে।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত কাজ সরাসরি কাঠের উপর করা হয়েছে অধিকাংশ থেকেই রঙ ঝ'রে গেছে। সবচেয়ে পুরানো কাজ ছিল জাপানের বিখ্যাত নারা মন্দিরে; সরাসরি কাঠের উপর, **কাঠ না ঘ'ষে** করা হয়েছিল ৫০০ খৃষ্টাব্দে, তার রঙ প্রায় কিছুই টিকে থাকে নি আধুনিককাল পর্যন্ত। যেসব কাজ নষ্ট হয়নি তা কাঠের উপর কাপড় চড়িয়ে করা হয়েছিল, যেমন মিশরে। সেখানে শবাধারের উপর ঐরূপ কাজ সবচেয়ে যা পুরানো তা খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ বৎসরের ব'লে অনুমিত হয়। তারপর ঐরূপ কাঠের উপর লাগানো কাপড়ে ছবি আঁকা হয় ইটালিতে, ১২০০ খৃষ্টাব্দে। কাজেই নিশ্চিন্তমনে স্থায়ী কাজ করতে গেলে কাঠের উপর কাপড় চড়িয়ে করাই ভালো। সরাসরি কাঠের উপর কাজ করা হলে, কাজের সন-তারিখ ও পদ্ধতি, রঙ ও আঠার বিভিন্ন পর্যায় ও 'ভাগ' এগুলি পাটার উল্টা পিঠে লিখে রাখা উচিত—পরবর্তী শিল্পীদের কাজে লাগবে।

ওয়াস্‌লি (কাগজের পাটা)

যথাযথ রাজপুত বা মোগল রীতিতে টেম্পারা রঙের ছবি বা রেখার ছবি আঁকতে হলে ওয়াস্‌লি (কাগজের পাটা বা বোর্ড) তৈরি করা চাই; তার প্রণালী জানা উচিত।

ওয়াস্‌লির জন্য শণ তুলো বা গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি দেশী কাগজই প্রশস্ত। পূর্বকালে এই কাগজ ভারতের বহু জায়গায় পাওয়া যেত। এখন জয়পুর, আজমীর, ওয়ার্ধা প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। গাছের ছালের বা আঁশের কাগজ নেপাল, সিকিম প্রভৃতি হিমালয়-উপত্যকার বহু স্থলে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। একে নেপালি কাগজ বলা হয়। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে আমরা এই কাগজ ব্যবহার করে দেখেছি, দেশী (টেম্পারা) ছবি আঁকবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই কাগজ খুব চিমড়ে আর পুরাতন হলেও পোকা লাগে না। যে গাছের ছাল থেকে তৈরি হয় তাতেই কীটনাশক গুণ আছে।

ওয়াস্‌লি তৈরি করতে চাই—ওয়াস্‌লির আঠা, ব্লটিং কাগজ, দেশী কাগজ, দুটি সমান মাপের মসৃণ সমতল কাঠের পাটা, একটি পালিশ পাথর (agate) বা শঙ্খ।

এখন, ছয়-সাতখানি দেশী কাগজ ইচ্ছামত আকারে, একই মাপে পরিষ্কার ক'রে কেটে নাও। চ্যাপ্টা চওড়া তুলি দিয়ে কাগজগুলি একটার পর একটা ভিজিয়ে, কাঠের পাটার উপর ঈষৎ ভিজে ব্লটিং কাগজ রেখে তার উপর একটির পরে আরেকটি গুছিয়ে রাখ এবং উপরে আরেকখানা ঈষৎ ভিজে ব্লটিং কাগজ রেখে আর একটা কাঠের পাটা চাপা দাও। এর পর ঐ কাগজের গোছা থেকে একখানি কাগজ সন্তর্পণে ছুরি দিয়ে আলগাভাবে তুলে নিয়ে, কাগজের তলায় হাত দিয়ে, ছবি আঁকার কাঠের পাটায় আস্তে আস্তে রাখো। ওয়াস্‌লির আঠা কিভাবে তৈরি হয় পূর্বে বলা হয়েছে; সেই আঠা আঙুলে ক'রে নিয়ে কাগজখানির মাঝে মাঝে লাগিয়ে দাও, তারপর জল-হাত ক'রে ধীরে ধীরে আঠাটি সমস্ত কাগজের উপর চৌরস ক'রে লাগাও। ডাইনে বাঁয়ে আঁকা বাঁকা (zigzag) গতিতে হাত চালাতে হবে, মাঝে মাঝে জল-হাত ক'রে নিলে হাত সহজে সরবে। আঠা বেশ লাগানো হলে পাটাখানা কাৎ ক'রে দেখলে বোঝা যাবে সমান হ'ল কিনা। ঠিকমতো আঠা লাগানো হয়ে থাকলে আর একখানি কাগজ ব্লটিং কাগজের নীচে থেকে বার ক'রে নিয়ে পূর্বের আঠা-লাগানো কাগজের উপর রাখতে হবে। এ সময় অন্য একজনের সাহায্য পাওয়া গেলে ভালো হয়। নতুন কাগজখানি পূর্বের কাগজের উপরের বাম কোণে রুজু রুজু ভাবে মিলিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে নামাতে থাকো; এ সময় সঙ্গী যিনি থাকবেন, সামনা-সামনি ব'সে, আঠা-লাগানো কাগজের সঙ্গে এ কাগজখানা সঙ্গে সঙ্গে সাবধানী হাতের চাপ দিয়ে চৌরসভাবে মিলিয়ে দিতে থাকবেন। কাগজে কাগজে ঠিকমতো জোড়া হল কিনা দেখে নিতে হবে। দুটি কাগজের ভাঁজের ভিতর হাওয়ার বুদ্‌বুদ থাকলেও
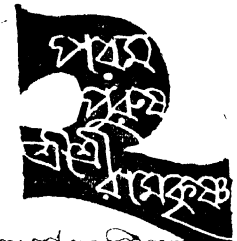
চলবে না; থাকলে, আস্তে আস্তে হাতের চাপ দিয়ে বার ক'রে দিতে হবে। দুটি কাগজ জোড়া হল তো উপরের কাগজে, পূর্বের মতো আঠা লাগিয়ে আর একখানি কাগজ বার ক'রে নিয়ে পূর্বের মতোই হস্তকৌশলে আবার জুড়ে নিতে হবে। এইভাবে পর পর সব কাগজ লাগানো হয়ে গেলে শেষেরটির উপরেও আঠা লাগাতে হবে, কিন্তু পাৎলা ক'রে। এখন এই জোড়া-লাগানো কাগজের গোছা ছুরি দিয়ে পাটা থেকে আল্‌গা ক'রে তুলে নিয়ে, চারধার আঠা-লাগানো কাগজের ফিতে বা ফালি লাগিয়ে দেয়ালে এ'টে দাও—পাটায় যে কাগজখানি উপরে ছিল দেয়ালেও সেইটেই উপরে থাকা চাই। দেয়ালে বেশ শুকিয়ে গেলে জোড়া দেওয়া কাগজের চার ধার ব্লেড দিয়ে কেটে, দেয়াল থেকে খুলে নাও। এর পর মজবুৎ ও মসৃণ কাঠের পাটা বা কাঁচের উপর রেখে পালিশ-পাথর দিয়ে অথবা শাঁখ দিয়ে ওয়াস্‌লির দু পিঠই ভালো ক'রে পালিশ ক'রে নাও। তা হ'লেই ওয়াস্‌লি তৈরি হল। একাধিক ওয়াস্‌লি তৈরি ক'রে সঞ্চয় ক'রে রাখা ভালো। যখন ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়।

মনে রাখতে হবে, এই তৈরি ওয়াস্‌লির ভিতর পিঠে মোটে আঠা লাগানো হয়নি আর উপর পিঠে পাৎলা আঠা এক পর্দা রয়েছে। এই উপর পিঠেই ছবি আঁকা হবে।

ছবি আঁকতে হ'লে একখানি ওয়াস্‌লি নিয়ে চওড়া চ্যাপ্টা তুলিতে তার দু' পিঠই অল্প ভিজিয়ে দাও। যে কাঠের পাটায় ছবি আঁকা হবে তার উপর এই ঈষৎ-ভিজে ওয়াস্‌লি রেখে, আঠা-লাগানো শক্ত কাগজের ফিতে দিয়ে চার ধার এ'টে দাও। পাটার উপর ওয়াস্‌লি খুবই অল্প ভিজে থাকতে থাকতে, একটি তেলা কাগজ বা ট্রেস্ করবার কাগজ ওর উপর রেখে পালিশ-পাথরে বা শাঁখে অল্প পালিশ ক'রে নাও।

এখন এর উপর ইচ্ছামত শিরীষ বা গঁদ মেশানো রঙে কাজ করা চলবে। পূর্বেই বলেছি, রঙে গঁদ মেশাতে হলে, যখনকার তখন টুক্‌রো গঁদ আঙুল দিয়ে মেড়ে মেড়ে মেশানোই ভালো—রঙ উজ্জ্বল থাকে। বিলিতি রঙের কেকগুলিতে আঠা দেওয়া থাকে, আর দিতে হয় না। ছবিতে যে যে রঙ লাগাবে তা একেবারেই তৈরি ক'রে রাখতে হয়, টেম্পারা ছবি আঁকার এই রীতি। কারণ, অমিশ্র রঙ বার বার করা গেলেও, দুই বা তার বেশি রঙের মিশ্রণে যে রঙ হয় তা একবারের মতো হুবহু আর একবার করা যায় না। পূর্ব দিনের শুকোনো রঙে প্রত্যহ নতুন ক'রে জল দিয়ে, প্রয়োজনমত একটু আঠা মিশিয়ে ভালো ক'রে আঙুলে মেড়ে নিয়ে কাজ শুরু করবে। প্রত্যহ মাড়া হয় ব'লে রঙ ক্রমশ খুবই মোলায়েম হয়ে আসবে। কাজ যখন বন্ধ থাকবে, রঙের বাটিগুলি একটি ঢাক্‌নায় বা কাপড়ে ঢেকে রাখবে, যাতে ধুলোবালি না পড়ে।

শকুন

অসিতকুমার

খরনিবদ্ধ আঁখি
গোলগম্বুজ চুড়োয় দাঁড়িয়ে
তলায় তাকিয়ে থাকি।
মানুষ পোকারা আসে যায়, হাসে কাঁদে
ঘর ভাঙে ঘর বাঁধে
আশাশঙ্কাতে কাঁপে বিচিত্র প্রাণ
দৃষ্টি প্রখর, চঞ্চু নখর, আমি প্রতীক্ষমান
রক্তে মাংসে বুদ্বুদগুলো, ফোটে আর ফেটে যায়
বাঁকা চঞ্চুর ঘায়
পরিচয়হীন বস্তুপিণ্ডে পরিচয় থেকে যায়—।

যে যাই বলুক, আমি জানি এই পৃথিবী ত' শবাধার
যে যাই করুক, এখানে আমার অখণ্ড অধিকার
যে যাই ভাবুক, এই পৃথিবীতে অস্থিমাংস সার
তোমরা জান না তাকি?
খরশান এই চঞ্চুতে চিরি পৃথিবীকে বারবার
যন্ত্রণা তার কভু টের পাও নাকি?

ঊর্ধ্বে আকাশ, অন্ধ আকাশ, কোথায় শাখাশ্রয়
কোন নীড়ে নেই আতপ্ত আশ্বাস,
নখে চঞ্চুতে পাব জীবনের চূড়ান্ত পরিচয়
অন্যে আমার অটল অবিশ্বাস।
গোলগম্বুজ চুড়োয় কেবল, একা আমি, শুধু একা
কঠিন শূন্য জমিয়াছে আশেপাশে—
অতীতে কোনই আশ্রয় নেই, ভবিষ্য নয় দেখা
সুদূরে মাটির বুকে বুকে শুধু রক্ত চিহ্ন লেখা
লোভ, শুধু লোভ, দুর্মর লোভ, হায়েনার হাসি হাসে
সঙ্গীরা সব শূন্যে উধাও—
খরনিবদ্ধ আঁখি;
একা আমি চেয়ে থাকি
জন্ম জীবন, সবই নিরর্থ, পৃথ্বী শিকার ভরা
সংহারে তাহা সত্য করিব নাকি?

ইণ্ডির ঘাট

সুশীল রায়

সে এক সময় ছিল, যখন এই ইণ্ডির-ঘাটটি ছিল আমাদের প্রত্যেক দিনের সঙ্গী। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাঙ্কের ধার দিয়ে এগিয়ে সাহেববাজার ছাড়িয়ে মাস্টারপাড়া পেরিয়ে আমরা চলে আসতাম পদ্মার কিনারে, উঠে আসতাম এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের উপর। এখানে উঠেই দেখতে পেতাম, পৃথিবীটা কত বড়। চওড়া পদ্মার ঢেউ ডিঙিয়ে চোখের দৃষ্টি চলে যেত ওপারে, কিন্তু সেখানেও পৃথিবীর শেষ নয়। ওই ধূসর গাছপালার ওপারেও নাকি পৃথিবী আছে, তখন একথা শুনে আশ্চর্য লাগত। পৃথিবীর শেষ দেখার জন্যে কোনো তাগিদ ছিল না বটে, কিন্তু পৃথিবী যে আরো অনেক বড়—এই কথাটার মধ্যেই যেন মস্ত মজা ছিল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে বেড়ে যখন অনেক বড় হব, তখন নাকি পৃথিবীর এই রহস্যটা জানতে পারব, এরকম আশ্বাস পেয়েছি তখন অনেকবার। তাই, পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের কথাই ভাবতে শুরু করেছিলাম, মনে পড়ে। খুব অধৈর্য ঠেকত; মনে হত কিছুতেই তেমন বড় হয়ে উঠছি নে কেন। তেমন বড় হয়ে উঠতে যেটুকু সময় লাগা দরকার, সেটুকু সময় দিতেও কিছুতেই মন চাইত না। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথার উপর সোজা করে পেন্সিল শুইয়ে দিয়ে তার শিস দিয়ে দেয়ালে দাগ দিতাম। দু দিন পরই আবার দাগ দিতাম। আশ্চর্য, স্পষ্ট দেখতে পেতাম—দুদিনেও এতটুকু বাড়ি নি। তাই মুষড়ে পড়তাম। মনে হত, পৃথিবীর রহস্যটা তাহলে বুঝি আর জানা হল না।

কিন্তু এখন বড় হয়েছি, অনেক বড় হয়েছি। আর ইঞ্চি দিয়ে মেপে ওঠা সম্ভব নয়। এখন মাপা হচ্ছে ফুট দিয়ে। কয়েক ফুট লম্বা হয়েছি। শুনেছি, আর নাকি বাড়ব না, বাড় নাকি এখানেই খতম হয়ে গেছে। নিজের অজানিতে কখন যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলাম, আবার নিজের অজানিতেই সেই বাড়টা কখন যে স্তব্ধ হয়ে গেল—এ খোঁজই রাখিনি। কিন্তু যার জন্যে এতটা বাড় বাড়ল, সেই পৃথিবীর রহস্যটা, এখন দেখছি, আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কিছুতেই তার বেড় পাওয়া যাচ্ছে না। দুই হাত দু পাশে যতটা সম্ভব প্রসারিত করে পৃথিবীকে জাপটে ধরতে গিয়ে দেখি, বাল্যের সেই ইণ্ডির ঘাটের কিনারেই পড়ে আছি। বাগিয়ে ধরা যায় না ওকে। এজন্যে আক্ষেপ নেই এতটুকু। কিন্তু আক্ষেপ হচ্ছে কেবল এই কথা ভেবে যে, তাহলে অকারণে এত বড় হবার মানে কি? সে আমলে যাঁরা বড় ছিলেন, তাঁরা তখন আশ্বাস দিয়েছিলেন কোন্ ভরসায়?

সব ইচ্ছে আর সব আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়েছি। কিন্তু সেই ইণ্ডির ঘাটটাকে জলাঞ্জলি দিতে পারছি নে কিছুতে। বহুদিন তার সঙ্গে দেখা নেই। জীবনের অনেকগুলো বছর ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে বেড়ে উঠে তাকে আড়াল করে দাঁড়াবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিল; কিন্তু এ খেয়াল তাদের হয়নি যে তারা স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। তাই তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা অনেক কাল বন্ধ থাকলেও, জীবনের এই বছরগুলো ভেদ করেও দৃষ্টিটা গিয়ে সরাসরি পড়ছে তারই উপর। তাই নিজেকে কিছুতেই সরিয়ে নিয়ে আসতে পারছিনে তার জিম্মা থেকে।

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এর জন্যে আপসোস করতে শুনেছি অনেককে। যে-রামকে কোনোদিন দেখিনি, যে অযোধ্যার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই—তাদের থাকা-না-থাকা আমার কাছে সমান। তাই তাদের অভাবকে অভাব ব'লে ঠেকে না। কিন্তু হঠাৎ কাল শুনলাম, সে পদ্মাও নেই, সে ইণ্ডির ঘাটও নাকি আর নেই। আমার কাছ থেকে যারা এতটা তফাৎ হয়ে গেছে অনেক দিন হল, যাদের থাকা-না-থাকার সঙ্গে আমার বর্তমান জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, হঠাৎ তাদের এই না-থাকার সংবাদে মর্মাহত হলাম।

এদের চাক্ষুষ দেখেছি, এদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ঘনিষ্ঠ। তবুও, এদের থাকা-না-থাকাটাও আমার কাছে আসলে ছিল সমান। এরা থাকলেও আমার কোনো লাভ হচ্ছিল না, এরা গিয়েও আমার কোন লোকসান নেই। এসব সত্ত্বেও, তারা যে আছে, এই অনুভূতিটাই ছিল আমার একটা ঐশ্বর্য। তারা আজ নেই জেনে, মনে হল, আমার সেই সম্পদটা আজ খোয়া গেছে।

বলতে দ্বিধা নেই, আমি কৃপণের মত মনে-মনে সঞ্চয় করে রেখেছিলাম এই ইণ্ডির ঘাট। একে মন থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না জানি, তবুও এর নেই সংবাদে আজ দারুণ ঘা খেলাম।

তেমন কিছুই না। লম্বা একটা লোহার বর্গা পদ্মার ঢালু বরাবর খানিকটা কাৎ হয়ে নেমে গেছে। তার গায়ে ইঞ্চির দাগ কাটা। পদ্মার জল কতটা বাড়ল, এখানে তাই মাপা হত। জল বেশি বেড়ে উঠে এমব্যাঙ্কমেণ্ট ছাপিয়ে, ওপারে গেলেই বিপদ। শহর ডুবে যাবে। আমরা অত খবর জানতাম না, জানবার ইচ্ছেও ছিল না। আমরা চিনতাম কেবল এই ঘাটটাকে।

পদ্মা আজ মরে গেছে। তার বুক ভরে গেছে চড়ায় আর চরে। জল চলে গেছে অনেক দূরে। ইণ্ডির ঘাটের কাজ খতম হয়ে গেছে তাই। আজ নাকি তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আগাছার জঙ্গলে সে নাকি ঢাকা পড়ে গেছে।

এটা একটা কঠিন সংবাদ নয়। কিন্তু সংবাদটা আমার কাছে নিদারুণ বলে ঠেকল। মনে হল, ইণ্ডির ঘাটের জীবনে

আজ তাহলে শুরু হয়েছে অরণ্যরোদন। একদিন যার কিনারে এসে উচ্ছল ঢেউ খেলা করত, জল গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে আসত যার বুকের দাগের উপর, যার বুকের প্রত্যেকটি অঙ্কের উপর তখন সকলের ছিল তীক্ষ্ণ নজর, আজ সে হারিয়ে গেছে।

সে হারিয়ে গেলেও আমি তাকে হারাতে রাজি না। আগাছার অরণ্যে অদৃশ্য না হয়ে পদ্মার উচ্ছল ঢেউয়ের দাপটে নিজেকে যদি তার জলাঞ্জলিও দিতে হত, তবুও আমি তাকে খোয়াতে রাজি হতাম না। তারই পাশে দাঁড়িয়ে আমি প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম, এই পৃথিবীর বিরাটত্ব, তাই সে-ই আমার কাছে হয়ে আছে একটি বিরাট প্রতিভার মতই উজ্জ্বল।

এরকম তো কত ইঞ্চির ঘাটেরই এমনি দশা ঘটেছে জীবনে। একটা কর্তব্যের পাশে এসে এমনি লোহার কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজে এতটুকু গলতি না হয় তার জন্যে কড়া নজর আছে সব-সময়ই নিজেদের উপর; তবুও একদিন কর্তব্যটাকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের বেকুব বানানো হয়েছে। তাদের জীবনের আক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে আমি আক্ষেপ করতে রাজি, তাদের জীবনের ট্র্যাজিডির জন্যে দুঃখ করতেও সম্মত আছি; কিন্তু পদ্মার কিনারের সেই ইঞ্চির ঘাটের তুলনায় এদের জীবনের ট্র্যাজিডি কিছু না।

সেই ট্র্যাজিডির ছোঁয়াচ এসে যেন লেগেছে আমার গায়ে। আমার মন তাই ভারি-ভারি ঠেকছে আজ। মনে হচ্ছে, লোহার সেই মজবুত বর্গাটার চেয়েও যেন বেশি ভারি হয়ে উঠেছে। যে ছিল পদ্মার কিনারে পড়ে, আজ যে হয়ে গেছে আগাছার অরণ্যে অদৃশ্য—আমি আজ তাকে আমার সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করতে পেরে ধন্যই মনে করছি নিজেকে। মন ভারি হয়ে ওঠায় সুখ তাই বিষণ্ণ হয়ে ওঠেনি সম্ভবত। মনে হচ্ছে আজ অনেকদিন বাদে আমি প্রফুল্ল হয়ে উঠেছি। অজস্র বছরের বেড়াগুলোকে লাফে লাফে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আমি গিয়ে যেন বসতে পেরেছি তারই কিনারে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছি তার বুকের উপর আঁকা দাগগুলো। শুকনো পদ্মা হঠাৎ ফেঁপে-ফুলে উঠেছে যেন, তার স্রোত তার উচ্ছ্বাস তার উল্লাস ফেনা-মাখা ঢেউ হয়ে উঠে এসেছে কিনার অবধি। তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। এতদিন বাদে আমিও যেন আবিষ্কার করে বসলাম আমাকে। মনে হল, দরকার নেই, পৃথিবীর রহস্য জানার কোনো প্রয়োজন নেই। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আমাকে যেভাবে বাড়িয়ে তুলে আজ এত বড় করা হয়েছে, একে একে মুছে ফেলা হোক সে ইঞ্চির দাগ, আমাকে করে দেওয়া হোক সেই ইঞ্চির ঘাটের খেলার সঙ্গীটি। তাহলে একভাবে এখানে আমি দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখতে পাব ধূসর ওপার, ওপারের পরপারে ওই আবছা গাছের মিছিল, তার উপর ঝুঁকে-পড়া ওই নীল আকাশটা।

আমিও যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিলাম আগাছার অরণ্যে। বছরের সেই জঞ্জাল-গুলো সরিয়ে আজ দেখতে পেলাম আমাকে। ওই ইঞ্চির ঘাটটাও অর্বাচীন অরণ্যের আড়াল থেকে উঠে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমাদের দুজনেরই আজ সমান অবস্থা। দু জনের জীবন থেকেই পদ্মার স্রোত সরে গেছে দূরে; দু জনেই তাই আজ স্বপ্নহীন হয়ে গেছি, স্রোতোহীন হয়ে গেছি, দুজনেরই জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেছে যেন একই সঙ্গে।

দেয়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাপলাম। ইঞ্চিতে নয়, ফুটে। হাসি পেল। হাঁটু ভাঁজ করে একটু নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আগের দাগটার সমান হলা অনেক কষ্টে। যে দাগ ছাপিয়ে উঁ হয়ে উঠছি নে কেন ব'লে অধৈর্য হ উঠেছিলাম একদিন, আজ সেই দাগটা আঁকড়ে ধরতে লোভ হতে লাগল। হাঁ ভাঁজ করে অনেকগুলো ইঞ্চি চু করলাম বটে, কিন্তু সোজা হতে গিয়ে নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেলাম এদিক-ওদিক তাকালাম, কেউ দে ফেলল কি না। আর কেউ না দেখু আমি তো নিজে দেখে ফেলেছি—এতে অপদস্থ ঠেকতে লাগল, অপরাধী ঠেক লাগল।

আজ আর সে ঘাট স্বীকার ক লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গে ক্ষতি যা হবার হয়েছে, তার পূরণের ত কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আ ক্ষতি হয়ে না যায়, এইজন্যে সাবধান হ উঠেছি আজ। কোনো অসতর্ক মুহূ আরো বড় হবার আকাঙ্ক্ষা না জে ওঠে, এজন্যে হুঁশিয়ার হয়ে দাঁড়ি আছি নিজের পরিপূর্ণ দীর্ঘতায়।

ধূলটে কীর্তন

সরলাবালা সরকার
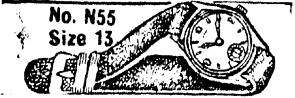
কীর্তনময়ী নবদ্বীপ নগরী। বিশেষ করিয়া ধূলটের সময় যে কীর্তন হয় সেই কীর্তনে বহু দূরদেশ হইতেও কীর্তনীয়াগণ নবদ্বীপে আসিতেন কীর্তন শুনাইতে।

মাকরী সপ্তমীতে হয় এই কীর্তনের আরম্ভ এবং পূর্ণিমা পর্যন্ত কীর্তন চলিতে থাকে। প্রতিপদের দিন ধূলা উড়াইয়া দলে দলে নগর সংকীর্তন নগরের পথে বাহির হয়, এইজন্য এই কীর্তনকে ধূলটের কীর্তন বলা হয়।

৫০ অথবা ৫৫ বৎসর আগে আমি প্রথমে ধূলটের কীর্তনের সময় নবদ্বীপ যাই। ইহার আগে এবং পরে অবশ্য আরও অনেক বার গিয়াছি।

নবদ্বীপে মন্দির ও আখড়া অনেক, তাহার মধ্যে মহাপ্রভুর মন্দিরই প্রধান মন্দির। কীর্তনীয়ারা প্রথমে এইখানেই কীর্তন আরম্ভ করেন।

মৃদঙ্গের গুরু গুরু গম্ভীর ধ্বনির ভিতর মঙ্গলাচরণের শ্লোক উচ্চারিত হইতেছে:—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্‌।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত
সদা
হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

যাহা কখন কোন অবতার কর্তৃক অর্পিত হয় নাই, সেই স্বীয় উন্নত উজ্জ্বল রস দ্বারা পরিপূর্ণ ভক্তিরূপ পরম সম্পদ জীবগণকে বিতরণ করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণ হইতেও অতি রমণীয় কান্তি ধারণ করিয়াছেন সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়রূপ আবাসে সর্বদা প্রকাশিত থাকুন।

ইহার পর আরম্ভ হইল বাসুদেব ঘোষের কীর্তন;—

"যদি গৌর না হত, কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে,
রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা-বিপিন মাধুরী
প্রবেশ—চাতুরী সার,
বরজ যুবতী রসের আরতি
শকতি হইত কার?
গাও পুনঃ পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব মাঝারে এমন দয়াল
নাহি আর কোন জন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া,
কেমন সেধেছে সিদ্ধি।
বাসুদেব হিয়া পাষাণে গড়িয়া
রেখেছে কোন বা বিধি?"

মূল কীর্তনীয়া ব্যাখ্যা করিয়া চলিলেন, "এই যে নবদ্বীপ, এই নবদ্বীপে শচীগর্ভসিন্ধু হইতে নবদ্বীপচন্দ্রের যেদিন উদয় হইল, সেই প্রেমজ্যোৎস্না-প্লাবিত পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে পৃথিবীর পাপ তাপ সমস্ত নিমেষে দূর হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গধ্বনির সহিত আরম্ভ হইল,

কলি ঘোর তিমির গরাসিল দশদিক,
ভাইরে, ধরম করম গেল দূর।
অসাধন-চিন্তামণি বিধি মিলাইল আনি,
গোরাবর দয়ার ঠাকুর
(কোনো সাধন তো করি নাই, তবু বিধি সদয়
হয়ে মিলাইল সেই অসাধনের চিন্তামণি)
দয়ার ঠাকুর গোরাচাঁদের
নদের মাঝে উদয়ে আজ
পাপ তাপ সব দূরে গেল।
ভাইরে, নদীয়া আজ যেন এক সুখের পাথার।
ওরে (একদিন নয় দুদিন নয়, আমাদের
নিতিই নব সুখেরি পাথার।
আনন্দ জলধিতে আনন্দেরি তরঙ্গ লীলা,
ভাইরে, একদিন নয়, দুদিন নয়,
নিতিই নব সে তরঙ্গ,
নিতিই নব নব সে তরঙ্গ সুখের
পাথার নদীয়ায়।)
মনে করি নদে ভরি আমার এ দেহ বিছাই গো,
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই গো।

প্রস্তাবনা এইভাবে শেষ হইবার পর ঘন ঘন করতাল ও মৃদঙ্গের বাজনার সহিত "গৌরচন্দ্রিকা" আরম্ভ হইল। গৌরচন্দ্রিকার ভাব এই যে, মহাপ্রভু গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া এমন এক ভাবে বিভাবিত হইয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া সেই চঞ্চল চূড়ামণি হাস্যময় নিমাই পণ্ডিতকে আজ কে স্মরণ করিবে? কোথায় গেল তাঁহার অধ্যাপনা, কোথায় গেল পড়ুয়াগণের সঙ্গ! নির্জনে বসিয়া অনবরত অশ্রু গদ্‌গদ্‌ স্বরে কি মন্ত্র যে জপ করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন।

"বদন পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে
বিম্ব বিড়ম্বিত ওষ্ঠ কেন সদা কাঁপে?"
(গয়ায় গিয়ে কি যে মন্ত্র পেল,
কে তারে কি নাম শুনাল)

আর বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধা, তিনিও প্রথমে শুনিয়াছিলেন একটি নাম, তাহার পর আবার তাঁহার চিত্রাঙ্কন-কুশলা সখী বিশাখা সেই শ্যামচাঁদেরই চিত্র অঙ্কন করিয়া তাঁহার সম্মুখে নামকে মূর্ত্য করিয়াছিল।

বৃকভানুর আদরিণী নন্দিনী, অখলা, সরলা, ব্রজবালা আজ একটি নাম শুনিয়াই কি পাগলিনী হইলেন?

"সই, কেবা সে শুনাল শ্যামের নাম?
(নামে যত বিষ তত মধু)
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
দিবসে কি রজনীতে, জাগরণে কি স্বপনে
এ নাম বদন যে ছাড়ে না
(দিবা নিশি জপি জপি রসনা যে রসে ভোর,
ক্ষণেক বিরতি নাহি মানে)
জপিতে জপিতে নাম পুলকে এলায় দেহ
কেমনে পাইব সই তারে।

সখিরে, যার নামের স্পর্শের এত প্রতাপ, যদি একবার তার অঙ্গের স্পর্শ পাই, না জানি তখন আমার কি দশা হবে।

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি না হয়?
যেখানে বসতি তার মনেতে জানিয়া গো
কে হেন যুবতী ঘরে রয়?
পাসরিব মনে করি পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
সে বড় নিপুণ শ্যাম রায়?
সখীরা কানাকানি করে, আমাদের রাই
কেন এমন হল।
"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে
থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা।
(সখী সঙ্গ আর তার ভাল লাগে না লাগে না।
না জানি কার সঙ্গ লাগি ব্যাকুলতা)
সদাই ধেয়ানে রহে আনমনে
না চলে নয়নের তারা,
হসিত নয়নে চাহি মেঘ পানে
কি কহে বাউরী পারা।

রাধিকার আর গৃহকাজে মন নাই. গুরুজনের ভয়ও নাই। অলঙ্কার ধারণের ভার সহ্য করাও আজ যেন শ্রীমতীর পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

"হার ভার ভেল, কঙ্কণ তাজল
চীর চাদন ভেল আগি,
দখিনেঞো পবন দুঃসহ ভেল
বহতহ নারী বধ লাগি।"

গৃহকার্যে নিপুণা রাধারাণী কত যত্নেই দধি দুগ্ধের কাজ সম্পন্ন করিতেন.

কত না যতনে ঘর অএলাহু
কেকর দধি দুধ কাজে
দারুণ সন্তাপে সবহি বিসরল
তাজল গুরুজন লাজে।

সখিরা বার বার জিজ্ঞাসা করেন, "সখী শ্যামের নাম যেদিন শুনিলে সেদিন থেকে তোমার একি হল? আমরা তোমার প্রিয় সখী, আমাদের কাছে তোমার মনের ব্যথা কি, কোন্ ব্যাধি তোমাকে এত বেদনা দিতেছে তাহা খুলিয়া বল।

রাধিকার একমাত্র উত্তর নয়নের জল।

"অকথন ব্যাধি কহনে না যায়,
যে করে শ্যামের নাম ধরে তার পায়॥"

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও শ্রীরাধারই মত।

"পথ-গতি পেখলু সো ধনি,
প্রেম-সরোবর টলমল ঢলঢল,
ব্রজবধূ মুকুটমণি।
জঁহা জঁহা পদযুগ ধরই
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই।
জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ,
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ।
কি হেরল অপরূপ গোরি
পইঠল হিয় মাহি মোরি।

আর কি তার দেখা পাব?
প্রেম সরোবরের সেই পঙ্কজিনী
আবার কি তার দেখা পাব?
পুণহি দরশনে জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর
চরণ-জাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর।
(তার পা দুখানি হৃদে ধরে
হৃদয় জ্বালা জুড়াইব)
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যদুপতি
চিত থির নহি হোয়।
রমণী কুল শিরোমণি সো হেন রমণী
পুনু কি এ মিলব তোয়?

—এমন সময় আসিলেন বড়াই, তিনি দৌত্যকার্যে অতি নিপুণা, তাঁহার এক নাম বৃন্দা।

সখীরা তাঁহাকে শ্রীরাধার অবস্থা জানাইল।

"আমাদের চাঁদবদনী, দিনে দিনে মলিন হল।
যেন পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় হয়ে যায়
কৃষ্ণ পক্ষে কলায় কলায়.
"চাঁদবদনী ধনী চকোর নয়নী,
দিবসে দিবসে ভেল চৌগুণে মলিনী।"
আবার কোন্ বনে যে বাঁশী বাজে, সেই
"বাঁশি-নিসাস গরল তনু ভোর"
কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।"
একবার মাত্র "নয়নে দেখল হরি এত অপরাধে।" বৃন্দা ব্যাধির বিবরণ শুনিয়া বলিলেন,

"ওরে অবোধিনী, তোরা এ দারুণ ব্যাধির কারণ কি আর তার ঔষধই বা কি তার কিছুই তো বুঝতে পারিস্ নি।

অবুঝ সখীজন ন বুঝয়ে অবধী।
আন ঔষধ কর আন বেয়াধী।"
(এ ব্যাধি তো নয় দেহের ব্যাধি)
(এ যে) "মনসিজ মনমে মন্থে বেবথা।
ছাড়ি কলেবর মানস বেথা"
"পীরিতি পীরিতি তিনটি আখর
দহন মোহন সাধি,
কভু বা অমিয়া কভু বা গরল
ঘটায় দারুণ ব্যাধি।"
এই যে প্রেম, এ এক অসাধন-সাধনা।
চণ্ডীদাস কহে শুনে অবোধিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে না করে প্রেম,
দুখ যায় তার ঠাঁই।
—সখী, তোরা অবলা সরলা
প্রেমের তোরা কি জানিস।
চণ্ডীদাসের বাণী শুনে বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ তাজিলে
পীরিতি মিলয়ে সেথা।

দূতী শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা শ্রীরাধার অবস্থারই মত। শ্রীকৃষ্ণ সুবল সখার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "সখা আমার যদি এক লক্ষ মুখ হইত তবু তো যমুনায় স্নানরতা শ্রীরাধার যে রূপ দেখিয়াছিলাম তাহার বর্ণনা দিতে পারিব না।

"সিনানক বেরি জইসে হম পেখল
কি কহব নহ সুখ লাখি।
যমুনা কিনারে সোই রামা।
সিনায়ত গোরী হম রহু বহু দূরে
কটাখে নেহারত হামা।
হেরইত মঝু তুল ধূড়ল গেল,
মুরতি রহল তহি থাড়ি,
তিরি-জন ভরসি উপমা নাহি পাই অ
পুন জিউ মুরতি সঞ্চারি।

সখা, আমাকে দেখে সেই গৌরাঙ্গিনী খনেকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ঠিক যেন একখানি মূর্তি।

আমি যদি ত্রিজগত ভ্রমণ করি-তবু তো সে মূর্তির উপমা খুঁজে পাব না।

আবার দেখলাম, মূর্তিতে যেন প্রাণ সঞ্চার হল।

তৈখনে দেখল সমাধল সিনান
চলব করত অনুমানি।

সখা, যেন তাঁর স্নান সমাপন হয়েছে মনে হল, এইবার চলে যাবেন। আর যমুনার জলরাশি যেন তাঁর বিরহবেদনার ভয়ে তরঙ্গিত হয়ে উঠলো।

অপরস বিরহ সহত নহি পারই
আও তরঙ্গিত পানি।
তনু সং মিলি গেল সজল নীলাম্বর,
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি,
রোয়ত সাটী মোহে ধনী তেজব
পহিরব আনহি সাড়ী।

সখা, তাঁর সজল নীলাম্বরখানি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, আর তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ঝরিতেছে যেন বস্ত্র এই ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে যে, এবার আমাকে ত্যাগ করিয়া ইনি অন্য বস্ত্র পরিবেন।

তকর দুঃখ দেখি মুঝ আঁখি দোন
রোই চলিল তহু সঙ্গে,
আপনক দুখ মিটব জব পেখব
পুণহি তহু বরাঙ্গে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই দশা দেখিয়া বৃন্দা আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন, এ যে দেখি ব্যাধি সংক্রামক, একের ব্যাধি অপরেও সংক্রামিত হইয়াছে। যখন দুজনেরই এক ব্যাধি, তখন একই ঔষধের প্রয়োজন।

তখন সুচতুরা দূতী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন—

"কি কহব মাধব পুনফল তোর,
তোহারি মুরলী-রবে রাই বিভোর।
তাহি পুন সুনল নাম তোহার।
উছল যে ভাব হাম কহই না পার।

—মাধব, তোমার পুণ্যফলের কথা কি আর বোলবো। তোমার মুরলীর রব শুনিয়াই রাধিকা বিভোর হইয়াছেন। আবার তাহার পর যেই তোমার নাম শুনিলেন অমনি যে ভাবতরঙ্গ তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইল আমার সাধ্য নাই যে তাহার বর্ণনা দিব।

অঙ্গ অবস ভেল কাঁপি অগেয়ান।
মুরছিত ভেল ধনি কিছু নহি জান।
বুঝ এ ন পারি এ কৈসন রীত,
কীএ ভেল কিছু নহ পরতীত।
বিদ্যাপতি কহ দূতীর বচনে কানু
চিত্র-পুতলি জনু ভেল,

নয়ন লোরে ধনি ডুবইত অহরহঃ
হরি-পর তিরি-বধ দেল

হায়, হায়, হে হরি, তুমি কি স্ত্রী-বধের ভাগী হইলে? দূতীর বচন শুনিয়া কানু চিত্রপুতলীর মত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

হে হরি হে হরি কর অবধান
দরশ দান করি রাখহ পরান।
খন খন বর তনু ঝামর ভেল,
সরস বিলাস হাম সব দূরে গেল।
চকিত চকিত বহে নয়ন লোর
অধর শুখায়ল নাহি নিকসই বোল।
* * * *
তপন কনক তনু কাজর ভেল জনু
(দীপ্ত তপনের মত আমার রাইয়ের তনু
কাজলের মত কালো হয়ে গেল যে)
মরমক বিরহ হুতাসে।
কবি বিদ্যাপতি মন অভিলাসত
কানু চলহ তছু পাসে।

বৃন্দাবনের বনে হল নববসন্তের আগমন। নববসন্তের বাঁশী বাজলো বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে।

রাইয়ের কানে সে বাঁশীর ধ্বনি,
"সুনইতে সুনইতে থাপয়ে চিত,
জইসে কুরঙ্গিনী ব্যাধ সঙ্গীত।"
এবার আরম্ভ হল মৃদঙ্গের সঙ্গে কীর্তন:
মন্দ মন্দ মধুর বায়, ঐ যে শ্যামের
বাঁশী বাজে,
বাজে ঐ ঐ ঐ,
ঐ শোন্ শ্যামের বাঁশী বাজে
কোথা প্যারী!
আমি একলা কুঞ্জে রইতে নারি (তোমা বিনে)
বাঁশীর সুরে সুরে কি মাধুরী
এসো শূন্য কুঞ্জে কুঞ্জেশ্বরী।
(শূন্য কুঞ্জ আজি পূর্ণ কর)
সখি, তোরা সবাই শুনেছিস্ বেনু
কেবল আমার কেন অবশ তনু?
(বাঁশীর সুরে সুরে)
তোদের বাঁশী বাজে—বাজে কানের কাছে,
ওরে আমার বাজে হিয়ার মাঝে।
সখীরা উতলা হইয়া উঠিল, কুঞ্জ-সজ্জার আয়োজন চাই, আয়োজন করতে হবে বাসক শয়নের।

"সুখের রাতি জ্বালহ বাতি,
নিকুঞ্জ কর আলা,
কুসুম তুলিয়া বোঁটা ফেলি দিয়া
গাঁথহ চিকণ মালা।
কস্তূরী চন্দন কুসুম ভূষণ
সপুষ্প কদম্ব ডাল,
শুভ আলিপনা করহ রচনা
গাঁথহ যূথিকা মাল।
যমুনার বারি ভরি হেমঝারি
রাখহ যতন করি,
পিক শুক সারি, আন ত্বরা করি
নিকুঞ্জ মন্দির ঘেরি।"
রাধিকা বলিতেছেন,

সখী তোরা কিসের আলিপনা দিবি? আজ শ্যামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ আমার কুঞ্জ-কুটীরে।

আলিপনা দেওব মতিম হার,
অভিষেক করব নয়ন ধার।
তাঁর উপবেশনের যোগ্য আসন কোথায়?

বসাইব প্রাণপ্রিয়ে হিয়ার মাঝার।
আজি এ নিকুঞ্জ মোর সুখের পাথার।
এদিকে বৃন্দা তাড়া দিচ্ছেন,

"রাই, ঝট কর নটিনীর বেশ,
সময় হইবে আসি বাজিবে সংকেত বাঁশী,
ধৈরজের না রহিবে লেশ।
(তখন অধীর হয়ে তুমি ছুটে যাবে,
বেশভূষা করার কি আর উপায় হবে)
তুই অমনি করে ছুটে যাবি ধনী
তোকে লোকে বলবে পাগলিনী।
দ্রুত বেগে চলি যাবে কেশভার এলাইবে,
দড় কর বেণীর রচনা।
শ্রম জলে যাবে ভাসি, কাল হবে মুখশশী,
কাজল পরিতে করি মানা
নূপুর পরিতে বলি, পুন তাহা মানা করি,
চলিতে চরণ হবে ভারি।
আর এক বাদ আছে গুরুজন জাগে পাছে
কলরব শুনিয়া তাহারি।
নীল পট্ট গ্রন্থি ধরি আঁটিয়া পরহ সাড়ী,
যেন খসিয়া না পড়ে বন পথে।
গোবিন্দ দাস কয় এই সে উচিত হয়,
বিলম্ব না কর ধনী ইথে।"
সখীরা সাজাইবার উপকরণ আনিতেছেন, রত্নভূষণ গোরচনা, কুঙ্কুম প্রভৃতিঃ
সুবর্ণের পীঠ আনি রাইকে বসালো তথি,
কোন কোন সখী করে মানা,
(হারে, ললিতা বিশাখা করে মানা)
যে বিনা ভূষণে ভুবন আলো করে,
আজ কি ভূষণে সাজাবি তারে?
রাধারাণী ব্যাকুলা, বুঝি বিলম্ব হইতেছে। বার বার সংকেত বংশীর ধ্বনি আসিতেছে।

গুরুজন যদি জাগিয়া উঠেন।
যদি গমন পথে বাধা পড়ে।
আর সজ্জাই বা কিসের, শ্যাম যে পরশমণি।
সে অঙ্গ পরশিলে সখী আমার এ অঙ্গ,
হবে সোনা রে
সে পরশমণির আমি কি দিব তুলনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন,
কর্ণের ভূষণ তার গুণ যে শ্রবণ?
(কি কাজ ভূষণে?)
নয়নের ভূষণ আমার রূপ দরশন,
(কাজল দিয়ে কি সাজাবি?)
হৃদয়ের ভূষণ সেই চিন্তামণি ধন।
আমি প্রেম চন্দ্র হার পরেছি গলায়,
(কি কাজ ভূষণে?)
যদি তোরা সাজাবি মোরে,
কৃষ্ণ নাম লেখ্ আমার অঙ্গ ভরে।
ইহার পর অভিসার যাত্রা।
ধনি কুঞ্জপথে চলিল রে,
বৃক ভানু নন্দিনী রমনী শিরোমণি
শ্যামদরশন আশে।
গজবর গামিনী তনু অতি কমলিনী
রঙ্গিনী সঙ্গিনী পাশে।
কবরী হেরি চামরী পশিল গিরি কন্দরে
মুখ হেরি মেঘগুঠনে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ডরে স্বর শুনি কোকিল
গতিভরে করি বনবাসে।
চললু ধনী অভিসার,
চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই
গুরুজন ভুবন দুয়ার।
অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই
কাঁপই নীল নিচোল:
কত কত মনহি মনোরথ উপজত
মনসিন্ধু মনহি হিলোল।
মন্থর গমনি পন্থ দরশাগুলি
সখী জন চলু সাথ সাথ।
পরিমলে হরিত হরিত করি বাসিত
ভাবিনী অবনত মাথ।
সখীগণ মনে মনে কামনা করিতেছেন, রাধার অভিসার পথ নির্বিঘ্ন হোক্।
রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী
কতিখনে পহুঁছিব কুঞ্জর গমনী।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে,—আমাদের সখী ভীরু প্রকৃতি কতক্ষণে পৌঁছিতে পারিবেন, কে জানে?

ভীম ভূজঙ্গম সরনা।
কত সংকট তাহে কোমল চরণা।
বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিসার।
গগন সঘন মহী পঙ্কা,
বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা।
দশ দিস ঘন আঁধিয়ার,
চলইত স্খলই লখই নহি পার।
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতি গুরু বাধা সহই।

কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার যাঁহার জন্য কই তিনি?

"অরুণ কিরণ কিছু অম্বর দেল।
দীপক শিখা মলিন ভেল।"
রাত্রি যে প্রভাত হইয়া আসিল, কিন্তু কৃষ্ণ কই? কীর্তন আরম্ভ হইল,—
"কইগো বৃন্দে সই,
আমার বৃন্দাবন চন্দ্র কই,
গগনের চন্দ্র অস্তে গেল ওই।

পড়ে পাতের উপর পাত,
বুঝি ওই এলেন প্রাণনাথ
চমকিয়া চমকিয়া ওঠে ধনী।
আমি করিয়া বাসর সজ্জা
হায় হায় হায়
একি সাজা
গেলাম গো—
কত বাসি ফুল রাশি হয়ে রয়েছে ওই।
আমি তজিলা গৃহকাজ ভয় কুলশীল লাজ,
করিলাম কি অকাজ,
আমার কই সে নায়কের আনন্দ কই।
—এই যে কীর্তন, ইহাতে [illegible]

কলে গায়কের [illegible] অন্য ভাববিহ্বলতা। কীর্তনী কীর্তন করিতে করিতে নিজের ভাবে নিজেই বিভোর, অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, "আহা, আহা?" আর চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

সখীগণ রাধাগত প্রাণা তাই রাধা যখন গহন কাননে অভিসারে চলিয়াছেন, তখন রাধারাণী পথ অপথ গ্রাহ্য না করিয়াই ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর সখীগণ বিধিকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন, "হে বিধি আমাদের সখী যেন নিরাপদে সঙ্কেত স্থানে পৌঁছিতে পারেন। যেন রাত্রি প্রভাত না হইয়া যায়, যেন গুরুজন জাগিয়া না উঠেন।

কীর্তনীও তদ্‌ভাবে ভাবিত। যখন কার্তিকী পূর্ণিমায়

"শারদচন্দ্র পবন মন্দ—
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরলী।"

সেই পূর্ণিমা রজনীতে বৃন্দাবনে রাসের উৎসব।

"আজ, বৃন্দাবনের মাঝে শুনি
নূপুরের কলরব রে,
আজ বৃন্দাবনে গোপীগণের
প্রেমেরি উৎসব রে।
রাস হাট পরে ছত্র
শশধর ধরে রে,
পবন চামর হয়ে
মন্দ মন্দ বহেরে।
চৌদিকে ফিরত দীপ তারকার মালা,
নটন হিল্লোলে দোলে
নব ব্রজবালারে।

নটরাজ কৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন শ্রীরাধা এবং ব্রজবালাগণ।

থুকু থুকু থুকু থুকু থুকু তায়,
ধনী নেচে যায় রে।
বাজে কিঙ্কিনী বাজে কিঙ্কিনী
কর কঙ্কন।
কিঙ্কিনী কঙ্কন বাজে শ্যাম অনুরাগে।
বলয়া নূপুরে বাজে কিঙ্কিনী রে।

সেই রাসনৃত্যে অবগুণ্ঠন দিয়া নাচিতেছেন মূল কীর্তনীয়া, তাঁহার সঙ্গিগণ, এমন কি দর্শকগণও নৃত্য করিতেছেন এ দৃশ্যও দেখিয়াছি।

কীর্তন কেবল বর্ণনায় শেষ হয় না। মুখের [illegible], সে যেন অশ্রুপ্রবাহ। এমনি নানাভাবে নানালীলা। গোষ্ঠলীলায় মা যশোদার

[illegible] আঁখিনীর নয়ন তিতিয়া যায়,
দেখ [illegible] কাঁপে কর,
বাঁশি গদ গদ কহে, আজি রাখি যাহ সাথে
শূন্য না করিও মোর ঘর।"

আবার সখা সঙ্গে কৃষ্ণ,
গহন কাননে তপত বায়
যমুনা বারি উছলি যায়
সখা সহ বিনোদ রায়
ঝাঁপ দিয়া পরে
জলেরে, জলেরে, জলেরে।

কীর্তনী যেন জলে ঝাঁপ দিতেছে এইরূপে তখন তাঁহার হস্তভঙ্গীমা।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মরমী ভক্ত স্বরূপ এবং রামরায়ের সঙ্গে আঠার বৎসর ধরিয়া এই কামগন্ধহীন অপূর্ব লীলারস উপভোগ করিয়াছেন। সেই উপভোগের সাধনাই কীর্তনরস উপলব্ধির সাধনা।

(৮)

সম্রাট ঔরংগজেবের মুখে একটা ক্রুর হাসি খেলে গেল।

এই একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে আক্রমশালী অম্বর বংশের ভাবী রাজাকে বিনা যুদ্ধে বিনা পরিশ্রমে অংকুরে শেষ করে দেওয়ার। হাত দুখানা নিসপিস করে উঠল।

এই অম্বর রাজবংশটাই বড় খারাপ, ও নেমকহারাম তার মতে। নির্বোধ প্রপিতামহ আকবরই ওদের বড় বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কি দরকার ছিল তার মানসিংহকে সমস্ত বড় বড় যুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠাবার—আসাম উড়িষ্যা থেকে কাবুল পর্যন্ত? কেনই বা তাকে দিয়ে বাঙলা বিহার উড়িষ্যা মায় দক্ষিণাপথ পর্যন্ত সুবেদার করে পাঠান? সেই ত শেষপর্যন্ত এত বেশী বাড় বাড়তে দেওয়ার ফলে মানসিংহকে বিষ খাওয়াতে পর্যন্ত চেষ্টা করতে হয়েছিল। বুন্দির ইতিহাসে ত বলে, যে আমার নির্বোধ প্রপিতামহ আকবর একটা মাজুন (মাদক মিঠাই) তৈরী করে খানিকটাতে বিষ মিশিয়ে রাজা মানকে খেতে দিয়েছিলেন কিন্তু নিজেই ভুল করে বিষ মেশান মিঠাই খেয়ে মারা গিয়েছিলেন সে কথা অবশ্য আমার দরবারের বাক্যনবীশরা লেখেনি। তবু ওই চালাকি আমাদের কাছে নতুন নয়।

তা ছাড়া রাজা মান ত আমার ওয়ালিদ-উল্-বলদ্ (দাদু) সেলিমকেই প্রায় তখ্তে তাউস হারা করে ছেড়ে দিয়েছিল। ভাগ্যিস ওই রাজপুতানীর বাচ্চা খুসরু দিল্লীর মসনদে বসতে পায়নি। না হলে কি সাংঘাতিক কাণ্ডটাই না হত। আমাদের এই পবিত্র চাঘ্তাই তুর্কী বংশ।

ঔরংগজেবের মুখের উপর মেঘ ঘনিয়ে এল।

বোকা আকবরকে জ্বালিয়ে মারল মানসিংহ। কিন্তু তস্য বোকা শাহজাহানকেও কি কম কষ্ট পেতে হয়েছে এই রাজপুত পোষণের নীতির জন্য? এমন কি শাহানশাহ তামাম হিন্দুস্থানের মালিক আমাকেও এতদিন যন্ত্রণা পেতে হয়েছে কার জন্য?

ওই মীর্জা রাজা জয়সিংহ। ওঃ ওর কথা ভাবলে নিজেরই দাড়ি পটাপট উপড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করে এখনো। আমার বাবার সময় দরবারে ওর কি জমজমাট ইনামদারী। শয়তানটা কাফের দারাকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। মসনদের জন্য লড়াইয়ের সময় এক ওকেই আমার যা কিছু ভয় ছিল। ভাগ্যিস, খোদা হাফিজ, মীর্জা রাজা শেষ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে লড়েনি। চালাকী করে আসল লড়াইয়ের সময় আপনা বাঁচিয়ে সরে পড়েছিল। তবু কম কি শয়তান? ওই মারাঠা মুষিক শিবাজী যে আমার হাত এড়িয়ে পালাতে পারল সে ত ওরই যোগসাজসে না হোক, অন্তত কারসাজিতে।

মুখের ওপর মেঘ ঘনীভূত হল।

শুধু কি তাই? মীর্জা রাজা জয়সিংহের পিছনে বাইশ হাজার সোয়ার আর বাইশ জন সর্দার আছে বলে সে দুনিয়াটাকে ছোট মনে করে। হিন্দুস্থানের বাদশা ওর কাছে কিছুই না যদিও আমিই তাকে ছ'হাজারী মনসব দিয়েছি। অম্বরের দরবারে বসে সেই নেমকহারাম ছ'হাজারী মনসবদারটা কিনা দুহাতে দুটো কাঁচের গ্লাস নাচায়। নাচাতে নাচাতে বলে ওই ওটার নাম সাতারা আর এই এটার নাম দিল্লী। দিলাম ওই ওটাকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে আর রাখলাম এই এটাকে আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে। যখন খুশী যেমন করে খুশী নাচাব আর খেলাব, খেলাব আর ফেলব।

মুখের ভিতর দাঁতের কিড়মিড়িতে বজ্রনির্ঘোষ হল।

ভাবতে সম্রাট্ ঔরংগজেবের এক লহমা সময়ও লাগে না। বহুত ঠিক হ্যায়। মীর্জা রাজা জয়সিংহের ছোট ছেলেকে অম্বরের গদির লোভ দেখিয়ে বাপকে বিষ খাওয়াব। কিন্তু বড় ছেলেকেই শেষপর্যন্ত গদিতে বসাব যাতে রোজ বাপের দশা মনে করে রেখে নিজেকে সামলিয়ে রাখে। আর ছোটটাকেও অম্বরের একটা টুকরো দিয়ে দিব যাতে দুজনের মধ্যে শত্রুতা বেঁধে থাকে আর দুজনেই কমজোরী হয়ে থাকে। তাহলে মোগলের আর কোন ভয় থাকবে না।

আর হাতের মুঠোর মধ্যে ঝুলছে এই অম্বর বংশের বাচ্চা—এটাকে এখনি যমুনার জলে দিই ডুবিয়ে। কাছোয়ার বাচ্চারা (কুশধ্বজ বংশধররা) আর কোনদিন দিল্লীর মসনদের কাঁটা হতে পারবে না।

ক্রুর হাসি ফুটে উঠল সম্রাটের মুখে। মেঘ ও বজ্রনিনাদের পরিবর্তে তাতে শোভা পেতে লাগলু শুধু বিদ্যুৎ।

আগ্রার কেল্লার ছায়ায় যমুনার নীলজলে বজরায় সান্ধ্যবিহারে ভাসমান ছিলেন সম্রাট্ ঔরংগজেব। সঙ্গে বিশেষ খয়েরখাঁ ওমরাহ মাত্র কয়েকজন আর পেয়ারের অম্বর রাজপুত্র বালক জয়সিংহ।

বালককে তিনি আরো বেশী পেয়ার দেখিয়ে দুহাতে তুলে নিয়ে জলের উপর ঝুলিয়ে দোলা দিতে লাগলেন। বললেন,
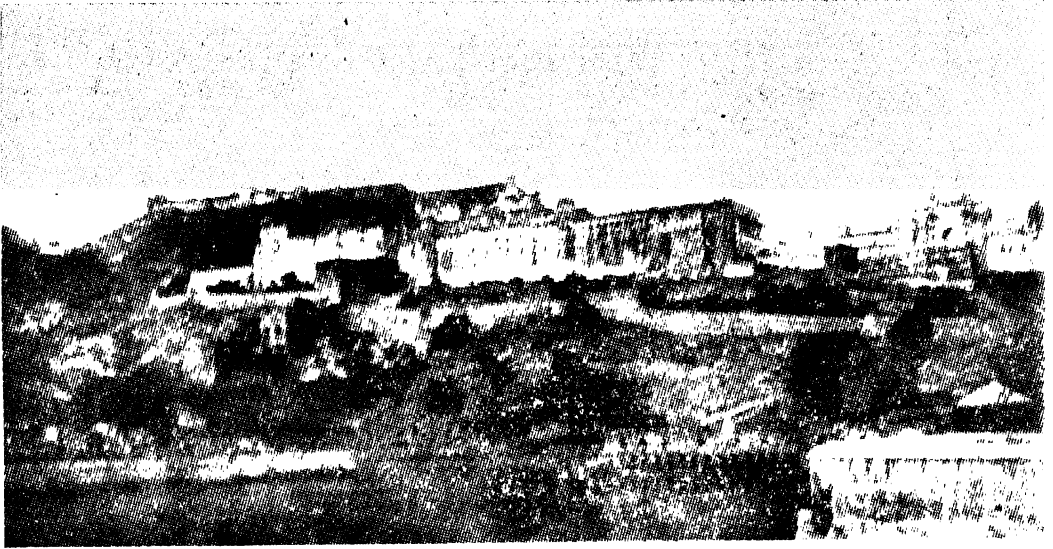
অম্বর গিরিদুর্গ

—আচ্ছা বৎস, তোমায় যদি এখন আমার হাত থেকে ছেড়ে দিই তা হলে কি হয়?

বৎসের অবশ্য মৎস্যের মত জলের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। অবলম্বন ছিল শুধু শূন্যে লম্বমান দুখানি সবল কিন্তু অবিশ্বাসী হাত আর নীচে বহমান যমুনার কৃষ্ণ বারি রাশি।

বৎস বলে বসলেন,—শাহান্‌শাহ্‌, আমরা যখন সাদী করি একটা হাত থাকে দুল্‌হানের (বধূর) হাতে আর সংসারের সব ঝামেলার হাত থেকে সারা জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। কিন্তু একখানা হাতের জায়গায় আমি আশ্রয় নিয়েছি দু দুখানা হাতের। আর কার হাত? স্বয়ং যিনি দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। আমার আর ভাবনার কি আছে?

নিমেষে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হল সম্রাটের মুখ থেকে। মোগলের মনে বীর মহিমা বোধ, যাকে বলা যেতে পারে শিভ্যালরী, জেগে উঠল। বালককে জলের উপর দোলাতে দোলাতে সম্রাট্‌ বললেন, —তুমি ত বাচ্ছা নও বৎস, তুমি গোটা মানুষের চেয়ে চার আনা বেড়ে গেছ এরই মধ্যে। শুধু জয়সিংহ নও, সোয়াই জয়সিংহ।

সেই থেকেই জয়পুরের সব মহারাজারই নামের আগে থাকে সোয়াই। সেদিনকার প্রথম সোয়াই জয়সিং, আর এদিনের রাজস্থানের রাজপ্রমুখ সোয়াই মানসিং।

গল্পটা সত্যি নাকি? মহা কৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম অধ্যাপক বন্ধুকে। তিনি একজন আসল জয়পুরীয়া। বংশানুক্রমে এখানকারই বাসিন্দা ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাজপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অবশ্য ইতিহাসের নন।

তাই বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি হেসে বললেন, বাঃ আপনি দেখছি অঙ্ক কষে ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করতে চান। জানেন ত আমরা এখানে যে সঠিক শাস্ত্রের আলোচনা করতাম সেটা হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র নয়।

কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যাতেও ত অংকের প্রয়োজন খুব বেশী।

তা হোক কিন্তু মশায় তাতে নীলাকাশে বাধাহীনভাবে চরে বেড়াবার সুযোগ আছে—আশ্বাস দিয়ে বললেন এই দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। এই আকাশে অনেক কাহিনী, অনেক চারণের গান ভেসে বেড়াচ্ছে। সেগুলিই রাজস্থানের সত্য ঘটনা। একটা জাতির মনের পরিচয় যাতে আছে সেটাই ত আসল ইতিহাস।

যাহা ঘটে তাহাই একমাত্র সত্য নহে। ঠিকই বলেছেন বন্ধু।

এমনি একটা সুবিধাজনক দার্শনিক মনোভাব নিয়ে সোয়াই রাজা জয়সিংহ তার সময়কার নানা রকম অশান্তির আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে দূরে সরে থাকতে পেরেছিলেন। আঠার শতকের হিন্দুস্থানে কোথাও শান্তি ছিল না। কোন রাজ্যেই লোকে নিরাপদে মনের খুসীতে দিন কাটাতে পারত না। রাজা প্রজাতে খুব বেশী প্রীতি বা সহানুভূতির সম্বন্ধ ছিল না। রাজাদের নিজেদের মধ্যে ছিল শুধু একটা সম্বন্ধ—সেটা হচ্ছে চক্রান্ত করে অন্যকে ঠকান বা তার রাজ্য জয় বা লুঠ করা। হিন্দুস্থানের ভিতরে এমন কোন শক্তিশালী রাজত্ব ছিল না যার সার্বভৌম ক্ষমতা অন্যদের রক্ষা করতে পারে। মোগল বাদশাহী ছিল নিভন্ত প্রদীপ আর মারাঠা শক্তি ছিল ঘরজালান

আগুনের শিখা। ভ্রাতৃযুদ্ধ বা আত্মীয়-বিরোধ ছিল বড় বড় রাজপরিবারের অভ্যস্ত ফ্যাশন। আর বাইরে থেকে বারবার বিদেশী লুঠেরা রাজারা এসে উত্তর ভারতকে ছারখার করে দিত। এই পটভূমিকায় শাস্ত্র বা শিল্প চর্চার সময় বা সুযোগের কথা কে ভাবে?

কিন্তু ভাবতেন একজন। তিনি সোয়াই রাজা জয়সিংহ। মারাঠা বর্গীর লম্ফঝম্প, নাদিরশাহী ঝড়ঝাপটা তার মনের সরোবরে কোন টলমলে ঢেউ জাগাতে পারেনি। তিনি জয়পুর রাজ্যকে সে সব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে নিজে রাজহংসের মত সে সরোবরে ভেসে বেড়িয়ে নানা শাস্ত্রচর্চা, সমাজ সংস্কার, বিদ্যার গবেষণা, শিল্পের সহায়তা করে সময় কাটিয়েছেন। অথচ সাংসারিক রাজনীতিতেও তিনি কম ধুরন্ধর ছিলেন না।

যে বিরাট গিরিদুর্গ ও প্রাসাদ আমরা এখন অম্বরে দেখি ও যে আধুনিক জয়পুরের সহরের শোভা আমরা প্রশংসা করি তা প্রকৃতপক্ষে সোয়াই রাজা জয়সিংহের কীর্তি। জয়পুর, দিল্লী, মথুরা, কাশী ও উজ্জয়িনীতে যে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদদের দ্বারা অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত মানমন্দির আমরা দেখি সেগুলি তাঁরই কীর্তি। এই বিদ্যার যে সিদ্ধান্ত-গুলি তিনি তৈরী করে গিয়েছিলেন আজও সব ভারতীয় পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিদদের গণনা তার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। গ্রীক জ্যামিতিক ইউক্লিডের গণনা থেকে আরম্ভ করে বহু পাশ্চাত্য গাণিতিকের গ্রন্থ তিনি সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। সমরখন্দের রাজজ্যোতির্বিদ উলুগ বেগের গণনা সিদ্ধান্তে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তাই সাত বছর ধরে নিজে পর্যবেক্ষণ করে স্বতন্ত্র গণনা সিদ্ধান্ত তৈরী করেছিলেন। সে যুগের সেই অন্ধকার যুগে যখন কালাপানি পার হওয়া আর বিধর্মী হয়ে যাওয়া সমান ছিল তিনি পোর্টুগীজ রাজ ইম্যানুয়েলের সভায় শিক্ষার্থী পাঠিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে জ্যোতির্বিদ আনিয়েছিলেন।

দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের বাহিরের বিশুদ্ধ (পিউর সায়েন্স) শাস্ত্র চর্চাতেই তিনি জীবন কাটাননি। অনেক প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি খুব চেষ্টা করেছিলেন। আজ যখন আমরা বৃটিশের লেখা ইতিহাসে জানি যে সার উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ ও বালিকা-বধ বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বৃটিশেরও আগের একটি সংকীর্ণ, গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যমালার যুগে এই সোয়াই পুরুষ মাত্র অম্বরের রাজা হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র রাজপুতানায় সতীদাহ নিবারণ করবার জন্য নীতি শাস্ত্র তৈরী করে তা প্রচলন করবার চেষ্টা করেছিলেন। অসম্ভব বেশী বিয়ের পণের অত্যাচারে রাজপুতেরা শিশুকন্যা জন্মের পরই হত্যা করে ফেলত। সেই বিয়ের প্রথারই আমূল সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। ঔরংগজেব যে মহাঘৃণিত জিজিয়া কর হিন্দুদের উপর বসিয়ে গিয়েছিল তা তাঁরই চেষ্টা ও প্রভাবে মোগল সম্রাট উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন। নবজাগ্রত মারাঠা শক্তি তারই সহায়তায় উত্তর ভারতে প্রথম পদক্ষেপ করতে সমর্থ হয়।

বহু বিদেশী ও বিধর্মীর সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও সোয়াই রাজা মনে প্রাণে হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দুর যে অন্যের মত ও অন্যের জ্ঞানের মধ্যে ভাল জিনিষ খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা ছিল তা হারাননি। জৈন মুসলমান খৃষ্টান তার চোখে সমান ছিল; সকল ধর্মে তার অনুরাগ। সকল শাস্ত্রের ভিতরের সত্য ও তথ্য তিনি সব সময় খুঁজে দেখেছেন। প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণই এই। ইয়োরোপে তখন সহর পরিকল্পনা মাত্র আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের পরিকল্পনায় এমন একটি নূতন সহর বানালেন যার পথের পরিধি ও সমান্তরাল রেখার প্ল্যানের চেয়ে বেশী সুন্দর কিছু এখনো পশ্চিমে টাউন প্ল্যানিংয়ে দেখা যায় না। জয়পুরের হাল্কা গোলাপী বর্ণের কারুকার্যখচিত অথচ ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে অনুকূল গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য পৃথিবীর মনোযোগ এখনো আকৃষ্ট করে। সহরের বাজার অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে হাওয়া মহলের কারুকার্য একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুতের শাড়ী ও পাগড়ীর বর্ণ-সমৃদ্ধি এবং পিতল ও অন্যান্য ধাতুর বস্তুর কারুকার্য এই সময়েই প্রথম খ্যাতি লাভ করে। জয়পুর অঞ্চলের মর্মরশিল্পের প্রতিষ্ঠা বহু আগে থেকেই ছিল কিন্তু অম্বরের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের যে বিস্তৃতি ও জয়পুরের নূতন সহরের যে প্রস্তুতি তাঁর সময়ে হয়েছিল তার ফলেই

জয়পুরের মানমন্দির

জয়পুরী মর্মরমন্দির

এই মর্মরশিল্পের প্রসার অনেক বেশী বেড়ে যায় ও জয়পুরীয়া শিল্পধারা গড়ে ওঠে।

জয়সিংহের বহুদূরদশী রাজনীতি প্রতিভার যে কাহিনী অধ্যাপক বন্ধু শোনালেন তার পরিপোষক আর একটি ঘটনা সোয়াই রাজার রাজ্যকালের প্রথমেই ঘটেছিল। মোগল সর্বদাই হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে ভেদনীতি আর হিন্দুও নিজের জাতীয়তাবোধের অভাব দিয়ে শত্রুকে সাহায্যই করেছে। তার উপর বহুবিবাহের ফলে বহুবার সিংহাসন নিয়ে বৈমাত্র এমন কি সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদ হয়েছে। এই দুইয়ের ফলে অনবরত রাজপুত রাজাদের অক্ষম বা নিবীর্য হয়ে থাকতে হ'ত। সোয়াই রাজার ক্ষেত্রেও সেই কূট-নীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

জয়সিংহ আর বিজয়সিংহ ছিলেন বৈমাত্র ভাই। ছোট ভাইয়ের যদি সাম দান দ্বন্দ্ব ও ভেদ চাণক্যের শেখান এই চার কূটনীতির সঙ্গে ভাল পরিচয় থাকে তাহলে সেই এই মহাবিদ্যা খাটিয়ে বড় ভাইকে পথে বসিয়ে নিজেই সিংহাসন পেতে পারবে। মোগল সম্রাট্দের উত্তরাধিকার পর্বের এই উদাহরণ বিজয়-সিংহ লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই সম্রাটের দরবারে বিজয় সিংহ দান নীতির আশ্রয় নিয়ে উজিরসাহেবকে মাত্র জহরৎ দান করেই অম্বর রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ও সবচেয়ে উর্বর তৃতীয়াংশ দাবী করে বসলেন। সোয়াই রাজা গত্যন্তর না দেখে হুজুরের উজিরের মর্জী তামিল করতে রাজী হলেন। তখন আরো পাঁচ কোটি টাকা ও পাঁচ হাজার ঘোড়সোয়ার সৈন্য দান করে—সুধী পাঠক অবশ্যই এই দান-নীতিকে ঘুষ নামের অপবাদ দিবেন না—বিজয় সিংহ গোটা অম্বরই দাবী করে বসলেন ও মোগল দরবারে সনদ তৈরী হতে লাগল।

জয়সিংহ ত শুধু একটা গোটা মানুষ নয়; তিনি হচ্ছেন সোয়া মানুষ। সহজাত বুদ্ধিতে ধরে ফেললেন যে, দানের উত্তরে দান দিলে পাশার দান ঠিকমত পড়বে না। এবার চাই চাণক্য ঠাকুরের নূতন মন্ত্রণা অর্থাৎ ভেদ নীতি। তিনি সব সর্দারদের আমন্ত্রণ করে বললেন যে, তাদেরই ইচ্ছাতে তিনি গদীতে আরোহণ করেছেন কিন্তু সম্রাটের উজীরের ইচ্ছাতে তার ভাই চলেছে সে গদী থেকে তাকে সরিয়ে দিতে। অতএব এখন কর্তাদের ইচ্ছায়ই কর্ম হোক; সোয়াই রাজার তাতে আপত্তি নেই।

বারা কোট্রি অম্বর কা অর্থাৎ অম্বরের বার জন্য সামন্তবংশ জয়সিংহ যে বিজয়সিংহকে এক-তৃতীয়াংশ ঠিকই ছেড়ে দেবেন এই আশ্বাস পেয়ে দিল্লীতে বিজয়সিংহকে আমন্ত্রণ পাঠালেন। এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, যদি জয়সিংহ নিজের কথা রক্ষা না করেন তাহলে তারা নিজেরা বিজয় সিংহকেই অম্বরের গদীতে বসিয়ে দেবেন।

মোগলের শৃগালবুদ্ধি উজীর অত সহজে ভোলবার পাত্র নন। তবুও শেষ-পর্যন্ত অনেক সৈন্য সঙ্গে দিয়ে বিজয় সিংহকে এক-তৃতীয়াংশ দখল করতে পাঠিয়ে দিলেন। সর্দারেরা চাইলেন যে এই সুযোগে দুই ভাইয়ে সত্যকারের মিলন হয়ে যাক। বিজয় সিংহের তাতে সম্মত না হয়ে উপায় ছিল না কারণ মহানুভবতার প্রত্যুত্তরে মহানুভবতা দেখাতে হবে এটা হচ্ছে রাজপুত ধর্ম। কিন্তু তা বলে ত আর সিংহের গহ্বরে গিয়ে সোয়াই সিংহের সঙ্গে মিলন ও সৌহার্দ্য করা চলে না। অতএব কয়েক মাইল দূরে আর একটি গিরিদুর্গের কাছে বিজয় সিংহ তাঁবু পাতলেন। জয়-সিংহ যখন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হচ্ছেন তার নাজির এসে হাতে একখানা চিঠি তুলে দিল। কি? না, রাজমাতা নিবেদন করছেন যে, তিনি এই দুই লালজীর (রাজার বাছাদের) মিলন ও শান্তি স্থাপন স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক করতে চান।

ছল ছল নয়নে সোয়াই রাজা সামন্তদের পানে তাকালেন। অশ্রুবাষ্প নিরুদ্ধ কণ্ঠে তারা সমস্বরে এই সাধু প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সোয়াই রাজার দেড়া নাজির তখন সাজাতে শুরু করলেন মহাদোল। রাজ-মাতার সখীবাহিনী ত কম নয়। তাদের জন্য সাজান হল তিনশো রথ—ঘেরাটোপে ঘেরা। কুললক্ষ্মীরা সব চলেছেন দু-দুজন একটি রথে। দীর্ঘ ছ' মাইল পথের দুধারে অগণিত পুরবাসী জমা হয়েছে। ভ্রাতৃবিরোধের আসন্ন সমাপ্তির আনন্দে তাদের কণ্ঠে সম্মিলিত জয়ধ্বনি। সে ধ্বনিকে ছাপিয়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছে প্রস্তর বন্ধুর পথে পথচারী পুরবাসীর জন্য হরিলুটের বাতাসার মত রাশি রাশি মুদ্রার রূপালী ঝন্ঝনা। অম্বর রাজবংশের

...ইতিহাসে এত বড় আনন্দের দিন আর কখনো আসেনি।

সন্দেশবাহী দূত এসে আভূমি নত হয়ে বক্ষে হস্তরক্ষা করে নিবেদন করল যে, রাজমাতা দুর্গপ্রাসাদে এসে পোঁছেছেন। রাজা ও সামন্তবর্গ ঘোড়ায় চড়ে বসলেন সেখানে যাবার জন্য। দুই রাজভ্রাতা অশ্রু বিসর্জন করতে করতে প্রমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। জয়সিংহ ভাইয়ের হাতে এক-তৃতীয়াংশের সনদ তুলে দিবার সময় আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—ভাই, যদি চাও তুমিই অম্বরের সিংহাসন নাও। আমার জন্মস্বত্বের বদলে দিয়ো শুধু তোমার এই পরগণাটুকু।

কোন রাজপুতই বদান্যতার প্রতিযোগিতায় পিছপাও হবার নয়।

বিজয়সিংহ সমান উদারতা দেখিয়ে বললেন, না দাদা, আর দুঃখ দিয়ো না। আমার সব অভাব হয়েছে পূর্ণ, সব অভিযোগ হয়েছে চূর্ণ। আমায় এবার ক্ষমা কর শুধু।

এখন বিদায়ের সময় হয়ে এল। এমন সময় নাজির এসে সংবাদ দিল যে এখন যদি সামন্তরা চলে যান রাজমাতা দুই ভাইকে এসে আশীর্বাদ করে যাবেন। অবশ্য সামন্তরা ইচ্ছা করলে তাঁর অন্দরমহলে দ্বারে এসে প্রতীক্ষা করতে পারেন।

জয়সিংহ এখনও অশ্রুবিমুগ্ধলোচন হয়ে আছেন। বললেন—বারাকোটরি অম্বর যা আদেশ করবেন তাই তার শিরোধার্য।

ভ্রাতৃমিলন বিহ্বলতায় রাজা এখনও শুধু যে বিমুগ্ধ তা নয়; দশের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। রাজাই এখন দশের প্রজা, বারা কোটরীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন।

তারা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে রাজমাতার কাছে গিয়েই দু ভাই দর্শন দিলে ভাল হয়। নিজেরা হাত ধরাধরি করে প্রসন্নচিত্তে তারা অন্দরমহলে চলে গেলেন।

রাজমাতার দেউরীর সামনে এসে জয়সিংহ সৌভ্রাত্র ও মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে বললেন—মাতৃসন্দর্শনে যেতে এটার আর প্রয়োজন কি? বলেই কোমরবন্ধ থেকে তরবারী খুলে একটা খোজার হাতে তুলে দিলেন। বিজয়সিংহই বা কম যাবেন কেন? তিনিও পূর্ণ বিশ্বাস দেখিয়ে ভাইয়ের উদাহরণ অনুসরণ করলেন।

তাদের পিছনে নাজির অন্তঃপুরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

রাজমাতা ও দুই ভ্রাতা।

দুই বিবদমান ভ্রাতার পুনর্মিলন—মাতৃমন্দিরে—মাতৃসকাশে।

রাজা রামচন্দ্র থেকে অবতীর্ণ কুশধ্বজ বংশের বিপুল ঐতিহ্যময় রাজপরিবার দ্বন্দ্বের অবসান।

ঘটনার গুরুত্বে অভিভূত হয়ে সামন্তরাজগণ অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে রাজমাতা ছয়শত সখী সঙ্গে মহাদোলে চড়ে অম্বরে ফিরে চললেন।

রাজমাতা নয়; তার ছদ্মবেশে মল্লবীর রাজসেনাপতি। কুললক্ষ্মীরা নয়; তাদের পরিবর্তে পুররক্ষীরা। আর রাজমাতার চৌদোলে সেনাপতি ছাড়া দ্বিতীয় আসনে হস্তপদবদ্ধ বন্দী বিজয়সিংহ। বিশালবপু এই মল্ল এক নিমেষে নিরস্ত্র বিজয়সিংহকে ভূপাতিত করে রাজ অন্তপুরে বন্দী করে ফেলেছিলেন।

বন্দীকে অম্বর গিরিদুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার খবর পৌছানর পর জয়সিংহ একা এসে দেখা দিলেন সামন্তরাজাদের সামনে। কোথায় গেলেন বিজয়সিংহ? কোথায়? সকলেরই সন্দেহহীন মুখে একই প্রশ্ন।

"মেরা পেটমে"—উত্তর দিলেন জয়সিংহ। আমরা স্বর্গত মহারাজার দুই ছেলে। আমিই বড়। আপনারা যদি মনে করেন যে বিজয়সিংহের রাজা হওয়া উচিত এই আমি তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমায় তাহলে আপনারা বধ করুন।

সামন্তরাজগণ এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তবু বিশ্বাসঘাতকতার এই কারবারে অস্বাচ্ছন্দ্যে অস্থিরতায় তাদের মন বিভ্রান্ত হয়ে রইল।

তা বুঝতে পেরে জয়সিংহ আবার বললেন, আপনাদের জন্যই আমি নিজে পাপ করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। বিজয়সিংহ রাজা হলে ওর সঙ্গে এই যে মোগল উজীরের পাঠান ছ হাজার মনসব এসেছে ওরাই সব লুটেপুটে খেত। শুধু আমি নয়, আপনারাও সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যেতেন।

অবস্থা বুঝে সামন্তরাজাদের ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

দিল্লীর মসনদ তার প্রতি যে অবিচার করেছিল নিজের কূটবুদ্ধিতে তা তিনি খণ্ডন করে নিলেন। এবং জয়পুর কোন দিন তাঁকে এই কৌশল অবলম্বন করার জন্য ভবিষ্যতে দোষী করবার কারণ খুঁজে পায়নি।

বাস্তবিক পক্ষে এমন একাধারে রাজনীতিক, আইনকর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের তুলনা সে যুগে পাওয়া যায় না।

হিন্দু শুধু দার্শনিকতায় ডুবে থাকে। তার সাংসারিক জীবনে তিলে তিলে ক্ষয়, শক্তি থাকা সত্ত্বেও শত্রুর হাতে পরাজয়, বিদেশী বিজয়ীর শাসন মাথা পেতে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এ সবের মূলে আছে অনেকখানি দার্শনিকতা যা নিষ্ঠুর সত্যকে সহনীয় করে তুলেছে। কিন্তু সেই দার্শনিকতাতে তিনি মিশিয়েছিলেন সংসারের প্রয়োজনীয়তাকে। তাই হিন্দু যদিও ইতিহাস লিখত না তিনি উল্লেখযোগ্য সবকিছু ঘটনার ডায়েরি রেখে গিয়েছেন কল্পদ্রুম বইখানাতে। একশ ন' গুণ জয়সিংকা বইতে তিনি নিজের একশ নয় কাহিনীতে সে সময়ের বহু ঘটনার ইতিহাস রেখে গিয়েছেন। ইতিহাস এসে সেখানে উপন্যাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সাংসারিকতা মিশে গেছে দার্শনিকতার সাগরসঙ্গমে।

তিনি যখন মারা গেলেন তিনজন সহধর্মিণী ও বহু উপপত্নী পর্যন্ত তাঁর চিতায় সহমরণে গেলেন।

কিন্তু রাজস্থানের কেহ লক্ষ্য করে দেখেনি যে সেই সঙ্গে বহু বিদ্যাও সহমরণে গেল। **(ক্রমশ)**
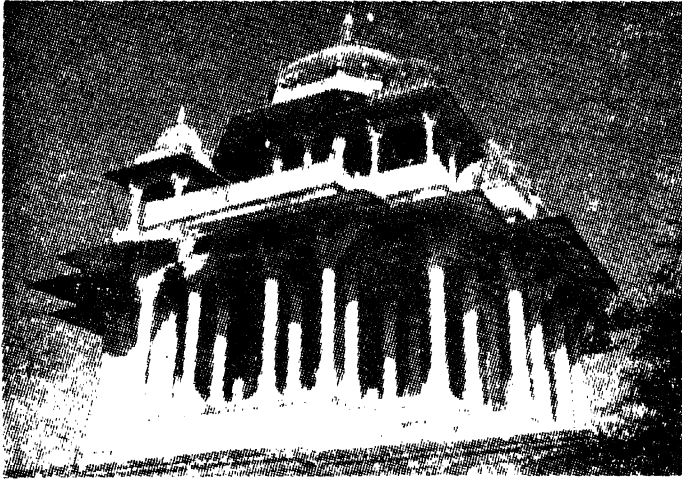
জয়পুরী মর্মরমন্দির

এই মর্মরশিল্পের প্রসার অনেক বেশী বেড়ে যায় ও জয়পুরীয়া শিল্পধারা গড়ে ওঠে।

জয়সিংহের রহুদূরদর্শী রাজনীতি প্রতিভার যে কাহিনী অধ্যাপক বন্ধু শোনালেন তার পরিপোষক আর একটি ঘটনা সোয়াই রাজার রাজ্যকালের প্রথমেই ঘটেছিল। মোগল সর্বদাই হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে ভেদনীতি আর হিন্দুও নিজের জাতীয়তাবোধের অভাব দিয়ে শত্রুকে সাহায্যই করেছে। তার উপর বহুবিবাহের ফলে বহুবার সিংহাসন নিয়ে বৈমাত্র এমন কি সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদ হয়েছে। এই দুইয়ের ফলে অনবরত রাজপুত রাজাদের অক্ষম বা নিবীর্য হয়ে থাকতে হ'ত। সোয়াই রাজার ক্ষেত্রেও সেই কূট-নীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

জয়সিংহ আর বিজয়সিংহ ছিলেন বৈমাত্র ভাই। ছোট ভাইয়ের যদি সাম দান দ্বন্দ্ব ও ভেদ চাণক্যের শেখান এই চার কূটনীতির সঙ্গে ভাল পরিচয় থাকে তাহলে সেই এই মহাবিদ্যা খাটিয়ে বড় ভাইকে পথে বসিয়ে নিজেই সিংহাসন পেতে পারবে। মোগল সম্রাটদের উত্তরাধিকার পর্বের এই উদাহরণ বিজয়-সিংহ লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই সম্রাটের দরবারে বিজয় সিংহ দান নীতির আশ্রয় নিয়ে উজিরসাহেবকে মাত্র জহরৎ দান করেই অম্বর রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ও সবচেয়ে উর্বর তৃতীয়াংশ দাবী করে বসলেন। সোয়াই রাজা গত্যন্তর না দেখে হুজুরের উজিরের মর্জী তামিল করতে রাজী হলেন। তখন আরো পাঁচ কোটি টাকা ও পাঁচ হাজার ঘোড়সোয়ার সৈন্য দান করে সুধী পাঠক অবশ্যই এই দান-নীতিকে ঘুষ নামের অপবাদ দিবেন না— বিজয় সিংহ গোটা অম্বরই দাবী করে বসলেন ও মোগল দরবারে সনদ তৈরী হতে লাগল।

জয়সিংহ ত শুধু একটা গোটা মানুষ নয়; তিনি হচ্ছেন সোয়া মানুষ। সহজাত বুদ্ধিতে ধরে ফেললেন যে, দানের উত্তরে দান দিলে পাশার দান ঠিকমত পড়বে না। এবার চাই চাণক্য ঠাকুরের নূতন মন্ত্রণা অর্থাৎ ভেদ নীতি। তিনি সব সর্দারদের আমন্ত্রণ করে বললেন যে, তাদেরই ইচ্ছাতে তিনি গদীতে আরোহণ করেছেন কিন্তু সম্রাটের উজীরের ইচ্ছাতে তার ভাই চলেছে সে গদী থেকে তাকে সরিয়ে দিতে। অতএব এখন কর্তাদের ইচ্ছায়াই কর্ম হোক; সোয়াই রাজার তাতে আপত্তি নেই।

বারা কোট্রি অম্বর কা অর্থাৎ অম্বরের বার জন্য সামন্তবংশ জয়সিংহ যে বিজয়সিংহকে এক-তৃতীয়াংশ ঠিকই ছেড়ে দেবেন এই আশ্বাস পেয়ে দিল্লীতে বিজয়সিংহকে আমন্ত্রণ পাঠালেন। এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, যদি জয়সিংহ নিজের কথা রক্ষা না করেন তাহলে তারা নিজেরা বিজয় সিংহকেই অম্বরের গদীতে বসিয়ে দেবেন।

মোগলের শৃগালবুদ্ধি উজীর অ... সহজে ভোলবার পাত্র নন। তবুও শেষ পর্যন্ত অনেক সৈন্য সঙ্গে দিয়ে বিজয় সিংহকে এক-তৃতীয়াংশ দখল করতে পাঠিয়ে দিলেন। সর্দারেরা চাইলেন যে এই সুযোগে দুই ভাইয়ে সত্যকারের মিলন হয়ে যাক। বিজয় সিংহের তাতে সম্মত না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ মহানুভবতার প্রত্যুত্তরে মহানুভবতা দেখাতে হবে এটা হচ্ছে রাজপুত ধর্ম। কিন্তু তা বলে ত আর সিংহের গহ্বরে গিয়ে সোয়াই সিংহের সঙ্গে মিলন ও সৌহার্দ্য করা চলে না। অতএব কয়েক মাইল দূরে আর একটি গিরিদুর্গের কাছে বিজয় সিংহ তাঁবু পাতলেন। বিজয় সিংহ যখন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হচ্ছেন তার নাজির এসে হাতে একখানা চিঠি তুলে দিল। কি? না, রাজমাতা নিবেদন করছেন যে, তিনি এই দুই লালজীর (রাজার বাচ্চাদের) মিলন ও শান্তি স্থাপন স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক করতে চান।

ছল ছল নয়নে সোয়াই রাজা সামন্তদের পানে তাকালেন। অশ্রুরোধ নিরুদ্ধ কণ্ঠে তারা সমস্বরে এই সাধু প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সোয়াই রাজার দেড়া নাজির তখন সাজাতে শুরু করলেন মহাদোল। রাজমাতার সখীবাহিনী ত কম নয়। তাদের জন্য সাজান হল তিনশো রথ—ঘেরাটোপে ঘেরা। কুললক্ষ্মীরা সব চলেছেন দু-দুজন একটি রথে। দীর্ঘ ছ' মাইল পথের দুধারে অগণিত পুরবাসী জমা হয়েছে। ভ্রাতৃবিরোধের আসন্ন সমাপ্তির আনন্দে তাদের কণ্ঠে সম্মিলিত জয়ধ্বনি। সে ধ্বনিকে ছাপিয়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছে প্রস্তর বন্ধুর পথে পথচারী পুরবাসীর জন্য হরিলুটের বাতাসার মত রাশি রাশি মুদ্রার রূপালী ঝন্‌ঝনা। অম্বর রাজবংশের

ইতিহাসে এত বড় আনন্দের দিন আর কখনো আসেনি।

সন্দেশবাহী দূত এসে আভূমি নত হয়ে বক্ষে হস্তরক্ষা করে নিবেদন করল যে, রাজমাতা দুর্গপ্রাসাদে এসে পৌঁছেছেন। রাজা ও সামন্তবর্গ ঘোড়ায় চড়ে বসলেন সেখানে যাবার জন্য। দুই রাজভ্রাতা অশ্রু বিসর্জন করতে করতে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। জয়সিংহ ভাইয়ের হাতে এক-তৃতীয়াংশের সনদ তুলে দিবার সময় আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—ভাই, যদি চাও তুমিই অম্বরের সিংহাসন নাও। আমার জন্মস্বত্বের বদলে দিয়ো শুধু তোমার এই পরগণাটুকু।

কোন রাজপুতই বদান্যতার প্রতিযোগিতায় পিছপাও হবার নয়।

বিজয়সিংহ সমান উদারতা দেখিয়ে বললেন, না দাদা, আর দুঃখ দিয়ো না। আমার সব অভাব হয়েছে পূর্ণ, সব অভিযোগ হয়েছে চূর্ণ। আমায় এবার ক্ষমা কর শুধু।

এখন বিদায়ের সময় হয়ে এল। এমন সময় নাজির এসে সংবাদ দিল যে এখন যদি সামন্তরা চলে যান রাজমাতা দুই ভাইকে এসে আশীর্বাদ করে যাবেন। অবশ্য সামন্তরা ইচ্ছা করলে তাঁর অন্দরমহলে গিয়ে এসে প্রতীক্ষা করতে পারেন।

জয়সিংহ এখনও অশ্রুবিমুগ্ধলোচন হয়ে আছেন। বললেন—বারাকোট্রি অম্বর যা আদেশ করবেন তাই তার শিরোধার্য।

ভ্রাতৃমিলন বিহ্বলতায় রাজা এখনও শুধু যে বিমুগ্ধ তা নয়; দশের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। রাজাই এখন দশের প্রজা, বারা কোট্রীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন।

তারা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে রাজমাতার কাছে গিয়েই দু ভাই দর্শন দিলে ভাল হয়। নিজেরা হাত ধরাধরি করে প্রসন্নচিত্তে তারা অন্দরমহলে চলে গেলেন।

রাজমাতার দেউরীর সামনে এসে জয়সিংহ সৌভ্রাত্র ও মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে বললেন—মাতৃসন্দর্শনে যেতে এটার আর প্রয়োজন কি? বলেই কোমরবন্ধ থেকে তরবারী খুলে একটা খোজার হাতে তুলে দিলেন। বিজয়সিংহই বা কম যাবেন কেন? তিনিও পূর্ণ বিশ্বাস দেখিয়ে ভাইয়ের উদাহরণ অনুসরণ করলেন।

তাদের পিছনে নাজির অন্তঃপুরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

রাজমাতা ও দুই ভ্রাতা।

দুই বিবদমান ভ্রাতার পুনর্মিলন—মাতৃমন্দিরে—মাতৃসকাশে।

রাজা রামচন্দ্র থেকে অবতীর্ণ কুশধ্বজ বংশের বিপুল ঐতিহ্যময় রাজপরিবার দ্বন্দ্বের অবসান।

ঘটনার গুরুত্বে অভিভূত হয়ে সামন্তরাজগণ অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে রাজমাতা ছয়শত সখী সঙ্গে মহাদোলে চড়ে অম্বরে ফিরে চললেন।

রাজমাতা নয়; তার ছদ্মবেশে মল্লবীর রাজসেনাপতি। কুললক্ষ্মীরা নয়; তাদের পরিবর্তে পুররক্ষীরা। আর রাজমাতার চৌদোলে সেনাপতি ছাড়া দ্বিতীয় আসনে হস্তপদবদ্ধ বন্দী বিজয়সিংহ। বিশালবপু এই মল্ল এক নিমেষে নিরস্ত্র বিজয়সিংহকে ভূপাতিত করে রাজ অন্তপুরে বন্দী করে ফেলেছিলেন।

বন্দীকে অম্বর গিরিদুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার খবর পৌছানর পর জয়সিংহ একা এসে দেখা দিলেন সামন্তরাজাদের সামনে। কোথায় গেলেন বিজয়সিংহ? কোথায়? সকলেরই সন্দেহহীন মুখে একই প্রশ্ন।

"মেরা পেটমে"—উত্তর দিলেন জয়সিংহ। আমরা স্বর্গত মহারাজার দুই ছেলে। আমিই বড়। আপনারা যদি মনে করেন যে বিজয়সিংহের রাজা হওয়া উচিত এই আমি তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমায় তাহলে আপনারা বধ করুন।

সামন্তরাজগণ এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তবু বিশ্বাসঘাতকতার এই কারবারে অস্বাচ্ছন্দ্যে অস্থিরতায় তাদের মন বিভ্রান্ত হয়ে রইল।

তা বুঝতে পেরে জয়সিংহ আবার বললেন, আপনাদের জন্যই আমি নিজে পাপ করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। বিজয়সিংহ রাজা হলে ওর সঙ্গে এই যে মোগল উজীরের পাঠান ছ হাজার মনসব এসেছে ওরাই সব লুটেপুটে খেত। শুধু আমি নয়, আপনারাও সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যেতেন।

অবস্থা বুঝে সামন্তরাজাদের ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

দিল্লীর মসনদ তার প্রতি যে অবিচার করেছিল নিজের কূটবুদ্ধিতে তা তিনি খণ্ডন করে নিলেন। এবং জয়পুর কোন দিন তাঁকে এই কৌশল অবলম্বন করার জন্য ভবিষ্যতে দোষী করবার কারণ খুঁজে পায়নি।

বাস্তবিক পক্ষে এমন একাধারে রাজনীতিক, আইনকর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের তুলনা সে যুগে পাওয়া যায় না।

হিন্দু শুধু দার্শনিকতায় ডুবে থাকে। তার সাংসারিক জীবনে তিলে তিলে ক্ষয়, শক্তি থাকা সত্ত্বেও শত্রুর হাতে পরাজয়, বিদেশী বিজয়ীর শাসন মাথা পেতে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এ সবের মূলে আছে অনেকখানি দার্শনিকতা যা নিষ্ঠুর সত্যকে সহনীয় করে তুলেছে। কিন্তু সেই দার্শনিকতাতে তিনি মিশিয়েছিলেন সংসারের প্রয়োজনীয়তাকে। তাই হিন্দু যদিও ইতিহাস লিখত না তিনি উল্লেখযোগ্য সর্বকিছু ঘটনার ডায়েরি রেখে গিয়েছেন কল্পদ্রুম বইখানাতে। একশ ন' গুণ জয়সিংকা বইতে তিনি নিজের একশ নয় কাহিনীতে সে সময়ের বহু ঘটনার ইতিহাস রেখে গিয়েছেন। ইতিহাস এসে সেখানে উপন্যাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সাংসারিকতা মিশে গেছে দার্শনিকতার সাগরসঙ্গমে।

তিনি যখন মারা গেলেন তিনজন সহধর্মিণী ও বহু উপপত্নী পর্যন্ত তাঁর চিতায় সহমরণে গেলেন।

কিন্তু রাজস্থানের কেহ লক্ষ্য করে দেখেনি যে সেই সঙ্গে বহু বিদ্যাও সহমরণে গেল। (ক্রমশ)

রহস্যময় মধুচক্র

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

প্রতি মৌচাকে মৌমাছির সংখ্যা বহু,—কোন কোন চাকে বহু-সহস্র, কোন কোন চাকে লক্ষাধিক। এই সব অসংখ্য মৌমাছির জন্মদাতা চাকের একমাত্র রাণী মৌমাছিটি। তারা সকলেই এক রাণী মাতার সন্তান, সকলে পরস্পরের ভ্রাতা-ভগিনী। ভগিনীর সংখ্যা সর্বাধিক, ভ্রাতার সংখ্যা দু' এক শতের অধিক নয়। চাকে ভগিনীদেরই

এইরূপ কাঠের বাক্সের ভিতরে মৌমাছি পোষা হয়। পোষা মৌমাছি এই সব কাঠের বাক্সের ভিতরে চাক তৈরি করে।

প্রাধান্য, ভ্রাতাদের অস্তিত্ব চাকে জানতেও পারা যায় না। চাকের যিনি সকলের মাতা তাকে রাণী বলা হ'লেও চাকে রাণীর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কিছুই নেই। সে যেন একটি কলে চালিত যন্ত্র। তার একমাত্র কাজ চাকের বংশ রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধি করা। এ কাজ সে সম্পাদন করে উদরে ডিমের বোঝা বয়ে বয়ে দৈনিক সে এক-হাজার হ'তে দু'হাজার ডিম পাড়ে। কোন আকস্মিক ঘটনায় তার মৃত্যু না ঘটলে সে তিন চার বৎসর এইভাবে একটানা ডিম পেড়ে যায়।

চাকের ভগিনীগণ সকলেই শ্রমিক। শ্রমের দ্বারা তারা যে শুধু নিজেদেরই দেহ পোষণ করে তা নয়, চাকের বহুশত ছানার প্রতিপালনের ভারও তাদেরই উপর, যদিও বহু শত ছানার একটিও তাদের নিজেদেরই সন্তান নয়। ভগিনীদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, তারা চির-বন্ধ্যা। বন্ধ্যা হলেও চাকের অসহায় ছানাদের প্রতিপালনে তারা অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ।

মক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণ মৌচাকের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে দেখা যায় মৌচাকে মৌমাছিরা শুধু যে দলবদ্ধভাবেই বাস করে তা নয়, তারা মানুষেরই ন্যায় সমাজ-বদ্ধ জীব। আমাদের সমাজের কর্ম-ব্যবস্থার ন্যায় তাদের সমাজের কর্ম-ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গঠিত। প্রতি স্তরের প্রত্যেকের কাজ সুনির্দিষ্ট—কোথাও কোনরূপ অব্যবস্থা, কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নেই। একটি বিষয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সমাজ ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে জীবিকার্জনের জন্য সাধারণতঃ একই ব্যক্তি একই কাজে নিযুক্ত থাকে আজীবন ধরে। যে রাজ-মিস্ত্রী তাকে প্রায় আজীবন রাজ-মিস্ত্রীরই কাজ করতে হয়, যে তাঁতী সে আজীবন ধরে তাঁত বোনে। কিন্তু মৌচাকের ব্যবস্থা অন্যরূপ। চাকের কোন মৌমাছিকেই—একমাত্র রাণী ব্যতীত—তাদের স্বল্পস্থায়ী জীবনের সমগ্র সময় একই কাজে নিযুক্ত থাকতে হয় না। জন্মাবার পর মৃত্যু পর্যন্ত চাকের প্রতি কাজের সঙ্গে তাদের [illegible] ক'রে পরিচয় ঘটে চাকের [illegible] কাজের ভিতর দিয়ে, তাদের জীবনচক্রের চাকা একবার ঘুরে [illegible]।

ডিম হ'তে মৌমাছির জন্ম হলেও ডিমের ঠিক পরবর্তী অবস্থাই মৌমাছি নয়। মৌচাকের খোপের ভিতরে [illegible] নরম মুড়ির মতো [illegible] তাদের ডিম বলে মনে করি। কিন্তু *প্রকৃতপক্ষে সেগুলি মৌমাছির ডিম নয়, সেগুলি ডিমের পরবর্তী কীড়া বা লার্ভাবস্থা (larva)। ডিম তিন দিনের হ'লে লার্ভাতে রূপান্তরিত হয়। কীড়ার পুত্তলীতে (pupa) পরিণত হ'তে লাগে প্রায় এক সপ্তাহ। পুত্তলীর পরবর্তী অবস্থাই পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি। ডিম পূর্ণাঙ্গ* মৌমাছিতে পরিণত হয় প্রায় তিন সপ্তাহে। তারপর তারা আরো বেঁচে থাকে পাঁচ কি ছয় সপ্তাহ। চাকের ভিতরে কীড়া-শিশুর খোপ ও পুত্তলী-শিশুর খোপ দেখেই চিনতে পারা যায়। কীড়ার খোপের মুখ খোলা আর পুত্তলীর খোপের মুখ একটি শুভ্র পর্দার মতো জিনিস দিয়ে মোড়া। চাকের ভগিনী-শ্রেণীর শ্রমিক মৌমাছিরা মুখে ক'রে কীড়াদের খাওয়ায়—তাই তাদের খোপের মুখ ঢাকা নয়। কিন্তু পুত্তলীরা খায় কি করে? খোপের মুখ বন্ধ থাকায় তার ভিতরে মুখ নিয়ে তাদের মুখে

খাবার তুলে দেবার উপায় নেই। তবে কি তারা না খেয়েই বে'চে থাকে? আহার ভিন্ন কোন জীবই বাঁচতে পারে না। পুত্তলীদের বে'চে থাকবার জন্য আহারের প্রয়োজন। তারা সে আহার পায় পর্দার মতো জিনিসটির গা থেকে। পর্দাটি এমনভাবে তৈরী যে তার ভিতর দিয়ে হাওয়া চলাচল করতে পারে এবং তার নিম্নপৃষ্ঠে প্রচুর রেণু মাখানো থাকে। পুত্তলীরা ঠোঁট দিয়ে সে রেণু চুষে চুষে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে, বে'চেও থাকে।

পুত্তলী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চাকে তাদের কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে তারা নিজের গা পরিষ্কার করে নেয়। পুত্তলী-জীবনের চিহ্ন তখনো তার গায় এখানে সেখানে কিছু কিছু লেগে থাকে। ঠোঁট দিয়ে, পা দিয়ে, জিব দিয়ে চেটে চেটে বেশ ধীরে সুস্থে সে তার গায়ের আবর্জনা তুলে ফেলে দেয়। এখন তাদের শরীরটি দেখায় বেশ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। এবার সে মন দেয় তার পরিত্যক্ত খোপটির দিকে। যে খোপটি সে পরিত্যাগ করে এসেছে, সে জানে তা চিরকাল পরিত্যক্ত হয়ে থাকবে না—আবার তার ভিতরে একটি নতুন প্রাণের জন্ম হবে, অচিরকালের মধ্যে রাণী ডিম পাড়বে তার ভিতরে। রাণী এসে খোপটি আবর্জনাপূর্ণ দেখলে কিছুতেই সে তার ভিতরে ডিম পাড়বে না। রাণীর আগমনের পূর্বেই সে খোপের ভিতরের সব আবর্জনা পরিষ্কার করে মুখের লালা দিয়ে খোপের ভিতরটি বেশ ক'রে মেজে দেয়। এখন খোপটিকে দেখায় তার নিজেরই শরীরের মতো উজ্জ্বল চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে।

পুত্তলী-জীবনের শেষ মুহূর্তে সে যে খাদ্য গ্রহণ করেছিল তারপর এ পর্যন্ত সে আর কিছুই খায় নি। এতক্ষণে তার খিদে পাবার কথা। আজ আর কেউ তার মুখে খাবার তুলে দেবে না। নিজেকেই তার খাবার খ‍ু'জে নিতে হবে। সেজন্য মধু বা রেণুর সন্ধানে তাকে চাক হ'তে বাইরে যেতে হবে না। পূর্ব হ'তেই তার এবং তারি মতো অন্যান্য নবজাত মৌমাছিদের জন্য চাকে মধু ও রেণু সঞ্চিত হয়ে আছে। এখনো তার ডানা পা দৃঢ় শক্ত হয়নি, চাকের সরু সরু গলিপথ দিয়ে এদিক ওদিক ক'রে সে ধীর গতিতে খাবার সন্ধানে বের হয়। চারদিকে অসংখ্য মৌমাছির আনাগোনা সকলেই তার অপরিচিত কিন্তু তাদের দেখে সে কিছু-মাত্র ভয় পায় না। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জানে চাকের সকলেই তার আপন-জন। মৌমাছিদের আনাগোনার ও ভীড়ের ভিতর দিয়ে সে নিজের পথ ক'রে নেয়। চাকের যেস্থানে মধু ও রেণুর ভাণ্ডার সেখানে গিয়ে সে উপনীত হয়। এ-খোপ থেকে মধু, ও-খোপ থেকে রেণু সে তৃপ্তির সঙ্গে একটু একটু ক'রে খায়, কেউ তাকে বাধা দেয় না। গা তার ক্রমশ শক্ত হয়ে আসে, পায়ে ডানায় সে জোর পায়। ক্ষুধা নিবৃত্তি হ'লেই সে দ্রুত ফিরে চলে তার কাজের জায়গায়।
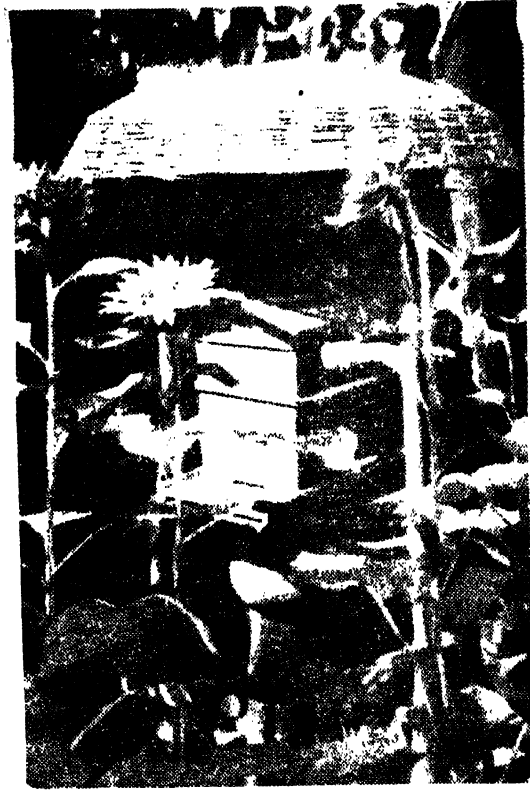
বাগানের ভিতরে মৌচাকের বাক্স রাখা আছে।

সে কোথায়? কে তাকে তার সন্ধান দেয়? চাকের নানা কাজে মৌমাছির দল ব্যস্ত। একটির পর একটি এক এক দল মৌমাছি কেবলি চাকে আসছে, আবার অমনি চাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। তারা আনছে মধু, রেণু। সে কি তাদেরই সঙ্গে বাইরে যাবে মধু, রেণুর খোঁজে? না, নবজাত শ্রমিক মৌমাছিরা দু' সপ্তাহ পর্যন্ত চাক হ'তে বের হবে না। এই সময়টা তারা চাকে থেকে চাকের নানা কাজের শিক্ষানবিশী করবে। তাদের প্রথম কাজ চাকের ছানাগুলিকে প্রতি-পালন করা। অসহায় ছানাগুলি ঠোঁট মেলে কেবলি হাঁ করে আছে খাবারের জন্য। তাদের ক্ষুধা বেশি। তাদের খাওয়াতে হয় দিনে বহুবার। জন্মাবার পর কাজের

উপযুক্ত হওয়া মাত্র শ্রমিক-মৌমাছির দল ছানাদের প্রতিপালনের কাজে নিযুক্ত হয়। খোপে সঞ্চিত রেণু ও মধু এনে তাদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ায়, জিব বুলিয়ে তাদের গা পরিষ্কার করে। তাদের গায় কোনরূপ ময়লা জমতে পারে না। আহার ও পরিচর্যায় ছানাগুলি ক্রমশ বড় হ'তে থাকে। ছানাদের বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সেবিকার দল এসে তাদের প্রতিপালনের ভার নেয়। বয়স অনুসারে ছানাদের খাদ্যেরও পরিবর্তন হয়। মধু, রেণু সকলেই খায়। কিন্তু খাঁটি রেণু ছোট ছানারা হজম করতে পারে না। মধু অপেক্ষা রেণুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি। তাই ছোটদের বেলায়, রেণুর সংগে সেবিকারা তাদের গা হ'তে নিঃসৃত এক জাতীয় লালা মিশিয়ে খাওয়ায়। আমাদেরও অতি শিশুরা খাঁটি দুধ হজম করতে পারে না—তাই তাদের দুধের সংগে জল মিশোতে হয়। এই লালা মিশ্রিত খাদ্যের নাম মৌমাছি প্রতিপালকেরা দিয়েছে 'বী-জেলি' (Bee-Jelly)।

জন্মাবার পর এইভাবে তাদের দশদিন কেটে যায়। এই সময়ে মায়ের বুকের দুধের ন্যায় তাদেরও বুকের দুধ বা সেই লালা জাতীয় রস শুকিয়ে আসে। তখন আর ছানাদের প্রতিপালনে তার মন থাকে না। তখন সে ছানাদের পরিত্যাগ ক'রে নিযুক্ত হয় অন্য কাজে। বয়স্ক মৌমাছিরা ফুল হ'তে মধু নিয়ে যেখানে এসে বসে সে সেখানে গিয়ে স্থান নেয়। তাদের মুখে মুখ লাগিয়ে তাদের পেটের মধু চুষে বার করে নেয়। বয়স্ক মৌমাছিদের পেটে মধু জমাবার জন্য একটি অতি ক্ষুদ্র থলের মত জিনিস আছে, সেটি পিনের মাথার বিন্দুটি অপেক্ষা বড় নয়। তারি ভিতরে তারা ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে একটু একটু ক'রে মধু জমায়। থলেটি মধুতে পূর্ণ হ'লেই তারা চাকে উড়ে আসে। অল্পবয়স্ক শ্রমিকের দল যাদের বয়স দশদিন অতিক্রম করেছে, তারা এসে তাদের পেটের মধু হাল্কা করে। বয়স্ক মৌমাছিরা ফুল হ'তে মধু সংগ্রহ ক'রে চাকে এসে পৌঁছিয়ে দেয় মাত্র, কিন্তু তা ভাঁড়ারে তুলে রাখবার ভার অল্পবয়স্ক মৌমাছিদের উপর।

মধু ভাঁড়ারে তুলতে তুলতে ২।১ দিনের মধ্যে তাদের দেহে এক আশ্চর্য

পরিবর্তন দেখা যায়। পেটের তলার নীচের দিকের কোন কোন অংশ ফুলে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় মোমের অতি পাতলা স্তর। মোমের স্তর জমতে আরম্ভ করতেই নতুন কাজের তাড়া আসে তাদের মনে। ভাঁড়ারের কাজ অন্য নবাগতদের উপর দিয়ে তারা চলে যায় তাদের উদরের মোম কাজে লাগাতে। চাকের প্রত্যেকটি খোপ মোম দিয়ে তৈরি। আর এই মোমের খনি মৌমাছিদের নিজেদেরই উদর কিন্তু প্রত্যেকের নয়, যাদের বয়স হয় হইতে দশ দিন হয়েছে, তাদেরই উদর হ'তে মোম ক্ষরিত হয়। সেই মোম দিয়ে খোপের পর খোপ তৈরি হ'তে থাকে। মধু, রেণু ও ভবিষ্যৎ শ্রমিকদের জন্মাবার জন্য নতুন নতুন খোপ তৈরি হয়। সেই সংগে তৈরি হয় অন্য এক শ্রেণীর খোপ। সেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু গড়ন একইরূপ, তাদেরও ছয়টি করে বাহু (Hexagon)। এই খোপগুলিতে জন্ম হয় পুরুষ মৌমাছির। পুরুষ মৌমাছি শ্রমিক মৌমাছি অপেক্ষা আয়তনে বড়। প্রতি চাকে রাণী জন্মাবার জন্যও কয়েকটি ক'রে খোপ তৈরি হয়। সেগুলি দেখতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের, আকারেও অপেক্ষাকৃত বড়—খোপগুলি লম্বা হয়ে চাকের সমতল ছাড়িয়ে উপরের দিকে তাদের মুখ বাড়িয়ে দেয়। মুখের গড়ন গোলাকার। চাকে রাণীর দেহের আয়তন সর্বাপেক্ষা বড়।

বাসা তৈরি করতে করতে কিসের উত্তেজনায় নবজাত শ্রমিকের দল এক একবার বাসা ছেড়ে বাইরে বের হয়ে যায়। চাকেরই কাছাকাছি চারদিক ঘুরে ফিরে দেখে, কিছুক্ষণ পরেই আবার চাকে ফিরে আসে, আবার চাক তৈরির কাজে মন দেয়। প্রতিদিনই এইভাবে ওরা কিছুক্ষণ বাইরে বাইরে কাটায়, প্রতিদিনই তাদের এই অভিজানের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। তাদের বয়স যখন তিন সপ্তাহ পূর্ণ হয়ে আসে তখন বাসার চারদিকের কয়েকশত গজ জায়গা জুড়ে যা যা-চেনবার তা তাদের চেনা হয়ে যায়। এ তাদের বাসার সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ করবার পূর্ব সূচনা। চাক ছেড়ে এবার তাদের ফুলের মধু, ফুলের রেণুর খোঁজে বাইরে বের হতে হবে। তাই বাইরের জগতের সংগে তাদের পরিচয় লাভের এই চেষ্টা। কিন্তু তার পূর্বে দু তিন দিনের জন্য তাদের চাকের দ্বারপালের কাজ করতে হয়।

পোষা মৌমাছিদের কাঠের বাক্সের ভিতরে পোকা হয়। সেই বাক্সের ভিতরে তারা চাক বাঁধে। বাক্সের একধারে কাঠের গায় থাকে একটি ফুটো। এই ফুটো দিয়ে মৌমাছি ভিতরে যাওয়া আসা করে। দ্বারপালেরা বাক্সের ভিতরে ফুটোর কাছে বসে সর্বক্ষণ চাক পাহারা দেয়। কয়েকটি বাইরেও ফুটোর মুখের কাছে বসে থাকে। বাইরে হতে পরিচয়পত্র না দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশের কারোর অধিকার নেই। প্রতি চাকের পরিচয়পত্র সেই চাকের বিশেষ গন্ধ। অজানা কোন চাকের কোন মৌমাছি ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করলেই দ্বারপালেরা তাদের গায়ের গন্ধে টের পায়। অজানা চাকের গন্ধ পেলেই অমনি সকলে মিলে তাকে আক্রমণ করে, চাক হতে তাকে বিতাড়িত করে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। মধুর লোভে অন্য কোন শত্রুকে চাকের কাছে আসতে দেখলেই দ্বারপালের দল তাদের তাড়া করে। মানুষও তাদের আক্রমণ হতে রেহাই পায় না। কিন্তু মানুষ বা তেমনি অন্য কোন বড় শত্রুর গায় ওরা একবারই মাত্র হুল ফুটাতে পারে। হুল ফুটানো মাত্রই সে-হুল তাদের গায় ভেংগে আটকে যায়। হুলহীন হয়ে ওরা আর বাঁচে না—তখনি তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাদের স্বজাতীয় মৌমাছি, বোলতা বা অন্যান্য পতংগের গায় ওরা যতবার খুশী হুল ফুটোতে পারে। হুলের ঘায় তাদের জর্জরিত করে। তাতে হুল খসেও না, ভাংগেও না। তাতে তাদের মৃত্যুও ঘটে না।

জন্মাবার পর ২০ দিন অতিবাহিত হবার পর তারা পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছিরূপে গণ্য হয়। তারপর তারা বাঁচে আর দুই সপ্তাহকাল মাত্র। জীবনের শেষ দু সপ্তাহ তাদের কাটে চাকের বাইরে মধু ও রেণু আহরণ করে। রেণু ও মধু আহরণ করে দু বিভিন্ন দল। মধু সংগ্রহ করতে করতে কখনো তারা রেণু সংগ্রহ করে না, আবার রেণু সংগ্রহ করবার সময় তারা কখনো মধু সংগ্রহে মন দেয় না। তবে একই মৌমাছি সকালের দিকে মধু সংগ্রহ করে আবার বিকেলের দিকে রেণুও সংগ্রহ করে। মধু সংগ্রহের সময় ফুল সম্বন্ধেও তাদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এক যাত্রায় (trip) কখনো তারা মধুর জন্য দু বিভিন্ন জাতীয় ফুলের উপর বসে না, এমন কি দুটি বিভিন্ন জাতীয় ফুলের গাছ যদি পাশাপাশিও থাকে। একসংগে তাদের পেটের ভিতরের ক্ষুদ্র থলিটুকুতে খুব সামান্যই মধু ধরে। কয়েক ফোটা পরিমাণ মধুর জন্য অন্তত তাদের হাজারটি ফুলের উপর বসতে হয়। ফুলের প্রাচুর্য ও তাতে মধুর প্রাচুর্য থাকলে এক একটি চাক হতে দৈনিক এক সের মধু পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মধু সংগ্রহের জন্য দৈনিক কী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমই না তাদের করতে হয়। এতটা পরিশ্রম তাদের শরীরে বেশিদিন সয়না, ক্রমশ তাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে আসে। জ্বরা এসে তাদের আক্রমণ করে। তখন তারা আর বাসা হতে বের হয় না—বাসায় থেকে কাজ করবার পক্ষেও তারা অযোগ্য হয়ে পড়ে। যদি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু না ঘটে তাহলে একদিন স্বাভাবিক মৃত্যুতে তাদের জীবনের অবসান হয়। জীবনের অন্তিমকাল তাদের অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

এই হল মৌমাছিদের শ্রমিক জীবনের কাহিনী। আর রাণীর? তা আরো বিস্ময়কর।

শ্রমিক ও রাণীর বংশ পরিচয় একই—একই চাকে একই পিতামাতা হতে তাদের জন্ম। ভাগ্য গুণে ঠিক ভাগ্য গুণে

নয়, শ্রমিকদের নিজেদেরই ইচ্ছানুসারে চাকের একই জাতীয় ডিমের কোন একটি হতে রাণী জন্মায় রাণী হয়ে। পূর্বেই বলেছি শ্রমিক কীড়া-শিশু ও রাণী কীড়া-শিশুর খাদ্য এক নয়। খাদ্যের গুণ ও পরিমাণের তারতম্য অনুসারে কীড়াবস্থা হতে ভগিনীগণ চির বন্ধ্যা হয়ে জন্মায়, আকারেও হয় ছোট, আর কীড়াবস্থায় অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিমাণে অধিক খেয়ে রাণী জন্মায় সন্তানের জন্মদানে সক্ষম হয়ে, আকারেও হয় সে বড়। রাণীর খাদ্যের নাম বী-মিল্ক (Bee-milk)।

শ্রমিকের সংখ্যা যতই হোক, প্রতি চাকে রাণী মাত্র একটি। একটির অধিক রাণী একসঙ্গে চাকে বাস করতে পারে না —রাণীই তাদের বাস করতে দেয় না। চাকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে তারা কিছুতেই সহ্য করে না। কিন্তু রাণীর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? সে যদি মরে যায়? চাক রাণীহীন হলে চাকের অস্তিত্বও লোপ পাবে। যদিও চাকে রাণীর কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই, তবু রাণীকে কেন্দ্র করেই চাকের অস্তিত্ব। রাণীহীন চাকের মৌমাছির দল কোথায় ছন্নছাড়া হয়ে যাবে তার কোন ঠিক নেই। তখন তাদের জীবন হয় উদ্দেশ্যহীন। চাকের প্রতি তখন তাদের আর কোন মায়া থাকে না। সেইজন্য রাণীর জীবিতকালের মধ্যেই শ্রমিকদল চাকের মধ্যে কয়েকটি (ছয়টির বেশি নয়) অপরিণত রাণী প্রতিপালন করে। প্রয়োজন মতে তারা তাদের রাণীতে রূপান্তর করে। রাণীর দুর্ঘটনা অপেক্ষা মাঝে মাঝে রাণীর বিচিত্র খেয়ালের জন্যই বিশেষভাবে তাদের এই সতর্কতা। প্রতি চাকের মৌমাছির সংখ্যার উচ্চতম হার যখনই পূর্ণ হয়ে আসে তখনই শ্রমিকদল বুঝতে পারে চাকের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যাকে তারা এতদিন ধরে এত যত্নে প্রতিপালন করেছে একদিন সে তাদের মায়া ত্যাগ করে উড়ে চলে এক অনির্দিষ্ট যাত্রায়। কিন্তু চাকের মৌমাছির দল তাকে একা যেতে দেয় না, বেশ একটি বড় দল তার সঙ্গ নেয়। অনির্দিষ্ট যাত্রায় বহির্গত হলেও রাণী প্রথমে চাক হতে বেশিদূরে না গিয়ে নিকটেই কোন গাছের ডালে বা ঝোপের মধ্যে বসে। সঙ্গীরাও তাকে ঘিরে জড়াজড়ি হয়ে বসে সেই ডালে। সন্ধানী মৌমাছি (Scout) একটি দু'টি করে ছোটে এদিক ওদিকে উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে। মৌচাকের পালক সেই সময়ে তাদের বিশেষভাবে রাণীকে প্রলোভিত করে তার কোন একটি চাকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারে তাহলে তাদের আর ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। রাণী এক সময় দলবল নিয়ে সেস্থান হ'তে সরে পড়ে। কোথায় যায় তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

পুরাতন চাকটি তখন রাণীহীন কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। রাণীর চাক ছাড়বার পূর্ব হ'তেই শ্রমিকরা রাণীর জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ খোপে উপযুক্ত আহার দিয়ে ভবিষ্যৎ রাণী জন্মাবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলো। তাদেরই ভিতরের একটি পুত্তলী রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে চাকে রাণীর পদ গ্রহণ করে। একদিন যায় দুদিন যায় একসপ্তাহ কখনো দু' সপ্তাহও কেটে যায়। হঠাৎ একদিন নতুন রাণী পাখা মেলে শূন্যে উঠে চলে তীর-বেগে। সেদিন চাকের শ্রমিকদলের একটিও তার সঙ্গ নেয় না, সেদিন তার সঙ্গ নেয় একদল পুরুষ মৌমাছি। এতদিন তারা অলসভাবে চাকে দিন যাপন করছিলো শুধু এই দিনটিরই জন্য। শ্রমিকদলও এতদিন তাদের জামাই আদরে পুষছিলো এই দিনটিরই জন্য। তাদের মধ্যে যে ভাগ্যবান সেই শূন্য পথে আজ রাণীর সঙ্গে তার হবে বিয়ে—সেই শূন্য-পথেই বাসরশয্যা যাপন করে রাণী ফিরে আসে চাকে। কিন্তু ভাগ্যবান পুরুষ মৌমাছিটি আর চাকে ফিরে আসে না—রাণীর সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য সহবাস করার পরই তার মৃত্যু ঘটে। অন্যেরা চাকে ফিরে আসে।

চাকের পূর্ণ ঐশ্বর্যের সময় বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল। তখন মৌমাছি ফুলের মধু ও রেণু পায় প্রচুর। রেণু ও মধুই চাকের প্রধান সম্পদ। রেণু ও মধুর সম্পদে তাদের ভাঁড়ার তখন ভরে ওঠে। শূন্য-খোপ ডিমে নতুন নতুন ছানায় ভরে যায় নতুন নতুন খোপ তৈরি হয়। মৌমাছি প্রতিপালকদেরও তখন মধুর ব্যবসা বেশ ফেঁপে ওঠে।

তারপরেই আসে শরতের শীত চাকের দুর্দিন। এ সময় কেউ চাক হতে বের হয় না। সকলেই চাকের ভিতরে নিজ নিজ জায়গা নিয়ে শীত যাপনের জন্য তৈরি হয়। সে সময় চাকের সঞ্চিত মধু তারা আহার করে। কিন্তু তার পূর্বে পুরুষ মৌমাছিগুলিকে তাড়ায় চাক হতে। নতুন রাণীর মাতৃত্ব লাভ করার পর চাকে তাদের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রকৃতিতে অপচয়ের স্থান নেই। মৌমাছি প্রকৃতিরই সন্তান। এতদিন যাদের জামাই-আদরে প্রতিপালন করছিলো শ্রমিকগণ সে সময় তাদেরই চাক হতে বিতাড়িত করে নিষ্ঠুরভাবে। তারা সহজে চাক ছাড়তে চায় না। কিন্তু শ্রমিকগণ তাদের কামড়িয়ে, ধাক্কিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে দ্বারের বাইরে। কিন্তু বাইরে এসে তারা খাবে কি, থাকবে কোথায়? পুনরায় চাকে ঢুকতে চেষ্টা করতেই তারা অভ্যর্থিত হয় অবিরত কামড়, এমনি কি হুলের বিষের দ্বারা। অবশেষে অনাহারে, বাইরের শীতে ও শ্রমিকদের হুলের বিষে তারা প্রাণত্যাগ করে। শীতকালটা মধু-চক্র সম্পূর্ণ পুরুষহীন অবস্থায় থাকে। তখন সেখানে ভগিনীদের সম্পূর্ণ রাজত্ব।

কী দুর্ভোগ কী অশান্তি!

বস্তুত যদি তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় না হ'ত তো তাঁদেরও শান্তি নষ্ট হ'ত না, আমাকেও দুর্ভোগ পোহাতে হ'ত না।

কিন্তু তা কি হয়!

এক পাড়াতে থাকলে দেখা ও পরিচয় হবেই।

মোড়ের গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলাম বাস ধরতে সেদিন। দু'জনের সামনে পড়ে গেলাম এবং পরিচয় হ'ল।

ভাদুড়ি তাঁর সুদৃশ্য বেতের ছড়ি আকাশে উঁচিয়ে বললেন, 'ওই তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া একটু ভিতরের দিকে গিয়ে যে-কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে আপনাকে অশোক ভাদুড়ির বাড়ি কোন্‌টা। আসুন একদিন।'

অশোক পত্নী তাঁর সুন্দর নীলাভ রসাল ঠোঁটের ওপর ঈষৎ চেপে ধরে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি গল্প লেখেন আর আমরা এত কাছে আছি।'

যেন তাঁদের এত কাছে থাকাতে একটা গল্প সর্বক্ষণ তৈরী হয়ে আছে এমন ভাব নিয়ে মিসেস ভাদুড়ি অল্প অল্প হাসলেন কি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তিনি বললেন, কাল বিকেলে তাঁর বাড়িতে আমার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল। সাহিত্যিক লোক যেন ভুলে না যাই।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ভাদুড়ি বললেন, ব্যাঙ্ক ক'রে সময় পান না তিনি সত্যি, কিন্তু সাহিত্য পড়ার তাঁর নেশা আছে, সাহিত্যিককে কাছে পেলে খুশি হন। একদিন তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

অনুমান মিথ্যা হ'ল না। উজ্জ্বলা একটা বড় রুপোর থালায় ক'রে একরাশ গরম লুচি কড়াইশুঁটি কপি ভাজা, দুটো ডিমের বড়া ও এক মগ চা আমার সামনে হাজির করে বললেন, 'আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে আগেই বলে রাখছি।'

হা—হা। ওদিক থেকে প্রকাণ্ড হেসে ঢিলে পায়জামা পরা ভাদুড়ি সামনে এসে দাঁড়ান। সোনার সিগারেট কেইস আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার চেয়ে তুমি সুন্দরী বেশি বলে কি মনে কর তোমার গল্পে তিনি আগে হাত দেবেন, কখ্‌খনো না, আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখুন সাহিত্যিক, খুব ভাল গল্প হবে।'

বিরাটকায় কালো ভল্লুকের মত লোমশাবৃত ভাদুড়ির পাশে উজ্জ্বলাকে জ্যোৎস্নার রেখার মত ফুটফুটে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল।

'আমায় নিয়ে লিখলে একটা গল্প হবে না শুধু এপিক উপন্যাস হবে, এত ইন্‌সিডেন্স এত হেপেনিংস্‌ জীবনে।' ভাদুড়ি স্ত্রীকে আড়াল করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন।

'ছাই। তুমি বোঝ তুমি জান শুধু ব্যাঙ্ক আর তোমার ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুমটা। অই তো রাতদিনের কথা চব্বিশঘণ্টার চিন্তা, শুনছি। কী আর তেমন ঘটনা আছে সেখানে যে রাতারাতি ওই নিয়ে একটা গল্প ফাঁদা চলে। সরে দাঁড়াও আমি ও'কে পাখাটা খুলে দিচ্ছি।' উজ্জ্বলা পাখা খুলে দিতে তাঁর পরীর ডানার মত শুভ্র সুন্দর হাত সুইচ্‌-বোর্ডের দিকে বাড়িয়ে দেন।

ভাদুড়ি এবার ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, 'তুমি দামী শাড়ি হীরের আংটি পরছ আর ঘরে থেকে ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে সুন্দর হচ্ছ বলে যে একটা প্রথম শ্রেণীর গল্পের নায়িকা হবে আমি বিশ্বাস করি না, কি বলেন গল্প লেখক?

মুখে কিছু না বলে শুধু হাসলাম এবং আড়চোখে উজ্জ্বলার হাতের হীরের আংটিটা দেখে নিয়ে ভাদুড়ির সোনার কেইস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলাম।

এদিকে চায়ের টেবিলে দাম্পত্য কলহের ঝড় বইতে লাগল। প্রথমদিনই এই ঘটনা।

'গল্পের মালমশলা তোমার মধ্যে ছিঁটেফোঁটা নেই।'

'সীতাংশুবাবু তোমায় নিয়ে যদি কখনো গল্প লিখতে ট্রাই করেন সেটা নিছক পণ্ডশ্রম হবে, আমি দু'কলম লিখে বলে দিতে পারি।' সুন্দর বাহুযুগল বঙ্কিম করে উজ্জ্বলা স্খলিত খোঁপা ঠিক করতে থাকেন। ঝগড়ার সময় মেয়েদের মাথার খোঁপা ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে শাস্ত্রের বাক্য।

এবং ভাদুড়ি, আমার একটা সিগারেট শেষ না হতে পর পর তিনটে সিগারেট টেনে শেষ করে জ্বলন্ত টুকরোগুলো ঝপাঝপ ছাইদানির জলে নিক্ষেপ করে আমায় বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তাঁকে নিয়ে আগে একটা গল্প লেখা হোক, ভাদুড়ির অনেক দিনের ইচ্ছা, এবং সাহিত্যিক যদি ইচ্ছা করেন উজ্জ্বলাকে নিয়ে না হয় পরে একটা গল্পে হাত দিক, ভাদুড়ির তাতে উৎসাহ নেই। ও একটা গল্পই হবে না।

পরের গল্প শোনার মত নিজেকে গল্পের মধ্যে দেখা, দেখতে চাওয়ার আগ্রহ যে কত প্রবল আমাদের পাড়ার ব্যাঙ্কার অশোক ভাদুড়ি ও তস্য পত্নীর মধ্যে তা আর একবার আবিষ্কার করে দুজনকে নিয়ে দুটো গল্প লিখব প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুরো তিনবাটি চা ও তদুপযোগী প্রচুর খাদ্য খেয়ে এবং রাশি রাশি সিগারেট পুরে সেদিন দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

উঁহু। এক গল্পে দু'জন থাকলে চলবে না। উজ্জ্বলা দ্বিতীয়দিন আপত্তি করলেন।

ভাদ্বড়ি হেসে বললেন, 'আমাদের দ্ব'জনের মধ্যে একরকম অর্থাৎ কমন্ থিঙ আপনি কি পাচ্ছেন যে, ওকে না হলে আমার গল্প হবে না। ওসব আই-ডিয়া ছেড়ে দিয়ে আপনি অন্যভাবে চিন্তা কর্বন, সীতাংশ্ববাব্ব।'

ওর তরকারীতে বেশি ঝাল খাওয়া অভ্যাস, শীত পড়তে মাথা অবধি লেপে ঢাকা দিয়ে শোয়া স্বভাব, সিনেমা দেখতে ভালবাসে—অর্থাৎ যেগ্বলো আমার র্বচির সম্প্রর্ণ বিপরীত, স্বতরাং—' উজ্জ্বলা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'ওকে আমাকে মিলিয়ে নিটোল একটা গল্প হবে আশা করছেন কেন?'

'রিয়্যালী,' ভাদ্বড়ি উচ্চ হেসে বললেন, 'আমি র্বমালে কড়া সেণ্ট ঢালি আর উজ্জ্বলার র্বমালে কোনরকমে সেই গন্ধ এতট্বকু লাগলে সাতবার সেটা ও ডাইংক্লিনিং থেকে ধ্বইয়ে আনে, রেডিওর 'আজকের খবর' শ্বর্ব হলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, 'আধ্বনিক গানে'র আসর বসতে উজ্জ্বলার মাথা ধরে, কাজেই—'

দ্ব'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি হাসতে থাকি। সত্যি তো এই দম্পতিকে একটি গল্পে একরকম ক'রে ফোটাতে যাওয়া বিপজ্জনক হবে, ভাবি।

'আমি সেণ্টিমেণ্ট ভালবাসি না, ও বরং—' ভাদ্বড়ি বলতে যাচ্ছিলেন, তীক্ষ্ম-কণ্ঠে উজ্জ্বলা বললেন, 'নিশ্চয়ই না বরং তার উল্টো, কোনো কোনো ব্যাপারে ও এমন অস্থির হয়ে পড়ে যে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

ভাদ্বড়ি অস্থির না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বেশ তো, সবে পরিচয় হ'ল, দ্ব'দিন আসা যাওয়া কর্বন এবাড়ি। কে কোমল কে বা কঠিন গল্পলেখক আপনার চোখে তা ধরা পড়বে।'

বললাম, 'তাই, এখন এই নিয়ে দ্ব'জন ঝগড়া করবেন না।'

সেদিন আর হাল্কাভাবে আপ্যায়ন নয়। চা ডিমের বড়ার পরিবর্তে পায়েস পেস্তার বরফি রাজভোগ রসকদম্ব এল।

প্লেটগ্বলোর দিকে তাকিয়ে ভাদ্বড়ি ম্বদ্ব হেসে বললেন, 'তার চেয়ে পোলাও ফাউল কারি হলে পার্টি জমত ভাল। গল্পের আসরটা আরো ঘন হ'ত।'

ভুর্ব কু'চকে উজ্জ্বলা বললেন, 'না ওসব বিলাতী কায়দায় বাংলা দেশের গল্প লেখককে রোজ আদর করা কেন।'

'তাই গল্প লেখককে মিষ্টান্ন খাইয়ে মিষ্টি একটা পরিবেশ গড়ে তুলছ?'

'তাই না হয় করলাম তাতে দোষের কি।' উজ্জ্বলা চামচ দিয়ে একট্ব পায়েস নিজের ম্বখে তুলে আমার দিকে তাকাল।

'তাই বলে তোমায় নিয়ে যদি তিনি কোনদিন গল্প লেখেন তার সবটাই মধ্ব হবে তা-ও ভেবো না।' রাজভোগে কামড় বসিয়ে ভাদ্বড়ি উচ্চরবে হাসেন।

'তা না হলেও তোমার মত কসাই চরিত্র ফ্বটবে না আমার,—সারাদিন কেবল মাটন্ আর ফাউল আর বীফ্ আর হ্যাম্......। এত মাংসও তুমি খেতে পার!' ঠোঁট বে'কিয়ে এবং দাঁতের শব্দ করে এমনভাবে উজ্জ্বলা মাংস কথাটা উচ্চারণ করলেন যে গল্পলেখক হয়ে আমি তার ষোলআনা উপভোগ করলাম।

'হয়তো খাওয়াটা আমার হিংস্র কিন্তু হ্বদয় ফ্বলের মত কোমল, তোমার খাওয়া মধ্বর রসে মাথা কিন্তু হ্বদয় নামক জিনিসটি যে রেজারের ব্লেডের মত ধারালো ক্রুয়েল্ হয়ে আছে না তা-ই বা কে জানে!'

'তা আর তোমাকে বোঝাতে হবে না, গল্পলেখক নিজের চোখেই দেখবেন কে কি।' বলে উজ্জ্বলা বাঁ হাতে সাঁড়াশি দিয়ে তুলে আর একটা রাজভোগ আমার প্লেটে ছেড়ে দিলেন। 'খান আপনি শ্বধ্ব কথা গিলছেন, সাহিত্যিক।'

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দ্ব'জন অবশ্য আর ঝগড়া করলেন না। বিদায় দিতে এসে দ্ব'জনই আমার হাত ধরে কর্বণ গলায় বললেন, 'গল্প চাই, ব্বঝলেন সাহিত্যিক, —আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে আপনাকে।'

এত খাওয়া ও খাতির দিয়ে তারা যে ক্রমশ আমাকে সাংঘাতিকরকম ঋণী করে তুলছেন দ্ব'বার সেকথা উল্লেখ ক'রে যাতে দ্ব'জনকে নিয়ে দ্ব'টো ভাল গল্প তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তার চেষ্টা করবার প্রতিশ্রুতি রেখে সেদিনও চলে এলাম।

বস্তুত গল্পের কথা চিন্তা করতে উজ্জ্বলার দামী শাড়ি হীরের আঙটি, ওদের বিশাল আকাশ রঙ বাড়ি, মৌস্বমী ফ্বল ছিটানো উঠোন ও ভাদ্বড়ির প্রতি ম্বহ্বর্তে টাকা আধ্বলি প্বড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ দামী সিগারেটগ্বলো দ্বচার টান্ দিয়ে ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা ধরানোর ছবির সঙ্গে সেই ছবিটাই আমার চোখের সামনে বেশি ফ্বটে উঠল। দ্বজনের দ্বটো গল্পের মধ্যে হয়ে উঠতে চাওয়ার অদম্য বাসনা। যা আমায় ভাবিয়ে তুলল রীতিমত। না এ শ্বধ্ব বিলাস নয়। একটা ভাল গাড়ি কি দামী পিয়ানো রাখার
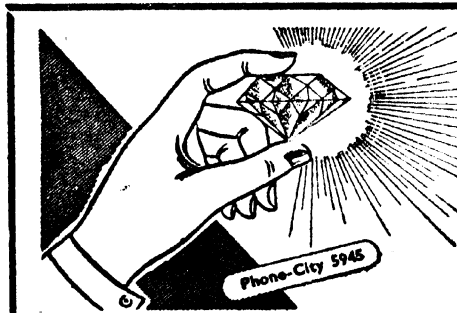
ইচ্ছার সঙ্গে এই ইচ্ছাকে একপাতে ফেলা যায় না।

ভাদুড়ির চল্লিশ পার হয়েছে লক্ষ্য করেছিলাম সেদিন। উজ্জ্বলার তুকতুকে পালিশ গালের নিচে থুতনির পাশে রেখা জেগেছে দেখেছি। যেন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধির পূর্ণতায় এসে হঠাৎ খেয়াল হ'ল দু'জনের আমরা কি আমরা কে তা তো জানা হ'ল না। একটা গল্প, একটা গল্পের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে দিন সাহিত্যিক দু'জনের সঠিক প্রকৃতি, না হলে শান্তি পাচ্ছি না। তাই কি? গল্পের জন্যে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন আসর জাঁকালো হ'ল বেশি।

গুডফ্রাইডে, কাজেই ব্যাংক হলি'ডে।

আহারটা সেদিন ভাদুড়ির ইচ্ছানুযায়ী পোলাও মাংস হ'ল। সঙ্গে আলুবখরার চাটনি।

আ, উজ্জ্বলার সেসব রান্নাও চমৎকার।

খাওয়ার পাট সেরে তিনজন গল্প করতে বসলাম। আমি ও ভাদুড়ি একটা শোফায়। দু'জন সিগারেট ধরিয়েছি। সামনে আর একটা শোফার প্রায় সবটা জুড়ে গা এলিয়ে দেওয়ার মতন ক'রে বসে উজ্জ্বলা পান চিবোচ্ছিলেন। কস্তুরীর গন্ধ বেরুচ্ছিল মনে হয় তাঁর মুখ থেকে।

গল্প করার আসর বৈঠক।

দরজা জানালায় চাঁপা রঙের পর্দাগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত ছিল।

বেশ মেজারের সঙ্গে ভাদুড়ি বললেন, 'আমার গল্পটা লেখা হয়ে যাক আপনাকে একটা ভাল জিনিস প্রেজেণ্ট করব।'

'কি আর প্রেজেণ্ট করবে তুমি!' উজ্জ্বলা ঘাড় সোজা ক'রে বসলেন। 'বড়জোর একটা বিলাতী কলম।'

'তুমি কি প্রেজেণ্ট করবে শুনি, যদি আমায় নিয়ে গল্প লেখা হয় লেখককে একটা কিছু দিয়ে সম্মান করতে হবে না?' ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে ভাদুড়ি স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'আমি তাঁকে উপহার দেব আমার এই হীরের আঙটি।' হীরকের মত কঠিন হেসে উজ্জ্বলা প্রত্যুত্তর দেন।

আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। আ, এই মুহূর্তে একটা গল্প আসছে না কেন।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি গল্প আসে। গল্প কারুর ইচ্ছার দাস নয়। কাজেই তখনকার মত গল্প না ভেবে গল্পের দাম দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখতে লাগলাম। বাইরে চৈত্র দুপুরের রোদ সোনা হয়ে ঝরছিল উঠোনময় মৌসুমীর ঝাড়ে।

একটা গল্পের জন্যে তাঁরা আমায় কি না দিতে প্রস্তুত। কলম, আঙটি, ড্রয়িং রুম সাজাবার ফার্নিচার, গাড়ি, কি একটা বাড়ি করার মতন টাকাই হয়তো।

শেষ বীট কে দিলেন জানি না। এক সময় দেখি দু'জনেই চুপ করে আছেন, ঝিমোচ্ছেন।

এত খেয়ে এবং এমন আরামে ব'সে থেকে আমারও ঘুম পেয়েছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না।

একটা শব্দে তিন জনের এক সঙ্গে ঘুম ভাঙল। তিন জনই চোখ মেলে দেখি মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা ভোমরা ভীষণ শব্দ ক'রে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পতঙ্গ দেখে ভাদুড়ির ভয়ের ভাবটা কাটল। বেশ একটু ভয় পেয়ে তিনি চমকে চোখ মেলেছিলেন। এইবেলা হেসে ফেললেন।

'ঘুমের মধ্যে যেন শুনেছিলাম এটম বোমা ফাটছে।'

ভয় না পেলেও বিদ্ঘুটে আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে উজ্জ্বলা বিরক্ত, চেহারা দেখে বোঝা গেল।

মাধবী বিতান থেকে উঠে আসা কালো কুচকুচে ভ্রমরটাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন।

'দুষ্টু, আর এদিকে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম নীচে বাগানে মালী কাজ করছে কোথা থেকে যেন গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে একটা ষাঁড় ছুটে এসে ওকে এই মারে তো সেই মারে। উঃ কি ভীষণ গর্জন।'

শুনে ভাদুড়ি আরো বেশি শব্দ ক'রে হাসলেন। 'আপনি, আপনার কি মনে হয়েছিল সাহিত্যিক?'

আমি নীরব। তখুনি কোনো উত্তর মুখে এল না। কেননা, ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝি আমার মাথায় গল্প এসে গেছল।

এ'দের হাসি ও কথা শুনে ভোমরাও আর ড্রইং-রুমে থাকতে চাইলে না, জানালা দিয়ে ছুটে পালিয়ে বাগানে নেমে গেল।

যেন শব্দটা হঠাৎ মুছে যাওয়াতে দু'জনেই আবার একটু অপ্রস্তুত, যে পথে ওটা পালিয়েছে ফ্যালফ্যাল ক'রে সেদিকে তাকিয়ে আছেন, লক্ষ্য করলাম। গল্প লেখার সন্ধানী মশাল জ্বালিয়ে আমি সতর্কভাবে পা বাড়াই।

'যা-ই বলুন মিসেস ভাদুড়ি, আপনাদের এমন সাজানো সুন্দর বাড়ি, কিন্তু ভয়ানক খালি খালি ঠেকছে ঘর-দুয়ার। এ বাড়িতে একটিও শিশু দেখছি না। কেমন চুপচাপ চারদিক।'

উজ্জ্বলাকে দেখা শেষ ক'রে আমি ভাদুড়ির চোখের দিকে তাকাই। 'কি বলেন, মিঃ ভাদুড়ি।'

'এই রে! এই বেলা গল্পে হাত পড়েছে। উজ্জ্বলা বলো, তোমাকে নিয়েই

এ গল্প লিখবেন তিনি, সাহিত্যিককে বলে দাও কেন তুমি মা হতে চাওনি।' ভাদুড়ি আর তত জোরে হাসলেন না।

উজ্জ্বলা বললেন, 'কেন, তোমায় নিয়েও সুন্দর একটা গল্প লেখা চলে। তুমিও তো বাপ হতে চাইলে না।'

সোনার সিগারেট কেইস থেকে কটা সিগারেট তুলে নিয়ে আমি তাতে গ্নিসংযোগ করলাম।

' না না', যেন দু'জনকে অভয় দিয়ে ামি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'এ তো কমন ং, দু'জনেই জড়িত, কাজেই শুধু কজনকে নিয়ে এই গল্প লিখব সে ভয় াই,—তাছাড়া সাবজেক্টটা বড্ড পুরোনো। র্মনি, প্রতিবেশী বন্ধু হিসাবে ধরুন জ্ঞেস করছি, কারণ কি।'

'কারণ আর কি, মশাই,' বেশ একটু াচ্ছিল্যের সঙ্গে ভাদুড়ি বললেন, শরীরের রক্ত জল ক'রে পয়সা করব, ু'জন খাব-দাব ভোগ করব। খামকা ানুষের মুখ বাড়িয়ে লাভ কি। ধরুন, ভগবান না করেন, এই সংসারে ছেলে-ময়ে এল, আর ওরা নাবালক থাকতে মামি চোখ বুজলাম, এমনি তো মশাই াড-প্রেসারে ভুগছি, কি কাল আমার ্যাঙ্ক ফেল পড়তে পারে, জমানো টাকা মার ক'পুরুষ খেতে পারে, তখন? জনে-শুনে তাই এসব ঝুঁকি নিইনি।'

'আমি মশাই ওই ফিজিক্যাল কষ্ট সহ্য করতে পারব না ব'লে এড়িয়ে চলছি, আর কিছু কারণ নাই।' উজ্জ্বলা ঈষৎ বক্রনয়নে আমার দিকে তাকান। এই নিয়ে লিখতে গেলে গল্প তেমন জমবে কি।'

ভাদুড়ি দুই চোখ বড় করে সিগারেট রান। দু'জনই একটু বেশি গম্ভীর।

আমি, যেন প্রসঙ্গটা তুলে অপরাধ করেছি, সেইভাবে অপরাধ ক্ষালনের জন্যে আরো দু'বার মাথা নেড়ে বললাম, 'ও একটা বিষয়ই নয়, আজকাল এই নিয়ে কে আর গল্প লিখছে।'

'ছেলে বলে ছেলে, ও তো বাড়িতে একটা কুকুর রাখতে নারাজ।' উজ্জ্বলা আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখান।

অল্প হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, একটা কুকুর রাখলে পারতেন, অত্যন্ত খালি খালি লাগে, শুধুই আপনারা দু'জন।'

নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বার করে ভাদুড়ি প্রথমে স্ত্রীর দিকে তারপর আমার দিকে তাকান। 'রিস্ক। কাল কোন কারণে কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়ে আপনাকে কামড়াতে পারে। তখন আপনার জীবন বিপন্ন হবে। ও পশু, কিছু বোঝে না। আপনি মানুষ হয়ে মশাই এই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন কোন্ আইনে! ট্রাম বাস ইলেকট্রিক আগুন চোর ডাকাত মিলিয়ে শহরে রোজ এ্যাকসিডেন্ট কিছু কম হচ্ছে নাকি যে জেনে-শুনে আর একটা এ্যাকসিডেন্ট-এর রাস্তা খুলে রাখব বাড়িতে?'

আমি উজ্জ্বলার চোখের দিকে তাকালাম।

'আমার, সত্যি বলতে কি, সাহিত্যিক, ঘেন্না করে কুকুর বেড়াল। এ্যাকসিডেন্ট ফ্যাকসিডেন্ট কেয়ার করি না যদিও, বড্ড ইতর বড় নোংরা।'

'বলে কি না কুকুর। সেবার বাড়িতে আমার ভাগ্নে একটা ময়না রেখে গেল। ছোঁড়া রসিক। রথের দিন বৌবাজার থেকে নগদ আড়াই টাকা দিয়ে পাখিটা কিনে এনেছিল। এখানে বারান্দায় খাঁচাশুদ্ধ ওটাকে ঝুলিয়ে রেখে যাবার সময় বলে গেল মামাবাবু মামিমা, তোমাদের ছেলেপুলে নেই, আমার এই ভাইটিকে দিয়ে গেলাম, একটু আদর-যত্ন করো।'

কথা শেষ করে ভাদুড়ি টেনে টেনে হাসেন।

গম্ভীর আবহাওয়া একটু তরল হয়েছে দেখে খুশি হয়ে গলা পরিষ্কার করে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় সেই ময়না, দেখছি না তো—'

'কোথায় সেই ময়না।' ভাদুড়ির গলা আবার মোটা হয়ে এল। 'মশাই বোম্বে মেইল ডিরেলড্ হলেও এত আওয়াজ হয় না, রাত্রে শালা এমন বিদ্‌ঘুটে কড়কড়ে গলায় ডেকে উঠত। দু'দিন আমি ঘুম থেকে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠেছি।'

ভাবছিলাম ভাদুড়ি কেন এত টাকা-পয়সা এমন অগাধ সুখের মালিক হয়েও একটা ছোট গল্পের নায়ক হতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করলাম।

'পাখিটাকে ভাগ্নের কাছে পা দিয়েছেন বুঝি?' বললাম, 'না কেউ নিয়ে গেল!'

'পাঠালেই কি আর ও সেখ থাকে।' ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফে উজ্জ্বলা গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন, ' দিনে বেশ পোষমানা হয়ে গেছে তাছাড়া সার্কুলার রোড থেকে ওয়ালিশ স্ট্রীট খুব দূরেও না। দু ময়নাকে ওবাড়িতে রেখে আসা হ দু'বারই শিকল কেটে পালিয়ে এসে এখানে।'

উজ্জ্বলার চোখের রং দেখে হঠাৎ ম হল এর সবটাই বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সু স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসপ্রিয়তায় প্রখর ন যেন কোথায় একটু মেঘ আছে, স্নেহ রসের ছিটেফোঁটা বাষ্প। আমার বুকে ভিতরটা রীতিমত ছলছলিয়ে উঠেছিল রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

'পাখিটা দেখতে সুন্দর ছিল রা যেত,' উজ্জ্বলা বললেন, 'কিন্তু উপা কি! দু'দিনেই আমার ঘরদুয়ার ন নোংরা করল। ধরা গেল না তাই খাঁচা পুরে রাখা আর সম্ভব হল না। শে দু'দিন সারা বাড়িতে উড়ে উড়ে এ কাণ্ডটি করল।'

'একটা বাল্‌ব ভেঙেছে সেটা বলো।' ভাদুড়ি স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে আমাকে বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠছিলাম। ব্যাটা কখন যে উড়ে উড়তে সেখানে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্যাসেজের বাতির উপর ছিটকে পড়ল উঃ এক চুলের জন্যে সেদিন বেঁচে গেছি বাল্‌বটা ছিঁড়ে আমার মাথায় পড়ত।'

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে নতু সিগারেট ধরাই।

'ওটাকে মারতে গিয়ে তুমি যে একটা এ্যাকসিডেন্ট বাধিয়েছিলে সেটা বলো।' উজ্জ্বলা আড়নয়নে স্বামীকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরব হাসেন।

একটা নিরীহ পাখিকে মারা যাওয়ার কাহিনী শোনার ইচ্ছা আমা আদৌ ছিল না। তথাপি প্রশ্ন না ক পারলাম না।

'কি রকম?'

'পেননাইফ খুলে ছুঁড়ে মেরেছিল ওর দিকে।' উজ্জ্বলা বললেন, 'দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ছুরিটা প্রায় ও'র কপালে এসে লেগেছিল, কি বুদ্ধিমান বুঝুন একবার!'

ভাদুড়ি মাথা নেড়ে নিজের দোষ স্বীকার করলেন। রাগের সময় তিনি বুদ্ধি ঠিক করতে পারেন নি, অথচ উজ্জ্বলা কত সহজে কাজটি সম্পন্ন করলেন।

'কিভাবে?' ঢোক গিলে আমি দুবার দুজনের মুখের দিকে তাকাই।

'হাতুর সঙ্গে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল উজ্জ্বলা।' মোটা খসখসে গলায় কথাটা শেষ করে ভাদুড়ি আবার সিগারেট ধরালেন।

হয়তো আমি অতিমাত্রায় নীরব হয়ে আছি দেখে উজ্জ্বলা তাড়াতাড়ি বলে শেষ করলেন, 'ওসব কুকুর পাখি রাখা আমাদের পোষায় না, ওরা বাইরে সুন্দর, দূর থেকে ভালো।'

চৈত্রের রোদ বাঁকা হয়ে গেছে।

একফালি রোদ জানালা গলিয়ে এসে উজ্জ্বলার ঘাস-রং চটির ওপর পড়েছে, এক আঁজলা পড়েছে অদূরে পিয়ানোর ওপর। হাতির দাঁতের ছোট্ট তাজ-মহলটা লাল রোদ গায়ে মেখে অপরূপ হয়ে উঠেছে। আলস্য ভঙ্গের চেষ্টায় শিরদাঁড়া সোজা করে হাই তুলে বললাম, চলি আজ, অনেকক্ষণ গল্প করা গেল।'

'আমাদের গল্পের কথা ভুলছেন না তো!' স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন।

বললাম, 'ভুলিনি সারাক্ষণই ভাবছি।' চলে আসব, বাধা পেলাম।

ভাদুড়ি চীৎকার করে ওঠেন। উজ্জ্বলা শোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান।

বস্তুতঃ ওটা ওখানে কি করে মাথা গলাতে পারল ভেবে পেলাম না। এমন পরিচ্ছন্ন তকতকে ঝকঝকে সুন্দর কার্পেট-মোড়া ড্রইং-রুমে কদাকার একটা আরশোলা দেখলে কার না রাগ হয়।

ঘৃণায় উজ্জ্বলা নাসিকা কুঞ্চিত করে ভাদুড়ির দিকে তাকাল। 'তাকিয়ে দেখছ কি, ওটাকে ধর। এত ফ্লিট ফিনাইল লাইজলের পরও কিনা আমার ঘরে—'

স্ত্রীর ধমক খেয়ে বাঘ-শিকারীর বিক্রম নিয়ে ভাদুড়ি হুড়মুড় টিপয়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে আরশোলাটাকে চেপে ধরেন। কার্পেট ছেড়ে টিপয় বেয়ে ওটা উঠছিল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'চটকে মেরে ছেড়ে দিন জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিন, আপদ যাক।'

'আপনি সাহিত্যিক কি না, তাই একথা বলতে সাহস পাচ্ছেন, এতটা ওভারলুক করছেন এসব।' উজ্জ্বলা বেশ একটু বিরক্ত হয়েছেন আমার কথায় টের পেলাম।

'ক্যারিয়ার নাম্বার ওয়ান। মেডিক্যাল রিপোর্ট এরাই কোলকাতায় সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মা কলেরা প্লেগ ছড়াচ্ছে।' ভাদুড়ি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো কি করব এখন, ব্যাটাকে কি করে নিধন করা যায় বুদ্ধি দাও।'

উজ্জ্বলা এক সেকেন্ড ভাবেন।

কিন্তু ততক্ষণ ধৈর্য থাকে না ভাদুড়ির।

'পুড়িয়ে মারব শালাকে।' বলে অ্যাশট্রের ছাইগাদার মধ্যে ওটাকে ঠেসে ধরেন এমন।

উজ্জ্বলা হা হা করে উঠলেন।

'কি বুদ্ধি তোমার! এমন ধোঁয়া আর বিশ্রী গন্ধ হবে যে দুজন বাড়িতে টিঁকতে পারব না। ওটা আমার কাছে দাও তুমি।'

সুবোধ বালকের মত ভাদুড়ি আধ-মরা আরশোলাটাকে স্ত্রীর জিম্মায় ছেড়ে দেন। হাতের চাপেই ওটার অবস্থা কাহিল তখন।

কিন্তু উজ্জ্বলা আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলেন না। চট্ করে খোঁপা থেকে একটা কাঁটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে আরশোলাকে এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধে ফেলেন। বার দুই ছটফট করে ক্যারিয়ার চিরকালের মত স্থির হয়ে গেল।

'রিয়্যালী এসব কাজে তোমার জুড়ি নেই।' আর উত্তেজনা নেই, খুশিতে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ভাদুড়ি সিগারেট ধরান। 'এমন কায়দা করে তুমি সারতে পার।'

উজ্জ্বলা কিছু বলেন না। শান্ত স্থির চোখ মেলে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর হীরকখচিত চম্পক অঙ্গুলির খেলাই দেখছিলাম এতক্ষণ, অন্তত তাঁর তাকানোর বিনিময়ে নীরবে হেসে তাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সিগারেট ধরানো শেষ করে ভাদুড়ি ওধারে, যেন অনেকটা নিজের মনে গুণ গুণ করে হাসছেন।

'এমনভাবে হাসছ যে!' উজ্জ্বলা বিরক্ত হয়ে স্বামীর দিকে তাকান। একটু অবাক হন।

'সাহিত্যিক যেভাবে তোমায় দেখ-ছিলেন, মনে হয় এই নিয়ে না তিনি একটা—'

'তাই কি!' অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে উজ্জ্বলা আমার দিকে চোখ ফেরাতে আমি সবেগে মাথা নেড়ে বললাম, 'না না, ছি ছি! এসব কি গল্প লেখার মালমশলা। আপনি ধৈর্য ধরে থাকুন আমি ভাল গল্প লিখে আনব।' বলে আর অপেক্ষা না করে লম্বা পা ফেলে সেখান থেকে চলে এলাম।

(১৮)

তারপর একটু থেমে নিবারণ আবার বললে—আপনি ওখানে যাবেন একদিন?

—আমাকে যেতে দেবে কেন?

—খুব যেতে দেবে—নিবারণ বললে—আপনি ব্রজরাখালবাবুর শালা, কেউ আটকাবে না, আর সবাই মিলে না লাগলে কিছু হবেও না, এই সেদিন বুয়র যুদ্ধ হয়ে গেল, আবার রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধছে—দেখবেন শাদা চামড়ারা এবার হারবেই হারবে। আপনি ম্যাটসিনি গ্যারিবাল্ডির লাইফ পড়েছেন? আপনাকে আমি বই দিতে পারি—এইরকম করেই তারাও তো স্বাধীন হয়েছিল। সেদিন সিস্টার নিবেদিতা এসেছিলেন এখানে, তিনিও আশীর্বাদ করে গেছেন আমাদের, বলেছেন—তোমরা স্বামীজীর মতন হও—

নিবারণের কথা শুনতে শুনতে ভূতনাথ চোখদুটো বুজোলো। মনে হলো—এ এক আশ্চর্য জগতে এসে পৌঁছেছে সে। কলকাতার কেন্দ্রে বসে বসে ভারতবর্ষের এক নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। জবচার্নক আর লর্ড ক্লাইভের কলকাতার এ যেন এক বিস্ময়কর রূপান্তর। যে-কলকাতায় ননীলাল থাকে, থাকে ছুটুক-বাবু, ছোটবাবু, ছোট বৌঠান আর থাকে সুবিনয়বাবু আর জবা—এ যেন সে-কলকাতা নয়। কলকাতায় এসে ভূতনাথও তো নিজের চোখে কত কি দেখেছে—!

সেদিনের সেই ঘটনাটা মনে পড়লো।

বৌবাজার থেকে বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকতে সেই যে বটগাছটার তলায় সান বাঁধানো বেদীটার ওপর নরহরি মহাপাত্রের বিগ্রহগুলো। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, দুর্গা, মনসা, শিব, কালি, ছোট পুতুলের মাপের অসংখ্য ঠাকুর সব! প্রথম যেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোয় ভূতনাথ, নরহরি তাকে ওইখানে প্রণাম করিয়ে পয়সা নিয়েছিল! মন্তর পড়িয়েছিল। তারপর মোহিনী-সিঁদুর অফিসে যাতায়াতের পথে কতবার কত পয়সা আদায় করেছে। মিথ্যে হোক বুজরুকি হোক, তবু ঠাকুর দেবতা তো! যে অদৃশ্য শক্তি এই বিশ্ব চরাচরের নিয়ামক, তাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তিতো ভূতনাথের নেই। ভূতনাথের নিজেরই জন্ম তো পঞ্চানন্দ-তলায় মানতের ফলে। হোক ওটা নরহরি মহাপাত্রের ব্যবসা বা দোকান, তবু ঈশ্বরের নাম করে যখন চাইছে, তাতে কী-ই বা এমন ক্ষতি! তাই আসা-যাওয়ার পথে প্রণাম করতে কখনও ভোলেনি ভূতনাথ!

কিন্তু সেদিন দুপুরে কী অভাবনীয় কাণ্ড!

গোটা কতক গোরা সৈন্যই বুঝি!

বনমালী সরকার লেন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল শিষ দিতে দিতে। সামনে যথারীতি নরহরি মহাপাত্র সবে গঙ্গাস্নান সেরে মাথার শিখাতে একটা গাঁদাফুল ঝুলিয়ে পথচারীদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে! এমন রোজই থাকে সে। নতুন কিছু নয়। এমন সময় ওই দৃশ্য দেখে গোরা সৈন্য দুটোর কী তাব হলো মনে কে জানে! একজন হাতের ছড়িটা দিয়ে মারলে নরহরির মাথার গাঁদা ফুলটাকে! উদ্দেশ্য হয়ত রসিকতাই, কিন্তু ভয় পেয়ে নরহরি চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু সে-চীৎকারে ফল ফললো উল্টো! পাশ থেকে একজন গোরা সৈন্য বুট দিয়ে মারলে নরহরির মুখে! কিন্তু মুখ তা বলে বন্ধ হলো না নরহরির। রাস্তার ধারে এক নিমেষে ছিটকে পড়লো নরহরি আর কাটফাটা চীৎকার করতে লাগলো। শব্দ শুনে এদিক-ওদিন থেকে জনতা কতক বেরিয়েও এল ব্যাপার দেখতে।

ভূতনাথও শব্দ শুনে বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখতে এসেছে।

কিন্তু সে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! বুক দুর দুর করে কাঁপছে সকলের। কারো কিছু বলবার সাহস নেই।

ভারি ভারি বুট দিয়ে গোরা দুটো তখন লাথি মারতে শুরু করেছে। এক একটা লাথি মারে আর লক্ষ্মী গণেশ ঠাকুরগুলো দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। শিব, দুর্গা, মনসা সব মার্বেলগুলির মত যেদিকে খুশি ছিটকে ফেলছে। শান বাঁধানো বেদীটাও বুঝি ভেঙেচুরে গেল বুটের ঠোকর লেগে। আর একপাশে পড়ে নরহরি মহাপাত্র চীৎকার করে পাড়া মাত করছে।

শেষকালে যেন ক্ষেপে উঠলো গোরা দুটো......

যাকে সামনে পায়, তাকেই মারতে যায়। বড়বাড়ির গেটে ব্রিজসিং দাঁড়িয়েছিল। বুকে গুলীর বেল্ট। হাতে সঙিন লাগানো বন্দুক। সে-ও বে-কায়দা বুঝে লোহার গেট বন্ধ করে দিলে। যে-যেখানে পারলে লুকোল গিয়ে। সব বাড়ির জানালা দরজা খড়খড়ি খটাখট বন্ধ হয়ে গেল।

এমন সময় বড়বাড়ির মেজকর্তা হিরণ্যমণি চৌধুরী বেরুচ্ছিলেন।

কচোয়ানের বসবার জায়গায় আমিরী ভঙ্গিতে ইব্রাহিম লাগাম ধরে জুড়ি চালাচ্ছে। শঙ্কর মাছের ছিপটিটা খাপের ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। মোম লাগানো গোঁফ জোড়া দুপাশে মস্ত কাঁকড়া বিছের মত চিতোনো। মাথার বাবড়ি চুল কাঁধের ওপর গিয়ে ঠেকেছে। মাথার পেছনে কাঠের চিরুনি আঁটা। জরির কাজ করা শাদা প্লেটের ওপর সোনার তক্তি ঝুলছে গলায়। আর ইয়াসিন সহিস পেছনে পা-

নির ওপর দাঁড়িয়ে সাবধান করছে াইকে। হুঁশিয়ার হো—হুঁশিয়ার হো—

ব্রিজ সিং লোহার গেট খুলে দিয়ে টেনসনের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। তারপর ড়ি বেরুবার আগে চীৎকার করে লো—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—হো—

সে-চীৎকারে হঠাৎ যেন কিছুক্ষণের ন্য সবাই চমকে উঠেছে।

গোরা দুটো লড়াই থামিয়ে যেন টু ইতস্তত করতে লাগলো।

ততক্ষণে গাড়ি সামনে এসে গেছে।

ভেতরে ভৈরববাবু বসেছিলেন। চিয়ে বললেন—ইব্রাহিম গাড়ি থামাও—জবাবু গাড়ি থামাতে বলছেন—থামাও ড়ি—

আগে মেজকর্তা নামলেন।

পেছনে ভৈরববাবু—।

মেজবাবু হাঁকলেন—ইব্রাহিম ছিপটিটা তো—

কিন্তু গোরাদুটো তখন রণমঞ্চ ছেড়ে পো ছুটতে শুরু করেছে।

মেজবাবু নরহরির কাছে গিয়ে এক দিলেন—উল্লুক, শুয়োর-কা-বাচ্চা ছিস কেন? মারতে পারলি না দু'ঘা আবার পড়ে পড়ে কাঁদছিস—বেল্লিক কা—

বলে সপাং সপাং করে শঙ্কর মাছের পটিটা দিয়ে বেদম মারতে লাগলেন হরি মহাপাত্রের পিঠে। মড়ার ওপর ড়ার ঘা। নরহরি কাটা পাঁঠার মত ফট্ করতে লাগলো রাস্তার ওপর। রা এতক্ষণ দরজা-জানালা বন্ধ করে দেখছিল, তারা এবার দরজা খুলে ড়িয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে।

হঠাৎ নরহরিকে মারা বন্ধ করে দের দিকে ছিপ্‌টি নিয়ে এগিয়ে লেন মেজকর্তা। বললেন—কি খছিস সব—বেরো এখান থেকে—রো—

আবার ঝটাপট্ সব দরজা বন্ধ হয়ে ল।

শান্ত সৌম্য মেজকর্তা হিরণ্যমণি চৌধুরীকে কেউ রাগতে দেখেনি। সেই নিও রেগে লাল হয়ে উঠলেন। তারপর ভৈরববাবু আর মেজকর্তা গাড়িতে উঠে শতেই জুড়ী আবার বনমালী সরকার ন পার হয়ে গেল।

পরদিন খাজাঞ্চী বিধু সরকারের ডাক পড়লো।

বেলা তিনটে তখন। বিধু সরকার আসতেই বললেন—নরহরি মহাপাত্রকে একশো এক টাকা দিয়ে বিদেয় করে দাও তো বিধু—আর সুখচরের গমস্তাকে চিঠি লিখে দাও, রাজীবপুরের বিলের ধারের দশ বিঘে জমি ওর নামে প্রজা-বিলি করে দেয় যেন—

যে হুকুম সেই কাজ।

তারপরে নাথু সিংকে ডেকে বললেন—নরহরি যেন এ গলির মধ্যে কখনও না ঢোকে আর—তাকে যদি আর কখনও দেখতে পাই তো গুলী করবো ওকে—বলে দিস—

তারপর থেকে নরহরিকে আর কখনও ভূতনাথ দেখেনি কলকাতায়।

গল্প করতে করতে নিবারণ যেন একবার থামলো। বোধ হয় ঘুম আসছিল ওর। ঘরের আলোটা একটু একটু কাঁপছে। ভূতনাথেরও চোখে যেন কেমন তন্দ্রার ভাব। আর শুধু কি নিবারণ আর ভূতনাথ? সমস্ত ভারতবর্ষই বুঝি ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাদশাহী আফিঙের নেশা। জাগতে চেষ্টা করলেও ভালো করে চোখ মেলা যায় না। একশো বছরে রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাস নেই, রাজবংশের উত্থান-পতনের গুরুগর্জন নেই। বেশ নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় সবাই ঘুমিয়েছে। সেই সর্বনাশা ঘুমের অন্তরালে কখন ধানকল এসেছে চুপি-চুপি, এসেছে পাটকল আর গম-পেষা কল, কাপড়েরর কল, আরো এসেছে স্টীম-ইঞ্জিন, স্টীমার, ছাপাখানা আর টাকা-ছাপানো কল—কেউ টের পায়নি। তৈমুর লঙ-এর আরবী ঘোড়া আর নাদির শা'র তলোয়ার যা পারেনি তাই করেছে একশো বছরের ইংরেজ রাজত্ব। ওপর-নীচে সমস্ত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

ভেতরে ভেতরে সমাজের ভিত গেছে ধসে। বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ আর চৈতন্য যা পারেননি তাই পেরেছে বাষ্প আর বাষ্পীয় যান।

ঘুম ভেঙে গেছে নিবারণের।

ঘুম ভেঙে গেছে ভুতনাথেরও।

বাইরে কে যেন জোরে কড়া নাড়ছে। ডাকছে—নিবারণ-নিবারণ—ও নিবারণ—

নিবারণ ধড়ফড় করে উঠে দরজা খুলে দিলে।

বললে—কে কদমদা' নাকি?

—হ্যাঁ, শিগগির চল্—দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে—

—কেন? এত রাত্রে?

—হ্যাঁ, স্বামীজী মারা গেছেন—

—স্বামীজী?

—হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ!

কোথা দিয়ে ঘুমের মধ্যে দিয়ে রাতটা কেটে গিয়েছিল মনে নেই ভূতনাথের। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও যেন স্বপ্ন দেখেছে ব্রজরাখালকে। মনটা ছটফট করেছে ব্রজরাখালের কাছে যাবার জন্যে। ব্রজরাখাল এত বড় সংবাদকে কেমন করে সহ্য করবে কে জানে! বাঙলা দেশে এত বড় নীরব ভক্ত আর কে ছিল!

ভোরবেলা কিন্তু আর এক কাণ্ড ঘটলো।

'যুবক সঙ্ঘে'র সদর দরজার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো একটা। ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ।

তারপরেই সুবিনয়বাবুর গলা—কই? এই বাড়িতে নাকি?

শিবনাথ বুঝি ছিল সামনে। বললে—এখন ঘুমোচ্ছেন একটু—তা আপনি ভেতরে আসুন—

সুবিনয়বাবু বললেন—অথচ ক'দিন থেকেই আমি ভাবছিলাম—কি হলো, কি হলো—ভূতনাথবাবু আসে না কেন, ব্রজরাখালবাবুকে জিজ্ঞেস করি—তিনিও বলতে পারেন না—শেষে আজ ভোরবেলা......

হঠাৎ ঘরের মধ্যে উদয় হলেন। সেই কালো চাপকানের ওপর কোণাকুণি পাকানো চাদরটা ফেলা। দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্যের মধ্যেও মুখের উদ্বিগ্নভাব ধরা পড়লো।

ভূতনাথকে জেগে থাকতে দেখে সামনে ঝুঁকে এসে বললেন—কেমন আছো এখন ভূতনাথবাবু?

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—গোরাদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ নেই, কিন্তু আঘাতটা যে মারাত্মক হয়নি এই রক্ষে—সর্ব জীবের যিনি নিয়ন্তা, যিনি

লোক দ্যুলোকের অধিপতি সেই রাকার......

শিবনাথ বললে—আমরা যথাসাধ্য স্ত রকমের যত্ন নিয়েছি—চিকিৎসার নও ত্রুটি হয়নি—

সুবিনয়বাবু বললেন—কিন্তু জবা মা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, আমাকে বলে য়েছে ও জায়গায় ভূতনাথবাবুকে রেখে সা ঠিক হবে না—হয়ত ঠিকমত সেবা চ্ছ না—জবা যে আমার বড় একগুঁয়ে য়ে শিবনাথবাবু—নিজেই আসতে ইছিল, আমি তাকে বারণ করলাম— লাম আমি তাকে নিয়েই আসবো— মি যে জবা মাকে কথা দিয়ে দিয়েছি কেবারে—

শিবনাথ বললে—ব্রজরাখালবাবুর বড় ঠুম—তাঁকে জিজ্ঞেস না করে—

সুবিনয়বাবু বললেন—তিনি যদি াপত্তি করেন, তাই বলছেন শিবনাথবাবু?

শিবনাথ বললে—তাঁকে না জিজ্ঞেস রে নিয়ে যাওয়া কি ভাল হবে?

সুবিনয়বাবু বললেন—তা'ও তো ক হবে না জানি, কিন্তু জবা মাকে মি গিয়ে কি জবাব দেব? বড় এক- য়ে মেয়ে কি না—! কিন্তু ব্রজরাখাল- বুকে একবার এখন খবর দিলে হয় না?

—তিনি তো এখন দক্ষিণেশ্বরে— পারে......

রি দেখা পাওয়া শক্ত—স্বামীজীর

—তা হলে কি হবে শিবনাথবাবু?

এতক্ষণে ভূতনাথ যেন কথা বলবার মতা ফিরে পেল।

বললে—আমি আপনার সঙ্গেই যাবো বিনয়বাবু—

হঠাৎ যেন সুবিনয়বাবু অকূলে কূল পলেন।

বললেন—আমাকে বাঁচালে ভূতনাথ- বু, জবা ভোরবেলা খবরটা পাওয়া শক্ত বড় কাতর হয়ে আছে কি না— দিন থেকেই আমরা ভাবছিলুম, ভূত- াথবাবু গেল সেদিন বাড়ি, আর দেখা- াক্ষাৎ নেই। খবর পাঠালুম ব্রজরাখাল- বুকে—তিনিও নেই, খবর পেলাম, তিনিও নাকি বাইরে গেছেন—

শিবনাথবাবু ধরাধরি করে ভূতনাথকে উঠিয়ে দিয়েছিল সুবিনয়বাবুর গাড়িতে। সারা রাস্তা সুবিনয়বাবু কথা বলেছেন। শিবনাথও সঙ্গে ছিল। 'মোহিনী সিঁদুর' অফিসে এসে পাঠকজী আর শিবনাথ নাবিয়ে দিলে গাড়ি থেকে!

যে ঘরে শোয়ানো হলো সে ঘরটা জবার মা'র ঘর। একেবারে অন্দর-মহলে এনে ওঠানো হলো।

জবা তৈরিই ছিল। বললে—বাবা আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন— ভূতনাথবাবুকে আমি দেখছি—

তারপর হাবার মাকে ডেকে বললে— বৈজুকে বল্ ডাক্তারবাবুকে একবার যেন খবর দেয় আর একটা গামলায় করে খানিকটা গরম জল করে নিয়ে আয় তো তুই—

অনেকখানি পরিশ্রমের পর ভূতনাথ বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কখন দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে টের পায়নি। যখন আবার তন্দ্রা ভাঙলো মনে হলো— কোথায় এসেছে সে। স্মরণ করতে একটু সময় লাগলো। তারপর ভালো করে নজর পড়তেই দেখলে পাশে বিছানার ওপর জবা বসে আছে। মাথায় জল-পটি দিচ্ছে। হঠাৎ এ মূর্তি দেখলে যেন চিনতে পারার কথা নয়। ভূতনাথের একেবারে কাছাকাছি বসে। এতখানি সান্নিধ্যের অবকাশ অবশ্য আগে কখনও মেলেনি। জবার শরীরের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগছে। হাতের স্পর্শে যেন রোমাঞ্চ হয়। ভূতনাথের শরীরের উত্তাপ যেন তাই আরো বেড়ে গেল।

সুবিনয়বাবু একবার ঘরে ঢুকলেন।

কিন্তু কিছু প্রশ্ন করার আগেই জবা বললে—বাবা আপনি আবার কেন এলেন—ডাক্তারবাবু তো বলে গেলেন কোনও ভয় নেই—জ্বরটাও একটু কম— আপনি যান বসুন গিয়ে, আমি যাচ্ছি—

সুবিনয়বাবু বললেন—মাথার ঘা'টা কেমন আছে?

জবা জলপটি দিতে দিতে বললে— ডাক্তারবাবু বললেন আরো কিছুদিন সময় নেবে—শুকোবার মুখ এখন, চুপচাপ কেবল শুইয়ে রাখতে বলেছেন, ঘা'টা ভালোর দিকে গেলেই জ্বরটাও কমে আসবে—

—দেখো মা, ছেলেদের ইচ্ছে ছিল না ভূতনাথবাবুকে এখানে পাঠায়, তোমার জন্যেই নিয়ে এলাম এখানে, যেন বিপদ না হয় দেখো,—

সুবিনয়বাবু চলে গেলেন।

জবা ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এসে আবার বসলো পাশে। ভূতনাথের জ্বরের ঘোরেও মনে হলো জবা যেন তার বড় কাছাকাছি ঘেঁসে বসেছে। জবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন। এ এক নতুন অনুভূতি। এমন করে এত কাছাকাছি যেন কেউ আগে এসে বসেনি। অস্পষ্ট কুয়াশার মত ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে শুধু পিসীমার কথা। অসুখ হলে এমনি করে পিসীমা কাছে এসে বসতো। বড় ভালো লাগতো তখন। কত বায়না করতো ভূতনাথ। অসুখ থেকে সেরে ওঠবার পর পিসীমা ভাত খেতে পারতো না। বিধবা মানুষ। দুপুর বেলা শুধু একবার পাথরের থালাটা নিয়ে বসতো খেতে পিসীমা। কিন্তু টের পেয়েই ভূতনাথ আস্তে আস্তে গিয়ে বসতো পাশে।

পিসীমা বলতো—ও মা, তুই ঘুমোচ্ছিস দেখে দুটো ভাত নিয়ে বসলাম—

ভূতনাথ নিবিষ্টচিত্তে দেখতো পিসীমা কেমন করে ডাল দিয়ে ভাত মাখছে। কেমন করে মুখে তুলছে। ভাতের লোভে সমস্ত শরীরটা যেন লালায়িত হয়ে উঠতো তার।

—পিসীমা, কুলের অম্বল করোনি আজ?

—না বাছা, কুলের অম্বলে আর কাজ নেই, বাড়ির ছেলের অসুখ আর আমি
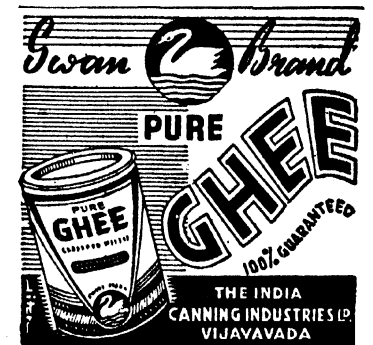
কুলের অম্বল দিয়ে কি না ভাত খাবো, তোর অসুখ ভালো হলে তখন আবার কুলের অম্বল করবো—

—কবে ভাত খাবো পিসীমা?

পিসীমার গলা দিয়ে যেন ভাত নামতো না।

সান্ত্বনা দিয়ে বলতো—অসুখ থেকে উঠে কি কি খাবি বল্ দিকিনি শুনি—

কত লিস্ট তৈরি করতো ভূতনাথ। শুয়ে শুয়ে লিখতো কাগজের ওপর অসুখ সারলে কী কী খাবে সে। কুলের আচার। বড়ি ভাজা। সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি। কত সাধারণ জিনিস সব। কিন্তু অসুখের সময় ভাবতে কি ভালোই যে লাগতো!

কিন্তু সেরে ওঠবার পর আবার যে-কে-সেই।

পিসীমা বলতো—ও কি রে, আর দুটি ভাত নে—

—পেট ভরে গেছে পিসীমা—

—তবে যে বললি আজকে অনেক ভাত খাবি! এই তোর খাওয়া, তুই-ই যদি না খাবি তো কার জন্যে এত সব রান্না—

অসুখের সময় যে মানুষ খাবার জন্যে অত ব্যস্ত, অসুখের পর সে-ই মানুষকেই খাওয়াবার জন্য কী পেড়াপিড়ি! বোধ হয় এমনিই হয় সকলের। এ বাড়িতে এসেও সেই সব কথা মনে পড়ে ভূতনাথের। দিনের বেলা যখন ভূতনাথ জেগে থাকে, কেউ থাকে না ঘরে—চারিদিকে চেয়ে দেখে। ঘরের বাইরেই বসবার হল ঘর। জবা আর সুবিনয়বাবুর গলা শোনা যায়।

জবা মাঝে মাঝে বই পড়ে শোনায় বাবাকে। আধো জাগা আধো তন্দ্রার মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের সুর ভেসে আসে। মনে পড়ে যায় নিবারণের কথা। ছেলেটা যেন স্বপ্ন দেখছে কোন্ দূর স্বর্গের। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন। মনে পড়ে যায় সেই গানটা—'মা গো যায় যেন জীবন চলে, বন্দে মাতরম্ বলে—'। কবে আসবে সেই তিনজন বাঙালী। যতীন বাঁড়ুজ্জে, বারীন ঘোষ আর অরবিন্দ ঘোষ। মনে পড়ে যায় প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড সাহেবের [illegible] বলতে পারে নিবারণ। পুণার বড়লাটের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে র‍্যাণ্ড সাহেব। চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে সে দৃশ্য। আর মনে পড়ে ১৮৯৯ সালের একটা দিন। নিঃশব্দে নাকি একদিন প্রত্যুষে ফাঁসি হয়ে যায় চাপেকার ভাইদের। সেই রক্তের বীজ বাঙলা দেশে এসে বুনেছে ওরা। ওই 'আত্মোন্নতি সমিতি', 'অনুশীলন সমিতি' আর 'যুবক সঙ্ঘের' ছেলেরা।

একা-একা শুয়ে শুয়ে আরো এলোপাতাড়ি কত কি কথা মনে পড়ে।

বড় বাড়ির কথাও মনে পড়ে। ব্রজরাখাল আর তাকে দেখতে আসেনি। কত কাজ ব্রজরাখালের। কখন সে আসবে। কোথায় ফুলবালা দাসীর ভেদবমি, কার অসুখের ওষুধ, আলমবাজারের মঠ, দক্ষিণেশ্বরের আশ্রম, নিজের যোগসাধনা। তারপর আছে চাকরি। তবু যে কেন চাকরি করে ব্রজরাখাল। কাদের জন্যে! বড় বাড়ির ছেলেদের রাত্রে পড়ানো তো সব দিন হয় না। প্লেগের যেবার হিড়িক হলো—কি কাণ্ডটাই না করলো সে কদিন। কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে সেই অমানুষিক সেবা আর অমিত পরিশ্রম। এখনও মনে আছে ভূতনাথের। লম্বা লম্বা ছুঁচের মত ইনজেকসন দিতে আসতো। বড় বাড়ির চাকর-ঝি কেউ বাদ গেল না। কি ব্যথা হয়েছিল হাতে ক'দিন ধরে। রাস্তায় রাস্তায় যাকে দেখতে পায় তাকেই দেয় ছুঁচ ফুটিয়ে। হাত ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। দলে দলে প্লেগের ভয়ে পালাতে শুরু করলো লোক। শেয়ালদা স্টেশনে নাকি ভিড়ের জন্যে টিকিট কাটাই দায়। সারাদিন পরিশ্রমের পর ব্রজরাখাল যখন রাত্রে ফিরতো কি চেহারা তার!

ভূতনাথ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—অফিস যাচ্ছো না ব্রজরাখাল, তোমার চাকরি থাকবে তো—

ব্রজরাখাল বলেছিল—চাকরি বড় না মানুষের প্রাণ বড়—

তারপরে একটু থেমে বলেছিল—আর পারছিনে বড়-কুটুম—এ সাহেব আসে স্যালিউট দাও, ও সাহেব আসে স্যালিউট দাও—একটু স্যালিউট দিতে [illegible] কি চাকরি নাই [illegible] আমিও ঠিক করেছি এক ঠাকুর ছাড় কারুর কাছে মাথা নোয়াব না বড়কুটুম—

বলে ঠাকুরের ছবিটার দিকে চেয়ে চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেছিল।

ভূতনাথ বলেছিল—কিন্তু তবে কেন তোমার ছাই চাকরি করা—

ব্রজরাখাল নিজের মনেই বলেছিল—সাধ করে কি আর চাকরি করি বড় কুটুম—

ভূতনাথও জানতো সে কথা। ক'দিন ব্রজরাখাল বাড়িতে না এলেই লোকের পর লোক এসে হাজির। এ এসে জিজ্ঞেস করে—ব্রজরাখালবাবু আছেন ও এসে জিজ্ঞেস করে—ব্রজরাখালবাবু আছেন? মাসের প্রথম দিকটার দিকে অনেকগুলো লোক হাঁ করে বসে আছে ব্রজরাখালের পথ চেয়ে।

বড়বাড়ির কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় ছোট বৌঠানের কথা। সেই তেতলার ঘরখানার কথা। উঁচু পালঙ্ক কড়িকাঠ থেকে একটা রঙিন মশারি ঝুলছে। দিনের বেলায় চুড়ো করে বাঁধা। এতখানি পুরু গদির ওপর শাঁখের মত সাদা চাদর পাতা। সারা দেয়ালে পটের ছবি। শ্রীকৃষ্ণের পায়স ভক্ষণ। গিরি-গোবর্ধনধারী যশোদা দুলাল। দময়ন্তীর সামনে হংসরূপে নলের আবির্ভাব। ঠোঁটে একটা [illegible] করা চিঠি। মদন ভস্ম। শিবের কপাল ফুঁড়ে ঝাঁটার মতন আগুনের জ্যোতি বেরিয়ে আসছে! পাশের কাচের আলমারীতে পুতুল। বিলিতি মেম-ঘাগরা পরা। গোরাপল্টন—মাথায় টুপি।

চোখ বুঁজলেই সব নিখুঁত মনে পড়ে যায়।

আর মনে পড়ে যায় ছোট বৌঠানের আলতা-পরা পা-জোড়া। টোপাকুলের মত টলটলে আঙুলগুলো। 'মোহিনী সিঁদুরে' কিছু কাজ হয়েছে কি না কে জানে। অনেকদিন তো হয়ে গেল ছোটকর্তা কি আজো সেইরকম নিয়ম করে বিকেলবেলা ল্যাণ্ডোলেট চড়ে বনমালি সরকার লেন পেরিয়ে চলে যায়। কড়ির মত সাদা ঘোড়া দুটো টগবগ করতে করতে কি তেমনি বড়বাড়ির গেট পেরিয়ে ছুটতে শুরু করে!

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

পায়ে হেঁটে চলতে চলতে যখন দেখা যায় কোনও আরোহীকে নিয়ে মোটরগাড়ী ছুটে চলেছে, তখন মনে হয়, কী আরামে আর কত আরামে এরা চলে! কিন্তু গাড়ীর আরোহীরা যে আরও আরামের প্রত্যাশী সেকথা ভাবাই যায় না। এইসব মোটর গাড়ীর আরোহীকে আরও আরাম ও আরও নিরাপদ করার জন্য মোটর কোম্পানী সদাই সচেষ্ট। গাড়ীর ঝাঁকানি

গাইরোসকোপের সাহায্যে মোটরের ঝাঁকানি দুলুনী লক্ষ্য করা হচ্ছে

কিংবা দুলুনীর জন্য যেটুকু আয়াসের ব্যাঘাত হয় সেটুকুও এঁরা বন্ধ করতে চান। গাইরোসকোপ যন্ত্র লাগিয়ে গাড়ীর পরীক্ষা চলে। এই যন্ত্রের সঙ্গে একটি ধাতুর কাঁটা লাগান থাকে, এইটিই নির্দেশক, গাড়ীটি হেললে-দুললে কিংবা একটু বাঁকলেই এই কাঁটার দ্বারা দাগ পড়তে থাকে আর এই দাগ দেখেই বোঝা যায়, গাড়িখানা কতটা নড়ে চড়ে ও ঝাঁকানি দেয়। তারপর গাড়ির এই দোষটুকুও শুধরে দিয়ে আরও উন্নত ধরণের গাড়ি তৈরী হতে থাকে।

*

দেহের ওজন বৃদ্ধিই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। অনেক সময় স্থূলতাই রোগের কারণ হয়। ডাঃ স্যামুয়েল জেলম্যান মোটা লোকেদের সাবধান করে দিয়েছেন, তিনি বলেন, দেহে বেশী মেদ বৃদ্ধি হলে অনেক সময় যকৃতটি জখম হতে দেখা যায় এবং "সিরোসিস অব লিভার" নামে অসুখ হতে পারে। এটি খুব সাংঘাতিক রোগ। ডাঃ জেলম্যানের মতে অনেকদিন ধরে মোটা হওয়াটা ভয়ের কথা নয় বরং হঠাৎ খুব বেশী ওজন বেড়ে যাওয়াটাই ভয়ের কথা। তেইশ বছর বয়স্ক লোক থেকে শুরু করে একাত্তর বছর বয়সের লোক পর্যন্ত যাদের ওজন ২০৬ থেকে ২০৯ পাউণ্ডের মধ্যে এরকম বিশজন লোককে পরীক্ষা করে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছেন যে, মেদবৃদ্ধিই যকৃতের রোগের কারণ। তাঁর এই মতামতের একটি যুক্তিসঙ্গত কারণও ডাঃ শ্যামুয়েল দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের সাধারণত যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন হয় মোটা লোকেদের খাদ্যের পরিমাণ একটু বেশী হয়ে পড়ে এবং ফলে যকৃতের ওপর বেশী চাপ পড়ে।

*

অন্ধকার রাত্রে রাস্তা চলতে চলতে অনেক সময় উল্কাপাত আমাদের চোখে পড়ে। আকাশ থেকে তারাটি খসে পড়তে দেখলেই আমরা বুঝি উল্কাপাত হলো, কিন্তু এর পরিণতি আমরা বিশেষ লক্ষ্য করি না। তারাটি খসে যখন ভূপৃষ্ঠে পড়ে তখন এটি জ্বলে পুড়ে যে অংশটা পড়ে থাকে সে খুব শক্ত একটি পাথরের মত পদার্থ মনে হয়। এটির যে কোনও মূল্য থাকতে পারে একথা আগে কখনও ভাবা যায়নি। বর্তমানে জেনেভার "মিটিওর সোসাইটি" ঘোষণা করেছেন যে, এক পাউণ্ড ওজনের এইরকম উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করে দিতে পারলে চার টাকা মূল্য দেওয়া হবে, তাছাড়া যারা বেশী সংগ্রহ করে দেবেন তাঁদের উপরি পুরস্কারও দেওয়া হবে। এই সমিতির ধারণা ছিল এই ঘোষণার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে উল্কা-পিণ্ড সংগৃহীত হতে পারে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত এক ডজন লোকও উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করতে পারেননি।

*

ভূগোলের পাতায় ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে যখন দেখি যে, আজকের ভূপৃষ্ঠ শত শত বছর আগে অন্যরূপ ছিল, তখন সে রূপ কল্পনা করে উঠতে পারি না। আজ যেখানে জনপদ গড়ে উঠেছে, একদিন হয়তো সে জায়গাটা সমুদ্রের তলদেশে ছিল, একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। বর্তমানে আমরা জানি যে, মণিপুরে শহরটি সমুদ্র-পৃষ্ঠে থেকে ৪৫০০ ফিট উঁচু। এখন শোনা যাচ্ছে যে, এই শহরটি নাকি এক সময় সমুদ্রের তলদেশে ছিল। সম্প্রতি "জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া" মণিপুর থেকে সাতাশ মাইল দূরে ডিমাপুর গ্রামের মাটির তলদেশ থেকে যে সমস্ত প্রস্তরীভূত জীবের সন্ধান পেয়েছেন তার থেকে এঁরা নিঃসন্দেহে বলতে পারেন যে, এ শহর একদিন সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখানে এঁরা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে "কাট্‌ল ফিশ" নামক এক ধরণের জীবের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এই জীবটি প্রায় ৪০ থেকে ৬০ হাজার লক্ষ বছর আগের পুরানো জীব।

একত্রিশ

আপনিই তো উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবেন? জিজ্ঞাসা করলে বিজয়। কিশোরবাবু বললেন—হ্যাঁ। বলেই তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বিজয়ের সভায় লোক ভালই হয়েছে। আরও লোক আসছে। কিশোরবাবু অনেক আগেই এসেছিলেন। তিনি হঠাৎ কি মনে ক'রে বললেন—আমি আসছি বিজয়। দশ মিনিটের মধ্যেই আসব।

মহাদেব সরকার অক্ষয় ঘোষাল থেকে শুরু ক'রে এখানকার জমির মালিকেরা এবং চাষীরা দল বেঁধে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিশোরবাবুই সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির আসনের পিছনে দেওয়ালের গায়ে এবং এদিকে ওদিকে কতকগুলি পোস্টারও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাণীগুলির অধিকাংশই স্বামী বিবেকানন্দের। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার লাইনও আছে। গান্ধীজীর বাণীও রয়েছে। সবগুলিই নির্বাচন ক'রে দিয়েছেন কিশোরবাবু নিজে।

সভাপতির আসনের ঠিক পিছনেই শ্রোতাদের একেবারে চোখের সামনে টাঙানো পোস্টারখানিই সবচেয়ে বড় এবং খুব মোটা হরফে লেখা। ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মহামায়ার চরণে বলিরূপে প্রদত্ত। তোমার সমাজ মহামায়ার ছায়া। ভারতের কল্যাণ তোমার কল্যাণ। মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার ভাই।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকে এটিকে তৈরী করেছেন কিশোরবাবু।

আর একটি পোস্টারও বেশ বড় হরফে লেখা। রবীন্দ্রনাথের দু ছত্র কবিতা।

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে!
দিতে হবে ভাষা এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

বিজয় নিজে একটি পোস্টার তৈরী করেছে। কৃষক মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের আদর্শ। বিজয়ের উদ্ভাবনী শক্তি এর বেশী নয়। কল্পনা বেচারার আদৌ খেলে না।

কিশোরবাবু দেখে শুনে খুঁত খুঁত ক'রে বললেন—বিজয় লেখাগুলি বেশ চমৎকার ক'রে সাজিয়ে লেখাতে পারলে না? ওরা সব কেমন সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে লেখে, দেখেছিস?

সে কথা সত্য। এদিক দিয়ে কপিল দেবের নৈপুণ্য অসাধারণ। বাক্য বা বাণী ওদের নিতান্তই সাদা সহজ সোজা, কিন্তু তাকে যখন তুলিতে কালিতে বিচিত্র ভঙ্গীর হরফে সাজিয়ে দেয় তখন দৃষ্টি তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

বিজয় বললে—নাই বা হল বাঁকা চোরা লেখা। মোটা মোটা অক্ষরে তো লেখা হয়েছে। আর কত তাড়াতাড়ি করতে হ'ল বলুন তো! আপনি বললেন—নইলে ও সব আমার খেয়াল ছিল না।

বিজয় সোজা কথা বলে—সত্য কথা বলে; কিশোরবাবুর কল্পনা অনুযায়ীই এ সবগুলি হয়েছে। কিশোরবাবু গভীর চিন্তা করেছেন এই সভাটিকে সার্থক ক'রে তুলতে। তিনি স্থির করেছেন এই হবে তাঁর জীবনের শেষ কাজ। মিথ্যা কৌশলের পন্থায় কুটীল চক্রান্তের পথে মানুষের হিংসা বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে ভারতবর্ষের মাটিকে রক্তাক্ত করে যারা কল্যাণ সাধনের কল্পনা করে তাদের তিনি বাধা দেবেন। বাধা দেবেন ন্যায়ের পথে ভারতের ধর্মের পথে কল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

রক্তাক্ত সর্বধ্বংসী সংগ্রাম ক'রে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় একদিন কুরুক্ষেত্র হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজ রথের উপর দাঁড়িয়ে অশ্বরজ্জু ধ'রে যে বিরাট-পুরুষ বলেছিলেন, অধর্মের বিনাশের জন্য পুণ্যকে সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। আবারও জন্মগ্রহণ করব। তিনি আবার জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতবর্ষে। কিন্তু সংগ্রামের পথে সে সাধনা করেন নি। করেছেন অহিংসার পথে প্রেমের পথে। এ যেন কুরুক্ষেত্রের ত্রুটি সংশোধন। মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক ও দণ্ডধারী অমিতাভ করুণা প্রসন্ন দৃষ্টি প্রশান্ত পুণ্যমাধুরীময় মুখমণ্ডল নূতন কালে এসে বলে গেলেন—জৈব প্রকৃতি অমোঘ সৃষ্টি, জন্ম এবং মৃত্যু সৃষ্টির আদিম বিধান, মৃত্যু ভয়ে জীব প্রকৃতি সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তন তার নিজের সাধনার পথে। হিংসা থেকে অহিংসার পথে, গোপনতা থেকে প্রকাশ্য পথে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, মিথ্যা থেকে সত্যের পথে। সংগ্রামের বাণী নিয়ে তাই আসি নি এই নব জন্মে। এসেছি শান্তির বাণী নিয়ে অহিংসার মন্ত্র নিয়ে। গ্রহণ কর ভারতবর্ষ। রক্ষা কর তাকে আপনার বক্ষ পঞ্জরের অভ্যন্তরে। পৃথিবী . একদা ক্লান্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে আসবে তোমার কাছে।

কিশোরবাবু বার বার ঘাড় নেড়ে কথার উপর জোর দিয়ে গৌরীকান্তকে বলেছেন তুমি দেখবে, তুমি থাকবে তখন, আমি হয় তো থাকব না। আসবে পৃথিবী তাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবে তার জীবনে আলো জ্বলেছিল; তাঁর বিশ্বাস তাঁর দৃষ্টি আজকের বাস্তববাদীর কাছে অবিশ্বাস্য কিন্তু তাঁর নিজের কাছে সে বিশ্বাস পাহাড়ের মত দৃঢ়, দিবালোকের মত অভ্রান্ত। তিনি বলেছেন—দুটো দুটো মহাযুদ্ধে তোমরা এত আন্তর্জাতিক পরিবর্তন দেখলে আবিষ্কার করলে কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনে তার প্রতিক্রিয়াটা দেখলে না? প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে অহিংসার অভ্যুত্থান দেখনি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই সাধনায় তার পরশাসন থেকে মুক্তি লক্ষ্য করলে না? আমি বলছি গৌরীকান্ত আবার এক মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী আসবে ভারতের কাছে ওই সাধনা ওই মন্ত্র গ্রহণের জন্য। আমি বলছি।

তিনি যেন চোখে দেখতে পেয়েছেন। বলেছিলেন—আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি গৌরীকান্ত! আমি দেখছি! সত্য সত্যই তাঁর ধ্যান দৃষ্টিতে তিনি যেন দেখেছিলেন—বোধিদ্রুম থেকে রাজঘাট পর্যন্ত বিরাট এক মিছিল। ইউরোপ এ্যামেরিকা এশিয়ার সকল দেশের মানুষ চলেছে দলে দলে, প্রতিটি দলের সম্মুখে রয়েছে তাদের দেশের পতাকা তাদের সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন দৃষ্টিতে কাতরতা—অপার তৃষ্ণা; শান্ত বিনম্র পদক্ষেপে তারা চলেছে। মাথার উপরে আকাশ প্রসন্ন নীল। মিছিলের পুরোভাগে বাজছে এক বিচিত্র যন্ত্র সংগীত। তার মধ্যে বাজছে মহাকবির প্রার্থনা সংগীত—

"ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত
বিষম-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক—রক্ত কলুষ গ্লানি
তব মঙ্গল শঙ্খ আনো, তব দক্ষিণ পাণি;
তব শুভ সংগীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে মুক্ত হে হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল করো কলঙ্ক শূন্য।

দরদর ধারায় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

চোখ মুছে তিনি বলেছিলেন—তুমি হয় তো বলবে মিথ্যা—কিন্তু না আমি চোখে দেখছি। তুমি হয় তো মনে মনে আমার চোখের জল দেখে হাসছ।

বাধা দিয়ে গৌরীকান্ত বলেছিল—না—না। হাসব কেন। আমি বিশ্বাস করি কিশোরবাবু। আপনার দেখা আপনার কাছে মিথ্যে নয়। কপিলদেবের কাছে যেমন তার বিপ্লব কল্পনা—বিপ্লবোত্তর দেশের রূপ সত্য। আপনার কাছেও এ সত্যও তেমনি সত্য।

কিশোরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—না। রামকৃষ্ণদেবের সামনে ভবতারিণীর আবির্ভাবের মতই এ সত্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ। আমি দেখতে পাচ্ছি চোখে। শুধু ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বলে তোমাকে আমি দেখাতে পারছি না। যতদূর ভবিষ্যত তাই শুধু বুঝতে পারছি না। তৃতীয় যুদ্ধ না আবার তার পরের যুদ্ধ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। এ তো ভবিতব্য নয় এতো অদৃষ্ট নয় গৌরীকান্ত, এ কর্মের ফল সাধনার পরিণতি। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। অমিতাভ বুদ্ধের যে সাধনা ভারতের আত্মার সাধনা যাকে নষ্ট করেছে বলে বুদ্ধিবাদী ব্রাহ্মণেরা উল্লসিত হয়েছিল—সে সাধনা বেঁচেছিল শূদ্র ভারতের বুকের মধ্যে। বার বার সে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে বীজ অক্ষয়। এ যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মহাত্মার সাধনা আবার সঞ্জীবিত হয়েছে।

কিশোরবাবু আবেগের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসের কথা বলে যান। মহাত্মাজীর তিরোধানকে তিনি বলেন চরম পাপ। তার একটা প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা তিনি করেন। আর আশঙ্কা করেন, রাজনীতির মন্ত্রগুপ্ত নীতিকে; ওকে তিনি বলেন মিথ্যাচার। ওই মিথ্যাচারের পাপে যদি ভারতবর্ষ তৃতীয় মহাযুদ্ধে নিজেকে জড়ায় তবে আবার তাকে কঠোর সাধনা করতে হবে। তবে সে সে সাধনা করবে। বলেন ভারতবর্ষকে আমি যে জানি। ভারতবর্ষের যারা নিরক্ষর যাদের বল পতিত তারা সকলেই অহিংস ধর্মী, বৈষ্ণব। বলতে পার গৌরীকান্ত যারা অসভ্য যারা অশিক্ষিত তারা বৈষ্ণব হল কেমন ক'রে? কেমন ক'রে ছাড়লে তারা হিংসাচার—যে আচারের মধ্যে বর্বরতা পায় চরম স্ফূর্তি! গৌরীকান্ত প্রতিবাদ করে নাই। শুনেই গিয়েছে। অন্তরে অন্তরে বিষণ্ণ হয়েছে। বেদনা বোধ করেছে এই আদর্শবাদী বৃদ্ধের জন্য। গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনেই বলেছে হায়, মানুষের সাধনাই যদি একমাত্র সত্য হ'ত! গোপন অপরিজ্ঞাত অন্তর লোকের মধ্যে বহু সহস্রাব্দের নিপীড়নের ক্ষোভ যদি সত্য না হ'ত! সাপের মূলধন তার দাঁতের বিষ, বিষ গেলে দাও দাঁত ভেঙে দাও—আবার বিষের থলি পূর্ণ হয়, আবার দাঁত গজায়! সাপ সুদীর্ঘকাল বাঁচে, সে জীর্ণ হয়, খোলস ছাড়ে আবার নূতন তেজে গর্জন করে মাথা তুলে ছোবল মারে। হিংসা যে তাই। অমৃতের স্বপ্ন চিরকালই স্বপ্নই থেকে গেল মানুষের ইতিহাসে। সাপের বিষের অমোঘ ওষুদের কথা কল্পনাই ক'রে এল মানুষ। খুঁজে কোনকালেই তো পেলে না।

একথা মুখে সে বলেনি। এমন কি অন্তরের এ চিন্তা মুখের কোন রেখার মধ্যেও ফুটে উঠতে দেয়নি। কিশোরবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন গৌরীকান্ত তাঁর ধ্যান-প্রত্যক্ষ সত্যকে উপলব্ধি করেছে বিশ্বাস করেছে। বলেছিলেন আজ সভাতে আমিই গাইব উদ্বোধন সংগীত।

কিশোরবাবু চিরদিনই সুকণ্ঠ গায়ক। কৈশোরে যৌবনে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বাঁশীর মত। তিনি গান গাইলে মানুষ কাজ ভুলত, কাজ ফেলে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত। আজ আর সে কণ্ঠ নাই, সে দমও নাই গানও বড় একটা করেন না; কিন্তু আজ তিনি সংকল্প করলেন—উদ্বোধন সংগীত তিনিই গাইবেন। মনে মনে গানও ঠিক করে ফেললেন—

রবীন্দ্রনাথের সেই গান এই ভারতের মানবের সাগর তীরে।

ব্রাহ্মণদের বলবেন—ব্রাহ্মণ আজ শুচি মন নিয়ে নেমে এস উচ্চাসন থেকে সমতল ভূমিতে। সবার হাত ধর। পরিত্যাগ কর সকল বিশেষ অধিকার, সকলকে তুমিই নিজ হাতে পরিবেশন কর। আজ দাও—জমির উৎপন্নের অধিক ভাগ দাও কৃষককে। ধরিত্রীকে মা বলে ডাকতে দাও তাদের। ধরিত্রী ধন্যা হোন।

অর্থাৎ ভাববাদী একটি বৃদ্ধের উথলে ওঠা হৃদয়াবেগ আজ শতধারে ছড়িয়ে পড়তে চায়। বিবেচনা করছেন না চারিদিকের যে ভূমিতে সে শতধারা বর্ষিত হবে—সে ভূমি মরুভূমি কি না!

* * *

কিশোরবাবু সভাস্থল থেকে বেরিয়ে এলেন—তার কারণ তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে যে আজ বিকেলের গাড়ীতে শান্তি এবং দেবকীদেবী ফিরে আসছেন কলকাতা থেকে। প্রায় মাস দুয়েক পর তারা ফিরছে। হঠাৎ একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মা ও মেয়েতে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। কি প্রয়োজন তা প্রকাশ করতে অনিচ্ছা দেখে কিশোরবাবু আর কোন প্রশ্ন করেন নি। গিয়ে অবধি কোন পত্রও দেয়নি। আজ হঠাৎ একখানা পত্র পেয়েছেন যে, তাঁরা আজই বিকেলে ফিরবেন। গৌরীকান্তকেও কোন পত্র দেয়নি। তাকেও কোন কথা বলে যায়নি। এই মাস দুয়েকের মধ্যে এখানকার ঘটনাবর্তও এমন দ্রুততর বেগে জটিল হয়ে উঠেছে যে, এ নিয়ে ভাবতেও কিশোরবাবু সময় পান নি। তবুও একদিন কি দুদিন গৌরীকান্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—গৌরী, শান্তিদের কোন খবর পাওনি?

গৌরীকান্ত বলেছিল—না তো!

কিশোরবাবু বলেছিলেন—কিছু বলেও গেল না, কোন খবরও দিলে না। কি হ'ল তা তো বুঝতে পারছি না।

গৌরীকান্ত বলেছিল—মিথ্যে ভাবছেন। শান্তির মত মেয়ে নন্দলালবাবুর হাতে গড়া সে। তার জন্যে ভেবে কি করবেন? পৃথিবীর সকল দুর্যোগের মধ্যেই সে আত্মরক্ষা করতে পারে।

—জিনিসপত্রগুলো আমার ঘরে রেখে গেল। তার জন্যে যে ভাবতে হয়। বাড়িতে একা মানুষ, কোথায় কখন চাবী ফেলি খুঁজে বেড়াই পাগলের মত। তার উপর হয়েছে কি জান—আমার পোষ্যগুলি নিরীহ নয়। কিছু গেলে করব কি?

গৌরীকান্ত হেসে বলেছিল—এইবার কিন্তু নিজের সঙ্গেও ছলনা করলেন সেই সঙ্গে আবার আমাকেও ছলনা ক'রে ভুলাতে চাইলেন। জিনিসের জন্যে আপনি ভাবেন নি। আপনার ভাবনা ঋষি ভরতের মৃগশিশুর ভাবনার মত নেহাত ক'রে শান্তিদের জন্যেই ভাবনা। আর একদিন কথা উঠেছিল সেই খাতাখানি নিয়ে। যে খাতাখানির অর্ধেকের উপর লিখেছিলেন শান্তির বাবা সন্তোষবাবু এবং কিছুটা লিখেছিলেন কিশোরবাবু। যে খাতাখানি তিনি গৌরীকান্তের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একদিন ওই খাতাখানা চেয়েছিলেন। গৌরীকান্ত বলেছিল সেখানা শান্তির কাছে আছে। সে পড়তে নিয়েছিল ফেরত দেয়নি। সেই প্রসঙ্গেই কথাটা উঠেছিল।

সেদিন গৌরীকান্ত বলেছিল—একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।

—কি বল তো?

—আপনাকে বলেছিলাম একদিন—শান্তির প্রিয়জন সম্পর্কে একটা কথা আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ আছে। দেবকী দিদিও কথাটায় একটু ঘুরিয়ে সায় দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। ছেলেটি নন্দলালবাবুর শেষ জীবনের শিষ্য। খুব কর্মঠ ছেলে।

—হ্যাঁ। সে পাকিস্তানে ডিটেনশনে রয়েছে জেলে। তার কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল। কোন একজন কপিলদেবদের দলের ছেলে পাকিস্তান থেকে চিঠিখানা নিয়ে এসেছিল। আমাকে কথাটা বলেছিল শান্তি। তারপরই কলকাতা চলে গেছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সেই চিঠির সঙ্গে ওর যাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে কি না? তবে অনুমান হয় আছে।

এ ছাড়া আর কোন কথা শান্তিদের সম্পর্কে হয়েছে বলে মনে পড়ে না কিশোরবাবুর। আজ পত্র পেয়ে বাড়িতে তাঁর পোষ্য যাঁরা আছেন, ভাইপো ভাইঝি তাঁদের বলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—ওরা আসবে, এখানেই থাকবেন এখন দু চার দিন। যে ঘরে ও'দের জিনিস আছে সেইখানাতেই থাকবেন।

কিন্তু চাবী দিতে ভরসা করেন নি। তারপর সারাদিনের উত্তেজনার মধ্যে কথাটা মনেও ছিল না। হঠাৎ সভায় গানের কথায় শান্তির কথা মনে পড়ে গিয়েছে। শান্তির কাছেই তিনি এ গান শুনেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে কিশোরবাবু খুব পারঙ্গম নন। এবং সত্য কথা বলতে ওদিকে তাঁর খুব রুচিও ছিল না। মধ্য যুগের গানগুলির উপরই তাঁর ঝোঁক ছিল। যৌবনকালে গানের দিক দিয়ে তিনি লালচাঁদ বড়ালের ভক্ত ছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনে শুনে সে সব গান শিখেছিলেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্র সঙ্গীত যখন দেশে প্রচারিত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠল তখন তাঁর গানের গলা ধরে এসেছে, দম ফুরিয়ে এসেছে এবং রুচি গিয়ে পড়েছে একেবারে ধর্মজীবনের উপর। এরই মধ্যে শান্তি এসে তাকে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ প্রার্থনা সঙ্গীতগুলি শোনালে। মনে আছে—প্রথম দিনই যখন শান্তি তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিল—

"ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।"

* * * *

এই যে হিয়া থরো থরো কাঁপে আজি
এমন তরো
এই বেদনা ক্ষমা করো ক্ষমা করো প্রভু॥"

শুনতে শুনতে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিলেন। মনে হয়েছিল এ যেন তাঁরই হৃদয়ের কথা তাঁরই প্রাণের সুর।

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু!

তিনি চোখ মুছে প্রসন্ন হাসি হেসে বলেছিলেন—শান্তি মা, তুমি আজ মহাকবির বাণী সুর কণ্ঠে বহন করে নিয়ে এসে আমাকে অভয় দিয়ে গেলে। আজ অভয় পেলাম আশ্বাস পেলাম নিশ্চিন্ত হলাম।

শান্তি প্রশ্ন করেছিল—ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।

কিশোরবাবু বলেছিলেন—এই যে নূতন কাল এসেছে যে কালে মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা থেমে গেল, দেবতা পুতুল

হয়ে উঠল, যে কালে বাইরের কলরবে ভগবান বিসর্জনের তাণ্ডব চীৎকার আকাশ স্পর্শ করলে, সেই কালে মহাকবির তপস্যায় গানে সুরে সঙ্গীতের মহামন্ত্রে মানুষের অন্তরে অন্তরে গড়ে উঠল তাঁর পাদপীঠ। কোন আয়োজনের ত্রুটি নেই: ভগবান এবার অন্তরলোকে জাগ্রত হবেন। এ কোলাহল থেমে যাবে। আমি নিশ্চিত জানি থেমে যাবে। আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম মা। আজ অভয় পেলাম!

তারপর আর শান্তিকে অনুরোধ করতে হয়নি। সে নিজে থেকেই তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিল—

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবার দাও শকতি।

কিশোরবাবু শান্তির তরুণ কণ্ঠের সঙ্গে নিজের বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলেন। একে একে অনেক গানের সুর তিনি শান্তির কাছেই শিখেছেন। আজ তাই গানের কথায় চকিতে মনে পড়ে গেল শান্তি তো আজ ফিরছে! তাকে নিয়ে আসবেন।

সঙ্গীত ব্রহ্ম!

এ সভা মহতী সভা। এমন মহতী সভা কালে কালান্তরে হয়। মনে পড়ছে এমনি সভা হয়েছিল উনিশ শো পাঁচ সালে।

নবগ্রামের সে সভায় তিনি একটা গান গেয়েছিলেন।

সে গান বঙ্কিমের বন্দেমাতরম মন্ত্র সঙ্গীত।

মন্দেমাতরম

সুজলাং সুফলাং—মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম! (ক্রমশঃ)

আন্তর্জাতিক আলোক-চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীবিমল ঘোষ

আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফী—বর্তমান পৃথিবীর এক বিস্ময়কর অবদান যে তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের আনন্দ-বিধানে, মানুষের আরোগ্য-নিদানে, মানুষের সন্দেহ-অপনোদনে এই আলোক-চিত্র আমাদের আজ নানাদিক থেকে নানাভাবে সাহায্য করছে। একদিক থেকে এটিকে আমরা বিজ্ঞানের অবদান বলেই জেনেছি; কিন্তু অন্যদিকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর অবদান আলোক-চিত্র যে কী ভাবে শিল্প-অবদানরূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে—আপন বৈচিত্র্যে শিল্পলোকের নূতন দুয়ার উম্ঘাটিত করে চলেছে—সে খবর আমরা খুব অল্প লোকেই রাখি। এই আলোক-চিত্র সৃষ্টির কাজটির মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের কী অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো যে সম্ভব তা আমরা সাধারণ লোকে ততখানি ভাববার বা বোঝবার চেষ্টা না করলেও আমাদের সকলের অগোচরেই সারা পৃথিবীর নূতন একদল স্রষ্টার চেষ্টাতেই প্রমাণিত হতে চলেছে। আলোক-চিত্র সৃষ্টিকৌশল ও যন্ত্রের আয়ত্তের সীমা লঙ্ঘন করে শিল্পোৎকর্ষের চরম যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছে যে তাতে আর সন্দেহ নেই। বহু দক্ষ আলোক-চিত্রী শিল্পী ও বিজ্ঞানী এই দুইয়ের সাধন-ক্ষেত্রে দুরূহতাকে আয়ত্তে এনেছেন যে তেমন পরিচয়ও আজ পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই আলোক-চিত্রীর সাধনায় শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এক নূতন আনন্দ ও রসলোকের আবির্ভাব ঘটছে। আলোক-চিত্র আজ আর শুধু প্রতিচ্ছবি নয়—ছবিও বটে। একথাগুলি যে কত বড় সত্য তা বুঝতে পারা যাবে, কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোক-চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত হলেই। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে এমন একাধিক চিত্র রয়েছে—যেগুলি দেখা মাত্র এই ভ্রম অপসারিত হয় যে, আলোক-চিত্র প্রতিচ্ছবি মাত্র। চোখের অগোচরে ছন্দ ও সুরের যে রূপ কেবলমাত্র শিল্পী-মানসেই প্রতিফলিত হয়ে তুলির লিখনে রূপ পেতো, সেই সূক্ষ্ম রূপরেখাকেও আলোক-চিত্রী ধরেছেন যন্ত্রের মাধ্যমে এমনই নিপুণ হাতে যা দেখে প্রদর্শনী সভাপতি বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিটি কথাই অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন—"চিত্র-শিল্পীর হাতের মধ্যে থাকে, রং আর রূপের অবাধ স্বাধীনতা তাই সে নিজের কল্পনাকে সার্থক করবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে যথেচ্ছ। কিন্তু আলোক-চিত্রীর মনের কথা প্রকাশ করা অত সহজ নয়। একটি যন্ত্রের মধ্যস্থতাকে অতিক্রম করে তবে না তার রূপশিল্প রচিত হচ্ছে। সার্থক আলোক-চিত্রীকে বিনাদ্বিধায় একাধারে যন্ত্রী এবং শিল্পী বলা যায়।"

আলোক-চিত্র সাধনার ক্ষেত্রে পৃথিবী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ সাধকদের সৃষ্ট সেই আনন্দলোক ও রসলোকের রসাস্বাদের সুযোগ দিয়েছেন—ফটোগ্রাফিক এসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গল। এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বে ভারতের বিশিষ্ট আলোক-চিত্রীদের চিত্র সংগ্রহ করে এনে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সেইগুলি সকলকে দেখাবার ব্যবস্থা করে আলোক-চিত্র ও আলোক-চিত্রীদের সৃষ্টিক্ষমতার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন, আর সেই প্রচেষ্টার নিষ্ঠাতে তাঁরাই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে আন্তর্জাতিক আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবার মর্যাদা অর্জন করেছেন।

প্রথমবারের প্রচেষ্টা হলেও এই প্রদর্শনীতে তাঁরা পৃথিবীর ছোট বড় ৩৪টি দেশের সহযোগিতা পেয়েছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে ৩৩৫ জন আলোক-চিত্রী মোট ১০৩১খানি ছবি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার ভিতর থেকে বেছে নিয়ে ১২৪ জন আলোক-চিত্রীর তেমন ২১৫খানি আলোক-চিত্র এই প্রদর্শনীতে সাজানো হয়েছে, যেগুলি দেখে মন এমনই মেতে ওঠে যে, একটি থেকে অপরটিকে পৃথক্ করে যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে; কারণ সত্যই এর আগে এতগুলি অসাধারণ আলোক-চিত্রের সমাবেশ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাই এই মাত্র ২১৫খানি ছবি দেখতেই লেগেছে আমার প্রায় তিন ঘণ্টা।

ককেট (৭৭) শার্লি হল (আমেরিকা)

তাওস গ্রাম (২৬) আর্ল ব্রাউন (আমেরিকা)

...র তাতেও মনে হয়েছে, কিছুই দেখা ...লো না। কারণ বিষয়-নির্বাচন, ...ত্তিগক, শিল্প নিপুণতা, রাসায়নিক ...নপুণ্য, রূপ ও রসের সূক্ষ্ম প্রক্ষেপনার ...মন্বয়ে এক বিরাট বিস্ময় ও অপার ...নান্দলোক রচিত হয়েছে—১নং চৌরংগী ...রাসের নীচের তলায় তিনটি ঘরে। ...ত্যেটি চিত্রই যেন তার আপন বৈশিষ্ট্যে ...পিপাসু মনকে সাদর আহ্বানে ডেকে ...চ্ছে কাছে, মৌন মূক ভাষায় পরিচিত ...রে যে যার আপন আপন স্রষ্টা আলোক-...চীকে। এই অনুভূতি থেকেই অকপটে ...লা চলে—প্রথম প্রচেষ্টা হলেও—আলেখ্য-...জির নির্বাচনে প্রদর্শনীর বিচারক ও ...রিবেশকরা যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় ...য়েছেন।

প্রদর্শনী গৃহের ডানদিককার ঘরে ...বেই প্রথমেই যে ছবিটি আকৃষ্ট করে—...টি বোরিস দোরোর তোলা "Bird of ... omen" (51) ছবিটি। এই ...বিটির বিষয়বস্তু একটি অদ্ভুত-বেশী ...গ-তাড়ুয়ার (Scare-crow'র) কাঁধে এসে ...সেছে একটি শকুন। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ ...গতাড়ুয়াটিকে ছবির বিচিত্র এক কোণ থেকে এমনই এক ভঙ্গীতে ধরা হয়েছে ক্যামেরারা চোখে—যে তার বেদনা ও দুর্ভাবনা মূর্ত হয়েছে মাত্র ভঙ্গী-টুকুতেই। তাছাড়া ছবিটির সমগ্র রচনাই অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এর পরেই চোখে পড়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিকার আলোক-চিত্রী ইউসুফ কার্শের তোলা—'উইনস্টন চার্চিল'এর প্রতিকৃতি, কারণ 'কার্শ'এর নাম আমরা জেনেছি, এদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর মুদ্রিত ছবিগুলি দেখে; কিন্তু মুদ্রিত ছবি আর তাঁর তোলা মূল চিত্র দেখা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কতখানি, তা বুঝতে পারলাম যখন একে একে দেখলাম—প্রতিকৃতিতে তিনি ধরেছেন—চার্চিলের দৃঢ়তা, বার্ণাড শ'য়ের ব্যক্তিত্ব আইনস্টাইনের হাতের দৃঢ়মুষ্টির অংগুলিতে সংকল্পের ঔজ্জ্বল্য—মাথার চুলের অবিন্যস্ততায় পার্থিব জীবনের প্রতি উদাসীনতা, জওহরলালের চিন্তা-কুলতা। কার্শ-এর ছবি মাত্রেই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হওয়া সত্ত্বেও তাই ছবির পর্যায়ে পড়ে। তাঁর ছবি তোলার এত খ্যাতি এইজন্যই যে, তিনি মানুষের নিখুঁত প্রতিচ্ছবির সংগে মানুষটির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকেও ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

এর পরে চোখ গিয়ে পড়ে চেকো-শ্লোভাকিয়ার 'এডলফ্ রোস্সি'র Dancing Faires (154) ছবিটিতে। আলোক-চিত্রে নৃত্যরতা ব্যালের ব্যক্তিরূপকে আড়াল করে কেবলমাত্র দৃশ্য ও গতিকে তুলির টানের মতোই সাবলীল করে যে ক্যামেরায় এভাবে ধরা যায়, তা এটি না দেখলে কোনও দিনই ভাবতে পারা যায় না। শুধু কি তাই 'পেন্টিং' বলে ভুল হয়, আলোকচিত্রের তেমনি কয়েকটি নিদর্শনও দেখা গেল। তার মধ্যে আমেরিকার শার্লি হলের তোলা Cocquette (77) ছবিটি উল্লেখযোগ্য। সত্যই এমন সব আলোক-চিত্র যদি শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে গণ্য না হয়—তাহলে কি বলবো?

১৫৪নং ছবিটির কাছেই রয়েছে ঘর-মুখো একপাল বলদের ছবি। দিনের শেষে ধুলো উড়িয়ে ঘরে ফেরার যে ব্যাকুলতা ও আবেগ জীবজগতেও রয়েছে—তারই ছবি রয়েছে ব্রেজিলের ফ্রান্সিসকো অ্যাজ্-ম্যানের তোলা 'Bojs' (4) চিত্রটিতে। বলদ গুলির শৃংগের সমান্তরালতার মত

প্রতিটি বলদের আকুলতাও সমান—এটিই যেন ব্যক্ত হয়েছে ছবিটিতে। এই ছবিটি প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। আরও একটু এগিয়ে চোখ নামাতেই চোখে পড়লো—আমার ভারতের জীবনদর্শনের এক অপূর্ব প্রতিচ্ছবি। মুণ্ডিতমস্তক দুটি সন্ন্যাসী পথে চলেছে—কিন্তু কোন পথে? তার ইঙ্গিত রয়েছে দূরে কুহেলিকার আবরণে আর এক সন্ন্যাসীর ছায়ামূর্তিতে। গুরুর অনুসরণে সংসার অরণ্য ত্যাগের পথনির্দেশ। ছবিটির নাম Jain Monks of India (99)—সত্যই রঙ ও তুলি দিয়ে আঁকার অভিনব এমন বিষয়বস্তুকে রূপ দিয়েছেন ভারতের স্বনামধন্য আলোক-চিত্রী ডাঃ কে এল কোঠারী।

চরিত্র-চিত্রণ ছাড়াও মানুষের মুখের ভাবরূপের রূপায়ণে আলোক-চিত্র যে কতখানি সক্ষম হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় যুগোশ্লাভিয়ার মার্জান ফাইফারের তোলা Actor (147) ছবিটিতে। অভিনেতার ভাবমুহূর্তকে ধরে রাখার নৈপুণ্য ও ভাবটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেভাবে ছবিটি প্রিন্ট করা হয়েছে তাতে সত্যই ছবিটিকে প্রথম শ্রেণীর শিল্প পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়। এমনই রাসায়নিক নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষতায় আলোক-চিত্র মৌলিক চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে হংকং-এর ইউ-ইউং-চিয়ুংয়ের তোলা "Fairy Gold" ছবিটিতে। দু'টি লাল মাছের ছবিতে যেভাবে High-key Print-এর নিপুণতা দেখানো হয়েছে, তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না।

নানা জিনিস ও পুতুল প্রভৃতি টেবিলে সাজিয়ে তোলা ছবি—অর্থাৎ যে ধরণের ছবিকে বলা হয় Table-top-photography তারও নিপুণ নিদর্শন দেখা গেলো—ফ্রান্সের "পিয়ারে রুসেল-এর তোলা তিনটি ছবিতে। তিনটি ছবির মধ্যে দু'টির রচনা ও বিন্যাস বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক, কিন্তু "Nordique" (158) নামে ছবিটিতে একটি সত্যিকারের মাছকে খুব ছোট ছোট পুতুলরা করাত দিয়ে কাটছে—এমনটি দেখানো হয়েছে। ফলে কিম্ভূত বা Queer subject সৃষ্টি করে ছবিখানির বৈচিত্র্য পরিবেশিত হয়েছে। আমেরিকার শিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত আলোক-চিত্রী অরে বোদাইন-এর তোলা 'রাত্রের বাল্টিমোর বন্দর' (13) ছবিখানি সত্যিই এক অপূর্ব সৃষ্টি। রাত্রের আলোর স্নিগ্ধতাটুকু যেন ছবিটির কেন্দ্র-বস্তু ধাতুময় জাহাজখানিকেও জ্যোৎস্না-সুষমায় রূপান্তরিত করে তুলেছে। এই কোমল স্নিগ্ধতাকে ফুটিয়ে তুলতে ছবিটির বেষ্টনী হিসাবে আর একখানি জাহাজের প্রান্তদেশ ও সেটির নোঙর-রজ্জুর কালো Sillhoutte ব্যবহার করা হয়েছে। এর পরেই রাত্রে তোলা ছবি হিসাবে এইচ টি কিং-এর তোলা "চন্দ্রালোকে ডাল হ্রদ" ((103) ছবিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইখানি ছবিই এবারকার প্রদর্শনীর সবসেরা আটটি ছবির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

জীবজন্তুর আলোক-চিত্র গ্রহণের বিশেষ দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় আছে এমন ছবি প্রদর্শনীতে খুব বেশী স্থান না পেলেও যে কয়েকটি বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সুনির্বাচিত হয়েছে। আমেরিকার শিল্পী 'জ্যাক রাইট'-এর তোলা—The kiss ছবিটিতে মা ও বাচ্ছা ককার স্প্যানিয়েলের আদর সোহাগের যে রূপ ফুটে উঠেছে তা দেখলে—কুকুরের কথা ভুলে মাতৃস্নেহের মধুর স্মৃতি মনের পটে জেগে ওঠে। এইখানেই ছবিটির বিশেষ কৃতিত্ব।

আলোক-চিত্রের মূল বস্তুই হলো আলো ও ছায়া, কিন্তু সেই আলো ও ছায়াকে, কেবলমাত্র ছবির আঙ্গিক হিসাবে ব্যবহার না করে যখন ছবি বিষয়বস্তু করে তোলা হয়, তখন আলোক চিত্রীর কৃতিত্ব বাড়ে অনেকখানি এ-কৃতিত্বের পরিচায়ক কয়েকটি উন্নত ধরণের ছবি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে তার মধ্যে পর্তুগালের "সাঁতে[illegible] আন্তোনিয়" দ্য-অলমিদা"র তোলা "[illegible] Bons Amigos" (42) ও ডাঃ কোঠারী তোলা "Difficult task" (100) আল ব্রাউনের Taos Village (26) ছবি কয়খানিই সত্যিই দেখবার মত। আলোর দীপ্তরেখার পাশে পাশে ছায়ার মসীপা[illegible] প্রেক্ষণের বিচিত্রতা উপলব্ধি করে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

আলোক-চিত্রের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক উৎকর্ষের দিকটিও কিভাবে কতখানি উন্নত হয়েছে, তার পরিচয় আছে একাধিক ছবির কাগজ, প্রিন্ট ও প্রোসেসিংয়ের বৈচিত্র্যে। সে সব কথা খুঁটিয়ে বলতে গেলে ফটো-বিজ্ঞানের বহু বৈজ্ঞানিক দিক আলোচনা করতে হবে এবং সেগুলি সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হবে না বলেই ঐ প্রসঙ্গটিকে বাদ রাখলাম। তবে এই প্রদর্শনীতে Paper Negative-এর সাহায্যে তোলা ছবির যে উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে, সেদিকে রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না। এ বিষয়ে অষ্ট্রিয়ার আলোক-চিত্রী লিওপোল্ড ফিশারের তোলা "Stille Winkel" (59) ও "Improvisation

"বোইস্" (৪) ফ্রান্সিস্‌কো এ্যাজম্যান (ব্রেজিল)

এবং ব্রেজিলের পিটার ওয়াডেলের তোলা "Rodas" (200) এই তিনখানি ছবি দেখবার মতো। এগুলি যে ফটোগ্রাফ মন তা মেনে নিতে চায় না। অথচ বাস্তবিকই তাই।

দৃশ্যপট বা ল্যান্ডস্কেপই হলো আলোক-চিত্রের সাধারণ বিষয়। ক্যামেরা হাতে পেলে প্রথমেই সবাই এই ধরণের ছবি তুলতে আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। কারণ সবাই মনে করেন, ওটাই সোজা পথ। কিন্তু এই সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোক-চিত্রী যে কী অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন, তা এই প্রদর্শনীর কয়েকটি দৃশ্য-চিত্র দেখলেই বোঝা যায়। আমেরিকার কার্ল ওবার্টের তোলা "Three Brothers" (135) ও "Rancheros Vistadores" (133) আমার খুব ভালো লেগেছে। "Three Brothers" ছবিটিতে সমুদ্র তটে নিম্ন-বনানী-শ্রেণীর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। উপরে মেঘ এসে যেন এই গাছ তিনটির মাথায় ঠেকছে—নীচে সমুদ্রের ঢেউ এদের পাদদেশ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বনানীর সংসারে তিনটি ভাই—তিনটি গাছ। বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় আলোক-চিত্রী জে এন উনওয়ালার "Family Group" (196) এই পর্যায়ের একখানি উল্লেখযোগ্য ছবি। এখন আলোচনা করা যাক প্রদর্শনীতে নির্বাচনের মর্যাদায় কোন্ দেশ কিভাবে স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে ক্যানাডার আলোক-চিত্রীদের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী—কারণ ক্যানাডার মোট তিনজন আলোক-চিত্রী ১২খানি ছবি পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে ১১খানি ছবিই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এর পরে হলো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—আমেরিকা থেকে ১৯জন আলোক-চিত্রী মোট ৭৬খানি ছবি পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে ১৭ জনের ৪৩ খানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ফ্রান্স থেকে পাঁচজন শিল্পী ২০টি ছবি পাঠান—তার মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে ৮ খানি। এর পরে স্থান হলো পর্তুগালের—সেখান থেকে ৪ জন আলোক-চিত্রী মোট ১৬খানি ছবি পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে ৮খানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে সবসেরা ছবি হিসাবে যে আটটি ছবি বাছাই করা হয়েছে, তার মধ্যে ক্যানাডার হ্যারি ওয়াডল ও ইউসুফ কার্শ ২ জন এবং ব্রেজিলের অ্যাজম্যান, আমেরিকার বোদাইন, জার্মানীর লুড্‌ভিগ্ সুস্টার, যুগোশ্লাভিয়ার গ্রীচ্‌ভীক্, ভারতের এইচ কিং ও হংকংএর ইউ ইউং চিয়ং-এর শিল্প-সৃষ্টি সম্মানের স্থান পেয়েছে—শিল্পীরাও লাভ করেছেন সম্মান-প্রতীক।

অবশেষে আমার বক্তব্য হলো এই যে, আন্তর্জাতিক আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর চিত্র-সম্ভারগুলি যে দরের চিত্র, সে তুলনায় তাদের এ প্রদর্শনীর স্থান হওয়া উচিত ছিল যাদুঘরের বারান্দায়। সেটি না হওয়ার ফলে এমন একটি আন্ত-র্জাতিক প্রদর্শনীতে যে পরিমাণ দর্শক-সমাগম হওয়া উচিত তেমনটি যে হচ্ছে না তা স্বচক্ষেই দেখে এলাম। যাই হোক, শিল্প-রসিকজন একটু কষ্ট স্বীকার করে ক্যালকাটা ক্লাবের পিছনে ১নং চৌরঙ্গী টেরেসের এই প্রদর্শনীটি দেখতে গেলে প্রচুর আনন্দ পাবেন যে একথা জোর করেই বলতে পারি। এই চিত্র-প্রদর্শনীতে বাঙলার ফটোগ্রাফীক এসো-সিয়েশন চিত্র সংগ্রহ ও চিত্র নির্বাচনে সুরুচি, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন যে তার প্রথম প্রমাণ হলো ভারতবর্ষের ৬৩ জন আলোক-চিত্রীর পাঠানো ২২৬খানি চিত্রের মধ্যে মাত্র ৬ জনের তেমন ৯খানি চিত্রই তাঁরা নির্বাচিত করেছেন, যেগুলি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে আন্তর্জাতিক অন্যান্য চিত্রগুলির সমকক্ষ হতে পারে। সত্য কথা বলতে কি ভারতের আলোক-চিত্রীদের মধ্যে আলোক-চিত্র চর্চা এখনও আন্তর্জাতিক আলোক-চিত্র সাধনার সেই পর্যায়ে পৌঁছয় নি, যেখানে আলোক-চিত্র প্রতিচ্ছবির সীমা অতিক্রম করে ছবি হয়ে ওঠে। এর কারণ এদেশের আলোক-চিত্রীদের সৃষ্টি ক্ষমতার দীনতা যে একথা বলছি না। তবে তাঁদের আলোক-চিত্র সাধনার বহু অন্তরায় এখনও রয়েছে আমাদের দেশে। প্রথমত ফটোগ্রাফীর যন্ত্রপাতি ও মালমশলার দাম এদেশে অত্যন্ত বেশী, দ্বিতীয়ত এদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া ফটোগ্রাফীর বিশেষ অনুকূল নয়। তাছাড়া অন্যান্য দেশে আলোক-চিত্র গ্রহণ ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে যে ধরণের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক ল্যাবরে-টরী গড়ে উঠেছে, আমাদের দেশে সে ধরণের কিছুই নেই। এই সমস্যাগুলির সমাধান হলে তখন এদেশের আলোক-চিত্রী ও আলোক-চিত্রও শিল্পী ও শিল্পের মর্যাদা লাভ করবে।

ফরমাশী বৃষ্টি

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘের দিকে তাকিয়ে পুরাকালে কালিদাস রচনা করেছেন 'মেঘদূত', শেলি লিখে গেছেন তাঁর অমর কবিতা—আর কালিদাস বা শেলির দৃষ্টি যাদের ছিল না—সেইরকম হাজার হাজার লোক, সেই মেঘেরই দিকে তাকিয়ে বার বার ভেবেছে—কেমন হবে তাদের সারা বছরের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিজ্ঞানসম্মত কথা বলেছেন তাঁর গানে—"মাটির বুকের মাঝে, বন্দী যে জল লুকিয়ে থাকে, মাটি পায় না তাকে—"। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা যে কথা ভাবছেন সেও অনেকটা এই রকম। মাটি বা সমুদ্রের বুক থেকে যে জল গিয়ে মিশছে আকাশের মেঘে—কেন তা বিফল হবে? কেন তাকে দিয়ে ঘোচানো যাবে না পৃথিবীর শ্যামলিমার দৈন্য।

পুরাকাল হতে দেখা গেছে, বার বার ভগবানের ক্ষমতা অধিকার করতে চেয়েছে মানুষ। একদিন ছিল যখন বন্যা-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ দেবতার করুণা-ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোনও উপায় জানত না। আজ তার অবস্থা এত অসহায় নয় এবং সে এদিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। যে বরুণদেব এতদিন সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন—ইচ্ছামত বৃষ্টি-পাতের সাধনাকে সামনে রেখে আধুনিক বিজ্ঞানীরা শুরু করেছেন তাঁরই বিরুদ্ধে অভিযান এবং দাবী করেছেন যে, অনেক-দূর অগ্রসর হয়েছেন।

বিজ্ঞানে বৃষ্টির কারণ মোটামুটি এইরকমঃ—ভূপৃষ্ঠ থেকে জল বাষ্পাকারে শূন্যে উঠে যায় এবং সাধারণত অপেক্ষা-কৃত ঠান্ডা হলে ছোট ছোট জলকণা হয়ে শূন্যে থাকে। কোনও কারণে এইসব জল-কণা আরও শীতল হতে থাকলে—আয়তনে ও ওজনে বর্ধিত হয় এবং একটা নির্দিষ্ট আয়তন ও ওজন পার হলেই বৃষ্টি হিসেবে আবার ভূপৃষ্ঠে পড়ে। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত করতে গেলে মেঘকে ঠান্ডা করতে হবে। এই ঠান্ডা করাতেই আসল ব্যাপার, কারণ এইখানেই সমস্যা, এইখানেই সমাধান।

মোটামুটি দুটি উপায়ে মেঘের এই অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাসের চেষ্টা হচ্ছে। 'শুকনো বরফ' বা 'ড্রাই আইস' বলে এক-রকম পদার্থ আছে। জিনিসটা জমান, কঠিন (solid) কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং এর তাপমাত্রা, শূন্য ডিগ্রীর—অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় জল বরফ হয়ে যায় তার চেয়েও ৮০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম। এরোপ্লেন থেকে এই শুকনো-বরফ আকাশে মেঘের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এর সংস্পর্শে এলে জলকণাগুলি, আকার ও ওজনের যে সীমারেখার কথা আগে বলা হয়েছে—তা পেরিয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ বৃষ্টি পড়ে।

দ্বিতীয় উপায়টিতে পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি যন্ত্র বসিয়ে তার সাহায্যে 'সিলভার আয়োডাইডে'র ধোঁয়া সৃষ্টি করে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কোনও পাহাড়ের ওপরেই এ ধরণের যন্ত্র বসানোর সুবিধা। সাধারণ ধোঁয়ার মতই এ ধোঁয়াতে অত্যন্ত ছোট ছোট সিলভার আয়োডাইডের গুঁড়ো থাকে এবং আকাশের মেঘ এর সংস্পর্শে এলে ঠিক আগের মতই ঘটনা ঘটে ও বৃষ্টি হয়।

কিন্তু শুধু উপায় আবিষ্কার করলেই হয় না—তার পরেই প্রশ্ন ওঠে—বাস্তব ক্ষেত্রে সে উপায় কতখানি ব্যবহারের উপ-যোগী? স্বভাবতই উপায়-প্রয়োগের আর্থিক দিকটার কথা প্রথমেই বিবেচনা করতে হয়। যদি এত বেশী অর্থব্যয় হয় যা কৃত্রিম-বৃষ্টি দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়—তবে এতে লাভ নেই। সেক্ষেত্রে একরকম বৃষ্টিকে সৌখীন বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই বলা চলবে না। অনুকূলে আবহাওয়ায় ক্যানাডা ও ফ্রান্সে এরকম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে- কিন্তু সেখান-কার বিজ্ঞানীরা সর্বদিক বিচার করে—এ পন্থা বাস্তবে ব্যবহারের উপযোগী কি না—সে সম্বন্ধে সঠিক মত দিতে পারেন নি।

সিলভার আয়োডাইডের সাহায্যে পরীক্ষা করে অস্ট্রেলিয়াতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নি। আমেরিকাতেও এ ধরণের পরীক্ষা হয়েছে এবং সেখানকার পরীক্ষকেরা খুব বেশী পরিমাণ সফলতার দাবী করলেও অনেকেই তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। অর্থাৎ এরা

বলেছেন—সিলভার আয়োডাইড না ছড়ালেও স্বাভাবিকভাবেই ও বৃষ্টিপাত হ'ত।

পাঠক সম্ভবত ফ্রান্স ও ক্যানাডার ক্ষেত্রে 'অনুকূল আবহাওয়া' কথাটির প্রয়োগ লক্ষ্য করে থাকবেন। অর্থাৎ একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে আয়ত্তে আনার জন্যে আরও একাধিক প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাহলে সমস্যার আসল চেহারার কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না।

কিন্তু এ কথা বাদ দিলেও আর এক দল বিজ্ঞানী যে ধরণের আপত্তি করেছেন—তা অনেক বেশী গুরুতর। তাঁদের মতে 'ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত' এ বস্তু নয়। এ পন্থা শুধু যখনই বৃষ্টিপাতের পক্ষে যথোপযুক্ত মেঘ আকাশে দেখা দিয়েও বিফল হবার মত হয় তখনই প্রযোজ্য। ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত মানে যেখানে খুশী এবং যখন খুশী বৃষ্টিপাত। এবং এরা বলেছেন এ বস্তু আজকের বিজ্ঞানের সাধ্যের বহু বাইরে।

এই সব বিজ্ঞানীরা দুদিক দিয়ে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মরু-অঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণ জলকণা-সমেত মেঘ সেখানে পৌঁছয় না। সেখানে বৃষ্টিপাত করাতে গেলে মানুষকে জলীয়-বাষ্পবাহী মেঘ তৈরী করে সেখানে পাঠাতে হবে। প্রথমে জলীয়-বাষ্প সৃষ্টি করার কথা ভাবা যাক্। মেঘে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা সাধারণত সূর্যের উত্তাপে রূপান্তরিত সমুদ্রের জল। সূর্যের কিরণ ছাড়া জলকে বাষ্পীভূত করার বড়রকম প্রচেষ্টাতে কি পরিমাণ জ্বালানি (fuel) লাগে তার সহজ হিসেব পাওয়া যেতে পারেঃ—এক বর্গমাইল জায়গায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জলকে বাষ্পীভূত করতে অন্তত ৬,৪০০ টন কয়লার প্রয়োজন হয়। সুতরাং সূর্য-কিরণকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণের উপায় যখন জানা নেই—এরকমভাবে জলীয়-বাষ্প সৃষ্টি করার চেষ্টা না করাই মানুষের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচায়ক হবে। অন্তত যতদিন পর্যন্ত না আণবিক শক্তিকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগান যাচ্ছে—এ ধরণের চিন্তা না করাই যুক্তিযুক্ত।

এ ছাড়া বৃষ্টিপাত নির্ভর করে বায়ু-প্রবাহের ওপর। এখন বায়ু-প্রবাহ আবার কেমনভাবে পৃথিবীর দৈনিক-গতির ওপর নির্ভর করে দেখা যাক্। বায়ুর গতি মোটামুটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় পৃথিবীর দৈনিক গতির প্রভাবমুক্ত এবং অনেক সহজবোধ্য। বিষুবরেখার কাছাকাছি কর্কট-ক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির মধ্যবর্তী ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যকিরণ প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়। ফলে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হয়ে জলীয়-বাষ্পের আকারে ক্রমশই উপরদিকে উঠতে থাকে। কিছুদূর পর্যন্ত উঠে এই বায়ু দুদিকে ছড়িয়ে যায় এবং জলীয়-বাষ্প সমেত উত্তরে ও দক্ষিণে যাত্রা করে। পিছন থেকে আরও যে উষ্ণ-বায়ু আসে তাদের সংঘর্ষ এ গতির সহায়তাই করে।

এরপর শুরু হয় গতির দ্বিতীয়-পর্যায়। উত্তর ও দক্ষিণগামী এই দুই বায়ুপ্রবাহের পথ একেবারে সোজা থাকা সম্ভব নয় এবং এদের ওপর পৃথিবীর দৈনিক গতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দৈনিক-গতির প্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি বিন্দু ২৪ ঘণ্টায় একবার মেরু-দণ্ডের চারিদিকে, পশ্চিম থেকে পূর্ব-দিকে ঘুরে আসছে। বিষুবরেখার ওপরের যে কোনও বিন্দুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী (২৪ ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল) এবং এ গতিবেগ উত্তরে ও দক্ষিণে ক্রমশ কমতে কমতে সুমেরুবিন্দুতে ও কুমেরু-বিন্দুতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ক্রান্তীয় অঞ্চলে উৎপন্ন এই বায়ু-প্রবাহ উৎপত্তি-স্থলের দৈনিক গতি নিয়েই উত্তরে বা দক্ষিণে যাত্রা করে এবং যে সকল স্থানের ওপর দিয়ে যায়—তাদের দৈনিক-গতি অপেক্ষাকৃত কম। ফলে যখন যেখানে পৌঁছয়—ভূপৃষ্ঠের উপরের সেই স্থান এবং এই বায়ুপ্রবাহ আবার একই সঙ্গে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরলেও বায়ুপ্রবাহের বেগ বেশী বলে আপেক্ষিক গতির সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের উপরের যে কোনও ব্যক্তির গতিবেগ কম এবং তার এই বায়ু-প্রবাহ পশ্চিম থেকে আসছে বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বায়ুর নিজস্ব গতি এবং এই আপেক্ষিক গতি যুক্ত হয়ে উত্তর-গোলার্ধের বায়ু-প্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে

বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পশ্চিম থেকে আসছে বলে মনে হয়। এখানে বলা যেতে পারে যে ভূপৃষ্ঠের ও বায়ু-প্রবাহের দৈনিক-গতি সমান হলে এই বায়ু-প্রবাহকে খালি উত্তর থেকে আসছে বা দক্ষিণ থেকে আসছে বলেই মনে হত।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুর গতি অন্য-রকম। এ অঞ্চলের উষ্ণবায়ু উপর দিকে উঠতে শুরু করলেই উত্তর ও দক্ষিণ থেকে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু শূন্য স্থান পূরণের জন্যে আসে। এবার অবস্থা ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ বায়ুর উৎপত্তি-স্থলের দৈনিক গতি বিষুব-রৈখিক অঞ্চলের চেয়ে কম এবং এবারে আপেক্ষিক গতির ফলে ভূপৃষ্ঠস্থিত কোন ব্যক্তির বায়ু পূর্ব দিক থেকে আসছে বলে মনে হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের এই বায়ু-প্রবাহ বাণিজ্য-বায়ু নামে পরিচিত। এবং উপরে যে কথা বলা হয়েছে তার জন্যে উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাণিজ্য-বায়ু যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব-দিক থেকে প্রবহমান বলে বোধ হয়।

সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি আরও কিছু স্থানীয় কারণে এইসব বায়ুপ্রবাহের গতির আবার কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় এবং অবশেষে যা দাঁড়ায় তারই উপর নির্ভর করে কোথায়, কোন দেশে যাবে মেঘের দল।

সুতরাং যেখানে-সেখানে যখন-তখন জলভরা মেঘ পাঠানোর ব্যাপারে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এই দুটি প্রধান অসুবিধা। সূর্যদেব যে কাজ এত সহজে করেন—দুর্বল মানুষের পক্ষে তা যথেষ্ট কঠিন, সূর্যকিরণ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ সাধ্যাতীত এবং পৃথিবীর দৈনিকগতিতে হস্তক্ষেপ করে—বায়ু-প্রবাহের গতি নির্ধারণ করা তো আরও অনেক দুরূহ। এই সব ভেবেই একদল বিজ্ঞানী বলেছেন প্রকৃত অর্থে ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত আজকের বিজ্ঞানের সাধ্যের বহুদূরে।

কিন্তু আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রকে আমরা যদি আরও অনেক সীমা-বদ্ধ করে আনি তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা যে অনেক বেশী সার্থক হচ্ছে বলে মনে হবে। এরকম দেশ বহু আছে যেখানে জলীয়-বাষ্পবাহী মেঘ প্রাকৃতিক কারণে আসবেই। কিন্তু যথাস্থানে পাহাড়-পর্বত না থাকার দরুণ বা এমনিই অন্য কোনও কারণে এই সব জায়গায় সব সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি নাও হতে পারে এবং এই সব ক্ষেত্রে আমাদের কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের প্রণালী যথোপযুক্তভাবে নিয়োগ করলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলা দেশের কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। বায়ু-প্রবাহের গতি ও দক্ষিণে সমুদ্রের অবস্থিতির জন্যে আষাঢ়-শ্রাবণে জলভরা মেঘ আকাশে দেখা দেবেই। কিন্তু বৃষ্টিপাত যদি কোনও কারণে প্রয়োজনের চেয়ে কম হয়—তাহলে বাঙলা দেশই এই পন্থা প্রয়োগের অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু হিমালয়ের উত্তরে মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে বৃষ্টি-পাতের ইচ্ছে থাকলেও কিছুই করবার থাকবে না। সুতরাং প্রথম থেকেই ক্ষেত্র-নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া উচিত।

মেঘকে শীতল করার যে চেষ্টা নিয়ে এত মাথা-ঘামানো, পাহাড়ের গায়ে তা আপনা থেকেই হয়। পাহাড়ের গায়ে ঠেকলেই মেঘ উপর দিকে যাবার চেষ্টা করে এবং উপরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে সহজেই বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। তাই প্রায়ই দেখা যায়, পাহাড়ের যেদিক থেকে বায়ু-প্রবাহ আসে সেদিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে বিপরীত দিকে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। শুনলে হাস্যাস্পদ মনে হতে পারে—কিন্তু যদি কোনও উপায়ে সমস্ত পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেওয়া যায় তবে বৃষ্টিপাতের এ অসাম্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়ে যাবে। মানুষের শক্তি এখানেও এত কম যে, এ কথা আজ শুধু হাসির উদ্রেক ছাড়া আর কিছু করে না।

তবু একথা স্বীকার্য যে, আজ যেসব পাহাড়-পর্বত আমরা দেখি একদিন কেবলমাত্র বৃষ্টির প্রভাবেই তা ধুয়ে মুছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা বহুবার পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সেদিনও সমস্যার মীমাংসা হবে না—কারণ প্রাকৃতিক শক্তিতে তখন নানা জায়গায় আবার দেখা দেবে নতুন নতুন গগনচুম্বী পর্বতমালা।

তাই মনে হয় ক্ষমতা যখন এত কম, এত সীমাবদ্ধ, যদি সত্যি সত্যিই মরু-ভূমিকে জলসিক্ত করার চেষ্টা করতে হয় আকাশ থেকে মাটির দিকে চোখ নামালেই বোধহয় ভাল। মেঘের স্বাধীনতায় হস্ত-ক্ষেপের প্রয়োজন নেই—সোজাসুজি সমুদ্র থেকে বা মাটির বুকের বন্দী জল দিয়েই চেষ্টা করা উচিত—মাটির রিক্ততা ঢাকার। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা তাঁদের সমস্ত শক্তি-বুদ্ধি নিয়ে এদিকে নজর দিলে সমস্যার সমাধান হয়ত দ্রুততর হবে।

নগর-সংকীর্তন

রূপদর্শী
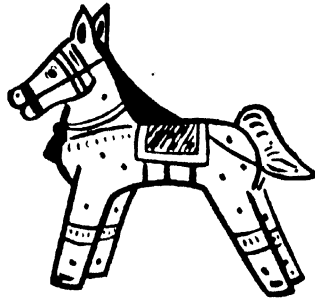
আগে এত ছিল না, এই টিণ্ডেল-ফিণ্ডেল, মেট, সর্দার সাত-দপ্তরে। কুলিরা সিধা এসে মোটটি তুলত, গাড়িতে গিয়ে বসিয়ে দিত, কি গাড়ি থেকে মোট নামাত। তারপর প্ল্যাট-ফরমের বাইরে দাঁড়ান হাওয়া-গাড়িতে মোট তুলে পয়সা নিত। এমন তেমন বুঝলে মোট-গাঁটরিসহ কুলি কে কুলি হাওয়া হয়ে যেত হাওড়া থেকে। প্রচুর হয়েছে।

তা বলে সকলেরই কি এক রীতি? তা কখনো হয়? তাহলে দুনিয়া চলবে কেমন করে? হাওড়ার কুলিদের বাইরে একটু বদনাম আছে। দেবতাভেদে ওরা পুজো পাল্টায়। যেই দেখল হ্যাট, কোট, বুট অঙ্গে, আর্দালি, চাপরাশী আছে সঙ্গে, মুখ ড্যাম, ফুল, সোয়াইনের কামান দাগছে, অমনি বিনয়ের মুখোশখানা কামিজের ভেতর থেকে বের করে ঝেড়ে পুঁছে মুখে বসালে। তারপর কথাটি না কয়ে কাজ-কম্ম চুকিয়ে দিয়ে সাহেবের সামনে হাত পাতলে। যদি সাচ্চা সাহেব হয়, কথা কইবে না, যা হাতে আসবে দিয়ে দেবে। বেশি পেলে খুশি মনে সেলাম কর, কম পেলে মনে মনে খিস্তি কর, কিন্তু মুখে কিছু বল না, আর সেলামটিও ঠুকে যাও।

শক্তের ভক্ত আছি বলে নরম মাটিতে নখ বসাবো না? বড়সাহেব যে ঠোক্করটি দিলে, বউএর উপর দিয়ে তা যদি না-ই তুললুম, তবে আর আর্যবংশের মুখ রইল কোথায়? সাহেবদের কিছু বলো না, বিনা ঝামেলায় যেতে দাও। কিন্তু তা বলে ঝামেলা ছেড় না। দ্যাখ, কে এল? বাঙালী বাবু? ছোকরা নাকি? সঙ্গে কে? এক খুবসুরৎ জানানা? আরে বড়ো আপ টু ডেট্ আছে। এখানে হাঙ্গামা হবে না, 'আসান্‌সে' কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে। জোয়ানীর এক রীতি আছে না? দু'চার আনার জন্য খিচাখিচ করবে না। মাল তুলে দাও। বাবু বিবিকে বসতে দাও আরামে। তো সির্‌ফ্ এক বাত পুছো, ক্যায়া বাবুজী আরাম তো মিলা? বাস্, তার পর মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হেসে হাতটা বাড়াও বাবুর দিকে। কিছু না বলতেই দেখবে একটি টাকা। যদি একটু কঞ্জুষও হয় তো এক আঠ আন্নি, একটি আধুলি। এই হল ভাল কুলির ইষ্ট মন্তর।

তবে যদি সুবিধেমত লোক দ্যাখ তো ঝাঁপিয়ে পড় তাদের উপর। খিচাখিচ কর, ঝামেলা বাধাও, হাঙ্গামা উঠাও। কি বাবু, এক কুলি, এক কুলি করছেন, সাতটা মোট আছে, তিন কুলিকা কমে হবে না। দেখিয়ে বাবু, তিন টাকা লাগেগা কমসে কম। কি তিন টাকা! মগ্‌কা মুল্লুক পায়া হ্যায় নাকি? তোমাকে নিতে হবে না বাবা, তুমি রাখ দেও। আচ্ছা বাবু, তো ঢাই টাকা। না বাবা, কাঁহে দিগদারি করছ। হাম তিরিশ বছরসে হিল্লী দিল্লী করছি, বুঝা, সাত ঘাটকা পানি হামরা পেটমে খলবল করতা হ্যায়। হামারা সাথমে শুধু শুধু পেঁয়াজি করে কই ফয়দা হবে না। তার চেয়ে যা বলছি বাপ্‌কা সুপুত্তুর হোকে তাই কর। একটি কুলিকে মাল দিয়ে সপ্ত-সাগর চষে এলুম, আর উনি এলেন নবাব খাঞ্জা খাঁএর নাতি। কুলি বুঝলে 'মিস্ ফায়ার'। দেখতে নরম কিন্তু ভেতরে শক্ত। তো চলল কাকুতির পালা। একটু দেখে-শুনে দেবেন বাবু। বাপু এত বাত না বলে গাড়িতে ওঠাও না। কথা পরে হবে। গাড়িতে মাল উঠল। দুটি সিকি বের করে কুলির হাতে দিতেই, কি বাবু, কি দিচ্ছেন? ঠিক দিচ্ছি বাবা। আবার ঝামেলা, আবার খ্যাঁচাখেঁচি, চেঁচামেচি, কথাতে কথাতে অশেষ ধস্তাধস্তি। তারপর দু পক্ষ এক-গা ঘামে নেয়ে উঠলে প্যাসেঞ্জারের পকেট থেকে এক আনি বের হল একখানা।

গ্রামের লোক হলেই কুলিদের পোয়া বারো। মেয়েরা একা হলে বিশেষ ট্যাঁ-ফোঁ আজকাল করে না। কেননা, পাবলিক এসে পড়বে। তেমন-তেমন জাঁহাবাজ মেয়ের সঙ্গে টক্কর লাগলে বাপ ডাকিয়ে ছেড়ে দেবে। তাই কুলিরা পারতপক্ষে আওরাতের মোট বইতে চায় না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। অবশ্যি আপ্-টু-ডেট্ জানানাতে এদের তত আপত্তি নেই, যতটা কিনা তীর্থ-ফেরতদের বেলায়। পুরীর গাড়ি, বানারস-গয়ার গাড়ি এলে এদের হৃদকম্প। তাই যত তাড়াতাড়ি পারে, থার্ড কেলাস জানানা ডিবিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য ধারে কেটে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেই কি পার আছে? অ-রে অ কুলি! এই মিনসে,

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি, নামা না মোটগুলো। আস্তে আস্তে, আঃ ওটাতে গঙ্গা আছে রে মুখপোড়া। ফেললি তো! বলি চোখের মাথা কি গুলে খেইছিস! আহ-হা, ওটা সোজা করে নামা। উল্টুস নি। যদি কিছু ভাঙে তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন। অ-মা, অ-কি, দিলি তো জলটুকু ফেলে। হারামজাদা, নচ্ছার, উট, বললুম না যত্ন করে নামা। গেরাজ্যি হল না। বেরো, শুয়ার, তোকে মোট বইতে হবে না। গালাগাল খেতে হবে, কিন্তু মুখে কিছু বলা চলবে না। উত্তর-প্রত্যুত্তর হলেই আর দেখতে হবে না। ভদ্রমহিলা এদিক-ওদিক চেয়ে বলে উঠবেন, বলি অ গার্ড বাবু, অপুলিশ, অ ভালমানুষের ছেলেরা, তোমরা উপস্থিত থাকতে এই ছোটলোক নচ্ছারটা আমাকে নাহক অপমান করছে গা। জিনিসপত্তর ভেঙে তচনচ করে দিলে। বলি দেশ কি অরাজক হয়েছে? আইন কি নেই?

আইন নেই মানে? প্রত্যেকটি লোক আজ আইন পকেটে নিয়ে ঘোরে। কিসের থেকে কি হল, কার দোষ, সে বিচারে কাজ কি? মার শালাকে। শুরু হল পাবলিকের বিচার। একেবারে মোক্ষম, দুদ্দাড়, দুমদাম। মারপিঠের পর, কুলিটিকে আধমরা করে পাবলিক বললে, শালে, জানানাকে অপমান কর। মাফ মাঙো। মাপ চাও। কিন্তু যার কাছে মাপ চাইবে, তিনি ততক্ষণে আরেকটি কুলি ঠিক করে মালপত্তর ঠিকে গাড়িতে চাপিয়ে গাড়োয়ানকে বলছেন, পটলডাঙ্গায় চল বাছা। আর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে কুলিটি চেল্লাচ্ছে, মাঈজী পয়সা। মাঈজী তখন কোমরের খুঁটের প্যাঁচ খুলছেন। কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না। কুলি ওদিকে সমানে চেল্লাচ্ছে, মাঈজী, পয়সা দিজিয়ে। এতক্ষণে মাঈজীর ট্যাঁক থেকে পয়সা বেরুলো। বেছে বেছে তেলা দুআনি দুখানি বের করে ধমক লাগালেন, মিন্‌সের রকম দ্যাখ না, যেন পালিয়ে যাচ্ছি। বাবা বাবা, এত তীথ্‌থ ঘুরে এলুম, কিন্তু তোমাদের মত ছিনে জোঁক আর কোথাও দেখলুম না। খুরে দণ্ডবৎ।

আর ডেঞ্জারাস হচ্ছে শেঠজীরা। গাদা গাদা মোট-মুটরি নিয়ে যাতায়াত করবে। কিন্তু মুটিয়াকে পয়সা দিতে গেলেই প্রাণ বেরোয়। ঝক্কাঝক্কি করতে করতে কুলিদের মুখের জল শুকিয়ে যায়। আধ-পয়সা নগদা খসাতে আধ ঘণ্টার কথা খসাতে হয়।

আজকাল তো বশে এসেছে। কি দেখছেন বাবু। বত্রিশ সাল তো এই 'লাট ফরামে'ই (প্ল্যাটফর্ম) হয়ে গেল। এখুনে লেবর ডিপাট হয়েছে। আগে সেসব কিছু ছিল না। গোরা টি সি, টিশন সুপ্রিণ্টেণ্ট, মেম 'বুকিন ক্লরাভি' ছিল। লেবর মানজর ছিল উ ভি এক গোরা। তো সে সাহাবের মর্জির উপর সব। আমার সঙ্গে সাহাবের ভাব তো আমি ঢুকিয়ে লিলাম আমার আদমীকে। তো তখন এত কুলিও ছিল না, প্যাসেঞ্জারও না। এখন তো খুব কড়াকড়ি আছে।

একজন দুজন তো নয়, চোদ্দশ আঠাশ জন কুলি হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে। তুমি আমি মন করলুম আর ট্রেন থেকে মোট নামিয়ে পয়সা কামালুম, সেটি হবার জো নেই এখন। দুনিয়া বড় কড়া। তুমি কুলির কাজ করতে চাও? কোথায় তোমার বাড়ি? কি পরিচয়? কে তোমাকে চেনে? এসব যদি জানা হল তো বেশ, দ্যাখ, লোক আর লাগবে কি না? লেবার সুপারভাইজারের কাছে যাও। এগারো নম্বর গেটের কাছে তাঁর অফিস। কণ্ট্রাক্টারের হাতেই এই ব্যবসা। রেল কোম্পানীর কাছ থেকে তিনি এই কাজের ঠিকে নিয়েছেন। প্যাসেঞ্জাররা যাতে হয়রান না হয়, কষ্ট না পায়, তাদের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তা দেখাই এই অফিসের কার্য। এই অফিসের দুটো হাত, এক হাতে প্যাসেঞ্জারদের মালপত্র চলাচল দেখছেন, আর হাতে খালাস করছেন পার্সেলের মাল।

কুলি ভর্তি করতে হবে এই আফিসের মারফৎ। কি নাম তোমার? বল। কোথায় ঘর? বল। কে চেনে এখানে? বল। ফটো তুলিয়েছ? দেখাও। আচ্ছা যাও। পুলিশে খবর দিই। তারা খোঁজ-খবর করুক তোমার বিষয়ে। রিপোর্ট পাঠাক। সন্তুষ্ট হলে খবর দেব। কাজে লেগো। অমনি অমনি কি হয়? তোমাকে লাইসেন্স করতে হবে, এই অফিস থেকে। মাসে তিন টাকা ফি।

লাইসেন্স পেলে তোমার কামিজে তার নম্বর সেঁটে রেখো। তোমার বাঁ হাতেও পিতলের যে চাক্তিখানা লাগানো থাকে, সেটা কি? সেটাও লাইসেন্স নম্বর। সেটা যদি প্যাসেঞ্জার চায় তো দিয়ে দিতে পার। প্যাসেঞ্জারের মনে ভরসা বাড়বে।

আজকাল অবিশ্যি মালপত্তর খোয়া বড় একটা যায় না। আমাদের হাতে ভারটা আসা ইস্তক অনেকটা কণ্ট্রোলে এনেছি। লেবার সুপারভাইজারটি বললেন, পাবলিক কম্প্লেন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তদন্ত করি। নালিশও কমে আসছে। প্যাসেঞ্জাররা যদি এক কাজ করেন তো বড়ই ভাল হয়। প্রতিটি কুলির কাছে তাদের পরিচয় দেওয়া কার্ড আছে। ওদেরকে কাজে লাগাবার আগে সেই কার্ডটি দেখে নেবেন। তাতে কুলিটার একটা ফটোও সাঁটা আছে। যদি কোন গোলমালে পড়েন, কিছু ভয় নেই, সটান আমাদের আফিসে চলে আসবেন, রাতদিন লোক থাকে প্যাসেঞ্জারকে সাহায্য করবার জন্য। কুলির নম্বরটা যদি মনে থাকে ভালই, ফটো দেখেও চিনে ফেলতে অসুবিধে হবে না, যে রকম কার্ড কুলির কাছে দেখলেন, ঠিক অবিকল ওই রকম আরেক কপি, আমাদের কাছে আছে। আপনার মাল নিয়ে সরে পড়েছে? রেট বেশী চেয়েছে? না কি কুকথা বলে মর্যাদাহানি করেছে? সটান এই অফিসে এসে সেরেফ নালিশটা পেশঁছে দিন তো, ব্যাটার ঘাড়ে হাউ মেনি হেড্ একবার দেখে নিই। প্রতি মোট চার আনা, এই হল এখনকার রেট। প্রতি মোট মানে প্রত্যেকটা আইটেম নয়। আপনার বেডিং, ট্রাঙ্ক, জলের কুঁজো কি টুকরি এই নিয়ে ওজন যদি এক মণ পর্যন্ত হল তো ওটাকে এক মোট ধরব। বাইরের গাড়ী থেকে ট্রেণের কামরায় পেশঁছে দেবে। মজুরী চার আনা। আজ নগদ কাল ধার। এর এদিক-ওদিক হয়েছে কি নম্বরটি টুকে নিয়ে সটান চলে আসুন তো একবার। কিম্বা তারই বা কি প্রয়োজন, প্রতিটি প্ল্যাটফর্মেই টিণ্ডেল পাবেন, সর্দার পাবেন, জুনিয়র সুপার-ভাইজার পাবেন, সিনিয়র সুপারভাইজার পাবেন। তকমা-আঁটা চেহারা। একটু ঠাহর করে তাদের বের করা, ব্যস্ তারপর নালিশটি ঠুকে দেওয়া। দেখতে দেখতে ত্যাড়া ঘাড় সিধে হয়ে যাবে। বলে জোড়নে পড়লে বাঁকা কেষ্ট অব্দি কালী হয়ে যায় আর এ তো মশাই কুলি। হ্যাঃ।

জুলুমবাজী ভাল নয়, এটা তো সবাই জানে, হাওড়ার কুলিরা জুলুমবাজ, এটাও সবাই জানে, কিন্তু জুলুম কি সবাই করে বাবুজী? জানো, আমাদের উপর কত জুলুম হয়? তিন টাকা লাইসিন ফি মাহিনামে। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, তো কুলি ভি বাড়তে যাচ্ছে। ফটু ভি তোলাতে হচ্ছে। খর্চা ভি আমাকে দিতে হচ্ছে। পোষাক-ওষাক সব কুছ্ আমার। চার আনা মোট তো পেট চলবে কেমন করে। আরো খেল আছে। শুনুন। রেল কোম্পানীর পার্সেল ট্রেন থেকে 'লোডিন'-আন্‌লোডিন্' (মাল তোলা, মাল নামানো) নিয়েছে কনট্রাকটার। কোম্পানীর কাছ থেকে রুপিয়া খিঁচে লিচ্ছে, নিজের প্যাকিট ভরছে। আর আমরা রোজ এক এক ঘণ্টা, দো দো ঘণ্টা, তিন তিন ঘণ্টা বেগার খাটছি।

এটা জানতুম না। ঘুরে ঘুরে সন্ধান নিলুম। বুড়ো কুলিটা বললে, ফোকটসে খাটায় না বাবু, পয়সা দেয়। কত শুনবেন? প্রতিদিন এক ঘণ্টা খাটলে মাসে বিশ আনা। তিন ঘণ্টা রোজ খাটলে মাসে চাল্লিশ আনা। আপনারা কত দেন? এক মোট চার আনা। তো কেন জুলুম হবে না? পেট কি মানবে বাবু? এত কুলি হয়েছে, তার উপর টিণ্ডাল, উণ্ডাল, সর্দার, মেট, ফলানা কে জানে কত, ওদেরকে রোজগারের হিস্যা দিতে দিতে ঘরে যখন যাব, তখন কি থাকবে আমার হাতে আর বালবাচ্চার মুখে ভি কি দেব?

একটু থাক, নিজেই দেখবে। ভাল ভাল মোট, যেখানে কিছু বক্‌শিস মিলবে, সে সব আপন আদমীকে দিয়ে দিবে। শালা সর্দার বনেছে। আমি একটা ভাল মোট ধরব তো তার মধ্যেও একটা আপন আদমী ঢুকিয়ে দেবে। কেন? না কত বকশিস পাই দেখতে। মাঝে মাঝে এমন ইচ্ছা হয় কি—

বুড়ো চুপ মেরে গেল। এক তক্‌মা-ধারী সর্দার আসছে। বুড়োর চোখ জ্বলছিল। চোখ তো নয়, আগুনের মালসা। একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা চিমটে করে সেই মালসা থেকে তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তাতাচ্ছিল, লোক আসতে দেখে চুপ করে তারই মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর একটু হেসে বললে, আচ্ছা, নমস্তে বাবুজী।

ইতিহাস

History of The Indian Association. 1876—1951. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অনারারী সেক্রেটারী, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৭৷৷৹ টাকা, বিদেশে ১৫ শিলিং।

ভারত-সভার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের নব জাগরণের গৌরবময় স্মৃতি অঙ্গাঙ্গী-ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভারত সভার প্রতিষ্ঠা হইতে তাহার ৭৫ বৎসরের কর্মতৎপরতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিক গবেষণামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের বিশেষ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠা সমধিক বর্ধিত করিবে। ঐতিহাসিক তথ্য-সন্নিবেশের সঙ্গে যথোপযুক্ত ভাষার বিন্যাসে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ফুটাইয়া তুলিতে বাগল মহাশয়ের অসামান্য রচনা-শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ, সরল, সুন্দর ঝকঝকে তাঁহার ভাষা। তথ্যরাজি হইতে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার পক্ষে অসংযত উচ্ছ্বাস বা আবেগের আবিলতা তাহার মধ্যে নাই। বস্তুত ঐতিহাসিক আলোচনার যে সব গুণ থাকা উচিত, ভারত সভার এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের আগাগোড়ায় গ্রন্থকার অপূর্ব দক্ষতার সহিত সেগুলি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। আলোচনা গবেষণামূলক হইলেও তথ্য-সন্নিবেশ-পদ্ধতির সৌষ্ঠব-জনিত একটা আকর্ষণ পাঠকের চিত্তকে পুস্তকখানির শেষ পর্যন্ত আগাইয়া লইয়া যায়। ভারত-সভার কর্ম-সাধনার ভিতর দিয়া সে যুগে বঙ্গমনীষার যে জ্যোতির্ময় বিকাশ ঘটে তাহা সর্ব দেশ এবং সব জাতির পক্ষেই বিস্ময়কর ব্যাপার। গর্ব করিবার মত বস্তু। বাঙলার মনস্বী, সাধক এবং স্বদেশ-প্রেমিক দিক্‌পাল সন্তানগণের তপস্যার প্রভাবে, তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠ সাধনার মহিমায় ভারতের জনচেতনা কিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, মুষ্টিমেয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই মুখ্যতঃ যে রাজনীতিক সাধনা একদিন নিহিত ছিল, তাহা কিরূপে সর্বভারতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রাণময় বীর্যকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে আলোচ্য গ্রন্থ-খানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সে চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-হিসাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মূলে ভারত সভার অবদান ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়াছে। আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার মতিলাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, বিপিনচন্দ্র বাঙলার আকাশ আলো করিয়া জ্যোতিষ্ক-রাজির যুগপৎ সেই প্রকাশে প্রাণশক্তির বিকাশে এ দেশে উদার মানবধর্ম কিভাবে রাজনীতিক চেতনার ধারায় বিভিন্ন মুখে এবং বিচিত্র গতিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিবরণ পাঠ করিতে গিয়া মনে প্রাণে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হয়। বস্তুত ভারত সভার সুদীর্ঘ সাধনার সে গৌরবময় অবদানের কোনটি ছাড়িয়া আমরা কোনটি উল্লেখ করিব? হিন্দু মেলা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের বৈপ্লবিক সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়কে জাতির দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়া গ্রন্থকার জাতির পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। গ্রন্থের পরি-শিষ্টাংশ ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হইতে বিশেষভাবেই মূল্যবান। এই সব উপকরণ সংগ্রহে গ্রন্থকারের প্রবল অনুসন্ধিৎসা এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ হইয়া থাকিবে এবং এই আলোচনার মাধ্যমে জাতি ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রগতির পথে নূতন আলোকের সন্ধান পাইবে।

প্রবন্ধ সাহিত্য

রুশ সাম্রাজ্যবাদঃ ইহার প্রতিরোধের উপায় ঃ রামস্বরূপ ঃ প্রাচী প্রকাশন, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ারঃ আট আনা।

রুশ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বর্তমানে সব চেয়ে তীব্র বিতর্কের বিষয়। কেউ রুশ দেশের নামে বিহ্বল, কেউবা কমিউনিজমে আস্থাবান কিন্তু রাশিয়াতে তার রূপ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। রামস্বরূপ এ দুই-এর কোন দলেই নন। তাঁর আস্থা গণতন্ত্রে। যদিও সে সম্পর্কে কোন আলোচনা এ বই-এর উদ্দেশ্য নয়। তিনি এখানে আলোচনায় বিশেষ করে জোর দিয়েছেন কমিউনিস্ট রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের থেকে সমগ্র পৃথিবীর আশঙ্কার ওপর। তিনি এই কথাটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সাম্যের ছদ্মবেশে রাশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদ, ক্রীতদাসপ্রথা গড়ে উঠেছে এবং যদি সত্বর পৃথিবীর গণ-তান্ত্রিক দেশগুলি এক না হয় তবে বিপদ সমূহ। কথাটা ভেবে দেখবার মত। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন। রামস্বরূপ তাঁর আলোচনায় রাশিয়ার কালো দিকটি যেমন দেখিয়েছেন আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে তেমন দেখাবার চেষ্টা করেছেন সাহস, ঔদার্য, দানশীলতা। তাঁর বক্তব্য বিষয়—যা অনেক গণতন্ত্রপ্রিয় লোককেই ভাবিত করেছে, আর একটু স্থির এবং নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করলে আরও ভালো হতো। ৩১৪।৫২

বিবিধ

Our Heritage Series No. 2: Dilwara Temples: Publications Division, Govt. of India. Rs. 2.

আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা গ্রামের জৈন মন্দিরগুলির বিবরণ ও বহু ছবি দেওয়া হয়েছে চল্লিশ পৃষ্ঠার ৭"×৯" মাপের এই পুস্তকটিতে। ছবিগুলির নির্বাচন ভাল হলেও সমগ্র দিলওয়ারা মন্দির গোষ্ঠীর একটি দূর থেকে তোলা আলোক-চিত্র দিলে ভালো হ'ত, কারণ এ ছবি মনোড-ব্রুনের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না এবং ঐ গ্রন্থেরই পরবর্তী সংস্করণ থেকেও অপসৃত হয়েছে। বিবরণটি কোথাও পান্ডিত্য প্রকাশ করতে না চাইলেও এমনভাবে লেখা যে গবেষকরা কোন নতুন তথ্য পাবেন না, আবার সাধারণ পাঠক বিরক্তি বোধ করবেন অতিরিক্ত তথ্যপূর্ণ মনে করে। আলোকচিত্রের ছাপা প্রশংসনীয় নয়, বিশেষ করে এটি যখন সরকারী-প্রকাশ হয়েও দু টাকা মূল্যাঙ্কিত। দিলওয়ারার স্থাপত্য পরিকল্পনার নীলপত্রটি অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু পুস্তিকার শেষে একটি Bibliography দেওয়া উচিত ছিল—কারণ Our Heritage Series-এর এই পুস্তিকাগুলির উদ্দেশ্য সাধারণের অনুসন্ধানস্পৃহা বাড়ানো।

সর্বশেষে, একটি কথা বলতেই হয় এই পুস্তিকাগুলি ভারতের বাঙলা, তামিল, উর্দু, গুজরাতি, তেলেগু, ওড়িয়া, মারাঠি, আসামী প্রভৃতি যাবতীয় মূল ভাষায় প্রকা

হওয়া উচিত। এবং তা হ'লে প্রকাশন ব্যয় সুতরাং মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম হবে, প্রচার বেশি হবে এবং উদ্দেশ্য সার্থক হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধ করতেও পারেন। কারণ চিত্র-পুস্তিকার অধিকাংশ ব্যয় ব্লকের। এ পদ্ধতিতে চিত্র-পুস্তিকা প্রকাশ করলে ছবিগুলি অফসেটেও ছাপা যেতে পারে, এবং কেবলমাত্র বিবরণগুলি পরে লেটার প্রেসে ছাপতে পারেন প্রাদেশিক সরকাররা।

৩৬।৫৩

The Golden Jubilee Souvenir: Sister Nivedita Girls' School, Calcutta. Price Rs. 2-8.

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়-এর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে এই সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় জানানো হয়েছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস বিনামূল্যে এই সংকলনটি ছেপে দিয়েছেন। এ ছাড়া বহু সুধীজনও নানা দিক থেকে সাহায্য করেছেন। অর্থাৎ অতুলনীয় মুদ্রণ পারিপাট্য, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসংগত প্রচ্ছদে এবং বহু খ্যাতনামা গুণীজনের প্রবন্ধে সুসমৃদ্ধ এই সংকলনটি একটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব প্রাচীরের এলাকা অতিক্রম করে সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদূর সাগরপার থেকে যে মহীয়সী মহিলা ভারতকে উজ্জীবিত করে তোলার আদর্শে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সেই ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিবিজড়িত বহু প্রবন্ধ ও বহুবর্ণ চিত্র এই সুভেনিরের মূল্য বাড়িয়েছে। ইংরেজী বিভাগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল নিবেদিতার একটি চিঠি, মৃণালিনী এমার্সনের সংক্ষিপ্ত দন্দের একটি রচনা, Sm C K Handoo লিখিত শ্রীসারদা দেবীর শেষ বাণী ও স্বামী শংকরানন্দের প্রবন্ধটি। শেষোক্তজনের রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

"Miss Margaret Noble met Swami Vivekananda in London. In a letter, the very first one dated June 7, 1896, Swamiji has expressed what he found through his spiritual insight.....He wrote:—

Dear Miss Noble,

......One idea that I see clear as daylight is that misery is caused by ignorance and nothing else.

......Buddhas by the hundred are necessary with eternal love and pity. Religions of the world have become lifeless mockeries—what the world wants is character..... It is no superstition with you. I am sure, you have the making in you of a world-mover, and others will also come."

সংকলনের বাঙলা অংশটিও প্রবন্ধে ও রামকৃষ্ণদেবের চিত্রে সমৃদ্ধ। শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সরলাবালা সরকার, শ্রীআশা দেবী, শ্রীলক্ষ্মী সিংহ, শ্রীবাসনা সেন, শ্রীবিজয়া দাশগুপ্তা ও অনিতা গুপ্তের প্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক নিঃসন্দেহে।

মাত্র আড়াই টাকা মূল্যের পক্ষে অসংখ্য চিত্রসম্বলিত এই সংকলনটি যথেষ্ট সুলভ বলতে হবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

চার কলমঃ—প্রবোধকুমার ঘোষ কর্তৃক ৮।৯, রসা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲। ৫৯।৫৩

সেরা গল্প (১ম খণ্ড)ঃ—বীরেশ্বর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। দীপজ্যোতি প্রকাশনী, ১৩১।১এ, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷৹। ৬০।৫৩

সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্পঃ—বীরেশ্বর সরকার কর্তৃক দীপজ্যোতি প্রকাশনী, ১৩১, বৌবাজার স্ট্রীট। মূল্য—৪৲। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৬১।৫৩

কবি গুরুর রক্ত করবীঃ—তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কল্পনাদেবী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সাধনা মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, বরিষা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৲। ৬২।৫৩

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্পঃ—ধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲। ২৬৩।৫৩

বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকঃ—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৸৹। ৬৪।৫৩

অ্যালবার্ট হলঃ—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৷৹। ৬৫।৫৩

অগ্নি পরীক্ষাঃ—আশাপূর্ণা দেবী, পি কে বসু এ্যান্ড কোং, কলিকাতা—৩১। মূল্য—৩৷৷৹। ৬৬।৫৩

সংগীত সংস্কৃতিঃ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১০৲। ৬৭।৫৩

নূতন ছড়া ও কবিতা—প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—৷৹। ৫৭।৫৩

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী—মনোরঞ্জন জানা, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৫৲। ৫৮।৫৩

কৃষিপত্র—ডক্টর তারেশচরণ রায়, কলিকাতা মহাকরণ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত।

ট্রামে-বাসে

দামোদর উপত্যকায় ভারত নবজন্ম লাভ করিয়াছে—এই মন্তব্য করিয়াছেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জওহরলাল। —"আমরা নবজাতককে সাদরে বরণ করছি আর এই সঙ্গে একথাও স্মরণ

করিয়ে দিচ্ছি যে, শিশুটিকে যাতে পেঁচোয় না পায়, সেদিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসর হইতে ভারত আর বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবে না। —"খাদ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে, মা মোটে না রাঁধলেও তপ্ত বা পান্তার অভাব আমাদের কোনদিনই হবে না"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে জাপানী প্রথায় ধান চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। —"চাল বণ্টনের প্রথাটা অবশ্যি ভারতীয় থাকবে বলেই অনুমান করছি"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বিহার কংগ্রেস পার্টির চীফ্ হুইপ শ্রীযুক্ত রামলক্ষ্মণ সিং যাদব নাকি পরামর্শ দিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিলোপ সাধন করিয়া তার কিছুটা অংশ আসাম ও উড়িষ্যাকে দিয়া বাকীটা বিহারের অঞ্চলভুক্ত করা হউক। —"কালনেমির পর এমন ভাগাভাগির পরামর্শ এই প্রথম শোনা গেল রামলক্ষ্মণের মুখে" বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

লিলুয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈকা ঝি'র বরখাস্তের প্রতিবাদে সেখানে শতাধিক ঝি ধর্মঘট করিয়াছে এবং তাকে পুনরায় চাকুরীতে বহাল না করা পর্যন্ত তারা ধর্মঘট চালাইয়া যাইবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। —"বৌকে শেখানোর আদি এবং অকৃত্রিম পথ ছিল ঝিকে মারা। লিলুয়ার স্বামীকুল এই সুবিধে থেকে বঞ্চিত হলেন বলে আমরা দুঃখিত এবং শঙ্কিতও হচ্ছি এই কারণে যে, লিলুয়া বা কতই দূর!"

* * *

বিধান পরিষদ ভবনের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে একলব্যের গুরুদক্ষিণার কথা আবার মনে পড়িল।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তনের সুবিধা না থাকিলেও প্রদর্শনে কোন বাধাই নাই!!

* * *

লোকসভার সদস্যদের অনেকেই রেলওয়ের ভাড়া হ্রাসের দাবী জানাইয়াছেন। আমরা আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় এই দাবীকে নেহাৎ ভাঁড়ামি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

* * *

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নাকি বলিয়াছেন যে, কাজের কাজ যদি কিছু হয়, তবে তিনি মার্শাল স্তালিনের সঙ্গে দেখা করিতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী গান ধরিলেন—"দেখা হবে ছাঁদনাতলায়, বলে গেল ইসারায়......"।

* * *

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হোলি উৎসবে পথেঘাটে রঙ নিয়া খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। —"পচা

ডিম, টমাটো, আলকাতরা প্রভৃতি তাঁর নিষেধের আওতায় পড়ে না। সুতরাং হোলি হ্যায়.........বলে শ্যামলাল।

* * *

করাচীর "ডন্" নাকি একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য। —"কিন্তু তার চেয়ে খামচি বা ল্যাং মারা সস্তার দিক থেকে ভালো নয় কি?"

রঙ্গজগৎ

একটি সম্মানিত (!) ছবি

বাঙলার চিত্রশিল্প প্রমোদের 'ডোজ'টা ঠিক সমান সমান রেখে দিয়ে যাচ্ছে। হাসির ছবির পরেই কান্নার ছবি। অবশ্য হিন্দী-ভাষী অঞ্চলের বরাত খারাপ, তারা কেবল-মাত্র কান্নার ছবিগুলিই পায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকে হয়তো হেসে প্রাণে স্ফূর্তি উপভোগ করতেই বেশী ভালোবাসে, কিন্তু বাঙলার চিত্রশিল্প তাদের জন্য বরাদ্দ রেখে দিয়েছে কান্নার মধ্যে দিয়ে প্রাণকে আকুল করে তোলা ছবির জন্য। তবে হিন্দীভাষী অঞ্চলের কান্নার ওপরে শ্রদ্ধা আছে বলতে হবে—কলকাতায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত এইচ এম ফিল্মসের 'ছোটিমা' ছবিখানির এদিন ধরে বাইরেকার পত্রপত্রিকায় প্রভূত প্রশংসা পাবার রহস্যকে আর কোন দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। 'ছোটিমা' অর্থাৎ 'বিন্দুর ছেলে'-র হিন্দী সংস্করণ, কাজেই শরৎচন্দ্রই হচ্ছেন এর প্রত্যক্ষ আকর্ষণ; যেকোন দর্শককেই ছবিখানি একবার দেখতে যেতে প্রণোদিত করবেই, কিন্তু দেখবার পরেও ছবিখানি যে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে পত্রপত্রিকায় লেখা-লেখির মধ্যে সেটা,—শরৎবাবুর লেখা কাজেই ভালো হবেই আর ভালো যদি না লাগে তো বুঝতে হবে নিজেরই অনু-ভূতিতে রস উপলব্ধি করার ক্ষমতাই সম্ভবতঃ কম,—নিজেদের এই দুর্বলতাকে প্রকাশ করার চেয়ে ছবিখানির সরাসরি প্রশংসা করে যাওয়াই নির্ঝঞ্ঝাটের কাজ। 'ছোটিমা' বাইরেতে বাঙলা চিত্রশিল্পের একটি পরম সম্মানিত চিত্র বলে কাগজে কাগজে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণেই জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পেরেছে কিনা, অর্থাৎ ততটা দীর্ঘকাল এক এক জায়গায় প্রদর্শিত হয়ে যাওয়ারও কৃতিত্ব লাভ করতে পেরেছে কিনা সে খবর বড় একটা পাওয়া যায়নি।

কেঁদে আনন্দ উপভোগ করার মতোই গল্প শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'। এর বাঙলা সংস্করণ ছবিখানি এখানে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কারণ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লোককে কাঁদিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে বলে। সে ছবিখানি পরিচালনায় অন্য কোন রকম কৃতিত্বের কথা কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, শরৎচন্দ্র যে রসাশ্রিত আবেগ পরিবেশন করতে চেয়েছেন পরিচালক বেশ দরদভরেই তা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলে-ছেন। কিন্তু 'ছোটিমা'র বেলাতে সমান উক্তি প্রয়োগ করা গেল না। শরৎচন্দ্রের গল্পের মধ্যেই শরৎচন্দ্রকে পাশ কাটিয়ে যাবার বহু লক্ষণ হিন্দী চিত্রনাট্যখানিতে প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। মাতৃস্নেহের অমন গল্প, লোকের দরদ উপচে পড়ে আবেগের স্রোতে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, কিন্তু 'ছোটিমা' সেই আবেগটাকেই উচ্ছ্বসিত করে দিতে পারেনি তেমনভাবে। তবুও পত্রপত্রিকায় লেখা পড়ে ছবিখানি বাইরে সম্মানিত হওয়ার যে প্রমাণ পাওয়া যায় সেটা আমাদের এখানে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

ছবিখানির সমগ্র পরিবেশটার মধ্যেও অমনি একটা জগাখিচুড়ী ভাব এনে দেওয়া হয়েছে। বাঙলাতে গল্প বলে সাজপোষাক আভরণ, চরিত্রাবলীর চালচলন বাঙালী-জনোচিত রেখে দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু যেহেতু ছবিখানি অবাঙালীদের জন্যে তৈরী হচ্ছে সুতরাং ওর চেহারা থেকে বাঙালীত্ব মুছে ফেলতে হবে এমন একটা চেষ্টা ছবিখানির অঙ্গভূষায় পরি-লক্ষিত হয়। কাহিনীর বাঙালী চেহারাটা যদি পুরোপুরিভাবে বদলে অন্য কোন এক অঞ্চলের চেহারা করে তোলা হতো তাহলেও কথা ছিলো, কিন্তু এখানে এনে দেওয়া হয়েছে একটা মিশ্র চেহারা। নাম-গুলো রয়েছে খাঁটি বাঙালীর, আচার বিচারেরও রয়েছে কতকটা বাঙালীর; সাজপোষাক কিছু বাঙালীর কিছু বিহারের, কিছু উত্তর প্রদেশের, এই রকম নানা জায়গার। ফলে নাট্যবস্তুর স্থানকাল নির্ণয়ে বাধা পেতে হয়, পাত্রপাত্রীর স্বরূপটা পরিকল্পনা করতে অসুবিধায় পড়তে হয়। ঘটনার আবেগের সঙ্গে দর্শক তাই নিজেদের আবেগকে খাপ খাইয়ে নিতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে। এর ওপরে রয়েছে কতকগুলো ঠিকে ভুল। গল্পের গোড়াতেই বিন্দুর কোলে বড়বৌ অমূল্যকে তুলে দেয়। ঠিক সেই সময়েই পটভূমিকায় ওদের নতুন গৃহ নির্মাণ কার্য চলতে থাকা দেখানো হয়। তারপর বছর দশেক পার হয়ে গেলো, অমূল্যর তখন 'ম্যাট্রিক' ক্লাশ, কিন্তু সেই বাড়িটি তৈরী হয়ে চলেছে তখনও সমানেই। কালক্ষেপ দেখাবার আরও তো উপায় খুঁজে বের করা যেতো! ছুটতে ছুটতে

বিন্দু বাইরের প্রাঙ্গণে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লো—দুজন ছুতোর তখন কাঠ চিরছে—বিন্দুকে সামনে পড়ে যেতে দেখেও তাদের হুঁশ হলো না কোন; আর পরিচালকও ছুতোরের হাতে বিন্দুর ঐ অবস্থাতেই গাছের গুঁড়িটা দু আধখানা হয়ে যেতে দেখিয়ে বিন্দুদের সংসারটাই ভাগ হওয়ার ইঙ্গিতটাকে সামনে তুলে ধরলেন, কিন্তু বিন্দুর দিকে নজরও পাত করলেন না। বিন্দুকে দিয়ে গান গাওয়ানোই বা মনে উদয় হতে পারে কি করে! একঘরে মশারি তো, আর এক ঘরে নেই—এমন ঠিকে ভুলও যথেষ্ট।

ছবির দোষত্রুটিগুলোকে আরও প্রকটিত করে তুলেছে বিন্দু চরিত্রের অভিনয় দুর্বলতা। যাকে কেন্দ্র করে আবেগকে ঘনীভূত করার কথা তারই অভিব্যক্তিতে যদি কোন আবেগ সঞ্চারিত না হতে পারলো তো কাহিনী দাঁড়াবার আর জোর পাবে কিসে। নাম ভূমিকায় মীরা মিশ্র একটা অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন তার শিল্প দক্ষতা প্রকাশ করার। সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তার অভিনয় ব্যর্থ হওয়ার ফলে সঙ্গের চরিত্রগুলিরও অভিনয় জমতে পারেনি। যেমন বড়বৌয়ের ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়। বাঙলা সংস্করণটি তার অভিনয়ে যতোটা মহিমান্বিত হতে পেরেছিল এতে তো সে পরিচয় পাওয়া গেল না। অভিনয় অবশ্য ভালো করেছেন যাদবের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল; হিন্দীতে অভিনয়ই ওর যেন বেশী খোলে। বাঙলাতেও ঐ ভূমিকাতেই তিনি অভিনয় করেছেন, কিন্তু এতোটা কৃতী তাতে তিনি হতে পারেননি। মাধবের ভূমিকায় অসিতবরণ যতোটা সুযোগ পেয়েছেন মানিয়ে নিয়েছেন। অমূল্যের ভূমিকায় নবাগত আনন্দকুমার ছেলেটিও ভালো অভিনয় করেছে। আর উল্লেখ করার মতো অভিনয় কারুর নেই।

ছবিখানির মধ্যে একটি বিশেষ সম্পদ হচ্ছে পংকজ মল্লিক সংযোজিত সুর—আবহ এবং গান, দুদিক থেকেই। কলা-কৌশলের অন্যান্য দিক মর্যাদা নিয়ে আসার মতো কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন হেমচন্দ্র চন্দ্র এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

বাঙগলা দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল খেলায় ১০৪ রানে মহীশূরে দলকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে উন্নীত হইয়াছে। দীর্ঘ নয় বৎসর পরে বাঙগলার ক্রিকেট দল পুনরায় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিল। ইহা খুবই আনন্দের ও সুখের বিষয়। আরও প্রশংসার বিষয় যে, বাঙগলার দল অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত। দলের অধিনায়কও তরুণ। স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত বাঙগলা দলকে সাহায্য করিতেছে। ফাইনালে বাঙগলা দলকে মরাহাষ্ট্র অথবা হোলকারের সহিত খেলিতে হইবে। ঐ খেলা আগামী ১৭ই মার্চ হইতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। হোলকার দল যদি ফাইনালে উন্নীত হয়, তবে খেলা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে, কিন্তু মহারাষ্ট্র দল উঠিলে হওয়া কঠিন হইবে। মহারাষ্ট্র দল বাঙগলা দলকে আমেদাবাদেই খেলিবার জন্য অনুরোধ করিবে। কলিকাতার মাঠে এখনই রৌদ্রের প্রখরতা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে সারাদিন খেলা চালান কঠিন, ইহার পর কি হইবে বলা চলে না। এইরূপ গরমের মধ্যে ক্রিকেট খেলা কখনই ভাল হইতে পারে না। তবে বাঙগলার ক্রিকেট উৎসাহিগণ ফাইনাল খেলা দেখিবার জন্য উদগ্রীব। এইরূপ অবস্থায় ঐ খেলা বাঙগলার বাহিরে হইলে তাঁহারাই হতাশ হইবেন এই পর্যন্ত।

বাঙগলা চতুর্থবার ফাইনালে

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৯৩৪-৩৫ সালে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙগলা দল ১৯৩৬-৩৭ সালে সর্বপ্রথম ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করে। সেইবারে বাঙগলা নবনগর দলের সহিত খেলিয়া ২৫৬ রানে পরাজিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙগলা দল ফাইনালে পুনরায় উন্নীত হয় ও দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে ১৭৮ রানে পরাজিত করিয়া রণজি কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙগলা দল পুনরায় ফাইনালে উন্নীত ও পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের নিকট এক ইনিংস ও ২৩ রানে পরাজিত হয়। এইবারে বাঙগলা ফাইনালে উন্নীত হইয়াছে। বাঙগলা প্রথম খেলায় বিহার দলকে প্রথম ইনিংসের খেলায় পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় উড়িষ্যা দলকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে। কোয়ার্টার ফাইনালে সার্ভিসেস দলকে ২৫৭ রানে পরাজিত করে। সেমিফাইনালে মহীশূরে দলকে ১০৪ রানে পরাজিত করিয়াছে।

বাঙগলা দলের এই সাফল্যের জন্য শিবাজী বসু, পি সেন ও বি ফ্রাঙ্কের ব্যাটিং দায়ী। বোলিংয়ে এস ব্যানার্জি (মণ্টু), বি দাশগুপ্ত ও এস কে গিরিধারীর কৃতিত্বও প্রশংসনীয়।

ফাইনাল খেলায় বাঙগলার পক্ষে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় খেলিবেন এখনও জানা যায় নাই। তবে আমাদের যতদূর ধরণা সেমিফাইনালে যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়াছেন তাঁহাদেরই ফাইনালে খেলিবার সুযোগ দেওয়া পরিচালকদের কর্তব্য হইবে। যদি কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে অবিচার করা হইবে। খেলার ফলাফল ঃ—

বাঙগলা ১ম ইনিংসঃ—৩৫৮ রান (শিবাজী বসু ১৪৭, বি ফ্রাঙ্ক ৫৮, পি সেন ৭৯, পি ই পালিয়া ৮৫ রানে ৩টি, টি ভি কৃষ্ণ ১০৬ রানে ৪টি, ভি এম ইঞ্জিনীয়ার ৩১ রানে ২টি উইকেট পান)

মহীশূর ১ম ইনিংস—১৯৮ রান (কে শ্রীনিবাসন ৩০, এ কৃষ্ণস্বামী ৭৭, এস ব্যানার্জি (মণ্টু) ৬৮ রানে ৫টি, এস সোম ৩৮ রানে ২টি, এস কে গিরিধারী ৩৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

বাঙগলা ২য় ইনিংস—১১০ রান (বি ফ্রাঙ্ক ১৮, জে মিত্র ২২, পি ই পালিয়া ২৯ রানে ৫টি, টি ভি কৃষ্ণ ২২ রানে ২টি উইকেট পান।)

মহীশূর ২য় ইনিংস—১৬৬ রান (এন টি আদিশেষ ৫০, পি আর শ্যামসুন্দর ২০, কে শ্রীনিবাসন ২৫, বি দাশগুপ্ত ২৬ রানে ৪টি, এস কে গিরিধারী ৩১ রানে ৪টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র রণজি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ৮ উইকেটে গুজরাট দলকে পরাজিত করিয়া সেমিফাইনালে উন্নীত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দলকে সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিজয়ী হোলকার দলের সহিত খেলিতে হইবে। মহারাষ্ট্র দলের এই সাফল্য কতকগুলি তরুণ খেলোয়াড়দের জনাই সম্ভব হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভাদভাদের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তরুণ খেলোয়াড়টি ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

গুজরাট ১ম ইনিংস—২০২ রান (জে সোধন ৫৪, পি পাঞ্জাবী ৪৮, ভোঁসলে ৫০ রানে ৪টি, ভি মাথে ৭০ রানে ৩টি ও এস প্যাটিল ৬০ রানে ২টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র ১ম ইনিংস—২৬০ রান (ভাদভাদে ৬৬, বোড়ে নট আউট ৩৮, এইচ দানী ৩১, জমু প্যাটেল ৯১ রানে ৬টি উইকেট পান।)

...**গুজরাট ২য় ইনিংস**—২৩৪ রান (পি পাঞ্জাবী ৭১, অনিল লাস্কারী ৫২, ইউ ভাগেলা ১৮, জে সোধন ৩৬, অমরনাথ ১৬, এস প্যাটিল ২৬ রানে ২টি, ভি মাথে ৪৫ রানে ২টি, ভাদভাদে ১১ রানে ৩টি, ভোঁসলে ৭৫ রানে ২টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র ২য় ইনিংস—২ উইঃ ১৭৮ রান (এম রেগে ৯০ নট আউট, বাহু তুলে ৩৭, এইচ দানী ৩৯ রান নট আউট)।

ভারত ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ছয়দিনব্যাপী তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ পোর্ট অফ

ক্লেপনের কুইন্স পার্কের ম্যাটিং উইকেটে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ইতিপূর্বে এই মাঠেই ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলা হয় ও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তবে সেই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। শেষ সময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটসম্যানগণ দ্রুত রান তুলিবার জন্য একেবারেই চেষ্টা করেন না। কিন্তু এইবারে ঠিক তাহারই বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়। ভারতীয় দলই জয়ী হইতে পারিত, কিন্তু তাহা পরিচালকের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্যই সম্ভব হয় নাই। এই বিষয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একজন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের অভিমত পাঠ করিলেই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন "কুইন্স পার্ক ওভালে তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ উদ্দেশ্যবিহীন নিষ্ফলতায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এই ব্যর্থতার জন্য আর কেহ নহে স্বয়ং হাজারের নেতৃত্বই দায়ী। রাত্রির অবসানে ভারতের পক্ষে দীপ্ত আশার সহিতই এই দিনের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়ক হাজারে অনড় সতর্কতা অবলম্বন করায় সুবর্ণ সুযোগ করতলগত হইয়াও ফস্কাইয়া গিয়াছে। ভারতের জয়লাভ সত্যই উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল। এইবারের টেস্ট পর্যায়ে ভারত একটি খেলায় পরাজিত হইয়াছে। এই খেলা এইভাবে উপেক্ষিত হওয়া কোন মতেই সংগত হয় নাই। হাজারে এই খেলায় পূর্বের ত্রুটি সংশোধনের জন্য অযথা বেলা ২টা পর্যন্ত কালক্ষেপ করায় শেষ সময় খেলার আর কোনই আকর্ষণ বর্তমান থাকে না। পূর্বের দিনে সমাপ্তি ঘোষণা করিলে অনেক বিপদ ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া শেষ দিনে অপরাহ্ন ২টা পর্যন্ত ব্যাট করা যুক্তিসংগত হয় নাই।" এই অভিমতদানকারী মাঠেই উপস্থিত ছিলেন সুতরাং তাঁহার মতামত একেবারেই উপেক্ষা করা চলে না। হাজারে যে কৃতি অধিনায়ক নহেন, ইহা পূর্বেই ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার পরেই তাঁহাকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক মনোনীত করিয়া নির্বাচকমণ্ডলী যে মারাত্মক ত্রুটি করিয়াছেন তাহার জন্য বর্তমানে অনুশোচনা করিয়া লাভ কি আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারত টেস্ট পর্যায়ের খেলায় জয়ী হইবে না—ইহাই ধারণা করিয়া রাখিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

এম আপ্তের অপূর্ব ব্যাটিং

বোম্বাইর তরুণ ব্যাটসম্যান এম এল আপ্তে এই টেস্ট খেলায় অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৩ রান করিয়াও নট আউট থাকেন। প্রথম টেস্ট ম্যাচেও ইনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সেইরূপ সুবিধা করিতে না পারিলেও তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে যেরূপ ক্রীড়াকৌশলের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে ইনি বিজয় মার্চেণ্টের ন্যায় ওপনিং বা প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে ভারতীয় দলের একটি বিরাট স্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবেন এই বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

বিনু মানকড়ের ব্যাটিং সাফল্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী বিনু মানকড় এই পর্যন্ত কি বোলিং, কি ব্যাটিং কোন বিষয়েই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারায় অনেকেই ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, ইঁহার খেলার অবনতি হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ৯৬ রান করিয়া দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হওয়ায় পূর্ব ধারণা অনেকেই পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরবর্তী খেলায় ইঁহাকে ব্যাটিং বিষয়ে উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখা যাইবে বলিয়া মনে করিতেছেন। দেখা যাক কার্যত কি হয়। খেলায় ফলাফল:—

ভারত ১ম ইনিংস—২৭৯ রান (জি রামচাঁদ ৬২, পি উমরিগার ৬১, জে ঘোড়পাড়ে ৩৫, বিনু মানকড় ১৭, এস পি গুপ্তে নট আউট ১৭, কিং ৭৪ রানে ৫টি, ওরেল ৪৭ রানে ২টি ও গোমেজ ২৬ রানে ১টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস—৩১৫ রান (উইকস ১৬১, ওয়ালকট ৩০, স্টলমেয়ার নট আউট ২০, এস পি গুপ্তে ১০৭ রানে ৫টি, ফাদকার ৮৫ রানে ২টি, জি রামচাঁদ ৪৮ রানে ১টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংস—৭ উইঃ ২৬২ রান ডিক্লেয়ার্ড (এম আপ্তে নট আউট ১৬৩, বিনু মানকড় ৯৬, পি উমরিগার ৬৭, ওরেল ৬২ রানে ২টি, কিং ২৯ রানে ১টি, গোমেজ ৪২ রানে ১টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস—২ উইঃ ১৯২ রান (স্টলমেয়ার নট আউট ১০৪, উইকস নট আউট ৫৫, পেয়ারাডো ২২, রামচাঁদ ৬১ রানে ১টি, এস গুপ্তে ১৯ রানে ১টি উইকেট পান।)

ডি কে গাইকোয়াড় ও ই এস মাকা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের কৃতি ব্যাটসম্যান ডি কে গাইকোয়াড় ও উইকেটরক্ষক ই এস মাকাকে শীঘ্রই স্বদেশে বিমানে ফেরৎ পাঠান হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই আহত হইয়াছেন ও ডাক্তারগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইঁহাদের সম্পূর্ণ তিন মাস বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ ইঁহারা ভ্রমণের অবশিষ্ট কোন খেলাতেই দলকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। ডি কে গাইকোয়াড়ের কাঁধের নিকটবর্তী হাড় স্থানচ্যুত হইয়াছে ও মাকার একটি আঙুল ভাঙিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের পরিবর্তে কণ্ট্রোল বোর্ড অপর কোন খেলোয়াড়কে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রেরণ করিবেন কি না, এই প্রশ্ন অনেকেই করিতেছেন। আমাদের যতদূর ধারণা এই ভ্রমণে যেরূপ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহাতে বহু অর্থ-ব্যয়ে আরও কোন খেলোয়াড়কে অবশিষ্ট অল্প সময়ের জন্য প্রেরণ করিবেন না।

আরও দুইজন খেলোয়াড় আহত

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের আরও দুইজন খেলোয়াড় সামান্য আহত বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বিনু মানকড়ের উরুর মাংসপেশীতে টান লাগিয়াছে ও ফাদকারের পাঁজরার নিম্নভাগের বামদিকের মাংসপেশীতে টান

বাংগলা ও মহীশূরের খেলায় বাংগলার শিবজী বসুর আউটের দৃশ্য

লাগিয়াছে। ডাক্তারগণের মতে এক সপ্তাহ বিশ্রামের পরেই খেলিতে পারিবেন। সেইজন্য ইঁহাদের চতুর্থ টেস্টে না খেলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহার পর আর কেহ আহত না হইলেই মংগল।

অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত ভ্রমণ

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার প্রচারিত সংবাদ ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মহাশয়ের বিবৃতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন, কিন্তু আমরা হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড ভারতে দল প্রেরণ করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ইহা যখন সংবাদ-পত্র মারফৎ প্রচারিত হইয়াছে তখন উহা সরকারীভাবে বোর্ডকে না জানাইলেও অস্ট্রেলিয়া দল ভারত ভ্রমণ করিবে না এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। সভাপতি মহাশয়ের ইতিপূর্বের অনেক বিবৃতিই যুক্তিহীন ও মূল্যহীন প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা সাধারণে বিস্মৃত হইলেও আমরা হই নাই।

মল্লযুদ্ধ

বাংগলার মল্লযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান বর্তমান। এই দুইটির মধ্যে একটির কার্যক্রম খুবই ভাল। বাংগলার অধিকাংশ জেলাতেই ইহার জেলা সংঘ আছে। প্রতি বৎসরই বিভিন্ন জেলায় ও বহু স্থানে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইয়া থাকে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানের নিখিল ভারতীয় মল্লযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সহিত কোনই যোগ-সূত্র নাই। অপর প্রতিষ্ঠানটি মাত্র কয়েকটি স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; জেলা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন জেলায় ইহার কোনই শাখা নাই। অথচ ইহার সহিত নিখিল ভারতীয় প্রতি-ষ্ঠানের সম্পর্ক আছে। যাহার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের মল্লবীরগণ ও পরিচালকগণ নিখিল ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় আন্ত-র্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এক সময়ে মনে হইয়াছিল আর থাকিবে না, একত্র হইয়া একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে, কিন্তু বর্তমানে তাহার কোনই সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। দুইটি প্রতিষ্ঠানই বেশ নির্বিকারচিত্তে যে যাহার খুশি মত কার্য করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে পরিচালকদের কোন ক্ষতি হইতেছে না সত্য, কিন্তু বাংগলার মল্লযুদ্ধের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইতেছে না। দুইটি প্রতিষ্ঠানের দলাদলির মধ্যে উৎসাহী মল্ল-বীরগণই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পরাধীন ভারতে ইহা চলিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া স্বাধীন দেশেও চলিবে ইহার কোনই যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমি আশা করি, বাংগলার এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-গণ এই বিষয় একটু চিন্তা করিবেন।

জাপানী মল্লবীর দল

জাপান এমেচার কুস্তি এসোসিয়েশন দেশের মল্লবীরদের অভিজ্ঞতার নিমিত্ত বিদেশ ভ্রমণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ইঁহারা নিজ ব্যয়ে ভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি ইঁহারা কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই দলে মোট বার জন সভ্য আছেন। ইহার মধ্যে একজন জাপানী কুস্তি এসোসিয়েশনের সভাপতি নাম মিঃ আই হাতা। একজন দলের ম্যানেজার নাম মিঃ ইয়ামামুরো। অপর দুইজন রেফারী—একজনের নাম মিঃ টি হাতাকেয়ামা ও অপর জনের নাম মিঃ কে মাত্রাসুই। অবশিষ্ট আট জন মল্লবীর। ইঁহারা ইতিমধ্যেই একদিন বাংগলা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৫—২ লড়াইতে বাংগলাকে পরাজিত করিয়াছেন। ইঁহাদের লড়িবার কৌশলও অভিনব ও প্রত্যেকেই খুবই তৎপর। ভারতীয় মল্লবীরগণ যেরূপ ধীর মন্থরগতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লড়িয়া থাকেন, ইঁহাদের তাহা করিতে দেখা যায় না। শারীরিক পটুতায় ইঁহারা নিজ ওজনের যে কোন ভারতীয় মল্লবীর অপেক্ষা তৎপর বা চটপটে। আমরা আশা করি, বাংগলার তথা ভারতের মল্লবীর-গণ ইঁহাদের লড়িবার কৌশল ও তৎপরতা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে ফল ভালই হইবে। নিম্নে জাপানী মল্লবীর-দের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

(১) এইচ হাসিমাতো (ফ্লাই ওয়েট), (২) কে ইয়োনোমরি (ব্যান্টম্ ওয়েট), (৩) এম আশাকাওয়া (ফেদার ওয়েট), (৪) টি শিমোটো (লাইট ওয়েট), (৫) টি শিমাতানি (ওয়েল্টার ওয়েট), (৬) এফ হিরালো (মিডিল ওয়েট), (৭) এম ইতো (লাইট হেভী ওয়েট), (৮) কে সোনে (হেভী ওয়েট)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ—

২৩শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কিদোয়াই অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, আগামী বৎসর হইতে বিদেশী চাউল আমদানী করা হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকারের বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনায় বিরোধী পক্ষ দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার ও ছাটাই সমস্যার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

মাদ্রাজে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী ভারতের পুলিশের সহিত ভারতভুক্তি আন্দোলনের সমর্থক কর্মীদের সীমান্ত অঞ্চলের সংঘর্ষের ফলে একজন ফরাসী কনস্টেবল নিহত এবং দুইজন কনস্টেবল আহত হইয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—অমৃতসরে ১৪৪ ধারা অমান্য করার অভিযোগে মাস্টার তারা সিং ও অপর নয়জন আকালী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকগণ বিধানসভা ভবনের সম্মুখে তাঁহাদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দ্বিতীয় দিবসের বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ প্রধানত সরকারী ব্যবসায়ের নামে রাজস্বের অপচয় এবং শিক্ষাখাতে সরকারী কার্পণ্যের তীব্র নিন্দা করেন।

অদ্য কলিকাতায় ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীটে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ক্যাশ-কক্ষ হইতে এক দুঃসাহসিক রাহাজানিতে দুর্বৃত্তদল ১০ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—জলন্ধরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে স্থানীয় অকালী জাঠার সভাপতি সর্দার মোহন সিং এবং আরও ৭জন আকালী নেতা গ্রেপ্তার হন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত চাউলের দোকানে চাউলের মূল্য ১৯৫৩ সালের ২রা মার্চ হইতে মণকরা ৭৲ টাকা ৮ আনা অর্থাৎ সের-প্রতি ৩ আনা হ্রাস পাইবে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য অপরাহ্নে গয়ার প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ৭৩নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর বগীতে আগুন লাগার ফলে ৪ ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। নিহতদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক আছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখ অদ্য সংসদে ভারত সরকারের ১৯৫৩—৫৪ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে দেখা যায় যে, ১৯৫৩—৫৪ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

অর্থমন্ত্রী কতিপয় করের হার রদবদলের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, চটের উপর রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করা হইবে। সুপারী, প্রসাধনদ্রব্য, কয়েক প্রকার বস্ত্র এবং মোটর গাড়ীর উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পাইবে। পার্শেল, পুস্তকের প্যাকেট, রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সিওর করা খামের উপর ডাকমাশুল বৃদ্ধি করা হইবে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য করাচীতে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ১৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকল্য ৭২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাফরুল্লা খানের অপসারণ এবং তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই আহম্মদিয়া সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণার দাবী করিতেছে।

১লা মার্চ—কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র অদ্য ওয়েলিংটন স্ট্রীটে তাঁহার নিজ ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

পেপসুর মুখ্যমন্ত্রী সর্দার জ্ঞান সিং রাড়েওয়ালা অদ্য প্রাতে রাজপ্রমুখের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। এই পদত্যাগের ফলে রাজ্যের শাসনভার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হায়দরাবাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি রামকৃষ্ণ রাও ঘোষণা করেন যে, তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ১৩ হইতে হ্রাস করিয়া ১০ জন করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

২৩শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর অধিনায়ক তাঁহাদের দূরপ্রাচ্যস্থিত বাহিনীকে সুপরিকল্পিতভাবে জীবাণু-যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া দুইজন উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক কর্মচারী স্বীকার করিয়াছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—পেরাক সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা চীনা তরুণী লী তেং-তাইর প্রাণভিক্ষা করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্টের ৫০ জনেরও বেশী সদস্যের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পেরাকের প্রধান মন্ত্রী পাইয়াছেন। লীর বর্তমান বয়স ২৫ বৎসর। একটি হাতবোমা রাখার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—রোমে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সংস্থার ৬টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠকে যথাসম্ভব সত্বর সম্মিলিত ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের কার্যে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তদুপরি বৈঠকে সকলেই একমত হইয়াছেন যে, পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জায় আর কালক্ষেপ করা উচিত নহে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—পারস্যের শাহ অদ্য দেশত্যাগ করিতেছেন বলিয়া নিউইয়র্ক বেতারে ঘোষণা করা হয়। উক্ত বেতারে পরবর্তী ঘোষণায় বলা হয় যে, শাহ মত পরিবর্তন করিয়াছেন এব দেশত্যাগ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১লা মার্চ—পারস্যের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেকের গৃহে মোতায়েন সৈন্য বাহিনী অদ্য বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর গুলী চালনা করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা শাহের সমর্থনে নানারূপ ধ্বনি করিতেছিল। অদ্য পারস্যের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল বহার মার্চকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—৷৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ৷৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা
শনিবার
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৫৯
DESH
SATURDAY, 14TH MARCH, 1953.
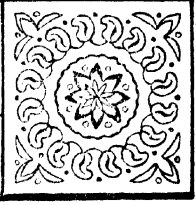
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তার

গত ৬ই মার্চ জম্মুর প্রজা-পরিষদের আন্দোলনের সম্পর্কে নিষেধ-বিধি অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার অভিযোগে দিল্লীতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লীর কর্তৃপক্ষের এই কাজ সুবিবেচিত হয় নাই, আমরা এই কথাই বলিব। অবশ্য আইন অমান্য করিলে তাঁহার ফলভোগের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হয় এবং গভর্নমেণ্টই আইনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কিন্তু গ্রেপ্তার হইবার পর ডাঃ মুখুজ্যে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা নাই, এই ধারণা লইয়া তাঁহারা আন্দোলন পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়; তখন আন্দোলন স্থগিত রাখা নেতাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে বাধ্যই করা হইয়াছে। তাঁহারা তাহা করিতে চাহেন নাই। প্রজা-পরিষদের পক্ষ হইতে জম্মুর জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে, আমাদের মতে তাহার মধ্যে অনেক ঝুঁকি আছে। কারণ এই আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া ক্রমশ যে অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, বর্তমান নানাপ্রকার সংকট ও সমস্যার মধ্যে সেইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অকল্যাণকর। বস্তুত ভারতের বিরোধী পক্ষই এই অবস্থার সুযোগ লইবার জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছে। এই কারণে এই আন্দোলন যাহাতে থামিয়া যায়, আমরা ইহাই চাই। কিন্তু দিল্লীর কর্তৃপক্ষের কাজ প্রকৃতপক্ষে বিরোধী আন্দোলনের গতিকেই বাড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের মনে হয়, কর্তৃপক্ষ নিষেধবিধি প্রয়োগ করিতে না গেলেই সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন। আন্দোলনের গতি যাহাতে অশান্তির কারণ সৃষ্টি করিতে না পারে, সেজন্য প্রস্তুত থাকাই তাঁহাদের উচিত ছিল। প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। ফলত যাঁহাদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা পরিচালনার উদ্যোগ করা হইয়াছিল, তাঁহারা কেহ যে শান্তিভঙ্গ করিবেন বা শান্তিভঙ্গের প্রশ্রয় দিবেন, এমন সম্ভাবনাও বিশেষ কিছু ছিল না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিক জীবনের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও বিশেষভাবেই বুঝিতে পারেন যে, আইন অমান্য করিবার পথ তাঁহার নয়। পণ্ডিত নেহরু এবং শেখ আবদুল্লা উভয়েই একথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, কাশ্মীর পুরাপুরিই ভারতভুক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কাশ্মীর গণপরিষদের মাধ্যমে এই কথা স্বীকার করিয়া লইলেই সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে। প্রজা-পরিষদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার পথে এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলাই প্রয়োজন এবং এপক্ষে কাশ্মীর কিংবা ভারত সরকারের অনর্থক একগুঁয়েমিতে অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, ইহাই উচিত। প্রত্যুত ভারত সরকার যদি দমনমূলক নীতির আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা আন্দোলনকে দমন করিবার জিদ লইয়া চলিতে থাকেন, তবে সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিবে, আমাদের এই ভয় হয়। সুতরাং সে পথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া জম্মুর অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা যে অমূলক এবং তাহার যে কোন ভিত্তি নাই, এই সত্যটি সুনিশ্চিত করাই বর্তমানে কাশ্মীর এবং ভারত সরকারের পক্ষে প্রধান কর্তব্য।

স্বখাত সলিলে

পশ্চিম পাকিস্থানের উপর দিয়া অশান্তির দমকা হাওয়া বহিয়া চলিতেছে। ধর্মোন্মাদ জনতার ধ্বংসলীলাকে সংযত করিবার জন্য লাহোরে জঙ্গী আইন জারী করিতে হইয়াছে। পাকিস্থানের ইতিহাসে সরকার পক্ষ হইতে অশান্তি দমনের জন্য এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন এই প্রথম। এ অশান্তির কারণ কি? পাকিস্থানে কোন সংকট এবং সমস্যা দেখা দিলে তথাকার শাসকগণ প্রধানত সীমান্তের সন্নিহিত পরপারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া থাকেন কিংবা কম্যুনিস্টদের উপর সে দোষ চাপাইয়া নিবৃত্ত হন। কিন্তু করাচী এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের বর্তমান অশান্তির কারণ উদ্ভাবনে অন্তত এ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রতিভা সেরূপ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়ার পক্ষে সুযোগ পায় নাই। আহম্মদিয়া সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে হইবে এবং পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জাফরুল্লা খাঁ যেহেতু

আহম্মদিয়া বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, সেজন্য তাঁহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করিতে হইবে, আন্দোলন-কারীদের এই দাবী। বস্তুত যে সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, বর্তমান অশান্তি সেই মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতারই প্রতিক্রিয়া। এ ব্রতের ফল যে এমনটাই দাঁড়ায়, পাকিস্থানের ভাগ্যবিধাতৃবর্গ তাহা আগে তলাইয়া বুঝেন নাই; কিংবা বুঝিলেও সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ বজায় রাখিবার দায়ে পড়িয়া জানিয়া শুনিয়াও প্রগতিবিরোধী মনোভাবকেই তাঁহারা প্রশ্রয় দিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে মুসলমান ব্যতীত অপর কেহ স্বাধীন পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারিবে না এবং পাকিস্থানে প্রবর্তিত আইনসমূহ ঠিক শরিয়তসম্মত হইল কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মোল্লা-পরিষদ নিয়োগের প্রস্তাবে শাসকদের সেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিচয় সেদিন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের এই দুর্বলতা বুঝিয়া মোল্লার দল এখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাহারা যে জেহাদী নীতি চালাইয়াছেন, বর্তমান মুসলমান-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহারা সেই ধর্মান্ধ বর্বরতার বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহার পর ব্যাধির বীজ আরও ছড়াইবে এবং বিভিন্ন মোল্লা-মৌলানাদের মুরীদবর্গের মধ্যে মোজাহেদী মহড়া শুরু হইবে, এমন আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং', সে তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সূত্রে মোল্লাবর্গের মধ্যে মতভেদে বিভ্রাট ঘটিবে, ইহা আদৌ আশ্চর্য নয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের আদর্শ যেখানে সর্বজনীন স্বার্থের উদার ভিত্তি এবং সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং যেখানে বিশিষ্ট কোন ধর্মমতকে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িত করা হয়, সেখানে এমন অনর্থ ঘটা সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক। সুতরাং দোষ কাহারো নয়। প্রত্যুত পাকিস্থানের রাষ্ট্রদেহে উপলক্ষিত ব্যাধি পাকিস্থানে ভাগ্যবিধাতৃবর্গের নিজেদের সৃষ্ট। তাঁহারা এখন বলিতেছেন, পাকিস্থানবিরোধী এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী দলের প্ররোচনা বর্তমান অশান্তির মূলে রহিয়াছে; কিন্তু বিভেদ এবং বিরোধকে তাঁহারা নিজেরাই তো রাষ্ট্রের কার্যত বলস্বরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং তদনুযায়ী তাঁহাদের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। পাকিস্থান শান্তির রাজ্য এবং ভারতের জন্যই সেখানে যতরকম বিপদ ঘটিতেছে, পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের এইরূপ প্রচারকার্য যে কতটা ভ্রান্ত, পাকিস্থানের বর্তমান অশান্তি বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এই সত্যই উন্মুক্ত করিয়া দিল। অতঃপর পাকিস্থানের নিয়ামকগণ নিজেদের ভুল বুঝিয়া বিপন্ন ইসলামের জিগীরে জোর বাড়াইবার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যদি যথেষ্ট বিবেচনাপরায়ণ হন এবং ধর্মান্ধতা প্রশ্রয় দিবার পথ পরিত্যাগ করেন, তবেই মঙ্গল।

আত্মদাতা কানাইলাল

সম্প্রতি চন্দননগরে আত্মদাতা বীর কানাইলাল দত্তের আবক্ষ মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বহুদিন হইতেই দেশবাসীর মনে এই ইচ্ছা কাজ করিতেছিল। বস্তুত কানাইলালের ফাঁসী হইবার কয়েক মাস পরেই এমন কথা উঠে। শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদিত 'ধর্মে' এই মর্মে একটি সংবাদও প্রকাশিত হয় যে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা কর্তৃক প্রেরিত কানাইলালের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি ফ্রান্স হইতে আসিতেছে। এই মূর্তি চন্দননগরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কানাইলালের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার সেই আয়োজনের কথা শুনিয়া তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল শিহরিয়া উঠে। বিলাতের 'মর্ণিং পোস্ট' মন্তব্য করিয়াছিল, 'একজন ভীরু নরঘাতককে আত্মদাতার সম্মানে সম্মানিত করা হইতেছে, তাহাকে একজন দেবতা করিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। তাহার মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা পর্যন্ত তোলা হইতেছে ইত্যাদি।' এতদিন পরে চন্দননগরের অধিবাসীরা সাম্রাজ্যবাদীদের এমন মন্তব্যের যথাযোগ্য জবাব দিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত চন্দননগরে সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহাদের জন্মভূমির আত্মদাতা সন্তানের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডুপ্লের মর্মর মূর্তিটিকে ১৯৪৭ সালে চন্দননগরের অধিবাসীরা তীব্র আন্দোলন চালাইয়া যে স্থান হইতে অপসৃত করেন, ঠিক সেই জায়গাতেই শহীদ কানাইলালের মর্মর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। চন্দননগর হইতে ফরাসী-প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারত হইতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন এখনও লোপ পায় নাই। পক্ষান্তরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর দল কূটনীতির পথে নানারকম দুরভিসন্ধি চালাইয়া ভারতের বুকে তাহাদের স্বার্থের ঘাটি আগলাইয়া রাখিবার জন্য এখনও চেষ্টা করিতেছে। উপদ্রবও আরম্ভ করিয়াছে কম নয়। আমরা আশা করি কানাইলালের স্মৃতি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ভারতভূমি হইতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণকে বলিষ্ঠ নীতিপ্রয়োগে প্রণোদিত করিবে এবং সে সম্বন্ধে কালবিলম্বের কোন প্রশ্নই আর থাকিবে না।

প্রথম কাজ প্রথমে

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল সেদিন দিল্লীতে ভারতীয় রেলপথের শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে নবসৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। দামোদর নদী পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, সেদিন তিলাইয়া বাঁধ এবং বোকারোর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বড় সৃষ্টি, বড় কাজের সংস্রবে গেলে সত্যই একটা আনন্দ হয়, পণ্ডিতজীর এই যুক্তি আমরা সকলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি; কিন্তু কোন্ কাজটি বড় এবং বৃহতের কেমন চেতনা হইতে এই

আনন্দ সত্য হয়, এইটি হইতে বিবেচ্য। বস্তুত বৃহৎ কল্যাণের সংগে কর্মের সংযোগ থাকিলে তবেই কাজটিকে প্রকৃত বৃহৎ বলা যায় এবং বৃহৎ স্বার্থত্যাগের প্রেরণামূলক চিত্তবৃদ্ধির উন্মেষের অনুপাতেই আনন্দেরও নিরিখ আসে। কর্মের এই স্বরূপটি আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং রাষ্ট্র-জীবনকে সমুন্নত করিয়া তুলিতে হইলে বৃহতের স্বার্থ-সাধনার প্রেরণাকে সত্য করিয়া তুলিবার কৌশলটিকে বিভিন্ন কর্মপন্থার ভিতর দিয়া উজ্জীবিত করিয়া তোলা দরকার। প্রত্যুত সেই পথেই নব-সৃষ্টির আনন্দ দেশের বুকে সাড়া জাগাইবে। কিন্তু সমস্যাটি খুব সোজা নয়। কারণ সংকীর্ণ স্বার্থের চেতনা নব-সৃষ্টির এই সত্যকার আনন্দের সম্পর্ক হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কর্ম-সাধনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ইহার জন্য অনেক রকমে দায়ী। দেশকে যদি শক্তি-শালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে অতীতের প্রাণহীন স্বার্থগত সেই সব সংস্কার হইতে জাতির মনকে প্রথমে মুক্ত করিতে হইবে এবং এজন্য রাষ্ট্র-জীবনের মূলে বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চার করা স্বভাবতঃই দরকার হইয়া পড়ে। জোড়াতালির পথে বেশিদূর আগাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় বণিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা-কালে এদেশের শিল্পপতিদের কাছে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এ সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, আমাদের সম্মুখে সমস্যা অনেক। কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি ধরিবে, কোন্‌ কাজটি আগে করা দরকার? স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশের সর্বত্র নূতন শক্তি সাড়া দিয়া উঠিতেছে। এতদিন এসব শক্তি চাপা ছিল। যদি নবজাগ্রত এই সব শক্তিকে উপযুক্ত পথে পরিচালনা করা না যায়, তবে সেগুলি জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবে, এমন ভয়ের কারণ রহিয়াছে। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের পথে এই সব শক্তিকে প্রয়োগ করিতে হইলে জনগণের সংগে আমাদের বিভিন্ন কর্ম-প্রসারের সংযোগের দিকটাকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলা প্রয়োজন। কোন বড় কাজ করিতে হইলে জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক এবং তাহাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে গেলে কল্যাণ কাহারো ঘটিবে না। শিল্পপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতজী এই উপদেশ দিয়াছেন যে, দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিবার দিকে আমাদের সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বার্থ এবং সমষ্টি-স্বর্থ, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মতে আমাদের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত স্বার্থ' এবং 'জনগণের স্বার্থ' এই দুইটির মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ থাকা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিতজীর উপদেশে যুক্তির দিক হইতে কোন গোল নাই; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই পথে যত বিপত্তি ঘটিতেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঝোঁকে এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শোষণ-নীতিই সম্প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং তত্ত্বের বিচার কিছু পরিমাণে কমাইয়া জনগণের স্বার্থ রক্ষার দিকেই কার্যত সরকারের নীতি বলিষ্ঠভাবে প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য।

কলিকাতার নূতন মেয়র

শ্রীযুত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বিনা বাধায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভূতপূর্ব মেয়রের অসুস্থতা জনিত অনুপস্থিতির জন্য শ্রীযুত মুখুজ্যেকেই ডেপুটি মেয়রস্বরূপে মেয়রের কাজ চালাইয়া যাইতে হইয়াছে। সুতরাং কার্যত মেয়র পদে তাঁহার এই নির্বাচনে সরকারী হিসাবে মেয়রের পদে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুত মুখুজ্যে ডেপুটি মেয়রস্বরূপে বিশেষ যোগ্যতার সংগে তাঁহার কর্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন এবং এজন্য তিনি যথেষ্ট জন-প্রিয়তাও অর্জন করিয়াছেন। মেয়ররূপেও তিনি নিরপেক্ষতা এবং যোগ্যতার সংগে কার্য পরিচালনা করিয়া শহরবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবেন, আমরা ইহাই আশা করি।

কলিকাতায় মশকাতঙ্ক

কলিকাতা শহরে মশক দলের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। পৌরসভা ইহাতে প্রমাদ গণিয়াছেন। কিন্তু দংশন-দক্ষ এই জীবটি শহরে আদৌ নবাগত নয়। বৎসরের বারোটা মাসেই ইহারা উপদ্রব চালায় এবং ইহাদের আশ্রয়কেন্দ্র-গুলিও কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের অবিদিত নয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে মশক ধ্বংস করিবার জন্য একটি বাহিনীও আছে। ইহারা নাকি মশক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পক্ষে পর্যাপ্ত রকমে বল-বাহন এবং উপকরণ-যুক্ত নহে। যদি মশকবিধ্বংসী এমন বাহিনী দ্বারা কাজই না চলে, তবে করদাতাদের পয়সায় ইহাদিগকে পোষণ করার কি সার্থকতা আছে, আমরা বুঝি না। একথা সত্য যে, মশকদের নিবাস-স্থল খাল, ডোবা অনেকগুলি শহরের সীমানার বাহিরে এবং সেসব জায়গায় গিয়া মশক ধ্বংসের এক্তিয়ার কর্পো-রেশনের নাই। এসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সংগে যোগ দিয়া এই উপদ্রব হইতে শহরবাসীকে রক্ষা করাই পৌরসভার পক্ষে কর্তব্য। পৌরসভার কর্তা-ব্যক্তিরা আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, শহরে অভিযানকারী মশক বাহিনীকে ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহক মশকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই বিবৃতিতে আমাদের পক্ষে সান্ত্বনার কোন কারণ নাই। কলিকাতার পূর্বাঞ্চল ম্যালেরিয়ার জন্য কুখ্যাত। সেই সব অঞ্চল হইতেই মশক বাহিনীর অভিযান ঘটিতেছে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা শহর এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের মশক-কুলকে নির্মূল করিবার জন্যই অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মার্শাল স্ট্যালিন

ইহার পরে কি? গত ৫ই মার্চ মার্শাল স্ট্যালিনের পরলোকগমনের সংগে সংগেই সমগ্র বিশ্বের পক্ষে এই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিন এমনই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

বস্তুত রাজনীতি সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই থাকুক, স্ট্যালিন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বের কথা চিন্তা করিলে আমাদের চিত্ত স্তম্ভিত হয়। তাঁহার প্রাণধর্মের প্রাচুর্যে এবং মনস্বিতার প্রখরতায় আমরা বিস্মিত হইয়া পড়ি। জর্জিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের অপরিজ্ঞাত পল্লীর একজন দরিদ্র যুবক দুর্দম অধ্যবসায়, অগ্নিময় আদর্শনিষ্ঠা এবং দুর্জয় সংকল্পশীলতার দ্বারা জগতের এক-ষষ্ঠাংশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সমুন্নত মহিমায় সমারূঢ় হইয়া যে অঘটন ঘটাইলেন, সত্যই তাহার তুলনা কোথায়? বিচিত্র এবং বিস্ময়কর তাঁহার জীবন। আঘাতের উপর আঘাত তাঁহার উপর ক্রমাগত আসিয়া পড়িয়াছে। অন্তত ছয়বার তিনি নির্বাসিত হন। কিন্তু সাইবেরেয়ার হিমময় অঞ্চলে নির্জন অবরোধ স্ট্যালিনের অন্তরের আগুনকে নির্বাপিত করিতে পারে নাই। বন্ধন-শৃংখল এই বিপ্লবী বীরের চরণ বন্দনা করিয়া নমস্কার করিয়াছে; কারাগার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। সব নির্যাতন, সকল নিপীড়ন, অকুতোভয় সংকল্পশীলতার সংগে অতিক্রম করিয়া দুর্গমের পথে তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হইয়াছে।

মার্শাল স্ট্যালিনের এমন অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের মূল উৎসের সন্ধান করিতে গেলে রাশিয়াকে দুর্গত অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার প্রবল প্রাণশক্তিরই আমরা পরিচয় পাই। বৃহত্তর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি প্রতিকূল সকল অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া লইয়াছেন। এই হিসাবে কেহ তাঁহার শত্রু, কেহ তাঁহার কাছে মিত্রও ছিল না। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় বুঝিলে মিত্ররূপে স্বীকৃত শক্তির সংগে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে তিনি যেমন ইতস্তত বোধ করেন নাই, তেমনই শত্রুরূপে পরিগণিত পক্ষকেও মিত্রস্বরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না। ব্যক্তি-স্বার্থ-বিবর্জিত আদর্শনিষ্ঠিত স্ট্যালিনের রাজনীতির এমনই ছিল অনাসক্ত স্বরূপ এবং দার্শনিক এমন উদার পটভূমির উপর স্ট্যালিনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তাহা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। একনায়কত্বের মূলে ব্যক্তি-স্বার্থের বিচারগত মোহ বা সংস্কার তাঁহার নীতিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে নাই।

তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় উত্তরাধিকারী ম্যালেনকভের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে কি না এবং যদি না হয়, স্ট্যালিনের মৃত্যু রাশিয়ার উপর এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া বিস্তার করিবে, এ সম্বন্ধে বর্তমানে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। পরবর্তী অবস্থা যেমনই দাঁড়াক, একথা সত্য যে, তাঁহার স্মৃতি মানব-সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।
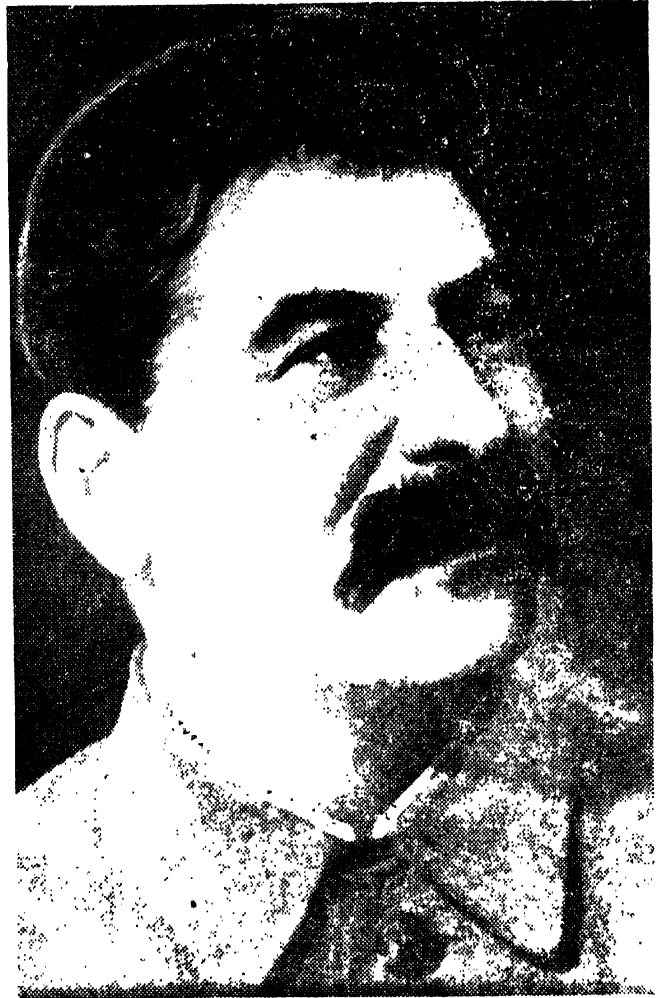
স্ট্যালিনের পরে

মার্শাল স্ট্যালিনের হঠাৎ পীড়া ও মৃত্যুর সংবাদে পৃথিবীময় যে নানা ভাব ও চিন্তার তরঙ্গ উঠেছে তার দোলা অনেকদিন ধরে চলবে। শত্রুমিত্র অনেকেই বলছেন স্ট্যালিনের সঙ্গে একটা যুগের অবসান হোল। প্রকৃতপক্ষে কোনো যুগের আরম্ভ বা শেষ কখন হয় সেটা সমসাময়িকদের পক্ষে বুঝা কদাচিৎ সম্ভব হয়। দীর্ঘকাল পরেও তা নিয়ে অনেক সময়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। স্ট্যালিনের জীবন ও কর্ম যে-যুগের অংশ সে-যুগ স্ট্যালিনের মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হোল, এরূপ মনে করার কোনো কারণ দেখি না। অবশ্য স্ট্যালিনের মৃত্যুতে বহুরকম প্রতিক্রিয়া অনুভূত হবে অথবা দেখা দেবে তবে কোনোটা হয়ত আশু দেখা যাবে, কোনোটা বা বিলম্বিত হবে। কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুতে এখনই পৃথিবীর ভারসাম্যের একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটল, এরূপ মনে করা ভুল হবে। স্ট্যালিনের মতো নায়কের মৃত্যুতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে ক্ষতি হোল সে তো স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু যে বিরাট যন্ত্র তিনি তৈরী করে গেছেন

বৈদেশিকী

তার জন্য একটা চালকগোষ্ঠীও তিনি গড়েপিটে রেখে গেছেন। তাঁদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর প্রভাব বহু স্তরে অনুভূত হবে। প্রথম প্রশ্ন হোল তাঁর সহকর্মী সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট-চালকরা বর্তমান সংকটে নিজেদের কীভাবে চালিত করবেন। অনেকের ধারণা ছিল যে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা অধিকারের জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। এ ধারণা যারা পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই একটা বড়ো ভুল করেন। লেনিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে অবস্থা ছিল, তার শাসনযন্ত্র যে অবস্থায় ছিল, নেতাদের মধ্যে বৈপ্লবিক মতবাদের যে সংঘর্ষ সজীব ছিল তার সঙ্গে সোভিয়েটের বর্তমান পরিস্থিতির কোনো তুলনা হয় না। অনেকে মনে করেন যে, লেনিনের মৃত্যুর পরে যেরূপ ঘটেছিল এখনও সেইরকম ঘটা সম্ভব। আসলে তা মোটেই সম্ভব নয়। তখনকার তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র এখন অনেক বেশী সুসংহত. গত ত্রিশ বছর ধরে যে শাসন-যন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে তার দৃঢ়তাও অবিসম্বাদিত এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধী মতবাদ বা দলের কোনো চিহ্ন নেই। স্ট্যালিনের হাতে অবশ্য ক্ষমতার অভূতপূর্ব সংহতি হয়েছিল কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত ডিক্টেটরীতে মাত্র পর্যবসিত হয়নি। স্ট্যালিন ক্ষমতা সঞ্চালনের যে যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন সেই যন্ত্রের নিজের একটা বিপুল শক্তি জন্মেছে। স্ট্যালিনের অবর্তমানে যাঁরা কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন তাঁদেরও সেই যন্ত্রের নিয়ম মেনেই অনেকটা চলতে হবে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে এতো তাড়াতাড়ি যে তাঁর স্থলে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মঃ ম্যালেনকভের নাম এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম ঘোষিত হল তা থেকে সেই যন্ত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণিত হয়। অবশ্য এটাও মনে হয় যে, পূর্ব থেকেই অর্থাৎ স্ট্যালিন যখন জীবিত এবং সুস্থ ছিলেন তখনই বোধহয় স্থির হয় যে, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রীর পদে মঃ ম্যালেনকভ প্রতিষ্ঠিত হবেন। বলা বাহুল্য প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলেই যে মঃ ম্যালেনকভ স্ট্যালিনের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন তা নয়। সেই হিসাবে স্ট্যালিনের 'উত্তরাধিকারী' হওয়া কারো পক্ষেই হয়ত সম্ভব নয়। আবার এই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে নূতন গভর্নমেণ্টের ঘোষণা হয়ে গেছে বলেই যে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ির আর কোনো সম্ভাবনা নেই তা বলা যায় না।

শাসনযন্ত্র যতো সুদৃঢ়ই থাকুক না

কেন একটা বিষয়ে নূতন সোভিয়েট নেতাদের মুশকিল হবেই। স্ট্যালিনের নামে যে কাজ হোত তার সুযোগ আর রইল না। জনসাধারণের মনের উপর স্ট্যালিনের যে প্রভাব ছিল তার দ্বারা সরকারী নীতি যখন যাই হোক না কেন লোককে দিয়ে তাই অনায়াসে মানিয়ে নেয়া যেতো। স্ট্যালিনের কথার প্রতিবাদ অসম্ভব ছিল, সেটা কেবল পুলিশের ভয়ে নয়। এখন গভর্নমেন্টের নীতি সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হলে সেটাকে স্ট্যালিন নামের মন্ত্র দিয়ে দূর করা যাবে না। ফলে গণতান্ত্রিক আলোচনা ও সমালোচনার ক্ষেত্র বাড়তে পারে, আবার উল্টাও হতে পারে অর্থাৎ পুলিশের ভয় দেখিয়ে লোককে চুপ করিয়ে দেবার চেষ্টার বৃদ্ধিও হতে পারে। কোনটা হবে বলা যায় না।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর প্রভাব সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন রিপাবলিকগুলির উপর কিরূপ হবে ঠিক বলা যায় না। অ-রুশ রিপাবলিকগুলি মস্কোর শাসন সম্বন্ধে সহসা অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে এরূপ মনে হয় না। তবে স্ট্যালিনের প্রভাব অন্তর্হিত হলে ধীরে ধীরে অন্যরকম একটা ভাব দেখা দিতে পারে যার সুযোগ সোভিয়েট বিরোধীরা নেয়ার চেষ্টা করবে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর প্রভাব পূর্ব য়ুরোপের সোভিয়েট প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির উপর কিরূপ হতে পারে সেটাও নিশ্চিত বলা কঠিন। তবে স্ট্যালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মস্কোর ইচ্ছা যত সহজে ও বিনা প্রতিবাদে 'পিওপলস্ ডেমোক্র্যাসি'র দেশগুলিতে প্রতিপালিত হোত এর পরে ততটা হবে বলে মনে হয় না।

স্ট্যালিনের মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট জগতের উপর কী প্রভাব হয় সেটাও লক্ষণীয় বিষয়। স্ট্যালিনের অবর্তমানে কম্যুনিস্ট জগতের সবচেয়ে নাম-করা লোক হবেন চীনের মাও সে তুং। রাষ্ট্রের ক্ষমতার দিক দিয়ে অবশ্য সোভিয়েটের প্রাধান্য থাকবেই কিন্তু কম্যুনিস্ট জগতের নৈতিক নেতৃত্ব মাও সে-তুং-এর উপর বর্তাবার সম্ভাবনা আছে। এর ফল নানারকম হবে যার আলোচনা আপাতত করার প্রয়োজন নেই।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার গতি কোন্ দিকে হবে তাই নিয়ে পৃথিবীময় জল্পনা কল্পনার অবধি নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েট কি করবে সেটা অনেকটা নির্ভর করে অন্য দেশগুলি, বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রতি কি মনোভাব প্রকাশ করে। স্ট্যালিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট দুর্বল হয়েছে, অতএব এখন তাকে কাবু করার জন্য সব দিক দিয়ে উঠে পড়ে লাগা যাক—যদি এই নীতি গ্রহণ করা হয় তবে সোভিয়েটের পক্ষেও উগ্রভাব অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সোভিয়েট যদি মনে করে যে, তাকে ভাঙবার, নষ্ট করার চেষ্টা হবে তবে আত্মরক্ষার জন্য সে অবশ্যই প্রাণপণ করবে। আর যদি সোভিয়েটের সঙ্গে সহজ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয় তবে সোভিয়েটের নীতিও তদনুরূপ হবে আশা করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মার্কিন সরকারের মতিগতি অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে সেটা খুবই আশঙ্কার কারণ। আমেরিকা বলতে পারে যে, শত্রু বিপদে পড়লে কি সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতো। হয়ত না। কিন্তু তাহলে আর কম্যুনিস্টদের 'নীতিহীনতা'র দোষ দেয়া কেন? 'খৃস্টানী' ফলানোই বা কেন?

৯।৩।৫৩

শোভাযাত্রা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আঙুলে যায় না ঠিক গোনা ঃ
শোভাযাত্রা কতবার দেখেছি কত-না।

বিচিত্র এ নগরের জনাকীর্ণতায়—
'রিলে'র ছবির মত যত দৃশ্য আসে আর যায় ঃ
যা-কিছু সে রূপ
সব যেন ছাই-হওয়া ধূপ--
নিমেষেই বাতাসে মিলায়।

শোভাযাত্রা শুভ পরিণীত ঃ
সে-ই শুধু কোনোদিন মুছে যায় নি ত!
দীপান্বিত রাজপথ,
কোলাহল আনন্দ-মুখর ঃ
মনোহর
চলেছে স্বপ্নের যাত্রী বধূ আর বর—
দেখেছি তা' নয়ন-সার্থক।

পুরাণের পুরোনো নাটক ঃ
হাজির থেকেছি তারো বারবার পুনরভিনয়ে —
আশার আকাশ-দীপ-নেভা
জায়া আর জননীর বিহ্বল বিস্ময়ে;
শুনেছি সে মর্মভেদী তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ঃ
খর সেই লবণাক্ত স্বাদ
হৃদয়ে এখনো আছে লেগে!
জীবনেরে ভালোবাসি তথাপি আবেগে।

শোভাযাত্রা অন্তহীন সময়েরো অচেনা প্রান্তরে।
ল্যাটিমের চেয়ে আরো জোরে
এ পৃথিবী ঘোরে;
হীরের কুচির মত গুঁড়ো-গুঁড়া তারা
সারারাত চোখে হানে শাণিত ইশারা;
গলানো গিনির মত সূর্যমূর্তি জ্যোতির্বলয়ঃ
ভয় করে, ভয় হয়—
কি রয়েছে, র'য়ে গেছে হিরন্ময় অন্তরালে এর!
খেই খুঁজে ফিরি এক গূঢ় রহস্যের
স্তব্ধ নিরুত্তর।

এ মহানগর
বহু শোভাযাত্রা পর
সেদিন সহসা দিলো তবু কি-আশ্চর্য উপহার ঃ
স্বর্গের সংসার-ছাড়া কোনো দেবতার
ছবি যেন—শুভ্র-শুচি চারু প্রসন্নতা—
পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য হাতে,
মরাল-নিন্দিত স্থির চরণ-সম্পাতে
শিবচতুর্দশীব্রতা
কন্যা এক কুমারিকা, একাকিনী মিশে গেল
সন্ধ্যার তিমিরে ঃ
অজানা গলির কোন ভৈরব-মন্দিরে।

বছর বছর যুঝে
যে অর্থের কোনো খেই পাইনিক' খুঁজে—
অকস্মাৎ তারে যেন মূর্ত দেখিলাম ঃ

সৃষ্টি-উচ্চকিত সেই নাম—
আলোকবর্ষের ঢেউ পদতলে পাক খেয়ে মাথা
কুটে মরে—
বিধুর বিরহ যেন ললাটের চন্দ্রমা ধূসর—
ধ্যানমৌন, নিশ্চেতন মহামহেশ্বর!
উমার তপস্যা চলে তথাপি অম্লান—
জীবধাত্রী নীলকণ্ঠে প্রদক্ষিণ করে।

শিল্পচর্চা

নন্দলাল বসু

স্বভাবে যত বস্তু দেখি তার একটা না একটা রঙ আছে। রঙ ছাড়া কোনো বস্তুর রূপের ধারণা হয় না। যা কিছু রঙ শুদ্ধ আর মিশ্র এই উভয় শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। হলদে, লাল, নীল—এই তিনটি শুদ্ধ রঙ। শুদ্ধ রঙের বহুবিধ মিশ্রণে বহু মিশ্র রঙ। সাদা আর কালোকে ঠিক রঙ বলব না—ছবির যত কিছু বর্ণবৈচিত্র্য তার দুটি অন্তিম সীমা প্রকাশের আর অপ্রকাশের বা বিলয়ের।

প্রকৃতিতে বস্তুর রঙ ছাড়া আরেকটি ব্যাপার দেখতে পাই—কোনো বস্তু উজ্জ্বল, কোনোটি বা ম্লান। অর্থাৎ, কোনোটি আলো-ঘেঁষা, কোনোটি বা অন্ধকার-ঘেঁষা, ছায়া-ঘেঁষা। কোনোটি শুভ্রের দিকে উন্মুখ, কোনোটি বা কালোতে বিলীয়মান। সাদা আর কালো উজ্জ্বলতার বা ম্লানতার বিভিন্ন পর্দা (grade) হিসাবে, টোন (tone) হিসাবে সব রঙেই আত্মগোপন ক'রে আছে।

শিল্পরত্ন, অভিলষিতার্থচিন্তামণি, জৈনকল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বিভিন্ন রঙ ও তাদের প্রত্যেকটির উপাদানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। স্বভাব পর্যবেক্ষণ করলে, স্বভাবের বস্তুগুলির বিভিন্ন বর্ণের স্মৃতি চিত্তপটে স্থায়ীভাবে এঁকে রাখলে, তারই সাদৃশ্যে ছবিতে যেসব রঙ, প্রত্যেক রঙের ম্লানোজ্জ্বল যেসব পর্দা, ব্যবহৃত হয়েছে বা ব্যবহার করা হবে—তার ধারণা খুব পরিষ্কার হবে, সুখকর হবে। শিল্পশাস্ত্রাদি থেকে প্রাপ্ত আর প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দিষ্ট, এরূপ রঙের দুটি তালিকা পরে সংকলনের ইচ্ছা রইল।

এখন, নানাপ্রকার ভিত্তিচিত্রে, কাঠে, কাপড়ে, রেশমী বস্ত্রে, কাগজে ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা **মাটি ও পাথরের যেসব রঙ বহুশঃ** ব্যবহার ক'রে থাকি, সেগুলির বিবরণ ও প্রস্তুতপ্রণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই সব রঙ নিজেরা তৈরি ক'রে নিলে প্রচুর রঙ খুব সস্তায় পাওয়া যায়। মেটে বা পাথুরে রঙ এই ক'টি আমরা ব্যবহার করি—

সাদা। **কাঠখড়ি।**

হলদে। এলামাটি, উজ্জ্বল ও মেটে দুই প্রকার।

লাল। গেরিমাটি, উজ্জ্বল 'সোনা' গেরি এবং কাল্‌চিটে (মেটুলি রঙ) দুই প্রকার।

সবুজ। 'হরা পাথর' পশ্চিমে জয়পুর প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়।

নীল। রাজাবর্ত (lapis lazuli) শক্ত পাথর, মহার্ঘ আর দুর্লভও বটে।

যে কোনো রঙ বেশি শক্ত হলে (যেমন হরা পাথর) শিলে জল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষে রঙ বার করতে হবে। শিলটি ঢালু ক'রে সামনে পাততে হবে আর শিলের নীচের দিকে রঙ ধরবার জন্যে একটি মুখ-চওড়া গাম্‌লা মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। কাদা-কাদা ঘষা রঙ গামলায় জমবে। গামলায় রঙ ভরে গেলে তুলে তুলে অন্য পাত্রে রাখবে। সের দুই আন্দাজ পেষা বা ঘষা রঙ হলে, দশ সের জল ধরে এমন একটি বড়ো বাল্‌তিতে জল ভরে পূর্বোক্ত রঙ কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালো করে ঘুলিয়ে দাও। ১০।১৫ সেকেন্ড অপেক্ষা করার পরই বাল্‌তির রঙ-ঘোলা জলটি ধীরে ধীরে উপর উপর অন্য একটি বাল্‌তিতে ঢেলে নাও। ঢালবার সময় পূর্বপাত্রের তলার রঙটি নেবে না বা ঘাঁটবে না। নতুন পাত্রে রঙ-ঘোলা জল বেশ থিতিয়ে গেলে পাত্রের তলদেশে রঙের একটি পলি পড়বে; এখন খুব সাবধানে, পলি-পড়া রঙ না ঘুলিয়ে, যতদূর হয় উপরের জলটি ফেলে দাও। এখন একটি ন্যাকড়ার পলতের এক মুখ পাত্রের জলে অন্য মুখ বাহিরে নিচু করে রাখলে (siphon-এর মতো) অল্প যে জল পাত্রে বাকি আছে তাও বেরিয়ে যাবে। এই পদ্ধতিকে রঙের পলি পড়ানো বলা যায়। পলি-পড়ানো রঙ খুবই মোলায়েম হয়। **আরো মোলায়েম রঙের প্রয়োজন হ'লে, একবার পলি-পড়ানো রঙে আবার জল ঢেলে ও ঘুলিয়ে নিয়ে পূর্বের** রীতিতেই নতুন একটি পাত্রে আবার পলি পড়ানো যেতে পারে। এই রকম মোট বার তিন পলি পড়ালে খুবই মোলায়েম রঙ পাওয়া যাবে। একটি পাত্রের রঙ-ঘোলা জল আরেকটি পাত্রে ঢালার পরে পূর্বপাত্রে যে মোটা রঙ তলানি হিসাবে রয়ে গেল, সেটি ফেলে দেবার দরকার নেই; নতুন রঙের সঙ্গে আবার নতুন ক'রে পিষে বা বেঁটে নিলেই হল। কাঠ খড়ি, এলামাটি, গেরিমাটি, হরা পাথর, অল্পবিস্তর কঠিন যে-কোনো মাটি বা পাথরের রঙ এইভাবে কার্যোপযোগী ক'রে নেওয়া যায়।

রঙ তৈরি হয়ে গেলে পরিমাণ-মতো গঁদের আঠা মিশিয়ে ছোটো ছোটো রঙের 'লেচি' বা 'কেক' বানিয়ে রাখা চলে। অথবা পাউডার বা 'চূর্ণ' আকারেও রাখা যেতে পারে। কিন্তু, কাচের বা কাচকড়ার বোয়েমে পরিষ্কার জল মিশিয়ে রাখা শুকনো রাখার চেয়ে প্রশস্ত। মাঝে মাঝে পুরাতন জল ফেলে দিয়ে পরিষ্কার নতুন জল দিতে হবে। বরোদা-কীর্তিমন্দিরে ভিত্তিচিত্র আঁকবার সময়, একবারের কাজ শেষ হলে ব্যবহার্য রঙ জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে আসা গেছে, পর বৎসর ফিরে গিয়ে সেই রঙেই কাজ হয়েছে।

প্রদীপের ভুষো থেকে কালো রঙ তৈরি করার বিধি। একটা সরায় সর্ষে অথবা তিলের তেল ঢেলে তার ভিতর সর্ষে অথবা তিলের পুঁটুলি ডুবিয়ে দাও। পুঁটুলি বাঁধবার সময় একটুখানি ন্যাকড়া পল্‌তের মতো বার করে রাখবে এবং সেইটি ধরিয়ে দিলেই শিখা উঠবে। এখন এই সরাটি থাকবে চারখানা বা তিনখানা ইঁটের মাঝখানে, সেই ইঁট কখানির উপর একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো সরা এমনভাবে উপুড় ক'রে রাখবে যাতে শিখার সব কালী বা ভুষো এই সরার ভিতর পিঠে জমতে থাকে। কাঁচা মাটি ইঞ্চি দেড় পুরু ক'রে উপুড়-করা সরার উপর পিঠে লাগিয়ে রাখবে। ঘরের এমন কোণে ভুষো পড়াবে যেখানে হাওয়া নেই। **মাঝে মাঝে দেখবে ভুষো পড়ছে** কিনা।

ভূষো যথেষ্ট জমলে তালপাতার টুকরা দিয়ে (পাকা তালপাতা কতকটা টেবিল-ছুরির পাতের আকারে) চেঁছে কাগজের ঠোঙায় বা মোড়কে রাখতে হবে। তেল-পলতের ভূষোয় অল্প তেল ধোঁয়ার সঙ্গে এসে যায়, এই তেল বার করবার জন্যে ভূষোগুলি একটি কাচের বোয়েমে পুরে খানিকটা বাছুরের চোনা মিশিয়ে কাদা কাদা ক'রে বোয়েমের মুখটি বন্ধ করে রাখবে পাঁচ-ছয় দিন—মাঝে মাঝে জল দিতে হবে যাতে একেবারে না শুকিয়ে যায়। পরে ভূষোটি শুকিয়ে গেলে বোয়েম থেকে বার ক'রে আন্দাজমতো শিরীষের আঠা (গরম) বা গঁদ মিশিয়ে খলে মেড়ে ছোটো ছোটো বড়ি ক'রে রেখে দাও। অথবা শুকনো গুঁড়ো ভূষো একটি পাৎলা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে বাঁধবে। গঁদ বা শিরীষের জল একটি কর্‌করে চীনা মাটির পাত্রে বা একটি মাটির সরায় রেখে, পুঁটুলিটি ঐ পাত্রে ধীরে ধীরে ঘষে ঘষে রঙ তৈরি করবে। ঐ ঘষা রঙ জল শুকিয়ে অল্প আঁট হলে ছোটো ছোটো বড়ি ক'রে রেখে দেবে। আঠার ভাগ ঠিক হল কিনা পরীক্ষা ক'রে নেবে।

আঠা হিসাবে গঁদের চেয়ে শিরীষই ভালো। সর্বদা গরম শিরীষের আঠা ব্যবহার্য। শিরীষ-মেশানো রঙ ব্যবহার করার কালে, মেড়ে নেবার দরকার হলে, ঠাণ্ডা জল মেশানো চলবে না। রঙ ঘষবার জন্যে চীনে মাটির বাটির প্রয়োজন।

আঠা মেশানো নয় এমন শুকনো ভূষোও কিছু রাখা দরকার; ফ্রেস্কো বা ডিম-আঠা-মেশানো কাজে ব্যবহার করা চলবে।

'লাল স্যাহি' বা লাল কালী। হিঙ্গুল থেকে রঙ তৈরির এই বিধি জৈনকল্পদ্রুমে লেখা আছে।—

সব থেকে ভালো হল কোরা ডেলা হিঙ্গুল, যাতে পারা আছে। ঐ হিঙ্গুল মিছরির জল দিয়ে খলে খুব ভালো ক'রে ঘুঁটে জলটি একটু থিতোতে দাও। তখন নীচে হিঙ্গুলের লাল রঙটুকু রক্ষা করে উপর উপর হলদে জলটা আস্তে আস্তে ফেলে দাও। আবার মিছরির জল ঢেলে রঙটি মাড়তে হবে এবং নীচে লাল রঙ থিতোলে উপরের হলদে জল সাবধানে ফেলে দিতে হবে। এইভাবে ১০ এমন কি ১৫ বার পর্যন্ত মিছরির জল দিয়ে দিয়ে ধোওয়া হলে পরে হিঙ্গুলটি টক্‌টকে লাল হয়ে উঠবে। বার বার মিছরির জলে ধুয়ে পরিষ্কার করার বিষয়ে আলস্য করলে চলবে না। যা হোক, উল্লিখিত পরিষ্কৃত হিঙ্গুল প্রথমে নিমপাতার রসে মেড়ে, পরে তাতেই ভেড়ার দুধ দিয়ে মাড়বে। অতঃপর লেবুর রস মিলিয়ে ভালো করে ধুয়ে জলীয় অংশটি সাবধানে ফেলে দিয়ে রঙের অংশটি রেখে দেবে। এখন মিছরি ও গঁদের জলে বেশ করে মেড়ে ছোটো ছোটো বড়ি করে শুকিয়ে রেখে দাও।

রঙে গঁদের ভাগ ঠিক হল কিনা তার পরীক্ষা। এক ফালি কাগজে গঁদ-মেশানো হিঙ্গুল আঙুলে করে লাগাও এবং রঙ ভিতর-পিঠে রেখে কাগজটি ভাঁজ করো। পরে একটি স্যাঁৎসেঁতে (স্নানের বা জল রাখার) ঘরে মাটির পাত্রে রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরে যদি দেখা যায় রঙে কাগজের ভাঁজ দুটি জুড়ে গেছে তা হলেই বুঝবে রঙে গঁদ বেশি হয়েছে, আর নখ দিয়ে খুঁটলে রঙ উঠে যায় যদি বুঝতে হবে আঠা কম হয়েছে।

এইভাবের হিঙ্গুল জৈন পুঁথিচিত্রে ব্যবহৃত হয়ে প্রায় ৪০০ বৎসর অবিকৃত আছে। আরো বেশি থাকবে কিনা বলা যায় না। অজন্তা-গুহাচিত্রেও ব্যবহার হয়েছিল মনে হয়, কিন্তু ঠিক থাকেনি।

হিঙ্গুলে রঙ তৈরির নেপালী পদ্ধতি. শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তীদেবী (আলমোড়া) জানিয়েছেন—আধ ভরি হিঙ্গুল অল্প অল্প গোরুর দুধ মিশিয়ে খলে মাড়ো। এক চিম্‌টি চিনি, এক চিম্‌টি সোহাগার গুঁড়ো, দু চিম্‌টি রামখড়ি (হাতে খড়িতে লাগে) বা সোপ্‌স্টোনের গুঁড়ো আর দেড় চিম্‌টি বাব্‌লার গঁদ মিশিয়ে খলে বহুক্ষণ ধরে খুব ভালো ক'রে মাড়ো। মাড়া হলে কাচের পাত্রে পুরে রেখে দাও।

হরিতাল। দগরি ও বরগি এই দুই জাতের হরিতাল আমরা জয়পুরের কারিগরদের কাছে সংগ্রহ করি। দগরি হরিতাল পুঁথির লেখা-সংশোধনের কাজে লাগে। ছবির রঙ হিসাবে বরগি হরিতালই ভালো; তার ভাঁজে ভাঁজে অভ্রের পর্দা থাকে, সেগুলি সোনার পাতের মতো চিক্‌চিক্ করে। এই রঙ তৈরি করার নেপালী পদ্ধতি আলোচনা করা যাচ্ছে—

হরিতালকে খলে মেড়ে মেড়ে ময়দার মতো মিহি গুঁড়ায় পরিণত করো। গুঁড়া মজবুৎ কাপড়ে ছেঁকে নাও। ছাঁকা গুঁড়ায় বাব্‌লার আঠার জল মিশিয়ে ভালো করে মেড়ে নাও। সে কাজ উত্তমরূপে সমাধা হলে ছোটো ছোটো বড়ি করে বা পাটালির মতো আকার দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে, শুকিয়ে রেখে দাও।

অবশ্য, রঙ তৈরি করার আগে, হরিতাল শোধন করে নিলেই ভালো। তা করতে হলে একটি মাটির হাঁড়িতে করে তিলের তেল জ্বালে চড়াও। তেল ফুটতে থাকলে, হাঁড়ির উপর আড়ভাবে একটি কাঠি রেখে তা থেকে হরিতালের টুকরাটি সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে দাও এবং মিনিট পনেরো ফুটন্ত তেলে রাখো। (হরিতালটি বেশি গুঁড়ি গুঁড়ি হলে ন্যাকড়ায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে।) খুব সাবধান—হরিতাল যখন ফুটবে পাত্রের নিকটে যাবে না। কারণ, হরিতালের বাষ্প (gas) বিষাক্ত। ফোটানোর পরে, হরিতাল লেবুর রসে মেড়ে নিয়ে জল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে ফেলে, তেলা ভাবটি দূর করতে হবে।

গন্ধক। অবিকল উল্লিখিত পদ্ধতিতে গন্ধক থেকেও রঙ তৈরি করে নেওয়া যায়।

এই হিঙ্গুল ও হরিতালের রঙ জৈন পুঁথির ছবিতে ও জগন্নাথধামের পটে ব্যবহার হতে দেখা যায়। বহু বৎসরেও রঙ প্রায়ই উজ্জ্বল আছে। কিন্তু আরো বহুগুণে পুরাতন ছবিতে বা ভিত্তিচিত্রে, অজন্তায়, সিগিরিয়ায়, অন্যান্য স্থলে, খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ থেকে ৯০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যা আঁকা হয়েছে, তাতে হিঙ্গুল হরিতাল অলক্তক বা নীলবড়ি কোনো রঙের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। চিত্রিতের বহু স্থল, যেমন হাতের তেলো, পায়ের চেটো, ঠোঁট, এ সবের রঙ উঠে গিয়ে অন্তরের সাদা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ঐ জায়গায় হিঙ্গুল বা আলতার রঙ লাগানো হয়েছিল। প্রাচীন অভিজ্ঞ শিল্পীরা এই রঙগুলি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। হরিতাল হিঙ্গুল প্রভৃতি উজ্জ্বল রঙগুলি পারা-ঘটিত বলেই সময়ে উবে যাওয়ার বা কালো হয়ে

যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই, হিঙ্গুলের বদলে ভালো উজ্জ্বল গেরি রঙ আর হরিতালের বদলে উজ্জ্বল এলামাটির রঙ ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকাই ভালো।

জাঙাল বা জাঙ্গাল রঙ (emerald green)। একটি মাটির হাঁড়িতে বা ভাঁড়ে তামার কুচি ভরে জাম্বীর (গোঁড়া) লেবুর রসে ভিজিয়ে দাও। কুচিগুলি লেবুর রসে ডুবে থাকবে। এখন উপযুক্ত মাপের একটি মাটির সরা তার মুখে ঢাকা দিয়ে এঁটেল মাটি বা সিমেণ্টের ওলোপ (বাঁধন) দাও। এই পাত্রটি হাত মুখ ধোওয়া হয় এরকম স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বা নর্দমার ধারে মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হবে। দু তিন মাস বাদে পাত্রটির ঢাকনি খুললে দেখা যাবে রঙ তৈরি হয়েছে। সবটা তামা না ক্ষয় পেয়ে থাকলে পুনর্বার অল্প লেবুর রস দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখো। পরে, সমস্ত তামা জ'রে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সবুজ হয়ে গেলে, তখন রোদে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে শিশিতে ভরে রাখো। ছবিতে ব্যবহার করার প্রাক্কালে আঠা মিশিয়ে মেড়ে নেবে। এই রঙটি স্থায়ী বলা যায়।

উদ্ভিজ্জ রঙ। ত্রিফলার কালো। একটি মাটি বা এলুমিনিয়ামের পাত্রে এক ছটাক ত্রিফলা-গুঁড়ো চায়ের চামচের এক চামচ নীলকসিস্‌ ও চার পাঁচ সের জল দিয়ে তিন চার বলক ফোটাতে হবে। সবশুদ্ধ দেড় ঘণ্টা আন্দাজ অল্প অল্প জল মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এইটি শুকিয়ে এলে আর একটু জল মিশিয়ে পাতলা ক্ষীরের মতো কর। কাগজে লাগিয়ে দেখো, রঙটি বেশ কালো না হয়ে থাকলে আরো একটু নীলকসিস্‌, আন্দাজ সিকি চামচ, মেশাতে হবে। হীরাকস দিলে কালো হয় বটে, কিন্তু কাপড় বা কাগজ যাতে লাগানো যায় তা জরে ফুটো হয়ে যাবে। ত্রিফলার কালোতে পশম রেশম ও সুতি কাপড় ছোপানো চলে। ছোপাবার সময় রঙটি অল্প নুন মিশিয়ে ও কাপড় দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নেবে। এই রঙ শুকিয়ে গেলে শিশিতে ভরে রাখবে। এটি রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগা দেওয়ালের মতো কালো হবে।

নীল (indigo) গাছের পাতা থেকে তৈরি হয়। বাজারে একে দেশী নীল বলে; এদেশে এখনো অনেক জায়গায় তৈরি হয়। বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করলেই চলবে। এই নীলে গঁদের জল মিশিয়ে বহুক্ষণ ধরে মেড়ে মিল করতে হবে। রঙ তৈরি হলে একটি চীনামাটির পাত্রে বা কলাপাতায় রেখে শুকিয়ে পাটালির আকারে কেটে বা বড়ি পাকিয়ে শিশিতে রেখে দিতে হয়। ব্যবহারের সময় আঠা কম মনে হলে আরেকটু আঠা মিশিয়ে নিলেই হবে।

এদেশীয় রাজপুত, কাংড়া, জগন্নাথের পট, এগুলিতে জৈব ও উদ্ভিজ্জ অস্থায়ী রঙ শাদার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হত। ছবি আঁকা শেষ হলে তার উপর গালা বা কোনো আঠা বা অন্য কিছু বার্নিশ দেওয়াতে রঙ স্থায়ী হত। এ সব ছবিতে ঐরূপ অস্থায়ী রঙ (চুনমিশ্রিত ভিত্তিচিত্রের জমিতে বা রৌদ্রে অতি অল্পকালেই উবে যায়) প্রায় দুইশত বৎসর অবিকৃত থাকতে দেখা গেছে; সরাসরি রোদ না লাগলে আরো বেশ কিছু দিন থাকতে পারে। সিংহলে কল্যাণী বৌদ্ধ মন্দিরে ও সেখানকার পুরাতন পুঁথির পাটায় আলতা ও নীল রঙের উপর বার্নিশ দেওয়া আছে বলেই তা ৪০০-৫০০ বৎসর টিকে আছে।

ক্রিমদানা বা লটকনা-বীজের রঙ বেনের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ক্রিমদানা এক তোলা ও লোধের ছাল তিন তোলা পাঁচ তোলা জলে দিয়ে তিন চার দিন রোদে রাখো; শুকিয়ে গেলে অল্প জল মিশিয়ে নেবে। পরে কাপড়ে ছেঁকে উনানে অল্প তাতিয়ে নিয়ে, পরিষ্কার তুলোতে শুষে নিয়ে গোল চাকতির আকারে রেখে দাও। লোধ ব্যবহার করাতে ক্রিমদানার ময়লা কেটে গিয়ে রঙটি উজ্জ্বল হয়।

জৈব রঙ। অলক্ত বা আলতা। ভালো লাক্ষাকাটি (লাক্ষা পোকার বাসা) বাজার থেকে কিনে এনে জলে উত্তমরূপে ধুয়ে অল্প কুটে নাও। এতে অল্প সোহাগা ও লোহার গুঁড়ো মিশিয়ে সিদ্ধ করো। সিদ্ধ করাতে যে ক্বাথ নির্গত হবে তা ঘন হয়ে এলে তুলোয় শুষে নিয়ে ছোটো ছোটো পাৎলা চাকতির আকারে শুকিয়ে রেখে দাও। কাজের সময় অল্প জলে ঐ তুলো রগড়ে নিলেই লাল রঙ বেরুবে; অল্প আঠা মিশিয়ে কাজ করা চলবে। সেকালে শিল্পীরা ছবির প্রথম খসড়া আলতা-রঙে তৈরি করতেন। এ রঙ বেশী দিন থাকে

না; ছবি আঁকা হবার পরে খসড়ার দাগ মিলিয়ে যায়, আর পাৎলা করে ব্যবহার করলে অল্প থেকে গেলেও অন্য রঙের কোনো ক্ষতি করে না।

ফ্রেস্কো (fresco)

বালি ও চুণের প্লাস্টার (plaster) ভিজে থাকতে থাকতে তার উপর যে ছবি আঁকা হয় তাকেই ফ্রেস্কো বা ইতালীয় ফ্রেস্কো বলা হয়। অভিধানে পাই: method of painting in water-colour on fresh plaster অথবা in water-colour laid on wall or ceiling before plaster is dry.

কর্নিক – ৬" লম্বা (হাতের চেটোর মাপে)		১
গজ পাটা		২
উসো		৩
উসো		৪
কোনা মাটাম		৫
বোতল		৬
তুলি রাখার তুলি-দান		৭
তুলি (নরম লোমের) CAMEL HAIR		৮
চিনে মাটির বা মাটির ছোট তলা-থেবড়া বাটি		৯
কুশের বা খড়ের কুঁচি		১০
হাত রাখার STICK (OIL PAINTING এ লাগে)		১১
মিহি জালের ছাঁকনি		১২
জলের গামলা		১৩
একটা ভিজা তোয়ালে		১৪
কিছু মিহি ছেঁড়া কাপড়		১৫

ভিত্তি চিত্র, বিশেষতঃ ফ্রেস্কো, করার তোড়জোড়

ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে ছবি করতে গেলে প্রথমেই নিখুঁত রেখাচিত্র ক'রে নেওয়া দরকার। অন্য একখানি কাগজে এই রেখাচিত্রের ছাপ (tracing) তুলে নিয়ে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রঙিন ছবি করা চাই। অতঃপর মূল রেখাচিত্রের রেখা ধ'রে ধ'রে ছিদ্র ক'রে 'খাকা' তৈরি ক'রে রাখতে হবে। খাকা'র উপর গুঁড়ো রঙের পুঁটুলি থুপে থুপে দেয়ালে ছাপ তুলে নেওয়া যাবে আর রঙিন আদর্শটি চোখের সামনে বা মনের সামনে থাকায় ঐ অনূদিত (transferred) রেখাবলীর আশ্রয়ে মনোমত ছবি অতিশয় দ্রুত আঁকা যাবে। অবশ্য, প্রবীণ শিল্পী, রূপ-কল্পনা যাঁর করামলকবৎ, ক্রিয়া-কৌশলের দক্ষতাও প্রচুর, তাঁর পক্ষে রেখাচিত্র বা রঙিন ছবি বা খাকা একান্ত প্রয়োজনীয় না হতে পারে। তবু এরকম শিল্পীও চিত্রিতব্য রূপ 'অভ্যাস' ক'রে রাখেন বা তার 'শর্ট্ হ্যান্ড্ নোট' নিয়ে রাখেন, ফলে ভিত্তিপটে আঁকা হবার আগেই চিত্ত-পটে তার ধ্যান বা ধারণা দৃঢ় ও নিঃসংশয় হয়ে থাকে। এজাতীয় কাজ দ্রুত সমাধা করতে হয় আর এতে সংশোধনের অবকাশ নেই বলা চলে; এজন্য অল্পঅভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে রেখাচিত্র আর রঙিন আদর্শ বা কার্টুন (cartoon) তৈরি ক'রে কাজে হাত দেওয়াই নিরাপদ ও প্রশস্ত।

প্লাস্টার তৈরি করতে বিশেষপ্রকার চুণ আর বালির প্রয়োজন। ফ্রেস্কোর কাজে নদীর বালি সব থেকে উপযোগী। বালি হাতে রেখে ঘষলে কর্ কর্ ক'রে শব্দ হয়, এই হল এই বালি চেনার উপায়। সমুদ্র তটের গোল-দানা বালি এ কাজের উপযোগী নয়, বেশি মিহি, তা ছাড়া ঐ বালির সঙ্গে মিশ্রিত নুন ছবির রঙের পক্ষে ক্ষতিকর। এখন, নদীর বালি (তার মধ্যেও বিশেষ ভালো যাকে 'মগ্রার বালি' বলা হয়) সুজি-আটা-চালা ছাঁকনিতে বা অনুরূপ অন্য কোনো জালের পাত্রে চেলে নিতে হবে। কাঁকর

আর অন্যান্য অবান্তর জিনিস বাদ প'ড়ে যাবে। মাটি বা অন্য কিছুর মিশ্রণ না থাকে এ বিষয়ে বিশেষ হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

ফ্রেস্কোতে ঝিনুকের চুন, ঘুটিঙ-চুন, পাথুরে চুন—যে-কোনো একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ঝিনুকের চুন সব থেকে ভালো ব'লে শোনা যায়। ঘুটিঙ-চুন তৈরি হয় ঘুটিঙ পুড়িয়ে। এই চুন জরিয়ে (slake ক'রে) নেবার জন্যে জল দিয়ে হাঁড়িতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে চুন ঘেঁটে নিতে হবে এবং থিতোলে জলটা বদলে দিতে হবে। চার পাঁচ দিন গেলে মোটা জালওয়ালা খদ্দরে ছেঁকে নিয়ে মাটির গামলায় রাখতে হবে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে চূর্ণ ক'রে ছেঁকে নিতে হবে আর মাটির জালা বা কাঠের পিপেয় ভ'রে রাখতে হবে। বাজারে ভালো পাথুরে চুন পাওয়া যায়, আমরা সেই চুনই ব্যবহার করেছি। পাথুরে চুনও ঘুটিঙ-চুনের মতোই জরিয়ে, শুকিয়ে, গুঁড়িয়ে মাটি বা কাঠের আধারে ভ'রে রাখতে হবে।

এখন, উক্ত গুঁড়ো চুন এক ভাগ আর পরিষ্কৃত শুক্‌নো বালি দুই ভাগ এই হল mortar বা 'মশলা'র উপাদান। কিছু শ্বেত পাথরের গুঁড়ো (marble dust কলিকাতার বাজারে পাওয়া যাবে) এই সঙ্গে দিতে পারলে ভালো হয়—এ জিনিস পূর্বোক্ত বালির অংশ কমিয়ে মেশাতে হবে, চুন থেকে কম করা হবে না।

মসলা মাখবার সময় কুশের কুঁচিতে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে, বেশি মসলা হলে মিহি ঝাঁঝরিতে জল দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বড়ো কর্নিক বা কোদাল দিয়ে ঠাসতে হবে। সাধারণ রাজমিস্ত্রি দিয়েই এ কাজ করানো ভালো; তবে সর্বদা সামনে থেকে তদারক করা প্রয়োজন, নইলে সংক্ষেপে কাজ সারবার ইচ্ছায় একেবারে বেশি জল ঢেলে কাজ নষ্ট করতে পারে। জল ছিটানো আর মাখা এই করতে করতে এক সময় সমস্ত মসলাটা আঁট-আঁট হালুয়ার মতো হবে—মাখমের মতো তল্‌তলে হলে চলবে না—তখন আর জল দেবার দরকার থাকবে না। তৈরি মসলা গ্রীষ্মে ৭।৮ দিন, বর্ষা-বাদলের দিনে ১২।১৪ দিন, এর বেশি রাখা যাবে না। এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে রোদ হাওয়া লাগে না; তাগাড়ের মতো ক'রে উপরে টিন বা অন্য কিছু চাপা দিয়ে রাখলে মসলা ভালো থাকবে। দরকার মতো তা থেকে মসলা নিয়ে কাজ করা যাবে। একটা কাজে যতটা প্রয়োজন তার মসলা একেবারে তৈরি ক'রে নেওয়াই ভালো।

তৈরি মসলা দেয়ালে লাগাবার সময় আর জল দেওয়া চলবে না। মসলা দেয়ালে ধরানো রাজমিস্ত্রি দিয়েই করানো যায়; কিন্তু হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন; নইলে সুবিধা পেলেই তারা জলের ছিটে দিয়ে কাজ সারবে। মসলা লাগাবার আগে দেয়ালটা যতটা পারা যায় ভিজিয়ে নিতে হবে, যখন দেয়ালে আর জল খাবে না তখনই মসলা ধরানো শুরু করতে হবে। পুরাতন দেয়াল হলে দেয়াল ভেজাবার আগে প্লাস্টার খসিয়ে খড়া বা খাঁজ বার ক'রে নারকেল-কাঠির মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ, ফ্রেস্কোর জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত মসলাটা সরাসরি ইঁটের উপর ধরাতে হবে। প্রথমে কিছু মসলা ইঁটের উপর ধরিয়ে জল-ছড়া দিয়ে বেশ ক'রে ইঁটের সঙ্গে উসো দিয়ে ঘ'ষে তারপর যদি প্লাস্টার ধরানো যায় তবে খুবই ভালো। প্রতিবারেই পাত্র থেকে মসলা নেবার সময়ে কর্নিক দিয়ে ঠেসে নিতে হবে; নাড়া না পেলে জল সব তলায় জ'মে তলার মসলাকে বেশি ভিজে ক'রে দেবে। মসলা লাগানো দেয়ালের তলায় শুরু ক'রে উপরে শেষ করতে হবে। উপর থেকে শুরু করলে নীচে পর্যন্ত হতে না হতে উপরের চুন-বালি শুকিয়ে যায়; এইভাবে একই জমিতে কোথাও ভিজে কোথাও শুকনো হওয়াতে কাজ নষ্ট হয়। নীচে থেকে মসলা ধরালে এই অসুবিধা হয় না; উপরের সদ্য-লাগানো মসলার জল চুঁয়ে শেষ পর্যন্ত নীচের মসলাকেও ভিজে-ভিজে রাখে।

নীচে-উপরে প্লাস্টার ধরানো হয়ে গেলে সমস্ত জমিটাকে একবার কাঠের গজপাটা দিয়ে সমান ক'রে নিতে হবে। কাজটা রাজমিস্ত্রি দিয়ে করিয়ে নিতে হবে বা শিখে নিতে হবে। যখন সমস্ত জমি বেশ সমান হয়ে যাবে, কোথাও উঁচু নিচু থাকবে না, তখন ছোটো একটা গজ-পাটার এক প্রান্ত (end) ধ'রে বাকি লম্বা অংশটা দিয়ে হাল্কা হাতে সমস্ত জমিটা বেশ কিছুক্ষণ পিটে যেতে হবে। খুব ভালো ক'রে পেটা চাই; দেখতে হবে পেটার সময় যেন জমির কোনো অংশ বাদ না পড়ে। এই সময় জমি বেশ ভিজে ভিজে হয়ে উঠবে। বেশি ভিজে ভাবটা একটু ক'মে এলে উসো দিয়ে বা পাটা দিয়ে হাল্কা হাতে ঠুকে ঠুকে জমিটা সমান ক'রে নিতে হবে, যাতে উপরে ঝুরঝুরে বালি না থাকে আর বেশ চৌরস হয়ে যায়। উসো ঘুরিয়ে চৌরস করা ভালো নয়; তাতে জমির উপরে চুন ভেসে উঠলে, বালি-বালি ভাব নষ্ট হবে—সেরূপ বাঞ্ছনীয় নয়। এই সমস্ত কাজের মধ্যে একবারও জল লাগানো চলবে না।

দেয়ালে রেখাচিত্র ছকে নেবার জন্যে মূল রেখাচিত্রের প্রত্যেকটি রেখা ধরে ধরে অজস্র ছিদ্র করে নিতে হবে। ফুটো করবার সময় কাগজের তলায় ভাঁজকরা পুরু কাপড় বা তুলো-ভরা গদি কিছু একটা রাখলে কাজ ভালো হবে আর তাড়াতাড়ি হবে। ছুঁচ বা পিন সর্বদা খাড়াভাবে ধ'রে ফুটো করতে হবে; কাত করে ধরলে রঙ থুপ্‌নোর সময় ফুটো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাল্‌চিটে রঙের গুঁড়ো দিয়ে থোপা চলবে না। হরা পাথরের সবুজ বা গেরি ও এলা মেশানো হাল্কা রঙের গুঁড়ো ব্যবহার করাই ভলো। রঙটি খুব পাৎলা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে অল্প ঢিলে ক'রে বাঁধতে হবে আর প্রস্তুত জমিতে ছিদ্র-করা রেখাচিত্র (খাকা) রেখে তার উপর থুপে যেতে হবে। খাকাটি দেয়াল থেকে সরিয়ে নেবার আগে এক পাশ থেকে উঠিয়ে দেখে নেওয়া উচিত দাগ ঠিকমতো পড়ল কিনা।

জমি ঠিক-ঠিক কাজের উপযুক্ত কখন আর কখন বা নয় ব'লে বোঝানো মুশকিল। ব্লটিঙ কাগজে রঙ দিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে শুষে নেয়, কাজের সময় ফ্রেস্কোর জমির অবস্থা হবে ঠিক তেমনি—রঙ লাগালেই শুষে নেবে। পরে এক সময় হবে যখন সহজে আর রঙ নিতে চাইবে না, রঙ শুষে নিতে একটু দেরি লাগবে। তখন বুঝতে হবে আর বেশিক্ষণ কাজ চলবে না, তাড়াতাড়ি

সারতে হবে। জমি শুকিয়ে আসবার মুখে রঙ লাগালে রঙ উপরেই থেকে যাবে; স্থায়ী হবে না। জমি তেমন ভিজে থাকতে রঙ লাগালে তুলির সঙ্গে বালি উঠে আসবে।

ফ্রেস্কোতে জৈব উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক রঙ ব্যবহার করা রীতি নয়। এলা মাটি, গেরি মাটি, হরা পাথর ও অন্যান্য চিত্রোপযোগী মাটি পাথর থেকে রঙ তৈরি করে অথবা সেই সব রঙ সংগ্রহ করে ব্যবহার করাই ভালো। প্রত্যেক গুঁড়া রঙের সঙ্গে সমপরিমাণ গুঁড়া চুন (যা তৈরি করে রাখা গেছে) মিশিয়ে ভালোভাবে মেড়ে বা পিষে নিতে হয়। মেড়ে নেওয়ার পর রঙ কাপড়ে ছেঁকে নিলে আরো ভালো। সাদা রঙের কাজ নিছক চুন দিয়েই হবে। কার্টুনে অর্থাৎ রঙীন আদর্শে যেমনটি যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, তারই অনুযায়ী চুন-মেশানো রঙ একে একে তৈরি করে শিশিতে নম্বর লিখে লিখে ভরে রাখতে হবে। যেসব বাটিগুলিতে রঙ গুলে কাজ করা হবে, সেগুলিতে পাল্টা নম্বর লিখে রাখতে হবে। যে নম্বরের শিশি থেকে রঙ নেওয়া হবে, সেই নম্বরের বাটিতে গুলে রাখলেই কাজ করার সুবিধা হবে। নইলে রঙ জলের মতো পাৎলা করে গুলতে হয়, লাগাতেও হয় খুব পাৎলা, অথচ গুলে দিলেই এক রঙের সঙ্গে আরেক রঙের তফাৎ থাকবে না, কাজেই চিনে নেওয়া অসম্ভব হবে।

হাত খুব পাকা হলে ফ্রেস্কো-জমিতে সরাসরি ছাপছোপ (touch) ও রেখার কাজ খুব ভালো করা যায়—চীনা 'কালি-তুলি'তে যে জাতের কাজ হয়। থাকা বা রঙীন কারটুন লাগে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রঙ খুব পাৎলা করে লাগাতে হবে। একই রঙ যে জায়গায় দুবার পড়বে, সেখানে ঘন দেখাবে। এই-ভাবে বার বার প্রয়োগ করেই রঙ ঘন করা বা তার ছায়াসুষমা (shade) বার করা সম্ভব। একই সময়ে রঙের উপর রঙ চাপাবে না; একবার রঙ দিয়ে সেটি একটু শুকোবার সময় দেবে এবং ততক্ষণ ছবির অন্যত্র কাজ করবে। এটাও জানবে, রঙ একবার গাঢ় হয়ে পড়লে আর তাকে ফিকে করা যাবে না; সুতরাং হুঁশিয়ার হয়ে, হাতে রেখে কাজ করতে হবে। একেবারে নিখুঁতভাবে আঁকা বা 'ফিনিশ' করা রঙীন আদর্শের উপযোগিতাও এইখানেই।

ছবি আঁকা শেষ হলে সমস্ত জমিটার উপর দিয়ে একটা বোতল কয়েকবার গড়িয়ে নিলে জমি খুব মসৃণ মোলায়েম হবে। মোলায়েম না করেই অনেক সময় ভালো দেখায়; যদি সেই রকম রাখার ইচ্ছা হয়, আলাদা কথা। বোতলটি মসৃণ হবে, তার গায়ে উঁচু-করা অক্ষর বা নক্সা থাকবে না। জমি একটু ভিজে থাকতে থাকতেই বোতল চালাতে হবে, তার উপর হাতের চাপ সমান থাকবে।

ফ্রেস্কো সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে কাজের সময় সচরাচর যেসব অসুবিধা ঘটে, সেগুলির উল্লেখ দরকার। প্রথমেই আন্দাজ থাকা দরকার, একদিনে আঁকিয়ের পক্ষে ঠিক কতটা কাজ করা সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় এক দিনে দুই বর্গফুটের বেশি হাতে নেওয়া ঠিক নয়। এই দুই বর্গফুট দেয়ালে প্লাস্টার ধরানো থেকে আরম্ভ করে ছবি এঁকে শেষ করা পর্যন্ত একজনের তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগবে। কাজ শুরু করলে তার মধ্যে বিশ্রাম পাওয়া যাবে না। ফ্রেস্কো-আঁকিয়ের এও খেয়াল রাখা দরকার যে, প্লাস্টার গ্রীষ্মে যত তাড়াতাড়ি শুকোবে, বাদলায় তেমন নয়। জানা দরকার, পাৎলা প্লাস্টার যত তাড়াতাড়ি শুকোবে, পুরু প্লাস্টার তেমন নয়। থাকা থেকে ছবির ছকটি দেয়ালে তোলবার সময় আর আঁকবার সময়েও একজন আঁকিয়ে সঙ্গীর বিশেষ দরকার। এরকম একজন বুঝওআলা লোকের সাহায্য পাওয়া গেলে নানাভাবে কাজের সুবিধা হয়।

বড়ো কাজ হলে এক দিনে হবার নয়, কাজেই পূর্ব দিনের কাজের সঙ্গে নতুন দিনের কাজ জুড়ে নিতে হয়। এক দিনে যতটা জমি হাতে নেওয়া গেল, তার ধারে আধ ইঞ্চিমতো পাড় ফালতু (blank) রেখে আঁকার কাজ শেষ করলেই চলবে; পরদিন ঐ আধ ইঞ্চি কিনার কলম-বাড়া করে চেঁছে তার উপর নূতন মশলা চাপিয়ে (অর্থাৎ জোড় দিয়ে) নূতন কাজ শুরু করা হবে। কোনো বস্তু বা মূর্তি ধরে সেই দিনেই তা শেষ করা ভালো আর কিনারে যদি প'ড়ে থাকে, তো তারও পরে আধ ইঞ্চি ফালতু প্লাস্টার ধরিয়ে রাখতে হবে।

সব শেষে বক্তব্য, ফ্রেস্কো সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী মোটেই নয়। ওস্তাদ শিল্পীর পাকা হাতের কাজেরই বিশেষ উপযোগী—যেখানে আঁকা হয় কম, ব্যঞ্জনা থাকে বেশি। বলাই বাহুল্য, ফ্রেস্কো ছবিতে চুন-বালি মিলেই বাঁধনের কাজ করে; অন্য কোনো আঠা লাগে না। (দেয়ালের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারলে ছবি বহুকাল স্থায়ী হয়। যে দেয়ালে ছবি হবে, তার নীচে-উপরে সিমেণ্টের দুটি রক্ষাকবচ, তার পিছনে পৃষ্ঠপোষক আরেকটি দেয়াল—এসব ব্যবস্থার কথা পরে আলোচিত হবে।) আঠা লাগে না, তবে কেউ বা ফ্রেস্কো-কাজ শুকোবার পর তার উপর ডিম-মেশানো রঙে সূক্ষ্ম কাজ করে ছবি 'শেষ' (finish) করেন।

(১৯)

সুবিনয়বাবু সেদিন এলেন ঘরে। বললেন—এখন কেমন আছো ভূতনাথবাবু?

ভূতনাথ বললে—একটু ভালো বোধ করছি—আর কিছুদিন বাদেই কাজ আরম্ভ করতে পারবো ভাবছি—

—কীসের কাজ?

—অফিসের কাজ—ভূতনাথ বললে।

—কোন্ অফিসের কাজ?

ভূতনাথ হঠাৎ এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারলে না। তারপর বললে —আপনি একলা সব পেরে উঠছেন না—

—ও-ও-ও—

সুবিনয়বাবু যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলেন।

বললেন—না ভূতনাথবাবু, ভাবছি ও আমি তুলে দেব—ও বুজরুকি আর করবো না, বিবেকে বাধছে, অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিতের দেশ, এখনও মোহিনী-সিঁদুরের কাট্‌তি আছে এবং কাট্‌তি আরো বাড়ছে, বোধকরি যতদিন চালাবো ততদিনই চলবে, আমার অর্থ সম্পত্তি সব দিয়েছে ওই মোহিনী সিঁদুর—উপনিষদে আছে......

বাধা পড়লো। জবা ঢুকলো ঘরে।

বললে—বাবা, আপনি বিশ্রাম করুন গে যান, আমি ভূতনাথবাবুকে দেখছি—

সুবিনয়বাবু চলে গেলেন নিঃশব্দে। কিন্তু কথাটা শুনে ভূতনাথের কেমন ভয় হলো। 'মোহিনী সিঁদুরে'র ব্যবসা যদি তুলে দেন তা' হলে সে করবে কি?

জবা এসে বিছানার পাশেই বসলো। তারপর ভূতনাথের চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলবেন আমাকে?

ভূতনাথ প্রথমে কেমন ভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারলে না। শেষে বললে—বাবা যা বলছিলেন সত্যি?

—বাবা কী বলছিলেন?

—ওই যে বলছিলেন, 'মোহিনী-সিঁদুরে'র কারবার তুলে দেবেন—

জবা আর একটু সরে বসে বললে—বাবার কথায় কান দেবেন না, বাবার এখন মাথার ঠিক নেই, এখন ও'র কেবল মনে হচ্ছে এ বুঝি লোক-ঠকানো ব্যবসা, কিন্তু লোকে যদি ইচ্ছে করে ঠকে তো আমরা কী করতে পারি—, এ হচ্ছে কর্তাভজার দেশ, মন্ত্র-তন্ত্রের দেশ, অবতারবাদের পীঠস্থান, এর মতন ফলাও ব্যবসা আর আছে নাকি? এর পেছনে আরো মূল-ধন ঢালতে পারলে এ আরো চলবে—

ভূতনাথ খানিকটা আশ্বস্ত হলেও যেন নিঃসন্দেহ হতে পারলো না। বললে —কিন্তু উনি যে বললেন, এ সব বুজরুকি—

জবা বললে—আজকাল ওই রকম ও'র মনে হচ্ছে—ও'র এখন মাথার ঠিক নেই—

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। তবে তো ছোট বৌঠানকে সে ঠকিয়েছে! কোনও কাজই হয়নি সে-সিঁদুরে! মিছি মিছি ছোট বৌঠান সেই সিঁদুর নিয়ে আজও ছোটকর্তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে হয়ত। এখনও হয়ত পরীক্ষা-নীরিক্ষার শেষ নেই। এখনও হয়ত তেমনি রাতের পর রাত ছোটকর্তার জন্যে জেগে জেগে কাটে! তারপর ভোরের দিকে যখন ছোট কর্তা আসে, যখন বংশী কাপড় বদলিয়ে দোতলার ঘরে শুইয়ে দেয়, নেশায় অচৈতন্য হয়ে বাড়িতে ফেরে, তখন খবর যায় ছোট বৌঠানের ঘরে। ছোট বৌঠানের যশোদা-দুলাল তেমনি জলচৌকির ওপর নিশ্চল নিথর দৃষ্টিতে পাথরের চোখ দিয়ে সব দেখে। সমস্ত বংশের পাপের জন্যে একা ছোট বৌঠানই হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করে। তবে বুঝি পটেশ্বরী বৌঠানের বাবার গুরুদেবের কথাই সত্যি! পূর্ব-জন্মে পটেশ্বরী ছিল বুঝি দেববালা। দেবসভায় ব্রাহ্মণের অপমান করায় এ-জন্মটা এমনি প্রায়শ্চিত্ত করে কাটিয়ে দিতে হবে।

পটেশ্বরী বৌঠানের কথা মনে পড়তেই ভূতনাথের যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। মনে হলো—অনেকদিন যেন দেখেনি ছোট বৌঠানকে। আর যদি কখনও দেখা না হয়! এখনি ছুটে যেতে পারলেই যেন ভালো হতো! অন্ততঃ বড়বাড়িতে যেতে পারলেও যেন শান্তি পাওয়া যেত। কিছুটা তো কাছাকাছি। দেখতে না-পাওয়া যাক। একটু সান্নিধ্য। একই বাড়ির দেয়াল-এর মধ্যে। এক ছাদের তলায়। একই আবহাওয়ার মধ্যে। অন্ততঃ বংশীর কাছে থাকতে পারলেও যেন ভালো হতো। বংশীর মুখে ছোট বৌঠানের কথা শুনতো। এ-যেন এক অপূর্ব আকর্ষণ! মাত্র দু'দিনের দেখা। তা-ও অত অল্প সময়ের জন্যে। কিন্তু মনে হলো—ছোট বৌঠানের কাছে না গেলে সে যেন বাঁচবে না। সে শুধু একবার গিয়ে বলবে—ছোট বৌঠান—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে কথা—মোহিনী-সিঁদুরে কিছু কাজ হয় না—

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আগে তবে বলোনি কেন যে মোহিনী-সিঁদুরে কিছু হয় না—সব তোমাদের বুজরুকি—কেন তবে বলোনি আমাকে—

জবা ভূতনাথের এই ব্যবহারে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সান্ত্বনার সুরে বললে—বাবার কথা বিশ্বাস করে মিছিমিছি কেন মন খারাপ করছেন—বাবার কি এখন মাথার ঠিক আছে, মা যাবার পর থেকেই বাবা কেবল ওই কথা বলছেন—

ভূতনাথ যেন বুঝতে পারলে না। বললে—মা? তোমার মা?

—আপনি শোনেন নি? মা তো মারা গেছেন!

—সে কি? কবে? কী হয়েছিল?

জবা বললে—এখনও পনেরো দিনও হয়নি হঠাৎ হার্ট ফেল করলেন, রাত্রে যেমন শুয়ে থাকেন বিছানায় তেমনি শুয়ে ছিলেন, ঠিক এই ঘরেই, সকাল বেলা জানতে পারলুম—রাত্রে কেউ টেরও পাইনি—কাউকে এতটুকু কষ্ট দিয়ে যাননি—

জবার চোখ দিয়ে যেন জল পড়বার উপক্রম হলো।

ভূতনাথ বললে—কই! আমি তো কিছুই জানতুম না, বাবাও কিছু বলেন নি—অন্তত ব্যবহারেও কিছু জানতে দেন নি—

জবা বললে—বাবাকে আপনি চিনলেন না, যেদিন মা মারা গেলেন সেদিনও বাবা সমাজে গিয়ে রোজকার মত প্রার্থনা করে এসেছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন, কেউ বুঝতে পারেনি আমাদের এত বড় দুর্ঘটনার কথা, রাত্রে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছি বাবা যেন কেবল জপ করছেন—'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—'ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—পরের দিন আমাকে সেই বাবার প্রিয় ব্রহ্ম-সংগীতটা গাইতে বলেছেন—

—নাথ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ—

আমি আপন মনেই গেয়ে চলেছি আর বাবা হাতে চৌতালে তাল দিয়ে চলেছেন। শেষে আমার সঙ্গেই গলা মিলিয়ে গাইতে লাগলেন। আমি গান থামালুম, বাবা তখনও গাইছেন—

জল স্থল মরুত ব্যোম পশু মনুষ্য দেবলোক
তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার **ত্রিভুবনেশ**...

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না বাবাকে দেখে, বেশ স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমূল বদলে গেছেন। কেবল বলেন, লোক-ঠকানোর পাপেই আমার এই ঘটলো—এ ব্যবসা আমি তুলে দেব মা—

কথা বলতে বলতে জবা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ভূতনাথের। ভূতনাথ আস্তে আস্তে জবার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরলো। জবা কোনও আপত্তি করলো না। তারপর কি জানি কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে ভূতনাথ জবার হাতটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করলো। তবু যেন জবার কোনও সম্বিত নেই। জবা যেন নিষ্প্রাণ প্রস্তর-প্রতিমা। ভূতনাথ অনেক-ক্ষণ তেমনি করে জবার স্পর্শের সুখ আস্বাদ করতে লাগলো।

জবা নিজের হাত না সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'মোহিনী-সিঁদুর' তবে উঠে গেলে আপনার ভয় কেন? চাকরি যাবে বলে?

ভূতনাথ দুই হাতে জবার হাতটা তখনও তেমনি করে ধরে আছে। মুখ আর বুকের মাঝামাঝি জায়গায় হাতটা লাগিয়ে রেখে বললে—ঠিক তা নয়—আগে জানতে পারলে ছোট বৌঠানকে অন্তত আমি বিশ্বাস করে 'মোহিনী-সিঁদুর' দিতাম না—

—ছোট বৌঠান আবার আপনার কে? কী হয়েছিল তার?

একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল ভূতনাথ পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে যে, এ-কথা কাউকে বলবে না। এমন কি জবাকেও না। কিন্তু এই মুহূর্তে সে-প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল ভূতনাথ।

বললে—তার কথা তো তোমায় বলেছি, বড়বাড়ির ছোট বউ—ছোট কর্তা রাত্রে বাড়ি আসেন না—তাকে বশ করবার জন্যে মোহিনী-সিঁদুর কিনে দিয়েছিলাম—

জবা যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—আপনার ছোট বৌঠানের বয়েস কত?

—তোমার চেয়ে বড় আর আমার চেয়ে কিছু ছোট—

জবা হেসে বললে—ছোট বৌঠানের জন্যে আপনার এতখানি দরদ তো ভালো নয়—

ভূতনাথ কিন্তু হাসতে পারলে না। বললে—পটেশ্বরী বৌঠানকে দেখলে তুমি এ-কথা বলতে পারতে না জবা—

জবা তেমনি হেসে বললে—আমি না দেখলেও কল্পনা করে নিতে পারি—

ভূতনাথ বললে—আর সবাইকে কল্পনা করা যায়—কিন্তু ছোট বৌঠান কল্পনার বাইরে—তাঁকে না-দেখলে কল্পনা করা শক্ত, দেখবার আগে আমারও সেই ধারণাই ছিল—

জবা বললে—তা' হলে দেখছি জল অনেকদূর গাড়িয়েছে—

তারপর একটু থেমে বললে—'মোহিনী-সিঁদুর' কখনও বিফল হয় না জানতুম—

ভূতনাথ বললে—তার মানে?

—তার মানে, বড়লোকের বাড়ির স্বামী পরিত্যক্তা রূপসী বউ, আপনার মনস্কামনা......

হঠাৎ জবা হাত টেনে নিলে। রতন ঘরে ঢুকেছে।

রতন বললে—দিদিমণি খোকাবাবু এসেছেন—

জবা বিছানা ছেড়ে উঠে বললে—বসতে বল হল্ ঘরে, আর চা করে আন—আমি আসছি—

এক নিমেষে জবা পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভূতনাথ যেন হতবাকের মত অসহায় অপ্রস্তুত হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। কিছু যেন করবার নেই। নিরুপায় সে। কে এ খোকাবাবু! কিন্তু সে যে-ই হোক এই মুহূর্তেই কি তাকে আসতে হয়! যেন অনেক কথা বলবার ছিল জবাকে, সবে মাত্র সূচনা হয়েছিল, কিন্তু বলা হলো না।

ও-পাশের হল্ ঘর থেকে ওদের গলার শব্দ কানে আসছে। জবা কথায় কথায় হাসছে! জবা এত হাসতে পারে! এত হাসির কথা হচ্ছে কা'র সঙ্গে। একবার মনে হলো চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখে আসে। আজ সবে ভাত খেয়েছে সে এতদিন পরে! এটুকু পরিশ্রমে কিছু ক্ষতি হবে না তার। কিন্তু লজ্জাও হলো। যদি ধরা পড়ে যায়। হঠাৎ মনে হলো—যেন চেনা চেনা গলার আওয়াজ। যেন ননীলালের গলা! ঠিক সেইরকম কথার ভংগী! ভারি কৌতূহল হলো দেখবার!

উঠতেই যাচ্ছিল ভূতনাথ। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে উঁকি দিয়ে দেখে আসতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ রতন আবার ঘরে ঢুকলো। কী একটা জিনিস নিয়ে চলে যাবে।

ভূতনাথ ডাকলো।

রতন ঘাড় ফেরালো—আমায় ডাকছেন নাকি কেরানীবাবু?

—হ্যাঁ, শোন ইদিকে, কাছে এসো—

রতন কাছে সরে এল।

ভূতনাথ গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলে—ও-ঘরে কে এসেছে?

রতন বললে—ও খোকাবাবু,—

—খোকাবাবু? খোকাবাবু কে? এ-বাড়ির কে হয়?

—এ-বাড়ির জামাইবাবু হয়, দিদি-মণির সঙ্গে বিয়ে হবে!

—ওর আসল নামটা কী?

—তা' জানিনে আমি—বলে রতন চলে গেল।

সেদিন রাত্রে শোবার আগে জবা একবার ঘরে এল।

বললে—ওষুধটা খাননি কেন?

ভূতনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কোনও জবাব দিলে না।

জবা ওষুধের শিশিটা নিয়ে কাছে এল। বললে—জ্বর ছেড়ে গেছে বলে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন নাকি? নিন হাঁ করুন—

ভূতনাথের কী মনে হলো কে জানে। নিঃশব্দে ওষুধটা খেয়ে নিলে। কোনও ওজর-আপত্তি করলে না। কিন্তু হঠাৎ এক কান্ড করে বসলো।

জবা ওষুধ খাইয়ে চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ভূতনাথ শাড়ির আঁচলটা চেপে ধরতেই কাঁধ থেকে কাপড়টা খসে পড়লো জবার।

একটি মুহূর্তে মাত্র। কিন্তু এক মুহূর্তে দু'জনই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এক নিমেষের মধ্যে যেন একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেল।

জবার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বললে—অভদ্র নীচ কোথাকার—

বলে আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো। কিম্বা হয়ত সারা রাত ঘুমই হয়নি ভূতনাথের। নিজের মনে সারারাত কেবল একটা দুশ্চিন্তাই জেগেছে যে, এ-বাড়িতে সে জবার কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে। জবা তো শুধু নারী নয়, সে যে একাধারে তার মনিব। মাসে মাসে সাত টাকা মাইনে আর এক বেলা ভাত খাওয়ার পরিবর্তে সে এখানে দাসত্ব করে। মানুষের পক্ষে যে-টা শুধু অপরাধই মাত্র, তার পক্ষে যে এটা ঘোরতর অপরাধের সামিল।

যথারীতি সুবিনয়বাবু রোজ ভোর-বেলা একবার ঘরে এসে কুশল প্রশ্ন করেন।

সেদিনও এলেন। তখনও ভালো করে সকাল হয়নি। কিন্তু এসে বললেন—ভূতনাথবাবু তোমার একটা চিঠি আছে—

চিঠি! চিঠি ভূতনাথের বড় একটা আসে না কখনও। চিঠি তাকে কে লিখতে গেল। বিশেষ করে এই ঠিকানায়।

সুবিনয়বাবু বললেন—একটি লোক চিঠি নিয়ে এসেছে—নিচে দাঁড়িয়ে আছে—

চিঠিটা খুলে পড়তেই ভূতনাথের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হলো। ছোট বৌঠানের চিঠি!

সুবিনয়বাবু বললেন—তা' হলে রতনকে বলছি ওকে ডেকে আনুক এ-ঘরে—

সবিনয়বাবু চলে গেলেন।

ভূতনাথের সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সমস্ত চিঠিটা আবার পড়লো সে।

"প্রাণাধিক ভূতনাথ,

পরে বংশীর নিকট এইমাত্র তোমার সংবাদ পাইলাম। কেমন আছো এখন। বড় উদ্বেগ বোধ করিতেছি। বংশীকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। যদি সম্ভব হয় এখানে চলিয়া আসিবে। পাল্কী পাঠাইলাম। আশীর্বাদ জানিবে।

তোমার ছোট বৌঠান"

বার বার চিঠিটা পড়েও যেন তৃপ্তি হলো না ভূতনাথের। এমন করে পটেশ্বরী বৌঠান যে তাকে চিঠি লিখবে এ যেন কল্পনাও করা যায় না। ভূতনাথের জীবনে এই সামান্য কাগজের একটা টুক্‌রো যেন এই মুহূর্তে এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে হলো। ক্ষমতা থাকলে এখনি উঠে বসতো ভূতনাথ। তারপর বিশ্বশুদ্ধ লোককে এই চিঠিখানা দেখাতো সে।

বংশী এল। ভূতনাথকে দেখবার জন্যে তারও যেন আগ্রহের শেষ নেই।

এসেই বললে—শালাবাবু এ কী চেহারা হয়েছে আপনার আজ্ঞে—

ভূতনাথ যেন এতদিনে একজন নিতান্ত আপনার লোক পেয়ে গেছে।

শুধু বললে—বংশী তুই...

বংশী বললে—ক'দিন থেকেই খবর করছি—শালাবাবু কোথায় গেল—ছোটমাও অস্থির—থানায় লোক পাঠান, বড়বাড়ির চাকর-বাকর সবাইকে শুধোই, ভৈরববাবু দশ জায়গায় ঘোরেন, তাকেও শুধোলাম, তিনি বললেন—কেল্লার গোরারা বোধহয় জখম্‌-টখম্‌ করে দিয়েছে দেখ্‌—মধু-সূদনকে শুধোলাম—সে বললে—আপদ গেছে তো বাঁচাই গেছে, তার গায়ের জ্বালা আছে কিনা আপনার ওপর—

ভূতনাথ বললে—কেন, তার কেন রে গায়ের জ্বালা আমার ওপর—

—ওই যে আপনি হলেন গিয়ে আমাদের তরফের লোক, ওর সুবিধে হচ্ছে না, আপনি আসার পর থেকে তেমন বাবু আদায় হচ্ছে না, আর ঝি চাকরে ঝগড়া হলে তো ওরই লাভ, বদ্‌লা এনে নতুন লোক বসিয়ে দেবে, বাবু নেবে, তারপর চাকরি করে দিলে এক টাকা করে মাইনে থেকে কেটে নেবে—সেটা পুরোপুরি হচ্ছে না—

ভূতনাথ বললে—আমি তো আর ওর পাওনায় ভাগ বসাতে যাচ্ছি নে—

—ভাগ বসাতে যাবেন কেন, কিন্তু ওর ভয় তো আছে, আপনি যদি ছোটমা'কে বলে দেন, ছুটুকবাবুর সঙ্গে আপনার পেয়ার আছে, দেখেছে আপনি ছুটুকবাবুর আসরে গান-বাজনা করতে যান—যদি বলে দেন? ও সব জানে যে, সব দেখে যে—চোখজোড়া ছোট হলে কী হবে—নজর যে আছে আঠারো আনা—

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বংশী বললে—ওদিকে এক কাণ্ড হয়েছে শোনেন নি—না আপনি আর শুনবেন কী করে, ঠনঠনের দত্তবাবুরা মেজবাবুর পায়রা চুরি করেছিল—

—পায়রা?

—হ্যাঁ শালাবাবু, পায়রা, গেরোবাজ পায়রা, পশ্চিম থেকে নিলেমে কিনে-ছিল ভৈরববাবু দেড়শো টাকা দিয়ে এক-

জোড়া, সেই পায়রা তিনবার লড়াই-এ জিতেছিল, কদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না তাদের, মেজবাবু যেমন সকালবেলা উড়িয়ে দিয়েছে রোজকার মত, বার কয়েক আকাশে চক্কর মেরে যেমন ঘুরে আসে রোজ, সেদিন আর এলো না, শ্যামবাজারের দিকে উড়ে গেছলো, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল—সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখা নেই, মেজবাবুর মেজাজ খারাপ রইল ক'দিন ধরে, বেণীও সামনে যেতে ভরসা পায় না—শেষে পাওয়া গেছে ছেনিবাবুর হাটখোলার মেয়েমানুষের ঘরে—

—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ শালাবাবু, পুলিশ এল, মামলা হলো, দুশো টাকা আদালতে গুণে দিয়েছে ছেনিবাবু—পরশু যে, আমাদের বড় বাড়িতে তাই ধুমধাম হলো খুব, পায়রা, পশ্চিম থেকে নিলেমে কিনে-মেজবাবুর, বেণীর দু টাকা বকশিশ হয়ে গেছে, চাকরদের কাপড় হলো একটা করে, মেজবাবু দলবল নিয়ে গঙ্গায় পানসী চালাতে গেলেন, সঙ্গে বড়মা ঠাকরুণ, মেজমাঠাকরুণ, ছোটমাঠাকরুণ সবাই গেছলো, নাচ-গান-বাজনা খানা-পিনা করে সমস্ত রাত কাটিয়েছেন—কিন্তু আমার মনটা ভালো ছিল না—কেবল ভাবছিলাম শালাবাবুর কী হলো—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বদরিকা-বাবুর খবর কী?

—তাকেও শুধোলাম আজ্ঞে, অত যে হৈ চৈ, তিনি সেই বৈঠকখানা ঘরে শেতল-পাটির ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছেন, বললেন—ছোকরা বেঁচে গেছে খুব, ভেগেছে নির্ঘাৎ—বলে ট্যাঁকঘড়িটা একবার বড়ঘড়িটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিলেন—পাগল না পাগল—কিন্তু আর দেরি নয়, আপনি চলুন আজ্ঞে, অনেক কাজ ফেলে এসেছি, ওদিকে আবার ছুটুকবাবুর বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে—

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।

—ছুটুকবাবুর বিয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ শালাবাবু, বড়মা ধরে বসেছেন, তার ভারি ইচ্ছে, নিজের তো ছুঁচিবাই, কবে আছেন কবে নেই, সখ হয়েছে বউ দেখে যাবেন, অধর ঘটকী ক'দিন ধরে যাতায়াত করছে, সিন্ধু বলছিল আসছে মাসে নাকি হবে—তা এখন থেকে তৈরি হতে হবে, ঘর-বাড়ি সাফ করা, কেনা-কাটা—হাতে আর সময় কই বলুন—

রতন ঘরে এল। বললে—দিদিমণি বললেন, আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে কেরাণীবাবু—

ওষুধ!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু দিদি-মণি কোথায়?

—দিদিমণি ভাঁড়ার বার করে দিচ্ছেন—

—একবার ডেকে দিতে পারো?

কিন্তু তারপর কী ভেবে বললে—আচ্ছা যাক, বাবু কোথায়?

বাবুকে ডাকবো—বলে রতন চলে গেল।

ভূতনাথ বংশীর দিকে ফিরে বললে—বড়বাড়ির আর কী খবর?

কী জানি ছোটবৌঠানের কথা সোজা-সুজি জিজ্ঞেস করতে কেমন লজ্জা করতে লাগলো ভূতনাথের। আর কখনও তার কাছে যাবার সুযোগ মিলবে কিনা কে জানে। আর একবার যদি তার কাছে যাওয়া যেত।

বংশী বললে—লোচন ক'দিন ধরে আপনার খোঁজ করছিল—

—আমার খোঁজ করে কেন সে?

—আজ্ঞে আয় কমে গেছে যে তার, তামাক আর কেউ খাচ্ছে না, ছুটুকবাবুর আসরে বরাদ্দ ছিল তিনসের তামাক হপ্তায়, তাও এদানি বন্ধ করে দিয়েছেন—তিনি বলেন—তাকাম কেউ খায় না, বিড়ি খায় সবাই, তা সবাই যদি বিড়ি-সিগারেট ধরে, ওর চলে কী করে আজ্ঞে, লোচন আমাকে বলছিল সেদিন—শালাবাবুর সঙ্গে তোর এত ভাব, ওকে তামাক ধরাতে পারিস না, না হয় মাসে আটটা করে পয়সাই নেব আমি—আর ওদিকে ইব্রাহিমেরও ভারি ভয় লেগে গেছে—

—কেন?

বংশী হাসতে লাগলো। বললে—যে-যার ভাবনা নিয়ে আছে শালাবাবু, আমার ভাইটাকে আমি যেমন বড়বাড়িতে ঢোকাবার কত চেষ্টা করছি কিছুতেই পারছি না, ওরও তেমনি—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ও আবার কা'কে চাকরিতে ঢোকাবে?

—আজ্ঞে চাকরিতে ঢোকাবে আর কা'কে, নিজের চাকরি তাই-ই থাকে কিনা দেখুন, মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে ভাবনায়, অমন বাবরি চুল, পাঠানী দাড়ি, তাই বলে আর ভালো করে আঁচড়াচ্ছে না,......

—কেন?

—আজ্ঞে খবর সব পেয়েছে ও, খবর তো আর জানতে কারো বাকি নেই, বাবুরা যে হাওয়া গাড়ি কিনছে, সে গাড়ি চালাতে তো আর কচুয়ান লাগবে না, ঘোড়াও লাগবে না, হাওয়ায় চলবে, বিলেতে এক-রকম গাড়ি উঠেছে শোনেন নি?

—হাওয়া গাড়ি? বাবুরা কিনবে নাকি হাওয়া-গাড়ি? কার কাছে শুনলি তুই?

বংশী বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল। শেষে বললে—আজ্ঞে শুনেছি আমি ভালো লোকের মুখ থেকেই, চুনী দাসী—ছোট-বাবুর মেয়েমানুষ......

চুনী দাসী! রুপো দাসীর মেয়ে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—গিছলে নাকি চুনী দাসীর বাড়িতে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ শালাবাবু গিছলাম, ছোটবৌঠান যেতে বলেছিল বলেই গিছলাম, কিন্তু না গেলেই ভালো হতো আজ্ঞে—

—কেন?

—আজ্ঞে ছোটমা'র সেদিন উপোষ, উনি পুজো-আচ্ছারা করেন তো মাঝে মধ্যে, নীলের উপোষ ছিল সেদিন, নির্জলা একেবারে, সারাদিন ধকল গিয়েছে নিজের পুজোয়, রূপলাল ঠাকুর এসে যশোদাদুলালের পুজো করে গেছে, দুপুর বেলা চন্তা সেই নৈবিদ্যির থালা বারকোষ সাজিয়ে বার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে সরকারী পুজোবাড়ির সিধে পত্তোর সব নিয়ে একসঙ্গে বার-বাড়ির লোক গিয়ে রূপলাল ঠাকুরের বাড়ি দিয়ে আসবে—আমি যেমন গেছি সন্ধ্যেবেলা দেখি ছোটমা'র মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে—তখনও জল খাওয়া হয়নি। বরাবর উপোষের পর আমি গিয়ে ছোটবাবুর কাছে জলের বাটি নিয়ে যাই, ছোটবাবু পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে দেন, তারপর সেই জলটুকু খেয়ে ছোটমা উপোষ ভাঙেন, কিন্তু ছোটবাবু সেদিন বাড়ি আসেন নি, ছোটমারও কিছু পেটে পড়েনি—

—কেন, ছোটবাবু বাড়ি আসেন নি কেন?

—তা' কি আমি জানি? না ছোট মা জানেন! ছোট মা আমাকে বললে—যা বংশী তুই একবার জানবাজারে যা একবাটি জল নিয়ে—আর দেখে আসিস বাবু কেমন আছেন—তা সেই অন্ধকারেই গেলাম আজ্ঞে জানবাজারে—গেলাম মরতে মরতে—গিয়ে দেখি সে এক কান্ড—ছোটবাবু শুয়ে আছে পা ভেঙে, খুব বেশি নাকি খেয়ে ফেলেছিলেন, মাথার ঠিক ছিল না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গেছেন—আমাকে দেখে কী রাগ, বললেন—বংশী তোকে বারণ করেছি না—এ-বাড়িতে আবার এসেছিস—

ছোটবাবুর রাগের মাথায় কিছু উত্তর দিতে নেই। তা' হলেই আরো রেগে যাবেন। কিছুই বললাম না, চুপ করে রইলাম। আস্তে আস্তে পায়ের কাছে বাটিটা নিয়ে ধরলাম গিয়ে। ছোটবাবু পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন—কে তোকে আসতে বলেছে এখেনে—? বেরো এখান থেকে—

তবু কিছু উত্তর দিলাম না। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইলাম। জানি কথা বললে আরো রাগ চড়ে যাবে।

তারপর খানিক পরে ছোটবাবু বললেন—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো—

বুঝলাম এবার ঘুম আসবে। তারপর ছোটবাবু যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন, অমনি পায়ের আঙুলটা টপ্ করে জলে ছুঁইয়ে নিলাম আজ্ঞে,—কিন্তু জলটা নিয়ে চলে আসছি হঠাৎ দেখি সামনে নতুন মা—

ভূতনাথ বললে—নতুন মা কে?

—আজ্ঞে ওই চুনী দাসী, ওকে আমরা নতুন মা বলি কি না, তা আমাকে দেখেই নতুন মা বলে উঠলো—বংশী তুই কখন এলি?

—বললাম—বাবু কাল বাড়ি যাননি তাই দেখতে এসেছিলাম আজ্ঞে—

—হাতে কী?

—আজ্ঞে ছোট মা'র আজ নীলের উপোষ গেছে কি না—

নতুন মা'র হাতে ছিল পানের ডিবে। দিনরাত পান খায় নতুন মা, এক মুখ পান ভালো করে চেয়ে দেখলাম নতুন-মা যেন আরো ফরসা হয়েছে, আরো মোটা হয়েছে, এক গা গয়না, নাকে নাকছাবিটা চক্ চক্ করছে।

নতুন-মা খানিক ভেবে বললে—হ্যাঁরে বংশী তোর ছোট মা শুনেছে আমি মটর গাড়ি কিনছি—?

বললাম—হাওড়া গাড়ি? কই শুনিনি তো?

—তোর ছোটমাও গাড়ি কিনবে নাকি? শুনেছিস কিছু?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে চলেই আসছিলাম। ছোট মা বাড়িতে না-খেয়ে বসে আছেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে এসেছি, নতুন-মা আবার ডাকলে—বংশী শুনে যা একবার—

কাছে যেতেই নতুন-মা বললে—এই রাস্তা দিয়েই তো যাচ্ছিস, যাবার পথে ওই মোড়ের দোকানে একবার খবর দিয়ে যাবি তো, বলবি আরো পনেরোটা সোডার বোতল যেন পাঠিয়ে দেয়, আজ রাতটা ওতেই চলে যাবে—কাল সকালবেলা আমার খবর দেব, আর দু সের বরফ ওই সঙ্গে—এই নে টাকা—

বলে দশটা টাকা দিলে আমার হাতে।

ভূতনাথ বললে—পনেরো বোতল সোডা! অত সোডা কী করবে বংশী?

বংশী হাসলো। বললে—মদ খাবে আজ্ঞে, কপালে ভাত জুটতো না যার এককালে, এখন সেই লোকের আজ ছোটবাবুর দৌলতে—

হঠাৎ সুবিনয়বাবু ঘরে ঢুকলেন—আমাকে ডাকছিলে নাকি ভূতনাথবাবু: না না উঠতে হবে না—

ভূতনাথ উঠে বসে বললে—আমি তো একটু ভালো হয়েছি, বড়বাড়ি থেকে ও'রা পাল্কী পাঠিয়েছেন—তাই ভাবছি—

সুবিনয়বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—তা হলে বেশ তো......কিন্তু জবা মাকে একবার খবর দাও—তার অনুমতিটা একবার—ওরে রতন—

সেদিন 'মোহিনী-সিঁদুর' অফিস থেকে পাল্কী করে যেতে যেতে বার বার মনে হয়েছিল বটে যে, জবা যাবার সময় একবার দেখা করতেও এল না! কিন্তু আর একটা দুর্বার আকর্ষণে ভূতনাথ তখন সে-অপমানও ভুলতে পেরেছে। অসভ্য ছোটলোকের মতনই তো ব্যবহার করেছে সে জবার সঙ্গে। অমন ব্যাপারের পর ভূতনাথেরও তো লজ্জার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বহুদিন পরে জবা যে তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল তা-ও যেন নিতান্ত অকারণে নয়। সেদিন ভূতনাথ ছিল অনুগ্রহ প্রার্থী আর জবা! জবা আর সে-জবা নয়। জবা বলেছিল......

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মাধববাবুর বাজার পেরিয়ে ভূতনাথের পাল্কী তখন দুলতে দুলতে চলেছে। পাল্কী-বেহারাদের মুখের সেই বোল এখনো যেন এত বছর পরেও কানে এসে বাজে—'হিন্-তাল' 'হিন্-তাল' 'হিন্-তাল্' 'হিন্-তাল্'—হিন্-তাল, হিন্-তাল্, হিন-তাল্ হিন্‌তা—ল—ল......

(ক্রমশ)

পোশাক

নারায়ণ চৌধুরী

আমার বিরুদ্ধে আমার বন্ধুবান্ধবদের একটা মস্ত অভিযোগ এই যে, আমি নাকি চেহারার পারিপাট্য বিধানে, সাজ-সজ্জা পোশাক-আশাকের ব্যাপারে তেমন মনোযোগী নই। আর এটাই নাকি আমার সাংসারিক অসাফল্যের (যে বিষয়ে আমার বন্ধুবান্ধবদের কেন, আমার নিজের মনেও কোনো সংশয় নেই) মূল কারণ। বন্ধুরা তাঁদের অভিযোগের সমর্থনে এই যুক্তি দেখান যে, চেহারার যত্ন নিলে একদিকে যেমন নিজের প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করা হয় তেমনি অপরের প্রতিও সম্ভ্রম দেখানো হয়। সমাজে চলতে গেলে এ দুটোই এক সঙ্গে দরকার। মানুষের গুণপনা কিছু তার গায়ে লেখা থাকে না। মুখেই মনের পরিচয় একথা নীতিবাক্য হিসাবে যতই মনোজ্ঞ হোক, শুধু মুখের আদল দেখে লোকে ভোলে না; মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্যিক প্রকরণাদির আশ্রয় নিতে হয়। সাজসজ্জা এই বাহ্যিক প্রকরণাদির অন্যতম। একজন লোকের সাজসজ্জা থেকে বলে দেওয়া যায়, সে লোক কী বা কেমন। কাজেই সাজসজ্জার ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই অবহেলা করা চলে না। যে লোক করে, বুঝতে হবে তার মনুষ্যচরিত্রের জ্ঞান নেই। সাজ-সজ্জার ঔদাসীন্যের দ্বারা সে যে শুধু নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তা-ই নয়, অপরের রুচিবোধকেও অহেতুক পীড়িত করে। মানুষ মানুষের এই ত্রুটি বরদাস্ত করতে নারাজ।

বন্ধুবান্ধবদের এই যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সত্যিই তো, তোমার চেহারা আর সাজপোশাকের মধ্য দিয়ে আত্মসম্ভ্রমবোধের পরিচয় যদি প্রকাশ না পায়, লোকেই বা তোমাকে সম্ভ্রম দেখাবে কেন। তুমি নিজেই যেখানে তোমার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নও অপরে সে স্থলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাকে মর্যাদা দেখাতে যাবে অতটা আশা না করলেও তুমি পারো। তাছাড়া আরও কথা আছে। চেহারার অযত্নের মধ্যে সমাজের আর-দশজন মানুষের প্রতি এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পায়, যা নাকি সামাজিক মানুষ ক্ষমা করতে অপারগ। লোকে উৎসব-অনুষ্ঠানে, বিবাহে, ভোজে তাদের সেরা পোষাক পরিধান করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায় কেন। স্বীয় চেহারার সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্যই শুধু নয়, নিমন্ত্রণকারী পক্ষের এবং তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যও বটে। কথায় বলে, 'আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পরনা।' পরের রুচি অনুযায়ী সাজ-সজ্জার বিধান পরের প্রতি মর্যাদার দ্যোতক। যার এ চেতনা নেই, যে শুধু আত্মখেয়ালেই সব সময় মগ্ন, সমাজে চলাফেরা করা তার পক্ষে সত্যই একটু অসুবিধাজনক।

তদুপরি, সাজ-সজ্জার পারিপাট্যের প্রশ্নের সঙ্গে লোকের আর্থিক সংগতির প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধনীর পোশাক তার ধনকৌলীন্যের জ্ঞাপক, অন্যপক্ষে দরিদ্রের পোশাক তার দারিদ্র্যের নিশানা। ধনী খেয়ালের বশে আটপৌরে পোশাক পরতে পারে, পরেও থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি গরীব তার পক্ষে একদিন সখ করেও দামী পোশাক পরা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে সে আর গরীব থাকত না, ধনীর কোঠায় প্রোমোশন পেয়ে যেত। এই তত্ত্ব মানুষের জানা আছে বলেই মানুষ আগন্তুক দেখা মাত্র সর্বপ্রথমে তার পোশাকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে, তারপর অন্যদিকে দৃক্‌পাত করে। চেহারায় আর পোশাকে মিলিয়ে আগন্তুকের সামাজিক অবস্থাটা মোটামুটি আঁচ করে নেওয়ার জন্যই মানুষের এই প্রয়াস। প্রয়াসটি কখনও সজ্ঞান, কখনও অর্ধজ্ঞান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্জ্ঞান। বোধ করি, অভ্যাসে অভ্যাসে জিনিসটি আমাদের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই এরকম হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, Tell me what you like and I shall tell you what you are. তোমার পছন্দ-অপছন্দ আমাকে জানালে আমি বলতে পারি তুমি লোকটি কেমন। এইটিকেই একটু ঘুরিয়ে এইভাবে যদি বলি, Tell me what you wear and I shall tell you what you are তা হলে অভিপ্রেত অর্থের বোধ করি খুব বেশি বদল হয় না। অন্তত পোশাক দেখে যে মানুষের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায় সে কথা নিশ্চিত।

চারদিকে খালি সম্মান আর সম্ভ্রমের জয়জয়কার। বন্ধুবান্ধবদের মুখে 'আত্ম-সম্মান' কথাটা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কিসের জন্য আত্মসম্মান, কাকে দেখাবার জন্যে আত্মসম্মান? যে সমাজে বেশীর ভাগ লোক পেট পুরে খেতে পায় না, পরবার বস্ত্র আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই জোটাতে পারে না, আত্ম-সম্ভ্রম বজায় রাখবার মতো কোনরকম জীবনোপায়ই যাদের নাগালের ভিতর নেই, সেই সমাজে তোমার-আমার মতো দু'-দশজন ভাগ্যবান্ লোকের জীবনে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রইল কি ক্ষুণ্ণ হল কী তাতে এসে যায়। সর্বব্যাপী মানবিক দুর্গতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুসংখ্যক লোকের এই যে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা—এ আমার কাছে নিতান্ত অবমাননাকর মনে হয়। এ এক ধরণের চেতনার অসাড়তা ছাড়া আর কী। পোশাকে-আশাকে তথাকথিত ভদ্রত্ব বজায় রেখে চলবার চেষ্টা তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীর করণ-কারণের প্রতি নিষ্ঠার জ্ঞাপক সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নিষ্ঠা অতিশয় সংকীর্ণ স্বার্থচেতনাপ্রসূত, সেটি বলা দরকার। এতে বোঝায় এই কথা যে, তোমার দৃষ্টি তোমার স্বশ্রেণীর পরিধির ভিতর ঘুরপাক খেতে অভ্যস্ত, অগণিত সাধারণ দুর্গত মানবের বেদনা তোমার চিন্তায় স্থান পায় না। যদি পেত তা হলে তথাকথিত ভদ্র সমাজের কৃত্রিম সম্ভ্রমবোধ আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্য তোমার তরফে এমন কাঙাল-পনা প্রকাশ পেত না, তুমি বরং সেক্ষেত্রে সম্ভ্রমবোধের খোলস ঝেড়ে ফেলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতে।

বাস্তবিক, আমার পোশাক আরও কেন দীন নয়, আমার আক্ষেপ তা-ই। আমার পোশাক-আশাকে যে-অনুপাতে

আমি 'ভদ্র' সমাজের রীতি-কানুন অনুসরণ করে চলছি, বুঝতে হবে 'ভদ্র' সংস্কারের প্রতি তদনুপাত মোহ আজও আমার ভিতর বিদ্যমান। আমি যে পরিমাণে প্রচলিত সংস্কারের অধীন সে পরিমাণে আমি পরাধীন। শ্রেণীচেতনা এখনও যে আমি বিসর্জন দিতে পারি নি এতে শুধু সে কথারই প্রমাণ হয়। এতে গর্ব করবার কিছু নেই, বরং গ্লানি বোধের কারণ আছে। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি ভ্রমণকালে তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন কেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, চতুর্থ শ্রেণী নেই বলেই তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও অনুরূপ মনোভাব অবলম্বনীয়। আমি কেন মহামতি গ্ল্যাডস্টোনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলতে পারি না, এর চাইতে আটপৌরে, দীন বস্ত্র নেই বলেই আমাকে আপনারা বর্তমান সজ্জায় ভূষিত দেখতে পাচ্ছেন, যদি থাকত তা-ই আমি কোন্-না পরিধান করতাম? একেবারে জীর্ণ শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরবার মতো মানসিক মুক্তি অর্জন করতে পারতাম তো বেঁচে যেতাম।

কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে নেবেন না। কলকাতার রাস্তায় চলতে চলতে যখন দেখতে পাই, ফুটপাতের উপর কোন ভিখারিণী নারী ছিন্ন শততালিযুক্ত মলিন 'ত্যানার' আবরণে স্বীয় লজ্জা 'পথিকের করুণার উপর' বিনিঃশেষে সমর্পণ করে অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে, আবরু বাঁচাবার তার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট নেই, যখন দেখতে পাই অনাদৃত-অবজ্ঞাত বে-ওয়ারিশ কোন শিশু শীতের দিনে আদুল গায়ে পথের ধুলোয় পড়ে আছে আর দারুণ হিমে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, তখন আমার এই ভদ্র পোশাক স্বীয় গাত্রোপরি একটা বিরাট ব্যঙ্গের মতো মনে হয়। মনে হয়, চারিদিকের এই সর্বব্যাপী রিক্ততার মাঝখানে আমাদের জনকয় মানুষের এই ভদ্র সাজবার প্রাণান্তকর প্রয়াস একটা প্রচণ্ড হ্যাংলামি ভিন্ন কিছু নয়। কিসের ভদ্রত্ব, কিসের কী। কেনই বা আত্মাভিমান। ঐ যে রাস্তার ধুলোয় জনকয় আপাত-সক্ষম পূর্ণবয়স্ক বেকার অবসন্ন ভঙ্গিতে চুপচাপ' শুয়ে আছে, ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে তাদের লিকলিকে সরু পা-গুলি পাঁকাটির মতো ঝুলছে, দীর্ঘদিনের উপবাস-খিন্ন ফোলা পেটের চামড়া ফুঁড়ে শিরাগুলি দড়ির মতো বেরিয়ে আছে, ঘাড়ে গলায় গালে এমন ময়লা জমেছে যে, চামড়ার উপর একটা ঘন কালো আস্তরণ পড়ে গেছে, মাথার জটাসদৃশ চুলের জঙ্গলের মধ্যে উকুনের ছড়াছড়ি—এদের এবং এদের সমগোত্র লোকদের যখন দেখতে পাই তখন আমার আত্মসম্ভ্রমের অহংকার আমার গায়ে এসে চাবুকের মতো বেঁধে। এক-এক সময় ক্ষোভ এবং ধিক্কারের সঙ্গে মনে হয়, বৃথা আমাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আত্মোন্নতির প্রয়াস, বৃথা আত্মসম্ভ্রমের ঠেকো দিয়ে নিজেকে সব সময় চাগিয়ে রাখবার চেষ্টা। সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক যে সমাজে আহার্য-বস্ত্র-আশ্রয়বঞ্চিত সে সমাজে তোমার আমার আত্মোন্নয়ন প্রয়াস একটা বিলাস বই আর কী। শাস্ত্রে মনের গতিকে সর্বদা ঊর্ধ্বগামী রাখবার কথা বলা হয়েছে, ভুলেও নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষকে অনাদরের ধুলোয় পিছনে ফেলে রেখে কিছুসংখ্যক মানুষের ঊর্ধ্বগামিতার প্রয়াস কি মান্য? সুবিধা যদি ভোগ করতে হয় তো সকলকেই সে সুবিধার ভাগ সমভাবে পরিবেশন করতে হবে। তা না পারি তো কারুরই সুবিধা ভোগে দরকার নেই। সকলেই পথের ধুলোয় সমভাবে গড়াগড়ি যাক।

বলা হবে, সমাজের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ, শোক বহুব্যাপক, আমরা উপরতলার কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই পর্বতপ্রমাণ দুর্ভাগ্যের নিরাকরণে কতটুকু কী করতে পারি। যে দুঃখ সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত সে দুঃখের মূলোচ্ছেদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আলাদাভাবে ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় এক্ষেত্রে সামান্যই কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

কথাটা স্বীকার্য, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত সহানুভূতি সমবেদনার প্রয়োজন ফুরায় না। একার চেষ্টায় বহুর দুঃখ নিরাকরণ যে সম্ভব নয়, এ কথা বিশদ ভাষণের অপেক্ষা রাখে না, তা হলেও বহুর দুঃখে বিগলিত হবার মতো চিত্তবৃত্তি মনের ভিতর সব সময় জাগরূক রাখা আবশ্যক। এতে আর কিছু হোক আর না-হোক্, আমাদের অপরাধের ভার লাঘব হয়; আমাদের অক্ষমতা আর অসহায়তার চেতনা মনের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে আমাদের অন্তত কিছুটা বিনয়ী করে তুলতে সহায়তা করে। কারুণ্যের অনুভূতি মনকে শান্ত রাখে, তাকে কখনও আত্মম্ভরী হতে দেয় না। একার বা কতিপয়ের চেষ্টায় বহুর দুঃখ দূর করতে না পারার বেদনা মনের ভিতর এমন একটা মধুর ব্যর্থতাবোধের সৃষ্টি করে যার সংস্পর্শে মনের সকল ময়লা কেটে যেতে বাধ্য।

এই মধুর ব্যর্থতাবোধ কয়জন আমরা সত্যি মনের ভিতর লালন করি? আমরা যখন বনেদিয়ানার গর্ব করি, আভিজাত্যের জয়ডঙ্কা পিটাই, 'আত্মসম্মান আত্মসম্মান' করে আকাশবাতাস মথিত করি, তখন সে আচরণের মধ্য দিয়ে এই ভাবটাই কি ফুটে ওঠে না যে, আমাদের দৃষ্টি স্বসমাজের গণ্ডীর ভিতর বড়ো বেশি আবদ্ধ, আমরা আমাদের সামাজিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সুখ-দুঃখের কথা সামান্যই চিন্তা করি? পোশাকের পারিপাট্য বিধানের কথা বলা হয়, কিন্তু কার জন্য? আমার এবং আমারই মতো মানসিকতা-সম্পন্ন স্বশ্রেণীর অপর কতিপয় মানুষের মনস্তুষ্টির জন্যে নয় কি? কাকে আমরা ভোজে আপ্যায়িত করি? আমার মতো যাদের পেট আগে থেকেই ভরা তাদেরকেই কি ডেকে এনে তাদের ভরা পেট আরও বেশি ভরিয়ে তুলি না? কাকে আমরা বন্ধুর মর্যাদা দিই? যাঁর বন্ধুসংখ্যা অগণন, যাঁর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ়, দু-চারজন বন্ধু এল কি গেল এতে যার কিছুই যায়-আসে না, তাঁকেই কি আমরা সাধারণত ডেকে বন্ধুর আসনে সমাসীন করি না? এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, আমাদের আভিজাত্যবোধ, আত্মসম্ভ্রমবোধ, বন্ধুত্বস্পৃহা সবই এক-একটা মস্ত প্রহসন। বহুর বেদনার উপর আমাদের সামাজিক কৌলীন্যের সৌধ উত্তুঙ্গ হয়ে আছে। এ সৌধ গুঁড়িয়ে যায় তো কার কী ক্ষতি।

আসলে, আমাদের অপরাধের কোনো তুল নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের একটি মানুষও অভুক্ত, অনাবৃত, অনাশ্রয় থাকছে, ততক্ষণ কারুরই আমাদের বহাল তবিয়তে সুখ ভোগের অধিকার নেই। সমাজে দুঃখের পরিমাণ যত বেশী তত বেশী আমাদের দায়িত্ব। এমন যদি হয় যে, দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষায়, অভাবে, রোগে, শোকে কষ্ট পাচ্ছে, কিছু-সংখ্যক লোক মাত্র সমাজের উপরতলায় বসে সুখ ও সুবিধা লুটছে, তবে সেই সুবিধাভোগী কিছুসংখ্যক লোকের প্রত্যেকেই এক-একজন মস্ত পাপী। তারা যে পাপী তার প্রমাণ, সমাজের তাবৎ সংগতি ও সম্পদ জনকয় ব্যক্তি মিলে তারা একাই ভোগ করতে ব্যস্ত এই সম্পদের উপর সাধারণ মানুষের যে কিছু দাবী থাকতে পারে এটি তাদের চেতনাতেই প্রবেশ করে না। যদি-বা করে, প্রবল স্বার্থবোধ সেই বিবেকের তাড়নাকে সর্বদাই চাপা দিতে সচেষ্ট। সমাজের বহুসংখ্যক মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি যখন এবম্বিধ চেতনার অসাড়তা দেখা দেয়, বুঝতে হবে, জাতীয় জীবনের পক্ষে তা ঘোর দুঃসময়। আমাদের দেশে এ দুঃসময় সমাগত বলে মনে করি।

সোখীন পোশাক পরে আত্মশোভা-বর্ধনের নারীসুলভ প্রয়াস ধিক্কৃত আরও এ কারণে যে, ওতে যে অহংবোধ প্রকাশ পায় সেটি অতি নিম্নস্তরের বস্তু। অহংবোধ মাত্রই খারাপ, আত্মাদর মাত্রই অশ্রদ্ধেয়, তার উপর সেটি যদি মনকে আশ্রয় না করে দেহকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে তবে তো তা আরও নিন্দনীয়। কৃত্রিম উপায়ে নিজের দাম বাড়িয়ে পরের মনোহরণের চেষ্টা মূঢ়তার চরম। বলা হবে, নারীর ভূষণ আর অলংকার-সজ্জার ভিতরের কথাটা তো এই, তবে সেখানে কেন আমাদের আপত্তি দেখা যায় না। এর উত্তর এই যে, নারীর পক্ষে যা প্রযোজ্য, মানুষমাত্রের পক্ষেই তা প্রযোজ্য নয়। পুষ্প ও ধাতুদ্রব্যনির্মিত আভরণ এবং বর্ণগন্ধের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দেহসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে পুরুষের মনোহরণ করাটা নারীর প্রকৃতিগত অভ্যাস। ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা প্রায় নারীত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। নারীকে মেনে নিতে হলে তার এই অভ্যাসকেও মেনে নিতে হবে। এর আর চারা নেই, কেননা, ফুল পেলে নারী সে ফুল মাথায় গুঁজবেই, গয়না পেলে সে গয়না গায়ে পরবেই, লাল রঙ পেলে হয় সে রঙ ঠোঁটে মাখবে নয়তো আলতা করে পায়ে পরবে, গন্ধদ্রব্য পেলে সেটি শরীরে ঢালবেই। তাই বলে পুরুষেরও এসব প্রকরণ-পদ্ধতি অনুসরণ করা? ছি ছি, সংসারে নারীপুরুষের কর্মবিভাগ তা হলে আছে কী করতে। যদি বলেন, পুরুষ তো সত্যি আর মাথায় ফুল গোঁজে না, পায়ে আলতাও পরে না, গায়ে গয়নাও চাপায় না, তা হলে তার বিরুদ্ধে আপনার এত উষ্মা কেন? এর জবাবে বলতে চাই, প্রকরণ-পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করাটাই তো সব নয়, নারীস্বভাবের অন্তর্লীন সজ্জামোহ পুরুষের আচরণে ফুটে উঠছে কিনা সেটি দেখা দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, স্বীয় কদর বাড়াবার তাগিদে কোন পুরুষকে যখন প্রসাধনরত দেখতে পাই, যখন দেখি, এই দশাসই এক জোয়ান-মর্দ, গায়ে ফিনফিনে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে তিন-তিনটে আঙটি শোভমান, পাউডারের ছোপে ঘাড়গলামুখ শ্বেতশুভ্র, গন্ধে দেহ ভুরভুর, মাথার চুল পরিপাটি বিন্যস্ত, আয়নার সামনে ঘন ঘন নিজের দেহশোভা নিরীক্ষণ করছে আর আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে সযত্নকর্তিত গোঁফের প্রান্ত চুমড়াচ্ছে—তখন রীতিমতো গা ঘিন ঘিন করে। এর উপর কেউ যদি আবার অপ্রয়োজনের চশমা চোখে পরে আরও বেশি মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করে তা হলে তো কথাই নেই। একেবারে সোনায় সোহাগা।

খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ থাক্। আমি যে কথা দিয়ে নিবন্ধের শুরু করেছিলাম সেটি পুনরায় বিবৃত করি। অপরের এবং নিজের নিকট নিজের কদর বাড়াবার জন্যে সাজ-সজ্জার পারিপাট্য বিধানের চেষ্টা আমার মতে অশ্রদ্ধেয়। আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াসের নামে এটি আত্মাবমাননা ছাড়া কিছু নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ সর্বদাই মান্য, তা বলে সাজ-সজ্জার ঘটাপটা করে ছন্নতা প্রকাশের অর্থ হয় না। মানুষের সমাজে এমনিতেই ব্যবধানের অন্ত নেই, তার উপর পোশাকের কৌলীন্য সৃষ্টি করে আর-একটি বড়ো রকমের ব্যবধান না গড়লেই কি নয়? ব্রাহ্মণ-নামধারী ব্যক্তিদের পক্ষে যেমন আজকের দিনে উপবীত ধারণ করাটা বেমানান, তেমনি পোশাকের তারতম্যের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াসও এ যুগের প্রবহমান সাম্যাদর্শের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ঋষি টলস্টয় যেদিন বুঝেছিলেন তাঁর আভিজাত্য ঠুনকো তাঁর বনেদিয়ানার অহংকার প্রবল একটি মোহ মাত্র, সেদিন তিনি তাঁর আভিজাত্যের খোলসটিও সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেদিন একেবারে জন-সাধারণের পোষাকে তিনি জনজীবনের স্তরে নেমে এসেছিলেন। রুশ কৃষকের আচারব্যবহার ধরণধারণ এই সময়ে তিনি সজ্ঞান সাধনায় আয়ত্ত করেন। গণজীবনের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের চেষ্টায় সেদিন তিনি নোংরা পোশাক পরতেও পেছপা হননি। মহামতি টলস্টয়ের এতাদৃশ আচরণের মূলে নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, পোশাকের অসমতা একটি বড়ো রকমের ব্যবধান, এই ব্যবধান মানুষে মানুষে বিরোধ জীইয়ে রাখতেই সাহায্য করে মাত্র; পক্ষান্তরে ব্যবধানটি দূর হলে মানবসমাজের পরস্পরের ভিতর আত্মীয়তা স্থাপনের কাজ বহুগুণ সহজ হয়ে যায়।

আমাদের গান্ধীজীর দৃষ্টান্তই ধরুন। তাঁর কটিবাসমাত্রসম্বল পোশাক ভারতের জনসাধারণের পোশাকের প্রতীক। খেয়ালের বশে এ পোশাক তিনি পরেননি, পরন্তু ভারতের গণ-জীবনের সুখ-দুঃখের সত্যিকার শরিক হবার কামনা থেকেই এই পোশাক তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। অন্যান্য ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে সজ্জাগত ব্যবধান দূর করাও তিনি তাঁর নেতৃত্বের সৌকর্যের পক্ষে আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন। আমরা যেদিন সাজসজ্জার ব্যাপারে টলস্টয় আর গান্ধীর মনোভাবের অনুসরণ করতে পারব, সেইদিনই শুধু আমরা যথার্থ সম্ভ্রমে ভূষিত হয়ে উঠব, তার আগে যেন আমরা সজ্জা-কৌলীন্যের গর্ব না করি।

রাজোয়ারা

শ্রীদেবেশ চন্দ্র দাশ

(৯)

অম্বরের সঙ্গে বাঙ্গালীর একটা অন্তরের যোগ আছে।

বোধ হয় সে জন্যই রাজপুতেরা একে আমের বলে ডাকলেও বাঙ্গালীরা অম্বর ছাড়া অন্য কোন নামেই একে দেখতে চায় না।

মোগল যুগে বার ভূঁইয়াদের মধ্যে বিভক্ত বাঙ্গলা দেশে এমন কোন ব্যক্তি জন্মান নি যিনি সবাইকে মিলিত করে পলায়মান পাঠান শক্তি বা উদীয়মান মোগল শক্তিকে দূরে হঠিয়ে দিয়ে বাঙ্গলাকে স্বাধীন করতে পারেন। যেখানে বাঙ্গালী সেখানেই দলাদলি, অথবা বাঙ্গালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে এই নীতি ঠিক আজকের মতই সেদিনও বাঙ্গালীকে দুর্বল করে রেখেছিল। মোগল পাঠানের শক্তি পরীক্ষার যুগে বাঙ্গালী বিক্রমশালী ভূঁইয়ারা একে একে পৃথক্‌ভাবে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবাই পরাজিত হন। প্রতাপাদিত্যও এমনিভাবে পরাজিত হন এবং তাঁর কুল-প্রতিমা যশোরেশ্বরীকে মানসিং অম্বরে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্য একটি কিংবদন্তী বলে যে, রাজা মানসিংহ প্রথমবারের যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের হাতে হেরে যাবার পর স্বপ্ন দেখেন যে কালিকা দেবী নিকটেই ভূগর্ভে অবস্থান করছেন। তাকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করলে মানসিংহ শত্রু জয় করতে পারবেন। সে স্বপ্ন অনুসারে তিনি কাজ করেন এবং জয়ী হন। বাঙ্গলা বিজয়ের পর তিনি এই প্রতিমা এনে অম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন।

এখানে কিন্তু প্রতিমার নাম শিলা-দেবী, যশোরেশ্বরী নয়।

তবু এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রতিমার সঙ্গে এসেছিল বাঙ্গালী পূজারী ও তাদেরই বংশধররা এখনো পুরুষানুক্রমে এই অপরূপ সুষমাময় গিরি দুর্গের মন্দিরে প্রতিদিন পূজা করে। এত মন্দির অম্বরে আছে যে, এ জায়গাটা গিরিদুর্গও বটে, গিরিমন্দিরও বটে।

একজন সত্যকারের বাঙ্গালী ও তাঁর সহধর্মিণী মন্দিরের সামনে আভূমি প্রণত হয়ে বিদেশে বাঙ্গালী প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করছিলেন। দু'জনেরই পরনে গরদ, হাতে তাম্রপাত্রে রক্তচন্দন ও রক্তজবা। মুঠো মুঠো রাঙা জবা পায়ের কাছে পেয়ে, খাঁটি বাঙ্গালীর বেশে পূজারী পূজারিণী প্রণাম পেয়ে মায়ের আমার কি শ্যামলা বাঙ্গলার কথা মনে পড়ল একটিবার? ইচ্ছা হল মনে মনে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু শুধু মন্দিরের দরজার দেওয়ালে মর্মরে গড়া সবুজ কলাগাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

যুদ্ধের ফলে বিগ্রহ সংগ্রহের আরো একটি কাহিনী জয়পুরের ইতিহাসে আছে।

সোয়াই রাজার প্রধান দুর্বলতা ছিল পানদোষ। অম্বরের রাজ কাহিনীকাররা তাঁর প্রিয় মদগুলির প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। ঠিক অন্যান্য সব সুকুমার কলার মতই। প্রায় হাজার

গিরিদুর্গও বটে, গিরিমন্দিরও বটে।

"আমারো নাম অভয় সিংহ" (প্রাচীন চিত্র)

বছর আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহু বিদ্যায় মহাপণ্ডিত ও গুণী মনীষী আলবেরুনী হিন্দুদের এইসব বিদ্যা লুকিয়ে রাখার ইচ্ছার সমালোচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে বিদেশী (আলবেরুনী কথার অর্থ বিদেশী; তিনি হিন্দুস্থানে বিদেশী এই আখ্যাই পেয়েছিলেন) বলে তাঁকে ত হিন্দুরা কিছু জানাবেই না, এমন কি নিজের জাতের বাইরেও তারা কাউকে কিছু জানাতে চায় না এই ছিল তাঁর দুঃখ।

যাই হোক, সোয়াই রাজা এমন সব মদ খেতেন যার মত উত্তেজক মদ নাকি রাজপুতানাতেও পাওয়া যেত না। চালের আরক বা মধুর গাজান রস যা দিয়েই সেই মদ তৈরী হোক না কেন এমন নেশা নাকি ভবিষ্যতেও কেহ বানাতে পারবে না। রাজা যখন তাতে মশগুল থাকতেন তখন তাঁর কাছে কোন রাজকার্য নিয়ে আসা একেবারে বারণ ছিল। বহু বার প্রার্থীরা এসে তাঁর কাছে নিবেদন করেছে যে, তারা মদ্যাচ্ছন্ন নয়, মতিস্থির রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করে। From Philip drunk to Philip sober আবেদন করার কাহিনী সর্বদাই মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু From Philip sober to Philip drunk আবেদনের একটা কাহিনী এখানে খুব মুখরোচক হবে।

এমনি মাতাল অবস্থায় যখন রাজা অম্বরের শিষমহলে বসে চারদিকে কাঁচের টুক্‌রায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে নিজের সঙ্গে মশগুল হয়ে বসে আছেন তখন এসে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল বিকানীরের রাজা ভক্তসিংহের দূত। সে সময় কারো তাঁর কাছে আসার অধিকার নেই। কিন্তু বাঙ্গালী প্রধান-মন্ত্রী বিদ্যাধরের প্রভাব ছিল অসীম এবং তারই সহায়তায় দূত শিষমহলে মদ্যাচ্ছন্ন সোয়াই রাজার কাছে নিবেদন করবার সুযোগ পেল। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি কথা নিবেদন করে যাবে।

নিবেদনটি ভক্তসিংহের চিঠিতেই লেখা ছিল। মাড়োয়ারের মহারাজা অভয়সিংহ ও বিকানীরের রাজা ভক্তসিংহ দুই ভাই এবং বিকানীর হচ্ছে মাড়বারের ছোট তরফ। আমাদের বাঙ্গালী জমিদার-দের মধ্যে দুই ভাইয়ের দুই তরপের মামলা লাঠালাঠিতেই নিষ্পত্তি হত এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত। কাজেই রাজ-পুতের দেশে রাজাদের মধ্যেই বা তা না হবে কেন—যদিও তারা দুই ভাই, একই বাপের সন্তান ও একই রাঠোর বংশের রাজা?

বিকানীর থেকে ভক্তসিংহ তেমন সম্মান দেখাচ্ছেন না মাড়োয়ারকে। অতএব অভয়সিংহ ভাইয়ের রাজ্য আক্রমণ করে বিকানীর অবরোধ করেছেন—তার কর্তৃত্বের অধিকারে। ভক্তসিংহ কিন্তু নিবেদন করছেন সোয়াই রাজার কাছে যে, তিনি জয়পুরের "ভগতীয়া" অর্থাৎ ভক্ত রাজা জয়সিংহের কাছে ছাড়া আর কারো কাছেই মাথা নোয়াবেন না। অতএব ভক্ত রাজা ভক্তসিংহের সাহায্যে এখনি যেন আসেন। তিনি কি আসবেন না?

মদ ও অহংকার উত্তর জুগিয়ে দিল। সোয়াই রাজা পানপাত্র ছেড়ে মসীপাত্র নিয়ে বসলেন। অভয়সিংহকে লিখলেন, শীঘ্র বিকানীর অবরোধ উঠিয়ে নিতে। পানপাত্র আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে সম্মান পেতে লাগল।

দূত করযোড়ে বলল,—মহারাজ, আর মাত্র একটুখানি লিখে দিন। শুধু লিখে দিন যে—নতুবা আমার নাম জয়সিংহ।

আবার পানীয় মাথায় দিল নাড়া। আবার জয়সিংহ গোঁফে দিলেন চাড়া।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দ্রুততম উট ছুটিয়ে দূত অভীষ্ট সিদ্ধ করে নিয়ে অম্বরের সীমা ত্যাগ করে গেল।

অমনি ত্বরিৎ গতিতে তড়িৎ সম উত্তর ছুটে এল।

তোমার কি এক্তিয়ার আছে যে আমায় হুকুম করতে চাও? যে আমার ও আমার তাঁবেদারদের মাঝখানে মাথা গলাতে চাও? তোমার নাম যদি জয়সিংহ হয়, আমারো নাম অভয়সিংহ।

ব্যস্‌।

কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল তুমুল রবে অম্বরে, মাড়োয়ারে বিকানীরে। অভয়-সিংহ জয়সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বিকানীর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে এলেন।

সবচেয়ে মজা হল তারপরে লড়াইয়ের সময়। জয়সিংহকে তেড়ে লড়াই দিতে এলেন কে? না, ভক্তসিংহ নিজে। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্য নয়। কারণ রাজপুত গোত্রগুলির প্রভাব আর যে কোন একতার বাঁধনের চেয়ে বেশী। রাঠোর রাঠোরে ধূলে পরিমাণ। কাছোয়া জয়পুর যখন রাঠোর মাড়বারকে আক্রমণ

করেছে তখন রাঠোর বিকানীর,—এক বাপের বেটা বলে নয়, এক গোত্রের লোক বলে—কি আর মাড়োয়ারের সাহায্যে না এসে থাকতে পারে?

কাজেই রাঠোরের অপমানের সম্ভাবনায় ভক্তসিংহের ভাইয়ের প্রতি প্রীতি উথলিয়ে উঠল। তিনি অভয়সিংহের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন যে, জয়পুরের ভয়ে মাড়োয়ার যেন বিকানীরের অবরোধ উঠিয়ে না নেয়। শুধু তাই নয়, ভক্তসিংহ নিজেই একা বিকানীরী সৈন্য নিয়ে জয়সিংহকে পিতৃপুরুষের মাড়োয়ার থেকে ভাগিয়ে দিয়ে আসতে চায়। তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে, একজন রাঠোর লড়াইয়ে একশ জন কাছোয়ার সমান।

ষড়যন্ত্রে অভয়সিংহও কম যাবার পাত্র নন। তিনি সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু ভাই ভক্তসিংহ রাঠোরের ইজ্জৎ রক্ষা করতে চাচ্ছেন, কাজেই তিনি কি করে তার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারেন? নিজে থেকে ভক্তসিংহ জয়পুরের সঙ্গ যুদ্ধের সব চাপ ও দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিচ্ছেন; এখন অভয়সিংহ বাধা দিলে আর একজন রাঠোরের কর্তব্যে বাধা দেওয়া হবে যে।

মহামুনি কৌটিল্য যে উপদেশ দিয়ে গেছেন—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌ সে কথা মনে রেখেই যে অভয়সিংহ এই প্রস্তাবে মত দিলেন এমন কথাও কোন দুষ্ট লোকে যেন না ভাবে।

রাজপুতের যুদ্ধযাত্রার একটা সুন্দর নমুনা এ কাহিনীতে পাওয়া যায়। মাত্র দুশো বছর আগেকার ঘটনা, কিন্তু রাজপুত ইতিহাসের প্রথম থেকে তাদের যোদ্ধাজীবনের শেষ পর্যন্ত এমনভাবেই যুদ্ধযাত্রা হয়েছে। প্রকাণ্ড তোরণের উপর বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। ঘোষণা করা হল "খের" অর্থাৎ সমবেতভাবে যুদ্ধের আহ্বান। তোরণের পাশে এসে দাঁড়ালেন ভক্তসিংহ। দুধারে দুই বিরাট্‌ তাম্র পাত্র, একটিতে জাফরানী জল আর একটিতে আফিমের আরক। তোরণের নীচে দিয়ে যত রাজপুত বেরিয়ে এল প্রত্যেককে ভক্তসিংহ নিজের হাতে দিলেন আফিমের আরক আর প্রত্যেকের বুকে ডান হাত দিয়ে জাফরানী জলের ছাপ লাগিয়ে দিলেন। আট হাজার মরণপণ করা রাজপুত যোদ্ধা জড়ো হল।

তখন ভক্তসিংহ বললেন,—যারা মরতে ইতস্তত করবে তাদের আমি অলক্ষিতে ফিরে যেতে এখনো সুযোগ দিচ্ছি। সামনের ওই বড় বাজরার খেতের ভিতর আমরা যাত্রা শুরু করব। যে না জিতেই ফিরে আসতে চায় সে ওই সময় বাজরার লম্বা লম্বা শিষের আড়ালে পিছনে থেকে যেয়ো। কেউ জানবে না। আমিও মুখ ফিরিয়ে দেখে নিতে চাইব না।

পাঁচ হাজারেরও বেশী রাজপুত মরতে এগিয়ে এল।

কেউ কিন্তু সে যুদ্ধ থেকে ফেরে নি—মাত্র কয়েকজন বাদে। ভক্তসিংহ দেখলেন যে, তিনি নিজে সেই অবশিষ্টদের মধ্যে একজন। তখন যে বেপরোয়া বীর বার বার আত্মবিসর্জনের জন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করেও মরতে পারেন নি তিনি অশ্রুনীরে ভাসতে লাগলেন।

ভক্তসিংহের সে বীরত্বের বর্ণনা শত্রুপক্ষের চারণের গানেই পাওয়া যায়। জয়সিংহের সভাচারণ রাজস্থানী ডিংগল ভাষায় যা গেয়েছেন তার বাংলা অনুবাদ এইরকম দাঁড়ায়ঃ—

এ কি রণ-নির্ঘোষ কালিকার?
এ কি হনুমন্তের হুংকার?
এ কি শেষনাগের নিঃশ্বাস?
কপিলেশ্বরের রোষপাশ?
নৃসিংহ অবতার এল কি?
অথবা রবিরশ্মি নিরখি?
ডাকিনীর মৃত্যুদায়িনী দৃষ্টি?
শিবের ত্রিনেত্রানল বৃষ্টি?
রোধিবে কে আগ্নেয় উদ্‌গার
ভক্ত হানিলে কাল তরবার?

যেমন সুযোগ্য শত্রু, তেমনি তার উপযুক্ত অনাপক্ষীয় চারণ। বীরত্বের সম্মান এমনভাবে দেওয়াই বীরধর্ম।

শত্রুর দ্বারা প্রতিপক্ষের বীরত্বের বর্ণনার আর একটি কাহিনী এখানে আপনা থেকেই মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এটাও রাজপুত বীরত্বের বর্ণনা—লিখে গেছেন রাজপুত জাতির আশা-ভরসার যিনি সমূলে উন্মূল করেছিলেন সেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর।

ফতেপুর শিক্রির যুদ্ধে মেবারের রাণা সঙ্গের অধিনায়কতায় সম্মিলিত রাজপুত সৈন্যরা যখন মোগল দলকে ঘিরে ফেলেছে সে সম্বন্ধে বাবর তুর্কী ভাষায় তাঁর আত্মজীবনীতে যে কবিতা লিখেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়াবেঃ—

মৃত্যু সন্ধ্যা সম শত্রুর দল।
ঘৃণ্য পিশাচ তারা নিশাসম কালো॥
তারকার চেয়ে বেশী সংখ্যার বল।
লেলিহান অগ্নির শিখা ছড়ালো॥

অথবা ধূম্রকুণ্ডলী সম অরি।
নীল অম্বরে হিংসায় তোলে শির॥

পিপীলিকা সম দক্ষিণে বামে ভরি'।
অশ্ব পদাতি হাজারে হাজারে ভিড়॥

গদ্যে লেখা এই আত্মজীবনীতে যেখানে ভাবের আবেগ এসে গেছে সেখানেই বাবর, কবিতায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফারসী রুবাই অর্থাৎ চৌপদী কবিতায় নিজের মনের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই যুদ্ধের বর্ণনা করতে করতে আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেনঃ—

বিজয়ী ব্যূহের বারিধি গর্জনে,
বিপুল ব্যাত্যা গভীর নিঃস্বনে,
কুম্ভীর যত সাগরে বিক্রমী;
অম্বরে ধূলি চতুর্দিকেতে ভ্রমি,
ঘন মেঘ প্রায় ছাইল রণস্থলী;
অসি-বিদ্যুৎ দ্যুতিমান্ মহাবলী।
দামিনীর প্রভা ঢেকে মুছে হল সারা।
রবির বদন আঁধারিল আলোহারা॥

কিন্তু এই বর্ণনায় শত্রুর বীরত্বের নিছক নির্ভেজাল প্রশংসার চেয়ে যে যুদ্ধে নিজের জয়লাভ হয়েছে সে যুদ্ধের ভীষণতার সুরই যেন বেশী পাওয়া যায়।

রাজপুত ও অন্য জাতির শিভ্যালরী বোধে এখানেই তফাৎ। যতই ক্ষমাহীন ক্ষান্তিহীন শত্রুতা থাকুক না কেন, শত্রুকেও যখন দেয় রাজপুত আপনাকে ঢেলে দেয়, উজাড় করেই ঢেলে দেয়। তার মধ্যে অশ্বত্থমা হত ইতি গজ এরকম কোন মানসিক রিজার্ভেশন রাজপুত রাখে না।

"শিভ্যালরী"র সেরা প্রতিযোগিতায় রাজপুতই প্রথম হবে। ইয়োরোপও কোনদিন তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

সোয়াই রাজার কথায় ফিরে আসা যাক। তিনি সে যুদ্ধে ভক্তসিংহের একটি রাঠোর দেবমূর্তি হস্তগত করেছিলেন—ঠিক যেমনভাবে রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী হস্তগত করেছিলেন বলে কথা আছে। তারপর অম্বরের একটি দেবী প্রতিমার সঙ্গে সে মূর্তির বিবাহ দিয়ে বহু উৎসব ও বহু উপহার দিয়ে মূর্তিটি তিনি ভক্তসিংহকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

রাজপুত হৃদয়ের এই মহানুভবতা জয়সিংহের রাজনীতির মধ্যেও বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। স্বদেশপ্রীতি মানুষকে সংকীর্ণ করে রাখে খানিকটা। সেজন্যই অম্বর বংশের স্বদেশপ্রীতি অম্বর রাজ্য ছাড়িয়ে সমগ্র ভারত বা সমগ্র রাজপুতানায় ছড়িয়ে পড়েনি। সেজন্যই অম্বর কখনো

মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজপুতানার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেনি। দিল্লী থেকে মাত্র দেড়শ' মাইল দূরে, আরাবলী পর্বতমালার নিরাপত্তার গন্ডীর বাইরে প্রবল শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জয়পুর আর কি করতে পারত? প্রজামত যেখানে রাজশক্তির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা নয়, ভূঁইয়াতন্ত্র অর্থাৎ ফিউডালিজম্ যেখানে সিংহাসনের একমাত্র অবলম্বন, সেখানে এর চেয়ে বেশী আর কিই বা আশা করা যায়?

মোগলের পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে তুলে ধরে রাখার শক্তি জয়সিংহের ছিল না। নাদির শার মত মহাপরাক্রমী বহিঃশত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা বা দূর করে দেবার মত সৈন্য বা সব রাজাদের সম্মিলিত করে যুদ্ধ করবার মত প্রভাব তার ছিল না। মারাঠারা উদীয়মান শক্তি হিসাবে নূতন উদ্যমে উত্তর ভারতে লুটপাটের আশায় ছুটে আসছে। তাদের বাধা দেওয়া বা দাক্ষিণাপথের মধ্যে আটকিয়ে রাখা অসম্ভব হত। কাজেই এই তিন বিপদ্ থেকে জয়পুরকে দূরে রেখে ও নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উদাহরণ দেখিয়ে অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলিকে রক্ষা পেতে সহায়তা করে তিনি রাজস্থানের রাজ্য ও প্রজা দুই পক্ষেরই যে উপকার করে গিয়েছিলেন তার জন্যই তিনি যোদ্ধা না হয়েও খুব বড় বীর ছিলেন বলতে হবে।

একমাত্র যুদ্ধেই যে জয় হয় তা ত' নয়; হিসাব করে চললে শান্তির পথেও জয় কিছু কম হয় না।

অম্বর গিরিদুর্গের প্রাসাদের ভিতরের অপরূপ চিত্রাঙ্কণ ও মর্মরকারুশোভা দেখতে দেখতে আবার সোয়াই রাজার কথা মনে পড়ল। এক হাতে তিনি প্রাচীন অম্বরকে শিল্পীর নিপুণতা দিয়ে সাজালেন, অপর হাতে নবীন জয়পুরকে স্রষ্টার দূরদৃষ্টি দিয়ে গড়লেন। একদিকে প্রাচীর প্রাচীন বিদ্যাগুলির লুপ্তোদ্ধার করলেন, অপরদিকে পশ্চিমের নবীন বুদ্ধি ও আবিষ্কারের দিকে জয়পুরের জানালা খুলে দিলেন। আজকের দিনের মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, অস্ত্রশালা, পুঁথিশালা এ সবেরই বীজ তিনি বপন করে গিয়েছিলেন। সোয়াই রাজা জয়সিংহ। সত্যই সোয়াই, মাত্র একজন মানুষ নয়।
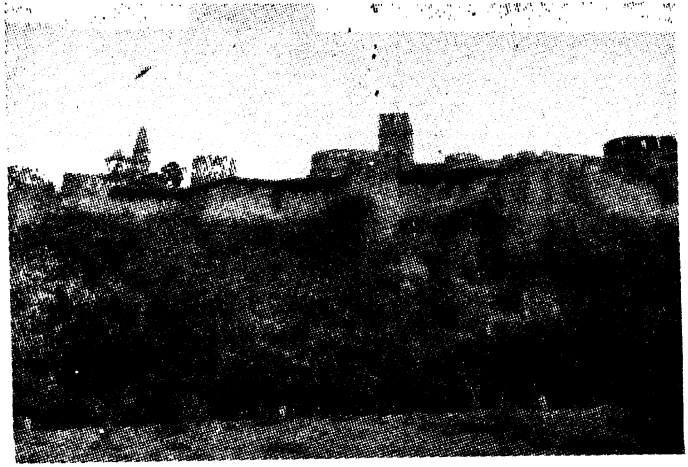
কিন্তু বিজয়সিংহের কি হয়েছিল?...

কেহ জানে না।

"কাদের দীর্ঘশ্বাসে বিজড়িত, কাদের কারাবাসের শৃঙ্খল ঝংকৃত......?"

অম্বর গিরিদুর্গেরও উপরে পাহাড়ে ওই যে একটা ভীমদর্শন দুর্গ দেখতে পাওয়া যায় ওটা কি? ওখানে কি রাখা হত? দীর্ঘশ্বাসে বিজড়িত, কাদের কারাবাসের শৃঙ্খল ঝঙ্কৃত, কাদের রাজপ্রাসাদচ্যুত নূপুরনিক্কণে ক্রন্দায়িত হত ওই দুর্গের মৃত্যুশীতল পাষাণ প্রাকার?

কেহ জানে না।

ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওলেয়স্ হিসাবে জয়পুরে একবার বেড়াতে এসে ওই শিলাদুর্গের ভিতরে যেতে চেয়েছিলেন। মহারাজা এমন পরিষ্কার দৃঢ়ভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন যে, সপ্তসাগরা বৃটানিয়ার ভাবী অধীশ্বর আর দ্বিতীয়বার সে কথা পাড়বার সাহস পেলেন না।

জয়পুরের চারধারের গিরিমালার সব চূড়া ঘিরে যে বিশাল প্রাকার শোভা পাচ্ছে তার পিছনে সূর্য আগেই অস্ত গিয়েছে। বানরের দল গাছের তলার বিহারস্থান ছেড়ে কোথায় জানি আশ্রয় নিয়েছে। বিরাট্ গিরিদুর্গের উপর ছড়িয়ে পড়ছে চিন্তামগ্ন অপার অন্ধকার।

যশোরেশ্বরীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঝাঁঝর বেজে চলেছে। একেবারে বাংলা দেশে এসে পড়লাম সে বাজনা শুনতে শুনতে, সেই কালিকা মন্দিরের আরতি দেখতে দেখতে। শ্যামল বাংলা দেশে যশোরে ইচ্ছামতী নদীর তীরে সে আরতির ধ্বনি কি কোনদিন বাতাসে বয়ে ফিরে আসে?

কিন্তু সে কথা ভাববার সময় পেলম না।

অম্বরের মুক্ত অম্বরে আলোর শেষ ছায়ার মায়াটুকুই অবশিষ্ট নেই যে। তাড়াতাড়ি নেমে আসতে হবে। পাহাড়ী জঙ্গলের কোথায় গলায় ঘণ্টা বাঁধা কোন গৃহপালিত হরিণীকে বোধ হয় বাঘ তাড়া করেছে—তার তীক্ষ্ম অসহায় আর্তনাদ ত্বরিত গতিতে দূরে মিলিয়ে গেল। ঠিক যেমন করে ওই শিলাদুর্গ আকাশে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে অম্বরের অতন্দ্র পাহারায় রত হল শুধু মৃত্যুরহস্য সঞ্চারী শৃগালদল। (ক্রমশ)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে কয়েকটি খনিজপদার্থের খুবই অভাব পরিলক্ষিত হয়। গন্ধক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। যদিও এই দেশের বিভিন্ন স্থানে গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সেইগুলির একটিও বিশেষ কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায় না। সেইজন্য এই দেশে প্রয়োজনীয় সমস্ত গন্ধকই আমদানী করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও জাপান প্রধানত এই তিনটি দেশই আমাদের প্রয়োজনমত গন্ধক সরবরাহ করিয়া থাকে।

১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই তের বৎসরে মোট ৭,২৪৬,৪২৮ হন্দর গন্ধক ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়। ইহার মূল্য প্রায় ৬,০৩,৪২,৫০০ টাকা। এই পরিমাণ গন্ধক যে সকল দেশ হইতে আনা হয়, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪২ সাল পর্যন্ত গন্ধকের আমদানী ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পায়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমদানী ব্যাহত হওয়ায় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সর্বত্র গন্ধকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধবিরতির পর ১৯৪৬ সাল হইতে গন্ধকের আমদানী পুনরায় বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।

বিদেশ হইতে আনীত গন্ধকের হিসাব

সাল		ইতালী	জাপান	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	অন্যান্য দেশ	মোট পরিমাণ
১৯৩৮	হন্দর	২,৬৮,০৮৭	১,০৬,২৫৭	...	৮৪,৯৩৮	৪,৫৯,২৮২
	টাকা	১৩,২১,৭৪৬	৪,৬৫,১২১	...	৪,০৯,৬৯৮	২১,৯৬,৫৬৫
১৯৩৯	হন্দর	১,৮৩,৯১৭	১,০৭,৬৬৬	২,৮৮,৩০০	৪২,৫৪৬	৬,২২,৪২৯
	টাকা	১০,৫৫,৩২০	৬,৬৫,৮৬১	১৪,২৫,১৯৩	২,১১,৪৫৩	৩৩,৫৭,৮২৭
১৯৪০	হন্দর	৩০,৭৮০	৬১,৬৬১	৭,৪১,৩২৫	৩৪,৫০৮	৮,৬৮,২৭৪
	টাকা	২,১৩,৬৬৭	৪,৩৭,০৮৯	৪৬,৮৯,৪৫৯	২,৫৫,৫৯২	৫৫,৯৫,৮৯৭
১৯৪১	হন্দর	...	২,৮৬০	৭,০৯,৮৯৯	২০,৮০৬	৭,৩৩,৫৬৫
	টাকা	...	৪০,৯৯০	৫৯,৯৮,১৬৭	২,০৮,৫৯৭	৬২,৪৭,৭৫৪
১৯৪২	হন্দর	...	...	২,৮৪,৫৩৯	২৪১	২,৮৪,৭৮০
	টাকা	...	...	২৭,৩৩,২৫০	৩,৪৩৬	২৭,৩৬,৬৮৬
১৯৪৩	হন্দর	...	...	৩,৭৪,৬৩৯	৪১১	৩,৭৫,০৫০
	টাকা	...	...	২৬,৩৫,০৫১	৬,৮৭৭	২৬,৪২,০২৮
১৯৪৪	হন্দর	...	...	৪,৬৩,৮০৬	১২	৪,৬৩,৮১৮
	টাকা	...	...	৩৯,৭৫,৪২৯	৬০	৩৯,৭৫,৪৮৯
১৯৪৫	হন্দর	...	...	২,১৪,৪৮৭	৬৩	২,১৪,৫৫১
	টাকা	...	...	২০,০৯,৫৭৯	৩,৯৬৮	২০,১৩,৫৪৭
১৯৪৬	হন্দর	...	...	৭,৮৩,৯২৪	২৭,৬৬৫	৮,১১,৫৮৯
	টাকা	...	...	৩০,৫৬,১৩৮	৬৯,৯৮৪	৩১,২৬,১২২
১৯৪৭	হন্দর	...	...	৬,৭৯,৮১৪	৭০,৫৯০	৭,৫০,৪০৪
	টাকা	...	...	৫৪,১০,১৫১	৫,৭৩,২৬৩	৫৯,৮৩,৪১৪
১৯৪৮	হন্দর	...	...	৭,১০,২৫৯	৩৪,২১২	৭,৪৪,৪৭১
	টাকা	...	...	৫৪,৯৯,৮৪৪	২,৭৮,৫৬১	৫৭,৭৮,৪০৫
১৯৪৯	হন্দর	...	...	৭,৭৮,১৪৫	১০,৩৭৪	৭,৮৮,৫১৯
	টাকা	...	...	৬৪,৪৪,২৪১	১,৭০,৮৩১	৬৬,১৫,০৭২
১৯৫০	হন্দর	...	...	১,১০১,৩৭৭	২৮,৩৭৯	১,১২৯,৭৫৬
	টাকা	...	...	৯৫,৪৮,৮৬৫	৫,২৪,৭৯১	১,০০,৭৩,৬৫৬

ভারতে গন্ধক উৎপাদন

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রধানত ইতালি ও জাপান হইতে ভারতে গন্ধক আমদানি হইত। ১৯৪১ সালের পর এই দুইটি দেশ হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে ভারতে গন্ধকের অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, কারণ, একমাত্র যুদ্ধেই গন্ধক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিবার নিমিত্ত ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার (Geological survey of India) উপদেশক্রমে ভারতের গন্ধক সমন্বিত স্থানগুলি হইতে গন্ধক উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪১ সাল হইতেই এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। তদানীন্তন ভারত গভর্নমেণ্টের সরবরাহ বিভাগ (Supply Department) ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সহায়তায় বেলুচি- স্থানের নক্-কুণ্ডি (Nok-kundi) নামক পার্বত্য অঞ্চলে এই উৎপাদনকার্য ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত চালায়। এই চারি বৎসর নক্-কুণ্ডি হইতে নিয়মিতভাবে গন্ধক রপ্তানি হয়—যথা: ১৯৪১ সালে ৭,২৩৩ টন, ১৯৪২ সালে ১২,৮৪১ টন, ১৯৪৩ সালে ৩০,৯৯১ টন ও ১৯৪৪ সালে ১২,২৪৫ টন।

বিদেশী গন্ধকের মূল্য

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে বিদেশ হইতে আনীত ১ টন গন্ধকের মূল্য ছিল ৯৮ টাকা। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে এই মূল্য যথাক্রমে ১৬৮ টাকা ও ১৭৮ টাকা হয় এবং ১৯৫১ সালের প্রথম কয়েক মাস ২৫০ টাকায় পরিণত হয়। অতঃপর সারা পৃথিবীতে গন্ধকের অভাবের দরুণ এই মূল্য অতিশয় বর্ধিত হয় এবং কলিকাতার বাজারে এক টনের মূল্য ৮০০ টাকা হইতে ১২০০ টাকা পর্যন্ত হয়।

গন্ধকের ব্যবহার

কাঁচামাল হিসাবে নানাবিধ শিল্প-ব্যবসায়ে গন্ধক ব্যবহৃত হয়, তবে সাল-ফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid)

প্রস্তুত-প্রণালীতে ইহার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে সর্বসমেত প্রায় ৫৫,০০০ টন গন্ধক ব্যবহার হইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়গুলিতে নিম্নলিখিতভাবে গন্ধকের ব্যবহার হয়ঃ—

শিল্প		বাৎসরিক প্রয়োজন
১। রসায়ন	...	৫,৫৩৮ টন
২। সার (Fertilisers)		
—(ক) সুপার ফস্‌ফেট্ (Super Phosphate)		৬,৬৬৬ ,,
—(খ) এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট্ (Ammonium Sulphate)		৫,০০০ ,,
৩। ধাতু ...	...	১০,৮০০ ,,
৪। তুলা ও বস্ত্র	...	১,১০০ ,,
৫। খনিজ তৈল	...	১,২০০ ,,
৬। চামড়া ...	...	২৬৫ ,,
৭। ব্যাটারী এসিড্	...	৩৩৩ ,,
৮। ডিস্টিলারী (Distillery)		৩৩৩ ,,
৯। অন্যান্য শিল্প	...	২,০০০ ,,
	মোট	৩২,৮৩৫ টন
		বা
		৩৩,০০০ টন

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রয়োজনে গন্ধকের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে বৎসরে প্রায় ১৩,৭০০ টনের প্রয়োজন হয়। যথাঃ—

(ক) চিনি শিল্প	...	৪,০০০ টন
(খ) সোডা ...	..	৩০০ ,,
(গ) ফটোগ্রাফিক রসায়ন	...	৪০০ ,,
(ঘ) দেশলাই শিল্প	...	২৫০ ,,
(ঙ) বারুদ শিল্প	...	৫০ ,,
(চ) রবার শিল্প	...	৭০০ ,,
(ছ) কাগজ শিল্প	...	১,০০০ ,,
(জ) রেয়ন শিল্প	..	৪,০০০ ,,
(ঝ) সরকারী প্রয়োজন	...	৩,০০০ ,,
	মোট	১৩,৭০০ টন

বর্তমানে এসিড্ প্রস্তুতকারক কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাহাদের উৎপাদন বর্ধিত করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে গন্ধকের ব্যবহার প্রতি বৎসরে আরও প্রায় ১৪,৫০০ টন বর্ধিত হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভারতে গন্ধকের বর্তমান প্রয়োজন বৎসরে প্রায় ৬২,০০০ টন। দেশের শিল্পোন্নতির সহিত এই প্রয়োজন ক্রমশই বর্ধিত হইবে।

বিশ্বব্যাপী গন্ধকের অভাবে ভারতের উদ্বেগ

যুদ্ধোত্তরকালে সর্বত্র নানাবিধ শিল্পে অধিক পরিমাণে গন্ধক ব্যবহৃত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে গন্ধকের অভাব অনুভূত হয়। ভারতেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াতে গন্ধক ব্যবহারকারী শিল্পগুলির কর্তৃপক্ষ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারা গভর্নমেন্টের সাহায্য লইয়া আমেরিকা হইতে অধিক পরিমাণে গন্ধক আনাইবার ও ভারতীয় শিল্পগুলির মধ্যে উহা ন্যায্যভাবে সরবরাহ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই উপলক্ষ্যে দুইজন ভারতীয় প্রতিনিধি আমেরিকায় যাইয়া আন্তর্জাতিক সম্পদ সংসদের (International Meterials Conference) গন্ধক সমিতির (Sulphur Committee) নিকট ভারতের অবস্থার বিবরণ পেশ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের তিন মাসের বরাদ্দের উপর আরও ৬,৫০০ টন সরবরাহ বর্ধিত করা হয়। কিন্তু ভারতের প্রয়োজন ইহাপেক্ষা সবিশেষ অধিক।

প্রাকৃতিক গন্ধক ব্যতীত ভারতে অন্যান্য কয়েকটি পন্থায় গন্ধক পাইবার সম্ভাবনা আছে। যথা,—

(১) জিপ্‌সাম (Gypsum) হইতে

(২) পাইরাইটিস্ (Pyrites) হইতে

(৩) ঘাটশিলায় অবস্থিত তাম্র কারখানার ত্যক্ত গ্যাস্ (Waste Gases) হইতে

(৪) যোধপুরের সোডিয়াম সালফেট্ (National deposits of Sodium Sulphate) হইতে

(৫) আসামের গন্ধকসমন্বিত কয়লা হইতে ও

(৬) উদয়পুরে অবস্থিত সীসা-দস্তার আকর (Lead-Zinc deposits) হইতে।

উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলি হইতে গন্ধক উৎপাদন করিবার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার জন্য ভারতীয় রসায়ন প্রস্তুতকারী সমিতি (Chemical Manufacturers' Association) জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের (National Planning Commission) নিকট পেশ্ করেন।

এই দেশে যেখানে যেখানে গন্ধক পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সেই সকল স্থান হইতে গন্ধক উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারকে মধ্যে মধ্যেই উপদেশ দিয়া থাকেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বব্যাপী গন্ধকের অভাবের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বিহারের সাহাবাদ জিলার অন্তবর্তী আমজড়ের 'পাইরাইট' সম্পদ হইতে গন্ধক উৎপাদন করিবার জন্য অনুমতি দেন। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার মাইনিং বিভাগ (Mining Section) এই কার্য পরিচালনা করিতেছেন। আশা করা যায়, ফল ভালই হইবে।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

রক্তের চাপ অর্থাৎ ব্লাড্ প্রেসার রোগটা খুবই সাধারণ কিন্তু এ রোগের চিকিৎসার কোনও সাধারণ ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। বর্তমানে অবশ্য অনেকরকম নতুন নতুন চিকিৎসার ব্যবস্থা চলছে। জনৈক ডাক্তার বলেন যে, অস্ত্রোপচার দ্বারা এড্রিন্যাল গ্রন্থি বাদ দিয়ে দিলে অনেক সময় এ রোগের উপশম হয়। যেসব ব্লাড্ প্রেসার রোগীর রোগ খুব সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে তারাও এই ব্যবস্থায় উপকার পেয়েছেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়নি, পরীক্ষামূলকভাবেই চলছে। এড্রিন্যাল জিনিসটি একটি বাদামের মত—এই এড্রিন্যাল কীড্নীর ওপরে থাকে। এখান থেকেই কোর্টিসোন, গেঁটেবাত জাতীয় রোগের প্রতিষেধক এবং আরও অনেকরকম রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে কোনও কোনও রাসায়নিক পদার্থের দরুণ অনেক সময় হৃদ্যন্ত্র এবং দেহের অন্যান্য টিস্যুগুলি ফুলে উঠে এবং দেহে অতিরিক্ত পরিমাণে জল ও লবণ জমে যায়। এই নতুন চিকিৎসা অনুসারে ১৪টি রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করে ৯টি রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। রোগ সেরে যাওয়ার পর রোগীর শরীরে খুব বেশী করে এড্রিন্যাল হর্মোনের ইন্জেক্শন দেওয়া হয়।

*

বিশ্বের বয়স কত? এ প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক আর সাধারণের পক্ষে চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। ভেবে চিন্তে না হয় বলা যায় কত আর হবে—এই দু' চার পাঁচ দশ কোটি বছর; এর চেয়ে বেশী আর কত হবে! বাস্তবিকপক্ষে এ বিশ্বের বয়স তার চেয়েও বেশী। বিশ্বের বয়স হবে ২,০০০,০০০,০০০ বছর। এই হিসাব জানার আগে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, বিশ্বের বয়সটা ২০০,০০০,০০০ বছর। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভালো যে, বিশ্বের বয়সের হিসাব করতে বসলে সাধারণ হিসাব মত ১২ মাসে বছর ধরা হয় না। এই হিসাবের এক বছরকে একটি "আলো বছর" ইংরেজীতে একে Light year বলে। কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে এক বছরে আলো যতখানি পথ অতিক্রম করে সেই দূরত্বটুকুই আলো বছর নামে অভিহিত হয়। এই দূরত্বের পরিমাণ অনেক সময় এত বেশী হয় যে, সংখ্যায় এর হিসাব রাখা যায় না; সেইজন্য "আলো বছরের" উদ্ভব হয়েছে। ডাঃ হারলো স্যাপলে বলেন যে, আগে বিশ্বের বয়স সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল আসলে সেটা ভুল এবং পুরান হিসাবের তুলনায় বিশ্বের বয়স অনেক বেশী। তিনি ২০০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত তাঁর নতুন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছায়াপথে এমন সব তারার সন্ধান পেয়েছেন যেগুলো থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর এই অভিমতটি তাঁর সারা জীবনের গবেষণার ফলাফল বলা যেতে পারে। আগে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, বিশ্বজগত খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে। ডাঃ স্যাপলে বলেন, প্রকৃতপক্ষে খুব ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

*

সাধারণত আমরা দেখতে পাই মাছের দুটো চোখ। তেচোখ মাছের কথাও আমরা জানি কিন্তু চার চক্ষুবিশিষ্ট মাছের নাম আমাদের জানা নেই। মাছেদের জলের মধ্যে থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, এজন্য চোখের গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গী সেইমতই হয়। এক ধরণের মাছ আছে যারা জলের মধ্যের খাদ্য যেমন দেখতে পায়, জলের ওপরের বায়ুমণ্ডলী থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের চোখের গঠন-প্রণালী ও দৃষ্টিশক্তি দ্বিধাবিভক্ত। এরা প্রতি চোখ দিয়ে দুরকম দৃশ্য দেখে, এজন্য এদের দুটি চোখকেই চারটি চোখ বলা হয় এবং তাই এদের চারি চক্ষুবিশিষ্ট মাছ বলা যায়। আমেরিকায় এ্যানাব্লেপস্ (Anableps) নামে এই ধরণের একরকম মাছ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এইরকম যে মাছ পাওয়া যায় সেগুলোকে খোরসুলা বলে। এই মাছ খুবই সাধারণ—বাংলাদেশের পুকুরে ও খালে আমরা এই খোরসুলা মাছগুলিকে জলের ওপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত দুটি চোখ জাগিয়ে রেখে খুব তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখি।

যুদ্ধপূর্ব যুগে আন্দামান বলতে পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলের বিভীষিকার কথাই আমরা আগে বুঝতাম। কিন্তু আজ আর আন্দামান দ্বীপ বন্দীদের উপনিবেশ নয়। এখন সরকারী কাজে, জীবিকার খোঁজে বহু লোকের এখানে পদপাত ঘটেছে। আর এসেছে বাঙলার নিরাশ্রয়ী নরনারীর দল নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজে।

বহু ছোট-ছোট দ্বীপ নিয়ে বঙ্গোপসাগরের বারিবিধৌত এই আন্দামান,— সংখ্যায় দু'শোরও ওপরে। এর মধ্যে 'বৃহৎ আন্দামান' যাকে বলে, সেই দ্বীপটিই প্রসিদ্ধতম। দ্বীপটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত দীর্ঘ এক পর্বত, যেন দ্বীপের মেরুদণ্ডের মতো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে; মাঝখানের উঁচু মেরুদণ্ড থেকে দুই পাশে দুই ধার ঢালু হয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে! দক্ষিণ অংশে পোর্ট ব্লেয়ারকে কেন্দ্র করে কিছুদূর পর্যন্ত সভ্যতার বিস্তৃতি, তারপর থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত গভীর অরণ্য!

এই অরণ্য আন্দামানের অন্যতম সম্পদ। সরকারী বনবিভাগের উদ্যমে ও রক্ষণাবেক্ষণে এখানকার কাষ্ঠ-ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অরণ্যপ্রান্তে ক্রমাগতই কুঠার পড়ছে; বনস্পতি লুটিয়ে পড়ছে মাটির ওপর, বসতিও বাড়ছে। অরণ্যের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত কাষ্ঠ-বহনকারী ট্রলির লাইন পাতা। বিচ্ছিন্ন বৃক্ষকাণ্ডের বড়ো বড়ো টুকরো বহন করে ট্রলিগুলি সারি সারি যাতায়াত করে। স্তূপীকৃত কাঠ পড়ে থাকে মাঠে, সেখান থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দেশলাই কারখানা অথবা সুবৃহৎ করাত কলে চালান হয়।

কিন্তু কাজটা খুব সহজ অথবা নির্বিঘ্ন নয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা যায়, অরণ্য-মধ্যে ট্রলির লাইন খোলা, লাইনের টুকরো উধাও। সরকারী মহলে তখনই সাড়া পড়ে যায়, তখনি সশস্ত্র পুলিশের দল আসে।' কিন্তু তাতেই শুধু হয় না, সামন্তর মতো লোকেরও দরকার পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, জারুয়া। নানাবিধ লোক এসেছে এখানে, নানা সূত্রে। দীর্ঘ বন্দিজীবন যাপনের পর

আর দেশে ফিরে যায় নি, এখানেই বাসা বেঁধে স্থায়ী হয়ে গেছে, এমন লোকও বিরল নয়। সরকারী পরিভাষায় যাদের 'লোকাল বর্ন' বলা হয়, তাদের মধ্যে নানা সংকর জাতির এইভাবে উদ্ভব হয়েছে। বাঙালী, পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশীয়, বিহারী, মাদ্রাজী, বর্মিজ, মোপলা প্রভৃতি ছাড়া নানাশ্রেণীর আদিবাসীর সাক্ষাৎ মেলে। এরা শহরের কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। এদের মধ্যে অনেকে কাজের খোঁজে শহরের প্রান্তে যে এসে বাসা বাঁধেনি এমন নয়; এমন কি, ক্রমে ক্রমে এদের মধ্য থেকে এক শ্রমিক গোষ্ঠীরও যে উদ্ভব না হচ্ছে তা নয়,—তবু এদের বৃহত্তর অংশ এখনো সভ্যতা-ভীত। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে সমাজবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গেই এরা থাকে,—সভ্যসমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। ছোট আন্দামান দ্বীপটিতে এইরকম একশ্রেণীর অর্ধসভ্য আদিবাসীদের দেখা যায়, তাদের বলে, **ওঙ্গ**। আরেকশ্রেণীকে বলে,—আরুয়া। মাছ ধরা, শিকার করা, এমন কি, চাষ-আবাদও ওদের কেউ কেউ করে। কিন্তু এরা ক্ষতিকর জাত নয়। সভ্যসমাজ এদের সংস্পর্শে এসেছে।

কিন্তু অসভ্য জারুয়ারা হিংস্র। এরা আন্দামানের সব থেকে ভীষণ ও সব থেকে রহস্যময় জীব। ট্রলির লাইন পড়ে সেই লাইনের লোহা থেকে ওরা তীরের ফলা বানায়, সেই ফলায় থাকে মারাত্মক বিষ মেশানো। সহসাই এদের দেখা যায় না, গহীন অরণ্যে কিম্বা নির্জন পরিত্যক্ত দ্বীপগুলিতে এদের বাস। এরা বন্য, এরা বর্বর। এদের পরনেও যেমন কোনো আবরণ নেই, মনেরও নেই আবরণ। একেবারে আদিম, উদ্দাম। অরণ্যের অন্তরালে থেকে এরা বিষমাখানো তীর চালায়, অব্যর্থ এদের সন্ধান, সে তীর একেবারে যেন সভ্যতার মর্মস্থলে গায়ে বিদ্ধ করে। মুহূর্তে সভ্য আন্দামানের নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ জাগে, বন্দুক নিয়ে ছুটোছুটি, হৈ-চৈ হাঁকডাক। কিন্তু জারুয়ারা ততক্ষণে যেন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে!

সামন্ত প্রত্যক্ষভাবে সরকারী লোক না হলেও জারুয়া-শাসনে সরকারের পক্ষে অপরিহার্য। তুষনাবাদ অঞ্চলের একেবারে প্রান্তে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কয়েক ঘর অনুগত আরুয়া ও 'রাঁচি কুলি' অর্থাৎ ভারত থেকে আগত মুণ্ডা ও কোল,—এই এদের নিয়ে ওর বাস। বনবিভাগের চিহ্নিত গাছ কেটে ট্রলি বোঝাই করার ঠিকাদারীই ওর প্রধান কাজ। জঙ্গলে গাছ-কাটার কুলিদের ওপর ওর অসাধারণ প্রতিপত্তি। ওরা ওদের ভাষায় ওকে ভালবেসে বলে,—'জংলী সাহেব।'

'জংলী সাহেব' স্বভাবে-ব্যবহারে বাস্তবিকই 'জংলী'। জংলীদের সঙ্গে বাস করে করে ওদেরি মতো অর্ধসভ্য বেপরোয়া জীবন-যাপন তার। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স শেষের দিকে হেলে পড়তে পড়তে এক যায়গায় এসে যেন থমকে থেমে আছে। পেশীবহুল দৃঢ় শরীর, মাথার চুলে পাক ধরলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার দিতে, বন্দুক চালাতে সে এখনো সমান পটু। চলনে-বলনে হাঁকডাকে জরাকে যেন বহু দূরে হটিয়ে রেখেছে সে।

একটা খাটো খাকীর হাফ প্যান্ট, মোটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে কোমরে আঁটা, তার এক পাশে ঝুলছে সরকার থেকে দেওয়া তার সুবিখ্যাত সঙ্গী জাপানী কোল্ট পিস্তল, পায়ে একটা বিবর্ণ কালো চামড়ার বুট জুতো; মাঝে মাঝে মাথায় একটা রঙ-চটা সোলার হ্যাট শোভা পায় বটে, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো আবরণই নেই। এই পোষাকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। শুধু জাহাজ আসার দিনে পোর্ট ব্লেয়ার অথবা এবার্ডিনের সরকারী অফিসে যখন যায়, একটা খাকীর সার্ট ঝুলিয়ে নেয় গায়ে, দাড়ি কামাবার কথা শুধু সেইদিনই মনে পড়ে। সেইদিনই পক্ষকালের মতো টাকা তুলে আনে পোস্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে। ওর ব্যবসার যা কাগজপত্রের কাজ, সে করে দেয় শহরের বিঘীলাইনের একটি কেরানীবাবু। শুধু দরকার মতো কাগজ-পত্রে সই করে আর সেই বাবুটিকে মাসে মাসে কিছু হাতখরচ বাবদ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। আর কিছু ভাববার নেই।

জাহাজ-আসার দিন সব প্রবাসীরই দেশের খবরের কথা মনে পড়ে। সেই নিয়মে ও'ও আসে চাথাম জেটীতে। 'মহারাজা' জাহাজের এদিক-থেকে-ওদিকে একবার অলস দৃষ্টি বুলিয়ে নি[illegible] আগ্রহশীল জনতার ভীড় কাটিয়ে ও চ[illegible] আসে সরকারী অফিসে, তারপরে সে বাবুটির কাছে। নিয়মতান্ত্রিক এক[illegible] যন্ত্রের মতোই জিজ্ঞাসা করে, দেশের খব[illegible] কেয়া হায়?

সেই বাবুটিও নিয়মমত উত্তর দি[illegible] যায়,—ভালোই হায়!

সামন্তরও আর কোনো প্রশ্ন নেই নিয়মমতো ঐ সংবাদ জিজ্ঞাসা ছাড়া দে[illegible] সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহও নেই। দীর্ঘ দিনের আন্দামান-বাসী সে, ভাষাও হয়ে গেছে বিচিত্র,—হিন্দী-উর্দুর ক্রিয়ায় চাক বাংলা শব্দ আর বাঙালী টান।

সামন্ত এককালে বাঙালীই ছিল বীরভূম না সিংভূমে বাড়ী। শোনা যায় একটি নারীঘটিত জঘন্য অপরাধে ও খুনের দায়ে এখানে আসে। দীর্ঘ কারা-বাসের পর আর যায়নি ফিরে, দেশের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। বন্দী-জীবনে নিরীহ, শান্ত ও অনুগত হিসাবে তার সুনাম ছিল। পরবর্তী জীবনে জারুয়া-দমনে অথবা জংলী কুলিদের বশে রাখায় সে সরকারের বিশেষ সাহায্যেই এসেছে; সুতরাং ক্রমে ক্রমে সরকারী কৃপা যে তার ওপর বর্ষিত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ওঁরা ওকে জংলীদের সর্দার বলেই মনে করেন, ওঁদের চোখে সে জংলীই আজকাল; জংলীদের মধ্যে যা খুসী সে করুক দেখবার দরকার নেই, শুধু সভ্যসমাজে বিশৃঙ্খলা না আনলেই হলো।

সামন্ত তাই সভ্যসমাজ থেকে দূরে আছে। এই জংলীদের মধ্যে, এই জংগলে, শালীনতার একেবারে বাইরে, কৃত্রিমতা থেকে শত যোজন তফাতে, সে সুখেই আছে। উদ্দাম, অবারিত তার জীবন এখানে। জংগলের সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক!

জংগলের প্রান্তে জংলীদের মতই ওর মাচা-বাঁধা কাঠের বাসা। বাসার পরেই পাহাড়, জঙ্গল, গভীর অরণ্যানী যেন ওকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মতই আহ্বান করে। ওর জংলীর দল নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ও জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ে। এক-একটা গাছ যেন এক-একজন প্রবল

পরাক্রান্ত সৈনিক। এক-একটি কাটা পড়ে, আর সে অদম্য উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে। তারপরে দলবল নিয়ে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই পতিত বৃক্ষকাণ্ডের ওপর, টুকরো টুকরো করে গড়িয়ে দেয় ট্রলির গহ্বরে। কিন্তু জারুয়ার ভয়ে জংলীরা, বিশেষ করে রাঁচির কুলি অর্থাৎ কোল-মুণ্ডারা বড় সন্তর্পণে থাকে, আর সন্ধ্যা নামতে-না-নামতেই নেমে আসে জংগল থেকে। মাঝে মাঝে দিনে দুপুরেই কাজ ফেলে ছুটে চলে আসে তারা, ভীত-ত্রস্ত কণ্ঠে বলে,—জারুয়া!...সামন্তর হাঁক ডাকেও ফিরে যেতে চায় না। অরণ্যের কোন্ কোণ থেকে যেন গম্ভীর একটা শব্দ উঠছে—গুম্—গুম্! জারুয়াদের সংকেতসূচক ঢোলের ধ্বনি। সামন্ত তার কোল্ট্ পিস্তল দিয়ে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে,—শব্দ থেমে যায়। তবু জংলীর দল সেদিন আর কাজের দিকে ঘেঁসতে চায় না। সামন্তর প্রধান অনুচর আরুয়া-বুড়ো জেঠু তার ভাষায় কাঁপা গলায় বলে,—না সাহেব, যেতে বলিস নি, ওরা এসেছে।

দু'একবার দু'একটা জারুয়া ফাঁকিতে ধরাও যে না পড়েছিল এমন নয়—একেবারে নিরাবরণ বন্য সেই মানুষ। বন্য পশুর মতোই কাঁচা মাংস খায়, পশুর মতোই হিংস্র, বন্যদের মতই সন্ধানী। বাঁধন ছিঁড়ে অদ্ভুত কৌশলে তারা গেছে পালিয়ে, গুলির ঘায়েও মরেছিল কেউ কেউ। একেবারে মূর্তিমান আদিম প্রকৃতি, আমাদের সভ্যতার জাল অপসারণ করলে আমাদের চেহারাও বোধ হয় অমনি জংলা, অমনি দুর্দান্ত, অমনি নিঃশঙ্ক নিরাবরণ!

জংলীর দল জারুয়াদের ভয়ে ত্রস্ত। ওরা মনে করে, জারুয়ারা মানুষও খায়। আজকাল বিশেষ করে ওদের ভয়টা যেন বেশী—যখন অরণ্য কেটে বসতি বিস্তার করেছে। অরণ্যে কুঠার পড়লেই জারুয়াদের আক্রোশ যেন বাড়ে। ওরা যেন আদিম অরণ্য-সন্তান, কুঠারাঘাতে অরণ্য-মাতার দেহে যখন মর্ মর্ আর্তনাদ জাগে, ওরা তখনি বুঝি রুখে দাঁড়ায়! ওদের জনসংখ্যা আজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে; বিশেষজ্ঞরা বলেন, আজকাল একশোরও কম। তবু ওরা সভ্য জনপদের বিভীষিকা, একথা স্বীকার করতেই হবে। অরণ্যে ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই। জামা-কাপড় পরনে দেখলেই ওরা ধনুকে তীর যোজনা করবে, আবরণের ওপর ওদের অসীম বিদ্বেষ। বন্ধুত্বপূর্ণ যতই ইঙ্গিত করো না কেন, তোমার আবরণকে ওরা কখনই বিশ্বাস করবে না। ওরা বিচিত্র।

অবশ্য যতই বন্য ওরা হোক, ওদেরও ভীতি আছে। পারতপক্ষে সভ্য বসতির ধারে ওরা ঘেঁষে না। কিন্তু তোমরা যদি ওদের বসতির দিকে হাত বাড়াও, ওদের জীবনযাত্রার চির অন্ধকার রহস্যকে যদি ভেদ করতে গহীন অরণ্যে এগিয়ে যাও, ওদের প্রতিরোধের তীক্ষ্ণ বিষ উদ্যত হয়ে উঠবে বৈ কী!

তাই সামন্ত তার যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই অরণ্য-প্রবেশ করে, ঠিক ওর অনুচরদের মতো। তার বেশী অগ্রসর হবার উৎসাহ নেই। ওরা এসে পড়ে তার এলাকায়, সে তার পিস্তল নিয়ে তাদের সংগে লড়তে রাজী, কিন্তু তার বেশী নয়। থাকুক ওরা ওদের বন্যতা নিয়ে গহীন অরণ্য, অনর্থক ওদের শান্তিভংগ করে লাভ কী?

এপারে সভ্যজগতের ক্রমঃবসতি, ওপারে জারুয়াদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ অরণ্য; সভ্য-অসভ্যের মাঝখানে সে আছে প্রহরীর মতো সীমারেখার পাহারায়! সভ্য ও অসভ্য জগতের মাঝখানে যে অদৃশ্য সীমারেখা টানা রয়েছে, ঠিক সেইখানেই সে আর তার জংলী-দল—সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে সেতু-বিশেষ।

কিন্তু সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে সত্যকার সীমারেখা কী টানতে পেরেছে মানুষ? সারাদিনের ক্লান্তির পর যখন দিক্‌বিদিক অন্ধকারে একাকার করে দিয়ে রাত্রি নামে—তখন সীমার বাঁধন খুলে ফেলে জেগে ওঠে উদ্দাম আদিম মন,—কোথায় ভেসে যায় বিধিনিষেধের বেড়াজাল,—অরণ্যের গন্ধ আর হাওয়া তাকে পাগল করে দিয়ে যায়। কোলমুণ্ডাদের পল্লীতে মাদল বাজে, আরুয়া পল্লীতে বাজে বাঁশী। আখের গুড়ের থেকে গোপনে চোলাই করা মদ নিয়ে আসে আরুয়া বুড়ো জেঠু। নিরুদ্ধ যৌবন যেন জরার প্রান্তে এসেও কথা কয়ে ওঠে!

জেঠুর যেন আজকাল কেমন-কেমন লাগে। কোলেদের প্রধান লছমনকে চুপি-চুপি বলে—জংলী সাহেবের রকম দেখছিস কয়দিন ধরে?

কী?

বহুদর্শী আমাদের জেঠু, বলে,—কেমন উদাস-উদাস ভাব। কেমন চুপচাপ ভাবে। কাজকর্মে আর তেমন আঁঠা নেই সাহেবের। হইল কী? সাঙ্গি আ যত্নআত্তি করে না নাকি সাহেবকে? সাঙ্গি ওদেরই জাতের একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরে
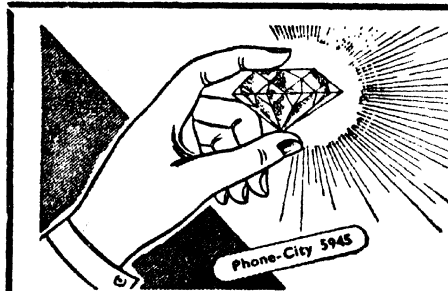
যুবতী মেয়ে। জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে,—আমাকে আর মনে ধরছে না সাহেবের। আমি আর ওর ঘরে থাকব না।

জেঠু ধমকে ওঠে,—থাকবি না ত করবি কী? ওকে রেঁধেবেড়ে দেবে কে? কে আছে আর সাহেবের?

আহা! মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠে সাঙ্গি। ভাবটা এই, সাহেবের আবার মেয়ের অভাব!

জেঠু ধরেছে ঠিক, সামন্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মনের মধ্যে একটা আশংকার ছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। একথা কাউকে বলার নয়। বললে, ওরা ভয় পাবে। সরকারী অফিসে জানাতেও মন চায় না। এখনও কোন ক্ষতি ত করেনি তারা! দেখাই যাক না। দরকার হলে বড়সাহেবকে খবর দিতে হবে বই কী!

জেঠু বললে,—সাহেব বাঙলাদেশ থেকে লোকগুলান আসছে, তাতেই তোর মনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

একটু চমকে উঠল সামন্ত, বলল, কেন রে, ওকথা তোর মনে উঠল কেন?

না, তাই বলছি।

জেঠু তাড়াতাড়ি সরে যায়। সামন্ত দেখেছে নূতন লোকগুলিকে। তারা কেউ চাষী,—পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে লাঙল চ'ষে ধান বুনবার চেষ্টা করছে। তা'ছাড়া কেউ কুমোর, কেউ ছুতোর, নানা ধরণের লোক। এ গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে এসে, অবশ্য একটু দূরে, একেবারে তাদের পল্লীর গা ঘেঁষে নয়। তাদের কাছ ঘেঁষা মানে জংগলের কাছ ঘেঁষা।

লছমন বলে,—এক একটা চাষী লোক তিন-তিনটে মোষ পাইছে গো, দুটো লাঙলটানার জন্য, একটা দুধ দেবার জন্য। আর নগদ টাকাও কিছু। ঐ যে টিন দিয়ে বাসা করছে দেখছিস না?

জেঠু একদিন বলে,—আরে লছমন, ইখানে জমি নিলো·কে, ই জংলীসাহেবের জমির লাগোয়া?

চালা বাঁধছে, বাস করবে দেখছি। এরা কারা?

লছমন বলে,—পিরান-পরা বাঙালী-বাবুদের মতো দেখাচ্ছে যেন!

—জংগলের কাছটি ঘেঁষছে, ভয়-ডর নাই?

ভয়-ডর কী? জংলীসাহেব রইছে নাই?

জংলীসাহেবের কিন্তু এসবে দৃকপাত নেই। এরা আসছে নিরাশ্রয় হয়ে,—তা আসুক, বাঁধুক এখানে ঘর। তাতে তার কী? সরকারী লোক বলে দিয়েছে,—ওদের দেখো সামন্ত, তোমারই ওপর ভার, ওরা যেন কোনো বিপদে-আপদে না পড়ে!

সামন্ত মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে এসেছে। বিপদ-আপদ আর এখানে কী? যদি কিছু ঘটে ত তারই ঘটবে, আর কারুর নয়।

হয়ত বিপদ আসন্ন। মনটা কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে থাকে সব সময়। মনে হয় নিদারুণ কোন দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে। আসন্ন বিপদের পদধ্বনি সে যেন শুনতে পেয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে তার বাসাকে ঘিরে সেই বিপদ যেন সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ায়। একি তার মনের ভ্রম?

কিছুদিন আগেকার ভুলে-যাওয়া ঘটনাটি তার আবার মনে পড়ছে আজকাল। এক সন্ধ্যায় কাজের শেষে পাহাড় থেকে নামবার মুখে অতর্কিতে এক জারুয়াকে ধরে ফেলেছিল ওরা। ম্লানায়মান অন্ধকারে ছায়ার মতোই দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের আড়ালে। কিন্তু পালাতে পারেনি। আন্দামানের মন্দগতি জীবনে এ এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। হয়ত পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে, হাঁটতে পারছিল না ভাল-রকম। দলবিচ্ছিন্ন একক এক জারুয়া। তাকে বেঁধে নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল তারই পাশের ঘরটাতে। সামন্ত তখন আনন্দে আত্মহারা বললেই হয়। সরকারে তার নাম উঠবে, ইনামও কিছু পাওয়া উচিত তার।

জেঠুর বাসা থেকে টলতে টলতে ফিরছিল সামন্ত, পিস্তল হাতে, একা। সেই ঘরটি খুলে বন্দীকে ভালো ক'রে দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সামন্ত। চালের কাঠের সঙ্গে হাত দু'টি শক্ত করে উঁচু করে বাঁধা, নীচে পা দুটোও বাঁধা, মুখেও কাপড় জড়ানো, যাতে শব্দ করতে না পারে বা কামড়াতে না পারে, ওদের দাঁত নাকি হিংস্র পশুর মতই তীক্ষ্ন। জটার মতো চুল ঝুলছে কাঁধের দু পাশ দিয়ে, চোখে ভয়ার্ত বন্য দৃষ্টি, এই প্রথম লক্ষ্যে পড়ল তার,—নিরাবরণ জারুয়াটি নারী এবং অল্প-বয়সী যুবতীই হবে সে।

কিন্তু গভীর রাত্রে কি একটা শব্দে তার ঘুম গেল ভেঙে। পিস্তল নিয়ে বেরুতে বেরুতেই দেখা গেল দ্রুতগতি দুটো ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎবেগে তার সামনে দিয়ে নেমে জংগলে ঢুকছে! মুহূর্তেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছিল সামন্ত, প্রবল উত্তেজনায় তার পিস্তল থেকে গুলী ছুটল, একবার-দু'বার-তিনবার। একটা ছায়ামূর্তি যেন পড়েও গেল মাটিতে।

পিস্তলের শব্দে বল্লম হাতে ছুটে এলো জেঠু আর তার দল, ছুটে এলো লছমন তার সাংগপাংগ নিয়ে। যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই। কে বা কারা বন্দিনীকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে কৌশলে। মশাল জ্বালিয়ে পিস্তলের শব্দ করতে করতে অরণ্যে কিছু দূর গিয়েই ফোঁটা ফোঁটা রক্তের সন্ধান পাওয়া গেল, তারপর এক জায়গায় চাপ রক্ত। সেইখান থেকে মাটিতে ভারি কোন কিছু টেনে নিয়ে যাবার স্পষ্ট দাগ। ওরা কিছুদূর গিয়েই ফিরে এলো, কাউকে দেখা গেল না। সামন্ত বুঝল, একজন ওদের কেউ নিশ্চয়ই গুলীতে মরেছে, নয়ত গুরুতর আহত।

ঘটনা এইটুকু, কিন্তু মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে গেল চমৎকার! জনৈক ইংরাজ সেনাপতির পর জারুয়া ধরায় তারই নাম বিখ্যাত হয়ে রইল! কিছুদিন কেটে গেল এইভাবে। কিন্তু তারপর থেকে কি যেন হলো সামন্তর, কিছুই ভালো লাগে না। সাঙ্গিকে প্রায়ই তাড়িয়ে দিতে গেছে! বলেছে, কোলদের মতো কাপড় পরেছিস কি? তোদের সেই জংগলে জাতভাইদের মতো গাছের বাকল পড়তে পারিস না!

সাঙ্গি ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে! সাহেব বলে কি, বুক-খোলা জংলীদের খাটো পোষাক সাহেবের পছন্দ হবে কেন? 'জংলী সাহেব' নিশ্চয়ই মসকরা করছে!

এই অস্থিরতাও একদিন মিলিয়ে গেল সামন্তের। কিন্তু কয়েকদিন হলো

তার আবার ভাবান্তর হয়েছে। সাঙ্গি বলে,—ঘুমুতে ঘুমুতে চমকে চমকে ওঠে সাহেব, পিস্তলটা তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরে। বলে, শুনছিস না পায়ের শব্দ!

তীব্র প্রতিহিংসায় কে যেন তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত তার গুলীতে মরে গেছে সেই বন্দিনী জারুয়া নারী, তার পুরুষ সঙ্গীটি শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে তার সর্বনাশ সাধনের পথ খুঁজছে! সেও সতর্ক থাকে সব সময়। কিন্তু সাঙ্গিকে সরাতে হবে, ওকে ওর প্রিয়জন মনে করে ওর ওপর না ওরা কিছু করে বসে। সাঙ্গিকে একদিন তাই বললে, বাড়ী যা। আর এখানে আসিস না কোনদিন!

সাঙ্গি অবাক হয়ে বলে উঠেছিল, সে কি, রান্নাবান্না করে দেবে কে তোর?

বেশ। দিনমানে থাকিস রাত্রি হতে না হতেই চলে যাস সব কাজ সেরে। বুঝলি?

সাঙ্গি কেঁদে ফেলে। সামন্ত তার চুল ধরে এক টান দিয়ে বলে, ন্যাকামী করিস না! বাসায় যা।

কথা না শুনলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো!

বৃত্তান্ত শুনে জেঠু বলে, ব্যাপারটা কি বলত সাহেব, ওকে তাড়ালি কেন?

ভাল লাগছে না কিছু, থাক না ওর বাসায় কিছুদিন।

প্রবীণ সাদা মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে জেঠু বলে, বুঝেছি। বাতাস লাগছে তোর। নতুন পরান খুঁজছিস!

চুপ কর তুই! ধমকে উঠল সামন্ত, বুড়ো বয়সে ভীমরতি! সে সব কিছু নয়, আমায় এখন কিছুদিন একলা থাকতে দে।

জেঠু আর কিছু না বলে চলে যায়। কি সে বুঝল কে জানে? সব কথা ত ওদের বলা যায় না! এখুনি ওরা ভয়-ডর পেয়ে সোরগোল তুলবে! দেখাই যাক না, কতদূর কি হয়! জানালা-দরজা বেশ ভালো করে বন্ধ করেই সে শোয়, তবু জেগে-জেগে ওঠে একটু পরে পরেই, বন্য বিরহীর দীর্ঘশ্বাস যেন তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়!

কিন্তু দিনের প্রখর আলোয় সব আশঙ্কাই বিলীন হয়ে যায়। জারুয়াদের জন্য সরকারী অফিসে সাহায্য চাইবার যে ব্যবস্থা সে করবে ঠিক করেছিল, তা স্মরণ করে দিনের বেলায় তার হাসিই পায়। দিনে সে পূর্ণ উদ্যমে কাষ্ঠ সংগ্রহে ব্যস্ত। হাঁক-ডাক, হৈ-চৈ, গোলমালে পল্লীটি অস্থির। যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি সে কাটিয়ে এসেছে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, সেই বঞ্চিত ক্ষুধিত যৌবন জীবন-সায়াহ্নে উদগ্র হয়ে উঠেছে, যেন পেয়ালা পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে অমৃতের ধারা। তাই যুবকের চেয়েও সে দৃঢ়, যুবকের চেয়েও সে উদ্যমশীল, নির্ভীক। মধ্যাহ্নে সাঙ্গি এলো তার খাবার নিয়ে। হাতে-গড়া মোটা কয়েক টুকরো পোড়া রুটি, কিছু ফেনশুদ্ধ ভাত, আর শুটকী মাছ পোড়ান। এক গেলাস দুধ। এই তার দৈনন্দিন খাদ্য। আহারে-বিহারে এই জংলীদের সঙ্গে তার কোনো তফাৎই নেই। খালি গা প্রখর রৌদ্রে ঘামে ভিজে গেছে। মাথায় মুখে কিছু জল দিয়ে সেই অবস্থাতেই গাছের ছায়ায় খেতে বসল সামন্ত। জঙ্গলের অনেকটা ভিতরে আজকাল কাজ চলছে তাদের। এখান থেকে রৌদ্র মাথায় করে বাসায় ফিরতে চায় না কেউ। আর সব কুলি-কামীনরা ত সেই ভোরেই মাথায় খাবারের বাটি বসিয়ে কাজে আসে। শুধু সামন্তেরই আছে সাঙ্গি। নইলে সব মেয়ে-মরদকেই জঙ্গলে আসতে হয় কাজে। কেবল বুড়ীরা থাকে বাসায় ছেলেপিলে আগলাতে। অকারণ স্ফূর্তিতে টগবগ করছিল আজ সামন্ত, সাঙ্গির খোঁপায় এক টান মেরে বলল, অমন মুখ ভার করে বসে আছিস কেন? টাকা চাই?

ছাই তোর টাকা!

তবে?

সাঙ্গি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কাঁদিস কেন? সামন্ত বলে, নাঃ, তোরা দেখি একেবারেই সভ্য-ভব্য হয়ে গেছিস! তোদের জংলী ভাইবোনদের দেখ্ গিয়ে। মাছ ধরছে, হরিণ শিকার করছে, বল্লম ছুড়ছে; কান্না কাকে বলে তারা জানে না! নানকৌরী দ্বীপে গেছিস? তোর মতো সাড়ী পরে না মেয়েরা, গাছের বাকল।

সাঙ্গির চোখ দুটো যেন তখন জ্বলছে, বললে, তোরই জন্য ত। তোর জন্যই ত আমরা সবকিছু করলাম!

হো-হো করে হেসে ওঠে সামন্ত, বলে, আমি ত তোদেরই মতন। আমিও তো জংলী।

সাঙ্গি রোষভরে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। ভাবটা এই,—আহা, তুই জংলী হতে যাবি কিসের জন্য!

দেখ্ সাঙ্গি, সামন্ত বলে, যাবি ঐ জঙ্গলের ভিতরে? অনেক দূরে জারুয়াদের সঙ্গে থাকব—

জারুয়াদের মতন! তোর সাড়ীরও দরকার নেই, গাছের বাকলেরও দরকার নেই!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে সাঙ্গি চেয়ে থাকে ওর দিকে। হয়েছে কি জংলী সাহেবের! পাগল হলো না ত! এসব কি আজে-বাজে বকে সে আজকাল!

সত্যি সাঙ্গি, সামন্ত বলে যায়,—তোদের ঘর-বাড়ি, পোষাক-আসাক, টাকা-কড়ি, কাগজপত্র কিছুই আমার ভলো লাগে না! এসব যেন ফাঁকির কারবার। ঐ জারুয়ারাই সাচ্চা!

এসবও সাঙ্গির বোঝবার কথা নয়, সে এর মধ্যে কি যেন আশঙ্কার সন্ধান পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, জারুয়ারা

তোকে খেয়ে ফেলবে, জঙ্গলে-টঙ্গলে যাস না!

হেসে ওঠে সামন্ত, বলে, কেনরে, খাবে কেন আমাকে? আমি ওদের কি করেছি?

তুই ওদর ওপর হামলা করেছিস না? জখম করেছিস না একটাকে? ওরা কিন্তু কিছু ভোলে না!

স্তব্ধ হয়ে যায় সামন্ত। তার অন্তরের শংকার ছায়া কি দেখতে পেয়েছে এই মেয়ে? তারও এই তো দিনরাত্রির চিন্তা!

কী ভাবছিস, সাহেব?

জংলী সাহেব হো-হো করে হেসে উঠল এবার. কী মনে ক'রে পিস্তলটা বার করে ওপরে উঁচিয়ে শূন্যের দিকে গুলী ছুঁড়ে দেয় একটা। শব্দ শুনে জংলীর দল সচকিত হয়ে ছুটে আসে। জেঠু এসে বলে,—কী হল সাহেব? জারুয়া?

উঠে দাঁড়ায় সামন্ত,—তোদের খালি জারুয়া আর জারুয়া! জারুয়ার ভয়ে রাত্রে ঘুম নেই! কী করবে জারুয়া? আয় কাজে চল্।

একটু এগিয়ে যেতেই লছমনের সঙ্গে দেখা। বলল,—তোকে কে খুঁজছে সাহেব।

আমাকে?

হ্যাঁ। ঐ যে।

নীচে ট্রলির লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী-চশমা-পরা এক বাঙালী ভদ্রলোক, হাত-জোড় ক'রে স্মিতহাস্যে বলছেন,—নমস্কার!

সানুচর নেমে আসে সামন্ত. বলে—কে? কী দরকার?

ভদ্রলোক বলেন,—আপনিই মিস্টার সামন্ত, নমস্কার! আপনার কথা খুব শুনেছি। বলতে গেলে আপনিই আমাদের রক্ষক।

কিন্তু, আপনি কে?

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের অনেক নীচে, যুবকই বলা যায়, তেমনি স্মিত-হাস্যে বললেন,—উদ্বাস্তু। ঐ ত একেবারে আপনাদের গা ঘেঁষে চালা তুলেছি।

সামন্তর কণ্ঠস্বর রুক্ষ, বলল,—তা এখানে চলে এলেন কেন, জঙ্গলে?

ভদ্রলোক অপ্রতিভ একটু হাসলেন, বললেন,—শহর ছেড়ে একেবারে গাঁয়ে এসে ডেরা বাঁধলাম কেন, তাই জিজ্ঞাসা করছেন? তা খানিকটা ইচ্ছা করেই এসেছি। দেখুন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। দেশে স্কুলে মাস্টারী করতাম। দেশ ত গেল, কিন্তু এখানেও ঐ মাস্টারী করা ছাড়া আর কী কাজ আমাদের দিয়ে হবে? ভাবছি. ছোট একটা স্কুল করব এখানে,—এই প্রাইমারী, মানে পাঠশালা গোছের। সরকারপক্ষ থেকে সব রকম সাহায্যও পাবো এ ব্যাপারে।

স্কুল! স্কুল করবেন! —সামন্ত একটু হেসে উঠল,—কাদের পড়াবেন? এই জংলীদের?

না হয় এরা না-ই পড়ল, এদের ছেলেমেয়েরা ত আছে? তা ছাড়া, দেখুন না, বাঙালী উদ্বাস্তুর ছেলেপিলেরাও তো আছে!

তাদেরি. নিয়ে পড়ুন। এখানে সুবিধা হবে না।

কেন হবে না! —ভদ্রলোকের চশমা রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করছে, বললেন,—না হবার কোনো কথা নয়। শুধু আপনি আমায় একটু সাহায্য করুন। আপনিও আমাদের মতো বাঙালী, আপনি চেষ্টা করলে...

বাধা দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সামন্ত, বলল,—ভুল করেছেন মশাই, আমি জংলী, এই এদেরই মতন। আমার সঙ্গে আপনাদের পোষাবে না! যান—যান—এই জঙ্গলের মধ্যে এসেছেন কেন, বাসায় যান!

বলেই সরে গিয়ে যথারীতি হাঁক-ডাক শুরু করল সামন্ত,—এই মংলু, লছমন, বুধিয়া,—আ যাও রে! জেঠু ওদের করাত ধরতে বল্। আর শোন, করাতের গুঁড়ো এবার থেকে কেউ পাবে না, সব চালান দিতে হবে শহরে। বড় সাহেব ব'লেছে. করাতের গুঁড়ো দিয়ে শহরের বাতিঘরের বয়লার জ্বালাবে, বুঝলি?

হাঁ।

হেসে উঠল সামন্ত,—তুই তো সব বুঝে উল্টে গেলি! বয়লার কাকে বলে জানিস?

জেঠু এ রসিকতায় কান দেয় না, বলে,—জংলী সাহেব, ই বাবুটা কে?

কে আবার! তোর-আমার মতো মানুষ, তোর-আমার মতই লাল রক্ত ওর গায়ে। এখানে থাকবে, ঐ যে টিনের চাল উঠেছে, ঐ ওখানে। স্কুল করবে রে স্কুল তোকে, আমাকে সব পড়াবে! সব আমরা 'বাবু' হ'য়ে যাবো!

আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সামন্ত জেঠু বোকার মতো ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে, এ সবের কিছুই সে বোঝে না! তারা তো জংলী, 'বাবু' তারা হতে যাবে কেন? পাগল এই জংলী সাহেবটা

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে ক্ষুণ্ণমনে বাসার দিকে ফিরে গেছে। লোকটিকে হাঁকিয়ে দিতে পেরে সামন্তর স্ফূর্তি বেড়ে গেল দ্বিগুণ। হয়ত নিজেই করাতে টান দিয়ে এলো দু' তিনবার। কেটে-ফেলা গাছে ডাল-পালা কাটছে সব কুলি-কামিনরা তাদের মধ্যে গিয়ে হয়ত ডাল কাটতে শুরু করল। গুঁড়ির টুকরো দড়ি বেঁধে ট্রলি কাছে গড়িয়ে আনছে কেউ কেউ,— তাদের সঙ্গে দড়িতে টান দিয়ে চীৎকার করে,—মারো জোয়ান, হেঁইয়ো!

কামিনরা ছোট ছোট ডালগুলি কেটে পরিষ্কার করছে একটা গুঁড়ি থেকে সামন্ত এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে এরা সব কোল মেয়ে। পরনে খাটো শাড়ি আঁচল বুকের ওপর দিয়ে টান ক[illegible] কোমরে বাঁধা, মাথায় ঝুঁটি-করা খোঁপা তাতে ফুল গুঁজেছে। ওরা একটানা সু[illegible] গান ধরেছে, আর কাজ করে চলেছে; গ[illegible] আর কাজ একসঙ্গে। সামন্ত কার[illegible] খোঁপা টান মেরে ভেঙে দিচ্ছে, কা[illegible] ফুল দিচ্ছে ছিঁড়ে ছড়িয়ে। একটি গো[illegible] গাল অল্পবয়সী মেয়ে খোঁপায় হ[illegible] দিতেই রুখে দাঁড়ালো, সামন্তর হা[illegible] ধরে মুচড়ে কামড়ই বা বসিয়ে [illegible] বুঝি! সামন্ত হেসে বলে,—বহুৎ আ[illegible] তোর নাম কী রে?

মেয়েটি ওর মুখের দিকে চেয়ে হ[illegible] ফিক করে হেসে ফেলে. বলে,—কমলি!

সামন্ত চট করে ওর চিবুক ধরে এ[illegible] নাড়া দিয়ে বলে,—কমল-ফুল! তা' [illegible] বুনোকমল, এখানে কেন? বনে যা[illegible]

সঙ্গিনীর দল হেসে ওঠে। সা[illegible] তাদের দিকে ফিরে বলে,—কীরে, হা[illegible] কেন সব?

একটি মুখরা মেয়ে উত্তর দে[illegible] সাহেব, কমল ফুলত বনেই পড়ে ত[illegible] তোদের ঘরে গিয়ে ত ফোটে নাই!

আবার হাসির ফোয়ারা ছোটে। সামন্ত ওদের ছেড়ে আরেকটু উঠে যায় পাহাড়ে। গুঁড়ি গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নীচে, লছমন হাঁকছে—হুঁশিয়ার!

এইভাবে কাজের দিন গড়িয়ে যায় সায়াহ্নে, ওরা দলবেঁধে সারি সারি নেমে আসে—ক্লান্ত দেহে। একটা মাটির জালায় খাবার জল রাখা হয় মাঠের ধারে। তার একটু দূরে একটি পাথরের ওপর বসে পড়ে সামন্ত। দলের লোক সব ফিরে গেলে যখন সর্দাররা বলবে, 'সব ঠিক আছে সাহেব', তখনই সে নিশ্চিন্ত মনে ফিরবে নিজের ঘরে। স্ফূর্তির জোয়ারে আজ বেশ পরিশ্রম করেছে সামন্ত, শরীর ক্লান্ত, তৃষ্ণাও পেয়েছে বেশ। ভীড় ফিকে হয়ে গিয়েছিল। একটি কোল-মেয়ে বোধহয় মাটির গেলাসে করে জল নিয়ে পান করছে ওর দিকে পেছন-ফেরা, দেখা যাচ্ছে না মুখ। সামন্ত বলল, মিটু গ্লাস দা লাগুইমে?

চট করে ফিরে দাঁড়াল মেয়েটি, খুশি-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল। তুই আমাদের কোল ভাষা জানিস, সাহেব!

সামন্ত দেখে, নিকষ কালোর লাবণ্যে-ভরা সেই কমালি-ফুল! উঠে দাঁড়াল, বলল,—হ্যাঁরে ফুল, আমি যে তোদের ওদিককারই লোক!

মেয়েটি সযত্নে জলের গ্লাসটি এগিয়ে দেয় ওর হাতে। যতই ঘুরিয়ে শাড়ী পরুক, ওরা সেই বুনোই। শরীর-মনের বন্যতা কী কৃত্রিম শালীনতা দিয়ে ঢাকা যায়! ওর চোখে-মুখে-দেহের উচ্ছলতায় সেই অবারিত আদিম বন্যতারই উদগ্র ইশারা!

লছমন এসে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে কাছে, বলছে,—সব ঠিক আছে, সাহেব!

ঠিক আছে? আচ্ছা, চল এবার।

সন্ধ্যা নামছে, জংলীর দলটি নেমে একটু ঘুরে গেল খালের দিকে, সেখানে স্নান সেরে ঘরে ফিরবে। জংলী সাহেবও স্নান করে সেখানে জংলীদের সঙ্গে। স্নান সেরে ফিরতে ফিরতে বেশ ঘোর অন্ধকারই হয়ে গেল আজ! ভিজে গা দিয়ে জল ঝরছে, পরনের প্যান্ট ভিজিয়েছে আজ,—এক হাতে শুধু পিস্তলটা, অন্য হাতে জুতো জোড়া। মাথার বড়ো বড়ো চুল বেয়ে জল ঝরছে, প্রশস্ত রোমশ বুকখানায় রোমরাজি ভিজে লেপ্টে আছে। একমনেই হাঁটছিল সামন্ত, বাসার কাছে এসে একটু যেন চমকে উঠল! বাসার মাচার নীচে ও কারা দাঁড়িয়ে!

—নমস্কার।

থমকে দাঁড়াল সামন্ত। দুপুরের সেই চশমা-ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা উদ্বাস্তু ভদ্রলোকটি। সঙ্গে আরও কেউ হবে, সাদা সাদা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে।

কী?

ভদ্রলোক তেমনি স্মিতহাস্যে বললেন, এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে! চলুন ওপরে, ঘরে গিয়ে বসা যাক।

নিরুত্তরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল সামন্ত, নিতান্ত অপ্রসন্ন মনেই। রাত্রির খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ অনেক রাত পর্যন্ত তার চলে জেঠুর ঘরে, কিন্তু প্যান্টটা বদলে লুঙ্গিটা পরে নিয়ে বেরুবার মুখে এ' আবার কী ফ্যাসাদ!

ঝাঁপটা খুলে ঘরে ঢুকল সামন্ত, বাতি জ্বালিয়ে সব ঠিক-ঠাক করে রেখেই চলে গেছে সেই কাঁদুনে মেয়েটা সাঙ্গি।

বেশ ঘর আপনার, দুখানাই ঘর বুঝি? ভদ্রলোক নিজেই ঢুকে পড়লেন ভিতরে, পিছনে পিছনে আরেকজন। সামন্ত সেইদিকে তাকাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। শাড়ী-ব্লাউজে-ঢাকা শহরের বড়কর্তাদের মেয়েদের মতো একটি মেয়ে, তাদেরি মতো সুগৌর গায়ের রং,—তারই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে! ভদ্রলোক বললেন, ইনি আমার স্ত্রী। ইনি মিস্টার সামন্ত।

—নমস্কার।

কিন্তু ভদ্রতার রীতিনীতি সবই ভুলে গেছে সামন্ত। তার নিজের দিকে শুধু চোখ পড়ল। সারাটা গা খালি—শুধু কোমরে খাটো প্যান্ট। প্রশস্ত রোমশ বুকখানা চরম নির্লজ্জতাই প্রকাশ করছে যেন! চট করে লুঙ্গিটা নিয়ে ছুটে বাইরে গেল সামন্ত; যখন ফিরে এলো, স্বামী-স্ত্রী তারই বিছানার খাটটার ওপরে অতি সহজ ভঙ্গীতেই বসে কী যেন কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে। ভদ্রলোক বললেন, আসুন। হয়ত অসময়ে বিরক্তই করতে এলাম আপনাকে। সামন্ত তার খাকীর জামাটা মেঝে থেকে তুলে হাতে নিলো, তেমনি নিরুত্তরেই আবার গেল বেরিয়ে। জামাটা অসাধারণ ময়লা, ভদ্রলোকের উজ্জ্বল শুভ্রতার কাছে এ'কিছুই নয়; কিন্তু তবু, যাহোক একটা আবরণ ত এটা!

ভদ্রলোক বললেন, সঙ্কোচ করবার কিছু নেই মিস্টার সামন্ত, আমরা নূতন এসেছি, কিন্তু আমাদের আপনি আপনার বন্ধু বলেই জানবেন।

মহিলাটির ঘোমটা কপালের ওপর পর্যন্ত ওঠানো, চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে, বললেন,—আপনি বসুন আগে।

জড়োসড়ো হয়ে খাটের এক কোণে বসে পড়লো সামন্ত। ভদ্রলোক বললেন, তারপর, কতদিন হয়ে গেল আপনার এখানে, এই শহীদ দ্বীপে?

কতদিন? মৃদু একটু হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে আনল সামন্ত, বলল,—কত-দিন তার কী লেখাজোখা আছে! বহুদিন!

একাই থাকেন?

হ্যাঁ, একাই। তবে, এইসব জংলীর আছে।

এই জীবন আপনার ভালো লাগে?

সামন্ত বলল,—মন্দ কী?

ভদ্রলোক বললেন, আমার কথাটা ভেবেছিলেন কী?

কোন কথা?

সেই যে স্কুলের কথা বলেছিলাম?

স্কুল! সামন্ত বলল, বেশ ত, করুন স্কুল।

সরকার অবশ্য সমস্ত সাহায্যই করবেন, কিন্তু আপনার সাহায্যই বেশী দরকার।

আমি? সামন্ত হাসল, আমি কী সাহায্য করব? নিজেই লেখাপড়া ভালো শিখতে পারিনি।

দেখুন? —ভদ্রলোক কাজের কথায় এলেন একেবারে, আমার বাসার পাশে যে বড়ো চালাটা উঠছে, ওখানেই পাঠশালা খুলব। উদ্বাস্তুদের ছেলেপিলে নিয়ে প্রথম-প্রথম বসব, তাদের দেখাদেখি জংলী-দেরও ইচ্ছা হবে, কী বলেন? দেখুন, মিস্টার সামন্ত, সত্যিকার শিক্ষার বড়ো দরকার, না হলে দেশের উন্নতি নেই! আর এদেশ এখন আমাদেরি দেশ বলতে হবে!

মহিলাটি এইবার একটু মৃদু হাসলেন, বললেন, তোমার স্কুলের প্রসঙ্গ একটু থামাও। অন্য কথা কিছু নেই?

আছে বই কী, ভদ্রলোক উৎসাহে বলে উঠলেন, জানেন মিস্টার সামন্ত, রস্ আইল্যান্ডে গিয়েছিলাম কাল। ঘরবাড়ী নিয়ে দ্বীপটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে; এক বাতিঘর ছাড়া কিছু এখন আর নেই। অথচ দেখুন, আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠতে পারে ওখানে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেদিকে তাকাই, সমুদ্র। অদ্ভুত জায়গা!

মহিলাটি এবারও তেমনি হেসে বললেন, থামো তুমি। মিস্টার সামন্ত, আপনার জঙ্গলের কথা বলুন। খুব বড়ো জঙ্গল বুঝি এটা?

সামন্ত বলল,—হ্যাঁ, জঙ্গলটা বড়োই বটে। ভিতরে নিবিড় বন।

জন্ত-জানোয়ার নেই?

সামন্ত মুখ তুলল এতক্ষণে, বলল, সরকারী হিসাবে হরিণ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আমি ভিতরে অজগর সাপ দেখেছি, তবে অন্য কোন জন্তু চোখে সতাই পড়েনি।

মহিলাটি উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল, জিজ্ঞাসা করলেন জারুয়াদের কথা, তারপরে আলোচনা ঘুরে গেল অন্য-দিকে। মহিলাটি এক সময় বললেন, যাই বলুন, এতবড়ো বন, এর মধ্যে বাঘ-ভালুক নেই, এ'আমি বিশ্বাস করতে পারি না!

সামন্ত বলল, কেউ কেউ বলে, এক-রকম ছোট ছোট বাঘ আছে, ঝোপে-ঝাপে গাছে-গাছে বেড়ায়, অতর্কিতে শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ে রক্ত চুষে খায়!

ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জেগুয়ারের কথা বলছেন!

তা জানি না, সামন্ত বলল, কেউ তাদের কোনদিন দেখা পায়নি, কিন্তু ঝোপের কিম্বা নীচু ডালপালার আড়ালে দুই তীব্র জ্বলন্ত চোখ অনেকেই দেখেছে এখানে!

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু তারা যে জেগুয়ার, তার কী প্রমাণ আছে? হয়ত তারাও অসভ্য জারুয়া, অন্ধকারে বন্য মানুষের চোখও হয়ত অমন জ্বলে! কিন্তু দাঁড়ান, একটা কথার মীমাংসা করি। জেরুয়া আর জেগুয়ার, কথাটা এক নয় ত? ভাবতে হবে এই নিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেগুয়ারকে সভ্যতাধ্বংসী বন্য হিংস্রতার প্রতীক বলা হয়ে থাকে, সেই অর্থে এই অসভ্য হিংস্রদের 'জারুয়া' বলা হয় না ত?

ভদ্রলোক নিজের ব্যাখ্যায় নিজেই জ্বলে উঠলেন অদম্য উৎসাহে, স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, দেখছ, লীলা, একটা অদ্ভুত সূত্র খুঁজে পাচ্ছি: তোমায় বলেছি না, ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে এমনি অনেক কিছু তথ্য পাওয়া যায়!

মহিলাটি একটু হেসে উঠলেন, বললেন, রেখে দাও তোমার ক্ষ্যাপামী। এখন ওঠো, হয়ত মিস্টার সামন্তর আমরা বিশ্রামের ক্ষতি করে দিচ্ছি।

কিন্তু ভদ্রলোকটি এত কথায় যা পারেননি, ভদ্রমহিলার অতি সহজ অন্তরঙ্গতার সুরে সে কাজটি হয়েছে, সামন্তর জড়তা অনেক কেটে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বললে,—না, না, আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। বসুন না আরেকটু।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন, না, আপনি একটু জিরোন, গল্প তোলা রইল আরেকদিনের জন্য। সব সময়ই আসব আমরা, বিরক্ত করব, এই ত দুপা এগুলেই আমাদের বাসা। মিঃ সামন্ত, কালকে সন্ধ্যাবেলা আসুন না আমাদের বাসায়? চা খাবেন।

চা সে শহরে গেলেই খায় বটে; কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতার সুরে কেউ ত' তাকে কোনদিন ডাকেনি? সে হঠাৎ-ই কোনো উত্তর দিতে পারল না। সেলুলার-জেলের সেই রুক্ষ দিনগুলি মনে পড়লে সভ্য-শালীন জীবনের প্রতি সে একটা আক্রোশই অনুভব করে। ছোট্ট সেল। মাথার ওপরে একটা ঘুলঘুলি, একপাশে ক্ষুদ্র লোহার দরজা। সেলের একপাশে নর্দমা, দরজার পাশে কম্বলের বিছানা, এটুকুর মধ্যে দিনের পর দিন কেটে গেছে তার। সেই এক ঘেয়ে জীবনে না ছিল প্রীতি, না ছিল মমতার পরিচয়। স্নেহ-মায়া-ভালোবাসা, এসব যেন তার কাছে কল্পনার বিষয়।

সেই রাত্রে আবার যেন সেই সেলুলার জেলের ভয়াবহ বন্দিত্ব অনুভব করল সামন্ত। ছটফট করে কাটিয়ে দিল সারাটা রাত। সকাল হতেই এলো সাঙ্গি, তার থমথমে কাঁদো-কাঁদো মুখ নিয়ে। এলো জেঠু, কি হলো সাহেব, কাল এলি না?

শরীরটা ভালো ছিল না রে জেঠু। তাই আর উঠিনি।

জেঠু মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়, নিশ্চয় বাতাস লেগেছে সাহেবের। কিন্তু যায় না সাঙ্গি, বলে, সাহেব, তুই সত্যিই আমাদের লোক না।

হো-হো করে হেসে উঠল সামন্ত, ওর বাহুমূলে দুটো ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, কে বলে আমি তোদের লোক না? আরে, আমি কি লেখাপড়া-জানা বাবু? আমি জংলী!

সাঙ্গি আর্তকণ্ঠে বলে, আঃ ছাড়, আমাকে, লাগে না আমার! জংলী কুথাকার!

বলেই এতদিন পরে হাসি ফুটে ওঠে সাঙ্গির মুখে। সামন্ত উঠে দাঁড়ায়, বলে, ঐ ঘরে দেখ্‌তে বোতল-টোতল একটা-আধটা আছে কি না, শরীরটায় একটু জুৎ করেনি।

কাজের দিন গড়িয়ে চলে। লছমন এসে বলে, বড় সাহেব আসছে লোকজন নিয়ে, গাছে-গাছে চিহ্নৎ করবে, আরও গাছ কেটে সাফ করতে হবে, তুকে ডাকছে, আরো লোক নাকি ইখানে আসবে।

মাথায় বিবর্ণ শোলার হ্যাটটা চাপিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সামন্ত।

সে রাত্রে জেঠুর আস্তানায় স্ফূর্তির মাত্রা একটু বেশী। জংলী সাহেব এত মাতোয়ারা হয়ে হল্লা করেনি বহুদিন। নেশায় সবাই ভরপুর, জংলী সাহেব সাঙ্গির কুঠুরিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল,—আজ আর উঠে বাড়ী যাবার ক্ষমতা নেই তার! রাত অনেক, আরুয়া পল্লী ঘুমন্ত, শুধু অভ্যাসবশেই ঘুম আচমকা ভেঙে গেল সামন্তর। দূরে বনে গুম্ গুম্ গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে না? হয়ত তারই মনের ভুল। পায়ের কাছে একতাল মাংসের স্তূপের মতো পড়ে আছে সাঙ্গি,—ঊর্ধাঙ্গ নিরাবরণ, কোমরের কাছে গাছের বাকল জড়ানো। একেবারে জংলী আরুয়া নারীর বেশেই আজ তার কাছে এসেছিল সাঙ্গি, কিন্তু তাতেও মন ভরেনি সামন্তের। অন্তর-কন্দরে কোন্ বিচিত্র কামনার অগ্নি-গোলক উদগ্র ক্ষুধায় জ্বলছে, তার হদিস কে জানে! সেই হাত-পা-বাঁধা নগ্নিকা জারুয়া-নারীদেহকে মনে পড়ে, সেই

উদ্ধত দেহছন্দ, সেই হিংস্র বিষাক্ত তীরের মতো দুটি চোখের দৃষ্টি!...... কিন্তু না, না, ও কোথায় কোন গহীন অরণ্যের অন্ধকারে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সে! উত্তেজনায় উঠে বসেছে জংলী সাহেব,—না, না, এ হয় না, হতে পারে না! অসীম বিতৃষ্ণায় সে পায়ের কাছের মাংসপিণ্ডকে দু'পায়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়! সাঙ্গি তখন কোন্ সুখ-স্বপ্নের সুরায় আচ্ছন্ন, কে জানে, একবার জড়িত-কণ্ঠে বলে, 'উঁ' তারপরে নিশ্চিন্ত আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপরে আবার দিন, আবার সন্ধ্যা। বাসায় এসেই সাঙ্গিকে তাড়িয়ে দেয় ঘর থেকে। বলে, যা' তুই তোর ঘরে। শীগগির যা?

করুণ কণ্ঠে তাকায় সাঙ্গি, বলে,—আরে, আলো জবালব না!

আমি আলো জ্বালাছি। যা তুই। বেরো শীগগির। কাপড় প'রেছে দেখ! অসভ্য জংলী!

কান্না সম্বল করে সাঙ্গি আবার ফিরে যায় তার ঘরে। সামন্ত নিজের হাতে আলো জ্বালে, খাকীর জামাটা গলিয়ে দেয় গায়ে, এবং তারপরে আকাঙ্ক্ষিত সেই কণ্ঠস্বরই দরজার কাছ থেকে শোনা যায়, —নমস্কার!

ঘরের শ্রী দেখে লীলা নিজে থেকেই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, তারপরে বলে—মিস্টার সামন্ত, সেদিন চা'য়ে এলেন না? আমরা অনেক আশা নিয়ে ব'সেছিলাম!

বাতির স্বল্প আলোয় অপরূপ দেখায় হাস্যোজ্জ্বল লীলার মুখখানা। সামন্ত সহ্য করতে পারে না সে উজ্জ্বলতা, সে মুখ নামায়, কিছু বলে না।

ভদ্রলোক বলে ওঠেন, পাঠশালা শুরু ক'রে দিলাম মিস্টার সামন্ত, বেশ সাড়া পাচ্ছি।

এবার ক্রমশ আপনার জংলীদের ছেলেপিলেদের ভিড়িয়ে দিন।

নিশ্চয় দেবো!—উৎসাহিত হয়ে ওঠে সামন্ত, লেখাপড়া শেখা খুবই দরকার! কিন্তু কোথায় ক'রেছেন স্কুল, স্কুলের বড়ো চালাটা ত এখনো ওঠেনি!

ভদ্রলোক অদম্য প্রেরণায় উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, স্কুল আপাততঃ আমাদের ঘরেই বসছে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, দুটি ত মাত্র প্রাণী। মিঃ সামন্ত, হাতে হাত দিন, আপনার কাছে এই-ই চেয়েছিলাম। আপনার অদ্ভুত কর্ম আর সংগঠন শক্তির কথা শুধু শুনিই নি, নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছি। আপনার সাহায্য যদি পাই, আমি বলে দিচ্ছি মিস্টার সামন্ত, আমি এখানে সোনা ফলাবো! কী জানেন, দেশ ছেড়ে এলাম মন-মরা হয়ে, কিন্তু এখানে এসে সত্যই কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছি! সত্যকার শিক্ষার বীজ বপন করতে হবে, কোন-রকম ভেদবুদ্ধি যেন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে!

লীলা হেসে উঠল, বলল, তোমার বক্তৃতা একটু থামাও। মিস্টার সামন্তকে পাবে বই কী, ও'কে দিয়ে যে কাজ করাতে চাও, সে কাজ উনি নিশ্চয়ই করে দেবেন। নয় কী, মিস্টার সামন্ত?

নিশ্চয়।

লীলা বলল,—দেখুন, আজ আর বসব না। কাল সন্ধ্যায় অতি অবশ্য আসবেন, একেবারে রাতের খাওয়া শেষ ক'রে ফিরবেন, বুঝলেন? না-না, কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না। আমার কথায় রাজী হ'তেই হবে আপনাকে। আর শুনুন, কাল সকালে আপনার জঙ্গলে যাব কিন্তু ব'লে রাখছি।

একটু অপ্রস্তুতের মতো হেসে ফেলে সামন্ত, বলে,—জঙ্গল? জঙ্গল আপনাদের জন্য নয়।

হেসে উঠল লীলাও বলল,—কিন্তু জঙ্গল কেটে ফেলার পর তখন সেটা ত আমাদের জন্য?

সামন্ত উত্তর দেয় না। লীলারা বিদায় নেয়—কিন্তু যে সৌরভ রেখে যায় ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে সে কী সহজে বিদায় নেবার?

রাত বাড়তে থাকে, আকাশে চাঁদ ওঠে, —ফিকে জ্যোৎস্নায় ভরে যায় মাঠ-বাট। সামন্ত ঘর বন্ধ ক'রে মাতালের মতো টলোমলো পা ফেলে এগুতে থাকে,—আরুয়া পল্লীতে নয়, কোল পল্লীর দিকে। প্রধানের ঘরেই ভীড়টা বেশী। মাদলের তালে তালে নাচের আসর জ'মেছে।

'জংলী সাহেব'কে অতর্কিতে পেয়ে আনন্দের জোয়ারে প্লাবন ব'য়ে যায়। দু' একটি মেয়ে নাচ থামিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, বলে,—কারে খুঁজিস গো! কমল-ফুল?

হেসে ওঠে প্রগলভার মতো। কিন্তু যার খোঁজে আসা, সে জংলী সাহেবকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়ে কী এক অছিলায় নাচ ছেড়ে সরে গিয়েছিল,—একেবারে এক ধারে একটা নারিকেল গাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল চাঁদের দিকে মুখ করে। ডোরাকাটা ফর্সা সাড়ীটা আঁট ক'রে পড়া,—কালো খোঁপায় একগুচ্ছ সুগন্ধ সাদা ফুল! খুঁজতে খুঁজতে এক সময় তার কাছে সরে আসে সামন্ত, বলে,—কী করছিস ওখানে দাঁড়িয়ে?

চাঁদ দেখছি, সাহেব।

ওর হাত টেনে নেয় তার হাতের মধ্যে সামন্ত, বলে—ওদিকে আয়, পাথরটার ওপরে বসি। কেমন হাওয়া দিয়েছে দেখেছিস?

পাথরের দিকে যেতে যেতে আপন মনে হেসে ওঠে কমলি,—বলে, তুই যে এলি আমাদের ইখানে?

এলাম।

ওর ছোট্ট হাতের মুঠি নিজের হাতে টেনে নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে সামন্ত, কিছু বলে না,—চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে মনের মধ্যে কেমন যেন পুঞ্জীভূত বেদনার ভার জমতে থাকে।

কমলি গুণ গুণ ক'রে কিসের যেন সুর তোলে, তারপরে এক সময় নিজেই থেমে যায়। তারপরে নীরবতা অসহ্য লাগতে, ব'লে ওঠে,—সাহেব, সাঙ্গিকে তাড়িয়ে দিয়েছিস?

কোনো উত্তর নেই। ওর চোখের দিকে চেয়ে একটু হেসে ওর কাঁধের ওপর মাথাটা এলিয়ে দেয় কমলি, তারপরে কেমন এক অস্পষ্ট অস্ফুট কণ্ঠস্বরে ব'লে ওঠে,—সাহেব, এ গাঁ-গুলান ভালো না। শহরে গিয়ে থাকবি? আমাকে নিয়ে? ভালো ভালো সব কাপড় দিবি, জামা দিবি, জুতা দিবি, হুঁ?

সামন্ত আদর ক'রে ওকে আরও কাছে টেনে নেয়—কিন্তু এবারও কিছু বলে না।

কমলি আবার কথা বলে, সেই আশ্চর্য অস্ফুট কণ্ঠস্বরে,—আমাকে বিহা করবি, সাহেব?

সাহেব এবারও কথা বলে না, একটু হেসে ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এ নীরবতা নিমন্ত্রিত নির্বাধ কোলমেয়ের কতক্ষণ সহ্য হবে, এক সময় উঠে দাঁড়ায়, বলে,—চল্ সাহেব, ওরা খুঁজবে।

ওর হাত তখনো সামন্তর হাতে, বলে,—কমলি? আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারিস?

হেসে ওঠে খিল খিল করে কমলি, চা কী গো! চা কুথায় পাবো? চল্, আয়, হাঁড়িয়া খাওয়াবো।

অসীম বিতৃষ্ণায় কমলীর হাত ছেড়ে দেয় সামন্ত, বলে,—আজ চলি।

রাত যায়, আবার দিন আসে। সেই কাজ, সেই হাঁকডাক। সেই সাঙ্গির খাবার নিয়ে আসা, অভিমানে চোখের জল ফেলা। কমলীর খোঁপায় টাটকা ফুলের গন্ধ, চোখের কোণে আমন্ত্রণের ইশারা! কিন্তু সব কিছুই নিরর্থক আজ, সব কিছুই মিথ্যা,—'জংলী সাহেব' একটা গুঁড়ির ওপর চুপচাপ বসে থাকে, কাজ ছাড়া আর কোনদিকে খেয়াল নেই যেন তার!

সন্ধ্যায় উদ্বাস্তু-দম্পতির দুয়ার খুলে যায়, লীলা বলে,—আসুন মিস্টার সামন্ত!

ভদ্রলোক একরাশ বই নিয়ে বসে আছেন। বলেন,—আসুন।

পড়ছেন!—সামন্ত বলে,—পড়েন বুঝি খুব?

এবার্ডিন থেকে কিছু বই জোগাড় করে নিয়ে এসেছি সেদিন। অনেক কিছুই জানবার আছে এ জায়গাটার সম্বন্ধে জানেন? এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা বলছে,—আন্দামান পুরাণ-বর্ণিত দ্বীপ। সংস্কৃত হনুমান শব্দ মালয়ের ভাষায় হন্ডুমান, সেই থেকে আন্দামান হয়েছে। আর বাঙলা মঙ্গলকাব্য ওকে আরও সুন্দর নাম দিয়েছে,—আন্দারমানিক। বহির্বাণিজ্যের পথে সওদাগরেরা ওই 'আন্ধারমাণিক'এরই দর্শন পেতো!

থামো তুমি!—লীলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে,—যত সব তত্ত্ব-কথা। মিস্টার সামন্ত, কাল উনি শহরে যাচ্ছেন, আমি যাব জঙ্গল দেখতে, বুঝলেন?

সে রাত্রের স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়। ঐ রকম খাবার তার ভাগ্যে জোটেনি কত দিন—কত বছর! আর তাঁদের স্নেহের স্পর্শ! কতো দীর্ঘদিন সে পায়নি ওর আস্বাদ! চোখের পাতা দুটি অকারণেই যেন ভিজে ওঠে!

পরদিন সকালে জঙ্গলের মধ্যে সত্যই চলে এলো লীলা! গোলাপী শাড়ি তন্বী-

হেটা পাক দিয়ে দিয়ে উঠেছে। আজ তার ঘোমটা নেই,—খুশি উচ্ছল ঝলোমলো একটি তরুণী মেয়ে!

মিস্টার সামন্ত, এই বুঝি ট্রলির লাইন? কি ছোট ছোট, বারে?......কী বড়ো বড়ো। গাছ, না? ...বাব্বাঃ, কী বিরাট বিরাট সব করাত আপনাদের ...! ঝর্ণার মতো কলকল করে উঠেছে লীলা।

......ওরা কাজ করুক, চলুন না একটু ওপরে উঠি?

সামন্ত বলে,—পারবেন?

কেন পারব না? সেদিন মাউণ্ট হারিয়েটে উঠিনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে?

খুব জঙ্গল কিন্তু ওখানে। আর তাছাড়া......

তাছাড়া? কী?

জারুয়াদেরও ভয় আছে।

আছে নাকি? লীলা একটু হেসে ওর দিকে তাকায়, বলে,—আপনি ত আছেন পাশে, ভয়টা কীসের?

কিন্তু সত্যিই আর বেশী ওঠা হয় না। বড়ো খাড়া পাহাড় ওদিককার। লীলা বসে পড়ে একটা পাথরের ওপর। সামন্ত সতর্ক প্রহরীর মতো চারিদিকে তাকায়।

অকস্মাৎ তার হাত ধরে টান দেয় লীলা, বলে,—বসুন না? দেখছেন, নীচে কী ছোট ছোট দেখাচ্ছে ওদের? যেন পুতুল!

সামন্ত শুধু বলে,—এবার চলুন। এসব জায়গায় দল বেঁধে ছাড়া আসা উচিত নয়। কিন্তু নামতে গেলে হড়কে যায় পা। সামন্তর বাহুতে ভর করে কোনক্রমে নামতে থাকে লীলা, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়।

কিন্তু অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি অতিকায় দানবের মতো তার বুকের ওপর চেপে বসেছে যেন! এপাশ ওপাশ করে, ঘুম আসে না। বালিশের নীচে তার ছোরা, হাতের কাছে পিস্তল! তবু সে চমকে চমকে ওঠে। বিপদের সুস্পষ্ট পদধ্বনি যেন হৃদপিণ্ডে জেগে ওঠে সামন্তের। জেঠুর পল্লী ছেড়েছে সে, ছেড়েছে কোলদের আস্তানা। সাঙ্গির কান্নার রাত্রি উত্তাল হয়ে উঠেছে, কমলির দেহমন প্রতীক্ষাশীর্ণ। কিন্তু ওদের থেকে সম্পূর্ণই ছিঁড়ে এনেছে সে নিজেকে! জেঠু তাকে বলে, তুই বাবু হয়েছিস!

সামন্ত উত্তর না দিয়ে ধমক দেয়। শহর থেকে জামা-কাপড় এনেছে কিনে, এনেছে ধুতি-পাঞ্জাবী। লীলা বলেছে,—ধুতি-পাঞ্জাবীতে আপনার একটা ফটো তুলিয়ে আনুন শহর থেকে।

তার চিত্তের সামনে আজ দুটি চিত্র, —এক সভ্যতা-শালীন লীলা,—আর একদিকে রাত্রির সেই গম্ভীর গুম্ গুম্ শব্দ, সেই অনাবৃতা জারুয়া-নারী! জানে, জারুয়ারা তাকে কিছুতেই ভুলবে না, উদ্যত বিপদ তার শিরে। লীলাদের সংস্পর্শে এসে সেই ক্ষুধিত জেগুয়ারদের কথা আরো বেশী করে মনে হয়। যেন দুদিক থেকে দুটি তীর এসে তার বুকে আমূলে বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! সেই আসন্ন দুর্যোগের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে সামন্ত!

এক তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রে সত্যই উঠল চীৎকার, বেজে উঠল জারুয়াদের ভেরীনাদ, মশাল জেলে বল্লম হাতে বেরিয়ে পড়ল জেঠু-লছমনের দল! বিদ্যুতের বেগে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে সামন্ত, হাতে তার উদ্যত গুলীভরা পিস্তল! জেঠু আর্তকণ্ঠে বলে—জারুয়া!

কোথায় জারুয়া!

ঐ জঙ্গলের দিকে।—মেরে ফেলেছে গো মেয়েটাকে, তীর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছে বুকটা!

কে? কে সে মেয়ে—?

ঠিক এমনি একটা দুর্ঘটনার আশা করছিল সামন্ত, তাকে পারবে না, তার প্রিয়জনকে নেবে হয়ত, ওদের এই রীতি।

কে! কে মেয়ে? সাঙ্গি?

না গো।

তবে? কমলি?

না গো।

তবে কে?—জেঠুর চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে থাকে সামন্ত, তারপর এক সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়।—এবার যেন সব বুঝতে পারে সে! কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র। তারপরেই উন্মত্তের মতো ছুটে চলে যায় অরণ্যের দিকে।

একলা যাস না সাহেব,—একলা যাস না!—জেঠু চীৎকার করে ওঠে।

কে শোনে সে চীৎকার? সামন্ত অরণ্যের মধ্যে পাগলের মতো ছুটতে থাকে! উঠতে থাকে পাহাড় ঠেলে! পা ছড়ে যায়, কেটে যায়, ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্ধকার রাত্রির বুকে জোনাকি জ্বলতে থাকে,—তারই ক্ষীণ চমকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছায়া-মূর্তির মতো দেখা যায়,—উন্মত্তের মতো সেই ছায়া লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে থাকে সামন্ত! নীচে, দূরে সঞ্চরমান মশালের আলোগুলি বিন্দুর মতো ঘুরতে থাকে, জেঠুদের কোলাহল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। একটু থেমে আবার ছুটতে থাকে সামন্ত। অরণ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যাবে সে! জারুয়াদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে এইবার! উদ্যত মৃত্যুর মতো পিস্তল হাতে দাঁড়াবে তাদের সামনে! ক্রমাগত পিস্তল ছুঁড়ে যেতে থাকে সামন্ত।

ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে গিয়ে এক সময় চাঁদ ওঠে। কতো সময়, কতো প্রহর পার হয়ে গেছে কে জানে, সামন্ত এতক্ষণে বুকে হাঁপ ধরে মাটিতে পড়ে যায়। জায়গাটা একট ফাঁকা মতন। কিছুক্ষণ নির্জীবের মতো পড়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সামন্ত। কোথায় সেই জারুয়ার দল? বনস্পতিরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অনধিকার-প্রবেশকে যেন তিরস্কার করছে! তারি ফাঁকে ফাঁকে ছায়ার মতো হয়ত দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই হিংস্র অরণ্য-সন্তান উগ্র প্রতীক্ষায়,—সুযোগ বুঝে চুপি চুপি এগিয়ে আসবে একসঙ্গে, অতর্কিতে তাকে ঘিরে ফেলবে চারিদিক থেকে! শঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে আবার পিস্তল

ছোঁড়ে সামন্ত, কিন্তু পিস্তলও এখানে নীরব। সর্বনাশ, কখন যেন তার গুলী ফুরিয়ে গেছে!

যেন হিম হয়ে গেল সর্বাঙ্গ! ঐ বুঝি ওরা এগিয়ে এলো এইবার! চারি-দিক থেকে এসে ধরবে চেপে, ছিঁড়ে নেবে একে একে তার হাত, তার পা! তার সমস্ত শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!......ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে হাত-পা! কণ্ঠে স্বর ফোটে না! শেষ পর্যন্ত নিদারুণ ভয়ে হাতের পিস্তলটাই ছুঁড়ে মারে সামন্ত,—একটা গাছের গায়ে ঠক্ করে একটু শব্দ হয়, কোথায় গিয়ে ওটা ঠিকরে পড়ে, কে জানে!

কিন্তু ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে সামন্ত, ভয়ার্ত পশুর মতো,— দিগ্‌বি-দিক্-জ্ঞানশূন্য! পিছনে পিছনে সমস্ত ছায়ারা যেন উল্লাসে ছুটে আসছে! বনান্তরাল পার হয়ে প্রাণপণে পালাতে থাকে সামন্ত! নিজের পায়ের শব্দকেও যেন আর বিশ্বাস নেই! যেন সারা অরণ্যে অকস্মাৎ পদধ্বনি জেগেছে,—সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে আসছে যেন তারা!

ছুটতে ছুটতে পাহাড়ী ঢালের মুখে হঠাৎ পা ফস্‌কে গেল সামন্তর, মুহূর্তে কী হতে কী হয়ে যায়, মাটি, পাথরের টুকরো, ঘাস আর ঝোপের ওপর দিয়ে সমস্ত দেহটা গড়াতে গড়াতে নামতে থাকে! খণ্ডিত বৃক্ষকাণ্ড যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল এসে একেবারে নীচে!

ওঠবার ক্ষমতা নেই, শরীরটা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! কপালের কাছটা ভিজে ভিজে, হয়ত কেটে গিয়ে রক্তপাত হচ্ছে ওখান থেকে! ডানপায়ের হাঁটুতে বিষম যন্ত্রণা, বাঁ হাতটা যেন নাড়া যাচ্ছে না,—নগ্ন পিঠটা ক্ষতবিক্ষত।

বন এখানে তত ঘন নয় দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্না এখানে অবারিত। অদূরে বোধ-হয় কয়েকটা কাটা গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। কে ই ক ... তীক্ষ্ন কুঠারের দাঁত দিয়ে নৃশংস পশুর মতো সে-ই তা খণ্ড খণ্ড করেছে অরণ্যকে। বনস্পতিরা তাই বাতাসে মাথা দুলিয়ে হাহাকার করছে, গভীর দীর্ঘশ্বাসও উঠছে যেন কোথা থেকে! অরণ্যের শাখায় শাখায় উদ্যত অভিশাপ! জোনাকির চমকে চমকে তীব্র সম্মোহন! আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সামন্ত। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একটু পরেই নির্জীবের মতো একটা কাটা গুঁড়ির ওপর এলিয়ে দিলো নিজেকে! মাথার ওপরে দুলছে বনের শাখা, একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ উঠেছে যেন কোথা থেকে! অনাস্বাদিত-পূর্ব স্নিগ্ধতায় ভরে যাচ্ছে চারিদিক। সেই ভীতিকর ছায়ারা কখন মিলিয়ে গেছে! বনের প্রতিটি তরুলতার সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গেছে সামন্ত!

দণ্ড নয়, পল-অনুপল নয়, যেন যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে এইভাবে! কিন্তু বন্য জারুয়ারা টের পেলো কী করে ওর মনের কথা? ওদের আদিম চোখে কী আদিম রক্তরঙের ভাষা সহজেই ধরা পড়ে? কেমন করে চিনতে পারল ওরা ওর সত্যকার প্রিয়জনকে!

কিন্তু প্রচণ্ড ওদের আক্রোশ এই সভ্যতার প্রতি! ওরা হয়ত জানে—সভ্য আবরণের নীচে কী পৈশাচিক হিংস্রা, নির্মম বর্বরতা আর অন্ধ স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে শাণিত হয়ে!

চুপ চাপ পড়ে থাকে সামন্ত। এমনি করে আরও কতো সময়, কতো প্রহর, কতো যুগ কেটে যাবে! হয়ত এক-দিন দেখা যাবে, তার দেহ আর দেহ নেই, শাখা তুলে বনস্পতির মতো নীরবে দীর্ঘ-শ্বাস ফেলছে সে এখানে দাঁড়িয়ে যুগের পর যুগ! কিন্তু ওরা আসবে, তীক্ষ্ন কুঠার দিয়ে আঘাত করবে তার দেহে, মাথায়, বুকে! ও: কী নিদারুণ সে যন্ত্রণা! সেই অনাগত যন্ত্রণা যেন তার ক্ষতবিক্ষত দেহে একসঙ্গে জ্বলতে শুরু করেছে!

নাঃ, ওঠে দাঁড়াতে তাকে হবেই কোন-ক্রমে। একটা ক্ষীণ কোলাহল যেন এতক্ষণ পরে তার কানে ভেসে আসছে না? দূরে দূরে বিন্দুর মতো এগিয়ে আসছে না কীসের আলো! তবে কী, আবার আসছে সেই জারুয়া!—না—না, ওরা জারুয়া নয়, —ওরা আসছে জনপদ থেকে, তীক্ষ্ন কুঠার হাতে! কাটবে অরণ্য, গড়বে বসতি, মায়াহীন মমতাহীন দয়াহীন সংসার,— পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় ঘেরা নিঃশ্বাসরোধী লৌহ কারাগার!

উঠে দাঁড়ায় সামন্ত। কোমরের লুঙ্গিটা গড়াবার সময় আলগা হয়ে কোন্ ডালের গায়ে জড়িয়ে গেছে কে জানে! অরণ্য তার আবরণ ছিঁড়ে ফেলেছে! অদ্ভুত উল্লাসে অকস্মাৎ ভরে গেল সারা মন! সে এবার সত্যকার জংলী—সত্যকার জারুয়া, নির্বাধ-নির্মুক্ত-নিরাবরণ, অরণ্য-মায়ের আদিম সন্তান! হাতে ভর দিয়ে কোনক্রমে এগিয়ে চলল সে শ্বাপদের মতো সেই আলোকবিন্দুর দিকে! গাছের পাতার আড়ালে, ঝোপের ধারে জ্বলতে লাগল জনপদ-ধ্বংসী দুটি ক্ষুধিত চোখ!

আলোর বিন্দু ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামন্তর বিহ্বল চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল অত্যুজ্জ্বল এক শুভ্র দেহ,— গোলাপী শাড়ি তন্বীদেহটা পাক দিয়ে দিয়ে উঠেছে, খুশির হিল্লোলে দুলে দুলে উঠছে সে,—পরম আগ্রহে দুটি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে,—এক নূতন জগৎ যেন ক্রমাগত আহ্বান জানাচ্ছে তাকে,—এসো এসো!

কিন্তু দ্বিগুণ হিংস্রতায় জ্বলে উঠল সামন্তর দুটি চোখ, মুহূর্তে পাশ থেকে একটা পাথর সে তুলে নিলো হাতে!— কেন এসেছিলে সামনে ঐ রূপ নিয়ে? নিরাবরণ আদিম নারীর মতো কেন এসে দাঁড়াওনি কাছে! তোমার ঐ পরিচ্ছন্ন আবরণ নিয়ে এসেছে বিদ্বেষকুটিল জন-পদের স্বাক্ষর, নিয়ে এসেছে রঙিন-আলোয়-ঢাকা যুদ্ধবিগ্রহের বিভীষিকা— সম্পদ-লোলুপ শ্বাপদদলের উন্মত্ত কোলা-হল,—অত্যাচার-অবিচারের অন্ধ নিষ্ঠুরতা —অসাম্যের তীক্ষ্ন নখাঘাত...!

উদগ্র হিংস্রতায় সজোরে ছুঁড়ে দিলো সে হাতের পাথরখানা, যেন বন্য জারুয়ার তীক্ষ্ন বিষাক্ত তীর ছুটে গেল ঐ লীলা-চঞ্চল ছায়াময়ীর দিকে! তীব্র আনন্দে উন্মত্তের মতো হেসে উঠল সামন্ত!

কিন্তু কোথায় কে? পাথরের খণ্ডটি অতর্কিতে এসে পড়ল মশালধারীদের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত কোলাহল জাগল, —জারুয়া—জারুয়া—জারুয়া!

শুধু বহুদর্শী জেঠু এক কোণ থেকে বলে উঠল কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা ধরা-ধরা গলায়,— জারুয়া নয় রে, জারুয়া নয়! আমাদের জংলী সাহেব। কিন্তু হুঁশিয়ার, জংলীসাহেব একেবারে পাগল হয়ে গেছে!

বত্রিশ

"আর্যাবর্তে ভারতবর্ষে তামসী নিশার অবসান হইতেছে। জবাকুসুমে সঙ্কাশ সূর্য দেবতা নূতন কালে নবরূপে আবির্ভূত হইতেছেন। সংবাদ শুনিয়াছি, আজ যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। দূরে নবগ্রাম পল্লীতে উষাকাল যেন আজ আবির্ভূত হইতেছে। নবগ্রামে আজিকার উষাকালে নূতন স্তব গান শ্রবণ করিলাম। গভীর গম্ভীর অথচ সুমধুর কণ্ঠে কেহ গাহিতেছে—মাতৃ স্তোত্র;

বন্দে মাতরম্!

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—শস্য শ্যামলাং মাতরম!

• • • •

ধরণীং ভরণীং মাতরম।"

সন্তোষবাবু লিখেছিলেন তাঁর সেই গ্রাম উপখ্যানে।

শান্তি খাতাখানি গৌরীকান্তের হাতে তুলে দিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। গৌরীকান্ত তাকে স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ জানিয়ে বললে—দীর্ঘ দিন পরে ফিরলে। কোথায় গিয়েছিলে কেন গিয়েছিলে জিজ্ঞাসা করব না। কারণ বাধা আছে। তা অনুমান করতে পারি। না হলে কেন কিছু বলে যেতে এবং সেখানে গিয়েও জানাতে, পত্র লিখতে। কিন্তু যে কাজেই গিয়ে থাক—সে কাজ তোমার মিটেছে তো? ভালভাবে মিটেছে? এবং ভাল আছ তোমরা?

ছ সাত ঘণ্টা ট্রেনে এসে শান্তিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মাথার চুলগুলি ঈষৎ রুক্ষ—অবিন্যস্ত মুখখানি শীর্ণ এবং শুষ্ক চোখের কোণগুলি লালচে হয়ে উঠেছে। তার শুষ্ক মুখে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল, সে হাসি যেমন ক্ষীণ তেমনি স্বল্পজীবী। ফুটেই মিলিয়ে গেল। শুক্লা প্রতিপদের চন্দ্রকলার উদয় হয় না একটু আভাস ফুটে ওঠে যেমন তেমনি। মৃদু স্বরে বললে—কাজ মিটেছে। মিটিয়ে এসেছি। কিন্তু—

গৌরীকান্ত তার মুখের দিকে চাইলে। ওই দৃষ্টির মধ্যেই তার জিজ্ঞাসা ছিল।

শান্তি বললে—যেটা মিটেছে সেটা মিটে গেছে, কিন্তু ওতেই তো জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেল না। আবার কাজ বাড়িয়ে এসেছি। এবার আপনাদের কাছে বিদায় নেব।

গৌরীকান্ত শান্তির মুখের দিকেই চেয়ে ছিল, তার মুখের ভাব ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করছিল; তার দৃষ্টির মধ্যে গভীর ব্যগ্রতা। কিন্তু যা সে প্রত্যাশা করেছিল তা দেখতে পেলে না। একটু বিষণ্ণভাবেই বললে—আমার চোখের ভুল কিনা জানি না—তোমাকে খুব উৎসাহিত দেখাচ্ছে না শান্তি। হয়তো পথশ্রমের ক্লান্তি খানিকটা আছে। কিন্তু সবটা নয়। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে পারছি নে। তবে কাজ বাড়িয়ে এসেছ বলছ, তার কথা যখন উল্লেখ করেছ তখন সেটাও কি বলতে পার না?

কাজ নিয়েছি গৌরীদা, রিলিফ রিহ্যাবিলিটেশন দপ্তরে একটা কাজ পেয়েছি।

এবার প্রসন্ন এবং উৎসাহিত হয়ে উঠল গৌরীকান্ত।—পেয়েছ?

হ্যাঁ পেয়েছি। কাজে যোগ দিয়েও এসেছি। দুঃখ পেয়ে এসেছি—লজ্জা পেয়ে এসেছি। কাজ করতে গিয়ে যত দুঃখ পেলাম এদেশের লোকের বিরূপ ভাব দেখে তাদের গালাগাল শুনে তেমনি লজ্জা পেলাম আমরা যারা এসেছি—তাদের অন্তরের দারিদ্র্য দেখে। সে অনেক কথা। তার উপর এদের নিয়ে যে জুয়োখেলাটা খেলছে পাঁচজনে, রাজনৈতিক নেতারা খেলছে, জোচ্চোরেরা খেলছে, নারী ব্যবসায়ীরা খেলছে, তার সঙ্গে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল লোকেরা যোগে রয়েছে, সে দেখে শিউরে উঠেছি। জানি নে, এ কাজ করব কি করে! তবু বাঁচতে হবে তো, খেতে হবে তো! আমি একটা ইস্কুলের চাকরী পেলেই খুশী হতাম। কিন্তু সে কথা থাক গৌরীদা আমি এসেছি আজ আপনাকে অনুরোধ জানাতে। বাবার খাতাখানি আপনার কাছে থেকে নিয়ে গিয়ে পড়েছি। এবার আমার জীবনের খুব বড় দুঃখ যখন পেলাম।

একটু স্তব্ধ হয়ে রইল শান্তি। তারপর বললে, জীবনের সব চেয়ে বড়

সমস্যা বড় দুঃখ পেয়েছি এই দুটো মাস। যন্ত্রণা পেয়েছি, বুকের ভিতটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবার মত যন্ত্রণা। আপনার কাছে গোপন করব না, একজনকে ভালবাসতাম সেও বাসত, দুজনে দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধই ছিলাম।

—আমি সে জানি শান্তি।

—হ্যাঁ, আপনি বিভাসকে জানতেন। দেখেছিলেন মামার ওখানে। অনুমান করা কষ্টকর ছিল না। মামার মৃত্যুর পর বিভাসের সঙ্গেই কাজ করেছি। সঙ্গে কেন? তারই হুকুম মত। সে কথা যাক। তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করেই ফিরে এলাম। সে আমাকে বললে কি জানেন ঃ বললে, হাজার হলেও পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের মেয়ে তো তুমি!

দীক্ষাও তোমার মামার কাছে তিনিও তাই, গোঁড়ামি আর একগুঁয়েমি তোমার অস্থিমজ্জায়। ধর্মের বড়াই আর মিথ্যে অহংকারে তোমরাই হলে এ যুগের এদেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শেষ এইখানে। অথচ সে কায়স্থ আমি গোঁড়া পণ্ডিতের মেয়ে হয়েও তাকে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। দ্বিধা করি নি। সে কথাটা তার মনেই হল না। তখনই সেই সময়ে বাবার খাতা-খানা নিয়ে পড়েছিলাম। নিষ্ঠুর দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা পেলাম। অন্যের কাছে বলতে লজ্জা পাই. আপনার কাছে পাই না। গৌরীদা বইখানা পড়ে এখানা নিয়ে আপনি নতুন করে লিখবেন? দেখবেন গৌরীদা বাবা কি লিখেছেন!

সে খাতার পাতা ওল্টালে।

নবমহাভারতে নবগ্রাম উপাখ্যানের আদি পর্বে মুসলমানদের এখানে আসার পর থেকে এখানে ইংরাজী ইস্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করে শেষ করেছেন সন্তোষবাবু।

আদি পর্বের শেষ অধ্যায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নূতন ধনী গোপী-চন্দ্রবাবু ইংরাজ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে প্রধান ব্যক্তিরূপে অভিষিক্ত হলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি মহৎ কীর্তি; এই বিদ্যালয়ই নবগ্রামের উপ্যাখ্যানে নূতন পর্ব সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও সন্তোষবাবু দেখতে পেয়েছেন এই কীর্তির প্রতিষ্ঠান ভূমিতে রয়েছে সম্পদের অহংকার। প্রতিষ্ঠার কামনা। বেদনা-বোধ করেছেন। লিখেছেন, শান্তি পড়লে—"এই মহৎ কীর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রাধাকান্ত অপমানিত হইয়া গৃহত্যাগ করিল। এবং একই রাত্রে একটি তরুণ যুবক এই গ্রামের ভবিষ্যত আশার মত স্বর্ণকান্তি স্বপ্নময় দৃষ্টি কিশোরও গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অতীতকে আঘাত করিল—অতীত

হয়তো জীর্ণ, দুর্বল; কিন্তু ভবিষ্যৎ আঘাত পাইল কেন?

হে মহাকাল, তুমিই জান সে কথা। তাহাকে তুমি ব্যক্ত কর।"

এর পর আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব।

সে পর্বের শুরু ওই।—"আর্যাবর্তে তামসী নিশার অবসান হইতেছে।"

নবগ্রামের আকাশে উষার আলোর রেশ সঞ্চারিত হয়েছে। কে স্তব পাঠের মত গান করছে—বন্দে মাতরম সঙ্গীত।

সন্তোষবাবু লিখেছেন—

"কণ্ঠস্বর শুনিয়া অনুমান হইতেছে এ কণ্ঠস্বর যেন কিশোরের কণ্ঠস্বর। সে কি এই উষাগমে ফিরিয়া আসিল? নবগ্রামের ভবিষ্যৎ কি বর্তমানে উদিত হইতেছে?

শ্বশুর কুলের অট্টালিকার ছাদে উঠিলাম। সম্মুখে গ্রামপথে স্বল্প আলোক আসিয়া পতিত হইয়াছে। দেখিলাম গৈরিকধারী দীর্ঘাকৃতি এক সবল যুবা দীর্ঘ পাদক্ষেপে ওই গান গাহিয়া চলিয়াছে। আমি প্রশ্ন করিলাম কে? আপনি কে—গান গাহিতেছেন?

সন্ন্যাসী দাণ্ডায়মান হইল। কহিল—আপনি কি সন্তোষ দাদা?

আর আমার সংশয় রহিল না। এ কি কিশোর। কিশোর! কিশোর ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি উচ্চকণ্ঠে কহিলাম—তোমাকে চিনিয়াছি—তুমি কিশোর। তুমি ফিরিয়াছ। আমি জানিতাম তুমি ফিরিবে। তুমি না ফিরিলে নবগ্রামের উপখ্যানে যুদ্ধের নায়কতা করিবে কে?

যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধ হইবে।

কুরুক্ষেত্রে রাজ্য লইয়া কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ হইয়াছে।

নবগ্রামে গোপীকান্তে স্বর্ণভূষণে রাধাকান্তে যুদ্ধ হইয়াছে।

সম্পদশালীর সঙ্গে সম্পদশালীর সংগ্রাম।

এবার ধনবানের সঙ্গে গুণবানের সংগ্রাম। এবার নায়ক তুমি। বিশ্বরাজ্যে সেই সংগ্রামের কাল আসিতেছে। তাহার প্রথম পরীক্ষা ভারতবর্ষে।

কুরুক্ষেত্রের উত্তরকালের মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছে তো? মহাভারতের মর্ম মন্ত্র? বিদ্বেষকে বর্জন করিয়াছে তো? হিংসাকে জয় করিয়াছ!

কিশোর কহিল—দীক্ষা পাইয়াছি। জানিয়াছি।

প্রশ্ন করিলাম—কোথায় পাইলে? কে দিল?

কিশোর কহিল—দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলে এই মন্ত্র জানিয়াছিলেন মহাসাধক রামকৃষ্ণদেব। এই মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন স্বামীজী বিবেকানন্দকে। তাঁহার নিকট এই মন্ত্র পাইয়াছি।

আমার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল। রামকৃষ্ণদেবের আরাধ্যার মূর্তি মনের মধ্যে উদিত হইল। মা ভবতারিণী!

দৃষ্টি ফিরাইলাম—নবগ্রামের পশ্চিমদিকে নূতন বিদ্যাভবন দেখিলাম। মনে প্রশ্ন জাগিল। রামকৃষ্ণদেব মহাশক্তি জানিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া বঙ্গদেশের মহানগরীর ইংরাজী মদগর্বীর মদগর্ব খর্ব করিয়া শিক্ষার উপরে সত্যকে প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন বৃক্ষশীর্ষে পুষ্পের মত। প্রখর জিজ্ঞাসু বুদ্ধিশক্তি অনুভবের রাজ্যের সিংহদ্বার উন্মুক্ত পাইয়াছিল। মহাভারতের মন্ত্র জাগ্রত হইয়াছিল। এই নবগ্রামে এই তরুণ সন্ন্যাসী মন্ত্র আনিয়াছে কিন্তু যদি সিদ্ধিলাভ করিতে না পারে? তবে কি হইবে? এই বিদ্যালয় হইতে বুদ্ধিকে যাহারা প্রখর করিয়া মার্জিত করিয়া যুধ্যমান হইয়া দাঁড়াইবে তাহারা কি বিদ্বেষকে হিংসাকে জয় করিতে পারিবে?

নূতনকালে নবপর্বে সম্পদের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ। শিক্ষার যুদ্ধ।

ধনীর সহিত গুণীর যুদ্ধ শিক্ষিতের যুদ্ধ।

বুদ্ধি যদি অনুভবের সহিত যুক্ত না হয়, তবে প্রেমের অভাবে বিদ্বেষ প্রখর হইবে। হিংসা প্রবল হইবে। ধর্ম শীত ঋতুর পদ্ম দলের মত বীজের মধ্যে প্রসুপ্ত অবস্থায় পঙ্কতলে প্রোথিত হইবে।

আমি এ যুদ্ধ দেখিতে পাইব না। আমার দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানেরা যুদ্ধের আদিতেই বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা জীর্ণ তাহারা পচিয়াছে। আর কোন সন্তান নাই থাকিলে তাহাকে কিশোরের হাতে দিয়া যাইতাম শিষ্য হিসাবে। বলিয়া যাইতাম, এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার সাধনা করিও। দেবকীর ক্ষেত্রে সন্তান হইলে অনায়াসে সে পারিত।"

পড়া বন্ধ করে শান্তি বললে—পড়ে আমার মনের যন্ত্রণার উপশম হল। জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। এর পর তার ওই সম্পর্ক শেষের কথায় মনে হল আমি মুক্তি পেলাম। তার ওই বামুনের মেয়ে বলে গাল শুনে আমার মন প্রসন্ন প্রশান্ত হয়ে উঠল। বিভাসকে হেসে বললাম—তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে বাঁচালে। ঘর বাঁধার পর মতের গড়মিলে ঝগড়া করে মন ভাঙাভাঙি করে ঘর ভেঙে যারা পরস্পরের বিপরীত দিকে বেরিয়ে পড়তে পারে তাদের দলের আমি নই; সে আমি পারতাম না। আমি না পারলেও তুমি পারতে। তা থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তোমার মঙ্গল কামনা করছি। তোমার ভাল হোক। প্রার্থনা করি তুমি যেন যোগ্য জীবনসঙ্গিনী পেয়ে সুখী হতে পারো।

গৌরীকান্ত কিন্তু অভিভূত হয়ে ভাবছিল সন্তোষ পিসেমশায়ের কথা। কি গভীর ভাবনার মানুষ ছিলেন তিনি! তিনি তো ভুল দেখেন নি, ভুল বোঝেন নি! এই বিদ্যালয় অনেক কৃতী মানুষ বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিদ্বেষকে তো জয় করতে পারে নি। বিদ্বেষ থেকে প্রীতিতে হিংসা থেকে প্রেমে তো আসে নি তারা! কিশোরবাবু নিজেই পারলেন কই?

শান্তি তার নীরবতা, সংশয়ের বশেই একটু ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার কথা নিয়ে

আপনি ভাবেবেন না গৌরীদা; আমি যা করেছি তার ফল সে ভালই হোক আর মন্দই হোক ভোগ করব আমি। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি ভুল করেছি, কিন্তু না করি নি। আমার মা বলেছেন আমি ঠিক করেছি। শেষ বয়সে আমার বাবা যখন ফিরে মায়ের কাছে গেলেন, মাকে একান্তভাবে আপনার ক'রে পেলেন, তখন বলতেন দেখ সারা জীবনটা নিত্য চণ্ডী-পাঠের সময় চোখে আমার জল আসত। প্রথমেই অর্গলা স্তোত্র পাঠের সময় দেবীর কাছে চাইতাম—'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্যানুসারিণী" আর ভাবতাম সে আর এ জন্মে হল না। মা বলতেন কেন তোমার শেষের দুই পক্ষ তো আমার থেকে দেখতে অনেক মনোরমা ছিলেন গো। বাবা বলতেন নয়নরমা বল আপত্তি করব না, কিন্তু মনোরমা যে সেই মনোবৃত্তি অনুসারিণী। দেবকী, মনুষ্য জন্মে মনই সব। দেহ সর্বস্ব পশু জন্মে জীব দেহ খুঁজেছে। মানুষ হয়ে প্রথম খুঁজেছে রূপ নয়নরমা কিন্তু রূপেও তৃপ্তি পায়নি, তখন বুঝেছে মনকে; মনোরমাকেই সে খোঁজে। সতীকে হারিয়ে মহাদেব তপস্যা করেন—মনোরমা উমার জন্যে মহাদেবী উমা তপস্যা করেন মনোরম মহাদেবের জন্যে। বুড়ো বলে অপছন্দ হয় না; অঙ্গের ছাইকে আবর্জনা ভাবেন না; ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে দেখেও বারেকের জন্যে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের ধন ভাণ্ডারের কথা ভাবেন না। শেষের দিকে মাকে বলতেন, দেখ শান্তির বিয়েতে যেন শান্তির মত নিয়ো। মেয়েকে পড়াচ্ছ। তার উপর পড়েছে নন্দর হাতে। বিয়ে হতে ওর দেরী হবে সে আমি জানি। হয়তো জেলেও যাবে। জেলেই বয়স কাটবে। না হলে—

একটু হাসি ফুটে উঠল শান্তির মুখে। চুপ করে গেল মধ্য পথে।

গৌরী বললে—তুমি যা বললে ভাই, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার একটুও বিরোধ নেই। তুমি যা করেছ তাতে আমার একবিন্দু অমত নেই। ঠিক করেছ তুমি। তাকে যদি এমনি ভালবেসে থাক যে, সে ছাড়া অন্য কাউকে জীবনে স্থান দিতে পারবে না, স্থান হবে না, তবুও ভুল করনি তুমি। তার সঙ্গে ঘর বেঁধে মতান্তরের অশান্তির মধ্যে নির্যাতন ভোগ করার চেয়ে দূর থেকেই তাকে ভালবেসো তুমি। তাতে ভোগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থেকেও ত্যাগের আনন্দে তৃপ্তি পাবে। বঞ্চিত দেহ মনকে পীড়িত করে, কিন্তু তোমার মনের শিক্ষার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

—তবে চুপ করে রইলেন যে?

—চুপ করে ছিলাম অন্য কারণে। ভাবছিলাম তোমার বাবার কথা। মনে ভেসে উঠছিল তাঁর ছবি। ছেলেবেলায় দেখেছি তবু স্পষ্ট মনে আছে। ছোটো খাটো মানুষ, সোনার মত সুগৌর দেহবর্ণ, কাঁচা পাকা চুল—খালি গায়ে খড়ম পায়ে আঁকশি সাজি হাতে—এইখানে—এইখানে তখন বাগান ছিল ফুল তুলতে আসতেন। আমার বাবার সঙ্গে অন্তরের একটি নিগূঢ় যোগ ছিল। বাবা বলতেন, মুখুজ্যে নামটা আপনার সন্তোষ না হয়ে প্রসন্ন হলেই ঠিক হ'ত। প্রসন্ন ব্যক্তিটি কে—এ প্রশ্ন করলে অনায়াসেই বলা যেত, চেহারা দেখে বেছে নাও। কারও ভ্রান্তি হ'ত না।

খাতাখানা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে বেছে একটা জায়গা বের ক'রে শান্তি বললে—সে কথাও সবই তিনি লিখে গেছেন। এই দেখুন।

—পড় তুমি।

"আমি রাধাকান্তবাবুর উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই বলিতাম—জয় রাধাকান্ত!

রাধাকান্তবাবু প্রায়শই উদ্যান মধ্যে বেদীকার উপর উপবিষ্ট থাকিতেন। পূর্বদিনের দিনলিপি লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন স্বাগত সুস্বাগত, দীনজনের অন্তরে আসন গ্রহণ করুন।

আমার নাম সন্তোষ—সেই হেতু এ কথা বলিতেন।

আমি বলিতাম—হে বন্দ্য বংশ জাত বন্দ্যো! আপনার মহৎ কুলে জন্ম, কর্মে আপনি বিষয়ী হইলে কুলপ্রসাদে মহৎ তত্ত্ব সমুদয় অবগত আছেন বলিয়াই মনে করি। আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, ধনকামী যশোকামী প্রতিষ্ঠাকামী প্রভৃতি সর্ববিধ কামীর অন্তরে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ কারণ আমার প্রকৃতি শীতল কামীর অন্তর উত্তপ্ত।

শুধু রাধাকান্তবাবু কেন? আমার পত্নীর অন্তরেই আসন গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সমগ্র নবগ্রামে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও পর হইয়া রহিলাম। উত্তপ্ত নবগ্রাম। প্রতিষ্ঠাকামীর অন্তরের উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; উত্তপ্ত কটাহের মত নবগ্রামের অবস্থা।

হায় নবগ্রামের বিদ্যালয় যদি সেই মহৎ শিক্ষার শান্তিজলে এ উত্তাপকে শীতল করিতে পারে!"

খাতাখানি নামিয়ে রাখলে শান্তি।

গৌরীকান্ত খাতাখানি হাতে নিয়ে বললে—সেদিন অনুভব করতে পারি নি—বুঝতে পারিনি এই মানুষটির দৃষ্টি অনুভব এত সূক্ষ্ম এত নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বসন্ধানী। আমি ভাবছিলাম সেই কথা। তুমি কথা বলছিলে—আমি সেই কথা ভেবে বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

শান্তি ব্যগ্রভাবে বললে—সেই জন্যে গৌরীদা, আমি চাকরীতে যোগ দিয়েও ছুটি নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। নবগ্রামের এই কাহিনী নূতনকালের ভঙ্গীতে লিখে একে আপনি প্রকাশ ক'রে দিন।

গৌরীকান্ত খাতাখানি পড়তে শুরু করেছিল। সে খাতা থেকে মুখ তুলে হাসলে। বললে—এই জন্যে তুমি পড়া বন্ধ করলে?

শান্তি আরক্ত মুখে বললে—না। ওটা নেহাত কথার কথা। ও জন্যে না।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই এসে প্রবেশ করলেন—কিশোরবাবু।

—শান্তি! খাতাখানা তুমি নিয়ে এসেছ হাতে ক'রে দিদি বললেন। কই!

গৌরীকান্তের হাত থেকে খাতাখানা তিনি নিজেই তুলে নিলেন। তারপর বললেন—তোমাকে আসতে হবে শান্তি। মিটিংয়ে আমার সঙ্গে গান গাইতে হবে।

(ক্রমশ)

অরণ্যজীবনের পউষ পরব

রমাপদ চৌধুরী

বাঙলার সমাজে এবং সংস্কৃতিতে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত কেন, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা যে বিভিন্ন প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন, তার মধ্যে আদিবাসী প্রভাব অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

আজকের দিনেও গ্রাম্য দিদিমা-ঠাকুমার দল নাতনীদের বিদ্রূপ করে বলেন, মেয়ে কুড়িতেই বুড়ি হয়ে গেছে। আমাদের কাছে এর মানে, কুড়ি বছর বয়সেই বুড়ি হয়ে যাওয়া। কিন্তু এর আদি ব্যুৎপত্তি সম্ভবত অন্য; কারণ মুণ্ডাদের মধ্যেও এই ধরণের একটি কথা প্রচলিত আছেঃ কুড়ী ঞা বুড়িহি। অর্থাৎ যৌবনেই বুড়ি। যৌবনই হয়তো সমোচ্চারণবশত বাঙলার সংখ্যা শব্দ 'কুড়ি'তে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই ধরণের অদ্ভুত পরিবর্তন ইংরেজিতেও হয়েছে, বিশেষ করে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশের অনুবাদে। বাইবেলের বহুপ্রচলিত একটি বাণী হলঃ

It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God!

এ উপমার কথা শুনলেই ব্যাপারটা কি উদ্ভট মনে হয় না? এত জিনিস থাকতে হঠাৎ ছুঁচের ফুটোয় উট ঢুকতে চাইবে কেন? বহু যুগ আগের রচনা, তার ওপর ধর্মগ্রন্থ, সুতরাং আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাননি কেউ। কিন্তু যিনি বা যাঁরা বাইবেলের মত এমন কাব্যময় গ্রন্থ লিখে গেছেন, তিনি বা তাঁরা এমন উদ্ভট এবং হাস্যকর উপমা ব্যবহার কেন করবেন? আসলে ওল্ড টেস্টামেণ্ট ছিল হিব্রু ভাষায়, তা থেকে গ্রীক এবং ল্যাটিনে অনুবাদ হয় এবং পরে ল্যাটিনের মাধ্যমে ইংরেজিতে আসে বাইবেলের বাণী। ফলে 'কামিল' শব্দ, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ ছিল 'দাড়ি' বা খুব মোটা সুতো, তা ইংরেজি 'ক্যামেল' শব্দে কোনক্রমে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তারপর থেকে কত লক্ষ বুটেন যে ছুঁচের ফুটোয় উটের মাথা ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

এমনি ভাবে অনেক কিছুই হয়তো বদলে গেছে কালের প্রভাবে, তাই এখন আর আদিবাসী সংস্কৃতির ক্ষীণস্রোত ফল্গুধারাটিকে আর্যভূমিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এত যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করেও আর্য-অনার্যের মধ্যে কোন লেনদেন হয়নি, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। কে দিয়েছে এবং কে নিয়েছে সে প্রভাব. তাতে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু মিল যা পাওয়া যায়, তাও কম নয়। হড়ভাষীরা ঠাকুর দেবতাকে বলে 'বোংয়া' বা 'বোঙা'। এ শব্দটা যে 'ওঁ' থেকেই রূপান্তরিত হয়নি, কে বলতে পারে? ভাষার দিক থেকে মূল খেরোয়ারীর সঙ্গে হিন্দী বা বাঙলার কোন মিল নেই এবং বিহারের পশ্চিমাঞ্চলের মুণ্ডারি ভাষাদির সঙ্গে বাঙলার কোন যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা আপাতদৃষ্টিতে কম। তা সত্ত্বেও আমাদের 'দাদা' হড়ভাষীর কাছেও 'দাদা', কাকা, কাকী, মামা, মামী একই. উচ্চরণের জন্যে 'শ' 'হ' হয়ে থাকলে বা 'হ' 'শ' হয়ে থাকলে 'শাশুড়ীর' প্রতিশব্দ হান্হাঁর বা হান্হাঁরী নিশ্চয়ই 'শান্শাঁরী' বা 'শাঁশারী' শব্দের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। চলিত বাঙলার 'রোজা' 'ওঝা' থেকে এসেছে এবং 'ওঝা' প্রাচীনতম মুণ্ডারি ভাষাতেও ছিল। বাঙলায় বলি পুষি বেড়াল, ওদের ভাষায় শুধুই 'পুষি'। এমনি আরো অনেক মিল দেখা যায়। এখানে অবশ্য শুধু মাত্র প্রাচীনতম শব্দগুলোই নেয়া হয়েছে, কারণ বর্তমান দিনে অসংখ্য বাঙলা ও হিন্দী শব্দও তাদের ভাষায় ঢুকে গেছে।

কিন্তু এই সব ছোটখাটো মিল অপেক্ষা বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে উৎসবের মিল। তার মধ্যে একটি হল 'পউষ পরব' বা পৌষ উৎসব। আমাদের চড়ক যেমন মাণ্ডা পরবের নামান্তর, ধর্মরাজের পুজোয় যেমন আদিবাসী সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রভাব, তেমনি আমাদের 'নবান্ন' এবং পৌষ সংক্রান্তির সঙ্গেও পৌষ পরবের নিকট আত্মীয়তা। 'নবান্ন' উৎসব হয়তো বা আদিবাসীরা আর্য সংস্কৃতি থেকে আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু পিঠে-সংক্রান্তিটির জন্য বাঙালী সমাজ আদিবাসীদের কাছে ঋণী।

কোন কোন আদিবাসী 'নবান্ন' এবং পৌষ পরবকে একটি মিলিত উৎসবে পরিণত করেছে। আবার অনেকে দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক উৎসব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বিড়্-হড়্ গোষ্ঠীর একটি বাড়িতে 'নবান্ন' উৎসবে দেখেছি চাল গুঁড়োর পিঠে তৈরি করে সপরিবারে স্নান করে গৃহদেবতার পুজো দিয়ে চক্রাকারে বসে গান গাইতে শুরু করে তারা এবং গানের শেষে গৃহকর্তা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার হাতে পিঠের প্রসাদ তুলে দেন।

বাঙলা দেশের 'নবান্ন' এবং পৌষ সক্রান্তির উৎসব যেমন ক্রমশই উৎসব-বিচ্যুত হয়ে শুধু মাত্র কয়েকটি নিরানন্দ আচারবিচারে পরিণত হচ্ছে, আদিবাসী-দের মধ্যেও তেমনি উৎসবের প্রাচুর্য কমে আসছে আজকাল।

মুণ্ডা ও অন্য কোন কোন আদিবাসীদের পৌষ পরব শুরু হয় পৌষ সংক্রান্তির আগে থেকে। এবং কমপক্ষে তিন চার দিন ধরে চলে। এই সময়টায় সমগ্র অরণ্য অঞ্চলে যেন নাচ আর গানের ঝড় বয়, গাছে গাছে আধ-ফোটা শাল-পলাশের আগুন আকাশ ছেয়ে ফেলবার উপক্রম করে।

পরবের দিনগুলিতে গ্রামের সমস্ত ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সূর্যোদয়ের আগেই কাছাকাছি কোন নদী বা পুকুরে গিয়ে একসঙ্গে স্নান করে এবং তারপর যে যার নিজের নিজের 'নববস্ত্র' পরে সম্মিলিত সুরে গান শুরু করে। নদীর পার থেকেই পুরুষরা একটি সারিতে চলে, পাশে পাশে মেয়েরা চলে ভিন্ন সারিতে। এবং সেই ভোর রাত্রি থেকে যে গান শুরু হয়, তা আর থামতে দেখা যায় না পরব উদ্‌যাপনের আগে।

বাড়ি ফিরে প্রত্যেক পরিবারের জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি পুজোয় বসে। (বাঙলার ব্রত, পার্বণ ইত্যাদির মধ্যে যেগুলিতে কোন পুরোহিতের সাহায্য দরকার হয় না, সেগুলিতে কি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার প্রভাব আছে?) পৌষ পরবেও কোন পুরোহিত প্রথা নেই। বাড়ির তৈরি নানা খাদ্যদ্রব্য সামনে সাজিয়ে রেখে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই মন্ত্রপাঠ শুরু করে—বংশের মৃত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করে করে মন্ত্রপাঠ চলে কিছুক্ষণ। মৃতদের মধ্যে যারা ভূত-প্রেতে রূপান্তরিত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, এই মন্ত্রের বলে তারা আবার মানুষ হয়ে জন্মাবে, এ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল। পুজোয় ফুলের ব্যবহার যথেষ্ট। এদিকে যতক্ষণ পুজো চলে, ততক্ষণ অন্যান্য মেয়ে-পুরুষের দল নাচ আর গানে মেতে থাকে। স্নানান্তে বাড়ি ফেরার সময় মেয়ে ও পুরুষদের দুটি ভিন্ন সারি থাকলেও পুজোর সময় তারা একসঙ্গেই নাচে-গায়, অবাধ মেলামেশার ফূর্তিতে মেতে ওঠে। এই সময়ে মেয়েদের সাজগোজ রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। খোঁপায় ফুল, সিঁথিতে ফুল, গলায় ফুলের মালা, কেউ কেউ মণিবন্ধে ও বাজুতেও ফুলের চুড়ি-তাগা ইত্যাদি পরে। এর ওপর রঙবেরঙের নতুন কাপড়, রুপোর অলঙ্কার, অভাবে নতুন কেনা পুঁতির মালা। এই সাজ-সজ্জায় উজ্জ্বল হয়ে উদ্দাম আবেগে হাত ধরাধরি করে নাচে আর গায় মেয়েদের দল। পুরুষরা সাজে ময়ূর পেখমে, মাথায় রঙীন পালকের মুকুট, কখনো বা অদ্ভুত সব মুখোশ পরে, আর নাচের তালে তালে বাজায় মাদল, মৃদঙ্গ, বাঁশী। এই নাচ আর গানের হাওয়া বয়ে চলে তিন-চার দিন ধরে। শুধু খাবার সময় সামান্য বিশ্রাম। ভোজনের প্রধান আকর্ষণ এ সময়—পিঠে। এছাড়া ছোলা, মুড়ি, চিড়ে, গুড়, মাংস ও ভাত খাওয়াতেও নিষেধ নেই। এ সময়ে পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়। এবং যে পরিবার গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে সমর্থ হয়, সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। এই সময়ে মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় নতুন নতুন বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, প্রেম ঘনিষ্ঠ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে এবং ঠিগিয়া বা বাক্‌দান থেকে শুরু করে বিবাহ পর্যন্ত হয় পরস্পরের আলাপের সূত্রে। অর্থাৎ পৌষ পরব শুধু একটি উৎসব নয়, আদিবাসী জীবনের একটি মূল্যবান সামাজিক অঙ্গ।

পৌষ পরবের গানগুলিও চমৎকার এবং কবি-কল্পনায় সার্থক। গানের পাত্রপাত্রী দুজন, একটি যুবক ও অন্যটি যুবতী। স্থানঃ সম্ভবস্থলে একটি ফুলের বাগান, অন্যথায় গানের ভাষাই একটি ফুলবাগানকে কল্পনায় এঁকে নেয়ঃ ফুলবাগানের মাঝে মাঝে অসংখ্য শাল-মহুয়া—হরিতকীর গাছ, আর তারই ভিতর একটি মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াবে মেয়েটি, চোখে হাসির ঝিলিক দিয়ে লুকিয়ে উঁকি মারবে মাঝে মাঝে, তাকাবে ফুলবাগানের গন্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটির দিকে। যুবকটিও মাঝে মাঝে তাকাবে সেদিকে, তারপর গান শুরু করবে এক সময়। আর মেয়েটি গান শুনতে শুনতে বাগানে ঘুরে বেড়াবে, ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, কখনো মুগ্ধ হবে সেঞ্জেলবাহার সৌন্দর্যে, কখনো গালে স্পর্শ করবে কুসুম্বি বাহার পাপড়ি।

ছেলেটি টেনে টেনে গাইতে শুরু করে!

নাম—দ-অ নেগাম্‌ সেঁনা-ই-য়া
নাম—দ-অ নাপুম সেঁনা-ই-য়া।
কিলি মিলি বারা
তালারে সেঁনাসেঁয়া
নাইং-দ নাপুম বাঙগাই
নাইং-দ নেঙগাই বাঙগাই
কিলিমিলি বারা
কুটি-রি-য়া।

তর্জমাঃ

তোমার মা আছেন
তোমার বাবা আছেন
(তাই) নানা রঙের ফুলের যে বাগান
সেই বাগানে দাঁড়িয়ে আছো তুমি।
আমাদের বাপ নেই
আমাদের মা নেই
তাই বাগানের বাইরে আছি আমি।

গান গেয়ে গেয়ে এই কথাটাই বোঝাতে চাইবে ছেলেটি, যে মেয়েটির সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছে সত্ত্বেও কেন বাগানে ঢুকতে পারছে না সে। এই গানটি শুনতে শুনতে এক সময় মুগ্ধ হয়ে মেয়েটিও সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করবে এবং এক পা এক পা করে বাগানের বাইরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ছেলেটি যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে নয়।

সমস্বরে গাইতে গাইতে ছেলেটিও ক্রমশ সেদিকে এগিয়ে যাবে এবং তারপর দুজনেই হাতধরাধরি করে নাচতে ও গাইতে শুরু করবে বাগানের বাইরে এসে।

ময়ূর নাটুয়া, মুখোশ নাচ ইত্যাদি ছাড়াও পৌষ পরবের এই বিশেষ গানটি রীতিমত চিত্তাকর্ষক। শিশুকেই আমরা ফুলের সঙ্গে তুলনা করি, কিন্তু আদিবাসী মন বাপ মা ভাই বোন নিয়ে যে পরিবার তাকেই ফুলের বাগান মনে করে এবং যে পিতামাতাকে হারিয়েছে সে মনে করে আনন্দের উদ্যানে তার প্রবেশাধিকার টুকুও নেই।

পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলার বহু জায়গাতেই এই ধরণের পৌষ-উৎসবে মেলা বসতো, নাচ গান আনন্দের ঝর্ণা বইতো গ্রাম্য মাটিতে। তারপর কখন থেকে, কিভাবে এই উৎসব শুধুমাত্র কয়েকটি নিরস এবং ঘরোয়া আচার বিচারে পরিণত হয়, তা এখন গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার মাটিতে আজ তাই উৎসবের শবটুকুই পড়ে আছে শুধু।

হিমালয় অভিযান

স্বামী ভূমানন্দ

কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পর্বত 'হিমালয়'। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ 'এভারেস্ট'; উহার উচ্চতা ২৯০০২ ফিট। 'এভারেস্ট' নামটি সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। বৃটিশ রাজত্বকালে, ১১১ বৎসর পূর্বে ভারতীয় জরীপী বিভাগ (Department of Indian Survey) হিমালয় পর্বত জরীপের জন্য, প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সার্ভেয়ার (Surveyor) ও ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি সহ, একটি সুপুষ্ট দল প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাধানাথ শিকদার হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া উচ্চতম শৃঙ্গ 'গৌরীশঙ্করকে, তিন দিক হইতে জরীপ (Triangular Survey) করেন এবং উহার উচ্চতা ২৯০০২ ফিট সাব্যস্ত করেন। এই জরীপী দলের অধিনায়ক ছিলেন তখন স্যার জর্জ এভারেস্ট (Sir George Everest)। গৌরীশঙ্করের' উচ্চতা পরিমাপের কৃতিত্ব অবশ্য তিনিই লাভ করিলেন এবং এই গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গই তখন তাঁহার নামে আখ্যায়িত হইয়া 'এভারেস্ট পর্বত' (Mount Everest) নাম ধারণ করিল।

বহুকাল হইতেই 'এভারেস্ট' পর্বতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত কয়েকটি বিদেশীয় অভিযান এই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। প্রধানত বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ এবং সুইজারল্যান্ড হইতেই এই অভিযানকারীরা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাহাড়ী দোভাষী, পথপ্রদর্শক ও কুলিদিগের সাহায্যে নেপাল হইতে অগ্রসর হইতে থাকেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, সম্প্রতি একটি ভারতীয় অভিযানের পরিকল্পনা চলিতেছে এবং ইতিমধ্যেই অভিযানের আয়োজন শুরু হইয়াছে। তাঁহারা আশা করেন, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দেই আরোহণ আরম্ভ হইবে। ভারতীয় অভিযান সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্বে পূর্ববর্তী বিদেশীয় প্রধান অভিযানগুলির একটি সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত দিতেছি।

শেষ বৃটিশ অভিযান কর্নেল জে হাণ্ট (Colonel. J. Hunt)এর তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের পর ইহাই বৃটিশ প্রথম অভিযান। তাঁহারা ২৩০০০ ফিট পর্যন্ত নিরুদ্বেগে আরোহণ করেন, কিন্তু ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মাংসপেশী ক্রমে দুর্বল ও আড়ষ্ট হইতে থাকে, আহার ও জলপানে স্পৃহা থাকে না, নিদ্রা হয় না এবং তাঁহাদিগের শীত সহ্য করিবার শক্তিও কমিয়া যায়। এই সমস্ত কারণে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

পরবর্তী অভিযান, British Royal Geographical Society এবং Alpine Club কর্তৃক একযোগে পরিচালিত হইবে। অধিক উচ্চে উঠিলে যাত্রীদিগের অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, কারণ সেখানে বায়ুর চাপ, সমতলের বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক কম। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত মাত্র ত্রিশ পাউণ্ড ভারবিশিষ্ট নূতন ধরণের যন্ত্র (Oxygen Apparetus) ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হইতেছে। পর্বতারোহীরা এক্ষণে যে জুতা ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত ভারি; তাই জুতার ভার কমাইবারও ব্যবস্থা এক্ষণে হইতেছে। এভারেস্টের শেষ ৫০০০ ফিটের জন্য (অর্থাৎ ২৫০০০ হইতে ২৯০০০ পর্যন্ত) এই নূতন ধরণের হাল্কা জুতা ব্যবহার করা হইবে। এগুলি এমনভাবে প্রস্তুত হইতেছে যে, পা বেশ গরম থাকে। একজন বলিয়াছেন, ২৩০০০ ফিট আরোহণের

উত্তর-পূর্ব দিক হইতে মাউণ্ট এভারেস্ট

পর জুতার ভার এক পাউণ্ড কমান স্কন্ধের ভার পাঁচ পাউণ্ড কমানর সমান—

"Beyond 23000 feet, the lessening in the weight of foot-wear by one pound is equivalent to reducing weight carried on the shoulders, by about 5 lbs."

এই বৃটিশ অভিযানের অগ্রগামী দল Dr. Charles Evans ও Mr. Alfred Gregory সম্প্রতি লণ্ডন হইতে প্লেনে দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩)। দলের অবশিষ্ট দশজন জলপথে রওনা হইয়াছেন এবং তাঁহারা শীঘ্রই আসিয়া ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। অভিযানের নেতা কর্নেল হাণ্টও শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা আশা করেন, দুই মাসের মধ্যেই অভিযানোপযোগী দ্রব্যসম্ভার, পথ-প্রদর্শক, কুলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আগামী মে মাসে (১৯৫৩) আরোহণ আরম্ভ করিবেন।

গত বৎসর (১৯৫২ খৃঃ) দ্বিতীয় সুইস অভিযান (Swiss Expedition) নেপাল হইতে আরোহণ করেন। পূর্ব-পূর্ব অভিযান ও বর্তমান অভিযান, এ পর্যন্ত আরোহণ-পথে আটটি ঘাটি (Camp) স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ঘাটি (Base Camp) ১৭২২৫ ফিট উচ্চে এবং অষ্টমটি ২৪৭৩৮ ফিট উচ্চে অবস্থিত; ইহার বামদিকে এভারেস্ট ও দক্ষিণ দিকে লোটসী শৃঙ্গ (Lohtsi Peak) ২৭৮৪০ ফিট উচ্চে। মিঃ ল্যামবার্ট (Monsieur R. Lambart), মিঃ রিসসি (Reisse) ও সুপ্রসিদ্ধ নেপালী শেরপা টেনজিং মাত্র সাতজন শেরপাসহ এই উচ্চতম ঘাটি ৯ই নভেম্বর, ১৯৫২ খৃঃ স্থাপন করেন। এখান হইতে এভারেস্ট শৃঙ্গ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দল এভারেস্ট শৃঙ্গাভিমুখে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে অসহ্য প্রবল ঝড় বহিতে থাকে ও বায়ুর উত্তাপ Freezing Point হইতে ত্রিশ ডিগ্রি নামিয়া পড়ে; কাজেই অনিচ্ছা সহকারেই দলের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই অভিযানে ২৫০ জন কুলি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়। এই অভিযানের খরচ ৩১২০০৪ ফ্রাঙ্ক (২৬০০ পাউণ্ড স্টার্লিং)। অভিযানের কর্তৃপক্ষগণ স্বদেশে ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, অভিযানকালে প্রথম ঘাটি (Base Camp) হইতে দ্রব্যাদি লইয়া উঠিবার সময় পনেরজন শেরপা কুলি দলভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং একটি স্নোম্যান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা-দিগের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। শেরপারা ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। প্রথম সুইস্ অভিযানের একজন ২৮২১০ ফিট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন।

জাপান হইতে এক অভিযানের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারাও তাঁহাদিগের মত অনেক দূর পর্যন্ত জরীপ (survey) করিয়াছেন। এই দল মাত্র ৫ জন জাপানী লইয়া গঠিত, ইঁহাদিগের নেতা মিঃ কে, ইমানিসি। বর্তমানে এ অভিযান Japanese Himalayan Reconnaisance Expedition নামে বিখ্যাত। তাঁহারা বলেন যে, এভারেস্ট শৃঙ্গে যাইবার একটি নূতন পথ তাঁহারা বাহির করিয়াছেন এবং এই বৎসরে (১৯৫৩ খৃঃ) বর্ষার পূর্বেই তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের কার্য প্রথম আরম্ভ হয় গ সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫২ খৃঃ) এ সারভের জন্য সেই সময় তাঁহারা ২১০০ ফিট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। দূর হইতে তাঁহারা দুইটি শৃঙ্গ দেখেন, একটির নাম "অন্নপূর্ণা", ২৬৪৯২ ফিট উ অপরটির নাম "হিমালচুলি" ২৫৮ ফিট। এই দলের একজন অগ্রণী এম্ তাকাগি বলেন, হিমাচুলীর রা অত্যন্ত খাড়া পাহাড় দ্বারা বন্ধ ও অ বলিয়া মনে হয়।

ইতিমধ্যে জার্মান ডাক্তার হে হফার (Dr. Herringhoffer Munich) একাই ভারতবর্ষে আ পৌঁছিয়াছেন। ইনি আলপস্ প অভিযানের একজন সুদক্ষ ক উপস্থিত তিনি হিমালয় অভি (German Expedition to Himalayas) একটি প্ল্যান প্রস্তুত করি এবং তাঁহার ১১ জন সহকর্মী আ

---

* স্নোম্যান সম্বন্ধে মল্লিখিত "অ তুষার-মানব" শীর্ষক প্রবন্ধ, 'দেশ' প ১৭ শ্রাবণ, ১৩৫৯ সংখ্যায় প্র হইয়াছিল।
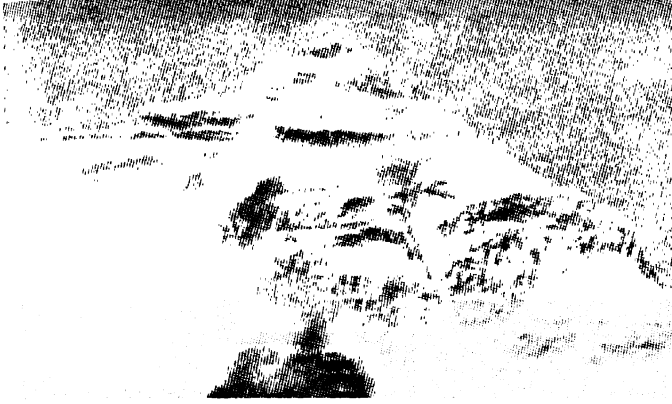
বর্ষাকালে মাউণ্ট এভারেস্ট

পর, এপ্রিল মাসে (১৯৫৩ খৃঃ) নংগা পর্বতে (২৬৬৫২ ফিট) আরোহণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবেন।

শতাধিক বৎসর পূর্বে নির্ধারিত এভারেস্টের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট সম্বন্ধে এক্ষণে সন্দেহ হওয়ায়, উহা পুনরায় পরিমাপ করিয়া দেখিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি জরীপী দলও (Government Survey Party) পুনরায় এভারেস্ট জরীপ করিবার জন্য আগামী এপ্রিল মাসে (১৯৫৩ খৃঃ) নেপাল হইতে যাত্রা করিবেন। হিমালয়ের আরও ৩২টি শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারণ করিবার পরিকল্পনাও তাঁহাদিগের আছে।

এক্ষণে ভারতীয় অভিযান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভারতীয় অভিযানের সম্ভাবনা, পর্বতারোহণে সুদক্ষ কর্মপাল কর্তৃক বর্তমান বৎসরের প্রথমে পরিকল্পিত হয়। ইনি পূর্বের ছয়টি অভিযানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এইজন্য ইঁহাকে "Everester" বলে। তিনি বলেন, যদি অভিযানের আয়োজনাদি তাঁহার ব্যবস্থা মত (Plan) চলিতে থাকে, তাহা হইলে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দেই তিনি হিমালয়ের (Tower of the world) শীর্ষপ্রদেশে ভারতীয় সচক্র ত্রিবর্ণ পতাকা সর্বপ্রথমে প্রোথিত করিবেন। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে ৯টি অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে। পূর্ববর্তী সকল অভিযানই হিমালয়ের দক্ষিণদিক ধরিয়া পথ প্রস্তুত করিতে করিতে উঠিয়াছেন এবং অকৃতকার্য অভিযানকারীরাও পুনরায় সেই পথ ধরিয়াই আরোহণ করিবেন। কিন্তু কর্মপালের নূতন রাস্তা হইবে এভারেস্টের উত্তর-পূর্ব দিক হইতে। কর্মপাল ১৯২২ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ অভিযানের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহাদিগের প্রথম দোভাষী (Interpreter) পথপ্রদর্শক (Guide) এবং কুলি-কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। কর্মপালের মতে ব্রিটিশ আরোহীরা ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন না করিলে, তাঁহার দলের কর্মীরা এতদিনে এভারেস্ট-আরোহণ সমাধা করিতেন—

"Most of the sherpas, including Angtharkay climbed up to the maximum height reached by one expedition; but when the British climbers were exhausted and decided to come back, most of accompanying sherpas, including Angtharkay, were quite fit and anxious to conquer Mount Everest. But unfortunately, every time the European leaders refused them permission to go higher. I am perfectly sure, if they had not been held back, Mount Everest would have been conquered lo g ago."

কর্মপাল তাঁহার পূর্ব সহকারী প্রসিদ্ধ শেরপা আংথারকে লইয়া, মাত্র ১২ জন সহ একটি আরোহীদল সংগঠন করিয়াছেন। ইহাদিগের কেহ কেহ পূর্ব অভিযানেও ছিল। "শেরপা" নেপালের একটি জাতি বিশেষ; ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কষ্টসহ ও পর্বতারোহণে সুদক্ষ। অভিযানের সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থ। এই ব্যাপারে সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতেই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে এবং এই অর্থের জন্য কর্মপাল ভিন্ন ভিন্ন গভর্নমেণ্টের নিকট প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। নেপাল সরকারও এই বিষয়ে সহায়তা করিবেন আশা করা যায়। পর্বত আরোহণকালে পথে ঘাটি (camp) স্থাপন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। প্রত্যেক ঘাটিতেই যন্ত্রপাতি, আহার্য, শীতবস্ত্রাদি, শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে রাখিতে হয়। এক ঘাটি হইতে অন্য ঘাটিতে সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং রেডিও প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্মপাল, ভারতীয় সৈন্য-বিভাগ হইতে রেডিও সেট্ এবং Indian Weather Bureau হইতে দৈনিক ভাবী প্রাকৃতিক শীত-বাত-বৃষ্টি প্রভৃতির বিবরণ (Weather Chart) পাইবেন আশা করেন।

কর্মপাল কেন উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে চান, তাহার বিশেষ কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন। এভারেস্টের দক্ষিণ দিক প্রায়ই চির-তুষারমণ্ডিত থাকে; কিন্তু শীতের শেষ-ভাগে উত্তর দিকের তুষার প্রবল বায়ুর প্রভাবে দূরীভূত হইয়া যায়; কাজেই এই রাস্তায় তাঁবু গাড়ার যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং বরফের ধ্বস (Avalanche) নামারও আশঙ্কা নাই। তাঁহার অভিযান দারজিলিং হইতে, অর্থাৎ ৭০০০ ফিট উচ্চতা হইতে, আরম্ভ হইবে এবং তিনি আশা করেন, উত্তর সিকিমের মধ্য দিয়া একটি সহজ পথ (shortcut) ধরিয়া,

তিন সপ্তাহেই তিনি রংবক বৌদ্ধ ধর্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইবেন।

কর্মপালের প্রস্তাব, তিনি ১০—১২ হাজার ফিট উচ্চে একটি শিক্ষাকেন্দ্র (Training Centre) খুলিবেন। ইহাতে কেবলমাত্র বলিষ্ঠ, উৎসাহী ও কর্মঠ যুবকদিগকে লওয়া হইবে। এখানে শীত সহ্য করানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই স্থান হইতে ক্রমে উচ্চস্তরে উঠিয়া, রাস্তা প্রস্তুত, জরীপ প্রভৃতির শিক্ষাও দেওয়া হইবে। পরে, যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইবে, তাহাদিগকেই অভিযানে অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে। শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আহারাদি, বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, ডাক্তারখানা, চাকর, কুলি ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং সেখান হইতে যাহাতে দারজিলিং কেন্দ্রে অতি সত্বর সংবাদ দেওয়া যায়, তাহার জন্য ফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও প্রভৃতিরও সরঞ্জাম রাখিতে হইবে এবং উভয় স্থানে যাহাতে সহজে অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়, তাহার সুব্যবস্থাও করিতে হইবে। অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থাই প্রচুর অর্থসাপেক্ষ সন্দেহ নাই।

সুবিখ্যাত শেরপা টেনজিং (Tenzing) কর্নেল হাণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হিমালয় অভিযানে যোগ দিয়া, আগামী মে মাসে (১৯৫৩ খ্রীঃ) যাত্রা শুরু করিবেন। তিনি যখন কর্মপালের প্রস্তাব জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ভারতীয় অভিযানের সম্ভাবনায় অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভারতবাসী, বিশেষত বিদেশীয় অভিযানের সহিত পর্বতারোহণে চির অভ্যস্ত; কাজেই কর্মপালের উদ্যোগ দেখিয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত অন্য কেহ হইতেই পারেন না এবং তিনি কর্মপালের এই নব অভিযানের যথাসাধ্য সহয়তা করিবেন—

"When his attention was drawn to a press statement made by Sri Karma Paul, at Calcutta on January 27 last (1953), Tenzing expressed his great delight at the prospect of an All Indian Everest Expedition in 1954. As an Indian, and above all as a mountaineer, he added, he will feel himself much happier than anybody else, to be of any help to such an expedition."

টেনজিং-এর মতে নব-অভিযান-যাত্রার পূর্বে, যাত্রীদিগকে অন্তত ৩ বৎসর শিক্ষানবিশভাবে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে; নতুবা অভিযান ব্যর্থ হইবে ও অকারণ বহু অর্থব্যয় হইবে এবং সম্ভবত জীবন-নাশও ঘটিবে। টেনজিং কর্মপালে পরিকল্পিত উত্তর পথ অপেক্ষা দক্ষি পথই ভাল মনে করেন।

এভারেস্টে উঠিবার সংকল্প লইয়া গত ৩০ বৎসরে ৯টি অভিযান অকৃতকার্য হইয়াছে। তাছাড়া, কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৪৬ ফিট), গডউইন অস্টেন (২৮২৫০ ফিট) প্রভৃতি কয়েকটি শৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টাও বিফল হইয়াছে। যতদূর মনে হয়, বর্তমান বৎসরে (১৯৫৩ খৃীঃ) বর্ষা নামিবার পূর্বেই অনেকগুলি অভিযান আরোহণ আরম্ভ করিবেন। আমরা আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিব এবং ফলাফল জানিবার নিমিত্ত উৎসুক থাকিব।

থাবলী

প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ...মতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ...ীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে অন্তত বিষয়বস্তু ও ...ঙ্গিকের দিক দিয়ে নবযুগ সূচিত ...য়েছিলো কল্লোল-গোষ্ঠীর বলিষ্ঠ আবির্ভাবে কথা অনস্বীকার্য। জীবনবাদ আর মানবিক...ার বীজমন্ত্র সম্বল করে যে শক্তিশালী ...হিত্যিকবৃন্দ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন, ...মেন্দ্র মিত্র সে দলের মধ্যমণি এ বিষয়ে ...ন্দেহের অবকাশ নেই। রচনাবৈচিত্র্যে যেমন ...নি মধ্যমণি তেমনি প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য আর ...ষ্ঠু জীবনবোধ তার রচনাকে স্বতন্ত্র ...র্যাদায় মণ্ডিত করেছিলো। তাঁর রাজ্যে তিনি ...ক, সংহতি ও সংবদ্ধতায় তিনি অনন্য।

মনোবিকলনের নামে ক্লেদরতির যে প্রয়াস ...ল্লোল যুগের প্রায় প্রতিটি লেখকের ...খাতেই পরিলক্ষিত হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ...বিতা, গল্প, উপন্যাস এ কলঙ্ক থেকে ...শ্চর্যভাবে মুক্ত। একই যুগে, একই ভাব...রায় পুষ্ট হয়ে এ ব্যতিক্রম কিভাবে সম্ভব ...টা চিন্তার বিষয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার প্রধান লক্ষণীয় ...ষয়, বুদ্ধি ও আবেগের বিজ্ঞানোচিত ...মন্বয়। এ সমন্বয় লেখকের বহুমুখিনতার ...য়, মননশীলতার দ্যোতক। দার্শনিক শ্রদ্ধা ...র কবিদৃষ্টির মাধ্যমে প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনা ...ল্পোৎসিদ্ধির চরম স্তরে উন্নীত। সাহিত্যের ...্ময়ানে এই কারণেই প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনা ...কালীনই শুধু নয় সর্বদলীয় আবেদন...য়। রচনার অন্তরালে দরদী সহিষ্ণু ...ন্তঃকরণ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এই ...দী মনের স্পর্শই দেহসর্বস্ব বারবধূ থেকে ...রু করে হৃতচেতনা জড়বুদ্ধি কেরানীকেও ...্রাণবন্ত বাস্তবপন্থী করে তোলে। অনুভূতির ...ভাব নেই, কিন্তু উচ্ছ্বাস, আবেগ-উচ্ছলতা ...য়ত লেখনীর দ্বারা নিয়মিত। যেটুকু ...ম্ভাব্য, সেটুকু নিয়েই কারবার। পাঠক...নকে সহজে আকৃষ্ট করার হালকা উপকরণ প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনায় বিরল।

প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনা প্রায়শ মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে। সূক্ষ্মাতি...সূক্ষ্ম অনুভূতি, অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতাক্লিষ্ট ...হৃদয়াবেগ, পরিমিত দুঃখ বেদনার স্বল্পায়ু...মুহূর্ত তাঁর রচনাশৈলীর মাধ্যমে শিল্পোৎ...কর্ষের চরম নিদর্শন হয়ে ওঠে। মানুষের ...বিচিত্র চেতনা লেখকের মনে অদ্ভুত রোমাণ্টিক ...পরিবেশ সৃজন করে, কিন্তু এ রোমাণ্টিসিজম ...আকাশচারী বাস্তব পরাঙ্মুখ আবেষ্টন ...সৃষ্টি নয়। মাটির গভীরে এর শিকড় প্রসারিত, এর প্রাণরস আহরিত হয় ধরিত্রী...গর্ভ থেকে।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুর অভি...নবত্ব ছাড়া ব্যঞ্জনাময় ভাষা প্রয়োগের সূক্ষ্ম

কারুকার্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অদ্বিতীয়। তার অন্তর্মুখী শিল্পী মানসের স্বরূপ-নির্ণয়ে এই কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবনকে বস্তুরূপে নয়, ভাবরূপেই তিনি চিত্রিত করার পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষ-অনুভূতি অপেক্ষা অনুধ্যান অনুভূতি দ্বারা বিষয়বস্তুকে শিল্প-সম্মত রূপদান করায় তাঁর লেখনী বিশেষ পারঙ্গম। প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনার প্রধান উপজীব্য, মানুষ নয়, মানুষের মন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্ব প্রথম শ্রেণীর। বুদ্ধিগ্রাহ্য অথচ স্বল্পভাষণ প্রকাশ ভঙ্গীর মাধ্যমে প্রতিটি চরিত্র রক্তে মাংসেই শুধু সঞ্জীবিত হয় না, নিজ নিজ বিচিত্র দুঃখ-সুখের অনুভূতি পাঠকের মনের দুয়ারে উপস্থাপিত করে। তাদের ব্যথা বেদনায় পাঠকের মনও আপ্লুত হয়।

পটভূমির বৈচিত্র্য পরিবেশ-সৃষ্টির যাদুতে কত প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হতে পারে প্রেমেন্দ্রবাবুর রচনাই তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। ভৌতিক, আধিভৌতিক কাহিনীও লিখন-ভঙ্গীর চমৎকারিত্বে বাস্তবের সমপর্যায়-ভুক্ত হয়।

বিশ্রুতকীর্তি সাহিত্যিকগণের মূল্যবান রচনাবলী একত্র গ্রথিত করে সুলভ মূল্যে সাহিত্যরসপিপাসুদের সহজলভ্য করে তোলার কাজে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রচেষ্টা অতুলনীয়। আলোচ্য গ্রন্থাবলীতে লেখকের নাতিহ্রস্ব দুটি উপন্যাস, নটি গল্প ও গোটা তিনেক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনানৈপুণ্যের ধারক ও বাহক। পরিমিত সীমার মধ্যে নিটোল নিখুঁত কাহিনী পরিবেশন করার যে ঐশী শক্তি লেখকের সহজ করায়ত্ত, এই গ্রন্থাবলীর প্রতিটি গল্পই সেই ক্ষুরধার শক্তির প্রভাবে বৈদুর্য-মণির মত দ্যুতিময়। দুটি উপন্যাসের মধ্যে অন্তত একটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাসের স্থান অধিকারের দাবী রাখে।

এমন একটা সময়ে যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য জগৎ অপেক্ষা সিনেমা জগতে অধিক পরিচিত, সেলুলয়েডের সর্বনাশা মোহ তাঁর নবউন্মেষশালিনী লেখনীকে প্রায় বন্ধ্যাই করে তুলেছে, স্পট লাইটের ঔজ্জ্বল্যের পাশে সাহিত্যের মৃৎপ্রদীপ নিষ্প্রভ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ঐতিহ্যের স্মারক রচনাসমূহ স্বল্প-

মূল্যে সাহিত্যরসিক সমাজের মধ্যে পরিবেশন করে ভাবীকালের পাঠকবর্গেরও ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

যে প্রকাশ পারিপাট্য আর মুদ্রণসৌকর্যের জন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের যাবতীয় গ্রন্থাবলী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আদৃত, আলোচ্য গ্রন্থাবলীটিতেও সে ঐতিহ্য অক্ষুন্ন।

কল্লোলযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা বিদগ্ধ পাঠকসমাজে বহুল প্রচারিত হোক, এই আমাদের একান্ত কামনা।

৬৮।৫৩

শিশু সাহিত্য

বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—১৸০।

ছোটদের উপযোগী করে বেশ সুখপাঠ্য-ভাবে লেখা এ ধরণের অতি সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক-পরিচিতির বই ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য আছে এবং 'পটেড বায়গ্রাফী' জাতীয় বই বিদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাঙলা ভাষায় এ বৈচিত্র্যের অভাব মেটাবে 'বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক' বইখানি। দুঃখের বিষয় যাঁদের কথা এ গ্রন্থে আছে তার মধ্যে 'বিশ্বের সেরা সাহিত্যিক' হিসেবে থ্যাকারের নাম আছে; কিন্তু হাফিজ, কোলরীজ, তুলসীদাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার একেবারেই নীরব। এ ছাড়া চীন, জাপান, গ্রীস, রোম-এর প্রাচীন প্রতিনিধি খুঁজে পাননি তিনি, ভাস ভবভূতি বঙ্কিম, শরৎ, এমনকি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও কোন আলোচনা করেননি। সস্তা দরের এই জাতীয় ইংগ-আমেরিকান বই যে কয়েকজনকে সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকার করে শুধু সেই করেকজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের নাম জুড়েই দায়িত্ব স্খলনের চেষ্টা প্রশংসনীয় নয়। যাই হোক, এ বই ছোটদের ভালই লাগবে এবং সম্ভবতঃ সাহিত্য সম্বন্ধেও তাদের অনুসন্ধান স্পৃহা কিছুটা বাড়াবে।

৬৪।৫৩

বিবিধ

শুকতারা: সম্পাদক—মধুসূদন মজুমদার। মাসিক শিশুপত্র। ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

ছোটদের মাসিক পত্রিকা বাঙলা দেশে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র আছে। তার মধ্যে 'শুকতারা' মাত্র ছ'বছরের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং কিশোর মহলে জনপ্রিয়ও হয়েছে। পত্রিকাটির সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হল মূল্য,বার্ষিক চাঁদা মাত্র চার টাকা। এ ছাড়া ছাপা, কাগজ ও রচনার দিক থেকেও পত্রিকাটি ছোটদের হাতে তুলে দেবার মত। কিন্তু ছবির দিক থেকে রুচি আরও উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কবিতা

সেতু (কবিতা সংকলন): সম্পাদক—আনন্দ বাগচী: সাহিত্য চক্র, ১০৫, শোভাবাজার স্ট্রীট: চার আনা। (৫৫।৫৩)

সপ্তর্ষি: তিন কোনিয়া পুকুর, বর্ধমান থেকে রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন: ছয় আনা। (৫৬।৫৩)

অ-নামা: অসীমানন্দ: সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১, এম হাজরা লেন, কলিকাতা: আট আনা। (৫৩।৫৩)

স্মৃতিলেখা: শ্রীসতোশচন্দ্র ভট্টাচার্য: শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ আশ্রম, শিলচর: আট আনা। (৫৪।৫৩)

নূতন ছড়া ও কবিতা: শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী: প্রকাশক, জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি: বার আনা। (৫৭।৫৩)

সাহিত্যের এই দুর্দিনেও বাঙলা দেশে নতুন কবি আসছে। নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। ভালো কি মন্দ সে কথা পরে বিবেচ্য। প্রচেষ্টা যে আশাপ্রদ তাতে সন্দেহ নেই।

সেতু বেশীর ভাগ নবীন এবং কয়েকজন প্রবীণ কবির কবিতা নিয়ে একটি কবিতা পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। হয়তো আরও অনেক কবিতা পত্রিকার মত এটিও স্বল্পায়ু হবে। তা নিয়ে দুঃখ করবার কিছু নেই। বাঙলার তরুণতর কবিদের উদ্যমের যে স্মারক এতে আছে তারও মূল্য কিছু কম নয়।

সপ্তর্ষি সাতজন কবির একাধিক কবিতার সংকলন। কোন কবিতাতেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন স্বাক্ষর নেই। তবে এদের সকলেরই দৃষ্টি কোণ কমবেশী এক। সমাজ-চেতনার একটি বিশেষ সুর সবার কবিতাতেই ধ্বনিত, সার্থক অসার্থক সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্টিভংগীর এই ঐক্য কবিতাগুলিতে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে।

অ-নামা স্বামী অসীমানন্দ লিখিত কাব্যগ্রন্থ। নিরাভরণ প্রচ্ছদপট দেখতে অনেকটা হ্যাণ্ডবিলের মত। কবিতাগুলিতে সহজ একটি আবেদন আছে। কোন বৈচিত্র্য না থাকলেও এই সরল স্বাচ্ছন্দ্যটুকু নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।

একমাত্র সারল্যই যদি কবিতা হয় তাহলে স্মৃতিলেখা কাব্যগ্রন্থ। কবির বক্তব্য সমিল পদ্যে বলা হয়েছে। বক্তব্যের সবটুকুই সরল। কোথাও এতটুকু রহস্যের কুয়াশা নেই।

নূতন ছড়া ও কবিতায় শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছড়াগুলি সুখপাঠ্য, ছন্দ সাবলীল। ছোট ছেলেমেয়েরা হাতে পেলে নিঃসন্দেহে খুশী হবে। তবে ছোটদের বইএর ছাপা বাঁধাই আর একটু মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ট্রামে-বাসে

পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অমান্য করায় হোলির দিন কলিকাতায় যে চারিশত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁদের মধ্যে ছয়জন মহিলাও আছেন বলিয়া জানা গেল। এই সংবাদে আমরা অনেকেই বিস্মিত হইয়াছি। খুড়ো বলিলেন—"ট্রামে-বাসে যাঁদের জন্যে সীট্ ছেড়ে দিতে হয় তাঁরা হলেন লেডীস আর যারা ধরা পড়েছেন hooli-gan গাওয়ার জন্যে তাঁরা হচ্ছেন জেনানা সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই।"

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার নাকি শীঘ্রই ভারতীয় জন্তু-জানোয়ারের একটি ছায়াচিত্র তোলার ব্যবস্থা করিতেছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে এই ছবি বিদেশে প্রদর্শন করা হইবে। —"আমরা অবশ্যি ডাইরেক্টার নই, তবু মনে হয় প্লেব্যাকে ভারতীয় ছবির ডায়লগ ওদের গলায় জুড়ে দিলে ছবিটার জেল্লা

বাড়বে। সরকার কথাটা বিবেচনা করে দেখবেন"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

ভারতে প্রতি ৬৩০০ অধিবাসী-পিছু ডাক্তার নাকি মাত্র একজন। —"কিন্তু তা-ও বেশি-ই বলতে হবে কেন না হাতুড়ে চিকিৎসায় এই ছ'হাজার তিনশ জনই অল্পবিস্তর পারদর্শী। তা ছাড়া পাঁচ পয়সা বা সো-পাঁচআনার মোক্ষম মানত থাকতে চিকিৎসারই বা কী প্রয়োজন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

জনাব জাফরুল্লার বরখাস্তের জন্য পাকিস্থানে জনমত উগ্র হইয়া

উঠিয়াছে।—"পররাষ্ট্র সম্বন্ধে খাঁ সাহেবের জ্ঞান অনেকখানি, এবারে স্বরাষ্ট্র সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়ার সময় এসেছে—better late than never !!"

* * *

উচ্চ হিন্দী শিক্ষার জন্য জনৈক শিক্ষার্থীকে নাকি সরকারী ব্যয়ে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। —"অথচ বাঙলার জন্যে গ্রীস বা মধ্যপ্রাচ্য তো দূরের কথা, প্রতিবেশী করাচীতে পর্যন্ত এখনো কোন শিক্ষার্থীকে পাঠানো হলো না"—বলা বাহুল্য মন্তব্য খুড়োর।

* * *

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বিরূপ এবং উদ্ভট সমালোচনা করায় ঢাকাতে পাকিস্থান ইতিহাস সম্মেলন পণ্ড হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। —"ইতিহাসটা লড়কে লেংগে থেকে শুরু করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

সোবিয়েৎ বৈজ্ঞানিকেরা নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পৃথিবীর বয়স বর্তমানে পাঁচ হাজার কোটি বৎসর। —"মেয়েছেলের বয়স ফাঁস করে দেওয়ার নীতি আমরা কিছুতেই সমর্থন করিনে"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে নাকি বলা হইয়াছে যে, বিলোপসাধন অনিবার্য। অবশ্য কবে হইবে তার কোন সদুত্তর দেওয়া হয় নাই। —"আজি হতে শত বর্ষ পরে"—উত্তর দিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

চিয়াং কাইশাক ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাল্টা আক্রমণের সময় সমাগত-প্রায়। —"দিনক্ষণের বিচারের ভার অবশ্যি

গুপ্ত-Press-এর হাতে!!" সংক্ষেপে মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সেদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নেশা প্রসঙ্গটা নাকি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। —"নেশা জিনিসটাই যে তাই, জমাতে আর মজাতে ওর জুড়ি নেই" শ্যামলাল এক টিপ নস্যি নিয়া মন্তব্য করিল।

রঙ্গজগৎ

একটি অপ্রত্যাশিত অবদান

বড়ো কিছু দেখবার আশা নিয়ে বাঙলা ছবি দেখতে যাবার দিন কবে কোন্ যুগে চলে গিয়েছিল। মাঝে তো বাঙলা ছবির ওপরে একটা বিতৃষ্ণাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপকভবে। সে অবস্থা থেকে মোড় অবশ্য ঘুরিয়ে দিয়েছে 'মহাপ্রস্থানের পথে, রত্নদীপ, বাবলা, কার পাপে?, শুভদা, সাত নম্বর কয়েদী' প্রভৃতি খানকতক ছবি, যারা বাঙলার উৎপাদনের ওপরে সমগ্র ভারতেরই অনেকখানি আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এ বাদেও 'পণ্ডিত মশাই, দর্পচূর্ণ, বিন্দুর ছেলে, পাশের বাড়ি, মহারাজ নন্দকুমার, ৭৪॥' প্রভৃতি এক ঝাঁক ছবিরও নাম করা যায় যারা বাঙলা ছবির ওপরে সাধারণের অনাগ্রহের ভাব দূর করে দিতে সহায়ক হয়েছে। এইভাবে গত দু বছরের ভিতরে এক-এক ধাপ করে বাঙলা ছবির ওপরে লোকের প্রত্যাশা ফিরে এসেছে। এখন লোকমন উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আশার চেয়েও বেশি কিছু পাবার আশায়, চমকের ঘোরে বিস্মিত হবার নেশায়। বড়ো দুস্তর লালসা এটা; বড়ো সোজা কথা নয় এই তৃপ্তিটা লাভ করতে পারা। লোকের সেই তৃপ্তি পরিসাধনের পথে খানিকটা যেতে পারাই যেখানে কম কথা নয়, সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত একখানি ছবি সে-পথে অনেকদূরে এগিয়ে আসার কৃতিত্ব প্রতিভাত করতে পেরেছে দেখা গেল। লোকের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবার মতো সেই গৌরবান্বিত অবদানটি হচ্ছে প্রডাকসন সিণ্ডিকেটের 'বাঁশের কেল্লা'।

* * *

প্রডাকসন সিণ্ডিকেট, মানে প্রযোজক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার সুধীর মুখোপাধ্যায়ের, এর আগের কৃতিত্ব 'পাশের বাড়ি'। স্রেফ একখানি হাসির ছবি; লোকে হেসেছে এবং ছবিখানি লোককে হাসাতে হাসাতে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ দীর্ঘকাল ধরেই। তবুও কিন্তু লোকের চমককে নিবিষ্ট করে তোলার মতো ছবি ছিল না সেখানি। 'বাঁশের কেল্লা' তুরুপ মেরে গিয়েছে এইখানেই—লোকের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাওয়ার কথা নয়, 'পাশের বাড়ি'র দরুণ সুধীর মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে প্রকৃতির ছবি পাওয়া যাবে বলে লোকে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল, 'বাঁশের কেল্লা' একেবারেই তার চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। লোকের হাল্কা রসে অবগাহন করার আশাটা পাওনা থেকে বঞ্চিত থেকে যায় বটে, কিন্তু তার জন্যে কেউ বিলাপ করতে যাবে না, কারণ 'বাঁশের কেল্লা' নাট্যবৈভবে ও চিত্রসম্পদে যে আদরণীয় বস্তু সামনে হাজির করে দিয়েছে, কোন সঙ্গত-প্রবৃত্তিই চাইবে না, তার প্রতি অনাদর বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে। বরং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী চেতনার নিগূঢ় দিকে আবেগকে যেভাবে মূর্ত করে তোলা হয়েছে ছবিখানিতে, লোকের কাছে

'বাঁশের কেল্লা'র নায়িকা নবাগতা অনিতা গুহ

মানিতই হবে। লোকের অনুভূতি মুখর হয়ে বলতে চাইবে, এমনি ছবিই এ চিত্রশিল্পের মর্যাদা রক্ষা করে যায়।

* * *

গল্পের স্থান ইছামতীর তীরে মোল্লাহাটি গ্রাম; কাল ঊনিশ শতক; পাত্র দের চাষিবৃন্দ এবং কু-পাত্র নীলের কুঠিয়ালরা। বিষয়বস্তু হচ্ছে চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করার জন্য জুলুম ও নৃশংস অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে চাষীদের একজোট হয়ে বিদ্রোহ, যা উত্তর-কালের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই বাস্তবিক সূচনা বলে পরিগৃহীত হয়। প্রকৃত গেলে আধুনিক কালের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েরই প্রকাশ। এর ঘটনা ও চরিত্রাবলী কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ করে দেওয়া হয়েছে তিতু-মীরের আদর্শ ও লক্ষ্যকে এই মোল্লাহাটির চাষীদের মনের বল অর্জনে প্রেরণার উৎস বলে দেখিয়ে দিয়ে। ছেলে বেলা থেকেই এই চাষীরা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা গড়ে ইংরাজের অভিযানকে রুখে দেবার গাথা শুনে আসছে মা-দিদিমা-পিসিমাদের কাছ থেকে। ছেলেবেলা থেকেই তারা তিতুমীরকে প্রাণের আদর্শ পুরুষ বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই অনুকরণে বাঁশের কেল্লা গড়ে খেলা করেছে। ছেলে-বেলার সেই অনুপ্রেরণাকে তারা কাজে লাগালে তাদের পরিণতবয়সে কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

* * *

এ গল্পে নায়ক ও নায়িকা হচ্ছে কেশব আর দুর্গা। কেশব একেবারে অনাথ নয়, থাকবার মধ্যে তার আছে এক বৃদ্ধা বিধবা পিসিমা; ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও বৃত্তি তার চাষ-আবাদ। দুর্গা কুঠিয়াল সাহেবদের দ্বারা অনুগৃহীত পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে। প্রথম পর্বে ছিলেন টুইডী সাহেব; সহৃদয় ব্যক্তি, গ্রামেরই একজন হয়ে ছিলেন। বার্ধক্যের জন্যে টুইডী সাহেব বিদায় নিলেন, যাবার আগে সাহায্যস্বরূপ চাষীদের পাঁচটা করে টাকা দিয়ে গেলেন। নতুন কুঠিয়াল লারমোর সেই দানটাকে দাদন বলে দিয়ে চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করার প্রথম জো পেয়ে গেল। চাষীদের অনমনীয় মনোভাব; নীল তারা বুনবে না। নৃশংস অত্যাচার চললো চাষীদের ওপরে। জবরদস্তি জমি দাগিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। অসহযোগী চাষী-দের জিনিসপত্র ক্রোক করা আরম্ভ হলো। হাত পড়লো কেশবের ওপরে, কারণ সাহেব জেনেছে, সে-ই হলো বিরোধিতার পাণ্ডা। কেশবের বাড়ির জিনিসপত্তর ঘর থেকে টেনে বের করা হতে লাগলো। কুঠিয়ালের কোচম্যান ভজহরির মা-মরা ছোট্ট ছেলে বাসু, তার কেশবদার ওপর এই জুলুম সইতে না পারায় সাহেবের গুলীতে তাকে শহীদ হতে হলো। বাসুর বাবাও মরলো সেপাইয়ের গুলীতে তার প্রাণাধিক বাসুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে লারমোর সাহেবের বন্ধুদের গাড়ি উলটিয়ে হত্যা করতে গিয়ে। অত্যাচার আরও বাড়লো, সাহেব যখন দেখলে চাষীরা নীল বোনবার নাম করে ধানের চাষ করছে। আগুন ধরানো হলো কেশবের বাড়িতে, প্রতিরোধ করতে গিয়ে পিসিমা আহত হয়ে আশ্রয় নিলেন পণ্ডিতের গৃহে আর তার জন্যে পণ্ডিতকে চালান করে দেওয়া হলো। পণ্ডিতের কন্যা দুর্গার সঙ্গে তখন বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে কুঠির নায়েব শেখরের সঙ্গে, কিন্তু সেও পারলো না তার ভাবী শ্বশুরকে সাহেবের কোপ থেকে রক্ষা করতে। কেশবকে তখন লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রামের কবিয়াল। পিসিমা তাকে তিতুমীরের উদাহরণ দেখিয়ে খবর পাঠালেন। দাঁড়ালো গ্রামের চাষীরা একজোট হয়ে; ছুটলো তারা কুঠিয়ালদের ওপর প্রতিহিংসার কোপ নিয়ে। লারমোর আর শেখর পালাতে পালাতে শেষে আশ্রয় নিলে দুর্গাদেরই বাড়িতে। একটা সুযোগ পেলে দুর্গা এতদিনে। কুঠির নায়েবের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে কেশব তার ওপরে যে কুপিত হয়েছে, এবারে দুর্গা তা খণ্ডন করে দেখিয়ে দেবে নায়েবের বৌ হতে সত্যিই সে নিজে চায়নি। লারমোর আর শেখরকে ঘরে বসিয়ে খাবার আনার ছুতোয় দুর্গা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে পিসিমাকে দিয়ে কেশবদের দলের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে। বিলম্বে অধীর হয়ে বন্দী দুজন দরজায় ধাক্কা মারলে। নিরুপায় হয়ে দুর্গা আগুন লাগিয়ে দিলে সেই ঘরে। দরজা ভেঙে আগুনের মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে বাইরে এসেই লারমোর গুলী করলে দুর্গাকে। কিন্তু পালানো আর হলো না ওদের, ক্ষিপ্ত চাষীর দলও সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘিরে ফেললে। ওদিকে তখন ঢাকের বাদ্যিতে নীল চাষ বন্ধের ফারমান জারীর ঘোষণা শোনা যাচ্ছে।

* * *

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ছবিখানি নতুন কিছু এনে দেয়নি, আর ঘটনাবলীর কথা যদি ধরা যায় তো 'নীলদর্পণ' আর '৪২'এর চেয়ে নতুনতর কিছু নেই। তেমনিই নৃশংসতা ও ক্রুরতার একটানা বিলসন। কিন্তু ও দুখানি ছবির চেয়েও 'বাঁশের কেল্লা' নানা বিষয়েই এমন উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে রয়েছে, যাতে ওর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদাই এসে গিয়েছে। সে মর্যাদা এসেছে বিন্যাস বৈশিষ্ট্যের গুণে। বিন্যাসের প্রতি পদটিতেই চিন্তারও যেমন, তেমনি আন্তরিকতারও পরিচয় ফুটে রয়েছে। যেমন একটি ইতিহাসের মহান্ অধ্যায়কে অবলম্বন করা হয়েছে, তার মানও যথাযথ রক্ষা করার জন্য নিষ্ঠাও প্রয়োগ করা হয়েছে। তার প্রধান একটি নিদর্শন হচ্ছে উপদেষ্টা হিসাবে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ। ছবিখানিতে তাই আগা-গোড়া ঐতিহাসিক পরিবেশটি কালোপ-যোগী হতে পেরেছে। পরিস্থিতির আবহাওয়াটা তাই উদ্দীপনাময় হতে পেরেছে, ঠিক বিষয়বস্তু মাফিক।

বিন্যাসের দিক থেকে অনেক কৃতিত্ব রয়েছে এতে, যা বাঙলা ছবি হিসেবে দৃষ্টিকে নির্ণিমেখ করে তুলবে।

* * *

সবচেয়ে চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে দৃশ্য রচনা ও পারিপাট্যের মধ্যে। বিষয়বস্তুর নাটকীয় প্রয়োজনের সঙ্গে ছন্দ মেলানো একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় দৃশ্য গঠনের মধ্যে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শটেই দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ছবিখানির চেহারাটা তাই নতুন ধরণের বলে প্রতিপন্ন হয়। দৃশ্যগুলির উপস্থাপন ধারার মধ্যেও সর্বাধিক শিল্প-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত ছবিখানির প্রধান সম্পদ দাঁড়িয়েছে আলোকচিত্রগ্রহণের বৈশিষ্ট্যে, যার জন্যে আলোকচিত্রশিল্পী দেওজীভাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই প্রসঙ্গে শিল্প-নির্দেশক কার্তিক বসুও সুখ্যাত হবেন। পোষাকাদি ও দৃশ্যপট সজ্জায় কাহিনীর পরিবেশকে ইতিহাসানুগ সুস্পষ্ট করে তোলায় তাঁর কৃতিত্বও বড়ো কম প্রশংসনীয় নয়। সুর সংযোজনার দিক থেকেও সলিল চৌধুরীর প্রদীপ্ত চিন্তাধারার একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকীয় পরিবেশসম্মত প্রভূত সঙ্গীতসম্পন্ন সুর তিনি পরিবেশন করে গিয়েছেন, যা আবেগকে সজাগ করে তুলতে কাজে এসেছে। বাঙলার পল্লীর সুরের গান তিনখানির সুরযোজনায় যেমন তেমনি পরিবেশনের মধ্যেও বৈচিত্র্য ধরতে পারা যায়। আরও বিশেষভাবে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব ফুটেছে টাইটেল সঙ্গীতটির সুর-রচনায় ও সঙ্গতবিন্যাসে, যা সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানির বিষয়বস্তুর ধাঁচটা মনে ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কলাকৌশলের দিক থেকে একমাত্র মনকে পীড়া দিয়েছে শব্দ-গ্রহণ; সংলাপ এমন জড়িয়ে গিয়েছে যে, অনেক সময় বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিরক্ত হতে হয়।

* * *

"বাঁশের কেল্লা"র অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন পুরনো অবশ্য আছেন, কিন্তু একমাত্র প্রভা ছাড়া প্রথিতযশা বলতে আর কেউ নেই। এতে পিসীমার ভূমিকাতেই প্রভার শেষ অভিনয়, আর শেষবারের মতো দেখিয়ে তিনি গিয়েছেন দর্শকমনকে আবেগে উদ্দাম করে তোলায় কি অতুলনীয় নাট্যপ্রতিভা ছিলো তার। দুর্গার ভূমিকায় অনিতা গুহ নবাগতা। কারদার-কলিনশ-টেরেসা শিল্পী নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কলকাতার বিজয়িনীদের তিনি অন্যতমা ছিলেন। ছবিতে তাঁর এই প্রথম অবতরণ এবং স্নিগ্ধ পল্লীবালার রূপটি তিনি ফুটিয়েও তুলেছেন চমৎকার। পিতার অবাধ্য খেয়ালী কবিয়ালের চরিত্রটির প্রতি লোককে দরদী করে তুলেছেন শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়—কমিক চরিত্র নয় কিন্তু তার। লারমোর সাহেবের ভূমিকায় ডেভিড কোহেন চরিত্রটিকে দুরাচারিতার জীবন্ত প্রতীক করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষুদে শহীদ বাসুর ভূমিকায় শ্রীমান অলোকের প্রতি প্রথম দৃশ্যে দেখা থেকেই মন টানবে, তারপর গুলী খেয়ে ওর মৃত্যু দৃশ্যে প্রাণটা ওর জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। পণ্ডিতমশায়ের শান্ত, সংযত নির্বিরোধী চরিত্রটিকে নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। কেশবের ভূমিকায় অনুপ-কুমারকেও মন্দ লাগবে না।

* * *

ছবিখানি দেখতে দেখতে কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে দর্শক নিজেদেরই ভিড়িয়ে দেয়, তাই সাহেবকে দিয়ে দুর্গাকে হত্যা করিয়ে দেওয়াটা যেন মনের সায় পায় না। অত্যাচার ও অনাচারকে সায়েস্তা করার জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে প্রাণের মূল্যে যে বিজয় তারা অর্জন করলো, তার উল্লাসটাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো দুর্গার মৃত্যুর সঙ্গেই। কেমন যেন অনভিপ্রেত পরি-সমাপ্তি। কাহিনী সম্পর্কে এই নালিশটাই এসে যায় শেষে।

রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী"

দাক্ষিণী শিল্পীগোষ্ঠী আগামী ২২শে মার্চ সকালে এবং ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ করেছেন। অভিনয়টি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের গৃহনির্মাণ তহবিলের সাহায্যার্থে।

রবীন্দ্রনাথের এই আধা-রূপক নৃত্য-নাট্যটির ভাবার্থ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য দাক্ষিণীর প্রায় চল্লিশজন শিল্পী অক্লান্তভাবে চেষ্টা করছেন। কলকাতার মঞ্চে "ফাল্গুনী"র অভিনয় এই হবে প্রথম।

রাজস্থানী লোকনৃত্য

রাজস্থান যেমন বীরত্ব, শৌর্য, ত্যাগ ও সাধনার আদর্শভূমি, তেমনি ওখানকার লোকশিল্প ও সাহিত্য অধিবাসীদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। সামন্ত যুগে নৃত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্প রাজা মহারাজাদের প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে ছিলো, ফলে জনসাধারণের সঙ্গে সেসব শিল্পের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপরদিকে স্পন্দিত হয়ে ওঠে জনসাধারণের নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ভিন্ন ধারার নৃত্য, গীত ও সাহিত্য। রাজস্থানের গ্রাম ও শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরে আজও এই লোক-শিল্পাদির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্থানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান-হেতু এই লোকশিল্প বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে থাকতে পেরেছে। আজও রাজস্থানের সর্বত্র এইসব নাচ দেখা যায়, গান শোনা যায়। রাজস্থানী নৃত্যের

মধ্যে ঘুমর, গণগোর, গিন্দড়, কচ্ছী ঘোড়ী, গৈর, ঝুমর প্রভৃতি নৃত্য প্রসিদ্ধ। রাজস্থানী নাটক নৃত্যধারারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নৃত্যনাট্যের অভিনয় হয় গ্রামে বা শহরের বড়ো রাস্তায় উন্মুক্ত স্থানে হাজার হাজার লোকের সামনে। এই নাটককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রাসধারী, খ্যাল এবং আদিবাসী নৃত্য।

রাসধারী নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পাত্রপাত্রী হয় ধার্মিক চরিত্রদের নিয়ে; গ্রাম ও শহরের সকল শ্রেণীর ব্যক্তি এতে অংশ গ্রহণ করে এবং অভিনয়ের জন্য কোন মঞ্চের দরকার হয় না। সব কাহিনীতেই প্রায় একই ধরণের পোষাক ব্যবহৃত হয় এবং অবশ্য গানের সঙ্গে নাচ ও সংলাপ ব্যবহার করা হয়। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নৃত্যনাট্য চলে। গানের সুর হয় মনোরম এবং ভাবভঙ্গীর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে। লোকের মনোবিনোদনের জন্যেই এই নাচের অনুষ্ঠান হয়, এর মধ্যে কোন ব্যবসায়িক প্রবৃত্তি প্রয়োগ করা হয় না। রাসধারীতে রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রকে বহুভাবে দেখানো হয়। পৌরাণিকের জায়গায় রাজস্থানী পোষাকই ব্যবহার করা হয়। এই নৃত্যনাট্যের গান শত শত বৎসর ধরে লোকের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে।

রাজস্থানের প্রাচীন ঐতিহাসিক গাথাকে সুরক্ষিত রাখতে খ্যালকে অবলম্বন করা হয়েছে। ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত কীর্তি খ্যাল-নৃত্যনাট্যে জীবিত রয়েছে। এক সময়ে এই খ্যাল নৃত্যনাট্য পেশাদার লোকশিল্পীদের জীবনধারণের মুখ্য উপাদান ছিলো। এর মধ্যে অমর সিং রাঠোড়ের খ্যাল, কেশরী সিংয়ের খ্যাল, রাজা বিচমলের খ্যাল, তুরা কলসীর খ্যাল, চন্দ্রমিলাগিরির খ্যাল ও মীরামঙ্গল বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু ভাট, বারেঠ, ঢোলি ও মিরাসি এই নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এই চারটি সম্প্রদায়ই রাজস্থানের লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই খ্যাল নৃত্যনাট্য অভিনয়ের জন্যে উন্মুক্ত স্থানে বড়ো বড়ো মঞ্চ বাঁধা হয় এবং মঞ্চের ওপর নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে পাত্রপাত্রী নীচে নেমে আসে। এই নৃত্যনাট্যের কথ্যাংশ ভাটেদের রচিত যা রাজস্থানী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নৃত্যনাট্যের পোষাক, ভাবভঙ্গী ও গানের সুর দেখা ও শোনামাত্রই মনকে আকর্ষণ করে নেয়। এর অভিনয় হয় সারারাত ধরে।

রাজস্থানের আদিবাসীর নৃত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত "গৌরি" যা উদয়পুরের আশপাশের ভিলেরা দেখায়। এ নাচ বি-ত্রিশটি ভিল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ভারতের আর কোথাও এ নাচ দেখা যায় না। ভিলেদের আরাধ্য ভৈরবের উপাসনা উপলক্ষে শ্রাবণ থেকে ভাদ্রের নবমী পর্যন্ত এক মাস ধরে এই নাচ হয়। নাচে যারা অংশ গ্রহণ করে, তারা প্রায় দেড় মাস ধরে মাছ, মাংস, সুরাদি ভক্ষণ ও পান পরিহার করে। সারাদিন নৃত্যের পর আরাধ্যদেবের পূজায় মগ্ন হয়।

* * *

রাজস্থানের এই নৃত্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করার কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই দেবীলাল সামরের অধিনায়কত্বে কলকাতায় ভারতীয় লোক-কলা মণ্ডলের একদল শিল্পী আসছেন খাঁটি রাজস্থানী নৃত্য দেখাবার জন্যে। এর আগে দলটি দিল্লীতে তাদের নাচ দেখিয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে। অধিনায়ক সামর অধুনালুপ্ত উদয়শঙ্কর কলাকেন্দ্রে রাজস্থানী নাচের শিক্ষক ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি রাজস্থানী নাচের শ্রেষ্ঠ পরিচর্যাকারী বলে খ্যাত। ভারতীয় লোক-কলা মণ্ডল খাঁটি রাজস্থানী নৃত্য শিক্ষা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত উদয়পুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। কলকাতায় নৃত্যের আয়োজন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত। আগামী ১৮ই থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত এই দলটি ধর্মতলার অপেরাতে (প্রাক্তন কোরিন্থিয়ান থিয়েটার) তাঁদের নাচের আসর বসাবেন।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ভারতের ক্রিকেট খেলার মরশুম প্রকৃত-পক্ষে শেষ হইয়াছে। এখনও যে সকল স্থানে এই খেলা পরিচালিত হইতেছে বা পরে হইবে, তাহা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলা শেষ না হওয়ার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। প্রখর রৌদ্রতপ্ত মাঠে সারাদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা কখনই সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। দর্শক ও খেলোয়াড় উভয়কেই চরম শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই এই খেলাঅবলোকন করিতে বা খেলায় যোগদান করিতে হইতেছে। ইহা হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বলিয়াছি, এখনও না বলিয়া পারি না। ভারতীয় ক্রিকেট পরি-চালনার অধিকর্তাগণ কবে যে ঠিক মরশুমের মধ্যে এই খেলার আরম্ভ ও শেষ করিবেন, তাঁহারাই জানেন। ক্রিকেট খেলায় বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের সারা বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত রাখিবার এই যে নীতি গত কয়েক বৎসর হইতে ইহারা অনুসরণ করিতেছেন, তাহাও ক্রিকেট খেলার উন্নতির পরিপন্থী, ইহা বহু-বার আমরা উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু পরি-চালকগণের এই দিকে কোনরূপেই দৃষ্টি নাই। ইঁহারা ভারতীয় বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একরূপ পেশাদারী সার্কাস পার্টিতে পরিণত করিয়াছেন। কাজকর্ম, ঘর-সংসার বলিতে এই সকল খেলোয়াড়দের যে কিছু আছে ইহা যেন পরিচালকগণ একেবারেই বিস্মৃত হইয়া আছেন—কেন তাহাও তাঁহারাই জানেন। এই-রূপে বিরামহীন খেলায় যোগদানের ফলে খেলোয়াড়গণ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাহা ইঁহারাও চিন্তা করেন না, এমন কি দেশের ক্রিকেট উৎসাহিগণও করেন না। কারণ তাঁহারা যদি করিতেন তাহা হইলে পরি-চালকদের সাধ্য ছিল না এইভাবে দেশের কতকগুলি সুসন্তানকে শারীরিক চরম ক্ষতিকারী অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত রাখা। বার বার একই কথা বলিতে অনেকেই চাহেন না, আমাদেরও তাহাই, কিন্তু দেশের ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা জানি, দেশবাসী একদিন এই সকল অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইবেন। সেই দিনের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না—ইহাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

ভারত ও ব্রিটিশ গায়নার খেলা

ভারত ও ব্রিটিশ গায়নার পাঁচদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে যোগদান করেন নাই। বিনু মানকড় দলের অধিনায়কতা করেন। ব্রিটিশ গায়না দল প্রথম ব্যাট করিয়া ২৯০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এল ওয়াইট ও ট্রিম ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ভারতীয় দলের পক্ষে এস পি গুপ্তের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। তিনি ১৩১ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন। পরে ভারতীয় দল খেলিয়া ৩৯৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ভি এল মাঞ্জরেকার ১৬৯ রান করিয়া ভ্রমণের দ্বিতীয় শতাধিক রান করিবার গৌরবে ভূষিত হন। এম আপ্তে, ঘোড়পাড়ে ও গাদকারীর ব্যাটিংও দর্শনযোগ্য হয়। ব্রিটিশ গায়না দলের এল ওয়াইট ৮০ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। চতুর্থ দিনের শেষে ব্রিটিশ গায়না দল ১ উই-কেটে ৯২ রান করে। পঞ্চম দিনে অবিরল বারিপাত আরম্ভ হওয়ায় খেলা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না ও খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

খেলার ফলাফল :—

ব্রিটিশ গায়না—প্রথম ইনিংস : ২৯০ রান (পেয়ারাডো ২১, ওয়াইট ৭৯, ট্রিম ৭৮ নট আউট, এস গুপ্তে ১৩১ রানে ৭টি, বিনু মানকড় ৮৯ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারত—প্রথম ইনিংস : ৩৯৮ রান (ভি এল মঞ্জরেকার ১৬৯, জি রামচাঁদ ২৫, এম আপ্তে ৩৭, পি উমরিগর ২৫, সি গাদকারী ৪৬, দীপক সোধন ৩২, জে ঘোড়পাড়ে ২৩, গ্যাক্রিন ৭০ রানে ২টি, ওয়াইট ৮০ রানে ৪টি, পেটোইর ৮৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

ব্রিটিশ গায়না—দ্বিতীয় ইনিংস : ১ উইঃ ৯২ রান (পেয়ারাডো ৫৪ রান নট আউট, গিবস ২৭ রান নট আউট, মানকড় ২২ রানে ১টি উইকেট)

ভারতীয় দলের প্রথম জয়লাভ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল ব্রিটিশ গায়নার জর্জ টাউনের ভারতীয় অধিবাসীদের সহিত একদিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিয়া ভ্রমণের প্রথম জয়-লাভের খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন। এই খেলাটি দুইদিনব্যাপী হইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রথম দিনে বারিপাতের জন্য খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল প্রথম খেলিয়া ৫ উইকেট ১৬০ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। পরে ব্রিটিশ গায়নার ভারতীয় অধিবাসী দল খেলিয়া ১১৭ রানে ইনিংস শেষ করে। ফলে ভারতীয় দল খেলায় ৪৩ রানে জয়ী হয়। এই খেলায় এস পি গুপ্তের মারাত্মক বোলিং ও জি এস রামচাঁদের বেপরোয়া ব্যাটিং দর্শকগণকে বিশেষ আনন্দ দান করে।

খেলার ফলাফল :—

ভারত—১ম ইনিংস : ৫ উইঃ ১৬০ রান (পি যোশী ২৬, জি রামচাঁদ ৬৮, ভি মাঞ্জরেকার ৩৬, গাদকারী নট আউট ১৫ রান, খাঁ ৪৫ রানে ২টি উইকেট পান।)

ব্রিটিশ গায়নার ভারতীয় অধিবাসী দল—১১৭ রান (সোহন ২১, আব্দুল ২৫, খাঁ ৩৭, এস পি গুপ্তে ৪৮ রানে ৬টি, জি রামচাঁদ ৯ রানে ৩টি উইকেট পান।)

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট দল

ব্রিটিশ গায়নার জর্জ টাউনে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হইয়াছে। এই খেলায় ভারতীয় দলে পি রায় স্থান পাইয়াছেন। দীপক সোধনকে দ্বাদশ খেলোয়াড় মনোনীত করা হইয়াছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলেও দুইজন নূতন খেলোয়াড়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন জামাইকার মিডিয়াম পেস বোলার রয় মিলার ও অপরজন ব্রিটিশ গায়নার চৌত্রিশ খেলোয়াড় এল ওয়াইট। নিম্নে উভয় দলের খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল :—

ভারতীয় দল :—বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, পি রায়, এম এল আপ্তে, জি এস রামচাঁদ, ভি এল মাঞ্জরেকার, পি আর উমরিগর, ডি জি ফাদকার, জে এম ঘোড়পাড়ে, এস পি গুপ্তে ও সি ভি গাদকারী।

দ্বাদশ ব্যক্তি—দীপক সোধন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল :—জে স্টলমেয়ার, বি পেয়ারাডো, ফ্রাঙ্ক ওরেল, সি ওয়ালকট, ইভার্টন উইকস, এফ কিং, এস রামাধীন, এ ভ্যালেন্টাইন, আর লীগ্যাল, লেসলী ওয়াইট ও রয় মিলার।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রকাশিত হইবার পরই আমরা উক্তি করি যে, নির্দিষ্ট তালিকার তারিখ অনুযায়ী খেলা শেষ হইবে না—বর্তমানে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নির্দিষ্ট তালিকায় সকল খেলা এমন কি, ফাইনাল পর্যন্ত মার্চে মাসের পূর্বেই শেষ হইবে স্থির ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। এখনও একটি সেমি-ফাইনাল খেলা ও ফাইনাল খেলা বাকী আছে। (সেমি-ফাইনাল খেলার তারিখ লইয়াও হোলকার ও মহারাষ্ট্র দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুরোধে ঐ গোলমালের অবসান হইয়াছে ও সেমি-ফাইনাল খেলা ১২ই মার্চ হইতে ইন্দোরে আরম্ভ হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ সঙ্গেই

কণ্ট্রোল বোর্ড স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, ফাইনাল খেলা কলিকাতার ইডেন উদ্যানে আগামী ২০শে মার্চ হইতে আরম্ভ হইবে। প্রখর রৌদ্রতাপ এখনই সাধারণ জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার পর অবস্থা কি দাঁড়াইবে, কেহই বলিতে পারে না। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা দেখিবার জন্য দর্শক সমাগমও অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না—খেলা কি স্তরের হইবে না বলাই ভাল। এইজন্য মনে হয়, পরিচালকদের উচিত রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সকল খেলা ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা। তাহার পর খেলার অনুষ্ঠান অর্থে খেলার সর্বদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত করা, ইহা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতে বাধ্য।

বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতা

বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে এইবারে এক প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। সকল অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান যোগদান না করিলেও যে কয়েকটা করিয়াছিল, তাহাতেই বিভিন্ন খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। কয়েকটি খেলায় আম্পায়ার সম্পর্কে কিছু গণ্ডগোল হইয়াছিল। তবে উহা ভবিষ্যতে থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। এইবারের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ক্রিকেট দলই বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হইয়াছে। রানার্স আপ হইয়াছে কালীঘাট ক্লাব। আগামী বৎসরে এই প্রতিযোগিতা ডিসেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইলে খুবই ভাল হইবে।

আন্তঃ জেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলায় নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে আন্তঃ জেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। এই প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলাই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলা শেষ পর্যন্ত লড়িয়া পরাজয় বরণ করিয়াছে। এইবারের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সেইরূপ ত্রুটিহীন হয় নাই। ভবিষ্যতে ইহার পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা করিলে বহু জেলা হইতেই বহু ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

হকি

কলিকাতার মাঠে হকি খেলার উৎসাহ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আরও পাইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কেবল আশ্চর্য হইতে হয় যখন মনে পড়ে বাঙ্গলার বাহিরের এতগুলি খেলোয়াড় বিরাট তর্জন-গর্জনের পরে ধীরে ধীরে কিভাবে বিভিন্ন দলে যোগদান করিলেন। কোথা দিয়ে কি যে হইয়া গেল, কেহই বুঝিতে পারিল না, জানিতেও পারিল না সবই যেন একটা বিরাট ভৌতিক কাণ্ডের মতন হইয়া গেল। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ নাভাল টাটা গুরুগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন, "কোন খেলোয়াড়কেই নিজ নিজ প্রদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া হইবে না। কেহই ফেডারেশনের নিকট হইতে অনুমতি পাইবে না।" কিন্তু তাঁহার সেই বজ্রসম "খবরদারী" কিভাবে যে চরম নীরবতার মধ্যে বিলীন হইয়া গেল, ইহা সাধারণেরও বোধগম্য হয় নাই, আমাদেরও না। এই বিরাট রহস্যের কোন দিন আত্মপ্রকাশ হইবে কি না বলা কঠিন, তবে দুর্মুখেরা বলেন, "ইহা সবই টাকার খেলা।" রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই আমরা শুনিয়াছি "টাকা সকল কিছু বাজীমাৎ" করিতে পারে—ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহা হইবে কেন, ইহাই ছিল আমাদের ধারণা; কিন্তু বর্তমানে বলিতে বাধ্য—হয়তো বা ক্রীড়াক্ষেত্র এক বিরাট রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য ইহাই, যদি পরিচালকগণের অভিরুচি ছিল, তবে কেন তাঁহারা সর্বসাধারণকে এইভাবে বিভ্রান্ত করিলেন? কেন তাঁহারা স্পষ্টই তখন বলিলেন না যে, সব কিছুই ঠিক করা আছে। সকল খেলোয়াড়ই খেলিবার অনুমতি পাইবে। আইন বলিতে যাহা আছে তাহার কোনই মূল্য নাই ইহা বলিয়া কেহ যদি বর্তমানে অভিযোগ করে, তাহার কি উত্তর ইঁহারা দিবেন, তাহাই আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে।

খেলার মান বা স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধি পায় নাই

কলিকাতার বিভিন্ন দলে বাঙ্গলার বাহিরের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে খেলার মান বা স্ট্যান্ডার্ডের কোনই উন্নতি হয় নাই। ভারতীয় হকি খেলার মান পূর্বাপেক্ষা যে নিম্নস্তরের হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। এই জন্য আশঙ্কা হয়, এখন হইতে যদি ভারতীয় ফেডারেশন খেলার মান বৃদ্ধির জন্য সুচিন্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ভারতের হকি খেলার বিশ্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখা কোনরূপেই সম্ভব হইবে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখনও অনেক দেরী আছে, চিন্তা করিয়া চঞ্চল হইবার কোনই কারণ নাই, কিন্তু আমরা বলিব, যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আগামী দুই বৎসরের জন্য সুচিন্তিত কার্যকরী ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত না হয়, কখনও সুফল পাওয়া যাইবে না। হকি খেলা স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। ঐ তরুণসমাজের মধ্য হইতেই দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় দলের খেলোয়াড় সৃষ্টি হইবে। বিভিন্ন ক্লাবের খেলার মধ্য দিয়া খেলোয়াড় সৃষ্টি পূর্বে হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু বর্তমানে যেভাবে "ভাড়াটে" খেলোয়াড় দ্বারা দলের শক্তি বৃদ্ধির নীতি ক্লাবসমূহে অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে খেলোয়াড় তৈয়ারী হওয়া অসম্ভব।

মল্লযুদ্ধ

জাপানী মল্লবীর দল কলিকাতায় মাত্র এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া পর পর বাঙ্গলা, ভারত ও অবশিষ্ট দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করায় অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের শারীরিক সামর্থ্য, তৎপরতা, মাটিতে লড়িবার কৌশল ও সকল কিছুই ভারতীয় মল্লবীরদের নিকট আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাকিবে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল, এই কথাই অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—ইহার উত্তরে বলা চলে আন্তরিক সাধনায়। জাপান মল্লযুদ্ধের আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের জন্য দীর্ঘকাল হইতেই চিন্তা করিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে নিয়মিতভাবে এক সুচিন্তিত পন্থা অবলম্বন করিতেছে। স্কুলে, কলেজে কুস্তি একরূপ বাধ্যতামূলক হইয়াছে। এই পর্যন্ত আটবার আমেরিকায় মল্লযুদ্ধ দল প্রেরিত হইয়াছে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের অধিকাংশ বিভাগেই প্রথম ছয়জনের মধ্যে ইহার মল্লবীরগণ স্থান লাভ করেন। ব্যান্টম ওয়েটে একজন চ্যাম্পিয়ন হন। ফ্লাই ওয়েটেও একজন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বর্তমান দলের শিমাতোরি হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে লাইট ওয়েটে ষষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের পর গত আট মাস ইঁহারা বহু আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন। দেশের জনসাধারণ অর্থ দিয়া, উৎসাহ দিয়া ইঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং ইঁহারা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় মল্লবীরদের চমৎকৃত করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ভারতে এই ধরণের প্রচেষ্টা যদি হয়, তাহা হইলেই ভারত জাপানী মল্লবীরদের স্তরে উপনীত হইতে পারিবে।

দেশী সংবাদ—

২রা মার্চ—অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কিত কমনওয়েলথ পরামর্শ সভার দ্বিতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বৈজ্ঞানিকদের এইরূপ এক পরিবেশ রচনার কার্যে সহায়তা করিবার আহ্বান জানান, যাহাতে বিজ্ঞান নিজের ধ্বংসের কারণ না হইয়া শান্তি, সংগঠন ও সহযোগিতার পথকে প্রশস্ততর করিয়া তুলিতে পারে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটের বিভিন্ন খাতের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর আলোচনা আরম্ভ হইলে বাণিজ্য কর বিভাগের কোন কোন অফিসারের যোগ সাজসে লক্ষ লক্ষ টাকার বিক্রয় কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

৩রা মার্চ—বিরোধী পক্ষের বাধা সত্ত্বেও অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ভূমি রাজস্ব খাতে ৪২,৭৩,০০০৲ টাকা মঞ্জুরীর দাবী গৃহীত হয়।

অদ্য শিয়ালকোটে আহম্মদিয়া বিরোধী বিক্ষোভে লিপ্ত এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায় এবং তাহার ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৪ঠা মার্চ—পেপসুর উপদেষ্টা শ্রী ভি কে বি পিল্লাই আজ ঘোষণা করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি পেপসু সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা বাতিল করিয়াছেন। পেপসু মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সম্ভবত আগামীকল্য রাজপ্রমুখের নিকট তাঁহাদের পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন।

অদ্য রাত্রিতে লাহোরে ওয়াজির খান মসজিদের নিকট জনতা জনৈক পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করে ও তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। এই ঘটনার পর লাহোরে অদ্য রাত্রি হইতে এক সপ্তাহের জন্য কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

উড়িষ্যার চরবেতিয়া প্রত্যাগত যে সকল উদ্বাস্তু নরনারী শিয়ালদহ স্টেশনে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে চারিজন উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গত ১লা মার্চ হইতে অনশন করিতেছিল। গতকল্য একদল পুলিশ নিশীথ রাত্রে তথায় হানা দিয়া অনশনকারীদের তাঁবু ছিন্ন ভিন্ন করে এবং তাহাদিগকে অপসারিত করে। প্রকাশ, পুলিশ ঐ সময় অনশনকারী ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানকারীদের উপর লাঠিও চালায়।

৫ই মার্চ—পেপসু রাজ্যের আইনসভা বাতিল করিয়া দিয়া এবং রাজ্যের সকল শাসন কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

অদ্য লাহোরে আহম্মদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর পুলিশের গুলী বর্ষণে তিনজন মারা গিয়াছে।

অদ্য দিল্লীতে এক জনসভায় জনসঙ্ঘের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারত ভুক্তির জন্য জম্মু আন্দোলনের সমর্থনে অবিলম্বে দিল্লীতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার বিষয় ঘোষণা করেন।

৬ই মার্চ—অদ্য অপরাহ্নে নয়াদিল্লীতে জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুরাতন দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জিও জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন।

অদ্য লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। দশম ডিভিসনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মহমদ আজিজ খান শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মার্শাল স্ট্যালিনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য অদ্য ভারতীয় সংসদে কোন কার্য সম্পাদন না করিয়া অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়।

৭ই মার্চ—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতি সঙ্ঘের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নই ভারতের মূল সমস্যা। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কার্যের মধ্যে একটা সমাজ কল্যাণমূলক আদর্শ নিহিত থাকা দরকার।

লাহোরে প্রধান শাসনকার্য পরিচালক মেজর জেনারেল মহম্মদ আজিম খাঁ শাসনকার্যের সুবিধার্থে লাহোর শহরটিকে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রতিটি অংশের জন্য একজন করিয়া আঞ্চলিক সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে লাহোরে ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

পাঞ্জাবের ইয়োল উদ্বাস্তু শিবিরে এক উচ্ছৃঙ্খল উদ্বাস্তু জনতা এক পুলিশ ঘাটি বেষ্টন করায় পুলিশ গুলী চালনা করে এবং তাহার ফলে ৫ জন উদ্বাস্তু নিহত এবং আটজন আহত হয়। পুলিশ পক্ষের একজন ডেপুটি পুলিশ সুপার নিহত হন।

৮ই মার্চ—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অন্ধ্র রাজ্য গঠন সম্পর্কে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাময়িক রাজধানী স্থাপনের প্রস্তাবে প্রবল মতভেদ দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

৩রা মার্চ—পারস্যে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য পুলিশ যে সমস্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আজার বাইজেন প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি এবং ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী মার্শাল শাহবখতিও আছেন।

৪ঠা মার্চ—মস্কো বেতার হইতে আজ একটি ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গত সোমবার শেষ রাত্রে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে ক্রেমলিনের একটি কামরায় মার্শাল স্ট্যালিন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার ডান হাত ও পা অসাড় হইয়া যায়। রাত্রি ২টায় তাঁহার অবস্থা সংকটজনক হইয়া পড়ে।

৬ই মার্চ—গতকল্য শেষ রাত্রে মস্কো বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবার, ৫ই মার্চ রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিটে (মস্কো সময়) মার্শাল স্ট্যালিনের মৃত্যু হইয়াছে। কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রী পরিষদের পক্ষ হইতে ইহা ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

মঃ জর্জি মালেনকোভ সোভিয়েট-রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। মঃ বেরিয়া, মঃ মলোটভ, মঃ বুলগানিন এবং মঃ কাগনোভিচ সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। নিকোলাই শেরনিকের স্থলে মার্শাল ভরোশিলভ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭ই মার্চ—মস্কো ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের সুপ্রশস্ত হলঘরে অনাবৃত এক শবাধারে স্ট্যালিনের শবদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শয়ান রহিয়াছে। রুশিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী জর্জি ম্যালেনকভ আজ সর্বাগ্রে লোকান্তরিত নেতার শব প্রহরায় দণ্ডায়মান হন।

মস্কো বেতারে ট্রেড ইউনিয়ন হলের সম্মুখে শোকাকুল জনতার বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রিয় নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অবিরাম স্রোতে শোকাকুল নরনারী আসিতেছেন। শিশুদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বহু জননীও আসিতেছেন।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্‌) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্‌)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

দেশ

শনিবার
৭ই চৈত্র, ১৩৫৯

DESH
SATURDAY, 21ST MARCH, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

মৌলিক অধিকারের মূল্য

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে এবং অপর কয়েকজন ভারতীয় লোকসভার সদস্যের অবরোধ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট কিছুদিন পূর্বে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এদেশের সংবিধানসম্মত সাধারণের মৌলিক অধিকারের মূল্য কার্যত কি অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার এক অধ্যায় উন্মুক্ত হইয়াছে। এই মামলা সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের রায় আমাদিগকে সত্যই অবাক করিয়া দিয়াছে। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে, ইহাই বিধান। কিন্তু ডাঃ মুখুজ্জে প্রভৃতির সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির না করিয়াও কয়েকদিন পর্যন্ত আটক রাখা হইয়াছিল। স্পষ্টই বোঝা যায়, সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার পর কর্তৃপক্ষের মাথার টনক নড়ে এবং তাঁহারা তাঁহাদের কার্যকে বিধিবিহিত প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সে চেষ্টা কিছু বিলম্বে হওয়াতে এক্ষেত্রে তাঁহারা পার পান নাই। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সব বেফাঁস হইয়া যায়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারে প্রকাশ পায় যে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ইঁহাদিগকে হাজির না করিয়াই কাগজে-পত্রে হাজির দেখাইয়া হাজতে রাখিবার আদেশ জারী করা হয়। সরকারপক্ষ হইতে সলিসিটর-জেনারেল এ সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশপত্রে তাঁহার একজন সহকারী ডাঃ মুখুজ্জে প্রভৃতি হাজির বলিয়া একটি লাইন জুড়িয়া দিয়াছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ধিলন তাহা জানিতেন না। তিনি আদেশনামা নানা কাজের তাড়াতাড়িতে না পড়িয়াই স্বাক্ষর করেন। বিচারপতি দাস সরকারপক্ষের এই কৈফিয়তে এই মন্তব্য করেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট ধিলন কার্যত মিথ্যা বিবৃতিতেই স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু মামলার বৈচিত্র্য এখানেই শেষ হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ধিলনের হুকুমনামা ৬ই তারিখ প্রদত্ত হয় এবং ৯ই মার্চ তাহার মেয়াদ শেষ হয়। ইহার পরও ডাঃ মুখুজ্জে প্রভৃতিকে আদালতে হাজির করা হয় নাই। ১২ই মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টে মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গেলে মুলতুবী রাখিবার পর এক টুকরা কাগজ সেখানে দাখিল করা হয়। এই কাগজখানা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সিংগলের আদেশ বলিয়া সরকারপক্ষ যুক্তি উপস্থিত করেন। কিন্তু দেখা যায় এ তথ্য সরকারপক্ষের সাক্ষীদেরও অজ্ঞাত ছিল। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণও তাগিদ দিয়া এরূপ প্রয়োজন দলিলের পাত্তা পান নাই। সরকারপক্ষে সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দেখান যে, একজন পুলিশ কর্মচারীর পকেটে কাগজখানা পড়িয়াছিল। হয়ত তিনি কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট স্বভাবতই এই কাগজের টুকরাখানাকে যথাবিধি হাজতে প্রেরণের আদেশ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা ডাঃ মুখুজ্জে প্রভৃতিকে আটক রাখা বে-আইনী হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত নন্দলাল শর্মা সাধারণ শ্রেণীর লোক নহেন। ইঁহারা প্রভূত প্রতিপত্তিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। লোকসভার ইঁহারা বিশিষ্ট সদস্য। ভারত-জোড়া ইঁহাদের মান। ইঁহাদের অবলম্বিত রাজনীতিক পন্থা ভাল কি মন্দ, এক্ষেত্রে এ প্রশ্নও বিবেচ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শাসনতন্ত্রসম্মত মৌলিক অধিকার ইঁহাদের পক্ষেই যদি এত সহজে ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সাধারণ লোকের অদৃষ্টে কি ঘটিতে পারে ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। সুপ্রীম কোর্টে মামলাটি গিয়াছিল, তাই ইঁহাদের প্রতি অবিচারের প্রতীকার হইল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে বিচারপ্রার্থী হইবার মত ক্ষমতা এদেশে কয়জনের আছে? সুতরাং জনগণের অধিকারের দিক হইতে বিষয়টি অত্যন্তই গুরুতর। সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন দেশের লোকেরা আগ্রহের সহিত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। বস্তুত এ ব্যাপারের এইখানে যবনিকাপাত হওয়া উচিত নয়। শাসন-বিভাগের দায়িত্বসম্পন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাঁহারা দেশের লোকের অধিকার লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, আমরা এই কথা বলিব।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

উদ্বাস্তুগণকে অনুপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করার ফলেই যে অনেক উদ্বাস্তু পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয় পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন-সচিব শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় সেদিন সে কথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এইভাবে প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া যাহারা

ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগকে সেখানে ফিরিয়া যাইতেই হইবে—আমরা ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সুবিবেচিত মনে করি না। এইরূপ জিদ উদ্বাস্তুদের দেহ এবং মনের উপর অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করিতেছে। দুর্গত এইসব নরনারীর প্রতি সমধিক সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া উচিত। বস্তুতঃ উদ্বাস্তুদিগকে যতটা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বসবাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া দরকার একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সম্পর্কে উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের আশ্রয়ের যে সব ক্ষেত্রে বিধিব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ স্বভাবতই উঠে। কিন্তু জবর-দখল কলোনীগুলি বিধিসম্মত করা সম্পর্কে পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুক্তা রায় সেদিন যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। তিনি এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এ সম্বন্ধে উভয়ে একই যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা এই যে, জমি সংগ্রহ করা সহজ নয়। কিন্তু জমি যে সংগ্রহ করা উচিত শ্রীযুক্তা রায় ইহা অস্বীকার করেন না। এইসব জমি জবর দখল করিয়া উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় যেভাবে কলোনীগুলি গড়িয়া তুলিয়া যেরূপ স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য শ্রীযুক্তা রায় তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং অন্যান্য উদ্বাস্তুদের কাছে সেই আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সহরের চারদিকে এতদিন যে সব জমি বনজঙ্গলে পূর্ণ অবস্থায় পতিত ছিল, উদ্বাস্তুদের প্রচেষ্টায় সেগুলি লোকবাসের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার দরুণ কলোনীগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। উদ্বাস্তুগণের মানসিক উদ্বেগও এজন্য সামান্য নয়। এরূপ অবস্থায় এইসব কলোনীর সম্বন্ধে অবিলম্বে পাকাপাকি রকমে ব্যবস্থা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে দেশের অগণিত লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়াইয়া মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থোপবিত্তে পরিস্ফীত হইবার যুগ আজ আর নাই। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সকলকে এখন আগাইয়া আসিতে হইবে। যাহারা এক্ষেত্রে স্বার্থকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে সংযত করাই সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। আমাদের মতে বিগত মহাযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রগত প্রয়োজনে যেভাবে সরকার হইতে জমি দখল করা হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও সরকারের পক্ষে তাহাই করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলের জমির দর লাভখোরদের পাল্লায় অস্বাভাবিক রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের মর্জি মানিয়া চলিতে হইবে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন-সমস্যায় বিব্রত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষে এমন যুক্তি সমীচীন হইতে পারে না। ফলতঃ এইসব জমি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করিবার পথে আইনতঃ যদি কোন অন্তরায় থাকে, তবে জরুরী ব্যবস্থা প্রয়োগে সে ত্রুটি দূর করিয়াই সরকারের পক্ষে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের স্বার্থই এখানে বড়; সুতরাং এক্ষেত্রে গড়িমসি করিবার কোন সার্থকতা আমরা দেখি না। বিপন্ন নরনারীর দুর্গতিকে সুযোগ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া যাহারা নিজেদের স্বার্থ পুষ্ট করিবার পিপাসায় মাতিয়াছে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া শুধু রাষ্ট্রের স্বার্থেরই পরিপন্থী নয়, মানবতারও তাহা বিরোধী এবং সমগ্রভাবে দেশের নৈতিক প্রতিবেশকেই তাহা দূষিত করিয়া তুলিয়া সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে বাধা ঘটায়।

ব্যবসা বাণিজ্যে বিপর্যয়

খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যও ক্রমে নামিয়া আসিতেছে—পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আমাদিগকে মনোমদ ভাষায় একথা শুনাইয়া দিয়াছেন। সাধারণে ইহাতে আশ্বস্তির কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছে না; কারণ, তাহাদের ক্রয়-সামর্থ্যের অভাব। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চারিদিক হইতে মন্দা আসিয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পাটের দাম প্রতি মাসে নামিয়া যাইতেছে। বর্তমানের দরে উৎপাদনের ব্যয়ই পোষায় না। পাকিস্থান হইতে পাট আমদানীর ফলেই পশ্চিমবঙ্গে পাটের মূল্য এইভাবে হ্রাস পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ইহাই অভিমত। অথচ পাকিস্থানের পাটের আমদানী সঙ্কোচ করিতে গেলেও বিপদ আছে। 'বিপন্ন ইসলামে'র জিগীর উঠিবেই। কিন্তু যেভাবে হোক্ পাটের বাজারের এই মন্দা কাটাইয়া তোলা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা কৃষক সম্প্রদায় বিপন্ন হইয়া পড়িবে এবং সমগ্রভাবে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিবে। পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলির অবস্থাও সঙ্কটজনক। ভারত সরকার সম্প্রতি এই বিধান জারী করিয়াছেন যে, মিলগুলিতে ১৯৫১—৫২ সালে যে পরিমাণ ধুতি ও শাড়ী উৎপন্ন হইত, তাহার ৬০ ভাগ বজায় রাখা চলিবে। তাঁত-শিল্প রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদের এই ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধ-ক্রমে ভারত সরকার এই রাজ্যের মিলগুলিতে ৮০ ভাগ উৎপাদন বজায় রাখিবার অনুমতি দিয়াছেন। আমাদের মতে ইহাও যথেষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলির উৎপাদনের উপর হইতে নিষেধ-বিধি পুরাপুরি রকমে তুলিয়া লওয়াই উচিত। কারণ, মিলগুলিতে উৎপন্ন ধুতি এবং শাড়ীর উপর নিষেধ-বিধি প্রবর্তিত থাকিলে বাজারে ধুতি এবং শাড়ীর অভাব বাড়িবে। তাহার ফলে বস্ত্র সঙ্কট আবার উৎকট আকার ধারণ করিবে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলিতে ধুতি এবং শাড়ী উৎপাদনের উপযুক্ত যন্ত্রপাতিই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর কাপড় উৎপাদনের সঙ্কোচ সাধিত হইলে এইসব যন্ত্রপাতি অকেজো হইয়া থাকিবে। ইহার ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। তাঁত-শিল্পের উন্নতি আমরা না চাই, এমন নয়; কিন্তু মিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এই শিল্পকে টানিয়া আনা অনুচিত বলিয়াই আমরা মনে করি। ইহার উপর পশ্চিমবঙ্গে চা-ব্যবসাও বর্তমানে বিপর্যস্ত। কতকগুলি চা-বাগিচার কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অপর কতকগুলির কাজ কমানো হইয়াছে। ইহার ফলে হাজার

হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। সরকার চা-বাগানসমূহের মালিকদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাগানগুলির কাজ যদি আরম্ভ করা হয়, তবে শ্রমিকদের জন্য সস্তা হারে রেশন সরবরাহেও তাঁহারা সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু মালিকরা এই জিদ ধরিয়াছেন যে, ইচ্ছামত শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস করা, তাহাদের বেতন এবং মাগ্গিভাতা কমানোর ক্ষমতা তাঁহাদের থাকা চাই। আমাদের মতে বাগানের মালিকদের এই অসঙ্গত আবদার মানিয়া লওয়া সরকারের পক্ষে কর্তব্য হইবে না। পক্ষান্তরে বাগানগুলির কাজ যাহাতে আরম্ভ হয় এবং বেকার শ্রমিকদের জীবিকার পুনঃসংস্থান ঘটে তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হওয়া তাঁহাদের উচিত।

সংখ্যালঘু-সচিবদের সফর

করাচীস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার ডাঃ মোহন সিং মেহতা সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া ফিরিয়াছেন। অতঃপর শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং জনাব আজিজুদ্দীন যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সচিবদ্বয়ের যুক্ত সফর আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহারা বিভিন্ন স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাদের অভাব অভিযোগ শুনিবেন এবং সভাসমিতি করিয়া যথারীতি সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। সংখ্যালঘু-সচিবদের এই ধরণের সখের সফর আজ নূতন নয়; কিন্তু এতদ্দ্বারা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কোনরূপ সমাধান এপর্যন্ত কিছু হইয়াছে কি? পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি জায়গাকে কৌশলে সফরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা হইতে পশ্চিমবঙ্গও যে মুক্ত নয়, পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষ ইহা প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের কাজ কিছুটা বাগাইয়া লইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে অতীতের অভিজ্ঞতায় এই সত্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু সচিবদের এই সফরের বেলায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের অভাব-অভিযোগ উপস্থিত করিবার কোন সুযোগই পায় না। পরন্তু সেজন্য তাহারা কোনরূপ উৎসাহও বোধ করে না। কারণ, তাহারা জানে যে, সে পথে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতীকার হওয়াই সম্ভব নয়। প্রত্যুত এই ধরণের সফর উভয় গভর্নমেণ্টের মামুলী ধরণের সৌজন্য প্রদর্শনের শুধু একটা রীতি মাত্র। পূর্ববঙ্গে এইভাবে সফরে গিয়া বিশেষ কোন সুফল ফলে নাই, ভারতের সংখ্যালঘু সচিব শ্রীযুত বিশ্বাস ইতঃপূর্বে এরূপ অভিমত প্রকারান্তরে ব্যক্তও করিয়াছেন। তবে, এই সফরের সার্থকতা কি আছে আমরা বুঝি না।

মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিভীষিকা

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উন্মত্ততা করাচী এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের কয়েকটি স্থানে কয়েকদিন ধরিয়া যে তাণ্ডব চালাইয়াছে, তাহাতে পাকিস্থান সরকারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, বলা যায় না। লুণ্ঠন, নরহত্যা, গৃহদাহ এসব তো আছেই, সেই সঙ্গে নারী-নির্যাতনও এক্ষেত্রে যথারীতিই বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মমতাজ দৌলতানা সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, লাহোরে কয়েকদিন ধরিয়া যে অরাজক কাণ্ড ঘটিয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। নারীর সম্মানের কোন মর্যাদাই ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় নারীনির্যাতন যত্র তত্র চলিতে থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনুশোচনা করিয়া লাভ কি? এ অবস্থা তো পাকিস্থানের নিয়ামকদের নিজেদের নীতিরই ফল। মোল্লা-প্রভুত্ব শাসন-নীতিতে প্রশ্রয় দিলে এ ব্যাপার ঘটিবেই। বিপন্ন ইসলামের জিগীর নরঘাতী জিঘাংসা জাগাইয়া কি অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে, আমরা তাহা হাড়ে হাড়ে জানি এবং বীভৎস নারীনির্যাতন সেক্ষেত্রে যে অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়, এ সত্যও সর্বজনবিদিত। তবে অতীতে ধর্মান্ধ এই বর্বরতার আঘাত অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপর দিয়াই গিয়াছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানী নীতি নিয়ামকদের স্বৈরাচারকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে; এখন ধর্মান্ধ বর্বরতার সেই আঘাত পাকিস্থানের নিজের উপরই পড়িতেছে। বর্বরতার বাঁধ একবার ভাঙিলে এমন ব্যাপারই ঘটে। জঙ্গী আইনের সাহায্যে পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ অরাজক অবস্থাকে আপাতত আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বাস কিছুই নাই। বস্তুতঃ এই ধর্মান্ধতা এত সহজেই যে দমিত হইবে, এমন আশা করা যায় না। মোল্লাই উন্মাদনা সুবিধা পাইলেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে এবং নারী-নির্যাতনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া মুরীদের দল ধর্মনিষ্ঠা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিবে। সুখের বিষয়, পূর্ববঙ্গে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোক নাই, তাই পূর্ববঙ্গে ধর্মান্ধ এই বর্বরতার বিভীষিকা দেখা দিতে পারে নাই; কিন্তু ভয়াবহ এই ব্যাধির বীজ হইতে পূর্ববঙ্গের সমাজ-জীবন যে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এমন কথা বলা যায় না।

ঝঞ্ঝাজনিত বিপদ

গত ১৪ই মার্চ, শুক্রবার রাত্রিতে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে ব্যাপক অঞ্চলের বহু নরনারী হতাহত হইয়াছে। অনেকে গৃহহীন নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়াছে। গৃহপালিত বহু পশু ধ্বংস হইয়াছে, শস্যের ক্ষতি ঘটিয়াছে। উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চল বিশেষভাবে জলপাইগুড়ি এবং কোচ-বিহার ঝড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। বহু নরনারী এই অঞ্চলে আহত হইয়াছে। আসামের নওগাঁ, করিমগঞ্জ, শিবসাগর, কামরূপ, দরাং এবং গোয়ালপাড়া জেলাতেও ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। ঝটিকা-পীড়িত অঞ্চলগুলিতে বহু উদ্বাস্তু নরনারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঝড়ের ফলে ইহারা অনেকে পুনরায় অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ঝটিকা বিপন্ন অঞ্চলের দুর্গত নরনারীর সাহায্য বিধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম সরকারের অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

রঞ্জন

ভারতে অবস্থিত বিদেশী বণিকদের দোকানের কয়েকটা চাকরি নিয়ে বর্তমানে যে আলোচনা চলেছে তার মধ্যে কোনো পক্ষেরই গৌরবের বিশেষ কিছু খুঁজে পাইনে। বরং ইংরেজ ও ভারতীয় চরিত্রের সেই দিকগুলিই সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠছে যেগুলির ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ট্য-যাত্রা হওয়া উচিত ছিল। এক পক্ষের হুঙ্কারমিশ্রিত আকুতি, আর অপর পক্ষের কপট বিনয়ের আবরণে অবিশ্বাস্য ঔদ্ধত্য সমগ্র দৃশ্যটিকে একাধারে করুণ ও হাস্যকর করে তুলেছে।

প্রথমেই পক্ষদ্বয়ের সঠিক সংজ্ঞা-নির্দেশ প্রয়োজন। বিবাদটা ভারত বনাম বৃটেন নয়। একপক্ষ এদেশে ব্যবসারত বিদেশী বণিক, অপর পক্ষ উচ্চ-মধ্যবিত্তবংশোদ্ভূত ক্ষুদে ক্ষুদে স্বদেশী সাহেবরা। বৃহৎ গোষ্ঠীর সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ হলেও দু'পক্ষই বর্তমানে শক্তিশালী কেননা এক পক্ষের হাতে টাকার ঝুলি আর অপরের হাতে এদেশের শাসনভার। বিবাদের ফলাফল সম্বন্ধে জাতি হিসাবে ইংরেজরা তাই যেমন উদাসীন, ভারতীয় জনগণও তেমনি সমান নির্লিপ্ত। ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশে না এলে স্বদেশে অনাহারে মরতেন এটা যেমন সত্য নয়, তেমনি নেতাজী সুভাষ রোডের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসে আরো দু'চারজন ভারতীয় কোনো মতে স্থান করে নিলে যে ভারতের সমস্যার সমাধান হবে, এমন মনে করাও মূঢ়তা। আসলে বিবাদটা ক্ষুদ্র একটি শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষুদ্রতর একটি শ্রেণীর মান-অভিমান। ওখানে ওর ছেলের আর এখানে এর ভাইপোর সংস্থান হয়ে গেলে বর্তমান উত্তেজনা বাষ্পের মতো উড়ে যাবে।

*

তবু তাই নিয়ে বাক্য-বর্ষণের অন্ত নেই। ইংরেজরা বলছে, আহা, আমরা ভারতীয়করণ চাই বৈকি, তবে এফি-শিয়েন্সির কথা ভুললে তো চলবে না। যতদূর দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকার এই যুক্তিটা মোটের উপর মেনে নিয়েছেন। অথচ এর মধ্যে সমগ্র ভারতীয় জাতির প্রতি যে বৃহৎ অপমান নিহিত আছে, সেকথাটা কই কেউ তো একবারও দেখিয়ে দিলেন না! দক্ষতার প্রশ্ন আজ কেন উঠল? এদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম শিল্প হচ্ছে রেলওয়েগুলি। সেগুলি সেদিন পর্যন্ত ইংরেজদের হাতে ছিল। পরে যখন সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হোলো, একে একে ইংরেজরা বিদায় নিলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে দক্ষতাও বিদায় নেয়নি? দেশের সবচেয়ে বড়ো শিল্পের বেলায় যদি স্বদেশে দক্ষতার অভাব না ঘটে থাকে, কিম্বা ঘটলেও অন্যান্য কারণে ভারতীয়করণ সমীচীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তবে আজ কেন চা আর পাট বিক্রির জন্যে বিদেশী না হলে সব ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে যাবার রব উঠল? বিদেশী পরিচালিত এমন কোন শিল্প আছে এদেশে যা রেলওয়েগুলির চেয়ে বড়ো, যেখানে দক্ষতার প্রয়োজন আরো বেশি?

আর দক্ষতার কথাই যদি বলো, সেনা বাহিনীর বেলায় কি হোলো? আরো বড়ো কথা, গোটা সরকারের বেলায় কেন এ প্রশ্ন উঠল না? আবেগমুক্ত বিচারে দিল্লীর মন্ত্রী আর সেক্রেটারিরা ক'জন তাঁদের পূর্বতন কর্মীদের সমকক্ষ? অথচ তাঁরা যখন বিদেশীদের হাত থেকে গোটা দেশের শাসনভার নিলেন তখন দক্ষতার প্রশ্ন উঠল না; আজ যখন সে প্রশ্ন উঠেছে দোকানদারির সহকারীদের বেলায় তখন তাঁরাই মেনে নিলেন যে দক্ষতার প্রশ্ন অবান্তর নয়, যে ভারতে খাদ্যের মতো দক্ষতারও বিরাট ঘাটতি। বাইরে থেকে আমদানী না হলে চলবে না।

এখানেই যোগ করা দরকার যে, যে-কটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারতীয় মালিকদের হস্তগত হয়েছে সেখানেও ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা কমেনি।

*

আর বিদেশী দপ্তরে ভারতীয় অফিসারদের সংখ্যাল্পতা নিয়ে যাঁরা বিলাপ করছেন তাঁদের অবস্থা আরো করুণ। যেদেশে একটা চাকরির জন্যে এক লক্ষ প্রার্থী সেখানে কাজ চাওয়া প্রায় ভিক্ষা চাওয়ার সামিল। সেখানে প্রার্থীর কোনো কিছু দাবী করবার ক্ষমতা থাকে না—দাতার আকাঁড়া চাল নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। এই কান্নার সঙ্গে তাই যাঁরা জাতীয়তার মিশ্রণ ঘটাতে চান, তাঁরা আসলে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করছেন না, পুরো দেশকে নিজেদের অপমানের ভাগী করছেন মাত্র।

আমি এই প্রশ্নটাকে জাতীয়তা থেকে বিমুক্ত করতে চাই আরও একটা গুরুতর কারণে। ইংরেজ আমলে আই সি এস এবং সেনা বাহিনীতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছেলেদের উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যৎ ছিল। আজ আই এ এস-এর সেই কৌলীন্যও নেই, বেতনও নেই। সেনা বাহিনীরও সেই অবস্থা। এই শ্রেণীর ছেলেরা আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের বন্যায় বিপন্ন হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া আর কোনো সরকারী চাকরিতে এদের রুচি নেই। এরা বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, ভারতীয় মধ্যবিত্ত বা দীন জনগণের সঙ্গে এদের কিছুমাত্র যোগাযোগ কোনো কালে ছিল না, আজো নেই। সহানুভূতিও নেই। এরা তাই মুখ চেয়ে আছে সাহেবী অফিসের দিকে এবং বর্তমান আন্দোলনটা প্রায় পুরোপুরি এই শ্রেণীর সৃষ্টি। আন্দোলনের সহায়তার জন্যে এদের মুখে জাতীয়তার নাম। আজ এরা স্বাধীনতার নামে বিদেশী অফিসে চাকরি চাইছে, গতকাল যেমন চাইত পরাধীনতার নামে বিদেশী সরকারে। ঈশ্বর করুন, এদের আন্দোলন যাতে সফল হয়। বেকার-প্লাবিত দেশে আরো দু জনের চাকরি হলে সেটাই লাভ।

*

কিন্তু এতে ভারতীয়করণ হবে না। কয়েকজন ভারতীয় শুধু অভারতীয় হবে —একদা যেমন ভারতমাতা তাঁর সমস্ত ফার্স্টবয়দের আই সি এস আর আই পি করে নিঃসর্তে দান করে দিতেন বিদেশী সরকারের হাতে। তখন তবু পরীক্ষার নিয়ম ছিল, তাই মধ্যবিত্ত মেধাবী ছেলেরাও সুযোগ পেত। আজকের আন্দোলন সফল হলে বিশেষ একটি শ্রেণী ছাড়া আর কোনো ভারতীয় সমাজ উপকৃত হবে না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জন্যে যে যে-ক্ষমতা মহত্তর কাজে নিয়োজিত হতে পারতো তা এখন শুধু বিদেশীর মুনাফা-লুণ্ঠনের সহায়ক হবে।

না। ওদের জন্যে চেঁচিয়ে আমি অন্তত আমার গলা ভাঙব না।

বৈদেশিকী

চেকোশ্লোভাকিয়া

১৪ই মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্‌ড্‌ পরলোকগমন করেছেন। মার্শাল স্ট্যালিনের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কম্যুনিস্ট-জগতের আর একজন কর্তাব্যক্তির আসন শূন্য হোল। মিঃ গটওয়াল্‌ড্‌ মার্শাল স্ট্যালিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে মস্কোতে গিয়েছিলেন। মস্কোর ভীষণ ঠাণ্ডায় বহুক্ষণ বাইরে থাকাতে তাঁর ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হয়। ১১ই মার্চ তিনি প্রাগে ফেরেন এবং তিনদিন বাদেই মারা যান। চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ প্রভাবান্বিত কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট কায়েম করা মিঃ গটওয়াল্‌ড্‌-এর প্রধান কীর্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সোভিয়েটের আওতায় য়ুরোপে যে কয়েকটি দেশে 'পিওপল্‌স্‌ ডেমোক্রাসি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়াতেই পশ্চিমী ধরণের ডেমোক্রাসি অর্থাৎ কম্যুনিস্ট ভাষায় যাকে 'বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি' বলে তাই ছিল। কারণ চেকোশ্লোভাকিয়াতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার পূর্বেই হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়াতে যখন 'বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি' নষ্ট করে দিয়ে দস্তুর কম্যুনিস্ট পার্টির ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হল তখন পশ্চিম য়ুরোপে যতো বেশি দুঃখপ্রকাশ হয়েছিল পূর্ব য়ুরোপের অন্য দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট প্রাধান্য এবং সোভিয়েট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তত বেশি হয়নি। অনেকের ধারণা ছিল যে সামাজিক বোধ ও মনোভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিম য়ুরোপেরই অংশ, সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিমী ডেমোক্রাসির পথ ছেড়ে কম্যুনিস্ট ডিক্টেটরি স্বীকার করবে না। কী কৌশলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় 'পিওপল্‌স্‌ ডেমোক্রাসি' প্রতিষ্ঠিত হল আজ সেটা পুরাতন ইতিহাস। সেই ইতিহাসে ডক্টর বেনেসের পদত্যাগ, মিঃ জ্যান মাসারিকের আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটনার কথা অনেকের মনে পড়বে।

মিঃ গটওয়াল্‌ড্‌-এর মৃত্যুর পরে চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিস্থিতিতে কী ধরণের পরিবর্তন হবে সেটা এখনও বলা যায় না। যদিও সোভিয়েটের সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্বন্ধ গত কয়েক বছরে ক্রমশই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে তাহলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার মনে পশ্চিমের দিকে একটা টান হয়ত ভিতরে ভিতরে কিছু এখনও আছে। সেটাকে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা বাইরে থেকে যে একেবারে করা হয় না তাও নয়। মিঃ গটওয়াল্‌ড্‌এর মৃত্যুর পরে সে চেষ্টা হয়ত আরো জোর করে করা হবে। কিন্তু রাশিয়ার সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ার অর্থনৈতিক যোগাযোগ যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে তাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে রাশিয়া থেকে আলগা হওয়া মোটেই সহজ নয়, ইচ্ছা থাকলেও না। তবে পূর্বে যেমন মস্কোর কথা মুখ থেকে বেরুবার আগেই শিরোধার্য করতে হোত মার্শাল স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে সেভাবটা কিছু কমবে। অবশ্য মিঃ গটওয়াল্‌ড্‌এর স্থানে যিনি বসবেন তিনিও নিশ্চয়ই মস্কোর বিশ্বস্ত লোকই হবেন।

তবে ক্রমশঃ দুই দেশের সম্বন্ধের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন দেখা দেবে মনে হয়। বলা বাহুল্য চেকোশ্লোভাকিয়াকে লক্ষ্য করে মার্কিন প্রোপাগান্ডার ঢেউ আরো জোরে উঠবে। তবে মার্কিন প্রোপাগান্ডা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে তার ফল উল্টো হতে পারে।

জাপানে আবার সাধারণ নির্বাচন

১৪ই মার্চ জাপানের পার্লামেন্টে ইওশিদা মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরেই পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। আগামী মাসের ১৯ তারিখে আবার সাধারণ নির্বাচন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গত অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল পার্টির সামান্য সংখ্যাধিক্য হয়। লিবারেল পার্টির মধ্যেও দুটি দল ছিল। যাই হোক শেষপর্যন্ত মিঃ ইওশিদার নেতৃত্বে লিবারেল পার্টির গভর্নমেণ্ট নিযুক্ত হয়। কিন্তু লিবারেল পার্টির মধ্যে দলাদলি চলতেই থাকে। সম্প্রতি ২২ জন লিবারেল পার্টির সদস্য পার্টি থেকে বেরিয়ে যান এবং তাঁরা বিপক্ষ দলগুলির সঙ্গে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দেন, ফলে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। আগামী সাধারণ নির্বাচনেও লিবারেল পার্টি মিলিতভাবে চলতে পারবে বলে মনে হয় না। তাহলে আগামী নির্বাচনের পরেও লিবারেল পার্টির মধ্যে দুটি দল থাকবে। গতবারের চেয়ে আগামী নির্বাচনে যে লিবারেল পার্টি বেশি আসন লাভ করতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরঞ্চ এবার আরও কম হতে পারে কারণ মিঃ ইওশিদার গভর্নমেণ্টের উপর শ্রমিক শ্রেণী এখন আরো অপ্রসন্ন হয়েছে। সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যেও দুটি দল আছে—একটি বামপন্থী ও একটি দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত। গত নির্বাচনে সোস্যালিস্ট পার্টির দুই তরফ মিলে পূর্বের চেয়ে বেশি আসন লাভ করেছিল, আগামী নির্বাচনে আরো বেশি পাবার সম্ভাবনা আছে। গত নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি পূর্বের তুলনায় অনেক কম আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। কম্যুনিস্ট ভোটের সংখ্যাও অনেক কম হয়। আগামী নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি যে গতবারের তুলনায় বেশি সুবিধা করতে পারবে তা মনে হয় না।

ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা

সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নেবার বিষয়ে বৃটিশ ও মিশরীয় গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাতে মিশরস্থ মার্কিন রাজদূতও উপস্থিত থাকছেন। সুদান সম্পর্কে চুক্তি হবার পরেও বৃটিশ ও মিশরীয়দের বাদানুবাদ চলছে। চুক্তি হবার অব্যবহিত পরেই জেনারেল নেগুইব 'সাম্রাজ্যবাদীদের' সম্বন্ধে এমন কতকগুলি উক্তি করেন যাতে ইংরেজরা চটে যায়। পরে আরো চটাচটির কারণ ঘটেছে। জেনারেল নেগুইব প্রকাশ্যে সুদানস্থ বৃটিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, তারা সুদানীদের উপর চাপ দিচ্ছে যাতে তারা মিশরের সঙ্গে যুক্ত থাকার পক্ষে না যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে এইরকম দোষারোপ চলতে থাকলে সুয়েজ অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচনা শীঘ্র সফল হবে কি? তবে এবার একটা হেস্তনেস্ত না করলে উভয় পক্ষেরই মুশকিল। সুয়েজ সম্পর্কে মিশরের জনমতকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে জেনারেল নেগুইব বিপদে পড়বেন। আবার একটা মিটমাট করে মিশরকে দলে রাখতে না পারলে মধ্যপ্রাচ্যের 'সুরক্ষা' ব্যবস্থার গোড়াতেই যে গলদ থেকে যাবে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আরব জাতিগুলির মনরক্ষার জন্য যেরকম চেষ্টা করছেন তাতে কে কবে কী করে বসে কে জানে। সেইজন্য আমেরিকারও এত উৎকণ্ঠা।

১৫।৩।৫৩

আজ এ বেলায়

শ্রীশুভাশীষ চৌধুরী

আরক্তিম নীলাকাশ, অন্ধকার রচে ব্যবধান—
বিচিত্রের পথে পথে সকরুণ সুরে বিস্তারিয়া
বক্ষোমাঝে সাড়া দেয় ভাষাহারা প্রদোষের গান,
রহস্যেই বিজড়িত তাই মোর অশান্ত হিয়া।
ওই দূরে দেখা যায় কোন এক অনমনা পাখী,
প্রত্যাশার মৃগয়ায় নিরন্তর চলে সে যে একা।......
মন বলে, 'চুপ, চুপ', অপলক মোর দু'টি আঁখি,
কথা নয়, গান নয়, এ বেলায় শুধু চেয়ে দেখা!

দিগন্তের বেড়া ভেঙে এলে কি গো বিমুক্তির দ্বারে?
জীবনের কলরোল মুহূর্তেই লুপ্ত হয়ে যায়,
ছন্দ ভাঙা এই ক্ষণে দীপ্তিচ্ছটা মোর চারি ধারে;
আকাশের বাণী তাই অসংকোচে খুঁজে ফিরে ঠাঁই।
চিত্তাকাশে বর্ণচ্ছটা, দুই চোখে প্রচ্ছন্ন কী লেখা—
কথা নয়, গান নয়, এ বেলায় চেয়ে চেয়ে দেখা!

অস্তগিরির পার্বতী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমারে হেরিনু অস্তবেলার সন্ধ্যারাগে
পার্বতী মেয়ে! নয়নে আমার স্বপ্ন লাগে--
যৌবন-ব্যথা-তপ্ত তরুণ বসুন্ধরা
আদিম কালের পরশ-বরণ-গন্ধ ভরা!

কিশোরী ধরার কানন-লীলার কানীন সুতা,
নয়নে তোমার সদা জাগার তন্দ্রালুতা।
কুন্তলে তব আদি-অরণ্য তিমির মায়া
বর্ণে উছল আলো-ঝলমল কুহক-ছায়া।

নহ তুমি লোল বিলাস-বিভোল অবন্তিকা
নহ প্রগল্‌ভা নগর-ললনা ললৎ-শিখা।
শৈল ময়ূরী, হরিৎ মহীর হরিণী তুমি
ক্ষেত্র তোমার অস্তগিরির গহন ভূমি।

শিলা-সংকট তুঙ্গ-শিখর নির্ঝরিণী
তোমার আলয় গহ্বর গুহা তমস্বিনী;
দৃষ্টি তোমার উচ্ছ্রিত-আলো পূর্বাকাশে
চরণ শীতল শীকর-সিক্ত দূর্বাঘাসে।

অঙ্গ তোমার বন-তুলসীর গন্ধশুচি
অস্ফুটদল কুন্দধবল দন্তরুচি
কুচ-কপিত্থ গুঞ্জামালার বৃন্তে বাঁধা
কণ্ঠে কপোত-বধূর বিধুর কূজন সাধা।

তোমারে হেরিয়া জীবন-সাঁজের মন্দালোকে
অনাদিকালের স্মরণ-কাজল লাগিল চোখে।
ধরণীর তুমি আদি মানবিকা বনোদ্ভবা
শাশ্বতী তুমি, ভাস্বতী তুমি সুদুর্লভা।

জয়পুরী ভিত্তিচিত্র

জোগাড়-যন্ত্র হিসাবে চাই—ওলন, নানা আকারের কর্নিক, জালের চালুনি বা ছাঁকনি, জল ছিটোতে বড়ো কুশের কুঁচি, 'মশলা' বাঁটতে শিল নোড়া, চুন রাখতে কয়েকটি মাটির হাঁড়ি, মশলা রাখতে কয়েকটি মাটির গামলা, রঙ রাখতে মাটির বা কলাই-করা ছোটো ছোটো বাটি, খড়ি নারিকেল (শাঁস যার শুকিয়ে মালার ভিতর নড়ে) বা নারিকেল তেল, কোর্ণা মাটাম (সেট্ স্কোয়ার), 'ক্যামেল' ও 'স্যাব্ল্ হেয়ার' সরু মোটা তুলি, শনের আঁশের তুলি, কেয়া-ডাঁটি বা খেজুর-ডাঁটি (ফলের থোকা ধরেছিল যাতে) থেকে বানানো তুলি, খুদ-হেন শ্বেতপাথরের গুঁড়ো (কলিকাতায় পাওয়া যায়) ও পাথুরে চুন। এর অনেকগুলি ইতালীয় ফ্রেস্কোতেও লাগে, পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

শ্বেত-পাথরের গুঁড়ো সরু-মোটা চালুনিতে চেলে, মোটা, মিহি, খুব মিহি —এই তিন ভাগ করে ফেলা দরকার। চুনের পাথরগুলি জল দিয়ে জরিয়ে, ফুটিয়ে, ছেঁকে নাও মোটা সুতোর জালি-কাপড় দিয়ে। এই ছাঁকা চুন মাটির হাঁড়িতে প্রচুর জল ঢেলে এবং কিছু দই (দশ সের চুনে দেড় ছটাক পরিমাণ) মিশিয়ে কাঠি দিয়ে ঘেঁটে রেখে দাও সাত-আট দিন। প্রত্যহ পূর্বদিনের জল বদলে নতুন পরিষ্কার জল দিয়ে ঘেঁটে রাখবে। কিছু বেশি দিন এইভাবে ভেজালে ভালো হয়। সাত দিনের কম হলে চলবে না। জল কখনো শুকিয়ে না যায়।

ছবির জমির জন্যে মশলা তৈরির বিধি। উক্ত চুন এবং মোটা মার্বেলগুঁড়ো সমান ভাগে নিয়ে শিল নোড়ায় বাঁটতে হবে। এ কাজটি বিরক্তিকর, একটু সময়ও লাগবে—মজুর দিয়ে করানোই ভালো। ভালো রকম পেষা হলে এতে আরো কিছু মিহি মার্বেল-গুঁড়ো মেশাও এবং জল দিয়ে মেখে নাও। ধীরে ধীরে আরো কিছু মিহি গুঁড়ো মিশিয়ে সাধারণ বালিকামের মশলার মতো আঁট করে নাও। এই মশলায় প্রথমেই যতটা মার্বেল-গুঁড়ো মিশেছিল, পরে বারে বারে আরো ততটাই

— শিল্পচর্চা —

নন্দলাল বসু

মিহি গুঁড়ো মেশানোর দরুণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে একভাগ চুন আর দু ভাগ মার্বেল-গুঁড়ো।

মশলা লাগাবার ক্রম ও কৌশল। প্রথমে দেয়াল থেকে ধুলোবালি বা পুরাতন মশলা চেঁছে পরিষ্কার করে নাও। (দেয়ালে পূর্বের মশলা বেশ শক্ত থাকলে তার উপরেও কাজ করা যায়।) প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে দেয়ালটি ভালো-রূপ ভিজিয়ে নাও। বেশ ভিজে গেলে কর্নিক দিয়ে মশলা লাগিয়ে গজ-পাটা দিয়ে সমান করে নেবে। অল্প জল ছিটিয়ে এমনভাবে গজ-পাটা চালাবে যাতে কোথাও কিছু উঁচু-নিচু বা গর্ত থাকবে না। (দেয়ালের নির্দিষ্ট অংশ সবটা এক-দিনে সারা না গেলে, পরদিন আবার বেশ করে ভিজিয়ে বাকি অংশে মশলা ধরানো চলবে)। আরায়েসের জমির এই হল প্রথম পর্দা। দ্বিতীয় পর্দাটি অপেক্ষাকৃত অল্প পুরু হবে এবং তাতে বেশি চুন আর কম মার্বেল-গুঁড়ো (মিহি) মেশাতে হবে। এই মশলা চড়িয়ে জমিটি উত্তমরূপে সমান করা হবে, পালিশ করা হবে না। এর পর তৃতীয় এক পর্দা মশলা ধরাতে হবে; তাতে চুনের ভাগ পূর্বের চেয়ে বেশি আর মার্বেল গুঁড়ো (সবচেয়ে মিহি) পূর্বের চেয়ে কম হিসাবে (proportionএ) মিশিয়ে পূর্বের চেয়ে পাৎলা করে লাগানো হবে। এই তৃতীয় পর্দা লাগানো হলে জমি তৈরির প্রথম পর্যায়ের কাজ সারা হবে; ফুটো-ফাটাগুলো এক সপ্তাহ পরে মেরামত করে নেওয়া যাবে।

এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে চিত্রোপযোগী জমির সবশেষ স্তরটি ধরানো হবে আর সেটি স্যাঁৎসেতে থাকতে থাকতেই ছবি ছকা, রঙ লাগানো, ছবি সারা, সব কাজ অবিচ্ছেদে করে যেতে হবে। তিন পর্দা মশলা লাগাবার পর এক সপ্তাহে জমি শুকিয়ে এসেছে, ফুটো-ফাটাও সারা হয়েছে, এখন সেই শুকনো জমির উপর কুঁচি করে অল্প অল্প জল ছিটিয়ে একটি (বাকড়া) বেলে পাথরের টুকরা দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে জমিটি মাজতে হবে। বেশী জল ছিটোবে না, তাতে মশলাটি নরম হয়ে উঠে আসতে পারে। (পূর্বের মশলাটি পর্দায় পর্দায় ভালোভাবে ও সমানভাবে লাগানো হয়ে থাকলে এই উঠে আসার সম্ভাবনা কম।) কিছুক্ষণ মাজা-ঘষার পর জমিটি তৈরি হবে। কুঁচিতে জল ছিটিয়ে ঘষলে যখন দেখবে সাদা জল বেরুচ্ছে না তখনই বোঝা যাবে, জমি তৈরি হয়েছে। তখন, মাখমের মতো ভিজে ছাঁকা চুণ (খুব মোলায়েম, আলাদা হাঁড়িতে এই কাজের জন্যেই বহুদিন ভেজানো থাকবে) আর খুব মিহি মার্বেল গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে নাও। এই মশলাটি খেজুর বা কেয়া ডাঁটির নরম তুলি দিয়ে জমিতে লাগাও আর পূর্বের মতো বেলে পাথর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে সমান করে নাও। (জমি বেশী ভেজাবে না।) জমির উপরকার জলটি এখন সাবধানে পুরু করে ভাঁজ-করা কাপড় চেপে চেপে শুষে নাও। এর উপর শনের তুলি দিয়ে কেবলমাত্র মোলায়েম ছাঁকা চুণ পরতে পরতে লাগাতে হবে। এককালে পুরু করে প্রলেপ দিলে চলবে না। পাৎলা করে তিন-চার, এমনকি, পাঁচ বারে লাগালেই ভালো হয়। যদি কোনো একটি রঙের এক-টানা বিন্যাসের প্রয়োজন থাকে পটভূমিতে বা অন্য কোথাও, তাহলে সেই রঙটি এই চুণের প্রলেপের সঙ্গে মিশিয়েই জমির প্রয়োজনীয় অংশে লাগানো প্রয়োজন। রঙটির পাৎলা প্রলেপ চার-পাঁচবার লাগাবার পর কর্নিক ধরে সমান চাপের উপর আঁকাবাঁকাভাবে (রাজমিস্ত্রীরা যেমন করে) পালিশ করতে হবে। এর পর পালিশ-পাথর দিয়ে পালিশ করতে হবে। জমি বেশি পালিশ করে চকচকে করবে না। দেয়ালে যে ছবি আঁকা হবে, ঠিক সেই ছবি সেই মাপে মজবুত জল-সয়-এমন কাগজে আঁকা এবং ফুটো করে 'খাকা' তৈরি করা—ফ্রেস্কো প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। নিছক চুণের বা

রঙ-মেশানো চূণের প্রলেপ কয়টি লাগানো এবং জমি পালিশ করা সারা হলে, ছবির খাকাটি দেয়ালে কোণে কোণে এবং ধারে ধারে মোম লাগিয়ে (সরাসরি ভিজে জমিতে নয়, ধারের শুকনা দেয়ালে আগে আঠা দিয়ে কাগজের টুকরা এ'টে) টাঙিয়ে নিতে হবে—অন্য লোকে ধরে রাখলেও ভালো—আর খুব মিহি কাঠ-কয়লার গ'ড়ো বা খুব মিহি হাল্কা গেরি রঙের গ'ড়ো মিহি ন্যাকড়ার টিলে প'টুলি বে'ধে খাকার সছিদ্র রেখা ধরে ধরে আস্তে আস্তে থুপতে হবে। নক্সাটি থুপবার সময় খাকা কিছুমাত্র সরে না যায়। প'টুলির রঙ ভিজে-ভিজে হয়ে এলে মাঝে মাঝে আগুনের আঁচে একটু সে'কে নেওয়া যায় বা শুকোতে দিয়ে ততক্ষণ অন্য প'টুলি ব্যবহার করা চলে। মাঝে মাঝে খাকার একটি কোণ ধরে তুলে দেখা দরকার, নক্সার ছাপ পড়ছে কিনা জমিতে।

রেখাচিত্র কাগজের খাকা থেকে দেয়ালে উঠে এলে পর ছবিতে রঙ লাগাবার পালা। এই ক'টি রঙ ব্যবহার করা হয়—কালো রঙের হিসাবে ভূষো, সাদা হিসাবে ছাঁকা চূণ, উজ্জ্বল গেরি, কাল্‌চিটে বা মেটুলি রঙ গেরি, এলা-মাটির হলদে আর হরা পাথরের সবুজ। প্রস্তুত রঙগুলি পূর্ব থেকেই বোয়েমের জলে ভিজানো থাকা ভালো। আঁকবার সময় রঙ মধুর মতো গাঢ় হওয়া চাই। বাটিতে রঙ নিয়ে ছোটো গ'দের টুকরো আঙুল দিয়ে মেড়ে মেড়ে রঙের সঙ্গে মেশাতে হবে। এখন নরম তুলি দিয়ে এই রঙ ছবিতে লাগাতে হবে। রঙটি ঈষৎ গাঢ় হওয়ায় ছবি আঁকার কালে পাশাপাশি লাগানো হলেও একটি রঙ আরেকটি রঙে মিশে যাবে না আর নক্সাটিও কোনো অংশে গা-ঢাকা দেবে না। রঙ লাগাবার জন্যে জমি বেশি পালিশ করে নেবে না পূর্বেই বলা হয়েছে; বেশি পালিশের উপর রঙ ভালো ধরবে না।

কালো রঙের লেপ দেওয়া সব থেকে কঠিন। ছবির পটভূমিতে বা কোনো বড়ো অংশে নিছক ভূষোর ব্যবহার না করাই ভালো। সহজে ব্যবহারোপযোগী কালো রঙ তৈরি করতে হলে মিহি কাঠ-কয়লার গ'ড়ো অল্প পরিমাণে মিশিয়ে পিষে নিলে বড়ো জমিতে লাগাবার সুবিধা হয়। কালো রঙ কর্নিক ধরে. পালিশ করার সময় জমিটি এক রকম রাখা শক্ত হয়; খুব সাবধান না হলে কালো রঙ অন্য রঙের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।

রঙ লাগানো হলে ছোটো ছোটো রঙের পটি (block) আর রেখাগুলি ছোটো (দু-সুতো-পুরু আর দেড় ইঞ্চি পেট-মোটা) কর্নিকে করে হাল্কা হাতে পিটোতে হবে। চওড়া রঙের পটিগুলি ঐ কর্নিকেই পালিশ করা চলবে—এ সময় কর্নিকটি জমির উপর সোজাভাবে না রেখে বরং যেদিকে কর্নিক যাচ্ছে, সেদিকে ওর ধারটি একটু আল্‌তোভাবে ধরতে হবে। বাম থেকে ডাইনে যেতে ডান ধার একটু আল্‌গাভাবে আর ডাইনে থেকে বাঁয়ে আসতে বাঁ··দিক একটু আল্‌গাভাবে ধরতে হবে।

কয়েকটি হুঁশিয়ারির কথা—প্রথমতঃ, দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে অবিচ্ছেদে শেষ করতে হবে; সেজন্য একবারে যতটুকু করা সম্ভব বলে মনে হবে, ততটুকু কাজই একদিনে হাতে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, অস্তরের শেষ স্তরটি যদি বেশি ভিজে বা বেশি শুকনা হয়, তার উপরে রঙ ভালো ধরবে না; দেয়াল কতটা ভিজে থাকা দরকার, সে আন্দাজ বহুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে হয় এবং সেই জ্ঞানই জয়পুরী ভিত্তিচিত্রণপদ্ধতিতে কৃতকার্য হওয়ার বিশেষ নির্ভর। তৃতীয়তঃ, পালিশ করার আগে বা পেটার আগে রঙ বেশি ভিজে থাকলে পাশের রঙের পটিতে ছড়িয়ে পড়বে আর বেশি শুকিয়ে গেলে পাপড়ি হয়ে ঝরে যাবে।

বিপর্যয়ের ভয় থাকলেও জমিটি (যে জমিতে রঙ ধরানো হবে) বরং ভিজের দিকে থাকাই ভালো। কম ভিজে হলে রঙ ঠিক ধরবে না, বেশি ভিজে থাকলে পালিশের সময় কর্নিকের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় খাব্‌লা হয়ে উঠে এসে গর্ত হয়ে যেতে পারে। এরূপ হলে কর্নিকে করে সেই জায়গাটি পরিষ্কারভাবে তুলে নাও এবং প্রাথমিক মশলাটি একটু শক্তভাবে তৈরি করে ঐখানে কর্নিক দিয়ে টিপে লাগিয়ে দাও; তারপর ঠিক পূর্বের ক্রম ধরে পর পর চূণ, রঙ ইত্যাদি লাগিয়ে মেরামত করে নাও।

ছবি পেটা ও পালিশ করা শেষ হলে একটু নরম ন্যাকড়া বা তুলো দিয়ে নারিকেল তেল সমস্ত ছবির উপর লাগিয়ে দাও। জয়পুরী চিত্রকরদের রীতি কিন্তু অন্যরকমঃ নারিকেল তেল দেওয়ার বদলে খড়োল (শুকনো) নারকেল বেশ করে চিবিয়ে 'দুধ'টি বেশির ভাগ গলাধঃকরণ করে ছিবড়েগুলি ফু' দিয়ে ছবিময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর নরম পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছিবড়েগুলি ঝেড়ে ফেলে, মুছে ফেলে, ইচ্ছা হলে পেট-মোটা কর্নিক বা পালিশ-পাথরে আরেকবার পালিশ করে নেওয়া যায়।

জয়পুরী আরায়েসের কাজে এক-এক-রঙা পটি (flat colour blocks) আর রেখার কাজ করাই সুবিধা। মিশরীয় পারসিক বা কাংড়া-রাজপুতনার ছবির মতো। অজন্তা বাগ বা বিলাতী ছবির অনুসরণে গড়ন (modelling) বা ছায়া-সুষমা (shading) দেখানো কঠিন; সে চেষ্টা না করাই ভালো।

অজন্তা ভিত্তিচিত্রের জমি

অজন্তা রীতিতে মাটির অস্তর লাগিয়ে ছবি আঁকার জমি তৈরি করা চলে ইঁটের দেয়ালে, পাথরের দেয়ালে, কাঠের জাফরি বা কঞ্চির ছিটেবেড়ার উপর। এই জমি তৈরির পদ্ধতিটি কুমোরদের প্রতিমা তৈরির রীতি পর্যবেক্ষণ করে ও অজন্তা ভিত্তিচিত্রের স্খলিত অস্তর বিশ্লেষণ করে অনুমানের দ্বারা ও পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই রীতির আশ্রয়ে ছবি এঁকে আমরা এর উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছি।

ইঁটের দেয়ালে অস্তর লাগাবার পূর্বে প্লাস্টার খসিয়ে, ইঁটের জোড়মুখ থেকে চূণবালি চেঁছে খড়া বার করে নেবে। ঐ খড়ার মুখে ও ইঁটের উপর শক্ত বুরুশে করে এক পোঁছ আল্‌কাৎরা লাগিয়ে দেবে, ফলে উই ও স্যাঁতা (damp) লাগার ভয় থাকবে না। আল্‌কাৎরা শুকোলে বিশেষভাবে প্রস্তুত মশলা ব্যবহার করতে হবে।

'প্রথম মশলা' তৈরির বিধি লেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন বস্তুর ভাগ মাপ হিসাবে, **ওজন হিসাবে নয়**—ওজনের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে। উইঢিপির মাটি তিন ভাগ, ঘাস-খেকো গোরুর গোবর এক ভাগ (শুকনো গুঁড়ো), চিঁড়ের বা ধানের তুঁষ এক ভাগ—এতে অল্প মেথির জলও মেশাতে হবে। চা-চামচের এক চামচ মেথি গুঁড়ো রোদ্রে শুকিয়ে বা শুকনো খোলায় ভেজে নিয়ে আধ-ভাঙা করতে হবে; এই আধ-ভাঙা মেথি ন্যাকড়ার পুঁটুলি করে অল্প জলে ভিজিয়ে 'মেথির জল' পাওয়া যাবে। মশলায় মেশাবার জন্যে ছটাক খানেক আল্‌কাৎরাও চাই। এই মশলার পরিমাণ ৬''×৬''×৬'' ঘন, অর্থাৎ আধ ঘন ফুট এবং এ দিয়ে ১'×১' বা এক বর্গফুট জমি আবৃত করা যাবে। (ভাগ ঠিক রেখে প্রয়োজন মতো বেশি মশলাও তৈরি করা যায়; মেথির জল বা আল্‌কাৎরা হিসাবমতো বাড়ালেই চলবে।)

উক্ত মশলায় জল মিশিয়ে কাদা করে এক সপ্তাহ পচাও। পরে কাদা-কাদা মশলা টিপে টিপে দেয়ালে লাগাও। সমান না করেই রেখে দাও। এই মশলা এক ইঞ্চি পুরু করে লাগানো হবে। মশলা লাগাবার দিন চার পরে যদি ফাটল দেখা যায়, সেই জায়গায় পূর্বের মশলাই আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মেরামত করে নিতে হবে। এই অস্তর সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তখন কুঁচি দিয়ে অল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মশলাটি পুনর্বার কর্নিকে করে বা হাতে করে লাগিয়ে উসো দিয়ে সমান করে নাও। পূর্বের অস্তরের অর্ধেক, অর্থাৎ আধ ইঞ্চি পুরু হলেই চলবে।

'দ্বিতীয় মশলা'। প্রথম মশলার সঙ্গে শনের মিহি কুচি চট্‌কে চট্‌কে ভালোরূপ মেশালেই দ্বিতীয় মশলাটি তৈরি হবে; পূর্বতন অস্তরের উপর কুঁচি করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে এই মশলাটি সিকি ইঞ্চি পুরু করে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় মশলায় একটু বেশি জল ঢেলে ও ঘেঁটে দিয়ে একটু থিতোতে দিলে একটি পলি পড়বে। এই 'পলি' মোটা কেয়াডাঁটির বা নারিকেল ছোবড়ার তুলি দিয়ে পূর্বপ্রস্তুত জমির উপর (অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার মশলার অস্তরের উপর) লাগাতে হবে, আর প্রলেপটি অল্প ভিজে থাকতে থাকতে কর্নিক দিয়ে মেজে সমান করে নিতে হবে।

শেষোক্ত জমির উপর কাঠখড়ির সাদা রঙে তেঁতুল বীজের আঠা বা ডিমের হলদে কুসুম হিসাবমতো মিশিয়ে উষ্ট্র-লোমের অপেক্ষাকৃত নরম তুলি দিয়ে একটির পর আরেকটি পাতলা প্রলেপ দেবে। একেবারেই পুরু করে রঙ লাগানো ভালো নয়; পর পর তিন-চারটি প্রলেপে প্রয়োজনমত পুরু করাই ভালো। এই সাদা রঙের অস্তরে রঙ লাগালে বা রেখা টানলে যদি ধেবড়ে যায় (রঙ নিজে থেকে ছড়িয়ে যায়), তবে এক-চা-পেয়ালা-পরিমিত জলে এক-নুন-চামচ-পরিমিত ফট্‌কিরি গুঁড়ো মিলিয়ে তারই দু-এক পোঁচ লাগিয়ে দেবে। কোথাও মিহি কাজ বা রেখার বাহার দেখাবার আবশ্যক হলে প্রস্তুত জমির উপর পাতলা তেলা কাগজ রেখে শঙ্খে বা পালিশ-পাথরে অল্প মেজে নেবে।

অজন্তাপদ্ধতির এই জমির উপরে রঙে যে কোন প্রকারের গঁদ মিশিয়ে বা অন্য উপযুক্ত আঠা মিশিয়ে ছবি আঁকা
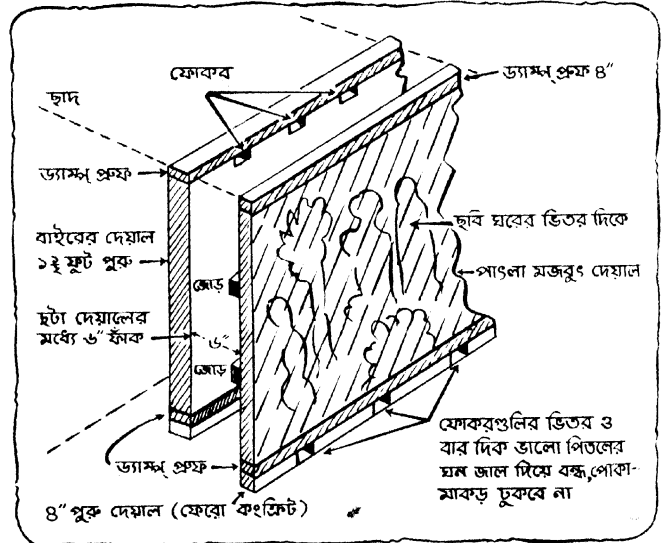
ভিত্তিচিত্রের উপযোগী দেয়াল

চলবে। এ-কাজের স্থায়িত্ব অন্য সব রকম ভিত্তিচিত্র থেকে, ফ্রেস্কো থেকে বেশি; পনেরোশত বৎসরের পুরাতন কাজও ভালো অবস্থাতেই আছে। ঢাকা বারান্দায় বা ঘরের দেয়ালে (যে দেয়াল মজবুৎ আর যার বাহির দিকটা জল-বৃষ্টির আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত) করা হলে অনেকদিন টিকবে। অবশ্য বাঙলার মত স্যাঁৎসেঁতে বৃষ্টি-বাদলার দেশে বিশেষভাবে প্রস্তুত জোড়া দেয়াল আর স্যাঁতা নিবারণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন—না হলে কোনো কাজই স্থায়ী হতে পারে না।

সিংহলী ভিত্তিচিত্র

চৌরস-করা পাথর বা ইঁট বা সিমেন্টের দেয়ালে, ছাদে, নারকেল ছোবড়ার তুলি করে প্রথমে একটি অস্তর লাগাতে হয়, তার উপাদান এক ভাগ মাটি আর দুই ভাগ বালি, আর বাঁধন বা আঠা ভাতের ফ্যান। এর উপর অপেক্ষাকৃত পাতলা একটি স্তর 'কিরিমেটিয়া' বা কেওলিন মাটি। তার উপরে ম্যাগ্নেসাইট (magnesite) দিয়ে আরো পাতলা একটি প্রলেপ দিয়ে ঘঁষে মেজে নিলেই সুন্দর সাদা জমি তৈরি হয়ে গেল।

অজন্তায় বাগে যেমন, সিংহলের সিগিরিয়া গুহাতেও তেমনি ছবি আঁকা হয়েছে পাথরের উপর মাটির জমি তৈরি করে। আনন্দকুমারস্বামী 'মধ্যযুগের সিংহলী আর্ট' গ্রন্থে অনুমান করেন যে, এক্ষেত্রে প্রথমেই মাটির (উঁই মাটির?) একটি স্তর, তার উপর তুঁষ এবং সম্ভবতঃ নারিকেল ছোবড়ার আঁশ মেশানো কেওলিনের আধ ইঞ্চি পুরু একটি স্তর, সবশেষে মাখমের মতো মোলায়েম চুণের একটি স্তর লাগানো হয়ে গেলে কর্নিকে মেজে মসৃণ করা হয়েছে। অতঃপর টেম্পারা ছবির মতো, জগন্নাথের পটের মতো, গঁদ বা অন্য আঠা মেশানো রঙে ছবি আঁকা হয়েছে বা হতে পারে।

অজন্তা-সিগিরিয়ার অনুরূপ মাটির জমির ছবিতে ছবি শেষ হলে যে কোনো রকম ভার্নিশ করা চলে। বেশির ভাগ শিরিষের বা তিসির জলের খুব পাতলা দু-এক পোঁচ দিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তিসির জল তৈরির বিষয় 'তিব্বতী টঙ্গা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

নেপালী ভিত্তিচিত্র

নেপালী পদ্ধতি নেপালী শিল্পী ভিখাজির কাছে জানা গেছে। মশলার উপাদান হল এক ভাগ কালো এঁটেল মাটি, হলদে মাটি এক ভাগ, ঘাস-খেকো গোরুর গোবর (আঁশ বেশি ও হড়হড়ানি ভাব কম) এক ভাগ, চিঁড়ের তুঁষ বা গমের ভুষি বা গাছের ছাল-ছেঁচা (বট নোনা ও তুঁত গাছ থেকে, নেপালী কাগজ যে গাছ থেকে হয় সেই সব চেয়ে ভালো, কারণ পোকা লাগে না) বা নেপালী কাগজ এক ভাগ, সামান্য মেথির জল—'অজন্তা ভিত্তিচিত্র' প্রসঙ্গে প্রাথমিক মশলার বিবরণের মধ্যে পদ্ধতি ও পরিমাণের বিষয় বলা হয়েছে। উল্লিখিত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে জল ঢেলে কাদা-কাদা করে পা দিয়ে চটকে নাও। ভালো রকম চটকানো হলে একটা ঠান্ডা জায়গায় জড়ো করে একটা ভিজে চট ঢাকা দিয়ে তিন-চারদিন রেখে দাও। যখন মাটি ফেঁপে উঠে একটু দুর্গন্ধ হবে, তখন কার্যোপযোগী হয়েছে বুঝতে হবে।

ইঁটের দেয়াল হলে পুরোনো প্লাস্টার খসিয়ে 'খড়া' বার করে আর পাথরের দেয়াল হলে অল্পবিস্তর ছেনি দিয়ে কেটে এবড়ো-খেবড়ো করে, দেয়াল জল দিয়ে ভিজিয়ে তার উপর পূর্বপ্রস্তুত মশলা কর্নিকে করে লাগাও। সেটি সম্পূর্ণ না শুকোতে আরেক পর্দা লাগাও। এভাবে যতগুলি পর্দা লাগাতে পারো, ততই ভালো। সবশুদ্ধ আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু করা যেতে পারে। পরে এঁটেল মাটি ও গোবরের খুব মিহি পাউডার (চূর্ণ) সমান ভাগে মিশিয়ে জলে গুলে, কেয়া বা খেজুর ডাঁটির তুলি দিয়ে পাতলা করে প্রলেপ দাও। (এসব মাটির পর্দা বা প্রলেপ সব সময় জমি একটু ভিজে ভিজে থাকতে লাগানো উচিত।) গোবর মেশানো অস্তর ধরানোর পর জমিটা কর্নিকে বেশ করে মেজে নিতে হবে। পরে ভালো মোলায়েম চুণ (আরায়েসের কাজের জন্যে যে ভাবের পাথুরে চুণ তৈরি করে নেওয়া হয়, দশ সের চুণে দেড় ছটাক দই মেশে, আর প্রত্যহ জল বদলে এক মাস বা তারও বেশি রাখতে হয়, কোনো সময়ে জল শুকোতে দিতে নেই) কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে অল্প শিরিষ বা গঁদ মিশিয়ে, অথবা কাঠখড়ির সাদা হিসাবমতো তেঁতুল বীজের আঠা বা ডিমের কুসুমে বা শিরিষ মিশিয়ে, অস্তরের শেষ স্তর হিসাবে লাগিয়ে দাও। মাটির অস্তরের শেষ প্রলেপে কাঠখড়ির সাদা, আর তেঁতুল বীজের আঠাই প্রশস্ত। এখন জমি অল্প ভিজে থাকতে থাকতেই একটি পালিশ-পাথরে পালিশ করে নাও। পালিশ-পাথরের অভাবে শাঁখ দিয়ে বা মসৃণ কাঁচের বোতল গড়িয়েও কাজ হতে পারে। এই সাদা জমিতে নেপালী টঙ্গা বা টেম্পারা ছবি যেমন হয়, তেমনি করেই রঙে গঁদ, শিরিষ বা ডিম মিশিয়ে মিশিয়ে কাজ করা যাবে।

(ক্রমশ)

অতুল সিকদার চাকরী করতো একটি মার্চেণ্ট অফিসে। তার মাইনে ছিলো কম, সংসার ছিলো বড়ো, অভাব ছিলো প্রচুর, কিন্তু অশান্তি ছিলো না মোটেও। বড্ড ভালো মেয়ে ছিলো তার বৌ চপলা, নামের সংগে স্বভাবের মিল ছিলো না মোটেও। স্বামীর অল্প যেটুকু আয় তাই দিয়ে সে মানিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে নিতো শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-দেওর পরিপূর্ণ সংসার।

শাখা আর দু'গাছি সোনার চুড়ি ছাড়া কোনো গয়না ছিলো না চপলার গায়ে। বিয়ের সময় বাপের কাছ থেকে যে কয়েক ভরি সোনা পেয়েছিলো, তাও সংসারের নানা প্রয়োজনে হাত-ছাড়া হয়ে ছিলো বহু আগেই। কিন্তু এর জন্যেও চপলার মনে কোনোদিন আক্ষেপ ছিলো না। সংসারে তার সুখের অভাব হয়নি, তাই গয়নার অভাবকে অভাব বলে মনে হয়নি কোনো দিন।

সেবার যখন অতুলের মাইনে দশ টাকা বাড়লো, রাত্তিরে চপলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে অতুল বল্লে, "তুমি তো কোনোদিন কিছু চাও না আমার কাছে। এবার অন্তত বলো তোমার কি চাই।"

চপলা কিছু বল্ল না। চুপ করে রইলো হাসি মুখে।

"একটি ঢাকাই সাড়ি?" বল্ল অতুল।

"বাবার শার্ট সব ছিঁড়ে এসেছে। ও'কে দু'তিনটে নতুন শার্ট সেলাই করিয়ে দাও", বল্ল চপলা।

"আচ্ছা, সে না হয় দেবো। কিন্তু তোমায় কি দেবো বলো।"

"আমায় কি আর দেবে", বল্ল চপলা. "আচ্ছা, আমায় দশটা টাকা দিও। আমার যা' ইচ্ছে হয় কিনে নেবো।"

"টাকা দিয়ে কি তুমি আর নিজের জন্যে কিছু কিনবে। ওতো তুমি খরচা করে ফেলবে তোমার প্রাণের দেওর-ননদের পেছনে", বল্ল অতুল।

"আমার টাকা দিয়ে আমি যা' খুশি করবো. তোমার তাতে কি?"

"উঁহু, সে হবে না। নগদ টাকা দেবো না তোমাকে। এম্নি কি জিনিস চাই বলো, এনে দিচ্ছি।"

"দেবেই আমাকে একটা কিছু?" চপলা একটু ভাবলো। তারপর বল্ল, "দেখ, এক্ষুণি যে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে যদি কোনোদিন পারো তাহলে----" থেমে গেল চপলা।

"তাহলে কি? বলো, বলে ফেল।"

"যদি কোনোদিন পারো, তাহলে একটি সোনার হার গড়িয়ে দিও আমায়। গলাটা একেবারে খালি থাকে। ভালো দেখায় না। খুব অল্প সোনায় যা হয় একটি গড়িয়ে দিও'খন।"

বলতে বলতে মুখ লাল হয়ে এলো চপলার। স্বামীর কাছে সে নিজের জন্যে কোনোদিন কিছু চায়নি। আজ ভারি লজ্জা করতে লাগলো।

চোখ তুলে তাকালো অতুল। চপলার ফর্সা গলাটি সত্যিই বড্ডো খালি খালি দেখাচ্ছে। সে হাতটি তুলে আনলো চপলার গলার কাছে, আঙুলগুলো বুলিয়ে নিলো গলার এপাশ থেকে ওপাশে।

"এই, ওরকম কোরো না", চপলা হেসে ফেলে বল্ল "সুড়সুড়ি লাগছে।"

কিন্তু সোনার হার গড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ হোলো না কিছুতেই। মাইনে যেমন বাড়লো সংসারের কয়েকটি খরচাও হঠাৎ বেড়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সোনার হার না পাওয়ায় কোনো আক্ষেপ হোলো না চপলার, কিন্তু অতুলকে জ্বালানোর, ওর কাছ থেকে এটা ওটা সেটার খরচা আদায় করার মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেল সে।

ননদ সুমিতার স্কুল থেকে হয়তো মেয়েরা পিকনিকে যাবে। তার জন্যে সুমিতার টাকা চাই দুটো। রাত্তিরে চপলা অতুলকে বল্ল। অতুল বল্লে, "মাসের শেষ। শুধু এই কদিনের বাজার খরচার টাকাটা আছে। ওকে বলো এবার যেন পিকনিকে না যায়। আরেকবার নিশ্চয়ই দেবো।"

"সে কি হয়", চপলা বল্ল, "ওটুকু মেয়ে, ওর এই সামান্য শখ মেটাবে না? একদিন বাজার না হয় নাই হোলো।"

অতুল কোনো উত্তর দিলো না। বেশী কথার মানুষ নয় সে।

একটু পরে চপলা বল্ল, "আমায় যে বলেছিলে সোনার হার গড়িয়ে দেবে?"

"এখন যে হাতে টাকা নেই চপলা", চোখ বুজে অতুল বল্ল।

"আমায় সোনার হার গড়িয়ে দাও", চপলা বল্ল।

"হাতে কিছু টাকা আসুক, তারপর দোবো।"

"তা'হলে কথা দিয়েছিলে কেন। গড়িয়ে দাও আমার সোনার হার।"

আস্তে আস্তে চোখ খুল্লো অতুল।

বল্ল, "সবই তো বোঝো চপলা। কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছো।

চপলার চোখ দুটো জলে ভরে এলো। কিন্তু মুখে ঠোঁটটেপা দুষ্টুমির হাসিটি গেল না কিছুতেই। বল্ল, "বেশ. তোমায় আর কিছু বলবো না যদি আমার একটি কথা রাখো।"

"কি।"

"আমায় দুটো টাকা দাও সুমিতার জন্যে।"

চপলাকে কাছে টেনে নিলো অতুল। বল্ল, "তোমায় নিয়ে আর পারলুম না।"

পরে অবশ্যি চপলা কোনোদিনই তার কথা রাখেনি। সংসারে অন্য সবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য যা কিছু যখনি যা' দরকার হয়েছে চপলা সবই আদায় করে নিয়েছে অতুলের কাছ থেকে, সোনার হারের কথা পেড়ে।

সেবার বছরের শেষে অতুল যখন উপরি একমাসের মাইনে পেলো, স্থির করলো এ টাকা সংসারে দেবে না। এ টাকা দিয়ে সোনার হার গড়িয়ে দেবে চপলাকে। বৌবাজারের এক গয়নার দোকানে আগাম টাকা দিয়ে অর্ডার দিয়ে ফেল্ল সেদিনই। তারপর একদিন সেটি পকেটে করে মাঝরাতে চপলাকে অবাক করে দেওয়ার প্রোগ্রাম ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলো।

ফিরে এসে দেখে হৈচৈ পড়ে গেছে বাড়িতে। চপলার ভীষণ অসুখ। দুপুরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখনো জ্ঞান ফেরেনি। পাড়ার ডাক্তার এসে বল্লো, হার্টের ব্যারাম। করোনারি থ্রমবোসিস। বেশ সিরিয়াস কেস। বড়ো ডাক্তার কাউকে ডাকুন।

অতুলের হাতে বেশী টাকা ছিলো না। হারছড়াটা বাঁধা দিতে হোলো অর্ধেক দামের টাকায়।

মাসখানেকের মধ্যে চপলা সেরে উঠলো। সোনার হার বাঁধা দিতে হওয়ায় মনে মনে খুব দুঃখ হয়েছিলো অতুলের। কিন্তু চপলা সেরে ওঠায় সে দুঃখ আর রইলো না। ভাবলো মাসে মাসে কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে দেনাটা শোধ করে হারটা ছাড়িয়ে আনবে।

চপলা যখন শুনলো অতুল সত্যি সত্যি গড়িয়ে ছিলো সোনার হার, কিন্তু অসুখের সময় বাঁধা দিতে হয়েছে সেটি, হেসেই উড়িয়ে দিলো। বল্ল, "বাঃ, আমার অসুখ হওয়ায় তো বেশ একটা ছুতো পেয়ে গেছো। ওসব আমি শুনবো না। বাদলের একটা টাকা চাই। ওদের এক মাস্টারকে ওরা ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে। ভালো চাও তো টাকাটা দিয়ে দাও বলছি, নইলে——"

"নইলে কি?"

"——আমায় সোনার হার গড়িয়ে দেবে বলেছিলে——"

অতুল আস্তে আস্তে একটা টাকা বার করে দিলো।

সোনার হারটি আর ছাড়ানো হোলো না কিছুতেই। কোনো মাসেই টাকা বাঁচানো যাচ্ছিলো না। প্রত্যেক মাসেই প্রচুর খরচা।

একটি বছর কেটে গেল। বছরের শেষে আবার বোনাসের টাকা পেলো অতুল। ভাবলো এটাকা থেকে প্রথমেই সে সোনার হারটা ছাড়িয়ে নেবে। আবার মাঝরাতে চপলাকে অবাক করে দেওয়ার প্রোগ্রাম ভাবতে ভাবতে সে চল্ল সেই সোনাবেনের দোকানে, যেখানে বাঁধা দিয়েছিলো সোনার হারটি।

দোকানে এসে মানিব্যাগটি খুলে হঠাৎ তার চক্ষুস্থির হোলো। ব্যাগের ভেতরের একটি খোপে সে হারের রসিদটি রেখেছিলো। এই সেদিনও সে দেখেছে রসিদটি ঠিক আছে সেখানে। এখোপ ওখোপ খুঁজে কোথাও পেলো না। ভাবলো, সেখোপে আরো দু'চারটি ছোটো কাগজ রেখেছিলো সেদিন। সেগুলো বার করতে গিয়ে কোনো এক সময় পড়ে যায়নি তো!

দোকানদার শুনে বল্ল, "সে কি? আপনার সেই সোনার হারটি? সেটাতো পরশু এক ভদ্রলোক এসে টাকা মিটিয়ে দিয়ে নিয়ে চলে গেছেন। ওকে আপনি পাঠান নি। আমি তো ভেবেছিলাম আপনারই লোক।"

ভদ্রলোকের বর্ণনা শুনে তাকে চেনে বলে মনে হোলো না অতুলের। বল্ল, "আপনি ওকে জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?"

"না", বল্ল দোকানদার, "আমার তো সন্দেহ করবার কোনো কারণ ঘটে নি।"

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো অতুল। ভাবলো, লোকসান গেল টাকাগুলো। কিন্তু টাকা লোকসান যাওয়ায় তার অতোটা দুঃখ হোলো না, যতোটা হোলো হারছড়াটা খোয়া যাওয়ায়। ভাবলো, যাকগে, যা গেছে গেছে। এ টাকাটা দিয়ে চপলাকে আরেকটি হার গড়িয়ে দেবো।

কিন্তু বাড়ি এসে দেখে আবার ডাক্তার এসেছে। চপলা আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে। সেই আগের অসুখটাই, করোনারি থ্রমবোসিস।

ডাক্তার যা বল্লে, তার মোদ্দা কথাটা হোলো এবার আর আশা নেই।

হাতে বোনাসের পুরো টাকাটা হোলো। তাই খরচা করে চিকিৎসা হোলো চপলার। সোনার হারটা না পাওয়ার জন্যে আর আক্ষেপ রইলো না অতুলের—কিন্তু এত দুর্ভাবনার মধ্যেও কিছুতেই ভুলতে পারলো না সোনার হারটির কথা।

দিন দুয়েকের মধ্যেই ক্ষীণ হয়ে এলো চপলার জীবন-প্রদীপ।

সন্ধ্যেবেলা চুপি চুপি কাছে ডাকলো অতুলকে। ফ্যাকাশে মুখে দুষ্টুমির ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমায় সোনার হার দিলে না?"

গলায় কি যেন আটকে গল অতুলের। কোনো কথা বলতে পারলো না। চপলার হাতটি তুলে নিলো নিজের হাতে।

চপলার চোখ জলে ভরে এলো। বল্ল, "জীবনে কোনো অপরাধ করি নি তোমার কাছে। শুধু একটি ছোট্টো অন্যায় করেছি। বলো মাপ করবে।"

"কি ছেলেমানুষি করছো চপলা", অতুল আস্তে আস্তে বল্ল।

"অন্যায়টা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে একটি কথা শোনো। আমি জানি আমি বাঁচবো না। আমায় কথা দাও তুমি আবার বিয়ে করবে?"

"একথা তুমি কি করে বলছো, চপলা", অতুল বল্ল।

দুষ্টুমির হাসিটি চপলার রোগ-পাণ্ডুর মুখ থেকে তখনো যায় নি। বল্ল, "যদি কথা না দাও, আমি সোনার হারের কথা বলতে বলতেই মরবো।"

অতুল কোনো উত্তর দিলো না।

"তুমি আমায় সোনার হারটি আর দিলে না।"

"চপলা!"

হাসিটি মিলালো না কিছুতেই, কিন্তু চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো চপলার। বল্ল, "অন্যায়টা শোনো। হারের রসিদটা তোমার ব্যাগ থেকে আমিই বার করে নিয়েছিলাম। সেদিন আমার এক মামাতো ভাই এসেছিলো। তাকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলাম। কিছু টাকা জমেছিলো

আমার হাতে। একটু একটু করে অনেক দিন ধরে জমিয়েছি। তোমায় বলি নি। হারটি তোমায় দেখিয়ে অবাক করে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু অসুখে পড়ে আর হয়ে উঠলো না।

একটু থামলো চপলা। তারপর আস্তে আস্তে বল্ল, "সোনার হারটি নতুন বৌয়ের জন্যে রেখে গেলাম।"

বছর না ঘুরতে অতুল আবার বিয়ে করেছিলো। ফুলশয্যার রাত্তিরে ঢলঢলে-মুখ নতুন বৌয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েদিলো সোনার হারটি। ফর্সা গলায় সোনার হারটি মানিয়েছিলো ভালো। অতুলের ভালোও লেগেছিলো নতুন বৌকে।

বৌটির নাম শান্তি।

সে তার যৌবন-উদ্বেল চটুলতায় নেশাও ধরিয়ে দিয়েছিলো অতুলের মনে, বশ করে হাতের মুঠোয় এনেছিলো তাকে। চাকরীতে অতুলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গয়নাগাটিও পেয়েছিলো বছর বছর।

তবু এই নতুন বৌটি জীবনে কোনোদিন সুখী হতে পারেনি। অন্য কারো গায়ে নতুন ডিজাইনের কোনো গয়না দেখলেই তার মন জ্বলতে শুরু করতো। সে তার বিবাহিত জীবন শুরুই করেছিলো চপলার একমাত্র ছবিটি উনুনের আগুনে দিয়ে।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সাধারণত সর্দি জ্বর হলেই আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, "ভয়ের কিছু নেই, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।" বাস্তবিকপক্ষে এ রোগে একেবারেই যে ভয়ের কিছু থাকে না, এ ধারণা ভুল। মাঝে মাঝে ইনফ্লুয়েঞ্জা যখন মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন তার ভীষণাকার ঠেকানোর বহু চেষ্টাই চলে। বর্তমানে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও য়ুরোপের অন্যান্য শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দেয় এবং ক্রমে ইজিপ্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এখন ভারতবর্ষেও এর বিস্তৃতি লাভ করতে পারে, এই আশঙ্কাই সকলের মনে জাগছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ইনফ্লুয়েঞ্জা দু' রকম ভাইরাসের দ্বারা ঘটে। বৃটেনে ও অন্যান্য দেশে যে সব মহামারী কয়েক বছর অন্তর অন্তর ভীষণাকারে দেখা দিয়েছিল, সেগুলি ভাইরাস 'এ' দ্বারাই ঘটে। ভাইরাস 'বি' দ্বারা যে রোগ হয়, সেটা প্রায় সব সময়ে সব দেশেই অল্প-বিস্তর দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কতকগুলি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার। বেশ আলো-হাওয়াযুক্ত ঘরে বাস করা এবং খুব ঘিঞ্জির মধ্যে না থাকাই নিয়ম। এ সব আইন মেনে চললে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এ রোগ এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে যে, জনসাধারণের পক্ষে কোনও রকম টীকা জাতীয় প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করাই ভালো। টীকা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে বহু বৎসর ধরে বহু আলাপ-আলোচনা হয়ে গেছে। টীকা দেওয়া ও না-দেওয়া লোকেদের বৃত্তান্ত নিয়ে দেখা গেছে যে, এ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টীকা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক টীকাটি চারটি ভাইরাসের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। এই ইনজেকশন চামড়ার তলায় দিলে এটি যেমন তাড়াতাড়ি রোগ নিবারণ করতে পারে, তেমনি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও জন্মায়।

*
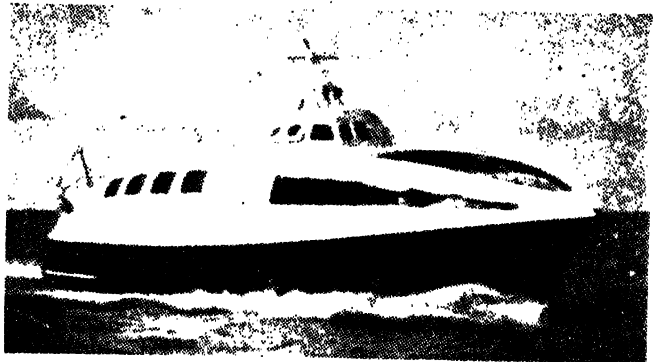
স্কটল্যান্ডে এয়ারোপ্লেনের ধরণে এক নতুন মোটর লঞ্চ তৈরি হয়েছে। এর ওজন ৪৬ টন আর লম্বায় ৮১ ফিট। এটি দুটি ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। এয়ারোপ্লেনের চালকের যেমন একটা বসার জায়গা থাকে, এতেও ঠিক সেই রকম ধরণের চালকের বসার জায়গা আছে। সমস্ত জাহাজটির ওপরে একটি ঘেরাটোপের মত অংশ জাহাজটি ঘিরে থাকে। এই জাহাজের মধ্যে দু'জন নাবিক ছাড়া আরও আটজন যাত্রী বেশ সচ্ছন্দে বাস করতে পারে। এদের স্নানের জন্য "শাওয়ার বাথ", খাদ্যদ্রব্য রাখার জন্য রেফ্রিজারেটর, গরম জল ও ঠাণ্ডা জলের বন্দোবস্ত ইত্যাদি প্রত্যেক কেবিনের সঙ্গে আছে। জাহাজটি এক সঙ্গে দু' হাজার মাইল পর্যন্ত চলতে পারে।

"এয়ারোপ্লেনের মত নতুন ধরণের মোটরলঞ্চ"

ঢেঁকানল রাজ্য ও কপিলাস পাহাড়

সরলাবালা সরকার

উড়িষ্যা দেশে কতকগুলি রাজ্যকে 'খণ্ডজাত মহাল' বলা হয়। ঢেঁকানল রাজ্য ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে ময়ূরভঞ্জ এবং ইহার পরই তখনকার দিনের বৃটিশ শাসনাধীন উড়িষ্যার মিত্ররাজ্যগুলির মধ্যে ঢেঁকানলের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাকৃতিক শোভার সৌন্দর্যনিকেতন এই আরণ্যপ্রদেশ। নিবিড় বনভূমি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, সেই জঙ্গলে হস্তি, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বসবাস আছে, আবার হরিণ ও ময়ূর প্রভৃতি নিরীহ জীবেরও অভাব নাই। মাঝে মাঝে 'খেদা' করিয়া হাতী ধরাও হয়, রাজ্যের ইহা একটি বিশেষ আয়।

লোক বসতি রাজধানী ঢেঁকানলেই বেশী, তবে বন জঙ্গল অঞ্চলেও স্থানীয় লোকের বসতি আছে। যাযাবর শ্রেণীর একদল লোক জঙ্গলে থাকিয়াই গোপালন ও দুগ্ধ বিক্রয় করে। ইহাদের ঘরবাড়ী নাই, বনেই কোনক্রমে সাময়িক আস্তানা তৈরী করিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করে, আবার গাছতলাতেও আগুনের কুণ্ড করিয়া রাত কাটায়। গাভীগুলি ইচ্ছামত বনে চরিয়া বেড়ায়; মাঝে মাঝে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়, তবুও তাহারা বন ছাড়া অন্যত্র থাকিতে চায় না।

ছোট ছোট পাহাড়ও আছে, কপিলাস পাহাড় ইহার মধ্যে একটি বড় পাহাড়।

ঢেঁকানলে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে আমি প্রথমবার যাই। আমার জ্যাঠামহাশয় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় নদীয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পেনশনের পর ঢেঁকানলের রাজাসাহেবের আমন্ত্রণে ঢেঁকানলে গিয়া ইঞ্জিনিয়ারের কার্যভার গ্রহণ করেন। আর আমার জামাতা স্বর্গতঃ প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ও ঢেঁকানলে প্রায় দশ বৎসর বাস করেন। প্রথমে তিনি যুবরাজের গার্জেন টিউটার হইয়া ঢেঁকানলে যান পরে দেওয়ান সাহেবের সহকারীর কার্য গ্রহণ করেন।

রাজা সুরপ্রতাপ সিংহ, বয়সে তরুণ, সুশ্রী, সুশিক্ষিত, চরিত্রবান, সদালাপী এবং প্রজাবৎসল নৃপতি। রাজা অল্প বয়সে পিতৃহীন হন এবং রাজমাতাই তাঁহার তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। দেশীয় রাজ্যের রাজকুমারগণের শিক্ষার জন্য ইংরাজ গভর্নমেণ্ট 'রাজকুমার কলেজ' নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ছোট, বড় অসংখ্য রাজ্যের রাজকুমারগণ সেই কলেজে গিয়া ইংরাজী শিক্ষকের নিকট বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী উচ্চারণ ও আদব কায়দা শিক্ষা করিতেন এবং সেই সঙ্গে মদ্যপান ও নানাবিধ বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হইতেন। সুরপ্রতাপের জননী পোলিটিক্যাল এজেন্টের বার বার কড়া তাগিদেও পুত্রকে সেই কলেজে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি সবিনয়ে জানাইয়াছিলেন, "সুরপ্রতাপ তাঁহার একমাত্র সন্তান তাহাকে দূরদেশে পাঠাইলে তিনি বাঁচিবেন না।" অগত্যা ঢেঁকানলেই তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাজা মোটর চালাইতে দক্ষ ছিলেন এবং সুদক্ষ অশ্বারোহীও ছিলেন। তবে পশুশিকারে তাঁহার ততটা উৎসাহ ছিল না, কেননা ঢেঁকানল রাজ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। রাজমাতা ছিলেন বৈষ্ণবধর্মে একান্ত অনুরাগিনী। রাজার উপরেও মায়ের প্রভাবের ফলে অহিংসার দিকেও সাধুসন্তের সঙ্গের দিকে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ঢেঁকানল রাজ্য মিত্ররাজ্য। রাজ্যে একদল সৈন্যও ছিল, জেলখানা ও বিচার বিভাগ ছিল। রাজার প্রাণদণ্ড দিবারও ক্ষমতা ছিল, কিন্তু গুরুতর অপরাধেও রাজা কোন অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন নাই। তাঁহার কারাগার অনেকটা সংশোধনাগারে পরিণত হইয়াছিল।

রাজার প্রকৃতিগত তেজস্বিতা, বংশগত মর্যাদাবোধ বিশেষভাবেই ছিল, কিন্তু দাম্ভিকতা ছিল না। সম্মানিত ব্যক্তির তিনি সম্মান দিতেন, আবার শ্রদ্ধেয়জনের নিকট শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ গ্রহণ করিতেও সর্বদা আগ্রহশীল ছিলেন।

তাঁহার আমন্ত্রণে বৈষ্ণব চূড়ামণি রামদাস বাবাজী ঢেঁকানলে গিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। বহু সাহিত্যিক ঢেঁকানলে গিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর রায়ের ঢেঁকানলে জন্মস্থান।

ঢেঁকানলে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন এবং উড়িষ্যা প্রবাসী বাঙ্গালীও অনেক ছিলেন। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রাজেন্দ্রবাবু। হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারও বাঙ্গালী ছিলেন। ঢেঁকানলে উড়িয়া ও বাঙ্গালীর মধ্যে আন্তরিক মিত্রতা ছিল, প্রাদেশিকতার নাম-গন্ধও ছিল না। জমি উর্বরা, রাজ্য ধনধান্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু তবু একবার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ঢেঁকানল রাজ্য ধ্বংস প্রায় হইয়াছিল, আর একবার সংক্রামক বেরী বেরী রোগে বহু অধিবাসী মারা যায়।

ঢেঁকানলে এক দল অস্পৃশ্য জাতি বাস করিত, তাহাদের 'পান চোর' বলা হইত, কারণ চুরিই ছিল তাহাদের জীবিকা। দাক্ষিণাত্যে অস্পৃশ্যতার সংস্কার খুবই বেশী, এই পানেরা এমনই অস্পৃশ্য যে সাধারণের চলার পথেও তাহাদের চলিবার অধিকার ছিল না। কাজেই চুরি ভিন্ন তাহাদের জীবিকা নির্বাহের অন্য উপায় ছিল না। তবে মাঝে মাঝে তাহাদের ডাকা হইত দু'-একটি কাজের জন্য—যেমন কাহাকেও গুরুতরভাবে শাস্তি দিতে হইলে পান-কুলীর ছোঁয়া 'পইড় পানি' অর্থাৎ ডাবের জল খাওয়াইয়া তাহার 'জাতি নাশ' করা হইত। সেই জাতিচ্যুত হতভাগ্য যতদিন না কুটুম্ব স্বজনকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া 'ভূরি ভোজ' দিতে পারিত ততদিন সে একঘরে হইয়া থাকিত। আবার টাকা ধার নিয়া যে ঋণী টাকা শোধ দিতে চাহে না তাহাকেও পানের সাহায্যেই সায়েস্তা করা হইত। দুই-

তিনজন পানকে উত্তমর্ণ অধমর্ণের দুয়ার গোড়ায় বসাইয়া রাখিত, বেচারা ঋণী এবং তাহার পরিবারবর্গ আর বাড়ীর বাহির হইতে পারিত না, কেননা সেই অস্পৃশ্যের গায়ের বাতাস তাহাদের গায়ে লাগিয়া তাহাদের 'জাতিনাশ' হইয়া যাইবে। সুতরাং বাজারহাট করা খাওয়াদাওয়া এমনকি গৃহদেবতার সেবা পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত। দুয়ারে বসিয়া আছে পান, সুতরাং অনশন ছাড়া আর উপায় কি? বাধ্য হইয়া তাহাকে ধার শোধ দিয়া রেহাই পাইতে হইত।

আমার জ্যাঠামহাশয় পুস্‌পুস্‌ গাড়ী তৈয়ারী করাইয়া সেই অস্পৃশ্য পানেদের দিয়া যখন গাড়ী টানাইতে আরম্ভ করিলেন তখন ঢেংকানলের কাছাকাছি সমস্ত রাজ্যে এমন কি কটকে পর্যন্ত হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। যাহা তাহা নয় একেবারে 'জাতিনাশ!' ইহা কে সহ্য করিতে পারে? রাজার কাছে আবেদনের পর আবেদন পত্র আসিতে লাগিল যে, এই ধর্মহীন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারকে বরখাস্ত করুন, দেশের ধর্মরক্ষা হউক।" কটকের কোন কোন সংবাদপত্রে এই ধর্মনাশা ব্যাপার সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা এইরূপ "একো বুদ্ধ বঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার আইছন্তি, সেই ধর্মহীনো পাষণ্ডো অস্পৃশ্য পানর দ্বারা শকট চালনা করি কিরি দেশবাসীরো ধর্মনাশ করিছন্তি।"

তখনকার দিনে কটকে আসিয়া সেখান হইতে মহানদী পার হইয়া এপারে আসিয়া অনেক পথ অতিক্রম করিয়া ঢেংকানল রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সেই পথ অতিক্রম করার মত যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই ঢেংকানল হইতে কটক কাছে হইলেও যেন বহুদূর হইয়া পড়িয়াছিল। রাজার অবশ্য একখানি মোটর গাড়ী ছিল, কিন্তু অন্য সকলের পক্ষে গরুর গাড়ী ছাড়া আর অন্য বাহন ছিল না।

রাজার কাছে দরখাস্তের স্তূপ জড় হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া জ্যাঠামহাশয় রাজার দর্শনপ্রার্থী হইলেন। এই তরুণ সুদর্শন রাজাকে তিনি সন্তানের মত স্নেহ করিতেন অথচ রাজমর্যাদা সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজাও তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতেন, ইনি যে একজন পরম হিতৈষী তাহাও মনে মনে অনুভব করিতেন।

জ্যাঠামহাশয় রাজার কাছে গিয়া তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিলেন তাহা এই, "রাজা সাহেব, আপনার রাজ্যে একদল বেকার যে অস্পৃশ্যতার অজুহাতে বংশগত চৌর্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে ইহা অবশ্য আপনি অবগত আছেন। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন একটি জাতিকে এভাবে চোর করিয়া রাখিবার জন্য দায়ী কে?"

রাজা একটু চুপ করিয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন, "দায়ী কে তাহা বলিতে গেলে সমাজকেই অবশ্য প্রধানতঃ দায়ী করিতে হয়, কিন্তু রায় বাহাদুর, সমস্যাটি মনস্তত্ত্বের সহিত জড়িত, এজন্য ইহার সমাধান সহজ নয়। অঙ্কশাস্ত্রবিদগণ যেভাবে জটিল অঙ্কের সমাধান করেন এই সমস্যাও সেইভাবে সমাধান করিতে হইবে, সুতরাং আমি আপনারই উপর ইহার সমাধানের ভার দিতেছি। আপনি যখন এখানে আসেন তাহার পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় শিশিরবাবু আপনার সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে একটি কথা ছিল সেটি এই যে "ইনি অঙ্কশাস্ত্রেও বিশেষভাবে অভিজ্ঞ।"

জ্যাঠামহাশয় এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, তবে প্রণালীটি কি তাহা ঠিক বুঝা যায় নাই। তিনি প্রথমে রাজার বাঙ্গালী কর্মচারীদিগের প্রয়োজনের সময় নিজের গাড়ী দিতেন, পরে তাঁহাদের নিজস্ব এক একটি পুস্‌পুস্‌ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া কতকগুলি পুস্‌পুস্‌ প্রস্তুতের ভার লইয়াছিলেন। ইহার ফলে অনেকগুলি পানই কাজ পাইল। তাহার পর একদিন রাজার সহকারী দেওয়ান পার্বতীচরণ দাস যখন বিশেষ প্রয়োজনে কটক যাইতেছিলেন, তখন জ্যাঠামহাশয় তাঁহার কাছে গিয়া নোয়াপাটনা পর্যন্ত পেঁৗছিয়া দিবার জন্য নিজের পুস্‌পুস্‌টি তাঁহাকে দিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "পার্বতীবাবু, আপনি পরম বৈষ্ণব, সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই নীচ জাতি বলিয়া এই পানেদের অবজ্ঞা করিবেন না, বৈষ্ণব ধর্মের ইহা রীতি নয়।"

পার্বতীবাবু পানের গাড়ী চড়িয়া যাইতেছেন এই দৃশ্য দেখিবার জন্য পথে জনতা হইয়াছিল, ইহার পর "জাতিনাশে"র আন্দোলন ধামাচাপা পড়িয়া গেল এবং পানেরা "পান চোর" এই পদবী হইতে "পানকুলী" পদবীতে উন্নীত হইল।

আগেই বলিয়াছি ঢেংকানলে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে, ইহার মধ্যে বলরামের মন্দির রামাইত সাধুদিগের অধিকারে ছিল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে যেমন সমারোহে বলরামের রথ টানা হয় রথযাত্রার সময় এখানেও সেইরূপ রথটানার বিশেষ উৎসব হইত। কোন কোনবার এই উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের বিখ্যাত 'ছউ নাচ' সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। এই নৃত্য সম্প্রদায়ের অভিনয় অপূর্ব, নৃত্যের মধ্যে দিয়া কাহিনীটি যেন ছবির মত অঙ্কিত করা হইত।

রথের সময় রাজা কপিলাস পাহাড়ে যাইতেন সেজন্য পথ পরিষ্কার করা হইত এবং পাহাড়ের উপর রাজার যে বাড়ী আছে সেটিরও সংস্কার করা হইত। সে সময় রাজার সঙ্গে বহু লোক কপিলাস পাহাড়ে যাইত, অনেক রাজ অতিথিও সে সময় রাজার সঙ্গে কপিলাস পাহাড়ে যাইতেন। ইহা ছাড়া অন্য সময়েও রাজা দুই-এক মাস কপিলাস পাহাড়ে থাকিয়া আসিতেন।

বিদেশ হইতে যাঁহারা ঢেংকানলে আসিতেন তাঁহাদের নিকট কপিলাস পাহাড় একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। বাস্তবিক এই পাহাড়ের দৃশ্য এত চমৎকার যে দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্তি আসে না। পাহাড়টি সীতাকুণ্ডের বিখ্যাত তীর্থ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ এবং চন্দ্রনাথের মত ন্যাড়া পাহাড় নয়। সমস্ত পাহাড়টি বড় ছোট নানা তরুলতায় আচ্ছন্ন, এমন কি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত নিবিড় জঙ্গলে আবৃত। অবশ্য চূড়া পর্যন্ত কেহই উঠিতে সাহস পায় না। তবে শোনা যায় এই দুর্গম গিরি শিখরে এখনও অনেক এমন যোগী আছেন যাঁহারা শত শত বৎসর হইতে তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চন্দ্রনাথের মন্দিরের দিকে অনেক দিন হইতেই সিঁড়ি ছিল, পরে বিরূপাক্ষনাথের মন্দিরের দিকেও সিঁড়ি হইয়াছে। কিন্তু কপিলাস পাহাড়ে পায়ে হাঁটিয়া উঠিতে হয়, উঠিতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগে, কেন না একটানা উঠা চলে না, মাঝে মাঝে বিশ্রামও লইতে হয়।

পাহাড়ের নীচে সমতলে একটি পল্লী আছে তাহার নাম দেবপল্লী। মন্দিরের পান্ডারা সেই পল্লীতে বাস করে, এবং সেখানেই পাহাড়ের উপরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চিত রাখা হয়। পাহাড়ের উপরে কাঠ ও জলের অভাব নাই, কিন্তু আর সমস্ত দেবসেবার জিনিস প্রত্যহ নীচে হইতে উপরে লইয়া যাইতে হয়। উপরে যথাক্রমে পর পর তিনটি মঠ আছে, সেগুলির নাম তলমঠ, মাঝিলা মঠ ও উপর মঠ। ইহার মধ্যে মাঝের মঠ যেখানে স্থাপিত হইয়াছে সেই স্থানটি অনেক দূর পর্যন্ত সমতল, কিম্বা পাহাড় কাটিয়া সমতল করা হইয়াছে। এই স্থানে দাক্ষিণাত্যের রীতি অনুসারে প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গন, ও অঙ্গনের ঠিক মধ্যস্থলে পাশাপাশি দুটি মন্দির, একটি দেবী পার্বতীর মন্দির ও অপরটি চন্দ্রশেখর শিবের মন্দির। চারি পাশে অঙ্গনের ধারে ধারে আরও অনেক মন্দির, সেগুলি দশ অবতারের মন্দির এবং গণেশ প্রভৃতি গ্রহ দেবতার মন্দির। এই প্রাঙ্গণেরই বাম পার্শ্বে সামান্য উচ্চস্থানে রাজার বাড়ী, আর অন্য দিকে ব্যারাকের একটি আস্তানা, সেটি রাজকর্মচারীদের জন্য।

পার্বতীর মন্দিরের অতি নিকটে প্রস্তরনির্মিত গোমুখ হইতে অবিরত জল পড়িতেছে। মনে হয়, কয়েকটি ঝরণা কোন উপায়ে একত্র করিয়া তাহার জল এইপথে পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। গোমুখী প্রবাহ! জলের ধারা অতি বেগে গোমুখ হইতে উৎসের মত বাহির হইতেছে। কী স্বাদু ও শীতল সেই জলরাশি, স্নানে ও পানে যেন নবজীবনের সঞ্চার হয়।

এই পাহাড়ে যাঁহারা মন্দিরের পূজারী তাঁহারা পূজার ভোগের অংশ নিয়মমত পান, এবং অভ্যাগতগণের মধ্যে বিতরণ বা বিক্রয় করিবার অধিকারও তাঁহাদের আছে। অন্ন, ব্যঞ্জন, ডাল ও একরকম চালের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত পিঠাই হইল ভোগের সামগ্রী। সাদাসিধা জিনিস কিন্তু সুস্বাদু। যাঁহারা কপিলাস পাহাড়ে কিছুদিন বাস করেন তাঁহাদের এই ভোগের প্রসাদই গ্রহণ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে হয়।

অবশ্য আম কাঁঠালের গাছও পাহাড়ে বিস্তর আছে। ফলের সময় সে সব গাছ ফলবান হয় বটে, কিন্তু বানরেরাই তাহার একচেটিয়া অধিকারী। অসংখ্য বানর ও বানরী গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ছোট ছোট বানর শিশুগুলি মায়ের বুকে ঝুলিতে ঝুলিতে স্বচ্ছন্দে এগাছ হইতে অন্য গাছে যাইতেছে। গাছে গাছে ফুলে ভরা লতার বেষ্টনে যেন এক একটি কুঞ্জ রচিত হইয়াছে। পাহাড়ে উঠিবার সময় পথের দুই ধারের অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথশ্রান্তি আর মনে থাকে না। দুধারে খাদ, সেজন্য সাবধানে চলিতে হয়, তবে খাদে পড়িবার আগে গাছ ও ঝোপে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই খাদের ভয় ততটা নাই।

ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ও প্রজাপতি উড়িতেছে, কত বিচিত্র বর্ণের পাখী, আবার কত বিভিন্ন সুরে পাখীর ডাক। মাঝের মঠ পর্যন্ত সিঁড়ি নাই বটে, কিন্তু মাঝের মঠ হইতে উপরের মঠে উঠিবার বার তের ধাপ সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলি বেশী চওড়া নয়, সেজন্য সিঁড়ির পাশের পাথর ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিলে সম্মুখেই কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলি একেবারে পাহাড়ের ধারে নির্মিত হইয়াছে, অপর পাশে এত গভীর জঙ্গল যে সম্ভবতঃ সে জঙ্গল কাটিয়া মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া পাহাড়ের একেবারে গা ঘেঁসিয়া এই কয়টি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে।

প্রথম মন্দিরটি বিশ্বনাথের মন্দির, দ্বিতীয়টি নারায়ণের মন্দির। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত অপূর্ব নারায়ণ মূর্তি পদতল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে ঝরণার বারিপ্রবাহ। অপূর্ব দৃশ্য। ডি এল রায়ের জাহ্নবী সম্বন্ধে বিখ্যাত গানটি স্বভাবতঃই মনে পড়িয়া যায়ঃ—

"নারদ কীর্তন—পুলকিত মাধব
বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্ম কমণ্ডল-উচ্ছলি
ধূর্জটি-জটিল-জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারে
জ্যোতি প্রপাত-তিমিরে।"

নারায়ণের পদতল-প্রবাহিত বারিধারা, এমন দৃশ্য আর কোনখানে দেখিতে পাওয়া সম্ভব নয়। কষ্ঠিপাথরে গড়া অতি সুন্দর মূর্তি, অতিসুন্দর দুখানি চরণ, আর সেই পদতলে প্রবাহিতা বারিপ্রবাহ "জ্যোতি-প্রপাত তিমিরে।" এই প্রপাতই মাঝের মঠে গোমুখী বারিরূপে অবিরত ঝরিতেছে, দিবারাত্রে তাহার বিরাম নাই।

ঢেঁকানলে গিয়া যিনি কপিলাস পাহাড় দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন আমার মনে হয় সেই পার্বত্য দৃশ্য এবং দেবী পার্বতীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র সেই গিরিরাজ্য জীবনে তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। গিরিরাজের কন্যা দেবী পার্বতী, এই কথাটিই বার বার এখনও স্মরণ হয়।

তখনকার দিনে ঢেঁকানল ছিল সুখসম্পদপূর্ণ সমৃদ্ধ রাজ্য, এবং প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন সেই রাজ্যের অধিকারী। কিন্তু রাজা অল্পবয়সেই মারা যান। সোরাইকেলার রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এবং কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল। তিনি ছিলেন বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, মায়ের নয়নের মণি। তাঁহার রাজ্যের প্রজারা তাঁহাকে দেবতার মত মনে মনে উপাসনা করিত। সেই রাজা যখন চিরদিনের জন্য চলিয়া গেলেন, রাজ্যের পক্ষে সে কী দারুণ সর্বনাশ! সমস্ত রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন করিয়া কেবল এক কাতর আর্তনাদ উঠিতেছে "হায়! হায়! হায়!" আবার এদিকে রাজকুমারের অভিষেকের আয়োজনও হইতেছে সেই সঙ্গে, রাজার গদী তো শূন্য থাকিতে পারে না।

পড়ার নেশা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা ঘটনা-সংস্থানে চারপাশে বই নিয়ে আমার জীবন গড়ে উঠেছে। ছোট ঘরের সংকীর্ণ তক্তপোশের অর্ধেকটা এখনো বই দিয়ে ভরা থাকে। কখনো কখনো শুধু পুস্তকের সান্নিধ্যটাই অনেকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এককালে এটা কিছু আত্মতৃপ্তি দিত। কিন্তু আজকাল মোহ দূর হয়ে গেছে। সিনেমা, সংগীত, চিত্রকলা বা ফুটবল খেলা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে বই পড়ার আনন্দ বেশি মর্যাদা পাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখতে পাইনে।

অবশ্য আনন্দের আগে আছে প্রয়োজন। আজকাল বই ও সংবাদপত্রের সাহায্য ছাড়া জীবন চলা দায়। সভ্যতার অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে আমরা এসে পৌঁছেছি কাগজ বা পুস্তকের যুগে। সাহিত্য পাঠের আনন্দ কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার কথা বাদ দিলেও দৈনন্দিন জীবনে বই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পূর্বে ছিল গুরুবাদ; গুরুরা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্মম পুঁজিপতি। তাঁদের হাতে-পায়ে ধরে শিষ্যবৃন্দ ছিঁটে-ফোঁটা জ্ঞান লাভ করতেন। গুরুকে যে কোনো উপায়ে তুষ্ট করা ছাড়া পথ ছিল না। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীরা থাকত অনেকটা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো। ঘরঝাঁট দেওয়া, জল আনা, গরু রাখা এবং গুরুর পা টিপে দেওয়া প্রভৃতি ছিল শিষ্যদের দৈনন্দিন কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা শেষে গুরুদক্ষিণার দাবীটা ছিল আরো কঠিন। একলব্যের মতো শুধু আঙুল কেটে দিলেই যথেষ্ট হতো না, প্রস্তুত থাকতে হতো মাথা দেবার জন্যও। কিন্তু এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেও সকলের পক্ষে গুরুর চরণে আশ্রয় পাওয়া সহজ ছিল না। শিষ্য হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত গুরুর ইচ্ছার উপর। এই খেয়ালী মেজাজের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। এক ঋষি তাঁর ব্রাহ্মণী স্ত্রীর ছেলেদের যথারীতি পড়াতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তাঁর শূদ্রাণী পত্নীর গর্ভজাত ছেলে যখন পড়তে এলো তখন তাকে শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফিরিয়ে দিলেন। অভিমানী বালক মার কাছে ফিরে এসে কঠোর সংকল্প নিয়ে নিজের চেষ্টায় সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করল এবং ঋগ্বেদের উপর সবচেয়ে বিখ্যাত টীকা লিখল 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'। শূদ্রা বা ইতরার ছেলে বলে একদিন যে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' নামের মধ্যে সেই অভিমানটুকু চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে গুরুদের ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থীও অনেক সময় অধ্যয়নের সুযোগ পেত না।

প্রাচীনকালে বই ছিল না বলেই এমনটা সম্ভব হতো। তালপাতার পুঁথি প্রচলিত হবার পরও অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। একে তো লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাছাড়া নিজেদের প্রভাব কমে যাবার আশংকায় পুঁথির প্রচলন করতে গুরুরা চাইতেন না। য়ুরোপে তো প্রথম দিকে বইগুলো মঠের গ্রন্থাগারে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো, যাতে কেউ বাইরে নিয়ে নকল করে করে প্রচার করতে না পারে। প্রাচীনকালের কথা না-ই বা বললাম। কয়েক শতাব্দী পূর্বেও রঘুনন্দন মিথিলা থেকে গুরুকে এড়িয়ে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে বাঙলা দেশে নিয়ে এসেছিলেন। নকল করে আনবার অনুমতি পাওয়া যায়নি। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পারলেই গুরু তাঁর সম্পূর্ণ বিদ্যা গোপনীয়তার শপথ করিয়ে প্রিয়তম শিষ্যকে দিয়ে যেতেন। এমনি করেই যুগ যুগ ধরে গোপনীয়তা রক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র প্রসারের সঙ্গে এলো নতুন যুগের সূচনা। জ্ঞানের রাজ্যে গণতন্ত্র নিয়ে এলো বই। যে জ্ঞানের ভাণ্ডার আবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে আজ সকলের জন্য তার দ্বার মুক্ত হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা জ্ঞান বর্তমানে আর্থিক বিনিময়ের সহজ পর্যায়ে অনেকটা নেমে এসেছে। আগে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হতো গুরুর মর্জির উপর। টাকা দিয়ে বই পাওয়া যায়; শিক্ষকের সাহায্য পাওয়াও স্বাভাবিক। গুরুর বাড়ীতে রাখাল হয়ে থাকবার প্রস্তাব তো দূরের কথা, আজকাল কোনো অধ্যাপক ছাত্রকে বলবার কল্পনাও করতে পারেন না যে লাইনে দাঁড়িয়ে আমার রেশনটা এনে দাও, তার বদলে লজিকটা বুঝিয়ে দেব। ছাত্ররা আগের মতো শিক্ষককে সমীহ করে চলে না; ক্লাশে পড়া না শুনে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করে। কারণ জানে শিক্ষকের সাহায্য অপরিহার্য নয়। বই পড়ে নিজেই জেনে নিতে পারবে। না পারে তো পরীক্ষায় অভিধানের কিম্বা টিউটরের সাহায্য নিলেই চলবে। ভবিষ্যতে শিক্ষকের মর্যাদা আরো কমে গেলে আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা মেধাবী ছাত্র তারা নিজেরাই বই পড়ে বুঝতে পারে; আর যারা মেধাহীন তারা না বুঝে নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের আপাত প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের আবশ্যক কি? প্রয়োজনের সঙ্গে শ্রদ্ধার মাত্রাও কমে আসছে।

কমলেও এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক প্রভৃতি যাঁরা লেখা-পড়ার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা আজও একটু বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। এটা পুরনো সংস্কারের অবশেষ ছাড়া কিছু নয়। লিপি আবিষ্কারের পরই সকল দেশে তাকে কর্মসাধনার সহায়করূপে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের প্রথম রচিত গ্রন্থগুলি ধর্মসম্বন্ধীয়। বইগুলি সযত্নে রাখা হতো মঠে ও মন্দিরে। জনসাধারণ এসব ধর্ম পুস্তকের পাঠ শুনতে আসত চণ্ডীমণ্ডপে এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে। দেবনাগরী, দেবভাষা প্রভৃতি নাম ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক দ্যোতক। প্রাচীন মিশরীয়দের চিত্রলিপি Hieroglyph-এর গোড়ার অর্থও হলো "Sacred carving" লেখক ও পাঠকরা সবাই ছিলেন ঈশ্বরভক্ত ধর্মসাধক। সুতরাং জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ধর্ম থেকে বিযুক্ত হলেও বই ও বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে তাঁদের প্রতি সম্মানটা এখনো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

যোগ্য হলে নিশ্চয়ই তাঁরা সম্মান পাবেন। বই সমাজের কতটা উপকার করেছে তা বিচার করলে বোঝা যাবে একে কেন্দ্র করে যাঁরা আছেন তাঁরা এখনো বিশেষ সম্মানের যোগ্য কি না। এককালে পৃথিবী ছিল পুস্তকহীন; বর্তমানে সাময়িক পত্রিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অন্তত পৌণে দুলক্ষ বই (টাইটেল) প্রতি বৎসর প্রকাশিত হয়। কত লক্ষ লক্ষ লোক পড়ছে এসব বই। গ্রেট বৃটেনের কথাই ধরা যাক্। এখানে শুধু লাইব্রেরী থেকে বার্ষিক প্রায় বত্রিশ কোটি বই পড়বার জন্য ধার দেওয়া হয়। এগুলো কিনে পড়তে হলে দাম লাগত দু'শ দশ কোটি টাকা। অন্য দেশ এখনো এতটা বই-পাগল হয়নি। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বইয়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এত বই পড়েও কি আমরা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছি? তিন হাজার বছর আগে যে সুখ ও শান্তি ছিল না আজ কি তা এসেছে আমাদের জীবনে? ক্ষুধা, মড়ক ও যুদ্ধকে দূর করা আজও সম্ভব হয়নি। হবে যে, এমন ইঙ্গিতও চোখে পড়ে না। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনে প্রকৃত মহৎ বিপ্লব নবযুগের শুভ সূচনা করেনি এখনো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বই গৌণ; হাতে-কলমে পরীক্ষাটাই মুখ্য। তবে বই পড়ে কি হয়? কেন তার এত সম্মান?

আপনার মতো আমিও পুস্তক পাঠের শতেক গুণ দেখিয়ে জবাব দিতে পারি। শুধু তাই নয়, বিশ্বাসও করতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। এত ভালো বই আছে, ইতিহাসের শিক্ষা আছে, তবু কি সত্যকে চিনতে পেরেছি? ক্রুশবিদ্ধ করবার পর যীশু খৃস্টকে আমরা স্বীকার করেছি ঈশ্বরের পুত্র বলে। আবার জোয়ানকে পুড়িয়ে মেরে সেণ্টদের দলভুক্ত করা হয়েছে। এমন দুটো জাজ্জ্বল্যমান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে আমাদের হাতে প্রাণ হারাতে হলো। ভালো বইয়ের পৃষ্ঠায় বন্দী মহৎ আদর্শগুলি নিরুপায় সাক্ষী হয়ে রইল। নিষ্ঠুর নির্বুদ্ধিতা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারল কই?

গান্ধীজীর জীবন যত বড়ই হোক, তাঁর মৃত্যু অন্তত এক দিক থেকে অনন্য-পূর্ব। আর কোনো মৃত্যু পৃথিবীর সর্বত্র এমন শোকোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারেনি। শালবনের নিভৃতে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন; তাঁর সঙ্গে ছিল কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর। চারপাশে ক্রুদ্ধ জনতার উল্লাস-ধ্বনি শুনতে শুনতে যীশু পরলোকগমন করেছিলেন। লাঞ্ছনার ভয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর বন্ধুরাও সামনে এগিয়ে যেতে পারেনি। পায়ে হেঁটে মন্থরগতিতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সুতরাং মহতের মৃত্যু হৃদয় পরিবর্তনের যে সুযোগ আনে, সে কালে তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যু-সংবাদ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বই, সংবাদপত্র, রেডিও, ফিল্‌ম প্রভৃতি আগেই তাঁর নামকে পরিচিত করে পটভূমিকা তৈরি করেছে। তাই আশা করেছিলাম, যে-বেদনা অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর হৃদয়কে এক করেছে, তারই সাহায্যে এক মহৎ আদর্শ গোড়াপত্তনের সুযোগ আসবে; গান্ধীজীর জীবনবেদ পথ দেখাবে আমাদের। বই ও সংবাদপত্রের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর আদর্শ যতটা প্রচারের সুযোগ পেয়েছে আর কোনো মহাপুরুষই তা পাননি। কিন্তু এতে ফল কিছুই হলো না। চেস্টারটন এক জায়গায় বলেছেন যে, বর্তমান যুগে আমরা অতীতের মতো ঢিল ছুঁড়ে মহাপুরুষদের হত্যা করি না; গোলাপ ফুলের তোড়ার নীচে চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারি। প্রশংসার গোলাপ ফুল আজকাল ফোটে বইয়ের পৃষ্ঠায়। গান্ধীজীকে আমরা বুঝতে চাইনি, চাইনি গ্রহণ করতে; তাঁকে ভাসিয়ে দিয়েছি প্রশস্তির বন্যায়।

শোপেনহাওয়ার সম্বন্ধে এক গল্প আছে। তিনি হোটেলে গিয়ে প্রত্যহ একটি স্বর্ণমুদ্রা টেবিলের উপর রেখে খেতে বসতেন। ওয়েটার ভাবত ভালো করে খাওয়ালে বুঝি ঐ মুদ্রাটি পুরস্কার পাবে। কিন্তু রোজই শোপেনহাওয়ার ওটি পকেটে ফেলে চলে যান। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওয়েটার একদিন প্রশ্ন করল যে, রোজ স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নেবার কী অর্থ? দার্শনিক জবাব দিলেন, "আমার চার পাশের টেবিলে যে সব লোক খেতে বসে তারা যেদিন কুকুর, ঘোড়া ও মেয়েদের সম্বন্ধে কথা না বলে কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে শুনতে পাব সেদিন এই মোহরটি ভিখারীদের দিয়ে দেব।" শোপেনহাওয়ার স্বর্ণমুদ্রাটি বিলোয়ে দেবার সুযোগ পাননি। আজকে সে সুযোগ আরও সুদূরপরাহত। কোন গভীর বিষয় উপলব্ধি করবার মতো মানসিক স্থৈর্যের অভাব ঘটেছে। সমাজে চলতে গেলে পৃথিবীর সব খবরই রাখা চাই। খেলাধুলো, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম,—সব বিষয়েরই কিছু কিছু খবর না রাখলে সাধারণ আলাপ-আলোচনাও চলতে পারে না। একালের কালচার মনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার মধ্যে: সকল বিষয়ে দু' একটা কথা বলবার ক্ষমতা থাকা চাই; না হলে লোকে আপনার শিক্ষায় সন্দেহ প্রকাশ করবে।

যিনি সাহিত্যের চর্চা করেন, তাঁর শুধু সাহিত্যের খবর রাখলেই চলবে না, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলা, কোরিয়ার যুদ্ধ, পিকাসোর শিল্পরীতি, ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফরাসী মন্ত্রিসভা, খাদ্যশস্যের পরিসংখ্যা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে দু চারটে মন্তব্য করবার মতো পটভূমিকা না থাকলে অবজ্ঞার পাত্র হওয়াই সম্ভব। বিজ্ঞান পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছে; বইয়ের মারফৎ টেবিলের উপর সংগৃহীত হয়েছে দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার। কিন্তু এদের সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা নাই আমাদের। বিজ্ঞান নানাবিষয়ের উন্নতি করলেও আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেনি। পূর্বে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে স্বল্প পরিধির মধ্যে দু একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর হতো আজ তাকে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুচ্ছ ও অমূল্য—সকল প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করতে চাই। সুতরাং আমরা সব কিছুর উপর চোখ বুলিয়ে যাই, মন বুলাতে পারি না। পারি না গভীর বস্তুকে আয়ত্ত করতে। গোয়েন্দা কাহিনীও রম্য রচনা তাই এ যুগের বিশেষ সৃষ্টি।

চীনা দার্শনিক তাওয়াই বলেছেন, অন্যকে যে জানে সে চতুর, নিজেকে যে জানে সে জ্ঞানী। বইয়ের যুগ আমাদের চতুর করেছে; অন্যকে জানবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা স্মার্ট হয়েছি; কিন্তু নিজেদের চেনা হয়নি। সকাল বেলায় খবরের কাগজের সম্পাদকীয় থেকে রাত্রিতে রেডিওর শেষ সংবাদ পরিবেশন পর্যন্ত কেবলই অপরের মতামতের বন্যায় হাবুডুবু খাই। নিজেকে নিয়ে একটু একা থাকবার সুযোগ নেই; একটা জিনিস যে মনের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে দেখব তেমন ফুরসৎ আর কোথায়? বই ও পত্রিকা চারদিক থেকে এসে অপরের চিন্তাভাবনাগুলি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়। পৃথিবীর কোনো সমস্যাকে নিজের মতো করে ভেবে দেখবার অবসর পাওয়া যায় না। নিজেকে চিনবার চেষ্টা তো দূরের কথা, মনের বিশিষ্ট কাঠামোটি রক্ষা করাই মুশকিল। একই বিষয়ে কত বিভিন্ন মত এবং প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের ছাপ মারা। এর কোনটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি নয়? চিন্তারাজ্যের এই 'টাওয়ার অব ব্যাবেল' অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা তুলে দিয়ে খানিকটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্ভব হলে আমাদের হয়তো মঙ্গলই হবে। শস্যের চাষ করতে গেলে আগাছা তো উপড়ে ফেলতেই হয়।

জীবনের গভীর উপলব্ধির জন্য বই অপরিহার্য নয়। এশিয়ার অনেক মহাপুরুষ ছিলেন নিরক্ষর। তাঁরা জগতকে

দেখেছেন প্রত্যক্ষরূপে, বইয়ের জানালা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন নি। উপলব্ধি যেখানে সত্য, প্রকাশ সেখানে হয় সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত। গীতা, বাইবেল, কোরাণের মতো এক একটি গ্রন্থে যুগ যুগান্তের সত্যোপলব্ধি মূর্ত হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ বইয়ের পৃষ্ঠায় এক কথাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যানুভূতির অভাবটা ঢাকতে চেষ্টা করি এখন। সত্য যদি কোথাও থাকে তাও অনাবশ্যক বহুভাষণের ফলে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই প্রসংগে মমের উদ্ধৃত একটি গল্পের উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নাঃ এক রাজা মানুষের ইতিহাস জানতে চাওয়ায় ঋষি-কল্প সভাপণ্ডিত পাঁচশ' খণ্ডের বই এনে হাজির করলেন। রাজা শাসনকার্যে ব্যস্ত; এত বড় বই থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর জানবার সময় নেই। বললেন, বই সংক্ষেপ করে আনুন। বিশ বৎসর পরে পণ্ডিত আবার এলেন পাঁচশ'র পরিবর্তে পঞ্চাশ খণ্ড বই নিয়ে। রাজা তখন বৃদ্ধ বড় বড় বই পড়বার শক্তি নেই। অনুরোধ করলেন আরো সংক্ষেপে করে আনতে। আবার বিশ বছর কেটে গেল; পণ্ডিত এবার মাত্র এক খণ্ড বই হাতে করে এলেন। কিন্তু রাজা তখন মৃত্যুশয্যায়, এক পৃষ্ঠা পড়াও অসম্ভব। পণ্ডিত এই দেখে একটি বাক্যে মানুষের ইতিহাস রাজাকে শুনিয়ে দিলেনঃ He (man) was born, he suffered, and he died. বয়সের সংগে সংগে পণ্ডিতের জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; তাই পাঁচশ' খণ্ডের বই এক লাইনে সংক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। আর এ-যুগে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য পেয়ে এক লাইনের বক্তব্য পাঁচশ' বইয়ে ফেঁপে ওঠে।

বই পড়াকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রয়োজনের পড়াটা হলো এ-যুগের বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্যই বই দরকার। গুরুবাদ উঠে গেছে, সে জায়গায় এসেছে বই। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, মিস্ত্রি, কারুশিল্পী, সবার কাছে আজ বইয়ের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রিসিটি, ট্রেন, জলের কল ইত্যাদি ছাড়া আজকাল আমাদের যেমন চলে না, বই তেমনি হয়ে উঠেছে জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজ করা হয়, তার জন্য তো সম্মান দেখাবার প্রশ্ন ওঠে না।

আর এক শ্রেণীর পাঠক প্রয়োজনের চাহিদা মিটবার পরও বই পড়ে। খেয়াল-খুশি মতো মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টানো কিংবা দু-একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস পড়বার কথা বলছি না। বই না হলে যাদের চলে না, পড়াটা যাদের কাছে আনন্দের উৎস,—বলছি তাদের কথা। এ ধরণের পাঠকের সংখ্যা সব দেশেই কম। বৃটেনে পাবলিক লাইব্রেরির কল্যাণে বিনা চাঁদায় যে কেউ বই পড়তে পারে। কাছে লাইব্রেরি না থাকলে দরজার গোড়ায় মোটর ভ্যানে করে চলমান গ্রন্থাগার চলে আসে। এত সুবিধা সত্ত্বেও জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ জনের বেশি নিয়মিতভাবে লাইব্রেরির সুযোগ গ্রহণ করে না। কয়েক মাস পূর্বে স্যাটারডে রিভিয়্যু পত্রিকায় এক প্রবন্ধেও দুঃখ করে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-গুলির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে বই পড়বার আগ্রহ দেখা যায় না। না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবার পরও নিয়মিত বই পড়াকে নেশা বলা যায়। নেশা কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এবং নেশা প্রধানত ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে বলে সকলের এক নেশা হবে, তাও বলা চলে না। তাশ খেলা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি আর পাঁচটা নেশার মতো বই পড়বার আনন্দ শুধু একাংশের মন আবিষ্ট করতে পারে।

বই পড়তে ভালো লাগে; সময় পেলেই বই নিয়ে বসি। বই পড়ে সংসারের কোনো উপকার করছি এমন মিথ্যা অহঙ্কার আমাদের নেই। নিজেরও উপকার করি না; শুধু আনন্দ পাই। কিন্তু এ আনন্দ নেহাৎ ব্যক্তিগত অনুভূতি। সুতরাং একমাত্র বই পড়বার জন্য কারো সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিসদৃশ ঠেকে।

আমরা ডক্টরেট থিসিসের জন্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর নির্দিষ্ট ধারায় অধ্যয়ন করি না। রোজই পড়ি, কিন্তু পড়ায় আছে অবাধ স্বাধীনতা। আজ যদি পড়ি মেয়েদের পোশাকের ইতিহাস, কাল পড়ব এলিজা-বেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের প্রিয় কুকুর ফ্লাশের জীবনী। পরশু সকালে তুলে নেব রাশিয়ান দর্শনের ইতিহাস, আর বিকেলে খুলে বসব হাওয়াই দ্বীপের উপকথা। পড়ে হজম করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বই চাখবার আনন্দটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। একালের অগুণতি হাল্কা সাহিত্য আমাদের জন্যই বুঝি সৃষ্টি হয়েছে। বই-খোর আমরা কাগজ যুগের প্রোডাক্ট। বইয়ের সাহায্যে ঘরের কোণে বসে আমরা দেশ-দেশান্তর ঘুরে আসি; মানুষের হৃদয়-অরণ্যে প্রবেশ করি; বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও ভূত-ভবিষ্যৎ নখ-দর্পণে প্রতিফলিত করি। এই আমাদের বিলাস, এই আমাদের আনন্দ।

অন্যান্য অনেক নেশার খোরাক যোগাবার জন্য নিয়ম-নির্দিষ্ট পথ আছে। আমাদের জন্য কিন্তু এখনো তেমন কোনো ব্যবস্থা হয়নি। অন্তত এদেশে নয়। হয়তো লাইব্রেরির কথা তুলবেন। কিন্তু লাইব্রেরির গোড়ার কথা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, এর সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে; নেশা-খোরের উপকরণ যোগানো মোটেই এর উদ্দেশ্য নয়। বিলেতে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যে, সাধারণের অর্থ দিয়ে নাটক-নভেল লাইব্রেরির জন্য কেনা উচিত কি না। একদল বলছে যে, সবাই তো বই পড়ে আনন্দ পায় না; কারো ভালো লাগে খেলা, কারো বা সিনেমা। শ'র পিগ-মেলিয়ান বইটি কিনে কর্তৃপক্ষ যদি কয়েকজনের আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করেন তাহলে যারা সিনেমা ভালোবাসে, তাদের জন্য পিগমেলিয়ান ফিল্মটি দেখানো হবে না কেন? সভ্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ না হলে সব আনন্দের মূল্যই তো এক। তাহলে পক্ষপাতিত্ব করা হবে কেন? যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার নয়।

লণ্ডনের বই-খোরদের সুযোগ-সুবিধার বহর দেখে ঈর্ষা হয়। বিনা চাঁদার লাইব্রেরি জালের মতো সমস্ত দেশটা ঢেকে রেখেছে; তবু যাদের পড়ার নেশা আছে, তাদের পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয়। নেশাখোরদের উপকরণ যোগায় কমার্সিয়াল লাইব্রেরিগুলি। এরা চাঁদা নিয়ে বই দেয়, তাই ফ্রী পাবলিক লাই-

ব্রেরি থেকে পার্থক্য বোঝাবার জন্য 'কমার্সিয়াল' কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরা পাবলিক লাইব্রেরির চেয়ে পাঠকদের সন্তুষ্টির জন্য বেশি মনোযোগ দেয়। অথচ তুলনায় চাঁদা খুবই কম। বছরে ষোল টাকা চাঁদা দিয়ে অনধিক সাড়ে দশ শিলিং দামের যে কোনো উপন্যাস এবং একুশ শিলিং দামের অন্য যে কোনো বই একবার একখানা করে পড়বার জন্য পেতে পারেন। পড়ে শেষ করতে পারলে দৈনিক একখানা করে বই ধার করতেও বাধা নেই। নতুন বই বেরোবার সংগে সংগেই এ সব লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। আর একটি লোভনীয় সুযোগ পাওয়া যায় এদের "গ্যারাণ্টীড সার্ভিস" থেকে। অর্থাৎ, বছরে প'য়তাল্লিশ টাকার মতো চাঁদা দিলে কমার্শিয়াল লাইব্রেরি যে কোনো বই সংগ্রহ করে দেবে। যদি স্টকে না থাকে, তা হলেও দু' একদিনের মধ্যে যে করে হোক, দাবী মিটাবে আপনার। অবশ্য বইয়ের দাম একুশ শিলিংএর মধ্যে হওয়া চাই। এমনি আরো অনেক রকম সুবিধা চাঁদা দাতারা পেতে পারে। লণ্ডনে অসংখ্য কমার্শিয়াল লাইব্রেরি আছে এবং শহরের বাইরেও এদের শাখা রয়েছে। গ্রামে চাঁদার হার অপেক্ষাকৃত কম। পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায়সুলভ প্রতিযোগিতা থাকে বলে পাঠকরা লাভবান হয়।

কলকাতার পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে কমার্শিয়াল লাইব্রেরির কয়েকটি শোচনীয় অনুকরণ দেখেছি। বলা বাহুল্য, নিত্য নতুন বইয়ের দাবী মেটানো এদের শক্তির বাইরে। আমাদের জন্য এত বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিকে সেগুলো হাতে পেঁছে দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়বার উপযুক্ত একটি বই সংগ্রহ করা যে কী কঠিন, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। খোরাক জোটে না বলে অনেককেই বই পড়া ছেড়ে দিতে হয়। স্বধর্মীদের ধর্ম ত্যাগের বেদনাদায়ক দৃশ্য অনেক দেখেছি। প্রায়ই চোখে পড়ে বই পাওয়া যায় না বলে কত উদীয়মান বইখোর শেষ পর্যন্ত তাশ-পাশার আড্ডায় কিংবা ফুটবল-ক্রিকেটের মাঠে ভিড়ে পড়ে।

বই যাদের কাছে নিছক আনন্দের উৎস, এই বিপদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(দশ)

রাঁধো বিনা নুনে,
সাজো বিনা চুণে পান,
টাকা বিনা বিয়ে করে
করো নাচ গান।

কোথায় যেন শুনেছিলাম ছড়াটা বহুদিন আগে। খুব মনে ধরেছিল আর আমার কাছ থেকে শুনে একজন বন্ধুর আরো এত বেশি ভাল লেগেছিল যে, তিনি ওটাতে গানের সুর লাগাবার চেষ্টাও করেছিলেন।

বাস্তবিক এর চেয়ে বড় গান করবার ব্যাপার আর কি হতে পারে? পৃথিবীটা জয় করতে বের হতে বলছে না। আলাদিনের ভেল্কীবাজীর পিদিমের সাহায্যও চাইছে না। এমনকি, একটা শক্ত অঙ্ক কষতেও বলছে না। শুধু নিজের অভাব ও অসুবিধাগুলিকে ভুলে থেকে একটু স্ফূর্তি করে নিতে বলছে।

আমাদের শাদামাঠা গরীবের জীবনে এর চেয়ে সহজ আরামের উপদেশ আর কি হতে পারে?

পাড়ার রোয়াকে বসে খবরের কাগজের কর্মখালির পাতাটার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে শেষ বিড়িটাতে একটা সুখটান দিয়ে সবাই সমস্বরে আমার এমন দরদ-ঢালা সুবিবেচনার কথায় সায় দেবে। এমনকি, এই স্লোগানটা যদি ভাল করে চালু করে নিজের ফতোয়া বলে কোন মেম্বার ঘোষণা করে ভোটযুদ্ধে নামে তার জয় নিশ্চয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

বিনা ভাবনায়, বিনা দায়িত্বে আরাম কে না চায়?

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়াদের মাথায় পাগড়ি কতদিন টিঁকবে, সে মাথা রাজছত্রের তলায় না শত্রুর হাতের বর্শার ডগায় শোভা পাবে, তার কোন ঠিক থাকত না। কাজেই রাজারা সময় পেলেই প্রাণ ভরে স্ফূর্তি করে নিতেন। আমরা, সাধারণ লোকরা, প্রায়ই মনে করি, 'হেসে খেলে নাও, দুদিন বই ত নয়।' যারা একটু বেশি বাহাদুর লোক, তারা ওমর খৈয়ামের ভাষায় বলেন (আসলে এটি নাকি কবি হাকিম তাবাতাবাই লিখেছিলেন, কিন্তু রসিকরা ওমর খৈয়ামের নামে এই রুবাইটি চালিয়ে দিয়েছেন):—

"রোজে কে গুজিস্তা অস্তু আজো
ইয়াদ্ মাকুন।
ফরদা কে নে আমদা অস্তু ফরিয়াদ মাকন॥
ওজে আমদা ও বর্ গুজিস্তা বুনিয়াদ মিনে।
হালি খুশ্বাশ্ ও উমর বরবাদ মাকুন॥"

কি লাভ হবে যে দিন গেল তাহার স্মরণে।
কিংবা যে দিন আসবে, ওগো, তাহার বরণে॥
অতীত ও ভবিষ্যতের ভিত্তি কিছুই নাই।
আজই যখন মধুর, মিছে কালের ভাবনাই॥

আর রাজা-রাজড়াদের দল?

তাঁদের আমোদ-আহ্লাদ করবার ক্ষমতাও অনেক বেশি, আর মনের বাসনার রঙ আকাশের মত উঁচুতে উঠে রামধনু রচনা করতে পারত। অথচ নিশ্চিন্ত থাকতে পারার মত সময় খুব কম। কাজেই উত্তর কলকাতার আড্ডার ভাষায় চুটিয়ে সুখ করে নেওয়ার ইচ্ছা তাদের হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

সব রাজসভাতেই নাচ-গান বিলাসের যে বাঁধাধরা নিয়ম থাকত, তার মানসিক কারণটি বোধ হয় এখানেই।

ভবিষ্যতের উপর ভরসা যার যত কম, বর্তমানকে সে তত বেশি থাবলিয়ে কামড়িয়ে ধরতে চায়। তাই হাতের কাছে সব সময়ই হাজির থাকত আমোদের বন্দোবস্ত, আর সুখের পায়রা। অর্থাৎ মোসাহেব পারিষদের দল।

দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দিনেরও তাই হয়েছিল। মোগলরা যখন প্রায় দিল্লী দখল করে ফেলেছিল, তখন অতি কষ্টে তিনি তাদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তার সময়কার ইতিহাস তারিখ-ই-ফিরোজশাইতে জিয়াউদ্দিন বরণী লিখেছেন যে, কোন যুগে বা কারো রাজত্বে এত বড় সৈন্যদল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ে নি। আলাউদ্দিনের পাঠান সাম্রাজ্য সে সময়েই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু বেঁচে গেল যখন, তখন তিনি কেন সময় থাকতে সুখ ভোগ করতে ছেড়ে দেবেন?

অতএব তার পর থেকেই আলাউদ্দিন মরিয়া হয়ে স্ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলেন। এছাড়া আর যেন কিছু করবার ছিল না। শুধু খানাপিনা, ভোজ, শুধু নাচ-গান, তামাশা। ঐতিহাসিক বরণী লিখে গেছেন:—

"বিরাট কামনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নিজের চেয়ে অনেক বড় বা তার মত লক্ষ জনের সমান হয়ে মগজের মধ্যে বীজাণু সৃষ্টি করতে লাগল। তার আগে আর কোন রাজার মাথায় আসেনি এমন সব কল্পনা তিনি পোষণ করতে লাগলেন। দেমাকে, মূর্খতায় ও নির্বুদ্ধিতায় তার মাথা ঘুরে গেল। একেবারে অসম্ভব কল্পনা ও উদ্ভট বাসনা পোষণ করতে লাগলেন।"

আলাউদ্দিনের ক্ষমতা ছিল, তাই তিনি এরকম জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু যাদের ক্ষমতা থাকে না, তারাও ওই রকম করে আমোদ-আহ্লাদে ডুবে মজে থাকতে চায়। ডাক্তাররা বলে রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু একবার ঢুকলে তার হাত থেকে বাঁচা বড় শক্ত।

মদ প্রভৃতি পঞ্চমকারও ম্যালেরিয়ার চেয়ে কম যায় না। বরং তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কোন রকমে মুখ বেঁকিয়ে, ঢোক গিলে, চিনি-মোড়া কুইনিনের পিল খেয়ে নিতে পারি। আবার আজকাল কুইনিনের বদলে অন্য ওষুধও বেরিয়েছে। কিন্তু পঞ্চমকারের ওষুধ কি?

ওষুধ যে নেই, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেখা গেল। আলা শেষের দিকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সব কেলেঙ্কারীর ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে নিজের হাতের আমীর-ওমরাহরা বিগড়িয়ে যাচ্ছে বা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে নানারকম অশান্তি ও বিদ্রোহও এজন্য হচ্ছে। তাই বহু চেষ্টা করে এসব কমিয়ে দিলেন ও মদ বন্ধ করে দিলেন। দিল্লীর পারিষদদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক সংযমের নিয়ম জোর করে চালু করবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ চরিত্রবান্ হয়ে উঠতে হচ্ছে দেখে বেচারীদের নাভিশ্বাস উপস্থিত হল।

অনেক রকম শারীরিক অত্যাচারের ফলে ভাঙা শরীর নিয়ে আলা বেশিদিন টিকলেন না। কিন্তু রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ আর তা ভুলতে পারে না। কাজেই তার অনুচররা মহাজনের দেখান মহাপথ বেছে নিয়ে খুন-খারাপি শুরু করে দিল। তার নিজের বিশেষ পেয়ারের ক্রীতদাস মালিক কাফুর নিজের হাতে ক্ষমতা রাখবার জন্য আগেই আলাকে দিয়ে হুকুম বের করিয়ে বড় শাহজাদাকে তখ্ত থেকে সরাবার মতলবে বন্দী করিয়ে রেখেছিল। এখন নিজের নাপিতকে পাঠাল আর একজন শাহজাদাকে অন্ধ করে ফেলবার জন্য। তার পর আলার যত ছেলে বা ওয়ারিশ, যে যেখানে ছিল, সবাই কে বন্দী করবার বন্দোবস্ত করল, আর প্রাণে মেরে ফেলল শেষ পর্যন্ত। হাতের পুতুল হিসাবে কোন নাবালক শিশুকে তক্তে বসানোর মতলব ছিল। আলাউদ্দিনের সুলতানার সব সোনারূপা জহরত কেড়ে নিল; এমনকি, তার ক্রীতদাসগুলিকে পর্যন্ত মালিক কাফুর মেরে ফেলল। কারণ ভবিষ্যতে তারাও হয়ত কোনদিন তখ্ত দখল করে বসতে পারে। শাহজাদা কুতুবকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হল। সুবিধামত তার বড়-ভাইয়ের চোখের মত তারো চোখ দুটি 'ক্ষুর দিয়ে যেমন করে খরমুজা কাটে'* তেমন ভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলার মতলব তৈরি হয়ে গেল।

সে সুবিধা আসার আগেই আলা-উদ্দিনের কয়েকজন পুরানো পাইকের কল্যাণে সেই মহা ক্ষমতাশালী ক্রীতদাস মালিক কাফুর রাতারাতি খুন হয়ে যায়, আর পাইকরা কুতুবকে ঘর থেকে মুক্ত করে এনে সিংহাসনে বসায়। তার পর তারা খোলাখুলি বলে বেড়াতে লাগল যে, যে দুজন শাহজাদা এখনো বাকী আছে, তাদের যে কোনটিকে তারা বাদশা বানিয়ে দিতে পারে, আর বাকী যে থাকবে, তাকে কোতল করতে পারে।

যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার খেই কিন্তু হারায় নি।

আলাউদ্দিনের ক্ষমতা ছিল, অর্থাৎ তিনি পণ দিয়ে বিয়ে করে নাচ-গান করেছিলেন। তার ছেলে কুতুবের ক্ষমতা ছিল না। তবুও বিনা পণে বিয়ে করে নাচ-গান করতে ছাড়েন নি। সেই কথাটাই বলতে চাই।

এযুগের রাজস্থানেও যে ওই বিনাপণে বিয়ের পর নাচ-গান চলছে, সে কথাও এখানে বলতে যাচ্ছি।

এত সাংঘাতিক সব ঘটনা, গুপ্ত হত্যা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সুলতান হয়েই কুতুব সুখের স্রোতে ভাসতে শুরু করলেন। মাত্র সাড়ে চার বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু মদ খাওয়া, গান বাজনা শোনা, চরিত্রহীনতা আর স্ফূর্তি করা, উপহার বিলান আর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোন কিছুতেই হাত দেন নি।'
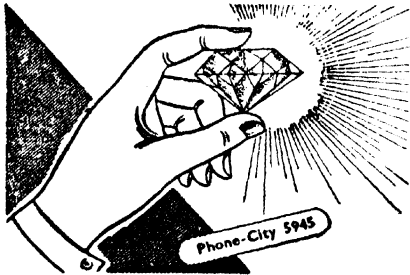
আমাদের জানাশোনার মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাসে রিজেন্সী রেটস্ নামে একদল লক্কা পায়রা রাজ সিংহাসনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে করে নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ ও অপকীর্তি করেছিল। এজন্য তাদের বদনামের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই সময়ে দিল্লীর সুলতানের চারপাশে যা চলছিল, তার তুলনায় বিলাতী কাণ্ড-কারখানা অত্যন্তই নিরামিষ ব্যাপার।

লোকের চোখের সামনে অথবা খুশক্-ই-লাখ, অর্থাৎ লাল রাজবাড়িতে সুলতান দিনে-রাতে সমানভাবে ঢলাঢলি শুরু করলেন। মদ ও অন্যান্য নেশার দোকান এবং নারী বেচাকেনা প্রকাশ্যভাবে চলতে লাগল। রূপসী রমণীদের আর দেখতে পাওয়া গেল না। একটি কিশোর বালক বা সুন্দর খোজা বা রূপসী কিশোরী পাঁচশ বা হাজার বা বড়জোর দু হাজার টঙ্কাতে বিকাতে লাগল।

এই সময়কার মাত্র তিনশো বছর আগে ১০০০ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ এদেশে যখন মুসলমানের হানা সবে শুরু হয়েছে, তখন গজনীর সুলতান মামুদের সভা-

---

*এই উপমাটা ঐতিহাসিক বরনীর

পণ্ডিত আল বেরুনী (এই কথাটার অর্থ হচ্ছে বিদেশী; কিন্তু যদিও তিনি বিদেশী ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভাল করে এ দেশকে বুঝতে ও জানতে কোন স্বদেশীয় সে যুগে চেষ্টা করেনি) দেখেছিলেন যে, হিন্দু মেয়েরা খুব শিক্ষিত ছিল। তারা খেলত, নাচত, ছবি আঁকত। সব রকম সর্বজনীন ব্যাপারে প্রকাশ্যে সক্রিয় অংশ নিত। ১২০০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পাকাভাবে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তার মাত্র একশ' বছরের মধ্যে দিল্লীর সুলতানের নাকের সামনে অর্থাৎ অন্তত যেখানে লোকে সুশাসন আশা করতে পারে, সেখানে এভাবে লোকের জীবনযাত্রা শুরু হল। সারা শহরটাই যেন দৌলতখানা-ই-জোলুষে পরিণত হল। বোতল বাহিনী থেকে আরম্ভ করে সব রকম পঞ্চমকার ও অস্বাভাবিক অপকর্ম পর্যন্ত লোকের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

আলাউদ্দিন যেভাবে চিতোরের সঙ্গে পদ্মিনীকে পেতে চেয়েছিলেন ও বিনা দ্বিধায় গুজরাটের সঙ্গে তার রাণী কমলাদেবীকে দখল করেছিলেন, সে উদাহরণ তার আমীর, মালিক, সাধারণ সৈন্য, এমনকি, মুসলমান প্রজারা পর্যন্ত অনুসরণ করতে ছাড়ে নি। আলা একবার সব বিদ্রোহীদের স্ত্রী-কন্যাদের, তাদের সামাজিক সম্মান প্রভৃতির কোন বাছ-বিচার না করে, কয়েদ করে রেখেছিলেন। সে সময়কার মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন যে, এর আগে পুরুষের অন্যায়ের জন্য তার নারী ও শিশুদের উপর কখনো হাত তোলা হয়নি। এ সময়ে একজনের হত্যার শাস্তি হিসাবে হত্যার মূলে যে দলটি ছিল, তাদের সকলের স্ত্রী-পরিবারের সর্বনাশ করা হয়, প্রকাশ্যভাবে বেইজ্জত করা হয় ও শেষ পর্যন্ত বাজারের বেশ্যা বানাবার জন্য বদমায়েসদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মায়েদের মাথার উপর বাচ্চাদের রেখে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। মুসলমান ঐতিহাসিক দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, কোন ধর্ম বা জাতে এরকম অত্যাচার করার বিধি নেই।

দিল্লীতে পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার পথে প্রথম ও সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের কাছ থেকে। তিনি আজমীর ও দিল্লীর রাজা ছিলেন। মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে শক্তিশালী বাধা এসেছিল রাজপুত রাণা সঙ্গের কাছ থেকে। তিনি যে শুধু মেবারের রাজা ছিলেন, তা নয়। প্রায় সমস্ত রাজপুতনাকে একসঙ্গে করে ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বাবরকে বাধা দিয়েছিলেন।

কাজেই মোগল-পাঠানের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি পড়েছিল প্রতিবেশী রাজস্থানের উপরে। শত্রুর প্রতি এই যে

মেয়েদের অস্তিত্বহীনতা

পাইকারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা দিল্লী থেকে চালু করা হয়েছিল, তার ধাক্কা স্বভাবতঃই সবচেয়ে বেশি পড়েছিল রাজপুতদের উপর। দিল্লীর হারেমের উদাহরণও ওরাই সবচেয়ে বেশি কাছে থেকে ও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে এবং গ্রহণও করেছে।

এ-যুগে আমরা রাজস্থানে কড়া পর্দা ও মেয়েদের অস্তিত্বহীনতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। বিশেষ করে মেবারে মেয়েদের যে অসহায়তা দেখি, তার চেয়ে বেশি অসম্মান আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তার কারণটাও ভুললে চলবে না। সে কথা পরে হবে।

এখন ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য রাজস্থানের গান শুনতে শুনতে দিল্লীর গীত বার বার এসে পড়ে। এই দুই অঞ্চলের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ এত বেশি, মাখামাখি আর মারামারি—দুই-ই এত ঘন ঘন হয়েছে যে, রাজস্থান কাহিনীতে দিল্লী মোটেই 'দূরে অস্তু' নয়।

এটা শুধু আমার বা সময়ের দূরত্ব থেকে বিচার করতে অভ্যস্ত কোন ঐতিহাসিকের কথা নয়। দিল্লীর মসনদ বা রাজস্থানের যে কোন সিংহাসন শয়নে স্বপনে জাগরণে পরস্পরের কথা ভেবেছে। ভাবতে বাধ্য হয়েছে, উদাহরণ হিসাবে জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত গোপন আত্মকথা ধরা যাক। আকবরের সময়কার রাজস্থান-বিজয় শেষ হয়ে গেছে। এমনকি, মেবারের রাণাও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। জাহাঙ্গীরের রাজস্থানের জন্য আর কোন চিন্তাই নেই। জীবন জুড়ে রয়েছে নূরজাহানের রূপের ছটা আর বুদ্ধির দীপ্তি।

এমন সুখের সময়ে জাহাঙ্গীরের একটা পার্টির বর্ণনা দেখা যাক। নয়া-দিল্লী বা কলকাতার ককটেল পার্টি তার

তুলনায় নেহাৎই নিরামিষ বা হবিষ্য কারবার। কোন বাধা-বন্ধন ছিল না সে পার্টিতে। স্যার টমাস রো বা দু-একজন যাঁরা একটু রয়ে সয়ে নেশা করতেন, তাঁরা ছাড়া কেহ প্রকৃতিস্থ ছিল না। ঘুমে ঢলে না পড়া পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নিজে কখন সরে পড়তেন না। নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে তবে বাতি নিবিয়ে দেওয়া হত আর সবাই তখন বিদায় নিত। আগ্রার সব ফিরিঙ্গীরা (অর্থাৎ ইউরোপীয়রা) এই রকম পার্টিতে নির্বিচারে নিমন্ত্রণ পেত প্রাসাদে আসবার জন্য এবং তাঁরাও এই সব পান-বিলাসের কাহিনী লিখে গিয়েছে। (ইংলন্ডের লেখকদের ইংরেজ নামে অভিহিত করার প্রথম চিহ্ন আমরা জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে পাই। তিনি তাদের 'অংরেজ' বলে বর্ণনা করেছেন)।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর বদান্যতার অফুরন্ত উৎস হয়ে উঠতেন। দয়া উথলিয়ে উঠত, এমনকি, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সাধু মতবাদ পর্যন্ত তিনি সে সময় আলোচনা করতেন। এরকম করতে করতে কখনো কখনো তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন।

খৃষ্টধর্মে সৎ জীবনের রীতি পালন সম্বন্ধে দশটি অনুশাসন আছে। জাহাঙ্গীর টেন কম্যান্ডমেন্টসের জায়গায় বারোটি অনুশাসন চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। তার চতুর্থটি হচ্ছে পানদোষ সম্বন্ধে।

তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, নেশা হয়, এমন কোন মদ বা নিষিদ্ধ আরক কেউ তৈরি বা বিক্রী করতে পারবে না। যদিও আমি নিজে মদে আসক্ত, আর আঠার বছর বয়স থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বদা মদ খেয়েছি।

ওয়াকিয়ৎ-ই-জাহাঙ্গীরীতে তিনি লিখেছেন যে, প্রথমে তিনি একবার শিকারে ক্লান্ত হয়ে হাকিমের কাছে একটু চাঙ্গা হবার মত পানীয় চেয়ে পাঠান। হাকিম তাঁকে দেড় পেয়ালার মত মিঠে হলদে মদ পাঠিয়ে দেয়। ফল হল খুব আরামদায়ক, কিন্তু এই সময় থেকেই জাহাঙ্গীর মদ খেতে আরম্ভ করলেন। মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে এমন হল যে, আঙুরের রসের মদে আর শানাত না এবং দুবার করে চোলাই করা (ডবল-ডিস্টিলড্) আরক খেতে আরম্ভ করতে হল। ন' বছরে মাত্রা উঠে গেল কুড়ি পেয়ালায়। তার মধ্যে চৌদ্দ পেয়ালা দিনমানেই সাবাড় হয়ে যেত। ওজন ছিল তার কমসে কম ছয় সের।

জাহাঙ্গীর নিজে লিখেছেন যে, শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, কাঁপতে কাঁপতে নিজের পেয়ালা নিজের হাতে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষে মদ কমিয়ে দিয়ে ফালুহা (সম্ভবত ভাঙ) ধরলেন, আবার পরে ভাঙের চেয়ে চড়া নেশা আফিম ধরলেন। ছচল্লিশ বছর বয়সে আফিমের মাত্রা হল চৌদ্দ রতি।

নূরজাহান শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের মদের মাত্রা কমিয়ে নয় পেয়ালা বাঁধা করে দিলেন। তবু মোগল সম্রাট কখনো কখনো গাইয়ে-বাজিয়ে ও নর্তকীদের নিয়ে আনন্দ করতে করতে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন। একদিন নূরজাহান নিজে এসে বাধা দিলেন, কিন্তু যিনি হিন্দুস্থানের হাতে-কলমে সম্রাজ্ঞী, জগতের আলো বলে আদরের নাম দিয়ে যাঁর রূপরাশিকে সম্মান নিজে দিয়েছিলেন, তাঁর কথাও জাহাঙ্গীর কানেই তুললেন না।

কখনো কখনো তিনি প্রাসাদ থেকে সটকিয়ে পড়তেন আর অজানা তাড়িখানায় ঢুকে সাধারণ মাতালদের সঙ্গে মিশে যেতেন। প্রজাদের কাছে খুব প্রিয়

ছিলেন তিনি। দেওয়ানী আমে রাজকার্য ও বাদশাহী আদব-কায়দা, থুড়ি রাজোচিত স্থূআচার, শেষ হয়ে যাবার পর সব রকমের প্রজার কাছেই তিনি দর্শন দিতেন বলে এই সব নৈশ য়্যাডভেঞ্চারে অনেকে তাকে চিনে ফেলত। কিন্তু তিনি তাদের বলে দিতেন যে, কেহ যেন তাঁর কাছে সে সময় কিছু প্রার্থনা না করে, কারণ মদের পেয়ালার সেলিম যা দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি করবেন, তখ্‌ত-ই-তাউসের জাহাঙ্গীর তা দিতে রাজী না হতে পারেন।

এত কান্ডজ্ঞান ছিল তাঁর। তবুও মদ ও স্ফূর্তির মাত্রা কমাতে পারতেন না।

ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো লিখেছেন যে, জাহাঙ্গীর বেশির ভাগ রাজকার্য রাত্রে করতেন, আর অনেক সময় তাড়াতাড়ি এত মাতাল হয়ে যেতেন যে, প্রায়ই কাজ করিয়ে নেবার বা বাদশাহী হুকুম বের করে নিবার সুযোগ হত না।

সেনাপতি মহবৎ খাঁর হাতে বন্দী হবার পর জাহাঙ্গীরকে বিজয়ী সেনাপতি কিছু বর প্রার্থনা করতে অনুমতি দিলেন। সেদিন বন্দী সম্রাটের প্রতি এই বিশেষ নেক-নজরের কারণ ছিল যে, তিনি নূরজাহানকে সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্রীর পদ থেকে চ্যুত করবেন বলে ঠিক ছিল। সম্রাট ওমর খৈয়ামের কবিতার মত একটি প্রার্থনা জানালেন—

'দাও আমার সরাব আর সুলতানা।'

বুদ্ধিমান রাজপুত সেনাপতি (শিশোদীয়া রাজবংশের সন্তান ও মহারাণা প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র হয়েও ইনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন) মহবৎ খাঁ দুটিই জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে দূরে রাখলেন।

সরাব—কারণ ইসলামে মদ বারণ।

সুলতানা—কারণ নূরজাহান মদের চেয়ে অনেক বেশি মাতাল করা নেশা। এবং তার উপর ক্ষুরের চেয়ে বেশি ধারালো বুদ্ধি তাঁর।

মহাবৎ খাঁ ভোলেন নি যে, নূরজাহান শুধু যে হাতে-কলমে সাম্রাজ্য চালাতেন ও জাহাঙ্গীর নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন তা নয়, জাহাঙ্গীরের সম্ভ্রাম্য পরিবেশে লেখা থাকত 'বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুম —রাণী বেগম নূরজাহানের নামের ছাপ পেয়ে সোনার জৌলুষ একশ' গুণ বেড়ে গিয়েছে।' মহবৎ খাঁ ভোলেন নি যে, জাহাঙ্গীর বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, নূরজাহানই সাম্রাজ্যের একেশ্বর; তিনি নিজে শুধু 'এক সের মদ ও আধ সের মাংস' ছাড়া আর কিছু চান না। (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী)।

এমন যে সম্রাট জাহাঙ্গীর—যিনি রাজকার্য কি দেখতেন, তা নিজেই একমাত্র জানেন—তিনিও তাঁর দৃষ্টি সর্বদা রাজস্থানের দিকে জাগ্রত রাখতেন। তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণখোলা রচনা, সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায় রাজপুত ও রাজস্থান সম্বন্ধে। তিনি ভুলতে পারেন নি যে, তাঁর মা ছিলেন রাজপুত, তাঁর সবচেয়ে বড় সেনাপতি ধর্মান্তরিত রাজপুত, তাঁর সবচেয়ে বড় সহায় রাজপুত। আর সবচেয়ে বড় শত্রুও রাজপুত।

দিল্লী ও রাজস্থানে সম্বন্ধ এতই বেশি।

এ ত গেল শুধু দিল্লীর উত্থান ও বিস্তারের সময়ের কথা। দিল্লীর পতনের সময়ও তাঁর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পড়েছে রাজপুতের ছায়া। রাজপুত যার স্বপক্ষে লড়েছে, সেই ভাই ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে তখ্‌তে বসেছে। তাঁর অস্ত্রধরা হাত সরিয়ে নিল বলে দিল্লী শক্তিহীন হয়ে গেল। রাজপুত যদি শক্তিমান ও সম্মিলিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসন রক্ষা করত, তাহলে তা আরো কিছুদিন নিশ্চয়ই টি'কে যেতে পারত।

তাই আবার বলতে পারি যে, রাজস্থান কাহিনীতে দিল্লী মোটেই 'দূর্ অস্ত্' নয়। (ক্রমশ)

ফুলকারি শিল্প

রম্পা পাল

ফুলকারি হচ্ছে সূচের কাজ করা শাল, যা 'বাগ' (ফুলবাগিচা) নামেও পরিচিত। উত্তর ভারতের মেয়েরা প্রাচীন কাল থেকে এ জিনিসটি ব্যবহার করে এসেছেন। ফুলকারির চিকণ কাজ সাধারণত নরম সিল্কের সুতো দিয়ে খদ্দরের উপর হয়ে থাকে। এই সিল্ক কাশ্মীর থেকে সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলেও পূর্বে আফগানিস্থান থেকে আমদানী করা হত। ফুলকারির জন্যে সাধারণত লাল, গাঢ় নীল ও শাদা জমির খদ্দর ব্যবহৃত হয় এবং সিল্ক সুতোর মনোমত রঙ হচ্ছে শাদা, সোনালি, সবুজ ও ফিকে লাল।

ফুলকারি কাজ খুব সরল—উপর দিকে, পাশের দিকে এবং একটা বিন্দু কেন্দ্র করে পাখার মত গোলভাবে ছড়িয়ে সোজা সেলাই করতে হয়। পাড় শক্ত করবার জন্যে কখনও কখনও হেরিংবোন, ক্রস-স্টিচ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য যে কোন সূচী শিল্পের মতো ফুলকারি কাজও দীর্ঘ অভ্যাস এবং শিক্ষা সাপেক্ষ। শালের পাল্লায় পৃথক কাজ তোলা হয়, যা ফুলকারির জমির কাজ থেকেও ঢের সুন্দর। কোন কোন বাগে পাল্লা নেই, শুধু সরু একটি পাড় থাকে।

বাগের উপর সূচের কাজ এত ঘন-সন্নিবদ্ধ হয় যে, জমির একটি সুতোও আর দেখা যায় না—সমস্ত বাগ জ্যামিতিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এক রঙা এবং কখনও বা দুই রঙা নক্সায় ঢেকে যায়। বাগগুলি উজ্জ্বল বুটিদার পরদার মত দেখায়। এ ধরণের কাজ পূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট ও ঝিলাম জেলায় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই দেখা যেত। এই স্থানগুলো এখন পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ঘুনগাট বাগের কথা উল্লেখ না করলে একটি বড় ত্রুটি থেকে যাবে। ঘুনগাটের অর্থ হচ্ছে, অবগুণ্ঠন—বিবাহিতা যুবতীকে পুরুষ গুরুজনদের সামনে মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকতে হত। এ প্রথার বেশি প্রচলন ছিল রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে। বাগের মধ্যে ঘুনগাট একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। ঘুনগাটের নক্সা সোনালি সিল্কের সুতো দিয়ে লাল খদ্দরের উপর এবং কখনও কখনও হালোয়ান নামক ফিকে লাল রঙের এক প্রকার বিদেশী কাপড়ের উপর তোলা হয়। শালের উপর দিকে মাঝামাঝি জায়গায় ঘুনগাট থাকে—যাতে মাথা আবৃত থাকে এবং দরকার মতো তাড়াতাড়ি মুখের উপর ঘোমটাটি টেনে দেওয়া যায়। ঘুনগাট নক্সার আকৃতি ত্রিভুজের মত; ভূমি শালের পাড়ের উপর এবং শীর্ষবিন্দু অবগুণ্ঠনবতীর গ্রীবাদেশের নীচ পর্যন্ত নেমে আসে। বাগে আড়ম্বর কিছু নেই, শুধু এক সেলাইয়ে ফিতার মতো দুটি মাত্র ডোরা থাকে।
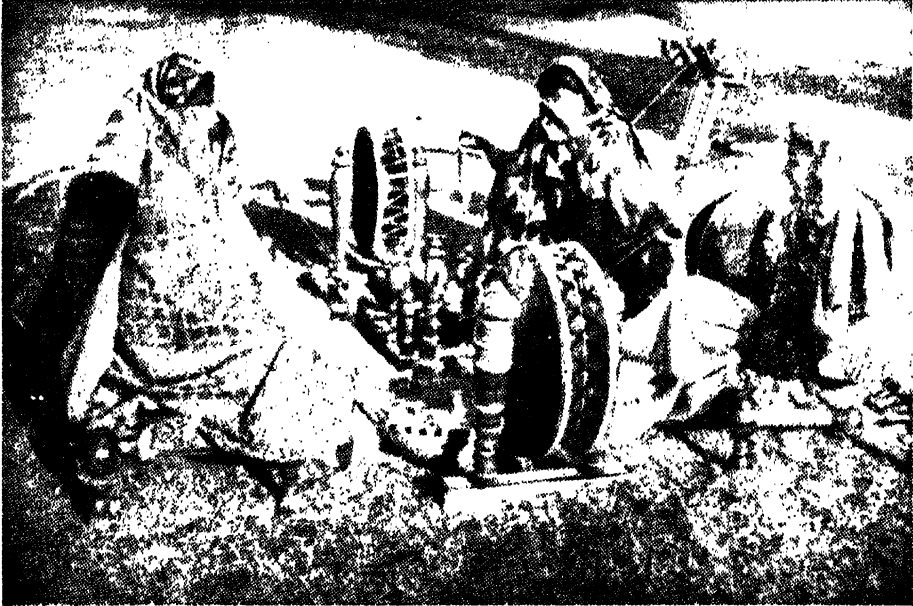
গ্রাম্য মেয়েরা শীতের দিনে ফুলকারি গায়ে দিয়ে চর[illegible] কাটছে

পূর্ব-পাঞ্জাবে যেসব বাগ তৈরি হয়, সেগুলোতে অল্পবিস্তর ফুল তোলা থাকে এবং তার সাথে কখনও কখনও নানা উজ্জ্বল বর্ণের চৌকা নক্সাও দেখা যায়। এ অঞ্চলের বাগের পাল্লাগুলো অপরূপ কারুকার্যশোভিত। 'ফুলকারি' ও 'বাগ' দুটি শব্দই সমার্থবোধক—ফুলতোলা শাল। কিন্তু সাধারণত পশ্চিম পাঞ্জাবে শেষোক্তটি আর পূর্ব-পাঞ্জাবে প্রথমোক্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণ পাঞ্জাবের ফুলকারি নক্সা ও সেলাই দুদিক থেকেই কিছুটা ভিন্ন। এখানকার ফুলকারিগুলোর পাড় অধিকতর চওড়া এবং আড়াআড়ি সেলাই ও অনেকটা আলগা সাটিন-সেলাই দ্বারা পাড়ের দুদিকই সুন্দর নক্সায় ঢেকে দেওয়া হয়। এগুলিতে পশু-পাখির আকৃতিই বেশির ভাগ তোলা হয়ে থাকে। পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাব উভয় অঞ্চলেই ফুলকারি ও বাগের উল্টো পিঠে অস্পষ্ট বিন্দুবৎ চিহ্ন ছাড়া আর কিছু থাকে না। দক্ষিণ পাঞ্জাবের ফুলকারি অপেক্ষাকৃত অমসৃণ, কারণ এগুলোতে সিল্কের চেয়ে কার্পাস সুতো দিয়েই বেশির ভাগ সুচের কাজ করা হয়। এ অঞ্চলের সংগতিসম্পন্ন কৃষক-বধূরা তাদের শাল রুপোর গহনার নক্সা দিয়ে অলঙ্কৃত করে এবং শালের যে প্রান্ত মাথা বেষ্টন করে, সেখানটায় একটি ছোট্ট রুপোর শকল সেলাই করে দেয়।

পাঞ্জাবের বলিষ্ঠ, কঠোর পরিশ্রমী পল্লীবালারা তাদের কলকণ্ঠ ও উচ্চহাস্যের জন্যে বিখ্যাত। কখনও কখনও তাদের কর্কশ ও অমার্জিত বলে মনে হয়। কিন্তু বাইরের কাঠিন্য সত্ত্বেও তাদের অন্তরের কোমলতা যেন বাগের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফুলকারি যথার্থই ফুলের বাগ—পুষ্পসম্ভারের বিচিত্র নক্সায় এর সর্বাঙ্গ খচিত। ফুলের কাজের জন্যেই এই শিল্পকে বলা হয় 'বাগ'। পাঞ্জাবী নারীর চিন্তা ও কল্পনা অতি সুন্দরভাবে বাগের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়।

নক্সার বিষয়বস্তুর জন্যে তাকে বেশি-দূরে যেতে হয় না। তার মৌলিক কল্পনা সূচিমুখের অজস্র খোরাক যুগিয়ে থাকে। দূরে কাছে নানা জায়গা থেকে সে বিষয়-বস্তু আহরণ করলেও তার গ্রাম্য পরিবেশে যা তার পরিচিত বস্তু,—যেমন ঘরবাড়ি, ক্ষেত-খামার, চন্দ্র-সূর্য, মাকড়শা ও তার জাল, সোনালি যবের ক্ষেত, যুঁই ও গাঁদা, প্রিয় ফল-ফলারি, শাক-সবজি, এমনকি, পরোটা, আয়না, চিরুণী, তীক্ষ্ম তরবারি (সম্ভবত স্বামীরা যখন যুদ্ধ করতে যেত), কখনও কখনও পরিপুষ্ট নারিকেল, যে সমুদ্র সে দেখেনি, সেই দূর সমুদ্রের ঢেউ এবং আরও অনেক কিছু সুচের মুখে ফুটে ওঠে। কখনও কখনও একপ্রস্থ গয়নাগাটির তাবত পদ—বালা, দুল, আংটি, নাকছাবি, তাগা সবকিছু ফুলকারির এক প্রান্তে স্থান পায়। এগুলোকে কড়াকড়ি অর্থে নক্সা ততটা বলা চলে না—এগুলোকে সিল্কের সুতোয় তার গোপন আকাঙ্ক্ষারই একটি নির্দোষ অভিব্যক্তি বলা সংগত!

সাধারণ পাঞ্জাবী মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি গ্রাম্য মেয়ের জীবনযাত্রার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। তার জীবন কঠোর কর্তব্যময়। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তার গৃহকর্মের বিরাম নেই। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে, ভজন-আহ্নিকের পর সে দিনের আহার্যের জন্যে গম ভাঙতে বসে। তারপর সূর্যোদয়ের সংগে সংগে আমরা তাকে দেখতে পাই গোয়ালঘরে দুধ দোহাতে। তারপর রান্নাবান্না ও ধোয়া-মোছা, ছেলেপিলে থাকলে তাদের তত্ত্বাবধান এবং মাঠে স্বামীর খাবার পেঁাছে দেওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর সে চরকায় সুতো কাটতে বসে। চরকায় সুতো কাটতে কাটতে সে তার শিশুকেও স্তন্য দেয়; শিশু শীঘ্রই তার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তাকে প্রতিদিন চরকায় সুতো কাটতে হয়। এই সুতোয় পরিবারের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরি হবে, স্বল্প পরিধেয়ের সংস্থান এই সুতো থেকেই হয়। এই সময়টাতেই পাড়াপড়শীদের আসরও বসে—বিনা খরচায় তাদের বৈকালিক ক্লাব। এই বৈঠকে গল্প-গুজবের সংগে সংগে ঘণ্টা দুয়েকের কাজও হয়ে যায়। কোনদিন হয়তো সুতো কাটা, কোনদিন বা সুচের কাজ, কাজ কোন-না-কোন একটা

থাকবেই। রাস্তার ধারে বা গাছের ছায়ায় কর্মনিরতা এক-একটি দলকে দেখে আনন্দ হয়—দু-তিনজন চরকা কাটছে, দু-একজন সূচের কাজ করছে, একটি মেয়ে হয়তো চমৎকার 'নালা' (সালোয়ার ও পায়জামার জালের ফিতা) বুনছে, আবার কেউ হয়তো ডুরির সুতো রং করছে। কোন সময় দেখা যায়, আসরের এক কোণে কোন বর্ষীয়সী মহিলা কোন যুবতীর পরিপাটি পাঞ্জাবী খোঁপা বেঁধে দিচ্ছেন; এই কেশকলাপে সময় প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও খোঁপা এক সপ্তাহের বেশি সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় থাকে। তারপর দিনের কজের শেষে লোক-সঙ্গীতের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন। জল-যোগের জন্যে শীতের দিনে ভাজা ছোলা আর গরমের দিনে শশা ও লবণ-মেশানো জাম হাতে হাতে বিতরিত হয় এবং বিশ্রম্ভালাপ ও পরিহাস-রসিকতার ভিতর দিয়ে এর সদ্ব্যবহার হতে থাকে। এই আবহাওয়ার মধ্যে ফুলকারির পরিকল্পনা হয় এবং 'বর্ণসমুজ্জ্বল একখানি মায়াময় আবরণী'তে রূপায়িত হয়ে উঠে।

ফুলকারি শিল্প ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সকল স্তরের মহিলাদের মধ্যেই প্রচলিত। জাটনী ও গুজরী মেয়েরা খুব উচ্চাঙ্গের ফুলকারি তৈরি করেছেন। রান্না, সেলাই প্রভৃতি গার্হস্থ্য বিদ্যার মতো ফুলকারি শিল্পও মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। মা ও পরিবারের অন্যান্য মহিলারা কন্যার বিবাহ-সজ্জার জন্যে ফুলকারি কাজ নিয়ে বসতেন। গৃহস্থালীর অসংখ্য কাজের মধ্যে ফুরসৎ কম, তাই এক-একটি ফুলকারি শেষ করতে কয়েক মাস অতি-বাহিত হয়। আগের দিনে স্নেহময়ী জননীরা মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের অঙ্গ হিসাবে মেয়েকে কমসে কম পঞ্চাশটি ফুলকারি দিতেন৭ এগুলোর অধিকাংশই জামাতা-গৃহের আত্মীয়াদের উপহার দেওয়া হত। কয়েক বছর আগে থেকেই কন্যার বিবাহসজ্জা রচনায় মায়েরা হাত দিতেন এবং প্রচুর শ্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে তা শেষ করতেন।

কোন যৌথ পরিবারের কর্ত্রীঠাকুরাণী এক বৃদ্ধা ভক্তিমতী মহিলাকে আমি জানি, যিনি সংসারের চাপে পরিবারের মেয়েদের জন্যে ফুলকারি তৈরি করে উঠবার সময় পেতেন না। সূঁচের কাজ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ধর্মবিশ্বাসের মতোই তিনি একে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খুব ভোরে উঠে স্নান করে একটি মাটির প্রদীপ জেবলে ফুলকারি বের করতেন, তারপর ভক্তিযুক্ত চিত্তে সূঁচ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম করতেন—যেভাবে ধার্মিকরা মালা জপ করেন। কাজকে ধর্মাচরণের মতো জ্ঞান করার এ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ভাবাড়ে সম্প্রদায়ের মেয়েরা ফুলকারি কাজে বিশেষ পারদর্শী, তারা প্রায়ই পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করে। সাধারণত তারা টাকা নেয় না, ফুলকারিতে যে পরিমাণ সিল্কের সুতো ব্যবহৃত হয়েছে, মজুরির পরিবর্তে সেই পরিমাণ সিল্কের সুতো দাবী করে। ভাবাড়ে পুরুষরা পেশাদার কুসীদজীবী, বানিয়া ও ধুরন্ধর ব্যবসায়ী; তাদের বনিতারা যে কঠোর শ্রম করেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না, তা আশ্চর্যের বিষয়। তারা এখনও জলন্ধর অঞ্চলে এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে চাহিদা আর তত নেই; তাছাড়া খাঁটি সিল্কের সুতো সংগ্রহ করাও কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

ফুলকারি বা বাগ একটি শ্রেষ্ঠ স্বদেশী শিল্প; খদ্দরের উপর সিল্কের কাজ অপূর্ব; সূঁচের কাজ এবং দেশী পাকা রং দিয়ে খদ্দর রঙগানোর কাজও অতি সুন্দর। কোন ড্রয়িং ছাড়া, কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া একমাত্র গ্রাম্য কামারের তৈরি একটি বাটকিন দিয়ে পৃথিবীর আর কোথায় এমন সুন্দর সূচীকর্ম দেখা যায়? তাছাড়া ফুলকারি কাজ সব সময়ে কার্পাস বস্ত্রের উপর হয়ে থাকে। শীতের সন্ধ্যায় এটি পরম উপভোগ্য, এর উষ্ণতা পশমী শালের চেয়ে কম নয়। কর্মব্যস্ত গ্রাম্য গৃহিণী নিত্যিকারের জন্য কারুকার্যহীন লাল রঙের একটি খদ্দরের শাল ব্যবহার করে থাকেন—যাকে শালুও বলা হয়। উজ্জ্বল ফুলতোলা শাল বিশেষ উপলক্ষ্যে ব্যবহারের জন্যে তোলা থাকে।

প্রাচীনকালে বিয়ের কনের ফুলকারি বিশেষ ধরনের লাল কাপড়ে বিশেষভাবে সেলাই করা হত। এর নাম ছিল 'চোপ'। সাধারণত কনের হাতে যখন গজদন্তের বালা পরান হত, তখন পিতামহী তাকে এটি উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করতেন।

হায়! অনেক সুন্দর আচার ও শিল্পের সাথে ফুলকারির আদরও লুপ্ত হয়েছে। শহুরে মেয়েরা একে বর্জন করেছেন, এমনকি, কয়েকটি অজ-পাঁড়াগাঁ ছাড়া গ্রামাঞ্চলেও এর আর কদর নেই। আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিলাতী এমব্রয়ডারি ফুলকারির স্থান নিয়েছে। যদি কারো কাছে ফুলকারি ও বাগ থেকে থাকে, তবে তা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া। আধুনিক তরুণীরা কৃত্রিম সিল্কের চটকদার সস্তা দুপাট্টা বেশি পছন্দ করে।

পাঞ্জাব বিভক্ত হবার অব্যবহিত পর বিধবা ও অনাথা মেয়েদের জন্যে কর্মকেন্দ্র খোলা হয়। সুখের বিষয়, এই কর্মশালাগুলিতে পরদা, কুশন, সুজনী প্রভৃতিতে ফুলকারি, সেলাই ও নক্সার নকল হচ্ছে কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। পাঞ্জাবের এই অতুলনীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা আবশ্যক।

রাজস্থান, গুজরাট, বাংলা, হায়দরাবাদ ও সিন্ধু প্রচুর উপকরণ যোগাতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতেও নানা দুর্লভ রঙ ও নমুনার তাঁতে-বোনা কাপড় পাওয়া যায়। দেশের অন্যান্য অংশেও দেশীয় শিল্পের চমৎকার সব নিদর্শন আছে।

অনেক স্ত্রীলোক দুষ্প্রাপ্য পুরাতন ফুলকারি কেটে জামা তৈরি করেছে। কিন্তু জামাগুলো সুন্দর হলেও এতে শিল্প-কলার প্রতি তাদের খানিকটা দৌরাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে। কেউ কেউ ফুলকারি দিয়ে বালিশের ওয়াড় তৈরি করেছে, যা হয়তো মাস কয়েক মাত্র টিঁকবে। আরও অনেকে তৈরি করেছে পরদা, কুশন ও সুজনী। ফুলকারি শিল্পের কতকগুলো শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বিদেশে চলে গেছে।

চান্ডিলে সর্বোদয় সম্মেলন

গৌরকিশোর ঘোষ

ভয় ছিল, ঘুমটা শেষ পর্যন্ত ভাঙবে কি না। ভয়টা আমার। সঙ্গী ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার এক স্টাফ ফটোগ্রাফার। তাঁর ভরসা ছিল, ভিড়ের চোটে ঘুমুবার সুযোগই হবে না। কারণ, শোনা ছিল সর্বোদয় সম্মেলনে যোগ দেবার সর্বাধিক সুবিধা কর্তৃপক্ষ করেছেন, রেল-ভ্রমণের জন্য কন্‌সেশন টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছে এক-পিঠের ভাড়া দিয়ে দু'পিঠে যাতায়াত। অবশ্য সুযোগটার সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারলুম না। খাদি প্রতিষ্ঠানে ফোন করে জবাব পেলুম, বড় দেরী হয়ে গেছে। কাজেই ভিড় একটা পাবোই, সে সম্ভাবনা সম্মুখে রেখেই যাবার জন্য তৈরি হলাম।

যতটা ভেবেছিলুম, ভিড় ততটা হয় নি। হাত-পা মেলে বসবার জায়গা পেলাম, পিঠটা ঠেস দিয়ে ঘুমুবার বন্দোবস্তও একটা হয়ে গেল। ঘুম তাড়াবার জন্য আমাকে অক্লান্ত সংগ্রাম করতে দেখে সঙ্গী আশ্বস্ত করলেন চান্ডিলে গাড়ি পৌঁছবে সাড়ে তিনটে চারটেয়, ততক্ষণ নিশ্চিন্তে ঘুমাও, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না, অতএব মা ভৈ। শেষ কথাটি সঙ্গী বলেছিলেন কি না আমার সন্দেহ. ট্রেনে ও'র ঘুম হয় না—ওটুকু শুনেই আমি তলিয়ে গেছি।

চান্ডিলে নামলুম তখন ভোর। অন্ধকার তখনো ঘোর। লোকজন, কুলী, মালপত্র, প্ল্যাটফরমের আলো, বিচিত্র বাক্যালাপ, ট্রেনের শব্দ আর শেষ রাত্রের হাড়-কাঁপানো হাওয়ায় কেমন যেন অন্য জগতের গন্ধ। নিত্যকার পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগটা একটু হোঁচট খেল।

কিছু নয় কিছু নয় করেও মন্দ যাত্রী নামল না। প্রায় সবাই সর্বোদয় সম্মেলনে এসেছেন। কিছু প্রতিনিধি আর কিছু দর্শক। বেশির ভাগই পশ্চিমবঙ্গ থেকে। প্ল্যাটফরমের উপরেই দেখা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদাহাসি শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সঙ্গে। এলেন? এলাম। আর কে আছেন? আপাতত একাই। এইটুকু শুধু কথা। ব্যস্—তারপর যে যার আপন গন্তব্যে। সম্মেলন-মণ্ডপ স্টেশন থেকে দু' মাইল। সঙ্গীটি বললেন, এই রাত্রে আর যাবো কোথায়? এইখানেই থাকা যাক। প্রস্তাবটি খারাপ লাগল না। সর্বোদয় আদর্শ হিসেবে আমার কাছে নতুন। মানুষের সর্বাত্মক মুক্তির এক পরিকল্পনা সর্বোদয় সমাজ গড়ে তুলছে, এমন কথা এক কর্মীর মুখে শুনেছিলুম। তাই পূর্ণ উৎসাহে এসেছি। এখনো রাত আছে। কাজ কি তাড়াহুড়ো করে। নতুন ভোরের আলো দিয়ে যদি নতুন আশার মুখ দেখবার সুযোগ পাই, তাকে কাজেই লাগাই। বিশ্রামাগারে তিল ঠাঁই নেই। অগত্যা বাইরে।

অন্ধকারের মধ্যেই রেল কোম্পানীর আয়োজনের বহরটার আন্দাজ পেয়ে গেলুম। যাত্রীদের কষ্ট লাঘব করবার জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত তাঁরা করেছেন। নতুন টিকিট ঘর, যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য এক বিরাট চালাঘর, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, পায়খানা—সব কিছুই নতুন করে করা

সর্বোদয় যজ্ঞস্থলী—অদূরে পাহাড়
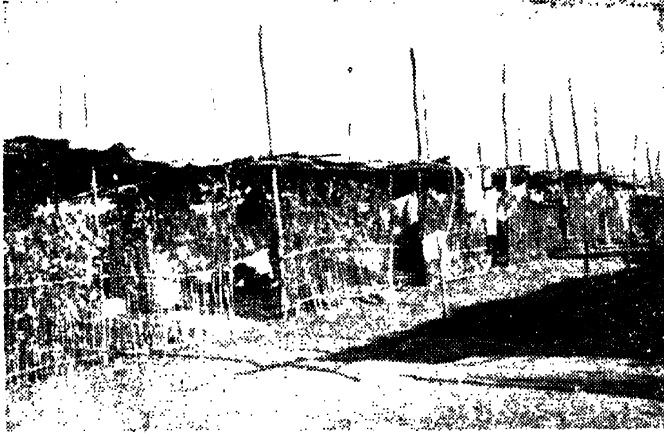
প্রতিনিধিদের বাসগৃহ

হয়েছে। আমরা সেই চালার নিচে আশ্রয় নিলুম।

সম্মেলন-মণ্ডপেও রেল কোম্পানী এক অফিস খুলে বসেছেন দেখলুম। মূল্য দিয়ে প্রবেশপত্র ও খাবার টিকিট নিয়ে আস্তানায় চললুম। ছিটে বেড়ার অজস্র কুটীর। তারই একটির মধ্যে স্থান হল। একা একখানা চালার দখল পেলুম। নেতৃস্থানীয়দের জন্য শিবির নয়, ছিটে-বেড়ার ঘরে বিচালী শয্যা নয়, একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামের মধ্যে সংগতিপন্নদের ঘরে তাঁদের ঠাঁই হয়েছে। এক নজরে জায়গাটা ভাল লাগবার মতোই। শক্ত মাটি, শুকনো বাতাস আর দূরে পর্বতরচিত এক অর্ধবৃত্তের বেষ্টনী।

আয়োজন হয়েছিল দশ হাজার লোকের, অভ্যর্থনা অফিস জানালেন, লোক তিন হাজারের উপর আসেনি। রেল কোম্পানীর বে-সরকারী রিপোর্টও সে কথা সমর্থন করেছে। শুনলুম ওয়ার্ধা থেকে একখানা স্পেশাল এসেছিল আগের দিন, তাতে নাকি তিরিশটে লোকও আসেনি। কাজেই বাকী স্পেশালটি বাতিল করে দিতে হয়েছে। আরো একটি স্পেশাল যথোপযুক্ত যাত্রীর অভাবে বাতিল হয়ে গেছে।

দুষ্ট লোকে সাংবাদিকদের সংগে শকুনের তুলনা দিয়ে থাকেন। শকুন খোঁজে ভাগাড়। আর আমরা সাংবাদিকরা খুঁজি অন্ন অফিস। এতক্ষণ কারো সাক্ষাৎ পাইনি। তার অফিসে যেতেই একজনের সংগে সাক্ষাৎ। তাহলে আপনিই এসেছেন? বিনীতভাবে স্বীকার করি। তারপর এ কোথায়, সে কেমনের পালাটা চুকিয়েই আচ্ছা বলে সরে পড়েন। আমরা সাংবাদিকরা (সহকর্মীরা মাপ করবেন) ঠিক ফ্যাসনদুরস্ত মহিলার মত। সৌজন্যবোধ ঠোঁটে মেখে পরস্পর মিলি, কিন্তু একে অন্যকে সইতে পারিনে, সদা শঙ্কা, এই বুঝি আমাকে মেরে বেরিয়ে গেল।

আটটায় সম্মেলন শুরু হল। সেদিন প্রত্যেকটি সাংবাদিকই নিজের অফিসে যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটির আরম্ভে ছিল "চাণ্ডিল, ৭ই মার্চ"। কেউ কেউ হয়ত "শনিবার"টারও উল্লেখ করে থাকবেন। সম্মেলন চলেছিল ৯ই মার্চ পর্যন্ত।

কাজ শুরু হল সূত্রযজ্ঞ দিয়ে। ঘণ্টা পড়বার সংগে সংগে সভামণ্ডপের মধ্যে অদ্ভুত এক গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। চরকার গুণগুণি। আমার মনে হল, বুঝি বা ঝাউবনে বাতাস লেগেছে।

সমস্ত সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ। সাংবাদিক-দের বাঁ ধারে এক বৃহৎ বেদী। মাটির তৈরি। বেদীটির গায়ে আল্পনা দেওয়া। অবশ্য সে আল্পনায় শিল্পচাতুর্য নেই। বেদীর সামনে প্রতিনিধি ও দর্শকদের আসন। এপাশে পুরুষ ওপাশে মহিলা। সমগ্র রাজ্য থেকেই প্রতিনিধি এসেছে। পুরুষ ও মহিলা, অধিকাংশই শিক্ষিত বুদ্ধি-জীবী।

শুধু একটানা শব্দ শুনে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ হাওয়া চঞ্চল হয়ে উঠল। ফোটো-গ্রাফাররা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বুঝলুম, রাষ্ট্রপতি এসেছেন। রাষ্ট্রপতি ধীরে ধীরে মণ্ডপের মাঝখানে এগিয়ে এলেন। সেখানে সুতো কাটছিলেন আচার্য বিনোবা ভাবে, এই যজ্ঞের প্রধান হোতা। রাষ্ট্রপতি তাঁর পাশেই বসলেন।

সূত্রযজ্ঞের পর, গীতসহযোগে মংগলা-চরণ, তারপর সভাপতি নির্বাচন। আগে শুনেছিলুম, উড়িষ্যা গান্ধী গোপবন্ধু চৌধুরী সভাপতি হবেন। কিন্তু পরে সভাপতির আসনে দেখলুম অখিল ভারত

উড়িষ্যাগান্ধী গোপবন্ধু

কাটুনি সংঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে। গোপবন্ধুবাবু সর্বোদয় সমাজ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন।

খাঁটি মানুষের সংগলাভ দুরূহ, দর্শন দুর্লভ। যাঁর কাছে একদণ্ড দাঁড়ালেই চিত্ত শান্ত হয়, এমন লোকই তো খাঁটি। গোপবাবুকে দেখে ধন্য হলুম। 'নিরহংকার', 'সরল', 'কর্মী' ইত্যাদি ফাঁকা কথায় তাঁকে বোঝানো যায় না, কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। সর্বোদয় সমাজের এই যদি খুঁটি হয়, তো

রাষ্ট্রপতি ও আচার্য বিনোবা ভাবে সূত্রযজ্ঞে ব্যাপৃত

নিঃসন্দেহে সে সমাজ আমার কাম্য। দুঃখ এই এ মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না।

সর্বোদয় সম্মেলনের প্রধান কর্মসূচী এবারে, এই পঞ্চমবার্ষিক অধিবেশনে, ছিল ভূদান যজ্ঞ। বিনোবাজী এই ব্রত গ্রহণ করে সর্বোদয় সমাজ আন্দোলনের কর্মী-দের চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করছেন।

গান্ধীজীর কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল মানুষের সর্বাত্মক মুক্তি। দারিদ্র্য থেকে, দাসত্ব থেকে, দুর্বলতা থেকে মুক্তি। ইংরেজের শাসন ছিল এক প্রধান বাধা। সে বাধা গান্ধীজী তাঁর জীব-দ্দশাতেই অপসারিত করে গেছেন। বাকী, মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করা। এই আদর্শই সর্বোদয়ের আদর্শ। বিনোবাজী বলেন, দেশের আইন বলবে এটা কর, তবে সে কাজ করব, এমন কেন? আমার অন্তর বলবে এটা কর, এ কাজটা ভাল; এ কাজটা কর না, এটা খারাপ, তবে আমি তা করব। আইন দ্বারা যে মানুষ চলে, সে আদর্শ নয়, বিবেকের বিচার যাকে চালিত করে, সে-ই আদর্শ। সেই আদর্শ মানুষ নিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে, সে সমাজে কোনো শোষণ থাকবে না, পীড়ন থাকবে না, ভেদ-বিভেদ থাকবে না, অন্যায় থাকবে না। এ-ই হল সর্বোদয় সমাজব্যবস্থার ছবি। গান্ধীজীর আদর্শ।

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস-কর্মীরা পরস্পর সাধারণ বন্ধন থেকে ছিটকে পড়লেন। সম্প্রীতি নষ্ট হল তাঁদের। একান্নবর্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। একদল রাষ্ট্র-রথসারথি হলেন। বহুবিধ সমস্যার দ্বারা চালিত হতে হতে কংগ্রেসকর্মীরা পরস্পরের ব্যবধান ক্রমশই বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। একদল সর্বজনমান্য কর্মী লোক আর রাষ্ট্রসারথিদের মধ্যে সম্পর্কের এক শূন্যতা সৃষ্ট হল।

রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁদের পিছনে এই ত্যাগী অক্লান্তকর্মা গোঁড়া গান্ধী-ভক্তদের সমর্থন জড় করতে পারছিলেন না। কংগ্রেসও এক সাধারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে এই সব অতৃপ্ত কর্মিবৃন্দের গঠনপিপাসার শান্তি করতে সমর্থ হচ্ছিল না। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন এই সব পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলোকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলবার এক সম্ভাবনা দেখাল। বহুদিন পরে দেখা হওয়া স্বজনের মতো বিপরীত ভাবের ভাবুকরা যখন পরস্পর উল্লসিত অন্তরে মেলামেশা কর-ছিলেন, তখন এই কথাই আমার মনে এল, ভূদান যজ্ঞ যদি গতিবেগপ্রাপ্ত হয়, তো অনেক কর্মীই কিছু কাজ পেয়ে বেঁচে যাবেন।

অনেকের মনেই প্রশ্ন এসেছে, যে অর্থনৈতিক তীব্র সমস্যা সকল আমাদের দেশে বর্তমান, তা কি ভূদান যজ্ঞ দিয়ে সমাধান করা যাবে? তারও আগেকার একটা প্রশ্ন আছে: ভূদান যজ্ঞ কি সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক রূপ?

এই প্রশ্ন দুটির উপর সর্বোদয় সমাজ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই সব প্রশ্নই এই সম্মেলনে প্রধান স্থান পাবে ভেবেছিলাম। সামন্তশাসিত সমাজ-ব্যবস্থার এক নির্দিষ্ট প্রকারের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল। তেমনি নির্দিষ্ট বুনিয়াদ আছে ধনতন্ত্রবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, সাম্য-বাদী প্রভৃতি অর্থনীতিরও। একের পর
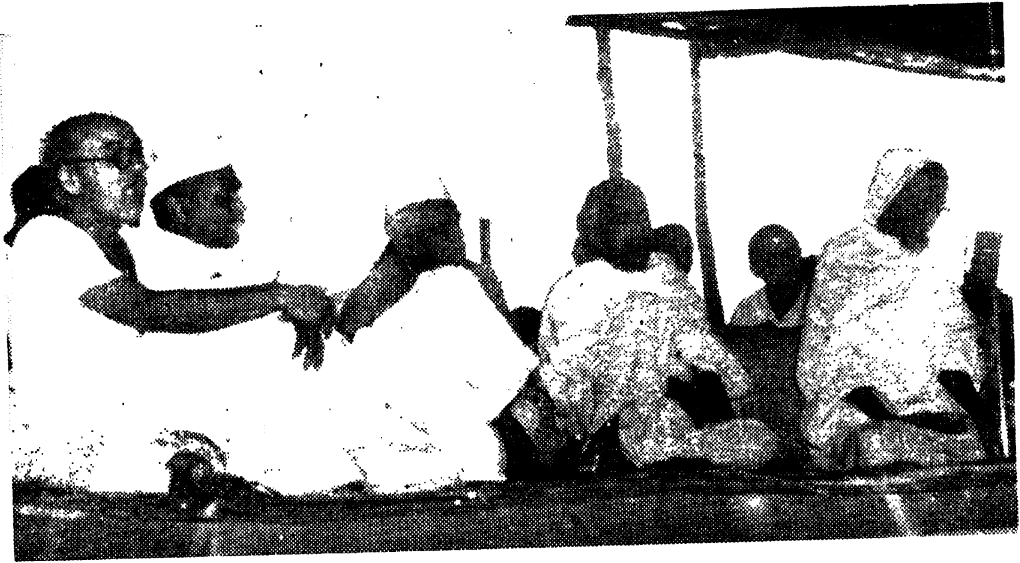
বক্তৃতারত বিনোবাজী

এক সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। তবুও মানুষ পূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছায় নি। সর্বাত্মক মুক্তি তার আজও লভ্য হয়নি। তার জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে অটুট। কিন্তু হাতছানি কই? যুদ্ধাতঙ্ক বিশ্ব তো সেই ইশারার দিকে চেয়ে আছে। সর্বোদয় সমাজ কি সেই ইশারা?

বর্তমান মানুষের দুর্ভাগ্য, বর্তমানে সব কিছুই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। কি সামরিক শক্তি, কি অর্থনৈতিক শক্তি, সব কিছুই জমা হচ্ছে কেন্দ্রে। ফলে স্বল্প সংখ্যক মানুষের তাঁবেদার হয়ে বাকী সবার দিন কাটছে। বর্তমান দুর্দশার মূলে কারণও তাই। কাজেই সর্বাত্মক মুক্তির একটি প্রধান সর্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। বিনোবাজী যাকে বলেন, "কর্তৃত্ব বিভাজন"।

এইখানে আর একটি প্রশ্ন জাগে, কংগ্রেস কি এই নীতি অনুসরণ করবেন? তাঁরা বর্তমানে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তা হচ্ছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। এই পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকারের কর্ণধাররা ভূদান যজ্ঞ ও সর্বোদয় আদর্শে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। আশ্চর্য নয় কি!

জনসংঘী সকলের প্রতিনিধিরাই বিনোবাজীর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। বিনোবাজী তাতে খুশী হয়েছেন।

কিন্তু কেউ না এলেও তাঁর চলা থামবে না। যখন দন্ড সম্বল করে বেরিয়েছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন সবাইকে, তখন কেউ সাড়া দেয়নি। তেলেঙ্গানা থেকে চান্ডিল, এতটা পথ আসতে না আসতে এতগুলো হাত এগিয়ে এসেছে। বিনোবাজী প্রেরণাচালিত পুরুষ। তিনি জানেন, তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর আর সম্মুখে অনন্ত পথ। সিদ্ধি যদি আসে উত্তম, নচেৎ প্রচেষ্টায় প্রাণপাত। যে দৃঢ়তা গান্ধীজীর ছিল, তা দেখলুম বিনোবাজীর শীর্ণ অথচ দৃপ্ত মুখে।

ভোজনের আয়োজন

(২০)

পাল্কী এসে সদর দরজা দিয়েই ঢুকলো বটে। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কোথায় চললো ঠিক ধরা গেল না। আস্তাবলবাড়ি, রান্নাবাড়ি, ভিস্তি-খানা পেরিয়ে গিয়ে থামলো একেবারে বাড়ির দক্ষিণে। সে দিকটায় গিয়ে নজরে পড়ে ধোপাদের কাপড় কাচবার জায়গা, বাগান, পুকুর। এদিকে কখনও আসেনি ভূতনাথ আগে।

বংশীর গলা কানে এল—এইবার পাল্কী নাবাও হলধরদা'—

পাল্কী নাবালো ওরা।

বংশী এসে দরজা ফাঁক করে মখমলের ঝালর-দেওয়া পর্দা সরিয়ে দিলে।

মুখ বাড়িয়ে বললে—শালাবাবু, এখানেই নাবতে হবে আজ্ঞে—

দুর্বল শরীরটা ঠিক যুৎসই হয়নি এখনও। একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাটা ঘুরে যায়। বংশী ধরলো এক পাশে। তারপর বললে—আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে চলুন—

প্রথমটা সিঁড়ির মুখে অন্ধকার। ছোট ছোট সিঁড়ি। ভাল ঠাহর পাওয়া যায় না। তারপর ভেতরে ঢুকে বেশ ফুটফুটে। চলতে চলতে একটা জায়গায় উঠে বংশী একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। ছোটখাটো ঘরটা। এককালে বুঝি সাজানো ছিল এ ঘর। এখনও পালঙ আছে একটা। দেয়ালে পঙ্খের কাজ করা। উড়ন্ত পরী, বেশ-বাস অবিন্যস্ত। কোথাও পাখী উড়ে যাচ্ছে, মুখে তার রঙিন চিঠি। আরো কত কী আঁকা। দেয়ালের বালি খসে গেছে জায়গায় জায়গায়। তবু ছবিগুলো ঠিক রুচিশীল বলা যায় না। চারদিকে চেয়ে দেখে ভূতনাথের দৃষ্টিতে কেমন কৌতূহল ফুটে উঠলো।

বংশী বললে—ছোট মা এই ঘরটাতেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা করেছেন আজ্ঞে—কোনও অসুবিধে হবে না আপনার এখেনে—

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ব্রজরাখাল যদি খোঁজে—তোমাদের মাস্টারবাবু—

বংশী বললে—মাস্টারবাবু? তিনি তো আর আসেন না এখানে—

—সে কি! ব্রজরাখাল কোথায় গেল?

—আজ্ঞে তা বলতে পারিনে—বহুদিন আসছেন না তিনি—চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এ বাড়ির—

সে কি!

আকাশ থেকে পড়লো যেন ভূতনাথ। তার সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক তো ব্রজ-রাখালকে কেন্দ্র করেই। ব্রজরাখালই যদি চলে গেল তা হলে এখানে থাকবে সে কোন অধিকারে। ওদিকে 'মোহিনী সিঁদুর' অফিসও যদি উঠে যায় তা' হলে সে যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে! কেমন যেন অসহায় বোধ করলো ভূতনাথ নিজেকে। আবার সেই গ্রামেই ফতেপুরেই ফিরে যেতে হবে নাকি। খাবে কি সে সেখানে। থাকবেই বা কোথায়। এতদিনে সে বাড়ি কী অবস্থায় আছে কে জানে। পাশের বিপিন কলুদের তেঁতুল গাছের জঙ্গল বোধ হয় আরো বেড়ে বেড়ে তাদের বাড়িটাও গ্রাস করে নিয়েছে। সেইখানে বাঘের আড্ডা হয়েছে হয়ত। হয়ত সাপ খোপের বাসা হয়েছে। রান্নাঘরটা তো ছিল বাঁশঝাড়ের লাগোয়া। বাঁশগুলো কে আর কাটছে! বাঁশগুলো সব হয়ত নুয়ে পড়েছে খড়ের চালের মাথায়। উঁই ঢিপিতে ঢেকে গেছে দাওয়া। পিসীমার অত যত্নের রান্নাঘর। গোবর লেপে লেপে কী সুন্দরই বাহার করতো পিসীমা। তারপর গোবর লেপা হলে মাটির দাওয়ার ওপর ঘুঁটের আগুনে পোরের ভাত চাপিয়ে দিত। কত বছর খায়নি পোরের ভাত। কাঁঠাল বিচি ভাতে, পোরের ভাত আর সরের ঘি!...কিন্তু সে কথা থাক, ব্রজরাখাল তাকে ফেলে গেল কোথায়? কেনই বা গেল। বংশীকে জিজ্ঞেস করলে সে-ও কিছু বলতে পারে না বিশেষ কিছু।

ওই ঘরটার মধ্যেই কাটলো সমস্তটা দিন।

একবার ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেল ভূতনাথকে। কোট ধুতি বুট জুতো পরা ডাক্তার। কী একটা ওষুধও বুঝি নিয়ে এল বংশী।

বংশী বললে—খেয়ে ফেলুন দিকি ওষুধটা—বেশী তেতো লাগলে এই ফল-গুলো খাবেন—

বেদানা, আঙুর, ন্যাসপাতি কুচিয়ে কেটে এনেছে রেকাবীতে।

বললে—আপনার জন্যে আজ্ঞে বকুনি খেতে হলো ছোটমার কাছে—

—কেন?

বংশী বললে—আমার হয়েছে জ্বালা শালাবাবু, চিন্তা কাজ করবে না তা-ও আমার দোষ, এই যে আপনি রুগী মানুষ বাড়িতে এসেছেন, ফলগুলো কুচিয়ে রাখতে পারে না ও, ভাঁড়ারে গিয়ে যদি রাঙা ঠাকুমাকে বলি তো শত হেনস্থা হবে আমার, ফিরিস্তি দাও কী হবে, কে খাবে, কেন খাবে, কী অসুখ, শালাবাবু তোর ছোটমা'র কে হয়—হ্যান ত্যান, ছোটমা তাই চিন্তাকে দিয়েছিল ফল কুচোতে, অথচ ওর কাজ কী বলুন, আমার মত কাজ করতে হতো তো বুঝতো—মেয়ে মানুষের সোয়ামী থাকলে সেও কি বসিয়ে খাওয়াতো ওকে—না কি বলুন শালাবাবু—অন্যাজ্য কিছু বলেছেন ছোটমা—

ভূতনাথ ঢক্ ঢক্ করে ওষুধ খেয়েই মুখটা বিকৃত করে উঠলো।

বললে—বড্ডো তেতো ওষুধ বংশী—

—আজ্ঞে ওষুধ তো তেতো হবেই, নবীন ডাক্তারের সব খাঁটি ওষুধ কিনা,

ছোটমা বলেছেন টাকা লাগে সব দেব আমি, রোগ সারা চাই—সস্তা ওষুধ হলে চলবে না—। তা ছোটমারও তো ক'দিন থেকে মেজাজ ভালো যাচ্ছে না কি না—

—কেন? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।

—ছোটমা যে নেকাপড়া জানা মেয়ে শালাবাবু, মেজমার মত নয় তো যে দিন-রাত কেবল বাঘবন্দী খেলবে, কি বড়মার মতন নয় যে খালি দিনের মধ্যে চৌষট্টি-বার চানই করছে কেবল, কেবল সাবান আর জল ঘাঁটছে, ছোট মা হলো মনিষ্যি যাকে বলে—কিন্তু পড়েছেন আজ্ঞে ছোট-বাবুর মতন মানুষের হাতে, কপালের লেখন কে খণ্ডাবে বলুন, এই যে এতদিন পরে বাড়ি এলেন, মানুষটা পড়েছিলেন বাড়ির বাইরে সেই জানবাজারে নতুন-মার বাড়িতে, কেমন আছেন ছোট মা দেখতেও তো ইচ্ছে হয়, কিন্তু না-ডেকে পাঠালে সে-হুঁশও নেই, শেষে ডেকে আনলুম ছোট মা'র ঘরে—ছোটবাবু তখন বেরোচ্ছেন, কাপড় কুঁচিয়ে দিয়েছি, জুতো পরিয়ে দিয়েছি, রুমাল দিয়েছি, টাকা-কড়ি গুছিয়ে দিয়েছি, সব শেষে বললুম—ছোট মা একবার ডাকছিলেন আপনাকে ওপরে—

ছোটবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন—কেন?...আচ্ছা চল্ যাচ্ছি—

যাবার মুখে এলেন ঘরে। আমিও এলুম পেছন পেছন। সব শুনলুম আড়ি পেতে।

ছোটবাবু বললেন—ডেকেছিলে নাকি আমাকে?

ছোট মা গলায় আঁচল দিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম করলেন।

বললেন—কেমন আছো?

ছোটবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ডেকে-ছিলে নাকি আমাকে?

—না দরকার আর কী, এমনি একবার দেখতে ইচ্ছে হলো, অনেকদিন দেখিনি—আজ আমার হিতসাধিনী ব্রত—

ছোটবাবু হো হো করে হাসলেন।

—আবার তোমার সেই ন্যাকামি আরম্ভ হলো—

ছোট মা কিচ্ছু কথা বললেন না।

ছোটবাবু রেগে গেলেন বুঝি। বললেন—সেই কান্না আর কান্না, কেন, ... পারো না হাসতে পারো না আর সব বউদের মত, দেখ তো বড় বৌঠান, মেজ বৌঠান সবাই কেমন হেসে খেলে আছে, হাসো—গাও—যা খুসী করো—যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না তা-ই হয়েছে—

—কিন্তু হাসি যে আমার আসে না—

—কেন আসে না? কী হয়েছে তোমার?

—কিন্তু তুমিই কি হাসো,—এ-ঘরে তোমার হাসি তো দেখিনি কখনও—অথচ শুনতে পাই তুমি ভারি আমুদে লোক, আমি কী দোষ করলুম—বলতে পারো—

—তার কৈফিয়ৎ তোমার কাছে দিতে হবে নাকি, আমি চললুম—এখন সময় নেই তোমার ন্যাকামী শোনবার—বলে ছোট বাবু ফিরছিলেন।

ছোট মা সরে এসে তাড়াতাড়ি ছোট-বাবুর চাদরের খুঁটটা ধরলেন।

বললেন—না গেলেই নয়—

ছোটবাবুর ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছিল বোধ হয়। ল্যাণ্ডোগাড়ি জোতা রয়েছে, একবার উঠলেই টগ্‌বগ্ করে ছুটতে আরম্ভ করবে ঘোড়াদুটো। ওদিকে নেশার সময় বয়ে যাচ্ছে, জানি তো সব, নতুন-মা গেলাস সাজিয়ে বসে থাকবে কি না, আর ছোটবাবুও মেজাজী লোক, সব কাজ ঘড়ি ধরে, নেশা মাথায় চড়ে গেলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না আজ্ঞে—তা ছোটবাবু একবার শুধু ফিরে তাকালেন ছোটমার দিকে—

ছোট মা আবার বললেন— না-ই বা গেলে আজ সেখেনে—

ছোটবাবু রেগেই ছিলেন। বললেন—না গিয়ে তোমার আঁচল ধরে বসে থাকবো, কেমন?

ছোট মা কিছু কথা বললেন না।

ছোটবাবু বলতে লাগলেন—বড়বাড়ির পুরুষমানুষদের তুমি তেমনি অপদার্থ ভাবো নাকি?

—কিন্তু তুমি তো মানুষ—তোমারও তো মনুষ্যত্ব...

ছোটবাবু এ-কথার আর জবাব দিলেন না আজ্ঞে, শুধু যেতে যেতে হেসে বললেন—বউ-এর কাছ থেকে যে মনুষ্যত্ব শেখে তার গলায় দড়ি ছোটবউ—

বংশী গল্প বলতে পারে বেশ। ভূতনাথ একমনে শুনছিল। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ছোট বৌঠানের এতটুকু যদি উপকারে আসতে পারা যেত।

হঠাৎ ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বংশী তোর ছোট মা সিঁদুর পরে কপালে?

—আজ্ঞে পরেন বৈকি. এতখানি জ্বলজ্বলে টিপ্ রোজ পরে—

—তোর ছোট মাকে বারণ করে দিস ও-সিঁদুর পরতে—

—কেন আজ্ঞে?

—তুই বারণ করে দিস, ও-সব হুজরুকি—আগে জানলে...

বলেই ভূতনাথ সতর্ক হয়ে গেল। বংশীর সঙ্গে অত কথা বলবার দরকার কী! আগে যদি সে জানতো তা হ'লে অমন করে ঠকাতো না ছোট বৌঠানকে। মিছি মিছি গোটাকতক টাকা নষ্ট হলো। হঠাৎ যেন রাগ হলো সুবিনয়বাবুর ওপর। রাগ হলো জবার ওপর। ওরা সব পারে। যাদের জাত নেই, তারা আবার ভগবানের কথা মুখে আনে! সব মিথ্যে কথা ওদের। ও-বাড়ির চাকরিটা যদি চলেও যায়, কোনও দুঃখ থাকবে না তার। আর একটা নতুন চাকরি জোগাড় করে নিতে হবে। শরীরটা একটু ভালো হলেই ঘুরবে চাকরির চেষ্টায়। ওই 'যুবক সঙ্ঘের' নিবারণকে বলে একটা যা হয় কিছু চাকরি। ওরা কলকাতার লোক। জানে শোনে সব। ব্রজরাখাল যদি আসে ফিরে তাকেও ধরতে হবে। এণ্ট্রান্স পাশ করেছে সে, চাকরির জন্যে এত ভাবনা। ডালহাউসি স্কোয়ারের ওদিকটায় জাহাজ কোম্পানীর সব অফিস হয়েছে কয়েকটা। ওখানে ঘোরাঘুরি করতে হবে। ঘোরা-ঘুরি না করলে কে এসে সেধে চাকরি তুলে দেবে তার হাতে। নতুন রেল-লাইন খুলেছে পুরীর দিকে, সেখানেও একবার চেষ্টা করতে হবে। রেলের চাকরি ভালো। ঢুকেই পনেরো টাকা মাইনে।

বিকেলবেলার দিকে ভূতনাথ বিছানা ছেড়ে ওঠে। একলা একলা শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগে না। মাসের পর মাস এই শুয়ে থাকা। আরো কত মাস শুয়ে থাকতে হবে কে জানে। প্রায় এক বছর হতে চললো তো। ঘরের বাইরেই একটা সরু চলাচলের পথ। লোক আসা যাওয়া করে না বড় একটা। দক্ষিণ দিকে গেলে রাস্তাটা সোজা নেমে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। তারপর বাগান, পুকুর, ধোপাদের বাড়ি, হীরু মেথরের ঘর। আর উত্তর বরাবর চলে গেছে সোজা। পথটা গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে একটা দরজার সামনে। দরজাটা বন্ধই থাকে। খিল দেওয়া। ওর ওপাশেই বুঝি বাড়ির চাকরদের কথাবার্তা শোনা যায়।

বোঝা যায় এ-জায়গাটা না-দোতলা, না-তেতলা, না-বারমহল, না-অন্দর-মহল। কবে এ-বাড়ির খোদ মালিক এইখানে এই চোর-কুঠরীর মধ্যে তাঁর কোন্ নৈশ-অভিযানের খোরাক এনে পুষে রেখে দিয়েছিলেন। রোজ রাত্রে বুঝি গোপনে সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলতো তাঁর অভিসার। আজো ভাঙা দেয়ালের গায়ে তার স্মৃতি তাই জড়িয়ে আছে বুঝি।

হিরণ্যমণি, বৈদুর্যমণি আর কৌস্তুভ-মণিরা তখন ছোট তিন নাতি। নিমক মহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ভূমি-পতি চৌধুরী এখানে বাড়ি করেন। ইটালিয়ান সাহেব এসেছিল নতুন বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকতে। বর্ধমানের সুখচর মহকুমা থেকে তখন নতুন এসেছেন জমিদারবাবু। পাশের বস্তীতে কুলিরা থাকে—আর সারা দিন খাটে বাড়ির পেছনে। ইটালিয়ান সাহেব থাকে হেস্টিংস হাউসের কাছে খাড়ির ধারের বাগান বাড়িতে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাহেব দেখে—মেমসাহেব একলা নয়, সামনে বসে কাছে ঘেঁষে গল্প করছে ভূমিপতি চৌধুরী।

সাহেবের মেজাজ গেল বিগড়ে। কয়েকদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল সাহেবের। মেমসাহেব যেন একটু বেশী সাজে, গুন্ গুন্ করে গান গায়। একটু অন্যমনস্ক ভাব। আজ হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল দু'জনেই।

মেমসাহেব সাহেবকে দেখেই চমকে উঠেছে। ভূমিপতি চৌধুরীও কম চমকাননি। এমন দিনে সাধারণতঃ সাহেব বাড়ি ফেরে না। বাড়ি ফেরবার কথা নয় আজকে।

দু'জনের ভাব লক্ষ্য করে সাহেব আর থাকতে পারলো না। কোমর থেকে পিস্তলটা বার করে দু'জনকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়লো। ভূমিপতি বেঁচে গেলেন একটুর জন্যে, কিন্তু অব্যর্থ গুলি গিয়ে লাগলো মেমসাহেবের গায়ে। মেম-সাহেব ঢলে পড়লো মাটিতে।

ভূমিপতি তখন সামলে নিয়েছেন নিজেকে। একমুহূর্তে উঠে খপ্ করে হাত ধরে ফেলেছেন সাহেবের।

ভয়ে সাহেবেরও বুঝি মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

বললে—লেট্ মি গো বাবু—লেট্ মি গো—আমাকে ছেড়ে দাও—

কিন্তু ভূমিপতির বজ্রমুষ্টির চাপে বুঝি পালাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

ক্ষমা চেয়ে সাহেব তো ছাড়া পেলো। কিন্তু পিস্তল কেড়ে নিলেন ভূমিপতি।

বললেন—তুমি খুন করেছ তোমার বউকে, তোমাকে পুলিশে দেব—

হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে শিল্পী এসেছিল জীবিকার জন্যে জলা-মাটির দেশে। রাস্তায় মেমসাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে জাহাজেই তাদের নাকি বিয়ে হয়ে যায়। তারপর ভাগ্যের ফেরে আজ এই অবস্থা। সাহেব খানিক পরে বললে—ফর-গিভ্ মি বাবু, আমি কাউকে কিছু বলবো না—আমায় শান্তিতে দেশে ফিরে যেতে দাও—আমি আর কখনও তোমাদের দেশে আসবো না—

ভূমিপতি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলেন সাহেবকে। সেই রাত্রেই সাহেব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা যায়নি তাকে। যে লোক এসেছিল এদেশে ছবি আঁকতে, কী ছবি সে এঁকে নিয়ে গেল নিজের অন্তরের অন্তঃপুরে কে জানে!

কিন্তু মেমসাহেব বুঝি সত্যি সত্যিই মরেনি। একটু জ্ঞান ছিল তখনও। সাহেবের বাড়ির চাকরবাকরদের টাকা-পয়সা দিয়ে মুখবন্ধ করে ভূমিপতি সেই রাত্রেই নিজের পালকীতে করে তুলে নিয়ে এসেছিলেন মেমসাহেবকে। নিজের বাড়িতে একেবারে। এনে তুলেছিলেন এই চোর-কুঠুরীতে। বাড়ির পুরোণ কবিরাজ এসেছিল। দেখে গেল। নাড়ি টিপে বললে—প্রাণ আছে এখনও—বাঁচবে এ রোগী—

সত্যি সত্যি মেমসাহেব বেঁচেও উঠলো একদিন। ঘা শুকিয়ে গেল হাতের। নতুন করে যেন নবজন্ম হলো মেমসাহেবের। নতুন ঘোড়ার গাড়ি কেনা হলো মেম-সাহেবের জন্যে। মেমসাহেব ঘরের বৌ হয়ে গেল তারপর থেকে। পান খেতো, তামাক খেতো, শুক্‌তুনী, চচ্চড়ী, কুলের অম্বল খেত। কিন্তু তবু বাড়ির মেয়েরা ছুঁতো না কেউ তাকে।

বলতো—ও গরু খেয়েছে, ও মেলেচ্ছো—ওর জল চল্ নয় বাছা হিঁদুর বাড়িতে—

মেমসাহেব ওই ঘরে থাকতো আর এক আয়া ছিল তার কাজ করবার জন্যে।

সারা বাড়ির মধ্যে তাকে ছুঁতেন শুধু ভূমিপতি। বাড়ির মালিক। তা-ও রাত্রে। দেওয়ানি কাজের ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে যখন রাত্রে চোখে তাঁর লাল-নেশা ধরতো। ছেলে—একমাত্র ছেলে—সূর্যমণি চৌধুরী তখন রীতিমত সাবালক হয়েছে। ওদিকে মেমসাহেবেরও ছেলে হয়েছে একটি। এমন সময় ভূমিপতি মারা গেলেন হঠাৎ। ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ হলো জবর। কিন্তু মেমসাহেব তারপর আর এ-বাড়িতে থাকতে চাইলে না। নিজের আর ছেলের আজীবনের ভরণপোষণের মত নগদ টাকা নিয়ে চলে গেল স্বদেশে। ভূমিপতি তাঁর উইলে সে-ব্যবস্থা করে যেতে ভোলেননি নাকি!

বড়বাড়ির চারপুরুষ আগের ইতিহাস এ-সব। বাড়ির চাকর থেকে আরম্ভ করে নায়েব গোমস্তা, বদরিকাবাবু সবাই এ-ইতিহাস জানে। তার চাক্ষুষ সাক্ষী আজকের এই চোর-কুঠুরী। আর চোর-কুঠুরীর লাগোয়া এই এক ফালি বারান্দা।

রোজ সকালে জানালাটা দিয়ে দেখা যায় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টা কেমন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় দিনের পর দিন। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে সমস্ত মন। কেবল ওষুধ আর পথ্য। বিশ্রাম আর ঘুম। একঘেয়ে ক্লান্তি-কর দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না ভূতনাথের!

কিন্তু ভূতনাথের সেদিন যে কী খেয়াল হলো। উত্তরদিকের দরজাটা খোলা যায় কিনা দেখতে ইচ্ছে হলো একবার! এই দরজা দিয়েই অন্দর মহল পেরিয়ে রাত্রে আসতেন বুঝি ভূমিপতি মেমসাহেবের ঘরে!

একটি দরজা শুধু। কিন্তু ভূতনাথ জানতো কি অন্দরমহলের এত ঘনিষ্ঠ এই একটি মাত্র দরজা তাকে ছোট বৌ-ঠানের এত কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেবে!

কেন যে এ-ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল কে জানে! হয়ত এ-ঘরটা একটু নিরিবিলি বলে। চাকর-দরোয়ান-গাড়ি-ঘোড়া, রান্নাবাড়ি, সমস্ত গোলমাল হট্ট-গোল থেকে দূরে থাকলে রোগীর পক্ষে সেটা ভালোই। কিন্তু দরজাটা খুলতে গিয়ে যেন রোমাঞ্চ হলো সারা শরীরে। এ যেন নিষিদ্ধ দরজা। তার এলাকার বাইরে সে যাচ্ছে। অধিকার-বোধের চৌকাঠ পেরিয়ে লঙ্ঘন করছে তার নির্ধারিত সীমা।

ওপার থেকে যেন সিন্ধুর গলা শোনা গেল—ও লো ও গিরি—ওখান থেকে সরে যা তো—

গিরি বললে—থাম্ বাছা, সবুর কর্ একটু,—হাতের কাজটা গুছিয়ে নি—

সিন্ধুও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—তোর হাতের কাজটাই বড় হলো লা, ওদিকে বড়মা সাজাঘরে যাবে, তোর জন্যে বসে থাকবে নাকি—সর শিগগির, চোখের আড়াল হ'—

মেজ বউ-এর গলা কানে আসে—। খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলে—ও গিরি তোর সুপুরি কাটা রাখ্ বাপু—শুনেছিস্ বড়দি সাজা-ঘরে যাবে—

গিরি গজ্ গজ্ করতে করতে বলে—আমি তো আর পুরুষ মানুষ নই মা যে আমাকে লজ্জা—সাতজন্মে যেন ছুঁচি-বাই না হয় মানুষের—ছিঃ—

ভেতর থেকে হুড়কো সরাতেই দরজাটা একটু ফাঁক হলো। ভূতনাথ স্পষ্ট দেখতে পেলো সব। বিকেলের ছায়া-ছায়া আলো চারদিকে। একেবারে মাথার ওপরেই অন্দর মহলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে।

সিন্ধু চীৎকার করে উঠলো তোর কাপড়টা সরিয়ে নিলিনে গিরি, বড় মা'র ছোঁয়া লেগে যাবে যে, ছুঁয়ে শেষে কি নোংরা হবে নাকি মানুষ—

—হলো, এই নিলাম সরিয়ে—হলো—?

বলে গিরি দড়ির ওপর থেকে কাপড়-খানা সরিয়ে নিলে।

আর চোখের সামনে...

আর ভূতনাথের চোখের সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল সেই মুহূর্তে!

বোধহয় এ-বাড়ির বড় বউ। বিধবা বড় বউ। সম্পূর্ণ নিরাবরণ নিরা-ভরণ অবস্থা। ত্বরিত গতিতে নিজের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন গিয়ে সাজা-ঘরে। পেছনে চললো সিন্ধু গামছা সাবান নিয়ে।

কাণ্ডটা ঘটলো এক নিমেষের মধ্যে।

কিন্তু সমস্তটা দেখবার আগেই ভূতনাথ নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে! ছি-ছি-! ছি !!

(ক্রমশঃ)

তেত্রিশ

সভা শেষ হল আবেগ এবং উত্তেজনার মধ্যে।

বিজয় ও কয়েকজন কর্মী প্রস্তাব উত্থাপন করলে, ভাগচাষের নূতন বিধি প্রচলনের জন্য। কৃষির ক্ষেত্রে এদেশে অনেক রকম ভাগ প্রচলিত আছে। জমির রকম ভেদে উৎপন্নের ভাগের ভেদ হয়ে থাকে। কৃষাণ যারা, যারা শুধু দেহের পরিশ্রমে মালিকের হাল গরু যন্ত্রপাতি সার নিয়ে চাষ করে, অনাবৃষ্টিতে সেচনের প্রয়োজনে চাষকর্মের প্রয়োজনে যেখানে মালিককে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হয়, সেখানে তারা পায় উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ, তাও মাত্র ফসলের ধানের, খড় তারা পায় না। এসব ক্ষেত্রে তারা বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের ঘর থেকে মাসে মাসে ধান ধার করে সংসার চালায়, ফসল উঠলে দেড়ি অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ ক'রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু হাতে ফিরে যায়, জমি খুব ভাল হলে, প্রচণ্ড পরিশ্রমী কৃষাণ হলে—বর্ষণ পর্যাপ্ত হলে বা জোল জমি যে জমিতে অনাবৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হয় না—সে হলে কিছুখানি ফেরত নিয়ে যায়। এর পর রবির চাষ থাকলে তার ভাগটা নিয়ে যায়, গুড়, কলাই, কিছু তরি, কিছু তিল, কিছু গম। ঋণ যদি শোধ না হয় তবে সুদ এবং আসলের বাকীটা একেবারে আসলে পরিগণিত হয়ে পর বছরে জের টেনে চলে—তার উপরে দেড়ি টানা হয়। হতভাগ্যেরা শেষ পর্যন্ত ঋণে আকণ্ঠ ডুবে যথাসর্বস্ব মনিবকে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে ম'রে খালাস পায়। যথাসর্বস্বই বা কি? একটুকুরো ভিটে, নয়তো দুটো গাছ বা বাঁশঝাড় এই পর্যন্ত। অন্য ভাগচাষী যারা তাদের হিসেব স্বতন্ত্র, জমির রকম হিসেবে ভাগ হয়ে থাকে। আঠার বাইশে, পঞ্চার্ধ, আধি, ঠিকে অনেক রকম। উৎকৃষ্ট জমি হলে কৃষাণি ভাগে অর্থাৎ দু'ভাগ মালিককে দিয়ে এক ভাগ নেবার কড়ারেই চাষীরা আগ্রহ সহকারে জমি নিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে লাভ তাদের খড়। সার ভাগীদার দেয়, লাঙল গরু তার, সেই হেতু খড়টা সে পায়। এরা কৃষাণ পর্যায়ের লোকদের থেকে সম্পন্ন অবস্থার লোক। জমির দাম যখন দেশে কম ছিল তখন এক টাকা পাঁচ সিকে মণ ধানের বাজারেও এই থেকে দু চারজন দু চার বিঘে জমি কিনেছে, নতুন একখানা ঘর করেছে এবং শেষ জীবনে নিজের জীবনটাকে সার্থক সফল মনে ক'রে হরি বা আল্লাকে নিত্য দু বেলা প্রণাম জানিয়ে চোখ' মুদেছে। বঞ্চনাকে জন্মান্তর কর্মফল মনে করে আগামী জন্মের প্রত্যাশায় সন্তুষ্ট থেকেছে।

এ নূতন কালের উপলব্ধিতে, বিচারে, দৃষ্টিতে প্রচণ্ডতম অবিচার—চরমতম অন্যায়—এ মহাপাপ। এই নূতন কালের দাবী—এই শ্রেষ্ঠ ন্যায়। বিগতকালের অবিচার অন্যায় ভ্রান্তি পাপের সংশোধনের জন্য আজ নূতন বিধি প্রয়োজন। সেই বিধিতে হাল-লাঙল সার বীজের জন্য এক ভাগ স্বতন্ত্র রেখে মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে উৎপন্ন সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিতে হবে। খোরাকী ধানের উপর সুদ বন্ধ করতে হবে।

চাষীরা হরিবোল দিয়ে উঠল—হরি হরি বল ভাই।—হ-রি বোল!

হিন্দু চাষীদের এইটেই জয়ধ্বনি।

মুসলমান চাষীরাও উল্লাস প্রকাশ করলে। আল্লা বলো ভাই—আল্লা হো-আকবর!

—আমার কিছু বলবার আছে। উঠে দাঁড়াল মহাদেব সরকার। কিন্তু জয়ধ্বনির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। সে আবার চীৎকার ক'রে উঠল—আমার কিছু বলবার আছে। থাম সব থাম!

তার সঙ্গে অক্ষয় ঘোষাল উঠল—হাত নেড়ে ইশারা জানিয়ে বললে—থাম সব, থাম।

বিজয় তার চেলাদের ইশারা জানিয়ে দিলে। তারা মুহূর্তে জয়ধ্বনির জের বাড়িয়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—বসুন আপনি, বসুন। বসুন!

একজন আবার ধ্বনি দিয়ে উঠল—বলো ভাই—মহাত্মা গান্ধীকি জয়!

—জয়! জয়!

—স্বাধীন ভারত কি জয়!

—জয়—জয়!

—চাষী মজুর কি জয়!

—জয়! জয়!

মহাদেব সরকার চীৎকার করে উঠল—তা হ'লে এ সভার কোন প্রস্তাব আমরা মানি না। মানব না! অক্ষয় ঘোষাল ক্ষিপ্ত হয়ে পাশের একটি চীৎকাররত ছেলের কাঁধে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—চুপ্! বস! কিশোরবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যেন থর থর ক'রে কাঁপছেন। তাঁর গৌরবর্ণ মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে, মাথার শ্বেতশুভ্র চুলগুলি নিজেরই চঞ্চল আঙুলের অধীর চালনায় বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে—তিনি তাঁর দীর্ঘ হাতখানি উপরে তুলে বলে উঠলেন—থাম! চুপ কর!

তাঁর চোখ দুটি যেন জ্বলছে।

সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল।

সুযোগ পেয়ে মহাদেব সরকার বলে উঠল—আমার কিছু বক্তব্য আছে। এ প্রস্তাবের আমি প্রতিবাদ করব।

—যা ন্যায়, যা দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে কল্যাণকর তারই প্রতিবাদ করবেন আপনি?

ঠিক এই মুহূর্তেই বাইরে রাস্তার উপরে একখানা জীপ এসে থামল। জীপ

থেকে নেমে গুণীবাবু এসে সভার মধ্যে প্রবেশ করলে। সমস্ত লোক মুহূর্তে সভাপতিকে ভুলে গেল—তারা তাকালে গুণীবাবুর দিকে। গুণীবাবু এখনো এখানে রাজ্যেশ্বর; বিরাট জমিদারীর অধিপতি। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের মালিক, বহু কীর্তিতে কীর্তিমান পিতামহের পৌত্র। প্রবলপ্রতাপ দুর্ধর্ষ পিতৃব্যের উত্তরপুরুষ। নিজেও দম্ভের প্রতিমূর্তি, আবার বহুখেয়ালের খেয়ালী মানুষ। বিগত সাম্রাজ্যবাদের যুগের মূর্তিমান প্রতীক। সে এসে দাঁড়িয়েছে বোধ করি নূতন কালের আত্মঘোষণার মুখে প্রবল প্রতিপক্ষের মত। গুণী এসে এক পাশে সাধারণের সারিতেই আসন গ্রহণ করলে। সহাস্য মুখেই সভাপতিকে নমস্কার জানালে। লোকে স্তব্ধ হয়েই তার দিকে তাকিয়ে রইল। বিচিত্র গুণী। তার মুখে হাসি। তাকে দেখে কিছু অনুমান করবার উপায় নাই।

সর্বাপেক্ষা শঙ্কিত হয়ে উঠল বিজয়। সব আয়োজন উদ্যম বোধ হয় পণ্ড হয়ে যাবে। গুণী উঠে প্রতিবাদ করলে —এই গরীব চাষীরা কেউ তার বিপক্ষে যেতে সাহস করবে না। তারা তার দৃষ্টির আড়ালে সংঘবদ্ধ হয়ে লুঠ করতে পারবে, হাঙ্গামা বাঁধাতে পারবে, কপিলদেবদের গোপন পথে, কিন্তু প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের তাদের সাহস নাই। চোখ তুলতেও পারবে না।

সে দ্রুতপদে এগিয়ে এল—শান্তির কাছে। একটু শুনুন আপনি।

—আমি?

—হ্যাঁ। বাইরে আসুন একবার।

বলেই সে গেল গুণীর কাছে।—গুণী দা!

—হুকুম কর। হাসলে গুণী।

—তোমার জীপটা একবার নেব। গ্রামের ভিতর থেকে আসব।

—বেশ তো! যাও। ড্রাইভার তো জানে তোমাকে।

—এই এলাম বলে।

দ্রুতপদে সে বেরিয়ে গেল। শান্তি বাইরে সভাপ্রবেশের পথের মুখেই দাঁড়িয়েছিল। বললে—আসুন। গাড়ীতে।

—কোথায়?

—গৌরীদার কাছে। তাকে আনতেই হবে। নইলে সব পণ্ড হবে। আসুন, আসুন। শান্তিকে প্রতিবাদের সময় দিলে না সে। ড্রাইভারকে বললে—চল একবার গ্রামের ভিতরে। গুণীদাকে বলে এসেছি। গৌরীবাবুর ওখানে চল।

* * *

গৌরীকান্ত সন্তোষবাবুর খাতাখানি হাতে করেই বসেছিল। মধ্যে মধ্যে অপরাহ্ণের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার মুখে একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটে রয়েছে।

সন্তোষ পিসেমশায় লিখে গেছেন—সমস্ত নবগ্রামে বাস করিয়াও পর হইয়া রইলাম। উত্তপ্ত নবগ্রাম। অহরহ প্রতিষ্ঠাকামীর অন্তরের উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। মহাভারতে আছে, শাপগ্রস্ত কর্কট নাগ এক যুগান্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-বেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়া ক্লিষ্ট হইতেছিল। মহারাজ নল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসকালে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। নবগ্রামের সমাজের অবস্থা তাই। আজ যদি রাজ্যভ্রষ্ট নলের মত শান্তিপ্রয়াসী কোন ধর্মাত্মা তাহাকে পরিত্রাণ করিত!

হায় নবগ্রামের বিদ্যালয় যদি সেই মহৎ শিক্ষার শান্তিজলে এ উত্তাপকে শীতল করিতে পারে! এই পর্যন্ত পড়েই শান্তি পড়া বন্ধ করেছিল। খাতাখানি নামিয়ে রেখেছিল।

এরপরে সন্তোষবাবু লিখে গেছেন, "আমার যদি সন্তান থাকিত তবে তাহার উপর এই দায়িত্ব আমি সমর্পণ করিতাম। তাহাকে এই শিক্ষাই প্রদান করিতাম। মহাভারতের শিক্ষা। তাহার নামকরণ করিতাম শান্তিকুমার। কন্যা হইলেও তাহাকে এই দীক্ষা দিতাম। তাহারও নাম রাখিতাম শান্তি। মধ্যে মধ্যে আবার আতঙ্কিত হইয়া উঠি। স্বধর্মভ্রষ্ট বৈষয়িক প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাকামী কর্কটনাগের মত ক্লিষ্ট অন্তর বিষাক্ত দন্ত ব্রাহ্মণ বংশের কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে কি হয় তাহার পরিচয় তো বর্ধমানের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আবার কেন? মহাভারত হারাইয়া যাইতেছে কালক্রমের বিস্মৃতির মধ্যে; মহাভারত হারাইতেছে নবকালের পরধর্মের মধ্যে। আমার প্রথমা পত্নী এমনই সন্তান দিতে পারিতেন।"

শান্তি এইটুকু পড়ে লজ্জিত হয়েছে। সন্তোষবাবু তার নাম শান্তিই রেখেছিলেন —বোধ করি এই বাসনাটাই তাঁর অন্তরে ছিল। এই লেখার দীর্ঘ বিশ পঁচিশ বৎসর পর শান্তির জন্ম হয়েছে, তবু নামটা তিনি ভুলে যান নি।

তারপর লিখেছেন—"নবগ্রামের নবকালের দ্বন্দ্বে এক পক্ষে ধনবান, এক পক্ষে গুণবান। আমি দিব্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছি। এক পক্ষে গোপীকান্তের বংশধর, অন্য পক্ষে কিশোর। বিচিত্র যোগাযোগে কিশোরের সঙ্গে রাধাকান্তের বালক পুত্র গৌরীকান্ত যুক্ত হইয়াছে। সন্ন্যাসী কিশোর আগে চলিয়া পিছনে চলিয়াছে গৌরীকান্ত, তাহার হাতে একটি বাক্স; কিশোর ভিক্ষা করিতেছে দরিদ্রনারায়ণের জন্য। নবমহাভারতের বহু অক্ষৌহিণী বিরাট বাহিনীর সেবার জন্য। মূর্খ ভারতবাসী—দরিদ্র ভারতবাসী—চণ্ডাল ভারতবাসী তাহার ভ্রাতা। তাহার ধমনীর শোণিতের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক নিকটতম। সে তাহাই বলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। বালক গৌরীকান্ত ভিক্ষাপাত্র বাক্সটি অগ্রসর করিয়া ধরিতেছে।

এ মহাযুদ্ধে দ্বিতীয় নায়ক কি এই

বালক? পরাজিত ব্যর্থমনোরথ হতাশা-ব্যঞ্জক সন্ন্যাসের আবরণে পলায়িত রাধাকান্তের পুত্র?

এর পরেই লেখা রয়েছে 'রাধাকান্তের উপাখ্যান'।

গৌরীকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসলে। পরমুহূর্তেই তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উত্তেজনা বয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তার বাবা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। বহুজনের সমক্ষে, গোপীকান্তবাবুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাবেশের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে নিষ্ঠুর অপমানে অপমানিত করেছিলেন। তার বাবা কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে মার্জনা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন গোপীকান্তবাবুর কাছে। তাঁকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন কিশোরবাবু।

তার বাবা তাঁর জীবনের দিনলিপিতে এই দিনের কথা লিখে শেষে তাকে সম্বোধন করেই এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদ লিখে গেছেন। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাকে বলে গেছেন—"বাবা গৌরীকান্ত, তুমি কখনও ধনী হইতে চেষ্টা করিও না। ধনী হইলেই রাজ-উচ্ছিষ্ট ভোজনে রুচি জন্মে। গুণী হইও। সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহস অর্জন করিও।"

এ কথাগুলি তার অন্তরে গাথা হয়ে আছে, মুখস্থ করে রেখেছে সে। সে লাঞ্ছিত হয়েছে গোপীকান্তের পুত্রের হাতে; বাল্যকালে টেবিল হার্মোনিয়মে হাত দিয়েছিল সে।

তার মা—মহিমময়ী মা—তাকে এই যুদ্ধের যোগ্য ক'রে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার বাপের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নিজের সাধ অনুযায়ী তাকে গুণের সাধনায় দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে সাধনা সে করেছে। কিন্তু যুদ্ধ তো শেষ হয়নি। রাজশক্তি—যে রাজশক্তি তার বাবাকে অপমানিত করেছিল—সে রাজশক্তির অবসান হয়েছে। তার নিজের শক্তি অনুযায়ী সে যুদ্ধ করেছে। তার নিজের পিতৃমাতৃ নির্দিষ্ট পথেই করেছে। কিন্তু যাদের উপলক্ষ্য করে এ মর্মান্তিক অপমান হয়েছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ তো শেষ হয়নি!

সে নিষ্ক্রিয় হয়ে এখানে বসে আছে দ্রষ্টার অহঙ্কার নিয়ে। নিজেকেই সে নিদারুণ তিরস্কারে তিরস্কৃত করলে। কেন? কোন অহঙ্কার তার? তার বাপের অমর্যাদার চেয়ে তার নিজের অহঙ্কার বড়! চঞ্চল হ'য়ে উঠল সে।

ঠিক এই মুহূর্তে জিপখানা এসে থামল তার দরজায়।

জিপের শব্দ শুনেই তার অনুমান হ'ল গুণী এসেছে। সে শক্ত হয়ে বসল। নিবিষ্ট মনে খাতাখানা পড়বার জন্য চেষ্টা করলে। গুণী আসছে তার সেই বিচিত্র বৈশিষ্ট্যময় চাল নিয়ে; মুখে স্বল্পহাসি; হাতে সিগারেট, মন্থর পাদক্ষেপ, কৃত্রিম বিনয়—তার অন্তরালে আকাশস্পর্শী দম্ভ নিয়ে সে আসছে।

পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল কিন্তু পড়া হল না। সব ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু একি? একটা পাতা যেন ছেঁড়া! কি হল? কে ছিঁড়লে পাতাখানা? ঠিক এই মুহূর্তে এসে দাঁড়াল শান্তি এবং বিজয়।

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে গৌরীকান্ত বললে—কি? মিটিং হয়ে গেল? জিপ কার?

—তোমাকে যেতে হবে গৌরী দা। নইলে তোমার পায়ে আমি মাথা ঠুকব। চল। গুণীবাবু এসেছে। সে প্রতিবাদ করতে এসেছে। তুমি জান, এখানকার লোক কেউ তার অমতে যেতে সাহস করবে না। কেউ হয়তো প্রতিবাদও করবে না। আমি বক্তৃতা করলে কি হবে? তুমি চল! শান্তি'দিকে শুদ্ধ নিয়ে এসেছি। যেতে হবে তোমাকে। গুণীর গাড়ীই নিয়ে এসেছি।

—আপনি চলুন গৌরীদা। এটাকে রাজনৈতিক মিটিং মনে করা আপনার ঠিক হচ্ছে না।

গৌরীকান্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সে দেখছিল না, সে ভাবছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। বললে—চল—যাব আমি।

—যাবে! জয় ভগবান! বল কোথায় জুতো আছে।

—দরকার নেই, এই স্যাণ্ডেল পরেই যাব।

—চাদর?

—না। কিন্তু গুণীর জিপে আমি যাব না। হেঁটে যাচ্ছি আমি।

—এই দেখ। তাতে ক্ষতি কি?

—আছে ক্ষতি বিজয়। তোরা পলিটিক্স করিস—তোদের ক্ষতি নেই। এসবের জন্যে তোদের অদৃশ্য কবচ-মাদুলী আছে। আমার নেই। আমি হেঁটেই যাব।

—দেরী কর না কিন্তু। শান্তি দি—আপনি বরং গৌরীদার সঙ্গে আসুন। আমি যাই দেখি এরই মধ্যে কি কাণ্ড হল। বেশী কিছু হলে—আমি কিন্তু এরই মধ্যে মিটিং ভেঙে দেব।

ছুটেই বেরিয়ে গেল বিজয়।

দৃঢ়পাদক্ষেপে গৌরীকান্ত অগ্রসর হল। যাবার সময় খাতাখানা তুলে শান্তির হাতে দিয়ে বললে—তুমি রাখ এখানা। এখানা গেলে চলবে না। বাকী যেমন আছে থাক। চাকরটা গোছাবে। কিন্তু একখানা পাতা যেন কেউ ছিঁড়েছে। তুমি দেখেছ?

—দেখেছি। পাতাখানা খুলে গিয়েছিল। আমিই সেখানা পিছন দিকে রেখে দিয়েছি।

গ্রাম থেকে মাঠের দিকে সোজা একটা রাস্তা ধরে তারা অগ্রসর হল।

কি হ'ল?

প্রচণ্ড কোলাহল উঠছে। জয়ধ্বনির মত। তবে কি কৌশলে এবং আধিপত্যের জোরে সব পণ্ড ক'রে দিলে গুণী? কি হ'ল!

শান্তি থমকে দাঁড়াল। বললে—দাঁড়ান গৌরীদা।

—দাঁড়াব?

—এখন আর গিয়ে কি করবেন? কি ফল? দেখছেন না, যা হবার হয়ে গেছে। আর যাবেন না।

—না, যাব। আজ জীবনের পরীক্ষা হয়ে যাক আমার! শান্তি আজ আমার পরীক্ষা। যদি মনে কর আমি হারব, আর সে হার দেখতে ভয় পাও, তবে ফিরে যাও ভাই। আমাকে যেতেই হবে। আর দুঃখকে যদি সইতে পার তবে এস।

সে অগ্রসর হল। শান্তি নীরবে তাকে অনুসরণ করলে।

ওদিকে তখন প্রচণ্ড কোলাহল উঠছে।

(ক্রমশ)

বিদেশীর চোখে আমরা

সবিনয় নিবেদন,

'দেশের' ২৮শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'বিকল্পে' রঞ্জনের মন্তব্য বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

উক্ত রচনার ভূমিকাংশে আমাদের দেশে আগত বিদেশী অতিথিদের প্রশংসাবাণীর উল্লেখ করে তিনি আক্ষেপ করেছেন, "যাদের নিন্দা একদিন অভিসন্ধিপ্রসূত বলে অবজ্ঞা করতুম, আজ আমরা তাদের প্রশংসা বিনা প্রশ্নে মাথায় তুলে নিই; একবারও সন্দেহ করি না যে এই প্রশংসাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে।" যদি একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এই উক্তির ভিত্তি হয় তাহলে আমার বক্তব্য এই যে আমার অভিজ্ঞতা ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ বিদেশীদের প্রশংসাবাণী সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত নন এমন খুব কম লোককেই আমি জানি। অবশ্য আমাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য বক্তৃতায় কখনো কখনো এ সম্বন্ধে বিনম্র উল্লেখ করে থাকেন, সম্ভবতঃ জনগণের চিত্তস্পর্শ করার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিক্ষিত জনসাধারণ এমন কি কখনো কখনো অশিক্ষিত জনসাধারণও এসব বিষয়ে নির্মমভাবে সন্দেহশীল, এই দেখে থাকি। এই সন্দেহশীলতা পরিমিত 'Scepticism'এর সীমা ছাড়িয়ে নিছক 'cynicism'এর গণ্ডীতে প্রায়শঃভাবে পৌঁছেছে; এই বোধ করে আমি অনেক সময়ে বেদনা পেয়েছি। আমাদের দেশের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা আমি একটা দুর্লক্ষণ বলেই মনে করি। বলতে হবে পরাধীনতা দিবসের ছায়া এখনো আমাদের দেশের চিত্ত থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়নি। আমাদের তদানীন্তন ইংরেজ প্রভুদের মতো আমরা এখনো সব বিদেশীদের মনোভাবকে সন্দেহের বিকৃত চক্ষে দেখে থাকি; এমন কি স্বদেশের নেতৃবর্গকেও। এটা আমাদের 'রাজনীতিক সচেতনতা' বলে হয়তো অনেকে গর্ব করবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে 'রাজনীতিক নাবালকত্ব' না বলেও উপায় নেই। মূঢ় ভাবাবেগে অভিভূত না হয়ে বুদ্ধির নির্মল আলোয় সব জিনিষ বিচার করে খাটিয়ে নিতে শিক্ষা করা প্রত্যেক স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন ব্যক্তিরই একটি প্রধান লক্ষ্য। একথা সর্ববাদীসম্মত (হয়তো তথাকথিত মার্কসবাদী বাদে)। কিন্তু প্রশংসাকাতরতা অথবা কর্তাভজা মনোবৃত্তিও যেমন মূঢ় হতে পারে, অবিমিশ্র সন্দেহশীলতা ও নিন্দাপরায়ণতাও তেমনিই মূঢ় হতে পারে। মানসিক ভারসাম্যের পক্ষে উভয়ই অকল্যাণকর। এই প্রসঙ্গে 'রঞ্জন' আর একটি উক্তি করেছেন ঃ বিদেশীরা আমাদের 'দেশ' সম্বন্ধে খুব অল্প আশা করে তার অনেক বেশী দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। এ কথার কী প্রমাণ তাঁর আছে জানি না। তবে এই সঙ্গে বোধ হয় এ কথাও বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের লোক স্বদেশের শাসকদের কাছে রাতারাতি অনেক বেশী আশা করে ফেলে আশানুরূপ ফল না পেয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েন। এই মানসিক পরিবেশও সুবিচারের অনুকূল নয়। অর্থাৎ বুদ্ধি-বিচারক্ষেত্রে যথার্থ সাবালকত্ব লাভ করার সময় সত্যই আমাদের এসেছে। 'দুরভিসন্ধি' অনুসন্ধিৎসা পরিহার করে শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর ভাবনা নিয়ে নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার অনুশীলন আমাদের জাতীয় জীবনেও এক প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্রে বলেন ঃ শ্রদ্ধাশীল চিত্তেই জ্ঞানের উদয় ঘটে।

এইবার তাঁর মূল-প্রসঙ্গ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি। শেংকমান সাহেব কোন যুক্তিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিদেশী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য বলেছেন জানি না। 'রঞ্জনে'র মতো আমাদেরও এ উক্তিতে বিস্মিত হওয়া আশ্চর্য নয়। তবে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ভাববার আছে। প্রথম কথা, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সর্বত্রই আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও জগদ্বরেণ্য মনীষীরা আছেন; তুলনায় সংখ্যায় হয়তো কম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রেরা বিদেশের বিদ্যালয়ে স্বকীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। অপর পক্ষে ইদানীন্তন শিক্ষক ছাত্রের দান-প্রতিদান সূত্রে এদেশে যেসব বিদেশী অধ্যাপক ও ছাত্রদের পরিচয় ঘটছে, অনেকেরই অভিমত যে তাতে আমাদের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। পরিশেষে, বিদেশে শিক্ষা-সংগঠন ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে আজও যে তীব্র সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে এ সিদ্ধান্ত অন্যায় হবে না যে তত্রস্থ পরিস্থিতি আমাদের তুলনায় শ্রেয়ঃ হোক্ না হোক্ একেবারেই নিখুঁত নয়; বরং বহুবিধ ত্রুটিতে পূর্ণ। এতে অবশ্য আমাদের গৌরবের বা সান্ত্বনার কোনো কারণ নেই। তবে শেংকমান্ সাহেবের উক্তির প্রসঙ্গে এ কথাগুলিও ভাবা যেতে পারে।

শিক্ষকদের আদর্শের কথা 'রঞ্জন' যা বলেছেন তাতে সম্পূর্ণ সায় অনেকেই দেবেন। অপর পক্ষ বলে থাকেন যে শিক্ষকরাও মানুষ, প্রয়োজন ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে তাঁরা নন, সেটা আশা করাই অন্যায়। উত্তরে বলতে হয় যে, সমাজে স্বর্গরাজ্য কোনোদিন হবে না, প্রয়োজন প্রলোভন সব সময়েই থাকবে। আদর্শপ্রাণ মানুষেরাই তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন চিরকাল। বলা বাহুল্য, শিক্ষক, যে অর্থেই নেওয়া যাক্, এই দলের অগ্রগণ্য। 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।' ইতি, ভবদীয়—হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, আলীগড়।

বিকল্পে বিকল্প

বাঙলা সাহিত্য বর্তমানে কয়েকজন সার্থক Essayist পেয়েছে। এঁদ্বারা আমাদের সাহিত্যে ভাষার আধুনিকতা যে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি এবং আরও অনেকেই কৃতী লেখক বাঙলা কথা সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। বাঙলা কথা সাহিত্যও আজ তাই বিশ্বের দরবারে সসম্মানে স্থান পেতে পারে। কিন্তু আমি যে Essayistদের কথা বলছিলাম তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে এঁরা যে ধরণের Style অনুসরণ করছেন তাতে নতুন এক সাহিত্য-পদ্ধতি গড়ে উঠছে যাকে বলা চলে "আলাপী সাহিত্য"।

এই আলাপী সাহিত্যের হোতা হচ্ছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। আর যাঁরা আছেন যাযাবর, রঞ্জন, রূপদর্শী প্রভৃতি এবিষয়ে তাঁরাও যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছেন। যে রচনা-কৌশল দিয়ে এঁরা নিজেদেরকে বাঙালী পাঠকের কাছে ঘরোয়া পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা সত্যই অনবদ্য। কোন প্রতিষ্ঠাবান লেখকের প্রশংসা বা সমালোচনা করার উপযুক্ত বলে আমি নিজেকে মনে করি না। তবে সাধারণ পাঠক হিসাবে প্রসঙ্গত দু'একটা কথা বলতে চাই এবং সে কথা বিতর্কের প্রশ্ন নয়, আবেদন মাত্র।

'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'চাচা কাহিনী' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবার পর বাঙলায় একটা নতুন ধরণের সাহিত্য গড়ে উঠছে এবং নতুন খোরাক পাওয়া যাচ্ছে—পাঠক সমাজ এই ভেবে মুজতবা আলীকে স্বাগত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু গভীর, আরও বেশী স্থিতিশীল রচনা সমষ্টির আশায় হয়তো বা পাঠক সমাজ কিছুটা সন্তোষও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি মুজতবা আলীর যে সকল রচনা সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে, নামে-বেনামে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে যদিও বুদ্ধির দীপ্তি, পাণ্ডিত্যের প্রাখর্য কিছুরই অভাব নেই তবুও একথা না

বলে পারছি না সৈয়দ সাহেবের কাছে বাঙলার পাঠক সমাজ অন্য কিছু আশা করেছিল—এরকম একঘেয়েমি নয়।

বাঙলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে অভিজ্ঞতার জাহাজস্বরূপ এরকম ব্যক্তির অনেক কিছু আজ দেবার আছে। সমাজের নীচে পড়ে আজও যারা খাবি খাচ্ছে, যাদের মুক্তির বাণী-রূপ এযুগের গীতা, সৈয়দ সাহেব যদি তাদেরকে নিজের কলমের আকর্ষণীয় শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করে তুলতেন তাহলে বোধ হয় একটা বড় কাজ সুগঠিত হতো। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সৈয়দ সাহেবকে আমরা সেভাবে পাইনি; পাব কিনা জানি না। তবুও একবার বলতে ইচ্ছে করে 'কলচর' ভীতু(?) সৈয়দ সাহেব যদি সত্যিই 'কলচর' কচলান ছেড়ে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে, নতুন সংস্কৃতি রচনায় সাড়া দিতেন তাহলে আরও সমৃদ্ধির পথে সাহিত্যকে নিয়ে যেতে পারতেন—পাঠক মনের এটা বিশ্বাস।

রঞ্জন বিরচিত 'বিকল্পে' লেখক সম্পর্কে যে কথার অবতারণা করা হয়েছে তাই আমাকে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনে উৎসাহ যুগিয়েছে। রঞ্জন উক্ত ক্ষেত্রে বলেছেন—"হলিউডের প্রযোজকদের মতো লেখকদের মধ্যেও পূর্বতন সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাবার লোভ ব্যাপক ও গভীর।" অর্থাৎ জাবরকাটা মনোবৃত্তির প্রাবল্য। পৃথিবীর সকল সাহিত্যেই কমবেশী এর নিদর্শন মিলবে। কিন্তু তা ছেড়ে যদি বাঙলা সাহিত্যের কথায় আসি তাহলে রঞ্জনেরই ভাষায় বলতে হয়—"নতুন কিছু লিখতে হলে, বাঙলা সাহিত্যের আবার প্রাণ-সঞ্চার করতে হলে, বাঙালী লেখককে আবার হাত বাড়াতে হবে। জীবনের সঙ্গে পুনঃ পরিচিত হতে হবে।" আলাপী সাহিত্যিক-বৃন্দ নিজেরাই যদি এপথে অগ্রসর হন, শুধু আলাপের কৌশলে নয়, বিষয় বস্তুতেও—তাহলেই কাজ হবে।

এখানে বিশেষ করে মুজতবা আলীকে জানাব তিনি যেন এবিষয়ে পথিকৃৎ হন।

—শ্রীকুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা।

অরণ্য জীবনের গান

মহাশয়,

গত ১৬শ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীর চিঠিটি পড়লাম। আমার লেখা অরণ্য-জীবনে'র গান' প্রবন্ধ থেকে তিনি একটি বাক্যের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি না দিয়ে অর্ধাংশ তুলে দিয়েছেন। বাকী অর্ধাংশে হ'ল "বর্তমান প্রবন্ধে আমি আদিবাসী গানের কল্পনাশক্তি ও উপমাজ্ঞানের পরিচয়ই দিতে চাই।" প্রবন্ধের শেষের দিকেও এই উপমার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উক্তি খুঁজে পাবেন তিনি, উপমা খুঁজে পাবেন প্রবন্ধের গান-গুলিতে। "আদিবাসী গানে উপমার ব্যবহার সংখ্যায় খুব কম" মন্তব্যের অর্থ বোঝাতে চেয়েছি এই যে, একটি গানে একাধিক উপমার দৃষ্টান্ত কম পাওয়া যায়। তথাকথিত অনুবাদ ও আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে আদিবাসী গানের পার্থক্য বোঝাবার জন্যেই এই মন্তব্য। আদিবাসী গানকে হেয় করার জন্যে নয়—প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়লেই পত্রলেখক তা বুঝতে পারতেন।

রমাপদ চৌধুরী, কলিকাতা।

চিত্রপ্রদর্শনী

মহাশয়,

১৯শে পৌষের সংখ্যায় একাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনায় আপনার সমালোচক প্রদর্শনীতে ভারতীয় প্রাচীন রূপদক্ষদের এবং অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রভৃতি মহান শিল্পীদের রচনা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য—তাঁদের রচনার সাথে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

নন্দলালের যদি সদ্য কোন রচনা থাকে সে কথা আলাদা। তাছাড়া প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র সদ্য অথবা এর আগে একেবারে অপ্রকাশিত রচনা রাখাই ভাল—এই আমার মত।

সকলকে পুরোনো শিল্পীদের কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তাদের শিল্পমনা করে তোলা দেশের চারুশিল্পের উন্নতির এক অপরিহার্য উপায়। কিন্তু সে কাজ চলিত বছরের প্রদর্শনীর নয়। তার জন্য নির্ভর করতে হবে প্রকাশকদের উপর এবং এমন এক 'শিল্পগৃহ' যাতে রাখা হবে গতদিনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা।

প্রকাশকরা সুলভ দুর্লভ উভয় সংস্করণেই শিল্পীদের কাজ ও জীবনী প্রকাশ করতে পারেন। বাঙালী প্রকাশকদের এ বিষয়ে একটু দায়িত্বও আছে। কেননা, কয়েকটি সহজলভ্য প্রকাশে তারা যদি কেবল কয়েকটি ছবির প্লেট ও তার সাথে বাঙলা টীকা ছাপেন আর তার হিন্দী সংস্করণ-এর জন্য ব্যস্ত না হন, তবে আমার মনে হয় সৌন্দর্যের খাতিরে যারা সে সব বই কিনবেন হয়ত তাদের কেউ কেউ টিপ্পনী বোঝার মত বাঙলা শিখে ফেলবেন। আমার মনে হয় বাঙলাকে প্রচারিত ও সমৃদ্ধ করার এটা একটা ফলদায়ী উপায়।

'শিল্পগৃহ' সম্বন্ধে সরকার, জনসাধারণ ও শিল্পী সকলেরই কর্তব্য আছে। তাঁরাই ভাবুন। তবে বাঙলার শিল্প-রসিকরা কলকাতা ছাড়া বাঙলার অন্যত্র 'বঙ্গ শিল্প নিকেতন'ও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যার সমস্ত কাজ ও চিত্রের টীকা টিপ্পনী ও প্রকাশন হবে বাঙলায়। হয়ত শান্তিনিকেতনই এর উপযুক্ত স্থান। ইতি—প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, কলিকাতা।

বন্ধ্যা বাংলা খেলোয়াড়ের জননী নহে---
দরদী মাসী মাত্র

শ্রীসন্ধানী

অন্যান্য খেলার মত কলিকাতার হকি খেলাও সম্প্রতি High Finance-এর কুক্ষিগত হইতে চলিয়াছে। যাহারা ফুটবল ও ক্রিকেট পরিচালনা করেন, হকির ক্ষেত্রেও কায়েমী স্বার্থ তাহাদের-ই। তাই, রুটির সঙ্গে মাখন এবং টাকার সহিত আনা যোগ করিবার সাধু উদ্দেশ্যে হকির পদ্মবনেও মত্তীর দাপাদাপি আরম্ভ হইয়াছে।

গাছ হইতে ফলের পতন দেখিয়া নিউটনের নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল। স্বাভাবিক ঘটনার অস্বাভাবিকত্ব-ই বজ্ঞানীর মনে অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার হকি খেলার মাঠে বহিরাগতদের কোলাহলে স্থানীয় ক্রীড়ামোদী মহলে মোটেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। তাহারা জানে, চাল ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না; টোপ ফেলিলে মাছও আসে। রজতচক্রের আকর্ষণেই যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাছাইকরা খেলোয়াড়গুলি টুপ টাপ করিয়া কলিকাতার মাঠে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা তাঁহারা জানেন। খেলোয়াড়ের জন্মভূমি যত্রতত্র, কিন্তু ক্রীড়াভূমি কলিকাতা। ঠিক যেন ল্যাংড়া ও ফজলি আম; কলিকাতাতে জন্মায় না, কিন্তু কলিকাতার বাজারেই তাহাদের ভিড়। বন্ধ্যা বাঙলা দেশ আজ আর খেলোয়াড়ের জননী নহে; দরদী মাসী মাত্র।

বাঙলার সমাজজীবনে ইহা ব্যতিক্রম নহে। বরং ইহাকে অতিক্রম করিবার শক্তির-ই অভাব এখন আমাদের। ইংরাজ আমলের আদিতে প্রায় অনুরূপ কারণেই কলিকাতার বুকে "ক্যালকাটা কালচার" বলিয়া এক অদ্ভুত পদার্থের প্রকাশ হইয়াছিল। বাঙলার মাটিতে তাহার শিকড় ছিল না। সুতরাং মাতৃস্তন্যবর্জিত শিশুর ন্যায় তাহার প্রাণকেন্দ্রে ছিল শক্তির অভাব। কিন্তু বাঙলা দেশের জল বাতাসের গুণে সেই ক্যালকাটা কালচার কিছুদিন বাঙালীর জীবনের বসন্তের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙলার কৃষ্টির অন্তঃপুরের দ্বার তাহার জন্য অবরুদ্ধ হইলেও বৈঠকখানাতে তাহার বাড়াবাড়ির কোন অভাব ছিল না।

সেই দিন হইতেই আমরা জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সদরে ও অন্দরে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গডাচর চন্দ্রের মত দুধ ও তামাক দুই-ই খাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রে এই ব্যবধান যেমন বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে তেমন আর কোথায়ও নহে। খেলার মাঠে বাঙলা এখন বারোয়ারীতলার নৃত্যচপলা উর্বশীর পদে "ধ্যান ভাঙ্গি তপস্যার ফল" দিতেছে। কিন্তু বাতায়নে প্রতীক্ষারতা পুরাঙ্গনার কাতরতা তাহার হৃদয় স্পর্শ করে না। তাই, বাঙলার খেলার যত-ই পৌষ মাস হইতেছে বাঙালীর খেলার তত-ই সর্বনাশ হইতেছে। বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। তুলসীমঞ্চে কুলবধূর করপুটে সযত্নে আচ্ছাদিত সন্ধ্যাদীপের স্নিগ্ধতা তাহার নিকট অন্ধকারকে আরও অন্ধকারময় করিয়া তোলে মাত্র।

তাই, বাঙলা দেশে যাহারা খেলার কান ধরিয়া টানাটানি করেন, তাঁহারা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন বাঙলার ক্রীড়াশ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহাদের কৃতিত্বে বাঙলা নাকি আজ ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদিতে ভারত সভায় শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। তাঁহারা আত্মবিস্মৃত; ভুলিয়া গিয়াছেন যে যাঁহাদের মান নাই, তাঁহারাই আশ্রয় গ্রহণ করে অভিমানের। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে ছিল দুর্যোধনের অভিমান, কিন্তু কৌরবের অপমান। বাঙলার খেলার গৌরব আজ বাঙালীর চরম অগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যেন কুললক্ষ্মীর কণ্ঠহারে বারবনিতার প্রীতিসাধন করিয়া পৌরুষ প্রকাশের কলঙ্কজনক প্রয়াস।

আমার বিরুদ্ধে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার অভিযোগ করিলে অবিচার করা হইবে। মাসীকে বাবার শ্যালিকা না বলিয়া মার বোন বলিয়া মানিতে রাজী আছি। কিন্তু মাসীকে মা বলিয়া স্বীকৃতি না দিলে নারীদ্বেষী বলিয়া বিবেচিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। বাঙলার খেলার বাড়-বাড়ন্ত হোক, খেলাধুলোর ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের শ্রীবৃদ্ধি হোক; শূন্যে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স শূন্যে শূন্যে ফুলিয়া ফাঁপিয়া

উঠুক,—আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বাঙালী খেলোয়াড়ের কঙ্কালের উপর বাঙলার খেলাধূলার তাজমহল গড়িয়া উঠিলে আমার মত অনেকের-ই মর্মপীড়ার কারণ ঘটিবে।

বাঙালী এখন আর সামান্য জাতিবাচক সংজ্ঞা মাত্র নহে। বাঙলার শ্যামলবুকে যাহারাই আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারাই বাঙালী। কিন্তু দিবে আর নিবে, মিলিবে মেলাবে, যাবে না ফিরে—এই হইবে বাঙালী বলিয়া বিবেচিত হইবার নিম্নতম মাপকাঠি। অর্থাৎ সুখের পায়রা হইলে চলিবে না; বাঙলার বনের দোয়েল কোয়েল হইতে হইবে। একদিনে না হইলেও, দিনে দিনে।

হকি খেলার আইনে এমনি একটি নিয়মও আছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আইনের শিকলে নিজেরা বন্দী হইতে নারাজ। তাই, তাদের শিকলের ঝনঝনানি কেবলমাত্র বজ্র আটন ফস্কা গেরোতে পরিণত হয়। কলিকাতাতে এই বৎসর দিগ্বিজয়ী দিগ্বিজয় সিং অর্থাৎ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক নামী ও বেনামী খেলোয়াড় আমদানী হইয়াছে। কোন সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার কুঞ্জে এই সমস্ত সুন্দরদের অভিসার সম্ভব হইয়াছে, ইহা কাহারও অজানা নহে। কিন্তু মালিনী মাসীটি কে?

হকি মরসুমের সূচনাতেই এক তারা দুই তারা করিয়া তাহারা বাঙলার আকাশে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনও আইন ছিল। কিন্তু কেহ ইহার উল্লেখও করে নাই। কারণ, হীরা মালিনীর হারের মাসুল হাতে করিয়াই চলিয়াছিল, তাহাদের খেয়া পারাপার। কিন্তু গোলমাল বাধিল তখন, যখন ভারতের অন্যান্য কেন্দ্র হইতে কলিকাতার মাঠের উপর সন্ধানী আলো সম্পাতের হইল সূচনা। সেই মুহূর্তে আরম্ভ হইল আইনের শিকলের ঝনঝনানি।

এই গোলমালের প্রকাশ্য ঢাক হইল বাবু। হেলসিঙ্কি অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক বাবু। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিল জনমত সৃষ্টির চেষ্টা। অন্যদিকে লৌহ যবনিকার অন্তরালে চলিল কর্তৃপক্ষের কূট কৌশলের খেলা "ধরি মাছ, না ছুই পানি"র নীতিতে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। কানে কানে পরামর্শ দিলেন সকলকে—কাগজে কলমে নবাগতদের কোনখানে চাতুরী দেখাইয়া দাও। তারপর বলিতে লাগিলেন যে এই ব্যাপারে ক্লাবের কথা না মানিয়া উপায় নাই। গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া সত্যাসত্য অনুসন্ধান অসম্ভব। অতএব, "বোঝ হে সুবোধ জন, যে জান সন্ধান"। খেলায় অনুমতি মিলিবে সকলের-ই। আইনের জালে ধরা পড়িবে না কেহ-ই। তবে দুই এক ক্ষেত্রে আমদানীর উপর কড়া এবং চড়া শুল্ক আরোপ করা যায় কি না চেষ্টাও চলিবে। মুখরক্ষা করিতে হইবে তো?

কিন্তু ইহা হইল খেলার রাজনীতি; দুষ্ট লোকে দুর্নীতিও বলে। কিন্তু উপসর্গহীন নীতি রহিল অন্তরালেই। বাঙলা দেশের ময়দানের টাঁকশালে যদি এত টাকাই থাকে যে হাতীশালাতে হাতী এবং ঘোড়াশালাতে ঘোড়া রাখা চলে, তাহা হইলে নিজস্ব গোয়ালের গরুগুলিকে দানাপানির অভাবে মারিয়া ফেলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বাহির হইতে খেলোয়াড় সংগ্রহে যে অর্থ ব্যয়িত হয় এবং হইবে, তাহার অংশমাত্রও যদি ঘরের খেলার উন্নতিতে নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে পররাজ্য নির্ভরশীলতা অতিক্রম করিয়া বাঙলা খেলোয়াড়ের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিত। যতদিন তাহা না হইত, বাইরের খেলোয়াড়দের ভূরিভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া খেলোয়াড়গণ অন্তত উচ্ছিষ্ট খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিত।

ড্রইং রুমে নিউ মার্কেট হইতে আমদানী বিচিত্র ফুলের সমারোহ, অথচ গৃহদেবতার পূজার জন্য তুলসী ও বেলপাতার অভাব—ইহা স্বাভাবিকও নহে, সুস্থও নহে। এই মনোভাব অত্যন্ত বিকৃত এবং বিকৃত বলিয়াই ধিকৃত।

নগর-সংকীর্তন

রূপদর্শী

বিদেশী বেনে বহর ভেড়ালে এপারে। সুতোনুটিতে নোঙর করলে, শালকেয় নয়। ওধারে জল কম। জাহাজ বাঁধা সম্ভব হয় না। তাই শিবপুরে জুত হল না, ডক গড়ল খিদিরপুরে।

তখন চলাচল পায়ের জোরে, কি গো-গাড়ীতে, কি খট্ খটা খট্ ঘোড়ার পিঠে। এ হল ডাঙগায় ডাঙগায়। আর জলে? নৌকা, কি জাহাজ। মাস্তুলে পাল, আর পালে বাতাস। খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে সাত সমুদ্রে খেয়া মার। এদেশের লোক পোঁছাও সেদেশে, সে-দেশের মাল গছাও এদেশে। তাই হল। বিদেশী বেনে মুলুকের মাল এনে তুললে কলকেতায়। সুতোনুটি গোবিন্দপুর কালীঘাট তখন কলকেতা হয়ে বসেছেন। ব্যাপারে ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে একেবারে বিয়ের জল গায়ে লাগা এক মেয়ে যেন। এমন চেকনাই।

এতো এপারের কথা। আর ওপার? ইংরেজের নেকনজর পড়ল না বলে দিন-কতক মুখ ঘুরিয়ে রইল অভিমানে। তারপর ঘোমটা আড়াল চোখদুটো ওপারের ভরা যৌবনের বাড় বাড়ন্ত দেখতে লাগল আর হিংসে রিষে বুক পোড়াল। এপার কলকাতা, আর ওপার হাওড়া।

কিন্তু এমন আড়ি আর কদিন? ইংরেজের দৃষ্টি ওধারেও পড়ল।

নদী ডিঙিয়ে ওপারে উঠলে। কপালে পরালে সোহাগের টিপ। সেই থেকে এপার ওপার এক হবার বাসনা পুষেছে মনে মনে। যতদিন যায় তত কাজ বাড়ে। কাজের ফিকিরে এপারের লোক ওপারে, আর ওপারের লোক এপারে নিত্য পারাপার করে। কি উপায়ে? না দিশী মাঝির পান্‌সি ভাউলের সওয়ার হয়ে। প্রধান ঘাট দুটো। এদিকে শিব-পুর আর উদিকে শালকের বাঁধাঘাট।

কিন্তু নদী নয়তো, সাক্ষাৎ শমন। এই বেশ শান্ত, কোথাও কিছু নেই। এই বান ঢুকল সাগর থেকে। তখন রব উঠল সামাল সামাল। কে থাকল কে গেল সে হিসেব পরে দেখো। মাঝি এখন কর পার, মাঝখানে ডুবিলে তরী কলঙ্ক তোমার। কিন্তু তরী হুঁশিয়ার মাঝির হাতেও অজস্র ডুবেছে। ধনে প্রাণে মারা গেছে কত যে অজস্র লোক তার হিসেব কে রেখেছে? ১৮৪০ সনে মানে একশ দশ বার বচ্ছর আগেকার এক রিপোর্টে জানা গেছে, সে সময় সালিয়ানা শ-আড়াই লোক সশরীরে গঙ্গা পেতেন। গিন্নীর খোঁচায় তিত বিরক্ত হাওড়ার লোকেরা

তখন প্রায়ই কলকেতা রওনা দিতেন। মনোগত ইচ্ছে, অল্প খর্চায় স্বর্গে যাবার চেষ্টা করা।

ইদিকে ব্যবসা পত্তরও বেড়ে উঠতে বিঘ্ন ঘটছে। যত ফ্যাসাদের গুরুঠাকরুণ, এই নদীটি। ওকে বাগে আনা বড় সহজ কম্ম নয়। পারাপারের সুরাহা করবার নানা ফিকীর চলতে লাগল। শেষকালে আমদানী হল এক ভোঁপা কল। আঃ মানুষের কি কেরামত। বৈঠা লাগে না পাল লাগে না, কি কলই বানাইছে মিঞা'-ভাই। গলগল করে চোঙ্গার মুখে ধোঁয়া ছাড়ে, ভোঁ-ও ভোঁ-ও চিক্কির ছাড়ে. ঘস ঘস পানি, উথাল পাথাল করে, আর কোম্পানীর কল এপার ওপার পাড়ি দেয়। সন ১৮২৩-এর আগস্ট মাসের গল্প। এমন নাকি এক অদ্ভুত কল গঙ্গায় ভেসেছে। চল চল আর্মানীর ঘাটে: ছুটোছুটি লুটোপুটি। নদীর দুধার লোকে লোকে ছেয়ে গেল। কি তাজ্জব! মাঝগঙ্গায় ভাসছে দ্যাখ যেন পেল্লায় এক পানকৌটি। প্রথম যে ইস্টিমার এপার ওপার ফেরী মারলে, তার নাম ডায়েনা।

কিন্তু কলের জাহাজও ফেল পড়ল। তখন রোয়াব উঠল পুল বানাও। হাওড়া আর কলকেতা এতদিনে অনেক নিকট হয়েছে। 'এই যে, কেমন আছেন'-এর সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে 'কেমন আছো'-তে এসে ঠেকেছে। এতেও চলছে না। এবার দৃঢ়বন্ধন চাই। খেপ মারা কাজে প্রাণ ভরছে না আর, আকাঙ্ক্ষা মিটছে না।

এক পুল বানাবার তোড়জোড় শুরু হল। তোড়জোড় নয়, কথাবার্তা। মাঝে মাঝে বার্তাচিৎ হয় আবার চাপা পড়ে যায়।··গভর্নর সাহেবের খানা টেবিলে খোসগল্পের ফাঁকে কেউ হয়ত কথাটা তুলে বসেন। বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খাওয়াটা বেশ জমে। খাওয়া শেষ তো কথারও ইতি। আর মাঝে মাঝে বাগড়া মারে, এই দিশী জাঁদরেল বাবুরা। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবুও বটেন প্রিন্সও বটেন, সে আমলের এক প্রধান চাঁই. হুগলীর নদীতে পুল চাই বলে সোরগোল তুললেন। ফাঁকা আওয়াজ নয়, টাকার আওয়াজও শোনাতে রাজী হলেন। বাবু জয়কেষ্ট মুখুজ্জেও তাঁর দোহারকি করলেন।

সন ১৮৪৪-য় রেল বসল। সব প্রথমে হাওড়া থেকে হুগলী। তার পরের বছর রেল পৌঁছুল রাণীগঞ্জ। তার সাত বছর বাদে কাশী অবধি পেঁাছে গেল। তারপর আরো দূর দূর চলে গেল। দেশ থেকে দেশে। এদ্দিন হাওড়া ছিল কলকেতার মুখের দিকে চেয়ে। এবার তার আপন মূল্যে নিজের গরব।

চোখ বুঁজে আর থাকা যায় না। রেল আসা না পৃথিবী আসা। খেয়া ইস্টিমার আর পানসি ভাউলিতে পৃথিবী আঁটে কখনো! পুল চাই, পুল। মানুষ যাবে, মাল যাবে, গাড়ী যাবে। তার ব্যবস্থা করছ কোথায়?

পুল হবে? কেমন পুল গো? ঝোলা সাঁকো না ভাসা সাঁকো? প্রথমে কথা হল ভাসা পুল হবে। তার পরক্ষণেই আবার কর্তাদের মতি বদলাল। বললেন, ভাসা পুল নয়। ঝোলা পুল হবে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭১ এই ষোল বচ্ছর ধরে খালি জল্পনা-কল্পনা চলেছে। পুলটা ঝুলবে না ভাসবে?

পুলটা ভাসলই শেষ পর্যন্ত। বড় বড় কর্তাদের সব ভাবনার শান্তি হল ১৮৬৮ সালে। ঠিক হল বেড়াল ঘুমাক আর জাগুক ঘণ্টা বাঁধা এবার হবেই তার গলায়। কে এমন মন্দ আছে এই দিগরে? কে বাঁধতে যাবে ঘণ্টা? কেন, সরকার। সরকারই শেষ পর্যন্ত কাজটা হাতে নিলেন। ঠিক হল একটা ট্রাস্টের হাতে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত তদ্বির তদারকের ভারটা দেওয়া হবে।

তখন বাঙ্গলার তখ্‌তে রাজ্যপাল নন, গদীয়ান আছেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর। তাঁকেই ভার দেওয়া হল ঝক্কি সামলানোর। টাকা জোগাবেন, পুলে যাবার পথ তৈরী করবেন, খর্চাটা যাতে উঠে আসে, মাথট বসিয়ে তার ব্যবস্থা করবেন। কাজ কি একটা যে এক কথায় হিসেব লেখা হয়ে যাবে। পুল বানাবার জোগাড় না হয় করা গেল, সে পুল সঠিক রাখবে কে? মেরামত করবে কে? কেন পোর্ট কমিশনার। তার উপরই ভার পড়ল হেফাজতের। একেবারে এর জন্য এক আইন বানিয়ে সেই আইন মোতাবেক হাবড়াপুলের সারাজীবনের জিম্মা দিয়ে পোর্ট কমিশনারকে বলা হল, প্রতি-গৃহ্যতাম্। পোর্ট কমিশনার বলে উঠলে, প্রতিগৃহ্যামি।

জায়গা নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উঠেছিল। কিন্তু এদিকে ডালহৌসী স্কোয়ার ততদিনে জেঁকে উঠেছে, আর ওদিকে হাবড়ার ইস্টিশান। যেই কেউ সালকে শিবপুরের নাম করে আর হাবড়া ডালহৌসী গর্জে ওঠে, মোদের দাবী মানতে হবে। তাই হল। মল্লিকঘাটের আড়পারই হচ্ছে হাওড়ার ইস্টিশান। এরাই শেষে এপারে ওপারে মিলনের ঘটকালি করলে।

স্যর ব্র্যাড্‌ফোর্ড লেস্‌লী। ভাঙন নয়, গড়নের কারিগর। তাঁরই কেরামতীতে নদীতে বাঁধন পড়ল। ভাসা পুল এপার ওপার ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় জুড়ে দিলে। অক্টোবর মাসে, ঊনো আশী বচ্ছর আগে সব প্রথম কলকেতার লোক হাবড়ায় আর হাবড়ার লোক কলকেতায় পায়ে হেঁটে পার হল। দুনিয়ার কাছে কলকেতার দরজা হাওদা হয়ে খুলে গেল। পুল বানাতে টাকা লাগল বাইশ লাখ।

বড় বড় জাইগাণ্টিক নৌকোর উপর পুলখানা বসানো। মাঝখানটা, চিচিং ফাঁক, তো খুলে গেল, উত্তরের গঙ্গায় বন্দী হয়ে সেসব জাহাজ ইস্টিমার ফেঁসে ফোঁস ফুঁসছিল, তারা দক্ষিণে সাগরে গেল, নৌকো, কিস্তি, বোট, গাধাবোট ও সুট সুট করে তাদের পিছু পিছু রওনা দিলে। দক্ষিণ থেকে আগত যারা পুলে

খোলার অপেক্ষায় গঙ্গার জলে চিৎ হয়ে (আকাশে কড়িকাঠ নেই, গোনার অসুবিধে) দুদণ্ড ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন, মওকা পেয়ে তারা উত্তর দিকে রওনা দিলেন।

মানুষ যাবে, জাহাজ ইস্টিমারের এধার ওধার যাতায়াত বন্ধ। জাহাজ ইস্টিমার যদি ছাড়লে তো মানুষকে আটকাও। নোটিশ পড়ল, বেলা অত ঘটিকা অত মিনিট হইতে অত ঘটিকা অত মিনিট পর্যন্ত হাওড়ার পুল খোলা থাকিবেক। সেই সময় মধ্যে যাবতীয় গমনাগমন বন্ধ। পোর্টকমিশনারের আদেশানুসারে।

আ খেলে যা। টেলিগেরাপ এসেছে মশাই, ছেলে মর মর, দুটো সাঁয়ত্রিশের ট্রেন না ধরলে পৌঁছুতে পারব না। আর আপনি পুল খোলবার টাইম পেলেন না! গমনাগমন বন্ধ বলে তো মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন, এখন আমি করি কি, একটা বিহিত কিছু করুন? বিহিত করবার আর আছে কি, নৌকোয় পার হয়ে চলে যান। অগত্যা। আবার সেই নদীর হাতে প্রাণ সমর্পণ।

১৯০৬ সালের জুন অবধি এমন চলেছে। তখন দিনের বেলাতেই পুল খুলে জাহাজ নৌকো পাশ করতো পোর্ট-কমিশনার। জুন থেকে ব্যবস্থার বদল হল। ঝঞ্ঝট এড়াবার জন্য গভীর রাত্রে হাওড়ার পুল খোলা হত। কলকেতার লোক ভুলেই গেল যে এ পুলে খোলা হয়। শুধু ক্বচিৎ কদাচ শেষ ট্রেনখানা বেজায় লেট থাকলে তার চড়নদারেরা সে রাত্রে আর কলকেতায় পৌঁছুতে পারত না। এসে দেখত মাঝখানের পণ্টুনখানাকে টেনে নিয়ে একপাশে রেখেছে, আর পিল পিল করে জাহাজ ইস্টিমারের স্রোত এধার ওধার যাতায়াত করছে। ভোঁ ভোঁ শব্দে সে তল্লাট তখন সরগরম।

শুধু পুল খোলা আর বন্ধ করার জন্যই নয়, অসুবিধে আরো বাড়তে লাগল। লম্বায় ১,৫২৮ ফিট, গাড়ী-ঘোড়া চলার রাস্তা চওড়ায় ৪৮ ফিট, আর লোকচলার রাস্তা চওড়ায় কুল্লে সাত ফিট। গাড়ী ঘোড়া মনিষ্যি বাড়ছে তো বাড়ছেই। ওইটুকু চওড়া স্থানের মধ্যে তা আর ধরে না। বড় পুল চাই। আবার চাই চাই দাবী উঠল।

এবার আর ভাসা পুল নয়। ঝোলা পুল। একজনকে থামিয়ে আরেকজনের যাওয়া নয়, এমন পুল বানাও যাতে একই সঙ্গে সবাই যাবে, উপরে ডাঙ্গার বাহন, নিচে জলের যান।

১৯৩৬ সালে বাঙলার সরকার আবার নড়ে বসলেন। এক বিলাতী কোম্পানীকে ঠিকে দিলেন। ক্লিভল্যাণ্ড ব্রিজ এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড খোলা পুল বানাবার ভার পেলেন। বিস্তর টাকার মামলত। ১,৬০৫,০০০, ষোল লক্ষ পাঁচ হাজার পাউণ্ড। এক পাউণ্ড ভাঙ্গালে দিশী টাকায় ফেলে ছেড়েও পনের টাকা মেলে। চোখ একেবারে চড়ক গাছে উঠে পড়বে স্যার, হিসেবটা কষলে।

কি পেল্লায় ব্রিজ! য্যারসা লম্বা, ত্যায়সা চওড়া। ভেতরে ঢুকলুম না যেন আস্ত এক শহরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলুম। যেন ময়দানবের শহর। উঁচু দিকে চাই তো ঘাড় মটমট করে। এপার থেকে ওপার হল ১৯০০ ফুট। ঝোলাপুলের কেলাসে হাওড়ার পুল পৃথিবীর মধ্যে থার্ড। আর চওড়াও কি কম নাকি? দুই ফুটপাথের মাধ্যিখানের ফাঁকটাই হল সত্তর ফুট। ফুটপাথ পনের ফুট। আর দুই তীরে ওই যে দুই আকাশে গিয়ে ঢুঁ মারে, তার এক একটাই হল গিয়ে তিন শ ফুট উঁচু।

ওই অত উঁচুতে বসেই এক ভদ্দর-লোক পা ঝুলিয়ে জোছনা রাতে মনের সুখে তান ধরেছিলেন। তারা-গুলোকে শোনাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের প্রাণে তা সইবে কেন? কারা যেন টের পেয়ে পুলিশে খবর দিলে। তারপর হৈ হৈ। নাম, নাম। পড়ে যাবেন মশাই। পড়ে গেলে মরে যাবেন, ওখান থেকে মরলে আর বাঁচতে হবে না। কিন্তু কে শোনে? কে ভ্রূক্ষেপ করে সে কথায়? ওই উপরে, ফুরফুরে হাওয়ায় যার প্রাণের পুলক পেখম মেলেছে তার কাছে কি তুচ্ছ কথার প্যাঁচ নাচানি ভাল লাগে। যে চেঁচাচ্ছে চেঁচাক। ভদ্দরলোক আকাশ পানে গান ছুঁড়তে লাগলেন, সাঁঝের তারকা আমি পথ-হারায়ে এসেছি ভুলে। শেষকালে দমকল ডেকে এই পথ-ভোলা পথিককে পথে নামাতে হয়। তারপর বোধ হয় রাঁচীর ঠিকানায় চালান দেওয়া হয়েছিল, ঠিক মনে নেই। আরেক-বার দুই বন্ধু শহরের গরমে টিঁকতে না পেরে হাওড়া ব্রিজের মাথায় চেপেছিলেন দুহাত তাস খেলতে। দমকল তাদেরও নামিয়েছিল। পরে জানা গেল সেটা কড়া সিদ্দির এফেক্ট। আরো জনা তিনেককে পুলিশ ওঠবার আগেই ধরে ফেলেছিল।

কেন এমন হয়? কার হাতছানি এরা পায়? এদের নিয়ে এ রহস্য ব্রিজটা কেন করে? জানেন? আমি জানিনে।

তবে এটা জানি হাওড়ার নতুন এই প্রকাণ্ড ব্রিজটি প্রথম খোলে ১৯৪৩ সালের পয়লা এপ্রিল।

ভারতীয় সঙ্গীতের রাষ্ট্র সমাদর

দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সামন্ত শাসনের অবলুপ্তিতে ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রসার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গিয়েছিল। এতাবৎকাল দেশীয় নৃপতিরাই ছিলেন সংগীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক; প্রাচীন রাজাদের ধারা অনুসারে তাঁরা দরবারে সংগীতজ্ঞদের প্রতিপালন করে আসছিলেন। নতুন সংবিধানে রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাবার পর সংগীতজ্ঞদেরও প্রতিষ্ঠা চলে যাবার উপক্রম হলো। ভারতীয় সংগীতকে সে সংকট থেকে বাঁচিয়ে তোলার ভারটা রাষ্ট্রই তুলে নিলে নিজের হাতে; কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিষদ এগিয়ে এলো সে-দায়িত্ব পালন করার জন্য; রাষ্ট্রপতি স্বয়ং দেশের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। ঠিক হলো, রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রতি বছর দু'জন উত্তর ভারতীয় এবং দু'জন দক্ষিণ ভারতীয় বিশিষ্ট সংগীতবিদ্ রাষ্ট্রপতির সনদ ও মানপত্র লাভ করবেন।

সংগীতজ্ঞদের সম্মানিত করার প্রথাটি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত বছর প্রবর্তন করেন এবং সম্মানিত প্রথম দলের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ যথাক্রমে হিন্দুস্থানী যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের জন্য, এবং শ্রীকারাইকুড়ী শাম্বশিব আয়ার ও শ্রীআয়কুড়ী রামানুজ আয়েঙ্গার যথাক্রমে কর্ণাটি যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের জন্য। আজীবন সংগীত সাধনা এবং সংগীতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ রাষ্ট্রপতি শিল্পীদের প্রত্যেককে নগদ ১০০০, টাকা এবং একখানি করে কাশ্মীরী শাল ও একটি সনদ প্রদান করেন। মূল্যের দিক থেকে এই উপহার বিপুল কিছু না হলেও রাষ্ট্রের কাছ থেকে সম্মান লাভটাই ভারতীয় সংগীত সাধনায় অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরিষদের এই উদ্যোগটি সংগীতজ্ঞদের জীবনের একটি পরম আরাধ্য সম্মান রূপে পরিগণিত হয়েছে।

এ বছর সংগীতজ্ঞদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সম্মান লাভ করেছেন হিন্দুস্তানী কণ্ঠসংগীতের জন্য শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার; হিন্দুস্তানী যন্ত্রসংগীতের জন্য ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ; কর্ণাটি কণ্ঠসংগীতের জন্য শ্রীসেম্মাঙ্গুড়ী আর শ্রীনিবাস আয়ার এবং কর্ণাটি যন্ত্রসংগীতের জন্য শ্রীদ্বারম ভেঙ্কটস্বামী নাইডু। গত ১৫ই মার্চ দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজের হাতে উপহার ও সনদ বিতরণ করেন। উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম

রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত চারিজন সংগীত-সাধক। বাম হইতেঃ দ্বারম্ ভেঙ্কটস্বামী নাইডু (কর্ণাটি যন্ত্রসংগীত), সেম্মাঙ্গুড়ি শ্রীনিবাস আইয়ার (কর্ণাটি কণ্ঠ সংগীত), ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ (সরোদ), শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার (কণ্ঠসংগীত)

আজাদ, ইউনিয়নের অন্যান্য মন্ত্রিবৃন্দ, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ এবং বিদেশের কূটনীতিক প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে এক অনুপম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনের বাদকদের ঐকতান বাদনের সঙ্গে জাতীয় সংগীত গীত হবার পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ অভ্যাগতদের সম্ভাষণ জানানোর পর শিক্ষা দপ্তরের এডিশনাল সেক্রেটারী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সনদগুলি পাঠ করেন এবং অতঃপর রাষ্ট্রপতি উপহারগুলি প্রদান করেন। সংগীতশিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রপতি তাঁদের সংগীত সাধনায় নিরত থাকতে বলেন, প্রাচীন ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা যেন উত্তরকালের কাছে তা পৌঁছে দেন। শিল্পকলা চর্চাকে প্রোৎসাহিত করার জন্য শিক্ষা দপ্তরের এইরূপ প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রপতি প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সংগীত নাটক একাডেমীর কথা উল্লেখ করে বলেন, আগে দেশীয় রাজন্যগণ সংগীত চর্চা যেভাবে উৎসাহিত করতেন অতঃপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গভর্নমেন্টগুলি যেন সেই ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সংগীতজ্ঞদের প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করা বিষয়ে মাদ্রাজই কিছুটা কার্যকরী উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলিতে রাজ্যের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের নিয়ে মাঝে মাঝে রাজভবনে জলসার অনুষ্ঠান ছাড়া সংগীতের প্রতি আর বিশেষ কোন সম্মান দেখাবার ব্যবস্থা হয়নি। রাজভবনে গাইবার জন্য রাজ্যপাল কর্তৃক আমন্ত্রিত হওয়াটা যে কোন সংগীতজ্ঞের কাছে সম্মানের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের সাধনার সেইটেই যথেষ্ট স্বীকৃতি নয়। সংগীত চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্যগুলির আরও অনেক কিছুই দায়িত্ব আছে।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত এবারের শিল্পীদের মধ্যে প্রথম মহিলা শিল্পসাধিকা সম্মান পেলেন শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার। মাত্র ন বছর বয়সে শ্রীমতী কেরকার সংগীতশিক্ষা আরম্ভ করেন পরলোকগত ওস্তাদ আবদুল করীম খাঁর কাছে। পরে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল কোলাপুর দরবারের প্রধান সংগীতজ্ঞ পরলোকগত ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন। হিন্দুস্থানী খেয়াল গানে শ্রীমতী কেরকারের অপরিসীম ব্যুৎপত্তি তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং দুঃসাধ্য রাগ রাগিনী উপহার দেওয়ার ক্ষমতার জন্য ভারতে আজ তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি কলকাতার জলসায় প্রায় প্রতি বৎসরই যোগদান করে আসছেন। গত বড়দিনে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীমতী কেশকার রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে তাঁর শিল্পকৃতিত্বের পরিচয় দানের সুযোগ লাভ করেন। রাষ্ট্রপতি সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মানার্থে শ্রীমতী কেশরবাঈর গানের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতি এতোই মুগ্ধ হন যে, পর পর তিনখানি গান শুনেও যেন তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে যায়। শ্রীমতী কেশরবাঈকে নিজে অনুরোধ করে আরও গান শুনে তবে তিনি স্থানত্যাগ করেন।

ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁও ভারতের একজন সর্বজনসম্মানিত সংগীতজ্ঞ। আজ তিনি সরোদ বাজনাতেই ওস্তাদ, কিন্তু প্রথম জীবনে সংগীত শিক্ষা তিনি আরম্ভ করেন তাঁর পিতার অধীনে 'হোরি ধ্রুপদ' গান নিয়ে। তানসেনের সঙ্গে এই বংশের সম্পর্ক আছে এবং সেই আমল থেকে বংশপরম্পরায় তাঁরা সংগীতের সাধক। এঁ'রই পূর্বপুরুষরা ইরাণ থেকে এদেশে সরোদ বাজনাটি আমদানী করেন এবং আজ যে সরোদ প্রচলিত সেটির পরিকল্পনাকারী হচ্ছেন ওস্তাদ হাফিজ আলির পিতামহ ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ। ওস্তাদ হাফিজ আলি মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর পিতা বিখ্যাত সরোদী ওস্তাদ নান্নে খাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। তারপর তিনি পিতামহের কাছে শিখতে থাকেন সরোদ বাজনা। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গুরুর সন্ধানে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে দেশের নানা স্থান ঘুরে সংগীত শিখতে থাকেন। স্বগৃহে পিতা ও পিতামহের কাছে শিক্ষালাভের পর প্রথমে তিনি বড়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ এবং পরে ওস্তাদ ওয়াজীর খাঁ ও ভাইয়া গণপৎ রাওয়ের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পকৃতিত্ব তাঁকে [illegible] তিনি [illegible] করতে সক্ষম হয়েছেন।

কর্ণাটি ধরনের কণ্ঠসংগীতের সাধক শ্রীসেম্মানগুড়ী আর শ্রীনিবাস আয়ার প্রথমে পরলোকগত সেম্মানগুড়ী নারায়ণস্বামী আয়ারের কাছে সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং সংগীতকলানিধি মহারাজপুরম বিশ্বনাথ আয়ার প্রমুখ কর্ণাটি সংগীতের বিশিষ্ট সাধকদের উপদেশ মেনে চলতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার কাছ থেকে 'রাজসেবানিরত' উপাধি লাভ করেন; ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজ সংগীত একাডেমী তাঁকে সংগীত কলানিধি উপাধিতে ভূষিত করেন। বছর কতক ধরে তিনি ত্রিবান্দ্রমের সংগীত শিক্ষালয় স্বাতিতিরুনল একাডেমীর অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাষ্ট্র কর্তৃক সম্মানিত সংগীতজ্ঞদের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ; মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স তাঁর।

সম্মানিত অপর কর্ণাটি সংগীতজ্ঞ হচ্ছেন ষাট বৎসর বয়স্ক শ্রীদ্বারম ভেঙ্কটস্বামী নাইডু। শ্রীনাইডু কর্ণাটকে যন্ত্রসংগীতের বিশিষ্ট সাধক, তাঁর দাদার অধীনে তিনি বেহালা বাজনা আরম্ভ করেন। বেহালা বাজনাটি তিনি এমনি আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসেন যে, আর কারুর সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজের থেকেই তিনি দুঃসাধ্য রাগ রাগিনী আয়ত্ত করে সকলকে চমৎকৃত করেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার সংগীত শিক্ষালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৬ সালে ওখানকার অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। ১৯৪১ সালে মাদ্রাজের সংগীত একাডেমী তাঁকে সংগীত কলানিধি উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯৫০ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কলা-প্রপূর্ণ উপাধিতে সম্মানিত করেন।

কবিতা

মিলিতা : সুনীলচন্দ্র সরকার। প্রকাশক—সুরজিৎ দাশগুপ্ত, জলার্ক, ৩৩ জেলেপাড়া লেন, শালকিয়া, হাওড়া। দাম—বারো আনা ও এক টাকা।

অবতামসী আবার রাত্রি : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা ভবন; ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। দু' টাকা।

পাখনা : শ্রীবটকৃষ্ণ দাস। ইউনাইটেড বুক্স্; ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। দু' টাকা।

আধুনিক বাঙলা কবিতার পাঠকসংখ্যা এখনো মুষ্টিমেয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দুর্বোধ্যতা। অবস্থাটার ইদানীং কিছু পরিবর্তন হয়েছে। গত দু-দশ বছরে যে-সমস্ত কবিতা লেখা হয়েছে তাকে, আর যা-ই হোক্, দুর্বোধ্যতার অপবাদ কেউ দিতে পারবেন না। কবিতা এখন অনেক বেশী সুবোধ্য। তা ছাড়া কল্লোলযুগীয় কবিকর্মে যে একটি চড়া-গলার উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, সেটি কেটে যাবার পর বাঙলা কবিতায় এখন এমন একটি স্মিতশান্ত মাধুর্য ফুটে উঠেছে নিঃসংশয়েই যাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা চলতে পারে।

'মিলিতা'র প্রধান গুণ এই মাধুর্য। বইখানি ছোটো, খুবই ছোটো; কিন্তু কবিমানসের যে প্রসন্নতার ফলে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, এ-বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতেই তা উপস্থিত। কবিতাগুলি রসস্নিগ্ধ, নীটোল, সম্পূর্ণ।

কবিমানস খুব-বেশী প্রসন্নতামণ্ডিত হবার একটা বিপদ আছে, কবিতায় তাতে শাণিতবুদ্ধি জৌলুসের ঈষৎ অভাব ঘটে। আলোচ্য বইয়ের কবিতাগুলি দেখলাম এই স্বাভাবিক নিয়মের একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। একদিকে এর শব্দযোজনা, উপমা-সম্ভার, পংক্তিবিন্যাস ইত্যাদি সমস্ত কিছুই যেখানে বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে, অন্যদিকে তেমনি আবার সেই সযত্নবিন্যস্ত কবিকর্মের মধ্যেও একটি বিষণ্নমধুর প্রায়-উদাস কবিমানসের সন্ধান পাওয়া যাবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই :—

আয় চ'লে এই জামতলায়
দূর থেকে দ্যাখ বাড়িটা তোর
এদিকে জানলা ওদিকে দোর

চলন্ত ছবি ঝলমলায়।...
দ্যাখ বসে এই জামতলায়
কেমন খেলনা বাড়িটা তোর
দপদপ করে জানলাদোর
মানুষ বাঁচার ঢেউচলায়। (জামতলা)

এত দ্রুত, তবু এত শান্ত কবিতা এবং এত ভালো কবিতা—প্রসঙ্গত বলি, 'মিলিতা'র মধ্যেও এমন কবিতা আর দুটি-একটির বেশি নেই—গত দু'চার বছরের মধ্যে আমরা খুব কমই পেয়েছি। 'চিল : মেয়ে : কবি' আর 'খোলা পথ' কবিতাটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি কবিতায় শব্দ দিয়ে এত সুন্দর চিত্র রচনা করা হয়েছে যে পাঠকমাত্রেই তাতে মুগ্ধ হবেন।

বাঙলা কবিতার পাঠকের কাছে শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকারের নাম খুব-বেশী পরিচিত নয়। তার কারণ, অনেকদিন থেকে লিখলেও তিনি অত্যন্তই কম লেখেন, এবং যতদূর জানি—এইটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। যে-কবি এত ভালো লেখেন, তিনি এত কম লেখেন কেন, যুক্তিসংগতভাবেই এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

একটু আগেই বলেছি, বাঙলা কবিতা এখন অনেক-বেশী সুবোধ্য। 'অবতামসী আবার রাত্রি'র কয়েকটি কবিতা পড়ে সে উক্তি এখন প্রত্যাহার করে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। শ্রীযুক্ত বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিমান কবি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংকলন-গ্রন্থে ইতিপূর্বে তাঁর কিছু কিছু কবিতা আমরা পড়েছি, পড়ে ভালোও লেগেছে। তাঁর এই প্রথম কাব্য-গ্রন্থেও এমন কয়েকটি কবিতা পাঠ করলাম, নিঃসন্দেহেই যা সমাদরের যোগ্য। তাঁর শব্দ-সম্ভার সমৃদ্ধ, শব্দপ্রয়োগের কৌশল কখনো কখনো অভিনব, কাব্যকুশলতা প্রশংসনীয়। কিন্তু 'নিশ্চরয়িনী', 'পেনামব্রা', 'গ্রাসিন্দু', 'জিহ্মিত' ইত্যাদি সব অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ-প্রয়োগ করে কবিতাকে এখানে ওখানে অনর্থক দুর্বোধ্য করে তুলবার যে-একটা ঝোঁক তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি কোন মতেই তাকে সমর্থন করা চলে না। তা ছাড়া যে অনুপ্রাসযোজনার দিকে তাঁর এত আগ্রহ, রসসঞ্চারের সহায়ক না হয়ে প্রায়ক্ষেত্রেই যে তা একটা শস্তা চাতুর্যে পর্যবসিত হয়েছে, সে-সম্পর্কেও তাঁর সচেতন থাকা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যদি আমরা একটি সত্যিকারের কবি-মনের পরিচয় না পেতাম, এত কথা বলবার কোনো দরকারই হতো না। তাঁর শক্তি প্রশ্নাতীত এবং যেখানেই তিনি দুর্বোধ্যতা আর শস্তা অনুপ্রাসের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন, সেইখানেই তাঁর পক্ষে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দেয়ালে বসুধারার আঁক', 'এইখানে এই নদীতীরে' এবং 'প্রণয়-প্রেক্ষা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন কবিতা যদি তিনি আরো লেখেন, বাঙলা কাব্য তাতে সমৃদ্ধই হবে।

'পাখনা' পড়ে কিন্তু আমরা খুশী হতে পারিনি। তার কারণ এই নয় যে, বইখানিতে কাব্যগুণের কিছু অভাব আছে। তা নেই। অভাব যে জিনিসটির আছে তা হলো মৌলিকতা। প্রথম পর্যায়ের রচনায় যদি দু-চারজন প্রতিথযশা কবির কিছু কিছু প্রভাব এসে পড়ে, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই বরং সেইটিই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রেও সে ত্রুটি আমরা উপেক্ষাই করতে পারতাম। কিন্তু শ্রীবটকৃষ্ণ দাসের এই কাব্যগ্রন্থে ইতস্তত তাঁর সমকালীনই শুধু নয়, সমবয়সী কবিদেরও যে ওতঃপ্রোত প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি তা তাঁর পক্ষে প্রশংসার কথা নয়। এমনিতে তাঁর কবিতা পরিপাটি, সযত্নবিন্যস্ত। কিন্তু তাই কি সব? স্থায়ী কবিতা লিখতে হলে সর্বাগ্রে তাঁকে নিজস্ব একটি সুর খুঁজে নিতে হবে।

৩৮৮।৫২, ২৫।৫৩, ৩৩।৫৩

উপন্যাস

প্রবাহ—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত। ভারতী লাইব্রেরী, পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক কর্তৃক ১৪৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, টাকা।

পল্লী-জীবনের পটভূমিকায় আখ্যায়িকার অবতারণা। কিন্তু ঘটনার গতি গ্রন্থকারের

মনকে নাগরিক প্রতিবেশের মধ্যেই লইয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গালী সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে তিনি আখ্যান ভাগের বিন্যাস-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এক্ষেত্রে পল্লী-জীবনের সম্পর্ক এবং তাহার প্রকৃত প্রাণস্পন্দন হইতে লেখক বাস্তবিক পক্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মৃন্ময় এবং তাহার বাল্যসহচরী মঞ্জুষা। জমিদারের মেয়ে মঞ্জুষা। আধুনিক শিক্ষা সে পাইয়াছে এবং মানসিক অগ্রগতি যথেষ্টই তাহার আছে। ইহা সত্ত্বেও সরল, উজ্জ্বল লাবণ্যময়ী চপল, চটুল মঞ্জুষার চরিত্রে পল্লীর তাজা প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়; কিন্তু ঘটনার গতির দ্রুততা এবং আকস্মিকতার আবর্তে পরিশেষে মঞ্জুষার ব্যক্তিত্বের এই মাধুর্য অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা লিলিই উপন্যাস-খানির পরে অনেকটা মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মৃন্ময়ের বন্ধু নাসরুল অপ্রতিষ্ঠিত জীবনের গতিবেগ উপন্যাস-খানাকে শেষ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে। নাসরুল জীবনের মূলে থাকিয়া কোন্ শক্তি তাহার চরিত্রের এই গতিবেগ সৃষ্টি করিতেছে তাহার রীতি-প্রকৃতি বুঝিয়া ওঠা যায় না। অন্যপক্ষে গ্রন্থকার আকস্মিকতার আবর্তে পরিবেশ আঙ্গিকের প্রতি যতটা আকৃষ্ট হইয়াছেন, মনোধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁহার সৃষ্টিতে ভাবের অন্তরঙ্গ নিবিড়তা ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ততটা দক্ষতা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য ঘটনার আকস্মিকতায় এবং সংঘাতে রসের বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে; কিন্তু রসের এই যে গতি বা প্রবাহ ইহার মূলেও ভাবের একটি ধারা প্রশান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রবাহিত হয়। গ্রন্থকারের সঙ্গতি আছে। রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে এবং রসধর্মের বিস্তার সাধনে তাঁহার রচনায় দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার আকস্মিকতার সংঘাতের চাপে স্থায়ী ভাবের পরিবেশে কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও উপন্যাস-খানিতে খাঁটি রস-পরিবেশন-পটুতার অভাব ঘটে নাই। প্রত্যুত বিভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া রূপ ও রসের যে চমক আসিয়া স্থানে মনের উপর পড়ে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। উপন্যাস খানির এই মৌলিকত্ব রসিক-সমাজে ইহাকে মর্যাদা দিবে। ৮৩।৫৩

শিশু সাহিত্য

আমার ছড়া—শ্রীসুনির্মল বসু। প্রকাশক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড। কলিকাতা। দাম—দেড় টাকা।

সুনির্মলবাবু শিশু-কবিতার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র রাজত্ব করছেন—এবার ছড়ার ক্ষেত্রেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। এমন সুন্দর ছবিতে ভরা চকচকে ঝকঝকে একখানি বই পেলে শিশু মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ বইটির প্রচার হলে শিশুদের লাভ ষোল আনা।

একটি ছড়া তুলে দিলাম ঃ—

এঁড়েদার লাঠিয়াল লাঠি ঠোকে ঠক্ ঠক্,
হুঁড়োরাম ভুঁড়িয়াল জল খায় ঢক্ ঢক্।
হরিতকী বেটে খেয়ে কাঁদে শিবু সর্দার,
বৈরাগী বনে যায় ফেলে টেলে ঘর-দ্বার।
হাতী করে লাথালাথি, দাপাদাপি দিনরাত
বিছুটির বনে এসে চিতাবাঘ চিৎপাত।

৮০।৫৩

ছড়ার ছবি (৪)—ছড়া রচয়িতা—শ্রীসুনির্মল বসু। প্রকাশক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২-এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯। দাম—এক টাকা।

শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ 'ছড়ার ছবি' নামে শিশুদের জন্যে ছড়া ও ছবির বই প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই শিশু মহলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বর্তমান বইটি সেই সিরিজেরই ৪র্থ সংখ্যক গ্রন্থ। এই বইটির ছড়াগুলি সমস্তই হিন্দী ছড়া থেকে বাঙলায় রূপান্তরিত করা। সুনির্মল বসু ছড়া রচনায় ওস্তাদ। তাঁর রচনার সঙ্গে মনোমুগ্ধকর ছবির সহযোগিতা ঘটায় বইটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া উচিত এ কথা বলাই বাহুল্য।

উদাহরণ হিসেবে একটি ছড়া আমরা উদ্ধৃত করলাম—

বুদ্ধু রাঁধে ডালের বড়া
কাল্লু রাঁধে ঝোল্ রে,
মজা করে আমরা খাব
হঠাৎ বাধে গোল রে;
ডালের বড়া ঝলসে গেল,
বুদ্ধু গেল ভড়কে,—
কাল্লু যেমন ঝোল নামালো
কড়াই গেল হড়কে।

৮১।৫৩

ছোট গল্প

চার কলম—নন্দদুলাল ঘোষ, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাদ্রিশেখর বসু ও অসীম ভট্টাচার্য। প্রকাশক—প্রবোধকুমার ঘোষ, ৮।৯, রসা রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য—দুই টাকা।

চারজন তরুণ লেখকের গল্প গ্রন্থ। বইটিতে মোট দশটি গল্প আছে। আরম্ভে নন্দদুলাল ঘোষের 'সুধীরমন', 'মন' ও 'বৈশালী' গল্প সন্নিবেশ এবং বর্ণনের মধ্যে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

মনে হয় নামান্তরে একই ধরণের রচনা। লেখকের ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকলেও কৃত্রিমতা প্রবল। এই ত্রুটি মানব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাহাড়ী মেয়ে', 'নীলা' ও 'অসমাপ্তে' নেই; তবে তাঁর গল্পের বিষয়-বস্তু গতানুগতিক। একজন সম্ভাবনাসম্পন্ন সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায় হিমাদ্রিশেখর বসুর 'ঝুমকোকা' ও 'রাইদাদু' গল্পে। মজলিসী গল্পের মেজাজ 'রাইদাদু'র সুরে থেকেই পাঠক মনকে আবিষ্ট ক'রে রাখে। রোমান্টিক গল্প হিসেবে 'ঝুমকোকা' সুখপাঠ্য। বইটির শেষ দিকে দুটি সুন্দর গল্প আছে অসীম ভট্টাচার্যের—'প্ল্যানচেট' ও 'উঠান সমুদ্দুর'। প্রথম গল্পটির হাস্যমধুর কৌতুক দ্বিতীয় গল্পটির করুণ ভাবমাধুর্যে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'উঠান সমুদ্দুরে' মনোবিশ্লেষণ এবং রচনাভঙ্গী লেখকের ক্ষমতার পরিচায়ক। লেখকেরা চারজনেই তরুণ, তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে। বইয়ের প্রচ্ছদপট রুচির পরিচায়ক, অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, তবে মুদ্রণের ত্রুটি না থাকলে সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। ৫৯।৫৩

বিবিধ

বাংলার সংগীত (প্রাচীন যুগ):—শ্রীরাজেশ্বর মিত্র। প্রকাশক : টি কে ব্যানার্জি এন্ড কোং, ৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

আদি থেকে বর্তমানের চলতি ধারার বাঙলা সংগীতের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ নিয়ে লেখা গ্রন্থখানি সংগীতের শিক্ষক, ছাত্র ও সমালোচক সবারেই কাজে লাগবার মতো করে রচিত হয়েছে। গ্রন্থকার নিজে সংগীতজ্ঞ বলে সংগীত সম্পর্কে আলোচনাটা সহজ করেছেন। তা'বলে নিজের পান্ডিত্য ফলাতে তিনি যাননি, সংগীতের শাস্ত্রকার ও টীকাকার পণ্ডিতরা যে সব কথা বলে গিয়েছেন গ্রন্থকার প্রামাণ্য উক্তি হিসেবে তাদের কথা ব্যবহার করে বাঙলার সংগীতের উৎপত্তির ইতিহাস এবং সংগীতের বৈশিষ্ট্য সামনে তুলে ধরেছেন। একশ আঠারো পাতার ছোট বই-ই বলতে হবে, কিন্তু ওরই মধ্যে গ্রন্থকার বাঙলার সংগীতের ঐতিহ্য এবং বিপুল ঐশ্বর্যের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাঙলার সংগীতের আগেকার আমলে কি কি রূপ ছিল, বাঙলার সংগীতে ভারতের কোন কোন অঞ্চলের প্রভাব কিভাবে এবং কি সূত্রে এসে যুক্ত হয়, বাঙলার সংগীতও ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কি সূত্রে প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য সংগীত ধারাকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে, গ্রন্থখানিতে তার একটা এমন ধারাবাহিক পর্যায় বিবৃত হয়েছে, যা বাঙলার সংগীত সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করায় প্রণোদিত করবে। কতকগুলি লুপ্ত ও অধুনা অশ্রুত বাঙলার গীতিকাব্য ও রাগ-বৈচিত্র্যের কথা এই গ্রন্থখানি পাঠে জানতে পারা যায়। বাঙলার সংগীতের উৎপত্তির ইতিহাস, প্রাচীন বাঙলার সংগীতের রূপ, চর্যাপদের গান এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত, এই চারিটি অধ্যায় নিয়ে এই তথ্যবহুল গ্রন্থ। বাঙলার সংগীতের প্রাচীন যুগটাই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে; মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ নিয়েও গ্রন্থকারের রচনার প্রতীক্ষায় রইলাম। সংগীত সম্পর্কে আলোচনা ও সংগীতের রূপ নির্ণয়ে এ গ্রন্থখানি খুবই কাজে লাগবে। (৪৬।৫৩)

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

অন্যতমা—মনোরঞ্জন রায়। সুরেশচন্দ্র হাজং কর্তৃক তুরা,—গারো হিলস্‌ আসাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲। ৬৯।৫৩

আলোপাত—নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং কোং, ১১-ডি আরপুলি লেন, কলিকাতা। মূল্য—৸৹। ৭১।৫৩

রূপান্তর—নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, গ্রন্থকার কর্তৃক ওল্ড ক্যালকাটা রোড, পাতুলিয়া, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৷৹। ৭২।৫৩

উপনিষদ্‌ জড় ও জীবতত্ত্ব—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকণকেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ১৩৯বি কর্ন-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৫৲। ৭৩।৫৩

পথ বেঁধে দিল—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷৹। ৭৪।৫৩

লন্ডনের নরক—দীনেন্দ্রকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷৹। ৭৫।৫৩

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে—স্বপন-বুড়ো। শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য— ২৷৷৹। ৭৬।৫৩

প্রেয়সীকে—সুমিত সেন। ধ্রুবরঞ্জন মজুমদার কর্তৃক ৬-বি ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৸৹। ৭৭।৫৩

সাধান পন্থা—সপ্তর্ষি শ্রীশ্রীমৎ স্বামী যোগজীবনানন্দ। পতিতপাবন কুন্ডু কর্তৃক ১১, এন এন ঘোষ লেন, টালীগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৲। ৭৮।৫৩

ঝঞ্ঝা—সুনীল ঘোষ। পুঁথি ঘর, ২২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৭৯।৫৩

Filariasis — Kaviraj Vijayakali Bhattacharjja Chiranjib Aushadalaya. 170 Bowbazar Street Calcutta. মূল্য—২৲। ৮২।৫৩

ট্রামে-বাসে

মিঃ এণ্টনী ইডেন তাঁর এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হউক ইহা কেহই চায় না, ইহাতে কাহারও কোন স্বার্থ নাই।—"বিলেতের কথা জানিনে কিন্তু এখানে এই কোলকাতায় অনেককেই মা কালীর দরজায় ধর্ণা দিয়ে বলতে শুনেছি, আর একবার যুদ্ধটা কোনরকমে বাধিয়ে দে মা, তোর জিব সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম মার্চ, এপ্রিল এবং মে এই তিন মাসে গঙ্গায় অন্যান্য বছরের তুলনায় অত্যন্ত বড় রকমের জোয়ার আসিবে।—"হাঙ্গরের সংখ্যাধিক্যের জন্যে কিনা তা বলা শক্ত। অবিশ্যি জলের হাঙ্গরের ভয় আমাদের বহুদিন আগেই কেটে গেছে" বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দিল্লীর এক সভায় পুলিশের লাঠি চালনা সম্পর্কে বিতর্কের

উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব মহাশয় জানাইয়াছেন যে গোলযোগের জন্য মূলতঃ দায়ী একদল ষাঁড়ের সম্মিলিত আক্রমণ। —"একবারে এক ঢিলে দুই পাখী—কেন না অনেকেই বিশ্বাস করেন A bull can do wrong"!!

খাদ্য মন্ত্রী জনাব কিদোয়াই বলিয়াছেন যে, শুঁটকী মাছ রপ্তানির জন্য নাকি সরকার নূতন ব্যবস্থা

করিতেছেন।—"জ্যান্ত মাছ তো ধরা পড়ল না, দেখা যাক্ নতুন জালে যদি শুঁটকী ধরা পড়ে"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতার নবনির্বাচিত মেয়র গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে "মিস্ ইউনিভার্স"কে পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন।—"মিস্ ইউনিভার্স আশা করি, কোলকাতা নগরটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করিবেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আমাদের জনৈক সহযোগী কোন একটি পুরুষের মেয়েতে রূপান্তরিত হওয়ার অদ্ভুত কাহিনী শুনাইতেছেন।—"কিন্তু অবয়বের দিক থেকে না হলেও কত পুরুষ যে মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে এই কোলকাতারই ট্রামে-বাসে বা অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে খোঁজ কি সহযোগী রাখেন"?

* * *

একটি বিশেষ ধরণের আবিষ্কৃত যন্ত্র হইতে যে শব্দতরঙ্গ নির্গত হইবে তাহা দিয়াই নাকি বাড়ীর ধোয়ামোছার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশ্চর্য্য কিছু নয়; একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে "আমার মরণ নেই" বলে একটা আর্তনাদ যখনই শব্দ-তরঙ্গে ভেসে আসে তখনই কলতলায় "বাসনমাজা ঝমাঝম আর কাপড় কাচা ধমাধম" আপনা থেকেই চলতে থাকে"।

* * *

কয়েকজন খেলাধূলার উদ্যোক্তা এবং উৎসাহী কয়েকজন কংগ্রেসীর সঙ্গে এক সভায় মিলিত হইয়া নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন যে কলিকাতায় একটি পৃথক ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে—"বিংশ শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার সন্দেহ নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে এই নিয়ে ক'বার হলো দাদা"।

* * *

লোকসভার সংবাদে প্রকাশ যে অধিবেশনের সময় দর্শকদের গ্যালারি হইতে জনৈকা মহিলা নাকি হঠাৎ দাঁড়াইয়া সদস্যাদিগকে তাঁর কথা শুনিতে
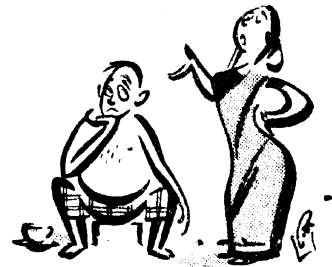
অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করা হয় নাই—"এবং এটা সম্ভব হয়েছে, লোকসভা বলেই, লোকদের সাধারণ বাড়ী হলে মহিলাদের কথা বলতে দেবে না এমন ক'টা ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে"!!

বাঙলা মঞ্চের বর্তমান

মাস কয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রমোদ-জগতের "বাইবেল" বলে সম্মানিত সাপ্তাহিক "ভ্যারাইটি" পত্রিকাতে তাঁদের প্রতিনিধি কলকাতার প্রমোদ আকর্ষণের বিবরণী দিয়ে বলেন এখানে কোন থিয়েটার নেই, দিশীও নয় বিদেশীও নয়। "ভ্যারাইটি"র মতো "বাইবেলে" অমন একটা ভুল খবর প্রকাশিত হওয়াটা ওদের অজ্ঞতার পরিচয় অবশ্যই ব্যক্ত করে, কিন্তু বাঙলা অভিনয়ের জন্য চারটি এবং হিন্দীর জন্য একটি পুরো এবং একটি আধা থিয়েটার সহরের বুকে বিরাজ করতে থাকা সত্ত্বেও বিদেশীদের যে তা গোচরে আসে না সেটা কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার নয় মোটেই। মঞ্চগুলির বর্তমান অবস্থার কথা মনে করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, বিদেশীদের কাছেই শুধু নয়, এদেশেরই এবং বাঙলার বাইরের লোকের কাছে এমন কি কলকাতা প্রবাসী অবাঙলীদের কাছেও কেন মঞ্চগুলির অস্তিত্ব গোচরিভূত নয়। এ অবস্থা কিন্তু চিরকাল ধরেই চলে আসছে না।

* * *

কলকাতায় থিয়েটার পত্তনের মূলেই ছিলো বিদেশীর হাত, একজন ইউরোপীয়ের। তারও পরে স্থায়ীভাবে পেশাদার অভিনয়শিল্পী সম্প্রদায় গড়ে তোলারও গোড়ার দিকের উদ্যোগ ছিলো অবাঙালীর। আরও পরে বিদেশীরাই আচার্য শিশিরকুমারের দলকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যান। আর, বাঙলার বাইরে থেকে কেউ এলে কলকাতার পেশাদার থিয়েটার তাদের অবশ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে থেকেছে এই সেদিন পর্যন্তও। আজ তাহলে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছলো কি করে?—কলকাতায় থিয়েটার আছে কি না সে খবরই লোকে সহরে থেকেও জানতে পারে না! অর্থাৎ কলকাতার থিয়েটার আগের মতো আর আকর্ষণীয় নয়। একদিন যা বিদেশীদের কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই নয়, বিদেশে নিয়ে

রঙ্গজগৎ

গিয়ে দেখাবার মতোও চমৎকারিত্ব প্রকাশে সক্ষম হয়েছিল, আজ বাঙলা মঞ্চের সে ক্ষমতা এমনই স্তিমিত হয়ে গিয়েছে যে, দেশের কাছেও তার অস্তিত্ব ধারণার বাইরে চলে যেতে বসেছে। পেশাদার মঞ্চগুলির এখনকার চলবার ধরণটা বিচার করলেই তার কারণ ধরতে পারা যায়।

* * *

বাঙলা নাটক অভিনয়ের জন্য এখন

বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুন আবেদন আনতে পারবে বলে প্রত্যাশিত প্রবোধকুমার সান্যালের "বনহংসী"র চিত্ররূপের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী, শোভা সেন ও নীতিশ মুখোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার্সের ছবিখানি পরিচালনা করছেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

ব্যাপক হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ যে কোন দিনের খবরের কাগজের পাতায় প্রমোদ অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তির বহর দেখে বুঝতে পারা যায়। পেশাদার মঞ্চকটি সপ্তাহে দিন তিনেকের বেশী অভিনয় করে না। বাকী কদিন মঞ্চ দখল করে রাখে সখের দলেরা; তাছাড়া সহর ও সহরতলীর যেখানেই থিয়েটার করার মতো হল আছে তার সবগুলিই প্রতিদিনই অধিকৃত থাকে; এর ওপর পাড়ায় পাড়ায় সামিয়ানা খাটিয়ে বা মেরাপ বেঁধে নাটক মঞ্চস্থ করারও বেশ একটা হিড়িক দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল, কলেজ, পাড়ার ক্লাব, সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষালয় এবং অন্যান্য ধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গুলি তো নিয়মিতভাবেই অভিনয় করে যায়, তাছাড়া সরকারী বেসরকারী অধিকাংশ অফিসেই আজকাল নাটক অভিনয়ের জন্য "রিক্রিয়েশন ক্লাব" গড়ে উঠেছে। এইসব ব্যাপারগুলো মিলিয়ে ধরলে দেখা যায় নাট্যাভিনয়ের জন্য এখন রয়েছে চারটি মঞ্চ। মাঝে মাঝে এদের কেউ কেউ নতুন নাটক অবশ্য মঞ্চস্থ করছেন, কিন্তু জমাতে পারছেন না কিছুতেই। নাট্যামোদী দর্শকের যদি অভাব থাকতো তাহলে একটা কারণ ছিলো, কিন্তু নাট্যামোদীর যে অভাব নেই সেটা বুঝতে পারা যায় সম্মিলিত নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে স্থান সংকুলানের চেয়েও বেশী দর্শক সমাগম দেখে, প্রবেশ মূল্যের হার এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও। নতুন নাটক দেখতে কিন্তু লোকের অমন আগ্রহ দেখা যায় না। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে পুরণো আমলের নাটকের মধ্যে এখনও যা পাওয়া যায় নতুন নাটকের মধ্যে সেইটেরই হচ্ছে অভাব। অপর দিকে পুরণো নাটকগুলিরও বেশীর ভাগ আবার যুগোপযোগী জ্ঞান, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর চাহিদা মেটাবার মতো প্রকৃষ্টও নয়। সে কারণে দেশের একটা বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের নাটকের ওপর মোহ থাকলেও তারা তা পরিতৃপ্তি সাধনের সুযোগ পাচ্ছে না। নাটকের ওপরে লোকের ঝোঁক যে কি পরিমাণ

জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ দেখা দিয়েছে ইতিহাসেই তার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। সখের দলগুলির অধিকাংশই অবশ্য নামকরা পুরণো নাটকই অভিনয় করে, তবে তাদের মধ্যেও কোন কোন প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে নতুন নাটক পরিবেশনেও সচেষ্ট হন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নাট্যরূপ প্রচেষ্টা ও রিকল্পনা পেশাদার মঞ্চকেও হার মানিয়ে দেয়। এমনকি বলা যেতে পারে বাঙলা নাটকে আজকাল নতুন চিন্তাধারা ও নতুন উদ্দীপনার সামান্য যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তা আসছে কতকগুলি অপেশাদার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মারফৎ। বাঙলা মঞ্চের মোড় ঘুরিয়ে দেবার শক্তির পরিচয় কেবল এইসব দলের কাছেই যাকিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার কারণ, পেশাদার দলগুলি এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী নন, বরং এরা যাতে অভিনয় মঞ্চস্থ করার সুযোগ না পায় সেই চেষ্টাই করেন।

*　*　*

চেষ্টা করলে যে নতুন নাটক পাওয়া যায় কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন নিয়মিতভাবেই। শক্তিশালী নতুন অভিনয়শিল্পীও তৈরী হয়েছে তাদের মধ্যে। পেশাদার মঞ্চের কোনটিই দশ পনেরো বছরের মধ্যে একজনও শক্তিশালী শিল্পী তৈরী করতে পারেন নি। নতুন নাটক নেই, নতুন শিল্পী নেই, নতুনভাবে পরিবেশন করবার উদ্যমও পেশাদার মঞ্চে নেই— কাজেই পেশাদার লোকের চেতনাতে আশ্রয় নিয়ে থাকবে কিসের জোরে? এর উপর আবার মঞ্চের মর্যাদা ও কৌলিন্যকে ক্ষুণ্ণও করা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এতাবৎকাল চলচ্চিত্রে দরকার হলে মঞ্চ থেকে অভিনয়শিল্পী আমদানী হচ্ছিলো, ইদানীং নতুন শিল্পীর অভাবে মঞ্চই পর্দার শিল্পীদের আমদানী করছে। মঞ্চের স্বাতন্ত্র্য তাতে ঘুচে যাচ্ছে পর্দায় অনবরতই যাদের দেখা যাচ্ছে মঞ্চেও আবার তাদেরই দেখতে যাওয়া জন কতকেরই ক্ষেত্রে দুবার করে সে ঝোঁক হতে পারে—সবায়েরই বেলা বার-বার সে ঝোঁক হতে পারে না। পেশাদার সম্প্রদায় মঞ্চের মর্যাদা নষ্ট করায় আরও একদিক থেকে সচেষ্ট হয়েছেন। সেদিন ষ্টার থিয়েটারে "কলঙ্কবতী" দেখতে গিয়ে এর প্রমাণ পাওয়া গেল। এই নাটকখানি তৈরী হয়েছে শৈলজানন্দের জনপ্রিয় ছবি "নন্দিনী" থেকে। এতোদিন নাটকেরই চিত্ররূপ হচ্ছিলো, কিন্তু নিরুদ্যম মঞ্চ আজ মঞ্চের সেই কৌলিন্যের কথা ভুলে ছবিকেই পরিত্রাতা বলে ধরে নিতে বসেছে। পর্দার অভিনয়-শিল্পী ছিলো, এবার এলো পর্দার চিত্র-নাট্য—মঞ্চের তাহলে রইলো কি? এই-ভাবে পর্দার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যেই আজ মঞ্চের অস্তিত্বের কথা লোকের মন থেকে চলে গিয়েছে।

*　*　*

থিয়েটার চলছে না বলে পেশাদার

সাফল্যমণ্ডিত নাটক "কেরাণীর জীবন"-এর চিত্ররূপে বাণী গাঙ্গুলী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায় ও অসিতা

গিয়েছে, এমন কি মঞ্চগুলির ওপরে তাদের মমতাটাও ভুয়ো। নয়তো মঞ্চকে উদ্দীপ্ত করে তোলার কোন চেষ্টাই তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না কেন? পেশাদার মঞ্চের বাইরে যাদের দেখা যাচ্ছে—অভিনয়ে এবং নাট্য পরিকল্পনায় তাদের মধ্যে নতুন যুগের প্রতিভা রয়েছে যথেষ্ট। পেশাদার মঞ্চকে বাঁচতে গেলে এই সব প্রতিভাবানদের সহযোগিতা না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পেশাদার মঞ্চসংশ্লিষ্টদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং নতুন প্রতিভাদের উদ্যম, উৎসাহ এবং নতুন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটলে তবেই বাঙলার মঞ্চ আবার সর্বজনের লক্ষ্যপথে জাজ্বল্যমান দীপ্তি নিয়ে দাঁড়াতে পরবে—এ ছাড়া উপায়ও আর কিছু নেই।

মঞ্চগুলি কাঁদুনী গেয়েই রেখেছেন; কিন্তু কেন চলছে না সেটা তারা নিজেদের থেকে তো বুঝতে চাইছেনই না অন্য কেউ সে কথা বোঝাতে গেলে তারা রীতিমত ক্ষেপে যান। নাটক ভালো হচ্ছে না বলবার উপায় নেই; তারা সব দোষই চাপিয়ে দিচ্ছেন জনসাধারণের অনুদারতা ও মঞ্চের পৃষ্ঠপোষণে বীত-শ্রদ্ধার ওপরে। কিন্তু লোকে আসবে কিসের তৃপ্তি পেতে! একেতো মঞ্চকে পর্দার সঙ্গে অভিন্ন রূপ ও অভিন্ন আত্মা করে তোলা হয়েছে, তার ওপর প্রেক্ষাগৃহের যা আবহাওয়া তাতে দুদণ্ড আরাম করে বসে থাকবারও উপায় নেই। ভেতরটা নোংরা, প্রথম তৈরী হবার পর কোনকালে যে সংস্কার হয়েছিল তার সব প্রমাণ মুছে গেছে। আসনগুলি তেমনি কষ্টদায়ক। নিকৃষ্টতম চিত্রগৃহের চেয়ে পরিচ্ছন্নতা ও আরামের দিক থেকে উৎকৃষ্টতম নাট্যগৃহটিও নিকৃষ্ট। সে কথাও জানিয়ে কোন ফল হয় না। পেশাদার মঞ্চগুলি যারা অধিকার করে আছেন তারা পড়ে আছেন স্রেফ মায়ার বশে—নয়তো তাদের কোন উদ্যমও নেই উৎসাহও নিভে

ইতিহাসের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস "বৌঠাকুরাণীর হাটে" চিত্ররূপে মায়া, উত্তমকুমার ও মঞ্জু দে। ছবিখানি নরেশ মিত্রের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে

খেলার মাঠে

হকি

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের কয়েকটি দলের খেলার ফলাফল বর্তমানে ক্রীড়ামোদী মহলকে বিশেষভাবেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে অথবা কোন দলের সম্ভাবনা আছে, এই আলোচনা ও গবেষণাই এই চঞ্চলতার প্রধান কারণ। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে খেলার ফলাফল মনঃপূত না হইলে মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটিতেছে। খেলার পরিচালক বা আম্পায়ার খেলার শেষে নিগৃহীত হইতেছে। এক এক সময় দলবদ্ধভাবে আম্পায়ারদের আড্ডাতেও এই সকল উগ্র সমর্থকদের চড়াও করিয়া নানা প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিবার সংবাদও শুনিতে হইতেছে। কোন কোন ক্লাবের সমর্থকদের আচরণ এইরূপ জঘন্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, হকি আম্পায়ার এসোসিয়েশনকে পর্যন্ত খেলার পরিচালক সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এমনকি কোন বিশেষ দলের খেলা পরিচালনা করিতে নাকি আম্পায়ারদের অধিকাংশই নারাজ। হকি মাঠের এই যে শোচনীয় অবস্থা, সত্যই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন করিতে পারেন না। কেন পারেন না, তাহা না বলাই ভাল। আমাদের কথা হইতেছে এইভাবে খেলা পরিচালনা করিয়া লাভ কি? দলকে জয়ী হইতেই হইবে ইহার কোনই মানে নাই। জয়-পরাজয় খেলায় আছে ও থাকিবে। ইহা অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। কোন কোন ক্রীড়ামোদী বলিয়া থাকেন, খেলার পরিচালক খেলার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা বলিব এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যে ভুল ত্রুটি খেলার পরিচালনার সময় পরিচালক ধরেন, তাহা কেবল তাঁহার মানসিক শান্তির অভাবের জন্যই হইয়া থাকে। সমর্থকদের ভৎর্সনা, অযথা মারমুখি হইয়া বিশ্রাম স্থানে চড়াও হওয়া প্রভৃতির জন্য পরিচালক আম্পায়ারদের ' 'এইরূপ অশান্তিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে যে, তাঁহাদের পক্ষে সুস্থ ও ধীর-স্থিরভাবে খেলা পরিচালনা করা অসম্ভব। ইচ্ছা করিয়া কোন খেলার পরিচালক দলকে জয়ী বা পরাজিত করিয়া থাকেন, ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন। এই মারাত্মক ধারণা সাধারণ ক্রীড়া-মোদীর মনের মধ্যে স্থান দেওয়ার পশ্চাতে কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতি লোকের প্রচেষ্টা আছে ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। তবে ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা আম্পায়াররা কোনরূপ ভুলত্রুটি করি না ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহিতেছি। তাহারা করে ও কয়েকজন এমন আছেন, যাহাদের খেলা পরিচালনা করিবারই কোন যোগ্যতা নাই। এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য সকল আম্পায়ারের উপর দোষারোপ করার কোনই যুক্তি নাই। আম্পায়ারদের মধ্যে যখনই কেহ খেলা পরিচালনায় ত্রুটি করেন, তখনই ক্রীড়া সমালোচকগণ তাহার সম্পর্কে তীব্র মতামত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয় উহাই সংশোধনের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণ ক্রীড়া-মোদিগণের অপ্রীতিকর আচরণ খেলা বা খেলা পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে মাত্র কোন পরিবর্তনসাধন করে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ফুটবল মরসুমের সময় কোন খেলাতেই খেলা পরিচালনায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না।

চ্যাম্পিয়ানসিপের সম্ভাবনা

খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। পূর্ব হইতে কোন কিছুই জোর করিয়া বলা চলে না। প্রথম ডিভিসন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ সম্পর্কেও সেই জন্য কোন দল হইবেই বর্তমানে বলা চলে না। তবে বর্তমানে যে কয়েকটা দলের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে কাষ্টমসের অবস্থাই অপেক্ষাকৃত ভাল। এই দল এই-বারের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হইলে কোনরূপ আশ্চর্য হইবার কিছুই থাকিবে না। তবে ভবানীপুর, রাজস্থান ও মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের সম্ভাবনা এখনও আছে। ইহাদের মধ্যে ভবানীপুর দলের অবস্থা কিছুটা ভাল। এই দলে ভারতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হকি দলের অধিনায়ক বাবু আছেন। ইহাতে বর্তমান দলের অগ্রগতিতে অনেকখানি সাহায্য হইবে বলিয়া মনে হয়। মোহনবাগানের অবস্থাই এই তিনটি দলের মধ্যে অর্বাপেক্ষা খারাপ। এই দলকে পূর্ব অর্জিত গৌরব অর্জন করিতে হইলে অবশিষ্ট প্রত্যেকটি খেলাতেই বিজয়ী হইতে হইবে। উহা একেবারেই অসম্ভব। একরূপ অঘটন না ঘটিলে এই দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা নাই।

বেটন কাপ প্রতিযোগিতা

ভারতের প্রাচীনতম বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা শীঘ্র আরম্ভ হইবে। বাঙলার বাহিরের সকল বিশিষ্ট দলকে আনাইবার চেষ্টা হইতেছে শুনিতেছি। প্রতিবারেই হইয়া থাকে, কিন্তু ফল ভাল হয় না। বিশিষ্ট হকি দল অনেকেই যোগদান করে না। এইবারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি না হইলেও আমরা সুখী হইব। নিম্নে বর্তমানের লীগ তালিকা প্রদত্ত হইল—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
কাষ্টমস	১২	১০	২	০	৩৩	২	২২
ভবানীপুর	১১	৮	৩	০	২৬	৫	১৯
রাজস্থান	৯	৭	১	১	২৭	৪	১৫
মোহনবাগান	১০	৬	৩	১	২৬	৭	১৫
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১২	৭	১	৪	১৯	৮	১৫
মহঃ স্পোর্টিং	১০	৬	২	২	১৭	৩	১৪
এরিয়ান	৯	৫	২	২	১২	৯	১২
ইষ্টবেঙ্গল	৮	৪	৩	১	১৫	৮	১১
রেঞ্জার্স	১১	৫	১	৫	১২	১৫	১১
গ্রীয়ার	৭	৪	১	২	১১	৭	৯
পুলিশ	১১	৪	১	৬	১৬	২০	৯
আর্মেনিয়ান্স	১০	২	৫	৩	৭	৯	৯
আর্মড পুলিশ	১০	৩	৩	৪	১৩	১৫	৯
মেসারার্স	১১	৩	৩	৫	১৪	১৯	৯
ডালহৌসী	১০	৩	১	৬	৬	১৪	৭
জোপা	৯	১	৩	৫	২	১৪	৫
কালিঘাট	১০	১	৩	৬	৪	১৪	৫
ডব্লিউ বি জি প্রেস	১১	১	২	৮	২	২৪	৪
পোর্ট কমিঃ	১০	১	১	৮	৩	২৫	৩
সেণ্ট জোসেফ	১৩	০	১	১২	৮	৩৭	১

ক্রিকেট

প্রথম ডিভিসন

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যাল খেলায় হোলকার দল সাত উইকেটে মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। ফাইন্যালে হোলকার দলকে বাঙলা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। ঐ খেলা আগামী ২০শে মার্চ হইতে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ষ্টেডিয়ামে আরম্ভ হইবে বলিয়াই পূর্ব হইতে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দল সেমিফাইন্যালে বিজয়ী হইলে পূর্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু হোলকার দল এই সম্পর্কে কোনরূপ আপত্তি করিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে চিন্তা হইতেছে, এই খেলা বর্তমানে কলিকাতায় যেরূপ রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইবে কি করিয়া। উভয় দলের খেলোয়াড়গণই বা কিভাবে দিনের পর দিন এইরূপ দারুণ রৌদ্র তাপের মধ্যে মাঠে খেলিবেন। দর্শকগণের বসিবার স্থানের উপরেও যে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও রৌদ্রতাপ হইতে রেহাই দিবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ অবস্থায় দর্শকগণই যে দিনের পর দিন নিদারুণ শারীরিক দুঃখ-

ভাগ করিয়া খেলা দেখিবেন, তাহাও মনে হয় না। এই যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য পরিচালকগণ দায়ী হইবে কোনই সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সর্বদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়, সেই দিকে পরিচালকগণ দৃষ্টি দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব। সকল খেলা মরসুমের মধ্যেই শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেমিফাইন্যাল খেলা

হোলকার দলের সেমিফাইন্যালের সাফল্যকে অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ বলা চলে। কারণ মহারাষ্ট্র দল অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারাই গঠিত ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা অধিকাংশ কৃতী ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র দলের এম ভি মাথে, ভাদভাদে, ভোঁসলে প্রভৃতি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান পাইবেন, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। হোলকার দলের এই খেলায় তিন জন শতাধিক রান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কে এম রঙ্গনেকারের ১৫৩ রানই সর্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য হয়। ইহা ছাড়া বি বি নিম্বলকার ও সি টি সারভাতের শতাধিক রাণও উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় মুস্তাক আলীও দ্বিতীয় ইনিংসে ১২ রানের জন্য শতরান পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্র দলের পক্ষেও এম ভি মাথে শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

খেলার ফলাফল—

মহারাষ্ট্র ১ম ইনিংস—৩৩১ রান (এম মাথে ১১৫, ওয়াই সিধায়ে ৬৭, আর ভাদভাদে ৫৩, এইচ দানী ৪৪, অর্জুন নাইডু ৪৭ রানে ৩টি, এইচ গাইকোয়াড় ৯১ রানে ৩টি, সি সারভাতে ৫৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

হোলকার ১ম ইনিংস—৪৬৯ রান (কে এম রঙ্গনেকার ১৫৩, বি বি নিম্বলকার ১১৪, এইচ গাইকোয়াড় ৫৯, মুস্তাক আলী ৫০, বোড়ে ৬০ রানে ৩টি, প্যাটেল ৪৩ রানে ২টি, ভোঁসলে ৯৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র ২য় ইনিংস—৩৬৯ রান (এইচ দানী ৯১, এম মাথে ৬৪, এম রেগে ৬৩, এস প্যাটেল ৪৯, ওয়াই সিধায়ে ৩১, বি বি নিম্বলকার ৫৭ রানে ৩টি, অর্জুন নাইডু ৬১ রানে ৩টি ও সারভাতে ৬৮ রানে ৩টি উইকেট পান।)

মুষ্টিযুদ্ধ

হোলকার ২য় ইনিংস—৩ উইঃ ২৩৫ রান (সারভাতে ১২০ নট আউট, মুস্তাক আলী ৮৮, প্যাটেল ৫৫ রানে ১টি, ভোঁসলে ৭৪ রানে ২টি উইকেট পান।)

জাপানী মল্লবীর দল ভারতে মাত্র এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া উন্নততর নৈপুণ্যের বলে প্রতি দলগত প্রতিযোগিতায় বাঙলা, ভারত ও সর্বভারতীয় সম্মিলিত দলকে পরাজিত করেন। জাপানী মুষ্টিযুদ্ধ দলও যে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবেন, তাহা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম দলগত প্রতিযোগিতাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই লড়াইতে বাঙলা দলকে জাপানী দল শোচনীয়ভাবে ৫—১ লড়াইতে বা ১১—৭ পয়েন্টে পরাজিত করিয়াছেন। মুষ্টিযুদ্ধে মুষ্টিঘাতের শক্তি কতখানি সাফল্যে সাহায্য করে, তাহা জাপানী মুষ্টিযোদ্ধাগণ প্রত্যেকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কোন জাপানী মুষ্টিযোদ্ধাকেই চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। ধীর অথচ নিশ্চিত সুযোগ সন্ধানী ঘুষির মারে বাঙলার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার পাল্টা উত্তর দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মুষ্টিযুদ্ধের সংক্ষেপ রিং ক্রাফ্‌ট বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা এই জাপানী মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে অভাব থাকিলেও ঠিক যে প্রথায় লড়িলে শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়া যায়, তাহা ইহাদের মধ্যে কাহারও অজানা ছিল না। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ ক্ষেত্রে জাপানী মুষ্টিযোদ্ধা বিশ্বখ্যাতি সম্প্রতি অর্জন করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে অপেশাদার বা এমেচার মুষ্টিযুদ্ধ ক্ষেত্রেও জাপানী মুষ্টিযোদ্ধাগণ যে শীঘ্রই স্থান পাইবেন, তাহার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহারা ভারতের আরও কয়েকটি স্থানে দলগত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন ও সর্বক্ষেত্রে দলগত সাফল্যলাভ করিবেন এই বিষয় আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

টেবিল টেনিস

ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান দ্রুত উন্নতির পথে চালিত হইতেছে এবং শীঘ্রই আমরা বিশ্ব স্তরে উপনীত হইব ইহা আমাদের অনেকেরই ধারণা। কিন্তু এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহা হংকংয়ের দুইজন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের ভ্রমণের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা পাঁচটি টেস্ট খেলায় ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া চারিটিতে বিজয়ী ও একটিতে পরাজিত হইয়া টেস্ট পর্যায় খেলার গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন বা 'রবার' লাভ করিয়াছেন। এই দলের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় শি সু চু ভারতের কোন স্থানে কোন খেলাতেই সিংগলসে পরাজিত হন নাই। তিনি সিংগাপুরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিরাজী স্যাটোকে (জাপান) পরাজিত করেন। ইহার পর হংকংয়ে ভূতপূর্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জনী লীচ ও রিচার্ড বার্জম্যানকে প্রত্যেকটি প্রদর্শনী খেলায় পরাজিত করেন। ইহার পর ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতের খেলোয়াড়গণ পরাজিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহার ব্যাট ধরিবার কৌশলেও অভিনবত্ব আছে। ইনি 'পেন হোল্ডার গ্রিপ' খেলোয়াড় না বিশ্বখ্যাত। ভারতের কৃতি খেলোয়াড়গণ ইহার সহিত বহু ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন যদি কিছু কৌশল আয়ত্ত করিয়া থাকেন, খুবই সুখের বিষয় হইবে। যদি না করিয়া থাকেন, বলিব এইরূপ ভ্রমণের কোনই সার্থকতা নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ—

৯ই মার্চ—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে বলেন যে, টোকিওর রেংকোজী মন্দিরে রক্ষিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চিতাভস্ম জাপানস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের হেপাজতে আছে।

অদ্য লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, দিল্লীর বর্তমান আন্দোলনের উদ্যোক্তারা দেশের শত্রুদেরই সমর্থন করিতেছেন। এইদিন লোকসভায় শ্রী ভি জি দেশপান্ডে (হিন্দু মহাসভা) উপাধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েংগারের নির্দেশ অমান্য করিয়া দিল্লীতে পুলিশের লাঠি চালনা এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও লোকসভার অপর দুইজন সদস্যের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মুলতুবী প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে অধিবেশন কক্ষ হইতে বহিষ্কার করা হয়।

আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে আস্থা জ্ঞাপনান্তে আজ চান্ডিলে নিখিল ভারত সর্বোদয় সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী পঞ্চম অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। সম্মেলনে ভারতের সর্বত্র মাদক নিবারণের অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০ই মার্চ—লাহোরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া প্রায় ৫ হাজার লোকের এক জনতা অদ্য দিল্লীর ফতেপুরীতে সমবেত হইলে তাহাদিগকে ছত্রভংগ করিবার জন্য পুলিশ লাঠি চালায়। জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদের উদ্যোগে পরিচালিত এই শোভাযাত্রা সদর বাজার হইতে অগ্রসর হইতেছিল। সত্যাগ্রহ করিবার জন্য এইদিন মোট ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অমৃতসরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমর সিং ১৪৪ ধারা অমান্যের অভিযোগে ৪৩ জন অকালী কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া জনসভা করার জন্য ইঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন।

১১ই মার্চ—অদ্য অপরাহ্নে টালীগঞ্জ এলাকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে অনুমান তিনশত পরিবারের দেড় হাজার অধিবাসীর এক বস্তি অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং দেড় বছরের একটি শিশু জীবন্ত দগ্ধ হয়।

অমৃতসরের সংবাদে প্রকাশ, প্রায় এক সহস্র আহমদিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পলায়নকালে ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত সন্নিকটে পাক সেনাবাহিনী তাহাদের গতিরোধ করে। আহমদিয়াদের গৃহে অগ্নিসংযোগ, তাহাদের দোকানপাট লুণ্ঠন এবং বর্তমান বিপজ্জনক অবস্থার দরুণ তাহারা আতঙ্কিত হইয়া দেশত্যাগের চেষ্টা করিয়াছিল।

১২ই মার্চ—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শ্রী এন সি চ্যাটার্জি, শ্রীনন্দলাল শর্মা ও শ্রীগুরুদত্ত বৈদ্যের পক্ষ হইতে হেবিয়াস কর্পাসের যে আবেদন করা হইয়াছিল, অদ্য সুপ্রীম কোর্টের কন্‌স্টিটিউশন বেঞ্চ কর্তৃক তাহা মঞ্জুর করা হয় এবং তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদানের আদেশ প্রদত্ত হয়। গত ৬ই মার্চ ডাঃ মুখার্জি ও অপর ব্যক্তিদিগকে সভা ও শোভাযাত্রা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের অভাবহেতু ২ কোটি ৭৭ লক্ষেরও অধিক লোক খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই অদ্য লোকসভায় এই সরকারী হিসাব প্রকাশ করেন।

ভারতের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম অদ্য কলিকাতায় সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস ভবনে কলিকাতা ও লন্ডনের মধ্যে প্রথম সরাসরি রেডিও-টেলিগ্রাফ যোগাযোগের উদ্বোধন করেন।

১৩ই মার্চ—পাকিস্থানী পাঞ্জাবের লায়ালপুরে সহরও সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। এই সহরে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন বিপজ্জনক আকার ধারণ করিয়াছে।

সংযুক্ত ছাটাই ও বেকার বিরোধী কমিটির উদ্যোগে অদ্য সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে সহস্র সহস্র লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা 'ছাটাই করা চলবে না', 'কাজ দাও নয়তো বেকার-ভাতা দাও', 'বেকার-ভাতা দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে', ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে বিধান সভা ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

১৪ই মার্চ—করাচী হইতে ঢাকা যাইবার কালে গতকল্য শেষ রাত্রিতে একখানি পাকিস্থানী যাত্রিবাহী বিমান ভারতীয় এলাকায় ত্রিপুরা রাজ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িলে উহার মোট ১৬ জন আরোহী নিহত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় খাদ্য দপ্তরের বাজেট সম্পর্কে বিতর্ককালে সরকার বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন সদস্য বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া উক্ত বিভাগে দুর্নীতি, অপব্যয় ও স্বজন পোষণের তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করেন।

১৫ই মার্চ—ভারত সরকার ১লা জুন হইতে সারা ভারতের সকল বিমান পরিচালন ব্যবস্থা খাস নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভি জি দেশপান্ডে অদ্য লক্ষ্ণৌয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

বিদেশী সংবাদ—

৯ই মার্চ—অদ্য মস্কোর রেড স্কোয়ারে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল স্ট্যালিনের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। ক্রেমলিন প্রাসাদের ধারেই যেখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে তাহারই পার্শ্বে স্ট্যালিনের সমাধি দেওয়া হইয়াছে। স্ট্যালিনের ৫১ বৎসর বয়স্ক উত্তরাধিকারী নূতন সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জর্জি ম্যালেনকভ অন্ত্যেষ্টি ভাষণ প্রদান করেন।

সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষণ করিয়া ম্যালেনকভ বলেন, লোকায়ত গণতান্ত্রিক সরকারসমূহের সহিত মৈত্রী ও ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তর করা এবং চীনা জাতির সহিত চিরদিনের ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুত্ব নিবিড়তর করাই আমাদের নীতি। সর্বজাতির সহিত শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষাই আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা।

১২ই মার্চ—অদ্য পশ্চিম জার্মানির আকাশে রুশ জেট বিমান বহরের আক্রমণে একখানা বৃটিশ বোমারু বিমান ভূপাতিত হয়। উহার ফলে ৬ জন বৃটিশ সৈনিক নিহত হইয়াছেন।

১৪ই মার্চ—দূর প্রাচ্যে কম্যুনিস্টদের উপর সামরিক চাপ বৃদ্ধিকল্পে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার একটি নূতন পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অদ্য বিরোধী দলসমূহ কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে জাপানের যোশিদা মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটিবার পর জাপ পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৫ই মার্চ—সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ অদ্য সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতাকালে বিশ্বশান্তির জন্য আবেদন জানান। মহাযুদ্ধের পর সুপ্রীম সোভিয়েটের এই প্রথম বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে নূতন মন্ত্রিসভার গঠন অনুমোদিত হয়।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

শনিবার
১৪ই চৈত্র, ১৩৫৯

DESH SATURDAY, 28TH MARCH, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

জওহরলাল ও জয়প্রকাশ

কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রিদলের পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কে কংগ্রেস-সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে আলোচনা আপাতত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মূলনীতি এবং আদর্শের দিক হইতে ভারতের প্রধান অপর কয়েকটি রাজনীতিক দলের অপেক্ষা এই দুই দলের মধ্যে সমধিক মিল রহিয়াছে। প্রত্যুত যাঁহারা প্রজা-সমাজতন্ত্রি দলের নেতা, তাঁহারা অনেকেই কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত নিষ্ঠাবান্ কংগ্রেসকর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মি-স্বরূপে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন। আদর্শের দিক হইতে ইঁহাদের লক্ষ্য যে একই—পণ্ডিত নেহরুও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই লক্ষ্য সাধনে নীতি প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়াছে এবং বাস্তব বিচারে সে পার্থক্য একেবারে যে সামান্য, তাহাও বলা যায় না। প্রজাসমাজতন্ত্রিদল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য অনতিবিলম্বে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন। পণ্ডিত জওহরলাল নীতিগতভাবে প্রগতিমুখী এই বৈপ্লবিক কর্মপন্থা অবলম্বনেরই অনুকূলে; কিন্তু কংগ্রেসপক্ষের সকলে এতটা আগাইয়া যাইতে সাহস পান না। তাঁহারা বর্তমান অবস্থার বিশেষ বিপর্যয় না ঘটাইয়া ধীরে এবং নিরাপদ পদক্ষেপে সমাজ-জীবনের পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের এই ধীর এবং যাহাকে তাঁহারা সুনিশ্চিত নীতি বলিয়া মনে করেন, তাহার মূলে গলদ রহিয়াছে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে সে গলদ। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁহার পত্রে সে কথাটা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজ-জীবনের সংস্থিতি এবং নিরাপত্তার জন্য সতর্কতার খুঁটিনাটি বিচার নানাভাবেই বাড়াইয়া তোলা যায়। কিন্তু রাজনীতিক কোন বৃহত্তর আদর্শ সিদ্ধ করিতে গেলে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য সঙ্কল্পশীলতা এবং সাহস থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে অবস্থা যেমন আছে, তাহার কোন বিপর্যয় না ঘটে, অনবরত সেই দিকেই দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিলে অগ্রগতি সম্ভব হয় না এবং জনসাধারণের মনে নবসৃষ্টির প্রেরণাও একান্ত হইয়া উঠে না। সমাজতন্ত্রিনেতা কংগ্রেসের বর্তমান কর্মনীতিতে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য আন্তরিক এবং আত্যন্তিক গরজের অভাব দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস কর্তৃক অবলম্বিত পাঁচসালা কর্মপন্থার মধ্যে এমন আত্যন্তিক তাগিদের অভাবের জন্যই উক্ত কর্মপন্থা সম্বন্ধে দেশের জন-সাধারণের মধ্যে আবশ্যক উৎসাহ এবং আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই। বস্তুতঃ শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের এমন উক্তির যুক্তিকে একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফলের হিসাবটা যদি এই ক্ষেত্রে বড় করিয়া দেখা যায়, তবে পাঁচসালা কর্মপন্থার সাফল্য সত্ত্বেও সমগ্র ভারতের জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ, আগ্রহ জাগ্রত হইবার মত যে বড় রকমের কিছু ঘটিবে, ইহা মনে হয় না। প্রত্যুত সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে আশানুরূপ ফল না হইতে দেখিয়া জনগণ নিরাশ হইয়া পড়িবে, এমন আশংকার কারণ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ব্যাপক বৈপ্লবিক কর্মনীতি অবলম্বনে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইতে গেলে এ আশংকার কারণ ততটা থাকিত না; কারণ বৃহৎ স্বার্থের চেতনায় ফলের হিসাব সেখানে অনেকটা গৌণ হইয়া পড়িত এবং মনের জোরে জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইত। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জাতির সংহতির উপর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ রকমে গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। একদিকে কম্যুনিস্ট অপর-দিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ—এই দুই শক্তির সম্বন্ধে তাঁহার আতঙ্ক। বস্তুত অর্থ-নৈতিক সমুন্নতি সাধনের, বৈপ্লবিক নীতির সাহায্যে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রগত, সংহতিবোধ যদি জাগাইয়া তোলা যায়, তবেই এই সমস্যার আমূল প্রতিকার সাধিত হইতে পারে, আমাদের এই বিশ্বাস। আগামী পাঁচ-ছয় বৎসরকাল দেশের পক্ষে খুবই সংকটজনক। কংগ্রেস-সভাপতি উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের এক সম্মেলনে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস-কর্মীদের আত্মতুষ্টির মনোভাব লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে

কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা এবং কর্মনীতিতে পণ্ডিত নেহরু যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না, প্রজা-সমাজতন্ত্রিদলের সহযোগিতা লাভে তাঁহার সাম্প্রতিক আগ্রহ হইতেই সে পরিচয় অনেকখানি পাওয়া যাইতেছে। এই আগ্রহের ফলে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি সাধনে কংগ্রেসের নীতি সমধিক বৈপ্লবিক চেতনায় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, আমরা ইহাই আশা করিতেছি। পথের হদিস জানা সত্ত্বেও কংগ্রেস-সভাপতি সম্ভবতঃ সহকর্মিদের সমর্থনের অভাবাশঙ্কায় অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়াইতেছেন; তাঁহার এই বিড়ম্বনার অবসান ঘটে আমরা ইহাই কামনা করি।

বিদেশে গান্ধীজীর স্মৃতিপূজা

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন হইয়াছে। লোকসভার একটি প্রশ্নোত্তরে পররাষ্ট্র-বিভাগের সহকারী সচিব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ, বেলজিয়াম, কঙ্গো, সিংহল, আবিসিনিয়া, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, মরিশাস এবং গ্রেট বৃটেনে গান্ধী স্মৃতিরক্ষার কোন না কোন ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ইদানীং আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ইন্দোচীনেও গান্ধী স্মৃতিরক্ষার আয়োজন আরও হইয়াছে। বিশ্বমানবের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহামানবের যে অবদান শুধু মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা অবশ্যই তাঁহার প্রতি সমুচিত সমান প্রদর্শিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শকে রাষ্ট্র এবং " সমাজ-জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার উপরই তাঁহার স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান নির্ভর করে। বিদেশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গান্ধীজী কোনদিনই চলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিত্তি করিয়া গান্ধীজী বিশ্বমৈত্রীজনক জীবনাদর্শ উদ্দীপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতের জনগণের সেবা এবং তাহাদের মুক্তি সাধনার ভিতর দিয়া যদি তিনি তাঁহার জীবনাদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই তাহা মানব-সমাজের সর্বত্র যথার্থরূপে সম্প্রসারিত হইবে। সত্যসন্ধ মহাপুরুষের প্রাণময় সে সাধনা বিশ্বের সর্বত্র অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহাত্মাজীর মর্মর প্রমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে, বিভিন্ন দেশ সমগ্রভাবে আজই তাঁহার প্রদর্শিত অহিংস নীতি অবলম্বন করিবে এমন আশা করা যায় না; কিন্তু মহামানবের স্মৃতি পূজায় এই পথে তাঁহার ভাবাদর্শ ক্রমশ জন-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব সমধিক। অথচ আমরা, যাহারা গান্ধীজীকে জাতির নেতৃস্বরূপে লাভ করিয়াছিলাম, যাহাকে জাতিরজনকস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি, মহাত্মাজীর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁহার জীবনাদর্শ সত্য বিচ্যুত হইয়া উত্তরোত্তর দূরে সরিয়া পড়িতেছি এবং জাতির প্রাণকেন্দ্র হইতে আমাদের রাষ্ট্র-সাধনার গতি বাহিরের দিকেই কার্যতঃ ছুটিয়া চলিয়াছে। আদর্শনিষ্ঠার এই অভাব জাতির অগ্রগতির পথে বিড়ম্বনাই বৃদ্ধি করিবে।

অগ্রগতির অন্তরায়

ভারতের অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আদিম জাতিগোষ্ঠীগুলির সামাজিক সমুন্নতি বিধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। সেদিন এই কমিশনের কাজের উদ্বোধন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল উভয়েই বলিয়াছেন, শ্রেণীহীন এবং জাতিভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মুখ্য লক্ষ্য মৈত্রী এবং মানবতা। বর্তমান জাতিভেদ কার্যত এই সংস্কৃতির অভিব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। এই সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে অনুদার সংস্কার হইতে প্রচলিত ধর্মমতকে দূর করা আগে দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যটি একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যুগধর্মের গতি বুঝিয়া ধর্মকে রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে পৃথক করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ধর্মকে জড়-প্রথার চূণ-সুড়কী দিয়া কবর তৈয়ারী করিয়া সমগ্র জাতিকে গতকালের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে ভারত কোনদিনই জাতি-হিসাবে গড়িয়া উঠিত পারিবে না। স্বামীজী জাতির জীবনে যুগান্তর ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। প্রাণবল তাঁহার ছিল প্রচণ্ড। বস্তুত অতীত যুগেও এদেশের ঋষি, উপদেষ্টা এবং আচার্যগণ যুগোচিত অবস্থার পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সনাতনত্বকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে সংকুচিত হন নাই। প্রাণবান্ প্রেমিক পুরুষের একান্ত অভাব এদেশে ঘটে নাই। কিন্তু পরাধীন অবস্থায় ভারতের সমাজ-জীবনের সজীবতা অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। জাতির সর্বাঙ্গীণ এবং স্বাভাবিক বিকাশে পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ধর্মের নামে নানা রকমের গোঁড়ামি জাতির প্রাণধর্মকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে। ক্লিষ্ট পিষ্ট জাতি সনাতন সংস্কৃতির আদর্শ হইতে কার্যত বিভ্রষ্ট হইয়া কূপমণ্ডূকতা প্রাপ্ত হয়। স্বাধীন ভারত লক্ষ্য-নির্ণয়ে ভুল করে নাই। কিন্তু এই লক্ষ্যপথে সাধনায় অগ্রসর হইলে বৃহত্তের বেদনায় সমাজ বিধানে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য জাগ্রত করিয়া তোলা প্রয়োজন। দীর্ঘ দিনের সংস্কারদুষ্ট দৃষ্টি দূর করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে সেই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। জাতির জনকস্বরূপে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শও ছিল তাহাই। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক দিক হইতে সামগ্রিকভাবে উন্নতি সাধন করিতে হইলে দার্শনিক উদার দৃষ্টির সাহায্যে জাতির ধর্মজীবনকেও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্য, শিল্পকলা সব দিক হইতে মানুষ হিসাবে মানুষের মহত্ত্বকে জীবন্ত করিয়া ধরা এখন দরকার। কমিশনের কাজে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি আমাদের জাতীয় জীবন হইতে অপসারিত হোক।

১৪ই চৈত্র, ১৩৫৯ সাল

ইশ্লাম ধর্মের মর্যাদা

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন নিজের ঘাটিতে ঠিক রহিয়াছেন। ধর্ম-সংস্কারকে ভাঙগাইয়া রাষ্ট্রনীতিক সুবিধা লাভ করিবার জন্য পাকিস্থানের শাসকবর্গ আগাগোড়া একই নীতির কুট খেলা খেলিয়া চলিয়াছেন। এ রীতির কোন ব্যতিক্রম অদ্যাপি দেখা যাইতেছে না। সম্প্রতি পশ্চিম পাঞ্জাব এবং করাচীতে আহমদিয়া-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মতে এই উপদ্রব রাজনীতিক। শুধু তাহাই নহে, এই সব উপদ্রব সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে পাকিস্থানের সীমান্তের বাহিরের চক্রান্তও নাকি রহিয়াছে। পাকিস্থানের অব্যবহিত সীমানার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া খাজা সাহেব কার্যত ভারতের প্রতিই যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এ কথাটা বুঝিতে অবশ্য বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির মূলে যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর; কারণ পাকিস্থানের অভ্যন্তরভাগে যাহারা এই সব উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছে, দেশরক্ষার প্রয়োজনে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র যাহারা ব্যবহার করিয়াছে, টেলিফোনের লাইন কাটিয়াছে, রেলপথ ভাঙিগয়াছে, তাহারা কম্যুনিস্টও নয় কিংবা আবদুল গফফর খাঁয়ের অনুবর্তীও নহে, এমনকি, তাঁহারা যে সুরাবর্দী সাহেবের দলের লোক, এমন কথাও কেহ বলিতে পারেন না। ফলত এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা নিষ্ঠাবান্ শরিয়ৎপন্থী জেহাদী অনুপ্রেরণায় ইসলামের মহিমা রক্ষার জন্যই তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, ইশ্লামে হিংসার স্থান নাই, গৃহদাহ, নারী-নির্যাতন, এসব সে ধর্মের পথে চলে না। পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-পর্ব হইতে শুরু করিয়া এ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের এই মৌলিক মর্যাদা পাকিস্থানী প্রক্রিয়ায় কতটা রক্ষিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে সেই প্রশ্নই খাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সেসব যুক্তি শুনিয়া লাভ নাই, কারণ ভারতের বিরুদ্ধে বিপন্ন ইসলামের জিগীর তুলিবার সুযোগটা খাজা সাহেব এবং তাঁহার দলবল হাতে রাখিয়াই চলিবেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে সেই মনোবৃত্তির পরিচয় আমরা পাইতেছি। সেদিনও তিনি বলিয়াছেন, ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর কথা যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহারা ভারতকে জানেন না। খালের জলের প্রশ্ন লইয়া, উদ্বাস্তুদের সম্পত্তির বণ্টন মূল্য লইয়া, সর্বোপরি কাশ্মীর লইয়া ভারত পাকিস্থানের বিরুদ্ধতা করিয়াই চলিয়াছে। এক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে হাত মিলানো সম্ভব হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, খাজা সাহেব নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আজ আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে পুরোপুরি রাজনীতির প্রভাব দেখিয়াছেন এবং ইশ্লাম ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িত করিবার ফলেই পাকিস্থানের পক্ষে এই সংকট যে দেখা দিয়াছে, এই সত্যটি বেমালুম চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মতে এ-পথ আত্মপ্রবঞ্চনারই পথ এবং এ-পথে পাকিস্থানের সংকট সমস্যার কোন সমাধানই সম্ভব হইবে না। প্রত্যুত আত্মানুসন্ধানের দ্বারা প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে উচিত। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে বিশেষ ধর্মমতের প্রভুত্ব জড়িত করিতে গেলে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ বর্বরতার আঘাতই পাকিস্থানের রাষ্ট্র-জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ইহা নিশ্চিত।

ব্রহ্ম সীমান্তে ভারতের প্রধান মন্ত্রী

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল কলিকাতা হইয়া আসাম যাইতেছেন। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী মিঃ থাকিন নুর সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত দেশে কয়েকদিন সফর করিবেন। এই সীমান্তে এমন কি ব্যাপার ঘটিল, যেজন্য ভারত এবং ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী— এই দুইজনের সেখানে উপস্থিতি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, এ সম্বন্ধে লোকের মনে স্বভাবতঃই আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কারণ অবশ্যই কিছু আছে। কিছুদিন হইতেই আসামের সীমান্তবর্তী নাগাদের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে একদল স্বতন্ত্র নাগা রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে অশান্তি তো লাগিয়াই আছে। ব্রহ্ম গভর্নমেণ্ট উপজাতীয় কারেন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ এখনও দমন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্প্রতি জেনারেল চিয়াং-কাইশেকের সমর্থক একদল চীনা গেরিলা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা বিদ্রোহী কমীদের সঙ্গে যোগ দিয়া সীমান্ত দেশে অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে ইহাদের সংঘর্ষ চলিতেছে। এই দলের তৎপরতা ভারতের পূর্বোত্তর সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া বিচিত্র নয়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রবাদী নাগাদের সঙ্গে ইহারা যোগ দিতে পারে। ওদিকে আমেরিকা ইন্দো-চায়নার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি বাড়াইবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নব পরিকল্পিত নীতির প্রয়োগপদ্ধতি এই দিকে প্রযুক্ত হইবে। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত দেশে চীনা জাতীয়তাবাদী দলে তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের অবস্থাটা সত্যই আন্তর্জাতিক দিক হইতে অনেকটা গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে ভারতের পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া বিশেষভাবেই প্রয়োজন এবং ব্রহ্ম সীমান্তবর্তী ভারতের উপজাতিসমূহের মধ্যে এই বোধ জাগাইয়া তোলা দরকার যে, ভারতের স্বার্থের সঙ্গেই তাহাদের স্বার্থ জড়িত আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে চায় না; পক্ষান্তরে তাহাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাহাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সে পক্ষপাতী। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ব্রহ্ম সীমান্ত পরিদর্শনের ফলে নাগা প্রভৃতি উপজাতীয়সমূহের অন্তরে ভারতের সমতলবাসী সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবোধ নিবিড় হইয়া উঠিবে এবং স্বার্থপ্রণোদিত কোনরূপ অনর্থকর প্ররোচনা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে না, আমরা ইহাই আশা করি।

বাঙালী ভদ্রলোক

বাঙালী ভদ্রলোক বলতে যে বিশেষ শ্রেণীটিকে বোঝায় শিল্পে সাহিত্যে তাদেরই অতুল কীর্তির প্রভায় বাঙলা দেশ আজ জগৎবরেণ্য। বাঙলাদেশের জলহাওয়াই হয়তো এজন্য দায়ী, কারণ বাধা-বিঘ্ন যেখানে যত বেশি মানুষের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উৎকর্ষও সেখানে তত প্রবল। বাঙলাদেশ অতীতে কোনোকালে হয়তো সুজলা সুফলা ছিল কিন্তু তারপর থেকে একাদিক্রমে কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ, কখনো বন্যা, আবার কখনো বা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বারবার বিপন্ন বিধ্বস্ত হয়েছে। এমন একটা বছরও বোধ হয় যায় নি যেবার একটা না একটা বিপর্যয় দেখা না দিয়েছে। শোনা যায় এক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেই এক কোটিরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছিল। ক্রমে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এই সব বিপদ নিবারণ করা কিছু পরিমাণে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতিকে যে আজো পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারে নি তার প্রমাণ তো প্রতিনিয়তই পাওয়া যাচ্ছে। এই বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করেও বাঙালী যে জ্ঞানে গরিমায় এতো উন্নতি করতে পেরেছে এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে থাকি, ফলে সকলেই আমাদের উপর নির্ভর করেন। এতে আমাদের গৌরব কম নয়।

ভারতবাসীর

নিত্য-সঙ্গী — বার্মা-শেল

ডা যুদ্ধের হাওয়া কোনদিকে ?

সম্প্রতি মার্শাল টিটো লণ্ডন বেড়িয়ে [illegible]ছেন। সেখানে তিনি প্রচুর সরকারী [illegible] আপ্যায়ন লাভ করেন। যুগো-[illegible]ভিয়ার কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রপতি বাকিংহ্যাম প্রাসাদে রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক [illegible]র্ধিত হন, যদিও দরবারী ভাষায় সে [illegible]র্ধনাকে নাকি 'বেসরকারী' বলতে হবে [illegible] নিয়ম হচ্ছে যে রাজ্যাভিষেক না [illegible] পর্যন্ত ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী [illegible] বিদেশী রাষ্ট্রপতিকে 'সরকারী'-[illegible] সম্বর্ধনা জানাতে পারেন না। যাই [illegible] মার্শাল টিটোর সঙ্গে বৃটিশ [illegible]মেণ্টের সংবাদ আরো পাকা হোল। [illegible]র বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী যুগো-[illegible]ভিয়া রাশিয়া ও রুশপ্রভাবাধীন [illegible] চক্ষে পরম শত্রু। সেই [illegible] গত কয়েক বছর ধরে যুগো-[illegible]ভিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের [illegible] ধীরে ধীরে নিকটতর হয়েছে। [illegible] দুপক্ষেরই। বর্তমানে যুগোস্লা-[illegible] পশ্চিমী ক্যাম্পের ভিতরেই বলা [illegible] যদিও যুগোস্লাভিয়া কম্যুনিস্ট-[illegible]। মস্কোর মতে টিটো বিপথে গিয়ে [illegible]এর শত্রু হয়েছেন, টিটোর মতে [illegible] ও তাঁর দলের লোকরাই খাঁটি মার্কস-[illegible] ও খাঁটি কম্যুনিস্ট এবং স্টালিন-[illegible]রাই ভ্রষ্টাচারী। পোপকে না মেনে [illegible] যদি নিজেকে ক্যাথলিক বলে প্রচার [illegible] তাহলে তার যেরকম অবস্থা হয় [illegible] প্রাধান্য অস্বীকার করে নিজেকে [illegible]নিস্ট বললে অবস্থা অনেকটা সেই-[illegible] হয়। তবে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে [illegible]লিন-বিরোধী কম্যুনিস্টদের মধ্যে [illegible]জেদের মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের [illegible] একটা নূতন চেষ্টা দেখা দেবার [illegible]ভাবনা আছে।

টিটো কমিনফর্মের শাসন অমান্য [illegible]ছেন বলে মস্কোর প্রভাবাধীন আন্ত-[illegible]তিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের চক্ষে [illegible] পাপী। জ্ঞাতিশত্রুকে লোকে [illegible] বড়ো শত্রু বলে মনে করে। [illegible]টোর কর্মফলে যেন কম্যুনিস্ট-জগতের [illegible]-দেয়ালের মধ্যে একটা ফুটো হয়েছে। [illegible]থিবীর অনেক দেশেই কিছু কিছু [illegible]লিনবাদ-বিরোধী কম্যুনিস্ট আছে। [illegible] তাদের সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার [illegible]নিস্টদের এই পার্থক্য যে যুগো-

শ্লাভিয়ার কম্যুনিস্টদের হাতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আছে। সেই জন্য তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-লাভ কম্যুনিস্ট নীতির একটি সর্বপ্রধান লক্ষ্য। কম্যুনিস্ট পার্টি কোনো জায়গায় একবার কর্তৃত্ব পেলে তা হারাবার সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দেবার ব্যবস্থা করে। কম্যুনিস্ট পার্টি একবার ক্ষমতা পেয়ে সেটা হারিয়েছে—এ পর্যন্ত এরকম ঘটনা কোথাও ঘটে নি। টিটোর সম্বন্ধেও অবশ্য সেকথা খাটে। কমিনফর্মের বিরুদ্ধতাও টিটোর দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে নি। কিন্তু মস্কো-কম্যুনিজম-এর চোখে টিটোর দৃষ্টান্ত আরো বিপজ্জনক, কারণ টিটো যে মস্কোর চক্ষে খাঁটি কম্যুনিজম-এর পথ ত্যাগ করেও যুগোশ্লাভিয়ার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। নিয়মমত এ অবস্থায় দেশদ্রোহী চর বলে টিটোর বিচার ও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। যুগোশ্লাভিয়াতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট morale-এর পক্ষে মোটেই ভালো নয়।

তাছাড়া রাশিয়ার সামরিক নিরাপত্তার প্রশ্ন তো আছেই। যুগোশ্লাভিয়া বে-হাত হয়ে যাওয়াতে য়ুরোপে রাশিয়ার সামরিক সুরক্ষার ব্যবস্থা কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। মস্কোর সঙ্গে ঝগড়ার পরে কিছুকাল যুগোশ্লাভিয়া দুই ব্লকের মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্থানে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রমশ একদিকের ঠেলা ও অন্য দিক থেকে সাহায্য করার আগ্রহের মধ্যে পড়ে যুগোশ্লাভিয়ার নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা ক্রমশ ক্ষীণ হতে লাগল। যদিও এখন পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়া আমেরিকা বা বৃটেনের সঙ্গে কোনো প্রকাশ্য সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি, তবুও তার সামরিক লেন-দেন যে এখন পুরোপুরি ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গেই চলেছে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। গোড়ার দিকে যে অবস্থা ছিল, তাতে রাশিয়ার সঙ্গে যদি ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের কোনো সাক্ষাৎ সামরিক সংঘর্ষ উপস্থিত হোত, তবে যুগোশ্লাভিয়া নিরপেক্ষ থাকতে পারত। এখন আর সে অবস্থা নয়। এখন যুগোশ্লাভিয়ার গায়ে হাত তুললে যেমন ইঙ্গ-মার্কিন দৌড়ে আসবে, তেমনি ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘর্ষ বাধলে যুগোশ্লাভিয়াকেও তার ভাগী হতে হবে। সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও তুর্কীর মধ্যে একটা সামরিক মৈত্রী চুক্তি হয়েছে। এর দ্বারা যুগো-শ্লাভিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মনান্তর যেমন আরো একটু বাড়ল, তেমনি যুগো-

স্লাভিয়া আরো একটু বেশি করে ন্যাটোর (North Atlantic Treaty Organisation) আওতার মধ্যে এলো।

তবে ইতিমধ্যে আর একটা অন্য রকম হাওয়াও বইতে শুরু করেছে। কয়েকদিন থেকে মস্কোর বেতারে একটা সুর খুব বেশি শোনা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, সোভিয়েটের শান্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ। মস্কো খুব জোর দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছে যে, কম্যুনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলির নির্বিবাদে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করে থাকা সম্ভব। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না—এ কথাটাও খুব বেশি জোর দিয়ে মস্কো থেকে বলা হচ্ছে। সোভিয়েটের পূর্বতন পররাষ্ট্র সচিব মঃ ভিসিনস্কি ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ইউনোতে সোভিয়েটের স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছেন। অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এই সপ্তাহে তিনি যখন ইউনো'র আলোচনায় যোগ দেবেন, তখন তাঁর মুখ থেকে এমন কিছু শোনা যাবে, যাতে কোরিয়ার যুদ্ধে নামবার একটা সম্ভাবনা দেখা দেবে। লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মহলের মতও নাকি এই যে, রাশিয়ার সঙ্গে একটা মিটমাট হবার সম্ভাবনা পূর্বের চেয়ে বেড়েছে। রাশিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ-এর সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার ও মিঃ চার্চিলের সাক্ষাৎ-আলোচনার সুযোগ ঘটানোর চেষ্টাও নাকি চলছে। যাই হোক, 'ঠাণ্ডা-যুদ্ধের' অংশ হিসেবে সোভিয়েট এলাকার অভ্যন্তরে উস্কানি দিয়ে গোলমাল বাধাবার মার্কিন নীতিতে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যে কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এই নীতি সোভিয়েট ছাড়া অন্য দেশেও অনেকেই নিন্দনীয় বলে মনে করেন। অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা সোভিয়েটের নেই—এই কথার দ্বারা সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আন্তর্জাতিক জনমতকে উপরোক্ত মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে আরো প্রবল করতে পারেন। তবে কেবল এই করেই মার্কিন গভর্নমেণ্টের নীতি বদলানো যাবে না। গত মহাযুদ্ধের সময়ে বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি ক্যাপিটালিস্ট দেশের আশঙ্কা দূর করার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কমিনটার্ন ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এবার সদিচ্ছা প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ কমিনফর্ম ভেঙ্গে দেবার কথা উঠতে পারে। কী হবে বলা যায় না, তবে মিটমাটের জন্য যদি সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কমিনফর্ম ভেঙ্গে দিতে রাজি হন, তবে মস্কো-টিটো বিবাদ-প্রসঙ্গে সেটা খুবই একটা কৌতুকাবহ ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই।

২৫।৩।৫৩

—শিল্পচর্চা—

নন্দলাল বসু

সোনার তবক-ছাপা

সোনার তবক (অত্যন্ত মিহি পাত) যেভাবে ছাপা হয় সেইভাবেই তামা বা রূপার তবকও ছাপা যায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির বিবরণ একে একে লেখা যাচ্ছে।

কুশন (cushion)—৮″×৫″ মাপের (আধ ইঞ্চি পুরু) এক টুকরা চৌরস কাঠ পশমী কাপড় বা বনাত দিয়ে ঢেকে এক খণ্ড বাফ (buff) চামড়া মুড়ে চার ধারে পেরেক মেরে টান ক'রে দাও। প্যাডের শিয়রের দিকে খানিকটা পার্চমেণ্ট্ এ'টে ভাঁজ ক'রে রাখো. ভাঁজ খুললে যা দেয়ালের মতো উঠে মাথার দিক ও দুই পাশের অনেকটা এভাবে রক্ষা করবে যে, কাজ করবার সময় কুশন থেকে তবক হাওয়ায় উড়ে যাবে না। কুশনের নীচে-পিঠে তিনটি চামড়ার ফাঁস থাকবে, একটিতে বুড়া আঙুল ঢুকিয়ে কাজ করা যাবে, অন্য দুটি গলিয়ে কাজ চুকে গেলে উট্‌লোমের তুলি আর তবক-কাটা ছুরি রাখা হবে।
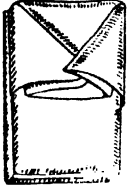
কুশন
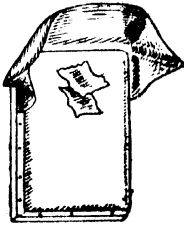
কুশনে বিছানো তবক ও টিপ (বিশেষ রকম তুলি)

কুশনের উল্টা পিঠ

তুলি—'ক্যামেল হেয়ার' বা উটের লোমের মোটা তুলি. তবক লাগাবার পর বাজে টুকরাগুলি ঝেড়ে ফেলবার জন্যে।

ছুরি—তবক-কাটা ছুরির ফলা লম্বা ও ল্যাচ্‌লেচে (flexible) হবে. বিশেষ ধার থাকবে না আর হাল্কা বাঁট হবে 'প্যালেট নাইফ'-এর বাঁটের মতো।

টিপ (tip)—২॥″×৩″ মাপের বিশেষ রকমের চওড়া তুলি. তবক তুলে নিয়ে ছবিতে যথাস্থানে বসাবার জন্যে। কাঠ-বিড়ালির লেজের লম্বা লোমে তৈরি হয়। দু টুকরা মজবুত কার্ডের হাঁয়ের মধ্যে লোমগুলি খুব পাৎলাভাবে. প্রায় একটি একটি ক'রে সাজিয়ে আঠা দিয়ে এ'টে দিলেই হল।

বাঁশের ছুরি—চেয়াড়ি চে'চে ছুলে দিব্যি তৈরি করে নেওয়া যাবে।

বাঁশের চিম্‌টা—দুটি চাঁচাছোলা বাঁশের চেয়াড়ি রোলাম (সেতারীরা ব্যবহার করে) দিয়ে গোড়ার দিকে জুড়ে নিতে হবে, চিম্‌টার মতো ব্যবহার করবার কালে আল্‌গা ডগা দুটি ঠিক-ঠিক মেলা চাই। তবক (বিশেষতঃ ছোটো টুকরা) তুলে বসাতে এই চিমটাও ব্যবহার করা চলে।
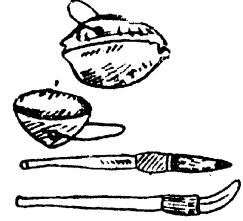
কড়ি, পালিশ-পাথর পালিশ-কাঠি
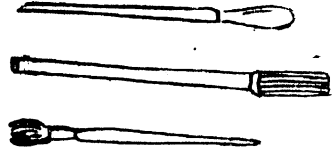
ছুরি, বাঁশের ছুরি তুলি
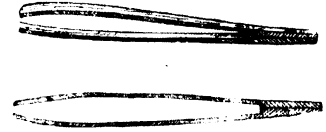
বাঁশের চিম্‌টা

বত্—তবক ছাপবার বিশেষ রকম আঠা। মাছের আঠা (fish glue) বা জিলেটিন (gelatin) বাজার থেকে কিনে এনে একটি ঠাণ্ডা জলের পাত্রে বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে। পরে আগুনের আঁচে দু-তিন বলক ফুটিয়ে তাতে মিছরি বা বাতাসার টুকরা ছেড়ে দাও। আঠাটি একতার চিনির রসের মতো হবে, মধুর চেয়ে পাৎলা। শীতের দিনে আঠার পাত্রটি একটি গরম জলের পাত্রে বসানো থাকলে ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারবে না, লাগাবার সময় বৎটি গরম থাকবে। কাগজে বা ছবির জমিতে বৎ লাগাবার পর আঙুল দিয়ে চিট্‌টা দেখবে, কিছু নরম হয় তো অল্পক্ষণ অপেক্ষা ক'রে, শুকিয়ে যাওয়া মাত্র, জমিতে মুখের ভাব্‌রা দিয়ে পরে

সোনার তবক ছেপে তুলোর নুটি দিয়ে চেপে চেপে বসিয়ে দেবে।

তেল চাই। **পেঁজা তুলো** খানিকটা চাই।

তবক—বিলেতি তবকের খাতা কিনতে পাওয়া যায়। দেশী তবকও দিল্লী, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কলিকাতার চকবাজারে পাওয়া যায়। তবক নানা রঙের হয়, ঘোর কমলালেবুর রঙ থেকে ফিকে হলুদ পর্যন্ত, আর রুপোর মতো সাদা। সোনা ছাড়া এলুমিনিয়াম, তামা, রুপো এসব ধাতুরও তবক হয়। সোনার তবক আগুনের শিখায় ধরলে আসল বা ভেল সহজে জানা যাবে। বাজে 'সোনা' বা ব্রোনজের পাত আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাবে। অথবা নাইট্রিক অ্যাসিড (এচিং করতে আর্টিস্টেও ব্যবহার করেন) দিলে আসল সোনার তবক অবিকৃত থাকবে, অন্য জিনিস বিকৃত বা লুপ্ত হবে।

পালিশ-পাথর—এগেট (agate) হলে হয়; শঙ্খ বা কড়ি বা যে-কোনো মসৃণ শক্ত পাথর হলেও চলে। আর, চিতাবাঘের দাঁত, অভাবে কুকুর বা অন্য শ্বাপদ জন্তুর পাশের লম্বা দাঁত, একটি কাঠির ডগে বসিয়ে নিলেও উত্তম পালিশ করা যায়।
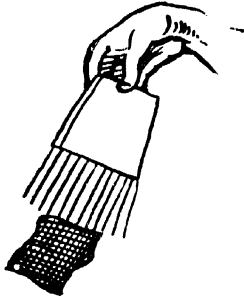
টিপ দিয়ে তবক তোলা হচ্ছে
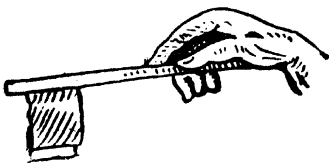
বাঁশের ছুরিতে তবক লেগেছে

তবক লাগানোর কৌশল—প্রথমেই তবকের খাতা থেকে কয়েকটি পাত কুশনের ভিতর ঝেড়ে দাও (কাজ করবে সার্শি-আঁটা ঘরে যেখানে হাওয়া চলে না আর কুশনের মাথার দিকে পার্চমেণ্ট কাগজের ঘেরও তোলা থাকবে)—একটি লম্বা-ফলা ছুরির ডগে পাতগুলি ধীরে ধীরে বিছিয়ে নাও। পরে বাঁশের চেয়াড়ির ছুরি বা টিপ অর্থাৎ বিশেষ রকম তুলি একটি সোনার পাতের ধারে লাগিয়ে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বৎ-লাগানো নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দাও। ধৈর্য ধ'রে অভ্যাস করলে হাত তৈরি হয়ে যাবে, গোড়াতেই হতাশার কারণ নেই। (ব্রোনজের সস্তা পাত নিয়ে প্রথমে অভ্যাস করা ভালো।)

টিপের বদলে চেয়াড়ির ছুরিতে কাজ চলে। ছুরিটি গায়ে রগড়ে, মাথার চুলে দু-একবার বুলিয়ে সোনার তবকের ধারে ছোঁয়াতে হবে। সোনার তবক টুকরো করা দরকার হলে কুশনের ভিতর বিছিয়ে লম্বা ছুরির সাহায্যে অল্প চাপ দিয়ে ইচ্ছামত টুকরা করে নেবে। খুব ছোটো টুকরা হলে বাঁশের চিমটাটি দিয়ে তুলে তবক যথাস্থানে বসাতে হবে। এক টুকরা তবকের পাশে আরেক টুকরা বসাতে মাঝে অহেতুক ফাঁক না পড়ে।

তবক-ছাপার ভিন্ন কৌশল। খাতার পাৎলা কাগজটির পিছন পিঠে (ভিতরে তবক আছে) একটু তুলা তেলে খুবই অল্প ভিজিয়ে বুলিয়ে দাও; তাহলে তবকটা কাগজের সঙ্গে এঁটে থাকবে। তখন কাগজ-সমেত তবকটি আঙুলে বা চিম্‌টায় তোলা যাবে, প্রয়োজনমত ছুরি বা কাঁচি দিয়ে ছোটো টুকরা করাও যাবে আর যথাস্থানে ছেপে দিলেই চলবে। কাগজটির উপর তুলার নুটি দিয়ে চেপে বসিয়ে দেবে। আঠা শুকিয়ে এলে সেবল্‌ হেয়ার তুলি দিয়ে কাগজ এবং অনাবশ্যক সোনালি গুঁড়া বা পাত ঝেড়ে ফেলবে। সাবধান, তবক-লগ্ন কাগজের উপর পিঠে বেশি তেল না লাগে: তাহলে তবকটি কাগজ ছাড়তে চাইবে না।

শুধু তবক (পিছনের কাগজ ছাড়া) যখন লাগানো হবে, তখন লাগানোর পর একটা পাৎলা কাগজ তবকের উপর রেখে তবে তুলার নুটির চাপ দেবে; না হলে তুলার আঁশ বতের আঠায় জড়িয়ে যাবে আর তবকটি কুঁচকে যাবারও সম্ভাবনা আছে। তবক-লাগানো জমি বেশ শুকিয়ে গেলে ছবিটি এক খণ্ড কাঁচের উপর রাখবে, যাতে মসৃণ সমতল পাওয়া যায়, অতঃপর কম পালিশ দরকার হলে তবক-লাগানো জায়গায় একটি পাৎলা ট্রেসিং কাগজ রেখে তার উপর পালিশ-পাথর বা ঘোট্‌না দিয়ে পালিশ করবে; বেশি পালিশের জন্যে ট্রেসিং কাগজ না দিয়ে সরাসরি পালিশ করতে হবে। সোনা আরো বেশি ঝকঝকে দেখাতে হলে তবক লাগাবার পূর্বেই ছবি বা তার প্রয়োজনীয় অংশটি ভালো ক'রে ঘষে পালিশ করে নেবে; খুব-পালিশ-করা জমির উপর তবক লাগিয়ে তুলার নুটির চাপ দিলে সোনা আপনিই ঝক্‌ঝকে দেখায়। পালিশ করার আগে ঘোট্‌না পাথরটি একটু তাতিয়ে নেবে। তবক লাগাবার পূর্বে তবকের খাতাটিও রৌদ্রে বা আগুনের উত্তাপে একটু গরম করে নিলে কাজের সুবিধা হবে।

তুলি-তৈয়ারী

শান্তিনিকেতনে সর্বদাই আমরা সরু কাজ ও রেখার কাজ করতে হলে বিলাতি তুলি (Winsor & Newton-এর sable-hair brush) আর মোটা কাজ বা রঙ ভরাট করা বা রঙের 'ওয়াশ' বা প্রলেপ দেওয়া, এজন্য চীনা-জাপানী মোটা ও চ্যাপ্টা নানারকম তুলি ব্যবহার করে থাকি। এসব তুলি যখন সহজে পাওয়া যায়, আর উৎকৃষ্ট তুলি তৈরির কৌশলও আয়ত্ত করা কঠিন, উপাদান দুর্লভ—তুলি তৈরির 'চেষ্টা' বিশেষভাবে করা হয়নি। অথচ নিজের তুলি নিজে তৈরি করারও একটা আনন্দ আছে। পূর্বে তো দেশের চিত্রকরেরা দেশী তুলিই ব্যবহার করে গেছেন। অজন্তা, রাজপুত, মোগল—এই-সব উঁচুধরণের ছবির জন্যে উৎকৃষ্ট তুলি দেশেই তৈরি হয়েছে। পোটোরা আজও নিজের তুলি নিজে তৈরি করে নিচ্ছেন।

আমরা বিভিন্নরকম ভিত্তিচিত্র আর টেম্পারা কাজ করবার সময়, অন্তর আর মোটামুটি রঙ লাগাবার জন্যে, গাছের চিম্‌ড়ে ও মিহি আঁশওয়ালা ডাঁটি থেকে মোটা ও মাঝারি তুলি তৈরি করে ব্যবহার

করে থাকি। খেজুর কেয়া বট বেত এসবের ডাঁটি থেকে শুয়োরের লোম থেকে যেমন হয়ে থাকে সেরূপ কড়া তুলি তৈরি করে নেওয়া যায়। কেয়াগাছের পাকা ঝুরি (সরু বা মোটা), বটের ঝুরি, খেজুরের ডাঁটি (যে ডাঁটিতে খেজুর ধরেছিল), কাঁচা বাঁশ বা বেত—এই হ'ল সহজলভ্য উপাদান। এইসব ঝুরির ডাল বা ডাঁটি আট-দশ আঙুল মাপে কেটে কেটে নিয়ে এগুলির একদিক গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে। পরে সিদ্ধ-করা দিকটা একটা কাঠের উপর রেখে আরেকটা কাঠের ঘা দিয়ে খুব আস্তে আস্তে থেঁতো করতে হবে। বেশি জোরে ঘা দিলে আঁশগুলি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আছে। এইভাবে তৈরি তুলি সুলভ, মোটা কাজ করে নষ্ট হয়ে গেলেও গায়ে লাগে না।

পুরাতন শিল্পশাস্ত্রে তুলি-তৈরির বিধি আছে। বাছুরের কানের ভিতর থেকে কিছু লোম কেটে নিয়ে দুই হাতের তেলোয় তুঁষের ছাই দিয়ে রগড়ে নাও। পরে এক জায়গায় জড়ো করো ও সেই লোমগুলি ডান হাতের তেলোয় এমনভাবে গুছিয়ে নাও যাতে ডগাগুলি সমস্তই একটি বিন্দুতে জড়ো হয়। তখন লোমগুলির ডগের দিকে আঙুল দিয়ে ভালোরূপে টিপে ধ'রে ঝেড়ে নাও; বাজে ছোটো লোম ঝরে যাবে। ডগাটি ভালো করে ধরে লোমগুলির গোড়ার দিক গ'দের জলে ভিজিয়ে নাও (ভেজাবার সময় ডগের দিকে আঙুল আলগা না হয়ে যায়) আর গোড়াটা বেশ করে গোল-মতো করে নাও। আঠা শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনমত লম্বা রেখে নীচের দিকে সমান ক'রে কেটে নাও। পরে মিহি রেশমের সুতো (পুঁটি-মাছ ধরার মিহি 'চিক' হলে চলবে) দিয়ে গোড়াটা ফাঁস দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে নাও। বাঁধা শেষ হলে এতটা সুতো বাড়তি হবে যে লোমগুচ্ছের মাপ ছাড়িয়ে ডগের দিকে আঙুল চার বেরিয়ে থাকবে, সেইভাবে গ'দের আঠা দিয়ে সুতোটি লোমগুলির গায়ে লেপ্টে দেবে। লোমের গুচ্ছটি সরু বা মোটা যেমন হবে সেই অনুযায়ী হিসাব করে পায়রা হাঁস বা ময়ূরের পালখ সংগ্রহ করে সেটি সুবিধামত মাপে কেটে নেবে। লোমের গোছা পরাবার আগে এই পালকের ডাঁটিটি জলে
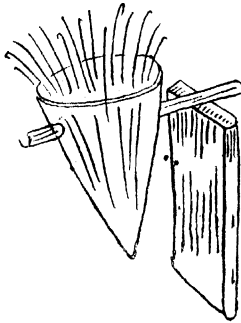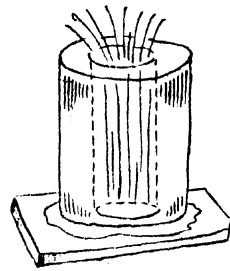
মাটির চোঙে বা কাগজের ঠোঙায় লোম-গোছানো

ফেলে আগুনে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, তার ফলে নরম হলে লোমগুলি ঢোকাবার সুবিধা হবে আর পরে শুকিয়ে এবং চুপসে লোমগুলি 'কামড়ে' ধরে থাকবে। পালকের ডাঁটির বড়ো ছিদ্র দিয়ে লোমের গোছা প্রবেশ করিয়ে অন্য ছিদ্র-পথে তার সুতোসুদ্ধ ডগাটি বার করে নিতে হবে; সুতো ধ'রে আস্তে আস্তে টেনে লোমগুলি যতটা বার করবার বার ক'রে নিতে হবে।

দেশী পোটোরা বাচ্ছা পাঁঠার ঘাড়ের লোম, কড়া তুলির জন্যে বাচ্ছা মোষের ঘাড়ের লোম বা ছাগলের পেটের লোম, আর খুব সরু তুলির জন্যে বেজি বা কাঠবিড়ালির লেজের লোম ব্যবহার করে। সরু তুলি জ্যান্ত কাঠবিড়ালির লেজের লোম থেকেই ভালো হয়। জীবটিকে গ্রেপ্তার করে তার লেজের ডগা জলে ভিজিয়ে নিলে তুলির মতো লোমের গোছা পাওয়া যাবে। ঐ গোছা আঙুলে টিপে ধরে কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেই কাঠ-বিড়ালির ছুটি হবে। পরে পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়াতেই গ'দে চুবিয়ে, রেশমী সুতোয় জড়িয়ে, পালকের ডাঁটিতে ভ'রে তুলি তৈরি করা যাবে।

তুলির উপযোগী লোম সংগ্রহ করে তার আগাগুলি ঠিক করে লওয়ার আরেক কৌশল। ছোটো মাথাভাঙা বাজে লোম বেছে ফেলে দিয়ে বড়ো লোমগুলি তুঁষের ছাই দিয়ে দু' হাতের তেলোয় রগড়ে সেগুলির আগাগুলো জড়ো করে নিতে হবে একটি মাটির চোঙের ভিতর বা কাগজের ঠোঙায়। এক বা দেড় ইঞ্চি ব্যাস এরকম নলের আকার খানিকটা কুমোরের মাটিতে একটি লেড-পেন্সিল ফুটিয়ে ছিদ্র করা যাবে এবং শুকিয়ে নিলেই হবে। এরকম ফুটোওয়ালা পাকা কঞ্চি বা বাঁশ পেলেও চলবে। এই মাটির বা বাঁশের চোঙের নীচের দিকে একটি কাগজ বা পিজবোর্ড এঁটে নিতে হবে। এখন লোমগুলির ডগ সবই নিচুমুখে চোঙে ভ'রে চোঙের তলার কাগজে বা বোর্ডে আস্তে আস্তে ঠুকতে হবে; ফলে লোমের ডগাগুলি সমতলে আসবে, সমান হবে। ভালোভাবে কাগজের ঠোঙা একটি বানিয়ে নিয়ে তার ভিতরে ঠুকে ঠুকেও লোমের ডগাগুলি সমান করে নেওয়া চলে।

অতঃপর লোমের গোছার গোড়ার দিক ভালো করে আঙুলে টিপে ধরে পূর্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়ায় তুলি তৈরি করে নিলেই চলবে। (ক্রমশ)
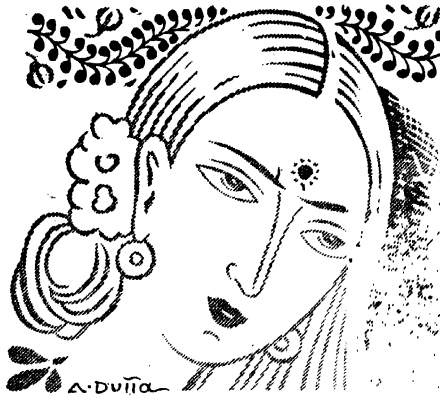
এই প্রথম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্লাসের একঘর মেয়ের সামনে বাঙলার টিচার মণিকা দত্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে। বসন্ত ঋতু সম্বন্ধে এমন সুন্দর প্রবন্ধ ফার্স্ট ক্লাসের কোন মেয়েও লিখতে পারেনি। আমি তাদেরও এই বসন্তের উপরেই লিখতে বলেছিলাম। কিন্তু মঞ্জুর মত এত ভালো লেখা, এমন নিখুঁত বর্ণনা কারোরই হয়নি। তোমাদের সকলের উচিত, ওর এই প্রবন্ধটা একবার করে পড়া। সবটাই তো তোমার লেখা মঞ্জু? না, কি কারো সাহায্য নিয়েছ?' মিসেস দত্ত একটু হাসলেন।

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দিদিমণি, সব আমার নিজের। কারো কাছ থেকে কোন হেল্প নিইনি। কোটেশনগুলি নিয়েছি শুধু রবীন্দ্রনাথ থেকে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'তাঁর কাছ থেকে সবাইকেই নিতে হয়। তোমার কোটেশনগুলিও খুব এ্যাপ্ট হয়েছে। ভারি চমৎকার হয়েছে প্রবন্ধটি। বোসো।'

সহাধ্যায়িনীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মঞ্জু বসে পড়ল। আত্মপ্রসাদে ওর কোমল সুন্দর মুখখানা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রশংসা আজ নতুন নয়। প্রায় রোজ প্রত্যেক পিরিয়ডে ইংরেজি, বাঙলা, অঙ্ক সংস্কৃত সব বিষয়ের টিচারদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু প্রশংসা পায় মঞ্জু। কিন্তু কোনদিন একঘেয়ে লাগে না। যত শোনে, ততই নতুন মনে হয়।

চৌদ্দ উৎরে সবে পনেরয় পা দিয়েছে মঞ্জু। এখনো ষোড়শী হয়নি, কিন্তু ভুবনেশ্বরী হয়েছে। নিজের ছোট জগতে মঞ্জুর একান্ত আধিপত্য। বীণাপাণি বিদ্যাপীঠের এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই মঞ্জু যে শুধু অদ্বিতীয়া তাই নয়, সারা স্কুলের মধ্যে ওর একটি বিশেষ স্থান আছে। টিচাররা সবাই ওকে স্নেহ করেন। হেড মিস্ট্রেস আশা করেন, মঞ্জু জেনারেল স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের গৌরব বাড়াবে। দেখা হলেই পড়াশুনো সম্বন্ধে তিনি ওকে খুব উৎসাহ দেন।

শুধু যে ক্লাসের আর টিচার্সরুমে মঞ্জুর গুণপণা নিয়ে আলোচনা হয়, তাই নয়,—ক্লাসের প্রতিষ্ঠা দিবস, পুরস্কার বিতরণের দিন, আরো সব ছোট ফাংশনে গান আর আবৃত্তির জন্য ডাক পড়ে মঞ্জুশ্রী রায়ের। সেখানেও হাততালি আর বাছা বাছা পুরস্কারগুলি তার জন্যে বাঁধা থাকে।

সাধারণত পড়াশুনোয় যারা ভালো হয়, দেখতে তারা হয় কালো কুশ্রী। কিন্তু মঞ্জু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ওর গায়ের রঙ গৌর, মুখের ডৌল আর দেহের গড়ন সুন্দর। স্কুলের উৎসব-অনুষ্ঠানে, ছোট ছোট নাটকের অভিনয়ে মঞ্জুশ্রীই অবিসংবাদী নায়িকা।

সবুজ মলাটের মোটা এক্সারসাইজ বইটা মঞ্জুর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে মিসেস দত্ত বললেন, 'প্রবন্ধ তো হোল, কিন্তু তোমাদের পত্রিকার খবর কি? 'উন্মেষ'এর বসন্ত সংখ্যা কবে বেরোবে? ফাল্গুন গেছে, চৈত্রেরও আধাআধি হোল, এর পর তো দারুণ গ্রীষ্ম। কলকাতায় বসন্ত আর ক'দিন।

জীবনেও বসন্ত খুব বেশি দিনের নয়। মিসেস দত্ত তিরিশ পেরিয়ে গেছেন। বোধ হয়, সে কথাটাও তাঁর মনে পড়ল।

মঞ্জুরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করে—নামটা মিসেস দত্তই ঠিক করে দিয়েছিলেন 'উন্মেষ'। ঋতুতে ঋতুতে মঞ্জুদের 'উন্মেষ' বেরোয়, ঋতুতে ঋতুতে প্রচ্ছদপটের রঙ বদলায়। এ-পত্রিকারও সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী রায়। লেখাগুলি মণিকাদিই মোটামুটি দেখে শুনে দেন। এসব কাজে তাঁর ভারি উৎসাহ।

মঞ্জু বলল, 'লেখাগুলি সবই খাতায় তোলা হয়ে গেছে। শুধু মলাটের ছবি আঁকাই বাকি। এবারও আর্টিস্ট সুরজিৎ সেন ছবি এঁকে দেবেন। খাতাটা তাঁর বাড়িতেই পড়ে আছে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'তাগিদ দিয়ে বের করে আন। আর্টিস্টদের মত কুঁড়ে মানুষ আর দুটি নেই। তাঁরা নিজেরা কাজ করেন না, কাজ তাঁদের দিয়ে করিয়ে নিতে হয়।'

মঞ্জু বলল, 'আমি আজই করিয়ে আনব।'

স্কুল ছুটি হোল সাড়ে চারটেয়। এর মধ্যে অনেকবারই উন্মেষ আর সুরজিৎ সেনের কথা মঞ্জুর মনে পড়েছে। সত্যি অনেকদিন

র পড়ে আছে খাতাটা ও'র কাছে। দিই দিই করে আর দিচ্ছেন না। ভারি অলস, ভারি কুঁড়ে মানুষ সুরজিৎ দা। নাছোড়-বান্দা হয়ে ও'র পিছনে লেগে না থাকলে ওঁকে দিয়ে ছাবতো ভালো, একটা লাইন পর্যন্ত টানানো যায় না। হেমন্ত আর শীত সংখ্যার বেলাতেও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে মঞ্জুশ্রীর। আর্টিস্টের কুঁড়েমি ভাঙতে কি কম হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে মঞ্জুর?

রত্না দাস পত্রিকার সহ-সম্পাদিকা। বয়সে মঞ্জুর চেয়ে বছর খানেকের বড়। কিন্তু পদগৌরবে ছোট বলে মঞ্জু তার ওপর খুবই প্রভুত্ব করে। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে মঞ্জু বলল, 'চল রত্নাদি, খাতাটা নিয়ে আসি সুরজিৎদার কাছ থেকে।'

রত্না বলল, 'না ভাই, আমার কাজ আছে। তিনদিন ধরে মা গেছেন শিশু-মঙ্গলে। ফিরে গিয়ে বিকেলের সব কাজ সেরে রান্না করতে হবে। স্কুলে যে আসতে পারছি এই ঢের।'

মঞ্জু ধমকের সুরে বলল, 'না, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। আজ শিশুমঙ্গল, কাল তমুকমঙ্গল। একটা-না-একটা অজুহাত লেগেই আছে। এমন করলে ক্লাবই বা চলবে কিভাবে, কাগজই বা বেরোবে কি করে!'

রত্না বলল, 'কি করব ভাই, আজকাল আমাকেই সব দেখতে হয়। পড়াশুনোর পর্যন্ত সময় পাইনে। তুমি বরং অমিয়া কি সুজাতা ওদের কাউকে নিয়ে যাও।'

মঞ্জুশ্রী বলল, 'তোমাদের কাউকেই লাগবে না, আমি একাই যেতে পারব।'

বান্ধবীদের বিদায় দিয়ে হাজরা রোডের মোড়ে এসে মঞ্জু মুহূর্তকাল ভাবল। এখনই সুরজিৎদের ওখানে যাবে না বাড়িতে বইগুলি রেখে তারপর যাবে। হাতে একরাশ বই। এ্যালজেবরা, ব্যাকরণ কৌমুদী আর প্রবেশিকা-ভূগোলে বোঝা বেশ ভারি হয়েছে। এগুলি বাড়িতে রেখে আসাই ভালো। বইয়ের রাশ হাতে দেখলে সুরজিৎদা ভারি ঠাট্টা করেন, 'এই যে মুর্তিমতী সরস্বতী ঠাকরুণ, আজ মোটা কলেজ স্ট্রীটটা বগলে নিয়ে চলেছ, কিন্তু দু বছর বাদে যখন কলেজে ঢুকবে, দুই আঙুলের টিপে পাতলা একখানা খাতা ছাড়া কি কিছু আর তখন শোভা পাবে?'

এমন মজার মজার কথাও বলতে পারেন সুরজিৎদা। ভারি চমৎকার মানুষ, ভারি অদ্ভুত মানুষ।

সদানন্দ রোডের লাল রঙের ফ্লাট বাড়িটার তেতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে মঞ্জুরা থাকে। বাবা মা দাদা বউদি আর সে। দুই দিদির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাই ছোট ঘরখানা মঞ্জুর ভাগেই পড়েছে। পুরো একখানা ঘরেরই সে মালিক। এ ঘরখানার ওপর দাদার লোভ ছিল। এ ঘরে সে পড়বে, বন্ধুরা কেউ এলে তাদের এখানে বসিয়ে গল্প করবে। কিন্তু দাদার অবুঝ আবদার মা কি বাবা কেউ মানেননি। তাঁরা দুজনেই বলেছেন, 'না না না। মঞ্জুর একখানা আলাদা ঘরের দরকার বই কি। ও বড় হয়ে উঠছে না, তাছাড়া পড়া-শুনো আছে না ওর?'

দাদা একটু আপত্তি করলে মা বলে-ছেন, 'ঘর তো তোমার পাওয়ার কথা নয়। সুমিতা আছে তাই ঘর একখানা তাকে দিয়েছি নইলে তোমার আবার ঘরের কি দরকার। কতক্ষণই বা বাড়িতে থাক। নেহাৎই কয়েক ঘণ্টা অফিসে থাকতে হয়, তাই নইলে চব্বিশ ঘণ্টাই বন্ধুদের বাড়ি আড্ডা দিতে পারলে তোমার ভালো হয়। তোমার আবার বাড়ি ঘরের কোন দরকার আছে নাকি মৃণাল?'

দাদা হেসে বলেছে, 'দরকার থাকলেও কি আর পাব? মঞ্জু যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিনী সেখানে কারোরই জয়ের আশা নেই।

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িগুলি ডিঙিয়ে মঞ্জু এসে নিজেদের পাঁচ নম্বর ফ্লাটটার সামনে দাঁড়াল। তারপর কড়া নাড়ল জোরে জোরে।

বউদি সুমিতা এসে দোর খুলে দিল। একুশ-বাইশ বছরের তরুণী বধূ। ছোট ননদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, কড়া দুটি কি ভেঙে ফেলবে নাকি?'

মঞ্জু বলল, 'নইলে কি তোমার ঘুম ভাঙবে? আর ঘুমিও না বউদি। যথেষ্ট মোটা হয়েছ। নাও এবার ধরতো বইগুলি।'

সুমিতা বলল, 'ইস আমার দায় পড়েছে। স্কুলে পড়বে তুমি, আর বইয়ের বোঝা বুঝি বয়ে বেড়াব আমি।'

বইয়ের বোঝা দু' বছর আগেও সুমিতা বয়েছে। যে বছর বি এ দিয়েছে, সেবারই বিয়ে দিয়েছেন বাবা। আর বোঝা বইতে হয় না।

মঞ্জু অবশ্য বইগুলি সত্যি সত্যিই বউদির হাতে পৌঁছে দিল না। নিচের মোটা খাতাটা কাঁধে ঠেকিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

মেয়ের সাড়া পেয়ে ঘর থেকে সরোজিনী বেরিয়ে এলেন। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। পরনে চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়ি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। ঠোঁট দুটি পান আর দোক্তার রঙে রঞ্জিত। গায়ের রঙ এ'রও উজ্জ্বল। স্থূলাঙ্গী হলেও এখনো সুন্দরী বলা-যায়। দেখলেই বোঝা যায় বেশ একটি সুখী স্বচ্ছল সংসারের গৃহিনী। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাঁপাচ্ছিস যে। ছুটতে ছুটতে এলি বুঝি, রোদে শুকিয়ে মুখের কি ছিরি হয়েছে দেখ।'

মঞ্জু হেসে বলল, 'মোটেই শুকোয়নি মা। আর আজ তেমন রোদ কোথায়, কেমন মেঘলা মেঘলা দিন দেখছ না।'

সরোজিনী বললেন, 'দেখেছি বাপু দেখেছি। এবার বইগুলি আমার হাতে দাও। আমি রেখে দিচ্ছি। নাতির চেয়ে পুতরা ভারি। একরত্তি মেয়ে, বই চেপেছে একরাশ। কি যে হয়েছে আজকালকার স্কুলগুলি।'

মায়ের পাশ কাটিয়ে নিজের ছোট ঘরে এবার ঢুকে পড়ল মঞ্জু। নিজের পছন্দ মত এ ঘরখানাকে সে সাজিয়েছে। জানলায় দরজায় নীল পর্দা। এক পাশে ছোট খাট। খাটের ওপর সাদা ধবধবে বিছানা। গেরুয়া রঙের শান্তিনিকেতনী বেড-কভারে আবৃত। মাথার কাছে ছোট বইয়ের সেলফ। ওপরের তাকে প্রাইজ পাওয়া গল্প আর

কবিতার বই। নিচের তাকগুলি স্কুলের বই আর খাতায় বোঝাই। ঘরের কোণায় ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি সেতার। সপ্তাহে দু দিন গানের স্কুলে যায় মঞ্জু। ডান দিকে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হলদে রঙের গুটিকয়েক সুন্দর সুন্দর ফাইল আর বাঁধানো খাতা। উন্মেষের সম্পাদিকার দপ্তর। মনোনীত আর অমনোনীত লেখা সবই সযত্নে সাজিয়ে নীল ফিতেয় বেঁধে রেখেছে মঞ্জু। অমনোনীত লেখার একটা ফাইল রাখা দস্তুর, তাই রাখতে হয়েছে। নইলে কিছুই মঞ্জুর অমনোনীত নয়, সমস্ত জীবনটাই পরম মনের মত।

বাবা কাজ করেন কাস্টমস-এ, দাদা ইনকাম ট্যাকসে। দুজনই অফিসার গ্রেডে। তারাই মঞ্জুর এসব সখের প্রশ্রয় দিয়েছেন—ফাইল, রঙীন পেন্সিল আর কাগজচাপা কিনে দিয়ে খেলনা অফিস সাজিয়ে দিয়েছেন মঞ্জুর। দাদা বলেছেন, 'একটা কলিং বেল কিনে দিতে হবে তোকে। যখন টিপবি আমিই না হয় বেয়ারার বেশে এসে হাজির হব। আর একটা পদ বাড়বে আমার। উন্মেষ অফিসের হেড বেয়ারা।'

মঞ্জু হেসে বলেছে, 'আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে। সত্যিই কিন্তু উন্মেষ অফিস একদিন আমাদের হবে। ছাপা হয়ে বেরোবে কাগজ, ছাপার অক্ষরে বেরোবে আমাদের সকলের নাম।'

এ স্বপ্ন মঞ্জু প্রায় রোজই দেখে। কলেজে একবার ঢুকতে পারলেই উন্মেষকে সে ছেপে বার করবে। সে হবে তখন সত্যিকারের কাগজের সম্পাদিকা।

কিন্তু সুরজিৎদার বাড়িতে আজই যেতে হবে, এখনই যেতে হবে মঞ্জুকে। উন্মেষের বসন্ত সংখ্যা কাল বার না করতে পারলে, মণিকাদির কাছে, মিতালী সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে তার মান থাকবে না। উন্মেষকে কেন্দ্র করে ছোট একটি ক্লাবও গড়ে উঠেছে মঞ্জুর—ক্লাসের বন্ধুরা যারা কাছাকাছি থাকে তারাই এ ক্লাবের সদস্যা। সপ্তাহে একবার করে অধিবেশন বসে। গান হয়, আবৃত্তি হয়। তারপরে হয় চা আর জলযোগ। দু চার আনা করে চাঁদা ক্লাবের সভ্যারা দেয়, কিন্তু তাতে খরচ কুলোয় না। সেজন্যে ভাবনা নেই মঞ্জুর। স্থায়ী পৃষ্ঠপোষক আছেন বাবা আর দাদা—আছেন মা আর বউদি। বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে মঞ্জু। সে আজকাল আর পুতুল খেলে না, ক্লাব আর পত্রিকা নিয়ে খেলে। সে খেলায় অভিভাবকদেরও আনন্দ।

বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে স্কুলের শাড়ি বদলে পাটভেঙে আর একখানা আকাশনীল শাড়ি পড়ল মঞ্জু। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিল আর একবার। আলগোছে পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নিল।

সরোজিনী এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, বিস্মিত হয়ে বললেন।

'ওকি এখনই আবার কোথায় যাচ্ছিস মঞ্জু।'

'যাচ্ছি না, এক্ষুণি চলে আসছি মা।'

সরোজিনী ধমক দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, কি তোরা হয়েছিস বলতো। স্কুল থেকে এই তো এলি। এক্ষুণি আবার হুট করে বেরোচ্ছিস। আচ্ছা তোর কি ক্ষিদে তেষ্টাও পায় না? এমন করলে শরীর টিঁকবে?'

মঞ্জু বলল, 'আমি একটু ক্লাবের কাজে বেরোচ্ছি মা। সুরজিৎদার' ওখান থেকে ম্যাগাজিনটা আনতে যাচ্ছি। যাব আর চলে আসব। এসে খাব, এসে তোমার সব কথা শুনব। লক্ষ্মী মা।'

সরোজিনী শাসনের সুরে বললেন, 'থাক থাক আর আহ্লাদে দরকার নেই। আমার কথা না শুনলে ক্লাব-ট্যাব সব আমি তুলে দেব বলে রাখছি। দয়া করে অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যাও কথা শোন আমার।'

পরম অনিচ্ছায় বড় এক কাপ দুধ আর দুটি সন্দেশ খেতেই হোল মঞ্জুকে। তারপর রুমালে মুখ মুছে আর কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে গেল নিচে।

সুরজিৎদা কাছেই থাকেন, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। জায়গাটা অবশ্য ভালো নয়, বড় ঘিঞ্জি নোংরা গলি। বাড়িটাও খারাপ। পুরোন, নোনাধরা। একতলার যে ছোট ছোট দু খানি ঘর নিয়ে সুরজিৎদারা থাকেন সে ঘর দুখানাও ভালো নয়। ভারি স্যাঁতসেঁতে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। এই নিয়ে দাদার কাছে অভিযোগও করেছিল মঞ্জু, 'আচ্ছা দাদা, তোমার বন্ধু অমন কেন। একটু ভালো বাড়িতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে পারেন না'

অমলেন্দু হেসে বলেছিল, 'পারে বইকি।'

মঞ্জু বলেছিল, 'তবে থাকেন না কেন?'

অমলেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'ইচ্ছা করেই থাকে না। ছবির মত বাড়িতে যারা থাকে, তাদের দিয়ে ছবি আঁকা হয় না।'

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন হয় না?'

অমলেন্দু বলেছিল, 'না, এত যদি কেন কেন করিস, আমি কেন, আমার ঠাকুরদাও সব জবাব দিতে পারবে না। আগে বড় হয়ে ওঠ, তারপর সব 'কেন'র জবাব একটা একটা করে নিলেই খুঁজে নিতে পারবি।'

ঢের বড় হয়েছে মঞ্জু। বুঝতে তার কিছু বাকি নেই। দাদা গোপন করলে কি হবে, সে টের পেয়েছে সুরজিৎদা'রা গরীব, খুবই গরীব। প্রথম প্রথম এই নিয়ে একটু মন খারাপ হয়েছিল, এখন আর হয় না। এখন বরং মনে হয়, ওই বাড়ি, ওই ঘর, ওই ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর ময়লা পায়জামা ছাড়া যেন সুরজিৎদাকে মানায় না। সুরজিৎদা যদি ভালো বাড়িতে, ভালো সাজপোশাকে থাকতেন, তাহলে তিনি আর্টিস্ট না হয়ে দাদার মত ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হতেন। তা যে হননি, ভালোই হয়েছে। তাহলে মঞ্জুর ম্যাগাজিনের মলাট এঁকে দিত কে?

মাস ছয়েক আগে দাদাই একদিন সুরজিৎদার বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে আলাপ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এঁকে চিনতে পারছ তো সুরজিৎ? উন্মেষ পত্রিকার সম্পাদিকা। এঁর কাগজকে সচিত্র করবার ভার তোমার ওপর।'

সুরজিৎদা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ তো।'

ঘর-বাড়ি যেমন সুন্দর নয়, সুরজিৎদাকেও তেমনি সুপুরুষ বলা চলে না। বয়সে দাদার চেয়েও বড়। বত্রিশ তেত্রিশ অন্তত হবে। শ্যামবর্ণ, রোগা ছিপছিপে চেহারা। প্রথমে একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল মনটা। কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে সয়ে গেছে। আর্টিস্টকে ওইরকম অসুন্দরই হোতে হয়। সে যদি রূপবান হতো, তাহলে তো আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দিনরাত নিজের মুখ দেখলেই চলত। তাহলে তো সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকবার কথা তার মনেই হতো না।

এসব যুক্তিও দাদার মুখেই শুনেছে মঞ্জু। দাদা বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বন্ধু সুরজিৎদা অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁকে। সে ছবি মঞ্জু বুঝতে পারে না। কিন্তু বুঝতে না পারার মধ্যেই তো মজা! অঙ্কের প্রশ্ন যত শক্ত হয় ততই ভালো, ততই মঞ্জুর হয় আনন্দ। সহজ প্রশ্ন যারা সাধারণ মেয়ে, যারা অঙ্কে কাঁচা তাদের জন্যে। ছবির বেলায়ও সেই কথা।

সেই থেকে সুরজিৎদার সঙ্গে মঞ্জুর ভাব। দাদার সঙ্গে তার এই বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ কদাচিৎ হয়। কিন্তু মঞ্জু যখনই ফুরসৎ পায় সুরজিৎদের বাসায় গিয়ে ঢোকে। এ যেন এক আলাদা দেশে বেড়িয়ে আসার আনন্দ।

সুরজিৎদা একা থাকেন না। তাঁর স্ত্রী আছে আর দুটি ছেলেমেয়েও আছে। বউদি দেখতে সুন্দরী নন। তেমন আলাপী কি মিশুকও নন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। সুধা বউদির সঙ্গে তেমন দেখা সাক্ষাৎই হয় না মঞ্জুর। তিনি আবার কি একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ করেন। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, ততক্ষণও ঘর-সংসার, আর ছেলেমেয়েকে নাওয়ানো খাওয়ানো নিয়ে থাকেন। মঞ্জু বসে বসে সুরজিৎদার সঙ্গে গল্প করে। হাতের কাজ থাকলেও সে কাজ রেখে সুরজিৎদা যে তার মত মেয়ের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত গল্প করতে বসেন, এতে ভারি খুশি হয় মঞ্জু। ওর আত্মসম্মান যেন অনেকখানি বেড়ে যায়।

পরশু বিকেলেও পার্কের কাছে সুরজিৎদার সঙ্গে মঞ্জুর দেখা হয়েছিল। দেখা হতেই তাগিদ দিয়ে বলেছিল, 'কই, আমার ছবির কি হোলো?'

সুরজিৎদা বলেছিলেনঃ 'হচ্ছে।'

মঞ্জু হেসে বলেছিল, 'হচ্ছে হচ্ছে তো কতদিন ধরে করছেন। আর কিন্তু দেরি করতে পারব না।'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'তাই নাকি?'

মঞ্জু বলেছিল, 'তা ছাড়া কি? আপনার জন্যে আমাদের কাগজ বেরোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। আর কোন কথা শুনব না আপনার, আমি কালই যাচ্ছি।'

সুরজিৎদা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, 'না না কাল নয়, পরশু এসো।'

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, 'পরশু কখন?'

'বিকেলে।'

'বিকেলে বেড়াতে বেরোবেন না তো!'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'আমি বিকেলে বেড়াই না, দুপুরে বেড়াই। যখন সবাই কাজ করে আমি তখন টোটো করি। তুমি যদি যাও অবশ্যই থাকব।'

মঞ্জু বলেছিল, 'আমি নিশ্চয়ই যাব। ছবি তৈরি থাকে যেন।'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'থাকবে।'

পুরোন বিবর্ণ বাড়িটার সামনে এসে মঞ্জু কড়া নাড়ল। একটি আধ বুড়ো ঝি এসে দোর খুলে দিয়ে বলল, 'এই যে তুমি। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই।' সুরজিৎদা বাসায় নেই, কালীর মা? তুমি ঠিক দেখেছ তো?'

কালীর মা একথায় চটে উঠে রুক্ষ গলায় বলল, 'দেখেছি বাপু দেখেছি। বুড়ো হয়েছি বলে তো আর অন্ধ হইনি। না দেখতে পেলে করে কম্মে খাচ্ছি কি করে।'

মঞ্জু মনে মনে হাসল, 'ঝি চাকরেরা একটু বেশি বকে। তাদের বাড়িতেও ঠিক এমনি।

মঞ্জু বলল, 'তাতো ঠিকই। আচ্ছা আমি একটু বাইরের ঘরটায় বসছি। ওঁরা আসুন ততক্ষণে। আমার বিশেষ দরকার।' কালীর মা বলল, 'দরকার হয় বসতে পারো। কিন্তু কে কখন ফিরবেন তা আমি বলতে পারব না বাপু। যা মেজাজ নিয়ে আজ বেরিয়েছেন দুজনে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর কিছু বলতে হবে না।'

মঞ্জু দোর ঠেলে সুরজিৎদার ঘরে এসে বসল। আজ যেন ঘরটা বড় বেশি অগোছালো। মেজেয় বইপত্র ছড়ানো তক্তা-পোশের ওপর কয়েকটা অসমাপ্ত পেন্সিল স্কেচ। খানকয়েক কাগজ টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া। সুধা বউদি কি ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখতেও পারেন না। আর সুরজিৎদারও আক্কেল দেখ। বললেন থাকবেন, অথচ এখন আর পাত্তা নেই। কিন্তু মঞ্জুও ছাড়বার মেয়ে নয়। যত রাতই হোক, সুরজিৎদাকে ফিরতেই হবে বাসায়। মঞ্জু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। তারপর ছবি আঁকিয়ে নিয়ে তবে বিদায় হবে এখান থেকে। তার আগে

একটি পাও নড়বে না। কালকের মধ্যে বসন্ত সংখ্যা বার করাই চাই মঞ্জুর।

ভিতরের উঠানে কালীর মা বাসন মাজছে আর সুধা বউদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বক বক করছে। মঞ্জু একা একা বসে থাকতে থাকতে একবার ভাবল উঠে যায় ওদিকে। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ বোধ করল। সুধা বউদি নেই, তাঁর ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে।

ঘরের এক কোণায় একটা নেড়া টেবিল পড়ে আছে। ওপরে কোন ঢাকনির বালাই নেই। সুধা বউদি যেন কি। একটা টেবিল ক্লথও করে দিতে পারেন না। এর পরে যেদিন আসবে মঞ্জু একটা সুন্দর ঢাকনি করে নিয়ে আসবে। এই টেবিলের দুটি দেরাজের মধ্যে সুরজিৎদার তুলি আর রঙের বাক্স-টাক্স থাকে। অনেকদিন তাঁর সামনে মঞ্জু এসব দেরাজ ঘেঁটে দেখেছে। তিনি রাগ করেননি, বরং খুশিই হয়েছেন। খোলা দেরাজ। চাবিটাবির বালাই নেই। আজও মঞ্জু দেখবে নাকি খুলে। যদি সুরজিৎদা কোন ছবিটবি রেখে গিয়ে থাকেন তার জন্যে? তাদের ম্যাগাজিনটা বা কোথায়? সেটাও কি দেরাজের মধ্যে রেখে গেছেন? মঞ্জুর ভারি লোভ হোলো দেরাজটা খুলে দেখে। কিন্তু খুলতে গিয়ে কেমন একটা সংকোচও বোধ করল। ছি ছি ছি ও'রা কেউ বাড়ি নেই, কাজটা কি ভালো হবে!

কৌতূহল আর ভদ্রতার সঙ্গে এ দ্বন্দ্ব বেশিক্ষণ চালাতে হোল না, মিনিট পনর বাদেই সুধা বউদি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই একটু যেন চমকে উঠলেন, 'কে? কে অন্ধকারে বসে?'

সুধা সুইচ টিপে আলো জ্বালল ঘরের, 'ও তুমি?'

মঞ্জু বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আমি। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি।'

সুধা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে তাকাল, 'একাই বসে আছ? তিনি ছিলেন না? তিনি কোথায় গেলেন? আমার পায়ের সাড়া পেয়ে পালালেন নাকি?'

সুধা অদ্ভুত একটু হাসল।

মঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সুরজিৎদার কথা জিজ্ঞেস করছেন বউদি। তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। তাঁর জন্যেই তো অপেক্ষা করছি।'

সুধা রূক্ষ, শুকনো গলায় বলে উঠল, 'তা আমি জানি। তুমি যে কার জন্যে অপেক্ষা করছ তা আমার জানতে বাকি নেই।'

মঞ্জু অবাক হয়ে সুধা বউদির দিকে তাকাল। দেখতে আরো যেন রোগা হয়েছেন বউদি,' আরো কালো, আরো বিশ্রী। আর কি খরখরে গলা। হঠাৎ কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল মঞ্জুর। তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের ম্যাগাজিনের ছবিটা কি আঁকা হয়ে গেছে বউদি? হয়ে থাকলে দিন। আমি নিয়ে চলে যাই।'

সুধা বলল, 'সে কি কথা। এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলে, দেখা না করেই যাবে? আরো খানিকক্ষণ বোসো। সে আসুক। দুজনকে পাশাপাশি দেখে নয়ন জুড়াই তারপরে যেয়ো।'

মঞ্জু অস্ফুট, কাঁপা গলায় বলল, 'বউদি, এসব কি বলছেন? আমি যাই, আমাকে যেতে দিন।'

কিন্তু হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে সুধা দোর আগলে দাঁড়াল। ওর মাথায় আঁচল নেই, কোটরের ভিতর থেকে চোখ দুটো জ্বলছে, 'না না, শোন, আজ তোমাকে সব শুনে যেতে হবে।'

মঞ্জু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'কি শুনব। আপনি এসব বলছেনই বা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!'

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'ন্যাকা, বদমাস মেয়ে? তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছ না! তুমি কচি খুকি আছ, না? তুমি কিচ্ছু জানোনা না, না? আমি সব জানি, আমি সব শুনেছি। কালীর মার কাছ থেকে আমার কিচ্ছু শুনতে বাকি নেই। আর অন্যের কাছে আমার শোনাশুনিরই বা কি আছে! আমি নিজেই কি সব দেখতে পাচ্ছিনে, নিজেই কি সব টের পাচ্ছিনে?'

নির্বাক বিমূঢ় মঞ্জু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। সুধা বলে চলল, 'আজ সাত আট দিন ধরে ঘরে একটি টাকা নেই। কোন রকমে ধার করে রেশন এনেছি। সারাদিন টাইপ করতে করতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। আর উনি আছেন ও'র আর্ট নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে। যাতে দুটি পয়সা আসবে, ছেলে মেয়ে দুটি খেয়ে বাঁচবে তার নামে দেখা নেই, উনি ম্যাগাজিনের মলাট আঁকছেন, ষোড়শী সুন্দরীর ধ্যান করছেন! এই নাও তোমার ম্যাগাজিন।'

তাকের ওপর থেকে উন্মেষের বসন্ত সংখ্যা নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল সুধা, 'যাও চলে যাও। মলাট আঁকাতে হয়, অন্য জায়গায় গিয়ে আঁকিও। কত পার্ক আছে, গার্ডেন আছে, আঁকবার জায়গার অভাব কি, মেলবার জায়গার অভাব কি। কিন্তু আমার চোখের ওপরে নয়, আমার চোখের ওপরে নয়।'

ঘর থেকে একবার নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এল মঞ্জু। ধুলো মাখা খাতাটি তুলে নিল হাতে। পুরোপুরি ছবিটি আঁকা হয়নি। কেবল ফুলে পল্লবে ভরা বসন্ত ঋতুর অস্পষ্ট একটা আভাস পেন্সিলের দাগে দাগে ফুটে উঠেছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলল মঞ্জু। সুধা বউদির কথাগুলি বিকটমূর্তি ধরে যেন পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে। তার পালিয়ে যাওয়া চাই। কিন্তু চোখের জলে সামনের পথ ঝাপসা হয়ে আসছে মঞ্জুর, কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে।

কবিতায় ভরা বসন্তকালের প্রবন্ধ মণিকাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, ফুল আর ছবি, ক্লাব আর ম্যাগাজিনের মধ্যে হঠাৎ কতকগুলি বিশ্রী কটু শব্দ এসে জড়ো হয়েছে। আর আশ্চর্য, অভিধান ছাড়াই প্রত্যেকটি শব্দের মানে বুঝতে পেরেছে মঞ্জু। কেন পারবে না? সে তো আর সত্যিই খুকি নেই। সে আজ বড় হয়েছে। বড় হওয়ার কি যে মানে, বড় হওয়ার কি যে জ্বালা তা আজ প্রথম টের পেয়েছে মঞ্জু।

---

(১১)

ওই যে বিনাপণে বিয়ে করে নাচগান করার কথা হচ্ছিল।

তারই একটা আধুনিক অর্থাৎ এই শতাব্দীর উদাহরণ খুব কাছে থেকে পেলাম সে দিন। কোন্ দরবারে সে খবরটা বড় কথা নয়।

সকালের রাজ রাজড়ারা জানতেন যে দু দিন বৈত নয়: অতএব হেসে খেলে নেওয়া দরকার সময় থাকতে। একালের রাজারা কিন্তু জানতেন যে যতদিন বৃটিশ রাজ আছে এবং কেন চিরকাল থাকবে না কাইজার হিটলার প্রভৃতি দুষমণরা যখন কিছুই করতে পারল না ওদের?—ততদিন তারা ও তাদের বংশধররা নির্ভয়ে নির্ভাবনায় মসনদে বহাল তবিয়তে বজায় থাকতে পারবেন।

শুধু বৃটিশ রেসিডেণ্ট বা পলিটিক্যাল এজেণ্টকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

তবে তারা মহাশয় ব্যক্তি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের পাশ, বড় সরকারী চাকরীর শৃঙ্খলায় পোষ মানানো। তার উপর ইংরেজের সহজাত ডেমোক্র্যাটিক আবহাওয়ায় মানুষ। কাজেই ওদের পথে ছায়া না ফেললে রাজাদের নিজেদের ছায়া ক্ষীণ হয়ে যাবার ভয় নেই। পাখতুনীস্থান সীমান্তে লোকে শুভেচ্ছা জানায় এই বলে যে, তোমার ছায়া যেন কখনো না কমতে থাকে। অর্থাৎ তোমার বরবপু যেন রোগা হয়ে তনুলতায় না দাঁড়ায়।

সেই হিসাবে রাজাদেরও কলেবরের ছায়া কমে যাবার কোন কথা ছিল না।

কাজেই ওই আগেকার দিনের নাচগান স্ফূর্তির ঢেউ সমানভাবেই দরবারে বয়ে যেত। তার মধ্যে অনেক সময় সত্যকারের গুণী ব্যক্তিরাও আসর জাকিয়ে বসেছেন। বড় বড় ওস্তাদ যাদের গান বাজনা নাচ আমরা কলকাতা বোম্বাইয়ে সস্তার টিকিটে মিউজিক্ কন্‌ফারেন্সের পিছনের বেঞ্চিতে বসে উপভোগ করে আসি তারা অনেকেই কোন না কোন দরবারের আশ্রয় না পেলে শুধু সাধারণের রসগ্রাহিতার উপর নির্ভর করে এমন আত্মভোলাভাবে ললিতকলার চর্চা করতে পারতেন না। আকবরের নওরতন সভার তানসেন থেকে একালের ছোট্ট ষ্টেট মাইহারের সভা-ওস্তাদ বাঙ্গালী আলাউদ্দিন খান্ পর্যন্ত বহু গুণীই বড় হয়েছেন দরবারের আশ্রয়ে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় নাচগানের টিউশানী করে পেট চালানর মাঠ্য কলা বিদ্যা খুব বেশী বাড়তে পারে না কারণ সংসারের চাকার ক্যাচর ক্যাচর আওয়াজ সুরেলা যন্ত্রের রিণঝিণকে ছাপিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। আর বাঙলাদেশের ভদ্র সমাজে, শিক্ষিত পরিবারে এসব বিদ্যার আলোচনাও মাত্র গত ত্রিশ চল্লিশ বছরের সৃষ্টি। বাঙলার বাইরে বহু প্রদেশেই এখনো সে রেওয়াজ কায়েম হয়ে চালু হয়নি। তার আগে গুণীদের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার পথ হিসাবে এই সরু গলিটুকুও ছিল না।

সেখানে চৌরঙ্গীর মত চওড়া আসর পেতে দিয়েছিল রাজারাজড়াদের দরবার।

মুসলমান বাদসারা হিন্দু রাজাদের চেয়ে এ হিসাবে আরো বেশীই দিয়ে গেছেন দেশকে। বিশেষ করে যখন আমরা ভেবে দেখি যে, মুসলমান শাস্ত্রে এসব লীলাকলা একেবারে নির্বিন্ধ ছিল তখন তাদের এইসব ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতার বাহাদুরী আরো বেশী বেড়ে যায়।

তবে মুসলমান ও হিন্দুতে তফাৎ হচ্ছে মুলগত। পৃথিবীটাকে হিন্দু বিচার করেছে মস্তিষ্ক দিয়ে, মুসলমান বরণ করেছে হৃদয় দিয়ে। হিন্দু মনে রেখেছে পরকালের আশা, মুসলমান চোখে দেখেছে ইহকালের নেশা। হিন্দু বেছে নিয়েছে শাস্ত্র, মুসলমান তুলে নিয়েছে অস্ত্র।

এই পার্থক্যের ফলে হিন্দু তিলে তিলে একটা একটা করে শ্বেত পাথরে সুচীসূক্ষ্ম জালির ও প্রতিমার কাজ করে দিলোয়াড়া মন্দির তৈরী করেছে; মুসলমান তৈরী করেছে মনমাতানো রঙবেরঙের পাথর ও মিনার কাজে ভরান রঙমহল। সে জন্যই আমরা হিন্দু যুগে পাই বৈভব, মুসলমান যুগে বিলাস।

সেই একই কারণে বিদেশী টুরিস্ট এ দেশে বেড়াতে এসে দাক্ষিণাত্যে দেখতে যায় মন্দির আর গোপুরম; উত্তর ভারতে, যেখানে হিন্দুযুগের স্থাপত্যের চিহ্ন কমে গেছে সেখানে, দেখতে আসে দিল্লীর কেল্লা ও তাজমহল।

রাজস্থান দিল্লী আগ্রার এত কাছে ও নানা সম্বন্ধ দিয়ে জড়ান যে, রাজোয়ারার দরবারগুলিতে জীবনকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ খুব ভাল করেই ফুটে উঠেছে বার বার—হিন্দুয়ানী ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করা সত্ত্বেও।

কাজেই আশ্চর্যের কথা নয় যে, দক্ষিণে হিন্দু রাজাদের সভায় আদর হল ভারত নাট্যমের, কথাকলির। সে অঞ্চলে শাস্ত্রের নিয়ম, সূক্ষ্ম মুদ্রা আর স্পষ্ট রূপক দিয়ে নাচের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলা হত। কিন্তু উত্তরে অর্থাৎ যেখানে মুসলমানী প্রভাব ভাল করে ছড়িয়েছে সেখানে কথ্থকের মত নাচের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় চলতে লাগল, নাচওয়ালীর নাচ। রামায়ণের রূপক দিয়ে কি আর কামায়নের রূপ ফুটিয়ে তোলা যায়? চরণামৃতে কি নেশা হয়?

বাঙলায় তাকে আমরা বলতাম খেমটা নাচ। কিন্তু রাজদরবারের ঝলমল আলোয় ঝকমকে গহনার জৌলশ ছড়াতে ছড়াতে বাইজীরা যখন নাচে তখন তাকে অত সামান্য একটা নামে মানায় না।

যাক, সোজাসুজি হিজ হাইনেসের

নাচের নিমন্ত্রণে চলে আসা যাক। নাম আর ধাম দিয়ে কি হবে। নাচটাই আসল।

তখনো তাদের খানা পিনার পর্ব শেষ হয়নি। পাত্রমিত্ররা তখনো টেবিলের দুপাশে সারি সারি বসে আছে। মাথায় সবারই রঙবেরঙের চটকদার পাগড়ী। ঝকমক করছে তাদের কারুকার্যে ভরা পোষাক। একটু হেললে দুললে পাগড়ী কি পোষাক কোন একটি অলক্ষিত কোণা থেকে হীরাজহরতের হাসি ঠিকরিয়ে বেরিয়ে আসে।

হীরের হাসি—সে শুধু কল্পনাই করা যায়। এদের পূর্বপুরুষরা যখন লড়াইয়ে যেতেন তখন তলোয়ারের হাসি বিদ্যুতের মত খেলে বেড়াত। সে কথা ওদের চারণ কবিরা বলে গেছেন। কিন্তু এদের মণিমুক্তার হাসি বোধ হয় এটম বমের চোখধাঁধানো আলো ছড়িয়ে যায়। কিন্তু ওসব ভীষণ ভীষণ কথার চিন্তা এখন দূরে থাকুক। মনে মনে নিজেকে সমঝিয়ে নিয়ে বললাম—রঙমশালের আলো ছড়িয়ে দেয়।

অবশ্যই রংমশালের আলো। কারণ যে টেবিলে বসে ওদের খানা পিনার শেষ পর্বটি এখনো চলছে তার নীচের কার্পেটে রঙের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। জাফরাণী হলদে বা আবীরের লাল বা টকটকে সোনালীর সংগে মুক্তার মত শাদা রঙ মিশ খেয়ে কত কিছুই না নকসা সৃষ্টি করেছে সে কার্পেটে। আর তার উপরে শোভা পাচ্ছে সারি সারি মণিমুক্তায় ভরা বুক আর পাগড়ীতে ঘেরা মুখ।

বোধ হয় উৎসাহের চোটে একটু আগেই এসে পড়েছিলাম। তবে প্রভু-ভক্তির ভারে নুইয়ে পড়া সরকারের কয়েক জন সর্দার তার আগেই এসে গেছেন। কিন্তু কথা কয় না কেউ। পাশের ঘরে যে হিজ হাইনেসের দল এখনো গুরুগম্ভীর হয়ে বিরাজ করছেন। দি মিস্টিরিয়াস ইস্টের মিষ্টি রস ত এখানেই। ইষ্টদেবতা ইচ্ছা না করলে কারো হাসি ঠাট্টা করবারও পথ নেই।

মনে মনে যাচাই করে নিলুম ইয়োরোপে এ অবস্থায় কি হত। ছোট্ট ছোট্ট ঠাট্টা, হাসি ইয়ারকি, বানানো মজার গল্পের গুঞ্জনে পায়রার খোপে পরিণত হ'ত প্রকাণ্ড হলটা। সবাই পরস্পরের খুব কাছে এগিয়ে আসত সে সময়টুকুতে। হয়ত একপাশে, কিম্বা সৌভাগ্য বেশী হলে দুপাশেই, আলো করে বসতেন কোন মহিলা। যার মন জুগিয়ে মুখে হাসি ফোটাবার জন্য অনেকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পরে যেত। যার পারসোনালিটি যত ইনটারেস্টিং এই কথাবর্তার পরীক্ষায় সে তত বেশী জিতে যাবে। এর সংগে জড়িয়ে যাবে না কোন কলঙ্কের আভাস বা চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা মন দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধে ইশারা।

নিছক ফুল ফোটাবার খেলা বলা চলে এই কথাবার্তাকে।

হীরের ফুল দু কানে দোলাতে দোলাতে হিজ হাইনেস এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে আরো কয়েকজন নাচ দেখতে নিমন্ত্রিত লোক এসে গেছেন।

অতিথি যাঁরা খাবার টেবিল জাকিয়ে বসেছিলেন তাদের নাম পাশাপাশি বসালে রাজোয়ারার একটা ছোটখাট ম্যাপ সাজানো যায়। কিন্তু শেকসপীয়র বলেছেন যে, নামে কি আছে? তাই নামগুলি তোলা রইল।

আজকের রাতে নাচটাই আসল।

কফি আর লিকিওর (ডিনারের পরে খাবার জন্য হাল্কা মদ) নিয়ে খালি পায়ে পাগড়ী মাথায় বাটলারের দল আনাগোনা করতে লাগল। এদিকে সেদিকে কয়েকজন খোশ গল্প শুরু করলেন। বুঝলাম ইংরেজীতে যাকে বলে বরফ ভাঙ্গা তাই হচ্ছে। ভোজের টেবিলে ফর্ম্যালিটির যে বরফ জমাট হয়েছিল তা গলতে শুরু হয়ে গেছে। এবার নাচের দল নামার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।
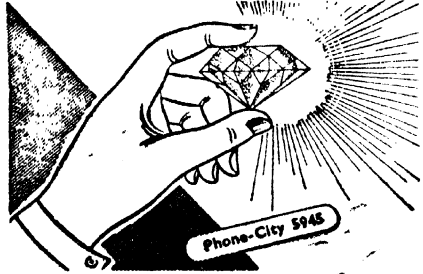
কত অসম্ভব খরচই না হয়েছে এই ঘরটি সাজাতে। যে ডেকরেটারদের অর্ডার দিয়ে সাজান হয়েছে তাদের রুচির প্রশংসা করলাম। দেওয়ালে সুন্দর রঙিন সব ছবি—শিকারের, ঘোড়দৌড়ের, দিল্লী দরবারে হাতীর পিঠে চড়া আগেকার রাজার। ম্যান্টল্ পীসে, টেবিলে কাঁচের আলমারীতে নানারকম মার্বেল পাথরের ও চীনা জেড পাথরের মূর্তি। অনেকগুলি তার মধ্যে নগ্নিকা।

ইতিমধ্যে ডাইনিং রুমের লম্বা টেবিলটি সরে গেছে। শাদা চাদরে ঘরটি মুড়ে দেওয়া হয়েছে আর দেওয়ালের পাশে পাশে ছোট ভেলভেটের গদী আঁটা গিল্টি করা চেয়ার বসান হয়েছে। হিজ হাইনেস একজন সাহেব অতিথির স্ত্রীকে আদর করে পাশে এনে বসালেন। আরো দু-তিনজন হাইনেসকে যেচে ডাকলেন কাছাকাছি বসতে। বাকী সব যে যার সিট বেছে নাও।

দেশীয় রাজার দরবারের ক্ল্যাসিক্যাল অনুষ্ঠান নাচ শুরু হল।

টুক টুক করে আলতারাঙা পায়ে ঢুকল নাচওয়ালীর দল। জন পনের ষোল হবে। গায়ে দামী শাড়ী বা শালোয়ার, পায়ে ঝলমলে ঘুঙুর আর

চোখে হরিণীর ভীত চকিত চাহনি। শাদা চাদরের এক প্রান্তে এসে তারা বসল। পাশেই বসেছে বাজনদারের দল। উসখুস করতে করতে তারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে একটু আধটু কথা বলছে। একটি নর্তকী চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে হিজ হাইনেসের কাছে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল।

আমার কানে কানে একজন সর্দার বললেন—এই হচ্ছে এখনকার পাটরাণী।

অর্থাৎ সবচেয়ে পেয়ারের বাইজী। অবশ্য যতদিন বড়র পিরীতি টেকে। কথাই আছে—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণেকে হাতে দাঁড়, ক্ষণেকে চাঁদ।

তবে পিরীতির বাঁধ যতদিন টেকে বাইজী তারই মধ্যে যে অনেক বালির কেল্লা বানিয়ে নিচ্ছে তা বুঝতে কোন ভুল হয় না। গায়ের গায়না, পরনের সাজেই তার প্রমাণ।

অব্যর্থ প্রমাণ। তা না হলে আর হিজ হাইনেস ওর সঙ্গে এমন দিলখোলা উড়কো রসিকতা করছেন আর হো হো করে হেসে গড়িয়ে যাচ্ছেন?

অট্টহাসি কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম। বিরাট দেহটা হেসে গড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট গিল্টি করা চেয়ারে আর আঁটছে না। কালিদাসের বর্ণনায় শকুন্তলার কথা মনে পড়ল। অতিপিনদ্ধ বল্কলে যৌবন ভারাবনতা আশ্রমপালিতার দেহ আর আঁটছে না।

হঠাৎ এই উপমাটি মনে পড়ে গিয়ে নিজেরই বিশ্রী লাগল। যেন পূজার সাত্ত্বিক প্রসাদ মুখে দিতে গিয়ে হঠাৎ এক টুকরা মাংস বা হাড় এসে গেল। কোথায় কন্ব-মুনির তপোবন আর কোথায় স্বৈরতন্ত্রের দেশের এক রাজসভা। সামনে দেখছি যে খুসীতে উপচিয়ে উঠে হিজ হাইনেসের পা দুটো কার্পেটের ফুলগুলিকে মাড়িয়ে দিচ্ছে আর একটা হাত পাশের একজন হাইনেসের কাঁধ আঁকড়িয়ে ধরল। মনে হল যেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মাই ডিয়ার ভাব দেখান।

অথবা হয়ত তাল সামলানই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

এদিকে ততক্ষণে নাচ শুরু হয়ে গেছে। নাচ নয় শুধু। তার সঙ্গে গানও

কৈসে ভরু পানিরে

চলেছে তাল রেখে। একটার পর আর একটা। প্রায় আধঘণ্টা নাচল একজন। সঙ্গে সঙ্গে গান চলেছে—

ইয়ে হরদম কৈসী হোরী।
ভর পিচকারী
মুখ পর ডারি
ভিঙ্গ গয়ী চুন্দর শাড়ী
ইয়ে হরদম কৈসী হোরী।

শেষপর্যন্ত হিজ হাইনেস হাত ঝাকি দিয়ে এই হরদম হোরীর নাচ থামিয়ে দিলেন।

কত হরেক রকমের নটী। নানা প্রদেশ থেকে বেছে এনে ফুলের মালা গাঁথা হয়েছে যেন। হিমাচলের তনুমধ্যা পাহাড়িনী, কাশ্মীরের চটুলনয়নী যবনী, ক্ষীণকায়া পুষ্পিত কবরী দাক্ষিণী।

লাংকা শাড়ী ও চোলি পরা মাথায় ফুলের মালা বাঁধা এই দক্ষিণীর নাচ শেষ হলে শুরু করল কাশ্মিরী। পরনে সাটিনের চুড়িদার শালোয়ার, অঙ্গে ভেল-ভেটের কুর্তি, কাঁধের উপর ছড়ান রেশমী দোপাট্টা, মাথায় জড়ান সোণার পেচী আর সুরেলা কণ্ঠে উর্দু গজলঃ—

দেওয়ানা বানানা হ্যায়
তো পেয়মানা বানা দে;
ময় ঢুণ্ড্ রহি সারি বান্‌রা,
মেরা শ্যাম কাহা হ্যায়।

সারি বান্‌রা অর্থাৎ সারা দুনিয়াতে শ্যাম যে কোথায় লুকিয়ে আছেন তার সন্ধান কে জানে। কিন্তু 'পেয়মানা বানা দে'র মাতাল করা আহ্বানে নাচের আসরে বেশ একটা সাড়া পরে গেল। ঘুর ঘুর ঘুর। চটুল রসে সবার মাথা ঘুরে যাচ্ছে না কি?

পিছন থেকে খুব সন্তর্পণে বাটলারের দল পেয়মানা বানিয়ে দেবার জন্যই বোধ হয় ছোট ছোট লিকিওরের গ্লাস নিয়ে হাজির হল।

ততক্ষণে এক রাজপুতানী আসর দখল করেছে। রঙের ফোয়ারা ছড়িয়ে উড়ছে তার লেঙ্গা, ঘুরছে তার আঙ্গি (চোলি), ছড়িয়ে যাচ্ছে তার ওড়না। হাতে হাতীর দাঁতের চুড়ী, মাথায় বোর্‌খা আর রাখ্‌রী, গলায় সোনার টেওটা, কানে হীরের ঝুম্‌কো আলোর ঝিলিক হেনে

পুষ্পিত কবরী দক্ষিণী

যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আর সবচেয়ে শোভা পাচ্ছে তার পা দুখানি।

পায়ের আঙুলগুলি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে রূপার বিছিয়াতে। তার উপর গোড়ালী থেকে শুরু হয়েছে কত গহনা একেবারে থরে থরে। একটার উপর আর একটা। কারুলা, আওলা, নেংওরী, টংকা, পায়জোর। এত সব অলংকার আর নূপুরের মিঠে বুলি।

কিন্তু গানের ভাষায় তখন শ্যাম রাধার হাত চেপে ধরে রেখেছেন, পানিয়া ভরণে যেতে দিচ্ছে না। তাই রাধা নাচছেন ঠুংরী গানের সঙ্গে সঙ্গেঃ—

রোকে মেরা গেল্‌; কৈসে ভরুঁ পানি রে।

* * *

এসোরি নিডর ঝকাজোরি মোরি বইয়া রে॥

রোকে মেরা গেল্‌ অর্থাৎ আমার পথ রুখে রেখেছে। ডরহীন নন্দদুলাল জোর করে হাত ধরে ফেলেছে। কেমন করে জল ভরে নিই? কেমন করে যাই আমি, ওগো? রাধা ত যেতে পারছেন না। তাই একটানা নেচে চলেছেন।

কিন্তু ততক্ষণে নিমন্ত্রিত প্রায় সকলেই দেখি আমার মত উসখুস করছেন উঠে পড়বার জন্য। কিন্তু দরবার স্বয়ং না উঠে গেলে নিমন্ত্রিতরা কেহ উঠতে পারবে না এই হচ্ছে নিয়ম। একটানা আর কত নাচ দেখা যায় শাদা চোখে ও মন না রাঙগায়ে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজনা থামল। ঐকতানের গম্‌ গম্‌ করা রেশ নূপুরের রিণঝিণ আর হাতের ও পায়ের অলংকারের মিঠে ঝুনঝুন ধ্বনিকে হলঘরের চারিদিকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

কখন জানি হিজ হাইনেস অলক্ষিতে সরে পড়েছেন আসর থেকে। তাই দেখে এখন সবাই দাঁড়িয়ে উঠল বিদায় ও ধন্যবাদের পালা সারবার জন্য। ইংরেজী প্রথায় আমরা হাতে হাতনাড়া দিয়ে বিদায় নিলাম। নর্তকীদের দিকে দিলাম একটি পাইকারী নমস্কার দূর থেকে আলগোছে। ওরা রাজপুত প্রথায় সুন্দর ভঙ্গিতে বুকে হাত দিয়ে মাথা নুইয়ে বিদায় জানাল।

হঠাৎ তার মধ্যে যে ছন্দ ও সুরের স্পন্দন পেলাম এতক্ষণের নাচের মধ্যে তা পাইনি।

কিন্তু নাচের বর্ণনা কোথায়? এত হল গিয়ে শুধু নাচের আসরের বর্ণনা। কিন্তু, সুধী পাঠক, ওটুকুই এর মধ্যে সব চেয়ে মনোহর অংশ। তবু যদি জানতে চাও তাহলে সেই ঝকমকে নূতন অয়েল পেণ্টিংটির কথা মনে করিয়ে দিব। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই পরিচিত প্রশ্ন ও উত্তরটি।

ছবিটা কেমন সুন্দর হয়েছে, না?

অনেক ভেবেচিন্তে গা বাঁচিয়ে উত্তর এল—অবশ্য, অবশ্য, বাঁধাইটা ভারী চমৎকার।

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর
পুলকে উল্লসি,
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী"

আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম না, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

(ক্রমশঃ)

তথ্যের তত্ত্ব

সত্যকাম

একদা আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের আদর ছিল, এখন হয়েছে তথ্যজ্ঞানের কদর। এযুগে সকলেই চার্বাক; সবাই জন্ স্টুয়ার্ট মিল্, এ-যুগের বৈশিষ্ট যদি কিছু লক্ষ্য করে থাকেন ত দেখবেন, চারিদিকে মানুষ কেবল তর্ক করছে। আরও লক্ষ্য করবেন যে এসব তর্কের ভিতরে যুক্তিটা বড় কথা নয়, প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দেবার একটি মাত্র রঙ-এর টেক্কা হচ্ছে তথ্য, স্ট্যাটিস্টিক্স্। যাঁর পকেটে সেটি আছে, অর্থাৎ, কথা বলতে বলতে ঝড়াৎ করে যিনি অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি-দশমিক-অনুদশমিক দিয়ে একটা অঙ্ক হুড় হুড় করে বলে যেতে পারেন, মোকদ্দমায় শেষ জিত তাঁর। মড়ার বাড়া যেমন গাল নেই তেমনি বর্তমান যুগে স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর তর্ক চলে না।

এ ত আপনারা আকচার দেখছেন, পরিষদে বিরোধী পক্ষ একজোটে সরকারি মুখপাত্রটিকে লক্ষ্য করে কথার ছুঁচোবাজী ছাড়চেন, আর সে বেচারি উত্তর দিতে উঠে কেবলি গ্যাংড়াচ্ছেন। হঠাৎ পাশ থেকে একটা ফাইল তুলে নিয়ে বিরোধী পক্ষর দিকে সেইটে দেখিয়ে সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,—"মাননীয় সভ্যরা যাই বলুন না কেন, আসলে নিশ্চিন্তপুরে অনাহারে একজন লোকও মারা যায়নি, অনাহারজনিত রোগে ভুগে দুইজনের মৃত্যু সংবাদ অবশ্য আংশিকভাবে সমর্থিত হইয়াছে।" বামপন্থী, বম্-পন্থীরা পর্যন্ত এরপর চুপ করতে বাধ্য কারণ সরকারি মুখপাত্রটি এইমাত্র যা বল্লেন তা হল সরকারি তথ্য অর্থাৎ অফিসিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স্,—এ হিসাব জজে মানে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করেই রাজ্য চলছে, সরকারি ঠিকুজীর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সব কিছু নির্ধারিত হচ্ছে,--হাকিম নড়ছে, হুকুম নড়ছে, বাজেট হচ্ছে, গেজেট হচ্ছে, এককথায়, দিন রাত হচ্ছে, রাত দিন হচ্ছে। এ-হেন অঘটন-ঘটন পটিয়সী তথ্য কিছু চট করে জোগাড় করা যায় না, এ সংগ্রহ করার একটা বিশেষ সরকারি উপায় আছে। নিশ্চিন্তপুরে ক'জন লোক মরল' সে খবর জানতে হলে সরকারি মুখপাত্র যে সরাসরি নিশ্চিন্তপুর এলাকার সার্কেল অফিসারের কাছে পত্র লিখেই ব্যাপারটা জানবেন, সরকারি ব্যাপারে এরকম নিয়ম নেই। এখানে সব কাজ ধাপে ধাপে করতে হয়। সবার উপরে ঈশ্বর, আর নয়ত মনে করুন মন্ত্রী, তিনি খবর জানবেন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারির কাছে।, সেক্রেটারি জানবেন বিভাগীয় কমিশনারের কাছে, কমিশনার জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা হাকিম অর্থাৎ এস ডি ওর৹কাছে। এস ডি ও সার্কেল অফি-সারের কাছে; সার্কেল অফিসার নিজেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের কাছ থেকেও খবর নিতে পারেন, ইউনিয়ন বোর্ড আবার চৌকিদারের কাছ থেকে খবর নেবেন। তারপর সেই খবর আবার সার্কেল অফিসার মারফৎ উঠতে উঠতে বিভাগীয় কমিশনার হয়ে সেক্রেটারিয়েটে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারির কাছে এসে পেঁছুবে। একটা রীতিমত সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক। এর মধ্যে ব্যাসকুট হচ্ছে যে, সবকটিই সরকারি সিঁড়ি কেবল নীচের তলায় একটি মাত্র বে-সরকারি ধাপ—সেটি ঐ ইউনিয়ন বোর্ড, সরকারি গঙ্গা এই এক যায়গায় বে-সরকারি যমুনায় এসে মিশেছে। এটি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ এর সভ্যরা সরকার থেকে মাইনে পান না, কিন্তু সার্কেল অফিসারের ডান হাত বাঁ হাত যা বলেন সব কিছু এঁরাই, সেই হিসাবে সরকারি যন্ত্রর এও একটা অঙ্গ। এহেন আট-ঘাট বাঁধা অঙ্ক কষার নিয়মে সরকার যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তাতে ভুল থাকবার কথা নয়, সুতরাং এর, বিরুদ্ধে কথা বলবে কোন্ অর্বাচীন? নিশ্চিন্ত-পুরের মৃত্যু সংবাদটা একটা বিশেষ ঘটনা, তার জন্য এত কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সাধারণভাবে কি রকম উপায়ে সরকারি তথ্য সংগ্রহ হয়, আজকে তারই কিছু তত্ত্ব আপনাদের কাছে নিবেদন করব বলে বাসনা করেছি, সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কটা জানা থাকলে ব্যাপারটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে, তাই ওটা জানিয়ে রাখলাম। এখন, কাণ্ট্রিমেন! লেণ্ড্ মি ইওর ইয়ারস্, দেশবাসী! আপনাদের কানগুলি আমায় ধার দিন।

মনে করুন দেশে "গ্রো মোর ফুড" অভিযান হবে। হৈ, হৈ, ব্যাপার, রৈ, রৈ, কাণ্ড, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার, গ্রো, গ্রো মোর, গ্রো মোর ফুড। অধিক খাদ্য ফলাও। ওদিকে সেক্রেটারিয়েট থেকে খবর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে—ডিভিসনাল কমিশনার, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি ও, সার্কেল অফিসার সবাই ধাপে ধাপে খবর পেলেন, "হুঁশিয়ার," "গ্রো মোর ফুড" অভিযান শুরু হয়েছে, সবাই বুঝে কাজ করবেন।" সার্কেল অফিসার ঘুরে ঘুরে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের সমঝে দিয়ে গেলেন, "দাদা, এবার "গ্রো মোর ফুড" হচ্ছে দেখবেন আপনাদের ইউনিয়নে যেন এবার বেশী ধান হয়।" একটা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাও হয়ত দিলেন, খাদ্য না হলে আমরা খাব কি? ইত্যাদি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বাররা সায় দিলেন, "তা, ত,' বটেই।" মাস দুই কেটে গেল। ইতিমধ্যে শহরে ধুম ধড়ক্কা চলেছে,—বিজ্ঞাপন, ফিরিস্তি বক্তৃতা, লোকের মুখে চোখে শুধু এক কথা "গ্রো মোর ফুড", "গ্রো মোর ফুড," সমস্ত আব-হওয়াটাতেই একটা "গ্রো মোর ফুড"-এর বিদ্যুৎ প্রবাহ। সরকারের আর তর সয়না,—দেশের লোকদের একটা কিছু খবর দিয়ে দিলে কেমন হয়, গাছে ওঠার আগেই এক কাঁদি! যা ভাবা তাই কাজ। আবার সিঁড়ি বেয়ে খবর গেল, "এবার কি রকম আন্দাজ বাড়তি ফসল হবে তার একটা অগ্রিম হিসাব চাই।" এর নাম পূর্বাভাস। মাঠে তখন গাছ বড় হয়ে উঠে ধান প্রায় ফলতে শুরু করেছে, সুতরাং কত ফলন হবে গাছ দেখে মোটামুটি ধারণা করা শক্ত কাজ নয়।

সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে পত্র দিলেন, "ওপরআলা জানতে চেয়েছেন, একটা আন্দাজ দিন এবার কত মণ ফসল উঠবে আপনাদের এলাকায়।" ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যরা সরকারি চাকর নয়, ওরকম চিঠিপত্তর সার্কেল অফিসারের কাছ থেকে তাঁরা হামেশা পেয়ে থাকেন, একবার পত্রখানায় চোখ বুলিয়ে কি হয়ত না দেখেই প্রেসিডেন্ট সেটা ফাইলে রাখলেন। ওপর থেকে আবার তাগাদা এল, "ফিগার কই? সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডকে লিখলেন, ফিগার দিতে আর দেরি করবেন না।" সে পত্রও ইউনিয়ন বোর্ডের ফাইলে রইল। শেষটায় ওপর থেকে কড়া চিঠি এল, "অমুক তারিখের মধ্যে ফিগার দিতেই হবে।" সার্কেল অফিসার আর পত্র না লিখে সশরীরে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের বাড়ী গিয়ে হাজির, "মশাই চাকরি আর থাকে না, ফিগারটা তিন দিনের মধ্যে দিতেই হবে।" এবার প্রেসিডেন্ট কথা দিলেন, "এবার ফিগার নিশ্চয় পাবেন"। তারপর ডাক পড়ল চৌকিদারদের, ওরে, তোদের এলাকায় এবার কার কত জমি চাষ হল, আর ফলন কেমন টুকে আনিস ত"? চৌকিদারেরা ঠিক ঠিক টুকে আনল। তারা গ্রামের লোক, নিজেরাও অল্পবিস্তর চাষবাস করে, সুতরাং তাদের এলাকায় কার কত জমি, কোন জমির কত ফলন তারা ভালই জানে। কিন্তু ফিগার পেয়েই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের আক্কেল গুড়ুম—এ যে হুবহু আগের বছরের অঙ্ক চৌকিদারদের তম্বি করতে তারা বললে "তাইত হবে, সকলে সেই জমিই ত চাষ করেছে, ফলনও সেই রকমই হবে। প্রেসিডেন্ট রেগে বল্লেন, "সেই জমিই মানে? পতিত জমি চাষ করেনি কেউ?" চৌকিদার বল্‌লে "আজ্ঞে, পতিত জমি ত কিছু নেই, তবে গিয়ে আপনার খানা ডোবা, ঘেঁটুবন, এগুলো পতিত আছে বটে, কিন্তু ওখেনে ত, আজ্ঞে, কেউ চাষ করেনি"। প্রেসিডেন্ট চেঁচিয়ে বল্লেন, "আলবৎ করেছে, ভাল করে দ্যাখ্ গে যা"। তারপর মিষ্টিমুখে বললেন "হতভাগা! এ বছর "গ্রো মোর ফুড হচ্ছে শুনিস নি, গত বারের মত ফসল হলে চলবে কেন? সার্কেল অফিসার সাহেবে

বলে গেলেন শুনিস নি?" যা ভাল করে দেখে শুনে ফিগার ঠিক করে আন"। চৌকিদার চোর তাড়িয়ে খায়, সে বুঝল 'অধিক খাদ্য ফলাও' হচ্ছে, মানে ফিগারটা ফলাও করে ধরতে হবে। আবার ফিগার এল,—প্রেসিডেণ্ট মিলিয়ে দেখলেন গত-বারে এ ইউনিয়নে চাষ হয়েছিল ১৫০০০ বিঘা জমি, ফসল হয়েছিল ৬৫.০০০ মণ ধান, এ বছর চাষ হয়েছে ১৬৫০০ বিঘা জমি, আন্দাজ করা যাচ্ছে ধান হবে ৯৫,৫০০ মণ। ফিগার দেখে প্রেসিডেণ্ট নিশ্চিন্ত, সার্কেল অফিসার আসতেই বল্লেন, "এই নিন ফিগার"। সার্কেল অফিসার মহা খুশী, তিনি আবার একটু বায়না করে বল্লেন, "বেশ, বেশ, খুব ভাল কাজ করেছেন আপনারা, তা ও ফিগারগুলো ত পূর্বাভাস, তার মানে, মাঠের ফসল চোখে দেখে আন্দাজে ধরা ও তা' একটু এধার ওধার হবেই। তা ওই সাড়ে ষোল, সাড়ে পাঁচানব্বই, দেখতে ভাল নয়, ওগুলো রাউণ্ড ফিগারই করে দেবেন।" শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। ফিগার দাঁড়াল চাষ হয়েছে ১৭,০০০ বিঘা, ফলন হবে ১,০০০০০ মণ। সার্কেল অফিসারের এলাকার ১৭টা ইউনিয়নের এই ধরণের পূর্বাভাসের ফিগার এল; সব জড়িয়ে দাঁড়াল হয়ত ১৯ লাখ মণ ধান। উনিশ ভাল দেখায় না, আর পূর্বাভাস ত আন্দাজের উপর ধরা, তার একটু এদিক ওদিক হলে ক্ষতি কি? তাই তিনি রাউণ্ড ফিগার ২০ লাখ মণ করেই এস, ডি, ওর কাছে পাঠালেন। এস, ডি, ও আবার তাঁর এলাকার ৬টা সার্কেলের ফিগার জড়িয়ে আবার রাউণ্ড ফিগার করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠালেন। সকলকেই ওপরওলার কাছে কাজ দেখাতে হবে। না হলে প্রোমোশন পিছিয়ে যাবে, ভাল জায়গায় বদলী হওয়া হবে না। যাই হোক সিঁড়ি বেয়ে রাউণ্ড হয়ে ফুলতে ফুলতে পূর্বাভাসের ফিগার যখন সেক্রেটারিয়েটে এসে পেঁছিল, তখন সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেল। তখুনি কাগজে কাগজে খবর গেল, "গ্রো মোর ফুড"-এর অভূতপূর্ব সাফল্য। গত বছর দেশে ধান হয়েছিল এত লাখ মণ, এবার ফসলের পূর্বাভাসে জানা গেছে এবছর হবে এত লাখ মণ। অর্থাৎ মোট ১৩·৭২ ভাগ বৃদ্ধি। আমাদের দেশে যা ধান উৎপন্ন হয় জাতীয় প্রয়োজনের থেকে তা ৪৫·৮৫ ভাগ কম। সুতরাং এবার কম হবে মাত্র ১২·১৩ ভাগ। আশা করা যায় আগামী বৎসর আমরা খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিব এবং আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে ২১·৫৯ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯৮৭৬৫৪·৩২ মণ মজুদ থাকিবে। তাঁহার পরবৎসর আমরা বিদেশে চাউল

রপ্তানি করিব কিনা তাহার বিষয় চিন্তা করিব"। খবরের কাগজে ফিরিস্তি আর হিসাব পড়ে দেশের লোকেদের আর কোনই সন্দেহ রইল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা ভাবল, যাক্, এতদিনে তাহলে খেয়ে বাঁচব। অবশেষে ধান কাটা হল। সেক্রেটারিয়েট থেকে আবার সিঁড়ি বেয়ে খবর গেল,—"পূর্বাভাসের সংখ্যা ত পেয়েছি, এখন ফসল কাটার পর কত ধান পাওয়া গেল তার হিসাব জানান্"। এবার আর আন্দাজ নয়, পুরোপুরি হিসাব চাই। এর উপর নির্ভর করেই প্রকিওরমেণ্টের ধান নেওয়া হবে, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি হবে, রেশনের বরাদ্দ কম-বেশী হবে, সুতরাং এবার আর গোজামিল চলবে না। হিসাব যা এল' তা একটি আস্ত দুঃসংবাদ, পূর্বাভাসের লম্বা অঙ্ক চুপ্‌সে গিয়ে ফলনের সংখ্যা আগের বছরের মতই দাঁড়িয়েছে। ওপরআলা নীচের-আলাকে তলব করলেন, "ব্যাপার কি? এত কম ধান কেন হল কারণ জানান"। 'কারণ' আর কি, যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু তা বল্লে ত চলে না, একটা 'কারণ' না দিলে ওপরআলার মুখ থাকে না, নীচেরআলার চাকরি থাকে না, সুতরাং 'কারণ' একটা দিতেই হবে। 'কারণ' অবিশ্যি হাতের কাছেই পাওয়া যায়। ভগবানের ইচ্ছেয় আমাদের দেশে ধান চাষের সময়টা প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। ভাদ্র মাসের কিছুদিন শুকনো খটখটে, আশ্বিন মাসে কখনো কখনো ঝড়, কখনো বৃষ্টি, এসব প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এর থেকেই 'কারণ' খুঁজে পাওয়া যায়। কোনও যায়গার সার্কেল অফিসার জানালেন, এ এলাকায় ভীষণ অনাবৃষ্টির ফলে গাছ সব শুকিয়ে গেছে, তাই আশানুরূপ ফসল পাওয়া গেল না। কোনও সার্কেল অফিসার জানালেন, এ অঞ্চলে ভয়ানক অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হয়ে অর্ধেক ধান পচে গেছে। কেউ জানালেন ঝড়, সাইক্লোন। মোটমাট একটা সন্তোষজনক 'কারণ' পাওয়া গেল, "প্রাকৃতিক দুর্যোগ"। ওপরআলা স্বস্তির নিঃশ্বাসটাই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত করে ফেলে দেশের লোককে খবর দিলেন "প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য, এবছর যত ধান আশা করা গিয়েছিল তা আর
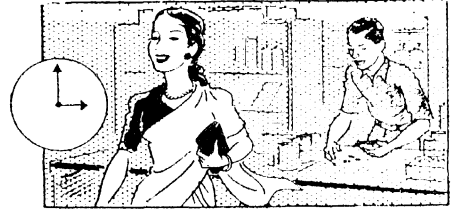
পাওয়া গেল না"। এমনিধারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে দেশে প্রতি বছরেই ঘটে থাকে সে কথাটা আর খুঁচিয়ে কেউ তুলল না; রেশন যে বাড়বে না, সেই দুশ্চিন্তাতেই কলকাতার লোক আবার যাদবপুরে চালের ধান্ধায় ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

এরকম হামেসা হচ্ছে। এই ধরণের অসংগতিপূর্ণ তথ্য বাড়িয়ে ধরা হিসাব, সরকারি দপ্তর থেকে প্রত্যেক ব্যাপারে পরিবেশন করা হচ্ছে। যাঁরা এই হিসাব দাখিল করেন, তাঁরা জ্ঞানত ধর্মত জানেন এ হিসাব ঠিক নয়, তবু তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে ওপরআলার কাছে এই রকম হিসাব দাখিল করেন। এ করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। চিতোর-রাণার বুঁদির কেল্লা জয়ের বাসনার মত কোনও আধুনিক রাণা মহারাজ যদি মনে করেন যে তিনি মুখ থেকে "অধিক খাদ্য ফলাও" কথাটি খসালেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেশে অধিক খাদ্য ফলতে শুরু করবে, তাহলে অধস্তন কর্মচারিদের পক্ষে "মাটি দিয়ে বুঁদির মত নকল কেল্লা পাতিয়ে'র অনুসরণ করা ছাড়া উপায় কি? নকল তথ্য দাখিল করেও তখন তাঁদের দেখাতে হবে যে সত্যিই অধিক খাদ্য ফলেছে। রাজ্য চলছে রাজকর্মচারিদের উপর নির্ভর করে। তাঁদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে যে তাঁদের প্রত্যেকের দায়িত্ব অসীম। তাঁদের নিজ নিজ এলাকার যে সুশাসন চলছে, সেখানে যে কোনও অভাব অভিযোগ নেই, সেখানে যে প্রতিটি সরকারি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হচ্ছে, এগুলি কাগজে কলমে প্রমাণ করার ভার অফিসারদের উপর। শুধু কাগজে কলমে প্রমাণ করলেই হল, ঘটনা যাই হোক না কেন। যে যত ভালভাবে একাজ করতে পারবেন তাঁর তত তাড়াতাড়ি উন্নতির সম্ভাবনা, যিনি না পারবেন তাঁর উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, চাকরি থাকাই দুষ্কর।

কর্তব্য সম্পাদনের অত্যুগ্র উৎসাহে অনেক কর্মচারি সময় সময় ওপরআলার কাছে এমন তথ্যও দাখিল করেন, উদ্ভাবনার অভিনবত্বের জন্য যা নোবেল পুরস্কার দাবী করতে পারে। এমনই একজন কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এক বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে। কর্মচারীটি জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কর্মদক্ষতার পুরস্কার হিসাবে ইতিমধ্যেই তিনি রায় সাহেব খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন সেই অঞ্চলের বন্যার রিলিফ অফিসার। বন্যার জল যখন সরে গেল, তখন ঐ বন্যায় ঐ অঞ্চলে যত ক্ষতি হল তার একটা মোটামুটি হিসাব তৈরি করার জন্য সরকার থেকে ঐ অফিসারের উপর নির্দেশ এল। নির্দেশনামায় স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছিল যে ক্ষতির জন্য কোনও রকম ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকার করবেন না, কেবলমাত্র ক্ষতির পরিমাণটা তথ্য হিসাবে তাঁরা জানতে চান। রায় সাহেব ধান, চাল, গরু, বাছুর ইত্যাদি—ক্ষতির হিসাব কি রকম ধরেছিলেন তা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কেবল বাড়ী পড়ার দরুণ ক্ষতির পরিমাণটা তিনি কি হিসাবে ধরেছিলেন তা আমি দেখেছি। প্রথমেই তিনি স্থানীয় চৌকিদারদের কাছ থেকে হিসাব নিয়ে জানলেন যে ঐ এলাকায় প্রায় চারশ বাড়ী বন্যায় একেবারে ধ্বংস হয়েছে। অবিশ্যি বাড়ী মানে সেগুলি সবই মাটির ঘর, কোনোটি এক কামরা, কোনোটি দু' কামরা। রায় সাহেব এক কামরা ঘর পিছু ক্ষতি ধরলেন ৩৲ টাকা, আর দু কামরা ঘরের জন্য ধরলেন ৫৲ টাকা। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম ৩৲ টাকা ৫৲ টাকাগুলি কিসের হিসাব? তিনি সহজভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন এইসব বাড়ীর দাম। আমি হতভম্ব হয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলাম তিন টাকা, পাঁচ টাকায় বাড়ী হয় নাকি? রায় সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করে বল্লেন, "তা হয়"। তারপর বিশ্লেষণ করে দেখালেন, "ওগুলো মাটির বাড়ী বৈ ত নয়, ওর আর দাম কি? যাদের বাড়ী তাদের ওগুলো তৈরি করতে কিছুই খরচ হয় না। মাটি? সে ত মাঠেই পাওয়া যায়। চাল ছাওয়া?—সে ঐ ক্ষেতের খড় কিম্বা খেজুর পাতা কি কেশো ঘাস। আর বাঁশ?—সে ত আশে পাশেই বাঁশ-ঝাড়ে অজস্র রয়েছে, ওর জন্য পাড়াগাঁয়ে কেউ পয়সা খরচ করে না। আর ঘর তৈরি করে ওরা যে যার নিজেরাই সুতরাং মজুর খরচও নেই। একমাত্র কিনতে হয় বেড়া বাঁধার জন্য দড়ি, তার জন্য ঐ ৩৲ টাকা আর ৫৲ টাকাই যথেষ্ট, এর বেশী সাধারণত লাগে না"। চমৎকৃত হলাম, রায় সাহেবের যুক্তি আর হিসাবের সারবত্তা অস্বীকার করার উপায় নেই। রায় সাহেব সহৃদয় অফিসার, তাই কষ্ট করে দড়ির খরচটা অবধি ধরেছেন, ওটা না ধরে তিনি সটান রিপোর্ট দাখিল করতেও পারতেন, "গেছে গুটিকত চাষার কুটির" ওতে কিছুই ক্ষতি হয়নি।

এই রকম ঘরের বদলে দড়ির, নাকের বদলে নরুণের হিসাব পেয়েই যাঁরা টাক্‌ডুমাডুম বাদ্যি বাজিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য কথায় কথায় স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ঝাড়েন, সিগারেটের আগুনভোলা লোকটির মত তাঁরাও হয়ত নিজেরাই জানেন না তাঁরা দেশবাসীকে কি তথ্য শোনাচ্ছেন।

অনেকে অভিযোগ করেন, সরকারি তথ্য হচ্ছে চৌকিদারি তথ্য; পাঁচ টাকা মাইনের অশিক্ষিত গ্রাম্য চৌকিদার সে আর কি হিসাব দেবে, সেইজন্য সরকারি হিসাবে এত গরমিল। ভাল লোক, শিক্ষিত লোক, একাজে নিযুক্ত করা উচিত। আমার মনে হয় এর কোনও দরকার নেই। প্রথমত ন' মাসে ছ' মাসে এক আধটা হিসাবের জন্য একদল আলাদা লোক নিযুক্ত করা ব্যয় সাপেক্ষ, তার উপর শিক্ষিত লোক হলে ত কথাই নেই। তা ছাড়া, গ্রামের কোনও তথ্য পেতে হলে চৌকিদারের চেয়ে ভাল লোক পাওয়াও দুষ্কর। গ্রামের চৌকিদার গ্রামেরই লোক, সাধারণত নিম্নশ্রেণীর চাষীদের মধ্যে চালাক চতুর লোক থেকেই চৌকিদার নিযুক্ত করা হয়। কাজ তার চোর তাড়ান, ট্যাক্‌শ আদায় হলেও, প্রায়ই তাদের নিজেদেরও কিছু জোত-জমি থাকে। গ্রামের প্রতিটি মাঠ, ভাল মন্দ প্রত্যেক লোক তার জানা, গ্রামের সুখ-দুঃখের সে ভুক্তভোগী। সুতরাং গ্রামের তথ্য তার চেয়ে ভাল কে জোগাবে? বাইরের লোক দিয়ে ত একাজ চলতেই পারে না, কারণ, আর কিছু না হোক, বাংলা দেশে এমন সব যায়গা আছে বর্ষাকালে যেখানে যাওয়াই অসম্ভব। কিন্তু চৌকিদারের কাছে সম্ভব, কারণ সে ডাংপিটে লোক, আর সেইজন্যই সে চৌকিদার হয়েছে। দু একজন হাবলা-

গোবলা দেখতে চৌকিদার যদি আপনারা কেউ দেখে থাকেন ত জানবেন সেটা হচ্ছে তার বাইরের চেহারা, আসলে, চৌকিদার মাত্রেই একটি তুখোড় জীব। সে যদি ইচ্ছা করে ত গ্রামের তথ্য সে ঠিকই জোগাতে পারে। তা ছাড়া, চৌকিদার যদি হিসাবে কিছু এদিক সেদিক করেই, 'তাহলে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বাররা, যাঁরা কি না গ্রামের মাথা, তাঁরাও ইচ্ছা থাকলেও সেটা ধরতে পারবেন না, এরকম হতেই পারে না। এ'দের উপর আছেন সার্কেল অফিসার, যাঁর হাত দিয়ে তথ্য চালান হবে। নিজের এলাকায় কোন কাক কোন গাছে ডিম পাড়ে এ খবর যিনি জানেন না তিনি সার্কেল অফিসারই নন। বাস্তবিক পক্ষে ইংরাজ শাসনের এক অপূর্ব সৃষ্টি এই সার্কেল অফিসার। নিজের এলাকার ভিতর এ'র অজানা তথ্য নেই, এ'র অসাধ্য কাজ নেই। চালাতে চাইলে, এ'দের দিয়েই কাজ চলে; ভালভাবেই চলে। আসলে কথাটা তা নয়। সত্য, আন্তরিকতা এবং দায়িত্বশীল নিরপেক্ষতার যদি সরকারি চাকুরিতে কদর থাকত, এবং সরাসরি চাকুরিয়ারা যদি বুঝতেন ঐগুলির যথাযোগ্য প্রমাণ দেখাতে পারলে ওপরআলার কাছে তার সমাদর হবে, সরকারি চাকুরিয়া হিসাবে ওপরআলা ঐরকম চরিত্রই তাঁদের কাছে আশা করছেন, এর উপরেই নির্ভর করবে উন্নতি,—তাহলে চৌকিদার, সার্কেল অফিসার, এস, ডি, ও-দের হাত দিয়েই যে তথ্য সরকার হাতে পেতেন, যে খবর তাঁরা জানতে পারতেন, কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলও তার উপর কলম চালাতে পারত না। প্রশ্ন হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর, প্রশ্ন হচ্ছে সদিচ্ছার, সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করা হবে, না, ধামাচাপা দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে পছন্দসই একটা কিছু ছেলেভুলানো খেলনার মত তৈরি করে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া হবে। সব কিছু নির্ভর করছে ওপরআলা খোদা কর্তার ইচ্ছার উপর। তিনি যে সুর বাজাবেন, কর্মচারিরাও সেই সুরে গাইবেন, এইটাই হল আমলাতান্ত্রিক ঐকতানের ঘরানা ঠাট। আমাদের দেশে বাস্তবিক পক্ষে এখনও আমলাতন্ত্রই চলছে।

অনেকে বলেন, সাধারণ সরকারি যন্ত্রর থেকে পরিসংখ্যার ভার পরিসংখ্যান বিভাগের উপর ছেড়ে দিলে কাজ ঢের ভাল হবে। পরিসংখ্যান বিভাগ অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্স্ ডিপার্টমেণ্টের লোক বর্ষাকালে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধান-পাটের হিসাব আনতে পারলে কথাই ছিল না; তারা গ্রামে ঢুকতেই পারবে না, যদি বা ঢোকে, লোক চিনতে, মাঠ চিনতে, তাদের বছর কেটে যাবে; আর শেষ পর্যন্ত যদি

কানও ফিগার তারা টুকেও আনে, তাহলে সে ঐ এর ওর মুখে শুনে আন্দাজে আন্দাজে, সে ফিগার ভুল হবার সম্ভাবনা আঠারো আনা। সম্প্রতি এক স্ট্যাটিস্টিক্সের লোকের পাল্লায় পড়ে ওঁদের হিসাব নেবার প্রণালী আর বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় দেখে, ওঁদের সম্পর্কে আমার উঁচু ধারণাটা একটু পিছুলে গেছে। ঘটনাটা বলছি। একদিন সকাল বেলায় একটি ভদ্রগোছের ছোকরা অথবা ছোকরা গোছের ভদ্রলোক এসে আমায় জিগেস করলেন, "মশাই, এ বাড়ীতে কটি গরু থাকে?" প্রশ্ন শুনে আমি ত হকচকিয়ে গেলাম, বলে কি? কলকাতার বাড়ীতে গরু? না কি বাড়ীর লোকদের কটাক্ষ করে কোনোরকম মস্করা করছে? জিগেস করলাম, বাড়ীতে গরু মানে?" ছেলেটি বলল (২০।২২ বছরের যুবককে ভদ্রলোক না বলে ছেলেটিই বলছি) সে স্ট্যাটিস্টিকস্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে এসেছে, বাড়ী বাড়ী গরু ঘোড়ার হিসাব নিতে। আশ্বস্ত হলাম; কিন্তু ভেবে পেলাম না এত ব্যাপার থাকতে, কলকাতায় বাড়ী বাড়ী গরু ঘোড়ার খোঁজ নেবার জন্য পরিসংখ্যান বিভাগ এত ব্যস্ত কেন? দেশের আর সব তথ্য কি তাঁদের নেওয়া হয়ে গেছে? মরুক গে, ভাবলাম আমার কি, যা হচ্ছে হোক। ছেলেটিকে বললাম আমাদের বাড়ীতে কোনও গরু নেই। ভাবলাম এবার ছেলেটি চলে যাবে। ও হরি! পকেট থেকে একটা পেনসিল বার করে সেইটা চট্ করে একবার জিবে ঠেকিয়ে সে হাতের নোটবইয়ে কি জানি টুকল। তারপর আবার বলল, "আচ্ছা, ঘোড়া?" আমি বললাম, "না, আজকাল কলকাতায় কি কেউ ঘোড়া রাখে? তাও নেই।" ছেলেটি আবার পেনসিল জিবে ঠেকিয়ে নিয়ে খাতায় কি টুকল, তারপর বলল, "মুরগী?" এইবার আমি একটু মুশকিলে পড়লাম, যাই হোক স্ট্যাটিস্-টিকস্ বিভাগের লোকের কাছে সত্য গোপন করা উচিত নয় মনে করে বললাম, "আছে, কাল শেয়ালদার হাট থেকে দুটো কিনে এনেছি, এখনও আছে বিকালে আর থাকবে না।" ছেলেটি বলল, "কেন? আমি বললাম, "খাব"। ছেলেটি কেমন যেন একরকম করে আমার দিকে তাকাল, মনে হল সে যেন বলতে চায়, "কাজটা কি ভাল হবে?" কিন্তু সে ওকথা বলল না, শুধু জিবে পেনসিলটা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নোট বইয়ে লিখতে লিখতে বলল, "এখনও ত আছে। হ্যাঁ, কি বল্লেন, দুটো? তা কটা মোরগ, কটা মুরগী?" আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তবুও ভদ্রতা রক্ষা করে বললাম, "অত কি আমি দেখে রেখেছি? যা হোক লিখে নিন না, মোরগ হোক, মুরগী হোক, বিকালে ত থাকবে শুধু পালক।" ছেলেটি বলল, "তা কি হয়? সরকারি চাকরি, স্যার, আপনি কাইণ্ডলি একবার দেখে এসে ঠিক করে বলুন, আর না হলে, আমি কি ভেতরে যেতে পারি?" আমার কানের কাছটা ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে, মহাপুরুষের কথা স্মরণ করে মনে মনে উল্টো দিক থেকে ১, ২, গুণতে গুণতে বললাম, "ভেতরে যাবার প্রয়োজন নেই, আমি বলছি লিখে নিন দুটোই মোরগ।" ছেলেটি একটু ইতস্তত করে অগত্যা তাই লিখল। আমি এবার একটু তিক্ত কণ্ঠেই বললাম "হয়েছে ত? এবার তাহলে আসুন।" ছেলেটি বলল, "যাচ্ছি স্যার, এই আর একটু।" তারপর খুব তাড়াতাড়ি খাতায় চোখ বুলিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠে বলল "ওঃ, আর একটা কথা, আপনি কি ছাগল পোষেন? "আপনারা বিশ্বাস করুন আমি এর পরেও ছেলেটিকে কিছু বলিনি, শুধু অল্প একটু গম্ভীর হয়ে তার প্রশ্নর জবাব দিয়েছিলাম, "না"। তারপর ছেলেটি যখন চলে যাচ্ছে তখন তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আচ্ছা, আপনি আর সব বাড়ীতে তথ্য নিচ্ছেন ত? তাঁরা আপনার সব প্রশ্নর জবাব দিচ্ছেন?" ছেলেটি একটু অসহায়ের মত বলল, "একেবারেই না স্যার, এই প্রথম আপনি সব কথার জবাব দিলেন, তাও ঠিক দিলেন কি না জানি না। অন্য অন্য বাড়ীতে কেউ ত কথাই কইতে চায় না, অনেকে বললে, কর্তা বাড়ী নেই আমরা কিছু জানি না, আবার কেউ কেউ দু চার কথার পর রীতিমত রেগে উঠলেন। আমাদের কি দোষ বলুন ত? এ দেশের লোক স্ট্যাটিস্টিক্সের মূল্য বোঝে না এ যে কত দরকারি..."। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তা জানি, কিন্তু আপনি তা হলে ঐ সব বাড়ীর হিসাবে কি লিখছেন?" ছেলেটি বলল, "কি আর লিখব, কেউ কিছু বললেন না তাই লিখছি ঢ্যাঁড়া, অর্থাৎ ওসব বাড়ীতে কিছু নেই।" আমি বল্লাম, "কিন্তু তাহলে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স্ ত ভুল হবে।" ছেলেটি চলে যেতে যেতে বলল, "ও একটু আধটু উনিশ-বিশ—এ কিছু এসে যাবে না।" একটু আধটু, উনিশ-বিশ, হলে হয়ত সত্যিই এসে যেত না, কিন্তু "উনিশ-বিশ" যে "উনিশ-উনোসত্তর" হতে পারে, ছেলেটি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সেটা টের পেলাম। আমাদের পাড়ার কাছেই অনেক ঘর গোয়ালার বাস, পাড়াসুবাদে তার ভিতর আমার অনেক বন্ধুও আছেন। একটু বাদেই আমার এক গোয়ালা বন্ধু বেশ চিন্তিত হয়ে আমার কাছে এসে বললেন, "এ, আবার নতুন কি উপদ্রব বল ত?" আমি বললাম "কিসের কথা বলছ?" সে বলল, "ঐ যে এক গরুর গণৎকার এসে পাড়ায় পাড়ায় গরুর খোঁজ নিচ্ছে, এ সব কেন বলতে পার" আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা ত নিচ্ছে, তা তোমাদের ত সকলেরই গরু আছে, সব ঠিক ঠিক হিসেব দিলে ত?" সে বলল, "আরে মাথা খারাপ? আমরা কি কিছু বুঝি না? হিসেব দেবে! যার বিশটা গরু সে লিখিয়েচে পাঁচটা।" আমি বললাম, "সে কি? এ যে খুব দরকারি ব্যাপার, এর থেকে কত কাজ হবে, তাতে তোমাদেরও ভালই হবে, আর তোমরা জেনে শুনে মিথ্যে কথা বললে?" সে বলল, "আরে রাখ রাখ, আমাদের ভাল হবে, ঐ যে খাটাল উঠোবার কথা শুনছি, তারই জন্যে এ সব হিসেব নিচ্ছে বুঝতে পারলে না?" হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম। সত্যিই ত, একদিকে একদল মুরুব্বী বলছেন শহর থেকে খাটাল সব উঠিয়ে দেব, এখানে গরু রাখা চলবে না, আর একদল ঠিক সেই সময় খোঁজ নিচ্ছেন, 'কার কত গরু আছে খুলে বলুন; গ্রামে চলছে লেভী প্রথা, ফসলের অনুপাতে সরকারের কাছে ধান বিক্রী করতে হবে, আর এক দিক থেকে খোঁজ নেওয়া চলল, "কার জমিতে কত ধান হল হিসাব দাও," এই রকম দো-ফাঁদে পড়ে স্বয়ং

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও "ইতি গজ" বলে তাল সামলাতে হয়েছিল, আর যাদের গরু, যাদের ধান, তারা ত সব কলিকালের ছা-পোষা জীব। নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই তারা যে সঠিক খবর বলবে না এ ত সকলেরই বোঝা উচিত। অথচ, এর উপর নির্ভর করেই যে তথ্য সংগ্রহ হবে সেইটাই হবে, "স্ট্যাটিস্টিকস্, সকল তর্কের শেষ মীমাংসা, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, সকল সমস্যা সমাধানের অকাট্য নির্ভর-যোগ্য সূত্র।

সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে যে তথ্য জড়িত তার হিসাবে এই রকম গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। আবার আর এক রকম ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য পাওয়া যায় রাজনৈতিক কারণে। ১৯৪১ সালে সেনসাস্ নেবার সময় কংগ্রেস থেকে সেনসাস্ বয়কট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে সেনসাস্ বন্ধ রইল না বটে, কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের ভিতর সেনসাস্ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ রইল না। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই হোক, অথবা ভবিষ্যতে হাওয়া কোন দিকে বইবে আগে থেকে তার আঁচ পাওয়ার জন্যই হোক, মুসলিম লীগ কিন্তু এ ব্যাপারে ঠিক উলটো পন্থা গ্রহণ করলেন। তাঁরা ভালভাবে প্রচার করলেন যে, সেনসাসে প্রত্যেকটি মুসলমানকে যাতে গোণা হয় তারজন্য মুসলমানদের সজাগ থাকা প্রয়োজন। এমনকি, গর্ভবতী মুসলমান রমণীর পেটের ছেলেটা অবধি যেন বাদ না পড়ে। সেনসাসের গণনার ভার তখন বেসরকারী গণনাকারীদের উপর ছিল: তাদের গণনার পর একদল সরকারী কর্মচারী গণনাগুলি "চেক" করার অর্থাৎ যাচাই করে দেখার ভার পেয়েছিলেন। এই রকম একজন সরকারী কর্মচারীর কাছে শুনেছি যে, তিনি যখন তাঁর এলাকায় চেক করতে গেলেন, তখন প্রাথমিক গণনাকারীর খাতায় দেখা গেল এক মুসলমান পরিবারের লোকসংখ্যা ৮জন; ৪জন বয়স্ক আর ৪জন শিশু। কর্মচারীটি সেই পরিবারের লোকদের সব তাঁর সামনে হাজির করতে বললেন। দেখা গেল ৬জন প্রাণী হচ্ছে মোটমাট, ৪জন বয়স্ক, ২জন শিশু। তিনি হিসাব ভুল লেখা হয়েছে বলে কেটে সংশোধন করতে যাচ্ছেন, পাশ থেকে গৃহস্বামী হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "করছেন কি হুজুর, ৮জনই ত হবে।" কর্মচারীটি ত অবাক, বললেন, "ছজন ত দেখছি, আর দুজন?" গৃহস্বামী বোরখা পরা দুটি মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, "ওদের পেটে আল্লার দয়ায় যে দুটি শিশু আছে, তারাও ত মনিষ্যি, তাদের বাদ দেবেন কেন?" কর্মচারীটি
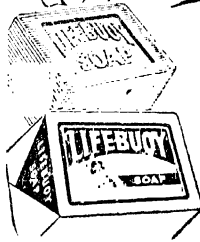
অবিশ্যি ও দুটি মনিষ্যিকে বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু এ রকম কত হাজার পেটের ছেলে যে সেবারের সেনসাসে মুসলিম সংখ্যা বর্ধন করেছে, তার সঠিক হিসাব আজ পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামের সরল মুসলমানরাও সেদিন পেটের ছেলে গুণিয়েছিলেন রাজনৈতিক দলের শিক্ষায়, তারা গ্রামের ভিতর গিয়ে পাখীপড়া করে তাঁদের এইসব শিখিয়েছিল, না হলে গ্রামের সাধারণ লোক সাধারণত এত বুদ্ধিমান নয়। হিন্দুদের ভিতর কংগ্রেস কিম্বা মহাসভার তরফ থেকে এমনিধারা কোনও প্রচার হয়নি, তাই সেদিন গাঁয়ের অনেক হিন্দু ঠিক গেঁয়োর মতই হিসাব লিখিয়েছিলেন। আমাদের সেই কর্মচারীটির অভিজ্ঞতাই বলি। মুসলমানদের সংখ্যা চেক করার পর তিনি এক হিন্দু বাড়ি চেক করতে গেলেন। সেখানেও এক বাড়িতে সংখ্যা দেখলেন ৮; ৪জন বয়স্ক, ৪জন শিশু। কর্মচারীটি সেই বাড়ির লোকদেরও সব তাঁর সামনে হাজির করতে বললেন। তারা যখন সব লাইন করে এসে দাঁড়াল, কর্মচারীটি অবাক হয়ে দেখলেন, বয়স্ক লোক ৪জন ঠিকই, ১জন পুরুষ আর ৩জন স্ত্রীলোক, কিন্তু তাদের সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে, সংখ্যায় শিশুই ৯টি। কর্মচারীটি বললেন, "এত সব কারা এরা?" গৃহস্বামী সলজ্জ হেসে বললেন, "আঁজ্ঞে, এনারা সব আমারই সন্তান।" জানা গেল, ভদ্রলোকের তিন পক্ষ। তিনজনেই হ্যাট্-ট্রিক করেছেন। যাই হোক, কর্মচারীটি বললেন, "এরা ত দেখছি ৯জন, তাহলে মাত্র ৪জন শিশু লিখিয়েছেন যে?" গৃহস্বামী অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুগুলিকে দেখিয়ে বললেন, "এনারা ত সব নাবালক, এনাদের নামেও ডাক হবে?" এমনি তথ্যের উপর নির্ভর করেই ১৯৪১-এর সেনসাস্ তৈরি হয়েছিল। তার ফলে ভারত-বিভাগের কিছু ইতর-বিশেষ হয়েছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু যদিই তা হয়ে থাকে, তার জন্য এখন আঙুল কামড়ে লাভ নেই।

স্বাধীন ভারতের ১৯৫১ সালের সেনসাসের সব তথ্যও যে নির্ভেজাল এমন কথাও হলফ করে বলা মুশকিল। এবারের সেনসাসে লোক গণনার সঙ্গে সঙ্গে কে কি ভাষা জানেন তারও একটা হিসাব নেওয়া হয়েছে। আমাদের বাড়িতে যিনি সেনসাস্ করতে এলেন, তিনি আর সব তথ্য নেবার পর আমায় জিগেস করলেন, "আপনি কি কি ভাষা জানেন?" আমি বললাম, "বাঙলা আর ইংরাজি।" ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, "হিন্দী জানেন না?" আমার হিন্দী-জ্ঞান সামান্যই, কোনো রকমে হাম, তুম্ ইত্যাদি দিয়ে সহজ দুএকটা কথা যে বলতে পারি না তা নয়, কিন্তু তাতে করে এ বলা চলে না যে, আমি হিন্দী জানি। বাস্তবিকপক্ষে ওড়িয়া ভাষাতেও আমি ও ধরণের দুচারটা কথা বলতে সক্ষম, আর তা বিশুদ্ধ ওড়িয়া, যা আমি কিছুদিন সম্বলপুরে শহরে থাকবার ফলে শিখেছিলাম। কিন্তু হিন্দী, ওড়িয়া কোনও ভাষাই আমি জানি বলতে আমার সঙ্কোচ আছে, কারণ ওরকম জানাকে জানা বলা চলে না। আমি তাই সেনসাস্ গ্রহণকারী ভদ্রলোককে বললাম, "আমি হিন্দী তেমন জানি না।" ভগবানের কি দুরভিসন্ধি, ঠিক সেই সময় আমাদের বিহারী খবরের কাগজওয়ালা কাগজের মাসকাবারী দাম চাইতে এল, আর আমি তাকে সরলমনে বললাম, "আজ হামারা থোড়া কাম হায়, কাল দাম মিলেগা।" আর যাই কোথায়, সেনসাসকারী মুচ্কি হেসে বললেন, "এইত আপনি হিন্দী জানেন।" বলে, উনিত লিখতে যান আর কি, আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এরকম জানাকে যদি জানা বলেন, তাহলে আমি ওড়িয়াও জানি, লিখতে হলে দুটোই লিখুন।" ভদ্রলোক বললেন, তার উপায় নেই, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষা জানা থাকলে মাত্র একটি ভাষার কথাই উল্লেখ করতে হবে। আমি বললাম, "তাহলে হিন্দী কেন, লিখুন ওড়িয়া, সেইটাই আমি হিন্দীর চেয়ে বরঞ্চ একটু ভাল জানি।" ভদ্রলোক বললেন, "সাধারণ-ভাবে আমাদের উপর নির্দেশ আছে যে, যাঁরা মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দী এবং অপর কোনো ভারতীয় ভাষা জানবেন, তাঁদের নামের পাশে শুধু হিন্দী লিখতে হবে!" আমি তখনি জোর করে বললাম, "সে আমি কিছুতেই আপনাকে লিখতে দেব না আমি যখন বলছি, আমি হিন্দী জানি না, তখন আপনি আপনার ইচ্ছা মতন যা খুশী লিখবেন নাকি?" অনেক বাদ-বিতণ্ডা, নরম গরম কথার পর ভদ্রলোককে আমায় হিন্দী জানার পর্যায় থেকে রেহাই দিতে রাজি করা গেল। আমার ধারণা, এবারের সেনসাসে কলকাতার অধিবাসীদের ভিতর হিন্দী জানা লোকের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে, তাঁদের ভিতর বেশ কিছু লোকের হিন্দী জ্ঞান আমারই মতন। তবু, নিজেকে বহু-ভাষী প্রমাণ করার স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যই হোক, অথবা সেনসাস গ্রহণকারীদের উৎসাহের ফলেই হোক, এ'দের নাম হিন্দী-জানা লোকদের সংখ্যা স্ফীত করতে সাহায্য করেছে। এর ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটেছে বিহারে। সেখানে, যাঁদের স্বাভাবিক মাতৃভাষা বাঙলা, তাঁদের অবধি মাতৃভাষা হিন্দী লেখাতে বাধ্য করা হয়েছে, এরকম অসংখ্য অভিযোগ খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে গণ্ডগোল হয়েছে মানভূমে, সেখানে এ ব্যাপার নিয়ে কয়েক স্থানে রীতিমত দাঙ্গা অবধি বেধেছে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের হাত দিয়ে সেদিন সেনসাসের পাতায় যে তথ্য লেখা হয়ে গেছে, আগামী দশ বছরের মত যে কোনও ব্যাপারে তাই হবে অকাট্য প্রমাণ। মানভূমের লোকেরা হিন্দীভাষী না বাঙলা-ভাষী, এ সম্পর্কে আর কারও কথা, আর কোনও মতামত, প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না।

এমনকি, বিনোবাজীর কথাও নয়। সম্প্রতি চাণ্ডিল থেকে তিনি জানিয়েছেন যে, সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা বা উপদেশ কিছুই বুঝতে পারে না। তারা বাঙলা ছাড়া আর কোনও ভাষাই বোঝে না, তাই তিনি এখন বাঙলা শিখছেন। চাণ্ডিল মানভূম জেলায়। সরকারী তথ্য অনুসারে সেখানকার বেশীরভাগ লোকের হিন্দী ভাষা বোঝবার কথা।

বাঙলায় শেকসপীয়র চর্চা

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি"—একথা বলে নব্য বাঙলার অন্যতম প্রধান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেকসপীয়রকে বরণ করেছিলেন। কার্লাইলও বলেছিলেন, ভারত সাম্রাজ্য ও শেকসপীয়রের মধ্যে একটিকে যদি ত্যাগ করতে বলা হয়, তবে ইংলণ্ড শেষোক্তকেই আঁকড়ে থাকবে। কার্লাইলের এই বণিক-সুলভ মূল্যায়নের তুলনায় ইংলণ্ড ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে হেমচন্দ্রের প্রশস্তি অধিকতর মার্জিত বলে মনে হয়। একথা সুবিদিত যে, বাঙলার নবজাগরণ ভাব-জগতের এক বিরাট আলোড়নের ফল। দুটি ভাবধারা এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল--একটি হচ্ছে পশ্চিম থেকে আনীত নতুন বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের প্রতি সুতীব্র অনুরাগ এবং অন্যটি হচ্ছে ভারতের বৈদেশিক দাসত্ব বন্ধনের বিরুদ্ধে অনুরূপ তীব্র বিক্ষোভ, যা অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে দৃষ্টিকে উৎসুক করে তুলেছিল। কাজেই শেকসপীয়র প্রসঙ্গে কালিদাসের উল্লেখ আকস্মিক ঘটনা নয়। কালিদাসও নাট্যকার হিসেবে বিশ্বসভায় স্থান পাবার দাবী রাখেন। গোয়েটে তাঁর এক অনুপম চৌপদী কবিতায় কালিদাসের শকুন্তলাকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন—

"বসন্তের ফুল্ল ফুল, শরতের ফলের মিলন,
পুষ্ট তিরপিত আত্মা, মোহে যাহে
মানবের মন,
স্বরগের মরতের এক ঠাঁই অপূর্ব মিশ্রণ,
'শকুন্তলা' 'শকুন্তলা' কিবা আর
আছে অকথন!"
(হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)

যাহোক, বাঙালী কবির কাছে কালিদাস তাঁর 'সমস্ত সৌন্দর্য' নিয়েও এক অতীত যুগের প্রতিনিধি ছিলেন; শেকসপীয়রের সৃষ্টিতে তাঁরা শুনেছিলেন জীবন্ত-লোকের প্রাণস্পন্দন, তাই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতর কবি।

এই গভীর শেকসপীয়র-প্রীতি বাঙলার রেনেসাঁসের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এবং কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রভাবে ও শিক্ষায় এই অনুরাগ বিকশিত ও পুষ্ট হয়েছিল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। 'হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদের সাধারণ শিক্ষার' জন্য জনসাধারণের চাঁদায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই শুভসংকল্পের প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও

এইচ এল ভি ডিরোজিও

গোঁড়া হিন্দুসমাজের সনাতনী সংস্কারকে আহত করে উদ্দেশ্যটিকে পণ্ড করে দেবার ভয়ে তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ্যে অগ্রসর হননি। ২৭শে আগস্ট, ১৮১৬ সালে পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত হয়—এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বছরটি শেকসপীয়রের মৃত্যুর দ্বিশততম বার্ষিকী। যা হোক, মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দুটি ভাষা শিখতে হত, তার মধ্যে ইংরেজী ছিল বাধ্যতামূলক। পরবর্তী দশ বৎসরে ইংরেজী অধ্যয়ন দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮২৭ সালে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্ররা "Pope's Poems", "The Vicar of Wakefield", "Paradise Lost" ও "Shakespeare's Plays" পড়ছিল। ১৮৩১ সালে জেনারেল কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "ইংরেজী ভাষার উপর যে পরিমাণ দখল জন্মেছে এবং যে পরিমাণে ঐ ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় ঘটেছে, য়ুরোপের কোন বিদ্যালয়ও তার সমকক্ষ হতে পারে না।"

এই অসাধারণ সাফল্যের জন্যে এইচ এল ভি ডিরোজিওর দান অল্প নয়। ১৮২৮ সালে তিনি ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে হিন্দু কলেজে আসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর, কিন্তু শিক্ষকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন অব্যবহিত পরে। তাঁর ইংরেজী জীবনীকার লিখেছেন, "কোন নেটিভ বিদ্যালয়ে তাঁর আগে বা পরে আর কোন শিক্ষক ছাত্রদের ওপর তাঁর মত এত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ডিরোজিও তাঁর শান্ত, মধুর সুস্মিত স্বভাব, সপ্রতিভ পরিহাস-কৌতুক, পাণ্ডিত্য, শেখাবার আগ্রহ, ধৈর্য ও শিষ্টাচার দ্বারা শুধু ক্লাসে পড়াবার সময়েই যে তাঁর ছাত্রদের চিত্তজয় করেছিলেন, তা নয়। পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে কথোপকথনের সাহায্যে তিনি ছাত্রদের শেখাতেন, ক্লাসের পাঠ্যবস্তু প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে উৎসাহ দিতেন। ইংলণ্ডের চিন্তাধারা ও সাহিত্যে ছাত্রদের জ্ঞান বিস্তৃততর ও গভীরতর করবার জন্যে ডিরোজিও একটা স্বেচ্ছাবৃত কর্তব্য নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের যে সব ছাত্র তাঁর এই স্বেচ্ছাবৃত কর্তব্যের সুযোগ নিত, তিনি ক্লাসের নিয়মিত কাজ শুরু হবার আগে এবং কখনও বিদ্যালয়

ছাত্রটির পরও তাদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজী সাহিত্য থেকে নানা বিষয় পড়ে শোনাতেন।" কিন্তু ইতিহাসের এমনই ক্রুর পরিহাস, শিক্ষক হিসেবে এই সাফল্যই হল ডিরোজিওর কাল। স্বাধীন চিন্তার বিকাশে তিনি যেভাবে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তাতে গোঁড়া হিন্দুসমাজ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অমূলক অপবাদ খাড়া করলেন। ডিরোজিও এর প্রতিবাদে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে তিনি তিনখানা পত্র লিখেছিলেন যা গাম্ভীর্যে ও ওজস্বিতায় লর্ড চেস্টার-ফিল্ডের নিকট ডাঃ জনসনের অথবা ১৯১৯ সালে ভারতের বড়লাটের নিকট রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রের মতই ইংরেজী ভাষার বিখ্যাততম পত্রগুলির মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য।

হিন্দু কলেজের সংস্রব ছাড়াও বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তিনি একজন স্মরণীয় পুরুষ। বাঙলার নব-অভ্যুদয়ের কোন ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। ডিরোজিওর পিতা ছিলেন একজন পর্তুগীজ বণিক এবং মাতা ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা—বিহারের কোনও এক নীলকরের ভগিনী। ডিরোজিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন; তাঁর বয়স তখনও আঠারোর কোঠায়। তখন থেকেই তিনি যৌবনের সমস্ত আবেগ ও উদ্যম নিয়ে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন হন এবং সমসাময়িক প্রায় সমস্ত আলোচ্য বিষয়ে পদ্যে ও গদ্যে বহু রচনা করে গেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ছ বৎসর বয়স থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত মাত্র আট বছর তিনি কলকাতার কোন এক প্রাইভেট স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। যাহোক, কবিরূপেই ডিরোজিও অমর হয়ে আছেন। এক শতাব্দীরও বেশি গত হয়েছে, কিন্তু তাঁর উদ্দীপ্ত বাণী ম্লান হয়নি। তিনি ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ সালে তেইশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু দেশাত্মবোধ অনুশীলনের জন্য ভারত-বাসীকে যে উদাত্ত আহ্বান তিনি করে গেছেন, তা কি কেউ ভুলতে পারে? ভারতীয় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনার তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শক—যা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আমাদের কাব্যক্ষেত্রে এক নূতন পর্ব-নির্দেশ।

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মন্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সেই বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!"

(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন ডিরোজিও আর সেখানে নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি তখনও জাগ্রত। এই শিক্ষাচার্য এবং উত্তরকালে আধুনিক বাঙলা কাব্যরীতির প্রবর্তক—হিন্দু কলেজের সেই স্বনামধন্য ছাত্রটির মধ্যে এক অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীররসাত্মক মহাকাব্য রচনা করেছিলেন বলে সাধারণত মিল্টনের সাথে মাইকেলের তুলনা করা হয়, কিন্তু মেজাজ ও জীবনযাত্রার দিক থেকে মার্লোর সাথেই তাঁর মিল ছিল অধিকতর। আধুনিক অর্থে আমাদের প্রথম নাট্যকারও তিনিই এবং বাঙলায় প্রথম জাতীয় নাট্য-শালা স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। ছাত্ররূপে মধুসূদন ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের সংস্পর্শে আসেন। তখন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। রিচার্ডসন বেঙ্গল আর্মির একজন সৈনিকরূপে ১৮১৯ সালে ভারতে এসেছিলেন, কিন্তু দশ বৎসর সেনা-বাহিনীতে চাকুরির পর রুগ্ন হয়ে পড়লে তিনি সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ

করেন। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং তিনি যে জন্ম-শিক্ষক ছিলেন তারও তিনি প্রমাণ দেন। মেকলে আড়ি পেতে হিন্দু কলেজে তাঁর 'ওথেলো' পড়ান শুনে তাঁকে পরে বলেছিলেনঃ "আমি ভারত সম্বন্ধে সবকিছু ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আপনার শেকসপীয়র পড়ানো কখনই ভুলব না।" রিচার্ডসন তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রদের নিকট ডি এল আর নামে পরিচিত ছিলেন। মধুসূদন ছিলেন ডি এল আরের একান্ত অনুরাগী শিষ্য এবং অনুকরণ যদি কারু প্রতি আন্তরিক

বঙ্কিমচন্দ্র

অনুরাগের লক্ষণ হয়, তবে মধুসূদন সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি গুরুর হস্তাক্ষরটি পর্যন্ত অনুকরণ না করে ক্ষান্ত হননি। মধুসূদন নিজের কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে সদা-সচেতন তো ছিলেনই, তার ওপর রিচার্ডসনের মতো গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে তিনি আমরণ শেকসপীয়রের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। শেকসপীয়র ইচ্ছা করলেই একজন নিউটন হতে পারতেন একথা সহপাঠীদের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে মানসিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি অংকশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন এবং বন্ধুবর্গ ও শিক্ষকগণের প্রচুর আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে কোন এক পরীক্ষায় তিনি অঙ্কে অতি উচ্চ নম্বর লাভ করেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি ল্যাতিন, গ্রীক, ফরাসী, ইতালিয়ান প্রভৃতি আট-ন'টি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু চরম দুর্দিনে শেকসপীয়রই ছিল তাঁর আশ্রয় ও সান্ত্বনা স্থল। মধুসূদনের দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন একজন ফরাসী মহিলা যাকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। নিঃসীম দারিদ্র্যের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধিশয্যায় তিনি যখন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ শোনেন, তখন শেকসপীয়রের সেই অংশটিই তাঁর শোকদগ্ধ অন্তরে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছিল যেখানে ম্যাকবেথ লেডী ম্যাকবেথের আকস্মিক মৃত্যুর পর জীবন-মৃত্যুর খেলা সম্বন্ধে অনুধ্যান করছেন।

রিচার্ডসনের প্রাণময় শেকসপীয়র অধ্যাপনা নিষ্ফল হয়নি। তাঁর ছাত্ররা শুধু পরীক্ষা পাশের জন্যে শেকসপীয়র পড়ে সন্তুষ্ট না থেকে শেকসপীয়র থেকে আবৃত্তি ও শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় শুরু করেন। অবশ্য যেসব শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু কলেজের মারফৎ শেকসপীয়র ও ইংরেজী নাটকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ও কলকাতায় ইংরেজী থিয়েটার দেখেছিলেন, রিচার্ডসনের আগেই তাঁদের মধ্যে একটা অকৃত্রিম নাট্য-স্পৃহা জন্মেছিল। এর ফল হয়েছিল "হিন্দু থিয়েটার"। ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ সালে "জুলিয়াস সীজারের" কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য নিয়ে এর প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন হয়। থিয়েটারের আয়ু অবশ্য বেশি দিন ছিল না, কিন্তু এর অনুপ্রেরণা সহজে নষ্ট হয়নি। আমরা দেখতে পাই, ১৮৪৮ সালে বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য নামক একজন বাঙালী অভিনেতা কলকাতার ব্রিটিশ থিয়েটার "স্যানস সুসি"তে ওথেলোর ভূমিকায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৮৫৩ সালে আমরা দেখতে পাই ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে সম্পূর্ণরূপে বাঙালী যুবকদের দ্বারা অভিনীত পূর্ণাংগ নাটকরূপে "ওথেলো" মঞ্চস্থ হয়েছে। ইয়াগোর ভূমিকায় বাবু প্রিয়নাথ দে দর্শকচিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিলেন। পরবর্তী বৎসর তাঁরা "মার্চেণ্ট অব ভেনিস" মঞ্চস্থ করেন। এ অভিনয়ে মিসেস গ্রীগ নামক একজন ইংরেজ মহিলা পোর্সিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৮৫৫ সালে বাঙলার শিক্ষা-জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ বৎসর শুধু হিন্দুদের জন্য বেসরকারী বিদ্যালয়রূপে হিন্দু কলেজের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। সরকার এর পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৫ই জুন, ১৮৫৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ঐ সময়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও বাস্তব রূপায়ন লাভ করে এবং ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের তেইশজন ছাত্র পরীক্ষা দেন এবং সকলেই কৃতকার্য হন। উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও নাম ছিল, যিনি উত্তর
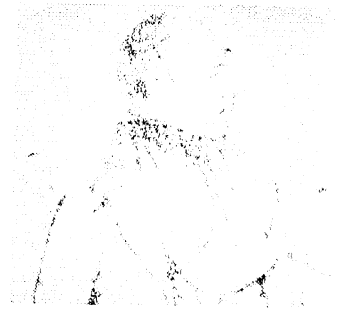
ডি এল রিচার্ডসন

কালে ঊনবিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আসন লাভ করেছিলেন।

মধুসূদন যেমন আধুনিক বাঙলা কবিতার, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের জনক। মধুসূদনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও মাতৃভাষায় লেখনী ধারণের পূর্বে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে হাত মকশ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬[illegible] সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৮৯৪ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলার সাহিত্য সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ও "আইভানহো"র মধ্যে খানিকটা আপাত সাদৃশ্য থাকায় ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণত স্যার ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি শেকসপীয়রের নাটকের

সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস নাটকে রূপায়িত ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এগুলো আজ অবধি অতি জনসমাদৃত। বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যা নিছক নারীরূপে শেকসপীয়রের মিরাণ্ডাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে —তা হচ্ছে কপালকুণ্ডলা।

শেকসপীয়র অবলম্বনে বাঙলায় নাটক লিখে ও নাটকের অনুবাদ করে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শেকসপীয়রের নাটক জনপ্রিয় করবার চেষ্টা কখনও কখনও হয়েছে। কিন্তু এ সব চেষ্টা বিশেষ সফল

এইচ এম পার্সিভ্যাল

হয়নি। যে-কোন কারণেই হোক, সেকশপীয়রের বাঙলা নাট্যাভিনয়কে শিক্ষিত সমাজ সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। এর একটি কারণ এই মনে হয় যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শেকসপীয়রের নাটক অধ্যাপনার ধারা এবং সৌখীন ও পেশাদার নাট্য সম্প্রদায়গুলি দ্বারা অভিনয়ের ধারা ভিন্ন। ব্র্যাডলি, কোলরিজ ও ল্যাম্বের আদর্শ অনুসরণ করে শেকসপীয়রের নাটক কবিতারূপে পড়ান হয়—যা একাকী উপভোগ ও মননের বিষয়, যার সাথে রঙ্গালয়ে অভিনয় প্রদর্শনের ও দর্শকদের হাততালি পাবার সমস্যা জড়িত নেই। এই অভিমত সবচেয়ে ভাল পরিস্ফুট হয়েছে শেকসপীয়রের নাটক অভিনেতাদের প্রতি অধ্যাপক এইচ এম পার্সিভ্যালের মন্তব্যে। তিনি তাঁর কোন এক ছাত্রের নিকট এক পত্রে লিখেছিলেনঃ "শেকসপীয়র সম্বন্ধে থিয়েটারের লোকদের সমালোচনার উপর গুরুত্ব দিও না। তুমি আমি শেকসপীয়র পড়ি ও অনুভব করি; তারা শেকসপীয়র অভিনয় করে ও অনুভব করবার ভান করে।"

অধ্যাপক পার্সিভ্যাল ভারতে শেকসপীয়র সম্বন্ধীয় পাণ্ডিত্য পরাকাষ্ঠার এক উচ্চ সীমা নির্দেশ করে গেছেন। তিনি ১৮৫৫ সালে চট্টগ্রামে এক খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি ইংলণ্ডে যান। তথায় লণ্ডন থেকে তিনি সসম্মানে ক্লাসিকস ও ফরাসীতে গ্র্যাজুয়েট হন এবং অধ্যাপক ব্র্যাকির সিনিয়ার গ্রীক ক্লাসে যোগ দেন; অতঃপর লণ্ডনে ক্লাসিকস্-এ এম এ পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতির জন্যে তিনি এডিনবার্গে অধ্যাপক সেলারের অধীনে উচ্চতর লাতিন ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। স্বর্ণ পদকের পরবর্তী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ১৮৭৯ সালে ক্লাসিকস-এর এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি হেনরী মর্লির অধীনে ইংরেজী সাহিত্য এবং ক্রুম রবার্টসনের অধীনে দর্শনশাস্ত্রও অধ্যায়ন করেছিলেন। এছাড়া, নিয়মিত পাঠের একঘেঁয়েমি দূর করবার জন্যে তিনি এডিনবার্গে প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদবিদ্যার সম্পূর্ণ ক্লাসে যোগ দেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও একটি "সার্টিফিকেট অব মেরিট" লাভ করেন। কিন্তু পার্সিভ্যাল ক্লাসে ছাত্রদের যখন পড়াতেন, তখন তাঁর আচার আচরণে কোথাও পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ পেত না। কোন জটিল অংশ বা দুর্বোধ্য উপমার অর্থ উদ্ধারে তিনি কখনই পশ্চাদপদ হতেন না। তাঁর টীকা-টিপ্পনী ছিল সরস ও ব্যঞ্জনাময়। যদিও শেকসপীয়রই তাঁর অধ্যাপনার প্রধান বিষয় ছিল, তবুও "অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারী" প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত মিলটনের "Samson Agonistes" ও স্পেনসারের "Faerie Queen I" প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। শেকসপীয়র সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা ছাত্রদের এক নূতন সৌন্দর্য ও চিন্তা রাজ্যে নিয়ে যেত যেখানে বিজ্ঞ সমালোচকদের কখনই অনধিকার প্রবেশের যো ছিল না। তিনি কখনই অপরের মতামতের বাহন ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে ১৯২৬ সালে লণ্ডনে অবসর জীবনযাপন করবার পূর্বে শেকসপীয়র সম্বন্ধে ক্রোচে ও ব্র্যাডলির লেখা পর্যন্ত তিনি পড়েন নি। তিনি যখন তাঁর "ইণ্ডিয়া শেকসপীয়র" গ্রন্থমালা প্রকাশের কাজ হাতে নেন, শুধু তখনই তাঁদের বই পড়েছিলেন। বইগুলো তাঁর নিজস্ব ধারণাকে ওলোটপালট করে দেয় কিনা ভেবে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন; কিন্তু পরে

অধ্যাপক পি সি ঘোষ

স্বস্তির সঙ্গে তিনি বল্লেন—"না, বইগুলো তা করেনি।" ক্রোচে ও ব্র্যাডলি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করার যোগ্যঃ

"ভাবের দ্বারা শেকসপীয়রকে বুঝতে হবে, দর্শনের দ্বারা নহে—শেকসপীয়র বিচারে এটাই ছিল ক্রোচের মাপকাঠি। ক্রোচের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, সময় সময় তিনি নিজের মাপকাঠিকেই বিস্মৃত হয়েছেন। ব্র্যাডলীও সময় সময় তাই করেছেন এবং ক্রোচের বিশেষ উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। ব্র্যাডলী যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে শেকসপীয়র পড়েছেন এবং বিবেচনার সাথে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে যতখানি জায়গা নিয়েছেন, তার এক-

চতুর্থাংশ পরিসরেই তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা যেত। তিনি ম্যাকবেথের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রগুলি বোঝেননি, এবং ম্যাকডাফ্ ও ম্যালকমের মধ্যেকার দৃশ্য ভুল বুঝেছেন। তিনি tests-এর যষ্ঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে চলেছেন, কিন্তু যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শেকসপীয়র বোঝেন, তাঁদের এভাবে যষ্ঠি আশ্রয় ক'রে চলতে হয় না।"

অধ্যাপক পার্সিভ্যাল ৩১ বৎসর একটানা চাকুরি করে ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সর্বান্তঃকরণে তাঁর পুরাতন গুরুর আদর্শ অনুসরণ করে পার্সিভ্যালের স্মৃতিকে পরবর্তী ছাত্রসমাজে সজাগ রাখেন। তিনিও ১৯১৫ সাল থেকে আরও পঁচিশ বৎসর একান্ত যত্নের সাহিত শেকসপীয়র অধ্যাপনা করেছিলেন। অধ্যাপক ঘোষ অবশ্য অধ্যাপক পার্সিভ্যালের মতো সর্বব্যাপী পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর একটি ক্ষমতা ছিল যা তাঁর গুরুর ছিল না। তাঁর শেকসপীয়র পঠন ছিল অতি উচ্চাঙ্গের- তিনি রিচার্ডসনের পঠনরীতি ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমরা আরও চমৎকৃত হই যখন আমরা স্মরণ করি যে তাঁর অধিকতর খ্যাতনামা পূর্বাচার্য ডিরোজিওর মতোই তিনিও তাঁর সমগ্র শিক্ষা কলকাতাতেই লাভ করেছিলেন। পার্সিভ্যালের প্রতি অনুরক্তি সত্ত্বেও অধ্যাপক ঘোষ তাঁর ক্লাসকে রঙ্গমঞ্চেরই কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর জীবিত নেই, কিন্তু আজ বাঙলার কলেজগুলোতে যাঁরা শেকসপীয়র পড়াচ্ছেন, তাঁদের অধিকাংশই তাঁর ছাত্র এবং তাঁর ছাত্র হিসেবে তাঁরা গৌরবান্বিত।

কলেজের গণ্ডীর বাইরে বাঙলায় শেকসপীয়র অনুরাগীদের একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী আছে। আমাদের নাট্যকারমাত্রই শেকসপীয়রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান। কিন্তু শেকসপীয়রের মূল রচনার সহিত যাঁদের পরিচয় আছে, শেকসপীয়র ভক্তের সংখ্যা স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয় তাঁর নাটকগুলোর যথাযথ অনুবাদ হয়নি। কতকগুলো অনুবাদ থাকলেও, সেগুলো বিশেষ সন্তোষজনক নয়। শ্রীঋষি দাস লিখিত বাঙলায় শেকসপীয়রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী মাত্র গত বৎসর প্রকাশিত হয়েছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

বিলম্বে হলেও এই আরম্ভ শুভ বলে মনে হয়। কারণ গত বৎসর বঙ্গীয় শেকসপীয়র পরিষদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরিষদে রয়েছেন শীর্ষস্থানীয় অভিনেতাগণ, যেমন, শিশিরকুমার ভাদুড়ি—যিনি কোন কলেজে শেকসপীয়র অধ্যাপনা ছেড়ে পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনয় ও নাট্য পরিচালনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত ও শেকসপীয়রের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, পরিষদ সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার আশা রাখে। শেকসপীয়রের মৃত্যুর ত্রিশততম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত "Book of Homage to Shakespeare" (১৯১৬) নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী অনুবাদ সহ ভারতের পক্ষ থেকে একটি সনেট লিখেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই অনুবাদ তাঁর "ইংরেজী" গ্রন্থাবলীতে স্থান পায়নি।

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি,
দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন
তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি
তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য-বন্দনা-
সঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ
ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া, তাই হেরো যুগান্তর-
শেষে
ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

[March of India হইতে]

জাপানী পুতুলের ইতিবৃত্ত

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিল্প, বাণিজ্য ও সামরিক শক্তিতে জাপান বিস্ময়কর উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। প্রতীচ্য থেকে বিজ্ঞান আয়ত্ত করে তার ফলকে দেশ পুনর্গঠনের কাজে লাগানো হ'ল। দেখতে দেখতে জাপান এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল। সূর্যোদয়ের দেশ জাপান সবিতার কর-স্পর্শে ঝলমল করে উঠল। মানুষের

পুতুল সুন্দরী

জীবন হল স্বচ্ছন্দ, দৃষ্টি হল উদার আর মন হল সৃষ্টিশীল।

জাপান আজ আবার রিক্ত বিলুণ্ঠিত। সাম্রাজ্য-লোভ ও যুদ্ধবাদ জাপানী শাসক সম্প্রদায়কে উন্মাদ করে তুলেছিল উপ-নিবেশ স্থাপন করতে, এশিয়ার অন্যান্য দেশকে করতলগত করতে। তাদের দৃষ্টি হয়ে উঠল সংকীর্ণ ও একপেশে। অন্য দেশের স্বাধীনতাকে খুন করতে গিয়ে জাপান নিজেকেই খুন করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর মার্কিন বুটের তলায় হল জাপানের স্থান। জাপানের সমস্ত সম্পদ আজ মার্কিন দখলকারী সৈন্যদের কবলে। তার সাহিত্য, সংস্কৃতি আজ স্তব্ধ, জাতীয় জীবন বিপন্ন বিষাক্ত।

তথাপি জাপানী পুতুল জীবন্ত

সত্যি বটে জাপানের মানুষ আজ ব্যক্তিত্ববিহীন পুতুলবিশেষে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার অঙ্গুলি হেলনে তারা উঠে বসে নাচে গায়—তা মেনে নিলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, জাপানের পুতুল জীবনের স্পর্শ লাভ করেছে। শিল্প-মাধ্যম হিসাবে পুতুল (dolls) আর কোন দেশে এত সমৃদ্ধশালী হয়েছে বলে জানা নেই। অতি সূক্ষ্ম কলাকৌশলের ভেতর দিয়ে সাধারণ পুতুলকে যে কি রকম জীবন্ত করে তোলা যায় জাপানী পুতুল না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

জাপানের এই পুতুলশিল্প কিন্তু আজকের নয়। তা গড়ে উঠেছে শত শত বৎসরের পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে। গ্রামে ও শহরে ছোট-বড় শিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টায় আধুনিক পুতুল শিল্পের বনিয়াদ গড়ে তুলেছেন শতাব্দীব্যাপী সাধনার ভেতর দিয়ে।

কিভাবে সর্বপ্রথম জাপানে পুতুল জিনিসটা চালু হল সে বিষয়ে একটা মজার গল্প আছে। প্রাচীনকালে জাপানে যখন বাড়ির কর্তা মারা যেতেন, তখন তাঁর প্রিয় চাকরবাকর এবং গরু-ঘোড়াকে প্রভুর মৃতদেহের সঙ্গে কবরে পুঁতে দেওয়া হত। এই ছিল সামাজিক প্রথা। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে জাপানী সম্রাটের জনৈক বন্ধুর মনে প্রশ্ন জেগেছিল কি করে এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান করা যায়। মিছামিছি এতগুলো প্রাণ নষ্ট করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে একদিন সম্রাটকে গিয়ে বলল যে, সত্যিকারের প্রাণীগুলিকে এ রকম নির্দয়ভাবে হত্যা করা উচিত নয়। তার চেয়ে যদি মানুষ বা জন্তুর মত করে গড়া কোন পুতুলকে মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা যায়, তাহলে এত-গুলো প্রাণ বিনষ্ট হয় না। আর চলতি প্রথাটাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বেঁচে থাকবে। কথাটা সম্রাটের মনে লাগল; তিনি বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করলেন। তখন থেকে বাড়ির কর্তার মৃতদেহের

প্রাচীনকালের জাপানী সেনাপতি

সঙ্গে সমাধিস্থ করা হতে থাকল তার আদরের ভৃত্য বা ঘোড়ার পুতুল।

এই হল প্রথম পুতুল তৈরির ইতিহাস। এই নূতন প্রথা শুধু যে এক প্রগতিশীল সামাজিক সংস্কারসাধন করল তাই নয়, সারা দেশে পুতুল তৈরি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পেল। জাপানের পুতুলশিল্পে এক নবযুগ সঞ্চারিত হল।

নূতন আর্ট

পুতুলের বিভিন্ন গঠন-পদ্ধতি ও নির্মাণকৌশলের ভেতর দিয়ে শিল্পী-মনের চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটে। আর্ট-ফর্ম হিসেবে ইহা অতিশয় উন্নত ধরণের কলা। জাপানী পুতুলের ক্ষেত্রে ইহা খুবই সত্য। কেননা, পুতুলগুলির

গঠন ও সৌষ্ঠব এমনি মনোরম যে তা দর্শকের মনে দাগ কেটে রাখে। হাত, পা, মুখাবয়ব এবং ভঙ্গিমা চিত্তাকর্ষক-ভাবে রূপায়িত করা হয়; সঠিক ব্যালান্স' দিয়ে পুতুলকে করে তোলা হয় পরিপূর্ণ। সবচেয়ে কঠিন চোখের দৃষ্টি ও ভাব ফুটিয়ে তোলা এবং চুল রচনা করা; যথাযথ রঙ প্রয়োগ করাটাও 'রীতি-মত শক্ত। অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগর ছাড়া তা সম্ভব নয়। অতি উন্নত পর্যায়ের শিল্পজ্ঞান না থাকলে মাত্রাজ্ঞান এবং অনুপাত সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা না থাকলে চোখের কাজ বা রঙের ব্যবহার ইত্যাদি সূক্ষ্ম জিনিস সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না। পুতুল নির্মাণে বিশেষ করে চোখের কাজ সবচেয়ে শক্ত।

পৌরাণিক গল্প ও উপাখ্যান, ধর্ম-তত্ত্ব লোকনৃত্য এবং বিখ্যাত যোদ্ধা ও নেতার জীবন অবলম্বন করে পুতুল বানানোর রীতি জাপানে প্রচলিত আছে। মাঝে মাঝে এমন পুতুল দেখা যায় যা আসলের থেকেও উন্নততর ও সুন্দরতর। বর্ণাঢ্য বেশবাশের বৈচিত্র্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুঠাম দেহ ও নিখুঁত 'পোজ' (Pose)-এ সামান্য পুতুলকে অপূর্ব সুষমায় ভরে তোলা হয়। সঙ্গের ছবিটির দিকে তাকালেই তার তাৎপর্য বুঝা যাবে। এ একটা "পুতুল-সুন্দরী"। লাস্যময়ী সুন্দরী নারীর এক ভঙ্গিমাকে এখানে ধরে রাখা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, পুতুলটির দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ ও বেশবাস হাতের তৈরি, মেসিনের নয়।

জাপানের আর্টিস্টরা বাস্তবধর্মী ও সৌন্দর্যানুরাগী। তার পরিচয় পাওয়া যাবে পুতুল বানানোর মধ্যে। অভিসার রঙ্গনটীদের যে সব পুতুল তারা তৈরি করে থাকে তাতে জড়িয়ে থাকে রূপ-লাবণ্যের মাধুরিমা। দক্ষ পুতুল-নির্মাণ-কারীদের মঞ্চে অভিনীত নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা চাই, তা নইলে তারা তাদের শিল্প-মাধ্যমের ভেতরে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না, বিচিত্র ভঙ্গিমা ও অভিব্যক্তির সমাবেশে পুতুলকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে না।

নির্মাণ-পদ্ধতি

আগেকার দিনে সাধারণত একজন শিল্পী আরো দু-একজন সহকারীর সহায়তায় পুতুল বানাতেন। যিনি প্রধান শিল্পী তাঁকেই পুতুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গড়তে হত; পোশাক-আশাক ও ফিনিশ (finish) দেওয়াও ছিল তারই কাজ। বর্তমানে অবস্থা অনেকটা বদলে গিয়েছে। ব্যাপক উৎপাদনের প্রয়োজনে কাজ ভাগ হয়ে গিয়েছে। আজ এক কারখানায় প্রস্তুত হয় মাথা, অন্যটায় হাত, আরেকটাতে পা ইত্যাদি। সম্পূর্ণ পুতুলটি তৈরি হবার আগে হাজারো প্রাথমিক স্তর ডিঙিয়ে আসতে হয়। আজকের এই ব্যাপক উৎপাদনের যুগে এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে? একজন লোককে পুরা কাজ করতে হলে সময় লাগবে বেশী আর দামও পড়বে অতিরিক্ত। তাই এই কাজ-বণ্টন।

অবশ্য নামজাদা শিল্পীরা এখনো পর্যন্ত নিজের একার প্রচেষ্টায় পুতুল তৈরি করে থাকেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলোর দাম সাধারণ লোকদের আয়ত্তের বাইরে সেইজন্য এই বিশেষ পুতুলগুলো উন্নত আর্টের নিদর্শনরূপে জাতীয় যাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়; মেলা অথবা প্রদর্শনীতেও দেখানোর ব্যবস্থা আছে।

জাপানী পুতুলের উৎকর্ষ

জাপানী পুতুল শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। বিন্যাস, ভঙ্গিমা ও সৌন্দর্যের এত চমৎকার নিদর্শন অল্পই আছে। আমেরিকাতেও পুতুল-শিল্প যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু হলে কি হবে, জাপানের সঙ্গে তুলনায় তা অপেক্ষাকৃত নিম্ন-স্তরের। মার্কিন পুতুল বড় বেশী বাস্তবধর্মী, এমন কি যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট। জাপানী পুতুল শ্রেষ্ঠতম আর্টের উজ্জ্বল প্রতিভূ।

সত্যি কথা, যুগের চাহিদা অনুসারে জাপানের পুতুল-শিল্প কিছু কিছু সংশোধিত হয়েছে। চিরাচরিত ধারায় আজ আর তা সন্তুষ্ট নয়। তাই দেখি বিখ্যাত "বিউটি ডল" (Beauty dolls) সনাতনী নিয়মের থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে। "পুতুল-সুন্দরী"-র

মুখাবয়ব আধুনিক, চোখগুলো টানা-টানা এবং বৃহদায়তন, দেহের রেখা ব্যঞ্জনাময়। এসব কিছুর মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতা ও আর্টের ছাপ অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু বিদেশী প্রভাব যথেষ্টভাবে পড়লেও জাপানী পুতুল তার স্বকীয়তা আজও হারায়নি। মুখমণ্ডলের মধ্যে জাপানী নরনারীর প্রতিকৃতি লক্ষণীয়-ভাবে বেঁচে আছে। আর্টের সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে অম্লান। আসল কথা হচ্ছে কি, বর্তমান যুগের যুব-সম্প্রদায় চায় এমন ঢঙের পুতুল যার মধ্যে থাকবে প্রতীচ্যের বর্ণালী এবং আবেদন (appeal) অথচ স্বদেশের নিজস্বতাও যার মধ্যে বহুলাংশে থাকবে বিদ্যমান, জাপানী পুতুলের যেটুকু বিবর্তন আজকে হয়েছে তা ক্রমোন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। ফ্যাশনের মাপ-কাঠিতে তা আজও রয়েছে অপূর্ব।

রকমারি প্রকাশভঙ্গী

জাপানী পুতুলের গড়ন ও প্রকাশ-ভঙ্গী বহু রকমের; বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন ধরণের পুতুল বানানো হয়। প্রতি বছর জাপানে ৩রা মার্চ বালিকা উৎসব দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হয়। সেই উপলক্ষে "হিনা ডলস্" (Hina Dolls) নামে বিখ্যাত এক ধরণের পুতুল তৈরি করা হয়ে থাকে। ৫ই মে বালক উৎসব দিবসে "গগাৎসু ডলস্" বা "মে ডলস্" (Gogatsu Dolls or May Dolls) বানানো হয় উৎসবের প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে। তারপরে রয়েছে জগদ্বিখ্যাত "বিউটি ডলস্" (Beauty Dolls)। অনেকটা ফরাসী কায়দায় তৈরি করা এই বিউটি ডলস্গুলোতে ফুটিয়ে তোলা হয় সুন্দরী যুবতীর চিত্তহারী দেহ-সৌষ্ঠব।

একটি পুতুল সুন্দরী

এ ছাড়াও "ককেশী ডলস্" (Kokeshi Dolls) নামে এক ধরণের পুতুল আজকাল জাপানে খুবই প্রচলিত আছে। এগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এরা কাঠের তৈরি; বিচিত্র রঙে রঙীন এই পুতুলগুলো ছোট-বড়-মাঝারি সব রকমেরই পাওয়া যায়।

শত শত প্রকারের পুতুল জাপানে তৈরি করা হয়। উপরে মাত্র কয়েক ধরণের পুতুলের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতি জিলায় এবং প্রতি শহরে নিজস্ব পদ্ধতি আছে; আপন আপন বৈশিষ্ট্যে তারা প্রোজ্জ্বল। হাকাতা এবং কায়তো-র পুতুল তার মধ্যে আবার খুবই নামকরা।

পুতুলের দেশ জাপান; যে কোন রুচির মানুষের উপযোগী পুতুলের অভাব নেই জাপানে। যাঁরা পুতুল ভাল-বাসেন তাঁদের কাছে জাপান ইন্দ্রপুরীর মতই লোভনীয় মনে হবে।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

অনেক সময় দাড়িকামানোর ব্লেডগুলি নতুন থাকা সত্ত্বেও ব্লেডের কিনারায় একরকম ছিট্ ছিট্ দাগ লাগা থাকে। এইসব ব্লেডগুলির ওপরের মোড়কের কাগজটি খুলেই দেখা যায়, এর ওপর এমন ধরণের দাগ পড়েছে যেন মনে হয়, কতকগুলি পোকা চলে ফিরে তাদের পদচিহ্ন এঁকে রেখে গেছে। এই ধরণের দাগকে বৈজ্ঞানিকরা "ফিলিফর্ম করোসন" অর্থাৎ সুতার মত সূক্ষ্ম জরা দাগ বলেন। মোড়কের মধ্যে থাকা সত্ত্বে এরকম দাগ কেন হয় বলা শক্ত। কারখানার আবহাওয়ার আর্দ্রতার জন্যও ঘটতে পারে কিংবা ভিজে ধুলা বা ছাই উড়ে পড়ার দরুণও হতে পারে। অতএব কারখানার আবহাওয়ার আর্দ্রতা দূর করতে পারলেই ব্লেডের ওপর এই ধরণের মরচে পড়া বন্ধ হয়। "ব্রিটিশ ন্যাশনাল কেমিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি" এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ব্লেডের মোড়কের কাগজটি যদি সোডিয়ম বেনজয়েট্-এ ভিজিয়ে নিয়ে ব্লেড মোড়া হয় তাহলে আর এরকম মরচে পড়ে না। এই ব্যবস্থা শুধু যে ব্লেডের পক্ষেই কার্যকরী তা নয়, এ ধরণের পাতলা ইস্পাতের পাতের যে কোনও জিনিস তৈরী করতে হলে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

*

আমেরিকার নৌবহর দুটি নতুন ধরণের আণবিক ডুবোজাহাজ তৈরি করেছে। এই ধরণের ডুবোজাহাজ ভবিষ্যতে অন্যান্য জাহাজদের পক্ষে সবচেয়ে বড় গুপ্ত মারণাস্ত্র হবে। এই আণবিক ডুবো-জাহাজ সমুদ্রের তলদেশে এত গভীরে এবং এত নিঃশব্দে যেতে পারবে যে, শত্রুপক্ষের জাহাজদের পক্ষে এর কোনও ক্ষতিসাধন করা প্রায় অসম্ভব হবে। এ জাহাজ জলের মধ্যে চলার সময় শুধু যে শব্দ হবে না তা নয়, এটা কোনও রকম বুদ্বুদ কাটাবে না এবং জলের মধ্যে কোনও রকম আলোড়নের সৃষ্টি করবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে এই অজ্ঞাত শত্রুটি দীর্ঘকাল জলের মধ্যে থাকতে পারে। জাহাজের নাবিকদের জন্য বিশেষ ধরণের পোষাক ও বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে বোতলে করে অক্সিজেন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই, তা ছাড়াও প্রয়োজন হলে জল থেকে খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন তৈরি করে নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

*

আকাশ দিয়ে এয়ারোপ্লেনগুলি যখন উড়ে যায় তখন মনে হয় না যে, এরা আবার জমিতে নেমে আসে। বাস্তবিক-পক্ষে এদের ওড়বার রসদ এরা জমি থেকেই সংগ্রহ করে। সাধারণত প্লেন-গুলিতে নীচ থেকেই পেট্রোল ভরে দেওয়া হয়, এমন কি দূরপথের যাত্রী বিমানগুলিকেও মাঝ পথে নেমে এসে পেট্রোল সংগ্রহ করতে হয়। সামরিক বিমান, বিশেষত নৌবহরের বিমানগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই অসুবিধাজনক ছিল। নতুন ব্যবস্থা মত এইবার বিমান-গুলিকে আর নীচে নেমে পেট্রোল নিতে হয় না। একটা খুব বড় বিমানে পেট্রোল ভরে উড়িয়ে দেওয়া হয়, এটিকে "ট্যাঙ্কার প্লেন" বলে। যে বিমানের পেট্রোলের প্রয়োজন হয় তারা এই উড়ন্ত প্লেন থেকেই পেট্রোল সংগ্রহ করতে পারে। ট্যাঙ্কার প্লেন থেকে একটা হোস পাইপ যে প্লেনের পেট্রোল দরকার তার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়, ফলে একটি উড়ন্ত প্লেন থেকে আর একটি উড়ন্ত প্লেনে পেট্রোল সরবরাহ করা হয়।

*

শীতে যখন খুব কষ্ট হয়, তখন মনে হয় গরমকালটাই ভালো, আবার গরম-কালে আই-ঢাই করতে করতে মনে হয় কবে শীতকাল আসবে। একই ঋতুতে ঘরে বসে যদি নানা রকম ঋতুর আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়, তাহলেই বোধ হয় মানুষ সুখী হতে পারে। এই ব্যবস্থার প্রচলন হচ্ছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের সুখের জন্য নয়। কোনও কোম্পানী পরীক্ষাকার্যের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে। কোনও প্লাস্টিকের জিনিস ও ইস্পাতের দ্রব্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ঋতুতে কী অবস্থা প্রাপ্ত হবে, সেইটাই এই ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

ট্যাঙ্কার প্লেন থেকে অন্য প্লেনে পেট্রোল ভরা হচ্ছে

শ্রীবিমল মিত্র

২১

সেদিন ছোটবৌঠান ডেকে পাঠালেন।

বংশী বললে—অত ঘুরে যাবার দরকার কী শালাবাবু—এই তো সামনেই দরজা—

কী জানি কেমন যেন সংকোচ হলো ভূতনাথের। সেদিন দরজার ফাঁক দিয়ে অন্দরমহলের যে নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখেছে তারপর ওটা খুলতে আর সাহস হয়নি তার। এ ক'দিন একটু একটু বাগানে বেড়িয়েছে গিয়ে। পুকুরের পাড়ে গিয়ে হাওয়া খেয়েছে।

ছুটুকবাবু দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কী খবর ভূতনাথবাবু, দেখাই পাওয়া যায় না আপনার—সেদিন ওস্তাদ ছোট্টু খাঁ এসেছিল, আহা, পুরিয়ার খেয়াল যা শোনালে—কানা বাদল খাঁর পরে অমন পুরিয়া আর শুনিনি মাইরী—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজকে আসর বসবে নাকি?

—আর আসর—আসরই বোধহয় ভেঙে দিতে হবে—এখন যাত্রা-থিয়েটারের গানেরই আদর বেশী দেখছি—ওস্তাদী গানের আর কদর কই—তেমন ওস্তাদও আর জন্মাচ্ছে না—তা আসুন আজকে আপনি—

—কখন—

—সন্ধ্যেবেলা—

বাড়ির চারদিকে রাজমিস্ত্রী খাটছে। ছুটুকবাবুর বিয়ের জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই লোচন আবার দেখতে পেয়ে ডাকলে একদিন।

—আসুন শালাবাবু—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কী হচ্ছে—

এ-ঘরেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘর ধোয়া মোছা চলছে। হুঁকো, নল ফরাসি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে লোচন। বললে—ছুটুকবাবুর বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে হুজুর—নতুন ফরাসি এসেছে সব—নতুন তামাক এসেছে গয়া থেকে, খেয়ে দেখবেন নাকি?

ভূতনাথ বললে—না এখনও খাইনে—

—বড় ভালো জিনিস ছিল আজ্ঞে, এক টাকা ভরির জিনিস, এখানে বসে খেলে এ-বউবাজার অঞ্চলটা একেবারে খোসবাই হয়ে যাবে, মেজবাবু ফরমাস দিয়ে আনিয়েছে হুজুর, ছোটবাবুর বিয়ের সময় একবার এসেছিল—খাস নবাবী মাল কিনা—আধলা না-হয় নাই দিলেন, কে আর জানতে পারছে—

আতরের শিশি নিয়ে ঢেলে তামাক মাখতে বসলো লোচন।

তাড়াতাড়ি লোচনকে এড়িয়ে ভিস্তি-খানায় জল নিয়ে স্নান সেরে নিলে ভূতনাথ। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলে, একবার ব্রজরাখালের ঘরটায় গিয়ে দেখলে হয়। কোনও চিঠিপত্র এসেছে কিনা। কেমন ধারা লোক ব্রজ-রাখাল। একটা খবর পর্যন্ত দিলে না। কোথায় গেল! কেমন আছে সেখানে। কিন্তু ব্রজরাখালের ঘর তেমনি তালাবন্ধ পড়ে আছে।

পাশের ঘরে ব্রিজ সিং আটা মাখছিল। বললে—মাস্টার সাব্ তো নেহি হায় শালাবাবু—

—কোথায় গেছেন জানো ব্রিজ সিং—

—কেয়া মালুম বাবু, রোজ রোজ হামেশা দশ বিশঠো আদমি এসে পুছে—লেকিন মাষ্টারসাব তো পাত্তা ভেজলো না—

দুপুরবেলাটাও কাটতে চায় না আর। সেই কর্কশ এক-একটা চিলের ডাক বাতাসে ভেসে আসে। এখানে বসে ফতেপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে 'কুয়োর ঘটি তোলা—আ—আ' শব্দ করতে করতে যায়। কখনও যায় মুশকিল আসান। তখন অন্দরে বেশ গুলজার চলে। দরজাটার কাছে গিয়ে কান পাতলে বিচিত্র কথা শোনা যায়।

মেজবৌ গিয়ে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ বড়দি সিন্ধু যে তোমায় খাইয়ে দিচ্ছে বড়—

সত্যি সত্যি বড়বৌ-এর ঝি সিন্ধুই ভাত খাইয়ে দিচ্ছে আজ।

—ওমা একি—

গিরিও এসে পাশে দাঁড়িয়ে গালে হাত দেয় বুঝি।

শুচিবায়ুগ্রস্তা বড় বৌ-এর বিচিত্র কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে।

সিন্ধু বলে—বড়মা'র দু'টো হাতই অশুদ্ধ হয়ে গেছে আজ—

মেজ বৌ হাসতে হাসতে বলে—এরকম অশুদ্ধ হলো কী করে বড়দি—

বড় বৌ হাসেন না। বলেন—কাপড় শুকোবার দড়িতে হাত দিয়েছিলুম—আর ওমনি পোড়ারমুখো একটা কাক কোত্থেকে এসে বসলো দড়িতে—

হাসি চাপতে পারে না গিরি।

মেজবৌ আবার জিজ্ঞেস করে—তা' এমন অশুদ্ধ কদ্দিন চলবে তোমার?

বড় বৌ বুঝি রাগ করলেন। বলেন—হাসিস নে মেজ বৌ, হাসতে নেই—হাসলে তোরও হবে—

মেজ বৌ বলে—রক্ষে করো মা, আমার হয়ে কাজ নেই, সাত জন্মে অমন রোগ আমার হবে না—আমার ভাতার আছে, আমার কেন হতে যাবে—

বড় বৌ মেজ বৌকে কিছু বলেন না। বলেন সিন্ধুকে—শুনলি তো সিন্ধু, তবু যদি ওর ভাতার ঘরে শুতো—

মেজ বৌ কিন্তু রাগে না কথা শুনে। খিল্ খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসির দমকে হাতের চুড়ি গায়ের গয়না টুংটাং বেজে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে —আর ভাসুর ঠাকুর কা'র ঘরে শুতো বলবো বড়দি—বলে দেবো—

কথা শুনতে শুনতে ভূতনাথের একবার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। এত বড় বাড়ির বউ সব—এরা কী ভাষায় কথা বলে!

বড় বৌ একবার চীৎকার করে ডাকেন —ছোট—ও ছোট—ও ছোট বউ—ছুটি—

চিন্তা খর খর করে এগিয়ে আসে—ছোটমাকে ডাকছো নাকি বড়মা—

—ডাকতো একবার ছোটমাকে তোর—এসে কান্ড দেখে যাক্—

—কী হলো বড়দি—

ছোট বৌঠান বুঝি এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বলে—আবার বুঝি তুমি বড়দিকে কিছু বলেছ মেজ্‌দি—

—দেখ্‌না ভাই—সারা দিনমান উনি ন্যাংটো হয়ে ঘোরাঘুরি করবেন, কিছু বললেই দোষ, আমরাও গা খুলে বেড়াই, কিন্তু পরনের কাপড়টা পর্যন্ত....

—ওর না হয় রোগ হয়েছে মেজদি, কিন্তু তোমাকেও তো দেখেছি, তুমিই বা কম যাও কিসে—

—তুই আর বলিসনি ছোট, তোর আবার বড্ড বাড়াবাড়ি, কে আছে শুনি দশটা চোখ মেলে? অত জামা কাপড়ের বাহার কেন শুনি, ঘরের মানুষেরা তো ফিরেও চায় না—

ছোট বৌঠান কী জবাব দেবে বুঝি ভেবে পেলে না।

তারপর বললে—তুমি কি সত্যিই চাও মেজ্‌দি যে, ঘরের মানুষ ঘরে থাকুক—

—তুই আর কথা বাড়াসনে ছোট, বড় ঘরের পুরুষমানুষরা কবে আর ঘরে কাটিয়েছে শুনি, আমার বাপের বাড়িতেও দেখেছি, এ-বাড়িতেও দেখছি—তোর বাপের বাড়ির কথা অবিশ্যি আলাদা—

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। নাপ্‌তিনী আসে আলতা পরাতে। মেজ বৌ আলতা পরে, নখ চাঁছে, পায়ে ঝামা ঘষে। গল্প করে ইনিয়ে বিনিয়ে। সাদা সাদা পা বাড়িয়ে দিয়ে মেজ বৌ গল্প করে।

—হ্যাঁরে রঙ্গ, কাল রাত্তিরে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল কেন রে?

নাপিত বউ বলে—ধোপা বৌ-এর ছেলে হয়েছে যে মেজমা—শোননি?

—ওমা এই সেদিন যে মেয়ে হলোরে একটা—বছর বিয়ুনি নাকি? খুব ভাগ্যি ভালো তো ধোপা বৌ-এর—

হঠাৎ তেতলার সিঁড়ি দিয়ে বংশী তর্ তর্ করে উঠে আসে।

বলে—ছোটবাবু আসছে মা—

নাপ্‌তিনী সন্ত্রস্ত হয়ে এক মাথা ঘোমটা টেনে দেয়। মেজ বৌ গায়ের কাপড়টা টেনে দেয়। গিরি লম্বা করে ঘোমটা টেনে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।

মেজ বৌ বলে—ওমা ছোট দেওর যে ...কী ভাগ্যি—

ছোটবাবু তর্ তর্ করতে করতে উঠে আসে তেতলায়। বাতাসে একটা মৃদু গন্ধ। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

প্রতিদিন এই দৃশ্যেরই রকম-ফের অন্দরের বউ-মহলে। ভূতনাথের মনে হতো এত বড় বাড়ির বৌ সব—এরাও তো আর পাঁচ বাড়ির বৌদের মতনই সাধারণ। অতি সাধারণ। শুধু দূর থেকেই বুঝি একটা রহস্যের আবরণ থাকে। অন্দর-মহলের ভেতরে যখন এই দৃশ্য, বাইরের মহলেও ওমনি সাধারণ ঘটনাই ঘটে সব।

বংশী সেদিন শশব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছিল।

—আসুন শালাবাবু, মজা দেখবেন আসুন, গন্ধবাবা এসেছে—

—গন্ধবাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বারবাড়িতে লোক আর ধরছে না, গন্ধবাবা এসেছে, যে-যা গন্ধ চাইছে গন্ধবাবা তাই-ই দিচ্ছে—

ভূতনাথও ছুটলো। গাড়িবারান্দার নিচে পৈঁঠের ওপর বসে আছে এক সাধু। মাথায় জটা। কপালে সিঁদুরের প্রলেপ। বিকটাকার মূর্তি। চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চাকর-বাকর লোক-লস্কর সবাই। দাসু জমাদারের ছেলেমেয়েরাও এসে দূরে দাঁড়িয়ে গেছে। ইব্রাহিমের ছাদের ওপরেও লোক।

অনেক কষ্টে বংশী ভূতনাথকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো ঠেলে ঠুলে।

লম্বা চওড়া চেহারা লোকটার।

বলছে—বেহেস্ত্ কা হুরী আউর জাহান্নম্ কা কুত্তি ইয়ে সব ঘারেল হোতি হায়—হামারা ইয়ে পাত্থল্ দেওতা মহাদেওতানে আপ্‌না হাতসে দিয়া হুয়া হ্যায়—ই পাত্থল্ দেখো—গরীবোঁকো রূপিয়া দেনেওয়ালে, মোকদ্‌মামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা—মাঙ্‌নেওয়ালোঁকো সব কুছ দেনেওয়ালা—ই পাত্থল্ দেখো—দেওতাকো জরিমানা পাঁচ পাঁচ আনা—

মধুসূদন ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—গন্ধবাবা, আমাকে পদ্মফুলের গন্ধ করে দাও দিকি হাতে—দেখি একবার—

গন্ধবাবা পাথরটা দিয়ে মধুসূদনের হাতের তেলোয় ঘষে দিলে।

মধুসূদন হাতের তেলোটা শুঁকে দেখে। সত্যিই তো! খাঁটি পদ্মফুলের গন্ধ!

—দেখি মধুসূদন কাকা, দেখি শুঁকে—

—দেখি আমি শুঁকে দেখি—

সবাই শুঁকে পরীক্ষা করে দেখে ভুল নেই। কোনও ভুল নেই। পদ্মফুলই বা কোথাওকে এল।

—গন্ধবাবা, আমার হাতে কেরোসিন তেলের গন্ধ করে দাওতো দেখি—

গন্ধবাবা পাথরটা তার হাতে ঘষে দিলে আবার। যে-হাতে পদ্মফুলের গন্ধ ছিল সেই হাতেই এখন কেরোসিন তেলের কড়া গন্ধ।

—দেখি শুঁকে দেখি—

—ওমা, কেরোসিনের গন্ধই তো বটেক্—

সবাই ঝুঁকে পড়ে।—

গন্ধবাবা আবার বক্তৃতা দেয়—বেহেস্ত্‌কা হুরী আউর জাহান্নম্ কা কুত্তি ইস্‌সে সব কুছ্ ঘায়েল হোতি হ্যায়—হামারা ইয়ে পাত্থল্ দেওতা মহাদেওতানে আপ্‌না হাতসে দিয়া হুয়া হ্যায়—ই পাত্থল্ দেখো—গরীবোঁকো রুপিয়া দেনেওয়ালা, মকদ্‌মামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা, মাঙ্‌নেওয়ালাকো সব কুছ্ দেনেওয়ালা—দেওতাকো জরিমানা পাঁচ পাঁচ আনা...

পাঁচ আনার পুজো দিতে হবে। মাত্র পাঁচ আনাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এমন সুযোগ বোধহয় কেউ ছাড়তে চাইলে না।

বংশী চুপি চুপি বললে—শালাবাবু, ভাইটার চাকরির জন্যে পাঁচ আনা জরিমানা দেব নাকি—

মধুসূদনেরও বুঝি কিছু মনস্কামনা ছিল। দেশের একটা ধানজমির ওপর বহুদিনের লোভ। নিজের জমির লাগোয়া। দরে পোষাচ্ছিল না। সে-ও পাঁচ আনা দিলে জরিমানা। হুড় হুড় করে আরো পয়সা পড়তে লাগলো।

গন্ধবাবা তখনও বক্তৃতা দিয়ে চলেছে—সব ইয়ে পাত্থল্‌কা খেল্, মহাদেওতা মহাদেওকী খেল্, ইয়ে পাত্থল্...দুনিয়ামে যো কুছ্ মাঙ্‌না হায় তো মাঙ লেও, ইয়ে পাত্থল্‌কো দৌলতমে সব কুছ্ মিলনেওয়ালা হ্যায়, বেহেস্তকা হুরী আউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়, হামারা ইয়ে পাত্থ্‌ল—গরীবোঁকো রুপেয়া দেনেওয়ালা, মকদ্‌মামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা, মাঙনেওয়ালোঁকো সব কুছ্ মিলনেওয়ালা...

দেখতে দেখতে পঞ্চাশ ষাট টাকার খুচরো পয়সা জমে উঠলো গন্ধবাবার সামনে।

হঠাৎ ভূতনাথেরও মনে হলো যেন তারও কিছু মনস্কামনা করবার আছে। নিজের চাকরি নয়। সংসারে কারোর কিছু নয়। কিন্তু অন্তত ছোট বৌঠানের জন্যে যেন পাঁচ আনা জরিমানা দিলে হয়। যেন সুখী হয় ছোট বৌঠান। যেন স্বামী-সেবা করতে পারে ছোট বৌঠান। যেন মনস্কামনা সিদ্ধি হয় ছোট বৌঠানের। যেন মোহিনী সিঁদুরে যে-কাজ হয়নি তা সফল হয়।

গন্ধবাবা জিজ্ঞেস করলে—তুলসীপাতা হ্যায় ইধার—?

—আছে বাবা, আছে তুলসীপাতা আছে—

গন্ধবাবা সবার হাতে গাঁজার কলকে থেকে নিয়ে একটুকরো পোড়া তামাক দিলে। সেই পোড়া তামাক হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে তুলসীগাছকে প্রণাম করে এসে আবার হাতের মুঠো খুলতে হবে।

বংশী, মধুসূদন, লোচন, বেণী, দাসু জমাদার, ইব্রাহিম কচোয়ান, ইয়াসিন সহিস, ব্রিজ সিং সবাই মনস্কামনা নিয়ে মহাদেবকে পাঁচ আনা জরিমানা দিয়েছে। সবাই হুকুম মত কাজ করলো।

গন্ধবাবা এবার সকলের মুঠোর ওপর তার স্ফটিক পাথর ছুঁইয়ে দিলে। মনে মনে কোনও মন্ত্র পড়লো কিনা কে জানে। তারপর বললে—আবি মুঠি খোল—

বংশী ভূতনাথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বংশীও মুঠো খুললো—

ভূতনাথ দেখলে তার মুঠোর মধ্যে পোড়া তামাকের বদলে একটা নীল কাগজ। নীল কাগজের ওপর একটা ত্রিভুজ আঁকা। সেই ত্রিভুজের ভেতর আরেকটা ত্রিভুজ।

সকলের হাতের মুঠোর মধ্যে ওই একই ব্যাপার।

গন্ধবাবা বললে—মাদুলী করে ওটা গলায় পরতে হবে—একমাস পরে গন্ধবাবা আবার আসবে এ-বাড়িতে, তখন যদি না মনস্কামনা পূর্ণ হয় তো সকলের পয়সা ফেরৎ দিয়ে যাবে—

বংশী বললে—শালাবাবু, আপনিও একটা জরিমানা দিন না আজ্ঞে—

ভূতনাথও সেই কথা ভাবছিল।

গন্ধবাবা তখন টাকাপয়সাগুলো

কুড়োচ্ছে আর মুখে বক্তৃতা—বেহেস্ত্ কা হুরী, আউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়—ইস্ পাথল্—, মহাদেওনে দিয়া হুয়া হ্যায়—গরীবোঁকো রুপেয়া দেনেওয়ালা, মক্‌দমামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা, মাঙনেওয়ালোঁকো সব কুছ্...

হঠাৎ এক কান্ড ঘটে গেল।

বদরিকাবাবু বুঝি গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন—কী হচ্ছে রে—এত গোলমাল কীসের—

মস্ত বড় ভুঁড়ি। গায়ে তুলোর জামা। বরাবর বৈঠকখানা ঘরে শুয়েই থাকেন। বড় একটা লোকচক্ষুর সামনে বেরোন না। এই আজকের অস্বাভাবিক গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন প্রথম।

—কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া?

গন্ধবাবার সামনে এসে বললেন—কেয়া হুয়া? কোন্ হ্যায় তুম্—

বংশী বললে—উনি গন্ধবাবা—

আরো অনেকে বললে—যা গন্ধ চান্, উনি করে দেবেন আজ্ঞে—

সব শুনলো বদরিকাবাবু। বললেন—দাও দিকি আমার হাতে গন্ধ করে—ফুলের গন্ধ করে দাও—নিমফুলের গন্ধ—

নিমফল! তাই সই।

গন্ধবাবা স্ফটিক পাথরটি একবার হাতে ঘষে দিলে বদরিকাবাবুর। তারপর আওড়াতে লাগলো—বেহেস্তকা হুরী ওউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্‌সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়...কেয়া বাবুজি মিলা?

বদরিকাবাবু বার বার নিজের হাতটা শুঁকতে লাগলেন। যেন অবাক্ হয়েছেন একটু।

বললেন—কী করে করলে বলো দেখি বাপধন—

—ইয়ে পাথল্‌কা খেল্ হ্যায় বাবুজি, মহাদেওতানে দিয়া হুয়া হ্যায়—

—দেখি বাবা তোমার পাথরখানা—

ছোট স্ফটিকখানা নিয়ে বার বার দেখতে লাগলেন বদরিকাবাবু। সামান্য একটুকরো পাথরের কারসাজি! অবিশ্বাসের বিদ্রূপ ফুটে উঠলো ভাব-ভঙ্গীতে। ছোট ছেলে যেমন রসগোল্লা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে! মুর্শিদ-কুলী খাঁর কানুনগো দর্পনারায়ণের শেষ বংশধর। সহজে বিচলিত হবার লোক নন্। কত রাজা মহরাজাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তুড়ি দিয়ে। ইতিহাসের বিলুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের এক টুক্‌রো ফসিল্ যেন হাতে নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে বসেছেন।

বললেন—কী হয় এতে বাপধন?

গন্ধবাবা বললে—সব কুছ্ হো স্যাক্‌তা হ্যায় বাবুজি—মহাদেওকা কিরপা মে...

—অমর হওয়া যাবে?

—জী হাঁ, অমর ভি হো স্যাক্‌তা হ্যায়—

—তবে অমরই হয়ে যাই—

বলে বলা-নেই—কওয়া-নেই বদরিকা-বাবু পাথরটা নিয়ে টপ্ করে মুখে পুরে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গন্ধবাবা চিৎকার করে উঠলো—সত্যনাশ হো গয়া, সত্যনাশ হো গয়া...

—আরে রাখ্ তোর সর্বনাশ, সর্ব-নাশের মাথায় পা—বলে বদরিকাবাবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেন কিছু অস্বস্তি বোধ করছেন।

বললেন—লোচন এক গ্লাস জল দে তো—

গন্ধবাবা বললে—বাবুজী মর্ যাইয়ে গা—

কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো যেন বদরিকাবাবুর দম আটকে আসছে। আই-ঢাই করতে লাগলো সারা শরীর। চোখ দুটো উল্টে এল। গেলাস গেলাস জল খেলেন। মস্ত বড় ভুঁড়ি আরো ফুলে উঠল দেখতে দেখতে। সাক্ষাৎ মহাদেবের দেওয়া স্ফটিক যে! (ক্রমশঃ)

ফের আগুন

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বজ্রমুখর আগুন কি ফের জ্বলবে?
মদের নেশায় মাতাল পৃথিবী টলবে?
হানাহানি—এই ভয়
মুছে দিতে কেউ কল্যাণকামী নয়?
মশা ও মাছির মতই জীবন
মৃত্যুতে পাবে লয়?
তবু ছাই-চাপা হঠাৎ আগুন
নড়ে'চড়ে' ওঠে দ্রুত বহুগুণ,
স্ফুলিঙ্গশিখা আকাশে ছড়ায়—
বর্মা, মালয়, চীন, কোরিয়ায়,
শত আশ্রয়-নীড়
ঠুনকো কাঁচের মতই কখন
বারুদের স্বাক্ষর
সারা অম্বরে ঘনঘটা-মর্মর
ছড়াতে চায় কি—সমুদ্রপ্লাবী ঝড়?—
তাই বিদ্যুৎ কাঁপে?
পৃথিবী হবে কি পুড়ে ছারখার
বারবার অভিশাপে?
ঈশ্বর তুমি নেই
এ মাটির ঢেলা নির্মম আঘাতেই
অবিরাম চিড় খাবে?
মৈত্রী কি সম্ভাবে
পৃথিবী সামলে রাখো,
বারুদ কাদায় ঢাকো,—
বিস্ফোরণকে দূরে,
ম্লানদিগন্তে উজ্জ্বল রোদ্দুরে
আরবার ছবি আঁকো,

সাহিত্য-পাঠকের ডায়েরি

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রবাদ আছেঃ 'হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।'

মুখমণ্ডলের স্নায়ু-পেশী-ত্বকের প্রসারণ-সংকুচনে হাসির কর্তৃত্ব আছে, সন্দেহ নেই। ফলে, একরকম যন্ত্রণাও ঘটতে পারে। কপালে ত্বকের টান ধরতে পারে। তবে সে টানের বিস্তারও বেশি নয়, আয়ুও অমিত নয়। হাসির ঝাপ্‌টা বৃষ্টির পশলার মতোই কিছু-ক্ষণ থেকে থিতিয়ে ক্ষান্ত হয়। তেমনি হলেই ভালো লাগে। মন হালকা লাগে, শরীর শক্তি পায়,—জীবন হাস্যবর্ষণে রৌদ্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পরশুরামের 'ধুস্তুরী মায়া'* কপাল-ব্যথা-করা হাসির বই নয়। তাঁর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'—এই সব ক'খানিই হলো হাসির নির্ঝর—স্বাস্থ্যকর এবং তৃপ্তিকর। ১৩৩২-এ বেরিয়েছিল 'গড্ডলিকা', —১৩৩৫-এ 'কজ্জলী',—তার কিছুকাল পরে 'হনুমানের স্বপ্ন';—আরও পরে ১৩৫৭ সালে দেখা দিলো তাঁর নতুন দশটি গল্পের সংগ্রহ 'গল্পকল্প',—এবং পরিশেষে, সম্প্রতি বেরিয়েছে আরও বারোটি হাসির গল্প;—প্রথম গল্পের নাম অনুসারে এই বইখানির নাম দেওয়া হয়েছে 'ধুস্তুরী মায়া'।

'ধুস্তুরী মায়া'-র মায়ামোহ উপভোগ করে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের একটি উক্তি মনে পড়া অবান্তর নয়। মোহিতলাল লিখেছিলেনঃ—"আর এক-জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিশালী লেখকের নাম করা যাইতে পারে—ইনি 'গড্ডলিকা'-প্রণেতা পরশুরাম। ইঁহার রচনায় যে হাস্যরস আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে wit এবং fun থাকিলেও তাহা অতি স্নিগ্ধ সংযত satire; তাহার সেই fun-এর অন্তরালে একটা অতিশয় প্রচ্ছন্ন cynical laughter আছে।" মোহিতলাল পরশুরামের 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' এবং 'ভূষণ্ডীর মাঠ' গল্প দুটির উল্লেখ করে এই অভিমত জানিয়েছেন যে,—১] এ ধরণের হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে নতুন; ২] তবু এসব রচনায় "লেখকের attitude খাঁটি 'হিউমার'-এর attitude নয়—কারণ, এই হাস্যরসের অন্তরালে, মানুষের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে একটি সহৃদয় রসকল্পনার যে নির্লিপ্ত প্রসন্নতা, তাহা অপেক্ষা বিদ্রূপের ভঙ্গিই প্রবল; ৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "হাস্যরসে যে উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার হাস্যরসসৃষ্টির মূলে এক ধরণের poetic reason বা কবি-বুদ্ধি আছে, পরশুরামের হাস্যরসে তাহা নাই।"

সমালোচকের কলমের খোঁচায় হাসির চারুকলা বিদীর্ণ হয়ে তত্ত্বের হাড় বেরিয়ে পড়ে। তাৎপর্যের ওজন বুঝতে বসে স্বতঃসিদ্ধের খুশি হারাতে হয়। তবু, সমালোচকরা বরণীয়। কারণ, তাঁরাই প্রাকৃত বুদ্ধিকে মার্জিত করে রুচি সৃষ্টির আনুকূল্য করেন। অতএব, পরশুরাম সম্পর্কে এই মন্তব্যগুলির পুনর্বিবেচনা আবশ্যক। 'ধুস্তুরী মায়া' প্রকাশিত হওয়ার ফলে এ কাজে অগ্রসর হবার একটি উপলক্ষ্য হস্তগত হলো।

উদ্ধব পাল আর জগবন্ধু গাঙ্গুলী, —দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুরেই বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। উদ্ধব হলেন ইমারতী রঙের ব্যবসায়ী—বেঁটে, মোটা, শ্যামবর্ণ, মাথায় টাক, কাঁচাপাকা ছাঁটা গোঁফ; জগবন্ধু লম্বা, রোগা, ফরসা, গোঁফ দাড়ি নেই,—ডামরুলতলা হাই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। জগবন্ধু মুৎদার; উদ্ধব স্বল্পশিক্ষিত, বহুবিত্ত, পত্নীসেবিত এবং এতৎসত্ত্বেও অসুখী। উদ্ধব তাঁর বন্ধুর সঙ্গে স্বপনপুরী-সিনেমায় সম্প্রতি 'লুটে নিল মন' দেখে-ছেন। জগবন্ধুকে বলেছেনঃ "দেখা ইস্তক মনটা খিঁচড়ে আছে। জীবনের যা সব চাইতে বড় সুখ—প্রেম, তাই আমার ভোগ হল না।"

জগবন্ধু জবাব দিলেনঃ "অবাক করলে তুমি। বাড়িতে সতীলক্ষ্মী গৃহিণী
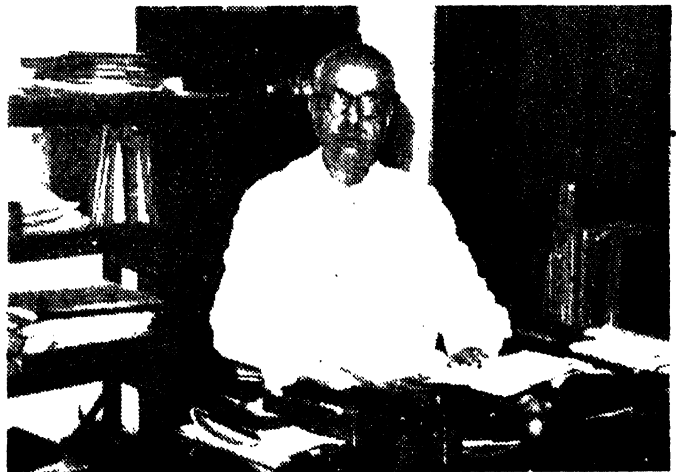
* ধুস্তুরী মায়া : পরশুরাম (১৩৫৯) এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২। মূল্য—৩ টাকা।

আছেন, তবু বলছ প্রেম হয়নি......!" ঢাকুরে-লেকের ধারে একটা বড় শিমুল গাছের তলায় বসে আলাপ হচ্ছিল। সেই গাছে থাকতো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী। উদ্ধব-জগবন্ধুর আলাপের মূলকথাটা সম্বন্ধে নিয়ে ব্যাঙ্গমা কি করলো? পরশুরামের নিজের কথা তুলে দেখা যাকঃ—

"—বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে। এই বলে ব্যাঙ্গমা তার সায়ংকালীন কোষ্ঠশুদ্ধি করলে। উদ্ধব আর জগবন্ধু রুমাল দিয়ে মাথা মুছে একটু সরে বসলেন।

ব্যাঙ্গমী বললে, তোমার তো নানা-রকম বিদ্যে আছে, একটা উপায় বাতলে দাও না। আহা, বুড়ো বেচারার মনে বড় দুঃখু, যাতে তার শখ মেটে তার ব্যবস্থা কর।"

ব্যাঙ্গমা বলে দিলো 'ধুস্তুরী ছোলার' রহস্য। এক এক ধুস্তরী ছোলার গুণে দশ-দশ বছর বয়স কমে যাবে।

"উদ্ধব ফিস ফিস করে বললেন, নোট করে নাও হে, নোট করে নাও। জগবন্ধু তাঁর নোটবুকে লিখতে লাগলেন।" অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হলো। উদ্ধব ধুস্তুরী-ছোলা খেয়ে তরুণ হলেন। 'প্রেমের' ক্ষুধায় 'কাঁচা বয়সের সোয়াদ' চাখবার জন্য ব্যগ্র বন্ধুকে জগবন্ধু অবশ্য বলেছিলেন—"উদ্ধব ভাই, আমার কথা শোন, আলেয়ার পিছনে ছুটো না, ঘরে ফিরে চল। বেশ আছ, সুখে থাকতে কেন ভূতের কিল খাবে।"

কিন্তু ভূতের কিল না-খাওয়া পর্যন্ত তৃপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? রাজকুমারী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্পন্দচ্ছন্দা চৌধুরাণী এবং তাঁর সম্পর্কে-দাদা বার-অ্যাট-ল মকর রায়ের তর্জন-গর্জনের দিকে তুড়ি মেরে জেগে রইলেন উদ্ধবের অভ্যাস-সংস্কার-প্রবৃত্তিময় প্রবীণ সত্তা। মনে পড়লো গৃহলক্ষ্মী কালিদাসীর হাতের রান্না, মনে পড়লো সুদীর্ঘ, সুঅভ্যস্ত, বহু-নির্ভর-নিশ্চিত দাম্পত্য। ১৯শে বৈশাখ, বুধবার অমাবস্যা তিথিতে ধুস্তুরী ছোলা খেয়ে উদ্ধব-জগবন্ধু তরুণ হয়েছিলেন। জগবন্ধু অবশ্য সাংখ্যের পুরুষের মতো সাক্ষী মাত্র উদ্ধবের সঙ্গী ছিলেন। তারপর কালিদাসীর মহিমা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে এসে তিনটি বেলপাতা চিবিয়ে পুনরায় মন্ত্র পাঠ করলেনঃ—

বম মহাদেব সকল বস্তু
আগের মতন আবার অস্তু।

সকল বস্তু আবার পূর্বাবস্থায় ফিরলো। শুধু তাই নয়, বোঝা গেল যে ১৯শে বৈশাখ বুধবার আদৌ অতিক্রান্ত হয়নি। সবই ধুস্তুরী মায়ার মোহ। মনের অমাবস্যা কেটে গিয়ে পূর্ণিমা দেখা দিয়েছে। এই মাত্র!

মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। সে কাহিনীতে প্রবীণ জমিদার ভক্তপ্রসাদকে দেখা গিয়েছিল। ভক্তপ্রসাদ একই সঙ্গে অর্থলোভে এবং লাম্পট্যলোভে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অর্থ এবং কাম—চতুর্বর্গের এই দুটি বর্গ পাশাপাশি বিদ্যমান। হানিফের যুবতী স্ত্রীকে কামনা করে ভক্তপ্রসাদ ভেবেছিলেন —"মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?" অবশেষে "দীনবন্ধো, তুমিই যা কর"—বলে ভক্তপ্রসাদ তাঁর লক্ষ্য স্থির করেছিলেন।

পরশুরামের 'ধুস্তরী মায়া'র উদ্ধব পালও অর্থবান, কৃতী, কামাতুর ব্যক্তি। ভক্তপ্রসাদ ইংরেজি জানতেন না, ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর স্বভাবের বিরোধিতা ছিল। পরশুরামের উদ্ধব পাল কিন্তু ঈষৎ অন্য প্রকৃতির মানুষ। তিনি বলেছেনঃ "আজকাল অ্যাং ব্যাং চ্যাং সবাই বিলেত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসছে। আমারও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইংরিজী বলতে পারি না, হ্যাট-কোট-পায়জামা-আচকান পরতে পারি না, কাঁটা চামচ দিয়ে খেলে পেট ভরে না, কাজেই যাবার জো নেই।"

সে যাই হোক, ভক্তপ্রসাদ এবং উদ্ধব পালের অবস্থা এবং স্বভাবের কিছু সাদৃশ্য যে চোখে পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলাদেশে উনিশের শতকের অর্থ-কৌলীন্য-লালিত লাম্পট্যের সঙ্গে বিশের শতকের বিত্তসামর্থ্য-লালিত লাম্পট্যের কিছু সাদৃশ্য থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

পরশুরামের এই কাহিনীতে এবং 'ধুস্তুরী মায়া' গল্পসংগ্রহের অন্যান্য গল্পে মোহিতলাল-কথিত wit, fun, satire—সবই আছে। তবে কাহিনী শেষ করে যে cynical কি অন্য কিছু, তা নিয়ে বিতর্ক জমতে পারে।

Hazlitt বলেছিলেনঃ 'wit is the salt of conversation, not the food.' পরশুরামের লেখাতেও wit-এর তাদৃশ ব্যবহারই ঘটেছে। তিনি Swift-এর সতর্কবাণী মনে রেখে কলম ধরেছেন বলে মনে হয়। Swift-ই তো বলেছিলেনঃ—'Perpetual aiming at wit is a very bad part of conversation.' 'Wit-ব্যাপারটা কি? Locke অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেনঃ—'wit consists in assembling and putting together with quickness, ideas in which can be found resemblance and congruity, by which to make up pleasant pictures and agreeable visions in the fancy.'

পরশুরামের 'হনুমানের স্বপ্নে'র শেষ গল্প 'তৃতীয় দ্যূতসভা'র শেষ উক্তিতে চমৎকার wit-এর নমুনা আছে এবং কেবল wit-ই নয়। মোহিতলাল যাকে বলেছেন 'cynical laughter'—কতকটা তেমনি হাসিই যেন সেই উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। অতএব উক্তিটি তুলে দেখা যাক:—

"বলরাম বললেন, 'মৎকুনি, তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার সঙ্গে দ্বারকায় চল। সেখানে অহিংস সাধুগণের একটি আশ্রম আছে, তাতে অসংখ্য উৎকুণ-মৎকুণ-মশক-মূষিকাদির নিত্য সেবা হয়। তোমাকে তার অধ্যক্ষ করে দেব, তুমি নব নব গবেষণায় সুখে কালযাপন করতে পারবে।"

এখানে 'উৎকুণ-মৎকুণ-সংযোগটি চমক-প্রদ এবং হাস্যকর এবং অহিংস সাধুগণের আশ্রমে মৃত্যুভয়ভীত সুবলনন্দন মৎকুণির স্বার্থসন্ধানমূলক গবেষণার প্রস্তাবটি শুধু হাস্যকর নয়,—কুটিল ভবিতব্যের একটি নির্মম সহাস্য জৃম্ভণ!

'ধুস্তুরী মায়া'র গল্পমালার হাস্য-প্রকৃতি এতোটা নৈরাশ্যতাড়িত নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাকঃ—"প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি মুচুকুন্দ, ভারতজ্যোতি বঙ্গচন্দ্র কলিকাতাভূষণ মুচুকুন্দ" একই কালে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ

প্রতিষ্ঠানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ('লক্ষ্মীর বাহন' দ্রষ্টব্য)। "ইহকাল আর পরকাল দুদিকেই তাঁর সমান নজর আছে, তবে ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে মাথা ঘামান না, তাঁর পত্নীর আজ্ঞাই পালন করেন।" "মচুকুন্দ-গৃহিণী মাতঙ্গী দেবী লম্বা-চওড়া বিরাট মহিলা (হিংসুটে লোকরা বলে একখানা একগাড়ি মহিলা)।" এই মচুকুন্দর জীবনে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। তহবিল-তছরূপ জালিয়াতি জুয়াচোরাজি প্রভৃতির দায়ে তাঁকে জেলে যেতে হলো। সাত বছর কারাবাসের পরে তিনি সস্ত্রীক বারাণসী যাত্রা করলেন। এই গল্পটির সূচনায় পরশুরাম লিখেছেন:—

"এ দেশের অসংখ্য কৃতকর্মা চতুর লোকের যে নীতি মচুকুন্দরও তাই ছিল। যুধিষ্ঠির বোধ হয় একেই মহাজনের পন্থা বলেছেন। এ'দের একটি অলিখিত ধর্ম-শাস্ত্র আছে; তাতে বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম শ্যাম যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্ট মিউনিসি-প্যালিটি রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না। যদিই বা কিঞ্চিৎ অপরাধ হয়, তবে ধর্মকর্ম আর লোক-হিতার্থে কিছু দান করলে সহজেই তা খণ্ডন করা যেতে পারে। বণিকের একটি নাম সাধু, পাকা ব্যবসাদার মাত্রেই পাকা সাধু। মচুকুন্দর দুর্ভাগ্য এই যে তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি, দৈব তাঁর পিছনে লেগেছিল।"

কল্যাণময় দৈবের অঘটনঘটন সামর্থ্যে যিনি বিশ্বাস করেন,—অনাচারের Nemesis-এ অথবা অপরাধীর স্বখাত-সমাধিতে যাঁর বিশ্বাস অটুট, তাঁকে নৈরাশ্যবাদী 'সিনিক' বলা অসংগত। অতএব মোহিতলালের 'cynical laughter' সম্পর্কিত মন্তব্যটি পরশুরামের সব রচনার প্রসংগে সমর্থনযোগ্য নয়।

George Santayana একদা humour সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা লিখেছিলেন। তার বঙ্গানুবাদ করলে মন্তব্যটা এই রকম দাঁড়ায়:—

এই দুনিয়া যেন নিত্য নিজেকেই ব্যঙ্গ করছে। প্রতি মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে আদর্শ লুটিয়ে পড়ছে প্রতি দিনের আদর্শ-বিরোধিতার গ্লানিতে। তবু সর্বদা জাগ্রত আছে আত্মশোধনের বলবতী ইচ্ছা। ভাঙনের পরমুহূর্তেই গঠনের কাজ শুরু হচ্ছে। অনর্জিত মর্যাদা অর্জনের স্পৃহা সজাগ আছে, সক্রিয় আছে। ভুল, ত্রুটি, ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা শোধন করবার প্রয়াস আছে মৃত্যুহীন। অতীতের ছায়া-মূর্তিটিকে যেখানে যেখানে অসংগত মনে হয়েছে,—সেখানে সেখানে সংস্কারের কাজ চলছে। এইভাবে খণ্ডতায়—পূর্ণপ্রেক্ষায় সমন্বিত একাকার সত্যস্বরূপের ওপরে মানুষের মন থেকে উৎসারিত তথাকথিত এক আদর্শ দুনিয়ার ছায়া পড়ছে। মানুষের জীবনের বিচিত্র স্তরে স্তরে সেই ছায়া-জগতের প্রাধান্য মেনে নেওয়া হচ্ছে। কায়াতে-ছায়াতে এই যে ব্যবধান,—humour এই ব্যবধানকেই রসিকের উপভোগ ও উপলব্ধির সামগ্রী করে তোলে।

পরশুরামের 'ধুস্তুরী মায়া' আমাদের বর্তমান এই দেশকালের পূর্বকথিত 'ছায়া' এবং 'কায়া',—দুটিকেই একই সংগে পাশা-পাশি উদ্ঘাটিত করেছে এবং এ-বইয়ে তাঁর পূর্বস্বভাবের বিশেষ কোনও বদল হয়নি। মধুসূদন দত্তের মতোই স্বদেশের পুরাণ-প্রসংগে তাঁর মনোজগৎ নিত্যমুখর। পাত্র-পাত্রীর সংলাপে রামায়ণ মহাভারতের নানা কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। শুধু তাই নয়, পুরাণের লুপ্ত কথা পুন-রুদ্ধারের খেলা খেলতে তাঁর বিশেষ ভালো লাগে। 'কজ্জলী'-র 'জাবালি',—'গল্পকল্পে'র, 'ভীমগীতা'—এবং 'ধুস্তুরী মায়া'-র 'অগস্ত্যদ্বার' কিংবা 'গন্ধমাদন-বৈঠক' একই প্রকৃতির হাস্যপ্রযুক্তি মনে করা অসংগত নয়। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' 'তিলোত্তমা' প্রভৃতি পুরাণস্মর গম্ভীর কাব্য লিখেছিলেন বটে,—কিন্তু গুরু-গম্ভীর পুরাকাহিনীকে অতি-সত্য বর্তমানের আসরে টেনে নামিয়ে খোস-গল্প জমাতে ইচ্ছা করেন নি। দ্বিজেন্দ্র-লাল রায় লিখেছিলেন—

—এ কি হেরি সর্বনাশ!
রাম তুই হবি বনবাস—
এ কি হেরি সর্বনাশ।
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে,
সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
ভাল এক জোড়া পাশা আর ঐ (ওরে)
ভাল দু জোড়া তাস।
—এ কি হেরি সর্বনাশ!

—কিন্তু পরশুরামের পুরাণপ্রকল্পনার মৌলিকতার পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের রাম-চন্দ্রও তুচ্ছ দুর্বাসাও যেন অপোগণ্ড! 'বাল্মীকি রামায়ণ' এবং 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস-মহাভারতের বঙ্গানুবাদকার পুরাণ-বিজ্ঞ রাজশেখর বসুর ছদ্মনামটিও যে পুরাণসিন্ধু থেকেই আহরণ করা হয়েছে, এ ব্যাপারটি সতর্ক সাহিত্য-পাঠক ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করতে বাধ্য হন। পরশুরাম—বিষ্ণুর অবতার তিনি কুঠারপাণি, কিন্তু কল্যাণকাম। বাঙলা সাহিত্যের করুণ-গম্ভীর, ছায়াচ্ছন্ন, প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্য-মৃত্যুভাবনামথিত রসতীর্থে এই দেবর্ষির নাম আত্মসাৎ করে যে লেখক আজ থেকে আটাশ বছর আগে একদা 'গড্ডলিকা' লিখেছিলেন "ধুস্তুরী মায়া"র অন্তরালে আবার তাঁকেই দেখা গেল এবং দেখে পুনর্বার ভালো লাগলো।

(৩৪)

কোলাহলের মধ্যে জয়ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

এদেশের জয়ধ্বনি বিচিত্র। ধ্বনি থেকে বোঝা যায় না জয় হল কার। মানুষের নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার রীতি চলন হয়েছে বটে, এসেছে বটে, কিন্তু আজও তা' রপ্ত হয়নি। ওই অভ্যাস আজও আবদ্ধ হয়ে আছে লেখাপড়া শেখা দস্তুরমত ভদ্র বাবু মশায়দের মধ্যে। তারাই ধরিয়ে দেন—অমুক কি;—তখন সাধারণে বলে জয়। নইলে ওরা নিজেরা যখন আপনা থেকে জয়ের আনন্দ অনুভব করে তখন ভগবানের নাম করে ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সে কি হিন্দু কি মুসলমান। কি আনন্দ কি উত্তেজনা কি দুঃখ সবেরই প্রকাশ ওরই মধ্যে হিন্দুরা বলে হরি হরি বলো, মুসলমানেরা বলে আল্লা হো আকবর। আজও কবি গান গাইতে আসে সেখ গোমানী আর লম্বোদর বাঁড়ুজ্জে—সৃষ্টিধর কোটাল—তারা গান শেষ করবার মুখে গায়—

'এই পর্যন্ত হলাম ক্ষান্ত সবায় প্রণাম করি
মুসলমানে আল্লা বলো হিন্দু হরি হরি।'

বাস, মুহূর্তে আকাশ বাতাস ভরে দিয়ে আল্লা আল্লা হরি হরি ধ্বনি ওঠে সম্মিলিতভাবে। সত্যিকারের প্রাণের সঙ্গে যে সুখদুঃখের ঘনিষ্ঠ যোগ—তাতে এই ধ্বনিই ওঠে। অনাবৃষ্টির বছরে আকাশে এল আকাশছাওয়া মেঘ, মাঠে ওই মিলিত ধ্বনি উঠল, এ গৌরীকান্ত জানে। শববাহকের দল হরিধ্বনি দিয়েই বেদনা

পাড়াকে গ্রামকে। এই কারণেই সে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল।

শান্তি কিন্তু বুঝতে পারেনি এর গুরুত্ব। সে আশ্বস্ত হয়েই বললে—ওরা হরিবোল দিচ্ছে। গোলমাল কিছু নয়।

হেসে গৌরীকান্ত বললে—সব থেকে বড়ো গোলমাল বা গণ্ডগোলের ভয় ওইখানে ভাই। এ গণ্ডগোল বিপক্ষকে সমর্থন করলে—এর মুখ ফেরানোর থেকে কঠিন কিছু আর হয় না শান্তি। এ হল ওদের আত্মার শপথ। ভগবানই ওদের আত্মা! ব্যাখ্যা হয়তো করতে পারে না, কিন্তু অনুভবে জানে! কার কোন কথায় এমন ধ্বনি দিয়ে উঠল— বুঝতে পারছি না। এসো—একটু জোরে হাঁটো।

গুণী দাঁড়িয়ে বক্তৃতা—হ্যাঁ—বক্তৃতাই; বক্তৃতা করছিল।

লোকে সমর্থন করছে তাকেই।

বুক ভরে একটু নিশ্বাস নিয়ে সে যেন সাহস সঞ্চয় করেই সভার মধ্যে ঢুকল। তার পিছনে শান্তি। গুণীর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বিজয়। জিপে সে আগেই এসে পেঁাচেছে। উত্তেজনায় তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে—মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে বেরুচ্ছে।

গুণী তখন বলছিল—এই আমার প্রস্তাব। সকলের এই আনন্দের ধ্বনি শুনে আমি বুঝতে পারছি যে এতে আপনাদের মত আছে। চলুন এই প্রস্তাব নিয়ে আমরা তাঁর কাছে যাব। তাঁকে

—ওই, ওই তিনি এসেছেন—। চীৎকার করে উঠল বিজয়। হাত বাড়িয়ে আঙুল দেখালে গৌরীকান্তের দিকে।

গুণীও তাকে দেখিয়ে বললে—ওই তিনি এসেছেন।

—এস গৌরীদা। এখানে এস। বল ভাই সব হরি হরি বলো—আল্লা আল্লা বলো।

ধ্বনি উঠল।

গৌরীকান্ত বিস্মিত হয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না—কি হয়েছে—গুণী কি বলেছে। গুণী এমন কি বলতে পারে, যাতে গৌরীকান্তকে উপলক্ষ্য করে জয়ধ্বনি উঠবে!

গুণীই বললে—আজকের এই সভায় আমি প্রস্তাব করেছি যে, এই নূতন কালে ভাগ আইনের চাষ আইনের একটা পরিবর্তন—যেখানে হতেই হবে, যে কালে একটা পুরনো কাল চলে গেল—একটা মন্বন্তর হল—সেকালে পুরনো নিয়ম পুরনো মনু চলতে পারে না, নতুন নিয়ম চাই। কিন্তু সে নিয়ম করবে কে? নতুন মনু কই? এই আইন কে রচনা করবে, করতে পারে? আমি বলেছি—তুমি গৌরীদা—তুমি পার; তোমাকে ভার দিতে চাই আমরা। এ ভার তোমাকে নিতে হবে। এর জন্যে এখনি আমরা সকলে তোমার কাছে যেতাম। তুমি এসে পড়েছ। আমি বলব—ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলব না—বিজয় এবং শান্তিদেবী তোমাকে নিয়ে এসেছে অনুরোধ করে। স্বীকার করব না সে কথা।

একটু হাসলে গুণী। সে হাসিতে ধারও একটু ছিল—বাঁকাও বটে একটু, কিন্তু তাতে জ্বালা নাই। একটা পুরানো কাঁটাকে বের করে দিয়ে সে যেন জ্বালার উপশমই করলে।

গুণী বললে—বল তুমি। সকলকে বল—তুমি ভার নিলে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গৌরীকান্ত। সে আজ চোখে দেখতে পেলে সমগ্র নবগ্রামের সে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি। জীবজননী যে অন্ধ প্রচণ্ড স্নেহার্ত ক্ষুধায়—সন্তান প্রসব করে তাকে আহার করে উদরস্থ করে চিরজীবনের জন্য আত্মজকে আত্মস্থ

স্নেহার্ত ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, এই সমবেত জনতার অতি ব্যগ্র দৃষ্টির মধ্যে। সে দেখতে পাচ্ছে। অনুভব করছে।

মুহূর্তে সে ওয়ার্ত হয়ে উঠল। এ গ্রামে মা যদি একবার তাকে গ্রহণ করতে পারে—তবে আর সে তাকে ছাড়বে না। পায়ের নখ থেকে একটা শিহরণ বয়ে গেল মাথা পর্যন্ত।

কিশোরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এ ভার তোমাকে নিতে হবে গৌরীকান্ত!

গৌরীকান্ত ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে বললে—না!

—না! প্রায় চীৎকার করে উঠলেন কিশোরবাবু।

—তুমি 'না' বলছ গৌরীদা? আমাদের সকলের অনুরোধ তুমি রাখবে না? গুণী এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরলে।

—আমরা শুনব না। মানব না। আমাদের দাবী তোমাকে মানতে হবে। নইলে নবগ্রাম তোমাকে স্থান দেবে না। চলে যেতে হবে তোমাকে। চিরদিনের মত চলে যেতে হবে। আমরা জানব—এখানকার গৌরীকান্ত, স্বর্গীয় রাধাকান্তবাবুর ছেলে, সে মরে গেছে—হারিয়ে গেছে, তুমি তার ছদ্মবেশ নিয়ে এখানে এসে আমাদের ঠকাচ্ছ। সে গৌরীকান্ত তুমি নও। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের। এক নিশ্বাসে বিজয় চীৎকার করে বলে উঠল। তার নাকের পোটি দুটো ফুলছে। সে হাঁপাচ্ছে।

—চুপ কর বিজয়। আমাকে আমার কথা বলতে দে।

—কি বলবে তুমি? তুমি তো না বলেছ। আমি জানি, আজ এখানকার কোন দামই তোমার কাছে নাই। আমাদের দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করে না। আমাদের কথায় তুমি কৌতুক অনুভব কর। মনে মনে হাস।

—না, হাসি না। কৌতুকও অনুভব করি না। নিজের অক্ষমতা মনে মনে অনুভব করি, আর লজ্জায় মরে যাই। কাঁদি। কাল থেকে কালান্তরে চলেছেন মহাকাল—তাঁর পাদক্ষেপের স্থান নির্দেশ করে আগে থেকে আল্পনা রচনা করবার দৃষ্টি, শক্তি যোগ্যতা আমার নাই। কোথায় পা যে তিনি ফেলবেন। সে কি কেউ জানে? আমি জানি না। তাই ভয় পাই। এই যে নূতন কালে ভাগ চাষের কৃষাণ চাষের নূতন নিয়ম হবে তার কতটুকু জানি আমি—কতটুকু বুঝি? শুধু একটা ভাগের নিয়ম করে দিলে সে হবে—মাটির তলার যে আগুন ফাটল ফাটিয়ে বেরিয়ে আসছে তার উপর গণ্ডুষ খানেক জল ছিটিয়ে এখনকার মত নিভিয়ে দেওয়া। অথচ আসলে দরকার—ভগীরথের তপস্যায় ওই ফাটলের পথ ধরে গঙ্গাকে নামিয়ে এনে মাটি খুলে প্রবাহিনী বইয়ে দেওয়া। জমির উৎপন্নের ভাগের আপোষ করলেই তো সমস্যা মিটবে না। জমির অধিকারের প্রশ্ন—জমি কার—সেই প্রশ্ন রয়েছে ঠিক এরই পিছনে। বলতে পার—জমি কার হবে?

এবার স্তব্ধ হয়ে গেল জনতা।

—তবুও আমি ভার নিলাম। কিন্তু একা আমি নই। পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চায়েত তৈরী কর। একজন আইনজ্ঞকে রাখ। একজন কৃষাণ একজন ভাগজোতদার—একজন জমিদার মালিক চারজন আর আমাকে যখন চাও তোমরা—আমি। পাঁচজন মিলে ব্যবস্থা করব।

জনতা এবার উৎসাহিত হয়ে আবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

* * *

—আমার ভয় করছে শান্তি। আমি ভয় পেয়েছি।

—কেন গৌরীদা! এ ঘটনাটিকে আপনি এত বড় করে দেখছেন কেন আমি বুঝতে পারছি না।

—আমি অনুভব করছি শান্তি। মনে হচ্ছে, আজ আমার মৃত্যু হল।

কি বলছেন আপনি?

—ওতে আপত্তি থাকে—তবে বলছি—নূতন একটা জন্ম হল। এর সঙ্গে আগেকার জন্মের গৌরীকান্তের কোন মিল থাকবে না। হয়তো সাদৃশ্য খুঁজে পাবে না!

—এত কথাই যখন বলছেন—তখন বলি—কেন থাকবে না, কেনই বা পাব না। জন্মান্তরের সঙ্গে জাতিস্মর বলেও তো একটা কথা আছে। আপনার যদি এটা জন্মান্তরই হয়, তাই যদি বলেন আপনি তবে আপনার মত মানুষ জাতিস্মরই বা হতে পারেন না কেন বলুন তো!

—জাতিস্মরের একটা অতিবড় মর্মান্তিক দুঃখ আছে শান্তি। সেটা তাঁরা ভেবে দেখলে না। পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে জাতিস্মর জন্ম যদি সম্ভবই হয়, তবে ভেবে দেখতো কি হয়? নূতন বাপ—নূতন মায়ের কোলে—নূতন ভাইবোনের মধ্যে জন্মায়—জীবন শুরু করে তারই মধ্যে চেনে সে জন্মের পরমাত্মীয়দের, হয় তো বা বাপ মা—ভাই বোন, হয় তো বা স্ত্রীপুত্রদের কিন্তু তারা তো কোনক্রমেই এ জন্মের আপন নয়, আত্মীয় নয় হয়তো

বা স্বধর্মী স্বজাতিও নয়। কি সে নিষ্ঠুর অবস্থা বুঝে দেখ তো!

এবার শান্তি চুপ করে রইল। বুঝতে পারলে—গৌরীকান্ত তার খ্যাতিময়ী জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে গিয়ে ভবিষ্যতের অখ্যাত জীবনের কল্পনায় দুঃখ পাচ্ছে। এ দুঃখ স্বাভাবিক। কিন্তু এর তো প্রয়োজন আছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই বাইরে এসে থামলো গুণীর জিপ। গুণী এসেছে। সে আজ এখানেই খাবে বলেছে। রান্না হচ্ছে বিজয়ের বাড়িতে। সভার শেষ না হতেই গৌরীকান্ত চলে এসেছিল। বলে এসেছিল—ভার আমি নিলাম। তোমরা নিজেদের মধ্যে চারজন প্রতিনিধি স্থির করে নাও। সে ভারটা তোমাদের। সভাপতি মশায় রইলেন—তিনিই আমার গুরু, তাঁকে পাঁচজনের বাইরে উপদেষ্টা করে রাখলে আমি সুখী হব।

বলেই সে চলে এসেছিল। অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও চলে এসেছিল। গুণী এসে তাদের দুজনকে জিপে চড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—চল—আমি যাচ্ছি। আজ এখানেই খাব। বিজয়কে বলে রেখেছি ওর বাড়িতেই সকলের নেমন্তন্ন আজ। শান্তিদেবী আপনারও।

বাড়ি ফিরে শান্তির সঙ্গেই কথা হচ্ছিল। এতক্ষণে গুণী এসে পৌঁছুল। —গৌরীদা! ডেকে তার সেই সহাস্য কৌতুকময় ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে—চোখের দৃষ্টিতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে গৌরীর দিকে তাকিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

গৌরী প্রসন্ন মুখেই তাকে আহ্বান জানালে—এস। বস। একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

চেয়ারখানা গৌরীর পাশেই। গুণী বললে—উঁহু। শান্তিদেবী আপনি ওটায় বসুন। আমি গৌরীদার সঙ্গে মুখোমুখী বসব।

শান্তি উঠে বললে—আমি এখন যাই বরং।

—কেন? আমি এলাম বলে? তা হলে তো আমাকেই যেতে হয়।

—না। বাড়িতে মা রয়েছেন। ট্রেন থেকে নেমেই প্রায় চলে এসেছি।

—কিশোরবাবুকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনার মাকে প্রণাম করে এলাম। তাঁকেও আসতে বলেছি। কিশোরবাবু তাঁকে নিয়েই আসছেন। সুতরাং আমি রয়েছি বলে উঠতে চান তো আমিই উঠছি। অন্যথায় বসুন। মা আসছেন।

গৌরী পাশের চেয়ারে হাত দিয়ে বললে—বস শান্তি। গুণীর সঙ্গে বাক্যের মারপ্যাঁচে পারবে না। বিশেষ করে সরস কথার বাঁকা মারে ওর জুড়ি নেই। সোজা লড়াইয়ে—ও মুখচোরা কিন্তু চোরা মারে গুণ্ডা। তোমাদের ঢাকা অঞ্চলে ছুরি মারের ওস্তাদির গল্প শুনেছি যে—সাইকেলে চড়ে পাশ দিয়ে আক্রমণকারী চলে গেল রশি-খানেক—তখন আক্রান্ত বেচারা জানতে পারলে—তাকে মেরেছে এবং তাকিয়ে দেখলে গোটা পেটখানি দু ফাঁক নাড়িভুঁড়ি সব ঝুলে বেরিয়ে আসছে। কথার চোরা মারে ওর গুণ্ডামীর সূক্ষ্ম-চাতুর্য ঠিক সেই রকম।

হাসতে লাগল গুণী।

তারপর বললে—কেমন জব্দ হয়েছ? আমি শুনছিলাম তুমি পোটলা পুঁটলি বাঁধছ।

হেসেই গৌরীকান্ত বললে—শোধটা কি তাহলে সজ্ঞানে সচেতনভাবে নিলে গুণী?

—শোধ?

—তুমি আজ আমাকে খাটো ক'রে দিয়েছ গুণী।

—খাটো করে দিয়েছি?

—তুমি আজ আমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছ ভাই।

—কি যে বল গৌরীদা!

—সত্যি বলছি ভাই। আমি বয়সে বড়। আমার কথাটা তুমি বিশ্বাস করে নাও। জান তুমি গুণী—আজ আমি কেন গিয়েছিলাম সভায়? তুমি তো জান আমি এ পর্যন্ত এখানে কোন সভা-সমিতিতে যাই নি। সেদিন দাঙ্গার সময় তুমি বিজয় কিশোরবাবু, এস-ডি-ও সকলকেই ডেকেছিলে—তবু যাই-নি। এ ব্যাপারটা তার চেয়ে গুরুতর নয়।

—হ্যাঁ। গুণী সিগারেট বের করে ধরালে—খাও।

—না থাক এখন।

গুণী নিজে সিগারেট ধরিয়ে বলে—হ্যাঁ। আমি তোমাকে ওখানে প্রত্যাশা করিনি। তাইতো বলছিলাম, চল প্রস্তাব নিয়ে দাবী নিয়ে তার কাছে যাই। বিজয় হঠাৎ বললে—ওই তিনি এসেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বুঝলাম প্রাণের ডাকটাই নিশ্চয় টেনে এনেছে তোমাকে।

—না। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েছিলাম। গুণী বিকেল বেলা কিশোরবাবু বিজয় বারবার অনু-রোধ করেছিলেন—আমি যাইনি। শান্তি এল বিকেলের ট্রেনে। সে এল আমার কাছে একখানি খাতা নিয়ে। এখানি বিচিত্র বস্তু। নবগ্রামের পুরাণ কথা বলতে পার। শুরু করেছিলেন শান্তির বাবা সন্তোষ পিসেমশায়। দিয়ে গিয়ে-ছিলেন কিশোরবাবুকে। নিজে শেষ করতে পারেন নি, কিশোরবাবুকে বলে-ছিলেন তুমি শেষ কর। তিনিও পারেন নি আমাকে দিয়েছেন কিশোরবাবু শেষ করতে। শান্তি খাতাখানা পড়তে নিয়েছিল। ফেরত দিয়ে বললে, চলে যাচ্ছি এখান থেকে। আরও কথা হচ্ছিল। এমন সময় কিশোরবাবু এসে শান্তিকে টেনে নিয়ে গেলেন সভায় গান গাইতে হবে। আমি একা খাতাখানি পড়তে লাগলাম। পড়লাম নবগ্রামে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রকাশ্য সভায় আমার বাবাকে অপমান করেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, তোমার পিতামহের কোন হাত ছিল না, কিন্তু হাত ছিল তোমার পিতৃব্যের। সে অপমান আমার বাবার কাছে মৃত্যু তুল্য হয়েছিল। তাঁর নিজের ডায়রী মনে পড়ে গেল। তারপর মনে পড়ে গেল দীর্ঘকাল ধরে কত বিরোধ কত দ্বন্দ্ব কত আঘাত! সেই আঘাতেই জর্জরিত হয়ে আমি একদা গ্রাম ছেড়েছি। জ্বালা জ্বলে উঠল। মনে হল গুণী আমার দেহে মনে আগুন লেগেছে। এই সময়েই এল বিজয় আর শান্তি তোমারই জিপ নিয়ে। বললে গুণী এসেছে সব থেকে বেশী জমি তার—সে প্রতিবাদ করবে। এবং এখানকার লোক সে প্রতিবাদের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে না। তোমাকে যেতেই হবে। আমি সব

বললাম—যাব। কিন্তু গুণীর গাড়িতে নয়। হেঁটে গেলাম। জয়ধ্বনি শুনে নিজেকে বাঁধতে বাঁধতেই গেলাম। জীবনে বাক্যের শব্দের যে সাধনা করেছি—তার সব শক্তি এক করে আজ তোমার বিরুদ্ধে বলব। তোমাদের ইতিহাসে যত অপকীর্তি আছে—তোমাদের কীর্তির কথা বাদ দিয়ে—সেই বলব—জ্বালায় মিশিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে বলব। গুণী গিয়ে শুনলাম তোমার কথা। আমি মাথা হেঁট করলাম—অন্তরাত্মা লজ্জা পেলে; অনুভব করলাম কত ছোট হয়ে গেছি। আজ তোমার প্রণাম পাওনা আমার কাছে। তুমি আমাকে রক্ষা করেছ।

গুণী স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। মধ্যে মধ্যে মুখে ছুটে আসছিল রক্তোচ্ছ্বাস। দম্ভ বারবার যেন খাঁচায় পোরা বাঘের মত শিকে থাবা মেরে ব্যর্থ হয়ে শান্ত হচ্ছিল। আবার মারছিল থাবা।

গৌরীকান্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে—তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম ভাই, আজকে যে এখনকার এই সমস্যা সমাধানে তুমি এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী, সম্পত্তিশালী প্রতাপশালী ব্যক্তি—তোমার কর্তৃত্বের অহংকার অধিকার ত্যাগ করলে—সেই আসনে আমাকে বসিয়ে অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধলে—সেটা কি তুমি তোমার স্বভাবগত খেয়ালের বশে করলে না ভেবে চিন্তে সচেতনভাবে সজ্ঞান বিবেচনায় ত্যাগের আহ্বান শুনে করলে?

গুণী বললে—আমাকে সামলাতে দাও গৌরীদা। দুরন্ত নাড়া দিয়েছে আমাকে। স্থির হতে দাও। সে আর একটা সিগারেট ধরালে। গৌরীকান্তের দিকে বাড়িয়ে দিল কেস।

একটু পর বললে—গৌরীদা! মনটা আমারও ক্ষেপে উঠেছিল তোমার কথা শুনে। সব মনে পড়ে গিয়েছিল।

গৌরীকান্ত হেসে বললে—সন্তোষ পিসেমশায় এর মধ্যে কি লিখেছেন জান। একটি নূতন দেবতাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন নবগ্রামে—আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের মধ্য থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। খাতাখানা কই শান্তি?

কাঁধের ঝোলা থেকে শান্তি খাতাখানা বের করে দিলে।

গৌরীকান্ত আলোর সামনে ধরে পাতা উল্টে একটা জায়গা বের করে পড়লে—"মানব প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বামচক্ষু রক্তবর্ণ। বাম হস্তে বক্র ক্রূর নখর মালা। বাম দিকের অধরপ্রান্ত কঠিন শীতল বিষাক্ত হাস্যরেখায় ভীষণ। বাম অংশে বিষজর্জর নীলাভ। পৃথিবীর প্রতিটি আঘাত, ক্ষুদ্রতম অপমান সে আপন ধ্যান মন্ত্রের সংগে যুক্ত করিয়া চলিতেছে, হস্তের জপমালায় —এক-একটি রুদ্রাক্ষ গাঁথিয়া চলিয়াছে। এ-দেবতার মুখের দক্ষিণ অংশ বেদনায় ব্যথিত হইয়া অসহায়ের মত এই বাম অংশকে বলিতেছে—পৃথিবীর মধুময়তার দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই বায়ু স্পর্শ গ্রহণ কর, মধুবাতা ঋতায়তে! কিন্তু বাম চক্ষু বাম ভাগ নিস্পন্দ।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সকলে।

গুণীই স্তব্ধতা ভংগ করে বললে—দেখি খাতাখানা দাও।

খাতাখানা দেখে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—মিথ্যে কথা বলব না গৌরীদা, মিটিংয়ের কথা আমি জানতাম না। সুতরাং সজ্ঞানে, সচেতনভাবে প্রভৃতি বেশ দলিলী ছন্দে বেঁধে ছেঁদে যা বললে—তা ঠিক নয়। তবে এটা বিশ্বাস কর, আমি এসেছিলাম তোমাকে বাঁধতেই। সেদিন দাংগার সময় তোমাকে বলেছিলাম, এস গৌরীদা—সব ভুলে আমরা এক হয়ে যাই। আমি ভগবান মানি গৌরীদা—

—আমিও মানি গুণী। আমি মানি না কে বললে তোমাকে?

—কি জানি? বোধহয় আজকালকার গুণীজনেরা সবাই নাস্তিক বলে। অবশ্য আমার মত নামে যারা গুণী, তারা বাদে। যাক, তাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কেমন করে তোমাকে এখানে বেঁধে রাখি। কূল-কিনারা না-পেয়ে ছেড়েই দিয়েছিলাম ভাবনাটা। ক'দিন আগে শুনলাম—তুমি পাঁজি না হোক ক্যালেন্ডার দেখছ এবং জিনিসপত্র গোছাচ্ছ। দুঃখ পেলাম। হঠাৎ কাল রাত্রে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে দুখানা চিঠি পেলাম। বিচিত্র চিঠি জ্যাঠামশায়কে লিখেছেন সন্তোষবাবু, শান্তিদেবীর বাবা। তাই খাতাখানা নিয়ে দেখলাম—দুটো লেখার মধ্যে মিল কতটা দেখলাম, হ্যাঁ একই হাতের লেখা।

—আমার বাবার চিঠি?

সন্তোষ পিসেমশায় তোমার জ্যাঠা মশায়কে কি লিখেছিলেন?

—তোমার খোঁজ চেয়েছিলেন গৌরীদা। হাসলে গুণী। এবং এর মধ্যেই পেলাম তোমাকে এখানে বেঁধে রাখবার উপায়। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। এসে দেখি মিটিং হচ্ছে। মুহূর্তে মনে হল—যে উপায়টা পেয়েছি, সেটা এইটের সঙ্গে জড়িয়ে অকাট্য করতে পারা যায়। তাই মিটিংয়ে ওই প্রস্তাব করলাম।

—শান্তি হাত বাড়িয়ে বললে—দেখি চিঠিখানা!

—দেখবেন? হেসে গুণী চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলে।

(ক্রমশ

রঞ্জন

ইংরেজি কাব্যের অনেক ফুল ফুটেছে ইটালির বাগানে। বায়রন, শেলি, কীটস্, ব্রাউনিঙ্ প্রমুখ নানা ইংরেজ কবির জীবনের (এবং মরণের) সঙ্গে ও-দেশ নিবিড়ভাবে জড়িত। ভেনিস, পিসা, রোম, ফ্লোরেন্স, নেপলস, কাপ্রি—ইটালির প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য শহরের স্মৃতিময় রূপ-কীর্তনে ইংরেজি কাব্য-কানন মুখর। তবে সেসিল ডে লুইস* কি আবার সেই পুরানো প্রান্তর পরিক্রমা করেছেন?

বইয়ের গোড়াতেই, নামপাতায়, জ্যাসপার মোর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কবি প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেনঃ "ইটালি-ভ্রমণ হচ্ছে আবিষ্কারের অভিযান, শুধু প্রকৃতি আর নগরের আবিষ্কার নয়, ভ্রামণিকের নিজের অন্তর ও আত্মার আবিষ্কার।" বলা বাহুল্য, এ বিষয় কখনো পুরানো হবার নয়, কেননা, মানুষের মন হচ্ছে এমন গ্রন্থ, যা 'চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।' বিশেষ করে সে-হৃদয় যদি কবি লুইসের হৃদয়ের মতো ভাবসমৃদ্ধ, গীতি-মুখর ও জ্ঞানধনী হয়।

তবু ভয় করার কারণ ছিল। যে বিষয়বিমুখ আত্মানুচিন্তন এবং অন্তহীন আত্মবিশ্লেষণ প্রায় সমগ্র আধুনিক কাব্যের আবেদন মর্মান্তিকভাবে সীমিত করে রেখেছে, উপরের উদ্ধৃতিটাতে তার ভয়াবহ প্রশ্রয় আছে। তাছাড়া এই লুইসই কিছুদিন আগে তাঁর পেঙ্গুইন সংকলনের ভূমিকায় লিখেছিলেনঃ আমরা বোঝাতে লিখিনে, বুঝতে লিখি। অর্থাৎ আধুনিক কাব্য এইজন্যে দুর্বোধ যে তা শুধু কবির সঙ্গে তাঁর নিজের একান্ত গোপনীয় ভাব-বিনিময়, শ্রোতা সেখানে অনাহূত। স্বারোপিত এই নিঃসঙ্গতার ফল শুধু কাব্যের অবিক্রেয়তা নয়, আধুনিক কাব্যের নিঃসীম বিষণ্নতারও উৎস এখানেই।

কিন্তু লুইসের "দি পোয়েটিক ইমেজ" নামক অনবদ্য বক্তৃতামালার পাঠকদের অজানা নেই যে, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত অন্যান্য অনেক সহ-কবিদের তুলনায় অনুগ্র। তিনি যে আধুনিক কবিদের স্পষ্টতমদের মধ্যে একজন তার নূতন পরিচয় আছে আলোচ্য গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। তিনি যে বিষাদ ছাড়া অন্যান্য অনুভূতিকে কাব্যে অপাংক্তেয় জ্ঞান করেন না, তারও মুখর প্রমাণ আছে কাব্যটির বহুস্থানে।

যেখানে কবি আত্মদর্শনে ব্যাপৃত, সেখানেও বৈচিত্র্যের অপ্রাচুর্য নেই। প্রারম্ভেই কবি নিজেকে তিন ভাগ করে নিয়েছেনঃ টম, ডিক আর হ্যারি। (এই নামচয়নেও কাব্যটির সার্বজনীনতা স্পষ্ট।) কাব্যের প্রথম অংশ এই ত্রয়ীর আলাপ। একটি মানুষে তিনটি মানস, লক্ষ্য অমর রোম। টম বলছে সে স্ন্যাপশট নেবে। ডিক বলছে, সে তা ডেভেলপ আর প্রিণ্ট করবে। হ্যারি বলছে, সে সেগুলি বাঁধিয়ে রাখবে। কাব্যটির প্রধান গুণ এই যে, এই তিন স্তরেই এর উপভোগ সম্ভব। এ যেন এমন ফুল, যা খোঁপায় পরতে পারো, মালা গেঁথে প্রিয়ের গলায় দিতে পারো, আবার দেবতার পায়ে পুজো দিতে পারো।

*

"দি পোয়েটিক ইমেজ" গ্রন্থে লুইস হার্বার্ট রীডের মন্তব্য উদ্ধৃত করে মেনে নিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র মূর্ত প্রতীক নিয়ে কাব্য হয় না। আরো বলেছিলেন, সেই সঙ্গে চাই এমোশন, সেনস্যুয়াসনেস এবং প্রোজ মীনিং। ভাব, ইন্দ্রিয়-সজাগতা ও বক্তব্যগুণ—এই তিনের অপূর্ব সমন্বয়ে "অ্যান ইটালিয়ান ভিজিট" সত্যকার সার্থক কাব্য হয়েছে। চিন্তা এখানে কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়নি, বাক্-চাতুরীতে আনন্দবোধ লুপ্ত হয়ে যায়নি। লুইস তাঁর নিজের কাব্যে দেখিয়েছেন যে, অসংলগ্ন সমাজের সদুত্তর অসংলগ্ন রচনা নয় ("দি পোয়েটিক ইমেজ্", ১১৭ পৃঃ)।

আনন্দ লোপ পায়নি, কিন্তু রোমান্টিক কবিদের সংশয়লেশশূন্য উচ্ছ্বাস কোথায় মিলবে আধুনিক কাব্যে? "We did not, you will remember, come to coo." নানা সভ্যতার শ্মশান এই রোম নগরীর বর্তমান দৈন্য তাই লুইসের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফোরাম আছে, বেটি গ্রেবলের পায়ের প্রাচীর বিজ্ঞাপন। শাদা-কালোর এই ছবির বর্ণনা মুহূর্তের জন্যেও কাব্যধর্মভ্রষ্ট হয়নি। তারই সঙ্গে আছে জিজ্ঞাসাঃ এই বিরাট সভ্যতার মৃত্যু হোলো কী করে? উত্তরের ইঙ্গিত আছেঃ

> পুরানো পরিচিত কাহিনী সে।
> জলহীন স্নানাগার, শুষ্ক নির্ঝরিণী।
> তারও আগে মজেছিল ধর্মের ধারা
> উচ্চাশার ঊষর মরুতে।
> অভিলাষ ব্যাধি হোলো, বিলাসের মতো,
> যেন সিফিলিস
> পলে পলে ক্ষয়ে গেল, মরে গেল
> সভ্যতার স্বাস্থ্য সজীব।

এর পরে তাই কবিকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে কবরের কাছে, সেখানে নিজেকে স্বাগত মনে হয়েছে। পরে ফ্লোরেন্সে পালিয়ে যেতে হয়েছে স্থাপত্যে শান্তি খুঁজতে।

বইয়ের ষষ্ঠ পর্বে আবার মৃত্যুর চিন্তা। আবার সংশয়, যখন পলায়নরত বর্তমানের মধ্যে শাশ্বতের সন্ধান করতে হয়েছে। এই নৈরাশ্যসমুদ্রে—

> প্রেম ছাড়া আর আছে কোন তরী?
> উঠেই পড়ি।

কবি এ অভিযানে বিষাদমুক্ত হননি, কিন্তু নিরাশও হননি।

আমাদের বর্তমান কাব্যবিমুখতার জন্যে প্রধানত আধুনিক কাব্যের ত্রুটি দায়ী, আমাদের রুচিভ্রম নয়। পাঠকের হৃদয়ে কাব্য আজ শুধু উচ্ছ্বাস দিয়ে প্রতি-ধ্বনি জাগাতে অক্ষম, কেননা, সেই হৃদয় আজ অবিমিশ্র আনন্দ আর দ্বন্দ্বহীন নিশ্চিন্ততায় শায়িত নয়। তাই কাব্যের আসনে আবেগকে আজ কিছুটা জায়গা দিতে হয় যুক্তি আর বিশ্লেষণকে। এই দুই নবাগত যদি সবটা জায়গা জুড়ে বসে, তাহলে কাব্য স্বধর্ম ভ্রষ্ট হয়, কিন্তু সুষ্ঠু সমন্বয় হলে কাব্য সমৃদ্ধতর হয়—যেমন ডে লুইসের রচনায় হয়েছে।

সপ্তম ও অন্তিম অধ্যায়ে কবি আবার নিজেকে তিন ভাগে ভাগ করে যাচাই করেছেন ইটালি-ভ্রমণে তাঁরা কে কী পেয়েছেন। আলো পেয়েছেন (সঙ্গে ছায়া ছিল), গান পেয়েছেন, প্রাণ পেয়েছেন। আমরা এমন একখানি কাব্য পেয়েছি, যার সানন্দ পাঠে ইটালিকে জানতে পাই, কবিকে জানতে পাই। নিজেকেও জানতে

*An Italian Visit by C. Day

ঘুম নয়। যেন নাছোড় কাবুলী। ঘাড়ে চোখের দরজায় বসে থাকে। না চুকিয়ে বিদেয় করে সাধ্য কার? মন আরো আগে। রাত্তির তার টি খতম করে সেই যে সময়ে 'কল-বয়' দিনের কাছে, ('কল-বয়' কি? কোম্পানীতে কাজ করা থাকলে আর টা ব্যাখ্যা করতে হত না। রেলের কি ইঞ্জিন-ড্রাইভার কি কুরু-বাবু চেকার, তাদের যখন গভীর রাতে বেরুতে হয়, তখন সময় হিসেব এক লোক ছোটে তাঁদের ঘুম তে। এই যে ঘুম ভাঙানো খোকা, বলে 'কল-বয়') গঙ্গা থেকে সেই কেমন এক নতুন হাওয়া ভেসে আসে, বাজারে একটি রা নেই, হাওড়ার পুল বাতির একনরী হার গলায় পরে মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, ওপারে হাওড়া সানের একচোখো ঘড়িটা কাঁটা দিয়ে মেরে মেরে ওপারের সময়কে এপারে ফেলে যখন, মন চায় তখনই ওঠে। আলিস্যি, কিন্তু কুঁড়েমি। বেঞ্চের চাটাই মাদুর, তার উপরে একটা নামত, তার উপরেই দেহখান।

নগর-সংকীর্তন

রূপদর্শী

খানা বিছানাই জড়িয়ে নাও গায়ে। কিন্তু না, এইবারে ওঠো। গান শোনা যাচ্ছে প্রভাতী বুড়োর। নাইতে আসছে, তার মানেই চারটে বাজে।

প্রভাতী বুড়োর থেকে ভোরে আর কেউ নাইতে আসে না। ওই হল ঘাটপাণ্ডাদের 'কল-বয়'। বড়বাজারের ঘাটে চল্লিশটে ঘাটপাণ্ডা। যজমানরা নাইতে আসবেন। শুকনো-সাকনা কাপড়-জামা সঙ্গে থাকে, সেগুলো রাখবার ব্যবস্থা কি? না ঘাট-পাণ্ডার টুকরী। জুতো খুলে রাখুন ওর আলমারীটার মধ্যে। জামা-কাপড় টুকরীতে, তারপর নিশ্চিন্তে নেমে যান গঙ্গার শীতল গর্ভে। চানটান সেরে উঠে আসুন। নিশ্চিন্তে এগিয়ে যান ঘাটপাণ্ডার কাছে। ওর এলাকার চাটাইয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপড়টি ছেড়ে রেখে প্রসাধন। ব্যবস্থা আছে। আর্শি আছে, চিরুণী আছে। চুল আঁচড়ে মুখ দেখুন। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকলে তিলক-মাটির ছাপ লাগিয়ে নিন, চন্দনের প্রলেপ লাগান মুখে। আর্শিতে মুখের ছায়ার চেহারা দেখে মালুম করুন, বাহার খুলল কেমন।

যজমান একবার আসতে শুরু করলে আর ফুরসৎ কোথায়? তাই নিজের কাজ সেরে রাখতে হয় সেই প্রত্যূষকালেই। শুধু তো টুকরিই নয়, টুকটাক আরো দ্রব্য রাখতে হয়। ধরুন দাঁতনকাঠি। অত ভোরে যজমান আসবে, এসেই এক কাঠি দাঁতন চাইবে। যদি দিতে না পারলুম তো জগন্নাথ জানেন, ও খদ্দের আর আমার বাক্স-মুখো হবে না। একা তো নই, এই যে ঘাটটুকু দেখছেন, এই বড়বাজারের ঘাট, এখানে চল্লিশটে পাণ্ডার পারমিশন আছে। তার বেশী আর একজনেরও বসবার হুকুম নেই। বিনা হুকুমে কেউ বসবে? পোর্ট কমিশনারের রেজিস্টার্ড গোমস্তা আছে কি করতে। রিপোর্টটি করে দিলেই ঘাড় ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বের করে দেবে।

করল আর একটা বাক্স নিয়ে ঘাটে এসে পান্ডা হয়ে বসলুম, সেটি হচ্ছে না। পান্ডা হতে চাও, তো পোর্ট কমিশনারকে দরখাস্ত কর। সব লিখে জানাও, কি নাম, সাং মোং (সাকিন মোকাম) কোথায়, কে তোমার বাপ, পান্ডাগিরি ক'পুরুষ ধরে করছ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সে দরখাস্ত পোর্ট কমিশনারকে পাঠাও, সেখান থেকে হুকুম পেলে তবে বাক্স পেতে বসতে পার।

যারা আছে এখানে, সবাই বনেদী। কেউ দু'পুরুষ, কেউ চার পুরুষ কাটালে এই চানের ঘাটের শানে বসে। বাঁধানো ঘাটের মেঝেতে আমরা আর কার্ণিশের খাঁজের ওই পায়রাগুলো বনেদিয়ানায় এক বয়েসী।

যদি একেবারে দক্ষিণ থেকে ধরেন তো কালীঘাট। খুব পুরানো ঘাট। চান করলে অক্ষয়-পুণ্যি। তাই খদ্দের-পাতি ওখানে বেশী। পান্ডাদেরও দু'পয়সা হয়। তারপর চাঁদপাল, প্রিন্সেপ, আর্মানীঘাট, বাবুঘাট, এদিকে এই বড়বাজারের ঘাট, গোয়েঙ্কার ঘাট, হাওড়ার পুল ছাড়িয়ে জগন্নাথ ঘাট, আহিরীটোলার ঘাট, পাথুরেঘাটার প্রসন্ন ঠাকুরের ঘাট, বাগবাজারের ঘাট—এগুলো নাম করা। পান্ডাও আছে।

বাবা এই ঘাটে সারাজীবন পান্ডাগিরি করে দেহ রেখেছেন। তাঁর বাবাও এই ঘাটে জীবনপাত করেছেন। এই যে চন্দনের বাটি দেখছেন এটা বাবার, এই যে তিলক-ছাপ দেখছেন এটা ঠাকুন্দাদার। বহুদিন এসব বাক্সে ভরা ছিল। বাবা মারা গেলেন, তখন আমার জোয়ান বয়স, ভাবলাম কি, ঘাটে আর বসব না। কাকাকে বাক্সটাক্স দিয়ে এধার-ওধার ঘুরলাম। দু-চারটে কাজও করলাম। কিন্তু ভা[ল] লাগল না। দু'চার বছর পরে কি ম[নে] হল, পোর্ট কমিশনারে দরখাস্ত ক[রে] হুকুম নিয়ে নিলাম। এখন তো পাঁচ[...] বছর হয়ে গেল।

মাঝখানে পোর্ট কমিশনার বললে 'লাইসেন' দিতে হবে। এমনি খেতে পয়সা পাইনে 'লাইসেন' কোথা থেকে দেব, খুব গোলমাল হল। যজমানদের গিয়ে ধরলাম। তারা বললে পোর্ট কমিশনারকে, বাপ-দাদার আমল থেকে যেমন চলছে, তেমনই চলবে। পান্ডাদের কাছ থেকে পয়সা-টয়সা নেওয়া চলবে না। যজমান সব ভারি ভারি আছে কিনা। তাদের কথা পোর্ট কমিশনার ফেলতে পারে না।

শুনুন তবে এক মজার গল্প। আর্মানীর ঘাটটা শীলবাবুরা বানিয়ে [...]

এ গল্প আমার বাবার মুখে শোনা। সেই তখনকার আমলেই খর্চা হয়েছিল প্রায় লাখ টাকা। অমন মজবুত ঘাট। তা পোর্ট কমিশনার বললে, ওখানে গুদোম বানাবো। শীলেদের মত চাইলে। তাঁরা বললেন, বেশ, আমাদের আপত্তি নেই। তবে কি না যেমন ঘাটটি ভাঙবে, অবিকল সেই নক্সামত আরেকটি ঘাট বানিয়ে দিতে হবে। ব্যস্, একথার পর পোর্ট কমিশনার ঠাণ্ডা।

বাবুরা ঘাট বানিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ছেড়ে দিয়েছেন পোর্ট কমিশনারের হাতে। ঝাড়ুদার খরচা, লাইট খরচা সব তার। ঘাট পাবলিকের পাঁঠা বটে, তবে ল্যাজের দিকে কাটবার কোন উপায় তার নেই। চান করতে পুরুষ আসছে, মেয়ে আসছে। ওদের দেখে কেউ খিস্তিখাস্তা বেমালুম চালিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য যদি ইন্সপেক্টরের নজরে একবার পড়েছে তো যার এলাকায় এসব হচ্ছিল, সেই পাণ্ডার দফা গয়া হয়ে গেল। এখানে যত পাণ্ডা, তত নম্বর। আমার নম্বর সতের। যদি আমার এখানে কোন বেচাল, বেয়াদপি ধরা পড়ে তো আমার পাণ্ডাগিরি একেবারে ঠাণ্ডা।

ওই যে দেখছেন, কোনের দিকে এক ছোকরা বসে আছে, ওর বাবার নামে ছিল পারমিশন। অফিস-ফেরতা কেরানীবাবুদের কেউ কেউ ওর কাছে আসতেন। ওর কাছে গাঁজা-টাজা সব থাকত। বাড়িতে অফিসে লজ্জা করে, এই ঘাটের ঘুপসীতে বসে দুটান তাই দিয়ে ঘরে ফিরতেন। পড়বি তো পড় একদিন ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি। ব্যস্, আর যাবে কোথায়? হয়ে গেল। শেষে অফিসে হাঁটাহাঁটি, দৌড়-ঝাপ। কিছুতেই হল না। বুড়ো তো পাগল হয়ে উঠল। তারপর একদিন না-পাত্তা হয়ে গেল। ছেলেটা ছিল নাবালক। সেই শেষ পর্যন্ত নম্বরটা পেল। তবে নিয়ম হচ্ছে, নাবালকের গার্জিয়ান-স্বরূপ কেউ না থাকলে রেজিস্টার্ড গোমস্তাই টাকাকড়ি উসুল করে দেয়।

রোজগার আর কত হয় আমাদের? বড় জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে। যজমানদের কাছে বাঁধা বরাদ্দ আছে। সেই যা ক'টা পয়সা মাস গেলে আসে। নগদ খদ্দেরে আর কত হয়? রোজ দু-চার-পাঁচ আনা।

তবে যাকে তাকে ডেকে ভরসা পাইনে। কত রকম যে ফিকিরবাজ লোক আসে, তার কি ঠিক আছে? একবার হল কি? দুজন লোক এল চান করতে, নতুন লোক। জামা-কাপড়ের নমুনা দেখে তো আমাদের জিভ্ লক লক করে উঠল, এ-শাঁস কার কাছে যায়? আসুন আসুন বাবু! সবাই টুকরি এগিয়ে দেয়। শেষে একজন তো পাকড়াল। বাকী সবাই তাকে পারে তো চোখ দিয়ে গিলে খায়। জামা-কাপড় খুলে, গামছা এনেছিল সঙ্গে, তাই পরে তো চান করতে গেল। ফিরে এসে জামা-কাপড় পরেই একজন চেঁচিয়ে উঠলে, আমার টাকা? আরেকজন চেঁচালে, আমার সোনার বোতাম? দ্যাখ দ্যাখ করতে করতে বিস্তর লোক জমে গেল। পাণ্ডাকে ধরে এই মারে তো এই মারে। সে বেচারার তো হয়ে গেছে। হৈ-চৈ শুনে পুলিশ এসে তো ধরে নিয়ে গেল তাকে। দু মাস সাজাও হল। পরে জানা গেল, পাণ্ডা নির্দোষ। যার সোনার বোতাম চুরি গিয়েছিল, কারসাজিটি তার। সে নিজেই এক পাকা চোর। বন্ধুর টাকা গাপ করে সরে পড়ার চেষ্টায় কেসটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যি ভাল যে শয়তানটা ধরা পড়ে গেল। আর একবার এক চোর, আরেকজনের কাপড় পরে পালিয়ে গেল, আর সে কাপড়ের দাম দিতে হল বেচারা পাণ্ডাকে।

তবে আরেকটা ঘটনা বলি। এক অর্ধোদয় যোগে, এই ঘাটে, দুজন ভদ্দরলোক এলেন, আর তাঁদের সঙ্গে এক বৌ। চান করবেন। ওদের দুজনে আমার কাছে এলেন। টুকরি এগিয়ে দিলাম। ওরা জামা-কাপড় ছাড়লেন। বৌটিকে মেয়েদের ঘাটে এক পাণ্ডার হাতে তুলে দিয়ে এলাম। তারপর বসে আছি। তিন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। দুজনের একজনও এল না। চার ঘণ্টা পরেও না। আর এলোই না। কি বলব বাবু। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মেয়েদের ঘাটের পাণ্ডারও সেই দশা। আর বিলম্ব না করে পুলিশে খবর দিলাম। পুলিশ জামা-কাপড় নিয়ে গেল। পয়সা কড়ি নাকি অনেক ছিল। কিন্তু পুলিশও বের করতে পারল না। সবাই বললে, মরে গেছে। তিন-তিনজন একসঙ্গে মরল, একটু আশ্চর্য লেগেছিল। তার চার-পাঁচ বছর পরে, পুরী গিয়েছিলাম, সেইখানে সেই বৌটিকে দেখেছি বাবু, অন্য এক ছোকরার সঙ্গে। কি তাজ্জব।

আমার বাপ একটা ঘটনা বলেছিল, সেটা বলি শুনুন। সে অনেক দিনের ঘটনা। আমার ঠাকুর্দা তখন পাণ্ডা। বাবা ছেলেমানুষ। গঙ্গার ঘাটে তখনো এমন কোঠা ওঠেনি। পাণ্ডারা বসত ঘাটের কিনারে। যার যার বড় বড় ছাতা ছিল, সেই ছাতা দিয়ে রোদ আটকাতো। বিষ্টি-কালে ভিজতেই হত। তখন শহরে এত মানুষ ছিল না। তেমন জলেরও ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। দূরে দূরে থেকে আসত সব গঙ্গা নাইতে। তখন তো এখনকার মত এত মোটরগাড়ি-টাড়ি হয়নি। টমটম, ফিটন ছিল পাল্কী ছিল কোন কোন বাড়িতে। বাবুরা আসতেন টমটম, কি ফিটন, কি পাল্কী-গাড়ি করে। আর অন্দরের মেয়েছেলেরা আসত পাল্কী চড়ে। সেই অন্দর মহল থেকেই তারা পাল্কীতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিত, পাছে কেউ দেখে ফেলে। আর গঙ্গার ঘাটে এসেও পাল্কী থেকে নামত না। বেয়ারাগুলো সেই দরজা বন্ধ পাল্কী গঙ্গার জলে ডুবিয়ে আবার বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেত। এই ছিল সেকালের নিয়ম।

আমি যখন গঙ্গার ঘাটে গেলুম, তখন স্নানার্থীর ভিড় চারদিকে গিসগিস করছে। ফাঁকে ফাঁকে পাণ্ডার সঙ্গে আলাপ জমালুম। পুরুষ ঘাটের পৈঁঠায় দু-তিনটে হিপোপটেমাস রোদ পোয়াচ্ছে? না হিপো নয়, পালোয়ানের পো! সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ভাগিয়াসার চেহারাগুলো আরামের আমেজে তা দিচ্ছে। ওপাশে একজন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে, আর চটাস-পটাস ঘাড়ে গর্দানে তৈলমর্দন চলেছে। একপো তেল চার আনা, সেদিন আর নেই। তেল মাথার লোকের অভাব পড়ে গেছে। মালিসের ব্যবসা ক্রমেই মন্দা। তেল যাঁদের দিতে হয়, তাঁরা আর নদীতে আসেন না, তাঁরা এখন গদীতে। তাঁদের নাগাল এদের হাত পাবে কেমন করে?

চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীপরিমল রায়

অগ্রহায়ণ

শ্রীপরিমল রায়ের অর্ধশতাধিক চিত্র, স্কেচ ও ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। শিল্পী রায়ের শিল্পশিক্ষা আরম্ভ হয় সরকারী কলাবিদ্যালয়ে কিন্তু অনিবার্য কারণে শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বেই তাঁকে সরে আসতে হয়। শিল্পে সাধারণ অনুরাগ বশত অঙ্কনকার্য থেকে বিরত তিনি হননি—নিজে নিজেই নানানভাবে এখনও এ'কে চলেছেন।

শিল্পীর দৃষ্টি মুখ্যত বাস্তবমুখী এবং দৈনন্দিন জীবন নিয়ে ছবি আঁকতেই তিনি বেশী ভালবাসেন। একথা তিনি তাঁর চিত্র তালিকায় বিশেষ করে উদ্ধৃতও করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার নানান দিক নিয়ে অঙ্কিত অধিকাংশ ছবিতে সেই সহজ জীবনের প্রাণের ছোঁয়া যেন পাওয়া যায় না। তারা যেন শিল্পীর কল্পনা জগতের লোকজন। সাধারণ জীবনের ছবি আঁকতে হলে শিল্পীকে আরও নিষ্ঠার সংগে অনুধাবন করতে হবে তাদের জীবনকে তাদেরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তা না হলে তা ব্যর্থ হবে।

শিল্পীর কাজে আর একটি দুর্বলতা হল ড্রইংএ আতিশয্য দোষ। সময়ে সময়ে সেই দোষ বিকৃতির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া নির্বিচার রঙ ব্যবহারের ফলে বহু ছবি ভারাক্রান্ত হয়েছে। এই ধরণের নানান দুর্বল রচনার মধ্যে যে কটি ছবি একটু রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ধানকাটা (২) পরিশ্রান্ত (৭) জীবনদোলা (২২) অগ্রহায়ণ (১৪) প্রভৃতি কএকটি চিত্র। এগুলোর তুলনায় ভারতীয় আঙ্গিকে অঙ্কিত কএকটি রচনা বিশেষভাবে দুর্বল ও প্রাণহীন মনে হয়েছে। রুদ্র বৈশাখ (৪) অশোকবনে সীতা (৩৪) ওরা কাজ করে (১০) বিশ্রাম (২৭) শাঁখারী (৩২) ওরে আয় (৩৩) প্রভৃতি রচনাগুলো এই পর্যায়ে পড়ে। সেদিক দিয়ে শিল্পীর সমুদ্রের কএকটি রচনা' বেশী আনন্দ দিয়েছে। বিশেষ করে তাঁর The golden rays come over the ocean (১৯) ছবিটিতে figureগুলো দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করলেও ছবিটির বর্ণসুষমা উপভোগ করার মত। মাতাল সমুদ্র (১৭) চিত্রটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া একঘেয়ে দুপুর (১৬) ব্যথিতা (২৪) সিঁদুর রঙের সৌন্দর্য (৩০) প্রভৃতি চিত্র এবং কএকটি রেখা-চিত্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভাল লাগে। শিল্পীর কএকটি ভাস্কর্যও এই সংগে উল্লেখযোগ্য।

স্কেচ্

শিল্পীর প্রথম প্রচেষ্টায় যে দোষ-ত্রুটির কথার উল্লেখ করলাম ভাবিষ্যতে সে দোষত্রুটি অতিক্রম করে তিনি আরও পরিণত পরিমার্জিত ও সুষ্ঠু রচনা নিয়ে আমাদের আনন্দ দেবেন এই আশাই করি।—

উপন্যাস

অ্যালবার্ট হল—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৷৷৹ টাকা।

কলেজ স্ট্রীটের অ্যালবার্ট হল একদিন সারা বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল, সারা ভারতের রাজনৈতিক আশা-উদ্দীপনার মঞ্চ। অ্যালবার্ট হলের সে রূপ বদলে গেছে, নীলাভ ডিসটেম্পারের স্নিগ্ধতা আর কফির উগ্র গন্ধের মাঝখানটিতে জন্ম নিয়েছে নতুন একটি পৃথিবী। এ জগৎ সমাজ আর সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বপ্নবাবির জগৎ। বেলের পরগাছার মত কয়েকটি স্বল্পবুদ্ধি রাজনৈতিক কথাকর্মী, স্বপ্নবিলাসী ছাত্র-ছাত্রী, হবু সাহিত্যিক, করুণাকাঙ্ক্ষী কবি, ফাঁপা এবং ফাঁকা ব্যবসাদার, গাইয়ে আঁকিয়ে নানা ধরণের চরিত্র জমা হয় এখানে, কলরব জমায়। আর তাদেরই কেন্দ্র করে শুধু এই অ্যালবার্ট হলের এলাকাটুকুর মধ্যে একটি নতুন ধরণের উপন্যাস রচনা করার চেষ্টা করেছেন লেখক। হয়তো স্বাভাবিক বলেই কিছুটা তার্কিকতা দেখা গেছে এর পাতায় পাতায়, কিন্তু ফরাসিসদৃশ এই আঙ্গিকের সাহসিকতা প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই। বিভিন্ন চরিত্র, কথা, ঘটনার ফাঁকে একটি অন্তঃশীলা ধারা—প্রেম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি, কাহিনীর আভাসটুকুই কেবল, আবেশ গড়ে ওঠেনি। ভিন্ন বিষয়ের গভীরতাও এখানে অনুপস্থিত। অনু-সন্ধানী চোখ নিয়ে দেখলে এমন কয়েকটি ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে সত্য, কিন্তু অ্যালবার্ট হলের সরস জীবন্ত অথচ শূন্যকুম্ভ রূপকে তুলে ধরার প্রচেষ্টাও কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। কয়েকটি চরিত্রও স্পষ্ট রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায়। তবে এতগুলি চরিত্রের আমদানী না করলেই বোধ হয় লেখক আরো সার্থক হতে পারতেন। অসংখ্য রেখার প্রয়োজন হয় তরুণ শিল্পীর, সক্ষম যিনি তিনি একটি রেখার দ্বারাই গণ্ডী বেঁধে নিতে পারেন।

তবু, আশা করি, এই নতুন ধরণের উপন্যাসটি পাঠক পাঠিকাদের তৃপ্তি দেবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট ভালো। ৬৫।৫৩

কিনু গোয়ালার গলি (দ্বিতীয় সংস্করণ) —সন্তোষকুমার ঘোষ, দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৬। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে এক আলোড়ন পড়ে যায়। উপন্যাসখানি কলিকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের নিপুণ রূপায়ণ। শুধু জনপ্রিয়তার জন্যই নয়, সার্থক শিল্প হিসেবেই কিনু গোয়ালার গলি উল্লেখযোগ্য। অল্প সময়ের মধ্যে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই এর চাহিদার সব চেয়ে বড় সাক্ষী।

এই সংস্করণের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ-সজ্জা পূর্ব সংস্করণের চেয়ে অনেক বেশী মনোহর হয়েছে। ২৪।৫৩

অগ্নিপরীক্ষা—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী। পি কে বসু এণ্ড কোং, কলিকাতা—৩১। ৩৷৷৹।

একেবারে ঘরোয়া জীবনের হাসিকান্নায় ভরা বাংলার মধ্যবিত্ত সংসারের পারিবারিক চরিত্রকে মিষ্টিমধুর সরস গল্পের উপজীব্য করাই আশাপূর্ণা দেবীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, রোমান্সের মানবকে ঘিরে রোমাঞ্চময় কাহিনী রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। হয়তো গভীরতার অভাব আছে তাঁর লেখায়, হয়তো বা বৈচিত্র্যেরও। কিন্তু রসের ক্ষেত্রে এমন হাসি আর কান্নার সমন্বয়সাধন খুব অল্পই চোখে পড়েছে। লেখিকা মহত্তর কোনকিছু সৃষ্টি যদি নাও করে থাকেন, নিম্নস্তরের কিছুও লেখেননি।

'অগ্নিপরীক্ষা' তাঁর নতুন উপন্যাস। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। চিত্রণও অনেকক্ষেত্রে কাব্যের সীমায় পৌঁছেছে। তপস্বী, চিত্রলেখা, মণীন্দ্র ও হেমপ্রভার চরিত্র যেমন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, তেমনি বলার কিশোর মনের উদ্ভ্রান্তি, সাকলার ও সপ্তমীর শিশুমি, কিরীটির কূটনীতি দুঃসাহস মনকে নাড়া দিয়ে যায় বই শেষ হবার পরও। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট চমৎকার। ৬৬।৫৩

ধর্মগ্রন্থ

উদ্বোধ বাণী—মাতাজী শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী। শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্তা কর্তৃক সত্যব্রত মঠ, পোঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৸৹ আনা।

সত্যব্রত মঠের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী শৈশব হইতে ধর্মভাবসম্পন্না ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নির্জন অরণ্যে গিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হন। কয়েক বৎসর হিমালয়ে তপশ্চারণের পর সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ায় সত্যব্রত মঠ স্থাপন করেন। বর্তমানে ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় উক্ত মঠের একটি শাখা স্থাপন করিয়া অধিকাংশ সময় তথায় অবস্থান করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে ব্রহ্মচারিণী চিন্ময়ী দেবীর উপদেশসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-রসপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলি পাঠ করিলে

উপকৃত হইবেন। ভাষা প্রাঞ্জল এবং সর্বসাধারণের উপলব্ধির পক্ষে উপযুক্ত। ৭৬।৫৩

সাধন পন্থা—সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎস্বামী যোগজীবনানন্দজী প্রণীত। প্রথম বল্লী। সত্যায়তন মহামন্দির, পোঃ সত্যায়তন, বাঁকুড়া হইতে শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—৩, টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে সত্যায়তন মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমৎস্বামী যোগজীবনানন্দজী তাঁহার উপদিষ্ট সাধন পন্থার বিস্তৃত আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য, আসন, ধ্যান, নাম-সাধনা এবং মন্ত্র রহস্য উপলব্ধির প্রকরণগুলি সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। এই আলোচনা গ্রন্থকারের প্রগাঢ় অধ্যাত্মানুভূতি এবং সাধনমার্গে তাঁহার সমুন্নত অধিকারের পরিচায়ক। লেখক অদ্বৈতবাদী এবং বৈদান্তিক। তিনি শক্তির সাধনা এবং চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নৈতিকতাবিহীন শক্তি পশুবল মাত্র; সুতরাং চরিত্রকে তপস্যার প্রভাবে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়া বীর্যবান্ হইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "চিরকাল আর্ত দেশকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছে এই গেরুয়ার দল। রামদাসের লেংটির আবরণেই ছত্রপতি শিবাজী মানুষ হইয়াছিল। গেরুয়ার সাহচর্যেই অশোকের মত, চন্দ্রগুপ্তের মত সম্রাটের উদ্ভব হইয়াছিল। গেরুয়াধারী দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ হইতেই মিলিয়াছে বর্তমান কর্মপ্রবণতা।" যাঁহারা সত্যায়তনের বিশেষ সাধন-পন্থা অবলম্বনে অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রসর হইতে উৎসুক পুস্তকখানি প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে, অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহারাও সকলেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যের অনেক গভীর এবং গূঢ় রহস্য এই আলোচনায় প্রাঞ্জল হইয়াছে। ৭৮।৫৩

প্রাচীন সাহিত্য

চূড়ালা ও শিখিধ্বজ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত কর্তৃক বর্তমান প্রকাশনা, ৩৩এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ মাত্র।

পৌরাণিক কাব্যকাহিনী। যোগবাশিষ্ঠের রাজ্ঞী চূড়ালার দার্শনিক তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ আখ্যায়িকাটি অবলম্বন করিয়া কবিতাটি লিখিত হইয়াছে। অন্তরগ্রাহ্য সত্যের বলিষ্ঠ অনুভূতিতে, রসধর্মের ঔজ্জ্বল্যের চমকচ্ছটায় ছন্দের সৌষ্ঠব এবং সাবলীল সংলাপে রচনাটি সর্বাংশে সার্থক হইয়াছে। রচয়িতা বাঙলার কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নবাগত নহেন। আলোচ্য কাব্যকাহিনী তাঁহার যশোগৌরব বির্বাধত করিবে। চূড়ালা ও শিখিধ্বজের কাব্যকাহিনী পুস্তকখানি মুখ্যাংশ অধিকার করিলেও এই সঙ্গে বর্ষবরণ, লেখনী, নৈশচারী, রামায়ণ, বৈদেহী ও দশানন, সাবিত্রী ও দ্রৌপদী, গোপী-গীতা এই কয়েকটি ছোট কবিতাও আছে। এগুলির মধ্যে 'রামায়ণ' এবং 'সাবিত্রী ও দ্রৌপদী' এই দুইটি কবিতা উল্লেখযোগ্য, তন্মধ্যে 'সাবিত্রী ওদ্রৌপদী' সমধিক রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। ৮৬।৫৩

সমালোচনা সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী—মনোরঞ্জন জানা, এম-এ, এন জি ব্যানার্জি, ১৬ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসাকে (নারী সম্পর্কীয়?) মধ্যমণি করিয়া রীতিমত সমালোচনা না করিয়া একটি ভাবলোক সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছি। যে অর্থে উপন্যাস জীবনেরই নিগূঢ় প্রকাশ, আমি সেই অর্থটাকেই সার্থক করিতে চাহিয়া উপন্যাসগুলিকে জীবনের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিম-নারী-চরিত্রের মূল সূত্রটিকে তিনি ঠিকই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। অধ্যবসায়ী ছাত্র মাত্রেরই পুস্তকটি কাজে লাগিবে। ৫৮।৫৩

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্নিশিক্ষা—হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী; প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২, টাকা। ৮৪।৫৩

শরৎ স্মরণিকা—ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ; শরৎ সমিতি, ২২এ, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা। মূল্য—১, টাকা। ৮৫।৫৩

উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রবেশিকা—যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥০ টাকা। ৮৭।৫৩

হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা—স্বামী বেদানন্দ; ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য—১০ আনা। ৮৮।৫৩

করে দেখ—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য; বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ৯৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—১০ আনা। ৮৯।৫৩

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়; ধীরেন্দ্রমোহন রায় কর্তৃক ২১৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১০ আনা। ৯০।৫৩

আমার দেশের কবি—ধীরেন্দ্রলাল ধর; শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২, টাকা। ৯১।৫৩

মৃন্ময়ী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; দেব-সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য—১, টাকা। ৯২।৫৩

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে শুনিলাম, দিল্লীতে মহিলাদের "সঞ্চয় সপ্তাহ" প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়াছে। —"পতির পুণ্যকে এখন আর সতীর পুণ্য বলে মনে করা হয় না, তাছাড়া পুণ্যের জন্যে

মাথা ব্যথা কারু নেই। দেখা যাক্, এই ব্যবস্থায় সতীর আয়ে যদি পতির আয় বাড়ে। তবে কথা হচ্ছে, সঞ্চয়টা কার আয়ে সঞ্চিত হবে, তা কিন্তু খোলসা করে এ সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করেন প্রবীণ সংসারী বিশু খুড়ো।

* * *

সমগ্র বাঙলা দেশে একটিমাত্র পাগলা গারদ ছিল বহরমপুরে, তাহাও বর্তমানে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। —"হয়ত সমগ্র বাঙলার পাগলের সংখ্যাধিক্যের কথা চিন্তা করেই গারদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইবারে গুটি-কয়েক সুস্থ মস্তিষ্কের জন্যে একটি গারদের ব্যবস্থা হলে সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকারের কর্তব্য পালন যেমন হয়, তেমনি পাগলদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিও সুবিচার হয়"—পরামর্শটা দেয় আমাদের শ্যামলাল।

* * *

জীবনব্যাপী সংগীত সাধনা ও অনন্যসাধারণ সংগীত প্রতিভার জন্য রাষ্ট্রপতি চারজন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞকে সম্মানিত করিয়াছেন। —"জীবনব্যাপী সংগীত সাধনা না করেও যাঁরা নাগরিক-দের জীবনকে সঙ্-গীতের স্রোতে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছেন, তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি!" —মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

তমলুকের হ্যামিল্টন হাইস্কুলের প্রত্নতত্ত্বাগারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহৃত যে শাল ও ছড়ি সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য নাকি বহু উৎসুক দর্শকের ভীড় হইতেছে। —"স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সংগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঠনঠনের চটিজোড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন। কাবুলি-মোকাসিনের আসরে সেই দুর্লভ চটিজোড়ার প্রয়োজন বুঝি বাঙলার সবচেয়ে বেশি"।

* * *

যোগাযোগ সচিব মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আর দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। —"সুসংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু যাঁরা 'engaged' আছেন, তাঁদের আশা করি, সরকার একবারে 'অরক্ষণীয়া' না করে একটা রক্ষণের ব্যবস্থাও করবেন" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মাদ্রাজ ঘোড়দৌড়ের মাঠের সংবাদে জানা গেল যে, House Plate-এ 'Prohibition' নামক ঘোড়াটির ছুটিবার কথা ছিল, কিন্তু সে দৌড়ায় নাই। আমাদের জনৈক রেস-রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"ট্রেনারের বুদ্ধি আছে বলতে হবে, কেননা Prohibition-এর জেতার চান্স একেবারেই ছিল না এবং হয়ত কোনদিনই হবে না। মহালক্ষ্মীতে মোরারজী দেশাই মশাই বরং বেটিং করে দেখতে পারেন!!
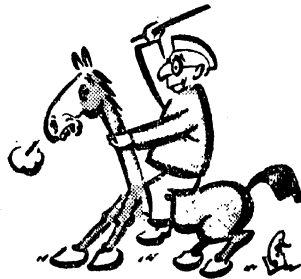
* * *

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য **চুক্তি** আলোচনার জন্য পাক্ প্রতিনিধিরা দিল্লী আগমন করিয়াছেন। —তাঁদের আগমন হয়ত সার্থক হবে, কেননা, তাঁরা জানেন, চুক্তি রক্ষার বালাই নেই আর আরো জানেন—দেবে আর দেবে, শুধুই দেবে, যাবে না ফিরে, এই দিল্লীর অভিমানবের যমুনা তীরে"!!

* * *

পাকিস্থানের অন্য এক সংবাদে জানা গেল যে, পাক্ পার্লামেণ্টের পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে।

—"হাকিমী দাওয়াইর কেরামত বলতে হয়"—সংক্ষেপে মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

জামসেদপুর, চাঁইবাসা, পুরুলিয়াস্থ আদালত ভবনসমূহে শুনিলাম, বিজলী বাতির পরিবর্তে সলিতার বাতি জ্বলিবে। —"পঞ্চবার্ষিকীর প্রথম কিস্তি কি না, তা অবশ্যি সংবাদে বলা হয়নি। সে যা হোক, আমরা শিবরাত্রির সল্‌তেটির দিকেই তাকিয়ে থাকবো,—নয়ন যদিন রইবে বেঁচে"—শ্যাম তার কথাটা গান দিয়েই শেষ করে।

রঙ্গজগৎ

বাঙলা নাটকের আর এক রূপ

বাঙলার পেশাদার মঞ্চের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো গত সপ্তাহে। একেতো উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার মতো কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে না আজ-কাল, তার ওপর আদবকায়দাটা ক্রমশই যেভাবে চলচ্চিত্রঘেঁষা হয়ে উঠছে, তাতে আশংকা আরও বেড়েই চলেছে। সদ্য মঞ্চস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে "ঝিন্দের বন্দী" আবার আশংকাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। চলচ্চিত্রের দোসর হয়ে ওঠাটা মঞ্চের পক্ষে দোষের খুবই, তবে সে সবেতে বাঙলার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতার একটা ছাপ তবু থাকে, "ঝিন্দের বন্দী"তে তাও লোপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—বাঙলা নাটক, কিন্তু চেহারাটা করে তোলা হয়েছে হিন্দীর অনুকরণে—প্রতিভার অন্তঃসার-শূন্যতাকে সাড়ম্বরে ঢেকে দেবার ধূর্ত উপায়। নাটকের অন্তঃস্থলকে শ্রী ও রস-মণ্ডিত করে তোলার চেয়ে "ঝিন্দের বন্দী"তে বহিরাভরণের চাকচিক্যের দিকেই সব নজরটা দেওয়া হয়েছে। এ যেন বাঙলা মঞ্চের আত্মপরাভবের একটি আড়ম্বরপূর্ণ অভিব্যক্তি। আর এ আড়ম্বরও সুসংগত কোন সুচ্ছন্দ শিল্পধারারও পরিচয় এনে দেয় না।

* * *

চার অংকের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা দৈর্ঘের নাটক "ঝিন্দের বন্দী"। আখ্যান-ভাগ গ্রহণ করা হয়েছে শরদিন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রচনা থেকে, সেটিরও আবার সূত্র হচ্ছে "প্রিজনার অফ্ জেন্ডা"। গল্পটা রূপকথা ধরণের, কিন্তু তার স্থান কালপাত্রকে বছর কতক মাত্র আগে ইংরেজের আমলে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে। গল্পের আরম্ভ একেবারে হাল আমলের কলকাতা থেকে। ঝিন্দ রাজ্যের রাজা শংকর সিং নিরুদ্দেশ; তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন রাজপরিবারের একান্ত অনুগত সর্দার। অভিষেকের কয়েকটি দিন মাত্র বাকি, শংকর সিংকে খুঁজে বের করা চাই, তা না হলে গদী দখল করবে তার ভাই উদিৎ সিং। আসলে, গদীতে বসবার জন্যই উদিৎ সিং তার সহচর ময়ূরবাহনের সহায়তায় শংকর সিংকে বন্দী করে নিজের জমিদারী শক্তিগড়ের দুর্গে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সর্দার কলকাতায় শংকর সিংকে পেলে না বটে, কিন্তু তার বদলে কাজ হাঁসিল করার একটা উপায় দেখতে পেলে। কলকাতার লেক ক্লাবে তলোয়ার খেলা দেখতে গিয়ে সর্দার অবিকল শংকর সিংয়ের মতো দেখতে এক যুবকের সন্ধান পেলে। নাম তার গৌরীশংকর। সর্দার এই গৌরীশংকরকেই শংকর সিংয়ের জায়গায় রাজা সাজিয়ে ঝিন্দে নিয়ে গেলেন। অন্য কেউই কিছু ধরতে পারলে না, কিন্তু উদিৎ সিং ও ময়ূরবাহন জানতে পারলে শংকর সিংয়ের জাল পরিচয়। তবুও তারা জাল শংকর সিংকে ধরিয়ে দিতে পারছিলো না। ইতিমধ্যে অভিষেক হয়ে গেলো এবং সেইক্ষেত্রেই পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝড়োয়ার রাজকুমারীর সংগে শংকর সিংয়ের তিলক অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, দুটি অনুষ্ঠানই হলো গৌরীশংকরকে নিয়ে। উদিৎ ও ময়ূরবাহন গৌরীশংকরের প্রাণ-নাশের চেষ্টা করলে, কিন্তু ব্যর্থ হলো। ঘটনাচক্রে গৌরীশংকরের সংগে ঝড়োয়ার রাজকুমারীর সাক্ষাৎ হয়ে যায় এবং তারা সংগে সংগেই গভীর প্রেমে নিমগ্ন হয়। সর্দার গৌরীশংকরকে সাবধান করে দিলেন এই বলে যে, রাজকুমারী আসল শংকর সিংয়ের বাক্‌দত্তা, নকল সেজে গৌরীশংকর যেন তাকে পাবার চেষ্টা না করে। এদিকে অবশ্য গৌরীশংকর তার আচারে ব্যবহারে এবং রাজকীয় চালচলনে প্রাসাদের সকলের মন জয় তো করেই, এমন কি সর্দারেরও। ওদিকে উদিৎ ও ময়ূরবাহনের ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠতে থাকে। কৌশলে গৌরীশংকরকে শক্তিগড়ের দুর্গে আহ্বান করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়, কিন্তু এবারে গৌরীশংকর সামান্য মাত্র আহত হয়। এরপর উদিৎ ও ময়ূরবাহন ঝড়োয়ার রাজকুমারীকে অপহরণ করে শক্তিগড় দুর্গে বন্দিনী করে। ইচ্ছে ছিলো জোর করে উদিৎ সিং তাকে সেইখানেই বিয়ে করতে বাধ্য করবে। ইতিমধ্যে গৌরীশংকর রাজকুমারীর প্রিয় সাথী কৃষ্ণার সহায়তায় তার সংগে সাক্ষাৎ করে এবং নিজের আসল পরিচয় দেবার চেষ্টা করে। রাজকুমারীর মনে তাতে এক রহস্যেরই যা সৃষ্টি হয়, কিন্তু নকল শংকর সিংয়ের ওপরে তার প্রেম অটলই থেকে যায়। দুর্গে বন্দিনী রাজকুমারীর সামনে আসল শংকর সিংকে হাজির করে উদিৎ রাজকুমারীর ভুল ভাঙার চেষ্টা করে, কিন্তু

ঘটনা আর বেশী এগলো না। গৌরীশঙ্কর অতর্কিতে সেখানে উপস্থিত হলো; উদিৎ সিং, ময়ূরবাহন এবং আসল শঙ্কর সিংও নিহত হলো। সে ঘটনার সাক্ষী রইলো শুধু সর্দার আর রাজার দেহরক্ষী। এবারে গৌরীশঙ্করকেই আসল শঙ্কর সিং বলে চালানোর আর অসুবিধে রইলো না কোন। এতদিনে সর্দার দেড়শো বছরের একটা কাহিনী শোনালেন, যাতে জানা গেলো যে গৌরীশঙ্করের প্রপিতামহ একদা ঝিন্দ রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। শঙ্কর সিংয়ের পিতামহ ছিলেন তার ঔরসে তৎকালীন রাণীর গর্ভজাত সন্তান; শঙ্কর সিংয়ের সঙ্গে গৌরীশঙ্করের চেহারার তাই অদ্ভুদ সাদৃশ্য। সর্দার জানালেন যে, এই সূত্রে ঝিন্দের সিংহাসনের ওপরে গৌরীশঙ্করেরও অধিকার আছে। সর্দার রাজকুমারীর সঙ্গে গৌরীশঙ্করের মিলন ঘটিয়ে দিলেন।

* * *

নাটকীয় তত্ত্ব বলতে কাহিনীতে কোথাও কিছু নেই, রয়েছে কেবল রহস্য ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে তোলার মতোই ঘটনার সমাবেশ। তাছাড়া জোরটা খাটানো হয়েছে দৃশ্যসজ্জার দিকেই বেশী। এতো জমকালো ও বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা দৃশ্যপট আগেকার পার্শী থিয়েটারের এবং তারই ধারারক্ষক হিন্দী নাটকগুলিতেই দেখা যায়—"ঝিন্দের বন্দী"তেও দর্শকদের প্রলুব্ধ করা হয়েছে ঐ দিক থেকেই, এ যেন বাঙলা নাটকই নয়। বাঙলা নাটকে এতো আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা বড়ো একটা দেখা গিয়েছে বলে মনে পড়ছে না। দৃশ্যপটের ঝলমলে জাঁকজমক চোখে রামধনুর ঝিলমিল এনে দেয়, কিন্তু মনকে টেনে ধরতে গেলে নাটকে যে বস্তুর দরকার সেইটের অভাবে সবই যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, দু একটা দৃশ্য দেখবার পরই তা উপলব্ধি করা যায়। রহস্যমূলক কাহিনীর ওপরে যেমন একটা কৌতূহল জেগে ওঠে নাটকখানি তার চেয়ে বেশী কিছু মনে জাগিয়ে তোলে না। আর দৃশ্যসজ্জাদি জমকালোই সার, তার মধ্যে শিল্পচ্ছন্দের কোন বালাই নেই।

* * *

নাটকখানিতে বক্তব্য বিষয় কিছু নেই বলে ধরে নিতে পারলেই ভালো, কারণ বলবার কথা ওতে যা রয়েছে এখনকার দিনে সেটা সুঅভিপ্রেত নয়। গৌরীশঙ্কর নকল রাজা সেজে ঝিন্দে যেতে উত্তেজিত হয়ে উঠলে এই শুনে যে তার প্রপিতামহকে ঝিন্দের রাজা হত্যা করেছিলো এবং সে বাঙালীকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। শেষে এইটেই হয়ে উঠলো গৌরীশঙ্করের শ্লোগান। কথায় কথায় বাঙালীত্বের বড়াই করা—বাঙালী এমন একটা দুর্জয় বীর যে, একটা অবাঙলা দেশকে জব্দ করে অধিকার করে নিতে সক্ষম হলো —এই হলো কাহিনীর প্রতিপাদ্য। সংলাপের মধ্যেও নাট্যরস বলতে নেই কিছু, আর নাটকীয় গভীরতাও নেই।

* * *

নাটকের প্রথম দুটি অংক শেষ হয়েছে আড়ম্বর দেখিয়েই। এ পর্যন্ত কোন চরিত্রে অভিনয়ও ফুটে ওঠার কোন সুযোগ নেই। নাটক কিছুটা এলো তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে—গৌরীশঙ্কর ঝড়োয়ার রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সর্দার তাকে বাধা দিতে যাওয়ায়। আর অভিনয় জমলো তৃতীয় অংকের শেষ দৃশ্য থেকে, উদিৎ সিং গৌরীশঙ্করকে 'বাঙালী কুত্তা' বলে সম্বোধন করে চিঠি লেখাতে। চতুর্থ অংকের ক'টি দৃশ্যই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনায় শেষ হয়েছে। কতকগুলি বিসদৃশতা চোখে পড়ে। প্রথম দৃশ্যেই সর্দার কলকাতায় গৌরীশঙ্করদের বাড়ীতে এসে ঝিন্দের প্রসংগ তুলতে গৌরীশঙ্করের দাদাকে বই দেখে ঝিন্দের পরিচয় জানতে হলো, অথচ সামনেই টাঙানো তার প্রপিতামহের একখানা ছবি যিনি ছিলেন ঝিন্দের দেওয়ান। গোড়ার একটি দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে উদিৎ সিং ও ময়ূরবাহনকে শঙ্কর সিংকে অপহরণ

করার ষড়যন্ত্র করতে। ঘরের ভিতরে শঙ্কর সিং পানোন্মত্ত, বাইরে উদিৎ ও ময়ূরবাহন, মাঝে রয়েছে একটা কাঁচের জানলা। ময়ূরবাহন ঘরে প্রবেশ করে নর্তকীদের চলে যেতে এবং শঙ্করকে ধরে নিয়ে যেতে ইশারা করলে, সেটা দেখানো হলো জানলার কাঁচের গায়ে ময়ূরবাহনের ছায়া ফেলে; কিন্তু ছায়াটা ফেলার সময়েই আলো ব্যবহার করা হলো, ততক্ষণ জানালাটা অন্ধকার থাকবে কেন? আর এক ক্ষেত্রে সর্দার ও গৌরীশঙ্করের তলোয়ার খেলা দেখানো হয়েছে ঐভাবে জানলার ওপরে ছায়া ফেলে। এতো শ্লথ ও অপটু হাতের তলোয়ার খেলা না দেখালেই ভাল হতো। পট পরিবর্তনের সুযোগ করার জন্য মাঝ পথে এক বৈরাগিনীকে দিয়ে মীরার ভজন একখানা শোনানো হয়েছে—মীরার ভজনের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা উপেক্ষা করে একটা মনগড়া সুরে গানখানি গাওয়ানো হয়েছে। এটা একটা অপরাধ।

* * *

গৌরীশঙ্কর ও শঙ্কর সিংয়ের দ্বৈত ভূমিকায় অবতরণ করছেন ছবি বিশ্বাস। **অবশ্য শঙ্কর** সিংয়ের আবির্ভাব মাত্র একবার, একেবারে শেষ দৃশ্যে। এখানে বেশ একটা কায়দা খাটানো হয়েছে দুজনকেই এক সঙ্গে দেখাবার মায়া সৃষ্টি করে। আধুনিক রাজার চরিত্র, সাজ-পোষাকের বাহার দেখাবার সুযোগ রয়েছে এবং ছবি বিশ্বাসও সে সুযোগ সদ্ব্যবহার করেছেন সাত-আটবার ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোষাক ব্যবহার করে। গৌরীশঙ্করের

চেয়ে অর্ধোন্মাদ শঙ্কর সিংয়ের ক্ষণিক আবির্ভাবেই ছবি বিশ্বাস ভালো অভিনয় দেখিয়েছেন। আড়ম্বরের বহরে অভিনয়ে খুব মনোজ্ঞ একটা কৃতিত্ব দেখানো কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, উদিৎ সিংয়ের ও ময়ূরবাহনের ভূমিকায় যথাক্রমে সুশীল রায় ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমারীর ভূমিকায় সরযূবালা অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় শিল্পীদের মধ্যে আছেন সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী, গীতশ্রী, কেতকী প্রভৃতি।

রবিতীর্থের বসন্তোৎসব

গত রবিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রোডের বালিকা শিক্ষাসদন ভবনে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রবি-তীর্থ রবীন্দ্রনাথের বসন্ত ঋতুর ষোলখানি গান দিয়ে একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। সুচিত্রা মিত্র, ললিতা বসু, মঞ্জুলা বসু, কল্যাণী বসু, অপর্ণা বসু, অলকা সরকার, মীরা সিংহ, ঊষা সিংহ, দীপ্তি দে, স্মৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়া রায়, দ্বিজেন চৌধুরী, সুশীল ভৌমিক, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই মুখোপাধ্যায়, আর্য মিত্র, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর পাল, পবিত্র দেব প্রভৃতি ঊনিশজন শিল্পী গানে যোগদান করেন। সুচিত্রা মিত্রের তিনখানি একক গান বিশেষভাবে তৃপ্তি দান করে, আর প্রশংসনীয় হয়েছিল মঞ্চসজ্জা—ভারতীয় ও জাপানী শিল্পধারার সঙ্গে মিশ খাইয়ে ভারি চমৎকার একটা পটের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

গীতবিতানের সমাবর্তন

গত ৮ই মার্চ রাজভবনে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র গীতবিতানের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী বঙ্গবালা দেবী ছাত্রছাত্রীদের উপাধি-পত্র বিতরণ করেন। ১৯৫২ সালে কৃতী উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রিবৃন্দ হচ্ছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে গীতভারতী উপাধি—অমলশঙ্কর ভাদুড়ী, আরতি লাহিড়ী, চন্দন ভট্টাচার্য, সুভাষ দত্ত, বনানী ঘোষ, বিমল নাগ, অলকা গুহ, সুবিমল সেন, শুক্লা বিশ্বাস, মৃন্ময়ী দত্ত, অরুণা বসু, বাসন্তী চৌধুরী, দেবপ্রসাদ কুমার, মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ ঘোষ, গৌরী বসু, মৈত্রেয়ী রায়, বেনু সেন, জ্যোৎস্না সেন, পূরবী সেনগুপ্তা, নীলাক্ষী ভট্টাচার্য; সেতার বাজনায় সুরভারতী উপাধি লাভ করেন উর্বশী মজুমদার ও রুমেলি দে: এবং উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের জন্য সঙ্গীতভারতী উপাধি লাভ করেন হিরন্ময় পণ্ডিত, লীনা রাহুত ও ইলা ভৌমিক।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা শেষ হইয়াছে। হোলকার দল প্রথম ইনিংসে ১৭ রানে অগ্রগামী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই বাঙলা দলকে পরাজিত করিয়া চতুর্থবার রণজি কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। হোলকার দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙলা দল যেরূপ অবস্থার মধ্যে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিয়াছে তাহা "অদৃষ্টের পরিহাস' ছাড়া কিছুই নহে। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এই খেলার ঘটনাবলী এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল।

প্রখর রৌদ্রতপ্ত মাঠে খেলা

ক্রিকেট মরসুম অতিবাহিত। প্রখর রৌদ্রতাপ সাধারণকেই দ্বিপ্রহরে ইতস্তত ভ্রমণ বা কার্য হইতে বিরত করিয়াছে। ঠিক এইরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে জাতীয় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালের ন্যায় চরম গুরুত্বপূর্ণ খেলা অনুষ্ঠিত হইবে, খেলার কোনই স্তর থাকিবে না, খেলা কিছুই হইবে না ইহাই ছিল খেলা আরম্ভের পূর্বে সকলের ধারণা। কিন্তু বাঙলা ও হোলকার দলের খেলোয়াড়গণই খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের পর দিন যেভাবে খেলায় উত্তেজনা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে ঠিক মরসুমের সময়েও কোন ক্রিকেট খেলায় পরিদৃষ্ট হয় নাই। উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল অপূর্ব দৃঢ়তা, জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা। দর্শকগণও এই উভয় দলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আশা ও নিরাশায় আন্দোলিত হইয়াছেন। খেলা শেষ হইলে সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইয়াছে সত্যই ভাল ক্রিকেট খেলা দেখিলাম। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ খেলা বাঙলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শতাধিক ও দ্বিশতাধিক রান

এই খেলায় বাঙলার পক্ষে পি বি দত্ত শতাধিক রান ও হোলকারের পক্ষে বি বি নিম্বলকার দ্বিশতাধিক রান করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের খেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া হোলকার দলের ৪০ বৎসর বয়স্ক কৃতী ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক আলী উভয় ইনিংসে প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেন। তিনি প্রথম ইনিংসে দর্শকগণের করতালিতে উত্তেজিত হইয়া ৯৯ রান করিয়া আউট হন। এমন কি দ্বিতীয় ইনিংসে যখন হোলকার দলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করিয়া ৪৯ রান করেন। চপলমতির খেলোয়াড় বলিয়া লোকে মুস্তাক আলীকে জানিত, কিন্তু এই খেলায় তাঁহার অন্য রূপ সকলে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছে। বলিয়াছে "কেন ইহাকে এখনও ভারতীয় দলে স্থান দেওয়া হয় না। ফিল্ডিং, ব্যাটিং কোন বিষয়েই ইহার শক্তি কমে নাই।" বাঙলা দলও চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের এক স্মরণীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন। মাত্র আড়াই ঘণ্টার খেলায় ৫ উইকেটে ২৮৭ রান সংগ্রহ করেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ইতোপূর্বে বাঙলার কোন দলকেই এইরূপ বেপরোয়া ব্যাটিং করিতে দেখা যায় নাই।

শেষ দিনের উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা

শেষ দিনে অর্থাৎ পঞ্চমদিনে বাঙলা দল জয়লাভের জন্য সর্বপ্রকারই চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় "একটি বলের" অভাবে জয়লাভ করিতে পারে নাই। হোলকার দলের ধুরন্ধর খেলোয়াড়গণ সকলে আউট। বাঙলার দ্বিতীয় ইনিংসের ৩২০ রানের বিরুদ্ধে হোলকারের ৯ উইকেটে মাত্র ১৪৯ রান হইয়াছে। ৫৫ মিনিট খেলা শেষ হইতে বাকী এই সময় হোলকারের শেষ খেলোয়াড় খর্বাকৃতি ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের পেশাদার খেলোয়াড় হইবার জন্য মনোনীত ধালওয়াড়ে ন্যাটা বোলার হীরালাল গাইকোয়াড়ের সহিত যোগদান করিলেন, দর্শকমণ্ডলী এমন কি হোলকার দলের প্রবীণ অধিনায়ক কর্ণেল সি কে নাইডু পর্যন্ত পরাজয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত, এইরূপ সময় দেখা গেল গাইকোয়াড় বা ধালওয়াড়ে কেহই আউট হইতেছেন না। দর্শকগণ উত্তেজিত হইয়া নানা-রূপ রব তুলিলেন। অচল অটল এই দুই খেলোয়াড়। বোলার ঘন ঘন পরিবর্তিত হইল, খেলার কোনই পরিবর্তন হইল না। শেষ ওভারের বল আসিয়া পড়িল এখনও ইহারা নট আউট। দর্শকগণের উৎসাহ উদ্দীপনা সমস্তই নিস্তব্ধতার মধ্যে অন্তর্হিত হইল। বিরাট এক হাহাকার শব্দ সারা মাঠ আচ্ছাদিত করিল। হোলকারের খেলোয়াড়দ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আউট হইলেন না। পাঁচ দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইল। হোলকার প্রথম ইনিংসে ১৭ রানে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিলেন। ইহার পরেই দেখা গেল একদল দর্শক মস্তকের উপরে ধালওয়াড়েকে তুলিয়া ধরিয়া উল্লাস করিতেছেন। হোলকারের প্রবীণ অধিনায়ক কর্ণেল নাইডু, হোলকারের মহারাজা মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরালাল গাইকোয়াড় ও ধালওয়াড়েকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।' অপর দিকে বাঙলার সমর্থক বিরাট জনতা গভীর শোকাভিভূত মহাশ্মশান ক্ষেত্র অবনত মস্তকে নিঃশব্দে ত্যাগ করিতেছেন। এই সময়ের দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না—যে সে কি করুণ দৃশ্য। ১৮৮২ সালের ওভালের মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে পরাজিত করিলে লণ্ডনের স্পোর্টিং টাইমস মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ওভ্যাল মাঠে ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যু হইয়াছে—বন্ধুবান্ধব মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া গভীর বিলাপে মগ্ন—মৃত আত্মার শান্তি হোক, চিতাভস্ম অষ্ট্রেলিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।" ঠিক অনুরূপ-ভাবেই বলিতে হয়, বাঙলার ক্রিকেটের এই দিনে মৃত্যু দৃশ্যেরই অবতারণা করা হইয়াছে।

ধন্য ধালওয়াড়ে

হোলকার দলের একটি ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কথা বাঙলার ক্রিকেট উৎসাহিগণ বহুদিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না—তিনি হইলেন ধালওয়াড়ে। ইনি শেষ দিনে যে কেবল অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া দলকে জয়যুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে—হোলকারের প্রথম ইনিংসেও যখন বাঙলার অগ্রগামী হইবার সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে তখন একটি দিক রক্ষা করিয়া বি বি নিম্বলকারকে সাহায্য করেন যাহার ফলে হোলকার দলের পক্ষে অগ্রগামী হওয়া সম্ভব হয়। এই

দিনেও শেষ পর্যন্ত ইনি নট আউট থাকেন। অর্থাৎ ইঁহাকে বাঙলার বোলারগণ কখনও পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইনি ধন্য।

খেলার ফলাফল

বাঙলা—১ম ইনিংসঃ—৪৭৯ রাণ (পি বি দত্ত ১৪১, এন চ্যাটার্জি ৫২, গিরিধারী ৪৫, শিবাজী বসু ৪৮, বেণু দাশগুপ্ত ৪০; এইচ গাইকোয়াড় ১২৮ রাণে ৪টি ও অর্জুন নাইডু ৬৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

হোলকার—১ম ইনিংস—৪৯৬ রাণ (বি বি নিম্বলকার ২১৯, মুস্তাক আলী ৯৯, রঙ্গনেকার ৮৬, অর্জুন নাইডু ৪৩; এস সোম ১৯৫ রাণে ৪টি, গিরিধারী ১০২ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বাঙলা—২য় ইনিংসঃ—৫ উইঃ ৩২০ রাণ (ডি দাস ৩৪, বি ফ্রাঙ্ক ৬২, পি সেন ২৪, নির্মল চ্যাটার্জি ৫৪, গিরিধারী নট আউট ৫৮ রাণ, বেণু দাশগুপ্ত নট আউট ৫৯ রাণ; অর্জুন নাইডু ৭৩ রাণে ২টি, জগদ্দেল ১৯ রাণে ১টি উইকেট পান)।

হোলকার—২য় ইনিংসঃ—৯ উইঃ ১৭৭ রাণ (মুস্তাক আলী ৪৬, নিম্বলকার ২৫, সি কে নাইডু ২৫, এইচ গাইকোয়াড় ১৭ রাণ নট আউট ও ধালওয়াড়ে ২ রাণ নট আউট; এস সোম ৪৪ রাণে ২টি, মণ্টু ব্যানার্জি ২৫ রাণে ২টি, এস গিরিধারী ১৭ রাণে ৩টি ও বেণু দাশগুপ্ত ৩৮ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল কিংস্টনে জামাইকা দলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করিয়া ভ্রমণের দ্বিতীয় জয়লাভে সক্ষম হইয়াছে। এই খেলাটি পাঁচদিনব্যাপী ও খেলার মীমাংসা পঞ্চম দিনের নির্দিষ্ট সময়ের ৪০ মিনিট পূর্বেই হইয়াছে। তবে খেলায় কোন দলই অধিক রান করিতে পারে নাই। ভারতীয় দলও প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৪০ রান করে। এই খেলার সাফল্যের জন্য ভারতীয় দলের ডান হাতে লেগ স্পিন বোলার এস পি গুপ্তের মারাত্মক বোলিংই বিশেষভাবে দায়ী। তিনি প্রথম ইনিংসে ৫টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭টি উইকেট একাই দখল করিয়াছেন। ইহার পরেই মানকড়ের বোলিংয়ের উল্লেখ করিতে হয়। তিনিও উভয় ইনিংসে অল্প রানে ৫টি উইকেট পতন সম্ভব করিয়াছেন।

খেলার ফলাফল—

জামাইকা ১ম ইনিংস—১৯৪ রান (রে ৪৪, বোনিটো ৭৪, জে হোল্ট ২২, এস গুপ্ত ৮৮ রাণে ৫টি, মানকড় ৫০ রানে ৩টি ও রামচাঁদ ২৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারত ১ম ইনিংস—১৪০ রান (মাঞ্জরেকার ৪৯, উমরিগর ১৯, কানাইয়ারাম ২২, ঘোড়পাড়ে ১৮, রামচাঁদ ১৫, গুডরিজ ২৮ রানে ৬টি, স্কট ৫০ রানে ৩টি উইকেট পান।)

জামাইকা ২য় ইনিংস—৮৯ রান (ওরেল ৪৭ রান নট আউট, বোনিটো ১৩, এস গুপ্তে ৪৩ রানে ৭টি, মানকড় ২৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংস—৪ উইঃ ১৪৭ রান (পি রায় ৫২, মানকড় ২৬, হাজারে ২৭, উমরিগার নট আউট ২৪, স্কট ৪৬ রানে ৪টি উইকেট পান।)
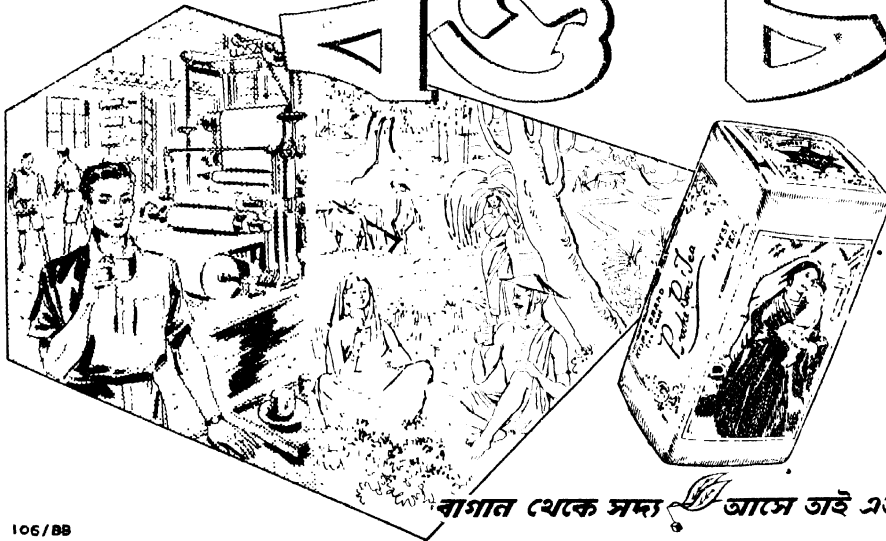
দেশী সংবাদ—

১৬ই মার্চ—সংসদ সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ভারত সরকারের সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অর্থ দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন।

কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে সকল স্তরে সহযোগিতার ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করার জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনেহরু ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় 'দুর্ভিক্ষ' খাতের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য যথোপযুক্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহারা কোন কোন জেলায় দুর্ভিক্ষের করালছায়া দেখা যাইতেছে এবং ইতোমধ্যেই কোন কোন স্থানে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মন্তব্য করেন।

১৭ই মার্চ—অদ্য লোক সভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করা হয়। পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "ভারতে কোন বিদেশী উপনিবেশের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, ইহা আমাদের পক্ষে কল্পনাতীত।"

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতাদের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

১৮ই মার্চ—কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে নেহরু-জয়প্রকাশ আলোচনা ব্যর্থ হইবার কারণ সম্পর্কে শ্রীনেহরু এক বিবৃতিতে বলেন, "বর্তমান অবস্থায় ন্যূনতম কর্মসূচী অনুযায়ী এক সঙ্গে কাজ করিবার এখনও সময় আসে নাই বলিয়া আমার মনে হয়। যদিও আমাদের মধ্যে বহু বিষয়ে মতৈক্য হইয়াছে।"

অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের অনগ্রসর শ্রেণীগুলির অবস্থা উন্নয়নের উপায় নির্ধারণের নিমিত্ত ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত অনগ্রসর শ্রেণী কমিশনের প্রথম সভার উদ্বোধন করিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, জাতি-ধর্মের সকল ব্যবধান দূর করিয়া ছোট-বড় সকলকে সমমর্যাদায় সঙ্ঘবদ্ধ করিবার সামর্থ্যের উপরই রাষ্ট্রের অগ্রগতি নির্ভর করে।

১৯শে মার্চ—পাকিস্থান সরকার অদ্য ভারতে পাট রপ্তানি সম্পর্কে বৈষম্যমূলক লাইসেন্স ফী ধার্য করিবার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছে। পক্ষান্তরে

সাপ্তাহিক সংবাদ

ভারত সরকার পাকিস্থানে রপ্তানি কয়লার উপর হইতে 'সারচার্জ' উঠাইয়া লইতে রাজী হইয়াছেন। নয়াদিল্লীতে পাক-ভারত বাণিজ্য বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে সকল পর্যায়ে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনেহরুর নিকট গত ৪ঠা মার্চ প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ যে ১৪ দফা খসড়া কর্মসূচী প্রেরণ করিয়াছিলেন, অদ্য শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাহা প্রকাশ করেন।

২০শে মার্চ—কয়লা এবং পাট বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে তিন বৎসরের জন্য একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আগামী তিন বৎসরকাল ভারত বৎসরে ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্থানের নিকট হইতে ক্রয় করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। অপর পক্ষে তিন বৎসরকাল মাসিক ৮২ হাজার হইতে ৮৪ হাজার টন পর্যন্ত কয়লা পাকিস্থানকে সরবরাহ করা হইবে।

২১শে মার্চ—ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ লোকসভায় ভারতের বিমান চলাচল কোম্পানীগুলি জাতীয় করণের জন্য এক বিল উত্থাপন করেন। উহাতে বিমান চলাচল কোম্পানীগুলির কার্যভার গ্রহণের জন্য দুইটি কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন অদ্য লোকসভায় বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষতি-পূরণ দেওয়া সম্পর্কে তাঁহার দপ্তর যে পরিকল্পনা করিতেছেন, মন্ত্রিসভা তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। শ্রী জৈন জানান যে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য যে তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, সেই কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কমিটি তাহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

২২শে মার্চ—উভয় বঙ্গের মধ্যে পাস-পোর্ট প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর ১৯৫২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে 'দেশ-ত্যাগের প্রমাণপত্র' (মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট) লইয়া ১৮,০০০ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। পাকিস্থানে ভারতের হাই-কমিশনার ডাঃ মোহন সিং মেহতা আজ কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

জম্মুর ব্যাপারে জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলন সম্পর্কে অদ্য দিল্লীতে ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে লাহোরের সামরিক শাসন পরিচালক অদ্য আরও তিনটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই মার্চ—যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো সরকারীভাবে বৃটেন পরিদর্শনের জন্য অদ্য লণ্ডনে পেঁাছেন। তাঁহার আগমন সম্পর্কে লণ্ডনে কঠোরতর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

মিশরের বিপ্লব পরিষদের তিনজন সদস্য অদ্য বিশেষ জোরের সহিত বলেন, সুয়েজ খাল এলাকা হইতে বিনাসর্তে বৃটিশ সৈন্য বাহিনীকে অপসারিত করিতে হইবে, ইহাই মিশরের দাবী। এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা সম্পর্কে আলোচনা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার ব্যবস্থায় মিশর সম্মত হইবে না।

১৭ই মার্চ—অদ্য কমন্স সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী ইডেন বলেন, যতদিন তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকিতেছেন, ততদিন তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক কম্যুনিস্ট চীন সরকারকে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন না।

অদ্য নেভাদায় আমেরিকার নূতন আণবিক বিস্ফোরণ (আণবিক অস্ত্র নহে) ঘটানো হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য নির্মিত ৩ শত ফুট উচ্চ স্তম্ভটি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রায় দুই মাইল দূরে পরিখায় অবস্থিত এক হাজার সৈন্যের মধ্যে কেহই আহত হয় নাই।

১৯শে মার্চ—গতকাল তুরস্কের দার্দানেলিস এলাকায় প্রবল ভূকম্পনে তিনশত হইতে পাঁচশত লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২১শে মার্চ—সুদানের গভর্নর জেনারেল স্যার রবার্ট হাওয়ে আজ সুদানের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সনদে স্বাক্ষর করেন।

মঃ আওনিন জাপোটোকী চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

২২শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ১৪টি রাষ্ট্রের প্রস্তাব ৫০—৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা চালাইয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

দেশ

শনিবার
২১শে চৈত্র, ১৩৫৯

DESH

SATURDAY, 4TH APRIL, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতীয় সপ্তাহ

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল ভারতের জাতীয় সপ্তাহ। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের অগ্নি-নালিকার উৎক্ষিপ্ত ধূমে পাঞ্জাবের আকাশে অগ্নিময় আবর্ত উত্থিত হয়। পশুবলের সেই বীভৎস, উদ্দাম, উন্মাদ আলোড়ন এবং বিলোড়ন ভারতের জন-মানসে বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংক্ষোভ সৃষ্টি করে। জাতীয় সপ্তাহ সেদিনের ঐতিহ্য বহন করিয়া আনে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সেই হইতে যুগান্তরের সূত্রপাত হয়। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর জাতীয় সপ্তাহের অতীত ঐতিহ্যের সেই উত্তেজনা এবং আবেগ অনেকখানিই এখন আর নাই। সংঘাত এবং সংঘর্ষের পথে প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটে। বৈদেশিক শাসন বিধ্বস্ত হওয়াতে সংঘাত-সংঘর্ষের সেই ভাব প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে এখন আর তেমন করিয়া ধরা পড়ে না; কিন্তু তাই বলিয়া জাতির অগ্রগতির পথে বাধা যে নাই, অর্থাৎ সংঘাত এবং সংঘর্ষের কারণ যে বিলুপ্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। বস্তুত তেমন কারণ এখনও যথেষ্টই আছে। বৈদেশিক শাসন একদিন জাতির আত্মাকে পিষ্ট করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তাহার অগ্রগতির পথে বাধা ঘটাইতেছিল, জাতির উন্নতি এবং সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির পথে এখনও এদেশে প্রগতি-বিরোধী তেমন বিরোধী শক্তি, পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদের আকারে না হইলেও অন্য আকারে কাজ করিতেছে। সুতরাং বৈদেশিক শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে, এই কারণে জাতির প্রাণধর্ম যদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং সেই সব বিরোধী শক্তি প্রশ্রয় পাইবার মত প্রতিবেশ তাহার ফলে সৃষ্ট হয়, তবে স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও দুঃখ-দুর্দশা আমাদের ঘুচিবে না। সুতরাং প্রগতিবিরোধী এই সব শক্তির বিরুদ্ধে জাতির প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই বর্তমানে প্রয়োজন। জাতীয় সপ্তাহে গঠনমূলক কর্মসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের ইহাই নির্দেশ। কিন্তু শুধু উপদেশে কোন কাজ হয় না। গঠনমূলক কাজকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে উপদেশের সঙ্গে আন্তরিকতাও থাকা দরকার অর্থাৎ যাঁহারা তেমন উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের কার্য এবং আচরণে জনসাধারণের মধ্যে আদর্শ সাধনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, এমন মনের জোর থাকা প্রয়োজন। কংগ্রেসের কর্মনীতিতে এই বস্তুটির কিছু-দিন হইতে বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গী না হইয়া কর্মীরা দূরে থাকিয়া শুধু উপদেষ্টার সুবিধাটুকু লুফিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেবা এবং ত্যাগের যে আদর্শ পূর্বে তাঁহাদের জীবনে সত্য হইয়া জাতির প্রাণধর্ম উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, বর্তমানে তাহা বিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে গঠন-মূলক কর্মসাধনার প্রেরণা শুধু কংগ্রেস-কর্মীদের সুবিধাবাদসুলভ নিতান্ত বাগ-বিলাসেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাজীর নামের যাঁহারা দোহাই দেন, দেখা যায়, গান্ধীজীর কর্মনীতির উপর তাঁহাদের অনেকেরই কার্যত বিশ্বাস নাই। অথচ অন্তরের বলই জনসাধারণকে আকর্ষণ করে। জাতীয় সপ্তাহে এই কথাটি বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কর্ম সম্পন্ন হয় না, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই বাণী জাতীয় সপ্তাহে আমাদের অনুধ্যানের বিষয় হোক্‌। 'সকল মহৎ সিদ্ধি পরম প্রয়াসে', কবিগুরুর এই মহাবাক্য এদেশের রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে নূতন শক্তি সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক। প্রত্যুত জনসাধারণ ঠিকই আছে। তাঁহাদের প্রাণবলও কিছু ক্ষীণ হয় নাই। শুধু আন্তরিকতার একটু স্পর্শ পাইলে তাঁহাদের শক্তি নবসৃষ্টির পথে এখনও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং আজও পূর্ববৎ অঘটন ঘটাইবার সামর্থ্য রাখে। নিদ্রিত রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার সোনার কাঠির সেই স্পর্শ কাহারা দিবে? সমগ্র দেশ তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছে।

ভূমিদান-যজ্ঞের সার্থকতা

ভারতীয় লোকসভার সদস্যগণ একটি সভায় সমবেত হইয়া আচার্য বিনোবা ভাবের প্রবর্তিত ভূমিদান যজ্ঞের সমর্থন করিয়াছেন। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং ভূমির স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানের উপর এদেশের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণা এদেশের রাজনীতিক মহলে অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে;

কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈপ্লবিক বলিষ্ঠ নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত করিতে নেতারা অগ্রসর হন নাই। আচার্য বিনোবা ভাবে যে পথে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতেও যে ইহার সম্যক্ সমাধান হইবে, ইহা মনে হয় না। কিন্তু ভাবেজীর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তিনি জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে একটা বৈপ্লবিক চেতনা সমগ্র দেশে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এদেশের রাজনীতিক নেতৃবর্গ—সকলে মিলিতভাবে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া যে কাজটি করিতে পারেন নাই, ভাবেজী একাই সে কাজটি সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, ভাবেজী যেভাবে ভূমিদান যজ্ঞের আন্দোলন জমাইয়া তুলিয়াছেন, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের বিচারবুদ্ধির তাহা অতীত। ক্ষীণকায় এই যে মানুষটি, ইহার মধ্যে অনন্যসাধারণ এমন শক্তি কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের সহজ এবং একমাত্র উত্তর এই যে, এদেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সমবেদনা, অল্প কথায় মানব-প্রেমই, তাঁহার সাধনার মূলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছে। ফলত অর্থনীতিক সূত্র তাঁহার কাছে বড় হয় নাই। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা নিরসনের জন্য বেদনাই তাঁহার সাধনাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। জনগণের অন্তর তিনি স্পর্শ করিয়াছেন। ভাবেজীর মূল লক্ষ্য, এদেশের ভূমিহীন কৃষিজীবীদের ভূমির সংস্থান, এই লক্ষ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাবেজীর সাধনার অন্তর্নিহিত আদর্শের মৌলিকত্ব আরও ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া মানবতার চেতনাকে এদেশের সমাজ-জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছেন। স্বার্থ-সংকীর্ণতার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে সেবা এবং ত্যাগের পবিত্র প্রতিবেশ তিনি এদেশে গড়িয়া তুলিতেছেন। প্রত্যুত ভাবেজীর সাধনার অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক এই সত্যটির সম্ভাবনা সামান্য নয়। এদেশের সামাজিক এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলন অব্যর্থ প্রভাবে উদার দৃষ্টিকে যেভাবে সম্প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। আমাদের রাষ্ট্রনীতির নিয়ন্তৃবর্গের মধ্যে আমরা আজ পর্যন্ত এমন মনোবলের পরিচয় পাইতেছি না। তাঁহাদের নীতির গতিকে সর্বত্র একটা সঙ্কোচের ভাব আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুত এদেশের রাজনীতিক কোন কর্মনীতির মূলেই তপঃপরায়ণ এই যে মানুষটি, ইঁহার মত প্রবল প্রাণধর্মের শক্তি পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য শুধু দয়া-দাক্ষিণ্যের জোরে কোন বড় কাজ হয় না এবং ভাবেজীর আন্দোলনের মূলেও দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রবৃত্তিকে আমরা বড় করিয়া দেখিতেছি না। আমরা তাঁহার সাধনার আদর্শের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রাণবত্তাকেই গুরুত্ব দিতেছি। আমাদের নেতাদের মধ্যে এই বস্তুটির একান্তই অভাব ঘটিয়াছে। ভাবেজী এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া আদর্শের এই প্রাণবত্তাকে যদি জাগাইয়া তুলিতে পারেন, তবে সে শক্তি বৈপ্লবিক গতিতে পথ করিয়া লইবে এবং কোন সংস্কারান্ধ বিচারই তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রনায়কদিগকে সেক্ষেত্রে জনমতের চাপে পড়িয়াই দেশের অথনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহার তপোবল নানা মতবাদের আলোড়নে এবং আবর্তের ভিতর দিয়া সেবা ও ত্যাগই যে সকল শক্তির মূলে এবং সে বস্তু ব্যতিরেকে কোন মতবাদেরই যে মূল্য নাই, এই সত্যটি সুনিশ্চিত করিয়া দিতেছে। বস্তুত এমন ব্রতের ব্যর্থতা নাই এবং এই দিক দিয়া ইহা মহাব্রত।

পাকিস্থানের রাজনীতি

পাকিস্থানের রাজনীতিতে দলীয় পাকচক্র ক্রমেই পাকিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে সেখানে অবশেষে কি ডিক্টেটরশিপ অর্থাৎ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে এমন আশঙ্কায় নূতনত্ব কিছু নাই। পাকিস্থানের শাসন-নীতি ডিক্টেটরী ধারা ধরিয়া বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ভাঙ্গাইয়া শাসকগোষ্ঠী কার্যত একনায়কত্বের খেলাই সেখানকার রাজনীতিতে খেলিতেছেন। কিন্তু এমন শাসন-নীতির ফল রাষ্ট্র-হিসাবে অনগ্রসর দেশে যেমন ঘটে, সেখানেও তাহাই আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার লালসায় দলীয় সঙ্ঘাত বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্মান্ধতাকে রাজনীতির কূট-কৌশলরূপে অবলম্বন করিতে গেলে তাহাতে যেসব কুফল ফলে, পাকিস্থানের শাসকবর্গের সম্মুখে তজ্জনিত সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মালিক ফিরোজ খাঁ নূন পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি যে কার্যক্রম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কিছু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তিনি ধর্মের সম্পর্ক ছাড়িয়া অর্থনীতির উপরই প্রধানত জোর দিয়াছেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ধর্মের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। দেশের লোকের অন্নের সংস্থান করাই তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। বাঙলা ভাষাকে ভিত্তি করিয়া পূর্ববঙ্গের যে আন্দোলনে পাকিস্থানের শাসকবর্গ রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্রের সন্ধান সেখানে পাইয়াছিলেন, নূন সাহেবের মতে সেই আন্দোলন অযৌক্তিক নয়। তিনি বলেন, কোন প্রদেশের উপরই অপর একটা ভাষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া চলে না। বাঙলায় যদি উর্দু হরফ চালানো যায়, তবে সে ভাষাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। নূন সাহেবের এই মনোভাব পূর্ববঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করিবে, একথা বলা যায় না। তবে ইহা বেশ বোঝা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের শাসকবর্গ সম্প্রতি দস্তুরমত ভাবনার মধ্যে পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের নীতির ভুল, তাঁহারা যেন কতকটা বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ভারত-পাকিস্থান ছাড়পত্রের দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের লোকদের যে অসুবিধা এবং ক্লেশ ঘটিতেছে, পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব জনাব জাফরুল্লা খাঁ একথা স্বীকার করিয়াছেন এবং সব

অসুবিধা দূর করা হইবে বলিয়া আশ্বাসও তিনি দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এজন্য পূর্ববঙ্গের লোকদের যদি আজ দুর্ভোগের মধ্যে পড়িতে হইয়া থাকে, তবে সেজন্য পাকিস্থানের শাসকবর্গই দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সেদিন ভারত বণিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে স্পষ্ট করিয়াই একথা বলিয়া দিয়াছেন। পাকিস্থানই ছাড়পত্রের এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। এজন্য যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলি যদি দূর করিতে হয়—দায়িত্বও পাকিস্থানের। বলা বাহুল্য, পাক-ভারতের মধ্যে সম্প্রতি যে বাণিজ্য চুক্তি সংসাধিত হইয়াছে, যদি তাহা সর্বাংশে সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তবে উভয় বঙ্গের মধ্যে গতিবিধির সকল রকমে বাধা দূরে করাই দরকার। ছাড়পত্র-প্রথার বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু রদবদলের দ্বারা এ সমস্যার সম্যক্ সমাধান সম্ভব হইবে না, এই সোজা সত্যটি স্বীকার করিয়া ছাড়পত্র-প্রথা রহিত করাই পাকিস্থান সরকারের পক্ষে কর্তব্য। কিন্তু ভারত সম্পর্কে এতাবৎকালের অনুসৃত নীতির এইরূপ পরিবর্তন সাধন করা পাকিস্থান সরকারের পক্ষে খুব সহজ নয়। কারণ এমন চেষ্টায় উদ্যত হইলে প্রতিপক্ষ ধর্মসংস্কারের উপর জোর দিবে এবং সেই পথে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবার ফিকির খুঁজিবে। মুশকিল এই যে, গোঁড়ামির ভাব যদি একবার জনগণের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়; বিশেষত যেখানে জনসাধারণের বেশির ভাগ লোকই নিরক্ষর, তবে সহজে সে গ্রন্থি কাটাইয়া বাহির হওয়া যায় না। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিতেও ধর্মান্ধতাকে কেন্দ্র করিয়া কুটচক্রের গতি সহজে নিবৃত্ত হইবে না। অথচ সে গ্রন্থি কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা বা সমুন্নতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই সংকট-সন্ধিক্ষণে পাকিস্থানের নেতৃবর্গকে একটা পথ বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং তাহার উপরই পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

খাদ্য-সংগ্রামের সমাধান

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ মধ্যপ্রদেশ পরিভ্রমণে গিয়া সম্প্রতি নাগপুরের একটি জনসভায় এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই ভারত খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। বিদেশ হইতে তখন আর খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে না। শুধু ইহাই নয়, ভারত বিদেশে খাদ্য রপ্তানি পর্যন্ত করিতে সমর্থ হইবে। খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই সাহেবের কথায় আরও জোর। তিনি সেদিন বোম্বাইতে বলিয়াছেন, যেখানে যত খাদ্যশস্যের দরকার, তিনি সেই পরিমাণেই সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার মতে ১৯৫৩ সালের পর বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সর্বপ্রধান সমস্যা—চাউল সংস্থানের যে প্রশ্ন, তাহার অবসান ঘটিবে। খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াই সাহেবের সরকারী তথ্য-সংখ্যানের উপর বিশেষ বিশ্বাস নাই। তিনি নিজেই একথা বলিয়াছেন; তবে কিসের উপর ভিত্তি করিয়া যে তিনি এই আশ্বাস দিয়াছেন, বোঝা যায় না। সরকার কর্তৃক অনুসৃত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলে খাদ্যশস্য সম্পর্কিত পরিস্থিতির এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে, না ইহা অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ফল? ফলত সরকারী পরিকল্পনার জন্য যে খাদ্যশস্যের অবস্থার সম্পর্কে এই উন্নতি ঘটিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার মত বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ এদিকে এ পর্যন্ত আশানুরূপ সম্প্রসারিত হয় নাই। তারপর শুধু শস্যের উৎপাদন বাড়াইলেই যে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ইহাও ঠিক নয়। খাদ্যমন্ত্রী নিজেও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, খাদ্যশস্যের অভাব বর্তমানে দেশে না থাকিলেও কোন কোন অঞ্চলের লোকদের ক্রয়-সামর্থ্য হ্রাস পাওয়াতে কষ্টের কারণ রহিয়া গিয়াছে। সমস্যা তো এইখানেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গে এ অবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। এখানে খাদ্যশস্যের মূল্য পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের চেয়ে হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা এবং উপকণ্ঠবর্তী বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চল ছাড়া রেশনের বাঁধাবাঁধি রহিতও করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাদ্য সমস্যার সমাধান ইহাতেই হইয়াছে বলা যায় না। বস্তুত অপেক্ষাকৃত কম দামেও যথেষ্ট খাদ্য সংস্থানের ক্ষমতা দেশের লোকের নাই। অর্থকৃচ্ছ্রতা এখানে নিদারুণ আকার ধারণ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বত্রই মন্দা। ফলে বেকার সমস্যা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা এখন দুষ্কর। কলিকাতা শহর এবং উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলে কয়েকটা কারখানা বাড়িলেই যে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এমন ধারণা আমরা নিতান্তই ভুল বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে খাদ্য সমস্যার সঙ্গে সমগ্রভাবে অর্থনীতিক সমস্যা জড়িত রহিয়াছে। দেশের খাদ্য সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান করিতে হইলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র এই সব সমস্যার সমাধানের জন্যও সমানভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। এজন্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোরই আমূল সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন। সাধারণভাবে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান যতদিন উন্নীত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই, অথবা বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন রহিত হইলেই যে, খাদ্য-সংগ্রামের অবসান ঘটিবে, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। খাদ্যের অভাব না থাকিলেও এদেশের লোকে খাদ্যের অভাবে যে মরে, এমন মর্মন্তুদ ঐতিহ্য এদেশের আছে। সুতরাং খাদ্যমন্ত্রী কিদোয়াই সাহেবের আশ্বাসে আমরা যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না।

বিকল্প

রঞ্জন

বইয়ের বাজারে আমি একাধারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা। তাই এ বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রবোধকুমার সান্যাল সম্প্রতি কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে পাঠক ও লেখকদের পক্ষ থেকে যে বক্তৃতা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে মত প্রকাশে আমার অসুবিধা এই যে সে প্রায় চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা হবে। আর তা নইলে নিজের জন্যে পক্ষপাতশূন্যতা দাবী করা হবে, যেন আমি দু'য়ের বিবাদে নিঃস্বার্থ মধ্যস্থ। অমন অমূলক দম্ভ আর নেই।

প্রবোধকুমার সান্যাল একটু অহমিকার সুর মিশিয়ে বলে গেলেন যে লেখকরা সমাজের মন গড়ে; যে লেখকরা না বাঁচলে সমাজ ও সভ্যতার মহতী বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী; যে লেখকদের বাঁচানো সরকারের অবশ্য-কর্তব্য কেননা সামন্তপৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটেছে। ইতিমধ্যে একথাও বলতে ভোলেননি যে বিভিন্ন শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে এক দল সত্যকার শিল্পী এবং আরেক দল সাময়িকভাবে জনপ্রিয় কিন্তু শিল্পবিচারে অবজ্ঞেয়। আরো বলেছেন যে আজকালকার পাঠক উপন্যাসে শুধু গল্প নিয়ে তুষ্ট নয়, আরো অনেক কিছু চায় সে।

কথাগুলিকে মেলাতে পারছিনে কিছুতেই। উক্তিগুলিকে (এগুলি যুক্তি নয়) সিলজিস্‌মের আকারে সাজিয়ে দেখা যাক। এক, লেখক সমাজের মন গড়ে। বলা বাহুল্য, এই গঠনকার্য একমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে (যদি আদৌ হয়) যখন লেখকের রচনা স্বেচ্ছায় বহুর দ্বারা পঠিত হয়। তাই যদি হয়, তাহলে সরকারের দ্বারে সাহায্য-ভিক্ষা কেন?

দুই, সমাজজীবনের জন্যে লেখক অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, এ দাবী ধাঙড় বা ডাক্তার বা জর্লের কলের মিস্ত্রী আরো বেশি করে করতে পারে।

তিন, সামন্তানুগ্রহের বিলোপ নিয়েও এত বিলাপের অর্থ বুঝিনে। ক'জন লেখক তখন রাজসভায় ঠাঁই পেতেন, আর কত সহস্র লেখক এখন শুধু লিখেই জীবিকানির্বাহ করছেন? তাছাড়া, রাজতরঙ্গিণীতে রাজাদের প্রশংসা না করে উপায় ছিল না, আর আজ লেখক যাকে খুশি সমালোচনা করতে পারেন। অবশ্য, লেখকের এই স্বাধীনতার মূল্য বোধ হয় প্রবোধ সান্যালের কাছে খুব বেশি নয়, কেননা তিনি আবার সরকারের অনুগ্রহপ্রচ্ছায় শরণ দাবী করেছেন।

চার, ঠিক কবে থেকে পাঠক উপন্যাসে প্রেমের গল্প ছাড়া জ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি অন্যান্য সম্ভার চাইতে শুরু করল? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র বুঝি ওইটুকু দিয়েই এতদিন বাঙালী পাঠকদের ঠকিয়ে এসেছেন?

পাঁচ, যদিও সহজবোধ্য কারণেই এমন বইয়ের সংখ্যা বেশি যেগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে পরে অনাদৃত হয়েছে, গোটা বিশ্ব-সাহিত্যে এমন ক'টি বইয়ের নাম করা যায়, যা সমকালীন পাঠক অবজ্ঞা করেছে এবং উত্তরকাল তার মহত্ত্ব আবিষ্কার করে মাথায় তুলে নিয়েছে?

ছয়, লেখকদের শ্রেণী ভাগ করে প্রবোধকুমার যে একদল লেখককে প্রচারক বলে অভিহিত করেছেন, তারও অর্থ অত্যন্ত পরিমিত। আর্টের নানা সংজ্ঞার মধ্যে একটা এই যে শিল্পী বিশ্বকে তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের (টেম্পেরামেণ্ট) মধ্য দিয়ে যা দেখেছে, তাই প্রকাশ করবে। অতএব, মতামত তার মধ্যে আসতে বাধ্য। এবং সেই সঙ্গে অল্পবিস্তর স্বীয় মতের প্রচারণ। আজ অন্তত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাজনীতির প্রতি উদাসীন হওয়ার অর্থ রাজনীতির একটি দলকে পরোক্ষ সহায়তা করা। ফরাসী দার্শনিক প্যাসকাল বলতেন, দর্শন না মানাও একটা দর্শন।

*

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সুলিখিত বক্তৃতাটিতে কণামাত্র অহমিকা ছিল না। কিন্তু তিনিও এই ভুল করলেন কী করে যে, সবচেয়ে যোগ্য সাহিত্য-সমালোচক হচ্ছে আগামী কাল? তিনি বলেছেন, নতুন কোনো বই আর সবাই পড়ছে বলেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে পড়তে হবে, না পড়লে মুখ দেখানো যাবে না, এমন দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত; কেননা, তিনি জানেন যে, ভালো বই আজ-কে অতিক্রম করে কালও আদরণীয় থাকবে, আর মন্দ বই কালের গর্ভে তলিয়ে যাবে।

বিফল লেখকের মনে এই যুক্তিটা সান্ত্বনা জোগায়—'আজ আমায় কেউ চিনল না, কিন্তু আমার প্রতিভা আগামী-কাল সবাই বুঝবে' (সার্ ম্যাক্স বীয়রবম্-এর ইনক সোমস্-এর কাহিনী স্মরণীয়)—কিন্তু পাঠকের তো এই ভুল যুক্তিটায় আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই। আজকের পাঠক কেন নিজেকে এমন হীনবুদ্ধি মনে করতে যাবে যে, কালকের পাঠককে সে তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করবে? ইংলণ্ডের পাঠককুল এককালে রবীন্দ্রনাথ যেমন পড়তো, আজ তেমন পড়ে না। উপরের যুক্তিটা সত্য বলে মেনে নিলে একথাই কি মানতে হয় না যে, সেদিনকার পাঠকরা সাহিত্য-বিচারে অক্ষম ছিল আর আজকের ইংরেজ পাঠকরা রবীন্দ্রনাথের সত্যকার অকিঞ্চিৎকরতা আবিষ্কার করেছে? সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ যেমন অভ্রান্ত নয়, কালও তেমনি ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়।

*

আমি বলি কি, সমাজের মধ্যে আছে অনেকগুলি পল্লী। লেখক-পল্লীর বাসিন্দারা যদি অন্যান্য পল্লীর চেয়ে নিজেদের অঞ্চলকে অধিকতর অভিজাত বা একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করেন, তবে তাঁদের সে যুক্তি যেমন অবিনীত তেমনি অগ্রহণযোগ্য। আবার সাহিত্যের পল্লীতেও আছে নানা আকারের ও নানা আকৃতির বাড়ি। কে বলবে কোন্‌টা সবচেয়ে ভালো আর বাকীগুলি নিকৃষ্ট? পাঠক আপন অভিরুচি অনুযায়ী যেখানে খুশি, যখন খুশি যাবে, আবার খুশি ফুরোলেই বিদায় নেবে।

মালিক-মজদুরের সম্পর্ক সরকার আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু লেখক-পাঠকের সম্বন্ধ প্রীতির সম্বন্ধ, প্রয়োজনের নয়। প্রীতি না থাকলে Queen's Proctor কী করবেন? সমালোচকের যষ্টিও সেখানে সমান অক্ষম। দু পক্ষই সমান স্বাধীন। এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকলে (অর্থাৎ প্রবোধ সান্যালের প্রার্থনা নামঞ্জুর হলে) কোন-না-কোন লেখক পাঠককে (অর্থাৎ হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে) সর্বদাই আনন্দ দেবেন—আজও, কালও।

শান্তি কত দূরে ?

কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের সম্ভাবনা আবার দিগ্‌প্রান্তে উঁকি দিচ্ছে। প্রায় মাস দেড়েক পূর্বে ইউ-নো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ক্লার্ক উভয় পক্ষের ধৃত যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা আহত ও গুরুতরভাবে পীড়িত, তাদের বিনিময় করা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব চীনা ও উত্তর কোরিয়ান সেনাপতিদের কাছে পাঠান। সম্প্রতি কম্যুনিস্ট পক্ষ থেকে সেই প্রস্তাবের অনুমোদনসূচক উত্তর এসেছে। শুধু তাই নয়, চীনা ও উত্তর কোরিয়ান সেনাপতিরা আহত ও পীড়িত বন্দীদের ছাড়া অন্য বন্দীদের মুক্তিকাল এবং যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনাও পুনরায় আরম্ভ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটা আরো আশাপ্রদ। মিঃ চৌ বলেছেন যে, পীড়িত ও আহত বন্দীদের বিনিময় সম্পর্কে উভয় পক্ষের যুক্তিসঙ্গত মনোভাব প্রকাশে সমগ্র যুদ্ধ-বন্দী সমস্যার সমাধানের একটা সুরাহার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। মিঃ চৌ আশা করেন যে, এই সমস্যার একটা সমাধান মিললেই যুদ্ধবিরতির চুক্তি হতে দেরি হবে না। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চায় তাদের অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করে বাকী বন্দীদের কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হেফাজতে পাঠানো হোক যাতে তাদের মুক্তি সম্পর্কে একটা ন্যায়সম্মত ব্যবস্থা হতে পারে।

যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা উত্থাপিত এবং মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের দ্বারা সংশোধিত যে প্রস্তাবটি ইউনোতে কিছুদিন পূর্বে গৃহীত হয় এবং যে-টা সোভিয়েট ও চীন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত হয় তার সঙ্গে মিঃ চৌ-এর বর্তমান প্রস্তাবের অবশ্য পার্থক্য আছে তবে উভয়ের মধ্যে ভাবের দূরত্ব অলঙ্ঘনীয় নয়। মিঃ চৌএর বিবৃতির ভাষাও খুব মোলায়েম। সুতরাং আশা করা যাচ্ছে যে শীঘ্রই পানমুনজনে সন্ধির আলোচনা—যা গত অক্টোবর মাসে স্থগিত হয়ে যায়—আবার আরম্ভ হবে। সোভিয়েট গবর্ণ-মেণ্টও মিটমাটের জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছেন বলে মনে হয়। এখন কেবল ভয়, আমেরিকা বেশি চাপাচাপি না করে।

বৈদেশিকী

এ বিষয়ে আশংকা যে অমূলক তা নয়। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মার্কিন ও ফরাসী গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের আলোচনান্তে যে সরকারী বিবৃতি দেয়া হয় তার কতকগুলি কথা কিঞ্চিৎ উদ্বেগজনক। ঐ বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে মার্কিন ও ফরাসী গবর্নমেণ্টের চক্ষে কোরিয়া ও ইন্দোচীনের যুদ্ধ পরস্পর-সম্পর্কিত। একটির ফলাফল অপরটির উপর নির্ভরশীল। মার্কিন ও ফরাসী গবর্নমেণ্ট তাই কম্যুনিস্ট চীনকে সাবধান করে দিয়েছেন যে কোরিয়াতে যুদ্ধ-বিরতির সুযোগ নিয়ে চীনাদের ইন্দো-চীনের যুদ্ধে ভিয়েৎমিনকে অধিকতর সাহায্য করতে মতলব যদি থাকে তবে অ সন্ধি হতে দেয়া হবে না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতিতে স্বীকৃত হবার পূর্বে আমেরিকা এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় যে ইন্দোচীনে চীনা সাহায্যের চাপ কমবে, অন্ততপক্ষে বাড়বে না। এবিষয়ে আমেরিকাকে নিশ্চিন্ত করা সহজ হবে না, কারণ ফ্রান্স সহজে নিশ্চিন্ত হবে না। প্রকৃতপক্ষে কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হোক, ফ্রান্স এটা চায় না। কারণ ফ্রান্সের ভয় কোরিয়ার যুদ্ধ থামলে চীন গবর্ণমেণ্ট ইন্দোচীনে ভিয়েৎ-মিনকে আরো বেশি সাহায্য করার সুযোগ

পাবেন, এমন কি ইন্দোচীনে চীনা "ভলাণ্টিয়ার" বাহিনীরও উদয় হতে পারে। আমেরিকার পক্ষে ফ্রান্সের আশঙ্কা নিরসনের চেষ্টা করতেই হবে। ইন্দোচীন সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিস্টদের কবলিত হলে কেবল ফ্রান্সের ক্ষতি নয় আমেরিকার সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কিত নীতির ভিত্তি-মূলেই ঘা পড়বে। সেজন্য ইন্দোচীনে ফরাসীদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখার এবং সফল করার চেষ্টা আমেরিকা করবেই। ইন্দোচীনের যুদ্ধের ভারে ফ্রান্স প্রপীড়িত সন্দেহ নেই। ফ্রান্স এই ভার বহনে পাছে অপারগ হয় অথবা অনিচ্ছুক হয় সেই ভয়ও আছে। সেই জন্য ফ্রান্সের মন না রেখেও উপায় নেই। পশ্চিম য়ুরোপের সুরক্ষা ব্যবস্থায়ও ফ্রান্সের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সুতরাং ফ্রান্সের মনস্তুষ্টি করতেই হবে। সেই জন্যই মরক্কো ও তিউনিসিয়াতে ফরাসী ঔপনিবেশিক অত্যাচারের কোনো প্রতিকার হচ্ছে না।

কোরিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে ইন্দোচীনের যুদ্ধ জড়িয়ে দেখার ফলে কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম হবে। যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটির সমাধান হলেই কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না এরূপ মনে করা ঠিক হবে না। আমেরিকা কোরিয়ার যুদ্ধকে আলাদা করে দেখতে রাজী নয়, সুতরাং একটা একটা করে যে বিবাদ-নিষ্পত্তি হবে তার আশা কম। যদিও যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা এবং যুদ্ধবিরতির অন্যান্য সর্ত সম্বন্ধে আলোচনা আবার আরম্ভ হবে বলেই ধরে নেয়া যায়, তাহলেও মিটমাট যে চট্ করে হয়ে যাবে সে-আশা না করাই ভালো।

আমেরিকা এখনো সবদিক থেকে প্রতিপক্ষের উপর চাপ বৃদ্ধি করার নীতিই অনুসরণ করছে। চীনের উপকূল পুরোপুরি অবরোধের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রয়েছে বটে, তবে সামরিক গুরুত্ব আছে, এরূপ দ্রব্যাদির চীনে প্রবেশ বন্ধ করার জন্য মার্কিন চেষ্টা তীব্রতর হয়েছে। আমেরিকা যদি বোঝে যে কম্যুনিস্ট পক্ষ নরম হয়েছে এবং একটা মিটমাটের জন্য সত্যই আগ্রহ-শীল তাহলে আরো চাপ দিয়ে একসঙ্গে বেশি আদায় করার লোভ হওয়া আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু বেশি চাপাচাপির ফল উল্টা হতে পারে। কম্যুনিস্ট পক্ষ যদি বোধ করে যে আমেরিকা নিছক নিজের সর্তে মিটমাট চায় তবে মিটমাট হওয়া কঠিন হবে, কারণ উভয়পক্ষের শক্তির তারতম্য এখনো এরূপ হয় নি যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর নিজের সর্ত চাপিয়ে দিয়ে তাকে মিটমাটে আসতে বাধ্য করতে পারে।

বর্মায় কুমিনটাং উপদ্রব

বর্মায় চীনা কুমিণ্টাং গেরিলাদের উপদ্রবের কথা বহুপূর্বে বৈদেশিকীতে আলোচিত হয়েছে। এতদিনে বর্মা গবর্ন-মেণ্ট ব্যাপারটা নিয়ে ইউনোতে নালিশ করেছেন। নালিশটা অবশ্য সাক্ষাৎভাবে ন্যাশনালিস্ট চীন গবর্নমেণ্ট অর্থাৎ ফর-মোজায় অবস্থিত চিয়াং কাইশেক গভর্ন-মেণ্টের বিরুদ্ধে কিন্তু দোষটা গিয়ে মার্কিন সরকারের উপরও পড়বে। কারণ, মার্কিন সরকারের সহায়তা, অন্তত পক্ষে মৌন সমর্থন ভিন্ন ফরমোজার কর্তৃপক্ষ বর্মায় উপদ্রবকারী কুমিণ্টাং গেরিলাদের অস্ত্রশস্ত্র সাজসজ্জা দিয়ে জীইয়ে রাখতে পারতেন না। ফরমোজার যা কিছু সামরিক সম্ভার সবই আমেরিকা জোগায়, ফরমোজা থেকে উত্তর-পূর্ব বর্মায় কুমিনটাং সৈন্যদের কিছু পৌঁছাতে হলে থাইল্যাণ্ডের ভিতর দিয়েই সেটা করা সহজ ও সম্ভব। থাইল্যাণ্ড সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার প্রভাবাধীন। থাইল্যাণ্ড থেকে কিছু হলে সেটা আমেরিকার অগোচরে থাকার কথা নয়। আরও গুরুতর কথা হচ্ছে এই যে, বর্মা সরকারের নিকট নাকি এই ব্যাপারে কয়েকজন আমেরিকানের সাক্ষাৎভাবে জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ আছে। এইরকম কয়েকজন আমেরিকানের নামও নাকি গবর্নমেণ্ট মার্কিন সরকারকে জানিয়েছিলেন কিন্তু মার্কিন সরকার কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করেননি। মার্কিন সরকারের এই ব্যাপারে সরাসরি নিজেদের জড়িত না করারই সম্ভাবনা। কিন্তু 'বেসরকারী'ভাবে মার্কিন সরকারের সাহায্য ও অনুমোদন ছাড়া এসব ব্যাপার ঘটাও সম্ভব নয়।

বর্মা সরকার এত দেরী করে ইউনোতে নালিশ করতে গেছেন কেন তার দু'তিনটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত কুমিণ্টাং সৈন্য যারা বর্মায় ঢোকে তারা অনেকদিন অনেকটা ছন্নছাড়া গেরিলার মতোই ছিল। বর্মা গভর্নমেণ্ট মনে করেছিলেন ক্রমশ তাদের অস্ত্রত্যাগ করানো যাবে। কিন্তু ঘটনা অন্য ধারায় গেলো। এখন আর লোকগুলোকে গেরিলার পর্যায়ে ফেলা যায় না। এখন নাকি তারা একটা হাজার দশেকের বেশ সুসজ্জিত বাহিনীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের হাতে প্রচুর মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রও এসেছে। আরো মুশকিল হয়েছে এই যে, এরা বর্মী বিদ্রোহীদেরও সাহায্য করছে। সুতরাং এখন এই সমস্যার একটা হেস্তনেস্ত করা ছাড়া বর্মা সরকারের আর কোনো পথ নেই। এতদিন যে বর্মা সরকার নিশ্চেষ্ট ছিলেন তা নয়, যেখানে সম্ভব বর্মার সরকারী সৈন্যদের দ্বারা কুমিণ্টাং গেরিলাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া বর্মা সরকার মার্কিন সরকারকে একটা কিছু প্রতিবিধান করার জন্যও অনু-রোধ করেছেন—কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাতে কোনো ফল হয়নি। তাই একরকম বাধ্য হয়েই বর্মা ইউনোতে নালিশ করতে গেছে। এর ফলে আমেরিকা ও বর্মার সম্পর্কের উপর একটা চাপ পড়বে। তার জন্য বর্মা নিজেকে প্রস্তুত করেছে। বর্মা আমেরিকার কাছ থেকে TCA'র (Technical Corporation Administration) সাহায্য পাচ্ছিল, বর্মা সরকার আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে যে আগামী জুনের পরে আর সে সাহায্য বর্মা নেবে না। মার্কিন সরকারের উপর এর কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখার বিষয় হবে। বর্মা জানে যে, কুমিণ্টাং সৈন্যদের চীনে যাওয়াও সম্ভব নয়, তাদরেকে ফরমোজায় পাঠানোর কথাও বর্মা বলছে না। আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে নিরস্ত্র হয়ে তারা যদি উপদ্রব না করে শান্ত হয়ে থাকে তাহলেই বর্মা আপাতত সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু ইউ-নোর দরবারে নালিশ করে কি ফল পাওয়া যাবে? ১।৪।৫৩

কবিতা

চাঁচর

হরপ্রসাদ মিত্র

নয় বৈশাখী ঊষার কুসুম,
    নয় মালঞ্চ-শোভন ফুল।
জ্বলে আগুনের পদ্মপলাশ—
    ফাঁকা মাঠে তবু অন্ধকার
থাকে ইতিউতি,—যদিও, এদিকে
    চাঁচর-জ্বলন জীবনময়।
এই চৈতালী আকাশের নীচে
    পীত-রক্তিম নতুন রাগ!

গেছে হলাহল-তৃষ্ণার দিন—
    ছিলো না শান্ত এ-জাগরণ।
মানি মনে আজ মিছে ক্ষণবাদ
    শুনি কে-সে—এক চিরন্তন!
কালো অবিরাম বিপুল অসীম
    তারই ছায়াপথে তারার ঢেউ—
এই নিরর্থ, বেবাক প্রসার—
তবু এখানেই উজ্জীবন!

ও কোন্ শব্দ,!—পাহাড়ী নদীর খেয়ালী জলের কলস্বন।
পাখির কূজন,—বৃদ্ধ বটের শাখায় নীড়ের বিকম্পন।
হাওয়া ফিস্‌ফিস্—লঘু-পিপ্পল-পাতায়
    ও-শুধু ঝরার বেগ।
চৈত্রের হাওয়া!
মাঠের গন্ধ!
—কালের প্রয়াণ নিরুদ্বেগ!

অবনীন্দ্রনাথের 'ওয়াশ' বা ধোওয়াট রঙের কাজ

শিল্পচর্চা

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ জল-রঙে যে নিজস্ব পদ্ধতিতে ছবি আঁকতেন, তারই নাম ওয়াশ (wash); ধোওয়াট রঙের কাজও বলা চলে। এই পদ্ধতি হল—কাগজে, রেশমী কাপড়ে, সুতী কাপড়ে, পেন্সিল-রবার দিয়ে নিখুঁতভাবে এঁকে অথবা কাঠ-কয়লার কাঠি দিয়ে মোটামুটি ছকে ভিজে-ভিজে জমিতে জল-রঙে ছবি আঁকা হয়। রঙ ধরিয়ে স্থায়ী (fixed) করবার জন্যে রঙ শুকিয়ে গেলে জলে ডুবিয়ে পুনরায় শুকিয়ে নেওয়া হয়; কিন্তু রঙ লাগানোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনোই প্রায় শুকনো জমিতে কাজ করা হয় না। প্রথমে ছকা ছবির বিভিন্ন অংশ মনোমত বিভিন্ন রঙে ভরাট করা হয়, যেখানে দরকার রঙ দিয়ে ছায়াসুষমা (shading) প্রয়োগ করা হয়, পরে ছবির পশ্চাৎপটে (back-ground-এ) বা অন্য বড়ো বড়ো অবকাশে (space-এ) রঙ ধরাবার জন্যে আর পূর্বে-ধরানো রঙগুলি মোলায়েম করে আনবার জন্যে এক বা অধিক **আস্বচ্ছ** (trans-parent) **রঙের হাল্কা প্রলেপ** (wash) **বুলোনো হয়** ভিজে জমিতে। এর পর প্রয়োজনমত আবার রঙ ভরাট করা, ছায়া-সুষমার প্রয়োগ, রেখাবিন্যাস, খুঁটিনাটি কারুকার্য, রঙের চূড়ান্ত উজ্জ্বলতা (highlight) আর বিশেষ গভীরতা (depth) নিপুণভাবে ছবির মধ্যে বেঁটে দেওয়া—এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে ছবি সারা করা বা ফিনিশ (finish) করা। কিন্তু মনের মতো না হলে আবার রঙের প্রলেপ (wash) বুলোনো, আবার ধরে ধরে কাজ করে শেষ করা। এই হল এ পদ্ধতির মোটামুটি আঁচ। সাধ্যমত বিশদ করে পরা বলা যাচ্ছে। তার আগে বিভিন্ন উপায়-উপকরণের উল্লেখ প্রয়োজন।

হাতে-তৈরি বিলেতি হোয়াট্‌ম্যান (Whatman) কাগজ এ কাজের সবচেয়ে উপযোগী। অন্য হাতে-তৈরি ভালো বিলেতি কাগজেও আঁকা যায়। চীনা, জাপানি, এদেশী একটু মজবুত কাগজও মন্দ নয়। তবে হোয়াটম্যানের মতো এত ওয়াশ অর্থাৎ এত জলে ডোবানো আর এত রঙে ধোওয়ানো অন্য কোনো কাগজ সহ্য করতে পারে না; চার-পাঁচটির বেশি ওয়াশ দিতে গেলে ফেটে যায় বা গলে যায়। হোয়াটম্যান কাগজে আঁকা ছবিতে রঙের ওয়াশ ১৪।১৫ বার পর্যন্ত দেওয়া চলে।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের রঙের পছন্দ ছিল বিলেতি আস্বচ্ছ জলরঙের ছবি (Trans-parent water-colour painting) আঁকতে যা লাগে সেইমতো। বিলেতি চিত্র-পদ্ধতি শিক্ষার বইয়ে এই প্যালেটের (বাছাই বর্ণমালার) বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। মোটামুটি রঙগুলি হল—Prussian blue, cobalt, indigo, chrome yellow, mauve, neutral tint, carmine burnt sienna ইত্যাদি। Indian red, light red, ochre, terra-vert ইত্যাদি অস্বচ্ছ (opaque) ভারী রঙ ব্যবহার করা চলে না রঙের ওয়াশ দেবার সময়; রঙ ভরাট করবার সময় আসবাবপত্র, বাড়ি, সম্মুখভূমি (foreground) প্রভৃতিতে এদের প্রয়োগ। মোটের উপর বলা যায়, অবনীন্দ্রনাথ ভারী রঙ পছন্দ করতেন না। নইলে বিলেতি জল-রঙের চ্যাপ্টা বাক্সে যা রঙ আছে, সবই ব্যবহার করতেন। কখনো বা 'সব' রঙের উপর তুলি ছুঁইয়ে আঁকতেন—ওস্তাদ বাজিয়ের হাত যেভাবে চলে পিয়ানো-যন্ত্রের কী-বোর্ডে—কোন্‌টা আল্‌তোভাবে ছুঁলেন আর কোন্‌টা বাদ দিলেন বোঝা গেল না। রঙ মিশোবার প্যালেটে বা কাঁচে বহু পূর্বের মেলানো মেশানো রঙ লেগে থাকত; একেবারে ধুয়ে পরিষ্কার করার বিরোধী ছিলেন। chrome yellow রঙটা পারদঘটিত; তার ব্যবহারকালীন উজ্জ্বলতা স্থায়ী হয় না, বিকৃত হয়ে 'কালো' হয়ে যায়। এজন্য ঐ রঙের ব্যবহার পরে অবনীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন।

ভালো বিলেতি আর চীনা-জাপানি তুলি ব্যবহার করাই ভালো। রঙের ওয়াশ-গুলি বুলোবার জন্যে আর অন্য অনেক সময়েও ২।৩ ইঞ্চি থেকে ৫।৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া নরম লোমের ভালো জাপানি তুলি (flat brush) অত্যন্ত কাজ দেয়।

এ পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথমেই হাল্কা হাতে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রেখাচিত্র (drawing) করে নেওয়া দরকার। এজন্য উৎকৃষ্ট এইচ-বি (H B) পেন্সিল ও মাঝে মাঝে এক-বি (1 B) পেন্সিল আর খুব নরম রবার (eraser) ব্যবহার করা হয়। যাতে কাগজের জমি নষ্ট না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রেখে ড্রয়িং বা তার সংশোধন করা আবশ্যক। বেশি ঘষাঘষিতে কাগজের আঁশ উঠে জমি নষ্ট হলে শেষ পর্যন্ত ভালো-ভাবে ছবি সারা (finish করা) বা রঙের আস্বচ্ছতা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পটু চিত্রকর, যাঁর মনে চিত্র-বিষয়ের রূপের ও রঙের ধারণা দৃঢ় আছে, পরিষ্কার আছে, নিখুঁত রেখাচিত্র না করেও কেবল কাঠ-কয়লার কাঠিতে বা খুব নরম পেন্সিলে বা খুব হাল্কা রঙে আঁকবার বিষয়গুলির মোটামুটি আকার (block) ছকে নিয়েই চিত্রণ শুরু করতে পারেন। এইভাবের ছকাটি কড়া না হলেই হল; খুব হাল্কা রঙে বা রেখায় খুব হাল্কা হাতে হওয়া চাই। কাঠ-কয়লা দিয়েই বস্তুর আকার (block) বার করা ছাড়া তাতে ছায়াসুষমা (shade) আরোপ

করা ও সেটি জলে ভিজিয়ে আর শুকিয়ে পাকা করে নেওয়া সম্ভব—তার পর চলতে পারে ছবিতে রঙ 'ভরা', ছবি 'সারা'। চীনা কালীর অত্যন্ত ফিকে পোঁছেও ছবির উক্ত 'একমেটে' কাজটি (আকার বার করা ও ছায়াসুষমা যোগ করা) সেরে নেওয়া চলে।

ওয়াশের কাজ অন্য চিত্রণরীতির সহ-যোগেও করা চলে। টেম্পারা রীতিতে কাজ করার পরে ছবি জলে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে (রঙের স্তর পুরু থাকলে চার-পাঁচবার এরূপ করা দরকার) রঙ স্থায়ী করে নিয়ে তার উপর (প্রধানতঃ আকাশে ও পশ্চাৎপটে একটি মোলায়েম ভাব ও বিশেষ আবহাওয়ার বিশেষ ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই) মনোমত রঙের ওয়াশ দেওয়া যায়। পুরোপুরি ওয়াশ-রীতিতে, যে কাগজে কাপড়ে বা সিল্কে ছবি আঁকা হয়, তাতে **সর্বদাই জল-ঝরা স্যাঁতা (damp) অবস্থায়** ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ভরাট করা হয়। যে কোনো রঙের একটি ছোপের উপর নূতন ছোপ দিয়ে সেটি প্রয়োজনমত ঘোরালো করে নেওয়া হয়। রঙের একটি ছোপ বা ওয়াশের উপর আরেকবার রঙের ছোপ বা ওয়াশ দেবার প্রাক্কালে পূর্বের ছোপটি ওয়াশটি একেবারে শুকিয়ে নিতে হয়; পরে কাগজটি বা ছবিটি জলে ডুবিয়ে দ্রুত হাতে আঁকবার পাটার উপর তুলে লাগিয়ে দিয়ে পাটাখানি খাড়া করে বা কাৎ করে জল ঝরিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়; শুকিয়ে গেলে পুনরায় জলে ভিজিয়ে স্যাঁতা অবস্থায় নূতন করে রঙ লাগাতে পারা যায়। যে কোনো ভরাট-করা রঙ, রঙের ওয়াশ, রঙ দিয়ে রেখাঙ্কন, খুঁটি-নাটি কারুকাজ—স্থায়ী করবার জন্যে এইভাবে অন্তত দুবার ভেজানো ও শুকোনো উচিত; রঙ পুরু করে লাগানো হয়ে থাকলে আরো কয়েকবার করা আবশ্যক। এই কৌশলকেই রঙ স্থায়ী (fix) করা বলে; এর ফলে রঙে মেশানো আঠা সবই ধুয়ে বেরিয়ে যায় বলা চলে, অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, রঙ তবুও খুবই কামড়ে লেগে থাকে।

ধোওয়াধুয়ি ছবির কোন্ অবস্থায় কতখানি করা দরকার কাজ করতে করতেই তার জ্ঞান পাকা হবে। অনেকেই বোধ করি অবনীন্দ্রনাথের বলা সরস গল্পটি জানেন : দক্ষিণের বারান্দায় যেখানে তিনি ছবি আঁকতেন, এক অনু-সন্ধিৎসু মেমসাহেব এসে উপস্থিত, নোট্‌বই হাতে; কৌতুকপ্রিয় আর্টিস্ট বুঝি তাঁকে ধোঁকা দেবার জন্যেই একদিন ছবিখানা 'দু'শোবার' জলে ডোবালেন, অন্য কোনোদিন অন্য একখানা ছবি আদপে জলে না ডুবিয়ে হয়তো চওড়া তুলিতে কাগজের এ-পিঠ ও-পিঠ একটু ভিজিয়ে নিয়ে কাজ সারলেন। আর, হতবুদ্ধি প্রশ্নকারিণীকে আরো হতবুদ্ধি করে দিয়ে বললেন, তিনি তো পাগল নন যে, রোজ বাঁধা ফরমুলায় কাজ করবেন বা একদিন আরেকদিনের দাগা বুলোবেন।

রঙের কাজ করবার আগে প্রত্যেকবার ছবিটি ভিজিয়ে ছবি আঁকবার পাটার উপর লাগিয়ে নিতে হবে (পাটার সঙ্গে আঠা দিয়ে জোড়া হবে না)—কারণ, শুকনো জমিতে কদাচ রঙ লাগানো হয় না। জলে একেবারে না ডুবিয়ে (তাড়াতাড়ি কাজ সারবার দরকার হলে) শুকনো কাগজখানা পাটায় উপুড় করে ফেলে চওড়া তুলি দিয়ে তার পিছন-পিঠ অল্প ভিজিয়ে নেওয়া যায়, পরে পাটায় উল্টে নিয়ে খুব হাল্কা হাতে জলে-ভিজে চওড়া তুলি (নরম লোমের) তার উপর বুলিয়ে নিলে কিছুক্ষণ রঙ লাগানো চলবে। জলের হোক, রঙের হোক, ওয়াশগুলি দিতে কড়া তুলি ব্যবহার করা চলে না; ছবি বেশি ভেজালেও ভালো না। বেহিসাবি ধোওয়া-ধুয়িতে গোড়ার দিকে লাগানো রঙ আর ফিনিশ উঠে যেতে পারে। রূপের গড়ন (modelling) বা ছায়াসুষমা (shading) আর রেখার কাজ, ছবিতে এগুলিও করতে হয় স্যাঁতা জমিতে পূর্বেই তা বলেছি। শেড লাগিয়ে তার ধারটি জলে-ভিজে তুলি দিয়ে মুছে নিলে সহজেই শেড বেশ মিলিয়ে দেওয়া যায় আর রূপের বলন বা 'গোল' ভাব ভালো ফোটে।

পূর্বেই একরকম বলেছি ছবির পশ্চাৎপটে আকাশে এবং বড়ো বড়ো অবকাশে রঙ ধরানোর জন্যে, পূর্বের ধরে ধরে করা রঙের কাজ মোলায়েম করে আনার জন্যে আর সকালের বা সন্ধ্যার বা রাত্রির বিশেষ ভাব আর বিশেষ আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলার জন্যে ওয়াশের ব্যবহার। ওয়াশ বুলোবার আগে যা-কিছু রঙ ভরা, ছায়াসুষমা লাগানো, রেখা টানা, খুঁটি-নাটি দেখানো হয়ে গেছে, সেগুলি চাপা না দিয়ে তার উপর এক পর্দা অস্বচ্ছ রঙের হাল্কা একটি 'পলি' পড়ানো বা 'ধোওয়াট' ধরানো এর ফল বলতে পারা যায়। বারংবার ধরে ধরে কাজ আর বারং-বার ওয়াশ দেওয়া এইভাবে কাজ করে করে যখন ঠিক মনের মতো হল, তখনই ছবি সারা। ওয়াশে বিশেষ করে ব্যবহার হয় বা অবনীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, কতকগুলি নীল জাতের আর লাল জাতের ঠাণ্ডা (cold) রঙ, যেমন—French blue, indigo, neutral tint, mauve, crimson, carmine ইত্যাদি। কখনো কখনো ছবিতে বৃষ্টি, কুয়াশা বা ধোঁওয়া দেখাবার জন্যে, অথবা টেম্পারা ছবির অনুরূপ রঙের ঘনতা অস্বচ্ছতা (opacity) দেখাবার উদ্দেশ্যে সাদার সঙ্গে প্রয়োজনমত কোনো অস্বচ্ছ রঙ মিশিয়ে ভিজে-ভিজে জমির উপর খুব পাৎলা দুয়েকটি ওয়াশ দেওয়া চলে; বিশেষ করে কুয়াশা মেঘ বৃষ্টি দেখাতে হলে কাগজ বেশ ভিজে থাকতে থাকতেই নরম চওড়া তুলিতে ঐরূপ রঙ বুলিয়ে দিলে ভাবটি (effect) সুন্দর পাওয়া যায়। কখনো বা ছবির বিশেষ-ভিজে-ভিজে জায়গায় সাদা রঙ তুলির ডগায় নিয়ে ছেড়ে দিলে সে রঙ আপনা থেকে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে মেঘের আকার নেয় আর ছবি-সুদ্ধ পাটাখানা কাৎ করে ও ঘুরিয়ে মেঘের মনোমত গতি ও ভঙ্গী সৃষ্টি করা যায়। এরকম সাদা-মেশানো রঙের ওয়াশে ছবির রঙ ও রেখার কাজ অনেক কোমল দেখায় এবং তার উপর পুনর্বার ফিনিশ করলে **ভালো টেম্পারা ছবির ভাব ফুটে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ওমরখৈয়াম ও আরব্য-উপাখ্যান চিত্রাবলীতে এই চিত্রণ-রীতিই ব্যবহার করেছেন।** প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বা অনভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে এভাবে সাদার ব্যবহার না করাই ভালো। অস্বচ্ছ জল-রঙের ছবিতে বিলেতি চিত্রকরেরাও খুব অল্পই এরূপ সাদা রঙ ব্যবহার করেছেন বা সাদা-মেশানো ওয়াশ দিয়েছেন। টার্নার এরকম সাদার ওয়াশ দিতেন এবং খুব কড়া তুলি দিয়ে ঘষে ঘষে ফিনিশ করতেন।

ছবির সবুজ রঙের উপর উষ্ণ

(warm) লাল রঙের ওয়াশ ফোটে না; একটা ম্যাড়মেড়ে ভাব দাঁড়ায়, ছবি নষ্ট হয়। এজন্য যেখানে যেখানে সবুজ রঙ দেওয়া আছে, সেখানেই উষ্ণ রঙের ব্যবহার করতে হয় খুব সাবধানে; সবুজকে ম্লান করতে হলে বা বদলাতে হলেই তার উপর ঐরূপ ওয়াশের উপযোগিতা। ছবি প্রায় শেষ হবার মুখে ঘন, কালচে আর ধাতব (সোনা প্রভৃতি) রঙ ব্যবহার করা উচিত। কখনো কখনো ধাতব রঙের উপরেও পাৎলা ওয়াশ বুলিয়ে তার প্রখরতা কমিয়ে আনা হয়; কিন্তু খুব সাবধানে আর সাবলীল হাল্কা হাতে করা দরকার, যাতে 'কাজ' উঠে না যায়।

ওয়াশের ছবিতে হাইলাইট (high-light) বা শুভ্রতার সীমা দেখাবার জন্যে সাদা রঙের ব্যবহার প্রশস্ত নয়; সেরূপ সাদা পরে কর্কশ দেখায় ও চুন-লেপা মনে হয়। ওয়াশের ছবিতে হাইলাইটের কাজ আনতে হলে কাগজের (তেমনি কাপড়ের) মৌলিক 'সাদা' প্রয়োজনীয় অংশে প্রথম থেকেই বাঁচিয়ে চলতে হয়; কোথাও সাদাটে ভাব রাখতে হলে অন্য রঙের হাল্কা ওয়াশ সাবধানে ও খুব হিসাব করে দিতে হয়।

ছবি অল্প ভিজে থাকতেই অপেক্ষাকৃত কড়া তুলি (জলে ভিজিয়ে ও ন্যাকড়ায় মুছে) ছবির রঙের উপর ঘষে ঘষেও হাই লাইট বার করা যায়, অর্থাৎ পূর্বে-লাগানো রঙটুকু তুলে ফেলে কাগজের 'সাদা' উদ্ধার করা যায়। কিন্তু তুলি বেশী ভিজে থাকলে তুলির জল ছড়িয়ে পড়ে রঙের মধ্যে অবাঞ্ছিত ছোপ ধরে যাবে, বেশি ঘষতে হলে কাগজের আঁশ উঠে আসবে—এসব বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকা দরকার। নইলে ছবি ভালো সারা যাবে না, সংশোধনও কষ্টসাধ্য হবে। এরকম ঘষাঘষি না করাই ভালো। রেখাচিত্র করতে গিয়ে অতিরিক্ত রবার ঘষার মতো ছবি ফিনিশ করতে গিয়েও অতিরিক্ত রঙ ঘষা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে পরে ছাড়া মুশকিল হয়, ফলে বর্ণপ্রয়োগের ও ভাবলাবণ্যযোজনের ব্যাপারে নিখুঁত কল্পনার ও নিশ্চিত ধারণার অভাব ঘটিয়ে রচনাকে অত্যন্ত দুর্বল করে এবং শিল্পীকে নানারকম গোঁজামিল দিতে প্ররোচনা দেয়। অবনীন্দ্রনাথের মতো পাকা আর্টিস্টের কথা আলাদা—খুব অনায়াসেও ছবি করেছেন আর মনোমত ভাবটি (effect) না আসা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়েন নি, ঘষে মেজে অপ্রত্যাশিত উপায়েও আশ্চর্য উৎকর্ষে পৌঁছে গেছেন। ছবি 'সারা' হবার পরেও তিনি হাইলাইট বার করতেন বা ছবির কোনো অংশের রঙ হাল্কা করবার উদ্দেশ্যে কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে কড়া তুলিতে সেখানকার রঙ তুলে ফেলতেন; কাগজের ছাল উঠে গেলেও কাগজখানা বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে, প্রয়োজন হলে হাতের নাগালের মধ্যে গড়গড়ার তপ্ত ছিলিমের উপর সেঁকে, একটু মোলায়েম কাপড় দিয়ে ঘষে জমি পালিশ করে নিতেন। তার পর নতুন করে ভেজানো, রঙ ধরানো ও ফিনিশ করা। দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, বৈষ্ণবীর ছবি একখানা আঁকা শেষ হয়ে গিয়েছিল; পরে ছবির একটা জায়গা নরুনে ঈষৎমাত্র ছিঁড়ে দিয়ে আশ্চর্য হাইলাইট বার করলেন বৈষ্ণবীর হাতের খঞ্জনীতে। পাকা আর্টিস্টের পক্ষে সবই সম্ভব।

অবনীন্দ্রনাথের পদ্ধতিতে অবনীন্দ্র-পরবর্তী যাঁরা ছবি এঁকেছেন তাঁদের প্রায় সকলের কাজই একঘেয়ে (flat) একঘেয়ে হয়ে পড়েছে; মিয়োনো মুড়ির মতো। অবনীন্দ্রনাথের ছবির তাজা মুচমুচে ভাব (crispness), তাঁর রঙের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দা (tone), আশ্চর্য ভাবব্যক্তি (expression), এসবের অভাবে ছবি সাদামাটাভাবে শেষ হয়েছে বা ফিনিশে বড়ো কর্কশভাব এসে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের ছিল—দেশী ও বিলেতি চিত্রণরীতির সম্যক্ জ্ঞান, স্বভাব পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের (nature and life studyর) প্রচুর অভিজ্ঞতা, অভিজাত রুচি, রসিক ও দরদী মনের সহজ স্বাভাবিক 'কবিত্ব'; এসবের অসদ্ভাবে, আমার মনে হয়, ওয়াশের রীতিতে তাঁর চিত্রের উৎকর্ষে অন্য চিত্রকরের পৌঁছনো একেবারেই অসম্ভব। তবু ওয়াশের আংশিক প্রয়োগে চিত্রের বর্ণকল্পনায় একটা মোলায়েম সৌকুমার্য আনা যায় যে যার পদ্ধতিতে এঁকেও। মনে রাখা দরকার, অবনীন্দ্রনাথের ছবির রেখা, অজন্তা বা রাজপুত-পারসিক ছবির ধরণে টানা (flat) নয় বা লেখানুকারী (calligraphic) নয়। তাঁর ছবির ড্রয়িং কতকটা বিলেতি স্বভাব-ঘেঁষা (স্বভাব-অনুকারী নয়) ছবির মতো। এজন্যে রেখাও তাঁর প্রধানতঃ রূপের গড়ন বা বলন (modelling) বোঝাবার জন্যে। ঠিক মোগল ছবির মতো। যাঁদের বিলেতি অস্থিসংস্থান-জ্ঞান দুরস্ত হয়নি, ছায়াতপের পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন নেই, পারিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান স্বল্প, তাঁদের পক্ষে অবনীন্দ্রনাথের অনুকরণ বা অনুসরণ বিপজ্জনক। কারণ, ঐগুলির বিশেষ জ্ঞান ও বোধ থাকাতে অবনীন্দ্রনাথ দেশী রীতির সঙ্গে বিদেশী রীতির আশ্চর্য সামঞ্জস্যসাধন করে করে ছবি এঁকেছেন; বিদেশীর নকল না করেই বিদেশী চিত্ররীতির সার আহরণ করেছেন, আত্মসাৎ করেছেন—অন্যে তা না পারায় তাঁদের ওয়াশের চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের কৃতির ন্যায় সার্থক হবে না, অন্তঃসমৃদ্ধ হবে না।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির সচরাচর উচ্চতা দেড় ফুট, দু' ফুট মাত্র। পারসিক রাজপুত মোগল পুঁথিচিত্রের তুল্য। ওয়াশের রীতিতে খুব বড়ো ছবি বাগাতে পারা যায় না; কারণ, আঁকবার সময় কাগজ সর্বদা ভিজে রাখা কঠিন হয়। ওয়াশের রীতিতে অবনীন্দ্রনাথের বড়ো ছবির মধ্যে—ঔরঙ্গজীব বাদশা (৬॥'×৪') আর ত্রয়ী (এন্ড্রুজ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী : ৪'×১॥') উল্লেখ করা যায়। তাঁর ছাত্রদের কাজের মধ্যে—উমার ব্যথা (৩'×১॥'), উমার তপস্যা (৫'×৩'), পার্থসারথি (৪'×৩') এবং অজন্তা ও বাগ গুহার প্রতিচিত্রগুলি এই রীতির বড়ো ছবি বলা যেতে পারে। বড়ো ছবির ভিজে কাগজ বেশিক্ষণ স্যাঁতসেঁতে রাখবার জন্যে তার নীচে বড়ো ভিজে কাপড় একখানা পাট করে পেতে রাখা ভালো; তা হলে অনেকক্ষণ কাজ করা চলে। কাগজের উপর বড়ো জলের পাত্র থেকে জল ঢেলে দিয়ে কাজ করা হয়। বড়ো ছবি ক্যানভাস চড়াবার ফ্রেমে (canvas-stretcherএ) চড়িয়ে নিলে ওয়াশের সুবিধা হয়।

(সমাপ্ত)

(২২)

গন্ধবাবা চলে গেল এক ফাঁকে। যাবার সময় বলে গেল—বাবুজী মহাবীর হ্যায়—লেকিন্ হরগীজ্ মর যায়গা—

মধুসূদন ভয় পেয়ে গেল। বললে—কী সর্বনেশে কাণ্ড—

লোচনও ভয়ে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে; কী জানি কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। বদরিকাবাবু যদি মারাই যায়, সাক্ষীসাবুদ, পুলিশ-আদালত নানান হ্যাঙ্গাম পোয়াও। মেজবাবু যদি টের পায়, কানে যদি যায় কোনওরকমে। মেজবাবুর যা মেজাজ, জরিমানা হবে সকলের।

বদরিকাবাবু গাড়িবারান্দার তলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে হাঁসফাঁস করছেন।

বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু ওখান থেকে—কাজ কী এসব হ্যাঙ্গামে—

হ্যাঙ্গাম দেখে সত্যিই তখন সবাই সরে পড়েছে একে একে। ভূতনাথ চেয়ে দেখলে জায়গাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

বংশী আবার কামিজটা ধরে টানলে—চলে আসুন শালাবাবু, কাজ কি ছেঁড়া ঝঞ্ঝাটে—আমার আবার ওদিকে কাজ পড়ে রয়েছে—

ভূতনাথ বললে—তুই বরং যা বংশী, ছোটবাবু জানতে পারলে আবার—

—তাই যাই—

বলে বংশীও চলে গেল।

ভূতনাথ নীচু হয়ে বদরিকাবাবুর মাথায় হাত দিলে। মুর্শিদকুলিখাঁর কানুনগোর শেষ বংশধর। এখানে এই বেঘোরেই বুঝি গেল এবার।

হঠাৎ যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরুল।

বদরিকাবাবু কথা বলছেন—বেটা গেছে নাকি হে ছোকরা—

ভূতনাথ অবাকও কম হয়নি।

বললে—কেমন আছেন?

চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে বদরিকাবাবু বললেন—বেটা গেছে নাকি হে ছোকরা—

—চলে গেছে—কিন্তু আপনি কেমন আছেন?

বদরিকাবাবু এবার উঠে বসলেন।

নিজের জামা-কাপড় সামলাতে সামলাতে বললেন—আমার হয়েছে কি যে কেমন থাকবো—বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের বৈঠকখানার দিকে চলতে লাগলেন।

ভূতনাথও সঙ্গে সঙ্গে গেল। বদরিকাবাবু ঘরে ঢুকে শেতলপাটি বিছানো তক্তপোশের ওপর আবার চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে একবার ট্যাঁক ঘড়িটা বার করে সময়টা দেখে নিলেন।

ভূতনাথের যেন ভারি অবাক লাগছিল সমস্ত ঘটনাটা ভেবে।

বললে—আপনি শুধু শুধু কেন খেতে গেলেন পাথরটা—সাধু-সন্ন্যাসীদের পাথর—

—খেতে যাবো কেন, খাইনি তো—

বদরিকাবাবু বিস্মিতের মত চাইলেন।

—আমার আর কাজ-কম্ম নেই, আমি ওই পাথর গিলতে যাবো—বলো কি ছোকরা, এই দেখ—বলে আর এক ট্যাঁক থেকে স্ফটিক পাথরটা বার করলেন—এই দেখো—

তাজ্জব ব্যাপারই বটে।

নবাবের আমলের পুরোন বংশ আমাদের হে, আমি সেই বংশের শেষ 'বংশধর বটে, তা' আমি গলায় পাথর আটকে মরতে যাবো কেন শুনি? এতদিন ধরে ঘড়ি ধরে বসে আছি অপঘাতে মরবো বলে? সব দেখতে হবে না! ইতিহাস কি মিথ্যে হবে নাকি? সব লাল হয়ে যাবে না। রণজিৎ সিং তো মিথ্যে বলবার লোক নয়, নাজির আহম্মদ রইল না, রইল না রেজা খাঁ, বলে মধুমতী তীরের সীতারাম আর ফৌজদার আবুতোরাব—তারাই রইল না! কোথায় গেল পীর খাঁ, কোথায় গেল তোর বক্স আলি—এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ উঠছে আবার নাবছে—চৌধুরীরাও নাববে—এই বড় বাড়িও ভাঙবে একদিন, রাজসাপ যখন কামড়েছে, একেবারে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করবে না। এখনও যে দর্পনারায়ণের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি রে—

কী কথায় কী কথা উঠে গেল।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু গন্ধবাবা কি দোষ করলো—

—আরে, এটা যে গন্ধবাবার যুগ রে, গন্ধবাবারাই তো আজ রাজা হয়ে বসেছে—ওদের তাড়াতে হবে না—এই আমাদের মেজবাবু, ছোটবাবু তোর ওই 'মোহিনী সিঁদুর' সব যে গন্ধবাবার দল—

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না ভূতনাথ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল হঠাৎ। ও-কথার তো আর শেষ নেই। সব কথার মানেও বোঝা যায় না বদরিকাবাবুর। সেদিন সুবিনয়বাবুও বললেন, 'মোহিনী সিঁদুর' বুজরুকি। এই এত ঐশ্বর্য, গাড়ি, বাড়ি, লোকজন, চাকর-বাকর সব উচ্ছন্নে যাবে! কী অদ্ভুত যুক্তি, কী অদ্ভুত হেঁয়ালী!

সন্ধ্যেবেলা ছুটুকবাবুর ঘরে গিয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজ এখনও কেউ আসেনি—

ছুটুকবাবু আসর সাজিয়ে বসেছিলো।

বললে—এই আপনার কথাই ভাবছিলাম,—কোথায় ছিলেন এ্যাদ্দিন, ননীলাল খুঁজছিল—

—ননীলাল?

গাঙ্গের ডাক্তারবাবুর ছেলে সেই ননীলাল! নামটার সঙ্গে যেন অনেক রোমাঞ্চ, অনেক স্মৃতি জড়ানো আছে। অনেক সমারোহ, অনেক সৌরভ। ননী-

লালের নামটা মনে পড়লেই যেন সমস্ত ছেলেবেলাটা আবার সজীব হয়ে ওঠে! তার সেই চিঠি! সেই চিঠিটা আজো সযত্নে টিনের বাক্সের মধ্যে যে রেখে দিয়েছে সে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে খোঁজ করছিল কেন?

—ওর বিয়ে হলো কি না—আপনাকে নেমন্তন্ন করতে চেয়েছিল—

—বিয়ে? হয়ে গেছে?

ছুটুকবাবু বললে—হ্যাঁ হয়ে গেল বিয়েটা। ননীটা যা হোক খুব দাঁও মেরেছে বিয়েতে—তিনখানা বাড়ি—সাত লক্ষ টাকা।—

—সেকি?

ভূতনাথও কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। এই সেদিন যে সে টাকা ধার করতে এসেছিল ছুটুকবাবুর কাছে। এরই মধ্যে এত টাকার মালিক হয়ে গেল সে!

ছুটুকবাবু আবার বললে—এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেল ননীটা, বরাবর জানতুম ও একটা সোজা ছেলে নয়। আমাদের টাকায় বরাবর বাবুয়ানি করে আমাদের ওপরই টেক্‌কা মেরেছে—তা বাহাদুরী আছে ননীর, কোত্থেকে কার সংগে ভাব জমিয়ে শেষ পর্যন্ত কী যে করে বসলো—

——কী করে কী হলো ছুটুকবাবু?

ননীলাল অবশ্য তার কল্পনায় চিরকালই উঁচু ছিল। ছোটবেলা থেকে ননীই ছিল ভূতনাথের আদর্শ। অমন চমৎকার সুন্দর চেহারা। রূপবানই বলা যায়। কিন্তু মাঝখানে যেদিন দেখা হয় ওর সংগে, সেইদিনই কেমন আঘাত পেয়েছিল ভূতনাথ মনে মনে। তার সেই আগেকার চেহারা যেন আর নেই। সেই লাবণ্য মুছে গেছে মুখ থেকে। তার সেই ঘন ঘন সিগারেট খাওয়া। সেই কোঠরগত চোখ। আর সেই অশ্লীল প্রসংগ আলোচনা। যে-মানুষ এত নিচে নামতে পারে, চরিত্রহীনতার একেবারে শেষ ধাপে, সে কেমন করে জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে! কেমন করে সে সাত লক্ষ টাকার মালিক হবে—তিনখানা বাড়ির স্বত্বাধিকারী হবে!

ছুটুকবাবু বলতে লাগলো—হেন রোগ নেই, যা ওর হয়নি শালাবাবু, আমরা কত বারণ করেছি এ-পথে আর যাস্‌নি—কিন্তু ননী বলতো—'ওসব তোদের কুসংস্কার,—এটা আর কুলমর্যাদার যুগ নয় রে—এটা টাকার যুগ—' বলতো—'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকা বংশ, টাকা গোত্র—টাকাই জপ-তপ-ধ্যান—সবার চাইতে বড় কুলীন টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা—'

বলতাম—তোর স্বাস্থ্য গেলে টাকা কে খাবে—?

ননী বলতো—টাকা না থাকলে এ স্বাস্থ্য নিয়ে কী হবে?

কখনও বলতো—এ যুগের খৃষ্ট, বুদ্ধ আর চৈতন্যদেব কে জানিস?

আমরা প্রশ্ন শুনে হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম—খৃষ্ট, বুদ্ধ আর চৈতন্যদেব—ওরা আবার যুগে যুগে বদলায় নাকি?

ননীলাল বলতো—বলতে পারলিনে? এ যুগের অবতার হলেন শেঠ-শীল আর মল্লিক—

ছুটুকবাবু কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়লো। হাসির চোটে ভুঁড়ির মাংস থল থল করে নেচে ওঠে। যেন একটা কৌতুক করবার দারুণ বিষয় পাওয়া গেছে।

—আমাদের কলেজের ভেতরে ঢুকতে মস্ত বড় সদর দরজার ওপর লেখা ছিল—"God is Good"—একদিন কলেজে মহা সোর গোল বেধে গেল। হৈ-চৈ কান্ড। কী সর্বনাশ ব্যাপার! দেখা গেল কে যেন বড় বড় হরফে সেখানে লিখে রেখেছে—"God is Money"—আমরা তো অবাক সবাই। সেকালে রামগোপাল ঘোষ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যখন বলেছিল—'I do not believe in the holiness of the Ganges' তখনও হিন্দুসমাজ এত চমকায়নি—তা সেই ননীলাল শেষ পর্যন্ত......

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বউ কেমন হয়েছে?

—বউটাও রূপসী শালাবাবু, তাই তো বলছি—ওর কপালটা ভালো, কাল নেমন্তন্ন খেয়ে এসে পর্যন্ত ওই কথাই তো ভাবছি—শালাটা করলে কী—আজ এসেছিল সবাই গান-বাজনা করতে—মন বসলো না—পাঁচশো টাকা ধার নিয়ে গেছে ননী এই সেদিন—এখনও শোধ করেনি—তার কাছে পাঁচশো টাকা চাইতেই এখন লজ্জা করবে আমার—পাঁচশো টাকার জন্যে নয়, পাঁচ হাজার টাকা গেলেও কিছু ভাবতুম না—ননী আমার কাছ থেকে অমন অনেক টাকা নিয়েছে—হিসেব রাখিনি কখনও,—কিন্তু এমনভাবে ননী আমাকে টেক্কা দিয়ে যাবে ভাবিনি তো কখনও—

ছুটুকবাবু যেন কেমন মুষড়ে পড়েছে।

বলতে লাগলো—এই যে সব নেশা-টেশা করার শিক্ষা দেখছেন শালাবাবু, এ-সব ও-ই আমাকে প্রথম শেখায়, এই যে গান-বাজনার সখ—এ-ও ওরই কাছ থেকে প্রথম শিখি—তখন কলেজে সবে ঢুকেছি

—চাকরের সঙ্গে গাড়িতে যাই আর গাড়ি করে ফিরে আসি, একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা কলেজ ছুটি হয়ে গেল— দু'জনে একসঙ্গে বেরুলাম রাস্তায়— কোন্ রাস্তা দিয়ে ঢুকে কোন্ রাস্তায় বেরিয়ে শেষে এক গলির মধ্যে নিয়ে গেল ননী, সেখানে একটা বাড়িতে গান-বাজনা হচ্ছিল—আমাকে বললে—পেছন পেছন চলে আয় চুড়ো—বলে নিজেই আগে ঢুকে পড়লো—

আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি দোতলার ওপর গানের আসর বসেছে, গান গাইছে একটা মেয়ে. নাকে একটা প্রকাণ্ড নথ্—

ননী একপাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে পড়লো। আমাকেও টেনে পাশে বসালে।

গান থামলো। সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল যে সে-ও থামলো। তবল্‌চিও থামলো।

ননী মেয়েটার কানে কানে চুপি চুপি কী বললো কে জানে!—মেয়েটা আমার দিকে দু হাত তুলে সেলাম করে বললে—আপনার বহুত্ মেহেরবানি—কী গান গাইবো ফরমাজ করুন—

তা বুঝলেন তখন আমার বুক কাঁপছে. বয়েসও কম. গোঁফও ওঠেনি বলতে গেলে. তা ছাড়া ওসব জায়গায় কখনও যাইও নি আগে; আমি কিছু কথাই বলতে পারলুম না। গান-বাজনা শোনা অবশ্য অব্যেস ছিল আমার. বাড়িতে এসে কত বাইজী গান গেয়ে গেছে. নজরানা নিয়ে গেছে. নাচ দেখেছি. সে-সব অন্য রকম, নাচঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি আমরা, বাড়ির চাকর-বাকর সবার কাছে কত কিছু শুনেছি, কাকা-মশাইরা বাইজীদের সঙ্গে সারারাত ধরে ফূর্তি করেছে—খাওয়া দাওয়া হয়েছে, নেশা টেশাও চলেছে, তোষাখানায় যখন গেছি চাকরদের মুখে বাবুদের কীর্তি-কলাপ শুনেওছি। বড় ছোট মাঝারি নানান মাপের রঙ বেরঙের বোতলের চেহারা দেখেছি, কিন্তু আমরা মানুষ হয়েছি ও-সব আওতার বাইরে। ওসব চলতো আমাদের চোখের আড়ালে। কিছু আমাদের জানতে পারবার কথা নয়! মা'র কাছে গিয়ে বাবামশাইএর অন্য চেহারা দেখতুম! বড় ভয় করতুম কিনা কর্তাদের—কিন্তু এমন করে বাইজীর মুখোমুখি হই নি কখনো—ননী মেয়েটাকে বললে—কিছু খাওয়াও ভাই আমাদের—আমার বন্ধু আজ এই প্রথম এল এ-সব জায়গায়—

আমার দিকে চেয়ে বললে—কীরে চুড়ো—খিদে পেয়েছে—কী খাবি বল্—তোর তো আজ বিকেলের বরাদ্দ দুধ খাওয়া হয়নি—

আমার তখন শালাবাবু ঘাম ঝরছে—খাবো কী মাইরী। খেতেই ইচ্ছে করছে না।

ননী জানতো বিকেলবেলা এক গেলাস দুধ আর ফল খাওয়া অব্যেস, আমার। কতদিন কলেজের পরে আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ও ফলটল খেয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তখন কে আমার কথা শোনে ভাই! মেয়েটা কা'কে যেন কী বললে। আর খানিক পরেই এল সব খাবার। ফলও এল, মিষ্টিও এল। আর আমার জন্যে দুধও এল।

মেয়েটা আমাকে বললে—আপনার বড় লজ্জা বুঝি—

কিন্তু ননীটা কী বদমাইস জানেন! মেয়েটাকে বললে—তুমি তো লজ্জাহারিণী ভাই—ওর লজ্জা আজ ভাঙতে পারবে না—

মেয়েটা জিব কেটে বললে—তেমন অহঙ্কার আমার নেই ননীবাবু, আপনা-দের মতন ভদ্দরলোকের পদধূলি পড়ে আমার কুঁড়ে ঘরে, তাইতেই আমি ধন্য—

ননী বললে—বাজে কথা থাক্, খাবার দিলে, আর মুখশুদ্ধি দিলে না এ কী রকম! তেষ্টা পাচ্ছে যে—

মেয়েটা ঝল্‌মল্ করে উঠে পড়লো। বললে—ছি ছি আগে বলতে হয়—

বেনারসী ওড়নার ঘোমটা সরিয়ে খস্ খস্ শব্দ করতে করতে গিয়ে এবার দাঁড়িয়ে দেরাজ খুলে পেছন ফিরে তাকালো আমার দিকে। বললে—কড়া জিনিস চলবে আপনার—

তখন কড়া মিঠে কিছুই জানিনে। কখনও খাইনি ওসব। কিন্তু খেলাম। কড়া খেলাম কি মিঠে খেলাম জানি না শালা-বাবু—কিন্তু খেলাম!—সেদিন কী আদর আমার! আমাকে তোয়াজ করাই একমাত্র কাজ হলো বাড়িশুদ্ধ লোকের।

তারপর গান চলতে লাগলো। মতিয়ার মুখেই ওই গানটা প্রথম শুনি। এখনও মনে আছে সেটা—'জখ্‌মী দিল্‌কো না মেরে দুখায়া করো'—

একে গজল তায় মতিয়ার গলা, সঙ্গে সারেঙ্গী আর পেশাদারী হাতের তবলা। তার ওপর আবার একটু অমৃত পেটে গেছে—কখন যে কোথা দিয়ে সময় চলেছে টের পাবার কথা নয়। তখন বাড়ির কথাও আর মনে নেই, কারোর কথাই মনে নেই—তখন মতিয়াকে নাকি আমি কেবল বলেছি নেশার ঘোরে—তোমায় বিয়ে করবো আমি—তোমায় ছাড়বো না আমি—

ভোর বেলা যখন ঘুম ভেঙেছে নেশা কেটেছে তখন ননী এল।

এসেই গালাগালি।—বললে—ছি ছি চুড়ো তোর একটা জ্ঞানগম্যি নেই, সারা রাত বাইজীর বাড়ি কাটালি এত বড় বংশের ছেলে হয়ে—

আমি তো অবাক্ শালাবাবু। বলে কী! আমাকে ওই-ই নিয়ে এল আর এখন কিনা আমাকেই গালাগালি!

আড়ালে নিয়ে এসে চুপি চুপি বললে—আমরা ভদ্দরলোকের ছেলে—একটু ফুর্তিটুর্তি করে চলে যাবো নিজের বাড়ি তা না রাত কাটাবো এখানে—কত বললুম—চল্ চুড়ো চল্ চল্—তুই কিছুতেই শুনলি না—ছি ছি—এখানে কি রাত কাটাতে আছে—

তখন আমারো তাই মনে হচ্ছিল মাইরী। এ কী করলুম! আমি তো ভদ্র-লোক! আমি বড়বাড়ির ছেলে—আমি নিমক মহলের বেনিয়ান ভূমিপতি চৌধুরীর প্রপৌত্র। সূর্যমণি চৌধুরীর নাতি, হিরণ্যমণি চৌধুরীর ছেলে—আমার এ কী পরিণাম।

বললাম—চল্ বাড়ি চল্—

ননীলাল বললে—সে কি? বাড়ি যাবি কী রে?

আবার কী দোষ হলো বুঝতে পারলাম না! বললাম—কেন?

—ওকে কিছু দে—মতিয়ার তো এটা ব্যবসা—ও এত কষ্ট করলো—সারা রাত জাগলো—

তাও তো বটে! কিন্তু সঙ্গে তো কিছু আনিনি—

ননী বললে—বাড়ি থেকে আনিয়ে দে—কিছু না দিলে খারাপ দেখাবে যে—

তোদের বংশের মুখে চুণকালি পড়বে যে—

বললাম—কত দিতে হবে—

—তোর যা খুশী, মতিয়া কিছু চাইবে না, ও তেমন মেয়ে নয়, তা হলে আর তোকে এখানে আনতুম না, অন্য মেয়ে হলে অবিশ্যি হাজার টাকা চেয়ে বসতো, তা ছাড়া তুই তো কিছু বলিসনি, আমিই এনেছি তোকে—দায়িত্বটা তো আমারই,—তবে ওর তো এটা ব্যবসা, ওরই চলে কিসে—আর তোদের বংশের নামটাম আছে —দেখিস্ যেন বদনাম না হয়—

—কত দেব তুই বল্—

ননী গলা নিচু করে বললে—নবাবী করে যেন বেশি দিতে যাসনি তুই—আসলে তো ওরা বাঈজী—পাঁচশো টাকা দিয়ে নাম নম করে সেরে দে এ-যাত্রা—

তা এই হলো ননীলাল। আপনি ভেবেছেন ননী সেই পাঁচশো টাকার সবটা দিয়েছে মতিয়াকে? অর্ধেক নিজে মেরে দিয়েছে। তারপর যখন আবার পরে একদিন মতিয়ার কাছে গেলুম—জিজ্ঞেস করলুম—

মতিয়া বললে—সে কি, আমাকে একটা পয়সাও তো দেয়নি সেদিন—

তা ননীলালকে চিনতে আমার আর বাকি নেই শালাবাবু—। আর শুধু কি আমাকে! আমার মতন আরো কত বড় লোক আছে কলকাতায়। সারা কলকাতায় লোকের কাছ থেকে ধার করেছে। ঠনঠনের ছেনি দত্তর ছেলের কাছ থেকেও নিয়েছে। একটু বড়লোক দেখলেই তার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। শোধ কাউকেই দেয়নি। শুধু কি একবার। বার বার আমার কাছে একটা-না-একটা ছুতো করে ধার চেয়েছে। ওর ওই একটা গুণ। ও চাইলে কেউ না বলতে পারে না।

খানিক থেমে ছুটুকবাবু বললে—একটু চলবে নাকি আজ? একটুখানি—

ভূতনাথ ছুটুকবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে বললে—মাপ করবেন ছুটুকবাবু। সেদিন খেয়েছিলাম—আজকে আর নয়...

ছুটুকবাবু বললে—তবে বলছেন যখন থাক, কিন্তু আমি একটু খেয়ে আসি—

বলে পর্দার ভেতরে গিয়ে আবার মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

এসে বললে—সেই কথাই কাল থেকে ভাবছি, ননীটা বাহাদুর ছেলে বটে—কত ঘাটের যে জল খেয়েছে আর কত ঘাট যে পার হয়েছে তার শেষ নেই—অথচ একজামিনেও পাশ করলে, আর নেশা ধরে গেল আমাদেরই...

হঠাৎ সুযোগ বুঝে ভূতনাথ বললে—আপনার সেই শশী কোথায় গেল—শশীকে দেখছিনে—

—না শালাবাবু, ও-সব চাকর আর রাখবো না ঠিক করেছি, পারা ঘা হয়েছিল সারা গায়ে—

—বংশীর একটা ভাই আছে, বংশী বলছিল ওর ভাইটাকে যদি...

কথাটা শুনে ছুটুকবাবু যেন চটে গেল—না শালাবাবু, ও-সব এক ঝাড়ের বাঁশ, ওদের কাউকেই আর বিশ্বাস নেই, বেটারা সবাই পাজি—ও সবাই যেন মাল-কোষের ধৈবত্—যেখানেই থাকুক ঘুরে ফিরে ঠিক সেই ধৈবতে এসে দাঁড়াবে.. তা এবার ভাবছি পরীক্ষাটা আবার দেব—একটা মাস্টার ঠিক করেছি—হপ্তায় চার দিন লেখাপড়া আর তিনদিন গান-বাজনা আর এই নেশাভাঙটাও ছাড়তে হবে—

বলে আবার উঠলো ছুটুকবাবু। উঠে পর্দার আড়াল থেকে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

বলে—আপনি বেশ ভালো আছেন স্যার—কোনও নেশাটেশার মধ্যে নেই—এ একবার ধরলে ছাড়ায় কোন্ শালা—

হঠাৎ বাইরে যেন কার ছায়া পড়লো!

ছুটুকবাবু চীৎকার করে উঠলো—কে রে কে ওখানে? কে?

(ক্রমশ)

(১২)

দরবারের নাচে মন ভরল না।

মনে হল যেন ঝুটা মণিমুক্তার চমকানি দেখে ফিরে এসেছি। জহুরী যদিও নই এটুকু বুঝতে পারা শক্ত হল না।

শুধু আমি কেন, যারা এ দেশী নাচের কিছু বোঝে না, যারা শুধু বল-ড্যান্সের সাধারণ পাঁয়তারা কসে, তার সামাজিকতার আনন্দটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে তারাও এ সহজ কথা বুঝতে পারত।

কি জানি। হয়ত আমি বাঙলাদেশের রেনেসেন্স অর্থাৎ নবজাগরণের যুগের সংস্কারের রস নিজে তেমন আস্বাদ করবার সুযোগ না পেলেও বহু লোককে উপভোগ করতে দেখেছি বলেই এ নাচ ভাল লাগল না। হয়ত আধুনিক সভ্যতার পালিশে চকচকে হাল্কা নাচ দেখার পর এসব পুরানো আসল রাশভারী নাচ আমাদের অনভ্যস্ত চোখে ভাল লাগে না। ঠিক যেমন ফিউচারিস্ট ডিজাইনের হাল্কা সোনার ব্রেসলেটের পর সাবেকী আসল সোনার ভারী বাজুবন্দ আর পছন্দ হয় না।

নাইলনের হাওয়াইয়ান হাওয়া শার্টের পর আর কি গরদের সাবেকী ছাটের পাঞ্জাবীতে মন ওঠে?

কিন্তু আসল মাল কোন্‌টা?

মনের মধ্যে প্রশ্নটা জেগে রইল। কিছুদিন পর পরই খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, ওটাকে চাপা দেওয়া চলবে না।

মনে পড়ল বছর ত্রিশেক আগে ইংরেজ যুগের সেক্রেটারী অব স্টেট মণ্টাগু এই নাচের কথা নিজের গোপন রোজনামচায় লিখে গিয়েছিলেন। কেহ যে ভবিষ্যতে ছাপার অক্ষরে পড়বে, সে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই ডায়েরী লেখেন নি। বার বছর পরে তাঁর স্ত্রী সেগুলি বই করে ছাপিয়েছিলেন। কাজেই এতে অনেক কথা ও অনেক মত মণ্টাগু খুব খোলাখুলিভাবে লিখে যেতে পেরেছিলেন। মামুদাবাদের রাজা তাঁকে একবার দরবারী নাচ দেখিয়েছিলেন। সেখানে নর্তকীদের নাচ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, "কুৎসিত মেয়েরা কিম্ভূত পোষাক পরে, শিয়ালের মত হল্লা করে মৃগীরোগীর মত হাত-পা ছুঁড়ছিল বার বার। ওরা (ভারতীয়রা) বলে যে, আমাদের গীতবাদ্যও ওদের কাছে সমান দুর্বোধ্য। আমার কাছেও অবশ্য তাই। তবু এটুকু বুঝি যে, আমাদের গানের কোথাও একটা শুরু হয় আর শেষও একরকম হয় এবং প্রাণবন্ত ও কাঁদুনে, ভারী ও হাল্কা মিউজিকের তফাৎ আমি বুঝতে পারি।"

আমারও সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান তার চেয়ে বেশী মোটেই নয়।

তবু এই মহাজনের মতটা মনে করে একটু সান্ত্বনা পেলাম যে, যারা এই রকম দরবারী নৃত্যরসের অনুরাগী, তারা আমায় বড় জোর বেরসিক মনে করতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য সমাজের বাইরে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য রায় দেবেন না।

মনুষ্য সমাজের মধ্যেই বসে এ কথা হচ্ছিল। যে নতুন রাজস্থান গড়ে উঠছে পুরানো রাজোয়ারার গা ঘেঁষেই সেখানে। বাঙালী বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের গড়া মহারাজার জন্য তৈরী গোলাপী শহরের ঠিক বাইরে—রাজাও নয় সামন্ত-সর্দারও নয়, এমন যে নতুন প্রভাবশালী জাত গড়ে উঠছে তাদের জন্য তৈরী নয়া শহরে।

জয়পুরের 'ল্যান্ড মার্ক' হচ্ছে তার সুন্দর মিউজিয়ামের বাড়ি। ঠিক তার কাছেই রাজপুতানা ইউনিভার্সিটি নতুন তৈরী হচ্ছে। দেশের চারদিক থেকে জড়ো করা হয়েছে পণ্ডিত অধ্যাপকের দল। নতুন বিদ্যার আলো তাদের মুখে, সদ্য বিলেতী মার্কিনী ডিগ্রীর ছাপা নামাবলী তাদের নামে। যে সব সাধারণ অবস্থার ছেলেরা রাজপুত্রদের জন্য মার্কা-মারা মেয়ো কলেজে স্থান পেত না, তাদের আর ভাল প্রফেসারের কাছে পড়তে হলে দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ ছুটতে হবে না। ঘরের খেয়েই বাইরের বিদ্যা তারা এখন থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

সেই বিদ্যাদানের কর্ণধার হচ্ছেন ডক্টর মহাজানি। জাতিতে মারাঠী, বিদ্যায় ব্রাহ্মণ ও যশে ইণ্টারন্যাশনাল। এদেশে বাঙ্গালী শ্রীভূপতিমোহন সেনের মত দুয়েকজন ছাড়া এর মত অঙ্কশাস্ত্রে কেম্ব্রিজের এত বড় র‍্যাংগলার আর কেহ নেই। তিনি রাজী থাকলে শিক্ষা বিভাগের যে কোন বড় পদ যেচে তার পদপ্রান্তে আসত, কিন্তু আজীবন শুধু পেটভাতায় তিলক গোখলে প্রভৃতির মত নিঃস্বার্থভাবে ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সভ্য হিসাবে পুণা ফার্গুসন কলেজে পড়িয়ে এসেছেন। এখন নতুন রাজস্থানের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে এসেছেন। তিনি এখানকার ভাইস চ্যান্সেলার।

মনে পড়ে গেল যে এই রাজস্থানে, বিশেষ করে এই জয়পুরে মারাঠা আসত লক্ষ লক্ষ টাকা চৌথ আদায় করতে। অত্যাচারে ও শোষণে বছরের পর বছর

দেশকে শেষ করে যেত। আজ সেই মারাঠা একজন এসেছেন নতুন রাজস্থান গড়তে সহায়তা করতে। বন্দুকের বদলে এনেছেন বিদ্যা। আদায়ের পরিবর্তে করবেন দান। যা জোর করে অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। সেই দান যা যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এই তুলনার মধ্যে লুকানো দেশের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে মহাজনি মহাশয়ের চায়ের টেবিলে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

শ্রীমতী মহাজনি শিক্ষার সঙ্গে সুরুচির সুন্দর একটা সমন্বয় করেছেন নিজের গৃহস্থালীতে। স্বামী ডাকসাঁইটে ডাকাত নয়, পণ্ডিত। মেয়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ নিয়ে মার্কিন দেশে শীঘ্র যাবে পড়বার জন্য। কিন্তু ধরাকে সরা জ্ঞানও করেননি আর নিজের হাতে সংসারের সর্বকিছু করতে দ্বিধাও নেই। তাঁর হাতের তৈরী মিঠাই আমার হাতের মধ্যে থেকে মুখের ভিতর বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিজেরই অজান্তে হাত ও মুখ দুই-ই হাত গুটিয়েছে।

তিনি মৃদু হেসে বললেন যে আজ আমি সকালে তার বাড়ির বাগানে ময়ূরের নাচ দেখেছি বলে বোধহয় মনটা ভরে আছে। তাই খাবার কথা মনে হচ্ছে না। আমি নিশ্চয়ই কবি কারণ বাঙলা দেশের মাটিতে যে শুধু বোমারু আর কবি জন্মায় সে কথা সবাই জানে

মন অবশ্যই ভরেছিল। ময়ূরের নাচ কলকাতায় চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখতে হয়। বাঙলা দেশের কোন গ্রামে নিরামিষ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে যে হঠাৎ এক ঝাঁক ময়ূরের পেখম মেলে নাচ দেখতে পাব সে সম্ভাবনা নেই। অথচ বর্ষার কবিতা বাঙালীর মত এত আর কোন জাতি লেখেনি। বর্ষার মেঘ জয়দেব থেকে চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ প্রভৃতির আকাশ ছেয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যেমন-ভাবে কাব্যকে শ্যামল সরস করে তুলেছে এমন আর কোন দেশে হয়নি। কাজেই শুধু কবিতা পড়তে অভ্যস্ত আমি বা আমার শ্রীমতী কেন, ও রসে এখনো পর্যন্ত বঞ্চিত আমাদের শিশু কন্যা পর্যন্ত বাড়ির বাগানে চোখের সামনে ময়ূরের পেখম মেলে নাচ দেখে আত্মহারা। আমেরিকার কলেজে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন মহাজনি-কন্যা। এই নাচের আসরে সে ও অনুরাধা এক রসের রসানে সমবয়সী হয়ে গেল।

কাজেই আমিও যদি তাদের ছোঁয়া পেয়ে থাকি আর ভাবি যে

একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি;
তাই নিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী।

তাহলে জয়পুরের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্য কিছুই হয় না। এই গোবিন্দজীর দেশে বাড়ির বাগানে ময়ূরের নাচ থেকে আরম্ভ করে মূর্তি মহল্লায় যে ভক্তশিল্পীর হাতে শ্বেত পাথরের মধ্যে তার মনের গোপালমূর্তি আকৃতি নিয়ে উঠছে সেই শিল্পসৃষ্টি পর্যন্ত সর্বত্র সেই একজনের কথা বার বার মনে পড়ে।

তাই শ্রীমতী মহাজনি যে ময়ূরের নাচের কথা তুলবেন সে কথা অস্বাভাবিক নয়।

একটু কিন্তু অপ্রস্তুত হলাম। কি করে বলি যে মারাঠার সে যুগের ক্ষত্রবৃত্তি ও এযুগের ব্রাহ্মণবৃত্তির কথা ভাবছিলাম! ময়ূরের নাচের কথা ওঠায় বেঁচে গেলাম।

বললাম তিন বছর আগেকার এক দরবারী নাচের আসরের কাহিনী। যে নাচ ছিল চটকদার কিন্তু চমৎকার নয়। যার প্রেরণা আসেনি ওই ময়ূরের নিজের মনের আনন্দে নেচে যাওয়ার মধ্য থেকে। যা ময়ূরীর মত দর্শকদের মনে নাচের ঢেউ তুলতে পারেনি।

অবশ্য দরবারী রসে যারা ডুবে আছেন বা আছেন বলে দেখান উচিত বলে মনে করেন তাঁরা সে নাচের ঢেউয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। কিন্তু বহু রসের রসিক মহাশয় প্রাণী তারা। একেবারে অন্য আসমানের চিড়িয়া।

আর আমরা যারা এই নিরামিষ চায়ের টেবিলে জড়ো হয়েছি আমাদের কথা আলাদা। টেবিলে বসেছেন ডক্টর মুকুট-বিহারী মাথুর, ইকনমিক্সের দিগ্‌গজ পণ্ডিত। বয়সে নবীন কিন্তু প্রবীণের মুকুট পরেছেন মাথায়। সে প্রবীণতার প্রমাণ হচ্ছে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড় উপাধিতে।

বসেছেন অধ্যাপক গুপ্ত। মনে প্রা জয়পুরী কিন্তু বিশ্বপুরী ঘুরে এসেছে জ্ঞানের সন্ধানে। হাসিতে খুশী উপচিয়ে পড়ছেন চারদিকে। মনের বাতায় যেন খুলে দিয়েছেন হাসি ভরা দু নীলাভ চোখের মধ্যে দিয়ে।

নীলাভ চোখ? হ্যাঁ, ঠিক তাই রাজপুতের আদিম পূর্বপুরুষেরা ছি আর্যের সঙ্গে শক হূণ প্রভৃতি যোদ্ধ জাতির পাঁচমিশেলীর ফল। তাদের আদি ইতিহাস, আচার ব্যবহার ধর্ম এসব বিচা করলে রাজপুতের সঙ্গে প্রাচীন জার্মা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের লোক যথা, গথ কেল্ট, গাল প্রভৃতির আত্মীয়তার সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। তাতার ও মোগলদের ঐতিহাসিক আবুল গাজী লিখেছেন যে তাতারদের উপর আমাদের যে একটা বিরাগ আছে, সেটা থাকত না যদি আমরা ভেবে দেখতাম যে, তাতার দেশ অর্থাৎ উত্তর-মধ্য এশিয়া থেকেই সুইডিস, গ্লেস, হূন প্রভৃতি জাতিরা বাকী এশিয়া ও ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেরই ত লোকে আর্য বলে। হিটলার তাই উত্তর ইয়োরোপের সুইডিশ প্রভৃতি নর্ডিক জাতিকে আর্যদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

সেই কুলীন ব্রাহ্মণদের পরিচয় তাদের উপবীতে নয়, কারণ চেনা বামুনের ত পৈতের দরকার নেই। সে পরিচয় আছে তাদের সোনালী চুল, নীলচে চোখ আর উজ্জ্বল গায়ের রঙে। রোদে যা মলিন হয়ে যায়নি, গরম হাওয়ায় যা তেতে পুড়ে যায়নি। সেই নর্ডিকদের গুটি কয়েক প্রতিনিধিকে হিন্দুস্থানের খোলামেলা সূর্যের আলোয় কয়েক বছর রেখে দিলেই গায়ের রঙ তামাটে ও চোখের রঙ ঘোলাটে হয়ে আসতে যে পারে তার প্রমাণ আমরা মফঃস্বলের বহু খাঁটী ইংরেজ চাকুরের এক পুরুষের জীবনের মধ্যেই দেখে এসেছি।

অবশ্য রঙ পাকা হতে সময় লাগে। হিন্দুস্থানের খাঁটী আর্যদেরও লেগেছে হাজার হাজার বছর।

এখন হঠাৎ সেই হাজার বছরের যবনিকা তুলে বেরিয়ে এল অধ্যাপক গুপ্তের দুটি নীলাভ চোখ। মাথার চুলের ডগা আমার মত ঠিক অতটা কালচে এখনো হয়নি। কোটের কলারের নীচে ঘাড়ের কাছের রঙ ও মুখের রঙের তফাৎ দেখে

"ঝড়ের রাতের অভিসারের গান"
(প্রাচীন উদয়পুরী চিত্র)

অনুমান করা শক্ত নয় যত শতাব্দী ধরে তার বংশের রঙ পাকা হয়েছে ঠিক তত শতাব্দী যদি সূর্যের আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে ঠান্ডা দেশে তার বংশধরদের রাখা যায় তাহলে ধোপে ধোপে সাফ হতে হতে আবার আদি ও অকৃত্রিম রঙটি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

বহু ক্ষত্রিয় রাজপুতের ক্ষীণ কটি তট ও অধর, সরল সুঠাম দেহ ও নাসিকা দেখে সে কথা বহুবার মনে হয়েছে। কথায় কথায় কোন গ্রাম্য ঠাকুর সাহেব বা জায়গীর-দারকে সে কথা বললে তার মনে কষ্ট বা আনন্দ কোন্‌টা বেশী হবে তা বলা শক্ত। কিন্তু গুপ্তজী যে এই জাতিতত্ত্বের প্রমাণ নিজের গায়ে মেখে রেখেছেন তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না।

আর টেবিলে বসেছেন অধ্যাপক রুচিরাম। বয়সে তরুণ কিন্তু চোখ তুললেই সরমে অরুণ হয়ে উঠছেন ক্ষণে ক্ষণে। একসঙ্গে স্ত্রী পুরুষে মিলে বসা, খুশী মনে হাসা, হাল্কা রসালাপে ভাসা এখনো তেমন রপ্ত হয় নি। খাঁটী মেবারী তিনি। খাস উদয়পুরের পর্দাঘেরা অন্তঃপুর থেকে আমদানী। আরাবলী গিরিমালার ঘোমটায় উদয়পুর থেকে এসেছেন,—যেখানে এখনো কোন সাধারণ ক্ষত্রিয় ঘরের পুরুষের চোখের সামনে দিয়ে পথে পদ্মফুল ফুটিয়ে হাটে না। পায়ের নূপুরের রিনিঝিনি মিঠে সুর তুলে সন্ধ্যাবেলা পানিয়া ভরণে বের হয় না। বাইরের কাজগুলি সিভ্যালরীতে শিক্ষা পাওয়া পুরুষ সমাজের প্রাচীনপন্থী শাসন মেনে মেয়েদের বদলে নিজেরা করে নেয়। মিছেই এরা রাধাকৃষ্ণের ঝড়ের রাতের অভিসারের গান গেয়ে বেড়ায়। জীবনে ত সে গান প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে না কখনো।

চারদিকে ভীল মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা ও সব কাজে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ানর উদাহরণ দেখা সত্ত্বেও গ্রামে এমনকি শহরেও বনেদী রাজপুতেরা ঘরে বাইরে নারী ও পুরুষের মধ্যে ডিভিসন অব লেবার একেবারে কড়াক্রান্তিতে ভাগ করে রেখেছে। এটাতেই তাদের মান রক্ষা হয়।

জান কবুল, কিন্তু মান যাবে না।
পথি নারী? নৈব, নৈব চ।

সে সব অশাস্ত্রীয় কার্য মেবারী ঘরাণা রাজপুত কখনো করে না। করার কথা কল্পনাই করে না।

প্রথম প্রথম গুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুরা রুচিরামকে স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। নিমন্ত্রণ পার্টিতে তিনি আসতে পারলেন না কেন তা জিজ্ঞাসা করে 'হোস্টেস' তার অসুস্থতার কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করতেন। এখন সবাই জানে যে, তিনি স্ত্রী-পুরুষের মিশেলী নিমন্ত্রণের দিনে নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তবু নিমন্ত্রণকর্ত্রী একবার তার সন্ধান নিবেন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত ভাব দেখাবেন। শ্রীমতী মাথুর প্রভৃতি সকলেই সেজন্য সহানুভূতিতে একটু বিগলিত হবেন। এটা এই সমাজে নতুন নয়, আশ্চর্যও নয়।

কিন্তু রুচিরামের কাছেও এটা গা-সহা হয়ে গেছে কি? না, তার নিজের মধ্যে শুধু অস্বাচ্ছন্দ্য নয়, এমন কি একটু বিদ্রোহও জেগে ওঠে কখনো কখনো?

আর ওই যে গৃহপালিত হরিণী—যাকে অন্তঃপুর দাবানলের মত ঘিরে রেখেছে ছেলেবেলা থেকে—তার কি খবর? অন্দরের আগল খুলে বেরিয়ে আসবার জন্য তার কাঁকন-পরা হাত দুখানি কি নিস্‌পিস্ করে ওঠে না কখনো?

পোষাকী রাজপুত নাচ

ঘরে শ্রীমতী রুচিরাম নিশ্চয়ই গৃহিণী। কিন্তু সচিব কি না কে জানে? বাইরের হানাহানির সংসারের তাপে জর্জরিত হয়ে স্বামী যখন ঘরে ফিরে আসেন, তখন শ্রীমতী কি শুধুই গৃহিণী সেজে সামনে আসেন, না সখার মত সব সুখ দুঃখের ভাগী হন? সচিবের মত বুদ্ধি দেন? একজনের চেষ্টায় আরেক জনের চোখ দিয়ে যাচাই করে দেখে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমিয়ে দেন? বাইরের জগতে নানা ললিতকলার বিকাশ হচ্ছে; তার আভাস নিয়ে কি স্বামী ফিরে আসেন ঘরের প্রিয় শিষ্যাকে তাতে দীক্ষা দিয়ে অন্তত নিজের রুচিকে চরিতার্থ করতে? মনের মানুষকে রঙীন ফানুসের আলোয় দেখতে কি পান তার ফলে? সেই আলো—

সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে?

বিবাহবাসরের পর কি সাজান শুরু হয়েছে দুজনের মানস-আসর? না, বাসক-শয্যা শুধুই রয়ে গেছে দাম্পত্য শয্যা? ললিত সজ্জায় ময়ূরের মত বিকশিত হয়ে ওঠেনি?

অধ্যাপক রুচিরামের আনত নয়নের দিকে তাকিয়ে বার বার সে কথাই মনে হতে লাগল।

কিন্তু এদিকে ওই যে ময়ূরের নাচের কথা হচ্ছিল।

গুপ্ত বললেন, ময়ূর আমাদের এখানে নাচের মধ্যে অনেক প্রেরণা দিয়েছে। কাজেই আপনি যে সকালে ময়ূরের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নাচ যদি প্রকৃতির মাঝখান থেকে উঠে আসে তাহলেই স্বাভাবিক হয়। দরবারে যে নাচ দেখেছিলেন তা হচ্ছে কৃত্রিম শিক্ষার ফল। সিনথেটিক নাচ।

বললাম যে অত শত আমি বুঝি না। শুধু যেটা চোখে ভাল লাগবে, কানে যার তাল বাজবে, মনে যেটা ধ্বনি তুলবে সেটাকেই ভাল নাচ বলে মনে করতে প্রস্তুত আছি। ময়ূরীকে কি কেউ ভারতের নাট্যশাস্ত্র শিখিয়েছে? কিন্তু ময়ূর যখন নিজের মনের খুশীকে পেখম মেলে ঠিক মত ছড়িয়ে দিতে পারল, তখনই ময়ূরী নিজেই যেচে সাড়া দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে নেচে গেল।

মহাজনি-কন্যা বললেন,—তা আপনি যখন দেশ বেড়াতে এসেছেন, তখন নতুন যা দেখবেন, তাই ভাল লাগার কথা। তা না হলে ট্যুরিস্ট কেন? কাজেই ময়ূরী মত আপনার মন নিশ্চয়ই সাড়া দেবা জন্য তৈরী হয়েই আছে। পোষাক রাজপুত নাচও আপনার কম ভাল লাগে না।

আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই হল ন যখন আমার শ্রীমতীও বিপক্ষ দলে যো দিলেন।

তিনি বলে বসলেন,—ওর কথা আর বলবেন না। উনি হন্যে হয়ে কালচা সন্ধান করছেন রাজস্থানে আসাতক।

টোডরমলের কটা ছিল হাতী,
শাজাহানের ছিল কটা নাতী।

এসব দামী ও দরবারী খবর নিয়েও সন্তুষ্ট নয়; এখনি আবার প্রত্যেক ভাঙা পাথরের টুকরোর মধ্যে রাজপুত আর্ট, মরচে-ধরা তরোয়ালের মধ্যে তার বয়স, টোল খাওয়া গণ্ডারের চামড়ার ঢালের মধ্যে হলদীঘাটের ইতিহাস এসব বহুমূল্য তথ্য খুঁজতে শুরু করেছেন।

নতুন একটা আক্রমণ এল অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। একেবারে মোক্ষম মার। রুচিরাম মাথাটি মেঝের দিকে নামিয়ে রেখেই কথা পাড়লেন,—তা আপনি ময়ূরের মধ্যে নাচের ইতিহাস যখন পেয়েছেন, ময়ূরপঙ্ক্ষী পোষাক-পরা নর্তকীদের মধ্যে সে নাচের বিকাশ আপনিই খুঁজে বের করুন। না হলে রাজোয়াড়ার প্রতি একটি ঘোর অবিচার করে যাবেন।

বিশেষ করুণ একটা সুর গলায় আনবার চেষ্টা করে উত্তর দিলাম—কিন্তু আমার প্রতিই যে অবিচার হয়ে যাচ্ছে এবার।

সমস্বরে প্রতিবাদ উঠল সব দিক থেকে। যেন সপ্তরথীর ব্যূহে ধরা পড়েছে অভিমন্যু। সবাই আমার পা টানার অর্থাৎ 'লেগ পুল' করবার চেষ্টায় নাচ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলেন।

সত্যই ত। ওরা শুধু নাচের কথাই জানতে চেয়েছেন; নিজেকেই যে নেচে দেখাতে হবে এ হেন কথা ত বলেন নি।

অপরাধ কবুল করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্জি পেশ করলাম যে রাজোয়ারা আমরা হচ্ছি অতিথি। কোথায় খাঁটী নাচ দেখতে পাব তার সন্ধান দেবার, এমনি দরকার হলে নিজেরাই নেচে দেখিয়ে দেবা ভার হচ্ছে রাজস্থানীদের। এতজন রাজস্থানী যখন চারদিকে বসে আছেন তখ

অবশ্যই আসল নাচ না দেখে জয়পুর থেকে এবার অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ফিরে যেতে হবে না।

শ্রীমতী মহাজনি চট করে এই ভীষণ দারিদ্র্যের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, আমরাও এ জায়গায় নতুন লোক। গুপ্তজী, মাথুরজী এরা নিশ্চয়ই অতিথি সৎকারে পেছ পা হবেন না। আমরাও দেখতে চাই আসল জয়পুরী নাচ।

আমার ধনুক থেকে আর একটি শর নিক্ষেপ করলাম।

বললাম যে, কথক নাচ নাকি জয়পুরের খুব নাম করা নাচ, অথচ ঠিক কোথায় যে খাঁটী কথক দেখতে পাওয়া যাবে তার সন্ধান পেলাম না। গুপ্তজী যখন জয়পুরীয়া তাকেই এ কাজটি করে দিতে হবে।

রাজপুত সোয়ার যেন জিনে পা না দিয়েই ঘোড়া চড়ে বসল। তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি বললেন—ইউরেকা। আমি পেয়েছি। গাঙ্গোরী দরওজার কাছে গলি দিয়ে যেতে যেতে একদিন আমি কথকের বোল শুনতে পেয়েছিলাম। ময়ূরের আওয়াজের মত। ময়ূর নৃত্যই হবে বোধ হয়।

চলুন এখনি আমার সঙ্গে। জায়গাটা ঢুঁড়ে অর্থাৎ স্কাউটিং করে আসি আগে। ব্যাপারটা বুঝে তার পর একদিন সবাই মিলে দেখে আসা যাবে।

মহা উৎসাহে উঠে পড়লাম। চললাম দুজনে কথক নৃত্যের সন্ধানে। মন তখন ময়ূরের মতন পেখম মেলেছে।

(ক্রমশ)

অর্থ কমিশনের রোয়েদাদ

মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আঠারো বছর আগেকার কথা। তখন নতুন অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছি। রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর দারুণ ঝোঁক। স্বদেশের কোটি কোটি টাকার সঙ্গে বিদেশের মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড ও ডলারের হিসেবগুলো পরম আগ্রহে মুখস্থ করার চেষ্টা করি, নোট-বইয়ে টুকে রাখি, বন্ধুমহলে আলোচনা করি, ছাত্রমণ্ডলকে চমকিত করি এবং নিজে সারা মাস চিৎকার করে বেতন পাই একশ' টাকা, মধ্যে মধ্যে দু-একটা টিউশানিও জোটে। এই সময় ইংরাজ দয়া করে ভারতকে দিয়ে দিলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। বিলেতের পার্লিয়ামেন্টে ১৯৩৫ সালে নতুন করে রচিত হোল গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন—প্রদেশগুলো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন হয়ে গেল। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন পেলেই ত হোল না, পয়সাও চাই। ট্যাক্স বাড়লো। নতুন আইনে ট্যাক্স বসাবার মালিক হলেন দুজন, এক ভারত সরকার, দ্বিতীয় প্রাদেশিক সরকার। ১৯৩৫-এর গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের ১৩৮ ও ১৩৯ ধারায় নির্দেশ দেওয়া হোল যে, আয়কর এবং লবণ, আবগারী ও রপ্তানি শুল্ক, যা কিনা আদায় করলেন ভারত সরকার, তার সবটাই ভারত সরকার একা ভোগ করতে পারবেন না, তার খানিকটা ভারত সরকারকে দিয়ে দিতে হবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে খরচ করার জন্য। এর মধ্যে বিশেষ করে বলা হোল যে, ভারত থেকে যেসব পণ্য রপ্তানি হয়, তার মধ্যে পাট ও পাট থেকে তৈরি জিনিসের, অর্থাৎ চট, থলে ইত্যাদি রপ্তানি করে যে-টাকা ভারত সরকার নিট মুনাফা করবেন, তার অন্যূন অর্ধেক অংশ, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ দিতে হবে সেই সমস্ত প্রদেশকে যারা পাট উৎপাদন করে, অর্থাৎ বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম, এই চারিটি প্রদেশ পাট রপ্তানির শতকরা ৫০ ভাগ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবে। কথা হোল যে, এই সব ভাগ-বাঁটোয়ারার চুলচেরা হিসাব করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হবে। ১৯৩৫ সালে এই সব ব্যবস্থা কাগজে-কলমে পাকাপাকিভাবে হয়ে গেল।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাস। তদানীন্তন ভারত সচিব মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ড নিযুক্ত করলেন স্যার অটো নিমেয়ারকে। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভারত সরকারের দ্বারা আদায়ীকৃত এই সব টাকাকড়ির বাঁটোয়ারা নির্ধারণ করতে এবং প্রসঙ্গক্রমে কবে থেকে এবং কিভাবে এই স্বায়ত্তশাসন চালু করা যায়, সেই সব দিনক্ষণ স্থির করে দিতে। স্যার অটো নিমেয়ার ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে এসে পৌঁছুলেন এবং সমস্ত বিষয় গবেষণা করে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তাঁর বিরাট রিপোর্ট তৈরি করে ১৯৩৬ সালের ৩০-এ এপ্রিল তারিখে ভারত সচিবের হাতে সেখানা অর্পণ করলেন। ঐ রিপোর্ট পার্লামেণ্টে দাখিল করা হোল এবং ১৯৩৬ সালের ১২ই জুন বিলাতের পার্লামেণ্ট নিমেয়ারের নির্ধারণ পুরোপুরি গ্রহণ করলেন।

স্যার অটো নিমেয়ার তাঁর বিবরণীতে যে নির্ধারণ দিয়েছিলেন, তার মোটামুটি ব্যাপারটা হোল এই যে, আয়কর বলে ভারত সরকার সারা ভারত থেকে যে টাকাটা তুলবেন, সেই টাকাটা তোলার খরচ বাদ দিয়ে নিট যে টাকাটা সরকারের হাতে থাকবে, তা থেকে ভারত সরকারকে মোট অর্ধেক, অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ দিতে হবে প্রদেশগুলোকে। ঐ সময় ব্রহ্মদেশ বাদ দিয়ে (১৯৩৫-এর আইনেই ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল) আয়কর বাবদ অখণ্ড ভারত থেকে নিট আয়কর পাওয়া যেত বছরে বার কোটি টাকা, অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ অনুসারে বছরে ছয় কোটি টাকা প্রদেশগুলোর মধ্যে

বণ্টন করে দিতে হবে। তিনি স্থির করে দেন যে, যে-টাকাটা প্রদেশগুলোর মধ্যে ভাগ করা হবে, তার

শতকরা ২০ ভাগ	পাবে	বোম্বাই
,, ২০	,,	বাঙলা দেশ
,, ১৫	,,	মাদ্রাজ
,, ১৫	,,	ইউ পি
,, ১০	,,	বিহার
,, ৮	,,	পাঞ্জাব
,, ৫	,,	মধ্যপ্রদেশ
,, ২	,,	আসাম
,, ২	,,	উড়িষ্যা
,, ২	,,	সিন্ধু
,, ১	,,	উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ

অর্থাৎ নিট দুশো টাকা আয়কর আদায় হলে বোম্বাই এবং বাঙলা প্রত্যেকে পাবে কুড়ি টাকা হিসাবে, মাদ্রাজ এবং ইউ পি পনেরো টাকা হিসাবে ইত্যাদি। নিমেয়ার সাহেব এই সঙ্গে স্থির করে দেন যে, ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হবে ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ থেকে এবং ভারত সরকার ঐ আইন অনুযায়ী কাজ শুরু করলে ভারত এক বছর পর থেকে তার আয়করের যে-ভাগটা প্রদেশগুলোকে দেওয়ার কথা, ভারত সরকারকে সেই ভাগ প্রথম বছর থেকে দিতে হবে না, কারণ তাহলে নবগঠিত ভারত সরকারের ব্যয়সংকুলান করা সম্ভব হবে না। অতএব ভারত সরকার প্রথম পাঁচ বৎসর ঐ টাকাটা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের জন্যই রাখতে পারবেন এবং তারপর থেকে যতটা সম্ভব প্রদেশগুলোকে দিতে শুরু করে দশ বছরের মধ্যে দেয় অংশের পুরো টাকাটাই প্রদেশগুলির হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য তার পূর্বে যদি পুরো টাকাটা দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে দিতে পারে। এই কারণেই নিমেয়ারের নির্ধারণকে এদেশের অনেকেই ভবিষ্যতের আকাশ-কুসুম বলে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন।

পাট রপ্তানি শুল্ক সম্বন্ধে নিমেয়ার ঠিক করে দেন যে, পাট রপ্তানি শুল্কের শতকরা ৫০ ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলোকে আইন অনুযায়ী দেওয়ার পরেও আরও সাড়ে বারো ভাগ বেশী দেওয়া উচিত। এই হিসাবে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি শুল্কের শতকরা ৬২½ ভাগ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটি প্রদেশের ভোগে আসে। ১৯৩৬—৩৭ সালে পাট রপ্তানি শুল্ক বাবদ নিট আয় হয় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। আইন অনুসারে এর অর্ধেক টাকা এই চারিটি প্রদেশ পেয়ে উপরন্তু নিমেয়ারের নির্দেশ অনুসারে আরও শতকরা সাড়ে বারো ভাগ এরা পেয়ে গেল, অর্থাৎ বাংলা পেলে আরও বাড়তি ৪২ লক্ষ টাকা, বিহার বাড়তি ২½ লক্ষ টাকা, আসাম বাড়তি ২½ লক্ষ টাকা এবং আসাম ½ লক্ষ টাকা।

আয়কর এবং পাট রপ্তানি শুল্ক বাবদ প্রদেশগুলো ভারত সরকারের কাছ থেকে যা পাবে, তার উপর নিমেয়ার নির্দেশ দিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু করার জন্য কতকগুলো প্রদেশকে এককালীন মোটা টাকা নগদ সাহায্য করতে হবে এবং কতকগুলো প্রদেশ প্রতি বৎসরই নগদ কিছু করে বাড়তি টাকা আরও সাহায্য পাবে। এর মধ্যে বাংলা দেশকে বাৎসরিক ৭৫ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দেন নিমেয়ার সাহেব। অন্যান্য প্রদেশের সাহায্যের তালিকা দিয়ে প্রবন্ধকে দীর্ঘ করে লাভ নেই কারণ এগুলো এখন সমস্তই পুরাতন ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। ইংরেজ চলে যাওয়ার দু বছরের মধ্যেই নিমেয়ারের রোয়েদাদ চলে গেছে, অতএব এই পুরাতন ইতিহাস নিয়ে মাথা ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজনও আর নেই।

নিমেয়ারের রোয়েদাদ বলবৎ ছিল ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৯-৫০-এর বাজেট প্রণয়নের সময় ভারত সরকার ধুয়ো তুললেন এই বলে যে, ভারত সরকারের কাজ এবং দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে, অতএব পুরাতন রোয়েদাদের পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। সেজন্য তদানীন্তন ভারতের বড়লাট শ্রীরাজাগোপালাচারীর নামে যে নূতন রোয়েদাদের সৃষ্টি হোল তাতে বাংলাদেশ পেলে আয়করের মাত্র শতকরা ১২ ভাগ অংশ, বোম্বাই শতকরা ১৫ ভাগ অংশ এবং এইভাবে প্রায় সকলেরই প্রাপ্য অংশ বেশ কিছুটা করে কমানো হোল। পাট রপ্তানি শুল্কের কোন অংশই আর অংশ হিসাবে দেওয়া হোল না, নগদ সামান্য কিছু দেওয়া হবে বলে স্থির করে দেওয়া হোল।

এর ফলে সকল প্রদেশই হোল অসন্তুষ্ট। সর্বত্রই সেই একই কংগ্রেস সরকার চালু ছিল বটে, কিন্তু নগদ টাকার বাঁটোয়ারায় সহোদর ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, তা 'পার্টি' ত কোন্ ছার। সকল প্রদেশেই আপত্তি হওয়াতে ভারত সরকার বুঝলেন যে, এইভাবে চলবে না। অতএব আবার নতুন করে একটা অর্থ কমিশনের সৃষ্টি করতে হোল। এবার অর্থ কমিশনের পরিচালক হলেন স্যার চিন্তামন দেশমুখ এবং এই রোয়েদাদের নাম হোল দেশমুখ রোয়েদাদ।

দেশমুখ রোয়েদাদে আয়কর বিভক্ত হোল এইভাবে যে, যত টাকা নিট আয়কর ভারত সরকার পাবেন, নিমেয়ারের রীতি অনুসারে তার অর্ধেকই প্রদেশগুলোকে দেওয়া হবে। যে টাকাটা রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজিত হবে, তার

শতকরা ২১ ভাগ	পাবে	বোম্বাই
,, ১৭½	,,	মাদ্রাজ
,, ১৮	,,	উত্তর প্রদেশ
,, ১৩½	,,	পশ্চিম বাঙলা
,, ১২½	,,	বিহার
,, ৫½	,,	পাঞ্জাব
,, ৬	,,	মধ্যপ্রদেশ
,, ৩	,,	আসাম
,, ৩	,,	উড়িষ্যা

অর্থাৎ মজা হোল এই, পশ্চিম বাঙলা আকারে ছোট হয়েছে বলে তার প্রাপ্য কুড়ি ভাগের স্থলে হোল ১৩½ ভাগ, যদিও পশ্চিম বাঙলা থেকে সংগৃহীত আয়কর অবিভক্ত বাঙলার তুলনায় তেমন কিছু কমে নি। দেশমুখের রোয়েদাদের সঙ্গে আর একটা হিসাব দেখা উচিত। সেটা হোল এই যে, কোন্ প্রদেশ আয়কর হিসাবে ভারত সরকারের আয়কর কর্তার হাতে কত টাকা তুলে দিয়ে কত টাকা ফেরত পেয়েছে। বোঝবার সুবিধার জন্যে

ধরা যাক, প্রত্যেক প্রদেশই একশত করে টাকা দিয়েছে ভারত সরকারের আয়কর সংগ্রাহকের হাতে এবং তা থেকে ফেরত পেয়েছে

পশ্চিম বাঙলা মাত্র	২১	টাকা
বোম্বাই	২৪	„
পাঞ্জাব	৭১	„
আসাম	৮৪	„
মাদ্রাজ	৯৩	„
উত্তর প্রদেশ	১৭৮	„
মধ্যপ্রদেশ	২১৫	„
বিহার	৩২২	„
উড়িষ্যা	৬১৭	„

এই হিসাবে পরিষ্কার দেখা যায় যে, পশ্চিম বাঙলাই দেশমুখ রোয়েদাদে প্রায় ত্যজ্যপুত্রের আসনে এসে পৌঁচেছিল।

এছাড়া দেশমুখ রোয়েদাদে পাট উৎপাদক প্রদেশগুলোকে শতকরা হিসাবে কোন কিছু ফেরত না দিয়ে একটা থাউকো টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থায় ঠিক হয়েছিল

পশ্চিম বাঙলা	পাবে	বছরে	১ **কোটি** ৫ **লক্ষ টাকা**
আসাম	„	„	৪০ „ „
বিহার	„	„	৩৫ „ „
এবং উড়িষ্যা	„	„	৫ „ „

বাঙলা দেশের পক্ষ থেকে দেশমুখ রোয়েদাদের সঙ্গে পুরাতন নিমেয়ার রোয়েদাদের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, দেশমুখ রোয়েদাদে পশ্চিম বাঙলা এ বৎসর সর্বসাকুল্যে পেয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু নিমেয়ার রোয়েদাদ বলবৎ থাকলে সর্বসাকুল্যে পশ্চিম বাঙলার পাওনা হোত কমবেশি ২৪ কোটি টাকা।

দেশমুখ রোয়েদাদের পর পশ্চিম বাঙলা থেকে সরকারীভাবে দাবী করা হয় যে, পাট রপ্তানি বাবদ বাঙলার পাওয়া উচিত ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, কারণ অবিভক্ত বাঙলায় যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হোত, বিভক্ত বাঙলায় বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে প্রায় তার কাছাকাছি পরিমাণ পাটই তৈরি হচ্ছে এবং পাটের কলগুলো সমস্তই প্রায় পশ্চিম বাঙলায়।

দেশমুখ রোয়েদাদেও লোকে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতনভাবে টাকাকড়ির বিভাজন নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ভারত-সভাপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ নূতন একটি অর্থ-কমিশন গঠন করেন ১৯৫১ সালের শেষ-ভাগে। বাঙলাদেশ বরাবর নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে মনে করে বলেই বোধ হয় এই কমিশনের সভাপতি করা হয় বাঙালীকে। এই কমিশনের সভাপতি হলেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এবং তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন ৩০শে নভেম্বর ১৯৫১ সালে। নিমেয়ার সাহেব বিদেশী হয়েও যে রিপোর্ট সম্পূর্ণ নতুনভাবে গঠন করতে সময় নিয়েছিলেন সাড়ে তিন মাস, নিয়োগী মহাশয় সেই রিপোর্ট তৈরী করতে সময় নিলেন ১৩ মাস এবং তিনি তাঁর রিপোর্ট দাখিল করলেন ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে। এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখ ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিয়োগী রোয়েদাদকে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করা হউক বলে ভারত সরকারের পার্লামেণ্টের কাছে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনেই এই রোয়েদাদ ষোল আনা গৃহীত হবে বলেই মনে হয়। নিয়োগী কমিশনের রিপোর্টটা ছাপার অক্ষরে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার বইয়ের দোকানে এসে পৌঁচেছে।

নিয়োগী রোয়েদাদে পাঁচটি বিষয়ে নূতন পরিবর্তন হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। সেগুলি যথাক্রমে ঃ—

১। পূর্বের রোয়েদাদগুলিতে আয়কর বণ্টনের নিট পরিমাণ ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। নিয়োগী রোয়েদাদে সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে শতকরা ৫৫ ভাগ। অর্থাৎ নিট আয়-কর ১০০ টাকা হাতে এলে তা থেকে ৫৫ টাকা প্রদেশগুলিকে, না এখন আর প্রদেশ নেই, রাষ্ট্রগুলিকে ভাগ করে দেওয়া হবে। এই ভাগের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ দেওয়া হবে সেই রাষ্ট্র থেকে মোট কত টাকা আয়-কর হিসাবে আদায় হয়েছে, সেই ভিত্তিতে এবং শতকরা ৮০ ভাগ দেওয়া হবে ১৯৫১ সালের লোক-গণনা অনুসারে সেই রাষ্ট্রে কত লোক বাস করে, সেই সংখ্যার ভিত্তিতে।

২। পাট এবং পাটজাত পণ্যের শুল্কের কোন নির্ধারিত ভগ্নাংশ পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশকে না দিয়ে অধিক পরিমাণে বাৎসরিক দান দেওয়া হবে।

৩। তামাক, দেশলাই এবং বনস্পতির ওপর ভারত সরকারের প্রাপ্য নিট শুল্কের শতকরা ৪০ ভাগ রাষ্ট্রগুলিকে ভাগ করে দেওয়া হবে।

৪। কতকগুলো বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রকে আরও বাড়তি দান দেওয়া হবে।

৫। কতকগুলো অনুন্নত রাষ্ট্রকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু বাড়তি দান দেওয়া হবে।

মোটের ওপর নিয়োগী কমিশন
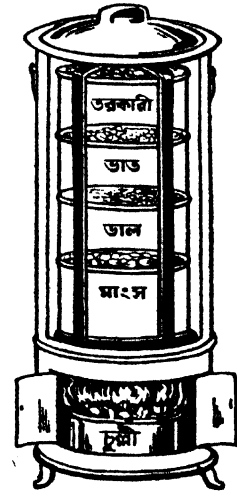
দেশমুখ রোয়েদাদের তুলনায় কিছু বেশি রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। দেশমুখ রোয়েদাদের হিসাবে এ বৎসর রাষ্ট্রগুলিকে দেয় টাকার মোট পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১২ লক্ষ, নিয়োগী রোয়েদাদে দেওয়ার কথা হয়েছে ৮৫ কোটি ৯৩ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ, মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বাড়ানো হয়েছে।

এর ফলে কোন্ রাষ্ট্র কি পরিমাণ পাবে, তা দেখা যাক ঃ—

যথা আয়-কর এবং তামাক ইত্যাদি শুল্কে বাবদ ৭ কোটি ৩০ লক্ষ, পাট বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং সাধারণ সাহায্য বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা। নিয়োগী রোয়েদাদে পাট বাবদ পাচ্ছে ঃ—

পশ্চিম বাঙলা— ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
আসাম — — ৭৫ লক্ষ টাকা
বিহার — — ৭৫ লক্ষ টাকা
উড়িষ্যা — — ১৫ লক্ষ টাকা

এ ছাড়া এই কমিশন স্বীকার করে নিয়েছে যে, পশ্চিম বাঙলা এবং পাঞ্জাবের পুনর্বসতি খরচ কেন্দ্রীয় সরকারই প্রধানত বহন করবেন এবং প্রদেশগুলির ওপর এজন্য তেমন বেশি চাপ দেওয়া হবে না।

কমিশনের মত যে এই রোয়েদাদ বর্তমান বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২—৫৩ থেকেই কার্যকরী করা হোক এবং এই ব্যবস্থা পাঁচ বছরের জন্য বলবৎ থাকুক অর্থাৎ ৩১শে মার্চ, ১৯৫৭ পর্যন্ত এই হিসাবে অর্থ বিভাজন চলুক।

মনে হয়, পার্লামেণ্টও বলবেন, তথাস্তু। তবে তাই হোক, 'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ'।

আপত্তি করার মত অনেক কিছুই রয়ে গেল, কিন্তু অর্থ-কমিশনের চেয়ার-ম্যান বাঙালী। দাঁতে দাঁত চেপে আমরা বলবো, বাঙালী যে প্রাদেশিকতা মনো-

রাষ্ট্র	নিয়োগী রোয়েদাদে প্রাপ্য		নিয়োগী রোয়েদাদে এই বৎসর কোন্ রাষ্ট্রের কত লক্ষ টাকা পাওয়া উচিত ঃ						
	বিভাজ্য আয়করের শতকরা অংশ	তামাক, দেশলাই ও বনস্পতি শুল্কের বিভাজ্য শতকরা অংশ	আয়কর এবং তামাক ইত্যাদির শুল্ক বাবদ	পাট বাবদ অনুদান	সাধারণ অনুদান	বিশেষ অনুদান	প্রাথমিক শিক্ষা সাহায্য	মোট	দেশমুখ রোয়েদাদে প্রাপ্য টাকা লক্ষের হিসাবে
আসাম	২·২৫	২·৬১	১৭০	৭৫	১০০	—	—	৩৪৫	২২১
বিহার	৯·৭৫	১১·৬	৭৩০	৭৫	—	—	৫০	৮৫৫	৬৫৫
বোম্বাই	১৭·৫	১০·৩৭	১১২৫	—	—	—	—	১১২৫	১১৬০
হায়দ্রাবাদ	৪·৫	৫·৩৯	৩৩৫	—	—	—	২৪	৩৫৯	১২৫
মধ্যভারত	১·৭৫	২·২৯	১৩৫	—	—	—	১১	১৪৬	৬
মধ্যপ্রদেশ	৫·২৫	৬·১৩	৩৯০	—	—	—	৩০	৪২০	৩৩৫
মাদ্রাজ	১৫·২৫	১৬·৪৪	১১১০	—	—	—	—	১১১০	৮৫৬
মহীশূর	২·২৫	২·৬২	১৭০	—	৪০	১৫৮(+)	—	৩৬৮	৩৪৫
উড়িষ্যা	৩·৫	৪·২২	২৬৫	১৫	৭৫	—	১৯	৩৭৪	২০১
পেপসু	·৭৫	১	৬০	—	—	—	৫	৬৫	১৬
পাঞ্জাব	৩·২৫	৩·৬৬	২৪০	—	১২৫	—	১৭	৩৮২	৩৪৩
রাজস্থান	৩·৫	৪·৪১	২৬৫	—	—	—	২৪	২৮৯	১০
সৌরাষ্ট্র	১	১·১৯	৭৫	—	৪০	১৮৭(+)	—	৩০২	২৭৫
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	২·৫	২·৬৮	১৮০	—	৪৫	৯৮(+)	—	৩২৩	৩২২
উত্তর প্রদেশ	১৫·৭৫	১৮·২৩	১১৭০	—	—	—	—	১১৭০	৮৮৮
পশ্চিমবঙ্গ	১১·২৫	৭·১৬	৭৩০	১৫০	৮০	—	—	৯৬০	৭৫৪
মোট ...	১০০	১০০	৭১৫০	৩৫০	৫০৫	৪৪৩(+)	১৮০	৮৫৯৩	৬৫১২

(যোগ চিহ্নিত সংখ্যার অর্থ পরে প্রাপ্তব্য)

এ ছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশের প্রাদেশিক-সরকারগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, ১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে তারা তামাকের ওপর স্বতন্ত্র প্রাদেশিক কর দরকারমত বসাতে পারবে।

এ বছরের হিসাবে পশ্চিম বাঙলা এই যে ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাচ্ছে, এই পাওনাটা তার হয়েছে তিন দফায়।

বৃত্তিসম্পন্ন নয়, তার আর একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই নিয়োগী রোয়েদাদ। আমাদের মন্ত্রীরা এই বিভাজন মেনে নিয়ে বাঙালীদের বোধ হয় আর একবার নীতিবাক্যে উপদেশ দেবেন, 'Earn more, pay more, take less, eat nothing.'

হায়দরাবাদ-ইলোরা-অজন্তা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাবো ঠিক করলাম। সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ, সুতরাং একা যাওয়া চলবে না। পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীরাও সঙ্গ নিলেন। নাগপুর হয়ে যাবো; ওখানে একঘর কুটুম্ব আছেন। ১৯৫১ খৃীষ্টাব্দের ২২শে মে সন্ধ্যার পর বম্বে-মেলে রওনা হলাম। ভিড় প্রচণ্ড, কিন্তু আমাদের ভ্রমণের আগ্রহ প্রচণ্ডতর। কাজেই সকল অসুবিধা নীরবে সইলাম। পরদিন বিকেল পাঁচটায় পেঁাছলাম নাগপুর।

দু'দিন কাটালাম কুটুম্ববাড়ী—শহরের এক অংশে, সীতাবল্দিতে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সরকারী বাগান, বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেশনের কাছাকাছি পাহাড়ের উপর শিবাজীর দুর্গ, শহরের শৌখীন-পাড়া, ডাক্তার খারের বাড়ি। শুনলাম, ডাক্তারজী সামান্য ভিজিটেই রোগী দেখেন এবং যত্ন করে দেখেন।

২৫শে মে সন্ধ্যায় নাগপুর থেকে রওনা হলাম হায়দরাবাদ অভিমুখে। আবার সেই ভিড়ের সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ, না সংঘাত? দিল্লী থেকে বোঝাই হ'য়ে এসেছে গাড়ী। ঠেলাঠেলি ক'রে ওঠা গেল। রাত্রিবেলায় কোথা দিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন চ'লে যেতে লাগলো। দু'টো একটা নাম মধ্যে মধ্যে কানে এলো। শুনলাম কাজীপেট, ওয়ার্ধা। হায়দরাবাদ নামপল্লী স্টেশনে পেঁাছলাম সকাল সাড়ে সাতটায়। সাইক্ল্-রিক্শায় ক'রে পেঁাছলাম আমাদের উদ্দিষ্ট গৃহে হনুমান টেক্‌রিতে। পথে সরকারী শুল্ক বিভাগের অফিসে জিনিসপত্র পরীক্ষা হ'ল।
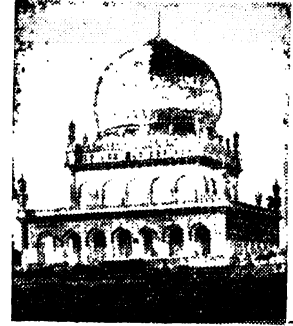
হায়দরাবাদ ও গোলকুণ্ডার প্রতিষ্ঠাতা কুতুবশাহের স্মৃতিসৌধ

সুন্দর একতলা বাড়ী, সামনে বাঁধানো উঠান, বাইরে কয়েকটি ফুলের গাছ। গৃহস্বামী স্থানীয় লোকদের কাছে সুপরিচিত। তাঁরই উদ্‌যোগে হায়দরাবাদে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হয়।

হায়দরাবাদের ব্যবসাকেন্দ্র আফজালগঞ্জের রাস্তা
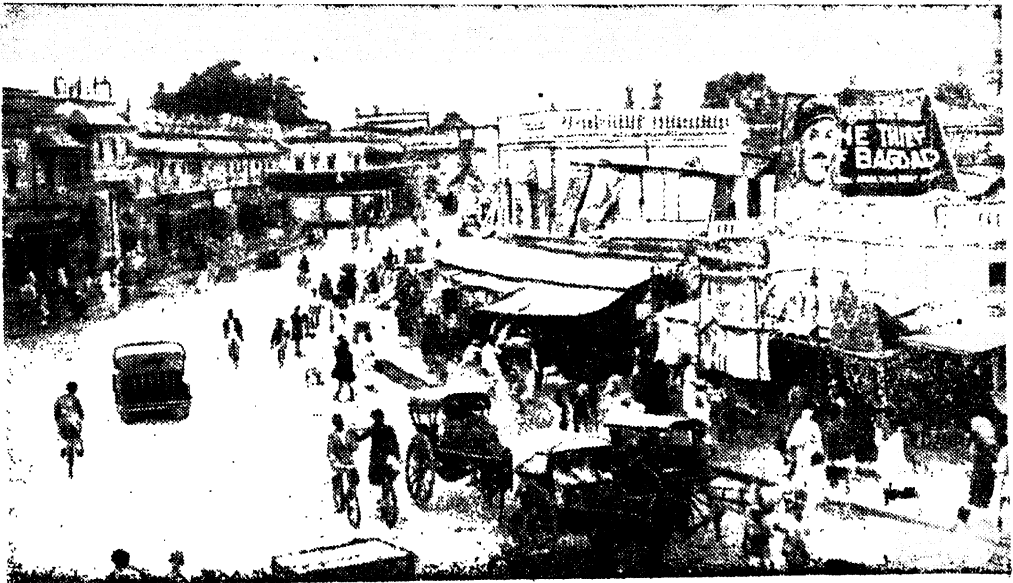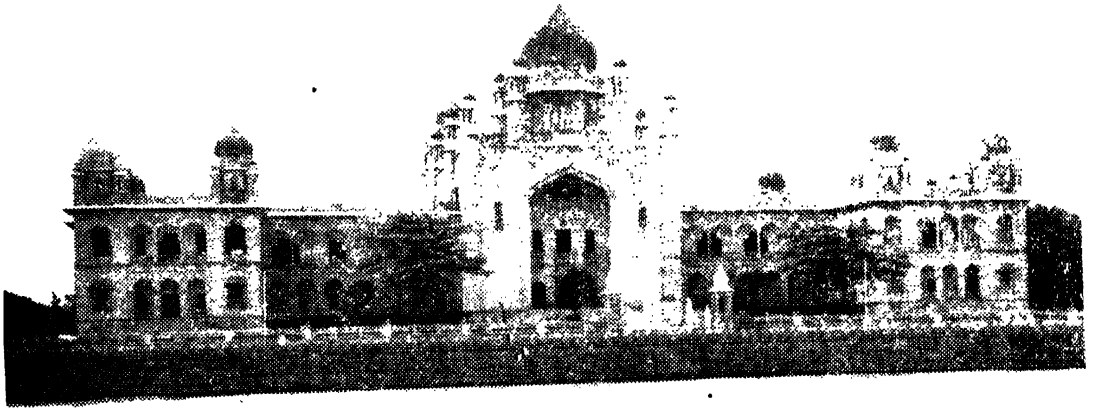
হায়দরাবাদ হাইকোর্ট: ইসলাম স্থাপত্য অনুসরণে আধুনিক গৃহ

২

কয়েকদিন থাকবো হায়দরাবাদে। কোথাও অপরিচ্ছন্ন ছোট খাটো গলিঘুঁজি নেই এমন নয়, কিন্তু মোটের উপর শহরটি পরিচ্ছন্ন। বড় রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধানো—ঝকঝকে তকতকে। বিভিন্ন পথে বাস্ আনাগোনা করছে। সেগুলি সুদৃশ্য এবং তার যাত্রিসংখ্যা নির্দিষ্ট। স্থানে স্থানে ট্যাক্সি, অটো রিক্'শ', সাইক্‌ল্ রিক্'শ' দাঁড়িয়ে। দু'ধারে সুসজ্জিত দোকানপাট। পাহাড়ে দেশ'বলে রাস্তা কোথাও কোথাও উঁচুনীচু।

রাত্রিবেলায় শহরের রূপ আরও খুলে যায়। পথের মোড়ে মোড়ে বড় বড় ডুম্-দেওয়া চা'র পাঁচটি ক'রে আলো এক সঙ্গে, এক এক শাখায় যেন কয়েকটি ক'রে ফল ঝুলে আছে।

সেকেন্দ্রাবাদের দিকে যেতে বাড়ীঘর আরও ফাঁকা ফাঁকা, ঝকঝকে দোকান, রেস্তরাঁ, কাফে। পথে হুসেন সাগর নামে হ্রদ, তার উপরে সেতু। পাশে রেলিঙের ধারে বেঞ্চি রয়েছে, ব'সে জলের শোভা উপভোগ করা যায়। নীচে কালো জল বাতাসে ছল ছল করছে, একখানি লঞ্চে আলো জ্বলছে, লঞ্চখানিতে নৌবিহার-বিলাসীদের আড্ডা। সেতুর উপর থেকে হুসেন সাগরের ওপারে দেখা যায় দূর পাহাড়ের উপর স্তরে স্তরে আলোকমালা। আমাদের সঙ্গী তাঁর মোটর গাড়ীতে ক'রে সেকেন্দ্রাবাদ হ'য়ে ঐদিকটাও ঘুরিয়ে আনলেন। সেখানে বান্‌জার পাহাড়ের উপর সুন্দর সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ী। ওটা ধনী শৌখীন লোকদের মহল্লা। চার পাঁচটি বাতিওয়ালা পথের আলোগুলি জ্বলছে। মনে হ'ল স্বপ্নপুরী, রূপকথার দেশ। ফিরে আসবার মুখে দেখলাম কবি সরোজিনী নাইডুর বাড়ী। খুব বড় মনে হ'লো না, কিন্তু গাছপালায় ঘেরা, মনোরম।

৩

সকালবেলা সরকারী বাগান দেখতে বেরুলাম। বাগান এবং চিড়িয়াখানা এক সঙ্গে। ভারী সুন্দর। চিড়িয়াখানায় দেখলাম—হরিণ, হাতী, বাঘ, অনেক জন্তুজানোয়ার আর নানারকমের পাখী। বেশ যত্ন ক'রেই সব রাখা হয়েছে। বাগানের মাঝে দু'টি সুসজ্জিত গৃহ। একটি প্রবেশদ্বারের কাছে, শাদাসিধে একতলা, দ্বিতীয়টি দূরে উঁচু গম্বুজ-ওয়ালা, বোধহয়, তিনতলা।

ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনে এসেছি। এবারে কৌতূহল মেটাবার সুযোগ মিল্‌লো। বিরাট্ বাদ্‌শাহী প্রাসাদ। ঝক্‌ঝক করছে মার্বেলের মেঝে। নানা স্থানে নানারকম কারুকার্য।

ছাত্রাবাসও সুদৃশ্য। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কিছু দূরে অধ্যাপকদের বাস-ভবন। প্রত্যেকের বাগানওয়ালা স্বতন্ত্র এক-একটি বাড়ী। শুনলাম, দু' একজন অধ্যাপক গবেষণায় বিশেষ আগ্রহশীল। কাগজে পড়েছিলাম, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষা পর্যন্ত উর্দুই শিক্ষার বাহন। অর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ

থেকে অনুবাদের কাজ সজোরে চল্‌ছে। অনুবাদ সব সময়ে সুবোধ্য বা সুপাঠ্য না হ'লেও এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ এবং মিশনারী কয়েকটি স্কুল কলেজ আছে। যে-ক'টি দেখলাম, সব-ক'টিই পরিচ্ছন্ন মনে হ'লো।

বিকেলে গেলাম চা'র-মিনার দেখতে। বাসে নামলাম মুসা-নদীর ধারে। নদীর উপর সুন্দর সেতু। সন্ধ্যা হ'তেই আলোকমালা জ্বলে উঠলো। সেতু পার হ'য়ে দু'দিকের দোকানপাট দেখতে দেখতে চল্‌লাম। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, এক চৌরাস্তার উপর চারটি মিনারওয়ালা বিশাল বেদী অথবা প্রাচীরহীন গৃহ। বেদীর উপর সশস্ত্র প্রহরীদল এবং প্রকাণ্ড কতকগুলি জলের জালা রয়েছে। সব গাড়ী চার-মিনারের পাশ কাটিয়ে ঘুরে যায়।

ফেরবার পথে দেখে এলাম সরকারী হাসপাতাল, হাইকোর্ট, সিটি কলেজ প্রভৃতি। হাসপাতালের সীমানা বিরাট, বাড়ীগুলি প্রকাণ্ড, চিকিৎসার ব্যবস্থাও শুনলাম ভালো। তা ছাড়া, হাকিমী মতে চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল আছে।

৪

হায়দরাবাদ বিভিন্ন লোকের দেশ। স্থানীয় অধিবাসী অনেকের ভাষা তেলেগু, কারও কারও হিন্দী অথবা মারাঠী, সরকারী ভাষা উর্দু। নিজাম-বাহাদুর মুসলমান, প্রজারা অধিকাংশ হিন্দু। রাজাকার-উৎপাতের পূর্ব পর্যন্ত রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দেয়নি।

ভারতীয় মুদ্রা নিজাম রাজ্যে চলে, কিন্তু ওখানকার পৃথক্ মুদ্রাও আছে। বিনিময়ে নিজামী মুদ্রা বেশী পাওয়া যায়।

নিজাম-প্রাসাদ সাধারণের পক্ষে অবরুদ্ধ। চারদিকে উঁচু পাঁচিল, গাছ-পালায় আড়াল-করা। কল্পনা-কপোত ওড়ানো ছাড়া কৌতূহল-নিবৃত্তির আর কোনও পথ পেলাম না।

সাধারণ হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী-দের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য ও সদ্ভাবই দেখলাম। নিজাম-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন এবং অনেক পড়াশুনা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের কতকগুলি লেখা সম্বন্ধে আমি সন্ধান দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা।
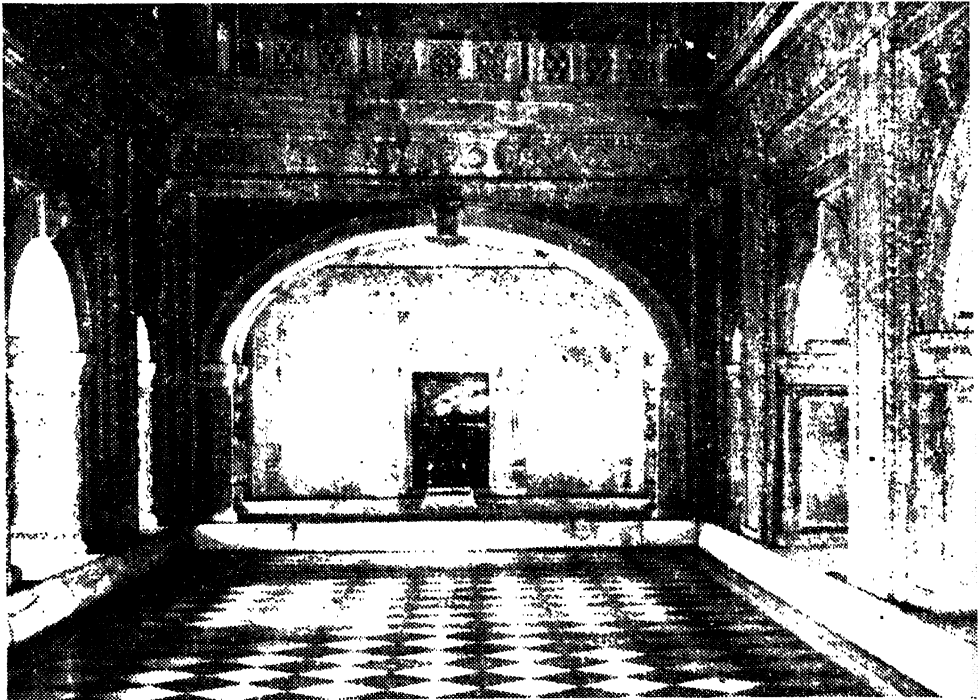
বিদরে রঙীন মহলের অভ্যন্তর

অজন্তার একটি গুহার বহির্দৃশ্য

স্থানীয় ওয়াই-এম্-সি-এতে গেলাম। তত্ত্বাবধানকারী এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী বাঙালী। তাঁরা সযত্নে মিষ্টি-মুখ করালেন।

৫

হায়দরাবাদ যাবার সময়েই সংকল্প ক'রে গিয়েছিলাম, অজন্তা-ইলোরা দেখে আসবো।

শহরের অন্তর্গত কাচিগুড়া স্টেশন থেকে বিকেলে রওনা হ'লাম ঔরঙ্গাবাদের পথে। দূরত্ব তিন শ' কুড়ি মাইল। ট্রেন ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে মাথাপিছু দশ টাকা। কোন কামরাতেই আরামে বসবার মত জায়গা নেই। কণ্টেসৃষ্টে একটু স্থান ক'রে নেওয়া গেল। সকালবেলায় পৌঁছলাম ঔরঙ্গাবাদ। রেলওয়ে হোটেলে থাকবার পরামর্শ অনেকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এক অবাঙালী বন্ধুর উপদেশ মত উঠলাম গিয়ে এক গুজরাটী হোটেলে। স্টেশন থেকে টাঙায় সওয়ারী-প্রতি আট আনা ক'রে পড়লো। হোটেলটি দোতলা, মাটির দেয়াল, 'থকথক কাশি দিলে ঠকঠক নড়ে।'। ভাড়া দিনে জন প্রতি সাড়ে চা'র টাকা। খাওয়া দাওয়া নিরামিষ, তবে পরিচ্ছন্ন, মন্দ লাগলো না।

ট্যাক্সি ফুরন ক'রে নিলাম। প্রথম দিনে দেখবো দৌলতাবাদ দুর্গ, ইলোরা, বিবি-কা-মখ্‌বরা; তিনটিই ঔরঙ্গাবাদের কাছাকাছি। দ্বিতীয় দিনে অজন্তা। মোট দিতে হবে এক শ' টাকা। শুনলাম, দৌলতাবাদই প্রাচীন দেবগিরি। মহম্মদ তুঘলকের স্মৃতি জড়িত আছে এর সঙ্গে। সামনের দিকে কিছু হিন্দু ভাস্কর্যের চিহ্ন চোখে পড়লো। একটি কামানের উপরে আমরা গিয়ে বসলাম, তার নাম মেঢ়াতোপ অর্থাৎ মেষাকৃতি কামান।

আবার উপরদিকে এগোতে লাগলাম। একটি সেতু, নীচের জল সবুজ হয়ে উঠেছে। মহলের পর মহল। এক জায়গায় এসে পথপ্রদর্শক মশাল জেলে নিলো। অন্ধকার গুপ্তপথ দিয়ে নিয়ে গেল আমাদের। প্রাচীনকালের ষড়যন্ত্র, পলায়ন, হত্যা প্রভৃতির কথা মনে পড়তে লাগলো। যখন পাহাড়চূড়ায় দুর্গশীর্ষে পৌঁছলাম, তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবু উপর থেকে চারদিকের দৃশ্য, দূরে দূরে ঢেউ-খেলানো পাহাড়—পশ্চিমঘাট পর্বতমালা—দেখতে বেশ লাগলো।

৬

ইলোরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। কিন্তু চোখে না দেখলে তার সৌন্দর্য অন্তরে অনুভব করতে পারতাম না। দূর থেকে দেখলাম, পাহাড়ের সারি, মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট প্রবেশদ্বার; দ্বারও নয়, যেন গুহামুখ। কাছে গিয়ে দেখি, পাহাড় কেটে শিল্পীরা মন্দিরের পর মন্দির রচনা ক'রে গেছেন। কোনটি একতলা, কোনটি দোতলা, উপরে ওঠবার সিঁড়িও আছে। মন্দিরের ছাদ পাহাড়ের উপরিভাগ। ভিতরে অসংখ্য কারুকার্য। স্তম্ভে, খিলানে, বেদীতে শিল্পনৈপুণ্যের অজস্র পরিচয়। মোটের উপর চৌত্রিশটি গুহামন্দির। যতদূর মনে পড়ে, পঞ্চদশ মন্দির থেকে হিন্দু রূপকল্পনার নিদর্শন দেখেছিলাম। তার পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পকীর্তি। চারিদিকে পূজোর আবহাওয়া। পাষাণের গায়ে খোদিত পূজাদৃশ্য; কোন নারী শঙ্খে ফুঁ দিচ্ছে,

কারও হাতে আরতি প্রদীপ, কারও হাতে ফুলের মালা।

পঞ্চম প্রকোষ্ঠটি বিরাট্। প্রবেশদ্বার থেকে বেদী পর্যন্ত কক্ষতল কয়েকটি পংক্তিতে বিভক্ত। মাঝখানের পথ বা পংক্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। কল্পনা নেত্রে যেন দেখতে পেলাম, কোনও পংক্তিপথে চলেছেন পীতবসন সন্ন্যাসীদল মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, কোনও পংক্তি ধ'রে অগ্রসর হচ্ছেন শুচিস্নাতা পূজারিণী দল ধূপদীপ নৈবেদ্য বহন ক'রে, কোনও পথে এগিয়ে যাচ্ছেন দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ। হয়তো আসছেন রাজা, রাণী, রাজপুরনারীদল। ঘণ্টাধ্বনিতে, পূজামন্ত্রে মুখরিত হ'তো চতুর্দিক্। বৌদ্ধযুগের সে বিপুল কর্মচেতনা আজ ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্র।

পঞ্চদশ প্রকোষ্ঠে বহু হিন্দু দেবদেবী মূর্তি। নটরাজের এবং একটি ধনুর্ধারী বীরের মূর্তি অত্যন্ত ভালো লাগলো। মুহূর্তে বিস্মিত হ'লাম পরবর্তী মন্দিরের সামনে গিয়ে। এর নাম কৈলাসমন্দির। পাহাড়ের মধ্যে কক্ষরচনা নয়, মূল পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকেই পৃথক্ মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। সু-উচ্চ, সুদৃশ্য মন্দির-চূড়া। আর শুধু মন্দির নয়, চতুঃপার্শ্বে মূর্তিমালা শোভিত উন্মুক্ত বিরাট্ প্রাঙ্গণ। দেবলোক, না স্বপ্নলোক? কত সাধকের কত সাধনা ও শ্রম কতকাল ধ'রে সৃষ্টি করেছিল এই রূপ? অতিব্যস্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত বর্তমান যুগের মানুষ এর কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ায়; আর-এক যুগের ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধের কাছে জানায় তার মুগ্ধ প্রণাম।

ইলোরা থেকে গেলাম বিবি-কা-মখ্‌বরায়। ঔরঙ্গজেব তাঁর মহিষীর স্মৃতিমন্দির রচনা ক'রেছিলেন তাজ-মহলের অনুকরণে। অনুকরণ যতদূর সম্ভব যথাযথ, তফাৎ যা তা আসলে আর নকলে। আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও সৌন্দর্যে এ সমাধি তাজের কাছাকাছি যেতে পারেনি।

ঔরঙ্গজেবের গুরুর কবরও রয়েছে কাছেই। আর আছে পানচাক্কি, নদীর জলস্রোতের সাহায্যে গমপেষার ব্যবস্থা
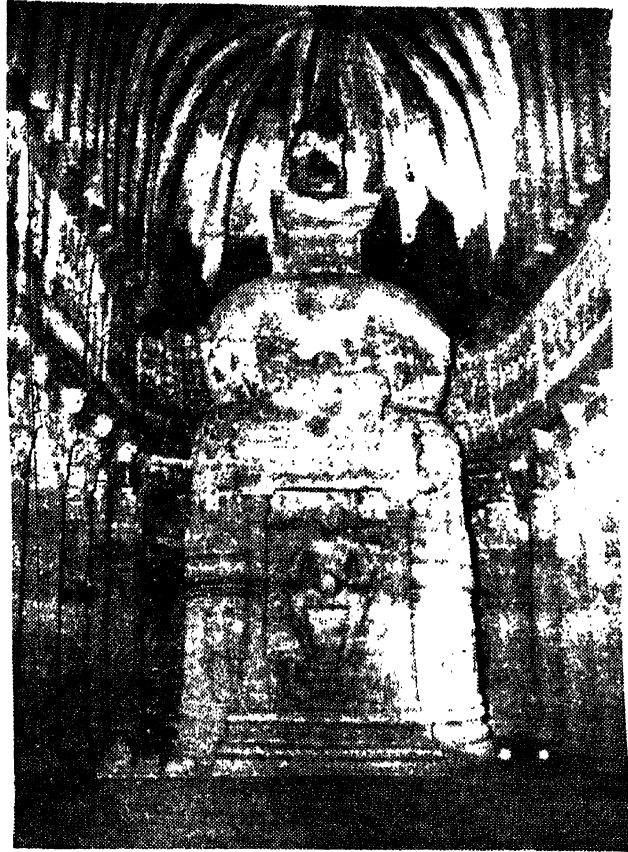
অজন্তার গুহাভ্যন্তরের বুদ্ধ স্তূপ

আছে সেখানে, সম্ভবত মোগল আমল থেকেই। সরোবরে মাছের খেলা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। মন ইতিহাসের ছায়ায় বিচরণ করলো কিছুক্ষণ। বৌদ্ধ, জৈন, পৌরাণিক, পাঠান, মোগল—বিভিন্ন যুগের ছবি ভেসে বেড়াতে লাগলো কল্পনায়।

৭

পরদিন অজন্তা। খুব ভোরে চা খেয়ে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে ক'রে রওনা হলাম। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা গ্রাম ৫৮ মাইল। গুহামন্দির সেখান থেকে আরও প্রায় ৭ মাইল।

অজন্তার স্থানীয় নাম 'অজিণ্টা'। অনেকের মতে শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'অজিন' থেকে। অজিনধারী সন্ন্যাসীদের বাসস্থান ছিল বলে গ্রামের এই নাম।

ভোরের বাতাসে গ্রাম্য পথ দিয়ে মোটরগাড়িতে চড়ে ছুটে যেতে বেশ লাগলো। এক জায়গায় আম বিক্রী হচ্ছিল, সস্তায় কিছু কিনে নিলাম। কিছুদূর যাবার পর দেখতে পেলাম দূরে ছোট্ট একটি সেতু। কাছে গিয়ে পার হলাম। নীচে বাঘর নদী। এখন প্রায়

এলোরার কৈলাস মন্দিরে নৃত্যরত নটরাজ

শুকনো। পাহাড়ী পথ এ'কে বে'কে ঘুরে ঘুরে উ'চুতে উঠেছে। মন্দির-গুহার কাছে গিয়ে পেণছলাম বেলা প্রায় দশটায়। ভিতরে ঢোকবার অনুমতি মিলবে সাড়ে দশটায়, বাইরে তার বিজ্ঞপ্তি রয়েছে।

এই অবকাশে কিঞ্চিৎ খেয়ে নেওয়া গেল। অতঃপর সি'ড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। এখানেও মন্দির-শীর্ষ শুধু স্বাভাবিক পাহাড়। কারুকার্য যা কিছু সব নীচে। ইলোরায় দেখেছি স্থাপত্য আর ভাস্কর্য, এখানে তার সঙ্গে রয়েছে চিত্রকলা।

সরকারী অনুমতিপত্র পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করে এনেছিলাম, প্রবেশে অসুবিধা হল না। এখানে মোট ২৯টি গুহা-মন্দির; তন্মধ্যে ২৬টি দেখবার মত অবস্থায় আছে। কোন্ কোনটি অসম্পূর্ণ। পাহাড়ের এই অংশ ধনুকের মত বাঁকা। তাই মন্দিরশ্রেণী অর্ধ-চন্দ্রাকারে সজ্জিত। স্থান-নির্বাচন, পরিকল্পনা, মণ্ডন সকল ব্যাপারেই শিল্পী-মনের ও সতর্কদৃষ্টির প্রমাণ রয়েছে। মনোরম শান্ত পরিবেশ। কাছাকাছি ঝর্ণা ছিল, সেখান থেকে সন্ন্যাসীরা সহজে জল সংগ্রহ করতে পারতেন। মন্দিরের দ্বার ও বেদীর এমনি অবস্থান, ভোর হলেই সূর্যের আলো গিয়ে বুদ্ধমূর্তির মুখের উপর পড়ে। সন্ন্যাসীদের পাথরের খাট, কতকটা কৌচের মত, দেয়ালের সঙ্গেই পাথর কেটে তৈরী; শিয়রের দিকে বালিশের আকারে পাথর উ'চু করে কাটা। এখানকার সবই বৌদ্ধদের শিল্পকীর্তি। কোনও গুহাকক্ষ বিহার বা মন্দির, আর কোনটি চৈত্য বা ভস্মাধার, সেখানে মূর্তি নেই, বেদীমধ্যে দেহাবশেষ মাত্র রক্ষিত হয়েছে।

ভাস্কর্যে চিত্রে এই অফুরন্ত রূপের প্রবাহ আনে দৃষ্টির বিভ্রম। ইলোরার মূর্তি সজীব, বিচিত্র এবং বিশাল, কিন্তু এর গুহায় গুহায় যে অপূর্ব অলংকরণ, তার তুলনা নেই।

ইলেকট্রিক আলো ধরে সমস্ত কারু-কার্য দেখাবে গাইড্। আলোর জন্যে দিতে হলো পাঁচ টাকা, আর গাইডকে দিলাম এক টাকা।

প্রথম গুহা। সুন্দর বুদ্ধমূর্তি। একদিক থেকে দেখলে মনে হয় মুখখানি প্রশান্ত গম্ভীর, অন্য দিক থেকে দেখলে মনে হয় মধুর হাস্যময়। স্তম্ভমালা কারুকার্যশোভিত। নীচের দিকে প্রস্তর-ফলকে এক একটি মনুষ্যমূর্তি। উপরে নাগবেষ্টন মধ্যে বুদ্ধদেব। কোথাও বা বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী শূন্যপথে উড়ে চলেছে। একটি মাথার সঙ্গে যুক্ত চারিটি হরিণের দেহ অদ্ভুত কৌশলে আঁকা।

দ্বিতীয় গুহায় দরজার কাছে প্রাচীর গাত্রে রাজা শুদ্ধোদন, পার্শ্বে শিশুবুদ্ধকে কোলে করে মাতা গোতমী।

সপ্তম গুহায় নানা ভংগীতে বুদ্ধ-দেবের ৬৫টি মূর্তি উৎকীর্ণ। অধিকাংশই পদ্মাসীন। পদ্মের কি অপরূপ শোভা ফুটেছে পাষাণেও। তার পাপড়ি, তার মৃণাল, কোথাও কোন খুঁত নেই।

ষোড়শ গুহায় জাতকের বহু চিত্র। বস্তুত অজন্তার প্রায় সব ছবিরই বিষয় জাতক থেকে নেওয়া। মনে হয়, সম-সাময়িক জীবনের অনেক আভাস পাই কোন কোন ছবিতে। একটি ছবিতে দেখলাম হাফ প্যাণ্ট-পরা পুরুষ মূর্তি হয়তো সে যুগের কোনও বিদেশী আগন্তুক। আর একটিতে, ফোল্ডিং টেবিলের উপরে আয়না রেখে প্রসাধনে মন দিয়েছে নারী। অন্যত্র, প্রহরীর কাছে বাধা পেয়ে এক রাজদর্শনপ্রার্থী ফিরে চলেছে বিষণ্ণ মুখে; আবার ভিন্ন পথে প্রবেশ ক'রে সে লাভ করেছে রাজানুগ্রহ, মুখে তার প্রসন্নতার আভা।

নরনারীর দেহের গড়নে, মুখ-চোখের ভাবভংগীতে যেন প্রাণের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। লোকমুখে শুনি, প্রাচ্যচিত্রের নাকি আংগিক আলাদা; তাতে দেহের সৌষম্য, অবয়বের সুমিতি নাকি গৌণ ব্যাপার। কিন্তু অজন্তার ছবিতে তো অস্বাভাবিকতা বা অসংগতির কোনও চিহ্ন চোখে পড়লো না।

অজন্তা গুহায় দেয়ালে চিত্রিত প্রসাধনরতা সুন্দরী রমণী

এই দু'হাজার আড়াই হাজার বছর রে ছবিগুলি রঙের উজ্জ্বলতা নিয়ে কৈ রইলো কি করে? পাথরের গায়ে কিসের প্রলেপ জমিয়ে কি রং দিয়ে শিল্পীরা এ'কেছিলেন কে জানে?

মন্ত্রমুগ্ধের মত গুহা থেকে গুহান্তরে প্রবেশ করতে লাগলাম। ভিতরদিকের ছাদে এত রূপের আসর সাজালেন কি ক'রে সেদিনের রূপকার? মাপজোখেও তো বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। কি ক'রে আঁকলেন অত উ'চুতে? ছবির ভঙ্গী দেখে মনে হয় দাঁড়িয়ে বা বসে' ও ধরণের ছবি আঁকা সম্ভব নয়, আঁকতে হয়েছে শুয়ে; অথচ তাও কি সম্ভব? কিসের উপর শুয়ে? তুলি ঠিক রাখলেন কি করে?

পুরাকালের জীবনযাত্রার যেটুকু নিদর্শন পেলাম, তাকেই অবলম্বন করে মনে মনে এ'কে গেলাম অনেক ছবি—সেদিনের ভোগবিলাস ঐশ্বর্য, প্রেম ও ধর্ম, সাধনা ও কল্পনা। আমাদেরই মত নরনারীর মনে কত না সাধ, কত না বাসনা! শুধু মনে হয়, তখনকার দেশবাসী ছিল প্রাণশক্তিতে উচ্ছল। ভোগে ও ত্যাগে চলেছে তাদের জীবন-উৎসব। ফেরবার পথে গাড়ি বিগড়ে গেল। একটি ক্ষীণ নদীধারার পাশে কলসী-কাঁখে জল আনতে গিয়েছিল কয়েকটি মেয়ে, তারা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলো।

গ্রামের ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো গাড়ি মেরামত। বহু পরিশ্রমের ফলে গাড়ি আবার চললো। হোটেলে এসে পে'ৗছলাম সন্ধ্যার পর। রাত ১০টা ৫৩'তে ট্রেন। দূরযাত্রীদের কামরায় উঠতে গেলাম। কেন জানি না চেকার পথ আগলে রইলেন। তর্কবিতর্ক নিষ্ফল হলো। অগত্যা ঠেলেঠুলে অন্য গাড়িতে উঠে পড়ি পড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম বহুক্ষণ। রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত অবসন্ন দেহে হায়দরাবাদ পে'ৗছলাম পরদিন দুপুরবেলা।

কয়েকদিন বিশ্রাম করে কলকাতায় ফিরলাম বেজওয়াড়ার পথে-মাদ্রাজ মেলে।*

---

* রমণী চিত্র ব্যতীত অন্যান্য ফটো শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ কর্তৃক গৃহীত

মানবপুত্র

বিমল কর

শালবনীর মেলায় আবার দেখা।

ডাক শুনে মুখ ফেরাতেই কে যেন খপ্ করে হাত ধরে ফেললো কেষ্টর। কার্বাইটের মরা জ্যোৎস্নায় সে মুখের দিকের তাকিয়ে কেষ্ট অবাক। ঠিক ঠাওর হয় না। এ কে? কাঁচপোকার টিপ কপালে, চোখে কাজল, পরণে রঙীন শাড়ি! সাজনী নয় তো? সাজনীর কথা মনে হতেই গায়ে-কাঁটা কেষ্ট দাঁড়িয়ে থাকে, চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নেবার।

হাত ছাড়ে না টিপ্-কপালী। কাজল-চোখ আরও ডাগর করে, কথার সুরে টান দিয়ে বলে, 'ভাবছিস কি? লারছিস ঠাওরাতে? আমি রে, আমি—কিষ্টো, গঙ্গামণি।'

নামের চেন্নায় নিমেষে মনে পড়লো গঙ্গামণিকে। কিন্তু ঠিক চেনা গেল না।

মেলার বাইরে এসে, কার্বাইটের আলোমোছা, কার্তিক-পূর্ণিমার কুয়াশা ভেজা জ্যোৎস্নায় গঙ্গামণিকে নিষ্পলক নয়নে দেখতে থাকলো কেষ্ট।

হঠাৎ বুঝি খেয়াল হলো গঙ্গামণির, কেষ্ট তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। খেয়াল হতেই সোজাসুজি চোখ তুলে তাকালো গঙ্গামণি। বললে, 'রাকাড়ছিস না যে—? চিনতে লারলি?'

কেষ্ট তবু চুপ। একটু পরে বললে, —তুই হেথায় ক্যানে?

'বিটিছেলা আমি, জুয়া চালতে আঁসি নাই। মানসিক দিব যে তাও লয়। পয়সা কুথায় রে কিষ্টো, ফুটো কড়িও সাথে নাই।' একটু থামে গঙ্গামণি। ঠাণ্ডা হাওয়ার কাঁপুনী লেগেছে। শাড়ির আঁচলটা আরও ঘন করে গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'সাধ ত কতো লয় মনে, পূজোথানে আজ মানসিক দিয়ে পেরথনা করি— রাত পোয়ালে ভাতে পাতে হয় ঠাকুর গো, আর কিছু লয়।' গঙ্গামণি কথার শেষে হঠাৎ থামলো, দীর্ঘ করুণ একটা টান দিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

কেষ্ট তাঁকালো। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গঙ্গামণি চোখের কাজল, কপালের টিপ বুঝি ধুয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কৃশ-করুণ কতকগুলো রেখা কুঞ্চিত শীর্ণ অস্থিসর্বস্ব একটি মুখকে ফুটিয়ে তুলছে, সেই আলোয়, সেই হাওয়ায়।

গঙ্গামণি গলার সুর আরও করুণ করে আবার বললে, 'বুঝে দ্যাখ্ ক্যানে রে—চাঁপার ঠেঙে সাজ নিলাম, শাড়ি নিলাম হাতে পায়ে ধরে।' গঙ্গামণি আঁচলে বাঁধা শাল-পাতার মোড়ক খুলে ধরলো, 'মাথা কুটে তার ঠেঙে পানও লিয়েছি দশ খিলি—দশ গণ্ডা পয়সা দিতে হবে কাল সুয্যি ওঠার মুখে-মুখেই।—কিন্তুক এক খিলি পান লিলে না কোনো হতভাগা।' গঙ্গা-মণির সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠলো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় না উত্তেজনায় কে জানে। কথাটাও ও শেষ করলো ঠিক মিনমিনে সুরে নয় বরং তিক্ত কর্কশ ভাবেই।

শালপাতায় মোড়া পানের খিলির দিকে বোকার মত চেয়ে থাকলো কেষ্ট। একেবারেই বোবা হয়ে।

অনেকক্ষণ পরে কেষ্ট জানতে চাইলো,

—থাকিস কুথায় আজকাল?

—ভাগাড়ে। তিক্ত সুরেই জবাব দিলে গঙ্গামণি, 'কপাল বটেক আমার, পাট-রাণীর কপাল রে কিষ্টো—আজ হেথায় কাল হোথায়, কেউ দিলেক শুতে তো ঢাকায় শুলাম, না দিলেক তো নালায়। শেয়াল কুকুরের পারা দিন কাটাই।'

গঙ্গামণি থামলো। বিকৃত সুর ও মুখকে আরও বিকৃত, তিক্ত করে তুলেছে।

কেষ্ট চুপ। মনে মনে তার অনে[ক] কথাই জমছে আস্তে আস্তে। গঙ্গামণি[র] চেনা রূপটাও সেই সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হ[য়ে] উঠছে তার কাছে।

কেষ্টর শীত করছিলো। পা পা ক[রে] সে মেলার দিকে আবার এগুতে লাগলো। গঙ্গামণিও।

মেলার প্রায় কাছাকাছি এসে গঙ্গাম[ণি] প্রশ্ন করলে,—এদিক পানে যাস কুথায়

—ঠাণ্ডা লাগে বড়। উই যে কো[ন] চায়ের দোকান দিয়েছে শেতল-দ[া] খুরি গরম চা খেয়ে লি উ[ই] দোকানে।

—মন্দ লয়! গঙ্গামণিও চা খাব[ার] লোভে আনমনা হয়ে উঠলো। বল[লে] তুই ক্যানে চায়ের দোকান দিলি ন[া] কিষ্টো? দু পয়সা তুর আসতো।'

সে কথার কোন জবাব দিলো ন[া] কেষ্ট।

দোকানের বাইরে, একটু তফা[তে] চায়ের খুরিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে গঙ্গামণি[র] লোভ বাড়লো আরও। বললে, 'ব[াড়ি] নাকি রে, কিষ্টো—তুর ই চা-পানি[তে] পেটের জ্বলনটা আগুন ধরাই দিলেক[।]' একটু থেমে আবার, 'বুঝ্ ক্যানে, চা[র] বেলা পেটে ভাত লাই। সে তুর [কু]' সকালে দুটো ফুলারু খেলাম, সন্ধ্যে[য়] খিদায় পেট দুমড়ায়, তিতা জল ক[রে] মুখে।' কথার মাঝে থেমে গঙ্গামণি সটা[ন] হাত পাতলো। কাকুতি করে বললে, '[দে] না ক্যানে গুটেক পয়সা। মুড়ি চিঁড়[া] কিনা খাই।'

কথা বলার মত কিছু খুঁজে পেল ন[া] কেষ্ট। পকেট থেকে একটা সিকি বে[র] করে গঙ্গামণির হাতে দিলো।

সিকি তো নয় যেন সাত রাজার ধ[ন] এক মাণিক—খুরির গরম চা-টুক এ[ক] চুমুকে নিঃশেষ করে গঙ্গামণি সিকিট[া] মুঠির মধ্যে জোরে চেপে ধরলো। শীতে[র] কাঁপুনীর মধ্যেও বেশ একটু গর[ম] পেয়েছে সে। চায়ে না সিকিতে, কে জানে।

মেলার এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে নজর করে গঙ্গামণি দ্রুতনিঃশ্বাসে বলে

দাঁড়া কিণ্টো, হেথায়। হুই একটা খাবার দোকান দেখি খুলো আছে। চট করে এলাম আমি।'

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখেই গঙ্গামণি হাওয়ার বেগে ছুট দিলো। চোখের পলকে অদৃশ্য।

সে দিক পানে তাকিয়ে গঙ্গামণিকে হঠাৎ চেনা দেওয়া জিনিসের মতই চেনা গেল। স্পষ্ট, সহজ ভাবেই। কার্বাইটের আকাসে আলো ছড়ানো এই মেলার ভিড়েই। মনে পড়লো কেষ্টর, সেই পুরোনো গঙ্গামণিকে: সেই চিল-চোখ, হাভাতা, হ্যাংলা, লোভী, দস্যি মেয়েটাকে। আর মনে পড়লো গত সনের কথাও। যে সনে আকাল হলো; চাল গেল, চুলো গেল গঙ্গামণিদের; জাত গেল, ধর্ম গেল; প্রাণও।

জলের মতই মনে পড়ছে সে সমস্ত কথা।

চাঁচুরিয়াতেই প্রথম দেখা, গঙ্গামণি আর কেষ্টর। তখন ওদিক পানে আকাল লেগেছে। চালের আকাল। আকাল যদি চালের হয় বাকি থাকে কি? গোড়া শুকোলো তো গাছ মরলো, ফুল পাতা ঝড়োলো।

তেমনি। রাক্ষুসে একটা টান দিয়ে কেউ যেন ওদের পায়ের মাটি ধসিয়ে দিলে; ছুঁড়ে ফেলে দিলে মাথার চালা। দলে দলে গঙ্গামণিরা বেরিয়ে পড়লো গ্রাম ছেড়ে, ভিটেয় ভিটেয় পিত্তবমির থুতু ছিটিয়ে।

দেড়বিত্তের শহর চাঁচুরিয়া। সেই শহরই দেখতে দেখতে ভরে গেল হাভাতাদের ভিড়ে। এ শহরেও এখন চাল বাড়ন্ত। ইঁট টালির কারখানার স্টোর থেকে চুপি চুপি চড়া দরে চাল এনে আরও চড়াদরে চাল বিক্রী করছে মহাজনের চুটকো দালালরা। রেল র‍্যাশানের গুদাম থেকেও চাল আসছে চোরা পথে: সে চাল তো চাল নয়, যেন সাদা হাড় বাঁধানো পালিশ দেওয়া খুর।

জনমানুষের কমতি নেই চাঁচুরিয়ায়। যারা আছে তাদেরই ভাতের পাতে টান তার ওপর এই নতুন উপসর্গ। ঘরের চৌকাঠে ওদের মাথা ঠুকতে দেখলেই গৃহস্থজন খেঁকিয়ে ওঠে,

ওরে, ও হারামজাদার দল, বলি চাল কি এখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি হলো?

প্রথম প্রথম ওরাও জবাব কাটতো। বলতো, গাঁয়ে শুনলাম হেথা রাজায় গোলা বাঁধলেক ধানের। ঠাকুর গো, দুমুঠো ভাতের লেগে এলাম হেথায়। ইস্টিশনের মাল গুদামে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল, কারখানার ফটক-ঘরে বস্তা বস্তা চাল—আপন চোখে দেখলাম, ঠাকুর। হেথা আকাল হবেক ক্যানে, কও?

ঠিক। চাঁচুরিয়াতে রাজায় গোলাই বেঁধেছে বটে। তবে সে গোলাতেই যা না হতভাগার দল। মরতে বাড়িতে, পথে-ঘাটে, পেট চিতিয়ে পড়ে থাকিস কেন?

পড়েই থাকে ওরা। পথে, ঘাটে, পাথর বাঁধানো মালগুদামের রাস্তায়, স্টেশনের ওভারব্রিজের তলায়। রোদ্দুরে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, কলেরা-বসন্তর মধ্যেই।

দিন যায়। দু-দশ জন সরে পড়ে, রেলের চাকার তলায় গলা দেয় ক'জন, একদল যায় কলেরায়, একদল বসন্তে, না খেয়ে খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মত কুৎসিত, নগ্ন ধড়টাকে রাস্তায় ফেলে রেখে কেউ কেউ আবার স্বর্গবাসী হয়।

তবু যদি ওরা একসাথে সবক'টা গিয়ে দামোদরের জলে ডুবে মরে, কি অন্যত্র চলে যায়, যেখানে রাজায় ধানের গোলা বাঁধে নি। তা যাবে না।

এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, হাড়গিলে রুগ্ন গরুর মত ধুঁকে ধুঁকে শ্বাস টানবে, কথা বলবে, কাঁদবে। ঠিক মনে হবে, কাঁচা পথ দিয়ে বলদটানা গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে কাতরানো, কর্কশ, করুণ। কচ্ছপের মত মুখ লুকিয়েছে বুকের তলায়। গায়ে চামড়া-পোড়া গন্ধ।

সারা শহরটা ওরা বিষিয়ে দিলে। আবর্জনায়, নোংরায়, মলমূত্র আর প্রকাশ্য ব্যভিচারে।

'টাউন রেস্টুরেন্টের' টেবিলে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট সবই দেখতো। আজ তিন বছর সে এখানে—এই চাঁচুরিয়ায় চায়ের দোকানে কাজ করছে। মালিক বদল হলো দোকানের, কলি ফিরলো, সাইনবোর্ড উঠলো মাথায়, টেবিল, চেয়ারও এলো—কেষ্ট কিন্তু

সেই কেষ্টই। তার আর কোথাও বদল নেই। সেই ময়লা নীল হাফপ্যান্ট আর আধহাতা গেঞ্জি। এই চায়ের দোকানে আগে খদ্দের ছিল না, এখন খদ্দেরের ভিড় কতো। সকাল থেকে চা দিয়ে দিয়ে, মামলেট ভেজে কেষ্টর হাতটাও অবশ হয়ে আসে আজকাল। নতুন একজন কারিগর এসেছে দোকানে। এতোদিন একলাই ছিল কেষ্ট। এখন দুজন। নতুন কারিগর চপ, কাটলেট ভাজে, মাংস রাঁধে, ডিমের ঝোল।

কোথায় ছিলো এতোদিন এই সব খদ্দেররা? চপ, কাটলেট আর ডিমের ঝোল যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়—সিগারেট ফোঁকে, চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিস-ফিসিয়ে কথা বলে? চোখের টোপ নিয়ে বসে আছে সর্বক্ষণ?

তাজ্জব লাগে কেষ্টর! সতেরো, আঠারো বছর বয়সের ছেলে, চায়ের লিকার দেখে দেখে আর কাপ ধুয়ে ধুয়ে যার মনটাই জলো জলো হয়ে থাকলো সেই কেষ্ট ভেবেই পায় না চালের আকালে দেশটাই যখন জল-ভিক্ষু চাতক পাখীর মত শূন্য চোখে চেয়ে রয়েছে, তখন এই বাবুরা কেমন করে, কোথা থেকে আসে চকমক করে, কাটলেট মুখে পুরে দিব্যি চিবোয়, মাংস খেয়ে হাড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পথে। ঘূর্ণী বয়ে যায় হাভাতাদের সেই হাড় কুড়োনোর পাল্লায়।

ভাবতে বসলে কেষ্টকে সুসমাচার খুলে বসতে হয়। মথি, যোহনের সুসমাচার আজো আছে কেষ্টর কাছে। আছে একটা ছেঁড়াফাটা বাইবেল। কাজের শেষে, রাতে, দোকান বন্ধ হলে রেস্টুরেন্টেরই এক চিলতে পর্দা ফেলে আড়াল করা রান্নাঘর থেকে কেষ্ট তার বিছানাপাটি নামিয়ে নিয়ে বেঞ্চি জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ে। তখন কেরাসিনের খুপি। সেই খুপির আলোয় তন্ন তন্ন করে খোঁজে মথি, লুক, যোহনের সুসমাচারের কোথায় আছে এদের কথা। এরা যারা চাঁচুরিয়ায় এসেছে ক্ষুধার তাড়নায় আর ওরা, যারা ডিমের লালচে ঝোল চামচে ডুবিয়ে হুস হুস করে খায়।

খুপির আলো ধরে কেষ্ট যীশুর ছবিও দেখে। মিশনারী থেকে দিয়েছিলো

কবে, কোন্ যুগে, সেই ছেলেবেলায়—কেষ্ট যখন মিশনারীর বাগানে ছিল, কাজ করতো মালিদের সাথে। সে ছবি আজ কালিতে ধূলিতে ময়লা, বিবর্ণ। কিন্তু তবু আছে—কেষ্টর কাছে, রেস্টুরেণ্টের খুপরিতে দেওয়ালে আঠা দিয়ে আঁটা।

মাথায় কাঁটার মুকুট, কপালে রক্ত-বিন্দু—করুণ নেত্র, যীশু চেয়ে আছেন ঊর্ধ্বপানে। খুপির শিস্-ওঠা লালচে আলোতে সে মুখ, সে চোখ, সে নগ্নগাত্র যীশু কেষ্টর কাছে আজকাল আরও রহস্যময় মনে হয়।

আঠারো বছরের কেষ্ট—ভালো করে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে অরফ্যানেজে মানুষ, মিশনারী কুঠিতে গতর দিয়েছে, রুটি খেয়েছে, লাল টালি ছাওয়া গীর্জেয় অর্গানের সুরে সুরে প্রেয়ার করছে ঠোঁট নেড়ে—সেই কেষ্টপদ দাস অবশেষে বুঝি একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলো। ঊর্ধ্বনেত্র যীশুর ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে কেষ্ট যেন বুঝতে পারলো, এ অন্যায়ের বিচার স্বর্গে।

আর এই যে তছনছ অবস্থা, কদর্য ভিড়, খেয়োখেয়ি, ঘিনঘিনে নোংরামি, এ আর কিছু নয় অপদূতে পাওয়া অবস্থা। বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত শয়তান অট্টহাস্য হাসছে। তাদের দাপটে মেঘ হলো না আকাশে, বৃষ্টি নেই, জল নেই। শয়তানদের নিঃশ্বাসে ধানের শীষ শুকিয়ে গেল, ফসল ফুরালো মাঠে-মাঠে।

এমনই হবে না? আকাশ থেকে আগুন আর গন্ধকের বৃষ্টি নেমে এসে প্লাবন বয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে পাপ—মনুষ্য-পুত্র আত্মপ্রকাশ করবেন।

সেই আগুন আর গন্ধকের বৃষ্টিতেই না চাঁচুরিয়ায় প্লাবন ডেকেছে। তীব্র জ্বলনে, কটু গন্ধে এর আকাশ-বাতাস ভরা। সাত শয়তানের ছিটিয়ে দেওয়া আবর্জনায় মানুষের গায়ে নোংরা, মনে নোংরা।

ঠিক এমন সময়ই গঙ্গামণির সঙ্গে দেখা। চাঁচুরিয়া যখন আর চাঁচুরিয়া নয়, নরক। নরক।

ভোলাবাবুদেয় গদিতে চায়ের অর্ডার ছিলো। বাবুদের চা খাইয়ে হাতের আঙুলে এঁটো চায়ের কাপ আর কেটলি ঝুলিয়ে কেষ্ট বাজারের রাস্তা দিয়ে আসছে। এমন সময় চোখে পড়লো দৃশ্যটা। কালিময়রার দোকান থেকে তার কর্মচারী নিতাই এঁটোকাঁটার আর ছেঁড়া পাতার জঞ্জাল ফেলা টিনটা হাতে করে রাস্তায় নামতেই চারপাশ থেকে ভিখিরী ছেলে ছোকরাগুলো তাকে ঘিরে ধরলো। রাস্তার ওপাশে নর্দমা। রাস্তার ওপারে গিয়ে জঞ্জালগুলো ফেলে দেবে নিতাই। কিন্তু কার সাধ্য এক পা এগোয়। ছিনে জোঁকের মত তাকে আটকে ধরেছে।

গালাগাল দিতে দিতে নিতাই দু-এক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় কে বুঝি বেকায়দায় পথ আটকাতে গিয়ে নিতাইয়ের পায়ে পা জড়িয়ে ফেললো। টাল সামলাতে গিয়ে নিতাইয়ের হাতের টিন ছিটকে পড়লো রাস্তায়, ঠিক মাঝ রাস্তাতেই। মারমুখো হয়ে নিতাই ঘুরে দাঁড়াতেই ভিখিরীর বাচ্চাগুলো দু পা হটে এলো। আবার এগুবে এগুবে করছে, এমন সময় কঁপা দূরেই মাল বোঝাই লরী। সরে গেল নিতাই, পথ ছেড়ে পালালো ভিখিরীর বাচ্চাগুলো। রাস্তা ফাঁকা। উচ্ছিষ্ট ছিটোনো, পাতা ছিটোনো টিনটা পড়ে আছে মাঝ রাস্তাতেই। হঠাৎ কোন এক অদৃশ্য কোণ থেকে একটা চিল ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই উচ্ছিষ্ট ভর্তি টিনটার ওপরেই। চেঁচিয়ে উঠলো পথ চলতি লোকজন। মালগুদোমের রাস্তা থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরে সবেমাত্র গিয়ার বদলেছিলো লরীটা। পুরোদমে ব্রেক কষলে। চাকা ঘষড়ানোর তীক্ষ্ন, কর্কশ, আওয়াজ উঠলো, বুক কাঁপানো আওয়াজ।

সবাই কিন্তু অবাক। উচ্ছিষ্ট ভর্তি টিন আর সামনে ছড়ানো যা পেয়েছে, সপ্টে-সাপ্টে আঁচলে তুলে, হাত পুরে চোখের নিমেষে লিকলিকে বেতের মত মেয়েটা উধাও। ঠিক যেন একটা চিল চোখের পলকে ছোঁ মেরে আবার উড়ে গেল। আশেপাশে কোথাও তার চিহ্ন নেই।

কেষ্টর বুক ধক ধক করে উঠেছিলো। সে কাঁপন থামলো দোকানে ফিরে, জল খেয়ে।

পরেরদিনই আবার দেখা। ওভার-ব্রিজের তলায়, এক্কাগাড়ির স্ট্যাণ্ডে। দেখার সাথে সাথেই চিনতে পারলো কেষ্ট। সেই কালো চিল।

স্টেশন থেকে ফিরছে কেষ্ট টিকিট-বাবুদের চা-টোস্ট খাইয়ে। খবরের কাগজ আর পাঁউরুটি-বিস্কুটের হাত-ঝোলানো ঝুড়িটা নিয়ে।

কেষ্টর হাতের ঝুড়ির দিকেই তাকাচ্ছিলো মেয়েটা। সোজাসুজি। রোজই হয়তো তাকায়। কিন্তু আগে কোনদিন কেষ্ট এই সাধারণ ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেনি। আজ করলো।

দাঁড়ালো কেষ্ট। তাকালো একটু। তারপর কাছে ডাকলো।

কালো চিল কাছে এলো। একেবারে গায়ের কাছেই।

—তুর নাম কি? কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

—গঙ্গামণি। চটপট জবাব গঙ্গা-মণির।

—নামটা তো তেমন টগবগে লয়। এলি কোন্ গাঁ থেকে?

—ধলগাঁ। নদী-পারে ছুষ্টিপুর, তার পাশেই বটে গ'।

—বটেক, ধলগাঁ! কেষ্ট এক মুহূর্ত নীরব হয়ে কি ভাবলো যেন। গঙ্গামণিকে দেখলো নজর করে। কালো চিলকেই। কাঠি গা, তবু গড়নে, চোখে, চুলে ছিটে ফোঁটা রূপ আছে।

—ধলগাঁ চিনি। দু'কোশ তফাতে গাঁ আমার, কাঁকুড়গাছি। কেষ্ট আবার একটু থেকে প্রশ্ন করলে, 'উদিক পানেও আকাল?'

—কুথায় লয়? গঙ্গামণি ধারালো দৃষ্টিতে কেষ্টকে যেন ব্যঙ্গ করে বললে, 'সগ্গ, মত্ত, পাতাল সরবত্রই। তুর গাঁ আমার গাঁ সতন্তর লয়, পিরথিবী ভরেই আকাল।'

কেষ্ট চুপ। একটু পরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে রেস্টুরেণ্টের পাঁউরুটি বিস্কুটের ঝুড়ি থেকে দুটো মিষ্টি বিস্কুট তুলে নিলো। গঙ্গামণির হাতে বিস্কুট দুটো ফেলে দিয়ে বললে,—'কাল তুই অমন করে গাড়ির সামনে ঝাঁপাই পড়্লি যে—ভাগ্যি জোর বেঁচে গেলি নয়তো কাটা যেতিস। তুর কি ভয়-ডর নাই রে?'

বিস্কুটে দাঁত বসিয়ে গঙ্গামণি ঠোঁট বেঁকালো। জবাব দিলে, 'কাটা পড়লে লিশ্চিন্ত হতুম গ'। পেরাণ গেলে পেট থাকতো লাই। পেটের জ্বালা সর্বনেশে

জ্বালা। কেউটে সাপের কামড়। সে জ্বলনের কাছে মরণ ডরায়।' কথার শেষে গঙ্গামণি কুকুরের কান্নার মত অদ্ভুত এক শব্দ করে হাসলো।

গঙ্গামণির সে হাসি কেষ্টর মরমে এসে বিঁধলো। ঠাঁই পেলো বরাবরের জন্যেই।

অন্তরঙ্গ হলো এই পরিচয় দিনে দিনে।

কেষ্টর তরফে বলার কথা সামান্য। কেষ্টপদ দাস অজ্ঞান বয়স থেকেই অনাথ। মিশনারীদের কাছে থেকেছে, খেয়েছে, প'রেছে। তারপর হেথা-হোথা ঘুরে এখানে এলো এই চাঁচুরিয়ায় তিন বছর আগে। সেই থেকে সে চায়ের দোকানে কাজ করে। ও কিন্তু কৃশ্চান।

কেষ্টর সঙ্গে ভাব হওয়ার পর গঙ্গামণির কষ্ট একটু তবু ঘুচলো। আগে নিত্য অনশন, এখন তবু টুকটাক জুটে যায় কেষ্টর কল্যাণে। রেস্টুরেন্টেরই আশেপাশে চিল চোখে সর্বক্ষণ সে টহল দিচ্ছে। ও এলাকাটা যেন ওর। সেখানে আর কাউকে হাত বাড়াতে দেখলেই চুলোচুলি শুরু করে। এদিকে মালিক আর কারিগরের চোখ বাঁচিয়ে কেষ্ট গঙ্গামণির আঁচলে এটা-ওটা ফেলে দেয়। ফাঁক পেলেই এই দয়া-দাক্ষিণ্য।

রোজকার ব্যবস্থাটা কিন্তু ছিল রাত্রেই, মালিক যখন চলে যায়, কারিগর বিদেয় নেয়, তখন। পেছোনে গলির পথ দিয়ে গঙ্গামণি রেস্টুরেন্টের পেছোন দরজায় হাজির।

—কি-ই-ষ্টো, উ কিষ্টোঃ আস্তে আস্তে নীচু গলায় ডাক দেয় গঙ্গামণি।

কেষ্ট মুখে কোন শব্দ করে না। নীরবে রেস্টুরেন্টের পড়তি বা বাড়তি মালের খানিকটা জালির ফুটো দিয়ে গঙ্গামণির ভাঙ্গা টিনের থালায় ঢেলে দেয়।

খুশি গলায় গঙ্গামণি বলে, 'তুর মত মনুষ্যি নাই রে ই জগতে, কি-ই-ষ্টো।'

ক'দিনেই গঙ্গামণির লোভ আরও বেড়ে ওঠে। —উ কিষ্টো, গুটেক মাস্ দে না। কাল তো শুধুই কাদা পারা ঘেঁটানো ঝোল দিলি। ভাত লাই একটুকুনও?

নিজের ভাত থেকেই কেষ্ট খানিকটা ভাত দিয়ে দেয়। না বললেও সে যে দেয় না, তা নয়। তবে রোজ হয়ে ওঠে না। মালিক মাপ করে চাল দিয়ে দেয় কেষ্টকে হপ্তা ভোরের। আগেভাগে ফুরোলে কিনে খাও।

আশ্চর্য মেয়ে এই গঙ্গামণি। কেষ্ট দেখতো আর ভাবতো। আর ওর লোভ, পেটের জ্বালা। তা এতো উগ্র, তীব্র যার বুঝি তুলনা নেই। লোভের আভায় গঙ্গামণির চোখ দগদগে ঘায়ের মত জ্বলতো।

গঙ্গামণিকে দেখে কেষ্টর মাঝে মাঝে মনে হতো, মেয়েটা যেন গন্ধকেরই ঝড়। কটু, তীব্র, বিষাক্ত।

তবু গঙ্গামণিকে কেষ্ট ভালোবাসতো। কেন যে, কে জানে? প্রতিবেশী গ্রামের মেয়ে বলে কি? না, আরও কিছু?

এক রকম ভাবে কেটে যাচ্ছিলো দিন। বাধ সাধলো গঙ্গামণি নিজেই। তার নিত্য নতুন ফন্দি ফিকির করে রেস্টুরেন্টের দরজা ঘেঁষে এসে দাঁড়ানো, আর প্রত্যহ এটা ওটা চাওয়া সমস্ত ব্যাপারটাকেই ফাঁসিয়ে দিলে মালিকের কাছে। কারিগর ব্যাটা সন্দেহ করতে শুরু করেছিলো আগে থেকেই, ইতর রসিকতাও করতো কেষ্টোর সঙ্গে তা নিয়ে। শেষাবধি মালিককে চুগলি। হাতে নাতে বামাল ধরা পড়েনি কেষ্ট এই যা রক্ষে। শাসানি, ধমকানি খেয়ে কেষ্ট হাত টান করলে।

গঙ্গামণির জিবে তার জন্মে গেছে ততদিনে। সে ছটফটিয়ে ঘুরে মরতে লাগলো রেস্টুরেন্টের এপাশ ওপাশ।

এমন সময় হঠাৎ ক' দিন গঙ্গামণি উধাও। পাত্তা নেই তার। দিন চারেক পরে ওভারব্রিজের তলাতেই দেখা।

হঠাৎ করে গেলি কুথায় তুই? কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

গঙ্গামণির গায়ে একটা নতুন কোরা শাড়ি। মাথার চুলগুলো তেল-চকচকে।

—চাকরী নিলাম রে, কিষ্টো। বাবুর বাসায়। খুশিতে গঙ্গামণি ঢলে পড়ছে।

—কোন্ বাবু?

—লাম টাম জানি নাই। উ ই যে বাবু, তুর দোকানে ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার খেতে আসেক রে। দুব্লা গোছের, চোখে কাঁচ, সাদা পারা দেখতে।
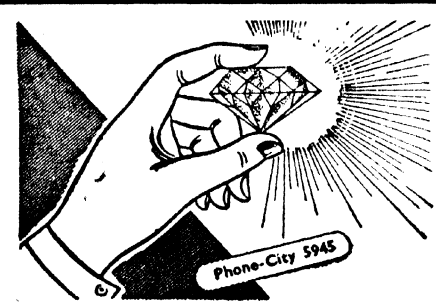
রোগা, চশমা পরা, ফর্সা বাবুটি যে কে, কেষ্ট বুঝতে পারলো না প্রথমে। পরে বুঝলো। বাবু নতুন। একেবারেই নতুন এ শহরে।

—বাবুর বাড়ি কুথায়।

—হুই যে, রেলপারে যেথায় সাঁকো আছে।

কেষ্ট মনে মনে জায়গাটা ভেবে নিলে। বাবুটিকেও ভালো করে মনে করলো। তারপর বললে, বাবুর বাসায় কোন্ কোন্ জন থাকে?

—কেউ লয়। ফাঁকা। জবাব দিলে গঙ্গামণি আরও পুলকিত হয়ে, 'বাবু আর আমি। দুজন মনিষ্যি। বাবু জাতটাতও মানে না রে, কিষ্টো। আমার হাতে ছোঁয়া

খায়। তিনদিন পেটপুরে ভাত খেলাম। গঙ্গামণি এমন একটা মুখভঙ্গী করলে যেন ওর মুখে এখনো সেই ভাতের গন্ধ।

কেষ্ট একটা বিড়ি ধরিয়ে গঙ্গামণিকে ভালো করে নজর করলো আবার। গঙ্গামণির গা গতরে একটু যেন ঢল নেমেছে আজকাল।

—দেখ্, গঙ্গামণি! কেষ্ট বললে ভেবে চিন্তে, 'এই আকালে শহরে অনেক হুটকো লোক এলো। অনেক ভদ্দরলোক বাবু। কিন্তুক মানুষগুলোকে মনে লয় না। মন্দ ঠেকে। বরং ই তোর পথঘাটই ভালো ছিল, রে।'

কেষ্টর কথায় গঙ্গামণি বাধা দিলে।

—আক্বকের কথা কাড়িস না কিষ্টো। শাড়ি দিলেক, ভাত দিলেক মানুষটা মন্দ হবে কিসের লেগে? উ দেবতার বংশ।

বেশ। কেষ্ট চুপ করে গেল।

গঙ্গামণির সঙ্গে আর দেখা হলো না। সপ্তাহ কাটলো, মাস কাটলো। সেই ফর্সা মতন চশমা চোখে বাবুটিও আর আসে না। একদিন কেষ্ট গেল গঙ্গামণির খোঁজ নিতে। সাঁকোর কাছে বাড়ি আছে বটে, তবে সেখানে গঙ্গামণি নেই, সেই বাবুটিও নেই।

কেষ্ট ফিরে এলো। মনে পড়ছিলো গঙ্গামণির কথাঃ শাড়ি দিলেক, ভাত দিলেক, মানুষটা মন্দ হবে কিসের লেগে? উ দেবতার বংশ।

সেই শেষ। কেষ্টর মনে গঙ্গামণির রঙ দিনে দিনে ফিকে হয়ে আসছিলো।

হঠাৎ আবার এই নতুন করে দেখা। শালবনীর মেলায়। কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে, কার্বাইটের আলোয়। সেই গঙ্গামণি।

হাত ধরতে কেষ্ট চমকে উঠলো।

—পালালি কুথায়, তুই? খুঁজে খুঁজে হেদায় গেলাম। গঙ্গামণি আবার এসে কেষ্টর হাত ধরেছে।

পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে কেষ্ট কখন যেন মেলা ছেড়ে ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—খেলি তুই?

—হাঁ। ফুরাইছিলো সব। চারগণ্ডা পয়সা—কি যে ছাতামাথা দিলেক রে কিষ্টো, গলাতেই সেঁদাই গেল। দে—বিড়ি দে একটা। শীত করে বড়।

শীত কেষ্টরও করছিলো। গঙ্গামণিকে বিড়ি দিয়ে কেষ্ট আশে পাশে একটু ঢাকা জায়গা খুঁজে নিলো।

পাশাপাশি বসলো দুজনে, কেষ্ট আর গঙ্গামণি। মন্দিরের ভেতরে তখন পক্ষকাল চাঁদের কলার হিসেব মত জ্বলা দেউটিকে ঘিরে শত শত মানসিক করা প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

দুজনেই চুপ করে বসে থাকলো। কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে, ফুটফুটে চাঁদের আলো এবার যেন শীতের দাপটে সাদা কাপড় জড়ালো গায়। দামোদরের চর থেকে ভিজে গন্ধ ভেসে আসছে। সোঁদা, বুনো গন্ধ। গঙ্গামণির কাঁচপোকার টিপ খুলে পড়ে গেছে কোথায়।

—হঠাৎ করে তুই শহর ছেড়ে গেলি কুথায় রে, গঙ্গামণি? কেষ্ট প্রশ্ন করলে।

চট্ করে এবার আর জবাব দিতে পারলো না গঙ্গামণি। মুখ বুজে বসে থাকলো অনেকক্ষণ। পরে কথার জবাব দিতে বসে ওর দু চোখ জলভরা হয়ে উঠলো।

সমস্ত কথা খুলে বললে গঙ্গামণি কেষ্টর পাশে বসে। একে একে। সেই হারামজাদা শয়তান মিনসেটা ভুলিয়ে ভালিয়ে, ভাতের লোভ দেখিয়ে তাকে শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। হেথায় হোথায় করে কাটালো কিছুদিন। তারপর একদিন পালিয়ে গেল। গঙ্গামণি একা। বিদেশ বিভুঁয়ে গ্রামে গ্রামে পথ ঘাট মাঠ করে ও ঘুরে বেড়াতে লাগলো ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে, ভাতের জন্য হাত পেতে পেতে। গাঁয়ে গাঁয়ে ধানের গোলা আজও শূন্য, আজও আকাল মেটেনি। পেটের তাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গঙ্গামণি এসে উঠলো হাতামোড়ায়। সেইখানেই ছিল গঙ্গামণি আজ দু—দু মাস। চাঁপাদের কাছেই। ওদের কথায়, ওদের সাথেই এই মেলায় এলো, শালবনীর মেলায়।

কথার শেষে গঙ্গামণি কেষ্টর হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিতে কেঁদে উঠলো।

—আর লারি, কিষ্টো। ব্যাধি হলো শরীলে, বল নাই। এ জ্বলন সামলাতে লারি। তুর সাথে লিয়ে চল আমায়।

হাত সরিয়ে দিলে না কেষ্ট গঙ্গামণির। কান পেতে শুনলো সব কথা। প্রথম আলাপের সেই হাসি মরমে গাঁথা ছিল, এবার গাঁথা হলো এই অনুনয়। নিরুত্তরে কেষ্ট শুধু তাকিয়ে থাকলো মন্দিরের দিকে। ওখানে শেষ রাতের দুধ আলো চূড়ো ভাঙ্গা শ্যাওলা মাথা মন্দিরের গায়ে গা মিশিয়ে দিয়ে যেন নিঃসাড়ে সোহাগ জানাচ্ছে।

ভোর হলো। সূর্য ওঠার মুখে মুখেই গঙ্গামণি চাঁপার শাড়ি, জামা চুপিসারে ফেলে রেখে এক্কায় এসে উঠলো। পাশে কেষ্ট। গঙ্গামণির দিকে তাকালো কেষ্ট। ভোরের আলোয় গঙ্গামণি ছেঁড়া ফাটা চিট নোঙরা শাড়িতে গা গতর ঢেকে এসেছে কায়ক্লেশে। শীতের হাওয়ায় কাঁপছে ঠক ঠকিয়ে।

সে দিক পানে তাকিয়ে তাকিয়ে কেষ্ট প্রথমটায় কেমন যেন অবাক, তারপর অদ্ভুত একটা বেদনায় মনভার হয়ে বসে থাকলো।

কেষ্টর চোখে গঙ্গামণির লুকোনো লজ্জাটা ধরা পড়ে গেছে। ছেঁড়া ফাটা শাড়ির আঁটুনীতে ঢাকা পড়েনি সে কলঙ্ক চিহ্নটা।

এক্কা ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে পলাশবনীর পথ ধরে। লাল ধুলো উড়ে পথের পাশে পলাশ আকন্দের পাতায় রঙ ধরাচ্ছে ধূসর। শূন্যে প্রান্তরে একটানা ঘণ্টি বাজছে ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘণ্টিগুলোর। সামনে পিছনে আরও কতো এক্কা, কতো মেলা ফিরতি মানুষ জন।

এক্কার ঝাঁকুনি খেতে খেতে সহসা কেষ্ট বুঝতে পারলো সাজুনীর সাজে সেজে এসেও গঙ্গামণি কাল রাত্তিরে পানের মোড়ক বাঁধা আঁচলের গিঁট খুলতে পারেনি কেন।

আবার সেই চাঁচুরিয়ায় ফিরে এলো গঙ্গামণি। এসে দেখে অবস্থার হের ফের তেমন কিছু হয়নি। মরে, পালিয়ে বেঁচে বর্তে শেষ পর্যন্ত যারা টিকে গেছে তারা প্রায় সকলেই ঠাঁই নিয়েছে ওভারব্রীজের নীচে, এক্কা স্ট্যাণ্ডের ছাউনীর তলায়। ঘোড়ায়, কুকুরে, মানুষে মিলে মিশে রাতটুকু নিশ্চিন্তে ওরা কাটিয়ে দেয়। ভোরের

মুখ দেখার সাথে সাথেই যে যার মত বেরিয়ে পড়ে পথে।

গঙ্গামণিও এসে মাথা গুঁজলো সেই ছাউনীতে।

আসার পথেই কেষ্ট সাবধান করে দিয়েছে গঙ্গামণিকে। খবরদার, দিনের বেলায় রেস্টুরেন্টের আশে পাশে গঙ্গা-মণি যেন ঘুর ঘুর না করে। রাত্রে সেই আগের মত গলিপথ দিয়ে লুকিয়ে গিয়ে পিছন দরজায় এসে ডাক দিলেই হবে। সজাগ থাকবে কেষ্ট।

এবার আর কেষ্টর কথা অমান্য করতে সাহস করলো না গঙ্গামণি। সারা দিন পরে সিকিপেটা, আধপেটা যাই হোক, যেমন হোক খাবারটা জোটে কেষ্টর কাছেই। তা কি বন্ধ হতে দেওয়া যায়?

খুব সাবধান হয়েছে এবার গঙ্গামণি। যতক্ষণ দিনের আলো আছে, বাজার পথে ওর ছায়া দেখবে না কেউ। সারা দিন লাইন ধারে, স্টেশনে, প্যাসেঞ্জার গাড়ির কামরায় কামরায় ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়।

রাত হলে আর ওর পা বাঁধা মানতো না। বাজারে ঢুকতি পথে অন্ধকার মত একটা জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো রেস্টুরেন্টের দিকে। কতোক্ষণে ভিড় কমে, মালিক চলে যায়, দোকানের দরজা বন্ধ করে দেয় কেষ্ট। অগ্রহায়ণের হিমে গঙ্গামণির সর্বাঙ্গ কনকনিয়ে আসে—তবু পা নড়ে না, চোখ ফেরে না অন্যদিকে। রেস্টুরেন্টের বাতিটা নিভে যাবার অপেক্ষায় তার দু চোখ ঠায় জেগে থাকে।

রেস্টুরেন্টের বাতি নিভে গেলে পা পা করে গঙ্গামণি গলির পথ ধরে। ছাই, জঞ্জাল, ফণিমনসা ঢাকা এক মানুষ গা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গঙ্গামণি রেস্টুরেন্টের পিছন দরজায় এসে থামে। জালের ফুকরি দিয়ে উঁকি মারে। আস্তে আস্তে ডাকে—'কিষ্টো, উ কিষ্টো।'

কেষ্ট সজাগ। ডাক শুনে গঙ্গামণির জন্যে লুকিয়ে রাখা খাবার হাতে জালের ফুকরির কাছে এসে দাঁড়ায়।

কালিঝুলি মাখা জালের ফুকরির গায় গঙ্গামণির জ্বল জ্বলে চোখ দুটো বেড়ালের চোখের মত জ্বলতে থাকে। হাপর-টানার মত শব্দ ওঠে ওর নিঃশ্বাসের। আবছা একটা ছায়া জালের ওপাশে মুখ ঘষে।

লুকিয়ে রাখা পাত্রটা ঝটপট টেনে নেয় কেষ্ট। ফাঁক দিয়ে গঙ্গামণির টিনের থালায় উজাড় করে ঢেলে দেয় সঞ্চিত খাদ্যবস্তুগুলো।

কথা বলার অবসর নেই গঙ্গামণির। অন্ধকারেই একটা হাত তার থালা থেকে মুখে এসে উঠেছে।

চুপ—সব চুপ। দূরে কুকুর ডাকছে। কেরাসিনের লালচে আলোয় রেস্টুরেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেষ্ট। বাইরে অন্ধকার। আবর্জনার গন্ধ ভাসছে। গঙ্গামণির গলা বন্ধ হয়ে এসে বিষম লাগে। কাশির দমকে বুক ছিঁড়ে যাবার যোগাড়।

ধমক দেয় কেষ্ট। ধরা পড়ার ভয়ে ওর গা ছম ছম করে। তাড়াতাড়ি জল দিয়ে বিদেয় করে দেয় গঙ্গামণিকে।

নিত্যই এই। কোনরকম ফের নেই। রাত্রে নিদেনপক্ষে একটি দুটি কথা হয়। নয়তো সব কিছুই চুপি চুপি; নিঃসাড়ে।

কথার পাট দিনের বেলায়। কাজের ফাঁকে স্টেশনে এলে যখন দেখা হয় গঙ্গা-মণির সাথে, তখন।

দেখতে দেখতে অগ্রহায়ণ শেষ হলো। পৌষ এলো শীতের প্রচন্ড দাপট নিয়ে। সে পৌষও শেষ। মাঘ মাসে গঙ্গামণি এক্কা স্ট্যান্ডের ছাউনীর তলায় শীতের রোদ্দুরে চুপচাপ বসে থাকে আর হাঁপায়। গায়ে বল পায় না। প্যাসেঞ্জার ট্রেন এলে কোনরকমে শরীরটাকে টেনে-টুনে প্ল্যাট-ফর্ম পর্যন্ত নিয়ে যায়। তাও যেন পারে না রোজ। মাথা ঘোরে চরকিপাকে। দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁপ ওঠে। চড়চড়িয়ে টান পড়ে পেটে। পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। গা গুলোয়, মাথা গুলোয়।

শরীরটা যতোই নিস্তেজ হয়ে আসে, ততই যেন গঙ্গামণির পেটের খিদে জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসে। কুকুরের মত পাত চেটে বেড়ায় গঙ্গামণি এক্কা স্ট্যান্ডের এখানে ওখানে।

এদিকে রেস্টুরেন্টে জোর রেষারেষি বেঁধে গেছে কারিগর আর কেষ্টতে। ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করেছিলো কারিগর। ধরা পড়ে দোষ চাপালো কেষ্টর ঘাড়ে। তা ছাড়া বেশ খানিকটা হাত টান ছিলো কারিগর ছোকরার। ধরা পড়লেই কেষ্টকে কোণঠাসা করে দিতো। বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, 'হবে না কেন মালে কমতি? সেই শালি তো আবার এসেছে—পিরীতের বোষ্টমী কেষ্টার। উর পাতেই তো যায়।'

গোলমেলে ব্যাপার দেখে কেষ্ট গঙ্গা-মণির 'আসা বন্ধ করে দিলে। বললে, 'ঝামেলা বাঁধাইছে রে, গঙ্গামণি। উ শালা লটবরের শয়তানি সব। তুই আর আমার ঠেঙে রেতে যাস নে। থাক্ হেথায়। লুকাই চুরাই দিব ক্যানে কিছু।'

সেই থেকে গঙ্গামণির একূল ওকূল দু-কূলই যেতে বসলো। দুর্বল শরীর নিয়ে বসে থেকে পাত চাটলে পেট ভরে না; কেষ্টর প্রত্যাশায় পথ চেয়ে চেয়ে হন্দ হয়ে গেলেও আজকাল তেমন কিছু জোটে না। রোজ তো নয়ই। বাধ্য হয়েই গঙ্গা-মণিকে এবার স্টেশন বাজার সর্বত্রই ককিয়ে কেঁদে, হাতে পায়ে ধরে পেটের জ্বালা মেটাবার চেষ্টায় বেরোতে হলো।

আরও কিছুদিন কাটলো এইভাবেই। গঙ্গামণি আর পারে না। শরীরে কুলোয় না একেই, তায় আবার যা জোটে এঁটো-কাঁটা তাতে ওর অরুচি। মুখে রোচে না।

কেষ্টর সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হলেই গঙ্গামণি ওর পথ আটকে ধরে।

—আর তো লারি রে কিষ্টো। ভাল্ তুই—ভাল্। দয়ামায়া কুথায় গেল রে তুর? ই শরীলে আমার থাকলো কি ক?

কেষ্ট চুপটি করে সব শোনে। কথা বলার মত কিছু খুঁজে পায় না। কিই বা আছে বলার!

আর একদিন দেখা। প্লেটে ঢাকা খাবার নিয়ে কেষ্ট যাচ্ছিলো স্টেশনে, বুকিং অফিসে।

—যাস কুথায় রে কিষ্টো? গঙ্গামণি পথ আড়াল করে দাঁড়ালো, 'কি আছে রে উতে?'

—চপ। জবাব দিলে কেষ্ট, 'টিকিট-বাবুর চেনা জানা লোক এলো। অর্ডার দিলেক।'

চপের প্লেটের দিকে লোভার্ত দৃষ্টিতে গঙ্গামণি তাকিয়ে থাকলো।

—মাসের চপ, না কি রে? গঙ্গা-মণির জিভে জল এসে পড়েছে।

—হাঁ বটে; মাংসের। কেষ্ট পা বাড়ালো।

—শুনু, শুনু কিষ্টো;—টিকিট-বাবুরা সবটাই কি খাবেক আর? টুকচা ফেলাছাড়া থাকলে দিস ক্যানে আমায়। আমি হেথায় আছি। গঙ্গামণি চপের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যেন অবশ হয়ে এলো।

চলে গেল কেষ্ট চপের প্লেট হাতে নিয়ে।

কিন্তু ছাড়া পেলে না। সেই থেকে গঙ্গামণির সাথে দেখা হলেই ও নাছোড়-বান্দা।

—উ কিষ্টো। খাওয়া ক্যানে একটা চপ্ রে? কতোই তা হয় তুদের রোজ। বড্ড সাধ লাগে—। ই জিবে আর সোয়াদ নাই রে। পায়ে পড়ি কিষ্টো তুর, একটা মাসের চপ খাওয়া আমায়।

কেষ্ট কতো বোঝায়। বলে, বড় কড়া-কড়ি রে গঙ্গামণি। মালিক নিজের হাতে সব গুণে রাখে, হিসেব নেয়। চপ তোকে খাওয়াই কি করে? একটু সবুর কর ফাঁক পেলেই খাওয়াবো।

গঙ্গামণির কপাল ভালো। অল্প ক'দিনের মধ্যেই হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। মাঘের শেষ তখন। বাজারে আলুর আড়ৎ যার সেই নন্দীবাবুদের মেয়ের বিয়ে। দু হাতে পয়সা ঢেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নন্দীবাবু। বোষ্টম লোক। বাড়িতে মাছ যদিও বা কারুর কারুর চলে, মাংস একেবারেই অচল। অথচ বরযাত্রীদের জন্যে খাবার ব্যবস্থাটা মাংসের পর্যায়ে না তুললেই নয়। মদনবাবুর রেস্টুরেণ্টে ঢালাও অর্ডার হলো মাংস আর চপের।

মাঘের প্রচণ্ড শীত। বিয়ের লগ্ন মাঝ রাতে। সেই দুরন্ত শীতে নিমন্ত্রিত-দের পাতে গরম চপ আর মাংস তুলে খাওয়ার পাট চুকোতে চুকোতে বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে গেল। ক্লান্ত মদন-বাবু বিদায় নিলে। চলে গেল কারিগর গামছার একটা মোটা রকমের পুঁটুলী বেঁধে। রেস্টুরেণ্টের ধোয়ামোছা শেষ করে কেষ্ট উনুনটায় কয়লা ঢেলে দিলে। রাত তো প্রায় শেষ হতে চললো। ভোর না হতেই চায়ের গরম জল দরকার।

হাতমুখ ধুয়ে অল্প একটু বিশ্রাম নিলো কেষ্ট। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে সমস্ত শরীরটা অবসন্ন হয়ে এসেছে। পর পর দুটো বিড়ি খেয়ে হাই

তুললো কেষ্ট। ঘুম পাচ্ছে ওর; ভীষণ ঘুম। রাতের গোড়ায় জোর খিদে পেয়েছিলো; এখন আর দাঁতে কুটো কাটতেও ইচ্ছে করে না।

বেঞ্চি জোড়া দিয়ে কেষ্ট তার বিছানাটা বিছিয়ে নিলো রেস্টুরেণ্ট ঘরে। একটা কালো ময়লা পর্দা ঝুলতো রেস্টুরেণ্টের রান্না করবার ঘর আর এই চেয়ার টেবিল সাজানো ঘরের মধ্যে। পর্দাটা গুটিয়ে দিলে কেষ্ট। উনুনে আঁচ উঠে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতে ওই আঁচের তাপটা বেশ লাগে।

চায়ের জল-গরমের টিনটা উনুনে চাপিয়ে জল ভর্তি করে দিলো। ফুটুক এখন।

ঠিক এমন সময়ই জালের ফুকরি দিয়ে ডাক শোনা গেল, 'কিষ্টো—উ কিষ্টো।'

এই ডাকেরই অপেক্ষা করছিলো কেষ্ট। গঙ্গামণিকে আজ যে আসতে বলেছে। হৈ হট্টগোলের মধ্যে না হলে আর সুযোগ জুটতো না। কতদিন মেয়েটা একটা চপের জন্যে বায়না ধরেছে, মাথা খুঁড়েছে কেষ্টর পায়। আজকের এই রাশি রাশি খাবারের মধ্যে ও যদি দুটো খায় কেউ জানতে পারবে না, ধরতে পারবে না। বেচারী গঙ্গামণি! কতোকাল পেট ভরে খায়নি, কতো দিন ওর মুখে এঁটোকাঁটা আর নোঙরা ছাড়া কিছু ওঠেনি। কেষ্টর ভরসা করেই গঙ্গামণি এখানে এসেছিলো এবার, এই চাঁচুরিয়ায়—কিন্তু কেষ্টও পারলো না। পারলো না গঙ্গামণিকে নিত্য একবেলা এক মুঠিও হাতে তুলে দিতে।

জালের ফুকরির পাশে পিছন দরজা। সেই দরজাটার খিল খুলে কেষ্ট ডাকলো, 'আয়—ভিতরে আয়।'

গঙ্গামণিকে দ্বিতীয়বার বলতে হলো না। অন্ধকারের গুহা থেকে হঠাৎ লোভার্ত একটা ভীরু পশু যেন ঘরে এসে ঢুকলো। শীতের দাপটে কাঁপছে হি হি করে।

কেরোসিনের খুপির আলোয় সেই ফোলা ফোলা বীভৎস মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেষ্ট দরজাটায় আবার খিল এঁটে দিলো।

—রাতটো শেষ করেই এলাম রে। গঙ্গামণি এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তীক্ষ্ন চোখে নজর করতে লাগলো।

—ভালোই করলি। কেষ্ট কি যেন ভাবলো একটু। তারপর তার নিজের পাত্রটা টেনে নিলে দেওয়াল-তক্তা থেকে। গঙ্গামণির জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলো দুটো চপ, ক' হাতা মাংস—সেগুলোও পাতে ঢেলে দিলো।

খাবারের পাত্রটা এগিয়ে দেবার আগে কেষ্ট বললে, 'শীতে তুই বড় কাঁপছিস গঙ্গামণি, একটু আগুন পুইয়ে নে। না হলে খাবি কি, কেঁপেই মরবি।'

—আগ সেঁকে কাজ নাই। তু দেখ ক্যানে—আমি হদ হদ করে খেয়ে লিব। সারা রাত ঠায় চোখ ফাবড়ে বসে আছি —ত' বসেই আছি। ই বাবা, এতো কি যজ্জি রে কিষ্টো, মানুষগুলো খায় তো রাত ভোর করেই খায় সব।

গঙ্গামণি অধৈর্য হয়ে আঁচল পাতলো।

—লিতে হবে না। বোস্ তুই, উখানেই বোস্। বোসে বোসে খা।

কেষ্টর কথায় গঙ্গামণি বোধ হয় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো প্রথমটায়। কিন্তু অতোশতো ভাববার সময় নেই তার। পেট থেকে জল টানছে জিবে। মাটিতে বসে পড়লো গঙ্গামণি।

হাতের পাত্রটা কেষ্ট এগিয়ে দিলো। সেদিক পানে তাকিয়ে গঙ্গামণির চোখের পাতা আর পড়তে চায় না। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে থাকে, হাঁ হয়ে থাকে মুখ। জিভ্ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ঘি-ভাতের ওপর।

বিয়ে বাড়িতে পরিবেশণ শেষ করে আসার পথে কারিগর নটবর ওদের ভাগ নিয়ে এসেছিলো—লুচি, মাছ, ঘি-ভাত কতো কিছু। কেষ্টকেও দিয়ে গেছে খানিক খানিক। সবই তোলা ছিল। কেষ্ট থালাটাই এগিয়ে দিয়েছে গঙ্গামণির দিকে। এর ওপর মাংস আর চপ।

জীবনে কোনদিন এত খাবার দেখেনি গঙ্গামণি। জিভে স্বাদ জানে না অনেক কিছুরই। কোন্‌টা কি, মিষ্টি না ঝাল, টক্ না নোন্‌তা, কিছুই তার জানা নেই। কোন্‌টা আগে ছোঁবে, কি যে আগে খাবে—গঙ্গামণি তা ভেবেই পায় না। চোখ দুটো থালার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

কেষ্টর তাগিদে গঙ্গামণির বিমূঢ় ভাবটা কাটলো।

হাত বাড়ালো গঙ্গামণি। ভাতে মিষ্টি কেন রে কিষ্টো? লং ক্যানে ইয়াতে মাগো মা, ঘিয়ে চপ্‌চপায়? ক্যাওটের বিটি আমি, বাপের কালেও মাছের সোয়াদ জ্ঞান হল না ইর পারা রে কিষ্টো। কী সুয়াদ—জিভে জড়াই যায় গ'!

বিড়ি ধরিয়ে কেষ্ট একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো গঙ্গামণির দিকে। গঙ্গামণিকেই সে দেখছে। দেখার মতই না দৃশ্যটা। পা ছড়িয়ে, মুখ থুবড়ে থালার উপর লুটিয়ে পড়েছে গঙ্গামণি। হাতের আঙুলগুলো তার পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে পাতের ওপর। বিরাম নেই গ্রাস আর গলাধঃকরণের। চোখ তুলে চায় না— সোজা করে না দেহটাকে।

অদ্ভুত! অদ্ভুত দেখাচ্ছে গঙ্গামণিকে। দু-পাঁচ ক্রোশ ছুটে আসার পর ঘাড় মুখ গুঁজে ঘোড়াগুলো ঠিক এমনি-ভাবেই দানা খায় না!

দৃশ্যটা কে জানে কেন, কেষ্টর ভালো লাগছে না। এমন হবে জানলে গঙ্গামণিকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিতো না; খাওয়াতো না চোখের সামনে বসিয়ে। কি যে খেয়াল হয়েছিলো কেষ্টর, ইচ্ছে জেগেছিলো ভীষণ—গঙ্গামণিকে সামনে বসিয়ে পেট পুরে ভালোমন্দ দিয়ে খাওয়াবে আজ। এই প্রচণ্ড শীতে ঘরের মধ্যে উনুনের আঁচের আরাম কি কম! সেই আরামে নিশ্চিন্তে বসে গঙ্গামণি ধীরে ধীরে খাক না কেন সব—যত তার পাতে আছে। —খাওয়ার খুশিতে গঙ্গামণির মুখে আনন্দ উপচে উঠুক, ক্ষুধা-তৃপ্তির সেই আরাম আর সুখ, যে আরাম, সুখ ও ভুলে গেছে অনেক কাল, অনেক শীত আগেই। অনেক সাধ ছিলো কেষ্টর, প্রবল বাসনাই, গঙ্গামণির সেই খুশি, পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ মুখখানি আজ ও দেখবে। আর সেই সঙ্গে একথাও কবুক গঙ্গামণি, কেষ্ট নিরুপায়; নয়তো গঙ্গামণিকে আছে খাওয়াবার আনন্দ, আছে সুখ?

কিন্তু কই খাওয়ানোর সেই সুখ পাচ্ছে না তো কেষ্ট। গঙ্গামণির মুখ গুঁজড়ে বসা ওই দেহের কোথাও কি খাওয়ার আনন্দ আছে, সুখ আছে?

আশ্চর্য! কেষ্ট অবাক মানছে মনে মনে। অপদেবতায় সূর্যের আলো মুছে দেয়, গাছের সবুজ পাতা এক নিঃশ্বাসে ঝরিয়ে ফেলে, সমুদ্রের জল

শুকিয়ে আগুনের ঝড় তোলে, ভীষণ ঝড়; তেমনি কি—তেমনি কি, আকালের ঝড় মানুষের মুখ থেকে খাওয়ার খুশিও মুছে নিয়ে গেল!

সেদিক পানে তাকিয়ে তাকিয়ে বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত অপদেবতাকে কেষ্ট যেন হঠাৎ রেস্টুরেণ্টের এই ঘরে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো। অনুভব করতে পারলো তাদের বিষনিঃশ্বাস। সেই তীব্র কটু গন্ধকের হাওয়া দিয়েছে আবার। পুরোনো চাঁচুরিয়া আর গঙ্গামণি, গঙ্গামণির দল মনের নাগরদোলায় ওঠানামা করছে।

কে? কেষ্ট চমকে উঠলো। পাত থেকে হাত গুটিয়ে গঙ্গামণিও চোখ তুলে তাকালো।

রেস্টুরেণ্টের বাইরের দরজায় ভীষণ জোরে ধাক্কা মারছে কে যেন। কান পেতে শব্দটা শুনতেই কেষ্টর মুখ শুকিয়ে এলো। ঢিপ ঢিপ করে উঠলো বুক।

বাইরের দরজায় ধাক্কা মারার শব্দটা থেমেছে। গঙ্গামণি তখনো পাত আগলে বসে। মাংসটা তবু একটু খেয়েছে, কিন্তু বড় সাধের চপ দুটো তখনো তার পাতে। তারিয়ে তারিয়ে খাবে শেষ পাতে, সেই ইচ্ছেতেই একপাশে সরিয়ে রেখেছিলো।

ইঙ্গিতে কেষ্ট গঙ্গামণিকে উঠতে বললে চটপট। ফিসফিসিয়ে জানালো, পিছু দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে।

মাংস আর চপ ছেড়ে পালিয়ে যেতে মন চাইছিলো না গঙ্গামণির। চুপি গলায় সে বললে, 'ডরাস ক্যানে? উ কিছু লয়। বাতাস হবেক, কি কুকুর-টুকুর।'

দরজায় ধাক্কা মারছে না আর কেউ। শব্দ নেই কোথাও। কেষ্ট একটু অপেক্ষা করলে। তবে? তবে কি বেলসেবুব? কেষ্টর ভয় কমলো না এতটুকুও।

—কাজ কি ঝামেলায়? তুই যা গঙ্গামণি।

প্রচণ্ড অনিচ্ছা, তবু গঙ্গামণিকে যেতে হবে। রাগ হলো তার খুব। চপ দুটো চট করে তুলে নিলো। একটা কামড় বসিয়ে গরগর করতে লাগলো রাগে, বিরক্তিতে।

আস্তে আস্তে খিল খুললো কেষ্ট পিছন দরজার। কপাটের একটু ফাঁক দিয়ে এক চিলতে অন্ধকার চোখে ঠেকেনি তখনো, হঠাৎ কে যেন বাইরে থেকে দড়াম করে এক লাথি মেরে কপাট দুটো হাট করে খুলে দিলো।

কপালে ঠোক্কর লাগলো কেষ্টর, জোর ঠোক্কর কপাটের। ঝিম ঝিম করে উঠলো মাথাটা।

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে কেষ্ট এক চোখে চাইলো। সেই চাওয়াতেই তার সর্বাঙ্গ অসাড়, পাথর হয়ে গেল নিমিষেই। স্বপ্ন নয়, নটবরও নয়, বাবু স্বয়ং—মদনবাবু। একেবারে দরজার ওপরেই।

মদনবাবু এক নজরে সব দেখে নিলেন। আগেও দেখছিলেন জালের ফুকরি দিয়ে।

পিছন দরজার কপাটটা বন্ধ করে খিল তুলে দিলেন মদনবাবু। বাঘের থাবার মত দৃঢ় মুষ্ঠিতে গলা টিপে ধরলেন কেষ্টর।

—নেমকহারাম, জোচ্চোর, সোয়াইন—আমার ব্যাগ কোথায় আগে বল? তারপর দেখছি সব—

দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়েছিলো কেষ্টর। মদনবাবুর হাত থেকে গলা ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে কেষ্ট গলা দিয়ে দমবন্ধ হবার মত ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলো।

গলা ছেড়ে দিলেন মদনবাবু।

দম নিতে লাগলো কেষ্ট। গলা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মুখ পাংশু।

—কোথায় আমার ব্যাগ? মদনবাবু এক থাবড়া লাগালেন কেষ্টর গালে।

দু-পা হঠে আসতে হলো কেষ্টকে।

—জানি না, বাবু!

—শালা, শুয়োর, ব্যাগ জানো না তুমি? জানাচ্ছি, দাঁড়াও!

কেষ্টর চুলের মুঠি নেড়ে আর এক থাপ্পড় কষালেন তার গালে। কেষ্ট দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছিটকে এলো।

মদনবাবু এক লাফে এগিয়ে গেলেন ক্যাশের দিকে। ক্যাশের চাবি খোলা। টানাটা উঠোতেই ব্যাগটা হাতে ঠেকলো। নিত্যদিন যেভাবে ব্যাগটা পড়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই। ব্যাগটা আজ যথেষ্ট ভারী। হ্যাঁ, নন্দীবাবুর টাকায় ভারী হয়েছিলো বলেই না এই শীতের শেষরাতে ব্যাগের কথা মনে পড়লো বিছানায় শুয়ে। আর যেই না মনে পড়া ছুটতে ছুটতে তিনি এলেন দোকানে। হাজার কাজে, ভিড়ে, বিয়ে বাড়ির খাবার পাঠানোর তদারকে কখন যেন ভুলেই ব্যাগটা দোকানে রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। মনে পড়তেই ছুটে এলেন। বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিলেন। কোন শব্দ নেই। এলেন পিছন দরজায়। জালের ফুকরি দিয়ে তাকালেন অন্দরে। ঘুমন্ত কেষ্টকে ডাক দেবেন বলেই। কিন্তু তাকিয়ে যে দৃশ্যটা চোখে পড়লো তাতে আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো মদনবাবুর। নটবরের কথাই তা হলে ঠিক। এমনিভাবে কেষ্ট রোজ তাঁর দোকানের খাবার চুরি করে ছুঁড়িটাকে খাওয়ায়। টাকা-পয়সাও যে আজকাল ক্যাশ থেকে মাঝে মাঝে চুরি যায়—সেটাও তাহলে কেষ্টর কীর্তি! বিশ্বাস কি? আর ব্যাগ? ব্যাগটাও কি তিনি সত্যি ভুলে দোকানে ফেলে গেছেন না হাতিয়ে নিয়েছে কেষ্ট? পলকে তাঁর বিচারবুদ্ধি লোপ পেলো।

ব্যাগটা হাতে করেই মদনবাবু আবার কেষ্টর কাছে এসে দাঁড়ালেন। নোটগুলো বের করে গুণে নিচ্ছেন এমন সময় খুট করে শব্দ হলো। গঙ্গামণি পিছন দরজার খিল খুলে ফেলেছে। পালাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে সবে।

মদনবাবু ছুটে এসে গঙ্গামণির হাত ধরে ফেললেন।

—শালি, হারামজাদী, লুঠতে এসেছিস এখানে? তোর চোদ্দ ভাতারের জমিদারী এটা। রাখ্—রাখ শীঘ্রি চপ্—নামিয়ে রাখ, ফেলে দে।

হ্যাঁচকা টান দিলেন মদনবাবু। গঙ্গামণি সেই টানে ছিটকে কেষ্টর কাছে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেলে।

ব্যাগটা মদনবাবু ততক্ষণে পকেটে পুরে ফেলেছেন।

গঙ্গামণিও ছাড়ার মেয়ে নয়। তার সেই বহুদিন আগেকার বেপরোয়া ভাবটা হঠাৎ যেন ভর করলো তাকে। চপ্ সে রাখবে না। হাতের মুঠিটা আরও জোর করে গঙ্গামণি চপ্ ধরলো। যেন হাতের মুঠিতে আগলে রেখেছে তার জীবন।

—গাল দিয়ো নাই। থুবো নাই চপ্।

গঙ্গামণি দরজার দিকে আবার এগিয়ে চললো।

মদনবাবু সাপ্টে ধরলেন গঙ্গামণিকে। চপ্ তিনি কেড়ে নেবেনই। রাখ্ চেপে গেছে। ধস্তাধস্তিতে কাড়াকাড়িতে গঙ্গামণির চপ্ গঁুড়ো গঁুড়ো হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটকে পড়লো। বাঁ হাতের চপটা তখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। অনেক কষ্টে।

—হেলোনী মাগি, চপ্ তোকে রাখতেই হবে। খেতে দেবো না। দেখি কেমন করে খাস তুই! মদনবাবু গঙ্গামণির বাঁ হাত চেপে ধরে মোচড় দিলেন।

—চামার,—কাৎরে উঠে গঙ্গামণি মদনবাবুর বুকের পাশেই কামড়ে ধরলো।

মদনবাবু আর্তনাদ করে হাত ছাড়লেন। গঙ্গামণি ছুটে পালাতে গেলে, মদনবাবু হাত বাড়ালেন। শাড়ির ছেঁড়া আঁচলটা হাতে এলো। টান দিতেই গঙ্গামণি বাধা পেলো; ছেঁড়া শাড়ি ছিঁড়ে গেল; এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়, গা থেকে কোমর খুললো।

সমস্ত জোর দিয়েই বুঝি একটা লাথি মেরেছিলেন পেটে মদনবাবু, গঙ্গামণি তীব্র আর্তনাদ করে ঘুরে পড়লো উনুনের ওপর। হুমড়ি খেয়েই পড়েছিলো গঙ্গামণি। গরম জল ভরা টিনটা লাগলো কোমরে—উল্টে পড়লো উনুনের পাশেই। উনুনে জল পড়ে ভ্যাপসা কটু গন্ধ ভেসে উঠলো, বিশ্রী একটা শব্দ হলো আগুনে জল পড়ার। বাকি জলটা গড়িয়ে পড়লো উনুন বয়ে মাটিতে। গঙ্গামণিও টলতে টলতে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে, অসহ্য কাতরানিতে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

কেষ্ট পাথরের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে। তার কোন সম্বিত নেই। কাঠের মত দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখেই যাচ্ছে। কি ঘটছে তা অনুভব করার বোধটুকুও লুপ্ত তার।

রণশেষে মদনবাবু যেন বিজয়ীর মত দাঁড়িয়ে ক্লান্ত শ্বাস ফেলতে ফেলতে গঙ্গামণিকে দেখছেন। নিষ্ঠুর কদর্য একটা হাসি তার মুখে। চোখ দুটো তখনো হিংস্র, অপ্রকৃতিস্থ।

—চপ্ খাবে—? হারামজাদী মাগী! খা চপ্!

মদনবাবু কেষ্টর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আর ব্যাটাচ্ছেলে, রাস্কেল, জোচ্চোর,—তুই! তোর বাপের দোকান এটা? পিরীত করে রাস্তার ছুঁড়ি ধরে এনে চপ্ কাটলেট খাওয়াবি? শুয়োরের বাচ্চা, এক আধ দিন নয়—বচ্ছর ধরে তুমি এই রকম চালাচ্ছো।

মদনবাবু কেষ্টকে আরও কয়েক ঘা কষাবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ গঙ্গামণির মর্মান্তিক একটা আর্তনাদ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। কেমন যেন মনে হলো! এক পা ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে নজর করলেন। কেরোসিনের খুপির লালচে আলোতেও রঙ ভুল হলো না। রক্তই। কাপড়ে, উরুতে, মেঝেতে। ফিনকি দিয়ে ছুটছে।

কী বীভৎস! মদনবাবুর সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠলো। অদ্ভুত একটা ভয় বুকের হাড়ে হাড়ে জমাট বাঁধলো, হৃদপিণ্ডটা যেন নিজের কানের কাছেই উঠে এসেছে।

পাংশু মুখে মদনবাবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কেষ্টই আবার তাঁর নজরে পড়লো। দু মুহূর্তে আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবলেন মদনবাবু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে। তারপর হঠাৎ মানিব্যাগ থেকে কতকগুলো নোট পকেটে পুরে ব্যাগটা তাগ করে ছুঁড়ে দিলেন কেষ্টর বিছানার ওপর। বোঁচা জোড়া করে পাতা কেষ্টর সেই বিছানার অন্ধকারে, কাঁথার ভাঁজে ব্যাগটা হারিয়ে গেল!

—ও! এই—! মদনবাবু কেষ্টর দিকে তাকিয়ে শাসানোর ভঙ্গীতেই কথাটা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলার স্বরে জোর এলো না, 'এখানে এই সমস্ত হচ্ছে? পেট খসানো! আচ্ছা—দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি তোমার। যাচ্ছি থানায়। মানুষ মারার চেষ্টা।'

পরমুহূর্তেই মদনবাবু গঙ্গামণির দিকে এক পলক তাকিয়ে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে পিছন দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন কেষ্ট তা বুঝতে পারলো।

কেরোসিনের খুপির লালচে ম্লান আলোতে রেস্টুরেণ্ট ঘরের দেওয়াল, বালতি, হাঁড়ি, কুঁড়ি যেন তালগোল পাকিয়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। উনুনের আঁচের আভা যেন আভা নয়। একটা চিতাই হবে। তেমনি হিংস্রভাবে তাপ ছড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। কাটা ছাগলের মত লুটোপুটি খাচ্ছে গঙ্গামণি। কী করুণ, অসহনীয়, মর্মান্তিক তার

গোঙানি। রেস্টুরেণ্ট ঘরের বন্ধ বাতাসও সে কান্নায় ককিয়ে উঠেছে।

কেষ্ট পাথর। ভয়ঙ্কর এক জগতে নিসঙ্গ দাঁড়িয়ে সে। বেলসেবুবের সাত অনুচর—সাত অপদেবতায় ঘেরা এই শ্মশান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মত পায়ে জোর নেই তার। ক্ষমতা নেই. এতটুকু। পথ হাঁটতে হাঁটতে কেষ্ট চলে এসেছে সেই মরুভূমিতে যেখানে ঝড় উঠিয়ে, সাপ ছেড়ে, আগুন বৃষ্টি করে বেল-সেবুব ভোজের উল্লাসে মত্ত। গন্ধকের সেই কটু বিষাক্ত হাওয়া ফুলে ফুলে ভূতের নাচ নাচছে। গঙ্গামণির পায়ের কাছে, পেটের কাছে, গায়ে হাতে, মাথায়। গন্ধকের সেই গরম হাওয়া। ভোজের আগে খানিকটা মাংসই সেঁকে নিচ্ছে নাকি শয়তানরা?

—কিষ্টো—কিষ্টো রে, আর লারি। উ মাগো, দায়ে গতর কাটে কোন্ চামারের—? পেট, কোমর কাটে; বাঁচা রে আমায়। বাঁচা। টুকুন জল দে।

জল? কেষ্ট তবু খানিকটা সম্বিত ফিরে পেলো এই জল চাওয়ায়। গেলাসে করে জল এগিয়ে দিলে গঙ্গামণিকে। জল খাওয়ার চেষ্টা করলে গঙ্গামণি, পারলে না। আবার লুটিয়ে পড়লো। বাঁ হাতের মুঠিতে তখনো তার আধখানা চপ।

গঙ্গামণির কটিতটের দিকে এতোক্ষণে ভালো করে চাইলো কেষ্ট। দু হাতের ব্যবধান থেকে। চেয়েই চোখ বন্ধ করলে। সর্বাঙ্গ শিহরিত হবার অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেল তার জিবে আর ঠোঁটে। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। পিছু হঠে ধপ করে বসে পড়লো কেষ্ট দু হাতে মুখ ঢেকে।

হঠাৎ একটা ডাক ছাড়া, ডুকরে ওঠা কান্নার শব্দে চমকে উঠে কেষ্ট, তাকালে গঙ্গামণির দিকে। আথালি পিথালি থেমে গেছে গঙ্গামণির। কাটা ছাগল যেমন শেষ ডাক দিয়ে থেমে যায় তেমনি।

কেষ্টর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। বিস্ফারিত, নিষ্পলক-নয়ন বিমূঢ় চিত্ত সে। পরমাশ্চর্য একটি জীবনকে সে দেখতে পেয়েছে। কেরোসিনের লালচে বিবর্ণ আলোয় অস্পষ্ট একটা মাংসপিণ্ডকে। কোন্ যাদুবলে হঠাৎ গঙ্গামণির জানুদেশে এসে ঠাঁই নিলো এ প্রাণ, এই পিণ্ড? বুকের ওপর দিয়ে যেন রেল গাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে কেষ্টর। অব্যক্ত যন্ত্রণা আর গুরু গুরু। ...

সমস্ত রক্তবিন্দু পাগল হয়ে হৃদপিণ্ডের কাছে ছুটে আসছে।

আলোছায়ার সেই অতল রহস্যের পাতায় গঙ্গামণির শত নাড়ির রক্তের আলপনা আঁকা ছিলো—অদ্ভুত আলপনা, সেই আলপনার স্নেহ-পিঁড়িতে নিশ্চিন্ত একটি প্রাণ নিঃশব্দে পড়ে থাকলো।

গঙ্গামণি একটু থেমে একবার উঠে বসার চেষ্টা ক'রে কাতরে, কঁকিয়ে আবার নেতিয়ে পড়লো।

ছটফট করছে কেষ্ট। পায়চারি করছে পাগলের মত। গঙ্গামণি নিশ্চল, নিস্পন্দ। তবে কি সে মরে গেল? চলে গেল এই পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধভরা বদ্ধ রেস্টুরেণ্ট ঘরের দেওয়াল ডিঙিয়ে, ওই ফুকোর কাটা জালের মধ্যে দিয়ে বাইরের হাওয়ায়—আকাশে?

বিমূঢ় কেষ্ট কি করবে বুঝতে না পেরে এক মগ জল নিয়ে গঙ্গামণির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ঠক ঠক করে তার পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে। খানিকটা জল ছলকে পড়ল গঙ্গামণির পেটে, পায়ে—সদ্যজাতের গায়ে। বাকি জলটা কেষ্ট গঙ্গামণির মুখে মাথায় ঢেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগালো।

দেখছে কেষ্ট। দেখছে এক মনে; দু চোখে অজস্র মমতা আর উদ্বেগ ভরে, গঙ্গামণি একটু কেঁপে ওঠে কি না! আর একবার কাতরে ওঠে কি না!

গঙ্গামণি কেঁপেই উঠলো। আর হঠাৎ—হঠাৎ সেই অস্পষ্ট মাংস পিণ্ডটা কোন্ অজেয় শক্তি বলে কেঁদে উঠলো এতোক্ষণে, এই প্রথম, দুর্বল, অসহায় গলায়।

কেষ্টর সর্বদেহ শিহরিত হলো সেই কান্নার শব্দে। আরও বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে কেষ্ট এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। যেন বনের পথে পথ-ভুলে হাতড়ে মরছে একটা আলোর নিশানা।

কেমন করে যেন অকস্মাৎ, অতর্কিতে কেষ্টর চোখে পড়লো দেওয়ালে আঠা দিয়ে আঁটা সেই ধূলি-ধোঁয়া-মলিন, বিবর্ণ যীশুর ছবির পানে। চোখ পড়ে তো থমকেই থাকে, নড়ে না আর। কেষ্ট যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। অজ এই মুহূর্তে কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ছবিটা! উনুনের আঁচের লাল আভার খানিকটা তির্যক রেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে ছবির গায়—সেই আভায় যীশু আজ আলোকিত।

কেষ্ট পলকহীন। চোখে তার অগাধ বিস্ময়। মন তার হাওয়ায় হাওয়ায় কোথায় বুঝি ভেসে গেছে। মনে পড়ছে অনেক কাল আগেকার একটি দৃশ্য: দোপাটি ফুলের বাগান ঘেরা ইঁট রঙের কাদা মাটির চার্চ। কেষ্টরা গিয়ে বসেছে চার্চের ভেতর। সাদা লম্বা জামা গায় পাদ্রী বুড়ো বাইবেল পড়ছে। চশমাটা নাকের তলায় নামানো। কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে, কাঁপছে তার শিখা। সে আলোয় যীশুর প্রকাণ্ড ছবিটার অন্ধকার ঘোচে না। মুখটা থাকে অস্পষ্ট। পাদ্রী বুড়ো সেই দিকে বার বার চায় আর চাপা গলায় পড়ে- ঠিক এই রকমই হবে: যখন দেখবে ওই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটছে তখন নিশ্চিত জানতে পারবে যে, ধর্মরাজ্য হাতের কাছে এসেছে। আমার কথা বিশ্বাস করো। মাটি এবং আকাশ লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার কথার অন্যথা হবে না। সে সময়ে সেই দুর্ঘটনার পর সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, চাঁদ আর আলো দেবে না এবং সমস্ত নক্ষত্র আকাশ থেকে খ'সে খ'সে পড়বে। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল কাঁপতে থাকবে। তারপর আকাশে মনুষ্য পুত্রের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর সকল জাতি তখন অনুশোচনা করতে থাকবে। তারা দেখতে পাবে, মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রমে এবং মহিমমণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘের ওপর দিয়ে আসছে।'

কী এক অদ্ভুত, তীব্র অনুভূতিতে বেদনায় আকুল হয়ে কেষ্ট তাকালো নীচে, রসুন-পিঁয়াজ, মাংস মশালা এঁটো-কাঁটা ছড়ানো ধোঁয়া-কয়লার কটু বাষ্পভরা রেস্টুরেণ্টের আধো-অন্ধকার মাটির দিকে গঙ্গামণির রক্ত আলপনার পাত্রে সাজানো মাংসপিণ্ডটা যেখানে কঁকিয়ে উঠছে থেকে থেকে!

বিমূঢ়, বিচলিত, বিহ্বল কেষ্ট সেখানে কি যেন দেখছে, কি যেন খুঁজছে!

চিত্র প্রদর্শনী

ছাত্র সংহতি

প্রতীক্ষা—সুশীলকুমার মজুমদার

সম্প্রতি বিডন স্কোয়ারে ছাত্র-সংহতির আয়োজনে যে হস্তলিখিত পত্রিকা, হস্তাক্ষর, শিশু ও শিল্প-শিক্ষার্থীদের অঙ্কিত চিত্রের একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তা নানান দিক দিয়ে প্রশংসার্হ। উদ্যোক্তারা যে নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিরাট প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিলেন তা আজকের দিনে বিরল, তাই এই ধরণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখে সংস্কৃতির এই দুঃসময়ে মনে আশা জাগে। সপ্তাহব্যাপী এই প্রদর্শনী অসংখ্য দর্শক দলে দলে এসে দেখে গেছেন। উদ্যোক্তাদের পরিশ্রম যে অনেকখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই জন্য তারা সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

বহু প্রকারের হস্তাক্ষরের বিচিত্র ও অপূর্ব নমুনার সঙ্গে প্রায় একশত বিভিন্ন হস্তলিখিত পত্রিকার সমাবেশ এই প্রদর্শনীতে করা হয়েছিল। প্রতিটি পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা শিল্পী ও লেখক-দের সহযোগিতায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়েছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

ছোটদের আঁকা ও তৈরী নানান চিত্র ও খেলনার বিভাগটিও নানান দিক দিয়ে আকর্ষক হয়েছিল, একাধিক সার্থক রচনার মধ্যে যেগুলোতে শিশুমনের পুরোপুরি ছাপ আছে বলে মনে হয়েছে বা বিশেষ-ভাবে ভাল লেগেছে, তার মাত্র কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল। নমিতা চক্রবর্তীর (৪ বছর) এবার মাটিতে বসব, মমতা চক্রবর্তীর (৫ বছর) বাড়ির কাছে, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের (৬ বছর) ময়না, কবিতা চক্রবর্তীর (৭ বছর) আদর এবং কলসী হাতে। ১১ এবং ১২ বছরের প্রতিযোগী-দের মধ্যে প্রশান্ত দাসের গো-দোহন, ঊষা করের একটি নক্সা, শুক্লা চট্টোপাধ্যায়ের লাল ঘোড়া, বেবী সেনগুপ্তার মোরগ।

বড়দের রচনার বিভিন্ন বিভাগে গ্রাফিক আর্ট এবং ভাস্কর্যের বিভাগটি বেশি ভাল লেগেছে। যদিও ভাস্কর্যে প্রতীচ্যের অনুকরণ প্রচেষ্টায় শিল্পীদের দৈন্যতাই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশের ভাস্কর্য এমন এক সুমহান্ আসনে প্রতিষ্ঠিত যে, সারা বিশ্বে তার তুলনা নেই। তাই এই দৈন্য বেদনাদায়ক। আজও যে দেশে অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যান্টা, কোনারক, দিলওয়াড়া প্রভৃতির মত শত শত মূর্তি নিদর্শন আমাদের সামনে রয়েছে, তখন কি আমরা শুধু প্রতীচ্যের নকল করেই যাব?

মূর্তিগুলোর মধ্যে অজিত চক্রবর্তীর মাছ ধরার পোড়ামাটির আলংকারিক রচনাটির দিশী ভাব ও ভঙ্গী মুগ্ধ করে। শ্রীদাম সাহার বিয়ের শোভাযাত্রাও ঠিক এ পর্যায়ের একটি সুন্দর রচনা। তাঁর প্রসাধনও বেশ ভাল হয়েছে। শর্বরী রায় চৌধুরীর Marble Head, Girl in pensive mood, At ease Bathing প্রভৃতি বিভিন্ন রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রঘুনাথ সিংহের জুতো পালিশওয়ালার সহজ ভঙ্গীটি বেশ আকর্ষক হয়েছে। সুবলচন্দ্র সাহার নৃত্যশীল গণেশ এবং বৃদ্ধা ঠাকুমার সহজ ও জীবন্ত মুখাবয়বটিও এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ।

গ্রাফিক আর্টের বিভাগটি সব দিক দিয়ে মনোজ্ঞ হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে যেগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে অমল সিংহ বড়ুয়ার 'মাটির 'পরে' একটি
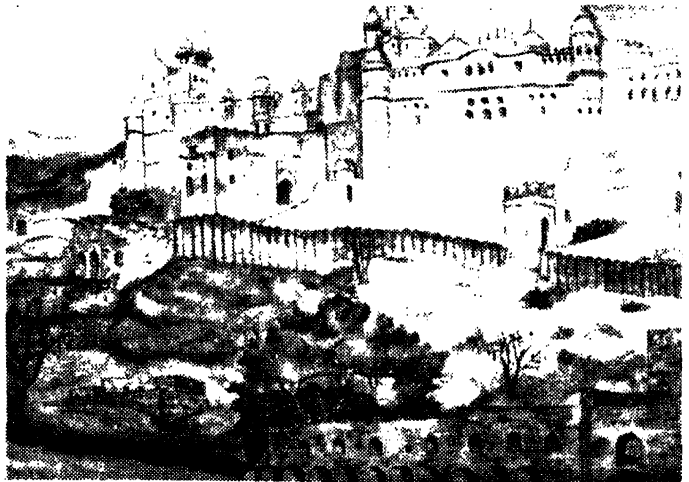
আম্বের—গৌরী দত্ত রায়

তৃষ্ণার নিবৃত্তি—অমরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী

কাঠ খোদাই। অনিমেশ চৌধুরীর কবুতরের বাসার এচিং. বিমলেশ রায়-চৌধুরীর 'বিশ্রাম'এর লিথোগ্রাফ. কল্যাণী চক্রবর্তীর কলকাতার গলির কাঠ খোদাই, মনোজ দাশগুপ্তের কাঠ খোদাই 'ফেলে আসা গ্রাম'। নমিতা মিত্রর কাঠ খোদাই ভোরের আলো এবং সুন্দর এচিংএর ...সুখী পরিবার এবং বিশ্রামের সময়, নন্দ কুন্ডুর এচিং ফেরার পথে. প্রবোধকুমার দাসের রঙীন কাঠ খোদাই হাতে-খড়ি ও প্রসাধন, চুণীলাল দত্তগুপ্তের 'খাটালের' লিথো, মাখনচন্দ্র দাসের দৈনিক মিলনস্থল রঙীন কাঠ খোদাই এবং মুস্তাফা আজিজের পদ্মার এ্যাকোয়াটিণ্ট।

জলরঙের রচনাগুলোর মধ্যে ভারতীয় আঙ্গিকে অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্র বেশ দুর্বল মনে হয়েছে। রচনাগুলির রঙ রেখা ড্রয়িং প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু তবুও তা প্রাণহীন মনে হয়। এর প্রধান দোষ, এগুলো অত্যন্ত বেশি গতানুগতিক। এদের মধ্যে অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Loving Lane এবং Crimson peeps through রচনা দুটি দুর্বল হলেও নতুনের আস্বাদে মন্দ লাগে না। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর দোলনার স্টাডিটি বেশ আকর্ষক হয়েছে; অচিন রায়ের পীর মহম্মদের বলিষ্ঠ প্রতিকৃতি, অসিত সেনের কালি-কলমে আঁকা Roadside inn-ও বেশ ভাল হয়েছে। গণেশচন্দ্র হালুইয়ের at dusk-এর এফেক্ট বেশ ভাল। গোপাল সান্যালের 'Calculating' বেশ জীবন্ত। গৌরী দত্ত-রায়ের রাজপুতানার দুটি রচনা, গোবিন্দজীর মন্দির ও অম্বর, কল্যাণী চক্রবর্তীর নৌকা এবং তপসী কাঁথা, কণকরঞ্জন বিশ্বাস-বর্মণের মীরা, মৈত্রেয়ী সেনগুপ্তের নিরালায়, সুশীলকুমার মজুমদারের 'প্রতীক্ষা', শঙ্কর দাসের 'ঘরকন্না' প্রভৃতি রচনা দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও ভাল লাগে। মুস্তাফা আজিজের Madman এবং শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের Felt hat বেশ জীবন্ত, নির্মলকুমার নাগের Boats for loading অতিরিক্ত সাজানো মনে হয়েছে। রবি মুখোপাধ্যায়ের সাঁওতাল পরগণার স্কেচ এবং শর্বরী রায় চৌধুরীর স্কেচ The confind ভাল।

তেলরঙের রচনাগুলোর মধ্যে অতীন সরকারের ফল এবং ফুল অতিরিক্ত সাজানো মনে হলেও ভাল লাগে। বিভূতি সেনগুপ্তের ফল এবং শাকসব্জী সেদিক থেকে অনেকটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বিমলেন্দু রায় চৌধুরীর দুপুরে বেলার 'আস্তানা' প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। চুণীলাল দাশগুপ্তের জানালার ধারে বেশ

চায়ের দোকান—অসিত সেন

হৃদয়গ্রাহী। তাঁর A start for living মন্দ নয়। কমল চৌধুরীর কলকাতার বস্তী নানান ধরণের রঙ ব্যবহারে নষ্ট হয়েছে। কানাই কর্মকারের কুঁড়েঘরের সম্মুখপট দুর্বল, মৃণাল বর্ধনের 'বৈতরণী' মন্দ নয়। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর 'তৃষ্ণার নিবৃত্তি' দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও এক নতুন প্রচেষ্টার সন্ধান দেয়।

উদ্যোক্তারা ভবিষ্যতে যদি এ ধরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ বিভিন্ন মহাশিল্পীদের রচনার পুরাতন শিল্প-রচনার প্রিন্ট এবং আমাদের দেশের নানান্ শিল্পসম্ভারের ফটো প্রভৃতি সংযোজিত করেন, তাহলে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করা হবে। কারণ আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ও এই সঙ্গে করান একান্ত দরকার; পরিশেষে উদ্যোক্তাদের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি, তাঁদের এই প্রচেষ্টা সর্বত্র অনুসৃত হবে।

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

লণ্ডনে ছোট ছোট শিশুদের জন্য একরকম পোষাক তৈরি হয়েছে, সেগুলি প'রে জলে নামলেও শিশুরা ডুবে যায় না। এ-পোষাক শিশুকে জলের ওপর নিরাপদে ভাসিয়ে রাখতে পারে, এমনকি, এই পোষাক পরে থাকলে শিশু সাঁতার কাটতেও পারে। অবশ্য এতটুকু শিশুকে সাঁতার শেখানর প্রয়োজন হয় না। তবে এ-পোষাকের প্রয়োজন শিশুর কেন হয়! পোলিও রোগে জল চিকিৎসার প্রচলন খুব বেশি এবং এই রোগাক্রান্ত শিশুর জল চিকিৎসা করানর সময় এই ধরণের পোষাকের খুব বেশি প্রয়োজন হয়। এছাড়া জল-চিকিৎসা করতে গিয়ে সহসা ঠাণ্ডা লেগে অন্য রোগ যাতে না ঘটে যায়, তার জন্যে এই পোষাক এমনভাবে তৈরি যে, এতে শিশুর গা ভেজে না।

নতুন ধরণের পোষাকে পোলিও রোগাক্রান্ত শিশুকে জলের ওপর ভাসিয়ে রাখা হয়েছে

*

পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে অর্ধনারী ও অর্ধ-মৎস্য দেহবিশিষ্ট যে জীবটির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে বৈজ্ঞানিকের হাতে কখনও পড়তে হয়নি, কিন্তু বর্তমানে কলকাতা শহরে অর্ধেক কচ্ছপ ও অর্ধেক কাঁকড়া দেহবিশিষ্ট লেজসমেত যে জীবটির আবির্ভাব হয়েছে, তাকে বৈজ্ঞানিকদের কবলে পড়তেই হবে। এই জলচর জীবটি ওজনে আধসের মত হবে, দেখতে একটা খুব বড় কাঁকড়ার মত কিন্তু পিঠের ওপরটা কচ্ছপের মত। এর লেজটি প্রায় আট-নয় ইঞ্চি লম্বা। নতুন জানোয়ারটি রেলওয়ে ইঞ্জিনের একটি জলের ট্যাঙ্কে পাওয়া গেছে, এখনও এটিকে একটি জলের ট্যাঙ্কে রাখা হয়েছে। এখন বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখবেন, এটি কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত জীব। নতুন নামকরণও হতে পারে।

*

আমরা জানি যে, কাগজ জলে ভিজলেই গলে যায়, কিংবা ছিঁড়ে যায়, কিন্তু কোনও একটি কোম্পানী এমন এক ধরণের কাগজ তৈরি করেছে, যেটা ভিজলেও রীতিমত শক্ত থাকে। এই কাগজ তৈরির সময় অন্যান্য সব পদার্থ ছাড়া 'নিও প্রীন ল্যাটেক্স' কাগজের মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই নিও প্রীন ল্যাটেক্সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি কাগজের আঁশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এবং এর জন্যেই কাগজটাকে জলে ভিজে যেতে দেয় না। এই ধরণের নানা রকম কাগজ এখন থেকেই বাজারে চালু হয়ে গেছে।

আর সি এ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী তাদের কোম্পানীতে একটি ১৪ ফুট×১০ ফুট মাপের ঘর তৈরি করেছে। এই ঘরটিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন স্তরের আবহাওয়া কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করতে পারবে। অবশ্য সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৭০০০০ ফিট পর্যন্ত ওপরের স্তরের আবহাওয়া এখানে তৈরি হতে পারে। সাহারা মরুভূমির উত্তাপ ও শুষ্কতা, সাইবিরিয়ার শৈত্য, কিংবা কোনও ঘন বনের আর্দ্রতা, হিমালয়ের শিখরদেশের জমাট বাঁধান ঠাণ্ডা এই একই কামরায় তৈরি হচ্ছে। এখানে পৃথিবীর সাধারণ উত্তাপের চেয়ে ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি উত্তাপ চড়িয়ে এবং শূন্য ডিগ্রির প্রায় ৮৫ ডিগ্রি নীচে উত্তাপ নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কক্ষটিতে উড়োজাহাজ চালকদের শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আবহাওয়ার সঙ্গে এদের খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত করা হয়।

*

বর্তমান প্লাস্টিকের যুগে চশমার ফ্রেম যে প্লাস্টিকের হবে এতে আর নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু প্ল্যাস্টিকের ফ্রেম বড় বিপজ্জনক, এতে আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ডাঃ পল ভ্যান ত্রিশটি এই রকম ফ্রেম নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ত্রিশটিতেই আগুন লাগে এবং এদের মধ্যে ২৬টি খুব বেশী বিপজ্জনক। অনেক সময় মাত্র সিগারেট ধরাতে গিয়েই এতে আগুন লেগে মানুষ পুড়ে গেছে।

আলোচনা

"রূপদর্শীর" প্রসঙ্গে "পরশুরাম"

[দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত "রূপদর্শী"র রচনা প্রসঙ্গে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু তাঁকে যে পত্র লিখেছেন পাঠকদের অবগতির জন্য পত্রখানি আমরা প্রকাশ করলাম। সম্পাদক, দেশ]

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার 'এই কলকাতায়' আর রূপদর্শীর নকশা এতদিনে পড়েছি। পড়তে পড়তে মনে হল আমার বয়স পঞ্চাশ বছর কমে গেছে, আমি একটি আড্ডায় বসে সমবয়সীদের অদ্ভুত আলাপ শুনেছি। বক্তারা কেউ ট্রেকপাল হাই ব্রাউ নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বড় বড় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা যা দেখেছে তারই বর্ণনা নিজস্ব ভাষায় দিচ্ছে, আর আমি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। দু-চারজন ছিজে বুড়ো আড়ি পাতছে আর বলছে, যত সব বিবেকাটে জুটেছে। কিন্তু সরে যাবার নামটি নেই, কান পেতে নিবিষ্ট হয়ে শুনছে।

কলকাতার (এবং সর্বত্র) নানারকম মানুষ আছে, নানারকম ঘটনা ঘটে; কিন্তু তার অল্পই আমরা মন দিয়ে দেখি, দেখলেও প্রকাশ করতে পারি না। আপনি শুধু দর্শী নন, দ্রষ্টাও বটেন, সূক্ষ্মদৃষ্টির সঙ্গে আশ্চর্য প্রকাশ শক্তি আপনার আছে। একদা হুতোম আর টেকচাঁদ যে নতুন পথ আবিষ্কার করেছিলেন তা এতদিন অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে ছিল। সেই বিস্মৃত পথের সংস্কার করে আপনি এবং আরও দু-একজন যাত্রী এগিয়ে চলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমী-টেকচাঁদী ভাষা পছন্দ করেননি। তাঁর আমলে বাঙলা সাহিত্যের সবে সদ্য গড়ে উঠছে। তিনি সে ভাষার প্রধান পথকার ও কর্ণধার ছিলেন, ওই দিকে যেতে ভয় পেতেন। কিন্তু এখন বাংলা ভাষায় পাকা রাস্তা গড়ে উঠেছে, ট্রেড ট্রাঙ্ক রোড আর রেল লাইন হয়েছে। ঝটপট ছুটে চলবার জন্য অটোযান চাই, ধীরে সুস্থে আশেপাশে দেখবার জন্য মেঠো-পথ আর গলিও চাই। আপনি এ আর গিতে চকবীর অভিজ্ঞতা আর রূপগ্রহী জাপান চীনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মামুলী ভাষায় লিখলে সমস্ত তথ্য প্রকাশ পেত না।

আজকাল 'রসোত্তীর্ণ' শব্দটি খুব দেখতে পাই। বোধ হয় এর মানে—এমন রচনা যা পড়লে তৃপ্তি হয় এবং একাধিকবার পড়লে অরুচি হয় না। কিন্তু তৃপ্তিই রসের সবটা নয়, মিথ্যা বর্ণনাও তৃপ্তিকর হতে পারে। যথাযথ প্রকাশও রসের একটি বড় অঙ্গ। আপনি নিজের অনুভূতি পাঠকের মনে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চার করতে পেরেছেন। আপনার স্ল্যাং-বহুল ভাষায় ভূগোল ইতিহাস লেখা চলবে না, কিন্তু আপনি যে রূপ ও রস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার পক্ষে এই ভাষাই উপযুক্ত। এ ভাষাকে কৃত্রিম বা মুদ্রাদুষ্ট বলতে পারি না, কারণ স্থানবিশেষে এর প্রচলন আছে। ইয়ারকি আর রসিকতার উদ্দেশ্যে যেসব বুলি চলে এবং নিত্য সৃষ্ট হয় তাই আপনি সাহিত্যিক প্রয়োজনে লাগিয়েছেন এবং আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

'ঘাঘু' শব্দটি কি আপনার তৈরি? বোধহয় ঘাগী আর ঘুঘু মিশে গিয়ে হয়েছে। এমন সার্থক সমাস রচনা ব্যাকরণের সাধ্য নয়।

এক কথায় বলতে পারি আপনি বাহাদুর লেখক। যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন তাতে যত রস তত তথ্য আছে। আরও দেদার লিখতে থাকুন। —শুভার্থী—রাজশেখর বসু।
২৫-৩-৫৩

এভারেস্ট শৃঙ্গের আবিষ্কর্তা

সবিনয় নিবেদন,

এভারেস্ট শৃঙ্গের প্রকৃত আবিষ্কর্তা কে রাধানাথ সিকদার কি ভাবে এই আবিষ্কারের সহিত জড়িত এবং 'এভারেস্ট' নামকরণের প্রকৃত কারণই বা কি এ বিষয়ে এই পর্যন্ত বহু আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় নাই। স্বামী ভূমানন্দ গত ৩০শে ফাল্গুনের 'দেশে' তাঁহার 'হিমালয় অভিযান' নামক প্রবন্ধে 'এভারেস্ট' নামকরণের যে ইতিহাসের বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে ভারতের একজন ভূতপূর্ব সারভেয়ার জেনারেল মিঃ জি এফ হিলি যে তথ্য কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনস্থ 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি আমি ইতিপূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকা মারফৎ আমাদের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই আশ্বিন, ১৩৫৯)।

মিঃ হিলি জানাইতেছেন যে, এভারেস্ট পর্বত আবিষ্কৃত হয়—অর্থাৎ কার্যক্ষেত্র হইতে আনীত তথ্যাদি দ্বারা এভারেস্টের উচ্চতা নির্ধারিত হয়—১৮৫০ সালের প্রথম দিকে দেরাদুনে সারভেয়ার জেনারেল ফিল্‌ড্ অফিসে। রাধানাথ সিকদার সেই সময়ে সারভে ডিপার্টমেণ্টের প্রধান computor ছিলেন। তাঁহার পক্ষে "হিমালয়ের অন্যান্য শৃঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া উচ্চতম শৃঙ্গ গৌরীশঙ্করকে তিন দিক হইতে জরীপ" করা সম্ভব ছিল কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। প্রথমতঃ রাধানাথের উপর ভার ছিল হিসাবকার্যের। প্রকৃত জরীপ কার্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। দ্বিতীয়ত, মিঃ হিলি জানাইয়াছেন যে, রাধানাথ ১৮৪৯ হইতে পরবর্তী দশ বৎসর কলিকাতায় সম্পূর্ণ অন্য কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

মিঃ হিলির পত্র হইতে আরও জানা গিয়াছে, যে সময়ে এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কৃত হয় সে সময়ে স্যার জর্জ এভারেস্ট ভারতের সারভেয়ার জেনারেল ছিলেন না—তিনি প্রায় নয় বৎসর পূর্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। (স্যার জর্জকে স্বামী ভূমানন্দ তাঁহার প্রবন্ধে "জরীপী দলের অধিনায়ক" হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন)। সেই সময়ে ভারতের সারভেয়ার জেনারেল ছিলেন স্যার অ্যান্ড্রু অ (Sir Andrew Waugh)। তিনি প্রকাশ করেন যে, স্যার জর্জের অতীত কার্যের ফলেই এই অভিনব আবিষ্কারটি সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁহার সুপারিশে ভারত গবর্নমেণ্ট এই শৃঙ্গের নাম 'এভারেস্ট' রাখিতে সম্মত হন। ভূতপূর্ব সারভেয়ার জেনারেল মিঃ হিলির এই সকল উক্তি সত্য কি না তাহার বিচার করিতে পারেন একমাত্র সারভে অফ ইণ্ডিয়া।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বামী ভূমানন্দের মূল আলোচনার সহিত ইহা বিশেষভাবে জড়িত না হইলেও এই প্রসঙ্গ অবতারণার প্রয়োজন মনে করিলাম, কারণ এভারেস্টের আবিষ্কার অথবা নামকরণ সম্বন্ধে জনসাধারণ এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন ইহা কখনই কাম্য নয়।

বিনীত,
অরুণ চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া

ট্রামে-বাসে

যাত্রীবাহী ট্রামে-বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ করিবার আইন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিনা বাধায় পাশ হইয়া গিয়াছে। —"বোঝা গেল যে-সমস্ত

ব্যাপারের পরিণতি শুধু ধোঁয়ায়, সেখানেই সরকার আর বিরোধী দল একমত!"

* * *

কলিকাতায় কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেওয়ার পর হইতে সরকারী তরফ হইতে রাস্তায় কাটা-ফল বিক্রয় বন্ধ করার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। —"যেমন ফুটবল মরশুম সমাসন্ন হয়ে এলেই বছরে একবার অনেকেই স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবৃতি ছাড়েন"।

* * *

কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ যদি কোনদিন হয়, তবে তাহা হইবে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির নির্ধারিত সর্ত অনুসারেই—বলিয়াছেন আচার্য কৃপালনী। বিশু খুড়ো বলিলেন "অর্থাৎ সোজা কথায় এই সর্তটা হবে তোমার জরু, আমার জরু, আমার জরু আমার জরু"।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিবরণীতে জানা গেল যে, রাজভবনে সদ্য-নির্মিত রান্নাঘরটির খরচ পড়িয়াছে চুয়ান্ন হাজার টাকা। সহযাত্রীদের মধ্য হইতে কে খোনাসুরে বলিয়া উঠিলেন—"বাঁপরে, যাঁর নঁখের ডঁগা 'এমন নাঁ জাঁনি সেঁ কিঁ রেঁ"।

* * *

নিখিল ভারত খাদ্য সংরক্ষণ সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে কৃষিমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেশে নাই বলিয়া এক প্রদেশের খাদ্য অন্য প্রদেশে প্রেরণেরও কোন সুবিধা হইতেছে না। শ্যামলাল বলিল—"এই যেমন বাঙলার কচুপোড়া একটি অতি উপাদেয় এবং লোকপ্রিয় খাদ্য, অথচ সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাবে অন্যান্য প্রদেশ এর অপূর্ব ভাইটামিন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন"।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সম্পূর্ণ অংশ রেকর্ড করিবার জন্য নাকি একটি যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —"ব্যবস্থাটা উত্তম বলে স্বীকার করা গেল না; যন্ত্রহীন সভাকক্ষে গোলে হরিবোল দেওয়ার যে মৌলিক অধিকার সদস্যদের ছিল, সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় তা হয়ত ব্যাহত হলো"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

দিল্লী সরকার চীনকে দিয়াছেন 'আশা'; শুনিলাম শীঘ্রই বৃটেনে 'লক্ষ্মীকে' পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আশাও গেল, লক্ষ্মীও যাইতেছেন, আমাদের জন্য বাকী রহিল শুধুই হাতী!!

* * *

সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে উন্মাদ রোগ নাকি মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। —"গ্রামবাসী হয়ত জানেন না যে, চব্বিশ ঘণ্টায় উন্মাদ রোগ সারানো সম্ভব। তার জন্যে প্রয়োজন শুধু পাঁচটি সরষের। কিন্তু এই সরষে সংগ্রহ করতে হবে এমন বাড়ি থেকে যেখানে কোন পাগল নেই। প্রয়োজন হলে খুঁজে দেখতে পারেন"—মন্তব্য করেন এক সহযাত্রী।

* * *

খাজা নাজিমুদ্দীন নাকি সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ভারতের সঙ্গে যে কোন আপোষ-আলোচনা করিতে তিনি
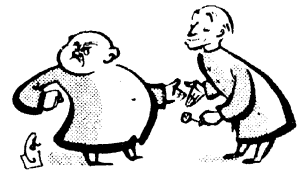
প্রস্তুত, কিন্তু এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল বাড়াইয়া দিতে তিনি রাজী নহেন। —"ভারত কিন্তু ডান হাতের 'বদ্ধমুষ্টি' দেখেও বাম হস্তের সঙ্গে করমর্দনে প্রস্তুত"!

* * *

জেনারেল নাগিব বলিয়াছেন যে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে বিনাসর্তে অবিলম্বে মিশর ত্যাগ করিতে হইবে অন্যথায় মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হইতে

হইবে। —"এর পরও অপমান করবে বলে শাসিয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধানের জন্যে মিঃ চার্চিল ইডেন সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছেন"—এ সংবাদ খুড়ো কোথায় সংগ্রহ করেছেন, তা তিনিই জানেন!

(৩৫)

পত্রখানি দীর্ঘ পত্র। পত্রের পাঠ দেখেই শান্তি বিস্মিত হল।

শুভ আশীর্বাদ ও যথোচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ

ভ্রাতাজীবন শ্রীমান কার্তিকচন্দ্র— আপনি সম্পর্কে আমার স্নেহাস্পদ হইলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, দেশের সম্মানে ও রাজার অনুগ্রহে মাননীয় ব্যক্তি। সর্বদেশে এবং সর্বকালে পুত্র রাজা হইলে তাহাকেও সম্মান প্রদর্শন শাস্ত্রবিধি এবং আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি; সেইহেতু একই সঙ্গে আপনাকে উভয়বিধ সম্বোধনে সম্বোধিত করিলাম। আশীর্বাদ করিলাম বলিয়া রুষ্ট হইবেন না বা সম্মান জ্ঞাত করিলাম বলিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না।

আমাকে অবশ্যই একটু স্মরণ করিতে পারিতেছেন। আমি ৺কৈলাসবাবুর জামাতা ৺স্বর্ণভূষণের দ্বিতীয়া ভগ্নি ৺প্রমদাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমার নাম শ্রীসন্তোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাথায় খর্ব, কাঁচাপাকা চুল, গৌরবর্ণ, ঘরজামাইটিকে মনে পড়িবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। তবে আজ প্রায় বিশ বৎসর নবগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এই বিশ বৎসরের মধ্যে অনেক ধূলামাটির সঙ্গে জীর্ণ হইয়া একেবারে লয় প্রাপ্ত হইয়াছি কিনা বলিতে পারি না। আপনাদের জীবনে বহু উন্নতি ঘটিয়াছে, আপনার পিতা ব্রহ্মার মত কীর্তিমান ছিলেন—বহুসৃষ্টিতে নবগ্রামকে নবগৌরবে নবীন করিয়া গঠন করিয়াছিলেন, অমরাবতী তুল্য গোপীচন্দ্র পল্লী গঠন করিয়াছিলেন, সেখানে আপনারা ইন্দ্রের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আশীর্বাদ করি, ধর্মকে আশ্রয় করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনকরত এই ইন্দ্রত্বে আপনারা অবিচলিত গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকুন।

আপনাকে আজ আপনার বহুবিধ এবং বহু গুরুত্বের কর্মের মধ্যে যে কারণে বিরক্ত করিতেছি, তাহা যদি আপনার পক্ষে প্রীতিপ্রদ, সুখকর না হয়, তাহা হইলে আমাকে বৃদ্ধ জ্ঞানে মার্জনা করিবেন। ৺রাধাকান্ত বাবু একদা অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অবজ্ঞাত অবস্থাতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্র বর্তমানে কোথায় এবং কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সেই সংবাদ জানিবার জন্যেই আপনাকে পত্র লিখিতেছি। ইহার পূর্বে শ্রীমান কিশোরের নিকট হইতে তাহাদের সংবাদ পাইতাম। মধ্যে পত্রাদি বন্ধ ছিল। কিছুদিন আগে কিশোরকে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পত্রের কোনই উত্তরাদি পাই নাই। অনুমান করিতেছি, সম্প্রতি দেশে যে রাজনীতি সংক্রান্ত আন্দোলন হইতেছে, দেশব্যাপী কারাবরণের যে অভিযান চলিতেছে, শ্রীমান কিশোর সেই অভিযানের সহিত যোগ দিয়া কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবে। অগত্যা ৺রাধাকান্ত বাবুর পত্নীর নামে পত্র দিয়াছিলাম, সে পত্র ফিরিয়া আসিয়াছে, ডাকপিওন— লিখিয়াছে মালিক এখানে নাই—কেহ ব্যক্তিকে পত্র লিখিয়া ভরসা করি না।

আপনি ওখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনি অবশ্যই তাহাদের সংবাদ রাখিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। এযাবৎ কিশোরের সঙ্গে পত্রালাপের মধ্যে তাহাদের সম্পর্কে যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে তাহারা আপনার স্নেহ-প্রীতির পাত্র ছিল না। ৺রাধাকান্ত যে সেকালে রাজ-প্রতিনিধি কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহার মূলে আপনার গোপন পরিচালনা ছিল, সে কথা আমি ভাল করিয়াই জানি। দেবতা পূজার জন্য যে ফুল ৺রাধাকান্ত তুলিতেন না বা অন্য কাহাকেও তুলিতে দিতেন না—আপনারা অন্যধর্মী রাজ্যের মুসলমান প্রতিনিধির জন্য সেই ফুল চাহিয়া পাঠাইলে তিনি গভীর আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াও না দিয়া পারেন নাই, রাজশক্তিকে তাঁহার নিদারুণ ভয় ছিল, কিন্তু ফুল দিয়া আত্মগ্লানির ক্ষোভে তিনি ওই গোলাপ গাছটি সমূলে ছেদন করিয়াছিলেন। এ কথা ৺রাধাকান্তবাবুর সান্ধ্য মজলিসে আপনি আসিয়া ৺রাধাকান্তবাবুর বালক পুত্রটির মুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন এবং আপনিই সে কথা ওই মুসলমান রাজ-কর্মচারীটিকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি। আমি সেদিন ওই সান্ধ্য আসরে উপস্থিত ছিলাম। কিশোর আমাকে লিখিয়াছিল— এই কারণটি স্মরণ করিয়া, বোধ করি— মনে মনে গ্লানি অনুভব করিয়া আপনি ইদানীং তাহাদের উপকার করিবার

চেষ্টাও করিয়াছিলেন। আপনার মনোভাবের পরিবর্তনের কথা জ্ঞাত হইয়া আমি আপনাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলাম। এবং ওই মাতা-পুত্রটি সম্পর্কে আশ্বাস অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সত্য বলিতে কি, ভরসা করিতে পারি নাই। কারণ রাধাকান্তের তেজস্বিনী স্ত্রীটিকে আমি চিনিয়াছিলাম। তিনি আপনার সাহায্য লইবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এ মেয়েদের জাত আলাদা। ইঁহারা স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কালীমূর্তিতে স্বামীকে ভীত করিতে পারেন—আবার পিতার মুখে স্বামী নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করেন। আপনার সহানুভূতি এবং সাহায্য তাঁহার পুত্রের পক্ষে, তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইলেও তিনি কি তাহা লইবেন? লইবেন না বলিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল।

কিশোরের পরবর্তী পত্রে আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। জানিয়াছিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, উপরন্তু আপনার সঙ্গে বিরোধেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমি সে সময় তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও ভরসা করিয়া লিখিতে পারি নাই। তাঁহাদের আপনার সহিত বিরোধে অকল্যাণ হইবারই কথা; সেই আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের অকল্যাণ সংবাদ শুনিবার জন্য কিশোরের সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করিয়াছিলাম। কিশোর সে পত্রে লিখিয়াছিল—'রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী কাশীর দিদির ভাবভঙ্গী দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু ইহাতে যে একটা বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ। কীর্তিবাবুর সঙ্গে বিরোধের অর্থ আপনি অনুমান করিতে পারেন। তিনিও তাঁহার ধৈর্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি শ্যামসাগর পুষ্করিণীর কথা অবশ্যই স্মরণ করিতে পারেন। ওই পুষ্করিণীটির চৌদ্দ আনা অংশের মালিক এখন কীর্তিচন্দ্র বাবু, দুই আনার মালিক 'রাধাকান্ত বাবুর পুত্র গৌরীকান্ত। কীর্তিবাবু ওই পুষ্করিণী সংস্কার করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গৌরীকান্তের দুই আনা অংশ তাঁহাকে বিক্রয় করা হউক। তিনি উপযুক্ত মূল্য বা উহার বিনিময়ে কোন ছোট পুষ্করিণী দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 'রাধাকান্ত বাবুর স্ত্রী ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কীর্তিবাবুকে আঘাত করিয়াছেন; বলিয়াছেন, বিক্রয় বা বিনিময় কোন মতেই করিব না; তবে তাঁহাকে দিতে পারি যদি তিনি আমাদের নিকট দান বলিয়া গ্রহণ করেন বা—তিনি আমার স্বামীকে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে মতি দিয়াছিলেন—তাহারই প্রতিদান দক্ষিণা হিসাবে ইহা গ্রহণ করেন। বুঝিতে পারিতেছেন—ইহার পরিণাম কি? 'রাধাকান্তবাবুর পুত্রকেও আপনি জানেন, দেখিয়া গিয়াছেন তাহার কৈশোরের মতিগতি, সে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে আমাকে অতিক্রম করিয়াছে, যাহাতে আজ আমি ভয় পাইতেছি, তাহাতে সে ভয় পায় না। আমার পথেই তাহার গতি গণ্ডীবদ্ধ নয়, পত্রযোগে সকল কথা লিখিতে পারি না। সেও তাহার মায়ের পাশে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় মায়ের সঙ্কল্প অপেক্ষাও তাহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর। সংঘর্ষ যত আসন্ন হইয়া আসিতেছে—তাহার দৃঢ়তা তত কঠোর উল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। আমি শঙ্কান্বিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। অশুভ একটা কিছু ঘটিবে ইহা নিশ্চয়।"

ইহার পর আমি আর কিশোরকে পত্র লিখি নাই। কিশোরও কোন পত্রাদি

লেখে নাই। অনুমান করিয়াছিলাম—আপনার বিরাগভাজন হইয়া আপনার সহিত বিরোধ করিয়া তাহারা প্রায় বিনষ্টের মতই দিন যাপন করিতেছে। ইহা অবশ্য আমি জানিতাম—নবগ্রামে থাকিবার কালেই অনুমান করিয়াছিলাম। ভাবীকালে আপনাদের সহিত রাধাকান্তের সন্ততির সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কাল আপনাদের সহায়। যতকাল বর্তমান রাজশক্তি অটুট আছে--ততকাল আপনার ভাগ্যবল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেই-হেতু রাধাকান্তের সন্ততির পরাজয়ও ঘটিবে। এই সত্যকে অনুমান করিয়াই নীরব ছিলাম; কারণ কালের গতিতে কালেই ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে।

সম্প্রতি অনেক দিন পরে অকস্মাৎ বিশেষ একটি ঘটনায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি। রাধাকান্তবাবুর স্ত্রীপুত্রের সংবাদের জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি তাহাদের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহার কারণ কিঞ্চিৎ আছে। এখানে যেখানে রহিয়াছি এ স্থান আমার প্রথমা স্ত্রীর পিত্রালয়। যখন বিবাহ করিয়াছিলাম—তখন এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট চক্রে আমার পিতার চক্রান্তে আমি বর্ধমান জেলায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে বাধ্য হই। সেখান হইতে তোমাদের গ্রামে গিয়া তৃতীয় বিবাহ করিয়া বাস করি। প্রমদার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হইয়া কিছুদিন ঘুরিয়া অবশেষে এখানেই ফিরিয়া আসিয়া প্রথমা স্ত্রীর নিকটেই রহিয়াছি। শেষ বয়সে একটি কন্যা সন্তানও হইয়াছে। আমার শ্বশুর মহাশয় ছিলেন এখানকার বিখ্যাত পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার পুত্র আমার শ্যালক সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী নবীশ। শুধু তাই নয়। তিনি একালের যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য বিবাহাদি না করিয়া নানারূপে আন্দোলন করেন—তাঁহাদেরই একজন। তিনিই আমার কন্যাটিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন—লেখাপড়া শিখাইতেছেন। ইহার উপর আমার হাত কি? আমার প্রথমা পত্নী পরমা সাধ্বী আমার অনুগামিনী হইলেও কন্যার ভবিষ্যৎ ও বিবাহাদি সম্পর্কে ভ্রাতার মতকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। নিতান্ত অসহায়ের মতই আমাকে শুনিতে হয়—ভাবিতে হয় কাল হইতে কালান্তরের পথে এমনি বহুবিধ ভাঙাগড়া হইয়া থাকে। কুল কৌলীন্য সবই যাইতে বসিয়াছে—যাইবেও। স্বাভাবিকভাবেই যাইবে। দেবত্বহীন প্রতিমার মত বিসর্জিত হওয়াই ইহার নিয়তি। গুণ গিয়াছে—কৌলীন্য কোন অধিকারে থাকিবে? তবুও ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে কন্যার পিতা হিসাবে তাহার ভবিষ্যত চিন্তা করি। কন্যার বয়স এখন অল্প তবুও ভাবি। বিবাহের কথাও ভাবি। সেই চিন্তার কথা পত্নীকে সসংকোচে বলিয়া থাকি। তিনি হাস্য সহকারে বলেন—বেশ তো আপনি গুণবান কৌলীন্য মর্যাদা সম্পন্ন পাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিন। যাহাতে শিক্ষিতা হইয়াও কন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামীর অনুগত হইতে পারে। সুখ-দুঃখের সম অংশীদার হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে। সেই সম্পর্কেই ভাবিতে গিয়া রাধাকান্তবাবুর পুত্রের কথা মনে পড়িতেছে। তাহার সহিত আমার এই কন্যার বিবাহের কথা সম্ভবপর নয়; কারণ বয়সের পার্থক্য অনেক। রাধা-কান্তের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। তবুও মনে পড়ে। কারণ নবগ্রামে থাকিতে মধ্যে মধ্যে মনে হইত আহা আমার যদি একটি কন্যা হয়, তবে এই বালকটির সঙ্গে বিবাহ দিই। কথাটি প্রথমে মনে হইয়াছিল সেইদিন—যেদিন বালকটি তাহার পিতার সান্ধ্য মজলিসে আপনার সমক্ষে ওই গোলাপ গাছ কাটার কথা প্রকাশ করিয়াছিল সেই দিন। মধ্যে মধ্যে মনে হইত। তাহার পর ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। বর্তমানে কন্যার কথা ভাবিতে গিয়া মনে পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের স্বপ্ন দেখিতেছি। কয়েকদিন স্বপ্ন দেখিয়া কিশোরকে পত্র লিখিয়াছিলাম সংবাদ জানিবার জন্য। কিন্তু পত্রের উত্তর পাই নাই। দ্বিতীয় তৃতীয়বারও লিখিয়াছি। তাহাতেও উত্তর না পাইয়া গৌরীকান্তের নামেই পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার পত্র ফিরিয়া আসিয়াছে।

এই কারণেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদের কোন্ পরিণতি ঘটিল? ক্রমে ক্রমে এই চিন্তা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়া আমাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছে। আমার এই চিত্তের কাতরতার পরিমাণ আপনাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করাইবার জন্যও বটে এবং মনের আবেগ বশতও বটে—এত দীর্ঘ পত্র লিখিয়া বসিলাম। তাহাদের সংবাদ এবং ঠিকানা আমাকে অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে আমি সুখী হইব। আপনাকে আশীর্বাদ করিব। আপনার মঙ্গল হইবে।

পরিশেষে পুনরায় আশীর্বাদ এবং সম্মান জ্ঞাপনান্তে নিবেদন ইতি—

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বিনয়াবনত
শ্রীসন্তোষচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

পত্রখানি পড়া শেষ করে শান্তি হাত বাড়িয়ে ফিরিয়ে দিতে গেল গুণীকে।

গুণী হেসে বললে—আমাকে না। ওটা গৌরীদাকে দিন।

গৌরী হাত বাড়িয়ে পত্রখানি নিয়ে পড়তে শুরু করলে।

শান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি চললাম গৌরী দা। গুণীবাবু—

—গুণীবাবু না। গুণী-দা বল তুমি। তুমি প্রমদা পিসীমার সপত্নী কন্যা হলেও কন্যা। সম্পর্কে বলতে গেলে গৌরীদার সঙ্গেই নেই। আমার সঙ্গে আছে। আমি তোমার দাদা। তুমি আমার বোন।

শান্তি তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। (ক্রমশ)

রঙ্গ দেশের ক্রীড়া পরিচালনায় রঙ্গ

শ্রীসন্ধানী

"এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু রঙ্গ ভরা"

গুপ্ত-কবি বঙ্গ দেশে কোন্ রঙ্গ দেখিয়া এই ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন তাহা জানি না। কিন্তু কলিকাতার সাম্প্রতিক ফুটবল কেলেঙ্কারীর কথা বিবেচনা করিলে স্বভাবতঃই এই সন্দেহ মনে উদয় হয় যে, অতীতের গুপ্ত বোধহয় বর্তমানের অন্য এক গুপ্তের কথা কল্পনা করিয়াই এই কটু রস পরিবেশন করিয়াছিলেন।

আই এফ এর নৌকার মাঝি তিনি। পদ্মাপারের লোক, তাই পাকা মাঝিও বটে। হালে পানি না পাইলেও পালে তার হাওয়ার অভাব নাই। আই এফ এর শতছিদ্রপূর্ণ তরণীকে এঘাট ওঘাট করিয়া আঘাটায় ভিড়াইতে তাহার কোন অসুবিধাও হয় না, আপত্তিও হয় না।

ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ৬ই মার্চ আই এফ এর কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভাতে। ১৯৫৩ সালের ফুটবল মরশুম আগতপ্রায় হইলেও তাহা ১৯৫২ সালের ফুটবল কেলেঙ্কারীর রাহুকবলিত। মনে থাকিতে পারে যে, গত বৎসর প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের নিম্নদেশে তিনটি দল—উয়াড়ি, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও জর্জ টেলিগ্রাফ—একই স্থানে ভীড় করাতে আই এফ এ সেক্রেটারীর অবস্থা হইয়াছিল ভাঁড়ের ন্যায়। সেক্রেটারী এখন এক হাজারী মনসবদার অর্থাৎ হাজার টাকা বেতনভোগী কর্মচারী। কিন্তু এমনি তাহার যোগ্যতা যে, না পারিলেন তিনি আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা শেষ করিতে, না পারিলেন লীগের অবতরণ সমস্যার সমাধান করিতে। তবে সত্যের খাতিরে এই কথা বলিতেই হইবে যে, তিনি পারিলেন না, কি করিলেন না, এই সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে।

ফুটবল পরিচালনার কূটনীতি সম্পর্কে যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাহারা সত্যই সন্দেহ করেন যে, সেক্রেটারীর এই অযোগ্যতা বহুলাংশেই অনিচ্ছাপ্রসূত। সমস্যার সমাধান না হওয়াতে তাঁহার মানহানি অথবা মানের হানি হইয়াছে বটে; কিন্তু সমস্যার সন্তোষজনক (?) সমাধান না হইলে সেক্রেটারী হিসাবে তাঁহার প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। এই সমস্ত সমালোচক বলেন যে, তিনি বাঁচিবার জন্যই মার খাইয়াছেন। অর্থাৎ সেক্রেটারিত্বের জন্য এই অসমাধান ছিল অপরিহার্য, অতি প্রয়োজনীয়।

মাত্র এক বছর আগের ব্যাপার; সুতরাং জনসাধারণের মনে না থাকার কারণ নাই। যখন ফুটবল লীগে দিনে দিনে এই ত্রিকোণ সমস্যার সৃষ্টি হইতেছিল তখন আই এফ এর খেয়ার মাঝি ক্রিকেট জাহাজের কাপ্তেন হইয়া ছিলেন ইংলণ্ডে। সেইখানে সেই সময়ে মানকড়ের মানভঞ্জনের পালাতে বিশেষ দূতীর ভূমিকাতে তিনি এমন বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্বদেশে ফুটবল সামলাইবার শলাপরামর্শ দিবার সময় তাঁহার ছিল না। অথচ তাঁহাকে বাদ দিয়া এই সমস্যা সমাধানের সাহস কাহারও ছিল না। সুতরাং আই এফ এর জনৈক আইন বিশারদসদস্যের ভাষাতে,

"The problem was profitably allowed to remain a problem so that a personal solution could be enforced at a more opportune time".

এই ত্রিকোণ সমস্যা ছিল সাধারণ ত্রিভুজনীতির ব্যক্তিগত। ত্রিভুজের যে কোন দুইটি বাহু তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড়। কিন্তু এই ত্রিকোণের যে কোন একটি দিক ছিল অন্য দুইটি দিক অপেক্ষা বড়। আই এফ এর যাহারা পরিচালক তাহারা আই এফ এ প্রেমিক, ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জামার অস্তিত্ব শরীরের সন্নিকটে হইলেও ত্বকের অস্তিত্ব নিকটতর।

(The shirt may be next to the body, but the skin is nearer).

আই এফ এর জন্য দরদের অভাব তাহাদের নাই, কিন্তু উয়াড়ি বা স্পোর্টিং ইউনিয়নের অবতরণে যে কেহ মরমে মরিয়া যাইবেন।

তাই, সমস্যা রহিয়া গেল সমস্যা। আই এফ এর আকাশের ঈশান কোণে দেখা দিল একটি কালো মেঘ। ঝড়ের পূর্বাভাষ বুঝিয়া আই এফ এর জীর্ণ মাঝি-মাল্লারা "বদর, বদর" করিয়া উঠিল। হালে পানি ছিল না বটে, কিন্তু এই ঝড়ে পাল ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল হাওয়াতে। সুযোগ বুঝিয়া সুকৌশলে তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন তদন্তের; গঠিত হইল তদন্ত কমিটি। কুটিলতার পথে সমস্যার জটিলতা কমিয়া আসিল।

তাও প্রৌঢ়ার প্রৌঢ়ত্বের উপর পাউডারের প্রলেপ। ইহা আড়াল করে, আলোকসম্পাত করে না। শান্তির বাণী প্রচারের পশ্চাতে যেমন থাকে যুদ্ধ-সজ্জা তেমনি তদন্তের পশ্চাতে আছে জনমতকে প্রতারিত করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক নিয়মসম্মত অভি-সন্ধি। আই এফ এর তদন্ত তাই শুরু হইল, কিন্তু শেষ হইল না। ...ইহা সমস্যাকে আরও সমস্যাপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য সৃষ্টি করা হইল নূতনতর সমস্যা।

গভীর জলের মাছ যাহারা তাহাদে[র] পক্ষে জল গভীরতর হইলেই সুবিধা হ[য়] অধিকতর। তাই অবতরণের সমস্যা[কে] ধামা-চাপা দিয়া তাহারা নূতন জিগ[ির] তুলিলেন। বলিলেন যে, ফুটবল মরশু[ম] অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হইয়া উঠিয়াছে ইহার সঙ্কোচ আবশ্যক, সুতরাং লীগে[র] দ্বিতীয়ার্ধ পরিবর্জন করা সঙ্গত অথচ ফুটবল এত জনপ্রিয় খেলা [যে] ইহার অতিরিক্ত সঙ্কোচ অবিধে[য়]। সুতরাং তাহারা মাঝামাঝি বন্দোব[স্ত] করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, প্রথম বিভ[াগ] লীগে দল বৃদ্ধি করিয়া ১৪ হইতে [...] করা হোক এবং লীগের দ্বিতীয় [ার্ধ] পরিত্যক্ত হোক।

এই নূতন চালেই তাহারা অবত[রণ] সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিরুদ্ধ [...] গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকে বানা[চাল] করিলেন। নূতন প্রস্তাব লইয়া আলোচনা এমন তুমুল হইয়া উঠিল যে পুরাতন

অবতরণ সমস্যা তলাইয়া গেল অবতলাতে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, কালীপুর এরিয়ান্স ও রাজস্থানের ক্ষমতাশালী দলগুলি করিল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা। অথচ এই নূতন প্রস্তাবে ছিল ১৪জন সভ্যের স্বাক্ষর। কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে নিয়োগ করিল সর্বশক্তি।

তাহাদের অবস্থা হইল এক-চক্ষু হরিণের মত। যে দিকে তাহাদের সজাগ দৃষ্টি সেদিক হইতে যে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। অবতরণের সম্মুখীন দুইটি দলের দুই মরমী ধুরন্ধর ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া করিলেন তাহাদের বিভ্রান্ত। ঠিক এই সময়ে হইল আই এফ এর সভা। সভায় প্রথম পর্যায়ে বাকযুদ্ধ হইল প্রথম দলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়ার্ধের খেলা বাদ দিবার প্রস্তাবকে উপলক্ষ করিয়া। মনে হইল সকলেরই মনোভাব "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"

ঠিক এই সময়ে বোড়ের চালে খেলা মাৎ করিলেন আই এফ এর মাঝি। তিনি এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবিবর্জিত প্রস্তাব পেশ করিলেন। বুদ্ধিমান লোক, পরাজয় স্বীকার করিয়াই জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। সকলেই যখন সংগ্রামশীল তখন মাঝদরিয়ায় নৌকাডুবির আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়া তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। লীগের দ্বিতীয়ার্ধ খেলার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ দলকে প্রশমিত করিলেন। সদরে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দ্বার খুলিয়া তিনি দল বৃদ্ধিতেও সকলকে সম্মত করাইলেন। তবে বর্ধিত শক্তি ১৮ নহে, মাত্র ১৫টি দল। বলিলেন, ইহাও মাত্র এই বৎসরের জন্য। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর একটির বদলে প্রথম বিভাগ হইতে দুইটি দলকে অপসারণ করা হইবে। সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রথম বিভাগ লীগে দল-সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে এবং তখন লীগের দ্বিতীয়ার্ধ প্রাণ ভরিয়া খেলিলেও ফুটবল মরশুম দীর্ঘায়িত হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

সাধু প্রস্তাব, সুতরাং বিপদ মিটিয়া গেল। কেবল যে কয়টি দলের অবতরণের আশঙ্কা ছিল তাহারা রহিয়া গেল প্রথম বিভাগে। নূতন সমস্যা সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবতরণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইয়া গেল। আই এফ এর মাঝি-মাল্লার করুণাতে হাবুডুবু খাইতে খাইতেও উয়াড়ী এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। জর্জ টেলিগ্রাফেরও সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস হইল।

এই রঙ্গ বঙ্গদেশেই সম্ভব।

শ্রীশ্রীমাতৃদেবী বলরাম মন্দিরে

শ্রীআশুতোষ মিত্র

তখন শ্রীশ্রীমার নিকট মাতৃভক্ত মেনীর মা বসিয়াছিলেন, যখন লেখক সেখানে উপস্থিত হইল। সে মেনীর মাকে পূর্বে কখনও চিনিত না। তাহাকে দেখিয়া মেনীর মা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইনি কি আমাদের মহারাজের ভাই? শ্রীমা বলিলেন—হ্যাঁ, সারদার (স্বামী ত্রিগুণাতীতের) বিষয় জানতো? মেনীর মা জিজ্ঞাসিলেন—কি না, কোনটা বলছেন? শ্রীমা বলিতে লাগিলেন—একবার বর্ধমান হয়ে দেশে যাচ্ছি। সারদা সেই মোটা শরীরে কাঁধে লাঠি হাতে গরুর গাড়ীর আগে আগে যাচ্ছে। দামোদর পার হয়ে খুব খানিকটা গেয়েছি, রাত্রি অনেক হয়েছে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো, ভাঙ্গাতে দেখি—রাস্তার একধার থেকে বানের জল অপর ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তাটা মাঝখানে ভেঙ্গে গিয়েছে, আর জল হুড় হুড় করে বেরুচ্ছে। সেখানে গাড়ী পার হতে গেলে হয়তো চাকা ভেঙ্গে যায়, নয়তো মানুষগুলো গাড়ী থেকে পড়ে যায়। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতে চাঁদের আলোয় দেখতে পেলেম সারদা সেই মোটা শরীর উপুড় করে মাঝখানে শুয়ে আছে। তখুনি গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়ী থামিয়ে সারদাকে বক্‌তে লাগলেম—তুমি কি ভেবে ওরকম করে শুয়েছিলে? মনে করেছ কি তোমার শরীর দিয়ে আমি বাঁচবো? তুমি মরে গেলে কে আমায় এত দূর নিয়ে যেত? কার ভরসায় আমি এসেছি, এ সব কি ভেবেছ? এইটুকু কি আমরা হেঁটে পার হতে পারতুম না? সে তাড়াতাড়ি উঠে বল্লে—মা আমায় মাফ্ করুন। আর থতমত খেয়ে গেল। তারপর সে হুঁশিয়ার হয়ে গেল। সে জানত না যে ঠিক ঐ সময়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। গুরুর জন্যে প্রাণ দিতে গিয়েছিল, কিন্তু একবার ভাবেনি, সে মারা গেলে আমায় কে নিয়ে যেত? এ যে হবার নয়। ঠিক সেই সময়েই যে আমার ঘুম ভাঙ্গবে। আমরা খানা পার হয়ে হেঁটে চলে গেলুম। গাড়ী আমাদের পেছনে এলো। এই রকম গুরুভক্তি কটা লোকের আছে? পাছে গুরুর ঘুম ভাঙ্গে সেই জন্যে শরীরটা দিতে গিয়েছিল। মেনীর মা শুনে কাঁদ, কাঁদ হয়ে বল্লেন—মা কি ভক্তি! শ্রীমা বল্লেন ওকে পরে বলেছিলুম—একি হবার, ঠিক আমার ঘুম ভাঙ্গবে আর তুমি বেঁচে যাবে। তুমি মারা গেলে আমার কি কষ্ট হতো তা তুমি কি বুঝবে। আমার শরীরের চেয়ে আমার কাছে তোমাদের বেঁচে থাকা যে ভাল। সারদা পরে বলেছিল—এ বুদ্ধি তখন যোগায় নি। আপনাকে নিয়ে যাওয়াটা যে বড় এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যে বেরিয়ে ছিলেম তা তখন মনে হয় নি। তখন আপনার ঘুম ভাঙ্গাটাই আসল মনে হয়েছিল। সেজন্যে মাফ করুন। দেখেছ মেনীর মা—গুরুর জন্যে একটা প্রাণকে তুচ্ছ করে দেওয়া আদৌ বড় কথা নয়। আমাকে কিন্তু সে কিনে রেখেছে। তার গুরুভক্তির কথা যখন মনে পড়ে তখন আমার প্রাণের ভেতর যেন কি রকম হয়ে ওঠে। শ্রীমা লেখককে বলিতে লাগিলেন

মেনীর মা বড় ভক্তিমতী। চুণীবাবুর (ঠাকুরের ভক্ত) বলরাম মন্দিরের প্রতিবেশী। সারদা কলকাতায় আসিলেই ওর ওখানে খেত। তুমি মাঝে মাঝে ওর হাতে খেও। তবে মাছ, টাছ পাবে না—ও বিধবা। স্বামী ত্রিগুণাতীত উদ্বোধন প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিছুকাল চালাইয়া আমেরিকায় প্রচারার্থে চলিয়া যান। সেখানে সানফ্রান্সিস্কো শহরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেদান্তধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। উহাই ভারতের বাহিরে প্রথম মঠ।

শ্রীশ্রীমাতৃদেবী ও দুর্গাপূজা

তখন শ্রীশ্রীমার জন্মভূমি জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকটে ছিলাম। স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্র পাই, তাহাতে তিনি লেখেন শ্রীমাকে কলিকাতায় আনিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে, কেননা গিরিশবাবু (নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ) দুর্গাপূজা করিবেন তাহাতে শ্রীমাকে উপস্থিত থাকিতে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। তাই তোমাকে লিখিতেছি শ্রীমাকে আনিবার জন্য। তিনি আসিলে গিরিশবাবু ও নদিদি সাতিশয় খুশি হন। শ্রীমা আসিবেন জানিলে যাতায়াতের খরচ বাবদ তোমাকে টাকা পাঠাইব। অতএব পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও। শ্রীমাকে রাজি করাইয়া স্বামী সারদানন্দকে পত্রোত্তর দিলে তিনি টাকা পাঠাইয়া দেন এবং বলরাম মন্দিরে শ্রীমাকে আনিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে প্রত্যহ গিরিশ ভবনে পূজার সময় মা যাইতেন এবং পূজান্তে ফিরিয়া আসিতেন। সেবার মহাষ্টমী অধিক রাত্রে পড়ে। মার অসুখ শরীর হইলেও গোলাপ মাকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রে গিরিশ ভবনে যান। সেই দিনের বৃত্তান্ত একটু বলি। শ্রীমা গোলাপমাকে লইয়া খিড়কী দরজায় "আমি এসেছি" বলিয়া কড়া নাড়িতে থাকেন। বাড়ীর ঝি দরজা খুলিয়া দেয় ও নদিকে চীৎকার করিয়া মা এসেছেন বলে। তখন হল্লা পড়িয়া যায়। আর গিরিশবাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। সেদিন শ্রীমার খুব ম্যালেরিয়া জ্বর। তথাপি সন্ধিপূজার শেষ পর্যন্ত থাকেন। যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী ভক্ত একদিকে প্রতিমা আর অপরদিকে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে থাকে। সে এক দেখিবার জিনিষ।

আর একবার স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) মঠে পূজা করিবার ইচ্ছা হয় এবং কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনান। তাহাতে শ্রীমাকে যোগদান করিবার জন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীটি শ্রীমার থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়া হয়। শ্রীমা সেই বাটীতে পূর্বে ছিলেন। দুর্গা পূজা করিবার বাসনা হওয়ায় স্বামীজী বলেন, কার নামে সংকল্প হবে? আমরা ত সব সাধু। আমাদের নামে সংকল্প হতে পারে না। মার নামেই সংকল্প হবে। এই স্থির হইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা, যিনি রাজা ইন্দ্রনারায়ণের পুরোহিত ছিলেন, তাঁহাকে তন্ত্রধারক এবং মাতৃসন্তান কৃষ্ণলালকে পূজারী করা হয় এবং ধুমধামের সহিত পূজা হয়। শ্রীমা প্রতিদিন পূজা এবং আরাত্রিকের সময় মঠে আসিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

(বেলুড়মঠে)

স্বামীজী নিজের ঘরে এক আত্মীয়ের (নাম বলিব না) সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমরা নিকটস্থ ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন—যা-যা এইটুকু সহ্য করিতে পারলি না, তোর আর কি হবে। আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া শুনিলাম এবং একটু বাদেই সেই আত্মীয়টিকে যাইতে দেখিলাম। একটু পরে ভগ্নী নিবেদিতা মঠে আসিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—একটু ছুঁতে না ছুঁতেই ঘাবড়ে ছটফট করতে লাগল, ওদের আর কি হবে। নিবেদিতা বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া বোঝা গেল, তিনি সেই আত্মীয়কে ঈশ্বরিক উন্নতির জন্য স্পর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাই তাহার জন্য আক্ষেপসূচক কথা ভগ্নীকে বলিলেন। নিকটস্থ ঘরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন। তিনি নিবেদিতা এবং আমাদিগের নিকট সকল শুনিয়া ঐ আত্মীয়টির জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। তারপর সেই আত্মীয় ভগ্নীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া মার্কিন দেশে চলিয়া যান এবং ফিরেন কিছুদিন পরে। সেই আত্মীয় একজন প্রসিদ্ধ লোক এবং দেশহিতের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। প্রত্যুত তাঁহার সেই সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকাখানির নামকরণ অধুনা একখানি দৈনিক পত্রিকা হইয়াছে। এক্ষণে সেই আত্মীয়টি দেশহিতকর কোন একটি বিষয়ে মাতিয়াছেন এবং সুযশও যথেষ্ট করিয়াছেন। আজীবন দারপরিগ্রহ করেন নাই। আমরা তাঁহাকে কিছুদিন পূর্বেও দেখিয়াছি।

পুস্তক পরিচয়

সমালোচনা সাহিত্য

কবিগুরুর রক্তকরবী—শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : সাধনা মন্দির, কলকাতা ৮। পরিবেশক : সিগনেট বুক-শপ, কলিকাতা ২০। মূল্য ৩৲ টাকা। রবীন্দ্র-কৃতির নানাদিকের নানা আলোচনায় বিদ্বজ্জনের আগ্রহ ও অনুরাগের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে ইহা সুখের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বহুশঃ আলোচিত বা সমালোচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রক্তকরবীর বিশেষ স্থান। কেবল রক্তকরবীর আলোচনার্থে ইতিপূর্বে অন্ততঃ একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল জানি। তবু আরো আলোচনার অবকাশ আছে যে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং বর্তমান গ্রন্থের লেখক এ বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতারই পরিচয় দিয়া বাঙালী রস-জিজ্ঞাসুদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। রচনার ধারা সাবলীল, ভাষা সুন্দর, বক্তব্যেও বিশেষ মৌলিকতা আছে। তবে রসসাহিত্যের ব্যাখ্যা করাতেই একটা অসুবিধা এই আছে—ভাষা ও ভাবের চূড়ান্ত উৎকর্ষে পেঁৗছিয়া যাহা সাহিত্য বা কাব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহাকে ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী আরো ভালো ভাব বা ভাষা জোটানো কঠিন; কাজেই 'পূর্ণ'কে 'ঈষন্ন্যুন' দিয়াই বুঝাইতে হয়, 'কালিদাস' যদি আবার 'মল্লিনাথ' হন (রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই বলিতে পারি না) তাঁহার পক্ষেও গত্যন্তর থাকে না। তবু, ইহারও উপযোগিতা আছে, নহিলে কোনো কাব্যের কোনো ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত লেখা হইত না। ব্যাখ্যার সাহায্যেই ব্যাখ্যার পারে যাইতে হয়।) ব্যাখ্যানের উক্তি সর্বসাধারণ অসুবিধা ছাড়া রক্তকরবীর ব্যাখ্যায় আরও অসুবিধা আছে জানি। ইহাকে তত্ত্বনাট্য, সংকেতনাট্য, রূপকনাট্য যে নামই দেওয়া হোক, ইহা যে সাধারণ 'নাটক' অর্থাৎ 'জীবননাট্য' নয় এবিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসংশয়। কিন্তু, বর্তমান লেখক ভিন্ন মত পোষণ করেন। রক্তকরবী যে রূপক কাহিনী নয়, স্বরূপাখ্যান নয়, এ কথাটা কত দূরে প্রমাণিত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু লেখক যে ভাবিবার ও বুঝিবার মতো বহু বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আলোচনার আলোচনা ছলে কথা বাড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। কেবল কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতে চাই—"রাজা ও রঞ্জনের মধ্যে সম্বন্ধ কি? রাজাই কি এককালে নন্দিনীর জীবনের প্রথম অধ্যায় রঞ্জনরূপে পরিচিত ছিল; এখন সেই রঞ্জন রাজা হইয়া উঠায় তাহার ও নন্দিনীর মধ্যে একটা জালের আবরণ পড়িয়া গিয়াছে? তাই কি নন্দিনীর সঙ্গে যক্ষপুরীতে রঞ্জনের বিচ্ছেদ? জালের দরজায় ঘা দিয়া নন্দিনী কি রাজার মধ্যে সেই রঞ্জনকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে?...তাই বুঝি নন্দিনী জালের বাধা মানিতে চায় না, জাল ছিন্ন করিয়া রাজার মধ্য হইতে তাহার প্রাণের রঞ্জনকে উদ্ধার করিতে চায়। এই প্রেমের বিশ্বাসে তাই কি নন্দিনী ঘোষণা করিয়া গেল, আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে—কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।"

আমার বিশ্বাস, এরূপ ব্যাখ্যা অপ্রত্যাশিত, অপূর্ব এবং অত্যন্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ। লেখককে খুবই বাহবা দিই। কিন্তু কথা এই যে ইহাতেও কি স্থির হয় না যে রক্তকরবী রূপক নাটকই বটে! রূপকতার তর তম অনেক স্তর থাকিতে পারে, সে হইল ভিন্ন আলোচনার বিষয়। বর্তমান গ্রন্থখানি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদরের যোগ্য ইহা পুনর্বার বলিতে চাই।

৬২।৫৩

শতাব্দীর কবি—অধ্যাপক সত্যেন্দ্র মজুমদার। অনুরাধা প্রকাশনী, কলিকাতা—১২। মূল্য—তিন টাকা আট আনা।

'নিবেদনে' প্রকাশক বলিয়াছেন—"কাব্যের ভাব ও আর্টের আলোচনা সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শুরু করবার চেষ্টা রয়েছে এ বইয়ে। এর উপস্থাপনের ধারা কাজেই মামুলী নয়, মৌলিক।" আমাদের মনে হইল, কেবল মৌলিক নয়, অভিনব। তিনজন কবিকে লইয়া এ গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক নাকি অধ্যাপক, কিন্তু কোথাকার অধ্যাপক আমরা জানি না। ম্যাজিক যে দেখায় সেও প্রফেসার, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি অধ্যাপনার চেয়ার-অধিকারী তিনিও প্রফেসার—সুতরাং নামের আগে প্রফেসার জুড়িয়া দিলেই সব সময় বোঝা যায় না কার জ্ঞান-গৌরব কতখানি। বর্তমান ক্ষেত্রেও এই অধ্যাপক আখ্যা দেখিয়া আমরা বিভ্রাটে পড়িয়াছি। ইহাই যদি তাঁহার 'মৌলিক' উপস্থাপন হয়, তাহা হইলে (এবং লেখক প্রকৃত অধ্যাপক হইলে) তাঁহার ছাত্রদের অবস্থা মন্দ, ছাত্ররা তাঁহার কাছে কী যে শিখিতেছে তাহা বোঝা যাইতেছে। তিনটি পাখীর নাম করিতে বলিলে এই অধ্যাপকের ছাত্ররা নিশ্চয়ই বলিবে—অ্যালবাট্রস, ঈগল ও ফড়িং। —কেন না, তাহাদের অধ্যাপকও যে অনুরূপ শিক্ষাই দিতেছেন, এই গ্রন্থটিই তাহার প্রমাণ। এ ধরণের গ্রন্থ প্রকাশে সমাজের হানি ঘটিবে ও গ্লানি বাড়িবে—ইহাই আমাদের সুদৃঢ় অভিমত।

কবিতা

প্রেয়সীকে : সুমিত সেন : বেঙ্গল বুক হাউস : পি-১৬৩, রসা রোড, কলিকাতা—২৬ : বারো আনা।

অন্যতমা : মনোরঞ্জন রায় : তুরা, গারো হিল্‌স্, আসাম : এক টাকা।

আলোপাত : নরেন্দ্রচন্দ্র রায় : ওরিয়েণ্টাল পাবলিশিং কোং : ১১-ডি আরপুলি লেন : ৸৹।

গীতিগুঞ্জ : জ্যোতিকুমার : প্রাপ্তিস্থান এম বি লাইব্রেরী, ২৩, ক্যানিং স্ট্রীট এবং গ্রন্থকার—১৪৪, আমহার্স্ট স্ট্রীট : এক টাকা।

বাঙলা কাব্যের দেশ কথাটা কে বলেছিলেন? কিন্তু তিনি তো বলেই খালাস। ভুগতে হচ্ছে আমাদের। নইলে যার এখনো মাত্রাজ্ঞান হয়নি তিনি কেন কবিতা লিখতে যাবেন। কবিতা ভালো হোক কি মন্দ হোক সেকথা পরে বিচার্য। এমন কি সব কবিতার ভালোত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু কবিতা হতে হলেই পঙক্তি বিন্যাসকে কতকগুলি নিয়মের অধীন হতে হবে। যতি মাত্রা মেনে চলতে হবে। কিন্তু মানাতো দূরের কথা 'প্রেয়সীকে' কাব্যগ্রন্থের (যদি তাই বলা যায়) কবির কবিতা সম্পর্কেই কোন ধারণা আছে বলে মনে হয় না।

অন্যতমার কবি মনোরঞ্জন রায় মিষ্টি রোমাণ্টিক মনের অধিকারী। রোমাণ্টিক কবিতার তালিকাটিও তাঁর আয়ত্ত। একটি সাবলীল আবেগের মৃদুস্রোত তাঁর কবিতায় সর্বত্র প্রবাহিত। উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নেই, শ্লথগতি ক্লান্তিও নেই। সমস্ত কবিতাই একটি মিষ্টি সুরের মাধুর্যমণ্ডিত। কটি লাইন :

'তাহলে একটিবার সে প্লাবনে আমারে ডুবাও।
মোহনার মুখে যদি ক্ষুদ্র দ্বীপ হতে
পারি তাও।
হয়তো তোমারে পাব। তোমার সমস্ত দেহমন।'

যতদূর মনে হয় এইটি শ্রীযুক্ত রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এইটিই শেষ গ্রন্থ হবে না এ আশা করব।

অমিল ছন্দে কবিতা লিখতে হলে ভাষা ব্যবহারের যে সুমিতি অপরিহার্য সেটি আয়ত্ত না করে আলোপাত-এ কবি একটু মুশকিলে পড়েছেন। তাছাড়া ভাবের দিক থেকেও এগুলো নেহাতই গদ্যের স্তরে। সমিল ছন্দ যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও দুর্বলতা বিরক্তিজনকভাবে প্রকট। ফল হয়েছে মারাত্মক। লেখাগুলো না হয়েছে কবিতা না গদ্য।

গীতিগুঞ্জ সঙ্গীত সংগ্রহ। সুর বাদ দিয়ে কেবল কথার কাব্যমূল্য নির্ণয়ে গীতিকারের ওপর অনেক সময় অবিচারের আশঙ্কা থাকে। তবু গীতিগুঞ্জের অনেক গানের কাব্যাংশ সুরবিহীন পাঠেও উপভোগ্য। কাব্য মূল্য অনস্বীকার্য।

৭৭।৫৩, ৬৯।৫৩, ৭১।৫৩, ৪৫।৫৩

ভ্রমণ কাহিনী

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে—স্বপন বুড়ো; ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা—১২। আড়াই টাকা।

সব দেশের সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধশাখা ভ্রমণ কাহিনী। ভ্রমণ কাহিনীর মারফৎ একটি দেশের অন্তরের সঙ্গে আর একটি দেশের অন্তরের পরিচয় হয়। অবশ্য সে কাহিনী যদি কেবল শহর বন্দর আর দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনাই হয় ভূগোলের বই হিসেবে ছাড়া তার আর কোন মূল্য নেই। কিন্তু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি দেশের হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করা বড় কঠিন কাজ। সে দৃষ্টি বড় দুর্লভ। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের লেখক সেই দুর্লভ দৃষ্টির সম্পূর্ণ অধিকারী এমন কোন প্রমাণ বইটিতে না থাকলেও মানুষকে চিনবার, তার সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করবার স্বাভাবিক প্রয়াসের প্রমাণ আছে এ বইটিতে। আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে লেখক ভিয়েনা গিয়েছিলেন সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই এ বই এ[illegible]

জন্য। সেখানে যাঁদের সঙ্গে তিনি আন্তরিকভাবে মিলেছেন, যাদের কাছ থেকে চেনা এবং অচেনা, আন্তরিকতা পেয়েছেন তাদের কথা, সেই দেশের কথা সহজ সুন্দর করে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে পরিচয়ের অধ্যায়টি বিশেষ মনোরম।

এক জায়গায় একটি বাক্য আপত্তিকর বলে মনে হলো। চীন দেশের একটি মেয়ে সম্পর্কে লেখক বলছেন, 'জাতিতে ইনি খৃস্টান কিন্তু নিজের দেশের কথা বলতে গিয়ে আনন্দে ও উৎসাহে একেবারে যাকে বলে পঞ্চমুখ।' এখানে 'জাতিতে ইনি খৃস্টান' এবং তারপরে 'কিন্তু' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ প্রশংসনীয় মনোভাবের পরিচায়ক নয়।

আর্ট প্লেটে ছাপা ছবিগুলি সুন্দর। ৭৬।৫৩

ইতিহাস

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—হরিহর শেঠ; ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—দশ টাকা।

প্রায় আট শত পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থে ৫০০ চিত্রের সাহায্যে লেখক প্রাচীন কলিকাতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহে লেখককে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, গ্রন্থটি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রথমে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু যুগে বা মুসলমান শাসনকালে কলিকাতার অস্তিত্ব ছিল না; ইংরেজ, ফরাসী বা ডচ বণিকদের দ্বারাই এই নগরের পত্তন হয়। শ্রীযুক্ত শেঠ এই মহানগরীর গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইহার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়, লেখক দুরূহ কার্য সম্পাদন করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থটিতে কলিকাতার পথঘাটের নামোৎপত্তির কথা, সাধারণ দেবালয়-মন্দির-মসজিদ-গীর্জা, কলিকাতার পুরাতন ছড়া ও কবিতা, সেকালের ইংরেজ সমাজ, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাসভবন, সেকালের খ্যাতনামা দেশীয় অধিবাসী ইত্যাদি অধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়—তখন পুস্তকটি হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা হয় না।

গ্রন্থটিকে একটি ঐতিহাসিক দলিল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। স্যার যদুনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ইহা যেন পপুলার এনসাইক্লোপিডিয়া।...আর, essay লিখিতে গেলে চুরি করিবার এমন ভাণ্ডার আর নাই।" গ্রন্থটি পাঠ করিয়া এই কথার তাৎপর্য সম্যক্ বুঝিতে পারা গেল—সত্যই এ গ্রন্থটি তথ্যের ভাণ্ডার। ২৯১।৫২

বিবিধ

উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রবেশিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

গ্রন্থকার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান উচ্চাঙ্গ সংগীত অনুশীলনের সাহায্যার্থে কয়েকটি চৌতালের ধ্রুপদ, ঝাঁপতালের সাদ্রা ও ত্রিতালের খেয়াল গানের আকার মাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন এবং এর সঙ্গে মোটামুটি যে শাস্ত্রজ্ঞান দরকার সে সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে ইমন কল্যাণ, ভূপালী, কামোদ, ছায়ানট, বেহাগ, শংকরা, কেদারা, গৌড়সারং, বিলাবল, বিভাস, খাম্বাজ, দেশ, সুরট, তিলককামোদ, ঝিঁঝিট, ভৈরব, গুণকেলী, রামকেলী, যোগিয়া—এই রাগগুলির পরিচয়, জ্ঞাতব্য বিবরণ ও বিশ্লেষণ সহ ৩১টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে শাস্ত্র পরিচয় স্বরূপ সংগীত বিভাগ, গীতি প্রকরণ, নাদ, শ্রুতি, স্বর, ঠাট, জাতি, বর্ণ, রাগ, গ্রাম, মূর্ছনা, বিক্ষেপ প্রক্ষেপ, পূর্বাঙ্গ উত্তরাঙ্গ, তানালাপ, মাত্রা, তাল প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্বাঙ্গীন আলোচনা করা হয়েছে তাতে ঔপপত্তিক বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট সহজে মর্মগম হবে। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ হিসাবে গ্রন্থকারের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতার সাহায্যে যেভাবে তিনি গ্রন্থ পরিকল্পনা করেছেন তাতে শিক্ষার্থিগণ বিশেষ উপকৃত হবেন।

গানগুলি সুনির্বাচিত; স্বরলিপি এবং মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন। উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানলাভ করতে চান এ বইখানি তাঁদের খুবই কাজে লাগবে। ৮৭।৫৩

এপিটাফ্

অসিতকুমার

আহা, এও পৃথিবীকে সব জেনে, বেসেছিল ভালো
রাত্রিকে আনেনি মনে, ভেবেছিল অন্তহীন আলো
জীবনের প্রেম দিয়ে, আশা দিয়ে মুগ্ধ পৃথিবীকে
রক্তদ্যুতিময়ী করে গিয়েছিল; দিয়েছিল লিখে
বিদ্যুৎ স্বাক্ষর শত;—চেতনার অশংক অভয়
জন্মের জটিল স্রোতে মেনেও মানেনি পরাজয়॥
—পার যদি ভুলে যেও, জীবনের জোয়ার ভাটায়
ওঠে পড়ে কত কিছু, কত কিছু ভেঙে ভেসে যায়,
সেও হ'ক্ তার-ই মত। কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই তার।
শুধু জেনো তার মনে জীবনের লক্ষ ধারা স্রোতে,
এমন জেগেছে প্রশ্ন,—কোথা নেই উত্তর যাহার॥

সূর্য মুকুর

আশুতোষ পাল

স্বপ্নের নিরাশা মাঝে নেচে যায় ব্যর্থতার রোষ,
হতাশার শেষ দীপ্তি পংগু জীবনের অবসাদ
আর রূঢ় ক্লান্তিময় ক্লেদসিক্ত মনের প্রাসাদ
গড়া যতো ছোট ছোট স্মৃতির কোঠায়। জীবকোষ
দেহের অংগনে তবু অতীতের গানের নির্ঘোষ
আজও শোনে পরম নির্জনে। কৈশোরের অভিঘাত
তরংগে তরংগে আজও করে যায় জীবনসম্পাত
মাঠের নির্জন কোণে, ওইটুকু জীবনে সন্তোষ।

মাঠে মাঠে সবুজের বুকে ভাঙা তীক্ষ্ম হাহাকার
সূর্যের মুকুরে দেখে বৈশাখের উষ্ণ নিশ্বাসের
মায়ায় সমুদ্রনীল আকাশের জ্বলন্ত যৌবন।
জীবনে বিষাদ নামে। মাঝে মাঝে তবুও আশার
জোনাকীনয়ন জ্বলে। প্রাণের অনন্ত তিয়াসের
সাগরে তবুও ঢেউ, আনন্দের উদ্বেল স্বপন।

বন-মর্মর

অমিতাভ চৌধুরী

রাত্রি আসে, কৃষ্ণাতিথি, নিরুদ্দেশ চাঁদ,
কামনা উন্মাদ
অন্ধকার অরণ্যের প্রতিটি প্রহর;
হাওয়া দেয়, চুল ওড়ে, বুক থর থর।

হাওয়া দেয়, চুল ওড়ে, ছুরির ফলক,
বিদ্যুৎ-ঝলক;
অন্ধকারে ঝাঁপ দেয় হৃদয়-আকাশঃ—
চুলের অরণ্যে দেখি আদিম আভাস।

হাওয়া দেয়, ক্ষ্যাপা হাওয়া, কৌতুক পাগলঃ
শাড়ির আঁচল
ডোরাকাটা ফণা তোলে চোখের সীমায়,
বিষ ঢালে; নেশা গলে, শরীর ঝিমায়।

ত্রস্ত ডাস, লক্ষ পাখি বুকে অন্তরীণ,
হাজার হরিণ
লাফ দিয়ে ভেঙে ফেলে নেশার প্রাচীর
তরমুজ রক্তকণা, সমুদ্র-অস্থির।

হে অরণ্য, হে আকাশ, হে প্রাণ আমার,—
বোবার পাহাড়
ভেঙে চুরে কথা কও,—কথার কলাপ;
অন্ধকার অরণ্যের প্রহর প্রলাপ।

হাওয়া নেই ঝড় নেই, শান্ত অচপল;—
শাড়ির আঁচল
ঝাঁপির আড়াল আর তন্দ্রাতুর চুল।
হঠাৎ কখন কাঁপে তোমার আঙুল।

পাঁচটি আঙুল হায় এ যে পঞ্চশর,—
বুকের পাঁজর
বিঁধে বিঁধে অগ্নি আনে শিরায় শিরায়
কুমারী-কামনা কাঁদে প্রণয়-পীড়ায়।

তুমি এসো, কাছে এসো, আরো আরো কাছে
আঙুলের আঁচে,
ফুল হয়ে গলে যাক কথার তুষার,
রাত্রি শেষ, কৃষ্ণাতিথি, আভাস ঊষার।

বঙ্কিম রচনার আর এক অক্ষম রূপায়ণ

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে পর্দায় হতশ্রী করে তোলার আর একটি উদাহরণ সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত স্টুডিও এক্সের তোলা "বিষবৃক্ষ"। এ নিয়ে বলবার কেউ নেই, তাই যার যা খুসী করবার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। যেমনভাবে খুসী মূলে ঘটনাবলীকে ওলোটপালোট করে দেওয়া হোক, নিজের দরকারে চিত্রনাট্যকার নতুন সব চরিত্র আমদানী করে নিন, নতুন ঘটনা বানিয়ে নিন, নতুন সংলাপ যোগ করুন, কেউ নেই আপত্তি করার। তাই ছবি তোলার প্রাথমিক জ্ঞানও যাদের নেই তাদের পক্ষেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গল্পের চিত্ররূপ হাতে নেওয়ার নির্ঝঞ্ঝাট সুবিধে রয়েছে। নিজের কৃতিত্বে ছবির কদর সৃষ্টি করতে না পারা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের নামের ভারে তো দর্শক আকর্ষণ করা যাবে! তাই এ পর্যন্ত এক এক করে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনাগুলিরই চিত্ররূপ দেওয়া হয়ে গেল—"চন্দ্রশেখর", "দেবী চৌধুরাণী", "দুর্গেশনন্দিনী", "ইন্দিরা", "রাধারাণী", "আনন্দমঠ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "কপালকুণ্ডলা" প্রভৃতি—বাকী আর বিশেষ কিছু নেই। এর মধ্যে কয়েকখানির একাধিক সংস্করণও ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা তোলা হয়েছে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, এদের মধ্যে দু'একখানি ছাড়া অভিজ্ঞ ও কৃতী চিত্রপরিচালকের হাতে পড়েনি কোনটাই. আর ধরতে গেলে কৃতী-অকৃতীনির্বিশেষে সবারেরই তোলা সব ক'খানি ছবিই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা গৌরবকে অল্পবিস্তর হতশ্রী করে দিয়েছে—কেউ ইচ্ছে করেই বঙ্কিমচন্দ্রকে ডিঙিয়ে নিজেদের বেশী বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা করতে গিয়ে, আর কারুর কারুর ক্ষেত্রে হয়েছে নিজেদের অজ্ঞতা এবং রস উপলব্ধি করার ও নাট্যবিচার শক্তির অভাবে। ন্যূনতম যেটুকু গুণ থাকা দরকার ছবির পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার হতে গেলে তাও যাদের নেই বেশীর ভাগ এমন লোকেরাই সব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হাতে তুলে নিয়েছেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ সাহিত্য গৌরব পর্দার দর্শকদের কাছে অনাস্বাদিতই থেকে গিয়েছে। প্রকৃতই চলচ্চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য পরিচয় দানে এ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি।

* * *

"বিষবৃক্ষ" ছবিখানির একাধারে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক শান্তি মুখোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র বিষয়ে কতখানি অভিজ্ঞতা জানা নেই। কিন্তু দৃশ্যের উপস্থাপন কৌশল, এমন কি একই দৃশ্যে এক শটের পর আর এক শটের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখবার মতো প্রাথমিক জ্ঞানেরও পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। সাহিত্যক্ষেত্রেও তার কি অধিকার জানা নেই, অথচ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে ভেঙেচুরে নতুন চরিত্র ও ঘটনা যোগ করে নিয়েছেন তার সঙ্গে সংলাপও। এক্ষেত্রে "বিষবৃক্ষ"র যে ফল হওয়া উচিত, তার চেয়ে এতটুকু কিছু কম হয়নি। "বিষবৃক্ষ" যে সামাজিক উপন্যাস হিসেবে বাঙলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সৃষ্টি ছবিখানি তার সামান্য আভাসও ফুটিয়ে তুলে ধরতে পারেনি।

* * *

ছবিখানিতে কাহিনীর পরিবেশটাই যা কিয়দংশে দাঁড় করানো হয়েছে, আর অভিনয়ের জন্য কিছুটা নজরে পড়েন কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ—তাও বঙ্কিম-পরিকল্পনার অনেক দূরে। এছাড়া অকৃতীর চৌকষ উদাহরণ হিসেবে এ ছবিখানির তুলনা খুব বেশী নেই। অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে এতে কাজ করেছেন মিহির ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, পদ্মা দেবী, শান্তি সান্যাল, লীলাবতী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। শিল্পনির্দেশকের প্রশংসনীয় কাজটা ছাড়া কলাকৌশলের

মনোজ বসু রচিত "নবীন যাত্রা"-র চিত্ররূপের একটি দৃশ্য। সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় ছবিখানি বাঙলা ও হিন্দীতে ("নয়া সফর") নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে

আর কোন দিকই অতি সাধারণ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ধাপেও উঠতে পারেনি।

দক্ষিণীর নূতন প্রচেষ্টা

গত বছর "অরূপরতন" পরিবেশন করে রবীন্দ্র সংগীত নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র দক্ষিণী তাঁদের কর্মধারায় একটি নতুন অধ্যায় যোগ করে নিয়েছেন। —রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়। সেই ধারারই অনুসরণে এবারে তাঁরা পরিবেশন করেছেন "ফাল্গুনী" যা গত ২২শে মার্চ নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হয়। নাচ গান ও অভিনয় মিলিয়ে দক্ষিণীর প্রায় চল্লিশজন শিল্পী এতে যোগদান করেন। বসন্তোৎসবের মরশুমে অভিনয়ের জন্য "ফাল্গুনী"র নির্বাচন সময়োপযোগী হয়েছে। বসন্তের চেতনা জাগিয়ে তোলা নিয়েই "ফাল্গুনী"র বিষয়বস্তু। জীবনকে যৌবনকে বার বার হারিয়ে তাকে ফিরে পাবার উৎসব অনুষ্ঠানেই এই রূপক নাটকের ভিত্তি।

"ফাল্গুনী" এ পর্যন্ত সর্বসাধারণ্যে বড়ো একটা মঞ্চস্থ হয়নি। বহুকাল পূর্বে জোড়াসাঁকোয় কবিগুরুর গৃহে এর অভিনয় হয়েছিল, তারপর আরও দু'একবার অভিনীত হয়েছে সেসবও কারুর না কারুর গৃহপ্রাঙ্গণে, জনসাধারণের গোচরের বাইরে। সর্বসাধারণ্যে দক্ষিণীর অভিনয়ই প্রথম হলো বলা যেতে পারে।

*　　*　　*

নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সমান সুযোগ রয়েছে এ নাটকখানিতে, দক্ষিণীর শিল্পিবৃন্দও সব ক'টি দিকেই উন্নততর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চমৎকারিত্বে নৃত্য ও গীতের দিকটাই অবশ্য বেশি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এবারে অভিনয়েও কৃতিত্ব দেখা

এবারের নাট্যাভিনয়ে দক্ষিণীর কৃতিত্বের সবচেয়ে প্রশংসনীয় পরিচয় হয়েছে নাচের দিকটা; বিশেষ করে পরিশিষ্টে মণিপুরী নাচটি সাজ-পোষাকে ও সুরে-ছন্দে এক অতি মনোরম শিল্প-সৃষ্টি। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন মাধবী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা চৌধুরী, লীনা গুহ-ঠাকুরতা, বীণা দত্ত, সন্ধ্যা-মালতী ঘোষ ও মন্দিরা সেন-রায়। গানে অংশ গ্রহণ করেন রমা ভট্টাচার্য, ইলা সেন, শীলা বসু, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু রায়চৌধুরী ও সুধীর ঘোষ। গানের সঙ্গে আবহ যন্ত্রসঙ্গীত কেমন হওয়া উচিত, তার আদর্শ পরিচয় দিয়েছেন সম্মিলিত-ভাবে অর্ধেন্দু ঘোষ, প্রসাদ সেন, রেখা ধর, নগেন রক্ষিত ও রাজকৃষ্ণ রায়। শিল্প-নির্দেশনায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়, সুনীতি মিত্র, অরূপ গুহ-ঠাকুরতা ও অজিত চক্রবর্তী।
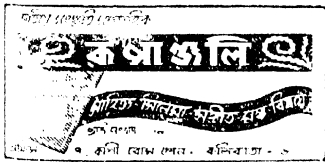
"পাশের বাড়ি"র দলের তোলা আগতপ্রায় ছবি "শ্বশুরবাড়ি"র একটি দৃশ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গিয়েছে, বিশেষ করে নবযৌবনের দলটির মধ্যে। অবশ্য নাটকখানিতে চরিত্র বলতেও এরাই। কেবল সূচনা-দৃশ্যে রয়েছেন রাজা, মন্ত্রী, কবিশেখর আর শ্রুতিভূষণ। জরা ও মৃত্যুর মধ্যে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে চলার মানসিক দ্বন্দ্বটা এই দৃশ্যে এনে দেওয়া হয়েছে। এ-দৃশ্যে শিল্পীরা কিন্তু অভিনয়ে তেমন রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। শিল্পী নির্বাচনের দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত ছিল। চরিত্রের সঙ্গে চেহারার মিল থাকাটা যে একান্তই দরকার, সে নিয়মকে এখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে রাজা, মন্ত্রী ও কবি-শেখরের ক্ষেত্রে; ফলে সূচনার দৃশ্যটি নাটকের আর কোন কাজে আসতে পারেনি। আসল দৃশ্য দুটিতে প্রাণ এনে দিয়েছেন নবযৌবনের দলের ছেলেরা, যে চরিত্র-গুলিতে অভিনয় করেন সুনির্মল অধিকারী, শ্যামাদাস সেনগুপ্ত, (দাদা জমিয়েছিলেন ভাল আর তাকে রূপ-সজ্জায়ও মানিয়েছিল), আশীষ মুখোপাধ্যায়, অরূপ গুহ-ঠাকুরতা, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। গানে ও অভিনয়ে সবচেয়ে চেতনাময় পরিবেশ তৈরি করে দেন অন্ধ বাউলের ভূমিকায় শ্যামল মুখোপাধ্যায়। এঁদের অভিনয়ের মধ্যে একটা দোষ কিন্তু দর্শকের অভিনিবেশে বাধা দেয়। সেটা হচ্ছে—মঞ্চময় পায়চারি করে কথা বলা, আর শুনতে শুনতেও পায়চারি করে বেড়ানো।

* * *

খেলার মাঠে

হকি

বেংগল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালিত লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ডিভিসনের বা বিভাগের খেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এই সময় বিভিন্ন ডিভিসন বা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই বৎসরে একটি বিষয় লক্ষ করিবার আছে। এইবারে প্রত্যেকটি ডিভিসন বা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লইয়া যেভাবে তিন বা ততোধিক ক্লাবের মধ্যে যেরূপে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বহু বৎসর বাংগলার হকি লীগের খেলায় পরিদৃষ্ট হয় নাই। ইহার জন্যই বিভিন্ন দলের সমর্থকগণকেও এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। কোন্ দল শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হইবে, কেহই বলিতে পারে না। অথচ এই সমর্থকগণ আশা ও নিরাশায় দোলায়মান মন লইয়া মাঠে খেলা অবলোকন করিবার সময় মনপূত ফলাফল না হইলেই ধৈর্যচ্যুতির পরিচয় দিতেছে। ইহাতে প্রায়ই মাঠে বহু অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ হইতেছে।

আম্পায়ারদের ত্রুটি

আম্পায়ারদের ত্রুটির জনাই নাকি বহু খেলার ফলাফল যাহা হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিতেছেন। আম্পায়ারগণ মানুষ—তাহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের উপর চড়াও করিয়া গালিগালাজ বা প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হওয়া প্রকৃত খেলোয়াড়জনোচিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে।

প্রথম ডিভিসন লীগ

প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য কাস্টমস, রাজস্থান ও ভবানীপুর—এই তিনটি ক্লাবের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি দলই গৌরবে ভূষিত হইবে। ঐ দল কোনটি তাহা বর্তমানে বলা চলে না। তবে এই তিনটি দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেংগল ও মোহনবাগান দলকে দেখিলেও আশ্চর্যের কিছুই হইবে না। এই বিভাগের সেন্ট জোসেফ দলকে এইবারে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইতে হইবে, এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই।

হকি লীগে প্রথম ৫টী দলের অবস্থা
প্রথম ডিভিসন

টীমের নাম	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
কাস্টমস ...	১৫	১২	৩	০	৩৮	৩	২৭
রাজস্থান ...	১৪	১২	১	১	৩৬	৭	২৫
ভবানীপুর	১৩	১০	৩	০	২৮	৫	২৩
ইস্টবেংগল	১৪	১০	৩	১	২৯	৯	২৩
মোহনবাগান	১৪	৯	৪	১	৩৭	৯	২২

দ্বিতীয় ডিভিসনে ক্যালকাটা, আদিবাসী ও তালতলা—এই তিনটি দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ক্যালকাটা দল যেরূপভাবে খেলিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হইলে আশ্চর্যের কিছুই হইবে না।

তৃতীয় ডিভিসনের 'এ' গ্রুপে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং, যাত্রী ও গ্রেল ক্লাব—এই তিনটি দলই জোর প্রতিযোগিতা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি দল চ্যাম্পিয়ন হইবে—ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আন্তঃ-কলেজ লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারিত হইয়াছে যাদবপুরের কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজী শেষ খেলায় বংগবাসী দলকে পরাজিত করিয়া এই গৌরবে ভূষিত হইয়াছে। এই দল প্রায় প্রতি বৎসরই হকি ভাল খেলিয়া থাকে। এইবারে চ্যাম্পিয়ন হইয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আমরা চ্যাম্পিয়ন যাদবপুর কলেজ দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বেটন কাপের খেলা

ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বলিয়া খ্যাত বেটন কাপের খেলা কবে আরম্ভ হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাহা ছাড়া এই প্রতিযোগিতায় ভারতের কোন্ কোন্ বিশিষ্ট দল যোগদান করিবে, তাহাও অজ্ঞাত আছে। ইহাতে আশংকা হয়, প্রতিবারের ন্যায় এইবারেও এই প্রতিযোগিতা স্থানীয় কয়েকটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু ইহা হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই বিষয়টি হকি পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। ইহারা চিরকালই নীরব—যাহার ফলে বোম্বাইয়ের আগা খাঁ কাপ ধীরে ধীরে ভারতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ হকি অনুষ্ঠান পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। বাংগলার হকি খেলোয়াড়দের ইহা গৌরবের বিষয় একেবারেই নয়।

টেবিল টেনিস

বুখারেস্টের বিশ্ব-টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষ হইয়াছে। হাংগারীর কৃতী খেলোয়াড় এক সিডো এই-বারের প্রতিযোগিতায় সিংগলস্ ও ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস্ তিনটি বিভাগে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার সমতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মহিলা বিভাগে রুমানিয়ার মিসেস এঞ্জেলিকা রোজিক্স। ৩১ বৎসর বয়স্কা এই মহিলার সাত বৎসরের একটি কন্যা আছে। ঘরকন্নার যাবতীয় কার্য পর্যবেক্ষণের পর যেটুকু অবসর সময় পান, তাহাতেই টেবিল টেনিস খেলার অনুশীলন করেন। এইরূপ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা আছে বলিয়াই ইঁনি উপর্যুপরি চতুর্থবার মহিলা বিভাগের সিংগলস চ্যাম্পিয়ন হইলেন। ইঁনি ১৯৫০ সালে বুদাপেস্ট, ১৯৫১ সালে ভিয়েনায় ও ১৯৫২ সালে বোম্বাইতে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে সিংগলসে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তবে এইবারের ন্যায় কোনবারেই ইঁনি তিনটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হন নাই। হাংগারীর পুরুষ খেলোয়াড় এক সিডো এই সর্বপ্রথম বিশ্বের সিংগলস্ চ্যাম্পিয়ন হইলেন। ইতঃপূর্বে ১৯৫০ সালে সুজের সহযোগিতায় ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হন। নিম্নে ১৯৫৩ সালের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের বিভিন্ন বিভাগের খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

পুরুষদের সিংগলস্

এক সিডো (হাংগেরী) ২১—১৬, ২৩—২১, ২১—১৮ গেমে আইভান এণ্ড্রাডিসকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস্

মিসেস এঞ্জেলিকা রোজিক্স (রুমানিয়া) ২১—১১, ২১—১১, ১৯—২১, ২১—১৬ গেমে মিস্ গিজলে ফারকাসকে (হাংগেরী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্

এক সিডো ও জোসেফ কোজিয়ান (হাংগেরী) ২৩—২১, ১৯—২১, ১২—২১, ২১—১৮, ২১—১৯ গেমে জনী লীচ ও রিচার্ড বার্জম্যানকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

এক সিডো (হাংগেরী) ও মিসেস রোজিক্স (রুমানিয়া) ৯—২১, ২১—১৯, ২১—১৯, ২১—১৯ গেমে জেড ডোলিনার (চেকোশ্লোভাকিয়া) ও লিণ্ডা ওয়ার্টেলকে (অষ্ট্রিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস্

মিসেস রোজিক্স (রুমানিয়া) ও মিস্ ফারকাস (হাংগেরী) ২১—৯, ২১—৯, ১৮—২১, ২১—১৮ গেমে ডায়না রো ও রোজালিণ্ড রোকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

ভারতের না-যোগদানের কারণ

ভারত ১৯৫২ সালের বিশ্ব-টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুভার গ্রহণ করে। এই-বারে সেই ভারত বুখারেস্টে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন-

শিপে যোগদান করিল না, ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন। জাপান, হংকং প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়গণ যে কারণে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই, ঠিক সেই কারণেই বোধ হয় ভারত যোগদান করে নাই। তবে ইহা খেলার দিক হইতে সমর্থন করা চলে না। খেলা সকল সময়েই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা উচিত।

বিশ্বের টেবিল টেনিসের শ্রেণী বিভাগ

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সভায় বিশ্বের টেবিল টেনিস খেলার দেশসমূহের এক শ্রেণী বিভাগ গঠন করা হইয়াছে। এই শ্রেণী বিভাগে ভারত পুরুষ ও মহিলা উভয় বিষয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। নিম্নে এই শ্রেণী বিভাগের তালিকা প্রদত্ত হইল——

সোয়েথলিং কাপ (পুরুষদের)

প্রথম শ্রেণী—ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হংকং, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, ফ্রান্স, রুমানিয়া, আমেরিকা, চীন, সুইডেন ও জার্মাণী।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ভারত, ভিয়েৎনাম, নেদারল্যাণ্ড, ওয়েলস, চিলি, ব্রেজিল, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল ও পোল্যাণ্ড।

অপর সকল দেশ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

কর্বিলিয়ন কাপ (মহিলাদের)

প্রথম শ্রেণী—ইংলণ্ড, রুমানিয়া, জাপান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ওয়েলস, চেকোশ্লোভাকিয়া, আমেরিকা, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হংকং।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ভারত, যুগোশ্লাভিয়া, চীন, জার্মাণী, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়া।

অপর সকল দেশকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

ফুটবল

ফুটবল খেলা বাঙলার সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় খেলা। ইহাকে বাঙলার জাতীয় খেলা বলিয়া অভিহিত করিলেও কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত এই খেলায় যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাঙলা দেশে পরিলক্ষিত হয়, ভারতের অন্য কোন রাজ্যেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ এক জনপ্রিয় খেলার মরশুম আগতপ্রায়। সুতরাং ক্রীড়ামোদিগণ, বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকগণ বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য কি! তবে ক্লাবের পরিচালকদের তৎপরতা বৎসরের প্রথম হইতে কেন বহু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহারা নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া খেলোয়াড় সংগ্রহে লাগিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের সহায়ক আছেন একদল অনুচরবর্গ বা দালালের দল। ইহারাই বিভিন্ন দলের বা স্থানের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়দের সহিত এই সকল পরিচালকদের যোগসূত্র রচনা করেন। ইহার বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করেন না, তাহা নহে। তবে ইহাদের কার্যকলাপ এরূপ গোপনীয়তার মধ্যে সম্পাদিত হয় যে, সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ কেন, বিশিষ্ট গুপ্তচরের পক্ষেও "হদিশ" পাওয়া সম্ভব নহে। ইহাদের মধ্যেই টাকার লেনদেন, চাকরীর ব্যবস্থা, দ্রব্যাদির ব্যবস্থা—এমন কি বহু প্রলোভনীয় বেড়াজাল খেলোয়াড়দের জন্য রচিত হয়। আর্থিক দুরবস্থায় নিপীড়িত, উপস্থিত খেলোয়াড়গণ কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ইহাদের আওতায় পড়িতে বাধ্য হন ও নানা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের সহিত জড়িত হন। ইহার জন্য খেলোয়াড়দের কেবল দোষারোপ করিলে অন্যায় হইবে। ইহার জন্য কাহারও উপর যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম বিভিন্ন ক্লাবের ঐ সকল দলপরিচালকদের করিতে হয়। তাহার পর তাঁহাদের অনুচরবর্গের বা দালালদের। কিন্তু ইহা কোনদিনই অনুষ্ঠিত হইবে না। পরিচালকমণ্ডলী যাঁহারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের একমাত্র অধিকারী, তাহা ঐ সকল দুর্নীতির সহায়ক বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত। এই জন্যই গত বৎসর ফুটবল খেলার সকল গলদ দূরীকরণের জন্য অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার শেষ পর্যন্ত ফলাফল কি হইল, সাধারণে কিছুই জানিতে পারিল না। ভবিষ্যতে পারিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্রীড়া-সমালোচক এই অনুসন্ধান কমিটির অভিমত সম্পর্কে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যায় যে, অনুসন্ধান কমিটি সকল কিছুর জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকদের দোষী করিয়াছেন। এই জন্যই উহা প্রকাশ না করিয়া ধামাচাপা দেওয়া হইয়াছে। এই পরিচালকমণ্ডলীতে কয়েকজন লোক ছিলেন, যাঁহারা গুরুতর অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিতেন। এইবারে বার্ষিক নির্বাচনে তাঁহাদের পরিচালকমণ্ডলী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এমন কি যিনি একদিন ইহাদের মুকুটমণি হইয়াছিলেন, পদাধিকার বলে ও সরকারের যোগসূত্র হিসাবে তাঁহাকেও এইবারে পরিচালকমণ্ডলীর তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ একনায়কত্বের অধীনে যাহাতে পূর্বের ন্যায় সকল কিছু বিনা বাধায় পরিচালিত হইতে পারে, তাহার জন্য বাছাই করিয়া তাঁবেদার ব্যক্তিদেরই পরিচালকমণ্ডলীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার পর বাঙলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা সম্পর্কে যেটুকুও সম্ভাবনা ছিল, তাহা ত্যাগ না করিয়া উপায় নাই। এইবারের ফুটবল মাঠ দুর্নীতির এক চরম লীলাক্ষেত্র হইবে বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া ইহার অবসান অসম্ভব। খেলার প্রধান উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের জন্য সকলকে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া। সেই খেলা যখন জাতীয় জীবনকে চরম কলুষিত করিতেছে, এখন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কিরূপে যে নীরব থাকিতে পারেন, ইহা আমাদের কোনরূপেই বোধগম্য হয় না।
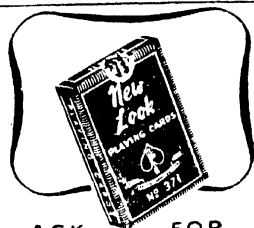
সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ—

২৩শে মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের দাবী সম্পর্কে বিতর্ককালে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ অনেকগুলি ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তীব্র ভাষায় লেভি প্রথায় ধান্য সংগ্রহের ব্যাপারে দুর্নীতি ও জুলুম, খাদ্য বিভাগের কর্মচারিগণের অযোগ্যতা ও স্বজন প্রীতি, খয়রাতি সাহায্য দানে দুর্নীতি এবং ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সরকারী জুলুমের অভিযোগসমূহ আনয়ন করেন। বিতর্কের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অভিযোগসমূহের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, কোন সরকারী অথবা বে-সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি বিরোধী পক্ষের কোন সদস্যের কোন অপরাধের অভিযোগ থাকে তবে তিনি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারেন।

২৪শে মার্চ—পাক পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিঞা মমতাজ দৌলতানা অদ্য গভর্নর জনাব আই আই চুন্দ্রিগড়ের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পূর্ববঙ্গের গভর্নর মালিক ফিরোজ খাঁ নূন মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নির্দেশ অনুযায়ী দৌলতানা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সচিব ডাঃ জে পি চৌধুরী অদ্য ঘোষণা করেন যে, কলিকাতায় পুনরায় কলেরা মহামারী রূপ ধারণ করিয়াছে।

২৫শে মার্চ—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় অন্ধ্র রাজ্য গঠন সম্পর্কে এক ঘোষণায় বলেন যে, ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে নূতন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইবে। সরকারের অভিমত এই যে, অন্ধ্র রাজ্যের অস্থায়ী রাজধানী অন্ধ্র এলাকার মধ্যেই অবস্থিত থাকা উচিত।

অদ্য লোকসভায় জম্মু আন্দোলন সম্পর্কে জনসঙ্ঘের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয়ের নিষ্পত্তিকল্পে জম্মু প্রজা পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহিত গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হউক। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, কোনক্রমেই আন্দোলনকারীদের সহিত আপোষ-আলোচনা করা যায় না।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যাত্রীবাহী যানবাহনে ধূমপান বিল (১৯৫৩) নামে একটি সরকারী বিল বিনা-বিরোধিতায় গৃহীত হয়।

২৬শে মার্চ—আসাম বিধান সভার জনৈক সদস্যের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পাইলে অদ্য আসাম বিধান সভায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। পুলিশ খাতে ব্যয়-মঞ্জুরের প্রস্তাবের উপর একটি ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী বলেন, এই বিধান সভারই একজন সদস্য আসামের মানচিত্র সহ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সমাবেশ সম্পর্কে পাকিস্থানে গোপন সংবাদ প্রেরণ করিতেছিলেন। এই সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।

২৭শে মার্চ—অদ্য দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভূদান সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার কার্যে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

সিন্ধুর রাজনীতিক ঘটনাবলী দ্রুত আবর্তিত হইতেছে। অদ্য সিন্ধু মুসলিম লীগ কাউন্সিল সিন্ধুর লৌহ মানব মিঃ এম এ খুরোকে সিন্ধু লীগ সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত করিয়াছে। মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে পাকিস্থান মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিনের নির্দেশে তাঁহাকে সিন্ধু মুসলিম লীগের সভাপতি পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল।

জম্মু-কাশ্মীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের জন্য অদ্য রাত্রে কলিকাতা হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সত্যাগ্রহী দল ট্রেনযোগে দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

২৮শে মার্চ—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু'র সহিত একযোগে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য অদ্য বৈকাল ৪-৩০টায় সদলবলে বিমানযোগে ইম্ফলে পৌঁছিয়াছেন। এইদিন প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু ইম্ফল যাইবার পথে দমদম বিমান ঘাঁটিতে স্বল্প-স্থায়ী অবস্থানকালে সাংবাদিকদিগকে বলেন, ব্রহ্ম দেশের অভ্যন্তরে কুওমিন্টাং সৈন্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্রহ্মদেশ রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিকট যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে, সাধারণভাবে ভারত উহা সমর্থন করিবে।

অদ্য লোকসভায় বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে সংযোগরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মচারীদের এইরূপ আশ্বাস দেন যে, কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও কোনও কর্মচারী ছাটাই হইবে না।

অদ্য মোগায় শিরোমণি আকালী দলের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে সভাপতি মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাবের পাঞ্জাবী ভাষা-ভাষী অংশ পেপসু ও বিকানীর লইয়া একটি পাঞ্জাবী ভাষাভাষী প্রদেশ গঠনের দাবী জানান।

২৯শে মার্চ—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য ইম্ফলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ব্রহ্মে কুওমিনটাং সৈন্য-বাহিনীর কোন কাজ নাই, তাহাদের ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করা উচিত। তাহারা ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া না গেলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে হইবে।

দিল্লী হইতে আগত শান্তিদেবী নাম্নী এক জাতিস্মর মহিলা অদ্য কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারস্থ থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে তাঁহার পূর্ব জন্মের ঘটনা ও পরলোকের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন। কুমারী শান্তি দেবীর বর্তমান বয়স ২৬ বৎসর।

বিদেশী সংবাদ—

২৩শে মার্চ—মিশরের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নাগিব অদ্য ঘোষণা করেন যে, বৃটিশরা যদি স্বেচ্ছায় মিশর ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে।

২৪শে মার্চ—রাণী এলিজাবেথের পিতামহী রাণী মেরী অদ্য রাত্রে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল।

২৫শে মার্চ—ব্রহ্ম সরকার অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী চীনের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের অভিযোগ পেশ করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—লণ্ডনের একটি সংবাদে প্রকাশ, মাউ মাউ আন্দোলন দমনের জন্য বিমানযোগে আরও সহস্রাধিক বৃটিশ সৈন্য কেনিয়ায় প্রেরণ করা হইতেছে।

২৮শে মার্চ—বৃটিশ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লয়েড অদ্য কায়রোতে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নগীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুয়েজখাল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে।

২৯শে মার্চ—ব্রহ্ম সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ঊর্দ্ধতন রাজনৈতিক মহল হইতে অদ্য বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের পূর্ব সীমান্তে আক্রমণরত চীনা জাতীয়তাবাদী গেরিলা দলের সহিত আমেরিকানদের যে যোগসাজস রহিয়াছে, উহার প্রতিবাদেই ব্রহ্ম সরকার আমেরিকান কারিগরী সহযোগিতা চুক্তির অবসান ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০,
পাকিস্থানের মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

শনিবার
২৮শে চৈত্র, ১৩৫৯

DESH

SATURDAY, 11TH APRIL, 1953.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্মরণে—

বৎসরের শেষ দিন, আমাদের স্মৃতি-পথে বিপুল বেদনা বহন করিয়া আনে। নয় বৎসর পূর্বে বৎসরের এমনই এক শেষ দিনে ৩০শে চৈত্র আমরা 'দেশের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং উপদেষ্টা শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকারকে হারাইয়াছি। প্রফুল্লকুমার 'দেশে'র প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা, তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সর্বোপরি তাঁহার সরল, বিমল সাধু জীবনের পবিত্র প্রভাব 'দেশে'র প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির মূলে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। প্রফুল্লকুমার প্রকৃত কর্মযোগী ছিলেন। গীতোক্ত আদর্শ আমরা তাঁহার সমগ্র কর্মসাধনার ভিতর প্রদীপ্ত দেখিয়াছি, তদ্দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হইয়াছি। সর্বাবস্থার মধ্যে মনের স্থৈর্য এবং প্রশান্তির যে অবস্থাটি ভাগবত-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রফুল্ল-কুমার-এর জীবন তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিঘ্ন-বিপদে তিনি কোনদিন বিচলিত হন নাই। নৈরাশ্যের অন্ধকার দেশের পরাধীন অবস্থার সেই দুর্দিনে মুহুর্মুহু আমাদের যাত্রাপথ আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, দিক্‌চক্রবালে বিভীষিকা বিস্তার করিয়া রাজরোষের বিদ্যুৎ চমকাইয়াছে, বজ্র ঘন ঘন গর্জিয়া উঠিয়াছে, দারুণ সেই দুর্যোগের মধ্যেও প্রফুল্লকুমার আমাদিগকে অকুতোভয় বীর্যবলে উদ্দৃপ্ত রাখিয়াছেন। প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূল বাত্যাবেগে সন্তাড়িত দেশ-মুক্তির আদর্শের বাতিটিকে প্রাণের আগুনে জ্বালাইয়া তুলিয়া তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন। ভয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। প্রফুল্লকুমার বিপদে যেমন মুহ্যমান হন নাই, তেমনই সম্পদেও তাঁহাকে আত্মহারা করিতে পারে না। সর্বপ্রকার রোষ, ক্ষোভ এবং উত্তেজনার ঊর্ধ্বে তাঁহার জীবন অপরিম্লান কমলদলের মত মাধুর্য বিস্তার করিয়াছে। চরিত্রের এই মাধুর্য বৈষ্ণব-বীর্যের পরিচায়ক। প্রফুল্লকুমার সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি সাহিত্যিক ছিলেন; সাংবাদিক স্বরূপে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকার তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি, তিনি ছিলেন, এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং পোষক। তিনি ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব। সত্যনিষ্ঠ সাধকের প্রাণের প্রাচুর্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অমৃতের অধিকারী। অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা লইয়া আমরা আজ অমর জীবনে অধিষ্ঠিত প্রফুল্লকুমারের স্মৃতির অনুধ্যান করিতেছি। তাঁহার উদ্দেশে আমাদের প্রণতি নিবেদন করিতেছি। অমৃতলোক হইতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তিনি আমাদিগকে আদর্শ-সাধনে সঞ্জীবিত রাখুন।

বাঙলা নববর্ষ

বর্ষচক্র বিঘূর্ণিত হইল। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। মানুষের কাছেই এই হিসাব। কলা-কাষ্ঠাদিরূপে যে শক্তি জগৎকে পরিণাম প্রদান করিতেছে, আমরা তাহার স্বরূপ বুঝি না, রীতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি না, কালের ফাঁকে ফাঁকে ডাক করিয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে তবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। এইভাবে সেই মহাশক্তিরই লীলা আমাদের জীবনকে আশ্রয় করিয়া অনাগতের দিকে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। অতীতকে ভুলিয়া আমরা ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া চলি। কিন্তু এ স্বপ্ন বৃথা নয়। বস্তুতঃ এই স্বপ্নই নব সৃষ্টিতে বাস্তব হইয়া উঠে। ব্যক্তি এবং জাতি দুস্তর কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং মণিমুক্তা আহরণ করিয়া মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। নববর্ষের সমারম্ভ এবং সমাগমে সেই কথাটি মনে জাগিতেছে। কালের এই ফাঁক দিয়া ভবিষ্যতের দিকে ডাক করিয়া নব সৃষ্টির স্বপ্নময় ভাবনার আঁচটি আমরা অন্তরে আনিবার চেষ্টা করিতেছি। বিগত বৎসর আমাদের পক্ষে সুখকর হয় নাই। বাঙ্গালীর জীবনের উপর দিয়া বিপর্যয়ের ঝড় দুর্নিবার বেগে বহিয়া চলিয়াছে। সেই বিপর্যয়ের স্রোত আমাদিগকে নিরুদ্দিষ্ট-ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। শান্তি এবং স্বস্তির কোন আশ্বাসই আমরা একান্তভাবে অন্তরে পাইতেছি না। বাস্তব জীবনের নিতান্ত এই বিপর্যয়ে সুখের কোন স্বপ্নই আমাদের জীবনে জমিয়া উঠিতেছে না। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। পথ আমাদের করিয়া লইতেই হইবে। অতীতের ঐতিহ্য আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। বর্তমান বাঙলার আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু এই আকাশও

উজ্জ্বল করিয়া আলো আসিতেছে। জ্যোতিষ্কনিচয়ের ভাস্বর সে জ্যোতি, দিব্য সে দ্যুতি কোন অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইবার নয়। মহামানবমণ্ডলীর অমৃতময় অবদানের উত্তরাধিকারী আমরা বাঙ্গালী। আমরা সামান্য নই। বাঙ্গালী মরিবে না, মরিতে পারেও না। বর্তমান বাঙলার এই বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত অবস্থার আলোড়ন হইতেই সমগ্র ভারতে জ্যোতির্ময় জীবনেরই জাগরণ ঘটিবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে সমগ্রভাবে সার্থক করিতে নব সৃষ্টির ভাবনাকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে এই বাঙ্গালী। নববর্ষ সমাগমে এইসব আশার বাণীই আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতেছে—'চরৈবেতি'। সেই দিব্য বাণীকে অন্তরে ধারণ করিয়া বর্তমান বাঙলার রৌদ্রদগ্ধ এই আকাশ-তলে, কালবৈশাখীর বজ্রানলের এই ভীষণ এবং ভৈরব পরিমণ্ডলে নববর্ষকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

বাহিরের লোকের প্ররোচনা

"নাগা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাহিরের লোকেরাই দায়ী" ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রীর সহিত ছয়দিনব্যাপী মণিপুর-আসামের নাগা পাহাড়, লুসাই পার্বত্য অঞ্চল, মণিপুর এবং ব্রহ্মের সীমান্তের অন্তর্বর্তী নাগা অঞ্চল পরিভ্রমণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাহিরের লোক বলিতে পণ্ডিত নেহরু কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, সে কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কোহিমায় পণ্ডিত জওহরলালের অভ্যর্থনার জন্য আহূত জনসভা হইতে প্রায় দুই হাজার নাগা বাহির হইয়া চলিয়া যায়। তাহাদের অভি-যোগ এই যে, পণ্ডিতজীর কাছে তাহারা যে আবেদনপত্র দাখিল করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। এই আবেদন পত্রখানি সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার যে উদ্ধৃতাংশ বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কালা আদমীদের শাসনে নাগাদের আপত্তি, ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শ্বেতাঙ্গদের শাসনই তাহারা শ্রেয় মনে করে। এই শ্বেতাঙ্গ কাহারা? ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উক্তি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ রাজত্বকালে বিদেশী ধর্মপ্রচারকগণ এবং ইংরেজ কর্মচারিগণ নাগাদিগকে এইভাবে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সে সময় ভারতের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের ন্যায় নাগা পাহাড়কেও দেশের অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশের প্রভুত্বের সে যুগের অবসান ঘটিয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের শত আবদার সত্ত্বেও ইংরেজের তন্ত্রতাউশ এদেশের বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে না। তবে এইরূপ প্রচার প্ররোচনা কেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ভারত স্বাধীনতা লাভ করাতে একদল বৃটিশ রাজপুরুষের বুকে বড় লাগিয়াছে, তাঁহাদের মনের ক্ষোভ মিটিতেছে না। সুতরাং পণ্ডিতজীর উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারাই নাগা অঞ্চলে ভ্রান্ত প্রচারকার্যের মূলে রহিয়াছে। পণ্ডিতজীর যুক্তিতে গুরুত্ব রহিয়াছে। পাকিস্থানে নিযুক্ত ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের জবানীতে ইংলণ্ডের সংরক্ষণশীল দলের পরিচালিত সংবাদপত্র-গুলিতে পণ্ডিত জওহরলালের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করা হইতেছে, তাহাই সে পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ। ভারতের পূর্ব সীমান্তবর্তী সহজ, সরল স্বাধীনচেতা বলিষ্ঠ নাগা জাতিকে এইভাবে বিভ্রান্ত করা বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপারও নয়। কিন্তু জগতের বিভিন্ন দেশে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের ফলে পার্বত্য জাতিসমূহের পরিণতি কি ঘটিতেছে এবং এখনও কেনিয়া, ইন্দোচীন, মালয়ে নরঘাতী খেলা ইহারা কিভাবে চালাইয়া যাইতেছে, নাগারা যদি সে খবর রাখিত তবে তাহারা এইভাবে বিভ্রান্ত হইত না এবং তাহারা এই শ্রেণীর বন্ধুদের সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টা করিত। এই শ্রেণীর সম্পর্ক হইতে নাগাদের দূরে থাকিবার দায়িত্ব বর্তমানে ভারত সরকারের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। নাগা সম্প্রদায় ভারতেরই অধিবাসী। তাহারা আমাদের দেশের লোক। তাহাদের স্বার্থের সঙ্গে ভারতের স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিশেষত ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে যদি শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর দল উপদ্রব সৃষ্টি করিতে এবং অনর্থ ঘটাইতে সুযোগ পায়, তবে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে। সুতরাং এইপ্রকার কার্য দমনে ভারত সরকারের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। সেই সঙ্গে পার্বত্য জাতি-সমূহের অধ্যুষিত অঞ্চলের জনসাধারণের সহযোগিতা আকর্ষণ করিবার উপযোগী-ভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-বিধি প্রভৃতি উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনা সম্প্রসারণে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন।

শিক্ষকের আদর্শ

সম্প্রতি সিউড়ীতে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে শিক্ষা-সমস্যার বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা ব্যাপারে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর গতানুগতিকতা, শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে সরকারের কার্পণ্য এসব প্রসঙ্গ সম্মেলনে উত্থাপিত হইয়াছে। সিউড়ী সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত রাজকুমার চক্রবর্তী তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে বলিয়াছেন,—"শিক্ষকের জীবন এদেশে দারিদ্র্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁরাই ভবিষ্যৎ জাতির স্রষ্টা। তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে দেশ এখনো শেখেনি—তাতে কিছু সময় লাগবে। কিন্তু তার জন্যে অভিমান করলে চলবে না। যদিও জীবনধারণের প্রশ্নটি উপেক্ষা করা চলে না, তবু সরকার বা অপরের সাহায্যে নিরপেক্ষভাবেই আমাদের যথা-সাধ্য কর্তব্য পালন করতে হবে। এ কথা সত্য, শিক্ষক সমাজেও আজ একটা নিরুদ্যম দেখা দিয়েছে, কিন্তু আমাদের পূর্বগামী আচার্যগণ যে মহৎ ঐতিহ্য রক্ষা করে গিয়েছেন, তার কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। তাঁদের সত্য ও মুক্ত জ্ঞানের অনির্বাণ মশাল উজ্জ্বলতর করে উত্তর পুরুষগণের হাতে আমাদেরই সমর্পণ করে যেতে হবে।" আদর্শ খুবই উচ্চ সন্দেহ নাই। কিন্তু আদর্শ যতই উন্নত হোক্, মানুষ জড় প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। শিক্ষাব্রতীর এই যে উন্নত আদর্শ, দেশ স্বাধীন হইবার পরও তাহা উপেক্ষিত হইতেছে,

ইহাই দুঃখের বিষয়। বর্তমানে আমাদের শাসন-ব্যবস্থার যাঁহারা নিয়ামক, পবিত্র শিক্ষাব্রতীর আদর্শের দোহাই দিয়া প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত আছেন। শিক্ষকরাও যে তাঁহাদের মতই রক্তমাংসের শরীরধারী মানুষ এবং বর্তমান সামাজিক পরিবেশ এবং প্রয়োজনানুযায়ী জীবনধারণ তাঁহাদিগকেও করিতে হয়, এ সত্য কার্যতঃ তাঁহারা অস্বীকার করিতেছেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথা উত্থাপন করিলেই কর্তা-ব্যক্তিদের মুখে একই জবাব পাওয়া যায়। শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতির অভাব তাঁহাদের একটুও নাই, কিন্তু অর্থেরই অভাব। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন এইরূপ দাঁড়ায় যে, অন্যান্য সব কাজে অর্থের অভাব হয় না, অর্থের যত টানাটানি দেখা দেয়, যাঁহাদের অবদানের উপর জাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, সেই শিক্ষকদের দুই মুষ্টি উদরান্নের সংস্থানেরই বেলায়! বাস্তবিকপক্ষে এদেশের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। অথচ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া নেতৃত্বাভিমান তৃপ্ত করিতে কথার বেলায় তো তাঁহাদের কসুর কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার জন্য ব্যয়, যদি প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার লাভ করিত তবে অর্থাভাবের প্রশ্ন এতটা বাধাস্বরূপে দাঁড়াইতে পারিত না। আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন যদি উন্নত করিতে হয়, তবে শিক্ষার সম্পর্কে সরকারকে এই উদাসীনতা দূর করিতে হইবে। তাঁহারা যাহাতে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের জন্য সমধিক সাহস এবং আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হন, ইহা করিতে হইবে। ফলতঃ ফাঁকা কথায় এইভাবে কার্যত আদর্শের অবমাননার সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না—ইহা নিশ্চয়।

মেয়র-নির্বাচন

শ্রীযুত নরেশনাথ মুখুজ্যে এবং শ্রীযুত পূর্ণেন্দুশেখর বসু যথাক্রমে কলিকাতার মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র-স্বরূপে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনের ফল পূর্ব হইতেই একরূপ অবধারিত ছিল। নির্বাচন-সভায় সভাপতি পদের প্রশ্ন লইয়া পৌর সভায় সেদিন দুই পক্ষে যেরূপ দ্বন্দ্ব শুরু হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহার পক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ কংগ্রেস পক্ষের সদস্যদের জোর এত বেশী যে, অপর পক্ষের জয়ী হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমাদের মতে এরূপ ক্ষেত্রে অনর্থক একটা হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া পৌর-সভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিলেই বিরোধী পক্ষ সমধিক সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন। সুখের বিষয় এই যে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কার্য যথারীতি পরিচালিত হয় এবং নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র উভয়েই নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন; কারণ, এই পদে পূর্ব হইতেই তাঁহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া কিছুই বলিবার নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আলোচনার কথাবার্তা
সাক্ষাৎ সম্পর্কে আলোচনার কথাবার্তা
চলিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল খাজা সাহেবের সঙ্গে মিলিতভাবে আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আগ্রহ এই নূতন নহে। কিন্তু পাকিস্থানের সঙ্গে সদ্ভাব এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠার জন্য এ পর্যন্ত তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছেন, সেগুলি যে সার্থক হয় নাই। শিলচরের বক্তৃতায় সে কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং সেজন্য দুঃখ প্রকাশও করিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া এ সমস্যার যে সম্যক্‌-রূপে সমাধান সম্ভব হইবে, আপাতত এমন কোন ভরসাই আমরা পাইতেছি না। কারণ, সমস্যার মূল কারণটি পাকিস্থানের শাসননীতির সঙ্গে মৌলিকভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পাকিস্থানের শাসন-নীতি সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রদায়িকতাকেই পাকিস্থানের শাসকগণ নিজেদের প্রধান সম্বল স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই অস্ত্রটির তীক্ষ্ণতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার গরজে ভারতের সম্বন্ধে পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ-বুদ্ধিকেও উদ্দীপ্ত রাখিতে হইতেছে। ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলবীদের এজন্য মাথা হেঁট করিয়া চলা ছাড়া অন্য উপায় তাঁহাদের যে নাই, আহমদিয়া-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে সে পরিচয় যথেষ্ট রকমে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুত পাকিস্থানের শাসন-নীতি হইতে ধর্মান্ধ এবং উৎকট এই মনোবৃত্তি যতদিন নিদূরিত না হইতেছে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের স্থায়িভাবে মৈত্রীর সম্পর্কে ততদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।
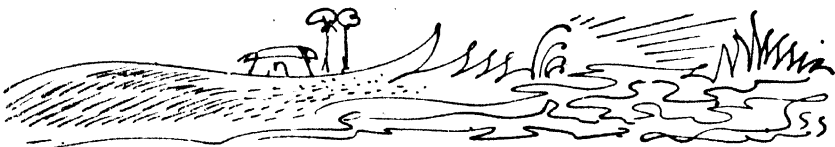
পরলোকে মিঃ আসফ আলী

গত ২রা এপ্রিল মিঃ আসফ আলী পরলোকগমন করিয়াছেন। মিঃ আসফ আলী সুইজারল্যান্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত স্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সুইজারল্যান্ডেই ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অন্যতম অগ্রণী স্বদেশপ্রেমিক এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদক্ষ সৈনিক মনীষী রাষ্ট্রনীতিক মিঃ আসফ আলী শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। গত ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

মিঃ আসফ আলীর জীবন সংগ্রামময় ছিল। দেশের পরাধীনতার বেদনা তাঁহার মনপ্রাণকে প্রথম যৌবনেই বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি যোগদান করেন। একবার নয়, বার বার বিদ্রোহী আসফ আলী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতন এবং লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। বহু অগ্নি-পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া তিনি দেশবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আস অধিকার করেন এবং কংগ্রেস-নেতৃবর্গে অন্যতম অগ্রণীর মর্যাদা অর্জন করেন স্বদেশের মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ সাধন—মিঃ আসফ আলীর জীবে এই দুইটি ছিল প্রধান ব্রত।

বারংবার অবরোধ এবং তজ্জনি নির্যাতনে, বিশেষভাবে শেষবারের বন্দি জীবনে মিঃ আসফ আলীর স্বাস্থ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রি মিশনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হইবা পূর্বে তিনি অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। ঐ সময় তাঁহা স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয় অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাণবান পুরুষ স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও মি আসফ আলী স্বদেশের সেবাব্রত হইতে কোনদিন বিরত হন নাই। পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে অস্থায়ী গভর্নমেণ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি অন্যতম মন্ত্রি স্বরূপে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত স্বরূপে গিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তিনি উড়িষ্যার রাজ্যপাল স্বরূপে নিযুক্ত হন এবং সেখানে যথেষ্ট জনপ্রিয়ত অর্জন করেন। অতঃপর মিঃ আসফ আলী সুইজারল্যাণ্ডের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত থাক অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মিঃ আসফ আলীর পরলোকগমনে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষে অভাব ঘটিল। তাঁহার বিদ্রোহী অন্তর পরকীয় প্রভুত্বের কাছে কোনদিন নতি স্বীকার করে নাই। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে জাতীয়তাকে তিনি জীবন দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আদর্শ নিষ্ঠায় তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশের মুক্তি সাধনার যে মহাব্রত তিনি গ্রহণ করিয়া ছিলেন, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়া তিনি তাহা উদ্‌যাপিত করিয়া গিয়াছেন। অপরিম্লান মহিমায় অধিষ্ঠিত ভারতের এই বীর সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মস্কোর ডাক্তারদের অব্যাহতি

গত জানুয়ারী মাসে ন' জন বিখ্যাত সোভিয়েট চিকিৎসক গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রকাশিত হয় যে, তাঁরা নাকি গুপ্তচরের কাজ করছিলেন এবং ডাক্তারির দ্বারা সোভিয়েট রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অভিযোগে ছিল এঁরা নাকি মঃ ঝানভ ও মঃ শেরবাকভের অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিলেন; অর্থাৎ এই ডাক্তাররা জেনে শুনে উক্ত নেতাদের ভুল ব্যাধি নির্ণয় করেন ও ইচ্ছা করে ভুল ওষুধের ব্যবস্থা করেন—যার ফলে তাঁদের অকালে জীবন অবসান হয়। এই ডাক্তাররা আরো অনেককে এইভাবে মারার চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ ছিল। ডাক্তারদের গ্রেপ্তার ও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংবাদ যখন প্রকাশিত হয় তখন এটাও ঘোষিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন। সত্য হলে অপরাধ অত্যন্ত ভীষণ সন্দেহ নেই, সুতরাং সরকারী ঘোষণার সংগে সংগেই অপরাধীদের প্রাণদণ্ড চাই বলে রাশিয়ায় রব উঠেছিল। একটি মেয়ে ডাক্তার, যিনি নাকি অভিযুক্ত ডাক্তারদের "ষড়যন্ত্র" ফাঁস করে দেন তাঁকে সোভিয়েট দেশের সর্বোচ্চ খেতাব "অর্ডার অব লেনিন" দেয়া হয়। সকলের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, যথাকালে অভিযুক্ত ডাক্তারদের বিচার ও প্রাণদণ্ড হবে। ব্যাপারটা নিয়ে দেশেবিদেশে নানা জল্পনা কল্পনা চল্লো। তার একটা কারণ ছিল এই যে, অভিযুক্ত ন' জন ডাক্তারের মধ্যে অন্তত পাঁচজন ছিলেন ইহুদি। কিছুদিন থেকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এই রকম অভিযোগ করছিলেন যে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট "Zionist" প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুপ্তচরের কাজে লাগাচ্ছেন। এই অভিযোগের সংগে মস্কোর ডাক্তারদের মামলার যোগাযোগ করে তখন রব ওঠে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইহুদী নির্যাতন শুরু করেছেন। সংগে সংগে সোভিয়েটের প্রভাবাধীন কয়েকটি রাজ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাতে এই প্রচার খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক মামলা, যাতে প্রধান আসামীদের অধিকাংশই ছিল ইহুদী। এইসব ব্যাপার নিয়ে ইজরেল-এর সংগে সোভিয়েট ও সোভিয়েট প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধ অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত টেল-আভিভে সোভিয়েট দূতাবাসে বোমা-বিস্ফোরণের পর সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইজরেলের সংগে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেন। এর পর মঃ স্ট্যালিনের মৃত্যু ঘটল ও মঃ ম্যালেনকভ সোভিয়েটের প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং সোভিয়েট মন্ত্রি-মণ্ডলী ও রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালকমণ্ডলীতে আরো অনেক রদবদল হোল। রদবদলের পালা বোধ হয় এখনও শেষ হয়নি।

যাই হোক, নূতন আমলে মস্কোর "খুনে" ডাক্তারদের ভাগ্যে একটা বিস্ময়কর ও অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। গত সপ্তাহে সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করেছেন যে, পূর্বে এঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল সে-সব মিথ্যা। ডাক্তারেরা সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাঁদের মুক্তিদান করা হয়েছে। পূর্বে যে ন' জন ডাক্তারের নাম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা ছাড়া আরো ছ' জন ডাক্তারও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের নাম পূর্বে প্রকাশ পায়নি—সকলেই ছাড়া পেয়েছেন। যে মেয়ে ডাক্তারটিকে "অর্ডার অব লেনিন"

খেতাব দেয়া হয়েছিল তাঁর খেতাব কেড়ে নেয়া হয়েছে। Ministry of Internal affairs সমস্ত বিষয়টির অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, প্রাথমিক তদন্তটাই সম্পূর্ণ দুষ্ট ছিল। ডাক্তারদের বিনা কারণে ও বে-আইনীভাবে জড়ানো হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমস্ত মিথ্যা ও যে-সব কাগজপত্র সাক্ষ্যাদির উপর অভিযোগগুলি দাঁড় করানো হয়েছিল সে-সবও ভিত্তিহীন। আরো গুরুতর কথা এই যে, যে-উপায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছিল তা অবৈধ, সোভিয়েট আইনে তা একেবারেই নিষিদ্ধ।' এই সবের জন্য যারা দায়ী তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন পূর্বতন উপমন্ত্রীও আছেন।

সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কর্তৃক এরূপ খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক বিচার-বিভ্রান্তির ঘটনা প্রকাশ অভূতপূর্ব। তবে এ ব্যাপার সোভিয়েট নাগরিকদের এবং বিদেশীদের চক্ষে একরকম ঠেকবে না।

সোভিয়েট নাগরিকগণ এতে হয়ত তেমন কিছু আশ্চর্য বোধ করবে না। তারা হয়ত এর ভিতর তাদের গভর্নমেণ্টের ন্যায়ানুবর্তিতা ও সৎসাহসেরই একটা নূতন প্রমাণ দেখতে পাবে। বেশির ভাগ সোভিয়েট নাগরিকই হয়ত বিশ্বাস করবে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে আইন নিষিদ্ধ উপায়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় না, যদি কখনো হয়, তবে যেমন এই ক্ষেত্রে-- গভর্নমেণ্ট তা ধরে ফেলেন এবং আইন-ভঙ্গকারীদের দণ্ডবিধান করেন। সহজ অবস্থায় সবদেশেই রাজনৈতিক অপরাধ বা উহার বিচারপদ্ধতির সহিত সাধারণ নাগরিকগণের বিশেষ পরিচয় থাকে না। তাদের যেটুকু পরিচয় সে অরাজনৈতিক সাধারণ অপরাধ ও তার দণ্ডবিধির সঙ্গে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, রাশিয়ায় অরাজনৈতিক সাধারণ অপরাধের দণ্ডবিধি খুবই সরল এবং তার প্রয়োগও ভদ্র। এক্ষেত্রে পুলিশী জুলুম বলতে যে ধারণা হয় তা নেই, 'বেআইনী' উপায় দ্বারা স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রশ্নই ওঠে না। রাজনৈতিক মামলা হামেশা হয় না, তা সাধারণ নাগরিকের অভিজ্ঞতার বাইরে। বিশেষ করে গত বহু বৎসর ধরে গভর্ন-মেণ্টের বিরোধিতা করার কোনো দৃষ্টান্ত পর্যন্ত ছিল না। কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য রেষারেষি ছিল না তা নয়, অনেক উত্থান পতনও ঘটেছে, কিন্তু সেসব সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে। তার জন্য রাজনৈতিক 'বিচারের' দরকার হয়নি, তার জন্য দেশের দণ্ডবিধির প্রয়োগ আবশ্যক হয়নি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রের দ্বারা কাজ হয়েছে। রাশিয়ায় আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রভৃতির উপরও পার্টির শাসন অব্যাহত রয়েছে, তার জন্যও দণ্ডবিধির আইন প্রয়োগ করার দরকার হয় না, 'প্রাভ্দার' স্মিতহাস্য অথবা ভ্রূকুটি যথেষ্ট, কারণ অর্থ ও সম্মান দুই-ই পার্টি সুনজরের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সোভিয়েট নাগরিকদের সোভিয়েট দণ্ডবিধি ও বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা ... না থাকার কোনও কারণ নেই। ডাক্তারদের এই ব্যাপারেও সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কার্য সোভিয়েট নাগরিকদের নিকট অস্বাভাবিক লাগবে বলে মনে হয় না। ... ফলে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের বিচারপদ্ধতি ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে বরঞ্চ তাদের ধারণা আরও একটু উঁচু হবে।

বাইরের লোকের চক্ষে ব্যাপারটা ... রকম লাগবে। অনেকে বলবে এই সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নিজের কথাতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেআইনী উপায়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করার অভ্যাস সোভিয়েট পুলিশের আছে। কেউ কেউ এর মধ্যে পর্দার আড়ালে সোভিয়েট নেতাদের একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সন্ধান করছেন। কেউ কেউ মনে করছে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহুদী নির্যাতন সম্বন্ধে যে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল ... ম্যালেনকভ সেটা দূর করতে চান। আবার কেউ কেউ বলছে এটা কম্যুনিস্ট 'শান্তি আক্রমণ'—peace offensive'এরই একটা অঙ্গ মাত্র! যাই হোক আসল কথা হচ্ছে এই যে, মস্কোর ডাক্তাররা অব্যাহতি পেয়েছেন! তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয়, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ... সুস্পষ্ট ঘোষণায় মানুষের মন থেকে একটা বড়ো অস্বস্তি দূর হোল।

* * *

গত সপ্তাহের বৈদেশিকীতে একটা ছাপার ভুল রয়ে গিয়েছিল—TCA (Technical Co-operation Administration) ... Co-operation এর জায়গায় Corporation ছাপা হয়েছিল।

৮।৪।...
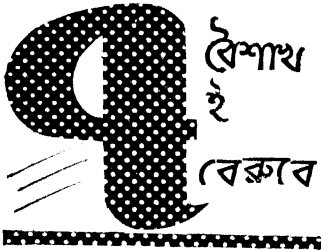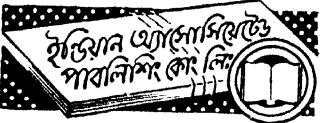
কবিতা

পৃথিবীর প্রতি সমুদ্র

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

তুমি পৃথিবী
        চির মৌন,
আমি সমুদ্র
        কলমন্দ্রে মুখর;
তুমি ব'সে আছ
        বালুচরী শাড়ির প্রান্ত
                লুটিয়ে দিয়ে
ললাটে তোমার সন্ধ্যা তারার কুঙ্কুম,
আমি প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে
        তোমার পায়ের কাছে রাখছি
            পান্নার পেটিকা
            হস্তীদন্তে খচিত,
তোমার কোন প্রার্থনা নাই
আমার প্রার্থনা অন্তহীন।

সূর্যডোবা দিগন্তে যেখানে
        গোধূলির জাল ছিঁড়ে ছুটেছে
        আঁধারের কৃষ্ণসার মৃগযূথ
সেখানে নিবদ্ধ তোমার দৃষ্টি,
আর আমি,
        অদৃষ্টের সঙ্গে দ্যুত খেলায় মগ্ন,
        যেন তরঙ্গের পাশা গড়িয়ে ছুটে যায়
            বিপুল ব্যর্থতার অভিমুখে।

তুমি চাওনা ফিরে,
আমার ফিরে ফিরে চাওয়ার আর অন্ত নাই।
        বাসনার ব্যবধান সে যে দুস্তর।
        নিজের ছায়াকে লঙ্ঘন করতে পারে কে?
            তুমি উদাসীন
            আমি আসক্ত
        তুমি কন্যাকুমারী
        আমি কৌমারহর দুর্জয়।

কৌস্তুভমণির মতো দীপ্যমানা
            হে পৃথিবী
তুমি কি সব জ্বালার ঊর্ধ্বে?
        তুমি শুধু সুন্দরী নও
            তার চেয়েও বেশি
            তুমি অপূর্ব।
        তাই বুঝি তুমি বাসনার অতীত।

বিধাতা তোমাকে গড়েছেন
            কিন্তু দেননি দোসর
তাই প্রেমের দাহ নাই তোমার বক্ষে।
        হীরকের মতো তুমি কঠিন,
        হীরকের মতো তুমি উজ্জ্বল
        হীরকের মতো তুমি সুন্দর
আর হীরকের মতোই তুমি শীতল।

হে কামনার মানসসরোবরের বীণাপাণি,
            তুমি গান জাগিয়ে দাও
            গ্রহণ করো না সে গানকে,
        তুমি প্রাণ জাগিয়ে দাও
            নিষ্ফল করো সে প্রাণকে,
    তুমি বান জাগিয়ে দাও
            ব্যর্থ হয় সে বন্যা,
বেদনার বাড়বানলে তুমি হ'য়ে ওঠো আরও সুন্দর
আরও মনোহর
হ'য়ে ওঠো কল্পনার সামগ্রী!

হে পৃথিবী,
তুমি আর উর্বশী কি একত্র উঠেছিলে
            লবণাম্বু ভেদ ক'রে?
            তুমিই উর্বশী।

তাই নাই তোমার ব্যথা
নাই সুখ
নাই দুঃখ
তাই নাই তোমার আনন্দ
আছে ধূর্জটির জটা-নিঙড়ানো উদাসীন সৌন্দর্য,
তাই ব্যথায় উল্লাসে তোমার সমান রুচি,
তাই দুঃখের নূপুরে বাজাও সুখের সুর,
তাই মিলনের পাত্রকে সংক্ষেপে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে
হা হা হাস্যে ফুটিয়ে তোলো মন্দারের কুঁড়ি,
মন্দাকিনীতে জাগিয়ে দাও ঢেউ,
প্রলুব্ধপুরুষ হাত বাড়িয়েই চমকে দেখে
তুমি উদাসীন
তুমি তুহিনস্পর্শ
তুমি কল্পনা।

হে সুন্দরী, হে পৃথিবী
হে অদ্বিতীয়া
তোমাকে পেয়ে স্বস্তি নাই,
তোমাকে ছেড়ে শান্তি নাই,
হে সঙ্গীতের সরস্বতী
তুমি গেলে গান যায়,
গান গেলে আর থাকে কি
আমি সমুদ্র
প্রকৃতির বীণা।

কে তোমাকে ক'রেছে মোহিনী
হে সুন্দরী
কোন্ ব্যবধানের নীলাম্বর,
কোন্ সূর্যের সুবর্ণ,
কোন্ চন্দ্রের রজত,
কে করলো তোমাকে মোহিনী?
ছিন্ন হোক সেই বসন,
ভিন্ন হোক তোমার নীবী,
দীর্ণ হোক তোমার কাঁচুলি,
কীর্ণ বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হোক তোমার
কাঞ্চীকেয়ূর কঙ্কণ
বিলাসবাসরের শঙ্করীর অলঙ্কারের মতো।
বস্ত্রের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে
বারম্বার
উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ছে তোমার যে-স্তন
পূর্ণ মহিমায় হোক উদ্ভাসিত,
বিশ্বের দৃষ্টি করুক অন্ধ,
ফুটিয়ে তুলুক সৌন্দর্যের তৃতীয় নেত্র,
তোমার খুলে-পড়া স্নিগ্ধ কেশপাশ
রচনা করুক
অন্তহীন বাসর রাত্রির ঘনিষ্ঠ তমিস্রা,
আর তোমার নির্দয় আলিঙ্গনে
নিপীড়িত চৈতন্য বিলীন হ'য়ে মরুক
দিগঙ্গনার বাহু বন্ধনে
সন্ধ্যার অসহায় অন্তিম রৌদ্রটুকুর মতো।

তুমি নেই

অর্চনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত

তুমি নেই, তাই দিল্লী শহর ফাঁকা ঃ
লোদি পল্লীর জনতার মাঝে সঙ্গবিহীন থাকা!
সেদিনের ঘন রাত্রিগুলিকে
আজও তো ছড়ানো দেখি চারিদিকে,
সফ্‌দর জং গম্বুজে আরও দেখি চাঁদখানি বাঁকা—
তবু ফাঁক আছে, তুমি নেই, তাই মন একেবারে ফাঁকা।

কাজ দিয়ে ভরা দিনের-তরণী মন্থর ব'য়ে যায়,
দিকহারা শেষে ঠেকে এসে এই রাত্রির মোহনায়;
জোনাকিরা জ্বলে স্বপ্নের চরে,
স্মৃতির ঢেউয়েরা মাথা খুঁড়ে মরে—
অস্তকালের মিনারের পারে—বেদনা-বিদ্ধ পাখা
উড়ে যায় দেখি তোমার আকাশে একখানি চাঁদ বাঁকা!

রজনীগন্ধা, ফাঁকা মন নিয়ে রাত্রি কাটে না আর ঃ
তোমার স্মৃতির গন্ধ জড়ানো মনের অন্ধকার
শীর্ণ চাঁদের এক কোণা লেগে
জনতাবহুল দিল্লী শহর আরও মনে হয় ফাঁকা,
ছিঁড়ে গিয়ে হের শিহরে আবেগে,
অসহ হ'য়েছে ফাঁকা মন নিয়ে লোদি পল্লীতে থাকা।

সারা রাস্তা শুভেন্দুর অস্বস্তিতে কেটেছে। অভ্যর্থনা না-জানি কেমন হবে। দেড় বছর পুরনো জামাই। তবু বিয়ের পর এই প্রথম।

কিন্তু না শাঁখ, না উলু। মোটঘাট নামাতে হল নিজেকেই। কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছছে, চকিতের জন্যে দেখা গেল শাশুড়িকে। কিন্তু তিনি সামনে এলেন না, চট করে আড়ালে চলে গেলেন, বোধ হয় ছেঁড়া শাড়িটা ঘুরিয়ে পরতে।

বিধবা শালা-বৌ সুহাস এল তার পর। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, অল্প হেসে বললে, একটু ব'স ভাই, চা করে আনি। আসলে কিন্তু ঢুকল গিয়ে কলঘরে। মুখটা হয়ত ঘষে নেবে ভিজে গামছায়, চুলে একবারটি চিরুনী বুলিয়ে নেবে।

ছোট শালি মিনি একটা জলচৌকি এনে দিলে, সতীর তখনও দেখা নেই।

'তোমার দিদি কোথায়', শুভেন্দু নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

'আছে, আছে, বাপরে, কী ব্যস্ত'। বড় শালি কণিকা—এখনো যে ফ্রক পরে—চোখ ঘুরিয়ে বললে। হাত-পাখা নিয়ে কণি দাঁড়িয়েছে গা ঘেঁষে, শুভেন্দু জড়োসড়ো হয়ে গেল। এত বড় হয়েছে মেয়েটা, তবু লজ্জা নেই। হক না জামাইবাবু, পুরুষ তো। ভাল করে খেতে-পরতে পায় না, শরীরের পুষ্টি নেই. কিন্তু ফ্রকে আর পোষ মানে না। মাথা নীচু করল শুভেন্দু, ঘামছিল, এবার নাইতে শুরু করল।

আড়ষ্ট স্বরে বলল, পাখাটা আমাকে দাও।

পায়ের নখগুলো কী বিশ্রী বড় হয়েছে কণির, কতদিন কাটে না, কে জানে। হাঁটু থেকে গোড়ালি অবধি ধুলো, মাঝে মাঝে শুকিয়ে-আসা কবেকার চর্মরোগের চাকা চাকা কালো দাগ। ঘৃণায় মনের ভেতরটা দড়ি-পাকান হয়ে গেছে। পাখাটা আমাকে দাও, শুভেন্দু আবার বললে। কণি ছাড়ল না, টানাটানিতে শুভেন্দুর একটা আঙুল ছড়ে গেল।

অস্ফুট স্বরে শুভেন্দু বললে, উঃ। দুফোঁটা রক্ত জমেছিল, কণি মুখ নামিয়ে আনলে।—দিন, শুষে নিচ্ছি। এখুনি রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

গায়ে কাঁটা দিল শুভেন্দুর, রক্তশুদ্ধ হাতটা পকেটে পুরে দিয়েও স্বস্তি হল না। শাদা পাঞ্জাবীটার একাংশে লাল ছোপ লাগল, ভ্রূক্ষেপ করল না।

'তোমার দিদিকে ডেকে দাও' শুভেন্দু বললে মরিয়া হয়ে।

'দিদি এখন আসবে না', কণি আস্তে আস্তে বললে, 'দিদি ছাদে বসে কাঁদছে।'

'কাঁদছে? কেন?'

ফিস ফিস করে কণি বললে, 'রোজ কাঁদে যে। আমি জানি। দু'একদিন পরে বাচ্ছা হবে কিনা, তাই।'

'বাচ্ছা হবে বলে কাঁদে!' বিমূঢ় গলায় শুভেন্দু বলল, যেন কণি দুর্বোধ্য কোন ভাষায় কথা বলছে, সবটুকু মানে হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

'কাঁদে। দিদি ভীষণ ভয় পেয়েছে যে! বলছে বাচ্চাটা বাঁচবে না। বাঁচবে না কেন জামাইবাবু?'

ঠিক তখুনি শাশুড়ি ঢুকলেন ঘরে। শুভেন্দু প্রণাম করবে বলে মাথা নোয়ালে। মৃণালিনী পা ছুঁতে দিলেন না, দু-পা সরে দাঁড়ালেন, শুভেন্দুর মাথায় রাখবেন বলে ডান হাত বাড়ালেন, শেষ পর্যন্ত ছুঁলেন না, আশীর্বাদের একটা ভঙ্গী করলেন মাত্র। শুভেন্দু ততক্ষণ দস্তা-রুপো মেশান দুটো কাঁচা টাকা রেখেছে মেজেয়, প্রণামী। শাশুড়ি চেয়ে দেখলেন, ইতস্তত করলেন এক মুহূর্ত, তারপর নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন টাকা দুটো, আঁচলে বাঁধলেন। এ-শাড়িটা আগেকারটার চেয়ে হয়ত একটু ফর্সা, কিন্তু এটাও এখানে-ওখানে ছেঁড়া।

মামুলি দু-একটা কথা হল, মৃণালিনী বললেন, যাই, রান্নার বন্দোবস্ত দেখিগে। শুভেন্দু টের পেল, চৌকাটের ওপাশে গিয়ে তিনি চোখের ইশারায় ডাকলেন, মিনিকে, আঁচলে-বাঁধা টাকা দুটোর একটি দিলেন মেয়ের হাতে।

—মোড়ের দোকান থেকে চার আনার মিষ্টি নিয়ে আয়।

—মোটে চার আনার মা? আমাদের জন্যে কিছু আনব না?'

দ্রুত কঠিন একটা চড়ের শব্দে আবদারের বাকিটুকু চাপা পড়ে গেল।

চায়ের কাপ নিয়ে এল সুহাস, একটু পরে মিনিও ফিরল মিষ্টি নিয়ে।

কড়া পাকের সন্দেশ, শুভেন্দু ভেঙে ভেঙে মুখে পুরলে; দু-একবার গলায় ঠেকে গেল, চায়ের রসে ভিজিয়ে নিলে। শূন্য ঠোঙাটা মিনি লেহন করছে জিভ্ দিয়ে, আর কণি—হাত-পাখা নিয়ে সে, তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—লোলুপ দুটো চোখ নিয়ে। শুভেন্দু বার বার বিষম খেল, চা চলকে পড়ে জামাটা এখানে-ওখানে ভিজে গেল।

'সতী কেমন আছে' মৃণালিনীকে সসঙ্কোচে একবার জিজ্ঞাসা করল।

'ভালই তো।' মৃণালিনী অন্য দিকে চেয়ে জবাব দিলেন।

'ভয়ের কিছু নেই ত।'

'ভয়? না ভয় কিসের?' মৃণালিনী বললেন, কিন্তু স্বরে তেমন আশ্বাস ফুটল না।

'ডাক্তার নিয়মিত দেখছে তো।' প্রশ্নটা নিজের কানেই কর্কশ, প্রায়-অভদ্র শোনাল, কিন্তু মুখের কথা হল হাতের তীর, ফেরান যায় না। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'এই প্রথমবার কি না?'

প্রথমবার! অস্ফুট কণ্ঠে মৃণালিনী কথাটার পুনরুক্তি করলেন, একটু শিউরেও উঠলেন হয়ত, শুভেন্দুর চোখে ধরা পড়ল না।

কতকটা স্বগত, কতকটা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে, শুভেন্দু বললে, 'ভয়ের কী আছে। এখানে আপনার কাছেই তো আছে। যত্ন হচ্ছে।'

'যত্ন, এখানে!' শুভেন্দুর কথা থেকেই দুটো শব্দ বেছে নিয়ে মৃণালিনী উত্তর দিলেন, কিন্তু তাতেই সব বলা হয়ে গেল। 'যত্ন, এখানে।'

আলাপের নড়বড়ে সাঁকোটা কেঁপে গেল, শুভেন্দু হাত বাড়িয়েও আরেকটা খুঁটি ধরতে পারল না।

রান্নার যোগাড় দেখতে মৃণালিনী একটু পরে উঠে গেলেন, তার পরও শুভেন্দু চুপচাপ বসে রইল। বেলা ফুরিয়ে এসেছে, ঘরের ভিতরটা এখন অন্ধকার-অন্ধকার। একটা মাকড়শা কখন থেকে দেয়াল থেকে দেয়ালে নিঃশব্দ পায়ে ঘুরছে, জাল পাতার উপযুক্ত জায়গাটি না পেয়ে এখন একদৃষ্টে দেখছে শুভেন্দুকে। দিনের শেষ ভনভন মাছিটি এখনও অদৃশ্য হয়নি, এরই মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে উঠে এসেছে একঝাঁক মশা, গুনগুন শুরু করেছে।

মিনি পান নিয়ে এল। শুভেন্দু বললে, খাই না।

তবে সিগারেট জামাইবাবু? এনে দিই দোকান থেকে?

তাও না। কোন রকম নেশা শুভেন্দুর নেই।

ফিক করে হেসে মিনি বললে, একটি ছাড়া। দিদিকে ছাড়া আপনার চলে না, না জামাইবাবু?

শুভেন্দু মনে মনে বলল, পাকা মেয়ে। মুখে বলল, 'কে বললে। এই তো দিব্যি আছি।'

ঘাড় বাঁকিয়ে মিনি বললে, 'ইস্, তা বইকি। দিদিকে দেখলে সাধু-সন্ন্যাসীরই মন টলে যায়; তো আপনি! প্রতুলদাও বলতেন—'

'প্রতুলদা কে?' শুভেন্দু ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল।

গালে তর্জনী রেখে মিনি বলল, 'ও-মা, জানে না? প্রতুলদা তো প্রায় রোজই—সেই দিদির বিয়ের আগে থেকেই—'

কথাটা শেষ হল না। কখন সুহাস বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, নির্বাক চোখের কঠিন ইশারায় বাইরে টেনে নিয়ে গেল মিনিকে।

তখনও সতীর দেখা নেই। ছাদের কোন্‌টিতে একলা বসে কান্না কি শেষ হয়নি।

শুধু বসে থেকে থেকে শুভেন্দু ক্লান্ত হয়ে উঠল। মশা তাড়াল একটা, হাই তুলল কয়েকবার, তারপর এক সময় নিজে থেকেই চোখ দুটো জড়িয়ে এল। ঘামে পাঞ্জাবীটা ভিজে উঠেছে, বিশেষ করে ঘাড়ের কাছে, ছুড়ে-যাওয়া আঙুলটা টনটন করছে এতক্ষণ পরে, কণ্ঠার ঠিক নীচেই একটা ঘামাচিকে ঘিরে কয়েকটা মশা ভোজে বসেছে। ঘুম হল না, এক গ্লাস জল পেলে বড় ভাল হত।

উঠে বারান্দার দিকে যাবে, কিন্তু চৌকাটের বাইরে পা দেওয়া হল না। দরজার বাইরেই দীর্ঘ দুটি ছায়া, সে দুটিকে সনাক্ত করতেই শুভেন্দু বুঝি একবার বাইরে উঁকি দিল। বারান্দার কোণে, দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে সুহাস, দ্বিতীয় জনকেও চিনতে শুভেন্দুর দেরি হল না। সতী।

'কী হবে, কী হবে, ভাই ঠাকুরঝি আমার যে ভারি লজ্জা করছে। প্রতুল চৌধুরীর আসবার সময় যে প্রায় হয়ে এল।'

সুহাসের কণ্ঠ।

সতীর জবাবও প্রায় সংগে সংগে শানা গেল। মৃদু গলা, ক্লান্ত, একটু বা কেনো। —আমাকে কী করতে হবে।

'শুভেন্দুবাবু এমন হঠাৎ এসে পড়েছেন, তাই। উনি কী ভাববেন ঠাকুরঝি? ও'র কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। তুমি প্রতুল চৌধুরী এলে ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকের মত ফেরৎ পাঠিও তো ভাই।'

'লজ্জা আমারও আছে বৌদি। প্রতুল চৌধুরীর কাছে এ-শরীরটা দেখাতে পারব না।' সতীর গলা তেমনি শুকনো, ক্লান্ত, কিন্তু দৃঢ়তর।

'প্রতুল চৌধুরীকে শরীর দেখাতে লজ্জা, তোমার ঠাকুরঝি? কী বিষ ছিল সুহাসের গলায়, সতী ছিটকে সরে এল এ-পাশে, একেবারে শুভেন্দুর মুখোমুখি।

'সতী, শোন।' শুভেন্দু ধীরকণ্ঠে বললে।

সতী মুখ তুললে। জল-টলটল নীল দুটি চামচ। এক-পা, দু-পা করে ঢুকল ঘরে। নিস্তেজ, চাপা সুরে বলল, 'কী।'

'প্রতুল চৌধুরী কে, সতী।'

ঠিক তখনই বাইরে কড়া নড়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে নয়, একটানা। আগন্তুকের নিশ্চিত বিশ্বাস প্রবেশাধিকার সে পাবেই।

'যাও, দরজাটা খুলে দিয়ে এস।'

'না, না, আমি না', আকুল কণ্ঠে সতী বলে উঠল; 'তুমি যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

বিস্ময় ফুটল শুভেন্দুর চোখে; তারপর ঠোঁট দুটি বিদ্রূপে বেঁকে গেল। —'বেশ, তবে আমিই যাই।'

যেতে হল না, দরজা ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে সুহাস, যাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, তার রোমশ মণিবন্ধের ঘড়িটি শুধু দেখা যায়।

'পথ ছাড় সুহাস।'

'আজ না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আজ চলে যাও প্রতুল।'

আধো অন্ধকারে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল, ক্ষণপরে সিগারেটের ধোঁয়ায় দুটি মানুষ নিমেষের জন্যে আড়াল হয়ে গেল। একটু পরেই তাদের আবার যখন দেখা গেল—একজনের কণ্ঠলগ্ন ঘাড়, আরেক-জনের খোলা ঘোমটা মাথার আলগা খোপা —তখন প্রতুলচৌধুরী বলছে, 'তবে তুমি চল।'

'কোথায়?'

'ভয় নেই। ঠিক সময়েই ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ওরা বাইরে ট্যাক্সিতে বসে আছে সুহাস, একা ফিরে গেলে আমার উপায় থাকবে না।'

'চল।'

একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সুহাস,

দরজা ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে সুহাস

কাপড়টা ওখানে দাঁড়িয়েই ঠিকঠাক করে নিল। 'চল।'

—এই বেশেই? জুতোও পরবে না?

—কাজ কী। সুহাসের স্বরে একটা হিম হাসির আভাস পাওয়া গেল শুধু। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, প্রতুল, পা কাঁপছে। তাড়াতাড়ি চল।

দরজার কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ শুভেন্দু একটা গাড়ির দরজা খোলার, স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনলে; গাড়িটা পিছনে যে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া রেখে গেল, তার আঘ্রাণ নিলে বুক ভরে। তারপর ফিরে তাকাল।

ঘরের মধ্যে জানালার শিক ধরে সতী আতঙ্কপাণ্ডুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এসবের অর্থ কী সতী, শুভেন্দু চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেল, কিন্তু শুধু বিকৃত একটা স্বর বেরল, কণ্ঠনালীর কাছে গোটা কয়েক শিরা উঁচু হয়ে উঠল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝপ করে সতী মাটিতে বসে পড়েছে, রুক্ষ চুলের ভার পিঠময় ছড়ান, অবিন্যস্ত বেশ। শুভেন্দু চেয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

সতী পলকে কুড়িয়ে নিল আঁচল, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ।

ফিরে যাচ্ছি। শুভেন্দু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললে।

ফিরে যাচ্ছ? সতী অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, এই রাত্রে? এখন তো ট্রেন নেই।

স্টেশনে কাটাব। এখানে আমার আর এক মুহূর্ত থাকা চলে না, সতী।

কেন?

নির্লজ্জের মত সতী যে এত কিছুর পরও এপ্রশ্নটা করতে পারে শুভেন্দু আশংকা করেনি। মুহূর্তের জন্যে হত-ভম্ব হয়ে গেল, তারপর বলল, 'এ কেনর উত্তর তোমার যদি জানা না থাকে সতী, তবে তোমার বৌদি হাওয়া খেয়ে ফিরলে জিজ্ঞাসা কর।

জিনিসপত্র সব গোছানই ছিল, স্যুট-কেসটা হাতে নিয়ে শুভেন্দু দরজার বাইরে পা দিলে। টলতে টলতে সতী এগিয়ে এল, শুভেন্দুর হাত দুটি ধরে অসহায় গলায় বলে উঠল, না তুমি যেতে পারবে না।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল শুভেন্দু, পারল না। কপালে অল্প অল্প ঘাম দেখা দিল, কিছু রোষে, কিছু ক্ষোভে, কিছু উত্তেজনায়।

ছাড়। নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে একত্র গ্রথিত করে শুভেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

না, না, না।—হাত দুটো ছেড়ে পা জড়িয়ে ধরল সতী, নিমেষের জন্যে শুভেন্দু দেহে বিদ্যুৎ-দাহ বোধ করল। মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই বিতৃষ্ণা গলা অবধি উঠে এল, অন্ধপ্রায় শুভেন্দু কী করল খেয়াল ছিল না, সম্বিৎ ফিরে এলে দেখল সতী লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

দেহ নিথর, চোখ দুটি অপলক, দৃষ্টি-হীন।

শুভেন্দু ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ভেঙে বসল পাশে, এখনও ওর পায়ের পাতার ওপর সতীর শিথিল দুটি হাতের মিনতি। ক্ষীণশ্বাস দেহটি সহসা প্রবল একটা আক্ষেপে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল, একটু একটু গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

'সতী।' শুভেন্দু ডাকল সাহস করে।

*সাড়া এল না। বড় বড় দুটি কাল চোখ বিস্ফারিত করে সতী চেয়ে আছে। সে-চোখে তিরস্কার না ঘৃণা, পড়বার সাধ্য শুভেন্দুর নেই। অনেক পরে সতীর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, ক্ষীণ, প্রায়-*অশ্রুত গলায় বলল, মাকে ডেকে দাও। তুমি যাও।

মৃণালিনী, কনি, মিনি সবাই বারান্দার কোণেই বুঝি ছিল ভীড় করে। ইঙ্গিতমাত্রে ভিতরে ছুটে এল। মৃণালিনী মেয়ের মাথা কোলে তুলে নিলেন, কনি নিয়ে এল হাত পাখা, মিনি জল আনতে ছুটল।

একবার শুধু শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে মৃণালিনী বললেন, পাশের বাড়িতেই ডাক্তার। একবার ডেকে দেবে।

সুটকেসটা আর তুলে নেওয়া হল না। অন্ধকার প্যাসেজ পেরিয়ে শুভেন্দু ডাক্তারের খোঁজে সদর রাস্তায় বেরল।

ডাক্তার এসেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ভিতর থেকে। বললেন, আপনি বাইরে থাকুন। সামান্য হেসে বললেন, এ সময়ে স্বামীকে ভিতরে যেতে নেই।

শুভেন্দু কিছুক্ষণ পড়া-না-বোঝা ছাত্রের মত অবোধ চোখে চেয়ে রইল। তারপর ভাঙাভাঙা স্বরে বলল, সে কী। এত শীগগির।

ডাক্তার বললেন, বেশি প্রিমেচিওর তো নয়। তবে হঠাৎ কোন শক পেয়ে পেইনটা বোধ হয় নির্দিষ্ট দিনটির কিছু আগেই শুরু হয়েছে।

সারা রাত শুভেন্দু বারান্দায় পায়চারী করেছে। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়া মাথায় লাগাতে দাঁড়িয়েছে সদর রাস্তায়। চোখ ঘুমে ভরে এসেছে, অনেক দূরের একটা বাড়ি থেকে রাত-পাখির কর্কশ আওয়াজ, দেয়ালের টিকিটিকিটার থেকে থেকে শব্দ, বারান্দার কোণে রাখা বেতের সাজিটার ভিতরে ইঁদুরগুলোর কিচিরমিচির, কল চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার টুপটাপ, রাত্রের বিচিত্র সব শব্দের সঙ্গে ভেজানো ঘরের ভিতর থেকে একটি মেয়ের অবিরাম গোঙানি এক হয়ে মিশে গেছে।

সদর দরজায় পিঠ দিয়ে শুভেন্দু দাঁড়িয়েছিল। *চোখ দুটো ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে, হঠাৎ টের পেল সন্তর্পণে কে যেন কবাট দুটি ঠেলছে। সরে দাঁড়াতেই দরজা ফাঁক হয়ে গেল, মাথা নীচু করে সুহাস ঢুকল ভিতরে।* শুভেন্দুকে দেখে যেন চমকে গেল।—আপনি! এখানে?

শুভেন্দু সেই অন্ধকারেও সুহাসের মুখখানা দেখতে চেষ্টা করছিল। কোন উত্তর দিল না।

সুহাস আবার মৃদু গলায় বলল, সতী ঠাকুরঝি—

শুভেন্দু তর্জনী তুলে ভেজান দরজাটা দেখিয়ে দিল। কোন কথা হল না।

শেষ রাতে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

—কী হল ডাক্তারবাবু?

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে ডাক্তার বললেন, বলছি। আপনি আমার সঙ্গে একবার ক্লিনিকে আসবেন।

শুভেন্দু পিছে পিছে এল। ডাক্তার প্রথম হাত ধুয়ে নিলেন বেসিনে। চোখে-মুখে জল দিলেন, জানালা খুলে দিয়ে সকালের প্রথম আলোর দীর্ঘ একটি জ্যোতির্ময় রেখাকে ডেকে আনলেন ভিতরে।

দুঃসংবাদ আছে শুভেন্দুবাবু। ইংরিজী একটা খবরের কাগজ হকার কখন কবাটের নিচে দিয়ে গলিয়ে রেখে গেছে, বড় বড় হেড লাইনে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রথম পাতায় সাজান, সেদিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে থেকে শুভেন্দু অর্থোদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল, ডাক্তারের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল। দুঃসংবাদ আছে।

টেবিলে রাখা হাতের পাতায় চোখ দুটি নিবদ্ধ রেখে শুভেন্দু আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'সতী কি বেঁচে নেই?'

'আছে।'

'তবে কি বাচ্ছাটা—'

'সেও আছে।' ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু জন্মান্ধ হয়েছে শুভেন্দুবাবু।'

'জন্মান্ধ?' শুভেন্দু যান্ত্রিক কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল।

'জন্মান্ধ।' ডাক্তার আবার বললেন। 'আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন। আমি ডাক্তার, সঙ্কোচের কারণ নেই।'

একটির পর একটি প্রশ্ন। ডাক্তার *শুভেন্দুর কানে যেন গরম সীসে* ফোঁটা ফোঁটা করে ঢালছেন। কোনটার কী উত্তর দিলে ঠিক নেই, টলতে টলতে ক্লিনিক থেকে যখন বেরিয়ে এল' তখন জমাটবাঁধা ধাতুপিন্ডের মত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

কিছু বাকি নেই। ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছেন, ভিতরে গিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বলেছেন, ডিটেলড রিপোর্ট এখন দিতে পারছি না শুভেন্দুবাবু, কিন্তু প্রিলিমিনারি ইম্প্রেসন থেকে আপনাকে বলছি সাবধান হোন। একটু থেমে বিচিত্রকঠিন কণ্ঠে বলেছেন, 'যতদূর বুঝতে পারছি, লজ্জাকর রোগের কীট আপনার রক্তে ছেয়ে গেছে।'

'আমার রক্তে, ডাক্তারবাবু? আমার? অসহায় শিশুর মত শুভেন্দু চেঁচিয়ে উঠেছে।—এ কী করে সম্ভব হল ডাক্তারবাবু, কী করে।' উদ্ভ্রান্ত, আবিল দৃষ্টি শুভেন্দুর, নিশি জাগররক্তিম দুটি চোখ। বলতে বলতে সেই চোখে দু' ফোঁটা জল দেখা দিল, আকুল, রুদ্ধপ্রায় গলায় শুভেন্দু বলে উঠল, 'বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, কোন দুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করেনি। বাবা ছিলেন পন্ডিত, ছেলেবেলা থেকে তাঁর কড়া শাসনে থেকেছি; মদ দূরে থাক, সিগারেট, নস্যি কখনও ছুঁইনি, একটা সুপুরী পর্যন্ত দাঁতে কাটিনি। মেয়েদের দিকে সমস্ত জীবন মুখ তুলে পর্যন্ত তাকাইনি, কাছে যাইনি, সে প্রবৃত্তিই হয়নি, এ-সর্বনাশ আমার কেন হল ডাক্তারবাবু, কেমন করে হল।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে ডাক্তার শুনেছেন, একাগ্র হতে হাতের সিগারেটটা নিবিয়েছেন, পরে আবার একটা ধরিয়েছেন, সেটা ছাই-

দানীতেই নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, খেয়াল করেননি। শেষে উঠে এসে শুভেন্দুর পিঠে আশ্বাসের ভঙ্গীতে হাত রেখেছেন। আই পিটি ইউ, ইয়ংম্যান। আমি জানি, কেন। জীবনে আপনি দোষ না করে থাকতে পারেন, কিন্তু ভুল করেছেন। বিয়ের আগে আপনার যথেষ্ট খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল।'

আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। তপ্তরক্ত ছুঁচের মত কথাটা বিঁধেছিল শুভেন্দুর মর্মে। তবু ডাক্তার বলেছিলেন।

'প্রফেসন্যাল সিক্রেট। তবু আপনাকে খুলে বলা কর্তব্য মনে করি শুভেন্দু-বাবু। তিন বছর আগে আরও একবার এমনি কল পেয়ে, ও-বাড়ি আমাকে যেতে হয়েছিল।'

'কী হল সেই শিশু?' শুভেন্দু নিস্তেজ মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল।—'জন্মান্ধ?'

'না। সেটি ক্ষীণজীবী হয়েই জন্মেছিল। ক' ঘণ্টা পরেই মারা যায়। তখনই আমার আসল কথাটা বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু অপ্রিয় সত্য আমাদের সজ্ঞান চিন্তার পাশ কাটিয়ে যায়।'

হাই তুলে ডাক্তার চোখের পাতা দুটি ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করলেন, সেই অবসরে শুভেন্দু বেরিয়ে এল পথে। কোন দিকে যাবে।

শুভেন্দু জানে কোন দিকে। হাতের মুঠি কঠিন, কপালের শিরা স্ফীত। একটু পরেই টুঁটি টিপে ধরবে সতীর, তারপর বিকলাঙ্গ জন্মান্ধ শিশুটিরও ইহলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

কড়া কড়কড় করে উঠল। দরজা খুলে দিয়ে সুহাস ভয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে। জুতোর ঠোকরে একটা কাঁসার গ্লাস ঝনঝন শব্দে ছিটকে পড়ল উঠোনে; প্রতিধ্বনি দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরল।

সতী চমকে তাকাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল নিজের মুখ, কোলের শিশুটিকে।

মুহূর্তের জন্যে শুভেন্দু স্তব্ধ হয়ে গেল। আঁচলের নিচে মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাত-পা নড়ে উঠলো, মাঝে মাঝে চুক চুক শব্দ, থেমে থেমে ট্যাঁ-ট্যাঁ কান্না। একটু পরেই থেমে যাবে এ-কান্না, আর আঁচলের আড়ালে প্রসব-অবসন্ন যে শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে, সেটা একেবারে নিস্পন্দ হয়ে যাবে। সব শেষ।

সেই মুহূর্তে একটা টিকটিকি পোকা ধরার উল্লাসে টকটক করে উঠল, জানালার ফাঁক দিয়ে দুটো বোলতা ঘরে ঢুকে শুভেন্দুর কানের কাছে শুরু করল গুঞ্জন। হঠাৎ হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল শুভেন্দুর। সব শেষ? সব না তো। তার রক্তময় ছড়িয়ে আছে অগণিত পাপ-

---

কণিকা, দুটি অপঘাত মৃত্যু দিয়েও তো তাদের নিঃশেষে মুছে ফেলা যাবে না। ভাবতে ভাবতে মাথাটা টলে উঠল, শুভেন্দুর আরক্তিম, আবিল দুটি চোখ দিয়ে তপ্ত নির্ঝরের মত জল ঝরতে লাগল। সতীর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে শুভেন্দু কেবলি বলতে থাকল, তুমি আমার এ-সর্বনাশ কেন করলে সতী, কেন করলে।

সতী নড়ল না, মুখ ফেরাল না, আঁচলের নীচে থেকে শুধু অতি শ্রান্ত একটি নিয়মিত প্রশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল, আর মাঝে মাঝে ট্যাঁ-ট্যাঁ কেঁদে উঠে একটি নবজাতক তার জন্মান্ধতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল।

ধীরে ধীরে উঠল শুভেন্দু। দরজার কোণে স্যুটকেসটা তখন থেকে পড়ে আছে; ডালাটা আছে হাঁ করে। সেটাকে খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে শুভেন্দু ফের ভরতে লাগল।

—একটা কথা শুনবেন?

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল, সুহাস।

জিনিস গোছান হয়ে গিয়েছিল, শুভেন্দু সুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুহাস ওকে ডেকে নিয়ে গেল বারান্দার কোণটিতে। মিনি আর কনি খেলনা নিয়ে বসেছিল, তারা ত্রস্ত হয়ে একধারে সরে বসল। মৃণালিনী একবার উঁকি দিয়ে ফের কলঘরে গিয়ে লুকোলেন।

'কী বলবেন।'

সুহাস মাথায় সামান্য ঘোমটা টেনে দিল, আঁচলটা গুছিয়ে নিল গায়ে। নত চোখে ধীর স্বরে বলল, 'সতী ঠাকুরঝি আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়নি শুভেন্দু-বাবু, আমি দেব।'

অসহিষ্ণু গলায় শুভেন্দু বলে উঠল, 'জবাব আমি চাই না বৌঠান, আমার সব জানা হয়ে গেছে। সতীর ব্যাপারটা সব ডাক্তারবাবু কাছে শুনেছি, আর'—একটু ইতস্তত করে বলল, 'আর আপনাকে তো কালই দেখেছি।'

'দেখেছেন। শুনেছেন।' সুহাস আস্তে আস্তে শব্দ দুটির পুনরুক্তি করল। 'কিন্তু দেখা-শোনার পরেও একটা জিনিস বাকি থাকে, বোঝা। আপনি আমাদের কথা বোঝেননি শুভেন্দুবাবু।'

'বুঝে লাভ নেই। আমার সর্বনাশ যা হবার, হয়েছে। সমস্ত কৈশোর, প্রথম যৌবন নিজেকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে রুদ্ধপ্রায় ঘরে থাকার পুরস্কার তো পেলামঃ এই রোগ। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর পথ নেই সুহাস বৌঠান।'

'আত্মহত্যা?' দেখতে দেখতে হিংস্র হয়ে উঠল সুহাসের দুটি চোখ, ঘোমটা খসে পড়ল। 'আত্মহত্যা আমরা করিনি, শুভেন্দুবাবু? উনি, সতীর দাদা, হঠাৎ যখন মারা গেলেন। এখন আমাদের স্বজন নেই, সহায় নেই। একটা ভাড়া বাড়িতে বুড়ি শ্বাশুড়ি, কমবয়সী বিধবা বৌ, বয়স্থা ননদ, আর দুটি কিশোরী মেয়ের কী খেয়ে কী পরে দিন কেটেছে অনুমান করতে পারেন? হাঁড়িতে একটা চাল নেই, অথচ প্রতিদিন একটার পর একটা কুৎসিত উড়ো চিঠি এসেছে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেরা দিয়েছে শিষ। রাত্রে উঠোনে ঢিল পড়েছে। অন্ধকার ঘরে কাঠ হয়ে শুয়ে আমরা প্রতি রাত্রে ভেবেছি কখন ভোর হবে। আবার ভোর হলে ভেবেছি এখনি অন্ধকার নেমে এসে আমাদের সব লজ্জা ঘুচিয়ে দিক। লেখা-পড়া বেশি শিখিনি, তবু চাকরির চেষ্টায় ননদ-ভাজ মিলে শহরের পথে পথে ঘুরেছি; ইতর, অশ্লীল ঠাট্টা ছাড়া কিছু জোটেনি। হাতে তৈরি ছোটখাট জিনিস ফিরি করতে বেরিয়েছি, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরাই আমাদের ঠকিয়েছে বেশি, ঠিক-মত দাম দেয়নি। ততদিনে শেষ ভরি সোনাও বিকিয়ে কাঁসার বাসনে হাত পড়েছে। ঠিক এই সময় এগিয়ে এল প্রতুল চৌধুরী আমাদের বাঁচাতে, মারতে।'

'প্রতুল চৌধুরীই কি সতীকে—' শুভেন্দু স্তম্ভিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'হাঁ। সতীকে ওই বিপথে টেনে নিয়ে যায়। ওর বয়স ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, প্রতুল চৌধুরী সতী ঠাকুরঝিকেই বেছে নিয়ে-ছিল। আপনি এসে সতীকে বাঁচালেন, এবার এগিয়ে গেলুম আমি। আমারও শরীরে কীট ধরেছে শুভেন্দুবাবু। বেশি দিন আর টানতে পারব না।' বলতে বলতে যন্ত্রণায় সুহাসের মুখ বিকৃত হয়ে গেল, কণির মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমার পরে আসবে কনি। সব প্রতুল চৌধুরীর নোট বইয়ে নম্বর-টোকা হয়ে গেছে। কনিরও এই রোগ হবে। ওর পরে হয়ত আসবে মিনি।' দ্রুত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুহাস বলে গেল, 'আপনি পালাতে চাইছেন শুভেন্দুবাবু, কিন্তু আমরা কোথায় যাব। প্রতুল চৌধুরী তো সংসারে শুধু একজনই নয়। এই রোগ তারা দিয়েছে আমাকে, সতীকে, আপনাকে। কনিকে মিনিকেও দেবে। কারও রেহাই নেই। এ-রোগ আমাদের সকলের শুভেন্দুবাবু, আর শুধু শরীরেরই নয়।'

সুহাস একটু দম নিল, তারপর শুভেন্দুর হাত দুটি চেপে গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনি সেরে উঠুন শুভেন্দুবাবু, আমাদের সবাইকে সারিয়ে তুলুন।'

সেই স্পর্শে শুভেন্দুর গায়ে কাঁটা দিল। সুহাসের অনুনয়-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চেয়ে মুখ ফেরাতে পারল না। আস্তে আস্তে সুটকেশটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

একটি হারানো সূত্র

তেজেশচন্দ্র সেন

সম্প্রতি পৃথিবীতে জীবের ক্রম-বিকাশের ধারার একটি হারানো সূত্রের (missing link) সন্ধান পাওয়া গেছে। এই হারানো সূত্রটি একটি প্রকাণ্ড মাছ—আয়তনে প্রায় ৫ ফুট দীর্ঘ। এই বিরাট বিপুল আয়তনই ইহার একমাত্র বিশেষত্ব নয়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব জলের মাছের ডাঙগার জীবে বিশেষভাবে উভচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হবার ঠিক পূর্বেকার অবস্থা কিরূপ ছিল, এ তারই একটি জীবন্ত নিদর্শন।

ক্রম-বিকাশ তত্ত্বের গোড়ার কথা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে জীব ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে। সৃষ্টির অতি আদিতে জলে যে-ছিলো শৈবাল জাতীয় এক-কোষ উদ্ভিদ, যুগ-যুগান্তর ধরে রূপান্তরিত হয়ে তাই আজ ক্রমবিকাশের ফলে ডাঙগার শাল, বট, শিমুল প্রভৃতির ন্যায় বিরাট আয়তনের মহীরূহরূপে পরিণত হয়েছে। যে এক-কোষ জীব আমিবা যাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন দেখতে পাওয়া যায় না, তাই ছিলো সৃষ্টির আদিতে জন্তু শ্রেণীর (animal) জীব। এই এক-কোষ জীব আমিবাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানা পরিবর্তনে ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে আজ হাতী, ঘোড়া, গণ্ডার, উট প্রভৃতির ন্যায় বিরাট আয়তনের চতুষ্পদ জন্তুরূপে পরিণত হয়েছে। মানুষও ক্রমবিকাশরূপ বৃক্ষের একটি শাখা। একই বৃক্ষের একই শাখায় আজ-কার দিনের উন্নত শ্রেণীর লাঙগুলহীন বানরের সঙ্গে মানুষের ও জন্ম। বানরেরই ন্যায় মানুষও এক সময়ে গাছের শাখায় শাখায় বিচরণ করতো, গাছের ফল, মূল, পত্র ও নানাবিধ কীটপতঙ্গ ছিলো তাদের জীবিকা। কোন এককালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের পূর্বপুরুষ রূপান্তরিত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে। যে কারণেই হোক বানর জাতির সে সৌভাগ্য ঘটে নি। তাই আজও তারা শাখাবিহারী।

এই ক্রমবিকাশ তত্ত্ব নিতান্তই মানুষের উদ্ভট কল্পনা নয়। ইহার সপক্ষে বিজ্ঞানী-গণ আজ বহু নজির উপস্থিত করতে

সিলাকান্থের মাথায় হাত রেখে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ স্মিথ বসে আছেন
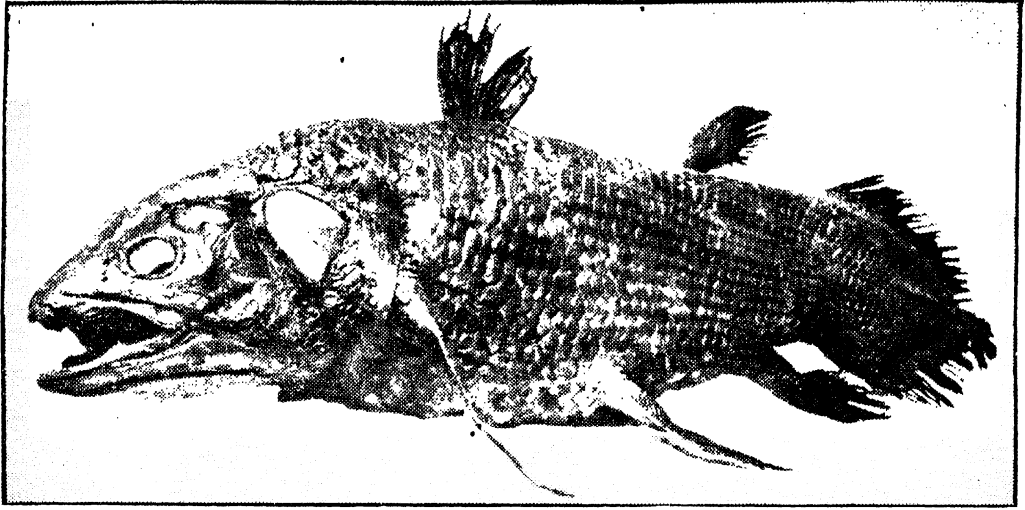
সম্প্রতি জালে ধৃত সিলাকান্থ। উভচর জীবের মত পাখনা দিয়ে আগে এরা ডাঙগায়ও চলতে পারত

পারেন। সেই সব নজিরের মধ্যে পৃথিবীর নানা সময়ে নানা স্থানে ভূস্তরে প্রাপ্ত জীব-শিলাগুলি (fossil) প্রধান। সুসম্বন্ধভাবে সজ্জিত করলে এই জীব-শিলাগুলির মধ্যে একটি আশ্চর্যরূপ ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আকার, আয়তন ও আকৃতিগত নানা বৈচিত্র্য লক্ষিত হলেও এরা যে অবিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, এগুলি যে একই আদি জীবের বিভিন্ন রূপান্তরিত অবস্থা এটা প্রমাণ করা আজ আর তেমন বিশেষ শক্ত কাজ নয়। ক্রমবিকাশ তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন মহামনীষী ডারউইন সাহেব। তাঁর জীবিতকালে বর্তমান সময়ে নানা দেশে বিভিন্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত অধিকাংশ জীব-শিলাই অনাবিষ্কৃত ছিল। তাই তিনি তাঁর মতের সপক্ষে জীব-শিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি কিম্বা তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানের প্রাণীদেহের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য অবলোকন করেছিলেন, তারি উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন তাঁর মত প্রতিষ্ঠার জন্য। পরে বহু স্থানে বহু জীব-শিলা আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁর মত আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এখনো জীব-শিলাগুলির মধ্যে ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের হারানো খেই সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি। সাম্প্রতিক আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে সংলগ্ন সমুদ্রে ধৃত সিলাকান্থ্ নামক (Cœlacanth) জীবটি সেইরূপ একটি হারানো খেই বা সূত্র। কিন্তু এটা জীব-শিলা (fossil) নয়, এ একেবারে একটি জীবন্ত হারানো সূত্র।

এই হারানো সূত্রটি অতি আদিম যুগের একটি সামুদ্রিক জন্তু। জলে ধৃত হলেও একে মাছ না বলে জন্তুই বলা যেতে পারে। কেননা, আকারগত সাদৃশ্যে মাছ অপেক্ষা জন্তুর সঙ্গে এর মিল বেশি। এর দাঁত মার্জারের দাঁতের ন্যায় তীক্ষ্ন, মাথার খুলির হাড় বিড়ালের খুলির হাড়েরই ন্যায় শক্ত মজবুত, চোখ দুটি গোল গোল, অতি বৃহৎ ও রং ঘন নীল, দেহের দু' ধারের দাঁড়ের আকারের দু' জোড়া পাখনা দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পায়ের মতো, আঁশগুলি বর্মের ন্যায় দৃঢ় শক্ত। অতি আদিতে সমুদ্রজলে এর প্রথম জন্ম কখন হয়েছিলো, তা বলা শক্ত। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, অন্তত ৩০ কোটি বৎসর পূর্বে এদের জন্ম হয়েছিলো সমুদ্রে। সেই যুগ-যুগান্তর ধরে এরা কখনো সমুদ্রের গভীর জলে কখনো পাহাড় বেষ্টিত তীর সংলগ্ন সমুদ্রে সাঁতার কেটে নির্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এসেছে। বহু স্থানে এদের যে-সব জীব-শিলা পাওয়া গেছে, তা দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, ৫ থেকে ৭ কোটি বৎসর পূর্বেও এরা সমুদ্রের জলে জীবিত ছিলো। তার পরে বহুদিন পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব-প্রান্তের তীরের নিকট-বর্তী সমুদ্র-জলে জেলেদের জালে একটি সিলেকান্থ্ ধরা পড়ে। জাহাজে তোলার পর মাছটি তিন ঘণ্টা মাত্র জীবিত ছিলো। জীবিতাবস্থায় তার গা হতে প্রচুর তেল ক্ষরিত হয়েছিলো, জাহাজের ক্যাপটেনকে তার লেজের ২।১ ঘা আঘাতও খেতে হয়েছিলো। মাছটিকে পাড়ে এনে জাহাজের ক্যাপটেন একজন স্থানীয় জীব-বিজ্ঞানীকে ডেকে আনে মাছটির বংশপরিচয় উদ্ধার করবার জন্য।

ভূস্তরে প্রাপ্ত সিলাকান্থের একটি জীবশিলা (fossil)। জীব-শিলাটির বয়স ১৬ কোটি বৎসর

স্থানীয় বিজ্ঞানী একে সনাক্ত করেন প্রাচীন যুগের সিলাকান্থ্ মৎস্য বলে। জীব-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো এই মাছ এখন আর জীবিত নেই, অন্তত ৫ কোটি বৎসর পূর্বে অন্যান্য আরো বহু সামুদ্রিক মৎস্যের ন্যায় সিলেকান্থ্‌ও পৃথিবী হতে চিরকালের মতো লোপ পেয়ে গেছে।

জে এল বি স্মিথ (James Leonard Brierley Smith) দক্ষিণ আফ্রিকার রোডস্ ইউনিভার্সিটির জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর বিশেষ গবেষণার বিষয় প্রাচীন যুগের মৎস্য। ধৃত সিলাকান্থের সংবাদ তাঁর কানে পেঁছিবা মাত্র তিনি আর কালবিলম্ব না করে ছোটেন মাছটি দেখবার জন্য। জ্যান্ত দেখতে না পেলেও অন্তত সশরীরে মাছটি দেখতে পাবেন, এই ছিলো তাঁর মনে আশা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেখানে পেঁছিতে না পেঁছিতেই মাছটির দেহের এমন বিকৃতি ঘটে যে, শুধু তার কঙ্কাল ও কয়েকটি আঁশ ভিন্ন তিনি আর কিছুই দেখতে পান নি। পূর্বেই এর জীব-শিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো। কিন্তু এটা যে এখনো সশরীরে জীবিত আছে, এ তাঁর মনে পূর্বে কখনো কল্পনায়ও উদিত হয় নি। সশরীরে মাছটিকে দেখতে না পেয়ে তিনি অতিশয় নিরাশ হলেন, কিন্তু তিনি একেবারে দমে গেলেন না। একটি মাছ যখন একবার ধরা পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই এই জাতীয় আরো মাছ সমুদ্রে জীবিত আছে। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আরো দুই-একটি মাছের সন্ধান করা যাবে। সেদিন থেকে এই মাছের সন্ধান করাই হলো তাঁর জীবনের ব্রত। নিজে একটি জেলে-জাহাজ ও লোকজন নিয়ে সমুদ্রে সমুদ্রে জাল ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পর্বতসঙ্কুল তীর-সংলগ্ন অগভীর সমুদ্রে, প্রবাল দ্বীপ-সমূহের চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে কখনো গভীর সমুদ্রে, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এমন কোন সম্ভাব্য স্থান ছিলো না, যেখানে তিনি জাল না ফেলেছেন। ১৫ বৎসর এরূপ অবিরত চেষ্টায় কতবার তাঁকে কত রকম বিপদের মুখেই না পড়তে হয়েছে। একবার দশ ফিট দীর্ঘ একটি হাঙ্গরের কামড়ে তাঁর একটি হাত প্রায় যাবার মতো হয়েছিলো। কতবার তাঁকে মাছের বিষপূর্ণ দাঁতের কামড় খেতে হয়েছে। কিন্তু সিলাকান্থের মার্জার-দন্তের সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য অদৃষ্টে তাঁর একবারও ঘটে নি। কিন্তু তবু তিনি নিরাশ হন নি। ধৃত সিলা-কান্থের জন্য ১০০ পাউন্ড পুরস্কার প্রাপ্তির কথা মুদ্রিত পত্রে প্রচার করে তিনি নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন।

গত বৎসরের শেষভাগে একদিন স্মিথ সাহেব একখানা কেবল্‌গ্রাম পেলেন মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকট মজাম্বিক প্রণালীতে একটি সিলেকান্থ্ মৎস্য ধরা পড়েছে। তিনি যদি মাছটি সশরীরে দেখতে চান, তাহলে অবিলম্বে যেন তিনি এখানে চলে আসেন। টেলিগ্রামের প্রেরক ক্যাপটেন এরিক হান্ট (Eric Hunt) একটি বৃটিশ বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ। মোজাম্বিক প্রণালীর যে স্থানে ক্যাপটেন হান্টের জাহাজ ছিলো, তার কাছাকাছি স্থানে আহ্‌মদ হোসেন নামক এক ব্যক্তির জালে মাছটি ধরা পড়ে। এ সংবাদ পেয়েই ক্যাপটেন হান্ট মাছটি দেখতে যান। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি একজন জীব-বিজ্ঞানীও ছিলেন। মাছটি দেখে সিলা-কান্থ্ বলে তার চিনতে দেরি হলো না। তিনি স্মিথ সাহেবকে কেবলগ্রাম করেই মাছটির দেহে যাতে পচন না ধরে, সে ব্যবস্থায় মন দিলেন। প্রথম তিনি চেষ্টা করলেন বরফ সংগ্রহ করতে। কিন্তু বরফ
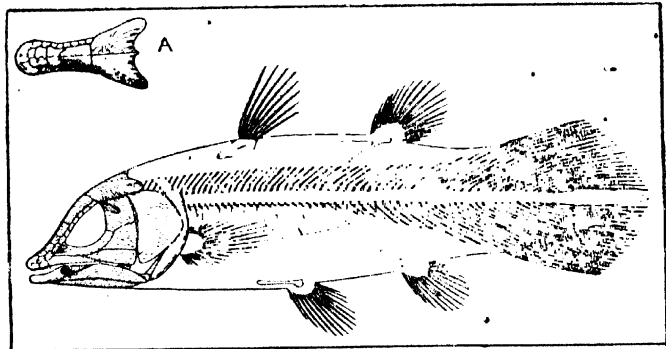
সিলাকান্থের কঙ্কালের চিত্ররূপ

না পাওয়ায় একজন ডাক্তারের কাছ থেকে সিরিঞ্জ (Syringe) এনে মাছের দেহে প্রয়োগ করলেন ফর্মেলিন (formalin)।

এদিকে স্মিথ সাহেব কেবল্‌গ্রাম পেয়েই ফোন ধরে ডাকলেন প্রধান মন্ত্রী মালান সাহেবকে। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হয়ে গেছে। মালান সাহেব ঘুমের ঘোরেই ফোন ধরলেন। তাঁর কানে এলো একটি ব্যাকুল কণ্ঠ—স্মিথ সাহেবের কাতর অনুনয়—কালই তার একটি উড়ো-জাহাজ চাই। তাঁকে যেতে হবে ১৫০০ মাইল দূরে ফরাসী অধিকৃত জাউড্‌জি (Dzaoudzi) নামক দ্বীপে। সেখানে একটি সিলাকান্‌থ্‌ মাছ ধরা পড়েছে। মালান সাহেব সেই রাত্রিতেই সমর বিভাগের কর্তৃপক্ষের সংগে ফোনে কথা বলে উড়ো-জাহাজ ঠিক করে রাখলেন।

সকালেই স্মিথ সাহেব উড়লেন মাছের সন্ধানে। যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে মাছটি তিনি দেখতে পেলেন। হান্ট সাহেব মাছটি এনে রেখেছিলেন তাঁর জাহাজে। স্থানে স্থানে পচন ধরতে আরম্ভ করলেও স্মিথ সাহেব গোটা আস্ত মাছটিই উড়ো-জাহাজে তুলে সংগে করে নিয়ে এলেন কেপটাউনে। বলা বাহুল্য, আহমদ হোসেন ১০০ পাউন্ড পেয়েছিলো পুরস্কারস্বরূপ।

মালান সাহেবের নিকট যখন মাছটি উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি মাছটির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মিথ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি বলতে চান, ৩০ কোটি বৎসর পূর্বে আমরা দেখতে এরকম ছিলেম? কি বিশ্রী দেখতে?" স্মিথ সাহেব উত্তরে বললেন—"এর চেয়েও দেখতে কুশ্রী মানুষ আমি দেখেছি।" মালান সাহেব খৃষ্ট ধর্মের যে-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা বিবর্তনবাদ বিশ্বাসী নন। স্মিথ সাহেব মালান সাহেবের নামানুসারে মাছটির নতুন নামকরণ করেছেন—মালানিয়া অঞ্জুয়ান (Malania Anjouan)।

মাছটি এখন স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁর ল্যাবরেটারিতে রক্ষিত আছে। এখনো এর সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য উদ্ঘাটিত হয় নি। সব তথ্য উদ্ধার করা তার একার কাজ নয়। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। হয়তো আরো বহু বৎসর লাগবে সমুদয় তথ্য উদ্ধার করতে। তখন হয়তো জানা যাবে, সিলাকান্‌থ্‌ প্রত্যক্ষভাবে সত্যি সত্যি ডাঙগার জীবের হারানো সূত্র কি না।

বাংলার পাটী শিল্প

সতীশচন্দ্র দে

ভারতীয় অর্থনীতিতে, বিশেষত কুটীরশিল্পের তালিকায় পাটী-প এক বিরাট স্থান অধিকার করিয়া ছ। এই শিল্প মাদুর শিল্পের প্রতি-গিতায় আজও মাথা উঁচু করিয়া হিয়া আছে। ভারত তথা বাঙলা দেশে নক প্রকারের কুটীরশিল্প আছে এবং হা কত প্রকার, তাহার তথ্য এখনও ঠক সংগৃহীত হয় নাই। অধিকাংশের কটে এই শিল্প আজও অপরিচিত হয়াছে।

পাটী একপ্রকার ঘাস জাতীয় চারাগাছ তে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন নামে এই চারাগাছগুলি পরিচিত। সাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ঢাকা, ফরিদপুর ভৃতি জেলায় ইহা 'মোত্রা' নামে পরিচিত। শালে ইহা 'পৈয়িতা' নামে খ্যাত। ম ঊর্ধ্বে ৭।৮ ফুট পর্যন্ত একটানা জভাবে বাড়িয়া থাকে। 'মোত্রা' বা এই গাছগুলি নিম্ন-পতিত জলাভূমিতে ন্মিয়া থাকে। ১২ ফুট হইতে ২ ফুট লে বা ইহার কিছু কমবেশি জলে এই রাগাছগুলির বেশ ভাল চাষ হয়। ভূমিতে কোন শস্যাদি হয় না, সেখানেও র চাষ হইতে পারে। বনাঞ্চলে বা ন্য অঞ্চলে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে ষ্টি হয়, সেখানেও এ-চারাগাছগুলি রোপণ করা যায়। কারণ ইহা রৌদ্র বা ষ্টিতে বা জলে নষ্ট হয় না। ইহা কবার পুঁতিয়া দিলে বিশেষ কোন যত্ন াতেই বহুল পরিমাণে ইহার বৃদ্ধি ইয়া থাকে। এ-চারাগাছগুলির বার মাসই দ্ধি আছে এবং বর্ষাকালেই ইহা প্রচুর রিমাণে বাড়িতে থাকে। এই সময়েই টির নীচে শিকড় হইতে অসংখ্য চারাগাছ হির হয়।

স্যার জর্জ ওয়াল্ট সাহেবের লেখা—"The commercial product of India" থে এ-শিল্প সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন "Mutra is a woody shrub of Eastern Bengal, Assam, Burma and Malayan Peninsular. It thrives on moist ground which need not be specially prepared and it can be reproduced by cuttings as well as transplantation of shoots." (P. 774).

এই চাষের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে কোন জায়গার অভাব নাই বলিয়াই মনে হয়। কারণ এই বঙ্গে হাজার হাজার জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ স্থানে এ-চারাগাছগুলির চাষ হইতে পারে, তাহার তথ্য কৃষিবিভাগ হইতে এখনই লওয়া দরকার এবং হাজার পাঁচেক বিঘা জলাভূমিতে আসাম, বর্মা, পাকিস্তান, মালয় প্রভৃতি যে কোন দেশ হইতে এ-চারাগাছগুলি আনাইয়া রোপণ করিয়া ইহার সত্যাসত্য বিচার করা প্রয়োজন। তাহা হইলে এই শিল্প এদেশের মাটিতেই উৎপন্ন হইতে পারিবে এবং কিয়ৎ-পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ও ইহার চাষের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাইবে।

স্যার জর্জ ওয়াল্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "The chief producing districts are Faridpur, Bakharganj, Tipperah and Chittagong in Eastern Bengal, Sylhet and Cachar in Assam, and Huzada in Burma."

ভারতবর্ষে কোন 'মোত্রা'র চাষ নাই। ইহা আপনা আপনিই পার্বত্য অঞ্চলে, জলা-ভূমিতে, খাল-বিলের ধারে, নিম্ন-পতিত জমিতে জন্মিয়া থাকে। সেখান হইতে ইহা কাটিয়া আনিয়া একপ্রকার ধারালো দা দিয়া সরু সরু করিয়া চিরিয়া লয় এবং তাহা হইতে শক্ত মজবুত বেত তৈরি হয় এবং বেতগুলি আঁটি বাঁধিয়া জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং সুনিপুণ কৌশলে বেতী তুলিয়া তাহার দ্বারা মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকাগণ পাটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই পাটীই 'শীতল-পাটী' নামে পরিচিত। পাটী নানা প্রকারের। মোটা এবং চিক্কণ পাটীর ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে শয্যায় চাদরের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা হয়। বড় বড় সভা-সমিতিতে সতরঞ্চির পরিবর্তেও ইহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের ইহা ছিল নিজস্ব সম্পদ। ধনী, নির্ধন, ছোট-বড়, সকল শ্রেণীর লোকই ইহার সঙ্গে ছিল পরিচিত। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসরূপে ইহার ব্যবহার প্রতি ঘরে ঘরে। এ-শিল্পের ব্যাপকতা ছিল পূর্ব-বাঙলার প্রতিটি জেলায়—যথা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নয়। তাহারা মাদুরেরই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারত বিভক্ত
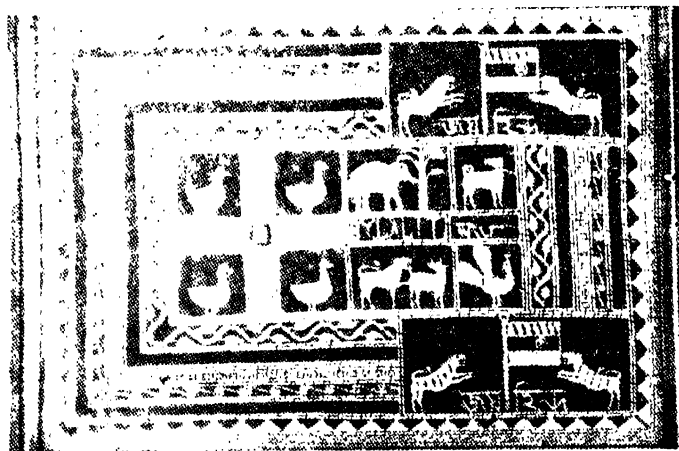
শ্রীহট্টের শীতল পাটী

হওয়ায় এই শিল্পের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া আজ অনেকেই মাদুর অপেক্ষা ইহার প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কারণ মাদুর অপেক্ষা ইহা অনেক টেঁকসই ও মজবুত। মাদুর জলে ভিজিলে সহজেই পচিয়া নষ্ট হয়। ময়লা হইলে পরিষ্কার করাও কষ্টকর। কিন্তু পাটী রৌদ্র বা বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না। শুধু জল দিয়া ধুইয়া দিলেও ইহার সৌন্দর্য নষ্ট হয় না। ইহা বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। কিন্তু মাদুর অল্প দিনের মধ্যেই ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাদুরে ছারপোকা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পাটীতে কোন ছারপোকা বাসা বাঁধিতে পারে না। তাই বাঙলা দেশে মাদুরের ব্যবহার ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। পাটী বসিতে ও শুইতে আরামদায়ক। ইহা জমিদার ও ধনীর গৃহে কার্পেটের পরিবর্তে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পাটীর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে স্যার জর্জের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"From the steams are prepared the famous Sital Pati or Cool-mats. For the manufacture of the finish mats the Mutra should be cut when one year old...... owing to their coolness they are much used during the hot weather both by Europeans and by Natives, being placed beneath the bedding sheets. As a historic fact of some interest, it may be here mentioned that formerly the main corridor of the East India House in Leadenhale Street, London, is paid to have been lined with this matting. The quality is judged by glosiness, smoothness and fineness of texure and it is said that over this smoothness even a serpent cannot glide." (P. 725).

মোত্রার কোন অংশেরই অপচয় হয় না। ইহার দ্বারা পাপোষ, ঝাড়ন, আসন, হাত-বাক্স, ফুলের সাজি, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বিতীয় আবরণকে 'আঁতি' বা 'মাজ' বলে। আঁতি সুতার পরিবর্তে নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'মাজ' দ্বারা ক্ষার উৎপন্ন হয়। মাজের ছাই দিয়া সোডার পরিবর্তে কাপড় পরিষ্কার করা যায়। পয়সার অভাবে অনেক লোকই মাজের ছাই দিয়া কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই মাজ নানা প্রকারের ভেষজ দ্রব্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা চলে। রাসায়নিক পরীক্ষা-মূলক কার্যে ইহার ব্যবহার অনেক প্রকার হইতে পারে। ওয়াল্ট সাহেব লিখিয়াছেন,

"It has been suggested more than once that his fibre would make an excellent substitute for the panalna fibre in hat manufacture. The plant also yields a pith which might well be employed as a paper-material if procurable in sufficient quantity."

এই ব্যবসা ছিল আসাম ও বাঙলা দেশে সীমাবদ্ধ। ইহার শিল্পীরা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের। তাহ... কাহারও উপর নির্ভরশীল ছিল ... আসামের 'মোত্রা' উৎকৃষ্ট বলিয়া বাঙ... দেশ হইতে অনেক লোক প্রতি বৎ... আসামে কাজ করিতে যায়। যে... জায়গায় উহারা কাজ করে, তাহা... মোত্রামহল বলা হয়। মহলগুলি ব... বিভাগের অধীনে। মোত্রাগুলির ডাক হ... বড় বড় ধনী মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী ... মহলগুলি ডাকিয়া রাখে বনবিভাগ হইতে... তাঁহাদের নিকট হইতে বড় বড় ধ... শিল্পীরা কিনিয়া নেয়। সেখানে এ... কর্মীরা মাসের পর মাস দলবদ্ধ অরাক্ষ...

স্থায় বিপদসঙ্কুল হিংস্র শ্বাপদ-রবেষ্টিত জায়গাতে কুঁড়েঘর তৈরি রিয়া কাজ করিতে থাকে। এসব কাজ র মাসই হয়। বর্ষাকালে শিল্পিগণ শে ফিরিয়া যায়। কিন্তু পূর্বে মহলগুলির ডাক হইত না। যে কোন াক ইচ্ছামত মোত্রা কাটিয়া আনিতে ারিত। তাহার জন্য বনবিভাগকে কোন ল্য দিতে হইত না। মাঠের পর মাঠ-াপিয়া ইহা জন্মিয়া থাকে। এই জঙ্গল-গুলি পরিষ্কার করার জন্য বনবিভাগ হতে লোক নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু খন তাহারা দেখিতে পাইল যে, ইহা বনা খরচায় পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে, খন পরিষ্কার করিবার জন্য পয়সা ব্যয় রিবার প্রয়োজন বোধ হইত না। সেই মোত্রা-কাটা মাঠগুলি বনবিভাগ হইতে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইত। পরে এই জমিগুলি ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এখন আর কেহ ইচ্ছামত 'মোত্রা' কাটিয়া আনিতে পারে না।

এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছে। তাহারা দারিদ্র্যের জন্য নির্যাতিত ও অবহেলিত। সন্তান-সন্ততিগণ নিরক্ষর রহিয়া গিয়াছে। আক্ষরিক জ্ঞানলাভের উৎসাহ মোটেই দেখা যায় না। অর্থাভাবের জন্য এ-শিল্পে অতি বাল্যকাল হইতেই জড়াইয়া পড়িতে তারা বাধ্য হয়। এবং পড়াশুনা হইতে এই কাজের গুরুত্ব দেয় বেশি। কারণ ছেলেমেয়ে সবাই উপার্জন-শীল হয়। নিজ নিজ ঘরে বসিয়াই এই কাজ করিতে পারে। শিল্পীরা বাড়ি বাড়ি বেতী পৌঁছাইয়া দেয় এবং পাটী তৈয়ার হইলে আবার লইয়া আসে। সাধারণত, মেয়েরা গৃহকর্ম শেষে এই কাজ করিয়া থাকে। ভারত বিভক্ত হওয়ায় যেসব উদ্বাস্তু পরিবার কোনও রকমে একটু সংস্থান করিয়া লইয়াছে এবং যাহারা এ-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এতদিন উপলব্ধি করিত না, তাহারাও আজ এ-শিল্পের প্রতি আস্থাবান ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যদি লোকালয়ের চারিদিকে পাটী তৈরি দেখিতে পায়, তাহা হইলে পাটী বুনন শিখিয়া উপার্জন করিতে পারে। এ-শিল্পের ব্যাপকতা পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। কিন্তু পূর্ব-বাঙলার অধিবাসীরা ইহার প্রচলন বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। পূর্ববঙ্গের যেসব সহস্র সহস্র লোক ইহার উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ তাহারা এখানে শিল্পভাবে নিঃস্ব ও নিরন্ন অবস্থায় চরম দুর্দশার সম্মুখীন। তাহারা কলিকাতা, হাওড়া, নবদ্বীপ, কাঁচড়াপাড়া এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানা স্থানে ভয়ংকর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেছে। যাহাতে
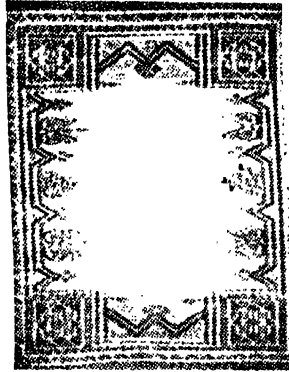
মেদিনীপুরের মাদুর

উদ্বাস্তুগণ জীবিকাভাবে দ্বারে দ্বারে নিষ্পিষ্ট হইয়া অভাবের তাড়নায় অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া না মরে, তাহার প্রতিকারের জন্য এ-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট বেকার সমস্যার সমাধানে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের এখনই হস্তক্ষেপ করা দরকার।

প্রায় তিন কোটি লোকের দেশ এ পশ্চিমবঙ্গ। ৫০।৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু হইয়া চলিয়া আসিয়াছে পূর্ব-বাঙলা হইতে পশ্চিম বাঙলায়। উদ্বাস্তুগণ, নিজেদের চেষ্টায় এবং গভর্নমেণ্টের সহযোগিতায় ২০০ হইতে ৩০০টি কলোনী গড়িয়া তুলিয়াছে। এ-কলোনীগুলিতে ৫।৬ লক্ষ লোক বাস করে। অনেক বস্তীও আছে। প্রায় লক্ষাধিক লোক এ-বস্তীগুলিতে বাস করে। Transit Campগুলিতে অসংখ্য লোক আছে। এ-শিল্পকে গড়িয়া তুলিতে হইলে কলোনী, বস্তী ও ক্যাম্পগুলিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। আঞ্চলিক হিসাবে ঐ কলোনী, বস্তী ও ক্যাম্পগুলিকে বিভক্ত করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। প্রথমত, এক লক্ষ লোককে কেন্দ্র করিয়া ইহার কাজ শুরু করিতে হইবে। এই কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালাইতে হইলে একটি Multi Purpose Society গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করিতে হইবে। এক লক্ষ বেকার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ এ-কাজে নিযুক্ত হইলে সংসারের অভাব-অনটন এখনই কিছুটা লাঘব করিতে সমর্থ হইবে। এই সব লোকদের কাজ শিক্ষা দিতে হইলে এক-দল সুনিপুণ কর্মীর দরকার হইবে। এ প্রকারের কর্মীর এখানে কোন অভাব হইবে না। তাহাদিগকে আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত করিয়া কলোনী, বস্তী ও ক্যাম্প-গুলিতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা ৮।১০ দিনের মধ্যেই পাটী বুনন শিক্ষা করিতে পারিবে। এভাবে একদল ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হইলে তাহারা ঐ কলোনী বা বস্তী বা ঐ ক্যাম্পগুলির লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবে। তাহা হইলে ঐ কর্মীদের আর প্রয়োজন হইবে না। তাহারা অন্যান্য কলোনীগুলিতে গিয়া এভাবে শিক্ষা দিতে পারিবে। যতই ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকিবে, ততই ইহার প্রতি বেশি লোক আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। এবং তাহারা নিজেরাই বুনন দেখিয়া ক্রমে ক্রমে শিখিয়া লইতে পারিবে। এভাবে বাঙলার সর্বত্র কলোনী, বস্তী ও ক্যাম্পগুলিতে এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলেও এ-শিক্ষার প্রসারতা ছড়াইয়া পড়িবে। যেসব স্ত্রী-পুরুষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের মাহিনা, পথ-খরচ প্রভৃতি দিতে হইবে। স্থানে স্থানে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।

পূর্বে দৈনিক দুই লক্ষ পাটী উৎপন্ন হইত। এ-শিল্পে প্রায় তিন লক্ষ লোক আসাম ও বাঙলায় নিযুক্ত ছিল। গড়ে পাটীর বিক্রয়-মূল্য তিন টাকা করিয়া ধরিলে ছয় লক্ষ টাকার পাটী তৈরি হইত। একজন সুনিপুণ কর্মীর দৈনিক আয় ছিল দেড় টাকা হইতে দুই টাকা। শিক্ষার্থিগণ দশ আনা হইতে বার আনা দৈনিক উপার্জন করিতে পারিত। ওয়াল্ট সাহেব লিখিয়াছেন,

"The price varies from Rs. 2 for the common sort to as much as Rs. 100 for the best qualities."

—ইহা ছিল ১৯০৮ সালের নির্ধারিত মূল্য।

পূর্বের চেয়ে পাটীর মূল্য বর্তমানে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইভাবে শিল্পের প্রসারতা বাড়িয়া যাইবে এবং শিক্ষার্থীরাও ছয়-সাত দিনের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহকর্ম শেষে মাসিক ৪০৲।৫০৲ টাকা আয় করিতে পারিবে। এইভাবে তাহাদের অভাব-অনটন লাঘব করিতে সমর্থ হইবে। এই শিল্পও বিরাট বেকার সমস্যার সহায়ক হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। এই ব্যবসায়ে এক লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকিলে দৈনিক গড়ে ৭৫,০০০ হইতে ৮০,০০০ পাটি প্রস্তুত হইবে। তার জন্য ১ লক্ষ লোক মজুরী হিসাবে কমপক্ষে দৈনিক লক্ষাধিক টাকা পাইবে। ৫ টাকা করিয়া গড়ে বিক্রয় হইলে ৮০ হাজার পাটীর মূল্য ৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। এইভাবে জাতীয় আয় বাড়িয়া যাইবে। এ-সব জাতীয় ব্যবসায় হইতে কিরূপে জাতীয় আয় হইতে পারে তাহা George walt সাহেবের ১৯০৮ সালের প্রণীত গ্রন্থে জানা যায়। "The highest recorded value was Rs. 2,41887 in 1900—1." পরবর্তীকালে এই আয় যে বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই ব্যবসায় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসামেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ইহার আয় যতই বাড়িতে থাকিবে ততই ইহার প্রসারতা বৃদ্ধি পাইয়া বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিবে। অন্যান্য কুটীরশিল্প প্রতিযোগিতার জন্য বিপন্ন কর্মিগণ অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে। কিন্তু এই শিল্প প্রতিযোগিতায় বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতেও নাই। ইহার উৎপত্তি যতই বাড়িবে, ততই ইহার ব্যাপকতা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকার-সমস্যা সমাধানের একটা পথও খুলিয়া যাইবে। এখন পর্যন্ত যত পাটী ব্যবহারের প্রয়োজন, তত পাটী এ বঙ্গে প্রস্তুত হয় না। এই বেতীগুলি আসাম হইতে আনিতে হয়। অথচ পাটীর চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এখানে 'মোত্রা' চাষ করা প্রয়োজন। এজন্য অর্থের বা শ্রমের প্রয়োজন হয় না। এক বৎসরের মধ্যে বড় হইয়া কাজের উপযুক্ত হয়।

সুতরাং বাঙলার এই কুটীর-শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে এই শিল্পের প্রসার লাভ হয়, সেই জন্য 'মোত্রা'র চাষের বন্দোবস্ত মা[illegible] পারপাস সোসাইটি মারফৎ মহলগুলি[illegible] বিলি ব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত এবং দে[illegible] বিদেশে ইহার প্রচার করিয়া বাজার সৃ[illegible] করিলে বাঙলার এই শিল্প তাহ[illegible] অতীত গৌরব ফিরিয়া পাইবে।

(১৩)
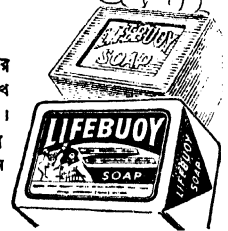
মাথার উপর লকলকে ছোরাটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল তবলচি।

কলিজার মধ্যে প্রাণপাখী আমার তৎক্ষণে ছটফটানি থামিয়ে ছোরা খাবার জন্য লুটিয়ে পড়েছে।

হীরাবাঈয়ের মুখ থেকে একটু আধো চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। নাচের আসর জমে ওঠার পর ঝগড়া-ঝাটি, মন কষাকষি এরকম অনেক কিছু হয়। কিন্তু চোখের সামনে মানুষ খুন হয়ে যাবে, তা সে কখনো ভাবতে পারে নি।

হীরাবাঈয়ের ঘরে তিন দিন লুকিয়ে রইলেন মাস্টারজী সোহনলাল। নীচে নেমে এলেই ওই ছোরা তার বুকের মধ্যে বসিয়ে দেবে, এমন একটা ভীষণ শাসানি দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল তবলচি সে রাত্রিতে। শুধু ধুতি ও বাণ্ডি (তুলোভরা ছিটের গরম হাফ-হাতা কোট) পরে বাঈজীর আসরে নাচ দেখাতে এসেছিলেন সোহনলাল। তারপর বাঈজীর শাড়ি পরে তিন রাত্রি সেখানে কাটিয়ে দিতে হল।

এই দুর্ঘটনা অর্থাৎ মিস এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বলতে বলতে সোহনলালের মনে কোন ভয়ের স্মৃতি ফুটে উঠল না। যে স্মৃতি তার মনে জাগল, তা হচ্ছে বেপরোয়া বাহাদুরীর। তার জীবনে নাকি এমন বাহাদুরীর ব্যাপার আর কখনো হয়নি। এমন নাচই মাস্টারজী নেচেছিলেন সে রাতে যে, তার সঙ্গে ঠিকমত তাল দিতে না পেরে মরীয়া হয়ে তবলচি তাকে খুন করে ফেলবে বলে শাসিয়েছিল।

বলতে গেলে—শাসিয়ে দিতে একরকম বাধ্যই হয়েছিল। নাচ ও তবলার পাল্লা আমরা বাইরে থেকে খুব উপভোগ করি। কিন্তু তার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন রেষারেষিতে ওস্তাদদের মধ্যে নাকি এমন ব্যাপারই হয়। মারাত্মক নাচ হবে সেটা তাহলে।

কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলতে খেলতে স্বামী-স্ত্রীতে মুখ দেখাদেখি বন্ধের ব্যাপার চোখে দেখেছি। বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত আদালতে পেশ হয়েছে, এমন কথাও শুনেছি। কিন্তু নাচের আসরে এমন সংঘর্ষের ব্যাপার একেবারে আশ্চর্য।

মাস্টারজীর অল্প বয়সে এ ব্যাপারটি হয়েছিল।

লম্বা একহারা হাড়ে-মাসে গড়া দেহ। ঘন শ্যামবর্ণের ভিতর দিয়ে টিপিক্যাল রাজপুত গড়ন ফুটে উঠেছে: সে শরীর যেন কথকের, রাধাকৃষ্ণের লাস্য বা শিবের তাণ্ডব নাচ ও লড়াইয়ের সময়ের নৃমুণ্ডমালিনী নাচ—দুইয়েতেই সমানভাবে পটু। হাতের পায়ের আঙুল দেখে বুঝতে দেরি হল না যে, সেগুলি দিয়ে শিল্প ও শস্ত্রবিদ্যা দুইয়ের সাধনা সমানভাবে করা সম্ভব।

পাৎলা মলমলের পাঞ্জাবীর আস্তিন তুলে সেই লম্বা কলার মত আঙুলের মুঠি দিয়ে নমস্কার করে গাঙ্গোরী দরওয়াজার মাস্টারজী শতরঞ্চিতে আরাম করে বসতে অনুরোধ করলেন।

শতরঞ্চিকে পশ্চিমে দররি বলে। কেন তা জানি না, কারণ রাজস্থানে যেসব শতরঞ্চি তৈরি হয়, তার সুন্দর রঙীন নক্সার জন্য এই নামটিই খুব মানানসই। দর়ি বললে কিছুই বলা হয় না।

অবশ্য নামকরণে বাঙালী এখনো হিন্দুস্থানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। জুতার দোকানের নাম শ্রীচরণেষু, খাবারের দোকানের নাম মিষ্টিমুখ, আর মুদীখানার নাম পণ্যশ্রী, এ শুধু বাঙলা ভাষাতেই সম্ভব। বাঙলার মাটিতে ধান ক্ষেতের শীষে কবিতা গজায়। গাঙের উপর দিয়ে ভেসে-আসা বাতাসের স্নেহ-স্পর্শ, তাতে একটু হাত বুলিয়ে গেলে দুলে দুলে সে ধানের সারির ঢেউ অপ্সরাদের নাচের ভঙ্গী দেখিয়ে যায়। দুটো দোয়েল পাপিয়া হঠাৎ কোথা থেকে গান গেয়ে উঠে মনে করিয়ে দেয় যে, গাঁখানার নাম মধুবাণী বা বনস্থলী বা নয়নজোড়। কাজেই যদিও একটা গালিচা এদেশে ভূমিষ্ঠ হয়ে নাম পেল দর়ি, রসকষহীন ব্যবসায়ের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে সে জিনিস যখন বাঙালী গৃহিণীর মিঠে হাতে পৌঁছাল, তখন তার নতুন নামকরণ হল শতরঞ্চি।

শেক্সপীয়র অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন যে, নামে কি আছে? আমরা কিন্তু মনোহরা ও রসকদম্ব অতি মোলায়েমভাবে আস্বাদ করতে করতে পয়োধি নামের দইটুকুর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মিহি গলায় উত্তর দিই যে, নামেই ত সব। সুঠাম ক্ষীণ বৃন্তের উপর শিথিল সাজে দাঁড়ান, চামেলীকে কি রোডোডেনড্রন বলে ডাকলে মানাবে? না, তার গন্ধটুকুর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাবে?

ভেবে দেখুন, পাশাপাশি দুটো দোকান দাঁড়িয়ে আছে। একটিতে হরেক রকমের ফিউচারিস্ট আর্টের নমুনা দেখিয়ে (দুষ্ট লোকে বলে দোকানের ভবিষ্যৎ নেই বলে) সাইনবোর্ড টাঙ্গান। নাম—মনোহারী। অপরটিতে সোজা কালো রঙের মোটা অক্ষরে লেখা—শপ অব হাকিমৎ রায়। আর তার নীচে গোটা গোটা অক্ষরে যোগ করা আছে—ব্রাদার ফেইলড্ বি এ।

আপনি এখন কোন্ দোকানে পদধূলি

খাঁটি জহুরীর পরিচয়। (উদয়শঙ্করের নৃত্য প্রবন্ধ)

দেবেন? এই এলোমেলো করে সাজান কম মালের ও আরো কম খদ্দেরের প্রতি মনোযোগ দিতে অভ্যস্ত কলকাতাই বিপণীতে? না, এই ঝকঝক করা মাল ও মোলায়েম অভ্যর্থনায় বোঝাই পেশোয়োরী দোকানে? বলা বাহুল্য, প্রথম দর্শনে প্রেম আপনার 'মনোহারী'র প্রতিই গজাবে।

তবু প্রশ্ন করলাম সোহনলালকে। এত নাম যে নাচের, তাকে আপনারা কথক বলেন কেন? পেশোয়ারেরও ওপারে ফ্রন্টিয়ার আর আফগানিস্থানের মাঝখানে যেসব পাঠান উপজাতি থাকে, তাদের মধ্যে ঘটক বলে একটা নাচের চলন আছে। তার মধ্যে বলতে গেলে রৌদ্ররসই একমাত্র নজরে পড়বার মত রস আর ঘটক নাম না দিয়ে ঘটাঘটি নাম দিলেও বেমানান হয় না। তরোয়াল এমনি কারদানী করে নাচে যে, ওই লম্বা সুগঠিত মানুষগুলির অঙ্গভঙ্গীর বদলে তাদের তরোয়ালের রাগরঙ্গই দেখতে হয় সমস্তটা সময়।

না। কথক সেরকম ঘটাঘটির ব্যাপার কিছু নয়। যদিও এতে যে পরিশ্রম আর প্রাণশক্তি লাগে, সে আমাদের পূর্বদেশের নরম সরম 'চরণে জড়িত লম্বা'-টাইপের নাচে যারা অভ্যস্ত, কথক নাচা তাদের কর্ম নয়।

সুচারু চরণক্ষেপের ছন্দে একটি কথা, অর্থাৎ কাহিনীকে প্রকাশ করা হয় বলে এই নাচের নাম কথক। পায়ের এই কারিকুরির নাম হচ্ছে বোল। যে এই কথা নাচের মধ্য দিয়ে দেখায়—থুড়ি, বাঙালী আমি, আমার লেখা উচিত রূপায়িত করে —তাকেও বলে কথক।

প্রধানত পায়ের কাজের মধ্যে একটা কথাকে ফুটিয়ে তোলা নিশ্চয়ই খুব শক্ত কাজ। বিশেষ করে যখন একই লোক শুধু গতির ছন্দে রাধা ও কৃষ্ণের বা শিব ও পার্বতীর নাচ একই সঙ্গে রূপায়িত করে। এমনভাবে তা করতে হবে যে, দর্শকের বুঝতে একটুও বাকী থাকবে না যে, কে কখন নাচবে। সেই গতির ছন্দে শুধু ভাব নয় ভাষাও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ভঙ্গী আর মুদ্রার মাধ্যমে একটা কথা ফুটিয়ে তোলা বরং সহজ হত। কিন্তু শুধু সাবলীল চরণক্ষেপের কারিগরিতে কি করে একটা কথা ফুটিয়ে তোলা যায়?

ভারত-নাট্যমে রূপক ও ভঙ্গী দিয়ে নাচের বিষয়বস্তু ফোটান হয়। কথাকলিকে প্রধানত প্রকাশ করা হয় হাতের মুদ্রা দিয়ে। মণিপুরী হচ্ছে সমস্ত দেহের ছন্দের বিকাশ। সোহনলাল বললেন—আপনিই বিচার করে দেখুন এবার, কোন্ নাচের ভিতর দিয়ে বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা সবচেয়ে শক্ত ও সাধনাসাপেক্ষ?

শুধু তাই নয়। সোহনলালের মতে সব ভারতীয় নাচেরই মূল কথা হচ্ছে কথকে। কারণ এই নাচের মধ্যে গতির ছন্দের শিক্ষা পাকা করে নেওয়ার পরই অন্যান্য সব নাচ নিখুঁতভাবে শেখা আর ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়। ঠিক যেমন ক্লাসিক্যাল গানের জন্য গলা তৈরি করে নেওয়ার পরই আধুনিক গান গাওয়া ভাল হয়। তাঁর মতে উদয়শঙ্করের বিশ্ববিজয়ী নাচের ঔৎকর্ষের উৎসও হচ্ছে এখানে। রাজস্থানে জন্ম বলে তাঁর প্রতি রাজস্থানীদের আকর্ষণ ও তাঁর জন্য গৌরব বোধ বাঙালীর চেয়ে বোধ হয় কম নয়।

উদয়শঙ্করের পায়ের নূপুর ছিল রাজস্থানী কথকের ছন্দে বাঁধা, কিন্তু মাথা ছিল বাঙলা দেশের রিনায়সেন্সের (কৃষ্টির নবজাগরণের) প্রসাদে পুষ্ট আর চোখ ছিল সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের রুচি ও রূপসাধনার উপর।

বিশ্ব জুড়ে ফুলের তোড়া আর প্রশংসার মালা উদয়শঙ্কর আহ ' করে-

ছিলেন নৃত্যভারতীর জন্য। ভিত্তি তাঁর ছিল রাজস্থানী কথক নৃত্যে। তিনি যে এই কথক নাচের শেষপর্যন্ত দেখেননি, এই ভিত্তির উপরে নানা ঢঙের নানা দেশের নৃত্য পরিচালনার পাঁচ-মিশেলী ইমারৎ গড়েছিলেন সেজন্য এখানকার শিল্পের পিউরিস্টরা অভিযোগ করে।

কিন্তু আমি পান্ডাও নই, পণ্ডিতও নই। কাজেই স্রষ্টার সৃষ্টি প্রতিভাশাস্ত্রের মন্ত্রকে কোন্‌খানে বা কতটুকু বদলিয়েছে বা অস্বীকার করেছে তার বিচারে আমার কি দরকার? একটা সুন্দর হীরের গহনাকে সিন্দুকে সযত্নে অক্ষুন্নভাবে রাখা বেশী বাহাদুরী, না তাতে নতুন কারু-কার্য করে নতুন রূপ দেওয়াতেই খাঁটি জহুরীর পরিচয় সে তর্ক তুললাম না।

শুধু মনে মনে বললাম যে, উদয়-শংকর যা করেছেন তা বোধ হয় শুধু ভোল বদলান। কিন্তু ভোল বদলান ও ভুল বা ভেজাল ত এক জিনিস নয়।

একটা হচ্ছে সৃষ্টি। অপরটা হচ্ছে নষ্ট করা। উদয়শংকর কি করেছিলেন তার প্রমাণ দিয়েছে সারা পৃথিবীর করতালি।

কিন্তু সে করতালি ও প্রশংসার ঝাঁপতাল থেকে দূরে এক কোণে অনাড়ম্বরভাবে রয়েছে এদেশের গুণীরা যারা কথক শিল্পকে এখনো বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখতে চায়। স্টেজের ফুটলাইট তাদের চোখ ধাঁধায় না। সিনেমার স্পট লাইটের সামনে আসতে তাদের কোন ব্যাকুলতা নেই। কিন্তু গুণী সমঝদারদের এনকোর ধ্বনি এখনো তাদের বার বার দর্শকদের সামনে এনে দাঁড় করায়।

সোহনলাল সেই মুষ্টিমেয় গুণীদের মধ্যে একজন। সংখ্যা এদের ক্রমশঃই কমে আসছে কিন্তু কোন সংশয় নেই যে, কথক শিল্পের ভবিষ্যৎ এদেরই হাতে। আর দেশও সে কথা ক্রমশ স্বীকার করছে।

উত্তর ভারতে তিনটি কেন্দ্রে কথক নাচের বিস্তার হয়েছিল, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী আর জয়পুর। পাঠককে বলে দিতে হবে না যে লক্ষ্ণৌ-ই কথক আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। সবচেয়ে বেশী মিঠেও বটে। লক্ষ্ণৌএ সব কিছুই মিষ্টি হয়ে ওঠে। এখানকার উর্দু বড় ভদ্র, আদবকায়দা খুব মোলায়েম, শিষ্টাচার অতি সরস আর পিয়ার দিঠি নাকি সব চেয়ে মিঠে।

পরখ করে দেখবার জন্য পাঠকরা আছেন।

মিহি ও মিঠের সাধনায় লক্ষ্ণৌ এত এগিয়ে গিয়েছিল যে, এক বিখ্যাত উর্দু কবি নাশিক ত আবেশে দিশেহারা হয়ে প্রিয়াকে উদ্দেশ করে লিখে ফেললেন যে—

দে দোপাট্টা তু আপনা মল মল কা।
না তবা হুঁ কফন্‌ ভি হো হাল্‌কা॥

অর্থাৎ আমি এতই অবলা হয়ে গেছি যে, তোমার মলমলের হাল্কা দোপাট্টার (উড়ানী) চেয়ে ভারী কিছু আমার কফিনের উপর সইবে না।

গানবাজনার চর্চা লক্ষ্ণৌতে যত বেশী ও যত ভক্তি ভরে অর্থাৎ রিলি-জিয়াসলি করা হয়েছে তত সারা ভারতে আর কোথাও হয় নি। লক্ষ্ণৌএর নবাব গিয়েছে একশ বছরের উপর হল কিন্তু নবাবী চাল যায় না। বিলাস গিয়েছে কিন্তু বিলাসী মন যায় নি। কাজেই শিল্পরসিকরা শিল্পকে জিইয়ে রেখেছেন সযত্নে পুরুষানুক্রমে। একজনের পর একজন বড় কথকের ওস্তাদ লক্ষ্ণৌএ এই নাচকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন।

প্রথমে রাধাকৃষ্ণ, শিব-পার্বতী বা সীতা রামের উপাসনাকে রূপ দিত এই নাচ। হ্যাভলক এলিস বলেছেন যে দার্শনিকের চিন্তা পর্যন্ত ছন্দে ছন্দে নেচে চলে। শিশু যে ছন্দে ছন্দে মনের আনন্দে নেচে চলে তা কোন্‌ মা না লক্ষ্য করেছে? ভক্তও যে ভাবের আতিশয্যে অমনভাবেই নেচে উঠবে তা আশ্চর্য নয়। মনের আবেগ দেহের আবেশে দেবতার আরাধনায় ফুটে উঠল।

আমাদের দেশে বৈরাগী ও বাউল হাততালি দিয়ে একতারা বাজিয়ে বা খঞ্জনীর ঝঙ্কারে নেচে নেচে নাম কীর্তন করে সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায়। উত্তর ভারতেও ভাবের বন্যা অমনভাবেই বয়ে গিয়ে কথক নাচের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কালক্রমে দরবারে আর হারেমে গিয়ে ঢুকল এই নাচ এবং সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিতে যখন ভাঁটা পড়ল আসক্তি তখন এই নাচের জোয়ার বাঁচিয়ে রাখল।

তবু বিন্দাদীন নামে একজন গরীব ভক্ত দরবারের আশ্রয় না নিয়ে শুধু কৃষ্ণ ভগবানের শরণ নিয়ে সারা জীবন তাঁরই জন্য নেচে গিয়েছেন। সে সব নাচের অসংখ্য ঠুংরীর বোল রচনা করে গিয়েছেন। সেগুলিই বোধহয় কথকের সবচেয়ে বড় আদরের ধন। লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন মহারাজের নাম এখনো সব নৃত্য-রসিকের মুখে মুখে চলে আসছে।

রাজদরবারের দৌলতেই জয়পুরের কথক নাচ বেঁচে ছিল। এবং বেশ ভাল ভাবেই বেঁচেছিল আর উত্তর প্রদেশে অচ্ছন মহারাজ যেমন এই নাচে একেশ্বর সম্রাটের মত নাম করেছিলেন জয়পুরে জিয়ালালও তেমন সম্মান পেয়েছেন।

এই জিয়ালালেরই সাক্ষাৎ ছাত্র সোহনলাল।

কল্পনা করে নেওয়া যাক একটা কথক নাচের আসর। চুড়িদার চুস্ত পায়জামা পরনে, মাথায় টুপী ও গায়ে অংগরাখা

'পরে নামল কথক। সারেঙ্গী ও তবলা 'চলবে সঙ্গে সংগত করে। এক একটা খণ্ডে ভাগ করা আছে তবলার বোল আর কথকের কথা। সংগত শুরু হয়ে গিয়েছে, কথক এসে দাঁড়িয়েছে আসরের মাঝখানে। ঝকমক করছে তার পোষাক। ঝমঝম করছে তার পায়ের নূপুর তবলার তালে তালে। সবাই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি।

কথক প্রথমে তার বোলটি আবৃত্তি করবে। হয়ত খানিকটা গানের কলিও আবৃত্তি করবে। তারপর শুরু হবে নাচ। শিবের তান্ডব দেখান হচ্ছে এখন

জটাট্ ভিগ গলে জ্বলে
প্রবাহ পাত তস্থলে।
গলে বিলম্বি লম্ব তুঙ্গ
ভূজঙ্গ মুন্ড মালিকা॥
ডমড্ ডমড্ ডমট্ ডমট্
নিনাদ বট্ ত্রিমমু
চিকার তান্ড তান্ডব
শিব শিব তুমহে তুমহে।

গুরুজী জিয়ালালের কথা বলতে বলতে সোহনলাল একেবারে আত্মহারা। এত প্রহার ও এত আদর নাকি কোন গুরু কখনো দেয়নি। প্রহারের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে সব বিদ্যা শিখিয়েছে নিজের লাভের কথা না ভেবে।

রাজপুত এমনভাবেই উজাড় করে ঢেলে দেয়।

অবশ্য যোগ্য পাত্র না হলে দেয় না।

একবার উড়িষ্যার একজন রাজা জিয়ালালকে নিজের দরবারে এনে রাখলেন কিছুদিন। রাজাটির নিজেরও কথকে খুব ভাল হাত ছিল এবং অচ্ছন মহারাজ প্রভৃতি বহু শিল্পীর পৃষ্ঠ-পোষক হয়েছিলেন। জিয়ালাল খুব আরামে সেখানে রইলেন। রোজ নাকি দুবেলায় দশ সের দুধ জ্বাল দিয়ে রাবড়ী খেতেন ও এক প্রিয় শিষ্যকে খাওয়াতেন। রাবড়ীর প্রেরণায় না শিক্ষার গুণে বলা শক্ত কিন্তু ওই শিষ্য, কার্তিক ছিল তার নাম, অসম্ভব ভালভাবে নাচ শিখে নিল। ধা—তেই—ই—তা এটুকু বোলের মধ্যেই সে নাকি সাতাশ চক্কর দিতে পারত।

কথকের মূল গোপন তথ্য হচ্ছে তার বোলে। ওস্তাদের 'তারিকা' অর্থাৎ বাতানেকা ঢঙ হচ্ছে তার জীয়ন কাঠি মরণ কাঠি। অন্য লোকের কাছ থেকে সযত্নে গোপন রাখতে হলে ওস্তাদ এমন-ভাবে নিজে তবলা বাজাবে যে তার সঙ্গে নাচিয়ে খুব ভাল নিখুঁতভাবে নাচলেও গৎ ধরে ফেলতে পারবে না। জিয়ালাল সেই গোপন গৎও কার্তিককে শিখিয়েছিলেন।

সাকরেদের বাহাদুরীতে ওস্তাদের গৌরব; দরবারের সৌষ্ঠবে রাজার। কাজেই একটি মুলতানী গাই, একটা গোটা গ্রাম ও এক থালা টাকা প্যালা পেয়ে জিয়ালালের মনের সুখ অব্যাহত ভাবে চলতে লাগল। নতুন নতুন গৎ সৃষ্টিতে, নতুন গতের রেওয়াজে তার দিন বর্ষার নদীর মত দুকুল ছাপিয়ে সুখে ভরে উঠতে লাগল।

এমন সময় রাজাসাহেব পলিটিক্যাল এজেণ্টকে নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ করলেন। সরকারী সেক্রেটারিয়েটে পি, এ কথার অর্থ হচ্ছে পার্সনাল য়্যাসিস্ট্যাণ্ট। সে হচ্ছে কৃতী কর্মচারীর কর্ণধার। অফিস টেবিলে স্টেনোগ্রাফার, অফিস আলমারীর পাহারা-দার এবং অন্যান্য সর্বকর্মে সাড়ে বত্রিশ ভাজা। কিন্তু বৃটিশ আমলের পোলিটি-ক্যাল দপ্তরে পি, এ ছিল পলিটিক্যাল এজেণ্ট। এক একটা রাজ্য গোষ্ঠীর মধ্যে একজন এজেণ্ট। একেবারে খাটি সাহেব, হয় আই-সি-এস না হয় আর্মি অফিসার। ব্যবহার যখন সিভিল মন তখনো মিলিটারী। একেবারে সপ্তম সুরে বাঁধা। কারণ রাজন্যদের একটুও বেসুরো চ্যাঁচাতে দেওয়া চলতে পারে না। দেশের

মানচিত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির এলাকাগুলির হলদে রংয়ের ঠিক পাশে পাশেই লাল রঙের এলাকাগুলিতে জাতীয় কংগ্রেসের দাবী একেবারে বিপদের লাল নিশান উড়িয়ে রেখেছে। প্রায় দশ বছর পরে পরেই এক-একটা আন্দোলন শুরু হয়, আর দেশে বৃটিশ বনিয়াদের নীচে এক-একটা ভূমিকম্পের ধাক্কা এসে লাগে। কিন্তু সে ধাক্কা থেকে অন্তত হলদে টুকরোগুলি যেন রক্ষা পায়, সেজন্য পলিটিক্যাল এজেণ্টরা অত্যন্ত যত্নবান। শ্বেত জাতির পবিত্র গচ্ছিত ধন কি খদ্দরধারীদের অভদ্র চীৎকারে ফুৎকারের মত উড়ে যেতে দেওয়া যায়?

তাই এজেণ্টরা বিশেষ সতর্ক। আর তাদের এই মধ্যযুগের উপযোগী দায়িত্বহীন ক্ষমতা বৃটিশ সরকার দরাজ হাতে দিয়ে এসেছিল। হীরা-পান্না জড়িত পাগড়ীটি সিংহাসনের উপর নিশ্চিন্তভাবে শোভা পাওয়া নির্ভর করত সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর। তারই অঙ্গুলি হেলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হ'ত বৃটিশ সিংহের লাঙ্গুলের প্রীতি বা বিরক্তি।

এ যে একেবারে রাজার রাজা। যদিও ডেমোক্রাটিক বৃটেনের মার্জিত শিক্ষা ও ভদ্রতা এজেণ্টকে ঘিরে রাখত, তারই মধ্যে লুকানো থাকত ধ্যানমগ্ন মহাদেবের প্রসন্ন কপালের প্রচ্ছন্ন আগুনের শিখা। দরকারমত তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে পারত যে কোন সময়।

'মা-বাপ' গভর্নমেণ্টের এই প্রতিনিধি কোন স্টেটে এলে সমারোহের কোন সীমা থাকত না। এই রাজ-স্টেটেও উৎসব লেগে রইল ক'দিন ধরে। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। ভোজ, শিকার, দরবার সবই হল যথারীতি।

শেষ দিনে ছিল নাচ। রাজাসাহেব বিশেষ উদারতা দেখিয়ে জিয়ালালকে এজেণ্ট সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ই করিয়ে দিলেন। জিয়ালালের জীবনে অনেক বুক ফুলে ওঠার মত ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এমনটি আর কখনো হয়নি।

কার্তিকের নাচে ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। এজেণ্ট সাহেবের মেমসাহেব এই সুদর্শন কিশোরকে কাছে ডেকে এনে বিশেষ সাধুবাদ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কৃতার্থ-করা হাসি হেসে রাজা সাহেবকে বললেন—আপনি ত, ইয়োর হাইনেস, বিশেষ গুণের সমঝদার। একে এই অদ্ভুত নাচের শিক্ষা দিয়েছে কে?

স্বয়ং ব্রহ্মা যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে বলতেন—বৎস, যা বর চাও, তাই দিব, তাহলেও এত আনন্দের কারণ ঘটত না। আর এ ত অদেখা স্বর্গের অজানা ব্রহ্মা ঠাকুর নয়, স্বয়ং পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের মেমসাহেব।

আহ্লাদে ডগমগতনু হয়ে নৃত্যরসিক রাজাসাহেব বাটলারদের ইঙ্গিত করলেন আরো শ্যাম্পেন আনতে। মনটা হয়ে গেছে হাল্কা, উড়ছে সপ্তম স্বর্গে। এমনকি, শ্যাম্পেন, টলটলে সোনালি শ্যাম্পেন ছাড়া মানায়?

জিয়ালালের শিষ্যের মুখে শম্পানীর এই নাম শুনে বুঝতে ভুল হল না যে, যে মদ এখন নাচের আসরে পরিবেষণ করা হয়, তা শ্যাম্পেন ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু মনটা একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল। শিরাজী হাতে কি এসে হাজির হল বেহেশতের হুরীরা বা ইহকালের সাকীরা? সেই শিরাজী, যার সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম লিখেছেনঃ—

মে লাল মুজা বস্‌ত ও সুরাহি কান্ অস্ত্।
জিগাম্ অস্ত্ পিয়ালা ও শরাবাস
জান্ অস্ত্॥
আন্ জামে বালাভরিন্ কে জে ময়
খানদান অস্ত্।
আশক-ই-অস্ত্ কে খুন দিলদার
ও পিনহান্ অস্ত্॥

ফারসী কবিতা যেন নূপুরের সিঞ্জনের মত ঝঙ্কার তোলে মনের মধ্যে। শুনতে শুনতে মনের তারে দিলরুবার তারের মত আনন্দে বেদনায় টন টন করে মূর্ছনা জেগে ওঠে। মনে মনে বাংলায় তার একটা অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছিলাম। না করে উপায় ছিল না, এমনি মোহময় সে রুবাই।

মদিরা—গলানো চুনী;
পেয়ালা—তাহার খনি;
পানপাত্র যেন দেহ, পরাণ পানীয়।
যে স্ফটিক পেয়ালায়
উচ্ছ্বসিত মদিরায়
লুকানো হৃদয়-রক্ত তারে অশ্রু মেনে নিয়ো।

আমায় একটু অন্যমনস্ক দেখে সোহনলাল বললেন—কি সাহেব, বিশ্বাস করতে পারছেন না ত কি বলতে যাচ্ছি এবার?

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম,—না, না। তা কেন হতে যাবে? বলুন আপনার গুরুজীর গল্প।

স্ফটিকাধারে ফরাসী সুরা টলমল করে উঠল অশ্রুবিন্দুর মত। রাজাসাহেব তাতে মন ডুবিয়ে যেন স্বগতভাবে বলে ফেললেন—আমিই কার্তিককে এই নাচের গৎ তৈরি করে শিখিয়েছি।

কাছেই মাথায় শিরোপা পরে বসেছিলেন জিয়ালাল। কান তার লাল হয়ে গেল। আর মন আগ্নেয়গিরির আগুন-জ্বালা উদ্গার করা শেষ হয়ে গেলে যে বিবর্ণ লাভা পরে থাকে, তার মত। ধীরে ধীরে শিরোপা নামিয়ে তিনি অলক্ষিতে আসর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথায়, তা কেউ জানতে পারল না।

ততক্ষণে পেয়ালায় আরো শ্যাম্পেন ঢালা হয়েছে। হায়, বেদনায় যে ভরে গিয়েছে, আরেক জনের পেয়ালা সে কথা ভাববার বা বুঝবার তাদের সময় কোথায়?

ইংরেজিতে বলে 'অন উইথ দি মিউজিক'—সঙ্গীত চালিয়ে যাও। কারণ সেটুকুই সত্য। জীবনের সঙ্গীত—যাতে হাসি-কান্নার চুণী-পান্না সমানভাবেই জড়ানো আছে।

জিয়ালাল পরে আবার নতুন করে নাচের মহড়া দিতে লাগলেন। এবার কার্তিকের চেয়ে বড় সাকরেদ বানাতে

হবে এবং এবার আর কিশোর নয়, কিশোরী হবে তার নাচের আধার। লাস্যে হাস্যে যৌবন-সুষমায় সেই কিশোরীর নাচ নদীর তরঙ্গের উপর লাবণ্যের ফেনার মত যেন ভেসে ভেসে যায়। তুলনায় কার্তিককে যেন মনে হয়, সে ঢেউয়ের নীচের নিশ্চল জলরাশির মত। তার নতুন সৃষ্টি জয়কুমারী কার্তিককে ময়ূর-হারা করে ছেড়ে দেবে, এই হল তার পণ।

ললিতকলাকে যে একবার ভালবাসে, সে কখনো তাকে ছাড়তে পারে না। মানুষের প্রেমে আদি আছে, অন্ত আছে। শিল্পীর প্রেমে শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। তার হৃদয়ে ক্ষত হয়, ক্ষতিতে ভরে যায়। আহত হয়, কিন্তু হত হয় না। ওই আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেমিক কবি ওমর খৈয়ামেরই মত—

এ ভয় বরণ্ দিল কে দারো সোজি নেশ্ত্।
সুন্দ অজ্ দেহে মেহার-এ-দিল
ফারোজি নেশ্ত্॥
রোজে কে তু বে ইশ্ক বসর্ খ্যায় বুরুদ্।
জয়তার্ আজ্ আন্ রোজ্তরা
রোজে নেশ্ত্॥

মিছে সে হৃদয় যাতে নেই ভালবাসা,
খুশীতে রয় না ভ'রে বাসনার বাসা;
হৃদয়ের প্রেম বিনে
কাটাইবে যেই দিনে
হাহাকারে রয় ঘিরে সে দিনের আশা।

তাই জিয়ালাল আবার নবীন উৎসাহে নতুন নতুন নাচের গৎ ঠিক করতে লাগলেন।

কিন্তু হায় হৃদয় তার ভরল না।

জয়পুরে বর্ষা একটা বিশেষ সমারোহের ব্যাপার। কারণ বৃষ্টি হয় বছরে মাত্র কয়েক হাজার ফোঁটা। অথচ চারিদিকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট লতাগুল্মে ভরা পাহাড়ের সারি—যারা বর্ষার জল পেলে ওই ময়ূরের মতই পেখম মেলে নবশ্যাম শোভায় সেজে নেচে উঠতে চায়। তাই জিয়ালাল একবার বর্ষার বোল তৈরি করতে লাগলেন ঝুলন পূর্ণিমায় নতুন নাচের আসর পাতবার জন্যে। গোবিন্দজীর ভক্তদের শহরে ঝুলনের নাচ হবে।

তিনি রচনা করলেন ঃ—

উমন্ড ঘুমন্ড ঘটা, উমন্ড ঘুমন্ড ঘটা
ধরিয়র্ ধরিয়র্ গরজরিয়ো।
না দিগ্ দিগ্ না দিগ্ দিগ
যো দিগ্ দিগ্ যো দিগ্ দিগ
বুনে কি আটা পাটা, বুনে কি আটা পাটা
ইন্ ঘিনে ইন্ ঘিনে ও গরিয়োঁ।
পড়ত বুন্দ পড়তাল, যাপড় তর তর
হর সাগর তট ভরিয়ো।
থর্র্র্ তট্।

থর্র্র্ তট্ এই গতের সঙ্গে তাল রেখে ময়ূরের পেখমের মত পেখম মেলে জয়কুমারীকে ঘুরে যেতে হবে।

কিন্তু হায়! কোথায় জয়কুমারী?

জবরদস্ত ওস্তাদের কড়া শাসন ও রেওয়াজের ধাক্কা সামলাতে না পেরে জয়কুমারী নিজের ভাগ্য নিজে জয় করবার জন্য গুরুজীকে ছেড়ে গোপনে সরে পড়েছে।

ঝুলনের রাতে সেবার বর্ষার বোল আর তালে তালে দর্শকের মনে মূর্ছনা জাগাল না।

শুনতে শুনতে সেই অদেখা, অতৃপ্ত জিয়ালালের জন্য একটি করুণ সমবেদনা অনুভব করতে লাগলাম। এই ত মাত্র চার-পাঁচ বছর আগেও জিয়ালাল আপন-ভোলা মন নিয়ে একটার পর একটা নূতন কথক নাচ রচনা করে গিয়েছেন।

করুণ উপসংহারে সিনেমার গল্প বা প্রতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকদের রচনা শেষ করা চলে। কিন্তু রোজকার আট-পৌরে জীবন তাতে বড় ভারি হয়ে ওঠে। তাই উৎসুকভাবে সোহনলালের নিজের জীবনের কাহিনী জানতে চাইলাম।

তিনি হেসে বললেন—আপনারা ময়ূরের নাচ দেখে খুশি হয়েছিলেন। আপনাদের আমার ময়ূর নাচের কাহিনীটি তাহলে শোনাই।

জিয়ালালজীর মত আমিও একটা বর্ষার বোল রচনা করেছিলাম।

উমন্ড ঘটা ঘন ঘোর;
দামিনী মোর
মচায়ে শোর;
দামিনী ধময়েক থরর্র্ ছ্যাক্।

থরর্র্র্ ছ্যাক্ বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চারবার ময়ূরের মত ঘুরে যেতে হবে। তার সঙ্গে তাল দিতে যাওয়া তবলচীর পক্ষে বেশ শক্ত ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন হীরাবাঈ নাগরীর আসরে আমি যখন ছেলেবয়সে নাচ দেখিয়ে বাহাদুরী নিতে এলাম, তবলচী ওই ছরর্র্র্ ছ্যাক্ পা-ভাজ কিছুতেই তবলায় তুলতে পারছিল না।

আমি নেহাৎ দয়া করে তাকে বললাম—আমার এ বোল তুমি তবলায় আঙুল দিয়ে তুলতে পারবে না ওস্তাদজী; ছুরি দিয়ে তবলার চামড়া কেটে আওয়াজ তুলতে হবে।

লজ্জায় লাল হয়ে তবলচী আমার নাচের সঙ্গে তাল সামলাতে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছুরি দিয়ে তবলার চামড়া গোল করে কেটে ফেলে ওই আওয়াজ ফুটিয়ে তুলল। বাহবা বাহবা ধ্বনিতে আসর ভরে উঠল।

আমারও রোখ চেপে গিয়েছিল। নাচের পুনরাবৃত্তি করলাম চৌতালের বদলে আটতালে আটবার ঘুরে গিয়ে। থরর্র্র্ র্র্র ছ্যাক্।

রেষারেষিতে হার না মেনে হাতের কাছের দ্বিতীয় তবলাটার চামড়া ঘুরিয়ে কেটে ফেলে তবলচী এবারও পাল্লা দিয়ে গেল।

বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, তবলা-ওয়ালে।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। সারাস শেষ পর্যন্ত কে পায়, তা দেখে নিতে হবে। আবার ঘুরে নাচতে নাচতে ওই জায়গায় এলাম। নাচের বেগ বাড়িয়ে দিয়ে মাতাল-করা আবেগে দিলাম চড়িয়ে বোল মাত্রা। হা-হা-হা ধ্বনিতে আসর ভরে গেল।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে তবলা ছেড়ে উঠে পড়ল তবলচী। হাতে মুঠো করে ধরা সেই ছুরি। ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে শুধু বলল—নীচে রাস্তায় নেমে এস, এবার অন্য চামড়া না কাটলে আর তাল সামলান যাবে না।

মাথার উপর লকলকে ছোরাটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল তবলচী।

নগমার (কথক নাচের সঙ্গের বাজনার) সঙ্গত থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আর তবলচীর তাল সামলাবার জন্য সোহনলাল বাঈজীর শাড়ি পরে তিনদিন তিন রাত্রি সেখানেই কাটিয়ে দিলেন।

তারপর?

তারপর সোহনলাল যে নাচ দেখালেন তাতে ময়ূর-নৃত্য দেখা আমাদের সার্থক হল। (ক্রমশ)

(২৩)

—আমি বংশী আজ্ঞে—

—তা বাইরে কেন—ভেতর আয়—কী দরকার—?

বংশী বললে—আমি শালাবাবুকে একবার ডাকছিলাম—

—ও—বলে ভূতনাথ উঠে বাইরে এল।

ভূতনাথ বাইরে আসতেই বংশী গলা নিচু করে বললে—কই, ছোট-মার কাছে যাবেন বলেছিলেন—যাবেন না?

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু আছেন, না চলে গেছেন?

বংশী বললে—ছোটবাবুর তো অসুখ খুব—পেটে যন্তরনা হচ্ছে কতদিন থেকে—বাড়িতেই থাকেন—

—তাহলে?

—আমি ছোটমা'কে বাইরে ডেকে আনবোখ'ন, আপনি কথা বলবেন—তাতে কি—ছোটমা যে আপনার কথা বলছিলেন—আজ্ঞে—

—তবে চল্—

ছুটুকবাবুর ঘরে ঢুকে ভূতনাথ বললে—তাহলে আজ আসি ছুটুকবাবু, আর একদিন আসবো—

বাইরে বেরিয়ে ভূতনাথ বললে—কোন্ দিক দিয়ে যাবি বংশী—?

বংশী বললে—কেন আপনার সেই চোর কুঠুরীর শুরু বারান্দা দিয়ে—

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ইঁটবাঁধানো উঠোনের ওপর তখন ইব্রাহিমের ছাদের আলোটা থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে। ওদিকে খাজাঞ্চীখানার দরজায় তালা পড়ে গেছে। দক্ষিণের বাগানের কোণ থেকে দাসু মেথরের ছেলেটা বাঁশীতে বিল্বমঙ্গলের সুর ভাঁজছে—'ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে'—। আস্তাবলের ভেতর ছোটবাবুর শাদা ওয়েলার জোড়া অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঠকাঠক্ পা ঠুকে চলেছে। আস্তাবলের ওপর দোতলায় ব্রজরাখালের ঘরটা তেমনি অন্ধকার। তার পাশে ব্রিজ সিংএর ঘরে টিম টিম আলো জ্বলছে। বোধ হয়, আটা মাখছে এখন। থপ্ থপ্ শব্দ আসছে সে-ঘর থেকে। তার পেছনে তোষাখানায় চাকরদের ঘরে এখন তাস-পাশা চলছে। সন্ধ্যেবেলা কাজ কম। বাবুরা বেরিয়ে গেছেন বেড়াতে।

ভূতনাথ আস্তাবল বাড়ির পাশ দিয়ে একেবারে বাগানের কাছে এল। বংশী আগে আগে চলেছে। মনে হলো—প্রথমে গিয়ে কী কথা বলবে। বহুদিন থেকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল ছোট বৌঠানকে। গিয়ে বলতে হবে—মোহিনী সিঁদুর আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা! সব বুজরুকী! ছোট বৌঠান যেন মোহিনী সিঁদুর না পরে। আগে যদি জানতো ভূতনাথ তো মোহিনী সিঁদুর দিত না কখনও।

বংশী এবার ডাকলে—চলে আসুন শালাবাবু—

—এ আবার কোন্ রাস্তা বংশী?

চোর কুঠুরীর ঠিক সামনাসামনি একটা দরজা। এতদিন নজরে পড়েনি তো! সেই ইটালিয়ান সাহেবের মেমসাহেব! এখান দিয়ে এই গুপ্ত পথে বুঝি অভিসারের আয়োজন হতো। ভূমিপতি চৌধুরী বুঝি এই দরজা খুলে দিতেন মধ্যরাত্রে। নিমক মহলের বেনিয়ানের হৃদয় নিয়ে লেনদেন চলতো বুঝি এই-খানে। এই লোকচক্ষুর অন্তরালে!

বংশী বললে—এই রাস্তা দিয়েই ছোটমা আনতে বলেছেন আপনাকে আজ্ঞে—

অতি নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ভূতনাথের মনে হলো—ভূমিপতি চৌধুরীর পর এ-দরজা এই প্রথমবার বুঝি আবার খোলা হলো এতদিন পরে। নিঃশব্দে সে বুঝি পেরিয়ে চলে এসেছে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে। সেদিনটা এই বারান্দার মতই বুঝি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কলকাতা শহর তখন সবে গড়ে উঠছে। সুতানুটিতে তখন কেবল হোগ্লার জঙ্গল। সেই হোগলার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আর্মেনিয়ানরা মেয়েমানুষের ব্যবসা করে। আর ডাকাতরা টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে পথিকদের খুন করে ফেলে দেয় গঙ্গার জলে। মানুষ বলি দেয় কালীঘাটের কালীর সামনে। তারপর জবচার্নকের আমল থেকে শুরু হয়ে শহর যখন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এসে প্রথম এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, তখন এল স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস আর এক মাদাম গ্র্যান্ড! পৃথিবীর সেরা প্রেমের কাহিনী। সেদিন সেই রাত্রে যখন মাদাম গ্র্যান্ডের শোবার ঘরে প্রথম ধরা পড়লো ফ্রান্সিস সাহেব তখন ভূমিপতি চৌধুরীরও জন্ম হয়নি; কিন্তু মাদাম গ্র্যান্ড বুঝি বার বার বিভিন্ন রূপ নিয়ে জন্মেছে সংসারে। কখনও ফ্রান্সিস সাহেবকে, কখনও ভূমিপতি চৌধুরীকে, আবার কখনও জবার রূপ নিয়ে ছলনা করেছে পুরুষ জাতকে। এই অসময়ে ছোট বৌঠানের আকর্ষণের পেছনেও যেন সেই ইতিহাসের পুনরা-বৃত্তির যোগাযোগ রয়েছে। রয়েছে এক মহা-অপরাধের পূর্বাভাস। নইলে এই এত আকর্ষণ কেন? ব্রজরাখাল তো বার বার বলেছিল—কাজটা ভালো করোনি বড়ো-কুটুম—ওরা হলো সাহেব-বিবির জাত—আর আমরা হলাম গিয়ে গোলাম—ওদের সঙ্গে অত দহরম মহরম ভালো নয়—

সেই অন্ধকারাবৃত আবহাওয়ায় বংশীর পেছন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল ভূতনাথ। কেন সে যাচ্ছে। কোথায়

যাচ্ছে। কার কাছে যাচ্ছে। এই কি তার কলকাতা দেখতে আসা। জীবনে সে প্রতিষ্ঠা করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে—তবে আজ কেন এই অভিসার! রোজ রোজ ঘরের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে কেন এই তিমিরাভিসার! যে-পথ দিয়ে বার্নিয়ার হ্যামিল্টন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, ভূমি-পতি চৌধুরী সবাই একদিন গেছে, আজ ভূতনাথও আবার সেই পথ দিয়ে বুঝি যাত্রা করছে—তার এই অবৈধ নৈশ যাত্রা!

বংশী পেছন ফিরে আর একবার ডাকলে—কই, আসুন শালাবাবু—

হঠাৎ কী যেন হলো। মনে পড়লো ছোট বৌঠানের যশোদা-দুলালকে! মনে পড়লো ফতেপুরের বারোয়ারী তলার মা মঙ্গলচন্ডীকে। আর মনে পড়লো—নরহরি মহাপাত্রের সর্বসিদ্ধিদাতা বিনায়ককে।

ভূতনাথ বললে—চল্—যাই—

দরজাটা খুলেই সামনে ছোট বৌঠানের ঘর। একেবারে মুখোমুখি।

আগে থেকেই বুঝি বন্দোবস্ত ঠিক ছিল সব। বংশী দরজার সামনে যেতেই ছোট বৌঠান বেরিয়ে এল।

ঘরের আলো পড়ে ছোট বৌঠানের কানের হীরেটা চক চক করে উঠলো।

ভূতনাথকে তখনও বুঝি ভালো করে দেখতে পায়নি ছোট বৌঠান।

বললে—কইরে বংশী—ভূতনাথ কই—

ভূতনাথ সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল—বললে—বৌঠান এই যে আমি—

—ও, তা তুমি এসেছ—এস—

মাথা থেকে নিঃশব্দে ঘোমটাটা খসে গেল বৌঠানের। এতক্ষণে ভালো করে যেন দেখতে পেল মুখটা। সেই ছোট বৌঠান। ভূতনাথের যেন চোখ নামতে চায় না।

ছোট বৌঠানের নজরে পড়লো। একটু হেসে বললে—এসো, ঘরের ভেতরে এসো—

তবু ভূতনাথের যেন দ্বিধা হলো। বললে—ছোটবাবু কোথায়?

—আছেন, কিন্তু সেজন্যে তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি এসো—

ঘরে যেতেই ছোট বৌঠান বললে—কেমন আছো ভূতনাথ?

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে একবার। সব ঠিক তেমনি আছে। আলমারীর পুতুলগুলো ঠিক তেমনি করে তার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সোনার বাঁশি হাতে করে ছোট বৌঠানের যশোদা দুলাল তেমনি অচল অটল দাঁড়িয়ে। ছোট বৌঠানের দিকে চাইতেই ভূতনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। মনে হলো, একটু আগেই যেন ছোট বৌঠান খুব কেঁদে ভাসিয়েছে। কিন্তু ভূতনাথের চোখে চোখ পড়তেই ছোট বৌঠানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো।

বললে—কী দেখছো ভাই অমন করে—

ভূতনাথ বললে—না, আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম একটা কথা—

—কী কথা—বল না শুনি—

—ও সিঁদুর আর আপনি পরবেন না—ওই মোহিনী সিঁদুর—

—কেন সিঁদুরে আবার কী দোষ করলো ভাই—জবার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে।

—না ঠাট্টা নয়, সুবিনয়বাবু নিজে বলেছেন, ওসব বুজরুকী—

—তা হোক, কিন্তু আমার কাজ হয়েছে ভাই—

—সে কি!

—হ্যাঁ, মোহিনী সিঁদুরের ফল ফলেছে আমার, অনেক ওষুধ-বিষুধ আগে খেয়েছি, মাদুলি-তাগা, কিছুই বাদ রাখিনি, পুজো-মানত্ সব করে দেখেছি, কিছুতে কিছু হয়নি আগে—কিন্তু মোহিনী সিঁদুরে কাজ হয়েছে—

—সে কি বৌঠান, সুবিনয়বাবু নিজেই বললেন যে, ও বুজরুকীর ব্যবসা তুলে দেবেন—

—তা হোক—

—কী করে হলো—

—সব কথা তো তোমাকে বলা যায় না, তুমি শুনতেও চেও না কিছু—কিন্তু......

—কিন্তু কী বৌঠান?

ছোট বৌঠান যেন একটু দ্বিধা করলো। তারপর বললে—ছোটকর্তা কথা দিয়েছেন আমাকে, জানবাজারের বাড়িতে আর যাবেন না—বরাবর রাত্রে বাড়িতেই থাকবেন, যদি আমি......

—যদি আপনি......?

—এখন এর বেশি আর শুনতে চেও না—এর বেশি আমি বলবোও না—

ছোট বৌঠান যেন নিজেকে সামলে নিলে।

তারপর বংশীকে ডেকে ছোট বৌঠান বললে—বংশী তুই এখন যা—পরে ডেকে পাঠাবো—

বংশী চলে যাবার পর ছোট বৌঠান গলা নীচু করে বললে—কিন্তু ভূতনাথ, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে—আজকেই—

ভূতনাথের উৎসুক দৃষ্টির সামনে চোখ রেখে পটেশ্বরী বৌঠান বললে—করবে? পারবে?

—পারবো। কী?

—কেউ যেন জানতে না পারে—বংশীও নয়—

—কেউ জানবে না বৌঠান—

—আমাকে মদ কিনে এনে দিতে হবে—

—মদ—

—হ্যাঁ, মদের অভাব নেই এ-বাড়িতে তা সবাই জানে। এ-বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই খায়, কিন্তু তবু দরকার—খুব ভাল মদই নিয়ে এসো, বেশি নয়, সামান্য হলেই চলবেখন, কিন্তু আজ রাত্রেই—আমি টাকা দিচ্ছি—

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে সিন্দুক থেকে চাবি খুলে টাকা বার করে দিলে—

বললে—এই জন্যেই তোমায় ডেকে-ছিলাম—

ভূতনাথ উঠলো। পটেশ্বরী বৌঠান বললে—হ্যাঁ ভাই যাও—তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো—রাস্তা তো চিনে নিলে—ওইখান দিয়ে আসবে—কেউ জানবে না—

হতবুদ্ধির মত ভূতনাথ বেরিয়ে এল বাইরে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু এমন যে হবে ভাবতে পারেনি ভূতনাথ। বড়-বাড়ির রহস্যই বুঝি আলাদা। অন্য কোনও নিয়মে বুঝি একে বাঁধা যায় না। ইতিহাসের পাতায় এর মানুষগুলো বড় বেশি নড়ে চড়ে, কথাও বুঝি বেশি বলে—কিন্তু কিছুতে বুঝতে দেয় না নিজেদের! ভূতনাথের মনে হলো পটেশ্বরী বৌঠান যেন সত্যিই ইস্কাপনের বিবির মতন—হাতে যদিই বা আসে সে শুধু হাতের বাইরে চলে যাবার জন্যে!

ভূতনাথ সন্ধ্যের অন্ধকারেই গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

আজ এতদিন পরে ভাবতে যেন কেমন লাগে। সে-মানুষগুলো, সে-সময়গুলো কোথায় গেল। সেই লঘুপক্ষ দিন আর রাত গুলো। উঠে বসে ধীরে সুস্থে চলা, ভাবা আর বাঁচা! দিন যেন আর ফুরোয় না, রাত যেন আর কাটে না। সূর্য উঠতো যেন বড় আস্তে আস্তে! ডুবতো যেন বড় দেরি করে। গড়িয়ে গড়িয়ে চলতো সময়ের চাকা! হচ্ছে, হবে। অত তাড়া কিসের। তামাক খাও। আর একটু জিরোও। সমস্ত দিন তো পড়ে রয়েছে। কত কাজ করবে করো না!

সে অনেকদিন আগের ঘটনা।

সেবার হুজুগ উঠলো চৈত্রমাসের অমাবস্যার দিন মহা প্রলয় হবে—!

প্রলয় মানে এক ভীষণ কাণ্ড! কলি যুগ শেষ হয়ে যাবে। পাঁজিতে লিখেছে—অমাবস্যা তিথিতে দ্বাদশ ঘটিকা সপ্তম পল ত্রয়োদশ দণ্ড গতে ঘাতচন্দ্র দোষ।

ভৈরববাবু এসে বললেন—লোচন, দে বাবা ভালো করে তামাক খাইয়ে দে—আর তো কটা দিন—

লোচনও কথাটা শুনেছিল—বললে—বলেন কি ভৈরববাবু, কলি উল্‌টে যাবে—

—উল্টে যাবেই তো, কলির চারপো পূর্ণ হয়েছে যে—উল্টোবে না—

লোচন বললে—উল্টে গেলে কী হবে—?

ভৈরববাবু বললেন—সত্য যুগ শুরু হবে—

লোচন বললে—আমরা দেখতে পাবো তো?

—বেঁচে যদি যাস তো দেখতে পাবি কি—কিন্তু বেঁচে থাকলে তো—কী য় আগে দেখ্—

লোচন সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লো—চিবো না ভৈরববাবু—বলেন কি!

ভৈরববাবু হুঁকো টানতে টানতে বললেন—বলে বাবুরা বাঁচবে কিনা তাই আগে দেখ্—বাবুরা বাঁচলে তবে তো কর-বাকরেরা, মনে কর, সাততলা বাড়ির মত উঁচু জল দাঁড়িয়ে গেল এখানে, কলকেতা শহর হয়ত সমুদ্দুর হয়ে গেল—তখন কোথায় থাকবি তুই, আর কোথায় থাকবো আমি—মেজবাবু পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে—

সমস্ত কলকাতার লোকগুলো ভয় পেয়ে গেল।

যেখানে যায়, সেখানেই ওই আলোচনা। রাস্তার ধারে রোয়াকগুলোতে আড্ডা বসে। জোর আলোচনা চলে।

নিশা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল।

বলে—যদি বেঁচে থাকি তো আবার ফিরে আসবো শালাবাবু, মরবার আগে জমি-জিরেতের পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নেই তো—মরে গেলে কে আর দেবে—

লোচন বলে—পেট ভরে ভাত খেয়ে নে বংশী—এ জন্মে আর খেতে পাবি কি না-পাবি—

বংশীও বড় ভয় পেয়ে গেছে। বলে—কী হবে শালাবাবু—

বলে—বোনটার জন্যেই ভাবি শালাবাবু, বিয়ে দিয়েছিলুম, আট কুড়ি টাকাও খরচ হয়ে গেল, সোয়ামীও বাঁচলো না ওর। এখানে যাহোক ছোটমার পায়ের তলায় বসে দুমুঠো খেতে পাচ্ছিলুম—একী কাণ্ড বলুন তো—

এক-এক করে দিন যায়। চৈত্র মাসের আমাবস্যা এগিয়ে আসে।

একদিন 'মোহিনী সিঁদুর' অফিসে গিয়ে সুবিনয়বাবুর কাছে কথাটা পাড়লে ভূতনাথ।

—আপনি কিছু শুনেছেন স্যার—

সব শুনে সুবিনয়বাবু বললেন—শেষ দিনটার জন্যে অত ভয় পাও কেন ভূতনাথবাবু, গানেরও তো সম্ আছে, ছন্দেরও তো যতি আছে, কিন্তু নদী যেখানে থামে, নদী যেখানে শেষ হয়, সেখানে একটা সমুদ্র আছে বলেই তো শেষ হয়—তাই শেষ হয়েও তার তো কোনও ক্ষতি নেই—

I have come from thee—why I
know not;
But thou art, God! What thou
art;
And the round of eternal being
is the pulse of thy beating
heart.

জানো ভূতনাথবাবু—ফল যখন পাকে, তখন ডাল থেকে ছিঁড়ে পড়াই তার গৌরব, কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি, সে দীনতা বলে মনে করে তবে তার মতো কৃপার পাত্র আর কে আছে—

কথা বলতে গেলে সুবিনয়বাবুর আর মাত্রাবোধ থাকে না।

শেষে সেই অমাবস্যা তিথি এল।

সমস্ত বাড়িতেই যেন একটা উত্তেজনা। ইব্রাহিম সহিসও আজ অসুখের ভাণ করে কাজে আসেনি। তোষাখানা, ভিস্তি-খানা, খাজাঞ্চিখানা আজ যেন থম থম করছে। রান্না বাড়ির কাজ সকাল সকাল শেষ হয়ে গেছে। ব্রজরাখাল তখন ছিল এখানে। কিন্তু তারও দেখা নেই।

বিকেল বেলা ভূতনাথ ব্রজরাখালকে বলেছিল—আজ সন্ধ্যেবেলা একটু সকাল-সকাল ফিরো ব্রজরাখাল—

ব্রজরাখাল বলেছিল—কেন?

—কী সব শুনছি হবে—পাঁজিতে লিখেছে—

—তুমিও যেমন বড়কুটুম, পাঁজির কথা বিশ্বাস কর, অত 'দৈবের' ওপর বিশ্বাস করলে কাজ চলে না, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন—কাপুরুষতা—

—কিন্তু পাঁজি কি মিথ্যে লিখেছে? কত জ্ঞানী পণ্ডিত লোকেদের লেখা সব—

ব্রজরাখাল বলেছিল—রেখে দাও পাঁজিওয়ালাদের জ্ঞান; জ্ঞানের পরেও আছে বিজ্ঞান, ঠাকুর বলতেন—'যে দুধের কথা কেবল কানে শুনেছে, সে অজ্ঞান যে দুধ দেখেছে সে জ্ঞানী, আর যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ঠ হয়েছে, সে হলো বিজ্ঞানী'—যাই বলো বড়কুটুম আমার ও-পাঁজিতে বিশ্বেস নেই—জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাইরে ওরা—

বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল নিজের কাজে।

ব্রজরাখাল বিশ্বাস করেনি, সুবিনয়-বাবুও গুরুত্ব দেননি, কিন্তু মেজবাবু সেদিন বাড়ি থেকে বেরুলেন না। সকাল সকাল খানা সেরে নিলেন। নাচঘরেই সেদিন আড্ডা বসলো। ভৈরববাবু এলেন গোঁফে তা দিয়ে। বগলেশ-আঁটা জুতো-জোড়া সন্তর্পণে দরজার পাশে রেখে—ফরাসের ওপর গিয়ে বসলেন। মতিবাবুও এলেন। ছাতাটা এক-পাশে রেখে কোঁচানো ওড়না আর কোঁচা সামলে বসলেন এগিয়ে। সকলেরই বাঁকা সিঁথি, বাবড়ি-করা চুল।

আরও এলেন বড় মাঠাকরুণ। ভারিক্কি চেহারা। হাতে পানের ডিবে। বারো গাছা করে মোটা বেঁকি চুড়ি দুহাতে। টাঙ্গাইলের কড়কড়ে দাঁতিওয়ালা চওড়া পাড়ের শাড়ি। আরো এসেছে তিনকড়ি। তিনকড়ির বয়েস কালে চেহারা ভালো ছিল বোঝা যায়। নাকে হীরের নাকছাবি। গালভর্তি পানদোক্তা। মোটাসোটা মেয়েটি। এককালে হাসিনী আসার আগে ওই ছিল সুয়োরাণী। তারপর আসে হাসিনী। হাসিনী বয়েসে কচি। গায়ের গয়না তারই বেশি। বেশি কথা বলে—ছটফটে—চুলবুলে—

মেজবাবু গড়গড়ায় মুখ দিয়েই হুংকার দিলেন—বেণী—বেণী—

বেণীর আসতে দেরি হলো।

মেজবাবু বললেন—রূপলাল ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়—

ভৈরববাবু বললেন—আজ্ঞে পাঁজি আমি নিজে দেখেছি—রাত বারোটা বেজে সাত পল ত্রয়োদশ দণ্ডে ঘাতচন্দ্রদোষ—

মেজবাবু বললেন—না না রূপলাল আসুক না, যদি মহাপ্রলয় হয়ই তো ঠাকুর মশাইও কেন বাদ যাবেন—সকলের একযাত্রা হওয়াই তো ভালো—

মতিবাবু বললেন—আজ্ঞে আমি তো গিন্নীকে বলে এসেছি, আজ সব যেন একঘরে এসে শোয়—কিন্তু ঘুম কি আর কারো আসবে। সবাই জেগে বসে আছে—

ভৈরববাবু বললেন—কলিযুগ শেষ হয়ে গেল, একরকম বাঁচা গেল স্যার। ছোট লোকদের আস্পর্ধা দিন দিন যেমন বাড়ছিল, সত্যযুগ এলে আবার জিনিস-পত্তরের দাম কমবে, জামাকাপড় সস্তা হবে, আট আনা মণ চাল কিনবো—চাইকি দামই লাগবে না—

মতিবাবু বললেন—সে গুড়ে বালি, এ রামরাজত্ব তো নয়, এবার ইংরেজের রাজত্ব। এখানে অবিচার চলবে না—

মেজবাবু বললেন—সেদিন বেহ্ম-জ্ঞানী শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানেন—

সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলো।

মেজবাবু বললেন—জিগ্যেস করলাম—কী বুঝছেন? তিনি বললেন—মানুষের ডাকে যেমন দেবতার আসন টলে, তেমনি মানুষের পাপেও তাঁর আসন টলে—

—তা মিথ্যে তিনি বলেন নি, স্যার, টলবেই তো, এই যে কলিযুগে প্রজারা জমিদারকে মানতে চায় না, ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না, এ-ও পাপ বৈকি স্যার—

মেজবাবু একটু পরে বললেন—কটা বাজলো দেখতো—

—এই তো সবে সন্ধ্যে—সাতটা বেজে চল্লিশ—

মেজবাবু বললেন—তাহলে এখন তো অনেক দেরি, তা' হলে...

বলে বড়মাঠাকরুণের দিকে তাকালেন।

বড়মাঠাকরুণ পান সাজতে সাজতে বললেন—আজকে আর গাইতে বোল না হাসিনীকে। কারোর মেজাজ ভালো নেই—

মেজবাবু বললেন—গান না হয় না হোল, তুমি, তবে ওইগুলো বার করো, বরফও তো এসেছে—

বড়মাঠাকরুণ তাতেও নারাজ। বললেন—তোমার মতিচ্ছন্ন হচ্ছে দিন দিন—আজকে কোথায় বসে বসে জপতপ করবার দিন—

—তবে সিদ্ধিই হোক, সিদ্ধির সরবৎ, গরমটাও পড়েছে খুব, বেশ করে পেস্তা বাদাম বেটে, একটু ল্যাভেণ্ডার দিয়ে ... কী বলো ভৈরববাবু—

ইতিমধ্যে রূপলাল ঠাকুর এসে পড়লেন। গায়ে গরদের চাদর। খড়ম পায়ে।

পাশের ঘরের ফাঁক দিয়ে সবাই দেখছিল। ভূতনাথ, লোচন, আরো সবাই। আজকে প্রায় সকলের ছুটি। সকাল সকাল রান্নাঘরের পাট শেষ।

বংশী তাড়াতাড়ি এসে বললে—শালা-বাবু, ওদিকে সর্বনাশ হয়েছে—শিগ্‌গির আসুন—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো রে বংশী—

একরকম জোর করেই টানতে টানতে ভূতনাথকে বাইরে নিয়ে এল বংশী।

(ক্রমশঃ)

প্রবোধচন্দ্র সেন

মানুষ প্রাণবান জীবমাত্র নয়, সে মনোবান। প্রাণী হিসাবে সে জন্মায় স্বদেশের মাটিতে, মনোবান জীব হিসাবে তার আবির্ভাব স্বভাষার ভূমিতে। তার প্রাণলীলার ক্ষেত্র স্বদেশের মাটি, আর মনোলীলার প্রকাশ স্বভাষার রঙ্গমঞ্চে। মাতৃভূমির কোলে আমাদের মনোজীবনের অভিব্যক্তি। দীর্ঘকালের ত্যাগ, সাধনা ও সংগ্রামের ফলে আমাদের মাতৃভূমি সুচিরকালীন বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং আমাদের জননেতারা তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার বন্ধনদশা মোচনের কোনো পরিকল্পিত প্রয়াস কোথাও দেখতে পাই না। অথচ একথা ধ্রুব সত্য যে, ভাষার মুক্তি ছাড়া শুধু দেশের মুক্তি আমাদের জাতীয় জীবনে সার্থকতার সন্ধান দিতে পারবে না। মন যেখানে মুক্ত নয়, সেখানে দেহের মুক্তি কি করতে পারে? অমৃতলোকের সন্ধান পেতে হলে মনের মুক্তি চাই। মনে আছে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার যুগে ইংরেজ লাটকে লক্ষ্য করে যেসব গান করা হত, তার একটি লাইন হচ্ছে এই—

ফুলার, আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো স্বাধীন রয়॥

আজ কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে তার উল্টো কথা।—

দেহ মোদের স্বাধীন বটে, মন তো স্বাধীন নয়। সুতরাং আমাদের ভয়ের কারণ আজও রয়েছে। কেননা ইংরেজের প্রভাব গিয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজীর প্রভাব যায়নি। যাবার নামও করে না। ইংরেজের শাসন ছিল স্থূল, তাই তার বন্ধন ছেদন কঠিন ছিল না। কিন্তু ইংরেজির শাসন সূক্ষ্ম, যে শিকল দিয়ে সে মনকে বেঁধেছে তা অদৃশ্য, তাই তার বাঁধন কাটার কথা মনেও হয় না। ডাকাতের ভয় দূর করা যায়, কিন্তু ভূতের ভয় কিছুতেই ছাড়ানো যায় না, মনের মজ্জাতে তার আশ্রয়।

ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করা চলে, তাকে কাবু করা যায়। ভূতের সঙ্গে লড়াই চলে না, তাকে কাবু করাও সম্ভব নয়। ভূতের ভয় থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় দিনের আলোর আশ্রয় গ্রহণ। আজ চিন্তাহীনতার গাঢ় অন্ধকার আমাদের মনকে চারদিক থেকে কেবলই বিভীষিকা দেখাচ্ছে; কবে যে আমাদের মনের পূর্ব দিগন্তে জ্ঞানের আলো ঝিকিয়ে উঠে সব বিভীষিকার অবসান ঘটাবে, তারই প্রতীক্ষায় আছি।

•

একথা আমরা ভুলে যাই যে, মানুষের জীবনযাত্রার ন্যায় একটা মননযাত্রাও আছে, যদি না থাকত, তবে আমরা চিরকালের জন্য ইতিহাসের আদিম পর্বেই থেকে যেতাম; এমনকি ডারউইনের থিওরিও কিছুদূর পর্যন্ত সত্য হয়ে আর এগোতে পারত না। পশুদেরই আছে একমাত্র জীবনযাত্রা, সেই পশু যে দিন মননযাত্রার পথে পা বাড়াল, সেদিন থেকেই যথার্থ মানুষের আবির্ভাব। জীবনযাত্রার এক চাকার গতি অস্থির, সেই চাকায় চড়ে ভবিতব্যতার অভিমুখে যারা যাত্রা করেছিল, কালের মোড়ে মোড়েই তাদের পতন ঘটেছে; ইতিহাস-পথের আশেপাশে তাদের কঙ্কালাবশেষ আজও মাঝে মাঝেই আমাদের চোখে পড়ে। নিছক জীবনের সঙ্গে মননকে জুড়ে দিয়ে মানুষ যেদিন দুই চাকার রথে চড়ে বসল, সেদিন থেকেই তার অগ্রগতি সুস্থির অথচ দ্রুত হয়ে উঠল। এক চাকার আবর্তনে শুধু গতিই আছে, স্থিতি নেই; প্রতি মুহূর্তেই তার পতনের আশঙ্কা। দুই চাকার রথের আরোহী স্থির থেকেও গতিশীল; তার অতিক্রমণে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য থাকে। মুহুর্মুহু পতনের আশঙ্কা তার মনকে নিত্য বিচলিত করে না। জীবন ও মননের দুই চাকার রথে চড়ে মানুষ যেদিন ইতিহাসের বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করল, সেদিন থেকে

স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে;
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

সেদিন থেকে মানুষ স্থির থেকেও নিত্য বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। জীবন ও মননের সমন্বয়েই আসে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য। মানুষের রথচক্র যে ঐ সমন্বয়ের পথ থেকে রেখামাত্রও বিচলিত না হয়ে কল্যাণের দিকে নিত্য এগিয়ে চলেছে, এমন কথা বলছি না। দেশে দেশে যুগে যুগে ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে তার বহু ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। যেখানেই জীবন ও মননের সমন্বয়ে ত্রুটি ঘটেছে, সেখানেই দেখা দিয়েছে মানুষের দুর্গতি। কোথাও তার রথগতি অবল্গিত বেগলাভ করে ইতিহাসের মোড়ে এসে মানুষকে বিনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে; জানি না আজ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তারই পুনরাবৃত্তির পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে কিনা। কোথাও জীবন-মননের সমন্বয় ব্যাহত হয়ে ইতিহাস-পথের মাঝখানেই রথের চাকা ভেঙে গিয়ে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, যেমন হয়েছে আমাদের এই ভারতবর্ষে। ওই চাকা-ভাঙা রথে বসেই আমরা কিছুকাল যাবৎ তারস্বরে নানারকম আস্ফালন করছি, যারা আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, পরুষকণ্ঠে গালাগালি করেও তাদের নাগাল পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না,—অবশেষে হতাশ হয়ে দ্রাক্ষালুব্ধ বিফলকাম শৃগালের মতোই বলছি যারা দ্রুত এগিয়ে গেল ঐতিহাসিক বিনাশের মধ্যেই তাদের শেষ পরিণতি। আবার কেউ কেউ আমরা ঐতিহাসিক গতিলাভের আশায় রথের মুখটাকে অতীতের দিকে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভাঙা চাকা ধরেও কম টানাটানি করিনি। বঙ্কিম-ভূদেবের আমল থেকে এই সেদিন পর্যন্তও এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কি করুণ দৃশ্যেরই অবতারণা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সুখের বিষয় অবশেষে আমাদের নেতাদের দৃষ্টি পড়েছে রথের ভাঙা চাকার দিকে। রব উঠেছে, 'চাকা মেরামত করা চাই, চাকা মেরামত করা চাই।' তার জন্য বহু মহলা পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে, ভাঙা চাকাতে হাতও লাগান হয়েছে। কিন্তু কোন্ চাকাটাতে; জীবনের না মননের? কোন চাকা ভেঙে যাওয়ার

ফলে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির রথ ইতিহাসের মধ্যপথে এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে? আমি বলি আমাদের মননের চাকাটাই বিকল হয়ে গিয়েছিল, তাই জীবনের চাকাটাও স্তব্ধ অচল হয়ে পড়েছে। ইতিহাসই এই সত্যের সাক্ষী। কিন্তু এখানে ঐ সাক্ষীকে জেরা করবার সময় আমাদের নেই। সুতরাং আমাদের মনন-চাকার বিকলতার কথাই সত্য বলে মেনে নেব। কিন্তু আমাদের নেতাদের মুখে কি কথা শুনছি? আমরা কি নিত্যই শুনছি না যে, আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে, নতুবা আমাদের বাঁচোয়া নেই; আমাদের বাঁচনের মান, Standard of living বড়ই নীচু, তাকে উঁচু করতেই হবে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ইত্যাদি? আমরা যাকে বাঁচন বলি, সেটা এদেশে মরণের পর্যায়েই নেমে এসেছে—তার প্রতিকার চাই—একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু কি উপায়ে? রোগী জীবনীশক্তি হারিয়ে মুমূর্ষু দশায় এসে পোঁচেছে। তাকে বেশী করে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে, না তার রোগের বীজ বিনষ্ট করতে হবে? বস্তুত তাকে পথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ওষুধ দিয়ে তার রোগ দূর করতে হবে। এটাই হচ্ছে তার বাঁচবার, বলিষ্ঠ হবার একমাত্র উপায়, অন্য পথ নেই। আমাদেরও আজ ওষুধ-পথ্য দুই চাই; তা না করে শুধু ভূরি ভোজনের ব্যবস্থায় মন দিলে প্রত্যবায়ই ঘটবে। আমাদের দেশে আজ জীবনের মান এত নেমে গেছে, কারণ মননের কোনো মানই নেই। যদি জীবনের মান রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রথমেই মননের মান বাড়াতে হবে। পশ্চিম ভূখণ্ডে মানুষ মনন ও বুদ্ধির বলে দেশকালের ব্যবধানকে প্রায় শেষ করে এনেছে। আর আমরা অমনন ও অবুদ্ধির সহায়তায় জীবন-মরণের ব্যবধানকেই প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছি—এটাই আমাদের চরম কৃতিত্ব! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাদের এই কৃতিত্বের কথাই অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অথচ আমাদের দেশে একদিন মনন ও বুদ্ধির গৌরব দৃঢ় স্বরেই ঘোষিত হয়েছিল। ইংরেজি প্রবাদে আছে, জ্ঞানই বল। বস্তুতঃ জ্ঞানবলের চেয়ে বড় বল আর কিছুই নেই। আমাদের দেশের বালক-পাঠ্য হিতোপদেশ গ্রন্থেও অনুরূপ কথা আছে।—

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু
কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

এই হিতবাক্যে আমরা কর্ণপাতও করিনি, ফলে সিংহ-শশকের অলীক গল্প ঐতিহাসিক সত্যের রূপ নিয়ে আমাদের কাছে সমুপস্থিত হল। ইংরেজ-শশক ভারত সিংহকে বুদ্ধিবলে পর্যুদস্ত করে প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করে গেল। তবু কি আমাদের চেতনা হয়েছে? এই যুক্তিতেও যদি প্রত্যয় সঞ্চার করতে না পারি তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে আপ্ত-বাক্যের আশ্রয় নিতে হবে। (কিন্তু ভয়ে ভয়ে কেননা শাস্ত্রবাক্যকে অনেক সময়েই ভেলকির অরেকল বা ম্যাকবেথের ডাইনি-বচনের ন্যায় বিভিন্নার্থে গ্রহণ করা যায়, আর যে সমুদ্র মন্থন করে বিপরীতার্থক বাক্যরাশি উদ্ধার করা না যায় তা শাস্ত্র পদবাচ্যই নয়)। উপনিষদে বলা হয়েছে, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে।" পারমার্থিক কল্যাণ লাভের সহায় যে পরাবিদ্যা তাকেই এখানে বলা হয়েছে বিদ্যা আর ঐহিক কল্যাণ লাভের সহায় যে অপরা বিদ্যা তাকে বলা হয়েছে অবিদ্যা। এই মৃত্যু-তরণ অপরা বিদ্যার প্রসাদেই প্রতীচ্য জনপদবাসীরা অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে। আর আমরা ঐহিক অপরা-বিদ্যাকে অস্বীকার করে পরাবিদ্যার কৃপায় এক ধাপেই অমৃতলোক প্রাপ্তির অত্যাকাঙ্ক্ষায় ও দুশ্চেষ্টায় একেবারে মৃত্যুলোকের কিনারায় এসে অবতীর্ণ হয়েছি। তাইতো আমাদের কবিকে প্রাচীন ভারতের কাছে ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা জানাতে হয়েছে—

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

মৃত্যুতরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইহনিষ্ঠ অপরাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ। এই অপরাবিদ্যার প্রসাদ লাভ বুদ্ধিচর্চা-সাপেক্ষ। অথচ 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর' ইত্যাদি আরামপ্রদ মিঠে বুলির সাহায্যে বিশ্বাস ভক্তি ও মোহের দেশজোড়া কাঁথা চাপা দিয়ে আমাদের খোকা-বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছি আর গুণ গুণ সুরে কেবলি বলছি—

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

খাজনা দিতে হচ্ছে দারিদ্র্য দিয়ে, দুর্ভিক্ষ দিয়ে, মহামারী দিয়ে। অথচ একদিন ভারতবর্ষ যখন সজীব ছিল, জাগ্রত ছিল, উদ্যত ছিল, তখন এদেশে অবিদ্যার চর্চা ছিল নিরন্তর, বুদ্ধির শিখা ছিল অস্তমিত। তাই তো গীতা-কার বলেছেন—

'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'
কেননা
'বুদ্ধিনাসাৎ প্রণশ্যতি'।

বুদ্ধির শরণ গ্রহণ কর, নতুবা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ যে আমরা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি তার মূলে রয়েছে বুদ্ধিচর্চার প্রতি দীর্ঘকালব্যাপী বিমুখতা। আবার আপ্ত বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে ঋষি-বাক্যতুল্য বলেই মনে করি। তাই আপ্ত-বাক্য হিসাবে তাঁর উক্তিই উদ্ধৃত করছি।—

'বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে। শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু", তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে সংযুক্ত করুন।"

ভগবানের কাছে এই যে বুদ্ধির বর প্রার্থনা, তার কারণ অবুদ্ধিই আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্গতির মূল।

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।

ভগবান নিজে এসে মানুষকে রক্ষা করেন না, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ দিয়েই তাকে রক্ষা করেন। বিপদকে জয় করবার একমাত্র আয়ুধ হচ্ছে বুদ্ধি. হিতোপদেশের এই হিতবাক্য আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি। বুদ্ধিহীনকে যে স্বয়ং বিধাতাও সৌভাগ্য দান করতে পারেন না, একথা হর-পার্বতী সংবাদের সুপরিচিত কাহিনীতেও প্রসিদ্ধি লাভ

করেছে। করতলগত সৌভাগ্যও যে বুদ্ধির দোষে ফসকে যেতে পারে, সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচাতে হলে একথা যেন আমরা কিছুতেই না ভুলি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি 'সাবধান' বাণী আজ আমাদের বিশেষ করে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। তাঁর উক্তি এই—

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনও পাঠান, কখনও মোগল, কখনও ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসেছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হ'ল উপলক্ষ্য...বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। জীবন-যাত্রার পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যেস, চণ্ডুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে যদি তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাঁদের [illegible]লীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পর পদপীড়নের তালে তালে মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন [illegible] এইমাত্র প্রভেদ। —সমস্যা, কালান্তর।

ভয়ংকর অপ্রিয় কথা, কিন্তু সত্য। সেইজন্য বিশেষ করে স্মরণীয়। অপ্রিয় [illegible] শোনাবার মত হিতৈষী জগতে দুর্লভ।

আজ ভৌগোলিক ভারতবর্ষ পরবশতার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতিগত চেতনাময় ভারতবর্ষে পরবশতার অবসান ঘটেছে কি? সেখানে কি এখনও মনুমান্ধাতার সমাজ বিধান, পুরাণ শরিয়তের ধর্মনির্দেশ ও ইংরেজের চিন্তাভাবনার অদৃশ্য রাজত্ব কসঙ্গেই চলছে না? এই অদৃশ্য রাজত্বের সাংঘাতিক পীড়নের অবসান ঘটাতে হলে দীপ্ত বুদ্ধির শাণিত অসিকে কোষমুক্ত করতে হবে। কেননা, চিত্তরাজ্যে যেখানেই আমরা বুদ্ধিকে মানবো সেখানেই আমরা স্বাধীন হবো। "সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।" আমাদের চিত্তরাজ্য থেকে যে দুঃখের মূলে পরবশ্যতার অবসান ও যে সুখের উৎস আত্মবশ্যতার অভ্যুদয় ঘটাতে হলে চাই বুদ্ধির জাগরণ, চাই অন্তর্মুখী মননশক্তির বিকাশ। বোধিদ্রুমতলে নিরন্তর ধ্যান সাধনান্তে সত্যবুদ্ধির মহাজাগরণের ফলে যে মহাপুরুষ 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়েছেন তার বাণীও আজ স্মরণীয়. তিনিও আত্মনিষ্ঠতা মননপরায়ণতার আদর্শের কথাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের যোগে চিরকালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে গেছেন। তাঁর শেষ বাণী হচ্ছে—আত্মশরণো ভব, অনন্যশরণো ভব, নিজেই নিজের স্মরণ নাও, আর কারও শরণ প্রার্থনা করো না। তিনি বলেছেন—

অত্তা হি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরোসিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুর্লভং॥
ধম্মপদ ১২।৪

নিজেই নিজের প্রভু, তা ছাড়া আর কে প্রভু থাকতে পারে? যিনি নিজেকে আয়ত্ত করতে পারেন, তিনি দুর্লভ প্রভুত্বের অধিকারী হন।

গীতাতেও অনুরূপ উক্তি আছে (৬।৫)। এর চেয়ে মহত্তর স্বাধীনতার বা আত্মবশ্যতার আদর্শ আর কি হতে পারে? এই যথার্থ স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায় কি? উপায় মননশক্তির আশ্রয় গ্রহণ। কেননা 'মনোপুব্বং গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।' অর্থাৎ 'মন আগে, ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে' (রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ) বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত হয়েছে যে গ্রন্থে তার নাম ধম্মপদ। ধম্মপদ বৌদ্ধজগতের গীতা। উদ্ধৃত লাইনটি ঐ ধম্মপদ গ্রন্থের প্রথম উক্তি। ধম্মপদের প্রথম দুই শ্লোকের মর্মার্থ এই—

গোরুর গাড়ীর চাকা যেমন গোরুর পায়ের অনুসরণ করে, দুঃখও তেমনি প্রদুষ্ট মনের অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে ছায়া যেমন কায়ার অনুবর্তী হয়, সুখও তেমনি প্রসন্ন মনের অনুগামী হয়।' সুতরাং যথার্থ সুখ অর্জন করতে হলে মোহের আবিলতা ঘুচিয়ে মনের প্রসন্নতা, বুদ্ধির নির্মলতা বিধান করা চাই। তাই বলছিলাম দেশের সুখসম্পদের মান বাড়াতে হলে বুদ্ধির ও মননের মান বাড়াতে হবে। Standard of thinking না বাড়ালে Standard of living কখনও বাড়তে পারে না। অনেক সময় শুনতে পাই জীবনের মান বাড়লেই মননের মানও বাড়বে। একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা তা সত্য নয়। নিছক জৈব জীবন তথা বর্বরতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত যে মানব জীবন, তা মননের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। তার উল্টোটা সত্য নয়, অর্থাৎ জীবনের মান বৃদ্ধির দ্বারাই মানুষের মনন নিয়ন্ত্রিত হয় না। যদি হত তাহলে জীবন স্ফূর্তিতে ভরা আদিম অধিবাসীদের কিংবা অফুরন্ত স্বচ্ছলতার মধ্যে পরিবর্ধিত ঐতিহাসিক অভিজাত সম্প্রদায়ের মননের বিকাশ ঘটত সব চেয়ে বেশী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, আধুনিককালের পাশ্চাত্য জগতে মনন শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের ফলেই সেখানে জীবন-মানেরও এমন অভাবিতপূর্ব উন্নয়ন ঘটতে পেরেছে। ট্রেন-স্টীমার এরোপ্লেন সিনেমা-রেডিও প্রভৃতি যে সব সরঞ্জাম মানুষের জীবন-মানের ক্ষেত্রে এমন অবিশ্বাস্য রকম বিপ্লব ঘটিয়েছে, তা তো মনন বিকাশেরই প্রত্যক্ষ ফল, জীবন শক্তির নয়। জীবনকে উপবাসী রেখে জীর্ণ দশায় এনে ফেলে মননের উন্নয়ন করতে হবে এমন বাতুলতা আমি করছি না; একথা বলাই বাহুল্য। আমি বলছি সভ্যতার সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম আমদানী করলেই দেশে মননের উন্নয়ন হবে না, অন্তরের স্বাধীনতা আসবে না, আর, তা না হলে আমাদের দুঃখ-রজনীরও অবসান হবে না। কেননা, যে আত্মবশ্যতা সর্বসুখের উৎস তারই নামান্তর অন্তরের স্বাধীনতা, ইউরোপের মননশক্তি-প্রসূত আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপকরণই আজ অসভ্য বর্বর আদিম অধিবাসীদেরও ভোগে লাগছে। তারাও ট্রেনে চড়ছে, টেলিগ্রাম পাচ্ছে, রেডিও শুনছে, সিনেমা দেখছে, এমনকি তারা ওসব যন্ত্রপাতি চালনাও করছে। কিন্তু তা বলেই তারা যে সভ্যতারও অধিকারী হয়েছে একথা বলা মোটেই চলে না। আসলে তারাও ওই যন্ত্রপাতির অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে এবং পরের নির্দেশে চালিত হচ্ছে। অতএব ভেবে দেখতে হবে আমাদের দেশে এই যে বহুবিধ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে, তাতে সত্যই আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান হবে কি না। আর যাই হোক, তাতে মনের দারিদ্র্য ঘুচবে না; আর মনের দৈন্য যতদিন থাকবে ততদিন দুঃখ লাঞ্ছনাও আমাদের ছাড়বে না। সভ্যতার সাজসরঞ্জাম

আমদানী বা উৎপাদন যতই হোক না কেন, আমাকে বলতেই হবে, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' 'যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' সভ্যতার সম্পদ আর চিত্তের সমৃদ্ধি এক কথা নয়। তাইতো প্রত্যক্ষতঃই দেখতে পাচ্ছি বর্তমান জগতের মানস-সরসী তীরে আধুনিক কালের অলকাপুরী আমেরিকাতেও।

মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।

নতুবা মর্ত্য জগতের এই অমরিকা-পুরীতেও আত্মহত্যার হিড়িক এখন নিত্যব্যাপার হয়ে দাঁড়াল কেন? বস্তুতঃ বাইরের সম্পদে চিত্তের দৈন্য ঘোচে না, আর চিত্তের দীনতা না ঘুচলে দুঃখ দুর্গতিরও অবসান নেই। অন্তরের সম্পদ, চিন্তার স্বাধীনতা যার নেই, রাজাসনে বসেও সে স্বাধীন হয় না। এইজন্যই ইংরেজ রাজত্বের অবসানে দেশ-ব্যাপী স্বাধীনতার মধ্যে থেকেও আমরা যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি না। বুদ্ধদেব বলেছেন,—মানুষের জিভ স্পর্শ মাত্রই সুপরশের স্বাদ পায়, কিন্তু কাষ্ঠময় বা তৈজসদর্বী সুপরশের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও তার স্বাদ পায় না, কারণ সে শক্তিই তার নেই। আমাদের সেই দশা, অহরহ স্বাধীনতার মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও আমাদের নির্জীব মন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে না। তাই বলছিলাম, আমাদের মনকে সজীব করে তোলা চাই, সচেতন করে তোলা চাই। মনন শক্তিকে সক্রিয় করে তোলা চাই। তাহলেই আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পাব, তার সদব্যবহার করতে পারব। নতুবা শবের গলার মুক্তাহারের মতোই সে স্বাধীনতা আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং নিজেদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও গঠন করেছি। সে রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনকল্যাণ এবং কল্যাণ সাধনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু জন-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপায় কি এবং কোন রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র বলে স্বীকার করব? এই আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে, রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধৃত করি।—

আজকালকার দিনে সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি, যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্ত্য দেশে বল লাভ করেছে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে মানুষে নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে তখন থেকেই জনসাধারণ মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে। —সমাধান, কালান্তর।

রাষ্ট্রনীতির এই আদর্শকে বলা যায় সর্বোদয়ের আদর্শ। কিন্তু তা সর্বজনের সেবা করে নয়, তাকে সুখ সম্পদ দান করে নয়, সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, তার আত্মবিশ্বাসকে উদ্‌বুদ্ধ করে। সর্বজনকে স্বাধীন বুদ্ধির অধিকারী করেই তাকে স্বায়ত্তশাসনের ও যথার্থ মুক্তির স্বাদ দিতে হবে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের জনকল্যাণ প্রচেষ্টার মধ্যে বুদ্ধি জাগাবার কোনো অভিপ্রায় দেখতে পাই না। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের যোগে সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসাদ বিতরণের ব্যাপক অভিপ্রায় নেতাদের চিত্তকে অধিকার করেছে। কিন্তু জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি খোলবার অভিপ্রায় দেখি না। অথচ বৈজ্ঞানিক সম্পদ লাভের চেয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিলাভ বহুগুণে শ্রেয়ঃ। কেননা ওই দৃষ্টিলাভের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ স্বাধীনতার কল্যাণ সম্পদ।

বাঙলা দেশে দামোদর-ময়ূরাক্ষীর জলস্রোতকে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলে বেঁধে তার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা দেশের মাটিকে শ্যামল করে সম্পদ বৃদ্ধির যে সাধু প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু ওদিকে আমাদের গ্রামে গ্রামে সমাজের স্তরে স্তরে চিত্তস্রোত শুকিয়ে গিয়ে দেশব্যাপী অনুর্বরতার অভিশাপ যে সমগ্র জাতিকে মানসিক নিত্য দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করছে, তার প্রতিকারের কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টা কোথাও দেখতে পাই না। নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে দেশকে শস্যসম্পদশালী ও লোকালয়কে বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত করা চাই বইকি। কিন্তু জন-সাধারণের মনন স্রোতকেও তেমনি পরি-কল্পিত উপায়ে কাজে লাগিয়ে জাতী[illegible] চিত্তভূমিকে সমৃদ্ধ ও সর্বজনের মনে[illegible] কক্ষকে বুদ্ধির দীপ্তিতে আলোকি[illegible] করাও চাই। বরং এই মনন শক্তি[illegible] উদ্‌বোধনই চাই সর্বাগ্রে; কেনন[illegible] বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশক্তি চালনার মূলেও থাকে[illegible] মনন শক্তিরই ক্রিয়া। মনন শক্তিকে[illegible] যথোচিতভাবে উদ্‌বুদ্ধ না করে যন্ত্র[illegible] শক্তিকে চালাতে গেলে বিভ্রাটও ঘটতে[illegible] পারে, অন্ততপক্ষে যন্ত্ররাজ বিভূতি[illegible] প্রসাদও যে পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না[illegible] এটা নিঃসন্দেহ।

সুতরাং যথার্থভাবে জনকল্যাণ করতে[illegible] হ'লে দেশের মনন শক্তিকে, বুদ্ধিশক্তি[illegible] পূর্ণ মাত্রায় উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, তাকে[illegible] কাজে লাগাতে হবে। তার উপায় কি? [illegible] উপায় শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার এব[illegible] সাহিত্যের মুক্তিবিধান। শিক্ষা ও সাহিত্য[illegible] অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার উন্নতি[illegible] ও প্রসার হলেই সাহিত্যেরও উন্নতি [illegible] প্রসার ঘটে কার্যকারণ সম্বন্ধের জোরেই[illegible] কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে শিক্ষা[illegible] ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটতে পারেনি[illegible] ইংরেজের প্রভাবে ও ইংরেজির মোহে[illegible] বিষয়টা আরও একটু খুলে বলা দরকার[illegible]

মুখ্যত মানুষের মনন শক্তির উদ্‌[illegible]বোধনের নামই শিক্ষা, আর মানুষের[illegible] মনন সম্পদের চিরন্তন ভাণ্ডারের নাম[illegible] সাহিত্য। সুতরাং, এ-দুটি যে পরস্পর[illegible] নিরপেক্ষ হ'তে পারে না একথা বলা[illegible] বাহুল্য। আমাদের শিক্ষার দোষ-ত্রুটি [illegible] অপূর্ণতার ফলেই সাহিত্যের পূর্ণ বিকা[illegible] ঘটতে পারেনি। এখানেই বলে রাখি[illegible] সাহিত্য বলতে আমি শুধু রসসাহিত্য[illegible] বুঝি না, ব্যাপকার্থে ইতিহাস, দর্শন[illegible] বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার মননসম্পদকে[illegible] আমি সাহিত্য বলে গণ্য করি। এই[illegible] ব্যাপকার্থ গ্রহণ যে অন্যায় নয়, একথা[illegible] সমর্থনে আমাদের সাহিত্য সম্মেলনগুলি[illegible] ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের[illegible] কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

আগে শিক্ষার কথাই বলি। আমাদের[illegible] শিক্ষার প্রধান দোষ দু'টি—তার অগভীরত[illegible] ও সংকীর্ণতা। আমরা যে শিক্ষা পাই তা[illegible] সাধারণতঃ ব্যবহারিকতার বাহ্য প্রয়োজনের[illegible] সীমাকে অতিক্রম করে আমাদের মর্মকে[illegible] স্পর্শ করে না, চিত্তকে সুনিয়ন্ত্রিত কর[illegible]

না এবং চরিত্রকেও গঠন করে না। তা ছাড়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিক থেকেও সে শিক্ষা সংকীর্ণ, আর সমাজগত ব্যাপ্তির দিক থেকেও তা নেহাৎই অপরিসর—এ শিক্ষা সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরের অল্প কয়েকজন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশের পনেরো আনা লোকই এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত। শিক্ষার এই বিবিধ দোষেরই মূল কারণ একটি বৈদেশিক ইংরেজি ভাষার মধ্যস্থতা। দুর্বোধ্য বেদ-মন্ত্রের মধ্যস্থতা যেমন ভক্ত ও ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগের অন্তরায় ঘটায়, ইংরেজি মধ্যস্থতাও তেমনি শিক্ষিতব্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ঘটায়। ফলে এই কৃত্রিম শিক্ষা আমাদের ব্যবহারে যদিবা লাগে, মর্মে কখনও লাগে না। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত মন্ত্রের মতোই ইংরেজি বিদ্যাও আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আরেক দুস্তর বিচ্ছেদ রচনা করেছে। ফলে আমরা 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'; আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাছে ইংরেজিই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ঘরের কাছের অশিক্ষিত প্রতি-বেশীরা দূরবর্তী গ্রহের চেয়েও দূরবর্তী—দূরবীণ লাগিয়েও তাদের হৃদয়ের দেখা আমরা পাই না। যে দেশের শিক্ষার এই অবস্থা সে দেশের সাহিত্যের অবস্থাও যে ভালো হতে পারে না, তা সহজেই বোঝা যায়। রোগী যখন মরণদশায় পড়েও রোগের যন্ত্রণা বোঝে না, তখনই তার অবস্থা হয় শোচনীয়। আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা। আমরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু তার গলদ যে কোথায় তা বুঝতেও পারি না, প্রতিকারের চেষ্টা তো কল্পনারও অতীত।

সাহিত্য মানুষের শিক্ষা তথা মনো-জগতেরই প্রতিরূপ। শিক্ষায় ও মননেই সেখানে গলদ রয়েছে, সাহিত্য সেখানে পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। বাঙলা সাহিত্যকে একটুখানি পরখ করলেই তার অভাব ধরা পড়ে। প্রথমতঃ তার অব্যাপ্তি, যে বাঙলা সাহিত্যের আমরা গর্ব করি, তা কয়জন বাঙালীর সম্পদ? শতকরা পাঁচ জনেরও কিনা সন্দেহ। তাই যদি হয়, তবে এই সাহিত্য বাঙালী জাতির কোন্ কল্যাণসাধন করবে? বাঙলা সাহিত্যকে বাঙলা দেশের সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলা চাই। নতুবা এ সাহিত্য আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যেসব বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তার তলাটা হাল্কা হলে চলে না। সেসব জাহাজের তলায় ভারী মাল বোঝাই করে জাহাজকে গভীর জলের মধ্যে স্থিতিদান করা হয়। তলা ভারী না হলে অর্থাৎ ব্যালান্স না থাকলে মাথাভারী জাহাজ ঝড়-তুফানের আঘাত সইতে পারে না, সহজেই কাত হয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের মাথা-ভারী বাঙলা সাহিত্যেরও সেই দশা। তার তলায় ব্যালান্স নেই, জনসাধারণের হৃদয়ের গভীরতায় তার প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা নেই। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয় জীবনে যদি কখনও দুর্যোগ দেখা দেয়, তাহলে এ সাহিত্যও রক্ষা পাবে না, আমাদেরও সে রক্ষা করতে পারবে না—এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

দ্বিতীয়তঃ বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি পরিসরও বড়ই সংকীর্ণ। একে সাহিত্য-সৌধ বা সাহিত্য পিরামিড না বলে সাহিত্যস্তম্ভ বলাই ভালো। কীর্তিস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু কীর্তিসৌধ কখনও নয়। সমগ্র জাতীয় চিত্তকে আশ্রয় দেবার মত প্রশস্ত কক্ষ তার নেই। কেননা, বাঙলা সাহিত্য একাঙ্গীন; একমাত্র কবি কল্পনাকে আশ্রয় করেই সে স্তম্ভের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরিধিও খুব বেশী নয়। একমাত্র রসচর্চাকেই সে আশ্রয় করেছে, মননকে সে এখনও স্বীকার করতে পারেনি। বহু-মহলা ইংরেজি সাহিত্যে মননের বিভিন্ন রত্নকক্ষে যে অজস্র সম্পদের সন্ধান মেলে, বাঙলা সাহিত্যে তা আমরা আশাও করি না। কেননা, আমরা ধরে নিয়েছি যে, বাঙলায় শুধু কাব্য, গল্প ও নাটকই হতে পারে, উচ্চাঙ্গের মনন সাহিত্য রচনা করতে হলেই ইংরেজির আশ্রয় নিতে হবে। কেন এমন হল? হ'ল এইজন্য যে, উচ্চশিক্ষায় এখনও আমরা বাঙলাকে একমাত্র রস-সাহিত্যের কোঠাতেই এক-ঘরে ক'রে রেখেছি—ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের কক্ষে তার প্রবেশাধিকার নেই। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মন্দিরে নরশার্দূল আশুতোষের যে মর্মর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত আছে, তার গায়ে লিপিবদ্ধ আছে এই প্রশস্তি বচন—

His noblest achievement, surest of all
The place of his mother-tongue in step-mother's hall.

আমাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির যে আমাদের বিমাতার অর্থাৎ ইংরেজিরই মন্দির, একথা অসংকোচেই স্বীকার করা হয়েছে। তারই এক কোণে দীনা মাতৃ ভাষার একটুখানি স্থান করে দিয়েছেন, এটাই আশুতোষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দোর্দণ্ড-

প্রতাপ ইংরেজের রাজত্বকালে এটুকু করাতেও যথেষ্ট দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়েছিল একথা স্বীকার করি। কিন্তু আজও যে আমরা ঐশ্বর্যশালিনী বিদেশিনী বিমাতার ষোড়শোপচার পূজার্চনার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে তার পদপ্রান্তে দীনা মাতৃভাষাকে (যার স্তন্য-রসে আমাদের জীবন-মন গঠিত হয়েছে) একটুখানি আশ্রয় দিয়েই পরিতৃপ্ত রয়েছি, তার চেয়ে কলঙ্কের বিষয় আর কি হতে পারে? মাতৃ-অবমাননা ও বিমাতৃ-বন্দনার এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি?
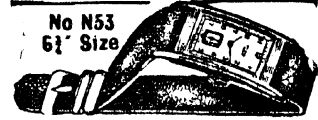
মনন সাহিত্যচর্চা ও রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার এই যে অতি প্রাধান্য তার হেতু কি? প্রথম হেতু ইংরেজের স্বীকৃতি। রাজার জাতির স্বীকৃতিতে উৎসাহিত হয়ে আমরা শতাধিক বৎসর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত চর্চাই বিদেশী বিমাতৃ ভাষাতেই করে এসেছি। দ্বিতীয় কারণ আমাদের মনের জড়তা, জড়ের প্রধান ধর্ম এই যে, কোনো শক্তি তাকে একবার যেদিকে গতি দান করে, সে নিজের শক্তিতে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য পথ ধরতে পারে না। ইংরেজের হাতের অর্থাৎ মেকলের হাতের ঠেলা খেয়ে আমাদের মন শতাধিক বৎসর ধরে যে-পথে চলেছে, নিজের জড়তাবশতঃ সে ও-পথ ছেড়ে অন্য পথ বেছে নেবার কথা ভাবতেও পারে না। বরঞ্চ সেই অভ্যস্ত পথকে আঁকড়ে থাকবার অনুকূলেই নানা যুক্তির অবতারণাও করে। তার মধ্যে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, ইংরেজিই সমস্ত ভারতবর্ষকে ঐক্য দান করেছে এবং ইংরেজিই সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করেছে। ইংরেজির আশ্রয় ত্যাগ করলে ভারতীয় ঐক্য এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগ নষ্ট হবে, আর তাতেই ঘটবে আমাদের মহতী বিনষ্টি। ছোট কাপড়ে মোটা দেহের একাংশ ঢাকতে গেলে অপরাংশ ফাঁক হয়ে যায়। এই যুক্তিও সেই রকম। এই যুক্তিতে এক সমস্যা ঘোচাতে গিয়ে যে আরেক সমস্যার সৃষ্টি করছি, সে কথা আমরা ভুলেই যাই। ইংরেজির সাহায্যে ভারতবর্ষের ঐক্যবিধান করতে গিয়ে বাঙালীর ঐক্যকে যে নষ্ট করছি, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে স্বদেশ-বাসীর সঙ্গে যে বিযুক্ত হচ্ছি, সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই। ঈশপের গল্পে যে জ্যোতির্বিদ্ আকাশের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কুয়োর মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তারই দুর্দশা যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেকথা ভাববার অবকাশও আমাদের নেই। ইংরেজির ঊর্ধ্ব গগনে জ্যোতিষ্করাজির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে আমরা যে স্বদেশের নিম্ন-ভূমিতে বিনাশের ভয়ংকর ফাঁকটার দিকেই পা বাড়াচ্ছি, সেদিকে হুঁশ নেই। বিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখবার, ভারতবর্ষের ঐক্য-বিধানের লোভে স্বদেশবাসীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিনাশলাভের অদ্বিতীয় মহৎ দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে যাবার জন্য বাঙালীর আবির্ভাব হয়েছে একথা বিশ্বাস করতে পারি না।

বাঙলায় রস সাহিত্য রচিত হবে মাতৃ-ভাষায়, আর মনন সাহিত্য রচিত হবে বিমাতৃভাষায়, এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদ আর কতদিন চলবে? হৃদয় ও মস্তিষ্কের বিচ্ছেদ যে জীবনের পক্ষেই মারাত্মক একথা যেন না ভুলি। মনন সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ না হলে রসসাহিত্যও যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, একথাও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে? গাছের শিকড় যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসার সংগ্রহ করতে না পারে, তবে তার ফলে অমৃতরস যোগাবে কি করে? এটুকু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, আমরা যেন বাঙলার এককক্ষময় অপ্রশস্ত একতলা ঘরের উপরে ইংরেজির বহুকক্ষময় প্রশস্ত দোতালার ঘর নির্মাণের অসাধ্য সাধনেই ব্রতী হয়েছি। রসসাহিত্য রচনায় আশ্রয় নেব বাঙলার, আর ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মনন সাহিত্য রচনায় আশ্রয় নেব ইংরেজির, এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা দীর্ঘকাল টিকতে পারে না। এই অস্বাভাবিকতার অবসান না ঘটালে বাঙলা সাহিত্যের মুক্তি নেই। আমাদের মহা-বিদ্যালয়সমূহে যেদিন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত মনন বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলবে মাতৃ ভাষাতে, সে দিনই বাঙলা সাহিত্যের বহুকক্ষময় প্রশস্ত প্রাসাদ রচিত হবে, সেদিন রসসাহিত্যেরও সুদিন আসবে। পণ্ডিতজনের জন্য উপরের তলার প্রশস্ত ভোজনাগার, আর সাধারণের জন্য নীচের তলার সংকীর্ণ পানীয়শালা—এই সর্বনাশা আত্মবিচ্ছেদের অবসানও ঘটবে সেদিনই।

সেদিন যে সুনিশ্চিতই আসবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।' 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।' ভরসার কারণ সেই অনাগত কালের দখিনে হাওয়ার আমেজ এখনই যে মনের মধ্যে অনুভব করছি। সমস্ত দৈন্য সংকীর্ণতার ঝরাপাতার মধ্যেও আমি বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান ঋতু পরি-বর্তনের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে।' রাজ সরকারের ঔদাসীন্য, শিক্ষানায়কদের নিষ্ক্রিয়তা এবং পণ্ডিতজনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঙলা মনন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে ইতিমধ্যেই অজস্র মুকুল মঞ্জরীর আবির্ভাব হয়েছে—

চোখ আছে যার দেখছে সে জন,
অন্ধজনে দেখবে কি?
ঊষার আগেই আলোর আভাস
সকল চোখে ঠেকবে কি?

এসব মুকুল মঞ্জরীর অনেক কিছুই ঝরে যাবে সত্য, কিন্তু এই বসন্তপর্যায় শেষ হ'তে না হ'তেই যে বাঙলা মনন সাহিত্যের শাখায় শাখায় ফল সম্ভারের আবির্ভাব ঘটবে তা ঋতুচক্র আবর্তনের মতোই ধ্রুব সত্য। আজ যদি বাঙলা সাহিত্যের 'আদম-শুমারি' নেওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যাবে গত কয়েক বছরে বাঙলার মনন বিভাগে ছোট বড় যত বই বেরিয়েছে এবং বেরুচ্ছে, এর পূর্বে কোনো কালেই তা হয়নি।

তার কারণ কি? প্রধান কারণ ইংরেজের তিরোধান। ইংরেজের আকর্ষণেই আমরা দীর্ঘকাল ইংরেজি ভাষার চতুর্দিকে চক্রপথে আবর্তিত হচ্ছিলাম। ইংরেজ আজ তিরোহিত হয়েছে, তার নিত্য আকর্ষণের প্রভাবও শিথিল হয়েছে। ফলে জড়ত্বের নিয়ম অনুসারে আমরা আরও কিছুকাল ওই চক্রপথেই আবর্তিত হব, কিন্তু ক্রমক্ষীয়মান গতিবেগে। এভাবে ইংরেজের টান যে দিন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে, সেদিন আমাদের সাহিত্য সমগ্রভাবেই মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে তাকেই প্রদক্ষিণ করতে থাকবে, তাতেই হবে তার সার্থকতা, সেদিনই আসবে সর্বাঙ্গীন বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ, সঙ্গে আসবে আমাদের শিক্ষার সমগ্রতা ও জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ।

তা হ'লে এদেশ থেকে কি ইংরেজির চর্চা একেবারেই উঠে যাবে? তার উত্তর—না, কখনও না। ইংরেজি হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণখনি। যতদিন তার স্বর্ণ ভাণ্ডার নিঃশেষ না হবে, ততদিন আমাদের সুদক্ষ খোদাইকররা তার থেকে অবিরাম স্বর্ণ আহরণ করতে থাকবে। শুধু ইংরেজি কেন, ফ্রেঞ্চ, জর্মান, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষার খনিতেও আমদের খোদাই-করদের কাজ চলবে অবিশ্রান্তভাবে। সে সোনা শোধন করে তাঁরা দেবেন আমাদের স্বর্ণকারদের হাতে। সেই স্বর্ণকাররা তার থেকে বহু বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার রচনা করে পরাবেন আমাদের মাতৃভাষাকে। সেই সুদিনকেই আমি বলছি বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

তবে এতদিন আমরা কি করেছি? এতদিন আমরা সবাই মিলে ইংরেজির সোনার খনিতে সেঁধিয়ে কেবলই অশোধিত সোনা সংগ্রহ করেছি এবং পরস্পরের গায়ে ছোঁড়াছুড়ি করেছি। কেউ কেউ যে ঐ সোনা দিয়ে অলঙ্কার গড়ার কাজেও মন দেয়নি, তা নয়। যাঁরা সেদিকে মন দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গী বিমাতার দেহ-লাবণ্যকেই বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করবার ব্যর্থ সাধনাতেই জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু সেই শ্বেতভুজা কৃষ্ণ হস্তের সেই পূজার্ঘ্যকে ক্ষণিক হাস্যে গ্রহণ করলেও তাকে নিত্যকালের অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখেননি। তা ছাড়া মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্র প্রমুখ আর কয়েকজন সামান্য কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার রচনা করে ভক্তিনম্র করে শ্যামাঙ্গী দীনা মাতৃভাষার রিক্ত কণ্ঠেই পরিয়েছেন, সেই দরিদ্র সন্তানের ভক্তি অর্ঘ্যকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে গ্রহণ করে তাকে নিত্যকালের রত্নাধারেই সঞ্চয় করে রেখেছেন। কিন্তু তাতেও তৃপ্ত না হয়ে মায়ের সেই ভক্ত সন্তান কটি

'কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়,
সে যে আমার জননীরে।'

এই বেদনা-সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে শুধু অশ্রুজলের মুক্তা হারেই মায়ের শ্যামাঙ্গ ভূষিত করে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঙলা মায়ের অধিকাংশ সাবালক সন্তানই ইংরেজির স্বর্ণ খনিতে প্রবেশাধিকার পেয়ে ও অমার্জিত বিদেশী সোনা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুযোগ

পেয়ে খনির সেই অন্ধকার গহ্বরকেই আমাদের চিরকালের আশ্রয়স্থল বলে সগর্বে স্বীকার করে নিয়েছেন। বার বার মায়ের আহ্বান শুনেও রৌদ্রালোকে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার আশংকাতে ওই মোহান্ধকারের বাইরে আসতে তাঁদের চরণ দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু কাল বসে নেই। ওদিকে খনির বাইরে মাতৃভাষার অমানিশার শেষে নবপ্রভাতের সোনার আলোতে আহ্বানগীত ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

আজ মাতৃভাষার অংগনে বিগত রজনীর অন্ধকার কেটে গিয়ে নব প্রভাতের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই শুভ মুহূর্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বিদেশী খনির তিমির গর্ভ থেকে এবং নবযুগের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নূতন ঊষাকে অভিবন্দিত করে সমবেত কণ্ঠে গাইতে হবে—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।

চিত্র প্রদর্শনী

ইণ্ডিয়া স্ক্যানডিনেভিয়া সোসাইটি

কিছুদিন আগে পর্যন্তও শিশু-শিল্প প্রদর্শনী একটা দুর্লভ ঘটনা ছিল। ইদানীং হাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। শিশুদের শিল্পচর্চাও যে শিল্পপদবাচ্য হতে পারে এবং তার মধ্যে বিশুদ্ধ শিল্পরসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এ সত্য আমরা উপলব্ধি করতে শিখেছি।

এ বছর পর পর কয়েকটি শিশুশিল্প প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে ঠিক এমনই একটি শিশুপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ইণ্ডিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সোসাইটি। শিশু ও কিশোর কিশোরীদের অংকিত চিত্রসম্ভার, নানান্ ধরণের খেলনা প্রভৃতি ও ছুঁচের এবং সেলাইয়ের কাজ এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। এই নূতন সংঘটির উদ্দেশ্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ও ভারতের শিশু ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করা। প্রদর্শনীর শেষে এই কাজগুলোর মধ্যে কিছু বাছাই করে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় পাঠান হবে এবং ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকেও এই ধরণের একাধিক প্রদর্শনী যাতে আমাদের দেশে আসতে পারে উদ্যোক্তারা সে প্রচেষ্টাও করবেন।

বাজারের দৃশ্য —রমেশ ডালমিয়া

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নানান শিশু-প্রদর্শনীর মত এ প্রদর্শনীটিতেও কয়েকটি দোষ ত্রুটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অধিকাংশ চিত্রে শিশু বা কিশোর কিশোরীদের মনের ছাপ যেন পাওয়া যায় না বরং তা অধিকতর পরিণত বলেই মনে হয়। প্রদর্শনীটিতে আরও কিছু কম সংগ্রহ থাকলে তা আরও মনোজ্ঞ হ'ত এবং দর্শকদের 'পরেও সুবিচার করা হ'ত। সাজানোর দোষত্রুটির জন্যও তা অনেকটা ভারাক্রান্ত মনে হয়েছে। বহু ভাল ছবি উপভোগ করা যায় না বা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তা ছাড়া বহু ছবির ওপরে বড় বড় লেবেল লাগিয়ে দেয়ায় উদ্যোক্তাদের শিল্পী মনের পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। মূল ছবি—তা যতই নগণ্য হোক না কেন তার ওপরে লেবেল প্রভৃতি লাগিয়ে নষ্ট করবার অধিকার কারও নেই এবং তাতে শিল্প-রুচির পরিচয়ও পাওয়া যায় না। প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখবার সময় একটি চিত্র তালিকা এবং সংঘের উদ্দেশ্য

প্রভৃতি জানবার আগ্রহ থাকলেও তা জানবার সুযোগ হয়নি। ভবিষ্যতে উদ্যোক্তারা এসব দিকে তাঁদের সযত্ন ও শিল্পীসুলভ দৃষ্টি দিলে দর্শকের এবং শিল্পীদের প্রতি সুবিচার করা হবে।

বিভিন্ন শিল্পরচনার মধ্যে যেগুলোতে শিশু বা কিশোর মনের সামান্য ছাপ পাওয়া গেছে তার কয়েকটির নীচে উল্লেখ করা গেল। জয়া মুখার্জির (১২ বছর) তিন বন্ধু এবং গাড়ীর পেছন। বীরা

সাধু —আর দেশাই

গ্রামের পথে —অমরনাথ ঘোষ

সেনগুপ্তের (৭ বছর) মণিপুরী নৃত্য, পিয়ালী মজুমদারের (৮ বছর) একটি দৃশ্যচিত্র। রমেশ ডালমিয়ার (১৩ বছর) কয়েকটি রচনার সঙ্গে এর আগে অন্যান্য প্রদর্শনীতে পরিচিত হয়েছি। এ প্রদর্শনীতেও তার কয়েকটি চিত্র বেশ সুন্দর হয়েছে। তার ব্যাঘ্রশিকার, ঘোড়-দৌড় এবং বাজারের দৃশ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি চিত্র নতুন একটি কল্পনা জগতের সৃষ্টি করেছে। ত্রিলোচন সিংহের (১২ বছর) ক্যাপ্টেন ত্রিলোচন, হিমানী সেনের (১২ বছর) একটি মেয়ে। নিকুঞ্জ লোহিয়ার প্রাতভ্রমণ প্রভৃতি রচনাও উপভোগ করার মত। সুমেরু রায়চৌধুরীর (৫ বছর) লাল হাতী এবং লাল ঘোড়াগাড়ীতে লাল রঙের ব্যবহারে চমক লাগায়। কৃষ্ণা ঘোষের (১২ বছর) পার্বণ, কল্পনা সরকারের (১২ বছর) নর্তকী. মনোহরলালের পার্ক, সারা ডাক্তারের ভোরের কাজ, ধর্মবীর দুগলের ডালিয়া প্রভৃতি রচনাগুলোর প্রত্যেকটিতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। প্রকাশ পোদ্দারের (১২ বছর) ছেলেদের পার্কএর বিশিষ্ট কম্পোজিশানটি শিশু মনের বিশেষ দৃষ্টির দিকটা উদ্ঘাটিত করে। আর দেশাইয়ের সাধু প্রদর্শনী আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। অমরনাথ ঘোষের (১২ বছর) রচনাগুলো পরিণত মনে হলেও তার আলঙ্কারিক সুরটি বেশ লাগে। তার মাঝি, ব্রিজ, গ্রামের পথে প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাজই সুন্দর হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পীর নানান ধরণের সেলাইয়ের এবং ছুঁচের কাজ, খেলনা, মূর্তি প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

সমালোচনার জন্য যে কয়টি দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা হল আশা করি উদ্যোক্তারা ভবিষ্যতে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। ভবিষ্যতের প্রদর্শনী দোষ-ত্রুটিমুক্ত হয়ে আরো সার্থক হবে এই আশাই করি।

সত্যিকারের আনন্দ
উৎকৃষ্ট
তামাকে
তৈরী
ম্যাগনাম
সিগারেট
সী কিং
মেগনামস্
এগুলো বড়
এগুলো ভালো
এগুলো উইলসের তৈরী
MAGNUMS
SEA KING
৫ আনায়
১০টি
স্থানীয় করের নিয়মাধীন

৩৬
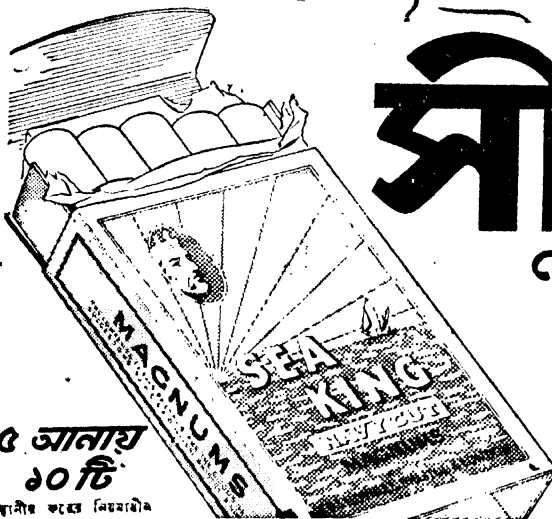
চীৎকার করো না। রেভলিউশন বিপ্লব এমনি করেই আসে। এতো শুধু শুরু। নিঃশব্দে হাসলে কপিলদেব।

অন্ধকার রাত্রি—নদীর ধারে জঙ্গলের পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ; মাঠের শেষে উঁচু টিলার উপর গ্রাম অনেক দূরে। সেইখানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। পাশে দাঁড়িয়ে রমা, তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত, ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে; কথা বলতে গিয়েও আতঙ্কে কথা বলতে পারছে না। সামনে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ। তখনও ছটফট করছে। কপিলদেবের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মামুদ, সুক্কুর আরও দুজন মামুদের চেনা। আর রয়েছে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী—এই অঞ্চলের একজন ডাক্তার, কপিলদেবদের দলের সভ্য।

লাশটা পড়ে রয়েছে প্রমোদ ঘোষের।

কপিলদেব রমাকে নিয়ে পাকিস্তানে তার গ্রামে চলে যায়নি। সে প্রমোদের গ্রাম ছেড়ে রমাকে নিয়ে এসে উঠেছে ঘনশ্যাম ডাক্তারের এলাকায়। সঙ্গে তার মামুদ এবং সুক্কুরও এসেছে। এই এলাকাটায় একটা খুব বড় সুবিধে আছে। সেটা হল এলাকাটায় আসা-যাওয়ার কোন সুগম পথ নেই। নদীর বন্যা এ অঞ্চলটাকে এমনই প্লাবিত ক'রে যে, পথঘাটগুলি খানাখন্দতে দুর্গম হয়ে থাকে। গ্রীষ্মে যেটুকু মেরামত হয় বর্ষায় তার অনেক গুণ বেশী খুলে যায়; তাও এবার আর মেরামত হয়নি; কারণ মেরামত করে ইউনিয়ন বোর্ড, সে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ঐ ঘনশ্যাম ডাক্তার। এবার কপিলদেবের নির্দেশেই ঘনশ্যাম ডাক্তার রাস্তায় হাত দেয়নি। এ রাস্তায় মোটর দূরের কথা, বাইসিক্লও চলে না। তার উপর ডাক্তার নির্দেশ দিয়ে দুটো কাল-ভার্টের উপরের তক্তা খুলে তুলে নিয়েছে। সবচেয়ে বড় সুবিধে হল, এলাকাটা দুই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা। এবং এই জেলার সীমানাতেও দুই থানার এলাকা। এ জেলার পুলিশ এলে ও জেলার সীমানায় অত্যন্ত সহজে, খানকয়েক বাড়ীর উঠানের মধ্যে দিয়ে সকলের অগোচরে চলে যাওয়া চলে। তার উপর নদীর ধারের বিস্তীর্ণ দুর্গম জঙ্গল। এর কিছু পূবেই মস্ত বড় বিল। বিলের চারিপাশের গ্রামগুলিও দুর্গম এবং দুর্ভেদ্য। এখানে আত্মগোপন করলে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য—অসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। আরও সুবিধে আছে, সেটা হ'ল ঘনশ্যাম ডাক্তারের আধিপত্য। ডাক্তার মানুষ, বড় জোতদার; এই কারণে লোকে ভয়ও করে, ভক্তিও করে। তার কথার উপর 'না' কথা এখানে চলে না।

ডাক্তার পাশ করে স্বগ্রামে এসে বসবার আগে থেকেই ওদের পৈত্রিক প্রতিপত্তি ছিল। ঘনশ্যাম ডাক্তার হিসেবে এবং দেশকর্মী হিসেবে জীবন শুরু করে সে প্রতিপত্তিকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে। প্রথম সে কংগ্রসকর্মী ছিল। খদ্দর প'রে গান্ধী-টুপি লাগিয়ে প্র্যাক্‌টিস ক'রে বেড়াত। সে সাঁইত্রিশ আটত্রিশ সালের ঘটনা। জেলার সদর থেকে কংগ্রেস কর্তারা আসতেন। সভাসমিতি হত। ঘনশ্যাম বিনা ফিয়ে গরীবদের দেখত। এই সময় হ'ল জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইলেক্‌শন। কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে স্থির করলে। ঘনশ্যাম এই থানায় কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়াবার আবেদন জানালে। কিন্তু এ থানায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—গুণীবাবুর বাবা। গোপীচন্দ্রবাবুর ছেলে পবিত্রবাবু এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ ধনী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ এবং মানুষ হিসেবে তিনি এমনই মধুর চরিত্রের মানুষ ছিলেন যে, তাঁর জয় একরকম সুনিশ্চিত বলেই লোকে জানত। এই কারণেই ঘনশ্যামের সামান্য খানিকটা অঞ্চলের জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর ক'রে কংগ্রেস তাকে খাড়া করতে সাহস করেনি। একজন অর্থশালী এবং প্রতিপত্তিশালী লোককেই দাঁড় করিয়েছিল। ঘনশ্যামের দোষই হোক আর গুণই হোক, সে নিজেকে ছোট দেখে না কোনকালে। সে কংগ্রেসের সঙ্গে সংস্রব ক্ষীণ ক'রে দিলে। প্রথমটা চেষ্টা করলে কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণধারদের হটিয়ে একটি নূতন দল তৈরী করে কংগ্রেস দখল করে বসবে। কিন্তু সেটা সহজ ছিল না। বছর তিন চার পরেই এল বিয়াল্লিশ সাল। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। চারিদিকে ধরপাকড় শুরু হল। ঘনশ্যাম সংস্রব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে ফেললে। এই সময়েই এখানে এল কপিলদেব।

কপিলদেব সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের সভ্য। এই জেলায় একটি আশ্রম তৈরী করে এখানে দশ বারোজনে মিলে কাজ করত। সেই সময় ঘনশ্যামের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বিয়াল্লিশ সালে দলটি ভেঙে গেল। এই আন্দোলন নিয়ে মত-ভেদ হয়েই ভাঙল। তিন চারজন গান্ধীজীর আদর্শ বড় বলে সেই পথে যাত্রা শুরু করলে। জনপাঁচেক এই সুযোগে সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কপিলদেব এবং আর দুজন স্বতন্ত্র পথ ধরলেন।

তাঁদের মতে এই সময়ে বিপ্লব আন্দোলন সে সহিংস আর অহিংস যাই হোক শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, পৃথিবীর সর্বনাশ নিয়ে আসবে। পৃথিবীব্যাপী বিরাট সাম্যবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রশক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে, পৃথিবী পিছিয়ে যাবে বহু বৎসর। রাশিয়া ধ্বংস হবে। রাশিয়াকে রক্ষা করবার জন্য আজ বিপ্লব আন্দোলন নয়, এই যুদ্ধজয়ের আন্দোলনে ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। কপিলদেব তার বর্তমান দলের সভ্য হন। ইংরাজ সরকার দলটিকে বাধাবন্ধনহীন গতিবিধি-উক্তির অধিকার দিলেন, পুস্তক প্রকাশে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, নৃত্যে গীতে প্রচার কাজ চলতে লাগল। ওদিকে গরম বক্তৃতারও অবধি রইল না। অন্যদিকে মেয়েদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে কাজ চলতে লাগল। এক কালের অবসানে নূতন কালের আগামী সংস্কৃতির ভূমিকা রচনা হল। কলকাতা শহরে ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ সচকিত হয়ে উঠল। তাদের ঘরের মেয়েরা ছেলেরা দলে দলে আসতে শুরু করল। দেশে নূতন আগন্তুক লক্ষ লক্ষ ইংরেজ এ্যামেরিকান সৈন্যদলের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদেরও কয়েকজনকে দেখা গেল। বড় বড় ইংরেজ রাজকর্মচারীদের দু' একজন বাঙালী আই-সি-এসও এলেন। সে এক মহা সমারোহ, বিপুল উদ্যম।

কপিলদেব এই ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে এল ঘনশ্যামের কাছে।

আঙুল দিয়ে ভবিষ্যতের যবনিকা হেলায় সরিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভবিষ্যতের চিত্র। যুদ্ধের শেষ হতে হতে শুরু হবে বিপ্লব।

শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, সমাজ বিপ্লব। রাষ্ট্রশক্তি দখলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে সংগ্রাম। আজ যারা দেশের জনগণ মন অধিনায়ক সেজে বসে আছে তারা বহ্নির মুখে তৃণের মত ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তার সঙ্গে অবশ্যই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যারা তাকে অবজ্ঞা করেছে, অবহেলা করেছে—তারা সবাই। সেই ঘনশ্যাম এই দলে যোগ দিয়েছে।

বিয়াল্লিশ সাল থেকে প'য়তাল্লিশ পর্যন্ত সে এখানে এই অঞ্চলটিতে এই দলের প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজ আমলের অনেক কাজে অগ্রণী হিসেবে স্থান পেয়েছে। সরকারী সাহায্যে দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানা পরিচালনার ভার ছিল তাঁর উপর। কলকাতা থেকে দলের মেয়েরা এখানে আসত জমানো দুধের কৌটো—গুঁড়ো দুধের টিন নিয়ে। দিনকয়েক পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে ঘুরেও যেত। মধ্যে মধ্যে নাচগানের আসর হত। নতুন গান। নতুন আদর্শ। মুক্তি! সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি।

প'য়তাল্লিশ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ঘনশ্যামের দল দেশে, শহরে, বাজারে, বড় বড় গ্রামে এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু এ অঞ্চলে ঘনশ্যাম তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। রাজনীতির জটিল তত্ত্ব ও গোপন তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন লোকগুলি এসব প্রশ্নের ধার ধারে না। এ ছাড়াও দূরদর্শী কপিলদেবের পরামর্শে কতকগুলি দুর্ধর্ষ লোককে নিয়ে একটি এমন শক্তিশালী দল সে এখানে গড়ে রেখেছে যে, তাদের ভয়ে এখানকার লোকে প্রায় বোবা হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। আরও একটি সুবিধা আছে। এই সীমান্ত অঞ্চলটি মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলেই কিছুদিন আগে দাঙ্গা বাঁধবার উপক্রম হয়েছিল। মুসলমানেরা বর্তমানে স্তব্ধ; ভীতও বটে এবং বেদনায় অভিমানে তারা দেশের রাজনীতিক আন্দোলন, সমাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে দূরেই থাকে। যারা ফেরারী তাদের আশ্রয় দেয় না বটে, কিন্তু তাদের কথা প্রকাশও করে না।

ঘনশ্যাম ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করে অবশ্য মুসলমানদের নিজেদের দলে টানবার। সে তাদের গ্রামে গেলে বলে, তোমাদের মৌজার জমির বিলি বন্দোবস্তের ফর্দ তৈরী করছি। বুঝেছ।

অর্থাৎ জোতদার জমিদার প্রভৃতির জমির ফর্দ তৈরী করে সেগুলির কোন্‌টি কাকে দেওয়া হবে তারই ফর্দ।
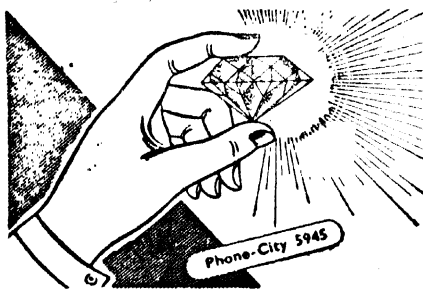
তারা মনে মনে আশান্বিত হয়। একটু হাসে।

সঙ্গে সঙ্গে নবগ্রামের বিজয় বাঁড়ুজ্জের মুখ মনে পড়ে। কঠিন হয়ে ওঠে তাদের মুখের পেশী এবং দৃষ্টি। হায়-হায়-হায়! একেই বলে নসীব! অদৃষ্ট!

ওই বিজয় চটের মত পুরু কাপড় পরে টং টং করে আসত তাদের গ্রামে, বলত—হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান।

তারা হাসত। বলত—হ। উ সব বুঝি আমরা। কায়েদে আজম জনাব জিনা সাহেব উ সব চালাকী বুঝি ফাঁস ক'রে দিছে! যাও যাও বামুন, হিঁদুর গেরামে যাও।

আজ সেই বিজয় ঘুরে বেড়ায় ছাতিটা ফুলায়ে। চোখ গরম ক'রে সেদিনে ওই দাঙ্গার সময় কইল—তোমাদের জানের জন্যে দায়ী রইলাম আমি। কিন্তু তোমরা

যদি দাংগার মতলব কর তো সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। হিন্দু মুসলমান যে কেউ দাংগা করলে তাকে সহজে ছাড়ব না।

বিজয়ের মত একটা ভাঙা ঘরের ছোকরার এই আকস্মিক প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে অসহ্য। যদি গুণীবাবু হ'ত তবে সে তাহা সহ্য করত। হাঁ, হাজার হলেও বড় মাছের কাঁটা। লাখোপতির ঘরের ছেলে।

এখানকার এই বিচিত্র জটিল অবস্থার সুযোগ কপিলদেব যোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কলকাতা থেকে দলের অন্যতম মুসলমান নেতা হামিদকে এখানে নিয়ে এসেছিল গোপনে। হামিদ এখানকারই লোক। সেই কোন্ পনের ষোল বৎসর বয়সে এখান থেকে কলকাতা গিয়েছিল জাহাজের জাহাজী হতে। সেখানে বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে নেতা মহম্মদ সাহেবের সংস্পর্শে আসে। তাঁর কাছে থেকে লেখাপড়া শিখে হামিদ এখন মস্ত নেতা। হামিদ এখানে এসে অবস্থাটাকে আরও অনুকূল করে দিয়ে গিয়েছে।

কপিলদেব তাই এখানে এসে চেপে বসেছে।

একটা পরিকল্পনা তার আছে। এখান থেকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবে। দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলেছে। তেলেঙ্গানা চলছে। বাঙলায় দক্ষিণ বঙ্গে শুরু হয়েছে। বাঁকুড়ায় সোণামুখীতে শুরু হয়েছে। একটা জঙ্গলের মধ্যে তাদের সে আড্ডাও সে দেখে এসেছে। সেই দেখেই এখানকার পরিকল্পনা তার আরও দৃঢ় হয়েছে। দলের গঠন চলছে।।

রমাকে এনে রেখেছিল—ঘনশ্যাম ডাক্তারের ডান হাত অক্ষয় সরকারের ঘরে। সে নিজে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। সুকুর এবং মামুদ এরাও জেলার এলাকার মুসলমান গ্রামে রয়েছে। মামুদের বন্ধুবান্ধব এখানে কয়েকজনই আছে। হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। তাদের মধ্যে যোগাযোগ করছে।

সেদিন মেদিনীপুরের খবর নিয়ে এল একজন কর্মী। সে এখানেই কিছু-দিন আত্মগোপন করে থাকবে। সেখানে এখন পুলিস ক্যাম্প বসেছে। তমলুক থানায় ২নং ইউনিয়নে অশ্বিনী চক্রবর্তী খুন হয়েছে। হৃষীকেশ চক্রবর্তীকে দিনের বেলা কুড়ুল আর কোদাল দিয়ে কাটা হয়েছে। ভীমকাটা গ্রামের বুড়ো কংগ্রেস সভাপতি খুন হয়েছে। আরও অনেক হিসেব সে দিলে।

রমা স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিল।

সে ওই কুড়ুল এবং কোদাল দিয়ে হত্যার বর্ণনা শুনতে শুনতে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিল।

—কি হ'ল?

কপিলদেব বসে শুনছিল—মুখে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল। কল্পনায় সে দেখছিল—গোটা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলেছে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা—জ্বলছে।

তারপর সেই ভস্মের উর্বরতায় উর্বর দেশে শস্যশ্যামলতা ফুটে উঠছে।

বিরাট পৃথিবীব্যাপী এক মহান দেশ। বাধাবন্ধনহীন জীবন। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে বিমুক্ত জীবন। কুসংস্কার পূজার ন্যক্কারজনক প্রবৃত্তি থেকে মোহ-মুক্তি। ভবিতব্যতা অদৃষ্টবাদের জুজুর ভয় থেকে নির্ভয় উল্লাসময় জীবন!

সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা ইন্দুরের মত গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাতেও বাঁচবে না। গণআক্রোশের সর্বদাহী বহ্ন্যুল্লাস থেকে তোমাদের পরিত্রাণ নাই।

এরই মধ্যে রমার চীৎকারে বাধা পেয়ে ভুরু কুঁচকে কপিলদেব বললে—কি হ'ল?

রমা উঠে দাঁড়াল। বললে—এই তোমাদের যুদ্ধ? এমনি নৃশংসভাবে হত্যার নাম যুদ্ধ?

—হ্যাঁ যুদ্ধ। বস।

—না। বসব না আমি। আমি চলে যাব।

—চলে যাবে? হেসে উঠল কপিল-দেব। সে দিনও একবার এই কথা বলে-ছিলে। মনে আছে?

—আছে।

—তবে?

হঠাৎ রমা তার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল—আমাকে ছেড়ে দাও—মুক্তি দাও আমাকে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি।

কপিলদেব কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ইঙ্গিতে সকলকে যেতে বললো। সকলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কপিলদেব রমার পিঠে এলানো চুলের রাশির উপর কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—ছিঃ! ওঠ!

—না, আমাকে মুক্তি দাও তুমি—আমাকে মুক্তি দাও।

—একটা কি দুটো অত্যাচারী মানুষের মৃত্যু—

—এই নিষ্ঠুর মৃত্যু—

—হ্যাঁ নিষ্ঠুর তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু রমা সে নিষ্ঠুরতা কি তারা যে নিষ্ঠুরতায় দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে—তার থেকেও বেশী?

—হ্যাঁ বেশী।

হা-হা করে হেসে উঠল কপিলদেব।

—তুমি এমন ক'রে হেস না। মুহূর্তে উঠে বসল রমা। চোখ তার জ্বলে উঠল।

কপিলদেবেরও চোখ দুটি ছোট হয়ে এল। বললে—তোমার মনের ভিতরটা আমি জানি রমা। কথাটা খুনের নিষ্ঠুরতা নয়। আসল কথা তোমার ভালবাসা। আমি ঠিক বুঝতে পারিনে আসল লক্ষ্যটি কে—তবে উপলক্ষ্য যে প্রমোদ তা আমার অজানা নেই। তুমি প্রমোদকে চিঠি লিখেছিলে—সে চিঠি আমার হাতে। উত্তর না-পেয়ে তুমি অধীর হয়ে পড়েছ। মনের ভিতরটা চীৎকারই করছিল—হঠাৎ এই খুনের কথাটায় সেটা ছুতো ধরে বেরিয়ে এসেছে।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে সে রমার সামনে ধরে হাসতে লাগল।

—তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দাও।

—জান—সে এখন দায় এড়াবার জন্যে আমাদের বিরোধিতা করছে। আমাদের পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর থেকে সে থানায় আনাগোনা করছে, নবীন পালের কেসে সে মামুদের সুক্কুরের বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করে দিচ্ছে?

—আমি তাকে বারণ করব। আমি হলপ করছি, শপথ করছি।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কপিলদেব বললে— ভাল, তুমি তাকে চিঠি লেখ। সে যদি আসে তুমি তার সঙ্গে যাবে। লেখ গাড়ী নিয়ে সে যেন নদীর ধারে—ঘাটের কাছে আসে। তুমি সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

তারপর গাঢ়স্বরে বললে—আমার জীবনে তোমাকে আমি চেয়েছিলাম। আজও চাই। মাথার রুখু চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললে—আমার ধারণা ছিল—তুমিও আমাকে চাইবে। তা তুমি চাইলে না।

হাসলে—বললে—বেশ তাই হোক। আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়েই বা কি করব? বিপ্লবের জ্বলন্ত মশাল নিয়ে যারা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটে—তারা ওই আগুনেই পুড়েও মরে। বিপ্লব সার্থক হবেই কিন্তু আমার জীবন অনিশ্চিত। সুতরাং তাই হোক। তুমি ফিরেই যাও।

রমা অকস্মাৎ কপিলদেবের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—তাও সইব, সইতে পারব। তুমি শুধু এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না। তুমি ওই মামুদ সুক্কুরদের নিয়ে পথ চলো না। প্রেতের সাহায্যে মানুষকে বাঁচানো যায় না।

কপিলদেব তার কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে হেসেই মৃদুস্বরে বললে—এ দেশে তো তা যায় রমা। যে মেয়েদের ছেলে হয়ে পেঁচোয় পেয়ে আঁতুড়ে মরে—তারাই তো যায় পাঁচুঠাকুর-তলায়। দেশে যে গণ্ডায় গণ্ডায় পাঁচু-গোপাল নাম রয়েছে।

রমা তার বুকের মধ্যেই ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে বললে—না, সে আর নেই। নূতন দেশ জাগছে। আজ নূতন জ্ঞানের আলো তার চোখে মুখে। যা কিছু কালো—দ্রুত মিলিয়ে যাবে। তোমাদের আদর্শ সাম্য তাকে অস্বীকার করবে কে? শুধু সত্যকে মেনে নাও, হিংসাকে ছাড়।

—কথাটায় যেন গৌরীবাবুর প্রম্‌টিং শুনতে পাচ্ছি রমা।

—হলেও গৌরীদার কথা নয়। এ ভারতবর্ষের কথা।

—ভারতবর্ষ তো গোষ্পদ রমা, আমি যে পৃথিবীর কথা শুনছি। নাও এখন ছাড়। তোমার আমার পথ এক নয়। তোমাকে ভালবাসি—তাই তোমাকে ছেড়েই দেব। নইলে ছেড়ে দেওয়া তো উচিত নয়। সকলে রাগ করবে। হয় তো—। তা হোক। ছেড়েই দেব তোমাকে। লেখ—তুমি চিঠি লেখ। ঠিক রাত্রি বারোটা, নদীর ঘাটের উপর গাড়ী রেখে—খানিকটা পূব দিকে এগিয়ে আসবে। কোন ভয় নেই। তোমাকে একলা রেখে আমরা চলে আসব। তবু যদি তার ভয় হয়—তবে সে লোক নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু পুলিশ হলে—গুলি খেয়ে মরবে। তুমি চিঠি লিখে রাখ। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চললাম আমি। আজ অনেকগুলি গাড়ী পার হবে।

এ জেলা থেকে ও জেলায় গোপনে ধান চালানের কারবারে সাহায্য করা এখন কপিলদেবের অন্যতম কার্যপদ্ধতি। এতে দেশে খাদ্যাভাব আরও বেড়ে উঠবে। তা ছাড়া সাধারণ লোকের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। এখান থেকে দশমাইল দূরে—একটা রাস্তায় ধান যায় আসে। কপিলদেব সুক্কুর মামুদ নিত্য রাত্রে বিশ মাইল হাঁটে। এরই মধ্যে একদিন এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের লোকেদের দুটো রাইফেলও চুরি করেছে তারা।

হতভাগ্য প্রমোদ রমার চিঠি পেয়ে আত্মসম্বরণ করতে পারেনি। চতুর প্রমোদ চারজন দাঙ্গাবাজ লাঠিয়ালও সঙ্গে এনে নিজেকে নিরাপদই ভেবেছিল। কিন্তু কপিলদেব আরও চতুর। দাঙ্গাবাজ লাঠিয়ালেরা মামুদেরই চ্যালা। চিঠি নিয়ে যে লোক প্রমোদের কাছে গিয়েছিল —সেই এদের সঙ্গেও কথা বলে এসেছিল।

প্রমোদকে সরাবার কথা কপিলদেব ভাবছিল। সেদিন রমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কল্পনাটা মাথায় এসেছিল। এবং সেই কল্পনাকে সে অত্যন্ত সুচারু কৌশলে কাজে পরিণত করলে। রমাকে সঙ্গে নিয়ে সে একাই এসেছিল। মামুদেরা আগে থেকেই এসে লুকিয়েছিল। রমা জানত না।

লাঠিয়ালদের নিয়ে প্রমোদ এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মামুদেরা বেরিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রমোদের লাঠিয়ালেরা সরে দাঁড়িয়েছে। সুক্কুরের হাতে ছিল একটা কুড়ুল। সেই কুড়ুল তার মাথায় বসিয়ে দিলে।

হতভাগ্য প্রমোদ!

চীৎকার করে উঠল রমা। কপিলদেব বললে—চীৎকার করো না। বিপ্লব অমনি করেই আসে। এ তো শুরু।

—চল এখন। মামুদ, প্রমোদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের বল—ফিরে গেলে ওরা ফ্যাসাদে পড়বে। পুলিশ ওদেরই ধরবে সর্বাগ্রে।

রমা চীৎকার করে উঠল—না—আমি যাব না।

—না গেলে—পুলিশ তোমাকে ধরবে রমা। তোমার চিঠিতেই প্রমোদ এসেছিল। দায়টা তোমার কম না। (ক্রমশঃ)

রঞ্জন

আমাদের অনেকেরই অপর নাম গড়াচর। আমরা ডুচও চাই, টামাকও চাই।

সমরসেট ম'ম অবশ্য বারবার বলেন যে, তাঁর লেখার (এবং সকল সাহিত্যের) এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ দেয়া, কিন্তু তাঁরও রচনায় এমন প্রচ্ছন্ন অভিযোগের অন্ত নেই যে, তাঁকে কেউ সুধী বলে সম্মান দিল না। বিপরীত দিকের দৃষ্টান্ত সেই অপঠিত লেখকগণ যাঁদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, 'সাধারণ পাঠক ছেলে-মেয়ে-মেলানো গল্প ছাড়া আর কিছুর রসগ্রহণে অক্ষম।' সার্থক লেখক তাহলে কাকে বলব? যিনি শুধুই সরস এবং লোকপ্রিয়? না, যিনি সারবান এবং নীরস, তাই অল্পপ্রিয়? আমি প্রশ্নটার উত্তর দেব না, কেননা এই বিভাজনটাই আমি ভ্রান্ত বলে মনে করি। সরসতা আর সারবত্তার সম্বন্ধ আমার কাছে অহিনকুলের সম্বন্ধ নয়।

তবু যে রচনার প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ-দান নয়, শিক্ষাদান, তা অতীব সুপাঠ্য হলেও তাকে সাহিত্য বলে মানতে আমার বাধে। তাই, মনে আছে, বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে যখন সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল তখন আমি একটি বেতার বক্তৃতায় তার প্রতিবাদ করেছিলুম। বলেছিলুম, রাসেলের অনেক রচনা সাহিত্য, কিন্তু যেহেতু সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি সাহিত্যপুরস্কারে অনধিকারী। আজো এ মতটা পুরোপুরি পরিহার করিনি।

*

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সাহিত্যিক চিত্তে বিপরীত একটা প্রবৃত্তি লক্ষ্য করে বিব্রত হয়েছি। সেটাকেই গদাধরী প্রবৃত্তি বলছিলুম। যখন দেখি কোনো ভাবুক সাহিত্যের কোনো মনোহারী মাধ্যমে তাঁর মৌলিক চিন্তা প্রকাশ করেন বলে লেখক হিসাবে পাঠকদের কাছে আদৃত হন কিন্তু জ্ঞানী হিসাবে পণ্ডিতদের মহলে অবজ্ঞাত থাকেন, তখন সেই হিং-টিং-ছট্-মার্কা পাঠশালার গুরুমশাইদের এই বলে গাল দেবার লোভ দমন করতে পারিনে যে, লেখকটির একমাত্র অপরাধ তিনি অনুস্বার-বিসর্গের স্তূপ জড়ো করেননি, শক্ত কথা সুন্দর ও সরস ভাষায় বলেছেন। অর্থাৎ, একান্ত স্বার্থপরের মতো, সাহিত্যিক প্রসঙ্গত ভাবুক হলে তাঁর জন্যে ভাবুকের পুরো সম্মান দাবী করি, অথচ ভাবুক প্রসঙ্গত সাহিত্যিক হলে তাঁকে সাহিত্যিকের ষোলো আনা সম্মান দিতে কার্পণ্য করি।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, বার্নার্ড শ'-র জন্যে দার্শনিকের স্বীকৃতি চাই। কেননা 'ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান' বা 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা' নাটকে তিনি জীবন সম্বন্ধে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও মত প্রকাশ করেছেন যা নীরস গদ্যে বিবৃত হলে অনায়াসে দর্শন বলে পরিগণিত হোতো। আবার বার্ট্রাণ্ড রাসেল যখন মুখ্যত দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করতে বসে অজ্ঞাতসারে সাহিত্য সৃষ্টি করে বসেন তখন তাই নিয়ে তুষ্ট থাকিনে। প্রশ্ন তুলি সজ্ঞান উদ্দেশ্যের। জিজ্ঞাসা করি, রাসেল কি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, না জ্ঞান বিতরণ করতে? দার্শনিকদের বেলায় এটা অত্যন্ত গর্হিত রসহীনতা বলে মনে করি যে, তাঁরা সাহিত্যের বাসায় দর্শনের জন্ম হলে সে শিশুকে অন্ত্যজ বলে অবজ্ঞা করেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এই অযৌক্তিক দাবীটাও করি যে, দর্শনের ঘরে সাহিত্যের আকস্মিক অর্থাৎ অপূর্বপরিকল্পিত জন্ম হলে সাহিত্যে তার পাংক্তেয় হবার অধিকার নেই।

*

তাহলে কি লেখকের উদ্দেশ্যই শুধু লেখার শ্রেণী-নির্দেশ করবে? অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টি রচনার মূল উদ্দেশ্য হলে তবেই তা সাহিত্য, আর অসাহিত্যিক অভিসন্ধি থাকলে তা সুরচিত হলেও সাহিত্য নয়? রাসেলের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কালে প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, না। আজ এতটা নিঃসন্দেহ নই। কেননা যদি ধরেও নিই যে, সাহিত্যের একমাত্র সঙ্গত উদ্দেশ্য আনন্দবিধান তাহলেও প্রশ্নটার সমাধান হয় না। আনন্দেরই যে রূপ-পরিবর্তন হচ্ছে দিনে দিনে। কালকের রসিকতা আজ রুচিহীন মনে হয়। গত পরশুর চাঁদ-চকোর নিয়ে হায়-হায় আজ

অসহ্য গলিত ভাবালুতা বলে প্রত্যাখ্যাত। তারও আগের দিনের ঈশ্বর নিয়ে রামপ্রসাদী ভজনা বা পরমপুরুষের অতি-সরলতা আজ ক'টি শিক্ষিত মনে অনুজুগী সাড়া পাবে? বর্তমানবিরক্ত কেউ যদি বলেন, ঈশ্বর গুপ্তের পুনরাবির্ভাব চাই, কবিতাও আবার কাস্তে আর কীর্কিগার্ড ছেড়ে চাঁদ-চকোরে ফিরে না গেলে আত্মস্থ হবে না এবং আধুনিক মন আবার বিশ্বাসের কোলে না ফিরলে বর্তমান বিভ্রান্তি বিদায় নেবে না—তাহলে তা নিয়ে বিবাদ করবারও দরকার নেই। ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন বলে কোনো বস্তু নেই, তাই তাঁদের ব্যবস্থা এমন ওষুধ যা খেলে রোগ হয়তো সারলেও সারতে পারে কিন্তু রোগী যে তা সেবন করবে না তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সাহারার রোগীকে হাইড্রোপ্যাথি বুঝিয়ে কী লাভ? ব্রডওয়ের মেয়েকে রান্নাঘরে ফিরতে বলা কি অরণ্যে কান্না নয়?

*

নন্দনশাস্ত্রের সহস্র সূত্র আবৃত্তি করলেও আজকের ঔপন্যাসিক তাই কিছুতেই তাঁর সমাজচেতনা পুরোপুরি পরিহার করতে পারবেন না। কবির পক্ষেও আজ তাই শুধুমাত্র চন্দ্রাহত হয়ে উচ্ছ্বাসসর্বস্ব কাব্যরচনা সম্ভব নয়। বর্তমান সাহিত্যে তাই প্রেরণা সব সৃষ্টির জননী হলেও বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণকে ধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতেই হয়। অর্থাৎ ভাবুকের পক্ষে সাহিত্যিক হওয়া যদিও শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয়, সাহিত্যিকের পক্ষে আজ যৎকিঞ্চিৎ ভাবুক হওয়া প্রায় অপরিহার্য। অর্থাৎ বার্ট্রান্ড রাসেলের মত পন্ডিত ব্যক্তি যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহ'লে তাঁকে সাদরে সাহিত্যিক বলে গ্রহণ করলে সাহিত্যের শুচিতা নষ্ট হবে না।

আশি বছর বয়সে রাসেল ঠিক সেই কাজটি করেছেন। পাঁচটি ছোটো গল্পের একটি সংকলন* প্রকাশ করেছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দদান: প্রতিটি কাহিনীর বর্ণনায় দার্শনিক রচনার স্বচ্ছতা ও দীপ্তি বর্তমান।

গল্পগুলি কেমন? প্রকাশক বলছেন এগুলি আর কারো লেখা হ'লেও তাঁরা বইটি প্রকাশ করতেন। হবে। কিন্তু আমি পড়তুম না। এবং জানতুম কী হারিয়েছি। ভয়ানক কিছু নয়।

*Satan in the Suburbs by Bertrand Russell (The Bodley Head, 9s. 6d.).

বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

'ফসল ফলাও' অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে 'ঘাস গজাও' অভিযানও বোধহয় শুরু হবে। পেন্সিলভেনিয়ার স্টেট্ কলেজে সম্প্রতি কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণের যে সমিতি মিলিত হয়েছিল, তাতে জগতে ঘাস ও শুঁটি জাতীয় গাছের উৎপন্ন বৃদ্ধি করা সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। এই সমিতি ঘাসের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঘাস গরু-শাগল-ঘোড়া ইত্যাদি পশুর খাদ্য—এ ছাড়া ঘাসের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে ঘাস পশু-খাদ্য হলেও, অপ্রত্যক্ষভাবে এই ঘাস মানুষের দেহের পুষ্টি সাধন করছে। এই খবরটা একরকম জানা নেই বলেই পৃথিবীর ভূখণ্ডের অর্ধেকটা ঘাসে ঢাকা জমি থাকা সত্ত্বেও মানুষের এই খাদ্যাভাবের যুগে এই ঘাসের জমিগুলো যথাযথভাবে খাদ্য বৃদ্ধির কাজে লাগানো হয়নি। এইসব কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, জগৎজোড়া এই বুভুক্ষা নিবারণ করতে হলে পৃথিবীর বুকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও শুঁটি জাতীয় গাছ জন্মান দরকার। জগতে ঘাস প্রচুর উৎপন্ন হলে গরু-ছাগলের পুষ্টিসাধন হবে ফলে মনুষ্যকুল এদের দুধ অমিত পরিমাণে পেতে পারে। এ ছাড়া পশুকুলের পুষ্টিসাধন হলে মাংস জাতীয় আমিষ খাদ্যও বৃদ্ধি পাবে। এই ধরণের শুঁটি জাতীয় গাছ ও ঘাস যে-কোনও পতিত জমিতে প্রচুর জন্মান যায়। এতে প্রচুর ঘাস তো পাওয়া যায়ই উপরন্তু এই পতিত জমিগুলির উন্নতিসাধন হয়। এই ঘাসের চাষ করার পর ঐ পতিত জমিতে অন্যান্য শস্যও ভালোভাবে জন্মাতে পারে।

*

সুইস ঘড়ি নির্মাতারা এক অভিনব ঘড়ি তৈরী করেছেন। এ ঘড়ি শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হবে। ঘড়ির নাম দেওয়া হয়েছে ফোটো-ইলেকট্রিক ক্লক। গাছ যেমন আলো বিনা বাঁচে না, এই ঘড়িও তেমনি আলো বিনা চলে না। আসল অথবা নকল, যে কোন রকমের সাধারণ জোরওয়ালা আলো ঘণ্টা চারেক পেলেই এই ঘড়ি চব্বিশ ঘণ্টা চলে, আর মেইন স্প্রিংএর চাপ সর্বদা সমান থাকায় 'করেক্ট টাইম' সব সময়েই জানিয়ে দেয়।

অন্য যে কোনো ঘড়ির সঙ্গে এর পার্থক্য ধরা পড়ে না, কেবল নীচে তিনটি খুপ্রি আছে, যার মধ্যে দিয়ে আলো প্রবেশ করে তিনটি ফোটো—ইলেক্ট্রিক সেলকে আঘাত করে। এরা আলোর
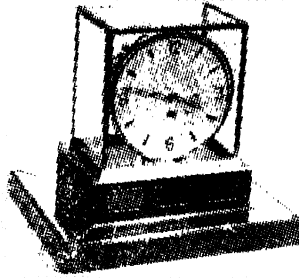
ফোটো-ইলেক্ট্রিক ঘড়ি

রশ্মিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে; যে বৈদ্যুতিক শক্তি একটি ছোট্ট মোটরকে চালু করে। এই মোটর আবার মেইন স্প্রিংকে ঘুরিয়ে দম দেওয়ার কাজটি করে দেয়। যাঁরা আপন ভোলা লোক; ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে থাকে না, তাঁদের পক্ষে এই ঘড়ি খুব সুবিধাজনক বলে মনে হবে। তবে ভুলে যদি তাঁরা ঘড়িটিকে অন্ধকারে রাখেন, তাহলেই ঘড়ি বিকল হয়ে যাবে।

*

ক্যান্সার রোগ নিয়ে যে গবেষণা চলছে, একথা কিছু নতুন নয়, এ পর্যন্ত কোনও কিছুই বিশেষ কার্যকরী হয়েছে বলে ধরা যায় না, কারণ রোগ নির্ণয় করা যায় এত দেরিতে যে, কোনও ব্যবস্থাই কাজে লাগে না। গবেষণা অবশ্য অনেক দিক থেকেই চালান হচ্ছে। বর্তমানে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গবেষণা চালানর ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৯৫০ সালে 'ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মেডিক্যাল সায়েন্সের' একটি সম্মিলনী বসে, তাতে তাঁরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁদের মতে স্থান-বিশেষে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। এঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে স্থানের জমিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকে, সেই জমিতে উৎপন্ন সব্জিপাতি খেয়ে স্থানীয় লোকেরা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়। তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, ঐসব জৈব পদার্থবহুল জমিতে উৎপন্ন সব্জিগুলি কার্সিনোজেন (Carcinogen) বহুল হয় এবং এই কার্সিনোজেনই গাছেদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের জন্ম দেয়, সেই কারণেই এই সব্জি খাওয়ার দরুণ মানুষের মধ্যেও এ রোগ দেখা দেয়। এরা আরও বলেন যে, এই সব সব্জির পুষ্টিসাধন ক্ষমতা হয়তো কম থাকে, সেইজন্যই এই সব্জি খেলে চট্ করে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়। এরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, বিশ বছর আগে যে ধরণের ক্যান্সার রোগ হতো আজকাল সেরকম হয় না, এখন এ রোগ ফুসফুসে বেশি আক্রমণ করে। অবশ্য রোগের প্রকোপ সর্বত্রই বেশি হয়েছে, তবে শহর ও শহরতলীতেই এর প্রকোপ বেশি—এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে এরা অনেক কারণই দেখিয়েছেন, তাঁরা বলেন, শহুরে লোকেরা বেশি ধূমপান করে বলেই ফুসফুসে এই রোগ হয়; শহরের কলকারখানার ধোঁয়ার দরুণও এ রোগ হতে পারে, তাছাড়া পেট্রলচালিত মোটরের ধোঁয়ায়ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা এ ধরণের রোগে খুব বেশি আক্রান্ত হয়, কিন্তু বাইরে থেকে এসে যাঁরা ঐ স্থানে বসবাস করেন, তাঁদের এ রোগ হয় না। সুতরাং এদের খাদ্য থেকেই এ রোগ উৎপন্ন হয়, একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ট্রামে-বাসে

জাতিস্মর মহিলা-বর্ণিত স্বর্গের কাহিনী পাঠ করিয়া জনৈক কৌতূহলী শ্রোতা আমাদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। মনে হইল সেই সব প্রশ্নের সদুত্তরের উপরই তাঁর স্বর্গারোহণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা স্থিরীকৃত হইবে। সুস্পষ্ট কারণে তাঁর প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহে আমরা অপারগ এবং অবান্তর বোধে তাঁর সমস্ত প্রশ্নও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না। সাধারণের গোচরার্থে তার একটিমাত্র প্রশ্নই শুধু উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

স্বর্গে ট্রামে-বাসে লেডিসদের আগমনে লেডিস সীট ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা বলবৎ আছে কি? টীকা নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন।

* * *

উদর পূর্তি আর সম্ভব হইতেছে না বলিয়া কোথায় একদল সাধু নাকি জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—"তাঁরা সাধু বলেই জীবনধারণের এই সোজা পথটা এত সহজে তাদের চোখে পড়ল"—মন্তব্য করেন এক সহযাত্রী।

* * *

কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে কচ্ছপের ডিম নাকি একটি অতি উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য। —"তবু যা হোক্ এটা সংগ্রহ করা হয়ত অসম্ভব হবে না; এর বদলে ঘোড়ার ডিম বললেই হয়েছিল আর কি!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মদ্যপান বর্জন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও মদ্য আমদানীর পরিমাণের উপর কোনই প্রতিক্রিয়া হইতেছে না বলিয়া একটি সরকারী বিবৃতি পাঠ করিলাম। '—"কিন্তু শুধু আমদানীতে আর আপত্তি করার কী আছে, থাচ্ছে না তো কেউ"—যিনি মন্তব্য করিলেন তাকে দেখিতে পাইলাম না।

* * *

পশ্চিমবঙ্গকে ১৯৬০ সাল নাগাত আফিংশূন্য করার একটি পরিকল্পনা নাকি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।—"গুলিখুরী কোন্ সাল নাগাত শেষ করা হবে তা অবশ্য এখনো জানা যায়নি !!"

* * *

পাকিস্তান হইতে একদল মুসলমান ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। তাদের নিকট জানা গেল যে, এমন দিন যায় না যে দিন লাহোরে বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চলে জাফরুল্লা খাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ান না হয়। —"কিন্তু তার বদলে কুশপুত্তলিকা কবর দিলেই হয়, খাঁ সাহেবের মনে দ্বিজাতিতত্ত্বের তত্ত্বটা আর একবার নূতন করে নাড়া দিয়ে যেতো।"

* * *

খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াই সম্প্রতি এক বিবৃতিতে কোন্ প্রদেশে কি পারমাণ দুগ্ধ ব্যবহৃত হয় তার একটা তালিকা দিয়াছেন। —"দুধে

মেশানো জলের পরিমাণ কোন্ প্রদেশে কত সে কথার উল্লেখ নেই বলে হিসেবটা ঠিক্ মেলানো সম্ভব হচ্ছে না"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি ভোজ সভায় মিঃ চার্চিল নাকি টিটোকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যুদ্ধ যদি বাধেই তাহা হইলে বৃটেন তাঁর সঙ্গে একসাথে যুদ্ধ করিবে। —"শুনলাম টিটো বলেছেন যে, এইটুকুই

আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আশ্বাসটা পানভোজনের আগে দেওয়া হয়েছে না পরে দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে সংবাদদাতা নীরব. সুতরাং...

* * *

জাপান সরকার নাকি ভারত সরকারকে ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত যুদ্ধে মৃত জাপানী সৈন্যদের অস্থি প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। —"কিন্তু তা না করে হাড় ক'খানা গঙ্গায় দেওয়ার প্রস্তাব করলে ভালো হতো না কি?"

* * *

লণ্ডনে রেজিন্যাল কৃষ্টি নামক জনৈক পঞ্চান্ন বৎসরের একটি কেরাণীকে পুলিশ সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, লোকটি যে-বাড়ীতে বাস করিত সেখানে ছয়টি মৃত রমণীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে। অনুমান করা হয় কৃষ্টিই তাহাদিগকে খুন করিয়াছে, এদের মধ্যে একটি তার স্ত্রী। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে নাকি লোকটির খুনের নেশা জাগে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, চন্দ্রালোকিত রাতে যখন চকোরেরা লারে লাপ্পা ধরেন তখন অনেকের মাথাতেই খুন চেপে যায়, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন !!"

রম্য রচনা

বিচিত্র উপল—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রকাশক—বঙ্গ ভারতী গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, পোঃ মহিষরেখা, জেলা হাওড়া। মূল্য—চার টাকা।

এই গ্রন্থেরই প্রথম প্রবন্ধের মধ্যে এক জায়গায় লেখক বলিয়া ফেলিয়াছেন—"প্র-না-বি'র আড়ালে প্রমথনাথ বিশী অন্তর্হিত।" এই 'ফ্যাক্‌ট'টা সম্প্রতি প্রমথবাবুর অন্যান্য লেখার মধ্য হইতেও উঁকি মারিতেছে, তাঁহার ধারণা তাঁহার বিদূষক রূপটাই বুঝি পাঠক সাধারণের কাছে প্রিয় ও পরিচিত। কিন্তু আমাদের কথার কোন মূল্য যদি তাঁহার কাছে থাকে (সম্ভবত নাই—বায়ুগ্রস্ত লোক বিশেষত প্র-না-বি'র মত নিজের কথা ছাড়া তাহারও কোন কথার মূল্য দেন না) ত এটুকু তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পারেন—প্র-না-বি'র নাম পর্যন্ত যখন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, প্রমথনাথ বিশী তখনও নিজ-অধিকারে বাঙ্গালী পাঠক সমাজে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি দখল করিয়া থাকিবেন। পাঠক সাধারণকে তাঁহার অত অবজ্ঞা কেন? তাহারা যাহার যতটুকু মূল্য ঠিকই একদিন কড়াক্রান্তি বুঝাইয়া দিবে। চিন্তাশীল প্রমথবাবু কবি প্রমথবাবু, সমালোচক প্রমথবাবু—বিদূষক প্র-না-বি'র অনেক উর্ধ্বে আজই বসিয়া আছেন, স্বীয় আসনের দিকে তাকান নাই বলিয়াই টের পান নাই। বাঙ্গালীর জীবন-সন্ধ্যা, রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ, নেহরু—নীতি ও ব্যক্তিত্ব, মাইকেল মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের নরনারী—প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক যদি না বাঁচেন, কোপবতী ও পদ্মার কথাসাহিত্যিক যদি না বাঁচেন, প্রাচীন (?) অসমীয়া ও প্রাচীন পারসিক কবিতার কবি যদি না বাঁচেন—ত প্র-না-বি বাঁচিবে? এমন ধারণা তাঁহার কী করিয়া হইল? ডিকেনস্ একদা পিক্‌উইক্ পেপারস্-এর লেখক হিসাবেই সাধারণ্যে পরিচিত হন্—কিন্তু তাই বলিয়া আজ কি লোকে এক কথায় তাঁহাকে এ টেল অফ টু সিটীজ্, ডেভিড্ কপারফীল্ড বা ব্লিক হাউসের লেখক বলিয়াই চিনিতে পারে না?

আমরা ত জানি প্রবন্ধ লেখক প্রমথনাথ বিশীই সবচেয়ে বড়। আর সে ধারণা—বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িয়া আরও বদ্ধমূল হইল। অবশ্য চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ বলিতে যা বুঝি—তেমন লম্বা চওড়া ও ফুটনোট্ কণ্টকাকীর্ণ প্রবন্ধ এগুলি নয়। বরং ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ে চেষ্টা করিলে ফেলা যায়। কিন্তু তাও ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় হইবে না। এগুলি এক নূতন ধরণের জিনিস। বেলে-লেৎরস্ হইলেও হইতে পারে। তবে আমরা ইহার কোন বিশেষ লেবেল দিতে চাই না। সময়ে সময়ে লেখকের মনে যখন যে-কথাটা উদিত হইয়াছে সেই কথার উপরই দু'চার কলম লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে ইহাতে যেমন

গুরুগম্ভীর কথাও আছে, তেমনি ঠাট্টা-তামাসারও অভাব নাই। ফলে পড়িতেও ভাল লাগে আবার পড়া শেষ হইলেও কতকগুলি কথার রেশ মনে থাকিয়া যায়। এক কথায় 'আমার পাঠক' ও 'হাঁস' প্রবন্ধও যেমন আছে—তেমনি 'গোরুর গাড়ী', 'কবির পদ্মা', 'সূর্যোদয়ের কাব্য', 'উজ্জয়িনীর গলি', 'ফুলের আহ্বান',' শকুন্তলার অঙ্গুলি' প্রভৃতি প্রবন্ধও আছে। বরং সত্য কথা বলিতে কি এ বইয়ে কাব্যধর্মী ও চিন্তাধর্মী রচনাই বেশি—আর এই শ্রেণীর রচনাতেই যে প্রমথবাবুর হাত সবচেয়ে বেশি খোলে, তাহা কে না জানেন? এইখানে প্র-না-বির সাধ্য নাই যে তাঁহার সহিত পাল্লা দেয়। আর এ কথার জন্য বেশিদূরেই বা যাইতে হইবে কেন? প্রমথবাবুর প্রবন্ধ পুস্তকগুলির জনপ্রিয়তা কি প্র-না-বি লক্ষ্য করেন নাই।

কিন্তু এসব অবান্তর কথা। আসল কথাটা হইতেছে এই যে 'বিচিত্র উপল' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গোয়েন্দা কাহিনীর রুদ্ধ নিঃশ্বাস আকর্ষণ নাই, হালকা হাসির বিশেষ চটক নাই—নাই গল্প উপন্যাসের মায়া—তাড়াহুড়া করিয়া পড়িবার জিনিস ইহা নয়। অবসর সময়ে একটু একটু করিয়া তারিফ করিয়া করিয়া পড়িবার মত বই এটি। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ইহার "মন্থর তালের সঙ্গে বাঁশীর সুর মিশিয়া" পাঠক-চিত্তের নীরন্ধ্র অনবসরতার "রৌদ্রদীপ্ত আকাশে সৌন্দর্যের আলোকলতা বয়ন করিয়া চলিয়াছে"। অবসরহীন মানুষের কর্মমুখর দিনগুলি ছাড়াও এ জগতে পাইবার ও কামনা করিবার মত কিছু আছে। এ বইয়ের প্রবন্ধগুলি যেন পাঠকচিত্তকে সেইসব দুর্লভ বস্তুরই আভাস দেয়—"দ্বিপ্রহরের রৌদ্রাভিষেক অতিক্রম করিয়া কোন্ সন্ধ্যায় স্বর্গতোরণের অভ্যন্তর দিয়া নক্ষত্রভাস্বর নিশীথের অভিমুখে" বিশ্রাম ও কল্পনার রাজ্যে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়।

এই বইটি প্রকাশ করার জন্য শুধু শ্রদ্ধা বা বিস্ময় নয় আমরা ইহার প্রকাশককে কৃতজ্ঞতাও জানাইতেছি।

ছাপা, বাঁধাই ও অঙ্গসজ্জা প্রশংসার যোগ্য। ২১৫।৫২

চিত্র-নাট্য

পথ বেঁধে দিল—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—দুই টাকা আট আনা।

শক্তিশালী লেখকের যে কোন জাতীয় রচনার মাধ্যমে পাঠকমনকে আকৃষ্ট করার শক্তি সহজ-করায়ত্ব। তার একমাত্র কারণ কোন তন্ত্রীতে আঘাত করলে পাঠকের মনেও তার অনুরণন ওঠে জাত-শিল্পীদের সে রহস্য সুপরিজ্ঞাত।

শরদিন্দুবাবু সার্থক নামা লিখিয়ে। গল্প, উপন্যাস, নাটক সব কিছুই তাঁর যাদু-দণ্ডের স্পর্শে প্রাণবন্ত, রসোত্তীর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থটির কাহিনী চিত্র-নাট্যের মাধ্যমে রচিত। সিনেমার রূপোলী পর্দায় বেশ কিছুদিন আগে এই কাহিনীটি দর্শকবৃন্দের অভিনন্দন লাভেও সমর্থ হ'য়েছিলো। সিনেমা সাফল্যের কথা বাদ দিয়ে সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও গ্রন্থটি কাহিনীর সরসতায়, চমকপ্রদ ঘটনা-সংস্থাপনে, কৌতুকাবহ সংলাপে পাঠক মনের ওপর গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম। ইংরাজী প্রবাদ অনুসারে পুডিংয়ের গুণ বিচার যদি আস্বাদ গ্রহণেই হয়, তাহলেও স্বল্পকালের মধ্যে পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ হওয়া জনপ্রিয়তার চরমতম মাপকাঠি ব'লেই আমাদের ধারণা।

উপসংহারে বিশ্বকবির 'অভিসার' কবিতার কাহিনীটি গ্রন্থকার চিত্রনাট্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু মূল কাহিনীটি যে রবীন্দ্রনাথের, এ কথার উল্লেখ কোথাও নেই। না ভূমিকায়, না পরিশেষে। চেনা বামুনের পৈতার অপ্রয়োজনীয়তার ব্যাপার হ'লে আমাদের বলার কিছু নেই, কিন্তু তবু মনে হয় সামান্য একটু স্বীকৃতি থাকলেই যেন শোভন হ'তো। উপগুপ্ত বাসবদত্তার কাহিনী হয়তো বৌদ্ধযুগের, কিন্তু চিত্রনাট্যটি রচিত হ'য়েছে রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতাটি অবলম্বন ক'রে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট চিত্রণ প্রথম শ্রেণীর। ৭৪।৫৩

উপন্যাস

রূপান্তর—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, রায় কুটির, ৩-৬ ক্যালকাটা রোড, পাতুলিয়া (বন্দীপুর), ২৪ পরগণা। দেড় টাকা।

লেখকের হয়তো উদ্দেশ্য ছিল কোন উপন্যাসের মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথা অথবা অথনৈতিক বৈষম্যের অন্ধকার দিকটিতে আলোকসম্পাত করা। আপ্রাণ চেষ্টারও অন্ত নেই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পর পর গোটাকতক মৃত্যুও ঘটান হয়েছে। তবে কেন যে এতসব করতেই হলো সেইটুকুও কেবল বই পড়ে বোঝা গেল না। এক একটা নতুন চারত্র নিজের ইচ্ছেমত রঙ্গভূমিতে ঢুকে পড়ছে, পাটটুকু বলে হঠাৎই আবার প্রস্থান করছে। কোন কারণ নেই, হেতুতো নেই। আর গল্প তো নেইই। কেবল ভালো ভালো কিছু হিতসাধনী বক্তৃতা আছে। সবটা পড়েও বইখানি গল্প না প্রবন্ধ না রহস্য-রোমাঞ্চ কিছু বোধগম্য হলো না। ৭২।৫৩

ছোট গল্প

সেরা গল্প—প্রকাশক—দীপজ্যোতি প্রকাশনী, ৯৩।১এ, বোবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—দু টাকা বারো আনা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধতম শাখা ছোট গল্প হ'লেও, বইয়ের বাজারে গল্প-সংকলনের চাহিদা অতি সামান্য। অতিখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্পও শ্রেষ্ঠ গল্পের স্তবকে মুড়ে পরিবেশন করতে হয়। তারও কাটতি পরিমিত।

সেই কারণেই স্বল্পখ্যাত লেখকদের গল্প-সংকলন প্রকাশ করার প্রচেষ্টাকে দুঃসাহসিক অভিযানের নামান্তর ব'লেই মনে হয়। বাণিজ্যিক সাফল্যের আভাষ দেওয়ার কাজ সমালোচকের নয়, আর সে সাফল্যই যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের মাপকাঠি এমন অযৌক্তিক কথাও আমরা বলবো না।

আলোচ্য সংকলনটিতে মোট নয়টি গল্প সংযোজিত হ'য়েছে। পরিবেশ-বৈচিত্র্যে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে আর লিপিকুশলতায় প্রত্যেকটি গল্পই যে পরিণত শিল্পের নিদর্শন এমন না হ'লেও প্রায় প্রতিটি গল্পই বাস্তবানুগ, অর্থহীন উচ্ছ্বাসবর্জিত এবং বর্তমান কালের সমষ্টিচেতনার যথাযথ আলেখ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষের জীবনকে দেখবার যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হ'য়েছে তার আবেদন চিরকালীন।

তবে গল্পগুলো যে লেখকদের 'সেরা' গল্প এটাতেই আমাদের ঘোরতর আপত্তি, কারণ প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এ সংকলনের লেখকদের কাছে আমাদের আশা অনেক, দাবীও কম নয়।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট আলংকরণ মনোজ্ঞ। ৬০।৫৩

গোয়েন্দা কাহিনী

চক্রান্ত ও সংঘর্ষ—শ্রীস্বপনকুমার, শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। দশ আনা।

সর্বজ্ঞ, সর্বগামী ও সর্বক্ষম দস্যু প্রদ্যুম্নের রোমাঞ্চকর অভিযান। ধনীরা সব থরহরি কম্প, পুলিশ বিব্রত। কিন্তু ধুরন্ধর গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জির হাত থেকে কারও রেহাই নেই। আর থাকলেতো ডিটেকটিভ গল্পই হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের জরুরী দলিলপত্র চুরি করে চীন পালাবার পথে শেষ পর্যন্ত জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে দস্যু প্রদ্যুম্নকে খেলা শেষ করতে হয়। বিজয়ী ডিটেকটিভ দলিল নিয়ে ফিরে এলো। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নেই। ষড়যন্ত্রের জটিলতা অথবা ডিটেকশনের বাহাদুরীও নেই। নেহাতই সরল গোয়েন্দা গল্প। ৪২।৫৩

অনুবাদ সাহিত্য

অন্তর্জালা—স্টিফান জাইগ, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০।

ইতিহাস Marriage Alliance-এর মাধ্যমে ভিন্ন দেশীয় মেয়েকে বধূরূপে বরণ ক'রে ঘরে তোলার রেওয়াজ ছিলো। সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি ছাড়াও এর একটা কৃষ্টির দিক ছিলো। বিদেশের মানুষকে আত্মীয়পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সে দেশের বিজ্ঞান, সাহিত্য, সভ্যতাকে এনে ঘরের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে মহিমমণ্ডিত ক'রে তোলাই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন চিন্তাধারাকে স্বদেশজাত ক'রে তোলার কাজে এদেশের অনেকেই ব্রতী হ'য়েছেন। ভিন্ন দেশের বিজ্ঞান দর্শন ছাড়াও কাব্য, গল্প, উপন্যাসও এ দেশীয়

ভাষায় অল্প বিস্তর অনূদিত হ'য়েছে। এ শুধু আশার কথাই নয়, ভরসার কথাও।

স্টিফান জাইগের নাম পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর একাধিক গ্রন্থ সারা ইউরোপে আলোড়ন তুলেছিলো। তাঁর রচনার বিশেষত্ব প্রাপ্তিতে নয়, গভীরত্বে। ব্যাপক চেতনায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্র পুষ্টিলাভ করে না, তিলে তিলে অনুভূতির সূচীমুখে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কিশোর মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে দুটি জীবনের ঘনিষ্ঠতার কাহিনী। স্বল্পতম চরিত্র, ঘটনার তন্তুজাল দিগন্ত প্রসারিত নয়, ঘাত-প্রতিঘাতের সামান্য অবকাশও নেই, কিন্তু নিটোল প্রত্যেকটি চরিত্র, দু একটি আঁচড়ে পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। কিশোর এডগারের চরিত্র গ্রন্থকারের এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার প্রতিটি পদক্ষেপ পরিমিত, প্রতিটি জিজ্ঞাসা কিশোর যৌবনের মধুর রহস্যাবৃত।

কাহিনীটি ভাষান্তরিত করেছেন শান্তি-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদ উপভোগ্য, সাবলীল। কোথাও সামান্য জড়তা নেই, আড়ষ্টতাও নয়। ভিনদেশী চরিত্রদের তিনি এ দেশের পরিচ্ছদ পরিয়েছেন বটে, কিন্তু সে পরিচ্ছদ কোথাও ঢিলেঢালা হয় নি, আঁটও নয়। যে সাহিত্যবোধ থাকলে ও দেশের রসোত্তীর্ণ রচনা এদেশের সার্থক কাহিনীতে রূপান্তরিত করা যায়, সে সাহিত্যবোধ অনুবাদকের পূর্ণমাত্রায় আছে। সেই কারণে অনুবাদ শুধু সুখপাঠ্যই নয়, মনোজ্ঞও হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনবদ্য ভূমিকা গ্রন্থটির প্রধান আকর্ষণ। ৯৬।৫৩

শিশু-সাহিত্য

ঈদের চাঁদ—সওগত আলী আখন্দ, প্রকাশক—মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, কোহিনুর মঞ্জিল, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ইসলামী উপকথার চারটি কাহিনী ছোটদের উপযোগী করে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্প বলার কায়দায় লেখক মোটামুটি সাফল্যও অর্জন করেছেন। তবে ভাষা আরও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। ছোটদের হাতে যে তুলে দিব তার ছাপা-বাঁধাই-প্রচ্ছদপট আরও অনেক সুন্দর হওয়া প্রয়োজন।

সমালোচনা সাহিত্য

শরৎ-স্মরণিকা—সম্পাদক—ডক্টর ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ, সহ-সম্পাদক—অনিলকুমার দে, শরৎ সমিতি, ২২এ, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯। এক টাকা।

বাঙলাদেশে সৃষ্টিশীল সাহিত্য যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে গবেষণার দিকটি সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তাই নির্ভরযোগ্য সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে এখনও অঙ্গুলিমেয়। যেটুকু হয়েছে তারও অধিকাংশ কেবল সাহিত্যকর্মের ওপর। সাহিত্যিকের জীবনচর্যা, তাঁর জীবনাদর্শ এবং রচনায় তার প্রতিভাস এই তিনটিকে একসঙ্গে বিচার করে বৃহত্তর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সামগ্রিক গবেষণার ক্ষেত্র এখনও নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এমন কি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও তেমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও হয়নি। অন্যান্য দেশে একজন বিখ্যাত লেখককে কেন্দ্র করে গবেষণার এক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেক্সপীয়র বা পুস্কিন তাই জাতীয় সম্পদ।

এদিক থেকে শরৎ-স্মরণিকার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। যদি এই সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ পায়, তার তেমন কোন আশা দেখা যাচ্ছে না, সমিতি তাহলে ধন্যবাদার্হ হবে। আলোচ্য স্মরণিকায় শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তি আলোচনা করেছেন। জীবন নিয়ে গবেষণার দৃষ্টান্তও এখানে উপস্থিত। তবে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবর্তমানে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজটি বন্ধ হবে না এই আশাই করব। কয়েকটি আলোচনা নিতান্তই 'বিদ্যালয়গন্ধী'। কবিতাগুলি সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেনি। ৮৫।৫৩

বিদেশ ভ্রমণ

মস্কো থেকে চীন ঃ গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। ২৸০।

লেখিকা সোভিয়েট দেশে 'মাত্র দু' দণ্ড' ছিলেন, চীনে দিন কয়েক এবং তারপর দেশে ফিরেই বই লিখে ফেললেন, 'মস্কো থেকে চীন'। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে যে বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় তা অসাবধানী পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

রাশিয়ায় তাঁর কাছে ভারতের গর্ব করবার মত কোন কিছুর সন্ধান চায়নি কেউ, যে দু' একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন তাদের উচ্ছ্বাসে ভরা আত্মপ্রচার ও নাৎসী-সুলভ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণাটুকুই শুনেছেন তিনি এবং মার্কিন শেতাঙ্গ যেভাবে নিগ্রোদের দিকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ করুণার দৃষ্টিতে তাকায় সেইভাবে তাঁরা ভারতবাসীর প্রতি অপমানকর সহানুভূতি জানিয়েছে বলেই লেখিকা ভারতের একটি ঘৃণ্য ও নোংরা ছবি তুলে ধরেছিলেন তাদের সামনে এবং লিখতে না জানা সত্ত্বেও দেশে ফিরে তাদের দেশ সম্পর্কে প্রচারমূলক বই লেখার আদেশ শিরোধার্য করেছেন। স্বীকারোক্তি ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। বইটির বৈশিষ্ট্য

হ'ল এই যে, বিদেশের পরিচয় (?) যত না আছে এ গ্রন্থের পৃষ্ঠায় তার চেয়ে বেশী আছে নিজের দেশকে দেশে-বিদেশে ঘৃণিত ও অপমানিত করার হীন প্রচেষ্টা। এ ধরণের বইকে বিকার গ্রস্তের প্রলাপোক্তি ভেবে ক্ষমা করবার মত সহনশীলতা ভারতবাসীদের থাকলেও রাশিয়ায় অনুরূপ মন্তব্যের জন্যে যে কোন সোভিয়েট লেখকের ভাগ্যে কি ঘটতো তা জানতে ইচ্ছে করে। চীন সম্পর্কে তাঁর কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, "এ বই-এর সমস্ত মালমশলা চীনে, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।" তাই গোটাকয়েক নিরস জবানবন্দী ও চীনের আইন কানুন থেকে পাতার পর পাতা তুলে দিয়েই দায়িত্ব স্খালন করেছেন তিনি। মায়াকোভস্কির প্রতি সোভিয়েট দেশবাসীর শ্রদ্ধা দেখে তিনি বলেছেন, 'আমাদের রবীন্দ্রনাথকে আমরা আজ শুধু মৌখিক সম্মান দিয়েই খালাস'।' এই হীন এবং মিথ্যা উক্তি গ্রন্থটিতে একটি মাত্র নয় বলেই সহ্য করা যায়। ব্রিটেন শেক্সপীয়রকে যতখানি শ্রদ্ধা করে ভারতবাসী তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করে রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র লেখিকার 'জংগী ভাইবোনরা', মৌখিক সম্মান তো দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে হেয় করবার জন্যে জঘন্য ভাষায় প্রচার চালিয়ে এসেছেন তা জানলে তাঁদের খাসমুলুক রাশিয়াও হয়তো লজ্জায় অধোবদন হবে।

চীন সম্পর্কে লেখিকা কোন বাস্তব ছবি দিতে পারেন নি, শুধু জানিয়েছেন যে, সাম্যতন্ত্রের আগে চীন পৃথিবীর বর্বরতম দেশ ছিল। খুশি হয়েছেন চীনাদের মুখে সাম্যতন্ত্রের হাসি দেখে। ভারতবর্ষ চীনের গেরিলা যুদ্ধের নীরস বিবরণ জানতে চায় না, চীনের জীবনকে দেখতে চায়। সে জীবন যেটুকু এ বই-এ ধরা পড়ে তাতে দেখা যায় কারখানার মালিক সেখানেও আছে, ভূমি-সংস্কার ভারতীয় প্রচেষ্টা থেকে পৃথক নয়, মানুষে-টানা রিক্সা সেখানেও বন্ধ হয়নি রিক্সাওয়ালা হঠাৎ বেকার হয়ে পড়বে এই আশংকায়।

চীনে ধনী চাষীর সম্পত্তি আমরা বাজেয়াপ্ত করিনি', 'এখনও যৌথভাবে জমি চাষ করার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি', 'এই বিংশ শতাব্দীতে চাষের এমনি আদিম যন্ত্রপাতি দেখলে অবাক হতে হয়', 'লেখাপড়া জানা অনেকেই বলে বুদ্ধ নাকি তোমাদের দেশ থেকে এসেছিলেন। আমি অবশ্য একথা বিশ্বাস করি না।' চীনের বিভিন্ন লোকদের কাছ থেকে সংগৃহীত এই সব মালমশলা দেখেও কেন তিনি ভারতবাসীদের সম্বন্ধে ঘৃণার গান গেয়ে বেড়িয়েছেন বোঝা যায় না।

এক জায়গায় লেখিকা বলছেন, 'লন্ডনকে দেখেই যেমন মনে হয়েছিল কোলকাতার কোথায় যেন একে দেখেছি, সাংহাই দেখেই তেমনি মনে হয়েছিল নিউ-ইয়র্কের এ যেন জাত ভাই।' 'মস্কো থেকে চীন' পড়ে আমাদের মনে হয়েছে যেন দুটি পররাষ্ট্রের বিনা মূল্যে প্রচার পুস্তিকা পড়ছি এবং ভারতের রুচিহীন নিন্দা রাঁচি শহরের কোথাও শুনেছি।

পাঠকদের কাছে এ বই বিকারগ্রস্তের রচনা বলে মনে হবে আশংকাতেই সম্ভবতঃ প্রচ্ছদপটে একটি ঘুঘুর ছবি দিয়ে কূট বুদ্ধি আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৪৪।৫২

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

দেশের ছেলে—শান্তশীল দাস, চলতি নাটক নভেল এজেন্সি, ১৪৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲। ৯৩।৫৩

বাজপাখীর রণহুংকার — স্বপনকুমার, জেনারেল লাইব্রেরী, ১১৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য—॥৹। ৯৪।৫৩

গোপাল ভাঁড়—সুধীন্দ্রনাথ রাহা, দেব লাইব্রেরী, ৬৫, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১॥৹। ৯৫।৫৩

নেতাজীর পদক্ষেপ—উমাপদ খাঁ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲। ৯৭।৫৩

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—অনিল বিশ্বাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫৲। ৯৮।৫৩

হরিনাম সাধন রহস্য—জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্মা, গ্রন্থকার কর্তৃক ৯১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৹। ৯৯।৫৩

ময়ূরকণ্ঠী—সৈয়দ মুজতবা আলী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩॥৹। ১০০।৫৩

হাসির ছবির বিবর্তন

মাত্রার বাইরে গেলেই হয় বেহায়াপনা, আর বেহায়াপনাও বেলাগাম হয়ে গেলে দাঁড়ায় বেলেল্লাপনায় তখন আর রুচি ও শালীনতাবোধ বলতে কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে থাকে না। হাসির ছবি নিয়ে বাঙলা চলচ্চিত্র এসেছে এখন এই পর্যায়ে। বুদ্ধি খাটিয়ে রসাল বিষয় পরিকল্পনা করে হাসাবার চেষ্টা দেখলে কোন কথাই উঠতো না, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যশিল্প প্রতিভার সঙ্গে বিরোধ—বোকামী, ক্যাবলামী আর ছ্যাবলামী, আর সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে আদি রসের তাড়না। প্রায় ছবিগুলির সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যেই শালীনতার বাঁধ ভেঙে চলবার কেমন যেন একটা ইঙ্গিত এনে দেবার চেষ্টা দেখা যায়।

*　　*　　*

"বরযাত্রী" ছবিখানির সাফল্যই হলো কাল। ওর মধ্যে তবু সাহিত্যসম্মত রস

রঙ্গজগৎ

ছিলো, শালীনতা ছিলো। ওদেরই দল থেকে বেরিয়ে এসে সুধীর মুখোপাধ্যায় তুললেন "পাশের বাড়ী"। এই আরম্ভ হলো যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েদের প্রেমের অভিযান নিয়ে হুল্লোড়ে গল্প। শালীনতাকে বর্জন করার সামান্য একটু চেষ্টা এ ছবিখানিতে হয়েছে। "মাণিক-জোড়"য়েতে কালীপদ দাশ রুচিকে অমান্য করা যায় কি-না পরীক্ষা করে দেখলেন। এর পর এলো নির্মল দের "৭৪॥"। এতে এলো কলেজী ছেলেমেয়েদের প্রেম করা নিয়ে হুল্লোড়ে কাণ্ডর একটা চেহারা একদিকে, আর একদিকে তেমনি হুল্লোড় প্রৌঢ় দম্পতিকে নিয়ে। ছবিখানির সুস্থতা সম্পর্কে অনেককেই প্রশ্ন তুলতে শোনা গিয়েছে। এর পর এলো খগেন রায়ের "বৌদির বোন" যার নামটাতেই আদিরসের স্বাদ মাখিয়ে দেওয়া রয়েছে। এরপর "শ্বশুরবাড়ী", "ঝকমারি", "বুড়োর বিয়ে", "গোপাল ভাঁড়" প্রভৃতি আগামী ছবিগুলি কি রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবে খানিকটা অনুমান করা যায়।

*　　*　　*

লোকে হাল্কা রসের জিনিস যে পছন্দ করে তাতে ভুল নেই; ওপরে উল্লেখ করা মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির বাজার চল থেকেই তো তা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু, শুদ্ধমাত্র হাল্কারসের ছবিই পছন্দ করে বা সবচেয়ে পছন্দ করে এমন প্রমাণ নেই। তাছাড়া, কতকগুলো ক্যাবলা ছেলেকে এক অনূঢ়া মেয়ের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া ছাড়া লোককে হাসাবার আর কোন পথ নেই, এটাও পরোক্ষে বাঙলার সাহিত্য শিল্প নাট্য প্রতিভা এবং সেই সঙ্গে রুচি ও শালীনতাবোধের ওপর ব্যঙ্গ করা ছাড়া কিছু নয়। ক্যাবলামো দেখে লোকে হাসবেই, কিন্তু সেইটেই কি হাসাবার স্ট্যাণ্ডার্ড?

*　　*　　*

চিত্রভানুর "বৌদির বোন" লোককে হাসানো বিষয়ে চলতি মনোবৃত্তিপ্রসূতই একখানি ছবি। এরও কাহিনী হচ্ছে কতকগুলি ক্যাবলা চরিত্রের ছেলেকে নিয়ে। এদের মধ্যে একজন ছুটলো যে মেয়ের কাছে অপমানিত হয়েছে তারই সঙ্গে প্রেম করতে—নেহাৎই মামুলী ঘটনার মধ্যে দিয়ে সাক্ষাৎ। আর ঐ ছেলেটিকে প্রেমের পথে এগিয়ে দিতে তার সহচর পড়লো আর একটি মেয়ের প্রেমে। এক নম্বর পাত্রের বৌদির ঝোঁক তার বোনটির সঙ্গে দেওরের বিয়ে দেওয়ার এবং সেইজন্যে দেওরটির ওপরে নির্দেশ ছিলো তার বাপের বাড়ীতে দেখা করতে যাওয়ার, যাতে বোনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। ছেলেটি কিন্তু ঘটনাচক্রে যার প্রেমে পড়লো সে-ই যে তার বৌদির বোন তা

"নতুন ইহুদী"-র এক নাটকীয় ক্ষণ—রূপসৃষ্টিতে বাণী গাঙ্গুলী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সে বুঝতে পারেনি, বুঝলো অবশ্য শেষে। বলে রাখা দরকার, এরা সবাই এম-এ ক্লাশের ছেলেমেয়ে!

* * *

একটা প্লট গল্প তৈরী করার চেয়ে কতকগুলো থাপছাড়া ঘটনা সৃষ্টি করেই কাজ সেরে নেওয়া হয়েছে; গল্পের ধারাবাহিকতার দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। আর, হাসাতে হবে বলেই অবান্তর কতকগুলো দৃশ্য তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গী ছেলেটির ভূমিকার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলা বাহুল্য, সকলকে ছাপিয়ে দৃষ্টি জুড়ে থাকেন যদিও পূর্ণমাত্রায় ওর প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ অবাধ নয়। যেন, ভানু লোককে হাসাতে ওস্তাদ ক্ ভানু লোকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় সেইজন্যেই ওকে একটা ভূমিকায় রাখা হয়েছে, চরিত্র সৃষ্টির খাতিরে নয়। অমনিধারা নবদ্বীপ ও নৃপতিকে রাখা হয়েছে কয়েকটি দৃশ্যে, গল্পে তাদের প্রয়োজন থাক বা না থাক। দাদাটি সেজেছেন ছবি বিশ্বাস, তাঁরও কিছু নেই। নাম ভূমিকায় রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়; —"পাশের বাড়ী" দেখে টুকে নেওয়া চরিত্র যেনো তাও আবার অতোটা ঝিলিকও নেই। আরও হাসাবার জন্যে রয়েছেন হরিধন, আশু বোস প্রভৃতি। নায়কের ভূমিকার রয়েছেন বেণু মিত্র, আর তাঁর বৌদিটি হচ্ছেন বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকদিন পর দ্বিতীয়া প্রেমিকার ভূমিকায় আরতি দাসকে দেখা গেলো।

\- \- \-

"বৌদির বোন" হাসির ছবি অবশ্যই বলতে হবে—তবে ছবিখানির গঠনের বিভিন্ন দিকগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে হাস্যকর কৃতিত্ব।

কলম্বিয়া—রেকর্ড

মার্চ মাসের গীতি-সম্ভার

মার্চ মাসের গীতিসম্ভারের মধ্যে তিনখানি আধুনিক ও একখানি শ্যামা-সঙ্গীত। শ্যামল গুপ্ত রচিত গীতিশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান দুখানি "আগামী দিনের সবুজ স্বপ্ন" ও "আমার লক্ষ্মী এলে ঘরে" মনকে পরিতৃপ্ত করে শিল্পীর আবেগভরা কণ্ঠমাধুর্যে। (GE 24660) গান-দুখানির সুর দিয়েছেন অনিল বাগচি। (GE 24661) রেকর্ডখানি অপরেশ লাহিড়ীর সজীব বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে আর সুরের খেলায় সমৃদ্ধ। এই রেকর্ডের দুখানি গানই—"আগডুম বাগডুম" ও "ঠুন্ ঠান্ ঠুন্ বাজে কাঁসি" আধুনিক। শ্রুতিমধুর দুখানি গান গেয়েছেন (GE 24683) রেকর্ডে গায়ত্রী বসু। দুখানি গানেরই সুর দিয়েছেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। দরদী কণ্ঠে গেয়েছেন পান্নালাল ভট্টাচার্য দুখানি চিরমধুর শ্যামাসঙ্গীত (GE 24662) "তোর মত মা এত আপন" ও "তুই নাকি মা দয়াময়ী"।

নৃত্যশিল্পী শান্তা

বিমল বসু

নাট্যশাস্ত্রের যে বিপুল সম্পদ ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে তার আবেদন এতটুকু কমেনি। কিন্তু তাকে পূর্ণ অবিকৃত রূপে পরিবেশন করার মত ঐকান্তিকতার অভাব বেশ কিছুকাল থেকে অনুভূত হচ্ছে। ১৯৫০ সালে শ্রীমতী শান্তা কলকাতায় প্রথম ভরতনাট্যম্ দেখালেন। তার আগে এবং পরে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকবার তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ভরতনাট্যম্ এবং কথাকলি নৃত্যের একজন অন্যতম শিল্পী বলে তাঁর স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। সেদিন উত্তর কলকাতার জনৈক নৃত্যরসিকের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি নাচ শিখতে শুরু করলেন কী করে? একটু মৃদু হাসিতে উত্তরের অর্ধেকটা দিয়ে,

বাকী অর্ধেকটা কথায় বললেন—ঠিক জানি না।

আমি নাছোড়বান্দা। বললাম—তবু—

—তখন দশ এগার বছর বয়স, বম্বেতে ছিলুম। একজন নাচের শিক্ষকের কাছে মণিপুরী আর কথক নাচ শিখতাম। তিনি অনেককে শেখাতেন, আমার জন্য সময় দিতে পারতেন কম। তাতে আমি তৃপ্ত হতে পারলাম না। আমার আরো চাই, অনেক চাই। আমি নাচের সব কিছু শিখতে চাই। কেন কী করে আমার মনে এই প্রেরণা এসেছিল তা বলতে পারব না। আর তেমন গল্প করে বলার মত কিছু নেইও। কেমন করে জানি না, কিসের ডাকে জানি না, চলে এলাম দক্ষিণ ভারতে, ভারতীয় নৃত্যের পীঠস্থানে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে।

[তখন শান্তার চোখের ভঙ্গীতে আমার দৃষ্টি পিছিয়ে গেল কয়েক বছর আগে। দেখতে পেলাম, ওর আজকের সইদের মতই, একটি ছোট্ট মেয়ে, লম্বা লম্বা হাত পা আর বড় বড় একজোড়া চোখ নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে তরঙ্গের তালে তালে, মালাবারের সমুদ্রকূলে। তখনকার প্রচণ্ড উত্তেজনা, অদম্য উৎসাহ আজো ধরা পড়লো বলবার ভঙ্গীতে।]

পেলেন গুরু?

কেরালা কলামণ্ডলমে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামনী মেননের কাছে কথাকলি নাচ শিখতে শুরু করলাম। কথাকলি নাচে প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম দরকার। সেজন্য মেয়েরা বড় কথাকলি শিখতে যায় না। আমাকে তিনি প্রথমে কথাকলি নাচের কতগুলি হাল্কা হাল্কা ভঙ্গী শেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু আমার তো তাতে চলবে না। সম্পূর্ণ কথাকলি আমার শিখতে হবে, নয়তো কিছুই শিখব না। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। সেখানে নিয়ম ছিল বেলা ২॥টা থেকে শিক্ষা শুরু হত, আর রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি চলত —কী তারও বেশি। ক্রমে তিনি আমার একাগ্রতা লক্ষ্য করে কঠিন কঠিন বিষয়-গুলোও শেখাতে থাকেন।

ভরতনাট্যম্ শিখলেন কোথায়?

কথাকলির সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী অট্টম নাচও শিখতে শুরু করলাম কৃষ্ণ পানিক্করের কাছে। মোহিনী অট্টম নাচেও কথাকলির মতই মহা-কাব্যের এক একটা বিষয় বর্ণিত হয়। ভরতনাট্যমের মত এই নাচটিও কেবল একজন মেয়ে নাচে। সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে হয় (সলিকুট্টু বা বোল্)।

[নামের থেকেই বোঝা যায়, মোহিনী অট্টম মুগ্ধকারিকার নাচ; মন হরণ করে নেয়। এর মুদ্রায় মৌলিক পার্থক্য কিছু নেই, কিন্তু প্রয়োগের ঢং আলাদা। চোখ মুখের ভঙ্গী, দেহের ঢং, মুদ্রার প্রয়োগ এবং সঙ্গে সঙ্গে গান সব মিলিয়ে একে পৃথক্ করে দিয়েছে। এই নাচটি অধুনা অবলুপ্তপ্রায়।]

ভরতনাট্যম্?

কলামণ্ডলমে তিন বছর থাকবার পর পান্ডানাল্লুর চলে' এলাম। সেখানে নাট্যকলানিধি বিদ্বান্ মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই-এর কাছে ভরতনাট্যম্ শিখতে শুরু করি।

কেন, কথাকলি ভাল লাগল না?

না না, সেজন্যে নয়, আমি ভরত-নাট্যম্‌ও শিখতে চাই, সেজন্যে একই সঙ্গে তিনটে চালালাম। অবিশ্যি সেজন্য আমার পরিশ্রম করতে হয়েছে অমানুষিক। আর এই 'নটুভানরমদের' (নাট্যশাস্ত্রের শিক্ষক) এক একজনের এক এক রকম জীবনধারা, শিক্ষাপ্রণালী। ভরতনাট্যমের গুরু মীনাক্ষীসুন্দরম্ শিক্ষা দিতে শুরু করতেন ভোর ছ'টা থেকে। আমাকে বহু কষ্ট করে সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে।

[ক্রমে শান্তার একাগ্রতা এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা উভয় গুরুরই মনোরঞ্জন করেছিল। এবং খুব কঠিন কঠিন নাচ-গুলোও শেখাতে শুরু করেন। মাদ্রাজে একবার 'তানবর্ণম' (ভরতনাট্যমের একটি অংশ) নাচবার সময় বিদ্বান্ মীনাক্ষী-সুন্দরম্ পিল্লাই বলেছিলেন যে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি এই নাচটি শেখাবার মত উপযুক্ত শিষ্যা পান নি।]

এই তিনটে নাচের মধ্যে আপনার কোন্‌টা সবচেয়ে ভাল লাগে?

হেসে বললেন, তিনটেই সবচেয়ে ভাল লাগে।

এছাড়া আর অন্য কোন নাচ শেখেন নি?

হ্যাঁ শিখেছি। সিংহলের ক্যান্ডিয়ান নাচ শিখেছি। সেটাও খুব ভাল নাচ।

আচ্ছা, আপনার নাচে এত কম বাজনা থাকে কেন? অন্য অনেকের নাচে দেখেছি কত বাজনা থাকে। আপনি কী বাজনা পছন্দ করেন না?

তা নয়। বাজনা আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু নাচের বাজনায় একরাশ যন্ত্র অপ্রয়োজনীয়। বেশি কতকগুলো যন্ত্র বা বাজনার বাহুল্য নাচের কতকগুলি সূক্ষ্ম কাজকে চেপে দেয়। গানেও অনেক সময় এরকম হয়। সেজন্য ঠিক ঠিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাজনা ব্যবহার করা আমি পছন্দ করি না।

তাহ'লে বাজনা কি শুধু নাচের সঙ্গে ঠেকা দিয়ে যাবে? ওর আর কোন কাজ নেই—এই আপনার মত?

তিন বৎসর পর কলকাতার আসরে পুনরাভির্ভূতা শ্রীমতী শান্তা

তা নয়। শুধু ঠেকা দিয়ে যাবে কেন? যেমন ধরুন মৃদঙ্গম। নর্তক বা নর্তকীর যেমন ক্লাসিকাল নৃত্যে 'মনোধর্ম' আছে—মৃদঙ্গমের তেমন 'মনোধর্ম' আছে। অর্থাৎ তাল মান লয়ের সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখে মৃদঙ্গ-বাদক তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। এবং সেটা নাচের সহায়ক, বিরোধী নয়। কিন্তু অনেকগুলি যন্ত্রের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। অনেকে হয়ত নাচের দোষত্রুটি চাপা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

আপনি কি এখনো নিয়মিত সাধনা করেন?

যখন বাইরে থাকি তখন ঘণ্টা চারেকের বেশি হয়ে ওঠে না, নতুবা নিয়মিত আট ঘণ্টার কম নয়।

সিনেমা দেখেন?

না, সিনেমা আমার ভাল লাগে না।

তবে, অবসর সময় কী করে কাটান?

একটু ব্যক্তিগত জীবনের ভিতর ঢুকে পড়বার ইঙ্গিত করেই প্রশ্নটা করলাম। দেখলাম যে কাজটা তিনি অবসর সময় করেন সেটা বলতে একটু সলজ্জ ভাব।

অবসর সময় একটা কিছু তো নিশ্চয় করেন?

একটু সলজ্জভাবেই বললেন, আমি একটু ছবি আঁকতে ভালবাসি।

অবস্থাটাকে একটু হাল্কা করে আনবার জন্য বললাম, এতো খুব ভাল কথা, চার্চিলও শুনেছি অবসর সময় ছবি আঁকেন।

আর কিছু করেন না? বই-টই পড়া?

তাও কিছু কিছু পড়ি।

কি জাতীয় বই আপনি পড়েন?

দর্শন পড়তেই আমি ভালবাসি। বিশেষ করে উপনিষদ, ভাগবৎগীতা ইত্যাদি।

তা'হলে একেবারে একটু হল না। সে তো অনেক।

কবিতা?

কবিতা খুব ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা আমি পড়েছি, খুব ভাল লাগে। শেলী কীটসের কবিতাও আমি খুব পছন্দ করি।

বিদেশে কেন যেতে চান?

বিদেশে যাবার জন্যে যে আমি উৎসুক তা নয়। তবে বিদেশ থেকে অনেক আহ্বান আসে। আর আমার বন্ধুরাও বললেন তাই যাচ্ছি। খুব উৎসুকও নই, আবার সুযোগ এলে প্রত্যাখ্যান করব এমন মনোভাবও নেই।

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের শ্রমসাধ্য ভ্রমণ ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের ও সুখের বিষয় যে, এই দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণে যেরূপ ব্যর্থতার পরিচয় দিবেন বলিয়া অধিকাংশ লোক আশঙ্কা করিয়াছিলেন সেইরূপ কিছু হয় নাই। ভারত টেস্ট পর্যায়ের খেলায় বিজয় গৌরবে ভূষিত না হইলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বেশ সুনাম ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। ইহার মধ্যেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট দলের অধিনায়ক স্টলমেয়ার ভ্রমণ শেষে বেশ উৎসাহদ্দীপক ও প্রশংসাসূচক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় দল সম্পর্কে আমার মনোভাব বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ। দল হিসাবে আমার ধারণা ভারতের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই উচ্চাঙ্গের—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অপেক্ষাও ভাল। গুপ্তের বোলিং সত্যই অপূর্ব। আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে ইহার সমতুল্য ডান হাতের স্পিন বোলারের সম্মুখীন ইতিপূর্বে আমি কখনও হই নাই। ইনি অচিরেই বিশ্বের একজন খ্যাতনামা বোলার হিসাবে পরিগণিত হইবেন। আমরা টেস্ট পর্যায়ের খেলায় জয়ী হইয়াছিল কেবল ব্যাটিংএ ভারতীয় দল অপেক্ষা ভাল হওয়ায়। ইহা ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান ফ্রাঙ্ক ওরেল, ওয়ালকট ও উইকস এইবারের খেলায় পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারায় আমরা জয়ী হইতে পারিয়াছি।" ইহার পরেই তিনি ভারতীয় দলের ফাস্ট বোলারের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সকলেই জানে ও এই বিষয়ে ভারতে বহু সংবাদপত্রে বহু আলোচনা প্রচারিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান শীঘ্র যে হইবে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কোন একটি সুচিন্তিত ধারাবাহিক কার্যকরী পরিকল্পনা ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ করেন নাই—করিবার ন্যায় ধৈর্য বা নিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা কেবল খেলার অনুষ্ঠান ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট। এই মনোভাব যতদিন পরিবর্তিত না হইতেছে ততদিন ক্রিকেটের চরম উন্নতি সম্ভব নহে।

খেলার মাঠে

ভারত রবার লাভে বঞ্চিত

১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণে আসিয়া ভারতীয় ক্রিকেট দলকে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পরাজিত করেন। এইবারে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। পাঁচটি খেলার মধ্যে একটি খেলায় জয়ী হইয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যেভাবে টেস্ট পর্যায়ের রবার লাভ হইতে ভারতকে বঞ্চিত করেন এইবারেও তাহাই হইয়াছে। এইবারের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল একটিমাত্র টেস্ট খেলায় ভারতকে পরাজিত করিয়াছেন। অবশিষ্ট সবগুলি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। তবে এইখানে ইহা বলিলে কোন অন্যায় হইবে না যে, ১৯৪৮—৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল চতুর্থ টেস্ট খেলায় মাদ্রাজ মাঠে ভারতীয় দলকে ইনিংসে পরাজিত করেন এবং ঐ খেলাই জয়পরাজয় নিষ্পত্তি করে। এইবারে কিন্তু তাহা হয় নাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এইবারে দ্বিতীয় টেস্টে মাত্র ১৪২ রাণে পরাজিত করিয়াছেন তাহাও খুবই ভাগ্যবলে। ভারতীয় ক্রিকেট দল যেভাবে খেলা আরম্ভ করিয়াছিল তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব হইত না।

মোট রানের গড়পড়তায় তারতম্য

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের পাঁচটি টেস্ট খেলায় মোট রানের গড়পড়তাও উল্লেখযোগ্য। দেখা যাইবে এই বিষয়েও ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

পাঁচটি টেস্ট খেলার ৬৬টি উইকেটে মোট ২৬৪৩ রান সংগ্রহ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫৬২ রান ব্যাটিংয়ে ও ৮১ রান অতিরিক্ত হিসাবে আসিয়াছে। ফলে প্রত্যেক উইকেটে রান সংখ্যার গড়পড়তা দাঁড়ায় ৪০·০৪ রান।

ভারত

পাঁচটি টেস্ট খেলার ৯২টি উইকেটে মোট ২৯৪২ রান সংগ্রহ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৮৫০ রান ব্যাটিংয়ে ও ৯২ রান অতিরিক্ত হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক উইকেটের গড়পড়তা দাঁড়ায় ৩১·৯৭ রান।

ব্যক্তিগত শতাধিক রান

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কয়েকজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগত শতাধিক রান লাভেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে হীন প্রতিপন্ন হয় নাই। বিশেষ করিয়া টেস্ট খেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

[ভারতের পক্ষে]

আপ্তে—১৬৩ (৩য় টেস্ট)

পি রায়—১৫০ (৫ম টেস্ট)
উমরিগর—১৩০ (১ম টেস্ট)
—১১৭ (৫ম টেস্ট)
মঞ্জরেকার—১১৮ (৫ম টেস্ট)
[ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে]
ওরেল—২৩৭ (৫ম টেস্ট)
উইক্‌স—২০৭ (১ম টেস্ট)
—১৬১ (২য় টেস্ট)
—১০৯ (৫ম টেস্ট)
ওয়ালকট—১২৫ (৪র্থ টেস্ট)
—১১৮ (৫ম টেস্ট)
পিয়ারোড়ু—১১৫ (১ম টেস্ট)
স্টলমেয়ার—১০৪ * (৩য় টেস্ট)

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়পড়তা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতীয় দলের ভ্রমণের ব্যাটিং ও বোলিং সমগ্রভাবে আলোচনা না করিয়া যদি টেস্ট খেলাকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে—ভারতীয় দলের গড়পড়তার তালিকা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একরূপ সমতুল্য বলা চলে।

টেস্ট ম্যাচে গড়পড়তা হিসাব

[ব্যাটিং]

ভারতীয় দল

	খে	ইং	ন আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
উমরিগর	৫	১০	১	৫৬০	১৩০	৬২·২২
আপ্তে	৫	১০	১	৪৬০	*১৬৩	৫১·১১
পি রায়	৪	৮	০	৩৮৩	১৫০	৪৭·৮৭
মঞ্জরেকার	৪	৮	১	২৫৪	১১৮	৩৬·২৮
মানকড়	৫	১০	২	২২৯	৯৬	২৮·৬২
ফাদকার	৪	৬	০	১৬৩	৬৫	২৭·১৭
রামচাঁদ	৫	১০	০	২৪৯	৬২	২৪·৯০
সোধন	২	৪	১	৭১	৪৬	২৩·৬৭
গাদকারী	৩	৫	২	৬৮	*৫০	২২·৬৭
গাইকোয়াড়	২	৩	০	৬৭	৪৩	২২·৩
ঘোরপাদে	২	৩	০	৬৩	৩৫	২১·০০
হাজারে	৫	১০	০	১৯৪	৬৩	১৯·৪০
গুপ্তে	[illegible]	৮	৩	৪৫	*১৭	৯·০০
যোশী	৩	৫	০	৪২	৩২	৮·৪০

* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক

[বোলিং]

	ও	মে	রাণ	উইঃ	গড়
ফাদকার	১১৩·১	৩৩	২৩০	৯	২৫·৫৬
গুপ্তে	৩২৯·৩	৮৭	৭৮৯	২৭	২৯·২২
হাজারে	৫৮	১০	১৩২	৩	৪৪·০০
রামচাঁদ	১৫৪	৩৬	৩০২	৮	৩৭·৭৫
মানকড়	৩৪৫	১০২	৭৯৬	১৫	৫৩·০৭

[ব্যাটিং]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

	খে	ইং	ন আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
উইকস	৫	৮	১	৭১৬	২০৭	১০২·২
ওয়ালকট	৫	৭	১	৪৫৭	১২৫	৭৬·১
ষ্টলমেয়ার	৫	৯	৩	৩৫৪	*১০৪	৫৯
ওরেল	৫	৮	০	৩৯৮	২৩৭	৪৯·৭
রে	২	৩	১	৭৯	*৬৩	৩৯·৫
পেয়ারোডো	৫	৮	০	২৫৭	১১৫	৩২·১
রামাধীন	৪	৫	৩	৪০	*১৬	২০
ক্রিশ্চিয়ানি	২	৪	১	৪২	৩৩	১৪
গোমেজ	৪	৫	০	৬২	৩৫	১২·৪
লীগ্যাল	৪	৫	০	৫০	২৩	১০
কিং	৫	৬	০	৩৩	১৯	৫·৫
ভ্যালেন-টাইন	৫	৬	১	২৩	১৩	৪·৬

* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক

[বোলিং]

	ও	মে	রান	উইঃ	গড়
ওয়ালকট	৩৫	১৪	৪৮	২	২৪
কিং	২৩৮	৭৮	৪৮০	১৭	২৮·২৩
ভ্যালেনটাইন	৪৩০	১৭৯	৮২৭	২৮	২৯·৫৩
গোমেজ	২৩৫	৯৯	৩৭৯	১১	৩৪·৪৫
রামাধীন	২৩২	৯৬	৪৭১	১৩	৩৬·২৩
ওরেল	১৩০	৩৪	২৬৩	৭	৩৭·৫৭
স্টলমেয়ার	৭১	১৩	২৩১	৩	৭৭

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ

হইয়াছে সত্য, কিন্তু খেলা প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত যেরূপ চরম উত্তেজনাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয় ইতিপূর্বে ভারতীয় দলের খুব কম খেলাতেই তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই খেলার জয়-পরাজয়ের উপর ভারতীয় দলের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল এবং ভারতীয় খেলোয়াড়গণও জয়ী হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক খেলার শেষে দলের তরুণ খেলোয়াড়দের প্রশংসা করিয়াছেন ও পুরস্কৃত করিয়াছেন। ইহা না করিয়া বোধ হয় তাঁহার উপায় ছিল না। তিনি ভ্রমণের অধিকাংশ খেলায়, বিশেষ করিয়া শেষভাগে কি ব্যাটিং, কি বোলিংয়ে কোন বিষয়েই স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় দলের খেলোয়াড়দের হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে দেখা গিয়াছে তরুণ খেলোয়াড়গণ দলের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ ত্রুটি করে নাই। দলের পরাজয় যখন সুনিশ্চিত তখন অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া অবস্থা পরিবর্তন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পি রায় ও মঞ্জরেকার ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় ভারত নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে চারিটি খেলা অমীমাংসিত ও একটি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী হওয়ায় টেস্ট পর্যায় খেলার গৌরব পুনরায় লাভ করিয়াছে। নিম্নে পঞ্চম টেস্ট ও অন্যান্য সকল টেস্ট খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

১৯৫২-৫৩ সালের ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার ফলাফল

বিভিন্ন টেস্ট খেলার ফলাফল

(১) প্রথম টেস্ট ম্যাচ পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিত।

ভারত ১ম ইনিংস:—৪১৭ রাণ (আপ্তে ৬৪, রামচাঁদ ৬১, উমরিগার ১৩০, সোধন ৪৫, গোমেজ ৮৪ রাণে ৩টি উই:)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস:—৪৩৮ রাণ(উইকস্ ২০৭, পেয়ারাডো ১১৫, ওয়ালকট ৪৭, এস গুপ্তে ১৬২ রাণে ৭টি উইকেট পান)।

ভারত ২য় ইনিংস:—২৯৪ রাণ (আপ্তে ৫২, উমরিগার ৬৯, ফাদকার ৬৫, রামাধীন ৫৮ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস:—১৪২ রাণ কেহ আউট না হইয়া (রে ৬৩ রাণ নট আউট ষ্টলমেয়ার ৭৬ রাণ নট আউট)।

(২) দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ব্রিজ টাউনে অনুষ্ঠিত হয়। ভারত খেলায় ১৪২ রাণে পরাজিত।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস:—২৯৬ রাণ (ওয়ালকট ৯৮, উইকস ৪৭, এস গুপ্তে ৯৯ রাণে ৩টি, মানকড় ১২৫ রাণে ৩টি, হাজারে ১৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারত ১ম ইনিংস:—২৫৩ রাণ (আপ্তে ৬৪, হাজারে ৬৩, উমরিগার ৫৬, ভ্যালেণ্টাইন ৫৮ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস:—২২৮ রাণ (ষ্টলমেয়ার ৫৪, ফাদকার ৬৪ রাণে ৫টি উইকেট পান)

ভারত ২য় ইনিংস:—১২৯ রাণ (রামচাঁদ ৩৪, রামাধীন ২৬ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

(৩) তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিত।

ভারত ১ম ইনিংস:—২৭৯ রাণ (রামচাঁদ ৬২, উমরিগার ৬১, কিং ৭৪ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস:—৩১৫ রাণ (উইকস ১৬১, গুপ্তে ১০৭ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ভারত ২য় ইনিংস:—৭ উই: ৩৬২ রাণে ডিক্লেয়ার্ড (আপ্তে ১৬৩ রাণ নট আউট, উমরিগার ৬৭, মানকড় ৯৬)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস:—২ উই: ১০৮ রাণ (ষ্টলমেয়ার ৫৫ রাণ নট আউট)।

(৪) চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ব্রিজ টাউনে অনুষ্ঠিত হয়। শেষ তিনদিন বৃষ্টির জন্য খেলা পরিচালনা করা একরূপ সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত খেলা পরিত্যক্ত হয় ও অমীমাংসিতভাবে শেষ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ভারত ১ম ইনিংস:—২৬২ রাণ (মানকড় ৬৬, গাদকারী নট আউট ৫০, ভ্যালেণ্টাইন ১২৭ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস:—৩৬৪ রাণ (ওয়ালকট ১২৫, উইকস ৮৬, ওরেল ৫৬, এস গুপ্তে ১২২ রাণে ৪টি, মানকড় ১৫৫ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

ভারত ২য় ইনিংস:—৫ উই: ১৯০ রাণ (পি রায় ৪৮, ভ্যালেণ্টাইন ৭১ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

(৫) পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ কিংসটনে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা অমীমাংসিত।

ভারত ১ম ইনিংস:—৩১২ রাণ (উমরিগার ১১৭, পি রায় ৮৫ রাণ, মাঞ্জরেকার ৪৩, ভ্যালেণ্টাইন ৬৪ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস:—৫৭৬ রাণ (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯, ওয়ালকট, ১১৮, পেয়ারাডো ৫৮, এস গুপ্তে ১৮০ রাণে ৫টি, মানকড় ২২৮ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

ভারত ২য় ইনিংস:—৪৪৪ রাণ (পি রায় ১৫০, মাঞ্জরেকার ১১৮, আপ্তে ৩৩, রামচাঁদ ৩৩, ঘোড়পাড়ে ২৪, গোমেজ ৭২ রাণে ৪টি, ভ্যালেণ্টাইন ১৪৯ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস:—৪ উই: ৯২ রাণ (উইকস ৩৬, ওরেল ২৩, রামচাঁদ ৩৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ—

৩১শে মার্চ—গতকল্য রাত্রিতে উত্তর কলিকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে একদল দুর্বৃত্তের দুঃসাহসিক আক্রমণের ফলে দুইজন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে একজন কলিকাতা কর্পোরেশনের এক কাউন্সিলরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অপরজন তাঁহার প্রতিবেশী ও আত্মীয়।

অদ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৪নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনের সময় এক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। হাওড়া গোলাবাড়ী থানার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এবং ইহাতে সোডার বোতল, ইটপাটকেল ও পটকা নিক্ষিপ্ত হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ লাঠি চালায়। ইটপাটকেল ও পটকা নিক্ষেপ এবং লাঠিচালনার ফলে ২২ জন আহত হয়।

লণ্ডনের ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার বৈদেশিক সম্পাদক মিঃ চার্লস ফোলি বিশেষ কার্যব্যপদেশে করাচী আসিয়া যে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে তিনি বলিয়াছেন, 'পাকিস্থানের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৃটেন যে শত শত বৃটিশ অফিসারকে ধার দিয়াছে, তাহারা ভারত আক্রমণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।'

অদ্য সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত মৃত্যুকর বিল লোকসভায় পেশ করা হইয়াছে। উহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, মৃত্যুকর ধার্য হইতে রেহাই পাওয়ার যোগ্য সম্পত্তির ন্যূনতম মূল্য হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার টাকা হইবে।

১লা এপ্রিল—গতকল্য রাত্রে গয়া হইতে ২২ মাইল দূরে গয়া-নওয়াদা লাইনে দুইটি মালগাড়ীর মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে ৫ জন নিহত এবং ২১ জন আহত হয়।

মিঃ এম এ খুরো অদ্য সিন্ধু চীফ কোর্টে পাকিস্থান মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে এক ইনজাংশন মামলা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, খাজা নাজিমুদ্দিনকে অবৈধভাবে প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছে এবং লীগ প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি যাহাতে কোনরূপ নির্দেশ জারী করিতে না পারেন তজ্জন্য ইনজাংশন প্রার্থনা করা হয়।

২রা এপ্রিল—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য লুসাই পাহাড়ের সদর আইজলে পৌঁছিলে পাঁচ হাজার উৎফুল্ল লুসাই নরনারী ও শিশু তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

সুইজারল্যাণ্ডে ভারতীয় দূত জনাব আসফ আলির মৃত্যুতে অদ্য লোকসভায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। মৌলানা আজাদ বলেন, জনাব আসফ আলি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অক্লান্ত যোদ্ধা। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি এবং শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু যথাক্রমে কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। উভয়েই সংখ্যাগুরু কংগ্রেস দলের সদস্য।

৩রা এপ্রিল—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য ১২৮ মাইল দীর্ঘ আইজল-লুংলে রাস্তার উদ্বোধন করেন।

পাকিস্থানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ অদ্য পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যরা কাশ্মীরের উত্তর প্রত্যন্তে পাকিস্থানের সীমানা লঙ্ঘন করিয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল—অদ্য দিল্লীতে ভারতীয় জীবন বীমা অফিস সংঘের রজত জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

অদ্য সিউড়ীতে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জি ও তাঁহার পরামর্শদাতা কমিটির অপসারণের দাবী জানান হয়।

৫ই এপ্রিল—এই বৎসর উড়িষ্যায় অত্যধিক পরিমাণে ধান উৎপন্ন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের বরাদ্দ ৩২,৮০০ টন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত ২০,০০০ টন চাউল বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ আরও ২০,০০০ টন ধান পাইবে।

মোগার সংবাদে প্রকাশ, কম্যুনিস্ট অধিকৃত তিব্বতের সন্নিহিত অঞ্চলে পাঞ্জাব, পেপসু ও হিমাচল প্রদেশের গভর্নমেণ্টসমূহ সীমান্তস্থিত জিজ্ঞাসাবাদ ঘাটি স্থাপন ও নূতন সৈন্য আমদানীসহ কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। হিমালয়ের উত্তর দিক হইতে এইসব পাহাড়িয়া অঞ্চলে গোপনে সশস্ত্র কম্যুনিস্টগণের প্রবেশের সম্ভাবনা আছে বলিয়া কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সংবাদ পৌঁছিবার পর এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ—

৩১শে মার্চ—কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসাকল্পে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সহিত কাশ্মীর সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি ডক্টর ফ্রাঙ্ক গ্রাহামের সর্বশেষ যে আলাপ আলোচনা হয়, অদ্য তিনি তাহার বিবরণ নিরাপত্তা পরিষদে দাখিল করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন যে, আলোচনার সময় অসামরিকীকরণের মেয়াদের অন্তে যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার উভয় দিকে উভয় পক্ষের কত সৈন্য ও কি ধরণের সৈন্য মোতায়েন থাকিবে, সে বিষয়ে মতভেদ কিছুটা হ্রাস পাইলেও, এখনও যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। সুতরাং উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মতানুসারে তিনি আলোচনায় যবনিকাপাত করিতে সিদ্ধান্ত করেন।

১লা এপ্রিল—নাইরোবিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মাও মাও সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত বলিয়া বর্ণিত কাফ্রিদের আক্রমণে এক্ষণে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

অদ্য মস্কো বেতার হইতে প্রচারিত একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভ কোরিয়ায় রুগ্ন বন্দী বিনিময় সম্পর্কে কম্যুনিস্টরা যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহাকে যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার একটা সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করেন।

নিরাপত্তা পরিষদ আজ সুইডেনের দাগ হ্যামারস্ক জোয়েসকে সেক্রেটারী জেনারেলের পদের জন্য সুপারিশ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

২রা এপ্রিল—গতকল্য রাত্রিতে সুইজারল্যাণ্ডস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জনাব আসফ আলি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া বার্নে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ রবিবার বিমানযোগে ভারতে নীত হইবে।

৪ঠা এপ্রিল—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জর্জ ম্যালেনকভের সরকার ১৫ জন চিকিৎসকের মুক্তির সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। কয়েকজন সোভিয়েট নেতার মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে গত জানুয়ারী মাসে মস্কোয় যে নয়জন চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে তাঁহারাও আছেন।

৫ই এপ্রিল—চতুঃশক্তি বিমান নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনাকল্পে আগামী মঙ্গলবার বার্লিনস্থ সোভিয়েট হেড কোয়ার্টারে বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিন প্রতিনিধিগণ সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইবেন।

কম্যুনিস্ট সংযোগ রক্ষা কর্মচারিগণ পীড়িত ও আহত বন্দিবিনিময় সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামীকল্য পান-মুন-জনে রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্মচারিগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতীয় মূল্য : প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থানের মূল্য : প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।